মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচি

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষান্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৬৯

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

কচ ও দেবযানী

ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

"ভারতবর্ষ" পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে জানিয়েছেন তাঁর শুভেচ্ছা ও তাঁর আশা যে "ভারতবর্ষ" আরও বহু বৎসর ধরে আমাদের মাতৃভূমির সেবা করবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

ভারতের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

"ভারতবর্ষর"-র সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জানিয়েছেন তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয়া শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

"ভারতবর্ষ"-র সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরে পদার্পণের সংবাদে প্রীত হয়ে তাঁর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।
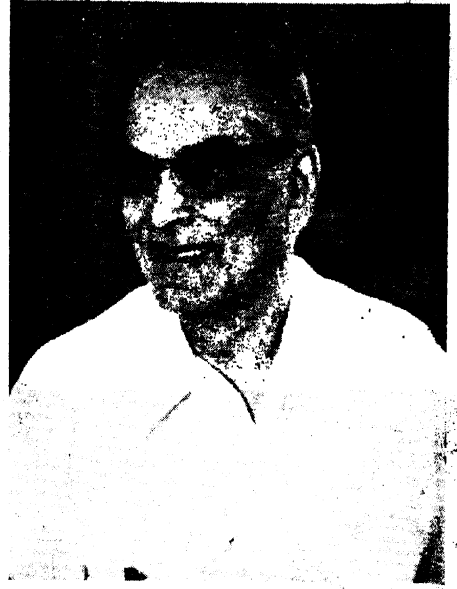
CHIEF MINISTER
WEST BENGAL.

কলিকাতা-১।
জুন ২৮, ১৯৬২

বর্তমান আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র ৫০ বৎসরে পদার্পণ করিল জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। আমি এই ৫০ বৎসরই ভারতবর্ষ পড়িয়া থাকি। ইহার সৎ-সাহিত্য প্রচার ও রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তার সমর্থনের জন্য আমার মত সকলেই "ভারতবর্ষ"-কে ভালবাসে। আমি ইহার আরও উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি। ইহার পরিচালকদের জীবন পবিত্রতর হউক—তাহাই আশীর্বাদ করি।

কৃষি, খাদ্য, ও সরবরাহ
মন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ১২ই জুন, ১৯৬২

প্রিয় শৈলেন,

তোমার ৮ই জুন তারিখের পত্রে 'ভারতবর্ষ'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সংবাদ জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইতিপূর্বে ফণিদা-ও এ সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন।

বাংলাভাষার সমৃদ্ধিতে সংবাদ-সাহিত্যের দান অপরিসীম। এই সংবাদ-সাহিত্য পরিবেশনে যে সকল সাময়িক পত্রিকা অগ্রণী হইয়াছিলেন 'ভারতবর্ষ' তাহাদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের মনীষীদের অনেকেরই সাহিত্য-প্রতিভার অঙ্কুর 'ভারতবর্ষ'-এর মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

আমি আশা করি আরও বহুদিন 'ভারতবর্ষ' সাহিত্যের সেবা করিয়া জাতীর সংস্কৃতির উন্নতি এবং প্রসার করিবে।

ইতি—তোমাদের—

শ্রীশৈলেনকুমার চ্যাটার্জি
সম্পাদক, "ভারতবর্ষ"
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি

গ্রাম : "বি পি সি সি"

ফোন : { ৪৭-৩২১৪
৪৭-৩২১৪

"কংগ্রেস ভবন"
ভব্লিউ.সি./ ১৭৬০
১৮।৬।৬২ ইং
৫৯-বি, চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা—২০

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। শুধু অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের রচনা সমৃদ্ধ হয়ে নয়, বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে 'ভারতবর্ষ' যেভাবে সাহিত্য সাধনার পরিচয় বহন করে এনেছে তা নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কালের বিচিত্র গতির সংগে সংগ্রাম করে 'ভারতবর্ষ' যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য বজায় রাখতে পেরেছে তার জন্যও এঁরা নিশ্চয় গৌরব অনুভব করতে পারেন।

'ভারতবর্ষের' এই শুভদিন উপলক্ষে অগণিত গুণগ্রাহী-দের সংগে আমিও তার দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

অতুল্য ঘোষ

(অতুল্য ঘোষ)

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, 'ভারতবর্ষ'
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

MINISTER
INFORMATION AND BROADCASTING
INDIA.

Camp: "Armsdell",
Simla S. W.
June 24, 1962.

My dear Mr. Chatterjea,

Happy to learn that 'The Bharatvarsha' has completed 50 years of its useful existence. Founded by the Poet and Dramatist late Dwijendra Lal Roy, it has attracted the attention of very eminent Bengali writers and given opportunities to many talented young men to rise to eminence through the columns of your journal. I can only send my hearty felicitations and wish your journal continued success.

Yours Sincerely,

B. Gopala Reddi

(B. Gopal Reddy)

Shri Sailen Kumar Chatterjea,
Editor, "The Bharatavarsha",
203-1-1 Cornwalis Street,
CALCUTTA: 6.
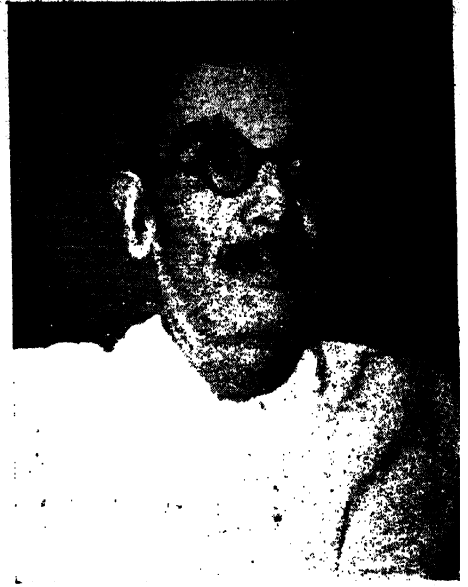
EDUCATION MINISTER,
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
১৫।৬।৬২

বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, হাসির গানের স্রষ্টা, জাতীয় সঙ্গীতের নবধারার প্রবর্ত্তক কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, জলধর সেন মহাশয়দিগের ন্যায় প্রখ্যাত সাহিত্যিকদিগের সম্পাদিত, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা সমৃদ্ধ 'ভারতবর্ষে'র সুবর্ণ-জয়ন্তী সমাগত শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় নিরত এমন দীর্ঘায়ু ও গৌরবান্বিত মাসিক পত্র বড় বেশী নাই। অতএব 'ভারতবর্ষে'র এমন সৌভাগ্যের দিনে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, আর কামনা করি তাহার অধিকতর সমৃদ্ধ শতায়ুঃ।

(রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী)

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য
ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর
অভিনন্দন বাণী—

২২, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা—৬
২৯.৬.৬২

"ভারতবর্ষ" পত্রিকা পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করল জেনে খুবই খুসী হলাম। Survival of the fittest-প্রকৃতির নিয়ম, আর সেই নিয়মে "ভারতবর্ষ" পঞ্চাশ বৎসর ধরে অস্তিত্বই শুধু বজায় রাখে নি - গুণে, গরিমায়, উৎকর্ষে, বৈশিষ্ট্যে ও আভিজাত্যে গরীয়াণ হয়ে বিরাজ করছে। আমি বিজ্ঞান-সেবী, কিন্তু সাহিত্য-রসে বঞ্চিত নই। সাহিত্য আমি ভালবাসি। "ভারতবর্ষ" আমার প্রিয় পত্রিকা। তার অগণিত নিয়মিত পাঠকবর্গের মধ্যে আমিও একজন। আজকে তার এই শুভবর্ষে "ভারতবর্ষ" কে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং আশা করি আরও বহু বহু বৎসর ধরে সে বাংলা সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগের সেবা করে যেতে পারবে—

সত্যেন বোস

[সকল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-বাণী এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না—আগামী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করা হবে
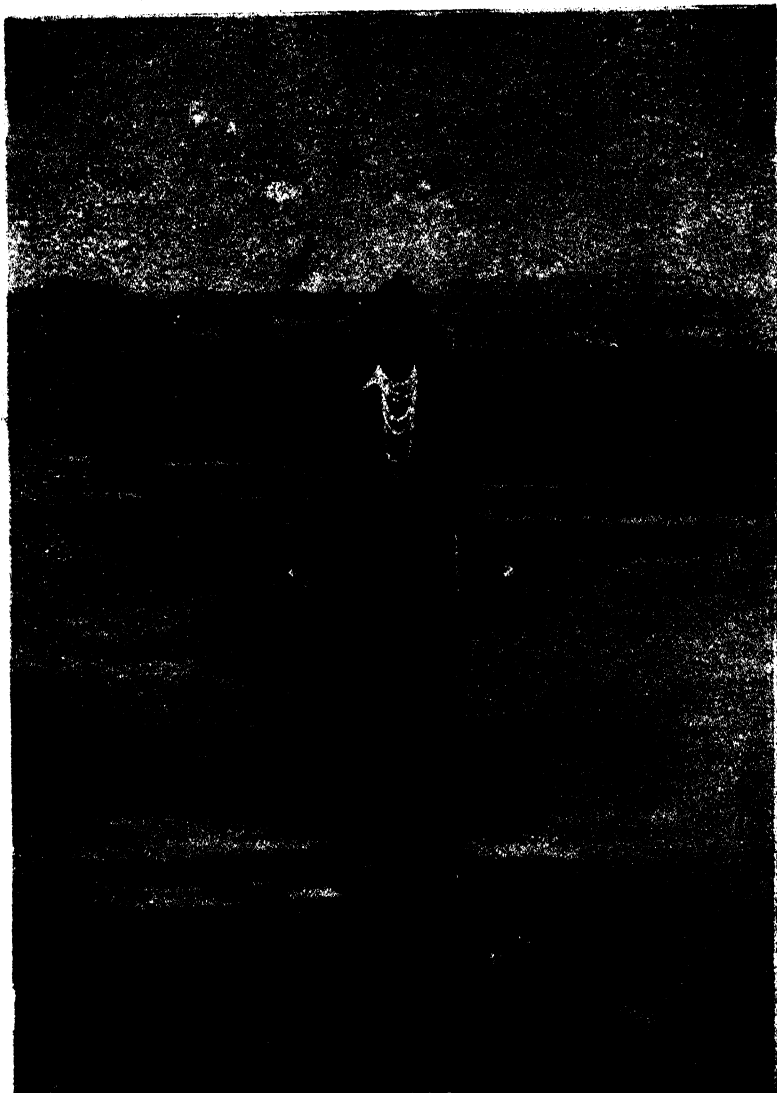
॥ ভারতবর্ষ ॥

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ"—

[অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রকাশিত ভারতমাতার প্রতিকৃতি।]

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

ভারতবর্ষ

আষাঢ়—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

আজি হ'তে অর্দ্ধ-শতবর্ষ আগে "ভারতবর্ষ"-প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশপ্রেমিক কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ভারতবর্ষ'-র প্রথম সংখ্যার জন্য যে অমর সঙ্গীত করেছিলেন সৃষ্টি, তখনকার দিনে প্রায় জাতীয় সঙ্গীতের পর্য্যায়ে যা হয়েছিল উন্নীত, যার মাধুর্য্য ও মহিমা আজও হয়নি নষ্ট কালের প্রভাবে, নিঃশেষিত হয়নি যার প্রয়োজন সময়ের পরিবর্ত্তনে—আজিও যার সুর-ঝঙ্কারে ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে বাঙ্গালী তথা আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর মন হয়ে উঠে উৎসাহিত, উদ্দীপিত, উচ্ছ্বসিত—সেই কালজয়ী সঙ্গীতকে আজ অর্দ্ধশতাব্দী পরে প্রতিষ্ঠাতার পুণ্য স্মৃতিতে 'ভারতবর্ষ'-র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করে আবার প্রকাশ করা হল সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরের প্রথম সংখ্যায়। —সম্পাদক।

॥ ভারতবর্ষ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রী!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

২

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে— তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

৩

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট ; সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !'

৪

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিককলরবে, চুম্বি তোমার চরণপ্রান্ত ;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ ।"

৫

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তানতরে কত না বেদনা কত না হর্ষ
—জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের "ভারতবর্ষ"-র প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতা ছু'টির মুদ্রিত চিত্র।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২০

সম্পাদক

শ্রীজলধর সেন, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
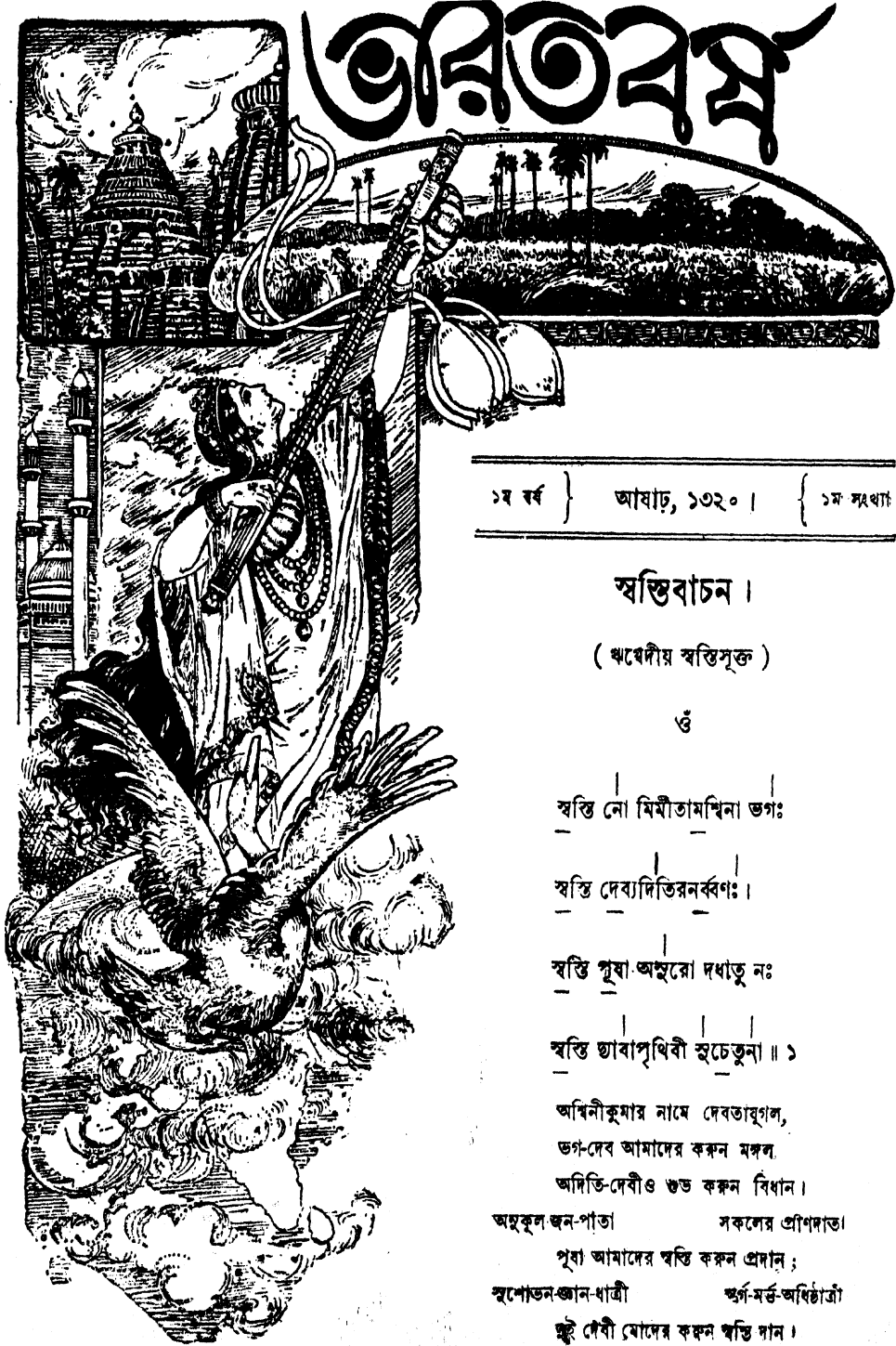
১ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২০। { ১ম সংখ্যা

স্বস্তিবাচন।

(ঋগ্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত)

ওঁ

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ

স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ।

স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ

স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা ॥ ১

অশ্বিনীকুমার নামে দেবতাযুগল,
ভগ-দেব আমাদের করুন মঙ্গল,
অদিতি-দেবীও শুভ করুন বিধান।
অনুকূল-জন-পাতা সকলের প্রাণদাতা
পূষা আমাদের স্বস্তি করুন প্রদান;
সুশোভন-জ্ঞান-ধাত্রী স্বর্গ-মর্ত্ত-অধিষ্ঠাত্রী
দুই দেবী মোদের করুন স্বস্তি দান।

অর্দ্ধ-শতাব্দী আগে "ভারতবর্ষ"-র প্রথম সংখ্যার 'সূচনা'-তে সম্পাদকদ্বয় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা এ যুগেও উদ্ধৃতির যোগ্যই শুধু নয়, অবশ্য পাঠ্যও। —সম্পাদক

= সূচনা =

যেদিন স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, সে দিন অলক্ষ্যে বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়াছিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কল্লোলিনী ভাব-মন্দাকিনী আজ প্রবাহিত হইয়া সহস্র ধারায় বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্র উর্ব্বর করিতেছে। মাসিক-পত্রিকায় মাসিক-পত্রিকায় বঙ্গদেশ ছাইয়া গিয়াছে, নগরে নগরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাব সাগরে আনন্দ-কল্লোল উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধি-রসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন এক উত্তাল ভাব-সমুদ্রের বিরাট্ বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গ-সাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাব-রাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল; বঙ্গভাষা নব-যৌবন লাভ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় উচ্চ মাসিক-পত্র সৃষ্টি করিলেন, ঐন্দ্রজালিক শব্দ বিন্যাস সৃষ্টি করিলেন, মনোহর উপন্যাস সৃষ্টি করিলেন, সুভিজ্ঞ সমালোচনা সৃষ্টি করিলেন, নূতন প্রণালীর ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিলেন, সহজ-সরল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সৃষ্টি করিলেন, উচ্চ অঙ্গের রসিকতা সৃষ্টি করিলেন। মাইকেলও তেমনিই অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নূতন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয়না যে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের, ও মাইকেল আধুনিক বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক।

যাঁহারা এই মনীষিদ্বয়ের রচনায় ইংরেজি ভাবের প্রভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন, তাঁহারা একটু অত্যধিক মাত্রায় 'স্বদেশী'। এই দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিভা গৃহের দাসী নহে—সে গৃহের কর্ত্রী। সে শুদ্ধ পিতৃপুরুষের সম্পত্তি গ্রহণ করেনা—সে নূতন রাজ্য সৃষ্টি করে। সে পুরাতনের কূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহেনা—সে মুক্ত বাতাসে পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতে চাহে। প্রতিভা পুরাতন আদর্শে আবদ্ধ থাকে না, পুরাতন ও নূতনে মিশাইয়া নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ এক ভৌতিক ব্যাপার। ইহার গতি জল প্রপাতের ন্যায়। এই সাহিত্য বাঙ্গালী জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এই উদ্দাম স্রোতের ফেনিল তরঙ্গে বাঙ্গালী গা ভাসাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী বঙ্গভাষাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

তথাপি বড় কষ্টে, বড় অবজ্ঞার পর্ব্বতভার ঠেলিয়া বঙ্গভাষাকে উঠিতে হইতেছে।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের শাসন-কর্ত্তারা বাঙ্গলা ভাষা জানেন না, শিখিতেও চাহেন না। তাঁহাদের মতে বাঙ্গলা সাহিত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—অর্থাৎ (১) যাহা রাজ-বিদ্বেষমূলক, এবং (২) যাহা রাজ-বিদ্বেষমূলক নহে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য বুঝিবার জন্য তাঁহারা অনুবাদকের সাহায্য গ্রহণ করেন। শেষোক্ত শ্রেণীর সমস্ত সাহিত্য তাঁহাদের দ্বারা সমভাবে অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, বর্জ্জিত। আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের রাজা মহারাজাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গলা ভাষা সম্যক্ জানেন না ও তাহার আদর করেন না। তাঁহাদের সজ্জিত প্রাসাদের প্রশস্ত পাঠাগারে মহামূল্য আলমারিগুলি অপঠিত ইংরেজি গ্রন্থের ও মাসিক পত্রিকার উজ্জ্বল সমাবেশ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা গ্রন্থ ও মাসিক-পত্রিকা তাঁহাদের চরণ-প্রান্তেও স্থান পায়না। কোন বাঙ্গালী রাজা গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করেন নাই! স্পষ্ট শুনিলাম যে, এই বঙ্গীয় যুবকের এই নির্লজ্জ উক্তি শুনিয়া বঙ্গভাষা লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করি।" এ লজ্জা কি রাখিবার স্থান আছে!

আজ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও ছাত্র সম্প্রদায়ই বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বাঙ্গলা গ্রন্থ ও মাসিক

পত্রিকা পাঠ করেন, বাঙ্গলা বক্তৃতা শ্রবণ করেন, বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় করেন, বাঙ্গলা কবির সমাদর করেন। সেদিন বঙ্গদেশের এক অতি শুভদিন, যে দিন এই সম্প্রদায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথের গলে বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। সে সম্মানে সমস্ত বঙ্গভাষা সম্মানিত হইয়াছিল। তাঁহাদের জয় হউক।

কিন্তু বঙ্গভাষা সাবালিকা হইয়া ধীরে ধীরে নিজের স্বত্ব বুঝিয়া লইতেছে। আর তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি এই সমাদর, জাতীয়ত্বের এই গভীর আলোড়ন, মাতৃভাষার প্রতি জাতির এই অচলা ভক্তি, শেষে গভর্মেণ্টের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়াছে। মহামতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে এই অনাদৃত বঙ্গভাষাকে গভর্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন দিয়াছেন। সে দিন বঙ্গদেশের একটি স্মরণীয় দিন, যেদিন হইতে বাঙ্গলা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য-পাঠ্য বিষয় বলিয়া গণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশুতোষের নাম অক্ষয় হউক।

রাজা মহারাজাদেরও বঙ্গভাষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং স্নানের পূর্ব্বে কদাচিৎ তাহা হাতে করিয়া বিজৃম্ভন সহকারে তাহার চিত্রিত পৃষ্ঠাগুলির উপরে একবার চোখ বুলাইয়া যান। সঙ্কট মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রোগী বাঁচিবে। আজকাল দেখি যে, দুই একজন মহারাজা সাহিত্যের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হউন।

আর মধ্যবিত্ত ও ছাত্র সম্প্রদায়! তাঁহাদের অশ্রান্ত সেবা আজ সার্থক হইয়াছে। তাঁহাদের স্নেহসেচিত অঙ্কুর আজ বর্দ্ধিত হইয়া শত শাখায় পল্লবিত, মুকুলিত হইয়াছে। তাঁহাদের যত্নে রক্ষিত গাভী আজ আসন্ন-প্রসবা। তাঁহাদের আজ কি আনন্দ!

অগ্নি জ্বলিয়াছে। আর ভয় নাই। আমরা আজ কল্পনায় বঙ্গসাহিত্যের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। যেদিন এই উপেক্ষিত বঙ্গভাষা পৃথিবীর সমক্ষে সগর্ব্বে নিজের আসন গ্রহণ করিবে; যেদিন এই সাহিত্যের ঝঙ্কার সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, আর এই মাসিক-পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইবে; যেদিন এই ভাষায় নূতন বাল্মীকি গান ধরিবে, নূতন ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ লিখিবে, নূতন গৌতম বিচার করিতে বসিবে, নূতন শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে ছুটিবে; যেদিন এই অবজ্ঞাত জাতির সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বিস্মিত জগৎ জয়গান করিবে। সে দিন আসিবে। আর যদি ইংরেজ-শাসনের শান্তি এ সাহিত্যকে ঘিরিয়া রক্ষা করে, ত সে দিন বহুদূর নয়।

আমরা আশা করি যে, এই রাজপুরুষগণ যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা পড়েন না, তাঁহাদিগকে—এই বাঙ্গলা সাহিত্য পড়াইব এবং প্রাচ্যভাব সম্পদে প্রতীচ্যকে সম্পদ-শালী করিব। আমাদের ইচ্ছা যে, রাজা মহারাজারা—যাঁহারা এই সাহিত্যকে সগৌরবে অবজ্ঞা করেন, তাঁহা-দিগকে চিত্রের উপবন দিয়া, কবিত্বের স্রোতস্বিনী দিয়া, উপন্যাসের জ্যোৎস্নাময় আকাশের নীচে দিয়া, চিন্তার দেশে লইয়া যাইব। আমাদের অভিলাষ, যে জনসাধারণকে ভাব ও রুচির অধঃস্তর হইতে এক মায়াময় রাজ্যে টানিয়া তুলিব, যেখানে ধর্ম্ম হাসে, বিজ্ঞান ভালবাসে, দর্শন গান গায়, চিন্তা ও কল্পনা হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করে। আমাদের সাধনা যে আমাদের মাতৃভাষাকে সমবেত মানবমণ্ডলীর সম্মুখে গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় মহামহিমার রাজমুকুট পরাইয়া দিব, এবং যে জাতির এই ভাষা, তাহাকে সমুচিত সম্মান করিতে জগৎকে আদেশ করিব।

বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালি ডান্তে ও পেট্রার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাই-কেলের জননী। হতাশার কারণ নাই। চাই শুধু সাধনা। চাই শুধু অবিশ্রান্ত সেবা। চাই শুধু অটল বিশ্বাস, আর অচলা ভক্তি।

আমরা বঙ্গভাষার সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে স্বাগত সম্ভাষণ দিতে আসিয়াছি। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় প্রদীপ হইতে এই ক্ষুদ্র দীপ জ্বালাইয়া লইয়া শঙ্খঘণ্টায় মাতার আরতি করিতে আসিয়াছি। আমরা অন্যান্য বহু যোগ্য সন্তানের সহিত মাতার চন্দন-সুগন্ধি পবিত্র মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছি। আমরা মাসে একবার করিয়া আসিয়া দূর প্রান্ত হইতে তাঁহার চরণারবিন্দে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যাইব। মাতা যদি তাঁহার ইন্দীবর নেত্র দুটি ফিরাইয়া স্মিতমুখে একবার আমাদের মুখপানে চাহেন, তাহা হইলেই আমাদের পূজা সার্থক হইবে।

আমাদের ভাগ্যবিধাতা দূরে অলক্ষ্যে বসিয়া আমাদের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। আমরা যেন না পিছু হটি। আমরা যেন না ভয় পাই। আমরা যেন সাহিত্যের বাতাসকে পবিত্র রাখিতে পারি। আমাদের বন্দনায় যেন বিগলিত-স্নেহা জননীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। আমাদের গানে যেন জগৎ মাতিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে। আমরা যেন আত্মসম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া, মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের কাছে সম্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া পঁহুছিবে।

গায়ত্রী শির

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

গায়ত্রী শিরের মহিমা অতি অপূর্ব্ব। এই গায়ত্রী শির জপ করলে প্রাণায়াম হয়ে যায়।

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়াম স্তদুচ্যতে॥

(অমৃতনাদোপনিষৎ)

দীর্ঘ প্রাণে ব্যাহৃতি, প্রণব ও গায়ত্রী শিরের সহিত গায়ত্রী তিনবার পাঠ ক'রবে। তার নাম প্রাণায়াম।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।

৬২টি অক্ষর আছে, ত্রিগুণ করলে ১৮৬ হয়। পরমহংসগণ ১৮৬ বার ওঙ্কার জপ করবেন, তাহলে প্রাণায়াম হবে।

স ব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
দশ কৃত্বঃ প্রজপ্তা সা রাত্র্যাহ্না যৎ কৃতং লঘু।
তৎ পাপং প্রণুদত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচরণা॥
শত জপ্তাতু সা দেবী পাপোপশমনী স্মৃতা।
সহস্র জপ্তা সা' দেবী উপপাতকনাশিনী॥
লক্ষ জপ্যেম চ তথা মহাপাতকনাশিনী।
কোটি জপ্যেম রাজেন্দ্র যদিচ্ছতি তদাপ্নুয়াৎ॥
যক্ষবিদ্যাধরত্বং বা গন্ধর্ব্বত্বমথাপিবা।
দেবত্বমথবা রাজ্যং ভূলোকে হত কণ্টকম্॥
দশ সহস্র জপ্যেন নিষ্কামঃ পুরুষোত্তম।
বিধিনা রাজ শার্দ্দূল প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥
যথা কথঞ্চিজ্জপ্তৈষা দেবী পরম পাবনী॥
সর্ব্বকামপ্রদা প্রোক্তা বিধিনা কিং পুণর্নৃপ॥

(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় প্রথম কাণ্ডে)

যারা ব্যাহৃতি প্রণব ও শিরের সহিত সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করেন, তাঁদের কুত্রাপি ভয় নাই।

দশবার জপ করলে দিবারাত্রি কৃত যে লঘু পাপ তা অতি সত্বর প্রণষ্ট হয়, একথা নির্বিচারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই গায়ত্রী দেবী শতবার জপ্তা হ'লে পাপের উপশমকারিণী হন। এবং সহস্র জপে পরদার-গমন, আত্মবিক্রয় আদি ৪৯ উনপঞ্চাশ প্রকার উপপাতক নষ্ট করেন। লক্ষ জপের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপহরণ, গুরুদার-গমন ও তাদের সঙ্গজাত পঞ্চ মহাপাতক নষ্ট হয়।

উপপাতক—(১) গোহত্যা, (২) অযাজ্য যাজন, (৩) পরদার গমন, (৪) আত্মবিক্রয়, (৫) গুরুত্যাগ, (৬) মাতৃত্যাগ, (৭) পিতৃত্যাগ, (৮) স্বাধ্যায় ত্যাগ, (৯) অগ্নিত্যাগ, (১০) সুতত্যাগ, (প্রত্যেকের প্রতি যে রূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা না করাকে ত্যাগ কহে) (১১) পরিবিত্তিতা (অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহের পরে জ্যেষ্ঠের বিবাহ করণ) (১২) পরিবেদন (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত সত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ করণ) (১৩) ঐ রূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান, (১৪) ঐ রূপ স্থলে পৌরহিত্য, (১৫) কন্যাপুষণ, (১৬) বার্দ্ধুষ্য, (১৭) ব্রতলোপ, (১৮) তড়াগ বিক্রয়, (১৯) আরাম বিক্রয়, (২০) দার বিক্রয়, (২১) অপত্য বিক্রয়, (২২) ব্রাত্যতা, (২৩) বান্ধব ত্যাগ, (২৪) ভৃতকাধ্যাপন, (২৫) ভৃতকাধ্যয়ন, (২৬) অপণ্য বিক্রয়, (২৭) সর্ব্বাকরাধিকার, (২৮) মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন, (২৯) ওষধিহিংসন, (৩০) স্ত্র্যাজীব, (৩১) অভিচার, (৩২) মূলকর্ম্ম অর্থাৎ মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ, (৩৩) ইন্ধনার্থ অস্তরের দ্রুমচ্ছেদ, (৩৪) আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ, (৩৫) অবৈধ ভোজন, (৩৬) অনাহিতাগ্নিতা, (৩৭) স্তেয়, (৩৮) ঋণাশোধন, (৩৯) অসৎ শাস্ত্রাভিগমন, (৪০) কৌশীলব্য ক্রিয়া, (৪১) ধান্যস্তেয়, (৪২) পশুস্তেয়, (৪৩) কুপ্য স্তেয়, (৪৪) মদ্যপ, (৪৫) স্ত্রী নিষেবণ, (৪৬) স্ত্রী হত্যা, (৪৭) শূদ্র হত্যা, (৪৮) বৈশ্য হত্যা, (৪৯) ক্ষত্রিয় হত্যা, (৫০) নাস্তিকতা।

হে রাজন! কোটি গায়ত্রী জপে যক্ষত্ব, বিদ্যাধরত্ব,

অথবা গন্ধর্বত্ব বা দেবত্ব কিম্বা পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য —যা ইচ্ছা করবেন তাহাই প্রাপ্ত হবেন।

নিষ্কাম পুরুষোত্তম যথাবিধি দশ সহস্র জপের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হন।

যে কোন প্রকারে পরম পাবনী দেবী গায়ত্রী জপিত হ'লে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রদান করে থাকেন। বিধিপূর্ব্বক জপের কথা আর কি বলবো?

সর্ব্বাত্মনা হি যা দেবী সর্ব্বভূতানি সংস্থিতা।
গায়ত্রী মোক্ষ সেতুর্বৈ মোক্ষ স্থানমনুত্তমম্॥
ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্ম গায়ত্রী সশিরাঃ স্মৃতা।
অপিপাদমধীয়ীত গায়ত্রী সশিরা স্তথা॥
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যস্তে ব্রহ্মাধ্যাপয়ং স্তথা॥

(ঋষ্যশৃঙ্গ)

যে গায়ত্রী দেবী সকলের আত্মারূপে সর্ব্বভূতে উত্তম রূপে অবস্থিতা তিনিই মোক্ষের সেতু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোক্ষ স্থান। ওঁ আপোজ্যোতি রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" এই ষোলটি অক্ষর গায়ত্রী শির বলে স্মৃত হন। শিরের সহিত যদি কেহ এক পাদ পাঠ করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হতে মুক্ত হন ও অধ্যাপনাকারীও মুক্ত হয়ে যান।

ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্ম গায়ত্রী সশিরাস্তথা।
সকৃদাবর্ত্তয়েদ্ যস্তু সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

যিনি ষোড়শাক্ষর গায়ত্রী শিরের সহিত একবার আবৃত্তি করেন তিনি জ্ঞানাজ্ঞান কৃত নিখিল পাপ হ'তে বিমুক্ত হন।

এবং যস্তু বিজানাতি গায়ত্রীং ব্রাহ্মণস্তু সঃ।
অন্যথা শূদ্র ধর্ম্মা স্যা দ্বেদানা মপিপারগঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যা ব্রাহ্মণেন সা।
ব্যাহৃত্যোঙ্কার সহিতা সশিরস্কা যথার্থতঃ॥
সশিরাশ্চৈব গায়ত্রী যৈর্বিপ্রৈরবধারিতা।
তে জন্মবন্ধ নির্মুক্তাঃপরং ব্রহ্ম ব্রজন্তি চ॥

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

এইরূপ গায়ত্রী যিনি বিশেষরূপে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। তা না হলে সমস্ত বেদের পারগামী ব্রাহ্মণও শূদ্রধর্ম্মা, তজ্জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে ব্রাহ্মণের তাঁকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যাহৃতি ওঙ্কার ও গায়ত্রী শিরের সহিত গায়ত্রী যে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অবধারিত হয় তারা জন্ম বন্ধন বিশেষ রূপে মুক্ত হয়ে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

স ব্যাহৃতিং স প্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

(অগ্নিপুরাণ)

যাঁরা ব্যাহৃতি প্রণব ও শিরের সহিত নিরন্তর গায়ত্রী জপ করেন তাঁদের কোথাও ভয় নাই। তাঁরা চির অভয় লাভ করেন।

আদ্যা ব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত গায়ত্রী সশিরাস্তথা।
ওঙ্কারং বিন্দতে যস্তু সমুনির্নেতরো জনঃ॥

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

প্রথমে ভূরাদি সমস্ত ব্যাহৃতি পরে আপো জ্যোতীরসাদি সপ্ত গায়ত্রী শির ওঙ্কার সহিত যিনি অবগত হন, তিনি মুনি, অপর ব্যক্তি মুনিনন্দ।

শঙ্খ বলেছেন—

যাঁরা ব্যহৃতি, প্রণব ও গায়ত্রী শিরের সহিত সতত গায়ত্রী জপ করেন তাঁদের কুত্রাপি ভয় নাই।

শত জপ্তাতু সা দেবী দিন পাপ প্রণাশিনী।
সহস্র জপ্তাতু তথা পাতকেভ্যঃ প্রমোচিনী॥
লক্ষ জপ্তাতু সা দেবী মহাপাতক নাশিনী॥
সুবর্ণ স্তেয় কৃদ্ বিপ্রো ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
সুরাপশ্চ বিশুধ্যন্তি লক্ষ জপান্ন সংশয়ঃ॥

সেই জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রী শতবার জপিতা হলে—দিনের পাপ প্রনষ্ট করেন। সহস্রবার জপিতা হ'লে বহু পাতক হতে প্রমুক্ত করেন। দশ সহস্রা জপ্তা হ'লে সমস্ত পাপ নাশ করে থাকেন। লক্ষ জপে মহাপাতক নাশ করেন, স্বর্ণাপহারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুদারগামী, ও সুরাপানকারী বিশুদ্ধ হন, এতে কোন সংশয় নাই।

বিশেষ ভাবে গায়ত্রীর দ্বারা হোম করলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা হোমে বরদা দেবী সমুদয় কাম্যবস্তু প্রদান করেন।

সুসমাহিত প্রযত শুদ্ধ ব্যক্তি ঘৃতযুক্ত তিলের দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রে হোম করলে, সর্ব্ব পাপ হ'তে প্রমুক্ত হন। পাপাত্মা লক্ষ হোমের দ্বারা নিখিল পাতক হতে নির্ম্মুক্ত হন। পাপবিরহিত হয়ে, অভীষ্ট লোক লাভ করেন।

গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।

গায়ত্র্যাস্তু পরংনাস্তি দিবি চে হ্‌ চ পাবনম্‌॥

গায়ত্রী বেদ মাতা, গায়ত্রী পাপ নাশকারিণী, এজগতে এবং স্বর্গে গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, পবিত্রকারিণী আর কিছুই নাই।

হস্তপ্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে।

তস্মাৎ তামভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণো হৃদয়ে শুচিঃ॥

নরক সাগরে পতনোন্মুখ পাপীকে দেবী হাত বাড়িয়ে দেন, উদ্ধার করবার জন্য। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ শুদ্ধান্তঃকরণে নিত্য গায়ত্রী অভ্যাস করবেন।

গায়ত্রী জপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে নিযুক্ত করবে, যেমন পদ্মপত্রে জল থাকে না, তদ্রূপ গায়ত্রীজাপক ব্রাহ্মণের পাপ অবস্থান করতে পারে না।

গায়ত্রী জপের অনন্তফল; অনন্তদেব, অনন্তবদনে তা বল্‌তে সমর্থ হন কি না সন্দেহ। গায়ত্রীর এক একটি ঋষি ছন্দ দেবতা যুক্ত অক্ষর এই মানুষকে সম্যক সিদ্ধি দান করেন।

গায়ত্রী অক্ষর	ঋষি	ছন্দ	দেবতা
তৎ	বামদেব	গায়ত্রী	অগ্নি
স	অত্রি	উষ্ণিক্‌	প্রাজাপত্য
বি	বশিষ্ঠ	অনুষ্টুপ্‌	সৌম্য
তু	শুক্র	বৃহতী	ঈশান
র্ব	কন্ব	পঙ্‌ক্তি	সাবিত্র
রে	পরাশর	ত্রিষ্টুপ	আদিত্যদৈবত
নি	বিশ্বামিত্র	জগতী	বার্হস্পত্য
অং	কপিল	অতিজগতী	মৈত্রাবরুণ
ভ	শৌনক	শর্করী	ভগদৈবত্য
র্গো	যাজ্ঞবল্ক্য	অতিশর্করী	আর্যামৈশ্বর
দে	ভরদ্বাজ	ধৃতি	গণেশ
ব	জমদগ্নি	অতিধৃতি	রাষ্ট্র
স্য	গৌতম	বিরাট	পৌষ্ণ
ধী	মদ্গল	প্রস্তাবপংক্তি	ঐন্দ্রাগ্ন
ম	বেদব্যাস	কৃতি	বায়ব্য
হি	লোমশ	প্রাকৃতি	বামদেব্য
ধি	অগস্ত্য	আকৃতি	মৈত্রাবরুণি
য়োঃ	কৌশিক	বিকৃতি	বৈশ্বদেব
যো	বৎস	সংকৃতি	মাতৃক
নঃ	পুলস্ত্য	অক্ষরপংক্তি	বৈষ্ণব
প্র	মাণ্ডুক	ভূঃ	বসুদৈবত
চো	দুর্বাসা	ভূবঃ	রুদ্রদৈবত
দ	নারদ	স্বঃ	কৌবের
য়াৎ	কশ্যপ	জ্যোতিষ্মতী	আশ্বিন

(শ্রীদেবী ভাগবত ১২।১)

ব্রাহ্মণোত্তম যদি গায়ত্রীর একটি মাত্র অক্ষর ও সংসিদ্ধ হন তা হ'লে তিনি বিষ্ণু শিব ও ব্রহ্মা হতে সঞ্জাত সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির সহিত স্পর্দ্ধা করতে সমর্থ হয়ে থাকেন।

উপনিষদে গায়ত্রী—

গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে।১॥ ছাঃ ৩।১২।

এই যা কিছু স্থাবর জঙ্গম ভূত সকল, এ সমুদয়ই গায়ত্রী, শব্দ রূপিণী বাক্‌ই এই সমস্ত প্রাণীকে গান করে এবং ত্রাণ করে অর্থাৎ সকল ভূতের অভ্যন্তরে অনাহত নাদরূপে গান করে, তার দ্বারাই মানুষ স্ব স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়। তজ্জন্য বাক্‌ই গায়ত্রী। ১॥

কথিত স্বরূপা যে গায়ত্রী তাহা আবার পৃথিবীরূপিণী যে হেতুভূতসমূহ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাকে উপেক্ষা করে না॥ ২॥

পূর্ব্বোক্তা গায়ত্রী রূপা পৃথিবীই পুরুষাশ্রিত এই শরীর, কারণ ভূত শব্দ বাচ্য ইন্দ্রিয় সমূহ এই শরীরেই প্রতিষ্ঠিত ইহাকে লঙ্ঘন করে না। ৩॥

যা পুরুষাশ্রিত দেহ তাহাই আবার শরীরের অন্তরস্থ হৃদয় কমলের সহিত অপৃথক, যে হেতু (ভূত শব্দ বাচ্য) ইন্দ্রিয়বৃন্দ শরীরেই প্রতিষ্ঠিত ও তাকে লঙ্ঘন করে না॥ ৪॥

পূর্ব্ব কথিতা এই গায়ত্রী ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চারিটি পাদ বিশিষ্টা ও বাক্‌, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রান এই ষড়বিধা ঐ অর্থের সমর্থক রূপে ইনি গায়ত্রী নামক ব্রহ্ম ঋক্‌ মন্ত্রে প্রকাশিত হ'য়েছেন॥ ৫॥

এই গায়ত্রী নামক ব্রহ্মের মহিমাও ষড়বিধা। চতুস্পদাগায়ত্রীর সমপরিমাণ বিকারী বিশ্ব-স্বরূপিণী গায়ত্রী হতে ও পুরুষোত্তম মহত্তর। আকাশাদিভূত সকল এই গায়ত্রী ব্রহ্মের একপাদ মাত্র। ত্রিপাদ অধিকারী পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি স্বীয় জ্ঞান স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬ ॥

ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত জগৎ এই পুরুষের মহিমা। বস্তুতঃ সেই পুরুষ এই মহিমা হতেও অতিশয় অধিক কালত্রয়বর্ত্তী প্রাণীসমূহ এই পুরুষের একপাদ ত্রিপাদ অবিনাশী রূপে স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে।

যাঁকে ত্রিপাদ ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হয়েছে—তিনিই পুরুষের বাইরের এই আকাশ দেহের বাইরের যে আকাশ, তাহাই আবার দেহমধ্যস্থ আকাশ—দেহমধ্যস্থ যে আকাশ তাহাই আবার হৃদয় পদ্মস্থ আকাশ। হৃদয় আকাশ নামক ব্রহ্ম পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী ও প্রবৃত্তিহীন। যিনি ব্রহ্মকে ঐরূপে জানেন, তিনি পরিপূর্ণ, অবিনাশী শ্রী (ঐশ্বর্য্য) লাভ করেন।

(বৃহদারণ্যক গায়ত্রী ব্রাহ্মণ, পঞ্চমাধ্যায় চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

"ভূমি মন্তরিক্ষং দ্যৌঃ—(১)

ভূমি-অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ এই আটটি অক্ষর, গায়ত্রীর প্রথম পাদে—"তৎসবিতুর্বরেনিঅং" এই আটটি অক্ষর আছে। গায়ত্রী প্রথম পাদ—ত্রিলোকাত্মক যিনি এই পাদটিকে এই রূপে জানেন তিনি তিনলোকে যা কিছু আছে সবই জয় করেন। ১ ॥

"ঋচো যজূংষি সামানি" (২)

ঋচো যজূংষি সামানি এই আটটি অক্ষর গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদে "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" এই অষ্টাক্ষর, সে জন্য গায়ত্রী দ্বিতীয় পাদ ত্রিবেদাত্মক—যিনি এই পাদটিকে এরূপ জানেন, তিনি তিন বেদের দ্বারা লভ্য সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন। ২ ॥

"প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাক্ষরনি"। ৩ ॥

প্রাণ-অপান "বি+আ+ন এই আটটি অক্ষর গায়ত্রী। তৃতীয় পাদেও অষ্টাক্ষর—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। সুতরাং গায়ত্রীর তৃতীয় পাদটি প্রাণাপান ব্যানাত্মক। যিনি তৃতীয় পাদটিকে এরূপে জানেন তিনি জগতে যত প্রাণী আছে সকলকেই জয় করতে সমর্থ হন। তারপর এই যে তাপ-বিকীরণকারী সূর্য্য, ইনিই ত্রিপদা গায়ত্রীর তুরীয় দর্শত ও পরোরজা রূপ চতুর্থ পাদ। যা চতুর্থ তাই তুরীয়, যে হেতু এই সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত পুরুষ যোগিগণের দ্বারা যেন দৃষ্ট হন। অতএব ইনিই দর্শত পাদ, যে হেতু এই সূর্য্যই জগতের অধীশ্বর হ'য়ে তাপ দান করেন, এই হেতু ইনিই পরোরজা। যিনি গায়ত্রীর চতুর্থ পাদটিকে এবম্প্রকারে বিদিত হন, তিনি অবিকল এই রূপেই সর্ব্বাধিপত্যরূপ ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতির সহিত অবিকল সূর্য্যেরই মত জ্যোতির্ম্ময় হন।

ত্রিলোক, ত্রিপদা ও প্রাণরূপিণী গায়ত্রী তুরীয়, দর্শত ও পরোরজা পাদে প্রতিষ্ঠিতা, সেই তুরীয় পাদ সূর্য্য, সূর্য্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত, চক্ষুই সেই সত্য। চক্ষু যে সত্য, তা লোক-প্রসিদ্ধ। যদি বিবাদপরায়ণ দুই ব্যক্তি "আমি দেখেছি" "আমি শুনেছি" বলে, তাহলে "আমি দেখেছি" যে বলে, তাকেই আমরা বিশ্বাস করবো। এই সত্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই সেই শক্তি। কাজেই সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য লোকে বলে—'বল' সত্য হোতে অধিকতর ওজস্বী। এই রূপেই গায়ত্রী অধ্যাত্মরূপে দেহাশ্রিতা প্রাণে অধিষ্ঠিতা। এই গায়ত্রী-গয় দিগকে ত্রাণ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রামই গয়। কাজেই তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ত্রাণ করেছিলেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দেহকে মাত্র আশ্রয় করে বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত হোত। নাদ রূপিণী এই গায়ত্রী অবিচ্ছিন্ন নাদ শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের বিষয়-গ্রহণ-ইচ্ছা দূরীভূত করে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে মিলিত করে দিয়েছিলেন। কর্ণকে দিকের সঙ্গে, ত্বককে বায়ুর সঙ্গে ও চক্ষুকে সূর্য্যের সঙ্গে মিলিত ক'রে তাদের ত্রাণ করেছিলেন) এই হেতু তাঁর নাম গায়ত্রী। আচার্য্য শিষ্যকে উপনীত ক'রে এই সাবিত্রি অর্থাৎ গায়ত্রী উপদেশ দেন তাহা ইহাই বটে। আচার্য্য যাঁকে গায়ত্রী উপদেশ করেন, গায়ত্রী তাঁর ইন্দ্রিয় সকলকে ত্রাণ করেন।

একই পরমাশক্তি সিদ্ধ দেবী বাইরে সূত্রাত্মারূপে এবং দেহাভ্যন্তরে প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত। এই সূত্রাত্মিকা গায়ত্রীতেই সমপূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

ইন্দ্রিয়বৃন্দ ত্রাণের অর্থ কিছু দিন গায়ত্রী জপ করলেই অলৌকিক শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রত্যক্ষীভূত হয়। তখন লৌকিক বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না।

বাক্ অনুষ্টুপ। আমরা উপনয়নের পর, বাকেরই

উপদেশ দিব বলে কেউ কেউ অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত সাবিত্রীর উপদেশ করেন। তা ক'রবেন না, গায়ত্রী-রূপিণী এই সাবিত্রিরই উপদেশ দিবেন।

এরূপ জ্ঞানী অধিকতর প্রতিগ্রহ করলেও গায়ত্রীর একটি পাদের তুল্য হয় না।

গায়ত্রী স্বরূপদর্শনকারী অর্থাৎ অখণ্ড নাদে প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রীজ্ঞ যদি ধনপূর্ণ ত্রিভুবন প্রতিগ্রহ করেন, তার দ্বারা গায়ত্রীর প্রথম পাদের ফলভুক্ত হবে। আর ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা লভ্য যত ফল আছে সে সকল যিনি প্রতিগ্রহ করবেন, তার দ্বারা গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হবে।

আজ জগতে যত প্রাণী আছে, যিনি সে সকল প্রতিগ্রহ করবেন, তার দ্বারা গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফলভুক্ত হবে।

তদনন্তর তাপদাতা সূর্য্য গায়ত্রীর তুরীয় দর্শত ও পরোরজা পাদ—এঁর বিজ্ঞান ফল কোন প্রতিগ্রহের দ্বারা ভুক্ত হয় না। বস্তুতঃ ত্রিপাদ বিজ্ঞানের ফল ও ভুক্ত হতে পারে না। কারণ এই সমস্ত ত্রিলোকাদি কোন উপায়ে প্রতিগ্রহ করবে।

তস্যা উপস্থানং গায়ত্রস্যেকপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসা বদো মা প্রাপদিতি যং দ্বিষ্যাদ-সাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হে বাস্মৈ স কামঃ সমৃদ্ধতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠ তেঽহমদঃ প্রাপমিতি ॥ ৭ ॥

গায়ত্রীর নমস্কার

মা গো তুমি একপদী দ্বিপদী
ত্রিপদী পুনঃ তুমি পদ বিরহিতা
ধ্যানের অতীতা তুমি গো জননী
তুরীয় দর্শত পরোরজা রূপিণী
তোমাকে করি নমস্কার।
অজ্ঞান শত্রু যেন না পারে
বিঘ্ন প্রদানিতে। সকাম মানব
আপন শত্রুর সমৃদ্ধি
নাশের তরে জ্ঞাত করিবেন
প্রার্থনা চরণে তাঁহার ; তাহা
হলে না হবে বর্দ্ধিত সেই
অরাতির সমৃদ্ধি সকল। আমি
যেন রিপুর বাঞ্ছিত বস্তু
পারি লভিবারে।
এরূপ বিশ্রুতি আছে
ধরণীর মাঝে, জনক রাজা গায়ত্রী
বিদ্যার বিষয়ে বলেছিলেন
অশ্বতরাশ্ব তনয় বুড়িল হস্তীরে
তুমি বলিলে তুমি গায়ত্রী
বিদ্যায় অভিজ্ঞ, তবে কেন হায়,
গজরূপ করিয়া ধারণ বহন
করিছ মোরে। বলিলা বুড়িল
হে সম্রাট! আমি গায়ত্রীর
মুখ হই নাই অবগত, তাই
এ দশা আমার। বলিলেন
জনক নৃপতি, অগ্নিই গায়ত্রীর
মুখ, প্রচুর কাষ্ঠ যদি অগ্নিতে
কেহ করয়ে প্রদান, অগ্নি তাহা
করেন ভস্মীভূত। এরূপ জ্ঞানবান
বহু পাপ অনুষ্ঠানে ও সমস্ত করিয়া
ভক্ষণ, হন শুদ্ধ পূত, অজর অমর।

গায়ত্রীর ন্যায় ব্রাহ্মণের মহামন্ত্র আর নাই। যে ব্রাহ্মণ দেবমাতা গায়ত্রীর শরণাপন্ন হবেন, তিনি ইহলোক পরলোক জয় ক'রতে পারবেন পারবেন পারবেনই-পারবেন।

জীবনের যে অংশ চলে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবেনা, অবশিষ্ট যে আয়ুটুকু আছে গায়ত্রী জপ ক'রে যিনি অতিবাহিত করতে সমর্থ হবেন তাঁর জীবন সার্থক তিনিই পুরুষোত্তম।

স্বরূপে আপন আছ সর্ব্বক্ষণ
অন্য কিছু নাহি আর।

নীরব নিষ্পন্দ সচ্চিদানন্দ নিরালম্ব নিরাকার॥ এই অদ্বিতীয় লীলার ছলনে কতই ছন্দে কত স্পন্দনে, কেন হও তুমি না জানি কেমনে সগুণ বহু সাকার। বেদ যাঁরে মন্ত্রে করে আমন্ত্রণ,
যাঁর লাগি যত তপ আচরণ,
ব্রহ্মচর্য্য যাহারই কারণ তুমি সেই—'ওঁকার॥'
জয় মা গায়ত্রী।

নারী

নরেন্দ্র দেব

তোমাদের বাসিয়াছি ভালো।
তোমরা জ্বালিয়া দেছ আনন্দের আলো
যুগে যুগে মানুষের অন্ধকার বুকে।
জীবনের নিত্য সুখে দুঃখে
তোমাদের অফুরন্ত দান
প্রীতিপূর্ণ প্রণয়ের অভিরাম মান-অভিমান।
নিজেরে উজাড় করি নিঃশেষে দেবার,
নিয়ত প্রসন্ন মনে অক্লান্ত সেবার
অতুলন সস্নেহ গৌরব,
আমাদের মর্মকোষে ভরে দেয় জীবন-আসব।

তোমাদের অন্তহীন রঙীন মায়ায়
অন্তরের সুনিবিড় সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
এই কাদা-মাটি সিক্ত ধূলি-লিপ্ত প্রাচীনা ধরণী
হ'য়ে ওঠে বারে বারে অপরূপা অরুণ-বরণী ;
পরিপূর্ণ ক'রে তোলো নানা রসে তোমরাই
আমাদের নীরস জীবন ;
তবু তাহে তৃপ্ত নহে মন,
অনুখন
চিত্তে শুধু জাগে এ সংশয়—
তোমাদের যাহা ভাবি, হয়ত তোমরা তাহা নয় !
রমণীর সত্য পরিচয়
আমাদের অনেকেরই রয়ে গেছে আজিও অজানা।
তোমাদের মনের ঠিকানা—
কোনোদিন মেলে নাই খুঁজি,
তাইতো দু' আঁখি আজও বুজি
গহন হৃদয়-পথে অন্ধ সম অন্ধকারে চলি,
কেহ পায় দেবী তার, কারেও দানবী যায় ছলি।

মিলনার্ত পুরুষেরা তোমাদের পথে যায় ছুটি।
নবনী-কোমলা নারী ! তবু তব দু'টি দৃঢ় মুঠি
চিরশিশু আমাদের চালিত করিছে ধরি হাতে,
আজীবন রহি সাথে সাথে
হাসি অশ্রু আনন্দের ছন্দে ছন্দে ঘুরে
রূপে রসে স্পর্শে গন্ধে সুরে
এ জীবন যারা ভরি দিল,
মনে মনে প্রশ্ন করি—এরা কারা ? এরা কোথা ছিল ?

মকুলিকা বালিকা যে—দিনে দিনে নবীনা কিশোরী !
অঙ্গে অঙ্গে ভ্রূবিভঙ্গে ওঠে তার ভরি
হিল্লোলিত তরুণ যৌবন,
তরঙ্গিয়া বহে যেন উচ্ছ্বসিত ফুল্ল প্রস্রবণ !
অপার সৌন্দর্য রাশি ওঠে হাসি তরল তনুতে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে দেহতটে প্রতিটি অণুতে,
চকিত চঞ্চল দৃষ্টি আঁখি কোনে রচে ইন্দ্রজাল
সৃষ্টির আবেগে যেন জনে জনে করিছে মাতাল !
আনন্দ সহজ ছন্দে নৃত্য করে তব সর্ব দেহে,
দীপান্বিতা করে তোলে অন্ধকার নিরানন্দ গেহে।
বিমুগ্ধ এ বিশ্ব তাই তোমাদের প্রেমের ভিখারী—
গৃহের বিগ্রহ রূপা শুচিস্মিতা নারীর পূজারী।

হে আদি জননী নারী ! শিশু বক্ষে ধন্য মানি মাতৃ-
মূর্তিখানি।
দেখেছি তোমারই মাঝে ক্রীতদাসী, মহিয়সী রাণী ;
স্নেহময়ী সোদরায় দেখিয়াছি সস্নেহে আদরে,
জায়া রূপে দেখিয়াছি তোমাদের আপনার ঘরে,
কন্যা রূপে লইয়াছি বুকে,
লজ্জানম্রা নববধূ দেখিয়াছি আনন্দে কৌতুকে।
দেখেছি আর্তের পাশে দয়াময়ী সেবিকার বেশে,
অন্নপূর্ণা মূর্তি তব দেখেছি এ ভিক্ষুকের দেশে।
মন্দিরে দেখেছি তুমি অর্চনা-নিরতা পূজারিণী,
গৃহ কর্মে শুভব্রতা সুকল্যাণী মঙ্গলচারিণী।

ব্রহ্মবাদিনীর বেশে দেখিয়াছি তোমাদের শান্ত তপোবনে,
দেখিয়াছি তোমাদের দুর্গম তীর্থের পথে সহযাত্রী সনে।

তোমাদেরই দেখিয়াছি কখনো বা লজ্জাহীনা রূপে!
দুর্গন্ধ পঙ্কিল ক্লিন্ন ঘৃণ্য অন্ধকূপে
গড়িতেছো পাপের প্রাসাদ।
বিবেকের কোনো প্রতিবাদ
বাজেনা হয়ত' বুকে ক্ষণতরে আর!
কেবল জঘন্য স্বার্থ, উগ্র ব্যভিচার,
মাথাইয়া দেহে মনে কলংকের কলুষিত গ্লানি
গভীর পংকের মাঝে আমাদের লয়ে যাও টানি।

তোমাদের নাগপাশ, জাদুকরী মোহের বাঁধন
অসাড় করেছে কত আমাদের অশান্ত যৌবন?
জড়ায়ে সে মায়া জালে পৌরুষের ঘটে সর্বনাশ।
তোমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস—
নামাইয়া আনিয়াছে আমাদের নরকের দ্বারে,
নির্বোধ পতঙ্গ সম পুড়ে মরি মোরা নির্বিচারে
তোমাদের রূপের শিখায়।
আমাদের অন্তরের স্বাতন্ত্র্য বিকায়
পণ্য সম যেথা দিবা নিশি,
আলো ছায়া অন্ধকারে সঙ্গোপনে মিশি
বারবধূ মধু পানে মত্ত হয়ে সাধি;
রচি সেথা রতি মদে আমাদের ঘৃণিত সমাধি।

বেদনা-বিক্ষুব্ধ চিত্তে কতদিন ভাবি মনে মনে,
ঘটে এ কেমনে?
সুনন্দা সুন্দরী নারী-পূজার পবিত্র অর্ঘ্যযারা,
কর্দমে লুটায়ে পড়ে কোন লোভে তারা?
স্বর্গ রচিবার শক্তি বিধাতা দিলেন যার হাতে।
সে কেন আসন তার পংকিল কর্দম তলে পাতে?
এ রহস্য কিছুতেই হয় নাই বোধগম্য যার
তারাই কি বলে ডেকে—নারী জেনো নরকের দ্বার!

ভাবি বসে, একি খেলা চিরদিন চলে বিধাতার?
নারীর চরিত্র নাকি অগোচর সর্ব দেবতার!

দিগন্ত বিতত ওই অভিরাম নীল চক্রবাল
যেমন রেখেছে করি চিরদিন দৃষ্টি অন্তরাল
অনন্তের প্রান্ত পথ-রেখা,
তেমনি যায় না বুঝি দেখা
তোমার স্বরূপ মূর্তি নারী?
যুগে যুগে সন্ধানীরা বৃথা খোঁজে—কোথা উৎস তারই!
মেলে নাই তোমার উদ্দেশ,
তোমারে জানিতে চাওয়া আজও তাই হয়নাই শেষ।

কখনো বিলাস কক্ষে দেখা পাই প্রমদার বেশে,
যেথা তব নিত্য নব লীলার উন্মেষে
নিখিল পুরুষ আত্মহারা!
অন্বেষিয়া সারা
জীবন পথের বাঁকে বাঁকে
গৃহ-আঙিনার স্নিগ্ধ স্নেহকুঞ্জ ফাঁকে
কোথা উঁকি মারে সেই কমনীয় মুখ
প্রত্যাশা উন্মুখ
আকাশ-কুসুম সম উঠেছে ফুটিয়া?
মধুলুব্ধ মধুকর আশে পাশে আসিছে ছুটিয়া।
যেন বা কমল কলি জাদু মন্ত্রে লভিয়াছে প্রাণ,
লয়ে তার বর্ণ গন্ধ হাসি রূপ গান
সজীব হইয়া এল ধরণীর বুকে!
আমাদের নয়ন সন্মুখে,
তোমাদের উচ্ছ্বসিত বিচিত্র মাধুরী
গড়ে তোলে যেন এক কল্পনার কাম্য স্বপ্নপুরী।

রজনীগন্ধার মতো ঋজু দীর্ঘ ওই দেহলতা,
কানে কানে বলে কোন রজনীর মিলন বারতা!
তোমাদের গতিছন্দে আন্দোলিত সঙ্গীত ঝংকার,
মেখলায়, মণিবন্ধে, পীনবক্ষে নাচে ফুলহার;
তোমাদের কমকণ্ঠে বীণাবিনিন্দিত মঞ্জু স্বর,
কুটিল কটাক্ষ করে মনসিজ হৃদয় বিধুর।
আমাদের মুগ্ধপ্রাণে যে আনন্দ দেয় সে নিবেদি
মনে হয় কোনোদিন যদি ওই রহস্যের আবরণ ভেদি
নারীর স্বরূপ কভু পাই দেখিবারে!
তোমাদের অন্তরের গভীর অতল পারাবারে

কা রহস্য রয়েছে লুকানো ?
বিচিত্র রূপিণী ওগো ! কোথা হতে এত প্রীতি-এ মাধুর্য আনো ?

বিশ্বের অনধিগম্য প্রহেলিকা যে রমণী মন
নাহি জানি সেথা হ'তে কেন আসে হেন আকর্ষণ !
কী ইঙ্গিত ডাক দেয় তোমাদের বাতায়ন হ'তে
আমাদের জীবনের পথে ?
সুরঞ্জিত ওই দুটি অধরের কোনে
সে কোন বসন্তসেনা, মদালসা হাসিছে গোপনে,
নিখিল বিভ্রান্ত করা হাসি !
আঁখির পলকে যেন উঠিছে উদ্ভাসি
চকিত বিদ্যুৎ বিভা,
অলকার ইন্দ্রধনু—অপ্সরা প্রতিভা—
ভ্রূভঙ্গ বিলাস-লীলা
আবেগে কম্পিত করে স্থাণু হেন জড়পিণ্ড শিলা।

রক্তে আনো মত্ত দোলা, চিত্তে শিহরণ,
তোমাদের অঙ্গ আবরণ
অনঙ্গের যেন আভরণ !
বিচিত্র বরণ বেশ বাস,
শ্রাবণ মেঘের প্রায় নিবিড় তিমির কেশ পাশ,
মুগ্ধ করে আমাদের,—মানি :
তবু জানি,
যত কিছু রুচিরম্য চারু প্রসাধন
সে তো শুধু করে দেবী তোমাদের স্বরূপ গোপন।

যুগে যুগে—জানি কালে কালে,
আমাদের দৃষ্টি অন্তরালে
নিজেরে সাজাও অভিনব।
কবে এই ছলনার ছদ্মবেশ তব
ছিন্ন করি, ভিন্ন করি কৃত্রিম ও মিথ্যা পটভূমি
তোমার প্রকৃতি রূপ শুভক্ষণে প্রকাশিবে তুমি।

অনন্ত যে কৌতুহল জেগে আছে অনাদি কালের
দীর্ণ করি সেই চির পৌরাণিক রহস্য জালের
দেখা দিক শাশ্বত সে নারী, নারী শুধু যার পরিচয়,
নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ, যেবা কেহ নয়,
শুধু মাত্র নারী,
আমরা দর্শনপ্রার্থী চিরদিন তারি।
আদ্যাশক্তি রূপে যারে বারে বারে করেছি বন্দনা,
আমাদের চিরারাধ্যা শুধু সেই জনা।

দেখা দিক সেই নারী যার কাছে দিগ্বিজয়ী মানি' পরাভব
চরণে আনিয়া দেয় ধরণীর আহৃত বৈভব !
দেখা দিক সেই নারী, অঙ্গুলী হেলনে হেলে যার
এ বিশ্ব সংসার !
ক্রুদ্ধ যার কটাক্ষের ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে
সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে নাড়া লাগে বাসুকির ভিতে :
তোমরা যে তাদেরই দুহিতা,
তোমরা ত্রিকালব্যাপি হে অপরাজিতা !
বিজয়িনী সমগ্র ধরায় ;
পৌরুষ কাঁদিয়া ফেরে যেথা অসহায়।
যে নারী সৃষ্টির মূলাধার,
জীবধাত্রী ধরিত্রীর পালয়িত্রী মহাশক্তি যার—
দেখা দিক সেই নারী সীমা নাই যার মহিমার !

তোলো নারী , তোলো তব জীবনের যবনিকা খানি,
ছদ্ম আবরণ যত খুলে ফেল টানি,
দেখাও প্রকাশ করি আপনার প্রকৃত স্বরূপ—
যেথায় গোপনে জ্বালি অন্তরের প্রেমস্নিগ্ধ ধূপ
একা বসি নিরজনে পূজিতেছ প্রাণের ঠাকুরে,
চিত্তের অব্যক্ত বাণী—মর্মের অশ্রুতপূর্ব সুরে
শুনিছ যেথায় মনে মনে,
আমি চাই প্রবেশিতে তোমাদের সেই হৃদি কোনে—
যেথা কভু নাহি কোনো নয়ন ভুলানো পত্রলিখা,
যেথা তব প্রাণদীপে অকপট শুভ্র শান্ত শিখা
জ্বলিছে নিভৃতে,
যেথা তব মুক্ত মনে সমুদার চিতে
খেলা করে স্বচ্ছ নীল নির্মল আকাশ,
যেথা সদা দক্ষিণা বাতাস

কামনা কলুষ স্পর্শে নহেকো চঞ্চল ;
যেথায় অম্লান তব প্রাণ-শতদল
একান্তে রচিছে ধ্যানে অর্ঘ্য দেবতার ;
যেথা তুমি নিয়ে যাও জীবনের শ্রেষ্ঠ
উপহার
তোমার আপন সন্তানটিরে,
আমি সেই পূজার মন্দিরে
ক্ষণেক দাঁড়াতে চাই শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে।
আমার বিমুগ্ধ এই শ্রদ্ধা দৃষ্টি ল'য়ে
বারেক হেরিতে চাই না-দেখা যে
সম্পূর্ণ তোমারে !
নাই যেথা ছলা কলা বিলাস বিভ্রম একেবারে :
সৃষ্টির প্রথম নারী ছিল সে যেমন অর্বাচীন,
নবীন অন্তর খানি আবিলতাহীন ;
সংকীর্ণ স্বার্থের যেথা নাহি কোনো ছায়া,
যেথা শুধু ভালবাসা, বুকভরা মমতা ও মায়া।
ছোট, বড় আত্মপর, মিলায় যেথায় নির্বিচারে,
তোমার অতলস্পর্শী সীমাহারা স্নেহ পারাবারে
অবগাহি ধন্য মানে সন্তানেরা জন্মজন্মান্তর,
যেথা তুমি শুধু নারী—জগজ্জননীরূপা, কেহ তব
নহে যেথা পর,
যেথা তুমি সহজাত শুচিশুদ্ধ অকপটপ্রাণ,
অযাচিত অফুরন্ত করো স্নেহ দান ;
যেথা তব সম দুঃখ সুখ
চিত্ত যেথা নিত্য তব নিখিলের কল্যাণে উন্মুখ,
সখী ও সচিব মিত্র গৃহলক্ষ্মী প্রিয়া একাধারে,
যার মাঝে দেখা পাই আমার একান্ত আপনারে—
সেই তো প্রকৃত নারী—শক্তিস্বরূপিণী আমি তারে
প্রণাম জানাই !
আমার অন্তর হ'তে তাই বারে বারে ;
স্তবগান করি তার, বলি,—তুমি জগতের আলো !
যুগে যুগে তোমাদেরই বাসিয়াছি ভালো।

আল্পনা—

—ইন্দিরা বিশ্বাস
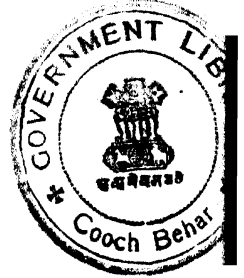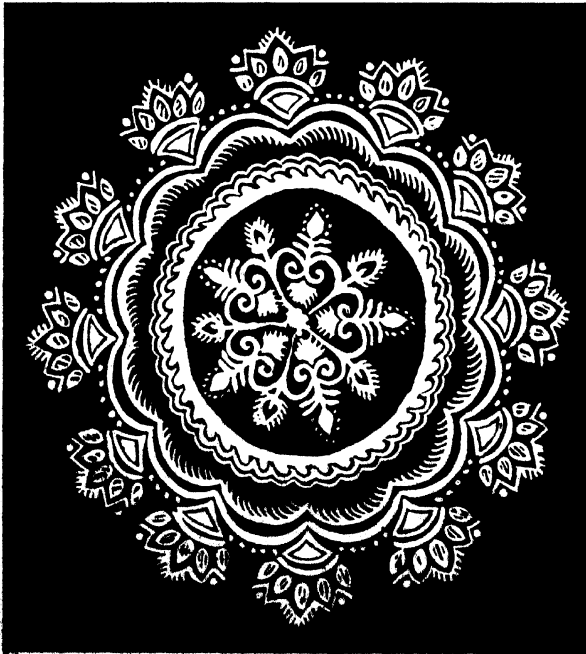
ভিখারীটা একজন বড়লোকের দাওয়ায় বসেছিল। রোদে কাঠ ফাটছিল চতুর্দ্দিকে। পিচের রাস্তাগুলো গরমে নরম হয়ে গিয়েছিল। বেচারা এই রোদে আর হাঁটতে পারছিল না। হেঁটেও লাভ হ'ত না কিছু। এই দুপুরে সকলের বাড়ির কপাট বন্ধ। কে তাকে ভিক্ষা দেবে। হাঁকাহাঁকি করলে দূর দূর করে' তাড়িয়ে দেবে সবাই। ভাত খেয়ে ঘুমের সময় তো এটা, এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয়। সকাল থেকে অনেক হেঁটেছে বেচারা, কিন্তু বেশী কিছু পায় নি সে। আজকাল নয়া পয়সার যুগ, নয়া পয়সাই দেয় সবাই। দু'মুঠো ছাতু খেতে গেলেও চার আনা পয়সা চাই। এক নয়া পয়সা ভিক্ষা

পেলে পঁচিশটা নয়া পয়সা চাই। পঁচিশ জন সহৃদয় লোকের দেখা পাওয়া কি সহজ আজকাল? এই সবই ভাবছিল বেচারা বসে'বসে'। লোকটা বুড়ো। অস্থি-চর্ম্মসার চেহারা। পরণের কাপড়টা ময়লা, শতছিন্ন। এত ছোট যে উরুত দুটোও ঢাকে নি ভাল করে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি। ছোট ছোট কোটরগত চোখ। এর সঙ্গে বেমানান কিন্তু তার পায়ের জুতো জোড়া। ছেঁড়া বটে, কিন্তু ভাল চামড়ার। তার আভিজাত্যের চিহ্ন এখনও তার সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান। একজন ধনী যুবক জুতো জোড়া দান করেছিল তাকে কিছুদিন আগে। দয়া-পরবশ হ'য়ে ততটা নয়—যতটা তার শু র‍্যাক (shoe rack) খালি করবার জন্যে। তার জুতো রাখবার জায়গায় আর স্থান ছিল না। ও জুতো বিক্রিও করা যেত না, তাই দানই করতে হয়েছিল।

ভিখারীটা ঢুলছিল বসে' বসে'। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

"পৌলিশ, পৌলিশ"

ভিখারী দেখলে একটা রোগা ছেলে জুতো পালিশের সরঞ্জাম ঘাড়ে করে' রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"পৌলিশ, পৌলিশ—"

চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। রাস্তায় কেউ নেই। এই রোদে কে জুতো পালিশ করাতে বেরুবে? কি বোকা! হাসল ভিখারীটা।

"এই শোন—"

ছোঁড়াটা এগিয়ে কাছে আসতেই ভিখারীটা যা বলল তা অবিশ্বাস্য।

"আমার এই জুতোটা পালিশ করে' দে।"

"তুমি জুতো পালিশ করাবে?"

একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটি-ফুটি করতে লাগল ছোঁড়ার চোখের দৃষ্টিতে।

"হ্যাঁ করাব—"

"চার পয়সা লাগবে"

"চার পয়সা মানে ছ' নয়া পয়সা তো? দেখি।"

"হ্যাঁ, আছে আমার কাছে। পালিশ করে' দাও জুতোটা—নাও, আগেই দিয়ে দিচ্ছি।"

সেদিন সারা সকাল ঘুরে ছ'টি নয়া পয়সাই রোজগার করেছিল সে।

ছোঁড়াটা জুতো পালিশ করতে লাগল।

অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে স্মিত মুখে ছোঁড়াটার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল ভিখারীটা। কল্পনা করছিল। বছর-খানেক আগে তার ছোট ছেলে হুলিয়া পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে নাকি এখন কলকাতার রাস্তায় জুতো-পালিশ করে' বেড়ায়। হুলিয়ার মুখের সঙ্গে এ ছেলেটার মুখের কোনও সাদৃশ্য নেই। ভিখারীটার কিন্তু মনে হচ্ছিল আছে। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সে ছেলেটার মুখের দিকে। ছোঁড়াটা মুচকি মুচকি হাসছে। হুলিয়াও ওই রকম হাসত।
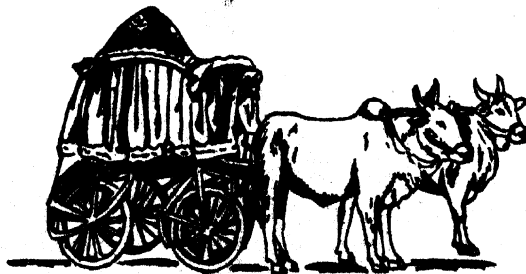
দ্বিজেন্দ্রলাল

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বঙ্গমাতার সুসন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল আজ আর ইহজগতে নাই—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনোচিত অমরধামে হাসিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত মরণকে উপহাস করিতে পারে কয় জন? 'সিংহল-বিজয়' নাটকের যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতিত হইল। বঙ্গভারতীর কাব্য-কুঞ্জে তাঁহার সুললিত প্রাণ-মাতান সুধাবর্ষী সঙ্গীত-স্বরলহর আকাশে বাতাসে আর ভাসিয়া বেড়াইয়া 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে' না—হৃদয় বীণার তন্ত্রীগুলিতে আর ঝঙ্কার দিবে না—কুজন-আকুল কলকণ্ঠের সুমধুর কাকলী আর শুনিতে পাইব না। বঙ্গবাণীর মন্দিরে অগ্নিহোত্রী ঋত্বিকের উদাত্ত অনুদাত্ত প্লুতস্বরে আর সামগীতি উঠিয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব ভাবের সমাবেশ করিয়া দিবে না—জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা লইয়া নাট্যে, কাব্যে, গানে, ব্যঙ্গকবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল আর আমাদিগকে শিবসুন্দর ধ্রুবের পথ দেখাইয়া দিবেন না। বাঙ্গলার অবসাদের দিনে সত্যকে প্রেয়ঃ করিতে কে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিল?—জননী জন্মভূমির প্রকৃত গৌরবগাথা শুনাইয়া কে আমাদিগকে বঙ্গমাতার সহিত পরিচয় সাধন করিয়া দিয়াছিল? যখন আমরা 'বন্দেমাতরমের' ঋষির সেই 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা' বঙ্গমাতার কথা বিস্মৃত হইতেছিলাম—যখন সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়' গানের সুরলহর আকাশে মিশিয়া গিয়াছিল—যখন প্রবাসী কবি গোবিন্দরায়ের 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও' ক্ষীণ-স্রোতা যমুনার মত আগ্রার কুঞ্জকানন হইতে বঙ্গদেশের বাতাসে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সমীরিত হইতেছিল—যখন বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর কণ্ঠে কণ্ঠে 'অয়ি ভুবন-মন-মোহিনি সূর্য্য-করোজ্জলধরণি' গীত হইয়া বাঙ্গালীর মানসপটে তুষার-কিরীটিনী ভারতলক্ষ্মীর শোভা সম্পদের চিত্র জাগাইয়া তুলিতেছিল, তখন কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগরিত করিবার জন্য 'আমার জন্মভূমি' ও 'আমার দেশ' গাহিয়া আমাদের হৃদয়-বীণায় আঘাত করিয়াছেন—ভাবের হিল্লোল তুলিয়াছেন—নয়ন-সম্মুখে 'ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' দেশমাতৃকার যে মনোরম চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা ফরাসীদিগের "মার্সেলুস্" ব্যতীত জগতের সাহিত্যে বিরল। আমাদের দেশ 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। বাস্তবিকই কি আমাদের সাধের জন্মভূমি কল্পনার মধুর আলোকে উদ্ভাসিত নয়? নদনদীর অব্যক্ত-মধুর গীতি, পক্ষীদিগের কাকলিকূজন কি আমাদিগকে তাপদগ্ধ এই সংসার হইতে দূরে শান্তির আলয়ে, স্বপ্নময় কুহকরাজ্যে লইয়া যায় না?—আর আমরা যাঁহাদের বংশধর, তাঁহাদের নিকট জগতের সকল দ্রব্যই মায়া—স্বপ্ন। তাহারা লোকোত্তর অতীন্দ্রিয় মোক্ষের জন্য লালায়িত ছিলেন। আর আমাদের এই জন্মভূমি যে পূত ঋষি যতি সাধকদিগের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? প্রকৃতির উপাসক কবি বঙ্গজননীর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া জগতের সমক্ষে নিজ জন্মভূমির বিশেষত্ব দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—প্রাণের নিভৃত কন্দরে যে আশা তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অন্তঃসলিলা স্বদেশ-হিতৈষণার ফল্গুনদী উৎসারিত হইয়া জানিনা কাহার প্রেরণায় বাহির হইল—"আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি"—ভাই বাঙ্গালী, দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট কি আমরা এই মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইব? "আমার দেশে" কবি দেখাইয়াছেন, আমাদের অভাব কিসের?—অতীত যাঁহাদের উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ তাঁহাদের অন্ধকারময় হইতে পারে না।" 'যদি ও মা তোর দিব্য আলোক ঘেরিয়াছে আজি আঁধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর'—তিনি জীবনে আশাহত হন নাই। আমাদের জড়ত্ব, আমাদের অবসাদ, আমাদের কর্ম্মে শিথিলতা দূর করিতে হইবে—জগতের

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

"ভারতবর্ষ"-র প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, আজ সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরের প্রথম সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিতেই শুধু নয়—প্রথম সম্পাদককে স্মরণ করেও তাঁর সেই প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

[স]ক্ষে আমরা যে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বংশধর, [ত]াহা দেখাইতে হইবে—দেখাইতে হইবে 'মানুষ আমরা [ন]হিতো মেষ' তাই তিনি মর্ম্মভেদী দুঃখে বলিয়াছেন, [']আবার তোরা মানুষ হ"—ইংরেজী চরিত্রে (Ethics) [য]াহাকে বলে "Be a Person" আপনাকে চিনিতে হইবে—আপনার সুপ্ত শক্তির পরিচয় লইতে হইবে। একদিন জ্ঞান-গরিমায় বাঙলাদেশ ভারতের মুকুটমণি ছিল—যেদিন ভারতের অন্যান্য দেশের ছাত্রেরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বাঙলার নবদ্বীপে আসিয়া বাঙ্গালীগুরুর পদতলে বসিয়া ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, স্মৃতি শিক্ষালাভ করিত—যেদিন শৌর্য্য বীর্য্যে বাঙ্গালী ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করিত; যেদিন বাঙ্গালীর দয়া-দাক্ষিণ্য ও সর্ব্বস্ব-দানের নিদর্শন দেখিয়া ভারতবাসী মুগ্ধ হইত—যেদিন বাংলা ভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সকলের আদর্শ ছিল—সেই দিন পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে; এবং কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আমরা শক্তিধর হইয়া মানুষ হইব, তখনই জননী জন্মভূমির জড়তা ঘুচাইতে পারিব। উষার স্নিগ্ধ মঙ্গল আলোকের সহিত আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আর সেই শুভদিনে আমরা কবির সহিত যেন বলিতে পারি,—'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ'। এরূপ অকৃত্রিম মাতৃ-পূজকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, দেশও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পথে ততই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। বিয়োগ-বিধুর বাঙ্গালীর নিকট তাহা এখন আশা করা যায় না। তবে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সামান্য পরিচয় দিয়া পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে দুই একটা কথা বলিব।

প্রসিদ্ধ সমালোচক Buffon বলিয়াছেন—মনীষীর চরিত্র তাঁহার রচনাভঙ্গীতে (Style) প্রতিভাত হইয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব—তাঁহার ভাব ও ভাষার বেশ সামঞ্জস্য আছে। সোজাকথায়, সরলভাবে হৃদয়ের ভাব বুঝাইতে তিনি অদ্বিতীয়। দ্বিজেন্দ্র-লালের বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানে। তাঁহার গানে [অশ্ল]ীলতার অভাব নাই, শ্লেষবিদ্রূপ নাই, মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ নাই—আছে সরল হাসি ও কৌতুক। সময়ে সময়ে হাসির আবরণ ভেদ করিয়া অরুন্তুদ জ্বালা প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু কখন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই। ব্যথীর জন্য সমবেদনার উৎস তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয় হইতে সর্ব্বদাই ছুটিতে থাকে। হাস্য-রসিকেরা সামাজিক ব্যাধিগুলি দূর করিবার জন্য হাস্যরসের অবতারণা করেন, দোষীর দোষগুলি লোক-লোচনের সমক্ষে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন—হৃদয়ের পরতে পরতে যাহাতে তাহারা যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে, তাহাই করিয়া থাকেন। আর আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদের হইয়া কৌতুক করেন, আপনাকে তাহাদের একজন করিয়া লন,—"আমরা সেজেছি বিলাতি বাঁদর" "We are reformed Hindus" "আমরা বিলাত-ফের্ত্তা ক ভাই" প্রভৃতি গানে তিনি আপনাকে বাদ দেন নাই। তিনি বলিতেছেন, ভাই আমি তোমাদেরই একজন, কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি, একবার নয়ন মেলিয়া দেখ। তাঁহার এই শ্রেণীর হাসির গানে আমরা হাস্য-রসিক Edgar Allen Poer করুণ-রসের প্রাচুর্য্য দেখতে পাই। নন্দলালের দেশ-হিতৈষণায় আমরা তথা-কথিত স্বদেশ প্রেমিকদিগকে বিপথগামী হইতে দেখিয়া হাসিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদিগকে ঘৃণা করি না। ব্যালজাক বা থ্যাকারের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের এইখানেই পার্থক্য। তাঁহারা মানবদ্বেষী (Cynic); ভ্রান্ত মানবকে তাঁহারা ঘৃণা করেন; দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্য আপনিও তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সহিত সমবেদনা দেখাইয়া থাকেন—এই সমবেদনা ও করুণাই তাঁহার হাসির গানের বিশেষত্ব।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা অনেক স্থলেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কোন কোন চরিত্রের ভূমিকা তিনি ইংরেজি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়া অঙ্কিত করিয়া প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রবন্ধে পাঠকগণ তাঁহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণশক্তি, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার প্রকৃতি-সমালোচনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। মৎ-সম্পাদিত "বাণী" পত্রিকার পাঠকেরাও তাঁহার গোরার

সমালোচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে 'ভারতবর্ষে' সেই শক্তির পরিচয় দিবার অধিকতর সুযোগ পাইতেন।

যেদিন প্রথম তিনি বাঙলা ভাষায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক খানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার নিকট আসেন, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। যখন তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে তাঁহার সহযোগী করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তখন তাঁহার উদার-হৃদয়ের ও বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু যখন আমি আমার অক্ষমতার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তখন তাঁহার কাছে যে সকল উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। তখন তাঁহার সহৃদয়তা ও সহজ সরল সহাস্য আননের শক্তি অনুভব করিয়া তাঁহার কথায় 'না' বলিবার শক্তি আমার ছিল না। হৃদয়-বশীকরণের অমোঘ শক্তি যে তাঁহার এত ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না—মানবের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে মানব যে কার্য্য করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতাম না, জানিতাম না সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন এত অল্প সময়ের মধ্যে লোককে আপন করিয়া লইতে পারে, এমন শক্তিধর গৃহী বাঙ্গালায় আছেন। কিন্তু হায়, তখন কে জানিত বঙ্গ-ভারতীর পূজার মন্দিরের হৈম প্রদীপ এত শীঘ্র নিবিয়া যাইবে, কে জানিত জীবন-মধ্যাহ্নে দ্বিজেন্দ্র-তপন চিরতরে অস্ত যাইবে—কে জানিত নির্ম্মম কাল আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ ব্যবধান করিয়া দিবে,—কে জানিত তাঁহার সাহায্য হইতে আমি এরূপে বঞ্চিত হইব, কে জানিত আমারই মস্তকে এই গুরুভার ন্যস্ত হইবে। যাহা যায় তাহা ত আর ফিরিবার নয়—দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্দ্ধানে 'ভারতবর্ষের' যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবে ভগবানের কৃপায় 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদনে আমরা আমাদের অগ্রজ-প্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্তজলধর সেন মহাশয়ের সহায়তা লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত পথে চলিবে। কবির ভাষায় বলি—

"তোমারই চরণ করিয়া শরণ
চলেছি তোমারই পথে;"—

দ্বিজেন্দ্রলাল ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও অল্প দিনের মধ্যেই 'ভারতবর্ষের' জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ অনেক দিন ধরিয়া উপভোগ করিতে পারিবেন।

মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণপ্রিয় 'ভারতবর্ষ' যেন বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষা-ভাষীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়।

যাকে নিয়ে গল্পের অবতারণা তার ডাক নাম ফিরিঙ্গী। আট সাট ভরাট গঠন, উৎকট সাদা রং, চোখের তারা ফিকে নীল, চুলেও কালর লেশমাত্র নেই, হঠাৎ দেখলে ধবল রোগী বলে ভ্রম হয়। ভীতিপ্রদ রোগ গা ঘেঁসে থাকলেও তার উছলে-পড়া যৌবনে এমন একটি আকর্ষণ ছিল যার নাগালে এলে রূপসন্ধানী ঘনিষ্ঠতার জন্য লালায়িত হয়ে উঠত। জনরব, অনেক দৃঢ়চিত্ত চরিত্রবানকেও পরীক্ষার বাজীতে টলতে দেখা গিয়েছে।

ফিরিঙ্গীর জন্ম-ইতিহাস কেহ জানে না। জানার প্রয়োজনও হয় না—কারণ যেখানে সে থাকে সে অঞ্চলে বংশপরিচয় অচল। ফিরিঙ্গীর বসবাস খোলার ঘরে। বাড়ীর সামনেই পাঁকে ভরা প্রাচীন নর্দ্দামা দীর্ঘকাল ধরে পচাকে জড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে। নর্দ্দামার গায়ে লাগা হাতখানেক চওড়া সিমেণ্ট বাঁধান রোয়াক, প্রত্যহ পরিষ্কার হওয়ার দরুণ চিক্কন হয়ে গিয়েছে। পরিচ্ছন্নতার ঐটুকু জলুসই পরিবেশের সামঞ্জস্যে গরমিল এনে দিয়েছে। দৈন্য ও সৌখীনতার জাতিগত আক্রোশ থাকা সত্ত্বেও পংক্তির আসনে এইরূপ শিষ্টাচার কমই দেখা যায়। সংক্ষেপে পচা পাঁক ও পালিশের যোগাযোগে স্থানটি বৈশিষ্টপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অন্ধকারের আমেজ লাগলেই রোয়াকে রূপপ্রদর্শনীর মেলা বসে। ওজন ও জলুসের অনুপাতে পণ্যবস্তুর দরকসাকসি চলে। হিসাবে গোল বাধলে অনেক সময় ছুরির ব্যবহারে বচশার নিষ্পত্তি করতে হয়। এইরূপ ঘটনায় আঁতকে ওঠার কিছু নেই, ছুরির ব্যবহার এদিকে নিত্যই ঘটে থাকে।

ফিরিঙ্গী জীবিকা উপার্জ্জন করে এই রোয়াকে বসে। দরদস্তুর তার ধাতে সয় না, খরিদ্দারকে পর্য্যন্ত সে যাচাই করে থাকে। অদ্ভুত আচরণে এগিয়ে আসা মানুষ পিছিয়ে পড়ে, অন্নদাতা বেহাত হয়ে যায়। সকলেই জানে এ পাড়ায় ক্রেতাকে বাছাই করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ। ফিরিঙ্গী এদিক দিয়ে একটু কেমনতর। সব জেনেশুনেও চরিত্র শুদ্ধি সম্বন্ধে নির্ব্বিকার।

অশোভনীয় আচরণ দেখে সমব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে "তুই যদি অমন তো এ পাড়ায় এলি কেন।" মোট কথা তার দম্ভ, প্রতিবেশীদের কাছে আলোচনা ও ঈর্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঈর্ষার সঙ্গে অভিযোগের কারণও ছিল যথেষ্ট। ওর জ্বালায় পাড়াটারই বদনাম রটতে আরম্ভ করেছে। খরিদ্দারদের মধ্যে সকলেই তো উদার মন নিয়ে আসে না, অমন চরিত্রের কথা মুখে মুখে ঘোরে, ফলে যারা সৎপন্থী তাদের কারবারের উপরেও লোকে কটাক্ষপাত করতে

ছাড়ে না। প্রতিবেশীরা এই কারণে ফিরিঙ্গীর উপর চটা।

ফিরিঙ্গীর দুর্নীতি অক্ষমনীয় হলেও তার একটি অনুরাগী ছিল, দুর্দ্দিনে তাকে কাছে পাওয়া যেত, অভাবকে সামলে নেবার ভার সে নিজেই নিয়েছিল। কয়দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির জন্যই বোধ হয় সে এদিকে আসতে পারে নি। বাড়ির সামনে হাঁটুর উপর জল জমে গিয়েছে, রাস্তা নর্দ্দামা রোয়াক সব একাকার। সব কিছুই জলের তলায় অন্তর্ধান করেছে। এ দিকটা ঢালু হওয়ায় সদর রাস্তার যাবতীয় ভাসমান আবর্জ্জনা রোয়াকের সামনে জড় হয়েছে। বস্তির বাসীন্দাদের সঙ্গে আবর্জ্জনার কেমন একটা মিল ঘটে গিয়েছে, সদর থেকে বিতাড়িত নোংরা যেন এইখানে আশ্রয়ও স্থায়িত্বের সন্ধান পেয়ে আর নড়তে চায় না। কত দিন এইভাবে চলবে তার স্থিরতা নেই, কারণ সুযোগ বুঝে করপোরেসনের ম্যাথররাও ধর্ম্মঘট করে বসেছে। অভি-যোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রোয়াকে কেনা বেচার কাজ বন্ধ।

দুর্য্যোগের মাঝে ফিরিঙ্গী জ্বরে পড়ল। ঘরে এক ফোঁটা পানীয় জল পর্য্যন্ত নেই। রাস্তার কল থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়, কল আকণ্ঠ নিমজ্জিত। চালের হাঁড়ীও বোধ হয় শূন্য। যৎসামান্য কিছু পড়ে থাকলেও রাঁধবে কে? এখানে সকলেই স্বপাক-ভোজী, মাইনে দিয়ে পাচক রাখার ক্ষমতা কাহার নেই। দুর্য্যো-গের আবির্ভাবে যে যার নিজের তাল সামলাতেই ব্যস্ত। ভাগ্যগুণে ফিরিঙ্গী জ্বরের জ্বালায় বেহুঁস হয়েছিল, তা না হলে জঠরের জ্বালায় কাহার না কাহার দ্বারে অন্নের জন্য ধন্না দিতে হোত। পাশের ঘরের মেয়েটি থাকলে এতটা ভাববার ছিল না, তাকেও আজ কয়দিন হোলো ঘরের মানুষ পুলিসের সাহায্যে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে।

ফিরিঙ্গী তক্তপোষের উপর শুয়ে শূন্য হাঁড়ী আর ঘরের কথাই ভাবছিল, তার সঙ্গে নিজের অতীত জীবনের কথা মনে পড়তে লাগল। লোক মুখে শোনা, সে যখন সদ্যজাত শিশু—তখন কেহ তাকে আশ্রমের প্রবেশ দ্বারে রেখে যায়। ছোট্ট পুলিন্দার ভিতর শীতের রাতে কেমন করে বেঁচে ছিল, তা আজও বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে আছে। সে আজ কুড়ি বৎসর আগের ঘটনা।

আশ্রমের একটি নাম আছে তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই, হোম বললেই আমাদের কাজ চলে যাবে। হোমের নিয়ম কানুন বিদেশী আদর্শে বাঁধা। নিয়মের পূজা এখানে বাঁচার প্রধান অবলম্বন। উঠতে বসতে "না"-এর বেড়া চলন্ত পা-কে আড়ষ্ট করে দেয়। হাসিকান্না রাগদুঃখ সোহাগ যাবতীয় স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে সংযমের শাসনে এমন ভাবেই দমন করা হয় যে সজীব মানুষকে দম দেয়া কলের পুতুল ছাড়া আর কিছু ভাবা চলে না। ঘড়ীর কাঁটা জড় হলেও যেমন চলে, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেমন সময়কে অতীতের গহ্বরে সমাধিস্থ করে, প্রতিটি মুহূর্ত্ত ক্ষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ঠিক সেই ভাবে এখানকার মানুষরা জীবনকে শেষ করে জড়ত্বকে সার্থক করার জন্য। প্রতিনিয়ত নিজেকে পাপী ভেবে পুণ্যের খাতায় জমার দিক বাড়ায়—মৃত্যুর পর লাভজনক হিসাবের আশায়।

দিনের পর দিন এই প্রথায় জীবনধারণ ফিরিঙ্গীর কাছে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল। যান্ত্রিক প্রথায় দৈনন্দিন কর্ত্তব্য শেষ করার পর যখন সহকর্ম্মীরা তাস খেলা বা দিবানিদ্রায় ক্লান্তি দূরীকরণের ব্যবস্থা করত তখন ফিরিঙ্গী জানালার ধারে একেলা বসে থাকত। চোখের সামনে লোহার গরাদগুলো বন্দীশালার সীমানায় পাহারা দিলেও ওদের পাশ কাটিয়ে রাস্তার পথিকদের চলাফেরা দেখে সে সান্ত্বনা পেত। আপন মনেই চলার তাগিদ খুঁজে বার করত, ভাবত যে কারণেই চলার প্রয়োজনীয়তা আসুক, ওরা দেয়াল ঘেরা আড়ষ্টতার মধ্যে আটক পড়ে নি। যে রাস্তা দিয়েই হাঁটুক চলার উদ্দেশ্য ওরা নিজেরাই ঠিক করে এবং ইচ্ছামত চলার পথে মোড়ও ঘুরতে পারে। তুলনায় নিজের কথা ভাবতে গেলে মনে হোত, আর কতদিন।

বয়সে তখন যৌবনের তাত লেগেছে। অজানাকে জানার বাসনায় অন্তর্জ্বালা অসহনীয় হয়ে উঠলেও দুঃখের কাহিনী বলার সাহস ছিল না, পাছে কাহাকেও ভাল-বাসার ইচ্ছাও পাপ বলে গণ্য হয়। এই অন্তর্বিপ্লবের সময়, রুখে ওঠা যৌবন এল তীব্র আলোড়ন সঙ্গে নিয়ে। নতুনকে জানার তাগিদে কৌতুহল যখন মনের আনাচে-কানাচে উঁকিমারা সুরু করে দিয়েছে তখন নবাগতের আকর্ষণে আর একজনের সাড়া পাওয়া গেল। তিনি হোমের নতুন মাষ্টার মশাই।

ফিরিঙ্গীর লেখাপড়া তখনও শিশুপাঠ্য পুস্তকের বাইরে আসতে পারেনি, তথাপি শিক্ষা সম্বন্ধে বৃহত্তর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য থাকায় মাষ্টার মহাশয় ফিরিঙ্গীকে প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী সময় দিতেন, দেশ বিদেশের কথা শোনাতেন—বিদেশী স্বাধীনপন্থী নারীর ব্যাখ্যায় দেশী ঘরোয়া কথা এসে পড়ত। আমাদের জীবন ধারায় যে নারীর স্থান সংসারের গারদখানায় আটক পড়েছে, সকাল বিকাল সন্ধ্যায় যে প্রাচীনপন্থী মেয়েরা পরের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করে নিজের কথা ভাববার অবকাশ পায় না—তা দৃষ্টান্ত দ্বারা এমন ভাবেই বুঝিয়ে দিতেন যে ফিরিঙ্গী বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যেত। কত সময় জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে, "ওরা বিয়ে না করে একলা থাকে কেমন করে, চোর ডাকাত এবং বদলোক পিছু নিলে আত্মরক্ষাই বা সম্ভব হয় কেমন করে, বিয়ে না করে ভালবাসা পাপ নয় কি?" আর কত কথা জানার ইচ্ছা প্রবল হলেও, প্রশ্নকে এগিয়ে দিতে সাহস পায় না পাছে মাষ্টার মশাই তাকেই খারাপ ভেবে বসেন। এদিক দিয়ে মাষ্টার মশাইএর বিশ্লেষণ, সংস্কারবদ্ধ নীতি সমর্থন না করলেও তাঁহার কথা শুনতে ভাল লাগত, সর্ব্বদা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার হিতোপদেশ শুনতে শুনতে ফিরিঙ্গীর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। মাষ্টার মশাইএর আবির্ভাবে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছিল। কথোপকথনের মধ্যে আর একটি লোভনীয় আকর্ষণ ছিল, তা ফিরিঙ্গীর সৌষ্টবপূর্ণ গঠনের উচ্ছসিত প্রশংসা। নারীর সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যায় তুলনামূলক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হলেই মাষ্টার মশাই ফিরিঙ্গীকে আদর্শ না করে পারতেন না। কাবতা ঘেঁসা ভাবোচ্ছাস শ্রুতিমধুর হলেও, স্বকর্ণে আত্ম-প্রশংসা শোনা বিশেষ করে গঠনের, একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ফিরিঙ্গীর কাছে এ খবর গোপন ছিল না, তথাপি সে নিজেকে ভালবেসে ফেলেছিল, দুটো ভাল কথা শুনতে ভালই লাগত।

রূপচর্চ্চায় ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও উচ্ছ্বাসের সতর্ক প্রয়োগ ফলপ্রদ হয়ে ওঠায় মাষ্টারের প্রত্যাশারও ক্রম-বিকাশ দেখা গেল। প্রিয়দর্শনার সহিত ঘনিষ্টতার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। খুবই স্বাভাবিক—কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, গুরু শিষ্যার মাঝে নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়, দাতা ও গ্রহীতার মাঝে অন্তরায় সরাবার জন্য একদিন অভাবনীয় প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন, মুক্তির প্রস্তাব। হোমের বাইরে যে একটি জগৎ আছে, মানুষ যে সেখানে ইচ্ছামত চলা-ফেরা করে এবং প্রতি পদবিক্ষেপে পাপের কথা স্মরণ করতে হয় না, এই কথা যুক্তির দ্বারা বোঝানর পর একটি চিরকুট কাগজে হোমের বাহিরে যাবার পথ নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন। চিরকুটে একটি ঠিকানা এবং ঘর ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া আর কিছু লেখা ছিল না।

হোমের বাইরে ঠিকানা পড়তে ফিরিঙ্গীর ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠল। একদিকে আজন্মকালের আশ্রয় ও সংস্কার, অপর দিকে মুক্তির ডাক ও অজানার মোহ। দ্বিধার দ্বন্দে সারাটা দিন কিভাবে কাটল সে নিজেই বুঝতে পারে নি। চোখের তলায় কালীমার ছাপ দেখে দুই একজন সমবয়সী সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় ফিরিঙ্গী তাদের পাশ কাটিয়েছিল।

দেখতে দেখতে দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, রাত্রি এল অন্ধকারের আড়াল নিয়ে। পলে পলে ঘূর্ণমান ঘড়ীর কাঁটা এগিয়ে চলেছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দিকে, ফিরিঙ্গী ঘর-ছাড়ার ডাক শুনছে বাইরে থেকে। ক্রমান্বয় রাত্রি গভীর হয়ে আসতে লাগল। হোমে সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন, জেগে আছে কেবল ফিরিঙ্গী। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়ীর ঘণ্টা বাজায় ফিরিঙ্গী চমকিয়ে উঠল—রাত তখন একটা। ফিরিঙ্গী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ঐখান থেকে হোমের দেউড়ি আর রাস্তা দেখা যায়। ফটকের চাবি কিভাবে মাষ্টার মশাই সংগ্রহ করে ফিরিঙ্গীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। চাবিটি চিরকুট কাগজে মোড়া ছিল। ঘর থেকে বারান্দায় আসার সময় চাবি হাতের তালুতেই ছিল। অন্যমনস্কতায় তার উপর আঙ্গুলের বেসামাল চাপ পড়ায় হটাৎ মাটিতে পড়ে গেল। লোহা আর সিমেন্টের সংঘর্ষণে যে ধ্বনি উঠল তাতেই সমস্ত শরীর ও মনে এমন একটি ঝাঁকুনি খেল যে তৎক্ষণাৎ যাওয়া বা থাকার সিদ্ধান্তে আসা দরকার হয়ে পড়ল। ফিরিঙ্গী ঠিক জানত, এই মুহূর্ত্তে সুযোগ না নিলে ভবিষ্যতে আর সাহস সংগ্রহ করতে পারবে

না। এই সময় কেহ যেন কানের কাছে এসে চুপি চুপি বলে গেল "বেরিয়ে পড়"।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ফিরিঙ্গী ধীরে অতিসন্তর্পণে ও নিঃশব্দে নেমে এল। ফটকের কাছে এসে দেখে দরোয়ান পাহারায় নেই, হয়ত—তামাক আনতে ঘরে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ফটকের তালা খুলে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

নিঝুম রাত, জনমানবহীন অজানা পথে পা বাড়াতেই ফিরিঙ্গীর ভিতরে ভূমিকম্পের মত ওলোট-পালট সুরু হোল। একলা কখন সে রাস্তায় বার হয় নি। মাষ্টার মশাই বলেছিলেন গেট থেকে খানিকটা দূরে মোড়ের মাথায় তাঁহাকে পাওয়া যাবে, তিনি সেখানে গাড়ী নিয়ে ফিরিঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা করবেন। মাষ্টার মশাই যে সময় মোড়ের মাথায় থাকবেন বলেছিলেন ঠিক সেই সময় ঘর থেকে বার হওয়া সম্ভব হয় নি, কেন তার কারণ নিজেই জানে না। গম্যস্থল কাগজে কলমে লেখা থাকলেও পথ দেখিয়ে দেবে কে? কাগজটিও চাবির সঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। সেটি আর তোলা হয় নি। মোড়ের সন্ধানে ফিরিঙ্গী হন্ হন্ করে চলতে লাগল। মোড় পেলেই সে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাঁকের পথ ধরে। একটা ছুটো করে অনেকগুলি মোড় পার হয়ে এল, মাষ্টার মশাইর দেখা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে হোম থেকে অনেকটা পথ এসে পড়েছে, দীর্ঘপথ হাঁটার অভ্যাস নেই, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি একযোগে পথ চলার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। তখন সে একটি গলির ভিতর দিয়ে চলেছে। গলির শেষে একটি বাড়ীর রোয়াক পেয়ে, বসে পড়ল। অবসাদগ্রস্ত দেহ নিয়ে অমন একটি আরামের স্থান পেতেই ঘুম এগিয়ে এল সব কিছু ভুলিয়ে দেবার জন্য। তন্দ্রার ঘোরে যখন সে জড়িয়ে পড়েছে তখন কিছুর ছোঁয়ায় চমকিয়ে উঠল, চোখ খুলতেই দেখে একরাস দাড়ী গোঁফ যুক্ত একটি জটাধারী মুখ অতি কাছে এসে অস্পষ্ট ভাষায় কিছু বলছে। উর্দ্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন, নিম্নাঙ্গ গুণ চটের বড় থলে দিয়ে ঢাকা। বুক ও হাতে কাল লোমের আবরণ এমন ভাবে পড়েছে যে হটাৎ দেখলে মনে হয় বিরাটকায় বনমানুষ। অতকাছে ঐরূপ একটি ভয়ঙ্কর জীব দেখে ফিরিঙ্গী চিৎকার করার চেষ্টা করতেই বাঘের থাবার মত একটি হাতের তালু তার মুখের উপর এসে পড়ল। পাশবিক শক্তির চাপে মুখ খুলতে পারল না, গলা দিয়ে যে শব্দ বার হোল তা কতকটা গোঙানীর মত আওয়াজ। কাতর আর্তনাদ অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল কিন্তু শোনার লোক কেহ ছিল না, সকলেই তখন ঘুমে অচেতন।

(খ)

ফিরিঙ্গী যখন জ্ঞান ফিরে পেল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। একরাশ লোক তাকে, ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলেই যেন দৃষ্টির দ্বারা তাকে ছোঁয়ার জন্য অস্থির, মাংসাশী পশুর মত ওদের চাহনি। মানুষের দৃষ্টিতে যে ঐরূপ লোলুপতা থাকতে পারে, তা ফিরিঙ্গীর জানা ছিল না। তাড়াতাড়ি, বিশৃঙ্খল শ্লথ বেশ সংযত করে উঠে বসল। একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ফিরিঙ্গীর নিকটেই প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখা গেল, তিনি বিশেষ ভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে অনেক কথা ফিরিঙ্গী সম্বন্ধে বলে ফেলেছিলেন। তিনি নাকি ফিরিঙ্গীর ভগ্নীপতি হন। মা-হারা মেয়েকে নিজের ছোট বোনের মতই মানুষ করেছেন। কিছুদিন থেকে মেয়েটার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কথায় কথায় বলত "ঘর ছেড়ে যাব"। সত্যই যে এমনটি ঘটবে তা কল্পনা করতে পারেন নি। আজ তিন দিন ঘরছাড়া, খুঁজে খুঁজে হায়রান, পুলিসে খবর দিয়েও পাত্তা পাওয়া যায় নি। ওযে বাজারের পথেই ঘুরছিল তা কে জানে। আত্মীয়তার খবর দিয়ে সকলকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কেহ যদি একটা বন্ধ গাড়ী আনিয়ে দেন তাহলে মেয়েটাকে ঘরে তুলতে পারি। বেচারা কয়দিনেই শুকিয়ে কাট হয়ে গিয়েছে। এখুনি আহারের ব্যবস্থা না করলে হয়ত আর একটা কিছু বাঁধিয়ে বসবে। শুষ্ক কাঠ দেখার জন্য ভীড় জমে নি, কিন্তু অন্নদানের কথা উঠতেই ছুই একজন করে যে যার গন্তব্য স্থানে চলে যেতে লাগল। ফিরিঙ্গীর সঙ্গে ভদ্রলোকের নিকট সম্বন্ধ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একজন হৃদয়বান উঠতি বয়সের ছোকরা ঢাকাঢুকি বন্ধ গাড়ী নিয়ে আসতে অনেকেই সাহায্য করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। ঐ রূপ গঠনকে ছোঁয়ার সুবিধা দিলে সাহায্য সহজ লব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। ভদ্রলোক নিকট

সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ট করার জন্য কাছে এসে বললেন, "লক্ষ্মীটি ঘরে চল, তোমার বোন কয়দিন তোমাকে দেখতে না পেয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। বড় বোন রাগের মাথায় যদি কিছু বলেই থাকে, তাই বলে ঘরছেড়ে চলে আসতে হয়"।

অস্বস্তিকর ঘনিষ্টতায় ফিরিঙ্গী বিরক্ত হয়ে উঠছিল। আচরণটি ভদ্রলোকের দৃষ্টির বাইরে ঘটেনি। সাময়িক ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বললেন, "আমি জানি তোমার তরফ থেকেও বলবার অনেক কিছু আছে। সব কথা ঘরে গিয়ে হবে। লক্ষ্মীটি এখন আর গোল কোর না, ঘরে চল"। ঘর আর বোনের কথা শুনে ফিরিঙ্গী অবাক—কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বলতে চাইলেও মুখ দিয়ে কোন ভাষা বার হোল না। যাবতীয় ঘটনার তাড়নায় কেমন জড়-ভরতের মত হয়ে গিয়েছিল। নির্ব্বাক ভাষায় প্রতিবাদ প্রকাশ পেলেও লোকে ধরে নিল—আত্মীয়র কথাই ঠিক; যারা গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তারা ধৈর্য্যের উপর জুলুম সহ্য করতে পারল না, পুনরায় অনুরোধের অপেক্ষা না করে মেয়েটিকে প্রায় জোর করেই বন্ধ গাড়ীতে পর্দ্দানসীন করে দিল।

গন্তব্যস্থল জানা না থাকায় ভাড়া ঠিক করা হয় নি। গাড়োয়ানও সওয়ারী তোলায় আপত্তি করল না, কারণ সে জানত এইরূপ ঘটনায় নেহ্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশীই পাওনা হয়ে থাকে। ভাড়া নিয়ে গোল বাধালে যে কমাবার চেষ্টা করে তাকেই অসুবিধায় পড়তে হয়। যাই হোক, গাড়োয়ানের প্রত্যাশার উপর কোন অত্যাচার হয় নি।

নতুন গৃহপ্রবেশের সময় ফিরিঙ্গী কোন আপত্তি করল না, সে ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছিল। ফটক পার হয়ে, দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে যে স্ত্রীলোকটি অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এল তাকে দেখলেই মনে হয় তার জীবন-ধারার সঙ্গে কুৎসিত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ফোকলা দাঁত, লোলচর্ম্ম হাতে মোটা সোনার গিল্টি করা বালা ও রুলি। জায়গায় জায়গায় গিল্টি উঠে গিয়ে যেন সৌখিনতাকে, সস্তার হিসাব মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি একগাল হেসে স্বাগতম বলার জন্য যে কয়টি শব্দ ব্যবহার করল তা সুরুচির পরিচায়ক নয়। ফিরিঙ্গীকে উপরে নিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোক বৃদ্ধাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মেয়েটি খুব সোজা নয়, সব দিক নজর রেখে তোয়াজ কোরো। আমাদের যা কাজ তাতে কেঁচ খুঁজতে অনেক সময় সাপ বেরিয়ে পড়ে। সাপের খেলায় তুমি ত বয়স পাকালে, তবু বিষ দাঁত না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত নজর রাখা ভাল। অনেক দিন পরে বাবুকে ভাল জিনিস দেবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে—খবর দিয়ে আসি। আমাদের যখন পছন্দ হয়েছে তখন বাবু আমাদের বিচারের উপর কথা বলবেন না। বকশিষও ভাল পাওয়া যাবে। বাবুর সামনে ধরতে হলে একটু সাজিয়ে দিতে হবে তো? ঘরের পয়সা খরচ করে ও কাজটি চলে না। যাই বলে দেখি, কি পাওয়া যায়।

অভ্যাস অনুসারে ফিরিঙ্গীকে উপরে নিয়ে বৃদ্ধা সুসজ্জিত ঘরগুলি দেখাতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে জানিয়ে দিল, বাবু কি রকম সৌখীন লোক। মনে লেগে গেলে পয়সা খরচে বাধে না। বাবুকে খুসী করতে পারলে, এই সব আসবাব থেকে আরম্ভ করে, মোটর চড়ে হাওয়া খাওয়া, নিত্য নতুন শাড়ী পরা—সব যুটে যাবে। তবে মুখ গুমরে থাকা চলবে না। হাসি খুসী ভাব না দেখলে তিনিই বা······বৃদ্ধার কথা শেষ হবার আগেই ফিরিঙ্গী জিজ্ঞাসা করল, "এসব কথা আমাকে বলছ কেন? তোমরা আমাকে কোথায় আনলে?" ফিরিঙ্গীর প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধা অবাক। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে শুনিয়ে দিল। ওসব কথা এখন থাক, এইটুকু বলতে পারি তুমি সুখেই থাকবে, কেবল বাবুর নজরে লাগলেই হোল। সর্ত্তপূর্ণ সুখে থাকার ইঙ্গিত শুনে ফিরিঙ্গীর কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। সন্দেহ রইল না, প্রতিশ্রুতির পিছনে পাশবিক ভোগের আয়োজন চলেছে। উল্লিখিত বাবু একটি মাংসাশী নরপশু, সেই বুভুক্ষু পিশাচকে তুষ্ট করার জন্য এরা জীবন্ত প্রাণীর সন্ধানে ঘোরে। আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি, আর অনেক আশঙ্কার প্রশ্ন গড়ে তুলেছিল, কিন্তু কোনটাই ব্যবহার করা গেল না। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ফিরে এলেন দুইজন লোক সঙ্গে নিয়ে। ওদের হাতে নামকরা দোকানের পরিচ্ছদ ও আহার্য্য, ছাপ-মারা কাগজের পুলিন্দায় ঢাকা ছিল। সামনের লোকটিকে দেখলেই বোঝা যায় বাঙ্গালী নয়। লাম্পট্যের টিকা যেন কপালে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে চোখে লাগিয়েছে সুরমা,

গায়ে চুড়িদার গিলে করা পাতলা পাঞ্জাবী, নিম্নাঙ্গে লুঙ্গী, পায়ে বাহারি পাম্পস্থ। ক্ষৌরকার্য্যের কৌশলে গণ্ড, রেশমের মত মসৃণ হয়ে গিয়েছে, চাঁচা পোঁচা গালের পাশে এক জোড়া তা দেয়া বিরাট গোঁফ, চুড়া দুইটি ধারাল বল্লমের মত খাড়া হয়ে আছে। সব জড়িয়ে বিচার করলে বলতে হয় সে একটি উচ্চস্তরের শিকারী। নারী শিকার তার পেশা।

লোকটা কথা বলে না, কেবল আড়চোখে দেখে এবং মুচকে হাসে—সে হাসি নানা ইঙ্গীতে ভরা। লোকটির চাহনি দেখেই ভদ্রলোক বুঝে নিলেন, শিকারী পরীক্ষা চালিয়েছে, এক কথায় বাতিল করার মত কিছু থাকলে গোঁফের উপর ঘন ঘন চাড়া পড়ত না। লক্ষণগুলি শুভ, এখন বাবুর কাছে মনমত খবরটা পৌছালেই হয়। শুভ লক্ষণের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ফিরিঙ্গীকে বললেন, "বেলা হোল, স্নান আহার সেরে নাও। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে চেহারাটা কি করেছ আয়নায় নিজের মুখ না দেখলে বুঝতে পারবে না। এই অবস্থায় তোমার বোনের কাছে নিয়ে গেলে আমাকে বলবে কি। এটা বাবুদের বাড়ী—তাঁহাকে খবর পাঠাতে শাড়ী আর কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন। আহার স্নানাদির পর একটু জিরিয়ে নিলেই নিজের ঘরে যাবে। বাবু বলেছেন গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে বেরুতে হচ্ছে, একটু কাজ আছে, ঘণ্টা দুইএর ভিতর ফিরে আসব।" বক্তব্য শেষ করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। সুরমাপরা লোকটি ফিরিঙ্গীকে একলা পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, সুবিধা পেতে লোলুপ দৃষ্টি আরও প্রখর হয়ে উঠল। সাপের দৃষ্টির সামনে ভেক যেমন পালাবার শক্তি হারায়, সেইভাবে ফিরিঙ্গী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্নানের অনুরোধ মনে পড়তে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হোল। যে কোন কারণে লোকটার সান্নিধ্য এড়াতে পারলে যেন সে বাঁচে। বৃদ্ধা কাছেই ছিল, ফিরিঙ্গী বললে "স্নানের ঘর কোথায় দেখিয়ে দাও"। বৃদ্ধা বুঝল—কাংলা এইবার টোপ গিলেছে, এখন খেলিয়ে তোলার অপেক্ষা মাত্র। চার ফেলার বাহাদুরিতে গোঁফের মালিক যে ভাবে দাবীর অংশ বাড়াবার চেষ্টায় ছিল তা বৃদ্ধার পছন্দ হয় নি। ওর নজর থেকে দূরে নিতে পারায় বৃদ্ধাও যেন খুসী হয়ে উঠল। কালক্ষেপ না করে গোঁফের মালিককে বললে "তুমি একটু নীচে অপেক্ষা কর, স্নান হয়ে গেলেই তোমাকে খবর দেব"।

স্নানের ঘরে আসবাবপত্রে বেশ অভিনবত্ব ছিল। তোয়ালে সাবান পাউডার সব কিছুই সাজান। উপরে ঘরগুলি দেখলে মনে হয় না এখানে কেহ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তথাপি সবকিছু সাজান দেখলে খটকা লাগা স্বাভাবিক। বৃদ্ধা নতুন শাড়ী আলনায় রেখে বললে, তোমার সুগন্ধী আতরের দরকার হবে, "বাবু ঐ জিনিসটি পছন্দ করেন। সাজিয়ে দেবার ভার আমার উপর কিনা—তাই ঐদিকটা আমাকে বিশেষ করে দেখতে হয়। নাও বাপু তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে, এর ভিতর আমি সব গুছিয়ে রাখি"।

ফিরিঙ্গি স্নানের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। গরাদহীন জানালা খোলাই ছিল, জানালার কাছে এসে দেখল দোতলা তেমন উঁচু নয়। জানালার পাশেই প্রাচীন ধরণের পায়াযুক্ত লোহার বাথ টাব। ফিরিঙ্গীর উপস্থিত বুদ্ধি বেকার বসেছিল না, হঠাৎ স্থির করে ফেলল—পায়ায় শাড়ী বেঁধে জানালার পথে নীচে নেমে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। নতুন শাড়ী পায়ায় বেঁধে যখন জানালা থেকে ঝুলিয়ে দিল তখন দেখল, শাড়ীর শেষ মাটি থেকে অনেকটা উপরে রয়ে গিয়েছে, তাছাড়া তলায় পুরান ভাঙ্গা ইটের স্তুপ। অতটা উপর থেকে ইটের উপর পড়লে পা ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিত্রাণের পথ স্থির করে ফেলেছিল।

ফিরিঙ্গী গাছে চড়া মেয়ে নয়, সার্কাসেও কখন খেলা দেখায় নি, নামার সময় কোন প্রকারে খানিকটা ঝুলে থাকতে পেরেছিল; কিন্তু পুষ্ট দেহভারের টানে হাতের মুঠো মাঝ পথেই খুলে গেল। পর মুহূর্ত্তে ফিরিঙ্গী ইটের স্তুপের উপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যে আওয়াজ শুনল—তাতে যে কোন সাহসীর রক্ত হিম হয়ে যায়। মনে হোল পায়ের কাছেই সাপের ছোবল পড়েছে। মৃত্যু দূতের ডাক হোমের বাগানেই ইতিপূর্ব্বে শুনেছিল। ফিরিঙ্গী জানত সে বাঁচা ও মরার সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। হাঁটু ভাঙ্গ ভাবেই জখম হয়েছিল। ঘটনাটি শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। ফিরিঙ্গী যেখানে আছাড় খেয়েছিল তার কাছেই সন্ত খোলস ছাড়া জাত সাপ নির্জ্জীব অবস্থায় পড়ে ছিল।

আকস্মিক উৎপাতে চমকে উঠে ছোবল মারে। এই সময় ফিরিঙ্গীকে পালাতে দেখলে তেড়ে এসে মৃত্যুর ডাক ভাল করেই শুনিয়ে যেত।

খানিকটা সময় কেটে যাবার পর, বহুকষ্টে ফিরিঙ্গী ইটের স্তূপ থেকে নেমে এল। বাড়ীর এদিকটায় কোন সময় বাগান ছিল। বাগান এখন আর ব্যবহার হয় না, চতুর্দ্দিকে আগাছায় ভরে গিয়েছে। ফিরিঙ্গী ভাবল কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে হয়ত রক্ষা পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু গোঁফের মালিককে মনে পড়তে, বাড়ীর ভিতর থাকতে সাহস পেল না—পথ খুঁজতে লাগল কি ভাবে বাহিরে যাওয়া যায়। খুবই সতর্কতার সহিত এগুচ্ছিল। ক্রমান্বয় পাচিলের গোড়ায় এসে পৌছাল। পুরান পাঁচিল, অনেক জায়গায় ধসে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখানেও ইটের স্তূপ, বাড়ীর সীমানা পার হতে হলে সাপের ঘরে পা দিয়েই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে হবে। অন্য উপায় না থাকায় কোন প্রকারে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে স্তূপের উপর তুলল এবং পাচিলের অপর দিকে নেমে গেল।

পাচিলের এ পাশে একটি পচা ডোবা, রাশীকৃত অবর্ণনীয় আবর্জ্জনা দিয়ে সেটি বোজানর ব্যবস্থা চলেছে। শূকরের দল, পচার দখল নিয়ে মাঝে মাঝে মল্লযুদ্ধে নেমে পড়ছে। ডোবার ওপাশে ডোমেদের বস্তি। বস্তির পিছনে খানিকটা খোলা জায়গা পড়ে আছে। এইখানে বস্তির যাবতীয় ময়লা ফেলা নিয়ম। জায়গাটা নিরাপদ বলেই মনে হোল। শূয়োরের পাল যেখানে দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি চালিয়েছিল সেইখানে একটি চাকা-ভাঙ্গা মোষের গাড়ী পড়েছিল। চাকার কাছে গাছের ছায়া পেতে ফিরিঙ্গী একটু বসার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। হাঁটুর বেদনায় একটা পা যেন অচল হয়ে গিয়েছে, একটু না জীরুলেই নয়। আশ্রয়ের কাছে আসতেই একটি শূয়োর ফিরিঙ্গীর দিকে এমন ভাবে রুখে দাঁড়াল যে বাকি কয়টিও নেতাকে অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। শূয়োরের সন্দিগ্ধ ভাব আসা স্বাভাবিক, কারণ সাদা চামড়ার মানুষ ওরা কখন দেখে নি। অচেনাকে মিত্র বলে গ্রহণ করার আপত্তি থাকায় প্রতিবাদের জন্য প্রথমটি রুখে দাঁড়িয়েছিল।

যে সময় পালের গোদা ফিরিঙ্গীকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল সেই সময় বস্তি থেকে একটি স্ত্রীলোক ময়লা ফেলার জন্য ডোবার দিকে আসছিল। শূয়োরের চরিত্র বিশেষ ভাবে জানা থাকায় মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তার আগেই জানোয়ারের মেজাজ সংযমের বাইরে চলে গিয়েছিল, চিৎকারকে অগ্রাহ্য করে তীর বেগে ফিরিঙ্গীর দিকে ছুটে গেল। আক্রমণের ফলে হাঁটু থেকে জানু পর্য্যন্ত যে গভীর ক্ষত হোল তাতে অঙ্গটিকে তখনকার মত অকেজো করে ছাড়ল। দারুণ আঘাতে ফিরিঙ্গী মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ঘটনা আরও মারাত্মক হয়ে উঠত, যদি স্ত্রীলোকটি একটি বাঁখারি নিয়ে শূয়োরকে তাড়া না করত। চেনা মানুষের তাড়ায় জানোয়ার পালাল বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গী আর উঠতে পারল না।

ডোমনীর চিৎকার শুনে বস্তি থেকে একজন, জোয়ান পুরুষ ছুটে এসেছিল, তখন ফিরিঙ্গী জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে, জানু দিয়ে রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। গত বৎসর ঐ দাঁতালটাই আর একজনকে জখম করেছিল। রীতিমত গুণোগার দিয়ে ডোম রক্ষা পায়। ডোমনী বললে, "দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? মেয়েটাকে তুলে নিয়ে ঘরে চল, এবার নালিশ করলে শুধু শূয়োর পালা বন্ধ হবে না, বস্তি থেকে বার করে ছাড়বে"।

পুরুষটি ডোমনীর স্বামী, মরদ বলে ডাকে। মরদ উত্তর দিলে, ঘরে তুললেই তো হবে না। ওর যা অবস্থা তাতে এখুনি হাসপাতালে না নিতে পারলে হয়ত রক্তস্রাবেই ঘরের ভিতর মারা যাবে, তখন কৈফিয়ত দেবার আর কিছু থাকবে না। মরদ কিছুদিন আগেই আধা খুনের মামলা থেকে ছাড়ান পেয়েছে। রক্তাক্ত মড়ার খবর পুলিশের কাছে পৌছালে আর দেখতে হবে না, সোজা হাজতে নিয়ে পুরবে। ডোমনী বললে, "হাসপাতালেই নিয়ে চল। কাঁধে করে তো নিয়ে যাবি না। ওকে ঘরে রেখে একটা গাড়ী ডেকে আন।"

মরদ শক্তিশালী পুরুষ, ফিরিঙ্গীকে তুলে ঘরে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হোল না।

হাসপাতাল বেশ দূরে, ট্যাকসি-ষ্টাণ্ডও কাছে নয়। ষ্টাণ্ড থেকে গাড়ী যোগাড় করে হাসপাতালে যেতে হোলে যে ভাড়া উঠবে তা দেবার ক্ষমতা ডোমের ছিল না, মাসের

শেষে থাকার কথাও নয়, গহনা বাঁধা দেয়া ছাড়া উপায় নেই, অসুবিধার কথা বলতে গেলেই ডোমনী মুখঝামটা দিয়ে উঠবে। তাড়িখানাতে তেজারতীর কারবার। পোদ্দার হুসিয়ার লোক, বন্ধক রাখার সর্ত সে তাগ বুঝে করে। বেহুঁস অবস্থায় ষোল আনা লাভ দিতে না পারলে সে টাকা দেয় না। ডোমনী এসব খবর রাখে। খানিকটা তাড়ি না খেলে যে পোদ্দার ধার দেবে না তাও ডোমনী জানত, কারণ নেশার বস্তুটি বিক্রয়ের মূল সম্পদ, ধার দেয়া আনুষঙ্গিক ব্যবসা। তাহলেও প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়র অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় ডোমনী আশঙ্কান্বিত হয়েছিল, কিন্তু মরদের কাঁচু মাচু ভাব দেখে নিজের হাত থেকে এক জোড়া রূপোর বাজুবন্ধ খুলে দিয়ে বললে, এই দুটো নিয়ে যা করতে হয় কর। খবরদার ওখানে জমে যাস না। মেয়েটার একটা ব্যবস্থা না হলে আমরা দুজনাই মরব। যদুয়ার পিঠে ছুরি চালানর কথা সে এত শিগ্‌গির ভোলে নি। আজকের সুবিধা পেলে পাড়ার লোক মরদকে পয়লা নম্বর খুনে করে ছাড়বে।

(গ)

ট্যাক্‌সি দাঁড়াবার জায়গা মাইল খানেক দূরে। পোদ্দারের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এতটা পথ সে ছুটেই এল। যথাস্থানে এসে দেখে একটিও গাড়ী নেই। পনের কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর একটি খালি গাড়ী এল বটে, কিন্তু আহ্বানকারীর ঠিকানা শুনে ড্রাইভার জানিয়ে দিল মিটার খারাপ হয়ে গিয়েছে, ভাড়া আগেই ঠিক করতে হবে। সঙ্গত প্রস্তাবে আপত্তি করার অধিকার না থাকায়, দ্বিগুণ ভাড়া মেনে নিয়ে, মরদ পথপ্রদর্শক হিসাবে সামনের সিটে বসল। এই রূপ অবস্থায় অভিজ্ঞ ড্রাইভার পেট্রোলের দাম মাঝ পথেই আদায় করে থাকে। গত্যন্তরে ঘরে পৌছাবার আগেই হিসাবের পুঁজী থেকে বেশ খানিকটা খসে গেল, তার উপর ফিরতে যা দেরী হোল তাতে মেয়েটা বেঁচে থাকলেই রক্ষে।

ইতিমধ্যে ডোমনী, ফিরিঙ্গীর আপাদ মস্তক পরীক্ষার কাজ সেরে ফেলেছে। পরীক্ষার ফলে যা পেল তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার মত কিছু ছিল না। একে ঝাঁঝাঁল যৌবন, তার উপর সাদা রং। অশুভ লক্ষণগুলি ডোমনীকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিল। এমন একটি প্রাণীর সঙ্গে মরদকে একলা ছাড়া মোটেই সঙ্গত নয়। গাড়ী এনেছি বলে মরদ সামনে দাঁড়াতে ডোমনী বললে "আমিও তোর সঙ্গে যাব। বৌকে সঙ্গে নিতে মরদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু যাতায়াতে অযথা খরচের কথা ভেবে জানিয়ে দিল, ফিরবার সময় হেঁটে আসতে হবে। অমন একটি ভয় দেখানর কথায় সন্দেহ থাকল না যে যোয়ান মেয়েটির সঙ্গে একলা থাকার ব্যবস্থা আগে-ভাগেই ঠিক করে এসেছে। উত্তর দিলে "আমার পা তোর চেয়ে কম মজবুৎ নয়"। এক যোড়া চাঁদির বাজু-বন্ধ বাঁধা দিয়ে যাতায়াতের গাড়ীভাড়া কুলায় না—এমন হিসাব মেনে নেয়া ডোমনীর পক্ষে সম্ভব হোল না—কারণ গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা সংগ্রহ ডোমের সংসারে নতুন ঘটনা নয়। সে ধরে নিল যে টাকা মরদ পেয়েছে তার সবটাই তাড়িখানা আর সাদা চামড়ার পিছনে খরচ করবে। ডোমনী পণ করে বসল, প্রাণ থাকতে অমনটি হতে দেবে না। শেষ পর্য্যন্ত ডোমনীর জিদই বজায় রইল।

হাসপাতালের ঘটনা আরও জটিল হয়ে উঠল। আঘাত ও রক্তস্রাবের কথা শোনার পরেও ডাক্তার শাস্ত্রসম্মত পরীক্ষা না করেই বললেন, "ভয়ের কারণ আছে বৈকি। রীতিমত সুশ্রূসার দরকার। সময়ের বাইরে আমাকে দেখাশোনা করতে হবে তার জন্যে উপরি খরচাও আছে। বাড়তী নজর রাখতে হলে অগ্রিম কিছু দিতে হয়। তোমরা গরীব বলেই উপরি সময় দিতে চাইলাম, তা না হলে টাকা দিয়েও আমাকে পাবার উপায় নেই। ছুটির ঘণ্টা পড়লেই আমি প্রাইভেট রোগী দেখতে চলে যাই।

পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে ঔদার্য্য প্রকাশ করার পর ডাক্তার ভীড়ের মাঝে পরীক্ষার পাত্রীকে খুঁজতে লাগলেন। ফিরিঙ্গী, বেঞ্চির একটি কোনায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। চার ধারে কাল, তারই মাঝে ধপ ধপে সাদা, যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুবই স্বাভাবিক। ডাক্তারের দৃষ্টিও সহজ প্রত্যাশার ব্যতিক্রম হতে দেয় নি। যথাস্থানে নজর আটক পড়ায়, ডোমনী মরদকে কুনুই

দিয়ে ঠেলা মেরে বললে, "দেখছিস কি, নজর লেগেছে এগিয়ে যা, এখন ধরতে পারলে খরচা অনেক কমে যাবে। নজর ঠিকই লেগেছিল, তবে অগ্রিম প্রাপ্য হস্তগত না হওয়ায় হাসপাতালের চলতি আইনকানুন অটুট রাখতে হোল। ফরমায় ফেলা প্রশ্নমালা ছাপার অক্ষরে সামনেই ধরা ছিল। একের পর এক সেগুলি মরদের উপর প্রয়োগ করতে লাগলেন। রোগীর নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, উপার্জ্জনক্ষম হলে মাসিক আয় কত ইত্যাদি। উপরি-পাওনার গোল না বাধলে হয়ত প্রশ্নগুলি দেখিয়ে দেবার দরকার হোত না ; একে সদুত্তর পাওয়া গেল না, তার উপর রক্তে ভেজা কাপড় ও গভীর ক্ষত দেখে ডাক্তারের ঠোঁটে বাঁকা হাসির নড়া চড়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ক্রূর ইঙ্গীত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে এটা পুলিসের কেস, মার পিঠে, ধারাল কুড়ুল দিয়ে না কোপালে আঘাত অত গভীর হতে পারে না"। মরদের দিকে তাকিয়ে একটি সংযমিত হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "সত্যি কথা বল, মেয়েটি তোমার কে হয়"? ডাক্তারের কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা দেখে বোঝা গেল একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তৈয়ার না করতে পারলে পুলিসের হাঙ্গামা সুনিশ্চিত। ডোমনী মরদকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই এগিয়ে এল, বিপদসঙ্কুল প্রশ্নকে সামলাবার জন্য। আচরণটি যুক্তিসঙ্গত, কারণ মরদের পেটে তাড়ির হুল্লোড় চলেছে, কি বলতে কি বলে দেবে তার ঠিক নেই। ব্যাপারটা লঘু করার জন্য ডোমনী বলে ফেলল, "হুজুর ও আমার সতীন। আমার মরদের কি একটা বৌ, ওর সাদি তো হরদম লেগে আছে। একটাকে ছাড়ে তো আর একটাকে ধরে। যেতনা শ্বশুরশাশুড়ী হয়ে গেল, তাদের নাম ঠিকানা তাড়ি-খোর মনে রাখতে পারে। ওর বৌদের ইজ্জৎ আছে, না ঠিকানা আছে। সব তো রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে থাকে। রাস্তাই ওদের ঘরবাড়ী, ঠিকানাও বদলায় হরদম। মরদ আমার সঙ্গে থাকে, আমার ঠিকানা লিখে নিন।

রোগীর গলদ যুক্ত নাম আর ঠিকানা ইনপেসেণ্ট (in patient) এর খাতায় লিখে কোন লাভ নেই। ও যে রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছে তাতে ভয় দেখিয়ে কিছু উপরি আয়ের আশা নেই রোগীর অবস্থাও বেহুঁস। উপস্থিত বেহুঁস অবস্থাই ডাক্তারের লাভ। সজ্ঞানে কথা বলার ক্ষমতা থাকলে দাঙ্গার খাঁটি খবর লিখতে হোত, তা হোলেই তো ডবল ফ্যাসাদ। সাক্ষী হিসাবে আদালতে ডাক পড়তই, ফলে টানা হেঁচড়ায় প্রাণান্ত অবস্থা হয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবু ঠিক করলেন, কাগজে কলমে কোন নথী না থাকাই ভাল।

যে সময় ডাক্তারবাবু সুবিধা অসুবিধার হিসাব ঠিক করছিলেন সেই সময় মরদ একটি পছন্দসই রসাল উত্তর যোগাড় করে ফেলেছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়ে চুপি চুপি কিছু বলার চেষ্টা করতেই, ডোমনী পেটের উপর স্মরণীয় গোঁত্তা মেরে বললে—বেসরম, তুই কি জানিস। যখন ও আছাড় খায় তখন তুই ডোবার ধারে ছিলি? হুজুর যেখানে সতীন আছাড় খেয়েছিল সে জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি। মারপিট দাঙ্গা কিছুই হয় নি। তবু হুজুর আপনি ঠিকই বলেছেন, কুড়ুলের মত কোন ধারাল জিনিসেই কেটেছে। যেখানে সতীন আছাড় খায়—সেখানে বাবুদের ডোবা বোজান হচ্ছিল, সারা দুনিয়ার জঞ্জাল ঐখানে ফেলছে, জঞ্জালের মধ্যে নেই কি, পেয়ালা পিরিচের টুকরা, ভাঙ্গা কাচের গেলাস, পুরান কোদাল বা কুড়ুল ও পড়ে থাকতে পারে।

আঘাতের কারণ যে ভাবে ডোমনী খাড়া করল তাতে রোগকে হাল্কা করে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হোল। ডাক্তার ডোমনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আছাড় খেয়ে কেটে থাকলে অত ভাববার কিছু নেই। এখন ব্যানডেজ করে ইনজেকসন দিয়ে দিচ্ছি, পরশু এস।

ঘটনা চক্রের ফলে ঐ সাদা মেয়েটা যে আসল সতীনের স্থান অধিকার করে বসবে ডোমনী তা কল্পনাও করতে পারে নি। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার ভার সেধে ঘাড়ে নেবার পর পরিত্রাণের ও পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ঘরে না তুলে রক্তে ভেজা কাপড় সমেত মেয়েটাকে রাস্তায় ফেলে গেলে পুলিসের কুকুর গন্ধ শুঁকে বাড়ীতে এসে চড়াও হবে। বিলাতী ডালকুত্তাকে লেলিয়ে দিলে আর রক্ষে আছে, নল পড়ার মতই ওদের মন্ত্রপড়া নাক।

(গ)

কিছুদিন পরের কথা। ফিরিঙ্গী অনেকটা ভাল, ডোমনীর সঙ্গেই আছে। কিভাবে বনিয়ে নিল অনুমান

করা শক্ত। ফিরিঙ্গীর মধ্যে ডোমনী একটি মহৎ গুণ আবিষ্কার করেছিল, সেটি, মরদকে এড়িয়ে চলা। দ্বিতীয় খোঁড়া পা নিয়েই সংসারের অনেক কাজ করে দিত। রান্নার ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ডোমনীর নেকনজর খানিকটা লাভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহের পাহারা শেষ পর্য্যন্ত লাভের গুড়ে বালি মিশিয়ে দিল। গোল বাধল একটি নতুন শাড়ী নিয়ে। ফিরিঙ্গী একবস্ত্রে হোম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেটি অব্যবহার্য্য হওয়ায় ডোমনী নিজের একটি পুরাতন শাড়ী দিয়েছিল, শতছিন্ন বস্ত্র, বহু গ্রন্থীর সাহায্যে সেটি ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছিল। দৃশ্য কটু হওয়ায় মরদ দুই একবার এ বিষয় উল্লেখ করেছিল। ফিরিঙ্গীর প্রতি দরদ দেখে ডোমনী, একদিন তেড়ে উঠে বলেছিল "অত যদি সোহাগ করার ইচ্ছে তো নিজের পয়সায় শাড়ী কিনে দে না। মোটা হয়েছিস আমার বাপের পয়সায়, মাসে মাসে কিছু না দিলে হাঁড়ী ওঠে না—তা সত্ত্বেও মরদের সোহাগ করার সখ দেখে বাঁচি না। নিজেকে মরদ বলা তোর সরম লাগে না" ?

ডোমনীর উক্তি মরদের আঁতে ঘা দিয়েছিল। মরদ উপায়ক্ষম নয় এমন কথা বলা চলে না। তবে যা উপায় করে তা সংসারে দেয় না। এদিকটা চালিয়ে নেবার ভার ডোমনীর উপর পড়েছিল। নিজে গতর খাটিয়ে যা পেত তা দিয়ে না কুলালে বাপের কাছে ধার করতে হোত। সে ধার, মাসে মাসে বেড়েই চলেছে, মরদ শোধ করার কথা মুখেও আনে না।

মরদ করপোরেসনে চাকরি করে, নরদামা পরিষ্কার করা ওর কাজ। বাঁধা মাইনে ছাড়া উপরি আয়ও আছে। প্রকাশ্যে উপরি আয় আসে শুয়োর বেচে। গোপনীয় পন্থাতেও সে উপায় করে, সূত্রটি গোপন থাকাই ভাল। উল্লেখ করলে হয়ত গল্পের একটি শাখা বেরিয়ে যাবে।

আঁতে ঘা দিয়ে কথা শোনার পর, মরদ সত্যই একটি নতুন শাড়ী কিনে ফিরিঙ্গীকে দিয়েছিল। শাড়ী দেবার সময় মরদের মুখে বিড়ির পরিবর্ত্তে বিলাতী সিগারেট দেখা গিয়েছিল। ডোমনী দান ও চালের বহর দেখে চুপ করে থাকতে পারে নি। ফিরিঙ্গীর সামনেই বলে ফেলেছিল —ওর জন্যে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

নতুন শাড়ীকে সূত্র করে ডোমনীর সন্দেহ পাকা হয়ে গিয়েছিল। সর্ব্বদাই ফিরিঙ্গীকে চোখে চোখে রাখত। ঘরের বাইরে যেতে হলে ফিরিঙ্গীকে আলাদা ঘরে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিত। ঘরে বন্ধ করা নিয়ে একদিন তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। জরুরী ডাকে ফিরিঙ্গীর বাইরে আসার দরকার হয়েছিল। ডাকাডাকিতে মরদ জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং জরুরী ডাকের কারণ জানতে পেরে তালা ভেঙ্গে ফেলে প্রয়োজনীয় স্থানে ফিরিঙ্গীকে যেতে দেয়। ডোমনী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখে ফিরিঙ্গীর দরজা খোলা। দুজনার মধ্যে কেহই ঘরে নেই। অবৈধ প্রেম সম্বন্ধে অধিক প্রমাণের প্রয়োজন না থাকায় মরদকে শিক্ষা দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওদের ফেরার অপেক্ষায় দাওয়ায় বসে রইল।

শিকার ধরার জন্যে বাঘিনী যে ভাবে ওৎ পেতে থাকে, ডোমনী সেইভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখল মাণিকযোড় একসঙ্গে ফিরছে, পাশাপাশি চলার কি ভঙ্গী, ছোঁয়ার নাগাল না পেলে যেন কাহার পা চলে না।

উভয়ে দাওয়ায় ওঠার পর, কোনরকম কৈফিয়ত শোনার অপেক্ষা না রেখেই, ডোমনী মরদের মুখে খানিকটা নিষ্ঠীবন ফেলে আপ্যায়ন জানাল। স্ত্রীলোক, পুরুষের গায়ে থুতু ফেলার চেয়ে অপমানকর আচরণ ডোমেদের মধ্যে আর কিছু নেই। একেই ফিরিঙ্গীকে উপলক্ষ্য করে কিছুদিন ধরে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ হয়েছিল, তার উপর ফিরিঙ্গীর সামনেই অযথা অপমান, মরদ সহ্য করতে পারল না, পাল্টি জবাব মরদ হাত দিয়েই দিল। একটি চপেটাঘাতেই ডোমনীকে ধরাশায়ী হতে হোল। মরদ আদর করার জন্য গালে হাত বোলায় নি। মারটি মনের মত হওয়ায়, ডোমনী মাটি ছেড়ে উঠতে চায় না। ফিরিঙ্গী প্রথমটা ভেবেছিল অভিমানের রেশ চলেছে, কিন্তু খানিকটা সময় একই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তুলতে গেল। ফলে হিতে বিপরীত ঘটল। ডোমনী উঠেই ফিরিঙ্গীর চুলের ঝুঁটি ধরে আচমকা এমনই টান দিল যে খোঁড়া পায় টাল সামলাতে না পেরে মরদের গায়ে গিয়ে পড়ল। দৃশ্যটি দাঁড়াল গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত। ডোমনীর সামনেই ঐরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দেখায় সংযমের সব আইন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। হিংস্র পশুর মতই ডোমনী

তেড়ে এসে মরদের হাত কামড়ে দিল। বেশ খানিকটা মাংস দেহচ্যুত হতে বললে "আজ তোকে চিবিয়ে খাব। মুখে আর কতটুকু ধরে, তোকে বঁটি দিয়ে কেটে তোর পেয়ারীর সামনেই দেখিয়ে দেব তাজা মাংস কি ভাবে খেতে হয়"।

স্বামী-হত্যার মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ হবার পরেই, ডোমনী পাশের ঘরে চলে গেল এবং সত্যই বঁটি হাতে বেরিয়ে এল মরদের মুরদ শেষ করার জন্য। ফিরিঙ্গী উপযুক্ত সময় অস্ত্রটি কেড়ে না নিলে যা ঘটত তা সহজেই অনুমেয়। একটি ঘটনা থামাতে গিয়ে আর একটি এসে উপস্থিত হোল। ঘরের ভিতর মল্লযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। অস্ত্রটি বেহাত হওয়ায় যত রাগ এসে পড়ল ফিরিঙ্গীর উপর। অনধিকারচর্চ্চায় আগুয়ান হওয়ার জন্য বঁটির ডগা খাড়া হয়ে উঠল ফিরিঙ্গীর কাঁধের উপর। ফিরিঙ্গীর দৈহিক শক্তি ডোমনীর অপেক্ষা কম ছিল না। খোঁড়া পা নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে বিশেষ বেগ পেতে হলেও শেষ পর্য্যন্ত ডোমনীকে নিরস্ত্র হতে হোল।

দুই নারীর দৈহিক শক্তি প্রদর্শনীতে যে চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের সৃষ্টি হোল,তাতে মরদের মত রসিকের টনক নড়িয়ে দিল। আধ্যাত্মিক বিধান অনুসারে ভালবাসার স্তরভেদ জানা না থাকলেও সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠনের চুম্বক জাতীয় আকর্ষণকে ভাল লেগে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না এবং থাকলেও রসগ্রহনকালীন কোন বিঘ্নকে মেনে নিত কি না সন্দেহ। মল্ল যুদ্ধকে সূত্র করে দেহের যে দোলা দেখল তা মরদের বিচারে নৃত্যকলাবিদের অঙ্গসঞ্চালন অপেক্ষা কোন দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়। রঙ্গমঞ্চে, নটীর নৃত্যদর্শন কালীন রসিক যেমন কলা চর্চ্চায় অভিভূত হয়ে পড়ে, তাল ও সঙ্গীতের যোগে দোলায়মান দেহ দর্শনকে কৃষ্টির সেবা ভাবে, সেই রূপ ফিরিঙ্গীকে নবরূপে দেখতে পেয়ে নিজেকে মরদ হারিয়ে ফেলেছিল।

রূপ চর্চ্চার মধ্যে যে বিঘ্ন মরদকে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ করে তুলছিল, তা মাংসচ্যুত দেহাংশের বেদনা। একদিকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা,অপরদিকে রূপদর্শনের প্রলোভন। আলু থালু বেশের আবরণ, ও ভরাট ও নিটোল গঠনের অতর্কিত প্রকাশ ধীরে একটি চক্রান্তপূর্ণ সঙ্কল্পের দিকে মরদকে টানছিল। সঙ্কল্পের সিদ্ধি লাভে যে বিপদসঙ্কুল প্রতিক্রিয়া জড়িয়ে থাকতে পারে সে কথা ভাববার অবকাশ পেল না। মরদ স্থির করে ফেলল, ফিরিঙ্গীকে নিজের না করে ফেলতে পারলে, অভাবের অন্তর্দাহী জ্বালা অসহনীয় হয়ে উঠবে। আত্মপীড়নের মত কুমতিকে মরদ কখন প্রশ্রয় দেয় নি। আজকের ঘটনাতেও চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেয়া সম্ভব হোল না। মনে পড়ল, দাওয়াইখানার পথেই মস্‌গুলি স্থানটির কথা ঐখানে সন্ধ্যাটা মরদ ইচ্ছামত ব্যবহার করে। আনন্দের প্রকরণে নীতিবিরুদ্ধ আয়োজন এসে পড়লে জবাবদিহীর জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হয় না। অন্তর্জ্বালার আর একটা দিকও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সেটি মুখে থুতু ফেলার অপমান। সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করতে পারলে ডোমনীকে মনের মত শাস্তি দেয়ার সুবিধা পাওয়া যায়। চিন্তা ঘোরপাক খেয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কাল বিলম্বের অবসর ছিল না, হটাৎ বেপরোয়ার মত ফিরিঙ্গীর হাত ধরে এবং আদেশের স্বরেই বললে, "চল্ আমার সঙ্গে, এখানে আর তোর থাকা চলবে না। কয়দিন আগেই ডোমনী বলছিল তোকে বঁটি দিয়ে কাটবে। তোর ছেলে পিলে হলে জ্যান্ত পুতে ফেলবে। কাল আমার ভাতের উপর ছাই ছড়িয়ে রেখেছিল,—বলে কি পোড়ার মুখে ঐ রুচবে ভাল। চল, আমার সঙ্গে চল, আমি তোর সঙ্গে থাকব। আজ চার বছর বিয়ে হোল, বাঁজা মেয়ে মানুষ একটা ছেলে দিতে পারল না"।

ছেলে পিলের কথা শুনে ফিরিঙ্গীর মনোভাব কি রকম হয়েছিল তা বলা কঠিন। অবাধে এই ধরণের কথা ইতিপূর্ব্বে সে কখন শোনে নি। হোমের বাইরে যে জগৎকে জানতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ডোম পরিবারের কোন যোগ নেই। হোম থেকে বেরিয়ে আসার পর একটির পর একটি ঘটনা জড়িত। যে সব অভিজ্ঞতাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হোল তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। জগৎকে জানার জন্য হোমের কড়া নৈতিক বাঁধন থেকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ে গেল। আজন্মের আবেষ্টনিক সংস্কার তাকে বেঁধে ফেলেছিল। মা হবার বাসনা এলেও ডোমের প্রস্তাব অনুসারে মাতৃত্বের দাবী কখন তার মনে আসে নি। আশ্রয় দানের বিনিময়ে বংশবৃদ্ধির প্রত্যাশা শুনে ফিরিঙ্গী কেমনতর হয়ে গেল।

ভেবে দেখল, ঐ লোকটার সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মত বসবাস অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বঁটিটা তখনও ঘরের কোনায় পড়েছিল। যে অস্ত্রের মার থেকে বাঁচার জন্য একটু আগেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে তাকেই মুক্তির প্রয়োজনে পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করবার জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠল। সংস্কারকে বাঁচানর উদ্দেশ্যে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য যখন ফিরিঙ্গী প্রস্তুত, সেই সময় একটি ঝাঁকুনি খেল। ঝাঁকুনির পর কিছু বলার আগেই ফিরিঙ্গীকে একটানে মরদ ঘরের বাইরে এনে ফেলেছে। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পিছু নেয়ার সম্ভাবনা থাকায় ডোমপাড়ার লোকেরা সহজে ঘরোয়া বিবাদে যোগ দিতে চায় না। শক্তিশালীর হেঁচকা টানে ফিরিঙ্গীকে ঘরের বাইরে এসে পড়তে অনেকেই দেখেছিল। দেখেও ঘটনাটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে কেহ নিল না। ফিরিঙ্গীর অবস্থা দাঁড়াল কতকটা —জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘের মত। খোঁড়া পা নিয়ে মরদের কাছ থেকে ছুটে পালাবার উপায় নেই। ঘরে ফিরলে ডোমনীর সম্বর্ধনা প্রস্তুত হয়ে আছে, তার বাক্য-বাণ বঁটির ধারের চেয়েও শানান। কথার ছুরি দিয়ে সে পেঁচিয়ে কাটবে। চেঁচামেচি করেও কোন লাভ নেই। কেহ যদি এগিয়ে আসে তাহলে আশ্রয়ের বিনিময়ে কি দিতে হবে তা এখন ফিরিঙ্গী জানে। গত্যন্তরে মরদের সঙ্গ নিতে আপত্তি তুলল না। ভবিতব্যের বিধান তাকে যে ঠিকানায় নিয়ে ফেলল, তার বিশদ বিবরণ গল্পের গোড়াতেই লিখেছি।

ফিরিঙ্গীকে সাচ্ছন্দ্য দেবার জন্য মরদ চেষ্টার ত্রুটি করে নি। ধার করে নতুন শাড়ী কিনেছে, সুগন্ধি সাবান দিয়েছে, আর কত কি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই, তবু মনের মত করে ফিরিঙ্গীর নাগালে আসার অধিকার পেল না। দেহের অত কাছে থেকেও মনকে সরিয়ে রাখায় ফিরিঙ্গীর প্রতি আসক্তি ক্রমান্বয় কমে আসতে লাগল। ফিরিঙ্গীর মন না পেলেও, ভোগের বস্তুকে জীইয়ে রাখার জন্য আহার ও ঘরভাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত আকর্ষণের দাবীতে আর একজন ভাগীদার এসে পড়ায় ঘরের ভাড়া দেয়া বন্ধ হল।

এ পাড়ায় বস্তির মালিক ভাড়া আদায় করে দিন হিসাবে, প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় ভাড়া না পেলে বাড়ি-আলা উচ্ছেদের জন্য গুণ্ডা লাগিয়ে দেয়। ওরা আইনের ধার ধারে না, সোজা ভাড়াটেকে তুলে নিয়ে রাস্তায় বসিয়ে ছাড়ে। ডোমের অবহেলায় ফিরিঙ্গির বার দুই রাস্তায় বসার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। অন্নের জন্য প্রতিবেশীর কাছে ভিক্ষা চাইতে গেলে যা পায়, তা পাঁজরা মোচড়ান কথা। এই সব ঘটনার পর সে স্বাবলম্বী হবার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে। ব্যবসায় উপযুক্ত ভাবে দরদস্তর না করতে পারলেও খরিদ্দার যা চায় তা বেচায় আর আপত্তি তোলে না—কেবল দেখে নেয় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আছে কি না।

এই ধরণের মানুষ বিকট গন্ধ সঙ্গে নিয়ে আসে। তার উপর ভালবাসার অভিনয় করতে গিয়ে যখন আবোল তাবোল বকতে সুরু করে তখন প্রলাপ ফিরিঙ্গীর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই দুর্ব্বলতা থেকে সে বহু চেষ্টা সত্বেও নিষ্কৃতি পেল না। অদ্ভুত তার প্রকৃতি, বিরুদ্ধ পরিবেশে বাস করেও প্রেম ফিরিঙ্গীর কাছে পবিত্র হয়ে আছে—আজও ভালবাসার পাত্র খুঁজছে। দেহের উপর যতই পাপের বোঝা চাপান হোক না কেন সে জানে তার মন এখনও কলুষিত হয় নি। কাহার জন্য অমূল্য সম্পদ মনের গোপন কোণায় স্বতন্ত্র করে রেখেছে সে নিজেই জানে না তবু অজানা মনের মানুষকে সব কিছু বিকিয়ে দেবার বাসনা ছাড়ে নি। ঐটুকু আশাই তার বাঁচার অবলম্বন হয়ে আছে।

দুর্য্যোগের দিনে ফিরে আসি। ফিরিঙ্গী যখন জ্বরের জ্বালায় শয্যাশায়ী, শূন্য হাঁড়ী আর ঘর ভাড়ার কথা ভাব-ছিল, হোমের কঠোর নীতিবদ্ধ পীড়নকেও বর্ত্তমান বাঁচার তুলনায় পরম বাঞ্ছনীয় মনে করছিল সেই সময় পাশের ঘর থেকে পুলিসের লোক ও আত্মীয়স্বজন এসে একটি কিশোরীকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। মেয়েটি কয়েক-দিন আগে এখানে এসেছিল। অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। সদাই সন্ত্রস্ত ভাব দেখে ফিরিঙ্গী নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করে জানল পাড়ার পাতান দাদার সঙ্গে মেয়েটি বেরিয়ে আসে এবং স্নেহপরায়ণ দাদার প্ররোচনায় অনেকগুলি দামী সোনার গহনাও সঙ্গে আনে। দাদার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রখর হওয়ায় গহনাগুলি কোন নিরাপদ স্থানে রেখে আসতে বেরিয়েছে, কিন্তু সেই যে গেছে আর ফেরেনি। নতুন জায়গায় অদ্ভুত লোকেদের মাঝে ফেলে যাওয়ায় কিশোরী বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিল, সহানুভূতি কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় তা সে জানত না। মেয়েটির হাবভাব দেখে ফিরিঙ্গী বুঝেছিল কেহ তার প্রতি দরদী হয়ে উঠলেই দীক্ষার আয়োজন সুরু হবে। তার আগে সাবধান করে দিতে পারলে হয়ত একজন নিরীহ প্রাণীকে এদের কৃপা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে—কিন্তু তার প্রয়োজন হোল না, মেয়েটিকে তার নিজের লোক এসে নিয়ে গেল। মেয়েটির কাছে নগদ টাকাও কিছু ছিল, তারই সাহায্যে ফিরিঙ্গী উভয়ের ঘরভাড়া মিটিয়েছে এবং আহারের ব্যবস্থাও করেছে। দুর্দ্দিনের বন্ধু চলে যেতে ফিরিঙ্গী একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেল। ফিরিঙ্গীকে খোঁজার জন্য আপনজন কেহ ছিল না, সে পড়ে রইল রাস্তায় বসার অপেক্ষায়।

লক্ষ্মীর অভিশাপ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম আবির্ভাবের দিনে ধরণীর বক্ষে মানুষ একান্ত লক্ষ্মীহীন হয়েই স্থাপিত হয়েছিল। জীবধারার ক্রম-বিকাশের শেষ পরিণতি হিসাবে মানুষ যে দিন পৃথিবীর কোলে জন্ম নিল সেদিন তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তার না ছিল বাসের জন্য আশ্রয়স্থল, না ছিল শীতাতপ-নিবারণের জন্য আচ্ছাদন, না ছিল অন্নের ভাণ্ডার। জীবিকার জন্য যাযাবরের মত এখানে ওখানে ঘুরে তার আহার সংগ্রহ করতে হত। মাটি খুঁড়ে মূল আহরণ, বৃক্ষ হতে ফল আহরণ বা শীকারবৃত্তি অবলম্বন ক'রে পশুহনন তার ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মানুষ গুহায় বাস করত বা গাছের তলায় আশ্রয় নিত। অন্য নানা স্তন্যপায়ী জীবদের সহিত তুলনায় তার জীবন অতি হীন ছিল। তার থেকে বলবান অনেক হিংস্রজীব ছিল যাদের সর্ব্বক্ষণ পরিহার ক'রে তার আত্মরক্ষা করতে হত। বাঘের কাছে তখনকার দিনে তার অবস্থাটা বর্ত্তমান যুগে হরিণেরই সামিল। পৃথিবীতে প্রাধান্য স্থাপন করা দূরের কথা, কোনো রকমে আহার সংগ্রহ ক'রে আত্মগোপন ক'রে টিকে থাকতে পারলেই নিজেকে সে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করত।

এ হেন লক্ষ্মীহীন জীবের মধ্যেই কিন্তু এমন সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত ছিল, যা তার ভাবী জীবনকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মস্তিষ্ক-শক্তি তুলনায় অন্য জীব হতে বেশী ছিল। তাই ভাববার, চিন্তা করবার শক্তি সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। সে ভাষা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে যেমন ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি বস্তু-নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তার দুটি যুক্ত হাত, তা যেমন স্পর্শ-শক্তি সংযুক্ত, তেমন পাঁচটি অঙ্গুলি বিশিষ্ট হওয়ায় সূক্ষ্ম কাজ করবার উপযুক্ত। তার বুদ্ধি শক্তি এই দুটি হাতকে ব্যবহারের জন্য পেয়েছিল। এই দুয়ের সংযোগে তার বিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল।

এই দুটি বস্তুকে সম্বল ক'রে লক্ষ্মীহীন মানুষের লক্ষ্মী-লাভের অভিযান সুরু হয়েছিল। জীবনকে সুখকর করবার জন্য যার কিছুই নাই তার সব উপকরণই সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে নিজের বুদ্ধি শক্তির সাহায্যে। আহার ও আচ্ছাদনই সবার থেকে মৌলিক সমস্যা। তাই তাতেই নজর পড়েছিল প্রথম। ফল-মূল আহরণ ও ক্ষুদ্র পশু-শীকারই প্রথমে তার অন্ন সমস্যার সমাধানের উপায় হয়েছিল। কিন্তু তাতে বেশী দিনের মত খাদ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় না। শীকারী পশু শীকারে সাফল্য লাভ করে প্রকৃতি দত্ত অস্ত্রের সাহায্যে। শারীরিক বল ত তাদের আছেই, তার ওপর তাদের দেহ ধারাল দাঁত এবং নখর দ্বারা সজ্জিত। সেও যদি অনুরূপ অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে তা হলে শীকারে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা তার সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

এই ভাবে সুরু হল তার শীকারের অস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য সাধনা। প্রকৃতি তাকে এবিষয়ে সাহায্য করে নি। নিজের জীবনধারণের উপকরণ তার নিজে উৎপাদন করতে শিখতে হবে। ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা তার আয়ত্ত করতে হবে। অস্ত্রের কাঁচা মাল কি হবে? হিংস্র জীবের নখর ও দন্ত কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত অথচ ধারাল। প্রকৃতির বক্ষে ছড়ান নানা কাঁচা মালের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে সে সংগ্রহ করল ছোট পাথর খণ্ড। তা কঠিন পদার্থ। তাকে ঘষে ঘষে ধারাল করা যায়। তা হলে তা হাতিয়ার হতে পারে। তাতে শীকারকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করা যেমন সুবিধা, তার দেহ কেটে ছাল ছাড়িয়ে মাংস আহরণেও তার তেমন ব্যবহার হতে পারে। একাধারে তা আক্রমণের অস্ত্র ও কর্ত্তনের যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

এই ভাবেই মানুষের জীবনের ইতিহাসে প্রস্তর-যুগের সূত্রপাত হয়। হাতিয়ার সংগ্রহের ফলে যেমন তার শীকার-বৃত্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ হল, তেমন নিহত পশুর চর্ম্ম হতে শীতাতপ নিবারণের জন্য বস্ত্রও তার জুটল। ক্রমশ প্রস্তর খণ্ড হতে নানা অস্ত্র নির্ম্মাণে দক্ষতা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার দিন দিন বর্দ্ধিত হল। যে পাথরে ধার বেশী, সেই পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হল। পাথরকে ঘষে মেজে শুধু ধারাল ক'রে কখন মানুষ তৃপ্তি পেত না, তার গঠনকে সুন্দর করত, তাকে ঘষে পালিশ ক'রে উজ্জ্বল করত। এই পথে সে প্রাচীন প্রস্তরযুগ হতে নূতন প্রস্তর যুগে উন্নীত হল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। যাদুঘরগুলিতে তারা সংগৃহীত আছে। নূতন প্রস্তর যুগের প্রস্তর যে তুলনায় প্রথম যুগের হাতিয়ার হতে সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল, তা অনভ্যস্ত চক্ষেও ধরা পড়ে।

মানুষের সম্পত্তি উৎপাদনের এই প্রবল প্রচেষ্টা তাকে শিল্প উৎপাদনে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। শিল্প উৎপাদনের জন্য যে শক্তি তখন তার হস্তগত ছিল তা অতি সামান্য। তার দুখানি হাতই সে শক্তির উৎস। এই হাতের শক্তিই শিল্প উৎপাদনের কাজে তখন তার একমাত্র অবলম্বন। প্রস্তর যুগের মানুষের লক্ষ্মীলাভের সাধনায় তার হাতই একমাত্র সহায়ক।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখতে হবে। মানুষ চিরকালই গোষ্ঠীপ্রিয় জীব। সে একা বাস করতে ভালবাসে না। সেকালে গোষ্ঠী ছিল খুব সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ একটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী হত। সেই পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অতি সরল। জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সে সবই পরিবারের মানুষই সংগ্রহ করত বা উৎপাদন করত। প্রস্তরের অস্ত্র প্রতি পরিবারের মানুষই উৎপাদন করত। পণ্য হিসাবে তা পাওয়া যেত না। আহার্য্য সংগ্রহ পরিবারের বয়স্ক মানুষেরই করতে হত, প্রধানত শীকার বৃত্তি দ্বারা। অন্য কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে লেনদেনের তার কোনো সম্পর্ক সম্ভবত ছিল না।

ক্রমশ মানুষ লক্ষ্মীলাভের পথে আরও খানিক এগিয়ে গেল। আগুনের গুণ দেখে দেখে সে একদিন মুগ্ধ হল। অগ্নি শীত হতে পরিত্রাণ করে, হিংস্র পশু হতে মানুষকে নিরাপদ করে। শুধু তাই নয়, সে আবিষ্কার ক'রে বসল আগুনে পাক করা খাদ্য খেতে সুস্বাদু এবং সহজ পাচ্য। তখন সে আগুনকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করল। চকমকি পাথরের সাহায্যে ইচ্ছামত তাকে কিভাবে উৎপাদন করতে হয় শিখল।

কিন্তু কেবল শীকারবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন তাকে তৃপ্তি দিল না। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য নিত্য শীকারে বাহির হয়। মাংস এমন জিনিষ নয় যা দীর্ঘ দিন সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়। অন্নসংস্থানে নিশ্চয়তা এ ব্যবস্থা দিতে পারে না। অন্ন সংগ্রহের জন্য শীকারের জীবের পশ্চাতে ঘুরতে হয়। কোন সময় শীকারের জীব দুষ্প্রাপ্য হলে বাসস্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ধরণের জীবনে সত্যই স্বস্তি নাই। এমন কিছু উপায় উদ্ভাবন করা যায় না যাতে খাদ্যবস্তু ইচ্ছামত উৎপাদন করা যায় এবং সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়? আবার এই নূতন পথে সন্ধান চলল। এমন বনজ শস্য আছে যা মানুষের আহার্য্য হতে পারে। তার বীজ সংগ্রহ ক'রে ভূমি কর্ষণ ক'রে রোপণ করলে শস্য মেলে। সেই শস্য সঞ্চয় ক'রে রাখলে প্রায় এক বছরের মত অন্ন সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

এই ভাবেই মানুষ কৃষিজীবী হতে শিখল। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হবার ফলে মানুষের জীবনে এক নূতন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। শীকার বৃত্তি জীবনে অবসর আনে না, বাসের স্থায়িত্ত আনে না। ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান দল হিসাবেই মানুষের টিকে থাকতে হয়। কিন্তু কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হবার ফলে এক জায়গায় অবস্থান করেই অন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল। বৎসরে বর্ষা ঋতুতে একবার শস্য উৎপাদন করলেই দীর্ঘকালের মত অন্ন সমস্যার কষ্ট হতে পরিত্রাণ সম্ভব। ফলে যে ছিল যাযাবর, তার এক জায়গায় বসতি স্থাপন করা সম্ভব হল। তখন জনপদ জন্মলাভ করল। যেখানে অনেক পরিমাণ উর্ব্বর ভূমি মেলে, সেখানে অনেক পরিবার একত্র বসতি স্থাপন ক'রে কৃষিকার্য্যের সাহায্যে জীবন ধারণ করতে পারল। ফলে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্থাপন সম্ভব হল। মানুষের সমাজ গড়ে উঠল। মানুষ প্রকৃত সামাজিক জীব হল।

কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভের প্রয়োজনে মানুষের বুদ্ধি শক্তি নূতন পথে পরিচালিত হল। কৃষির সাফল্য নির্ভর করে সেচের ব্যবস্থার উপর। তখন সেচের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত বন্যা বা বৃষ্টির জলের উপর। ঠিক কখন বর্ষা নেমে প্রথম বন্যা আনবে জানা থাকলে ক্ষেতের প্রস্তুতির কাজ সময় মত করে রাখা যায়। এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ পঞ্জিকা আবিষ্কার করেছিল। তার গল্পটি অতি সুন্দর। এই কৃষির যুগের প্রথমে নীল নদের অববাহিকায় মানুষ তখন প্রথম বর্ষার বন্যায় প্লাবিত ভূমিতে শস্য উৎপাদন করতে শিখেছে। কিন্তু ঠিক কোন সময় বন্যা আসবে না জানা থাকলে ত ঠিক সময় শস্য বপন করা যায় না। তখনকার দিনের জ্ঞানী মানুষ নজর করল যে—যখন বন্যা আসে তখন আকাশে সন্ধ্যাকালেই একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্রটিকে আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা নাম দিয়েছিলেন লুব্ধক। এটি আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে তার অবস্থিতি। তারা কয়েক বছর নজর ক'রে দেখল যে গড়ে ৩৬৫ দিন পরে এই নক্ষত্র আকাশের সেই স্থানে আসে এবং সেই সময় নীল নদে বন্যা নামে। এই ভিত্তিতেই মিশরবাসীরা মানুষের ইতিহাসে প্রথম পঞ্জিকা বাহির করেছিল।

এক স্থানে স্থায়ীবাস এবং অন্নসংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়তা মানুষের একটি মস্ত বড় সুবিধা এনে দিল। এখন সে ইচ্ছামত অন্ন উৎপাদন করতে পারে। সমগ্র বৎসরের আহার্য্য সে এক সঙ্গে সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তার স্থায়ী বসবাসের জন্য এবং শস্য ভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য উন্নত ধরণের বাসগৃহের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফলে সে ইষ্টক নির্ম্মাণ করতে শিখল। ইচ্ছামত নানা প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করল। শস্য রক্ষার জন্য আধার দরকার। তাই পাত্র এবং আধার নির্ম্মাণ করাও তার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রয়োজনের তাগিদে সে কুম্ভকারের চাকা আবিষ্কার করল। তার সাহায্যে মৃত্তিকাকে উপাদান ক'রে সে নানা পাত্র নির্ম্মাণ করল। তাকে অগ্নিদগ্ধ ক'রে শক্ত এবং স্থায়ী করল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র ও আধার আমরা যাদুঘরে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাই।

কোনো বিশেষ স্থানে ঘর বেঁধে বাস করা যখন সম্ভব হল, তখন তার আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিসাবে মানুষের ভাগ্যে আবার এক নূতন সম্পদ জুটে গেল। সে ঘর বেঁধেছে, সে জনপদের পত্তন করেছে, ক্ষেত্রের কর্ষণ ক'রে শস্যের ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে। এ অবস্থায় যে পশুকে হত্যা ক'রে সে পূর্ব্বের যুগে ক্ষুধা নিবৃত্তি করত, সেই পশুকে গৃহে পালন করার সুবিধা পেল। এখন সে এই শ্রেণীর পশুকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করতে সমর্থ। ক্ষেত্রজাত শস্যের অনাবশ্যক অংশ হতে তার খাদ্য সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব। অপর পক্ষে যেমন শস্যের ভাণ্ডার তার মজুত থাকে, তেমন আহার্য্য মাংসের ভাণ্ডারও হাতের কাছেই সঞ্চিত রূপে পাওয়া যায়। এই ভাবেই বোধ হয় গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি বন্য জীব গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়েছিল। অশ্ব পোষ মেনে ছিল বোধ হয় তারও পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যখন মানুষ যাযাবর ছিল।

পুষ্টির উৎস হিসাবে যদিও তারা সম্পদ আর সমৃদ্ধির পথে মানুষকে অন্য উপায়ে আরও বেশী এগিয়ে দিয়েছিল। সেই দিক হতে তাদের গৃহপালিত জীবে পরিণত হওয়ার তাৎপর্য্য অনেক বেশী। সে তাৎপর্য্য এই হিসাবে যে—তারা মানুষের হস্তে এক নূতন শক্তিকে স্থাপন করেছিল। এতকাল মানুষ নিজ বাহুবল ও দেহের বলের উপর নির্ভর করত নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান বা সম্পদ উৎপাদনের জন্য। এখন হতে গৃহপালিত পশুদের দেহবলও তার আয়ত্ত হল। এই ভাবে গরু একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদে পরিণত হল। তার মাংস মানুষকে খাদ্য জোগাল, আর তার দুগ্ধ শিশুর পানীয় হল এবং তার দৈহিক শক্তি ভূমি কর্ষণকে সহজ ক'রে দিল। পূর্ব্বে নিজের দৈহিক বলের সাহায্যে মানুষের ভূমিকর্ষণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন লাঙল উদ্ভাবন ক'রে তাতে গরু জুতে সে বৃহত্তর ক্ষেত্র আরও গভীর ভাবে কর্ষণ করবার ক্ষমতা লাভ করল। কৃষি প্রসার লাভ করল।

এটি বহু উদাহরণের একটি মাত্র। পশুর শক্তিকে অধীনে এনে তাকে মানুষের সেবায় কাজে লাগানর কৌশল এই ভাবে তার যখন আয়ত্ত হল তখন এক নূতন সম্ভাবনার পথ মানুষের নিকট অর্গল মুক্ত হল। আরও নানা পশুকে

সে পোষ মানাল এবং নানা ভাবে ব্যবহার করতে শিখল। ঘোড়াকে হয়ত আয়ত্ত করে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের জন্য ইতিপূর্ব্বেই সে বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল। এখন ভূমি-কর্ষণের কাজেও তাকে লাগাল। সে চাকা আবিষ্কার করল। চাকার সাহায্যে যান নির্ম্মাণ ক'রে আরও সহজে ঘোড়া জুতে ভ্রমণের সুবিধা করে নিল। এই ভাবে প্রথম রথ আবিষ্কার হল। হস্তীর মত বিরাটকায় পশুকেও বন থেকে ধরে এনে পোষ মানিয়ে অনুরূপ কাজে নিয়োগ করল। তার বিপুল শক্তি ভার উত্তোলনের কার্য্যে নিযুক্ত হল।

এই ভাবে মানুষ এক নূতন যুগের মধ্যে এসে পড়ল। এতদিন মানুষ তার নিজের বাহু ও দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে এসেছে জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বা কোন বস্তু উৎপাদনের জন্য। এখন সে এক নূতন শক্তির সন্ধান পেল। ফলে পূর্ব্বে যেমন বলা হয়েছে—তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সম্ভাবনা বা সম্পদ উৎপাদনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। এই নূতন শক্তি তাকে সমৃদ্ধির পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে দিল। এখন সে কষ্টসাধ্য কাজ নিজে না ক'রে এই সকল গৃহপালিত পশুর স্কন্ধে অর্পণ করে। রথে বা গোযানে চড়ে পদব্রজে ভ্রমণ সে পরিহার করতে পারে। সেই রকম কি শস্য উৎপাদন করতে বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে, যেখানে কাজটি আয়াসসাধ্য বা একটানা ক'রে যাওয়া বিরক্তিকর, সেখানে সে পশুশক্তি প্রয়োগ ক'রে সেই জাতীয় কাজ হতে নিজেকে অব্যাহতি দিল। ক্ষেত্রকর্ষণের জন্য সে গরু বা অশ্ব নিয়োগ করল। তৈল উৎপাদনের জন্য বলদ ব্যবহার করল। ভূমিতে জলসেচের জন্য বলদকে কাজে লাগাল।

অন্ন-সমস্যার মত বস্ত্র-সমস্যাও একটি প্রধান সমস্যা। তার সমাধান মানুষ প্রথম করেছিল পশু দেহ হতে আচ্ছাদন বস্তু সংগ্রহ ক'রে বা বৃক্ষ হতে বল্কল সংগ্রহ ক'রে। সে সমাধান সন্তোষজনক নয়। পরে নূতন পথে সে সমাধান পেয়েছিল। কার্পাস গাছের তুলো হতে সুতো পাকিয়ে সেই সুতো হতে সে বস্ত্র বয়ন করতে শিখল। তকলি উদ্ভাবন হল সুতো পাকানর জন্য। পরে তার স্থান চরকা নিল। বয়ন করবার জন্য মানুষ তাঁত উৎপাদন করল। একাজগুলি এতসূক্ষ্ম যে পশুশক্তি নিয়োগের অবকাশ এখানে ছিল না। তা না হলে এ কাজও মানুষ পশুর স্কন্ধে অর্পণ করত।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য তিনটি মৌলিক সমস্যার সমাধান লাগে। প্রথম, অন্নসংস্থান, দ্বিতীয় বস্ত্রসংস্থান এবং তৃতীয় যাতায়াতের বা দ্রব্য সরবরাহের সমস্যা। আবাসের সমস্যাও একটি মৌলিক সমস্যা। প্রথম যুগে মানুষ এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে নির্ভর করত সম্পূর্ণ নিজ কায়িক শক্তির উপর। সে ব্যবস্থা তত সন্তোষজনক নয়। প্রথমত সে কাজগুলি পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য। দ্বিতীয়ত মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ায় তার ফলও সীমাবদ্ধ। পায়ে হেঁটে বেশী দূর যাওয়া চলে না। বাহুবলের উপর নির্ভর করে বেশী পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করা যায় না।

দ্বিতীয় যুগে পশুশক্তি আয়ত্ত হওয়ায় মানুষের এ বিষয় অনেক খানি সুবিধা হয়ে গেল। গৃহপালিত পশুগুলিকে সে এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের দৈহিক শক্তি মানুষের দৈহিক শক্তি হতে অনেক বেশী। সুতরাং এক্ষেত্রে দুই বিষয়ে তার লাভ হল। প্রথমত, কষ্টসাধ্য কাজ তাদের ওপর অর্পণ ক'রে সে কষ্ট হতে অব্যাহতি পেল। দ্বিতীয়ত, তাদের শক্তির উৎকর্ষ হেতু যে কাজ পশু দ্বারা করান সম্ভব, তা আরও ভাল ভাবে সম্পাদিত হল। বলদের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ যেমন বেশী পরিমাণে করা সম্ভব তেমন গভীর ভাবে সম্ভব। পদব্রজে যত দূর ও যত দ্রুত যাওয়া যায় অশ্বযানে তা হতে অনেক বেশী দূরবর্ত্তী স্থানে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগে এই ভাবে মানুষের যে সমাজ জীবন গড়ে উঠেছিল তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। কায়িক শক্তির সাহায্যে ততটা নয়, যতটা পশু শক্তির সাহায্যে সে এখন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে, হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে সে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করে এবং দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য সে পশুশক্তির উপর নির্ভর করে। জীবনে তখনও জটিলতা দেখা দেয়নি। সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপকরণের তালিকা বিশেষ দীর্ঘ হয় নি। শস্য উৎপাদনই তখন মৌলিক কাজ। বেশীসংখ্যক মানুষই কৃষিকর্ম্ম ক'রে জীবনধারণ করে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কিছু কারিগরও থাকে। তারা ভূমিকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে। তারা গোযান বা অশ্বযান

নির্ম্মাণ করে। তারা বস্ত্র বয়ন করে। তারা গৃহে নিত্য ব্যবহার্য্য পাত্র বা আধার উৎপাদন করে।

সুতরাং সমাজ তখন গ্রাম-কেন্দ্রিক। গ্রামে চাষীই প্রধান শ্রেণী। তাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কয়েক ঘর কারিগর বা শিল্প দ্রব্য উৎপাদক থাকে। এক ঘর কর্ম্মকার, এক ঘর কুম্ভকার, এক ঘর সূত্রধর এবং একাধিক ঘর তন্তুবায় থাকতে বাধ্য।

এই বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছড়ান আকারে গড়ে ওঠে পত্তন বা নগর। কোথাও হয়ত দশ দিকের দশটা পথ একস্থানে মিলেছে। নানা পণ্যদ্রব্যের সেটা বিনিময়-কেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠে। সেখানে বহু ব্যবসায়ীর মিলন হয়। তারই ভিত্তিতে সেখানে একটি নগর গড়ে ওঠে। কোথাও বা রাজাশাসনের জন্য শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কত আমলার সেখানে কাজ জোটে, রাজদরবারে কত মানুষের আনাগোনা করতে হয়। এই ভাবে সেখানেও বহু মানুষের বসতি স্থাপিত হয়। সেখানেও নগর গড়ে ওঠে। গ্রামই যেন নিয়ম, নগর যেন ব্যতিক্রম। জীবনে জটিলতা কম। জীবনযাত্রার তাল দ্রুত নয়, মন্দ। এই হল মোটামুটি দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য।

মানুষের নূতন শক্তি আয়ত্ত করবার তৃষ্ণা কিন্তু তখনও নির্ব্বাপিত হয় নি। এককালে নিজের দৈহিক শক্তি তাকে যে সম্পদ এনে দিয়েছিল তাতে সে তৃপ্তি পায় নি। পরবর্ত্তী যুগে সে পশুদেহের শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্তি পায় নি। নূতন-তর শক্তির উৎসের সন্ধানে তার মন ছুটেছিল। নূতন ক্ষেত্রে শক্তির সন্ধান যে এতকাল সে পায়নি, তাও নয়। অতি-শৈশবেই সে অগ্নির গুণ চিনেছিল এবং তাকে ইচ্ছামত উৎ-পাদন করবার দক্ষতা অর্জ্জন করেছিল। কিন্তু তার ব্যবহার সে করেছিল অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। রন্ধনের কার্য্যে বা শীত হতে পরিত্রাণের কার্য্যে বা রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করবার কার্য্যে তাকে ব্যবহার করেছিল। কাজেই প্রাকৃতিক শক্তিকেও যে আয়ত্ত ক'রে ব্যবহার করা যায় সে অভিজ্ঞতাও তার ছিল। পরবর্ত্তী কালে নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে সে যাতায়াতের সমস্যাকে সহজ করেছে। জোয়ার ভাঁটার নিয়মকে আয়ত্ত ক'রে সে নদীকে যাতা-য়াতের পথে পরিণত করতে পেরেছে। বস্ত্রের সাহায্যে বাতাসকে বেঁধে সে নৌকা বা জাহাজ পরিচালিত করেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরা ছিল প্রকৃতির প্রকট শক্তি।

প্রকৃতির মধ্যে নিদ্রিত যে শক্তি রয়েছে তার সঙ্গে এতকাল তার পরিচয় হয়নি। সেই শক্তির সন্ধান সে যেদিন পেল সেদিন আর একটি যুগান্তর সংঘটিত হয়ে গেল। ঘটনাটি অতি সামান্য। একটি ইংরেজ বালক লক্ষ্য করেছিল যে কেটলিতে যখন জল গরম হয়ে ওঠে এবং বাষ্প নির্গত হতে থাকে তখন কেটলির ঢাকনা ওপরে উঠে যায়। এই দৃষ্টান্ত পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করল যে জল যখন উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তখন বাষ্পের মধ্যে যে আত্মবিস্তারের শক্তি আছে তা কেটলির ঢাকনাকে ওপরে ঠেলে দেয়। এই ভাবেই প্রকৃতির মধ্যে ঘুমন্ত যে শক্তি আছে তার প্রথম সাক্ষাৎ মানুষ লাভ করেছিল। তার পর যা ঘটে গেল তা যেমন আকস্মিক, যেমন দ্রুত, তেমনি বিস্ময়কর।

বাষ্পের এই বিস্তার শক্তিকে মানুষ নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। বস্ত্র উৎপাদন করতে যেমন সুতো পাকানো তেমন বস্ত্রবয়ন উভয়ই বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং একান্ত বিরক্তিকর কাজ। পশু শক্তিকে আয়ত্ত করেও সে এই বিরক্তিকর কাজ হতে অব্যাহতির উপায় খুঁজে পায় নি। আজ বাষ্পশক্তির আবিষ্কার সেই অব্যাহতির পথ সুগম ক'রে দিল। বাষ্প-চালিত তাঁত এবং বাষ্পচালিত মাকু তৈয়ারী হল। তার ফলে সমাজ জীবনে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হল তাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নামকরণ যে যথার্থ হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। সেই রকম তার বিনিময়ের ক্ষেত্রও ছিল অপরিসর। গ্রামাঞ্চলে এক বা একাধিক গ্রামেই তা সীমাবদ্ধ। কোনো কুম্ভকারের উৎপাদিত পণ্য তার গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে ফুরিয়ে যেত। বিশেষ বিখ্যাত কারিগর হলে হয়ত পাশের গ্রামেও তার পণ্য যেত। সহর অঞ্চলে তুলনায় ধনী শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। তারা মূল্যবান পণ্যদ্রব্য ক্রয় করবার ক্ষমতা রাখত। তা দূর

থেকে আসত বৈ কি। কিন্তু তা উৎপাদন করত যে শিল্পীরা, তাদের সংখ্যা যেমন কম ক্ষমতাও তেমন সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তার চাহিদা ছিল না। এইকালের শিল্পীরা প্রধানত নিজ হস্তেই কাজ করত। অর্থাৎ যে শ্রমিক সেই ছিল সাধারণত মালিক। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুটি আলাদা সত্তার আবির্ভাব তখনো হয় নি।

বাষ্পের শক্তি কিন্তু অপরিসীম। তাকে আয়ত্ত ক'রে মানুষ যখন বস্ত্র উৎপাদনের কার্যে লাগাল, তখন এক নূতন দৈত্যের যেন আবির্ভাব হল। যন্ত্রচালিত মাকু ও যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্য নির্মিত হল কারখানা। আগুনের সাহায্যে জল উত্তপ্ত ক'রে বাষ্প উৎপাদনের জন্য নির্মিত হল প্রকাণ্ড 'বয়লার'। পাইপযোগে সেই বাষ্পচালিত ক'রে বিশেষ পথ দিয়ে তাকে নির্গত ক'রে চালান হল প্রকাণ্ড চাকা। সেই চাকার সহিত নানা বেল্টের সাহায্যে মাকু এবং তাঁতকে সংযুক্ত ক'রে তাদের চালিত করা হল। এইরূপে মানুষের নূতন সৃষ্টি যন্ত্ররাজ অধিষ্ঠিত হল। কি আসুরিক তার শক্তি! লোষ্ট্র, কাষ্ঠ, ইষ্টক ও লৌহ দ্বারা তার ঘন পিনদ্ধকায় দেখলে মনে ত্রাস আসে। তার যা শক্তি তা এক সাথে শত শত তাঁত চালাতে পারে এবং সহস্র মাকু ঘোরায়। যেখানে এতগুলি যন্ত্র একসঙ্গে কাজ করে, সেখানে সেই যন্ত্রগুলির প্রতি নজর রাখতে এবং তাদের জোগান দিতে কত লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং এই দানবকে সৃষ্টি করতে ও চালু রাখতে সমাজের কাঠামোর কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন সীমাবদ্ধ আকারে অল্প মূলধন নিয়ে ছোট ছোট শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। যিনি শিল্পী সাধারণত তিনিই কেন্দ্রের মালিক ছিলেন। মালিক এবং শ্রমিকের কোনো ভেদ ছিল না। এখন কিন্তু এতবড় যন্ত্রদানব সৃষ্টি করতে লাগে প্রচুর অর্থ। দ্বিতীয় যুগের ছোট শিল্পীর এত পরিমান অর্থ সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। কাজেই মূলধন তোলবার জন্য প্রয়োজন হল ধনী বা বিত্তবান মানুষের। বড় জমিদার বা ব্যবসায়ীরাই এত পরিমাণ অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যয় করতে সামর্থ্য রাখে। কাজেই পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারাও এসে জুটল। তাদের অর্থে নির্মিত হল কারখানা। অপর পক্ষে দুএকজন কারিগর দিয়ে এতবড় কারখানা চালু রাখা যায় না। সুতরাং অসংখ্য কারিগর নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অন্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্যও বহু মজুরের প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

ফলে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেল। ব্যাপক ভাবে পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গড়ে উঠল দুটি বিভিন্ন সমাজ। এক দিকে বিত্তবান মালিক অর্থ দিয়ে কারখানা গড়ে তোলে আর মজুরী দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। অপর দিকে গড়ে উঠল অসংখ্য শ্রমিকের সমাজ। তারা পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম দান করে এবং পরিবর্তে মজুরী পায়। ফলে গ্রামের সমাজ ভাঙতে আরম্ভ করল। যে পণ্য দ্রব্য কারখানায় উৎপাদিত হয় তা পরিমাণে এত বেশী এবং মূল্য তার এত কম যে গ্রামের শিল্পী তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না। গ্রামের শিল্প প্রতিযোগিতায় হার মেনে মরতে বসল। গ্রামের কারিগর নিজের কুটীর-শিল্প ভেঙ্গে দিয়ে কারখানায় যোগ দিল। কারখানায় যত শ্রমিকের প্রয়োজন শুধু কারিগর দিয়ে তা মেটে না। তাই চাষীও ক্ষেত খামার ফেলে কারখানায় এসে জুটল। গ্রামের সমাজ ভেঙে বড় বড় কারখানার পাশে শিল্প-কেন্দ্র গড়ে উঠল। সেখানে অসংখ্য শ্রমিকের বাস। তাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান জোটে না, তবু গাদাগাদি ক'রে এক জায়গায় থাকতে হয়। সেখানে কষ্ট, দুঃখ এবং দারিদ্র্যই সাধারণ নিয়ম। সেখানে কয়েক ঘর মুষ্টিমেয় বিত্তবান মালিকের গৃহে তার ব্যতিক্রম।

এই পথে মানুষ প্রকৃতির বক্ষে অপ্রকট অবস্থায় স্থিত আরও অনুরূপ শক্তির সন্ধান পেল। খনিজ কয়লা উত্তাপ দেয়, সেই উত্তাপে জলকে বাষ্পে পরিণত ক'রে বাষ্পের আত্মবিস্তার শক্তির ব্যবহার ক'রে প্রথম শিল্প বিপ্লব সুরু হয়েছিল। তার পর খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হল। তার বিস্ফোরণ ঘটিয়েও অনুরূপ কাজে লাগান যায়। তার ভিত্তিতে যে শক্তির যন্ত্র উদ্ভব হল, তার নাম হল আভ্যন্তরীণ স্ফোটন ভিত্তিক ইঞ্জিন'। তার পর জলের নিম্নমুখী গতিও একটা প্রাকৃতিক শক্তি। তাকে ব্যবহার ক'রে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। উত্তাপ হতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়েও কল-কারখানা চালান যায়। এই ভাবে প্রকৃতির নানা অপ্রকট

শক্তি মানুষের আয়ত্ত হয়ে মানুষের সমাজ বিন্যাস রীতিমত পরিবর্তিত করে দিল। যন্ত্রশক্তিই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন হল। শস্য এখন উৎপাদিত হয় বড় বড় খামারে যন্ত্রের সাহায্যে। যাতায়াতকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে যন্ত্রচালিত যান। তার ভোগের জন্য বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয় যন্ত্রচালিত কারখানায়।

পুরাণে গল্প আছে যে দেবতা আর অসুর এই দুই দলে মিলিত হয়ে লক্ষ্মীলাভের আশায় এক কালে সাগর মন্থন করেছিল। তার ফলে লক্ষ্মীলাভ হয়েছিল ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে এক ভাণ্ড গরলও উঠে এসে তাদের রীতিমত বিপদ ঘটিয়েছিল। পুরাণে যা গল্প—মানুষের ইতিহাসে তা সত্য ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে অপ্রকট শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে মানুষ সত্যই লক্ষ্মীলাভের পথকে সুগম করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুই ভাণ্ড গরলও এসে জুটেছে। প্রথম গরল হল ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা। যন্ত্রভিত্তিক শিল্প পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে যারা লিপ্ত তাদের দুটি বিভিন্ন দলে ভাগ ক'রে দিয়েছে। এক দিকে আছে মূল ধনের মালিক, অন্য দিকে আছে শ্রমিক। তাদের স্বার্থ বিভিন্ন এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর দাঁড়িয়ে। এই সমস্যা অর্থনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে রাজনীতিতে আত্মবিস্তার করেছে। ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন দলের সমর্থনের ভিত্তিতে দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়েছে। তাই আজ পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ সংকটাপন্ন।

অপর পক্ষে যন্ত্রশক্তিকে চালু রাখতে প্রয়োজন পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রায় চাহিদা। তার ক্ষুধা যেমন বেশী, তেমন উৎপাদন শক্তি বেশী। যে পণ্য মাল উৎপাদিত হল, তা বিপণন না হলে লোকসান ঘটে। তাই বিপণন তার প্রধান সমস্যা। এই সূত্রেই আর এক গরলের সৃষ্টি। বিপণনের জন্য বাজার চাই। বাজার সৃষ্টি করতে সাম্রাজ্য চাই। এই ভাবেই শিল্প বিপ্লবের প্রথম যুগ শিল্পে অগ্রবর্তী জাতিরা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছিল। এই হল গরলের দ্বিতীয় ভাণ্ড।

এই মালিক-শ্রমিক সমস্যা ও সাম্রাজবাদের সমস্যা শিল্প বিপ্লবের দুটি মূল সমস্যা। তারা ঠিক বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে বিশেষ আলোচনার বিষয় হল এই শিল্প বিপ্লবেরই আর একটি কুফল। তা যে সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে তা ততটা প্রকট নয়। সেই কারণে তেমনভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিন্তু যেমন দ্রুতগতিতে তা বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হয় মানুষের জীবনকে তা অন্যভাবে বিপদাপন্ন করবে। সে বিষয়ে তাই আমাদের আজ সচেতন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়টি বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনকে সম্ভব করতে হলে যেমন এক দিকে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন পণ্য দ্রব্যের বিপণনের। বিপণন ব্যাপারটা সত্যই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়—কারণ যন্ত্রের ক্ষুধাও যেমন বেশী তেমন উৎপাদন-শক্তিও বেশী। উৎপাদন-শক্তি বেশী হওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণও বেশী হয়ে পড়ে এবং সেই অনুপাতে বিপণনের সমস্যাটাও বড় হয়ে পড়ে। এই সমাধানের চেষ্টাতেই প্রথম যুগে শিল্পে অগ্রসর জাতিগুলি সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছিল। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারলে দুই দিক হতে সুবিধা আছে। প্রথম যে দেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল সেই দেশ হতে কাঁচা মাল আমদানি করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত সেই কাঁচা মাল ব্যবহার ক'রে কারখানায় যে পণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হবে সেই দেশের বাজারে তা বিক্রয় হতে পারে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কারখানা চালু রাখবার জন্য ইংরেজ এইভাবে ভারতকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে একরকম অক্রিয় এবং অচল অবস্থায় এসে পড়েছে। সুতরাং বিপণন সমস্যা সমাধানে তা এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়।

বিপণন সমস্যার সমাধান আর এক উপায়ে হতে পারে। মানুষের ভোগের ইচ্ছার তৃপ্তির জন্যই ত উৎপাদন এবং সেই উৎপাদনের জন্যই কারখানা। বাড়ীর যেমন ভিত্তি থাকে, তার উপর একতলা ওঠে, তার উপর দোতলা ওঠে—উৎপাদন শিল্পের বিন্যাসেও অনুরূপ ব্যবস্থা এসে পড়ে। তারও ভিত্তি আছে; তার উপর নির্ভর ক'রে বেড়ে ওঠে বিভিন্ন স্তরের শিল্প। সামাজিক মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতাই হল সকল শিল্পের ভিত্তি। মানুষ যা কেনে তা সোজা ভোগ করবার জন্য। তার জন্য তাকে

বলা হয় ভোগ্যপণ্য। এই ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য যে কারখানা হয় তাই হল, তা হলে শিল্প বিন্যাসের এক তলা। কিন্তু ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে লাগে নানা যন্ত্র। তাও উৎপাদন করতে কারখানার প্রয়োজন। এই যন্ত্র উৎপাদনের কারখানাগুলি যেন শিল্প বিন্যাসের দোতলা। অপর পক্ষে সেই যন্ত্র উৎপাদন করতেও কাঁচা মাল লাগে—যেমন লোহা বা ইস্পাত। সেই কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্যও আবার কারখানা দরকার। এদের সেই জন্য বলে মৌলিক শিল্প। এই মৌলিক শিল্পই যেন তিনতলা।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যাতায়াতের সুবিধার জন্য কোনো বিত্তবান মানুষের মটর গাড়ী কেনবার ইচ্ছা হয়েছে ধরা যাক। সে যাবে দোকানে। সেখানে প্রদর্শনী কক্ষে সদ্য কারখানা হতে আনীত মটর গাড়ী আছে। এখন সেই গাড়ী যে কারখানায় উৎপাদিত হল সেখানে মটর গাড়ির বিভিন্ন অংশ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র দরকার। সেই যন্ত্রের চাহিদা পুরণের জন্য আর এক শ্রেণীর কারখানা দরকার যেখানে সেই যন্ত্র উৎপাদিত হবে। আবার সেই যন্ত্র উৎপাদিত করতে দরকার ইস্পাতের মত কাঁচা মাল উৎপাদনের। তার জন্য আবার বিভিন্ন কারখানার দরকার। এই ভাবেই শিল্প বিন্যাস গড়ে উঠেছে। একের প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে, আবার তার প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে। বিত্তবান মানুষের ভোগের জন্য মটর গাড়ী। মটর গাড়ী উৎপাদনের জন্য এক শ্রেণীর কারখানা। সেই কারখানার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য আর এক শ্রেণীর কারখানা। আবার সেই কারখানার কাঁচা মাল জোগান দেবার জন্য ইস্পাতের কারখানা। সুতরাং ধাপে ধাপে এই যে শিল্প বিন্যাস গড়ে উঠেছে তার মূলে আছে মানুষের ভোগে উৎপন্ন পণ্যের ব্যবহার। সুতরাং যে ভোগ্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন হবে তাকে মানুষের ভোগে লাগান প্রয়োজন। ভোগ্য পণ্য বিপণনই মূল কথা। বিক্রয় হলে তবেই শিল্পে যে অর্থব্যয় করা হয়েছে তা উঠে আসবে। দেহের নিকট যেমন আহার, শিল্পের নিকট তেমন বিপণন একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখন এই বিপণন সমস্যার সমাধানের আর একটি উপায় হল ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। যেটা করা যায় মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নীত ক'রে। এটা বেশ ভাল বোঝা যায় শিল্পের অনগ্রসর সমাজের বিষয় আলোচনা করলে। এমন অনুন্নত দেশ আছে যেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ পায়ে জুতো পরে না, দেহে উত্তরবাস ধারণ করে না, কেবলমাত্র কটিবাসই তার সম্বল। সে দেশের মানুষের যদি রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তার মনকে উত্তরবাস ব্যবহারে অভ্যস্ত করান যায়, তা হলে কাপড়ের চাহিদা বাড়বে। কাজেই বস্ত্র শিল্প বিস্তার লাভ করবে। উত্তরবাস উৎপাদনে সেলাই লাগে। কাজেই দরজির চাহিদা বাড়বে, সেলাই কলের চাহিদা বাড়বে। তার জীবনের মানকে আর একটু উন্নত করতে পারলে সে পায়ে জুতো পরতে চাইবে। ফলে জুতো-শিল্প বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং এই ভাবে জীবনের মাপ উন্নীত করলে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বর্দ্ধিত করা যায়। চাহিদা বর্দ্ধিত হলে কারখানায় যে বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন হয় তার বিপণন সহজ হয়ে পড়ে।

শিল্পে অগ্রবর্ত্তী দেশে এই পথেই বিপণন সমস্যা সমাধানে চেষ্টা হয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ব্যবস্থার যেমন প্রসার হয়েছে, তেমন দেশের মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নূতন নূতন পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পে অগ্রবর্ত্তী দেশে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ খুব বেশী রকম হয়েছে। এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবান ব্যবহার্য্য পণ্যের ব্যবহার বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোনো সাধারণ মানুষ রেডিও, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিসন এবং মটর গাড়ীর মালিক হবার স্বপ্ন দেখে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মালিক হয়েও বসে। এই সব মূল্যবান জিনিষ কিনতেও বেশী মূলধন লাগে। সাধারণ মানুষ তা পাবে কোথায়? তার জন্যও ব্যবস্থা আছে। যারা এই সব মূল্যবান পণ্যের কারবার করে তারা মাসিক কিস্তিতে মূল্য শোধ করবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়। সমগ্র মূল্য না দিতে হলে মাসিক আয়ের অংশ কিস্তি শোধের জন্য বরাদ্দ ক'রে দিয়ে জিনিষ কেনা যায়। কবে মাসিক আয় হতে সঞ্চয় ক'রে ক'রে মূলধন জমবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তার একটা সুবিধা আছে। এই সব মূল্যবান পণ্য ক্রয় করবার ক্ষমতা অর্জ্জনের অনেক পূর্ব্বেই সেগুলি

ভোগ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও এসে পড়ে, যে এমন ভাবে ভোগ করে তার ঋণ-শোধের একটা দায়িত্বও বহন করতে হয় এবং মাসিক আয়ের একটা মোটা অংশ এই কিস্তিবদ্ধ ঋণ শোধে কমে যায়।

এই সূত্রেই শিল্প বিপ্লবের তৃতীয় কুফলটি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সুবিধার জন্যই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যন্ত্রের জন্য অত্যধিক মূলধন ব্যয় হয় এবং তা পরিশোধের জন্য নির্ভর করতে হয় অধিক পরিমাণ পণ্যের ব্যবহারে। সেই কারণে উৎপাদন ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হয়ে পড়ে—পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের সীমাহীন বিস্তারে। এই সূত্রেই বিপদ আসে। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে আর পণ্যদ্রব্য উৎপাদন হয় না। যে কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয় তাকে বাঁচিয়ে রাখতে উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হতে থাকে এবং মানুষের তা কেনবার প্রয়োজন থাক বা না থাক, নানা উপায়ে কিনতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। নানা চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন প্রচার হয়, কার-বারিরা এসে ধরাধরি করে, ঘরে টাকা না থাকলে ধারে জিনিষ দেওয়া হয়—কত কি। সুতরাং পণ্যদ্রব্য ক্রয় আর প্রকৃতি ভোগের জন্য নয়, যন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য। যেটা ছিল গৌণ, সেটা মুখ্য বস্তুর স্থান অধিকার করে বসে।

এই ভাবে শিল্পে-অগ্রসর দেশে মানুষের জীবনধারার মান অত্যধিক বেড়ে গেলে অবস্থাটা হয়ে পড়ে বেশ শোচনীয়। মানুষের জীবন রীতিমত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। মানুষের কাজ যেন হল উপার্জ্জন করা এবং ভোগ্য-পণ্য ক্রয় করা। প্রকৃত ভোগের প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক পণ্য কিনতে হবে, হাতে টাকা না থাকলে ধারে কিনতে হবে। একথা স্বীকার্য্য যে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য খানিক পরিমাণ বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দরকার। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে। মানুষ একটি জটিল সত্তা। তার হৃদয় আছে, মন আছে, দেহ আছে। তার হৃদয় মানুষের সঙ্গে, অন্য জীবের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। তার মন ভাবতে, মৌলিক চিন্তা করতে অবসর চায়। তার দেহ তার সেই মন সেই হৃদয়কে ধারণ করে। তারও কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন আছে বৈকি। তা না হলে হৃদয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তি কাজ করে না। তার শৈশবে মানুষের সে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। পরে বৈষয়িক সমৃদ্ধির সঙ্গে সেটা সম্ভব হয়েছিল। এই বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্যই পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। সহজে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যই যন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা। কিন্তু যন্ত্রীকরণ যে অর্থ নৈতিক বিন্যাস আনল তার ফলে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রশ্নই প্রাধান্য পেল বেশী। ফলে ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। হৃদয়-বৃত্তির বা মনন-বৃত্তির দাবী ত উপেক্ষিত হলই। সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানও গৌণ বস্তুতে পরিণত হল। মানুষ যেন উৎসর্গীকৃত হন যন্ত্রদানবের কাছে। যন্ত্র দানবের জন্যই তার জীবন নিবেদিত। পণ্যদ্রব্যের ভারে তার জীবন হয়ে পড়ল ব্যতিব্যস্ত।

শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। মানুষের দেহবল বা পশুবল উৎপাদনের কাজে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তবে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা এখনো বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যে নীতি যন্ত্রী-করণের জন্য দায়ী, সেই নীতিই উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন একটি নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চলেছে যা যন্ত্রীকরণের কুফলকে আরও বেশী বর্দ্ধিত করবে। তাকে বলা যায় 'স্বয়ংক্রিয়ণ'। যন্ত্রীকরণের পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং অন্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য মানুষের বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র থাকে। স্বয়ংক্রিয়ণে তা থাকবে না। বর্ত্তমান কালে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে এই সংযোগ স্থাপন বা নিয়ন্ত্রণের কাজ আপনা হতে সম্পাদিত হয়। তাই হল স্বয়ংক্রিয়ণের বৈশিষ্ট্য। পণ্য উৎপাদনে এই নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ হলে যন্ত্রীকরণের যে কুফল তা নিঃসন্দেহে আরও বর্দ্ধিত হবে। স্বয়ংক্রিয় কারখানা স্থাপন করতে মূলধন খরচ হবে অনেক বেশী। উৎপাদনের কাজে মানুষের সহিত সংযোগ একরকম বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তার উৎপাদন শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। ফলে সেই বিপণন সমস্যা আরো বর্দ্ধিত আকারে

দেখা দেবে। সেই ভাবী ব্যবস্থা মানুষের ভাগ্যে আরও কি দুর্ভোগ আনবে তা কল্পনা করা যায় না।

যন্ত্রদানবের এই দৌরাত্ম্য যে পশ্চিমের মানুষের নজরে আসেনি তা নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ ক'রে বৈষয়িক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁচেছে ঠিক, কিন্তু সে উন্নতি আমেরিকাবাসীর অবিমিশ্র সুখের কারণ হয়নি। পণ্যদ্রবের বোঝা তাদের জীবনকে সবিশেষ ভারাক্রান্ত করেছে। যন্ত্রীকরণের এই কুফলের দিকটির প্রতি সে দেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার প্রমাণ স্বরূপ 'সুস্থ সমাজ' শীর্ষক এরিক ফ্রোম লিখিত পুস্তকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি এই বলেছেন ঃ

"আমাদের পণ্যদ্রব্য ভোগের রীতির নিশ্চিত ফল হল আমরা তাতে কখনো তৃপ্তি পাই না, কারণ আমাদের মধ্যে যে সত্য বাস্তব ব্যক্তিটি আছে সেত তা ভোগ করে না। এই ভাবে আমরা আরও পণ্যের জন্য আরও ভোগের জন্য একটি ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন বোধ গড়ে তুলি। এ কথা সত্য যে, যে পর্য্যন্ত দেশের মানুষের জীবনের মান সম্ভ্রান্তভাবে জীবনযাত্রার স্তরের নীচে থাকবে, সে পর্য্যন্ত স্বভাবতই অধিক পণ্যদ্রব্য ভোগের প্রয়োজন থাকবে। এও সত্য যে মানুষ যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে মার্জ্জিত রুচির খাদ্য, সুন্দর কারুকার্য্য, পুস্তক প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করবে—তেমন সঙ্গত কারণে অধিক পণ্যের প্রয়োজন থাকবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের পণ্যদ্রব্য ভোগের বাসনা মানুষের প্রয়োজনের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। প্রথম দিকে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য ভোগের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বেশী সুখ ও তৃপ্তি দেওয়া। পণ্যদ্রব্য ভোগ একটি উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ ছিল, সে উদ্দেশ্য হল সুখ লাভ। বর্ত্তমানে তা নিজেই উদ্দেশ্যের স্থান দখল ক'রে বসেছে। প্রয়োজনের অন্তহীন পরিবর্দ্ধন উপার্জ্জনের চেষ্টাকে বর্দ্ধিত করতে বাধ্য করে এবং এই নূতন প্রয়োজনগুলির উপর এবং যে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলি তার জোগান দেয় তাদের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে।"

যন্ত্রদানব যে এমন আপদ হয়ে মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করবে তার আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের মনেও জেগে-ছিল। তিনিও বলেছেন যে প্রযুক্তি বিদ্যার অতিপ্রয়োগে যখন উৎপাদন ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ হয়, তখন আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজনবোধ ক্রমবর্দ্ধমান হারে বেড়ে চলে এবং সেই প্রয়োজন দূর করতে আমাদের কার্য ও সামর্থ্যের ওপর চাপ বৃদ্ধি হয়। ফলে আমাদের বৈষয়িক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু তার জন্য আমাদের অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। সব থেকে দুঃখের কথা হল, মানুষের জীবন হতে অবসর আবার পলাতক হয়। মানুষ কেবলমাত্র অর্থ-নৈতিক জীবে পরিণত হয় এবং তার সকল কাজ সকল চেষ্টা অর্থ-উপার্জ্জন ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় ক'রে ভোগের কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জীবনের ক্ষেত্র রীতিমত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তিনি তাই বলেছেন ঃ

"একই কারণে মনে হয়, বর্ত্তমান সভ্যতা আদিম মনোভাবে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের প্রয়োজনগুলো এমন ভীষণ দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে যে আত্মসাধনায় সিদ্ধি লাভের অবসর পাই না এবং আত্মসাধনায় বিশ্বাসও হারিয়ে বসেছি।" (মানুষের ধর্ম্ম)

তাঁর মতে তার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন আমাদের চারিপাশে এক প্রাচীর তুলে দেয়। ফলে অন্যের সহিত প্রীতির সংযোগ থাকে না, প্রকৃতির সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, উন্নত চিন্তা বা ভাবনার অবকাশ মেলে না। বিশ্ব হতে যেন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, নিজেদের বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি। এ যেন বনের পাখীকে খাঁচার মধ্যে পুরে দেবার মত। তাই তিনি বলেছেন ঃ

"আমাদের একান্ত জটিল বর্ত্তমান পরিবেশে যান্ত্রিক শক্তিকে এমন নিপুণভাবে গড়ে তোলা হয় যে ভোগ্য-পণ্য যে হারে উৎপাদিত হতে থাকে তা মানুষের পছন্দ ক'রে ভোগ করবার ক্ষমতার বাহিরে চলে যায় এবং তার প্রকৃতির ও প্রয়োজনের সহিত সহজভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে না।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উদ্ভিদের বিস্তারের মত পণ্যদ্রব্যের এই অসংযত অতিবিস্তার মানুষের জন্য অবরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। নীড় হল সরল জিনিষ। তার আকাশের সহিত সহজ সংযোগ আছে ; পিঞ্জর জটিল এবং মূল্যবান জিনিষ ; যা বাহিরে আছে তা হতে তা অতি বেশী রকম

বিচ্ছিন্ন। বস্তুরূপী দৈত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং চারিদিক হতে নিজেকে আচ্ছন্ন করতে দিয়ে মানুষ নিজের জন্য দ্রুতবেগে পিঞ্জর নির্ম্মাণ ক'রে চলেছে।"

(মানুষের ধর্ম্ম)

এখানে 'পিঞ্জর' এবং 'নীড়' এই পদ দুটির তাৎপর্য্য বিশেষ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবার প্রয়োজন আছে। তাঁর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে উন্নতির খানিক পরিমাণে প্রয়োজন নাই যে তা নয়, বরং মানুষের অনেক অভাব সহজে দূর করতে সাহায্য করে এবং অবসর এনে দিয়ে তার বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। সেই রকম পাখীরও নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য একটি নীড়ের প্রয়োজন আছে, তা না হলে উন্মুক্ত আকাশে নিরুদ্বেগ চিত্তে উড়ে বেড়াবার সুযোগ তার মেলে না। নীড় তাই তার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে না, বরং তা ভোগ করবার সুবিধা এনে দেয়। কিন্তু সেই পাখীকে যদি পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হয়, তার আবাসের ব্যবস্থা নিশ্চয় নীড় হতে অনেক ভাল হয় কিন্তু অনন্ত আকাশে স্বাধীন বিচরণের অধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়। তেমনি মানুষের জীবনকে খানিক পরিমাণ নিরাপদ করতে এবং দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদন সমস্যার অনন্ত জটিলতা হতে মুক্তি দিতে খানিক পরিমাণ প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। উৎপাদন ব্যবস্থা সহজ হলে যা সবার বড় লাভ তা হল নানা বৃত্তি বিকাশের সুবিধার জন্য অবকাশ। কিন্তু যান্ত্রিক শক্তির সংযোগে অত্যধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হলে তার বন্যায় আবার অবসর ভেসে চলে যায় এবং মানুষের জীবন সঙ্কুচিত এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এও একরকম নিজের চারিপাশে পিঞ্জর নির্ম্মাণের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে গোড়াতেই আমাদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা একান্তভাবে কেবল লক্ষ্মীরই সাধনা ক'রে এসেছি। আমরা ভুলে বসে আছি যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আছে। তাঁরা সম্বন্ধে পরস্পরের ভগিনী এবং উভয়ের মধ্যে এমন প্রীতির সংযোগ যে একজনকে বর্জ্জিত ক'রে অন্যের প্রতিষ্ঠা কারও প্রীতিকর নয়। দৈহিক প্রয়োজনগুলিকে অস্বীকার ক'রে মনোবৃত্তির বা হৃদয়বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়। অপর পক্ষে প্রয়োজন থাক বা না থাক কোন দৈহিক ভোগের জন্য ভোগ্য পণ্য আহরণ করলে মনো বৃত্তি বিকাশের অবকাশ পায় না। শুধু সরস্বতীর সেবা ক'রে তাঁর মন পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে সরস্বতীকে দূরে রেখে কেবল লক্ষ্মীর উপাসনা তাঁকে রুষ্ট করে। মানুষের ইতিহাসে ঠিক তাই ঘটেছে। সরস্বতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আমরা কেবল লক্ষ্মীর উপাসনা করেছি। তাই তিনি রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছেন। সেই জন্যই ত এত বৈষয়িক সম্পদ মানুষের ভোগে এল না, বরং পণ্যদ্রব্যের এই পাহাড়প্রমাণ সঞ্চয় তার জীবনকে শুধু ভারাক্রান্ত করে নি, নিষ্পেশিত করবার উপক্রম করেছে।

এই ভ্রান্তি সংশোধন করবার এখন কি সময় আসে নি? লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে দুই ভগিনী, তাঁদের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য এই কথা স্মরণ রেখে আমাদের কি অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাসের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বিধান প্রয়োজন নয়?

একটি প্রশ্ন

প্রফুল্ল রায়
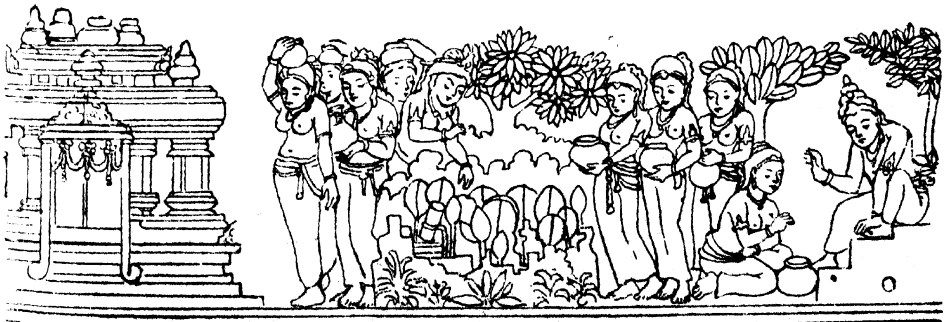
বোম্বাই শহরের এই ঋতুটাকে একখানা ধ্রুপদ গানের মত মনে হয়। এই ঋতু অর্থাৎ বর্ষা।

ধ্রুপদের যেমন তিনটে স্তর, প্রথমে আলাপ—মধ্যে গান—অন্তিমে বিস্তার, এখানকার বর্ষারও তাই। প্রথমে মেঘেদের আনাগোনা, তারপর অল্প অল্প বৃষ্টি, একেবারে শেষ পর্যায়ে যে বর্ষণ তার বিরাম নেই। দিবারাত্রি প্রবলবেগে অবিরত সে ঝরতেই থাকে।

সপ্তাহখানেক হ'ল এখানে বর্ষার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে। কদিন আগেও জ্যৈষ্ঠের রোদে পুড়ে পুড়ে আকাশটা তামাটে হয়েছিল। এমনই অসহ্যছিল তার দাহ, যে সেদিকে তাকানো যেত না। তাকালে চোখ ঝলসে যেত। আজকাল আরব সাগরের লবণাক্ত কালো জল থেকে মেঘেরা উঠে এসে আকাশটাকে স্নিগ্ধ করতে শুরু করেছে। সমস্ত গ্রীষ্ম জুড়ে সে শুধু জ্বলেছে। আরব সাগরের মেঘেরা এখন তার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে।

যেদিকে যতদূর তাকানো যায়, মেঘ আর মেঘ সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। মনে হয় এক অদৃশ্য ধুনুরি আকাশময় খুশিমত তুলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বাঙলা দেশের মানুষ। মেঘ দেখলেই আমার মন ময়ূর হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় কোনদিকে বেরিয়ে পড়ি বেরিয়ে আমি পড়িও। শুধু মেঘ দেখেই না, যে কোন সময় একটু অবকাশ পেলেই ট্রাম-বাস-অফিস-ভিড় আর উচ্চস্বরের হৈ-চৈ দিয়ে ঘেরা নাগরিক জীবনের ছক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাই। আমার স্বভাবে আর শোণিতে একটা অস্থির যাযাবর আছে। সবসময় সে আমাকে চঞ্চল করে রাখে।

আজ ছুটির দিন। দুটো সিদ্ধ ডিম, একটা কলা আর কিছু পাউরুটি ঝোলায় পুরে সকালবেলাতেই চার্চগেট স্টেশনে ছুটলাম। ছুটির দিনের একটা মুহূর্তও শহরে থেকে অপচয় করতে আমি রাজী নই।

এখান থেকে একটা ট্রেন ছাড়ে। সোজা সেটা বোরিভিলি পর্যন্ত যায়। শেষ স্টেশনের একখানা টিকিট কিনে গাড়িতে উঠলাম।

একসময় গাড়ি ছাড়ল। বোম্বাই শহর পেছনে রেখে ইলেকট্রিক ট্রেন নিমেষে উধাও হ'ল।

শহরের পর বিস্তৃত শহরতলী। সেখানে কল-কারখানা ধোঁয়া-ধুলো। বছরের কোনসময় সেখানে ছুটি নেই। দিবারাত্রি সেখানে ব্যস্ততা। দেখতে দেখতে শহরতলীও পেরিয়ে গেলাম।

বোরিভিলিতে যখন পৌছলাম তখন দুপুর। দুপুর হলেও মেঘের জন্য রোদের তেজ প্রায় নেই বললেই হয়। একটা ঠাণ্ডা ছায়াচ্ছন্নতা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আর আছে হাওয়া। আরব সাগরের উচ্ছ্বসিত দুর্বিনীত বাতাস আমার পিছু পিছু এই বোরিভিলি পর্যন্ত ছুটে এসেছে।

কালেক্টারের হাতে টিকিটখানা সঁপে দিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম।

স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকেই মাঠ শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রের অন্তহীন অবাধ মাঠ। চড়াই-উতরাইএ মাঠটা তরঙ্গিত। মাটির রঙ এখানে কালো। এত কালো যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সামনের ওটা যেন মাঠ নয়, একটা বিশাল সমুদ্র তার অগণিত ঢেউ নিয়ে ওখানে স্তব্ধ হয়ে আছে।

মাটির প্রকৃতি এখানে পাথুরে। লক্ষ বছরের বৃদ্ধ আদিম পৃথিবীটা মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তরে রুক্ষ আর কর্কশ হয়ে রয়েছে।

আমি বাঙলা দেশের মানুষ। মাঠ বলতেই আমার চোখে একখানা নিবিড় শ্যামলিমার ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু সবুজের আভাষ এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। দু চারটে রুগ্ন চেহারার বাবলা আর আমলকি গাছ ছাড়া কঠিন নীরস মাটি থেকে আর কোন উদ্ভিদই মাথা তুলতে পারে নি।

তবু এই প্রান্তরকে আমার ভাল লাগল। এখানে অসীম মুক্তি, এখানে নিঃশব্দ সীমাহীনতা।

কোন এক মনীষী বলেছেন, মাঝে মাঝে প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িও। আত্মানুসন্ধান হবে।'

আমি তত্ত্বান্বেষী নই। আত্ম-সন্ধানের জন্য আমার কোন ব্যগ্রতাও নেই। আমি স্বভাব-যাযাবর, স্বভাব-পলাতক। ছুটি-ছাটায় এই যে শহর থেকে পালিয়ে আসি, এ শুধু একটু মুক্তির খোঁজে। নাগরিক জীবনের খাঁচাটার মধ্যে সারাটা সপ্তাহ প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকি। ছুটির দিনে প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে বুক ভরে শ্বাস টেনে বাঁচি।

কখন যে উঁচু-নীচু চড়াই-উতরাই মাঠটার ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, খেয়াল নেই। কতক্ষণ হেঁটে-ছিলাম, তা-ও মনে করতে পারব না।

একটা উঁচু টিলার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তরে আমার জন্য যে এমন একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আগে জানতে পারি নি।

টিলাটার গা ঘেঁষে বিরাট কম্পাউণ্ড নিয়ে একটা বাড়ি। উঁচু উঁচু প্রাচীর তার চারপাশে বেষ্টন করে রয়েছে। প্রাচীরগুলো এত উঁচু যে বাইরে থেকে ভিতরের কোন অংশই দেখা যায় না। মনে হচ্ছে, মধ্যযুগের কোন এক দুর্গের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

মাঠের মাঝখানে সীমাহীন নির্জনতায় বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। পায়ে পায়ে খুব কাছে এসে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম প্রাচীরের গায়ে অনেকগুলো চতুষ্কোণ টিনের পাত আঁটা আছে। ইংরাজীতে সেগুলোর ওপর লেখা রয়েছে, 'মনুষ্যজাতির প্রবেশ নিষেধ।'

বিমূঢ়ের মত টিনের পাতের লেখাগুলোর দিকে অনেক-ক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

একসময় বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেল। মনে হ'ল, এই বাড়িটার ভিতর একটা অগাধ রহস্য লুকিয়ে আছে। যেমন করে হোক সেটা জানতেই হবে। দুর্বার আকর্ষণে বাড়িটার অভ্যন্তর আমাকে টানতে লাগল।

স্থির করলাম, ভিতরে ঢুকব। খুঁজে খুঁজে সদর

দরজাটা বার করলাম। দরজাটা লোহার। ভারী ভারী পাল্লা দুটো ভিতর দিক থেকে বন্ধ। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ডাকতে লাগলাম, 'কে আছেন, দরজা খুলুন।'

ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না।

আবার ডাকলাম, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—'

বাড়ির ভিতরটা এবারও নিরুত্তর। শুধু আমার গলার স্বরটা লোহার দরজায় ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

একবার মনে হল, সম্ভবত এই বাড়িতে কেউ থাকে না। পর মুহূর্তেই ভাবলাম, কেউ না থাকলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকতে পারত না। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে।

অনেক ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেলাম না তখন ঠিক করলাম দরজা টপকে ভিতরে ঢুকব।

প্রাচীরের তুলনায় দরজাটা খুব বেশি উঁচু নয়। একটু চেষ্টা করতেই সেটা পেরিয়ে গেলাম।

ভিতরে ঢুকেই আমাকে অবাক হতে হ'ল। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পুকুর। আর সেই পুকুরটাকে বেষ্টন করে রয়েছে সারি সারি অসংখ্য টিনের চালা। সেগুলোর চারপাশ মোটা মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা।

চালাগুলোর কোনটাতে মুরগী, কোনটাতে পায়রা, কোনটাতে ময়ূর, কোনটাতে হরিণ রয়েছে। একটা চালায় বড় কাচের বাক্সে একজোড়া চন্দ্রবোড়া সাপও দেখতে পেলাম। আর একটা চালায় বন-বিড়াল জাতীয় ধূসর রঙের একটা জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও অন্য চালাগুলোয় এক কি একাধিক প্রাণী রয়েছে তাদের নাম আমি জানি না। মাঝখানের পুকুরটাতে একজোড়া রাজ-হাঁসের সঙ্গে অসংখ্য পাতিহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে ছোটখাট চিড়িয়াখানা বিশেষ।

যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু পশু আর পাখি। কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ল। পুকুরের ওপারে একটা চালার সামনে একজন প্রৌঢ় ভদ্র-লোক দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন বললে ঠিক বলা হয় না। খাঁচার ভিতরে একটা চিতাবাঘের বাচ্চা রয়েছে। ভদ্রলোক তাকে মাংসের টুকরো খাওয়াচ্ছেন।

আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, 'শুনুন—'

চমকে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। আর সেই মুহূর্তে তাঁর সম্পূর্ণ চেহারাটা আমি দেখতে পেলাম।

গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। মাথার চুল ঈষৎ তামাটে। তীক্ষ্ণ নাকের দু-পাশে দীর্ঘ উজ্জ্বল চোখ। ভুরু দুটো ঘন এবং জোড়া। বিস্তৃত বুক, ক্ষীণ কটি এবং ঋজু মেরুদণ্ড। পরণে ঢোলা পা-জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী। পোষাকের হেরফেরে তাঁকে একজন অভিজাত রোম্যান বলে মনে হতে পারে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর বিস্ময় কেটে গেল। দৃষ্টিটা একটু একটু করে তীক্ষ্ণ প্রখর এবং বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত গলায় ইংরাজীতে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?'

থতমত খেয়ে গেলাম। কাঁপা ভীত স্বরে বললাম, 'আজ্ঞে, আমি বোম্বাই থাকি। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়েছিলাম। এখানে এসে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'এতদূরে নিরিবিলি মাঠের মাঝখানে পালিয়ে এসেছি। তবু তোমরা আমাকে বিরক্ত করতে আসছ কেন? হোয়াই?'

ভদ্রলোকের ইংরেজী উচ্চারণ বিশুদ্ধ, ভাষাটাও একেবারে নির্ভুল। রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তি বলেই তাঁকে মনে হয়।

জড়িত দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি?'

'কী ব্যাপারে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তুমি ভেতরে ঢুকলে কেমন করে? চারপাশে উঁচু পাঁচিল আর সদর দরজাটাও তো বন্ধ রয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে?'

'দরজা টপকে ঢুকে পড়েছি।' আমি বললাম।

কি একটু যেন চিন্তা করলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই বলে উঠলেন, কিন্তু কেন?'

উত্তর দিলাম না।

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, 'দেওয়ালের গায়ে টিনের পাতাগুলোতে কী লেখা রয়েছে তোমার চোখে পড়ে নি?'

'পড়েছে।' এবার জবাব দিলাম।

'আমার এই কম্পাউণ্ডের মধ্যে মানুষের প্রবেশ নিষেধ। সে কথা আমি স্পষ্ট করে লিখে পাচিলময় লাগিয়ে দিয়েছি। তুমি সেগুলো পড়েছ। তা সত্ত্বেও ঢুকেছ যে?'

'আজ্ঞে, খুব কৌতুহল হয়েছিল তাই—' প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম।

'কিন্তু কোন কৌতুহলই তোমার মিটবে না।' বলেই আমার একটা হাত ধরলেন ভদ্রলোক। তাঁর মুঠির ভিতর আমার হাতটা যেন ভেঙে গুড়িয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। বুঝলাম এই বিচিত্র রহস্যময় মানুষটি শুধুমাত্র সুন্দর আর সুপুরুষই নন, অসাধারণ শক্তিমানও।

ভদ্রলোক বললেন, 'চল।' বলেই আমাকে টানতে টানতে সদর দরজাটার কাছে নিয়ে এলেন।

ভিতর দিক থেকে দরজাটার তালা আটকানো ছিল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে তালা খুললেন ভদ্রলোক। তারপর আমার ঘাড় ধরে বাইরে ছুঁড়ে দিতে দিতে বললেন, 'গেট আউট। আর কোনদিন এখানে আসবে না।' বলতে বলতেই দরজার পাল্লাদুটো টেনে আবার তালা লাগিয়ে দিলেন।

শক্ত পাথুরে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। জামার খানিকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। কপাল মুখ এবং বুকের চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। গা ঝাড়তে ঝাড়তে একসময় উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রলোকটির কথা ভাবতে লাগলাম। এমন একটা অস্বাভাবিক মানুষ জীবনে আর কখনও দেখি নি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বার বার আমি এখানে আসব। যতদিনই লাগুক এই মানুষটার সমস্ত রহস্য আমাকে জানতে হবে।

পরের ছুটির দিন আবার এলাম। সে-দিনের মতই দরজাটা বন্ধ ছিল। কাজেই টপকে ঢুকতে হল।

আজ আর বাঘের বাচ্চাটাকে মাংস খাওয়াচ্ছিলেন না ভদ্রলোক। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিলেন। দুটো লেগ-হর্ণ মুরগী খানিকটা দূরে ঝটাপটি হুড়োহুড়ি করছিল। একদৃষ্টে তাদের খেলা দেখছিলেন।

কাছে এসে বললাম, 'আমি এসেছি।'

মুরগী দুটোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ফেটে পড়লেন, 'আবার, আবার তুমি এসেছ!'

কিছু বললাম না।

উত্তেজনায় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সে-দিন না তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলাম, কোনদিন এখানে আসবে না—'

একটা উত্তর মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলাম। সেটা বলার অবকাশ পেলাম না। তার আগেই সেদিনের মত হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

এরপর আমার জেদ বেড়েই চলল। ছুটি পেলেই মহারাষ্ট্রের সেই প্রান্তরে সেই নিঃসঙ্গ বাড়িটায় চলে আসি। নিশির ডাকের মত বাড়িটা যেন আমাকে টানতে থাকে।

আমি আসি। বন্ধ দরজা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকি। ঐ পর্যন্তই। মানুষের সঙ্গ ছেড়ে যে ভদ্রলোক নির্জন প্রান্তরে পশু-পাখিদের রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে আছেন তার রহস্য আর জানা হয় না। আমাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দেন।

দেখতে দেখতে বর্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হ'ল। ক'দিন আগেও মেঘেদের রঙ ছিল ধবধবে সাদা। হাল্কা তুলোর মত আকাশময় তারা ভেসে বেড়াত। এখন তাদের রঙ এবং প্রকৃতি বদলে গেছে। এখন তারা নিবিড় কালো। ইচ্ছামত ভেসে বেড়াবার চপলতাও তাদের নেই। আরব সাগরের মেঘেরা এখন ভয়ানক গম্ভীর। মহারাষ্ট্রের আকাশ জুড়ে তারা স্থির এবং অনড় হয়ে আছে।

আজকাল প্রায় রোজই অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। ক'দিনের মধ্যেই প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হবে, আকাশ-জোড়া কালো মেঘে তারই সংকেত রয়েছে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একদিন সেই বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলাম।

পুকুরটার চারধারে বৃত্তাকারে পাখি আর জন্তুদের চালাগুলো রয়েছে। তাদের একপাশে একখানা ছোট একতলা বাড়ি। সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন ভদ্রলোক।

দূর থেকে কেন যেন মনে হ'ল ভদ্রলোক এই চিড়িয়াখানার অন্য সব বাসিন্দার মতই একজন। তাঁর স্বতন্ত্র কোন মানবীয় সত্তা নেই।

যাই হোক, আজকের বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছে। আকাশ থেকে তীরের ফলার মত বড় বড় ফোঁটাগুলো নেমে আসছে।

আমি দৌড়তে লাগলাম। দৌড়তে দৌড়তে ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়লাম।

ভদ্রলোক মাথা তুলে তাকালেন। আস্তে আস্তে তাঁর মুখে একটা ভ্রূকুটি ফুটে বেরুল। পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে গেল। হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন, 'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বাস্তবিক আই এ্যাম ডিফিটেড্।'

অন্য দিন দেখামাত্র ঘাড় ধরে আমাকে কম্পাউণ্ডের বাইরে বার করে দিয়ে আসেন। আজ কিছুই করলেন না। মনে মনে আশ্বস্তই হলাম।

ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।'

কাছেই একটা খালি বেতের চেয়ার পড়ে ছিল। তার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলাম।

সমানে বৃষ্টি পড়ছে। মহারাষ্ট্রের আকাশে যত মেঘ ছিল সব যেন গলে গলে ঝরে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'যখনই তুমি আস গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দি। তা সত্বেও আবার আস কেন?'

এতক্ষণে মুখ খুললাম। বললাম, 'প্রথম যেদিন এ বাড়িতে ঢুকি সেদিনই তো বলেছিলাম—আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক কৌতূহল। সেই কৌতূহল মেটাবার জন্যে বার বার আসি।'

'কৌতূহল! কৌতূহল!' বার দুই শব্দটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখ দেখে মনে হ'ল, কি একটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন।

একটু পরেই মগ্ন ভাবটা কেটে গেল। খুব শান্ত গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'বল, আমার সম্বন্ধে কী জানতে চাও—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে একসময় শুরু করলাম, 'এখানে আপনি একাই থাকেন?'

'একা কোথায়? এই যে হাঁস-মুরগী-হরিণ-বাঘের বাচ্চা—এরাও তো রয়েছে।'

'না-না, একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'মানে, মানুষ বলতে আপনি একাই—না আর কেউ আছে?'

'মানুষ বলতে আমি একাই।

'কতদিন এখানে আছেন?'

'তা বছর চোদ্দ-পনের।'

'চোদ্দ-পনের বছর!'

'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'এর মধ্যে এক দিনের জন্যেও এই কম্পাউণ্ডের বাইরে যাই নি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

'অন্য সব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বলে তো একটা ব্যাপার আছে। এই কম্পাউণ্ড থেকে না বেরুলে খাবার দাবার যোগাড় করেন কেমন করে?'

'একটা লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে, প্রতি বুধবার আটা-ময়দা-ডাল-ঘি, হাঁস-মুর্গীদের খাবার—এক সপ্তাহের মত খোরাকি দিয়ে দাম নিয়ে যায়। কম্পাউণ্ডের ভেতরে তাকে আমি ঢুকতে দিই না। সদর দরজা খুলে মালপত্র-গুলো নিয়ে দাম চুকিয়ে ওখান থেকেই হাঁকিয়ে দি।' একটু থেমে কি ভেবে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'চোদ্দ

পনের বছরে ঐ লোকটা ছাড়া আর কোন মানুষ আমি দেখি নি।'

'আচ্ছা—'

'বল।'

'চোদ্দ-পনের বছর তো হাঁস-মুর্গী, খরগোষ, এই সব নিয়ে আছেন। সব সময় এদের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে ?'

'নিশ্চয়ই।' অস্বাভাবিক দৃঢ় গলায় ভদ্রলোক বললেন। 'এরা অন্তত মানুষের মত বিশ্বাসঘাতক বেইমান না।'

আমার স্নায়ুগুলো একসঙ্গে চকিত হয়ে উঠল। বুঝলাম, মানুষ সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকটির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। আরও বুঝলাম মনের ভিতর একটা অব্যক্ত অবাঙ্ময় যন্ত্রণা আছে তাঁর। সেই যন্ত্রণাটাই তাঁর রহস্য। শুধোলাম—মানুষের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে না ?'

নীরস শুষ্ক স্বরে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'না, একেবারেই না। তুমি দেখ নি বাইরের প্রাচীরে লিখে রেখেছি—'মনুষ্যজাতির প্রবেশ নিষেধ ?'

বললাম 'দেখেছি। কিন্তু কেন আপনি মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন ?'

'কেন শুনতে চাও ?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

'চাই।' বেতের চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন ভদ্রলোক। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকে যেতে লাগল। কপালের উপর অনেকগুলো গভীর জটিল রেখা দেখা দিয়েছে। মনে হয়, কেউ যেন ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে ইচ্ছামত দাগ কেটেছে। বুঝলাম, একটা নিদারুণ অসহ্য ভাবনার মধ্যে তিনি এগিয়ে গেছেন।

একসময় চোখ মেললেন ভদ্রলোক। তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, 'আমার দেশ পোরবন্দরে। জাতিতে আমি গুজরাটি। নাম মগনভাইজী। আমার বাবা গগনভাইজী পোরবন্দরে জমিদার-শ্রেণীর লোক ছিলেন। হাজার বিঘে জমি ছিল আমাদের। দেশে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি ছিল। বাড়িটার স্থাপত্য-রীতিতে প্রচুর গথিক প্রভাব ছিল। বাবা ছিলেন খুবই সৌখিন প্রকৃতির মানুষ। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসের 'লন্' বানিয়েছিলেন। 'লন্'টার মাঝখানে একটা ফোয়ারা সবসময় উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত। ফোয়ারাটাকে ঘিরে মরসুমী ফুলের বাগান ছিল। সবুজ মাঠটার চারপাশে পাথরের অজস্র মূর্তি ছিল। এ তো গেল বাড়ি আর জমির কথা। এসব ছাড়া ছিল খান পাঁচেক লরী, পঁচিশটা মোষের গাড়ি আর দুটো মোটর সাইকেল।'

বলতে বলতে মগনভাইজী থামলেন। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের পুকুরটার দিকে তাকালেন। ঝরঝর করে অবিরাম জল ঝরছে। অনেকক্ষণ বৃষ্টির শব্দ শুনলেন তিনি। তারপর একসময় আরম্ভ করলেন, 'আমরা কিন্তু পোরবন্দরে থাকতাম না।'

'কোথায় থাকতেন তা হলে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বাবার সঙ্গে আমি বোম্বাইতে থাকতাম। বোম্বাইতে জাভেরি বাজারে বাবার জহরতের ব্যবসা ছিল। বোম্বাইতে আমাদের বাড়ি ছিল না। ইচ্ছা করলে বাবা একখানা বাড়ি কিনতে পারতেন। কিন্তু কেনেন নি। মালাবার হিল্‌সে ফ্ল্যাট ভাড়া করে আমরা দু-জনে থাকতাম।'

'আপনারা দু-জনে মানে ?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'বাবা আর আমি।'

'আপনার মা কোথায় থাকতেন ?'

'মাকে আমি দেখিনি। শুনেছি আমার জন্মের পরেই তিনি মারা গেছেন।'

'আপনারা তো বোম্বাইতে থাকতেন। আপনাদের পোরবন্দরের বাড়ি আর সম্পত্তি কে দেখাশোনা করত ?'

মগনভাইজী বললেন, 'আমার কাকা।'

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলাম না।'

মগনভাইজী বৃষ্টির দিক থেকে চোখ ফেরান নি। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বলতে লাগলেন, 'অর্থবান বাপের একমাত্র সন্তান আমি। বুঝতেই পার—প্রচুর আদরে মানুষ হয়েছি। যখন যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। কোনদিন কোন ব্যাপারে আমাকে বিমুখ হতে হয় নি। অবশ্য অন্য সব বড়লোকের ছেলের মত আমি ছিলাম না। আমার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। কোনদিন কোন অসঙ্গত বদখেয়ালে আমি পয়সা ওড়াই নি। ছাত্র হিসাবে আমি ভালই ছিলাম। স্কুলের টীচারেরা, কলেজ এবং য়ুনিভারসিটির

অধ্যাপকরা বলতেন, 'জুয়েল!' মানুষকে নানারকম নেশায় প্রাগ্র। কেউ মদে, কেউ বা মেয়েমানুষে ডুবে যায়। আমার নেশা ছিল বই। দিবারাত্রি লেখাপড়ায় মগ্ন হয়ে থাকতাম।'

মগনলালজী আর একবার চুপ করলেন। এদিকে বৃষ্টি থেমে এসেছে। মেঘ এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। আকাশের রঙ তরল সীসার মত। আত্মবিস্মৃতির মত অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। একসময় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, দর্শন নিয়ে এম-এ পাশ করেছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিলাম। বাবার ইচ্ছা ছিল, এম-এ পাশ করার পর আমি তাঁর জহরতের ব্যবসায় বসব। আমার ইচ্ছা ছিল অধ্যাপনা করব। কিন্তু বাবার বা আমার, কারো ইচ্ছাই পূর্ণ হল না।'

'কেন?' নিজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করে বসলাম।

'হঠাৎ বাবা মারা গেলেন।' মগনলালজী বলতে লাগলেন, 'বাস্তববুদ্ধি আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। জীবন সম্পর্কে আমার যেটুকু জ্ঞান তার সবই ছিল অধীত। এত-কাল লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আর কোনদিকে নজর দেবার প্রয়োজন হয় নি। বাবার মৃত্যুর পর দিশাহারা হয়ে পড়লাম। জহরতের ব্যবসা, পোরবন্দরের সম্পত্তি—এসব নিয়ে কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অকূল সমুদ্রে সাঁতার-না-জানা মানুষের যে অবস্থা হয়, আমার তখন সেই অবস্থা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

মগনলালজী আবার আরম্ভ করলেন, 'ভেবে ভেবে আমি যখন অস্থির, সেই সময় কাকার কথা মনে পড়ল। সেই কাকা—যে আমাদের পোরবন্দরের সম্পত্তি দেখাশোনা করত। ভাবলাম তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। বাবার মৃত্যুর দিন চারেক পরেই জহরতের দোকান বন্ধ করে পোরবন্দর রওনা হলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম পোরবন্দরে আমার জন্যে এত বড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে!'

অর্ধস্ফুট স্বরে বললাম, 'কী বিস্ময়?'

'পোরবন্দরের বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন বিকেল। বাবার মৃত্যুর এবং আমার আসার খবর আগেই টেলিগ্রাম করে কাকাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি ফটকের কাছে কাকা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই কাকা এগিয়ে এল। তার মুখেচোখে ভাইয়ের শোকের চিহ্নমাত্র নেই। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর শুষ্ক নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলে উঠল, 'এ বাড়িতে তুমি ঢুকতে পাবে না।' চমকে উঠলাম। বাবা বেঁচে থাকতে যখনই এ বাড়িতে এসেছি আমাকে নিয়ে কাকা উৎসব শুরু করে দিয়েছে। আমার প্রতি তার স্নেহের অন্ত ছিল না। যে কটা দিন থাকতাম আমাকে নিয়ে যে কী করবে ঠিক করে উঠতে পারত না কাকা। সেই স্নেহপ্রবণ মানুষটা বাবার মৃত্যুর চারদিনের মধ্যে এত বদলে গেল কেমন করে? সব কিছু কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল আমার। যাই হোক, চিৎকার করে উঠলাম, 'এ বাড়িতে ঢুকতে পাব না কেন?' কাকা বলল, ঢুকবার অধিকার নেই, তাই।' অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। তারপর ভীত স্বরে বললাম, 'কেন?' কাকা বলল, 'বোম্বাই ফিরে যাও। সেখানে তোমার নামে উকিলের চিঠি দিয়েছি। সেটা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।' আমার পায়ের তলায় যেন মাটির আশ্রয় নেই, দেহে কিংবা মনে কোন চেতনা নেই। অনুভূতিশূন্য জড়ের মত আমি বোম্বাই ফিরে এলাম।' এই পর্যন্ত বলে মগনলালজী থামলেন। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। তিনি চুপ করেই রইলেন।

আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'বোম্বাই এসে উকিলের চিঠিটা পেয়েছিলেন তো?'

মগনলালজী চকিত হয়ে উঠলেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'পেয়েছিলাম।'

'কী ছিল তাতে?'

'ছিল আমার সর্বনাশের খবর। উকিল মারফত কাকা জানিয়েছে—বাবার বাড়ি-জমি-সম্পত্তি আর জাভেরি বাজারের জহরতের দোকানে আমার কোন অধিকার নেই।'

'কারণ?'

'কারণ, আমি নাকি আমার বাবার বৈধ সন্তান নই। আমার মা আমার বাবার বিবাহিতা স্ত্রী নন। কাজেই বাবার সম্পত্তিতে আমার আইনসঙ্গত কোন দাবী থাকতে

পারে না। আমি যেন এক কাপড়ে সব ছেড়ে চলে যাই। চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। মনে হ'ল, হৃদপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। স্থির করলাম, কাকার সঙ্গে 'কেস্' করব।' বলতে মগনলালজী উত্তেজিত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

চুপচাপ মুখ বুঁজে আমি শুনে যেতে লাগলাম।

মগনলালজী থামেন নি, 'বাবার অর্থের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। 'কেস্' করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, আমি অবৈধ সন্তান নই। সত্যিই আমি অবৈধ সন্তান না। যদি হতাম নিশ্চয়ই কখনও না কখনও কারো না কারো কথায় বা ব্যবহারে টের পেতাম। অবৈধ জীবন হচ্ছে পারার ঘায়ের মত। তার পরিচয় কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যায় না।'

'কেসে কী হ'ল ?' আমি শুধোলাম।

'টাকা দিয়ে অনেক সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করল কাকা। তাদের জোরে মিথ্যাকে সে সত্য করল। ফল হ'ল কী ? মানুষের চোখে আমি নিরর্থক হয়ে গেলাম। সবাই আমাকে ঘৃণা করতে লাগল। জীবনটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হ'ল। পৃথিবীটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। জন্মপরিচয়ের মিথ্যা গ্লানি একটা নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আমার পিছু পিছু ছুটতে লাগল।' বলতে বলতে মগনলালজীর ঘাড় ভেঙে যেন ঝুলে পড়ল।

এ মুহূর্তে আমার যে কী বলা উচিত—ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

মগনলালজী ফিস ফিস করে বলতে লাগলেন, 'এত বড় পৃথিবীতে আমার জন্যে এতটুকু স্থান নেই। আমি হেয়, ঘৃণ্য। জগতের চোখে আমি দূষিত আবর্জনামাত্র। কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। কে আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানবে, এই সব ভেবে ভেবে যখন আমি পাগলের মত হয়ে গেছি সেই সময় ডালিনার কথা মনে পড়ল।'

'ডালিনা কে ?'

'এক পার্শী ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ে। আমরা সহপাঠী ছিলাম। এক সঙ্গে এম-এ পাশ করেছি। আমরা সহপাঠী, ঠিক বললে যথেষ্ট বলা হয় না। আমরা পরস্পরের অনুরাগী ছিলাম। ডালিনাকে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই ভাবতাম। আমার সম্বন্ধে ডালিনার মনোভাবও তাই। আমরা বিয়ে করব, এই বোঝাপড়াটুকু পরস্পরের মধ্যে ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, এই দুঃসময়ে সে পাশে এসে দাঁড়াবে। ডালিনা মডার্ণ শিক্ষিত মেয়ে। তার সঙ্গে কথায়বার্তায় যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে অহেতুক কুসংস্কার তার নেই। আমার ব্যক্তি পরিচয়টাকে নিশ্চয়ই সে মর্যাদা দেবে। কিন্তু—'

'কী ?'

'ডালিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'সম্পত্তির লোভে কাকা তো আমাকে 'অবৈধ সন্তান' প্রমাণ করে দিল। তুমি এসব বিশ্বাস কর ?' ডালিনা বলল, 'তোমার কাকা তোমার বাবার আপন ভাই, নিশ্চয়ই সে সমস্ত খবর রাখে। তোমার জন্মের মধ্যে কোন গলদ না থাকলে তার সাধ্য কি যে কেসে জেতে !' শিউরে উঠলাম। ডালিনা আবার বলল, আমার বাবার ইচ্ছা নয় এরকম অবস্থায় তোমার সঙ্গে আর মেলামেশা করি।' বুঝলাম, ডালিনা তার বাবার দোহাই দিয়ে নিজের মনোভাবটাই ব্যক্ত করছে। আরও বুঝলাম, যত আধুনিকা যত শিক্ষিতাই হোক, জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে সেই পুরনো সংস্কারটা সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই করুণাহীন পৃথিবীতে ডালিনাই ছিল আমার শেষ আশ্রয় শেষ ভরসা। শেষ ভরসা আমার হারিয়ে গেল। একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে গেলাম।'

আমি কিছু বললাম না। একদৃষ্টে মগনলালজী নামে এই প্রৌঢ় যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটির দিকে শুধু তাকিয়ে আছি।

মগনলালজী আবার আরম্ভ করলেন, 'ডালিনার কাছে আঘাত পেয়ে স্থির করলাম, বোম্বাইতে আর থাকব না। যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব। বছর কয়েক ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু শান্তি পেলাম না। যখনই কোন মানুষের সংস্পর্শে গেছি, কোন না কোন ভাবে তারা আমাকে প্রতারণা করেছে। শেষ পর্যন্ত আবার বোম্বাইতে ফিরে এলাম।'

'তারপর ?' অস্ফুট গলায় বললাম।

'তারপর আর কি।' মগনলালজী বললেন, 'বাবা আমার নামে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। তার থেকে হাজার দশেক টাকা মামলা আর নানা জায়গায় ঘোরায় খরচ হয়েছে। বাকি টাকা তুলে বোরিভিলিতে

এসে এই বাড়ি করেছি। যে মানুষেরা সারা জীবন আমাকে প্রতারণা করল তাদের সঙ্গ চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছি। পশুপাখিরাই এখন আমার সঙ্গী, সহচর, বান্ধব। আমার বাড়ির মধ্যে কোন মানুষকে ঢুকতে দিই না।'

মগনলালজী বেতের চেয়ারটা আরো কাছে টেনে বসলেন। শুধোলেন, আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মিটল?

আমি জবাব দেবার আগেই মগনলালজী আবার বলে উঠলেন, 'সবই তো শুনলে, এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও—'

'কী প্রশ্ন?' আমি নড়েচড়ে বসলাম।

'আমার কাকা, ডালিনা—এরা সব মানুষ। এই মানুষদের একজন হয়ে আমার বাড়িতে ঢোকার কোন অধিকার তোমার আছে কী?' মগনলালজীর গলাটা রূঢ়, রুক্ষ, এবং কর্কশ শোনাল।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা ছিল। কিন্তু দেবার অবকাশ পেলাম না।

বৃষ্টিটা মাঝখানে একটু কমে আবার প্রবলবেগে শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই আমার ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন মগনলালজী।

ভারতবর্ষ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

'তুমি এলে সুধা সম মম জীবনে'—
লাবণ্য যে ধরে নাক দেহে ও মনে।
তোমার স্নেহ ভালবাসা—
বাড়িয়ে দিলে আমার আশা
ভরে দিলে বুক যে আমার সোনার স্বপনে।

২

আমার ভুবন রাঙিয়ে দিলে প্রথম তুমি গো—
অনুরাগে নূতন হল আকাশ ভুমি গো।
অতীত এবং ভবিষ্যতে—
এনে দিলে স্মরণ পথে
এনে দিলে প্রথম আষাঢ় কি মৌশুমী গো।

৩

তোমায় নিয়ে কাটলো অধেক শতাব্দী যে হায়।
কত ভাব ও রঙের ঢেউ যে লাগলো তোমার গায়।
তোমার গন্ধ অধিবাসে—
আমার বাঁশীর সাড়া আসে
তোমার দেওয়া দই হলুদের ফোঁটাই শোভা পায়।

৪

তোমার সাথে আছি এবং রইবো মিশে আমি
কালজয়ী এ ভালবাসা—তোমায় প্রণমামি।
আমার এ সুর তোমার সুরে
ঝঙ্কারিবে নিকট দূরে,
মোর শিরে ওই পদ্ম হস্ত—কিরীট চেয়ে দামী।

৫

মনে রেখো, ভুল না গো এ ভিক্ষাটি চাই
যাবার আমার সময় হল—অধিক দেরী নাই।
নব জলধরের সনে,
আসবো তব এ অঙ্গনে
জাগছে মনে নীলোৎপলের পূজার আকাঙ্ক্ষাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের "ভারতবর্ষ"-র প্রথম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলালের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল তাই উদ্ধৃত করা হল এই সংখ্যাতেও।

—সম্পাদক

জীবনকথা

প্রসাদদাস গোস্বামী

দ্বিজেন্দ্রলাল, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশধরগণের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সপ্তপুত্রের মধ্যে সকলের ছোট। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। নাম মালতী। মালতীকে দ্বিজেন্দ্র বড়ই স্নেহ করিতেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ কৃষ্ণনগরে বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সিদ্ধশ্রোত্রীয়। দ্বিজেন্দ্রের পিতা একজন শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রিয়, উদারচিত্ত, সুহৃদরঞ্জন, এবং সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তক, তাঁহার আত্মজীবনকাহিনী ও ক্ষিতীশ-বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। ৺দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে। উক্ত মিত্রজ মহাশয়, মহাত্মা ৺রামতনু লাহিড়ী, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহার পরম সুহৃদ ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল পিতৃগুণ সমূহের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল পিতার গুণগ্রাম পাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। পিতৃগুণ সমূহের চরমোৎকর্ষ ত তাঁহাতে পরিস্ফুট ছিলই, অধিকন্তু তাঁহার বিশ্ব-বিমোহিনী প্রতিভা ও আশ্চর্য্য মেধা আজি তাঁহাকে এই উচ্চ পদবীতে উন্নীত করিয়াছে। আমরা আপাততঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়
ও কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার গুণ-সমূহের ও শক্তির পরিচয় দিব। বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্র অতিশয় রুগ্ন ছিলেন। কৃষ্ণনগরের Anglo Vernacular School হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমশঃ গৌরবের সহিত এফ-এ, বি-এ এবং ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজীতে অনার্সে প্রথম বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাপরা জেলায় রেভেলগঞ্জে প্রথম শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল, এবং তাঁহার এক ভ্রাতা তথায় কর্ম্ম করিতেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে তথায় গিয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। দুই এক মাসের মধ্যেই সরকার বাহাদুর হইতে এই মর্ম্মে পত্র পান যে, যিনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাইতে অনিচ্ছুক, অতএব দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বৃত্তি লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না? দ্বিজেন্দ্র পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি অনুমতি দেন। তখন সরকারি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ইংলণ্ডে গিয়া সিসেষ্টার কালেজ হইতে কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া F. R. A. S. উপাধি লাভ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে কলিকাতার স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরম রূপবতী জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের দাম্পত্য-জীবন বড়ই সুখের হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের চক্ষে "এত সুখ সইল না।"

বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইং ১৮৮৬ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে সরকারি চাকরি পাইয়া তাঁহাকে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে সার্ভে ও সেট্‌লমেণ্টের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য যাইতে হয়। তৎপরে ১৮৮৭ সালের ২১এ সেপ্টেম্বরে মজঃফরপুরে বদলি হন। তৎকালে তিনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত থাকায়, ১৮৮৭ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে বিনাবেতনে ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই সময় দ্বিজেন্দ্র মুঙ্গেরে তাঁহার দাদাশ্বশুর (সুরবালার মাতামহ) স্বনামখ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর নিকট চিকিৎসার্থ বাস করেন। রোগমুক্ত হইয়া ১৮৮৮ সালের ১লা জানুয়ারি পুনর্ব্বার কার্য্যে ফিরিয়া যান, এবং বনেলী ও শ্রীনগর ষ্টেটের সহকারী সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হইয়া মুঙ্গের ফোর্টের ৫নং বাঙ্গলায় বাস করেন। তৎপরে সুজামুটার সেট্‌লমেণ্ট কার্য্যে মেদিনীপুরে বদলি হন। ১৮৯৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দিনাজপুর যাইতে হয়। ১৮৯৪ সালের ১৮ই আগষ্ট তিনি আবকারি বিভাগের প্রথম ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৬ সালের ১৭ই মার্চ্চ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এবং কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০ সালের ১৩ই অক্টোবর আবকারি বিভাগের কমিশনারের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসর ১৩ই নভেম্বর পুনর্ব্বার আবকারি ইনস্পেক্টরের পদে ফিরিয়া আসেন। এই সময় অর্থাৎ ১৩১০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (২৯এ নভেম্বর ১৯০৩) তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি কার্য্যে বিদেশে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এই

দারুণ শোকে অধীর হইয়া কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার (মণ্টু) ও একমাত্র কন্যা মায়াদেবী নিতান্ত শিশু; সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের ৭ই নভেম্বর পুনর্ব্বার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া খুলনায় বদলি হন, এবং পরে অল্পদিনের মধ্যেই বহরমপুরে এবং গয়ায় বদলি হইয়া কিছুদিন তথায় কার্য্য করিবার পর ১৯০৮ সালের ২৮এ জানুয়ারি ১৫ মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতায় "সুরধাম" নামক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করেন। পরে ১৯০৯ সালের ২৮এ এপ্রিল ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হন। তথা হইতে ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁকুড়ায় বদলি হইয়া ৩ মাসকাল সেখানে থাকার পর মুঙ্গেরে বদলি হইবার সময় কলিকাতায় আসিয়া অসুস্থ হন এবং মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কালভার্টের চিকিৎসাধীন থাকেন। এক বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াও স্বকার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য না হওয়ায়, ১৯১৩ সালের ২২এ মার্চ্চ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর দুই মাসও অতিবাহিত হয় নাই। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) শনিবার অপরাহ্ন বেলা ৫টার কিছু পূর্ব্বেই সাংঘাতিক সংন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া সুরধামে জ্ঞানশূন্য হন। রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। আর ফিরিবেন না।

শৈশবে, অর্থাৎ যখন দ্বিজেন্দ্রের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর মাত্র, কৃষ্ণনগর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় তিনি আর্য্যগাথা প্রথমভাগ লেখেন। ইহা কয়েকটি গানের সমষ্টি মাত্র। তাহার পর, সম্ভবতঃ অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকায় আর কিছু লিখিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে বাস কালে ইংরেজিতে Lyrics of Ind. নামক একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। Edwin Arnold সাহেব এখানির বিস্তর প্রশংসা করেন, এমন কি, তিনি বলেন যে, যদি ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিত, তাহা হইলে, ইহা যে ইংরেজের লেখা নয়, তাহা বুঝা যাইত না। ইংলণ্ডে ইনি ইংরেজি সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে সমাজে গৃহীত না হইতে পারায়, অভিমানভরে তীব্র ভাষায় 'একঘরে' নামক পুস্তক লেখেন। ইহার সমস্ত উক্তি সত্য হইলেও ভাষার তীব্রতা দোষে স্বজনবর্গ কিছু বিরক্ত হন। তৎপরে ক্রমে কবির হাস্য রসের পরিচয় পাওয়া যায়। "আর্য্যগাথা" (২য় ভাগ) প্রকাশিত হওয়ার পর, হাস্য-রসাত্মক নাটক "বিরহ" প্রকাশিত এবং ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরে "কল্কি অবতার", "প্রায়শ্চিত্ত" ("বহুত আচ্ছা" নামে ক্লাসিকে অভিনীত), "ত্র্যহস্পর্শ", "পাষাণী", "তারাবাই" ও "সীতা" নাটক, এবং "আষাঢ়ে", নামক হাস্যরসের কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ অব্দে "Crops of Bengal" নামক কৃষিবিদ্যা বিষয়ক ইংরেজি পুস্তক প্রকাশিত হয়। কবি প্রণীত "প্রতাপসিংহ" নামক নাটকই নাট্য-জগতে তাঁহার যশোরাশি বিস্তার করে। ষ্টার ও মিনার্ভা, উভয় রঙ্গমঞ্চেই উহা বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হইয়াছে, পরে ক্রমান্বয়ে "দুর্গাদাস", "নুরজাহান", "মেবার পতন", "সোরাব রোস্তাম", "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", "পুনর্জ্জন্ম", "পরপারে" ও 'আনন্দ বিদায়' নাটক; "মন্দ্র", "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" খণ্ডকাব্য এবং "Lessons in English" শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। অপ্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে 'ভীষ্ম' মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, আরও কয়েকখানি লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন, বিস্তর প্রবন্ধ মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাবে "চিন্তা ও কল্পনা" নামে মুদ্রিত হইতেছিল। কবিরচিত 'আমার দেশ', 'আমার ভাষা', সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে 'শোক-গীতি' প্রভৃতি কয়েকটি গান অমূল্য। উল্লিখিত গ্রন্থ ও গীতাবলী, কবিকীর্ত্তি ভারতে চিরকাল অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তিনটি অতি শৈশবেই প্রাণত্যাগ করে। এক্ষণে দুইটি মাত্র রাখিয়া তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ দিলীপকুমার

রায় মণ্টু, ১৮৯৭ সালের ২২এ জানুয়ারি অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় জন্মগ্রহণ করে। এ বৎসর মণ্টু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকালের শেষ কথা—"মণ্টু"; তাহার পর আর তিনি কোন কথা কহেন নাই। কনিষ্ঠা কন্যা মায়া ১৮৯৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতে জন্মগ্রহণ করে। মায়া তাহার মাতার ন্যায় সুন্দরী, এবং অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি। জগদীশ্বর কবির হৃদয়ের ধন এই দুইটি রত্নকে দীর্ঘজীবী করুন। বাছারা অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছিল, কিন্তু স্নেহশীল পিতা তাহাদের পিতামাতা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভগবান সেই পিতাকে হরণ করিয়া তাহাদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়াছেন। তাহাদের মুখ দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়।

আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসে

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম তোমার মহামনীষার অন্তরতলে সে একদিন,
বঙ্গবাণীর কুঞ্জবিতানে শিহরণ তোলে মলয়ানিল;
দূর ছায়াপথে তারকার দীপ বাজাইল যেন আলোক-বীণ
অনাগত কোন দিনেকের লাগি' পুলকে আকুল গাহে
নিখিল।

বঙ্গ-ভারতী-অঙ্গন-তলে তুমি দেখা দিলে নবজাতক,
পূর্ব্ব-অচলে তরুণ তপন ললাটে আঁকিল শুভ আশিস্;
কান্ত, উজল দরশনে তব তৃষ্ণা মিটাল দূর চাতক,
আকাশে বাতাসে মহাসঙ্গীতে ভরিল ধরণী এ দশ দিশ্।

বৃন্দাবনের শ্যামল কিশোর সুর ভরেছিল বাঁশিতে তার,
উজান বহিল যমুনার জল ছুটিল যতেক গোপিনী বধূ;
তুমি দিলে ডাক, রোধিবে সে হেন হৃদয়মাঝারে সাধ্য কার,
কত যে মনীষা, প্রতিভা ছুটিল তোমার প্রসাদ পাইতে মধু।

কালের প্রবাহে কাটিল তোমার শৈশব আর বাল্যকাল,
আসিল নবীন যৌবন-দশা অপরূপ রূপ মহিমময়,
তুষার-মৌলি হিমালয় যেন অটলোন্নত দীপ্তভাল,
বঙ্গ-মনীষা মহা-পরিসরে ঘোষিল তোমার মহাবিজয়।

সংস্কৃতির গৌরবে ভরা ধন্য এ ভূমি মহাভারত,
প্রচার করিলে নব মহিমায় বিস্মৃত সেই পুণ্য কথা;
বাংলা জাগিল ত্যাগে ও প্রেমে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে জাগে ভারত
ধুয়ে মুছে গেল তোমার আলোকে বিগত দিনের সে
আবিলতা।

প্রতিষ্ঠিত আজিকে তুমি যে, যশের দীপ্তি তোমারে ঘিরে,
অর্দ্ধ-শতেক-বর্ষ-জীবনে স্বর্ণ-জয়ন্তী এল যে আজ,
আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসে তোমার-জন্ম-দিবসটিরে
নন্দিত করি প্রাণের হর্ষে 'ভারতবর্ষ' রাখিয়া কাজ।

বিপুল পৃথিবী, অনন্ত কাল, তারি মাঝে হও মৃত্যুঞ্জয়ী,
বঙ্গবাণীর পূত আশ্রমে আনিতেছে যারা কামনারতি;
দলিয়া তাদের জাগ্রত করো, জাগ্রত করো শক্তি ত্রয়ী—
'শান্ত-শিবম্-সুন্দরম্'-এর—মিনতির সাথে জানাই নতি।

মনসামঙ্গল

অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে ভাব প্রেরণার দিক দিয়া কোনটি অগ্রবর্তী তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য হইলেও সাহিত্যিক আবির্ভাবের দিক দিয়া মনসামঙ্গলই প্রাচীনতর। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ উভয়ের আমরা যে বর্ণনা পাই, তাহাতে উভয়ই যে সুপ্রতিষ্ঠিত, বহুজনসেবিত, আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ও ভোগোপচার-বহুল পূজাবিধিরূপে চৈতন্যপূর্ব সমাজে বর্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হই। হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ যাহাই হউক, এই দুইটি উপধর্ম যে লৌকিক উৎসবরূপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। চৈতন্যদেবের পুরাণানুসারী, আদর্শবিশুদ্ধি ও ভাবৈশ্বর্যে মহনীয় প্রেমধর্মের-প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যে ইহারা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহাদের দেশব্যাপী প্রভাবের নিদর্শন। ইহারা যে ছোটখাট কয়েকটি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীসীমিত, অনার্য ও অশিক্ষিত জনসংঘের সরল কল্পনা-উদ্ভূত, আদিম স্তরের অনুষ্ঠানমাত্র ছিল না; পরন্তু পৌরাণিক ভক্তি-আবেগ ও রূপারোপ পদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা সুনিশ্চিত। হয়ত চৈতন্যধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে শক্তিপূজার বিশুদ্ধতর ভাবদীক্ষা প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ না করিলে মনসা ও অনার্য চিন্তাপ্রসূতা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধান দেবতারূপে পূজিতা হইতে থাকিতেন।

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিম রূপটি কোথায়ও অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয় নাই। আমরা পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্রতর ব্রতকথানুরূপ কাহিনী হইতে বাংলা কাব্যের আদিমরূপটি কল্পনা করিতে পারি। বাংলা দেশের কবিদের হাতে লখীন্দর-বেহুলার কেন্দ্র-কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর বিবাহ ও সংসার জীবন, মনসার জন্ম ও পার্বতীর সঙ্গে তাহার বিরোধ, তাহার নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-পরিত্যক্ত জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও পূজা-লোলুপতা এবং নরখণ্ডে চাঁদের সহিত তাহার সুদীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও ভাগ্য বিপর্যয়, লখাই-এর সহিত বেহুলার বিবাহ ও বাসরঘরে সর্পদংশনে তাহার প্রাণত্যাগ, বেহুলার অসাধারণ মনোবল ও একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে তাহার মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবন—এই সমস্ত বিষয়ের অতিপল্লবিত ও সময় সময় বাস্তব রসপূর্ণ বর্ণনা সংযুক্ত হইয়া কাব্যগুলি একটি বিরাট পুরাণের আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সমস্ত মনসামঙ্গলেই এই আখ্যান-বস্তুর অভিন্নতা লক্ষিত হয়। এইরূপ ঘটনা-কাঠামোর সর্বস্বীকৃত গ্রহণ নিশ্চয়ই দুই তিন শতাব্দীর অনুশীলন ও প্রচারের ফল। এই হিসাবে দেখা যাইবে যে মনসামঙ্গলের বীজ তুর্কী আক্রমণের পূর্ব হইতেই জাতীয় চেতনায় উপ্ত ছিল। তুর্কী বিজয়ের যদি কোন প্রভাব ইহার মধ্যে থাকে, তবে ইহা এই পূর্বাগত সমীকরণ প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কানা হরিদত্ত জনশ্রুতিতে মনসামঙ্গলের আদিকবি রূপে প্রখ্যাপিত। ইহার সম্বন্ধে ইহার অব্যবহিত পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্ত যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য সূচক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত অতীত প্রশস্তি রীতির একটি বিরল ব্যতিক্রম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য অবশ্য বিজয়-গুপ্তের এই অশিষ্ট উক্তিকে বিদ্বেষপ্রসূত ও তথ্যতঃ অযথার্থ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হরিদত্তের যে কয়েকটি রচনাংশ উদ্ধৃতির উপর তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংখ্যা ও পরিমাণে এত অল্প যে উহাদের সহায়তায় হরিদত্তের প্রশংসা বা অপ্রশংসা কোনটাই চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায় না। নিন্দা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা গৌণ; কিন্তু

যাহা মুখ্যতঃ আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে তাহা হইল বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই স্পষ্টভাষণের অসংকুচিত প্রয়োগ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আদিকবির সশ্রদ্ধ উল্লেখের সহিত তুলনায় হরিদত্তের প্রতি এই কটূভাষণ আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ায়।

লক্ষ্য করিতে হইবে হরিদত্তের এই নিন্দা শুধু মাত্র কবিত্বশক্তি ও আখ্যান-গ্রন্থন নৈপুণ্যের অভাবের জন্য নহে, সমস্ত উপস্থাপনারীতি, ছন্দোপতন ও গীতের দিকে আপেক্ষিক অমনোযোগও এই নিন্দার কারণ। অনর্থক লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গীর বাহুল্য সমস্ত অভিনয়টিকে রুচিহীন করিয়া তোলে—ইহাও অভিযোগের অন্যতম হেতু। হরিদত্তের গীত যদি কালে লুপ্ত হইয়া থাকে তবে এই অবলুপ্তির জন্য অন্ততঃ একশত বৎসর লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

হরিদত্তের রচনার প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিলে ইহাতে মঙ্গলকাব্য রচনা ও পরিবেশনের একটি নূতন রীতি পরিবর্তনই সূচিত হইতেছে এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ঠেকে। মনে হয় হরিদত্ত মঙ্গলকাব্যের যে আদিম রূপ—ইহার ব্রতকথা ও পাঁচালীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকার ও শিথিল অবয়ব-বিন্যাস—তাহারই প্রবর্তক ছিলেন। ইহার কাব্যমূল্য, বর্ণনাপদ্ধতি ও গীতরূপায়ণ খুব নিকৃষ্ট স্তরেরই ছিল ও নানাবিধ স্থূল অঙ্গভঙ্গী ও বৈচিত্র্যহীন সুরপ্রয়োগে আবৃত্তির দ্বারা প্রকৃত জনসাধারণের কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিত। পরবর্তী যুগের নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয়-সন্নিবেশ ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে এক উন্নততর আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহাকে উচ্চ শ্রেণীর কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্যই মনে হয় হরিদত্তের সঙ্গে তাঁহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী।

নারায়ণদেবের উদ্ভবকাল ও বাসস্থান সম্বন্ধে যে তুমুল বাদানুবাদের অবতারণা হইয়াছে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কাব্যের রস-আস্বাদনের জন্য তাহার সম্যক আলোচনা অপরিহার্য নহে। তাঁহাকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িতে হইবে না। তিনি এবং তাঁহার প্রায় সমকালীন কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র-পরিকল্পনা, নানা আখ্যান ও পুরাণ-কাহিনীর সমাবেশ, উহার সমাজচিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্ম ভাবনা ও জীবনদর্শন—এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও ইহার বহুশতাব্দীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেন। ইঁহারা ইঁহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে কতটুকু পাইয়াছিলেন ও নিজেরা কি নূতন সংযোজনা করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যাইবে না। তবে তাঁহারা যে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের নবরূপের স্রষ্টা তাহা নিশ্চিত।

বিজয়গুপ্তের আত্মপরিচয়ে সুলতান হুসেন সাহার নামোল্লেখ থাকায় তাঁহার রচনাকাল নির্দেশক ইঙ্গিতের যথাযথ ব্যাখ্যাকে ১৪৯৪ খ্রীঃ অঃর সহিত যথার্থবাচক ধরা সুসঙ্গত। নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তকে করুণরস বর্ণনায় ও পুরাণ-মহিমা প্রতিফলনে ও দ্বিতীয়কে বাস্তব চিত্রাঙ্কন এবং সময় সময় স্থূল ও অমার্জিত পরিহাস-রসিকতায় শ্রেষ্ঠপদবাচ্য করা যায়। নারায়ণদেব ভাবপ্রবণ ও আদর্শনিষ্ঠ; পক্ষান্তরে বিজয়গুপ্ত সূক্ষ্মতর শিল্পবোধসমন্বিত ও সমাজসচেতন। বিজয়গুপ্ত চাঁদ সদাগরকে মনসার নিকট নতি স্বীকার করাইয়া তাঁহার চরিত্র মহিমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আধুনিক আদর্শ-অনুযায়ী চাঁদের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব-গৌরব লইয়া যতটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, মধ্যযুগের ভক্তিসর্বস্ব দেববাদনির্ভর কবিগোষ্ঠী চাঁদের স্বাধীন চিন্তায় সেরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বরং যে মানুষ দেবতার সহিত অসম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইত তাহাকে হঠকারী গোঁয়ার-গোবিন্দ রূপেই তাঁহারা দেখিতেন। সেইজন্যই মনসার সহিত বিবাদে চাঁদকে তাঁহারা নানা বিসদৃশ দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন ও মোটের উপর তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়াই দেখাইয়াছেন। সেইজন্য বিজয়গুপ্ত চাঁদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। সে যুগে পারিবারিক মমতা ও দেবভক্তি ব্যক্তিচরিত্রে দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ অপেক্ষা শ্লাঘ্যতর গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্য আমরা চাঁদের যে আচরণকে অধঃপতনের চিহ্নরূপে গ্রহণ করি, তৎকালীন কবিগোষ্ঠীর

রঙ্গে তাহাই তাহার সুস্থ জীবনবোধের নিদর্শনরূপে গণ্য হইত।

দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের বিবর্তনের মধ্যস্তরের কবি বলিয়া অনুমিত হইতে পারেন। তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহার বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব। চাঁদ গোড়াতে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবতার প্রতি সমদর্শী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি এই পারিবারিক কলহে জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য হন। অবশেষে শিবের মধ্যবর্তিতায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। সুতরাং ইহার পরিকল্পনা কতকটা মনসামঙ্গলের মূলধারা বহির্ভূত। মনসার লৌকিক সংস্কারাচ্ছন্ন মহিমা প্রচারের গ্রন্থে বংশীদাস এমন একটি গভীর আন্তরিকতা ও উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রবর্তন করিয়াছেন—যাহার ফলে এই মনসামঙ্গল গাথাটি ময়মনসিংহের জনজীবনের আনন্দ-উৎসব ও স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মনসামঙ্গলের পরিণতিস্তরের নিদর্শন কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল। তাঁহার আত্মপরিচয়ে বারা খাঁ, বিষ্ণু দাস, ভারামল্ল প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার কবিত্বশক্তি যেমন উচ্চাঙ্গের, তাঁহার ভাষাও সেই পরিমাণে মর্যাদাময় ও গ্রাম্যতাদোষযুক্ত।

এই কাব্যের অন্তিম স্তরে আমরা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পাই। ইহার রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডঃ আশুতোষ দাস ও পণ্ডিত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এই দুইজনের যুগ্ম-সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। জগজ্জীবনের আখ্যান-গ্রন্থন ও কবিত্ব উভয়ই প্রশংসনীয়। মনে হয় যে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী ও দেবতত্ত্বের সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে ইহার অন্তিম পর্যায়ের কবিগোষ্ঠী ইহার ঘটনাবিন্যাস ও জীবন রূপায়নে একটি সহজ সুসঙ্গতি অর্জন করিয়াছিলেন। কাহিনীর উদ্ভটত্ব তখন অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, দেবরোষ-পীড়িত মানুষের হৃদয়গতির ছন্দ অনেকটা সহজ ও অতিরঞ্জনমুক্ত হইয়াছে। বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের মিলন প্রায় সম্ভাব্য সীমায় পৌঁছিয়াছে ও কবিদের কাব্যরচনা একটি সুনির্দিষ্ট প্রথার অনুসরণে গতির স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জগজ্জীবনের কাব্যে এইরূপ সুষ্ঠু ও সুবলয়িত পরিণতির নিদর্শন দেখা যায়। চাঁদের দৃঢ়-সংকল্পও শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিবের আজ্ঞা লইয়াও বেহুলার স্নেহপূর্ণ আবদার পূর্ণ করিতে বামহস্তে মনসার পূজা করিয়াছে ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতির পরিবর্তে তাহার প্রতি বদ্ধাঞ্জলি নমস্কার নিবেদন করিয়াছে। জগজ্জীবনের পরিকল্পনায় একমাত্র ত্রুটি হইতেছে লখীন্দরকে কামুকরূপে অঙ্কন ও মাতুলানীর সহিত তাহার গর্হিত ইন্দ্রিয়সম্পর্ক বর্ণনা। মনে হয় যে লখীন্দরের পিতা-মাতা তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তাহার বিবাহ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই সিদ্ধান্ত-পরিবর্তনের কারণরূপে লখীন্দরের চরিত্রে উৎকট কামায়ন-প্রবৃত্তি ও বিবাহ-লোলুপতা দেখান হইয়াছে।

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবির মধ্যে ষষ্ঠীবর দত্ত (যাঁহার উপর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'সেন' উপাধিতে ভ্রমবশতঃ ন্যস্ত করিয়াছিলেন), জীবন মৈত্র (১৭৪৪ খ্রীঃ অঃ), বিষ্ণুপাল প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইঁহারা মনসামঙ্গলের অবসান যুগের কবি।

সর্বশেষে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যধারার পাঠের ফলে বাঙালীর জীবনচেতনায় কিরূপ চূড়ান্ত ফলশ্রুতির উপলব্ধি ঘটিয়াছিল? অবশ্য সর্পভীতি নিবারণে ইহার অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস বাঙালী সমাজজীবনের একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইতে সহায়তা করিয়াছে। প্রাকৃত জনসাধারণের নিকট ইহাই মনসামঙ্গলের চরম আবেদন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মচেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহার একটা উচ্চতর আবেদনও ছিল। মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্কের মধ্যে যে একটা অনিশ্চিত, শঙ্কাসঙ্কুল সীমান্ত-প্রদেশ ছিল, মনসা সেই রাজ্যেরই অধিবাসিনী। তাহার প্রতি আমাদের ভয় ভক্তিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় নাই। ন্যায়নীতিশাসিত শাশ্বত ধর্মপ্রত্যয়ের অন্তরাল হইতে আকস্মিক দৈবনিপীড়নের যে মূঢ় বিহ্বলতা আমাদের জীবনে মরীচিকার বিভ্রান্তি আঁকিয়া যায়, সর্পদেবীর তির্যক গতি, সাংঘাতিক ছোবল ও দ্রুত

অন্তর্ধান তাহারই রূপক। বাঙালী মনসাপূজার ছদ্মবেশ-ধারিণী এই রহস্যময়ী, ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বস্থিতা নিয়তিরই রোগোপশমের চেষ্টা করিয়াছে। সাধারণতঃ ধর্মসাধনায় একটি সুনিশ্চিত প্রাপ্তির প্রসন্নতা জাগে। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, পুরাণের ভক্তিবিভোর আত্মনিবেদন, রামকৃষ্ণ প্রেমলীলার বেদনাময় আকৃতির মধ্যে অন্তর্লীন সূক্ষ্ম আনন্দ-প্রত্যয়, হারানোর মধ্যে পাওয়ার পরম আশ্বাস, শাক্ত পদাবলীতে সমস্ত খেদ-বঞ্চনার মধ্যে মাতৃকরুণানির্ভর অভয়বোধ—এ সমস্তই ধর্মের চিত্তপ্রশান্তি বিধানশক্তির নিদর্শন। মনসামঙ্গলের কবিগোষ্ঠী এরূপ কোন নিটোল তৃপ্তি দিতে পারেন নাই; এমন কি কামনাপূরণের নিম্নতর নিশ্চিন্ততাও এখানে অনুপস্থিত। মনসার পূজায় বড় জোর বিপদ এড়ানো যায়; নিশ্ছিদ্র ও ক্রম-বর্ধমান সম্পদও ইহার ফলরূপে প্রতিশ্রুত হয় নাই। এমন কি রূপকথার অবাস্তব সুখভোগও ইহার অনায়ত্ত। সমস্ত বিপদোত্তীর্ণ নায়ক-নায়িকা যে বাকী জীবনটা অবিমিশ্র সুখ-স্বস্তিতে কাটাইবে সেরূপ আশ্বাসও এখানে অনুপস্থিত।

সমগ্র মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিয়া দৈবাহত মানব-জীবনের প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে। দেবরোষের অতর্কিত আবির্ভাব, উহার অতন্দ্র, ক্ষণে ক্ষণে নব নব পীড়নাস্ত্ররূপে দৃশ্যমান প্রতিহিংসা-পদ্ধতি, জালবদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য ব্যর্থ আকৃতি, সর্বনাশের অতল গহ্বরমুখে দাঁড়াইয়া তাহার ক্ষণিক, অস্বস্তিকণ্টকিত আনন্দচয়ন, শেষপর্যন্ত এক অজ্ঞাত ভাগ্যের প্রসাদ ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নানা বিভীষিকাময় নিরুদ্দেশযাত্রা, সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায়ের আহ্বান—এই সমস্ত মিলিয়া মানবজীবনকে এক করুণ, অসহায় দৈবক্রীড়নক রূপেই প্রতিপন্ন করে। চাঁদের নিষ্ফল পুরুষকার, সনকার পুনঃ পুনঃ শোকদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের অসহ্য বেদনা, লখীন্দর-বেহুলার অতৃপ্ত জীবনাকৃতি, ও বেহুলার অনির্দেশ্য অদৃষ্টনির্ভর নৌকাযাত্রা মানবজীবনের যথার্থ প্রতিরূপ। ক্রূরকুটিল দৈবশাসন নিয়ন্ত্রিত জীবনে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্যের জন্য উদ্ভট ও বীভৎস রস সহজেই পুঞ্জীভূত হয়। দেবলীলার বিসদৃশ অভিনয়ের পটভূমিকায় নারীদের পতিনিন্দা ও মাছমারা গোদার পারিবারিক আবেষ্টনের বীভৎসতা চাঁদের হাস্যকর দুরবস্থা, সনকার অতিশয়িত শোকোচ্ছ্বাস ও লখীন্দরের কামোন্মত্ততা যেন জীবনের স্বভাবছন্দরূপে প্রতিভাত হয়। কর্কটদংশনে নলরাজার শারীরিক বিরূপতার মহাভারতোক্ত কাহিনীর ন্যায় এখানে দৈবদষ্ট মানবজীবনও তেমনি সহজ সুষমা ও সঙ্গতি হারাইয়াছে। এই আকস্মিকতার সর্পদংশনক্লিষ্ট, পরিণামরমণীয়তাহীন, বিষনীল জীবনযাত্রা মনসামঙ্গলের দেবারতিদীপ্ত মন্দিরাঙ্গনের আলোকোৎসবকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। দেবতা-মানবের যে মিলন-বাসর ভক্তি-প্রীতি-চরিতার্থতার ঘন প্রলেপে এক নীরন্ধ্র দেউল নির্মাণ করে তাহারই মধ্যে সংশয়ের একটি অলক্ষিত ছিদ্র দিয়া মনসাপ্রেরিত কালনাগিনীর ন্যায় একটি প্রতিকারহীন অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। মনসা-মঙ্গলের সমস্ত জোড়াতালা-দেওয়া সমাধান প্রয়াসের মধ্যে এই দুশ্চিকিৎস্য অসঙ্গতিই আমাদিগকে জীবনের অনির্ণেয় রহস্যময়তার প্রতি সচেতন করিয়া তোলে।
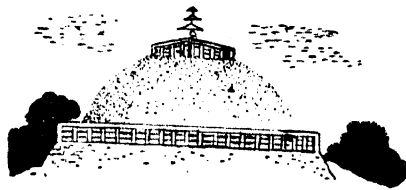
খুব কাছে না গেলে অবিনাশবাবুর নজরে আসে না। বাঁ চোখটা কদিন ধরে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। চশমার কাঁচটা পালটাতে হবে। তার আগে চোখটা একবার দেখানো দরকার। ছেলেকে চিঠি লিখেছেন। এখনও উত্তর আসে নি। ছেলে রেলে চাকরি করে। মাসের অর্ধেক দিনই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। বালাশোর থেকে ব্যাঙ্গালোর। আমেদাবাদ থেকে ধানবাদ। অবিনাশবাবু ঠিক করে রেখেছেন পেন্সেনের টাকাটা পেলে নিজেই

চলে যাবেন ডাক্তারের কাছে। চোখের ব্যাপারে অবহেলা করা ঠিক নয়।

রাস্তা ছেড়ে অবিনাশবাবু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে কাগজের টুকরো বের করে একবার মিলিয়ে নিলেন। না, এটা নয়। এটার নম্বর তেরোর দুই, কিন্তু দরকার পনেরোর এক।

কাগজটা পকেটে রেখে অবিনাশবাবু আরো এগিয়ে গেলেন লাঠিতে ভর দিয়ে। এক সময়ে অটুট স্বাস্থ্য ছিল। একটানা চার মাইল হাঁটতে পারতেন। ডন বৈঠক দিতেন এক নাগাড়ে দু'শো। কিন্তু পেন্সন নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ভেঙে পড়ল। যা খান হজম হয় না। অনেকক্ষণ বসে থেকে উঠতে গেলেই চোখে অন্ধকার দেখেন। তার ওপর এই চোখ। চোখটা কমজোর হওয়াতে মুস্কিলে পড়েছেন বেশী।

এইবার পেয়েছেন। লাল রংয়ের দুতলা বাড়ী। সামনে এক চিলতে জমি। বাগান করার অপপ্রয়াসের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিং বেলটা টিপতে গিয়েই অবিনাশ-বাবু থমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে বুঝি হিসাব করলেন। কত বছর। কত দিন। তা প্রায় বছর ত্রিশ হবে, কিংবা বড় জোর আরো বছর দুয়েক কম। এত বছরে একটা জনপদ বদলে যায়, তো একটা মানুষ।

যদি চিনতে না পারে। কলিং বেলে হাত ঠেকিয়ে অবিনাশবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। চিনতে পারবে নাই বা কেন? মুখ দেখে, চেহারা দেখে যদি চিনতে অসুবিধা হয় তো, নাম বললেই চিনতে পারবে।

চিনতে পারলে কেমন হবে অভ্যর্থনার ধারা। মন শিকড় মেলেছে আরেকটা সংসারে। সেখান থেকে রস আহরণ করে পুষ্ট করেছে নিজের শাখা-প্রশাখা। ফলে ফুলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এখন সীমানার বাইরের কাউকে চেনার চোখ নেই। মনও বোধ হয় নয়।

এইবার এতক্ষণ পরে অবিনাশবাবু কলিং বেল টিপলেন। পর পর দুবার। তারপর সরে নেমে এলেন রাস্তার ওপর। বলা যায় না, কুকুর পোষা আজকাল অনেক বাড়ীর রেওয়াজ হয়েছে। দরজা খুললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ের ওপর। এই বয়সে ছুটে পালাবার শক্তিও নেই। হয়তো কামড়াবে না, কিন্তু আঁচড়ে দিলেও ঝঞ্ঝাট কম নয়। কিসে থেকে কি হয়, কিছু বলা যায় না।

না, কুকুর নয়। কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেল না। দরজা খুলল একটা ভৃত্য।

কাকে চান বাবু?

নামটা বলতে গিয়েই অবিনাশবাবু বিব্রত হলেন। কি মনে করবে চাকরটা। কোন ভদ্রলোক এ নাম ধরে আবার ডাকে নাকি।

কিন্তু উপায় নেই। অন্য কোন নাম অবিনাশবাবুর জানা নেই। একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন। কোথাও কোন সাইনবোর্ড আটকানো আছে কি না। সেখান থেকে অন্তত নামের কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু না, বরাত খারাপ অবিনাশবাবুর। যে নামটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন, যে নাম উচ্চারণে হাজার বাধা, সে নামটাই করতে হ'ল।

বেলা-দিদিমণি আছেন? কথাটা বলেই অবিনাশবাবু শুধরে নিলেন, বেলা মা-ঠাকরুণ আছেন বাড়ীতে?

প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্যটি বিশাল এক হাঁ করে রইল। 'বিস্ময়ের দ্যোতক।'

অবিনাশবাবুর খেয়াল হ'ল। ওটা তো ডাক নাম। ও নামে চাকর বাকরের তো চেনবার কথা নয়। ভাল একটা নাম বেলার ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে ডাক নামের চেয়ে ভাল নাম আর অবিনাশবাবুর মনে পড়ল না।

মা-ঠাকরুণ আছেন? সব দিক বাঁচিয়ে অবিনাশবাবু প্রশ্ন করলেন।

বড় মা-ঠাকরুণ? সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যটি পাল্টা প্রশ্ন করল।

অবিনাশবাবু ঢোঁক গিললেন। বড় ছোটর প্রশ্ন উঠবে এ কথা তো ভাবেন নি। বয়সকালে তো ওঠেই নি। তখন বেলাই ছিল সব। ছোট বড় এই সব বিশেষণের পরিধি পার হয়ে অখণ্ড, অদ্বৈত এক নাম। যে নাম স্মরণে আনন্দ, মন্থনে অমৃত।

ইঞ্জিনিয়ারবাবুর স্ত্রী যিনি। অবিনাশবাবু এতক্ষণ পরে যেন মাটির স্পর্শ পেলেন পায়ের তলায়। অনিশ্চিত তরঙ্গের পারে তটের ইসারা।

আজ্ঞে তিনি তো ছোট মাঠাকরুণ। অবিনাশবাবুর অজ্ঞতায় ভৃত্যটি আর একবার বিস্ময় প্রকাশ করল।

ও, তাই বুঝি। তাকেই আমার একটু দরকার।

কি নাম বলব? কথাটা বলেই ভৃত্যের কি মনে পড়ে গেল। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল; আজ্ঞে, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

দরজা খুলে দিয়ে ভৃত্য সরে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে অবিনাশবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

সাজানো বসবার ঘর। আধুনিক আর বনেদী প্রথায় মেশানো। দেয়ালের কোণে লাঠিটা রেখে অবিনাশবাবু কাণের চেয়ারে বসলেন। ভেতরের দরজার দিকে মুখ করে। যাতে বেলা ঘরে ঢুকলে প্রথমেই তিনি দেখতে পান। কিংবা মনের মধ্যে, অবশ্য অচেতন মনে, এই ইচ্ছা-টুকুই হয়তো ছিল, যে বেলা ঘরে ঢুকলেই যেন তাকে দেখতে পায়। অন্য কিছু দেখার আগে।

কথাটা মনে হতেই অবিনাশবাবু মুচকি হাসলেন। ত্রিশ বছরের বিবর্ণ একটা কামনার ওপর রং বুলিয়ে তাকে উজ্জ্বল করার একি হাস্যকর প্রয়াস। পত্রহীন, পুষ্পহীন, কোরকহীন কয়েকটা শুধু শিকড়ের সমষ্টি, তাকে সঞ্জীবিত করার এ চেষ্টা শুধু নিরর্থকই নয়, প্রায় অসম্ভব।

ভৃত্য তখনও দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। অবিনাশ-বাবুর দিকে চেয়ে বলল, আজ্ঞে নামটা কি বলব, বললেন না?

নাম, অবিনাশবাবু ভাবতে শুরু করলেন। নাম বলতে আর অসুবিধাটা কোথায়। কিন্তু কোন নামটা বলবেন? অবিনাশচন্দ্র বসু, গালভরা এমন একটা নামে কি বেলার মন ভরবে! তার বদলে শুধু যদি বলেন, রাঙাদা, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো বেলা বুঝবে। বুঝবে, প্রহর-শেষের আলোয় রাঙা পরম ক্ষণে পুরানো দিনের মানুষটা ফিরে এল।

অবিনাশবাবু ডাক নামটা আর বললেন না। এ নাম ধরে ডাকার লোক আর বেশী নেই॥ সবাই একে একে বিদায় নিয়েছে। তা ছাড়া, সে রঙের আর কিই বা অবশিষ্ট আছে! সংসারের হাজার ঝামেলায়, শোকে তাপে রাঙা রং ঝলসে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

বল, অবিনাশবাবু এসেছেন, অবিনাশচন্দ্র বসু।

নিজের নামটা এভাবে বলতে ভারি অদ্ভুত লাগল অবিনাশবাবুর! মনে হল এ যেন অন্য কারো নাম, অন্য কারো পরিচয়।

ভৃত্যটি ভেতরে ঢুকে গেল।

মনে মনে অবিনাশবাবু কথাগুলো সাজিয়ে নিলেন। একটার পর একটা। প্রথমেই হয়তো বেলা অনুযোগ করবে এতদিন না আসার জন্য। বিশেষ করে এক শহরে থেকেও। কি করে বোঝাবেন বেলাকে—কাছাকাছি থাকলেই সব সময়ে কাছাকাছি আসা যায় না। মাঝখানের হাজার বাড়ী আর শড়ক হয় তো বাধা হয় না, বাধা হয় নিজের মন। সে মন ডিঙ্গিয়ে কাছে আসা যায় না, মানুষটা খুব চেনা হ'লেও।

তাছাড়া বেলা যে এত কাছে রয়েছে একথা অবিনাশ-বাবু জানতেনই না। জানবার সুযোগই হয় নি।

পর্দাটা নড়ে উঠতেই অবিনাশবাবু ঠিক হয়ে বসলেন। আশ্চর্য ষাট বছরের এত চোট খাওয়া হার্টটা দ্রুতস্পন্দিত হ'ল। ঠিক যেমন বহু বছর আগে বেলাদের বাড়ীতে ঢোকার সময়ে হ'ত।

না, কেউ নয়। চঞ্চল হাওয়ায় পর্দাটা দুলছে। এত তাড়াতাড়ি বেলা আসবেই বা কি করে। সংসারের ভার রয়েছে তার ওপরে। শাশুড়ীর সেবাযত্ন সব কিছুর। আগের মতন তন্বী, চপল মেয়ে কি আর বেলা আছে—যে দুদিকে বেণী দুলিয়ে বইয়ের গোছা বুকে চেপে ছুটে চলে আসবে।

কি অন্যায়ই করেছেন অবিনাশবাবু। পড়ানোর নাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করে গেছেন। কেবল আবোল তাবোল কথা। যুক্তি নেই, অর্থ নেই, একরাশ কথার জুঁই ফুল। কিন্তু তবু উত্তরকালে জীবনে বহু অর্থময় কথার চেয়েও সেদিনের নিরর্থক কথাগুলোর ওপরই যেন আকর্ষণ ছিল বেশী।

সে যুগে মেয়েদের পড়ানোর জন্য অবিবাহিত তরুণ শিক্ষকের চল ছিল না। অবিনাশবাবু বেলার পিতৃবন্ধুর ছেলে, সেই সুযোগেই তার ওপর পড়ানোর ভার পড়েছিল, বিকেলে ঘণ্টা দুয়েক। কিন্তু মাত্র দুঘণ্টা পড়িয়ে উঠে যেতে অবিনাশবাবুর মন চাইত না।. অবিনাশবাবু উঠতে চাইলেও বেলা আপত্তি করেছে। বই গোছাতে

গোছাতে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বলেছে, বেশ, বাবা, বেশ। আমার জন্য কারো সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আমি নিজে নিজেই পড়ব। গতবারের মতন সব সাব্‌জেক্টে ফেল করব, সেও ভাল, তবু কারো খোসামোদ করতে পারব না। উঠতে গিয়েও অবিনাশবাবু হেসে আবার বসে পড়েছিলেন।

কিন্তু এ বছরে পরীক্ষার ফলও গত বছরের মতনই হ'ল। রিপোর্ট কার্ডটা অবিনাশবাবুর সামনে ফেলে দিয়ে বেলা হাসতে হাসতে বলেছিল, সারা বছর বক বক করলে কি আর নম্বর পাওয়া যায়। যাক, এদিকে তো যা হবার হ'ল, অন্যদিকে কি করবে কর। কাল বাগবাজার থেকে দেখতে এসেছিল, আবার সামনের শনিবার আসবে খিদিরপুর থেকে।

সেদিকেও অবিনাশবাবু কিছু করতে পারেন নি। সাহসের অভাবই শুধু নয়, কলেজে পড়া একটা ছোকরার হাতে মেয়ে দিতে কেউ রাজী হবে না, এটাও জানা ছিল। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য কারণ ছিল।

ভৃত্য ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই অবিনাশবাবু সোজা হয়ে বসলেন। কি ব্যাপার। বেলা কই ? বেলা আসে নি ?

ছোট মাঠাকরুণ এসেছেন বাবু। নকিবের মতন চড়া গলায় আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে ভৃত্যটি বলল।

এসেছেন ? কোথায় ? মুখে অবিনাশবাবু কিন্তু বললেন না, কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

আপনার কি বলার আছে বলুন। ছোট মাঠাকরুণ পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

পর্দার ওপারে! অবিনাশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বাঁ চোখটা একটু ঝাপসা, কিন্তু ডান চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পর্দাটা। কৈ পর্দার ধারে কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। সারাক্ষণ বেলা কি পর্দার আড়ালেই থাকবে।

অবিনাশবাবু ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে গেলেন। পর্দার দিকে চেয়ে একটু কেশে বললেন, আমি অবিনাশ, মানে রাঙাদা!

পর্দাটা একটু দুলে উঠল। ব্যস, আর কিছু নয়। অবিনাশবাবু খুব আশা করেছিলেন, ডাকনামটা শুনেই বেলা হয় তো পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসবে। চিনতে পারবে পুরোনো দিনের মানুষটাকে।

আমি শ্যামবাজারের অবিনাশ বসু। তুমি চিনতে পারছ না আমাকে ?

এইবার পর্দাটা খুব জোরে কেঁপে উঠল। পর্দার পাশ থেকে একটি শ্যামা স্থূলাঙ্গী মহিলা বেরিয়ে এল!

ওমা, তুমি ? এত বছর পরে কি মনে করে ?

সম্বোধনের বহর দেখে ভৃত্যটি সরে গেল। ছোট মাঠাকরুণের কোন আত্মীয়ই হবেন! এখানে দাঁড়াবার আর প্রয়োজন নেই।

বস, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বেলা অবিনাশবাবুর কাছাকাছি এগিয়ে এল।

অবিনাশবাবু বসলেন না। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে বেলাকে দেখলেন। মালী যেমন নিজের পোঁতা ছোট চারাগাছের পরিপুষ্ট রূপান্তর দেখে।

তুমি ঠিক আগের মতনই আছ বেলা। থেমে থেমে অবিনাশবাবু বললেন।

মাথা খারাপ তোমার, থুতনিতে আড়াইটা ভাঁজ ফেলে বেলা হাসল, আগে কি এই রকম শরীর ছিল আমার। উঠতে বসতে হাঁপাতাম!

শরীরে এত মেদ হয়তো ছিল না, কিন্তু মুখ চোখ তো এমনিই ছিল। বয়সের পলিমাটি কিছু চাপা দিতে পারে নি, বিকৃত করতে পারে নি কিছু।

ভজু যখন গিয়ে বলল—একবাবু দেখা করতে এসেছে, আমি ভাবলাম কে রে বাবা। আমার সঙ্গে কে আসবে দেখা করতে। তবে মাঝে মাঝে ওঁর লোক-জন আসে, কন্ট্রাক্টরের দল। ছেলে বাড়ীতে না থাকলে আমাকেই কথা বলতে হয়। কই বস, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

বেলা আর একবার মনে করিয়ে দিল।

এই বসি, অবিনাশবাবু চেয়ারে চেপে বসলেন।:বললেন, কিন্তু আমি তো তোমার চাকরকে আমার নামটাও বলেছিলাম।

ও ভূতের কথা আর বল না। আমাকে গিয়ে বললে, অভিলাষবাবু এসেছেন। কথাটা বলেই বেলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হাসিতে, আর তখনই অবিনাশবাবু দেখতে পেলেন—আগের মতন ঠিক নেই বেলা। সেদিনের ঝকঝকে দাঁতের বদলে কাল কাল দাঁত। দোক্তা কিংবা

জর্দার কল্যাণে। কিন্তু হাসলে আগের মতনই চোখের দুটো কোণ কুঁচকে যায়, ঠোঁটটা ধনুকের মতন বঙ্কিম।

তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস—এবার অবিনাশবাবু বললেন।

দেয়ালের দিকে রাখা সোফার ওপর বেলা বসে বলল, কি মতলব বল দেখি তোমার? এত বছর পরে কি মনে করে?

হঠাৎই কথাগুলো অবিনাশবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ভয় পেয়ো না, পুরোনো দিনের মতলব নিয়ে আসি নি।

কথাগুলো বলেই অবিনাশবাবু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বেলার সারা মুখে অপূর্ব রংয়ের খেলা। কুমারীর লজ্জার রং কোথা থেকে আহরণ করল এবাড়ীর প্রৌঢ়া ছোট মাঠাকরুণ!

কি যে বকো পাগলের মতন, ঠিক নেই। আমি কি তাই বলেছি। বেলা সামলে নিল, এই শহরেই আছ তা হলে?

বছর পাচেক আছি। শেষ ছিলাম কোচবিহার কলেজে। সেখান থেকেই রিটায়ার করেছি। তোমার কর্তা কোথায়? একবার আলাপটা করিয়ে দাও। এখন তো আর ভয় নেই। আমি তো নখদন্তহীন এক স্থবির।

থাম, থাম, বেলা মুখ ঝামটা দিল যখন নখদন্ত ছিল, তখনই ভারি বিক্রম দেখিয়েছিলে। মাথা নীচু করে তো পালিয়ে গেলে।

সে শুধু তোমার মাথা উঁচু রাথার জন্য—অবিনাশবাবু হাসলেন।

সেদিনের কথা একটু একটু করে মনে পড়ছে। অবিনাশবাবু ঠিক মাথা নীচু করে পালিয়ে যান নি। সাহস করে বুক ঠুকে বেলার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। চেয়েওছিলেন বেলাকে। কিন্তু সম্ভব হয় নি। যে বাধার উল্লেখ বেলার বাবা করেছিলেন, সেটা পার হবার কোন উপায় অবিনাশবাবু খুঁজে পান নি।

কর্তার সঙ্গে দেখা করাব কি। সে কি থাকে এথানে। কেবলই তো বাইরে বাইরে ঘুরছে—জানলার দিকে মুখ করে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বেলা বলল।

কণ্ট্রাক্টের কাজ তো। দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা করে বেড়াচ্ছে। বাড়ীতে আর কদিন থাকছে।

বেলা খুব আস্তে আস্তে বলল। ক্লান্ত, বিস্বাদ গলায়। যেন ঘুরে ঘুরে সেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

এখন পয়সা তো ইঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্টরদের'ই হাতে। দেশ নতুন করে গড়ে উঠছে। শিল্পের উন্নতি হচ্ছে দিকে দিকে। তার রসদ তো ওঁরাই জোগাচ্ছেন। মনে হল অবিনাশবাবুর কণ্ঠে যেন হতাশার স্পর্শ। লজিকের লেকচারার, রিটায়ার করেছেন তিনশো টাকা মাইনেয়। মানুষ-গড়ার দক্ষিণা দেশ-গড়ার দক্ষিণার চেয়ে অনেক কম।

তারপর, তোমার কথা বল? বৌদির কি খবর? ছেলেমেয়ে কটি? অবিনাশবাবু ম্লান হাসলেন—তোমার বৌদির খবর তো বলতে পারব না।

বলতে পারবে না? কেন?

সে আজ ছ বছর আমাকে ছেড়ে গেছে। গলার স্বর বেদনার্দ্র করতে গিয়েও অবিনাশবাবু পারলেন না। বেলার সামনে নিজের গৃহিণীর জন্য শোকপ্রকাশ করাটা যেন একটু কৃত্রিম মনে হল।

ওঃ—তালুতে জিভ ঠেকিয়ে সমবেদনার শব্দ করল বেলা, তারপর বলল, ছেলেমেয়ে?

ছেলে নেই।

মেয়ে দুটি। একটির বিয়ে দিয়েছি, আর একটি বাকি।

বস, তোমার জন্য চা জলখাবার নিয়ে আসি। বেলা ওঠার চেষ্টা করল।

না, না, অবিনাশবাবু সবেগে হাত নাড়লেন, আমার প্রেসারের ব্যাপার কিনা, খাওয়া-দাওয়ার খুব কড়াকড়ি। তা ছাড়া, চা আমি খাইনা, তা তো জানো।

এমন ভাবে তুমি কথা বলো রাঙাদা, যেন রোজ দুবেলা তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। তুমি কি খাও না খাও—তার হিসাব আমার জানা।

রাঙাদা। এই একটি সম্বোধনে বহু দিনের অদর্শনের ব্যবধান সরে গেল। মাঝখানের দিনগুলো উধাও। সেই পুরোনো দিনের সম্পর্ক বুঝি আবার ফিরে এল। যে দুটো সম্পর্ক, যে দুটো নাম কাছাকাছি এসেও মিলতে পারে নি। ছিটকে পড়েছে দুটো সংসারে।

বেলা প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু আসল কথাটা কি বল তো ?

কি আসল কথা ?

হঠাৎ কি মনে করে এলে ?

কেন কিছু মনে না করে আসতে নেই! তোমার কাছে আমারও কৈফিয়ৎ দিতে হবে? প্রৌঢ়ত্ব যেন অবিনাশবাবুর ছদ্মবেশ। গলার স্বরে তারুণ্যের রেশ।

কি ব্যাপার বলো তো ? বুড়োবয়সে আবার পুরোনো কবিতার খাতাটা টেনে বের করেছ বুঝি। এমন হেঁয়ালী করে কথা বলা কি এ বয়সে মানায়।

অবিনাশবাবু হাসলেন, বয়সটা তো বাইরের পোশাক। হৃদয়ের সঙ্গে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই।

বেলা দু গালে দুটো হাত দিয়ে বসল—আস্তে আস্তে বলল, মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো ?

কি ?

মনে হয়, সেদিন যে বাধাটা বড়ো মনে হয়েছিল, সে বাধা একটা বাধাই নয়। দুজনেই পিছিয়ে গিয়েছিলাম, নয়তো দুঃসাহসিক কিছু করে ফেললে মন্দ হ'ত না।

অবিনাশবাবু হাসলেন, সত্যি কথা, তোমরা ব্রাহ্মণ আমরা কায়স্থ,এ বাধাটা এত হাস্যকর যে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে এই বাধাই আমাদের জীবনে একদিন পর্বতের রূপ নিয়েছিল। আজকাল দেশের সীমানা, সমাজের পরিধি পার হ'য়ে লোকে দেশান্তর থেকে মনের মানুষ সংগ্রহ করছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমে উঠেছিল। বেলা উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। অবিনাশবাবু চমকে উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যে যে কথাগুলো বলা সহজ মনে হয়েছিল, এই আলোর বন্যায় সেই কথাগুলো উচ্চারণ করাই যেন দুরূহ ঠেকল।

এক সময় মনে হয়েছিল তোমাকে না পেলে আমি পাগল হ'য়ে যাব। পুরো পাগল না হ'লেও, অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিলাম। বইয়ের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজেছিলাম। রাশি রাশি বইয়ের প্রাচীর সাজিয়ে তোমাকে না পাওয়ার ক্ষোভের বন্যা আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম। খুব সফল হয়েছিলাম, এমন কথা বলব না।

জানো, বাসর ঘরে আমি সারাটা রাত কেঁদেছিলাম—উদাস গলায় বেলা বলল—অবিনাশবাবুর দিকে সোজা-সুজি চোখ তুলে না চেয়ে।

আশ্চর্য, অবিনাশবাবুর কোলের ওপর মাথা রেখে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। এক নাতি মারা গিয়েছে চোখের সামনে—কিন্তু অবিনাশবাবু এতটা বিচলিত হন নি। কোথায় কবে যেন পড়েছিলেন, প্রথম প্রেমই প্রেম, বাকি সব কিছুটা লালসা, কিছুটা প্রয়োজন। নয়তো এতদিন পরে বেলার কথায় বুকের মধ্যে এমন মোচড় দিয়ে কেন উঠবে।

বড় ভীরু ছিলাম আমরা রাঙাদা। পদে পদে সাবধান হবার ভান করতাম, কে কি ভাববে, কে কি বলবে এই চিন্তাতেই সর্বদা সন্ত্রস্ত।

খুব আস্তে আস্তে বেলা কথাগুলো বলল—চাপা গলায়—যেন নিজের সংসারও শুনতে না পায়।

আজকের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ ভয় কাটিয়ে উঠেছে—চেয়ারে হেলান দিয়ে পিঠটান করে অবিনাশবাবু বললেন। কথাটা যেন সমস্ত তরুণ-তরুণীর তরফ থেকে বললেন, মুখ-চোখের এমনই ভাব।

বেলা কোন কথা বলল না। দুটো হাত কোলের ওপর রেখে চুপচাপ বসে রইল। মনটা এখানে নেই। দুস্তর সময়ের বাধা পার হয়ে অনেক পিছনে চলে গিয়েছে।

সত্যি বেলা, এরা আমাদের মতন ভীরু নয়—তোমার আমার ছেলেমেয়েরা। সেই কথাই আজ তোমাকে বলতে এসেছি।

অবিনাশবাবুর কথায় মন নেই বেলার। কিছু কথা কানে যাচ্ছে, অনেকটা আবার যাচ্ছেও না। তবু শেষ কথাটার খেই ধরে বেলা বলল, ছেলেমেয়েদের কথা কি বলছিলে ?

অবিনাশবাবু হাসলেন—না, মানে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের কথা বলছি। তারা এ বাধা পার হবেই। সমাজের চাকার তলায় হৃদয়কে পিষ্ট হ'তে তারা দেবে না।

আমাদের ছেলেমেয়েরা ? মানে ? এতক্ষণে বেলা কৌতুহলী হয়ে উঠল।

মানে, তোমার দীপু আর আমার রাখী।

এইবার বেলা দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—দীপু, দীপুকে চেন তুমি ?

বারে, চিনি না। প্রায় রোজ বিকালেই তো আমার বাড়ীতে যায়। রাখীর কাছে।

রাখী, রাখী কে?

রাখী আমার ছোট মেয়ে। কাল বিকেলে দুজনে প্রণাম করতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি দীপুকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করতে তোমার খবর বেরিয়ে পড়ল। খুব আনন্দ হ'ল। দীপুর কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা চলে এলাম তোমার কাছে। ভাবলাম, বলে আসি, যা আমরা পারি নি, ভয়ে পিছিয়ে গেছি, তা পেরেছে দীপু আর রাখী। ওরা প্রেমের অসম্মান করে নি।

কি বকছ পাগলের মতন? সব কিছু ভুলে বেলা চীৎকার করে উঠল, মেঘে মেঘে বেলা তো বেশ হয়েছে। এখনও ছেলেমানুষী গেল না। নাকি, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে?

বেলা! স্খলিত, অসহায় কণ্ঠে অবিনাশবাবু উচ্চারণ করলেন। বেলার এ ভাবান্তর তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

থামো, থামো, মরার বয়স হ'ল, বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? আমরা কুলীন, তোমরা কায়স্থ, বিয়ে অমনি বুঝি হলেই হ'ল। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেধরার কাজে লাগিয়েছ, আমার ছেলেকে ভালমানুষ পেয়ে টোপ গেঁথে জোড় বাঁধবার চেষ্টায় আছ, সে সব বুঝি না ভেবেছ? কদিন ধরে কানাঘুষা শুনছি, এক ম্যাট্রিক পাশ বেজাতের কালো মেয়ের ফাঁদে পড়েছে আমার ছেলে। সে যে তোমার কারসাজি, সেটা আজ বুঝতে পারলাম। তাই এসে অবধি বড়ো বড়ো কথা শোনাচ্ছ।

বেলা, ভুল বুঝছ তুমি আমায়—অবিনাশবাবু ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন।

থাক, থাক, সবাই তোমায় ভুল বুঝছে। ধরা পড়ে আর কাঁদুনী গাইতে হবে না। আমার সর্বনাশ করার তালে ছিলে, পারনি। এবার আমার ছেলের সর্বনাশ করার চেষ্টায় আছ। আসুক আজ দীপু বাড়ী, তার যার-তার বাড়ী যাওয়া ঘোচাচ্ছি।

বেলার সারা মুখ আরক্ত। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে—এইভাবে কিছুক্ষণ চললে বেলা হয়তো জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতেই লুটিয়ে পড়বে।

অবিনাশবাবু আর দাঁড়ালেন না। এরপর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। কম্পিত হাতে ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা টেনে নিলেন। এ বয়সের সম্বল।

প্রতিদান

জসীম উদ্‌দীন

তুমি এসেছিলে এতটুকু হাসি, এতটুকু স্নেহধারা
তাই লয়ে ছুটি বনে বনান্তে কস্তুরী-মৃগ-পারা।
তাই লয়ে বাঁশী বেজে ওঠে দূরে, আকাশ পরিধি ঘুরে
দীগন্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া ছড়ায় মাটির পাত্র-পুরে।

আরো যদি দিতে কোথা রাখিতাম? ছোট এই মোর বুক
তারো চেয়ে ছোটো তটিনী মেখলা সসাগরা ধরাটুক।
তারো চেয়ে ছোটো সেই সে বিধাতা এত যদি দিল দান,
কেন সে কৃপণ নাহি দিল তাহা রাখার পাত্রখান।

আজিকে তোমারে বলিতে এসেছি, ও দেহ
বীণার তারে
অনাহত কত বাজিছে রাগিণী সময়ের ঝংকারে।
সেই সুর ঘুরি বহু বহু দেশ পশে সে আমার বুকে
সেথা ঝংকারে আর এক বীণা তোমার রাগিণী টুকে।
তুমি তো জানো না, তাই লয়ে একা ত্রিযামা
যামিনী জেগে,
অতি মিহি করে চাঁদের সুতোয় বুনি শাড়ী
তোমা লেগে।

মাদ্রাজ থেকে পন্দিচেরী

সুরেশচন্দ্র সাহা

মাদ্রাজ থেকে রওনা হওয়া গেল পন্দিচেরীর পথে, মফঃস্বলগামী দূরপাল্লার বাসে। মূল সহর থেকে বাস চলে এলো সহরতলীতে, অতি প্রশস্ত মনোরম রাস্তা বেয়ে; ক্রমে মাম্বালাম্, গিণ্ডি, তাম্বারাম্—এক একটী উপসহর; যেমন কলকাতার কাছে বেলঘরিয়া, সোদপুর, ব্যারাকপুর। এই উপসহরগুলি বৈদ্যুতিক ট্রেনে যুক্ত রাজধানীর এক অতি পরিচ্ছন্ন প্রসারণ—মাদ্রাজ সহরটাই যেন ল[illegible] জাম্প দিতে দিতে গিণ্ডি, তাম্বারামে এসে থেমে গিয়েছে। এই উপসহরগুলির অধুনা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, সৌষ্ঠব বিস্ময়কর। প্রশস্ত রাজপথ, আম, নারিকেলের কুঞ্জঘেরা বিরাট বিরাট অট্টালিকা, বাগান, পার্ক, খ্রীষ্টানুরাগীদের সাধারণ ভজনালয়—আরও কত কি নিত্য নূতন নির্মাণ কার্য—সব মিলে প্রত্যেকেই রাজধানী মাদ্রাজের মত এক একটী স্বয়ং-সম্পূর্ণ সহর, অমর্য্যাদাকর 'উপ' কথাটা আর মনেই আসতে চায় না।

শ্রীঅরবিন্দ

ক্রমে বাস চলে এলো সহর থেকে দূরে। রাস্তার দুপাশে সারিবন্দী তরুশ্রেণী—শিশু আর কড়িগাছের মত, লক্ষকোটী হলুদ ফুলে ভরা। দুপাশেই সবুজ ধানক্ষেত। মাদ্রাজের পশ্চিমে অন্তর্বর্তী অঞ্চলে এগিয়ে চল্‌লে কিন্তু

ত বহুবিস্তীর্ণ উদার ধানক্ষেত, এত সবুজ মাঠ, এত লোকবহুল পল্লী চোখে পড়ে না। কোন কোন অঞ্চলে শস্যপূর্ণ অনতিবৃহৎ ধানগাছগুলির প্রাচুর্য্য আর লক্ষ্মীশ্রী বাংলাকেও যেন হার মানায়। চৈত-বোশেখের বাংলার দুঃসহ গরম, খাস মাদ্রাজ সহরেও তেমনি দাবদাহ। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই দূরপথের হাওয়া কিন্তু বেশ মিষ্টি। বাংলার মত পর পর শুধু সমভূমি—হঠাৎ সমভূমি থেকে কোথাও কোথাও সু-উচ্চ পাহাড়শ্রেণী চলে গিয়েছে। চলার পথে নদীনালা প্রায় নেই-ই, তবে কোথাও মাঝে মাঝে হয়ত অগভীর অতি-প্রশস্ত জলাভূমি চোখে পড়ে। সমতলের বদলে মাঝে মাঝে পাহাড় আর পাহাড়ের পাদমূলে এমনি জলাভূমি বেশ চিত্তাকর্ষক। রেল আর বাসরুট কোথাও কোথাও সমান্তরালভাবে চলেছে দক্ষিণদিকে ; আর দুপাশে পাল্লা দিয়ে পাহাড়শ্রেণী একেবারে সমতল থেকে মাথা তোলা দেওয়া, যেমন চোখে পড়ে মাদ্রাজের সর্বত্র। এছাড়া শত মাইল বিস্তীর্ণ পথে কোথাও আর চড়াই উৎরাই নেই বললেই চলে।

প্রায় তিরিশ মাইল পেরিয়ে পৌছান গেল চিংগেলপেটে—একটা জেলাসহর, এক রাজপথবিশিষ্ট কৃষ্ণনগর, কাল্না সহরের মত। চিংগেলপেটের আগে পালর ব্রীজ। পালর একটী অতি প্রশস্ত নদী, জল নেই ; গভীরতাও এক ফুটের বেশী নয়। এত প্রশস্ত একটী জলবিহীন নদীর খাদ এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে পূবে, বঙ্গোপসাগরের দিকে। এর সমতলী বুক চিরে কোথাও কোথাও গোটা কত জলরেখা—এক একটী যেন এক হাত চওড়া নদী, তাতে কাকচক্ষু জল। তামিল ভাষায় "পাল" শব্দের অর্থ দুধ, আর নদী। অধুনা শুষ্ক পালরের বুকে বহুদিন আগে বারমাস বইত ক্ষীরধারার মত স্রোতবতী জলধারা ; সহজলভ্য জলের সিঞ্চনে মাঠে মাঠে আর ধান ধরত না। পালর উপকূলের সমৃদ্ধ জনপদে তখন সকলেই ছিল 'দুধেভাতে'। তাই এর সত্যিকারের মানে দুধনদী। আজও পালরের অতি-পরিসর অগভীর খাদে জল থাকে বছরে সাত আটমাস, তবে সে জলুষ আর নেই। খরার চারমাসের নদীগর্ভে কোথাও কোথাও দেখা যায় ডোবাখানার গর্ত, তাতে থাকে জল আর মাছ দুই-ই। নদীর আটদশ মাইল ব্যাপী এমনি অংশ হাজার দুহাজার টাকা জলকর দিয়ে মৎস্য-ব্যবসায়ীরা ইজারা নিয়ে বেশ দু'পয়সা কামায়। অনেক জায়গায় বালু খুঁড়লেও স্ফটিকস্বচ্ছ জল মেলে, ফল্গুনদীর জলের মত। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি দৈর্ঘ্যে যাই হোক, প্রশস্ততায় অতুলনীয়। কৃষ্ণা গোদাবরীও এমনি প্রশস্ত নদী।

চেংগেলপেটের পর আবার পন্দিচেরীমুখী একটানা পিচ্ঢালা পথ, পথের দু'পাশে ছায়াসুনিবিড় গাছের সার। হয়ত সাত আট মাইল পর্যন্ত শুধুই তেতুল গাছ, (দক্ষিণী ভ্রাতারা মার্জনা করবেন) তাতে অজস্র তেতুলের ফলন।

শ্রীমা

তারপর আবার অনেক দূর কেবল ফলন্ত নারকেল গাছের সার। এবার শুরু হল শুধু নিষ্ফলা পাম গাছের পালা ; ছাই ছাই রঙ, শাখাপ্রশাখা বর্জিত—অত্যন্ত অশোভন স্পর্দ্ধায় আকাশ ভেদ করে মাথা তুলেছে। মাথার শেষ অগ্রভাগে গুটীকত পাতা বের হয়ে আছে, কঠিন প্রাণ বিদীর্ণ করে একটুখানি করুণার মত।

যতই পন্দিচেরীর দিকে এগিয়ে চলেছি দু পাশের মাঠে ঘাটে শস্য লক্ষ্মী যেন প্রসন্ন হাস্যে কলস্বনিত হয়ে উঠছে।

এবার দুপাশের জমি গেরুয়া রঙের। দক্ষিণগামী রাস্তা

সমুদ্র থেকে কোন কোন জায়গায় মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূর। সমুদ্রের ধারে লক্ষ লক্ষ গাছের এতবড় নারকেল আর তালবন আর কোথাও চোখে পড়ে নাই। রাস্তার দুধারে টালীর ঘর দেওয়াল সবই গেরুয়া রঙের। গৈরিক ধূলি মেখে মেখে গাছগুলির গুড়ি পর্যন্ত গেরুয়া। সামনেই যোগীগুরু শ্রীঅরবিন্দের তপোভূমি। সেখানে পৌছানর পূর্বে মনের প্রস্তুতি পর্বের চিহ্ন বুঝি বা এই সন্ন্যাসী জীবন-সুলভ গৈরিকতা।

এখন সুধু একটানা ছ'সাত মাইল দীর্ঘ পথ, রেল লাইন যে কোথায় ভুলে ফেলে এসেছি মনে নেই। এপাশে ওপাশে ভূমিখণ্ড একেবারে আবীরলাল। সেই অজস্র আবীরের মধ্যে সবুজকৃষ্ণ গাছ পালা, অসংখ্য ঝাউবন, সমুদ্রের হাওয়ায় দুলছে—চির ফাগুয়াতে সেই নীল-কলেবর পরমপুরুষের যেন নিত্য দোললীলা।
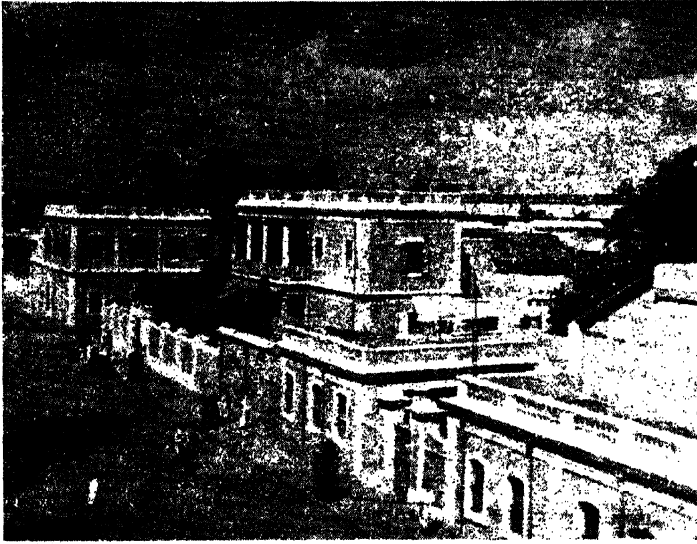
আশ্রমের মূল ভবনের দৃশ্য

এবার সেই বহুবাঞ্ছিত তীর্থভূমি, শ্রীঅরবিন্দের সাধন সিদ্ধি সমাধির আশ্রম। রিক্সা বা ট্যাক্সিওয়ালাকে 'আশ্রম' শুধু এই কথাটা বললেই যথেষ্ট। তা হলেই আশ্রমের মূল বাড়ীটাতে নিয়ে হাজির করে। কিন্তু এই বাড়ীটাই সব নয়, পুণ্যভূমি পন্দিচেরীর নানা অংশে অবস্থিত প্রায় তিনশ খানা বাড়ী নিয়ে আশ্রমের নানা বিভাগ। কোন ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছায় বা পরিকল্পনায় একদিনে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় নি এত বিরাট কর্ম-যজ্ঞশালার। শ্রীঅরবিন্দের মহিমা আর জীবনদর্শন স্বতঃপ্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে ভক্ত, আশ্রমী, কর্মী ও কর্ম বেড়েছে, প্রয়োজন পড়েছে নতুন নতুন বাড়ীর। কিনে বা যে কোন স্থানে জমি সংগ্রহ করে তৈরী হয়েছে আশ্রম বাড়ী, নানা শাখা প্রশাখা। মোটরে চড়ে—সবগুলি বাড়ী কোন মতে ঘুরে দেখতে কমপক্ষে সময় লাগে তিনঘণ্টা, আর মিটারে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মোট প্রায় যোলমাইল পথ অতিক্রম করা হয়েছে গোটা আশ্রমটা পরিক্রমার জন্য। আশ্রম থেকেই গাড়ীর ব্যবস্থা হয়, কেবল দর্শনার্থীরা চাঁদা করে তেলের খরচটা দিয়ে দিলেই হল।

এখানে এলে প্রথমেই একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কোন আশ্রমীর বা আশ্রমবাসিনীর পরণে নেই গেরুয়া, হাতে নেই কমণ্ডলু—সংসারবীতরাগ সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম বাহ্যিক নিদর্শন যা'! একজন মুক্তিকামী সন্ন্যাসী যদি দশঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে ধ্যানে জপেপূজায় কাটান, আর সেই ধ্যানলব্ধ জ্ঞান যদি ব্যবহারিক জীবনে যথাযোগ্য প্রযুক্ত না হওয়ার সুযোগ পায়, তবে কি প্রয়োজন সেই আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান অনুধ্যানের? যোগীজনসম্রাট শ্রীঅরবিন্দ বিরাট কর্মযোগী। সকলের সামনেই রয়েছে বিরাট কর্মক্ষেত্র। তাঁরই কৃপানুকুলো বয়সধর্মবর্ণস্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে কর্মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাচ্ছেন মুক্তির পথ নির্দেশ—জীবনের নানাক্ষেত্রের বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়ে করে চলেছেন চিত্তবৃত্তিনিরোধের অত্যাশ্চর্য্য সকল এক্সপেরিমেণ্ট। তাই এখানে গেরুয়া কমণ্ডলুর বালাই নেই, বাহ্যিক পূজা উপচারের আয়োজন নেই। সমুদ্র সৈকতের

আশ্রমটী জেগে ওঠে অতি ভোরে, বিহগকণ্ঠে কাকলীর আগে—তপোময় সুপ্রাচীন ভারতের নর্মদাসিন্ধুসরস্বতী তীরে ঋষিকণ্ঠে সামগান মুখরিত তপোবন একদিন যেমন করে জেগে উঠ্‌ত। আর ক্রমে ক্রমে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে আশ্রমের প্রতিটী বিভাগ।—কামারশালা, তাঁত-শালা, সীবনালয়ের কর্মচাঞ্চল্যের সংগে সংগে ছুতারখানা, বেকারী, ডেয়ারী, শিল্প-বিজ্ঞানী সঙ্গীত, সাহিত্যকলা, টেবিল, টেনিস, সন্তরণ, দিনান্তিক প্রার্থনা, শিক্ষামূলক সচিত্র প্রদর্শন—এক কথায় জীবনের সর্বস্তরের সমস্তরকম ব্যবহারিক যোগের অভ্যাস ও প্রয়োগ এখানে অব্যাহত ভাবে চলেছে। এখানে আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা মোট প্রায় তেরশ'। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও ভাবধারা শ্রীমায়ের পরিচালনায় যে রকম দ্রুত প্রসারের পথে—তাতে করে, হয়ত আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আশ্রম বাড়ীর মোট সংখ্যা হাজারে আর আশ্রমীর সংখ্যা দশ সহস্রে দাঁড়াবে।

আশ্রমে ঢুকতেই দেখা গেল গুটীকত ভদ্রলোক—কারও পরণে হাফ্‌ প্যাণ্ট, কারও ধুতী পাঞ্জাবী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুকটাক্‌ আলোচনা করছি এমন সময়ে ধ্বনিযুক্ত পরিষ্কার বাংলায় এক কিশোর যুবক একটা চেয়ার দেখিয়ে স্মিতহাস্যে বল্‌লেন—বসুন। বক্তা এক বৃটীশ যুবক। ওর মা বাপ সবাই শ্রীঅরবিন্দের করুণাধন্য হয়ে আশ্রমবাসী। বৃটেনভূমিতে যে বৃটনীয়রা কল্পনা করতে পারে না যে পৃথিবীতে ইংরেজ ছাড়া জাত আর ইংরেজী ছাড়া ভাষা আছে তাঁদের আশ্রমবাসী হতে দেখে আর বাংলা বুলি বলতে শুনে সত্যি আশ্চর্য্য লাগে। এখানে এই মহাভারতের সাগরতীরে সবই সম্ভব হয়েছে। এখানে পনের রকমের বিদেশী জাত আর ভাষা থাকলেও বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় পয়তাল্লিশ জন। তারপরেই গুজরাতী। অবশিষ্ট সর্বভারতীয় পাঁচমেশালী। গুজরাতী ছেলেমেয়েরা কিন্তু বাংলা বলে বেশ। আশ্রমে ছোটবড় সবারই সবরকম ভাষা শিক্ষার সুযোগ আছে। এতটুকু ছেলে মেয়েরা কত অল্প সময়ে তিন চার পাচটা ভাষায় লিখ্‌তে পড়্‌তে বল্‌তে পারে দেখ্‌লে অবাক হতে হয়। আশ্রমবাসীদের বিশ্বাস এ সবই সম্ভব হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের সংঘজননী শ্রীমায়ের করুণা ও সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবে।

সেদিন ছিল রবিবার, আশ্রমের সকল বিভাগে ছুটী। সুতরাং সর্বাগ্রে যাওয়া গেল শ্রীঅরবিন্দের সমাধি দর্শনে। দেহত্যাগের প্রায় ১১১ ঘণ্টা পর শ্রীঅরবিন্দের নশ্বর দেহটী মূল্যবান একটী কাষ্ঠাধারে সমাহিত করা হয়। কংক্রীটে গেঁথে গেঁথে বেদী তৈরী করে কাষ্ঠাধারটী তার মধ্যে রেখে উপরে পরম যত্নে ও সম্ভ্রমে মাটী চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। এই স্বল্পপরিসর সমাধিভূমিটী সারা আশ্রমের—এক কথায় সারা অরবিন্দ-জগতের পবিত্র তীর্থভূমি। এইখানে যে এক অটুট দেহমনহৃদয়-ভরানো শান্তি ও নৈঃশব্দ্য বিরাজ করে জগতে তার তুলনা নেই। আশেপাশের জনতার মধ্যেও এর নীরবতা বিজনের নীরবতাকেও হার মানায়। মাঝখানে ছোট্ট একটী উঠোন, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে এক একটী বাড়ী বা তার অংশ বিশেষ। পুবশিয়রী
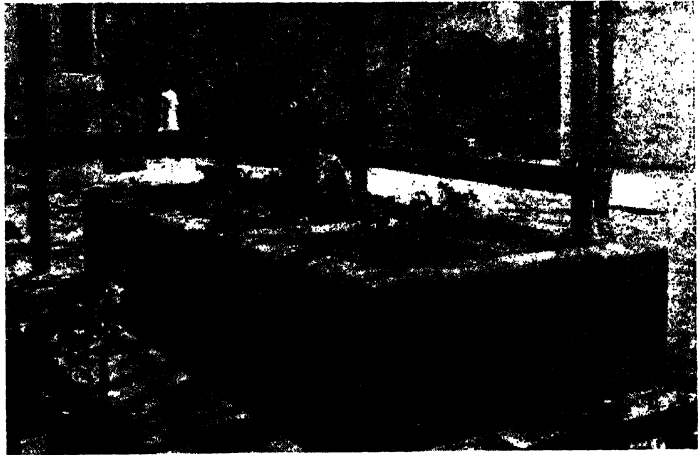
সমাধি

সমাধি থেকে সামান্য এগোলে একটী রাস্তা ক্রমে উপরে উঠে গেছে একটী কক্ষে—যেখানে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের অবস্থান-যোগ-সিদ্ধির পুণ্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাঁর ঐহিক জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস, তাঁর ব্যবহার-করা ঘড়ি কলম বইখাতা পরম শ্রদ্ধায় এমনভাবে রক্ষিত আছে দেখে মনে হয় এইমাত্র তিনি কোথায় যেন গেছেন, এখনই এসে আবার সব ব্যবহার করবেন।

সমাধিটী কত রকমারি ফুলে ও ফুলস্তবকে সাজান। পায়ের কাছে রক্ষিত আধারে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত
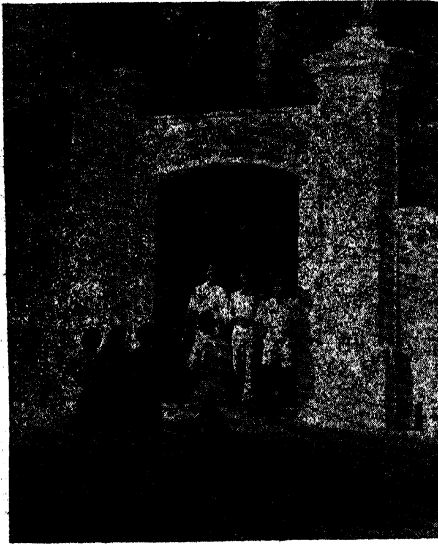
শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখভাগ।

সুগন্ধী মহীশূর ধূপশলা জলছে। কত ভক্ত সমাধিতে মুঠি মুঠি ফুল ছড়িয়ে, ধূপশলা জেলে প্রণাম করছে। অতি ভোরে নিকটেই এক ভক্ত অনেক ফুল আর ধূপশলা নিয়ে বসে থাকেন হাতে হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। দিনে রাতের যে কোন যামে কত আশ্রমী, বাইরের শোকতাপ-ক্লিষ্ট কত বাইরের মানুষ বেদী স্পর্শ করে প্রণত হয়ে পড়ে থাকে অসীম ভক্তিতে। সমাধির চারিদিকেও প্রতি ঘরের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে পুষ্পান্বিত ফুলের গাছ, সযত্নে লাগান। চারিদিকের এই মধুগন্ধবহ আবহাওয়ার মাঝখানে সমাধির পাশে বসে মানুষ যেন সেই পরম জ্যোতির্ময় পুরুষের মধুর সান্নিধ্য অনুভব করে।

আশ্রমের প্রতিটি অংগ ফুলে ফুলে ভরা। প্রত্যেক ফুলের গুণভেদে আশ্রমজীবনে নতুন নামকরণ করেছেন শ্রীমা—কোন অলৌকিক মুহূর্তে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভংগিতে শ্রীমায়ের কাছে প্রতিভাত হওয়া সেই বিশেষ অর্থবাহী নাম। সমাধির ঠিক উপরে বড় একটী গুলমোহর বা সোনাল জাতীয় গাছ, রাশি রাশি হলুদ ফুলে ভরা। এর নাম 'সার্ভিস' টী। এই গাছটী রাত্রিদিন আপন অজস্র ফুলদল শ্রীঅরবিন্দের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য হচ্ছে—সুতরাং সার্থক এর নাম 'সেবাইত' বৃক্ষ।

সমাধির পায়ের দিকে পঞ্চদলবিশিষ্ট কাঠচাঁপা ফুলের গাছ। এই ফুলের নাম 'মনস্তাত্বিক পরিপূর্ণতা'। এর প্রতিটি দলের নাম : 'প্রত্যয়', 'আকাঙ্ক্ষা', 'আন্তরিকতা', 'ভক্তি', 'সমর্পণ'। এধারে একজাতীয় করবী জাতীয় ফুল—যার নামকরণ হয়েছে 'ভ্রান্তি সমর্পণ'। তাছাড়া এদিকে ওদিকে ফুটন্ত জবা, পঞ্চমুখীজবা, গাঁদাফুল, সূর্যমুখী, আসল করবী, ধুতরা প্রভৃতি ফুলগাছ আপন প্রস্ফুটিত হাস্যে বিকশিত হয়ে আছে। জবা ফুলের আশ্রমী নাম 'শক্তি', পঞ্চমুখীজবা 'সক্রিয়শক্তি'। গাঁদাফুল 'নমনীয়তা'র প্রতীক। ধুতরা 'তপস্যা' পুষ্প। সূর্যমুখী 'দিব্যজীবনমুখী চেতনা'র প্রতীক। আসল করবী 'বিজয়পুষ্প'। ৺বিজয়ার দিনে আশ্রম সজ্জিত হয়ে উঠে এই জয়ার্থক করবীপুষ্পে। আশ্রমের প্রবেশ পথের ফটকে নীলকমলের (রাধাঝুমকা) কুঞ্জ। এই ফুলের নাম 'নীরবতা' অর্থাৎ নীরবে আশ্রমে প্রবেশ কর। প্রবেশ পথের বাঁদিকে অশোক ফুল—অশোক আপন নামেই আপন গুণ প্রকাশ করছে—অর্থাৎ এখানে কোন শোক দুঃখ নেই।

আশ্রমের শুধু মূলভবনেই নয়, সর্বশাখায় এই বিশেষ অর্থবাহী ফুলের বাহার। শুধু ফুলের নামকরণেই নয়—মোট তেরশ আশ্রমীকে নিয়ে নানা বিভাগ, ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেককে কর্মে নিয়োগ। সকলের সব রকম শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়া থেকে খেলাধুলা পর্যন্ত সমস্ত কিছুর নিখুত পরিচালনা—সবই চুরাশী বৎসরের এই শক্তিময়ী আশ্রমজননীর উপর ন্যস্ত। তাই আজও তাঁর চোখে ঋষিদৃষ্টি, মনে কবির কল্পনা

কর্মে শিল্পীর সাধনা। বিচিত্র নয়, মাত্র সেদিন পর্যন্ত আশ্রমীকুলের এই অধ্যাত্মজননী সমুদ্র সৈকতের মাঠে টেনিস খেলেছেন যুবজনবিক্রমে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কথা। ফরাসী চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক মনীষী বিশ্বময় ঘুরে ফির্‌ছেন সস্ত্রীক। পার্থিব সম্পদের কম্‌তি না থাক্‌লেও তাঁর মনে ছিল না শান্তি, বিদুষী স্ত্রী ছিলেন না ঐহিক সুখে সুখী। তাই সারা বিশ্বে পাতি পাতি করে খুঁজছিলেন সেই পরম সত্যকে। চরম শান্তির উৎসকে। পান নি। অবশেষে তাঁর সন্ধান মিলল পুণ্যভূমি পন্দিচেরীতে। স্ত্রী স্বামীকে জানালেন! এতদিন ধরে সারা বিশ্বে যাঁর সন্ধান তাঁরা কর্‌ছিলেন তাঁর দেখা পেয়েছেন। এর পরই দুজনের শ্রীগুরুর কৃপালাভ ও দীক্ষা। সেদিনের সেই ফরাসী দার্শনিকের সত্য সন্ধানী স্ত্রী আজ শ্রীঅরবিন্দ সংঘ-জননী—সবার মা।

শ্রীমায়ের দর্শন

সেদিন শ্রীমায়ের দর্শন-লাভের সুযোগ হল সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে—ভক্তসমক্ষে তাঁর প্রাত্যহিক দর্শনদানের নির্দিষ্ট সময়। ভোরে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সেরে শুচি বস্ত্রে ও শুচি মনে সকলে ক্রমে নিঃশব্দে লাইন করে সমবেত হন রোজ, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকে। দর্শনের আগে মনটাকে সমস্ত রকম চিন্তাক্লেদমুক্ত করার জন্য যার যার স্ব-আরোপিত এই ব্যবস্থা। ক্রমে রাস্তার ধারে থাকার ঘরের ব্যালকনিতে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন মা—তারপর সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুখ তুলে চাইলেন, যেন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের চোখে চোখে তাকিয়ে কিছু দিয়ে দিচ্ছেন। তারপর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল দূরে, বহুদূরে—একটু পরে সে দৃষ্টি নিমীলিত হয়ে এলো—যেন কোন্ সুদূর সত্যলোক থেকে এক মহাশক্তি আকর্ষণ ক'রে নিজের মধ্যে সংহত কর্‌লেন, পরে আবার উদার দৃষ্টি মেলে রাস্তায় ভিড়-করা ভক্তমণ্ডলীতে সেই শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন। প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল, আবার দৃষ্টি মেলে ধরলেন সকলের সামনে; মুখ না ফিরিয়ে আস্তে আস্তে পেছু হেঁটে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন সকালে দর্শনার্থীদের ভীড়ে দেখা গেল এক ভদ্রমহিলাকে—সুইডেনবাসিনী। এসেছিলেন সবার আগে—এসে যুক্ত করে নগ্নপদে নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন। দর্শনের পরেও আত্মসমাহিতভাবে স্থান কাল ভুলে আবার দাঁড়িয়ে আছেন। তেমনি করজোড়ে। যখন তিনি চলে গেলেন তার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে সকলে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। আরও জনকয়েক ভিনদেশী ও বিদেশিনী চোখে পড়্‌ল—যাঁরা দীর্ঘ গৌরকান্তি দেহে এক

ফালি কাপড় জড়িয়ে নগ্নপদে হাসিমুখে আশ্রমজীবন যাপনে ধন্য হয়েছেন। ভোগ ও লালসা, ব্যবহারিক সাফল্য এবং দারুণ রজোগুণের আস্ফালনের কেন্দ্রভূমি ইউরোপ, আমেরিকার ধনশালী লোকেরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে এমন সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন, যার জন্য অনায়াসলভ্য বিলাস ত্যাগ করে এই অন্তর্মুখী অনাড়ম্বর তপশ্চারী জীবনযাপনে প্রলুব্ধ হয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এক চমকপ্রদ প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশু বিভাগ থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জন্য ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, বিভিন্ন ললিত কলা ইত্যাদি অধ্যাপনার যে ব্যাপক ব্যবস্থা আছে তা ভারতের কোন অংশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের চেয়ে কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না।

১৫টী দেশ থেকে সংগৃহীত শিক্ষক নিয়ে এর অধ্যাপকমণ্ডলী গঠিত। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সবাই আশ্রমবাসী। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা হয় এখানকার স্বকীয় ধারায়, স্বকীয় সূচী অনুসারে। এখানকার শিক্ষার উচ্চমান, পবিত্র আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারের উচিত অবিলম্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দান।

গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাথায় গান্ধীটুপী পরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপে ধাপে সমাপ্ত অংশ নিমেষে বোতাম টিপে যাঁরা উদ্বোধন করেন তাঁরা এই বিরাট কর্মযজ্ঞশালাটী মাঝে মাঝে দেখে গেলে দেশের এবং তাঁদের নিজেদেরও উপকার হবে বলে মনে হয়।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোক চিত্র শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্কেচ : অশোক দেব

ভারতবর্ষ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্মরণ জয়ন্তী জাগে আশাবরী সুরে সুরে তব,
আষাঢ়ের প্রভাতের আনন্দের সমারোহে নব
অর্দ্ধশতাব্দীর পারে। স্বদেশের ঐতিহ্যের তুমি
মহান্ মহিমালয়ে, ধন্য করি দিলে জন্মভূমি
শাশ্বত স্বাক্ষরে। আপনার প্রজ্ঞাতীর্থ পাঠ করি
সারস্বত সাধনার মন্ত্র দিলে বাণী মূর্ত্তি ধরি
কোন এক রৌদ্রস্নাত জনারণ্যে মধ্যাহ্ন লগনে,
স্বপ্নের সৌরভ তব শতাব্দীর ঋতু-আবর্ত্তনে
দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে করেছে যে নিত্য আকর্ষণ
সৌজন্যে শ্রদ্ধায় যুগ পান্থ জনে। কভু বিস্মরণ
হবে না কালের, যতদিন বঙ্গভাষা বিশ্বে রবে
আপনারে করিয়া বিস্তার।

বহুতারকারে নভে
করেছ প্রোজ্জ্বল। নব অঙ্কুরের হেরি অভ্যুত্থান
আনুকূল্যে তব, বহু বনস্পতি লভিয়াছে স্থান
তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে, তব শোভা সুধারস পিয়া
দিনে দিনে হয়েছে বর্দ্ধিত তোমারি আশ্রয় নিয়া;
আজ তারা কীর্ত্তির শিখরে বন্দনীয় সর্ব্বোত্তম,
তুমি বিশ্বে চির বরণীয় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম।

সাতন্ত্র্য দেখেছি তব। স্বদেশের মৃত্তিকার রস
বণ্টন করেছ তুমি তুচ্ছ করি নিন্দা অপযশ।
হও নাই ত্রস্ত ভীত আধুনিক ঘাত প্রতিঘাতে
সত্য শিব সুন্দরের পূজা বলিষ্ঠ আদর্শ সাথে
করেছ সুদীর্ঘ দিন। তোমার বীণাতে নাহি বাজে
বেসুরে রাগিণী; মধ্যমণি ভাব জগতের মাঝে।
পঞ্চাশ বছরে এসে পঞ্চদশী সাজিয়াছে যারা,
তাদের মত তুমি হওনিকো আজো বুদ্ধিহারা
ডেকে এনে সাম্প্রতিক টপ্পা-গাওয়া কীর্ত্তনের দল
প্রগতির রচিতে দুর্গতি; তুমি আজো অচঞ্চল
অভিজাত বাঙ্ময়ী।

দ্বিজেন্দ্রলালের পুণ্যস্মৃতি;
বক্ষে তব, শরৎ সাহিত্য তব গৌরবের গীতি,
ভাবপুষ্প আহরণে অলিসম তুমি জলধরে
সাথে লয়ে শ্যামল করেছ দেশ: দগ্ধ বালুচরে
আজ অজস্র ফসল। নুয়ে পড়ে বীথি ফলে ফুলে
সংসার গহনে। ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্ম মূলে
আনন্দের করেছ সঞ্চার, বিহঙ্গেরা নীড় বেঁধে
করিছে কূজন ভাব ভাবনার সাথে সদা মেতে
অধিত্যকা মাঝে তব।

তুমি ভেঙে দিলে সব ভুল
সৌন্দর্য্য-বিকীর্ণ করি,' মোর কাছে তাহা যে অতুল,
আমার মধ্যাহ্ন দিনে পেয়েছিনু আশ্রয় তোমার
আজি এ উৎসব ক্ষণে সেই কথা নহে ভুলিবার।
চারিদিকে তাসের প্রাসাদে চলে পরম কৌতুকে
উদ্ভটরচনা, হেরি তার জয়যাত্রা পৃথ্বীবুকে'
চলে দর্প ভরে, তারি মাঝে তোমারি জয়ন্তী করি,
অমিতায়ু হও তুমি ভারতীর রত্নশতনরী।

❋ অতীতের স্মৃতি ❋

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

৩

একালে আমাদের দেশে 'বারোয়ারী পূজোর' রেওয়াজ খুবই···ভুর্গোৎসব, শ্যামা পূজো, সরস্বতীপূজো, শীতলা পূজো —নিত্য এমনি আরো কত কি পূজো-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান, সবই আজকাল সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আধুনিক গণ-তান্ত্রিক কেতায়···অর্থাৎ 'বারোয়ারী' ব্যবস্থায়—পাড়া আর বেপাড়ার লোকজনের কাছ থেকে ছোট-বড় নানা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে। অথচ, আজ থেকে প্রায় একশো-সত্তর বছর আগেও এই 'বারোয়ারী পূজোর প্রচলন ছিল না' আমাদের দেশে। প্রাচীন পুঁথি-পত্র ঘেঁটে ইদানীং যে সব ঐতিহাসিক-তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই থেকে জানা যায় যে বাঙলা দেশে অভিনব এই 'বারোয়ারী' পূজোর ব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয়েছে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি আমলে। সেকালে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতা শহরের অনতিদূরে সুসমৃদ্ধ গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রায় ১৭৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে সেখানকার বারোজন মাতব্বর-ব্যক্তির সক্রিয়-উৎসাহে সর্ব্বপ্রথম মহাসমারোহে 'বারোয়ারী পূজোর ব্যবস্থা হয়। অভিনব-প্রথায় এই পূজোর অনুষ্ঠান যে তখনকার যুগে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারও প্রমাণ মেলে সবিশেষ। অর্থাৎ গুপ্তিপাড়ায় নব-প্রবর্ত্তিত সেকালের এই 'বারোয়ারী পূজোর' অসামান্য সাফল্যের ফলে, অচিরেই এমনি গণতান্ত্রিক-প্রথায় পূজো করার হিড়িক ছড়িয়ে পড়লো আশেপাশের আরো সব গ্রামে-শহরে—এমন কি কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতাতেও। তখনকার আমলে এই সব 'বারোয়ারী পূজোর' আসরে যে সব বিচিত্র কাণ্ড-কারখানা ঘটতো প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একালের রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেরই হয় তো সে সব কাহিনী জানবার আগ্রহ আছে, তাই বিভিন্ন প্রাচীন সংবাদ-পত্র থেকে সেকালের 'বারোয়ারী পূজো' সম্বন্ধে কয়েকটি বিচিত্র খবরাখবর সঙ্কলন করে দেওয়া হলো।

* * * *

বারোয়ারী পূজো

(দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, মে, ১৮২০)

···a new species of Pooja, which has been introduced into Bengal within the last thirty years, called *Barowaree*···About thirty years ago, at Goopti-para near Santi-poora, a town celebrated in Bengal for its numerous college, a number of brahmins formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the Shastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounding villages. Finding their collections inadequate, they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many, according to current report, have never returned. Having thus

obtained about 7000 Rupees, they celebrated the worship of Juguddhatree for seven days with such splendour, as to attract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindu ritual, but beyond this, the whole was formed on a plan not recognized by the Shastras. They obtained the most excellent singers to be found in Bengal, entertained every brahmun who arrived, and spent the week in all the intoxication of festivilty and enjoyment. On the successful termination of the scheme, they determined to render the pooja annual, and it has since been celebrated with undeviating regularity.

A way having been thus opened···the example was imitated in other parts of Bengal···Within a few miles of the metropolis, more than ten of these subscription assemblies are annually formed. The most renowned are those at Bulubh-poora, Konnugura, Ooloo, Gupti-para, Chugda, and Shree-poora. At Ooloo, where it is celebrated with extraordinary shew, *Patres conscripti* of the town have passed a law that any man who on these occasions refuses to entertain guests, shall be considered infamous and expelled from society···

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ৮ই মে, ১৮১৯)

পূজা।—২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাইচণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য-পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন ২ পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর ২ প্রকার তামসা অনেক হয়। তিন চারি দিন পর্য্যন্ত সমান লোক যাত্রা থাকে। অনেক ২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ১১ই আগষ্ট, ১৮২১)

বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি পূজা ॥—বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে ২৩ শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতিআশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিস্প্রয়োজন সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্ব্বাপর পাচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮২১)

বারএয়ারি পূজার বিরোধ ॥—সংপ্রতি মোং জয়নগর শ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে তাহাতে ঐ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অসমম্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ঐ তাঁতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ইহাতে জয়নগরের তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া যে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরস্পর রাগান্ধ হইয়া লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্য বলিদান ও রক্ত পাতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারি পূজাতে বারএয়ারী মারামারি

প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এখন তাহারদের মোকদ্দমা সদরে হইতেছে।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৩৭)

দুর্গার দুর্দ্দশা।—আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চুচুঁড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুর্ভুর্জা দুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চুচুঁড়ার লোকেরা বারইয়ারি পূজার্থ এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করে তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে দুই দল আছে একদল তাঁতি তাহারা বৈষ্ণব অপর দল শুঁড়ি তাহারা শাক্ত অতএব ঐ মূর্ত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল পরে শুঁড়ি দলেরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের ব্যতীত বলিদান পূজা হয় না অতএব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবীর সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত শামিয়ল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে বৈষ্ণবেরা পূজা করুক পরে শাক্ত-মতাবলম্বী শুঁড়িরা বলিদান করিয়া পূজা করিতে পারিবে এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাঁতিরা পূজা করিয়া তাহারদিগের ঘট বিসর্জ্জন দিল পরে শুঁড়িরাও ছাগল মহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে। কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসিনঃ।

* * *

সেকালের এই সব 'বারোয়ারী পূজোর' মহোৎসবে যে কি বিরাট ধুমধাম-আড়ম্বর আর ঘটা হতো,তার পরিচয় পাওয়া যায় উনবিংশ শতকের স্বনামধন্য-সাহিত্যিক কালী-প্রসন্ন সিংহের রচিত ঐতিহাসিক-গ্রন্থ 'হুতোম পেঁচার নক্সার' কয়েকটি ছত্রে···তার কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * * *

(হুতোম পেঁচার নক্সা)

···একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারো-ইয়ারি পূজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল। শেষ বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন করতে হয়েছিল, তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালা 'মা'র অপঘাত মৃত্যু' উপলক্ষ্যে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোয়ারী পূজো করেন তাহাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

* * * *

এমনি বিচিত্র ধুমধাম-আড়ম্বর আর প্রচুর অর্থব্যয় ছাড়াও সেকালে এ সব 'বারোয়ারী পূজোর' আসরে দলাদলি, রেষারেষি, দ্বন্দ-বিরোধ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামাও যে প্রায়ই ঘটতো—সে প্রমাণ পাওয়া যায় উপরে উদ্ধৃত প্রাচীন সংবাদ-পত্র আর সমসাময়িক-সাহিত্যের টুকরো টুকরো খবরাখবর থেকে। এ সব ছাড়াও, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেকালের 'বারোয়ারী পূজোর' পাণ্ডাদের উপদ্রব যে আরো কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠেছিল—তার পরিচয় মিলবে ১৮৪০ সালে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণের বিশেষ একটি সংবাদ মাধ্যমে।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ১৮৪০)

···মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন···স্ত্রীলোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টি মাত্রই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন তাহাতে

লজ্জাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া বেহালানিবাসী যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন।···

* * * *

তবে এ অনাচার অচিরেই বন্ধ হয়েছিল সেকালের চব্বিশ-পরগণা এলাকার সুদক্ষ ইংরেজ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট পেটন সাহেবের ব্যক্তিগত-তৎপরতায়। এ উপদ্রব শায়েস্তা করতে পেটন সাহেব শেষে নিজেই একদিন ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে আত্মগোপন করে সটান এসে হাজির হলেন বেহালার বারোয়ারী-তলায়। ঘেরাটোপ-ঢাকা সুদৃশ্য পাল্কী দেখে সেখানকার 'বারোয়ারী-পূজোর' পাণ্ডারা ভাওরালেন—বুঝি কোন বড়লোকের ঘরনী চলেছেন আশে-পাশে কোনো আত্মীয়-বাড়ীতে—মোটা চাঁদা আদায়ের লোভে তাঁরা পথের মাঝেই পাল্কী ঘেরাও করে পাল্কী-বেহারাদের উপর জুলুম সুরু করে দিলেন। পাল্কী-বেহারাদের আগে থেকেই শেখানো ছিল···তারা যতই অনুনয় জানায়—সঙ্গে কর্ত্তা-ব্যক্তি কেউ নেই··পয়সা-কড়ি নেই···সম্ভ্রান্ত-ঘরের কুলনারী একা চলেছেন পাল্কীতে—বেহালার বারোয়ারী-তলার পাণ্ডাদের ততই রোখ চেপে যায়! শেষে অধৈর্য্য হয়ে যেমনি তাঁরা পাল্কীর ঘেরাটোপ সরিয়েছেন, অমনি দেখেন—অসহায় কুলনারী নয়···তাঁর জায়গায় পাল্কীর ভিতরে বধূ-বেশে বসে রয়েছেন লাল-মুখো ইংরেজ-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রবল-পরাক্রান্ত পেটন সাহেব! বেহালার বারোয়ারী-তলার এই অভিনব-কাহিনীটি সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের সংবাদ-পত্রে···তারই কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করে আপাততঃ 'বারোয়ারী-পূজোর' প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টেনে দেওয়া যাক।

* * * *

(সম্বাদ ভাস্কর, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০)

···তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃদকম্প হইল এবং কে কোন দিকে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না। তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।···

* * * *

উনবিংশ শতকে কোম্পানীর আমলে দেশে তখন নিত্যই লেগে থাকতো আরো নানা রকম উৎসব-অনুষ্ঠানের ঘটা। কারণ, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা শহরে তখন কাঁচা-পয়সা রোজগারের সুযোগ-সুবিধা ছিল প্রচুর··· দেশ-দেশান্তর থেকে নানা জাতের লোকজন এখানে এসে ছোট-বড় কাজ-কারবারের দৌলতে অল্পদিনের মধ্যেই রীতিমত বিত্তশালী হয়ে উঠতো···সুতরাং তখনকার আমলে মনে তাদের স্ফূর্ত্তিও ছিল অঢেল। তারই ফলে, সেকালের সমাজে সারাক্ষণই বইতো তখন এমনি নানান্ আমোদ-প্রমোদের অফুরন্ত প্রবাহ! চড়ক-সংক্রান্তি আর গাজনের উৎসবও ছিল সে-যুগের বিশেষ প্রিয় একটি বিচিত্র সর্ব্বজনীন অনুষ্ঠান···প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তারও বহু নিদর্শন মেলে। তবে উনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত এ সব উৎসব ছিল যেমন নির্ম্মম, তেমনি অশ্লীলতাপূর্ণ··· ইংরেজ আমলে ক্রমশঃ এ সব বর্ব্বর-প্রথার আমূল সংস্কার সাধিত হয়।

* * * *

চড়কের উৎসব

(সমাচার দর্পণ, ২৪শে এপ্রিল, ১৮১৯)

চড়ক।—গত সংক্রান্তির দিন মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলেই শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। একজন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্জ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ২১শে এপ্রিল, ১৮২৭)

চড়কপূজা।—চড়ক পূজার সময় সন্ন্যাসিদের মধ্যে

কেহ ২ মত্ত হইয়া পথেতে এমত কদর্যারূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতাস্থ ম্যাজিষ্ট্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপূজার সময় এইরূপ অতিনির্লজ্জ তিন চারি জন সন্ন্যাসিকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম্ম যে তাহারা কিম্বা অন্য লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্তে তাহারদের শাস্তি হইবেক…। হরকরা প্রকাশক লিখিয়াছেন যে এরূপ কর্ম্ম হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি যদি কর্ত্তব্য হয় তবে যাহার তাহাতে অনুরাগ হয় সে কোন নির্জ্জন স্থানে বনে কিম্বা নিজ ভবনে গিয়া তাহা করুক কিন্তু এরূপ ভদ্রলোকের সম্মুখে না করুক।…

* * * *

সেকালের গাজন উৎসব
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

গাজন উৎসব

(সমাচার দর্পণ, ১৫ই বৈশাখ, ১৮২৮)

অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।—বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চৈত্র নীলের উপবাসের দিবস এ নগরস্থ যত গাজন আছে সে সকল গাজনের সন্ন্যাসিরা প্রথমতঃ প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বাণ ফুড়িয়া কালীঘাট হইতে আসিতে থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইয়াছিল সেই গোলযোগে বাবুদিগের বিনা অনুমতিতে দুই জন কপটবেশী ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া অতিকুৎসিৎ সং সাজিয়া ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের অজ্ঞা শাসকেরা ঐ দুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তৎকর্ম্মের উচিৎ ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাম তাহারা দুই সপ্তাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে।…

* * * *

একালের মতো সেকালেও দোলযাত্রার উৎসবে প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা যেতো উনবিংশ শতকের হিন্দু-সমাজে। প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তারও নজীর খুঁজে পাওয়া যায়। এমন কি সেকালের এই আনন্দ-উৎসবের উত্তেজনা শেষ পর্য্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলার বাঁধ ভেঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পর্য্যবসিত হয়ে উঠতো…হোলি-খেলার ফাগ আর আবিরের জল আরো গাঢ় হয়ে উঠতো তাজা-রক্তের লালরঙের সঙ্গে মিশে! এ সব প্রমাণও মেলে সেকালের সংবাদ-পত্রের পাতায়-পাতায়।

* * * *

দোলযাত্রার উৎসব

(সমাচার দর্পণ, ৯ই মার্চ্চ, ১৮২২)

দোলযাত্রা॥—মোকাম শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগে স্থাপিত শ্রীশ্রীযুক্ত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই ম দোল যাত্রাতে শ্রীযুতবাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হই দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিস ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্ম ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য ক করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৪০)

হুলির উৎসব।—বর্ত্তমান কালীন হুলির উৎসবে না দাঙ্গাহঙ্গামা ঘটিয়াছে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শি জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল পরে তাহারা অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্ব্বক আবি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া এবং নানা কুৎসি গান করত পথে ২ বেড়াইতেছিল ইতিমধ্যে কাক হইতে আগত কএক জন মহম্মদীয়ের দিগেকে দেখিয় তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।…

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

উপানন্দ

ভগবান তথাগত মহাকরুণার মূর্ত প্রতীক, মানবতার শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা, সাম্যমৈত্রীপ্রেম ও শান্তির বার্তাবহ। তাঁর গৃহত্যাগের পুণ্য তিথি শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। নিজের মুক্তির জন্যে নয়, সকলের অশ্রুমোচনের জন্যে তাঁর মহাভিনিষ্ক্রমণ। তাই এ তিথি ধরিত্রীর কাছে চিরপবিত্র—এই দিনেই মহাজীবন ঋষিপত্তনে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেছিলেন। গৃহত্যাগের পর রাজার দুলাল জীবের দুঃখে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছেন। মুখে ছিলনা কথা, কেবল চোখে ছিল জল। জীবের কল্যাণ আর মুক্তির জন্যে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন সর্ব্বপ্রকার বিপন্নতা ও দুঃখ, আত্মসমাহিত হয়েছিলেন কৃচ্ছ্র সাধনায় ঘর ছাড়া হয়ে সুদীর্ঘ ছয় বছর ধরে যে বিরাট সঙ্কল্প নিয়ে তিনি উদগ্র সাধনা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয় নি, শেষে পেয়েছিলেন প্রশ্নের জবাব। বোধিদ্রুমতলে হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। দুঃখ জয়ের পথের সন্ধান দিয়ে গেলেন তিনি।

এই অবতার পুরুষের আলোক ধারায় অবগাহন করে ধরিত্রীর আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত! এর পূর্ত্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোলো বুদ্ধ জয়ন্তী বাংলা তেরশো তেষট্টি সালে। ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির জীবন্ত বিগ্রহ গৌতমবুদ্ধকে বাঙালী নিয়েছে আপনার করে, দেখেছে সে ভগবানের অবতার রূপে তাঁকে, তাই উত্থিত হয়েছে তার বৈষ্ণব কবি জয়দেবের কণ্ঠে—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর—জয় জগদীশ হরে।'

হাজার বছর আগেও বাংলার আঙিনায় মুখরিত হয়েছে শত শত কণ্ঠে—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। আজ বুদ্ধাব্দ ২৫০৬। সেদিন হয়ে গেল বুদ্ধ পূর্ণিমা। একই দিনে মহাজীবনের আর্বিভাব, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণ। এটি মানব ইতিহাসের ব্যতিক্রম, পরম বিস্ময় ও বটে।

যে কথা বাল্যজীবনে দেবদত্তকে বলেছিলেন গৌতম তীর বিদ্ধ হাঁসকে বাঁচিয়ে, সেই কথাই আজো আড়াই হাজার বছর পরেও পৃথিবীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন—'প্রাণ' নিতে পারো কিন্তু একটি প্রাণও কি দিতে পারো?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি দেবদত্ত। শিকারী মৌন বিস্ময়ে চেয়েছিলেন তাঁর মুখের পানে। এই প্রশ্নই অনন্ত নিখিলের চিরন্তন প্রশ্ন।

সভ্যতার রাজপথ বেয়ে আজও চলেছে মানুষ অনাগত ভবিষ্যতের সন্ধানে। পথের দুধারে প্রতিদিবসের কতনা বিচিত্র কাহিনী, কতনা করুণ সঙ্গীত, কতনা মর্ম্মন্তুদ বেদনা, আর্ত্তনাদ হাহাকার তাকে আবেষ্টন করছে। সে অশ্রুভারাতুর। চলার পাথেয় যাদের হারিয়ে গেছে, তারা এপথে দেখিয়ে চলেছে রণ-বিভীষিকা, বর্ব্বরতার বীভৎসতা, হিংসার পাশবিক উল্লাস। তাদের নৃশংসতার চরম

অভিব্যক্তি আজও প্রত্যক্ষ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তুই-ই আজ বর্ব্বর।

তাঁর জন্মভূমিতে আজও চলেছে পশুবধ, গৃহপালিত পশুর হচ্ছে হনন, যে গোজাতি স্বদেশের মূল্যবান সম্পত্তি, আজ সে জাতিও কসাইদের কবলে পড়ে অবলুপ্তপ্রায়, ফলে অর্থগৃধ্নু বৈশ্যশক্তি পরিচালিত স্বদেশ ক্রমে ক্রমে দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে উঠ্‌ছে। গোহত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে, অবলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে দেশের অমূল্য সম্পদ। আজ তোমরা পাওনা পর্য্যাপ্ত ঘি, দুধ, মাখন। শরীর শীর্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল। বিশ্বে বুদ্ধানুস্মৃতি হয়েছে সত্য কিন্তু বুদ্ধানুসৃতি অর্থাৎ বুদ্ধকে অনুসরণ করা হয় নি। হোলে মনুষ্য সমাজ পেতো মহাগৌরবময় জীবন, হোতো অমৃতের অধিকারী। জীবের কল্যাণ আর মুক্তির জন্যে প্রভু সর্ব্বপ্রকার বিপন্নতা ও দুঃখ বরণ করে নিয়েছিলেন, কৃচ্ছ্রসাধনায় হয়েছিলেন আত্ম-সমাহিত। কিন্তু মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁর জন্যে কতটুকু স্বার্থত্যাগ করেছে! সেদিন ও সমগ্র বিশ্বে হয়ে গেল আনন্দের সমারোহ আর অন্তরের দীপালী উৎসব বুদ্ধ-জয়ন্তী লগ্নে, তাঁর বাণীকে মর্য্যাদা দিয়েছে সবাই, কিন্তু কেউ গ্রহণ করেছে কি? আজ্‌কের দিনে এইটি হোক্ প্রধান বক্তব্য—আলোচ্য বিষয়।

আড়াই হাজার বছর আগে যে পশ্বাচার, স্বার্থগৃধ্নুতা, খাদ্যখাদকতা, দুর্নীতি ও হিংস্রতা ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে করেছে কলঙ্কিত, আজ আড়াই হাজার বছর পরে ও চলেছে তার পুনরাবৃত্তি, অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আজো চলেছে অগণিত মানুষ পশুও নর শোণিতের তরঙ্গ ভেদ করে, কঙ্কালের ওপর দিয়ে অগ্রগতির পথে। এ অগ্রগতির ভয়াবহ রূপ সৃষ্টি কয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে গভীর আতঙ্ক। বুদ্ধের মহাপরি-নির্ব্বাণের পর কত মহাপুরুষই না এলেন! তাঁরা শুনিয়ে গেলেন মহা মঙ্গলের কথা, শুনিয়ে গেলেন শান্তির বাণী, সত্যকে করে গেলেন প্রকাশ। স্বার্থগৃধ্নু মানুষ বর্দ্ধিত, শুন্‌লোনা তাঁদের কথা, আজ তাই বিশ্বজুড়ে এত অশান্তি!

বুদ্ধকে অবলম্বন করে খৃষ্ট মানবতার চরমোৎকর্ষ সাধন করে গেলেন, প্রেমের মহিমা মূর্ত্ত করে গেলেন শ্রীচৈতন্য, শিবজ্ঞানে জীবসেবার পথ নির্দ্দেশ করে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্দী শত্রু সর্দ্দার সামুমাকে পরিবারের সমস্ত খাদ্য বিতরণ করে, সপরিবারে হজরত মহম্মদ অভুক্ত থেকে দেখিয়ে গেলেন মহত্তম আদর্শ। তবু অন্তহীন অন্ধকার, তবু বিশ্ব-কল্যাণ বোধহীন মানুষের স্বার্থপরতার ক্ষিপ্রতা, তবু শত সহস্র দুর্দ্দশা—তবু জীব-হিংসা!

এ যুগেও এসেছেন মহাচিন্তানায়কের দল। তাঁরা বিশ্বে বপন করে গেলেন ভালোবাসায় বীজ, ফল্‌লো হিংসা বিদ্বেষের তিক্ত বিষাক্ত ফসল। টলষ্টয়, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রোমারোলাঁ, জোহান বোয়ের, রবীন্দ্রনাথ, আর্লরাসেল প্রভৃতি এলেন। সত্য জীবনের পথে এঁরা দিলেন প্রেরণা মানব সমাজকে, দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌লেন বিশ্বকল্যাণের গভীরতম প্রয়োজনের দিকে—কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। এঁরা জীবনপুরোহিত। ধরিত্রীর চিরনমস্য। মানব জাতি এঁদেরকে শ্রদ্ধা করেছে, পূজা করেছে কিন্তু অনুসরণ করেনি। এখানেই সভ্যতার গলদ। এ থেকে বুঝা যায় মানুষের মন বস্তুটা অসীম রহস্যময়, এর মনের ব্যাধি আরোগ্যের অতীত। এখনও চলেছে দিকে দিকে আণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা, নেতৃত্বের নামে যুথবদ্ধ পশুশক্তির আস্ফালন।

ভগবান তথাগতের আবির্ভাবের পর থেকে বিশ্বমানব সমাজে চলেছে ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্মের, সন্নীতির সঙ্গে দুর্নীতির সংগ্রাম। হয়তো এই সংগ্রামের মাধ্যমে শোনা যাবে অতিমানব-সভ্যতার নবজন্মের আগমনী, হয়তো আস্‌বে এক নতুন মানসিক চেতনা। জন্মচক্রের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হওয়ার জন্যে তথাগত পৃথিবীতে জন্ম নেন নি, এসেছিলেন অজানাকে জানবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়ে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল। তাই এ দিন অতি পবিত্র।

অনন্ত কালের জন্যে তিনি রেখে গেছেন আলো। তাঁরই বাণীকে অবলম্বন করে সেই হারানো দিনে সংখ্যাতীত মানুষের ঘটেছিল মোহমুক্তি। সেদিন ভারত বিশ্বতীর্থ। ভারতের ভৌগোলিক সীমাভেদ করে দূর দূরান্তরে পৌচেছ তাঁর মহাকরুণার অবদান। অগণিত মানুষের কণ্ঠে উঠেছে—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি; সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

নানা দেশ থেকে এসেছে তীর্থযাত্রীরা, সারনাথে, বুদ্ধগয়ায়, শ্রাবস্তীতে, কপিলাবস্তুতে, কুশীনগরে, রাজগৃহে। এসেছে পরিব্রাজক দল দুর্গম গিরি ——— কান্তার

পুঞ্জ ভেদ করে, দুরন্ত জলধি পেরিয়ে। বুদ্ধ ঋষিপত্তনে যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করে গেছেন, তা কেবল পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, অর্দ্ধ পৃথিবীতে হয়েছে তার ব্যাপ্তি। বৈদিক যুগের আদর্শের যেখানে সমাপ্তি, সেখানে সুরু তাঁর নব প্রাণাদর্শের বন্দনা গান। তখন ছিল ভোগ ও ত্যাগের ভাঙাগড়ার সন্ধিক্ষণ। এসময়ে বুদ্ধ দিলেন সমন্বয়ের চেতনা, গঠন করলেন সার্ব্বভৌম কল্যাণ ধর্ম্মের মহামিলন কেন্দ্র—'বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায়—'

বুদ্ধ বলেছেন, সত্যই এজগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, এটাও সত্য। দুঃখের ধ্বংস হয় এটাও সত্য, আর এটাও সত্য যে, দুঃখ ধ্বংসের উপায়ও আছে। তিনি দুঃখ ধ্বংসের যে উপায় বা পথ নির্দ্দেশ করে গেছেন, তারই নাম মার্গ বা পথ। এই পথের আটটি অঙ্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাক্‌, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম, (উদ্যম) সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক্‌ সমাধি। তিনি বলেছেন—'এহি পসসিক' এর দ্বারা দুঃখ ধ্বংস হয় কিনা এসো দেখ।

যারা জীবহিংসা করে, চুরি করে, অন্যায় ইন্দ্রিয় সেবা করে, মিথ্যা কথা বলে, মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে, তাদের আত্মার অধোগতি হয়, জন্মজন্মান্তর ধরে কষ্ট পায়—বুদ্ধ এই সত্যই উদঘাটিত করে গেছেন। বুদ্ধ ঈশ্বরের বা আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেননি, আবার অস্বীকারও করেননি। যখনই কেউ এবিষয়ের প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে, তিনি থেকেছেন মৌনী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তেন না। নিশ্চিত করে বুদ্ধ কিছু বলেননি, এই সূত্র ধরে কেবলমাত্র তাঁর মৌন ভাবকে তাঁর নাস্তিক্যের লক্ষণ বলা চলেনা।

বৌদ্ধসাহিত্য পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। 'ধর্ম্মপদ'কে বলা যায় বৌদ্ধগীতা। 'ত্রিপিটকই' বৌদ্ধ জগতের পরম আশ্রয়। বুদ্ধের তত্ত্ব ও তথ্য অনুসরণ করে পরবর্ত্তীকালে এই ভারতে গড়ে উঠছে নানা মতবাদ, রচিত হয়েছে নানা পথ—বৈভাসিক সৌতান্ত্রিক বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বাস্তিবাদ, যোগাচার, বীরাচার, বজ্রযান, প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রভৃতি। এরা ঘটিয়েছে চিন্তাধারার রূপান্তর, সমাজ জীবনে এনেছে বিচিত্র বিভ্রান্তি আর দ্বিধা সংশয়। বৌদ্ধতান্ত্রিকতায় ভরে গেছে দেশ, সক্রিয় হয়েছে কত না অভিচার—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি।

শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত থেকে উচ্ছেদ সাধন করে গেছেন সত্য, কিন্তু বাঙালীর অস্থিতে মজ্জায় আজো রয়েছে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের অমোঘ প্রভাব, যদিও রচিত হয়েছে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি। শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধকে বলেছেন—'Greatest Thinker' রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব রূপে। কবিগুরু বলেছেন '·মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন।' কবি বলেছেন—

'পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠেছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

আমরাও বলি—'বুদ্ধস্তপতি তেজসা—'

ভারতবর্ষের স্বুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ক্ষণে পরম কারুণিক মহাজীবন ভগবান বুদ্ধের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হোক্‌ এর ওপর—এই একান্ত প্রার্থনা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-কাহিনীর সার-মর্ম্ম

মাইকেল জ্যোশেঙ্কো

রচিত

গোয়েন্দা-কুকুর

সৌম্য গুপ্ত

[মাইকেল জোশেঙ্কো ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে 'জার্' সম্রাট (Czar) শাসিত রাশিয়ার একজন সুবিখ্যাত রঙ্গ-রস কাহিনীকার (Satirist)···ব্যঙ্গ-রচনায় তিনি ছিলেন বিশেষ সিদ্ধহস্ত! তাঁর রচিত অভিনব রস-কাহিনী-গুলি শুধু সেকালের রাশিয়াতেই নয়, সারা দুনিয়ার সাহিত্য-রসিকদের কাছে আজ প্রচুর সমাদর লাভ

করেছে। জ্যোশেঙ্কোর রচিত কাহিনীগুলি 'জারের' আমলে রাশিয়ার বহু অন্যায়-অনাচার সম্বন্ধে—তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্ম্মভেদী এবং সারগর্ভ—সামাজিক ও মানসিক উন্নতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এই কারণেই জ্যোশেঙ্কোর বিচিত্র ব্যঙ্গ-কাহিনীগুলি আজ সারা পৃথিবীর সাহিত্য-রসিকদের কাছে এতখানি উপভোগ্য অমর-সম্পদ হয়ে উঠেছে। মাইকেল জ্যোশেঙ্কোর জন্ম ১৮৩৬ সালে—মৃত্যু ১৯০১ সালে!]

শহরের প্রকাণ্ড বাসা-বাড়ী···বাড়ীতে অসংখ্য কামরা। সে সব কামরায় নানা ধরণের দোকান আর নানা শ্রেণীর ভাড়াটিয়ার বাস। একতলায় এক সৌখিন জিনিষপত্রের দোকান···মালিক—ইরেমি ব্যাব্‌কিন। একদিন হঠাৎ তার হৈ-হৈ চীৎকারের হট্টগোলে সবাই সচকিত হলো!···ব্যাপার কি? ইরেমির খুব দামী 'ফার-কোট' (Fur-Coat) ছিল দোকানের কোণে আলনায়—সেটি চুরি গেছে! ইরেমি চীৎকার করতে করতে থানায় গেলো···নালিশ লেখালো···পুলিশকে বললে—চোর ধরা চাই···আমার কোট উদ্ধার করা চাই!

থানার পুলিশ-কর্ত্তা খুবই তৎপর···তখনি গোয়েন্দা-কুকুর নিয়ে ইরেমি ব্যাব্‌কিনের সঙ্গে এলো তদন্ত করতে গোয়েন্দা-পুলিশের এক সার্জ্জেণ্ট।

কুকুরটাকে দেখলে ভয় হয়···ছুঁচোলো মুখ···ত্‌'চোখে যেন আগুন জলছে···চেহারা কুশ্রী, কদাকার!

দেখতে দেখতে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ের ভিড় জমলো। ব্যাব্‌কিনের দোকানের দরজায় পায়ের দাগ দেখিয়ে দিল পুলিশের সার্জ্জেণ্ট···কুকুর মাটিতে নাক ঠেকিয়ে ঘ্রাণ নিলে···তারপর চারিদিকে তাকিয়ে নাক ফুলিয়ে ঘ্রাণ নিতে লাগলে···তার ঘ্রাণ নেওয়া শেষ হলে পুলিশের সার্জ্জেণ্ট তাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে আড়ালে গেল সরে!

বাতাসে ঘ্রাণ নিতে নিতে—গোয়েন্দা-কুকুর ব্যাব্‌-কিনের দোকানের লোকজনদের দিকে তাকাতে লাগলো···তারপর হঠাৎ এ-বাড়ীর পাঁচ-নম্বর কামরায় থাকে বুড়ী ফিয়োক্লার—সেও ভিড়ে এসে দাঁড়িয়েছে···কুকুরটা সেই বুড়ীর পোষাকের কোণ কামড়ে ধরলো। ভয়ে ফিয়োক্লার বুড়ী ধেৎ-ধেৎ বলে যত তাকে তাড়া দেয়, কুকুর তত জোরে বুড়ীর পোষাক চেপে ধরে। ভিড়ের লোকজন হৈ-হৈ করে উঠলো—তোমার এই কাজ বুড়ী···বটে! ইরেমির 'ফার্-কোট' চুরি!

ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে পুলিশের সার্জ্জেণ্টকে উদ্দেশ করে বুড়ী বললে—দোহাই বাবা···আমাকে ছেড়ে দিতে বলো, 'ফার্-কোটের' কথা আমি জানি না, তবে হাঁা, কবুল করছি বাবা—আমি লুকিয়ে একটু-আধটু মদ-চোলাই করি···আমার ঘরের পিছনে তার সাজ-সরঞ্জাম পাবে!

পুলিশের সার্জ্জেণ্ট কুকুরকে টেনে ছাড়িয়ে নিলে···ভিড়ের লোকজন বুড়ীকে ধরে বললে—পালাস্‌নে বুড়ী···তোকে থানায় যেতে হবে!

পুলিশের সার্জ্জেণ্ট গোয়েন্দা-কুকুরকে আবার দোকান-ঘরে এনে ছেড়ে দিলে···দিয়ে হিস্-হিস্ করে শিষ দিলে···কুকুর বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে তেড়ে গিয়ে ধরলো—এই বাসা-বাড়ীর তদারক করে যে লোকটি তাকে! গোয়েন্দা-কুকুর লাফিয়ে তার কোটের কোণ ধরলো দাঁতে চেপে। লোকটা ভয়ে উবুড় হয়ে পড়ে গেল···হাত জোড় করে বললে—আমি কোট চুরি করিনি হুজুর···তবে হাঁা, আমার কশুর আছে—মানে, বাড়ীর ভাড়াটেদের কাছ থেকে জল-সরবরাহের জন্য যে ভাড়া আদায় করি, সে টাকা মালিককে দিইনি—তছরুপ করেছি!

বাড়ীর ভাড়াটেরা তাকে চেপে ধরলো···ধরে তার হাত-পা বাঁধলো···বললে—তোমাকে পুলিশে দিতে হবে···চোর!

কুকুর তখন তাকে ছেড়ে এ-বাড়ীর সাত নম্বর কামরার ভাড়াটের দিকে ছুটে গিয়ে তার পেণ্ট্‌লেন ধরলো কামড়ে। সে ভাড়াটের মুখ ভয়ে একেবারে কাগজের মতো শাদা···পুলিশের সার্জ্জেণ্টের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে বললে—ওকে ধরুন হুজুর···এ কি সাংঘাতিক কুকুর!···ইরেমির ঐ কোট আমি নিইনি, হুজুর···তবে, ফৌজ থেকে ফেরারী হয়ে এসে নাম ভাঁড়িয়ে এখানে বাসা নিয়েছি! ফৌজের আইনে আমি অপরাধী···কশুর মানছি আমি···নিয়ে চলুন গারদে···কুকুরের কামড় থেকে আমায় বাঁচান, দোহাই হুজুর!

ভিড়ের লোকজন সবাই তারিফ করতে লাগলো···

গোয়েন্দা-কুকুরের কি অসাধারণ শক্তি! কবে কে কোথায় কি অপরাধ করেছে—ঠিক তাকে ধরেছে!

ইরেমি ব্যাব্‌কিন পুলিশের সার্জেন্টকে বললে—খুব হয়েছে মশাই, আমার তদারক···এখন আপনার ঐ কুকুর নিয়ে আপনি আপনার থানায় ফিরে যান!

এগিয়ে এসে এ কথা যেই বলা, অমনি গোয়েন্দা-কুকুর ঘ্যাঁক্‌ করে কামড়ে ধরলো ইরেমির জামা-কাপড়! সকলে অবাক!···ইরেমি বলে উঠলো—আরে, আমাকে ধরেছে কেন?···আমি ফরিয়াদী···আমার কোট চুরি গেছে···ছাড়্‌···আমাকে ছাড়্‌!

ইরেমি কুকুরকে ধমকানি দিলে···কিন্তু কুকুর তাকে ছাড়লো না···কুকুরের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলছে!

ভয় পেয়ে ইরেমি বললে—আরে, আরে···ঠিক ধরেছে! ও পুলিশ-সাহেব, আপনার কুকুরকে ডাকুন!···আমি তদন্ত চাই না···চাই না···ওরে বাবা···এ তো কুকুর নয়···সাক্ষাৎ ভগবান!···ঠিক ধরেছে!···

সকলে বললে—তার মানে?···

ইরেমি ব্যাব্‌কিন বললে—ও 'ফার্‌-কোট' আমার নয়···আমার খুড়োর! খুড়োর অজানাতে ও কোট আমি চুরি করে এনেছিলুম!

গোয়েন্দা-কুকুরকে পুলিশ-সার্জেন্ট ডাকলে···কুকুর দিলে ইরেমিকে ছেড়ে···ছাড়া পাবামাত্র ইরেমি ছুটে সেখান থেকে পালালো।

তারপর বাতাসে ঘ্রাণ নিতে নিতে কুকুর ধরলো—পর-পর ভিড়ের মধ্যে তিনজনের পোষাক কামড়ে। তাদের মধ্যে একজন বললে—সরকারী চাকরী করে···সরকারী তহবিল ভেঙ্গে জুয়া খেলে সে টাকা উড়িয়েছে। আরেক-জন বললে—সে তার স্ত্রীকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এমন মার মেরেছে যে স্ত্রী মরণাপন্ন! তৃতীয় ব্যক্তি যা বললে, তার অর্থ—সে এমন জঘন্য অপরাধ করেছে যে তার কথা লোক-সমাজে বলা যায় না!

ব্যাপার দেখে ভিড় পাৎলা হয়ে এসেছিল···কুকুরকে ডেকে পুলিশ-সার্জেন্ট বিদায় নেবে, হঠাৎ গোয়েন্দা-কুকুর কামড়ে ধরলো পুলিশ-সার্জেন্টের উর্দ্দি! পুলিশ-সার্জেন্ট চীৎকার করে উঠলো—ছাড়্‌ ছাড়্‌···ওরে ছাড়্‌!···আমি আমার কসুর মানছি! তোর খোরাকের জন্য আজ আমি তিরিশ রুবল পেয়েছি থানায়, তাই থেকে বিশ রুবল সরিয়ে ছিলুম নিজের খরচ-পত্র মেটানোর জন্য!···এবারে রেহাই দাও···দোহাই!···

গোয়েন্দা-কুকুরকে কোনমতে সরিয়ে পুলিশ-সার্জেন্ট হলো গমনোদ্যত···তারপর পথে যা ঘটলো···সে কথা থাক! কারণ, সে কাহিনী হবে দীর্ঘ এবং প্রায় একালের···অর্থাৎ ঠিক্‌ বাছতে, যাকে বলে গাঁ উজোড়! অতএব এখানেই শেষ করি!

রামছাগল

শ্রীকৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য

রামছাগলটা দাড়ি নেড়ে
বল্লে সেদিন বেড়ালটাকে
তোরা গোঁফের বড়াই করিস
দেখ্‌তো চেয়ে আমার দিকে।
নবীর মোল্লা সেদিন পথে
দাড়িটা মোর বল্লে দেখে
অমন দাড়ী আমার হ'লে
হাজি হ'তাম জেঁকেজুকে।
অনেক রকম দাড়ী আছে
চাপ্‌ দাড়িটা মন্দ নয়,
সবার সেরা ছাগল দাড়ি
আমার খ্যাতি জগৎময়।
মিনি বল্লে ছাগল দাদা
খুব যে দাড়ির বড়াই করো
তবে একটা গল্প বলি
একটুখানি ধৈর্য্য ধরো।
বেগমপুরের মোল্লাপাড়ায়
উজির নামে একটা লোকের
তিরিশ হাত এক দাড়ি আছে
সেটা তাহার অনেক কাজের।
রাতের বেলায় পাকিয়ে সেটা
বালিশ করে দেহ ছড়ায়,

দিনের বেলায় সেই দাড়িতে
ছাগল বেঁধে মাঠে চরায়।
সেই দাড়িতে বাল্‌তি বেঁধে
পাত্‌কো থেকে তোলে জল
নারিকেলের গাছে উঠে
নামায় আবার বেঁধে ফল।
দাড়ির গরব ক'রো নাকো
আসল দাড়ি ওরেই কয়
ছাগল দাড়ী বাজে দাড়ি
ছোট্ট সে যে কাজের নয়।
দাড়ির গরব তুমি ছাড়ো
বেঁচে গেছ ছোট্ট দাড়ি
নইলে পরে বাঁধতো তাতে
লাগতো নাকো দড়াদড়ি।
আমার গোঁপের নিন্দে তুমি
ক'রো নাকো কোনকালে
বাঘের নাম কি শোননিক
আমার সে যে বোনের ছেলে।

——
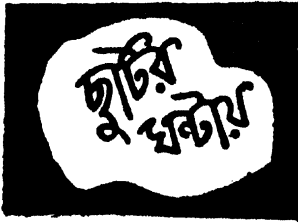
চিত্রগুপ্ত

এবারে বিজ্ঞানের যে বিচিত্র-মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটির নাম—'লাঠির ভার-সাম্যের রহস্য-লীলা'। এ খেলাটির কলা-কৌশল খুব কঠিন নয়…একটু অভ্যাস করলেই তোমরা অনায়াসে সেটি আয়ত্ত করতে পারবে। তবে এই অভ্যাসটিই হলো আসল দরকার…কারণ কলা-কৌশল ভালো রকম রপ্ত না হলে, খেলাটি সুষ্ঠুভাবে দেখানোর সময় খুবই অসুবিধা ভোগ করবে!

লাঠির ভার-সাম্যের রহস্য লীলা:

বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি দেখানোর জন্য বেশী কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। এ খেলার জন্য চাই শুধু দু'তিন ফুট লম্বা একটি লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডা—যা সচরাচর সবাইকার বাড়ীতেই মিলবে।
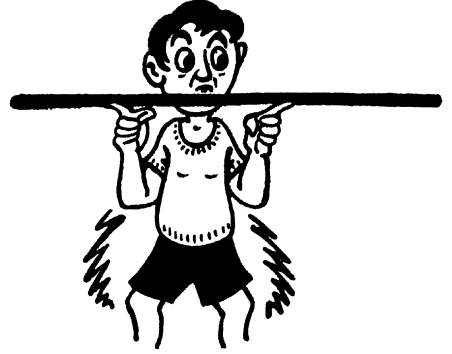
এই লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডা জোগাড় করে নিয়ে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে সেটিকে দুই হাতের 'তর্জ্জনীর' (Forefinger) উপরে সমানভাবে শুইয়ে রাখো। এভাবে শুইয়ে রাখার সময় বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে—লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার একদিক যেন অপর দিকের চেয়ে হাতের তর্জ্জনী দুটির কিছু বেশী বাইরে থাকে! এবারে ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে হাতের আঙুলের উপর শুইয়ে-রাখা লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার ভার-সাম্য বজায় রেখে, দু'হাতের দুটি তর্জ্জনীকে ক্রমশঃ বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে সরিয়ে আনো। এমনিভাবে দু'হাতের দুটি তর্জ্জনীকে যতই লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার বাহিরের দিক থেকে ভিতরের দিকে সরিয়ে আনবে, ততই মনে হবে যে লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার যেদিকের প্রান্তটি বেশী বাইরে রয়েছে, সেই দিকটিই ক্রমশঃ ভারী হয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়বে …এমন কি, টাল সামলাতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত হয় তো মাটিতেই গড়িয়ে পড়বে! আসলে কিন্তু বিজ্ঞানের ভার-সাম্যের নিয়মানুসারে, এমনটি ঘটবে না কিছুতেই… দু'হাতের তর্জ্জনী দুটিকে ক্রমশঃ লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার

বাইরের দিক থেকে ধীরে ধীরে ভিতরে সরিয়ে এনে পাশাপাশি মিলিয়ে রাখলেও, লাঠি বা ডাণ্ডা আঙ্গুলের উপর থেকে নীচে খশে পড়বে না সহজেই···বরং রীতিমত বিস্ময়করভাবে আগাগোড়া সমতা (equilibrium) বজায় রেখে সটান শুয়ে থাকবে দুটি তর্জ্জনীর উপরে দেহ-ভার সুবিন্যস্ত করে! তর্জ্জনী দুটিকে সন্তর্পণে বাহিরের দিক থেকে ভিতরের দিকে সরানোর সময় লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডাটি হেলেদুলে এপাশে-ওপাশে সামান্য ওঠা-নামা করলেও, নিজেই তার ভার-সমতা সামলে নেবে··· হাতের আঙ্গুলের আশ্রয় থেকে টলে মাটিতে গড়িয়ে পড়বে না! এ হলো-বিজ্ঞানের এক বিচিত্র রহস্য।

কেন এমন হয়, জানো? বিজ্ঞানের অভিনব নিয়মানুসারে, তর্জ্জনী দুটির সঙ্গে সংঘর্ষণের (Friction) ফলে, লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডা তার ভার-সাম্য (Balance) বজায় রাখে। অর্থাৎ, লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার যেদিকটি তর্জ্জনীর বেশী-বাইরে থাকে, আঙ্গুল সরিয়ে নেবার সময় সেদিকটি ভারী হয়ে যখনই নীচে ঝুঁকে পড়ে, তখনই অন্যদিকে বিজ্ঞানের অভিনব নিয়মানুসারে সংঘর্ষণের-চাপ সৃষ্টি করে বিপরীত-শক্তিতে উপর থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে থাকে—আর ভার-সমতা বজায় রাখে। লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার যে-প্রান্ত তর্জ্জনী থেকে কম-বাইরে থাকে, সেদিকেই সংঘর্ষণের চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং যে-প্রান্তটি তর্জ্জনীর বেশী বাইরে থাকে, সেইদিকটিতেই সংঘর্ষণের চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। এমনি ওঠা-নামার ফলে দু'হাতের দুটি তর্জ্জনীর উপর শোয়ানো লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার বহিঃপ্রান্তের দূরত্ব আর সংঘর্ষণের চাপ অভিনব-ধরণের ভার-সমতা সৃষ্টি করে বলেই দণ্ডটি আঙ্গুলের উপর থেকে মাটিতে খশে পড়ে না।

এই হলো এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য! তোমরা নিজের হাতে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র লীলা-কৌশল পরখ করে ত্থাখো!

আগামী সংখ্যায় এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-মজার খেলার কথা জানাবার চেষ্টা করবো।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। গেলাস সাজানোর হেঁয়ালি ঃ
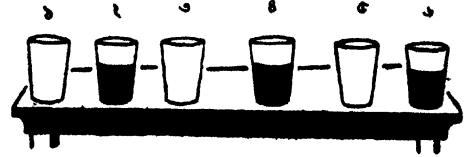
উপরের ছবিতে দেখ'ছো—টেবিলের উপরে একই-লাইনে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে ছয়টি কাঁচের গেলাস। এই ছয়টি গেলাসের মধ্যে, তিনটি গেলাসে রয়েছে সরবৎ, আর বাকী তিনটি গেলাস রয়েছে শূন্য—অর্থাৎ, সরবৎ নেই সেগুলিতে। গেলাসগুলি সাজানো রয়েছে পাশাপাশি একসারিতে—একটি খালি আর একটি সরবৎ-ভর্ত্তি··· এমনি ধরণে। এখন, বুদ্ধি খাটিয়ে, এই ছয়টি গেলাসের মধ্যে মাত্র একটিকে ঠাঁই নেড়ে সরিয়ে উপরের ঐ লাইন বজায় রেখে এমন কায়দায় ব্যবস্থা করতে পারো—যাতে তিনটি খালি-গেলাস থাকে সারির একদিকে, আর তিনটি সরবৎভরা গেলাস থাকে সারির অন্যদিকে। তবে মনে রেখো—খালি কিম্বা সরবৎ-ভর্ত্তি গেলাসটিকে মাত্র একবারই ঠাঁই নেড়ে সরানো যাবে—বারবার নয়···এবং উপরের ঐ সারিবদ্ধভাবে সাজানোর ব্যবস্থাটিও বজায় থাকবে আগাগোড়া! এ হেঁয়ালির সঠিক সমাধান যদি করতে পারো তো বুঝবো—বুদ্ধিতে বেশ পাকা হয়ে উঠেছো দিনে দিনে!

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা
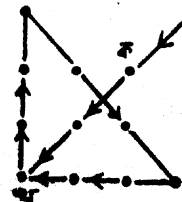
পাঁচ অক্ষরে নাম—জলাশয়ে জন্ম। প্রথম অংশ খব

সুখাদ্য—লোকে চিবিয়ে খায়। দ্বিতীয় অংশও সুপেয়—সেটি পান করে মানুষ আরাম পায়। কিন্তু সবটা মিলে—মানুষের অখাদ্য...তাকে ধ্বংশ করাই মানুষের কাজ।

রচনাঃ বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তরঃ

১। বিন্দু আর সরলরেখার আজব হেঁয়ালিঃ

উপরে যে নক্সা দেওয়া হয়েছে সেই নক্সার ভঙ্গীতে—বাঁ-দিকের উর্দ্ধ-প্রান্তের 'ক' চিহ্নিত বিন্দু থেকে পেন্সিলের সরলরেখা টানতে সুরু করে পর-পর বিন্দুগুলিকে ছুঁয়ে ডান-দিকের নিম্ন-প্রান্তের 'খ'-চিহ্নিত বিন্দুটিতে এলেই, এই আজব-হেঁয়ালির রহস্য সমাধান করতে পারবে অনায়াসেই।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধার উত্তরঃ

২। চারটি পয়সা এবং তিনটি ভিখারী

৩। তাজমহল

গত মাসের সব ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছেঃ

ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণকুমার মুখটী, দিলীপকুমার চৌধুরী (জামশেদপুর), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), পিণ্টু হালদার (বর্দ্ধমান), সৌরাংশু, বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুতুল, শুমা, হাবলু, টাবলু (হাওড়া), রিনি, রণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছেঃ

অনুরাগময়, পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময়, সিপ্রাধারা, ধীরাগময়, মণিমালা হাজরা (বড়বাড়িয়া মেদিনীপুর), আলো, শীলা, রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা), বাপ্পা সেন, পম্পা সেন (কলিকাতা), কৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ), সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর), অঞ্জলি, বন্দনা চট্টোপাধ্যায় (বারাকপুর), অলক, পুটু, কৃষ্ণা, গীতা, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছেঃ

অসীমা দাস (মীরাট), রবীন্দ্রনাথ দিন্দা, হেমন্তকুমার জানা, শিপ্রা চৌধুরী (মেদিনীপুর), কবিতা সরকার (বর্দ্ধমান), মুরারী চৌধুরী (ফুটিগোদা), কুমার নারায়ণ, মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর, মেদিনীপুর), গৌতম, সুজাতা, পূরবী, অমিতাভ কোঙার (বাতানল, হুগলী), শীলা, শ্যামলী, সন্ধ্যা, সিপ্রা, শিমা (ফুটিগোদা, ২৪ পরগণা), বুচকু, ডিগবী (কলিকাতা), প্রতীপেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা), অনুপকুমার, স্বপ্না (তেলিনীপাড়া, হুগলী), নীতা, গৌতম, অশোক, কল্পনা (কলিকাতা), অরূপকুমার (ফুটিগোদা, ২৪ পরগণা), জয়ন্তী, তীর্থঙ্কর, দীপঙ্কর (মেদিনীপুর), নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়, বাবলু দ্বিজেনদা, (রঘুনাথগঞ্জ), সুষমা, মিনতি, রেখা, রেবা, চন্দন সূত্রধর (দার্জ্জিলিং), সুলেখা, শ্রীলেখা, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (শ্যামনগর), টিকা, টমি, টুনি, নানি, গুণি ও ভানু (নিউ দিল্লী)।

মোটর-গাড়ীর কথা

দেবশর্ম্মা রচিত
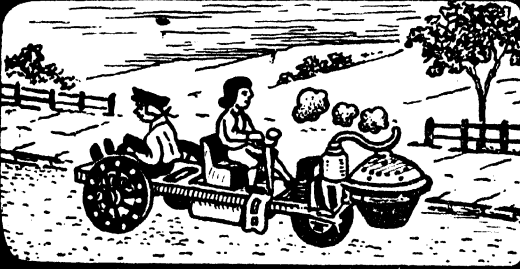
প্রথম মোটর-গাড়ী পথে চলতে সুরু করে ১৭৭০ সালে। এটি তৈরী করেছিলেন সেকালের এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক – তাঁর নাম, কুনো (CUGNOT)। তবে এ গাড়ী পেট্রোলে চলতো না... রেলের এঞ্জিনের মতো 'বাষ্পীয়-শক্তিতে' চালানো হতো। এ গাড়ীর গতি ছিল খুব কম, মানুষ হেঁটে অনায়াসেই এ গাড়ীকে অতিক্রম করে যেতো।

কুনোর তৈরী মোটর-গাড়ী প্রথম উদ্ভাবিত হলেও, মৃদু-গতির জন্য তেমন জনপ্রিয় হলো না। তবে তাঁরই প্রথা অনুসরণ করে ১৮২৭ সালে পথে চলন হলো 'বাষ্পীয়-শক্তি' চালিত সেকালের এই আজব-ছাঁদের যাত্রীবাহী মোটর-যান। সে-যুগের এ সব বিরাট যাত্রীবাহী-যান ছিল অনেকটা আমাদের একালের মোটর-বাসের মতো... অন্ততঃ সেই ধরণেই কাজে লাগানো হতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এ সব গাড়ীরও গতি তেমন দ্রুত ছিল না, তবে আদি-গাড়ীর চেয়ে বেশী
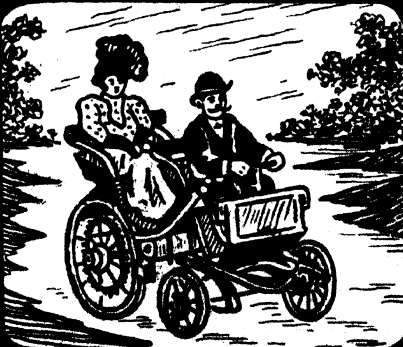
প্রথম 'পেট্রোল-এঞ্জিন' চালিত মোটর-গাড়ী তৈরী করেন জার্ম্মান-বৈজ্ঞানিক ড্যেমলার (DAIMLER)। এ গাড়ী পথে বেরুলো ১৮৮৬ সালে জার্ম্মানীতে। বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই এ গাড়ী অচিরেই রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুললো সৌখিন আর বৈজ্ঞানিক মহলে – তখনকার আমলে। ড্যেমলারের উদ্ভাবিত অভিনব 'ইন্টার্ণাল-কম্বাশ্চান-এঞ্জিন মোটর তৈরীর ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্মরণীয় দান... একালে অনুসৃত হচ্ছে দুনিয়ার সর্ব্বত্র। ড্যেমলারের তৈরী এই পেট্রোল-চালিত মোটর-গাড়ীর গতিবেগ ছিল রীতিমত দ্রুত... দেখতেও তান

রেঙ্গুনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রেঙ্গুন বাঙালীর কাছে কিছু বিভূঁই-বিদেশ নয়। এই তো সেদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষেরই একটা অংশ হইয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা ভারতবর্ষের মানচিত্রে ভারতবর্ষকে যখন মাতৃ-মূর্তিতে দেখিতাম তখন সিংহলকে দেখিতাম মায়ের পদতলে সমুদ্রজাত পদ্মরূপে, আর ব্রহ্মদেশকে দেখিতাম হিমালয় পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া মায়ের যে কুঞ্চিত এবং এলায়িত কুন্তল তাহারই মহিমান্বিত বিস্তাররূপে। মানচিত্রে ভারতবর্ষকে যখন সিংহরূপে দেখিতাম তখন ব্রহ্মদেশকে দেখিতাম পশ্চাতের পা রূপে। সে পা কাটা গিয়াছে, তাই ভারতবর্ষের আর সেই সিংহরূপ নাই।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জানিতাম, বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্চলের সুন্দর শহর চট্টগ্রাম, মহাপ্রাণাশ্রিত ভাষা শুনিতে প্রথমে যতটা কর্কশ ও অপরিচ্ছন্ন লাগুক, সে ভাষা বহন করিত যে মনের কথা তাহা বড় অকপট—বড় কোমল। সেই চট্টগ্রামের সহজ বিস্তার আরাকানে—তাহার পরেই ছড়াইয়া পড়ে আকিয়াব, মান্দালয়, রেঙ্গুনে। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রেঙ্গুনের কথা আরও বেশি করিয়া আমাদের ঘরের কথা হইয়া উঠিয়াছিল।

অতএব এতদিন পরে রেঙ্গুনে কয়েকদিন ঘুরিয়া আসিয়া রেঙ্গুনের কথাকে আর ঘটা করিয়া বলিবার হয়ত কোন অর্থ হয় না। কিন্তু দেশটি যত পুরাতন ও পরিচিত হোক না, যে মানুষ নূতন করিয়া দেখে তাহার মনে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে; বহুদিনের পুরাতন কথাই হয়ত আবার কিছু কিছু নূতনের আমেজ আনিয়া দিতে পারে। তাহা ছাড়া ইদানীংকালে আমাদের দুনিয়াটা যে বড্ড বেশি বন্ বন্ বেগে ঘুরপাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিত্য নূতন পরিবর্তন। সে পরিবর্তনও পরিচিত দেশ এবং পরিচিত মানুষকে লইয়া মনে নিত্য-নূতন কথা জাগাইয়া তুলিতেছে।

সম্প্রতি এই জ্যৈষ্ঠমাসেই ব্রহ্মদেশীয় বাঙলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকদিন রেঙ্গুন এবং তাহার কিছু কিছু আশপাশ ঘুরিয়া আসিলাম; তাহারই কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি।

চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে চাল-চিড়া বাঁধিয়া বড় বড় পাল-তোলা নৌকায় সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া এবং তাহার পরে বড় বড় নদী ধরিয়া ব্রহ্মদেশে যাতায়াতের কথা শুনিয়াছি। ভাসানো কাট বা বাঁশের উপরে ঘর-বাড়ি বাঁধিয়া যাতায়াতের গল্পও অনেক শুনিয়াছি, তাহার ভিতরকার সত্য-মিথ্যার পরিমাণ নির্দেশ করা সহজ নয়। সাম্পানে পাড়ি দেবার কথাও অনেক শুনিয়াছি। এখনও রেঙ্গুন শহরের দক্ষিণে উত্তরে যে নদী রহিয়াছে তাহাতে যাহারা সাম্পান চালায় সে সব মাঝি-মাল্লার শতকরা অন্ততঃ সত্তর জন চট্টগ্রামের মুসলমান। তাহার পরে অবশ্য প্রধান হইয়া উঠিল ব্রিটিশ আমল হইতে ছোট বড় জাহাজে চড়িয়া যাতায়াত, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র মধ্যেই রেঙ্গুনযাত্রী বাঙালীগণের জাহাজ-যাত্রার সে-সব বর্ণনা এখন পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা বলিয়া গ্রহীতব্য।

এখন সেই জলের জাহাজেরও যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন উড়ো জাহাজের যুগ—চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন বা কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন—ছ'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার পথ। সমুদ্র-পথে যাত্রি-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-পথে চলিতে সমুদ্রের অভিজ্ঞতা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই—এখন আবার এক বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা। দমদম বিমানঘাঁটি হইতে বিমানে উঠুন; প্রথমে নীচের দিকে তাকাইলে শহরতলীর সাদা-লাল বাড়ি-ঘর, তাহার পরে আরম্ভ হইল গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে খড়ের ঘর—তাহার পরেই কুঞ্চিত বনাঞ্চল আর কেবল ছোট বড় আঁকাবাঁকা নদী—তাহার পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর

বেড়াজাল, মাঝে মাঝে দ্বীপের মত বনাঞ্চল—তাহার পরে কিছুকাল শুধু নদী আর চড়া—তাহার পরে সোজা সমুদ্রের উপর দিয়া পাড়ি। তীরের রেখাটি মুছিয়া যাইতে বেশি সময় লাগে না, ঠিক তাহার পরেই 'নীলিমায় নীলিমায় মহিমায় মহিমায়' মহামিলন। উপরে এবং চারিদিকে আকাশ নীল, নীচে সমুদ্র আরও ঘননীল। সমুদ্রের নীলে আর আকাশের নীলে কোথায় গিয়া যে মেলামেলি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। নীচের যে অসীম ঘন নীল তাহার উপরে ইতস্ততঃ সাদা সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আর উপরে যে আকাশের নীল তাহার নীচেও পাতলা সাদা সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে —আমাদের বিমানটা যেন মাঝখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ানো একটা সাদা চিল। কোথাও যেন তেমন কোন বন্ধন নাই, শূন্যটা যেন চারিদিকে ছড়ানো নীল শূন্য; যে পর্যন্ত আবার ব্রহ্মের পাহাড়ি কূল না দেখা দেয় সে পর্যন্ত চারিদিকের নীলে ঘেরা মনটা সত্যই চিলের মত অলস পাখায় ভর দিয়া ঘুরপাক খাইতে চায়।

নীচের নীলের মধ্যে যখন আবার সাদা সাদা অনেক বিন্দু দেখা যাইতে থাকে তখন বোঝা গেল ব্রহ্মের কূলে আসিয়া পৌছিয়াছি। সাদা সাদা বিন্দুগুলি ছোট ছোট সব দ্বীপ। দূর হইতে অত সাদা দেখায় কেন বুঝিতে পারি না। বঙ্গদেশের উপকূলের দ্বীপগুলিকে অমন সাদা দেখায় না। ব্রহ্ম-উপকূলের বড় বড় দ্বীপগুলির চারিদিকেও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কেমন যেন চওড়া সাদা রেখার ঘের টানা। তাহার পরেই আবার আরম্ভ হইল পাথুরে মাটি আর কুঞ্চিতঘন বনের পরে বন—অল্প পরেই রেঙ্গুন শহর।

রেঙ্গুন বিমানঘাঁটিতে যখন পৌছিলাম তখন বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। কিছুদূর পূর্ব হইতেই নীচে ঘন মেঘ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বিমানঘাঁটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকিলেও বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। বিমানের সিঁড়ির কাছেই একটা বাস আনিয়া দাঁড় করানো হইল, তাহাতে করিয়া আমরা আমাদের বিবিধ প্রকারের পরীক্ষা-গৃহে আসিয়া পৌছিলাম। সম্মেলনের স্থানীয় উদ্যোক্তৃবর্গই উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সহজে ছাড়াইয়া লইলেন; তের মাইল পথ মেঘাবৃত আকাশ এবং টিপ্ টিপ্ বর্ষার মধ্যে অতিক্রম করিয়া রেঙ্গুন শহরে আসিয়া পৌছিলাম।

যে বাড়িতে আমার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল সে বাড়িটি কাঠের তিনতলা বাড়ি। বাহির হইতে দেখিয়া সব সময় কাঠের বাড়ি বোঝা যায় না; কারণ অনেক বাড়িরই সামনের দিকে অনেক সময় কিছু কিছু ইঁটের কাজ থাকে, তাহার উপরে বিলাতি মাটির আস্তরণ বেশ সংশয় সৃষ্টি করে। কিন্তু মেঝেতে হাঁটিবার সময়েই স্পষ্ট বোঝা যায়।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যেই একটু পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণ নদীতীরের বড় একটি প্যাগোডা (স্থানীয় লোকে বলে 'কায়া') বা বুদ্ধমন্দির দেখিয়া আসিয়াছি। ব্রহ্মদেশ মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মের দেশ—প্রথমেই তাই বুদ্ধমন্দিরে সমাসীন বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া আসিয়া মনটি ভাল লাগিল। সন্ধ্যার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিন-তলার পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়াছিলাম। সামনে একটা খোলা মাঠ; কিন্তু আমাদের বাড়ির বারান্দাটা ঘেঁষিয়া একটা আমগাছ ও একটা বড় শিরীষগাছ জাগিয়া উঠিয়াছে। গাছের ডালে অন্ধকারে বার বার পাখীর পাখা ঝাপটাইবার শব্দ পাইতেছিলাম; বুঝিলাম দিনের বেলা বৃষ্টিতে ভিজিয়া অনেক পাখী আসিয়া এই গাছে আশ্রয় লইয়াছে; তাহাদেরই ঘন ঘন পাখা ঝাপটাবার শব্দ। শেষ রাত্রে সেই শিরীষগাছের পাখীগুলির ডাকেই ঘুম ভাঙিল। কি পাখী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না, ভাবিলাম, কোন নূতন পাখী নাকি! তখনও একে-বারে ফর্সা হয় নাই, গাছের পাতার আড়ালে-বসা পাখীগুলিকে তাই তখনও পরিষ্কার চিনিতে পারিতেছিলাম না। খানিকটা যেন শহুরে কাকের ভাঙাগলার ডাক, খানিকটা যেন তাহাতে ঘুঘু পাখীর কণ্ঠস্বরের মিশ্রণ, উভয়ে মিলিয়া কণ্ঠস্বরের একটা অভিনবত্ব। একটু ফর্সা হইলে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, হ্যাঁ—কালো কালো কাকই ত বটে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অমন পরিবর্তন আমার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ লাগিল। একটা জিনিস সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া বুঝিলাম। প্রাকৃতিক অবস্থানের পরিবর্তন কণ্ঠস্বরের কিরূপ পরিবর্তন আনে! বোধহয় বাগযন্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারগুলির ভিতরেই এই

পরিবর্তন আসে; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রচিত তারের এই পরিবর্তনই আনে ধ্বনির ভিতরে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনই হইল বিশেষ বিশেষ ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের মূল। কাক এত পরিচিত পাখী এবং তাহার কণ্ঠস্বরের সহিত ভোরবেলা হইতেই আমাদের এত পরিচয় যে কাকের কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন বুঝিয়া লইতে আমার কিছুই কষ্ট হইল না।

যেদিন গিয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিলাম তাহার পরের দিন সন্ধ্যায়ই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন হইল। এই সম্মেলন সম্বন্ধে বলিবার কথায় পরে আসিতেছি। তাহার পরের দিনই ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন। আমি সকালবেলায়ই উঠিয়া রেঙ্গুনের প্রধান বুদ্ধমন্দির স্যুয়েডাগন্ প্যাগোডায় গেলাম। স্থানীয় বাঙালীরা ইহাকে বলেন 'বড় ফায়া'। ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক শহরেই অনেকগুলি 'ফায়া' আছে, ইহার ভিতরে সাধারণতঃ একটি থাকে 'বড় ফায়া', স্যুয়েডাগন্ই হইল রেঙ্গুনের সর্বপ্রধান ফায়া বা বুদ্ধমন্দির। স্যুয়েডাগন্ ফায়া শব্দের অর্থ হইল স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধমন্দির। বিরাট এই ফায়াটির সর্বত্র সোনার রঙের কাজ করা, সেইজন্যই এটিকে বলা হয় সোনার মন্দির। এই ফায়াগুলি আকৃতিতে হইল নীচের দিকটায় একটা বিরাট স্তূপের আকৃতি, উপরের দিকে সেই স্তূপ ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া প্রায় অভ্রভেদী হইয়া ওঠে। কোন কোন ফায়ার ঠিক মাঝখানে একটি গর্ভমন্দিরের মত আছে, তাহার ভিতরে সাধারণতঃ পিতলের বা মার্বেল পাথরের অথবা চীনামাটির বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনেক ফায়ারই কোনও গর্ভমন্দির নাই; চারিদিকে চারিটি কাঠের কারুকার্যখচিত দীর্ঘ প্রবেশ-পথ; আর সেই প্রবেশপথের সামনেই ফায়ার গায়ে প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি, আশেপাশে অনেক বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধশিষ্য অর্হৎগণের মূর্তি। সেইখানেই অনেকখানি বসিবার স্থান; সামনে ঘেরদেওয়া অল্প উঁচু কাঠের দেয়ালের মত; তাহার উপরে স্থাপিত নানা ধাতুতে নির্মিত নানা আকৃতির বড় বড় অনেকগুলি ফুলদানি। ভক্তগণ প্রবেশ পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া ঐ বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে, চুপ করিয়া প্রার্থনা করে, মন্ত্রপাঠ করে, বার বার প্রণাম করে—তাহার পরে হাতের পুষ্পগুচ্ছ ঐ ফুলদানিতে সাজাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। কেহ কেহ বা একপাশে বসিয়া মালা লইয়া নীরবে জপ করিতে থাকে; কেহ বুদ্ধের কোন এক নাম জপ করিতেছে, কেহ বা 'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স' এই মন্ত্রেই জপ করিতেছে। ফায়ায় চারিদিকের চারিটি প্রবেশ-পথের সম্মুখেই যে এইভাবে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা নহে; কোন কোন ফায়ায় বিরাট স্তূপটি ঘিরিয়া এইরূপ পর পর বহু বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে; এবং অনেক বুদ্ধমূর্তির সামনেই অনেক লোক যাহাতে বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকে। এই জাতীয় পরিকল্পনার পিছনে উদ্দেশ্য এই থাকে যে—একটি ফায়াতে একই সময়ে যাহাতে বহুসংখ্যক ভক্ত নরনারী বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে বসিয়া শান্তভাবে প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারে।

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন সকাল হইতে মনে হইতেছিল, ভগবান বুদ্ধের স্মরণে সমস্ত শহরবাসী যেন নূতন চেতনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে দেখিতে লাগিলাম, সব বয়সের ব্রহ্মবাসী নারীপুরুষই প্রত্যূষে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে চলিয়াছে বুদ্ধ মন্দিরের দিকে। সব বয়সের মেয়েরাই গায়ে মুখে 'তানাকা' মাখিয়াছে, মাথার চুলে কিছু না কিছু সাদা ফুল পরিয়াছে। 'তানাকা' ব্রহ্ম নারীরা খুবই গায়ে মুখে মাথায়; অনেকটা চন্দনের মতন; কাঠ ঘসিয়া গায়ে মুখে লাগাইতে হয়, শরীর খুব স্নিগ্ধ শীতল ও মসৃণ রাখে। আর মাথায় ফুল না পরিলে ব্রহ্মনারীদের যেন কোন প্রসাধনই হইল না।

ফায়ার দিকে যত নরনারী চলিতেছে তাহাদের প্রায় সকলেরই হাতে ফুলের গুচ্ছ; যাহাদের হাতে ফুল ছিল না তাহারাও দেখিলাম ফায়ার প্রবেশপথের দুইধার হইতে ফুলের গুচ্ছ কিনিয়া লইতেছে। অপরে মোমবাতি আর ধূপকাটি কিনিয়া লইতেছে। সবাই গিয়া নীরবে ধূপ মোম ফুল লইয়া বসিতেছে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে—প্রার্থনা করিতেছে, মন্ত্র পড়িতেছে, বার বার নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেছে—আর সমগ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে, পাদমূলের ফুলদানিগুলিতে ফুল অর্পণ করিয়া। কেহ কেহ এ-পাশে ও-পাশে গিয়া মোমবাতি জ্বালাইয়া দিতেছে, ধূপকাঠি জ্বালাইয়া দিতেছে, নানা উপকরণে ভাত থালায় সাজাইয়া বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছে। আশে পাশে ছোট ছোট কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে তাহা

কত যত্নে জল দিয়া স্নান করাইয়া দিতেছে। বড় ফায়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম—নানা বাদ্যবাজাইয়া একটি শোভাযাত্রা আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার ভিতরে কিছুসংখ্যক নানা বয়সের বৌদ্ধ ভিক্ষু রহিয়াছেন (বালক ভিক্ষুর সংখ্যাও কম নয়), ওখানে যাহাদের বলা হয় ফুঙ্গি, আমরা বলি ফুঙ্গি। কিন্তু ফুঙ্গির সংখ্যা কম, গৃহীর সংখ্যাই বেশি। গৃহী ভক্তগণের হাতে—বিশেষ করিয়া সুচি-সজ্জিতা কিশোরী এবং যুবতীগণের হাতে একটি করিয়া সুন্দর অঙ্কনযুক্ত মৃৎপাত্র—তাহার ভিতরে সুবাসিত পবিত্র জল—উপরে কিশলয়ের পল্লব—সকলে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে ঐ মৃৎপাত্রের জলে ভগবান বুদ্ধকে স্নান করাইয়া দিবার জন্য।

ফায়ার এদিক সেদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিলাম, আর মনটা কেমন একটা স্নিগ্ধ শান্তির স্পর্শ লাভ করিতেছিল। যিনি মানুষের মধ্যে মহত্তর—যিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্ হইয়া মানুষের জীবনের সত্যকে দেখিয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নিখিল মানুষের মনে কি আগ্রহ—কি আর্তি। যিনি কঠোর বৈরাগ্যে নিজেকে রিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন অমৃতের সন্ধানে, তাঁহার পাদমূলে গুচ্ছে গুচ্ছে সৌন্দর্য-নিবেদনের কি ব্যাকুলতা! যিনি বিষয়াসক্তি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া লইয়াছিলেন মানুষের কল্যাণ কামনায় তাঁহারই পাদমূলে অর্জিত অর্থের কিছুটা অর্পণ করিতে পারিয়া সাধারণ মানুষ কত মন গভীর তৃপ্তিলাভ করিতেছে। যিনি শ্মশানে পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ করিয়া পরিধানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য গৃহীর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যিনি অনাহারে ত্বগস্থিসার হইয়া বোধির ধ্যান করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বিবিধ অন্ন নিবেদন করিয়া সাধারণ গৃহিগণের কত যেন একটা পরিতৃপ্তি! প্রত্যেক স্তরের মানুষের মধ্যেই লুকাইয়া আছে বোধির বীজ স্ফুট-অস্ফুট শ্রেয়োবোধের রূপে। সেই শ্রেয় যে-মানুষের মধ্যে একদিন পরিপূর্ণভাবে বিষয়ীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল সেই মানুষকেই পরমশ্রেয়—পরমমঙ্গলের বিগ্রহরূপে মানুষ আজ ভগবান্ করিয়া লইয়াছে। যেমন করিয়া লোক তাঁহার উদ্দেশ্যে কিছু দান করিয়া—তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া—বার বার তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া—তাঁহার উদ্দেশ্যে পুষ্প গন্ধ দীপ নিবেদন করিয়া মানুষ নিজের ভিতরকার বোধিবীজের ক্ষণিক-স্পন্দনে অন্ততঃ একটি দিনের জন্য—অন্ততঃ একটি ক্ষণের জন্য সাড়া দিয়া নিজের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়; এই উপলব্ধিতেই চরিতার্থ তাহার ধর্মবোধ।

একদিন রেঙ্গুন হইতে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল দূরে চায়টং নামক একটি স্থানে নদীর মধ্যে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে একটি ফায়া দেখিতে গিয়াছিলাম; অনেকখানি ভাঁটীতে ব্রহ্মপুত্রনদীর ভিতরে ছোট পাহাড়ে অবস্থিত উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরের মত। ঠিক সেখানেও যেমন কূল হইতে ছোট দাঁড়ের ডিঙ্গিতে পার হইয়া মন্দিরে পৌছিতে হয় এখানেও তেমনি সাম্পানে করিয়া তীর হইতে গিয়া ফায়ায় পৌছিতে হয়। উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরে যাইতে যেমন মন্দিরের চারিদিকে জলের কুটিল আবর্তের ভয় এখানেও ঠিক তাহাই। যাক্, অনেক গ্রামের পথ দিয়া এই ফায়া দেখিতে আসিতেছিলাম, ঠিক যেন আমাদের দেশের অজ পাড়া গাঁ, সেইরূপ দৈন্য-দারিদ্র্যের লক্ষণ গৃহশ্রীতে এবং নরনারীর দেহে পোষাকে। একটি গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতেছি। সেদিনও মেঘ—তড়ি ঘড়ি বর্ষা পড়িতেছে। একটি গ্রাম্য ভিক্ষুকে দেখিলাম ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া এক গৃহীর বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া আছেন, ভিক্ষু আসিয়াছে দেখিয়া অল্পবয়সী একটি মহিলা সাধারণ এক খানি থালায় কিছু খাবার (সম্ভবতঃ ভাত) লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সেই খাবার ভিক্ষুকে দিয়া আবার চলিয়া গেলেন। যেভাবে তিনি ভিক্ষুকে অন্ন দিলেন তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম। খাবারের থালা খানি লইয়া মহিলাটি ভিক্ষুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাহার পরে থালা হাতে করিয়া ভিক্ষুর সামনে তাঁহার দেহ মনকে নত করিলেন, তাহার পরে ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রে খাবার ঢালিয়া দিলেন, আবার নিজের দেহমনকে নত করিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমার মনে হইতেছিল, ঐ গ্রাম্যভিক্ষুটি ঐ গৃহী মহিলাটির নিকটে একটি মহাভিক্ষুরই প্রতীক—যে মহাভিক্ষু ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া মানুষের জন্য পরম শান্তির বাণী সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন। সেই নরোত্তমের নিকটে

প্রণতির যে আগ্রহ, সেই আগ্রহই মানুষের ধর্মবোধকে সত্যমূল্য দান করিয়াছে।

রেঙ্গুনে বুদ্ধপূর্ণিমার কথা বলিতে বলিতে হয়ত একটু দূরে সরিয়া পড়িলাম। আসলে সেই প্যাগোড়ার মধ্যে সমস্ত পরিবেশ-দৃশ্য ও কার্য আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর সেই ভালো লাগার মধ্যে মনের ভিতরে তুলনায় আরও কিছু পরিবেশ-দৃশ্য ও কার্যের কথা মনে পড়িতেছিল। বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলিতে মোটামুটি চমৎকার একটি শান্ত পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশ। হৈ চৈ একেবারেই কিছু দেখা যায় নাই এমন নহে। সর্বসাধারণকে লইয়া যেখানে ধর্মোৎসব সেখানে খানিকটা হৈ চৈ থাকিবেই। প্রার্থনারত শান্ত নরনারীর মধ্যেই মুখোসপরা সং-সাজা লোকজনের উদ্ভট বাদ্যবাজনা ও নৃত্যসহ শোভাযাত্রাও দুই একটি দেখিলাম। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উদ্ভট লাগিল মোটা মোটা বাঁশের খণ্ড ফাঁড়িয়া দুই হাত দিয়া সেগুলি ঠোকাঠুকি করিয়া বাজাইয়া উৎকট শব্দ করা। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরূপ কিছু কিছু উৎসবের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও সর্বত্র একটা শান্তভাব লক্ষিত হয়। ইহার সহিত আমি মনে মনে তুলনা না করিয়া পারি নাই আমাদের দেশে বিশেষ কোনো ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের দেবস্থান, মন্দির এবং প্রসিদ্ধ তীর্থগুলির অবস্থা। সে যেন রণক্ষেত্র! হৈ হৈ রৈ রৈ, গলদঘর্ম ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি, কলহ-কোলাহল চিৎকার আর্তনাদ—সব জড়াইয়া অনেক সময়ই মনে হইয়াছে—কি একটা বীভৎস পরিবেশ! এক পাণ্ডা আপনাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, অপর পাণ্ডা আপনার তিনপুরুষের উপরে তাহার খাতায় লেখা দখলিস্বত্বের অধিকারে পিছন হইতে আপনার কাপড়-জামা টানিয়া ধরিতেছে, ইহার ভিতরেই দেখিবেন পিছন হইতে আপনার সপ্তপুরুষের মঙ্গলকামী হৃষ্টপুষ্ট কোনো সুপুরুষ আপনার কণ্ঠে একটি মালা জড়াইয়া দিয়া আপনার অঙ্গে তারকব্রহ্মরামনামের ছাপ দিয়া দিতেছেন, এবং আপনি যতক্ষণে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সমস্ত দেহমনের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন ততক্ষণে অবসর পাইয়া কোনো সদব্রাহ্মণসন্তান আপনার বৃদ্ধা মাতাকে সযত্নে একটি কোণে টানিয়া লইয়া দশমুদ্রা দক্ষিণায় তীর্থফলপ্রাপ্তির একটি অতিমহৎ সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করাইতেছেন। তাহার পরে এখানে দর্শনী মুদ্রা—ওখানে দর্শনী মুদ্রা, এখানে মাথা হেঁট করিবার দক্ষিণা—ওখানে ভেটদানের লম্বা ফিরিস্তি—কোথায় আপনার চিত্তের শান্তভাব—কোথায় আপনার প্রার্থনা—কোথায় আপনার প্রণতি! এমন চমৎকার পরিবেশে পাহাড়ের উপরে কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরটি; কিন্তু যেদিন কামাখ্যা দর্শনে গেলাম সেদিন প্রথমই যাহা চোখে পড়িল তাহা এই, পাঠা-ছাগলের স্বচ্ছন্দ বিহার ও মলমূত্রত্যাগে মন্দিরের অঙ্গন নোংরা দুর্গন্ধ হইয়া রহিয়াছে, বলির প্রয়োজনে মন্দিরের পরিবেশই অনুরূপ হইয়া গিয়াছে। পচা বেলপাতার উগ্রগন্ধে নাকে কাপড় না দিয়া বৈদ্যনাথ ধামের বাবা বৈদ্যনাথের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার কোনো উপায় নাই।

আর একটা জিনিস আমার মনে হইল। বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি লক্ষ্য করিলেই মনে হইবে, এগুলি এমন পরিকল্পনা লইয়াই গঠিত হইয়াছে—যাহাতে বহু নরনারী একসঙ্গে চারিদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে শান্ত ভাবে বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারে—প্রণতি জানাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশ মন্দিরই একেবারে তদ্‌বিপরীত; গলিঘিঞ্জি দিয়া অন্ধকার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অথবা অনতিপ্রশস্ত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া দর্শন-স্পর্শন লাভ করিতে হইবে। সুযোগ বুঝিয়া পাণ্ডা পুরোহিতগণও প্রবেশদ্বারে প্রথমে যতটা সম্ভব ভীড় জমাইয়া নয়—তাহার পরে ঠেলাঠেলি চাপাচাপি—যতখানি অর্ধমৃত হইয়া বাহির হওয়া গেল ততখানি পাপের ভার লাঘব করিয়া আনিলাম বলিয়া আমরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

রেঙ্গুনের রাস্তাঘাটে, প্রসিদ্ধ কায়াগুলির অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর কিছু অপ্রাচুর্য দেখিলাম না, কিন্তু কোনো ফায়াতেই তাঁহাদের কোনোরূপ অত্যাচার দেখিলাম না। সব ফায়াতেই টাকা-পয়সা দান করিবার জন্য বাক্স রহিয়াছে, যাহার যাহা ইচ্ছা সেখানেই তাহা দান করিয়া যায়, কেহ কোথাও কিছু চায় না। আর আমাদের কোনো তীর্থের স্টেশনে গিয়া একবার নামিলেন কি, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই এক প্রশ্ন—'বাবুর নিবাস কোথায়—নাম কি

আপনি কোনও অসাধারণ শক্তি ও তিতিক্ষার অধিকারী যদি না হন তবে এই নিবাস ও নাম না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবার আপনার সাধ্যই নাই। এই কিছু দিন পূর্বেও মথুরা গিয়াছিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে নাম-নিবাসের জালায় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম—ভাবিলাম যমুনার কোনো ঘাটে গিয়া একটু চুপ করিয়া বসি। সাধ্য কি? যেখানে গিয়া বসি সেখানেই সেই নাম-নিবাস; মনে হইতেছিল, অন্ততঃ কয়েকটা মুহূর্তের জন্যেও যদি আমার নামের আর নিবাসের কোনো বালাই না থাকিত তাহা হইলে হয়ত একটু সোয়াস্তি লাভ করিতে পারিতাম। শেষ অবধি ঘাটেও বসিতে না পারিয়া নৌকা করিয়া একেবারে যমুনার জলে ভাসিলাম! কোথাও গিয়া একটু শান্ত হইয়া বসা যেন আমাদের মন্দির-তীর্থগুলির প্রথাবহির্ভূত কর্ম।

রেঙ্গুনে গিয়াছিলাম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দিতে; সেই আসল কাজের কথা এতক্ষণে কিছুই বলা হয় নাই। রেঙ্গুনের বাঙালী-সমাজ বহুদিনের একটি আত্মপ্রতিষ্ঠ সমাজ। আগে সংখ্যায় ইঁহারা অনেক ছিলেন, গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই নানা রাজনৈতিক এবং আর্থিক কারণে সে সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মান। বর্তমানে আবার ব্রহ্মসরকার নানা ভাবে বাঙালীগণের উপরে চাপ দিতেছেন ব্রহ্মের নাগরিকতা গ্রহণ করিবার জন্য; নাগরিকতা গ্রহণ না করিলে তাঁহাদিগকে নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, বাঙালীগণ তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ফলে আবার নূতন করিয়া ব্রহ্ম হইতে পলায়নের মনোবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এখন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। একদল আছেন চাকরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া; তাঁহাদের মনোবৃত্তি হইল, যতদিন থাকা যায়, অসুবিধা হইলে সরিয়া পড়িব। আর একদলের এমন চট্ করিয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা এই, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহাদের এভাবে চলিয়া আসিবার কোন ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই। তাঁহারা ওখানেই হয়ত থাকিবেন, তথাপি ওখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত; বিদেশী-রূপে বছরে বছরে বিশেষ কর দিয়াই তাঁহারা ওখানে ভারতবর্ষ বা পাকিস্তানের নাগরিকরূপে বসবাস করিতেছেন। অপর একটি বড় সংখ্যা ব্রহ্মদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া ঐখানেই স্থায়িভাবে বসবাস স্থাপন করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য সঙ্কল্প দেখিলাম, তাঁহারা ব্রহ্মদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া চিরদিন ব্রহ্মদেশেই বাস করিতে চান—কিন্তু তাঁহাদের বাঙালী-সত্তাকেও তাঁহারা অটুটভাবে রক্ষা করিবার কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই বাঙালী-সত্তাকে তাঁহারা রক্ষা করিতে চান বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য, বাঙলা সংস্কৃতির ভিতর দিয়া। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে কত জাতি তো কত দূর দূর স্থানে গিয়া বসবাস করিতেছে, বিদেশে বসিয়া তাহারাও তো নিজেদের জাতীয় সত্তা রক্ষা করিয়া চলিতেছে, আমরা বাঙালীরাই বা তাহা পারিব না কেন? এই জাতীয়তার সংরক্ষণ আমাদের বিদেশে বসিয়া জীবনকে গড়িয়া তোলাকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবে। ইঁহাদের দৃষ্টির প্রখরতা দেখিলাম। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিলাম। বিদেশে বসিয়াও ছিন্নমূল হইয়া ইহারা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ঘুরিয়া মরিতে চান না; ইঁহারা চান, বাঙালী হইয়াই ব্রহ্মদেশের উর্বর মাটিতে শিকড় প্রসারিত করিব; সেখান হইতে জীবনের যে অভিজ্ঞা-অনুভূতি লাভ করিব তাহা দ্বারা বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকেই বিচিত্র সম্পদে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিব।

রেঙ্গুনবাসী এই শ্রেণীর বাঙালীগণের এই সব কথা যে শুধু মুখের কথাই নয়, ইহার মধ্যে সত্য আছে—সম্ভাবনা আরও অনেক আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। চারিদিন ধরিয়া তাঁহারা সাহিত্য-সম্মেলন, সঙ্গীতানুষ্ঠান, শিল্পপ্রদর্শনীর ভিতর দিয়া যে মানসিক-প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভিতরে তাঁহারা 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' এই নীতিকেই যে মনেপ্রাণে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন তাহা বোঝা গেল। একদিন সঙ্গীতানুষ্ঠানে দেখিলাম, রেঙ্গুনের জনৈকা প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা এবং বর্তমানে আকাশবাণীর গায়িকা আমাদিগকে গান গাহিয়া শোনাইলেন; প্রথমদিনে তিনি ব্রহ্মদেশীয় সঙ্গীতই গাহিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তিনি গাহিয়া শুনাইলেন দুইখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত, একখানি, 'আমি ভয় করব না ভয় করব না', দ্বিতীয়খানি, 'নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি';

স্বর এবং উচ্চারণ একেবারে নিখুঁত না হইলেও মোটা-মুটি ঠিকই ছিল। অনেকখানি শ্রদ্ধা ও যত্ন ব্যতীত ইহা সম্ভব হয় নাই; এই শ্রদ্ধা ও যত্নের মূলে রেঙ্গুনবাসী বাঙালীরা রহিয়াছেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। রেঙ্গুনে একটি 'টেগোর সোসাইটি' রহিয়াছে; মুখ্যতঃ বাঙালীগণ দ্বারা সংগঠিত এবং পরিচালিত হইলেও বাঙালী-গণ ইহার মধ্যে অবাঙালী এবং অভারতীয় সকলকেই টানিয়া লইয়াছেন। প্রতি বৎসর তাঁহারা কলিকাতা বা শান্তিনিকেতন হইতে কোনও বিশিষ্ট দলকে লইয়া যান এবং স্থানীয় শিল্পিগণের সহযোগিতায় নিখুঁতভাবে সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য এবং অন্য নাটক করিবার ব্যবস্থা হয়। বিদেশীয়গণের মধ্যেও ইঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রচারের ভাল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এবারের সাহিত্য-সম্মেলনে স্থানীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার জন্য লিখিত গল্পগুলি আমি পড়িয়াছি। গল্পগুলি যে একেবারে নিখুঁত বা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু কয়েকজনের লিখিত গল্পের ভিতর দিয়া বাঙলা সাহিত্যের একটি নূতন সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি ইঙ্গিত লাভ করিলাম। তাঁহারা গল্পগুলি লিখিয়াছেন ব্রহ্মদেশীয় জীবন লইয়া, নায়ক-নায়িকা ও পার্শ্বচরিত্র পরিবেশ সবই ব্রহ্মদেশীয়। জিনিসটি আমার নিকটে অতি তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাস ছোট গল্প নাটক সর্বত্র বিষয়বস্তুর পরিধির মধ্যে একটা বড় দৈন্য লক্ষিত হয়। জীবনের ক্ষেত্রে বাঙালী জীবনের পরিধিকে যেন আমরা কিছুতেই আর অতিক্রম করিতে পারি না। ব্যতিক্রম যে একেবারে কিছুই নাই তাহা বলিতে পারি না, তবে অতি বিরল। ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা পাকে প্রকারে যেন সেই একই বাঙালী জীবনের অফুরন্ত পাঁচালী। ইংরেজি সাহিত্যে তো ঠিক তাই নয়। যে-দেশে লেখক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছেন সেই দেশের পরিবেশে সেই দেশের বিচিত্র জীবন লইয়াই তাঁহারা সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। আমাদের ভিতরকার যাঁহারা দীর্ঘদিন ব্রহ্ম দেশে রহিলেন ব্রহ্মদেশের জীবন-বিচিত্রা লইয়া তাঁহারা যদি বাঙলায় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে আমাদের সাহিত্যে নূতন সরসতাও আসিবে, সমৃদ্ধিও আসিবে।

সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিল রেঙ্গুনবাসী বাঙালীগণের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ দেখিয়া। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলে ঘরে মায়ের আকর্ষণ যেমন আরও বেশি করিয়া দেখা দেয়, ইঁহাদেরও যেন তাহাই হইয়াছে।

আর একটি নূতন অনুভূতি লাভ হইয়াছে রেঙ্গুনে গিয়া। এক বাঙলা ভাষাভাষী—এক বাঙলা সাহিত্যের রসে পরিপুষ্ট—এক বাঙলা সঙ্গীতের অনুরাগী একটি বাঙালী জাতি বলিয়া দুনিয়ায় যে কোন জাতি আছে, তাহা এই পনর বৎসরের রাজনৈতিক ডামাডোলে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি। শুধু ভুলিয়া গিয়াছি বলিলে সব কথা বলা হইল না, ইচ্ছা করিয়া সে-কথা স্মরণে আনাও আজিকার দিনে মহা পাপ—স্পষ্টতঃ রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধ। বঙ্গ ভাগ হইয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু পাছে বঙ্গকে অবলম্বন করিয়া কোনো ঐক্যের স্মৃতিজাগিয়া ওঠে সেই জন্য পূর্ববঙ্গ নামটিও লুপ্ত করিয়া দিয়া পূর্ব পাকিস্তান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে বাঙলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে বসিয়া বাঙালী এত ভালবাসে—যে বাঙলা সাহিত্যকে তাহারা বুকের সকল দরদ দিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিতেছে, সেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী যুবকগণ বুকের রক্ত দিয়াছে। এই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে—এই বাঙলার গানকে নিত্য-নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে ও আস্বাদ করিতে পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রহ চেষ্টা যত্নের কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য নাই। এ কথা পশ্চিমবঙ্গে বসিয়াও মন খুলিয়া বলা যায় না, পূর্ব-বঙ্গে বসিয়াও বলা যায় না, ব্রহ্মদেশে বসিয়া এক সঙ্গে মুক্ত-কণ্ঠে এ কথা টুকু আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা লইয়া বলিতে পারিয়াছি। রেঙ্গুনের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের নিকটে যেমন আহ্বান আসিয়াছে, ঠিক তেমন করিয়াই আহ্বান গিয়াছে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক এবং কলা শিল্পীগণের নিকটে। আমরাও যেমন করিয়া সানন্দে সাড়া দিয়াছি, তাঁহারাও তেমন করিয়াই সানন্দে সাড়া দিয়াছেন; রেঙ্গুনে গিয়া আমরাও যেমন করিয়া বুক ফুলাইয়া বলিয়াছি 'মোদের গরব মোদের

আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!'—তাঁহারাও কথাটাকে তেমন করিয়াই প্রাণ ভরিয়া বলিয়াছেন। আর রেঙ্গুনের যাহারা বাঙালী তাঁহারা সমবেতভাবে আমাদিগকে যখনই সম্বোধন করিয়াছেন তখন তাঁহারা বার বার একটি কথাই বলিয়াছেন, 'মাতৃভূমি হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও শিল্পি-বৃন্দ!' অন্ততঃ কয়েকটি দিনের জন্য দেখিয়া আসিলাম এবং স্থানীয় ও নবাগত সকলের ধ্যান-মনন, আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া এই কথাটা অনুভব করিয়া আসিলাম—পৃথিবীতে বাঙালী বলিয়া একটি জাতি আছে—তাহার একটি মাতৃভূমি আছে—একটি ভাষা—একটি সাহিত্য—একটি সংস্কৃতি আছে। রাজনৈতিক ভেদরেখা সেই সত্যকে এখনও সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দিতে পারে নাই।

পঞ্চাশ বছর আগে

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পঞ্চাশ বছর আগে যার কাঁচা লেখা
এই মাসিকের বুকে দিয়েছিল দেখা
ছাপার অক্ষরে;
বহুকাল পরে
নিকটে তাহার
আসিয়াছে জোরাল তাগিদ
লেখা পাঠাবার।

অতীতের নড়বড়ে, জংধরা জানালাটা
মাথার শিয়রে
রুদ্ধ ছিল বহুকাল ধরে।
তার কথা বেমালুম গিয়েছিনু ভুলে।
কে আজিকে দিল তারে খুলে
লেখা-পাঠাবার এই তাগিদের ছলে।

ধুলো-পড়া, ঝুলে-ভরা খোলা সেই জানালাটা দিয়ে
কখন সহসা,
বহুদূর হতে ভেসে-আসা
এলো-মেলো একরাশ
দমকা বাতাস
ঢুকে পড়ে ঘরে,
বহুদিনকার জমা গুমোটের পরে।

দুরন্ত খেয়ালী সেই দমকা হাওয়ায়
এলো-মেলো হয়ে খুলে যায়
গোড়াকার পাতাগুলো ফের,
পড়ে-ফেলা জীর্ণ পাতা জীবন-নাট্যের।

ভেসে ওঠে কত ছবি কত ঘটনার,
ভুলে-যাওয়া কত মুখ জেগে ওঠে ধীরে ধীরে
ভেদি অন্ধকার,
ছোপধরা, মুছেযাওয়া রং-এ ও রেখায় একাকার;
পঞ্চাশ বছর আগেকার।

পঞ্চাশ বছর আগে যার কাঁচা লেখা
এই মাসিকের বুকে দিয়েছিল দেখা
ছাপার অক্ষরে;
বহুকাল পরে—
তারও দেখা পেয়ে গেছি
খোলা ঐ বাতায়ন-পথে,
আজি যার সাথে
হয়ে গেছে ছাড়াছাড়ি,
আমার হারানো সেই পুরান আমাকে
দেখিয়া ফেলেছি আজ খোলা ঐ জানালার ফাঁকে।

দেবতার মুখ

মায়া বসু

বল হরি! হরিবোল!

তখনও ভোর হয়নি। নক্ষত্রবিরল আবছা আকাশের শেষ তারা কটাও ঘুমে ঢুলছে। অনির্বাণ চিতার আগুন বুকে নিয়েও সদাজাগ্রত শ্মশানটা বোধকরি সমস্ত দিনের পর শেষ রাত্রের ঝোঁকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত শ্মশানবন্ধুদের পরলোকযাত্রীর কানে সরব মন্ত্রোচ্চারণে চমকে জেগে উঠল আবার।

শেষ চিতাটা এখনো জলছে। চুল পোড়ার গন্ধ, মাংস চামড়া পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। চিতার কাছেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে একটা মাঝ-বয়সী ঝাঁকড়া চুলো লোক। তার পাশে বসে ঢুলছে আর একটা লোক। তবে ঘুমে নয় নেশায়। চিতার প্রায় নিভন্ত আগুনে বাঁশ দিয়ে অপর লোকটা কাঠ ঠেলে দিচ্ছে। আগুন খুঁচিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ও। চিতার আগুনে ওর মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে।

বল হরি! হরিবোল!

আবার একটা এলো!

একটা শেষ নাহতেই।

কোমরে গামছা বাঁধা লোকগুলো খাটিয়া সুদ্ধ মড়াটাকে নামিয়ে পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। বোঝা গেল, অনেক দূর থেকে হেঁটে আসতে হয়েছে ওদের।

বসে থাকা লোক দুটো, বাঁশ হাতে আগুন খুঁচিয়ে দেওয়া লোকটা তাকাল নতুন-আনা মড়াটার খোলা মুখের দিকে। বছর পঁচিশের স্বাস্থ্যবান সুদর্শন লোকটা যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে রয়েছে। রোগের কোন যন্ত্রণা বা বিকৃতির চিহ্ন পর্যন্ত সে মুখে নেই। ভোর হলেই ও যেন চমকে জেগে উঠে বসে আশ্চর্য হয়ে ভয়ানক ভয় পেয়ে বলে উঠবে, আমাকে এখানে আনলে কেন তোমরা? আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মাঝবয়সী ঝাঁকড়া চুলো লোকটা চমকে শিউরে উঠে আবার চোখ বন্ধ করে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজল।

ওকে ওভাবে শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করতে দেখে বাঁশ হাতে দাঁড়ানো লোকটা নেশায় আরক্ত চোখ দুটো কুঁচকে

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। নিস্পৃহ উদাসীন দৃষ্টিতে তাকালো বসে থাকা অপর সঙ্গীটির দিকে। ফিস ফিস করে বলে উঠল, শালা! একেবারে বুঁদ! নেশা করে জ্ঞান-গম্মিটুকুও হারিয়ে বসেচে! তুই চোখ বন্ধ করে থাকবি বলে ভেবেচিস শালার যমও চোখ বন্ধ করে থাকবে? তোকেও দেখতে পাবে না?

যা বলেছিস মাইরী! অপর লোকটা ঢুলু ঢুলু চোখে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ব্যাটা পাকা মাতাল হয়ে বসে আছে! নেশা কর্‌বি কর্—তা বলে মাতাল হবি কেন?

ঘাটবাবু!

সাড়া এল না।

ঘাটবাবু! ও রেজেষ্টারিবাবু—

শেষ রাতের আয়েশের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। বিরক্ত চিত্তে নকুড় হালদার স্বগতোক্তি করল, দেবো শালার চাকরি ছেড়ে। একটু চোখ বন্ধ করার উপায় নেই। সাত সকালে এনে হাজির করেছে ব্যাটারা? একটু পরে এলে যেন পৃথিবী রসাতলে যেত! জ্বালিয়ে খেলে!

আবছা অন্ধকার বারান্দায় হাতলহীন চেয়ার আর বহু যুগ আগেকার রং ওঠা কাঠচটা সাড়ে তিন পায়ার টেবিল। অদৃশ্য বাকী আধখানা পায়ার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে কাঠ-কুটো কাগজ দিয়ে উঁচু করে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও টেবিলটা সমান হয়নি। তিনদিক উঁচু। একদিক নীচু।

গঙ্গার ধারের রাস্তার দিককার রেলিং খানিকটা ভাঙ্গা। বারান্দা ভর্তি ঝুল কালি। অবিরাম চিতার ধোঁয়ায় সব যেন বিবর্ণ, মলিন, ছায়াচ্ছন্ন। একটু দূরেই গঙ্গার কোল ঘেঁষে পোড়া কাঠের টুকরো। ভাঙ্গা কলসী। ছেঁড়া ন্যাকড়া, তুলো-ওঠা বালিশ। পোড়া ছাই। ঘিয়ে ভাজা হাড় জিরজিরে লোমওঠা কুকুর কটা এমন কি পাতা ঝলসানো শ্রীহীন বিগত যৌবন শ্মশানের প্রহরীর মত গাছ কটাও কেমন যেন একাকার হয়ে গেছে সেই অনির্বাণ চিতার ধোঁয়ায়। কুয়াশায়।

সাড়া দিয়ে, হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নকুড় হালদার। চেয়ারে বসে এক হাতে চশমাটা নাকের উপর বসিয়ে আরেক হাত বাড়াল নবাগত শোকাচ্ছন্ন লোকটির দিকে। ডেথ সার্টিফিকেট?

মুহ্যমান লোকটা ডাক্তারের সই দেওয়া কাগজখানা এগিয়ে ধরল।

রেজেষ্টারির খাতাটার পাতাগুলো খর খর করে ওলটাতে ওলটাতে ঘাটবাবু প্রশ্ন করল, নাম?

নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বয়স?

এই পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে পা দিয়েছিল মাত্র। লোকটার গলা ধরে এলো।

এখানে সই করুন। কে হয় আপনার?

শত্তুর, ঘাটবাবু শত্তুর!—

কাঁপা হাতে সই করতে করতে প্রায়-বৃদ্ধ লোকটা হাহাকার করে উঠল। মায়ের পেটের সহোদর ভাই। কোন ছেলেবেলায় মা বাপ মারা গেছে। বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। লেখাপড়া শিখিয়েছি। চাকরি পেল। বিয়ে দিলাম ঘটা করে। ঘর আলো করা বৌ এলো। তিনটে বছরও কপালে সইল না!

শ্মশানের চিরন্তন মৃত্যু বিচ্ছেদ বিলাপে অভ্যস্ত নকুড় হালদারের ঘাটাপড়া মনটাও ব্যথিত হয়ে উঠল।

কি আর করবেন বলুন দাদা? এ তো মানুষের হাত নয়। আড়ালে বসে আর একজন কলকাঠি নাড়ছেন। এ তাঁরই কাজ। চোখের উপর যা দেখা যায় না, বসে বসে তাই-ই দেখছি। তা আপনার বৌমার ছেলেপুলে আছে তো?

কপালে হাত দিল শোকার্ত প্রৌঢ়। বৌমা পোয়াতী। এই মাস কয়েক হবে। ভগবান ওর এতবড় সর্বনাশ করলেন। এই গুঁড়োটুকু যেন বেঁচে থাকে।

লোকটা নেমে চলে গেল। ঘাটবাবু খাতা বন্ধ করে হাঁক পাড়ল, তিনে, এই তিনে—

বারান্দার আধা অন্ধকার কোন থেকে ঘুম জড়িত আওয়াজ এলো, যাই বাবু।

বসে বসে আর একটা হাই তুলল ঘাটবাবু। আসতে হবে না। দয়া করে এক ভাঁড় চা এনে দাও তো বাছাধন, দেখো যেন ঠাণ্ডা জল না হয়ে যায় আবার।

হালদার মশাই!

রেলিং ঘেরা বারান্দার ওধারেই নদীর ঘাটে যাবার পথ। বেশ কিছুদিন এই পথ দিয়ে অল্প বয়সের সাধুটি গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করতে যান। সংসার সম্বন্ধে ওঁর যতটা বৈরাগ্য, শ্মশান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রায় ততটাই। আসা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে নকুড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-চার কথা বলেন।

ঘাটবাবুও ওঁকে দেখলে উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করে। কবে কটা এলো। দিনে-রাতে তার কাজের বিরাম নেই। এই অতি জঘন্য কাজটা ছেড়ে দিতে পারলে যে ঘাটবাবু বাঁচে, এ কথাও প্রত্যেকদিন কয়েকবার করেই শুনতে হয় সাধুকে।

গৃহত্যাগী হলেও পুরোপুরি সন্ন্যাসী উনি এখনো হননি। পরণের ধুতিটা পাট করা হলেও সাদা। বৈরাগ্যের গেরুয়া রং ধরেনি তাতে।

এই যে সাধুদাদা! রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালো নকুড় হালদার। কতক্ষণ? স্নানে যাবার সময় হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এর মধ্যেই এসে গেছে। আপনার কাজ সুরু হয়ে গেছে কাক ডাকতে না ডাকতেই।

দেখুন দাদা, চাকরির সুখ! রাত-দিন মড়া ঘাঁটা আর ভাল লাগে না। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, দি শালার চাকরি ছেড়ে—

সান্ত্বনা দিলেন সাধুদাদা। শবই তো শিব ভাই! সেই শিবের শেষ কাজে যে সাহায্য করে, সে তো মহা-পুণ্যবান!

আর পুণ্যি! সক্ষোভে ঘাটবাবু কপাল চাপড়াল। উপায় থাকলে কবে এ শালার চাকরি ছেড়ে দিতাম। দেবোও তাই। হাতে কিছু জমলে সোজা দেশে চলে যাবো। গোটা দুতিন গরু আছে। জমি-জমা আছে। চলে যাবে কোন মতে। মা তো চিঠির উপর চিঠি লিখছেন। মেয়ে ঠিক করা আছে কবে থেকে। বিয়েটা করে যেতে বলছেন। বয়স তো হচ্ছে! সংসার যখন করতেই হবে—

সাধুদাদার মুখে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে উঠল। এই মহাশ্মশানে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রাণপণে ভুলতে চান তাঁর বিগত সংসারী জীবনটাকে। মুক্ত হতে চান কামনা বাসনা মায়া মমতার পার্থিব মোহজাল থেকে।

শরীরের অবাধ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে, ছয় রিপুকে শাসনে-সংযমে রাখতে চান মানব দেহের নশ্বরতার চরম পরিণতি প্রত্যক্ষ করে। আর ঘাটবাবু, ঠিক একই জায়গায় বসে, চিতার আগুনের আলোয় ভবিষ্যৎ জীবনের, সম্ভোগের স্বপ্ন দেখছে!

ঘাটবাবুর বিলাপে ছেদ পড়ল না। সাত সকালে কেমন বউনি সুরু হল দেখুন না। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলে, কদিনের জ্বরেই কাবার! ঘরে ছেলেমানুষ পোয়াতী বৌ! হয়ত কত আশা করেছিল ছেলের মুখ দেখবে দুজনে এক সঙ্গে—কত আশা কত আনন্দ, সব ঘুচলো! তাও বলি, সন্তানের মুখ দেখাও মহা-ভাগ্যেরকথা।

কী বললেন! কী বললেন!

সাধুদাদার হঠাৎ চমকে ওঠায়, দীপ্তোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত বিস্মিত হয়ে ঘাটবাবু বললেন, কেন একটু আগেই তো আপনার সামনে দিয়ে গেল, দেখতে পেলেন না? ঐ তো তার কথাই বলছি। সাতাশ বছরের জোয়ান ছেলেটা গেল। কচি বৌটা পোয়াতী, তার কি মনের অবস্থাটা বলুন তো? তার চেয়ে বেচারীর স্বামীটা যদি না মরে সন্ন্যাসী হয়ে যেত আপনার মত, তবু ওর একটা আশা, সান্ত্বনা থাকতো। হয়ত এক-দিন ছেলের টানে ফিরে আসবে স্বামী। সন্তান কি সোজা জিনিষ দাদা? এর যে সেটুকু আশাও নেই। কী কপাল! একেই বলে ভাগ্য!

সাধুদাদার মুখ বিবর্ণ। কপালের কুঞ্চিত রেখায় অন্ত-র্দ্বন্দ্বের, যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট।

ঘাটবাবু তীক্ষ্ণ সন্দেহের দৃষ্টিতে সাধুদাদার আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে দেখলো ভাল করে। সাধুদাদা, যদি অভয় দেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

আত্মসংবরণ করে সাধুদাদা উত্তর দিলেন, বলুন।

আমায় আপনি ভালবাসেন, স্নেহ করেন, দাঁড়িয়ে দুটো ভালমন্দ কথা বলেন। তাই সাহস করে জানতে চাইছি, এত কম বয়সে আপনি ঘর ছাড়লেন কেন? বাড়িতে কে কে আছেন আপনার? বিয়ে হয়েছিল? ছেলেপুলে?

রেলিংএর ধার থেকে সরে দাঁড়ালেন সাধুদাদা। তাকালেন অদূরবর্তী কলুষনাশিনী গঙ্গার দিকে। তাকালেন দূর চক্রবালে আরক্ত আভায় উদ্‌ভাসিত সূর্যোদয়ের দিকে। ঝাঁকড়া ঝুপসী পাতাভরা বিরাট মহানিম গাছটার দিকে। সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। তবু জবাব দিতে হল এক সময়। শুধু গলাটা কেঁপে গেল। হালদার মশাই, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। গৃহী জীবন, একবার যা পরিত্যাগ করে এসেছি, সেটা আর স্মরণ করতে নেই আমাদের।

মহাশ্মশানের সদাজাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী ঘাটবাবু এবার বিচিত্র হাসি হাসলেন। তবে থাক সাধুদাদা। আর একটা কথার উত্তর দেবেন? যদি অবশ্য বলতে বাধা না থাকে? যে সংসার ত্যাগ করে এসেছেন, যাঁদের ভালবাসা স্নেহ মায়া মমতার বাঁধন কেটে পালিয়ে এসেছেন, স্মরণ করতে না চাইলেই কি তাদের একেবারে ভুলে থাকা সম্ভব?

বাবু চা। তিনে ওরফে তিনকড়ি চায়ের ভাঁড় এগিয়ে ধরলো ঘাটবাবুর হাতের কাছে।

এদিকে ফিরে চায়ের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে আবার পথের দিকে তাকিয়ে আর একবার হাসলো ঘাটবাবু।

স্খলিত পায়ে, মাথা নীচু করে সাধুদাদা গঙ্গাগর্ভের ঘাটের দিকে নেমে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। অন্যমনস্কভাবে। একটা আহত যন্ত্রণাবিদ্ধ রক্তাক্ত ভীরু প্রাণীর মত।

* * *

গঙ্গাগর্ভ থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসছিলেন স্বামী মুক্তানন্দ। পরণের শ্বেত শুভ্র বসন বৈরাগ্যের রঙে গৈরিক হয়েছে। কপালে কয়েকটি রেখা ভাঁজ পড়েছে পর পর। তা ছাড়া মাঝখানে কয়েকটা বছর কেটে গেলেও চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং আরো শান্ত সৌম্য সুদর্শন, আরো কান্তিমান হয়েছে।

একদিকে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের পর পাহাড়। দেবতাত্মা হিমালয়! দিগন্ত বিস্তৃত স্তম্ভিত ধুসর অজঙ্গম ঢেউএর রাশি। আর একদিকে অনেক নীচে তীক্ষ্ণ তীব্র তরঙ্গসঙ্কুলা বেগবতী গঙ্গা। প্রচণ্ড বেগে ফুলে ফুলে উদ্দাম ঢেউ তুলে আরো নীচে ছুটে চলেছে।

পাহাড়ি পাইনটার নীচে দাঁড়িয়ে অস্তমান সূর্যকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন স্বামীজি। অস্ফুট কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন আপন মনেই।

> ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
> ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
> ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম-গোপ্তা।
> সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

প্রণাম শেষ হতেই নজরে পড়লো লছমনঝোলার পুল থেকে নেমে আসছেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। অনেকেই আসেন এখানে বেড়াতে। পাঁচ ছয় বছরের অত্যন্ত সুন্দর চেহারার ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ছেলেটির হাত অত্যন্ত শক্ত মুঠোয় ধরে খুব আস্তে আস্তে আসছেন ভদ্রলোকটি। ছেলেটি অতিরিক্ত চঞ্চল আর দুরন্ত—এতদূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। বার বার কচি মুঠোয় টান মারছে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা পাথরগুলোকে বলের মত শট্ মারছে। এক একবার ভদ্রলোকটিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। কখনো বা ওঁকে জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ছে।

পিছনেই মাথায়-ঘোমটা মহিলাটি, ছেলেটির মা বোধ হয়, ওদের থেকে বেশ একটু পিছিয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে বকছেন ছেলেটিকে। অবশ্য তাতে কোন ফল হচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মুখও চলছিল সমানে।

নির্মোহ, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী কৌতুকস্মিতমুখে লক্ষ্য করছিলেন এই প্রাণচঞ্চল অদ্ভুত সুন্দর মানবকটিকে। কান পেতে শুনলেন তার কলকাকলি। শিশু নারায়ণ!

বাবা! মা গঙ্গায় চান করবো বাবা।

আচ্ছা বাবা। কাল সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে তুমি আমার সঙ্গে স্নান করবে। এখন শোনো। তারপর ভগীরথ তো কত তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনলেন। কিন্তু তারপর আবার কত যুগ ধরে মহাদেবকে পুজো করলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে নিজের জটায় ধারণ ক'রে তাঁর স্রোতের বেগ কমিয়ে দিলেন। তবে তো পৃথিবীর মানুষ গঙ্গাকে পেল।

মহাদেব মা গঙ্গাকে জটায় ধারণ করলেন কেন বাবা?

না হলে মা গঙ্গার স্রোতে পৃথিবী যে ভেসে যেত বাবা।

তারপর কি হল বাবা?

তারপর সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে। সেই যে কপিল মুনির শাপে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্পর্শে তাঁদের মুক্তি হল।

ষাট হাজার ছেলে। এক দুই তিন চার পাচ ছয়, সে কত বাবা?

সে অনেক। তুমি আর একটু বড়ো হও, বুঝবে।

তোমার একটা মোটে ছেলে কেন বাবা?

আঃ খোকন! এবার পিছন থেকে ভদ্রমহিলার ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠ শোনা গেল। এত বকতেও পারিস্! সন্ধ্যা হয়ে এলো, বাড়ি ফিরতে হবে না নাকি?

ছেলেটি কানেও নিল না মায়ের কথা। বাবা ঐ ফুলটা নেবো? বলনা বাবা? ঐ লাল ফুলটা?

আচ্ছা নাও গে যাও। আর বেশী দূরে যেওনা যেন।

আচ্ছা বাবা। এই বোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ—মুখে মুখে ভ্রমরের মত গুঞ্জন তুলে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ছেলেটা পাহাড়ি পাইন গাছটার তলায় বুনো ফুলগুলোর দিকে ছুটে এলো।

স্বামীজি হাসিমুখে একটু এগিয়ে এলেন ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। ও ততক্ষণে ফুলের কথা ভুলে গিয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে কতকগুলো বাঁদরের দিকে—বিশেষ করে একটা মা-বাঁদরের দিকে। এইমাত্র সেটা লাফ দিয়ে গাছের ডালে এসে বসলো। তার পেটের তলায় আঁকড়ে ধরে রয়েছে একটা অতি ক্ষুদে বাচ্ছা।

এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য ওর জীবনে এই প্রথম।

সহসা হুপ্ করে একটা গোদা বাঁদর লাফ মেরে ওর সমুখে বসতেই ও ভয়ে চিৎকার করে উঠে কোনদিকে ভাল করে না তাকিয়েই সামনেই স্বামীজিকে দেখে ছুটে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো ওকে। বাবা বাবা—দেখ দেখ—কত্তো বাঁদর!

দুহাতে ওকে বুকে তুলে নিলেন স্বামিজি। সেই নরম নধর অতিসুকুমার শিশুটির স্পর্শে সহসা যেন তাঁর সমস্ত দেহ মন আত্মা অমৃতের স্পর্শে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

ততক্ষণে ভদ্রলোকটি আগে আগে—তাঁর পিছনে মহিলাটিও এগিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোকটি হাসিমুখে স্বামীজিকে উদ্দেশ করে বললেন, এর মধ্যে খোকন আপনার সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে দেখছি। ভারী দুষ্টু আর দুরন্ত আমাদের বাবুল।

বাবুল, ওঁর কোল থেকে নেমে এসো।

সহসা পশ্চাৎবর্তিনীর নীরস রুক্ষ রমণীকণ্ঠের কাঠিন্যে স্বামীজি আত্মবিস্মৃত ভাবে তাকালেন তার দিকে।

হঠাৎ চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। মাথা ঘুরে গেল। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ অবনত করলেন। অনির্দেয় যন্ত্রণায় মানসিক বিপ্লবে সমস্ত সংযমের গণ্ডী ছিন্ন ভিন্ন করে শরীরের রক্তস্রোত বইতে লাগলো প্রবল বেগে।

সহজাত সংস্কারে, সাধনায় আত্মদমন করলেন। তাঁর শিথিল হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাবুল মাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি—আমি ইচ্ছে করে উঠিনি মা, আমি তো বড় হয়ে গেছি। উনি আমায় কোলে নিয়ে ছিলেন।

সাধু সন্ন্যাসীদের কোলে উঠতে নেই। চলো ঐ ঝর্ণাটা দেখে আসি আমরা দুজনে—

ছেলের হাত ধরে একরকম জোর করেই ভদ্রমহিলা যেন টেনে নিয়ে চলে গেলেন, পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা ক্ষীণস্রোত ঝর্ণাধারার দিকে, স্বামীজিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

ভদ্রমহিলার এই বিচিত্র অভদ্র অশালীন রুক্ষ ব্যবহারে স্তম্ভিত হতবাক ভদ্রলোকটি, আর বিমূঢ় বিহ্বল সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রইলেন মুখোমুখি। নির্বাক স্বামীজির মুখের করুণ অভিব্যক্তি, সুতীব্র বেদনাময় পাণ্ডুরতায় লজ্জিত অপ্রস্তুত ভদ্রলোকটি হাত জোড় করলেন। কিছু মনে করবেন না স্বামীজি। অনেকক্ষণ বেরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে, কদিন শরীরটাও ভাল নেই—মানে—

বাধা দিলেন মুক্তানন্দ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি কিছুই মনে করিনি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

কলকাতা থেকে। আমার নাম দীপ্তিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র দিন দুই হরিদ্বারে এসেছি। ব্রহ্মকুণ্ডের উপরেই মহামায়া কটেজে উঠেছি। ভারী চমৎকার জায়গাটা।

থাকবেন তো দিন কতক?

ঊর্মিলার, মানে বাবুলের মায়ের খুব ভাল লেগেছে

এই জায়গাটা। তবে ভারী খেয়ালী মানুষ। তার ইচ্ছে হলেই থাকবো দিন কতক। ঠিক বলতে পারছিনা।

স্বামী মুক্তানন্দ প্রাণপণে আত্মদমন করে দীপ্তিমান-বাবুর দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ভদ্র এবং শিক্ষিত। বাবুলের মায়ের স্বামীজির প্রতি এই আকস্মিক রূঢ় ব্যবহার ঢেকে দিতে চাইলেন নিজের বিনয়নম্র আচরণে।

একদিন আমাদের ওখানে যাবেন—ভদ্রলোকটির গলায় অনুনয়ের সুর। বাবুল সন্ধ্যাবেলায় ব্রহ্মকুণ্ডের গঙ্গায় নৌকো ভাসায়। আমরাও থাকি কাছাকাছি।

নিশ্চয় যাবো। ওদিকের আশ্রমে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। আপনি কিন্তু আর দেরী করবেন না। সঙ্গে ছোট ছেলে। অন্ধকার হয়ে এলো। অনেকদূর যেতে হবে।

আর একবার হাতজোড় করে ভদ্রলোকটি বললেন, নিশ্চয় যাবেন নইলে ভাবব আপনি আমাদের উপর রাগ করেছেন।

নিরুত্তর স্বামীজির মুখে অতিবিচিত্র বেদনার্ত অতি-করুণ হাসির আভাস জেগে উঠলো।

*　*　*

ব্রহ্মাকুণ্ডের বাঁধানো ঘাট থেকে নৌকো করে ফুল আর জলন্ত প্রদীপ ভাসাচ্ছে বাবুল। হাসছে, ছুটছে, হাততালি দিচ্ছে। সঙ্গে ওর রক্ষকই হবে বোধ হয়, অল্পবয়সের একটি পাণ্ডা ঠাকুর। ওর সঙ্গে কথা আর কাজে তাল রাখতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে।

দূর থেকে বাবুলের দিকে নিষ্পলক, তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্বামী মুক্তানন্দ।

আলো জ্বলছে গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গার বুকের তরঙ্গ-লীলায় সেই আলো প্রতিফলিত হচ্ছে একটি অস্থির প্রাণচঞ্চল শিশুর মুখে চোখে। কাছেই মন্দিরের মধ্যে আলো জ্বলছে বিগ্রহের সামনে। সেদিকেও একবার তাকিয়েছিলেন মুক্তানন্দ। কিন্তু বিগ্রহের পাথুরে চোখের উপর চোখ পড়তে শিউরে উঠে সরে এসেছেন এই নির্জন অন্ধকার কোণে। চলে যেতে গিয়েও পারেননি। একটা অদৃশ্য মহাভয়ঙ্কর বশীকরণ মন্ত্রশক্তিতে তিনি বাঁধা পড়েছেন। সে বাঁধন ছাড়িয়ে যাবার সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে। মোহাচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন বাবুলকে। আজ নয়—আজ কদিন ধরেই।

তিনি ভ্রষ্ট—অসংযমী। হৃদয়ের গভীরে স্নেহ মায়া মমতা বাৎসল্য যে প্রবল রিপুগুলোকে এতদিন সামলে সংযমে জপতপ ধ্যানমন্ত্রে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, বাবুলকে দেখার পর থেকে সব ভেঙ্গে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। গৃহত্যাগী, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কোন অধিকার তাঁর নেই। তিনি ব্যর্থ! পতিত।

সন্ন্যাসী মুক্তানন্দের দুই চোখে জল। এই মুহূর্তে তাঁর ঈশ্বর, গুরু, জপতপধ্যান সব কিছু মূর্ত হয়ে উঠেছে ওই শিশুটির মধ্যে। কামিনী কাঞ্চন ভোগ বাসনা সব ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু আজ এত দিন পর হঠাৎ দেখা ওই এতটুকু শিশুর মায়া যে তার চেয়েও সহস্র গুণ বেশী হয়ে উঠবে কে জানতো এ কথা?

নিঃশব্দে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে উর্মিলা উঠে দাঁড়ালো।

সম্বিৎ ফিরে পেলেন স্বামীজি। সচকিতে পিছনে সরে গেলেন কয়েক পা। ছি ছি একি করলেন? আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। তাছাড়া ব্রহ্মকুণ্ডের মত পবিত্র পীঠস্থানে একমাত্র প্রণম্য দেবতা শিবগঙ্গা! শিব, দুর্গা!

উর্মিলা নতমুখে উত্তর দিল, সেদিনের অপরাধের জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে হঠাৎ দেখে আমার একটি বড় চেনা দুঃখী মেয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, তাই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেম। ঘোর সংসারী, মায়াবদ্ধ জীব। ক্রোধ হিংসা দ্বেষ, প্রতিশোধ—কিছুই দমন করতে পারিনা। আপনি এসব তুচ্ছ জিনিষের অনেক উপরে। অযথা আপনাকে দুঃখ দেওয়া উচিত হয়নি আমার।

উর্মিলার গম্ভীর সুন্দর মুখে বিষাদের রেখা। ঘোমটার তলায় টানাটানা তুলি দিয়ে আঁকার মত স্বাভাবিক ভ্রু-রেখার তলায় অতল আয়ত গভীর দুচোখে বেদনার ঢেউ। চকিতে সে দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করলেন মুক্তানন্দ।

উর্মিলার অন্যমনস্ক দৃষ্টি ঢেউ-উত্তাল গঙ্গার দিকে—মন্দিরে—আকাশে।

আরতি আরম্ভ হয়েছে বিগ্রহের। প্রদীপের শিখার

ছায়া কাঁপছে। কাঁপছে গঙ্গার ঢেউ। কাঁপছে মুক্তানন্দের-হৃদয়।

নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে উর্মিলা আবার কথা কইলো।

সেই দুঃখী মেয়েটা। বাপমা-মরা মামামামীর গলগ্রহ। কিন্তু দেখতে সুন্দর ছিল। রূপের জোরে বেশ ভাল ঘরেই হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

অবশ্য বিয়ের কয়েক দিন আগেই সে একখানা চিঠি পেয়েছিল। তার ভাবী স্বামীর। সংসারে তাঁর মন নেই। তাঁর মায়ের চোখের জল, অনশন তাঁকে এখনো সংসারে বেঁধে রেখেছে। একমাত্র সন্তান তিনি, তাই তাঁকে ফেলে চলে যেতে পারছেন না। আর মায়ের চোখের জলে, দিনের পর দিন অনশনে বাধ্য হয়েই এই বিয়েতে মত দিতে হয়েছে। এখন মেয়েটি যদি আপত্তি করে, তবেই তিনি এই অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে মুক্তি পান। মেয়েটি যেন মনে রাখে, স্ত্রীর অধিকার তিনি কোন দিনও তাকে দিতে পারবেন না এবং মায়ের মৃত্যুর পরই সংসার ত্যাগ করবেন।

মেয়েটি চিঠিখানা তার মামীকে দিয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হল না। রূপ ছাড়া যে মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা গানবাজনা, বাবার পয়সাকড়ি আত্মীয়-স্বজন আর কিছুই নেই, এমন গলগ্রহ অরক্ষণীয়াকে বিনা পয়সায় পার করার সুযোগ কে ছাড়ে বলুন? তাছাড়া মেয়েটির ভাবী শ্বশুরবাড়ির অবস্থা খুব সচ্ছলই ছিল। অমন ঘরে বিয়ে হওয়া যে কোন মেয়েরই ভাগ্যের কথা।

স্বামীজি নিশ্চুপ। নিশ্চল। পাষাণ মূর্তির মত।

অবশ্য মেয়েটাও মুক্তি চেয়েছিল। তার এক মুক্তি। উদয়াস্ত পরিশ্রম লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে। তাই এক দিন বিয়ে হয়ে গেল।

জ্ঞাতিগুষ্ঠি মিলে মস্ত শ্বশুরবাড়ি। বিধবা শাশুড়ী উঠতে বসতে মেয়েটাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। কানে মন্ত্র দিতে লাগলেন, ছেলেকে বশ করতেই হবে। যে করেই হোক। সন্ন্যাসী ছেলেকে সংসারী করতেই হবে। না হলে এত বড় বিষয় সম্পত্তি সব যাবে। তাঁর শ্বশুরের তরফের বংশেরও এই খানেই শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন ফিরলনা। যুবতী সুন্দরী স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকালেন না তিনি। ঘুরতে লাগলেন সাধু-সন্ন্যাসীর আস্তানায়। শ্মশানে মন্দিরে মঠে। গুরু খোঁজে। ঈশ্বরের খোঁজে।

তারপর একদিন—ঢোঁক গিলল উর্মিলা।

তারপর একদিন কোন এক তান্ত্রিক সাধুর পাল্লায় পড়ে কী সব কারণ-বারি না কি পান করে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আর সেই সুযোগে মেয়েটির শাশুড়ী মেয়েটিকে পাঠালেন গভীর রাত্রে তার সেবা করতে ব্রহ্মচারীর এতদিনকার সংযম, ব্রহ্মচর্য ভাঙ্গলো সেইরাত্রে। তবে সজ্ঞানে নয়। অবশ্য মেয়েটিরও দোষ ছিলনা, একথা বলা যায় না—

থাক্ থাক্। আর কিছু শুনতে চাই না। চুপ করুন—দয়া করুন—

দুহাতে মুখ ঢাকলেন স্বামীজি।

আর একটু বাকী আছে। উর্মিলার কণ্ঠ নির্লিপ্ত উদাসীন। একটা গল্পের উপসংহারটুকু শেষ করবার জন্য ও যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মেয়েটির শাশুড়ী হঠাৎ মারা গেলেন। মেয়েটির মনে হল। তার মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। জ্ঞাতিবিরোধ, ঝগড়াঝাটি এ বাড়ি নিত্যই লেগে থাকত। শাশুড়ী সব কিছুই সামলাতেন। বৌকে তিনি প্রাণের মতই ভালবাসতেন।

তার কয়েকটা দিন পরেই মেয়েটির স্বামী জানতে পারলেন মেয়েটি সন্তানসম্ভবা।

সেই রাতের পর জ্ঞান ফিরতেই তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীকে বর্জন করে চলতেন। কিন্তু মায়ের শেষ কাজ শেষ করেই তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করলেন চিরদিনের মত। এতটুকু ভাবলেন না সেই নিরুপায় মেয়েটির চরম অসহায় অবস্থার কথা। তখনও আর কেউ জানত না তার এ অবস্থার কথা।

মেয়েটি অকূল পাথারে পড়ল। তারপর যা হবার তাই হল। জ্ঞাতিশত্রুরা বিষয় সম্পত্তির লোভে ছিনে জোঁকের মত তার পিছনে লাগল। সব দিক দিয়েই তার সর্বনাশ করার জন্যে এগিয়ে এলো।

মেয়েটি বুঝলো, বিষয় সম্পত্তি শুধু নয়। রূপ যৌবন, এরাই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। কোনমতে আত্মরক্ষা

আনন্দেতে
আত্মহারা
চেঁচায় সে যে
উন্মনা,
বোনটি বলে
মিষ্টি হেসে—
'হাসছে সবাই
দেখছনা ?'

ফটো :
রমেন চট্টোপাধ্যায়

গাগরী ভরে

ফটো :
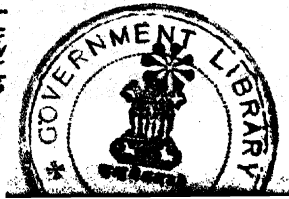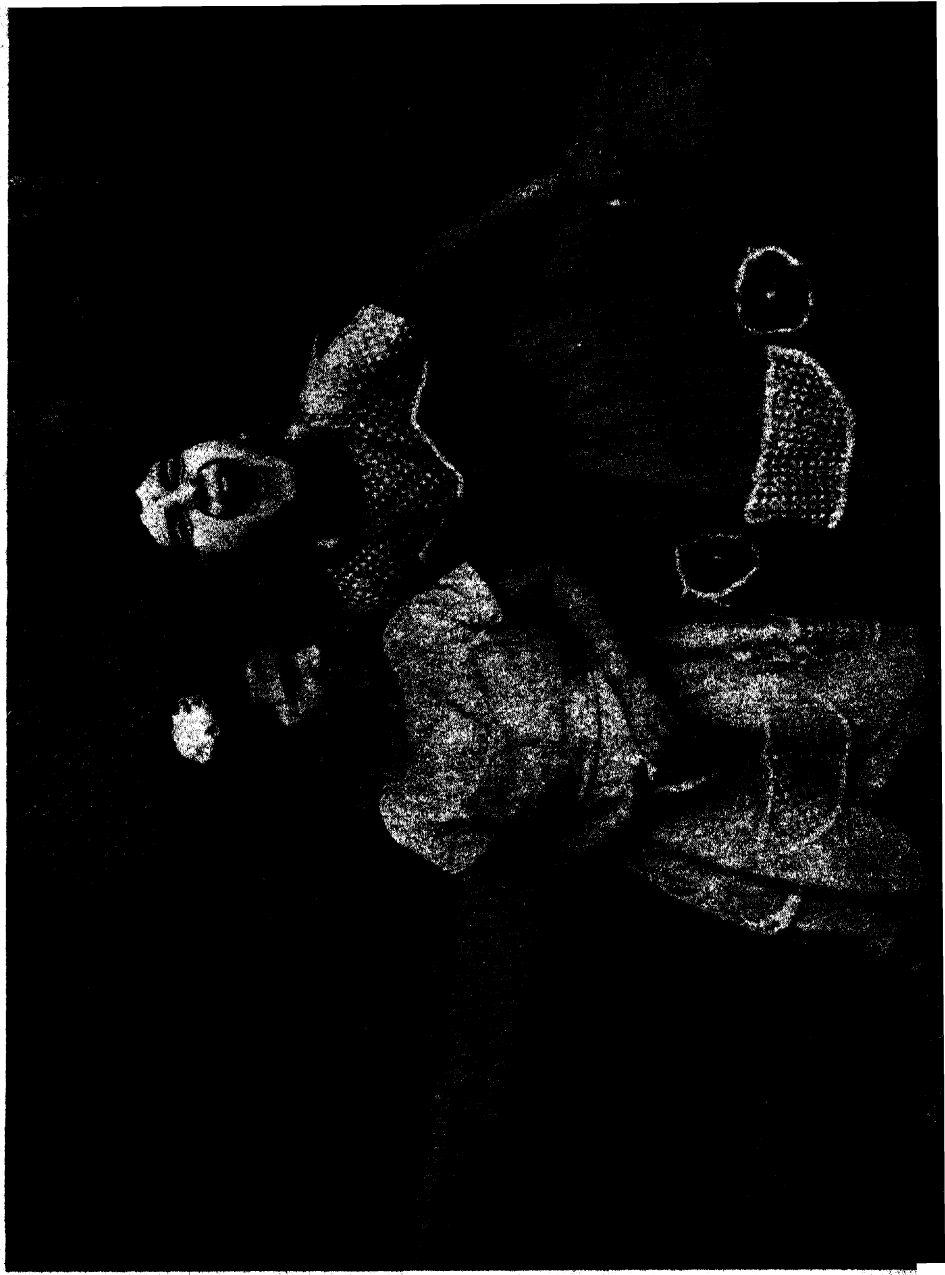
করতে লাগল সে। কিন্তু পেরে উঠল না ওদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে পথে নামল নিজেকে ওদের লালসার হাত থেকে বাঁচাতে—

কলঙ্ক! কী কলঙ্ক? সচকিত স্বামীজি উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন উর্মিলাকে।

কলঙ্ক হত না যদি মেয়েটির স্বামী প্রকাশ করে যেতেন সে অন্তঃসত্ত্বা। সুতরাং প্রমাণিত হল সে চরিত্রহীনা। বিষয় সম্পত্তির দাবীদার জ্ঞাতি ভাই শরীকরা প্রমাণ করলো তাদের ভাই। মেয়েটির স্বামী চিরদিনই সন্ন্যাসী প্রকৃতির 'ব্রহ্মচারী'। মেয়েটির গর্ভের সন্তানের পিতা সে কোনক্রমেই নয়—একটা অসহায় নিরপরাধ অল্প-বয়সী মেয়েকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে এতবড় কলঙ্কের বোঝা তার মাথায় চাপাতে তাদের এতটুকু লজ্জা হল না। মেয়েটি একবস্ত্রে স্বামীর একটি কানাকড়িও না নিয়ে পথে নামল। অবশ্য মামাবাড়িতেও তার জায়গা হল না। কেলেঙ্কারীর খবর সেখানেও তারা পৌঁছে দিয়েছিল আগেই।

আরতির ঘণ্টাধ্বনি অনেকদূর অবধি ভেসে আসছে। ভেসে আসছে হর হর মহাদেও! গঙ্গামায়ীকি জয়! মন্দিরের ধূপারতির ধোঁয়া কুয়াশার মত অস্পষ্ট করেছে দেবতার মুখ।

তারপর! নিজের গলার স্বর নিজের কানে যেতেই চমকে উঠলেন স্বামীজি। একটা বিলুপ্ত সত্তা মৃতদেহের অন্তঃস্থল থেকে যেন কথাটি উচ্চারিত হল! তারপর!

তারপর!

স্বামীজির ঘোলাটে চোখের দৃষ্টির সঙ্গে বৃথাই চোখ মেলাতে চেষ্টা করল উর্মিলা।

তারপর আর কি শুনতে চান স্বামীজি? যে মেয়ের স্বামী ধর্মসাক্ষী করে, শালগ্রাম নারায়ণ শিলা অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে করে অসহায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে সব কিছু জেনে শুনেও জ্ঞাতি শত্রুদের হাতে ফেলে রেখে পরমার্থের সন্ধানে পালিয়ে যায়, বিষয় সম্পত্তির লোভে শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা যার চরিত্রে এত বড় কলঙ্ক অপবাদ রটায়। মামা মামী যাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে, তারপরে সে মেয়ের খবর আর কে রাখে বলুন? যাকগে এসব কথা। রাত অনেক হল। আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। পুজো আর্চার ক্ষতি হল। মিছিমিছি কবেকার কোথাকার একটা দুঃখী মেয়ের কথা কেন যে আপনার কাছে বলতে গেলাম! আমাকেও এবার ফিরতে হবে। কাল সকালের বাসেই আমরা দিল্লী যাচ্ছি। সেখান থেকে দু একদিন বাদেই কলকাতা। আজ রাত্রেই কতক বাঁধা ছাঁদা করে রাখতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বাবুল! স্বামীজির কণ্ঠ-স্বরে সর্বস্ব হারানোর ব্যাকুলতা। এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন কেন?

উর্মিলা কোন উত্তর দিল না।

মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ হল। স্তব্ধ হয়ে গেল শেষ ঘণ্টাধ্বনির রেশ টুকুও। নির্জন হয়ে এলো ব্রহ্মকুণ্ডের চত্বর।

অস্থির অশান্ত হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে করতে স্বামী মুক্তানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, আর বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে কোথাও কোনদিনও দেখা হবেনা। আমার—আমার একটি প্রশ্নের উত্তর যদি দেন—

দুটি শান্ত চোখের গভীর দৃষ্টি স্বামীজির ব্যাকুল দৃষ্টির সঙ্গে মেলাল উর্মিলা। বলুন?

আপনার ছেলে—বাবুল—বাবুলের বাবার নাম কী!

রুদ্ধশ্বাসে উর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুক্তা-নন্দ। যেন এই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাঁর জীবন মরণ নির্ভর করছে—। যেন পৃথিবীটা তার সমস্ত গতি হারিয়ে স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে গেছে! উত্তরটা পেলে আরও স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতিও স্তব্ধ।

দেহের সমস্ত রক্ত উর্মিলার মুখে এসে জমা হল। চোখ কান নাক মুখ দিয়ে এখনি বুঝি ফেটে সহস্র ধারায় ঝরবে। মাথা নীচু করলো উর্মিলা—। চোখ বন্ধ করলো।

অশান্ত অধীর উত্তেজিত স্বামীজি আবার প্রশ্ন করলেন, বলুন! দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে আমার শেষ প্রশ্নটার জবাব দিয়ে যান। বাবুল—বাবুল—বাবুলের বাবার নাম কী?

উর্মিলা আত্মসংবরণ করে মাথা উঁচু করলো। হাওয়ার বেগে এলোমেলো ঘোমটা আর একটু টেনে দিল। ওর মুখে

আলো কাঁপলো ছায়া কাঁপলো। এক মুহূর্ত্তের জন্যে বিচিত্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো স্বামীজির উৎকণ্ঠা সংশয়, দ্বন্দ্ব ভরা পীড়িত নির্য্যাতিত মুখের দিকে। তারপর তাকালো গঙ্গার দিকে—মন্দিরের দিকে—তারপর ফিরে যাবার অন্ধকার পথের দিকে।

তারপর চলতে চলতে মন্দিরের মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়ালো।

আপনি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই জানেন না। স্বামীর নাম মেয়েদের মুখে আনতে নেই।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল উর্মিলা।

দুহাতে বুক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বামীজি।

কে জানে কতক্ষণ ?

এক মুহূর্ত্ত, না অনাদি অনন্ত কাল !

রাশী রাশী অন্ধকার ঢেউ এর মত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে—দুহাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে আসছে।

ক্ষমাহীন মহাভয়ঙ্কর অপরাধের শাস্তির মত !

বাবুল ! বাবুল !

সভয়ে যেখানে বাবুল প্রদীপ ভাসাচ্ছিল, খেলা করছিল, স্বামীজি তাকালেন সেদিকে।

অন্ধকার। সেখানেও অন্ধকার। বাবুল নেই। আর কোন দিনও তাকে দেখতে পাবেন না স্বামীজি।

আর কোনদিনও বাবুলের মুখ দেখতে পাবেন না।

পরমেশ্বর !

ফিরে তাকালেন মন্দিরের দিকে।

সেখানেও অন্ধকার।

রুদ্ধ দরজার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার মুখ।

সূর্য্য লেখনী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

আকাশের পাণ্ডুলিপি পড়িতে পড়িতে
মৃত্যুহীন মহাকাব্য আস্বাদন করি ;
সর্ব্ব সত্তা ওঠে মোর মহানন্দে ভরি'।
সে শুধু লিখিছে লেখা সূর্য্য-লেখনীতে।
শত ছিন্ন অংশ তা'র সমুদ্রে—সরিতে
মাঠে—ঘাটে—ধুলা-স্তরে যায় গড়াগড়ি ;
তা'রও অংশ-ভাগ যদি ক্ষণমাত্র পড়ি
মহারসানন্দে চিত্ত মাতে আচম্বিতে।
যে অদৃশ্য মহাকবি হ'য়ে আত্মহারা
মুহুর্মুহুঃ লিখে যায় দুরন্ত কলমে
তা'রে দেখিবারে চিত্ত হয় মত্ত-পারা।
ভাগ্যবশে দেখা যদি যেতো কোন ক্রমে !
সূর্য্য-লেখনীতে ঝরে অমৃতের ধারা ;—
উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তেরে ফিরে রসই আনে শমে।

"ভারতবর্ষ" পত্রিকার প্রকাশ যাঁর আনুকূল্যে সম্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ষ মহাদেশের তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান "বেঙ্গল মেডিকেল্ লাইব্রেরী" ও "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"-এর যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই স্বনামধন্য, স্বভাব-সজ্জন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে তদানিন্তন সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রায়বাহাদুর জলধর সেন যে "স্মৃতি-তর্পণ" করেছিলেন, "ভারতবর্ষ"-র সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কর্ম্মবীর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণে সেই প্রবন্ধটি আবার প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

স্মৃতি-তর্পণ

জলধর সেন

এবার যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করবার প্রয়াসী হয়েছি, তিনি কোন ধনী বা জমিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই—নদীয়া জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি ছিলেন। তিনি কোনদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়াও স্পর্শ করেন নাই—বিশ্ব-বিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোন বিদ্যালয়েও তিনি প্রবেশ লাভ করেন নাই। আর সেকালে এখনকার মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়ও ছিল না। যে গ্রামে দুচার ঘর অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের বাস ছিল, সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা বসত, গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের ছেলেরা সেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়ে গুরুমহাশয়ের কাছে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষালাভ করতেন; সে শিক্ষার সঙ্গে ছাপা-বই পড়ার বড় একটা সংশ্রব ছিল না। ছাত্রেরা বর্ণ ও বানান শিক্ষা করত। শুভঙ্করী, বাজার হিসাব, জমিদারী ও মহাজনী সেরেস্তার কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও জমা-ওয়াশীল-বাকী পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আর গুরুমশাই ও ছাত্রদের অভি-ভাবকগণের প্রধান দৃষ্টি ছিল হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার দিকে। এই বিদ্যাশিক্ষা করেই সেকালের লোকে জীবিকার্জ্জন করতেন এবং এই বিদ্যার জোরেই সে সময় অনেকে তালুক-মুলুক, বিষয়-বিভব করে গিয়েছেন। আমি যাঁর স্মৃতি-তর্পণের প্রয়াসী হয়েছি, তিনি এইরকম একটা পাঠশালায় কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করেছিলেন।

যাঁরা বিগত ৭০।৮০ বৎসরের বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, অন্ততঃ যাঁরা দুচারখানি বাঙ্গালা ছাপা বইও নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই সেই সকল বইয়ের অনেকগুলিরই প্রচ্ছদপটে দুইটি নাম ছাপা দেখেছেন—একটি শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, আর একটি 'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী'। আজ আমি আমার সেই শুভানুধ্যায়ী পূজনীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করব।

আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলাম, পাড়াগাঁয়েই আমার শিক্ষাদীক্ষা। তাহ'লেও সে সময় কল্‌কাতার দু-চারটে খবর আমরা পেতাম। আমার বেশ মনে পড়ে, সে সময় আমরা কলিকাতার তিনটে বড়-পুস্তকবিক্রেতা ও
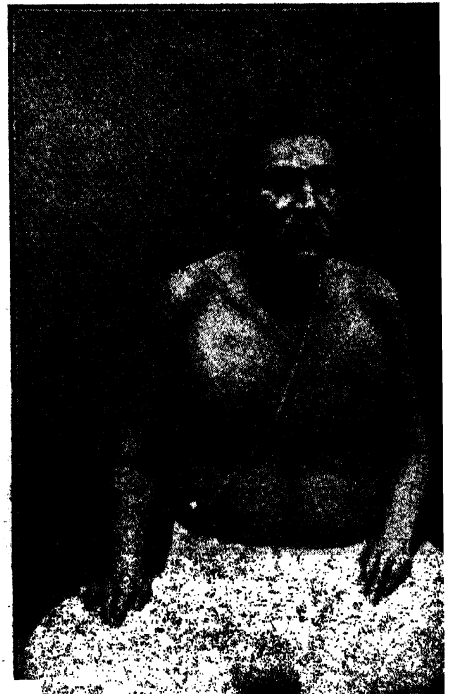
প্রকাশকের নাম শুনতে পেতাম—এক যোগেশবাবুর ক্যানিং লাইব্রেরী, আর গুরুদাসবাবুর বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, তৃতীয় চিনেবাজারের পদ্মচন্দ্র নাথের বইয়ের দোকান। এই তিনটি ছাড়া বটতলায় অনেক পুঁথির দোকান ছিল ; তাদের নাম বড় একটা জানতাম না।

স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে যখন কলিকাতার কলেজে পড়তে এলাম, তখন দুই চার বার গুরুদাসবাবুর দোকানে বই কিনতে গিয়েছি। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, আমাদের আদব-কায়দা শিক্ষা অন্যরকম ছিল। আমি দোকানে উপবিষ্ট গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্র উপবীতধারী, সৌম্যমূর্ত্তি মানুষটি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনিই দোকানের কর্ত্তা গুরুদাসবাবু। তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে বইয়ের কথা বল্‌তাম। তিনি অদূরে উপবিষ্ট কর্ম্মচারীকে বল্‌তেন "অনন্ত, দেখ ত ছেলেটি কি বই চান।" এই অনন্তবাবুই তাঁর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং আজীবন গুরুদাসবাবুর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনন্তবাবু আমাকে বই দিতেন, তাঁরই হাতে মূল্য দিতাম এবং আস্‌বার সময় পুনরায় গুরুদাসবাবুকে প্রণাম করে চ'লে আসতাম। এই আমার প্রথম গুরুদাসবাবুর দর্শন লাভ—পরিচয় লাভ নয়। প্রতিদিন আমার মত কত ছেলে তাঁর দোকানে বই কিনতে আসত; তাদের সকলকে চিনে রাখা কি সম্ভব? গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় এ সময়ের অনেক পরে হয়েছিল। সে কথা পরে বলছি।

আমি পূজনীয় গুরুদাসবাবুর পবিত্র জীবন-কথা লিখতে বসি নাই,সে স্পর্দ্ধাও আমার নাই—আমি স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি। তাহলেও, আমার স্মৃতি-চর্চ্চা করবার পূর্ব্বে গুরুদাসবাবুর মহানুভবতা, তাঁর ঔদার্য্য,তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বলতে চাই এবং সেকথাও অন্যের বিবৃত কথা—আমার কথা নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পড়েছিলাম, সেই পুস্তকের কোন কোন প্রস্তাব 'ভারতবর্ষে'ও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকখানির নাম 'দাদার কথা'। লেখক সুরেশচন্দ্র ঘোষ। এ 'দাদা' আর কেহই নহেন, ভারত-বিখ্যাত অদ্বিতীয় ব্যবহারাজীব দানবীর পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়; সুরেশবাবু তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সার রাসবিহারী পঠদ্দশায় কলিকাতায় হিন্দু হোষ্টেলে থাকতেন। সেই সময়ের কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি সুরেশবাবুকে যাহা বলেছিলেন, সেই কথা কয়টিই নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। "হোষ্টেলের আর একটি লোকের কথা বলি শোন—এখন তাঁর অনেক পয়সা হয়েছে, কলকাতায় বাড়ীঘর করেছেন, তাঁর বই-এর দোকান আছে, নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বোধ হয় নাম শুনেছ? এমন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বাঙ্গালীর মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ তাঁর তখনকার অবস্থার মত লোকের মধ্যে। তিনি আমাদের হোষ্টেলের বাজার-সরকার ছিলেন। সামান্যই বেতন পেতেন। বোধ হয় সংসারে অনেক লোকজন প্রতিপালন করতে হতো, খুবই তাঁর টানাটানি ছিল বুঝতাম। এদিকে হোষ্টেলে বাজার সরকারের কাজে তিনি অনেক পয়সা ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। ইচ্ছা করলে যথেষ্ট সরাতে পারতেন! কিন্তু তাঁর পরম শত্রুও কখন বল্‌তে পারে নাই—'গুরুদাসবাবু একটা পয়সা চুরি করেছেন'! আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাজার সরকারের এ সুখ্যাতি পৃথিবীতে কেউ করতে সাহস পাবে না!"

"তিনি মেডিকেল কলেজের ছেলেদের জন্য দু'টা আলমারিতে সামান্য ডাক্তারি বইও রাখতেন। ছেলেরা বই কিন্‌বার সময় বই-এর দাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন—'এটা এত টাকা, ওটা অত টাকা কেনা পড়েছে।' ছেলেরা কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—'যা হোক দাও।' 'যা হোক দাও'। আমি একদিন তাঁকে বল্‌লাম—'গুরুদাসবাবু, বেশ ব্যবসা করছেন? বইটার কেনা দামের উপর যদি বলেন—'যা হোক্ দাও, যা হোক দাও'! তবে ছেলেরা কে আর আপনাকে টাকাটা, সিকাটা দিতে চাইবে? দুচার পয়সা দিয়ে সেরে দেবে'। তাতে তিনি হেসে বলতেন—'তাই ঢের, তাই ঢের। তোমাদের কাছে আবার কি নেব?' অথচ দেখ, তাঁর তখন কত টানাটানি ছিল! একটা কথা আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'; কিন্তু গুরুদাসবাবুর সম্বন্ধে এটা কখনও খাটে নাই। অভাব তাঁর স্বভাব নষ্ট করতে পারে নাই।"

"পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বহুবাজার কি ঐদিকে কোথায় একটা বই-এর দোকান করবেন স্থির করেন।

হোষ্টেলের অনেকে তাঁকে নিষেধ করে বললেন—আপনার মূলধন বেশী নাই, আপনি এমন কাজ করবেন না; দোকান চলবে না, ঠক্‌বেন!' আমি কিন্তু জোর করে বলেছিলাম—'উনি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবেন! ওঁর অমন Honesty মূলধন আছে; কেবল ওতেই উনি সফলতা লাভ করবেন!' হ'লও তো তাই! এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দেখচ তো? আমার খাবার সময় নাই, যাই কখন। আবার অনেক সময় ওটা মনেও থাকে না। অনেকে বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা ব্যবসা করতে যান, তাঁদের অধিকাংশেরই Honestyটা কম। তাই ফেল মারেন।"

"বি-এ পাশ করবার পরই দাদার একবার খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়েছিল। তিনি গোপনে গোপনে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ হইত। এ সম্বন্ধে দাদা বলিয়াছিলেন—"খ্রীষ্টান হবার দিন গোপনে হোষ্টেল হইতে বেরিয়ে গেলাম। গীর্জ্জার কাছাকাছি গেছি, তখন এমন একটা বিঘ্ন ঘটলো যে, আমার আর খ্রীষ্টান হওয়া হ'ল না। বিঘ্নটি এই—আমি গীর্জ্জায় ঢুকছি, এমন সময়ে বাবা গিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন। সে সময়ে সহসা সেখানে বাবাকে সে অবস্থায় আমার হাত ধ'রে ফেলতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম কেমন করে বাবা আমার খ্রীষ্টান হবার কথা জান্‌তে পেরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।"

"বাবাকে বললাম—'যাক্, আপনি যখন এসে পড়েছেন, তখন আর আমি খ্রীষ্টান হ'ব না।' তার পর বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে ফিরে এলাম। এই গুরুদাসবাবুই—আমি খ্রীষ্টান হব সন্দেহ ক'রে, বাবাকে টেলিগ্রাম করেন। বাবা সেই টেলিগ্রাম পেয়েই হোষ্টেলে আসেন। আমি তখন খ্রীষ্টান হবার জন্য হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে গেছি। বাবা হোষ্টেলে সংবাদ নিয়ে গীর্জ্জায় গিয়ে আমায় ধরেন। গুরুদাসবাবু সংবাদ দিয়ে বাবাকে এনে আমার খ্রীষ্টান হওয়ায় বাধা দিয়েছেন, এ আমি জানতে পেরেছি শুনে গুরুদাসবাবু ভয় পেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আর দেখা করেন নাই।"

"পরের দিন সকালে আমি ঝড়ের মত ছুটে গুরুদাস-বাবুর ঘরে গিয়ে তাঁহার হাতটা ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বল্‌লাম—'বেশ করেছেন!' এই বলেই সেখান থেকে চলে গেলাম।"

পূজনীয় গুরুদাসবাবুর জীবন-চরিত সার রাসবিহারীর এই কয়টি কথাতেই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়েছে। সত্য-সত্যই গুরুদাসবাবু মহার্ঘ সম্পদের, অতুলনীয় অগাধ মূলধনের অধিকারী ছিলেন; সে মূলধন, সার রাসবিহারীর কথায় তাঁহার Honesty। এই মূলধনই সংসার-সংগ্রামে তাঁকে জয়যুক্ত করেছিল, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন, অতুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন; এই Honesty মূলধনই তাঁকে সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় করেছিল, পুস্তক-ব্যবসায়ী-সমাজে তাঁকে বরেণ্য করেছিল। তাঁকে পুস্তক-ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের সভাপতি পদে বরণ করে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

তিনি সত্য-সত্যই বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে কত দুস্থ সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোতো। কিন্তু সে কথা বলতে আমি বসি নাই, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এই মহৎ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করবেন, আমি স্মৃতি-তর্পণই করব।

এই স্থানে আর একটি কথা বল্‌বার প্রলোভন আমি কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিনে। সে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গুরুদাসবাবু প্রথম বইয়ের দোকান করেন ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটের একটি ছোট ঘরে এবং সেই ঘরের পাশ দিয়ে যে ছোট একটা গলি ছিল, সেই গলিতে ছোট একটি বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। সে বাড়ী ও সে গলি এখন মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দোকানের প্রসার যখন বৃদ্ধি হোল এবং কিছু অর্থও সঞ্চিত হোল, তখন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের তেতালা বাড়ী কিনে সেখানেই নিচের তলায় দোকান করেন এবং দোতালা তেতালায় পরিবারসহ বাস করেন। কিছুদিন পরে ঐ বাড়ীর সম্পূর্ণ অংশেই দোকান বিস্তৃত করেন।

তিনি যখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ২০১ নম্বরের বাড়ীতে বাস করতে আসেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পরলোকগত মনোমোহন বসু মহাশয় ২০২ নং বাড়ীতে বাস করতেন। গুরুদাসবাবুকে নিকট প্রতিবেশী পেয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি যে গানটি রচনা করেন, 'মনোমোহন গীতাবলী' হতে সেই গানটি উদ্ধৃত করে দিলাম—

"চাঁদের হাট পেতেছেন পাড়ায় গুরুদাস।
সোনার ছেলে-মেয়ে আপনি গিন্নী, তেমনি শ্বশুর
তেমনি শ্বাস্।
কিবা শান্ত ছেলে হরি (১), মরি মরি কি মাধুরী,
ও তায় দেখলে সাধ যায় কোলে করি,
কথা শুনলে হয় উল্লাস।
নন্দিনী তাঁর নন্দরাণী (২), ফুল্ল কমল বদন খানি,
যেন আনন্দময়ী ঠাকুরাণী এসেছেন ছেড়ে কৈলাস।
সুবালা (৩) মেয়েটি হায়,যেন কলের পুতুল নেচে বেড়ায়,
ও তার ফুট্‌ফুটে রং, পুট্‌পুটে ঢং, বিধুমুখে মধুর হাস।"

গুরুদাসবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায় তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এইবার গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। আমি তখন মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজস্কুলে মাষ্টারী করি। সে সময় 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রে আমার কতকগুলি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে। তখন 'সাহিত্য'-সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহে আমার কয়েকটি ভ্রমণ কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার ব্যবস্থা হয়। সোদরপ্রতিম সুরেশচন্দ্র তখন বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে একটা বাড়ীতে বাস করতেন। সেই বাড়ীর নিম্নতলে তাঁর একটি ছাপাখানাও ছিল। সেই ছাপাখানাতেই 'প্রবাস-চিত্র' প্রথম ছাপার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় সুরেশচন্দ্র আমাকে লিখলেন যে, 'প্রবাস-চিত্র' প্রকাশের ব্যবস্থা করবার জন্য আমার একবার কলিকাতায় আসা প্রয়োজন। তাঁর পত্র পেয়েই আমি কলিকাতায় এলাম এবং তাঁরই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন যে, গুরুদাসবাবুকে 'প্রবাস-চিত্রে'র প্রকাশক করা তাঁরা স্থির করেছেন এবং সেই দিনই অপরাহ্ণকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত স্থির করতে হবে, সে সময় আমার উপস্থিত থাকা দরকার; অন্য কারণে না হোক, গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সেই দিনই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। সেই সময় পরম স্নেহভাজন শ্রীমান হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আমরা তিনজনে যখন গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ের সম্মুখে গেলাম, তখন দেখ্‌লাম তিনি ফুটপাথের পার্শ্বে একখানি বেঞ্চের উপর বসে আছেন এবং তাঁর পাশে বসে আছেন 'উদভ্রান্ত-প্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গুরুদাসবাবুকে ঐ স্থানে ঐ ভাবে বসে থাকতে অনেকদিন দেখেছি কিন্তু কোনদিন তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার দুঃসাহস আমার হয় নাই।

আমরা গুরুদাসবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হ'লে গুরুদাসবাবু সহাস্যমুখে বললেন 'কি হে সুরেশচন্দ্র, হেমেন্দ্রবাবাজী কি মনে করে?'

সুরেশচন্দ্র বললেন "আমাদের জলধরদাদার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছি।"

আমি তখন অগ্রসর হয়ে গুরুদাসবাবুকে যথারীতি প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন "আহা, থাক থাক।" সুরেশকে বললেন "ওঁর লেখার ত খুব প্রশংসা শুনতে পাই। বেশ, বেশ।"

সুরেশচন্দ্র তখন বললেন যে, তিনি আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে ছাপতে আরম্ভ করেছেন। ছাপার খরচ তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু দেবেন। গুরুদাসবাবুকে ঐ বইয়ের প্রকাশক হ'তে হবে।

গুরুদাসবাবু বললেন, "বেশ, তাতে আর আমার আপত্তি কি। আমিই সব খরচ দিতাম। তা তোমরা যখন সে ব্যবস্থা করেছ, ভালই করেছ। এরপর জলধরবাবুর যে বই ছাপা হবে আমি তার ভার নেব।"

(১) গুরুদাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, (২) জ্যেষ্ঠা কন্যা, (৩) মধ্যমা কন্যা।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, এই বইখানি কেমন চলে, তাই দেখে পরে এঁর হিমালয় ভ্রমণও ছাপবার ইচ্ছা আছে।

গুরুদাসবাবু বললেন "আমিই সে ভার নেব।" তখন সুরেশবাবু আমার অন্য পরিচয় দিলেন। গুরুদাসবাবু-বললেন "যখনই কলিকাতায় আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।"

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে তাঁকে প্রণাম করে সুরেশ ও হেমেন্দ্রের সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলাম। গুরুদাসবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ইহার তিন-চার মাস পরে মহিষাদলের মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসি। যেদিন কলিকাতায় আসি সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরুদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁকে যখন বললাম, আমি মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে এলাম, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন "ছেড়ে ত এলেন। তারপর কি করবেন?"

আমি বল্‌লাম, "আপনার আশীর্ব্বাদে কিছু করবার পথও হয়েছে। পাঁচকড়িবাবু ও সুরেশবাবু 'বঙ্গবাসীর' অধিনায়ক যোগেশবাবুকে বলে আমার জন্য 'বঙ্গবাসী' অফিসে একটা চাকুরী স্থির করেছেন। আজ সন্ধ্যার পর যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলে কথা পাকা হবে।"

গুরুদাসবাবু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "তবুও ভাল। আমি ভাবলাম, এ কি করলেন, কাচ্চা-বাচ্চা পোষা মানুষ—কিসে চলবে। তা কি জানেন, খবরের কাগজের কাজ ত কখন করেন নি। যোগেন্দ্রবাবু প্রথম শিক্ষানবীশকে কি আর বেশী মাইনে দেবেন, তাই ভাবছি। যাক্, তবুও ত একটা কিছু হোল। যোগেন্দ্র-বাবু কি বলেন, সে কথা কা'ল আমাকে বলে যাবেন, বুঝলেন।"

বুঝলাম অনেক কথা। আমার মত একদিনের পরিচিত লোকের উপর যে মানুষের এত স্নেহ আগ্রহ হয়, এত জানতাম না, সেদিন তা বুঝলাম। আর বুঝলাম কোন গুণে গুরুদাসবাবু এমন সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়েছেন, মা লক্ষ্মী তাঁর উপর কেন এমন সদয় হয়েছেন।

পরদিন 'বঙ্গবাসী' আফিসে যাবার সময় গুরুদাসবাবুর দোকানে গিয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে বললাম, আজই কাজে যাচ্ছি। যোগেন্দ্রবাবু আপাততঃ মাসে ত্রিশ টাকা দেবেন, কাজকর্ম্ম শিখলে বাড়িয়ে দেবেন।" গুরুদাসবাবু বললেন "আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা হোক ত্রিশ টাকা, কোন ভাবনা করবেন না, যখন যা অভাব হয় আমাকে জানাতে লজ্জা করবেন না।" কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সেই সংবাদপত্র সেবার প্রথম যাত্রাকালে যা দেখেছিলাম, আজ বহুকাল পরে এই বৃদ্ধ বয়সেও তা আমার মনে আছে; আর তারই জন্য এই সুদীর্ঘ কাল পরে সেই দয়ার সাগর মহাত্মার স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি।

এর পরের তের-চৌদ্দ বৎসরের ঘটনা আমার জীবনের এক সুদীর্ঘ স্মরণীয় ইতিহাস। কত বিপদ-আপদ, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, কত শোকতাপ যে এই চৌদ্দ বৎসর আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তা আমি জানি, আর জানতেন গুরুদাসবাবু। আমি এই কয় বৎসর প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশ নিয়েছি, তিনি যা আদেশ করেছেন তাই করেছি, তারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি। অবশেষে আজ পূর্ণ তেইশ বৎসর হোল, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও তাঁরই আদেশে 'ভারতবর্ষে'র ভার গ্রহণ করে নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় লাভ করেছি। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসের ১২ই তারিখে আমার সেই আশ্রয়দাতা, আমার অভিভাবক গুরুদাসবাবু উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে আমার অভিভাবকত্ব ভার নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন—আমি এখনও সে ভার বহন করছি—আর কতদিন করব তা তিনিই জানেন।

পূজনীয় গুরুদাসবাবুর স্মৃতি-তর্পণ এখানেই শেষ করতে পারছিনে; আমার প্রতি তাঁর যে কত স্নেহ, কত ভালবাসা ছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ না করলে এ স্মৃতি-তর্পণ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পরলোকগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব থেকে গুরুদাসবাবুর দৃষ্টিশক্তি লোপ হয়েছিল, তিনি আর দোকানে আস্‌তে পারতেন না, তাঁর দুইপুত্রই সমস্ত কাজকর্ম্ম করতেন। তিনি সে সময় পুত্রদের এই উপদেশই দিতেন, কারও একটি পয়সা পাওনা হ'লেই চাইবামাত্র দিতে হবে। কোন পাওনাদার কখনও এ কথা বলতে পারেন নি এবং এখনও

পারেন না যে, গুরুদাসবাবুর দোকানে প্রাপ্য টাকা আনতে গিয়ে কেউ কখন ফিরে এসেছেন। ইহাই গুরুদাসবাবুর মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই জন্য গুরুদাস লাইব্রেরীর এমন প্রতিষ্ঠা। আমি প্রায়ই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর বাড়ীতে যেতাম। সে সময় শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু কি সুধাংশুবাবু যদি উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে আমার সম্মুখেই তাঁদের বলতেন "দেখ, জলধরবাবু যখন যা চাইবেন তাই দিও, হিসাব দেখো না। নিতান্ত দরকার না হ'লে উনি কখন কিছু চান না।"

অনেকদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলি। তখন গুরুদাসবাবুর পুত্রেরা দোকানের ভার গ্রহণ করেন নাই। পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন বেড়াতে বেড়াতে দোকানে গিয়েছি। গুরুদাসবাবু আমাকে দেখে বল্লেন, "কৈ জলধরবাবু, পূজার হিসাবের টাকা নিলেন না।"

আমি বললাম, "ভারি তিন টাকা তের আনা পাব, তা আবার এত আগে নিতে আসব। ছুটির আগের দিন এসে নিয়ে যাব।"

গুরুদাসবাবু হেসে বল্লেন, "বেশ তাই আসবেন।"

গুরুদাসবাবু আগে থাক্‌তেই অনন্তবাবুকে শিখিয়ে রেখেছিলেন। ছুটীর দুই-একদিন পূর্ব্বে আমি যখন দোকানে গেলাম, তিনি অনন্তবাবুকে ডেকে বললেন, "অনন্ত, জলধরবাবুর হিসাবের পাওনা তিন টাকা তের আনা দাও।" অনন্তবাবু আমাকে তিন টাকা তের আনা দিলে, গুরুদাসবাবু বল্লেন—হিসাবে আরও কিছু পাওনা হয়েছে, নিয়ে যান।"

আমি বললাম—"পাওনাটা দেনায় দাঁড়াতে দশদিনও লাগে না। আমার এখন দরকার নেই।" গুরুদাসবাবু হাসতে লাগলেন।

একটু পরেই আমি যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লাম, তখন গুরুদাসবাবু বললেন—"একটু দাঁড়ান জলধরবাবু।" এই বলে অনন্তবাবুর দিকে হাত বাড়ালেন। অনন্তবাবু সবুজ কাগজে মোড়া কি একটা গুরুদাসবাবুর হাতে দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে সেই মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আপনি ত কিছু করবেন না, টাকা পেলেই একে ওকে দিয়ে বসবেন। তাই বৌমার জন্য এই হারটা গড়িয়ে রেখেছিলাম। বাড়ী গিয়ে তাঁকে দেবেন।"

আমি ত অবাক! মোড়ক খুলে দেখি একটা সোনার হার। আমি বল্লাম, "এ কি করেছেন?"

গুরুদাসবাবু হেসে বললেন, "আপনার পাওনা তিন টাকা তের আনা ত বুঝে পেয়েছেন, এখন বাড়ী যান। ওটা আপনার বই বিক্রীর টাকা থেকেই আমি গড়িয়েছি।" এই আমার পূজনীয় অভিভাবক গুরুদাসবাবু!

আর একবার রাণাঘাটের ষ্টেশনের কাছে একটা বাগানওয়ালা পাকা বাড়ী খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে সংবাদ পেয়ে গুরুদাসবাবুর কাছে গিয়ে সেইটে কিনবার কথা বল্‌তে তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন—"সে কিছুতেই হবে না। রাণাঘাটে বাড়ী কিনবেন? বিনা পয়সায় দিলেও আমি আপনাকে সেখানে যেতে দেব না; সেখানে যে ম্যালেরিয়া। তার থেকে এক কাজ করুন। দেশে গিয়ে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটু জমি কিনে ছোটখাটো একটা বাড়ী করুন। যে টাকা লাগে আমি দেব। বই বিক্রীর টাকা থেকে শোধ না হ'লেও আমি বাকী টাকা চাইব না।" এই থেকেই আমি আমার গ্রামের বাইরে নদীর তীরে ছোট একটা বাড়ী করবার প্রেরণা পাই এবং গুরুদাসবাবুর জীবদ্দশাতেই সেই বাড়ীর অনেকটা তৈরী হ'য়েছিল। এ সংবাদ শুনে তাঁর যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা কেমন করে বর্ণনা করব।

এমন কত ঘটনার কথা এই বৃদ্ধের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে সব কথা আর বলা হোল না। আজ এতকাল পরে সেই দয়ালু, মহানুভব, পরদুঃখকাতর ব্রাহ্মণপ্রবরের সামান্য স্মৃতি-তর্পণ করে কৃতার্থ হলাম, ধন্য হলাম, পবিত্র হলাম।

অনেকক্ষণ ধরে স্বরটা কানে আসছিল।

প্রথমে শুধু কণ্ঠটাই একটু চমকে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তারপর কথাগুলোও কৌতূহলী করে তুলেছে।

তবু পেছন ফিরে তাকাই নি। শুধু অভদ্রতা হবে মনে করে যে তাকাইনি তা নয়। হয়ত আশাভঙ্গ হবে এই ভয়েও খানিকটা। তা ছাড়া আজকাল ওধরণের দু চারটে ঝকমকে বুলি মুখস্থ রেখে কিছুক্ষণের জন্যে আসর জমাবার কায়দা অনেকেরই জানা। ওপরের ওই তবকটুকু একটু নাড়া চাড়াতেই উঠে যায়।

বৃষ্টিটা ধরবার আশায় চৌরঙ্গী পাড়ার একটা রেস্তোর"াঁয় কফি আর কিছু আনুষঙ্গিক নিয়ে বসেছি। হাল ফ্যাশনে সাজানো গুছোন হলেও রেস্তোর"াঁটি নেহাৎ সঙ্কীর্ণ অপরিসর। এক পাশে সিঁড়ি দিয়ে নকল একটা দোতলা তুলেও জায়গার বিশেষ সুসার হয় নি। টেবিলগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। তার ফাঁকে ফাঁকে গলে চেয়ার নিয়ে বসা একটা কসরৎ। চেনা অচেনায় ঠেসাঠেসি না হোক ঘেঁসাঘেঁসিটা একটু অস্বস্তিকর হয়।

সন্ধ্যার পর ভিড়টা প্রতিদিনই একটু বেশী থাকে, আজ বৃষ্টির কল্যাণে আর তিলধারণের জায়গা নেই। বাড়তি চেয়ার দেবার জায়গা থাকলে তা দিয়েও যে চাহিদা মেটানো যেত না, কাঁচের দরজা ঠেলে উৎসুক খরিদ্দারদের উর্দিপরা দারোয়ানের সেলাম নিয়ে ঢোকা আর হতাশভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন রকমে একটু আগে থাকতে ঢুকে একটা চেয়ার যে পেয়েছি এই ভাগ্যের কথা। ভাগ্যটা অবিমিশ্র নয়। চারজনের বসবার টেবিল। বাকি তিনটি আসনে অপরিচিত একটি অবাঙালী পরিবার আমার অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে নিজেদের অপ্রসন্নতা ক্ষণে ক্ষণে ভাবে ভঙ্গিতে এমন কি ভাষাতেও প্রকাশ করছেন। তাঁদের সৌজন্যের অভাব অত উগ্র না হ'লে এক প্রস্থ কফি খেয়ে হয়ত সত্যিই রেস্তোর"াঁর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বারান্দার নিচে ফুটপাথে গিয়ে বৃষ্টি ধরার জন্যে অপেক্ষা করতাম।

রেস্তোর"াঁর চেয়ে বাইরের বৃষ্টির ছাটলাগা জনাকীর্ণ ফুটপাথও শ্রেয় মনে করবার অন্য কারণও ছিল। এই

নতুন ধরণের রেস্তোরাঁগুলির বেশীর ভাগই ইদানীং সঙ্গীত পরিবেষণ একটা আকর্ষণ করে তুলেছে। অপরিসর রেস্তোরাঁর একটি কোণে সামান্য উঁচু একটি বেদী গোছের থাকে। জায়গায় কুলোলে তাতে একটি পিয়ানো স্থান পায়। নইলে বিলাতী কয়েকটি মুখে বা হাতে বাজাবার যন্ত্র শুধু। তাদেরই সহযোগিতায় সাধারণতঃ অত্যন্ত কদর্য বেশবাসে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে মাইকের সাহায্যে সস্তা বিলাতি গানের অক্ষম নকলে ভোজন-শালার সিগারেটের ধোঁয়া ও ভোজ্যদ্রব্যের গন্ধে ভারী বাতাস দুঃসহ করে তোলে। যে গায়িকার যত কর্কশ পুরুষালি গলা, তার নাকি তত খাতির। আপাততঃ এখানেও সেই অবাঞ্ছিত উপদ্রব সুরু হবার উপক্রম দেখেই মনটা পালাই পালাই করছিল। শুধু আমার টেবিলের অচেনা সঙ্গীদের স্বার্থপর অভদ্রতাতেই জেদ করে জ্বালা ধরাবার জন্যে আরেক প্রস্থ কফির অর্ডার দিয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজের আসনে বসে রইলাম।

তা না থাকলে দ্বিতীয় সুমিতার সঙ্গে দেখা হত না।

পেছনে যে কণ্ঠস্বর এতক্ষণ কৌতূহলী করে তুলেছিল তা যে সুমিতারই তা অবশ্য তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত ভাবতে পারি নি।

ভাববই বা কি করে।

আমি এ কণ্ঠস্বর যার মধ্যে একদিন শুনেছিলাম, স্বরটুকু বাদে তার ভাষা শুধু নয়, বাচন ভঙ্গিও আলাদা। এমন অবিরাম কথার নির্ঝর প্রবাহিত করে রাখা তার পক্ষে অবিশ্বাস্য।

তা ছাড়া তার নামও সুমিতা ছিল না।

যতক্ষণ সঙ্গীত সুধার স্রোত বইছিল ততক্ষণ অন্য কোন দিকে কান দেবার সুযোগ পাইনি।

প্রাণমন তখন ত্রাহি ত্রাহি।

সে কণ্ঠামৃতে কফিটাও বিস্বাদ লাগবার ভয়ে ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম।

গান ও তার অভিনন্দনে করতালি-ধ্বনি থামবার পর গায়িকা মেয়েটি আমারই সামনের দিকে একটি টেবিলে একজন বাদক সঙ্গীর সঙ্গে এসে বসল। গানে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার পর সে প্রাণের ঘাটতি পুরণ করতে কিঞ্চিৎ রসদের অবশ্যই প্রয়োজন। রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষই তা যোগান।

টেবিলের ওপর ভোজন পর্বের প্রাথমিক উপকরণ সাজানো যখন চলছে, গায়িকা মেয়েটি এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ আমারই পেছনের দিকে কাকে যেন দেখতে পেয়ে উল্লাসে হাত তুলে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ধ্বনিটা ঠিক বোধগম্য না হলেও আকারান্ত একটা নামের আভাস তার মধ্যে পেয়ে বুঝলাম সম্বোধনটা কোন পুরুষকে নয়।

পেছনের ভাষণ থেমে গিয়ে সেখান থেকেও 'হ্যালো লরা!' শুনে বুঝলাম কিছুটা উৎসুক যা কণ্ঠে তুলেছিল, এ সেই একই কণ্ঠস্বর।

শুধু সম্ভাষণ-বিনিময়েই ব্যাপারটা শেষ হলে এ কাহিনী লেখবার আর কোন কারণ থাকত না। কিন্তু প্রাথমিক ভূমিকার পর লরা তার টেবিলেই আমার পশ্চাৎ-বর্তিনীকে নিমন্ত্রণ করে বসল তার সঙ্গে অন্ততঃ একটু কফি খাবার জন্যে।

অদৃশ্যমান একবার বুঝি মৃদু আপত্তি জানালেন।

কিন্তু লরার কাছে সে আপত্তি টিঁকল না। তার টেঁস্‌ উচ্চারণে পশ্চাৎবর্তিনীর নামটাও বিকৃতভাবে এবার পাওয়া গেল। নামটা বাংলায় সম্ভবতঃ সুমিতা।

পিছন থেকে সুমিতা দেবী লরার টেবিলে গিয়ে বসবার সময় আমি শুধু নয় সমস্ত রেস্তোরাঁই বোধহয় কৌতূহলী হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করল। লরার সঙ্গীত নিত্য যাদের প্রাণে সুধা বর্ষণ করে সে সব মুগ্ধ ভক্তেরা নিশ্চয় তখন ঈর্ষান্বিত।

আমি কিন্তু তখন রীতিমত বিস্মিত ও সংশয়াচ্ছন্ন।

প্রথমতঃ নবযৌবনা লরার বান্ধবী হিসাবে সমবয়সী কাউকেই দেখা যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু সুমিতা দেবী পশ্চাতের অপরিচয় থেকে লরার টেবিলে যাবার সময় সম্মুখের আলোয় দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বুঝলাম পোষাকে প্রসাধনে আধুনিকা হলেও যৌবন-সীমা পার হ'তে তাঁর দেরী নেই।

বিস্মিত ও সংশয়াচ্ছন্ন শুধু ওই টুকুতে অবশ্য হইনি।

চালচলন পোষাক-আশাক ভাবভঙ্গি এমন কি শিক্ষা-দীক্ষায় ও নামেও আলাদা বলে চাক্ষুষ দেখার পরও এঁকে এত চেনা কেন মনে হয় বুঝতে না পেরেই অবাক ও চিন্তিত হ'লাম।

বাইরের কোন মিল না থাকা সত্ত্বেও আর একজনের কথা এঁকে দেখে এমন করে স্মরণে আসে কেন ?

আমার দ্বিতীয় প্রস্থ কফিও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে এসেছে।

আমাকে তাড়াতে না পেরে আমার টেবিলের অনিচ্ছুক খরিদ্দারেরা নিজেরাই পাওনা চুকিয়ে এবার উঠে পড়লেন।

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে বলে মনে হ'ল।

আমার সুতরাং আর এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না। 'বয়'কে বিল আনতে বলে যতটুকু পারি সুমিতা দেবীকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে আমার অদ্ভুত ধারণার হেতু বোঝবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

সুমিতা দেবী তখন লরা ও তার বাদক সঙ্গীর সঙ্গে রহস্যালাপে মত্ত। মাঝে মাঝে হাস্যধ্বনির সঙ্গে যে দু একটা কথার টুকরো কানে আসছিল তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পরিধানে স্কার্টের বদলে শাড়ী থাকলেও সুমিতা দেবী ওই ইঙ্গফেরঙ্গ সমাজের আপনার লোক না হলেও অন্তরঙ্গ একজন।

এ সুমিতা দেবীর সঙ্গে আমি যাঁর কথা ভাবছি তাঁর কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব।

সে বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হলেও স্মৃতির অদ্ভুত অযৌক্তিক আলোড়নে নিজের ওপর একটু বিরক্ত হয়ে রেস্তোরাঁর পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু পথ ঘাট যানবাহনের অবস্থা শোচনীয়। ট্রাম বন্ধ, বাসে ওঠা সাধ্যাতীত। ট্যাক্সি তপস্যাতেও দুর্লভ। কাতারে কাতারে নিরুপায় জনতা ফুটপাথে অলৌকিক উপায়ে কোন যানবাহনে জায়গা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছে।

তাদের সঙ্গেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই জেনে, ফুটপাথ-ঢাকা বারান্দার একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

খাড়া সেপাইএর মত এই ভাবে কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে।

আমার কিছুক্ষণ পরেই সুমিতা দেবীকেও রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াতে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। সুমিতা দেবীর চেহারা পোষাকে চালচলনে একটা অন্ততঃ ছোটখাটো মোটর নেপথ্যে থাকার আভাস যেন পেয়েছিলাম। সে আভাস তাহলে অলীক !

সুমিতা দেবী খানিক দাঁড়িয়ে থেকে একবার বুঝি হেঁটে যাবার সঙ্কল্পেই কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই কয়েক পা-ই। যেখানেই তাঁর গন্তব্য হোক এই কোথাও আধ-ডোবা কোথাও পেছল রাস্তা দিয়ে যাওয়া সাধ্য হলেও সমীচীন নয় বুঝেই বোধহয় তিনি আবার ফিরে এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালেন।

ক'টা রাস্তার ছেলে প্রতিদিন ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে বা দেবার নামে এখানে যাত্রীদের কাছে কিঞ্চিৎ বখশিষ রোজগার করে। চেহারা পোষাক দেখে আজও তারা ট্যাক্সি ডাকবার আশ্বাস কাউকে কাউকে দেবার চেষ্টা করছে বখশিষের আশায় !

কিন্তু ট্যাক্সি আজ কোথায়, যে ডাকবে !

সুমিতা দেবীকে কটা ছোকরা গিয়ে 'ট্যাক্সি ডাকব মেমসাব !' বলে বিরক্ত করায় তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমারই ভাগ্যে অমন অলৌকিক আবির্ভাব ঘটবে কে জানত !

যে থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা একেবারে রাস্তার ধারে ফুটপাথের একটি কোনে। হঠাৎ পাশে চাকার শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি—যা স্বপ্নেও অভাবিত সেই ফ্ল্যাগ-তোলা ললাটে বহ্নিলিপি জ্বালানো একটি ট্যাক্সি আমারই পাশের রাস্তা থেকে এসে মোড় ফিরছে।

মুখে 'ট্যাক্সি' বলে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার হাতলটা ধরে ফেলেছিলাম, নইলে মরীচিকা-মায়ার মত সে ট্যাক্সি মিলিয়ে যেতে বোধহয় দেরী হ'ত না।

কিন্তু দরজার হাতল ধরে দাবী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও দখল প্রায় যাবার উপক্রম।

সুমিতা দেবীকে যে কটি ছোকরা জ্বালাতন করছিল, তাদেরই একজন চক্ষের নিমেষে আমার প্রায় পর মুহূর্তেই ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনের দরজাটা তখন ধরে ফেলেছে।

দরজা খুলে ভেতরে উঠতে যাবার মুখেই সে ছোকরার কথায় সমস্ত শরীর একেবারে জ্বলে গেল।

এ ট্যাক্সি হামনে পহেলা লিয়া সাব !

ট্যাক্সির ঝগড়া কি কুৎসিত এমন কি সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে জানতে আমার বাকি নেই।

কে আগে ট্যাক্সি ডেকেছে তার মীমাংসায় ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সাক্ষ্যই চূড়ান্ত ও অকাট্য। এ ছোকরা সুমিতা দেবীর হয়েই ট্যাক্সি ধরেছে বোঝা মাত্র ড্রাইভারের ধর্মজ্ঞান কতখানি টনটনে থাকবে বলা খুবই শক্ত। ছোকরার পক্ষেই মাথাটা একবার হেলালে আর উপায় নেই। ফুটপাথের এই জনতাই আমার বিরুদ্ধে রায় দেবে।

'তুমনে লিয়া!' বলে তাই রাগে প্রায় ফেটে পড়ছিলাম, এমন সময় সুমিতা দেবী নিজেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে সত্যি প্রমাদ গণলাম।

সে ছোকরা'ত তখন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। গলার স্বরে যেটুকু সমীহ আগে ছিল এবার তাও বিসর্জন দিয়ে চড়া গলায় রুখে উঠল।

জরুর লিয়া। মেমসাবকে লিয়ে। পুছিয়ে ড্রাইভারকো!

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে ফল কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। সুমিতা দেবীই আশাতীত ভাবে সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে বিমূঢ় করে দিলেন।

প্রথমে ছোকরাকে ধমক দিয়ে জানালেন যে তাকে গাড়ি ডাকতে তিনি বলেনওনি, আর গাড়িও সে আগে থাকতে ধরেনি। আমাকে আগে গাড়ি ধরতে তিনি নিজে দেখেছেন বলে আমাকেই তিনি এবার অনুরোধ জানালেন তাঁকে আমার ট্যাক্সিতে বেশী দূরে নয় এই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট পর্যন্ত যদি আমি একটু পৌছে দিয়ে যাই।

এ দুর্যোগে ট্যাক্সি পাওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভারের অসহিষ্ণুতায় এবং সেই সঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বললাম, কিছু আর বলতে হবে না আসুন।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট বেশী দূরে নয়। একরকম ফিরিঙ্গি পাড়াই বলা চলে। সুমিতা দেবীর চেহারা চরিত্রের মহিলার সেই অঞ্চলেই বাসা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পৌছে দিতে গিয়ে বাসার বদলে একটা দোকান দেখে একটু বিস্মিতই হলাম।

এইটুকু পথ ট্যাক্সিতে আসতে আসতে সামান্য যা সৌজন্য বিনিময় হয়েছে তাতে ট্যাক্সি থামবার পর সুমিতা দেবী আমায় হঠাৎ একটু নামতে অনুরোধ করবেন এটাও কল্পনা করতে পারি নি

একবার ট্যাক্সি ছাড়লে আর পাওয়ার অনিশ্চয়তার কথা জানিয়ে যেটুকু আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম সুমিতা দেবী তা খণ্ডন করে বললেন—আপনার কোন ভাবনা নেই। ট্যাক্সি আপনাকে পাইয়ে দেবই। না পেলেও জলে পড়বেন না। বিপদে যে সাহায্য করেছেন তাতে আমার দোকানটা আপনাকে একটু না দেখিয়ে ছাড়ছি না।

এই পোষাক-আশাকের দোকান আপনার!

শুধু সুমিতা দেবীর অনুরোধে নয়, নিজেরও অতৃপ্ত কৌতুহলে সত্যিই অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিংকে বিসর্জন দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে তাঁর দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

সুমিতা দেবী আমার আপত্তি সত্ত্বেও নিজেই তখন ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছেন। আমার ভেতরে নিয়ে গিয়ে পার্টিশনের পেছনের একটি কামরায় বসিয়ে একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ আমারই! নইলে রেস্তোরাঁয় লরার অত খাতিরের বহর কি দেখতে পেতেন! লরা-কে যা পরে' গান গাইতে দেখলেন তার দামটাও এখনো বাকি!

লরার খাতিরের রহস্য জেনে নয়, সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি যে ও রেস্তোরাঁয় ছিলাম আপনি জানেন?

তা জানি বই কি!—বলে সুমিতা দেবী রহস্যময়ভাবে একটু হেসে অনুরোধ করলেন—আপনি দুমিনিট এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখুন। দোকান বন্ধ করবার সময় হয়েছে। আমি সে ব্যবস্থা করেই আসছি।

আপত্তির একটু ভান করে বললাম—কিন্তু আমায় বসিয়ে রেখে লাভ কি বলুন। মেয়েদের বিলিতি পোষাকের এ দোকানে নিজে ত খরিদ্দার কস্মিনকালে হ'ব না, কাউকে জোটাতেও পারব না। আমি যাঁদের জানি তাঁদের দৌড় রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলেজ স্ট্রীটের বাইরে নয়।

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে সুমিতা দেবী একটু বিদ্রূপের স্বরেই বললেন,-খদ্দের বাগাবার জন্যে আপনাকে ধরে রাখিনি। আপনি কলেজ স্ট্রীট রাসবিহারী অ্যাভে-

নিউর মানুষ, তাই জানেন না যে আমার এ দোকানের কিছু সুনাম তার নিজস্ব মহলে আছে। যা ফরমাশ আমরা পাই তাই মিটিয়ে উঠতে পারি না। সুতরাং আপনাকে ধরে রাখাটা নিছক কৃতজ্ঞতাই মনে করতে পারছেন না কেন?

সুমিতা দেবী পার্টিশনের অপর দিকে চলে যাবার পর বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়েই বসে থাকতে হ'ল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে খুব বেশী রাত হয়নি। সুমিতা দেবী নিজেই পৌছে দিয়েছিলেন তাঁর ট্যাক্সিতে। দোকান থেকে প্রতি রাত্রে তার রাউডন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌছে দেবার জন্যে একটি ট্যাক্সির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। সেই চুক্তি করা ট্যাক্সির ভরসাতেই তিনি আমাকে নিজের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে বলার সাহস পেয়েছিলেন।

সুমিতা দেবীর দোকানের নাম ঠিকানা দেওয়া কার্ড আমার কাছে আছে। আর কোন দিন তাঁর সে দোকানে বা রাউডন স্ট্রীটে তাঁর ফ্ল্যাটে হয়ত যেতে পারি।

কিন্তু গিয়ে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না।

সুমিতা দেবীর মধ্যে রহস্য যদি কিছু থাকে তা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবার নয়।

একটি কুজ্ঝটিকার যবনিকা আমার স্মৃতিকে চিরকালই বুঝি ব্যঙ্গ করবে।

সেদিন এই যবনিকা সরাবার চেষ্টাই করেছিলাম। সুমিতা দেবী তাঁর দোকান বন্ধ করার কাজ সেরে ফিরে আসবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম,-কতদিন আপনি এ ব্যবসা করছেন?

আমার পাশের সোফায় বসে তিনি হেসে বলেছিলেন—প্রায় দশ বছর। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? ইনকাম-ট্যাক্সে খবর দেবার জন্যে যদি হয় তাহলে জেনে রাখুন সেখানে আমার ফাঁকি নেই।

সুমিতা দেবীর লঘু পরিহাসটুকু অগ্রাহ্য করে গম্ভীর মুখে বলেছিলাম,—কেন জিজ্ঞাসা করছি, শুনুন তাহলে। প্রায় পোনোরো বছর আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বজ্রকঠিন তেজস্বিনী একটি মেয়ে। কোর্ট থেকে একটা কমিশনে তাঁর জবানবন্দী নিতে কদিন তাঁর বাড়িতে যেতে হয়েছিল। তিনি যাকে পর্দানশীন বলে তা ঠিক নয়, তবে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে নারাজ। তাঁদের বাড়ীর মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। মেয়েটি যেমন একটু অসাধারণ, কেসটাও ছিল তেমনি একটু বিচিত্র। তাই ভুলি নি। মেয়েটি মস্ত বড় এক ধনীর একমাত্র কন্যা। নাম ধরুন উমা। বাপ যথাযোগ্য পাত্রে উমার বিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নিজের খরচেই। ছেলেটি কিন্তু সেখানে গিয়ে সত্যভ্রষ্ট হয়। একটি বিদেশী মেয়েকে সেখানে সে লুকিয়ে বিয়ে করে। কিছুদিন বাদেই ব্যাপারটা জানতে পারলেও বাপ বা মেয়ে ছেলেটির বিরুদ্ধে দেশে বা বিদেশে কোথাও কোন প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করেন নি, উমা শুধু বাপের শিক্ষায় ও উপদেশে নিজেকে একান্তভাবে কঠোর ধর্মাচরণে আর শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে কিছুদিন বাদে উমার স্বামীর বিদেশিনী পত্নী মারা যায়। উমার বাবাও তখন গত হয়েছেন। স্বামী দেশে ফিরে এসে উমার কাছে ক্ষমা চেয়ে পূর্বের সম্পর্কে আবার ফিরে যাবার আবেদন জানায়। উমা কিন্তু বজ্রকঠিন। স্বামীর সমস্ত অনুনয় বিনয়ে সে বধির। তার জীবনে অবিশ্বাসী স্বেচ্ছাচারী স্বামীর আর কোন স্থান নেই এই তার বক্তব্য।

চরম হতাশায় ঝোঁকের মাথায় ছেলেটি একদিন স্বামীত্বের অধিকার দাবী করে' আদালতে কেস করে' বসে। সেই মামলা বাবদই জবানবন্দী নিতে কদিন আমাদের মেয়েটির বাড়িতে যেতে হয়েছিল। শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী এবং আগুনের শিখার মত তেজস্বী যে মেয়েটিকে তখন দেখেছিলাম, আপনাকে দেখে কেন তার কথা মনে পড়ে গেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

সুমিতা দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান একটু হেসে বলেছিলেন,—গল্পটা দেখছি নেহাৎ জোলো নয়। সেই মেয়েটির তারপর কি হয়েছে জানেন?

না তা জানি না। খবর রাখবার চেষ্টা করিনি। তবে কেসটা মীমাংসা পর্যন্ত গড়ায়নি তা জানি। উমার স্বামীই নিজে থেকে একদিন মামলা তুলে নিয়ে আবার বিলেতে ফিরে চলে যায়।

সুমিতা দেবী কেমন একটু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এইখানেই গল্প আপনার শেষ?

ত কমা-সেমিকোলন মাত্র, ভালো রকম দাঁড়িও পড়ল না।

না তা পড়ল না।

কিন্তু আমায় দেখে সেই আপনার শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী আর সঙ্কল্পে বজ্রকঠিন উমার কথা মনে পড়ল, এতো বড় আশ্চর্য! কোনো সম্পর্ক কি আমাদের মধ্যে থাকা সম্ভব?

তা নয় বলেই ত অবাক হচ্ছি!

উমাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে কি করতে হয় জানেন?—সুমিতা দেবীর গলার স্বর লঘু কৌতুকেই বুঝি কেমন অস্বাভাবিক শুনিয়েছিল,—উমাকে একদিন পূজা জপতপের ও কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নিজের হৃদয়কে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হতে হয়। যাকে নির্মম হয়ে সে ফিরিয়ে দিয়েছে সাগর পারে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করবার জন্যে সমস্ত দেহ মন তার উন্মুখ এ সত্য নিজের কাছে আর গোপন করা যায় না। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে স্বামীকে হয়ত দ্বিধা সঙ্কোচ জয় করে শেষ পর্যন্ত তাকে চিঠিই লিখতে হয়। কিন্তু সে চিঠির উত্তর আসে না। উমা তবু হতাশ যেন না হয়। স্বামীকে সেই বিদেশে গিয়েই খুঁজে বার করবার জন্যে সে তখন প্রস্তুত। নিজেকে স্বামীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই তখন তার সাধনা। যে ম্লেচ্ছাচারের জন্যে স্বামীকে সে ঘৃণা করেছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাই তাকে দিয়ে বরণ করাতে হয়। এতদিনের শুদ্ধাচার ও সংস্কার ছেড়ে উমা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা আচার আচরণে নিজেকে নতুন করে তৈরী করতে যেন মেতে ওঠে।

সংসারে সমাজে তার নামে কুৎসা কলঙ্কের তুফান তুলতে হয় এইবার। সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে স্বামীর সন্ধানে সাগর পারে পাড়ি দেবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, তখন আনতে হয় লুব্ধ নীচ জ্ঞাতিকুটুম্বদের তরফ থেকে তার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা। গৃহ-বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করা দেবোত্তর সম্পত্তিই ধরা যাক। স্বার্থের কুটিল ষড়যন্ত্রে আর আইনের জটীল প্যাঁচে ধর্মচ্যুত বলে সে সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা খুব কঠিন না হ'তে পারে। সমাজ সংসার থেকে বিতাড়িত প্রায় নিঃসম্বল উমার বিদেশে স্বামীর সন্ধানে যাওয়া আর হয় না। নিজের জীবিকা অর্জনই তখন তার কাছে সমস্যা হ'তে পারে। এই উমাকে এবার একটু টেনে বুনে ইঙ্গ-ভারতীয় ফিরিঙ্গি সমাজে সুমিতা দেবী বলে যে পরিচিত তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া বোধহয় যায়।

একটু থেমে বেশ উচ্চৈস্বরেই হেসে উঠে সুমিতা দেবী বলেছিলেন,—কিন্তু এমন আজগুবি মিল কি কখনো সম্ভব? সুমিতা দেবীর মাঝখানে সেই আপনার তপস্বিনী উমাই নিরুদ্দেশ ম্লেচ্ছ স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় এখনো মিথ্যা আশায় দিন গুণছে, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে!

যথা সময়ে সুমিতা দেবীর চুক্তি-করা ট্যাক্সি এসে বাইরে হর্ণ দিয়েছিল।

বেরিয়ে যাবার পথে দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোর সামনে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। সুমিতা দেবী তখন রাত্রে দোকান পাহারা দেবার জন্যে যে পরিচারক সেখানে থাকে তাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

নির্দেশ দেওয়া সেরে তিনিই এবার আমায় তাড়া দিয়েছিলেন, যাবার জন্যে,—আসুন আসুন, ট্যাক্সিওয়ালা-দের মেজাজ ত জানেন।

ফটোটা ভালো করে দেখা হয়নি।

হয়ত দেখবার মত কিছু তা নয়।

জিজ্ঞাসা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সারা দেশটা কি ভরে দিতে চাও
কামারে কুমারে মিস্ত্রীতে
কলের কুলি ও মজ্‌দুরে?
বল বল মহা-বৈজ্ঞানিক
তামাম দেশের নক্সা বানাবে
দর্শন ছেড়ে দার্শনিক?
কবি হাতে নেবে বাস্তুকারের
কাঁটা কম্পাস গজ ফিতে,
কালি কলমের পাট উঠে যাবে
বকলমে হবে শাস্ত্রপাঠ,
শিকেয় উঠবে রবি ঠাকুরের
কাব্যগ্রন্থ সন্ত্রাসে?
নব বসন্তে কোকিল ডাকবে
জড় জ্যামিতিক উচ্ছ্বাসে?

আকাশের গায়ে মেঘ ও রৌদ্র
মাটিতে দেবে না আলপনা,
রঙছুট্ হবে ইন্দ্রধনুর ঐন্দ্রজালিক আস্তরে,
ঘড়ির কাঁটায় সূর্য-চন্দ্র উঠবে নাম্‌বে অবশ্য
নক্ষত্রও আসর জমাবে প্রত্যহ,
কিন্তু সেদিকে তাকাবে না কেউ বিস্ময়ে;
স্থবীরা পৃথিবী, তার তরে আর
থাকবে না কারো কৌতূহল?
বসন্ত এসে হানা দেয় দ্বারে যদ্যপি
মনকে বুঝাবো মানসাঙ্কের
হিসাবনিকাশে তৎক্ষণাৎ?
দৈবাৎ যদি পূর্ণিমার চাঁদ
বাতায়নে এসে দেয় উঁকি,
কুসুম গন্ধে জাগে রোমাঞ্চ যৌবনে
মধুযামিনীর আবেশে হবনা উতলা কিম্বা আন্‌মনা?
কাঠ লোহা আর সিমেণ্ট বালিতে
গড়বে তুমি কি বাস্তুকার
মানুষ গড়ার কারখানা?
কলকব্জায় কব্জিতে দেবে
নব বলাধান ডোজ মাফিক?
তোমারে শুধাই যন্ত্রজীবন-উদ্গাতা,
কোন ফরমুলা লিখে দেবে তুমি
ফুটো জাহাজের মাস্তুলে?

বৃহৎ চক্রে ঘুরে ঘুরে যাবে
মানব জীবন সমস্যা
অনন্তকাল, বিপুলা পৃথ্বী—
একই প্রশ্নের সম্মুখে;
স্বল্প আয়ু ও বহু বিঘ্নতে সীমিত মোদের পদক্ষেপ
কালপুরুষের রোজনামচায় ওঠা নামা চলে রাত্রিদিন,
ক্ষুধার অন্তে তৃপ্ত হয় না পরম ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষা,
অমৃত তৃষ্ণা স্নায়ু-রন্ধ্রের শোনিতে শোনিতে জ্বলন্ত,
সংজ্ঞা সূত্রে হয়নাকো তার নির্বাপণ।

অবিরাম ঘোরে অলাতচক্র
ক্ষণ দৃষ্টিতে মতিভ্রম,
স্ফুলিঙ্গ হতে কাম কামনার
ইন্ধনে জ্বলে জীবন বেদ,
কাঁচের স্বর্গে ধাপে ধাপে ওঠা
বেলোয়াড়ী ঝাড় রাতটুকু।

মহৎ জীবন হাপরে পুড়িয়া
গড়িয়া তুলিছে রাত্রিদিন
প্লাষ্টিকে গড়া ঠুনকো সুখের
রঙীণ ফানুস অজস্র।

তবু শোন তুমি বৈজ্ঞানিক
কান পেতে শোন নবদিগন্তে
অমৃতায়নের পদক্ষেপ,
মৃদু কণ্ঠের গীত-ধ্বনিতে
জাগিয়া উঠেছে বিশ্বলোক।

কল্যাণের পথে পশ্চিমবাঙলা

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

(কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী)

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে আর্থনীতিক সংগ্রাম সুরু হয়েছে। এ সংগ্রাম দেশের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। সমাজ-জীবনের নানারকম অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যার উপর আর একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর আর্থনীতিক পুনর্বাসন। আর্থনীতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বরাজ এবং তা লাভ করতে হ'লে সমগ্র জাতিকে ত্যাগ স্বীকার করে দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আমাদের প্রয়োজন অনেক, কিন্তু সংগতি সীমাবদ্ধ। তাই দেশের বিত্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্য এক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশোন্নয়নের কাজ চলেছে। সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো সম্ভব নয়। তাই, কতগুলো প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, শিল্পোন্নতি, সেচের জল, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা ধাপে ধাপে এক স্বচ্ছল অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছি।

পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য ঃ

পশ্চিমবাঙ্লার প্রথম পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—(১) দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ক'রে খাদ্যাভাব দূর করা; (২) অর্থের নতুন বণ্টন ব্যবস্থা ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে আর্থনীতিক বৈষম্য দূর করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা; (২) দ্রুত শিল্প বিন্যাস দ্বারা কতকগুলি প্রয়োজনীয় বড় ও মৌলিক শিল্প স্থাপন করা; (৩) বেকার সমস্যা প্রশমনের জন্য জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা; (৪) মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে আর্থনীতিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হ'তে না দেওয়া।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য স্থির হয়েছে—(১) জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা; (২) অর্থনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি) সমতা বিধানের চেষ্টা করা; (৩) কৃষি ও সেচের উন্নয়ন; (৪) শিল্পের প্রসারণ ও শক্তিবর্দ্ধন; (৫) পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

পশ্চিমবাঙ্লায় তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট খরচের বরাদ্দ হয়েছে ২৯৩·১৫ কোটি টাকা। নিম্নলিখিত খাতে এই টাকা খরচ করা হবে—

		(কোটি টাকায়)
১।	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—	৫৩·৬০
২।	সেচ ও বিদ্যুৎ—	৬৩·৮৬
৩।	শিল্প ও খনিজ—	১২·১৪
৪।	পরিবহণ ও যোগাযোগ—	২৬·৫০
৫।	সমাজসেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—	৮১·৩২
৬।	বিবিধ—	৩৮·৩০

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পাদনের ফলে দেশের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ যে আজ কল্যাণের পথে এগিয়ে চলেছে সে-বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এবারে আমি রাজ্যব্যাপী এই বিরাট কর্মযজ্ঞের কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

উন্নত কৃষি ও অধিকতর খাদ্য উৎপাদন ঃ

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এই বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৫৩·৬০

কোটি টাকা। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা দু'টির মেয়াদে উন্নত জাতের বীজ, রাসায়নিক ও পচা সার সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; সমবায় সমিতির সাহায্যে ঋণদান, বিপণন ব্যবস্থা ও সুব্যবস্থিত গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি কৃষি ও কৃষকের যে সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেগুলি তৃতীয় পরিকল্পনায় শুধু চালু রাখা হয়নি, সেগুলির উপর আরও বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

জাপানী প্রথায় উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করায় ধানের ফলন বাড়ছে এবং এই প্রথা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব প্রচেষ্টায় সুফল ফলছে যথেষ্ট। ১৯৪৭—৪৮ সালে পশ্চিমবাঙলায় ধানজমির মোট পরিমাণ ছিল ৯৩, ৪৫, ৩০০ একর এবং মোট ৩৪, ০৬, ৪০০ টন চাল বছরে উৎপন্ন হত। উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিমবাঙলায় ধানজমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৯, ১৫,৬০০ একর এবং ঐ সালে মোট ৪১, ৭১, ০০০ টন চাল পাওয়া যায়।

সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সোনারপুর আরাপাঁচ, বাগজোলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি,এটাবেড়িয়া-কলাবেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি বড় জলনিকাশী পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে অনেক চাষোপযোগী জমি পাওয়া গেছে এবং তাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীতভাবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ছোট ছোট জলনিকাশী ও সেচ পরিকল্পনার উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সারা পশ্চিমবাঙলায় খালের জলের সাহায্যে মোট ৩,৫৪,৩১৭ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেত। ১৯৬০—৬১ সালের মধ্যে নদী-উপত্যকা প্রকল্পগুলি থেকে আরও দশলক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৬০—৬১ সালের মধ্যে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের খাল ও শাখা খালগুলি থেকে ৭,০০,০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়ুরাক্ষী প্রকল্পের দ্বারা ৬ লক্ষ একর খারিফ শস্যের জমিতে এবং একলক্ষ কুড়ি হাজার একর রবিশস্যের জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কংসাবতী জলাধার প্রকল্প থেকে ৮ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে।

শিক্ষা ঃ

স্বাধীনতা লাভের পর চোদ্দ বছর ধরে পশ্চিমবাঙলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য বুনিয়াদী শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি সমেত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০—৬১ সালে প্রায় ২৮,০০০-এ দাঁড়ায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে ২৮'৪৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তাতে শিক্ষা-গ্রহণের জন্য প্রবিষ্ট হয়। ১৯৪৬—৪৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯'৬০ লক্ষ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থার ও যোগ্যতার উন্নতির উদ্দেশ্যেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক শিক্ষক ভর্তির আসন সংখ্যা ১৯৬০—৬১ সালে ছিল ৪,৮৪০।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ৭৪৩টি বিদ্যালয়কে (মোট সংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ) উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। ৫৪৭টি বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৬০—৬১ সালের পূর্বে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ছিল ১১২, ১৯৬০—৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২১।

কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে, ১৯৬০—৬১ সালে দুর্গাপুর আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চালু হয়েছে। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ডিগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত শিক্ষাদানে রত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪টি। এগুলির মধ্যে ২টিতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ঃ

এই খাতে সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান—পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে শুধু রোগ চিকিৎসা হয় না। জনসাধারণকে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির টিকা দিয়ে ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য অটুট রাখবার চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাঙলায় প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়, ১৯৬১ সালের শেষে ৪,০৯০টিরও বেশী রোগী-শয্যাসহ, ১৮০টি প্রাথমিক ও ৩৫৩টি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু ছিল। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবাঙলার হাসপাতাল-

গুলিতে রোগী-শয্যার সংখ্যা ছিল ১৭,১০৭ ; ১৯৬১ সালে রাজ্যে মোট রোগীশয্যার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭,৬১১।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাঙলায় ১৪টি স্থানে যক্ষ্মা চিকিৎসা ও ৯২টি স্থানে কুষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬১ সালে এগুলি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫২টি ও ১১৬টি হয়েছে। যক্ষ্মা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাজ্যে ১৬টি বি. সি. জি. টিকা প্রদানকারীদল কাজ করছেন।

সমবায় ঃ

আমাদের এই অনগ্রসর দরিদ্রদেশে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একলা কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া টাকা কোথায়? কৃষকদের কৃষির যৎসামান্য খরচের জন্যও মহাজনের কাছে হাত পাততে হয় এবং ফলে সুদে আসলে অনেক কৃষককে জমি হারাতে হয়। কাজেই এখানে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা ইংরাজ আমলেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১২,৯৪৯ ; এগুলির সভ্য সংখ্যা ছিল ৬·৩৫ লক্ষ ও কার্যকরী মূলধন ছিল ১৩·৮৬ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালের শেষে সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯,০২৯, সভ্যসংখ্যা ১৪·০২ লক্ষ ও কার্যকরী মূলধন ৩৯·২৫ কোটি টাকা।

বড়শিল্প ঃ

দুর্গাপুরে একটি কয়লাভিত্তিক বিরাট শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। একটি কোকচুল্লী দৈনিক ১০০০ টন হার্ড-কোক উৎপাদন করছে এবং তাতে বাজারের চাহিদা কতকাংশে মিটছে। দামোদর উপত্যকা করপোরেশন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেছেন। ভারত সরকার একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেছেন। তাছাড়া একটি তাপবিদ্যুৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উৎপাদনও শুরু করেছে। কোকচুল্লী স্থাপনের ফলে কোক-উপজাত সামগ্রী উদ্ধারের যন্ত্রপাতি স্থাপন, আলকাতরা পরিস্রাবনের কারখানা ও কলকাতায় গ্যাস সরবরাহ করবার জন্য একটি গ্যাসগ্রীড স্থাপন করা হচ্ছে। একটি সার উৎপাদনের কারখানা, চশমার কাঁচ তৈরী করার কারখানা, সিমেন্ট শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কারখানা, কয়লাশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতির কারখানা প্রভৃতি বহু কয়লাভিত্তিক শিল্প দুর্গাপুরে গড়ে উঠেছে।

কল্যাণীতে ৫০,৭০০ টাকুর একটি সুতাকল স্থাপন করা হয়েছে। সুতাকলটি উৎপাদন আরম্ভ করেছে এবং এই কলে ১,১০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হতে পারবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন দ্বিগুণ করবার জন্য দুর্গাপুর-কোকচুল্লী সম্প্রসারণ এবং দুর্গাপুরে ও ব্যাণ্ডেলে আরও একটি ক'রে তাপবিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনার আগে পশ্চিমবাংলায় মোট প্রায় ৬২৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তি ছিল ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবাঙলায় মোট ১২লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে ব'লে আশা করা যায়।

দুগ্ধ সরবরাহ ঃ

কলিকাতায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য হরিণঘাটায় ৫,০০০ দুগ্ধবতী গবাদি পশু রাখা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রত্যহ ১ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদন, সংগ্রহ, শোধন এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। বৃহত্তর কলিকাতায় দৈনিক ৫,০০০ মণ দুধ সরবরাহ করবার জন্য বেলগাছিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় গো-মহিষ পালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

রাস্তাঘাট ও পরিবহন ঃ

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময়ে পশ্চিমবাঙলায় ১,১৮১ মাইল সরকারী পাকা রাস্তা, জেলাবোর্ডগুলির পরিচালনাধীনে ২,০৭৯ মাইল পাকা রাস্তা ও ১৫,৮৯০ মাইল কাঁচা রাস্তা ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অধীনে ২,৩০০ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদে পুরাতন রাস্তাগুলির উন্নয়ন এবং বছরে সেতু সমেত প্রায় ৩৫০ মাইল নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবাঙলায় ৯৭,৫০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ১৫১,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে পাকা রাস্তার মোট মাপ দাঁড়ায় ১,৪৪,০০০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার মোট মাপ দাঁড়ায় ২৫০,০০০ মাইলেরও বেশী।

সমষ্টি উন্নয়ন ঃ

সারা দেশটিকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে নিয়ে প্রতি ব্লকের অধিবাসিরা নিজ চেষ্টায় ব্লকের ছোটখাট উন্নয়নমূলক কাজগুলি করবেন সেই উদ্দেশ্যে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শুভ জন্মদিন, ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে মাত্র ৮টি ব্লক নিয়ে এই উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। ব্লকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২৫১টিতে

পঞ্চায়েত ঃ

শাসন বিকেন্দ্রীভূত করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে সারা পশ্চিমবাঙলার গ্রামাঞ্চলে ২০,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩,৩০০ অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৯—৬০ সালে ৪৭টি উন্নয়ন ব্লকে ৩,০২২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৪৬৯টি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েত গঠনের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

কলিকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থা ঃ

কলিকাতা নগরীর আশেপাশে বহুশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠাতে এবং কলিকাতার জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কলিকাতাবাসীকে দৈনিক জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলনিকাশী ব্যবস্থা, বাসগৃহ সমস্যা প্রভৃতি কলিকাতাবাসীকে কয়েকবছর ধরে নিপীড়িত করছে। এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য সরকার কলিকাতার জন্য একটি ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে মনস্থ করেন এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থাটি সেই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে।

'এমন ছেলেকে সামলাতে হলে...'

'এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত নেই ···! বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিট্‌ফাট রাখ্‌তে চান, তা'হলে কাপড় কাচাটাতো লেগেই আছে।'
'সানলাইটে কাচি, তাই রক্ষে! শুধু পেরে উঠছি সানলাইটের দেদার ফেনায় কাচাটা খুবই সহজ বলে। কেবল এমন খাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন কষ্ট না করে।'

৫৪ নং ফ্ল্যাট, ভগতসিং মার্কেট, নয়া দিল্লীর শ্রীমতী ওয়াদওয়ানি বলেন, 'কাপড় কাচায় সানলাইটের মতো এত ভাল সাবান আর হয় না।'

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S 31-X52 BG

স্ত্রীণাং চরিত্রম্
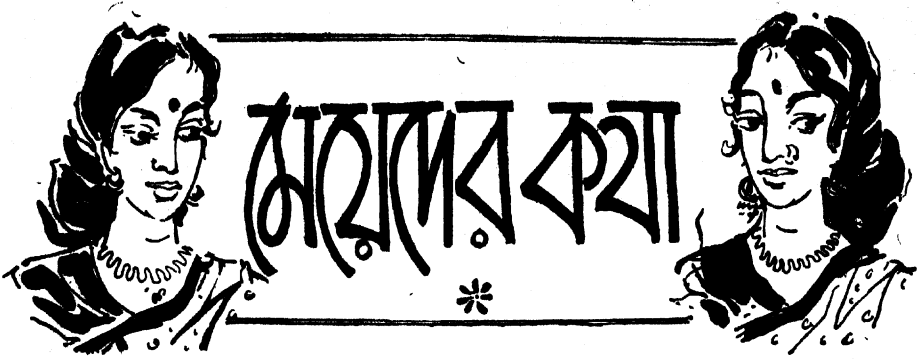
মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

"প্রত্যেক নারীকে বিয়ে করতে হবে। তার আর অন্য গতি নেই। এমন পুরুষকে তার আলিঙ্গন করতে হবে যাকে সে লাথি মারতেও ঘৃণা বোধ করে। তাকে সারা-জীবন জৈব অত্যাচার সহ্য করতে হবে, উন্মাদ, মাতাল, বা নির্বোধ স্বামীর পায়ের তলায়। সে যে নারী, স্বামীর নির্বিচার অধিকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না সে। তোমার সমাজ আমার সমাজ তার সে বর্বর অধিকারকে বিবাহমন্ত্র দ্বারা পবিত্র করে রেখেছে। সমাজ চোখ খোলা রেখে দেখছে এ সকল আইনসম্মত পাশবিক অত্যাচার।" বলেই তাকালেন, মিসেস্ রিজ, পাঞ্চালী ও সঞ্জয়ের চোখের দিকে। যদিও মহিলা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর লক্ষ্য করে বলেন নি, তবু পাঞ্চালী মনে করল মহিলা তাদের প্রতি লক্ষ্য করেই একথা বলছেন। একটু নম্র প্রতিবাদ করে সে বলল, "আমাদের অবস্থা কিন্তু তেমন নয়।"

"না, না, তোমাদের কথা বলছি না, সারা পৃথিবীর স্ত্রীজাতির দুর্ভাগ্যের কথা বলছি", বলে আশ্বাস দিলেন মিসেস্ রিজ।

মিসেস্ রিজ পাঞ্চালীদের বাড়ীওয়ালী। তারা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছে তাঁর বাড়ীর। মিসেস্ রিজ তাঁর বাড়ীতে একা থাকেন। তাঁর স্বামী একটি অল্পবয়সী মেয়েকে নিয়ে টেক্সাসে পালিয়ে গিয়েছে। বাড়ীর অন্য চারটি ফ্ল্যাট্ তিনি চারজন তরুণীকে ভাড়া দিয়েছেন। অবশ্য তারা সকলেই অফিসে কাজ করে। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে একখানা করে শোবার ঘর, চানের ঘর, রান্না ঘর। এক ফ্ল্যাটে থাকেন বাড়ীওয়ালী নিজে। মিসেস্ রিজ-এর স্বামী তার এই সুন্দর বাড়ীর লোভেই তাকে বিয়ে করেছিলেন। মিসেস্ রিজ তাঁকে, পালিয়ে যাবার আগে, একথা প্রত্যহ কমপক্ষে দশবার করে শুনিয়েছেন। সে-কথাটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যেই যেন মিঃ রিজ কুড়ি বছরের সুন্দরী তরুণী নেলীকে নিয়ে টেক্সাসে পালিয়েছেন। স্বামীর মধ্যে যত দোষ তিনি দেখেছেন সমস্ত পুরুষ জাতির মধ্যে তিনি আজ তা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু পাঞ্চালীর স্বামী সঞ্জয়ের প্রতি কেমন যেন একটা স্নেহ জন্মে গিয়েছে। তিনি তার খুব প্রশংসা করেন। ফলতঃ তাঁর ছয় ফ্ল্যাটের বাড়ীতে সেই একা পুরুষ, আর বাকী ছয়জন নারী; যথা পাঞ্চালী, বাড়ীওয়ালী মিসেস্ রিজ, আর চারজন ভাড়াটিয়া, ইসাবেল, ডোরা, অ্যানা ও লিলিয়ান্। মিসেস্ রিজ কোন পুরুষকে বা পুরুষের সঙ্গে যুক্ত এমন কোন

মেয়েকে ভাড়া দিতে রাজী নন। ব্যতিক্রম হয়েছে শুধু সঞ্জয়ের বেলাতেই। কিন্তু ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হয়েছে পাঞ্চালীর নামেই।

বাড়ীওয়ালীর বয়স হয়েছে বেশ। ৪৫ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর চমৎকার। দেহের আর স্বাস্থ্যের চর্চাতেই তাঁর দিন কাটে। আর বাকি সময়টুকুতে তিনি বাড়ীর অধিবাসীদের তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যহ তিনি পাঁচটি ভাড়াটিয়া মেয়ের খবর নেন, আর নেন সঞ্জয়ের—তার পড়াশোনা কতদূর এগোচ্ছে, শিক্ষা-সংক্রান্ত ডিপ্লোমা পেলে কি করবে ভারতে গিয়ে —এসকল খবর তিনি প্রায়ই নেন—উৎসাহ দেন। সেদিন তিনি রাত্রের খাবার খেয়ে স্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে সঞ্জয়দের খবর নিতে এলেন।

সঞ্জয়কে তার খুব ভাল লেগেছে। তার কারণ সে পড়া শোনা নিয়েই থাকে। পাঞ্চালীর সঙ্গ ছাড়া কোথাও বেড়াতেও যাচ্ছে না,অন্য কোন নারীর সঙ্গে একটু আলাপও জমাতে সে পারে না, যদি পাঞ্চালী উৎসাহ না দেয়। পাঞ্চালীর দৃষ্টিতে বাড়ীওয়ালী বুড়ী হয়ে গেছে; তাই সঞ্জয়ের সঙ্গে মিসেস্ রিজের আলাপ-আলোচনা জমতে দিতে সে আপত্তি করে নি। এমন কি সঞ্জয়কে তাঁর তত্ত্বাবধানে রেখে সে প্যারিস, বার্লিন, সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে চলে গিয়েছে ইসাবেল, ডোরা, অ্যানা কিংবা লিলিয়ান্ও তাদের পুরুষবন্ধুর সঙ্গে।

মিসেস্ রিজ কিন্তু ইসাবেল বা ডোরা বা অন্য কারো পুরুষবন্ধুদের দেখতে পারেন না। পুরুষজাতের প্রতি তার একটা সাংঘাতিক বিদ্বেষ। তিনি সময় পেলেই সঞ্জয়ের পড়ার টেবিলে এসে বসেন, আর গল্প করেন লণ্ডনের পুরুষজাতের নৃশংসতার। সঞ্জয় অত্যধিক সহানুভূতি দিয়ে শুনে যায়, যেন সে পুরুষজাতির কেউ নয়।

মিসেস রিজ বলেন "জানো আমার বাড়ীর চারটি মেয়ের দুঃখের কথা। ইসাবেল, ডোরা, অ্যানা তিনজনেরই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু জান কী সাংঘাতিক স্বামীর হাতে ওরা পড়েছিল? অন্য মেয়ের পেছনে স্বামীগুলি ঘুরে বেড়াত, আর মেয়েগুলি অফিসে চাকুরী করে খেটে মরত। এখনো করে তবে এখন তো মাতাল, জুয়াপ্রিয়, ভ্রষ্ট স্বামীগুলির জন্যে নয়। লিলিয়ানের বিয়ে হয় নি। দেখেছ মেয়েটি কত সুন্দরী। টমাস্ কুক্ সিপিং কোম্পানীতে হোষ্টেসের কাজ করে সে। কতবার তাকে বলেছি পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে এমন ঘুরে বেড়াবি না—সমুদ্রের ধারে, হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে, তাই ঘা খেল ঠিক। আমার বাড়ীর একটা দুর্নাম হবে তাই আমি কত চেষ্টা করে গোপনে ডাক্তারদের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করেছি। কিন্তু যেই-সেই। আমার কথা কে শোনে, আবার পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার এই ফরাসী ছেলেটা তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাইকে নিয়ে বেরিয়েছে। এমন কি তোমার পাঞ্চালী-কেও নিয়ে গেছে।"

ইঙ্গিতটাতে বড় লজ্জিত বোধ করল সঞ্জয়। "আমি-আমি" করে কি বলতে যাচ্ছিল। মিসেস্ রিজ তাকে কেমন একটা সান্ত্বনা দিলেন, বললেন, "তার জন্যে তোমার ভাবনা করার কিছু নেই। বড় চালাক মেয়ে সে।" তারপর সঞ্জয়ের মন অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বললেন, "একটা কথা কি জানো? মেয়েদের অফিসে বা কারখানায় কাজ করা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। কারণ কঠিন পরিশ্রমে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তার থাকে না। মাতৃত্ব তার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক পাপ। সন্তানদেরও মঙ্গল হয় না। জানো, লণ্ডনের এক কারখানায় ৭৭টি মেয়ে নিয়ে একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল—তাতে দেখা গেল, তাদের মধ্যে ৯টি গর্ভপাত হয়েছে, ৪০টি সন্তান জন্মের পরে মারা গেছে।"……তারপর একটু থেমে ভেবে বললেন, "জানো কি মেয়েদের পক্ষে মাতৃত্বের গৌরবের চেয়ে গৌরবের কিছু নেই। জানো Lady Emile Lutyens কি বলেছেন? তিনি বলেন' "Motherhood is a vocation by itself, and one of the highest in the world।" কিন্তু দুষ্কৃতকারী পুরুষ নারীকে সেই গৌরবের আসন থেকে বিচ্যুত করছে। তার মহিমাময় প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করছে নিজেদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।"

একটা আকস্মিক উন্মাদনা দেখা গেল মিসেস্ রিজের চোখে-মুখে। সে কি বাৎসল্য রসের না অন্য কিছুর—সঞ্জয় তা বুঝতে পারল না। হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন সঞ্জয়ের দিকে। সে বিছানায় বসে বই হাতে

করে মিসেস রিজের গল্প শুনছিল। কেমন চকিত হল সে। মিসেস্ রিজ্ গদগদ স্বরে কেমন যেন স্নেহের আবেগে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলেন, আর এক-হাতে নিবিয়ে দিলেন আলো। অবশ হয়ে পড়ল সঞ্জয়।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

কাগজের তৈরী সৌখিন-সুন্দর আর নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা রকমের বিচিত্র কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা ইতি-পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি···এবারে বলছি, রঙ-বেরঙের সুতী, পশমী আর রেশমী কাপড়ের ছোট-বড় টুকরো দিয়ে বিভিন্ন ধরণের যে সব অভিনব শিল্প-সামগ্রী বানানো যায়—তারই কথা। রঙীন-কাপড়ের টুকরো দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নানা ধরণের এ সব কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার ফলে, আমাদের দেশের গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের শুধু যে সংসারের দৈনন্দিন-কাজকর্ম্মের অবসরে নিরলস-চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ মিলবে, তাই নয়—সুন্দর-পরিপাটি ছাঁদে নিজেদের গৃহ-সজ্জা আর সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের অল্প-খরচে নিজেদের হাতে-গড়া বহুবিধ বিচিত্র উপহার-উপঢৌকন দেবারও সুবিধা হবে অনেকখানি। অথচ, কাপড়ের টুকরো দিয়ে এ সব অভিনব শিল্প-সামগ্রী তৈরী করা এমন কিছু ব্যয়সাধ্য বা পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার নয়···একটু চেষ্টা করলেই, এ-ধরণের সৌখিন এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তাঁরা বাড়ীতে বসেই নিজেদের হাতে গড়ে তুলতে পারবেন। তাই আপাততঃ, কাপড়ের কারু-শিল্পের কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের সৌখিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রচনার বিচিত্র পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ জানিয়ে রাখছি।
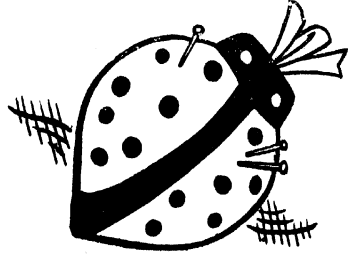
উপরের ছবিতে কাপড়ের কারু-শিল্পের সৌখিন অথচ নিত্য-প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদভোজী 'Lady-Bug' বা 'লাল-পোকার' ছাঁদে রচিত, অভিনব-ধরণের একটি আলপিন-রাখবার 'পিন্-কুশ্যনের' (Pin-cushion) নমুনা দেওয়া হলো। এ-ধরণের 'পিন্-কুশ্যন্' তৈরীর জন্য, প্রয়োজন-মতো মাপের ও রঙের কয়েকটি টুকরো পাত্‌লা 'ফেল্ট' (Felt) বা মোটা 'ফ্ল্যানেল' (Flannel) কিম্বা পুরু খদ্দর-জাতীয় কাপড় ব্যবহার করবেন। এ-ধরণের 'পিন্-কুশ্যন্' তৈরীর জন্য দরকার—কালো বা গাঢ়-বাদামী, আর লাল কিম্বা গাঢ়-কমলা রঙের দু'টুকরো কাপড়··· কালো বা গাঢ়-বাদামী রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে উপরের নক্সার ছাঁদে ঐ 'লাল-পোকার' দেহ এবং লাল কিম্বা গাঢ়-কমলা রঙের টুকরোটি দিয়ে তৈরী হবে পোকার দেহের দু'পাশের ডানা দুটি। দু'রঙের এই দুটি কাপড়ের টুকরো থেকে সুষ্ঠুভাবে ছাঁট-কাট করে কিভাবে ঐ 'লাল-পোকার' দেহ আর ডানা দু'খানি রচিত হবে, গোড়াতেই তার হদিশ দিয়ে রাখি।
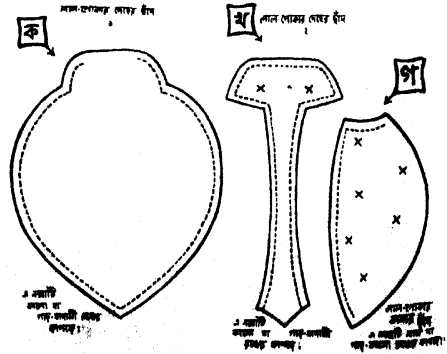
উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি-ছাঁদে 'লাল-পোকার' দেহ আর দু'পাশের ডানা দু'খানির জন্য পছন্দমতো কালো বা গাঢ়-বাদামী এবং লাল কিম্বা গাঢ়-কমলা রঙের কাপড়ের টুকরোগুলি যথাযথ-আকারে ছাঁটাই করা দরকার। তবে এ সব কাপড়ের টুকরোগুলিকে সরাসরি ছাঁটাই না করাই ভালো। কারণ, কাপড়ের টুকরোগুলিকে সরাসরি বিভিন্ন আকারে ছাঁট-কাটের সময়, মাপের বেহিসাব বা কাজের ভুল-ত্রুটি ঘটলে, সে গলদ, শোধরানো মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। ফলে, কারুশিল্প-সামগ্রীর চেহারাও নিখুঁত-ছাঁদের হবে না—বেয়াড়া দেখাবে এবং পয়সা খরচ করে কেনা কাপড়ের টুকরোগুলিও অনর্থক নষ্ট হবে। তাই এ কাজের সময়, গোড়াতেই উপরের ২নং চিত্রের নমুনানুসারে 'ক', 'খ' আর 'গ' চিহ্নিত, অর্থাৎ ঐ 'লাল পোকার' দেহ (১ এবং ২) ও ডানার বিভিন্ন অংশের কাঠামোর ছাঁদে, শাদা-কাগজের বুকে পেন্সিলের রেখা টেনে প্রত্যেকটি টুকরোর 'খশড়া-প্রতিলিপি' (Pattern) আলাদা-আলাদাভাবে এঁকে নিয়ে, সেগুলিকে একের পর এক বিভিন্ন-রঙের কাপড়ের টুকরোর উপরে সুষ্ঠুভাবে 'ছকে' বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে ফেলেন, তাহলে আর অনাবশ্যক দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তা-লোকসানের আশঙ্কা থাকবে না।

এমনিভাবে কাপড়ের টুকরোগুলির উপরে নিখুঁতভাবে 'লাল-পোকার' ঐ দেহ (১ এবং ২) আর ডানা দু'খানির বিভিন্ন 'খশড়া-প্রতিলিপি' 'ট্রেসিং' করে নেবার পর, ধারালো কাঁচির সাহায্যে কাপড়ের টুকরোগুলিকে যথাযথ-ছাঁদে ছেঁটে নেবেন—তাহলেই সেগুলি সেলাই করে একত্রে জোড়া দেবার কাজের উপযোগী হবে।

এবারে আলাদা-আলাদা রঙের এবং বিভিন্ন আকারের কাপড়ের টুকরোগুলিকে একত্রে মিলিয়ে সেলাই করে জুড়ে

নেবার পালা। এ কাজের সময়, গোড়াতেই পাশের 'এক নম্বর' ছবির ধরণে, 'গ'-চিহ্নিত অংশের অর্থাৎ 'লাল-পোকার' দু'খানি ডানার জন্য ছাঁটাই-করা কাপড়ের টুকরো দুটির বাইরের কিনারার দুই প্রান্তে প্রায় ¼″ ইঞ্চি জায়গা পরিপাটিভাবে মুড়ে ছুঁচ-সুতোর 'কাঁচা-সেলাই' (Basting) দিয়ে টেঁকে নিন। এবারে এই ডানা দু'খানির সঙ্গে 'খ'-চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ 'লাল-পোকার' দেহের ২য়-ভাগের প্রায় ¼″ ইঞ্চি কিনারা-বরাবর-জায়গা পরিপাটিভাবে মিলিয়ে, এ দুটি বিভিন্ন-বর্ণের কাপড়ের টুকরোকে 'কাঁচা-সেলাই' দিয়ে টেঁকে ফেলুন। এমনিভাবে 'লাল-পোকার' দেহের সামনের অর্থাৎ বুকের দিকটি রচিত হয়ে যাবার পর, 'ক'-চিহ্নিত অংশের অর্থাৎ দেহের ১ম-ভাগ বা পিঠের
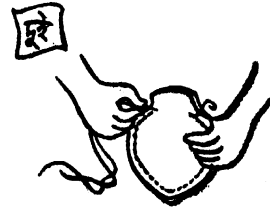
দিকের জন্য ছাঁটাই-করা কাপড়ের টুকরোটিকে পাশের 'দুই-নম্বর' ছবির ভঙ্গীতে দেহের সুমুখ-ভাগের কাপড়ের সঙ্গে আগাগোড়া সমানভাবে মিলিয়ে, ভালো করে সেলাই দিয়ে একত্রে জোড়া লাগান। তবে 'লাল-পোকার' মাথার দিকে অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো দুটির উপরভাগ সেলাই করবেন না—সেটুকু বাদ রাখতে হবে।

অতঃপর পাশের 'তিন-নম্বর' ছবিতে যেমন দেখানো

হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে সদ্য সেলাই করা 'লাল-পোকার' ডানা-সমেত দেহাংশের ঐ বিচিত্র 'ঠোঙাটির' মধ্যে বেশ ঠেসে খানিকটা পরিষ্কার তুলো (Cotton) বা কাঠের

গুঁড়ো (Sswdust) ভরে দিন। ঠোঙাটি প্রয়োজনমতো ভরাট হবার পর, গাঢ়-কমলা রঙের সরু একটি রেশমী-ফিতা (Narrow Si k Rib on) দিয়ে 'লাল-পোকার' শুঁড় রচনা করে, সেটিকে ঐ তুলো বা কাঠের গুঁড়ো ভরা ঠোঙার. মুখে যথাযথভাবে বসিয়ে দিন। এবারে ঐ ফিতা-বসানো ভরাট-ঠোঙাটির মুখে ছুঁচ-স্থতোর সেলাই দিয়ে বন্ধ করে দিন—পাশের 'চার-নম্বর' ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে। তাহলেই কাপড়ের কারু-

শিল্পের বিচিত্র 'পিন্-কুশান্' রচনার কাজ শেষ হবে।
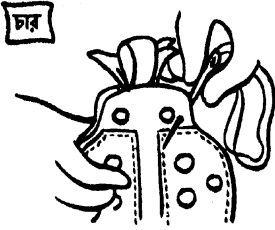
এখন রঙিন কাপড়ের তৈরী অভিনব এই 'পিন্-কুশ্যনটি' যে কোনো প্রিয়জনকে উপহার দেবেন তিনিই খুশী হবেন।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি স্থন্দর-স্থন্দর কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা জানাবার ইচ্ছা রইলো।

নক্সাদার টেবিল-ক্লথ

স্থনীরা মুখোপাধ্যায়

এবারে একটি নতুন-ধরণের স্থন্দর নক্সাদার টেবিল- ক্লথ সেলাইয়ের কথা বলছি। এ ধরণের টেবিল-ক্লথ তৈরীর জন্য বেশ পরিপাটি ও নিখুঁতভাবে স্থচী-শিল্পের কাজ করতে হবে এবং এ কাজ এমন কিছু দুঃসাধ্য- কঠিনও নয়।

উপরে কয়েকটি পদ্মপাতার মাঝে ফুটন্ত পদ্মফুলের যে বিচিত্র নক্সাটি দেখানো রয়েছে, সেটিকে যথাযথভাবে স্থচী-

শিল্পের কাজ করে টেবিল-ক্লথের বুকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, ভালো 'লিনেন' (Lin:n) বা 'খদ্দর' জাতীয় কাপড় ব্যবহার করতে হবে। খুব মিহি-মোলায়েম বা রেশমী কাপড়ের চেয়ে 'খদ্দর' বা 'লিনেন' জাতীর মোটা-খশখশে কাপড়েই রঙীন স্থতো দিয়ে এমব্রয়ডারী করা এই নক্সাদার স্থচী-শিল্পের কাজটি ঢের বেশী স্থন্দর দেখাবে।

পছন্দমতো কাপড় সংগ্রহ হবার পর, গোড়াতেই উপরের ঐ নক্সাটিকে প্রয়োজনানুরূপ-আকারে পরিষ্কার একখানা কাগজে পরিপাটিভাবে এঁকে নিতে হবে। এমনি-ভাবে পদ্মফুল ও পাতাগুলির নক্সা নিখুঁতভাবে এঁকে নিয়ে, সচিত্র-কাগজখানির নীচে এক টুকরো 'কার্ব্বন-পেপার' (Carbon-paper) পেতে সেলাইয়ের কাপড়টির মাঝখানে ঐ নক্সার প্রতিলিপি 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিন।

নক্সাটিকে আগাগোড়া 'ট্রেসিং' করে নেবার পর রঙীন স্থতো দিয়ে কাপড়ের উপরে এমব্রয়ডারী কাজ করতে হবে। এমব্রয়ডারী-কাজের জন্য 'তিন-তারের, (3 Strands of Cotton-threads) স্থতো ব্যবহার করবেন। এমব্রয়ডারীর সময় কাপড়ের যে সব অংশে (অর্থাৎ, উপরের নক্সার 'ক'-চিহ্নিত স্থানগুলি) 'বটন-হোলের' (Buttonhole) কাজ বা 'গর্ত্ত-রচনা' করতে হবে, সেই সব জায়গায় একসারি 'রানিং-ষ্টিচ' (Running Stitch) বা 'কাঁচা-সেলাই' দিয়ে রাখুন।
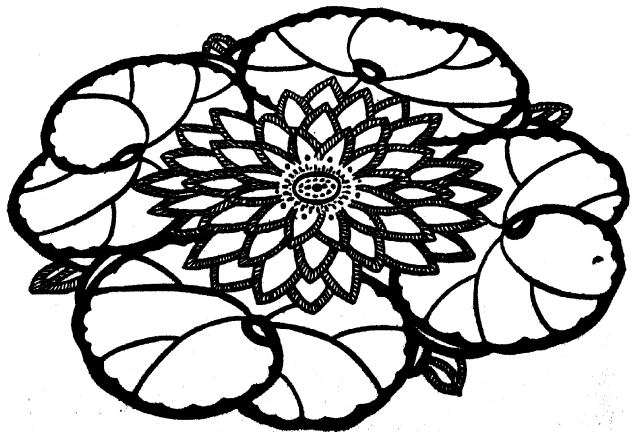
পদ্মফুলের মাঝখানে পরাগের গোলাকার অংশটিকে সোনালী কিম্বা হালকা-হলদে রঙের সুতো দিয়ে 'বটন-হোল' সেলাই (Buttonhole stitch) করুন। এবারে পরাগের ঐ গোলাকার-অংশটির মাঝে মাঝে মানানসই-ভাবে সোনালী অথবা হালকা-হলদে রঙের সুতোর সাহায্যে 'ফ্রেঞ্চ-নট' (French Knots) সেলাই দিয়ে কয়েকটি 'বিন্দু' এবং সেগুলির মাঝে মাঝে সবুজ-রঙের সুতোয় ফোঁড় তুলে 'চেন-ষ্টিচ' (Chain-Stich) পদ্ধতিতে আরো কয়েকটি এলোমেলো-ছাঁদে ইতস্ততভাবে ছড়ানো 'বিন্দু' রচনা করবেন। এ কাজের পর, পদ্মের পরাগের ঐ গোলাকার-চাক্তির বাইরের দিকে সোনালী বা হালকা-হলদে রঙের সুতোর 'রাণিং ষ্টিচ' Running Stitch সেলাই দিয়ে ছোট-ছোট আরো কয়েকটি 'আইলেট-হোল' (Small Eyelet-Holes) অর্থাৎ 'বিন্দুর মতো গর্ত-চিহ্ন' রচনা করে, সেগুলিকে ধারালো ছুরি (Stiletto) অথবা কাঁচির সাহায্যে কেটে নিখুঁত-ছাঁদে 'ফুটো' (Button-hole) বানিয়ে নেবেন। এবারে এই সব 'ফুটোর' কিনারাগুলি সোনালী অথবা হালকা-হলদে রঙের সুতোর সাহায্যে পরিপাটিভাবে সেলাই করবেন। পদ্মফুলের পাপড়িগুলি শাদা-রঙের সুতো দিয়ে 'বটনহোল ষ্টিচ' (Buttonhole-Stitch) পদ্ধতিতে সেলাই করতে হবে। পদ্মপাতাগুলি রচনা করতে হবে—সবুজ রঙের সুতোয় এবং 'বটনহোল' সেলাই দিয়ে। ফুলের-কোরক আর কচি-পাতা সেলাই করতে হবে 'বটনহোল' পদ্ধতিতে···তবে ফুলের কোরকের জন্য নেবেন সাদা-রঙের সুতো, আর কচি-পাতার জন্য দরকার—সবুজ রঙের সুতো।

এমনিভাবে পদ্মফুল ও পাতার নক্সাটি আগাগোড়া এমব্রয়ডারী হয়ে যাবার পর, সেলাইয়ের কাপড়টিকে অল্প-ভিজা অপর একটি পরিস্কার কাপড়ের উপরে সমানভাবে বিছিয়ে রেখে 'ইস্ত্রি' (Ironing) করে নেবেন। তারপর ধারালো একখানি কাঁচির সাহায্যে এমব্রয়ডারী-করা নক্সার বাইরের বাড়তি-কাপড়টুকু পরিপাটিভাবে ছেঁটে বাদ দিয়ে নিলেই, পদ্মফুল আর পাতার আকারে বিচিত্র নক্সাদার টেবিল-ক্লথ সেলাইয়ের কাজ শেষ হবে।

সুধীরা হালদার

আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল পাঞ্জাবী খাবার-দাবার বেশ পছন্দ করেন···তাই, এবারে ভারতের উত্তরাঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয় দুটি উপাদেয় পাঞ্জাবী-রান্নার কথা জানাচ্ছি। এ সব খাবার শুধু যে বিচিত্র অভিনব তাই নয়, খেতেও বেশ সুস্বাদু আর মুখরোচক। এ দুটি পাঞ্জাবী খাবারের মধ্যে—প্রথমটি হলো, নিরামিষ-রান্না, আর দ্বিতীয়টি হলো, আমিষ-রান্না। গোড়াতেই নিরামিষ-রান্নাটির কথা বলি।

পাঞ্জাবী 'সুখা-ডাল' ঃ

পাঞ্জাব-অঞ্চলের অভিনব এই 'শুখা-ডাল' খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, প্রথমেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিচ্ছি। অর্থাৎ, এ রান্নার জন্য চাই—এক পোয়া কড়াইয়ের ডাল, এক ছটাক কুচোনো পেঁয়াজ, কিছু ধনে পাতা, এক ছটাক ঘি, এক ছটাক জিরে-ভাজার গুঁড়ো, আধ চায়ের-চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প একটু গরম-মশলার গুঁড়ো আর খানিকটা গুঁড়ো-নুন।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজ সুরু করতে হবে। রান্নার সময়, পরিষ্কার একটি হাঁড়ি বা ডেকচিতে কড়াইয়ের ডাল ঢেলে, তার সঙ্গে আন্দাজমতো জল আর নুন মিশিয়ে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্রটিকে চাপিয়ে, ডালটুকু সুসিদ্ধ করে নিন। তবে ডালের পাত্রে এমন পরিমাণে জল মেশাবেন যে ডালটুকু সুসিদ্ধ হয়ে যাবার পর, তাতে যেন এতটুকু জল না থাকে···আগা-গোড়া বেশ শুকনো ঝরঝরে ধরণের হয়।

এভাবে কড়াইয়ের ডাল বেশ সুসিদ্ধ-ঝরঝরে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডালের পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে রেখে, অন্য একটি রন্ধন-পাত্রে ঘি চাপিয়ে সেই ঘিয়ে পেঁয়াজের-কুচোগুলিকে বেশ বাদামী-রঙীন করে ভালোভাবে ভেজে নিন। পেঁয়াজের কুচোগুলি আগাগোড়া

ঘিয়ে ভাজা হলে, রন্ধন পাত্রে এবার ঐ ইতিপূর্ব্বে সুসিদ্ধ কড়াইয়ের ডাল ঢেলে দিন। তারপর হাতা বা খুন্তী দিয়ে রন্ধন-পাত্রের ডাল আর পেঁয়াজের কুচোকে অল্পক্ষণ ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়ে কিছু ধনেপাতা মিশিয়ে দিন। এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে রেখে, খাবারটিতে আন্দাজমতো খানিকটা লঙ্কার গুঁড়ো, গরম-মশলা আর জিরে-ভাজার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই অভিনব 'শুখা-ডাল' পাঞ্জাবী খাবারটি পাতে পরিবেষণের উপযোগী হয়ে উঠবে।

পাঞ্জাবী 'গোস্ত্ কালিয়া' ঃ

এটি হলো পাঞ্জাব অঞ্চলের বিচিত্র-রসনাতৃপ্তিকর এক-ধরণের আমিষ-খাবার। এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—একসের ভালো মাংস, একপোয়া টোম্যাটো, একপোয়া পিঁয়াজ, কয়েক টুকরো আদা, একটি রসুন, কিছু ধনেপাতা, তিন ছটাক ঘি, খানিকটা গুঁড়ো-নুন, দুই চায়ের চামচ ধনে গুঁড়ো, দুই চায়ের চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, দুই চায়ের চামচ হলুদের গুঁড়ো, আর এক চায়ের চামচ গরম-মশলার গুঁড়ো।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, মাংসের টুকরোগুলিকে পরিষ্কার জলে পরিপাটিভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিন। তারপর আদা, পেঁয়াজ আর রসুন ভালো করে বেটে নেবেন। এ কাজ সেরে, উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকৃচি চাপিয়ে পেঁয়াজ-আদা-রসুনবাটাটুকু বেশ করে ঘিয়ে ভেজে ফেলুন। এগুলি ভেজে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে মাংসের টুকরো, টোম্যাটো আর আন্দাজমতো পরিমাণে ধনে-হলুদ-লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন মিশিয়ে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে মাংসটিকে বেশ ভালো করে 'কষে' নিন। মাংসের টুকরোগুলি সুষ্ঠুভাবে 'কষা' হলে, রন্ধন-পাত্রে অল্প একটু গরম-জল ঢেলে হাঁড়ি বা ডেক্চির মুখে ঢাকা চাপা দিয়ে, রান্নাটিকে কিছুক্ষণ উনানের নরম-আঁচে বসিয়ে রেখে সুসিদ্ধ করে নিন। এমনিভাবে মাংসের টুকরোগুলি আগাগোড়া সুসিদ্ধ হবার পর, কিছু ধনেপাতার কুচি আর আন্দাজমতো গরম-মশলা মিশিয়ে, রান্নাটিকে অল্পক্ষণ উনানের আঁচে ফুটিয়ে নেবেন। তাহলেই, পাঞ্জাবী 'গোস্ত-কালিয়া' রান্নার কাজ শেষ হবে। এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রেখে, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব আর অতিথি-অভ্যাগতদের পাতে সাদরে বিচিত্র উপাদেয়-এই উত্তর-ভারতীয় আমিষ-খাবারটি পরিবেষণের ব্যবস্থা করুন!

পরের মাসে, এ-ধরণের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় ভারতীয় খাবার-রান্নার বিষয়ে আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

খোলা ড্রেনটা ছোট একটি খালের মত রাস্তার এপ্রান্ত ও-প্রান্তে চলে গেছে। পাড়ার যত নোংরা জলের কুলুকুলু-নাদ, ড্রেনের পাড়ে দাঁড়ালে সব সময় শোনা যায়। বৃষ্টি হলে বিবর্ণ দুর্গন্ধ জল উপচে—নানারকমের শব্দের স্তবক পোটলা-পুঁটলি ভেসে যায়। আবার কাগজের নৌকাও মাঝে মাঝে ভাসে। বৃষ্টি না হলেও জল থাকে। কখনো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসে। কখনো বা হাঁটুজলও হয়। কুলদাবাবু বলেন 'পাতালের ভোগবতী'।

ড্রেনের পিছনে রোয়াকওয়ালা একটি জীর্ণ বাড়ি। সামনের দিকে তার জানলা দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। কিন্তু রোয়াকটিতে বসতে কোন বাধা নেই। পাড়ার তিন বুড়ো এখানে এসে অবাধে আড্ডা জমান। আরো অনেকে আসেন। কিন্তু তিনজনই রেগুলার সদস্য। সবাই চলে গেলেও রাত আটটা পর্যন্ত ওঁরা এখানে বসে থাকেন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে, অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হলে ছাতা মাথায় কেউ এসে হাজির হন। কেউ কেউ বিনা ছাতাতেও আসেন। কুলদা বাঁড়ুয্যে, যুগল গুপ্ত আর ননী মল্লিক—তিন বন্ধু। মনে হয় কেউ কারো বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না। দুএকদিনের অদর্শনেই সঙ্গ কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনজনের বয়সই ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। তিনজনই এখন কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনজনই হীন স্বাস্থ্য। কুলদা ব্লাড-প্রেসারের রোগী। যুগলকে একবার থ্রম্বসিস এসে হানা দিয়ে গেছে। ননীগোপালও নিত্য রোগা। পেটের গোলমালে ভোগেন। সংসারে এঁরা এখন তিনজনেই শুধু নামে কর্তা। কিন্তু বড়কর্তা নয়, বুড়োকর্তা। আসলে নিজেদের দেহের পোষণ তোষণ রক্ষণ অবেক্ষণ ছাড়া আর কোন কাজ এঁদের নেই। সংসার চালাবার ভার ছেলেমেয়েদের হাতে গিয়ে পড়েছে। কিছুটা ওঁরা নিজেরাই ছেড়ে দিয়েছেন, কিছুটা তারা কেড়ে নিয়েছে।

তিনজনের মধ্যে মিলও যেমন আছে গরমিলও তেমনি।

কুলদা বাঁড়ুয্যের অবস্থা ভালো। বছর দুই নাকি ডাক্তারি পড়েছিলেন। কিন্তু পোষায় নি। ছেড়ে দিয়ে ফরেষ্ট অফিসে কাজ নিয়ে চলে যান। সেই সুবাদে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। কথায় কথায় বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। শিকার কাহিনীর কথাও বলেন।

বাঘ ভালুক নাকি নিজের হাতে শিকার করেছেন। এখন অবশ্য সেই বীর সৈনিকের চেহারা নেই। দেব সেনাপতি এখন বাবু কার্তিক। চেহারাটি সুন্দর। দীর্ঘ চেহারা, লম্বাটে মুখ, চোখা নাক, গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। পাকার পরিমাণই বেশি। কুলদাই বেশ সৌখীন। এই রোয়াকের আড্ডাতেও মিহিধুতি পাঞ্জাবি পরে আসেন। কোন কোনদিন ফতুয়াও থাকে গায়ে। যুগলবাবুর মত ছেঁড়া আর ময়লা গেঞ্জি পরে আসেন না, ননীবাবুর মত খালি গায়ে আসতেও তাঁকে দেখা যায় না। মাথার চুলে নিয়মিত চিরুণী চালান। পায়ের চটিও সাধারণ নয়। হরিণের চামড়ার চটি। ময়ূরভঞ্জে ওঁর এক ভাগ্নে আছে। সেই নাকি ছমাস অন্তর দু জোড়া করে চটি মামাকে সাপ্লাই করে।

যুগলবাবু বলেন, 'কুলদা আমাদের আপাদমস্তক বাবু। দুপাটি দাঁত তো বাঁধিয়ে নিয়েছ। এবার এক কাজ কর। চুলেও কলপ লাগাতে শুরু করে দাও। তারপর একটি কিশোরীর পাণিগ্রহণ করে একেবারে নওলকিশোর মূর্তি। বয়েস থাকতে বিয়েটা কিন্তু আর একবার করলে পারতে।'

কুলদাবাবু আজ বিশবছর হল বিগতদার। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরাও বিয়ে করেছে। যে যার কাজের জায়গায় ছোট ছোট সংসার পেতেছে। মেজো ছেলে আছে সপরিবারে তাঁর কাছে। আসলে তিনিই আছেন মেজো ছেলে আর মেজো বউমার আশ্রয়ে।

বন্ধুদের কথায় কুলদাবাবু হাসেন, বলেন, 'বেশ তো দাও না একটা ঘটকালিটটকালি করে। তোমার নাতনীদের ভিতরে যদি কেউ থাকে—'

ঠিক সরাসরিভাবে তাঁর নাতনীদের কথা উল্লেখ করায় যুগলবাবু খুসি হন না। তাঁর জ্রভুটি কুঁচকে যায়। বাঁকা হেসে একটু খোঁচা দিয়ে বলেন, 'আবার আমার নাতনীদের কেন—পাড়াভরে তোমার নাতনীরই কি অভাব আছে নাকি ?'

তা অবশ্য নেই। পাড়ার স্কুল কলেজের যে কটি কিশোরী কি তরুণী ছাত্রী এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে তাদের অনেকের সঙ্গেই কুলদাবাবুর পরিচয় আছে। প্রত্যেকের নাম ধরে তাদের ডাকেন। শিখা, কৃষ্ণা, শ্যামলী, শমিতা প্রত্যেক মেয়ের পোষাকি নামগুলি পর্যন্ত কুলদা বাবুর মুখস্ত। কে কোন ক্লাসে পড়ে, কে অঙ্কে কাঁ ইংরেজীতে ভালো, কে গান জানে, কে ভালো আবৃ করে—সব খবর কুলদাবাবুর জানা। তিন বুড়োর মং কুলদাবাবুকেই তারা বেশি পছন্দ করে। কুলদাবাবু শু যে দেখতে ভালো—বেশেবাসে পরিচ্ছন্ন তাই নয়, তা আলাপের মধ্যেও বেশ রস আছে। সম্বোধনে মাধুর্য আছে দিদিমণি লক্ষ্মীদিদি বলে তিনি যখন ওদের কাছে ডাকে ওরা পোষাপাখির মত, পোষা খরগোস আর হরিণে বাচ্চার মত কুলদাবাবুর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। স্কুলের ফ্রক পরা মেয়ে হলে কুলদাবাবু তার গাল টিপে দেন। কলেজে মেয়ে হলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, কি বেণী ধরে আ একটু টান দেন। কেউ হাসে, কেউ উঃ বলে তাড়াতাডি ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'আপনি তো আচ্ছা মানুষ। লাগে না বুঝি ?'

দাদুর বয়সী তো তিনজনই। কিন্তু এই একটি দাদু ওপর নাতনীদের এত পক্ষপাত যুগলবাবু আর ননীবা ভালোর চোখে দেখেন না।

যখন কুলদাবাবু আসরে থাকেন না, যুগলবাবু ননীবাবু সঙ্গে জোট বাঁধেন। তিনি বলেন, 'কুলদা বড়ই মে ঘেঁষা।'

ননীবাবু যুগলবাবুকে আরো একটু খুঁচিয়ে দেওয়া জন্যে নিরীহ ভঙ্গিতে বলেন, 'কী আর করবে বলো। ঘ তো পরিবার নেই। বিশবছর ধরে নির্জলা একাদশ চলছে। তাই ছিঁটে ফোটা যেখানে যা পায়—।'

যুগলবাবু তাঁর গোলাকার মুখখানাকে আরও বিকৃ করে বলেন, 'যখন পরিবার ছিল তখনো এমনি। ওঁ ছুক ছুক স্বভাব ওর চিরকালের। নির্জলা একাদশী ন আরো কিছু। ডুবে ডুবে কত জল খায় কে জানে ?

ননী বাবুও সায় দিয়ে বলেন, 'বিনা জলপানে এতকা ধরে আছে মনেতো হয় না।

যুগলবাবু হেসে বলেন, 'যা বলেছ তবে এখন ওই ঘটিট বাটিটাই সম্বল। তখন অবশ্য ঘড়া বালতি কিছুর অভাব ছিল না।

কুলদাবাবুর সমালোচনার পর ওঁরা কুলদাবাবু আদরিণীদের মুণ্ডুপাত করতে শুরু করেন। কোনটি ন্যাকা

কোনটি পাকা, কোনটি হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। ওই যে শিখা নামে মেয়েটি এখনো ফ্রক পরে থাকে, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়লে কি হবে ওর বয়স আঠারোর নিচে নয়। যুগলবাবু ওর জন্মের সন তারিখ পর্যন্ত বলে দেন। ফ্রক পরলে ওকে বিশ্রী দেখায়। ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন না যুগলবাবু আর ননীবাবু। নিজেদেরই লজ্জা করে। কিন্তু আশ্চর্য ওর লজ্জা নেই, ওর বাপ-মায়েরও লজ্জা নেই! স্কুলের মাষ্টারনীগুলি কী করতে রয়েছে? তারাও কি শাসন করতে পারে না? সভ্যতা-ভব্যতা শেখাতে পারে না?

ননীবাবু বলেন, 'সবই যে এক জাতের এক গোত্রের। কে কাকে শাসন করে? শাসন করলে মানবেই বা কেন? মাষ্টারনীদের নমুনাও তো এখানে বসেই দেখতে পাই।'

যে দু-তিনজন মেয়ে টিচার এ পাড়ায় আছে তাদের সম্বন্ধে সমালোচনা চলে। তাদের কারো চাল-চলনই আদর্শ বলে যুগলবাবু কি ননীবাবুর মনে হয় না। বয়স হয়েছে, দেখতে ভালো নয়, কালো রঙের ওপর মানায়ও না—তবু ওদের ঠোঁটে লিপষ্টিক পরা চাই, জামার ছাট কাঁধ অবধি তোলা চাই।

ননীবাবু বলেন, 'ওদের নিজেদের চাল-চলন হাব-ভাব ভালো না হলে ওরা ছাত্রীদের কী শেখাবে বলতো। সংশিক্ষা তারা নেবেই বা কেন। তারা তো যা দেখে তাই শেখে।'

মনে হয় যুগলবাবু আর ননীবাবুর মধ্যে বেশ মনের মিল আছে। দুজনেই দেখতে খারাপ। যুগলবাবুর চেহারা বেঁটে। রং কালো। মাথায় টাক। ভুঁড়ি আছে। জরা তাঁর দেহকে আরো বিকৃত করেছে।

ননীগোপালকেও বার্ধক্য ছেড়ে দেয়নি। চুল তত না পাকলেও দাঁতগুলি একেবারেই গেছে। মাড়ির দিকে দু-একটি ছাড়া একটিও বাকি নেই। কুলদাবাবুর মত তিনি দাঁত বাঁধাননি। বাঁধাবার কথা উঠলে বলেন, 'ও এক উপসর্গ। দিনে দু-বেলা মাজা-ঘষা। ওসব হাঙ্গামা কে পোয়ায় মশাই। তা ছাড়া বাঁধিয়েই বা কি হবে। এ জিনিস তো আর ছেলেদের জন্মে রেখে যাওয়া যাবে না। অনর্থক পয়সা নষ্ট।'

সবাই জানে পয়সার কথাটাই বেশি বিবেচনা করেন ননী মল্লিক। নিজের কোন কাজ-কর্ম নেই। ছেলেরা যা রোজগার করে তাতে তাদের নিজেদেরই কুলোয় না। খরচ-পত্রে মাসের শেষে টানাটানি পড়ে। ননীবাবু তাই নিজের বসন-ভূষণের জন্মে অযথা দাবি করেন না। দাবি করলেও তাঁর স্ত্রী সে ব্যয় বরাদ্দের বিল অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন, 'কী দরকার তোমার অত জামা-কাপড় ছাতা জুতোয়। যাবে তো ওই রোয়াক পর্যন্ত। মোল্লার দৌড় মসজিদতক।

দাঁত বাঁধাবার প্রস্তাবও গৃহিণী আমল দেন না। কী হবে নকল দাঁতে। দাঁত পেলেই তো দাঁতে দাঁতে ঘষবে। সে দাঁত দুদিনের বেশি তিনদিনও টিকবে না। মিছিমিছি টাকাগুলি যাবে।'

বাবার দাঁতের কথা ছেলেরা মাসের প্রথম সপ্তাহে মাঝে মাঝে বলে—আবার শেষ সপ্তাহে ভুলে যায়। ননীবাবু আর উচ্চ-বাচ্য করেন না। করে লাভ নেই। মনে হয় যুগলবাবু আর ননীবাবুর মধ্যে খুব মিল আছে। দুজনেই পরিধেয় সম্বন্ধে উদাসীন। যুগলবাবুর পরণে পুরোণ লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। ননীবাবু শীতের দিনে একটা চাদর-টাদর কিছু জড়িয়ে এলেও গরমের দিনে ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃতই রাখেন। খাটো একখানা ধুতি থাকে পরণে। দুজনেই মেয়েদের চাল-চলনের কঠোর সমালোচক, বিলাস-ব্যাসনের নিদারুণ বিপক্ষে। আধুনিককালের রুচিহীনতায় দুজনেই উদ্বিগ্ন।

কিন্তু যেদিন যুগলবাবু থাকেন না, বিষয়-আশয়ের ব্যাপার নিয়ে শহরে যান কুলদাবাবু—আর ননীবাবুর মধ্যে সেদিন বেশ মতের মিল দেখা যায়।

কুলদাবাবু বলেন, 'যুগলটা কী কেপ্পন। হাড় কেপ্পন যাকে বলে। ওকে দেখে কে বলবে ও দুখানা বাড়ির মালিক! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কেবল ব্যাঙ্কে রাখবে। ভালো করে খাবেনা, পরবে না, অসুখ হলে চিকিৎসা করাবে না। মিছিমিছি আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। ওর বোধ হয় ধারণা স্ত্রী-পুত্র পড়ে থাকলেও ব্যাঙ্কের চেক বই আর পাশ বইও ট্যাঁকে গুঁজে পাড়ি জমাতে পারবে।'

ননীবাবু হেসে সায় দিয়ে বলেন, 'যা বলেছ। ওই টাকা টাকা করেই লোকটা গেল। বাড়িতেও শান্তি

নেই। চাবির গোছাটা নিজের কাছে রাখবে। বউ ছেলে-মেয়ে কাউকে বিশ্বাস করবে না। আরে বাবা, ওদের হাতেই তো সব দিয়ে যেতে হবে। আগে থেকেই সব ছেড়ে দাওনা। তাতে সেবা পাবে, শুশ্রূষা পাবে, আদর-যত্ন পাবে। মায়া-মমতা আসবে, সংসারের লোকের মনে। কিন্তু সে বোধ নেই। বললে কি হবে এটাই এখন স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। নিজের বাপ-মা তো অনেক আগেই গত হয়েছে। এখন ওয়ান পাইস ফাদার মাদার।'

কুলদাবাবু হেসে ননীবাবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, বেড়ে বলেছ। আর যত সব মামলাবাজ মোকদ্দমাবাজ, কুটকচালে লোকের সঙ্গে আমাদের এই যুগলকিশোর গুপ্তের খাতির। আমাদের যুগল হয়েছে উকিলে উকিল, ইঞ্জিনিয়ারে ইঞ্জিনিয়ার।'

ননীবাবু একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে বলেন, 'তা ওর অভিজ্ঞতা তো আছেই। বাড়ি-টাড়ি করেছে।'

কুলদাবাবু বলেন, 'করেছে করেছে। কলকাতা শহরে অমন বাড়ি অনেকে করে। কিন্তু ওর মত ইঁট কাঠ চুণ সুরকির মধ্যে দিন-রাত মুখ গুঁজে পড়ে থাকে কে। মুখে ও ছাড়া আর কথা নেই। লোকটি জন্ম নীরস। থিয়েটার সিনেমা দেখে না, তাতে পয়সা খরচ হয়। একখানা বই ভুলেও পড়বে না। রস পেলে তো পড়বে!'

ননীবাবু হেসে বলেন, 'ওর রস ইঁট কাঠের মধ্যে। অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক।'

যখন ননীবাবু থাকেন না তখন যুগলবাবুর সঙ্গেই কুলদাবাবুর বেশ ভাব জমে ওঠে। তখন ওঁদের দেখে মনে হয় চেহারায় চাল-চলনে এত অমিল থাকলেও এমন বন্ধু-যুগল বুঝি দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় জোড়া নেই।

কুলদাবাবু বলেন, 'ননীর সংসারে অত চেঁচামেচি কিসের বলো তো।'

কুলদাবাবু যা শোনবার আশা করেন, যুগলবাবু সেই প্রত্যাশিত কথাগুলিই তাঁকে শোনান। হেসে বলেন, 'কিসের চেঁচামেচি আবার। ছেলেগুলি তো তেমন মানুষ হয়নি। ভালো কাজ-কর্মও তেমন পায়নি। সব বাপকা বেটা হয়ে জন্মেছে। বাপও যেমন আলসে, চিরকাল কুঁড়ের বাদশা। জীবনে কোন একটা কাজ ছ মাসের বেশি করে নি। চাকরি না, বাকরি না, ব্যবসা না, বাণিজ্য না। কী করে যে চালিয়েছে ভগবান জানেন। যাকে অকর্মণ্য বলে তাই।'

কুলদাবাবু মুখ টিপে হাসেন 'এক হিসেবে মন্দ নয়। একেবারে গোড়া থেকেই রিটায়ার্ড লাইফ।'

যুগলবাবু বলেন 'শুধু পেনসনটি আসেনা এই যা আফশোষ।'

কিন্তু তিন বন্ধু যখন রোয়াকখানা জুড়ে ফের এক জায়গায় এসে বসেন, তখন তিনজন একেবারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। মতের পথের কোন বৈষম্যই যেন ওঁদের মধ্যে ধরা পড়েনা। তিনজনে মিলে একালের অনাচারের সমালোচনা করেন তরুণ-তরুণীদের অবিনয় অবাধ্যতায় নৈরাশ্য জানান। অবাধ মেলামেশার কুফলে তিনজনেই আতঙ্কিত হন। শিক্ষাদীক্ষার অবনতি সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকে না। তিনজনেই বলেন তাঁদের কাল একালের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। তিনজনেই অনুভব করেন এযুগের মতিগতির সঙ্গে তাঁদের কোন মিল নেই। এ যুগের ভাবভঙ্গী ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁরা যেন এক অজানা রাজ্যে এসে পড়েছেন। কিংবা তাঁরা ঠিক নিজেদের রাজ্যেই আছেন। কিন্তু এক অচেনা গ্রহের অদ্ভুত একদল জীব তাঁদের ঘাড় ধরে বলছে 'চলে যাও, বেরিয়ে যাও।'

পাড়ার ছেলেদের ঠাট্টা তামাসাও তাঁদের কানে আসে। কেউ তাঁদের নাম দিয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। কেউ বা বলে—বট পাকুড় অশ্বত্থ। কেউ বলে—ত্রিচূড়, কেউ বলে ত্রিকূট। অবশ্য সবই আড়ালে আবডালে। সামনে সবাই একেবারে শ্রদ্ধায় বিগলিত। পারে তো পায়ের ধুলো চেটে খায়। ছেলেদের এই ভড়ং ও আন্তরিকতার অভাবের বিরুদ্ধে তিনজনেই একজোট হয়ে উষ্মা জানান।

কিন্তু সেদিন ওঁদের এই পীঠস্থানের সামনে ছোট একটি ঘটনা ঘটল।

তিনজনে বসে যুগধর্মের সমালোচনা করছিলেন। ছোট ছোট কটি ছেলে-মেয়ে একটু দূরে জলের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ছিল। যুগলবাবু একবার ধমক দিলেন, গেলি এখান থেকে।

ওরা গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তিনজনকেই ভেংচিকেটে গেল।

যুগলবাবু বললেন দেখলে কাণ্ড! 'মা বাবার শিক্ষাটা একবার দেখলে?

কুলদাবাবু বললেন 'সেই কথাই তো বলছিলাম' আজকালকার বিদ্যালয়টা নিতান্তই মুখস্থ করা বিদ্যা। সত্যকারের শিক্ষার নামগন্ধও তাতে নেই, কালচারের কথা পাবে না এদের চালচলনে।' ননীবাবু বলে উঠলেন, 'আরে আরে মেয়েটা ড্রেনের মধ্যে ডুবে গেল যে।

চেয়ার ছেড়ে তিনজনেই উঠে পড়েছিলেন। কিন্তু পাতলা ছোটখাটো শরীর নিয়ে ননীবাবুই ছুটে গেলেন সব চেয়ে আগে। ঝুঁকে পড়ে মেয়েটার হাত ধরে তুলতে যাচ্ছেন—টাল সামলাতে না পেরে নিজেও পড়ে গেলেন ড্রেনের মধ্যে। নোংরা কাদা জল মাখা মেয়েটাকে নিয়ে যখন উঠলেন তখন নিজের গায়েও কাদা লেগেছে—মাথা আর কপালের খানিকটা গেছে কেটে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। ডাক্তারখানা এখান থেকে অনেক দূর। তাছাড়া এখন খোলেওনি। কুলদাবাবু তার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। ছুটে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে আয়োডিন আছে, ব্যাণ্ডেজের গজ কাপড় আছে—সাবধানী গৃহস্থ কুলদাবাবু। ফার্ষ্ট এডের জিনিষপত্র সব সময় ঘরে রাখেন।

মেয়েটির সামান্যই লেগেছিল। উদ্ধারকারী ননীবাবুই চোট খেয়েছেন বেশি।

কুলদাবাবু আর যুগলবাবু দুজনে মিলে তৃতীয় বন্ধুর মাথায় ওষুধ লাগালেন, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ননীবাবুর ছেলেমেয়েরা ছুটে এল বাবাকে নিয়ে যেতে।

ননীবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। তেমন কিছু' হয়নি।

যে ভদ্রলোকের মেয়ে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল খবর পেয়ে তিনিও এলেন। করজোড়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন—আপনারা ছিলেন তাই রক্ষে। নইলে মেয়েটা আজ মারাই যেত।'

কুলদাবাবু বললেন—'ছেলে মেয়ে একটু সাবধানে রাখবেন মশাই। আমাদের মধ্যে ননীবাবুই আজকের হিরো। যা বলবার ওকে বলুন।'

ননীবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, তোমরাই বা কম কিসে। তোমাদের সাহায্য না পেলে—।'

তিনজনে খানিক বাদে ফের রোয়াকের ওপর এসে বসলেন। বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কৌতূহলী জনতার ভিড় এখন আর নেই। কেউ কেউ একবার ননীবাবুর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার দিকে তাকাল। কেউ বা ভ্রূক্ষেপও করল না।

তিনবন্ধু পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলেন।

এ রাস্তায় আলো আছে। কিন্তু সব দিন জ্বলেনা। আজ ও এদিকটা অন্ধকার হয়েই রইল।

কুলদাবাবু বললেন, 'খুব যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ননী? তাহলে যাও শুয়ে থাকো গিয়ে।'

ননীবাবু বললেন, 'আরে না না। তেমন কিছু নয়।

তারপরে তিনজন ফের চুপ করে রইলেন। যুবকদের অনাচার কদাচার, তরুণীদের চাল-চলনের সমালোচনা, কালধর্মের বিচার বিশ্লেষণ আজ ওঁদের কাছে বড়ই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যুগলবাবু বললেন—মেয়েটা কিন্তু জোর বেঁচে গেছে। ননী দৌড়ে গিয়ে ঠিক সময় মত না ধরলে ওকে বাঁচানো কঠিন হত।'

ননীবাবু বললেন—'আমিতো ভাই নিমিত্তমাত্র। আগে দেখেছিলাম তাই আগে গিয়ে পড়েছি। তোমরা দেখলে তোমরাও যেতে। একি কেউ না গিয়ে পারে?'

কুলদাবাবু ননীবাবুর মাথার ব্যাণ্ডেজটা হাত দিয়ে আর একটু ঠিক করে দিলেন। ঠিক করার কিছু ছিল না। যেন স্পর্শ করার লোভেই স্পর্শ করলেন। তারপর স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'জ্বালা করছেনা তো?'

ননীবাবু তেমনি লজ্জিতভাবে বললেন—'আরে না না, তোমরা অত অস্থির হয়ো না।'

স্বভাবরসিক কুলদাবাবু বললেন—'যাই বলো ননী' আজ তুমিই পাড়ার বীরপুঙ্গব—কী খোলতাই চেহারা হয়েছে তোমার। মেক-আপটা চমৎকার মানিয়েছে। ব্যাণ্ডেজ তো নয়, যেন একেবারে রাজমুকুট পরে রয়েছ।'

ননীবাবু বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ মুকুট তো ভাই তোমরাই পরিয়ে দিয়েছ, আমার কি দোষ—দাও হে যুগল একটা বিড়ি দাও খাই।

বিড়ি সিগারেট ননীবাবু সাধারণত খান না। কিন্তু কখন কখন সখ হয়। কুলদাবাবু সিগারেট ছাড়া খাননা। কিন্তু আজ বিড়িতে আপত্তি করলেন না। যুগলবাবু ভুলেও কাউকে একটা বিড়ি অফার করেন না। কিন্তু আজ করলেন।

তারপর তিন বন্ধু তিন বিড়ি ধরিয়ে চুপচাপ বসে যার যার নিজের নিজের ধরণে এই বিচিত্র জীবনের কথা ভাবতে লাগলেন।

পত্র-পত্রিকা

উইকলী ওয়েষ্টবেঙ্গল—বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক—বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাক

বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক—বার্ষিক ২৲ টাকা।

শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা—বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষাণ্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

পশ্চিম বংগাল—নেপালী সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। বার্ষিক—৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ নঃ পয়সা।

মগরেবী বংগাল—উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা—বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ নঃ পয়সা।
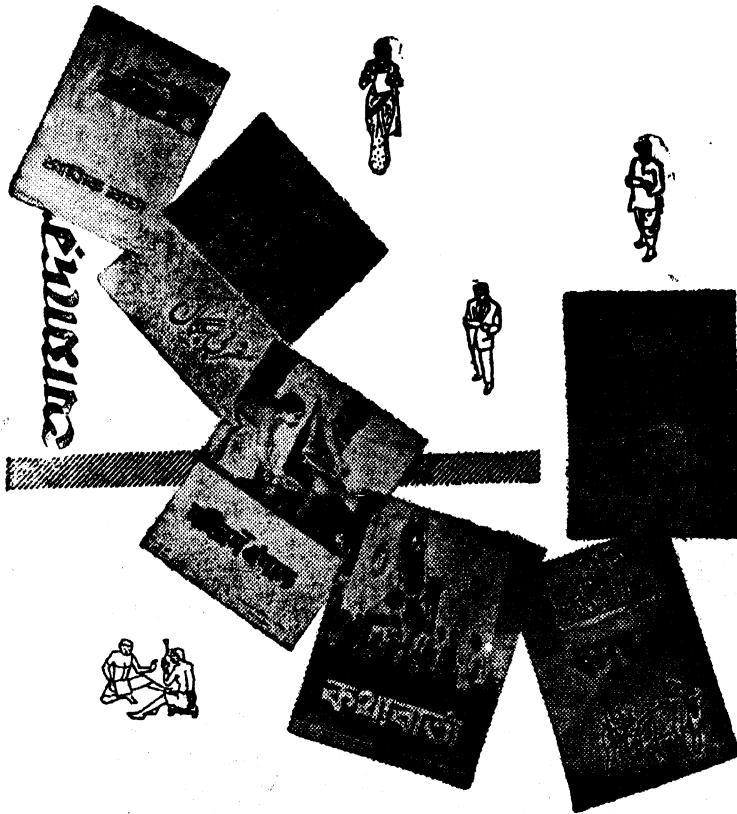
অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

জলধর ও অমূল্যচরণ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩২০ সালে 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হইবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠাতা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় স্বর্গলাভ করেন। তিনি প্রথম খণ্ডের জন্য সূচনা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা 'ভারতবর্ষ' ছাপার পরই তাঁহার কার্য শেষ হইয়া যায়। তৎকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথম হইতেই তাঁহার সহকারীরূপে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনে যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অতর্কিত মহাপ্রস্থানের পর 'ভারতবর্ষ' কর্তৃপক্ষ শুধু অমূল্যচরণের উপর সম্পাদনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া খ্যাতিমান লেখক ও সাংবাদিক জলধর সেন মহাশয়কে এই কার্যের জন্য আহ্বান করিয়া আনেন। কাজেই প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় জলধর ও অমূল্যচরণ উভয়ের নাম একত্রে সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

লেখকের সৌভাগ্য উভয় ব্যক্তির সহিতই তাঁহার দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পড়ার সময় লেখক অধ্যাপক অমূল্যচরণের সংস্রবে আসেন এবং প্রায় ২০ বৎসর কাল নানা কাজে তাঁহার সহিত যুক্ত ছিলেন। অমূল্যচরণ ১২৮৪বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ১০ই বৈশাখ ঘাটশীলায় পরলোকগমন করেন। তিনি কলিকাতা স্কটিস চার্চ কলেজে শিক্ষালাভের পর কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি লাভ করেন। হিন্দী, উর্দু ফারসী, সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, ইতালীয়ন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ছাব্বিশটি দেশী ও বিদেশী ভাষায় তাঁহার জ্ঞান ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি প্রথম জীবনেই একটি "অনুবাদ কার্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার অল্পদিন পরে এডোয়ার্ড ইন্সটিটিউসন নামে প্রথমে একটি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয় ও পরে তাহার সহিত একটি সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যক্ষতা করিতেন। পরবর্তীকালে কিছুকাল তিনি একটি মিশনারী কলেজে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ প্রায় ৩৫ বৎসর তিনি বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে বাংলা, সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্যের জন্য সেকালে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। মাত্র একবৎসর কাল তিনি 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক থাকিলেও পরবর্তী কালে তিনি 'বাণী', 'সঙ্কল্প', 'মর্মবাণী', শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, 'পঞ্চপুষ্প', 'শ্রীভারতী' প্রভৃতি মাসিকপত্রের কিছুকাল করিয়া সম্পাদক ছিলেন এবং জীবনের শেষ ৭ বৎসর "বঙ্গীয় মহাকোষ" নামক বিরাট অভিধানগ্রন্থের সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্ভব হয় নাই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মহা-কোষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর ২২ বৎসর অতীত হইলেও উদ্যোগ-আয়োজনের অভাবে আজিও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অমূল্যচরণ শুধু পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন না, কলিকাতার নিকটস্থ নৈহাটীর প্রসিদ্ধ ঘোষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজে বর্দ্ধিত হইয়া বিরাট সামাজিক মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন। অধ্যাপনা কাজের সহিত সমাজসেবা, পরোপকার ও বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের মঙ্গলসাধন করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিলেও ৪০ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া কত ছাত্রের যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি আজন্ম কলিকাতাবাসী হওয়ায় সে যুগে কলিকাতার সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একান্তভাবে যোগদান করিতেন। তিনি ১১ বৎসর কাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ও পরে কয়েক বৎসর সহ সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি এশিয়াটি সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তথায় গবেষণা করি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শুধু সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলে না, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অন্যতম অগ্রণীরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন এবং বহু বৎসর তাহার সম্পাদ ছিলেন। তিনি ৮ বৎসর কাল 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক', মাসিক পত্রে ও কয়েক বৎসর কায়স্থ সমাজের মুখপত্র 'কায়স্থ পত্রিকা' সম্পাদকও হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা যেমন বহুমুখী ছি কার্যধারাও সেইরূপ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল তিনি তাঁহার জীবনে কতক্ষেত্রে কতকাজ করিয়া গিয়াছেন তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। তাঁহার ম একজন গুণী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী ব্যক্তির বিস্তৃত জীবনী রচিত হই দেশবাসী তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ লা করিবে। আমরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদ হিসাবে আজ ৫০ বৎসর পরে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কা এবং তাঁহার কার্যের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মর করি।

জলধর সেন মহাশয় অমূল্যচরণের অপেক্ষা বয়োজে ছিলেন। তিনি ১২৬৬ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮০ বৎ বয়সে ১৩৪৬ সালে পরলোকগমন করেন। লেখকে তাঁহার শেষ জীবনে কয়েক বৎসর তাঁহার পদতলে বসি 'ভারতবর্ষ সম্পাদনে সহযোগিতা করিবার সৌভা হইয়াছিল। যদিও তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে জলধরদাদ সহিত লেখকের খানিকটা পরিচয় ছিল, কিন্তু শে প্রায় ৫ বৎসর সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার অসাধারণ মানবিকতা, বন্ধু-বাৎসল্য ও সাহিত্যি প্রীতির পরিচয়লাভ হইয়াছিল সেরূপ অসাধারণ আজিকার দিনে ক্রমেই দুর্লভ হইতেছে। জলধরদা ১৮৭৮ সালে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দশ টাকা বৃত্তিলা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্র করায় তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে নাই প্রথমে তিনি কুমারখালি হইতে প্রকাশিত কাঙাল হরিন মজুমদারের সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা' সাপ্তাহিক পত্রিক

লেখা আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ সালে প্রথম বিবাহের এক বৎসর পরে পত্নী ও পুত্র পরলোকগমন করায় তিনি পরিব্রাজক হইয়া হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং সেই সময় তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। প্রথমে তিনি মহিষাদলে জমিদার গৃহে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন ও কিছু কাল পরে তৎকালীন সর্ব্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে কয়েক বৎসর তিনি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সহ-সম্পাদক, 'হিতবাদী'র সহ-সম্পাদক ও 'সুলভ সমাচার' নামক দৈনিকের সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর ধরিয়া তিনি যোগ্যতা, সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত তাহা নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৬ সালের ২৬শে চৈত্র পরলোকগমনের প্রায় পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষ সম্পাদনা কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন; ১৯২২ সালে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বৃটিশ সরকারের রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বহুসংখ্যক ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করিয়া 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত করিতেন এবং কেবল তৎকালীন খ্যাতনামা লেখক ও পণ্ডিতদের লেখা সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেন নাই, বহু তরুণ অথচ প্রতিভাবান সাহিত্যিককে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া তাহাদের জীবন বিকাশের সুযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কত কবি, কথা-সাহিতিক ও লেখক তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

জলধরদাদাও সেকালের প্রাচীন পিতামহদের ধারায় স্নেহ, প্রীতি ও কৃপাদানে সকল সাহিত্যিককে একত্র করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেরণা ও নির্দেশ বহু অসাহিত্যিককেও সাহিত্যক্ষেত্রে মর্য্যাদা দানে সমর্থ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনার মধ্যে তিনি যে সকলপ্রকার নীচতাশূন্য ধারা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন পুরাতন ভারতবর্ষ পাঠ করার সময় আমরা তাহা মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করি। তাঁহার আদর্শ চরিত্র, সহৃদয় ব্যবহার ও সকলকে আশ্রয়দানের একান্ত কামনা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রকৃত অগ্রজের (দাদা) স্থান দান করিয়াছিল। তরুণ সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি সারা জীবন ধরিয়া সহস্র সহস্র সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন এবং যে কোন গৃহ হইতে আহ্বান আসিলেই তিনি তথায় গমন করিয়া সকলের প্রতি মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দান করিতেন। তিনি বাংলা দেশের বহু প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং 'দীর্ঘকাল' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 'রবি-বাসর', হাওড়ার গোবৰ্দ্ধন সংগীত সমাজ প্রভৃতির কর্মকর্তারূপে সেগুলিকে সর্ব্বজনপ্রিয় করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ জলধর দাদার পরিচয় প্রদান অল্প কথায় সম্ভব নহে। তাঁহার জন্ম-উৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে যে সকল 'স্মারক গ্রন্থ' উপহার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার জনপ্রিয়তার কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করি। পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া কর্ম্মযোগীর মত তিনি ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সক্রিয় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদনা কার্য্যে যিনি যোগদান করিবেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত জলধরদাদার কথা মনে করিতে হইবে। আমরা আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি তাঁহার মত আদর্শ কর্ম্মী ও সাহিত্যিক-স্রষ্টা আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় আবির্ভূত হইয়া দেশের সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবনকে বলিষ্ঠতর করার প্রেরণা দান করুন।

পর্যটক শিল্প ও পশ্চিমবাংলা

গৌরদাস বসু এম. এ

আলো ঝলমল সকাল। মন্দমধুর বসন্তের বাতাসে কাগজপত্র গুছিয়ে রোয়াকের একপাশে বসেছি। মাসিক ভারতবর্ষের জন্য পর্যটন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। হঠাৎ ছোট ছেলেটা তার পাঠ্যপুস্তক খুলে শাসাতে সুরু করল—"দেখব এবার জগৎটাকে……কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।" ঠিক সেইসঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলুম বড় মেয়েটি গিটারে ঝঙ্কার তুলছে—"রোদনভরা এ বসন্ত, সখি কখনো আসেনি আগে।" অনেক চিন্তাকরে, পরিসংখ্যান খুঁটিনাটি জোগাড় করে জাঁকিয়ে ব'সেছিলুম। সব যেন গুলিয়ে গেল। মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। অনেক-দিনই পর্যটন বিভাগে কাজ করছি। নানান্ হাঙ্গামায় একটু বেড়াতে বেরুবো—সে ফুরসৎ গত কয়েকমাসের মধ্যে আর হ'য়ে ওঠেনি। তাই এই একঘেয়েমির ব্যথাটা টনটনিয়ে দিয়ে মেয়ে জানালো—এ বসন্ত রোদনভরা, আর ছেলে জানালো—বেরিয়ে পড়ো, ভ্রমণেই আনন্দ। সত্যিই তাই। ভ্রমণের ঐতিহ্য ভারতবাসীর হাড়েমাসে জড়ানো। একঘেয়েমির জন্য আমাদের মত নাস্তিকের অস্থিরতাই হ'ল উদাসভাব। আর সেকালের ধর্মপ্রাণ লোকের এই-ই ছিল তীর্থদর্শনের জন্য সাময়িক বৈরাগ্য। উদ্দেশ্য একই। নূতন দেশ, নূতন লোক দেখা। ভাবের ও অর্থের আদান প্রদানে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করা।

তখনকার দিনে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পর্যটন সম্ভব ছিল না। যানবাহনের অভাব, পথে চোর দস্যুর উপদ্রব এবং সর্বোপরি পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই ব্যাপারে বিশেষ অন্তরায় ছিল। তবুও দেখেছেন মেগাস্থিনিস্, ফাহিয়েন, হিউয়েনসাঙ্ প্রমুখ পর্যটকগণ এদেশ পরিদর্শন করেছে। অশোকের ধর্মপ্রচারকেরা চীন, মিশর, গ্রীস, মধ্য-এশিয়ায় ধর্মপ্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। বাঙালী বণিক সপ্তগ্রাম ও তমলুকের বন্দর থেকে মূল্যবান পণ্যদ্রব্য নিয়ে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে পাড়ি দিয়েছে। দীপঙ্কর পর্বত লংঘন করে তিব্বতে জ্ঞানের আলো জ্বেলেছেন—আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শিল্পিগণ সুমাত্রা, যাভা দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করেছেন।

দেশের মধ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংস্কৃতি আদান প্রদানের তো চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর ভারতে হরিদ্বার, এলাহাবাদ ইত্যাদি চার জায়গায় বৃহৎ কুম্ভমেলা বস্ত, দক্ষিণ ভারতেও নাম উৎসব, বাংলার সাগরমেলা এবং দ্বারকা ও মরুতীর্থ হিংলাজের উৎসবে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সমাবেশ হ'ত।

সে আমলের ধর্মভিত্তিক পর্যটনকালে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য দিকেও ধারা বিস্তার করতে লাগল। মোগল সম্রাটগণ বিলাস ব্যসনের জন্য বড় বড় রাজপ্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ ও বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে দিনগুলি আনন্দমুখর ক'রে ভুলবার জন্য কাশ্মীর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়াবদল সুরু করলেন! তীর্থ ধর্ম ছাড়াও সাধারণ মানুষের কাছে এইগুলিও বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ালো।

পর্যটনকে কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় জনপ্রিয় করার চেষ্টা হয়েছে হালে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে প্রথম গৃহীত হয় ইউরোপে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যানবাহন ও যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হ'ল। স্বভাবতই ধনীলোকের ভীড় প্যারিস, রোম, সুইজারল্যাণ্ড, মিশর ইত্যাদিতে দেখা যেতে লাগল। জর্জ মার্শাল দেখলেন—নিখরচায় কাঁচাপয়সা রোজগারের পক্ষে এর চেয়ে ভালো পন্থা খুব কমই আছে। তাই সমর-বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির পুনরুন্নয়নের জন্য মার্শাল-প্ল্যানে শিল্পের ভিত্তিতে পর্যটন

ব্যবস্থা চালু করতে বলা হ'ল। পরিকল্পনা কার্যকরী করাতে দেখা গেল—এর মত লাভজনক শিল্প আর নাই। দশবৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে আগত পর্যটকের সংখ্যা ১৩৪০০০ থেকে দশ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো। কেবল ১৯৫৫ সালেই ৩ কোটি লোক ইউরোপ পরিভ্রমণ করল এবং বলাবাহুল্য এই তিনকোটির মধ্যে দেড়কোটিই হল আমেরিকান। এমনকি অষ্ট্রিয়ার মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রতি-বৎসর ৭০ লক্ষ করে লোক আসতে লাগল এবং তা থেকে রাষ্ট্রের আয় হতে লাগল ৮০ কোটি টাকা।

নূতন নূতন দেশ দেখে যারা আনন্দ পেতে চায় তারা কিছুতেই একই ভ্রমণ সূচিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর পর্যটক আকর্ষণের পক্ষে ভারতের সম্পদও তো কম নয়। ফলতঃ বিদেশী পর্যটকের মধ্যে, বিশেষ আমেরিকান পর্যটকদের বেশ একটা সংখ্যা ভারতেও আসতে সুরু করল। ১৯৪৮ সালে পর্যটক যাতায়াতের পরিমাপ লক্ষ্য করবার জন্য ভারত সরকারের একটি ছোট বিভাগ ছিল। পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলে এবং বিদেশী মুদ্রা বেশ আয় হতে থাকলে ভারত সরকার দেখলেন—এদের সুখ সুবিধার জন্য এবং আগমনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কিছু করা প্রয়োজন। অবশেষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা হ'ল ও ইউরোপ ও আমেরিকায় কয়েকটি পর্যটক-সংস্থা স্থাপন করা হ'ল।

পর্যটন সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের বর্ধিত কার্যকলাপের ঢেউ বাংলাদেশেও এসে লাগল। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অবগতির জন্য তথ্য সরবরাহ করা হ'ত। কিন্তু পরে নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়ল। পশ্চিমবঙ্গের দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে আহার বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'ল এবং রাজ্য সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, হোটেল, ট্রাভেল-এজেন্ট ও পর্যটনে জড়িত অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে এক পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (Tourist Development Committee) গঠন করা হল ১৯৫৮ সালে। এই কমিটির প্রথম অধি-বেশনে উন্নয়ন কার্যের প্রাথমিক মালমশলা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হল এবং সাধারণ কার্য পরিচালনার জন্য একজন টুরিষ্ট ডেভলপ্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করা সাব্যস্ত হ'ল। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যটকদের সুবিধার জন্য রেষ্ট হাউস নির্মাণের তালিকা অনুমোদন করা হয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও যেখানে যেখানে টুরিষ্ট-লজের প্রয়োজন তারও তালিকা তৈরী করা হয়। এছাড়া দার্জিলিঙে পর্যটকদের সুবিধার জন্য একটি টুরিষ্ট এড্‌ভাই-সরি কমিটি গঠনের ও কলকাতায় অনতিবিলম্বে একটি টুরিষ্ট ব্যুরো খুলবার নির্দেশ দেওয়া হয়। মোট কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন নীতির একটি পূর্ণ রূপই যে শুধু এই অধিবেশনে দেওয়া হয় তাই নয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্তব্য কাজের একটা পরিষ্কার খসড়াও এখানেই তৈরী হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরেই কিন্তু পর্যটন বিভাগের কাজ খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়েই সমস্ত রাজ্যকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ এবং কুচবিহার নিয়ে উত্তরাঞ্চল গঠিত হয় এবং এই অঞ্চলে কার্য পরিচালনার জন্য দার্জিলিং-এ একটি আঞ্চলিক আপিস স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া বাকী জেলাসমূহ নিয়ে হয় দক্ষিণাঞ্চল এবং তার আঞ্চলিক সংস্থা দুটি কেবল যে পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, তাদের খবরাখবর সরবরাহ ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করবে তাই নয়—অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে দেখাশোনা করবে এবং সরকারকে যাবতীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানাবে। উধ্বতন মহলে একজন ডিরেক্টার, একজন সহকারী-ডিরেক্টার ও কিছু এ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্যে কার্যভার চালাবেন। বর্তমানে ডিরেক্টার ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন। দার্জিলিং আপিসটি গত ১।৫।৬২ তারিখে খোলা হ'য়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যটন উন্নয়ন খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা রেখেছিলেন। দীঘায় একটি আরামপ্রদ টুরিষ্ট-লজ নির্মাণের জন্য ঐ টাকা খরচ করবার কথা ছিল। কিন্তু সমুদ্রের আকস্মিক ভাঙ্গনের জন্য রাস্তা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার-

গণ উপযুক্ত স্থান পান নি। ফলে ঐ টাকা নষ্ট হতে বসেছিল। অবশেষে আরো কিছু টাকা জোগাড় করে ১৭৭০০০৲ টাকায় দুটি ফ্যান, মাইক, বাথরুম, উড়ো, জাহাজের সীটের মত ডানলোপিলো সিটে সুসজ্জিত বাস ক্রয় করা হয়।

দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচারের জন্য এই সময়েই ঠিক হয় যে, কলকাতা, শান্তিনিকেতন, গৌড় ও পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, বক্রেশ্বর, ও মাসাঞ্জোর, দার্জিলিং ও কালিম্পং, বর্ধমান, হুগলী, দীঘা, জলধাপাড়া, ও বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে সুচিত্রিত ও রঙ্গীন পুস্তিকা বার করা হবে। এছাড়া সারা বাংলার সম্বন্ধেও একটি সুন্দর পুস্তক ছাপা হবে।

পর্যটন বিভাগ এখন মোটের উপর কায়েমী হয়ে বসেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমেই কার্যকরী হচ্ছে। ৩।২ ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্টে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত গৃহে দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটক-সংস্থা গত ২।৯।৬১ তারিখ থেকে কাজ সুরু করেছে। প্রতিদিন যথেষ্ট পর্যটক এই সংস্থায় যাতায়াত করছে ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। ভারত সরকারের দার্জিলিংস্থিত পর্যটক-সংস্থাটি আগামী ১।৫।৬২ তারিখ থেকে উত্তরাঞ্চলের সংস্থা হিসাবে কাজ সুরু করবে।

বাংলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা মোটের উপর ভালোই। আহার বাসস্থানের যা অসুবিধা। কলকাতা, দার্জিলিং ও শান্তিনিকেতনে হোটেল ও অন্যান্য থাকার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে নিম্নলিখিত টুরিষ্ট-লজ্ নির্মাণের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করা হবে :—

১।	শান্তিনিকেতন	৩·৫০ লক্ষ টাকা
২।	মালদহ	১·৫০ " "
৩।	ডায়মণ্ডহারবার	১·৫০ " "
৪।	কালিম্পং	২·০০ " "
৫।	দার্জিলিং	৪·২৫ " "
৬।	দুর্গাপুর	২·৫০ " "
৭।	বহরমপুর	২·০০ " "
৮।	দীঘা	১·৭৫ " "
৯।	বিষ্ণুপুর	১·০০ " "
		মোট ২০·০০ লক্ষ টাকা

[রাজ্যসরকার খরচ করবেন ১৪ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকার ৬ লক্ষ টাকা]

এই বাসভবনগুলি নির্মাণের জন্য জমির সন্ধান, নক্সা ও খরচের তালিকা তৈরী হচ্ছে। আশা করা যায় আগামী বৎসরের মধ্যে এগুলি বাসোপযুক্ত হবে। এগুলি চালু হলে সাধারণতঃ ভালো হোটেলে আহার বাসস্থানের যেমন ব্যবস্থা থাকে সেই রকমই থাকবে।

এছাড়া কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে এখন যেখানে প্রচার বিভাগের ইনফরমেশন সেণ্টার আছে ঐখানেই একটি বৃহৎ স্টেট্ গেষ্ট হাউস দিল্লীর অশোকা হোটেলের কায়দায় নির্মিত হবে। নির্মাণের জন্য নক্সা ও খরচের হিসাব তৈরীর কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে।

দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে আহার বাসস্থানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সুলভে আরামপ্রদ বাসে ঐসব জায়গা দেখানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে এবং নিম্নলিখিত পথে বাস চালাবার কথা হচ্ছে—

১। কলকাতা-দুর্গাপুর-মাইথন-পাঞ্চেতহিল-চিত্তরঞ্জন।

২। কলকাতা-গান্ধিঘাট-কল্যাণী-হরিণঘাটা-শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-পলাশী-মুর্শিদাবাদ।

৩। কলকাতা-দুর্গাপুর-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটি-কামারপুকুর-দীঘা।

৪। কলকাতা-বর্ধমান-পানাগড়-ইলামবাজার, শান্তিনিকেতন-বক্রেশ্বর-মশাঞ্জোড়-তারাপীঠ।

৫। কলকাতা-ডায়মণ্ডহারবার-ফ্রেজারগঞ্জ।
[নামখানা থেকে ফ্রেজারগঞ্জ রাস্তা নির্মাণ শেষ হলে]

৬। কলকাতা থেকে বিহারের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—যেমন গয়া, বোধগয়া, রাঁচী, রাজগীর, নালন্দা ইত্যাদি।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মাথাপিছু ৪৲ টাকা ভাড়ায় রবিবার ও বৃহস্পতিবারে সারাদিন সুসজ্জিত টুরিষ্ট বাসের সার্ভিস গত ২।১০।৬১ তারিখ থেকে চলছে। এ ছাড়া তিন চার দিনের ছুটির সময় দুর্গাপুর, মাইথন ও চিত্তরঞ্জন যাতায়াত করছে। দূর দূর জায়গায় নিয়মিত ভাবে এখন ভ্রমণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ সুসজ্জিত বাসের সংখ্যা মাত্র দুটি। কোন কারণে কলকাতা

পরিদর্শনের বাসটি বিকল হ'লে তার পরিবর্তে অন্য গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকার দরকার।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাস খরিদের জন্য টাকা আছে মাত্র ১৫০ লক্ষ। সে যা হোক, যেকোন প্রকারে অর্থ সংস্থান করে সরকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরও দু'খানা ও সুসজ্জিত তিনখানা বাস ক্রয় করবার ব্যবস্থা করছেন।

দলবদ্ধ পর্যটকদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য বর্তমানে যে সুসজ্জিত বাস দুখানি আছে সেগুলি ও আধুনিক মডেলের দুখানি ট্যাক্‌সি ভাড়া দেওয়া হয়। কলকাতা পরিদর্শনের জন্য দলবদ্ধ ছাত্রদের কনসেসন রেটে সুসজ্জিত বাসগুলি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কলকাতার দক্ষিণস্থ ছোট ছোট দ্বীপ ও গভীর অরণ্য যুগপৎ সৌন্দর্য ও হিংস্র পশু এবং কুম্ভীরের জন্য পর্যটক—জগতে সমধিক খ্যাত। এখানকার রয়াল বেঙ্গল টাইগার দেখার ও শীকারের জন্য বৈদেশিক পর্যটকমাত্রেই উদ্‌গ্রীব। সেরিয়ার লোকের মত লঞ্চে এই অঞ্চলে ভ্রমণ ব্যবস্থার তাগিদ অনবরতই আসে। সুতরাং এই অভাব পূর্ণ করবার জন্য সরকার একটি লঞ্চ খরিদ করতে মনস্থ করেছেন। নূতন লঞ্চ খরিদ বা নির্মাণ করার সময় সাপেক্ষে এখন প্রতি শনিবার বেলা ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত হুগলী নদী থেকে কলকাতা সহর দেখানো হচ্ছে। লঞ্চটি আউটরাম ঘাট থেকে যাত্রা করে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত যায়। তার পর সেখান থেকে ঘুরে সোজা দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে আবার আউটরামঘাটে ফিরে আসে। গত ২৭।১।৬২ তারিখ থেকে এই লঞ্চ সার্ভিস সুরু হয়েছে এবং সকলশ্রেণীর পর্যটকের মধ্যে এই সার্ভিস দিনদিনই প্রিয় হয়ে উঠছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্বন্ধে যেসব মনোহর পুস্তিকা প্রচারের কথা ছিল সেগুলি একে একে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এইসব পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্বন্ধে শুধু যে মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাই নয়, তথায় আহার বাসস্থান, যানবাহন ও উৎসবাদি সম্বন্ধেও বিস্তারিত তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ঐ পুস্তিকাগুলি ছাড়াও কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র-সমন্বিত একখানি পুস্তিকা ও বিভিন্ন বড় বড় রাস্তার মানচিত্র সম্বলিত কয়েকখানি পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকগুলি মুদ্রণের জন্য ১'৫০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এত অল্প টাকায় সব পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হবে না। অন্যত্র হ'তে বাকী অর্থের সংস্থান করতেই হবে।

বৈদেশিক পর্যটকদের মধ্যে যাঁরা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী বা ব্যবসায়ী তাঁদের এতদ্দেশীয় সমব্যবসায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত ভাবের আদান প্রদানের সুবিধার জন্য আতিথ্য পরিকল্পনা বা (Hospitality-Scheme) চালু করা হ'য়েছে। গত শীতকালে কয়েকজন পর্যটক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আতিথ্য গ্রহণ বা গল্পগুজব ক'রে এতদ্দেশীয় লোকের সবিশেষ প্রশংসাবাদ করে গিয়েছেন।

বাংলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শকের কাছে আরও আকর্ষণীয় করবার জন্য ছোট ছোট রাস্তা নির্মাণ, ফুলের বাগান করা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা ইত্যাদির জন্যও কিছু অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে।

পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকের সংখ্যাও যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। এখন বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে কিভাবে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তা লক্ষ্য করবার জন্য সরকার পরিসংখ্যান বিভাগের সাহায্য চেয়েছেন এবং কিভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে তারও নির্দেশ দিয়েছেন। কাজ সুরু হ'য়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই বছরের শেষেই রাজ্যে দেশী ও বৈদেশিক পর্যটকের গমনাগমনের পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

ভারত দর্শনে আগত বৈদেশিক পর্যটকের মধ্যে শতকরা ৪২ জন কলকাতায় আসে এবং এঁদেরই দিল্লী ও বোম্বাই দর্শকের সংখ্যা কলিকাতার চেয়ে মাত্র শতকরা ৪।৫ জন বেশী। সুতরাং পর্যটক-প্রিয় নগরী হিসাবে কলিকাতা সহরের স্থান পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে সুনির্দিষ্ট। এদিকে ভারতে পর্যটকের আগমনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যেখানে ১৯৫১ সালে সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০, সেখানে ১৯৫৯ সালে ১১০,০০০, ১৯৬০ সালে ১২৩,০৯৫ ও ১৯৬১ সালে ১৩৯৮'০৪এ দাঁড়িয়েছে। জেট-যুগ (Jet-Age) ভারতে পুরাদস্তর এসে গেছে এ সংখ্যা ভয়ানক রকম বেড়ে যাবে। আবার রাজ্যসরকারের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের ভ্রমণে সুবি া দেওয়ার নীতি দেশীয় পর্যটকের সংখ্যাও বাড়বে। এখন পর্যটকের এ বিরাট

ভীড় কেবল কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বাংলায় কলকাতা ছাড়া তো দ্রষ্টব্য স্থান কম নয়। আসমুদ্র হিমাচল পর্যটকের দর্শনীয় এমন বিভিন্ন প্রকার বস্তুর সমাবেশ ভারতে আর কোথায় আছে! এখানে যেমন সবুজ অরণ্য হিমালয়ের তুষারময় অগণিত শৃঙ্গ ও পুষ্পসম্ভারে পরিপূর্ণ মনোরম শৈলাবাস আছে তেমনি আছে তরঙ্গমুখরিত ঝাউবনঘেরা বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকত। শান্তিনিকেতনে আছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বে পুষ্ট ও প্রাণবন্ত আন্তর্জাতিক কৃষিকেন্দ্র, আর মোগল শাসনের পূর্ব ও পরবর্তীযুগের স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে গৌড়, মুর্শিদাবাদ, পাণ্ডুয়ার মন্দির, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ও স্তম্ভচূড়ায়। বিষ্ণুপুরের সুন্দর মন্দিরপুঞ্জে শুধু যে এক অভিনব দেবালয় নির্মাণ শিল্পের প্রকাশ তাই নয়, এইসব মন্দিরগাত্রের ছাপা ইটের কাজে প্রাচীন হিন্দু থেকে আরম্ভ করে মোগল ও রাজপুত চিত্রশিল্পের ধারা অপরূপ কলাকৌশলে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। জলধাপাড়ার রক্ষিত অরণ্যে গণ্ডার, বাঘ, হরিণ ও নানাজাতীয় পশুপক্ষীর মেলা। ওদিকে গ'ড়ে উঠেছে জার্মানীর রুঢ় ইস্পাত নগরীর কায়দায় দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী। সুতরাং পর্যটকদের কলকাতার বাইরের এই বিরাট দ্রষ্টব্য বস্তুর আমন্ত্রণ জানাতেই হবে। রাজ্যসরকার অবহিত আছেন যে এখন পর্যন্ত যে মুষ্টিমেয় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তা কিছুই নয়। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির প্রচারের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ ছাড়া আরও বিভিন্ন পন্থা নিতে হবে। যাতায়াতের আরও সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিমানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। দীঘায় যাওয়ার জন্য খড়্গপুর থেকে সুসজ্জিত টুরিষ্ট-বাস দিতে হবে। বক্রেশ্বরকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাজগীরের পর্যায়ে আনতে হবে। দার্জিলিং থেকে টাইগারহিল, সেঞ্চল লেক জলধাপাড়া, গৌর, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি স্থানে বাস-সার্ভিস চালু করতে হবে। এমনি আরও অনেক কিছু করলে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান কলকাতার মতই জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। উন্নয়নের গোড়ার কাজ যখন সুষ্ঠুভাবে সুরু হয়েছে এবং সবদিকেই সরকারের যখন সতর্ক দৃষ্টি আছে তখন আশা করা যায় বাংলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যত অবশ্যই উজ্জ্বল।

আষাঢ়-প্রভাতে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জাগরণে কিবা কাজ!—নিয়ে অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি
অলস আষাঢ় প্রাতে মনে হয় শুধু পড়ে থাকি
শান্ত স্তব্ধ গৃহ-কোণে। মাঝে মাঝে শুনি পেতে কান
আম্রপনসের কুঞ্জে রিমঝিম্ বাদলের গান
সুমধুর। যদি কারো তন্বীদেহে ভূষণ শিঞ্জন
শিয়রে বাজিয়া উঠে,—আর কিছু নাহি আকিঞ্চন
এ জীবনে! মাধবীর মনোহর পুষ্পিত প্রলাপ,
ব্যাকুল বকুলবক্ষোলীন লুব্ধ ভ্রমর-কলাপ,
চীনাংশুক চম্পকের চারু সুরভির সমারোহ,
বিলোল পলাশগুচ্ছ,—বসন্তের মদির সম্মোহ,
রক্তকরবীর রঙ্গ, রঙ্গনের অপাঙ্গের হাসি,
নিরজন পল্লীবাটে দধিশুভ্র মল্লিকার রাশি,—
কোন্ পূর্বজনমের ভুলে-যাওয়া সুখস্বপ্নসম
উতল অবশ করে কোন্ মোহে প্রাণমন, মম
এ প্রভাতে! কাজ-কর্ম?—ছিল, আছে, রবে চিরদিন।
জানি, শুধিতেই হবে দুঃখময় অস্তিত্বের ঋণ
এ সংসারে; জানি—এই গীতিগন্ধ সুরার আবেশ
মুহূর্ত্তেই যাবে টুটে,—এতটুকু না রহিবে লেশ!
সেই ক্লান্তি, সেই শ্রান্তি, বাঁচিবার অনন্ত প্রয়াস
স্বপ্নাতুর হৃদয়েরে করিবে নির্মম পরিহাস
ক্ষণ'পরে! এ জীবনে নাহি যদি তিলেক বিশ্রাম,
যযাতি-যৌবনা ধরা কেন তবে নয়নাভিরাম!
কূজনগুঞ্জনমন্দ্রে উল্লসিত কেন এ ভুবন!
ফুল ফোটা, চাঁদ ওঠা, পাখি ডাকা কেন অকারণ!
সুন্দর সৃষ্টির পানে চেয়ে আজ এই কথা ভাবি—
এ জীবনে সব ঝুঠা,—সত্য শুধু এ দেহের দাবি
দয়াহীন! চতুর্দিকে অন্তহীন কাজ আর কাজ!
কর্মী নহি,—কবি আমি আত্মমগ্ন নির্বোধ নিলাজ,—
কথা আর ছন্দ নিয়ে গৃহকোণে করি দিবারাতি
কল্পনার মোহঘোরে মনোহর মিথ্যার বেসাতি!
অকাজের কাজে মোর বসুধার কোন্ প্রয়োজন!
কর্মমত্ত ধরাতল প্রাণহীন যন্ত্রের মতন
আবর্ত্তিছে নিশিদিন। মনে তাই ভাবি বারবার—
কার ভ্রান্তি?—কে নির্বোধ? কবি, না এ যান্ত্রিক সংসার?
মৃত্যু যদি সত্য হয়—তবে কেন এত ছুটাছুটি?
পল্লবশয়ানপুষ্প বনতলে করে ফুটি ফুটি,—
তাহার নাহিক ত্বরা! নারিকেল তরুশাখা'পরে
মেঘলা দিনের আলো ঝিমায় মধুর তন্দ্রাভরে
মেদুর পবনে। হায়, ঐ মতো সুখশয্যালীন—
ললিত আলস্যে যদি কাটে শ্লথ নিদাঘের দিন!

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের বেচারামকে যথাযথ উপদেশসহ বিদায় দিয়ে আমি প্রথমেই বেচারামদের পাড়ার সেই এজমালী ঠান্‌দির বিবৃতি গ্রহণের জন্য তাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। প্রথমে এই বয়সেও আমাদের এই ঠান্‌দিদি আমাদের সম্মুখে এসে বিবৃতি দিতে রাজী হলেন না। তাঁর সেই একই কথা এই যে 'তাঁর বাপপিতামহের দেউড়ী কস্মিনকালে কোনও দারোগা বা সীপাই শান্ত্রী পার হতে পারে নি, আর আজ তাঁদের সেই সাবেকী পরিবারের মানুষ হয়ে তিনি ঐ সব আজেবাজে মানুষদের সামনে বার হয়ে আসবেন। তিনি যে কতবড়ো ঘরের মেয়ে, তা এই শহুরে মানুষগুলোর বোঝবারই ক্ষমতা নেই। এই সব আস্পর্দ্ধার কথা কোনও দারোগা তাঁর বাপের বা শ্বশুরবাড়ীতে সাবেকী কর্তাদের কাছে উথাপন করলে এতোক্ষণ নাকি তাঁরা আমাদের গাঁয়ের দ-এর মধ্যে গুম করে ফেলতেন ইত্যাদি। এই বৃদ্ধামহিলার এই গজগজানী শুনে আমাদের ন্যায় তাঁর বাড়ীর লোকেরাও রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠছিলেন। অতি কষ্টে তাঁরা তাঁকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে আমাদের সামনে তাঁকে বার করে আনতে পেরেছিলেন। এর পর আমি তাঁকে ঠাকুমা ও ঠান্‌দি প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করা মাত্র তিনি স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয়ে বলে উঠলেন, ও বাবা! তুমি দারোগা? সেই কবে ছোটবেলায় একবার আমি গ্রামেতে হংসেশ্বর দারোগাকে দেখেছিলাম। কিন্তু তুমি তো একটা বাচ্চা ছেলে। দারোগার তো ইয়া বড় গোঁফ থাকবে। এ্যা? এ সব ঠাট্টা নাকি? এই ভাবে এই পাড়ার এজমালী ঠাকুমা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে আমরা অতি সহজেই তাঁর একটা বিবৃতি নিতে পেরেছিলাম। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমি অমুক গ্রামের জমীদারদের বড় তরফের বড় কর্ত্তার প্রথম কন্যা। মুতেশপুরের জমীদারদের ঘরে আমার বিবাহ হয়। আমার আমলে হাতীগুলো বিক্রয় হয়ে যায়। তবে বাবা, হাতীর বাঁধার গাছগুলো আমাদের আমলেও সেখানে পোতা ছিল। কতো বাঁকা বাঁকা ভারী তরোয়াল আমার বধূ বয়সে সে বাড়ীতে দেখেছি। যে সব তরোয়ালগুলো নিয়ে পূর্ব্বপুরুষরা লড়াই জিতেছে, সেগুলো কিনা অখদ্যে নাতিগুলো চোখের সামনে লোহার সের দরে বিক্রয় করে দিলে। শেষে বাবা সব খুইয়ে ছোট ছেলেটার হাত ধরে এই শহরের বাসায় উঠেছি। এখানে না আছে দেব-দেবতার পূজা, না আছে গো-ব্রাহ্মণের সেবা। শেষে কি-না এখানে পুলিশের হামলাও দেখতে হলো। বাড়ী চড়াও হয়ে মানুষ জখম করা তো কস্মিন কালে শুনি নি। অবশ্য ঠেঙাড়ে গাঁয়ের পথে ঘাটে এমন সব ঘটনা কতো ঘটেছে।

[আমরা ইচ্ছা করেই এই ঠাকুমা বুড়ীকে তাঁর মনের ও প্রাণের কথা কিছুক্ষন ধরে বলে যেতে দিলাম। এই ভাবে মনের কথা অনাবিল ভাবে বলে যেতে যেতে তাঁর মনটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠলো। এই সুযোগে আমি তাঁকে এই মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু করে দিলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।]

প্রঃ—আচ্ছা ঠাকুমা! কাল সকালে আমি ঐ ভদ্র-

মহিলার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র তোমার নাতনীরা সব তোমাদের এই বাড়ীর বারাণ্ডার ওপর হতে অমন ভাবে হেঁসে উঠলো কেন ?

উঃ—তা বাবা ওরা ছেলে মানুষ তো! তুমি একবার তো মারধর খেয়ে চলে গেলে। আরো বাবা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নায় মরি। মেয়ে লোকের হাতে পুরুষ মার খেলে। তা তুমি চলে তো গিয়েছিলে, কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে আবার ফিরে এলে কেন ? পুলিশের লোক ব'লে তোমরা যা খুশী তা তো করতে পারো না। একটা কিছু সাংঘাতিক অপরাধ নিশ্চয়ই ওখানে করেছিলে। তবে যদি ওখানে গোয়েন্দাগিরী করতে গিয়ে মার খেয়ে থাকো তো সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে প্রথমবার অতোসব অন্তরের কথা দুজনায় মিলে কইলে কেন ? কিন্তু বাবা, তোমাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে যারা গেল, তারা তাহলে আবার কারা ?

[আমাদের এই সাক্ষীর এই বিবৃতি শুনে উপস্থিত সকলে হকচকিয়ে গিয়ে আমার দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেখছিল। এইরূপ এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইতিপূর্ব্বে আমি আর কোনও দিনই পড়ি নি। আমি ও আমার সহকারী কনকবাবু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কোথাও একটা কমেডি অব এরার হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তা'হলে ঐ ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ভদ্রলোকটীর সহিত আমার আকৃতির কম বা বেশী সাদৃশ্য ছিল। তা'না হলে ঐ আক্রমণকারীদের ন্যায় এই বৃদ্ধা সাক্ষীনীটীও এই একই ভুল করবে কেন ? আমি মনের এই সব চিন্তা চেপে গেলেও মুখ চোখ লজ্জায় আমার লাল হয়ে উঠছিল। এতোগুলো লোক তাহলে আমার চরিত্র সম্বন্ধেই সন্দেহ করছে নাকি ? কিন্তু তবুও আসল বিষয় খুলে না ব'লে একরকম দম বন্ধ করে আমি এই সাক্ষীনীকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু করে দিলাম।]

প্রঃ—আপনি বোধ হয় আমার চেহারার সঙ্গে আরেক জনের চেহারটা একটু গুলিয়ে ফেলেছেন। আচ্ছা ঠাকুমা! প্রথমে আমার মতন চেহারার যে লোকটাকে ঐ মহিলাটী অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না— সেই লোকটির সঙ্গে ঐরকম ঝাঁমেলার আগে ঐ মহিলাটীর কি কি প্রাণের কথা হয়েছিল ?

উঃ—তা জানি না বাবা! তোমরা দুজনা এক বা ভিন্ন লোক কি না ? তবে তোমার চেয়ে লোকটা বয়সে অনেক বড়োই হবে মনে হয়। তা তেইশ গণ্ডা বয়েস তো আমার হতে চললো। তা আমার চোখের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। তা বাবু, এতো লোকের সামনে এ সব কথা আমি বলতে পারবো না।

এই বৃদ্ধ মহিলার এবংবিধ উক্তির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আমার অনুরোধে উপস্থিত ছোট বড় সকলে দূরে চলে গেলে আমি এই বৃদ্ধা মহিলার এই সম্পর্কিত বাকী বিবৃতিটী লিপিবদ্ধ করে নিলাম। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"কাল সকালে আমি এ' বাড়ীর নাতনীদের নিয়ে এই বাড়ীর বারান্দার উপর বসেছিলাম। এমন সময় তোমার মত মোটা সোটা পুরুষই একটালোক ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ীর একটা জানালাতে টোকা দিল। একটু পরেই দেখলাম যে ঐ ভদ্রমহিলা চোখ রগড়াতে রগড়াতে জানালার ধারে এসে জানালা খুললেন। ভদ্রলোককে এই ভাবে বাইরের রাস্তায় দেখে তেলেবেগুনে জলে উঠে বললো, এতো সকালে এখানে তোমার আসার দরকার কি ? আমি তো বলে দিয়েচি আমার মনের আসল কথা। ভদ্রলোকটী বোধ হয় এতোখানি শুনতে হবে তা আশঙ্কা করেন নি। ঐ মহিলাটীর এই কথায় জানলার রেলিংটা মুঠা করে ধরে দাঁতগুলো কড়মড় করে ভেঙচে উঠে বলে উঠলো, তুমি যে কতোবড় স্বার্থপর শয়তান, তা আমি স্বপ্নে কল্পনাও করতে পারি নি। এই যদি তোমার মনে ছিল তা'হলে এতো আশার বাণী আমাকে না শুনিয়ে আমাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বললেই পারতে যে তোমাকে দিয়ে শুধু একটা সাংঘাতিক কাজ করিয়ে নিতে চাই। আমি বোধ হয় এই দিন পাগল হয়েই গিয়েছিলাম। তা না হ'লে এই কাজ এমন ভাবে আমার মত এক নিরীহ লোক করবেই বা কেন ? কি কুক্ষণেই না আমার সন্তানের আস্তানা খুঁজতে এসে তোমার সঙ্গে এতোদিন পরে আবার দেখা হয়ে গিয়েছিল। আদ্যোপান্ত আমার সমস্ত জীবনটা আমি তোমার জন্যেই না নষ্ট করলাম। এতো দিন পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে নতন জীবন সুরু

করতে চেয়েছিলাম ; ঠিক সেই শুভ মুহূর্তেই তুমি আমাকে আবার এক মহানরকে এনে ফেলে দিলে। আচ্ছা আমিও তোমাকে দেখে নেবো।' এই ভদ্রমহিলা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এই ভদ্রলোকের এই সব সুধামাখা বাণীগুলোকে গলাধঃকরণ করছিল। এইবার হঠাৎ সে পিছন ফিরে কি একটা দেখে নিয়ে সদর দরজা ঘুরে বাইরে এসে চীৎকার করে বলে উঠলো; 'অপরাধ আমি করালেও তা করেছো তুমি নিজে। তুমি মনেও ভেবো না যে এতে পার পাবে তুমি। এখন বেরিয়ে যাও, বলছি! ভদ্রলোক কিছুটা তাঁর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করার পর লোকজন জড় হচ্ছে দেখে সরে পড়ছিল। হঠাৎ এই মহিলাটী তার কাঁধটা ধরে নাড়া দিয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা! আমি দেখবো ভেবে আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারবো কি না? এখন সারা রাত জেগে মাথা কি ঠাণ্ডা রাখা যায়! তুমি না' হয় সকাল আটটা আন্দাজ একবার এদিকে এসো!' এদের এই সব কথায় এটা যে এই বাড়ীর এই বজ্জাত ভদ্রমহিলার এই সব নূতন কথার উত্তরে ঐ নিল্লর্জ্জ লোকটা বললে— 'ঘুরে আসবার জায়গা কাছে-পিঠে আমার কোথায়? তোমার এখানে যখন স্থান নেই, তখন না হয় ঐ দূরের পার্কটায় একটু বসে জিরিয়ে আসি। কিন্তু আজই আমি তোমার কাছ হতে একটা পাকা কথা চাই।' এই কয়েকটা কথা কাঁদোকাদো হয়ে বলে ঐ লোকটা টলতে টলতে এক দিকে চলে গেল।

এদের পিরীতের ঝগড়া আমার বুঝতে আর বাকী থাকে নি। তাড়াতাড়ি নাতনীদের ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে ওদিকে চেয়ে দেখি—লোকটা গুড় গুড় করে চলে যেতে যেতে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, 'আবার তোমার খপ্পরে আসবো? আমার ছেলেটাকে খুঁজে পেলে এবার তাকে নিয়ে শুধু সুখী হবো। এই জীবনে আমি অনেক পেয়েছি—আবার অনেক হারিয়েছিও, আর নয়—'

কিন্তু তা সত্বেও কিনা সেই সকাল আটটার সময়েই আবার লোকটা ফিরে এলো মনে করে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবিশ্যি আমরা তোমাকেই সেই লোকটা বলে ভুল করেছিলাম। তা এখন সত্য মিথ্যা অন্তর্যামী গুরু নারায়ণই জানেন। এই জন্যে এই নিল্লর্জ্জপানা দেখে নাতনীগুলো একবার হেসেও উঠেছিল। এই সব দেখে শুনে শেষে আমাদের বৌঝিগুলোও না গোল্লায় যায়।"

এই বৃদ্ধা মহিলা সাক্ষীনীর এই বিবৃতি শেষ হলে আমি ও আমার সহকারী কনকবাবু পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এতো লোকের সামনে নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করা সম্ভব ছিল না। তাই চোখের চাহ-নীর সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের অভিমত অবগত হয়ে সোজা-সুজি সেখান হতে আমাদের বেচারাম ওরফে বিচকের রুগ্ন পিসেমসাইএর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম।

ছোট দ্বিকক্ষযুক্ত একটী একতল গৃহের একটী অন্ধকার কক্ষে বেচারামের রুগ্ন প্রৌঢ় পিশেমশাই শুয়েছিলেন। তাঁর পায়ের দিকে বসে তাঁর বর্ষীয়সী স্ত্রী তাঁর শুশ্রূষা কর-ছিলেন। পাশের অনুরূপ একটী কক্ষে তাঁদের দুইটী ছেলে চীৎকার করে পড়া মুখস্থ করছিল।

আমি ধীরভাবে কান খাড়া করে এদের পড়ার বহর একটুখানি অনুধাবন করে নিলাম। না, এরা পড়া শুনা ভালো ভাবেই করছে। যাদের লেখা পড়া হবার, তা তাদের এমনিতেই হয়ে থাকে। কোনও ভালো বা মন্দ পরিবেশ তাদের মানুষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয় বলে মনে হয় না। এইরূপ এক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই এরা লেখাপড়া করে চলেছে। তবু এদের মধ্যে থেকেও লেখাপড়া শেখা হলো না শুধু আমাদের এই বিচকে ওরফে বেচারামের। সারা জীবনটাই বৃথা অপরের ফাইফরমাজ খেটেই সে কাটিয়ে দিলে। সম্প্রতি তাকে দিয়ে এই ফারমাইজ খাটানোর ব্যাপারে বিহিতরূপে আমরাও যোগ দিয়েছি। মনটা আমাদের ত্বরিতগতিতে ওদের পড়ার শব্দের দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে আমরা এই বিচকের পিশেমশায়ের উপর ন্যস্ত কর-লাম। এদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে যেন এতোদিনে একটু স্বস্তির রেখা ফুটে উঠেছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরে জেনেছিলাম যে বিচকে তাদের সংসারের স্বাচ্ছল্য এতো-দিনে ফিরিয়ে আনতে পারার জন্যেই তাঁদের এই আনন্দ। এই বিচকে তাঁদের আর গলগ্রহ পোষ্য নয়। তাঁদের আশা এই বিচকের দৌলতে তাঁরা যেমন বহু অপমানের হাত হতে বাঁচলেন, তেমনি তাঁদের ছেলেগুলোরও পড়াশুনো করে মানুষ হবার একটা উপায় হলো। বিচকে তাঁদের আমার সম্বন্ধে কি বলেছিল তা জানি না। আমাকে দেখে খুশীতে

মাথা নেড়ে তাঁর স্ত্রী মাথার কাপড়টা আরও একটু কপালের উপর টেনে দিলেন। আর ভদ্রলোক নিজে দুই হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলে উঠলেন, 'আমাদের বিচকেকে তাহলে তুমিই বাবা সৎপথে এনে চাকুরী দিয়ে মানুষ করে তুলেছো?' এঁদের এতদিনের অবহেলিত বিচকে কোনও দিনই অসৎপথে ছিল কি'না জানি না। আমি এঁর এই কথায় মাথা নেড়ে একটু হেঁসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু করে দিলাম। তাঁর এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আজ্ঞে! এই বিচকে হচ্ছে আমার এক স্বর্গতঃ দূর-সম্পর্কীয় ভগ্নীর একমাত্র পুত্র। এর বর্ত্তমান বয়স হবে সতের আঠারো। ওর আট বছর বয়সে মা মারা গেলে ওর বাপ আমাদের কাছে ওকে রেখে চলে যায়। এই সময় আমরা শাঙ্খিভাঙা লেনে বসবাস করতাম। এর বছর কয় পরে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট থেকে এই মহাল্লাটা ভেঙে ফেললে আমরা এই বাসায় উঠে এসেছি। আমরা শুনেছি যে বেচারামের বাপ এলাহাবাদে বিয়ে করে ঘর সংসার করেছে। কিন্তু এর মধ্যে সে একদিনও তার এই ছেলের খোঁজ-খবর আর নিলে না। সম্প্রতি তার সেই স্ত্রীও নাকি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে শাঙ্খিভাঙা পাড়া থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে দেখতে এসেছিল। তার কাছে শুনেছিলাম যে মাসকয়েক আগে ওর বাপ একবার ওপাড়ায় তার এই ছেলের জন্যে খোঁজ করে গিয়েছে। ওপাড়ার লোকেরা আমার ঠিকানা না দিতে পারলেও আমরা যে এই অঞ্চলে উঠে এসেছি তা তাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সে তো কৈ আর এদিকে একবারটীর জন্যে পা দিলো না। হয়তো সে মত পালটে ফেলে পূর্ব্বের ন্যায় আবার উধাও হয়ে গেলো। তবে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমাদের সঠিক ঠিকানা হয় তো সে পায় নি।

আজ্ঞে হাঁ, এ কথা ঠিক। ওদের গ্রাম পদ্মার ভাঙনে ভেঙে গিয়েছে।

ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটুকু আমাদের তদন্তকে যেন সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিলে। কিন্তু তাহলে কি এই সাংঘাতিক ও মর্ম্মান্তিক অপরাধের প্রকৃত হোতা কি বিচকেরই অপদার্থ পিতা? এইরূপ এক সন্দেহ পূর্ব্বেও একবার আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। কিন্তু তখনও এমন কোনও প্রমাণ আমি পাই নি—যাতে এইরূপ এক স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারা যেতে পারে। পদ্মা নদী তো বহু লোককেই ভিটামাটী ছাড়া করেছে—এই একটী তথ্যের উপর নির্ভর করে কাউকে কোনও এক বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ওপাড়ার এজমালী ঠানদি এবং এপাড়ার বিচকের পিসেমশাই-এর দুইটি বিবৃতি একত্রে সন্নিবেশিত করলে তো আমাদের তদন্তের মোড় এইদিকেই ঘুরিয়ে দেয়।

এইখানকার এই মৃত্যুমুখী রুগ্ন ভদ্রলোককে আর বেশী বিরক্ত করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবুও তাঁকে আরও দুই একটি প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা, এই বিচকের পিতাকে দেখলে আপনারা তাকে নিশ্চই চিনতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে হঠাৎ পথে-ঘাটে দেখলে বিচকে কি চিনতে পারবে।

উঃ—আজ্ঞে, আমরা তাকে ঠিক চিনতে পারবো। তবে বিচকের দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁর সঙ্গে বিচকের শেষ দেখা। এখোন ন'দশ বছর পরে দেখে বিচকে তাঁকে না চিনলেও চিনতে পারে। তবে দুজনার চেহারার মধ্যে বেশ একটা আদল এখনও দেখা যায়।

প্রঃ—হুম্! আচ্ছা, আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো! আমার চেহারার সঙ্গে বিচকের চেহারার কোনও আদল কি আছে? এই একটু আধটু যে কাছাকাছি—আমাদের উভয়ের চেহারার কি মিল দেখা যায়?

উঃ—আরে! কিই যে আপনি বলেন। আপনার চেয়ে সে যে বয়সে অনেক বড়ো, তবে, হাঁ। দূর থেকে দেখলে আপনাদের উভয়ের অবয়বের ও মুখাকৃতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে এই দশ বারো বছর পর তার চেহারা কি রকম দাঁড়িয়েছে তা কে জানে? কিন্তু এতো সব কথা আমাকে আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো!

এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই ভদ্রলোকের কাছে আপাততঃ আমার অন্য কিছু জেনে নেবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা এইবার তাড়াতাড়ি এঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ত্বরিতগতিতে অপেক্ষামান পুলিশ ট্রাকটীর উপর উঠে বসলাম, এর পর আমাদের নির্দ্দেশমত এই

পুলিশ ট্রাকটী নিউ তাজমহল হোটেলের দিকে ছুটে চললো। একমাত্র এই মামলার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় আমাদের মনেই আসে নি। হঠাৎ এক সময় আপন সম্বিত ফিরে পেয়ে আমি সহকারীর দিকে ফিরে চাইলাম। কিন্তু সহকারী আমার মতই চিন্তামগ্ন থাকায় তা দেখেও যেন দেখতে পেলো না।

'আমার মনে হয় কনক, সহকারী অফিসার কনকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমি বললাম, সেই দিন সকালে যাকে ঐ ভদ্রমহিলা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি আমাদের এই হতভাগ্য বিচকে ওরফে বেচারামের পিতা ছাড়া আর কেউই নন। খুব সম্ভবতঃ তাকে সকাল আটটার সময় পুনরায় সেখানে আসতে বলেছিলেন—কাউকে দিয়ে তাঁকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেবার জন্যে। এমন কি তাকে একেবারে শেষ করে দেবার ইচ্ছাও হয়তো তার ছিল। এদিকে তাঁর জায়গায় আমি সেখানে এসে পড়ায় আমাকে 'তিনি' বলে গুণ্ডারা ভুল করে থাকবে। আমি তাড়াতাড়ি পিস্তল বার না করলে, আর ঠিক সেই সময় তুমিও ট্রাকে করে সেখানে না এসে পৌছুলে হয়তো তারা ছুরি-ছোরা বার করে আমাকেই সেখানে একেবারে জানে মেরে শেষ করে দিত। এখন যদি ঐ ভদ্রমহিলাটীই এইসব গুণ্ডা বদমায়েসদের ওখানে ডেকে আনিয়ে থাকেন তা'হলে তো! ও বাবাঃ। এ সব ভাবতেও যে সারা শরীরটা শিরশির করে উঠে।

'এসব আপনার অমূলক সন্দেহ স্যার? আমার সহকারী অফিসার কনকবাবু আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'একেবারে সহায়-সম্বলহীন না হলেও ভদ্রমহিলা একজন বাঙালী মেয়ে মাত্র—তা'ও তিনি একাকিনী একটা বাড়ীতে বসবাস করেন। তাঁর আফিস বা কায-কারবারের বিষয় যা কিছু আমরা শুনেছি তাতে করে তাঁর সংসর্গ অন্ততঃ চোর গুণ্ডাদের সঙ্গে না থাকবারই কথা। আমার মনে হয় আপনার ওপর আক্রমণ ঐ পাড়ার ছোকরার দলেরই কয়েকজন করেছিল। এই সব প্রেম-ঘটীত ব্যাপার কোনও পাড়ায় ঘটলে সেখানকার ছেলে ছোকরারা সন্দেহমান ব্যক্তিদের এমনি দুই এক ঘা দেবার চেষ্টা করেই থাকে, এর মধ্যে অবশ্য রাগের চেয়ে ঈর্ষাই থাকে বেশী। এ ছাড়া আমাদের বিচকের বাবাকে এরমধ্যে অহেতুক ভাবে জড়ানো আমাদের পক্ষে উচিৎ হবে না। আপনার চেহারার সঙ্গে যদি তাঁর চেহারার আদল থাকে তাহলে এই চেহারার আর একজন লোকও কি ভূভারতে থাকতে পারে না। এসব চিন্তা হচ্ছে আপনার অনেকটা কাকতালীয়বৎ চিন্তারই সামিল। তাছাড়া সন্দেহকে তো প্রমাণ বলা যায় না। এসব বিষয় বিচকে জানাল আমাদের সে আর কোনও সাহায্যই করবে না। তার বাবা যদি সত্যিই তাকে খুঁজে খুঁজে ফেরে, তাহলে সেও তো তেমনি তার বাবাকে এখানে ওখানে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজও পর্য্যন্ত তার এই ছেলেবেলাকার দেখা পিতার দর্শনের জন্য সে কতোই না অস্থির। অবশ্য যদি তাঁর দ্বিতীয় পত্নীও গত হয়ে থাকেন, তাহলে এতোদিন পরে তাঁর শেষ অবলম্বন এই একমাত্র সন্তানটীর জন্য মন আকুল হয়ে উঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে পুত্রের খোঁজে এসে খামকা তিনি একটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িত করলেন কেন? এই মহানগরী কলকাতা হতে এলাহাবাদ শহর অনেক দূরে। এতোদিন পরে অতো দূর থেকে এসে হঠাৎ এখানে পাপের বেসাতী জমান এতো সহজ নয়।

সহকারী কনকবাবুর এই সদুত্তরটী আমার অবচেতন মন বোধ হয় পছন্দই করেছিল। আমাদের বিচককে আর সকলের মত আমরাও ভালবেসে ফেলেছিলাম। বাপ ছেলেকে পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর ঠিক সেই এক সময়েই ছেলেও বাপকে খুঁজে বার করতে চায়। অথবা পরস্পর পরস্পরের গা ঘেঁসে চলে গেলেও কেউ কাউকে চিনেও চিনতে পারছে না। এইরূপ এক নাটকীয় পরিস্থিতির কথা ভাবতেও মনটা আকুল হয়ে উঠে। হঠাৎ এই সময় আমাদের চিন্তার ধারা বিক্ষুব্ধ করে ফ্যাক করে আমাদের পুলিশ ট্রাকটা নিউ তাজমহলের সামনে এসে থেমে গেল। আর আমরাও আপন আপন সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে নিউ তাজমহলের সরু সিড়িটা বয়ে তর তর করে উপরে উঠে এলাম। এই সময় ওই হোটেলের ম্যানেজার ছুটিরামবাবু গামছা কাঁধে করে অকারণে ছুটাছুটী করছিলেন—বোধ হয় কারণে অকারণে এমনি ছুটাছুটী না করলে ম্যানেজারবাবুদের ম্যানেজারী জমে না। আমি এই নাকওয়ালা হাড্ডিসার ম্যানেজারবাবুকে এড়িয়ে একটু এগিয়ে যাওয়া

মাত্র তিনি হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে বলে উঠলেন, আরে অ মশাই! ওদিকে কোথায় চলেছেন? ওদিকটা কাশীপুরের রাজষ্টেটের ম্যানেজার থাকেন। এদিকে অফিসের ভিতর আসুন। কিন্তু ঘর-টর এক বেলার জন্যে আমরা ভাড়া দিই না। ঘুষখোর অফিসারেরা যেমন আলাপের সূচনাতেই বলে থাকেন, আমরা মশাই ঘুষ খাই না। তেমনি সূচনাতেই বোধহয় তিনি আমাদের শুনিয়ে রাখলেন যে এক বেলার বা এক ঘণ্টার জন্যে তাঁরা এখানে ঘর ভাড়া দেন না। আমরা অগত্যা অফিসের ঘরে এসে দেখলাম সেখানে এক পীতবর্ণের চন্দ্রানন ভদ্রলোক বসে আছেন। বেশভূষায় না হলেও আবভাবে তাঁকে রাজা বাহাদুর বলেই মনে হয়। ম্যানেজারের করকরে গলার বিপরীত সুন্দর শান্ত গলায় তিনি আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'নমস্কার, আসুন।'

আমাদের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে এই মালিক ভদ্রলোক অপ্রফুল্ল হয়ে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আজ্ঞে। আমার ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বরং আপনি কথাবার্ত্তা বলুন। আমার একটু বাইরে কায আছে, তাই একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হচ্ছে।' এই ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা হতে বুঝা গেল যে আজীবন এই হোটেলের ব্যাপারে পুলিশের ঝামেলা পুইয়ে পুইয়ে তিনি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এই ব্যাপারে ম্যানেজারকেই সামনে এগিয়ে দেওয়াটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকেন। আমরা এই উভয় ভদ্রলোকের সাহায্যে প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাশীপুর রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজারবাবুর দেখা পেলাম। এই রকম পুলিশের ঝামেলা অন্যভাবে মুলাকাৎ করতে ইনিও অভ্যস্ত ছিলেন। তাই পুলিশের আগমন সম্পর্কে সম্ভাব্য বিষয়গুলি আদ্যোপান্ত চিন্তা করে তাঁদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কথা-বার্ত্তা কওয়ার একটা রীতিনীতি সম্বন্ধে একটা ছক তৈরী করে নিয়ে বেশ প্রস্তুত হয়েই তিনি আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম—তিনি সেইদিনকার তদারকরত মোচওয়ালা ভদ্রলোক ছাড়া অন্য আর কেউই নন।

'আরে মশাই। আপনারা কি কাশীপুরের পুলিশের তরফ থেকে কোনও তদন্ত এখানে করতে এসেছেন'। এই মোচওয়ালা স্থূলকায় ভদ্রলোক আমাদের অভিবাদন করে বললেন, 'কিন্তু ওখানকার ক্রিমিন্যাল মামলা কটা আমরা তো হাইকোর্টে এনে ষ্টে অর্ডার করে নিয়েছি। মহা-মান্য হাইকোর্ট তো তাঁদের শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কোনও মামলার খবর তো কাশীপুর থেকে আমি পাইনি। যদি ইতিমধ্যে সে-খানে কোনও ঘটনা হয়েও থাকে, আমরা তার জন্যে দায়ী হতে পারি না। জমিদারবাবু এখন দিল্লীতে আছেন, রাণীমা আছেন কোলকাতায়, আর আমি আছি এখানে। আমাদের ষ্টেটের ছোটতরফের বাবুরা এমনি মিথ্যা মামলা প্রায়ই করে থাকেন। তা এবারের কি ব্যাপার হলো, বলুন। আমাদের বিরোধীপক্ষীয় ছোটতরফের বড়ছেলে এই শহরে নামকরা একজন চোখের ডাক্তার। উনিই এখানে ওঁদের পক্ষীয় যাবতীয় মামলার তদ্বির-তদারক করে থাকেন। তিনি যদি আমাদের এখানে চলে আসার জন্যে অযথা ভয় পেয়ে আপনাদের নিকট কোনও মিথ্যে নালিশ জানিয়ে থাকেন তো সেকথা স্বতন্ত্র।'

'আজ্ঞে না। কাশীপুরের কোনও ঘটনা সম্বন্ধে আমরা এখানে তদারকে আসেন নি'। আমি গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললাম, 'এখানকারই এক ঘটনা সম্বন্ধে আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। সেই সম্পর্কে আপনার একটা বিবৃতিও আমরা লিপিবদ্ধ করতে চাই।'

এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা হতে বুঝা গেল যে হয়তো তাঁদের কাশীপুরের জমিদারীতেও তাঁরা একটা ঘটনা ঘটানোর পূর্ব্বে এই কলিকাতা শহরে 'এ্যালিবাই' প্রমাণ করবার জন্যে সম্প্রতি সরে এসেছেন। তবে আমাদের এও দেখতে হবে যে তাঁদের জমিদারীর ছোট-তরফের কলিকাতার প্রতিনিধি এই বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক অমুকবাবুর দলের সঙ্গে এঁদের সঙ্গে এখানে কোনও নূতন করে আকচা-আকচি সুরু হয়েছে কিনা? সত্যই এই ভদ্রলোকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটী নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটী বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য।

আজ্ঞে আমার নাম অমুকচন্দ্র শীল। আমি কাশীপুর ষ্টেটের বড় তরফের দেওয়ানজী। সম্প্রতি হাইকোর্টের মামলা তদারকের জন্য আমরা সদলবলে কলকাতায়

এসেছি। এই সঙ্গে আমাদের রাণীমাও আমাদের সাথে এসে গিয়েছেন। তিনি তাঁদের কলকাতার রাজবাড়ীতে এসে উঠেছেন। আমি অবশ্য পূর্ব্ব হতেই নিউ-তাজমহলের একতলার সব কয়টা ঘরই ভাড়া নিয়ে আছি। কিন্তু এখানেও এসে আমাদের শান্তি নেই। কলকাতার বিখ্যাত চক্ষুবিশারদ কুমার অমুক এখানে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। কলকাতায় এঁদের দু' দুটো বড়ো বস্তী আছে। যত চোর গুণ্ডারা সেখানে বসবাস করে। ক'দিন ধরে আমাদের কলকাতার রাজবাড়ীর আশেপাশে বহু সন্দেহ-মান লোকও ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদেরও এখানে কয়টা বস্তী আছে বটে, তবে সেখানে কুলটা নারীরা বাস করলেও কোনও চোর গুণ্ডা বাস করে না, এখন দেখছি নিজেরা অপরাধ করে নিজেরাই আপনাদের কাছে এসে নালিশ জানিয়ে গিয়েছে। এই সব একটা সাবেকী জমিদারী চাল ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। উনিই বোধ হয় লোকজন পাঠিয়ে আমাদের কাউকে খুন জখম করার তালে ছিলেন। এখন আবার উনিই সাধু সেজে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছেন।

আমি এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে করতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলাম। এ যে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে চায়; তাও একটা আধটা নয়, একের পর এক ছোট বড় বহু সাপ। এদের মধ্যে কোনটা নির্ব্বিষ আর কোনটাই বা বিষাক্ত তা আমাদের কে বলে দেবে? আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাদের সমস্যা আরও বাড়লো বই কমলো না। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই হোটেলের নীচে দেখলাম একখানা BLT 444 (c) নম্বরের ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ট্যাক্সীটা আপনার নিজের, না আপনাদের ষ্টেটের। আর একটি বিষয়েও আপনাকে সঠিক ভাবে উত্তর দিতে হবে। আপনাদের এখানকার রাজবাড়ী বা জমিদারবাড়ীর পিছন দিকে একটা হলদে রঙের বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীটার একতলা ও দ্বিতলের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন?

উঃ—আজ্ঞে! ঐ বাড়ীর একতলায় আমাদের রাণী-মার এক সহপাঠিনী একাকী বাস করেন। আমাদের রাজবাড়ী মেরামত হবার সময় আমরাই ওখানকার দ্বিতলের ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিই। কিন্তু রাজবাড়ী তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে যাওয়ায় ওটা আর আমাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। এদিকে ওটা ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো করেও—এখনও পর্য্যন্ত ওটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি নি। এই BLT 444 ( ) নম্বরের ট্যাক্সীখানা আমাদের ষ্টেটের সম্পত্তি। রাজবাড়ীর কেউ কলকাতায় না এলে ওটা এমনি ভাড়া খাটে। এই ট্যাক্সী ছাড়া আমাদের এখানে আরও একটী ট্যাক্সী ও দুটো পাবলিক লরী আছে।

এই গাড়ীগুলো আমাদের নমীর বাগানের বস্তীতে একটা গ্যারেজে থাকে। আমাদের কলকাতার কর্ম্মচারী হারু গোঁসাই এখানকার সমুদয় সম্পত্তির দেখাশুনা করে। কলকাতায় থাকবার সময় আমি এর একটা ট্যাক্সী ব্যব-হার করি আর কি?

প্রঃ—এ ট্যাক্সী যে মধ্যে মধ্যে আপনি ব্যবহার করেন তার পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কিন্তু আপনার মনীবানীর সহপাঠিনী অমুকরাণীকেও তো ওটা আমরা ব্যবহার করতে দেখেছি। যাক্ ওসব আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারের বিষয় আমরা জানতে চাই না। এখন এই গত কয়দিন যাবৎ আপনার মনীবানীর ঐ বান্ধবীর বাড়ীর সামনে বারে বারে যে কয়টা ঘটনা ঘটে গেলো তার সম্বন্ধে আপনি কারও কাছে কিছু কি শুনেছেন?

উঃ—এ্যা! সেখানে আবার কোনও ঘটনা ঘটেছে নাকি? এ্যা কবে কবে? কি ঘটলো সেখানে? এ নির্ঘাত তাহলে ঐ ছোট তরফের ঐ ডাক্তার সাহেবের কাণ্ড। গেল বারের কর্পোরেশনের ভোটের সময় থেকে তিনি এমনি বহু ভদ্র গুণ্ডাদের পুষে আসছেন। এ ছাড়া তেনাদের বস্তীর পেশাদারী গুণ্ডারা তো আছেই। আমাদের মনীবানীর ঐ নিরীহ বান্ধবীর ওপর ওনার তাগ ও রাগ দুই আছে। একবার ভদ্রমহিলা কাশীপুরে বেড়াতে গেলে সেখানে তাঁকে তাঁর গাড়ীশুদ্ধ ওনারা লেটেল দিয়ে লুঠ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তা স্যার আপনিই বলুন। দুই শরীকের মধ্যে যখন সদ্ভাব ছিল তখন ওঁরা মেলামেশা না হয় করেছেন। ইংরাজি পড়া ছেলেমেয়ের

মধ্যে এমনি হয়েই থাকে। আর তাও তো সে অনেক দিনের পুরাণো কথা। এখন এই মামলা-মকর্দ্দমার সময় নিজের বান্ধবীকে ছেড়ে ওনাদের রায়ে উনি রায় দেবেন কেন? এইটে ছিল ওঁর একমাত্র ওনাদের কাছে অপরাধ। ভদ্রমহিলা ভয়ে শেষে রাজবাড়ীর পিছনের এই বাড়ীটাতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এখানকার ঠিকানা তো তাঁর জানবার কথা নয়। তাহলে কি ফলো করে এসে ওনাকে তিনি ঘায়েল করলেন নাকি?

এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হলো বোধ হয় ইচ্ছে করেই যে কয়েকটী সত্য কথা অতর্কিতে বলে ফেললেও বহু সত্য তিনি গোপন করেও গেলেন। এই রকম এক ঝানু লোকের কাছ হতে সত্য বার করা এক দুরাশা মাত্র। তবে ভদ্রলোকের মুখের 'ফলো করা' বাক্য দুইটী আমার পথ-নির্দ্দেশক হলো। আমি ঠিক করলাম যে কাল হতে এই ভদ্রলোককেও সেই সঙ্গে ওদের কলকাতার কর্ম্মচারী হারু গোঁসাইকে ফলো করার বন্দোবস্ত করলে বোধ হয় অনেক অজানা বিষয় জানা যেতে পারবে। তাই এখনকার মত এঁকে আর বেশী না ঘাঁটিয়ে এইদিনকার মত তদন্তে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা নিজেদের কোয়ার্টারে বিশ্রাম করার জন্যে ফিরে এলাম। [ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ ১৯৬২

গোপাল ভৌমিক

ক্ষীর সমুদ্রের কূলে
জম্বুদ্বীপে কবে চোখ মেলে
দেখেছি তোমার মূর্তি
আজ তার কিছু মনে নেই ঃ
ইতিহাস যত দীর্ঘ
তত ক্ষীণ মানুষের স্মৃতি
বিস্ময়ে অবাক মানে,
দৃষ্টি থামে হরাপ্পায়
অথবা নিকট কোন কাল-সীমাতেই
দাঁড়িয়ে আকাশ ছুঁতে প্রাণপণে চাই।

যেখানে যেটুকু পাই
অজন্তা ইলোরা কোণারক
তাই কেটে কেটে জুড়ে
যে মূর্তি নিজের হাতে গড়ি
পীনোদ্ধত বক্ষ আর ক্ষীণকটি
সে নারী যতই কেন হোক মনোরমা
তবু সে প্রাচীন প্রাচী নয় বলে
খুঁজে ফিরি বিস্মৃতির ক্ষমা।

একদা এ দেশে ছিল বশিষ্ঠ পুলোমা
সে তো ইতিহাস নয়, পুরাণ কাহিনী;
শ্রুতি আর কিংবদন্তী
দুটি প্রায় সমার্থবোধক।

ইতিহাস নেই জানি
কল্পনায় তাই পরিক্রমা
করে ফিরি কাম্বোজে ও শ্যামে—
ধূলিলীন পদচিহ্ন দক্ষিণে ও বামে।

তোমাকে এখন বুঝি চিনি শুধু নামে
যেহেতু এখন তুমি অঙ্গহীনা
বয়েস অনেক;
বহু স্মৃতি-বিজড়িত এ মনে যে
কল্পান্তের অনুষাঙ্গ জাগে
তাকেই রাঙিয়ে নিয়ে অনুভূতি-রাগে
ভাবি আমি বিগতায়ু সমৃদ্ধির রূপ
কিংবা ভাবী দিনে পোড়ে কামনা-ধধুপ।

আপাতত চোখে দেখে জঞ্জালের স্তূপে
আমি পাশ কাটিয়েই চলাফেরা করি,
ভুলেও ভাবি কি তাকে সরানোর কথা?
চারিদিকে ঝড়ঝঞ্ঝা
উটপাখি, বৃথা পথ খোঁজা!
তার চেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা সোজা।
যা ছিলে, যা হতে তুমি
আমি তার নিয়ামক নই,
শ্রুতি স্মৃতি কিংবদন্তী
সত্য সব যদি বেঁচে রই।

ভবিষ্যবাণী

হুমায়ুন কবীর

ভবিষ্যতকে জানবার চেষ্টা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটা অংশতঃ তার কল্পনা ও বুদ্ধিমত্তা উভয়েরই কাজ। তাই যুগে যুগে মানুষ তার ভবিষ্যতকে দেখবার জন্যে, যা এখনও ঘটেনি তা জানবার জন্যে যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং তাদের যে এ রকম কোনও কৌতুহল নেই তা বেশ বোঝা যায়।

এই ভবিষ্যদ্বাণী, কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখেই হোক বা তাস বা হস্তরেখা কিংবা ফলিত জ্যোতিষ, যার থেকেই হোক না কেন, এটাই বোধহয় যে এ সমস্তই সমষ্টিগতভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ ফলের উপরই ভিত্তি করে আছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ভবিষ্যদ্বক্তার পদ্ধতি ও উপায় বা যন্ত্র-কৌশল যাই হোক না কেন, কখনও কখনও তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। মানুষের অভিজ্ঞতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই রকমের আশ্চর্যজনক বিষয় অনেক জমা আছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হয়েছে যে বাহ্যিক বা বস্তুগত যোগাযোগের কোনও সূত্র ব্যতীতই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মনোভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ রকম পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্য এত বেশী পরিমাণে রয়েছে যে একে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

অথচ এই মনোভাবের যোগাযোগ কি ভাবে সাধিত হয় তার কোনও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি। সময় সময় ভবিষ্যদ্বাণী যা সব করা হয় তার ভিত্তিও ঠিক একই রকমের দুর্বোধ্য। এটাও সত্য যে ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে যেগুলো সত্যে পরিণত হয়েছে মানুষ সেগুলাই মনে রাখে, আর সহজেই ভুলে যায় যেগুলা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ব্যাপারের একটি রীতিসংগত অনুধাবনের প্রথম পদক্ষেপরূপে মনে হয় পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক তালিকা লিপিবদ্ধ করে রাখা, যাতে করে দেখা যেতে পারে যে কি অনুপাতে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে এবং এই সব সফল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য থেকে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি প্রত্যক্ষ করা কতখানি সম্ভব।

ধার্মিক লোকেরা, যাই হোক, ভবিষ্যৎ জানবার প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেন নি। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এ রকম পূর্বজ্ঞান বা পূর্বাভাস মানুষের নৈতিক ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। এটা আবার বিশেষ করে সত্য হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের মতন দেশের পক্ষে—যেখানে মানুষের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে অদৃষ্টবাদের দিকে এবং বিশ্বাস রয়েছে ভবিতব্যতা বা পূর্বনির্দেশের ওপর। যেটাকে একটা শুধু বুদ্ধির খেলা হিসাবে অনুমোদন করা যায়, সেটাই সাংঘাতিক অভ্যাসে পরিণত হয় যখন তা কারোও কাজের ধারার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

ভবিষ্যদ্বাণীর অভ্রান্ততার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস অনেক সময় দুঃখজনক পরিণতিও ঘটিয়েছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে ভারতীয় রাজারা স্থির বিশ্বাসে জ্যোতিষীদের সংগে পরামর্শ করে, তাঁরা যে সময়কে সব-চেয়ে শুভ মুহূর্ত বলে মনে করতেন সেই সময়কেই বেছে নিতেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরাজিত হতেন। টিপু সুলতান সম্বন্ধেও এই কথা বলা হয়েছে যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে সম্ভবতঃ তিনি পরাজিতও হতেন না এবং প্রাণও হারাতেন না। অনেকের বিশ্বাস হিটলারও তাঁর জীবনের প্রত্যেক চরম মুহূর্তে জ্যোতিষীদের সংগে পরামর্শ করতেন, আর তার পরিণামও আজকে কারও অজানা নয়।

অযোধ্যার কথা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দীর্ঘায়মান স্মৃতিচারণের শেষে একটি পুণ্যস্মৃতির কথা লিখে সমাপ্তি টানি এবার। লিখব শ্রীরামচন্দ্রের সরযূ-মেখলা অযোধ্যা নগরীতে কী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম ও কী ভাবে রামায়ণের মহিমা নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম।

একথার মানে নয় যে, পুণ্যশ্লোক মহাকবি বাল্মীকির কাব্যরসধারা বাল্যকালেই আমার হৃদয়কে উর্বর করে নি। শৈশবেই আমি রামায়ণ পড়তাম নানা অনুবাদ—গদ্যে পদ্যে। এদের মধ্যে কৃত্তিবাসের সহজ স্নিগ্ধ ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করত। কিন্তু আমার আরো ভালো লাগত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যানুবাদ। এ-দুই কবির চিত্রায়ণে আমি সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম হনুমানের ছবিতে। রামের কাছে হনুমান প্রার্থনা করেছিলেন—(পিতৃদেব প্রায়ই এ-শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করতেন :)

স্নেহো মে পরমা রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি সর্বদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা নিত্যং ভাবমন্যং ন গচ্ছতু॥
যাবদ্রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে স্থাস্যন্তি মম প্রাণাঃ ন সংশয়ঃ॥

রাজকৃষ্ণ রায় অনুবাদ করেছিলেন—যা প'ড়ে আমার চোখে জল আসত :

তব প্রতি প্রীতি ভক্তি যেন নাহি টুটে।
আমার মনের ভাব তোমা বই, প্রভু,
অন্য ঠাঁই ভুলিয়াও নাহি যায় কভু।
ধরাতলে রামকথা থাকিবে যাবৎ,
আমিও জীবিত যেন থাকি গো তাবৎ।

এ ছাড়া রাজকৃষ্ণ রায়ের সরযূ নদীর নানা বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মনে কতবারই যে সাধ জেগেছে এ-পুণ্য-তোয়ায় স্নান করতে। গঙ্গা, কাবেরী, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রে স্নান ক'রে পবিত্র বোধ করেছি বহুবারই—বিশেষ ক'রে গঙ্গা-স্নানে। কিন্তু এবার—বোধহয় লগ্ন এসেছিল ব'লেই—সরযূ দেবী মন টানলেন। ফৈজাবাদ অযোধ্যা থেকে ছয় মাইল, সেখানে আমাদের স্নেহাস্পদ সুধী মল্লিক (জজ্ সাহেব) এবং স্ত্রী প্রতিমা নিমন্ত্রণ করল। সুধী আমাদের প্রিয় বন্ধু এলাহাবাদের প্রাক্তন জজাধিপতি শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের কৃতী পুত্র। যেমন নম্র, সুকুমার, তেমনি সঙ্গীত-প্রিয়। বিশেষ ক'রে আমার ভজন ওরা দুজনেই অত্যন্ত ভালোবাসে। তার উপর বন্ধু বিধুভূষণ (আমরা দাদা পাতিয়েছি) বললেন : "দাদা, আপনি ও ইন্দিরা যদি

অযোধ্যা রাজপ্রাসাদ

ফৈজাবাদে যান তবে আমিও গিয়ে হাজির হব।" অথ ১৪ই সকালের ট্রেনে রওনা হলাম কাশী থেকে।

সুধী ও প্রতিমা আমাদের ষোড়শোপচারে খাওয়ালো, দাদার পৌরোহিত্যে ভজনও খুব জমল, বিশেষ তুলসী-দাসের ভজন :

সখা সহিত সরযূতীর বৈঠে রঘুবংশবীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস চরণমে লপটাই,
সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।

ইন্দিরা, শ্রীকান্ত, মোহন ও আমি ১৫ই সকালে সাত আট মাইল মোটরে ঘুরলাম অযোধ্যায়। তারপর বিশাল, নয়নাভিরাম সরযূ নদীতে স্নান করলাম পরমানন্দে। দেহমন জুড়িয়ে গেল। এখানে আমি মনে প্রাণে বাঙালী। হিমালয়,

কৈলাস, মানস সরোবর, অমরনাথের তুষার আশীষ আমার মাথায় থাকুন, আমি অস্থিমজ্জা-সজ্জায় নদীবিলাসী জীব। আমাকে দাও ব্রহ্মপুত্র, দাও যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ, সর্বোপরি দাও মা গঙ্গা। আমার অন্তরের প্রার্থনা—যেন গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ হয়। গঙ্গা দেখলে আজো আমার মনপ্রাণ উজিয়ে ওঠে। সরযূ অবশ্য গঙ্গার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তবু নদী তো। থুড়ি, ভুল বলেছি: শুধু নদী বলেই নয়। জর্মনিতে সুন্দরী রাইনে স্নান করেছি—যার অজস্র গুণগান করেছেন জর্মন কবি হাইনে। কিন্তু সে জলে দেহ স্নিগ্ধ হ'লেও মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয় নি—যেমন হ'ল সরযূতে। প্রণাম করলাম

হনুমান মন্দির অযোধ্যা

শ্রীরামচন্দ্রকে—যাঁর চরণস্পর্শে সরযূ আজো পুণ্যতোয়া, পাপতারিণী।

স্নানান্তে অযোধ্যার বিখ্যাত হনুমান মন্দিরে প্রয়াণ করা গেল। উঃ সে কী কাণ্ড!

হনুমানের ভক্তির কথা ভাবতে আমার হৃদয় আর্দ্র হয় ব'লে ভাবি যে আমার আশা আছে। শুধু গঙ্গা যমুনা, সরযূ, কৃষ্ণা, কাবেরীতে ভক্তি নয়, হনুমানকেও যে ভক্তি করতে পারে সে হিন্দুই বটে মনে প্রাণে। জানি অবশ্য এ-ধরণের কনফেশন-এর বিপদ কত—শুনে বিজ্ঞ ইদানীন্তনেরা ব্যঙ্গ হেসে বলবেনই বলবেন: "মিডীভাল তথা কম্যুনাল! হিন্দু উন-বিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞান-ধুরন্ধর হ'তে না যেয়ে সেকেলে ধার্মিক হ'তে চাইবে? এই কম্যুনাল পাপেই হিন্দু ডুবতে বসেছে।" বলুন। আমি বিশ্বাস করি—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—তাই ডুবি ডুবব হিন্দু হ'য়েই—যদি গঙ্গায় ডুবি তা হ'লে তো সাতচিতে গোলকধাম! বিদেশীরা আমার হাতে মাথা কাটবেন কী করে?—আমি তো ততক্ষণ পৌঁছে গেছি গঙ্গাযাত্রার পুণ্যে ঠাকুরের রাঙা চরণে—যেখানে ঠাঁই পেয়ে হনুমান্ হলেন অমর। কিন্তু যা বলছিলাম: বাল্মীকির হনুমান্-চরিত্রের কথা।

সত্যি কী আশ্চর্য সৃষ্টি মহাকবির! পরমহংসদেবের কথামৃতে আছে: "একজন হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ কী তিথি? তাতে হনুমান বলেছিলেন: আমি তিথি বার নক্ষত্র জানি না। আমি শুধু রামচিন্তা করি।"

হনুমানের এই একনিষ্ঠ অহৈতুকী ভক্তির বর্ণনা আমার বালহৃদয় যে কী অপূর্ব আবেগে দুলে উঠত কেমন করে বোঝাব? পড়তে পড়তে একবারও তো কই মনে হ'ত না হনুমান শাখামৃগ! এমনই ছিল বাল্মীকির বর্ণনাকৌশল যে পড়তে পড়তে সত্যিই মনে হ'ত,—যেন অমর হনুমানকে সামনে দেখছি আর আমি প্রার্থনা করছি: "তোমার মতন ভক্তি আমার হোক হে মহাবীর রামভক্ত!" হনুমানের বিচিত্র চরিত্র কেন সে সময়ে আমার মনে এত গভীর ছাপ দিয়েছিল এখন নিশ্চয় করে বলতে পারি না—কারণ পঞ্চাশবৎসর আগে আমার মনোভাব ঠিক কী ছিল এখন পরিষ্কার মনে নেই—কয়েকটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আবেগের ছাপ ছাড়া আর সবই হ'য়ে গেছে ঝাপসা। তাই কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে শুধু এইটুকু জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমার আবাল্য ভক্তি অভীপ্সাকে হনুমানের অপরূপ জীবন্ত চরিত্র উস্কে দিয়েছিল। পরে বিলেত গিয়ে আমার মন অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। ফলে বাল্মীকির হনুমান্ চরিত্রের কথা বড় একটা মনে হ'ত না। কিন্তু বহুবর্ষ পরে পণ্ডিচেরিতে মূল সংস্কৃতে বাল্মীকির রামায়ণ পড়তে না পড়তেই

কের দুলে উঠেছিল বিশেষ করে চারটি চরিত্রের মহিমায়ঃ সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও হনুমান্। হনুমানের কাছে আর সে শিশুসরল প্রার্থনা জানাই নি বটে, কিন্তু যখনই আমার যুবমনে নানা তার্কিক যুক্তির মেঘ এসে আমার বিশ্বাসকে টলিয়ে দিত, মনে পড়ত বিশেষ ক'রে হনুমান্ ও প্রহ্লাদের দাসভাবে সাধনার কথা—যে-সাধনায় তর্ক, যুক্তি ও সংশয়ের স্থান নেই, আছে শুধু সরল বিশ্বাসের ও দৃঢ় একনিষ্ঠতার ঠাট।

তবু আজো পুরোপুরি হদিশ পাই না—আমাদের শাস্ত্রে এত মহাভক্তের ছায়াপথ মাদৃশ ভক্তিকামীর নয়নমনকে উদাসী করা সত্বেও বিশেষ ক'রে হনুমান্ কেন আমার চিত্তকে এত আবিষ্ট ক'রে এসেছে! গঙ্গাস্নানের মহিমা বুঝি—সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা এ-দুয়ের রাজযোটক তো সোজা কথা নয়। তা ছাড়া আশৈশব চোখে দেখেছি মা গঙ্গার অমলা-কান্তি, কানে শুনেছি তাঁর মধুর কল্লোল, অঙ্গে পেয়েছি তাঁর স্নেহাশীষের কোমল স্পর্শ। কিন্তু হনুমানের তো কই বাংলাদেশে তেমন নামডাক নেই?

"মহাবীর" হ'লেন পশ্চিমাদের আরাধ্য, যেমন গণেশ মারাঠীর, কার্তিক দাক্ষিণাত্যের, শিব-কালী-কৃষ্ণ বাঙ্গালীর। তবে? হনুমান্ কেন আমার মতন আধুনিক বাঙালীর মনকে আজো এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে। তিনি একা লঙ্কাকাণ্ড করেছিলেন ব'লে? সে তো ঠাট্টার কথা। আমি বলতে চাইছি একটি গভীর কথা—প্রায় গুরুগম্ভীরের কাছাকাছি। তবু বলে ফেলি দুর্গা ব'লে। আমার বুদ্ধিবাদী ক্রিটিকরা তো আমাকে হিরোওয়ার্শিপর, উচ্ছ্বাসী, সেকেলে, উদ্ভট, গুরুবাদী আরো কত কি উপাধি দিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি ক'রে থাকেন—আমার হনুভক্তিতে তাঁদের চোখে আর কতই বা ছোট হব—মরার বাড়া তো গাল নেই? এ-যুগেও যে মূঢ় কৃষ্ণের নরলীলার নামে উজিয়ে ওঠে, বৈজ্ঞানিক ঐহিকতার চেয়ে পারমার্থিক বিশ্বাসকেই বড় ক'রে দেখে, খেয়াল—ঠুংরির চেয়ে ভজনকীর্তনকে ভালবাসে, গণমনের চেয়ে আর্য প্রজ্ঞাকে শ্রদ্ধা করে—সে হনুমানকে দেবতা ব'লে প্রণাম করবার পাগলামি করবে না তো করবে কে?

কিন্তু সত্যিই কি এ-মনোবৃত্তি এতই হেয় পাগলামি? পৌরাণিকী কাহিনী ছেড়ে দিলেও জীবজন্তুর কাছে কিছুই কি আমাদের শিখবার নেই? ইন্দিরার একটি গল্প মনে পড়ে। তার জবানিতেই বলি:

সরযূ নদী—অযোধ্যা

"আমার মার ছিল একটি প্রিয় কুকুর। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁকে শোভাযাত্রা ক'রে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতায় দিলাম তাঁর দেহ। কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমরা ফিরে এলাম—সে ফিরল না। আমরা তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কয়েকদিন বাদে দেখি সে মা-র চিতার কাছে ম'রে প'ড়ে রয়েছে।" পশুর ভালোবাসা ব'লে কি এ প্রভুভক্তিকে অবজ্ঞেয় বলবে, না বলবে—সব মানুষই এমন ভালোবাসতে পারে?

আমার মনে হয় বাল্মীকি যখন তাঁর প্রতিভ দৃষ্টিতে হনুমান্-চরিত্র দেখেছিলেন তখন কোনো আশ্চর্য দৈবপ্রেরণা তাঁর হৃদয় আলো ক'রে এসেছিল ব'লেই বানরদের তিনি

মানুষের চেয়ে ছোট ক'রে দেখেন নি। নৈলে রামায়ণে তিনি আরো তো অনেক ভক্তের ছবি এঁকেছেন—শবরী, গুহক, জটায়ু, বিভীষণ ইত্যাদি—তাদের কেউই কেন হনুমানের মতন চিরস্মরণীয় হ'য়ে পেল না দেবতার পদবী? এই কথাটি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রেই আমি এবার চমকে উঠেছিলাম অযোধ্যায়।

শাস্ত্রে বলে: "প্রত্যক্ষঃ কেন বাধ্যতে?" অর্থাৎ seeing is believing: সত্যি, কী ব্যাপারই দেখলাম স্বচক্ষে: সে কি সোজা ভিড়? শুধু তাই নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তারা অনেকেই! বলতে কি, জজসাহেবের আরদালি ও গুর্খা পুলিশ সাহায্য না করলে হয়ত ভিড়ের চাপে আমাদের চেপ্টে যেতে হ'ত। কী উৎসাহ যাত্রীদের মনে! "জয় জয় মহাবীর—জয় রাম!" বলতে বলতে আবালবৃদ্ধবনিতার সে কী আনন্দ-উচ্ছ্বাস! কী? না হনুমান্-মন্দিরে হনুমান্-দেবকে প্রণাম ক'রে তারা সবাই ধন্য হবে! অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে পাহাড়ে উঠে আমরা হনুমানের বিগ্রহ দর্শন করলাম—পুলিশ ও আরদালির সাহায্য নিয়ে তবে। কিন্তু ঐ কাতারে কাতারে চলমান জনসংঘে রুগ্ন, কুব্জ, পঙ্গু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ভিক্ষুক, অবলা, ছিন্নকন্থা যাত্রী, কৌপীনবন্ত, ভাগ্যবন্ত—সবাই মিলে পিঁপড়ের সার বেয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে পাহাড়ে উঠতে দেখি নি কি? তাদের মুখে সে কী আনন্দ—যে হনুমান্ দেবের চরণে ফল ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে আসবে! এ-অঘটনকে ঘটতে দেখি নি কি আমরা সেদিন এ-বিংশ শতাব্দীতেও?

চোখে আমার জল এল। এই-ই ভারত—পুণ্যভূমি! এ-দৃশ্য আর কোথাও দেখা যেত না। য়ুরোপে এ-ধরণের ভিড় হ'তে পারে কেবল সিনেমা-তারকাদের বিলাসিনী রূপ দেখতে, কিম্বা কোনো নামজাদা রাজনৈতিকের বক্তৃতা শুনতে। আমাদের দেশে জনতা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে যায় কোথায়? না দুর্গম তীর্থপথে, কুম্ভমেলায়, হিমালয়ের সাধুদর্শনে, অর্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নানে। কৃষ্ণপ্রেমকে এ-দৃশ্যের কথা লিখতে সে আমাকে লিখেছিল (২২-১১-৬১):

"Your description of the joy on the faces of the pilgrims in Ayodhya reminds me of the utter satisfaction, I noticed in the faces of the pilgrims setting out for home after the darshan of Badrinath, as if everyone's heart, big or little, was full."

আর একটি চিঠিতে ও লিখেছেন: "After all, India is India!"

এই ভক্তির ঐতিহ্য! এই অযৌক্তিক বিশ্বাস! দেবতার নামে শুধু উজিয়ে ওঠা নয়—দুর্গম পথে দুরভিসার দুঃখবিপদ—এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণও তুচ্ছ ক'রে ভক্তিকে সম্বল ক'রে শক্তি আহরণ করবার দৃশ্য। অঘটন নয় তো কী? সত্যি বলছি, চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতাম না যে রামায়ণের যাদুতে এক লাঙ্গুলী জীবকে লক্ষ লক্ষ লোক দেবতার বেদীতে বসিয়ে পূজা করতে পারে, ভক্তিবিহ্বল আবেগে দুরন্ত জনতার চাপ উপেক্ষা করে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে—শুধু এ-হেন উদ্ভট দেবতাকে দর্শন ক'রে ধন্য হ'তে!

হনুমান্ আমাদের দেশে বহু ভাবুক তথা জ্ঞানী ভক্তের চিত্তেও যে পূজ্য দেবতার আসন পেতেছেন, বাল্মীকির আশ্চর্য কাব্যকলার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোথা থেকে পেয়েছিলেন তিনি অমানুষকে দেবতা ক'রে নরলীলায় অবিস্মরণীয় করবার এ অদ্ভুত প্রেরণা?

এ-প্রশ্নের উত্তর শুধু এই যে, বাল্মীকি তাঁর প্রাতিভ ঋষিদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে হনুমানের মধ্যে দিয়েই অসম্ভব হবে সম্ভব, তাই আঁকতে হবে তাঁর কাব্যের অঘটনঘটন-পটীয়সী তুলিতে এমন একটি অভাবনীয় চরিত্র যার প্রতি স্পন্দনে ঝরছে যুগপৎ শৌর্য ও শক্তি। এ-হেন চরিত্র তার অদ্ভুত বিস্ময়রসের মহামহিমাই ভুলিয়ে দেবে আমাদের যে, সে পশু। সর্বাঙ্গসুন্দর দেবতাকে আরাধ্য করা হয়েছে তো অগুন্তি, বাল্মীকি বললেন, এবার পশুকে দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে মানুষকে করবেন ভক্তিবিহ্বল। পশুর খুঁৎ (limitation)—বুদ্ধি-বিচার চিন্তাশক্তির অভাব—এই সবই হনুমানের চরিত্রে হ'য়ে দাঁড়াক পরম সম্পদ। তাই তো হনুমান্ পারলেন অবলীলাক্রমে যা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য: নির্বিচারে প্রশ্নহীন ভক্তিতে অসংশয় আনন্দে রামের চরণে আত্মসমর্পণ করা।

হিন্দুধর্মের একটি মহান্ মহিমা এইখানে যে, ভক্তি-

সাধনায় সাধক নানা পথের পথিক হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বিপথে পথ কেটেছেন। তাই এতরকম পূজা, উপচার, উপাসনা, মন্ত্র, শোধন, কবচাদির ব্যবস্থা, এতরকম দেবতার এতরকম রূপ-কল্পনা—যে-রূপ যার ভালো লাগে তার জন্যে সেই রূপধ্যানের ব্যবস্থা, যে-পথে চলতে যার প্রাণ চায় তাকে সেই পথেই চলতে বলা, যে-মন্ত্রে যার মন বসে তাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। ভারতের সাধক ভগবৎসাধনায় কোনো পরীক্ষা (exp riment) করতেই ভয় পান নি এবং যে-পরীক্ষাতেই তপস্যার প্রসাদে ফল পেয়েছেন তাকে মঞ্জুর করতে ইতস্ততঃ করেন নি—যে-উৎপ্রেক্ষা, উপমা, মূর্তি বা রূপকের সাহায্যেই ভক্তির দিকে টান বেড়ে ওঠে তাকেই কাজে লাগিয়েছেন অকুণ্ঠ স্তবে, স্তোত্রে, প্রতীকে, আখ্যায়িকায় অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে। উপেয় (e d) তাঁদের একটি—ভক্তি, কিন্তু উপায় বহু। যাতেই মনে শ্রদ্ধা অনুরাগ উপচিত হয়, প্রাণ গলে হৃদয় প্রেমের প্রণামী দিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে তাকেই বরণ ক'রে এসেছেন—কখনো ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ারে, কখনো বা চমকপ্রদ বিদ্যুদ্দামে। মন আমাদের সহজেই ঝিমিয়ে পড়ে, তাই তাকে ক্রমাগতই ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চেয়েছেন তাঁরা। অসম্ভব কাহিনী? হ'লই বা—যদি সে ভক্তি সঞ্চার করে তাহ'লেই সে মঞ্জুর। হ্রদে কুমীর চেপে ধরল হাতীর পা। অমনি পশু হাতীর চেতনায় জেগে উঠল ভক্তি—শরণাগতির প্রার্থনা:

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং বিমুক্তসঙ্গী
মুনয়ঃ সুসাধবঃ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে ভূতাত্মভূতাঃ
সুহৃদঃ স মে গতিঃ॥

যাহার পরম মঙ্গলময় রূপদর্শনসাধ জপিয়া
নিখিল প্রাণীরে আপনার সম গণি' মুনি ঋষি গহন বনে
রাজে একা শুধু দুশ্চর তপসাধনার তরে অশঙ্কিয়া—
সে-তোমার, ওগো অগতির গতি, প্রার্থি শরণ
চির শরণে।

এই দ্বৈরূপ্যের (contrast) কলাকারু ভারতীয় কবিদের কাছে অতি আদরণীয় হ'য়ে এসেছে এই জন্যেই যে তাঁরা কালোর পটভূমিকায় সাদাকে সহজেই উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারতেন তাঁদের প্রতিভাবলে। তাই মহাদৈত্য বৃত্রও হ'ল অন্তরে বৈরাগী, মহাসুর বলি বামনের ছোঁওয়া পেতে না পেতে হ'য়ে দাঁড়াল ভক্ত, শিশু ধ্রুবের অভিমান তাকে করল কঠোর তপস্বী, বালক কুশলবের হাতে রামের অনীকিনীর হ'ল পরাজয়···ইত্যাদি। এদের মধ্যে একটি অদ্ভুত সৃষ্টি হনুমান—যিনি আমাদের পুরাকাহিনীতে মহাবীর নামে প্রখ্যাত—আজও হিন্দুস্থানীদের মুখে তাঁর এই উপাধিই উচ্চারিত হয় নামের বদলে। ভক্ত হনুমানের ভক্তিচিত্রণে তার বীর্যকে এত বড় ক'রে দেখানো হ'ল কেন—এ-প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে। উত্তর সহজ: ভক্তকে আমরা প্রায়ই দুর্বল ও উচ্ছ্বাসী ভেবে অবজ্ঞা করি—প্রায়ই বলি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে: "ভক্তি? ও মেয়েদেরই মানাই—পুরুষ চাইবে জ্ঞান, বল, কীর্তি।" বাল্মীকি তাই দেখাতে চেয়েছিলেন—শক্তিমানের শক্তিও কী ভাবে মহাকীর্তি অর্জন করে যখন সে অহৈতুকী ভক্তির আনন্দে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে। যে-বলীয়ান্ শক্তি-মদভরে দেবদ্রোহী হ'তে পারত, সে ভক্তির অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পায়—যেমন দৈত্যবালক প্রহ্লাদ দেখতে পেয়েছিলেন—যে, শক্তির বৈকুণ্ঠে পৌঁছয় কেবল সেই মহাজন—যে তার ভক্তির মহাবলেই তার শক্তির অহঙ্কারকে নুইয়ে নিয়োগ করতে শিখেছে ইষ্টের সেবায়। আত্মাদর অভিমান জাঁকজমকের নির্দেশপথে আপাত-মনোহর ভোগের পথ যার খোলা, সে কি স্বভাবে মহাবীর না হ'লে কাম ছেড়ে ভক্তিকে বরণ করতে পারে—প্রতাপের রাজত্ব ছেড়ে প্রেমের দাসত্বকে চাইতে? তাই তো হনুমানকে মহাবীর ব'লে পূজা ক'রে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ সাধক তাঁর বীর্য শৌর্য প্রেম ও ভক্তির প্রেরণা পেয়ে এসেছেন।

* * *

পরদিন ছিল অযোধ্যায় একটি বিশেষ পর্ব—মহোৎসব। শুনলাম এই তিথিতে না কি শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাজয় ক'রে ফিরে এসে দুর্গাপূজা ক'রে অযোধ্যা পরিক্রমা করেছিলেন—আট ক্রোশের পরিধি। সেই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের নানা গ্রাম ও শহর থেকে এসেছিল অগুন্তি তীর্থযাত্রী। কুম্ভ-মেলায় ছাড়া এত তীর্থযাত্রীকে কোনো একটি শহরে জমায়েৎ হ'তে দেখি নি। বিশ লক্ষেরও বেশি—শুনলাম।

ভোররাত থেকে কানে ভেসে আসছিল তাদের জয়ধ্বনি :
"জয়রাম সীতারাম···জয় মহাবীর···"

সকালে প্রাতরাশের পরেই উৎসুকচিত্তে বেরিয়ে পড়লাম এই অভাবনীয় উৎসব দেখতে।

সত্যিই অভাবনীয়! না দেখলে কল্পনাও করতে পারতাম না। ইন্দিরা, শ্রীকান্ত ও মোহনকে নিয়ে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম চক্রাকারে চলমান বিপুল জনসংঘের কিনারায়। জনসংঘ না ব'লে অশ্রান্ত জনস্রোত বলাই ভালো। কুম্ভমেলায় প্রয়াগে দেখেছিলাম লক্ষ লক্ষ নরনারী। জয়ধ্বনিমুখর স্নানযাত্রা। এখানে দেখলাম তাদের আনন্দ-উদ্বেল শোভাযাত্রা। অযোধ্যার ঐ দারুণ শীতে প্রাগূষা লগ্ন থেকে পদযাত্রায় চলেছে এ-বিশাল জন-সংঘ—বৃদ্ধবৃদ্ধা, প্রৌঢ়প্রৌঢ়া, যুবকযুবতী, বালক-বালিকা—এমন কি সদ্যজাত শিশু মায়ের কোলে, কিম্বা দুতিন বৎসরের শিশু পিতার কাঁধে। এইভাবে তারা সারাদিন অযোধ্যা পরিক্রমা করবে অন্ততঃ দশঘণ্টা ধ'রে —মাঝে মাঝে হয়ত একটু জিরিয়ে নেবে, বা সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ফের সুরু করবে পরিক্রমা "জয় রাম, সীতারাম, জয় মহাবীর" বলতে বলতে। মুখে তাদের সে কী আনন্দের আলো—পরিক্রমার ফলে মহাবীরের প্রসাদ পাবে রামসীতার প্রতি ভক্তিতে বহুদিনের পুঞ্জীত পাপ দূর হবে! এই পুণ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রাণ জেগে উঠেছিল ব'লেই আমি সেদিন সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম উজিয়ে উঠে তুলসীদাসের বিখ্যাত রামভজন :

তু দয়াল, দীন হুঁ, তু দাতা ময় ভিখারী।
ময় প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী।

এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে সুরু ক'রে, শোনে কথকের মুখে, গায় একযোগে রামধুন : "রঘুপতি রাঘব রাজারাম—পতিতপাবন সীতারাম।" আমাদের শিক্ষিত সমাজে এসব গান কেউ কেউ কখনো কদাচিৎ গান হয়ত—ড্রয়িং রুমের বা সভাসমিতির সুরুতে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে। কিন্তু তাঁদের মুখে রামনাম আর এই বহুদূরাগত দীনদরিদ্র ভক্তিকামী সরল বিশ্বাসীদের মুখে রামনামের জয়ধ্বনি—তফাৎ আশমান জমীন। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম এই বিপুল জনসংঘের উদ্বেলতা রামনামের ভক্তি তুফানে। তাদের মুখে সে কী অপরূপ বিশ্বাসের দীপ্তি, চোখে সে কী আনন্দ, চলনে সে কী পুলকশিহরণ! দেখতে দেখতে ইন্দিরার চোখ জলে ভরে এল। বলল আমার দিকে তাকিয়ে "কী অপূর্ব দাদা, না? দেখ তো—কী আনন্দে চলেছে এরা অশ্রান্ত পদক্ষেপে আটক্রোশ পথ পরিক্রমা করতে!"

মনে মনে বললাম : "ধন্য আমি যে এ-দৃশ্য দেখতে পেলাম, যার আলোয় বিকীর্ণ হয় ভগবানের আশীর্বাদ—ঝরে ভক্তির আনন্দ নির্ঝর—যার আশীর্বাদে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর দেহমন যায় জুড়িয়ে! ভারতকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ সন্তদাস প্রমুখ পরমভাগবতেরা যে পুণ্যভূমি নাম দিয়েছেন কেন যেন নতুন ক'রে দেখতে পেলাম। আমরা সংসারে দিনের পর দিন চলি—না চ'লে উপায় নেই ব'লে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি প্রাণবায়ু বাঁচতে হবে ব'লে, চোখ চেয়ে আলোকে বরণ করি আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না ব'লে। কিন্তু জীবনের আর একটি ছন্দ আছে যার নাম দেবতার আবাহনের ছন্দ, ভক্তির উচ্ছ্বাসে যার সহজ প্রকাশ। অযোধ্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে দেখেছিলাম সেদিন সেই দিব্য আবির্ভাব—যাকে কালেভদ্রে দেখা যায়। তাই মনে মনে প্রণাম করেছিলাম ঋষি বাল্মীকিকে যিনি রামায়ণ গান করেছিলেন সে কবে পাঁচহাজার বৎসর আগে—অথচ আজও তাঁর প্রাণের সুরে বেজে ওঠে লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী নিরন্ন প্রাণে ভক্তির ঝংকার, আনন্দের জয়ধ্বনি। রামায়ণের তথা মহিমার মর্ম যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম অযোধ্যায় এই আকস্মিক তীর্থযাত্রায়।
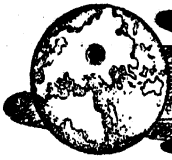
পঞ্চাশ বৎসর আরম্ভ—

'ভারতবর্ষ' বর্তমান আষাঢ় সংখ্যায় ৫০শ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ কাল যাঁহাদের কৃপা, আনুকুল্য, সাহায্য, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া একখানি মাসিকপত্র এই সুদীর্ঘকাল জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছে, আজ তাঁহাদের সকলের কথা—পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতিকে—আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং যে কল্যাণময়ের করুণায় 'ভারতবর্ষ' সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। আজ বিশেষ করিয়া অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার কৃতীপুত্রদ্বয় ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও ৺সুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা সর্বাগ্রে মনে করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তাঁহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উভয় ভ্রাতাই যে নিষ্ঠা, শ্রম ও সততার সহিত 'ভারতবর্ষ' পরিচালনা করিয়াছেন—তাহা সাংবাদিক জগতে অতি বিরল। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুদীর্ঘ কাল সকলের পিছনে থাকিয়া সকল কর্মীকে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করিয়া শক্তিমান ও বুদ্ধিমান করিয়া তুলিয়াছেন। সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রজের অনুবর্তী হইয়া কি প্রবন্ধ-রচনা, কি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা সকল কার্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ করিয়া সম্পাদক রূপে 'ভারতবর্ষকে' চিত্রণে, মুদ্রণে, সাধারণ পারিপাঠ্যবর্দ্ধনে সমৃদ্ধ করিতে সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—সর্বোপরি তিনি সর্বজনপ্রিয় 'খেলাধুলা' বিভাগটি প্রথমাবধি নিজ অপূর্ব রচনাশৈলী দ্বারা প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের একটি বিভাগের অভাব পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার অমূল্য উপদেশ ও পরামর্শ না থাকিলে ভারতবর্ষ দিন দিন উন্নতির শিখরে অগ্রসর হইতে পারিত না। আজ এই শুভদিনে সে জন্য আমরা তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপনের সময় অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহাদের অভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহারাই 'ভারতবর্ষে'র জন্মদাতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, কাজেই সকল কাজে কর্মীরা তাঁহাদের অশরীরী আত্মার আশীর্বাদ কামনা করে। স্বর্গত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রতিষ্ঠাতা ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ৺জলধর সেন ও ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কথা আমরা এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছি। আজ সকলের নিকট প্রার্থনা—অতীতে যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনই যেন আমরা সকলের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করিয়া 'ভারতবর্ষ'কে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমর্থ হই।
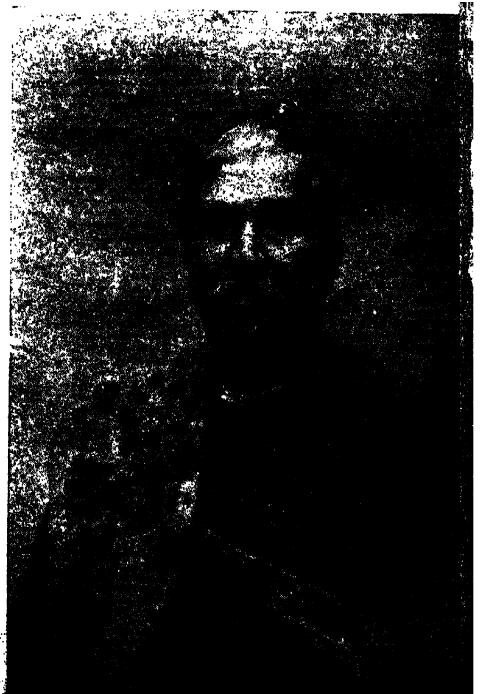
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

লোকসভা ও রাজ্যসভার উপ-নেতা—

গত ১৯শে জুন দিল্লীতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব রাজ্যসভা ও লোকসভার উপ-নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমহতাব জীবনে বহু কর্মক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র মোহন বাংলা দেশে 'মধুদা' নামে পরিচিত এবং মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে বিপ্লব আন্দোলনের নেতারূপে কার্যারম্ভ করিয়া ৫০ বৎসরেরও অধিককাল দেশসেবা ও জনসেবায় নিযুক্ত আছেন। সুরেন্দ্র মোহনের নির্বাচনে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী -

নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি. সঞ্জীবায়া গত ১৬ই জুন নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নূতন সদস্য-গণের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকে-কে-সাহ এবং শ্রীজগন্নাথ রাও চণ্ডিকী নূতন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন—শ্রীসাহ গুজরাট হইতে রাজ্যসভার সদস্য এবং শ্রীচণ্ডিকী মহীশূর হইতে লোকসভার সদস্য। শ্রীএস-কে-পাতিল কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ ছিলেন—এবারও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। বাংলা হইতে শ্রীমতী আভা মাইতি ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন—তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে এবার ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য করা হইয়াছে। নূতন সদস্য হইয়াছেন—(১) নূতন সভাপতি শ্রীডি. সঞ্জীবায়া (২) ইউ এন ঢেবর (৩) এন-সঞ্জীবন রেড্ডী (৪) ডাঃ বি-সি-রায় (৫) মোরারজী দেশাই (৬) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (৭) জগজীবন রাম (৮)

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

এস-কে পাতিল (৯) হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম (১০) কে-কামরাজ নাদার (১২) সি-কে গোবিন্দ ...য়ার (১৩) কে-কে সাহ (১৪) জগন্নাথ রাও চণ্ডিকী। নিম্নলিখিত ৭ জন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) ইন্দিরা গান্ধী (২) ওয়াই-বি-চ্যবন (৩) ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব (৪) সর্দার দরবারা সিং (৫) রামসুভগ সিং (৬) সাদিক আলি (৭) জি-রাজাগোপালন। নিম্নলিখিত কয়জনকে স্থায়ীভাবে কমিটীর প্রতি সভায় নিমন্ত্রণ করা হইবে স্থির হইয়াছে—(১) জহরলাল নেহরু (২) গুলজারি লাল নন্দ (৩) ভি-কে-কৃষ্ণ মেনন (৪) সি-সুব্রহ্মণম্ (৫) সি-বি গুপ্ত ও (৬) বিমলা প্রসাদ চালিহা।

রাষ্ট্রগুরু ভবনে জাতীয়তাকার্য—

কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল উত্তরে বারাকপুর মণিরামপুরে গঙ্গাতীরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহটি এতদিন পরে ভারত সরকার গ্রহণ করিয়া তথায় ভারতের প্রথম বংশতত্ত্ব ও জীববিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ১৩ বিঘা জমির উপর একটি বৃহৎ দ্বিতল গৃহে সুরেন্দ্রনাথ বাস করিতেন। ঐ বাড়ীতে মোট ১৩টি ঘর আছে। সুরেন্দ্রনাথ ঐ বাড়ীতে প্রায় ৫০ বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানেই ১৯২৫ সালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন—ঐ বাড়ীর পশ্চিমে গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহ দাহ করা হয়—তথায় একটি স্মৃতি

স্তম্ভ নির্মিত আছে। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ভবশঙ্কর ১৯৩৮ সালে পরলোকগমনের পর সেখানে ঐ বংশের আর কেহ বাস করে নাই—তথায় ডাক-বিভাগের একটি অফিস ছিল। ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্যে সরকার ইহা ক্রয় করিয়া তথায় এই নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। বিশ্ব-বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যালডেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিবেন। এত দিন পরে ঐ ঐতিহাসিক গৃহটি রক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন।

শ্রীনন্দ কিশোর ঘোষ—

কলিকাতার সিনিয়ার মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট, রবিবাসরের সদস্য ও ভারতবর্ষের লেখক শ্রীনন্দ কিশোর ঘোষ ২৩ বৎসর চাকরীর পর পদত্যাগ করিয়া সম্প্রতি
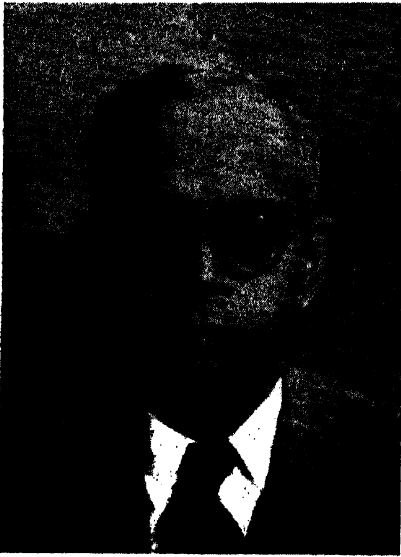
নন্দকিশোর ঘোষ

কলিকাতা স্নাতক কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের একজন পুরাতন ও বিশিষ্ট সদস্য। তিনি বিশ্ববিত্তালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীরূপে তিনি কলিকাতা সমাজে সর্বজনপরিচিত —আমাদের বিশ্বাস বিধান পরিষদের সদস্য হিসাবেও তিনি তাঁহার কর্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন।

অরিন্দম দত্ত—

খ্যাতিমান লেখক ও দেশকর্মী ৺চারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের পুত্র, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্টার অরিন্দম দত্ত গত ১৪ই জুন দিল্লীতে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১৯৩৭ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মধ্যপ্রাচ্যে, উত্তর আফ্রিকা, ইটালী ও গ্রীসে সামরিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি ১৯৪৬ হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় আইন ব্যবসার পর তিনি সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্ট্রার হইয়া দিল্লীতে চলিয়া যান। তিনি ভাল খেলোয়াড় ও ছোট গল্প লেখক ছিলেন।

নূতন কংগ্রেস সভাপতি—

অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি. সঞ্জীবায়া গত ৬ই জুন নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নূতন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থাকিবেন। শ্রীদামোদরম্ সঞ্জীবায়ার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর—এত অল্প বয়সে তাঁহার পূর্বে মাত্র শ্রী জহরলাল নেহরু, শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ২ বৎসর পূর্বে অন্ধ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন—হরিজন সম্প্রদায় হইতে তিনি সর্ব-প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হইলেন। তিনি কুর্নুল জেলার পেদ্দপাডু গ্রামের লোক এবং বি-এ, বি-এল। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম এম-পি নির্বাচিত হন ও ১৯৫২ সালে সংযুক্ত মাদ্রাজের এম-এল-এ হন। তখনই তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি. রাজাগোপালাচারীর মন্ত্রীসভার সদস্য হইয়াছিলেন। পরে অন্ধ্র রাজ্য পৃথক হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রকাশম্ ও শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন। —২ বৎসর পূর্বে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেস সভাপতি হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন—এখন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি আবার মুখ্যমন্ত্রী হইলেনও তিনি কংগ্রেস সভাপতি হইলেন।

স্বপনচারিণী

শ্রীশৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমের এক ছোট্ট শহর। ছোট হলেও খ্যাতি তার আছে স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেই শুধু নয় ব্যবসার কেন্দ্র ও তীর্থস্থান বলেও। প্রায়ই আসি এখান বেড়াতে। বেড়াতে ঠিক নয়, বায়ু-পরিবর্ত্তনে বা পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনে বলা-টাই বোধ হয় ঠিক। যে কদিন থাকি এখানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সকালে বিকালে ঘুরে বেড়াই রাস্তায় রাস্তায়, মাঠে মাঠে, ঘাটে অঘাটে। আর সন্ধ্যার পর বাজারে অর্থাৎ যেখানে মনোহারী দোকান, খাবার দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, খেলনার দোকান, ওষুধের দোকান ইত্যাদি বহু দোকানের সারি ও তার মধ্যে একটি সিনেমা হাউসও আছে—সেই হরেকরকম্‌বা ভীড় ও আওয়াজের মধ্যেই আমি মহানন্দে ঘুরে বেড়াই। সিমলা-দার্জ্জিলিং-এর যেমন 'ম্যাল্'—এ শহরের তেমনি এই বাজার। মন্দিরে যাবার রাস্তাও এই বাজারের মধ্যে দিয়ে আর প্যাঁড়া তৈরীর দোকানগুলিও এই রাস্তার ওপরই। কারুর হয়ত বাড়ীর ঠিকানা বা হদিস্ আপনার জানা নেই, কিন্তু আপনি শুনেছেন তিনি এখানে এসেছেন বেড়াতে। দেখা করতে বা ধরতে চান তাঁকে ? বেশ, কেবল সকাল সন্ধ্যায় এই বাজারে টহল দিন—দেখা একদিন হবেই। হয় তিনি ধর্ম্মের টানে মন্দিরে যাবেন, না হয় প্যাঁড়ার লোভে চাক্‌তে আসবেন, কিংবা চুড়ি বা শাড়ীর আকর্ষণে সপরিবারে (বাধ্য হয়েই অবশ্য) এদিকে ঘুরতে আসবেনই। এ সমস্ত বিষয়েই যদি তিনি 'ইমিউন্' হন তাহলেও শরীর সারাতে এসে থাকেন যদি তাহলে জল-হাওয়ার পরিবর্ত্তনে অসুখ-বিসুখ করবেই, তখন ওষুধ ও ডাক্তারের প্রয়োজনে এই বাজারেও একবার আসতে হবেই। তাছাড়া সন্ধ্যার পর অন্যান্য পথের আলো ঘুরে বেড়ানর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয় বলে এই আলো-ঝলমল বাজারের রাস্তায়ই লোকে পছন্দ করে বেশী—ঘুরে বেড়ানও চলে 'উইণ্ডো-সপিং' ও হয়, অনেকটা কল্‌কাতার নিউ মার্কেটের মতন।

আমি নতুন লোক নয়। প্রতি বছরই প্রায় আসি বাড়িসুদ্ধ সবাই। নতুন এখানকার কিছুই নয় আমার কাছে। তবু ঘুরে বেড়াতে হয়, নইলে হজম হবে না,

আর ভালও লাগে না একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে বই মুখে দিয়ে। তাস, দাবাতেও তেমন রুচি নেই। তাই ঘুরে বেড়াই পায়ে হেঁটে আর সাইকেলে। হাঁা, এই সাইকেলই হচ্ছে এখানে আমার প্রধান আকর্ষণ ঘুরে বেড়াবার। কল্‌কাতায় সাইকেল চড়া হয় না কিন্তু এখানে এলেই এই সাইকেলে চড়ে টোটো করে ঘুরতে আমার কি যে আনন্দ লাগে! উঁচু-নীচু পথ সর্পিল গতিতে ছুটে চলেছে—কোথাও দুধারে ফাঁকা মাঠ, কোথাও দুপাশে ভাঙ্গা পাথরের সারি, আবার কোথাও জলার পাড় ঘেঁষে রাস্তা চলে গেছে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। দূরে, বহু দূরে কোন দিকে দেখা যায় নীলাভ পাহাড় সুনীল আকাশের গায়ে যেন হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে, সামনে কোথাও অফুরন্ত প্রান্তর সীমাহীন আকাশের কোলে মিশে গেছে, আবার কোনও দিকে দেখা যায় দূর দিকচক্রবালে বনরাজিনীলার শ্যামল ছবি আকাশের পটে যেন আঁকা হয়ে আছে। এই শোভা দেখতে, এই বন্ধন হারা বন্ধুর পথে চলতে মনে জেগে ওঠে যে আনন্দের শিহরণ তা ভাষায় প্রকাশ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। এই বেড়ানর 'থ্রিল্' আরও উপভোগ করা যায় যদি খুব সকালে সাইকেল নিয়ে বেরুন যায়, আর ঐ সময়টাতেই আমি সাধারণত বেরিয়ে থাকি। ভোরের আলো যখন ফুটি ফুটি করে, তারারা তাদের বাসর জাগার শেষে যখন আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিশ্রামের তরে, সূর্য্যদেব তখনও আসরে আসেন নি, পাখীরা সবে কলরব সুরু করেছে—ঠিক এই সময়, রাত-শেষের ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝ দিয়ে আঁট্‌-সাট্‌ জামা-টামা পড়ে হু হু শব্দে সাইকেল ছুটিয়ে ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলার 'থ্রিল্' সত্যই উপভোগ্য—অন্তত আমার কাছে।

হাঁা, অল্প সল্প দুর্ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটেছে বইকি। ঠাণ্ডা-টাণ্ডাও লেগেছে। একবার তো এই রকম আধ-অন্ধকারে মহানন্দে ভাঙ্গা গলায় গান গাইতে গাইতে একটি বাড়ীর সামনে এক গর্ত্তের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের চাকা ঘুরে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে সাইকেল শুদ্ধ একেবারে চিৎপটাং! সেই অবস্থায় কানে এল মেয়েলী গলায় হি-হি-হি-হি হাসির উচ্ছ্বাস—আর এক পুরুষ কণ্ঠের ধমক—"আঃ, চুপ কর। লেগেছে হয়তো"—বলে বাড়ীর সামনের রোয়াকে বসে থাকা, যাঁদের আমি অন্ধকারে দেখতেই পাই নি, ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীনীকে চুপ করিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। লজ্জিত, অপ্রস্তুত আমি তখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, কিন্তু যে শক্ খেয়েছি তাতে বেশ লড়বড়ে করে দিয়েছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার টালখেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক ধরে ফেললেন—'বললেন তাড়াতাড়ি করবেন না, একটু চুপ করে বসুন, আমি জল আনাছি।' বলে তিনি এবার ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন—'জল আর আইডিন্ নিয়ে এস তো মালা। ভদ্রমহিলা (তাঁর স্ত্রীই হবেন বোধ করি) এবার দ্রুতপায়ে এবং মুখে আঁচল চাপা দিয়ে (হাসি চাপবার জন্যই বোধ হয়) বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি ততক্ষণে সামলে উঠেছি এবং হাতে, পায়ে ও পৃষ্ঠদেশে জ্বালা বোধ করলেও আর ওখানে থাকতে সাহস হল না। এক্ষুনি হয়ত মালা দেবী আইডিন্ ও জল নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন, হয়ত মুখে হাত চাপা দিয়েই আসবেন বা আঁচল দিয়েই কিংবা আঁচলের বদলে রুমাল বেঁধেও আসতে পারেন! আর তাঁর সে চাপা হাসি তাঁর চোখ দিয়ে ফুটে বেরুবে। 'আহা উহু'ও হয়ত হাসির দমককে সামলে উচ্চারণ করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে এই হাত পায়ের জলুনির চেয়ে তা আরও অসহ্য হবে বুঝতে পেরে আমি উঠে পড়লুম। জড়িয়ে-মড়িয়ে ভদ্র-লোককে বললাম—"আমার ভীষণ জরুরী কাজ আছে (অত ভোরে বিদেশে যে কি কাজ থাকতে পারে তা ভাবলাম না, ভদ্রলোকও কিছু বলতে পারলেন না), এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে, অনেক ধন্যবাদ, আমার কিচ্ছু হয় নি, ওরকম পড়েই থাকি (আবার সামলে নিয়ে বলতে হল) মানে রোজই পড়ি না অর্থাৎ এক্সপার্ট সাইক্লিষ্ট আমি কিন্তু এর চেয়েও বেশী পড়েছি, এ আর এমন কি, আমার কিচ্ছু হয়'নি, আপনার ব্যস্ত হবার কোনও দরকার সেই।" ইত্যাদি, ইত্যাদি হড়বড় করে খানিকটা বলতে বলতে সাইকেলের বেঁকে যাওয়া হ্যাণ্ডেলটা ঠিক করে নিয়ে চড়তে গিয়েই দেখলাম মালা দেবী আসছেন। তাড়াতাড়ি চড়তে গিয়ে আবার পড়ছিলাম, কোনও রকমে সামলে নিয়ে

একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়ে দিলাম। তাঁদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে গিয়ে তবে দম ফেলি। এবার জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখি বাঁ হাঁটুর কাছে কাপড়ের খানিকটা নেই ঘষ্‌টে উঠে গেছে, সেই সঙ্গে হাঁটুর খানিকটা ছালও—জ্বালাও করছে বেজায়। জামাটাও ধূলায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। এক্ষুনি বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু ভুল করে বসেছি। যেদিকে বেড়াতে যাচ্ছিলাম সেই দিকেই চলে এসেছি, বাড়ীর দিকে না গিয়ে। এখন ফিরতে হলে আবার ঐ রাস্তায় ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীর সামনে দিয়েই যেতে হবে। না, তা অসম্ভব। মনে পড়ল আবার সেই হাসির আওয়াজ। এতক্ষণ নিশ্চয় ভদ্রমহিলা গলা ছেড়ে হাসছেন আর স্বামীকে বর্ণনা দ্বারা বোঝাচ্ছেন আমার পতনের 'পোজ'টা। ঠিক এই সময় যদি আবার আমাকে তাঁদের সামনে দিয়ে যেতে দেখেন তাহলে তাঁদের মুখভাবটা, আর আমার মনোভাবটা কেমন হবে কল্পনা করে যাবার ইচ্ছা হলো না। কিন্তু করব কি এখন? জ্বলুনী না হয় সহ্য করলাম কিন্তু আইডিন্ বা ডেটল্ কিছু একটা লাগানো দরকার। অথচ ফিরতে পারছি না! খানিক্ষণ পরে তাঁরা নিশ্চয়ই বাড়ীর ভিতর চলে যাবেন

কিরে বাবু, কি দেখছিস?

তখন আস্তে আস্তে ওঁদের বাড়ীটা পেরিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু কতক্ষণ পরে তাঁরা ভেতরে যাবেন? ক্ষিদে তাঁদের নিশ্চয়ই পাবে তখন ভেতরে যাবেনই। কিন্তু কখন তাঁদের ক্ষিদে পাবে? কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব? খানিক্ষণ থাকলাম। তারপর আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে ওঁদের বাড়ীর কাছে এলাম। সাইকেল থেকে নেমে বাড়ীর পাঁচিলের ধারের একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ভদ্রমহিলা হাত পা নেড়ে কি বলছেন আর হাসছেন। ভদ্রলোকও সে হাসিতে যোগ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। রাগ, দুঃখ, লজ্জা মিশ্রিত আবেগের সঙ্গে আমারও হাসি পেতে লাগল। কি করব তা ঠিক করতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় পিছন থেকে—'কিরে বাবু, কি দেখ্‌ছিস?'—দেহাতি বুলি শুনে চমকে ফিরে দেখি এক সাঁওতাল মালি দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে। বোধ হয় ঐ বাড়ীরই মালি। কি বলব ঠিক করতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে খানিক্ষণ। তার পর হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। নীচু হয়ে মাটিতে যেন কিছু খুজতে লাগলাম। আর তাকে বললাম আমার একটা জিনিষ পড়ে গেছে তাই খুজছি। সে ব্যাটাও লেগে গেল খুজতে, আর বেশ জোরে জোরেই, তাদের স্বাভাবিক উচ্চরবে আমার কি হারিয়েছে, ঠিক কোনখানে হারিয়েছে ইত্যাদি খোঁজ করতে লাগল। ফল হল এই তার গলার আওয়াজে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এই দিকে এবং আমাকেও তাঁরা দেখতে পেলেন। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ও স্মিতহাস্যে জিগ্যেস করলেন—'কি ব্যাপার? কিছু পড়ে গেছে নাকি?' কি যে বলব তখন আমার মাথায় আসছে না। তবু গাঁইগুঁই

করে বললাম—'ইয়ে, মানে সাইকেলের একটা ইয়ে, মানে পকেট থেকে একটা ব্যাগ—এমন কিছু নয়, মানে বোধ হয় এখানে পড়ে গেছে।' বিস্মিত ভদ্রলোক বললেন—'মনিব্যাগ হারিয়েছে, না সাইকেলের কোনও পার্টস খোয়া গেছে ?' উত্তরে আর কথা না বাড়িয়ে, শুধু—'ও কিছু নয়, সামান্যই, ইয়ে—' এই রকমের একটা কি উত্তর দিয়েই চট্ করে সাইকেলে উঠে একেবারে বাড়ী মুখো দৌড়। কেবল ভদ্রমহিলার কাছ দিয়ে যাবার সময় কানে গেল—

এই হট, হট

'ইস্, হাঁটুর কাছটা কতটা কেটেছে।'—এই কথাটা। কিন্তু এবার আর হাসির শব্দ ছিল না।

বাড়ী ফেরার পথে মনে পড়তে লাগল আর এক হাসির কথা। সেও ঘটেছিল এই রকম এক সাইকেল থেকে পতনের ব্যাপারে বছর কয়েক আগে। তবে এটা যেমন শহরের ভেতরে ঘটল সেটা ঘটেছিল শহর থেকে দূরে ধান ক্ষেতের মধ্যে। তখন সাইকেল চালনায় পাকা হইনি মোটেই, কিন্তু রাস্তা ছেড়ে বেরাস্তায় সাইকেল চালাতে দ্বিধা করতাম না, আর সেজন্য আছাড়ও খেয়েছি প্রচুর। একদিন এই রকম এক সকালে, তবে এত ভোরে নয়, এক ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় ক্ষেতের সরু আলের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিলাম। এমন সময় সামনে দেখি কয়েকটি দেহাতি সাঁওতাল মেয়ে মাথায়, কাঁকে ঝুড়ি, কলসী নিয়ে আসছে। সাইকেল দেখে তারা পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। কিন্তু একটি আবলুসবরণ কিশোরী তার কাল ডাগর চোখ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে দেখতে লাগল পথ থেকে না সরেই। আমি তার কাছাকাছি এসে 'এই হট, হট' করতে করতে আর টাল সামলাতে পারলাম না। তার মাথার ঝুড়িটায় ঠেকা দিয়ে টাল সামলাতে গেলাম কিন্তু হিতে বিপরীত হল। সে ভয় পেয়ে যেই সরে দাঁড়াল আর অমনি আমি হুড়মুড় করে পড়লাম তার ঘাড়ের ওপর। তারপরের

অবস্থা যা হল তা মনে পড়লে আমার এখনও হাসি পায়। সাঁওতাল মেয়েটি, আমি, সাইকেল, তরকারীর ঝুড়ি সব ক্ষেতের মধ্যে গড়াগড়ি! সম্বিৎ ফিরতে দেখি মেয়েটি শুদ্ধ আমি মাটিতে পড়ে আছি আর সাইকেল চেপে রয়েছে আমাদের ঘাড়ে। ঝুড়ি পড়ে রয়েছে দূরে কিন্তু তরি-তরকারী সব চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে—আমাদের গায়ে মাথায় লাউ, কুমড়ো গড়াগড়ি খাচ্ছে। অবস্থা বুঝে হত-ভম্ব হয়ে গেলাম। ভয় হল এরা বোধ হয় খুবই রাগারাগি করবে। মারধোর হয়ত দেবে না মেয়েমানুষ যখন, কিন্তু গালাগালি দিতে ছাড়বে না। তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করছি সাইকেল ঠেলে এমন সময় মেয়েগুলি চারিদিক থেকে দৌড়ে এল, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নয়, দন্তপাটি বিকশিত করে হাসির দমক সামলাতে সামলাতে। এসেই আমায় হাত ধরে টেনে তুলল। পড়ে যাওয়া মেয়েটিকেও তুলল। সেও হেসে কুটিকুটি। আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না—তখনও হতভম্ব হয়ে আছি। একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করে—'তোর খুব লাগ্‌ছে নাকি রে বাবু?' আমি এবার সামলে নিয়ে একটু হেসে বলি—'না, আমার কিছু হয়নি। ও মেয়েটির লেগেছে কিনা দেখ।' সে মেয়েটি তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে আর খালি হাসছে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। তার পড়ে যাওয়া শাকসব্জীর ঝুড়ি আবার ভর্তি হয়ে গেল—সব কুড়িয়ে দিল তারা। তার-পর আবার দল বেঁধে চলল শহরের বাজারের দিকে। আমিও আর না দাঁড়িয়ে থেকে সাইকেলে উঠে পড়লাম। পিছন থেকে তখনও তাদের অবাধ প্রাণ খোলা হাসির শব্দ আসছে। ফিরে তাকালাম একবার। দেখলাম যে মেয়েটিকে ফেলে দিয়েছিলাম, সে যেতে যেতে ফিরে ফিরে খালি দেখছে আর হাসছে মুচকে মুচকে। তার ডাগর ডাগর কাল চোখ থেকেও যেন অনাবিল হাসি উপচে পড়ছে। আজকের হাসিতে যেমন হয়েছি অপ্রস্তুত, সে-দিনকার সে হাসিতে পেয়েছিলাম প্রাণখোলা আনন্দের স্বর। আর সে হাসির ছোঁয়ায় মনের আনন্দে সাইকেল চালাতে চালাতে গান ধরেছিলাম সেদিন—'কাল, ও সে যতই কাল হোক, দেখেছি তার কাল হরিণ চোখ।'

শহরের একপ্রান্তে বসতি যেখানে শেষ হয়ে আরম্ভ হয়েছে ধান জমি, তারই শেষে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি পাহাড়। লোকে বলে পাহাড়, আসলে খুব বড় পাথরের টিবি। ওপরে বেশ বেড়াবার জায়গাও আছে। এই পাহা-ড়ের নীচে অবধি প্রায়ই আসি কিন্তু ওপরে খুব কমই উঠি। সাইকেল ঠেলে তোলা কষ্টকর, আর নীচে রেখে গেলে চুরি হবার সম্ভাবনা। জায়গাটা বেশ নির্জ্জন। বিকালের দিকে কিছু কিছু লোকজন বেড়াতে আসে। সকালের দিকটা প্রায় ফাঁকাই থাকে। একদিন কি খেয়াল হল সকাল বেলাতেই এসে হাজির হলাম পাহাড়টার তলায়। সাই-কেলটা রেখে একটু বিশ্রাম করছি চোখ পড়ল পাশেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার দিকে। জানতাম ওটা খ্রীশ্চানদের একটা গোরস্থান, কিন্তু ঢুকিনি কখনও। দরজাটা দেখলাম ভেঙ্গে পড়ে গেছে, পাঁচিলও দু'এক স্থানে ভাঙ্গা। কি খেয়াল হল আস্তে আস্তে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ইতস্ততঃ অনেকগুলি কবর রয়েছে। বেশীর ভাগই ভাঙ্গা-চোরা। কয়েকটা তো ভেঙ্গে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। কয়েকটি ঢেকে গেছে ঘাসের আস্তরণে। গাছের চারাও বেরিয়েছে কতকগুলির ওপর। একটির ওপর গজিয়ে রয়েছে মাঝারি সাইজের একটি গাছও। কয়েকটি মানুষের এই অবহেলিত শেষ বিশ্রাম স্থলের দিকে চেয়ে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। হঠাৎ চোখ পড়ল গাছের তলার একটি পরিচ্ছন্ন সমাধির ওপর। কাছে না গিয়ে থাকতে পারলাম না। সমাধিটির ওপর একটি ফলকে কি লেখা রয়েছে। পড়লাম লেখা আছে "মেরি ব্রাউন্"। শোকসন্তপ্ত পিতা-মাতা রবার্ট ও মার্থা ব্রাউন্ তাঁদের স্নেহের কন্যার স্মৃতিতে উৎসর্গ করেছেন এই শ্বেতপ্রস্তর ফলক। তারিখ দেখে বুঝলাম সমাধিটি বেশী দিনের পুরান নয়। কিন্তু তারপরই চমকে উঠলাম মেরি ব্রাউনের জন্ম তারিখ, মাস ও সাল দেখে। কি আশ্চর্য্য! এ যে আমার জন্ম তারিখ, মাস ও সাল! একেবারে এক! মেরি ব্রাউন্ তাহলে আমারই বয়সী ছিল! আশ্চর্য্য লাগল। ভাবলাম বেঁচে থাকলে এই কিশোরী মেরি আজ আমার বয়সীই হত। কল্পনা করলাম তরুণী মেরিকে, হয়ত সে রূপসীই ছিল। কত আশা ছিল তার মনে। দেখত কত রঙ্গীন স্বপ্ন ভবিষ্যতের—যেমন আমি দেখে থাকি। হঠাৎ নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে ছিনিয়ে না নিলে তরুণী মেরি এই শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াত হয়ত আমারই

মতন, হয়ত সাইকেলও চালাত, হয়ত আমার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ও হয়ে যেত—একেবারে সমবয়সী সাইকেল-ভক্ত বলে। হয়ত হয়ত,…হঠাৎ মাথার ওপর পড়ল কয়েকটি ফুল। ওপর দিকে চেয়ে দেখি গাছ থেকে নাম না জানা কি ফুল ঝরে পড়ছে সমাধিটির ওপর। আমার গায়ে মাথাতেও পড়ছে। ছিঁড়ে গেল কল্পনার জাল। আস্তে আস্তে ফিরে চললাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন আরও একটু থাকি—কে যেন আমায় থাকতেই বলছে। মনের এ দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দিলাম না। সাইকেলে ওঠবার আগে পিছন দিকে একবার চেয়ে থালি দেখলাম। কিন্তু…না, বোধ হয় চোখের ভুল। কিন্তু মনে হল গাছ থেকে ঝরেপড়া ফুলগুলো সমাধিটির ওপর থেকে যেন আমার দিকেই উড়ে আসছে! হাওয়াতেই ওরকম হচ্ছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। ফিরে চললাম বাড়ীর দিকে। কিন্তু মন থেকে তাড়াতে পারলাম না মেরি ব্রউনের চিন্তা। খালি মনে হতে লাগল সে জীবিত থাকলে তার সঙ্গে যেন আমার ভাব হতই। কল্পনায় মেরির ছবিও মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল। উদ্ভিন্ন যৌবনা, স্বর্ণকুন্তলা, সুগৌরবর্ণা, চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা মেরির মূর্ত্তি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটি ফলকে কি লেখা রয়েছে

* * *

আমি চলেছি একটু জোরেই সাইকেলটা চালিয়ে। হঠাৎ বাঁকটা ফিরেই দেখি সাইকেল আরোহিণী একটি শ্বেতাঙ্গী তরুণী একেবারে আমার সামনে এসে পড়েছে। চেষ্টা করলাম ধাক্কাটা বাঁচাতে কিন্তু সামলাতে পারলাম না। বিপরীতমুখী দু'টি সাইকেলে লেগে গেল ঠোকাঠুকি, আর তারপরই দু'জনে গড়াগড়ি মাটির ওপর। অনেকটা সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে ধাক্কা মারার মতন। ধাক্কার শক্‌টা কাটতেই তাড়াতাড়ি উঠে মেয়েটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। পড়ার অভ্যাস আমার আছে, আর লাগেনিও বেশী; হাতের কয়েক জায়গায় একটু ছড়ে গেছে শুধু। মেয়েটি তখন উঠে বসেছে, তার জামার ধুলা ঝাড়ছে। স্কার্টের তলাটা খানিকটা ছিঁড়েও গেছে। আমি অনুতপ্ত স্বরে বললাম (অবশ্য ইংরাজীতে)—"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি চেষ্টা করেছিলাম ধাক্কাটা এড়াতে, কিন্তু পারি নি। আশা করি আমার অনিচ্ছাকৃত দোষ তুমি ক্ষমা করবে।" মেয়েটি আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তার নীল নয়ন মেলে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"না না। আমারই দোষ। আমারই উচিত ছিল বেল্ বাজান বাঁকের মুখে, কিন্তু আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে বাজাতে পারি নি। দোষ আমারই।" বাধা দিয়ে বলে উঠি আমি—'না, না, দোষ আমারই। আমারও উচিত ছিল বাঁকের কাছে বেল্ বাজান। কিন্তু বেল্‌টা আমার আগে থেকেই খারাপ। বাজালেও বাজত না। তাছাড়া আমার অত জোরে আসাও উচিত হয়নি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সে—"আমিও তো জোরে আসছিলাম। আমারই বেশী দোষ।" "না দোষ আমারই বেশী"—বললাম আমিও তৎক্ষণাৎ। এবার তরুণীটি আমার দিকে চেয়ে হেসে

সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম

ফেলল—রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে তার কুন্দধবল দন্তশ্রেণী ঝক্ ঝক্ করে উঠল, বলল—"বেশ, বেশ, দোষ আমাদের দু'জনেরই। কেমন, হয়েছে তো? এবারে সন্তুষ্ট তো?" বলে বাড়িয়ে দিল তার সুডৌল হাত আমার দিকে তাকে ধরে তোলবার জন্যে। অপরিচিতা তরুণীর হাত ধরার অভ্যাস না থাকায় একটু ইতস্ততঃ করতে হল, অবশ্য তখনই সামলে নিয়ে তার হাত ধরে তাকে তুললাম। লেগেছে কি না জিগ্যেস করতে যাবার আগেই সে টাল খেয়ে আমার গায়ের ওপর পড়ল। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলে আস্তে করে একটা উঁচু জায়গায় বসিয়ে দিলাম। বুঝলাম পায়ে কোথাও লেগেছে। জিগ্যেস করবার আগেই ও ডান পায়ের য়্যাঙ্কল্‌টা হাত দিয়ে চেপে ধরে কাতরোক্তি করে উঠল। আর দ্বিধা করলাম না। ওর হাতটা সরিয়ে পায়ের জুতাটা খুলে দিয়ে য়্যাঙ্কল্‌টা হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করলাম। ছোটবেলার থেকেই খেলার মাঠে ছোটাছুটি করার অভ্যাস আছে। তাই হাড়ে চোট লাগার ব্যাপারটা অজানা নয়, নিজেও জখম হয়েছি কয়েকবার। দেখে বুঝলাম ফ্যাক্‌চার হয় নি তবে কোনও লিগামেণ্টে চোট্ লেগেছে খুবই, ছিঁড়েও যেতে পারে। য়্যাঙ্কল্‌টা ফুলেও উঠেছে খুব। মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল—"নিশ্চয়ই ভেঙ্গে গেছে, আর বোধহয় আমি হাটতে পারব না।" আমি হেসে তাকে অভয় দিলাম—"সামান্য চোটে এত ভয় পাচ্ছ! আমাদের ওরকম কত লেগেছে খেলার মাঠে। তোমার কিছুই হয় নি, দিন কয়েক বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে ও—"তুমি বুঝি স্পোর্টস্‌ম্যান্? আমিও স্পোর্টস্ ভালবাসি, খেলাধুলাও করি। কিন্তু এরকম লাগেনি কখনও।" হেসে জিগ্যেস করি—"কি খেলা খেল?" ও বলে—"ব্যাড্‌মিণ্টন, টেবল টেনিস, ভলি, ব্যাস্কেট্, এই সব আর কি।" একটু গর্ব্বিতভাবে বলি—"ও সব খেলা আমিও খেলেছি। ওতে সাংঘাতিক চোট লাগবার সম্ভাবনা কম। পুরুষদের খেলা, যেমন ধর

ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতিতে হাড় ভাঙ্গবার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে ঐ সব মেয়েলী খেলায় তেমন নেই।"

আস্তে করে বসিয়ে দিলাম

এইবার দুষ্টুমীভরা ডাগর চোখ দুটো তুলে ও বলল—"কিন্তু সাইকেলিং করাটা পুরুষালী, না মেয়েলী?" চট্ করে উত্তর দিতে পারলাম না। তারপর উল্টে পড়ে থাকা সাইকেল দুটার দিকে চেয়ে বলে উঠি—"যে সাইকেল দু'টা পড়ে আছে ওর একটা পুরুষদের আর একটা মেয়েদের। সুতরাং সাইকেলিংটা উভয়েলী!" জোরে হেসে ওঠে মেয়েটি। একটু চুপ করে থেকে বলে—"কিন্তু এখন বাড়ী যাব কি করে? এ পা নিয়ে তো সাইকেল চালাতে পারব না।" তাই তো, ভাবনার কথা। জায়গাটা লোকালয়ের একটু বাইরে। এখানে তো চট্ করে খালি গাড়ী পাওয়া যাবে না। তাই একটু ভেবে বললাম—"তার জন্যে কি, আমি এক্ষুনি সাইকেলে করে গিয়ে বাজারের কাছ থেকে একটা টাঙ্গা বা সাইকেল্-রিক্সা ডেকে নিয়ে আসছি। তুমি একটুখানি বসে থাক।" আমার কথা শুনে মেয়েটি যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না। একটুখানি চুপ করে থেকে বলল—"একলা অতক্ষণ বসে থাকতে পারব না। তার চেয়ে…।" আবার একটু চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলেই ফেলে—"তোমার সাইকেলে কি কেরিয়ার আছে? আমাকে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? আমি অবশ্য খুব ভারী নই, আর আমার বাড়ীও বেশী দূরে নয় এখান থেকে।" কথাটা শুনেই কি জানি কেমন একটা যেন শিহরণ বোধ করলাম। হাঁ, না, কিছুই বলতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। তরুণী তখন বলে উঠলো—"কি বইতে পারবে না? না ইয়ং গার্লকে বইতে ইয়ং ম্যানের সাহস হচ্ছে না?" বলেই মুচকে হেসে ওঠে। না আর দ্বিধা করা যায় না। শিভ্যাল্‌রি জেগে উঠলো। জোর করে বলে উঠলাম—"না না ওসব কিছু নয়, আর সাহসের অভাবও আমার নেই অন্তত তোমাকে বইতে। তবে আমি ভাবছিলাম কেরিয়ারটার কথা, ওটা ঠিক আছে কি না।" এই বলেই আমি বীরদর্পে ভূপাতিত সাইকেলটার কাছে এগিয়ে গেলাম, আর ওটাকে তুলে দেখলাম হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নি, কেরিয়ারটাও ঠিক আছে। ওর সাইকেলটাকেও টেনে তুললাম। দেখলাম ওটারও বিশেষ কিছুই হয় নি, তবে সামনের চাকাটা বোধ হয় একটু টাল্ খেয়ে গেছে। যাই হোক, সাইকেল দু'টি নিয়ে মেয়েটীর কাছে এসে বললাম—"তোমার সাইকেলটাকে কি করব? এটাকেতো এমনি নিয়ে যাওয়া যাবে না।" ও একটু ভেবে বলে—"এক কাজ কর। ঐ যে বাগান বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওর মালির কাছে আমার সাইকেলটা একটু কষ্ট করে রেখে এস। এদিকে আমাকে সবাই চেনে। পরে সাইকেলটা নিয়ে যাওয়া যাবে।"—বলে মেয়েটি আমার দিকে কৃতজ্ঞ ভাবে চাইল। কি আর করি ওর সাইকেলটাকে টানতে টানতে সেই বাগান বাড়িটার কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর সাঁওতাল মালিকে ডেকে সাইকেলটা আর জিম্মা করে দিয়ে মেয়েটির কাছে ফিরে এলাম। তখন ও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'ধর আমাকে।' ধরতে হল। তখন ও বলে—"আমাদের কিন্তু পরিচয় হয়নি এখনো। আমার নাম মেরিয়ান্ ব্রাউন্

তাকে সবাই মেরি বলে।" আমিও বলি আমার নাম। তারপর মেরি বলে—'এখন ব্যথাটা একটু কম মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি। মা হয়ত ভাবছেন আমার দেরী দেখে। আমি বলে উঠি—"না ভেবে আর উপায় কি? ভাবতেই হবে মেয়ের জন্যে।"—"তার মানে"—জিগ্যেস করে মেরি চকিত হয়ে। "মানে, এই আর কি, একলা একলা সাইকেলে করে ঘোরা, কোন বিপদ আপদ হতে পারে তো, যেমন আজকে হ'ল।"—বোঝাই তাকে। গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয় মেরি—"তা একলা ঘুরব না তো দোকলা পাব কোথায়? সবাই তো আর আমাকে কেরিয়ারে করে বইতে চাইবে না। আর আমার সঙ্গে টোটো করে সাইকেলে করে ঘুরতেও কেউ রাজী হবে না।" কানটা অকারণে বোধ হয় লাল হয়ে ওঠে আমার। আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেলটাকে শক্ত করে ধরে রেখে মেরিকে কেরিয়ারে বসতে সাহায্য করলাম। তারপর সাবধানে সিটে উঠে বসেই সাইকেলটাকে দিলাম একটু গড়িয়ে আর প্যাডেল্টাও চালিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। তন্বী মেরি সত্যই হাল্কা। তাকে বইতে কোনও অসুবিধাই হল না আমার। সিটের পিছনটা ধরে সে বসেছিল, কিন্তু উচু নীচু রাস্তায় একটা পাথরের ওপর চাকা পড়তেই সাইকেল লাফিয়ে উঠল, আর পতনভীতা মেরিও জড়িয়ে ধরল আমাকে তার কোমল বাহুডোরে। কি রকম কেঁপে উঠল আমার শরীর, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি ঠোকার শব্দ পাওয়া গেল, আর মুখ চোখের অবস্থা? ভাগ্যে সামনে আয়না জাতীয় কিছু ছিল না, তা নইলে আবার হয়ত একটা য়্যাক্সিডেণ্ট ঘটে যেত! সাইকেল চালানর শ্রম এমন কিছু না হলেও কপাল দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম পড়তে লাগল। মেরি অবশ্য পরমুহূর্ত্তেই তার বাহুবন্ধন শিথিল করে দিয়েছে। এখন শুধু আমায় পিঠটা ছুয়ে আছে তার হাত দুটো। আমি কিন্তু সহজ হতে পারছি না। কি সব এলোমেলো ভেবে চলেছি। মেরিও চুপ্‌চাপ্। ওর অবস্থাও কি আমার মতন না কি? ওও কি আমার মতন যা তা ভেবে মরছে? মুখ ফিরিয়ে যে ওর দিকে দেখব সে উপায় নেই। মুখ পিছন দিকে ফেরালেই ব্যালেন্স হারিয়ে পপাত ধরণীতলে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবু বোধ হয় একটু ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম। মেরি তা বুঝেই বলে উঠল—"পেছনে দেখবার কিছু নেই। দয়া করে সামনের দিকে চেয়ে চালাও। এবার পড়লে আর আমি বাঁচব না।"—"এই বাবু, ঠিক সে চালাও।" টাঙ্গাওয়ালার কড়া গলার ধমক শুনে চমক্ ভাঙ্গল। একি, এ যে, বাজারের রাস্তায় এসে গেছি! কোথায় মেরি? মেরির স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল চট্ করে। সামলে নিলাম নিজেকে। কার না কার একটা সমাধি দেখে এরকম কল্পনা-বিলাস অস্বাস্থ্যকর। "ধ্যেত্তর নিকুচি করেছে মেরি ব্রাউনের"—বলে মনকে একটা ঝাঁকি দিয়ে সহজ করে নিলাম। তারপর জোরে ছুটিয়ে দিলাম সাইকেলকে বাড়ীর দিকে। কিন্তু, আশ্চর্য্য! পিঠের ওপুর যেন লেগে রয়েছে দু'টি পেলব হাতের স্পর্শ! তার অনুভূতি, তার আনন্দ, তার বেদনা যেন মনকে পেয়ে বসেছে!

বাড়ী ফিরেই সোজা স্নান করতে চলে গেলাম—বোধ হয় গায়ে জল ঢেলে মন থেকে এই ভাবনাকে ধুয়ে ফেলতে। কিন্তু তাকি আর হয়। খাওয়া দাওয়া সেরে যেই একটু বিশ্রামের জন্যে শুলাম অমনি সেই ভাবনা আরম্ভ হয়ে গেলো।—কে যেন মাথার মধ্যে বসে ভাবনার জাল বুনতে লেগে গেলো। মেরির সেই অদেখা অথচ কতকালের যেন চেনা সেই মুখ আস্তে আস্তে ভেসে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। কল্পনা যেখানে কেটে গেছিল ঠিক সেইখানেই যেন কে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতিতে, এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন যেন ভরে উঠল, ভেসে উঠল চোখের সামনে সিনেমার ছবির মতন,—সাইকেলের কেরিয়ারে মেরি বসে আছে এক মনোরম ভঙ্গিমায়, হাত দুটি তার ছুঁয়ে আছে আমার পিঠ। তার অনিন্দ্যসুন্দর সুগৌর মুখে, তার নীলোৎপলসম চক্ষে, তার সুঠাম শুভ্র দেহবল্লরী ঘিরে কি যেন এক আনন্দলহরী ঢেউ খেলছে, আর তারই ছোঁয়া লেগে আমার দেহের অণুতে অণুতে জেগে উঠছে এক অনাস্বাদিত পুলক-শিহরণ। সেই অনুভূতির আস্বাদ নিতে নিতে আমি চলেছি মেরির বাড়ীর পথে তারই নির্দ্দেশে। মেরি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে আমার কথা। আমার বাড়ীতে কে কে আছেন। আমি কি করি। পড়াশুনা শেষ করে কি করব, ইত্যাদি। নিজের কথাও বলে চলে। বাড়ীতে আছেন তার মা ও

বাবা। আর এক ছোট বোন আছে, নাম তার লিলিয়ান্, তাকে সবাই লিলি বলে। সে কিন্তু থাকে না এখানে। কোন এক হিল্-ষ্টেশনের কন্‌ভেন্ট্-স্কুলে সে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য আসে ছুটি ছাটায়।

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম তাদের বাড়ীর কাছে। একটি ফাঁকা জায়গায় প্রশস্ত চত্বরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মেরিদের বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। গেট থেকে একটি পরিচ্ছন্ন পথ চলে গেছে বাড়ী অবধি দুপাশে তার পাম্ গাছের সারি। গেটের পাশে প্রস্তর ফলকে লেখা "ডাঃ রবার্ট ব্রাউন্, এম-বি"। মেরিকে বললাম—'তোমার বাবা ডাক্তার আর তোমার পা ভেঙ্গেছে মনে করে এত ভয় পাচ্ছিলে ?" মেরি ফিক্ করে হেসে জবাব দেয়—'বারে, বাবা ডাক্তার বলে বুঝি কারও পা ভাঙতে পারে না, বা সাংঘাতিক কিছু হতে পারে না।"—"তা হয়ত পারে, তবে বাড়ীতে ডাক্তার থাকলে সুবিধা অনেক।"—বলে উঠি আমি। মেরি জবাব দেয়—"হ্যাঁ, অন্তত ভিজিট্‌টা দিতে হয় না।"—বলেই হেসে ওঠে খিল্‌খিল্ করে। আমি বলি—"তোমার এত হাসি দেখে মনে হচ্ছে পায়ের ব্যথা কমে গেছে। তাই নয় কি ?" মেরি বলে—'কমেছে বটে তবে ফোলাটা এখনও রয়েছে। কতদিন ভোগাবে কে জানে।" বাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেছি ইতিমধ্যে। মেরিকে বলি—"আমি সাইকেলটাকে দাঁড় করাচ্ছি, তুমি সাবধানে নেমে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।"—"কি ব্যাপার মেরি ? এত দেরী কেন ? তোমার সাইকেল কোথায় ?" কথাগুলি শুনেই ফিরে দেখি, মেরির মাই বোধ হয়, বেরিয়ে আসছেন। মেরি বলে ওঠে—"সব বলছি, এখন তুমি ধর আমাকে। আমার পায়ে আঘাত লেগেছে। তেমন কিছু অবশ্য নয়।"—অভয় দেয় মেরি তার মাকে।

সাইকেল থেকে নেমেই মেরি পরিচয় করিয়ে দেয় আমার

বসে আছে এক মনোরম ভঙ্গিমায়

তার মা মিসেস্ মার্থা ব্রাউনের সঙ্গে। আরও বলে যে সেই নাকি আমাকে ধাক্কা মেরেছে, আর আমি খুব ভাল বলেই নাকি তাকে বহন করে এনেছি এতদূর। মিসেস্ ব্রাউন্ করমর্দ্দন করেন আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে ও ধন্যবাদ জানান তাঁর মেয়েকে কষ্ট করে এতদূর বয়ে আনার জন্যে। তারপর মেরিকে দু'জনে ধরে নিয়ে যাই বাড়ীর মধ্যে। সামনের ড্রয়িং রুমেই একটা সোফার ওপর মেরিকে বসিয়ে দেওয়া হল। মিসেস্ ব্রাউন্ এবার মেরির পা'টা একবার পরীক্ষা করে দেখে বললেন—"ভেঙেছে বলেতো মনে হয় না। ওর

বাবা এসে যা হয় ব্যবস্থা করবে। আমি আর কি করব?" তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেন—"জান, আমি তখন কত বারণ করেছিলাম সাইকেল কিনে দিতে, কিন্তু মেয়ের আব্দারে বাপ গলে গেলেন—কিনে দিলেন সাইকেল। তারপর থেকে মেয়ের তো পাখা গজিয়েছে—দিনরাত সাই-কেলে চড়ে ঘুরে বেরাচ্ছে। য়্যাক্সিডেণ্ট্ হবে না তো কি? ভাগিস তুমি ছিলে বাছা, তা নইলে তো এতক্ষণ মাঠের মাঝে পড়ে থাকত, আসত কি করে এই পা নিয়ে! আর তোমার সাইকেলে চড়া হবে না মেরি।"—বলেন এবার মেরিকে। মায়ের কথা শুনে মেরি এতক্ষণ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিল। এবার বলে ফেলল—"বারে, সাইকেলে চড়ার কি দোষ। বাঁকের মুখে ধাক্কা লেগেছে। আমি কি ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরেছি? ও তো ওদিক থেকে আসছিল বেশ জোরেই। আমার কি সব দোষ না কি।"—বলে, অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে বসে মেরি। ওর মা এবার হেসে ফেলেন, বলেন—"তবে যে একটু আগে বললে সব দোষ তোমার, তুমিই ওকে ধাক্কা মেরেছ? তোমার কোন কথাটা সত্যি কি করে বুঝব বল।" অপ্রস্তুত মেরির শুভ্র গালে লালের ছাপ পড়ে। চকিতে আমার দিকে চেয়েই ফিরিয়ে নেয় তার আরক্ত মুখ। বলে ওঠে—"বেশ বেশ, সব দোষ আমার। এখন কিছু খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে। আর ওকে কিছু দেবে না?" চকিত হয়ে ওঠেন মিসেস্ ব্রাউন, "তাই তো", বলেই অগ্রসর হন। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলি,—"কিছু দরকার নেই, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।" মিসেস্ ব্রাউন্ কিন্তু কান দেন না আমার কথায়, ততক্ষণে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন দরজার বাইরে। মেরি বলে—"একটু বস। এতদূর এলে আমাকে বয়ে নিয়ে। তারপর ধাক্কা খেয়েছ, আছাড় খেয়েছ। একটু বিশ্রাম করে তবে যেও। তোমাকে তো আর আমরা সারাক্ষণ ধরে রাখব না।" মেরির কথা শুনে বসতে হল। বললাম—"বেশ, বসছি। আমার আর এমন কি কাজ আছে যে এক্ষুনি যেতে হবে। আমার তো এখানে বসতে ভলই লাগছে।" সত্যই মেরিদের বাড়ীর শান্ত পরিবেশ মনে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। মেরির মাকেও দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। তিনি যে মেরির চেয়েও সুন্দরী ছিলেন তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। এখন এই মধ্য বয়সেও গঠন তাঁর সুন্দর, তার ওপর বয়সের গাম্ভীর্য্যে ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে সে প্রখর সৌন্দর্য্যের ওপর যেন একটা শান্ত প্রলেপ পড়ে সে সৌন্দর্য্যকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে। মেরির বাবাকে তখনও দেখি নি। কিন্তু পরে দেখেছিলাম সেই দীর্ঘদেহ, সৌম্যদর্শন, সদাহাস্যময় চিকিৎসককে—দেখে ভক্তিই হয়ে ছিল মনে।

একটু পরেই মেরির মা দু'টি প্লেটে করে কয়েকটি পেষ্ট্রি ও স্যাণ্ডউইচ্ ও তিন গেলাস ঠাণ্ডা লাইম্-জুস্ সরবৎ নিয়ে এলেন। খাবারের প্লেট্ ও লাইম্ জুসের গেলাস আমাকে ও মেরিকে দিয়ে তিনিও একটি গেলাস নিয়ে টেবিলের ধারে বসে আমাকে খেতে অনুরোধ করলেন্। ক্ষিদেও পেয়েছিল তাই খেয়ে ফেললাম সব কিছুই। মেরির মা খুশী হয়ে আরও খাবার আনতে যাবার জন্যে উঠতেই আমি শশব্যস্তে উঠে পড়ে বলি—'এই যথেষ্ট হয়েছে, আর আমার পক্ষে খাওয়া এখন সম্ভব নয়। এবার আমাকে যেতে হবে। আর আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি কালকে এসে মেরিকে দেখে যাব।' মিসেস ব্রাউন্ কিছু বলবার আগেই মেরি বলে উঠল—"যদি তুমি না আস তবে বুঝব তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার জন্যে তুমি আমার ওপর ভীষণ রাগ করেছ।' একথা বলে মেরি আমার দিকে স্মিতহাস্যে চেয়ে রইল। মেরির মাও বলে উঠলেন—"তুমি নিশ্চয়ই আসবে, আর আসবে শুধু নয় কালকে রাত্রে এখানে ডিনার খেয়েও যেতে হবে—তোমার নেমন্তন্ন রইল।" এর পরে আমার আর বলবার কি আছে? আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি জানিয়ে দু'জনের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বেরিয়ে এলাম। তারপর সাইকেলে আরো-হণ করে চললাম গেটের দিকে। একবার শুধু চাইলাম পিছনের দিকে আর দেখলাম মিসেস ব্রাউন্ দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ীর দরজায়। আমার দিকে এক হাত তুলে বিদায় জানালেন, আমিও এক হাত হ্যাণ্ডেল থেকে তুলে নাড়লাম। তারপরই চোখ পড়ল ড্রইং রুমের জানলায়। দেখলাম মেরি এসে দাঁড়িয়েছে জানলার ধারে, আর চেয়ে আছে আমার দিকে এক অদ্ভুত মোহময় দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির মোহে পড়ে আর একটু হলেই ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, চট্ করে সামলে নিয়ে জোরে ছুটিয়ে দিলাম সাইকেলকে। কিছুদূর যাবার পর খেয়াল হল আমি গলা

ছেড়ে গান গাইছি, আর গানের ভাষা হচ্ছে—'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—!'

পরদিন সকালে আর বেরুলাম না। সন্ধ্যায় ওদের বাড়ী যাব, মেরির সঙ্গে গল্প করব, আরও কত কি ভাবনায় কেটে গেল দিনটা। বিকাল থেকে আবার ভাবনা ঢুকল মাথায় কি পরে যাব—টাই, কোট এঁটে যাব, না সাধারণ ভাবে প্যাণ্ট, সার্ট পরেই যাব। প্রায় 'ব্রীচেস' জাতীয় 'ন্যারো' কাটের ('হোস' বা 'ড্রেন্ পাইপ'ও নাকি বলে) অত্যাধুনিক প্যাণ্টের চলন তখনও বিদেশ থেকে আসে নি, না হলে তাই পরে যেতাম। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত প্যাণ্ট, সার্ট পরে (সার্টটা অবশ্য নাইলনের, তখনও টেরিলিন্ আসেনি) যাওয়াই স্থির করলাম, আর কোটটা হাতে নিয়ে নিলাম। অর্থাৎ দরকার মনে করলে পরে নেব। মাকে জানালাম রাত্রে আমার নেমন্তন্ন আছে এক বন্ধুর বাড়ীতে। মা জিগ্যেস করেন এখানে আবার কে এমন বন্ধু আছে যে নেমন্তন্ন করল। আমি বলি—'নতুন বন্ধু, হঠাৎ আলাপ হয়েছে, লোকাল লোক তাঁরা, আর খুব ভাল লোক, বিশেষ করে যেতে বলেছেন।' মার সামনে মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই, তাই মিথ্যা কথা একটাও বললাম না। শুধু চেপে গেলাম বন্ধুটি ছেলে না মেয়ে, সেই কথাটা।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পৌছে গেলাম মেরিদের বাড়ী। গেট পেরিয়ে বাড়ীর দরজার কাছাকাছি পৌছেই দেখি দরজার পাশে আধ-অন্ধকারে একটা 'রকিং' চেয়ারে মেরি বসে আছে। আমাকে দেখেই তার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মেরি স্বাগত জানাল আমাকে। তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখলাম প্লাষ্টারের শ্বেত আবরণে আবদ্ধ তার সুগঠিত পায়ের য়্যাঙ্কল্। জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই মেরি বলল—"ভাঙ্গেনি, তবে বাবা বললেন প্লাষ্টার করা থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। তাই প্লাষ্টারের বন্ধন সহ্য করছি।" সান্ত্বনা দিয়ে বলি—"তাতে কি হয়েছে? একটু কষ্ট করলে যদি তাড়াতাড়ি সেরে যায় সে তো ভালই। আর কষ্টই বা এমন কি? প্লাষ্টার করা অংশটি সুড়সুড় করলে বা চুলকাতে আরম্ভ করলেই একটু অসোয়াস্তি হবে। তা ছাড়া আর কি।" তারপর কাতর ভাবেই আমি বলে ফেলি—'সত্যি মেরি, তোমায় এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না, আর পারবও না কোনদিন।' আমার কথা শুনে মেরি আমার চোখে চোখ রেখে গাঢ়স্বরে বলে—'ওকথা বল না। তুমি একা কেন দায়ী হবে? আমি ত তখনই বলেছিলাম দায়ী আমরা দু'জনেই। আর সত্যি যদি দায়ী কাউকে করতে হয়, তা হলে তা হচ্ছে আমাদের ভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে আছে যে এ রকম ভাবে আলাপ হবে, তাই হল। এর জন্যে তুমি দুঃখ করছ কেন? আমার কিন্তু ভালই লাগছে; বেশ মজা লাগছে!—বলেই হেসে ফেলে। আবার বলে—'তোমার কি রকম লাগছে? বোধ হয় খুবই খারাপ, তাই না?' উত্তরে তাকে চটিয়ে মজা দেখবার জন্যে বলি—'সেটা অবশ্য সত্যই বলেছ। ওরকম ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দিয়ে আলাপ কি আর কোনও ভদ্রলোকের ভাল লাগে! অবশ্য অনেকের ভাল লাগতে যে পারে না তা আমি বলছি না। এরকম উত্তর বোধ হয় ও আশা করেনি। একটু থতমত খেয়ে যায়, চকচকে চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে, গলার স্বরও ওঠে কেঁপে, বলে—'ও, তাই বুঝি, তাহলে তো ভদ্রলোকের আমাদের মতন অভদ্রলোকের বাড়ীতে খেতে আসাও উচিত হয়নি, আর আমার মতন অভদ্র মেয়ের সঙ্গে দেখা করাও উচিত নয়—কথা বলা তো দূরের কথা।' এইবার আমার ঘাবড়াবার পালা। তার অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনে আমি কাঁচুমাচু হয়ে বলে উঠি,—'মেরি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি ওরকম কিছু মনে করে কথাটা বলি নি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্যমনস্ক ভাবে ধরে ফেলি তার করপল্লব। মেরি হেসে ফেলে এবার, বলে—'তুমি যে ওভাবে কথাটা বলনি তা আমি জানি, কিন্তু আমাকে রাগাতে গেছলে কেন? এখন হাতটা ছেড়ে ভেতরে চল, মা আসছেন।' মেরির কথায় সচকিত হয়ে উঠি। তাই তো, তার হাত যে আমার হাতের মুঠোয় আবদ্ধ, আর মিসেস ব্রাউন্ এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে সেই সময়। ভাগ্যিস তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তাই তিনি দেখতে পেলেন না এই ব্যাপারটা। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মেরির হাত ছেড়ে দিয়ে য়্যাটেন্সনের ভঙ্গিতে সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছি। মিসেস্ ব্রাউন্ হেসে জিগ্যেস করেন—'কতক্ষণ এসেছ? নিশ্চয় বেশীক্ষণ নয়। এবার চল ভেতরে গিয়ে বসবে,

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। মিষ্টার ব্রাউনও তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' মিসেস্ ব্রাউন্ মেরিকে ধরে তোলেন। আমিও সাহায্য করতে এগিয়ে আসি। মেরিও মধুর হেসে তার হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে।

আস্তে আস্তে আমরা তিনজনে ভেতরে যাই। সামনের ঘরেই বসেছিলেন মেরির বাবা ডাঃ রবার্ট ব্রাউন্। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে আমার হাত ধরে সজোড়ে নেড়ে দিলেন। হাতের ঝাঁকুনি থেকেই ভদ্রলোকের শারীরিক শক্তির পরিচয় কিছুটা মালুম হল। ডাঃ ব্রাউন্ আমাকে চেয়ারে বসতে অনুরোধ করে বললেন, —"আমার দুষ্টু মেয়ের জন্যে তুমি যা করেছ তার জন্যে আমরা সবাই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। মেরি তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেও তুমি কোনও রকম 'অফেন্স' না নিয়ে উল্টে তাকে বহন করে এতটা রাস্তা ঘুরে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেছ, এ তোমার উচ্চ মনেরই পরিচায়ক।" ফস্ করে বলে ওঠে মেরি—'ধাক্কা খেয়ে কোনও মেয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে তাকে তুলে আনা প্রত্যেক ইয়ং ম্যানেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, আর এ কাজে তারা আনন্দই পেয়ে থাকে, তাই নয় কি?' মেরি কি এখনও রাগ করে আছে আমার ওপর? চট করে কোনও উত্তর এল না মুখে। কিন্তু মিসেস্ ব্রাউনই যেন আমার হয়ে বলে উঠলেন—'সবাই তো আর অবশ্য কর্ত্তব্য সব সময় পালন করে না, আর মেয়েদের বহন করতে সবাই সব সময় আনন্দও পায় না। তবে যে কর্ত্তব্য পালন করে সে নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ তাতে সন্দেহ নেই। কি বল রবার্ট? আমাদের কথাগুলো এতক্ষণ ডাঃ ব্রাউন্ উপভোগ করছিলেন। এবার সহাস্যমুখে বলে উঠলেন —'তুমি, ঠিকই বলেছ মার্থা, অবশ্য কর্ত্তব্য সবাই সব সময় পালন করে না আর,'···বলেই মেরির দিকে চেয়ে বলেন— 'জান মেরি, অনেকদিন আগে—মার্থারও বোধ হয় মনে আছে।—আমি তখন ইয়ং ম্যান্। একবার রাস্তায় তোমার মার জুতার হাই-হিল্ খুলে গিয়ে পা মচ্‌কে যায়। তখন আমি তোমার মাকে অনেকটা পথ বহন করে নিয়ে আসি ঘর্মাক্ত কলেবরে, কিন্তু তাতে আনন্দ পেয়েছিলাম বলে তো স্মরণ হয় না।—বলেই হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন। আরক্ত মুখে মিসেস্ ব্রাউন্ বলেন—"আনন্দ যে পাও নি তাকি আমি জানি না। আমি হাস্যমুখে বসে বসে ওঁদের কথা শুনি—শুনতে ভালই লাগে। আর মেরি হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—চক্‌চক্ করে তার চোখ আলোর আভাতে।

খানসামা এসে জানায় খাবার দেওয়া হয়েছে। মিসেস্ ব্রাউন্ আমাকে বলেন—'খেতে চল। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।' ডাঃ ব্রাউন্ মেরিকে ধরে তোলেন। মেরি তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে খাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। মিসেস্ ব্রাউন ও আমি পিছু পিছু চলি।

খেতে খেতে নানারকম কথাবার্ত্তা চলে। ডাঃ ব্রাউন্ আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু জিগ্যেস করেন। নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেন। এ জায়গাটা তাঁর বেশ ভালই লাগে। শহরের হট্টগোল থেকে তিনি দূরে থাকতেই চান। মেরিরও এ জায়গা খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বোধ হয় ততটা পছন্দ নয় জায়গাটা। মিসেস্ ব্রাউন্ প্রতিবাদ করে জানান পছন্দ না হলে তিনি এখানে আছেন কেন? তবে শহরের স্বাচ্ছন্দতো সব সময়ে পাওয়া যায় না এখানে। তাছাড়া আরও কিছু কিছু অসুবিধা আছে বই কি। তবে তাঁর স্বামীর যখন এ জায়গা পছন্দ, মেয়ের যখন এখানে এত ভাল লাগে, তখন তাঁরও ভাল লাগা উচিত, আর ভাল লাগেও। বিশেষ করে অনেকদিন এখানে থাকার জন্যে এ জায়গার ওপর একটা মায়াও পড়ে গেছে।—নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে ডিনার-পর্ব্ব সমাধা হয়। তারপর ড্রইং রুমে এসে বসি সবাই। মিসেস্ ব্রাউন্ মেরিকে বলেন একটা গান গাইতে। কিন্তু মেরি রাজী হয় না। বলে—'আমার পা ভাঙ্গা, আমি এখন গান গাইতে পারব না। হেসে উঠি আমি, বলে ফেলি—'পায়ের সঙ্গে গলার এরকম সম্বন্ধ তাতো জানতাম না।—বলে ডাঃ ব্রাউনের দিকে চাই। ডাঃ ব্রাউন্ হেসে বল্লেন—'স্বরভঙ্গ হলে যদি হাঁটতে পারা যায়, তাহলে অবশ্যই পা ভাঙ্গলে গাইতেও পারা যায়, তবে যদি মুড্ থাকে।' মেরি বলে ওঠে—'সেই মুড্‌টাই এখন নেই।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে—'আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, না গাইতে পারার জন্যে। আর তুমি যদি আর একদিন আস তাহলে অবশ্যই গাইব।' আমি এবার উঠে পড়ি, আর বলি—'অবশ্যই

আসব, তোমার গান শোনবার জন্যেই শুধু নয়, তুমি কেমন আছ তা জানবার জন্যেও।' এই কথা বলে ডাঃ ও মিসেস্ ব্রাউনের দিকে চাইলাম। তাঁরা উভয়েই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন এবং মিসেস্ ব্রাউন্ বললেন—তুমি এলে আমরা খুবই খুশী হব, আর মেরির তো কথাই নেই, বন্ধুবান্ধব ওর কেউ নেই তো এখানে তাই সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তাও এখন বন্ধ রইল। তুমি এলে ও গল্প করতে পারবে বসে বসে।' আমি তখন তাঁদের শুভরাত্রি জানিয়ে দরজার দিকে ফিরতেই মেরি উঠে পড়ে আমাকে বলে—'চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলে হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। ধরতে হয় তার হাত। তারপর আমার হাতে ভর দিয়ে সে আসে দরজা অবধি। সেখানে দরজার পাল্লা ধরে সে দাঁড়ায়। আমার হাত ছাড়তে তার দেরী হয় একটু। নীচু গলায় বলে—'আসবে তো আমাকে দেখতে, আর আমার গান শুনতে?' বলেই তার উজ্জ্বল চোখ দু'টো তুলে চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। তার সে চোখের দিকে চেয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারি না। শুধু ধরে থাকা তার হাতটাতে একটু চাপ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলি—'নিশ্চয়ই।' তারপর হাত ছেড়ে 'শুভরাত্রি' বলেই সাইকেলের কাছে চলে আসি।

তারপর, হ্যাঁ, তারপর বহুবার গেছি মেরিদের বাড়ী। প্রায় রোজই,—হয় সকালে, নয় বিকালে। মেরির গান শুনেছি অনেকবার। তার সুললিত কণ্ঠের গান, বিদেশী সুরের হলেও, আমার কানে অপূর্ব্ব লেগেছে। তারপর মেরির সঙ্গে, মিসেস্ ব্রাউনের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটিয়ে চলে এসেছি। ডাঃ ব্রাউন্ও মাঝে মাঝে যোগ দিয়েছেন আমাদের কথা-বার্ত্তায়। কখনও কখনও মেরির মা ও বাবা হয়ত দু'জনেই বেরিয়ে গেছেন—মেরির কাছে আমাকে রেখে, আর আমরা গল্প করে গেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সময় যেন স্রোতের মতন কেটে গেছে। তারপর মেরি পায়ে একটু জোর পেতেই আব্দার ধরল আমার সাইকেলের কেরিয়ারে বসে ঘুরে আসবে। চালাব অবশ্য আমিই। মেরির মা হেসে বলেন—'এবারে পড়লে দুটো পাই যাবে।' মেরি বলে আমাকে ফিস্ ফিস্ করে—'যায় যাবে, তুমি তুলে আনতে পারবে না আমাকে?' মেরিকে নিয়ে এখন প্রায় রোজই ঘুরে বেড়াই সাইকেলে করে। কোনদিন যাই নদীর ধারে, কোনদিন পাহাড়ের তলে, আবার কোনদিন বনের মাঝে গিয়ে বনভোজন করি। মেরি বলে চলে কত-কথা। কথা তার ফুরোয় না। বলে, এ জায়গা তার কত ভাল লাগে। এ জায়গা ছেড়ে সে যেতে চায় না। এখানকার আকাশ-বাতাস, পথ-ঘাট, গাছ-পালা, সব কিছুই তার অতিপ্রিয়—এরা যেন তাকে টেনে রাখে। সিমলা-দার্জ্জিলিং-এর প্রশান্ত পরিবেশ, কলিকাতা-বোম্বের জৌলুস-জমক্, এমন কি য়ুরোপ-ইংলণ্ডের সুসভ্য সমাজ, সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ। সে এখানে থাকতে চায় চিরকাল, মরণের পরেও—মিশে যেতে চায় এখানকার মাটিতেই। আবেগ ভরে বলে চলে মেরি তার সব কথা। তার আবেগ আমাকেও করে স্পর্শ। আমিও জানাই আমারও কত প্রিয় এ জায়গা—একে আমি কত ভালবাসি। তাই ফিরে ফিরে আসি বারবার এখানকার বাতাসে নিশ্বাস নেবার জন্যে—পালিয়ে আসি শহরের ক্লেদাক্ত আবহাওয়া থেকে, মুক্ত বিহঙ্গের মতন ঘুড়ে বেড়াই এখানকার পথে ঘাটে। দুষ্টুমি করে মেরি জিগ্যেস করে—'তুমি বুঝি কবি? বাঙ্গালীরা সবাই প্রায় কবি হয় আমি শুনেছি। কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, কবিদের আমি ভালবাসি।' বলে কৌতুক ভরে চেয়ে থাকে আমার দিকে। তার আয়ত চক্ষে যেন বিদ্যুৎ খেল্লা করে। আবার আব্দার করে বলে—'লেখনা একটা কবিতা আমাকে নিয়ে, কিংবা একটা গল্প? আমি কি গল্পের নয়িকা হতে পারি না? দেখত চেয়ে আমার দিকে।'—দেখি চেয়ে চেয়ে, চেয়ে থাকি তার অনিন্দ্যসুন্দর অব-য়বের দিকে। মধুর হাসিতে ভরে ওঠে ওর মুখ, আর মধুর আবেগে ভরে আমার বুক।

একদিন মিসেস ব্রাউন্ জানান যে পরদিন মেরির জন্ম-দিন। আমাকেও নেমন্তন্ন করেন খাবার। শুনে অবাক হয়ে যাই—আমারও যে ঐ দিনেই জন্ম! সাল, মাস, তারিখও যে এক! বলি সে কথা মেরিকে, সে তো শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, বলে—'ভালই হয়েছে, আমরা কেউ কারুর চেয়ে ছোটও নই, বড়ও নই—একেবারে সমান। আমিও যোগ দিই তার আনন্দে। সেই

রাতে কবিতা লিখি তাকে নিয়ে, রাত জেগে জেগে। পরদিন তুলে দি তার হাতে এনে সন্তর্পণে জন্ম দিনের উপহাররূপে। বলি—পড়ে দেখ, কেমন লাগে জানিও। পরের দিন যখন যাই ওদের বাড়ী, ঘরে ঢুকতেই মেরি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। তার পেলব বাহুবন্ধনে পিষ্ট করে আমাকে বলে ওঠে—"তুমি একটি 'এঞ্জেল'!" তারপরেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হতভম্ব আমাকে ছেড়ে দেয়—সামলে নেয় নিজেকে। ভাগ্যিস তার মা ছিল না ঘরে। তবু আমার কানের ডগা দিয়ে যেন আগুন বেরুতে থাকে, বুকের মধ্যে শোনা যায় ঢিব্ ঢিব্ আওয়াজ, কপালে ফুটে ওঠে বিজ্ বিজ্ করে ঘামের রেখা। মেরি সরে যায় জানলার দিকে। তার শুভ্র কপোলে যেন ফুটে ওঠে আপেলের আভা, চক্ চক্ করে ওঠে তার চোখের তারকা। জানলার দিকে চেয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বলে—আমার আবেগকে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমা করবে। তোমার কবিতা আমার এত ভাল লেগেছে যে সারারাত প্রায় ঘুমুতেই পারিনি, ভোরের দিকে তন্দ্রার মাঝে আবার দেখেছি তোমাকে, তাই সামলাতে পারিনি নিজেকে। এবার সলজ্জ হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে। এতক্ষণে উত্তর আসে আমার মুখে—আজকাল লেখক মাত্রেই পারিশ্রমিক দাবী করেন, আর আমি দাবী না করতেই পেয়ে গেছি—আমার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কিন্তু না চাইতে পেলে লোভ বেড়ে যায়, তাই আরও কিছু পাবার আশা করছি—বলে তার পাশে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াই। আমার কথা শুনে মেরির গাল আরও লাল হয়ে ওঠে। আমার দিকে তার সেই লজ্জারক্ত মুখ তুলে ধরে বলে—"তোমাকে একটু আগে 'এঞ্জেল' বলেছি, এবার বলছি তুমি একটি মহাদুষ্টু! আর দুষ্টুদের প্রশ্রয় দিতে নেই, তাতে তাদের লোভ বেড়েই যায়।" বলে বটে প্রশ্রয় দিতে নেই, কিন্তু তার মুখ সে ফিরিয়ে নেয় না আমার দিক থেকে। আমিও সরে আসি তার কাছে। এমন সময় বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া যায় তার মার। তার মা যেন ডাকছেন তাকে, না তো, আমার নাম ধরেই যেন ডাকছেন, কিন্তু এ গলা তো আমার মার,—মিসেস্ ব্রাউনের তো নয়!···সুগভীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়! একি পাগলের মতন আমি ভাবছি সারা দুপুর শুয়ে শুয়ে। কোথায় মেরি! মার কথা কানে গেল—চাটা খাবি না? কখন বিকেল হয়ে গেছে। ওঠ, আর ঘুমুতে হবে না। উঠে পড়ি তাড়াতাড়ি। চা খেয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, জামা কপড় পরে বেরিয়ে পড়ি সাইকেল নিয়ে। বাজারের দিকেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু সার্টের বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বার করতে গিয়ে আর একটা কি খড়খড় করে উঠল। তুলে দেখলাম একটা শুকনো ফুল। মনে পড়ে গেল সকাল বেলা সেই সমাধিক্ষেত্রে যখন মেরির সমাধির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন গাছ থেকে কয়েকটা ফুল পড়েছিল গায়ে। তারই একটা বুক পকেটে ঢুকে গেছে। কিন্তু সেই ফুল দেখে মনটা যেন কি রকম করে উঠল, আর কেমন একটা আকর্ষণও অনুভব করলাম সেখানে যাবার—চালিয়ে দিলাম জোরে সাইকেলকে সেই পাহাড়ের দিকে।

যখন সেখানে গিয়ে পৌছালাম তখন সূর্য্যদেব তাঁর শেষ রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাচ্ছেন—সন্ধ্যার অন্ধকার সেই নির্জ্জন প্রান্তরে আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে। সাইকেলকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রেখে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সেই সমাধির সামনে। পকেট থেকে সেই শুক্‌নো ফুলটাই বার করে রেখে দিলাম সমাধিটির ওপর। কিন্তু হঠাৎ কি রকম এক শিহরণ যেন খেলে গেল আমার শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে। সারা দেহ শিউরে উঠল এক অজানা কারণে। হঠাৎ মাথার ওপর কি একটা পাখী ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে। চমকে দেখলাম চতুর্দ্দিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, জনমানবের কোনও সাড়া কোথাও নেই, আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রান্তরের সেই সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে একলা। আর থাকতে পারলাম না। তখন আমার সারা গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে কাঁটার মতন। দৌড়ে সাইকেলের কাছে এসেই কোনও রকমে সাইকেলটা তুলেই তাতে চড়ে বসলাম, আর প্রাণপণে চালিয়ে দিলাম দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। কিছুটা গিয়েই কিন্তু মনে হল পিছনে যেন আর একখানা সাইকেল ছুটে আসছে! পেছনে চাইবার সাহস হল না। ভাবলাম পেছনে চাইলেই যদি দেখি মেরি ছুটে আসছে তার সাইকেলে চেপে! ·তাহলে আমি সেইখানেই বোধ হয় অজ্ঞান

হয়ে যাব। এদিকে আমার সাইকেল টাল খাচ্ছে গর্তে আর পাথরে পড়ে। অন্ধকার তখন চতুর্দ্দিকে বেশ ঘনিয়ে এসেছে, এই অপরিসর কাঁচা রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এত জোরে সাইকেল চালান মানে যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু সাইকেলের বেগও কমাতে পারছি না লোকালয়ে পৌছানর আগে। পিছনের সাইকেলের আওয়াজও এগিয়ে আসছে। এমন সময় কানে এল—'বঁধুয়ারে-এ-এ···' ভাঙ্গা গলায় গানের রেশ? এত মেরির গলা হতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু পরেই এল সাইকেলে চড়ে এক দেহাতী যুবক। বগলে ছাতা ও হ্যাণ্ডেলে হারিকেন্ ঝুলিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। তাকে দেখে যেন দেহে প্রাণ ফিরে এল। বললাম—'ভাই, বড় রাস্তা অবধি আমার সঙ্গে যাবে?' সে বলল—'আস্থন না বাবু হামার সঙ্গে, এখানে কোনও ডর নেই।' চললাম তার সঙ্গে। আলোকিত বড় রাস্তায় পৌছে তাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ী মুখো ছুটলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম মেরির কথা আর ভাবব না, ঐ সমাধিক্ষেত্রেও আর আসব না কখনও।

*   *   *   *

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। আবার আমাকে যেতে হল সেই সমাধিক্ষেত্রে! সেই পাহাড়ের ওপরে গেছলাম বেড়াতে আর তাতেই হল কাল। নামবার সময় এক অদ্ভুত আকর্ষণ যেন আমাকে সম্মোহিত করে টেনে নিয়ে গেল সেই সমাধিক্ষেত্রে, সেই প্রায়ান্ধকার দিবাবসানে। রাস্তার ধারের গাছ থেকে কিছু ফুলও তুলে নিলাম আচ্ছন্নের মতন। তারপর সেখানে গিয়ে দেখি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চতুর্দ্দিকে, কিন্তু সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে যেন একটা অপার্থিব আলোর আভা রয়েছে। তাতে সব কিছু স্পষ্ট ভাবে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে যেন সব কিছুই। দাঁড়ালাম গিয়ে মেরির সমাধির সামনে, হাতে আমার নাম না জানা বনফুলের একটি গুচ্ছ। আস্তে আস্তে আমি সম্মোহিতের মত সেই পুষ্প গুচ্ছ রেখে দিই সমাধির ওপর। একটা শিরশিরে হাওয়া বয়ে যায় সমাধিক্ষেত্রের ওপর দিয়ে। তারপর সব নিথর নিস্পন্দ। দাঁড়িয়ে থাকি স্থাণুর মতন, কিন্তু অনুভূতির সাহায্যে বুঝতে পারি কি যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে—একটা রহস্যময় কিছু। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারি, পেছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারি কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে আমার। হাত পা নাড়বার আর ক্ষমতা নেই। সারা অঙ্গ ভাসছে ঘামে। বুকের মধ্যে দুরমুসের আওয়াজ। গলার মধ্যে যেন কি ঠেলে উঠেছে—আওয়াজ বার করতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। এই রকম চলচ্ছক্তি-রহিত অবস্থায় কোনও রকমে ঘাড় একটু ঘুরিয়ে আড় চোখে চেয়ে দেখলাম যা ভেবেছি ঠিক তাই। একটি কবরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে মেরি! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়ব। মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু
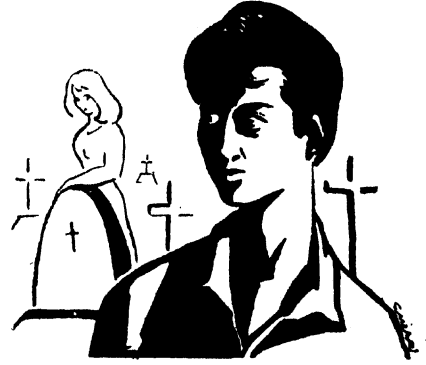
কবরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে

চোখের দৃষ্টিতে কেমন এক অপার্থিব ভাব। তাকে দেখে আনন্দ তো দূরের কথা, আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। মেরি আর একটু এগিয়ে এল। ইচ্ছা হচ্ছে ছুটে পালাই কিন্তু পা যেন মাটিতে গেথে গেছে। মেরি তার হাত প্রসারিত করল আমার দিকে। যেন ইঙ্গিতে বলছে সে হাত ধরতে। আমি বুঝতে পারছি তাকে স্পর্শ করলেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত। সে এগিয়ে আসছে। তার মুখের রহস্যময় হাসিতে, তার চোখের অপার্থিব দৃষ্টিতে আমি ক্রমশই সম্মোহিত হয়ে পড়ছি। আর বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না, পড়ে যাব। কিন্তু তাহলেই তো মেরি আমাকে স্পর্শ করবে, আর আমার······এমন সময় মাথার ওপরের গাছের মধ্যে থেকে ডেকে উঠল একটা কাক, আর ঝরে পড়ল কতকগুলো ফুল আমার মাথায়, গায়ে। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার সারা শরীরের মধ্য দিয়ে, কে যেন

[নের মধ্যে থেকে বলে উঠল—'পালাও''! আমি [চ]কিতে ঘুরেই এক লাফ দিয়ে ছুটতে গেলাম, কিন্তু [প]ারলাম না—একটা পাথরে পা আটকে আছাড় খেয়ে [প]ড়লাম! চিৎকার করে উঠলাম—'ভগবান, রক্ষা কর' [ব]লে। চোখ খুলতে পারছিনা প্রচণ্ড ভয়ে কিন্তু বুঝতে [প]ারছি মেরি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, আর পালাবার উপায় নেই। তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বললাম—মেরি, আমাকে স্পর্শ কর না, দোহাই তোমার, ছুঁয়ো না আমাকে। কিন্তু হায়, তার শীতল হাতের স্পর্শ আমার মাথায় অনুভব করলাম। চিৎকার করে উঠলাম—"মেরি, দয়া কর, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করি নি।" অনুভব করলাম সারা অঙ্গ আমার শীতল হয়ে যাচ্ছে, গায়ে মাথায় যেন বরফের স্পর্শ! আমার কি মৃত্যু হচ্ছে? প্রাণপণে একবার শেষ চিৎকার করলাম—বাঁচাও, বাঁচাও······মা, মা···।···যেন শুনতে পেলাম মার গলা। মা যেন বলছেন—'চোখ খোল্, চোখ খোল্, চেঁচাচ্ছিস কেন? এবারে সাহস করে চোখ খুললাম। খুলে হতভম্ব হয়ে গেলাম। একি! এযে আমার শোবার ঘর! আর আমি মাটিতে শুয়ে আছি মার কোলে মাথা রেখে। সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে জলে। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ঘর ভর্ত্তি লোক। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার। শুনলাম আমি নাকি ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে খাট থেকে পড়ে গেছি, আর পড়েই শুধু যাই নি, 'রক্ষা কর, বাঁচাও', বলে বিকট স্বরে চিৎকার করে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে ঘুম থেকে তুলেছি। তারপর আমার ঘুম ভাঙ্গাতে বা জ্ঞান ফেরাতে ঠাণ্ডা জল ঢালতে হয়েছে গায়ে মাথায়। বুঝলাম জলে ভেজা মার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শকে মেরির হাত মনে করেছিলাম, আর ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টাকে মনে হচ্ছিল মৃত্যুর হিম স্পর্শ! কিন্তু বাদ বাকিটা? সব স্বপ্ন! উঃ, আর এরকম কল্পনা-বিলাস করব না কখনও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি।

ছোট বোন বলে "মেরি, মেরি বলে চেঁচাচ্ছিলে কেন দাদা? মাও জিগ্যেস করেন—মেরি আবার কে? আমতা আমতা করি আমি। শেষে সকলের পেড়াপীড়িতে বলতে হল সব কথা। সমাধিক্ষেত্রে যাওয়া, সেখানে একটি সমাধিতে মেরি ব্রাউনের নাম ও তার জন্ম তারিখ, মাস, সালের সঙ্গে আমার জন্ম তারিখ, মাস ও সালের অদ্ভুত মিল দেখা। তারপর সন্ধ্যায় আবার সেখানে যাওয়া ও ভয় পেয়ে পালিয়ে আসা, এবং রাত্রে তারই ফলস্বরূপ এই বিকট স্বপ্ন দেখা! সবই বললাম, শুধু মেরিকে নিয়ে যে উদ্ভট কল্পনার জাল বুনেছিলাম সেটা আর বললাম না। শুনে মার মুখ হয়ে যায় গম্ভীর, বলেন—আর তোমার ওদিকে যাওয়া চলবে না মোটেই। কালকেই এর অন্য ব্যবস্থাও করতে হবে।

পরদিন সকালেই পুরুত আসে। কি সব পুজো-টুজো, হোম-টোম হয়। আমার হাতে ওঠে একটা মাদুলি ও আংটি। বাড়ী থেকে বেরুনই বন্ধ রইল সেদিন। এর পর থেকে মেরিকে নিয়ে আর ভাবতাম না।—শুধু আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তাকে তুলে রেখে দিলাম মনের গোপন মণিকোঠায়। তারপর আর বেশীদিন থাকা হল না। তাড়াতাড়িই ফিরতে হল কল্‌কাতায়।

আজ ফিরে যাবার দিন। সকাল বেলা একবার মনে হয়েছিল একলা না গিয়ে কাউকে সঙ্গে নিয়ে একবার পাহাড়ের ওপর থেকে সমাধিক্ষেত্রটা দেখে এলে কেমন হয়। কিন্তু মা রাজী হবেন না বুঝে আর ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। বিকালবেলা সব ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ট্রেন ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে, মালপত্র নিয়ে সবাই ষ্টেশনে এলাম এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় সব গুছিয়ে তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। কিন্তু ট্রেন ছাড়তে তখনও দেরি আছে দেখে অভ্যাসমত প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর পাইচারি করতে লাগলাম। কারা কারা আজ যাচ্ছে, কোনও চেনা মুখ আছে কিনা অন্য কামরায়, ইত্যাদি দেখে দেখে বেড়াতে লাগলাম। একটি ছোকরার কাঁধে ঝোলান ট্রানজিস্‌টর্ রেডিও থেকে কল্‌কাতা ষ্টেশনের বাংলা গান শুনতেও মন্দ লাগছিল না। এমন সময় পায়চারি করতে করতে, হঠাৎ একটা কামরার বাইরে লটকান নাম লেখা শ্লিপে চোখ গেল আটকে। বিশ্বাস করতে পারলাম না চোখকে প্রথমে। তারপর আবার ভাল করে পড়ে দেখলাম, লেখা আছে M. Brown! চমকে উঠলাম! অদম্য কৌতুহলকেও আর চেপে রাখতে পারলাম না। ঢুকে

পড়লাম কামরার দরজা ঠেলে ভেতরে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না সেখানে। শুধু দেখলাম বাঙ্কের ওপর একটা স্যুটকেশ রয়েছে আর তার গায়েও লেখা M Brown. কি করব ভাবছি, এমন সময় 'খট্' করে আওয়াজ করে খুলে গেল বাথ্‌রুমের দরজা। চমকে ফিরে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক স্থুলকায়া, গাউন্ পরিহিতা, নিকষ কালো, পৌঢ়া স্ত্রীলোক! হাঁ করে আমি চেয়ে রইলাম তার দিকে। কোনও কথা বলতে পারলাম না। স্ত্রীলোকটি একটুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে তার মূলার মত দন্তপাটি বিকশিত করে, আর কুৎকুতে চোখ দুটো নাচিয়ে, খনখনে গলায় জিগ্যেস করল—'What do ye want, son? (কি চাও বাছা)। মুখ দিয়ে আমার বেরুল না কোনও আওয়াজ! শুধু মাথাটা কোনও রকমে নেড়েই নেমে পড়লাম কামরা থেকে; আর মোহচ্ছন্নের মতন এসে বসে পড়লাম আমাদের কামরার মধ্যে। মনের মধ্যে কি যেন এক অব্যক্ত বেদনা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল—কি যেন এক প্রিয়বস্তু হারিয়ে গেল চিরতরে। সব কিছু যেন হয়ে গেল ফাঁকা, সব রং যেন হয়ে গেল ফ্যাকাশে, সব সুর যেন কেটে গেল মন থেকে। শুধু ভেসে এল

What do ye want, son?

কানে দুরাগত সঙ্গীতের সুর—রেডিও থেকে ছড়িয়ে পড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেশ—"সে ছিল আমার স্বপনচারিণী।"

ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

১৯২০ সনের পয়লা আষাঢ়। বাঙলা সাহিত্যের আকাশে এক পরম শুভ নক্ষত্রের জ্যোতি বিকিরিত হল। সেই প্রোজ্জ্বল জ্যোতির স্পর্শ পেয়ে প্রফুল্ল কুসুমের সৌন্দর্য ও সৌরভ নিয়ে বিকশিত হল মাসিক 'ভারতবর্ষ'।

অমর নাট্যকার ও কবি ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বাংলার আকাশের দেদীপ্যমান সূর্য তখন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। তাঁর অন্তরের একটি বড় কামনা ছিল একটি নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকা। তিনি অবসর গ্রহণ করার পরই সে পত্রিকা প্রকাশ করবেন স্থির করেছিলেন। সব বন্দোবস্ত করেছিলেন সে পত্রিকা প্রকাশের। ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ভার নিলেন সে পত্রিকা প্রকাশের। সাহিত্যিক ৺জলধর সেন ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ভার নিলেন সম্পাদকতার। তৎকালে বঙ্গদেশে অমূল্য চরণের মত বড় পণ্ডিত কেউ ছিলেন না। তিনি কাশীধামে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উপাধি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, পার্শী, আরবী, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, ইতালিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ২৬টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ৺হরিনাথ দের কথা বাদ দিলে তাঁর মত ভাষাবিদ্ বাংলা দেশে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন্ বৈষ্ণব পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর মত পণ্ডিত কোন দেশেই খুব বেশী জন্মান নি। সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল ও নিরভিমান। ১৩০৪ সালে বিভিন্ন ভাষায় পত্রাদি অনুবাদার্থে Translating Bureau নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। ১৩০৮ সালে Edward Institution নামে একটি ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি নিজে সে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩১২ সালে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৩১৯ সালে তিনি মালদহ সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৩২০ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কত গভীর ছিল তাঁর অন্তরের বেদনা যে দিন 'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রকাশের দিন। কারণ যাঁর প্রাণের অফুরন্ত আকাঙ্খা নিয়ে ভারতবর্ষ প্রকাশ পেল, প্রকাশের শুভদিনে তিনি ইহলোকে নেই। দ্বিজেন্দ্র লাল সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যা লিখেছেন তা সত্যই অন্তরস্পর্শী ও আলোকপ্রদ।

"যেদিন প্রথম তিনি (৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) বাংলা ভাষায় সর্বাঙ্গ সুন্দর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার নিকট আসেন, সেদিন আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। যখন তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে তাঁহার সহযোগী করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিলেন তখন তাঁহার উদার হৃদয়ের ও বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু যখন আমি আমার অক্ষমতার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম তখন তাঁহার কাছে যে-সকল উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। তখন তাঁহার সহৃদয়তার ও সহজ সরল সহাস্য আননের শক্তি অনুভব করিয়া তাঁহার কথায় না বলিবার শক্তি আমার ছিল না। হৃদয় বশীকরণের অমোঘশক্তি যে তাঁহার এত ছিল তাহা পূর্বে জানিতাম না!·····কিন্তু কে জানিত বঙ্গ-ভারতীর পূজার মন্দিরের হৈমপ্রদীপ এত শীঘ্র নিবিয়া যাইবে? ·········যাহা যায় তাহা তো আর ফিরিবার নয়—দ্বিজেন্দ্র লালের অন্তর্ধানে 'ভারতবর্ষে'র যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।······দ্বিজেন্দ্র লালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত পথে চলিবে। কবির ভাষায় বলি :—

তোমারি চরণ করিয়া শরণ
চলেছি তোমারি পথে।

দ্বিজেন্দ্র লাল ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়াও অল্পদিনের মধ্যেই 'ভারতবর্ষে'র জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের

গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গ অনেক দিন ধরিয়া উপভোগ করিতে পারিবেন।"

সত্যি সত্যি দ্বিজেন্দ্র লালের কয়টি অমর সঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষে'র প্রথম বর্ষে। সে সঙ্গীত শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, ভারতীয় সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ্। 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা দ্বিজেন্দ্র লালের বিখ্যাত গান ভারতবর্ষ !—

'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ! ভারতবর্ষ !'
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।'

"ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র" এই বিখ্যাত গানটিও ১৩২০ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শুধু দ্বিজেন্দ্র লালের গান নয়, বাংলা সাহিত্যের চিরকালের আরও অনেক সম্পদ্ প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষে'র 'প্রথম বর্ষে'। ৺চিত্তরঞ্জন দাসের অমর রচনা 'সাগর সঙ্গীত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যায় :—

নিবিড় নিশ্বাসহীন ধীরস্থির আঁখি কর।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগিবর,
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

দেশবন্ধুর সেই ধ্যান মগ্ন কবি রূপ ধরা পড়ে ছিল 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যায়। ইহা ভারতবর্ষের কাছে কম গৌরবের কথা নয়।

'ভারতবর্ষে'র গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলো জেলেছিল অমর কথাশিল্পী ৺শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী কাহিনী 'বিরাজ বৌ' ও 'পণ্ডিত মশাই'। 'বিরাজ বৌ' প্রথম প্রকাশিত হয় পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে'।

প্রথম বর্ষের 'ভারতবর্ষে' আরও যে সকল কবি, কাহিনীকার, লেখক ও লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যর চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র।
যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত—ব্যথিত (কবিতা)।
সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি—ছিন্নহস্ত।
অনুরূপা দেবী—মন্ত্রশক্তি।
খগেন্দ্র নাথ মিত্র—কৌতুহল।
নরেন্দ্র দেব—কবিবর ৺ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।
প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী—বাণী।
প্রিয়ম্বদা দেবী—জন্মমঙ্গল।
কালিদাস রায়—বিন্দু সরোবর, মন্দির, রাখাল রাজ উজ্জয়িনী ও কৌশাম্বী, শীতের প্রতি সাকি,নীলকণ্ঠের প্রতি ও প্রেমের জয়
প্রসন্নময়ী দেবী—গৃহ।
হেমেন্দ্র কুমার রায়—হরিদ্বার।
করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায় শৃঙ্খলিতা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অবৈতনিক পাঠে, ওয়ালটেয়ার, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্র নাথ, জীবন ভিক্ষা, স্নেহলতা (যে বাঙালী বালিকা পণ-প্রথার বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার জানিয়ে অনলে আত্মাহুতি দিয়েছিল, তারই প্রশস্তি) ও জয়দেব
জলধর সেন—৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, নসীবের লেখ (গল্প) ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ও পয়লা বৈশাখ।
দ্বিজেন্দ্র লাল রায়—ভারতবর্ষ ছত্র মহিমা, পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে (গান), বঙ্গরমণী।
সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত—স্বর্গদ্বারে।
সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রতিশোধ।
৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীস্তোত্র।
নিরুপমা দেবী—শবরের দেবী।
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—আমি ও তুমি।
প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—নীলুদা ও যুগল সাহিত্যিক।
দীনেন্দ্র কুমার রায়—মুক্তি পণ ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের ন্যায়নিষ্ঠা।
অশ্বিনী কুমার দত্ত—কীর্তন, আরতি, হারা আমি (কবিতা) ও ভক্ত আহ্বান।
ইন্দিরা দেবী—শ্রাবনে।
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—মিলন।
বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়—মহামিলন।

"আমি পথিক,
পথ আমারি সাথি—"
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে
একটা পুরানো পরিত্যক্ত পাল্‌কির ভিতরে
ঢুকে চোখ দু'টি বুজে বসতেন
আর কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে চলে
যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন
দেশে। উত্তরকালে 'সুদূরের পিয়াসী'
রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ
করেছেন—ঘরছাড়া বাতাসের মতো
'উদ্দাম-উধাও' হওয়ার কথা
ভেবেছেন। 'পথের প্রেমে' মেতে
উঠে কবিগুরু লিখেছেন :
"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।
... ...
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।..."*
D
ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম
(*বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)
DC-561 BEN

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়—বন্যহংস (শিকারের গল্প) ও বিমান বিহার।

উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রতিক্রিয়া।

মহারাজ বিজয় চান্দ মহতাব—আমার ইউরোপ ভ্রমণ ও শ্রীশ্রীশিবশক্তি।

প্রিয়ম্বদা দেবী—পূজারীতি

চন্দ্র শেখর মুখেপোধ্যায়—বিবাহ বন্ধনের স্থায়িত্ব।

কুমুদ রঞ্জন মল্লিক—নৌকাপথে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ লালা, পরীর মুক্তি, ভারতবর্ষের আবাহন (রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে), লোচন দাস, উপকণ্ঠে, হিন্দু ও নদীয়া।

যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিব-মূর্তি।

কৃষ্ণ দয়াল বসু—জাহ্নবী।

বিশ্বপতি চৌধুরী—ভক্তি।

প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী—অকালে দীপালী

ডাঃ রাধা কমল মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যের সমাজ গঠন শক্তি।

মান কুমারী বসু—বিজয়া।

ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষে যে কালজয়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ উপরিলিখিত রচনার সংক্ষিপ্ত তালিকা। শুধু প্রথম বর্ষে নয়, বিগত উনপঞ্চাশ বর্ষে 'ভারতবর্ষ' সংখ্যাতীত কালজয়ী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছে। এককথায় ভারতবর্ষের অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস ফলতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভবিষ্যতে সেই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত সারে লেখবার বাসনা রইলো।

হঁ্যা-চ্চো!·····

ফটো : রমেন ঘোষ

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—
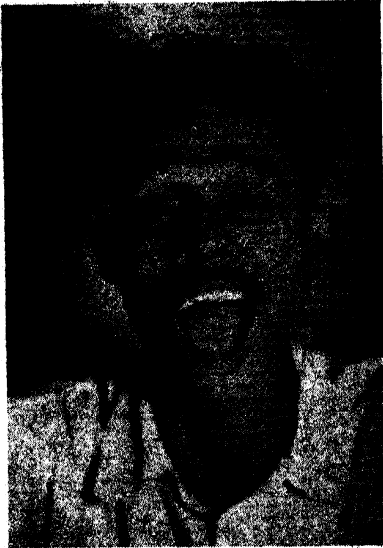
॥ অনুসরণ ও অনুকরণ ॥

বর্ত্তমানের এই জটিল সমাজ জীবনে, জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত সাধারণ মানুষের কাছে একটুকরো আমোদ-আহ্লাদের দাম আজ অনেকখানি। ব্যয়বহুল আমোদ-প্রমোদের কথা সাধারণের চিন্তার বাইরে আজও যেমন রয়েছে, আগেও তাই ছিল। তবে আগেকার কালে জীবনযাত্রা ছিল না এত জটিল, এত ঘাত-প্রতিঘাতময় এত হবার উপায় নেই। এখন মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, নিজের সংসারটুকু সামলাতেই সে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে, পাচ জনকে ডেকে, পাচজনকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করবার প্রবৃত্তি তার আর নেই। আর ইচ্ছা থাকলেও আজ সামর্থ্য তার সীমিত, ইচ্ছামত ব্যয় করা আজ তার সাধ্যাতিত। অথচ জীবনে, বিশেষ করে কর্ম্মব্যস্ত জীবনে, হাঁফ ফেলার জন্যে চাই একটু আমোদ-আহ্লাদ—অল্প খরচের মধ্যে। আর সেরকম আমোদ-প্রমোদের একমাত্র স্থল হচ্ছে সিনেমা-গৃহ, নাট্যালয় ও খেলার মাঠ। খেলার মাঠে মানুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে গিয়ে সব সময় আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। অনেকে আবার ক্রীড়ানুরাগীও নয়। কিন্তু সিনেমা-থিয়েটার সে দিক দিয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। তাই সিনেমা-থিয়েটারই বর্ত্তমান জন-জীবনের প্রমোদ-কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই। এবং এই প্রমোদ কেন্দ্র দু'টিকে ঘিরে, বিশেষ করে সিনেমাকে নিয়ে, যার ব্যাপ্তি ও আকর্ষণ

আর, ডি, বনশল, প্রযোজিত আগামী চিত্র "এক টুকরো আগুন" বিষ্ণু বর্ধনের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। দাম্পত্য জীবনেব পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির ভেতর দিয়ে মনোরম একটি সামাজিক গল্পের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। বিভিন্ন অংশে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অনুভা গুপ্ত, তন্দ্রা বর্মণ প্রভৃতি। সঙ্গীতে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন, আর দেওজীভাই আছেন ক্যামেরার কাজে। এখানে "এক টুকরো আগুনে"র একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্তকে দেখা যাচ্ছে।

বিঘ্নসঙ্কুল। তাই, তখনকার সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবেই জীবন কাটিয়ে গেছে, নিজেদের মধ্যেই আমোদ-আহ্লাদ হাসি-গানের বন্যা বইয়ে, বার মাসে তের পার্ব্বণের উপলক্ষে। বর্ত্তমানকালের আবহাওয়াতে কিন্তু আর তা থিয়েটারের যেয়ে অনেক বেশী, আজ সমাজ জীবন চেন পাক খাচ্ছে। হয়ত এখনও এমন লোক আছেন যাঁরা আদপেই সিনেমা দেখেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অসংখ্য সিনেমা অনুরাগীদের তুলনায় যে নগণ্য তা বলাই বাহুল্য।

সিনেমা বা চলচ্চিত্রের আকর্ষণ বা জনপ্রিয়তার প্রধান কারণই হচ্ছে দর্শকদের পক্ষে এ তেমন ব্যয়বহুল নয়, অথচ এর ব্যাপ্তি হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। সারা পৃথিবীর দৃশ্য, দূর দুরান্তরের দেশের সমাজের চিত্র, অচেনা-অজানা মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, নানা ঘটনা-অঘটনার খবর, সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়, উপভোগ করতে পারা যায় এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, নিজের দেশে চিত্র-গৃহের মধ্যে বসে। যদিও চলচ্চিত্র হচ্ছে শুধুই ছায়া, কায়ার সঙ্গে নেই এর সম্পর্ক, তবুও এই ছায়াই হয়ে ওঠে কায়ার সদৃশ—ক্যামেরার গুণে, আর মুহূর্ত্ত উড়িয়ে নিয়ে যায় মানুষের মনকে দেশ থেকে দেশান্তরে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। চলচ্চিত্রের এই চলমানতাই তাকে দিয়েছে জয়ের মুকুট—কায়াহীন হয়েও সে সবাইকে মেরেছে টেক্কা, নাট্যাভিনয়কেও করেছে পরাজিত, জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে।

নাট্যশাস্ত্র বহু পুরাতন। পৃথিবীতে এর প্রচলন হয়েছে বহু যুগ আগে। আমাদের দেশে ভরত মুনিই পুরাকালে এই শাস্ত্রের প্রচলন করেন বলে কথিত আছে। নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যাভিনয় আমাদের নিজস্ব। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে তা নয়। চলচ্চিত্র বা সিনেমা এসেছে বিদেশ থেকে। এই শিল্পের সব কিছুই বিদেশী। য়ুরোপ থেকে এর প্রচলন হলেও পৃথিবীর সব সভ্য দেশই এই শিল্পকে নিজস্ব করে নিয়েছে, নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে পুরাতন ধারা অনেক দেশেই একই রকম ভাবে [illegible]য় আছে—পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই হয় নি। আমা[illegible] দেশের যাত্রাগানের মধ্যেও সেই পুরাতন নাট্যশাস্ত্রের রূপ কিছুটা আছে, কিন্তু আধুনিক থিয়েটার বা রঙ্গালয় যে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী নাট্যশাস্ত্রকেই অনুসরণ করে, তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এতে দোষ নেই। আধুনিক যুগে যুগোপযোগী এ অনুসরণ বা কিছুটা অনুকরণও আবশ্যক। পুরান হয়ত ভাল, কিন্তু চলমান যুগের ভাবধারাকে অস্বীকার করে পুরানকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে বাহাদুরী থাকলেও বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। পুরানকে বা প্রাচীনকে অস্বীকার কর্ত্তে বলি না, আর তা করা উচিতও নয়।

বহুজন-মনহারিনী তারকা—ভারতীয় চিত্রের নবীন আশা

আশা পারেখ।

পুরানকে, প্রাচীনকে মেনে নিতে হবে, আর তার ওপর বনিয়াদ করেই গড়ে তুলতে হবে নবীনকে—প্রাচীনের ঐতিহ্যের সঙ্গে নবীনের বৈশিষ্ট্যকে, তা বিদেশাগতই হোক বা স্বদেশেরই হোক, মিশিয়ে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন কিন্তু নিজস্ব ভাবধারা। এবং তার জন্য হয়ত দরকার হবে অনুসরণের ও অনুকরণেরও। তাতে দোষ নেই, তার করেছে, আর অনুসরণ করে বিদেশের আঙ্গিককে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আপনার করে নিতে পেরেছে, আর তাই রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্মান বাংলা ছবির ভাগ্যেই মিলেছে সব চেয়ে বেশী। অবশ্য বাংলা গল্প-সাহিত্যের দানও এর পেছনে যথেষ্ট আছে। কিন্তু আগেই বলেছি বাংলা সাহিত্য এক সময় অনুসরণ করেছে বিদেশী সাহিত্য

ভারতীয় চিত্রাকাশে উড়িয়ে চলেছেন বিজয়-বৈজয়ন্তী নৃত্যপটীয়সী **বৈজয়ন্তীমালা।**

প্রয়োজন আছে। একে মেনে নিতেই হবে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, মহত্তর কারণে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করেছি বিদেশী সাহিত্যের ধারাকে। তাকে নিজস্ব করে, আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলাম বলেই, ঐশ্বর্য্যময়ী বাংলা সাহিত্য আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রূপ লাভ করতে পেরেছে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও আমরা অনুসরণ করেছি বিদেশী নাট্যাভিনয়ের আঙ্গিককে, আর তাই বাংলার ষ্টেজ আজ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। সিনেমার ক্ষেত্রেই বা এই অনুসরণ বাদ যাবে কেন? বাদ যায় নি। অনুসরণ সে এবং আজও করে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে অনুসরণ দোষের নয়, যদি তার থেকে ভালটাই নেওয়া হয়। কিন্তু এই অনুসরণের মাত্রা যদি ঠিক না থাকে তাহলে এটা দাঁড়িয়ে যেতে পারে অনুকরণে এবং আরও নামলে হবে হুবহু অনুকরণে এবং তার অর্থ নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জ্জন দেওয়া। নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে হুবহু অনুকরণকে বলা যেতে পারে চরম পতন, বিশেষ করে যদি তা ঘটে জাতীয় শিল্প বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। আর তা যদি ঘটে তাহলে আমরা হারাব আমাদের সব কিছু—আমাদের গৌরবময়, ঐশ্বর্য্যময়, ঐতিহ্যময়, অতীতকে, হারাব আমাদের ইতিহাসকে, হারাব আমাদের বর্ত্তমানকে, হারাব

আমাদের ভবিষ্যতকে ! আমাদের সব কিছুই হয়ে যাবে পরের দান, নিজস্ব আর কিছুই থাকবে না। বিশেষ করে আমরা হেয় হয়ে পড়ব সেই সব বিদেশীদের চক্ষে, যাদের আমরা অনুকরণ করেছি। তাই অপরের অনুকরণের বিষয়ে থাকতে হবে সদা সতর্ক। সীমা যেন কখনও অতিক্রম করা না হয়। নাটকের ক্ষেত্রে ও সিনেমার ক্ষেত্রে এই সীমানাকে খুবই সতর্ক ভাবে মেনে চলতে হবে। কারণ নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্রের মত জনপ্রিয় শিল্পের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারায় যতটা প্রকাশ হয় অন্য কিছুর মধ্য দিয়ে তা হয় না। এবং সেইখানেই যদি অনুকরণটা প্রকট হয়ে পড়ে অর্থাৎ হুবহু হয়, তা হলে ত জাতির পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বলা চলে যে এই অনুসরণ ও অনুকরণের সুযোগ সে খুব বেশী পায়নি বলেই, স্বাভাবিক কারণেই এই সীমারেখা সে কিছুটা মেনে চলেছে। কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সারা জগতের সঙ্গে তার যোগ সিনেমার মতন এত ব্যাপক নয়। এ দেশের বহু চিত্র বিদেশে প্রায়ই দেখান হয়ে থাকে, কিন্তু এখানকার নাটক বিদেশে মঞ্চস্থ করা হয়েছে খুব কমই। বিদেশী নাটকও আমাদের রঙ্গালয়ে অভিনীত হচ্ছে অনেক কম কিন্তু বিদেশী চিত্র প্রচুর পরিমাণেই এখানে দেখান হয়ে থাকে। এর কারণ আর কিছুই নয়, সিনেমার ফিল্মকে পাঠান বা আনা যত সহজ, নট-নটীদের নিয়ে গিয়ে বিদেশে অভিনয় করান সে তুলনায় অনেক শক্ত ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সিনেমার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যেমন একটা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় নি। এবং তা হয়নি বলেই নাটকাভিনয় এখনও অনেকটা স্বাধীন—অনুসরণ বা অনুকরণ এর ক্ষেত্রে খুব বেশী ঘটেনি, যতটা ঘটেছে সিনেমায়। সিনেমার এই ব্যাপ্তি দূরকে যেমন নিকটে টেনে এনেছে, তেম্নি চোখের সামনে উপস্থিত করেছে এনে বিদেশের ভাবধারা, সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই। এর মধ্যে আছে গুণ, আছে দোষ। দর্শকেরা দেখেন দু'টাই। দোষটি বাদ দিয়ে গুণটি নিতে পারলেই ভাল। কিন্তু দোষটি প্রাধান্য পেলেই সমাজের স্তরে স্তরে তা ঘাঁটি গাড়বে, আর সমাজ জীবনে ধরাবে ঘুণ। দর্শকদের পক্ষে তো এই। আর যাঁরা চিত্র-নির্ম্মাতা, তাঁরাও যদি বিদেশী চিত্রের গুণগুলির চেয়ে দোষগুলিই বেশী করে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেণ, তাহলে অধঃপতনের আর বাকি থাকবে না কিছুই। তাই আগেই বলেছি সিনেমাকে, বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে এই অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারে। বিদেশের উন্নত কলাকৌশলের, অভিনয়-চাতুর্য্যের, উৎকৃষ্ট আঙ্গিকের সব কিছুরই অনুসরণ ও কিছুটা অনুকরণও অবশ্যই দরকার চিত্রের মান বাড়ানর জন্যে। কিন্তু এমন ভাবে তা করতে হবে যাতে করে জাতি হিসাবে আমাদের বৈশিষ্ট্য যেন ক্ষুন্ন না হয়, বিশ্বের দরবারে। তবে আশার কথা যে বাংলা চিত্র, ভারতের অন্য ভাষাভাষী এক শ্রেণীর চিত্রের ন্যায় এই অনুকরণ দোষ থেকে বহুলাংশে মুক্ত এবং তা বলেই বাংলা চিত্রের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বভারতে, এমন কি বিদেশেও স্বীকৃত। আশা করি বাংলার চিত্র-নির্ম্মাতারা এই অনুকরণপ্রিয়তা থেকে মুক্ত থেকে, বিদেশী চিত্রের গুণটুকুরই অনুসরণ করে, বাংলা চিত্রের মানই শুধু বজায় রাখবেন না, উত্তরোত্তর চিত্রের উৎকর্ষ সাধনও করবেন।

***

শিল্পীর কথা

মহান শিল্পী ছবি বিশ্বাস

কুমারেশ ভট্টাচার্য

১১ই জুন—১৯৬২ সাল। সোমবার। বাঙলার তথা সমগ্রভারতের রংগ ও চলচ্চিত্রাকাশের একটি অত্যুজ্জল নক্ষত্র হঠাৎ খসে পড়ল নিতান্ত আকস্মিকভাবে। অপরাহ্নে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত মোটর দুর্ঘটনায় সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে কলকাতা শহর ও শহরতলীতে। হাজার হাজার গুণমুগ্ধ নরনারী শোকাভিভূত হলেন এই দুঃসংবাদে। গভীর দুঃখ ও শোকে উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাঁদের অন্তর। মনে-প্রাণে তাঁরা অনুভব করলেন অতি

প্রিয়জন হারাবার ব্যথা কত নিদারুণ। এই মহান্ শিল্পীর শবযাত্রা দেখে অতি সহজেই বোঝা গেছে, বাঙালীর অন্তরলোকে শিল্পী ছবি বিশ্বাস কত গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আসনে ছিলেন অধিষ্ঠিত। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয়ে সুদীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে তিনি মুগ্ধ করেছেন—হাসিকান্নায় মুখর করেছেন তাঁদের অন্তর। কিন্তু জীবনের শেষ দিনে সংসাররংঙ্গমঞ্চে যে শেষ ভূমিকা অভিনয় করে তিনি বিদায় নিলেন চিরতরে তা অতিকরুণ—অতি মর্মান্তিক। শেষবারের মত সজলচোখে সাগ্রহে দেখলাম তাঁর মুখখানা। এতটুকু ব্যথার লেশ যেন নেই সেই মুখে। কী এক গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে চিরনিদ্রিত শিল্পীর মুখখানাতে। কিন্তু সবাই জানেন, কত ভীষণ আঘাত পেয়ে তিনি ত্যাগ করেছেন শেষ নিঃশ্বাস। সেই নিদারুণ আঘাতের বেদনা ও চিহ্ন এতটুকুও ম্লান করতে পারেনি সদাহাস্যময় তাঁর সুন্দর মুখখানাকে।

কোলকাতার বিডনষ্ট্রীটের এক বর্ধিষ্ণু ও সম্মানিত পরিবারে ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন ছবি বিশ্বাস। এই বনেদী বংশটি সম্পদে ও ঐতিহ্যে ছিল গৌরবান্বিত। পিতামহ ৺কালীপ্রসন্ন দে বিশ্বাস ছিলেন তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ছবিবাবুর পিতার নাম ছিল ৺ভূপতিনাথ দে বিশ্বাস। ভূপতিনাথের চারটি পুত্রের মধ্যে ছবি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর পোষাকী নাম ছিল শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। মা আদর কোরে এই অতি সুন্দর টুকটুকে ছেলেটিকে ডাকতেন 'ছবি' বলে। কিন্তু মায়ের দেওয়া আদরের নামটিই ক্রমে ক্রমে লাভ করল পরিচিতি—পোষাকী নামটি চিরদিনই হয়ে রইল পোষাকী।

অতি শিশুকালেই ছবি তাঁর মাকে হারান। মাতৃহারা শিশুর যত্ন ও শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন স্নেহবৎসল পিতা ভূপতিনাথ।

অতি শৈশবেই ছবি ভর্তি হন নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি পড়তে শুরু করেন সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে। পরে হিন্দুস্কুলে পড়ে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। তারপর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে পরে বিদ্যাসাগর কলেজে এসে ভর্তি হন।

এই বিশ্বাস পরিবারটি ছিল বিরাট। বাড়ীতে বহু ছেলে-মেয়ে, দাস-দাসী। সর্বদাই বাড়ীখানা যেন আনন্দ কলরবে থাকত মুখর। বার মাসে ছিল তেরো পূজাপার্বণ। মহাসমারোহে হত দুর্গাপূজা। এই সংসারের উপর ছিল যেন লক্ষ্মীদেবীর পূর্ণ কৃপাদৃষ্টি। বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে

ছবি বিশ্বাস

আর, ডি, বনশল কোং-র সৌজন্যে

আবৃত্তি, গান, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত এই বিশ্বাস বাড়ীতে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই শুধু অংশ গ্রহণ করত এই সব অনুষ্ঠানে। এখানেই হয় ছবির অভিনয় শিক্ষার শুরু। কিন্তু তিনি সেদিন স্বপ্নেও ভাবেননি, অভিনয়কেই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে শুধু নেশা হিসাবেই নয়—পেশা হিসাবেই।

এর কিছুদিন পর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে শিশির-কুমারের সংগে হয় ছবির পরিচয়। শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপূণ্য, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিশেষ মুগ্ধ করে ছবিকে। তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন ছবি। তিনি আজীবন সগর্বে শিশিরকুমারের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে গেছেন।

ক্রমে ক্রমে কাঁকুড়গাছি নাট্য সমাজ, হাওড়া নাট্য-সমাজ ও সিকদারবাগান বান্ধব সমাজের সংস্পর্শে আসেন ছবি বিশ্বাস। 'নদীয়া বিনোদ' নাটকে নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সেদিন ছবিবাবু এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। তাঁর সেদিনের অভিনয় সত্যিই অবিস্মরণীয়।

এর পর ছবির পিতার ব্যবসা ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ। ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে আর্থিক সংকট। বহুদিনের পৈতৃক দুর্গাপূজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন ভূপতিনাথ। শরীর এবং মন তখন তাঁর দুইই ভেঙে পড়েছে। তখন বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তাঁরা উঠে এলেন মোহনবাগান লেনে। এর পরই শয্যাশায়ী হন তিনি। আর্থিক বিপর্যয়ের প্রচণ্ড ধাক্কা তিনি সামলাতে পারেন না। মৃত্যুকালে ছবিবাবুকে তিনি বিশেষভাবে বলে যান—যদি পার কোনদিন, তবে আবার পৈতৃক দুর্গাপূজাটা অন্ততঃ করবার চেষ্টা কোরো। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে ছবির পিতার মৃত্যু হয়।

এরপর কয়েক বৎসর কেটে যায় ছবির নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। সেই দুর্দিনে আত্মীয়-পরিজন ও জ্ঞাতিদের কত শ্লেষ, কত ঠাট্টা-বিদ্রূপই না মাথা নীচু করে সহ্য করতে হয়েছিল ছবি বিশ্বাসকে। কিন্তু জীবনের দুর্গম পথে তিনি সেদিনেও ছুটে চলেছিলেন নির্ভয়ে—মনে অফুরন্ত আশা ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে। হতাশায় তিনি কোনদিনই হন নি মুহ্যমান।

এদিকে ছবিবাবুর অভিনয় নৈপুণ্যের খ্যাতি ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চিত্রে তিনি সর্বপ্রথম বাংলার চিত্রামোদীদের জানান প্রথম অভিবাদন। প্রবোধ গুহ মশাইয়ের সাহায্যে তিনি মঞ্চাবতরণ করে 'পথের দাবী' ও 'মীরকাসিম' নাটকে অভিনয় করে লাভ করেন প্রচুর খ্যাতি। প্রায় সারা জীবনই তিনি সংযুক্ত ছিলেন সাধারণ রংগালয়ের সংগে। কিছুদিন পূর্বে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্রেয়সী' নাটকে তিনি সর্বশেষ মঞ্চাব-তরণ করেন। চিত্র জগতে প্রায় দেড়শতাধিক চিত্রে অবতরণ করে ছবি বিশ্বাস লাভ করেন নাট্যামোদীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা। 'কাবুলিওয়ালা', 'জলসাঘর' 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রভৃতি অসংখ্য চিত্রে তিনি যে উচ্চাংগের অভিনয় করেছেন তা দর্শকবৃন্দ কোনদিনই ভুলবে না! যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন সেই চরিত্রটি তাঁর অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্যে হয়ে উঠত প্রাণবন্ত। আত্মিক শক্তি দিয়ে অভিনীত তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্র দর্শকদের মনে রেখে গেছে একটা স্থায়ী ছাপ—যা সহজে ভোলা যায় না।

তিনি বলতেন; মঞ্চের অভিনয়ই তাঁর কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে। মঞ্চে অভিনয় করে শিল্পী সুযোগ পান দেখাতে তাঁর অভিনয়নৈপূণ্য—লাভ করেন উৎসাহ—মেতে ওঠেন নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায়। কিন্তু সিনেমা এর বিপরীত—প্রাণহীন।

ছবি বিশ্বাসের আদি পৈতৃক বাড়ী ছিল বারাসাত মহ-কুমার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। প্রচুর অর্থের এবং যশের অধিকারী হয়েও শান্ত নির্জন পল্লীকে তিনি কোন দিনই ভোলেন নি। তাই স্বগ্রাম জাগুলিয়ায় পৈতৃক বাড়ীর সংস্কার ও উন্নতি করে ছবি প্রতি বৎসর ধুমধামের সংগে করতেন সেখানে দুর্গাপূজা। পিতার অন্তিম কালের ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রতিটি লোক তাঁকে ভালবাসত আন্তরিকভাবে। তিনিও অতি সাধারণ ভাবে মিশতেন সবাইয়ের সংগে।

এই নিরহংকার ও সদাহাস্যময় লোকটির সাহচর্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে কত সরল ও কত অমায়িক ছিলেন এই মহান্ শিল্পী। গতবৎসর ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে যখন কর্মীদের চলেছিল ধর্মঘট তখনও এই সরল ও দরদী শিল্পী এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই ধর্ম-ঘটীদের পাশে—দিয়েছিলেন তাঁদের উৎসাহ ও অভয়।

বহুদিন পর্যন্ত টালীগঞ্জ অঞ্চলে রিজেণ্ট পার্কে তিনি বাস করছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে খোলা জায়গায় নানাবিধ শাক সব্জীর বাগান করা ছিল তাঁর একটা প্রধান সখ।

যদিও নিষ্ঠুর নিয়তি এমন মর্মান্তিক ভাবে সর্বজনপ্রিয় এই মহান শিল্পীকে আমাদের কাছথেকে ছিনিয়ে নিয়েছে অসময়ে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে তবুও তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে তিনি চিরদিনই থাকবেন অধিষ্ঠিত। বাঙালী কোন দিনই ভুলবেনা তার অতি প্রিয় এই অমর শিল্পীকে।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল প্রসঙ্গ

শ্রীবিমল মুখার্জ্জী

ফুটবল খেলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমি ইতি-পূর্ব্বে এই 'ভারতবর্ষে'র মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলাম। আজ আবার বহুদিন পরে এই খেলারই কয়েকটি অত্যা-বশ্যক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কলম ধরেছি।

এখনকার ফুটবল খেলার একটা প্রধান অঙ্গ বুট পরে খেলা। আজকাল বহু ছেলেকেই খেলার মাঠে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়—যাদের মধ্যে আমি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করেছি যে, অনেকেই নিয়মমত অনুশীলন না ক'রেই যেন দায়-উদ্ধারের জন্যই কোনরকমে খেলার মাঠে নামে। তা'দের চলা-ফেরা এবং খেলার প্রতিটি movement-এর মধ্যে বেশ একটা উদ্দেশ্যবিহীন এবং খাপছাড়া ভাব দেখা যায়। যার ফলে বল্ নিজের আয়ত্বের মধ্যে রাখা ও সময়মত স্বপক্ষীয় খেলোয়াড়কে জুগিয়ে দেওয়া তা'দের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

কাজেই প্রতিটি খেলোয়াড়ের উচিত পূর্ব্ব হতে ভালভাবে অনুশীলন ক'রে তারপর বুট পায়ে দিয়ে খেলার মাঠে আত্মপ্রকাশ করা। আমার মনে হয়, যদি ১২।১৩ বৎসর বয়স থেকে প্রতিটি ছেলেকে বুট পায়ে ফুটবল খেলার শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই অন্ততঃ ৫।৬ বৎসর পরে হয়ত বুটকে স্বীয় আয়ত্বাধীনে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। অর্থাৎ খেলোয়াড় যতক্ষণ না অনুভব করতে পারবে যে বুট তার অন্যান্য অঙ্গের মত নিজেরই একটা বিশেষ অঙ্গ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তার খেলার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবে না। আড়ষ্টতা ও জড়তা তার ভাল খেলার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে। অবশ্য এটাও ঠিক কথা যে অল্প বয়স থেকে শুধু অভ্যাস ক'রলেই সবাই বিখ্যাত খেলোয়াড় হ'তে পারবে না, কারণ খেলায় পারদর্শীতা লাভ ক'রতে হ'লে অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই 'ফুটবল সেন্স' অর্থাৎ ফুটবল খেলার জ্ঞান। যা' প্রতিটি খেলোয়াড়কে অর্জ্জন ক'রতে হবে স্বীয় প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায়।

শ্রীবিমল মুখার্জ্জী

এবার আমি যাব দর্শকদের কথায়। যাঁরা সত্যিকার ফুটবল অনুরাগী, তাঁরা সকলেই জানেন আজকালকার নিম্নস্তরের ফুটবল খেলার ভূমিকায় দর্শক সাধারণের অংশ কতখানি বেশী। দূর থেকে যুদ্ধের দৃশ্য দেখে কোন কিছু মন্তব্য করা এক কথা, আবার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে অস্ত্র
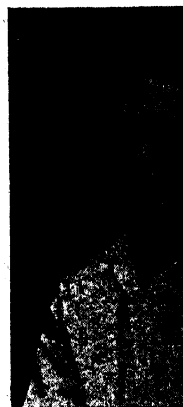
ধারণ করা আর এক কথা। আমাদের দেশের দর্শক-সমাজ নিজেদের মনের চাহিদামত ঘটনা না ঘটলেই বিরূপ মন্তব্যে মুখর হয়ে উঠেন। কোনরকম সংযমের পর্য্যন্ত চিহ্ন থাকে না। যার ফলে অনেক সময় বহু খেলোয়াড়ই নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং শেষপর্য্যন্ত তাদের খেলাও কার্য্যকরী হয়ে উঠে না। সুতরাং দর্শক সাধারণের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তাঁরা যেন সবসময় নিজেদের পছন্দমত খেলার ফলাফল হ'ল না বলেই বিরূপ না হয়ে ওঠেন। অবশ্য খেলোয়াড়দের তরফেও অনেক সময় আমি একটা অন্যায় লক্ষ্য ক'রেছি। অনেক খেলোয়াড় খেলার মাঠে রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠে। যেটা সত্যিকারের যে কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে অগৌরবের কথা। রেফারীর সিদ্ধান্ত ন্যায় হোক আর অন্যায়ই হোক, খেলোয়াড়ের সেটা বিচার ক'রবার কথা নয়। সে মাঠের মধ্যে নেমেছে খেলবার জন্য, প্রতিবাদ করতে নয়।

পরিশেষে আমার অভিমত এইযে, খেলার মান উন্নত ক'রতে হলে দুটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন। যে সমস্ত খেলোয়াড়দের 'ফুটবল সেন্স' আছে শুধু তাদেরই দলের মধ্যে খেলবার সুযোগ দেওয়া এবং সত্যিকার যাঁরা অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও প্রবীন খেলোয়াড় তাঁদেরই উপর নির্ব্বাচনের গুরুভার অর্পণ করা।

ভবিষ্যতের জন্য আরও কিছু বল'বার আশা রেখে আমার সীমিত বক্তব্য এখানেই শেষ ক'রলাম।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিশ্ব ফুটবল কাপ ঃ—

১৯৬২ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ (জুল রিমে কাপ) প্রতিযোগিতার শেষ পর্য্যায়ের খেলা হয় দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলিতে। এই শেষ পর্য্যায়ের খেলায় যোগদান করেছিল ষোলটি দেশ। ষোলটি দেশের মধ্যে ১৪টি দেশ ছিল প্রাথমিক পর্য্যায়ের লীগের খেলায় বিভিন্ন

জুল রিমে কাপ

গ্রুপের শীর্ষস্থান অধিকারী দেশ আর ১৯৫৮ সালের জুল রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল এবং ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ চিলি। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে গতবারের বিজয়ী দেশ এবং এবারের প্রতিযোগিতার

উদ্যোক্তা দেশকে প্রাথমিক পর্য্যায়ে খেলতে হয়নি। তারা সরাসরি শেষ পর্য্যায়ে খেলবার অধিকার লাভ করেছিলো; কিন্তু বাকি ১৪টি দেশকে শেষ পর্য্যায়ে খেলবার জন্যে প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলায় নিজ নিজ গ্রুপে শীর্ষস্থান লাভ করতে হয়েছিল। ব্রেজিল এবং চিলিকে বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সমস্ত দেশগুলিকে বিভিন্ন জোনের গ্রুপে ভাগ ক'রে খেলানো হয়। প্রাথমিক পর্য্যায়ে ৬টি জোন ছিল—(১) ইউরোপীয়ান জোন (১০টি গ্রুপে বিভক্ত), (২) এশিয়ান জোন, (৩) আফ্রিকান জোন (৩টি সেক্সনে বিভক্ত এবং ফাইনাল পুলের খেলা), (৪) নিয়ার ইস্ট জোন, (৫) সাউথ আমেরিকান জোন (৪টি গ্রুপে বিভক্ত) এবং নর্থ আমেরিকান এ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল জোন (৩টি সেক্সনে বিভক্ত এবং ফাইনাল পুলের খেলা)। এই ৬টি জোনের মধ্যে ইউরোপীয়ান জোনের ১০টি গ্রুপের ১০টি দেশ, সাউথ আমেরিকান জোনের ৩টি দেশ এবং উত্তর-মধ্য আমেরিকান জোনের ১টি দেশ মোট ১৪টি দেশ চিলির শেষ পর্য্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ইউরোপীয়ান জোনের ১০টি গ্রুপের মধ্যে তিনটি গ্রুপের (৭, ৯ এবং ১০ নম্বর) চ্যাম্পিয়ান দেশকে ভিন্ন জোনের তিনটি চ্যাম্পিয়ান দেশের সঙ্গে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। এই খেলায় ইউরোপীয়ান জোনের ৭, ৯ এবং ১০ নম্বর গ্রুপের অন্তর্গত দেশই শেষ পর্য্যন্ত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ইউরোপীয়ান জোনের ৭ নম্বর গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান দেশ ইতালী নিয়ার ইস্ট জোন চ্যাম্পিয়ান ইসরাইলকে পরাজিত ক'রে, ৯ নম্বর গ্রুপের শীর্ষস্থান অধিকারী দেশ স্পেন আফ্রিকান জোন-চ্যাম্পিয়ান মরক্কোকে পরাজিত ক'রে এবং ১০ নম্বর গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ যুগোশ্লাভিয়া এশিয়ান-জোন চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে নিজ নিজ গ্রুপের শীর্ষস্থান লাভ করে। প্রাথমিক পর্য্যায়ের লীগের খেলায় নিম্নলিখিত ১৪টি দেশ চিলির শেষ পর্য্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

ইউরোপীয়ান জোনের অন্তর্গত ১০টি গ্রুপের ১০টি দেশ: সুইজারল্যাণ্ড (১নং গ্রুপ), বুলগেরিয়া (২নং গ্রুপ), পশ্চিম জার্মানী (৩নং গ্রুপ), হাঙ্গেরী (৪নং গ্রুপ), রাশিয়া (৫নং গ্রুপ), ইংলণ্ড (৬নং গ্রুপ), ইতালী (৭নং গ্রুপ), চেকোশ্লোভাকিয়া (৮নং গ্রুপ), স্পেন (৯নং গ্রুপ) এবং যুগোশ্লাভিয়া (১০নং গ্রুপ); দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা (১নং গ্রুপ), উরুগুয়ে (২নং গ্রুপ), কলম্বিয়া (৩নং গ্রুপ) এবং নর্থ আমেরিকা এবং সেণ্ট্রাল জোনের অন্তর্গত মেক্সিকো। মেক্সিকো নিজ জোনে চ্যাম্পিয়ান হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ৪নং গ্রুপের প্যারাগুয়েকে পরাজিত ক'রে ৪নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান হয়।

চিলিতে দু'রকমের খেলা হয় ১৬টি দেশকে সমান চার ভাগ ক'রে তাদের প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হয় এবং প্রত্যেক গ্রুপের শীর্ষ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়। নক-আউট খেলার সুরু হয় এই কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্য্যায় থেকেই।

চিলিতে লীগের শেষ পর্য্যায়ের খেলায় ১নং গ্রুপ থেকে রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া, ২নং গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী এবং চিলি, ৩নং গ্রুপ থেকে ব্রেজিল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ৪নং গ্রুপ থেকে হাঙ্গেরী এবং ইংলণ্ড এই ৮টি দেশ কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ব্রেজিল, চিলি, যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে এই চারটি দেশের মধ্যে একমাত্র ব্রেজিল ছিল গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান, বাকি তিনটি দেশ ছিল নিজ নিজ গ্রুপের রানার্স-আপ। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান দেশ রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী এবং হাঙ্গেরীর পরাজয় খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। একদিকের সেমি-ফাইনালে গত বারের (১৯৫৮ সাল) জুল রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল ৪—২ গোলে চিলিকে পরাজিত ক'রে এবং অপর দিকের সেমি-ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৩—১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে ছিল।

ফাইনাল খেলা—

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত দেশ চিলিতে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১৯৫৮ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রেজিল ৩—১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার 'জুল রিমে' কাপ (বিজয়ী দলের পুরস্কার) জয়লাভের

গৌরব লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব ফুটবল মহলে দক্ষিণ আমেরিকার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অপরদিকে চিলি ১—০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। সেমি-ফাইনাল খেলায় চিলি ২—৪ গোলে ব্রেজিলের কাছে এবং যুগোশ্লাভিয়া ১—৩ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল।

ফাইনালে প্রথম গোল দেয় চেক দলের পক্ষে লেফট-হাফ জোসেফ মাসোপুষ্ট খেলার ১৪ মিনিটে। এর ২ মিনিট পরই ব্রেজিলের লেফট-ইন আমারিল্ডো গোলটি শোধ দেন। প্রথমার্দ্ধের খেলায় আর কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার ৬৯ মিনিটে লেফট-হাফ জিটো হেড দিয়ে দলের দ্বিতীয় গোল দিলে ব্রেজিল ২—১ গোলে অগ্রগামী হয়। খেলার ৭৭ মিনিটে ব্রেজিলের সেণ্টার-ফরওয়ার্ড ভাভা দলের তৃতীয় গোল দেন।

একনজরে লীগের খেলার ফলাফল

গ্রুপ ১

উরুগুয়ে ২ : কলম্বিয়া ১
রাশিয়া ২ : যুগোশ্লাভিয়া ০
যুগোশ্লাভিরা ৩ : উরুগুয়ে ১
রাশিয়া ৪ : কলম্বিয়া ৪
রাশিয়া ২ : উরুগুয়ে ১
যুগোশ্লাভিয়া ৫ : কলম্বিয়া ০

গ্রুপ ২

চিলি ৩ : সুইজারল্যাণ্ড ১
পঃ জার্মাণী ০ : ইতালি ০
চিলি ২ : ইতালি ০
পঃ জার্মাণী ২ : সুইজারল্যাণ্ড ১
পঃ জার্মাণী ২ : চিলি ০
ইতালি ৩ : সুইজারল্যাণ্ড ০

গ্রুপ ৩

ব্রেজিল ২ : মেক্সিকো ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ১ : স্পেন ০
ব্রেজিল ০ : চেকোশ্লোভাকিয়া ০
স্পেন ১ : মেক্সিকো ০
ব্রেজিল ২ : স্পেন ১
মেক্সিকো ৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া ১

গ্রুপ ৪

আর্জেন্টিনা ১ : বুলগেরিয়া ০
হাঙ্গেরী ২ : ইংলণ্ড ১
ইংল্যাণ্ড ৩ : আর্জেন্টিনা ১
হাঙ্গেরী ৬ : বুলগেরিয়া ১
হাঙ্গেরী ০ : আর্জেন্টিনা ০
ইংল্যাণ্ড ০ : বুলগেরিয়া ০

॥ লীগ পর্যায়ে চূড়ান্ত ফলাফল ॥

প্রথম গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
রাশিয়া	৩	২	১	০	৮	৫	৫
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	০	১	৮	৩	৪
উরুগুয়ে	৩	১	০	২	৪	৬	২
কলম্বিয়া	৩	০	১	২	৫	১১	১

দ্বিতীয় গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
পঃ জার্মাণী	৩	২	১	০	৪	১	৫
চিলি	৩	২	০	১	৫	৩	৪
ইতালী	৩	১	১	১	৩	২	৩
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	৩	২	৮	০

তৃতীয় গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
ব্রেজিল	৩	২	১	০	৪	১	৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩	১	১	১	২	৩	৩
স্পেন	৩	১	০	২	২	৩	২
মেক্সিকো	৩	১	০	২	৩	৪	২

চতুর্থ গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
হাঙ্গেরী	৩	২	১	০	৮	২	৫
ইংল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৩	৩
আর্জেন্টিনা	৩	১	১	১	২	৩	৩
বুলগেরিয়া	৩	০	১	২	১	৭	১

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রেজিল ৩.	:	ইংল্যাণ্ড ১
চিলি ২.	:	রাশিয়া ১
যুগোশ্লাভিয়া ১	:	পঃ জার্মানী ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ১	:	হাঙ্গেরী ০

সেমি-ফাইনাল

ব্রেজিল ৪	:	চিলি ২
চেকোশ্লোভাকিয়া ৩	:	যুগোশ্লাভিয়া ১

ফাইনাল

ব্রেজিল ৩	:	চেকোশ্লোভাকিয়া ১

ভারত সফরে জার্মান ফুটবল দল ঃ

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত স্টুটগার্ট ভি এফ বি ফুটবল দল ভারত সফরের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অপরাজেয় সম্মান নিয়ে স্বদেশে ফিরেছে। এই দলটি ভারতবর্ষে মোট ৫টি খেলায় যোগদান ক'রে প্রত্যেকটি খেলায় জয় লাভ করে; মাত্র ৪টি গোল খেয়ে ১৯টি গোল দেয়। খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল: ভি এফ বি স্টুটগার্ট দল আই এফ এ দলকে (ক'লকাতা) ৩—১ গোলে, মহীশূর একাদশ দলকে (বাঙ্গালোর) ৮—১ গোলে, সাউদার্ণ জোনকে (বাঙ্গালোর) ২—০ গোলে, অন্ধ্রপ্রদেশকে (হায়দ্রাবাদ) ২—০ গোলে এবং বোম্বাই একাদশকে (বোম্বাই) ৪—২ গোলে পরাজিত করে।

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বর্ত্তমানে লীগ খেলার তালিকায় শীর্ষস্থান দখল ক'রে আছে—১৪টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট। দ্বিতীয় স্থানে আছে মোহনবাগান, ১৫টা খেলায় ২২ পয়েণ্ট। মোহনবাগান ৪টে খেলা ড্র করেছে এবং হার স্বীকার করেছে ২টো খেলায়—জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে ০—১ গোলে এবং উয়াড়ীর কাছে ০—১ গোলে। গত ১০ই জুন পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সমান ১২টা খেলায় সমান ১৯টা পয়েণ্ট ছিল। মোহনবাগান পরবর্ত্তী ৩টে খেলায় ৩ পয়েণ্ট পেয়েছে। লীগের খেলায় এখনও পর্যন্ত অপরাজেয় আছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ে। গত বছরের রানার্স-আপ বি এন আর দল ১১টা খেলায় ১২ পয়েণ্ট পেয়ে লীগের তালিকায় উপস্থিত ৫ম স্থানে আছে। তৃতীয় স্থানে আছে ই আই আর, ১০টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট এবং ৪র্থ স্থানে জর্জ টেলিগ্রাফ ১০টা খেলায় ১২ পয়েণ্ট।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা

(১৭ই জুন পর্য্যন্ত)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্ব	বি	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১৪	৯	৫	০	১৫	২	২৩
মোহনাবগান	১৫	৯	৪	২	৩১	১০	২২
ই আই আর	১০	৪	৬	০	৮	৩	১৪

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

[illegible] পত্রিকার মাধ্যমে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গদেশবাসীর সেবা করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ। আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ী জানেন যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা একটি সুরুচিসম্পন্ন অভিজাত মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আদর্শকে যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং আর্থিক বিষয় বিবেচনা না করিয়া সাময়িক পত্র হিসাবে ইহার মূল্যকে যথাসম্ভব সুলভ রাখিবারও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদিনই সকল প্রকারের ব্যয় এত অধিক মাত্রায় বর্ধিত হইতেছে যে কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি না করিলে ইহার আদর্শ ও উন্নত মান বজায় রাখায় অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। রচনা ও চিত্রের উৎকর্ষ যাহাতে ব্যাহত না হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াই আমরা বর্তমান আষাঢ় সংখ্যা হইতে প্রতি কপির মূল্য ও চাঁদার হার নিম্নলিখিতরূপে সামান্য বর্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার জন্য অবশ্য পত্রিকার সৌষ্ঠব ও কলেবরও বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র হইবে, তবে তালিকাভুক্ত গ্রাহকগণকে বিশেষ সংখ্যার জন্য কোনও স্বতন্ত্র বর্ধিত মূল্য দিতে হইবে না। এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য "ভারতবর্ষ"-র অনুরাগী পাঠকবৃন্দের বিশেষ অসুবিধা হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আষাঢ়, ১৩৬৯ সংখ্যা হইতে "ভারতবর্ষ"-র পরিবর্তিত

মূল্য ও চাঁদার হার

ভারতবর্ষের মধ্যে (ভারতীয় মুদ্রায়)

প্রতি সাধারণ সংখ্যা	১'২৫
প্রতি সংখ্যা রেঃ ডাকে	১'৭৫
বার্ষিক চাঁদা (সডাক)	১৫৲
ষাণ্মাসিক চাঁদা (সডাক)	৭'৫০

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক চাঁদা (রেঃ খরচ সহ)	২১৲
ষাণ্মাসিক চাঁদা (রেঃ খরচ সহ)	১০'৫০
প্রতি সংখ্যা (রেঃ ডাকে)	১'৭৫

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক চাঁদা (রেঃ খরচ সহ)	২৪৲
ষাণ্মাসিক চাঁদা (রেঃ খরচ সহ)	১২৲
প্রতি সংখ্যা (রেঃ খরচ সহ)	২৲

বিনীত—

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৬৯

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

টালা পার্ক

কলিকাতা ২

প্রিয় ফণীবাবু,

ভারতবর্ষের স্বুবর্ণ জয়ন্তী বৎসর। পঞ্চাশ বৎসর হয়ে গেল তার গৌরবময় জীবনের। দেশ ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়েচে। নব সংগঠনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আজ সে কালের কথা মনে পড়ছে। আমার তখন ছাত্রাবস্থা। সেই ছাত্র জীবনেই ভারতবর্ষের গ্রাহক হয়েছিলাম। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার সঙ্গে ভারতবর্ষের মাধ্যমেই পরিচয় হয়েছিল। ৺শরৎচন্দ্রকে চিনেছিলাম, জেনেছিলাম ভারতবর্ষের মধ্য দিয়েই। পরশুরাম—৺রাজশেখর বসু মহাশয়ের ‘লম্বকর্ণ’ ‘ভারিয়া পিরেত’ এদের চিনিয়েছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ আমার সাহিত্য-জীবনে অনেক দিয়েছে। ভারতবর্ষেই আমি ‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’ লিখেছি আপনার আমলেই। স্বুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে শতবার্ষিকীর মঙ্গলকামনা জানাই। সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি—ভারতবর্ষ থেকে নবীন লেখক দলের, মহৎ লেখকের আবির্ভাব ঘটুক। বাংলা সাহিত্য ও ভারতবর্ষ জয়যুক্ত হোক।

আষাঢ়—১৩৬৯

গত ‘আষাঢ়’ সংখ্যায় অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন :—

মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ,
„ উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন,
„ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু,
„ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়,
„ কৃষি, খাদ্য. সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন,

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
„ কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীবি, গোপাল রেড্ডী

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।
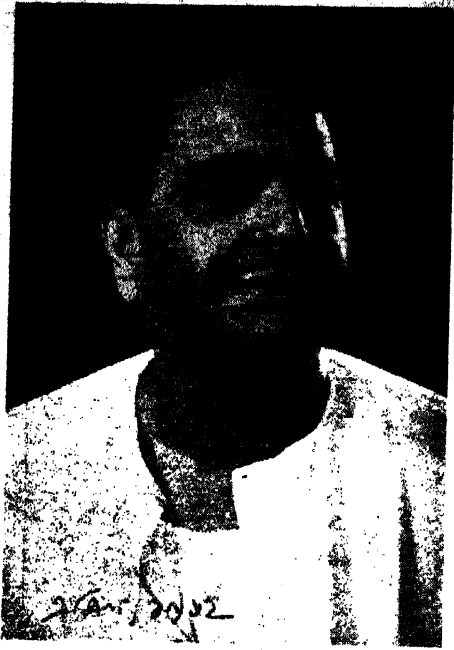
গোলকুটি

আদমপুর

পোঃ ভাগলপুর

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৯

'ভারতবর্ষ' প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন আমি মনিহারী গ্রামে মাইনর স্কুলে পড়ি। 'ভারতবর্ষ'-র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মহাপ্রয়াণ মনে যে গভীর হর্ষ-বিষাদের আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহা আজও মনে আছে।

তখন হইতেই আমি 'ভারতবর্ষ'-র নিয়মিত পাঠক। পরে ইহার লেখক-গোষ্ঠীভুক্ত হইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। আমার প্রথম উপন্যাস 'দ্বৈরথ' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষে'ই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম নাটক 'শ্রীমধুসূদন'ও। তাহার পর 'ভারতবর্ষ'তে আমার অনেক উপন্যাস, নাটক, গল্প, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমার সাহিত্য-সাধনাকে মর্য্যাদা দিয়া 'ভারতবর্ষ'-র কর্তৃপক্ষ আমাকে অশেষ ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অনেক উদীয়মান লেখকের লেখাই 'ভারতবর্ষ'-র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে 'ভারতবর্ষ' যে একটি নবীন অধ্যায় রচনা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহার স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবে আন্তরিক কামনা জানাই তাহার আয়ু যেন না ফুরায়।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)
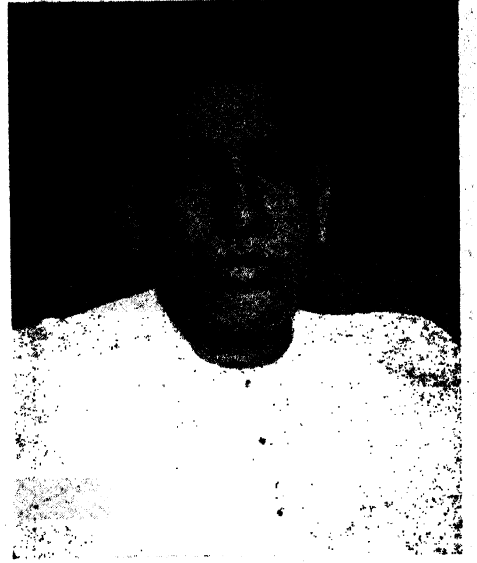
MINISTER
HOME (POLICE AND DEFENCE)
WEST BENGAL

Calcutta, the .... 196 .

৬।৭।৬২

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ উপাসক দেশ-প্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ'-র সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাঙ্গালী মাত্রেই পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করবেন। যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও মমত্ববোধের সঙ্গে গত পঞ্চাশ বছর ধরে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে 'ভারতবর্ষ' অকৃপণভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছে, তা বিস্ময়কর। বাংলার সাহিত্য-রথী ও সারস্বতগণের অনেকেই 'ভারতবর্ষ'-র উদার প্রেরণার কাছে ঋণী। জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ও জাতীয় চরিত্রের সমৃদ্ধি সাধনে ভারতবর্ষের দান বিপুল। সে কারণ সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতবর্ষের সুযোগ্য পরিচালক মণ্ডলীকে আমি অন্তরের অভিনন্দন জানাই। ভরসা করি, সাহিত্যকর্ম-সাধনে যে সুউচ্চ মান 'ভারতবর্ষ' স্থাপন করেছে তা নির্ভয়ে অবলম্বন করে শতবর্ষ পূর্তির যাত্রা-পথে সে এগিয়ে যাবে।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়
৬।৭।৬২

বিধানচন্দ্র রায়

॥ বিষণ্ণ দুপুরে ॥

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মধ্য দিনেতে যেন ঘনাল আঁধার
ধরণীতে—
নগরীর চঞ্চল, উচ্ছল, উজ্জ্বল
জীবনের স্রোতে,
অতি আচম্বিতে।
নিদাঘ বিশ্রাম রত জনতার মধ্যে—
দাবানল প্রায় সেই বারতা ভীষণ
ছড়ায়ে পড়িল করি মানুষে দহন,
সে শোক-বহ্নিতে।
স্তম্ভিত, বিস্মিত যেন বজ্রাহত প্রায়
শুনিল সে বাণী সবে
সভয়ে সখেদে—
বাংলার রূপকার, বঙ্গ-কর্ণধার
মুখ্য-মন্ত্রী সেই মহান বিধান,
এ মহাদেশের সেই বৈদ্য-প্রধান,
অলঙ্ঘ্য বিধানে কার করেছে প্রয়াণ—
অমর সে লোকেতে।
শত বুক চিরে উঠে হাহাকার
আকাশে,
মিশে যায় বেদনায় ভারী সেই
বাতাসে।

শত আঁখি হতে জল
ঝরিল যে অবিরল,
শত মন ভেঙ্গে যায়
নীরবে নিভৃতে।

আকাশের পানে চাহি
সেই শোক লগ্নে,
ব্যথাতুর মন যবে ব্যাকুল অনুযোগে
বিধাতারে বলে ওঠে ক্ষিপ্ত অভিযোগে—
'হরিলে কেন গো তুমি
এ মহান রত্নে,
হানি শেল বাঙ্গালীর বুকেতে।
কেন তারে দিলে না কো আরও সময়,
আরও বল, আরও আয়ু,
এ জীবন
আরও স্বাস্থ্যময়।
কেন আজি শেষ হল কর্ম্মের মাঝেতে,
এ জীবন
মহাকর্ম্মময়।
জন্মের দিনটিতে
মৃত্যুরে আনিয়ে,
বাঁধিলে দোঁহারে কেন
একছন্দে সুরে—
এ বিষণ্ণ দুপুরে।'

অন্তর মাঝে যেন ধ্বনিল উত্তর,
অলক্ষ্যে—
'পরিণত বয়সে, প্রয়োজন শেষেতে
করি কর্ম্ম আজীবন
মহাকর্ম্মবীর,
মহান সুজন।
দেহ ছাড়ি পুরান, আসিয়াছে ফিরে পুন,
ঈশ্বর-বক্ষে।
শাস্তি যদি দিতে চাও তাহারে,
জীবনের ওপারে।
অসমাপ্ত কর্ম্ম তার কর শেষ,
আরব্ধ কার্যের তার না রেখ
অবশেষ।
আত্মা তার হবে আনন্দময়,
দুঃখ যে
তার তরে নয়।
মহাশান্তি
পাবে পরপারে।'

শুনি এই বাক্য অন্তরে,
নমিলাম শ্রদ্ধাভরে
পরম পিতারে,
আমি বারে বারে—
সেই বিষণ্ণ দুপুরে।

শ্রাবণ—১৩৬৯

প্রথম খণ্ড	পঞ্চাশত্তম বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

বুদ্ধদেব ও নারী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

একটী সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেব নারীদের আধ্যাত্মিক জীবন-বরণ, অথবা সঙ্ঘ-গঠনের পক্ষপাতী একেবারেই ছিলেন না ; এবং সেইদিক থেকে, তিনি নরনারীর সমানাধিকার স্বীকার করেননি। বুদ্ধদেবের বাণী-সংগ্রহ, সুবিখ্যাত "অঙ্গুত্তর-নিকায়ে" ভিক্ষুণী সঙ্ঘ-গঠনের যে ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, তা' এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচ্য ; কারণ, এই 'সুত্তে' (অঙ্গুত্তর-নিকায় ৪-২৭) নারীদের সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের ধারণা ও মতামতের আভাস পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেব যখন কপিলাবস্তু নগরে, বোধিবৃক্ষো-দ্যানে, শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন মহাপ্রজাপতি গৌতমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন :—

"প্রভু! নারীদেরও সংসার পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণে এবং ভগবান তথাগত নির্দিষ্ট ধর্মবরণে অনুমতি দান করা কর্তব্য।"

বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন :—

"যথেষ্ট হয়েছে, গৌতমি! এরূপ সন্ন্যা ধর্মবরণে কৃতসংকল্প হয়োনা।"

দৃঢ়সংকল্পা মহাপ্রজাপতি বারংবার তিনবার

এই প্রার্থনা নিবেদন করলেন ; কিন্তু তিনবারই ভগবান্ বুদ্ধ সেই একই উত্তর দিলেন। পরিশেষে, গৌতমী হতাশ হয়ে, রোদন করতে করতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ যখন বৈশালী নগরীতে অবস্থান করছিলেন, তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী কেশ কর্তন করে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, বহু অনুরূপ ভিক্ষুণী বেশধারিণী নারী সমভিব্যাহারে পদব্রজে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে' ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে, ধূলিধূসরিত পদে, ভগবানের দ্বারদেশে উপবিষ্ট হয়ে রোদন করতে লাগলেন। বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ এই দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হয়ে,' ভগবান্‌কে বল্লেন :—

"প্রভু মহাপ্রজাপতি গৌতমী সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি-প্রাপ্ত না হয়ে,' ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে, ধূলিধূসরিত পদে, রোরুদ্যমানা হয়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। ভগবন্ ! নারীদেরও সন্ন্যাসগ্রহণে ও তথাগতনির্দিষ্ট ধর্ম-বরণে অনুমতি দান করা কর্তব্য।"

বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন :—

"যথেষ্ট হয়েছে, আনন্দ ! নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও ধর্ম-বরণ বিষয়ে অভিলাষী হয়োনা।"

বারংবার তিনবার আনন্দ একই প্রার্থনা নিবেদন করলেন। কিন্তু তিনবারই ভগবান্ সেই একই উত্তর দান করলেন।

তখন দৃঢ়সংকল্প আনন্দ বুদ্ধদেবকে স্পষ্টভাবে একটী প্রশ্ন করলেন :—

"প্রভু ! যদি নারীরা সংসার পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ ও তথাগত নির্দিষ্ট ধর্ম-বরণ করেন, তাহলে তাঁরা কি সাধনমার্গের উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে' পরিশেষে অর্হত্ব বা বুদ্ধত্ব লাভে সমর্থা হবেন ?"

ভগবান্ বুদ্ধ নিঃসংশয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন :—

"তাঁরা নিশ্চয়ই সমর্থা হবেন।"

আনন্দ সোৎসাহে পুনরায় শেষ প্রার্থনা নিবেদন করে' বল্লেন :—

"প্রভু ! নারীরা যদি এরূপে অর্হত্ব লাভে সমর্থা হন, তাহলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বিষয় পুনরায় চিন্তা করুন—যিনি ভগবানের মাতৃষসা, ধাত্রী, পালিকা মাতা, যিনি ভগবানের মাতার মহা-প্রয়াণের পরে ভগবানকে স্তন্যদান করেছিলেন। নারীদেরও সন্ন্যাস-গ্রহণে ও ধর্ম-বরণে অনুমতি দান করা কর্তব্য।"

এই সনির্বন্ধ প্রার্থনায়, পরিশেষে বুদ্ধদেব বল্লেন :—

"আনন্দ, যদি মহাপ্রজাপতি এই আটটী, মূলীভূত নিয়ম পালনে স্বীকৃত হন, তাহলে তিনি সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন।"

"প্রথমতঃ, একশত বৎসরের দীক্ষিত ভিক্ষুণী ও এক দিনের দীক্ষিত ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদন করবেন, এবং তাঁর সম্মুখে আসন পরিত্যাগ করে' দণ্ডায়মানা থাকবেন।"

"দ্বিতীয়তঃ, যেস্থলে কোন ভিক্ষু নেই, সেস্থলে কোনো ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করবেন না।"

"তৃতীয়তঃ, প্রতি মাসে দুবার ভিক্ষুণী ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট থেকে ধর্মাচারপালনাদি বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করবেন।"

"চতুর্থতঃ, বর্ষাবাসান্তে, ভিক্ষুণী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সঙ্ঘের সম্মুখেই স্বীয় দোষ স্বীকার ও মার্জনা-ভিক্ষা করবেন —যে দোষ কেহ দেখেছে, যে দোষের বিষয় কেহ শুনেছে, যে দোষের বিষয় কেহ সন্দেহমাত্রও করেছে।"

"পঞ্চমতঃ, গুরুতর দোষ করলে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সঙ্ঘের সম্মুখেই অর্ধমাস-কাল প্রায়শ্চিত্তাদি করবেন।"

"ষষ্ঠতঃ দুই বর্ষা-ঋতু শিক্ষা-লাভ করে,' ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের উচ্চতর বিভাগে প্রবেশের জন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সঙ্ঘ থেকেই অনুমতি প্রার্থনা করবেন।"

"সপ্তমতঃ, ভিক্ষুণী কোনদিনও ভিক্ষুকে তিরস্কার বা নিন্দা করবেন না।"

"অষ্টমতঃ, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে উপদেশ দান করতে পারবেন না ; যদিও ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে তা' দান করতে পারবেন।"

"এই সকল অষ্টবিধি প্রত্যেক ভিক্ষুণীকেই সমগ্র জীবন পালন করতে হবে গভীরতম শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে, কোনোদিনও এই সকল বিধি ভঙ্গ করা চলবে না।"

ভগবান্ বুদ্ধ এরূপ অষ্টবিধির উল্লেখ করে বল্লেন যে, যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই সকল বিধি অবশ্য-

পরিপাল্য রূপে গ্রহণে স্বীকৃতা হন, তাহলে তিনি সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারও লাভ করবেন।

আনন্দের মুখে এই আনন্দ-বার্তা শ্রবণে, গৌতমী তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে এই অষ্টবিধি পালনে সম্মতি-দান করলেন একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে ঃ—

"যেমন কোনো বেশভূষাবিলাসী তরুণ বা তরুণী মস্তক-প্রক্ষালন পূর্বক, পদ্ম-মালা যূথিকা-মালা বা সুগন্ধি পুষ্প-মালা, সাগ্রহে হস্তে গ্রহণ করে,' মস্তকে স্থাপন করেন, তেমনি আমিও এই মূলীভূত অষ্টবিধি সাগ্রহে গ্রহণ করলাম, এবং তা' জীবনে কোনোদিনও ভঙ্গ করবনা।"

আনন্দ ভগবান বুদ্ধকে এই সংবাদ দিলে, তিনি পুনরায় আশঙ্কা প্রকাশ করে' বল্লেন ঃ—

"আনন্দ, যদি নারীদের এই ভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ ও তথাগত-নির্দিষ্ট র্ম-বরণে অধিকার দান করা না হত, তাহলে এই আধ্যাত্মিক-জীবন (সঙ্ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী হ'ত, তাহ'লে এই সদ্ধর্ম নিশ্চয়ই একহাজার বৎসরকাল স্থায়ী হ'ত। কিন্তু যেহেতু নারীদের সেই অধিকার দান করা হয়েছে, সেহেতু এই আধ্যাত্মিক-জীবন বা সঙ্ঘ দীর্ঘকালব্যাপী হবেনা, সেহেতু এই সদ্ধর্ম মাত্র পাচশত বৎসর কাল স্থায়ী হবে।

"আনন্দ, যেমন,যে সম্প্রদায়ে নারীদের সংখ্যাই অধিক, কিন্তু পুরুষের সংখ্যা অল্প, সেই সম্প্রদায় সহজেই চৌর্য-তস্করাদি কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি ধর্মের যে কোনো অনুশাসনানুসারেই নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি-দান করা হোক না কেন, সেই আধ্যাত্মিক-জীবন (সঙ্ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী হবেনা।

"আনন্দ, যেমন সুপক্ক-ধান্যক্ষেত্রে শস্য রোগের প্রাদুর্ভাব হলে, সেই ক্ষেত্র দীর্ঘকালব্যাপী হয়না, তেমনি ধর্মের যে কোনো অনুশাসনানুসারেই নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি-দান করা হোক না কেন, সেই আধ্যাত্মিক জীবন (সঙ্ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী হবে না।

"আনন্দ, যেমন সুপক্ক ইক্ষুক্ষেত্রে শস্য-রোগের প্রাদুর্ভাব হলে, সেই ক্ষেত্র দীর্ঘকালব্যাপী হয় না, তেমনি ধর্মের যে কোনো অনুশাসনানুসারেই নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি-দান করা হোক না কেন, সেই আধ্যাত্মিক-জীবন (সঙ্ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী হবে না।

"আনন্দ, যেমন ভবিষ্যৎ চিন্তা করে', সুবৃহৎ জলাধারে বাঁধ দেওয়া হয়, যাতে জল নিঃসৃত হয়ে যেতে না পারে, তেমনি, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে', আমিও ভিক্ষুণীদের জন্য এই অষ্ট-বিধির বিধান দান করলাম—যা' তাঁরা জীবনে লঙ্ঘন করবেন না।"

বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ-গঠনের এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর-অর্থ-দ্যোতক ইতিহাস-পাঠে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠনের বিরোধী ছিলেন। তিনি যে সত্যই বিরোধী ছিলেন, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর এই অনিচ্ছার কারণ নারীদের প্রতি অশ্রদ্ধা, বা তাঁদের শক্তিতে অবিশ্বাস একেবারেই নয়।—এই একই 'সুত্তে' নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশ বিষয়ে বারংবার অনিচ্ছা-প্রকাশ করলেও, বুদ্ধদেব স্পষ্টতমভাবে বলেছেন যে, নারীদের অহর্ত্ব বা মহামুক্তি-নির্বাণ-লাভের শক্তি বিষয়ে তাঁর কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন ও স্থির জানেন যে, নারীরা সাধন মার্গের বিভিন্ন সোপান যথাযথ অতিক্রম করে,' উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উপনীতা হয়ে', পরিশেষে নির্বাণ বা অহর্ত্ব-লাভে ধন্যা হতে পারেন। এই উক্তির পরে, তিনি যে নারীদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধাহীন সহা-নুভূতিহীন বা অবিচারী ছিলেন, তা' কোনোমতেই বলা যায় না। জ্ঞান, সাধনা, তপস্যা ও মোক্ষে যে নরনারীর জন্মগত সমান শক্তি ও সমান অধিকার—সাম্যবাদী ভগবান্ বুদ্ধ তা' মুহূর্তমাত্রও অস্বীকার করেননি। বুদ্ধদেবের নিকট মনুষ্যমাত্রেই ছিল সমান-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নর-নারী-উচ্চ-নীচ-ধনি-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে সকলেই ছিল তাঁর নিকট সেই একই 'মানুষ'—একই শক্তির সমন্বয়ে বলীয়ান, একই মুক্তির মহিমায় মহীয়ান। তাঁর ধর্ম ছিল সেজন্য-আত্ম-গরিমার, আত্ম-বিশ্বাসের, আত্ম-প্রচেষ্টার ধর্ম।—ভারত-দর্শন-সার শ্রীমদ্ ভাগবদ্গীতা—একদিন আমাদের মানব-মহিমার মহতী আশার বাণী শুনিয়ে সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন ঃ—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

(গীতা ৬-৫)

অর্থাৎ, আপনিই আপনার উদ্ধার-সাধন কর; আত্মাকে

অবসাদগ্রস্ত করোনা। কারণ, একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু, একমাত্র আত্মাই আত্মার শত্রু।

ভগবান্ বুদ্ধও প্রায় একই সময়ে আমাদের সেই একই বিপুল বিশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বলেছেন :—

"অত্তা হি অত্তনো নাথ কো হিং নাথ পরো সিয়া।
অত্তনাহব স্বদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।"

(ধম্মপদ ১২-৪)।

অর্থাৎ, আত্মাই আত্মার নাথ বা পরম প্রভু, স্থিতি, আশ্রয়। অন্য নাথ তার আর কোথায়? আত্মা সুসংযত হলে, দুর্লভ, পরম প্রভু, স্থিতি আশ্রয় বা নির্বাণ লাভ হয়।

এরূপে, আত্মার অনন্ত শক্তি, অপার মহিমায় বিশ্বাসী বুদ্ধদেব আত্মার দিক্ থেকে নরনারীর মধ্যে কোনোরূপ ভেদ করেননি।

কিন্তু আত্মার দিক্ ব্যতীতও সংসারে আরেকটা দিক্ আছে, তা'হল বাহিরের সমাজের দিক্, জৈব প্রকৃতির দিক্।—দেহ ও আত্মা নিয়েই সংসারী জীব, এরূপ জীব নিয়েই সমাজ।—যাঁরা নবধর্ম-প্রবর্তক, যাঁরা ঘনান্ধকারের মধ্যে মানবসমাজকে নূতন আলোকের সন্ধান দান করেছেন —তাঁরা অবশ্য স্বভাবতঃই সামাজিক বহু নিয়মই স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করেন সমাজেরই কল্যাণের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সামাজিক যে নিয়ম মূলীভূত জৈব নিয়ম, কেবলমাত্র সংস্কারমূলক বা আচারবিচারগত নিয়ম নয়—সে নিয়ম ভঙ্গ করতে হলে, সেরূপ অনায়াসে করা চলে না, তার জন্য প্রয়োজন সুগভীর চিন্তা ও দূরদর্শিতা। যেমন, নারীদের শিক্ষা সামাজিক দিক্ থেকে অমঙ্গলপ্রসূ ধারণায়, নারীদের গৃহপিঞ্জরেই শিক্ষাদীক্ষা-হীন ভাবে আবদ্ধ করে' রাখার যে নিয়ম ছিল, তা' কেবলমাত্র সংস্কারমূলক নারীদের যাগযজ্ঞাদি অনধিকার বিষয়ে যে নিয়ম ছিল, তা' কেবলমাত্র আচারবিচারমূলক; কিন্তু নরনারীর অবাধ মিলনে সমাজে যে অনাচার-কদাচারের উদ্ভব হতে পারে, তারই আশঙ্কায় এরূপ মিলনের বিরুদ্ধে সামাজিক নিয়ম জৈব প্রকৃতিগত নিয়ম—সংস্কারমূলকও নয়, আচারবিচারমূলকও নয়। সেজন্য, অন্যান্য সংস্কারমূলক ও আচারবিচারমূলক নিয়ম যেরূপ অনায়াসে লঙ্ঘন করা যায়, জৈবপ্রকৃতিমূলক নিয়ম সেরূপ নিশ্চয়ই নয়।

ভগবান্ বুদ্ধ ছিলেন কেবল আত্মবিস্মৃত, উচ্চতমলোক-বিহারী, বাস্তবজ্ঞানশূন্য ঋষি নয়—সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন মানবের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টতম সম্পর্কে আবদ্ধ। তাঁর দর্শন ছিল মুষ্টিমেয়, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞানীগুণীর জন্যই নয় কেবল—আপামর জনসাধারণ প্রত্যেকেরই জন্য। সেজন্য, তিনি জনসাধারণের ইচ্ছা প্রবৃত্তি শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ছিলেন যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তাঁদের দোষত্রুটী, দৈন্যদুর্বলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সেজন্যই বাস্তবদর্শী ভগবান্, নরনারীর একই সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার শুভফলপ্রসূ বলে গ্রহণ করতে পারতেন না।

এস্থলে তিনটী প্রশ্নের উদয় হতে পারে।

প্রথমতঃ, জৈব প্রকৃতির নিয়মানুসারে নরনারীর সংস্পর্শ থেকে সাধারণ জীবনে ও সমাজে যে অনাচার-কদাচার, গ্লানি-মালিন্য, অধর্ম-পাপের সৃষ্টি হয়, তা' জৈব-প্রকৃতির পরিধির বহির্ভূত আধ্যাত্মিক জীবনে ও ধর্মসঙ্ঘেও কেন বিদ্যমান থাকবে? কারণ সাধনবলে, তপস্যা প্রভাবে, জৈবপ্রকৃতিকে বশীভূত করাই ত ধর্মের প্রধান কার্য।

এর উত্তর হল এই যে, ধর্মের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তাই—আত্মা দ্বারা দেহকে, সাধনা দ্বারা কামনাকে, অমৃতত্ব দ্বারা মৃত্যুকে জয় করাই ত ধর্মের একমাত্র সার। কিন্তু তা হল লক্ষ্যে উপনীত বিজয়ী, অর্হতদেরই প্রাপ্য সম্পদ্। অপরপক্ষে; যাঁরা সঙ্ঘে প্রবেশ করেছেন মুমুক্ষুরূপে, যাঁরা সসঙ্কোচে, কম্পিতচিত্তে অতি দুর্গম সাধনমার্গে প্রথম পদক্ষেপই মাত্র করেছেন, তাঁদের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন বহুদিন পদে পদেই স্খলনের ভয়ও তাদের স্বাভাবিক। তাঁদেরই জন্য ত কেবল "কামিনী-কাঞ্চন" পরিহারের সুকঠোর নিয়ম সর্বদেশে, সর্বকালে। নতুবা, যাঁরা সাধনসিদ্ধ, জীবন্মুক্ত পুরুষ, তাঁদের জন্য ত কোন আশঙ্কা, কোনো সাবধানতা, কোনো বিধি-বিধানের প্রশ্নই উঠে না। তাঁদের নিকট, "কামিনী"ই বা কে, আর "কাঞ্চনই" বা কোথায়? তাঁরা প্রত্যেকেই গীতায় বর্ণিত "বিজিতেন্দ্রিয়ঃ" "গুণাতীত" "যোগী",—"সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ" —মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমদর্শী (গীতা, ৬-৮; ১৪-২৪)। কিন্তু প্রথমশিক্ষার্থীকে নিশ্চয়ই প্রারম্ভে কামিনী-কাঞ্চনপ্রমুখ সমস্ত প্রলোভন সযত্নে পরিহার করেই চলতে হবে—নতুবা তার সিদ্ধি ও মুক্তি অসম্ভব।

আধুনিক যুগের ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবও সেজন্য নবীন ধর্মশিক্ষার্থীদের জন্য বারংবার "কামিনী-কাঞ্চন" পরিহারের বিধান দান করেছিলেন। তাঁর অনবদ্য উপমার সাহায্যে তিনি বলেছেন ঃ—

"সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েমানুষ হতে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি, ভক্তিমতী হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠবার সময় হেলতে দুলতে নাই। হেললে দুললে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় নাই; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পাল্লে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায়না।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ)।

এই যে "সিঁড়ি" ও "ছাদের" পার্থক্য, তা' হল আধ্যাত্মিক সাধনারই মূল কথা ঃ প্রথম দিকে সাবধানতা অবলম্বন, পরিশেষে সমদৃষ্টি। ভগবান্ বুদ্ধ এই মূলীভূত নীতি অনুসারেই নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দানে পরাঙ্মুখ ছিলেন, অন্য কোনো কারণেই নয়। তিনি জানতেন যে, ভিক্ষুণী সঙ্ঘ নামতঃ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরা নারীদের সর্বদাই ভিক্ষু সঙ্ঘের সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে; এবং এই ভাবে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ অনিবার্য হয়ে পড়বে। প্রথম সাধনাবলম্বী ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের তা' শুভফলপ্রসূ হবে কিনা—সেইটাই ছিল তাঁর চিন্তা ও আশঙ্কার বিষয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হতে পারে এই যে, বুদ্ধদেব বিশেষ করে' নারীদেরই সন্ন্যাস গ্রহণে ও স্বপ্রচারিত ধর্ম-বরণে বাধা দান করেছিলেন কেন?

এর উত্তরও হল এই যে, জৈব প্রকৃতির বিধান এরূপ সহজেই উপেক্ষণীয় নয়। এই সার্বজনীন নিয়মানুসারে, নারী মাতৃজাতি, সন্তানের স্রষ্ট্রী। সেজন্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিলে সাধারণ ক্ষেত্রে, পুরুষের অপেক্ষা নারীর পক্ষেই সংসার পরিত্যাগ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ অধিকতর কঠিন। অতএব, উৎসাহের প্রথম প্রাবল্যে সঙ্ঘে প্রবেশ করলেও, সকল নারীই শেষ পর্যন্ত এই আত্মসংযম-ব্রত রক্ষা করতে সমর্থা হবেন, কি না; তাঁদের জৈবিক-জননীত্বকে আধ্যাত্মিকজননীত্বে উন্নীত করতে অনুপ্রাণিত হবেন, কিনা—এই চিন্তাই দূরদর্শী বুদ্ধদেবকে ব্যাকুল করে' তুলেছিল। নতুবা, তিনি যে নারীদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা ও শক্তিতে অবিশ্বাসী ছিলেন না—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

তৃতীয় প্রশ্ন হতে পারে যে বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদের অষ্টানুশাসনের মাধ্যমে, নরনারীর সমানাধিকার অস্বীকার করে', নারীদের পুরুষাধীন করে গিয়েছিলে- কেন?

এরও কারণ হল, ভগবান্ বুদ্ধের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী—যা' বস্তুগত সত্য তাকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেবার সৎসাহস।—সেই যুগে, প্রকৃতি ও সমাজের সমস্ত দাবী ও বিধি নির্ভয়ে উপেক্ষা করে, অন্তঃপুরের ঘনান্ধকার ভেদ করে, নারীরা যখন উন্মুক্ত রাজপথে এসে প্রথম দাঁড়ালেন তখন সেই প্রথম আলোকপথাভিলাসিনীদের নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল পূর্বগামী ভিক্ষুদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতির। যে মোক্ষের পথকে উপনিষদ্ সভয়ে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"— (কঠোপনিষদ্ ৩-১৪)।

শাণিত ক্ষুরের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় সেই অতি দুর্গম পথে যাত্রারম্ভ সময়ে, নিশ্চয়ই তাঁদের প্রয়োজন ছিল পূর্ব যাত্রিগণের অমূল্য উপদেশের। অবশ্য, পরে কেবল আনুষ্ঠানিক নিয়মে পরিণত হলেও এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিচার-মূলক হয়ে পড়লেও, সাম্যমৈত্রীর মূর্ত প্রতীক, পরম-করুণাময় ভগবান্ বুদ্ধ যে উদ্দেশ্যানুপ্রাণিত হয়ে, প্রারম্ভে এই অষ্টবিধি প্রবর্তিত করেছিলেন, তা' সম্পূর্ণরূপেই সাধু ছিল, নিঃসন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে, প্রধান কথা এই যে, ভগবান্ বুদ্ধ নারীদের আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের বিরোধী ছিলেন না, সঙ্ঘে প্রবেশের বিরোধীই মাত্র ছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে সঙ্ঘে প্রবেশ—সমার্থক নয়। দ্বিতীয়টী ব্যতীতও প্রথমটী সম্পূর্ণ সম্ভব। সেজন্য বুদ্ধদেব নারীদের আধ্যাত্মিক সাধনার অধিকার দান করেননি—এ' কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাঁর প্রাণপ্রিয় সঙ্ঘ যেন কলঙ্কের সামান্যতম কালিমাতেও মলিন না হয়—এই ছিল তাঁর অন্তরের আকুতি। তাঁর আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না, বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী শোচনীয় অবস্থাই তার সাক্ষ্য দেবে। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম যে বুদ্ধদেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একসহস্র বৎসরের পূর্বেই অনাচার-কদাচার দুষ্ট হয়ে' বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য, কেবল ভিক্ষুণী-সঙ্ঘকেই দায়ী করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, বৌদ্ধ-ধর্মের এই মরণোন্মুখ যুগে, সত্যদ্রষ্টা ঋষি বুদ্ধদেবের অন্তর্নিহিত আশঙ্কার একটি ভয়াবহ মূর্ত চিত্র দেখে আমরা তাঁর সুদূরদর্শিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারি না। একমাত্র এই অতি স্বাভাবিক আশঙ্কার জন্যই তিনি নারী-দের সম্বন্ধে যে সকল বিধি-বিধান দান করেছিলেন, তা' নারীদের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে' গ্রহণ করলে, কেবল তাঁরই অমর্যাদা করা হবে মাত্র—সত্যের মর্যাদা করা হবে না।

অনেকের অনেকরকম বদ অভ্যাস আছে। সত্যেরও ছিল, কিন্তু সেটা একটু অস্বাভাবিক ধরণের। খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যে সব স্ত্রীলোকের ছবি থাকে তাদের মুখে কলমের রেখায় গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে দেওয়া ওর অভ্যাস। অবশ্য সর্ব্বদাই যে দেয় এমন নয়, তবে বিশেষভাবে যখন সে কিছু ভাবে, বা তার নিজের লেখার চিন্তা করে তখন অমনি আনমনে গোঁফ দাড়ি লাগানটা তার একটা বদ অভ্যাস—কোন কোন ক্ষেত্রে গোঁফহীন পুরুষের ছবিকেও সে খাতির করে না।

কলমে সত্যর গোঁফদাড়ি-প্রীতি থাকলেও ব্যক্তিগত ভাবে আদৌ নেই। সে সকালে উঠে চা' খাবার পূর্ব্বেই নিত্য নিয়মিত মুখখানাকে পরিষ্কার ভাবে কামিয়ে চকচকে করে তোলে। তার পরে বাইরে যায়—

এই সামান্য বদ অভ্যাসটা যে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটাবে তা কে জানতো ?

একখানা উপন্যাস জলদি শেষ করতে হবে বলে সে এই অসময়ে মুসৌরী চলে এসেছে। এখানে এখন মরশুমের শেষ, হোটেলে লোকজন বিশেষ নেই। শীত পড়ে এসেছে, হাওয়াবদলের যাত্রীরা চলে গেছেন। বিরাট হোটেলে লোকসংখ্যা কম,—কয়েকদিন হল কয়েকজন মহিলা হঠাৎ এসেছেন, দিল্লী ও এলাহাবাদ থেকে। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই হোটেলটার পূবের দিকে একটা চওড়া বারান্দা আছে,'—সকালে বিকালে সেখানে বসলে দেখা যায় পাহাড়ের উপর পাহাড় চলে গেছে—"স্থির তরঙ্গময় স্থিতার রত্নালয়"। সেখানে বসে বসে সত্য হিমালয়ের সৌন্দর্য্য পান করে, আর ভাবে, কখন লেখে'ও। মহিলাদের কয়েকজনের সঙ্গে তার পরিচয়ও' হ'য়েছে,—দু'জন সরকারী চাকুরে, সুনীতি কর ও সুলতা বসু—আর তিনজন ছাত্রী বি-এ, এম-এ পড়ে। লতিকা, বীথিকা আর নমিতা, ওরা এসেছে এলাহাবাদ থেকে। সুনীতি ও সুলতার বয়স প্রায় তিরিশ, সুলতার সিঁথিতে সিঁদুর আছে, ছাত্রীদের মধ্যে নমিতারও শাঁখা সিঁদুর আছে, বাকী সকলেই কুমারী।

বিরাট হিমালয় আর বিস্তীর্ণ পুরীর সমুদ্রের একটা ভয়াবহ প্রভাব আছে মানুষের মনের উপর—এখানে এই

বিরাট বৈচিত্র্যের মাঝে এসে বিগত-যৌবন যৌবনকে ফিরে পায়, মন বালকসুলভ চাপল্য ও প্রগলভতায় লজ্জা বোধ করে না। সত্যর বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও তার মনের খোলস্ খুলে পড়েছিল—তাই আলাপ সকলের সঙ্গেই তার হ'য়েছে, বিশেষতঃ বিদেশে সবাই বাঙ্গালী। কিন্তু সত্য কাজের ক্ষতি করে নি, তার লেখা চলছিল ঠিক ঠিকই—

বারান্দায় মাসিক পত্রিকাটা ভুল করে ফেলে রেখে এসে ঘরে বসে লিখছিল, এমন সময় হোটেলের চাকরটা বইখানা ফেরৎ দিয়ে গেল। লিখবার ভাব ধারাটা হঠাৎ ভঙ্গ হ'য়ে গেছে, কলম রেখে সে বইটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ভাবছিল। হঠাৎ একটা পাতায় তার দৃষ্টি আটকে গেল—

একটি পুরুষের ছবিতে কে যেন কানে ইয়ারিং, নাকে নাকছাবি, নোলক, মাথার খোঁপা এঁকে দিয়েছে। তার বিপরীত পৃষ্ঠায়ই সত্য অবশ্য কোনও নারী প্রতিকৃতির মুখে গোঁফ দাড়ি এঁকে দিয়েছিল। সত্য বুঝলে, ওদের মধ্যে কে যেন জবাব দিয়েছে' তার বদ অভ্যাসের। সে মনে মনে হেসে, চাকরকে ডাকলো—

চাকর আসতেই বইটা দেখিয়ে বললে—কে দিয়েছিল এটা তোমাকে?

—আজ্ঞে বইটা বাইরে পড়ে ছিল, আপনার বই দিয়ে গেলাম—

চাকরকে জেরা করে এর বেশী সে আর জানতে পারেনি। কিন্তু কে?

সুলতা একটু স্থূলকায় গম্ভীর প্রকৃতির, তার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। সুনীতি অবশ্য দেখতে সুন্দরী, তরুণী, তন্বী তার চেহারা, বেশ স্মার্ট, কথায় জব্দ করা কঠিন, তথাপি তার মধ্যে যে শালীনতা বোধ রয়েছে' তাতে তাঁকেও সন্দেহ করা চলে না। বাকী ছাত্রী তিনটির মধ্যে নমিতা সুন্দরী হলেও অত্যন্ত লাজুক, কথাবার্ত্তা বলতে ঘেমে ওঠে, তার পক্ষেও সম্ভব নয়। লতিকা আর বীথিকা নেহাৎ ছেলেমানুষ, তাদের পক্ষে তার মত একজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে পরিহাস করাও খুব স্বাভাবিক নয়।

সত্য ভাবছিল, কিন্তু যুক্তি দ্বারা সে কিছু বুঝতে পারেনি, তবে মনে মনে আশা করছিল যদি সুনীতি হয় তবে সে খুশী হবে।

সত্যও বিয়ে করেনি বা তার বিয়ে হয়নি এখনও,—হিমালয়ের প্রশান্ত বুকে রোমান্সের জন্য তার মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠবে এটা আর আশ্চর্য্য কি? সত্য পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতা আবার ওল্টাতে লাগল। পুরুষের ছবিগুলিতে নির্ব্বিচার নাকছাবি ইয়ারিং, নথ, নোলক, খোঁপা দেওয়া হ'য়েছে। সত্য মনে মনে একটু আনন্দের সঙ্গেই হাস্‌লো—

বিকালের চ'র আসরটা বাইরের বারান্দায়ই বসত। সত্য আজ একটু আগে আগেই গিয়ে বসল বারান্দায়,—দূরের পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশের শ্যামলতা ছড়িয়ে গেছে আজ তার মনে। একে একে ওরাও সকলে এসে বসলেন—চা ও এল—

সুনীতিই প্রশ্ন করল 'প্রথম—সত্যবাবু কি ভাবছেন? বিয়োগান্তই হবে না—মিলনান্তই হবে তাইত?

সত্য বলল,—তা ঠিক নয়, তবে—

—তবে আর কি? লেখায় ভাবনা ছাড়া আর কোন ভাবনা মাথায় এসেছে কি?

এসেছে—

বীথিকা বললে,—কি?

—ভাবছি, যদি সব মেয়ের গোঁফ দাড়ি হত, আর যদি পুরুষেরা খোপা বাঁধতো, নাকে নোলক, নাকছাবি পরত' তবে কি হত?

সত্য তাড়াতাড়ি ওদের মুখগুলি ভাল করে দেখে নিল, কারও মুখে কিছু ভাববৈলক্ষণ্য ঘটেছে কিনা?

সুনীতি বললে—এটা ভাববার বিষয় হল? তাহলে পুরুষের নাম মেয়ে হত, মেয়ের নাম পুরুষ হত—

সুলতা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, যেন এ আলোচনাটা শালীনতায় বাধে।

নমিতা ব'ললে,—এই গুরুতর সমস্যা নিয়ে এত ভেবে পড়লে ত লেখা বন্ধ হয়ে যাবে—

সুনীতি ঠাট্টা ক'রল—ভাবনা এসে গেলে উনি কি করতে পারেন? ভাবতেই হবে—

বীথিকা বলল,—তা ত বটে! ভাবনা কখন কিভাবে আসে—

সত্য তীক্ষ্ণভাবে সুনীতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—ভাবনাটা কি হঠাৎ আসে ?

—তাইত আসে। নইলে আপনার উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিয়ে যে ভাবনা—তাকি আমরা ভাবতে বলি—ভাবাটা আপনার রোগ তাই ভাবেন—

লতিকা চট্ করে বললে,—ওই রোগ আছে বলেই আপনি লেখক, আর আমাদের নেই বলেই আমরা পাঠক—

সুনীতি বললে—আমাদেরও রোগ আছে বই কি। ধরুন, ল' এর সঙ্গে ম' এর বিয়েটা কেন লেখক দিলেন না, এ নিয়ে আমাদের যত দুর্ভাবনা—

সকলে হেসে উঠল। সুনীতিও হাস্‌লো।

সুলতা হঠাৎ বললে,—সুনীতি কি সব ছেলেমানুষী আলোচনা হচ্ছে ?

—দ্যাখো সুলতাদি, বেড়াতে এসে এই হিমালয়ের বুকেও যদিনা একটু ছেলেমানুষী করি তবে কখন করব—দিল্লীর আফিসে ? সেখানে ত ফাইল আর ফাইল—

নমিতা বললে,—বাড়ীতে গেলে ত পরীক্ষার ভাবনা ভাবতেই বুড়িয়ে যেতে হয়—

সত্য বললে—থাক্ তবে সব দুর্ভাবনা, নতুন কিছু আমরা ভাবি—

বীথিকা বললে,—সেই ভাল, আচ্ছা সত্যবাবু আপনার বিয়ের বয়স ত প্রায় পেরিয়ে গেল, তা বিয়ে করেন নি কেন ?

সুনীতি বললে—এও ত আর একটা দুর্ভাবনা,—বিয়ে করেন নি, না হয়নি, না কল্পনা জগতে করেছেন—

লতিকা টিপ্পনী করলো,—না বিয়ে করেও হয়ত করেন নি এমনও হ'তে পারে—

সুলতা বললে,—সবই হ'তে পারে, কিন্তু হয়নি এইটেই বাস্তব ঘটনা—

সত্য বললে,—এইটেই অত্যন্ত বাস্তব সত্য। কেন হল না, কেন হয়নি তা নেহাৎ বিধিলিপি।

সুনীতি বললে,—তা ছাড়া কি ? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ না হলে বিয়ে ত হয় না।

সকলেই হেসে উঠলো। সুলতা বললে,—যাদের বিয়ে করার সাহস নেই তারাই বিয়ে করে না। এমনি আড্ডা চলল।

বিকেলে বৈকালিক ভ্রমণ প্রভৃতি শেষ করে এসে সত্য রাত্রের লেখা ঠিকই লিখল। কিন্তু শোবার সময় সে বিশ্লেষণ করল মনে মনে,—কার পক্ষে এইটি সম্ভব ? সুনীতি কেন তার ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামায় ? বীথিকা কেন তার বিয়ের প্রশ্ন করলে ? সুলতাই বা এত গম্ভীর কেন ? সত্য মনে মনে বিচার করে—কিন্তু কে তা ঠিক করতে পারে না। তবে সুনীতিকে বেশী করেই সন্দেহ হয় তার।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে সত্যর একটু দেরী হয়ে গেল—

ঘরে চা দিতে এসে চাকর একটা বুনো ফুলের তোড়া টেবিলের উপর রাখল। সত্য অবাক হ'য়ে বল্‌লে—কে দিয়েছে এ ফুলের তোড়া ?

—কেউ দেয়নি, বাইরে দরজার সামনে পড়েছিল তাই তুলে নিয়ে এলাম।

—এম্‌নিই পড়েছিল ?

—হাঁ্যা, চৌকাঠের উপর, তাই নিয়ে এলাম—

সত্য চা খেতে খেতে ফুলের তোড়াটা নেড়ে-চেড়ে দেখছিল, হঠাৎ টুপ করে তার ভিতর থেকে চার ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো পড়লো—ছোট একটু লেটার পেপারের কাগজে লেখা। মেঁয়েলি ছাঁদের সুন্দর অক্ষরগুলি, সুস্পষ্ট—তাতে লেখা—

মেয়েদের মুখে যদি সত্যিই দাড়ি গজায় তবে সেটা কি পুরুষের পক্ষে খুব সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হবে ? আর পুরুষেরা যদি খোঁপা বেঁধে নাকে নোলক আর নথ পরে, তবে সেটাই কি মেয়েদের পক্ষে খুব আনন্দের হবে ? আমার মনে হয়, যে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভাল। বহুদিন থেকে আপনার লেখা পড়ছি, মনে মনে সাধুবাদও দিয়েছি—তবে এ কথা কল্পনা করিনি যে মেয়েদের মুখে দাড়ির স্বপ্ন আপনি দেখতে পারেন। ভবিষ্যতে দাড়ি গজালে খোঁপা আর নথও গজাবে। ইতি—রহস্যময়ী।

সত্য কাগজের টুকরো হাতে করে ভাবল—এ রহস্য ভেদ করতেই হবে। কে তাকে এই আক্রমণ করেছে'

পিছন থেকে। কে রহস্যময়ী তার জীবনে হঠাৎ দোলা দিলে ?

সত্য বারান্দায় যেতেই দেখে ওরা পাঁচজন বসে আছে, আর সকলেই সংবাদপত্রের আধুনিক সংবাদের চর্ব্বিত চর্ব্বণে ব্যস্ত। সত্য একখানা চেয়ারে বস্তেই বীথিকা প্রথম কথা বললে—আজকার সান-রাইজটা দেখলেন না আপনি, কি সুন্দর দৃশ্য হয়েছিল। পাহাড়গুলোর চূড়ার উপরে মেঘ ছিল আজ, রংএর এক সমারোহ—

সুনীতি ব্যঙ্গ করল,—ওর মনে কত রংএর সমারোহ, এই পার্থিব রংএর সমারোহ দিয়ে ওর কি হবে ? এহ বাহ্য—

সত্য সুনীতির মুখখানা ভাল করে দেখল, সে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে। তা হ'লে সুনীতিই কি সব জানে ?

লতিকা বললে,—তার মানে সুনীতিদি, আপনি বল্‌তে চান এতদিন অর্থাৎ ওর জীবনের এই পঁয়ত্রিশ বছরে ওর মনে রংএর সমারোহ ছিল না, আজ সকালে হঠাৎ এই সমারোহের রহস্য দেখা দিয়েছে—এই মুসৌরীতে এসে ?

সত্য লতিকার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে চাইল—রহস্য কথাটা কানে তার খট করে লেগেছে। তা হলে লতিকা কি এই 'রহস্যের কথা জানে ? সেও মুখ টিপে টিপে হাসছে'—

নমিতা বললে,—জীবনটাই ত রহস্য। সে রঙীণই হোক্, আলোরই হোক্, আর অন্ধকারই হোক্—

বীথিকা বললে,—তার হেতুটা হচ্ছে এই যে মানুষও রহস্যময়, আর মানবীও রহস্যময়ী, অজ্ঞাত এই রহস্যই জীবনটাকে রহস্যময় করেছে—

সত্য ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। নমিতার সিঁথিতে সিন্দুর চিক্‌চিক্ করছে। বীথির ওষ্ঠে লাল রং, দুজনই রহস্যজনক ভাবে হাস্‌ছে।

সুলতা বললে—সকলে মিলে সকালটাকেই রহস্যময় করে তুললে যে ! ওকে কিছু বলতে দাও—এসব সম্বন্ধে ওঁর কোন অভিমত আছে কিনা ?

সত্য সংক্ষেপে বললে,—আমি আপনাদের সঙ্গে একমত—

সুনীতি বললে,—কি বিষয়ে ?

—আপনারা সকালেই যে রহস্যময়ী এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই, বিশেষতঃ আপনাদের ওই মুখ টিপে হাসি—

লতিকা বললে—তার মানে ?

—মানে এই যে, কোন হাসিটা ব্যঙ্গের কোনটি আনন্দের, কোনটি স্বপক্ষে কোনটি বিপক্ষে কিছুই বুঝবার উপায় নেই—

সুনীতি বললে,—আর এই বিদ্যে নিয়ে আপনি উপন্যাসে নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করেন, আর রহস্যময় হাসির ব্যাখ্যা করে পাঠকের বাহবা নেন ?

সত্য বললে,—বাহবা পাই কিনা জানি না। তবে আমার উপন্যাসের নারীচরিত্র ত' আমার গড়া, তাদের আমি চিনি, তাদের হাসি চিনি, মন চিনি, কিন্তু আপনাদের ত চিনি না—তাই হাসিও চিনি না। মনও চিনি না—

লতিকা বললে,—চিনুন, তা যদি চিনে নিতে না পারেন তবে মনগড়া চরিত্র দিয়ে কতদিন আর পাঠকের মন ভোলাবেন—

সত্য তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে,—হায় রহস্যময়ী !

সুনীতি বললে,—তা আজ সকালটাই রহস্যজালে একেবারে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এখন আপনি লিখবেন, না বেড়াতে বেরুবেন ?

সত্য বললে—না, এখন লেখার মুড নেই, মলে একটু যেতেও হবে, কাজ আছে—

—তবে চলুন, সকলেই একটু বেড়িয়ে আসি।

সকলে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। সত্য ওদের সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা করে ফিরে আসবে ঠিক করেছিল কিন্তু হল না।

সুনীতি কিছুক্ষণ বাদে বললে,—না, এ উঁচু নীচু রাস্তায় চলাও ভার—ফিরে যাই—

সত্য বলল,—আসুন একটু কাফি খেয়ে নেওয়া যাক্। তা হলেই আরও ঘোরা-ফেরা করা যাবে—

—সকলে আপত্তি জানালো, সত্য বলল,—তা হলে আমি একটু পরেই যাবো—

ওরা হোটেলে রওনা দিলে সত্য একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে, কাফির অর্ডার দিল। কাফি সামনে করে বসে সকালের রহস্য ভেদ করবে, মনে মনে যুক্তি আরম্ভ করল।

একবার মনে হয় সুনীতি, তার পরে একে একে সন্দেহ হয় সকলকেই। সুলতাই বা এই রহস্য সম্বন্ধে এত নীরব কেন? সত্যর ভাবনা ক্রমশঃ জট পাকিয়ে যায়—

সত্য অকারণ খানিক ঘোরা-ফেরা করে এবং অনাবশ্যক কিছু জিনিষ কিনে যখন হোটেলে ফিরল তখন বেলা দশটা। সকালের শীত গিয়ে একটু গরম লাগছে। জামা-কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়বে, ভেবে বিছানায় গিয়ে বসতেই দেখে একখানা চিঠি খোলা খামে—তেমনি সুন্দর মেয়েলি লেখা—

রহস্যময়ীকে খুঁজে বের করতে যত্নের ত্রুটি করেন নি দেখছি। আজ সকালে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের মুখ দেখছিলেন—কার মুখে আপনার চোখে স্বীকারোক্তি ফুটে ওঠে তাই হয়ত দেখছিলেন। কিছু পেলেন কি? পাননি নিশ্চয়ই,—কারণ এটা ত আপনার উপন্যাসের নায়িকা নয় যে যা খুশী একটা করবেন, এটা কঠিন বাস্তব। সমালোচকরা বলেন, নারীচরিত্র সৃষ্টিতে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—অন্তর্দৃষ্টিটা কত গভীর সেটার পরিচয় এবার হয়ত আপনি পাবেন। যা হোক আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে আপনার লেখার পরে আমার দুর্ব্বলতা ছিল, আজ মানুষটির পরেও দুর্ব্বলতা একেবারে নেই তা বলব না। আপনার ব্যবহার ও আলাপে আলোচনায় ভদ্রতার অভাব নেই, সেজন্য ধন্যবাদ। কেবল মাত্র ভদ্রতা ও শালীনতা বোধ দ্বারা নারীকে পাওয়া যায় না, তাকে জয় করতে হয় তার হৃদয়কে বুঝে। ইতি র।

সত্য চিঠিখানা বিছানার নীচে গুঁজে রেখে ভাবছিল,—আজ অতীত যৌবনে যদি তার উপরে কারও দুর্ব্বলতা জেগেই থাকে, তবে তার পক্ষে তাকে জয় করার পৌরুষ থাকা উচিত। কিন্তু কোন্ তরুণী তাকে জয় করতে আহ্বান করেছে সেইটেই একেবারে রহস্যময় হয়ে রইল—সত্য তাই ভাবছিল—

—ঘুমুচ্ছেন নাকি সত্যবাবু?

সত্য ফিরে দেখে সুনীতি। সত্য ওঠে বসে বলল,—না, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি—

—দেহের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে ত এখানে এলাম, কিন্তু মনের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে যে! কিছু ওষুধ আছে?

—অর্থাৎ!

—বই-পত্র পড়বার মত কিছু আছে? সময় ত কাটে না আর—বাজে গল্প আর কত করি? সুনীতি কথা বলতে বলতে টেবিলের উপর থেকে মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। সত্য তার মুখের দিকে চেয়েছিল—সুনীতি চেয়ারে বসে পড়ল।

যে দৃষ্টিটাকে কেন্দ্র করে—সত্যর জীবনে রহস্যময়ীর উদয় হয়েছে সেখানে এসে সুনীতি হঠাৎ থেমে গেল। একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে, বিরক্তির সঙ্গে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, এসব দাড়ি গোঁফ, খোঁপা নোলক নাকছাবি লাগিয়েছে কে? আপনি?

—কতকটা—আংশিক—

—তার মানে?

—তার মানে, আমি দু'একটা ছবিতে গোঁফ দাড়ি অবশ্য দিয়েছিলাম, ওটা আমার বদ-অভ্যাস—কিন্তু কে যেন তার প্রতিবাদে ওই খোঁপা প্রভৃতি লাগিয়ে দিয়েছে—

—কে দিয়েছে?

—আপনাদেরই কেউ, বইটা সেদিন বাইরে ফেলে এসেছিলাম—

—এ হতেই পারে না, আমাদের মধ্যে এমন অসভ্য বেরসিকা কে থাকতে পারে? কিন্তু আপনিই বা মেয়েদের মুখে এসব লাগান কেন?

—মেয়েদের মুখে ত নয়, ছবির মুখে—

—একই কথা। ছবিগুলো সব কিম্ভূতকিমাকার হয়েছে,—এটা কি ভাল হয়েছে?

সুনীতি একটু বিরক্তির সঙ্গে বইটা টেবিলে রেখে দিয়ে বলল—বই কিছু নেই?

সত্য বুঝলো সুনীতির নীতিতে বেঁধেছে, সে বিরক্ত হয়েছে। সত্য তাই বলল,—বই আনলে লেখা হবে না—তাই বই আনিনি—অর্থাৎ পড়তে আসিনি, লিখতে এসেছি—

সুনীতি এবার চটুল একটু হেসে বল্লে,—হ্যাঁ লিখুন, কিন্তু এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আমরা পড়বার বই চাইব, এসব কল্পনা করতে পারেন নি কেন?

সত্য ব্যঙ্গ করল—কল্পনার দৌড় ঠিক অতদূর পৌঁছয় নি—

—কতদূর লিখলেন ?

—কিছু কিছু হল, যতদূর হওয়া উচিত তা হয়নি—

—কেন ?

ঠিক লেখার মুড আস্‌ছে না, একটা রহস্য মনটাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। সত্য সুনীতির মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। 'রহস্য' কথাটা সে ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছে।

সুনীতি বললে,—রহস্য আবার কি ? রহস্য নিয়ে ব্যস্ত হলে ত লেখাই হবে না।

সত্য ক্ষুব্ধ হল,—সুনীতি অন্ততঃ এ রহস্যময়ী নয় তা সে এখন ঠিকই বুঝেছে, সেটা তার পক্ষে একটু নিরাশার কথাও বটে। সুনীতি উঠে বললো,—আসি, বিকেলে দেখা হবে—

সত্য বিছানায় পুনরায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল,—সুনীতি যদি এই রহস্যময়ী হত তবে সে খুশী হতে পারত, কিন্তু সে নয় বলেই সে যেন মনে মনে দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কে ?

সত্য ভাবছিল,—পায়ের শব্দ পেয়ে আবার উঠে বসল। বীথিকা, লতিকা আর নমিতা এসেছে,—

আসুন, বসুন—

ওরা এদিক ওদিক বসে পড়ল। বীথিকা বলল,—কতক্ষণ এসেছেন ? কতদূর ঘুরলেন ?

—এই দশটায়। একটু ঘোরাঘুরি করলাম বৈকি ?

লতিকা বলল,—আমরা হঠাৎ আপনার ঘর ইনভেড্ করলাম কেন—তাত জিজ্ঞাসা করলেন না।

সত্য বলল,—সে আপনাদের অনুগ্রহ। তবে কেন এসেছেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আমার মনে জাগে নি।

নমিতা বললে,—না জাগাটা কি ভাল হল ? আমরা তিনটি ভদ্রমহিলা একসঙ্গে এলাম এর একটা হেতু নিশ্চয়ই আছে, এবং কৌতুহল আপনার হওয়া উচিত ছিল।

—তা হয়ত ছিল কিন্তু আপনারা রহস্যময়ী, আপনাদের রহস্য ভেদ করবার দুঃসাহস আমার নেই, সে বয়সও বোধ হয় নেই—

বীথিকা বললে,—খুব লজ্জার কথা। লেখক হ'য়েও আপনার রোমান্সের বয়স নেই, একথা বলা বা স্বীকার করা অত্যন্ত লজ্জার কথা। যাক্, আমরা কেন এসেছি সে সম্বন্ধে আপনারই আগে প্রশ্ন করা উচিত—

—অবশ্যই, তবে না চাইতে দেওয়াই মহানুভবতা—

—তা হয়ত সত্যি, কিন্তু তা হলে ত আর রহস্যটা থাকে না।

লতিকা বললে,—আমরা এসেছি জানতে, আপনি কি নিয়ে বর্ত্তমানে লিখ্‌ছেন এবং কতদূর লিখেছেন। প্রয়োজন হ'লে যে সব রহস্য নিয়ে আপনি বিব্রত হ'য়েছেন তার কিছুটা আমরা সংশোধন করে বা পরিবর্ত্তন করে দিতে পারি—

সত্য লতিকার মুখের দিকে তাকাল—ঠিক তেমনি দুষ্ট হাসি তার মুখে। লতিকার মুখখানি সে ভাল করে দেখল, অসুন্দর নয়, বর্ণ তার ফর্সাই, দেহে যৌবনের লালিমা। চোখে একটা ভাবালুতা, প্রশান্ত চোখে স্বপ্নের প্রলেপ ,কিন্তু পাতলা ওষ্ঠ দুটী রহস্যময়—হাসিটা অত্যন্ত অস্পষ্ট, কোন অর্থই প্রকাশ করে না।

সত্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে,—রহস্যময়ীর পক্ষে নিজে সরল ও প্রাঞ্জলভাবে আত্মপ্রকাশ করলেই আর রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। সংশোধন আর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনও হবেনা।

লতিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল, নমিতা বললে,—রহস্য যদি রহস্যই না রইল তবে ত নভেলই শেষ। আর ত লেখারই দরকার হবে না ?

বীথিকা বললে,—রহস্যটা আবার কি ? বইটা কতদূর কি হল সেটা শুনি আগে তবে ত !

আলাপ আলোচনার পরে ওরা যখন চলে গেল তখন সত্যর সন্দেহ হল এরা কি তিনজনে যুক্তি করে এই রহস্য সৃষ্টি করেছে ?

বৈকালে চা'র আসরে সুনীতিই প্রথম কথা বললে,—সত্যবাবু, বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি !

সত্য চট করে বললে,—এ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

—ব্যক্তিগত জীবনেত' নেই, কিন্তু কলমের মুখে ত বহু বিয়ে দিয়েছেন, দাম্পত্যজীবনের ব্যাখ্যা করেছেন অতএব একটা মতবাদ বা ধারণা নিশ্চয়ই আছে।

সুলতা বলল,—ও সব বই-পড়া বিদ্যে। ওর মাঝে কিছু নেই—তবে এইটুকু সত্যি যে বিয়ে করলেও লোকে ঠকে, না করলেও ঠকে?

সুনীতি বললে,—তার কারণ?

লতিকা বললে,—ওই রহস্য। দূর থেকে যেটাকে সামান্য রহস্য মনে হয়, কাছে গেলে সেটা আরও জটিল হয়। এমন জট লাগিয়ে যায় যে আর রহস্যভেদ হয় না।

সত্য লতিকার মুখের দিকে তাকালো। সুনীতি বলল,—তার মানে মানুষ মাত্রেই রহস্য, তার মনও রহস্যময়, অতএব জীবনটাই একটা মস্তবড় রহস্য!

সত্য বলল, মানুষ নিজেকেই জানেনা, তাই রহস্যটা ক্রমশঃ জটিলতর হয়—

নমিতা বললে,—মানুষ নিজে তার মন জানেনা, অথচ অন্যের মনের রহস্য ভেদ করতে যায়—কি আশ্চর্য্য!

সত্য বলল,—আশ্চর্য্য ত বটেই! সত্য চেয়ে চেয়ে দেখে আর তার রহস্য ঘনীভুত হ'য়ে ওঠে।

কয়েকদিন এমনি করে কেটে গেল—

সত্য হতাশ হ'য়ে ছেড়ে দিয়েছে সন্দেহ করা, নিজের কাজ নিয়েই থাকে; কিন্তু আজ তার মনে দোলা লেগেছে তাই দোদুল্যমান মন নিয়ে লেখা এগোয় না।

হঠাৎ সেদিন আবার একখানা চিঠি এল—হোটেলের চাকর দিয়ে গেল। সত্যর জেরার উত্তরে জানালো—হোটেলের লেটার বক্সে চিঠিটা ছিল, ম্যানেজারবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই পরিচিত সুন্দর হাতের লেখা—

দেখছি হাল ছেড়ে দিয়েছেন—ভয়ে না দুঃখে জানি না। তবে অজানাকে জানা, দুর্লঙ্ঘ্যকে অতিক্রম করা, রহস্য ভেদ করাই জীবন। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে পড়ে থাকেন জানবার জন্যে, এভারেষ্টে মানুষ ওঠে অভিযানের মোহে, ডিটেকটিভ রহস্য ভেদ করে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে নয়, —আনন্দ পেতে! প্রথম যখন আপনার লেখা পড়ি তখন ভেবেছিলাম একমাত্র আপনিই হয়ত আমার অন্তরকে বুঝবেন, তাই মনে মনে আপনাকে ভালবেসেছিলাম, আজ সম্যক পরিচয় পেয়ে ভাল লাগেনি একথা বলি না, তবে আমি চাই আপনি বুদ্ধি, যুক্তি ও অন্তরের বিশ্লেষণে তাকে আবিষ্কার করুন। সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাবে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে শালীনতা কোথায়? জয় করবার আনন্দ কোথায়? ইতি র।

এর পরে আরও কয়েকদিন সত্য মুসৌরীতে ছিল, সে চিনতে চেষ্টা করেছে এই রহস্যময়ীকে, কিন্তু রহস্য জটিলতর হয়েছে বই সহজ হয়নি। মনে মনে তার একটা পরাজয়ের দুঃখ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে মনে হত এরা সমবেত ভাবে তাকে নিয়ে তামাসা করেছে, কখনও মনে হত—তা নয়, এর মধ্যে সত্যিই হয়ত একজন তাকে ভালবেসেছিল বা বাসতে চেয়েছিল।

হঠাৎ কলকাতা থেকে জরুরী খবর পেয়ে তাকে ফিরে আসতে হবে। খবরটা সে দিয়েছিল সকলকেই—কিন্তু কারও মুখে একটু বেদনার আভাষ সে খুঁজে পায়নি। কেউ আর দু'দিন থেকে যেতে বলেনি তাকে।

চলে আসবার মুহূর্ত্তে—হোটেলের লেটার বক্স মারফত আর একখানা চিঠি সে পেয়েছিল। তাতে সুস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ছিল—

আপনি হঠাৎ চলে যাবেন ভাবি নি, সেজন্যে আজ দুঃখ হ'চ্ছে। যে দুর্ব্বলতার কথা পূর্ব্বে আমি স্বীকার করেছি, তা আজও অম্লান আছে। বললে মিথ্যা বলা হবে, সামনাসামনি আপনাকে পেয়ে তা বেড়েছে। আমি কুমারী হই, বিবাহিত হই বা বয়সে কচিই হই আর বড়ই হই, আমার অনেকখানি অন্তর জুড়ে থাকবেন আপনি। সে অন্তর যদি কোনদিন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চিনতে পারেন তবে সেদিন আপনার কাছে আমি নিশ্চয়ই ধরা দেব। যাত্রা শুভ হোক্। ইতি র।

কলকাতা এসে সত্যর মনটা ক্রমশঃ আরও ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। কে তাকে তার অজ্ঞাতে ভালবেসেছে? ভাল যদি বেসেই থাকে তবে কেন এই আত্মগোপন করবার আকাঙ্ক্ষা। সত্যর কুমার মনে ধীরে ধীরে ভাঙন ধরল। তারপর একদিন অনেক চিন্তা করে খবরের কাগজের ব্যক্তিগত কলমে সে একটা বিজ্ঞাপন দিল—পর পর কয়েকদিন ধরে বিজ্ঞাপনটা ছাপা হল—

রহস্যময়ী—তোমার পরিচয় পেলে আমার সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একবার তোমার অন্তর বিচার করতাম, কিন্তু তুমি কি আমার অন্তর বিচার করেছ?

বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবার সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ এক-

খানা চিঠি পেল সত্য—প্রকাশকের দোকান মারফৎ। খামখানা ভাল করে দেখল, কোথা থেকে পোষ্ট করা তা বুঝবার উপায় নেই। খামের মধ্যে সেই পরিচিত সুন্দর হস্তাক্ষর—

বিজ্ঞাপনটা যে আমার উদ্দেশ্যে তা প্রথম বুঝতে পারিনি, তবে ভাল করে দেখেশুনে বুঝলাম আমারই উদ্দেশ্যে। আপনার অন্তরকে বিচার আমি করেছি, বিচার করেই শেষ চিঠি দিয়েছি। তবে আপনার নারী চরিত্র বিশ্লেষণ যদি কেবল উপন্যাসের পাতায়ই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তা কোন কাজেই না লাগে তবে সে অক্ষমতার জন্যে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে বৈকি? আমি এত কাছে ছিলাম, এত ইঙ্গিত আপনাকে করেছি, তবুও যদি রহস্য রহস্যই রয়ে যায় তবে সে দোষ কি আমার? আপনার ত্রুটির জন্যেই রহস্য চিরন্তন হ'য়েই থাকল, হয়ত চিরদিনই থাকবে। অতএব বিদায়। কল্পনার মনস্তাত্বিককে আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলাম বাস্তবের দরদীকে ইতি—র।

সত্য আজও বিয়ে করেনি—তার জীবনের এঘটনাকে আমরা জানি। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে সত্য বলে,—তোমরা যদি কেউ বলে দিতে পার কে এই তরুণী তবে আমি প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে পারি।

সত্যিই কে এই তরুণী?

অভিনয়

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মনে মনে অহংকার ছিল এতদিন
এ সংসারে আমি উদাসীন।
অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে দেখি অভিনয়—
ধরণীর রঙ্গমঞ্চে নিত্য রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শময়
অনাদি অনন্ত নাটকের।
মানবের হৃদয়ের
মহাসিন্ধু মাঝে জাগে মুহূর্তে মুহূর্তে আলোড়ন
ব্যথাতুর আর্তনাদ সোচ্ছ্বাস ক্রন্দন,
দম্ভ দর্প অহংকার, মিথ্যা আস্ফালন,
বিরহ মিলন আর মান-অভিমান,
লোভের দুর্বার গ্রাস, ঔদার্যের স্নেহসিক্ত দান।
দেখিতে দেখিতে অভিনয়—
জীবনের সূর্য মোর অস্তাচল করিছে আশ্রয়।
সহসা আপন পানে চেয়ে দেখি বিস্মিত হইয়া
নাট্যমঞ্চে নৃত্য করি নর্তকের
ভূমিকা লইয়া।
নিখিল নাটের গুরু দর্পহারী হরি
মোর সর্ব গর্ব নাশ করি
আমার অজ্ঞাতসারে—
কখন মঞ্চের পরে রাখিয়া আমারে
সহাস্যে দর্শক সাজি দেখিতেছে মোর অভিনয়
পরম চতুর লীলাময়।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতিক দর্শন

অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

ইংরেজীতে ন্যাশনালিজম (nationalism) বলিলে যাহা বুঝায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই। কারণ ভারতে প্রাচীন বা মধ্যযুগে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাংলাদেশে ইহার উদ্ভব হয়। তখন হইতে ইহার প্রতিশব্দরূপে জাতীয়তাবাদ এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রচারক রাজনারায়ণ বসু। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তিনি বাঙ্গালীকে পাশ্চাত্য আচার ও চিন্তাধারার মোহ দূর করতঃ ভাবে, ভাষায় এবং আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, সঙ্গীত, ক্রীড়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া জাতীয়ভাবে দীক্ষিত হইবার জন্য এক পুস্তিকা প্রচার করেন এবং ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য একাধিক সভাসমিতি সৃষ্টি করেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে তিনি "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দুর ধর্ম ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম্ম ও সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই মত প্রতিপাদন করিয়া তিনি উপসংহারে বলেন : "আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।......আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ত্তি হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণা করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।" অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ কবিতা অথবা সঙ্গীতটি আবৃত্তি করেন—

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃ প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
ইত্যাদি

জাতীয়তার এইরূপ উদাত্ত আহ্বান বাংলা দেশে রাজনারায়ণ বসুর পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। ইহা যে কি ভাবে বাংলার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল তাহা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক এই বক্তৃতার উচ্ছাসপূর্ণ প্রশংসা হইতে বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদর্শনে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন : "রাজ-নারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত (মিলে সব ভারতসন্তান ইত্যাদি) ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা, সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

রাজনারায়ণ হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের ভিত্তির উপরই এই জাতীয়তাবাদ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার ফলে হিন্দু একটি পৃথক জাতি এই ধারণাই বলবতী হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণের অনুরক্ত ও ভক্ত শিষ্য নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সনে বাংসরিক হিন্দু মেলা স্থাপনা করিয়া রাজনারায়ণের মতবাদ কার্যে পরিণত করেন। ভারতে হিন্দু যে একটি পৃথক জাতি ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করেন এবং যুক্তির দ্বারা তাহার সমর্থন করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রসারের জন্য তিনি জাতীয় সভা স্থাপন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের দুই জনের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী

ও চিন্তাশীল, এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনিই প্রথমে এইহিন্দু জাতীয়তাবাদের মূলে যে পাশ্চাত্য রাজনীতিক গভীর তথ্য নিহিত আছে তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে রাজনারায়ণবাবু জাতীয় সভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, আর ইহার চারিমাস পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের "ভারত কলঙ্ক" নামক প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের বহু রাজনীতিক তথ্যের আলোচনা করেন। হিন্দুজাতি সম্বন্ধে তিনি বলেন: "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য আর এইরূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ, অর্দ্ধাংশ মাত্র।

"হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না, পরজাতির অমঙ্গল সাধনা করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে "এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" কিন্তু তথাপি তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। কারণ "স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।" তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছেন, "ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।"

জাতীয়তাবাদের যে মূলনীতি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই যে এদেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা কঠিন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন—ইংরেজের অমঙ্গলই ভারতবর্ষের মঙ্গল—এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে তাহার পুরোভাগে ছিলেন। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইউরোপের যে জাতীয়তাবাদ বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তাহার অনুসরণ করিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে আজকাল অনেকেই মনে করেন যে জাতীয় ভাবের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতা মহত্তর আদর্শ, সুতরাং আমাদের তাহাই অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু জাতিগঠনের পূর্বে আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা অনেকটা একতলার ছাদ না তুলিয়া দোতালা দালান তোলার মতই অপ্রকৃত বলিয়া মনে হয়। আন্তর্জাতিকতার আদর্শ মহত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু পরাধীন দেশে অথবা যে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেও জাতীয় ঐক্য গঠনে সক্ষম হয় নাই, তাহার পক্ষে জাতীয়তাবাদ নিম্নতর আদর্শ হইলেও, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর আদর্শের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ কতদূর যুগোপযোগী তাহার আলোচনার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল।

আর একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—কারণ হিন্দুর প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের উপরেই উভয়েরই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র মূল তথ্যের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান যে একজাতির

অন্তর্ভুক্ত, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রাজনীতিবিদ তাহা বিশ্বাস করিতেন। সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ইহা স্বীকার করেন নাই—এবং ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় যে হিন্দুদের হইতে একটি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র জাতি, মহম্মদ আলি জিন্না অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব হইতেই তাহা জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজশাসকগণ যখন নিজেদের স্বার্থের জন্য হিন্দু-মুসলমানের এই প্রভেদ মানিয়া লইয়া নানারূপে ইহার ইন্ধন যোগাইতেছিলেন—তখন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব দৃঢ় করিবার জন্য হিন্দু রাজনীতিক নেতাগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে মুসলমান রাজগণের আমলে হিন্দুরা পরাধীন ছিল না—ইংরেজ অধিকারের পর হইতেই তাহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। অবশ্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালী নেতারা চিরকালই বলিয়াছেন যে মুসলমান আমলে পরাধীন হিন্দু জাতিকে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু নেতারা সে সকলে কর্ণপাত করেন নাই। লালা লাজপৎ রায় লিখিয়াছেন যে মুসলমান রাজারা ভারতবর্ষেই বাস করিত—সুতরাং ভারতের সকল লোকই তখন স্বাধীন ছিল। ইংলণ্ডে যেমন বিদেশীয় অ্যাঙ্গিল, জুট, স্যাক্সন, ডেইন, নর্মান প্রভৃতি জাতি রাজত্ব করিলেও ক্রমে ক্রমে তাহারা ঐ দেশের অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ভারতবর্ষেও তেমনি হিন্দু মুসলমান মিশিয়া এক জাতি গঠন করিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে নর্মান বিজয়ের দুই এক শত বৎসর পরে কে কোন জাতি তাহা চিনিবার যো ছিল না। ভারতবর্ষে সহস্রাধিক বৎসর একত্র বসবাস করার পরেও যে কে হিন্দু কে মুসলমান তাহা চিনিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না—সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হত্যাকাণ্ডে তাহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। লালা লাজপৎ রায় ও তাঁহার মতানুবর্তী নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই গুরুতর প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিনা তাহা বলা যায় না। অবশ্য বলা বাহুল্য, কংগ্রেস নেতাগণ সকলেই এই একই বুলি আওড়াইতেন,—কারণ গরজ বড় বালাই।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "ভিন্ন দেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষ ও ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষকে পরাধীন বলিয়াছেন। আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়াছেন। তাঁহার সংজ্ঞা অনুসারে আকবরের রাজ্যকাল ব্যতীত মুসলমান যুগে ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে যদি রাজার জাতি বিজিতদের সঙ্গে এক দেশে স্থায়ীভাবে বাস করিলেই বিজিত প্রজাগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে আমেরিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াই ধ্বংস হইয়াছে এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বর্তমানকালে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জাতিও সম্পূর্ণ স্বাধীন।

"জাতিবৈর" নামক প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচায়ক। ইংরেজ ও এদেশীয় লোকের মধ্যে (স্বাধীনতা লাভের পূর্বে) যে বিদ্বেষভাব ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই জাতিবৈর বলিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে "প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরির জন্য দুঃখিত।" কিন্তু তিনি ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর-ভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে, যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না—কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতি-যোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির

উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"

ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য আবেদন-নিবেদন-মূলক যে পন্থা রামমোহন রায় প্রবর্তিত করেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহাই রাজনীতিক আন্দোলনের একমাত্র প্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি এবং পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই কনষ্টিটিউশনাল অ্যাজিটেশন (constitutional agitation) ব্যতীত আর কোন উপায়ের কথা চিন্তা করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বপ্রথম এই প্রনালীর বিরুদ্ধে আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৩ সালে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী যে ফল-প্রসূ হইতে পারে না তাহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই প্রবন্ধগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার বহুপূর্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রণালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে 'পলিটিকস্' নামে কমলাকান্তের এক পত্র বাহির হয়। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আফিম দিবার লোভ দেখাইয়া কমলাকান্তকে পলিটিকস্ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে কমলাকান্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। "আমি রাজা, না খোসামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক—যে আমাকে পলিটিকস্ লিখিতে বলেন?" নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ভরিটাক আফিম সেবন করিয়া কমলাকান্ত বসিয়া আছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন অদূরে শিবুকলুর পৌত্র উঠানে ভাত খাইতেছে—আর অদূরে দাঁড়াইয়া একটি কুকুর উচ্ছিষ্ট ভোজনের আশায় নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে ভাতের থালার দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া আছে। "তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল এজিটেশ্যন সফল হইল; কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল।" কাঁটাখানি খাইয়া কুকুর আরও কিছু পাইবার লোভে মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিল—কলুপুত্র এক মুষ্টি ভাত দিল। এমন সময় কলুগৃহিণী কুকুরের প্রতি এক ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপ করায় 'রাজনীতিজ্ঞ' কুকুর আহত হইয়া অতি দ্রুত বেগে পলায়ন করিল। তখন কলুগৃহিণী দেখিল এক অতি বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া গৃহপালিত বলদকে সরাইয়া তাহার জন্য রক্ষিত খোলবিচালি খাইতেছে। কলুগৃহিণী এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র বৃষ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কলুপত্নী প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল এবং বৃষটি খোলবিচালি নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিল।

কমলাকান্ত এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন: "দুইরকমের পলিটিকস্ দেখিলাম—এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিসমার্ক এবং গর্শাকফ্ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন—আর উলসি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুকুর দরের পলিটিশ্যন।"

ইহার মর্ম বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। এই পত্রের অন্যত্র কমলাকান্ত লিখিয়াছেন: "ভাই পলিটিকস্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহাদের পলিটিকস্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিকস্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই!"

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পূর্বে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ নেতাগণ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। অপূর্ব প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে বাঙ্গালীর পঁচিশ বৎসর লাগিয়াছিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা বা স্রষ্টা নহেন—তিনি স্বয়ং তাহার ভাষ্য ও টিপ্পনীও লিখিয়াছিলেন। কয়েকজন রাজনীতিক সদস্যের করুণ আবেদনের পরিবর্তে দ্বিসপ্তকোটি ভুজের ধৃত খর-করবালের উপরই যে ভারতবর্ষের মুক্তি নির্ভর করে, বঙ্কিমচন্দ্র দিব্য দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ এই কথা বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করা উচিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কেমন যেন ভাল লাগে এমনি নির্জন দুপুরগুলো। নিজেকে ফিরে পায় মিষ্টি।

কারিগর স্নান করতে গেছে পুকুরে—মিষ্টি জিনিষপত্র-গুলো গুছিয়ে তুলছে। হঠাৎ কাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

…মনে মনে বিরক্তই হয় সে।

বাঁচতে চাইলেও ওরা যেন এখনও মাঝে মাঝে পথের কাঁটার মত এসে দাঁড়ায়। চারিদিকে ঘেয়ো কুকুরের দল এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে—এঁঠো পাতার চারিদিকে যেমন তারা ভিড় জমায় তেমনি কুৎসিত লালসা নিয়ে তারা এখানেও যেন ঘুর ঘুর করে।

…গোকুল এসেছে; কথাবার্তা নেই দাওয়ায় এসে চেপে বসে ফুক ফুক করে বিড়ি টানছে। চোয়াড়ে চোয়ালের হাড়গুলো ঠেলে উঠেছে—ভাঁটার মত দুটো চোখে কদর্য বীভৎস চাহনি।

হাসছে গোকুল।

—একা একা লাগছে ?

মিষ্টি জবাব দেয়—তাই তুই এলি নাকি হ্যাঁরে ?

কেমন আপ্যায়নই মনে করে গোকুল।…এখানে তার দাবী যেন খানিকটা আছে। এ চাকলার লোকের উপর কর্তৃত্ব করবার দাবী জানাবার জোর সে অর্জন করেছে।

মিষ্টির সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

গোকুল বলে ওঠে—শোনলাম খুব ধুম করে কাত্তিক পূজো করলি। তা হ্যাঁরে, আমাদিকে নেমতন্নও করতে নাই ?

মিষ্টি জবাব দেয়—কি করে করি বল ?

—কেনে ? গোকুল প্রশ্ন করে।

—তোর বাপ যে ইখানে ঘুর ঘুর করে, তা ছেলেকে বাপের আসলীলা দেখতে ডাকি কি করে বল !

—বাবা ! সে তো কবে মড়াগড়ের শোলে আংরা হয়ে গেছে।

গোকুল সহজভাবেই কথাটা বলে, মিষ্টি হাসছে—স্বৈরিণী সেই নারী, জিবের আগায় খুরের ধার এনে জবাব দেয়।

—তুর বাপ কি একটো ? ওই যে তারকবাবু—শোনলাম সেও তুর বাপ। সে মিনষে যে নাক সটরান দিছে এখানে—আবার তুও এয়েছিস। দপ্ করে জ্বলে ওঠে গোকুল। চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠছে। জ্বলছে দুটো চোখ।

—খুব বেড়েছিস লয় ? গজরাচ্ছে গোকুল।

হাসছে মিষ্টি, ছোবলটা ঠিক বেজেছে যথাস্থানেই। উঠে পড়েছে গোকুল।

—উঠলা যি গো ? ওই !

গোকুল দাঁড়াল না; উঠে বের হয়ে গেল হন হন করে। কথাটা তখনও কানে বাজছে। মিষ্টির ছুরির

ফলার মত কথাগুলো। হাসছে তখনও মেয়েটা খিল-খিলিয়ে।

—কি হল রে ?

…কারিগর উঠোনে ঢুকেছে স্নান সেরে। ওকে দেখে চুপ করে গেল মিষ্টি।

—এমনিই হাসছিলাম। লাও ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলাও দিন।

মিষ্টি দাওয়াটা সাফ করে জায়গা করতে থাকে। চকিতের মধ্যে কেমন বদলে গেছে, বিচিত্র একটি নারী।

কারিগর ওর দিকে চেয়ে থাকে—ঠিক যেন চিনতে পারে না ওকে। আলো আর ছায়ার আঁধার-ঘেরা একটি কোন মনোরম স্থান।

তার মত যাযাবর হাঁসও যেন তাই বাসা বেঁধেছে সেই নিরালায়।

…এমনি চোট খেয়েই গর্তের ভিতরের সাপও মাথা তোলে।

…যেখানে যখনই চোট খায় না কেন—বেদনাটা বাজে মনের গভীরে, তার সেই চরম পরিচয়টা লক্ষ্য করেই যেন লোকে তাকে ব্যথা দেয়—অপমান করে।

গোকুলও জানে—সারা অঞ্চলের লোক তাকে ভয়ও করে, আর ঘৃণাও করে তেমনি মনে মনে—দুঃসহ বিজাতীয় কোন ঘৃণা।

ওই স্বৈরিণী মেয়েটাও তাকে অপমান করতে সাহস করে। তাড়িয়ে দিতে পারে বাড়ী থেকে। অর্থ সামর্থ্য তার নেই।

…কিছুদিন কোথাও কোন রোজকারও হয়নি, তারকবাবুর দয়ার দানেই চলেছে। কোন মতে দুবেলা দুমুঠো জোটে ওখানেই। আর পড়ে থাকে নিজের ঘরে—না হয় বোর্ড অপিসের রকে। শীতে ঠাণ্ডায় হু হু কাঁপে। জেগে থাকে সারা রাত।

…ঘরের ছাউনি দেবার সামর্থ্যও তার নেই, খড় জোটেনি—বাঁশ বাখারী, দড়ি, ছাউনী দেবার বারুইএর মজুরী কোত্থেকে জোটাবে জানে না। এই সময় ছাইতে না পারলে সারা বছর আর খড় কুটাও জুটবে না। বৃষ্টির জলে ধ্বসে পড়বে।

যেটুকু ঘরের বাঁধন বলে ছিল—তাও থাকবে না।

চুপ করে ভাবছে গোকুল।

এ কথা এতদিন ভাবে নি। ওই নর্দমার পোকার মত ঘিণঘিণে মেয়েটার মুখে ওই সব কথা শুনে মনটা কেমন খিঁচড়ে যায়।

তারকবাবুকেও কথাটা জানিয়েছিল—কিছু খড় দেন কেনে? ঘরটা ছাওয়াবো—তারকবাবুর মনে তখন অন্য চিন্তা। ওর কথায় তবু জবাব দেয়।

—তা নিয়ে যাস! এবার তো তেমন খড়ও হয়নি। নিবি—পণ কয়েক!

—কিছু টাকা—

—ওসব হবে না এখন—সাফ জবাব দেয় তারকবাবু। কোন ধরা-ছোয়ার মধ্যে নেই। চুপে চুপে বের হয়ে এল গোকুল।

…কেমন যেন মেজাজটা বিগড়ে যায়। কদিন জুয়া থেকে যা রোজকার করেছিল তাও নেশা-ভাংএ খরচ হয়ে গেছে। হাতে পয়সাকড়িও নেই। এ জায়গাটায় থাকতে আর মন টেকে না।

চলেছে এই দালান-কোটার পাড়া ছেড়ে নিজের জীর্ণ ঘরের দিকে! মনে জ্বলছে গোকুল।

…দুদিকে নীচু পথ—বনগড়ানি জল এসে গ্রামে ঢোকে—পথটা তাই বালিতে ভর্তি—হাটবার পথ নয়, জল যাবারই পথ এ পাড়ায়। মানুষ যেন কোন রকমে হাঁটবার অধিকার পেয়েছে—এই ক'মাস।

…দুদিকে হুমড়ি খাওয়া জীর্ণ খড়ের চালা থেকে ধোঁয়া উঠছে, শালের ধোঁয়া; বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে কালো ধোঁয়ায় আর বাটিপেটার ঠং ঠং শব্দে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

গাড়ী বোঝাই বাসনঘুট নামছে অতুল কামারের শালের সামনে। ভুবন আর এমোকালী কাঁধে করে নামাচ্ছে মালগুলো, ওদিকে কার্ত্তিকের দোকানে নোতুন মাল ওজন করে মহাজনের সরকার হিসাব কসছে। একটু দাঁড়াল গোকুল।

…এ পাড়ায় সে যেন অবাঞ্ছিত কোন লোক। ওরা যে যার নিজের কাগ নিয়েই ব্যস্ত। ওর দিকে ফিরেও চাইল না।

…চুপ করে চলে গেল গোকুল।

পেট জ্বলছে।…কেমন চুঁই চুঁই করছে পেটের ভিতর তীব্র একটু অনুভূতি।

…অনেক দিন পর অনুভব করে গোকুল এই যন্ত্রণা—ক্ষুধার জ্বালা। বেলা বেড়ে চলেছে।

…দুপুরের রোদ হলদে হয়ে আসে।…দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামো নামো।

টিউবয়েল থেকে জল পাম্প করে তাই কোঁক কোঁক করে গিলে চলেছে।…কেমন অসাড় হয়ে আসে পেটের সেই জ্বালা।

…তারকবাবুর বাড়ী থেকে বের হয়ে আসবার সময় দেখেছিল ঠাকুর-বাড়ীতে অন্নভোগ—কেমন ঘিএর গন্ধ উঠেছে আকাশ বাতাসে। গোবিন্দ চালের সুগন্ধি পায়সান্ন!

…পেটের জ্বালাটা কেমন যেন বেড়ে ওঠে। ঝিম-ঝিম করছে দৃষ্টি। আজ দুপুরে ঘরেও দানাটি নেই। এগিয়ে যাবে—হঠাৎ কার ডাক শুনে দাঁড়াল।

—ঠাকুর! অ ঠাকুর মশাই।

ঠাকুর। গোকুলকে অনেকদিন ও নামে কেউ আর ডাকেনি। এককালে ডাকত অনেকে, নিমাই ঠাকুরের ছেলে—কারণ অকারণে অনেকে প্রণামও করত পথে ঘাটে। সে আজ অনেকদিনের কথা। তাই ওই ডাক-শুনে একটু চমকে ওঠে আজ।

—আমাকে ডাকছ?

অতুল কামার উঠে আসে। বুড়োর চোখে দড়িবাঁধা নিকেলের চশমা; পরণে একটু কালিমাথা কাপড়। শাল থেকে উঠে বাড়ী যাচ্ছিল, পথে ওকে দেখে দাঁড়িয়েছে। কি যেন খানিকটা অনুমান করে নেয়।

—হ্যাঁ। একটু আসবেন?

…বুড়োর সঙ্গে চলেছে গোকুল। বাড়ী ঢুকেই বুড়ো আদর করে বসায়।

…বসো। অগো—ও বৌমা!

ভুবনের বৌ হেঁসেল থেকেই সেই অবস্থাতে বের হয়ে আসে।

ভুবন বলে ওঠে—বেরাহ্মণ। একটু জলসেবার ব্যবস্থা করোদিকি।

বড় বৌই সংসারের চাকাটা ঠেলে চলেছে! তখুনিই আসনকরে জলগড়িয়ে মস্ত বাটিতে চিঁড়ে দুধ মুড়কি আর খেজুর গুড়ের নবাত এনে দেয় গোটাকতক।

গোকুল একটু অবাক হয়েছে এই অভ্যর্থনায়। অতুল বলে ওঠে—একটু জল সেবা কর ঠাকুর।

—গোকুল মাথা নীচু করে খেয়ে চলেছে।…হ্যা—সারা সকাল থেকেই আজ জোটেনি কিছু।

মনে হয় ওই মিষ্টির কথাগুলো—কোন জবাব দিতেও পারেনি সে।

—আর চাট্টি চিঁড়ে দিই?

…বড়বৌএর কথায় মাথা নাড়ে গোকুল।

—না, না। একটু আগেই খেয়ে বের হয়েছি।

অতুল কামার বলে ওঠে—দুটো পয়সা পেয়ে গেলাম আজকের কারবারে, বেরিয়েই পথে দেখলাম বেরাহ্মণকে।

গোকুল কথা বলে না।

বেলা পড়ে আসছে।…পথে বের হয়ে এল।

জীর্ণ ঘরটার দিকে যেতে চায় না। কেমন যেন হু হু করে মনটা। একটু ঘর—একটু আশ্রয়—একমুঠো অন্ন—সব কিছুই আজ গোকুলের কাছে স্বপ্ন।

…বৈকাল হয়ে আসছে। চট্টরাজ পুকুরের কাঁকুরে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ওই দূরের দিকে চেয়ে থাকে গোকুল।

…ঈশ্বর ডোমকে দেখে একটু অবাক হয় সে।

—ওস্তাদ!

ঈশ্বর এগিয়ে আসে—তোমাকেই খুঁজছিলাম ঠাকুর!

একটা চিল কর্কশ স্বরে ডাকছে আকাশকোলে; মুক্ত উদার ডাঙ্গা—শস্যরিক্ত প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে।

…একটা কথা ছিল ঠাকুর।

…কথা!

দুজনে পুকুরের পাড় থেকে চলেছে দুদিকে; যেন কেউ কাউকে চেনে না। কুচিলা ঝোপের ওদিকে গিয়ে বনে ঢুকল ঈশ্বর ডোম, কাহার পাড়ার ওপাশ দিয়ে বনের ওদিকে এগিয়ে চলেছে আর একটি প্রাণী সে গোকুল। হঠাৎ যেন তার গতি বেড়ে যায় বনের কাছাকাছি এসে। আর দেখা যায় না তাকে, বনের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মুখ আঁধারি রাত। পাখীর কাকলি থেমে গেছে, মুছে গেছে সারা আকাশে শেষ

সূর্যের আলোকধারা, সারা গ্রাম যেন ওই অসীম আঁধারে হারিয়ে গেছে। জেগে আছে দু একটি তারার আলো।

* * *

প্রীতি বইগুলো নিয়ে বসেছে। কেমন মনে হয় একান্ত অসীম গহনে সে যেন হারিয়ে গেছে। সভ্য জগতে সহুরে আলোকোজ্জ্বল জীবন যাত্রার মাঝে যাকে ভেবেছিল কোন ঠাঁই দেবে না, বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও মনে তার কথাই আসে।

অশোকের অস্তিত্ব তার কাছে একটা কঠিন প্রশ্নের মত জেগে রয়েছে। তাকে স্বীকৃতি দিতে ও পারেনি—একেবারে অবহেলা করার মত ক্ষমতাও নেই। ওর কঠিন ব্যক্তিত্ব আর ঋজুতার সামনে নিজেকে অনেক দুর্বল বোধ করে, তাই দূরেই সরে থাকতে চায়।

অশোকের কথাও ভেবেছে অনেক, একটা সুস্থ সবল, শিক্ষিত লোক বেকার থাকবে—বসে বসে শুধু গ্রাম্য কুটিল দলাদলির আবর্তে জড়িয়ে দিন কাটাবে সভ্য জগতের থেকে বহুদূরে অন্ধকার গ্রামে, এটা যেন তার কাছে অপমৃত্যু বলেই মনে হয়।

না হয় পলায়নী মনোবৃত্তি।

সহরের প্রচণ্ড বিবর্তন আর বিরাট রাজনীতির উত্তাপ থেকে পালিয়ে এসেছে অশোক।

…এই শ্রমবিমুখতাকেই সহ্য করতে পারেনি প্রীতি, কোথায় যেন বেধেছে তার মনে।

আজকের তরুণ মন, কি এক উন্মাদনার ঘোরে ছুটে যেতে যায়; জীবনে সে দেখেছে সহরের বিলাস-প্রাচুর্য ভোগসম্পদ, তার থেকে প্রীতির মনের কোণেও কোথায় একটা নিবিড় তৃষ্ণা সঙ্গোপনে তার মনের অতলেও জড়িয়ে গেছে তার অজ্ঞাতেই।

এ কথাটা নীলকণ্ঠবাবুর কাছেও যেন কোথায় প্রকাশ হয়ে গেছে।

প্রীতিই প্রতিবাদ করেছিল সেদিন।

—এটাকে স্বীকার করতে পারি না বাবা, তোমার ওই অশোকবাবুর এই কুয়োর ব্যাং হয়ে পড়ে থাকাটা।

নীলকণ্ঠবাবুও দেখেছেন প্রীতির তরুণ মনের এই বৃহত্তর জীবনের প্রতি সংবেদনশীলতা। মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। ওর পোষাক-আশাক—চালচলন কথাবার্তায় সেই মোহ যেন অজ্ঞাতেই জড়িয়ে পড়েছে।

—তাই বলে গ্রামে কারো কিছু করবার নেই?

প্রীতি বলে ওঠে—সহর থেকেই, বৃহত্তর জীবনের গণ্ডি থেকেই নির্দেশ আসবে; সমাজের ওপরের যারা তারা গ্রামের কেউ নয়।

—গ্রামের দিকে চেয়ে গ্রামের সমস্যা মিটবেনা—মিটবে মহানগরের নির্দেশে গ্রামের সব সমস্যা আর অভাব?

নীলকণ্ঠবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন।

প্রীতিও বাবার কথার সুরে বেদনার আভাষ টের পেয়েছে। জবাব দেয়।

—এ ছাড়া পথ নেই বাবা।

নীলকণ্ঠবাবু কথাটা মানতে চান না। বলে ওঠেন—গ্রামে এতদিন লোক হয়তো ছিল না—যারা তাদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন, এখন গ্রামের জীবনেও ধারাপথ বদলেছে মা, আরও বদলাবে।

প্রীতি বাবার কথার জবাব দিল না। দিলে কড়া কথা স্পষ্ট করেই বলতে হয় তাই বোধ হয় এড়িয়ে গেল। কিন্তু দুজনের পথ এবং মতের মূলে যে কোথায় একটা নীতিগত বিরোধ দেখা দিয়েছে তা ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত হলেও সেটা যে মুছে ফেলবার মত সামান্য নয়, তা বুঝতে পেরেছে দুজনেই।

নীলকণ্ঠবাবু চুপ করে ফুরসি টানতে থাকেন।

প্রীতিও পড়ায় মন দেয়।

…হারিকেনটা জলছে। লাল ম্লান আলোয় কেমন একটা অসহায় ভাব; আঁধারের মধ্যেই তা হারিয়ে গেছে।

…অশোকবাবুর কথাটা মনে পড়ে।…

একটা লোক কেন কি যেন মোহের ঘোরে এই অন্ধকূপে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে তা জানে না। কে জানে, হয় তো কোন গোপন ইতিহাস একটা রয়ে গেছে নিবিড় কোন ব্যথা, যার জন্যই সহরের জীবনে আজ ফিরে যেতে চায় না।

…প্রীতি আনমনে বইএর পাতাগুলো উল্টে চলে। হঠাৎ জাগে সুরটা—শান্ত স্তব্ধ গ্রাম সীমায় নিষ্প্রভ তারা-জলা আকাশে উঠেছে মিষ্টি একটা সুর।

…প্রীতির বইএ মন বসেনা, উঠে এসে জানলায় দাঁড়াল।…বিনিদ্র গ্রাম্য স্তব্ধতার মাঝে জাগর কোন বন্দী মন নিবিড় বেদনায় গুমরে উঠেছে।

…হু হু বাতাস বয়, রাতের হিম হাওয়া। তারাগুলো ঢেকে গেছে জমাট কুয়াসায়—অন্তহীন তমসার অতলে কোন সুপ্ত মন নিবিড় বেদনায় শুধু কাঁদছে।

…সহরের আলো আর কলরবের মাঝে জাগর কোন অতন্দ্রমনের এই কান্নার সার্থক সুর কোনদিনই শোনেনি প্রীতি।

সানাই বাজাচ্ছে অবিনাশ। অবিনাশ ডোম।

…একক সুরটা আলাপ করে চলেছে।

অশোক স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

প্রথম যেদিন ছেলেটার বাজনা শোনে ওই মিষ্টি লোহারণীর বাড়ীতে, সেদিনও এমনি চুপকরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ না হওয়া অবধি বের হয়ে আসতে পারেনি।

অবিনাশের সঙ্গে সেই খানেই পরিচয়। আজ অবিনাশ বৈকালে এসেছে নিজেই।

—বাজনা শোনাব ছোটবাবু!

অশোক একটু যেন অবাক হয়—সেকি রে, কাজের বাড়ী হয়—সানাই বসে। তা শুধু শুধুই—

হাসে অবিনাশ—বিয়ে পৈতে বাড়ীতে কি বন্দেজী জিনিষ বাজাইবাবু, ওই রং বাজাই। এতদিন বিষ্টুপুরে থাকলাম দুএকটি শিখছি—সমজদার আপনারা, না শুনলে?

কি যেন আশা নিয়ে শোনাতে এসেছে অবিনাশ। মুখ টুখ শুকনো—কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে আসছে বোধ হয়।

—তা খেয়ে এসেছিস?

চুপ করে থাকে অবিনাশ।

মাঝে মাঝে ওর এমনিই হয়। সারামন হুহু করে জ্বলে ওঠে। বাড়ীতে মন টেকেনা।

বাবাকে ও সহ্য করতে পারেনা মোটেই। লোকে কথায় বলে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।

ঈশ্বর ডোমের নাম এ চাকলার সবাই জানে। শিউরে ওঠে ওকে পথে দেখলে সময় অসময়! পাকা-কাঁচা চুলগুলো কদম ছাট! জুয়োর হাতও যেমন চলে, তেমনি এ অঞ্চলের গৃহস্থের নিশ্চিন্ত জীবনেও সে এনেছে কি এক আতঙ্কের কালো ছায়া।

কেউ জানেনা কার ঘরে কোনদিন চড়াও হবে।

সেই ঈশ্বর ডোমের ছেলে ওই অবিনাশ ডোম।

…ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন অন্য জাতের ছেলেটা, ভদ্রলোক ঘেঁসা—

এই নিয়ে মদ মেরে মত্তাবস্থায় ঈশ্বর অনেক মারধোরও করেছে বৌটাকে।

—ডোমের বাচ্চা কভি নয় উটো, ভদ্রলোকের বাচ্চা—বল সাচ কথা বলবি কস্‌বী মাগী।

বৌটা শুধু কেঁদেছেই। আর শিশু অবিনাশ দেখেছে মত্তপ বাপের সেই তাণ্ডব নৃত্য। শিউরে উঠেছে। কিশোর মনে জন্মেছে ঘৃণা আর আতঙ্ক। তাই বোধহয় একদিন ডানাপালক গজাতেই পালিয়ে যায়। সে আজ বছর দশেক আগেকার কথা।

…কিছুদিন হল ফিরেছে অবিনাশ।

দুচার জায়গায় সবে বাজিয়ে কিছু পয়সা কড়ি আনছে। ক্রমশঃ নাম ডাকও হচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বরের সেই এককথা।

—ডোমের ব্যবসায় প্যাটের ভাত কুনকালে হয়, হাঁরে শালা?

—আজও তাই নিয়েই বেধেছে বাবার সঙ্গে অবিনাশের।

…সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ে। অতীতের একটি শিশু কেঁদেছিল বাবার মারে। গরু চরাতেও যেতো না, সে যাবে পাঠশালে।

…মাও তার সে সাধপূর্ণ করতে পারেনি সেদিন।

…দীর্ঘ দশবছরে বদলেছে অনেক কিছু।

যোয়ান স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে অবিনাশ; কিন্তু মাও আজ বেঁচে নেই। শুনেছে কোন বছর নাকি অবিনাশের অনাগত কোন সহোদরকে বুকে নিয়েই হতভাগ্য নারী স্বামীর পুণ্যপদস্পর্শ লাভ করে শেষ হয়ে গেছে।

ঈশ্বর ডোম সেবার ডাকাতির দায়ে জেলে যাবার আগেই বৌটাকে সামান্য একটা নিষেধের প্রতিবাদে থেৎলে লাথিমেরে শেষ করে গিয়েছিল।

অবিনাশ সবই শুনেছে। চুপকরে সয়েই গেছে।

আজ দুপুরেও বাবা সেই কথাই তোলে।

…পাড়ায় কেমন যেন একটা নগ্ন দারিদ্র্য আর বীভৎসতা।

…বাতাসে ধেনোমদএর গন্ধ, কোথায় মাটির বড় জালায় ভাতে বাথর দিয়ে পচিয়ে রেখেছে।

ঘরে টেকা দায়, যেন নরক।

ঈশ্বর ডোম এই বয়সেও ওই উন্মাদনা ছাড়েনি। চোখদুটো করমচার মত লাল, সাকরেদদের ডাক দিয়ে নিজেই গিয়েছিল গোকুলকে খুঁজতে—সে নাকি বড়-বাবুদের গাঁয়ে গেছে।

তাই ঘরে এসে খেয়ে দেয়েই বেরুবে তার খোঁজে। হঠাৎ অবিনাশকে দেখেই কথাটা বলে ওঠে।

—উসব পুঁ প্যা ছাড়ান দে, বুউলি।

—তবে করবো কি ?

হাসছে ঈশ্বর ডোম। হা হা করে হাসছে দুর্দান্ত ওই লোকটা।…একটু গলা নামিয়ে ইসারা করে দেখায়।

—এতের বেলায় বেরো—একহাত মেরে আনবি, চোপন্নমাস খা কেন্নে, পায়ে পা দিয়ে।

শিউরে ওঠে অরিনাশ বাবার কথা শুনে। ঈশ্বর বলে চলেছে।

—সোমস্ত বয়েস। সখ গেল বাজালি—এক আধকলি। তবে ওতে প্যাট ভরবেক নাই। তাই বলছি ছাড়ান দে।

অবিনাশ কথা বলে না। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। তীব্র ঘৃণা আর অসহ্য অবজ্ঞা ফুটে ওঠে।

সারা বাড়ীটার বাতাস বিষিয়ে উঠেছে, মদের তীব্র গন্ধে মাছি উড়ছে ভন ভন করে। পাশেই পটলার বৌটা চেঁচাচ্ছে, পটলা বোধহয় পিটছে মদের ঘোরে।

বের হয়ে এসে দাঁড়াল অবিনাশ, হাতে ওই সানাইএর ছোট্ট বাক্স। ওরদিকে চেয়ে থাকে ঈশ্বর।

—কুথা যাবি ?

কথার জবাব দিলনা অবিনাশ, এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে গুলবাঘের মত লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল—ঈশ্বর ডোম।

—রা কাড়ছিস না যি ? কথাটো খুব খারাপ লাগছে না ?

—উসব করিনি কোনদিন, করবোও না। না খেতে পেলেও করবো না। আমি চোর লই—

গর্জন করে ওঠে ঈশ্বর— চোর। কি বললি ?

—বলছিতো, আমি চোর লই। চোরের ভাতও খাই না। তাই ইথান থেকে চলে যেচ্ছি।

—বটে ! ঈশ্বর অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

বলিষ্ঠ যোয়ান ছেলে। তার ভাতও এতদিন খায়নি। আজ মুখের উপর ওই জবাব দিয়ে গেল !

গর্জন করে ওঠে ঈশ্বর ডোম বেশ। তবে শুনে রাখো শালা—ই মাটিতে পা দিলে দুআধখান করে ফেলাবো। তখুনিই বলেছিলাম—কসবী বৌটাকে, উশালা বাপের বাচ্ছা লয়, ডোমের রক্ত ওর গায়ে নাই। শালা বিজাত।

—চুপ করে বের হয়ে এসেছে অবিনাশ।

সামান্য যে টুকু আশ্রয় ছিল আজ তাও হারিয়ে গেল—পরিচয়ও। একাই পথে বের হয়েছে একটি পথহারা কোন অপরিচিত অবিনাশ।

…সুরের পরশ তার মনে কোন অদেখা পথে কোন আকস্মিক মুহূর্তে প্রবেশ করেছিল, অনুরণন তুলেছিল জানে না। কিন্তু তার জ্বালাতেই বোধহয় আজ সে ওই ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে আপোশ করতে পারেনি।

—বিশাল গেরুয়া প্রান্তরের বুকচিরে চলে গেছে পথটা ; সবুজ বনসীমায় এসেছে ঝরাপাতার স্পর্শ ; পাখী ডাকছে। কোথায় শন শন হাওয়ার সুরে উদাস এক মহান সুরের আলাপন।

মূলতানী সুরের মতই রঙ্গীণ বেদনাময় একটি অদেখা আমেজ ওই দিকচক্রবালে বিধুরতা এনেছে।

শালফুলের সুবাস মিশেছে বাতাসে।

অবিনাশ কেমন যেন অসীম ওই ধরণীর কোলে তার নিজের সব দুঃখ ব্যর্থতার কথা ভুলে যায়।

—খাসনি দুপুরে ?

—আজ্ঞে !

অশোকের কথায় যেন হুঁস ফেরে। সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়ে।

—উ হবে পরে।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন একটা নিবিড় বেদনা ওর মনে। মেজের উপর বসে আছে। কালো পেটা গড়ন।

মুখে হাসির আভাষ একটু লেগেই আছে।

অবাক হয়ে সে দেখছে ঘরের চারিদিক—মুক্ত জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দিনের শেষ আলোয় বনসীমা রঙ্গীণ হয়ে উঠেছে।

পাখীরা দলবেঁধে ফিরছে কুলায়—সন্ধ্যা নামছে।

সুরটা উঠছে আকাশে।

জমাট বেদনা ঝরে পড়ে আকাশ থেকে হিম ধারায়, আর কুয়াসার গুড়ি গুড়ি চন্দন কণায়।

…টুপটাপ শিশির পড়ছে স্থলপদ্ম আর গন্ধরাজ গাছের পাতায়—গোলাপ গাছে কতকগুলো লাল ফুল ফুটেছে।

অবিনাশ কোন অসীম সুর রাজ্যের মাঝে হারিয়ে গেছে। অবাক হয়ে শোনে অশোক—সারা গ্রামের লোক।

একটা বাঁশীর রন্ধ্রের কোন নিবিড় বেদনাময় সুর সারা গ্রামসীমা ছেয়ে ফেলেছে সুরের মায়ায়।

রাত নেমেছে।

কুয়াসা ঢাকা রাত্রি; চাঁদের আলোটা ছড়িয়ে পড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রামসীমায়—ছায়া আঁধার ঘেরা বেনুবনে।

অবিনাশ যেন অন্য জগতে চলে গেছে।

ওই ক্লেদাক্ত পরিবেশ, দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য বাবার সেই কদর্য জীবনযাত্রা—এতটুকু আশ্রয়, সবকিছুর উর্দ্ধে সুরটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

মারু বেহাগ বাজাচ্ছে অবিনাশ।

বিষ্টুপুর গোঁসাইপ্রভুর প্রিয় সুর!…ওদের ঘরের মাধুর্যে—ভরপূর—প্রাণবন্ত।

এত মশগুল হয়ে সেও অনেকদিন বাজায় নি।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ ওঠে। কলরব!

নিস্তব্ধ সুরময় সেই পরিবেশের মাধুর্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে।

—চোর! চোর!

আর্তনাদ ওঠে কামারপাড়ার দিক থেকে। ভীত ত্রস্ত কাদের আর্তনাদ। থেমে গেল অবিনাশ।

…এত চেষ্টায় যে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছিল নিমিষের মধ্যে তা কোনখানে যেন হারিয়ে গেল। জেগে উঠেছে গ্রাম—কারা হৈ চৈ করছে।

আবছা অন্ধকারে কাদের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।
—হুঁসিয়ার।

…অশোক বন্দুক নিয়েই বের হয়ে গেল চকিতের মধ্যে। আবছা কুয়াসা ঢাকা অন্ধকারে দেখে—গ্রাম থেকে কাজলা-দিঘীর মরাহাজা খাতের ওদিকে কোন ছায়া মূর্তির দল বেগে বের হয়ে গেল।

মিশে গেল তারা অরণ্যের কুহেলি-ঢাকা অন্ধকারে।

তখনও কলরব শোনা যায়। কারা যেন দল বেঁধে এই দিকেই আসছে। লণ্ঠনের আলোয় পথটা ভরে উঠেছে।

চোর পড়েছিল অতুল কর্মকারের বাড়ীতে। আজই অতুল কর্মকার সদরে প্রথম চালান দিয়েছে অনেক মাল। খুট বাসনও এসেছে অনেক। কি করে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল জানে না—যারা পাবার ঠিকই পেয়ে গেছল। ছান্থ দাসও বলে ওঠে বীরদর্পে—

—আজ বৈকালেই শালা ঈশ্বরকে দেখেছিলাম কাকা।

অতুল কামার চুপ করে বসে আছে। কোন কথা বলে না। সকলেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা!…আজ সর্বস্বান্ত করতে এসেছিল ওরা। কিন্তু পারেনি।

সাবধান হয়েছিল আগে থেকেই কামার পাড়ার লোক। আকাশ বাতাসে ওরা টের পেয়েছিল আগামী সর্বনাশের কালো ছায়া।

ওরা সজাগই ছিল।

বাতাসে সুরটা উঠছে। মিষ্টি সানাইএর সুর। হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কারা যেন নেমেছে পাচীল টপকে। একটা শব্দ! জেগে উঠেছে সকলেই। চীৎকার করছে মেয়ে বৌরা—পাড়ার অনেকেই।

…বেগতিক দেখে ওরা পালাচ্ছে।

এমোকালী চালা থেকে লোকটাকে নামতে দেখেই পিছন থেকে পায়ে সজোরে বসিয়েছে লাঠিটা।

অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে যায় সে।

ওরাও পালাচ্ছে! নিমিষের মধ্যে আহত লোকটা উঠে দাঁড়াতে গেল—পারে না। আর সবাই কোন দিকে আঁধারে মিশিয়ে গেছে।

—ধরেছি এক শালাকে। আলোটা আন।

…এমোকালী গজরাচ্ছে। ভুবন—কার্তিক ছুটে যায়।

—আরে! এ যে ঠাকুর!…

চমকে ওঠে অতুল কামার। আজ বৈকালেই ক্ষুধার্ত লোকটাকে ডেকে এনেছিল—ভক্তিভরে ব্রাহ্মণ সেবা করিয়েছে। আর সেই-ই কিনা রাতের অন্ধকারে এসেছে তার সর্বনাশ করতে।

গর্জাচ্ছে কালীচরণ—ঠাকুর না কুকুর। দে শালোর মুখে মুতে।

—কেলে!

অতুল থামাল তাকে! কি করা যায় ভাবছে। চোরের ব্যাপারে কি ভাবছে তারা!…বেদনায় কাতরাচ্ছে গোকুল।—

হঠাৎ অশোককে দেখে ওরা যেন অকূলে কূল পায়।

—ছোটবাবু!

এগিয়ে এসে দাঁড়াল অশোক। অবাক হয়ে আহত গোকুলের দিকে চেয়ে থাকে।—থানায় খবর দিতে হবে কালী। কি যেন ভাবনায় পড়েছে তারা। আশ্বাস দেয় অশোক।

—কোন ভয় নেই। যাও আমি লিখে দিচ্ছি। আর রমণ ডাক্তারকে ডেকে আনুক একবার।

গোকুল উঠে বসেছে ইতিমধ্যে—কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

…সুরের সংস্পর্শ যেন ওদের আক্রমণে নিঃশেষে মুছে গেছে গ্রামসীমা হতে।

অবিনাশের সব চেষ্টা—সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছে ঈশ্বর ডোম বারবার তার নিষ্ঠুর পাশবিকতায়।

চুপ করে বসে আছে অবিনাশ, সেও শুনেছে ওই চুরির কথা, তার কানেও গেছে আজকের রাত্রের এই চুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বাবার নাম। অবনী মুখুয্যে সবজান্তা। সে নাকি পরিষ্কার বলেছে—এ সব চুরি ওই ঈশ্বর ডোমেরই কাজ।

ছাহু তো পরিষ্কারই বলেছে—উসব জানি না আজ্ঞে। উকে আজ বৈকালেই দেখছিলাম পড়েল পুকুরের ধারে ওই গোকুলের সঙ্গে।

অশোক কোন কথাই বলে না।

থানায় খবর পাঠিয়েছে রমণ ডাক্তার—গোকুলের পা খানা দেখে!—ঐ যে কামারের মার বাবা, গেছে একেবারে পাখানা।

কালী গজরাচ্ছে—আর চুরি যেন না করতে পারে আজ্ঞে। তাই ঠ্যাংটাই নিলাম। বেহ্মহত্যা করে কি হবেক।

আশ্চর্য ধৈর্য গোকুলের, এত কথাবার্তা—মন্তব্য—গালাগাল নির্বিকারচিত্তে হজম করে যায়।

অবিনাশও গিয়েছিল দেখতে। চুপ করে সরে এসেছে দেখে শুনে। কেমন তার মনে একটা বিক্ষোভের সুর—হতাশার অন্ধকারে সব যেন ডুবে যায়।

…ভোর হয়ে আসছে।

জেগে উঠেছে সুপ্তিমগ্ন গ্রাম। বনসীমার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে সকালের প্রথম সোনা রোদ।

…গরুগুলো এসে বনধারের মাঠে জমছে।

হাঁসের দল কলরব তুলেছে পড়েল পুকুরের ঘন নীল জলের বুকে। শান্ত জীবনযাত্রা। কোথাও কোন ছন্দহীনতা চোখে পড়ে না। ক্যাবে বের হচ্ছে মুনিষ-মাহিন্দারের দল।…এরই মাঝে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে অবিনাশের সুর।

—ছোটবাবু। অশোক ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। হাতে ওর সানাইএর ছোট্ট বাক্স। বেরুবার জন্য তৈরী হয়েছে সে। প্রণাম করে অশোককে।

…কোথা যাবি?

হাসে অবিনাশ, জানেনা সেও তার গন্তব্যস্থল। তবু যেতে হবে তাই জানে। এখানে থাকলে সে বাঁচবে না। ওদের মতই কোন রকমে শুধু মাত্র বেঁচে থাকবার জন্যই এই পথেই হয় তো নামতে হবে। এর চেয়ে তার এই অনিশ্চিত জীবনই কাম্য—তবু বাঁচবার পথ খুঁজে নিতে অন্ততঃ চেষ্টা করবে।

অশোক ওর হাতে তুলে দেয় দশ টাকার একটা নোট!

—রাখ।

…কেমন যেন ইতস্তত করে অবিনাশ।—মাঝে মাঝে দেখা করিস।

প্রণাম করে অবিনাশ। দেখা সে করবে। একটি

মানুষকে অন্ততঃ সে খুঁজে পেয়েছে এখানে, যে তাকে বুঝতে পেরেছে—অন্ততঃ ভালবাসে। এই ভালবাসার কোন সংজ্ঞা নেই, চিনতেও দেরী হয় না। অদৃশ্য কোন বন্ধনে মানুষকে বেঁধে রেখেছে—হাঁটতে শিখিয়েছে।

শত দুঃখের মধ্যেও তাই সান্ত্বনা পায় অবিনাশ। সকালের আলো-ঝলমল ধরিত্রী, পাখী ডাকা বনভূমির মাঝ দিয়ে চলে গেছে ছায়াঘন পথটা—মাথার উপর অসীম নীল আকাশ। বাতাসে বিচিত্র এক অধরা সুর। এমনি উদার পৃথিবীতে সে জন্মেছে। শত বর্ষামুখর দিনে শুনেছে মেঘগর্জনে আর বৃষ্টির ধারাপাতে একটা মহান সুর—দিক থেকে দিগন্তজোড়া সেই সুরের বিশাল অপরূপ রূপ—আবার সেই বর্ষার মেঘরাগের আলাপন শেষে দেখেছে শরতের শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়া-ঢাকা মাধুর্য্য—বাতাসে পূর্ণতার আশ্বাস।

বসন্তে তাই সেজে উঠেছে আজকের বনভূমি—সবুজ হলুদ আর নানা রংএর পত্রপুটের নৈবেদ্য, বাতাসে মহুয়া কুর্চি ফুলের মদির সুবাস।

বিশাল মহানঁ এ কোন পৃথিবী। মৌমাছি আর প্রজাপতিরা বাতাসে ছিটোন রঙ্গীণ ফুলের মত উড়ে চলেছে বনে বনে। একি এক সুন্দর রাজ্য।

...বাইরে মানুষের হানাহানি—শুধু বেঁচে থাকার জন্য এই হীনতা—নীচতা। কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে এই অপরূপ কোন সুন্দরের রাজ্য।

থমকে দাঁড়িয়েছে পথ-চলতি অবিনাশ।

কে যেন অজ্ঞাতেই তাকে এই শান্ত নিবিড় প্রকৃতির সভাঙ্গনে হাত ধরে এনে পৌঁছে দিয়েছে অধরা কোন স্বপ্ন রাজ্যের মুশায়েরায়!

কি ভেবে বসে পড়েছে অবিনাশ।

সবুজ হরিতকি গাছের নীচে বসে আপন মনে সে বাজিয়ে চলেছে। এর সুরটা ওই বনভূমির ঐক্যতানে মিশে গেছে। রাগ বসন্ত!

...বসন্ত রাগ আলাপ করছে অবিনাশ তন্ময় হয়ে। এ সুরের রেশ কোন মানুষের আসরে পৌছবে না—কোন অধরা সুন্দরের রাজ্যে হারিয়ে যাবে।

বনভূমিতে রোদ উঠেছে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে হিজিবিজি-কাটা রৌদ্র ছায়ার মায়াজাল; একজোড়া ময়ূর ঘুরে বেড়াছিল, কি একটা বিচিত্র সুরে—তারাও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

...শান্ত পুকুরের মাঝে কে যেন একটা ঢিল ছুঁড়েছে। ...চারিদিকে উঠেছে তরঙ্গ। তীরে গিয়ে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। কামারপাড়ার অনেকেই এতদিন ঠিক ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করতে পারেনি। ক্রমশঃ করেছে এবং বেশ বুঝেছে এই ঘটনার পর থেকেই।

তারা আর তারকবাবু—অবনী মুখুয্যে—ধরণী চট্টরাজ কাউকেই মাল দেবে না; সমস্ত মাল-পত্র যাবে সদরের মহাজনের ঘরে। ক্রমশঃ শালের গনগনে আগুনে তাতা লোকগুলোর মনে একটা কঠিন শপথ যেন জেগে উঠছে।

...অতুল কামার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। এতদিন বামুন এবং জমিদারবাবুদের গুষ্টী মায় পাঁচ কড়ার সরিকান ধরণী মুখুয্যেকেও সম্মান দিয়ে এসেছে। একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। তাই এত সহজে এক কথায় সে সব কিছু মুছে ফেলতে পারে না।

সতীশ ভটচাযএর কায বেড়েছে। কামারপাড়ার ন্যাড়া শিব পূজো—এটা সেটা পূজো আস্রায় সেই যায়। ওইটুকুই যেন ধর্ম এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে ওরা তাদের।

দেড় ঠেঙ্গে ভটচায সেদিন কথাটা পাড়ে।

এটা কি ঠিক হচ্ছে অতুল?

অতুল তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে—ভটচায মশায়ের কথায় মুখ তুলে চাইল।

—এই গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে এটা করা! গাঁয়ের পয়সা গাঁয়েই থাকতো—না হয়। যেছে মহাজনের ঘরে—

অতুল প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ছেলে-ভাইপো অন্যদের।

এমোকালী বলে ওঠে—না। ওরা দর বাড়ালে তবে কথা।

অতুল আপোষের সেই মন নিয়েই বলে।

—আজ্ঞে বাবুদের দর বাড়াতে বলেন, তবেই ছেলেরা কথা বলবে। জানেন তো আমরা হলাম বুড়ো হাবড়া, আজকালকার ছেলেদের ব্যাপার কিনা—

বুড়োও যেন নিজেকে অসহায় বোধ করে। সতীশ ভটচাযও। তারও মুস্কিল বেড়েছে এই পরস্পর ঝগড়ায়।

তারকবাবু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—শ্যাম আর কুল দুই রাখা চলবে না। দরকার হয় একটাকে ছাড়তে হবে।

তা ওই বামুনপাড়াই হোক—আর কামারপাড়া এবং অন্যান্য পাড়াই হোক—দুটোর একটাকে তার ছাড়তে হবে।

সতীশ ভটচায অবশ্য অনেক চেষ্টাই করছে যাতে একটা মীমাংসা হয়ে যায়—কিন্তু দেখছে দুজনেই যেন শাল-কাঠ, ভাঙ্গবে তবে মুইবে না।

অতুল বলে চলেছে—এটা দেখতেও খারাপ লাগে ভটচায মশায়—এই আকচা-আকচি? আমরা তো পিঁপড়ের জাত—টিকে আছি। টিপে দিলেই নাই। আপনিও বুঝিয়ে বলেন বড়বাবুকে।

ভুবন বাড়ীতে ঢুকেই ওদের কথাবার্তা শুনে একটু চটে ওঠে। বাবাকে যেন বুঝিয়েও পারেনি এতকাল। বুড়ো হলে বোধ হয় এমনি নিস্তেজ হয়ে আসে মানুষ। সকলের কাছেই কাঁদুনি গাওয়াটা স্বভাবেই দাঁড়ায়।

এগিয়ে আসে ভুবন। একটু কঠিন স্বরেই বলে ওঠে—থামো দিকি তুমি।

অতুল চুপ করে গেল। ছেলের অতর্কিত ধমকানিতে ভয় পেয়ে গেছে সত্যিই।

একটু থেমে বলে ওঠে অতুল—হাঁরে, মীমাংসার কথাও কইবি না? হাজার হোক গাঁয়ের বাবু ওরা।

গজরাচ্ছে ভুবন—মীমাংসা! ওই উদের সঙ্গে! তেলে জলে মিশ খায় না। ই আবার নোতুন কথা কি। উ লিয়ে আর কুন কথা তুমি বলবা না, শুনবো নাই।

সতীশ ভটচাযও চুপ করে যায়।

ভুবনই বলে ওঠে সতীশ ভটচাযকে।

—আপনিও এ নিয়ে আর কথা বলবেন না ভটচায মশায়; শেষ কথা হয়ে গেইছে। আর লয়।

সতীশ ভটচায সাপের মুখে চুমু দেয়—ব্যাঙের মুখেও। সুতরাং বলে ওঠে সেও—তা তো বটেই বাবা।

গজরাচ্ছে তখনও ভুবন—হাঁ। ছাপ কথা বলে দিইছি।

গুটি গুটি বের হয়ে গেল সতীশ ভটচায—অতুলও পিছনে পিছনে গেল, ছেলের ওই কড়া কড়া কথাগুলো কেমন তার ভাল লাগে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন।

—মেতে উঠলা নাকি হাঁ গো!

কদমবৌ সব ব্যাপারটাই শুনেছে। ভটচায মশায়কে ধমকানো—বুড়ো শ্বশুরকে ওই সব বলা—সবই দেখেছে সে।

কেমন ভাল লাগেনা তার এ সব।

কদম এমনিতেই শান্ত প্রকৃতির। চুপচাপ ঘর সংসারের কায নিয়েই থাকে। ভগবান তার বুকে একটা অসীম শূন্যতা ব্যর্থতা দিয়েছেন—তাও সে টের পেয়েছে।

মা হয়নি আজও।

মনে হয় কোন পাপে অপরাধে তার এই ব্যর্থতা। তাই সহজেই বোধহয় মন কাঁদে তার।

ভুবন এতশত ভাবে না। সে কায নিয়েই থাকে—এত তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতাও তার নেই। চায়ও না।

তাই স্ত্রীর কথায় জবাব দেয়।

—ঠিক কথা বলবো তাও দোষ!

—ঘরের ভেতর ঠিক কথা বলতে বলেনি কেউ—ওই সব বক্তিমে দেবা শালে বসে—ইখানে লয়। মানী লোককে যা লয়, তাই বলবা!

—ওই! ইকি হল তুর!

...অবাক হয়ে যায় ভুবন। কদমের অন্তরে কোথায় সেই সুপ্তব্যর্থতা জেগে উঠেছে। কাঁদছে সে।

ভুবনও কেমন অপ্রতিভ বোধ করে।

—ধ্যাৎ! খালি খালি কাঁদিস কেনে বল দিকি?

চোখ মুছে সরে গেল কদমবৌ। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বাঁটনা বাটতে থাকে।

সকালের সুরটা কেমন কেটে যায়। ভুবন শাল-ঘরের দিকে যাচ্ছে দেখে অতুল বুড়ো এসে চুপ করে চারপাইএর উপর বসলো। হাতের হুকোটা টানবার মনও যেন তার নেই। কি ভাবছে।

ভুবন দাঁড়াল না, কাযে চলে গেল বাইরে।

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের গোরা ও শরৎচন্দ্রের নববিধান

শ্রীবলাই দেবশর্মা

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যের সম্যক্ পরিক্রমা হয় নাই। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলিয়া প্রশংসা করা হইলেও যখন তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিবার একটা জল্পনা-কল্পনা হইতেছিল, তখন কেহ কেহ তাহার বিশেষ বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। অতীতের সেই সকল বিষয় বর্তমানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

শরৎবাবুর যে সকল উপন্যাস ও গদ্যসাহিত্য রসিক ও পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "নববিধান" উপন্যাস খানি স্থান পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী" যেমন একখানি লিরিক ধর্মী—গল্প, নববিধানও তেমনই নীতিকাব্য প্রবণ উপন্যাস। আপনাতে আপনি ঢল ঢল, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এই উপন্যাসটি সাহিত্য কলা আর্টের সমগ্রতার বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের যোগ্য কিনা, এ বিচার করিতেছি না, তবে ইহার একটি নারীচরিত্র যে অনুপম এবং উহাই এই উপন্যাসের মানস সরোবরে শতদল শোভায় ফুটিয়া রহিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। এমন নারী-চরিত্র কোটিকে গোটিক মিলে। এই উপন্যাসখানিকে বলা যায় সাহিত্যের উপেক্ষিত।

বঙ্কিমোত্তর উপন্যাস-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের "গোরা" বিখ্যাত উপন্যাস এবং ইহা বহু প্রশংসিত বটে। দ্বিজেন্দ্র-লাল—যিনি রবীন্দ্র কাব্যে দুর্নীতি, অবাস্তবতার ও অস্পষ্ট-তার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তিনিও গোরার প্রশংসায় হইয়াছিলেন—পঞ্চমুখ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর গোরা সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ অভিমত উত্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ঐ উপন্যাসের রসবস্তু সম্বন্ধে নহে—সমাজ-বিজ্ঞানের বিচারে গোরায় যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে রামেন্দ্রবাবু তাহাই সমাজ-বিদ্যা ও জীব-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ গোরা লিখিয়া-ছিলেন, সে ভাবধারা উপন্যাসখানির সমাপ্তিপর্ব পর্যন্ত অনুবর্তন করিয়া চলিতে পারিয়াছেন কিনা, সে কথাও আজ পর্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই। গোরার এইরূপ পরি-সমাপ্তি কি কারণে হইল, তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে জন্য হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ স্বরূপে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই কারণেই গোরা ব্রাহ্মতরুণী সুচরিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার ভারত-ভক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইল। রবীন্দ্র মানসিকতার ইহা পিতৃকৃত্য—যেনাস্য পিতরো যাতা।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের প্রভাবে কতকটা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোরা। গোরার উক্তি যাহা সে বিনয়ের সহিত আলোচনা করিত, কিম্বা গোরার একান্ত বন্ধু বিনয়—যাহা সুচরিতা ও পানু-বাবুর সহিত তাহাদের বিতর্ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, তাহা বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি, সমাজ ও "সন্ধ্যায়" উপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহারই পুনরুক্তি। এই সাদৃশ্য নির্ণয় করিতে বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না, উহা সহজেই ধরা পড়িবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব নহেন। তিনি তাঁহার স্বকীয় সত্তায় সমধিক আস্থাসম্পন্ন। পরন্তু তিনি ব্রাহ্ম এবং পিতৃধর্মনিষ্ঠ। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রব-র্তক ও প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র তিনি। বংশাভিজাত্যেও তদানীন্তন দিনের বাংলায় তাঁহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আবার শোণিতধারার বৈজিক শক্তিকেও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না। গোরা লিখিতে গিয়া তিনি তাহা পারেনও নাই। তাঁহার জন্মগত স্বভাব সংস্কারের বিপরীত ধারায় চলিতে যাওয়ায় তিনি পদে পদে থামিয়াছেন। পরিশেষে তিনি তাঁহার পৈতৃক ভাবাদর্শের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আইরিশ পিতামাতার সন্তান গোরা হিন্দু সমাজের পক্ষে একটা জটিল সমস্যা; অতএব ব্রাহ্মতরুণী সুচরিতার হাতে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া একটা নিতান্ত কল্পিত সমস্যার সমাধান

করিতে চাহিয়াছেন। আইরিশ-কন্যা মিস্ নোবল যে নিবেদিতা হইতে পারেন, অথবা স্যর জন উড্রফ্ যে ইংরেজ থাকিয়াও তন্ত্র অনুশীলন করিয়া মৃত্যু কালে বলিয়া যাইতে পারেন যে, পরজন্মে আমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিব; বিবেকানন্দের প্রতিবাসী এবং নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইয়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধতা করেন নাই। গোরার পরিণতি তাঁহার সুপরিকল্পিত।

গোরা যে আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই লেখা হউক, তাহার চরিত্রগুলিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি একটু অধিক আকর্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক হয় নাই। কেননা, ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য গুরু হইয়া তিনি যে হিন্দু ধর্মের জয় ঘোষণা করিবেন, এমন একটা সঙ্কীর্ণ সাম্য তিনি অনুসরণ করিতেন না। এইখানে ব্রহ্মবান্ধব—রবীন্দ্রনাথে ঐকান্তিক প্রভেদ। ক্যাথলিক খৃষ্টান উপাধ্যায় যে মুহূর্তে বেদান্তের আলোকে হিন্দুধর্মের অপূর্ব মূর্তি দেখিলেন,সেইদিনই তিনি তাঁহার পিতৃধর্মে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিশ্ব—রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ এমন সঙ্কীর্ণবুদ্ধি হইবেন—কেমন করিয়া?

তবে ব্রাহ্ম সমাজের যে আচার ব্যবহার—আদি ব্রাহ্ম সমাজের রবীন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারেন নাই, তাহার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অত্যুগ্র ব্রাহ্মিকা বরদা-সুন্দরীর প্রতি কবি আদৌ প্রসন্ন নহেন। এই হঠাৎ-ব্রাহ্ম মহিলাটির চলনে, বলনে, সাজসজ্জায় কোথাও তিনি শোভনীয়তা দেখিতে পান নাই। অথচ তাঁহারই কন্যা লাবণ্যললিতা কবির চক্ষে হেয় নহে। বরদাসুন্দরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কারণ দুইটি হইতে পারে। প্রথম—কাহারও কাহারও এইরূপ সাম্প্রদায়িক উগ্রতা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়; দ্বিতীয়—আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পার্থক্য হইতেও রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। শেষের কারণটি একান্ত অসঙ্গত নহে। কেননা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী সভা পানুবাবুর প্রতিও কবি সন্তুষ্ট নহেন। বরদাসুন্দরীর ব্রাহ্ম-পণার অতি-আধিক্য রবীন্দ্রনাথের চক্ষে আদৌ সমর্থন যোগ্য হইতে পারেনা।

তবুও গোরা গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নরনারীকেই পদে পদে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী পরেশবাবু যখন তাঁহার দক্ষিণের বারান্দাটিতে উপাসনা করিতে বসেন, তখন তিনি ব্রহ্মে একেবারে ডুবিয়া যান; কিন্তু গোরার পিতা কৃষ্ণদয়াল সর্বদা ধর্মকর্ম লইয়া থাকিলেও সে শুধু নিরর্থক আচার-বিচার বিধিনিষেধের বেড়াজাল। তাঁহাকে তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধু পরেশবাবুর মত ইষ্টধ্যানে সমাহিত হইতে দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মী, লেখক, বক্তা, প্রচারক পানু বাবু অপেক্ষা হিন্দু সমাজ ভুক্ত বিনয়ের প্রতি কবির মমতা কিছু অধিক, ইহার কারণ—বিনয়কে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন আছে। তাহাকে তিনি হিন্দু মেয়ের সহিত বিবাহ না দিয়া ব্রাহ্মিকা ললিতার সহিতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। যে চিহ্নিত ব্যক্তি, তাহাকে কে আর উপেক্ষা করিতে পারে। ঔপন্যাসিক ও কবি মানুষই, তাঁহাকে ঋষি বলিলেও ঋষি নহেন। রবীন্দ্রনাথও একথা বলিয়া গিয়াছেন—কাব্য দেখে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো! বিনয়কে তিনি হিন্দু সমাজের বদ্ধ পল্বল হইতে ব্রাহ্ম সমাজের মহাসাগরে অবগাহিত করাইয়াছিলেন।

গোরার মা আনন্দময়ীকে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ জননীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন! ইহার কারণ আনন্দময়ী হিন্দু গৃহিণী হইলেও উদারমতাবলম্বিনী। তিনি তাঁহার খৃষ্টান পরিচারিকা লছমিয়ার হাতে অন্নজল গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন না। কিন্তু, সুচরিতার মাসীমাতা নিষ্ঠাবতী এই হিন্দু বিধবাকে তিনি আদৌ সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই। বরং তাঁহাকে খর্ব করিতে কিছু মাত্র কার্পণ্য করেন নাই।

এইরূপে গোরার এক একটি চরিত্র লইয়া যদি তুলনামূলক সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উক্ত উপন্যাসে কবি ব্রাহ্ম নারীচরিত্রগুলিকে, এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যাহাতে হিন্দু সমাজভুক্ত কোনও মহিলা তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেনা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ব্রহ্মবান্ধবের একটি উক্তি মনে পড়ে। উপাধ্যায় বলিয়াছেন—জাতীয় ইতিহাসে যাহারা আলোক পায় না তাহারা ভ্রষ্ট।

কিন্তু জাতীয় ইতিহাসের এই দিব্য আলোক দীপ্যমান হইয়া উঠিল—শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসে। সাহিত্য-কলা

যাহাকে আর্ট বলা হয়, তাহা দেশাত্মবোধ ও স্বভক্তিশ্রী হইতে পৃথক বস্তু নহে। শরৎবাবু বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কেবল যে একটি মিষ্ট, করুণ, মমতাপূর্ণ রস পরিবেশন করিলেন, তাহাই নহে, তিনি হিন্দু নারী মহিমার অপূর্ব্বতাও তাঁহার কুশলী তুলিকায় আলিম্পিত করিলেন। যে ধর্মাশ্রয়ে রামকৃষ্ণ, ভূদেব, ইশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির জননী ও শত শত মহাপুরুষের মাতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি রাজা রামমোহন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জননী যে সমাজে সমুদ্ভূতা ও প্রতিপালিতা, সেই হিন্দু নারী কখনও হেয় হইতে পারেন? এইরূপ চিন্তাও আত্মদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথও এই নারী সমাজকে দেখিয়ে একদিন বলিয়াছেন—মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে। মাতৃত্বই হিন্দু নারীত্বের স্বরূপ।

শরৎচন্দ্র এই মাতৃস্বরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট কতকগুলি উপন্যাসে। তাঁহার নববিধান গ্রন্থখানিও এই মাতৃমহিমায় উদ্ভাসিত। নববিধানের উষা গর্ভধারিণী না হইয়াও জননী। তাহার সহজ মাতৃত্ব সর্ব্বদাই তাহার মাতৃ মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে। শরৎবাবু বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি গ্রন্থ না লিখিলে যে হিন্দুর নারী মাহাত্ম্য অজ্ঞাত হইয়া থাকিত এমন নহে, তবে বলি—সাহিত্যের উপন্যাস বিভাগে প্রতিমার রূপে ইহার একটা আবশ্যকতা ছিল। ইহার উপর দেড় শত বৎসর ব্যাপী স্বদেশী বিদেশী তাপ—প্রচারের ফলে বর্ত্তমান হিন্দুজাতি বহু পরিমাণে আত্মদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। যে যে নূতন রমণী সমাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহারা আর যাহাই হউন, রাণী ভবানী, সারদা দেবী, রাণী রাসমণি এবং শচীমাতা হইতে ভিন্ন গোত্রিয়া। তাঁহারা নিশ্চিতই জাগিয়াছেন, কিন্তু সে জাগরণ প্রাচ্য ভারতের ত্যাগ আদর্শ সমৃদ্ধ নহে, তাঁহারা নিশ্চয়ই তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিবেন না। বরং অমৃতলালের ভাষায় তাঁহারা নূতন বেদিনী রূপেতে মোহিত মেদিনী।

রসজ্ঞরা শরৎচন্দ্রকে বলিয়াছেন দরদী শিল্পী। এই দরদ না হইলে রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না। দরদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ সহানুভূতি—Sympathy ক্রৌঞ্চ মিথুনের প্রতি সুগভীর সহানুভূতিই আদিকবির কবিত্ব স্ফুরণের নিমিত্ত হইয়াছিল। শরৎ-মানসিকতায় এই সহানুভূতি ছিল প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাই তাঁহার গল্প, উপন্যাস পাঠে আপামর সাধারণ মুগ্ধ হইয়াছিল॥ তাহার যে সকল উপন্যাস-আখ্যান নৈতিক আদর্শ হইতে দূরবর্ত্তী তাহাও বারম্বার পড়িবার ইচ্ছা জাগে। পিয়ারী বাইকেও অবজ্ঞা করিতে সাধ যায় না।

বক্ষ্যমান আলোচনায় নববিধান উপন্যাসখানিকে কেন্দ্র করিয়া এই পরিক্রমা করিতেছি। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র উষা। তাহাকে লইয়াই এই আখ্যানটি একটি করুণ স্নিগ্ধ রসে ঢল ঢল করিতেছে। ইহাতে ঘটনার বিচিত্রতা নাই। বিচিত্র রসের সমাবেশ নাই। মনস্তত্ত্বের জটিলতা নাই। স্বামী পরিত্যাগী একটি গ্রাম্য তরুণীর সামান্য জীবন কথাই ইহার একমাত্র আখ্যান বস্তু।

উষা তাহার স্বামী সংসার হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছিল। পরিত্যক্তা হইয়াছিল—তাহার কারণ উষার শ্বশুর ইঙ্গ বঙ্গ সমাজভক্ত, আর উষা সংরক্ষণপন্থী বিদ্যারত্ন ঘরের মেয়ে; তাহার পিতৃপুরুষ চণ্ডীর পূজা করিতেন। কিন্তু এই অবজ্ঞাত মেয়েটি পুনরায় যখন তাহার স্বামী গৃহে স্থান পাইল, তখন তাহার নব আবির্ভাব দেখিয়াই ঋগ্বেদের সেই উষা সূক্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগচ্ছিত্র প্রকেতো তাজ্জনিষ্ঠ বিভা—জ্যোতি সমূহের মধ্যে জ্যোতি উষা আসিয়াছেন। এই কারকের আবির্ভাব দেখিয়াই উপলব্ধি করিতে পারা যায়—শরৎচন্দ্রের শিক্ষা-প্রতিভার সমুন্নতা। এই যে বিদ্যারত্ন বংশের দুহিতা, যে আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতি হইতে একান্তভাবে দূরবর্ত্তিনী—বরং যাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিলেও ক্ষতি হয় না, যে সুচরিতা লাবণ্যের পাশে বসিবারও যোগ্য নহে, যে কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখী হইতেও পৃথক, ধনাভিজাত্যের পারিপার্শ্বিকতায় প্রতিপালিতা হয় নাই, বরং শাস্ত্রশাসিত হিন্দু পরিবারে গ্রাম্য জীবন যাপন করিয়াছ, সেই মেয়ে বধু হইয়া যখন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন স্বামী গৃহে আসিল তখন তাহাকে নাসিকা কুঞ্চিত অথবা বিরক্ত হইতে দেখা গেল না। বরং তাহাকে ভিন্ন রূপেই দেখিলাম। যে রূপ মমতাময়ী কুললক্ষ্মীর পতিপুত্র নারায়ণ সুগৃহিনীর। সে যেন এ গৃহের উপেক্ষিতা অবহেলিতা নহে, বরং চিরন্তনী।

উষার স্বামী শৈলেশ কোনও কলেজের উচ্চ বেতন-ভোগী অধ্যাপক। ধর্ম মতে হয় ব্রাহ্ম, অথবা রিফর্মড হিন্দু। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর দেশে যে একটা নব্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহারা টেবিলে খায়, কাঁটা চামচ ব্যবহার করে, মুসলমান পাচকে যাহাদের—খাদ্য পাক করে, মুর্গী মাংস যাহাদিগের রসনায় অতি উপাদেয়.—শুক্তানি শাকের ঘণ্টে যাহাদের বিষম অরুচি, দুয়ারে জানালায় ভারি পর্দ্দা, টা টা, বাই বাই যাহাদের শিষ্ট বাক্য, পার্টি ও ডিনার—যাহাদিগের উৎসব, শৈলেশ সেই সমাজের লোক।—ইহা জানিতে পারিয়াছি তাহার ভগ্নী বিভার কথায়।—ইহা শৈলেশের পৈতৃক ক্রম। অর্থাৎ তাহারা দুই পুরুষে ইঙ্গবঙ্গ। গোরার পরেশবাবুর মত স্বকৃতভঙ্গ নহে।

শৈলেশ মানুষটি ভাল। সে তাহার বোন বিভার মত উগ্র নহে। কিংবা গোরার পানুবাবুর মত আক্রমণশীলও নহে। উষা পিতৃগৃহে যাইতে বাধ্য হইলে সে আবার—বিবাহ করে—একমাত্র পুত্র সৌমেনকে রাখিয়া সে স্ত্রী মারা যায়। পুনরায় নানা স্থানে বিবাহের কথা হইলেও এ পর্যন্ত আর বিবাহ হয় নাই। মাতৃহারা পুত্র ও সাংসারিক অব্যবস্থার জন্যই একান্ত বাধ্য হইয়া উষাকে আবার ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। শৈলেশের একটা মাত্র দোষ ছিল, সে বড় অগোছালো। সেই জন্যই অথবা ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের স্বাভাবিক বিলাস বাহুল্যে সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উষা যেদিন তাহার স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিল, সেই দিনই তাহার কিশোর বয়স্ক স্বপত্নী পুত্র তাহার মাকে ফিরিয়া পাইল। অতি ব্রাহ্মিকা গোরার বরদাসুন্দরী ও উষাতে এইখানে মর্মান্তিক প্রভেদ। বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিলেও তাহার জননীর স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। বরং সুচরিতার প্রতি তিনি একটু অসুয়াসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু বিদ্যারত্নের গৃহের উষা শাশ্বতী জননী।

উষার আসিবার সময় শৈলেশ অন্যত্র ছিল। কিন্তু প্রবাস হইতে ফিরিবার পর খাইতে বসিয়া দেখিল চেয়ার টেবিলের পরিবর্ত্তে আসন পাতা টোষ্ট-রোষ্টের পরিবর্ত্তে লুচি-তরকারী, আর পরিবেশনকারিণী উষা! তাহার মুসলমান বাবুর্চির সে সাক্ষাৎ পাইল না আর দুয়ারে সে ভারী পর্দ্দাও নাই। এই বিপর্য্যয়ে সে অসন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে পুলকিতই হইল। তাহার পর তাহার টেবিলে মেয়েলি অক্ষরে লেখা ছোট এক খানি হিসাবের খাতা দেখিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় সে বুঝিল—তাহার ঋণ ভার লাঘবের ত্রাণ-কারিণীরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার এই পরিত্যক্তা পত্নী। যে কুসংস্কারাছন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের কন্যা বলিয়াই প্রধানতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন বংশের এই তরুণীটি তাহার গলার কাঁটার মত ফোটে নাই বরং দুঃস্বপ্ন আতঙ্কিত কাল রাত্রির অবসানের পর সে যেন সত্যই মঙ্গল উষা।

কিন্তু, সমস্যা দেখা দিল' তখনই, যখন বিভা তাহার দাদার কাছে আসিল। সে নব্য সমাজের কন্যা ও গৃহিণী। তাহার স্বামী ক্ষেত্রমোহনও ব্যারিষ্টার। অতএব, তাহার জন্ম প্রাপ্তসংস্কার ও শিক্ষা উষাকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না! বরং তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তাহাকে পদে পদে আঘাত দিতে লাগিল। উষা পুরুষ মানুষ এবং গোরার বিনয় হইলে হয়ত এ আঘাতের যথোপযুক্ত প্রতিঘাত করিত, কিন্তু সে হিন্দু কন্যা, মাতা বসুমতীর মত সে সহনশীলা। ননদিনীর এই আঘাত সে নীরবে সহ্য করিল। কিছুমাত্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল না।

আধুনিকতা বিবর্জ্জিত যে আচার আচরণের জন্য বিভার এই উষ্মা এবং তাহার স্বামীর নিজের সমাজে অমর্য্যাদা ঘটিবার সম্ভাবনা, উষা তাহার প্রতিকারের দায়িত্বগ্রহণ করিল নিজের হাতে।

সে কোথাও কলহ কোন্দল, বাদপ্রতিবাদ করিল না। কিন্তু, শৈলেশের গৃহের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া দিয়া সে আবার তাহার পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। স্বামীর সংস্কার ও স্বভাবে কিছু মাত্র আঘাত দিল না। সীতা তাঁহার নির্ব্বাসন ও অগ্নি পরীক্ষায় কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। হিন্দু বিবাহ কালে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়—তোমার ও আমার হৃদয় এক হউক।

উষা যে দিন তাহার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বদিন শৈলেশ তাহার চায়ের টেবিলে সেই চির অভ্যস্ত রুটি টোষ্টই পরিবেশিত দেখিল এবং পরিবেশনকারী এক মুসলমান বাবুর্চী। এই রীতি পুনঃ সংস্থাপিত করিবার জন্য

উষা কোনও প্রকার উপদ্রব করে নাই। পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর মত স্বামীর তুষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছে। আবার, ঋগ্বেদ মন্ত্রে বলিতে সাধ যাইতেছে—

এষ দেবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্ব স্যেশানো কম্ব উষো সুভগে ব্যুস্থ।

উষা পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। এই উপেক্ষিতা পত্নী তাহার সভ্যতা ভব্যতা হইতে দূরবর্ত্তিনী হইলেও উষার পত্নীত্বের আপ্যায়নে সে সামান্য কয়দিনের মধ্যেই স্ত্রীর প্রতি মনে মনে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল স্ত্রী চলিয়া যাইবার পরই শৈলেশ অত্যগ্র হিন্দু হইয়া উঠিল। সে সৌমেনকেও রীতিমত ব্রহ্মচারী সাজাইল। সংসারে একটা উৎকট বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। বিভার স্বামী ক্ষেত্রমোহন এবং বিভা ও শৈলেশের বন্ধু-বান্ধব এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে সৌমেনকে তাহার পিসিমা পিতৃবংশের যোগ্য সন্তান করিতে চাহিয়া বিলাত পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সেই মিঃ সৌমেন এখন মুণ্ডিত মস্তক, কণ্ঠীধারী তিলক গোপী চন্দন চর্চ্চিত বৈষ্ণব বটু!

এই বিপর্য্যয়ের দুর্য্যোগে উষা আবার ফিরিয়া আসিল। ক্ষেত্রমোহন, বিভা বা শৈলেশ কেহই তাহাকে ডাকে নাই। তাহার পাতিব্রত্যই তাহাকে স্বামীর সংসারে ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং উষা ফিরিয়া আসিবামাত্রই বাবা শ্রীগুরুদেব ও গুরু পত্নী ও তাঁহাদের চেলা চামুণ্ডকে পুঁট্‌লি পোট্‌লা গুছাইতে হইয়াছে। আর সৌমেনের কিশোর অঙ্গে শোভা পাইয়াছে একখানি জড়িপেড়ে শান্তিপুরে ধুতী। আর্টের উপসংহার নাই। অতএব, এইখানেই আমার কথাটি ফুরাইল। তবে, শরৎচন্দ্রের নববিধানের উষাকে আবার বেদমন্ত্রে অভিনন্দিত করিতেছি—ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগচ্ছিত্রঃ প্রকেতো তাজনিষ্ট বিভ্‌বা।

বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

সমুন্নত গর্বভরে পর্বত একক মৃত্তিকায়,
বনস্পতি একা চিরকাল। যে হৃদয় সময়ের—
সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে থাকে, দুর্জ্ঞেয় সে; জানা যায়
তাকে কোন্ বুদ্ধি দিয়ে? সহজাত অনন্ত প্রেমের
মাধুর্য পারেনি তার অভিমানী দীপ্ত চেতনাকে
পৃথিবীর কাছে ধ'রে দিতে। একা যায় ঐরাবত,
সঙ্গহীন বন পথে, জলন্ত অঙ্গার যন্ত্রনাকে
আপন অন্তরে রেখে অগ্নিগর্ভ যেমন পর্বত।
পৌরুষ পাবক হ'য়ে দগ্ধ ক'রে গেছে ক্ষুদ্র ভয়ে।
নারীত্বের লাঞ্ছনায় নত নেত্র স্তব্ধ এ' দেশের
কলঙ্কিত আত্মা তার ঘৃণার আগুনে শুদ্ধ হ'য়ে
জীবনে উত্তীর্ণ হ'লো।
ক্লেশদীর্ণ কঙ্কর পথের
আঘাত একাই ব'য়ে সে গিয়েছে গর্বিত হৃদয়ে—
দীপ্তিহীন মোরা আজও বেঁচে আছি
লজ্জার আশ্রয়ে

ভক্ত-কবি মধুসূদন রাও

অন্নদাশঙ্কর রায়

মধুসূদন বলতে বাংলাদেশে যেমন একজনকেই বোঝায় ওড়িশায় তেমনি দু'জনকে। তাঁদের কেউ কারো চেয়ে কম প্রসিদ্ধ নন। দুজনেই অমর। যিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অমর তাঁকে বাংলাদেশের লোক চেনে। মধুসূদন দাস ছিলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক। আর সাহিত্যে অমর যিনি, তাঁর "ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ" এক কালে বাংলায় অনূদিত হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"য় কবিকণ্ঠের মালা পেয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা কারো মনে নেই। শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনো কোনো পরিবারে তাঁর শুদ্ধ জীবনের স্মৃতি জেগে আছে। মধুসূদন রাও ছিলেন কবি, তথা ভক্ত। সেইজন্য তাঁর প্রদেশের লোক তাঁকে ভক্ত-কবি মধুসূদন বলে নিত্য স্মরণ করে।

ছেলেবেলায় আমি যে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতাম সেখানে দ্বিতীয় ভাষা ছিল ওড়িয়া। সাহিত্যের পাঠ্য-পুস্তক ছিল মধুসূদন রাও মহাশয়ের রচনা। সে সব পাঠ্য পুস্তকের গদ্য অংশ মনে রাখবার মতো নয়। কিন্তু পদ্য অংশ মধুসূদনের স্বরচিত ও সুরচিত কবিতা। পাঠ্য-পুস্তকের জন্যই তিনি যে সে সব লিখেছিলেন তা নয়। তিনি লিখেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়, পরে জুড়ে দিয়েছিলেন পাঠ্যপুস্তকে। সে সব কবিতা পড়লে সহজেই ছন্দের কান তৈরি হয়ে যায়, চিত্ত সাহিত্যের আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়। তাঁর সব কবিতাই যে ভক্তিমূলক তা নয়। বরং প্রকৃতি-বর্ণনাই বেশী। তবে তার সঙ্গে খানিকটা দার্শনিকতাও থাকত। কিংবা নীতির অনুশাসন। মধুসূদন দাস কেবল সার আশুতোষেরই শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু মধুসূদন রাও ছিলেন আমার মতো বহু অবোধ বালকের শিক্ষার জন্য সমর্পিতপ্রাণ। শিক্ষাবিভাগেই তিনি কাজ করতেন। তবে এতদিনে তিনি পরলোকগত।

রাও কবিকে আমি চোখে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে "উৎকলসাহিত্য" পত্রিকায় তাঁর জীবনকথা প্রকাশিত হয়। লেখেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথ। আর একটু বেশী বয়সে এক সেট পুরাতন "উৎকলসাহিত্য" আমার হাতে পড়ে। তন্ময় হয়ে কবির জীবনচরিত পড়ি। কবির মৃত্যুকালীন একটি উক্তি আমার পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও মনে আছে। কবিকে যখন এনিমা দেওয়া হয় তিনি কাতরকণ্ঠে বলেন, এনিমা জানি না। জানি সেই চিনি মা। চিন্ময়ী মা।

কলেজে পড়ার সময় একটি পুরস্কার ঘোষিত হয়। আমি সেই পুরস্কারটি পাই—রাও কবির "বসন্তগাথা" নামক কবিতাবলীর সমালোচনা লিখে।

"বসন্তগাথা"র একটি কবিতা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করি। এটি কবির এক বন্ধুর পত্নীবিয়োগ লক্ষ্য করে লিখিত।

> "হজি নাহিঁ যার কেভেঁ কিছিহিঁ রতম
> এ মর্ত্য সংসারে সেহি দীন অকিঞ্চন।
> সে পুণি দরিদ্রতর, হরাই রতন
> এ ভবভবনে তাহা পাসোরে যে জন।
> সে পুণি দরিদ্রতম কৃপাপাত্র অতি
> হরাই পাসোরিবাক্ বলে যার মতি।"

স্বাধীনভাবে অনুবাদ করলে এই রকম শোনায়—

> "হারায়নি কভু যার কিছুই রতন
> এ মর্ত্য সংসারে সে-ই দীন অকিঞ্চন।
> সে জন দরিদ্রতর, হারিয়ে রতন
> এ ভবভবনে তাহা পাসরে যে জন।
> সে জন দরিদ্রতম কৃপাপাত্র অতি
> হারাইয়া পাসরিতে যার যায় মতি।"

আর একটি কবিতা কোনো এক পতিতা রমণীর দশা দেখে লেখা। তাতে আছে—

> "কে চাহিঁব চাহুঁ তোতে গর্ব অবজ্ঞার
> কিন্তু লো ভগিনী মুহিঁ তো দুঃখে কাতর।

আহত মো প্রাণ তোর মর্ম-হাহাকারে
কান্দই বিকলে মোর ব্যথিত অন্তর।"

ছন্দপতন না ঘটিয়ে এর পদ্যানুবাদ সম্ভব নয়। এর ভাষান্তর—কেউ যদি গর্ব আর অবজ্ঞাভরে তোর দিকে চায় তবে সে চা'ক গর্বে আর অবজ্ঞায়। ওলো ভগিনী, আমি কিন্তু তোর দুঃখে কাতর। আমার প্রাণ তোর মর্ম-হাহাকারে আহত। বিকল হয়ে কাঁদে আমার ব্যথিত অন্তর।

তার পরে কবি পতিতপাবনীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"পতিতা হেলেহেঁ নারী মোহরি তনয়া,
সতীত্ব, দেবীত্ব তার ললাটে লিখিত,
কে তাকু সেথিরু বিশ্বে করিব বঞ্চিত।"

এর অনুবাদ করা যায়। না করলেও চলে। তবু করা যাক।

"পতিতা হলেও নারী আমারি তনয়া,
সতীত্ব, দেবীত্ব তার ললাটে লিখিত,
কে তাকে তা হতে বিশ্বে করিবে বঞ্চিত।"

এ ক'টি নমুনার থেকে মনে হতে পারে কবি শুধু পয়ার ছন্দই জানতেন। তা নয়। ছন্দ সম্পদে ওড়িয়া অসাধারণ ধনী। আধুনিক যুগের পূর্বে তার ভাণ্ডারে বিচিত্র রাগরাগিণীসহযোগে রচিত অসংখ্য "ছান্দ" জমেছিল। কিন্তু সমসাময়িক রুচিতে সেগুলি আদিরসাত্মক বলে একালের কবিরা সে ধরণে নতুন কবিতা লেখা একপ্রকার বন্ধ করে দেন। ভক্ত-কবিও একজন ভিক্টোরিয়ান। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। অথচ প্রাচীন "ছান্দ" তাঁর শ্রুতিহরণ করেছিল। অনেকটা আমাদের ভানুসিংহ ঠাকুরের মতো। ভানুসিংহের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে তিনি নায়কনায়িকাকে বর্জন করে "ছান্দ" বাঁধলেন প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে। এই রকম একটি কবিতার নাম "পদ্ম"। সুর করে পড়তে হয়।

"পদ্ম"কে উদ্দেশ করে কবি যা বলেছেন তাতেও বিধাতার গুণগান। সে বিধাতাও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ঈশ্বর। মধুসূদন ভক্ত-কবি হলেও রাম কিংবা কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথ কিংবা লোকনাথ কিংবা চণ্ডী কিংবা সারদার নাম মুখে আনবেন না, তা হলে কেমন করে জনপ্রিয় হবেন? পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাঁর যেসব বই সেগুলি লোকে পয়সা খরচ করে কিনবে কেন? এখন মধুসূদন গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য। কে এক প্রকাশক নাকি বিক্রীত গ্রন্থের হিসাব দেন না। তাই বাজারে বই নেই। আমার এককালীন অধ্যাপক সুকান্ত রাও বললেন, "আমরাই ছেপে বার করব। কিন্তু তার আগে হাতে কিছু টাকা আসুক।"

ওদিকে ভক্ত-কবির শতবার্ষিকীও ভেস্তে গেল। টাকা উঠল না। উৎসাহী কর্মীরও অভাব। খুব সস্তায় দায়-সারা হলো কবির নিজের হাতে গড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের নাম পালটিয়ে ভক্ত-কবি উচ্চ বিদ্যালয় নাম রেখে। এই কবির কাছে উৎকলের কে না ঋণী! লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে ছেলেবেলায় এঁর লেখা পড়ে মানুষ হতে হয়েছে। "বর্ণবোধ" পড়ে অক্ষর পরিচয় হয়েছে কোটি কোটি উৎকলসন্তানের।

অবশেষে তাঁর কন্যা ও আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রবধূকেই করতে হলো পিতৃকৃত্য। লিখেছেন তিনি পিতার জীবনকাহিনী বাংলা ওড়িয়া দুই ভাষায়। তাঁর আদর্শ শ্বশুরপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"। তৎকালীন উৎকলসমাজেরও বিবরণ দিয়েছেন। পূজনীয়া অবন্তী দেবীর বয়স একাশি পূর্ণ হয়েছে। তৎকালীন উৎকল সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁর মতো ক'জনেরই বা আছে! এই কাজটি তিনি না করলে আর কেই বা করতেন! তৎকালীন উৎকলসমাজের সঙ্গে সমসাময়িক বঙ্গসমাজও যুক্ত ছিল। বহু বিশিষ্ট বাঙালী তখনকার দিনে ওড়িশায় অবস্থান করতেন। আর ব্রাহ্মসমাজেরও একটা ক্ষেত্র ছিল সেখানে। এই গ্রন্থে তৎকালীন বঙ্গসমাজেরও একটা দিক আলোকিত হয়েছে।

আধুনিক উৎকলসাহিত্যের ত্রিরত্ন হলেন রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও এবং ফকিরমোহন সেনাপতি। গল্পে উপন্যাসে ফকিরমোহন অদ্বিতীয়। কাব্যে রাধানাথেরই শিরে শিরোপা। মধুসূদনের গৌরব তা হলে কোন্‌খানে? মধুসূদন ছিলেন ঋষি-কবি। মৃত্যুঞ্জয় রথ মহাশয়ের ভাষায় "ব্রহ্মজ্ঞ মধুসূদন।" তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

সাধারণত দেখা যায় সাহিত্যে একজন বড় হলে আরেকজন তাঁর প্রতি হিংসায় জর্জর হন। বন্ধু হয়ে

থাকলে তাঁদের বন্ধুতায় ভাঙন ধরে। এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা যে মধুসূদন ছিলেন রাধানাথ ও ফকিরমোহন উভয়েরই পরম প্রিয়। রাধানাথের পুত্র সুলেখক শশিভূষণের ডাকনাম ছিল মধু। এই সাহিত্যিক-সৌহার্দ ব্যক্তিগত মাধুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধুসূদন ছিলেন মধুর স্বভাবের মানুষ।

রাধানাথও ছিলেন অতি সজ্জন। শেষ বয়সে তিনি একটি দোষের কাজ করেন। অনায়াসেই তিনি সেটি গোপন করে সাধুপুরুষ সাজতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হয়ে নিজের হাতে নিজের কলঙ্কের কথা লিখে ছাপার অক্ষরে প্রচার করেন। পুস্তিকাটি বিক্রয়ের জন্য নয়। আমি তখন ভূমিষ্ঠ হইনি। আমাদের পারিবারিক কাগজপত্রের মধ্যে সেটি পরবর্ত্তী কালে আবিষ্কার করি। করে চমকে উঠি। দারুণ মনস্তাপ তার ছত্রে ছত্রে। একমাত্র আপত্তির কারণ ছিল তিনি অপর একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তিনিও শুনেছি পালটা দিয়েছিলেন। ইঁা, তিনিও বিদুষী। সাহিত্যের ইতিহাসে এটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা।

পূজনীয়া অবন্তী দেবীর কাছে এসব কেচ্ছা শুনতে পাওয়া যাবে না। নইলে আরো দু'একটি কেচ্ছা আমার জানা। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর স্থান থাকবে এমন এক মহিলাকে দেখেছি—যাঁকে কিছুতেই আমি অপরাধিনী বলে স্বীকার করব না। ইনি ভক্ত-কবির নিকট আত্মীয়া অথচ সমাজ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিতা। একটা যুগের আলেখ্য আঁকতে হলে শাদা কালো সোনালী সবুজ নীল সব ক'টা রং ব্যবহার করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী কর্মযোগী ভারতরত্ন বিধানচন্দ্রের প্রতি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তাঁহার বর্ষবৃদ্ধি দিনে প্রশস্তি

ব্যাধির বিধান তুমি অসুস্থেরো স্বাস্থ্যের বিধান
সুস্থ যে সে সুখ চায় শান্তি চায় অশান্তের প্রাণ
তাহারো বিধান তুমি—অশান্তিতে ভরা চারিদিক
কেহ বলে ধন্য ধন্য কেহ বলে অধিক বা ধিক।
চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ যার বলিষ্ঠ বুদ্ধিষ্ঠ কর্ণধার
তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ন্যস্ত হোক হস্ত সবাকার।
দেশের দাক্ষিণ্য হতে পারে হতে শক্তির উদয়
তৃণে বাঁধে ঐরাবৎ যদি সবে একমত হয়।
না হলে বিভক্ত শক্তি বিযুক্তের বিপরীত গতি
ডান হাত যাহা করে বাম হাত করে তার ক্ষতি।
ধন-রাশি ঋণ হয় ফলে হয় স্বদেশ দুর্বল
যাদের উদ্দেশ্য মন্দ খল-খল হাসে যত খল।
প্রতিবিধানের তরে জনসাধারণ কারে চায়
ব্যূঢ়োরস্ক মহাবাহু শালপ্রাংশু শ্রীবিধান রায়।

তাঁহার আকস্মিক পরিনির্বাণে শোকার্তি

নীলাকাশে অকস্মাৎ বিনা মেঘে হল বজ্রাঘাত
আজি কি স্বর্গের ইন্দ্র হিংসায় করিল ইন্দ্রপাত
এ দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে? বঙ্গে তাই হইয়া ক্রন্দসী—
রোদসী রোরুদ্যমানা—বঙ্গলক্ষ্মী কাঁদিতেছে বসি।
নীরব জলদমন্দ্র জলধির সুগম্ভীর স্বর
বর্ষবৃদ্ধি দিনে আজি বর্ষশেষ হল অতঃপর!
আনত সহস্র শীর্ষ পুরুষের পৌরুষাঢ্য ভাল
অঙ্ক পাতি নিল বঙ্গ—যে ছিল নিঃসঙ্গ চিরকাল
বিবিক্ত আপন বীর্যে। অবিশ্রান্ত বিব্রত অস্থির
ভারতে 'ভারতরত্ন' বঙ্গ রঙ্গভূমে কর্মবীর।
দুর্বলের বন্ধু তুমি বলিষ্ঠের যোগ্য প্রতিবল
নথ দর্পণেতে তব তথ্য সব রহিত উজ্জ্বল।
রাষ্ট্রের, বিরাট মূর্তি নির্মাণের কুশলী ভাস্কর
সূর্যার্ঘ গ্রহণ কর ঘনাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ভাস্কর।

গায়ত্রী

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ব্রাহ্মণ মাত্র গায়ত্রী জপের দ্বারা কৃতার্থ হতে পারেন, আর কোন সাধনভজন করতে হয় না।

এ যুগে কর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ লক্ষ গায়ত্রী জপ করলে বেদ কার্য্যের যোগ্য হন। বার লক্ষ গায়ত্রী জপে "পূর্ণ ব্রাহ্মণ" হন।

লক্ষ দ্বাদশযুক্তস্তু পূর্ণ ব্রাহ্মণ ঈরিতঃ।
গায়ত্র্যা লক্ষ হীনস্তু বেদকার্য্যেন যোজয়েৎ।
আ সপ্ততেস্তু নিয়মং পশ্চাৎ প্রব্রাজনঞ্চরেৎ॥

(শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বর সংহিতা) ১১।৪৬।৪৭

সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়ম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

নিত্য সহস্র গায়ত্রী জপ করলে তিনমাস দশদিনে লক্ষ গায়ত্রী জপ হবে, আর তিন বৎসর চার মাসে বারো লক্ষ গায়ত্রী জপ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

তা হ'লে মৃত্যুজয়ী পূর্ণ ব্রাহ্মণ হবেন।

"ব্রহ্ম সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" (ছাঃ)

ওঙ্কারে উত্তমরূপে অবস্থিত ব্যক্তি অমৃতত্ব (মোক্ষলাভ) করেন। তিনি অভয়পদ পান।

"সর্ব্বেষামেব বেদানাং গুহ্যোপনিষদস্তথা।
সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রহ্মণো মুখাৎ।"

(ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট)

গায়ত্রী ব্রহ্মার মুখ থেকে বহির্গতা হয়েছিলেন।

ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥

(মন্ত্যবৃহদ্‌বিষ্ণু)

ওঙ্কার ও ভূর্ভুবঃস্বঃ অব্যয়। এই তিনটি অব্যয় মহাব্যাহৃতি-পূর্ব্বক এবং ত্রিপদা গায়ত্রীকে ব্রহ্মার মুখ বলে বিশেষ রূপে জানবে।

ওঙ্কারস্তৎ পরংব্রহ্ম সাবিত্রী স্যাত্তদক্ষয়ম্।
এষু মন্ত্রো মহাযোগঃ সারাৎসার উদাহৃতঃ। (কূর্ম্ম পুঃ)

ওঙ্কার পরব্রহ্ম, সাবিত্রী অক্ষয়ব্রহ্ম; এই মন্ত্র সারাৎসার মহাযোগ ব'লে কথিত হয়।

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ।
বেদা একত্র সাঙ্গাস্তু গায়ত্রী চৈকতঃস্মৃতাঃ॥

(যোগীযাজ্ঞবল্ক্য পুঃ)

ওজন দাঁড়িতে একদিকে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ, আর ঋক-যজুঃ-সাম এবং অথর্ব্ব বেদরেখে ও অপর দিকে "গায়ত্রী"কে রক্ষা করে ওজন করা হয়েছিল। দুই সমান হলেন।

সার ভূতাস্তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদো মতাঃ।
তাভ্যঃ সারা তু গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

বেদ সমূহের সারভূত গোপনীয় উপনিষৎ সকল।
তাদের সার গায়ত্রী ও ভূ-র্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি।

গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দ্ধং বা ঋচোঽর্দ্ধমৃচ এব বা।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্বর্বর্ণস্তেয়মেব চ॥
গুরুদারাভিগমনং যচ্চান্যদ্‌দুষকৃতং ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বমেব পুণাতীত্যাহ বৈবস্বতো যমঃ॥
ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রঃ সাবিত্রীঃ যশ্চ বিন্দতি।
চরিত ব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥ (যম)

গায়ত্রীর একপাদ অথবা অর্দ্ধপাদ একটি ঋক্ অথবা অর্দ্ধঋক্, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপহরণ, গুরুপত্নী-গমন এবং এ ছাড়া যে সব পাপ আছে, সে সমুদয় পাপ হতে পবিত্র করেন। বৈবস্বত যম একথা বলেছেন। ওঙ্কার ভূ-ভুর্বঃ-স্বঃ তিন ব্যাহৃতিযুক্ত সাবিত্রী যিনি বিদিত আছেন তাঁর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা হয়েছে, তিনি শ্রোত্রিয়।

সহ সাহস্র জপ্যেন নিষ্কামঃ পুরুষো যদি।
বিধিনাপি চ তৎ ধ্যায়েৎ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥

(অগ্নিপুরাণ)

নিষ্কাম পুরুষ যদি যথাবিধি ধ্যানের সহিত নিত্য সহস্র গায়ত্রী জপ করেন, তা হলে তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।

আরও—

যদি জ্ঞানরতো বিদ্বান্ সাঙ্গ বেদস্ত পারগঃ।

গায়ত্রীধ্যানপূতস্য কলাংনার্হতি ষোড়শীম্॥

জ্ঞানরত বিদ্বান্ যদি সাঙ্গ বেদের পারগামীও হন, তথাপি গায়ত্রী ধ্যানের দ্বারা পবিত্র জাপকের ষোল ভাগের এক ভাগের সমান নন্।

এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ।

উপাসিতং ভবেত্তেন বিশ্বভুবনসপ্তকম্॥

অজ্ঞাত্বাচৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাৎপরিহীয়তে।

অপবাদেন সংযুক্তোভবেৎশ্রুতিনিদর্শনম্॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

এই গায়ত্রীকে বিদিত হলে, সমস্ত বাঙ্ময় জগৎকে জানতে পারেন। যদি তাঁর উপাসনা করেন, তার দ্বারা ভূ-ভূর্বঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ সত্য এই সাত ভুবন অবগত হ'তে সমর্থ হন।

এই গায়ত্রীকে না জানলে ব্রাহ্মণত্ব হতে পরিত্যক্ত ও অপবাদযুক্ত হ'য়ে থাকেন, ইহা শ্রুতি উল্লেখ করেছেন।

গায়ত্রী বেদ জননী, গায়ত্রী লোকপাবনী।

ন গায়ত্র্যাঃপরংজপ্যমেতদ্ বিজ্ঞান মুচ্যতে॥

(কূর্ম্ম পুরাণ)

গায়ত্রী বেদমাতা, গায়ত্রী লোকের পবিত্রকারিণী, গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপযোগ্য মন্ত্র নাই। ইহাই বিজ্ঞান বলে কথিত হয়।

সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।

না যন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ব বিক্রয়ী॥

(মনু-যম-বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর)

গায়ত্রী মাত্র সার, সুসংযত ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ। আর অদান্ত সর্ব্বভক্ষক সমস্ত নিষিদ্ধদ্রব্যবিক্রয়ী ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট নন্।

এতয়র্চা বিসংযুক্তঃকালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।

বিপ্র-ক্ষত্রিয় বিড্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু॥

(মনু যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদ্‌বিষ্ণু)

গায়ত্রীও যথাকালে স্ব স্ব বর্ণোচিত ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সাধুগণের মধ্যে নিন্দিত হন।

সাবিত্রীঞ্চৈব মন্ত্রার্থংজ্ঞাত্বা চৈব যথার্থতঃ।

তস্যাংযদুক্তং পীঠে বা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

গায়ত্রী এবং মন্ত্র তাতে যা কথিত হয়েছে তা বস্তুতঃ (প্রকৃত পক্ষে) জান্‌লে, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রদান করেন।

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।

বিজ্ঞয়ার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাগতিম্॥

(কূঃ পুরাণ)

যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদমাতা গায়ত্রী পাঠ করেন, তাঁর অর্থ জেনে তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

বেদাঃসাঙ্গাস্ত চত্বারো ই ধীত্য সর্ব্বে থ বাঙ্ময়ম্।

গায়ত্রীং যো ন জানাতি বৃথা তস্য পরিশ্রমঃ॥

গায়ত্রীমাত্র সন্তুষ্টঃ শ্রেয়ান্ বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।

না যন্ত্রিতস্ত্রিবেদীচ সর্ব্বাশী সর্ব্ব বিক্রয়ী॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যিনি গায়ত্রী জানেন না, তাঁর সে সমস্ত পরিশ্রম বৃথা। গায়ত্রী মাত্র সন্তুষ্ট দমগুণান্বিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে অদান্ত, সর্ব্ব ভক্ষক, সমস্ত বিক্রয়কারী ও ত্রিবেদপাঠী ব্রাহ্মণ তা হ'তে হীন।

বৃহদ্ যম, গায়ত্রী জপের ফল বলেছেন—

"গায়ত্রীজপ নিরতা গচ্ছন্ত্যমৃততাং দ্বিজাঃ।"

গায়ত্রী জপ নিরত দ্বিজগণ মোক্ষলাভ করেন।

গায়ত্রীং জপতে যস্ত দ্বৌকালৌব্রাহ্মণঃ সদা।

অর্ব প্রতিগ্রহীতাপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥

(অগ্নি পুরাণ)

যে ব্রাহ্মণ দু সন্ধ্যায় নিত্য গায়ত্রী জপ করেন, তিনি যদি কুৎসিৎ প্রতিগ্রহকারী হন তা হলেও পরমগতি লাভ করে থাকেন।

আরও—

গায়ত্রীং জপতে যস্ত কল্যমুত্থায় বৈ দ্বিজঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি নিত্য প্রত্যূষে উঠে গায়ত্রী জপ করেন, পদ্মপত্রে যেমন জল লাগে না, তদ্রূপ তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

অগ্নিপুরাণে ব্রহ্মা গায়ত্রীকে বলেছেন—

কুর্ব্বন্তোঽপীহ পাপানি যে ত্বাং ধ্যায়ন্তি পাবনি।

উভে সন্ধ্যোন তেষাংহি বিদ্যতে দেবি পাতকম্॥

গায়ত্র্যাস্ত পরং নাস্তি দিবি চেহচ পাবনম্॥

হে পবিত্রকারিণি। পাপ ক'রেও যাঁরা উভয় সন্ধ্যায়

তোমাকে ধ্যান করেন তাঁদের পাপ নিশ্চয়ই থাকে না। এ জগতে ও স্বর্গে গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবন বস্তু আর কিছুই নাই—আরও—

যথা কথঞ্চিজ্জপ্তৈষা দেবী পরমপাবনী।
সর্ব্বকামপ্রদাপ্রোক্ত পৃথক্ কর্ম্মসুনিষ্ঠিতা ॥

স্বতন্ত্র কর্ম্ম সকলে নিষ্ঠিতা এই পরমপাবনী গায়ত্রী যৎ-কিঞ্চিৎ জপ করলেও সমস্ত কাম্যবস্তু প্রদায়িনী ব'লে কথিতা হন।

বিদ্যা তপোভ্যাংসংযুক্তং ব্রাহ্মণং জপ নিত্যকম্।
যদ্যপি পাপকর্ম্মাণ মতো ন প্রতিযুজ্যতে ॥
যথাহগ্নির্বায়ুনোদ্ভূতো হবিষা চৈব দীপ্যতে।
এবং জপ্য পরো নিত্যং মন্ত্রযুক্তঃ সদা দ্বিজঃ ॥

(বশিষ্ঠ)

নিত্য জপকারী বিদ্যা-তপস্যাসংযুক্ত ব্রাহ্মণ যদিও পাপ কর্ম্মকারী হন, তা হলেও তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যে রূপ বায়ুর দ্বারা বর্দ্ধিত অগ্নি ঘৃত প্রদানে দীপ্ত হন—এই রূপ জপ-পরায়ণ নিত্য-সততমন্ত্রযুক্ত দ্বিজ দীপ্তি পেয়ে থাকেন।

গায়ত্রীং জপতে যস্তু কল্যমুত্থায় বৈ দ্বিজঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥
কামকামো লভেৎ কামং গতিকামস্তু সদ্‌গতিম্।
অকামস্তদবাপ্নোতি যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর)

যে দ্বিজ প্রাতে উঠে প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করেন, পদ্মপত্রে যেমন জল লাগে না তদ্রূপ তাঁতে পাপ লিপ্ত হয় না। সকাম গায়ত্রী জাপক তাঁর কাম্যবস্তু, সদ্‌গতিকামী উত্তম গতি ও নিষ্কাম পুরুষ সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

পং ন তথা বেদ জপ্যেন পানির্দহতি দ্বিজঃ।
যথা সাবিত্রীজপ্যেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

(বৃহদ্‌যম)

দ্বিজ যেমন গায়ত্রী জপের দ্বারা পাপ মুক্ত হন, সেরূপ বেদ জপ ক'রেও পাপ দগ্ধ করতে পারেন না।

গায়ত্রীং জপতে যস্তু দ্বৌ কালৌ ব্রাহ্মণঃ সদা।
তয়া রাজন্ সবিজ্ঞেয়ঃ পংক্তিপাবনপাবনঃ ॥

(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর)

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ নিত্য সকালে এবং সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করেন, তাঁকে পঙক্তিপাবনগণের ও পবিত্রকারী ব'লে জানবে। (যাঁর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেলে লোক পবিত্র হয় তাঁর নাম পংক্তি পাবন।)

যোহধীতেহহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমজ্যোতি বায়ুভূত খ-মূর্ত্তিমান্ ॥

(মনু বৃহদ্‌বিষ্ণু)

যিনি তিন বৎসরকাল অনলসভাবে প্রত্যহ গায়ত্রী পাঠ করেন বায়ুভূত মূর্ত্তিমান আকাশস্বরূপ তিনি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

সহস্র পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীন্তু জপেন্নিত্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥

(বৃহদ্ যম)

সহস্র শ্রেষ্ঠা, শত মধ্যা, এবং দশসংখ্যক জপ নিকৃষ্টা এমন সর্ব্বপাপ বিনাশকারিণী গায়ত্রীকে নিত্য জপ করবে।

দশভির্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্।
ত্রিজন্মোত্থং সহস্রেন গায়ত্রী হন্তি পাতকম্ ॥

(ব্যাস গোভিন)

প্রত্যহ দশবার গায়ত্রী জপ করলে জন্মজনিত, শতবার জপের দ্বারা পূর্ব্বকৃত, আর সহস্র বার গায়ত্রীজপে ত্রি-জন্মের পাপ গায়ত্রী বিনষ্ট করেন।

দশকৃত্বঃ প্রজপ্তাঃতু রাত্র্যাহ্না যৎ কৃতং লঘু।
তৎ পাপং প্রণুদত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
শত জপ্তা তু সা দেবী পাপোপশমনী স্মৃতা।
সহস্রজপ্তা সা দেবী মহাপাতকনাশিনী ॥
লক্ষজপ্যেন সাহপ্যেবং সপ্ত জন্মোত্থপাতকম্।
কোটিজপ্যেন বিপ্রর্ষে যদিচ্ছতি তদাপ্নুয়াৎ।
যক্ষবিদ্যাধরত্বং বা গন্ধর্ব্বত্বমথবাপি বা ॥
দেবত্বমথ বিপ্রত্বং ভূয়ন্নিহত কণ্টকম্ ॥ (অগ্নিপুরাণ)

দিবা রাত্রি কৃত লঘু পাপ দশবার গায়ত্রী জপ করলে তা শীঘ্র প্রণষ্ট হয়। শতবার জপে পাপ উপশম হ'য়ে থাকে। সহস্র গায়ত্রী জপে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। সপ্তজন্মজাত পাপ লক্ষ জপের দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে যায়। হে ব্রহ্মর্ষে, কোটি গায়ত্রী জপে গায়ত্রী-জাপক যক্ষত্ব-বিদ্যাধরত্ব বা গন্ধর্ব্বত্ব অথবা দেবত্ব কিংবা বিপ্রত্ব যা ইচ্ছা করেন তা প্রাপ্ত হন। জন্ম-মৃত্যু প্রদায়ক অজ্ঞান রূপ মহাকণ্টক নিহত হয়।

সপ্ত জপ্তাহপুনাদ্দেহং দশভিঃ প্রাপয়েদ্দিবম্।
বিংশা বৃত্ত্যা তু সা দেবী নয়তে চেশ্চরালয়ম্॥
অষ্টোত্তর শতং জপ্তা তারয়েজ্জন্ম সাগরাৎ।
তীর্ণো ন পশ্যতি প্রায়ো জন্ম মৃত্যুংহি দারুণম্॥
গায়ত্রীঞ্চ জপেদ্ যোহি সোমবদ্ রাজতে হি সঃ॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

গায়ত্রী দেবী, নিত্য সপ্তবার জপে শরীর পবিত্র করেন, দশবার জপে স্বর্গে নিয়ে যান, কুড়িবার জপ করলে ঈশ্বর-আলয় প্রাপ্ত করান, এতশত আটবার জপানুষ্ঠানে জন্ম সংসার হ'তে উত্তীর্ণ করেন, তারিত ব্যক্তি দারুণ জন্ম-মৃত্যু আর দেখেন না। যিনি গায়ত্রী জপ নিরত তিনি চন্দ্রের মত বিরাজিত হন।

সহস্র পরমাং দেবাং শত মধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীস্তু জপন্ বিপ্রান্ পাপৈবিপ্রলিপ্যতে॥

(অতি বৃদ্ধ আপস্তম্ব)

সহস্র গায়ত্রী জপ শ্রেষ্ঠ, শত মধ্য, এবং দশ জপ নিকৃষ্ট, বিপ্র এই গায়ত্রীকে জপ করে পাপ সমূহের দ্বারা প্রলিপ্ত হন না।

সহস্র পরমাং দেবীং শত মধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীং বৈ জপোন্নিত্যং জপ যজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(কূর্ম্ম পুরাণ)

সহস্র গায়ত্রী জপ পরমা, শত মধ্যা ও দশ অবরা। নিত্য এই গায়ত্রী জপ, জপ-যজ্ঞ ব'লে প্রকথিত হয়।

দশবিংশ শতংবাপি গায়ত্র্যাঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ।
অহোরাত্রকৃতাচ্চৈব পাপাৎ সংমুচ্যতে হি সঃ॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

দশ, বিশ বা শত গায়ত্রী নিত্য জপ করবে। যিনি গায়ত্রী জাপক, এভাবে জপের দ্বারা তিনি অহোরাত্র কৃত পাপ হ'তে প্রমুক্ত হন।

আরও—

সোক্ষা রংচতুরাবৃত্তা বিজ্ঞেয়া সা শতাক্ষরা।
শতাক্ষরাং সমাবৃত্য সর্ব্ববেদ ফলংলভেৎ॥
গৃহেষ্বেতৎ সমং জপ্যং গোষ্ঠে শত গুণং স্মৃতম্।
নদ্যাং শত সহস্রন্তু অনন্তং ত্বগ্নি সন্নিধৌ॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

গায়ত্রী হলেন চব্বিশ অক্ষরা। ওঙ্কার যোগ করলে পঁচিশ অক্ষরা হন। এই পঁচিশ অক্ষরা গায়ত্রী চার বার জপে শতাক্ষরা হয়ে থাকেন। এই শতাক্ষরা সম্যক্ আবৃত্তি করে পাঠক সমস্ত বেদ পাঠের ফল লাভ করেন। গৃহে জপের ফল সমান, গোষ্ঠে শতগুণ, নদীতীরে লক্ষ এবং অগ্নি সকাশে জপে অনন্ত ফল লাভ হয়।

আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগশ্চ ব্রাহ্মণম্।
শিরসোঽক্ষর দৈবত্যমাহবানঞ্চ বিসর্জ্জনম্॥
ধ্যান জপ প্রয়োগশ্চ যেষু কর্ম্মসু যাদৃশঃ।
জ্ঞাতব্যং ব্রাহ্মণৈর্যত্নাদ্ ব্রাহ্মণ্যং যেন বৈ ভবেৎ॥

যে কর্ম্মে যদ্রূপ ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ব্রাহ্মণ, শির, অক্ষরের দেবতা, আবাহন, বিসর্জ্জন, ধ্যান, জপ প্রয়োগ যত্ন সহকারে জানা কর্ত্তব্য। তার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।

এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দ ব্রহ্মময়ী শুভা।
তপসা মহতা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধামতা॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক)

ধীমান বিশ্বামিত্র উৎকট তপস্যা প্রভাবে—কল্যাণী শব্দ ব্রহ্মময়ী ত্রিপদা গায়ত্রীকে দেখেছিলেন।

"হিরণ্যগর্ভ" (স্বর্ণ) মণিমালার জপে শতগুণ, ইন্দ্রাক্ষ (ভদ্রাক্ষ) মালায় সহস্রগুণ, রুদ্রাক্ষ মালায় নিযুতগুণ, ও পদ্মবীজ মালায় নিযুত অথবা প্রযুত ফল হয়। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। আর পুত্রজীবক জীবপুত্রিকা মালায় জপের পরিসংখ্যা নাই, অর্থাৎ অনন্ত ফল হয়। (ব্যাস)

স্ফটিক ইন্দ্রাক্ষ (ভদ্রাক্ষ) রুদ্রাক্ষ পুত্রঞ্জীব (জীব পুত্রিকা) সঞ্জাত অক্ষ মালা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। উত্তরোত্তর প্রশস্ত। অর্থাৎ স্ফটিক হতে ইন্দ্রাক্ষ—ইন্দ্রাক্ষ অপেক্ষা রুদ্রাক্ষ, তা হ'তে পুত্রঞ্জীব শ্রেষ্ঠ।

(গায়ত্রী জপের কাম্য ফল)

"গায়ত্রী অপেক্ষা পাপ কর্ম্মের শোধন আর কিছু নাই"

(অতিবৃদ্ধ আপস্তম্ব)

"গায়ত্রীর চেয়ে পরমপাবন আর কিছু দেখা যায় না (বশিষ্ট)

যশ্চ গোঘ্নঃ পিতৃঘ্নশ্চ ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী চ যশ্চ বিপ্রঃ সুরাং পিবেৎ॥
গায়ত্র্যাঃ শতঃ সাহস্রাৎ পূতো ভবতি মানবঃ॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

গো হত্যাকারী, পিতৃঘাতী, ভ্রূণ হত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী ব্রাহ্মণ, মদ্যপবিপ্র, লক্ষ গায়ত্রী জপ করলে শুদ্ধ হন।

বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠন্ রাত্রিংনীত্বাপ্সু চার্ক দৃক্।
জপ্তা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুচিব্রহ্ম বধাদৃতে॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

দিবা ভাগে বায়ু ভক্ষণ ক'রে থেকে জল পানের দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত করে সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক শুচি হ'য়ে সহস্র গায়ত্রী-জপকারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা ভিন্ন সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন।

গৌতম বলেন, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপহরণ ও গুরুপত্নীগমন রূপ মহাপাতক চতুষ্টয়ের গোপন প্রায়শ্চিত্ত একমাস যাবং প্রতিদিন সহস্র গায়ত্রী জপ। মনু, বিষ্ণু, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন।

দ্বিজ অনাচ্ছাদিত স্থানে সহস্র গায়ত্রী নিত্য জপ করলে, সাপ যেমন খোলস ছাড়ে তদ্রূপ মহাপাতক হতে বিমুক্ত হন।

বিষ্ণু বলেন—"দশ সহস্র গায়ত্রী জাপক ব্রাহ্মণ স্বর্ণাপহরণ পাপ হ'তে পবিত্র হয়"।

"যে দ্বিজ সম্বৎসর, ছয়মাস যথাবিধি গায়ত্রী জপ করেন তিনি সর্ব্ব প্রকারে পূজিত ও সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করেন, এ সম্বন্ধে কোন সংশ্রয় নাই। (যাজ্ঞবল্ক্য)

আরও—শত গায়ত্রী জপ করতে করতে স্নান, সাতবার জলের মধ্যে (আকণ্ঠ নিমগ্ন করে) জপ করবে। জলে শত বার জপ করে সেই জল পান করলে সমস্ত পাপ হ'তে প্রমুক্ত হয়।"

"সর্ব্বকামফলপ্রদায়িনী গায়ত্রীর দ্বারা তিল হোম করলে সর্ব্বপাতক নষ্ট হয়।" (বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর অগ্নিপুরাণ)

"সমুদয় বিরুদ্ধ পাপের মিলনজাত সঙ্কর উপস্থিত হলে, দশ সহস্র গায়ত্রী জপে সে পাপ নষ্ট হয়।" (বৃদ্ধ আপস্তম্ব)

সকল পাপের সঙ্কর উপস্থিত হলে দশ সহস্র গায়ত্রী অভ্যাস পরম শোধন। (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

সমস্ত পাপে পাপী সহস্র জপ শ্রেষ্ঠ, শত মধ্যা, দশ অবরা, (দশ সংখ্যা হ'তে কম না হয়)।

গায়ত্রী দেবীকে শুদ্ধিকামী ব্যক্তি নিত্য জপ করবে।

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

গায়ত্রী দ্বারা তিল হোম করলে, অগ্নি নিখিল পাপ ভস্মীভূত করেন। (শঙ্খ)

কোন দ্বিজ যদি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন না ক'রে প্রমাদবশে চণ্ডালাদি স্পর্শ করেন, তা হলে স্নান করতঃ অষ্ট সহস্র জপ করবেন। (কূর্ম্ম পুরাণ)

জাতকাশৌচ, মৃতাশৌচ না জেনে, কোন বিপ্র শূদ্রের বাড়ী ভোজন করেন, তা হলে অষ্ট সহস্র, বৈশ্য গৃহে পাঁচ শত, ও ক্ষত্রিয় বাড়ী ভোজনে দু'শো গায়ত্রী জপে শুদ্ধ হবেন। (পরাশর)

ব্রহ্মচারীগণের সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণ—"সপ্তরাত্রি অগ্নিপূজা ভৈক্ষ্যচর্য্যা না করলে ও বীর্য্যপাত করলে প্রায়শ্চিত্ত করবে —সে প্রায়শ্চিত্ত সম্বৎসরকাল নিত্য—ওঁ ভূঃ ওঁ ভূবঃ, ওঁ স্বঃ মন্ত্রে হোম, রাত্রিকালে ভিক্ষান্ন ভোজী শুচি ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ক্রোধ শূন্য হ'য়ে নদীতীরে অথবা তীর্থে গায়ত্রী জপ করলে, সে পাপ হ'তে প্রমুক্ত হবে। (শাতাতপ)

ব্রহ্মচারি ধর্ম্মে শাতাতপ :—

"সন্ধ্যা অগ্নিকার্য্য যদি প্রমাদবশে ব্রহ্মচারী না করে, তা হলে স্নান করে, সমাহিত হয়ে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করবে।

ব্রহ্মচারী হোম না ক'রলে স্নান করে শুচি সমাহিত হয়ে অষ্টসহস্র গায়ত্রী জপ করলে বিশুদ্ধ হয়।

(কূর্ম্ম পু)

ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট যদি অজ্ঞানবশে দ্বিজ ভোজন করে, অহোরাত্র গায়ত্রী জপ করত বিশুদ্ধ হয়। (আপস্তম্ব)

যিনি না জেনে নিকৃষ্টগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন, তিনি অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ ও পঞ্চগব্য পানের দ্বারা শুদ্ধ হন। (বৃদ্ধ আপস্তম্ব)

স্নানের দ্বারা অপহরণীয় পাপ হ'লে যদি তা না জেনে দ্বিজ পান বা ভোজন করেন তাহ'লে স্নান পূর্ব্বক সমাহিত হয়ে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করবেন। (সম্বর্ত্ত)

"যে উত্তম সিদ্ধ স্বেচ্ছায় শূদ্র শবের অনুগমন করেন তিনি সে পাপ ক্ষয়ের জন্য, নদীতে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করবেন।"

ব্রহ্মচারী দ্বিজগণের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন দিন নিদ্রাবস্থায় সূর্য্য উদিত হন, তা হ'লে তাঁর আকণ্ঠ জল নিমগ্ন করত অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ ও তিন দিন উপবাস করবেন।

দ্বিজাতি ব্রহ্মচারী যদি আচমন না ক'রে পান বা

ভোজন করেন, তা হলে তিন শত গায়ত্রী জপ করলে, সে পাপ হতে মুক্ত হবেন। (সম্বর্ত্ত)

অশান্তচিত্ত অথবা শান্তচিত্ত গায়ত্রী অনুশোধনের দ্বারা শুদ্ধ হন। (অত্রি)

"দ্বিজোত্তম কুকুর কর্ত্তৃক দষ্ট হলে স্নান পূর্ব্বক জপ করবেন। (কূর্ম্ম পুরাণ)

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদনুষ্ঠানাদিকং তথা,
গায়ত্রী মাত্র নিষ্ঠস্ত কৃতকৃত্যা ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৮ ॥
সন্ধ্যাসু চার্ঘ্যদানঞ্চ গায়ত্রী জপ মেব চ।
সহস্র ত্রিতয়ঃ কুর্ব্বন্ সুরৈঃ পূজ্যোভবেন্মুনে ॥ ৯ ॥
ন্যাসান্ করোতু বা মা বা গায়ত্রী মেব চাভ্যসেৎ।
ধ্যাত্মানির্ব্যাজয়া বৃত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরৈক সংসিদ্ধেঃস্পর্দ্ধতে ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
হরি-শঙ্কর-কজোত্থ-সূর্য্যা-চন্দ্র-হুতাশনৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীদেবীভাগবত ১২।১

গায়ত্রীমাত্রনিষ্ঠ দ্বিজ অন্য অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তার দ্বারাই কৃতার্থ হন।

ত্রিসন্ধ্যায় অর্ঘ্য দান ও তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করত সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। ন্যাস করুন বা না করুন অকপটভাবে সচ্চিদানন্দরূপিণীকে ধ্যান করত কেবল মাত্র গায়ত্রী অভ্যাস করবেন। ব্রাহ্মণোত্তম যদি গায়ত্রীর একটি অক্ষরও সংসিদ্ধ হন তাহ'লে হরি, শঙ্কর এবং ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন সূর্য্য, চন্দ্র ও হুতাশনের সহিত স্পর্দ্ধা করতে সমর্থ হন।

শুভকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা।
পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্ত্বন্যরেতজঃ ॥

দেবী ভাগবত

ওঙ্কার পিতা, গায়ত্রী মাতা, যে ব্রাহ্মণ এই পিতামাতাকে জানেন না, তিনি অন্যবীর্য্যজাত অর্থাৎ বিজন্মা-জারজ। নিষ্কাম পুরুষোত্তম দশসহস্র গায়ত্রী যথাবিধি জপ করলে পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! যে কোন প্রকারে পরমপাবনী সশিরস্কা গায়ত্রী জপ করলে সর্ব্বকাম্য ফল লাভ হয়। বিধিপূর্ব্বক জপের কথা আর কি বলবো।

গায়ত্রী জপের ফল এক মুখে বলতে কেউ পারে না। দ্বিজগণ এই গায়ত্রী মাত্র অবলম্বন করে যদি থাকেন তা হ'লে তাঁদের কিছু ভাবতে হবে না। গায়ত্রী শরণাপন্ন দ্বিজ উদর চিন্তায় প্রপীড়িত হন না। বিশ্বজননী অন্নপূর্ণা মা গায়ত্রী তাঁর অন্নের সংস্থান করে দেন। তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঐহিক ভোগসুখ ইচ্ছা না করলেও স্বতঃই এসে তাঁর চরণে লুণ্ঠিত হয়। অলৌকিক শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয় পঞ্চক গায়ত্রী জাপক দ্বিজগণের সর্ব্বক্ষণ সেবা করে—তাঁরা যা চান, তা পান। পরমপদ তাঁর নিত্য-নিকেতন হয়।

এসো-এস কলির ব্রাহ্মণ—ছুটে এসো, গায়ত্রী জপ কর, তোমার হারানো শক্তি ফিরে পাবে। কলির ব্রাহ্মণ হয়েও তুমি জগৎ-পূজ্য হবে। গায়ত্রী জপ কর।

অন্য বর্ণ পুরুষ ও মায়েরা তোমাদের ইষ্ট গায়ত্রী জপ কর, অভয় পদে স্থান পাবে।

যদি গায়ত্রী জপ করতে না পার তা হলে কেবল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

দুহাত তুলে নেচে নেচে গান কর—কখন বা দু হাত তুলে—শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম ব'লে নাচো। আবার কখনও দুবাহু উত্তোলন করে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।

আবার বগল বাজিয়ে নাচতে নাচতে বল—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।

তুমি নিশ্চয়ই ভগবানের দেখা পাবে। তাঁর শান্ত-অজর-অমৃত-অভয় পরম পদে স্থান পাবেই পাবে। নাচো নাচো—

জয় জয় সীতারাম।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইদিন অতি প্রত্যুষে আফিসে নেমে সহকারী কনকবাবুকে ডেকে পাঠালাম। গত রাত্রে সারাক্ষণ ঘুমতে পারি নি। তদন্তের সাম্ভব্য পথ ও পন্থাগুলো একে একে আমার মনে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেকটীই অমীমাংসিত থেকেই মনের নিম্ন-তলে নেমে তলিয়ে গিয়েছে। আজ নীচের আফিসে নেমেও চিন্তা হতে আমি রেহাই পাচ্ছিলাম না। আমি মনে মনে ভাবছিলাম—আজকে কোন পথে তাহ্‌লে এই মামলার তদন্ত চালাবো। হঠাৎ এই সময় সহকারী কনকবাবুও চোখ রগড়াতে রগড়াতে নীচে নেমে এলেন।

'আজকে, স্যার।' অবসাদক্লান্ত দেহে কনকবাবু সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, 'ঐ ভদ্রমহিলার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিসে গিয়ে তদন্ত করা যাক। ওখান থেকে অনেক নতুন খবর পাওয়া যেতে পারে। এখনো পর্য্যন্ত ঐ আহত যুবকের পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের খোঁজ না করার জন্যে আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। আমি তো এই মামলাটাকে মার্ডার কেসের সামিল ব'লে মনে করি। চোখ যাওয়া আর মরে যাওয়া, ও একই কথা।'

'হুঁ হুঁ! তাই ভালো হবে,' একটু চিন্তা করে আমি প্রত্যুত্তরে কনকবাবুকে বললাম, 'এতদিন এই ভদ্রমহিলা আফিসে যাচ্ছেন না। এই সুযোগে ওখানকার তদন্তটা সেরে ফেলাই ভালো। ওখান থেকে সোজা আমরা শান্তি-ভাঙ্গা বস্তীতে দেওয়ানজীর বিবৃতিতে উক্ত হারু গোঁসাই-এর সন্ধানে বার হবো। এই হারু গোঁসাই ছাড়া আরও এক জায়গায় আমাদের গোপনে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। কাশীপুর-জমীদার পরিবারের ছোট তরফের যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষু-বিশারদের সম্বন্ধেও কয়েকটা সংবাদ শুনা গেল। এই লোকটার নাম ডাক এই শহরে যে খুব ভালো তা নয়। আমাদের ঐ রহস্যময়ী ভদ্রমহিলা একই সঙ্গে দুই পক্ষের মন গোপনে জুগিয়ে চলছেন না তো? এক দিকে এই ভয়ঙ্কর লোকটা চোখের ডাক্তার। ওদিকে এই মামলার নায়কটীরও চোখটাই গেলো। উহুঁ, বোঝা যাচ্ছে না ছাই কিছু। এই ডাক্তারটিও তাঁর দলবল হয় এই ভদ্রমহিলার পক্ষে, নয় ব্যক্তিগত কারণে তাঁর বিপক্ষে কায করেন নি তো! যে সব ডাক্তাররা এই আহত যুবকটীর চিকিৎসা করেছেন তাদের এই চক্ষু-বিশারদটীর সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার মনে হয়।

সকালে আটটার সময় নীচে নেমে ভাবছিলাম যে এই দিন এই মামলার তদন্তের জন্য কোনও দিকটায় গিয়ে কাকে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। সহকারী কনকবাবু ইতিমধ্যে আফিসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। দুজনে মিলে এই দিনকার তদন্ত সম্পর্কীয় একটা ছক তৈরী করে নেবো ভাবছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে এই তদন্তের ব্যাপারে একটা বিরাট ফাঁকের কথা মনে পড়ে গেল। এই বিরাট গহ্বরটী যেন সমস্ত পুলিশি তদন্তটিকেই গিলে খেতে চাইছে। এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজ এখনও সেরে নিতে না পারার জন্য আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম।

'ওহে! কনক! একটা মস্তবড়ো ভুল যে হয়ে গেলো' —আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠে সহকারী কনকবাবুকে বললাম, 'এখন শ্রীমতীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটীতে তো গিয়ে তদন্ত সারা হলো না। শ্রীমতীকে নিয়ে সেখানে তদন্তে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি তো এখন তার ছোট বন্ধুটীর সেবাতে দারুণ ভাবে নিমগ্ন। এখন তিনি তাঁর

গৃহরূপ বৃন্দাবন হতে পাদমেকম্ ন গচ্ছামি' বলেই তো মনে হয়। তাহলে ওঁকে না বলেই ওঁর সেই আফিসে গিয়ে হানা দেওয়া যাক্।'

আমিও ঠিক স্যার এই কথাই ভাবছিলাম, তুই একবার বলি বলি করে বলেও ফেলছিলাম, আমার এই প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিয়ে সহকারী কনকবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনি অন্য আলোচনা করছিলেন বলে বলিনি। আজ এই দুর্ঘটনাটীর পর তিনটী দিন অতিবাহিত হলো। বড়ো সাহেব ডাইরী পড়ে এই তদন্তটা এখনও না সমাধা করার জন্যে একটা খোঁচা দেবেন মনে করেছিলাম। কিন্তু যে কারণেই হোক,ভাগ্যক্রমে ওঁর নজরটা অন্ততঃ এই ব্যাপারে এড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ ওঁর ধারণা যে ইতিমধ্যেই ওদের এই আফিসের তদন্তটা আমাদের সারা হয়ে গিয়েছে, আমার মনে হয় শ্রীমতীকে না জানিয়েই তাঁর আফিস মহলে তদন্তটা সেরে ফেলা উচিৎ হবে। আজই চলুন স্যার—'

আমি সহকারীর সাহায্যে এই মামলার ডাইরীটী আর একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করে নিলাম। এই সব কাজের সঙ্গে আমরা অন্য মামলার তুই একটা কাজও সেরে নিলাম। এরপর এই মামলার ডাইরীটী আর একবার দেখে নিতে গিয়ে আমাদের বিভাগীয় বড়ো সাহেবের একটা পুরা প্যারা-ব্যাপী মন্তব্য আমার চক্ষে পড়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাইরীর পাতার মার্জ্জিনে লেখা এতবড়ো মন্তব্যটী আমাদের নজরেও পড়েনি, বড়ো সাহেবের এই বিশেষ মন্তব্যটী নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"তোমাদের ডাইরীতে লেখা ঘটনাগুলি বেশ ইন্‌টারেষ্টিঙ হয়ে উঠছে হে। এটা সত্যই একটা মামলার ডাইরী বা উপন্যাস তা বুঝা দুষ্কর। এটা পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য রেকর্ডেড্ মামলা হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের এতদিনে ঐ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ ঠিকানায় তদন্ত করা উচিত ছিল। আমি হুকুম দিচ্ছি যে কালই একজন অফিসার এই ব্যাপারে কাশীতে যেন রওনা হয়ে যায়।"

আমি এই মন্তব্যটী পড়ে নিয়ে সহকারীর চোখের দিকে ওটা ঠেলে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আরও বেশী ভুল বড়ো সাহেব এই তদন্তের ব্যাপারে ধরতে পারেন নি। তবে এক সঙ্গে এতোগুলো তদন্ত সেরে নেওয়া এক কঠিন ব্যাপার ছিল। এই কাশীর ঠিকানা জানতে গেলে শ্রীমতী অমুকাদের ক্লাইভ ষ্ট্রীটের হেড আফিস থেকেই তা জানা যেতে পারে। তাই দশটা বাজার সঙ্গে আমরা দুজনে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিস-কোয়াটারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। মহানগরীর শহরতলী হতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিস অঞ্চলে যেতে আমাদের খুব বেশী দেরী হয়নি। প্রকাণ্ড একটী অট্টালিকার ত্রিতলের কয়টী কামরা জুড়ে শ্রীমতীর আফিস। শ্রীমতীর নিজস্ব ঘরটীর দরজার বাহিরে একটা টুলের উপর জনৈক বেহারা যথারীতি ঝিমলেও এই প্রশস্ত আফিস কক্ষটীর দুয়ারে তালা বন্ধ দেখা গেল। অবশ্য এইটিই আমরা আশা করেছিলাম। শ্রীমতীর ঘরের ডান পাশের ঘর দুটীতে আরও দু'জন প্রৌঢ় পুরুষ ডিরেক্টার বসে বসে কাজ করছেন। কিন্তু এঁদের পক্ষে শ্রীমতীর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটীনাটীর বিষয় না জানারই সম্ভাবনা বেশী ছিল। শ্রীমতীর ঘরের বাম দিকেও একটি ছোট ঘর আছে। সেইটীরও দুয়ারে তালা বন্ধ দেখা গেল। অনুমানে বুঝলাম যে এই ঘরটিতেই এই আফিসের 'কাশীবাসী পার্টনারের' একমাত্র পুত্র ঐ আহত যুবকটী বসে শিক্ষা-নবীশরূপে কাজ কর্ম্ম করতেন। প্রথমে আমরা মনে করে-ছিলাম যে এই আফিসের অপর দুই ডিরেক্টারদের জিজ্ঞাসা-বাদ করবো। কিন্তু তাঁদেরই এই ফার্ম্মের অন্যতম অংশী-দারের জবরদস্ত কন্যাকে তাঁরা যতই না অপছন্দ করুন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কিছু বিশেষ বলতে সাহসী হবেন ব'লে তো মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে এই আফিসের কোনও কর্ম্মচারীদের মধ্যে কোনও এক জানা-শুনা ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেই এঁর সুরাহা হতে পারে। দীর্ঘদিন পুলিশে কাজ করে বিভিন্ন স্থানে ঘুরা-ফিরা করায় স্বভাবতই আমাদের সঙ্গে বহু ব্যক্তির আলাপ হয়ে পড়ে। আমাদের আলাপী লোকেদের একত্রিত করলে অন্ততঃ তারা দশ ডিভিসন সৈন্যের সংখ্যা হয়। নানান কার্য্য ব্যপদেশে প্রতি মিনিটে গড়ে অন্ততঃ তিনজন লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হয়েছে। আজ বিশ বৎসর চাকুরীর পর এদের সংখ্যা অবর্ণনীয় হওয়ারই কথা। তাই সারা আফিসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরা-ফিরা করতে করতে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই একজন আলাপি লোকের দর্শন আশা করছিলাম। ডান পাশে রেলিঙএর ওপাশে কার্য্যরত

টাইপিষ্ট ও কেরাণীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা কাঠের পর্দ্দা ঘেরা ঘর থেকে এই আফিসেরই এক হেড্ ক্লার্ক অবিনাশবাবু ফাইল হাতে বার হয়ে আসছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। বছর কয়েক আগে তাঁর পাড়ার এক উৎপাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে আমরা তার যথেষ্ট উপকারও করেছিলাম।

'আরে! আপনি এখানে কি মনে করে, স্যার। আসুন আসুন আমার ঘরে আসুন।' ভদ্রলোক আমাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে আমাদের আদর করে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'এখন আপনি কোন থানায় বহাল আছেন। ওঃ:, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। তা এখানে আবার কার সর্ব্বনাশ করতে এলেন। না না, এই ঠাট্টা করলাম আর কি! আপনার মত সজ্জন লোক আরও ক'জন বেশী যদি পুলিশে থাকতো। আমি এই দুদিন হলো পদন্নোতি হওয়ায় হেড-ক্লার্ক হয়ে পর্দ্দানশীন হয়ে পড়েছি। আপনারা স্যার একটু এই পর্দ্দাঘেরা ঘরে বসুন। আমি এখুনি বেয়ারাকে চা খাবার আনতে বলে দিচ্ছি। এদিকে আমাদের মেম-সাহেব ডিরেক্টার ক'দিন হলো এক্কেবারে নিঃখোজ। তাঁর সঙ্গে আমাদের ছোট তরফের একজন ছোকরা সাহেবও আছেন। এ'সব ব্যাপার জেনে শুনে আমাদের নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ প্রৌঢ় ডিরেকটারদ্বয় তো রেগে আগুন। এদিকে তাঁদের এই চাপা ক্রোধাগ্নির ঠেলায় নিরীহ আমরা ক'জন হয়ে পড়েছি অস্থির। আমি সাহেবদের এই ফাইলগুলো বুঝিয়ে দিয়ে এখুনি ফিরে আসছি। বসুন আপনারা—

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে মেঘের দিকে না চাইতেই জল। এই আফিসের বড়োবাবু অবিনাশবাবু আমাদের এখানে বসিয়ে চলে গেলে আমার সর্ব্বপ্রথম এই গ্রাম্য প্রবাদটীরই বিষয় মনে পড়ে গেল। এই সঙ্গে আমার আর একটা বিষয় মনে হচ্ছিল। আমরা বহু লোকের উপকার ও অপকার করি বটে! কিন্তু তা জনতার অনন্ত মিছিলের মধ্যে পড়ে ভুলে যাই। কিন্তু অপরপক্ষ সব সময় যে তা ভুলে যায় তা নয়। আমরা মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে এই সুযোগে তাঁর কাছ হতে একটু প্রত্যুপকার আদায় করে নিতে পারা যাবে। আরও আমার কথা এই যে, এই মুখরোচক বিষয়টী কাউকে না কাউকে বলবার জন্য তিনি যেন উন্মুখ হয়েই রয়েছেন। এর একটু পরেই ভদ্রলোক তাঁর আপন আসনে ফিরে এসে গ্যাঁট হয়ে ব'সে আমাদের দিকে মিটি-মিটি চাইতে সুরু করলেন—আমরা একথা ওকথার পরে আসল তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করলে তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর এই বিবৃতি গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিলে অনিচ্ছাসত্বেও তিনি এই মামলা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় পাচ ছয়টি চা বাগান ও দুইটি লৌহ ফ্যাক্টরী আছে। এই সব বাগান ও ফ্যাক্টরীর জন্য পৃথক ম্যানেজার নিযুক্ত থাকে। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে হলে এই ব্যবসার সরীকানা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা দরকার। এই বিরাট ব্যবসার মালিক চারিজন। উহাদের নাম যথাক্রমে সুধীর ঘোষ, হরেন মাইতি—এঁরা এখন ঐ ওধারের ঘর দুইটীতে বসে কাজ-কর্ম্ম করছেন। এঁদের তৃতীয় মালিক ছিলেন স্বর্গত হরিসাধন ডট্—দত্ত নয়। এঁরই একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অমুকা বর্ত্তমানে তাঁর পিতার স্থান অধিকার করে রীতিমত এখানে যাতায়াত করে আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছেন। আমাদের এই ফার্ম্মের চতুর্থ মালিক সাধুচরিত্র ও নির্ব্বিবাদী ভবতোষ রায় এক্ষণে কাশীবাসী। তাঁকে আমরা ঠাট্টা করে এই প্রতিষ্ঠানের স্লিপিঙ [ঘুমন্ত] পার্টনার বলে থাকি। অথচ শুনেছি তাঁরই যৌবনের অক্লান্ত চেষ্টায় এই ফার্ম্মের যা কিছু উন্নতি। এই ভবতোষ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র সুশীল রায় কলিকাতায় এক হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করতেন এবং পিতার তরফ থেকে তাঁর এখানকার পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এই অফিসে কাযকর্ম্ম বুঝবার চেষ্টা করতেন। তাতে ব্যবসাবাণিজ্য এবং পড়াশুনা—এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী কার্য্য কি একসঙ্গে হয়। এর ফলে যা হবার তাই হয়ে গেলো স্যার কি? এই সুবাদে এই তরুণমতি যুবক

ঐ বয়স্কা রায়-বাঘিনীর খপ্পরে পড়ে গেলেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে ডিরেকটারের মিটিঙ-এ এঁরা দুই স্বামী স্ত্রী—খুড়ী বন্ধুবান্ধবী একদিকে যেতে লাগলেন। অপর নীতি-বাগীশ প্রৌঢ় ডিরেকটার দু'জন অপরদিকে যেতে লাগলেন। এক্ষণে এই দুই দল ডিরেকটার দুই দল শেয়ার হোল্ডার নিয়ে বেশ দুটো দল পাকিয়ে বসেছেন। ভাগ্যিস এঁদের বিভাগে বিভাগে সাহেব-ম্যানেজার আছে, তা না হলে এই ঘরোয়া বিবাদে এই ব্যবসা কবে লাটে উঠে যেতো। তবে আমাদের এই মহিলা ডিরেক-টারটীর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বয়স তো বেড়ে চলছে। এই সব ছেলে-ছোকরাদের এই রকম মহিলাদের আর কতোদিন ভালো লাগবে বলুন। ইদানীং এঁদের এই প্রেমবন্যায় একটু যেন ভাঁটা পড়ে আসছিল। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমাদের এই ছোকরা ডিরেকটার তীর্থবাসী পিতাঠাকুরের পরম বাধ্য হয়ে উঠে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-দ্বয় তাঁর পিতাকে গোপনে পত্র লিখে বোধ হয় এই সব বিশ্রী ব্যাপার জানিয়ে থাকবেন। তাই এই যুবক ডিরেকটার [পিতার প্রতিভূ] সুশীল রায় গত মাস ছয় আর কলিকাতা-মুখোই হতে পারেন নি। কিন্তু হঠাৎ মাত্র দিন দশ হলো এই সুশীলবাবু সুশীল ছেলের মত কলকাতায় চলে এলেন। আমাদের এই মহিলা ডিরেকটার তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনে স্বচালিত মোটর-যোগে রিসিভ করে কলিকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে যথারীতি পৌছিয়েও দিয়ে এলেন। এরপর আমাদের সুশীলবাবু আবার কয়দিন আমাদের—এই খুড়ী এই তেনাদের এই অফিসে এসে বসছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গত তিনদিন হলো তাঁরা দু'জনাই আর আমাদের এই আফিসে আসছেন না। তবে শ্রীমতী অমুক হুজুরাণী লিখে পাঠিয়েছেন যে ব্যক্তিগত কারণে তিনি দিন পনেরো অন্ততঃ তাঁদের এই অফিসে আসতে পারবেন না। এই সঙ্গে তিনি এ'ও লিখেছেন যে সুশীলবাবু পুরী রওনা হয়ে গিয়েছেন। শুনেছি যে ইংরাজীতে একটা হনিমুন ব'লে শব্দ আছে। তবে এদেশে এটা অচল বলে একটু দৃষ্টি-কটু ঠেকে। তা'ছাড়া বয়সেও একটা তার-তম্য তো আছে। কনে তো এদেশে অনেকের হাঁটুর বয়েসীও হয়ে থাকে, কিন্তু বর এতো ছোট হলে চলবে কেন? এ তাহলে তো একেবারে উল্টা পুরাণের কাল এসে গেল। এতদিন এদেশে বিলেতের লোকগুলোই শুধু আসতো। এখন দেখছি বিলেত দেশটাই আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। এই দুধের বাচ্ছা ছেলেটাকে এই রক্ত-লোলুপ বাঘিনীর খপ্পর থেকে কি কেউ রক্ষা করতে পারে না? তা ওঁর আমরা যা কিছু নিন্দাই করি না কেন? ভদ্রমহিলা যে একজন জবরদস্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।"

ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটী অনুধাবন করে আমরা অপর এক বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলুম। এতো বড়ো সম্পদশালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এই দলাদলি আরও একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে দিলে। এক-দল প্রভাবশালী ধনী লোকের অনুরূপ অপর একদলের লোকের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এই মামলা সম্পর্কিত অঘটনের জন্যে দায়ী নয় তো! কিন্তু তা'হলে তো তাদের এই যুবকটীকে আক্রমণ না করে তার এই সর্ব্বনাশের জন্য দায়ী ঐ মহিলাটীকেই আক্রমণ করা উচিত ছিল।

এমনি আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি ভাবলাম যে, আরও কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ না করে এই সম্বন্ধে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত হবে। এই জন্য আমি আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় সাক্ষীকে আরও কয়েকটী প্রশ্ন, করতে বাধ্য হলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আপনাকে দাদা আরও একটা প্রশ্ন করবো। এখানে আপনাকে আপনার ধ্যানধারণা মত একটা ব্যক্তিগত মতামতও জানাতে হবে। আপনি বললেন যে শ্রীমতীঅমুক থাকেন এই শহরের শহরতলীর একটা সাধারণ ফ্ল্যাটে। কিন্তু ওঁর ঐ যুবক প্রেমাস্পদকে তুলে দিলেন শহরের এক হোটেলে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, মহিলাটী এতো বিত্তশালিনী হয়েও শহরতলীর ফ্ল্যাটেই বা থাকেন কেন? যদি তাই তিনি রইলেন, তাহলে এই যুবকটীকেই বা সেখানেই তিনি রাখলেন না কেন? এই আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে ঐ যুবকটী সত্যই তিন দিন আগে পুরী শহরে গিয়েছে। কিন্তু

আপনি আমার কাছে জেনে রাখুন যে সে পুরী শহরে আদপেই যায় নি।

উঃ—আরে মশাই! এই সম্বন্ধে আগে আমার সহকারীদের সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছি। এখোন এই হেড্ ক্লার্কের পদে উন্নীত হওয়ার পর ওদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুবিধে কম। তাই এই সব ব্যাপার নিয়ে রাত্রে গিন্নীর সঙ্গেই আলাপ করে থাকি। ওঁরা মেয়ে হওয়ায় মেয়েদের মনের কথা শুনেই বলে দিতে পারেন। আমার স্ত্রীর মতে শ্রীমতী অমুকা বিয়ের আগে যুবকটীকে নিজের কাছে রাখতে চান না; এর কারণ ওঁর যে বয়স বাড়ছে তা আর কেউ না হোক উনি নিজে তো বুঝছেন। এখন 'মেক্-আপের' যুগে দূরে থেকে খুকীর মহড়া দেওয়া খুউব সহজ। কিন্তু স্নানের পর ওঁর এই বয়স দেখে যদি ঐ যুবক হবু-বরটীর মোহ কেটে যায়? এই জন্যই ভদ্রমহিলা বোধহয় ওঁকে দিনের আলোয় নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন না। আমার গিন্নীর মতে এই একই কারণে শ্রীমতী অমুকা বহু দূরে শহরতলীতে বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। এঁর আফিসের অন্য ডিরেক্টারদের নজর এড়িয়ে ক্ষণিকের সুখ ভোগের জন্যই বোধ হয় তিনি অতদূরে বাসস্থান বেছে নিয়েছেন। শহরতলীতে বড়বাড়ী না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি এই একতলার ফ্ল্যাটটীই ভাড়া নিয়ে থাকবেন। তবে এই ব্যাপারে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা ওয়াকীবহাল লোকেরাই বলতে পারবে।

প্রঃ—হুঁ তাহলে বুঝলাম সব! আপনি তাহলে এদের সম্বন্ধে একটু আধটু গবেষণা করে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে কি আপনি বলতে পারেন যে, আপনাদের এই যুবক মনিবটীর ইতিমধ্যে অন্য কোনও অল্পবয়স্কা মেয়ের দিকে নজর পড়েছিল কি'না। তা' ছাড়া বেনারসে নিয়ে গিয়ে ওর বাবা ওকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কি?

উঃ—এই তো মশাই আপনি আমাকে মুস্কিলে ফেললেন। এই জন্যেই লোকে বলে যে পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একটুও লাভ নেই। এখন দেখবেন মশাই এ সব বিষয় যেন কাক পক্ষীতেও জানতে পারে না। তা'-হলে সব কথা আপনাকে খুলেই বলতে হলো। এই ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র খুব ভালো, অন্য কোনও কচি-কাচি মেয়েকে ওনি জানেন না চেনেননা ব'লেই উনি এখনও আমাদের এই শ্রীমতীর প্রতি অনুরক্ত আছেন। উনি আজকালকার এক বখাটে ছেলে হলে তুলনা করে যাচাই করে সহধর্ম্মিণী নিতে পারতেন। কিন্তু ওঁর এই সব সাংসারিক অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই মশাই, এই জন্যেই তো এই সুন্দর ভালো মানুষটীর এমন সর্ব্বনাশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু ছেলেটীর অন্য কোনও দিকে নজর না থাকলেও আমাদের শ্রীমতীর সর্ব্বদাই ভয় যে, এই বুঝি তাঁকে হারিয়ে ফেললেন। ওঁর জেদের কারণে এই আফিসে কোনও মেয়ে টাইপিষ্টের পর্য্যন্ত ঢুকবার কোনও উপায় নেই, প্রথমে আমরা মনে করতাম উনি মেয়ে ব'লেই মেয়ে দেখতে পারেন না। কিন্তু পরে আমার গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম যে আসলে ওদের ব্যাপারটাই হচ্ছে অন্য। তবে হাঁ; এ ঠিক। ওঁর পিতা এই কলকাতাতেই তাঁর এই পুত্রকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন শুনেছি। এইরূপ এক প্রস্তাব নিয়ে এই শহরেরই জনৈক মহাধনী আমাদের এই নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদের সঙ্গে একদিন আলাপও করে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা কতদূর এগিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। আমাদের শ্রীমতী অমুকার এতো বড় সর্ব্বনাশ করে দেবার সুযোগ তাঁরা যে সহজে হারাবেন তা তো মনে হয় না। এই বিষয় নিশ্চয়ই তাঁরা একটুআধটু চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন বৈ'কি। তবে হাঁ এই দুইজন ধনুর্দ্ধরও খুউব সোজা মানুষ নয়। এঁরা একই সঙ্গে ব্যবসায়ী ও জমীদারও বটে।

এঁরা এঁদের মিল-ফ্যাকটারীর শ্রমিকদের শায়েস্তা করবার জন্যে ভেদনীতিটা ভালো করেই বুঝতে শিখেছেন। এই ছেলেটী বেনারসে যাবার পর সেখানে নিজেদের লোক পাঠিয়ে বিবাহের আছিলায় ওর সঙ্গে শিক্ষিতা যুবতী মেয়েদের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ করাবারও চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে সাধু হলেও নিজেদের স্বার্থেই তা তাঁরা করছিলেন। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের এই বিরোধী মহিলা ডাইরেক্টারের সঙ্গে তার একটা চিরবিচ্ছেদ এনে দেওয়া আর কি। তবে শুনেছি যে এঁদের এজেন্টরা ওর পিতার মত নিয়ে একবার জনৈক ভদ্রলোকের রূপসী মেয়েকে দেখানোর জন্য তাঁদের বাড়ীতে ঐ সুশীল ছেলেটীকে

নিয়েও গিয়েছিলেন। এসব আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেকটার সাহেবদের জনৈক বিশ্বাসী এজেন্টের কাছ হতে গোপনে জেনেছি মশাই। আমরা যতদূর শুনেছিলাম তাতে আমাদের এই সুশীল, স্যার, ওখানে জমে গিয়ে এখানকার পাট একেবারে উঠাবারই কথা। কিন্তু এখন তো আমাদের অবাক করে দিয়ে উনি আবার কলকাতায় ফিরে এই রায়বাঘিনীর—

প্রঃ—এইবার আপনাকে আমি একটা শেষ কথা জিজ্ঞাসা করবো। আপনি এই শ্রীমতী অমুকা ও তাঁর এই যুবক বন্ধুটী সম্বন্ধে তো অনেক কিছু বললেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ আছে, না যা কিছু আপনি বললেন তা শুধু শোনা কথা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে বললেন।

উঃ—এই তো মশাই আপনি আবার আমাকে মুস্কিলে ফেলে দিলেন। এই সব গোপন ব্যাপার অনুমান ছাড়া কি করে জানা সম্ভব বলুন। এতো সাক্ষী সাবুত রেখে এতে কেউ পা বাড়ায় না'কি? এই আভ-ভাব চোখের ভাষা বুঝে বাকিটা অনুমানই করে নিতে হয়। কিন্তু আফিস শুদ্ধ এতো গুলো লোক যা অনুমান করে তা কখনও মিথ্যে হতে পারে না। যাক্ মশাই। এখন এই অন্নদাতাদের নিন্দে করে পাপের ওপর পাপ বাড়াতে চাই না। তবে এ'কথাও ঠিক যে শুনাকথাগুলোকেও একেবারে মশাই আপনারা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কে আমাদের পিতা, মাতা, দাদা বা পিসিমা তা কি শুনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা মেনে নিই নি। এই পৃথিবীর যা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভালো ভালো কথা তা তো শুনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা জেনেছি ও মেনেছি। তাই—

আমি আমাদের এই অতি-প্রয়োজনীয় সাক্ষীকে বাহিরে ভৎর্সনা করলেও মনে মনে অন্ততঃ তাঁর বুদ্ধিমতী গৃহিণীর বুদ্ধির তারিখ করেছিলাম। আমার একবার এরই মধ্যে একটী অত্যদ্ভুত চিন্তাও মনে উঁকি দিয়েছিল। নিজের বিগতপ্রায় যৌবনটী তার যুবক প্রেমাস্পদের কাছে তুলে দেবার আগে কি শ্রীমতী অমুকা এই যুবকটীর অন্ধত্বই কামনা করেছিল? এই ভয়ানক চিন্তা আমার মনে আসা মাত্র আমি বার দুই শিউরে উঠলাম। কিন্তু এই নীল পদ্মের মত চক্ষু দুটী প্রেমাস্পদের না থাকলে তার আর রইলই বা কি? আমার এই অদ্ভুত ও অলীক চিন্তায় আমি নিজের মনেই হেসে উঠলাম। এটা এমন এক অবান্তর চিন্তা যে এ' সম্বন্ধে আমি কাউর সঙ্গে আলোচনা পর্য্যন্ত করতে ইতস্ততঃ করছিলাম। এরপর আমি নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিয়ে ভাবলাম যে, অযথা একটী সেবাপরায়ণা প্রেমিকার প্রেমের অমর্য্যাদা করা আমাদের পক্ষে উচিৎ হবে না। তারা আমাদের দেশাচার ও সমাজ এবং তাদের অভিভাবকদের প্রতি অন্যায় করলেও নিজে বা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্যায় করবে কেন? এ নিশ্চয়ই তাদের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত কোনও শত্রু পক্ষেরই এটা একটী অতি গর্হীত কার্য্য হবে। কিন্তু তার পরক্ষণেই আমার মনে হলো পৃথিবীতে অসম্ভব নামে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এই সম্ভাব্য পথেও একবার অতি সন্তর্পণে আমাদের তদন্ত চালানো উচিৎ হবে। কিন্তু এইটীই যদি সত্য হয় তা'হলে শ্রীমতী অমুকা নিশ্চয়ই এই কায নিজে সমাধা করেন নি। তা'হলে এই কাজটী তাঁর হয়ে সমাধা করে দিলই বা কে? অর্থাৎ শ্রীমতী অমুকা যদি সহায়ক আসামী হন তাহলে এই অপরাধের প্রত্যক্ষ আসামী হলেন কে? এই অপরাধ সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক সাংবাদদাতা—ঐ মহিলাটীর গ্রামসম্পর্কিত ভাইটী এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নেই তো! কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা'হলে এই সাংঘাতিক ভাবে আহত প্রেমিক যুবকটী কি এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পারতো না। আমরা নিজের কানে সেইদিনও তাকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থাতেও আবেশের স্বরে শ্রীমতী অমুকাকে মিলি নামে সম্বোধন করে ডেকে উঠতে শুনেছি। তাহলে—

'আপনি কি এখন ভাবছিলেন জানি না, স্যার,' আমাকে গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন দেখে আমার সহকারী বললেন—'কিন্তু আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতাটী হঠাৎ নিঃখোঁজ হয়ে গেলেন কেন? এদের এই সব প্রেমের ব্যাপারটা ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে উঠায় তা তিনি পছন্দ করছিলেন না? না, এই ভাবে তাঁর অন্তর্ধান হ'য়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর অন্য এক গূঢ় কারণও আছে। ঐ ভদ্রলোকও এই যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন নি তো! আমরা বিভিন্ন দেহের আত্মার মানুষ হয়েও একই সঙ্গে একই মূল

ধারায় আমরা উভয়ে চিন্তা করেছি বুঝে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই চিন্তা ধারা কিছুটা দূর একত্রে এসে দুইটী পৃথক ভাগে বিভক্ত হতে চেয়েছে। এখানে এই তদন্তের সহিত সম্পর্কশূন্য বাহিরের এক ব্যক্তির সম্মুখে এই সব বিষয় আলোচনা করার সুযোগ ছিল না। তাই আমরা শুধু পরস্পর পরস্পরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েকবার চেয়ে দেখলাম মাত্র। এদিকে চা ও তার সঙ্গে টা'ও এসে গিয়েছে। আমরা আমাদের এই সাক্ষী বন্ধুর অনুরোধে সে গুলি গলাধঃকরণ করতে করতে ভাবছিলাম যে এই আফিসের এই তথাকথিত নীতিবাগাশ ডিরেক্টার-দের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবো কি না? কিন্তু পরে আবার আমি ভাবলাম যে এতো শীঘ্র এখানে প্রকাশ্য তদন্ত না করাই উচিৎ হবে।

'এইবার আর একটা সত্যি কথা আপনাদের বলবো, দাদা!' আমাদের এই ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে গরম গরম সিঙ্গাড়া খাওয়া শেষ করে সন্দেশে হাত লাগিয়ে আমাদের এই অতিথি-বাৎসল বন্ধু বললেন, আমাদের সাহেবানী শ্রীমতী অমুকা আফিসের ব্যাপারে কঠোর হলেও ওঁর দয়া মায়া আমাদের উপর উনি যথেষ্ট দেখিয়ে থাকেন। পূজার সময় আমাদের তরফে মোটা বোনাসের জন্য যা ফাইট্ না উনি দিলেন। আমাদের মনে হচ্ছিল যে, এই কার্ম্মের উনি মালিকানি, না একজন শ্রমিক-দরদী নেতা। এইসব ব্যাপার নিয়েও ওঁর আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-দের সঙ্গে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তবুও কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের বহু বর্ণচোরা শ্রমিক নেতাদের যা কিছু দহরম মহরম তা ঐ শ্রমিক-বিরোধী নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়ের সঙ্গেই দেখা যায়। ভদ্রমহিলার গুণ তো অনেক ছিল, মশাই। এতোদিন যে ওঁর এই শ্রমিক দরদী নীতির জন্য আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়েরা তাঁদের মাইনে-করা গুণ্ডাদের সাহায্যে তাঁদের বিরোধী অবাধ্য শ্রমিক নেতাদের ন্যায় ওঁকেও পথে ঘাটে আবার জখম না করিয়ে দেন। সেদিন আমাদের এক সাচ্চা শ্রমিক নেতাকে ওঁদের লোক আচ্ছা করে এমন রাম-ধোলাই দিয়ে দিলেন যে বেচারা এখনও পর্য্যন্ত হাঁসপাতালের ১৩ নং বেডটী ছেড়ে আসতে পারলে না। এইদিক হতে বিচার করে আমরা শ্রীমতী অমুকা ও শ্রীমান অমুকের প্রতি খুউবই সহানুভূতিশীল। এই জন্য কখন কি একটা হয়ে যায় তাই নিয়ে আমাদের ভয়েরও অন্ত নেই। কিন্তু যেমন সর্ব্বদোষং হরে গোরা, তেমন সর্ব্ব গুণ হরে—ঐ যে, হে হে হে—

আমাদের এই ভদ্রলোকের এই শেষের বক্তব্যটী শুনেও আমরা কম চিন্তিত হয়ে উঠলাম না। এই প্রতিষ্ঠানে তাহলে শ্রমিক নেতৃত্ব নিয়ে যেমন দুইটী দল আছে, তেমনি আফিস কর্তৃত্ব নিয়েও এখানে দুটো দল আছে। তবুও এই গুহ্য তত্ত্ব বাহিরে থেকে একটুও বুঝবার উপায় নেই। এরা বাহিরের বন্ধুত্ব বজায় রেখেই তাঁদের যৌথ-কর্ত্তৃত্বের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। তাহলে এরাই গুণ্ডা লাগিয়ে এই মহিলাটিকে ঘায়েল করতে গিয়ে এই যুবকটিকে ঘায়েল করে বসলো না ত? তাহলে আমরা মিছামিছি এই ভদ্র-মহিলাটিকে এই ব্যাপারে জঘন্য ভাবেই সন্দেহ করেছি।

আমি আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় সাক্ষীটিকে জিজ্ঞাসা-বাদ করে জানলাম যে এই ঘটনাটী মফঃস্বলের এক আয়রণ ফ্যাক্টরীর নিকট বাঙলা পুলিশের রিসড়া থানার এলাকায় ঘটলেও এই আহত শ্রমিক নেতা কলকাতার এক হাঁস-পাতালে এখনো ভর্ত্তি হয়ে রয়েছেন, আমি এঁর কাছ হতে এই ঘটনার কাল পাত্র ও স্থান সম্বন্ধে যা জানবার তা জেনে সহকারীর দিকে একবার চেয়ে তাঁর মনের গতি বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর মনের ভাব দেখে মনে হলো যে তিনি এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

'তাহলে কাল তুমি ভাই একটা কায করো', আমি একটু ভেবে সহকারীকে বললাম, 'এই শ্রমিক নেতা সঙ্ঘটির মামলাটি নিশ্চয়ই স্থানীয় থানার অফিসাররা তদন্ত করেছেন। এই মামলাটীর সূত্র ধরে আমাদের মামলাটির সুরাহা হওয়াও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া একবার হাঁস-পাতালে গিয়ে এই শ্রমিক নেতাটির সঙ্গে দেখা করে আসবে নাকি?'

'আমার মতে কিন্তু স্যার, এটা আমাদের একটা বৃথা পণ্ডশ্রমই হবে। যদিও এই সব মামলার তদন্তে প্রতিটী সূত্রই কাযে লাগানো আমাদের উচিত, তবুও আমার মন বলছে যে ঐ ঘটনায় অপরাধীদের সঙ্গে এই ঘটনার অপরাধীদের সম্পর্ক নেই।' আমার সহকারী অফিসার বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই অভিমত প্রকাশ করে বললেন—'ঐ ভদ্রলোককে আহত করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে লাঠি-

সোঁটা বোমা ও সোডার বোতল এবং এই হতভাগ্য যুবকটিকে আহত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ডিজেল জাতীয় পদার্থ। এই বিষয়টুকু তদন্তের সময় আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা উচিত হবে।'

আমার এই সহকারী আমারই মনের কথা আমাকে শুনালেও আমি নিজে বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করার জন্য একটু লজ্জিত হয়ে উঠলাম। এদিকে আমাদের এই সব কথাবার্তা শুনে আমাদের এই বন্ধুবরও উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠলো—'এ্যা? ঐ যুবকটি আমাদের ঐ অমুক সাহেব নয় ত?' আমি তখুনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম—'আজ্ঞে! না না। আমরা আমাদের অন্য মামলার কথা বলছি। কিন্তু আপনাদের ঐ ছোট সাহেবের পিতার কাশীর ঠিকানা আপনি জানেন? আমার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমাদের এই বন্ধু ভদ্রলোক জানালেন যে তিনি ওর বর্ত্তমান পুরীর ঠিকানা বা ওঁর পিতার কাশী শহরের ঠিকানা—ওর কোনটাই অবগত নন। এই ব্যাপারে এই অফিসের একমাত্র ঐ নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়—শ্রী······ এবং শ্রী······আমাদের এই সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল করে দিতে পারতেন। এদিকে এই ফার্ম্মের এই যুবক পার্টনারের পিতার কাশী শহরের ঠিকানা আমাদের এই দিনই জানা দরকার। এর কারণ পরের দিন আমরা একজন অফিসারকে ঐ শহরে তদন্তের জন্য রওনা করে দেবো ঠিক করেছিলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল না যে, এখুনিই এখানে প্রকাশ্য তদন্ত করি। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে আমরা এই একটী ঠিকানার জন্যে এখানকার এই নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-দ্বয়ের দ্বারস্থ হওয়াই সমুচিত মনে করলাম। কিন্তু এই সময় আচমকা প্রায় ধূমকেতুর মত আমার মনে একটু আগে শুনা অথচ ভুলে যাওয়া একটা প্রশ্ন উদয় হলো। এ্যা! তাহলে শ্রীমতী অমুকা সাহেবানী তাঁর ঐ যুবক বন্ধুটীর পুরী রওনা হওয়ার কথা তাঁদের এই আফিসে মিথ্যে করে জানিয়েছিলেন কেন? তবে তিনি কি আশঙ্কা করেছিলেন যে কলকাতায় সে আছে জানলে এরা তার কোনও ক্ষতি করে বসবে। তবে এই সংবাদটুকু এই অফিসে পাঠানোর দিন ও সময় প্রথমে না জেনে এই ব্যাপারে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। এই সাংঘাতিক আহত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল ৫ই সেপ্টেম্বর, অনুমান আট ঘটিকার সময়ে। এখন আমাদের শ্রীমতী অমুকা সাহেবানী তাঁর ঐ ছোট্ট বন্ধুর পুরী যাওয়ার সংবাদটী এই ৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে না পরে এই আফিসে পাঠিয়েছেন তা' জানা দরকার। যদি তিনি তাঁর এই বিশেষ সমাচারপূর্ণ পত্রটি ৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে পাঠিয়ে থাকেন তা'হলে তো এই পত্রটী এখুনিই এই মামলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এই বন্ধু সাক্ষীর বিবৃতি অনুযায়ী এই পত্রটী এখানকার নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়ের একজনের ব্যক্তিগত ফাইলে রক্ষিত হয়েছে। যাক্ দেখা তো যাক কি হয়—

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারদ্বয়ের কক্ষের নিকট এসে বেয়ারার কাছ হতে জানতে পারলাম যে তাঁরা উভয়েই একটী ঘরে বসে পরামর্শে ব্যস্ত আছেন। এই সময় এই ঘরে বাহিরের কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার জন্যে এই বেয়ারার উপর নির্দ্দেশ ছিল। এমন সময় আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমাদের পূর্ব্ব-দৃষ্ট [পরিচিত] মোচওয়ালা ভদ্রলোক দু'দুজন চোয়াড়ে গোছের লোককে সঙ্গে করে এঁদের ঘর হতে বাহির হয়ে গেলেন। আমি এজন্য একেবারে প্রস্তুত না থাকলেও ক্ষণিকের মধ্যেই আপন কর্ত্তব্য ঠিক করে নিতে পেরেছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সুযোগ্য সহকারীকে এই লোকগুলিকে সাবধানে ফলো [অনুসরণ] করে ওরা কোথায় যায় তা গোপনে দেখে আসবার জন্য নির্দ্দেশ দিলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এঁদের কেউই আমাদের উপস্থিতি অনুমান পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। এঁরা সকলে চলে গেলে আমি এদের পিছন পিছন অনুসরণরত আমার সহকারী কনকবাবুর দিকে খুশী মনে একবার চেয়ে দেখলাম—তারপর বেয়ারার নিকট হতে একখানি ছাপা হলদে রঙের 'ভিজিটার'স স্লিপ' চেয়ে নিয়ে সেটার উপর আমার নাম ও পরিচয় লিখে সেটী ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম।

আমার লেখা পত্রটী পাওয়া মাত্র ভদ্রলোকরা আমাকে বেয়ারা মারফৎ তলব করে পাঠালেন। এত শীঘ্র ভিতর থেকে বেলের আওয়াজ পেয়ে আমার বুঝতে বাকী থাকে নি যে আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যই তিনি বেয়ারাকে ভিতরে ডাকছেন। আমাকে এই দুইজন ভদ্রলোক খুব খাতির করে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ

করলেন। তারপর তাঁরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হলো এঁদের মধ্যে কে আগে কি বলবেন তা তাঁরা ঠিক করে উঠতে পাচ্ছেন না।

আসুন আসুন, স্যার। এতোদিন তো মফঃস্বল পুলিশের লোক এসেছেন। এবার থেকে এই রিষড়ার মামলার তদন্তে নগর পুলিশ থেকে আপনারাও যোগ দিলেন নাকি, এঁদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আজ্ঞে আমার নাম শ্রী·····, আর ওঁর নাম শ্রী·········। আমরা দুজনাই এই কোম্পানীর ডিরেক্টার। এ ছাড়া আমাদের এখানে আরও দু'জন ডিরেক্টার আছেন। তবে তাঁরা আজ এখানে উপস্থিত নেই। এখন বলুন, আমরা আপনাদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারি। আমাদের রিষড়ার ইউনিয়নের সম্পাদকের উপর হামলার কিছু সুরাহা করতে পারলেন? আমার মনে হয় ভুল আসামীদের আপনারা পাকড়াও করে রেখেছেন। ওখানে তিনটা ইউনিয়নের মধ্যে তো আথচা-আথচির অন্ত নেই।

'আজ্ঞে এই মামলা সম্বন্ধে আমি আপনাদের এখানে এসেছি তা পূর্ব্ব হতেই অনুমান করে নিচ্ছেন কেন?' আমি ভদ্রলোক দু'জনকে একটু অবাক করে দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি আপনাদের কাছ হতে আপনাদের অপর দুইজন ডিরেক্টারদের সম্বন্ধে যৎসামান্য খোঁজ-খবর করতে এসেছি। কিন্তু কেন আমি তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই তা আমি আপনাদের বলবো না। তবে আমি আপনাদের এ'ও আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনারা যা বলবেন তা অন্য ডিরেক্টারদ্বয়ের নিকট গোপনই থাকবে।'

এই প্রতিষ্ঠানে এই ডিরেক্টার ভদ্রলোকদ্বয় প্রথমে নিজেদের আভ্যন্তরিক বিরোধ সম্বন্ধে কোনও কিছু প্রকাশ করতে রাজী হননি। প্রথম প্রথম এই উভয় ভদ্রলোকই আমার প্রতিটি প্রশ্ন কৌশলে নেতিবাচক উত্তর দ্বারা এড়িয়ে চলছিলেন। এই ভদ্রলোকদের একজন ছিলেন গৌরাঙ্গ ও ওঁদের অপরজন ছিলেন শ্যামাঙ্গ। কিন্তু উভয়েরই চক্ষুর মধ্য দিয়ে দুইটী একই ধরণের ও ধাঁচের বুদ্ধিদীপ্ত মন বেরিয়ে আসছিল। এঁরা অনেক বোঝানো ও পীড়াপীড়ির পর দু'জনাই একই রূপ দুইটী বিবৃতি আমার নিকট প্রদান করলেন। এঁদের একজনের বিবৃতি হতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এক্ষণে মাত্র চারিজন ডিরেক্টার বা মালিক। একদিকে এই আমরা দু'জন, আর অন্যদিকে ওঁরা দু'জন। ওঁরা অর্থে ঐ মহিলা অমুকা দেবী ও ঐ যুবক ডিরেক্টার। আমাদের পরম বন্ধু অমুকবাবু এখনো জীবিত। তিনি কিছুকাল পূর্ব্ব হতে ধর্ম্মীয় কারণে সস্ত্রীক কাশীবাসী হওয়ায় আমরা সম্প্রতি ওঁর এই পুত্রটিকে আমাদের শিক্ষানবীশ ডিরেক্টাররূপে মেনে নিয়েছি। পূর্ব্বে আমরা দু'জনাই মাত্র এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতাম। সম্প্রতি ওঁরা দুজনাও একে একে এখানে এসে জেঁকে বসেছেন। ওঁরা দুজন বলতে একজনই ধরে রাখুন। এর কারণ ঐ যুবকটীর কোনও পৃথক সত্তা আছে বলে মনে হয় না। আমরা চোখের সামনে অনেক কিছুই দেখতাম ও অনুভব করতাম। এই ব্যাপারে একবার গোপনে এই যুবকের পিতামাতাকে আমরা খবরও পাঠিয়েছি। কিন্তু ওর পিতামাতাকে কোনও এক বিশেষ মহল হতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে ব্যবসাগত দুরভিসন্ধি নিয়েই আমরা এইরূপ এক সংবাদ তাঁদের নিকট পাঠিয়েছি। এ ছাড়া তাঁদের আরও বুঝানো হয় যে—জ্যেষ্ঠা ভগ্নীপ্রতিম এই মহিলাটী তাঁদের পিতা-পুত্রের স্বার্থ সমর্থন করার জন্যেই নাকি আমরা এই সব মিথ্যা কাহিনীর অবতারনা করেছি। তবুও আমাদের কাশীবাসী পূর্ব্বতন বন্ধুটী তাঁর ছেলেটীকে কলিকাতা শহর থেকে সরিয়ে কাশীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এই কয়মাস হ'লো আবার এই দুগ্ধপোষ্য যুবকটী এই অফিসের কায-কর্ম্ম শিখবার অছিলায় কলকাতায় ফিরে এলো। তবে এ কথাও ঠিক যে এই ভদ্রমহিলা শ্রীমতী অমুকা এই নাবালক যুবকটীকে এই অফিসের কায-কর্ম্ম ভালো করেই শিখিয়ে নিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আমাদের অধীন কল-কারখানা ও কয়েকটা বাগানে ঘুরিয়েও এনেছেন। এরপর হঠাৎ গত তিন দিন হলো দু'জনাই একেবারে এক সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। তবে গত কাল এক ব্যক্তি একটা পত্র আমাদের দিয়ে গিয়েছে। এতে উনি জানিয়েছেন যে উনি ব্যক্তিগত কায-কর্ম্মে দিন কুড়ি ব্যস্ত থাকবেন। এই যুবকটীর সম্বন্ধেও এই পত্রে সংবাদ দেওয়া ছিল। এতে আমাদের এই শিক্ষা-

নবীশ যুবক পার্টনারটীর অসুস্থ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বভাবতঃই আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের বিদেশস্থ পার্টনার বন্ধুর এই একমাত্র পুত্রটীর অসুখের সংবাদে এখুনি তাকে দেখতে যাওয়া ও তার নিরাময়ের জন্য চেষ্টা করা। এই আমরা জানতাম যে আমাদের এই প্রায় বালক অংশীদারটী কলিকাতার নগর হোটেলে একটি ঘরে থাকে। আমরা তখুনি সেখানে লোক পাঠিয়ে জানতে পারি যে গত দুই দিন তার ঘরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ। অনুমানে অবশ্য আমরা বুঝতে পারি যে সে তা'হলে শ্রীমতী অমুকার বাড়ীতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, কেউ শ্রীমতীর বাড়ীতে যায় তা তিনি আদপেই পছন্দ করেন না। কদাচ কখন অফিসের কোনও ফাইল কাউকে দিয়ে ওঁর বাড়ীতে পাঠালে উনি তাকে তখুনি তাড়া করে বার করে দিয়েছেন। এছাড়া আপনি আমাদের কাছ হতে আর কি জানতে চান তা জানালে আমি তা আপনাদের জানাতে পারবো।'

ভদ্রলোক দুইজনের উপরোক্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ আমরা করে নিলাম বটে, কিন্তু আমার মাথা হতে তখনও ঐ গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটীর স্মৃতি বিদায় নেয় নি। এ' ছাড়া আরও কয়েকটী বিষয় তাদের কাছ হতে আমার বুঝে নেওয়া দরকার হয়েছিল। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই একটু আগে জনৈক মোচওয়ালা ভদ্রলোক ও তার সঙ্গে আরও দুইজন লোক আপনার ঘর হতে বার হয়ে গিয়েছিল। এঁরা আপনার এখানে কি জন্যে এসেছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কি আপনার পূর্ব্ব হতেই পরিচয় ছিল?

উঃ—আজ্ঞে! এই দিনই প্রথম আমি এদের দেখলাম। এঁদের আমাদের পার্টনার শ্রীমতী অমুকা এখানে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতীর পক্ষ থেকে আমাদের ফার্ম্ম হতে এঁরা কিছু নগদ অর্থ চেয়ে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ওরা শ্রীমতীর সই করা একখানা পত্রও এনেছিলেন। আমরা ২০০০৲ টাকা নগদ এঁদের হাত দিয়ে ওঁকে পাঠালাম। এতো টাকা একা নিতে সাহসী হন নি ব'লে উনি ওঁর সঙ্গে আরও দুজন লোক এনেছিলেন। তবে শ্রীমতীর এই পত্রখানিতে তাঁর সুর অনেক নরম দেখা যায়। এতে অনেকদিন পর আমাকে জ্যেঠামশাই সম্বোধন করে পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে।

প্রঃ—তাহলে উনি কি আপনাদের কাছে এর আগে কোনও অপরাধ করেছিলেন। এ ছাড়া রিষড়ার ফ্যাক্টরী সম্পর্কিত মারপিঠটাই বা কারা করেছিল। আপনাদের সঙ্গে কি ওঁর ম্যানেজমেণ্ট-সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারে গণ্ডগোল হয়েছিল।
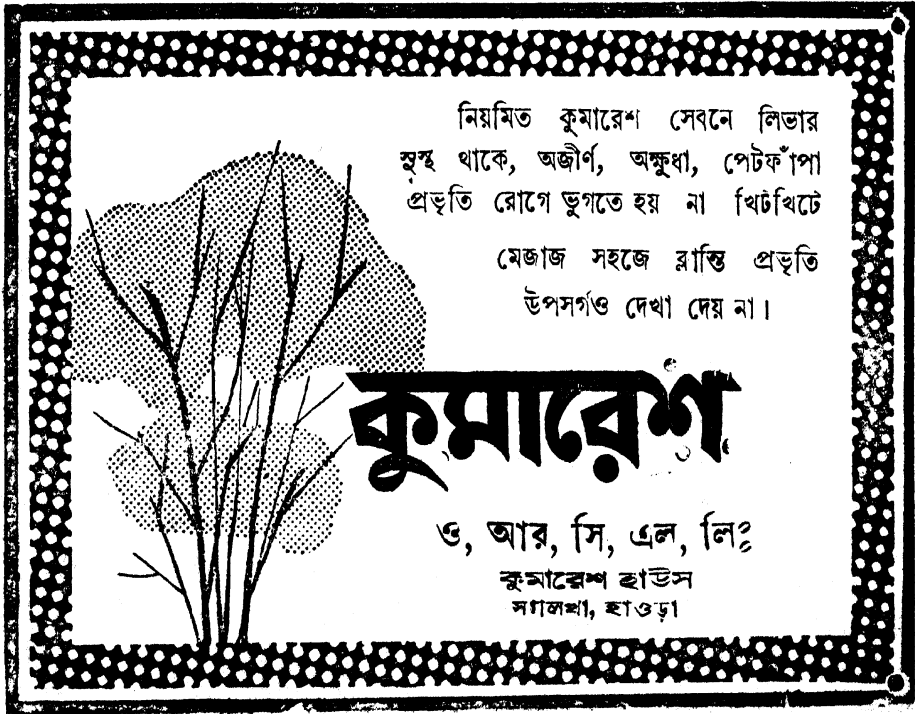
উঃ—তাহলে তো অনেক সংবাদই ইতিমধ্যেই আপনাদের কানে উঠেছে। তাহলে খুলেই বলি—আপনাদের সব কথা। প্রথমতঃ উনি রিষড়ার ফ্যাক্টরীর এক শ্রমিক দলের কাছে এমন একটা 'কমিট্‌মেণ্ট' করে বসলেন যে শেষে আমাদের পক্ষে তাদের সামলানো দায় হয়ে উঠলো। ওখানকার এই সব হাঙ্গামার জন্যে পরোক্ষভাবে উনিই দায়ী। অথচ অনেকে এই সব ব্যাপারে ম্যানেজমেণ্টের তরফে আমাদের দায়ী করতে চাইছে। দ্বিতীয়তঃ উনি অকারণে এই অফিসের একটি ভালোমানুষ একাউন্‌টেণ্টকে সরাসরি বরখাস্ত করে বসলেন। এর কারণ এতো তুচ্ছ যে আপনারা পর্য্যন্ত শুনে হেসে উঠবেন। অপরাধের মধ্যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন। এদিকে শ্রীমতী অমুকা তাঁদের সম্মুখ দিয়ে মেম সাহেবী ঢং-এ হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিলেন। এই সময় এই ভদ্রলোক নিম্নস্বরে সহকর্ম্মীদের বলেছিল যে—'দেখ! ওঁর ঘাড়ের রিঙ্কিলগুলো দেখে বুঝা যায় যে উনি 'এজিঙ্'। অতো দূর থেকে ওই কথা কটা কি করে যে তাঁর কানে গেল তা উনিই জানেন। এর পর তিনি অফিসে ফিরে এসে ভদ্রলোককে সরাসরি বরখাস্ত করলেন। কিন্তু এতে আমরা কি করে রাজী হই বলুন তো? ওঁর যে বয়েস হচ্ছে এ কথা তাঁকে কাউর মনে করিয়েও দেবার জো নেই। এর পর আমাদের বিরোধের তৃতীয় কারণটী সোজাসুজি বলে ফেলি। ওঁর সঙ্গে নাবালক প্রায় অমুকবাবুর পুত্রটীর দৃষ্টিকটু মেলামেশা আমরা আদপেই পছন্দ করি না। এতে ওঁদের সঙ্গে আমাদের এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরও কম বদনাম হচ্ছিল না। খুব সম্ভবতঃ এবার শেয়ার-হোল্ডারদের মিটিঙে-তেও

এই সব কেচ্ছার কথা উঠবে। আজ আবার কতকগুলো গুণ্ডাকে আমাদের কাছে টাকা চাইতে উনি পাঠিয়েছেন। এই সব গুণ্ডাদেরও উনি চিনলেন কি করে তা উনিই জানেন। আমরা আমাদের সহোদর-তুল্য ওঁর স্বর্গগত পিতাকে খুবই ভক্তি করতাম মশাই। তাই তাঁর এই মেয়ের এই শেষ পরিণতিতে আমাদের রাগের চেয়ে দুঃখই থাকে বেশী।

প্রঃ—ঐ লোকগুলো যে কোনও এক গুণ্ডা শ্রেণীর লোক তা আপনাদের ধারণা হচ্ছে কেন। এদের কি আপনি পূর্ব্ব হতেই গুণ্ডা ব'লে চিনতেন। এ ছাড়া আমাদের আরও একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আপনাদের এই যুবক পাট্‌নারের পিতাঠাকুরের কাশী-ধামের ঠিকানাটা আজই আমাদের জানা চাই। এই ঠিকানাটা আপনাদের খাতাপত্র হতে খুঁজে আমাকে দয়া করে জানিয়ে দিন।

ক্রমশঃ

ওসিয়াঁর দেবস্থানে

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

লোহার পাতের সারিসারি চৌখুপি লাগানো পাটাতনটাই গাড়ীটার যাত্রী বসবার ও মাল রাখবার জায়গা। ছাউনি নেই।

জ্যৈষ্ঠের বেলা একটার প্রচণ্ড রোদে, পাটাতনটা কি ভয়ানক গরম হয়ে আছে তা' শুনিয়ে বোঝানো শক্ত। মাঝে মাঝে আবার গরম বালির স্পর্শ নিয়ে ছুটে আসছে আগুনের মত বাতাসের হলকা। বাহনটিকে জোয়ালে জুড়ে দিয়ে চালক বললেন—"বৈঠ্ যাইয়ে।"

সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু, উপায়ান্তর না থাকায় উঠে বসতে হ'ল।

চালক জিজ্ঞাসা করলেন—"আপ জৈনী হৈঁ?"

বললাম—"নহি।"

—"তো ক্যা দেবী পূজা করতে হৈঁ?"

—"হাঁ জী।"

—"তব পহিলে 'সিচ্চাই' দেবীকো দেখ লিজীয়ে। ফির, মহাবীরজী কী মন্দির মে চলিয়েগা।"

মোটর টায়ারের চাকা থাকায় গাড়ীটা বেশ জোরেই চলল ও মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌছে গেল ওসিয়াঁর গ্রামে।

ওসিয়াঁ—ওসওআল্ জৈন সম্প্রদায়ের আদি বসতি তথা উৎপত্তিভূমি। যোধপুর থেকে উনচল্লিশ মাইল উত্তরে।...

এখান হ'তে বার মাইল দূরের বর্ত্তমান তিওঅরী গ্রাম, ছ' মাইল দূরের খেতাসর গ্রাম ও বি'শ মাইল দূরবর্ত্তী ঘটিয়ালা গ্রামটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক নগর ছিল উপকেশপুর বা উপকেশপত্তন।

ভারতবর্ষে তখন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব চলেছে। উপকেশপুরের রাজা উৎপলদেব ছিলেন তন্ত্রমতের সেবক। চামুণ্ডা তাঁর আরাধ্যা দেবী।

এই সময়ে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ষষ্ঠতম স্থলাভিষিক্ত আচার্য্য রত্নপ্রভ, পাঁচশ' শিষ্য সমভিব্যাহারে উপকেশপুরে উপস্থিত হ'লেন ও নগরের বাইরে, লুণাদ্রি পল্লীতে, অবস্থান করতে লাগলেন।

একমাস যাবৎ ঐ স্থানে সাধনভজন ক'রবার পর, আচার্য্যের কয়েকজন শিষ্য, ভিক্ষা ও আহার্য্যের চেষ্টায় নগরে গেলেন।

উপকেশপুরের সকলেই তখন তন্ত্রাচারে অভ্যস্ত ও আমিষভোজী হওয়ায় আচার্য্যের শিষ্যগণ কোথাও শুদ্ধ আহার্য্য না পেয়ে রিক্তপাত্র ফিরে এলেন। রত্নপ্রভের পার্শ্বচর, উপাধ্যায় বীরধবল, তখনি ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য সকলকে পরামর্শ দিলেন। সন্ন্যাসীরাও ব্যথিত চিত্তে স্থানত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'লেন।

নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা তখন রত্নপ্রভকে দেখা দিয়ে বললেন—'বৎস, তুমি চতুর্ম্মাসি কর, অভীষ্ট ফল পা'বে।'

তদনুযায়ী রত্নপ্রভ আরও তিন মাস সেখানে অবস্থান করতে মনস্থ করলেন।

কয়েকদিন পর এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। উৎপলদেবের জামাই সর্পাঘাতে প্রাণ হারা'ল। যখন মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় এক সন্ন্যাসীর বেশে চামুণ্ডা দেবী শ্মশানযাত্রীদের কাছে আবির্ভূতা হয়ে বললেন—'কি অদ্ভুত! তোমরা এই জীবন্ত মানুষটাকে পোড়াতে নিয়ে চলেছো?'

শববাহকরা এই মন্তব্যে চমকিত হ'ল।

সন্ন্যাসী কথাটি বলেই অন্তর্হিত হয়েছিলেন। সকলে তাঁর খোঁজ করতে করতে রত্নপ্রভের আস্তানায় উপস্থিত হ'ল ও রত্নপ্রভকেই পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী ভা'বল। দৈববাণীর নির্দ্দেশে উপাধ্যায় বীরধবল তখন রত্নপ্রভের পাদোদকে রাজজামাতার দেহ সিঞ্চন করতেই মৃত পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রল।

এই ঘটনার ফলে রাজা উৎপলদেব রত্নপ্রভের প্রতি

সিচ্চাই দেৱার মন্দির

আকৃষ্ট হ'লেন ও তাঁ'কে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি পাঠালেন। আচার্য্য তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না। রাজা আরও মুগ্ধ হলেন ও ক্রমে তিনি এবং তাঁর প্রজারা রত্নপ্রভের নিকট জৈন ধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন।

উৎপলদেব মহাবীর জিন-এর একটি মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করলেন।

এদিকে চার মাসও পূর্ণ হ'তে চলল। চামুণ্ডার নির্দ্দেশ মত চতুর্মাসি' অন্তে আচার্য্যের প্রস্থান সময় এগিয়ে আসতে লা'গল। রাজা মহাবীরের মূর্ত্তির নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

চার মাস পূর্ণ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে, এক বিস্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে মহাবীরের এক সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হ'ল।

...কিছুদিন যাবৎ মন্ত্রীর একটি গাভী চরভূমি হ'তে ফিরে এলে দেখা যাচ্ছিল—তা'র সমস্ত দুধ অপহৃত। তা'র রাখাল একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করল যে, গরুটি চরভূমি থেকে কিছু দূরে, একটি সুউচ্চ স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় ও আপনা হ'তেই তা'র সমস্ত দুধ নিঃসৃত হয়ে যায়! কয়েকদিন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার পর সে মন্ত্রীকে একথা জা'নাল।

তখন ওই স্থানটি খননের ফলে অপূর্ব্ব দর্শন এক মহাবীর মূর্ত্তি পাওয়া গেল।......

আচার্য্য রত্নপ্রভ পূর্ব্বেই ধ্যানযোগে, দেবী চামুণ্ডার কাছ থেকে এই বিষয়ে জানতে পেরে-ছিলেন।

শুভদিনে মার্গশীর্ষের (অগ্রহায়ণের) শুক্লা পঞ্চমীতে মহাসমারোহে মূর্ত্তিটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

উপকেশপুর ত্যাগের পূর্ব্বে, রত্নপ্রভ চামুণ্ডাকে মহাবীরের মন্দিরটির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নির্দ্দিষ্ট করে গেলেন। আর এই জাগ্রতা দেবীর উক্তিমত সকল অভীষ্ট লাভ করায়, দেবীকে সচ্চাই (অর্থাৎ সত্য) দেবী নামে অভিহিত করলেন। সেই 'সচ্চাই' বা চামুণ্ডা ক্রমে 'সিচ্চাই'য়ে পরিণত হয়েছেন। চামুণ্ডা অধিষ্ঠাত্রী হওয়ায় জৈন মন্দিরটির গায়ে এখনও দেবী চিত্র শোভা পাচ্ছে।

মহাবীর স্বামী

এখানের জৈন ধারাটি উপকেশবংশ বলে খ্যাত হয়েছিল। কালক্রমে উপকেশবংশই 'ওসওয়াল্' হয়েছে।···

আজ আর সেই উপকেশপুর নেই। তা'র অংশ বিশেষ মাত্র ওসিয়াঁ নামে বেঁচে রয়েছে।

শুধু বালি আর ইতস্ততঃ ছড়ানো নানা মন্দিরের ভগ্নাংশের মাঝে একটা গ্রামের মত জনপদ এই ওসিয়াঁ।

দিগন্তের বলয়রেখা ও সবুজ শ্যামলতার স্পর্শ হ'তে বঞ্চিত।······

সিচ্চাই দেবীর মন্দিরটি একটি টিলার উপর অবস্থিত। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, মন্দিরটি বাইশ শ' বছরের পুরানো। রত্নপ্রভ যদি পার্শ্বনাথ হ'তে ৬ষ্ঠতম ব্যক্তি হ'ন তা'হ'লে ওই হিসাব সঠিক বলেই ধরা যেতে পারে।

মহাবীরের মন্দিরটি বিশেষভাবে সংস্কারপ্রাপ্ত ও নব কলেবর। সিচ্চাই দেবীর মন্দিরটির মধ্যে মধ্যে জীর্ণোদ্ধার হ'লেও, জনসাধারণের মতে আদি মন্দিরটিই বর্তমান।

* * * * *

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ওসওআল্ জৈনদের এই তীর্থস্থান তথা শক্তিপূজার এক সুপ্রাচীন ক্ষেত্র দর্শন শেষ হ'ল।·····রেল স্টেশনের অনতিদূরে কয়েকখানা দোকান নিয়ে একটা ছোট বসতি। ফিরবার পথে চালক গাড়ীটা সেখানেই থামালেন। একটা খাবারের দোকানে খবর মিললো—ট্রেন দেড় ঘণ্টা লেট্।

স্টেশনের শেড্ যা' তেতে আছে তা'তে তা'র নীচে বেলা তিনটের রোদ্দুরে বসে থাকা শাস্তিরই নামান্তর। অতএব দোকানটা থেকে কিছু মিঠাই কেনা গেল। মতলব, সুদীর্ঘ সময়টা ময়রার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ঘরটায় বসে কাটানো।

কলকত্তার মুসাফির শুনে, সমাদরের সঙ্গে, গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত তা'র দোকানেই অপেক্ষা করতে বললো।

স্টেশন তো সামনেই, গাড়ী এলে দেখা যায়।

মিঠাইগুলি উদরস্থ করে জল চাইতেই দোকানদার যেন বিবর্ণ হয়ে গেল! গাড়ীর চালকটির সঙ্গে মারওআরী বুলিতে আলাপ করে এক গ্লাস দুধ দিয়ে বললো—"দুধ পী লিজীয়ে। ধুপ সে আয়ে হৈঁ, পানী পীনা ঠিক ন হি।"—দুধ খান। রোদ থেকে এলেন, এখন জল খাওয়া ঠিক নয়।

জলের বদলে দুধ! নিশ্চয় কোন বিশিষ্ট গ্রহের বিশেষ অনুগ্রহ। ব্যবসায়ীর মত মন দিয়ে কারণটা খুঁজতেই বোধ হ'ল, ব্যক্তিটি মোটেই শুভানুধ্যায়ী নয়! আসল কথা, ও দুধটা বেচতে চায়।

অবশ্য, একটু পরেই গাড়ীর চালক আমায় নিভৃতে যা' বললেন, তা'তে বোঝা গেল, জল না দেওয়ার ওই দুটো কারণের কোনওটাই সঠিক নয়। আসল কারণ, জল নেই। জল আনতে অনেক দূর যেতে হ'বে। এখানে খুব জলকষ্ট।·········

মহাবীর স্বামীর মন্দির
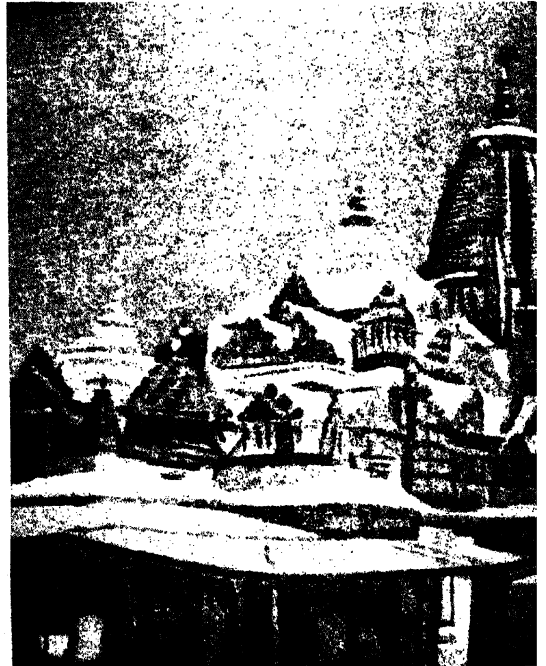
ওসিয়াঁ থেকে আরও কিছু উত্তর পশ্চিমে, জয়শলমের-পথে, এমন সব গ্রাম আছে যেখানে জলের বিলি ব্যবস্থা বিস্ময়করভাবে নিয়ন্ত্রিত।...দু'খানা গ্রামের মধ্যে হয়তো একটা কুয়া আছে,—প্রতি গৃহস্থ একদিন অন্তর খাওয়ার ও স্নান ইত্যাদির জন্য দু' ঘড়া জল পান। প্রত্যহ স্নান ও পরিচ্ছন্নতার কথা সেখানে অচিন্ত্যনীয়। ছোট ছেলে-মেয়েরা অবশ্য স্কুলের বইয়ে, স্বাস্থ্যতত্ত্বে, ও সব কথা পড়ে। তাই বেশীর ভাগই ওখানের লোকেরা যে রকম নোংরা কাপড়-চোপড় পরে ট্রেনে ওঠেন তা'তে ভিন-দেশী সহ-যাত্রীর পক্ষে সেই কামরা ত্যাগ করার ইচ্ছা হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

উত্তর রাজস্থানের অনেক জায়গাতেই চাষের উপযুক্ত জমি নেই। আছে পাথর। যেখানে পাথর নেই সেখানে আছে বালি। আর যদি বা জমি থাকে তো—নেই জল।

সেই জন্যই হয়তো লোটা কম্বল সম্বল করে, এদেশের অনেকেরই বহুকাল পূর্ব্বে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। যেতে হয়েছিল দেশে দেশে, দেশান্তরে, জীবিকার সন্ধানে। বাঁচবার জন্য ওরা আশ্রয় নিয়েছিলেন বাণিজ্যের। আর তাই, আজ মারওআরী বলতেই যেন বোঝায়, একটি ব্যবসায়ী জাতি।

এই সব ভাবছি এমন সময় দোকান ঘরে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ। সামনের বেঞ্চটায় বসেই আমায় প্রশ্ন করলেন—"তুমি রাজধানীতে থাকো ?"

প্রশ্নের ধরণ দেখে বিস্মিত হ'লাম !

বললাম—"না।"

বৃদ্ধ এবার প্রশ্ন করলেন—"তুমি কি সরকারী অফিসর ?"

উত্তর দিলাম—"না না, আমি সাধারণ চাকরিজীবী।"

—"তবে তোমায় বলে লাভ নেই।"

—"বলুনই না",—অনুরোধ জানালাম।

—"বলতে পারো তোমরা এখন কা'দের শাসনে আছো ?"

—"কা'রও নয়। স্বরাজ চলছে।"

—"কতদিন ?"

—"তা' চোদ্দ বছর হ'ল।"

—"বেশ। এই চোদ্দ বছরে কি কাজ তোমরা করেছো ?"

বৃদ্ধ নিশ্চয় কিছু খবর রাখেন না। তাঁর অজ্ঞতার কথা ভেবে দুঃখ হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি খবরের কাগজ পড়েন ?"

বৃদ্ধ বললেন—"না।"

—"সিনেমা দেখেন ?"

—"না।"

(মনে মনে ভাবলাম, তবে আর আমাদের achieve-ments-এর খবর তুমি রাখবে কি করে বাপু !)

বললাম—"অল্প সময়ের মধ্যে সে সব গুছিয়ে বলা যায় না। কত বড় বড় কাজই তো আমরা এই ক'বছরে করেছি। আর বললেও সব কথা আপনি বুঝবেন না। সে সব দেখে-শুনে দুনিয়ার সেরা সেরা দেশের মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও অবাক হয়ে গেছেন। বিদেশীরা ভেবেই পাচ্ছেন না যে, মাত্র চোদ্দ বছরে আমরা কি করে ঐ সব করেছি।"

বৃদ্ধ বললেন—"দু' একটা বল না শুনি।"

বললাম—"টেলিভিসন্ বোঝেন ?"

—"না। কি সেটা ?"

—"বেবী মোটরকার, মাত্র পাচ হাজার টাকায় তৈ'রীর কথা ভাবতে পারেন ?"

—"উহু।"

—"তবেই দেখুন তো, আপনি কি করে বুঝবেন আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের কথা ! হ্যাঁ হ'ত যদি আমেরিকা, তা'হলে গাঁয়ের একটা ছোট ছেলেও বুঝতো ওসব কথা।"

বৃদ্ধ বললেন—"সেখানেও বুঝি আমাদের মত এই রকম গ্রাম আছে ? ওদের কোনও গ্রামের মেয়েরা বাঁচবার জন্য এক ক্রোশ দূর থেকে ঘড়া মাথায় জল আনে ?"

বললাম—"এটা আপনার অবান্তর কথা,—একটা যাচ্ছে-তাই উদাহরণ। এ্যাচিভ্‌মেন্ট-এর সঙ্গে ও কথার কোনও সম্পর্কই হয় না। আপনার ও ধরণের কথা আমাদের শহরের, সভ্য সমাজের বা সরকারের কেউ বুঝতে পারবেন না।"

—"তা'হলে আমরাও তোমাদের টেলিভিসন্ বুঝবো না, বেবী মোটর বুঝবো না। তোমরা তোমাদের শহর

আলো ঝলমল

ফটো :
পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
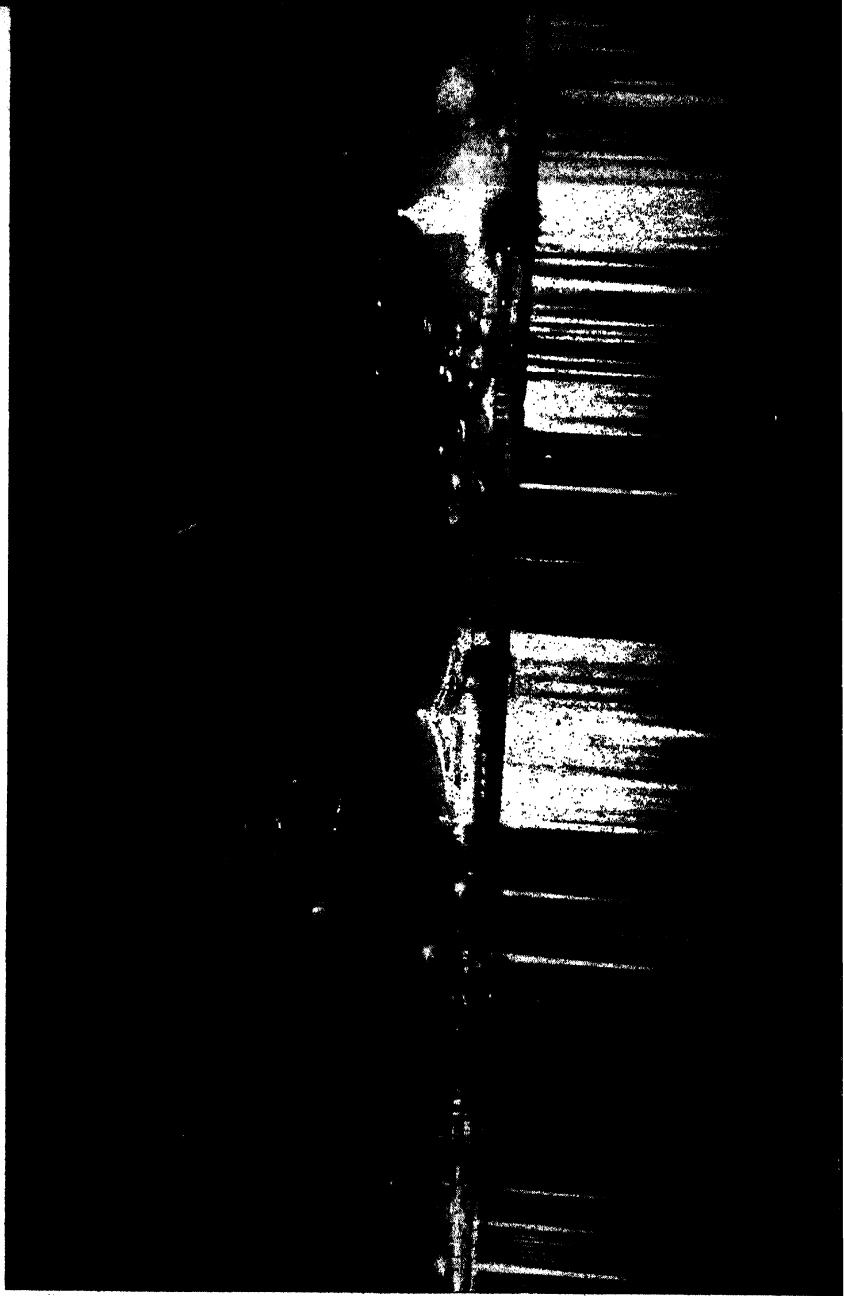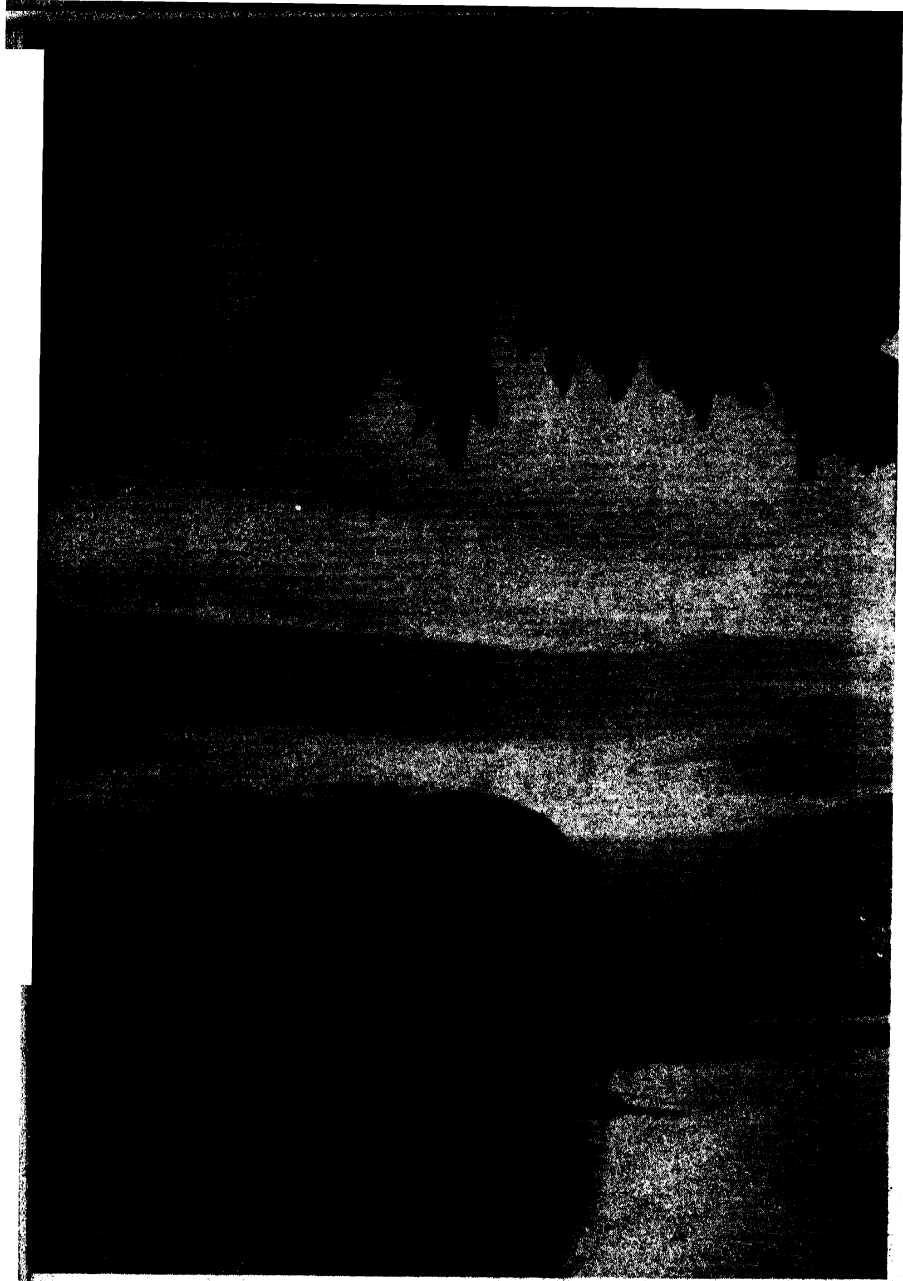
বেলা : দিনে   ফটো : স্থধাংশু মণ্ডল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

নিয়ে, তোমাদের সভ্যতা নিয়েই থেকো। বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের আগেই দরকার জল, আর তোমরা তা'রই ব্যবস্থা করতে পারোনি। আমাদের কাছে তোমাদের ওই সব কাজের কিছুই সার্থকতা নেই। ও সবই বাজে কাজ! আমাদের সমস্যার সঙ্গে তোমাদের সমস্যার মিল নেই। আমরা চাই জল, তোমরা চাও টেলিভিসন্ আর পাঁচ হাজারের মোটর গাড়ী। তোমাদের সমস্যা আর আমাদের সমস্যা আলাদা।"

বললাম—"আমরা তো খাল কেটেছি।"

বৃদ্ধ বললেন—"আমরা তো জল পাইনি।"

—"এখানে জল পাওয়া অসম্ভব। টিউব্ওয়েল্-এও পাওয়া যাবে না।"

—"তোমরা কয়েক শ' মাইল দূর থেকে পাইপ দিয়ে তেল আনতে পারো, আর জল আনার উপায় করতে পারো না!

—"মাথা খারাপ! আর খরচ উঠবে কোথা থেকে? এ অঞ্চলের লোক কতই বা ট্যাক্স দিতে পারবে?"

—"ও, তা'হ'লে দেশের কোনও এক অংশের মানুষ যদি তোমাদের হিসাবমত আয় না যোগাতে পারে তো—বাঁচবার জন্য জলের সুব্যবস্থাও আশা করতে পারবে না। তৃষ্ণার জলেরই সুরাহা হ'ল না, অথচ তোমরা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। এ স্বরাজের মানে বুঝলাম না।"

ভাবলাম, সরকারী অফিসার হ'লে বৃদ্ধকে বলতাম—"আমাদের এত কষ্টের স্বরাজের ওপর টিপ্পনী কাটতে লজ্জা করে না? ছিঃ!" হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধ চলে গেছেন।

ঠং ঠং করে একটা আওয়াজ ভেসে এল। অর্থাৎ স্টেশন থেকে গাড়ীর আগমনবার্ত্তা জানিয়ে প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

অরূপ ভট্টাচার্য্য

আবার এসেছে নটী ঋতুমতী শ্রাবণ-শর্ব্বরী
শ্যামাঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে জড়াইয়া মেঘ্‌লা-বারাণসী
স্পর্শে তার কদম্ব-কেশর দল উঠিছে শিহরি'
অজস্র স্ফটিক-মুক্তা শাড়ী হ'তে পড়িতেছে খসি'॥

তটিনীর দেহ-তটে যৌবনের চাঞ্চল্য বিপুল
উদধিমেখলা আজ নৃত্যরতা সিক্তা নীলাম্বসা
যেদিকে ফিরাই আঁখি সবই দেখি ব্যস্ত বেয়াকুল
দিক্ অঙ্গনার কটি হ'তে আঁধারের মেখলাটি খসা॥

বিহগ-দম্পতি সবে আলম্ব যে নিয়েছে কুলায়
চঞ্চুপুটে চঞ্চু রাখি' পান করে হৃদয়ের রস
মেঘবক্ষে ইরম্মদ্ মাঝে মাঝে চমকিয়া যায়
বিধস বাসনা-বহ্নি জাগাইছে জ্বালার হরষ॥

বাহিরে দুর্য্যোগ নামে, প্রাণে মোর দুরন্ত প্লাবন
কল্পনার কাম-স্বর্গে খুঁজিতেছি মোহিনী অপ্সরা
জলন্ত বর্ত্তিকা দীপে, দেখি চেয়ে অতৃপ্ত-নয়ন
হিয়ার হিমজা মোর কোথা, এসো হবে স্বয়ম্বরা॥

ভারতবর্ষের স্মৃতি

শ্রীকালিদাস রায়

আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের Sixth year Class-এর ছাত্র। নানা পত্রিকায় আমার কবিতা তখন প্রকাশিত হ'তো—তন্মধ্যে প্রবাসী, ভারতী, যমুনা, উপাসনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ক্রমে মানসী প্রকাশিত হ'ল। তার একজন প্রধান লেখক হ'লাম।

আমি 'অন্ধকার বৃন্দাবন' নামে একটা বড় গান লিখেছিলাম—প্রবাসী, ভারতী, মানসী তিনখানি পত্রিকা থেকে তা ফেরত এলো। তা সত্ত্বেও আমার একটা ধারণা ছিল—ওটা উচ্চ শ্রেণীর কবিতা নয় বটে, কিন্তু জনবল্লভ হওয়ার দাবি বোধ হয় এর আছে। একদিন সে কবিতাটা বাণী অফিসে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও করুণানিধানকে শোনালাম এবং বল্লাম—লেখাটা তিন খানা পত্রিকা থেকে ফেরৎ এসেছে। অমূল্যবাবু বললেন—ভারতবর্ষ ব'লে সত্বর এক খানা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বেরুচ্ছে—তারই প্রথম সংখ্যার জন্য এ লেখা থাক্‌ল। কিছুদিন পরে ভারতবর্ষ বেরুল—তাতে আমি ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে দুটি সনেট পাঠিয়েছিলাম প্রথম সংখ্যায় সেই সনেট দুটি বেরুল। তারপর দ্বিতীয় সংখ্যায় অন্ধকার বৃন্দাবন বেরুল। সেই এক কবিতায় আমার নামটা সুপরিচিত হয়ে গেল দেশে। আমার বন্ধু শিশির ভাদুড়ী কবিতাটা কোন কোন সভায় আবৃত্তি করেছিল—তাতে কবিতাটা জনবল্লভতা লাভ করল। ঐ কবিতাটা বেরুবার পর ভারতবর্ষের পরবর্তী সংখ্যায় নিরুপমা দেবী আমার ঐ কবিতার একটা উত্তর দেন—তাতে বক্তব্য—বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্যামচন্দ্র এক পা'ও কোথাও যাননি—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি—অতএব বৃন্দাবন অন্ধকার হতে পারে না। তারপর পরবর্তী একসংখ্যায় আমি লিখলাম—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি—নাম দিয়ে একটা কবিতা—এইভাবে অন্ধকার বৃন্দাবনের ধারা কিছু দিন ভারতবর্ষে চলেছিল।

ভারতবর্ষের উপর গোড়ার দিকে শরৎ দাদা (শরৎ চন্দ্র) ছিলেন বিরূপ। তিনি ভারতবর্ষের ঐ দ্বিতীয় সংখ্যার আগাগোড়া নিন্দা করে তাঁর বন্ধুকে একখানি পত্র দেন—নিন্দনীয়দের দলে পড়ে অন্ধকার বৃন্দাবনও তাঁর দ্বারা নিন্দিত হয়। তা হোক—সে চিঠি তখন ছাপা হয়নি—পরে ছাপা হয়েছে। যাই হোক, ভারতবর্ষে প্রকাশিত ঐ কবিতাতেই আমার তথাকথিত খ্যাতির সূত্রপাত—সেজন্য আমি ভারতবর্ষের কাছে ঋণী।

তারপর কয়েক মাস পরে আমার আর একটি কবিতা 'চিত্ত ও বিত্ত' ভারতবর্ষের প্রথম পাতে আমার ফোটোগ্রাফ সহ প্রকাশিত হয়, তাও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বছর দেড় পরে আমার পর্ণপুট প্রকাশিত হয়—এই কবিতার বইখানির অনেকগুলি কবিতা ভারতবর্ষেই প্রকাশিত।

পর্ণপুট প্রকাশিত হলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ণপুটের একটি সমালোচনা করেন। তা' প্রবন্ধাকারে রচিত বলে একে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তাতে পর্ণপুটের এমনি বিজ্ঞাপন হয়েছিল যে প্রথম সংস্করণ সত্বর ফুরিয়ে যায়। গ্রন্থকার হিসাবেও আমি ভারতবর্ষের কাছ থেকে যাত্রাপথে ঐ সমালোচনার পাথেয় পেয়েছিলাম।

প্রায় প্রতি মাসেই ভারতবর্ষে আমার কবিতা বেরুত। কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতাও মাঝে মাঝে বেরুত। কোন কারণে ভারতবর্ষের সঙ্গে কবিবরের মনোমালিন্য ঘটে। তাতে যতীনদাদা আমাকে বলেন—ভারতবর্ষে আর লিখতে পাবে না।'

আমি তাঁকে বললাম—'এতে ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই—আমারই ক্ষতি হবে। ভারতবর্ষের বহুল প্রচার, বহুপাঠক পাওয়া যায়।"

তিনি বলেন—"আমি তোমাকে বড় ভাইএর দাবীতে আদেশ করছি।"

আমি তিনমাস ভারতবর্ষে লিখিনি—তারপর আমার

অন্য এক অগ্রজের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত। তিনি বল্লেন—'যতীনের কথা শুনে তুমি অকৃতজ্ঞ হয়োনা। ভুলে যেও না তুমি ভারতবর্ষের কাছে ঋণী।'

তাঁর উপদেশে আমি ভারতবর্ষে লেখা দিতে থাক্‌লাম। যতীনদা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন।

বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে কবিবর সত্যেন্দ্র দত্ত ও চারুদা (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) যতীনদাকে তিরস্কার করে কথা বলতে উপদেশ দিলেন। আমি যতীনদাকে প্রণাম করলাম, তিনি বুকে ধরে কেঁদে ফেললেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সহৃদয় সংপর্ক বরাবরই আছে। কত পত্রিকার উদয় হলো, কত পত্রিকার বিলয় হলো, অধিকাংশ পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ হয়ে গেছে কোন না কোন কারণে। ৫০ বৎসর ধরে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ সমানই বর্তমান আছে। শরৎদাদার মৃত্যুর পর শরৎদাদার প্রত্যেক বই ধরে আমি আলোচনা করি—সেগুলি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়—সেইগুলিই আমার দুইখণ্ড শরৎ-সাহিত্যে উপনিবদ্ধ।

যে ছাত্রধারা কবিতার জন্য ছাত্র মহলে আমি সুপরিচিত, তাও ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে আমার শেষ গদ্য রচনা কবিবর দ্বিজেন্দ্র লালের কাব্য সমালোচনা (তিন সংখ্যায় প্রকাশিত)। সেই সমালোচনা ভূমিকা রূপে দ্বিজেন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষের পঞ্চাশত্তম জন্ম বৎসরে এই কথাগুলি বলে ভারতবর্ষকে অর্ঘ্য দান করছি। পঞ্চাশ বছরে দেশে একটা যুগান্তর ঘটে গিয়েছে—ভারতবর্ষ যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে—গতানুগতিক ধারা বর্জন করে, যুগধর্মের ইঙ্গিতে অগ্রসর হোক, আমি সেই প্রার্থনা করি।

মহামানব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তারাই তো যায় ধূলার ধরায়
সোনার ফসল বপন করে।
খোঁজ রাখেনা অমৃত ফল
কোথায় উহার কখন ধরে।
তারাই করে অবিরত—
দেশ জাতিকে সমুন্নত,
তা'রাই নর ও নারায়ণের—
ঘনিষ্ঠতা নিবিড় গড়ে।

২

তারাই আনে জাতির তরে,
মহৎ বৃহৎ সম্ভাবনা।
অনাগত শুভের লাগি—
জাগায় সফল উন্মাদনা।
এই ধরণী তারাই ওরে—
রাখে বাসের যোগ্য করে,
ঘুচায় জাতির সব অভিশাপ—
দেশের সর্ব্বারিষ্ট হরে।

৩

শাক্ত সাধক ঋত্বিকেরা
শব সাধনার মন্ত্র জানে,
চন্দ্রভালীর হস্ত হতে
সঞ্জীবনী সিদ্ধি আনে।
তা'রা ক্ষয়ী—অক্ষয় দান,
মৃত করায় অমৃত পান।
যুগের তারা সাক্ষী সুহৃদ
যুগ হতে যায় যুগান্তরে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
(স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী)

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা ক'র্ত্তে হ'লে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যে সকল ক্ষেত্রে বিকীর্ণ হ'য়েছে তার কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মানুষের চিন্তাধারায় যা কিছু ভাব উঠ্‌তে পারে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, মানুষের কল্যাণে বা জাতির বা দেশের কল্যাণে বা বিশ্ব মানবের বা বিশ্বের কল্যাণে, তাঁর অমৃতময়ী লেখনীর মাধ্যমে তাঁর অগণিত কাব্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে, রম্য-রচনায় তার বিকাশ আমরা দেখেছি। সমাজ ব'লতে বুঝি মানুষের সমষ্টি। সুতরাং সমাজ কল্যাণ কথা চিন্তা করতে হ'লে যাদের গোষ্ঠী নিয়ে সমাজ সেই ব্যক্তি বা মানুষের কল্যাণের কথা বাদ দেওয়া যায় না—কতিপয় মানুষকে নিয়ে ক্ষুদ্রতম পল্লীসমাজ, তদপেক্ষা বৃহত্তর মানুষ গোষ্ঠীকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সমাজ, তার চেয়েও বৃহত্তর মানুষের সমষ্টিকে নিয়ে দেশের জাতির, দেশীয় বা ভারতীয় সমাজ। দেশের গণ্ডীর বাহিরেও আছে বৃহত্তম বিশ্বমানব সমাজ। রবীন্দ্রনাথ সকল রকম গণ্ডীর, কি ভৌগোলিক, কি ধর্ম্মীয়, কি বর্ণের বেড়া অতিক্রম ক'রে বিশ্বমানবতার যে বাণী সারা জগৎকে দান ক'রে গেছেন, তাঁর বিরাট সাহিত্যের মাধ্যমে সেখানে তিনি কোন নিম্নস্তরের Unitকে বাদ দেন নি। তাই তাঁর মোহন তুলিকার স্পর্শে কেউ বাদ যায় নি—(Individual), ব্যক্তি সমাজ (Society), দেশ ও জাতি (Country) এবং সারা বিশ্ব (World Humanity)। স্রষ্টা তিনি, দ্রষ্টা তিনি, ঋষি তিনি,—তাঁর সুদূরপ্রসারী সত্যদৃষ্টিতে তুলে ধ'রেছেন নূতন আদর্শ—সে আদর্শ যদি ব্যক্তি, সমাজ, জাতি বা পৃথিবী গ্রহণ কর্ত্তে পারে রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাব সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে; সারা বিশ্বে কল্যাণ, শান্তি ও সুন্দর চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌বে, বিশ্বব্যাপী এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হবে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ, বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধকের যথার্থ গর্ব্ব ও গৌরব অর্জ্জন ক'র্ত্তে সমর্থ হবে। সারা ভারতে রবীন্দ্রনাথের ভারতের অতীত ঐতিহ্যের মোহন মূর্ত্তি ও ভবিষ্যৎ ভারতের সুদূর স্বপ্ন—প্রত্যেকের কাছে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।

তাই রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রথমেই ব্যক্তির আদর্শের কথা চিন্তা করি। কত কাব্যের ছন্দে ছন্দে, কত গদ্য সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে তিনি এই দেহ ও প্রাণ নিয়ে গড়া মানুষটির—কথা ফুটিয়েছেন—যেটা তর্কের বাহিরে, বিচারের উর্দ্ধে, সত্য ও সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহ-লীলা কবিতায় তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেখলেন,

> "দেহ আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
> একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার
> একি জ্যোতি, একি ব্যোমদীপ্ত দীপজালা
> দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা।
> একি বিচিত্র বিশাল—
> অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল—
> আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ—
> প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।"

সমস্ত মানুষের দেহতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সত্যকে তিনি অপরূপ রূপ দিলেন। শুনেছি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—যে মানুষের ধমনীতে প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য অসংখ্য বীজাণু (Cells) জন্মগ্রহণ করছে—আবার ধ্বংস হচ্ছে। সৃষ্টি চলেছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাঁর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সৃজনি-শক্তিকে কবির দৃষ্টিতে দেখে প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে

প্রকাণ্ড জগৎ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেন—The Universal man. এ দেহটা ত শুধু মাটী, প্রাণহীন দেহের ত কোন মূল্যই নেই। তাই সেই প্রাণ সম্বন্ধে কবিতা লিখ্‌লেন,—

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্র দিন ধায়
সেইপ্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধায় মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে—
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে।
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করিছে মহীয়ান্
যুগ যুগান্তের সেই বিরাট স্পন্দন—
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আর এক নবভারতের ঋষি—যিনি একই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতের পূণ্য ভূমিতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন—আবিষ্কার কল্লেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে যে, তরুলতা উদ্ভিদ সকলের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। সেই বিশ্বব্যাপী স্পন্দন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক মানুষের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে যুগযুগান্তরের বিরাট স্পন্দনের স্পর্শ অনুভব কল্লেন—তাঁর ধমনীতে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা সমাজের নিম্নস্তর (Unit) মানুষের চিন্তাকে বাদ দিয়া নয়। এই আদর্শে যে মানুষ বিশ্বাসী সেই মানুষে গঠিত—সমাজই হবে কল্যাণের ও সুদূরের প্রতীক। নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলির প্রতিটি কাব্যেই দেখি মানুষকে তিনি ভারতের অতীত ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের বাহকরূপে অধ্যাত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে কল্পনা ক'রেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি অনন্তশক্তির আধারভূত বিশ্বনিয়ন্তার স্পর্শ অনুভব ক'রেছেন—প্রকৃতির নানা রূপে, আলোকে, আঁধারে, গহনে, কাননে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, জলে, বাতাসে, বৃক্ষলতায়, সমুদ্রে, পর্ব্বতে, নদীপ্রান্তরে, ষড়ঋতু সমাগমে তিনি অনুভব করেছেন সত্য শিব ও সুন্দরের মোহনরূপ। তাই তিনি গাইলেন:

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকায় পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধ ময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি
শিখায় তোমার মন্দির মাঝে
ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার, যা কিছু আনন্দ
আছে—দৃশ্যে, গন্ধে গানে,
তোমারি আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

গীতাঞ্জলির প্রতিটী গীত অঞ্জলি দিয়েছেন বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে। এই গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ—ভাবের প্রাচুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, রচনার সৌন্দর্য্যে বিশ্বের দরবারে সম্মান দিয়েছেন তাকে বিশ্বকবিরূপে।

এই গীতাঞ্জলির যে কোন একটি গীত ভাবগ্রাহীরূপে শুধু পাঠ করলে প্রতি মানুষের মনই উচ্চস্তরে উঠে ভগবৎ সত্ত্বায় স্থিত হতে পারে এবং যদি পারে তাহা হইলেই ভারতবর্ষের তথায় বাংলার মানুষের রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব সার্থক হবে। নচেৎ শুধু দীপালোক সজ্জায়, নৃত্যনাট্যের, সঙ্গীতের ও বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার ক্ষণিকের আনন্দ পরিবেশন কর্ব্বে সত্য—কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বহু দূরে ফেলিয়া রাখিবে। গীতাঞ্জলির অমর গীতগুলির যে কোন একটি আশা করি এখানে আবৃত্তি উপযোগী হবে।

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে যাই—
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে—
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ—
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানের যোগ্য করে
অতি ইচ্ছার সংকট হ'তে বাঁচায়ে মোরে।"

ঋষির ন্যায় সাধন বলে যেন ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে গাইছেন—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
এবার, হৃদয় মাঝে লুকিয়ে, বসো—
কেউ জান্‌বে না কেউ ব'লবে না—
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি—
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি—
এবার, বলো আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না।
জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়—
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না।
না হয় আমার নেই সাধনা—
ঝ'রলে তোমার কৃপার কণা—
তখন নিমিষে কি ফুটবে না ফুল—
চকিতে ফল ফলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।"

এই ভগবানের কৃপাকণার প্রার্থনা ও প্রয়াসই ভারতে যুগ-যুগান্তরের অধ্যাত্ম সাধনা।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তায় সমাজের মানুষকে তিনি অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিমান, অর্থাৎ নির্ব্বিচারে ভগবৎ-বিশ্বাসী হওয়ার গান গেয়েছেন। যে গানের ছন্দ উঠেছিল ভারতের পুণ্যভূমিতে; সভ্যতার প্রথম প্রভাতে বেদ ও উপনিষদে ও ঋষিগণের কণ্ঠে।

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানের যোগ্য করে।"

ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে উঠে যখন গোষ্ঠী বা সমাজসমষ্টির সমবেত কল্যাণ প্রচেষ্টার কথা ভাবি—তখন শুধু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তার পরিচয় পাই না। পরিচয় পাই তাঁর কর্ম্মময় জীবনের আদর্শ পল্লীসমাজ ও পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায়। তাঁর অগণিত গদ্য সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে, অসংখ্য প্রবন্ধে, অভিভাষণে ও গানে ও কবিতায় তিনি দেশের ও জাতির কল্যাণ তথা সমাজের কল্যাণে হস্তক্ষেপ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে আদর্শ শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে এবং শ্রীনিকেতনে পল্লীর গ্রাম-সংস্কারে। বোলপুরে বার্ষিক আনন্দ মেলার উদ্বোধন করে বাংলার লোক সঙ্গীত, লোকনৃত্য, বাংলার লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন করতে পথ দেখিয়েছিলেন, শ্রীনিকেতনের উদ্বোধনের বহুভাষণে ও প্রবন্ধে "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলির অতুলনীয় ভাষায় দিকে দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গেছেন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে। তাঁর অতুলনীয় ভাষায় যেদিন শ্রীনিকেতনে বৃক্ষছেদনে ক্ষয়প্রাপ্ত জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপন বা বন-মহোৎসব আরম্ভ কল্লেন, তাঁর অতুলনীয় ভাষায় বল্লেন, "অমিতব্যয়ী সন্তান কর্তৃক অপহৃতা মাতার লুণ্ঠিত ভারতের পূরণ উৎসবই বনমহোৎসব।" এইরূপ শস্য রোপনের গানে, জল সিঞ্চনের তানে, বৃক্ষরোপনের উৎসবে এনে দিয়েছেন হতশ্রী পল্লীকে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করবার আনন্দময় পথ। যার উপর ভিত্তি ক'রেই—যে আদর্শ স্মরণ করে আজ আমরা স্বাধীন দেশে বনমহোৎসব করি। সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার বা Community Development Projectএর কাজে হাত লাগাই। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথের সাধনা আজ রূপায়িত হ'তে চ'লেছে—স্বাধীন জাতির বিরাট দেশ গঠন মঞ্চের পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার আয়োজনে। অপমানিত লাঞ্ছিত উপেক্ষিত অস্পৃশ্য—মানব সমাজের বেদনা ফুটে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে—তার গানে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ক'রেছ যারে—
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান।
মানুষের পরস্পরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ করে খেতে হবে—সকলের সাথে অন্নপান।"

এই প্রায়শ্চিত্ত জাতিকে ক'র্ত্তে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ—১০।১২ বৎসরের পূর্ব্ব যুগের ইতিহাস স্মরণ ক'রলেই বুঝতে পার্ব্বেন।

শ্রমের মর্য্যাদা ও খেটে খাওয়ার মেহনতি মানুষকে

তিনি কি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন—ফুটে উঠেছে তার "ধূলামন্দির" কবিতায় :—

"তিনি আছেন যেথায় মাটী ভেঙ্গে কর্চ্ছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙ্গে কাট্‌ছে যেথায় পথ, খাটছে বার'মাস
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাহার লাগছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।
ছিড়ুঁক বস্ত্র লাগুক ধূলা বালি
কর্ম্মযোগে তার সাথে এক হ'য়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

বাংলার শস্য শ্যামল ধরিত্রীর বু ক যখন তিনি বাঙ্গালীর বাংলা ভাষার ও বাংলা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করেছেন—তাঁর প্রাণের আবেগে প্রার্থনা করেছিলেন—

"বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গলার ঘরে যত ভাই বোন্
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

জাতিকে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত করতে ধর্ম্মের অন্ধতা, গোত্রীয় ভেদ বুদ্ধি, আচারের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবানের কাছে আদর্শ ভারতবর্ষে স্বপ্নরাজ্য কামনা করেছেন—তাঁর কবিতায়—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত সেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড খণ্ড করি
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হোতে
উচ্ছলিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বিচার স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্র বিশ্ব চরিতার্থ তায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা দেশাত্মবোধ—ঐ কবিতায় পরিস্ফুট হ'লেও ভারতের সনাতন আদর্শ, অন্যদেশের সঙ্গে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বে তার অবদান ফুটে উঠেছে—তার "ভারততীর্থ" সঙ্গীতে—

"হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা ওঁকার ধ্বনি
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া।
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোল আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

"স্বদেশী সমাজে" ঐ কথাই লিখেছেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনই ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। ভারত ধর্ম্ম বিভেদের মধ্যে সংঘর্ষ স্বীকার করে না। প্রত্যেক নবাগত আগন্তুককে যে শত্রুরূপে নিরীক্ষণ করে না। সে কাউকে প্রত্যাখ্যান করে না, কাউকে বিনাশ করে না—কোন পথই সে পরিত্যাগ করে না। সে মহান আদর্শের পূজারী এবং সকলকে সে এক বিরাট সমন্বয়ের মধ্যে আন্‌তে চেষ্টা করে।"

এই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি বৃহত্তর ভারত সমাজের কল্পনা করিয়া সুদূর প্রাচ্যে—জাপান, চীন, শ্যামদেশ, দ্বীপময় ভারত—ইরাণ, ইরাক পরিভ্রমণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে প্রযত্নশীল ছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া জড়বাদী পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের ও সভ্যতার অবদানকে তিনি অস্বীকার করেননি।

ভারতীয় মানব সমাজের ও জাতীয়তার ঊর্দ্ধে তিনি উঠে শুধু বিশ্বমানবতার স্বপ্ন দেখেননি—বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠান পরিচালনে ও আদর্শে বিশ্বকবি জাতীয়তার গণ্ডীর ঊর্দ্ধে সারা বিশ্বের মানবের মধ্যে তিনি মিলন ঐক্য ও শান্তির সন্ধান দিয়ে গেছেন—তাঁর শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে ও পরিকল্পনায়।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তার আলোচনায় বাদ দেওয়া চলেনা তার নারীত্বের আদর্শের কাহিনী—যা রেখে গেছেন তাঁর নানা সাহিত্যে ও লেখায়। বাদ দেওয়া চলে না তার দেশপ্রেমের ও দেশাত্মবোধের অন্যবদ্য দান ও স্বদেশ-সঙ্গীতগুলি যা ছন্দে, লালিত্যে ও ভাষার মাধুর্য্যে চিরদিন বাঙ্গলা সাহিত্যকে অমর করে রাখবে ও ভবিষ্যত দেশবাসীকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ কর্ব্বে। দেশের ইতিহাসকে তিনি কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে অমরভাষায় জাতির কাছে রেখে গেছেন।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজের একটি ছত্র উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ কর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—"দেশকে জয় করে নিতে হবে শুধু বিদেশীর হাত থেকে নয়, নিজেদের নৈষ্কর্ম্ম ও ঔদাসীন্য থেকে। দেশ আমাদের নিজেদের হয় নি, শুধু এই কারণে নয় যে এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে—যে দেশে দৈবক্রমে জন্মগ্রহণ করেছি মাত্র সেই দেশকে, সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা আত্মীয় করে তুলতে পারিনি। একে অধিকার কর্ত্তে পারিনি আত্মশক্তিতে ও দেশাত্মবোধে।" যদি রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে দেশের জনসাধারণের দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে কিছুমাত্র জাগ্রত হয়—রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হবে।

বিধানচন্দ্র

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা জুলাই রবিবার বেলা একটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো নিদারুণ খবর নিয়ে—বিধানচন্দ্র রায় আর ইহজগতে নাই—মাত্র সাড়ে ৯টার সময় তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে প্রণাম জানিয়ে এসেছি—আর হঠাৎ বিশ্ববিধাতা কি কলকাঠি নাড়লেন যে

জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে দোঁহে বসিয়াছে
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে

শুনেছি কখনো কখনো প্রবুদ্ধ জগতে এরকম অঘটন ঘটে। জন্মদিন মৃত্যুদিনে মিলিয়ে যায়। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য হয়ে সম্মুখে শান্তির পারাবারে পরম নির্বাপণে মেশে। সম্বোধির অংগই হল নিব্বানং পরমং সুখং।

তবে তাই হোক্, তবে তাই হোক্,

ছুটে গেলাম, তখনি জনারণ্য হয়ে উঠেছে চারিদিক, সর্বস্তরের লোক ছুটেছে—ধনী নির্ধন, মোটর-বিহারী পদচারী, ছাত্র শিক্ষক, স্ত্রী পুরুষ, কুলি মেথর। ডাকতার ব্যারিষ্টার, কোটিপতি ভূমিহীন, ভবঘুরে চাকুরে, ডি-এসসি, পি-এইচডি, কেউ বাকি নেই। মনে হলো একটি বিরাট বিশাল কর্মকুশল মানুষকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর শান্তসৌম্যমহিমার মাঝখানে আর এক বিশাল প্রাণ জন্ম নিচ্ছে। নাই, নাই, নয়।

রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, রুধিল না সমুদ্র পর্বত—একমনে একপ্রাণে উদ্বেলিত শোকাতুর জনতা বলছে—বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা যে তিনি নেই, মানি না সে কথা—তিনি আছেন, আমাদের জ্ঞানে, মনে, অবচেতনে তিনি আছেন, সেই গণপতি, সেই প্রিয়পতি—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে
প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে

মনে পড়লো সাইত্রিশ বছর পূর্বে দেশবন্ধুর প্রয়াণে এক নিদাঘতপ্ত জুন দিনে অশ্রুসিক্ত কলকাতাকে, স্মরণে এলো একুশবছর আগের এক স্মরণীয় শ্রাবণী সন্ধিক্ষণে জোড়াসাঁকোর গেট ভেংগে কবিগুরুর মরদেহকে যেন লুট করে নিয়ে চলেছিল শোকার্ত ভক্তরা। পিতা-পুত্র আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদেরও মহাযাত্রা দেখেছি। তারই বৃহদাকারে পুনরাবৃত্তি দেখলাম তার পরের দিন, সারা সহর চলেছে শ্মশানবন্ধু হয়ে রিক্তচিত্ত শোকতিক্ত মানুষের দল—ফিরলো শূন্য কুলায়ে, যেমন ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত পাখীরা ফেরে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে প্রবল ঝড়ের পর। কবি সজনীকান্তের কথা মনে পড়ে গেলো।

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছো কেউ

হ্যাঁ, একটি মানুষ আর একটি মানস, মেধায় মনীষায় কর্ম-অন্বেষায় শুভ্রসমুজ্জল, যার দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না—যার আশার অন্ত ছিল না, যার দেশের জন্য আকাঙ্খা ছিল আকাশচুম্বী, যার কর্ম প্রচেষ্টা অফুরন্ত। কবির ভাষায় তিনি শুধু শালপ্রাংশু মহাভুজ নন, আত্মকর্মক্ষম বীরও বটে—ক্ষাত্রধর্ম যাকে আশ্রয় করে আছে। বহুমুখী প্রতিভা, কর্ম-উদ্ভাসিত চেতনা, প্রাণ-উজ্জ্বল খর দৃষ্টি—নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছে, কোথাও নীচতা নেই, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি নেই, হীনমন্যতা নেই—বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়, বহুজনকে নিয়ে, বহুজনকে আশ্রয় দিয়ে যিনি কাজ করতে চাইতেন। হয়তো সেখানে তাঁর সংগে তাঁর অনুচরেরা অনেকেই তাল রাখতে পারেন নি, কর্মক্লান্ত হয়েছেন, কর্তব্য বিচ্যুত হয়েছেন—কিন্তু অনাচারে ভ্রষ্ট হননি। শবাসনে বসে প্রলুব্ধ হননি, কারণ তাঁরা শুনেছেন সেই আশার বাণী সেই অভয় ধ্বনি—কাজ করো, এগিয়ে চলো, মাভৈঃ। রোমাঁরোলা বলতেন—জীবনে সূর্য উঠলে সব কিছু অন্ধকার মিলিয়ে যায়। দাঁড় টানো, নীচে নামো, পুবে হেলো, ঠেলে তোলো, মোচড় দাও, এই পাঁচটি নীতি তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ—এ কথা তিনি নিজেই বলেছিলেন ধুবুলিয়ায় এক বক্তৃতায়। উপনিষদের উত্তরসাধক মন্ত্র 'চরৈবেতির' উদ্গাতা তিনি।

আগে চল, আগে চল ভাই—পড়ে থাকা পিছে,
মরে থাকা মিছে।

আমরা জানি বিধানচন্দ্রের জন্ম এক শ্রীমতাং গেহে, নিষ্ঠাবান ভগবদ্বিশ্বাসী পরিবারে। শুভকর্মপথে প্রেরণার বীজ সেইখানে, মাতা অঘোরকামিনী পিতা প্রকাশচন্দ্রের কাছে। যে পিতা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লণ্ডন থেকে বিধানচন্দ্র ফিরে এলে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন যে তাঁর জীবন মুকুলিত পুষ্পের সুরভিতে বিকশিত হোক্, যেদিন তিনি বিধির বিধানে চলে যাবেন সেদিন এই সুগন্ধই তিনি রেখে যান্। সন্ত তুলসীদাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি যখন যাবে হাসতে হাসতে যেয়ো —সবাই যেন কাঁদে। শুনেছি তিনি ছিলেন প্রতিভাধর ছাত্র, পরে দেখেছি তাঁর অভ্যুদয় ভিষগ্‌রত্ন হিসাবে। ব্যাধি-জর্জরিত আর্তের কাছে তিনি ছিলেন দেবদূত ধন্বন্তরী। মস্ত বড় ডাক্তার উৎসাহীকর্মী বর্ষমান জননেতা, এই পরিচয়েই জেনেছি তাঁকে আমাদের বাল্যে কৈশোরে যৌবনে। কিন্তু তারও বেশী কিছু ছিল তাঁর প্রতিভার মধ্যে, প্রাণস্ফুরণের অন্তরালে কোথায় একটি আহিতাগ্নি লালন করতেন তিনি সযত্নে মনের মণিকোঠায়। দেখেছি তাঁকে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তরূপ, বাংলার তরুণ প্রাণ যেদিন তাঁকে বরণ করে নিলে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রবীণ বনস্পতিকে পিছনে রেখে। দেখেছি তাঁকে পৌরপাল হিসাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সংস্থায় কর্ণধাররূপে, পরমবান্ধব রূপে। দেখেছি তাঁকে বেলগাছিয়া আর. জি. কর কলেজ ও হাঁসপাতালে, যাদবপুরের সেবা ও শিক্ষায়তনে, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাঁসপাতালে ও মাতৃসদনে, শৈলশিখরের শুকতারার পাশে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায়, দেশে বিদেশে, পথে প্রবাসে, নানা প্রতিষ্ঠানে, নানা উদ্যোগে। দেখেছি তাঁকে প্রায়োপবেশনের তপস্যায় সমুজ্জল গান্ধীজীর শরশয্যার পাশে অনলস বরাভয় মূর্তিতে। বিদেশী বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে যখন তিনি কারারুদ্ধ তখনও নিপুণ চিকিৎসকের দক্ষিণ পানি প্রসারিত হয়েছে হতভাগ্য কয়েদীর দিকে। একদিকে দেখেছি তাকে লক্ষ্মীর বরপুত্রদের চিকিৎসা করতে, তেমনি দেখেছি রাস্তায় নেমে আর্তকে সেবা করতে, বাড়ীতে নিয়মিতভাবে প্রতিটি দিন বিনা পারিশ্রমিকে আতুরকে আশ্বাস দিতে। রাইটার্স বিল্ডিংএর সামনে একদিন মোটর এ্যাক্সিডেন্ট হল। সর্বপ্রথমে এগিয়ে গেলেন স্বয়ং তিনি। গরীব চাপরাশী তার স্ত্রীপুত্রের চিকিৎসা করাতে পারে না—পা জড়িয়ে ধরল—পড়ে রইল গুরুভার রাজকাজ, নেমে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, বুকে চোং বসিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। বাহিরের শক্ত আবরণের ভিতরে যে একটি অত্যন্ত দরদী মন কাজ করত তার সন্ধান পাওয়া খুব শক্ত ছিল না। করুণাঘন চিত্তের সংগে মিশেছিল তাঁরই এক অনুরাগীর ভাষায়—the amazing vitality of his mind. He never ceased to grow, to learn, to understand.

সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছেন উদ্যোগী পুরুষসিংহ—কর্মযোগী—নিন্দা স্তুতি তুল্য মৌনীর মতন—গড়ে উঠবে নতুন দিনের বাংলা, নতুন শিল্প, নতুন রাষ্ট্র, নতুন চেতনা, স্বাস্থ্যে শিক্ষায় আনন্দে ঝলমল, নতুন ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র সমুদ্রধৌত বেলাবলয় থেকে তুংগশীর্ষ হিমাদ্রি পর্যন্ত, বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধুর অসীমে। দেশভাঙ্গার শ্মশানে দাঁড়িয়ে যে বামাচারী কাপালিক দল তাকে মহাশক্তির পাদপীঠ করে তুলতে সাহস রাখেন তাঁরাই তো প্রকৃত যোগী। শুধু মহাকালীকে জাগালেই দেশের সার্থকতা জাগে না—মহাসরস্বতীকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কমল আসনে—ধনধান্যেভরা মহালক্ষ্মীর ঝাঁপিটিও খুলে দিতে হবে, তবেই বিপ্লববিদ্রোহের অন্তরালে মা হবেন মহেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী। শুধু অর্থ নয়, বল নয়, স্বাস্থ্য নয়, আনন্দ উজল পরমায়ু নয়, শিল্প-উন্নয়ন নয়, কলামন্দির নয়, গণউদ্যম নয়, স্পন্দনমুখর মহিমা নয়—ভোগে যোগে ত্যাগে সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ শ্রী আর শ্রী। এই সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার, যৌবনের, শক্তির, শান্তির, স্বপ্ন দেখতেন সেকালের অথর্বানরা, উপনিষদকাররা। বাংলা দেশের পরম সৌভাগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণচঞ্চল বিদ্যুৎ-সজাগ দিনে কয়েকজন এসেছিলেন, যাঁরা এই সর্বাঙ্গীন স্বপ্ন দেখতেন—পূব মিলছে পশ্চিমের সঙ্গে, ধ্যান মিলছে ধারণায়, প্রাচীন জ্ঞান মিলছে নবীন বিজ্ঞানের সঙ্গে, অনুভূতির সঙ্গে যুক্তি, ভোগের সঙ্গে ত্যাগ। তারা যেমন ভাববিলাসী তেমনি আশাবাদী তেমনি কঠোর কর্মব্রতী। এঁদের চলনে বলনে এঁদের কাজেকর্মে ধ্যানে চেতনায় জীবনের প্রতিটি পর্বে এই সর্বতোভদ্র ছন্দ

প্রতিফলিত হত। জীবন এদের কাছে নিরর্থক নয়, সুখ-দুঃখে সম্পদে বিপদে সার্থক পরিক্রমা। বর্জন নয় অর্জন। নিজেদের ব্যষ্টির জীবনে তারই সাধনে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন, জাতির জীবনযজ্ঞে সেই সমিধ জ্বালিয়ে পূর্ণ আহুতির আয়োজন করেছেন। বিধানচন্দ্র ছিলেন সেই বড় সর্বমুখী বাঙ্গালীর দিগবিজয়ী প্রতিভার শেষ স্ফুলিঙ্গ—যে বাঙ্গালী বাঙ্গলার ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে চলেছে ভারত পথ পথিক হয়ে, বিশ্বজনের সাথী—ধীমান, বীতপাল, অশ্বঘোষ, দীপঙ্কর অতীশের, জীবকের স্বগোত্র তারা পারমিতাকে যে যোগিনীচক্রের মূলাধার থেকে সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বরোবদুরে আংকরে ভাষায় ভাষায় যে গিট বেঁধেছে—বদরিকা থেকে কুমারিকা যে ছুটেছে, চলেছে সাগরপারে শৈলশিরে। রামমোহন, কেশব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, অরবিন্দ, দেশবন্ধু, সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ সকলেই অল্পবিস্তর এরই প্রতীক। বিধানচন্দ্রও সেই ঐতিহ্যে লালিত—সহধর্মী, সমমর্মী স্পর্শ-কাতর তাঁর মন। তাইতো তাঁকে আমরা বলি—The last of the Romans, the last of the Mohicans. তিনি ছিলেন বাঙ্গালী মনের শেষ প্রত্যাশা। পরমহংসদেবের কথায় গত পনেরো বছর ধরে তাঁরই হাতে আমরা বকলমা (power of attorney) দিয়ে রেখেছি। তিনিও কাজ করে গেছেন নিস্পৃহ হয়ে, ফলাকাঙ্খী না হয়ে। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম।" সেই আশ্রয় যখন খসে যায়—পায়ের নীচের মাটি যখন ধ্বসে, উদার আকাশ সরে যায় তখন শোক-বিহ্বল ত আমরা হবই, কিন্তু তখনই প্রশ্ন জাগা উচিত—ততঃ কিম্ এর উত্তর দিয়েছেন একজন বিদেশী—সেটি তুলে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করি—

The problem of the Bengali people is as peculiar as is challenging. It has a historic background born of twisted and tortured developments since the world war and it has the deeper anguish of a sensitive and emotionally volatile community which has preferred the pursuits of art and culture to the temptations of commerce and industry. "What Bengal thinks to-day the rest of India thinks to-morrow" was the crescendo of Bengal's great renaissance. Now, other parts of India have advanced which should be a tribute to the pioneering role of Bengal in the national upsurge. But the Bengali believes that he is stagnating under a conspiracy of circumstances over which he has no control. The sense of frustration is only heightened by the feeling that the galaxy of Bengal's giants who dazzled the entire nation is almost over……To this situation of melodrama and explosive pathos Dr. Roy has administered a healing touch whose effects will become clear with the passage of time. As the lone giant of Bengal's passing generation, he maintains the emotional bridge as 'Bharatratna'. His hard work is an example for every Bengali who may otherwise be prone to sulk in a corner, his cheer is infectious, his attention to administrative details and his sagacious guidance have bewitched even veterans…and his height remains an inspiring symbol…"

এই আমাদের বিধানচন্দ্র। তাই যখন অকল্যাণের অকরুণ স্পর্শ বাংলাকে মথিত খণ্ডিত করে দিল সেই দুর্যোগের দুর্দিনে তাঁর ভগ্ন ম্লান মূক মুখে ভাষা জাগাবার ভার, তাঁর নিরন্নকে অন্ন দেবার প্রচেষ্টা, তাঁর বাস্তুহারাকে আশ্রয়ের আশ্বাস—ভগবানের নিদান রূপে এসে পড়ল বিধানচন্দ্রের উপর—

দিয়েছো আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার

সেই ইতিহাস গত ১৪ বছরের অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস রাইটার্স বিল্ডিংএর ফাইলে ফাইলে কলকাতার পথে পথে বাংলার পল্লীতে গ্রামে, নয়াদিল্লীর উদ্যোগ-ভবন মন্ত্রণাভবন সচিবালয়ে, নেতাদের সঙ্গে পরামর্শে বৈঠকে, ইউরোপ আমেরিকার আলাপে আলোচনায় তা লিপিবদ্ধ আছে। সে শুধু তেল-নুন-লকড়ির পরিচয় নয়, সে শুধু শৌর্যবীর্য আশা আকাঙ্খার প্রতীক নয়, সে শুধু ঘর বাড়ি, ক্যানেল ড্যাম ইলেকট্রিসিটি, নগর-সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়-উদঘাটন, শিল্প উন্নয়ন, পল্লী সংঘটনেই আবদ্ধ নয়—সে একটা বিরাট মানুষের প্রতিদিনের ইতিহাস।

মোর লাগি করিয়ো না শোক
আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

আজ বলতে ইচ্ছে করছে যে তুমি শুধু রাষ্ট্র-প্রধান নও, চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ নও, মহানায়ক নও, আমাদের ঘরের অতিপরিচিত আপন প্রিয়জন, শাঁখ বাজিয়ে তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে তোমাকে বরণ করে ঘরে তোলা যায়—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।

রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে অমর দুটি ছত্র লিখিয়ে এনেছিলেন বিধানচন্দ্র, যার গল্প তিনি বহু বার করেছেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

সে তো তাঁর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সে মহাজীবনই যেন মহাশরণ হয়ে ওঠে, সেই আদর্শ, সেই মঙ্গল চিন্তা, সেই কুশলশীল কর্মপ্রণালী। যেন আমরা বলতে পারি যে মৃত্যুকে আমরা অমৃত করে নিয়েছি—পার্থিব রজঃ মধুমৎ হয়েছে—তোমার আসন শূন্য যেন না থাকে, হে বীর পূর্ণ কর—

যত্তে মরীচি পুবতো মনো জগাম দূরকম।
তত্ত আবর্ত যামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে

আত্মা তোমার যে সুদূরপ্রসারিত কিরণমালার পথে চলে গিয়েছে তাকে আমরা পুনরাবাহন করি—সে আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্
তত্ত আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে

তোমার যে আত্মা সুদূর নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাবাহন করি। এহি, এহি দক্ষিণেভিঃ পথিভিঃ,—আমাদের সব কিছু মঙ্গল কাজে, চিন্তায় ধ্যানে গানে চেতনায় তুমি এসো, আমাদের আত্মবিনাশমত্ততার প্রতিষেধক হয়ে এসো, বাংলার জল, বাংলার মাটি, পূর্ণ হোক্ পুণ্য হোক—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিক্।

মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামি ইতি ভাষসে
ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ইতি নেক্ষসে

মরজীবন থেকে মহাজীবনে যাবার এই তো মন্ত্র।

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি তবু অনন্ত তবু আনন্দ জাগে।

অসিতপর্ণা

সন্তোষকুমার অধিকারী

আমার আকাশ দুলছে অন্ধকারে
অথচ দু-চোখে কাঁপলো আলোর ঝর্ণা;
আঁধারপুঞ্জে দাঁড়ালে অসিতপর্ণা,
এ' সৌভাগ্য শোনাই বলো ত' কারে?

আকাশ সুদূর মেঘ জল হ'য়ে ঝরে
দিগন্তে নামে বিপুল স্তব্ধ অমা,
হতাশার ঝড়ে বাঁচার পাইনি ক্ষমা,
নিঃশ্বাসে গ্লানি, বুকের রক্ত ক্ষরে।

অথচ তোমার হাসিতে স্নিগ্ধ সুর
আশ্বাসে আর জীবনের প্রত্যয়ে;
এ' আশ্চর্য মিছে যদি হয়—ভয়ে
চকিত; জানো ত' আশা বড় ভঙ্গুর।

আমি জেনে গেছি ব্যর্থতা; সংশয়
পরুষ স্পর্শে আমায় করেছে বন্ধ্যা;
অথচ আমার দুঃখকে দিতে জয়
শ্রাবণ রাত্রে এলো কি রজনীগন্ধা!!
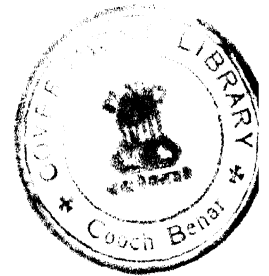
সাতটি হয়ে তবে বন্ধ হোল। শেষেরটি ছ' বছরের। বয়েস আর কতই বা। এই তো সবে তেত্রিশ। বিয়ে হয়ে ইস্তক ছেলেমেয়েদের হাপাজত আর রান্নাঘরের রাঁধুনীগিরি। আর কি করতে পেরেছে দীপা?

বিভাস নিজের স্বার্থটি বোঝে ষোল আনা। সকালে চা চাই, চান করতে যাবার আগে আরেকবার চা চাই। উনুনে ডাল ফুটুক, ভাত ফুটুক, কিছু শুনবে না বিভাস। বলা মাত্র তার চা চাই। মাঝে মাঝে মুখ না করে পারে

দীপা। অত কিসের! বাবুর আরামজ্ঞানটুকু আছে পুরো, দীপা সকাল থেকে খাটতে খাটতে মুখে রক্ত উঠলেই বা কি আসে যায়।

—জিজ্ঞেস করেছিলে একবার একটু জল খেয়েচি কিনা?

ভাতের ফ্যান গালতে গালতে বলে দীপা।

বিভাস হাসে।—সবই তো তোমার। যা হোক নিয়ে খেলেই তো পারো!

ওই এক কথা! গা জলে যায় দীপার। সব চেয়ে বেশী গা জলে ওই হাসি দেখলে। যাই বলো না কেন, ঠিক হেসে উড়িয়ে দেবে, আশ্চর্য মানুষ!

একদিন তো মেয়েকে দিয়ে বলে পাঠালে—বলগে যা তোর বাবাকে, ডাল না নাবলে চা হবে না। দিনের ভেতর হাজার বার চা খেতে হলে একটা রেস্টুরেণ্ট খুলে বসুক গে'।

—কি গো, অপিস থেকে এসে একটু চা পাবো না?

খুব গম্ভীর মুখ করে বলে দীপা,—না। একটু পরে পাবে।

—ডালটা নামিয়ে একটু জল গরম করলেই হয়।

—পারব না। আমি তোমার মাইনে-করা রাঁধুনী নই যে যা হুকুম করবে, তাই করতে হবে।

বিভাসও মুখটা গম্ভীর করে বলে—বেশ।

বলে ওপরে উঠে আসে।

দীপা বোঝে বিভাস একটু চটেছে। চটুক, একটু চটলেও ওর শাস্তি। বিভাস এত হাসবে কেন? এত শান্তিতে থাকবে কেন? যত অশান্তি কি তার একার? আজ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তবু।

তাড়াতাড়ি ডালের কড়া নামিয়ে কেটলির জল গরম করে চা তৈরী করে মেয়েকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেয় দীপা। ভাবে বেশী যদি রেগে থাকে তবে কাপটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে দেবে। তার চেয়ে যদি কম রেগে থাকে তবে চা খাবে না।

আবার দীপার গিয়ে সাধাসাধি করতে হবে। বাবুর রাগ ভাঙাতে হবে। বলতে হবে, বেশ বাপু, তোমার চা করে তবে আমার সব কাজ। হোল তো!

ভাবতে ভাবতে বেশ একটু খুশিও হয়ে ওঠে দীপা। রাগারাগি, মান-অভিমান, মন্দ কি? তবু তো বুঝবে সে ওকে রাগাতেও পারে, কাঁদাতেও পারে। হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেয়ে অনেক ভাল। হেসে উড়িয়ে দেয়া মানে গ্রাহ্যির মধ্যে না আনা। সেটা সহ্য করা যায় না।

মেয়ে নীচে নেমে এলো।

দীপা কড়াইয়ে তেল ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস কোরল, —কিরে, চা খেয়েছে তোর বাবা?

—হ্যাঁ, খাচ্ছে তো। হেসে বললে, দেখলি চা হোল কিনা?

মুহূর্তে দীপার মুখটা শুকিয়ে গেল। কড়ার তেলের ফেনা মরে ধোঁয়া উঠছে। কালজিরে হাতে নিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কড়ায় কালজিরে ছেড়ে দিলো। একটু নেড়ে চেড়ে ডালটা ঢেলে দিলো দীপা। দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিতে ভুল হয়ে গেল।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না দীপা।

ক্লাস টেন অব্দি পড়েছিলো দীপা। বয়েস তখন সবে সতেরোয় পড়েছে। বাবা মা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলে। দীপা তখনই একবার মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলো, বিয়ে হলে আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হবে না।

বাবা শুনে যদি বা একটু পিছিয়েছিলেন, মা রেগে বললেন,—কেন হবে না শুনি? বিয়ের পর কি কেউ পাশ করে না? তাছাড়া এমন ছেলে পাবে কোথায়। গবর্ণমেণ্টের চাকুরে। অতএব বিয়ে হোল। গভর্ণমেণ্টের চাকুরে বলে মা যে প্রতিটি পড়শীর কাছে গর্ব করেছিলেন, সে গর্বের কথা ভাবলে আজ হাসি পায় দীপার। টেলিফোন অপিসের কেরাণী। মাস কাবারের এক হপ্তা আগে টাকা ফুরিয়ে যায়। তবু যদি একটু সাবধান হোত বিভাস—তবে এমন শোচনীয় অবস্থা হোত না।

বিভাস মোটে সাবধান নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার যখন আর আটমাস বাকী, খোকন পেটে এলো। তারপর একবছর দুবছর অন্তর ছেলে আর মেয়ে। চার ছেলে তিন মেয়ে। তেত্রিশ বছর বয়েস অব্দি সখ-আহ্লাদ কিই বা মিটেছে দীপার। আঁতুড় ঘর আর রান্নাঘর। সখ কি আর ওর ছিল না? ম্যাট্রিক পাশ

করবে, কলেজে পড়বে, সাজবে, গুজবে, বেড়াবে। কই কিছুই তো হোল না?

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে এখন। পুরুষজাতই স্বার্থপর। দিব্যি হাসছেন, খেলছেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছেন, আদর্শ জননী হবার উপদেশ দিচ্ছেন। মাসকাবারে টাকা কটি হাতে তুলে দিয়ে খালাস। কর্তব্য শেষ হয়ে গেল তার।

আর দীপার? কি করে সংসার চলবে, কত বাজার করবে, ছোট ছেলেটার আমাসা সারবে কিসে, বড় ছেলেকে একটু ঘি খাওয়ান যায় কিনা, ঠিকে ঝি-টা আবার চারদিন কামাই করছে। ঝামেলার আর অন্ত নেই!

রাত বারোটায় যখন ওপরে ওঠে আসে দীপা, তখন বিভাসের সঙ্গে কথা বলবার শক্তিও থাকে না, ইচ্ছেও থাকে না। আর কথা বলবেই বা কার সঙ্গে। বিভাস তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এমনি করেই তো ষোলটা বছর কেটে গেল। রূপ বলতে কি আর কিছু আছে, না স্বাস্থ্য বলতে কিছু আছে? বলতে নেই—বিয়ের সময় দীপা রীতিমত রূপসীই ছিল, তার ওপর ছিল যৌবন। সবাই বলতো হাসলে নাকি ওকে এত সুন্দর দেখাত! এখনও হয়তো সে রূপের কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু হাসি আর নেই।

এই সেদিন বহুকাল পরে একবার হাসল দীপা। নিশ্চয়ই ওকে বহুদিন পরে খুব সুন্দর দেখিয়েছিলো, তা যদি না হবে, তবে অমন হাবার মত তাকিয়ে রইলো কেন লোকটা। সামনের বাড়ির শরদিন্দুবাবু। শোনা যায় ভদ্রলোক নাকি সাহিত্যিক। বই-টই লেখেন, দীপা অবশ্য একটি বইও পড়েনি। বই পড়বার সময় কোথায় ওর? সব কথাই শোনা। বোনের বাড়ি আছেন ভদ্রলোক। স্ত্রী নাকি মারা গেছে বছর পাঁচেক হোল। ছেলেপুলে নেই একটিও। একটু কষ্ট লাগে দীপার। একটা মেয়েও যদি থাকত, লোকটা এমন করুণ হয়ে উঠতো না ওর কাছে। লোকটার তাকানিটা ভারী করুণ। দেখলে মায়া লাগে।

শরদিন্দু বোস। অনেকগুলো বই লিখেছে। বইয়ের নাম দীপা জানে না। তা হোক তবু বই যারা লেখে তাদের সম্বন্ধে ভারী একটা কৌতূহল আছে, শুধু ওর কেন অনেকেরই। শরদিন্দু বোসকে একটু অন্য রকমের মানুষ মনে হয়, মনে হওয়াটা বিচিত্র কি?

কিন্তু ও হাসল কেন? হাসল লোকটার ড্যাবড্যাবে তাকানি দেখে। মরণ! সাত ছেলের মায়ের দিকে তাকাচ্ছে দেখো! দীপার কি সেই বয়েস আছে, না সেই মন আছে?

কোন কালে হয়তো ছিল, কিন্তু সে মন পরিণত হতে না হতে, পুরুষ সম্পর্কে কৌতূহল জমে উঠতে না উঠতে বিভাসকে কাছে পেয়েছে ও। আর তারপর পেয়েছে বছরের পর বছর সন্তান। এমনি সে সব যৌবনের নানা রঙের ভাব-সাবগুলো কোনদিনই স্পষ্ট হতে পারেনি ওর মনে। স্পষ্ট হবার আর বোধ করি দরকারও নেই।

তবু—।

তবু দীপার হাসি পায়। শুধু কি এই ভেবে যে ভদ্দরলোকের আক্কেলের বলিহারী। সাতটি সন্তানের মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দ্যাখো? হয়তো তাই-ই হবে।

তবু—।

তবু দীপার একটু কৌতূহল জাগে লোকটা কি এত বড় বোকামী করবে? শুনি তো লোকটা চিন্তাশীল, ভাবুক, তার এমন একটা ভুল অকস্মাৎ হবে কেন?

তবে তার ভেতরে ভাল লাগবার মত কিছু রূপের সন্ধান পেয়েছে লোকটা?

ছি, ছি, এ সব কি ভাবছে ও? বারান্দা থেকে ঘরে চলে আসে দীপা। ছেলেদের স্কুল থেকে আসবার সময় হয়েছে। আজ রুটি তরকারি করবার সময় ও পায়নি। চিড়ে কিনিয়ে আনাতে হবে, আর দই, ভুটি ভুটি মেখে মেখে দিতে হবে ওদের।

ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামবার সময় আর একবার দীপার চোখ পড়ে সামনের জানলার দিকে। ঠিক তাকিয়ে রয়েছে। একটু যেন হাসছে।

মরণ আর কি!

তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে দীপা। আর তাকায় না।

চিঁড়ে দই আনতে দেয় ঝিকে। বাটিগুলো নামাতে নামাতে ও না ভেবে পারে না শরদিন্দুবাবুর চেহারাটি কিন্তু ভারী সুন্দর। থোপা থোপা কোঁকড়া চুল। আজানুর

না বোধ হয় কখনো। পাতলা একটা গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়েছিলো। ধবধবে পরিষ্কার চওড়া বুকখানা। চোখ দুটি বড় বড়, একটু অন্যমনস্ক, হঠাৎ দেখলে একটু বোকা বোকা মনে হয়।

এ পাড়ায় অবশ্য ভদ্রলোকের চেহারার সুখ্যাতি আছে।

সেদিনও শিবুর মা বলছিলো—অমন সুন্দর চেহারা। দেখলে তো ছাব্বিশ সাতাশ বছর মনে হয়। আর একবার বিয়ে করলেই পারে?

কথাটা ন্যায্য। আর একটি বিয়ে করাই উচিত ভদ্রলোকের। ভদ্রলোককে বর পেলে এখনো যে কোন মেয়ে বর্তে যায়। সে নিজেও কি—।

ছি, ছি, এসব কি আবোল-তাবোল ভাবছে দীপা।

ঝি চিঁড়ে দই নিয়ে এসেছে। নাও বাপু, বাসন ক'খানা বার করে ফ্যালো। বাসন মাজতে মাজতে সন্ধ্যে করে বোস না।

ছেলেরা এসে পড়লো বলে। দীপা রাত্রের কুটনো কুটতে বসে।

সন্ধ্যে নাগাদ বিভাস এসে জামাটা ছেড়েছে। দীপা চায়ের কাপটা নিয়ে ওপরে এলো। জামাটা মুখের কাছে লাগতেই ভাঁপসা ঘামের গন্ধে সরে গেল দীপা।

—জামাটায় কি বিচ্ছিরি গন্ধ হয়েছে, একটু সেণ্ট লাগালেই তো পারো?

—সেণ্ট! বিভাস ভ্রূ একটু কুঁচকে তাকায়।

দীপার চোখে পড়ে গেঞ্জিটা বগলের দুদিকে ছিঁড়ে গেছে। ঘামে জবজবে।

—একটা গেঞ্জিও কি কিনতে পারো না?

বিভাস একটু বিরক্ত হয়ে তাকায়।

দীপা কথাটা বলে ফেলেই একটু লজ্জা পায়। কথাটা বলবার সময় ওর চোখের সামনে ছিল আর একজনের পরিষ্কার পাতলা গেঞ্জিপরা চওড়া বুক।

একটু হেসে বলে দীপা,—গেঞ্জিটা কাল লুকিয়ে নিয়ে আমি ঘরের ন্যাতা করে নোব। দেখো, তবে তুমি জব্দ হবে।

বিভাস একটু অবাক হয়, একটু বিরক্ত হয়—কি ভ্যান ভ্যান কোরছ, গেঞ্জি কেনবার টাকা কোথায়? জেনেশুনে আবার ন্যাকামো আরম্ভ করলে কেন?

মেঝের ওপর বসে পড়ে বিভাস।

এই কথার এই উত্তর! রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দীপা।

—চা রইলো। বলে চা নামিয়ে রেখে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

রান্নাঘরে এসে কিন্তু রাগ হয় না দীপার! রাগ হবার মুখেই একটা সহানুভূতির ভাব আসে মনে। আহা, অপিস থেকে খেটেখুটে এসেছে, এখনই এ ভাবে কথাগুলো না বললে হোত। অপিসে মাঝে মাঝে সায়েবের কাছে বকুনি খেলে মেজাজটা ওর ভাল থাকে না। সায়েবটারও বলিহারী! যত রাগ ওর ওপর। ভালমানুষের ওপরই অত্যাচার বেশী হয় কি না? বিভাস যে মানুষটি ভাল এ কথা তো দীপার চেয়ে বেশী কেউ জানে না? তবু যদি সাদা চামড়া হোত। এ আবার দিশী সায়েব। এদের নাকি ইংরিজি গালাগালের বহরটা আরও বেশী। বিভাসের মুখেই শুনেছে দীপা।

যাক গে, বিভাসকে কথাগুলো বলে ভাল করেনি দীপা। রাত্তিরে একটু গল্পসল্প করে ওকে খুশি করতে হবে।

রাত্রে শুতে এসে দেখে বিভাস বালিশটা বিছানা থেকে টেনে নিয়ে মাটিতে শুয়েছে। রাগ হয়েছে বাবুর। মনে মনে হাসল দীপা।

ঘরের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল শরদিন্দুবাবু তখনো লিখছেন। অনেক রাত অব্দি উনি লেখেন। কোঁকড়া চুলগুলো কপালের ওপর পড়েছে। একমনে লিখে চলেছেন।

দেখছিলো দীপা! বেশ তন্ময় হয়ে দেখছিলো। এর আগেও দেখেছে, কিন্তু আজকের দেখার ভেতর তন্ময়তা ছিল বেশী।

হঠাৎ মুখ তুললেন শরদিন্দুবাবু। সরাসরি এই জানালার দিকেই তাকালেন।

ছি, ছি, দীপা সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো জানলার ধার থেকে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক দেখে ফেলেছে। কি লজ্জা!

বিভাসের মুখখানা মেজের ওপর থুবড়ে পড়েছে। বিভাস কি ঘুমোচ্ছে! এত ঘুমোচ্ছে?

আস্তে আস্তে বিভাসের গায়ে ধাক্কা দিলো দীপা—শুনছো !

বিভাস মুখটা তেমনি অর্ধেকটা মেঝের ওপর রেখেই বললো,—বলো।

খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠে দীপা,—ওমা গো ! ঘুমোয় নি এখনো ?

তারপর পিঠে একটা হাত রেখে বলে,—মেজেয় কেন, বিছনায় চলো।

বিভাস তেমনি চোখ বুজেই বলে,—গরম লাগছে।

—এ্যাদ্দিন গরম লাগল না, আজ বুঝি গরম লাগছে। নাও ওঠো।

বিভাস আর কোন কথা না বলে বিছানায় উঠে এসে শুয়ে পড়ে।

পাশের ঘরে বড় ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে। কচি দুটোকে নিয়ে দীপা শোয়। আলাদা শোয় না। বরাবরই বিভাসের পাশে শোয়। ওর নিজের ইচ্ছে না থাকলেও এটা বিভাসের ইচ্ছে। বিভাসের ইচ্ছে ভয়ে অমান্য করতে পারে না দীপা।

আজ কিন্তু ও নিজেই বিভাসের পাশে শোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেশ ভাল লাগছে ওর পাশে শুতে। তা ছাড়া বিভাস একটু রাগও করেছে, তাই শোয়া দরকার।

ছেলেমেয়েদের ঘরের আলো নিভিয়ে দোরটা বন্ধ করে দেয় দীপা। তারপর আলোটি নিভিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে।

বিভাসের দিক থেকে বিশেষ সাড়া নেই।

অগত্যা দীপাকেই বলতে হয়,—শুনছো। আবার ঘুমোলে নাকি ?

—না। বলো।

—আজ বুঝি আবার সাহেব গালাগালি করেছে ?

—না।

—তোমাদের ওই সায়েবটা ভারী পাজী। হ্যাঁ গো লোকটা দেখতেও কি খুব ভাল ? পাজী লোকগুলো কিন্তু দেখতে খুব ভাল হয়।

—কার কথা বোলছ ? বোস সায়েব ?

—হ্যাঁ, সেই বদ লোকটা।

—দেখতে খুব ভাল। ধোপ দুরস্ত।

খুক খুক করে হাসে দীপা,—ছ্যাখো, ঠিক বলেছি। পাজী লোকগুলো দেখতে খুব ভাল হয়।

—তা হবে।

—তা হবে নয়। এই ছ্যাখো না ও বাড়ির শরদিন্দু বাবু। দেখতে কেমন সুন্দর, কিন্তু নিশ্চয়ই লোকটা পাজী।

বিভাস নড়ে শোয়।—তুমি কি করে জানলে লোকটা পাজী ? কত বড় সাহিত্যিক উনি, তুমি জানো ?

—সাহিত্যিক-ফাহিত্যিক জানিনা বাবু। বৌ মরেছে আবার বিয়ে করলেই হয়। নিশ্চয় লোকটা খারাপ। ও ভাল হতে পারে না।

বলতে বলতে শরদিন্দুবাবুর ভাসা ভাসা চাউনিটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। থোপা থোপা কোঁকড়া চুল। ধবধবে চওড়া বুক।

বিভাসের গায়ে হাত রাখে দীপা,—যাই বলো, ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু লোকটা।

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলে বিভাস,—খুব পছন্দ হয়েছে।

চট করে হাতটা সরিয়ে নেয় দীপা,—তার মানে ?

—তার মানে লোকটা দেখতে সুন্দর, অথচ তুমি নিশ্চয় জানো পাজী।

দীপার শরীরটা কেঁপে ওঠে, ভয়ে না রাগে ?

ওকি ভয় পেয়েছে ? ওর কথায় কি কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। হতে পারে না। বিভাসের মন নোংরা, মন নীচু, তাই সে কুৎসিৎ একটা ইঙ্গিত করতে একটুও দ্বিধা কোরল না।

রাগে ফুলে উঠে দীপা বললো,—তুমি কি বলতে চাও ?

—কিছুই বলতে চাই না। তুমিই তো আগা গোড়া নানা কথা বলতে চাইছ।

—একটা লোক দেখতে সুন্দর হলে তাকে কুচ্ছিৎ বলতে হবে ? কি নীচ তোমার মন ?

বিভাস কথা বলে না। চুপ করে শুয়ে থাকে।

দীপার ভেতর থেকে একটা বমি-বমি ভাব আসে।

ছি, ছি, বিভাসের মত একটা নোংরা লোকের সঙ্গে তাকে এতকাল ঘর করতে হচ্ছে। কি ছোট মন বিভাসের ? তার মত এমন নরম মেয়ে পেয়েছিলো বলে এতকাল অত্যেচার করেছে। তাই বলে যা নয় তাই বলবে ? সব কিছুরই একটা সীমা আছে !

হঠাৎ বিভাস চিবিয়ে চিবিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলে,—শরদিন্দুবাবুও কাল আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো।

দীপা চাপা তর্জন করে বলে,—চুপ করো, তোমার সঙ্গে

কথা বলতেও ঘেন্না হয়। আমার তোমার মত ছোট মন নয়। মনে এক মুখে এক করতে আজও শিখিনি।

সত্যিই কি তাই? দীপা কি মনে এক মুখে এক করতে শেখেনি? আজকের সব মনের কথাই কি বিভাসের সামনে ও মুখে আনতে পেরেছে?

দীপা কি ওর মনকেই পুরো অস্বীকার করে বসছে না? দীপা ঘেমে ওঠে।

বিভাস হঠাৎ পাশ ফিরলো। না, দীপাকে কথাগুলো বলা তার উচিত হয়নি। দীপা তো তাকে ছাড়া জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ চিন্তাও করে না। তবু কেন যে ও কথাগুলো বলে বসলো। কি জানি কেন ও দীপার মুখে অন্য পুরুষ সুন্দর শুনলে সহ্য করতে পারে না! এটা যে তার খুব অন্যায়—অস্বীকার করবে কি করে?

বিভাস দীপাকে জড়িয়ে ধরে।

দীপার রাগ ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ও বিভাসের কাছ থেকে এতক্ষণ এইটেই চাইছিলো।

একটি মালার কাহিনী

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মালা কিনতে ঢুকলুম হাতিবাগান বাজারে,
সস্তাও হবে আর তাতে থাকবে অনুরাগের
বাড়তি ছোঁয়া,
আমাদের পাড়ার দোকানের মালা!
চেনা দোকানী,
তারই মুখে শুনলুম দেখা করতে পারবে না তুমি আজ,
বন্ধুদের কাছে তাই ক্ষমা চেয়ে
বিজ্ঞপ্তি দিয়েছ তোমার দরজায়।

অসুখ অনেকেরই করে, তোমারও করেছে।
সকালের কাগজে পড়লুম ভালো আছো তুমি;
আশা করেছিলুম হয়তো বা দেখা হবে,
একটু হাসি, দুটো কথা, শিশুদের মহান প্রসাদ
ধন্য করবে আমাদের।
দোকানী বললে একটু আগেই সে ফিরেছে ওধার দিয়ে,
দেখা আজ একেবারেই হবে না,
শরীর নাকি তোমার দেখা দেবার মত নয়।

মনটা দমে গেল, ভাবলুম থাক্‌গে
মালা কিনে আর কাজ নেই,
হাতে তুলে না দিতে পারলে কি হবে বয়ে নিয়ে গিয়ে।
পরক্ষণেই কিন্তু মত পালটালো।
অনেক দিনের সংকল্প, যাই না হয় একবার,
বিনিময় না হোক, প্রীতি নিবেদন তো হবে।
আমাদের একান্ত ভালবাসার ধন তুমি,
মহান নেতা আমাদের,
তোমার জন্মদিনে অসুস্থ তোমাকে কাছে পাবনা ব'লে
পৌঁছে দেবনা আমাদের প্রীতি-উপহার,
তাও কি হয়!
অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল একাজে সেকাজে,
ফিরে এসে তারপর স্নানাহার।

দোকানীকে বললুম, দাও ভাই একটু ভাল দেখে
কম দামের একটি মালা।
দোকানী আমাদেরই লোক, তোমাকেও ভালবাসে,
চেনা বলেই বোধহয় বেশ মালাটি দিলে,
ভুর ভুর করছে টাটকা বেলফুলের সৌরভ।

খুসি মনে ট্রামে উঠলুম। দেখা না হ'লেও
এ মালা পেলে আনন্দ হবে তোমার,
কি চমৎকার এর গন্ধ!
নিজের নাম লেখা কার্ড সেফটিপিন দিয়ে
এঁটে দিলুম মালাটির সঙ্গে,
দেখা যদি নাও হয়, জানতে পারবে কোন ভক্ত দিয়েছে।

ট্রাম চললো। জানলার ধারে একটি সিটে বসে
মন চললো তারি সঙ্গে।
তবু তুমি আছ ব'লে
পর্বতের আড়ালে আছি আমরা,
নইলে যা আমাদের অদৃষ্ট!
খান্ খান্ হয়ে গেল সোনার দেশ,
আর লক্ষ লক্ষ মানুষের সোনার সংসার।
তোমার দিগন্ত-বিস্তারী উদার চোখের আলোয়
গভীর রাত্রির মধ্যেও আরক্তিম উষার স্পন্দন;
তুমি দিয়েছ নূতন বাংলা গড়বার মহান প্রতিশ্রুতি!
তোমায় ভালবাসি, তোমার আশায় আশ্বস্ত আমরা,
তোমার নেতৃত্বে চালিত আমাদের কত স্বপ্ন, কত সাধ:
—সেই তোমারই আজ আবার অসুখ করলো!
বয়স কত তোমার, বাঙ্গালীর গড়পড়তা পরমায়ু কত,
এসব আমাদের ভাববার কথা নয়।
আমরা তোমাকে ভালবাসি,
আমাদের সমহৃদয় বন্ধু তুমি,
তোমার জন্মদিনে আমরা যখন সুস্থ আছি,

তুমি কেন অসুস্থ হ'লে!

ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে বউবাজার ষ্ট্রীট পার হলো ট্রাম,
হঠাৎ নির্মল চন্দ্রের বাড়ীর সামনে দেখি
দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ুচ্ছে একদল ছেলে,
বেশ কিছু লোক হন্ হন্ করে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে;
ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি জানতে দেরী হ'ল না,
ট্রামে বসেই শুনলুম : তপ্ত গলিত সীসের মত
কানে ঢুকলো খবরটা,
চোখের সামনে এক মুহূর্তে সারা জগৎ অন্ধকার হয়ে গেলো।
সম্বিৎ ফিরলো, হাতের মালাটি আল্‌গা হয়ে পড়ে
যাচ্ছে মাটিতে;
হায়রে! এ মালা নেবার জন্য তুমি আর আমাদের
কাছে আসবে না!

সব লোক যাচ্ছে তোমার বাড়ীর দিকে, বাড়ীর মধ্যে,
সেদিকে যেতে পা আর উঠলো না আমার।
হাতে যে আমার চমৎকার বেলফুলের মালা,
পাড়ার চেনা দোকানী আমাদের দুজনকেই ভালবেসে
সস্তায় দিয়েছে,
তোমার জন্মদিনের প্রীতি-উপহার।

ডান দিকে তোমার বাড়ী, বাঁ দিকে সরকারী বাগান,
বাড়ীর মধ্যে জমাট কান্নার চাপে
বাতাস তো ঢুকতে পারছে না,
মনে হ'ল ওখানে আমার দম আটকে যাবে।
বাগানের নিরিবিলি একটা কোণে গাছের আড়ালে
গিয়ে বসি,
মালাটিকে মেলে দিই কোলের উপর।

এলোমেলো কত কি যে মনে আসে ঠিকঠিকানা নেই,
একটু একটু করে ভিড় বাড়ে,
রাস্তা ভ'রে যায় হাজার লক্ষ লোকে,
পুলিসের গাড়ী আসে, আসে বিশ্বনাথ সেবাসমিতির
জলের গাড়ী,
জনতার কলরবও ক্রমেই বাড়তে থাকে,
কবির ভাষায় বলতে গেলে 'পরাজয়ের জয়োল্লাস'
সুরু হয়ে যায়।

বহুক্ষণ কেটে যায় এমনি করে,
আবার কোন রকমে তোমার বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই।
ওপরের বারান্দায় মন্ত্রী কবির সাহেব, তার পাশে গোপালদা,
তার পাশে সুধীর, তার পাশে আরও অনেকে।
আমার হাতের মালার দিকে হয়তো সুধীরের চোখ পড়ে
শবাধারে মাল্য-অর্পণ করতে এসেছি ভেবে
হাতছানি দেয়, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দরজার দিক,
আহ্বান জানায় ভিতরে যাবার,
শেষ দেখা দেখতে আমাদের প্রিয়তম নেতাকে।

সমুদ্রে ঢেউ জাগে, জনতা উচ্ছ্বসিত হয়,
ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হয়ে যায় কে যেন;
একটা অর্ধমৃত ছেলেকে হাত ধরে টেনে তোলে
পুলিস-গাড়ীর ড্রাইভার,
ছেলেটি পায়ের জুতো হারিয়েছে, গায়ের জামা খণ্ডবিখণ্ড।
—জায়গা নেই, তবু সে ঢুকবেই তোমার বাড়ী,
দেখবে তোমাকে,
শক্তিমান উৎসাহীদের চাপে দুর্বল ছেলেটি
হারিয়েছে তার জামাজুতো।

আবার ওপর দিকে চোখ যায়, আবার হাতছানি
দেয় সুধীর,
চারিদিকে উদ্বেলিত সমুদ্র চঞ্চল হয়ে ওঠে।
পরম স্নেহভরে তাকাই আমার মালাটির দিকে,
এ মালার গন্ধ এখন ক্ষীয়মান, ম্লান হয়ে আসছে
এর অনুপম রূপ;
মনে হ'ল দুঃসহ ধৈর্যে এ যেন অপেক্ষা করছে
অনিবার্য মৃত্যুর জন্য।

ব্যাকুল হয়ে উঠি নিমিষের মধ্যে,
ওপরের ঘরে এখনও তুমি আছো,
আমার হাতে রয়েছে ভালবাসার প্রীতি-উপহার,
সে উপহার তোমাকেই দেবার, তোমার শবাধারে
দেবার জন্য নয়।

এ তোমার জন্মদিনের মালা,
মৃত্যুদিনের বেদনার সঙ্গে
একে জড়াতে মনতো চায় না!

যত্ন করে আল্‌তো বুকে তুলে নিই ম্লান মালাগাছি,
অতি সাবধানে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসি ভিড় ঠেলে।
উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছিলুম,
এবার ফিরি দক্ষিণ থেকে উত্তরে,
—ওয়েলিংটন থেকে শ্যামপুকুর।
অপরাহ্ণের পড়ন্ত রৌদ্র তীরের মত বিঁধছে,
তার আক্রমণ থেকে দু-হাতের আড়ালে
মালাটিকে বাঁচিয়ে চলি।

আমি মালা হাতে ফিরি দক্ষিণ থেকে উত্তরে,
ভাঙা মন, অবুঝ চোখ দুটো বারবার ভিজে যায়।
উত্তর থেকে দক্ষিণেও তখন অবিরাম জনস্রোত,
তাদেরও হাতে মালা, তাদেরও চোখ অশ্রুসিক্ত।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সৈন্যব্যূহের কেন্দ্রস্থলের সেনাপতিগণ

কেন্দ্রস্থলে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকে ছিলেন—বিখ্যাত, নিষ্ঠাবান ভ্রাতা (সম্বন্ধে ইনি বাবরের মামাতো ভাই), সৌভাগ্যের প্রিয় সহচর, যাঁর কৃপা সব সময়েই প্রার্থনা করা হয় সেই আল্লার অনুগৃহীত চিন্ তাইমুর সুলতান ; মহান আল্লার সুদৃষ্টি যাঁর উপর নিবদ্ধ, সম্রাটের পুত্রস্থানীয় (এঁর পিতা তাইমুর বংশের এবং বাবরের জ্ঞাতি ভাই। এঁদের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আবু সৈয়দ মির্জ্জা। এঁর বয়স ছিল তেরো বছর এবং সা'বেগমের উত্তরাধিকার সূত্রে বাদারসানের সা') প্রসিদ্ধ সুলেমান সা ; পবিত্রতার ধারক, সৎপথপ্রদর্শক গাজা কামালুদ্দিম দোস্ত-ই-খন্দ ; সুলতানদের বিশ্বাসী, ঘনিষ্ঠ সহচর, সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামাহুদ্দিন ইউনুস-ই-আলি ; রাজকর্ম্মচারীদের স্তম্ভ, অকপট সুহৃদ, ধর্ম্মবিশ্বাসে মহিমান্বিত জালালুদ্দিন দরবেশ-ই মহম্মদ সারবান ; রাজ-কর্ম্মচারীদের আর এক স্তম্ভ, অমাত্য-শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মবিশ্বাসে বলীয়ান—নিজামুদ্দিন দরবেশ-ই-সারবান্ ; রাজকর্ম্মচারীদের আর দুইটি স্তম্ভ—বিশ্বাসী গ্রন্থাগারিক সাহাবুদ্দিন আবদাল্লা ও দ্বারপালদের কর্ত্তা নিজামুদ্দিন দোস্ত।

কেন্দ্রের বাম দিকেও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছিলেন—সাম্রাজ্যের শক্তির উৎস, সম্রাটের মিত্র ও বিশেষ অনুগ্রহভাজন সুলতান বাজুলুস লোদির পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন আলম খাঁ ; মহান সম্রাটের অন্তরঙ্গ মোলভি-শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য জাতির সাহায্যকারী, ইসলাম ধর্ম্মের স্তম্ভ খাওয়াসের সেখ জইন্ (সেল নিজেই নিজের গুণ ব্যাখ্যা করছেন যেন তিনি নিজেকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখছেন। তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে অবশ্য আবুল ফজল এবং বাদায়ুন তাঁদের বিবরণে এই গুণাবলীর সায় দিয়ে গিয়েছেন) ; অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ কামালুদ্দিন মহবুব আলি, রাজ-অনুচরদিগের আর এক বিরাটপুরুষ পরলোকগত কুজ আমেদের ভ্রাতা নিজামুদ্দিন তারদি বেগ ; উপরোক্ত মৃত কুজের পুত্র সের আফ্গান ; মহান ব্যক্তিদের মধ্যেও মহান পরাক্রমশালী আইরিস খাঁ ; মন্ত্রী-শ্রেষ্ঠ খাজা কামালুদ্দিন লুসেনি এবং সম্রাট দরবারের আরও কয়েকজন পার্শ্বচর।

দক্ষিণ বাহুর সেনানায়কগণ

দক্ষিণ বাহুতে আছেন—মাননীয়, ভাগ্যবান, যাঁর দেহে আছে ভাবী সম্রাটত্বের চিহ্ন, খিলাফতের গগনে যিনি সফলতার সূর্য্য, যিনি ক্রীতদাস ও স্বাধীন সবারই প্রশংসিত সম্রাটপুত্র মহম্মদ হুমায়ুন বাহাদুর। এই মহান সম্রাট-পুত্রের ডান দিকে আছেন কাসেম-ই-হুমেনি সুলতান যিনি আভিজাত্যে রাজার মত এবং যিনি অনুগ্রহ-বিতরণকারী সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আর আছেন অভিজাতকুলের স্তম্ভস্বরূপ আমের-ই-ইউসুফ অঘটাকৃচি ; সম্রাটের বিশ্বাসভাজন অমাত্যকুলতিলক জালালুদ্দিন হিন্দ বেগ কছচিন ; সম্রাটের বিশ্বাসী ও আনুগত্যে ত্রুটিহীন জালা-লুদ্দিন খসরু কুকুলদাস ; সম্রাটের আস্থাভাজন—কোয়াযুম বেগ অর্দুসা ; রাজকীয় কর্ম্মচারীদের স্তম্ভ, আন্তরিকতায় কলুষহীন, কোষাধ্যক্ষ ওয়ালি কারা কাজি ; অমাত্যদের মধ্যে আর এক স্তম্ভ সিস্তানের নিজামুদ্দিন পিরকুলি ; সভাসদগণের স্তম্ভ বাদাকসানের খাজা কামালুদ্দিন পালওয়ান, রাজকীয় ভৃত্যদের শীর্ষস্থানীয় আবুল সরকার। অভিজাত-দের স্তম্ভ, অমাত্যদের মধ্যে বিশেষ গুণী, ইরাক দেশ থেকে আগত দূত সুলেমান আবাদ এবং সিস্তানের দূত হুসেন আবাদ।

জয়ের মুকুট যাঁর শিরে সেই অশেষ সৌভাগ্যবান সম্রাট-পুত্রের বামদিকে আছেন মহানকুলোদ্ভব সৈয়দ মুর্ত্তজা আলির বংশধর মির হামা ; আন্তরিকতায়পূর্ণ। অমাত্য-কুলের স্তম্ভ সামসউদ্দিন মহম্মদ কুকুল দাস এবং নিজামুদ্দিন খোরাসুগি আমাদ জানদার।

দক্ষিণ দিকে আছেন—হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, খাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাঁ—দিলওয়ার খাঁ (দৌলত খাঁর পুত্র) এবং অভিজাতদের আর এক স্তম্ভ। সেখেদের মধ্যে সেখ—সেখ গুরান। এঁরা দুইজন তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

বামবাহুর সেনানায়কগণ

ইসলামের সৈন্যবাহিনীর বাম বাহুতে মর্য্যাদাসম্পন্ন অনেকে ছিলেন। যেমন মহান বংশের প্রতিভূ, শক্তিমান-দের আশ্রয় তা'হা' এবং ইয়াসিনের বংশের গৌরব, শ্রেষ্ঠ দেবদূতের (মহম্মদের) বংশধারার আদর্শ সৈয়দ মহর্ষি খাজা; মহিমময়, ভাগ্যবান, সম্রাটের বিশেষসম্মানভাজন ভ্রাতামহম্মদসুলতান মির্জ্জা; রাজ পরিবারের তুল্য মর্য্যাদা-সম্পন্ন মেহেদি সুলতানের পুত্র আদিল সুলতান। সম্রাটের অতিবিশ্বাসী ও আস্থাভাজন অশ্বশালার অধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ; বন্ধুত্বে অকপট, সম্রাটের আস্থাভাজন সামস-উদ্দিন মহম্মদ আলি জং জং; রাজ অমাত্যদের স্তম্ভ আন্তরিকতায় ত্রুটিহীন, জালালুদ্দিন সা হুসেন ইয়ারগি মোগল এবং নিজামুদ্দিন জান্-ই মহম্মদ বেগ আটাকা।

হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে এই বিভাগে ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয়—কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ; অমাত্যশ্রেষ্ঠ ফর্মালের আলি খাঁ সেখ জাদ এবং অভিজাতদের স্তম্ভ বিয়ানার নিজাম খাঁ।

পার্শ্বরক্ষী সৈন্যদল

পার্শ্বরক্ষী দলের দক্ষিণ ভাগ চালনার জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপন বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অতি-বিশ্বাসী তার-দিক্ এবং বাবা কাস্কার ভাই মালিক কাসিম অবস্থান করছিলেন একদল মোগল সৈন্য নিয়ে। এই দলের বাম ভাগ চালনার জন্য একদল নিপুণ সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিশ্বস্ত সর্দার মুমিন আটাকা ও রুস্তম তুর্কমান।

রাজকীয় অনুচরদের অবলম্বন, আনুগত্যে ত্রুটিহীন, সভাসদগণের মধ্যমণি নিজামুদ্দিন সুলতান মহম্মদ বকসি ইসলামের গাজি সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করতে গেলেন। তিনি নানা দিকে সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী ও দূত প্রেরণ করলেন—মহান সুলতান ও আমিরদের নিকট কি ভাবে সম্রাটের আদেশানুযায়ী সৈন্য পরিচালনা করতে হবে। আদেশ ছিল যে সেনানায়কগণ তাদের নিজ নিজ ঘাঁটিতে স্থান গ্রহণ করলে তাঁরা অন্য কোনও আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না এবং আদেশ না পেলে যুদ্ধ করবার জন্য বাহু বিস্তার করবেন না।

যুদ্ধ

উপরোক্ত দিনের এক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদল পরস্পরের অভিমুখে এগিয়ে আসতেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যে ভাবে আলো অন্ধকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তেমনিভাবে দুই দলের কেন্দ্রভাগ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। দক্ষিণ ও বাম বাহুর সৈন্যদের এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল যে সেই যুদ্ধের দাপটে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো এবং আকাশ তুমুল ঝন্ ঝন্ শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল।

হতভাগা বিধর্ম্মী সৈন্যদলের বামবাহু ধর্ম্ম বিশ্বাসে বলীয়ান সৈন্যদের দক্ষিণ বাহুর দিকে অগ্রসর হয়ে খসরু কুকুলদাস ও বাবা কাস্কার ভাই মালিক কাসিমের সৈন্য-দলের ওপর আক্রমণ সুরু করলো। অশেষ মহিমান্বিত, অতি-ন্যায়বান ভ্রাতা চিন্ তাইমুর সুলতান আদেশানুসারে তাদের দলবৃদ্ধি করতে এগিয়ে গেলেন এবং সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে বিধর্ম্মী সৈন্যদের পশ্চাৎভাগে হটিয়ে দিলেন। এই কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হলো।

এ যুগের বিস্ময় গোলন্দাজবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় মুস্তাফা তাঁর দল নিয়ে দক্ষিণ ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছিলেন। সেইখানেই ছিলেন—সম্রাটের গৌরবদীপ্ত পুত্র হুমায়ুন বাহাদুর—যিনি ন্যায়বান এবং সৌভাগ্যশালী। বিশ্বসৃষ্টি-কর্ত্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন, কিছু করা না করার ব্যাপারে যাঁর আদেশ অমোঘ—সেই পরাক্রান্ত সম্রাটের যিনি বিশেষ প্রীতিভাজন।

যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে মহান্ ভ্রাতা কাসিম-ই-হুসেন সুলতান ও রাজ-অনুচরদের স্তম্ভদ্বয় নিজামুদ্দিন আমেদ-ই-ইউসুফ ও কুয়ায়াম বেগ আদেশানুসারে তাদের সাহায্যের জন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হলেন। যেমন দলের পর দল বিধর্ম্মী সৈন্য তাদের দলকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর

হচ্ছিল তেমনি ভাবে আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে সম্রাটের বিশ্বাসভাজন, ধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত হিন্দু-বেগ এবং তাঁর পশ্চাতে অভিজাতদের স্তম্ভ মহম্মদ কুকুলদাস ও খাজাগি আসাদ জান্দার এবং তাঁদের পশ্চাতে দরবারের আস্থাভাজন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরশীল, গোপনীয় কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের প্রধান ইউনুস-ই-আলি ও অভিজাতদের আর এক স্তম্ভ। বন্ধুত্বে যিনি খাটি সা মনসুর বুরলাস এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানীয়, বিশ্বস্ততায় পবিত্র, গ্রন্থাগারিক আবদুল্লা এবং তাঁদের পরে অভিজাতদের অবলম্বন দ্বাররক্ষীদের কর্তা দোস্ত এবং খোজাকারীদের সর্দ্দার খলিলকে পাঠানো হলো।

বিধর্মী সৈন্যদের দক্ষিণবাহু ইসলাম সৈন্যদলের বাম-বাহুর উপর বারংবার উন্মত্তের মত আক্রমণ করতে লাগলো। মুক্তি যাদের করতলগত সেই ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের ওপর তারা ভীষণভাবে আপতিত হলো কিন্তু প্রত্যেকবারই জয়ী যোদ্ধাদের শরবিদ্ধ হয়ে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। তারা ক্রমশঃ চিরমৃত্যুর আবাস নরকে যাওয়ার পথে নামতে লাগলো—যেখানে তাদের আগুনে দগ্ধ হওয়ার জন্য নিক্ষিপ্ত হতে হবে এবং সেই নরকেই হবে তাদের নিরানন্দ নিবাস। কৃষ্ণকায় বিধর্মী-দের সৈন্য ব্যূহের পশ্চাৎভাগে অভিজাতদের মধ্যে বিশ্বাস-ভাজন মুমিন আতাবাদ ও রুস্তম তুর্কমান উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের সাহায্য করবার জন্য সম্রাটের অধীনস্থ ব্যক্তি-গণের মধ্যে যিনি সিংহাসনের নিকটতম সেই আস্থাভাজন সুলতান নিজামুদ্দিন আলি খলিফার কর্ম্মচারী খাজা মামুদ ও আলি আতাকাকে পাঠানো হলো।

মহান ভ্রাতা মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা, রাজমহিমার প্রতিভূ আদিল সুলতান এবং সম্রাটের বিশ্বাসভাজন, ধর্মবিশ্বাসের মাধুর্য্যে মধুর, মহম্মদ আলি জং জং এবং রাজ-অনুচরদের স্তম্ভ সা হোসেন ইয়ারগি মোগল যুদ্ধ করার জন্য নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ খাজা কামালুদ্দিনকে একদল সৈন্যসহ পাঠানো হলো।

প্রত্যেকটি ধর্ম্মযোদ্ধার উৎসাহের সীমা ছিলনা। তারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো এই নীতি বাক্য সপ্রমাণ করতে যে—দুইটি প্রার্থনীয় জিনিষের মধ্যে একটি লাভ হবে—হয় জয় নয় ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু। যদি মৃত্যু হয় তাহলে এ জীবনে ধর্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শনের এই তো সুযোগ—যাতে ধর্ম্মেরই নিশান তুলে ধরা হবে মৃত্যুকে বরণ করে।

সঙ্ঘর্ষ ও যুদ্ধ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হচ্ছে দেখতে পেয়ে এই অলঙ্ঘনীয় আদেশ জারী করা হলো যে—রাজকীয় সৈন্যদল যারা সবাই তুল্য বীর্য্যবান এবং যারা শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কামানবাহী শকটের পশ্চাতে অবস্থান করছে—তারা এগিয়ে এসে গোলন্দাজবাহিনীকে মধ্যবর্ত্তী স্থলে রেখে কেন্দ্রের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ সুরু করুক। যেমন পূর্ব্বাকাশ ভেদ করে ঊষার উদয় হয় তেমনিভাবে শকটগুলির পশ্চাৎভাগ থেকে তাদের আবির্ভাব হলো। ঊষার রক্তিম আলোকচ্ছটা যেমন আকাশের তল থেকে ছিটকিয়ে এসে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ভাবে সেই হতভাগ্য বিধর্ম্মীদের রক্তবর্ণ রুধির ধারা রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লো। এ যুগের বিস্ময় ওস্তাদ আলি কুলি তাঁর কামান নিয়ে কেন্দ্রস্থলের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করছিলেন। সম্মুখস্থ লৌহ নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় হস্তিবাহিনী এবং বর্ম্মপরিহিত বিধর্ম্মীদের ওপর তিনি বৃহদাকারের প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ করে অসীম বীরত্বের কাজ করেছিলেন। তুলাদণ্ডে যদি গোলা-গুলি ওজন করা যায় তা হলে সেই ওজনের চেয়ে তাঁর পুণ্য কর্মের ওজন বেশী হবে। এই গোলাগুলি যদি তলার দিকে প্রশস্ত এবং উচ্চশীর্ষ পাহাড়ের গায়ে নিক্ষেপ করা হতো তা হলে সেই পাহাড়টা পেজাতুলোর মত হয়ে যেতো। মজবুত দুর্গের মত লৌহবর্ম্মপরিহিত বিধর্ম্মীদের ওপর ওস্তাদ আলি কুলি এমন ভাবে প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ করছিলেন এবং কামান ও বন্দুক থেকে গোলা ও গুলি এমন ভাবে ছোঁড়া হচ্ছিল যে বিধর্ম্মীদের বর্ম্মপরিহিত অনেক দেহ ধ্বংস হয়ে গেল। কেন্দ্রস্থলের বন্দুকধারী সৈন্যগণ আদেশানুসারে শকটগুলির পেছন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকেই বিধর্ম্মীদের মৃত্যু-বিষের স্বাদ বুঝিয়ে দিল। সম্মুখের সেনা-দল সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা অরণ্যের ব্যাঘ্রের মত সাহসী এবং তাদের নাম যারা বীরত্বের কাজে অগ্রণী, তাদের নামের সঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত হয়ে থাকবে।

ঠিক এই সময় মহিমান্বিত সম্রাটের আদেশ হলো—কেন্দ্রস্থলের কামানবাহী শকটগুলি অগ্রসর হোক। সম্রাট স্বয়ং—যাঁর ডান হাতের মুঠোয় জয় ও সৌভাগ্য এবং বাম হাতে যশ ও অধিকার—বিধর্ম্মী সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন। বিজয়ী সৈন্যগণ চার দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করলো। দেখে মনে হলো—যেন চলন্ত সৈন্যসমুদ্র এবং সেই সমুদ্রে প্রবল ঢেউ উঠছে। এই সমুদ্রের কুমিরগুলির শৌর্য্য ও বীরত্বও তাদের কাজের দৃঢ়তায় প্রকাশ পেলো। আকাশ ধূলিকণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রণক্ষেত্রে যে ধূলিমেঘের সৃষ্টি হলো তার মধ্যে তরবারির ঝলকানি দেখে মনে হতে লাগলো যেন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেমন আয়নার পেছন দিক দিয়ে মুখ দেখা যায় না তেমনি ধূলিজালের মধ্য দিয়েও সূর্য্যের মুখও দেখা যাচ্ছিল না। আঘাতকারী এবং আঘাতপ্রাপ্ত, জয়ী এবং পরাজিত এক সঙ্গে মিশে গেল এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যও আর ধরা গেল না। সময়ের যাদুকর এমন একটি রাত্রির আকাশের সৃষ্টি করলো যার একমাত্র গ্রহ হলো তীর এবং স্থির নক্ষত্রমণ্ডলী হলো দৃঢ় সংবদ্ধ সৈন্যব্যূহ।

'সেই যুদ্ধের দিনে, জগৎ ধাত্রী মৎস্য
রক্ত স্রোতে ভেসে গেল।
প্রশস্ত রণক্ষেত্রে, অশ্ব ক্ষুরাঘাতে,
ধূলি মেঘ সৃষ্টি হলো।
সেই ধূলি মেঘে আকাশের চাঁদ
একেবারে ঢাকা পড়লো।
যেন একটি পৃথিবী আকাশে উঠে,
আর এক স্বর্গ গড়লো।'

(বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে মুসলমান মত-বাদে মৎস্য পৃথিবীর ধারক। এই কবিতায় সেই মৎস্যের উল্লেখ। যুদ্ধের ভীষণতা দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে—যেন পৃথিবীর সাতটি ভূখণ্ডের মধ্যে একটি আকাশে উঠে গিয়ে সপ্তম স্বর্গের স্থলে অষ্টম স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এই কবিতাটি ফার্দৌসির সাহানামা থেকে গৃহীত)।

যে সময়ে পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকরা অবলীলাক্রমে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল সেই মুহূর্ত্তেই এই গোপন বাণী তাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছিল—লজ্জা করো না, দুঃখও করো না। বিশ্বাস করো। এই সব অবিশ্বাসীদের অনেক ওপরে তোমাদের মহিমা প্রচারিত হবে। সেই অভ্রান্ত সংবাদবাহীর নিকট তারা এই আনন্দময় বাণী শুনতে পেল—সাহায্য পৌচেছে আল্লার কাছ থেকে। দ্রুত যুদ্ধ জয় হবে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে এই শুভ বার্ত্তা পৌছে দাও। তারপর তারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। তাদের কানে পয়গম্বরদের প্রশংসাবাণী প্রবেশ করলো। আল্লার দরবারের ফিরিস্তারক (দেবদূত) তাদের মস্তকের চতুর্দ্দিকে পতঙ্গের মত ঘুরতে লাগলো। প্রথম ও দ্বিতীয় নমাজের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এমন যুদ্ধের আগুন জলে উঠলো যে সেই আগুনের শিখার নিশান যেন আকাশ স্পর্শ করলো। ইসলামের সৈন্যদের দক্ষিণ ও বাম ভাগ হতভাগা বিধর্ম্মী সৈন্যদের বাম ও দক্ষিণ বাহুর সৈন্যদের তাড়া করে তাদের কেন্দ্রস্থলের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একাকার করে ফেললো।

ইসলামের যোদ্ধাদের জয়ের এবং ধর্ম্মের নিশান উড্ডীন হওয়ার চিহ্নগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখে অভিশপ্ত বিধর্ম্মীরা এবং সয়তান অবিশ্বাসীরা এক ঘণ্টার মত সময় হতবুদ্ধির মত নিশ্চল হয়ে রইলো। তারপর তারা মরিয়া হয়ে আমাদের কেন্দ্রস্থলের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাম পার্শ্বের ওপর তাদের আক্রমণের বেগ গুরুতর হলো এবং সেইদিকে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু ধর্ম্মযোদ্ধাগণ যাদের মন সৎকাজের পুরস্কার পাওয়ার দিকে নিবদ্ধ তাদের তীর বিধর্ম্মীদের প্রত্যেক বক্ষে বিদ্ধ করতে লাগলো। বিধর্ম্মীদের ভাগ্য এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তাদের পতন হলো। এইরূপ অবস্থায় সুখী সম্রাটের ভাগ্যক্ষেত্রে জয় এবং সৌভাগ্যের মলয় বাতাস বইতে লাগলো এবং তাঁর কাছে এই শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো। সত্যই সুস্পষ্ট জয়ের বার্ত্তা পৌছে গিয়েছে। সেই সুন্দরী রমণী—জয় যাঁর নাম—যাঁর কুঞ্চিত কেশদাম স্বয়ং ঈশ্বর সজ্জিত করেন তিনি সাহায্য করবেন। যে সৌভাগ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, সে আবরণ খুলে গেল এবং তা' বাস্তবে পরিণত হলো।

কুযুক্তিপরায়ণ হিন্দুরা তাদের ধ্বংসজনক অবস্থার কথা উপলব্ধি করে বাতাসের মুখে যেমন পেঁজা তুলো উড়ে যায় এবং পতঙ্গরা ভেসে যায় সেই ভাবে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হলো। অনেকে

আহত হয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু অবশেষে কাক-শকুনির খাদ্যে পরিণত হলো। মৃত ব্যক্তিদের দেহ দিয়ে স্তূপ এবং মাথা দিয়ে স্তম্ভ রচিত হলো।

মৃতের তালিকার মধ্যে মেওয়াতের হাসান খাঁকে পাওয়া গেল—গোলার মুখে যার মৃত্যু হয়েছে। উপজাতিদের অনেক একগুঁয়ে সর্দার এইভাবে তীরের কিংবা গোলার মুখে শেষনিঃশ্বাস ফেলতে বাধ্য হয়েছে। তার মধ্যে আছে বাজরের (উদয়পুর) রাজা রাওয়াল উদয় সিং, ডুংগারপুরের শাসক—যার অশ্বসংখ্যা বারো হাজার। চার হাজার অশ্বের মালিক রায় চন্দ্রবান চৌহান, চান্দেরির রাজা ভূপত রাও—যার অশ্বসংখ্যা ছয় হাজার, মাণিক চঁদ চৌহান এবং দিলপৎ রাও যাদের প্রত্যেকের ছিল চার হাজার অশ্ব, গাঙ্গু, করমসিং ও দানকুশি যাদের প্রত্যেকের ছিল তিন হাজার অশ্ব এবং আরও অনেকে যারা ছিল দল ও জাতির নেতা ও দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দার। এরা সকলেই নরকের পথে যাত্রা করলো, মাটির পৃথিবী থেকে নরকের গর্ত্তে বাস করার জন্য। যেমন নরক পূর্ণ থাকে, সেইরূপ শত্রুরাজ্যের রাস্তাগুলি হত ও আহতদের দেহে পূর্ণ হয়ে গেল। ছোট ছোট মাটির গর্ত্তগুলি দুষ্কৃতিকারীদের দেহে ভরতি—যাদের আত্মা নরকের প্রভুর হাতে সমর্পিত হয়েছে। যেদিকেই ইসলামের সৈন্য ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়েছে সেখানেই কোনও না কোনও মৃতদেহ তাদের চোখে পড়েছে। ইসলামের সুবিখ্যাত সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের পিছন পিছন যে দিকেই ধাওয়া করেছে তারা লক্ষ্য করেছে যে অগণিত ভূপতিত শত্রু দেহে ভূমি এমন আবৃত যে—পা ফেলার স্থান নাই।

'হস্তীযূথ-প্রভুর সেনাদলের মত
যারা পাথরের ঘায়ে হয়েছিল হত।
এই হীন ঘৃণ্য হিন্দুর দলও
কামানের গোলায় ধরাশায়ী হলো।
তাদের শব দিয়ে হলো পাহাড় গড়া,
পাহাড়ের ঝরণা, তাদের রক্ত ধারা।
আমাদের নিপুণ সেনার তীরের ভয়ে,
মাঠে পাহাড়ে অনেকে গেল পালিয়ে।'

তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লার আদেশই পালনীয়। এখন তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন কর—যিনি সবই শুনতে পান। সবখানেই যিনি বিরাজিত। জয় এসেছে একমাত্র তাঁরই কাছ থেকে যিনি পরম শক্তিমান এবং জ্ঞানী। (জমাদি-উল সানি মাসের ২৫শে তারিখ ৯৩৩, হিজরি সন—২৯শে মার্চ, ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত)।

যুদ্ধজয়ের বর্ণনার পর আত্মকথার পুনরারম্ভ

শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার পর আমরা দ্রুত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে একের পর এক তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলা হলো। আমাদের শিবির থেকে রাণা সঙ্গর শিবিরের দূরত্ব প্রায় ক্রোশ দুই হবে। তার শিবিরে পৌছিয়ে তাকে অনুসরণ করার জন্য মহম্মদ আবদুল আজিজকে এবং আরও কয়েক জনকে পাঠানো হলো। কিন্তু তাদের কাজে হয়তো শিথিলতা ছিল! (সেই কারণেই রাণা সঙ্গ পালাতে পেরেছিল। এই বছরেই রাণা মারা যায়। সন্দেহ হয় তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়)। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। অন্যের উপর নির্ভর করে এই গুরুভার অর্পণ করা ঠিক হয়নি। এই বিধর্ম্মীর শিবির থেকে ক্রোশ খানেক অগ্রসর হয়ে আমি ফিরে এলাম—কারণ দিনের আলো নিভে এসেছে। আমাদের শিবিরে যখন ফিরে আসি তখন রাতের নমাজের সময়।

এই যুদ্ধ জয়ের পর আমার রাজকীয় পদবীগুলির মধ্যে 'গাজি' এই উপাধিটাও যোগ করি। আমার এই জয়ের সরকারি বিবরণে রাজকীয় উপাধিগুলি লেখার পর এই কবিতাটিও লিখে রাখি।

(তুর্কিতে) নিজ ধর্ম্ম ভাল বেসে মরুভূমিতে ঘুরেছি।
বিধর্ম্মী হিন্দুদের শত্রু বলে ভেবেছি।
শহীদ হইব আমি আশা ছিল তাই।
আল্লার দয়ায় হলাম গাজি, আর খেদ নাই।'

মহম্মদ সেরিফ—সেই জ্যোতিষী যার বিকৃত ও রাজ-দ্রোহকর আচরণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি—সে আমার জয়ের জন্য সম্বর্দ্ধনা জানাতে এলো। আমি তাকে গালাগালির স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম। এই ভাবে আমার রাগটা যখন পড়ে এলো এবং মনটাও হালকা হলো তখন সে পৌত্ত-লিকের মত আচরণ বিশিষ্ট বিকৃত স্বভাব। অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক এবং অকথা দুর্মুখ হলেও সে আমার পুরাতন ভৃত্য বিবেচনা করে উপহারস্বরূপ চার হাজার টাকা দিয়ে

তাকে বরখাস্ত করি। আদেশ দিই যেন সে আমার রাজ্য অবিলম্বে ত্যাগ করে চলে যায়।

পরদিনও আমাদের শিবিরেই থেকে যাই।—মহম্মদ আলি জং জং, সেখ গুরণ ও বর্ম্মরক্ষক আবদুল মালিকের সঙ্গে বিপুল সৈন্যবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহী ইলিয়াস খাঁকে দমন করার জন্য পাঠানো হলো। সে গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কোয়েথ নিজের অধিকারে এনে কিচিক আলিকে বন্দী করে।— আমার সৈন্যদল অগ্রসর হলে তার দলের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন পর তাকেও বন্দী করে আগ্রায় পাঠানো হয়। সেখানে তাকে জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

আদেশ দেওয়া হলো যে বিধর্ম্মীদের শির দিয়ে একটি জয় স্তম্ভ তৈরী করে যে পাহাড় ও আমাদের শিবিরের মাঝখানে এই যুদ্ধ হয় সেই ছোট পাহাড়ের ওপর সেই স্তম্ভ খাড়া করা হোক।

সেই স্থান ত্যাগ করে এবং দুইরাত্রি মধ্যপথে বিশ্রাম করে আমরা ২০শে মার্চ রবিবার বিয়ানায় পৌছাই। বিধর্ম্মী এবং ধর্ম্মত্যাগীদের অগণিত মৃতদেহ—যারা যুদ্ধে হত হয়েছে—বিয়ানা পর্য্যন্ত। শুধু বিয়ানা নয়—আলওয়ার ও মেওয়াং পর্য্যন্ত ছড়ানো ছিল।

শিবিরে ফিরবার পর আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানে আমিরদের আহ্বান জানাই এই আলোচনা করবার জন্য যে এই সময় রাণা সঙ্গর দেশে অভিযান চালানো উচিত হবে কিনা। কিন্তু পানীয় জলের স্বল্পতা এবং পথে অতিরিক্ত গরম ভোগ করতে হবে এই জন্য প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলো।

মেওয়াং প্রদেশ দিল্লী থেকে বেশী দূর নয়। এর রাজস্ব তিন চার কোটি টাকার মত। হাসান খাঁ মেওয়াতি এই দেশের শাসনভার তার পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিল —যারা এই রাজ্য বংশপরম্পরায় একাদিক্রমে দুই এক শতাব্দী শাসন করেছে। দিল্লী-সুলতানদের অধীন হলেও তাদের বশ্যতা নাম মাত্র ছিল। হিন্দুস্থানের সুলতানরা তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্যই হোক কিংবা সুবিধার অভাবেই হোক অথবা এই স্থানের পার্ব্বত্য প্রকৃতির জন্যই হোক কখনও মেওয়াংকে সম্পূর্ণ বশে আনতে পারেন নি। এই দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন না করতে পেরে তাঁরা যেটুকু বশ্যতা তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও হিন্দুস্থান জয়ের পর সুলতানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাসান খাঁকে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ দেখাই। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী ব্যক্তির ভালবাসা ছিল বিধর্ম্মীদের প্রতি। অনুগ্রহ এবং প্রসিদ্ধি দান করে আমি তার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করেছি তা উপেক্ষা করে সে ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের নেতা হয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিধর্ম্মীদের দেশে সৈন্য চালনা করার ইচ্ছা পরিত্যক্ত হওয়ায় আমি মেওয়াংকে বশীভূত করার জন্য মনস্থ করলাম। চারবার সৈন্য চালনা করে অগ্রসর হওয়ার পর পঞ্চমবার সৈন্য চালনা করে এই প্রদেশের রাজধানী আলোয়ার দুর্গ থেকে ছয় ক্রোশ দূরে মানস্ নদীর তীরে শিবির স্থাপন করি। হাসান খাঁর পূর্ব্বপুরুষদের রাজধানী ছিল তিজারায়। যে বৎসর আমি হিন্দুস্থান আক্রমণ করে পাহাড় খাঁকে পরাস্ত করার পর লাহোর এবং দেবলপুর অধিকার করি (১৫২৪) সেই সময় আমার সৈন্যদের অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হয়ে হাসান খাঁ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করে।

করমচাঁদ নামে হাসান খাঁর একজন প্রধান কর্ম্মচারী—যে হাসান খাঁর পুত্র—যখন আগ্রা দুর্গে বন্দী ছিল তখন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেই হাসান খাঁর পুত্রের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসে। আবদুল রহিম সাখাওয়েলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিই। হাসান খাঁর পুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই যে তার কোনও ভয় নাই এবং তার নিরাপত্তার সম্বন্ধেও আশ্বাস দান করি। তারা দুই জনই হাসান খাঁর পুত্র নাহির খাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। তাকে আবার অনুগ্রহ দেখিয়ে ভরণপোষণের জন্য কয়েক লক্ষ টাকার আদায়ী পরগণা দান করি।

আমি খসরু গোকুলতাসকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত পরগণা এবং আলোয়ারের শাসন ভার প্রদান করি। কারণ আমার ধারণা ছিল যে সে যুদ্ধে ভালভাবে তার কার্য্য সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সে তার দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজাজ দেখিয়ে আমার এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আমি পরে জানতে পারি—যে কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে যাচ্ছিলাম সে কাজ সে করেনি। করেছিল চিন্ তাইমুর

সুলতান। সুলতানকে মেওয়াতের রাজধানী তিজারা নগর এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রদান করি। তার্দিকাকে যে রাণা সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণ-দিকের পার্শ্ব-রক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিল এবং যে অন্য সকলের চেয়ে যুদ্ধে অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল তাকে আলোয়ার দুর্গের ভার দিয়ে পনরো লক্ষ টাকার সংস্থান করে দিই। আলোয়ার কোষাগারের ধনসম্পত্তি হুমায়ুনকে প্রদান করি।

রজব মাসের ১লা তারিখ উপরোক্ত শিবির থেকে রওনা হয়ে আলোয়ার দুই ক্রোশের মধ্যে পৌঁছে যাই। তারপর আলোয়ার দুর্গ দেখতে যাই এবং সে রাত্রি সেখানেই অবস্থান করি। পরের দিন শিবিরে ফিরে আসি।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ছোট ও বড় সকলেই যখন শপথ গ্রহণ করে তখন তাদের বলেছিলাম যে যুদ্ধ জয়ের পর যারা হিন্দুস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছা করবে তাদের ছুটি দেওয়া হবে। হুমায়ুনের সৈন্য-দলের অধিকাংশই বাদাক্সানের অধিবাসী। তারা কোনও সময়ই এক মাস কি দুই মাসের বেশী সময় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে কাবুল ছেড়ে থাকেনি। যুদ্ধের পূর্ব্বেও তাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। এই সব কারণে এবং তা ছাড়া কাবুল সৈন্যশূন্য আছে দেখে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তাদের সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুন কাবুলে ফিরে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত করার পর রজব মাসের ৯ই তারিখ বৃহস্পতিবার আলোয়ার থেকে যাত্রা করে মানস্ নদীর তীরে পৌঁছিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

মেহেদি খাজাও অনেক অস্বস্তি ভোগ করছিল। তাকেও কাবুলে যাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। বিয়ানার সামরিক সমাহর্ত্তার পদ ফটক-রক্ষীদের প্রধান পরিচালক দোস্তকে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে এটোয়ার ভার মেহেদি খাজাকে দেওয়ার কথা ছিল। কুতুব খাঁ এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর মেহেদি খাজার পুত্রকে তার পিতার স্থলে এইখানে পাঠানো হয়।

কাবুলে ফিরে যাওয়ার জন্য হুমায়ুনকে ছুটি দিয়ে এই জায়গায় দুই তিন দিন অবস্থান করি। বার্ত্তাবাহক মুমিণ আলিকে যুদ্ধ জয়ের বিবরণ সহ (ফতেনামা) কাবুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গ সংগ্রাম আরম্ভ করার সময় হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থানের বেশীর ভাগই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের পরগণা ও জেলাগুলো পুনর্দখল করে নেয়—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলতান মহম্মদ দুলদাই কনৌজ রাজ্য ত্যাগ করে আমার কাছে এসেছিল। সে আর সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হলো না—সেটা তার ভয়ের জন্যই হোক অথবা দুর্ণামের জন্যই হোক। কনৌজের ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিবর্ত্তে তাকে পনরো লক্ষ টাকা রাজস্ব-আদায়ী শিরহিন্দের ভার দেওয়া হলো এবং ত্রিশ লক্ষ টাকার কনৌজের শাসনভার মহম্মদ সুলতান মির্জ্জাকে অর্পণ করা হলো। কাসিম-ই-হুসেনকে বাদায়ুন দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের সময় বিবন্ লুকনুর (রামপুর রাজ্যের সাহাবাদের পুরাতন নাম) অবরোধ করে। তার বিরুদ্ধে অভিযান চালনার জন্য কাসিম-ই-হুসেনকে পাঠানো হয়। তার সঙ্গে যায়—মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা। তুর্কিস্থানের আমিরদের মধ্যে বাবা কাস্কা মালিক কাসিম তার ভাইদের আর তার অধীনস্থ মোগল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, বল্লম অস্ত্র ক্ষেপণে পারদর্শী আবুল মহম্মদ, মুরাদ তার পিতার এবং হুসেন খাঁ দরিয়াখানের দলবল নিয়ে, মহম্মদ দুলদাই-য়ের সৈন্যদল, হিন্দুস্থানের আমিরদের মধ্যে আলি খাঁ ফরমুলা, মালিক দাদ কারনানি, সেখ মহম্মদ এবং তাতার খান্ খানি জাহান্।

এই সৈন্যদল যখন গঙ্গানদী পার হওয়া আরম্ভ করে, সেই কথা জানতে পেরে বিবন্ সমস্ত কিছুর মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা তার পিছন পিছন খয়রাবাদ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে তারপর ফিরে আসে।

আগেই ধন-সম্পদ বিভাগের কাজ শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিধর্ম্মীদের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় প্রদেশগুলির শাসনের ব্যবস্থা করার সময় পাইনি। পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ঝামেলা মেটার পর আমি বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাগুলির শাসনভার কার কার ওপর দেওয়া হবে সেটা ঠিক করার সময় পাই। বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসছে দেখে আমি প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে রাখতে এবং বর্ষা শেষ হলে আমার সঙ্গে পুনরায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দ্দেশ দিই।

এই সময় আমার কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন দিল্লীতে ফিরে গিয়ে কতকগুলি বাড়ীতে যেখানে সঞ্চিত ধন ছিল সেই বাড়ী খুলে জোর করে অর্থ দখল করেছে। তার এই রকম বিসদৃশ আচরণের কথা কখনও ধারণা করি নাই। এতে আমি মনে বিষম আঘাত পাই এবং কড়া চিঠি লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

[ক্রমশঃ

ঈশ্বর যাকে মারেন
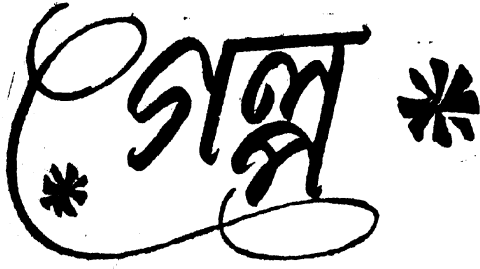
অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ইচ্ছে করেই যেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম।

খানিকটা আত্মগতভাবে চিন্তা, আর সে চিন্তার মধ্যে কোন ভাবগত কিংবা বিষয়গত ঐক্যও নেই; তবুও চিন্তার তরঙ্গে দোল খাওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি! এদিকে চোখ ফেরালেই হয়তো দেখা যাবে কোনো মহিলা আমার ট্রামের সিটের ঠিক পাশটিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'পাশের ভিড় তাঁকে ঠেলে রেখেছে। ভারি অস্বস্তিকর পরিবেশ।

ইস্কুল-কলেজের ছাত্রী কিংবা আফিসের কেরাণি মেয়ে—বয়সে আট-সাঁট যারা নিত্যই ভিড় ঠেলে যায় আর আসে, যারা নিত্যই দাঁড়িয়ে থাকে—তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম; কিন্তু গঙ্গাস্নানে চলেছেন বর্ষিয়সী—সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, অফিস টাইমে ভিড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁদের যে কেন এই সময় ধর্মের বাতিক মেটানো—সে কথা বলবে কে? বললেও শুনবেই বা কে?

মৌখিক এ-সম্পর্কে অনুযোগ প্রকাশ করেও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের বসবার সিটটি ছেড়ে কিন্তু উঠে দাঁড়াতে হয়।

কিংবা শিশু ক্রোড়ে কোনো জননী! ভিড়ের চাপে শিশুটি প্রাণপণে পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করেছে ঠিক আপনার বসে থাকা জায়গাটির পাশেই—আপনাকে বাধ্য হয়েই নিজের সিটটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়! অফিসটাইমে এ হলো ব্যতিক্রম! এ-সব ক্ষেত্রে ভালোমন্দের বিচার নেই। এ-ছাড়া ভদ্রতা বা চক্ষুলজ্জার বালাই আজকের দিনে আর না করলেও চলে—কেউ আপনাকে তার জন্যে দোষারোপ করবে না। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় করা নিজের রাজ-আসনটিতে চক্ষু মুদ্রিত করে বসে থাকুন! একপেট খেয়ে জ্যৈষ্ঠের আগুন-সেঁকা গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে টালিগঞ্জ থেকে ডালহাউসি স্কোয়ার দশটা-পাচটার কেরাণি-জীবনে চল্লিশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনা কি কম? তাই হয় দার্শনিক হোন্, না হয় চলতি ট্রামের বাইরে রাজপথের দৃশ্যে আত্মবিভোর হয়ে আপনার গন্তব্যস্থলে এগিয়ে চলুন!

লেডীস সিটটার ঠিক পিছনে একক বসবার জায়গাটিতে বসেছিলাম। কখনো মুদ্রিত চক্ষু, কখনো দার্শনিক চিন্তায় আত্মরত—কখনো বা নিছক দ্রষ্টা।

ট্রাম এগিয়ে চলেছে। ভিতরে-বাইরে ঠেলাঠেলি, হৈ-চৈ, কলহ-দ্বন্দ্ব, হট্টগোল। আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি নির্লিপ্ত।

'শুনছেন।'

ইচ্ছে করেই শুনলাম না।

'শুন্-চেন!!'

একটি মিষ্টি কলকণ্ঠের জোরালো তাগিদে এবার বাধ্য হয়েই চোখ ফেরাতে হলো।

অফিস-যাত্রিণী। সুবেশা তরুণী। সবে হয়তো কলেজের ছাড়পত্র পেয়েছে—সিঁথিমূলে এখনো সিঁদূরের লাল রেখা পড়েনি।

চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আহ্বানের সঙ্কেত বুঝেছিলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পরিত্যক্ত সীটে বসলো না। দণ্ডায়মান একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসে মেয়েটি বললে, 'ধন্যবাদ! এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভীড়ে দাঁড়াতে পারছেন না। এঁর জন্যেই আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।'

অতি ডেঁপো মেয়ে। অদ্ভুত তার সিভ্যালরি প্রকাশের ধরণ। তার বদান্যতা দেখে ট্রামশুদ্ধ সবাই তার প্রশংসা-

বাদে মুখর হয়ে উঠলো। আর লজ্জায় এতোটুকু হয়ে গিয়ে আমি তারই পাশটিতে অতি সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এলগিন রোডের কাছটিতে ট্রাম এসে থামতেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েটি প্রশ্ন করলো, 'এইখানেই নামবেন?'

'হ্যাঁ মা। হাসপাতালে যাবো।'

'সঙ্গে আর কেউ নেই?'

'না।'

'একা যেতে পারবেন?'

'এই তো পি. জি. হাসপাতাল। ঠিক চলে যাবো।'

কনডাক্টর ট্রাম থামিয়েছিল। মেয়েটি বৃদ্ধের হাত ধরে ট্রামের ভীড় সরিয়ে বৃদ্ধকে নামিয়ে দিলে।

অনাত্মীয় বৃদ্ধের প্রতি সৌজন্য প্রকাশে মেয়েটির চরিত্রের গুণ-কীর্তনে ট্রামের অভ্যন্তরস্থ যাত্রী-সাধারণ সকলেই আবার মুখর হয়ে উঠলো।

এবার আর আমি ভুল করলাম না। বৃদ্ধ নেমে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করা দরকার। সীটটিতে তাকেই বসতে দিতে হয়।

মেয়েটিকে অনুরোধ জানালাম, 'বসুন!'

পাল্টা জবাব দিয়ে সে বললে, 'না, না, সে কী, আপনিই বসুন!'

বললাম, 'আপনি মহিলা!'

'ধন্যবাদ। তবুও আপনি বসুন। আমরা আজকাল দাঁড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত। আপনি বয়স্ক।'

এরপর আর কথা বলা চলে না। চলতো—যদি বয়েসটা কম হতো! কিন্তু ভগবানের মার রুখবে কে! নীরবে তাই কণ্টকাসনে বসে পড়লাম।

ভবানীপুর থেকে ড্যালহাউসি স্কোয়ার অনেক দূর। এই দূরের পথ কাঁটার ঘায়ে জর্জরিত হয়ে যেতে হবে।

ট্রামের গতিটাও যেন মন্থর হয়ে এসেছে। সামনে পর পর আরো কয়েকখানি ট্রাম। ক্যাথিড্রল চার্চের ঘড়িতে বেলা পৌনে দশটার সঙ্কেত। গড়ের মাঠের সবুজ ঘাসে চড়া রোদ্দুরের মেলা। রাস্তার ধারে গাছগুলিতে ঝিলমিলে পাতা।

মন অশান্ত। এখন আর পথের চলমান দৃশ্যের প্রতি আত্ম-নিমগ্ন হয়ে বসে থাকা যায় না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দার্শনিক সাজাও অসম্ভব।

তার চেয়ে এখানে নেমে পড়লে কেমন হয়? হাসপাতাল নয়—ময়দানের গাছের ছায়া! কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল! পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হেস্টিংসের রাস্তাটাও ধরা যায়। সেখান থেকে গঙ্গার ধার!

একদিন না হয় অফিস কামাই হলোই বা!

বেদনার নাম

অসীমকুমার বসু

অলস তন্দ্রার মত হাল্‌কা ডানায় ভেসে ভেসে,
রাত্রির বাতাস এল ধীরে।
হৃদয়ের হ্রদ থেকে ক্লান্ত স্মৃতিরা ফিরে এসে
আশ্রয় খোঁজে এক শান্ত বিশ্বাসী কোন নীড়ে।

বিনিদ্র প্রহর গেল। চাঁদ গেল পশ্চিমে নেমে।
প্রতীক্ষা লজ্জিত হ'ল। বিষণ্ণ নিশ্বাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে
নির্জন হৃদয়ের মানে খুঁজে দেখে
শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'ল। মেনে নিল শেষ পরিণাম।

রাত্রি! আজকের এ স্মৃতিটুকু
তোমায় দিলাম।
তুমি শুধু রাতজাগা প্রহরের গায়ে গায়ে এঁকে
লিখে দিও বেদনার নাম।

স্মৃতিচারণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ই নভেম্বর মিলন ও বাণী রাকা ও প্রেমনকে নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে আমাদের আনন্দের চৌতাল হঠাৎ ঢিমে তেতালায় পৌছায় আর কি! আমি ইন্দিরাকে বললাম: "উঁহুঃ, লক্ষণ ভালো নয়—মিইয়ে যাবে কিনা চার চারজন যোগী?" তৎক্ষণাৎ ইন্দিরা চাঙ্গা হবার পথ-নির্দেশ করল: "রাজরথ পাঠিয়ে আরো যোগীদের আনানো যাক্।" কথাবৎ কার্য—এলেন কালীদা ও ডোরাস্বামী।

সেদিন—হয়ত শেষ সন্ধ্যা বলেই—কালীদা যাকে বলে rose to the occasion: সে যে কতরঙা কথারি ফুলঝুরি কেটে বললেন! অনেক কথাই টুকে রাখবার মত—কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে আর নেই যৌবনের সে-উৎসাহ। কেবল কালীদার দুটি তিরস্কারের কথা উল্লেখ না করলেই নয়: প্রথম, যে আমি ইন্দিরা সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ ক'রে ভুল করেছি—যদি এসব গুহ্য কথা প্রকাশ করতেই হয় তবে অন্য ভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়, আমি নিজেকে চিনি না ব'লে এমন অনেক মানুষকে বড় ক'রে ধরি যারা তেমন কিছু নয়। ভৎর্সনা ক'রেই কালীদা বললেন: "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি সত্যি ভালোবাসি ব'লেই টুকি, এবং আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ব'লে যে, ভাগবতীকৃপা আপনি পেয়েছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইন্দিরার আপনাকে গুরু বরণ করা। কিন্তু হয়েছে কি জানেন? যে-সব অলৌকিক অনুভবের এজাহারে ওর মহিমা আপনি প্রচার করবেন ভাবছেন সে-ধরণের অলৌকিক অঘটন ওর চেয়ে অনেক ছোট আধারের মাধ্যমেও ঘটে। যথা এইমাত্র যে বললেন—আপনার বন্ধু ৺ল-র বিদেহী আত্মার ওর কাছে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে প্রমাণ করা যে সে সত্যিই ল—।" আমার ইচ্ছা হয়েছিল বলি: "আমি যা পারি, তার চেয়ে বেশি পারি না তো কালীদা!" কিন্তু বলি নি—কারণ তর্কাতর্কি করতে আজকাল আর একটুও ভালো লাগে না। তাই কালীদাকে সেদিন শুধু বলেছিলাম: "আমি ভুলভ্রান্তি করলে বলবেন বৈ কি, কেবল একটি কথা: আমি আপনার তিরস্কারকে পুরস্কার গণ্য করার পরেও চলব নিজের পথেই, আর কারুর নির্দিষ্ট পথে নয়। কারণ বহু পোড় খেয়ে তবে পেয়েছি একটি পরম জ্ঞানদীক্ষা: যে ঠাকুর গীতায় একটুও অত্যুক্তি করেন নি—যখন তিনি অর্জুনকে পই পই ক'রে বলেছিলেন পরধর্ম শুধু ভয়াবহ নয়, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ। তাই শুধু নিবেদন রইল যে, আমার দ্বিবিধ (বা ত্রিবিধ বা চতু-র্বিধ) অপরাধের জন্যে তিরস্কার করতে চান করুন সাধ মিটিয়ে, আমার নানা ভ্রান্তিবিলাসের নিরসন করে যদি আমার মনকে পরিষ্কার করতে চান তাতেও আমি আপত্তি করব না, কেবল আমাকে অন্তর থেকে বহিষ্কার করবেন না এই টুকু মনে রেখে যে—আপনাকে দরদী তথা ব্যথার ব্যথী মনে হয় বলেই বারবার আপনার সৎসঙ্গ কামনা করি—আপনার নানা তর্জন সত্ত্বেও।"

কালীদার চোখ চিকিয়ে উঠল, তিনি আমাকে আলি-ঙ্গন করলেন। মোহন টুক ক'রে ছবি নিয়ে নিল। ছবিটি মন্দ হয় নি—কী বলো? অন্ততঃ কালীদা কি রকম দিলখোলা প্রেমময় পুরুষ, তার একটু আভাষও তো ফুটেছে।

কালীদার এই স্বভাবস্নেহশীলতার পরে জোর দিয়ে তিন চার বৎসর আগে ডোরাস্বামী আমাকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। তাতে এক জায়গায় ছিল: "আমি দেখেছি হিমাদ্রি আফিসে একদল আদর্শবাদী যুবক তাঁকে কী ভক্তি করে!—স্পষ্ট দেবতার মতনই বলব। শুধু তাই নয়, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে তারা দিনের পর দিন কত যে ত্যাগ স্বীকার করে যে—সে দেখবার মত। হিমাদ্রি পত্রিকা চলছে শুধু এই জাতের কয়েকটি ত্যাগোজ্জ্বল অনুরাগীরই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গুণে। দিলীপ, আমি এ-আটাত্তর বৎসরে দেখেছি ঠেকেছি ও ভুগেছি বিস্তর এবং শিখেছিও কম নয়—তাই তোমাকে একটা কথা বলতে পারি একটু

জোর করেই যে, এ-স্বার্থপূজারী যুগে বড়ই বিরল এ-জাতীয় কর্মী—যারা নায়কের নির্দেশে হাসি মুখে অক্লান্ত কর্ম ক'রে যায় পারিশ্রমিক বিনা। আর এ-শ্রেণীর কর্মী গড়ে তুলতে পারেন কেবল সেই জাতের মহাজন—যাঁরা মানুষকে ভক্তি করতে শিখিয়ে শক্তিমান্ করে তোলেন।" ডোরাস্বামী বাংলা জানলে তাঁকে বলতাম: "এইজন্যেই পিতৃদেব লিখে ছিলেন সহাস্যে—তাঁর একটি হাসির গানে:

"শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি,

(আর) ভক্তের জন্যে শক্তি জোগান মহত্তর ব্যক্তি।"

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ল মান্দ্রাজে প্রথম দিন কালীদাকে দেখেই ইন্দিরা বলেছিল: "শক্তিমান্ পুরুষ।" ১৩ই রাত্রে কথায় কথায় ইন্দিরাও এ-রায়টি উদ্ধৃত করতেই কালীদা হেসে বললেন: "সে কি? স্নেহবান্ নই?" আমি বললাম: "সে কি আর বেশি ক'রে বলার দরকার করে, কালীদা? না আপনি নিজেই জানেন না সে কথা? কেবল আমার মনে একটা বোবা খেদকে বহুদিন ধ'রে চেপে রেখেছি—আজ বললামই বা। কথাটা এই যে ইন্দিরা বলে আপনি বিস্তর সাধনা করেছেন, কিন্তু আপনি কিছুই বলেন না দেখে মনে প'ড়ে যায় লাওৎসের একটি বিখ্যাত উক্তি:

অজ্ঞান এই ভবে যারা—তারাই তো হয় মুখর নিতি,

জ্ঞানীরা সব মৌনী—ধাতার এমনি হায় বিচিত্র রীতি!

আমি হয়ত প্রথম দলে, আপনি—শেষের। কালীদা হাসিমুখে টুক ক'রে উত্তর দিলেন: "আর আমার বোবা খেদ এই যে—আপনি নিজেকে চেনেন নি ব'লেই আজো টের পাচ্ছেন না যে যাদের আপনি 'গ্রেট' উপাধি দিয়েছেন তাদের কেউই আপনাকে বাঁধতে পারবে না, আপনি নিজের পথ নিজেই কেটে চলবেন নিজের বিবেকের আলোয়।" (এই শেষ কথাটি বলেছিলেন তিনি মান্দ্রাজে উডল্যাণ্ড হোটেলে এপ্রিল মাসে—শুনে আমি একটু রাগই করেছিলাম—তাই মনে গেঁথে আছে, কেন না সে-সময়েও আমি চেয়েছিলাম মূলতঃ গুরুপদাঙ্কই অনুসরণ করতে পণ্ডিচেরিতে থেকে। এ-কথাটার উল্লেখ করলাম আরো এই জন্যে যে—কালীদার আরো কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর মতন এটিও পরে ফলেছিল।)

আমি নাছোড়বন্দ, বললাম: "সে তো হ'ল, কিন্তু আপনি কলকাতায় একদিন বলেছিলেন আপনার সাধনার কথা কিছু বলবেন।" কালীদা ফের এড়িয়ে-যাওয়া হাসি হেসে বললেন: "কী বলব বলুন? এক সময়ে করতাম সাধনা, কিন্তু এখন আর কিছুই করি না।" ভাবলাম ফের জেরা করি: "এরি নাম ভগবানে আত্ম-সমর্পণের সূচনা নয় তো?" কিন্তু করিনি—জানতাম ব'লে যে কালীদা একগাল হেসে অন্য কথা পাড়বেনই পাড়বেন।

যাহোক তারপরে কালীদা কত কথাই যে বললেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর অতিমানস (supramental) যোগ সম্বন্ধে! আমি শেষে বলতে বাধ্য হলাম: "থাক্ আর বলবেন না। আপনার ধারণা আপনারই থাকুক, আমার ধারণা আমার।"

আমার কথা সেদিন কালীদাকে সব খুলে বলা হয় নি, তবে তিনি খুব ভালো ক'রেই জানতেন শ্রীঅরবিন্দকে আমি গত চল্লিশ বৎসর ধ'রে—কী অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, কত পথের পাথেয় পেয়েছি তাঁর নানা চিন্তা নির্দেশ থেকে, কত শক্তি পেয়েছি তাঁর দৃষ্টান্তে ও স্নেহাশীর্বাদে। একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, সব গুরুবাক্যকেই আমি সবসময়ে মেনে নিতে পেরেছি। এ-ও আমার কোনোদিনই মনে হয় নি যে, শিষ্য গুরুর মতামতে কখনো কখনো সায় দিতে না পারলেও অনুতপ্ত হয়ে করজোড়ে গুরুর স্তাবকতা না করলে নরকে যাবেই যাবে। তবে আমার এ-ধরণের মতামত শুনে শিউরে উঠে আমার অনেক গুরুভাই-ই আমাকে উন্মার্গগামী মনে করার দরুণ বহু মনঃকষ্ট পেয়ে শেষে ১৯৪৩ সালে আর থাকতে না পেরে একরকম জোর ক'রেই গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করি ও খুলে বলতে বাধ্য হই যে তাঁর সব মতামতেই আমি নির্বিচারে সায় দিতে অক্ষম—এজন্যে তিনি আমাকে ত্যাজ্য শিষ্য করলে আমি প্রস্থান করব, কিন্তু আমার বিবেকবুদ্ধিকে ত্যাগ ক'রে মিথ্যা ভান ক'রে তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারব না। এ-সম্পর্কে আরো অনেক কথা আমার Among the Great-এর তৃতীয় সংস্করণে বিশদ ক'রেই লিখেছি, তাই এখানে শুধু তাঁর আশ্বাসটুকুর অনুবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হব। তিনি বলেছিলেন (৩৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা):

"আমি যখন কিছু বলি বা লিখি তখন শুধু আমার

মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করি---এমন কথা বলি না যে আমি যাই বলব আর সবাইকে মেনে নিতে হবেই হবে। ···আমি কোনোদিনই হুকুমী হাকিম হ'তে চাই নি, বা জোর-জুলুম করি নি যে—সবাইকার মতই আমার মতের ছাঁচে ঢালাই করতে হবে, কি সবাইকেই আমার যোগ করতে হবে।"*

আমি স্বভাবে ঠিক মামুলি গুরুবাদী নই—কালীদা একথা জানতেন ব'লেই আমার সামনে শ্রীঅরবিন্দের নানা মত খণ্ডন করতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। সেদিন তিনি ঠিক কী বলেছিলেন আমি মনে করতে পারছি না, তবে উত্তরে আমি যা বলেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। আমি নম্র অথচ দৃঢ়ভাবেই বলেছিলাম: "শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার পুরো অধিকার আপনার আছে নিশ্চয়ই, কেবল আমার বিনীত অনুরোধ: আমি তাঁর কাছে চিরঋণী একথা মনে রেখে আমার সম্বন্ধে তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে এ ধরণের কথা বেশি বলবেন না।"

আমার এ-আতপ্ত প্রতিবাদের উত্তরে কালীদা ধীর-কণ্ঠে কয়েকটা ব্যাখ্যা করলেন এমন চমকপ্রদ ভাষায়—চমৎকার ক'রে গুছিয়ে—যে আমি কী প্রত্যুত্তর দেব সত্যিই ভেবে পেলাম না। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি ও ইন্দিরা উভয়েই খানিকটা যেন আবিষ্ট মতন হ'য়ে পড়লাম। ইন্দিরা পরে বলেছিল: "বলি নি—কালীদা শক্তিমান্ পুরুষ!" আমি বলেছিলাম: "বলেছিলে মানি। কেবল আরো একটা কথা বলা যায় কালীদার সম্বন্ধে: যে, তিনি শুধু যে চিন্তায় বলিষ্ঠ তাই নয়—সব কিছুই দেখেন তাঁর বিশিষ্ট, নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতন্ত্রতার পরিচয় দিতে তাঁর একটি পত্র থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি। পুরো চিঠিটি অনামীতে ছাপা হয়েছে। তিনি আমাকে লিখেছিলেন কলকাতা থেকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে (২০।১।৫৬)!

"প্রাণসুন্দরেষু,

বাইশে জানুয়ারি আপনার জন্মদিন, তাই এই-দিনটি আপনার ও আমার বন্ধুদের কাছে এত প্রিয়।···

"প্রাণসুন্দর পুরুষ আপনি। আনন্দই আপনার বৃত্তি, আনন্দেই আপনার স্থিতি। আপনি আবাল্য নিজের চারপাশে এক সহজ আনন্দের পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। গানে, কাব্যে, গল্পে, আলাপে এই অভিনব আনন্দের রশ্মিই সর্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে। এমন আনন্দস্বরূপ আর কার? মহাপ্রেমিক আপনি। এই অনাবিল প্রেম আমাদের সকলের মনকেই স্পর্শ করে এবং আত্যন্তিকভাবে একটি গভীরতা হয়ত অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়। এদিক দিয়ে আপনার জীবন একটি জাতীয় সম্পদ।···

"সময়ে সময়ে আপনার জন্যে চিন্তিতও হই বৈ কি। কিন্তু পরে যেই ভাবি—ইন্দিরা আপনার দেখাশুনা করার ভার নিয়েছে। সেই আর কোনো চিন্তা থাকে না। ভগবানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এই মেয়েটি! অনেক সত্যিকারের ভালো মেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর ম'ত এমন দ্বিধাবিমুক্ত দ্বন্দ্ববিরহিত আলোকোজ্জ্বল মন আর একটিও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওর ভার ভগবান নিয়েছেন। আমি তবু ওর শারীরিক সুস্থতা কামনা করি, আর ভগবান্ আপনাদের আপ্তকাম করুন এই প্রার্থনা করি। ইতি।

প্রীতিমুগ্ধ শ্রীকালীপদ গুহরায়।

* * *

পরদিন অযোধ্যায় সরযূ নদীতে স্নান করব—তার কথা পরে লিখছি। আগে কালীদার কথাটা সেরে নিই। সেদিন রাত একটা অবধি কালীদা যখন নানা কথা ব'লে আমাকে উল্লসিত ক'রে তুললেন তখন আমি হেসে বলেছিলাম: "আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তিই করেছেন স্নেহবশে। তবে আমার সদানন্দ

---

* "I have never cared to be a dictator; neither do I insist that everybody's views must be moulded by mine, any more than I insist that everybody should follow me or my Yoga. (Among the Great, I. 135)

গুরুদেবের সঙ্গে আমার এ-শেষ আলাপের অনুলিপি আমি সেদিনই লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিই, ও তিনি অনুমোদন করলে তবে আমার বইটির তৃতীয় সংস্করণের শেষে জুড়ে দিই।

অবস্থা সম্বন্ধে আপনার চিঠিপত্রে থেকে থেকে যে ভুল মন্তব্য ক'রে থাকেন—তাতে আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় একটি অবিস্মরণীয়াকে। মহিলাটি মালাবারী খৃষ্টান। স্বামী ত্রিবাঙ্কোরের এক বড় আরণ্যক রাজপুরুষ, পরে আমাকে চমৎকার মধু ও আশ্চর্য বল্কলের আসন উপহার দিয়েছিলেন। আমি সে সময়ে—বোধ হয় ১৯৪৫ সালে ত্রিবন্দ্রমে রাজ-অতিথি, সর্বত্র গান গেয়ে চ'ষে বেড়াচ্ছি। একদা হঠাৎ রাজ-অতিথিশালায় এই মহিলাটিকে দেখলাম বৈঠকখানা ঘরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে তিনি আদৌ চিনতেন না, আমার গানও শোনেন নি। আমার গেরুয়া বেশ-এর 'পরে চোখ পড়তেই তিনি একটু একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেই উঠে অকুণ্ঠে আমার কাছে এসে বললেন চমৎকার ইংরাজিতে: "স্বামীজি! আমার একটি সদ্যোজাত শিশুকে আশীর্বাদ করতে যদি একটিবার আমাদের বাংলোয় পদধূলি দেন তাহ'লে বড়ই বাধিত হব। কিন্তু ব'লে রাখি আমরা খৃষ্টান—ক্যাথলিক—আপনার যদি শুচিবাই থাকে—" আমি বললাম হেসে: "ও বালাই আমার নেই। কেবল যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে একটি প্রশ্ন করতে চাই।" তিনি বললেন: "স্বচ্ছন্দে।" আমি বললাম: "আপনি খৃষ্টান হ'য়ে আমার মত হিন্দু স্বামীজির আশীর্বাদ চাইছেন কেন? আপনি কি হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন?" তিনি সোজাসুজি বললেন: "না। আমি আপনার কাছে এসেছি শুধু একটি কারণে: সেটি এই যে—আমি এই প্রথম দেখলাম এমন একটি মানুষ যে শুধু আনন্দকেই জেনেছে, দুঃখকে না।" আমি হো হো ক'রে হেসে বললাম: "আপনি বলেন কি! আমি জীবনে কত দুঃখ পেয়েছি যদি জানতেন—" তিনি বাধা দিয়ে বললেন: "আমাকে কেন মিথ্যে মিথ্যে ভোগা দিচ্ছেন স্বামীজি? (Why do you humbug me, Swamiji?) আপনার মুখে দুঃখ শোকের একটি রেখাও পড়ে নি এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে। এমন দুঃখশোকের চিহ্নলেশহীন মুখ আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি ব'লেই আপনার কাছে ধর্ণা দিতে এসেছি—যদি দয়া ক'রে আমার শিশুটিকে একটু আশীর্বাদ করেন এসে।"

হাসিতে আমরা কেউই কম নই তো। তাই গল্পটি ব'লে—ডোরাস্বামী, কালীদা, শ্রীকান্ত, মোহন ও ইন্দিরার সঙ্গে কোরাসে অট্টহাস্য ক'রে আমি রাজপ্রাসাদ কাঁপিয়ে দিলাম। হাসি থামলে কালীদাকে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল (যদি ও বলি নি): "ন্যাবা সবই হলদে দেখে, কালীদা! আনন্দময় পুরুষই আনন্দ দেখে চার ধারে।" বলিনি—কারণ মনে হ'ল কথাটা খানিকটা বৈষ্ণব বিনয়ের মতনই শোনাবে—যার মামুলি অতিপ্রয়োগে ধার ক্ষ'য়ে গেছে। জীবনে ভুল করেছি বহুবারই, কেবল এই একটি জায়গায় ভুল করিনি—এই মিথ্যে বৈষ্ণব বিনয়ের ভঙ্গি করার কপটাচারকে সাধ্যমত বর্জন ক'রে এসেছি আকৈশোর। তাই তো সেদিন কালীদাকে বলেছিলাম: "আপনার কাছে লুকোবো না কালীদা, আমার খুব আনন্দ হয়েছিল আপনার সে পত্র পেয়ে—যাতে আপনি লিখেছিলেন যে আমার স্মৃতিচারণ প'ড়ে আপনি 'অভিভূত' হয়েছেন। কারণ আপনার মতন ক্রিটিককে যে আমি অভিভূত করতে পারব এ-ভরসা আমার সত্যিই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম এত বই পড়বার আপনি হয়ত সময়ই পাবেন না, বা পেলেও আমার নানা মন্তব্যের জন্যে ফের আমাকে তিরস্কার করা সুরু করবেন।"

কালীদা উত্তরে বলেছিলেন—"আপনি আজ আপনাকে নিয়ে পৌচেছেন যেখানে—আপনার মনে লাগবার কথা নয় কে কী বলে না বলে। কেবল একটি কথা আপনাকে অকপটেই বলতে পারি যে, আমি আপনাকে সমালোচনা করি 'ক্রিটিক' হয়ে নয়, শুধু এই জন্যে যে, আপনি নিজেকে অযথা ছোট করেন তাদেরকে বড় করে ধরতে—যারা তেমন বড় নয়। এইটুকু বলে আমার এ-দুশ্চিকিৎস্য দুর্মুখতাকে ক্ষমা করবেন এই অনুরোধ রইল।"

তবু তাঁর নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার দুঃখ হয়ত আমি মনে টাঙিয়ে রাখব ভেবে—তিনি এবার আমার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়েছিলেন "পরে পড়বেন" বলে। সে-চিঠিটি ও তার উত্তরে আমার ছড়াটি উদ্ধৃত ক'রে কালীদা-ডোরাস্বামী প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি এবার।

কালীদার চিঠিটির ভূমিকা (contest) হ'ল এই, আমি তাঁকে মাসখানেক আগে আমার MIRA IN BRINDABAN কাব্যনাট্যটি উপহার পাঠাই,—তাতে

নবীন বাঙলার স্রষ্টা বিধানচন্দ্র

উপানন্দ

অকাল সন্ধ্যার কালোছায়া পড়েছে সর্ব্বত্র। অস্তমিত বিধানচন্দ্র। বিরাট বনস্পতির সমাধি। নব বাঙলার মহাগুরুনিপাতের বর্ষারম্ভ। শোকাচ্ছন্ন জন্মভূমি। জন্ম-মল্লিকার সৌরভে বিমণ্ডিত ছিলেন বিধানচন্দ্র। দূর করে গেছেন স্বজাতির প্রাণহীন স্থবিরতা, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার আত্মমর্যাদাকে সমগ্র বিশ্বের ভেতর। জাতীয় ইতিহাসের তিনি এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনা অনন্যসাধারণ। তিনি নবীন বাঙলার স্রষ্টা, মহান্ নেতা। প্রাচীন অন্তরকেই তিনি আবার নতুন আলোকে জগতের সাম্‌নে তুলে ধরে গেলেন।

আজ তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের অনুধ্যানই হোক্ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁর কথাই হোক আজকের দিনে আমাদের একমাত্র বক্তব্য।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১০-২০ মিনিটের সময় তিনি এই মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্যকায়া ধারণ করে অবতরণ করেছিলেন, আর ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১২-৩ মিনিটের সময় তিনি মহাপ্রস্থান করলেন। জন্ম দিনেই জন্মোৎসব সমারোহ শেষ করে নীরবতার ভেতর রেখে গেলেন সত্যধন, মৃত্যুকে তিনি বরণ করে মৃত্যুর অতীত লোকে চলে গেলেন। চিন্ময় পুরুষ তিনি। আশী বৎসর পূর্ণ করে সন্ধ্যার কবরীচ্যুত কুসুমের মত তাঁর আয়ু পড়লো ঝরে কাল-স্রোতের বুকে।

ভগবান পরমহংস বলেছেন আর গীতাতেও উক্ত আছে, যে মানুষকে যত বেশী লোকে ভালোবাসে, সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে, শ্রীভগবানের অংশ তাঁর মধ্যে তত বেশী। ভগবানের অংশ যে এই মহাজীবনের ভেতর খুব বেশী ছিল, এই সূত্র ধরে তা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যক্ষভাবে আজ তাঁকে আমরা হারিয়েছি বটে, পরোক্ষভাবে আমরা তাঁকে নিবিড় ভাবে পেয়েছি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মপথের অন্যতম দোসর ছিলেন মহাত্মা প্রকাশচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্র তাঁর তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মানন্দের আশীর্ব্বাদপূত জন্মলগ্ন তাঁর নব-বিধান সমাজের নামানুসারেই নবজাতকের নাম বিধানচন্দ্র। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। মায়ের নাম অঘোর কামিনী। পাটনায় তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ১৮৯৭ সালে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) ও ১৯০১ সালে পাটনা কলেজ থেকে গণিত শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেন। তারপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯০১ সালে তাঁর পিতৃদেব সরকারী কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই তাঁর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসারবাসিনীর মৃত্যু।

১৯০৬ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল এম, এস পরীক্ষায় বিধানচন্দ্র উত্তীর্ণ হন। তারপর বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হন। মেডিকেল

নবীন বাঙলার স্রষ্টা বিধানচন্দ্র

উপানন্দ

অকাল সন্ধ্যার কালোছায়া পড়েছে সর্বত্র। অস্তমিত বিধানচন্দ্র। বিরাট বনস্পতির সমাধি। নব বাঙলার মহাগুরুনিপাতের বর্ষারম্ভ। শোকাচ্ছন্ন জন্মভূমি। জন্ম মৃত্তিকার সৌরভে বিমণ্ডিত ছিলেন বিধানচন্দ্র। দূর করে গেছেন স্বজাতির প্রাণহীন স্থবিরতা, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার আত্মমর্যাদাকে সমগ্র বিশ্বের ভেতর। জাতীয় ইতিহাসের তিনি এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনা অনন্যসাধারণ। তিনি নবীন বাঙলার স্রষ্টা, মহান নেতা। প্রাচীন অন্তরকেই তিনি আবার নতুন আলোকে জগতের সামনে তুলে ধরে গেলেন।

আজ তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের অনুধ্যানই হোক আমাদের প্রধান কর্তব্য। তাঁর কথাই হোক আজকের দিনে আমাদের একমাত্র বক্তব্য।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১০-২০ মিনিটের সময় তিনি এই মর্ত্যলোকে মহাকায়া ধারণ করে অবতরণ করেছিলেন, আর ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১২-৩ মিনিটের সময় তিনি মহাপ্রস্থান করলেন। জন্ম দিনেই জন্মোৎসব সমারোহ শেষ করে নীরবতার ভেতর রেখে গেলেন মহাধন, মৃত্যুকে তিনি বরণ করে মৃত্যুর অতীত লোকে চলে গেলেন। চিন্ময় পুরুষ তিনি। আশী বৎসর পূর্ণ করে সন্ধ্যার কবরীচ্যুত কুসুমের মত তাঁর আয়ু পড়লো ঝরে কাল স্রোতের বুকে।

ভগবান পরমহংস বলেছেন আর গীতাতেও উক্ত আছে, যে মানুষকে যত বেশী লোকে ভালোবাসে, সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে, শ্রীভগবানের অংশ তার মধ্যে তত বেশী। ভগবানের অংশ যে এই মহাজীবনের ভেতর খুব বেশী ছিল, এই সব ধরে তা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যক্ষভাবে আজ তাঁকে আমরা হারিয়েছি বটে, পরোক্ষভাবে আমরা তাঁকে নিবিড় ভাবে পেয়েছি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অধ্যাত্মপথের অন্যতম দোসর ছিলেন মহাত্মা প্রকাশচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্র তাঁর তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মানন্দের আশীর্বাদপূত জন্মলগ্ন তাঁর নব বিধান সমাজের নামানুসারেই নবজাতকের নাম বিধানচন্দ্র। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। মায়ের নাম অঘোর কামিনী। পাটনায় তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ১৮৯৭ সালে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) ও ১৯০১ সালে পাটনা কলেজ থেকে গণিত শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেন। তারপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৯০১ সালে তাঁর পিতৃদেব সরকারী কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই তাঁর সর্ব জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসারবাসিনীর মৃত্যু।

১৯০৬ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল, এম, এস পরীক্ষায় বিধানচন্দ্র উত্তীর্ণ হন। তারপর বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন। মেডিকেল

কলেজে হাউসসার্জেনরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন. কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় এই সময়ে সুরু হয়। ১৯০৮ সালে তিনি লাভ করেন এম, ডি, ডিগ্রী। ১৯০৯ সালে বাইশে ফেব্রুয়ারী উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে বিলাত যাত্রা করেন, মার্চ্চ মাসের শেষভাগে লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে মে মাসে বিশ্ববিখ্যাত বার্থোলোমিউজ শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি হন।

বিধানচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় যখন বিলাতে যান, তখন তাঁর সম্বল ছিল মাত্র বারো শত টাকা। এই টাকায় তিনি দু'বৎসর ইংলণ্ডে বাস করে এসেছেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল লুকিসের পরামর্শে তিনি সেণ্ট বার্থোলো-মিউজ হাসপাতালে দুবৎসরের মধ্যে এফ আর সি এস আর এম আর সি পি পড়বার জন্যে গেলেন। কলেজের ডীন অবিশ্বাসের হাসি হেসে বিধানচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। এই কলেজে ভর্ত্তি হবার জন্যে বিধানচন্দ্রের জেদ চেপে গেল। তিনি ত্রিশবার ডীনের কাছে গিয়েছেন আর প্রত্যেক বারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। একদিন ডীনের মত হঠাৎ বদলে গেল, সম্মত হোলেন তাঁকে ভর্ত্তি করে নিতে। ভর্ত্তির ফি চল্লিশ গিনি। অবশেষে ডীন কিস্তিতে টাকা নিতে রাজী হোলেন। দশ গিনি দিয়ে ভর্ত্তি হোলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করতে লাগলেন। সকাল সাড়ে নটা থেকে একটানা বিকেল সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। দুপুরে লাঞ্চ খাবার পয়সা জুটতো না। শব ব্যবচ্ছেদের পর সংরক্ষক শবের দাম চাইলো বারো গিনি। তিনি বিস্মিত হোলেন, অত টাকা দেবেনই বা কি করে! গেলেন তাঁর অধ্যাপক ডাঃ এডিসনের কাছে। তিনি বিধানচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন 'তোমার কিছু দিতে হবে না।'

বিধানচন্দ্র ভাবলেন ডাঃ এডিসন বুঝি তাঁর দারিদ্র্যের জন্যে করুণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বললেন—কিছু দেবার ক্ষমতা আমার আছে। ডাঃ এডিসন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি সিলেকসন কমিটিতে আছেন। তাঁরই কথামত তিনি বিধানচন্দ্রকে ভর্ত্তি করে নিয়েছেন। সে সময়ে তীব্র আকারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছিল। এজন্যে ঐ কলেজে ভারতের বিশেষতঃ বাংলাদেশের কোন ছাত্রকে ভর্ত্তির বিরুদ্ধে তিনি আর দু' একজন ব্যতীত সকল সদস্যই রয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন—তুমি যে সব শব ব্যবচ্ছেদ করেছ, তা এত নিখুঁত যে, সেগুলি ছাত্রদের দেখিয়ে ক্লাসে পড়ান যায়। তোমাকে কোন ফি দিতে হবে না। কয়েকদিন পরে, বিধানচন্দ্র তাঁর কলেজের বেতনের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে গেলেন অধ্যক্ষ বল্‌লেন—'আর টাকা দিতে হবে না।' এই অধ্যক্ষই তাঁকে ত্রিশবার ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই কলেজে ভর্ত্তি করতে রাজি হননি। বিধানচন্দ্র শুনলেন—তিনি চর্ম্মবিভাগে যে কাজ করতেন তাতে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ এতই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, বছরে ষাট পাউণ্ড দিয়ে একজন সহকারী রেখে যে কাজ করতে হোতো, তাঁর পরীক্ষামূলক কাজে তাই হয়ে গিয়েছে। এজন্যে তাঁরা বিধানচন্দ্রের কাছ থেকে মাইনের টাকা নিতে রাজি হোলেন না।

বিধানচন্দ্র এম, আর সি, পি ও এফ, আর, সি, এস পাশ করে ডীনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ডীন বল্‌লেন—'রায়, আমি আমার আগেকার ব্যবহারের জন্যে আন্তরিক লজ্জিত। আর একটা বাঙ্গালী ছেলে এগার বারের পর এম আর সি পি পাশ করেছিল। তাই বাঙালী ছেলেদের ওপর আমার এই ধারণা হয়েছিল। কোন ইংরেজ ছেলে দু' বছরে এম আর সি পি ও এফ আর সি এস পাশ করতে পারে না। আমি যতদিন ডীন আছি ততদিন তোমার চিঠি নিয়ে যে ছেলেই আসবে, তাকে আমি বিনা দ্বিধায় ভর্ত্তি করে নেবো।'

বিধানচন্দ্র চৌদ্দ পনেরো জন বাঙ্গালী ডাক্তারকে ঐ কলেজে পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই পরবর্ত্তীকালে ভারত-বিখ্যাত চিকিৎসক হয়েছেন। অত্যন্ত দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করে বিধানচন্দ্রকে ইংলণ্ডে দিন কাটাতে হয়েছে। সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকার বেশী তিনি খরচ করতে পারতেন না। লাঞ্চ খাবার পয়সা তাঁর কোনদিনই জুটতো না। ইংলণ্ড থেকে যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন ট্রেনের টিকিট কেটে তাঁর পকেটে মাত্র পনরো টাকা, তার থেকে আবার এক-জন সহযাত্রীকে ধার দিলেন দশ টাকা। সেটা ছিল ১৯১১ সালের জুলাই মাস।

তিনি যে সময়ে বিলাতে পড়তে যান সে সময়ে টমাস কুক্ কোম্পানিতে বার্থ বুক করা হয়ে গেছে। আর মাত্র

দিন কয়েক বাকী। হঠাৎ জাহাজ কোম্পানি জানতে চাইলো বিলেতের জাহাজে যে বার্থটি রিজার্ভ হয়েছে, তার যাত্রী ইউরোপীয় না ভারতীয়।

ওরা জানতে পারলো—বার্থটি রিজার্ভ করেছে ভারতীয় ছাত্র। অম্নি জানিয়ে দিল ভারতীয় এই যাত্রীটিকে কেবিনের অপর বার্থেরও ভাড়া দিতে হবে কিম্বা জোগাড় করে দিতে হবে আর একজন ভারতীয় যাত্রী। অনুসন্ধানে বিধানচন্দ্র জানতে পারলেন—লণ্ডনের হেড অফিস থেকে নির্দ্দেশ এসেছে, একই কেবিনে একজন ভারতীয় এবং আর একজন ইউরোপীয়ানের স্থান হোতে পারেনা, এম্নি বর্ণবিদ্বেষ। অতএব এ জাহাজে যেতে হোলে তাঁকে একজন ভারতীয় যাত্রী খুঁজে নিতে হবে। নতুবা দিতে হবে ডবল ভাড়া।

বিধানচন্দ্র বললেন—'খুঁজে নিতে হয় তো নিন আপনারা। আমি খুঁজতে যাবো কেন!' উত্তর এলো—'তাহোলে আপনি পরের জাহাজেই যাবেন। এবার আপনার যাওয়া হবে না।' কর্নেল লাকিসের কথা তাঁর মনে পড়লো, তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। কর্নেল লাকিস তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি ছুটলেন কর্নেল সাহেবের কাছে, জানালেন জাহাজ কোম্পানির বর্ণবৈষম্যের কথা। কর্নেল লাকিস সব শুনলেন। তৎক্ষণাৎ টেলিফোন রিসিভার তুলে ধরলেন। জাহাজ কোম্পানী তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে অবশেষে বিধানচন্দ্রকে সে জাহাজেই যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল।

কিছুদিন আগেও ধনকুবেরের দেশ মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে বর্ণবৈষম্যের জন্যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রকাণ্ড হোটেলে গিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন। মধ্যিখানের এক টেবিল নিয়ে তিনি বসলেন সকলের মধ্যে। সবাই চর্ব্বচষ্য খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলো। গল্প গুজব সুরু করে দিলে নিজেদের মধ্যে। 'বয়'রা সবার টেবিলে নানা খাবার পরিবেশন করে যেতে লাগলো। কার কি প্রয়োজন বার বার এসে জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগলো সবাইকে। কিন্তু ডাঃ রায় ও তাঁর সঙ্গীদের কারো কাছে কেউ এলো না। উনি তখন ক্ষুধায় কাতর। হোটেলের শ্বেতাঙ্গ মহিলা ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করতেই তিনি বললেন 'এই হোটেল শ্বেতাঙ্গদের জন্যে, কালা আদমিদের জন্যে নয়। নিগ্রোদের এখানে প্রবেশ নিষেধ।' ডাঃ রায় প্রতিবাদ জানালেন। বললেন—তিনি ভারতবাসী, নিগ্রো নন—' শ্বেতাঙ্গ মহিলা বললেন—'সে একই কথা।' হোটেলের দ্বার দিলেন রুদ্ধ করে। সেদিন বিকেলেই ছিল সেই সহরের মেয়র কর্তৃক ডাক্তার রায়ের সম্বর্দ্ধনা সভা। সম্বর্দ্ধনা সভায় সহরের বিশিষ্ট নাগরিক সাংবাদিকদের কাছে ডাক্তার রায় ঘটনাটি সবিশেষ জানালেন। বললেন—'তিনি শুধু বিলেত থেকে পাশ করা একজন বিশিষ্ট ডাক্তার নন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর ও কলিকাতার মেয়র নন, স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিকও বটে। হোটেলে তাঁর প্রতি এই অভদ্র আচরণ ভারতবাসীর প্রতিই অপমান। ভারতের অস্পৃশ্যতা নিয়ে জোর গলায় এখানে তো খুব প্রচার কার্য্য চলে। কিন্তু ভারতে এমন ধারা বর্ণ বৈষম্য নেই।' মেয়র ঘটনাটি শুনে দুঃখ প্রকাশ করে ডাঃ রায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন মুল্লুকের বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সাদায় কালোয় এমনি তরো বর্ণ বৈষম্যের আজও অবসান হয়নি। এখনও বহু আমেরিকান আমাদের ঘৃণা করে কালা-আদমি বলে। এই সেদিনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত জিঃ এল মেহেতা ও তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে শ্বেতাঙ্গ হোটেলে খাবার পরিবেশন করা হয়নি। যেদিন তোমরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে এর প্রতিশোধ নিতে পারবে, আর এই সব বর্ণবিদ্বেষপরায়ণ শ্বেতাঙ্গ জাতিকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারবে, সেদিন সত্যিকারের স্মৃতি-তর্পণ করা হবে বিধানচন্দ্রের মত মহামানবের। বিধানচন্দ্র যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, বর্ব্বরতা ও পাশবিক ব্যবহার দেখেছেন, সেখানেই তিনি শির উন্নত করে দাঁড়িয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে বহু গল্প আছে, সেগুলো গল্পের মত গল্প, একটি নয়, দুটি নয়—অনেক অনেক। এসব গল্প শুনে তোমরা বহু শিক্ষা লাভ করতে পারো, ভবিষ্যতে বিধানচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আদর্শ মানুষ হোতে পারো।

এম আর সি পি ও এফ আর সি এস ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার কলেজে) এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন ও শিক্ষক হন। ১৯১৬ সালে তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হন এবং ঐ বৎসরই তাঁর প্রসিদ্ধ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ী ক্রয় করেন। ১৯১৯ সালে সরকারী চাকুরি ত্যাগ করে তিনি কারমাইকেল (বর্তমানে আর জি কর) মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হন এবং এখান থেকেই সুরু হয় তাঁর ডাক্তার হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পালা। ১৯২২ সালে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯২৩ সালে সুরেন্দ্রনাথকে পরাস্ত করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। এ সময়ে তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টি ভুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর তিরোভাবের পর স্বরাজ্য দলের অন্যতম কর্ণধার হয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্র তাঁকে সমাদরে আসন দিল। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের ৪৩ তম অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হন। পর বৎসর লাহোর অধিবেশনে তিনি ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য

করে তিনি ছয় মাসের জন্যে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে পরপর দুবার তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজির আহ্বানে আবার তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যুদ্ধ সম্পর্কীয় কংগ্রেস নীতির সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়াতে তিনি ঐ সদস্য পদ ত্যাগ করেন। এরপর ২ বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের সর্ত্তে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ১৯৪৮ সালে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভার পতন হোলে, বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী দলের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী রূপে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। সেই সময় থেকে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী রূপে তিনি বাঙলা ও বাঙালী জাতির উন্নতিকল্পে বহু কাজ করে গেছেন। তাঁর তিরোভাবে বাঙলার ক্ষতি অপরিমেয়। আধুনিক বাঙলাকে তিনি গড়ে গেছেন মহান সাফল্যের সঙ্গে, বাঙলার বহু দুরূহ সমস্যারও সমাধান করে গেছেন। বিরাট শিল্পনগরী দুর্গাপুরের জনক বিধানচন্দ্র। তাঁর নামেই দুর্গাপুরের নাম হবে বিধাননগর। তিনি বলে গেছেন, আমরা সত্যের বন্দনায় যেন পড়ে না থাকি। বিরাট কর্ম্মী, মহান নেতা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, শিক্ষক, সমাজসেবী, শাসক ও বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ রূপে তিনি স্বজাতির উন্নতি কল্পে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেখিয়ে গেছেন—কিভাবে সামান্য মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে অতিমানুষ হওয়া যায়। তাঁর ভেতর দেখেছি আমরা অদম্য কর্ম্মশক্তি যা আজকের দিনে জহরলাল নেহেরুর মত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিধানচন্দ্রের মধ্যে দেখেছি আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবের মৈত্রী ও সামাজিকতা, বিপিনচন্দ্রের প্রজ্ঞা, দেশবন্ধুর প্রেম, প্রফুল্লচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবা, আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন আত্মিক আদর্শ। তিনি জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্মযোগের সাধনালব্ধ পরম সিদ্ধির বিভূতি প্রকাশ করে গেছেন সর্ব্বক্ষেত্রে।

তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহান্ আদর্শ, তাঁর অমিত কর্মশক্তি তোমাদের অন্তরে প্রেরণা এনে দিক। এই মৃত্যুহীন নবীন বাঙলার স্রষ্টার উত্তরসাধক হয়ে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, স্বদেশ ও স্বজাতিকে তোমরা সর্ব্বোন্নত করে তোলো, তাহোলেই তাঁর প্রকৃত স্মৃতি পূজা হবে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের যে নব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবে, তার মধ্যে তোমাদের যথাযোগ্য স্থান যাতে হয় তার জন্যে বিধানচন্দ্র পথ রচনা করে গেছেন, তোমরা সেই পথে অগ্রসর হও, কিশোর জগতের বন্ধুগণ! তোমাদের কাছে আমার এই নিবেদন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভেতর দিয়ে অতীত যে নিয়ত আপনাকে কিভাবে গড়ে তুলছে সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে এগিয়ে চল—চরৈবেতি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম্ম

কাউন্ট লিও টলষ্টয়
রচিত

গমের দানা

সৌম্য গুপ্ত

[উনবিংশ-শতকের সুপ্রসিদ্ধ রুশ-সাহিত্যিক কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত-জীবনীর পরিচয় তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছো—'কিশোর-জগতে' প্রকাশিত তাঁর অন্য একটি কাহিনীর সার-মর্ম্ম আলোচনাকালে। কাজেই বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীকার লিও টলষ্টয় সম্বন্ধে আর নতুন করে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি কাহিনীই শুধু যে সাহিত্য-সম্পদে অপরূপ বৈচিত্র্যময় তাই নয়, বিবিধ সারগর্ভ নৈতিক-উপদেশেও সমুজ্জ্বল হয়ে আজো সারা পৃথিবীর জনগণের মনে অভিনব মহান্-আদর্শের সাড়া জাগিয়ে তোলে। কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের কাহিনীগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো—বিচিত্র মানবিকতার আবেদন —যা দেশ-কাল-পাত্রের বিচার করে না এতটুকু। তাই টলষ্টয়ের কাহিনীগুলি আজ এত জনপ্রিয়।]

গ্রামের প্রান্তে ক্ষেতের ধারে খেলতে গিয়ে ছোট ছেলেরা মাটির আলের ফাটলের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেলো অদ্ভুত-ছাঁদের একটা জিনিষ! জিনিষটি দেখতে ঠিক মুরগীর ডিমের মতো···তবে তার গায়ে আগাগোড়া গমের দানার মতো একরাশ খাঁজ-কাটা বুটি! সেই অদ্ভুত-জিনিষটি যে কি, ঠিক ঠাওর করতে না পেরে ছোট ছেলেরা যখন সেটিকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলো পথ-চল্তি এক পথিক। ছেলেদের হাতে এই অদ্ভুত জিনিষটি দেখে তার খুব কৌতূহল হলো···এমন জিনিষ সে এর আগে কখনও চোখে দেখেনি। কাজেই সে আর লোভ সামলাতে পারলো না ···ছোট ছেলেদের হাতে ক'টা পয়সা বখশিস্ গুঁজে দিয়ে, সেয়ানা পথিক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তাদের কাছ থেকে গমের দানার মতো খাঁজ-কাটা ডিমের-ছাঁদের সেই অদ্ভুত জিনিষটি আদায় করে সোজা ছুটলো শহরে···রাজ-দরবারে হাজির হয়ে মোটা টাকার বদলে সেটিকে বেচে দিলো রাজার কাছে!

অদ্ভুত-জিনিষটি হাতে পেয়ে রাজাও অবাক, ঠাওর করতে পারলেন না—সেটি কি ? তিনি তাঁর সভাপণ্ডিতদের ডেকে প্রশ্ন করলেন,—বলতে পারো, এটা কি জিনিষ ?···গমের দানা, না মুরগীর ডিম ?···

সভাপণ্ডিতেরা সবাই গমের দানার মতো বুটিদার ডিমের-ছাঁদের সেই অদ্ভুত জিনিষটি হাতে নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা করে দেখেও কিছুতেই ঠাওরাতে পারলেন না—জিনিষটি আসলে কি ! এই অদ্ভুত জিনিষটিকে রাজার সিংহাসনের পাশে দরবার-কক্ষের জানলার আলশের উপর রেখে সভাপণ্ডিতেরা যখন রহস্য-সমাধানের উদ্দেশ্যে গভীর গবেষণায় মত্ত, এমন সময় বাইরের বাগান থেকে হঠাৎ উড়ে এলো একটা পাখী···খাবার মনে করে গমের দানার মতো বুটিদার সেই ডিমের-ছাঁদের অদ্ভুত জিনিষটিতে ঠোকর দিতে লাগলো। পাখীর ঠোকরে ডিমের মতো সেই অদ্ভুত-জিনিষটির মাঝখানে একটা ফোকর হয়ে গেল

রাজার বিজ্ঞ-সভাপণ্ডিতেরা অবাক হয়ে দেখলেন—সেই ফোকরের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বিরাট-আকারের গমের দানা ! মহা-উৎসাহে সভাপণ্ডিতের দল ছুটে এসে রাজাকে সংবাদ দিলেন—মহারাজ, আপনার প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে পেয়েছি ! এ হলো অদ্ভুত এক-জাতের অতিকায় গম···এই দেখুন—তার বিরাট দানা !

অদ্ভুত-অতিকায় এই গমের দানা দেখে রাজা অবাক···তাঁর কৌতূহল আরো বেড়ে গেল···তিনি তখনি সভাপণ্ডিতদের হুকুম দিলেন—কবে এবং কোথায় এমন অতিকায়-দানাওয়ালা গমের ফসল ফলেছে—খোঁজ নিয়ে অবিলম্বে আমাকে জানান !

হুকুম শুনে সভাপণ্ডিতেরা পড়লেন মহা ফাঁপরে···রাজ্যের পুঁথি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে কোথাও তাঁরা কোনো সন্ধান পেলেন না রাজার এই বেয়াড়া প্রশ্নের ! শেষে হয়রাণ হয়ে রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা জানালেন—মহারাজ, আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-সাধ্যেরও বাইরে···কোনো কেতাবেই খুঁজে পেলুম না, হুজুর, এই অদ্ভুত জিনিষটির এতটুকু হদিশ !

রাজা বললেন—তাহলে উপায় ?···

অনেক চিন্তা করে সভাপণ্ডিতেরা বললেন,—আপনি বরং এক কাজ করুন, হুজুর···রাজ্যের যত প্রবীণ চাষা আছে, তাদের ডেকে খোঁজ করুন—এমন অতিকায় দানা-ওয়ালা অদ্ভুত গমের কথা তারা তাদের বাপ-দাদাদের কাছে কখনো শুনেছে কিনা !

রাজা বললেন,—বেশ ! কথাটা মন্দ বলোনি !

রাজার হুকুমে তখনি দরবারের লোকজন ছুটলো রাজ্যের সবচেয়ে প্রবীন চাষাকে খুঁজে আনতে। চারিদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে তারা অবশেষে দরবারে রাজার সামনে এনে হাজির করলো—চাষাদের এক থুথ্‌ড়ে বুড়ো মোড়লকে ! মোড়লের চেহারা জরাজীর্ণ···সুদীর্ঘ বয়সের চাপে লোলচর্ম-পাণ্ডুবর্ণ···একটিও দাঁত নেই মুখে···কানে ভালো শুনতে পায় না···চোখেও ভালো দেখতে পায় না···কোনোমতে ঢুঁহাতে ঢুটি লাঠির উপর ভর করে টলতে টলতে রাজার সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়ালো সেই বুড়ো চাষা। ডিমের মতো ছাঁদের অতিকায় গমের দানাটি বুড়ো-চাষার হাতে দিয়ে রাজা বললেন,—বলতে পারেন, মোড়ল মশাই, এমন অদ্ভুত গম কোথায় পাওয়া যায় ?···

গমের দানাটি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ বেশ নেড়ে-চেড়ে নজর করে দেখে বুড়ো-চাষা চুপচাপ কি যেন ভাবতে লাগলো। তাকে নিরুত্তর দেখে, রাজা শুধোলেন,—আচ্ছা মোড়ল মশাই, এতখানি বয়সে আপনি তো অনেক দেখেছেন শুনেছেন···আপনি কি কখনো এমন গমের ফসল চাষ করেছেন, কিম্বা কোথাও কিনেছেন বলে, আপনার মনে পড়ে ?

বুড়ো-চাষা আরেকবার সেই অদ্ভুত গমের দানাটিকে পরীক্ষা করে দেখে রাজার পানে তাকিয়ে বললে,—না, হুজুর···এমন ফসলের চাষও কখনো করিনি, হাটে-বাজারে খরিদও করিনি কোনোদিন ! সারা জীবন আমরা শুধু ছোটি-ছোটি দানাওয়ালা গমের ফসলই চাষবাস করে এসেছি···এমন অদ্ভুত, ডিমের মতো বড় দানাওয়ালা গম চোখেও দেখিনি কোনোদিন ! তবে হাঁ, আমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন···তিনি হয়তো এ-ধরণের গমের কথা জানতে পারেন বা দেখে থাকতে পারেন ! আপনি বরং তাঁকেই ডেকে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, হুজুর !

এ কথা শুনে রাজা তখনই থুথ্‌ড়ে মোড়ল চাষার বুড়ো-বাপকে দরবারে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরেই দরবারের দূত মোড়ল-চাষার বুড়ো-বাপকে এনে হাজির করলো রাজার সামনে। বয়সে প্রবীণ হলেও, বুড়ো-বাপের চেহারা কিন্তু তার ছেলে মোড়ল-চাষার চেয়ে অনেক বেশী জোয়ান-খটখটে আর কম-জরাজীর্ণ···চোখের দৃষ্টিশক্তিও বেশ প্রখর এবং কানে একটু কম শুনলেও, তার থুথ্‌ড়ে-ছেলের মতো অতখানি কালা নয়···শুধু একগাছা লাঠির উপর ভর করেই সে দিব্যি সহজভাবে হেঁটে এসে রাজার সিংহাসনের সামনে দাঁড়ালো। রাজা তার হাতে অদ্ভুত গমের দানাটি তুলে দিয়ে শুধোলেন,—বলতে পারেন, দা-ঠাকুর মশাই···এ জিনিষটি কি ?

ডিমের মতো বিরাট দানাটি হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে মোড়ল-চাষার বুড়ো-বাপ বললে,—মহারাজ, এ তো দেখছি, অদ্ভুত এক-জাতের গম !

রাজা বললেন—আপনি কি কখনো হাটে-বাজারে এ রকম গমের ফসল দেখেছেন বা নিজের ক্ষেতে চাষবাস

করেছেন ?···কিম্বা, কোনো দেশে এমন গমের ফসল হয়েছে, সে খবর শুনেছেন ?

সবিস্ময়ে সেই অদ্ভুত গমের দানার দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোড়ল-চাষার বুড়ো-বাপ জবাব দিলে,—না মহারাজ, আমার এতখানি জীবনে এমন অদ্ভুত গম আমি কস্মিনকালে চোখেও দেখিনি···চাষবাস তো দূরের কথা···এমন ফসল যে ক্ষেতে ফলে, সে কথাও কানে শুনিনি কোনোদিন ! কারণ, আমাদের যুগে লোকে যে যার নিজের নিজের জমিতে চাষবাস করে, ফসল ফলিয়ে সংসার চালাতো আর আশপাশের পাড়া-পড়শীদের অভাব প্রয়োজন মেটাতো হাটে-বাজারে বাড়তি-ফসল বেচে। তবে একালের গমের চেয়ে আমাদের আমলে, ক্ষেতে ফসলও জন্মাতো অনেক বেশী, আর সে সব গমের দানাও হতো বেশ বড় বড়···কিন্তু এমন ডিমের মতো বড়-দানার গম আমাদের কালে আমি কখনো চোখেও দেখিনি, হুজুর !···মনে আছে, ছোটবেলায় আমার বাবার মুখে শুনেছি যে, তাঁদের আমলে ক্ষেতে নাকি গমের ফসল ফলতো আরো ভালো, আরো প্রচুর এবং আরো বড় বড় দানাওয়ালা ! আমার বাবা এখনও জীবিত···বাড়ীতেই রয়েছেন মহারাজ, তিনি হয়তো আপনাকে হদিশ দিতে পারবেন—এমন বড় দানাওয়ালা গম তাঁদের আমলে কোথাও চাষবাস হতো কিনা !

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য
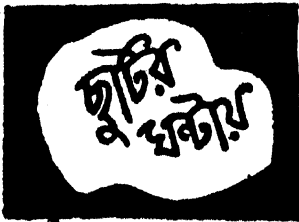
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের অভিনব-ধরণের বিচিত্র-মজার একটি চোখের-ধাঁধার খেলার কথা বলি। ইউরোপের বাজারে এ খেলা দেখানোর উপযোগী এক-রকম খেলনাও কিনতে পাওয়া যায়···সেগুলির নাম—'থোমাট্রোপ,'। আমাদের দেশে ইদানীং বৈদেশিক-মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কড়াকড়ি-বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে, এ ধরণের বিদেশী খেলনাপত্র আমদানী করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বিদেশের এই বিচিত্র-খেলনা 'থোমাট্রোপ' জোগাড় করা আজকাল অসুবিধাজনক হলেও, সামান্য চেষ্টা করলেই তোমরা নিজেরাই অনায়াসে ঘরে বসে এ ধরণের 'থোমাট্রোপ' খেলনা তৈরী করে নিয়ে তোমাদের আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের সামনে বিচিত্র-মজার এই চোখের-ধাঁধার খেলা দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। কি উপায়ে 'থোমাট্রোপ' বানিয়ে চোখের-ধাঁধার এই মজার খেলাটি দেখাতে পারো—আজ তোমাদের তারই আজব কলা-কৌশলের কথা জানিয়ে রাখি।

চোখের-ধাঁধার খেলা ঃ

'থোমাট্রোপ' বানাবার জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—সেগুলি এমন কিছু দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য বা বহুমূল্য নয়···তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই বিনা-খরচে এ সব সামগ্রী সংগ্রহ করা যাবে। তাই গোড়াতেই তোমাদের 'থোমাট্রোপ' বানাতে হলে যে সব জিনিসপত্র দরকার, তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ জন্য চাই—পোষ্টকার্ডের মতো পুরু-ছাঁদের একখানা পেষ্টবোর্ডের (Pasteboard) টুকরো, প্রায় হাতখানেক লম্বা মাপের দু' ফালি শক্ত-মজবুত 'টোয়াইন-সুতো' (Twine-chord) আর ছবি আঁকার রঙীণ পেন্সিল কয়েকটি। এগুলি তোমরা সহজেই জোগাড় করে নিতে পারবে।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, রঙীন পেন্সিলের সাহায্যে পোষ্টকার্ড-সাইজের ঐ 'পেষ্টবোর্ডের' ঠিক

১

মাঝামাঝি-জায়গায় একদিকে উপরের ১নং ছবির ছাঁদে 'ছুটন্ত ঘোড়ার' নক্সাটি এঁকে নাও। ঘোড়ার ছবিটি আঁকা হলে, পেষ্টবোর্ডটিকে উল্টে নিয়ে অপর দিকে রঙীণ পেন্সিল দিয়ে নীচের ২নং ছবির ছাঁদে 'লাগান-হাতে

২

ঘোড়সোয়ারের' নক্সাটি এঁকে ফেলো। তবে মনে রেখো—পেষ্টবোর্ডের দু'পিঠে আঁকা ছবি দুটি যেন কাগজের ঠিক মাঝামাঝি-জায়গায় থাকে। কারণ, ছবি দুটির কোনোটি যদি পেষ্টবোর্ডের মাঝখানে না থাকে বা একপাশে সরিয়ে আঁকা হয়, তাহলে খেলাটি স্বষ্ঠভাবে দেখানো সম্ভবপর হবে না। এমনিভাবে পেষ্ট-বোর্ডখানির এক-পিঠে 'ছুটন্ত-ঘোড়া' আর অন্য-পিঠে 'লাগাম-ধারী ঘোড়সোয়ারের, ছবি দুটি এঁকে নেবার পর, উপরের ১নং এবং ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে ঠিক তেমনি ধরণে ঐ পেষ্টবোর্ডের দু'দিকের দুই প্রান্তে ঠিক মাঝামাঝি-জায়গায় দুটি ফুটো করে, সেই ফুটোর মধ্যে দিয়ে সমান-ছাঁদে 'টোয়াইন-স্থতোর' ফালি দুটিকে গলিয়ে নিয়ে শক্ত করে গিঁট বাঁধো। এবারে ঐ স্থতোর ফালি দুটিকে কয়েকবার বেশ করে পাক দিয়ে নাও! তারপর তোমার চোখের সামনে ঘোড়া আর ঘোড়সোয়ারের আলাদা-আলাদা ছবি-আঁকা স্থতো-বাঁধা পেষ্টবোর্ডখানিকে চোখের সামনে ধরে, পাশের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে দু' হাতের দুই স্থতোর প্রান্ত কখনো বেশ শক্ত করে টেনে রেখে, আবার কখনো খুব ঢিলাভাবে ছেড়ে দিতে থাকো। তাহলেই দেখবে—দু'হাতের স্থতোর টান বারবার শক্ত আর ঢিলে করার ফলে, দু'পিঠে দু'রকমের নক্সা-আঁকা পেষ্টবোর্ডখানি চরকির মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকবে। এভাবে ঘোরবার ফলে, পেষ্ট-বোর্ডের এপিঠে-আঁকা 'ছুটন্ত ঘোড়া' আর ওপিঠে-আঁকা 'লাগামধারী ঘোড়সোয়ারের' ছবি দুটি চরকিপাক খেয়ে ঘুরে ক্রমাগত চোখের সামনে এত দ্রুত আর ঘন-ঘন আনাগোনা করবে যে তাই দেখে মনে হবে—ঐ ছবি দুটি যেন আলাদা-আলাদা নয়—একসঙ্গেই এঁকে রাখা হয়েছে! অর্থাৎ, 'ছুটন্ত-ঘোড়ার' পিঠেই 'লাগাম-হাতে' সজাগ বসে রয়েছে ঐ 'ঘোড়সোয়ার'!

এমনটি কেন হয়, জানো? পেষ্টবোর্ডের দু'পাশে আঁকা আলাদা-আলাদা ছবি দুটিকে দু'হাতের স্থতোর সাহায্যে বারবার খুব তাড়াতাড়ি চোখের সামনে ঘোরানোর ফলে, আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে...এবং তারই দরুণ চোখে ধাঁধা লেগে মনে হয় যে ছবি দুটি আলাদা নয়—যেন একই চিত্র দেখছি! বিজ্ঞানের মতে, এই বিচিত্র দৃষ্টি-বিভ্রমের কারণ—ফটো-ক্যামেরার 'লেন্সের (Lens) মতোই মানুষের চোখের আয়নায় বাইরের প্রতিফলিত-দৃশ্যের (Reflected-Image) স্থায়িত্ব খুবই অল্পক্ষণ... মাত্র ১ সেকেণ্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ! কাজেই চোখের সামনে আমরা যা কিছু দেখি, আমাদের দৃষ্টিতে সেটি ধরা থাকে খুবই অল্প সময়। চকিতের জন্ত...এমন কি, ১ সেকেণ্ডের ১০০০ ভাগের ১ ভাগের মতো সময়ও যদি কিছু আমাদের নজরে পড়ে তো তার স্মৃতি-রেশটুকু রয়ে যায় ঐ ১ সেকেণ্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ সময়টুকুর জন্য। কাজেই হাতের স্থতোর সাহায্যে চোখের সামনে 'ছুটন্ত ঘোড়া' আর 'লাগাম-ধারী ঘোড়সোয়ারের' আলাদা-আলাদা ছবি দুটিকে চকিতের জন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রমাগত দেখানোর ফলে, এ দুটির ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি-রেশ শেষ পর্যান্ত আটকে রয়ে যায় আমাদের নজরে...তাই আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে আর মনে হয়, এ দুটি যেন একই ছবি—পেষ্ট-বোর্ডের এপিঠে আর ওপিঠে আঁকা আলাদা-আলাদা ছবি নয়। এই হলো, এ খেলার আজব বৈজ্ঞানিক-রহস্য!

সিনেমায় বসে তোমরা যে সব চলচ্চিত্র দেখো—তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের এই অভিনব তথ্য—অর্থাৎ, যান্ত্রিক-কৌশলে দ্রুত-গতিতে আলাদা-আলাদা ছবি দেখিয়ে মানুষের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করে অপরূপ বৈচিত্র্য-রচনার স্থনিপুণ কারসাজি!

পরের সংখ্যায় বিজ্ঞানের আরো কয়েকটি বিচিত্র মজার খেলার হদিশ জানাবার বাসনা রইলো! আপাততঃ এবারের এই মজার 'থোমাট্রোপ' খেলাটি নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দেখো।

এমনিভাবে দুই দিকের সুতো টেনে কার্ডখানাকে ঘোরাতে হবে
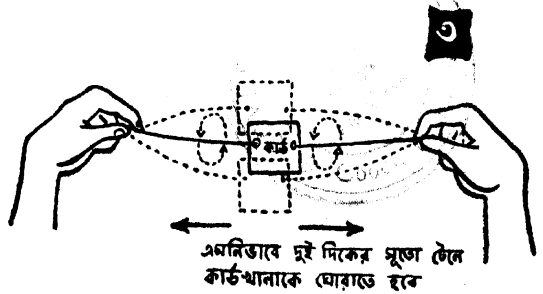
ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। রুমালে ফাঁশ বাঁধার আজব হেঁয়ালী:

পরপৃষ্ঠার ১নং ছবিতে দেখতে পাবে—একটি চতুষ্কোণ রুমাল। এমনি-ধরণের একটি চতুষ্কোণ রুমাল নিয়ে, সেই রুমালের একদিকের একটি কোণ ডান-হাতে এবং অন্য
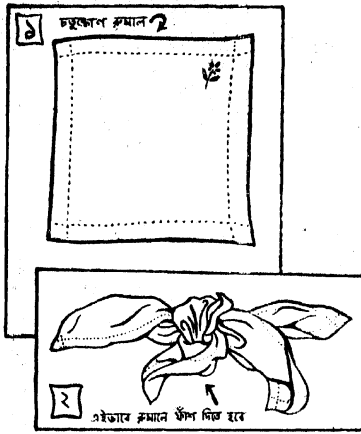
দিকের আরেকটি কোণ বাঁ হাতে ধরে, বুদ্ধি খাটিয়ে এমনভাবে কায়দা করে রুমালটিতে ফাঁশ দিয়ে গিঁট বাঁধো, যাতে ঐ রুমালের ফাঁশটি অবিকল উপরের ২নং ছবির ছাঁদের মতো দেখায়। তবে মনে রেখো—এভাবে রুমালে ফাঁশ বাঁধবার সময়, রুমালটিকে কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও হাত-ছাড়া করা চলবে না···অর্থাৎ, রুমালের দু'দিকের দু'টি প্রান্ত সারাক্ষণ হাতে ধরে রাখতে হবে। বলো তো দেখি, কি উপায়ে রুমালে ফাঁশ লাগানোর এই আজব হেঁয়ালীর মীমাংসা করা যাবে? যদি বলতে পারো তো বুঝবো—বুদ্ধিতে সত্যিই খুব দড় হয়ে উঠেছো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

তিন অক্ষরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এমন একটি জেলার নাম করো, যার শেষ অক্ষরটি বাদ দিলে হয় একটি জলপথ, আর মাঝের অক্ষরটি বাদ দিলে, সেটি কোনদিনই পুরোনো হয় না।

রচনা ঃ চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

৩। তিনটি অক্ষরে নাম মোর হয়েছে গঠন,
আমা ছাড়া কখনই বাঁচা নাহি যায়,
লেজটি কাটিলে মোর দুই প্রাণী হায়,
মাথা কেটে দিলে করি অরণ্যে গমন।
কি নাম আমার এবে বলো দেখি মিতে,
কৃষ্ণশঙ্কর বলে, হাসিতে হাসিতে!

রচনা ঃ কৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। গতবারে প্রকাশিত ছবির বাঁ-দিকে সরবৎ-ভর্তি দ্বিতীয় গেলাসটি তুলে নিয়ে, ছবির ডানদিকে যে দ্বিতীয় গেলাসটি শূন্য রয়েছে, সেটির মধ্যে সরবৎটুক ঢেলে দিয়ে, বাঁ-দিকের গেলাসটি আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলেই দেখবে—এ হেঁয়ালীর সমাধান হয়ে যাবে অনায়াসেই।

২। কচুরিপানা

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

মুরারীমোহন চৌধুরী (ফটিগোদা), নীতা, অশোক, গৌতম, কল্পনা (কলিকাতা), মল্লিনাথ ও বিদ্যুৎ মিত্র (জয়নগর), স্বপন মজুমদার, প্রশান্ত মিত্র ও অরুণ ঘোষ (ফটিগোদা), প্রদ্যোৎ, বিদ্যুৎ, নিলিম, গোকুল, কান্তু, মন্তু, চিনু ও গোরা মিত্র (জয়নগর) আলো, শীলা, ও রঞ্জিৎ বিশ্বাস (কাশীপুর), সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর), দেবাশিস মৈত্র, বুলা ও নন্দিতা (কলিকাতা), অশোক, প্রতিপ ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর), ধর্ম্মদাস ও গৌরাঙ্গ রায় (গোপীকান্তপুর, বাঁকুড়া), শঙ্কর চক্রবর্ত্তী (নবদ্বীপ), অনুরাগময়, পরাগময়, বিরাগময়, শিপ্রাধারা, স্বরাগময়, ধীরাগময় ও মণিমালা হাজরা (মেদিনীপুর), হাবলু, টাবলু, সুমা ও পুতুল মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), পুপু ও ভুটান মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), বিজু ও বুজু আচার্য্য (আলিপুর);

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বুচি, লাল্লা, বাচ্চু, (মীরাট), গোপালী (কলিকাতা), বাপি, বুতাম, পিন্টু, গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), পিন্টু, হালদার (বর্দ্ধমান);

মোটর-গাড়ীর কথা

দেবশর্ম্মা রচিত
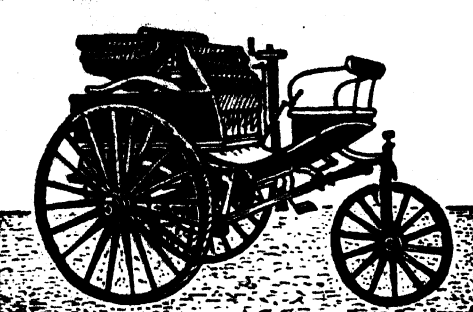
অতঃপর ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডের পথে দেখা দিলো কার্ল বেনজের (CARL BENZ) উদ্ভাবিত আজব-ছাঁদের পেট্রোল-ইঞ্জিন চালিত বিচিত্র এই তিন-চাকার মোটর-গাড়ী। এ গাড়ী চলতো – মাত্র একটি সিলিণ্ডারে (CYLINDER) এবং গতি-বেগ ছিল একালের উন্নত-ধরণের মোটর-গাড়ীর চেয়ে অনেক কম। বিলাতের যাদুঘরে এ গাড়ীর নমুনা সযত্নে রাখা আছে

জার্ম্মানীর মান্‌হিম-শহরের কারখানায় কার্ল বেনজের তৈরী পেট্রোল-ইঞ্জিন চালিত বিচিত্র মোটর-গাড়ীর আবির্ভাব হবার পর, ১৮৮৯ সালে ইউরোপের শহরের পথে চলতে সুরু করলো সার্পোলেৎ (SERPOLLET) সাহেবের পরিকল্পিত টমটম-গাড়ীর মতো চেহারার সেকালের অভিনব এই তিন-চাকার বাষ্পীয়-শক্তি (STEAM) চালিত আরো বেশী যাত্রীবাহী মোটর-যান। এ গাড়ীরও গতিবেগ ছিল মন্দ, তাই বিশেষ জনপ্রিয় হলো না।
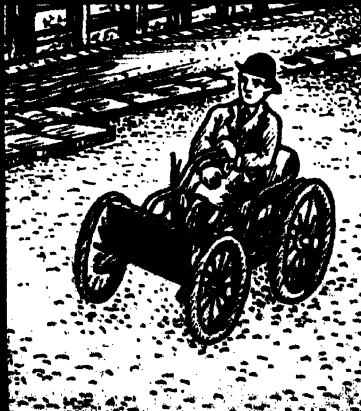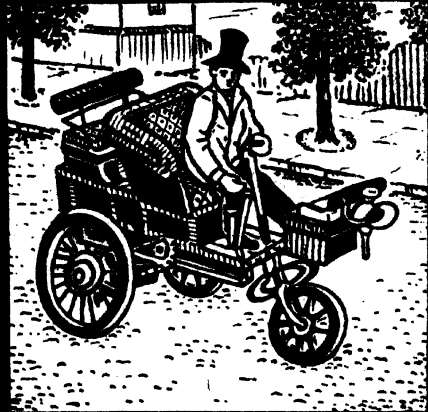
অবশেষে ১৮৯৩ সালে আমেরিকাতে হেনরী ফোর্ড নামে এক তরুণ যান্ত্রিক-বিজ্ঞানবিদ্ পেট্রোল-চালিত চার-চাকার এই বিচিত্র-উন্নত-ছাঁদের মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণ করে সারা দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়ে তুললেন। পেট্রোল-ইঞ্জিনের উন্নত-ধরণের কলকব্জার সুব্যবস্থা ছাড়াও, হেনরী ফোর্ডের (HENRY FORD) এই অভিনব মোটর-গাড়ীর চাকা চারখানিতে সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হলো রবারের তৈরী টায়ার (TYRES) আর টিউব (TUBES) – যা একালে সব মোটর-গাড়ীতে দেখা যায়। এর পূর্ব্বে সেকালের সব গাড়ীর চাকাই হতো কাঠের কিম্বা লোহার তৈরী।

সঙ্ঘর্ষটা নিতান্তই অতর্কিতে সঙ্ঘটিত হয়ে গেল।

বিনামা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌ছিল একটু দ্রুত গতিতেই। এম্‌নিতেই তার একটু দেরী হয়ে গেছে।

পিশির বাড়ী বিয়ের নেমন্তন্ন।

সাজ-পোষাকের ঘটা সেদিন একটু বেশী ছিল। তার কারণটাও নেহাৎ কম নয়। সবে সঙ্গীত-নাটক-আকাদমী থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বেরিয়েছে। তাই বাসর ঘরে গান গাইবার ভার পড়েছে ওর ওপর।

বিনামার বন্ধুরা বলে, যে-সাজেই ও আসুক না কেন, তাতেই ওকে অপরূপ মানিয়ে যায়। তা' সে নিতান্ত আটপৌরে হাওড়া হাটের সাড়ীই হোক,—আর নতুন নমুনার নাইলনের পরিধেয়ই হোক!

কিন্তু আজ ওর প্রসাধন সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত।

অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আগে দেবতারা নানা রকম অস্ত্রে মা দুর্গাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বিনামা নিজেই সর্ব্বরকমে নিজেকে নিখুঁত করে সাজিয়ে এনেছে। দায়িত্ব ত' বড় কমখানি নয়। বাসর ঘরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে।

সর্ব্বরকমে নিজেকে সুসজ্জিত করে বেলের গোড়ে দিয়ে খোঁপার বেষ্টনী তৈরী করেছিল।

এমনিতেই সুন্দরী বলে বিনামার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আজ যেন সে সবাইকার চোখ ঝল্‌সে দিতেই এসেছে! আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বিনামা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌ছিল। গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রীদলকেও ঘায়েল করা হবে কিনা সেটাও হয়ত বিনামার মনে ওঠা-নামা করছিল।

আঁখির ভ্রু-ভঙ্গীতে, কি পরিধেয়ের পারিপাট্যে, কিম্বা অলকের কুসুমে, অথবা সুরের মাধুর্য্যে বর থেকে সুরু করে ঘরভর্ত্তি বর্বরগুলিকে আহত করতে হবে—তারপর বিজয়িনীর মতো গ্রীবা ভঙ্গী করে, কোনো দিকে বিন্দুমাত্র

না তাকিয়ে তর্ তর্ করে নেমে চলে আস্‌বে এই সিঁড়ি দিয়েই—

'এই মধুর পরিকল্পনাটা মনে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল—ঠিক এমনি সময় এই অতর্কিত সঙ্ঘাত। কে জান্‌তো—ঠিক এই মুহূর্ত্তে রজত রুই মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা ডালের বালতি নিয়ে ততোধিক দ্রুতবেগে নেমে আস্‌ছিল তেতলার ছাদ থেকে।

কেউ ব্রেক্ কস্‌তে পারলে না!

রজত

সঙ্গে সঙ্গে হল দারুণ সঙ্ঘাত।

রজতের হাতের মুড়ো কণ্টকিত ঘন ডাল বিনামার মুখ আর গাল বেয়ে ঝরে পড়ে শ্রাবণের ধারার মতো নাইলন সাড়ীটিকে সিক্ত করে তুললো।

ততক্ষণে রজত হক্‌চকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে! হাতের পাত্রটি তীব্র আপত্তির স্বর তুলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে চলে গেল। আর বিনামার অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ কেন্দ্রীভূত হল—রজতের মুখের ওপর।

মুখে শুধু অস্ফুট উচ্চারণ করলে, ক্রুট্।

রজতের মনে হল—পাখীর গলায় গাওয়া একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভেঙে একেবারে খান্ খান্ হয়ে গেল।

প্রথমটা সে সত্যি-একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। তারপর হাত বাড়িয়ে বিনামার মুখ থেকে ঘন ডালের স্রোত সরিয়ে দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হল!

বিনামার চোখ দুটি থেকে আগুনের ফুল্‌কি বেরিয়ে এলো।

—আপনার সাহস ত' কম নয়! আবার গায়ে হাত দিতে আস্‌ছেন!

আম্‌তা আম্‌তা করে রজত উত্তর দিলে, এই তেতলার ছাদে পরিবেশন করে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছিলাম কিনা! বরযাত্রীর দল মাছের কালিয়ার জন্যে ভীষণ তাড়া দিচ্ছে!

বিনামার ইচ্ছে হচ্ছিল—এই ফর্সা ছিপ্‌ছিপে সুশ্রী ছেলেটার গালে চটাস্ করে এক চাপড় কসিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না—হাতেও তার ডাল চট্‌চট্ করছিল।

তাই দাঁতে-দাঁত চেপে শুধু মন্তব্য করলে—পরিবেশন! কালিয়া! কি করে কালিয়া রেঁধে—পরিবেশন করতে হয়—শিখিয়ে দেবো একদিন!

রজতের অপ্রস্তুত ভাবটা তখনো কাটেনি! তাই ডান হাতটাকে উঁচু করে ধরে জিজ্ঞেস করলে—ডালটা কি সত্যি গরম ছিল? ফোস্কা পড়ে নি ত' গায়ে?

এইবার রুখে উঠ্‌ল বিনামা!

—আবার রসিকতা করা হচ্ছে! গায়ে ফোস্কা পড়লে কি তেল মালিশ করার বাসনা নাকি?

ততক্ষণে হৈ-চৈ শুনে বিনামার পিশ্‌তুতো বোন ছুটে এসেছে। বিনামার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তার আর হাসি থামে না।

বিনামা

সেদিন বিনামা রজতকে আর এতটুকু দম ফেলবার ফুরসৎ দিলে না! কালিয়ার মাছ নিয়ে আস্‌তেই বলে, প্যানটা ভর্ত্তি করে মাংস নিয়ে আস্থন! না হয় চীৎকার করে ওঠে, এ কী! এখনো চাট্‌নীটা আনা হয় নি? কি করছিলেন এতক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে?

চাট্‌নী যদি বা এলো ত' হুকুম হল; পাঁপড়টা ভাজা হয়েছে কিনা—সেটা একবার গিয়ে দেখ্‌বেন ত? ঠাণ্ডা মিয়োনো পাঁপড় কি বরযাত্রীদের পাতে দেয়া চলবে?

এইভাবে একবার নীচ আর একবার ওপরে ছুটোছুটি করে অমন স্বাস্থ্যবান ছেলে রজতেরও হাঁফ ধরে গেল।

একা হাতে বরযাত্রীদের সন্দেশ পর্য্যন্ত পরিবেশন করে বিজয়িনী বিনামা কোথায় যে আনন্দ মহলে আত্মগোপন করলে তার আর হদিশ পাওয়া গেল না!

রজত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাশের কৃতবিদ্য ছাত্র। সেই সুবাদে সে এই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের গৃহ-শিক্ষক। এখন প্রায় বাড়ীরই একজন হয়ে গেছে। সবাই ডাকে রজতদা বলে। দিদির বিয়েতে বোনেরাই আগ্রহ করে বরযাত্রীদের পরিবেশনের ভার রজতদার ওপর ন্যস্ত করেছিল। কিন্তু তাতে যে এমন অনর্থ ঘট্‌তে পারে—সেকথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি!

বিনামা বড়লোক বাপের আদুরে মেয়ে। তাই গার্গীরা ভয় পেয়েছিল—হয়তো বিনামা বিষম চটে গিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলেই যাবে!

কিন্তু ও যখন চ্যালেঞ্জ করে গাছ-কোমর বেঁধে পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তখন বাড়ী শুদ্ধ্‌ মানুষ যেমন অবাক হল, খুশীও তেম্‌নি কম হল না!

কিন্তু আসল গোল বাঁধলো বাসর ঘরে গান গাওয়ার সময়।

সবাই ভেবে রেখেছিল, ঈশান কোণের মেঘ যখন দূরের আকাশে মিলিয়ে গেছে, তখন খোলা হাওয়ার মতোই বিনামার গান সবাইকার শ্রান্তি দূর করতে পারবে।

বাসরঘরে বরযাত্রীদের দারুণ ভীড়।

তারা ইতিমধ্যে বিনামার গুণপনার সব খবর জেনে নিয়েছে। যে মেয়ে গাছ-কোমর বেঁধে এমন নিপুণতার সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন করতে পারে—তার সঙ্গীত পরিবেশন যে আরো মধুর হবে—সে কথা নতুন করে আর বলবার কি আছে?

মনে হচ্ছে বরযাত্রীর দল আজ মরিয়া। শেষ ট্রাম চলে যাক, লাষ্ট বাস্‌ ধোঁয়া উড়িয়ে প্রস্থান করুক; —ওরা কিছুতেই বিনামার মধু-কণ্ঠের সঙ্গীত পরিবেশন থেকে বঞ্চিত থাকতে রাজি নয়।

বিয়ে বাড়ীর অনেকেই আশে-পাশে এসে ভীড় জমিয়েছে

ছিল। কেন না বাসরঘরে ঢোকবার আর কোনো উপায়ই ছিল না। বরযাত্রীর দল সেখানে মৌরশী পাট্টা করে বসে পড়েছে।

কনের ঠাকুমা-পিসিমা-দিদিমার দলও ঘন ঘন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করছিল।

কিন্তু যার জন্যে এত কাণ্ড—তার মান কিছুতেই ভাঙ্‌ছিল না। বিনামা সেই যে গার্গীর ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল—সেখান থেকে তাকে বাসরঘরে নিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সে ঘর থেকেও বেরুবে না, আর বাসরঘরে গানও গাইবে না।

বাড়ী শুদ্ধু লোকের সাধাসাধি।

কিন্তু বিনামার ধনুক-ভাঙা পণ—কিছুতেই সে বাসরঘরে গান গাইবে না।

দু একটি মেয়ে ওরই মধ্যে গান গেয়ে বরের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করল। কিন্তু বরযাত্রীর দল এমন মুখভঙ্গী করল, যেন ওদের সকলকে জোর করে চিরতার জল গিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

বরকে গান গাইতে বলায় চারদিক থেকে এমন একটা সোল্লাসধ্বনি উঠ্‌ল যে সবাই হকচকিয়ে গেল।

বরযাত্রীর দল তখন বায়না ধরলে, বিনামা দেবী যখন কিছুতেই গান শোনাবেন না—তখন কনের ঠাকুমা-দিদিমাদের ঘুঙুর পরে নৃত্য দেখাতে হবে।

মনে হল সবাই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাব সমর্থন করলে।

কিন্তু গার্গী আর তার বোনেদের ছুটোছুটির বিরাম নেই। যে করেই হোক—ওকে দিয়ে বরের সামনে গান গাওয়াতেই হবে। নইলে নতুন জামাইবাবুর কাছে তাদের সম্মান থাকে না!

সমস্ত সাধ্য-সাধনা যখন ব্যর্থ হল—তখন বোনেদের সব রাগ গিয়ে পড়ল রজতের ওপর।

এমনভাবে ডালের হাঁড়ি ওর গায়ে ঢেলে না দিলে বিনামা নিশ্চয়ই বাসরঘরে গান গাইত, আর তাদের সম্মানটাও সবার সাম্‌নে বজায় থাকত।

বিয়ে বাড়ীর হাসি

ওদিকে বরযাত্রীদলের হল্লা উঠেছে—বিনামা দেবীর গান শুনতে চাই। নইলে আমরা এখানে অবস্থান ধর্ম্মঘট করবো।

অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল—তখন বোনের দল একসঙ্গে গিয়ে রজতকে আক্রমণ করলে।

বল্লে, তুমি যখন অনর্থ ঘটিয়েছ, তখন তোমাকে গিয়েই বিনামার মান ভাঙাতে হবে।

রজত ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, মান ভাঙাতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমার মাথা না ভাঙে!

কিন্তু বোনের দল না-ছোড় বান্দা!

বল্লে, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। অন্যায় করেছ, এখন সে অন্যায়ের প্রতিকার করবে না? যে মাটিতে পড়ে লোক—ওঠে তাই ধরে।

বোনেরা সবাই মিলে রজতকে ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দিল।

রামে মারলেও মারবে—আর রাবণে মারলেও মারবে।

এক-পা-দুপা করে রজত অগ্রসর হল। রণাঙ্গনে যেতেও বোধকরি লোকে এতটা ভীত হয় না। কিন্তু কৈ—গার্গীর ঘরে ত' কেউ নেই!

ভীরু মেষ-শাবকের মতো রজত চারদিকে তাকাতে লাগ্‌লো।

সেই নাইলনের সাড়ীটি ডাল-চর্চ্চিত অবস্থায় ঘরের এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছে। এক জোড়া স্যাণ্ডেলকেও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

কি আশ্চর্য্য, এই স্যাণ্ডেল জোড়াও ঘন ডালে যেন চন্দন-চর্চ্চিত হয়ে আছে!

রজতের যেন লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল। ধীরে ধীরে সে গিয়ে ছাদে উঠল।

ম্লান চাঁদের আলোতে দেখা গেল—দূরে একটি নারী মূর্ত্তি ছাদের রেলিং ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

এগুবে কি পেছুবে—রজত হঠাৎ ঠাহর করতে পারলে না!

বেশ বুঝতে পারলে, নীচে একদল কুমীর হাঁ-করে অপেক্ষা করছে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেই একেবারে গিলে খাবে।

তার চাইতে মরিয়া হয়ে এগুনো যাক্‌। কপালে যদি দুঃখ থাকে—তবে কে খণ্ডাবে বলো?

রজত চিরকাল মোটা সোটা বই নাড়াচাড়া করে এসেছে। কিন্তু ঘন ডালের হাঁড়ি কি করে আয়ত্তে রাখতে হয় সে কৌশল জান্‌তে পারে নি!

মহাকাশ-চারীর দুর্ব্বার সাহস নিয়ে রজত অগ্রসর হল।

নিতান্ত অলস-অবজ্ঞায় বিনামা একবার শুধু তাকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। তারপর আগের মতোই আকাশের তারকা নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করল।

রজত নিজের উপস্থিতি বোঝাবার জন্যে শুধু একবার খুক্‌ খুক্‌ শব্দ করল। তারপর নিতান্ত বিনীত-কণ্ঠে কইলে, আপনি যদি দয়া করে গান না গান, তবে ওরা আমাকে জ্যান্ত কবর দেবে! দোহাই আপনার, এই নিরীহ প্রাণীকে রক্ষা করুন—

হঠাৎ বিনামা ওর দিকে একেবারে ফিরে দাঁড়ালো। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস্‌ করলে, আপনি আর কখনো ডাল পরিবেশন করেছেন?

ভয়ে ভয়ে রজত উত্তর দিলে, না ত!

বিনামা প্রশ্ন করল, তবে কেন ডালের হাঁড়ি নিয়ে অমন ছুটোছুটি করছিলেন?

বলির পাঁটার মতো রজত উত্তর দিলে, ওরা সব বল্লে যে! বরযাত্রীদের নাকি পরিবেশন করতে হবে!

তারপর বিনামা হঠাৎ এমন প্রশ্ন করে বস্‌ল—যার জন্যে রজত আদৌ প্রস্তুত ছিল না!

বিনামা শুধোলে, আপনি গল্প লেখেন?

রজত আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দেবার চেষ্টা করলে, মানে আমি—'মাতৃভূমি' কাগজে—

—তা সে যেখানেই হোক।

বিনামার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—পরিবেশন করবার প্রণালী জানেন না—অথচ অপরের কাজে হাত দিয়ে বসে আছেন? বানর-কীলক কথা পড়েছেন কখনো?

—আজ্ঞে?

—আজ্ঞে নয়। পড়ে দেখ্‌বেন। শিক্ষণীয় বস্তু।

রজতের এইবার শেষ চেষ্টা।

করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালে, গান একটা গাইবেন ত তা হলে? কথা দিচ্ছি বানর-কীলক-কথা আমি পড়ে মুখস্ত করবো।

বিনামা আরো কাছে সরে এলো। বল্লে, তা হলে এই কথাটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবেন। গল্পই হোক্‌ আর গানই হোক্‌—পরিবেশন প্রণালীটা জানা দরকার।

রজত বল্লে, আজ্ঞে, সে কথা যথার্থ।

—হুঁ! এখন থেকে শুধু গল্পই পরিবেশন করবেন।

আদেশের সুরে বল্লে বিনামা।

—কিন্তু গানটা?

—আচ্ছা, চলুন, পরিবেশন করছি।

বিজয়িনীর মতো গ্রীবা উত্তোলন করে বিনামা নীচের দিকে পা বাড়ালো।

❋ অতীতের স্মৃতি ❋

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

৪

বারোয়ারী দুর্গোৎসব, চড়ক-পূজা, গাজন, আর দোলযাত্রার উৎসবের মতোই সেকালে রাসলীলা আর রথযাত্রার সময়েও খুব ধুমধাম-আড়ম্বর হতো। একালের মতো সেকালেও রাসলীলা আর রথের পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে ধনী-দরিদ্র সকল স্তরের লোকজনের মনে জেগে উঠতো আনন্দ-উৎসবের প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা। অধুনা কলিকাতা শহরের শিয়ালদহ-বৌবাজার, শাহাপুর-টালীগঞ্জ এলাকায়, শ্রীরামপুরের সন্নিকটে মাহেশ আর পানিহাটির পাশে খড়দহ অঞ্চলে রথযাত্রা আর রাসলীলার উৎসবকালে যেমন বিরাট মেলা বসে, সেকালেও ঠিক এমনি বিচিত্র পণ্য-পশরা আর আবালবৃদ্ধবনিতার ভীড়ে রীতিমত জমজমাট হয়ে থাকতো এ সব মেলার আসর…প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তার প্রচুর নজীর খুঁজে পাওয়া যায়। তখনকার আমলের এই সব জনাকীর্ণ মেলা-প্রাঙ্গণে শুধু যে সাড়ম্বরে রথযাত্রা আর রাসলীলার বিচিত্র আনুষ্ঠানিক-পর্ব্ব আর বিভিন্ন পণ-পশরার বেশাতী চলতো তাই নয়, সমাগত জনগণের চিত্তবিলাস ও মনোরঞ্জনের জন্য নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকতো…পুতুল-নাচ, কবিগান, তরজা, খেউড়, ভেল্কী-ভোজবাজীর কায়দা কশরৎ থেকে সুরু করে, প্রমারা, তিন-তাস, নকল-ফাড় প্রভৃতি জুয়াখেলাও বাদ পড়তো না সেকালের এ সব মেলার আসরে! মেলার আসরে এসে উৎসবের আনন্দে বিলাসী সৌখিন লোকজনের মন তখন রীতিমত রঙীণ ফুরফুরে হয়ে উঠতো…তাই জুয়াখেলার কুহকিনী-মায়ায় তাঁরা সহজেই ধরা দিতেন এবং রাতারাতি বড়লোক হয়ে ওঠার নেশায় মেতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী বনে ঘরে ফিরতেন। প্রাচীন সংবাদ-পত্রে যে সব নজীর মেলে, তাই থেকে সুস্পষ্ট অনুমান করা যায় যে সেকালে জুয়াখেলার এই সর্ব্বনাশা-নেশা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ কি বিপুল প্রসারতা লাভ করেছিল! আপাততঃ উনবিংশ শতকের বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সেকালের সেই সব বিচিত্র কীর্ত্তি-কলাপের রোমাঞ্চকর বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—একালের কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাদের অবগতির জন্য!

* * * *

রথযাত্রা

(সমাচার দর্পণ, ১৯শে জুন, ১৮১৯)

রথযাত্রা।—১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক ২ স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয় মোং মাহেশেয় রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভদেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান

পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর২ ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক২ লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো২ লাভ হয় ও কাহারো২ সর্ব্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সময়ে দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না, তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কয়েদ হইল।

* * * *

রাসলীলা

(জ্ঞানান্বেষণ, নভেম্বর, ১৮৩৭)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—চব্বিশ পরগণার মাজিস্ত্রেটের সরহদ্দের মধ্যে খড়দহ গ্রামের হিন্দুরদিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতি বৎসর যে অন্যায় কর্ম্মসকল হয় তদ্বিষয়ক মল্লিখিত কত্রক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বিষ্ণুমতাবলম্বি যাঁহারা তাঁহারা এই রাসযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যাঁহারা এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাঁহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন সহর হইতে সেই স্থলে রাস দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্যামসুন্দর বিগ্রহের অতি প্রসিদ্ধ স্থান, তজ্জন্য কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের রাসলীলা দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন এবং দোকানদারেরা এই সময় লাভকরণার্থ নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়া যান যে কত্রক দিবস রাস হয় সেই কত্রক দিন এই স্থলে অনেক আহ্লাদ আমোদের দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলারা যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল গোস্বামী ইহারা নকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান তজ্জন্য প্রসিদ্ধ জুয়ারিদিগের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্ম্মকারিরা মহোৎসবের কত্রক দিবস ক্রমাগত জুয়াখেলা করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল লোকের ঐ খেলায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম সাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটীনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রাসবাটীতে এতদ্রূপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎপর্য্য এই যে বিচারপতিরা এই সকল কুকর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরো ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ।

চিৎপুরের রাস্তার কোন স্থানে।

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৩৭)

খড়দহের জুয়াখেলা।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে গত রাসযাত্রা সময়ে জুয়াখেলা নিবারণার্থ চব্বিশ পরগণার শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ আমারদিগকে কহিয়াছেন যে ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পোলীস আমলারদিগকে তদ্বিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন—বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঢেঁড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ট্রেট সাহেব জুয়াখেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞা যে উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। পরে সরকারী আমলারা বরকন্দাজ লইয়া রাস্তায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ হুকুমক্রমে যে গোস্বামীরা সামান্যতঃ ঐ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ২ অংশ পাইয়া থাকেন তাঁহারাও তাহা বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। যে চীনীয়েরা দলে২ ঐ স্থানে রীতিমত মেজ সমেত আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের বাক্স বন্দ করিয়া রিক্তহস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি জানা গেল যে বাটীর মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেলা হইয়াছিল এবং শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব এই কুকর্ম্মের

সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বৎসরে আরো কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাঁহাকে স্মরণার্থ আমরাও কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।

যদ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় নানা দিক্ হইতে মহাজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি তাহা অতি দূর ২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। ঐ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে লক্ষ ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত ২ বংশ্য একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। ঐ বার্ষিক উৎসবে এই পর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা রাজধানী হইতে বহুতর লোক আসিত কিন্তু যদবধি ৺প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের জাঁক ভাঙ্গিয়াছে।

* * * *

সম্বৎসরে, বিবিধ পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে উনবিংশ শতকের হিন্দু-সমাজে যেমন অভিনব উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ধুমধাম-আড়ম্বরের ঘটা দেখা যেতো, মুসলমান-সমাজে নানা রকম পরব-অনুষ্ঠানেও তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতো না সেকালে—প্রাচীন সংবাদপত্রে সে সব অতীত-স্মৃতিরও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে তথা ভারতে ইংরেজ-শাসনের বুনিয়াদ তখন সবেমাত্র কায়েমী হয়ে উঠছে…অপসৃয়মান নবাবী-আমলের প্রভাব-প্রতিপত্তির রেশ তখনও সজীব…দেশের সাধারণ লোকজন আর বিদেশী বণিক সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রদায় তখনও বাদশাহী বোল্-বোলাওয়ের নেশায় রীতিমত মশগুল…আচার-ব্যবহারে সৌখিন কেতা কায়দায় সকলেই তখন মোগলাই রীতি অনুকরণ করে রাতারাতি খানদানী 'ক্ষুদে নবাব বাহাদুর' বনে ওঠবার নেশায় মাতোয়ারা। কাজেই সে-যুগে মুসলমানী পরব-অনুষ্ঠানে যোগদানে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ধনী দরিদ্র, দেশী-বিদেশী সব রকম লোকজনেরই বিশেষ উৎসাহ আর সহযোগীতা দেখা যেতো। তৎকালীন মুসলমান সমাজে ঈদ, মহরম, প্রভৃতি বিশিষ্ট পরবের মতোই 'বেরা বা ভেলা ভাসান' উৎসবটিও ছিল সে যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় অনুষ্ঠান! এ উৎসব-উপলক্ষ্যে সেকালে দেশী-বিদেশী লোকজনের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে যেতো…তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে তখনকার আমলে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের বিচিত্র বিবরণ থেকে। সেকালের এ সব বিচিত্র 'পরবের' জৌলশ-অনুষ্ঠানে…অভিনব আতসবাজী আর রোশনাই দেখার আগ্রহে কৌতূহলী দর্শকের ভীড়ে ভরে থাকতো উৎসব-অঙ্গন!

* * *

বেরা বা ভেলা ভাসান উৎসব

(সমাচার দর্পণ, ৯ই অক্টোবর, ১৮১৯)

মুরশেদাবাদ।—১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য ২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনীবাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট ২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জ্বালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্ম্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা—তাহার উপর ঘর—সে ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্ম্মিত। এবং কোন কোন স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল, তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮২১)

বেরা ভাসান॥—২১ সেপ্তেম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদ হইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তেম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহা হইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচ গান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল, পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত তামাসা দেখিলেন।

*　　　*　　　*

মহরম

(সমাচার-দর্পণ, ১৮ই জুলাই, ১৮২৯)

মহরমের উৎসব। মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে হইতে পারে যে কেহ ২ ইহার মূল সুজ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন, অতএব গত সোমবারের গবরনরমেণ্ট গেজেট হইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

এই উৎসব মহম্মদের পৌত্র কালিফালীর ফতেমা নাম্নী স্ত্রীজাতপুত্র হাসন হোসেনের মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। পৈগম্বরের পৌত্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজপ্রযুক্ত এবং তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়াপ্রযুক্ত সর্ব্ব লোক কর্তৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। ৬৮০ সালে দমাসকসের নির্দ্দয় রাজা য়েজীদের প্রতিকূলে আপনার দাওয়া সংস্থাপনের উদ্যোগে হোসেন মারা পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতালম্বিরদের এক বিচ্ছেদ হইল এবং তৎকালাবধি মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি তাহারা আপনারদিগকে মুসলমানেরদের মধ্যে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে, দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী হোসেন আপনার স্ত্রী কর্তৃক হত হন, তিনি য়েজীদের পরামর্শে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন।

দুই ভ্রাতার যে উৎসব তাহা প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবসের স্বতন্ত্র ২ পদ্ধতি আছে, তাহা উত্তম ভাষায় রচিত এবং তাহাতে উভয় ভ্রাতার যন্ত্রণা অতি কোমলরূপে বর্ণিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরূপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই উৎসবের রীতি বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রচার হয়। তদ্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকসূচক উৎসবের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্যায় দেখা যায় এতদ্দেশে মুসলমানেরা আপনারদের সামান্য পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততো বাদ্য ও ধ্বজা লইয়া ভ্রমণ করে, পারসী দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ধনবান হউক কি নাই বা হউক শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করে।

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরবুলাই মহম্মদ প্রতি রাত্রিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদগৃহের গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারদের গাড়ীতে পরিপূর্ণ ছিল।

ইউরোপ জাতীয়েরা এই উৎসবে উপস্থিত হইতে যে অনুমতি পান তাহার এই কারণ জনশ্রুতিতে আছে যে য়েজীদ যৎসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্থ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তাহার দরবারে দৈবাৎ উপস্থিত এক খ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহারদের প্রাণরক্ষার বিষয়ে বিস্তর মিনতি করিলেন।

*　　　*

হিন্দু-মুসলমান সমাজের বিবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের মতোই উনবিংশ শতকের বিলাতী সমাজেও নানা রকমের সৌখিন আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল⋯প্রাচীন পুঁথি-পত্রে তারও অনেক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেকালের বিলাতী সমাজে যে সব বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের রেওয়াজ

ছিল, প্রসঙ্গক্রমে, তার কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেওয়া হলো।

* * *

সেণ্ট এণ্ড্রুর সাম্বার্ষিকী উৎসব

(ক্যালকাটা গেজেট, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৭৯৪)

On Monday last the Anniversary of Saint Andrew was celebrated by a respectable and numerous company of gentlemen, assembled at the theatre…At half past four the rooms began to fill, and upwards of two hundred guests had assembled by five o'clock, when the joyous sound of bagpipe summoned to the festive board, where profusion and elegance were happily united.

A variety of other toasts and sentiments succeeded ; two in particular, suggested by a visitor, viz, "may the British Constitution pervade the earth, and trample Anarchy under foot", "may the British Empire in all its parts ever exhibit the same harmony and unanimity that animate the present Company", were received under loud and unanimous plaudits.

The exhilarating tone of the bagpipe lent its aid and diffused such joy over every Caledonion Countenance, as to affect by sympathy the whole Company. The hours glided away, the bottle had a rapid circulation, the room resounded with loyalty, and every nerve vibrated with joy ; never did more harmony or conviviality preside over the affairs of Saint or Hero.

(ক্যালকাটা গেজেট, ৭ই নভেম্বর, ১৮০৫)

It is hereby notified to the sons of St. Andrew at or near the Presidency, who have not yet subscribed to the entertainment to be given on the 30th instant, that a paper is at Carlier and Scornee's for subscription.

Subscription this year fifty Rupees each.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮১২)

Monday last, the 30th November…a numerous and highy respectable party of Caledonians, accompanied by nearly an equal number of English and Irish Guests, forming a Company of upwards of a hundred assembled at 7 o'clock in the evening at Moore's Room.

The hilarity and social spirit of the evening…detained the numerous Company at table, without the desertion of a single individual, till 3 o'clock in the following morning ; at that time an interval was devoted to dancing and a few a Scotch Reels were executed with a high degree of vivacity. After the exercise of the dance, the Company returned to the table ; and at half past six on Tuesday morning aboat 18 or 20 jovial souls…finished the festivities of St. Andrew with 'God Save the King' in full chorus.

* * *

এছাড়া সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের বিত্তশালী-সৌখীন বিলাসী রসিকজনেরা তখন প্রায়ই সাড়ম্বরে অভিনব ধরণের পিকনিক পার্টি পানাহার আর নাচ-গানের আসরের ব্যবস্থা করে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন অফুরন্ত আমোদ-প্রমোদে মেতে…প্রাচীন সাময়িক পত্রে তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালের বল-নাচের দৃশ্য —প্রাচীন চিত্র হইতে সংগৃহীত

* * *

বল-নাচের আসর

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১৭)

The third Bachelors' Ball took place on last Wednesday evening and was conducted with the same hospitality and success as the

two preceeding—The fourth mask was that of a lady dressed in the extravagance of the present fashion ; her back half exposed, her petticoats so short, as to have at least eight inches above the ancle visible, and her head crowned with large bunches of roses—She soon succeeded in getting a partner, and after going down a country dance, left the inquisitive assembly in wonder who it could be ?

* * *

(এশিয়াটিক জার্ণাল, অক্টোবর, ১৮২৩)

Baboo Mutteelall Mullick, on Saturday night, 15th March, entertained a numerous assemblage of respectable natives and European ladies and gentlemen at a splendid nautch, in his spacious garden-house at Soorah···

The fair vocalist Begum Jahu, distinguished though she be for the peculiarly deep sonorousness of her rich tones, in rather energetically outlined, gave a not unpoetical idea of Thalestris···Begum Jahu now and then threw herself into attitudes, and gave a charming staccato movement to her person altogether, which completely eclipsed the most superb specimens of hopping, gliding, or jerking, ever witnessed in the town-hall ; really it is ten thousand pitties that such Capabilities for waltzing as Begum Jahu's could not be brought into action at a bachelors' ball : such a sight would warm the most frosty "Lamentable" that ever was. We infinitely prefer Begum Jahu's saltation to her singing. The latter is of too grave a cast for our taste···

After Begum Jahu stood up the not less charming, the not less tall, but far less stout, fair choister···Hingun. There was a deeper expression of sentiment in the face of the pensive Hingun than in the other···Hingun having given a prelude or two, with the most tuneful larynx in the world, sang Tazu-bu Tazu in a most beautiful style. Indeed, after Nickee, we never heard it sung so well. Nickee herself we were sorry not to meet at the entertainment, which was not the fault of the beautiful host, but of circumstances······The polite assiduity of Baboo Mootteelall Mullick was observed by all, and experienced by everyone ······ INDIA GAZETTE

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২২শে নভেম্বর, ১৮২৩)

নাচ ॥ —গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ শ্রীযুক্তবাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টাপর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচণীয়। অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ॥—গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ
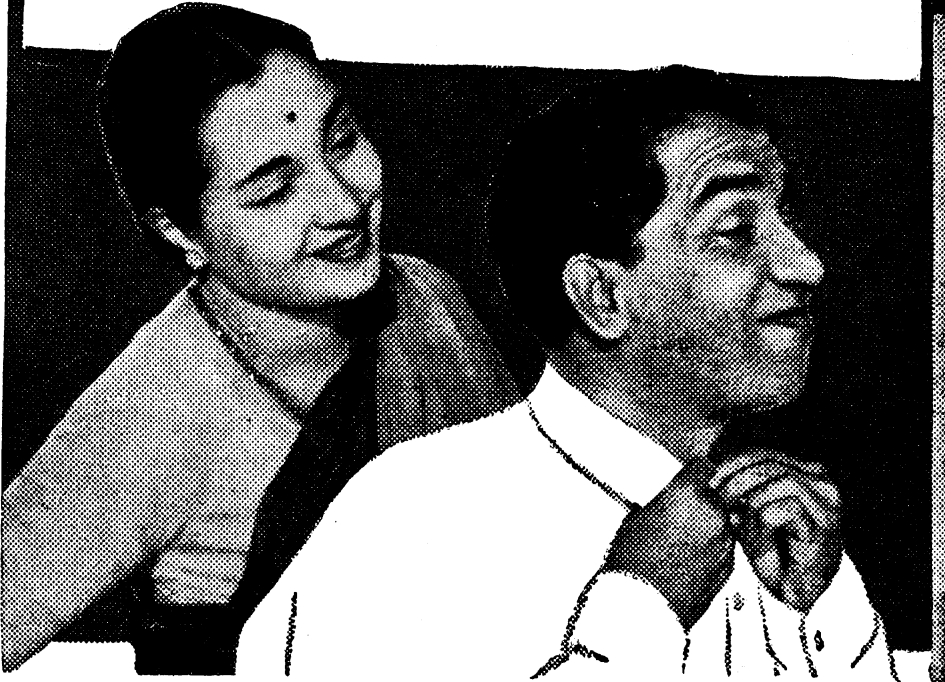
অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজন কর ইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। ঐ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি মনোরঞ্জক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল।

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু ঐ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজনগণকে লইয়া মহা ভোজ আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোশনাইও হইয়াছিল।

* * *

স্ত্রীণাং চরিত্রম্
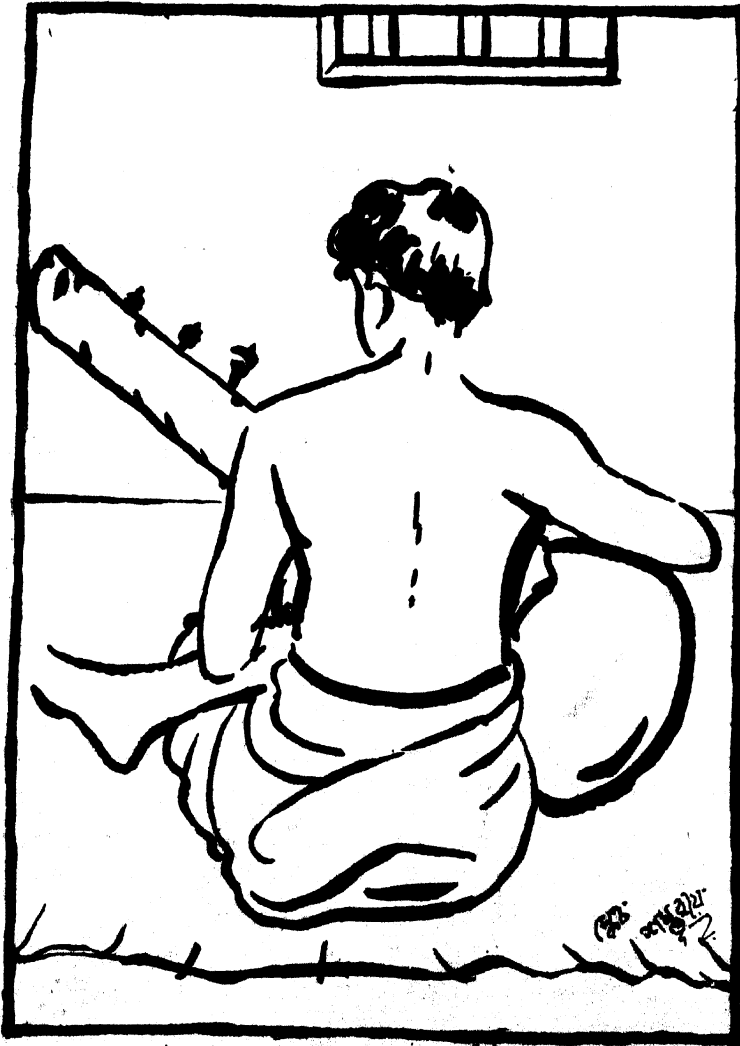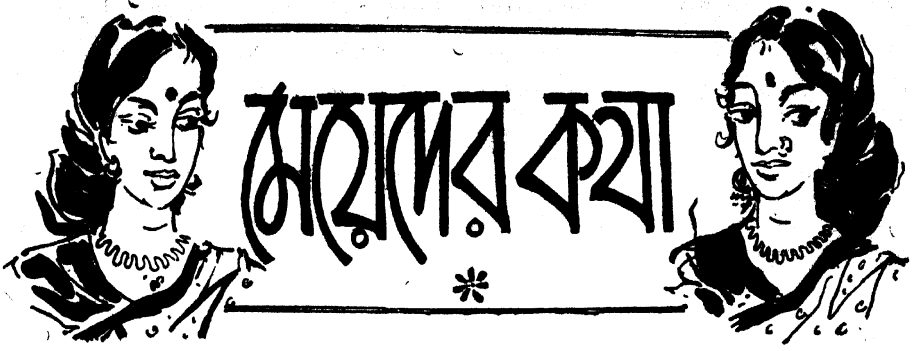
মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সঞ্জয় ও পাঞ্চালী বিলেত থেকে ফিরে আসার কিছু দিন পরেই পাঞ্চালী যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের বার্ষিক উৎসব। হেড্ মিষ্ট্রেস্ বনলতা চক্রবর্তী তাঁর প্রাক্তন্ ছাত্রী পাঞ্চালী ও তাঁর স্বামী সঞ্জয়কে সে উৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন। সঞ্জয়কে পাশ্চাত্যের নারী সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধও করলেন। সঞ্জয় সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা পছন্দ না করলেও এ প্রস্তাবে রাজী হতে বাধ্য হলেন, বিশেষ করে পাঞ্চালীর আগ্রহাতিশয্যে।

সভা বসেছে। অসংখ্য তরুণী-কিশোরী ও তাদের অভিভাবক অভিভাবিকার কলকাকলির মধ্যে উৎসবের কার্য স্বরু হল। সভার সম্মানিত অতিথি সঞ্জয়ের বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান এল। বনলতা দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী পাঞ্চালীর স্বামী সঞ্জয়কে। বিলাত থেকে সম্প্রতি সস্ত্রীক ঘুরে এসেছেন তার জন্য অভিনন্দনও জানালেন তিনি। সঞ্জয় বলতে স্বরু করলেন :—

"পশ্চিমের নারী সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের একটা বক্তৃতা। তাতে তিনি ভারত ও পশ্চিমের নারী নিয়ে তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব। মাতৃত্বই আদি, মাতৃত্বই শেষ। নারী শব্দটাই ভারতীয়ের অন্তরে একটি মায়ের ছবি ভাসিয়ে তুলে। ভগবানকে ভক্তেরা ডাকেন মা' বলে। আমরা যখন ছোট ছিলুম, তখন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের সামনে এক বাটী জল ধরতুম। তিনি তাতে পায়ের অঙ্গুল ডুবিয়ে দিতেন, আমরা সে চরণামৃত পান করতুম।

পশ্চিমের নারী হচ্ছে স্ত্রী। নারীত্বের সকল কিছু স্ত্রীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে নারীত্বের সকল শক্তি মাতৃত্বে কেন্দ্রীভূত।

পাশ্চাত্যের পরিবারে স্ত্রীর রাজত্ব। ভারতের পরিবারে মায়ের রাজত্ব। পশ্চিমের কোন পরিবারে 'মা' এলে তাঁকে স্ত্রীর প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়। গৃহের কর্ত্রী তো স্ত্রী। আমাদের দেশে মা সর্বদা আমাদের বাড়ীতে থাকেন। স্ত্রীকে তাঁর অধীন হতে হয়।

পশ্চিমের পরিবারে নারীর একই অবস্থা এখনও বর্তমান। কিন্তু আমাদের দেশের সে অবস্থা বদলে যাচ্ছে। মায়ের প্রাধান্য কমছে, স্ত্রীর প্রাধান্য বাড়ছে। এই যে পশ্চিমের হাওয়া লেগেছে তাতে স্বামীজি বর্ণিত ভারতীয় পরিবার আর নেই। এখন ভারতীয় পরিবারের চিত্র হচ্ছে মা ও স্ত্রীর সংঘর্ষের চিত্র।"......

সভায় একটা কোলাহল যেন হতে লাগল। পাঞ্চালী রেগে গেল। কেউ কেউ চেঁচাতে লাগল—"ইউরোপের

নারী সম্বন্ধে বলতে বলা হয়েছে। ভারতের কথা কেন হচ্ছে ?" ·····

গোলমাল কমলে পরে সঞ্জয় আবার আরম্ভ করলেন। "ইউরোপের নারী সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই আমাদের নারী সম্বন্ধে কিছু এসে পড়ে। তাই বলতে হচ্ছে। ভারতের নারীকে মা বললে তাঁরা খুশী হন, কিন্তু পশ্চিমের মেয়েদের 'মা' বললে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। স্বামীজি শেষে কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। সে কারণটা হচ্ছে 'মা' ডাক তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁরা বুড়ী হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু স্বামীজি তাঁদের বুঝিয়েছিলেন—"আমার বাপ ও মা আমার জন্মের জন্যে বছরের পর বছর প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের জন্য প্রার্থনা করেন। 'আর্য' কাকে বলে তার ব্যাখ্যা করে মনু বলেছিলেন,—'প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যাঁর জন্ম তিনিই আর্য।' মনুর মতানুসারে প্রার্থনার ব্যতিরেকে যে সন্তান জন্মেছে সেই অনার্য। ঐ সব সন্তান যাদের জন্যে প্রার্থনা করা হয় নি; অভিশাপ নিয়ে যারা জন্মায়, যারা মুহূর্তের অবহেলার অবসরে জন্ম নিচ্ছে, তাদের জন্ম রোধ করা সম্ভব হয় নি বলে, তাদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি ? স্বামীজি আমেরিকার মেয়েদের প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমরা কি তোমাদের সন্তানের জন্মের জন্যে প্রার্থনা কর ? মাতৃত্ব অর্জন করে কি তোমরা ধন্য মনে কর নিজেদের ? মাতৃত্ব দ্বারা তোমরা পূতশুদ্ধ হয়েছ একথা কি তোমরা ভাব ? তোমরা নিজের অন্তরে তার বিচার কর। যদি তোমরা তা না কর, তোমরা মনে রেখো, তোমাদের বিবাহ মিথ্যা, তোমাদের নারীত্ব নিরর্থক, তোমাদের শিক্ষা কুসংস্কারমাত্র। আর তোমাদের যে সকল অপ্রার্থিত সন্তান জন্মাবে তারা হবে মনুষ্যজাতির অভিশাপ।'······

পাশ্চাত্য জগতের অনেক নারী আজ এ সত্য অনুভব করতে পেরেছে। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা এ সত্যকে ভুলে যাচ্ছি······

পশ্চাতের দিকের কোণে কতকগুলি কলেজের মেয়ে বসেছিল। সঞ্জয় এ কথা বলা মাত্র তারা গোলমাল করতে লাগল। কতগুলি মেয়ে তারস্বরে "আর বলতে হবে না" বলে চেঁচাতে লাগল। কেউ বলল, "বিবেকানন্দের কথা বলছেন কেন ? নিজের কথা বলুন।"

সঞ্জয়ের তখন উত্তেজনা এসে গেছে। তিনি চীৎকার করে বললেন, "এখন তো আমার কথাই বলছি। বিবেকানন্দ ভারতে প্রার্থনাময়ী যে নারী দেখে গিয়েছিলেন তাঁরা কোথায় ? তাঁরা তো নেই !'······

গোলমাল আরো বেড়ে গেল। সঞ্জয়ের কথা আর কিছু বুঝতে পারা গেল না। বনলতা দেবী সঞ্জয়কে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন থিয়েটার হল থেকে পাশের একটা অফিস ঘরে। অন্য এক মিষ্ট্রেস্ মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। সুখ্যাত এক শিল্পীর সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ঘোষণা করলেন তিনি।

সঞ্জয়কে বনলতার সঙ্গে যেতে দেখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন পাঞ্চালী। পাঞ্চালী এখন কাউকেই বিশ্বাস করেন না। মিসেস্ রিজ্‌কে সেই বিলেতের ফ্ল্যাটে রাত্রে বান্ধবীদের নিয়ে ফিরে এসে যেভাবে দেখতে পেয়েছিলেন তাতে তিনি আর কোন নারীকেই বিশ্বাস করতে পারেন না। ঐ রাত্রের ঘটনাতেই তিনি সঞ্জয়কে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন ভারতে। নইলে যদিও সঞ্জয়ের ডিপ্লোমা লাভ হয়ে গিয়েছিল, বিলাতের মাটীতে ও জলহাওয়ায় তাঁর কেমন সন্তান জন্মায় তা' দেখার ইচ্ছা ছিল।

বনলতা সঞ্জয়কে যেখানে বসিয়ে খাবার প্লেট দিয়েছেন ছুটে তিনি সেখানে হাজির হলেন। পাঞ্চালী যেতেই তিনি আর এক প্লেট খাবার দিলেন তাঁকে। পাঞ্চালী বসেই প্রতিবাদ জানালো, "ওঁকে এত খাবার দিয়েছেন কেন ? ওর পেটে সইবে না।"

"তবে তুমি খাও।"

"না আমার শরীরটা ভাল নয়। গা বমি বমি করে।"

"ও তাই সঞ্জয়বাবু মাতৃত্ব সম্বন্ধে এমন চমৎকার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।"

"চমৎকার না ছাই !" বলেই পাঞ্চালী সঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন, "ওই পৌরাণিক কালের কথা কেন বলতে গেলে। ওসব কথা এখন কেউ বিশ্বাস করে।"

"তুমি করনা ?" প্রশ্ন করলেন বনলতা।

"এ-যুগে কে করে বলুন ?"

"হ্যাঁ তাই তো দেখছি। এ যুগে কেউ করে, কেউ করে না। স্বামী করে, স্ত্রী করে না। ভাবীযুগের সন্তানরা

কীর করবে কে জানে?" বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বনলতা দেবী দুজনেরই চোখে।

(ক্রমশঃ)

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

২

গতবারে যেমন নানা রকমের রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে অভিনব-ছাঁদের 'পিন্-কুশন' (Pin-Cushion) রচনার কথা বলেছি, এবারেওতেমনি-ধরণের রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে সৌখিন অথচ নিত্য-প্রয়োজনীয়, বিচিত্র একটি সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম (Sewing-case) রাখবার 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' তৈরী করার কথা জানাচ্ছি। রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী বিচিত্র-ছাঁদের এই
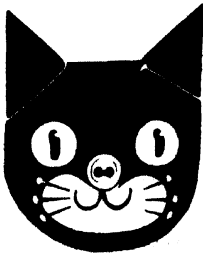
'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলিটি' দেখতে কেমন হবে, উপরের ছবিতে তার নমুনা দেওয়া হলো।

রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানানো বেড়ালের মুখের ছাঁদের অভিনব এই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলিটি' রচনা করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার হদিশ দিয়ে রাখি। এজন্য চাই ৪" ইঞ্চি × ৭" ইঞ্চি অথবা ৮" ইঞ্চি × ১৪" ইঞ্চি সাইজের এক টুকরো কালো, কিম্বা অন্য কোনো মানানসই রঙের পুরু 'ফেল্ট' (Felt) বা 'বনাতের, কাপড়, ব্যাগের পকেট বানানোর জন্য ২" ইঞ্চি × ৫" ইঞ্চি অথবা ৪" ইঞ্চি × ১০" ইঞ্চি সাইজের অন্য একটি কালো রঙের কাপড়ের বনাতের টুকরো, ৩" ইঞ্চি বা ৬" ইঞ্চি সাইজের এক টুকরো শাদা, হলদে কিম্বা অন্য কোনো মানানসই রঙের 'ফেল্ট, বা 'বনাতের কাপড়, এক হালি লাল, গোলাপী অথবা বাদামী রঙের ভালো এমব্রয়ডারী সুতো (Embroidery-Chord), একখানি ভালো কাঁচি, সেলাইয়ের ছুঁচ-সুতো, কাপড়ের উপর নক্সা-আঁকার 'খড়ি' (Tailor's-chalk) কিম্বা পেন্সিল, দুটো সবুজ রঙের বোতাম, একটি লাল বা গোলাপী রঙের বোতাম আর ছয়টি সেলাইয়ের ছুঁচ।

এ সব সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, কাপড়ের টুকরোগুলিকে নিখুঁতভাবে প্রয়োজনমতো মাপে ও আকারে ছাঁটাই করে নিতে হবে সবার আগে। এ কাজের সময়, সরাসরি কাপড়-ছাঁটাই না করে, প্রথমেই একটি শাদা কাগজের উপর এই ব্যাগ বা বটুয়া-থলির বিভিন্ন অংশের নক্সা এঁকে নেবেন—আবশ্যকমতো মাপে এবং ছাঁদে। তারপর সেই সব মাপের ও ছাঁদের নক্সা-অনুসারে কাপড়ের টুকরোগুলিকে যথাযথ-আকারে ছাঁটাই করে নিলে—কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি কাপড়ের-ছাঁটাইয়ের সময় কালো-বনাতের টুকরোটিকে সমান-মাপে দু'ভাঁজে পাট (Fold in half)
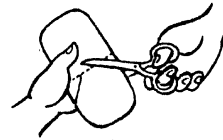
করে নেবেন। তারপর উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে দু'পাট করা কালো-বনাতের দু'দিকের প্রান্ত-সীমা দুটিকে কাঁচি দিয়ে পরিপাটিভাবে বেড়ালের 'থুত্‌নীর' (jaw) আকারে ঈষৎ গোলাকারে ছাঁটাই করে নিতে হবে। এ কাজ শেষ হবার পর, উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ভাঁজ-করা কালো-বনাতের কাপড়ের এক প্রান্তের দুটি 'কোন' (Corners) সুষ্ঠুভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে কোনাকুনি ধরণে বেড়ালের দুটি কানের ছাঁদ রচনা করুন। এমনিভাবে বেড়ালের দুটি কানের ছাঁদ ছেঁটে নিয়ে, কালো-বনাতের কাপড়টিকে আবার সমান-আকারে দু'ভাঁজ করে ফেলুন—গোড়াতেই যেমন

করেছিলেন। তাহলেই দেখবেন যে দিবিা নিখুঁত-ছাঁদে বেড়ালের ছুটি কান (Ears) রচিত হয়ে গেছে।

এবারে শাদা, হলদে অথবা মানানসই রঙের এবং ছোট সাইজের অন্য যে বনাতের টুকরোটি রয়েছে, সেটিকে কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করতে হবে—বেড়ালের মুখের অংশ অর্থাৎ উপরের ১নং ছবিতে দেখানো শাদা-জায়গার মতো ছাঁদে। এ কাজের সময়, ৩" ইঞ্চি অথবা ৬" ইঞ্চি বনাতের টুকরোটিকে ২২/৩" ইঞ্চি কিম্বা ৫" ইঞ্চি মাপে ছাঁটাই করতে হবে—অবিকল ঐ ১নং ছবিতে দেখানো বেড়ালের মুখের অংশের নমুনানুসারে। বেড়ালের মুখের ছাঁদে ছাঁটাই-করা বনাতের টুকরোটির মাপ হবে—লম্বালম্বিভাবে (Horizontal) ২২/৩" ইঞ্চি বা ৫" ইঞ্চি, আর খাড়াখাড়িভাবে (Vertical) মুখের অর্থাৎ কাপড়ের মধ্যভাগের মাপ বজায় রাখতে হবে ১১/৪" ইঞ্চি বা ২২/৩ ইঞ্চি।"

বেড়ালের মুখের অংশের কাপড়ের টুকরোটি আগাগোড়া ছাঁটাই করে নেবার পর, সেটিকে ১নং ছবিতে দেখানো নমুনানুসারে কালো-বনাতের উপর যথাযথস্থানে বসিয়ে পরিপাটিভাবে ছুঁচ-সুতো দিয়ে টেঁকে নিতে হবে। এবারে উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ছাঁদে এমব্রয়ডারী-সুতো দিয়ে বেড়ালের মুখের ঐ 'উল্টো-খিলানের' মতো অর্দ্ধ-গোলাকার (Arched) অংশ ছুটিকে সুষ্টুভাবে সেলাই করে নেবেন। তারপর এমব্রয়ডারী-করা বেড়ালের মুখের অর্দ্ধ-গোলাকার ঐ ছুটি অংশের ঠিক উপরে লাল বা গোলাপী রঙের বোতামটিকে সেলাই করে দেবেন। এমনিভাবে বেড়ালের নাসিকা-রচনার পর উপরের ১নং ছবিতে দেখানো নমুনানুসারে কালো-বনাতের কাপড়ের সামনের দিকে অর্থাৎ বিড়ালের মুখের সম্মুখ-অংশের ছু'দিকে কালো বা কোনো গাঢ় রঙের সুতো দিয়ে সবুজ-রঙের বোতাম ছুটিকে সেলাই করে দিলেই—বেড়ালের চোখ ছুটী বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তাহলেই বেড়ালের মুখের ছাঁদ রচনার কাজ শেষ হবে।

এবারে ছুভাঁজ করা কালো-বনাতের মাঝখানে সেলাইয়ের বিবিধ সরঞ্জাম অর্থাৎ সুতোর কাটিম, কাঁচি, আঙ্গুস্তা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখবার উপযোগী একটি 'পকেট' (Pocket) বা 'খোপ' রচনা করতে হবে। এ কাজের জন্য—কালো-বনাতের কাপড় ছাঁটাই করে ১১/৪" ইঞ্চি × ৪" ইঞ্চি অথবা ৩" ইঞ্চি × ৮" ইঞ্চি সাইজের একটি টুকরো নিন। সেটির তলার দিকের ছুটি প্রান্ত বেড়ালের থুতনীর (Jaw) ছাঁদে নিখুঁতভাবে ছাঁটাই করে নিয়ে, পকেটের এই কালো-বনাতের টুকরোটিকে বেড়ালের মুখের সামনের অংশের কাপড়ের পিছন দিকে যথাযথস্থানে বসিয়ে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে 'কাঁচা-সেলাই (Basting) দিয়ে টেঁকে নিন, তাহলেই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া' থলির মধ্যে জিনিষপত্র রাখবার উপযোগী দিব্যি সুন্দর 'পকেট' বা 'খোপ' তৈরী হয়ে যাবে। এবারে বেড়ালের মুখের ছাঁদে তৈরী 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' 'পকেট' বা 'খোপের' মধ্যে সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম ভরে রেখে উপরের ১নং ছবির নমুনামতো ভঙ্গীতে বেড়ালের মুখের ছুই দিকে সরু-সরু গোঁফের ধরণে তিনটি-তিনটি করে ছুঁচ এঁটে দিন ...তাহলেই কাপড়ের তৈরী 'সীবন-সামগ্রী' রাখার বিচিত্র-অভিনব এই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলিটি' রচনার কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি সুন্দর-সুন্দর সামগ্রী রচনার কথা জানাবার চেষ্টা করবো।

ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক

সুরুচি মুখোপাধ্যায়

বর্ষার মরশুম সুরু হয়েছে...কখনো ভ্যাপ্সা গরম, কখনো স্যাঁতসেতে বাদ্লা-আবহাওয়া! এ সময়ে ছোট ছেলেমেয়েদের শরীর খারাপ, সর্দ্দি-কাশি, জ্বর...এমনি সব উপসর্গ নিত্য লেগে থাকে ঘরে-ঘরে। কাজেই বর্ষাকালে তাদের স্বাস্থ্য আর শরীরের দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন...এতটুকু অসাবধান বা অমনোযোগী হলেই সংসারে রোগের প্রাতুর্ভাব আর ছুশ্চিন্তা-ছুর্ভোগের অন্ত থাকে না! এই সব কারণে প্রত্যেক সুগৃহিণীই বর্ষার সুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংসারের ছোট ছেলেমেয়েদের আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ আর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সর্ব্বদাই সজাগ-দৃষ্টি রাখেন—হঠাৎ ঠাণ্ডা বা গরম লেগে শিশুরা

যাতে সর্দ্দি-কাশি আর জ্বরে না ভোগে—সে বিষয়ে তাঁরা রীতিমত সচেতন থাকেন। বর্ষাকালের বেয়াড়া-আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের যাতে সুস্থ-নীরোগ রাখা যায়, সেজন্য শুধু তাদের আহার-বিহারের দিকে যথোচিত দৃষ্টিদান করলেই চলবে না···তারা যেন সর্ব্বদাই কালোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত থাকে, সেদিকেও সচেতন থাকা দরকার। অর্থাৎ, বর্ষাকালে স্যাঁত্‌সেতে বাদ্‌লা-আবহাওয়ার দরুণ আচম্‌কা ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি-কাশি-জ্বরে ভুগে ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে না অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেজন্য তাদের অঙ্গে যেমন সময়োচিত পোষাক-পরিচ্ছদের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তেমনি অহেতুক-রোগাশঙ্কা আর অতিরিক্ত-সাবধানতার ফলে, একরাশ জামা-কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে ভ্যাপ্‌সা-গরমে তাদের সুস্থ-কোমল দেহকে অনাবশ্যকভাবে ভারাক্রান্ত আর পীড়িত করে তুলে কষ্ট দেওয়ারও কোনো অর্থ নেই! বর্ষাকালের বেয়াড়া-আবহাওয়ায় ছোট ছেলেমেয়েদের দেহে যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে এবং ভ্যাপ্‌সা-গরম স্পর্শ না করে—এমন ধরণের হাল্কা-ঢিলাঢালা অথচ বুক-পিঠ-গলা ঢাকা সময়োপযোগী-ছাঁদের পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। এবারে তাই বর্ষাকালে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপযোগী কয়েকটি অভিনব-ধরণের পোষাকের নমুনা প্রকাশিত করা হলো—নীচের ছবিগুলি দেখলেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাবেন।

১
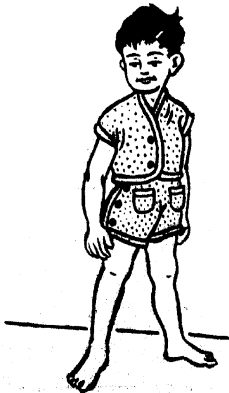
উপরের ১নং ছবিটিতে দু'তিন বছর বয়স থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের ছোট ছেলেদের পরিধান-উপযোগী বিচিত্র পোষাকের নমুনা দেখানো হয়েছে। এ পোষাকটি নক্সা-দার-রঙীণ ছিটের 'পপ্‌লিন' (Poplin), লন্ (Lawn) অথবা মিহি-মোলায়েম ধরণের খদ্দর বা সুতীর কাপড়ে তৈরী করা যাবে। এ পোষাকটিকে দুটি অংশে রচনা করতে হবে···উপরের অংশটি হবে—অৰ্দ্ধেক-হাত (Half-Sleeve) ফতুয়া বা 'জ্যাকেটের' (Jacket) মতো, এবং নীচের অংশটি হবে 'শর্ট-প্যাণ্ট' (Short বা Half-pant) বা 'নিকারবোকারের (Knickerboker) মতো। মোটামুটিভাবে, উপরোক্ত-ছাঁদে এ পোষাকটি তৈরী করতে হবে···তবে ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুসারে এ-ছাঁদের অল্প-বিস্তর রূপান্তর-সাধন করে নেওয়া যেতে পারে।

২

উপরের ২নং ছবিতে যে নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি দু'তিন বছর বয়স থেকে ছয়-সাত বছর বয়সের ছোট মেয়েদের পরিধান-উপযোগী পোষাক। এ পোষাকটিও রচনা করতে হবে—উপরোক্ত ঐ নক্সাদার-রঙীন 'পপ্‌লিন', 'লন্', খদ্দর অথবা মোলায়েম-ধরণের কোনো সুতীর কাপড়ে। ছেলেদের পোষাকের মতোই ছোট মেয়েদের পরিধান-উপযোগী অভিনব এই পোষাকটিও তৈরী করতে হবে দুই অংশে! অর্থাৎ উপরের অংশটি হবে—'অৰ্দ্ধেক-হাতা' 'চোলী' বা 'ব্লাউশের' (Blouse) ছাঁদে এবং এ

পোষাকের নীচের অংশটি রচিত হবে—'স্কার্ট' (Skirt) বা ঘাগ্‌রার মতো ধরণে ! এই হলো, উপরের ২নং নক্সার ছাঁদে বর্ষাকালে ছোট মেয়েদের পরিধান-উপযোগী বিচিত্র পোষাক তৈরীর মোটামুটি নিয়ম—তবে, আগেই যেমন বলেছি ঠিক সেইভাবে ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুসারে এ নিয়মের যে প্রয়োজনমতো পরিবর্ত্তন-সাধন করা চলবে না, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এ ধরণের হাল্কা-ঢিলাঢালা অথচ বুক-পিঠ-গলা ঢাকা পোষাক ব্যবহারের ফলে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু যে পর্য্যাপ্ত আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে তাই নয়, বর্ষার বেয়াড়া-আবহাওয়ার উৎপাত থেকে নিরাপদ-আনন্দে তাদের শরীর আর স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে চলতে পারবে—অভিভাবকদের অপরিসীম দুশ্চিন্তা আর দুর্ভোগের অবসান ঘটিয়ে !

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব পোষাক-পরিচ্ছদের নমুনা প্রকাশ করবার বাসনা রইলো !

—

সুধীরা হালদার

এবারে পশ্চিম-ভারতের কয়েকটি জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার রান্নার কথা বলছি। এগুলি গুজরাট-অঞ্চলের নিরামিষ-জাতীয় খাবার এবং এ সব হালকা-সহজপাচ্য উপাদেয় খাবারের রন্ধন-প্রণালী বিচিত্র হলেও, এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ বা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজেই গৃহস্থ-সংসারে আমাদের দেশের সুগৃহিণীরা অল্প-খরচে ও স্বল্প-আয়াসে নিজেদের হাতে এ সব অভিনব গুজরাটি খাবার বানিয়ে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের রসনা-তৃপ্তির সুব্যবস্থা করতে পারবেন।

শক্কর কন্দনে দাল : প্রথমে যে নিরামিষ-খাবারটির রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি, সেটির নাম—'শক্কর-কন্দনে দাল'। এটি গুজরাট-অঞ্চলের বিশেষ অভিনব এক ধরণের ডাল রান্নার প্রণালী। এ-রান্নাটির জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, গুজরাটী-কেতায় 'শক্কর-কন্দনে দাল' রাঁধবার জন্য চাই—তিনটি পরিপুষ্ট-ছাঁদের রাঙা-আলু, দুটি কাঁচা লঙ্কা, চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা অড়হর ডাল, সামান্য একটু হিং, এক টুকরো তেঁতুল, এক টুকরো আদা, চায়ের চামচের এক চামচ হলুদ, প্রয়োজনমতো খানিকটা গুঁড়ো নুন, বড় চামচের এক চামচ ভালো গুড় আর বড় চামচের এক চামচ ঘি। এ উপকরণগুলি দিয়ে যে পরিমাণ 'শক্কর-কন্দনে দাল' রান্না হবে, সেটি চার-পাচজনের আহারের উপযোগী। বেশী জনের জন্য ব্যবস্থা করতে হলে, উপরোক্ত হিসাব অনুসারে উপকরণের মাত্রা যে বাড়িয়ে দিতে হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য !

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, রাঙা-আলুগুলিকে চার-টুকরো করে কুটে এবং আদা আর লঙ্কা বেশ মিহি করে কুচিয়ে নিন। এ কাজের পর, ডালটুকু পরিষ্কার-জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। এবারে ঐ তেঁতুলের টুকরোটুকু চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা পরিমাণ জলে গুলে, খানিকটা তেঁতুলের রস তৈরী করে রাখুন। এমনিভাবে রান্নার প্রাথমিক কাজগুলি সেরে, উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকচি চাপিয়ে, তার মধ্যে চায়ের পেয়ালার তিন-চার পেয়ালা জল ঢেলে কিছুক্ষণ বেশ করে ফুটিয়ে নিন। উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকচির জল ফুটন্ত হলে, সেই জলে ডালটুকু ঢেলে দিয়ে খানিকক্ষণ গরম-তাপে বসিয়ে আধ-সিদ্ধ করে নেবেন। ডালটি আধ-সিদ্ধ হলেই, রন্ধন-পাত্রে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে, আগুনের মৃদু-আঁচে সুসিদ্ধ করে নিন। ডালের সঙ্গে সঙ্গে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি সুসিদ্ধ হয়ে 'মণ্ডের' (Pulp) আকৃতি ধারণ করলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজ-মতো পরিমাণে নুন, হলুদ, আদা, পেঁয়াজ আর তেঁতুলের রস মিশিয়ে রান্নাটিকে অল্পক্ষণ উনানের নরম আঁচে ফুটিয়ে নেবেন। ডালের জলে বুদ্‌বুদ্‌ ফুটে উঠলেই সে-জলে অড়হর ডালটুকু ঢেলে দিয়ে, খানিকক্ষণ উনানের আঁচে
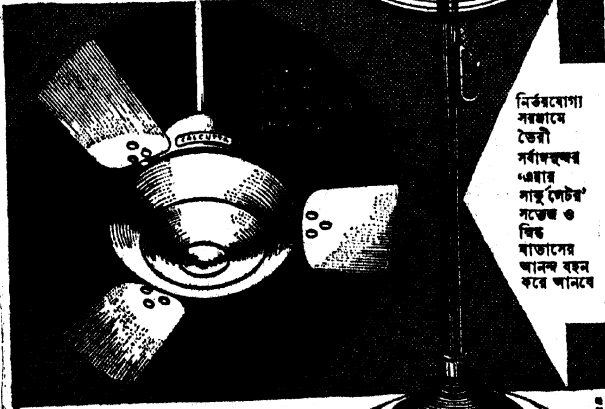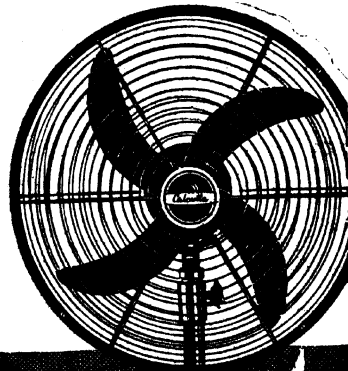
বসিয়ে রেখে আধ-সিদ্ধ করে নেবেন। ডালটি আধ-সিদ্ধ হলে, রন্ধন-পাত্রে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে, রান্নাটিকে উনানের মৃদু-আঁচে সুসিদ্ধ করে নিন। ডালের সঙ্গে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি সুসিদ্ধ হয়ে 'মণ্ডের' (Pulp) আকার ধারণ করলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজ-মতো পরিমাণে নুন, হলুদ, আদা আর তেঁতুলের রস মিশিয়ে রান্নাটিকে অল্পক্ষণ উনানের নরম-আঁচে ফুটিয়ে নেবেন। ডালের জলে বুদ্‌বুদ্ ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড় চামচের এক চামচ ঘি গরম করে, তাইতে সামান্য একটু হিং মিশিয়ে, ডালের 'ফোড়ন' হিসাবে, সেটুকু রন্ধন-পাত্রে ঢেলে দেবেন। এভাবে 'ফোড়ন' দিয়ে রান্নাটিকে অল্পক্ষণ ফুটিয়ে নেবার পর, ডালের সঙ্গে সামান্য একটু গুড় মিশিয়ে কিছুক্ষণ উনানের আঁচে ফুটিয়ে নিয়ে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রাখবেন। তাহলেই রান্নার কাজ শেষ। এবারে পাতে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে, গুজরাটী-কেতায় সদ্য-রান্না-করা 'শক্কর-কন্দনে দাল' খাবারটিকে হাঁড়ি বা ডেকচি থেকে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে পরিপাটিভাবে ঢেলে রাখুন !

এই হলো পশ্চিম-ভারতের অভিনব গুজরাটী-খাবার 'শক্কর-কন্দনে দাল' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

পাকি-কেরিস্থু শাক ঃ

এবারে নিরামিষ-জাতীয় আরেকটি যে বিচিত্র-অভিনব গুজরাটী-খাবার রান্নার কথা জানাচ্ছি, সেটির নাম—'পাকি—কেরিস্থু শাক'। এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—ছয়টি পাকা আম, দু'তিনটি কাঁচা লঙ্কা, চায়ের চামচের এক চামচ জীরা কিম্বা মেথির গুঁড়ো, সামান্য একটু হিং, চায়ের চামচের সিকি চামচ পরিমাণ ছোট এলাচ, লবঙ্গ আর দালচিনির গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো পরিমাণে অল্প খানিকটা নুন আর ঘি।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, আমগুলিকে পরিপাটিভাবে টুকরো করে কেটে ফেলুন। আমের টুকরো কোটা হলে, লঙ্কাগুলিকেও বেশ মিহি করে কুচিয়ে নিন। এবারে উনুনের আঁচে রন্ধন-পাত্র বসিয়ে, সে পাত্রে প্রয়োজনমতো ঘি দিয়ে, গরম-ঘিয়েতে রান্নার মশলাগুলিকে ভালো করে ভেজে ফেলুন। মশলাগুলি সুষ্ঠুভাবে ভাজা হলে, রন্ধন-পাত্রে রান্নার অন্য সব উপকরণ মিশিয়ে কিছুক্ষণ উনানের মৃদু-আঁচে পাক করুন। এভাবে পাক করার ফলে, আমের টুকরোগুলি নরম 'মণ্ডের' (Pulp) মতো হয়ে উঠলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে, অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে খাবারটিকে তুলে রাখুন। তাহলেই এই অভিনব গুজরাটী-খাবার 'পাকি-কেরিস্থু শাক' রান্নার পালা চুকবে। এবারে এই উপাদেয় নূতন-ধরণের খাবারটি পরিপাটিভাবে পরিবেশন করুন আপনার প্রিয়জনদের পাতে···গুজরাটী-কেতায় রান্না-করা এ খাবারটি খেয়ে তাঁরা যে আপনার সৌখীন-রুচির তারিফ করবেন—সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় থাকতে পারেন !

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের ভারতের বিভিন্ন-অঞ্চলের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় বিচিত্র খাবার রান্নার কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

দ্বৈতবাদ

সনত কুমার মিত্র

দুই চোখ দিয়ে দেখলেও দেখি একখানি ছবি :
আকাশের নীল, গাছের সবুজ অথবা পাহাড়,—
যাই বলো, যেন, এক চোখে দেখে হৃদয় ভরে না ;
দুই চোখে দেখে তুচ্ছ জিনিষও মন খুশী হয়।

দুটি ঠোঁট নড়ে বাতাসে ছড়ায় একখানি গান,
একা ঠোঁট যদি আমরণ নড়ে তবুও কথনো
কথাই হবে না ; তেমনি কিছুকে ধরতে গেলেও
খুব কম করে দুটি আঙুলের দরকার হয়।

পৃথিবীর এই এত আলো হাওয়া, এত হাসি গান,
এ সবের রস ঠিক পেতে হলে একাকী থেকোনা ;
দুই হতে হবে, দুটি হৃদয়ের দ্বৈতসৃষ্টি,
পৃথিবীর বুকে কিছু দেওয়া হয়, কিছু পাওয়া হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের একশ বছর

শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাষ্টার ও অফিসিয়াল্ রেফারী, কলিকাতা হাইকোর্ট)

আজি হতে শতবর্ষ আগে ১লা জুলাই তারিখে মহানগরী কলিকাতায় মহাধর্ম্মাধিকরণ হাইকোর্টের জন্ম হয়েছিল। গত ৯ই জুলাই তারিখে তার শতবার্ষিক পূর্ত্তি উৎসব সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হোলো। যার জন্মদিনে আমাদের ভারতবর্ষ ছিলো ব্রিটিশের অধীন, শতবর্ষপরে আজ আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে তার জন্মোৎসব সম্পন্ন হল।

জন্মকালে ইংরেজ প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার বার্ণস্ পিকক্-এর বিচারাধীনে কলিকাতা হইকোর্টের ইতিহাসে যে গৌরবময় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, আজ একশবছর পরে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীহিমাংশুকুমার বসু মহাশয়ের বিচারাধীনে সেই ঐতিহ্যের গৌরব শুধু অম্লান অক্ষুণ্ন আছে তা নয়, বহুলতর পরিমাণে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়েছে। এর পটভূমিকায় রয়েছে গত একশবছরের হাইকোর্টের গৌরবময় ইতিহাস। তারি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেতে হলে শ দু'য়েক বছর পিছনে যেতে হবে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে স্বদেশের ভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হোলে ইংরেজ বাঙলা বিহার উড়িষ্যার সার্ব্বভৌম শক্তি হয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করলো। দেওয়ানী পেলো দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং তারই বলে তারা শুধু বণিক রইলো না, ভূম্যধিকারী হয়ে পড়লো। তারপর নিজেদের বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো। রাজস্ব আদায়ের চিন্তা থেকেই সেদিন উদ্ভব হোয়েছিল আইন আর আদালতের প্রশ্ন। ইংরেজরা কলিকাতা সহরে প্রথম বিচার করেছেন প্রথম সাহেবী আদালত 'মেয়র্স কোর্টে'।

কলিকাতা হাইকোর্ট

তখন ফাঁসী দেবার ক্ষমতা ছিল না সত্য, কিন্তু ছিঁচকে চোরের শাস্তি যা ছিল তাও কষ্টদায়ক; সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারতো। প্রাক-পলাশী যুগে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে এদেশের আদালতগুলিতে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিগণই বিচারকের আসন গ্রহণ করতেন। এঁদের বলা হোতো কাজি। মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও গৃহযুদ্ধ আর মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়ের পরিবেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের নানাদিকে অনুপ্রবেশ করবার সুযোগ পেলো।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণকের আবির্ভাব হুগলীতে। তৎকালীন বাংলার নবাবের অনুমতি নিয়ে কেনা হলো সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা। এই তিনটি গ্রামকে একত্র করে হোলো কলিকাতার জন্ম। এই সময় থেকেই কোম্পানীর জমিদারী পত্তন। জব চার্ণকের কলিকাতায়

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার বার্ণস পিকক

ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের আবাস স্থল ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়াতে, সুসংবদ্ধ বিচার ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন বশতঃ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে সনদ বলে একজন মেয়র ও নয়জন অলড্যারম্যান্‌কে নিয়ে মেয়র্স কোর্ট তৈয়ারী হয়। ডান্ সেণ্টসবেরীলয়েড্ কলিকাতার প্রথম মেয়র। বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত এই আদালত। ইংলণ্ডের রাজশক্তি প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যদিও মেয়র্স কোর্ট কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, কোম্পানীর আদালতগুলি সমতুল্য ও স্বাধীনভাবে বিচারের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের বিস্তার সুরু করলো। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী নূতন সনদ বলে আরও অধিকার তারা পেলো। মেয়র্স কোর্টের ক্ষমতা কিছু হ্রাস করা হলো। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যেরূপ বিচার পদ্ধতি ছিল তাই কলিকাতায় আদালতে দেখা গেল। এখানে বিলাতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকানুনগুলি প্রয়োগ করা হোলো। মেয়র্স কোর্টের পরেই ছিল কলিকাতার জমিদারদের নিজস্ব আদালত, উপরে 'কোর্ট অফ আপীল' বা গভর্ণরের বিচার সভা।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে হাউস অফ কমন্সের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জানা গেল যে তদানীন্তন মেয়র্স কোর্টের কার্য্য কলাপ সন্তোষজনক নয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটীং এক্ট সুপ্রীম কোর্টের প্রাণ শক্তিকে সুদৃঢ় করলো। মেয়ার্স কোর্টের মধ্যে যে সব মামলা মোকর্দ্দমা রুজু ও মুলতুবি হয়েছিল সেগুলি সুপ্রীম কোর্টের কাছে হস্তান্তরিত হলো। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সনদে ইংলণ্ডের রাজশক্তি সুপ্রীম কোর্ট আদালতকে দপ্তরের আদালত (অর্থাৎ কোর্ট অফ রেকর্ডস) রূপে পরিগণিত করলেন। তিনজন বিচারক ও একজন প্রধান বিচারপতি নিয়ে গড়ে উঠলো সুপ্রীম কোর্ট। ইংলণ্ডের অধীশ্বর এঁদের নিয়োগ কর্ত্তা। এঁরা সকলেই ব্যারিষ্টার। বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত সকল প্রকার বিচারের ভার এঁদের হস্তে অর্পিত হোলো। ইংলণ্ডের কিংস বেঞ্চের আদালতের মত এরা পেলেন বিচার বিভাগীয় সার্ব্বভৌম অধিকার। সকল প্রকার আদেশপত্র ও সমনজারির বিলি বন্দোবস্ত ইংলণ্ডের অধীশ্বরের নামে প্রধান বিচারপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হোতো। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সনদের বলে প্রধান বিচারপতি হোলেন স্যার এলিজা ইম্পে এবং মাননীয় রবার্ট চেম্বার্স, মাননীয় ষ্টিফেন্ সিজারলিমেষ্টার ও মাননীয় জন হাইড্ হোলেন বিচারপতি।

প্রধান বিচারপতির বার্ষিক বেতন আট হাজার পাউণ্ড এবং প্রত্যেক বিচারপতির বার্ষিক বেতন ছয় হাজার পাউণ্ড ধার্য্য হল ব্রিটীশ পার্লামেণ্টের পরবর্ত্তী সনদের বলে সুপ্রীম কোর্টের বিচার সীমানা বেনারস ও ফোর্ট উইলিয়ামের শাসনাধীন স্থানগুলি পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করলো। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সনদের দ্বারা বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত শাসনকর্ত্তা, সৈন্যাধ্যক্ষ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল ও মিলিটারী অফিসার, মন্ত্রী, ব্রিটিশ প্রজা প্রভৃতিকে সুপ্রীম কোর্টের বিচার ও আদেশ মান্য ও পালন করবার জন্য বাধ্য করা হোলো। এর ফলে সুপ্রীম কোর্টের সার্ব্বভৌম শক্তির সঙ্গে

কলিকাতার গঙ্গার দিক থেকে তোলা একটি পুরান চিত্রে রাজ্যপাল ভবনের বাম দিকে নির্মীয়মান হাইকোর্ট ভবন দেখা যাচ্ছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সাংঘাতিক হয়ে উঠলো। অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সার্ব্বভৌম শক্তিকে খর্ব্ব করা হোলো। গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের কোন প্রকার কার্য্য বা আদেশের ওপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের রইলো না। রাজস্ব ব্যাপারেও সুপ্রীম কোর্ট অধিকারচ্যুত হোলো। স্থানীয় বিচার বিভাগীয় কর্ত্তাদের ভালোমন্দ কার্য্যাবলীর সম্পর্কে কোন প্রকার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট আর পেলোনা। সুপ্রীম কোর্টের প্রাদেশিক সীমা কলিকাতা সহরের বাইরেও প্রসারিত থাকলো না। কোম্পানীর আদালতগুলির সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও বিচার পদ্ধতির পার্থক্য দেখা গেল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 'য়্যাক্‌ট অব সেট্‌লমেণ্ট' পাশ হোলো। ক্রাউন কোর্ট অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের বিচার ও আইন প্রয়োগের এলাকা বা প্রাদেশিক অধিকার সীমা কলিকাতা সহরের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে রইলো। এই সীমিত অধিকার বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমানের বিচার সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানে ইংলণ্ডের আইন পদ্ধতি সুপ্রীম কোর্টে অনুসৃত হতো। দ্বৈতপ্রথা অব্যাহত ছিল। য়্যাটর্নীদের সহযোগীতার মাধ্যমে এড্‌ভোকেট্‌রা আদালতে মামলাকারীর পক্ষে দাঁড়াতেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে কলিকাতা নগরীর সুপ্রীম কোর্ট মামলাকারীদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল। এই আদালতের বিচারের প্রতি তাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতশাসন পদ্ধতির উন্নতিকল্পে পার্লামেণ্ট থেকে আইন পাশ হলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁদের অধিকারভুক্ত ভারতীয় অঞ্চলগুলি ইংলণ্ডের রাজশক্তির হস্তে অর্পন করলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রের দ্বারা এই হস্তান্তর চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হোলো। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ভারত গভর্ণমেণ্ট ও শাসনভারের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আইন পাস করলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে আইন বলে লেটার্স পেটেণ্টের মাধ্যমে বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের ব্যাপ্তি, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে আইনের ধারাগুলি প্রণয়ন করা হোলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ এবং রাজশক্তির কোম্পানির আদালতগুলির ভার গ্রহণ ও জেলা আদালতগুলির হাইকোর্টের অধীনস্থ হওয়ার দরুণ বাংলার সমস্ত আদালতই সর্ব্বপ্রথম ক্রাউন্ কোর্টে পরিণত হোলো। পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের লেটার্স পেটেণ্টও নিষ্ক্রিয় করে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে নূতন লেটার্স পেটেণ্ট বা সনদ ঘোষিত হোলো।

এই হাইকোর্টকে এডভোকেট, উকীল ও য়্যাটর্নী

নিয়োগ বা বরখাস্ত করার অধিকার দেওয়া হোলো। কলিকাতার চৌহদ্দির মধ্যে সাধারণ আদিম দেওয়ানি বিচার সীমিত। এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যের সর্ব্বপ্রকার বিচারের ভার তার ওপর অর্পিত হোলো। কতকগুলি সাধারণ সামান্য মামলা ছোট আদালতের (স্মল কসেস কোর্ট) ওপর ন্যস্ত হোলো। অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা বাঙলা বা বাঙলার বাহিরের মামলা বিচার করবার অধিকার তদারক বা তত্ত্বাবধানের ভার হাইকোর্টে অর্পিত হয়েছে। এর মামলার আপীল, আপীল বিভাগে ও প্রিভি কাউন্সিলে করার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যস্ত সর্ব্বপ্রকার বিচারের অধিকার কিছু কিছু অদল বদল করে হাইকোর্টের আদিম বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। কলিকাতার সদর দেওয়ানি, সদর নিজামৎ আদালতে যে সব বাংলা বা বাংলার বাইরের মামলা আপীলের জন্য আসতো সেই সব মামলার আপীলের শুনানি ও বিচারের জন্যে ঐ সব লেটার্স পেটেন্টের দ্বারা আপীল কোর্ট সৃষ্টি হয়। কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন আপীল কোর্ট যথা সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামৎ আদালতের সমপর্য্যায় ভুক্ত হয়েছে—আপিলেট সাইডের কেন্দ্রীভূত হাইকোর্ট। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ভারত গভর্ণমেণ্টের এ্যাক্ট অনুসারে লেটার্স পেটেণ্ট প্রদত্ত বিচারের কতকগুলি এলাকা বা অধিকার সীমা ও ক্ষমতা সংরক্ষিত। ঐ আইনের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে আদিম বিভাগের বিচারের সীমা নির্ণীত হয়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে কতকগুলি বিচারের অধিকার সীমা ও ক্ষমতা সংরক্ষিত। রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে হস্তক্ষেপ করবার বা বিচার করবার অধিকার নেই। সর্ব্বপ্রকার বিচারই ইংরাজী ভাষায় করবার নির্দ্দেশ আছে। প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে বেতন দিবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে হাইকোর্টের আর্থিক ব্যাপারের সর্ব্বপ্রকার ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত, কেন্দ্রীয় সরকার এই সরকারের ওপর এই ভার দিয়েছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হোলে আপীল বিভাগের কিছু কিছু বদলেছে। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ইংরাজের রচিত সর্ব্বপ্রকার আইন কানুনের বিধি ব্যবস্থা ও ক্ষমতা হাইকোর্টকে দিয়েছেন। ভারতীয় শাসন পদ্ধতির ২২৬ ধারায় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও বিচারের অধিকারও হাইকোর্টকে দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। এখন আপীলের জন্যে বিলাতের কিংস বেঞ্চে যাবার আবশ্যক নেই, দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টের বিচারই চূড়ান্ত।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী প্রধান বিচারপতির আদেশে 'দি হাইকোর্ট অব জুডিকেচার এ্যাট ফোর্ট উইলিয়ম্ ইন্ বেঙ্গল' কথাটীর পরিবর্ত্তে 'হাইকোর্ট এ্যাট্ ক্যালকাটা' রাখা হয়েছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সিটি সিভিল কোর্টের প্রতিষ্ঠা, ও দশ হাজার টাকা বা এর নিম্নের মামলা এবং পার্টনারসিপ প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগে পাঁচহাজার টাকার মামলা গ্রহণ করা হয়। স্মল্ কসেস কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারভুক্ত কতিপয় ধরণের মামলার উপর এর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই। সিটি সেসন্স কোর্টে দায়রা মামলার বিচারও হয়ে থাকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কাজ বেড়েই চলেছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে উইল প্রবেটের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি হয়েছে, ওয়েলথ্ ট্যাক্স, গিফ্‌ট ট্যাক্স, ডেথাডউটির আইন ইত্যাদি বহু নূতন আইন পাশ হওয়ায় ফলে এবং আয়কর আইন সংক্রান্ত মামলা বহুলতর বৃদ্ধির ফলে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে

কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি

কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সুপ্রীম কোর্টের এড্‌ভোকেটরা য়্যাটর্নী ব্যতীত নিজেরাই আদিম বিভাগের মামলায় তদারক ও বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে দাঁড়িয়ে ওকালতি করবেন।

প্রথম যখন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর বিচারের এলাকা ছিল সুদূর প্রসারিত। সমগ্র বাংলাদেশ তো এই এলাকার অন্তর্ভূক্ত ছিলই তা ছাড়া ছিল সমগ্র বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও আসাম, এমন কি বর্ম্মাও ছিল এই হাইকোর্টের অধীনে। তখন গভর্ণমেণ্টের কোন পৃথক বিচার বিভাগ ছিল না। এই বিস্তৃত এলাকায় যত বিচারালয় ছিল সেই সমস্ত বিচারালয়ের বিচার বিভাগ ও ব্যবস্থাপনার ভার ছিল এই হাইকোর্টের ওপর। হাই-কোর্টের আদেশে মফঃস্বল কোর্টের বিচারকরা এক কোর্ট থেকে আর এক কোর্টে বদলি হোতেন। বিচারক নিযুক্ত করতো এই হাইকোর্ট।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে আশী হাজার টাকায় কেরী সাহেবের বাড়ী কেনা হোলো। সেই বাড়ীই তেষট্টি বছর পরে নবরূপে দেখা দিয়েছিল হাইকোর্টের পতাকা শীর্ষে নিয়ে। বর্ত্তমান হাইকোর্ট ভবন গথিক্ স্টাইলে নির্ম্মিত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। তখন গভর্ণমেণ্ট স্থপতি ছিলেন ওয়াল্‌টার গ্রাণ্‌ভিল্। তিনি ইপ্রেস নগরের টাউন হলের অনুকরণে এই হাইকোর্ট ভবন নির্ম্মাণ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এর দ্বারোদ-ঘাটন হয়। হাইকোর্ট ভবন যেখানে নির্ম্মিত হয়েছে সেখানে ছিল সেকালের সুপ্রীমকোর্ট ভবন। সুপ্রীম কোর্ট ভবন নির্ম্মিত হয়েছিল ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সুপ্রীম কোর্ট ছিল হাইকোর্ট ভবনের ভিতর পশ্চিম অংশে। আরও তিনটি সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ী এর ভেতর পড়েছিল। তখনকার দিনের সেই সুপ্রীম কোর্টের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ছিল একটা সরু গলি। তারও পূর্ব্বদিক ছিল কল্‌কাতা বার লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা লঙ্-ভিল্ ক্লার্কের বাড়ী। তাঁর বাড়ীর পাশে এসপ্লানেড আর ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্টীটের মোড়ে সুপ্রীমকোর্টের মাষ্টার উইলিয়ম্ ম্যাক্‌ফারসনের বাড়ী। তাঁর ভাই ছিলেন বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী স্যার উইলিয়ম্ জর্জ্জ ম্যাক্‌ফারসন্। সুপ্রীম কোর্ট ভবনের বাইরেটা দেখতে ভালো না হোলেও এর ভিতরটা ছিল অতি সুদৃশ্য। এর দোতালায় ছিল গ্র্যাণ্ড জুরি রুম। এই কক্ষেই ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যার উইলিয়ম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রীম কোর্টের নীচের তলায় ছিল বিচার কক্ষ। আর একটি কক্ষে বস্‌তেন স্যার উইলিয়ম জোন্স।

যে সুপ্রীম কোর্টের ভিত্তির ওপর এই হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই কোর্টের একটি কক্ষে বসে স্যার এলিজা ইম্পে ১২ জন খাস বিলিতি জুরীর সাহায্যে যেমন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিয়ে গেছেন, আবার সেই হাইকোর্টে ১৯০৮—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বোমার মামলার মিথ্যা অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতিও পেয়েছেন। সেই বিচারের শেষদিনে বিচারককে সম্বোধন করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে গুরুগম্ভীর স্বরে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেই সার্থক ভাষণ সত্যে পরিণত হয়েছে।

এই হোলো কলিকাতা হাইকোর্টের একশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর পশ্চাতে রয়েছে এক বিরাট গৌরব-ময় ঐতিহ্য। বিচারের উচ্চ মানদণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত এই হাইকোর্ট। এর মাননীয় বিচারকদের ন্যায় নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম-বিচার, নিরপেক্ষতা ও মর্য্যাদা আজ সমগ্র দেশের হৃদয় জয় করেছে এবং বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীহিমাংশু-কুমার বসু মহাশয়ও অতীতের প্রধান বিচারপতিদের ন্যায় সগৌরবে এই বিরাট দায়িত্ব বহন করে চলেছেন।

ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র রায়—

ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ভারতমাতার সুসন্তান, সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ও দেশ-সেবক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভারতরত্ন গত ১লা জুলাই রবিবার বেলা ১২টা ৩ মিনিটে সাধনোচিত ধামে মহা-প্রয়াণ করিয়াছেন। অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারী, অনন্য-সাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন বিধানচন্দ্রের ৮১তম জন্মবার্ষিক পালনের জন্য যে দিনটি দেশবাসী নির্দ্দিষ্ট করিয়া নানাস্থানে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই জন্মদিনেই সহসা তাঁহার স্বর্গগমনের সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দেশবাসী সকলকে শোকে অভিভূত করিল। তিনি ২৩শে জুন শনিবার হইতে সরকারী দপ্তরখানায় যাওয়া বন্ধ করিয়া নিজ কলিকাতা ৩৬, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিলেন ও সকল সরকারী কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শ মতই তাঁহাকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ২৩শে জুন তিনি 'ভারতবর্ষের' জন্য স্বর্ণজয়ন্তীর আশীর্বাদ লিখিয়া দেন। ১লা জুলাই সকালেও তিনি সুস্থ ছিলেন এবং সেদিন বহু লোক সকালে তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার জন্ম-দিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বেলা ১১টার পর তিনি সহসা বুকে বেদনা অনুভব করেন এবং চিকিৎসকগণের সহিত রহস্যালাপ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের ১০ মিনিট পূর্বে শয্যা গ্রহণ করেন ও তখনই তাঁহার দেহ প্রাণহীন হইয়া যায়। ১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় আমরা তাঁহাকে প্রত্যহ বহু স্থানে সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে দেখিয়া মনে করিতাম—ডাক্তার রায় এখনও বহু বৎসর কর্মক্ষম অবস্থায় জীবিত থাকিবেন। তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনেও তিনি হাসিমুখে কথা বলিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুর সময়ও তাহারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর দিন সকালেও তিনি প্রয়োজনীয় সরকারী

অন্তিম শয়নে বিধানচন্দ্র।
শয্যাপার্শ্বে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকৃষ্ণ মেনন, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

কাগজ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং একদিন পূর্বে শুক্রবার সকালে তিনি স্বগৃহে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ৫০ বৎসরেরও অধিককাল তিনি প্রতিদিন সর্বক্ষণ কোন না কোন কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন—ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই অক্লান্ত পরিশ্রমই ডাক্তার রায়ের জীবনের সাফল্যের প্রধানতম কারণ ছিল। আমরা দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহার মহামানবের গুণ ও মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছি—তাই আজ তাঁহার এই পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণেও স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই পাটনায় ডাক্তার রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অবসর গ্রহণের পর ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী ছিলেন—প্রকাশ চন্দ্র তাঁহার সহধর্মিণী মহাপ্রাণা অঘোরকামিনী দেবীকে নিজের মনের মত করিয়া তৈয়ার করিয়াছিলেন—দুই কন্যার পর তাঁহাদের তিন পুত্র জন্মলাভ করে—প্রথম সুবোধচন্দ্র ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় সাধনচন্দ্র এঞ্জিনিয়ার ও কনিষ্ঠ বা তৃতীয় বিধানচন্দ্র ডাক্তার হইয়াছিলেন। পিতা তিন পুত্রকেই বিলাত পাঠাইয়া উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র 'অঘোরপ্রকাশ' গ্রন্থ লিখিয়া সাধ্বী পত্নী অঘোরকামিনী দেবীর কথা নিজেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মাতা ১৮৯৬ সালে ও পিতা ১৯১১ সালে পরলোকগমন করিলেও মাতাপিতার শিক্ষা ও জীবন যাপন প্রণালীর প্রভাব বিধানচন্দ্রের জীবন গঠনে বহুরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। পিতা প্রকাশচন্দ্র প্রথম দুই পুত্রকে উচ্চ শিক্ষাদানে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া বিধানচন্দ্র প্রথম জীবনে অর্থের প্রাচুর্য্যের মধ্যে পালিত হন নাই। তাঁহারা ২৪ পরগণা টাকী শ্রীপুরের বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারভুক্ত এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর।

বিধানচন্দ্র পাটনা, কলিকাতা ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এম-বি হইয়া তিনি ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি উপাধি লাভ করেন। পরে বিলাত যাইয়া ১৯০৯ সালে লণ্ডনের এল-আর-সি-পি ও ইংলণ্ডের এম-আর-সি-এস হন এবং ১৯১১ সালে লণ্ডনের এম-আর-সি-পি ও ইংলণ্ডের এফ-আর-সি-এস উপাধি লাভ করেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গল্পের কথায় পরিণত হইয়াছে। প্রথম জীবন হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন এবং ১৯১৬ সালেই তিনি ৩৬, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ী ক্রয় করেন। ১৯১৬ সালেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং সুদীর্ঘকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বোর্ডের সভাপতিরূপে উহার সমস্ত অর্থ ব্যবস্থায় সর্বদা অতিবাহিত থাকিতেন।

১৯২৩ সালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ২৪ পরগণা উত্তর মিউনিসিপাল নির্বাচন কেন্দ্রে তৎকালীন বঙ্গের মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়স্ক চিকিৎসক বিধানচন্দ্র সেদিন ৭০ বৎসর বয়স্ক ভারতবিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়া যে অসামান্য গৌরব লাভ করেন তাহা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অম্লান রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ দুই বৎসরকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার এবং কয়েক বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান ও ১৯৩১ হইতে ১৯৩৩ দুই বৎসরকাল কলিকাতার মেয়র থাকিয়া নানা ভাবে দেশ ও জাতির সেবা করিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-এস-সি উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহার দীর্ঘ দিনের সেবার স্বীকৃতিদান করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে তিনি কয়েকমাস কারাবরণও করিয়া গিয়াছেন।

১৯১৯ সাল হইতে তিনি বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমান আর-জি-কর কলেজ) সহিত যুক্ত হইয়া কলেজটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তাঁহারই আগ্রহে ও স্বর্গত ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের সহযোগিতায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপিত হইয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বর্গলাভের পর তাঁহার বাসগৃহে

যে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার রায় তাঁহার প্রধানতম কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে স্বর্গত ডাক্তার সুবোধ মিত্রের সহযোগিতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ডাক্তার রায়কে যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হইয়াছিল—কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই।

ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে তিনি যে কত দুঃস্থ দরিদ্র রোগীর বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াও তিনি প্রতিদিন সকালে ১ ঘণ্টাকাল বিনা পারিশ্রমিকে শত শত রোগীর চিকিৎসা করিয়া দেশবাসীকে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন।

১৯৪৮ সালে ২৩শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করিলে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্যভার গ্রহণ করেন এবং তদবধি ১৪ বৎসরেরও অধিককাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিরূপ যোগ্যতা ও নিপুণতার সহিত সে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ সর্বজনবিদিত।

১৯৬১ সালে স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ভারত-রত্ন উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করা হইয়াছিল।

ভারতের নূতন রাষ্ট্রপতি ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ গত ১লা জুলাই অপরাহ্ণে বিধানচন্দ্রের জন্মোৎসবে সভা-করার জন্য পূর্বদিন শনিবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্রের শব শোভাযাত্রায় ও কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া শেষ সম্মানদান করিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধুর স্বর্গলাভের পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপর কংগ্রেস পরিচালনার নেতৃত্ব পড়িলে বাংলার ৫ জন নেতা সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা হন—তাঁহারা ছিলেন—শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্রের সহিত সে দলের ইতিহাস শেষ হইল। বাকী ৪ জন নেতা পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন।

চিকিৎসক বিধানচন্দ্র সারা ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের সময় বিধানচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর পিতা স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বিধানচন্দ্রের গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলেই বিধানচন্দ্রের দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন।

আমাদের সৌভাগ্যের কথা ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষায় বিধানচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনীগ্রন্থ পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরের বাংলা সর-কারের ফাইলের মধ্যে বিধানচন্দ্রের যে কর্মময় জীবন-কথা লিখিত আছে, পরবর্তীকালে তাহা প্রকাশিত হইয়া দেশের ভবিষ্যৎ মানুষকে কর্মসাধনা শিক্ষাদান করিবে।

বিধানচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন—সারা জীবন ধরিয়া তিনি যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন, তাহার অধি-কাংশই তিনি দরিদ্র ও দুঃস্থ দেশবাসীর কল্যাণ কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তিনি অতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন এবং খাদ্য বা পোষাকে জীবনে কোনদিন বিলাসিতায় অন্যায় অর্থব্যয় করেন নাই। সদা পরহিতব্রতী, সহৃদয় ও কৃপাপরায়ণ বিধানচন্দ্র যাহার অভাব দেখিতেন, তাহাকেই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। বিরাট দেহ ও তদপেক্ষা বৃহৎ ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে কোমল হৃদয়টির পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহাই সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত ও সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিত। তিনি সাধক ছিলেন, কর্ম-সাধনার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার স্বর্গত আত্মা অমরধামে চির-শান্তি লাভ করিবে। আমাদের প্রার্থনা—আমরা যেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের জীবন সুপথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গত ১৪ই জুলাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডি-

সঙ্গীবায়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীঘোষ পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদী নেতা, কাজেই তাঁহার মনোনয়নে সকলে আনন্দিত হইবেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১লা জুলাই পরলোকগমন করায় গত ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিধানচন্দ্রের স্থানে দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং পরদিন পূর্বের মন্ত্রীদের লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং নিজে মুখ্যমন্ত্রী হন। বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পরদিনই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু প্রফুল্লবাবুর উপর রাজ্যের কার্যপরিচালনার কর্তৃত্ব দান করেন এবং মন্ত্রীদের লইয়া কাজ করিতে বলেন। একদল দুষ্টলোক মনে করিয়াছিল—মুখ্যমন্ত্রীর দল লইয়া পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে দলাদলি হইবে—কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পরক্ষণেই সকল কংগ্রেস নেতা মিলিত হইয়া একযোগে প্রফুল্লবাবুকে দলের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করায়—এ দুঃসময়ে যে পশ্চিমবঙ্গে দলাদলি হইল না তাহা দেখিয়া বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং স্বয়ং শ্রীজহরলাল নেহরু অতুল্যবাবুর কার্যের প্রশংসা করেন। প্রফুল্লবাবু বাংলা কংগ্রেসের পুরাতন কর্মী ও নেতা। ১৮৯৭ সালে বিহারে জন্মগ্রহণ করিয়া (তাঁহার আদিবাস খুলনা জেলার সেনহাটী হইলেও) পিতা গোপালচন্দ্র সেন এঞ্জিনিয়ার—কার্যব্যাপদেশে বিহারে বাস করিতেন। ১৯১৮ সালে প্রফুল্লবাবু ফিজিক্সে অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন ও একাউণ্টেন্সি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তদবধি তিনি কংগ্রেসে তথা দেশবাসীর সেবা ও মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন। তিনি গঠনমূলক কার্যে উৎসাহী—সে জন্য তিনি হুগলীর নো-চেঞ্জার তথা খাদি দলের পরিচালক ছিলেন। আরামবাগ যৌবনে তাঁহাকে আকৃষ্ট করায় সেখানে তিনি কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে আন্দোলনের তিনি চতুর্থ নেতা বা সভাপতি ছিলেন—পরে তিনি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সহিত অভয় আশ্রমেও কাজ করেন। মুক্তি সংগ্রামে তিনি কয়েকবারে মোট ১১বৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন এবং ১৯৪৫ সালে শেষ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। তাহার পর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন ডাক্তার ঘোষের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সাল হইতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় বিধানচন্দ্রের দক্ষিণহস্তরূপে কাজ করিয়াছেন। তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণকে সমানভাবে গ্রহণ ও ভালবাসার জন্য তাঁহাকে অজাতশত্রু বলা যায়। তিনি অবিবাহিত এবং তাঁহার দ্বার সর্বদা সকলের জন্য উন্মুক্ত। অনাড়ম্বর জীবন, অমায়িক ব্যবহার ও সরলতার জন্য তাঁহাকে সকলে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় সে জন্য দল নির্বিশেষে সকল কর্মীই আনন্দিত হইয়াছেন। পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রফুল্লচন্দ্র পশ্চিমবাংলাকে সুপরিচালিত করুন—সকলেই একান্তভাবে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে। আমরা তাঁহাকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা করি।

পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন—

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন গত ১লা জুলাই সকাল ১০টায় তাঁহার এলাহাবাদ বাসভবনে ৮০ বৎসর বয়সে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীটাণ্ডন ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মুক্তি সংগ্রামে ৭বার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে উকীল ছিলেন এবং পরে দীর্ঘকাল যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে। তিনি ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। একই দিনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীটাণ্ডনের মৃত্যু দুইটি রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

শ্রীএস-কে বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতিমান আই-সি-এস্ শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার

নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থানে তাঁহার সহকর্মী শ্রীএস বি রায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন কমিশনার হইয়াছিলেন। শ্রীরায় সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার (প্রধান কর্মকর্তা) নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস নূতন উন্নয়ন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ কাজ ছাড়াও উন্নয়ন বিভাগের পরামর্শদাতারূপে কাজ করিবেন। শ্রীকে-কে-সেন কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের কাজের সহিত হাওড়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের কাজও করিবেন। শ্রীনিয়োগী নিজ কাজ ছাড়া এনফোর্সমেণ্ট ও দুর্নীতি দমন বিভাগের সেক্রেটারীর কাজও করিবেন।।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাউল—

গত ১৬ই জুলাই কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রীএ-এম-টমাস কলিকাতায় আসিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে জানাইতেছেন যে—কেন্দ্রীয় শস্যভাণ্ডার হইতে পশ্চিমবঙ্গকে জুলাই মাসে ১৫ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে। পরে আরও বেশী চাউলের প্রয়োজন হইলে তাহা দেওয়া হইবে। বর্তমানে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি ভালই আছে—কাজেই কোথাও খাদ্যাভাবের কোন আশঙ্কা নাই।

শাসন ও বিচার বিভাগ—

বহুকাল হইতে সরকারী শাসনযন্ত্রে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করার কথা চলিতেছিল। সম্প্রতি ১৭ই জুলাই দিল্লীর খবরে জানা যায়—নিম্নলিখিত ৭টি রাজ্যে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করার ব্যবস্থা হইয়াছে—(১) পশ্চিমবঙ্গ (২) মহীশূর (৩) মাদ্রাজ (৪) মহারাষ্ট্র (৫) কেরল (৬) গুজরাট ও (৭) অন্ধ্রপ্রদেশ। বিহারে ১৭টি জেলার মধ্যে ১২টিতে, উড়িষ্যায় ১৩টি, জেলার মধ্যে ৯টিতে ও পাঞ্জাবে ১৯টি জেলার মধ্যে ৯টিতে কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ ও কুমাউন ও উত্তরখণ্ড বিভাগ ছাড়া ৪৭টি জেলায় কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত হইলে দেশে সুবিচার বৃদ্ধি পাইবে ও বিচারে মানুষের আস্থা বাড়িবে।

শ্রীদ্বারকা নাথ চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে ওয়াসিংটনে ভারতীয় দূত-অফিসে মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন। তাহাকে কঙ্গোর লিওপোলভিলিতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ১৯৪৮ সালে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালে প্যারিসে ও পরে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত লণ্ডনে দূতাবাসে কাজ করেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি করাচীতে ডেপুটী হাই কমিশনার ছিলেন ও পরে জেনেভাতে ভারতীয় কন্সাল জেনারেল ছিলেন।

ইংরাজি অন্যতম সরকারী ভাষা—

সম্প্রতি দিল্লীতে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন ভারতের শাসন তন্ত্রে এইরূপ বিধান ছিল যে ১৯৬৫ সালের পর হইতে হিন্দীই ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হইবে। কিন্তু ঐ বিধান পরিবর্তন করা হইয়াছে—তাহার ফলে ১৯৬৫ সালের পরও হিন্দীর সহিত ইংরাজি অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে চলিতে থাকিবে। শীঘ্রই প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু পার্লামেণ্টে একটি বিল আনিয়া ঐ বিষয়ে উপযুক্ত আইন দ্বারা ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়ে প্রবল আন্দোলন করা হইলে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত ও ইংরাজিই ভারতের প্রধান ও সরকারী রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত থাকিবে। এখনও যে কেন সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের প্রধান রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলনের উপযুক্ত চেষ্টা ও আন্দোলন হইতেছে না, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। এ বিষয়ে এখনই শ্রীকৈলাশনাথ কাটজু, শ্রীসি-রাজাগোপালাচারী, শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ইলামবাজারে নূতন সেতু—

গত ১৭ই জুন রবিবার সকালে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ইলামবাজারে অজয় নদের উপর নির্মিত নূতন পুলের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই পুল দ্বারা বীরভূমের কৃষিকেন্দ্রের সহিত বর্ধমান জেলার শিল্পকেন্দ্রের সংযোগ সাধিত হইল। ঐ দিনই পুলের উপর দিয়া মুখ্যমন্ত্রী গাড়ী করিয়া যাতায়াত করেন। পুলটি ১৭৪৭ ফিট দীর্ঘ। ঐ দিন পূর্তমন্ত্রী শ্রী খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত সকলকে জানান বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে ১৫টি পুল নির্মিত

হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ৩০টি নূতন পুল নির্মিত হইবে। এই পুল নির্মাণের ফলে সরাসরি বীরভূম যাতায়াত করা চলিবে এবং বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে বাণিজ্য বাড়িবে।

উত্তর-বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ১লা জুন উত্তর বঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের সপ্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যক্ষ বি-এন দাসগুপ্ত ঐ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিলিগুড়ি হইতে ৪ মাইল দূরে আঠারঘাট নামক স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানে ৬০০ একর জমী সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীদাসগুপ্ত জলপাইগুড়ির অধিবাসী। কলিকাতায় শিক্ষালাভের পর তিনি বিলাত হইতে চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট হইয়া আসিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তথায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় স্থানীয় ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষালাভ করা সুলভ ও সহজ হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ—

শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গত ১৬ই জুন শনিবার সকাল ৯টায় ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোমে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ দ্বিপ্রহরে বেলুর মঠে লইয়া যাইয়া দাহ করা হয়। ১৮৮৩ সালে হুগলী জেলার গুরুপ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৬ সালে তিনি ৺মা সারদা ময়ীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে স্বামী শিবানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি মঠের অন্যতম পরিচালক এবং ১৯৪৭ সালে সহকারী অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজীর দেহ রক্ষার পর গত ৬ই মার্চ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি মঠের বহু শাখায় বহু বৎসর বাস করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সারা ভারত অনেক বার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি ভাষণ সৎপ্রসঙ্গ নামে দুই খানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজ্যপাল মনোনীত এম-এ-সি -

গত [illegible] জুন পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীসহ নিম্নলিখিত ৭জনকে পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন (১) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (২) শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (৩) শ্রীমশারফ হোসেন (৪) শ্রীনগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (৫) শ্রীমতী রেবা সেন (৬) শ্রীগজানন খৈতান ও (৭) শ্রীজে-এ-দোশানি। আমরা সাহিত্যিক প্রমথবাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

রমেশচন্দ্র সেন -

গত ১লা জুন রাত্রিতে খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বরাহনগরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৫০ বৎসরের অধিককাল তিনি কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে নানা কার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি উপন্যাস বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

হাওড়া কলিকাতা সংযোগ—

বর্তমান হাওড়া পুল দিয়া এত বেশী মানুষ ও গাড়ী যাতায়াত করে যে প্রত্যেককে বহু সময় পুলের ধারে আটক থাকিতে হয়। সে জন্য হাওড়া পুলের এক মাইল দক্ষিণে গঙ্গার উপর একটি সেতু বা ভূগর্ভস্থ পথ নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। একটি বৃটিশ এঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন। এই তদন্তের জন্য ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে—তন্মধ্যে ৭॥০ লক্ষ টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ৩॥০ লক্ষ টাকা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রদান করিবেন। প্রতিদিন হাওড়া পুলের উপর দিয়া ৫ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ এবং ৪০ হাজার যান যাতায়াত করে। কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কাজ করিতেছেন। কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সত্বর উক্ত সংস্থা কার্যারম্ভ করিবে।

শ্রী টি-টি-কৃষ্ণমাচারী—

গত ৬ই জুন রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীটি-টি-কৃষ্ণমাচারীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। তিনি কোন বিশেষ বিভাগের ভার পাইবেন না তিনি কয়েকটি বিভাগের অর্থব্যয় সম্বন্ধে যোগাযোগ ও ব্যবস্থা করিবেন। ঐ দিন শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠি এম-পি ও ডেপুটী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মোট সংখ্যা হইল ৫২—তন্মধ্যে ১৮ জন মন্ত্রিসভার সদস্য, ১২ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ২২ জন ডেপুটী মন্ত্রী।

ভ্রম সংশোধন ঃ গত 'আষাঢ়' সংখ্যায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ-র প্রথম সংখ্যার থেকে উদ্ধৃত করে "সূচনা" নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হয়েছিল, ক্রমক্রমে তা তদানিন্তন সম্পাদকদ্বয়ের বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু আসলে 'ভারতবর্ষ'-র প্রথম সংখ্যার জন্য মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রবন্ধটি লিখে রেখে গিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষ' প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বয়ং।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

উপাধ্যায়

মেষরাশি

অশ্বিনী ও কৃত্তিকানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। ভরণীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভালো। সুখ, লাভ, সাফল্য, উত্তম প্রতিপত্তি সম্পন্ন বন্ধু, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, বিলাসব্যসন দ্রব্য উপভোগ প্রভৃতি শুভ ফল। স্বাস্থ্যহানি, ক্ষতি, উদ্বিগ্নতা, স্বজনের সহিত শত্রুতা প্রভৃতি অশুভ ফল। দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিশেষ কষ্টপ্রদ হয়ে উঠ্‌বে। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো যাবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিঞ্চিৎ অবনতি। পিত্তপ্রকোপ, বাতের যন্ত্রণা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতাও পূর্ণ ঐক্য প্রথমার্দ্ধে অটুট থাকবে। স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত অল্পবিস্তর কলহ এবং মনোমালিন্ত। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা অনুকুল। অর্থ এলেও বা আর্থিক সাফল্য হলেও যে ভাবেই হোক ব্যয় হয়ে যাবে, সঞ্চয় সম্ভব হবে না। একটু চেষ্টা করলে প্রথমার্দ্ধে কিছু সঞ্চয় হোতে পারে। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটা অনুকূল। লাভের যোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে ভালোমন্দের সংঘর্ষ যোগ আছে। শেষের দিকে পদোন্নতির যোগ উপরওয়ালার অনুগ্রহেরও সম্ভাবনা। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টি ভালোই যাবে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে উত্তম। স্বার্থহানি হবে না। বন্ধুবান্ধবদের আনুকূল্যে অর্থসম্পদ। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রণয়ের ক্ষেত্রে অনুকুল আবহাওয়া। শিক্ষাসংক্রান্তব্যাপারে এবং বিদ্যার্জ্জনে উন্নতি। ছায়াচিত্র ও মঞ্চের অভিনেত্রীরা সাফল্য ও খ্যাতিলাভ করবে। এমাসে অনেক নারী গর্ভবতী হবে। অনেকের সন্তান প্রসবের যোগ আছে। এমাসে মহিলাদের নাম, যশ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তৃত হবে। রেসখেলায় লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

বৃষরাশি

কৃত্তিকা ও মৃগশিরাজাতগণ ব্যক্তির পক্ষে অনেকটা ভালো, রোহিণী-জাতগণের পক্ষে অধম। ক্লান্তিকর ভ্রমণ ও নানারকম কষ্ট, প্রচেষ্টায় সাফল্য, ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, অপযশ, শত্রুবৃদ্ধি প্রভৃতি অশুভ ফল, অপ্রত্যা-শিত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে উত্তমবন্ধু, লাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা, সুসংবাদ, শত্রুজয় প্রভৃতি যোগ আছে। শরীর একটু ভেঙে পড়্‌লেও মারাত্মক পীড়া হবে না। পিত্তনিঃসরণের গোলমাল ও রক্তদুষ্টির সম্ভাবনা আছে। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্ত ও বন্ধুদের সহিত কলহ বিবাদ, গুরুতর হয়ে উঠ্‌তে পারে, এজন্তে সতর্কতা আবশ্তক আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক, লাভের পথগুলি রুদ্ধ হবে না। বাড়ী ঘরের পরিবর্ত্তন বা সংস্কার এমাসে বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটা মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে ভালো মন্দ বিশেষ কিছু দেখা যায় না। কর্ম্মব্যাপারে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটামুটি এক ভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ অনুকূল নয়। প্রত্যেক ব্যাপারেই বাধা, এজন্ত চিত্তের অবস্থা খারাপ হবে। সব বিষয়ে ঔদাসীন্ত দেখা যাবে, অবৈধ প্রণয়ে নৈরাশ্তজনক পরিস্থিতি। শেষের দিকে পরিস্থিতি অনেকটা আশাপ্রদ। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে ও বিদ্যার্জ্জনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মাসটা ভালো বলা যায় না। রেসে পরাজয় বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম। আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসটা মিশ্রফলদাতা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্যসুখ, প্রভাব প্রতিপত্তিবৃদ্ধি, বিলাসিতা, শত্রুজয়, লাভ প্রভৃতি শুভফলের সম্ভাবনা। স্বজন, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতির জন্ত কষ্টভোগ। চক্ষুপীড়া ও পিত্তপ্রকোপ হেতু শারীরিক অবস্থা কিছু খারাপ হোতে পারে। পারি-বারিক ঐক্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হবে না। কোন বন্ধু বা আত্মীয় সম্পর্কে দুঃসংবাদ প্রাপ্তি এবং তজ্জনিত বেদনা অনুভব। আর্থিকক্ষেত্রের অবস্থা সন্তোষজনক বলা যায় না, লাভ ও ক্ষতি সমানভাবেই থাকবে। বিশেষভাবে লাভ হোলেও ব্যয়ের চাপে আশানুরূপ অর্থ সঞ্চয় ঘটবে না। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে অপরের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। যে কোন কার্য্য নিজে ভেবে চিন্তে করা ভালো। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে। বৃত্তিজীবিও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। রেসে লাভ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক কর্ম্মী মহিলার পক্ষে প্রথমার্দ্ধ সুন্দরভাবে যাবে, অত্যন্ত জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও সুখস্বচ্ছন্দতা। বন্ধু মহলের বিস্তৃতি। অবৈধ প্রণয়িনীর উত্তম সুযোগ। মাসের শেষের দিকে সময় ভালো যাবে না। নানারকম অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মাসটি মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

কর্কট রাশি

পুষ্যা জাতগণের পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসু জাতগণের পক্ষে মধ্যম। অশ্লেষা জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটী মিশ্রফল দাতা। উত্তম স্বাস্থ্য,

লাভ, বিলাস ব্যসন, প্রচেষ্টায় সাফল্য, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে ও বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, গৃহে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, প্রভৃতি শুভ ফলের সম্ভাবনা উদ্বিগ্নতা, দুঃখ কলহ, উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ, প্রচেষ্টায় বাধা, মতলব বাজ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ হেতু বাধা বিপত্তি। মধ্যে মধ্যে অভাব হোলেও স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, রক্তের চাপবৃদ্ধি, উদরের বিশৃঙ্খলতা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট। স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গে প্রথম দিকে কলহ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা মোটের উপর মন্দ যাবে না। উপরি আয়ের সম্ভাবনা। ব্যয়াধিক্য যোগও আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী একভাবেই যাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ। কিন্তু উপর ওয়ালার সঙ্গে মতভেদ ও মনোমালিন্য হেতু অশান্তির সৃষ্টি। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী অনুকূল। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা। বস্ত্র, অলঙ্কার, যান বাহন রিফ্রিজেটার প্রভৃতি ক্রয় সম্ভব। উত্তমসঙ্গ, সামাজিক অনুষ্ঠানে আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ। রঙ্গমঞ্চে বা সিনেমায় যে সব নারী অভিনয় করে, তাদের পক্ষে এ মাসটি বিশেষ ভালো। তাদের নাম খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে। রেসে লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

সিংহ রাশি

মঘা ও উত্তরফল্গুনী জাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। পূর্ব্বফল্গুনীর পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভালো। সৌভাগ্যলাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখস্বচ্ছন্দতা, লাভ, শত্রুজয় সম্মান, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন জ্ঞানবৃদ্ধি, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য। শত্রু পীড়ন। স্বাস্থ্য ভালো হবে। চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ। ঘরে বাইরে ঐক্য ও শান্তি শৃঙ্খলা। বিবাহাদি উৎসবে যোগদান। আর্থিক অবস্থা ভালোই যাবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি অনুকূল। ভাড়া আদায়ের সময় কিছু বাধা এলেও কোনরূপ বিপত্তির কারণ ঘটবে না। চাকুরী জীবির পক্ষে অতীব উত্তম সময়। নিয়োগ কর্ত্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা তাঁর কাছে পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে বেকার ব্যক্তির চাকুরি যোগ। নূতন পদমর্য্যাদা ও সম্মান লাভ। অস্থায়ী চাকুরি জীবির চাকুরি স্থায়ী হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির আয়বৃদ্ধি লাভ। রেসে জয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। উত্তম বিবাহ ও দাম্পত্য প্রণয়। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের সমারোহে যোগদান ও আনন্দ উপভোগ। সামাজিক ক্ষেত্রে যে সব মহিলার পরিক্রমা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে। অনেকের ভাগ্যে প্রথম নবজাত সন্তান প্রসব ও তজ্জনিত মাতৃত্ব লাভ হেতু আনন্দ উপভোগ। অধ্যয়নরতা নারীর সাফল্য ও জ্ঞানার্জ্জন। সিনেমা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের অভিনয়ে কৃতিত্ব হেতু খ্যাতি অর্জ্জন। অবৈধ প্রণয়িনীর আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে এমাসে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী চিত্রা জাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। হস্তা জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। এমাসটী মিশ্রফল দাতা। প্রথমার্দ্ধটী বিশেষ ভালো যাবে। শেষার্দ্ধটি সুবিধাজনক নয়। মোটামুটি সাফল্য লাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্য লাভ ও উপভোগ প্রচেষ্টায় সফলতা, পারিবারিক সুখশান্তি, উত্তম বন্ধুলাভ প্রভৃতি উত্তম যোগ, মানসিক উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা, কতিপয় শত্রুর উৎপীড়ন, স্বজন কলহ, ক্ষতি প্রভৃতি অশুভ ফলেরও সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। সারামাস ধরে শারীরিক দুর্ব্বলতা। ক্লান্তিকর ভ্রমণ হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা। ধারালো অস্ত্র ব্যবহারে দুর্ঘটনার ভয় আছে। গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে সময়টা এক ভাবেই যাবে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে ভালো বলা যায় না। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। নিয়োগ কর্ত্তার সহিত দেখা সাক্ষাৎ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়া এবং তাতে সাফল্য ঘটবে। বেকার ব্যক্তির পদ প্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ কিন্তু পরপুরুষের সান্নিধ্য, পার্টি বা ভ্রমণে যোগ দান, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আত্মপ্রসাদ লাভ। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতব্যক্তির পক্ষে উত্তম। স্বাতী ও বিশাখা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসের বেশীর ভাগ সময় ভালো বলা যায় না, শেষার্দ্ধ কিছুটা ভালো। প্রথমার্দ্ধে মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, পীড়াদি কষ্ট। রক্তের হ্রাস এবং দূষিত ক্ষত সৃষ্টি হোতে পারে আঘাত বা দুর্ঘটনা থেকে। শেষে আশা পূর্ণ হবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধিও হবে। লাভ, বিলাসব্যসন, সুখ, উপর-ওয়ালার অনুগ্রহ, শত্রুহানি প্রভৃতি যোগ আছে। এমাসে পীড়াদি কষ্ট ক্ষত বা আঘাতজনিত বেদনা। দূর ক্লান্তিকর ভ্রমণ। আর্থিকক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়, বরং অর্থক্ষতি। প্রথমার্দ্ধে বড় রকমের কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু অনুকূল হোলেও বিশেষ লাভ-জনক পরিস্থিতি ঘটবে না। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটতে পারে। কারো জন্যে জামিন হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী বিশেষ ভালো বলা যায় না। এজন্য নূতন প্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়। বিষয় সম্পত্তি বা বাড়ী ক্রয় বিক্রয় এমাসে স্থগিত রাখা দরকার। বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে ভ্রমণের সম্ভাবনা কিন্তু সে ভ্রমণে বিশেষ কোন শুভ ফল হবে না। মামলা মোকর্দ্দমার দিকে এমাসে ঝুঁকলে ক্ষতি হবে। চাকুরি জীবিদের পক্ষে সময়টা অনেকটা ভালো। তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে উপরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চাকুরি প্রার্থীর নিয়োগ কর্ত্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা প্রভৃতি শুভপ্রদ হবে। এই সব শুভ সম্ভাবনা দ্বিতীয়ার্দ্ধে আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটির দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনেকটা শুভ হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে উত্তম। দূরদেশে ভ্রমণ, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ ও প্রগাঢ় প্রণয়াসক্তি জনিত চিত্তের প্রসন্নতা, অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য ও নানা প্রকার দ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্তি প্রভৃতি যোগ আছে। গৃহ-কর্ত্রীর প্রাধান্য বিশেষভাবে গৃহে বিস্তৃত হবে এবং পরিবারবর্গ তাঁর আদেশ পালন করতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। যে সব নারী রঙ্গমঞ্চে ও চিত্রজগতে অভিনেত্রীর কার্য্যে নিযুক্তা তাদের বিশেষ মান মর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা, অর্থোপার্জ্জন, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বিশেষ সাফল্য লাভ। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। বিশাখা জাত গণের পক্ষে মধ্যম। জ্যেষ্ঠা জাতগণের পক্ষে অধম। লাভ, সাফল্য, সুখ, প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচেষ্টায় সাফল্য, আনন্দ উপভোগ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। কলহ, মনোমালিন্য, ক্ষতি, মিথ্যা অপবাদ, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি, স্বাস্থ্যহানি, শত্রুতা, ও ক্ষতি স্বীকার প্রভৃতি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। ব্যাপক ভাবে প্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়। উদর ঘটিত পীড়া, অজীর্ণ চক্ষুপীড়া, প্রথমার্দ্ধে

রক্তের চাপ বৃদ্ধি। গৃহে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ মনান্তর। স্বজন বিয়োগের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে ভালোমন্দ ফল। কিছু লাভ হবে কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নয়। ব্যয়ের মাত্রাধিক্য। আয়কর আইনের চাপে বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রতারণা বা চাকুরীর জন্য ক্ষতি। এমাসে অপরের জন্যে জামিন হওয়া অনুচিত। অর্থের জন্য শত্রুতা বৃদ্ধি, এমাসে বড় রকমের কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। স্পেকুলেশনে কোন সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। এমাসে বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে নব প্রচেষ্টা অনুকুল। ভূমি ও গৃহ সম্পত্তি হোতে আয়বৃদ্ধি হবে। অধীনস্থ ব্যক্তির সাহচর্য্য লাভ। বাড়ীকেনাবেচার পক্ষে এমাসটী সন্তোষ জনক নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। উপরওয়ালার অসন্তোষ বৃদ্ধি। বৃত্তি জীবির পক্ষে কর্ম্মের প্রসারতা ও আয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী এক ভাবেই যাবে। রেসে জয়লাভের সম্ভাবনা কম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। তাদের বাসনা অপূর্ণ হবেনা। বন্ধু বান্ধব লাভ। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতা। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সন্তোষ জনক পরিস্থিতি। যে সব নারী ব্যবসায়ে লিপ্ত বা বৃত্তিভোগী বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চ ও ছায়া চিত্রের অভিনেত্রী তারা আয়স্ফীত ও মর্য্যাদা লাভ করবে। চাকুরি জীবি নারীর পক্ষে এমাসটী শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু রাশি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া জাত ব্যক্তি গণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বাষাঢ়া জাত গণের পক্ষে মধ্যম। এমাসে ভালোমন্দ বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। মানসিক উদ্বিগ্নতা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বজন বন্ধু বর্গের সহিত কলহ, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় বাধা, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, স্বজন বিয়োগ। অপর পক্ষে জনপ্রিয়তা খ্যাতি, লাভ, সুখ, বিলাস ব্যসন, সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নূতন বিষয় অধ্যয়ন ও জ্ঞান লাভ প্রভৃতি শুভ ফলের যোগ। শারীরিক কষ্টের সম্ভাবনা কিন্তু মারাত্মক পীড়ার যোগ নেই। উদর, গুহ্যপ্রদেশ এবং প্রস্রাবের স্থানে কষ্টভোগ। রক্তের চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা ও ঐক্য। পারিবারিক ক্ষেত্র ভালোই যাবে। গৃহে বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। অর্থপ্রাপ্তি যোগ, লাভ, আয়বৃদ্ধি, প্রচেষ্টায় সাফল্য কিন্তু ব্যয়াধিক্য যোগ আছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম বলা যায় না। মামলা-মোকর্দ্দমা, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। নূতন কোনরূপ পরিবর্ত্তন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। প্রথমার্দ্ধটী বেশ ভালোই যাবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপর ওয়ালার সহিত মনান্তর ঘটতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে নানা প্রকার বাধার সম্মুখীন হোতে হবে। শেষার্দ্ধে লাভ ও আয় বৃদ্ধি।

স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। যে সব স্ত্রীলোক বুদ্ধিজীবি ও লেখ্য বৃত্তি নিয়ে আছে, তাদের সাফল্য ও উন্নতি লাভ। বৃত্তিজীবি স্ত্রীলোকের ও উত্তম সময়। যে সব নারী রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমার নিয়মস্তরে আছে, তাদের উন্নতির যোগ। অবৈধ প্রণয়িনীর আশাপূর্ণ হবে। যে সব নারী চিত্র বা মঞ্চে তারকা শিল্পী, তাদের পক্ষে মাসটী সুবিধা জনক নয়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি যোগ। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠা জাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। এমাসে শুভফল গুলিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধই বেশী শুভফল প্রদ। প্রচেষ্টায় সাফল্য, চিত্তের প্রসন্নতা, সুখ ও আনন্দ উপভোগ, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়, জন প্রিয়তা লাভ, শান্তি সৌভাগ্য, বিবাহ এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্য উপভোগ, উত্তম স্বাস্থ্য প্রিয়বন্ধু সমাগম প্রভৃতি। অপর পক্ষে অশুভ ফল যথা—দূর ভ্রমণ ও তজ্জনিত ক্লান্তি ও অবসাদ। শারীরিক দৌর্ব্বল্য বোধ, ব্যয়াধিক্য প্রভৃতি। বিশেষ কোন পীড়ার যোগ নেই, কেবল দুর্ব্বলতা। সন্তানদের পীড়া গুরুতর ভাবে ঘটতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য। বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পরিবারবর্গ আনন্দ মুখর হয়ে উঠ্বে। টাকাকড়ি লেন দেনের ব্যাপারে লাভ। অর্থস্ফীতি, সঞ্চয়ের যোগ আছে। বিলাস ব্যসনে বেশ ব্যয় হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে, চাকুরির ক্ষেত্রে উত্তম। নিয়োগ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ বা তাঁর সম্মুখে পরীক্ষাদি শুভপ্রদ হবে এবং পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। চাকুরি জীবির পদোন্নতি যোগ। মাসের প্রথমার্দ্ধে ফসগুলি বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ, বিবাহ, পারিবারিক ঐক্য দাম্পত্য প্রণয় বৃদ্ধি, আমোদ প্রমোদ, সুন্দর ভ্রমণ, অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য প্রভৃতি যোগ আছে। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার ক্রয়ের জন্য কিছু ব্যয় হবে। শারীরিক পীড়াদি সম্ভাবনা আছে, এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। সমাজ ঘেঁষা নারীরা মনের মত প্রতিপত্তিশালী বহু বন্ধুলাভ করবে এবং তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা জাত ব্যক্তি গণের পক্ষে উত্তম সময়। শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র পদ নক্ষত্রের পক্ষে মধ্যম সময়। কিছু লাভ ও সুখ, উত্তম সঙ্গ ও বন্ধুলাভ, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও প্রচেষ্টায় সাফল্য। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য কিছু কষ্টভোগ, মনান্তর, স্বজন বিচ্ছেদ, ক্ষতি ও উদ্বিগ্নতা মামলা মোকর্দ্দমা, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি অশুভ ফল ও দেখা যায়। অজীর্ণতা হজমের দোষ, গুহ্য প্রদেশে পীড়া প্রভৃতি যোগ আছে। গুরুতর পীড়ার সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক অনৈক্য ও স্ত্রীর পীড়া। আর্থিক ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মোটামুটি ভাবে চলে যাবে। কিন্তু নতুন কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেই অনুকূল নয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী বা কৃষিজীবির ভাগ্যে নানা অসুবিধা ভোগ। নানা কারণে সম্পত্তি হানি হবে বা সম্পত্তির ক্ষতি হবে। স্বত্ব স্বামিত্ব নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমা হোতে পারে। সম্পত্তি ভাড়াটিয়া বা ভৃত্যাদি সম্পর্কে এমাসে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। চাকুরির স্থান ক্ষতিকর হবেনা। উপরওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ বলা যায়। রেসে পরাজয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী প্রতিকূল। কর্ম্মক্ষেত্রে পরপুরুষের সান্নিধ্যে না আসাই ভালো, এলেও খুব সতর্ক হয়ে চলা দরকার। কোন পার্টিতে বা উৎসব অনুষ্ঠানে এমাসে যোগদান করা বাঞ্ছনীয় নয়। গার্হস্থ্য কর্ম্মের মধ্যে সীমিত থাকাই ভালো। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি ঘটতে পারে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আদৌ ভাল নয়।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্র পদ জাত ব্যক্তি গণের কষ্ট ভোগ নেই বললেই চলে। পূর্ব্বভাদ্রপদ জাত গণের পক্ষে মধ্যম এবং রেবতী জাত গণের পক্ষে

নিকৃষ্ট সময়। মধ্যবিধলাভ, প্রচেষ্টার সাফল্য, কিছু সুখ, উত্তম বন্ধু। সুনাম ও জনপ্রিয়তা দেখা যায়। মানসিক উদ্বেগ, সাধারণ কাজে বাধা, কলহ ও মতভেদ, বন্ধুদের সহিত প্রীতির অভাব, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি। পীড়াদির কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শারীরিক অবস্থাও বিশেষ ভালো যাবে না। সন্তানাদির মধ্যে কয়েক জন রোগাক্রান্ত হবে। পারিবারিক অশান্তি বা ঝঞ্ঝাট ঘটবে না। পরিবার বহির্ভূত স্বজন গণের সঙ্গে মনোমালিন্য হোতে পারে। এমাসে আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষ জনক নয়, সময়ে সময়ে অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্ভাবনা আছে। চলতিভাবে যেরূপ অর্থ আসে তাছাড়া, অপ্রত্যাশিত ভাবে বা অন্ত কোন প্রকারে অর্থাগমের সম্ভাবনা নেই। ব্যয়াধিক্য নিশ্চয়ই ঘটবে। সমস্ত অভাব পূরণ হবে না। ঋণগ্রস্ত হবার যোগ ও আছে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি মধ্যম। কৃষি উৎপাদন বিষয়ে সাফল্য। চাকুরির ক্ষেত্রে একই ভাব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি ভালো যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালোমন্দ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই, কয়েকদিন মাত্র বিবাহাদি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে কিছু চিত্ত প্রসন্নতা, সাধারণ গৃহিনীর পক্ষে মাসটি প্রীতিপ্রদ, পারিবারিক ঐক্য ও শান্তি এবং বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ভোগ। রেসে পরাজয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। দাঁতের পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া, বেদনাঘটিত পীড়া। ধনভাবের ফল মধ্যবিধ। আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য। মাতার শারীরিক অসুস্থতা। বিদ্যা ভাব শুভ। সন্তানের স্বাস্থ্য হানি, এমন কি পীড়াদিকষ্ট। স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা আদৌ ভালো যাবেনা, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও পাকযন্ত্রের পীড়া জনিত কষ্ট ভোগ। কর্ম্ম ভাব শুভ। কর্ম্মোন্নতি যোগ আছে। মধ্যে মধ্যে ব্যয় বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন

শারীরিক অসুবিধা ভোগ। উল্লেখযোগ্য পীড়ার সম্ভাবনা নেই। ধন ভাব অতীব উত্তম। সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। বন্ধুভাব শুভ সম্মানলাভ ও বন্ধুর সাহায্যে কোন অভিনব কার্য্যে সাফল্য। সন্তানের দেহ পীড়া। পত্নীর পীড়াদি কষ্ট ও স্বাস্থ্যহানি। দাম্পত্য প্রণয় সুখ লাভ। মাতৃভাব শুভ। পিতার সহিত মতানৈক্য ও তজ্জনিত অসন্তোষ। তীর্থ ভ্রমণ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যয়। চাকুরির স্থল উত্তম। স্বাধীন ব্যবসায় সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক অবস্থা সন্তোষ জনক নয়। ধনাগম হবে কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপরিমিত ব্যয়। এজন্য সাময়িক ঋণের সম্ভাবনা। সহোদর ভাবের ফল শুভ। সন্তানের শারীরিক অবস্থা ভালোই যাবে। সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতির যোগ। মাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে। ভাগ্য ভাব শুভ। কর্ম্মস্থানে আশানুরূপ ভালো বলা যায় না। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে অর্থ ব্যয়। রবি শস্যের ব্যবসায়ে লাভ। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর ফল ভালো।

কর্কটলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যাবে না। ধন ভাব শুভ। আর্থিকোন্নতির যোগ আছে। আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতি যোগ। বিবাহজনিত সৌভাগ্য অথবা দাম্পত্য প্রণয় যোগ ক্ষুন্ন হবে না। মাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির পীড়া। নূতন কর্ম্মে অর্থ বিনিয়োগ হেতু ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল আশানুরূপ নয়।

সিংহলগ্ন

পিত্তাধিক্য পীড়ায় কষ্ট ভোগ। আকস্মিক অর্থ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি যোগ। জাতক শত্রু হন্তা হবে এবং গুপ্ত শত্রুদের দমন অবশ্যম্ভাবী। প্রতিযোগিতা মূলক কার্য্যে আশাতীত সাফল্য। সহোদর বা সহোদর স্থানীয় ব্যক্তির সহিত মনোমালিন্য। পিতার পীড়া। পত্নীর শরীর ভাব শুভ। সন্তানগণের লেখাপড়ায় উন্নতি। পুত্র বা কন্যার বিবাহ যোগ। উত্তম মিত্র লাভ। রাজানুগ্রহ লাভ। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং সম্পত্তিলাভের সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যালগ্ন

শরীর ভলো বলা যায় না। দুর্ব্বলতা, আর্থিকোন্নতির পথে কিঞ্চিৎ বাধা। আয়কর বৃদ্ধি। ভ্রাতৃভাবের ফল শুভ নয়। ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য। সম্মানলাভ। সন্তানের স্বাস্থ্য হানি। পত্নী ভাব শুভ। দাম্পত্য প্রণয় যোগ। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রসঙ্গ। পিতার পীড়া। মাতার বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার। ভাগ্যোন্নতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ ফল। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ ফল।

তুলা লগ্ন

রক্তঘটিত পীড়া, দাঁতের পীড়া, পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক উদ্বেগ। ধনভাবের ফল শুভ বলা যায় না। অপরিমিত ব্যয় ও সঞ্চয়ের অভাব। বিদ্যার্জ্জনের ফল সন্তোষ জনক। কর্ম্মস্থান ভালো বলা যায়। নানা প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান। মাতার পীড়া। তীর্থপর্য্যটন। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। অর্থাগমযোগ। সহোদর ভাবের ফল অশুভ। সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। বন্ধুভাবের ফল শুভ। সম্মানলাভ। বন্ধুর সাহায্যে অর্থ প্রাপ্তি। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা, বিদ্যালাভে বাধাবিঘ্ন। পিতা মাতার শরীর মন্দ নয়। পত্নীর শরীর ভাব শুভ। দাম্পত্য প্রণয় যোগ চিকিৎসাদি ব্যবসায়ে সুনাম। কর্ম্মভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

ধনুলগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। অর্থাগম। ব্যয়াধিক্য তজ্জন্য মনশ্চাঞ্চল্য। সহোদর ভাব শুভ। ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে

কোন শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ তজ্জন্য কিছু ব্যয়বাহুল্য। সন্তানের লেখা পড়ার উন্নতি, কন্যার বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা, পত্নীর পীড়া, মাতার শারীরিক অবস্থা মন্দ নয়। শিল্পসাহিত্যাদির দিকে আগ্রহ। মিত্রলাভ, কোন অভিজাত মিত্রের নিকট উপকার প্রাপ্তি। ভাগ্য বা ধর্ম্ম ভাবের উন্নতি, তীর্থ পর্য্যটন যোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশানুরূপ নয়।

মকরলগ্ন—

দেহ ভাব শুভ নয়, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি, ধনাগম, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, সহোদর ভাবের ফল শুভ। ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি, মিত্রলাভ, মিত্রের দ্বারা উপকার প্রাপ্তি, বিদ্যোন্নতি যোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি, সাময়িক ঋণ যোগ, শত্রুবৃদ্ধি যোগ, স্ত্রীর পীড়াদি কষ্ট, এজন্য মানসিক চাঞ্চল্য ও অর্থব্যয়, চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, ধনাগম যোগ, সহোদর ভাব শুভ, সহোদরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি, সম্ভ্রান্ত বন্ধুলাভ, বন্ধুর সাহায্যে আর্থিকোন্নতি বা পদোন্নতি, সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতির যোগ, কন্যা বা পুত্রের বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীভাব উত্তম, ভাগ্যভাব উত্তম, পিতার সম্বন্ধে ভালো বলা যায় না, বিদেশভ্রমণ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীনলগ্ন—

আকস্মিক আঘাত, রক্ত পাত, পাকযন্ত্রের পীড়া ও বেদনা সংযুক্ত পীড়া ভোগের আশঙ্কা, বাধা সত্বেও ধনাগম, সঞ্চয়ের আশা নেই, অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, ক্রোধ হেতু ধৈর্য্যচ্যুতি, সম্বন্ধু লাভ, মাতা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির প্রাণ সংশয় পীড়া ভোগ, পড়া শুনায় বা পরীক্ষা বিষয়ে রেখা গণিতের ফল সন্তোষজনক হবেনা। পিতার সহিত অসদ্ভাব। পুত্র কন্যার বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা, শিল্প সাহিত্যাদি চর্চ্চায় বাধা, স্ত্রীর সহিত মতানৈক্য হেতু অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান টেস্ট ঃ

পাকিস্তান : ১০০ রান (নাশিমূল গনি ১৭। ট্রুম্যান ৩১ রানে ৬, কোল্ডওয়েল ২৫ রানে ৩ এবং ডেক্সটার ৪১ রানে ১ উইকেট)

ও ৩৫৫ রান (জাবেদ বার্কি ১০১, নাশিমূল গনি ১০১। কোল্ডওয়েল ৮৫ রানে ৬ এবং ট্রুম্যান ৮৫ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড : ৩৭০ রান (গ্রেভনী ১৫৩, ডেক্সটার ৬৫ এবং কাউড্রে ৪১। ফারুক ৭০ রানে ৪ উইকেট) ও **৮৬** রানে ১ উইকেটে)

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড ৯ উইকেটে পাকিস্তান দলকে পরাজিত করে। খেলাটি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত গড়ায়নি; তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। টসে জয়লাভ ক'রে পাকিস্তান প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনেই পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস মাত্র ১০০ রানে শেষ হয়। এই দিন ইংলণ্ড ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭৬ রান করে। দ্বিতীয় দিনে টম গ্রেভনীই ইংলণ্ডকে জয়লাভের পথে নিয়ে যান। তিনি ১৫৩ রান করেন ৪ ঘণ্টা খেলে, বাউণ্ডারী ছিল ২২টা। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৭০ রানে শেষ হ'লে পাকিস্তান ২৭০ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে। দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ৪টে উইকেট পড়ে ১০৩ রান দাঁড়ায়। কিন্তু তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় দিনের অপরাজেয় পঞ্চম উইকেটের জুটি অধিনায়ক জাবেদ বার্কি এবং নাসিমুল গনি দৃঢ়তার সঙ্গে দলের রান বৃদ্ধি করেন। দু'জনেই ১০১ রান করেন। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫৫ রানে শেষ হ'লে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান তুলতে ইংলণ্ড দ্বিতীয়বার ব্যাট ধরে এবং একটা উইকেট খুইয়ে ইংলণ্ড খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৯ উইকেটে জয়লাভ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে যখন পাকিস্তান দলের জাবেদ বার্কি ট্রুম্যানের বলে ক্যাচ তুলে ইংলণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটারের হাতে ধরা পড়েন তখন ট্রুমানে নিজ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উই-কেট পাওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জ্জন করেন। তাঁকে নিয়ে মাত্র ৬ জন বোলার সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পাওয়ার দুর্লভ সম্মান পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু হয়েছে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ—ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে। সেই থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ৫৩৫টি সরকারী টেস্ট খেলা হয়েছে ইংলণ্ড-পাকিস্তানের এই ৩য় টেস্ট খেলা পর্য্যন্ত। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একমাত্র

অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রাই ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। এই খেলোয়াড়দের নাম, তাঁদের টেস্ট খেলা এবং উইকেট পাওয়ার সংখ্যা নীচে দেওয়া হল :

ইংলণ্ডের পক্ষে : (১) বেডসার—৫১ টেস্ট এবং ৫৮৭৬ রানে ২৩৬ উইকেট ; (২) স্ট্যাথাম—৬০ টেস্ট এবং ৫০৯৭ রানে ২১৯ উইকেট, (৩) ট্রুম্যান—৪৭ টেস্ট এবং ৪৫১৬ রানে ২০৭ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : (১) লিণ্ডওয়াল—৫৯ টেস্ট এবং ৫১৩৫ রানে ২২৫ উইকেট ; (২) বেনো—৫৪ টেস্ট এবং ৫৫৬৭ রানে ২১৯ উইকেট ; (৩) গ্রিমেট—৩৭ টেস্ট এবং ৫২৩১ রানে ২১৬ উইকেট।

উপরের ৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে স্ট্যাথাম, ট্রুম্যান এবং বেনো ছাড়া বাকি তিনজন টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন।

তৃতীয় টেস্ট ঃ

ইংলণ্ড : ৪২৮ রান (পারফিট ১১৯ রান, স্টুয়ার্ট ৮৬ এবং ডালেন ৬২। মুনির ১২৮ রানে ৫ উইকেট)।

পাকিস্তান : ১৩১ রান (আলিমুদ্দীন ৫০। ডেক্সটার ১০ রানে ৪, ট্রুম্যান ৫৫ রানে ২, স্ট্যাথাম ৪০ রানে ২ এবং টিটমাস ৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮০ রান (আলিমুদ্দীন ৬১ এবং সৈয়দ আমেদ ৫৪। স্ট্যাথাম ৫০ রানে ৪, এ্যালেন ৪৭ রানে ৩ এবং ট্রুম্যান ৩৩ রানে ২ উইকেট)

লিডস মাঠে ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ১১৭ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। ফলে ইংলণ্ড ৩—০ টেষ্ট খেলায় 'রাবার' লাভ করেছে। এই খেলাটিও পাঁচদিন পর্য্যন্ত গড়ায় নি ; তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে সাত মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। তৃতীয় টেস্ট খেলায় টেড ডেক্সটার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কলিন কাউড্রে দলের অধিনায়কত্ব করেন। ইংলণ্ড টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে ইংলণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে ১৯৪ রান ওঠে। প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে ৮৭ মিনিট নষ্ট হয়। প্রথম দিনে পাকিস্তানের মুঠোয় খেলা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় খেলেছিলেন পারফিট (১১৯ রান) এবং ডেভিড এ্যালেন (৬২ রান)। শেষ উইকেটের জুটিও মারমুখী হয়ে খেলেছিল—২৮ মিনিটে ৫১ রান। দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৩টে উইকেট পড়ে ৭৩ রান দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনের খেলার প্রথম ৯০ মিনিটে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৩১ রানে শেষ হয়—বাকি ৭টা উইকেটে এইদিনে মাত্র ৫৮ রান ওঠে। ২৯৭ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে পাকিস্থান 'ফলো-অন' করে। দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৮০ রানে—খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাত মিনিট আগে।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস ঃ

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পাঁচটি খেতাব অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেতাব পেয়েছে। আমেরিকার ভাগে পড়েছে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেতাব। আর মিক্সড ডাবলস খেতাব নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা জুটি। দুই দেশের মধ্যে এই ধরনের সমান ভাগ উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিরল। যদি খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকার উপর নির্ভর করা যায়, তাহলে আলোচ্য বছরে আমেরিকার সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলতে হবে। কারণ এ বছরে মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী মিসেস কারেন হানজে সুসম্যান (আমেরিকা) বাছাই তালিকায় ৮ম স্থান পেয়েছিলেন এবং মহিলাদের ডাবলস বিজয়ী জুটি মিসেস সুসম্যান এবং বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা) বাছাই তালিকায় উপরের স্থান পাননি। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার যে জুটি জয়লাভ করেছে, বাছাই তালিকায় তার তৃতীয় স্থান ছিল।

অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলসের কোয়ার্টার এবং সেমি-ফাইনালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে মোট আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৬ জন এবং সেমি-ফাইনালে চারজনই ছিল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে চারটি জুটির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল তিনটি জুটি। মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে

খেলেছিল ৪টি দেশ—চেকোশ্লোভাকিয়া, ব্রেজিল, আমেরিকা এবং বৃটেন। মহিলাদের ডাবলসের চারটি জুটির মধ্যে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার একক জুটি এবং অপর দুটি জুটিতে ব্রেজিল এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমেরিকা এক জোট হয়ে খেলেছিল। মিক্সড ডাবলস সেমি-ফাইনালে ৪টি জুটি এইভাবে তৈরী হয়েছিল—আমেরিকা ও বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিল, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ারই দুজন খেলোয়াড় নিয়ে জুটি।

অপ্রত্যাশিত ফলাফল

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার ক'রে প্রতি বছর খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রম-পর্য্যায় তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয় টেনিস খেলার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায়। কিন্তু এই তালিকা অনুযায়ী খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেন না। দেখা গেছে, তালিকার উপরের দিকের খেলোয়াড়রা নীচের দিকের খেলোয়াড়দের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এমন কি, তালিকায় স্থান পাননি এমন খেলোয়াড় বাছাই-খেলোয়াড়দের পরাজিত করেছেন। এই ধরণের ঘটনাগুলিকে অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর্য্যায়ে ফেলা হয় এবং প্রতিবছরই এই রকম ঘটে থাকে। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। মহিলাদের সিঙ্গলস খেলার তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মিস মার্গারেট স্মিথ। তাঁর এই শীর্ষস্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে নি। তিনি এই বছরই অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, সুইস এবং ইতালীয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পেয়ে বাছাই তালিকায় শীর্ষস্থান পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। লোকের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তিনিই উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পাবেন। কিন্তু আমেরিকার এক অখ্যাত খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিট উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মিস মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত ক'রে বিশ্বের টেনিস মহলকে হতবাক্ করেন। মোফিট বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পান নি। তাঁর নিজের দেশে তিনি ছিলেন তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড়। আলোচ্য বছরের খেলায় দ্বিতীয় অপ্রত্যাশিত ফলাফল দ্বিতীয় রাউণ্ডে বৃটেনের খেলোয়াড় মাইকেল হানের কাছে গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার রানার-আপ 'চাক' ম্যাকিনলের (আমেরিকা) পরাজয়। এ বছরের বাছাই তালিকায় ম্যাকিনলে পেয়েছিলেন ৫ম স্থান, আর বৃটেনের মাইকেল হান কোন স্থানই পাননি। চেকোশ্লোভাকিয়ার মিসেস ভেরা সুকোভা চতুর্থ রাউণ্ডে গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ৬নং খেলোয়াড় এ্যাঞ্জেলা মর্টিমারকে (বৃটেন), কোয়ার্টার-ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) এবং সেমি-ফাইনালে ৩নং বাছাই খেলোয়াড় এবং ১৯৫৯-৬০ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস বিজয়িনী মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিলেন। মিসেস ভেরা সুকোভা বাছাই তালিকায় কোন স্থান পান নি। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে মিসেস সুকোভাই স্বদেশের পক্ষে এই প্রথম ফাইনালে উঠেছিলেন এবং তিনিই অবাছাই খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম ফাইনালে খেলেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়—ভারতবর্ষের রমানাথ কৃষ্ণান,অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মিসেস ভেরা সুকোভা। রমানাথন কৃষ্ণান এবছরের বাছাই তালিকায় ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন। ডাবলসের খেলায় তিনি পায়ে দারুণ আঘাত পান এবং সেই খোঁড়া পা নিয়েই পরের দিন সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় যোগদান করেন ; কিন্তু প্রথম সেট খেলার পর তিনি খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। পায়ের ব্যথার দরুণই রয় এমারসন এবং মিসের ভেরা সুকোভাকেও খেলা থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছিল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু পুরুষদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন ২নং বাছাই খেলোয়াড় জুটি বব হিউইট এবং ফ্রেডস্টোলী। মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েচেন ৮নং বাছাই খেলোয়াড় মিসেস কারেন হাঞ্জে সুসম্যান; মহিলাদের ডাবলস খেতাব ১নং জুটি পাননি; ১নং জুটি মারিয়া বুইনো

(ব্রেজিল) এবং ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) সেমি-ফাইনালে পরাজিত হ'ন। মিক্সড ডাবলসে খেতাব পেয়েছেন ৩নং জুটি নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিসেস ডুপণ্ট (আমেরিকা)। এবছরের একনম্বর জুটি এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ফ্রেড স্টোলী এবং মিস লেসলী টার্ণার (অষ্ট্রেলিয়া) সেমি-ফাইনালে ৩নং জুটির কাছে পরাজিত হন। পুরুষদের ডাবলসে এ বছরের ১নং জুটি এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) সেমি-ফাইনালে অবাছাই জুটি বোরো জোভানোভিক এবং নিকোলা পিলিকের (যুগোশ্লাভিয়া) কাছে পরাজিত হন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার স্বদেশবাসী মার্টিন মুলিগানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার সিঙ্গলস খেতাব পান। ১৯২২ সালের পর রড লেভারকে নিয়ে মাত্র চার জন খেলোয়াড় উপর্যুপরি দু' বছর সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। এই চার জনের মধ্যে ফ্রেড পেরী (ইংলণ্ড) পান উপর্যুপরি তিনবার। পূর্ব্বের তিনজনের নাম বৃটেনের ফ্রেড পেরী (১৯৩৪-৩৬), আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) এবং অষ্ট্রেলিয়ার লিউ হোড (১৯৫৬-৫৭)। রড লেভার ন্যাটা খেলোয়াড় এবং তিনি ছাড়া আর কোন ন্যাটা খেলোয়াড় উপর্যুপরি দু'বছর এই প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পান নি। রড লেভার আর এক বিষয়ে একটি রেকর্ডের সমান অংশীদার হ'তে যাচ্ছেন—একই বছরে অষ্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব লাভ। লেভার ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ; বাকি শুধু আমেরিকান খেতাব। এ বিষয়ে রেকর্ড করেছেন আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে। আলোচ্য বছরে রড লেভার আর একটি রেকর্ডের সমান অংশীদার হয়েছেন। ১৯২২ সালের পরবর্ত্তী উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের বারোত্রা (১৯২৪-২৭) এবং অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার (১৯৫৯-৬২) উপর্যুপরি চারবার সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পাওয়ার স্বর্ণ সুযোগ এবছর হারালো। অষ্ট্রেলিয়া এ পর্য্যন্ত মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পায়নি। অন্যদিকে আমেরিকা চার বছর পর পুনরায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করেছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২ ও ৬—১ গেমে মার্টিন মুলিগাণকে পরাজিত করে।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিসেস কারেন হাঞ্জে সুসম্যান (আমেরিকা) ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে মিসেস ভেরা সুকোভাকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : বব্ হিউইট এবং ফ্রেড ষ্টোলী (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৫—৭, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে বোরো জোভানোভিক এবং নিকোল পিলিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মিসেস সুসম্যান এবং বিলি জিন মোফিও (আমেরিকা) ৫—৭, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে মিসেস সাণ্ড্রা প্রাইস এবং মিস বিনি স্বরম্যানকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিসেস ডুপণ্ট (আমেরিকা) ২—৬, ৬—৩ ও ১৩—১১ গেমে আর ডি র‍্যাস্টিন (আমেরিকা) এবং এ্যান হেডনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে মোহনবাগান ক্লাব ২৬টা খেলায় ৩৯ পয়েণ্ট পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আছে দ্বিতীয় স্থানে—২৬টা খেলায় ৩৭ পয়েণ্ট। মোহনবাগানের আর দুটো খেলা বাকি—জর্জ্জটেলিগ্রাফ এবং এরিয়ান্স দলের সঙ্গে। এই দুটো খেলায় আর তিন পয়েণ্ট পেলে মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পীয়ানসীপ নিশ্চিত হয়ে যাবে। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের বাকি দুটো খেলায় পুরো পয়েণ্ট পেলেও মোহনবাগানের কোন ক্ষতি হবে না।

দ্বিতীয় বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পোর্ট কমিসনার্স—১৬টা খেলায় ২৫ পয়েণ্ট। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে নেমেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব—১৬ টা খেলায় মাত্র ৭ পয়েণ্ট পেয়ে।

তৃতীয় বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে উঠেছে রেঞ্জার্স—১৫ টা খেলায় ২৫ পয়েণ্ট। চতুর্থ বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে উঠেছে শ্যামবাজার ইউনাইটেড।

সাহিত্য সংবাদ

High Court at Calcutta— Centenary Souvenir (1862-1962) :

কলিকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকী উৎসবের অবসান হয়েছে—নিভে গেছে হাইকোর্ট-চূড়ায় কলিকাতা-উজ্জল-করা ইন্দ্রপুরীর আলোর ঝলক; কিন্তু জ্ঞানের ও তথ্যের যে আলো জ্বলে উঠেছে এই স্মারণিকী গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার দীপ্তি থাকবে চিরভাস্বর হয়ে।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশুকুমার বসু স্মারণিকীর ভূমিকায় রেগুলেটিং এ্যাক্টের যুগ থেকে বৃটিশ বিচার পদ্ধতির ধারাবাহিক সমালোচনা করে এসে সাম্প্রতিক কালের পরিণত অবস্থার একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা একদা বিস্তৃত ছিল সুদূর বর্ম্মামুলুক পর্য্যন্ত। আদিম ও আপীল বিভাগের বিচারকগণ এই হাইকোর্টের সুনাম বৃদ্ধিতে কিরূপ সহায়তা করেছিলেন সে সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করেছেন প্রধান বিচারপতি মহাশয়। গত একশ বছরের কথা জানিয়েছেন বিচারপতি শ্রী ডি, এন. সিংহ তাঁর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে। মহারাজা নন্দকুমারের বিচারের চিত্রটি যা তিনি দিয়েছেন তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতি তাঁদের প্রবন্ধের মাঝে ফুটে উঠে গ্রন্থটির মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মিঃ হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার, বিচারপতি ম্যাক্‌নেয়ার ও শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জ্জী তাঁদের প্রবন্ধে বিগত দিনের বৃটিশ শাসকশক্তির সঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার শক্তির কিরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয়েছিল এবং কলিকাতা হাইকোর্ট কিরূপে স্বকীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল শাসক শক্তিকে খর্ব্ব করে, তার চমৎকার ঘটনাপঞ্জী পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান অন্তকরণের পরিচয় মেলে তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে। ব্যারিষ্টার হয়ে এসে কিভাবে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন এবং যাঁদের কাছ থেকে সৌহার্দ্র ও সহৃদয়তা পেয়েছিলেন, বিশেষ করে এটর্ণী শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহৃদয়তার কথা সুন্দর ভাবে বলেছেন এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নীতিকথাগুলিও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে শুনিয়েছেন। শ্রীসুব্রতকুমার রায়চৌধুরীর বিখ্যাত পাকুড় হত্যা প্রভৃতি মামলার বিবরণও চমকপ্রদ হয়েছে। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসির মামলা সম্বন্ধে শ্রীশচীন্দ্রভূষণ দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি চমৎকার হয়েছে। এ মামলার চমকপ্রদ ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বিবৃত করলে প্রবন্ধের মনোহারিত্ব আরও বেড়ে যেত।

ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, শ্রী ও, সি, গাঙ্গুলী. শ্রী এইচ. এন, সান্যাল, শ্রীএস, সি, শীতলবাদ, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী কে, পি, খৈতান. ডঃ রাধাবিনোদ পাল প্রভৃতির সারগর্ভ প্রবন্ধগুলিও এই স্মারণিকীর সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেছে। অসংখ্য মূল্যবান আলোক-চিত্র এ গ্রন্থের সুন্দর কলেবর সুন্দরতর করেছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ইতিহাস ফলতঃ বাংলা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ দিকের শতবর্ষের ইতিহাস। শুধু শতবর্ষের কেন? মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির কাল থেকে বর্ত্তমান কালের ইতিহাস,—যে ইতিহাস বাঙ্গালীজাতির অনেক দুঃখ, সংগ্রাম—অনেক গৌরবের কাহিনীতে সমুজ্জ্বল। এই স্মারণিকী গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যও তাই অনস্বীকার্য।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয়কে এবং স্মারণিকী প্রকাশের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীকে ও বিশেষ করে মণ্ডলীর সভাপতি বিচারপতি শ্রী ডি, এন, সিংহকে এরূপ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শৃঙ্খল : শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক সরোজবাবু। তাঁর উপন্যাসগুলি বঙ্গদেশের পাঠক পাঠিকার চিত্তজয় করেছে অনেক কাল আগেই। আলোচ্য উপন্যাসখানায় তিনি কারা-জীবনের একটি চিত্তস্পর্শী আলেখ্য

রচনা করেছেন। কত বিচিত্র রকমের অপরাধী মানুষের সমাবেশ হচ্ছে কারাগারে। অবশ্য নিরপরাধও রয়েছে তাদের মধ্যে। কাহিনীর নায়ক বিশেশ্বরও এক নিরপরাধ ব্যক্তি। কিন্তু আইনের বিচারে হয়েছে তার জেল। জেলে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন মুক্তির জন্য মানুষের আত্মার কত আকুতি। সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবু এককথায় বলা যায়, জেল-জীবন নিয়ে সম্প্রতি যে কয়টি কাহিনী রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে শৃঙ্খল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

[প্রকাশক—অমলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৬। মূল্য চার টাকা]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নমরেশ বসু প্রণীত উপন্যাস "ছিন্নবাধা"—৭.৫০

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাশিয়ান শেখ"—৪.৭৫

মণিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "বঙ্গেবর্গী" (২৫শ সং)—২.৫০

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "কাজল গাঁয়ের কাহিনী" (২য় সং)—৫৲

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "গৌড়মল্লার" (৩য় সং)—৪.৫০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

=শৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চ প্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲ কাশীনাথ ২৲

বিন্দুর ছেলে ১-৫০

রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ২-৫০, প্রফুল্ল ২-৫০, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ২৲, নল-দময়ন্তী ১-৫০,
বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ২-৭৫

অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

মহানিশা ২-৫০

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০

কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুল্লরা ২৲,
সুদামা ১-২৫, অপ্সরা ০-৩৭

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

মিটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গী ২-৫০, পথের শেষে ২-৫০,
দেবলাদেবী ২-৫০,
ললিতাদিত্য ২৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

আলিবাবা ১৲, নর-নারায়ণ ২-৭৫
প্রতাপ-আদিত্য ২-৭৫
আলমগীর ২-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

রাণাপ্রতাপ ২-৫০, দুর্গাদাস ২-৫০,
সাজাহান ২-৫০, মেবারপতন ২-৫০,
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲,
সোরাব-রুস্তম ১-২৫, পুনর্জ্জন্ম ০-৬২,
চন্দ্রগুপ্ত ২-৫০, বিরহ ০-৫০,
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, নূরজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২৲

কানাই বসু প্রণীত

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, ঝান্সীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲,
চাঁদসদাগর ২৲, খনা ২৲,
জীবনটাই নাটক ২-৫০,
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া
(একত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষার
প্রেম, আজব দেশ একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ৫৲, নবএকাঙ্ক ৩৲
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ
পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা
দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫০
ছোটদের একাঙ্কিকা ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ২৲, পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন্দ-প্যাখি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৬৯

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[illegible]মঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲
রামগড় ৪-৫০ **বাগ্দত্তা** ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **পথের সাথী** ৩৲
হারানো খাতা ৩৲ **পূর্বাপর** ৪৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲ **পরের ছেলে** ৩৲

পুষ্পলতা দেবী

নীলিমার অশ্রু ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

কুমারী মন ৩-৫০
গৌড়জনবধূ ৫-৫০
মণিবেগম ৬৲
কেউ ফেরে নাই ৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

ভাস্কর

[illegible] অক্ক খি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

উদাসীর মাঠ ২৲ **পরাজয়** ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর প্রাণ ২-৫০

কানাই বসু

পয়লা এপ্রিল ২৲

রঙছুট ১-৭৫

ননীমাধব চৌধুরী

[illegible] ৪৲

প্রফুল্ল রায়

নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

উত্তরণ ২-৫০

গিরিবালা দেবী

খণ্ড-মেঘ ২৲

পঞ্চানন ঘোষাল

দুই পক্ষ ২-৫০
মুণ্ডহীন দেহ ৩-২৫
অন্ধকারের দেশে ৩-৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲
মুস্কিল আসান ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং-সিদ্ধা ৩৲
ভুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

কার্টুন ২-৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲
পতঙ্গ ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

আশালতা সিংহ

মধুচন্দ্রিকা ২-৫০

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নিষ্কণ্টক ১-৫০ **ভুলের ফসল** ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲
বংশধর ২৲

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

লক্ষ্মীর বিবাহ ১-৫০

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

সুধীন্দ্রকুমার দেব

বিচ্ছেদ ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲
দক্ষিণের বিল ১ম ৪৲, ২য় ৪৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪-৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩-৫০ **কালকূট** ৩৲
কানু কহে রাই ২-৫০ **কাঁচামিঠে** ৩৲ **আদিম রিপু** ৩৲ **পথ বেঁধে দিল** ২-৫০ **গৌড়মল্লার** ৪-৫০
বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০
পঞ্চভূত ২-৫০ **ঝিন্দের বন্দী** ৪-৫০
সাদা পৃথিবী ৩৲ **ছায়াপথিক** ৩৲
বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ **বিষকন্যা** ৩৲
দুর্গরহস্য ৩-৫০ **চুয়াচন্দন** ৩-২৫
ব্যোমকেশের গল্প ২-৫০

প্রফুল্লকুমার সরকার

বিদ্যুৎলেখা ২৲

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২-৫০ **কলরব** ২৲
প্রিয় বান্ধবী ৪৲ **তরুণী-সঙ্ঘ** ২৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲
দুই আর দু'য়ে চার ২-৫০

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পদ্মরাজ ৩৲ **পদসঞ্চার** ৫৲

উপনিবেশ

১—৩ পর্ব। প্রতি পর্ব—২-৫০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

নকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল

পিতামহ ৬৲
নঞ-তৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাকজ্যোৎস্না ৩৲

তপোবনে দুষ্মন্ত

শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভাদ্র—১৩৬৯

প্রথম খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও কীর্ত্তন

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা বলছি। তখনও ছাত্রজীবন শেষ হয় নি।—কালোয়াতী গান শোনবার বেজায় সখ। কলকাতার ছোট-বড় গানের আড্ডাগুলোতে ঢুঁ-মেরে বেড়াই। দ্বারভাঙ্গার বিখ্যাত খেয়ালী—জটাধারী ঝা কলকাতায় এসেছেন। তাঁর বলরাম দে ষ্ট্রীটের গানের আড্ডাটি দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই খুব জমে উঠেছে। ঘন ঘন যেতে সুরু করে দিয়েছি সেখানে। ভারি দিলখোলা লোক এই ওস্তাদজীটি। অল্প দিনের মধ্যেই ঘরের লোকের সামিল হয়ে উঠেছি তাঁর।

রোজই যাই তাঁর গানের আড্ডায়। একদিন ওস্তাদজী বললেন—"তোমাদের বাংলা মুল্লুকের দু-চারটে কীর্ত্তন-গান আমাকে শিখিয়ে দিতে পার বাবুজী!"

কীর্ত্তনের সঙ্গে আমার সত্যকার পরিচয় একেবারেই ছিল না।—দু-চারটে বাজার-চল্‌তি উড়ো কীর্ত্তন-গান জানা ছিল মাত্র;—তাও শুনে-শেখা। কোন রকমে কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে তাই শুনিয়ে দিলুম ওস্তাদজীকে। কিন্তু এক-আধবার নয়—বহুবার শোনালুম তাঁকে। ওস্তাদজী কিছুতেই আয়ত্ত করে উঠতে পারেন না;—বলেন,—"গলায় ত ঠিক উঠছে না বাবুজী।"

অবাক হয়ে যাই ওস্তাদজীর কথা শুনে। যে লোক

সারাজীবন কণ্ঠ-সাধনা করেছেন, তাঁর গলায় উঠছে না এই সামান্য হাল্কা জিনিস! ভারি-চালের বনেদী কীর্তন হলেও বা কথা ছিল,—একেবারে বাজার-চল্‌তি হাল্কা-চালের কীর্তন!

সেদিন এই ব্যাপারটাকে নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাইনি। আজ কিন্তু মনের মধ্যে বারবার প্রশ্ন জাগে—এমনটা হয় কেন?

নিশ্চয়ই কীর্তনের মধ্যে এমন কিছু আছে—যা অবাঙ্গালী গায়কমাত্রের কাছে সম্পূর্ণ নূতন।

আসল কথা, কীর্তন হচ্ছে সমগ্র বাঙ্গালী-জীবনের স্বরূপ। আমাদের বিশিষ্ট বচন-ভঙ্গি; আমাদের সুখ-দুঃখ-প্রকাশের অতিসাধারণ ঘরোয়া ভঙ্গি, এমন কি বাচনিক আকার-ইঙ্গিত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত ভাব ও অনুভূতি-স্পন্দনের সূক্ষ্মতম অনুরণনটুকু পর্যন্ত এর ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ সব-জড়িয়ে জিনিসটা হয়ে উঠেছে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেণীভুক্ত। বাঙ্গালী যেমন ভারতীয়ও বটে আবার বাঙ্গালীও বটে, ঠিক সেই রকম।

বাংলা মুল্লুকের কীর্তন-সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গীতের তফাতটা ঠিক এইখানেই। আমি হিন্দুস্থানী দেশোয়ারী গান শুনেছি; সঙ্গীতের পরিভাষায় যাকে আমরা দেশী সঙ্গীত বলি। ওদের 'কাজরী', ওদের 'মাড়্', ওদের হাল্কা 'চৈতি' প্রভৃতি শুনেছি। খুব হাল্কা, সহজ-সরল তাদের সুর-ভঙ্গি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতেরই সস্তা সংস্করণ এরা। উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতরূপ—মূল নদীর এরা যেন শাখা-নদী। কীর্তন কিন্তু ঠিক ও জিনিস নয়। এ সঙ্গীত উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের মূল ধারা থেকে শাখা-নদী হয়ে বেরিয়ে আসেনি। এ সঙ্গীত বেরিয়ে এসেছে সেই একই উৎসমুখ থেকে, যেখান থেকে বেরিয়েছে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের মূল ধারা। উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের এ সন্তান নয়,—উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের এ সহোদর।

অন্যান্য প্রদেশের আঞ্চলিক বা দেশী সঙ্গীতের শাখা-নদীগুলি তাই ক্ষীণধারা। শাখা-নদী যে তারা। তাই তাদের মধ্যে—মূল নদীর প্রসার নেই, ব্যাপ্তি নেই, বৈচিত্র্য নেই। কীর্তনের মধ্যে কিন্তু ব্যাপ্তি বা বৈচিত্র্যের অভাব নেই। উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের বড় বড় রাগরাগিণী তাদের সুরবৈচিত্র্যের বিপুল আয়োজন নিয়ে এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। তালের বৈচিত্র্যের দিক থেকেও উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তনসঙ্গীত পাল্লা দিয়ে চলেছে সমানে। অতিবড় দীর্ঘ বিলম্বিত লয় থেকে সুরু করে অতিবড় হাল্কা, চটুল এবং দ্রুত লয়-এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

কাজেই কীর্তনসঙ্গীতকে একদিক থেকে যেমন দেশী সঙ্গীত বলা যেতে পারে, অপর দিক থেকে তেমনি একে মার্গসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করলেও বিশেষ আপত্তি উঠতে পারে না।

কীর্তনকে দেশী সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে এই হিসাবে যে, এর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা বিশেষ করে বাংলার। আবার একে মার্গসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে এই হিসাবে যে, এর মধ্যে মার্গসঙ্গীতের অনেক লক্ষণই বর্তমান।

কীর্তনের বিশেষত্বটা মূলতঃ ভঙ্গিগত। বাঙ্গালীর নিজস্ব একটা বচন-ভঙ্গি আছে। উচ্চারণ-ভঙ্গির কথা আমি বলছি না,—আমি বলছি বচন-ভঙ্গির কথা।

কথা উঠতে পারে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যেও ত হিন্দী শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গি রয়েছে। তবু ত আমরা বাঙ্গালী হয়েও হিন্দী গান অনায়াসে গাইতে পারি। তবে হিন্দুস্থানী গায়কেরা কীর্তন গাইতে পারবে না কেন?—

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, হিন্দী গানের মধ্যে উচ্চারণ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ শব্দগত। শব্দগুলির উচ্চারণ ঠিক হলেই কাজ চুকে গেল, এবং আলাদা আলাদা করে শব্দের উচ্চারণ নকল করা খুব কঠিন কাজ নয়। বচন-ভঙ্গি কিন্তু আলাদা জিনিস। তাকে আয়ত্ত করা অত সহজ নয়।

আমরা চেষ্টা করলে ইংরাজি শব্দগুলোর উচ্চারণ আলাদা আলাদা করে নকল করতে পারি, কিন্তু সেই শব্দগুলোর সমবায়ে যে বাক্যটি গড়ে ওঠে, সেই গোটা বাক্যটির বচন-ভঙ্গি অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে আছে শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গি, যা নকল করা খুব বেশি কঠিন নয়, এবং আমরা নকল করে ফেলেছিও অনেকটা। কিন্তু ওর মধ্যে যদি গোটা বাক্যের

বচন-ভঙ্গিটি থাকতো, তা হলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠতো।

আমাদের কীর্ত্তন সঙ্গীতের মধ্যে শুধু যদি বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণটাই বড় হয়ে উঠতো, তাহলে হিন্দুস্থানী গায়কদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা খুব বেশি কঠিন হয়ে উঠতো না এবং শব্দের উচ্চারণ সব সময় নির্ভুল না হলেও তারা বাংলা গান কোন রকমে গেয়ে দিতে পারতো।

আমি হিন্দুস্থানী গায়কের মুখে বাংলা টপ্পা এবং বাংলা ঠুংরী শুনেছি; এমন কি বাংলা গজল শোনবার সুযোগও আমার হয়েছে। বাংলা শব্দের উচ্চারন সবসময় নির্ভুল না হলেও তাঁদের গান আমার মোটামুটি খারাপ লাগে নি। কিন্তু কোন হিন্দুস্থানী গায়ককে আজ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন গাইতে শুনিনি, এবং আমার বিশ্বাস কীর্ত্তনের ভঙ্গি তাদের গলা দিয়ে বার করানো অত সহজ হবে না। তার কারণ কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যে শুধু বাংলা শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গিটাই সবখানি নয়, তার সঙ্গে আছে সেই শব্দগুলির সমবায়ে গঠিত গোটা বাক্যের বচন-ভঙ্গিটি, যা অবাঙ্গালীর পক্ষে আয়ত্ত করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

বাঙ্গালীর প্রতিভা এইখানে সঙ্গীত-জগতে একটা নূতন জিনিষ সৃষ্টি করে বসেছে। বাঙ্গালী তার কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যে নিজের বচন-ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত বেমালুম চালিয়ে দিয়েছে। বেমালুম বলছি এই জন্য যে, সে বচন-ভঙ্গি সুরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বাঙ্গালীর অতিবড় ঘরোয়া এই বচন-ভঙ্গিটি কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যে সুরের গতিভঙ্গির সঙ্গে এমন বেমালুম ভাবে মিশে গেছে যে, সুরের সামগ্রিক লীলাভঙ্গি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিচ্ছিন্ন করতে গেলে শুধু বচন-ভঙ্গিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সেই সঙ্গে সুরভঙ্গিও অচল হয়ে ওঠে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত শব্দগুলির উচ্চারণ ঠিকমত না হলেও সুরের দিক থেকে খুব বেশী ক্ষতি হয় না; কেন না এ ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গি সুরের গতিভঙ্গির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় নি।

বাঙ্গালী শ্রোতা হিন্দুস্থানী গায়কের মুখে বাংলা ঠুংরী শুনে, অথবা হিন্দুস্থানী শ্রোতা বাঙ্গালী গায়কের মুখে হিন্দী ভজন শুনে বলবে—গায়ক উচ্চারণ ঠিক রাখতে পারে নি বটে, কিন্তু গান গেয়েছেন ভালই। কীর্ত্তনের বেলায় কিন্তু ওকথা বলা চলবে না। ওখানে বচন-ভঙ্গি এবং সুরভঙ্গি যে একাকার হয়ে গেছে। কাজেই বচন-ভঙ্গি বজায় রাখতে না পারলে সুরভঙ্গিও যে অচল হয়ে পড়ে। কীর্ত্তনের বিশেষত্ব এইখানেই।

এই যে বচনভঙ্গির সঙ্গে সুরভঙ্গির বেমালুম সংমিশ্রণ, এর মূলে, আমার বিশ্বাস, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব ও আদর্শ অনেকখানি কাজ করেছে।

মহাপ্রভু নিজে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়েও আপামর সাধারণের উপযোগী করে তাঁর ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মবাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই জনকল্যাণকর আদর্শ অনুসরণ করেই তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ ভক্তেরা তাঁদের গভীর সঙ্গীত-পাণ্ডিত্যকে আপামর সাধারণের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করেছেন। তাঁদের সেই কল্যাণবুদ্ধিপ্রণোদিত শুভপ্রচেষ্টার ফলেই হয়েছে উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনসঙ্গীতের জন্ম। আপামর সাধারণের উপভোগ্য করে তোলবার এই কল্যাণবাসনাই বৈষ্ণব-সঙ্গীতাচার্য্যগণকে সাধারণ বাঙ্গালীর অতিবড় ঘরোয়া বচন-ভঙ্গির সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরলীলার সমন্বয়-সাধনে সচেষ্ট করে তুলেছে।

তাছাড়া আমার মনে হয়, কীর্ত্তন-সঙ্গীতের এই বচন-ভঙ্গি ও সুরভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক সঙ্গীত-রূপটির আড়ালে রয়েছে যে সুর ও লয়ের ভাব ও ভাষা-নিরপেক্ষ নিছক কাঠামো, মহাপ্রভুর প্রভাব সেখানেও যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। কেমন করে করেছে, সেই কথাই এইবার বোঝাতে চেষ্টা করবো।

কীর্ত্তনের মধ্যে তিনটি জিনিস বিশেষ করে আমার কাছে নূতন ঠেকে। একটি হচ্ছে কম্পন-বাহুল্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঘন ঘন লয়-পরিবর্ত্তন। তৃতীয়টি হচ্ছে একপ্রকার নূতন ধরণের সুরোচ্চারণ পদ্ধতি। এ জিনিসটা লিখে বোঝান যায় না। তবু যতটা পারি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

এঁই—এঁই এই শব্দটি এবং ইহারই অনুরূপ নাকি-সুরে পরপর একাধিকবার উচ্চারিত এক বা একাধিক যুগ্মশব্দ কেউ যদি খুব চিবিয়ে চিবিয়ে, এড়িয়ে এড়িয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে, তাহলে যেমনটি শোনায় কীর্ত্তন-গানের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই রকম একটা নূতন ধরণের সুরোচ্চারণ-ভঙ্গির প্রাদুর্ভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কোন লোক ঘুমের ঘোরে কথা বললে তার কণ্ঠস্বর যেমন শুধু অস্পষ্ট নয়, কেমন যেন জড়ানো-জড়ানো, কেমন যেন এড়ানো এড়ানো ঠেকে, অনেকটা সেইরকম। এইখানে মনে রাখতে হবে, এই বিকৃত উচ্চারণ বেস্থরে হচ্ছে না, রীতিমত স্থরে হচ্ছে।—অর্থাৎ এটা কীর্ত্তন-সঙ্গীতের একটা বিশেষ আঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

কীর্ত্তন-সঙ্গীতের এই তিনটি বিশেষ আঙ্গিক, অর্থাৎ কম্পন-বাহুল্য, ঘন ঘন তাল-পরিবর্ত্তন এবং ঝিমানো ও জড়িত স্থরোচ্চারণ পদ্ধতি উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তন-সঙ্গীতের একবারে অপরিহার্য অঙ্গ বললেই চলে। এখন দেখা যাক এই তিনটি জিনিস কোথা থেকে এলো।

আমার মনে হয়, এই তিনটি জিনিস এসেছে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দশাপ্রাপ্তিকালীন দিব্য-লক্ষণগুলি থেকে। কেমন করে, সেই কথাই এইবার বলবো।

প্রথমে কম্পন বাহুল্যের কথা ধরা যাক। স্বরকম্পন কীর্ত্তনসঙ্গীতের যে একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ সেকথা সকলেই জানেন। যাঁর কণ্ঠে কম্পন নেই, তাঁর পক্ষে কীর্ত্তন গাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। গলা দিয়ে যার গিট্‌কারি বেরোয় না, তার পক্ষে খেয়াল গাইতে যাওয়া যেমন বিড়ম্বনা মাত্র, কম্পন যাঁর গলায় নেই, তাঁর পক্ষে কীর্ত্তন গাইতে যাওয়া তেমনিই বিড়ম্বনা।

আপনারা সকলেই জানেন, মহাপ্রভু যখন ভাগবত-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন, তখন শুধু সর্ব্বশরীর নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরও ভাবাবেগে থর থর করে কাঁপতো। মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ অবস্থার আবেগপূর্ণ কম্পিতকণ্ঠের প্রতিধ্বনিই কি আমরা শুনতে পাই না কীর্ত্তন-সঙ্গীতের এই কম্পন-বাহুল্যের মধ্যে ?

কীর্ত্তন-সঙ্গীতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ঘন ঘন তাল-পরিবর্ত্তনের কথা এইবার ধরা যাক। সেখানেও আমরা দেখি, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার ছবিটিই আমাদের মানস চক্ষের সামনে ভেসে উঠেছে।

মহাপ্রভুর জীবন-চরিতগুলিতে আমরা পাই, ভাবাবেশ-কালে তিনি কখন ঘন ঘন লম্ফ প্রদান করছেন, কখন আবার ভাবাবেশে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ছে। কীর্ত্তনের অতর্কিত ঘন ঘন তাল-পরিবর্ত্তনের মধ্যে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার সেই ঘনঘন ভঙ্গি-পরিবর্ত্তনের চিত্রটিই কি আভাসিত হয়ে উঠছে না ?

মানুষ যখন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তখন সে আপনা হতেই দ্রুত ছন্দে ঝড়ের বেগে কথা বলে যায়, তখন তার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে তীব্র এবং জোরালো। আবার সেই মানুষই যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন তার কথা-বলার ছন্দ হয়ে ওঠে দীর্ঘ, বিলম্বিত, এবং কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে মৃদু ও অস্পষ্ট। কীর্ত্তনের ঘন ঘন তাল-পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থার এই সব ঘন-ঘন মনোভাব পরিবর্ত্তনের চলচ্চিত্রই আমাদের মানস-নেত্রের সামনে ভেসে ওঠে না কি ?

এইবার কীর্ত্তন-সঙ্গীতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটির কথা ধরা যাক্। এটি হচ্ছে একপ্রকার জড়িত, অবরুদ্ধ, অস্পষ্ট, মূর্চ্ছাহত কণ্ঠস্বরের স্বরানুকরণ।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দশাপ্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ভাবাবেগের প্রাবল্যে সম্পূর্ণ বাহজ্ঞানহীন হবার প্রাক্কালে মহাপ্রভুর কণ্ঠস্বর আপনা হতেই অস্পষ্ট, জড়িত, অবরুদ্ধ এবং ভাব-গদগদ হয়ে উঠতো, একথা সকলেই জানেন। আমার মনে হয়, মহাপ্রভুর সেই সময়কার জড়তাপূর্ণ, অস্পষ্ট, ঝিমিয়ে-পড়া কণ্ঠস্বরের দিব্যভঙ্গিটি চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্য্যগণের চেষ্টায় কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একটি বিশেষ আঙ্গিকরূপে ক্রমে আত্ম-প্রকাশ করেছে।

এইভাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব ঘরোয়া বচনভঙ্গি এবং মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালীন আঙ্গিক ও বাচনিক দিব্যলক্ষণ-গুলির সঙ্গে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের স্বর ও তালের বিচিত্র লীলাভঙ্গির অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছে আমাদের এই কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যে।
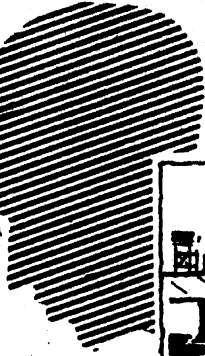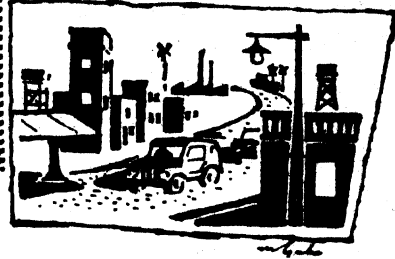
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধরণী মুখুয্যে কেপ্পনের হাড়। পিঁপড়ের পশ্চাদ্দেশ টিপেও নাকি সে চায়ের কাপে মেশায়—যদি তাতে গুড়ের সাশ্রয় হয়। ধরণীর বাপুতি আমলের ব্যবসা ওই খট বাসনের। অনেকেই তাতে দালান কোটা দিয়েছে, কিন্তু ধরণী মুখুয্যে সেই তেমনিই রয়ে গেছে। চেহারাটাও দড়ি পাকাচ্ছে, আর মাথার বাকী চুল ক'গাছিও উঠে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

নাকে কাঁদে—ধনে-প্রাণে ডুবে গেলাম। যা দিনকাল পড়েছে। এ কান্না নাকি তার চিরকালের।

দোকান-ঘরের বাইরে বসেছিল। কিছুদিন থেকেই দেখছে তার কারবারেও মন্দা এসেছে। চালানী কারবারে তো বটেই—বন্ধকী কারবারেও। অবশ্য বন্ধকী কারবার চলে ভালো গ্রীষ্মের সময় থেকেই পূজা অবধি। মুনিষ-মাহিন্দার নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরে যেন একটা টাকার জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

…শেষ অবধি কোনদিক দিয়েই সে টান মেটাবার পথ না পেয়ে আসে ধরণী মুখুয্যের কাছেও।

শুধু হাতে টাকা পয়সা দেবার লোক সে নয়, দর্শনী আনতে হয়। তাই দু এক টাকার বিনিময়ে তার অন্ধকার গুদোম ঘর ভরে ওঠে পিতলের হাড়ি কলসী বাটি থালায়; এবং অধিকাংশই আর ছাড়াতে আসে না।

একদিন অজ্ঞাত পথে তারা আবার পালিশ হয়ে নোতুন মালের সঙ্গে সদরে চলে যায়; এক টাকার মুনাফা দাঁড়ায় দশ টাকা—অবশ্য বছর খানেক পর।

আর যারা আসে রাতের অন্ধকারে তারা আনে হার-বালা—না হয় শুধবালা, নিদেন রূপোর পৈছি মল পাইজোর।

ধরণী মুখুয্যের কারবার সাত পাচে ভালোই চলেছিল। ইদানীং যেন একেবারে ঠোশ পড়ে গেছে।

বসে বসে ঢুলছে। হঠাৎ বেজাবাউরীকে আসতে দেখে চোখ খুলে চাইল—ঠিক চাওয়া বলা যায় না একে, নিরীক্ষণ করাই বলা যায়। বেজার হাতে একটা পিতলের চাদরের কলসী। সেটাকে সামনে নামিয়ে দেয়।

ধরণীও নিরীক্ষণ করে এবার সেইটাকে—বেজাকে নয়। গম্ভীরভাবে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দিয়ে কলসীটা ঘর ঢোকাতে যাবে। বাধা দেয় বেজা।

—আজ্ঞে তিন টাকা লাগবেক।

—তিন টাকা! অ্যা—

—আজ্ঞে!

ধরণী ইতিপূর্বে এ রকম অনেক করেছে। আজও তাই করে। পা দিয়ে কলসীটা ঠেলে দেয় ওর দিকে।

—হঠ! তিন টাকা—ঘাসের বীজ নাকি রে টাকা!

বেজাও কলসীটা উঠিয়ে নিয়ে নেমে গেল চুপ করে।

অবাক হয় ধরণী। প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—এ্যাঁই!

বেজা দাঁড়াল মাত্র। একটু আগেই দেখে এসেছে কামারপাড়ার লোকই তিন টাকা দেবে বলেছে। এখানে এসেছিল পুরোণো বাবু! তা নমুনা দেখেই যেন মন মেজাজ বিগড়ে গেছে।

বলে ওঠে—আজ্ঞে তিন টাকা দেবে বলেছে গুপী কামার।

তেলে বেগুনে জলে ওঠে ধরণী।

—তিন টাকা দেবে তুর বাবা। তা যা না কেন সেই-খানেই।

একবার ফিরে দাঁড়াল বেজা। কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়—গাল দেবানা ঠাকুর।

কথাটা মুখের উপর ছুড়ে মেরে চলে গেল সে হন হনিয়ে। গুম হয়ে বসে থাকে ধরণী মুখুয্যে। কেমন যেন কড়া জবাব দিয়ে চলে গেল ওই লোকটাও।

বুঝতে পারে কেন তার কারবারে মন্দা পড়েছে। এই-বার যেন একটা শক্ত বাধা আসছে। চুপ করে বসে থাকে ধরণী।

···একা ধরণী নয়—এ পাড়ার অনেকেই তাই টের পেয়েছে—ভাবছে।

ভাবছে তারকবাবুও।

সতীশ ভটচায শেষ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। ওই কামারপাড়ায় এখান ওখানে পেটো ঠুকরে চাল কলা যা সংগ্রহ হয় তাতে মানুষের নয়, কাক চিলের পেট ভরে। তার চেয়ে এই পাড়াই ভাল—নিত্য সেবা হচ্ছে। এটা-সেটা তো লেগেই রয়েছে পাল পার্বণ।

নৌকা বাঁধতেই হয়—বড় গাছেই বাঁধবে।

কথাটা সতীশ ভটচায আজ পরিষ্কার করেই জানায়।
—আপনার কথাই সত্যি বড়বাবু।

অবনী মুখুয্যে বানের আগে খড় কুটোর মত মাথা নাড়ে, ঢাকের আগে যেন কাঠি বাজছে।

—হবেই সত্যি ভটচায মশায়। হতেই হবে।

সতীশ ভটচায মাথা নাড়ছে।

—ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণো গতিঃ। বংশের কেউ শূদ্র যজায় নি। নেহাৎ ভুলটা আমিই করেছিলাম। তাই সংশোধন করতে চাই।

তারকবাবু একবার মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

সুযোগ বুঝে সতীশ ভটচায যেন আংরায় ফুঁ দিয়ে গণ-গণে করে তুলছে আগুনটা।

—ওদের মাটি মাড়াতেও ঘেন্না হয় বড়বাবু। আধ-পেটা খেয়ে থাকবো তবু ব্রাহ্মণ হয়ে ওখানে যাবো না।

সতীশ ভটচায এরপরই শুরু করে তার শ্রদ্ধেয় পিতা-মহ পঞ্চতীর্থ মশায়ের কথা, গ্রামের অনেকেই বহুবার তা শুনেছে—তারকবাবুও। তবু সতীশ ভটচায আওড়ে চলে।

—সেবার মামলার তদ্বির করে ফিরছেন সদর থেকে, বোশেখ মাসের দিন, ধুপ রোদ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ—বুড়োবামুন বহরাখুলা গ্রামে টাউরি খেয়ে পড়ে যায়। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে তেলিরা। বেরামণ!··· কি করে? শুধু চোখে আর মাথায় জলের ঝাঁপটা দিয়ে হাওয়া লাগায়—এককণা জল যেন মুখে না ঢোকে—সেই বংশের সন্তান আমি!

তারকবাবু কি ভাবছেন!

কামারপাড়ার ওরা কোত্থেকে এত সাহস পেল জানে না; এদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছেড়েছে মালপত্র লেনদেনের। ধরণী মুখুয্যে টাকে হাত বোলাচ্ছে। সেও বলে ওঠে—বন্ধকী কারবারও উঠে গেল। শোনলাম নাকি টাকা ধার-হাওলাতের পথও বন্ধ করবে।

—হুঁ—

অবনী বলে ওঠে—শোনলাম তারা নাকি সমবায় করছে।

সতীশভটচায ও ফোড়ন কাটে ওসব জানিনে বাবা, আমি বললাম মীমাংসার কথা—তা ভুবনো যেন তেড়ে মারতে এল। ওই অতুলের ব্যাটা ভুবনো।

তারকরত্ন জবাব দেয় না। ওদের কথাগুলো শুনছে। মনে মনে পাক দিচ্ছে একটা বুদ্ধি। হঠাৎ গোকুলকে আসতে দেখে ওরা চাইল ওর দিকে।

ক'দিন জেল হাজতে ছিল। কি করে জামিনে খালাস পেয়ে এসেছে। চুরির মামলা চলছে।

প্রণাম করে পরম ভবিষ্যুক্তের মত দাঁড়াল গোকুল, যেন সাধু মহাপুরুষ, বিনয়ের অবতার। আগ্রহ ভরে কুশল সংবাদ নেয়।

—ভাল আছেন বড়বাবু। জ্যাঠামশায়—মেজকাকা—

সারা গ্রাম শুদ্ধ যেন তার মধুর সম্পর্ক লতায় পাতায় জড়ানো, মুখে মধু বর্ষিত হচ্ছে।

—মিছিমিছি টেনে নিয়ে গেল কাকা আপনারা থাকতে। ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম খপ্ করে ধরে বেদম পিটিয়ে দিলে, দ্যাখেন কিনা পাটা—এখনও জখম সারেনি।

…বেলা বেড়ে চলেছে।

কি জবাব দেবে ওরা; আর কিই বা বলবে।

একে একে আড্ডাধারীরা উঠে যায়; ঘর খালি হয়ে গেল—

চুপ করে বসে আছে তারকবাবু—ওদিকে গোকুল যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে।…বের হতে যাবে। হঠাৎ তারকবাবুর ডাকে দাঁড়াল।

—শোন।

গোকুল ওর দিকে চাইল। তারকবাবুর মুখে কেমন একটা বিচিত্রভাব, এতক্ষণ ভেবে ভেবে একটা পথ বের করেছে।

গোকুল জানে—টের পেয়েছে কিছুটা।

তাকে কোন কাজে লাগাবে বড়বাবু; গোকুল সব পারে—পারতেই হবে তাকে।

কথাটা যেন আনমনে শুনছে—কোনদূর থেকে ভেসে আসছে ওই কথাগুলো গোকুলের কানে। শীতের আমেজ গিয়ে রোদ আসছে—বনভূমি কেমন ছায়াচ্ছন্ন উদাস হয়ে ওঠে।

…কেমন একটা সুন্দর ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে—একটা শান্ত মধুর তৃপ্তির স্বাদ আনা ছবি।

ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত একটি লোক—এখানে ওখানে কোথায় তার ঠাঁই নেই। কেমন পেটের ভিতর অসহ্য একটা জ্বালা—সারা শরীরে তার ব্যাপ্তি!

…তারই মাঝে একটু ছায়াঘেরা শীতল পানীয় আর আহার্য্যের স্নিগ্ধতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি নারী। কেমন সুন্দর একটা পূর্ণতা তার মনে।

…আদর আর স্নেহভরা উপকরণে সেদিন ক্ষুধার্ত গোকুলের মুখে যুগিয়েছিল ক্ষুধার অন্ন-পানীয়।

একটা সুন্দর অনুভূতি!

…বড়বাবুর কথাগুলো শুনছে সে। কেমন যেন চমকে ওঠে।

—বড়বাবু! না—না! ও আমি বলতে পারবো না বড়বাবু।

তারকরত্ন ওর দিকে চাইল—তীর সন্ধানী কঠিন দৃষ্টি মেলে।

গোকুলকে যেন নীরব শাসন আর কঠিন তিরস্কার করে তোলে। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন—বলতে হবে তোকে। এই কথাই বলবি।

—এতবড় মিছে কথা!

হাসছে তারকবাবু—তুইও দেখছি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হলি? শোন।…ঘরখানা পড়ে যাবে তোর এইবার; ছাওয়াগে যা—খড় পয়সা লাগে নিয়ে যা। আর খাবারও তো নেই…কি!

গোকুল ওর দিকে চেয়ে থাকে, তারকরত্নবাবু তাকে লোভ দেখাচ্ছে—খাবার—আশ্রয়—তার ঘর সব কিছু তুলে দেবে, যুগিয়ে দেবে, বিনিময়ে তাকে বলতে হবে ওই সব কথা!

…কোথায় যেন অসহায়ের মত বন্দী হয়েছে সে। জড়িয়ে পড়েছে নিজেরই জালে।

—নে! গোটাকতক টাকাও নগদ বের করে দেয়।

…স্তব্ধ হয়ে আসে গোকুল। শয়তানের কাছে অদৃশ্য দাসখৎ-নামায় সব কিছু লিখে দিল সে, তার মনুষ্যত্ব, বিবেক, শুভবুদ্ধি যা সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট ছিল—সবটুকুই।

…কেমন যেন মনের অতলে একটা কি বেদনা কাঁটার মত বাজে খচ খচ করে। হাসছে তারকবাবু—বলে দেখ না—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

এতদিন পর যেন ওদের পাড়ায় একটা সমবেত আশা রূপ নিতে চলেছে। কাজ-কর্ম সুরু করেছে। এগিয়েও গেছে অনেকখানি। অশোকই সেই পথ দেখিয়েছে। কামারপাড়া—তাঁতিপাড়ার সকলেই প্রায় কথাটা বুঝেছে;

এবার আর ঠকবে না তারা। অশোককে বলে—আপনিও থাকুন সমবায়ে।

অশোক জবাব দেয়—তোমাদের ব্যাপারে আমি ঢুকলে দুদিন পর তোমরা না ভাব—ওঁরা শোনাবেন আমার নিজের লাভের জন্যই আমি এসব করেছি।

—আমরা তা মানবো না! এমোকালী জবাব দেয়।

—তুমি না মানো, অন্য অনেকেই ক্রমশঃ সন্দেহ করবে। তার চেয়ে তোমাদের কায তোমরাই করো, আমি একজন মেম্বরই রইলাম।

…অতুল কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—তবে থামোকাই থাকবেন আপনি!

বিনা সর্তে—বিনা স্বার্থে এতবড় দায়িত্ব, এই ঝামেলা কেউ নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে এটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না তারা। বাবুদের অনেকেই এসেছিল—অবনী মুখুয্যেও এসেছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

…অতুল কামার যেন অবাক্ হয়ে শোনে ওদের কথা; মানুষ যে এত বিচিত্র হতে পারে তা কল্পনাও করেনি।

অবনী মুখুয্যেই বলেছিল—যেমন তারকবাবু তেমনি ওই অশোক। কাউকে বিশ্বাস করিস না ভুবন, অল রট! দুজনে মামা ভাগ্নে—তলে তলে একেবারে ক্লোজ কনটাক্ট, মানে এই শড় আছে বুঝলি। তা কই—দেখি কি দরখাস্ত করলি তোরা।

এমোকালীই জবাব দেয়—আজ্ঞে কাগজ-পত্র সব ছুট-বাবুর কাছেই রইছে।

রমণ ডাক্তার সাবধান করে দেয়—অবনীবাবুর কথা শোন কেলে, ঘাঁৎ ঘোঁৎ সব জানে। আর গ্রামের পঞ্চ-জনকে নিতে হবে তবে তো সমবায়।

অবনী ধুয়ো ধরে—হাজার হোক ডাক্তার মানুষ, উনি। হেলু মাষ্টার—ধর আমি—সবাইকে মুখ বাছাবাছি মেম্বর কর।

অতুল অবাক হয়ে যায়। তাঁদের এতদিন দেখা যায় নি। হঠাৎ যেচে এসে এত উপদেশ দেওয়াটা কেমন বিচিত্র ঠেকে।

জবাব দেয়—ভেবে দেখি, আমরা মুখ্য লোক, আপনাদের ছাড়া তো গতি নাই।

অবনী মুখুয্যে—রমণ ডাক্তার সেদিন চুপে চুপে বের হয়ে এসেছিল।

আর কিছু না করতে পারুক—অশোক আর তারকবাবুর মধ্যে যে মামা ভাগ্নে সম্পর্কটা আছে তাদের মধ্যে কোন যোগসাজক থাকা বিচিত্র নয়, এই প্রশ্নটা ওদের অনেকের মনে তুলে দিয়ে এসেছিল।

গদাকামার তাই বলে ওঠে—খুড়ো শেষকালে যেন একখাল থেকে অন্য ডোবায় না পড়ি কিন্তুক। সেই যে বলে না 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে। ভূত বলে আমি পেলম কাছে'। তাই যেন না হয় অতুলখুড়ো।

কালীই ধমকে ওঠে—থামো দিকিন!

কিন্তু এসবের মধ্যেই অশোক গেল না। অবাক হয় তারা অনেকেই অশোকের এই ব্যাপারে।

অতুল কামারের বারান্দায় আবছা আঁধার নেমেছে। বৈঠকের লোকগুলোর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তাদের মাঝে অশোক স্পষ্ট কথায় শুনিয়ে দেয় ওই মত।

—তালে আমাদিকে কি পথে বসাবেন ছুটবাবু!

—কেন?

আপনি থাকছেন না, শেষকালে মুখ্য মানুষ, এতটাকা দেনা দায়িকলিয়ে বসে বসবো।

হাসে অশোক ছেড়ে যাবো না কামার কাকা; পাশেই রইলাম। কাজতো এখন সবই বাকী, এখন যাবো কোথায়।

রাতহয়ে আসছে। বের হয়ে আসে অশোক। উঠোনের পাশে বড় বৌকে দেখে দাঁড়াল।

—চলেযেচ্ছ দাদা!

—হাঁ!

মেয়েটা সবকথাই শুনেছে। দেখেছে গ্রামে ওদের বিরাট প্রতাপ। শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়েও অশোক তার নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে—অর্জন—করেছে ওদের প্রীতি শ্রদ্ধা বহুমূল্য দিয়ে। আজও তা দেখেছে কদম বৌ।

—চলেযেছ?

—হ্যাঁ।

কদম বৌ হাসছে। ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় অশোক।

কদম বলে ওঠে—চা করছিলাম যে।

—যাক। রাত হয়েছে।

কদম পরিহাস-তরল কণ্ঠেই বলে ওঠে।

—বাবাঃ, ঘরে কেউ নাই, তবু ঘরে ফেরার টান তো দিব্যি রয়েছে দেখছি।

—অশোক দাঁড়াল না। সাইকেলটা নিয়ে বের হয়ে গেল পথে।

আবছা অন্ধকার নেমেছে। গ্রামপথ প্রায় জনহীন। শীতের আমেজ তখনও যায়নি।···কুয়াসা আর চাঁদের আলো দূরের উংরাই ডাঙ্গার বুকে শালবনসীমা আচ্ছন্ন করে তুলেছে। কোথায় ডাকছে একটা রাতজাগা পাখী কেমন করুণ বিষাদমাখা সুরে।

পথের ধারে বাড়ীগুলো কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ীতে তখনও আলো জলছে। কি ভেবে থামল অশোক। জানলার বাইরে দেখা যায় একফালি ম্লান আলোয় প্রীতিকে—পড়ছিল বোধ হয়।

থমকে দাঁড়াল অশোক।

প্রীতিকে এমনি রাতনির্জনে কোন মায়াময় একটি সুন্দর পরিবেশে ইতিপূর্বে সে দেখেনি। কেমন যেন নির্বাসিতা একাকিনী একটি সত্তা রাতনির্জনে কোন বিচিত্র জগতের লোক সে—পথ হারিয়ে এখানে আটকে পড়েছে।

—আপনি!

হঠাৎ যেন ধরাপড়ে গেছে অশোক কি একটা অপরাধ করতে গিয়ে। মনে মনে লজ্জিতই হয়। আমতা আমতা করতে থাকে।

—যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। কাকাবাবু আছেন?

সেই লজ্জা এড়াবার জন্যই যেন সহজভাবে ওদের বৈঠকখানাতে ঢুকলো। এগিয়ে আসে প্রীতি—বাবা সদরে গেছেন।

—একটু জরুরী পরামর্শ ছিল।

—কাল ফিরবেন।

কথা বলল না অশোক। রাত হয়ে আসছে—কি যেন একটা স্তব্ধরাত্রি। সব হারিয়ে গেছে। সবাই। জেগে আছে মাত্র তারা।

—আচ্ছা গ্রামে আপনার মন টেঁকে?

প্রীতির প্রশ্নে ওর দিকে মুখতুলে চাইল অশোক।

কেমন সোজা একটা প্রশ্ন। তবু তার উত্তর দিতে পারেনা অশোক।

প্রীতির চোখে মুখে একটা চাপা বিরক্তি। আলোয় দেখা যায় ওর সুন্দর সুঠাম দেহের ভাজে ভাঁজে কেমন একটা রূপবতী সত্তা, একটু ফর্সা সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, মুখে বুদ্ধির সতেজ একটা দীপ্তি।

শান্ত নিথর কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে একটা ম্লান তারার দীপ্তির মত ওই চোখদুটো তার দিকে কোন দূর থেকে চেয়ে আছে। প্রীতিও অনেকদিন থেকে কথাটা ভেবেছে।

—এমনিকরে গ্রামেই কি কাটাবেন?

—এখানেও তো কাউকে থাকতে হবে। অশোক ওর কথার জবাব দেয়।

এই অন্ধকার পাড়াগাঁয়ে—অবাক হয়ে গেছে প্রীতি।

—অন্ধকার একদিন আলো হবেই। নোতুন মানুষের দল আসবে—তাদের পথ দেখাতে আমরা অন্ততঃ মশালচি হতেও তো পারি।

কেমন যেন কথাটা মনঃপূত হয় না প্রীতির।

—ওসব আদর্শের কথা। আসলে কি ওর দাম!

প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে অশোক। ওর দুচোখে কোন এক ঘরের নেশা, অনির্দিষ্ট পথে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে যারা ছোট্ট ঘরের মাঝে আনন্দ আর শান্তির সন্ধান করতে চায় প্রীতি তাদেরই দলে। কোন আদর্শ-স্বপ্ন ওর জগতে নেই। কঠিন বাস্তবটাকেই চেনে ওরা।

বলে ওঠে অশোক—কি ওর দাম—আসলে কোন দাম আছে কিনা তাও জানিনা। শুধু এইটুকুই বলবো অন্ততঃ ওই বিশ্বাসটুকু আমার আছে তার জন্যই এখানে রয়ে গেছি।

—কোন ভবিষ্যতের পথ না খুঁজেও? লেখাপড়া শিখেছেন—আজকের দিনে যেমন করে হোক বাঁচতে পারেন একটা ভাল কাজকম্ম গুছিয়ে নিয়ে—

হাসছে অশোক। থেমে গেল প্রীতি ওর অতর্কিত এই হাসিতে। নিজের মনের একটা চাপা ব্যাকুলতাই কোথায় ধরা পড়ে গেছে। অনর্থক অশোকের জন্য সে অনেকখানি বেশী ভেবে ফেলেছে, তাই হয়তো ওকে জীবনপথ দেখাবার এই অহেতুক ব্যাকুলতা।

নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা আসে।

…কুয়াশাঢাকা আকাশে জ্বলছে জোনাকীর আলো, বাঁশ বনে বাতাসের হুহু আনাগোনার সুর। কেমন যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলে প্রীতি।

—আপনার মাও তো বেঁচে নেই?

—না। মাকে আমার মনে পড়েনা। বাবাও বিদেশে। তবে শীঘ্ঘীর নাকি রিটায়ার হয়ে আসছেন।

—এই খানে?

—না, কলকাতার বাড়ীতে, না হয় বাঁকুড়ায় থাকবেন।

—আর আপনি?

—এই পাড়াগাঁয়েই। কলকাতায় আমার মন টেকেনা। মনে হয় কেমন যেন হারিয়ে গেছি। নিজের সব কিছু হারিয়ে ওই মহাচারের বিরাট চাকার গতিবেগে আমিও যেন অবিশ্রান্ত ঘুরছি। পায়ের নীচে কোন মাটি নেই।

অশোকের মুখে একটা বেদনার ছায়া।

হঠাৎ কথা থামিয়ে উঠে পড়ে।

—চলি, রাত হয়েছে।

…কথা বললো না প্রীতি। অশোক বের হয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেমন অত্যন্ত একা অসহায় মনে হয় নিজেকে। অন্তহীন তমসার রাজ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে একটি একাকিনী সত্তা।

এই মাটি—এই জীবনযাত্রা অন্তহীন দিগন্তসীমা আর নীল আকাশের অসীমে অশোক যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে খুজছে একা একটি মেয়ে।

…প্রীতি চুপ করে বসে থাকে।

—শুতে যাবা নাই কো?

বুড়ী ঝিয়ের ডাকে ওর দিকে চাইল।

—হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।

ঝিটাও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—এত বয়স হল তবু দেখার যেন শেষ নেই।

যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে।

নীলকণ্ঠবাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল বুড়ী; আজ তার আমল যায় যায়—মেয়েকে দেখছে।

এরা যেন কেমন বিচিত্র।

বারবার বলেছে মনসার মা—এইবার মেয়ের বিয়ে দাও। কেমন উদোস পারা লাগছে উকে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

এতক্ষণ বারান্দায় বসে ঝিমুচ্ছিল আর শুনছিল ওদের দুজনের কথা, কেমন যেন সিপাই দারোগার মত তড়বড়ে সব।

অমন সুন্দর ছেলেটা যদি হয় সাজন্ত দেখাবে। তা কে কার কথা শোনে। গলা খাটো করে হঠাৎ প্রশ্ন করে মনসার মা!

—হারে, কি বলছিল ছুটবাবু!

প্রীতি ওর দিকে একটু বিরক্তিভরা চাহনিতে চাইল। বুড়ীর জীর্ণ ঘোলাটে চোখের দৃষ্টির মাঝে যেন বহু অতীতের কোন চটুল চাহনির বেদনাময় ধ্বংসাবশেষ।

…একটু অবাক হয় সে।

ধমকে ওঠে—কি আবার বলবে! যা শোগে যা—ঘুমতে আর আসে না। সারারাত ঘং ঘং কাসবি।

হাসছে বুড়ী!

দাঁতপড়া লালচে মাড়িতে ওর হাসিটা কেমন বিশ্রী দেখায়, ও যেন ব্যঙ্গ করছে প্রীতিকে। সন্দেহও করে—কি একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগে প্রীতির মনে। অশোকের এই রাত্রিতে আসাটা যেন বুড়ীর মনে অকারণ সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

চুপ করে পথে বের হয়ে চলেছে অশোক।

প্রীতির কথাগুলো ওর মনে কেমন একটা প্রশ্নের সাড়া জাগিয়েছে। হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, থামিয়ে দিয়েছে তাকে সত্যি; কিন্তু পথে বের হয়ে এসে এমনি স্তব্ধ অসীমের মাঝে কেমন ভাবনা তুলেছে মনের কোণে।

…আদর্শ! আর বাস্তব!

দুটো দুদিকের প্রশ্ন।

একটিকে ঘর ছেড়ে অসীম অনিশ্চিতের মাঝে এগিয়ে যাওয়া, কোন সুখশান্তির সন্ধান তার মধ্যে আছে কিনা জানে না, আছে শুধু অপমান আর আঘাত, অন্যদিকে একটি শান্ত জীবনযাত্রার সঙ্কেত।

সেখানে শান্তি আনন্দ তৃপ্তি হয়তো আছে।

প্রীতির দুচোখে তেমনি কোন স্তব্ধ শান্তিনীড়ের আহ্বান।

…সুপ্তিমগ্ন গ্রাম সীমা—আজ জীবনের অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। বাবার সংস্পর্শে আসেনি বড় একটা। তিনি চাকরী নিয়ে সারা ভারতে ঘুরে বেড়ান—মাকেও মনে পড়ে না।

ছেলেবেলা হতেই সে স্কুলবোর্ডিং কলেজ-হোষ্টেলেই মানুষ। ঘরের বাঁধন সে জানে না তাই বোধহয় এমনি শান্ত রাত্রির গহনে কার দুচোখের চাহনিতে একটা অন্য জগতের ইসারায় চমকে উঠেছে।

হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বনের ধারের রাস্তায় গরুর গাড়ী চলেছে দুর্গাপুরের দিকে। দু-একটা ওদের লিগের সঙ্গে ঝোলানো লণ্ঠনের এক ফালি দোল্য আলো—দুলছে আর ছিটকে পড়েছে পথে। কথার টুকরো শব্দ ভেসে আসে। বোধ হয় ধান বিক্রী করতে চলেছে দুর্গাপুর বাজারে। ভোর নাগাদ দামোদরের ধারে পৌছবে। তারপরই ভোরের আলোয় পার হবে তিন মাইল বালিয়াড়ি। শিশির-জমা বালিতে পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে—কনকন করে। গরু বাছুর এই ঠাণ্ডায় হাঁপিয়ে ওঠে। লালা ঝরে মুখ দিয়ে।

…সভ্য জগত, রেল লাইন আর এই প্রায়ান্ধকার বনঘেরা অঞ্চলের মাঝে ওই দামোদরই একটা সীমারেখা সীমাপ্রাচীর রচনা করে আছে আদিকাল থেকে, সভ্যতার সব আলো, গতিরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে খরস্রোতা ধ্বংসরূপী মহাকাল ওই দামোদর নদ।

…কেমন যেন প্রীতির কথা মনে পড়ে ; এই অন্ধকার গ্রামে তাই বোধহয় মন টেকে না, প্রীতির দুচোখে কি একটা বেদনার করুণ ছায়া, হঠাৎ পথ-চলতি একটি মন তাই আবিষ্কার করে চমকে উঠেছে।

একদিকে জীবন গড়ে—অন্য দিকে ভাঙ্গার সূচনা। শুধু ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে। অন্তহীন এই ভাঙ্গা গড়ার খেলায় রাত্রি দিনের পরিসরে মহাকালের চাকা ঘোরে দুর্নিবার গতিতে।

তারা জ্বলে—হাওয়া কাঁপে।

…বেজা বাউরী বসে আছে, বিনিদ্র রজনীর প্রহর ঘোষণা করে ডাঙ্গার দিক থেকে একটা বনপালানো শিয়াল, দুটো নীল চোখ জ্বলছে কি এক শ্বাপদ লালসায়! কাশছে বেজা বাউরী।

…জীর্ণ শরীরে কেমন একটা ক্লান্তি আসে! তবু ঘুম আসে না। অবশিষ্ট বিষাক্ত রক্তটুকু যেন মাথায় উঠেছে।

বৌটা নেই!…এক ঘুমের পর উঠে তামাক খাবার খেয়াল হয়েছে। বেজা ঘুমোয় ওই একটুকু—দিনান্তে একবারই খেতে পায়। ওই সান্ধ্য বেলাতে চাট্টি ভাত আর শামুক গুগলীর ঝাল পুই শাকপাতা দিয়ে ; সারাদিনের অসহ্য জ্বালার পর দুমুঠো ভাত যেন সারা শরীরে একটা অবসাদ আনে।

শান্তি ছেয়ে আসে। ঘুমোয় একটুকুন ভাত-ঘুম। তারপরেই আবার যা কে তাই। রাত কাটে—জেগে থাকে সুপ্তিমগ্ন বাউরীপাড়ার একটা অর্দ্ধমৃত প্রেতাত্মার মত ওই বেজা বাউরী।

আজ ঘুম ভেঙ্গে যেতে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে তামাকের ভাঁড়টা, যদি একছিলিম অবশেষ থাকে।

তালাইটা ফাঁকা—চালের বাতার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বৌটা নেই।

—এ্যাই!

বুড়ীমা একদিকে পড়েছিল ছেঁড়া কাঁথা চাপা দিয়ে আধমরা ভালুকের মত। ওর চীৎকারে বিরক্ত হয়ে ওঠে—এ্যাই চুক করে থাক।

—বৌটা কুথায়?

মা বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে—শুধোবি সিটোকে আত দুপুরে কুথা যায়!

বেজা চুপ করে এসে বাইরে বসল। কেমন হু হু হাওয়া বইছে। রাতের কনকনে হাওয়া।

নিঝ্ঝুম বাউরী পাড়ায় কোথায় কে যেন ককিয়ে কাঁদছে। নিতে বাউরীর আধমরা ছেলেটা কাঁদছে ককিয়ে—বোধহয় পেটের জ্বালায়। পেটের জ্বালায় ওরা শুধু কাঁদে।

আর বুক জ্বলছে বেজার।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চমকে ওঠে—আঁধারে পেত্নীর মত দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। ছেঁড়া ময়লা কাপড় থেকে

দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তখনও পেত্নীর মত কুৎসিত মেয়েটা হাসছে কদর্য বিশ্রী স্বরে।

ধমকে ওঠে বেজা—এ্যাই!

—বৌটোকে খুজছিস? দেখগো বড়বাবুদের খামারে—হিঃ হিঃ হিঃ। হাসিতে ফেটে পড়ে বাউরী পাড়ার প্রেতাত্মা। খিলখিলিয়ে হাসছে ওদের ঘরের সর্বনাশা আগুন দেখে।

...বেজার অক্ষম দেহের কোষে কোষে যেন আগুনের ধারা বইছে। জ্বলছে সারা গা।

হাতের কাছে পড়েছিল একটা আধপোড়া জুমড়ো কাঠ—তাই তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সরে যায় মেয়েটা।

হঠাৎ আবছা অন্ধকার ভেদ করে কাকে আসতে দেখে ওর দিকে চাইল বেজা। বৌটা রাত-দুপুরে অভিসার সেরে ফিরছে, মনে তখনও রঙ্গীণ নেশা। নোতুন ডুরে শাড়ীর খুঁটে বাধা কটা করকরে রূপোর টাকা; কপালে কাঁচপোকার টিপটা কোথায় খুলে পড়েছে।

কি যেন একটা উন্মাদ দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আসছে—তবু মনে মাদক-সুরের রেশ মুছে যায়নি।

সামনেই বেজাকে জুমড়ো কাঠ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে যায়—যেন ভয় পেয়েছে। পরক্ষণেই সামলে নেয় বৌটা।

বেজাও ওরদিকে চেয়ে থাকে; বৌটাকে দেখছে সে। ...নোতুন শাড়ী পরণে—দেহে কেমন উতরোল ঢেউ। বাউরী পাড়ায় ওকে মানায় না।

—হাঁ করে অমন উদোস মেরে দেখছিস কি? জুমড়ো কাঠ হাতে।

বেজা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়—তুকে!

হাসছে মেয়েটা—রাস্তার সম্মাইতো ওমনি হাঁ করে চেয়ে থাকে। তুইও!

কথা বলে না বেজা। এগিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারে দপ্ দপ্ জ্বলছে ওর শীর্ণ কোটরাগত দুটো চোখ; ধুকছে লোকটা। হঠাৎ সবশক্তি একত্রিত করে শীর্ণ শাঁড়াসীর মত হাত দুটো দিয়ে টিপে ধরে ওকে।

—এ্যাই! কাঁপছে বেজার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে।

বৌটাও চকিতের মত এক ঝটকায় ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল—আচমকা ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে বেজা।

গজরাচ্ছে বৌটা—ভাত দিবার ভাতার লয়, কিল মারবার গোঁসাই আইছেন। মরেও না যম! গায়ে হাত দিতে আসিস—খাইয়ে দাইয়ে তুর গায়ে জোর করছি লয়?

অসহায় বেজা উঠে বসেছে ততক্ষণে, ওই ধাক্কাটা তার দেহেই শুধু নয়, বিকৃত মনের কোনখানে নিবিড় বেদনা এনেছে।

...চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—ঘরের ভিতর ঢুকে গেল বিজয়িনীর মত বৌটা।

তার মনে তখনও জীবনবাবুর খামারবাড়ীর এক প্রান্তে সুন্দর ঘরটার স্বপ্ন, কেমন সেখানকার বাতাসটুকু অবধি সুগন্ধময়, মনোরম। ঝকঝকে তকতকে। এখানে যেন কেবল দুঃখ আর আঁধার, এতটুকু আলোর নিশানা নেই। আঁধারেই হাতড়ে কাপড় ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথাখানা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

...বেজা তখনও বাইরে বসে আছে। কাঁপছে শীতে আর হাড়-কাঁপানো জাড়ে।

খাটতে আর পারবে না কোন দিনই। সারা শরীরটা যেন ঘুণধরা বাঁশের মত পঙ্গু আর জীর্ণ হয়ে গেছে।...কুৎসিত রোগে জারিয়ে দিয়েছে তার দেহ।

...না হলে বৌটাও আজ তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করে।

খিক্ খিক খিক্!

..হাসছে খেঁকশিয়ালের মত সেই কুৎসিত টেরী বাউরী। একটা চোখ কাণা—তবু যৌবন তাকে বঞ্চিত করেনি। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় জানোয়ারের মত ঘুরে বেড়ায়। যদি কিছু রোজকার হয়।

...বেজার বৌকে তাই হিংসা করে, আনন্দ পায় বেজার ওই হেনস্থায়।

...বউটো ফিরে আইচে হ্যাগো? দেখলম যেন।

জবাব দেয় না বেজা।

...টেরী বলে ওঠে—কুনদিন যাবেক আর ফিরে আসবেক নাই। ভাল করে ছাঁদন দড়ি করো।

টেরী বোধ হয় কোথাও ধেনো মদ গিলেছে, কেউ দিয়েছে। বিশ্রী গলায় তাই বোধহয় গান গাইতে থাকে—

—বেজাই দাদা কলাই খেয়ো না।
জানলা দিয়ে বউ পালাবে
দেখতে পাবে না।

বেজা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে বসে থাকে, কেমন হতাশ হয়ে টেরী থেমে গেল।

[ক্রমশঃ]

স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভগবান যাঁদের পৃথিবীতে পাঠান তাঁর কাজ করবার জন্য তাঁদের ঘুমানোর অবকাশ কোথায়? ব্রাউনিংএর কাব্যে আছে, "Be sure they sleep not whom God needs!" একটা প্রাচীন মহাজাতির প্রসুপ্ত আত্মাকে জাগরিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কি বিধাতার প্রয়োজন ছিল না? প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বকীয় মর্ম্মবাণী আছে। এই মর্ম্মবাণীটিকে ঠিকমতো বুঝতে না পারলে জাতির প্রাণপুরুষকে আবিষ্কার করা যায় না। প্রথমস্তরের প্রত্যেক মনীষীরই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায়; সেই সমুজ্জ্বল ধীশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছে কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য্য। কল্পনামিশ্রিত ধীশক্তিকে আশ্রয় ক'রে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন সেই আদর্শগুলিকে—যাদের শিকড় জাতির চরিত্রের মধ্যে। জাতীয় চরিত্রের মজ্জাগত আদর্শগুলির জয়ধ্বনি তাঁদের কণ্ঠে। তাঁরা স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি।

রবীন্দ্রসাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী। রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে স্বর্গের বহ্নিশিখা। সেই বহ্নির আভায় আমরা দেখতে পেয়েছি ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে। আর এই সংস্কৃতি মানুষকে বলেছে স্বচ্ছ বুদ্ধির নির্ম্মল আলোয় সত্যকে চিনতে, আর অকুতোভয়ে সেই সত্যের অনুসরণ করতে। সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ধ্বনিটা গম্ভীর নির্ঘোষে বাজছে সেটা হোলো, জয় জয় সত্যের জয়। যেহেতু ভাবাবেগের মধ্যে তলিয়ে গেলে সত্যের ক্ষুরধার দুর্গম পথকে আমরা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারিনে, সেই হেতু ভারতীয় সংস্কৃতি ভাবাবেগ (emotionalism) আর কর্ত্তব্য এ দুয়ের মধ্যে কর্ত্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের কাজ দুষ্টের দমন, পাপকে ঠেকানো। অর্জ্জুন দেখলেন বিপক্ষের দলে তাঁর আত্মীয়স্বজন। তাঁর হাত থেকে খসে পড়লো গাণ্ডীব। অর্জ্জুনের হৃদয় ভাবাবেগের আর কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বে ফেনিল। আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে কর্ত্তব্যপালনে তিনি পরাঙ্মুখ। আপনজনকে ভালোবাসতে পারার মধ্যে মনুষ্যত্বের এমন কিছু গৌরব নেই। স্বামী বিবেকানন্দ গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন, "A cow can sacrifice its life for its young. Every animal can. What of that? It is not the blind, bird-like emotion that leads to perfection." গরুও তার বাছুরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। প্রত্যেক জানোয়ারই পারে। পক্ষীসুলভ অন্ধ ভাবালুতা পূর্ণতায় কখনো পৌঁছে দিতে পারে না। স্বামীজী বলছেন, একমাত্র নির্ম্মল বুদ্ধিকে সহায় করেই আমরা পূর্ণ মানুষ হ'তে পারি। যে মানুষ পূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত হতে চায় সে ভাবালুতাকে কখনো প্রাধান্য দেবেনা। কৃষ্ণ তাই যুক্তির পর যুক্তির অবতারণা ক'রে, পরিশেষে অর্জ্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভক্তের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করলেন। সেই দিব্যদৃষ্টি যখন এলো, তখন অর্জ্জুনের মনে আর কোন সংশয় রইলো না, সত্যকে তিনি পেয়ে গেলেন। সত্যের পথকে অনুসরণ করতে গেলে, আগে জানতে হবে সত্য কি—আর শুধু স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারাই এই জানা সম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রথমস্তরের কবি যাঁরা—তাঁদের আবেদন ভাবালুতার কাছে নয়, মানুষের নির্ম্মলবুদ্ধির কাছে—যে-বুদ্ধি সত্যের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করে দেয়, আর কর্ত্তব্যের কঠিন পথকে অনুসরণ করতে গেলে যা সত্য তার সঙ্গে পরিচয়ের একান্ত প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণের আবেদন অর্জ্জুনের ভাবালুতার কাছে নয়, তাঁর বুদ্ধির কাছে—স্বজনপ্রীতির মুখোসপরা মোহের মালিন্য থেকে মুক্ত সুনির্ম্মল বুদ্ধির কাছে। গীতায় কৃষ্ণের বাণীই ভারতবর্ষের মর্ম্মবাণী আর রবীন্দ্রসাহিত্যেরও মর্ম্মবাণী। ভারতের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যকে মন্থন ক'রে জাতির প্রাণপুরুষকে আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ

আর এই প্রাণপুরুষকে আবিষ্কার করে নব্যভারতের কর্ণে যে বাণী তিনি শোনালেন সেটা হচ্ছে : 'যা সত্য তাকে জানো নির্ম্মল বুদ্ধির আলোয়—যাতে তুমি কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হও।' 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় কচের মনে যে দ্বন্দ্ব সে ভাবালুতার সঙ্গে কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়েছে কর্ত্তব্য। দেবযানীকে কচ ভালোবেসেছে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। কিন্তু সেই ভালোবাসার ভাবাবেগে অভিভূত হ'য়ে কর্ত্তব্যকে কচ বিসর্জ্জন দিতে পারলেন না। কচ দেবতাদের কথা দিয়ে এসেছেন, সঞ্জীবনী বিদ্যা পরিবেশন ক'রে তাঁদের নূতন দেবত্ব দেবেন। ব্যক্তিগত কোন সুখের জন্যেই তিনি তাঁর কর্ত্তব্যকে অবহেলা করতে পারেন না। যে-ভালোবাসার প্রভাবে মানুষ নিজের সুখের লালসায় উন্মত্ত হ'য়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকে ভুলতে বসে, সে তো ভালোবাসা নয়—সে মায়া। নারীমায়ার দ্বারা কচ তাঁর স্বচ্ছ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দিলেন না। কী তাঁর কর্ত্তব্য তা তিনি উপলব্ধি করলেন আর সেই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে কচ তাঁর প্রিয়াকে বললেন :

"ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধমৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে। তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ।"

সুখকে ভোগ করবার এবং দুঃখকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা মানুষের মজ্জাগত। সুখ ভোগের এই অদম্য ক্ষুধা মানুষ পুরুষপরম্পরায় পেয়েছে তার পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে। এই আত্মপ্রীতি যতক্ষণ সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণ বিপদ নেই। বিপদ ঘটে তখনই যখন নিজের সুখের লালসায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মানুষ তার সমাজের কল্যাণকে গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন বোধ করে না। তখন ব্যক্তিগত ভোগতৃষ্ণা প্রবল হ'য়ে সমাজের শিরে ডেকে আনে প্রলয়ের ঝড়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তাই হৃদয়ের দাবীকে অস্বীকার করেনি, কামকে পশুর ধর্ম্ম বলে ঘৃণার চোখে দেখেনি, কিন্তু কর্ত্তব্যকে স্থান দিয়েছে সকলের উপরে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই কর্ত্তব্যের শঙ্খ নির্ঘোষ।

'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় পিতা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে রাজার কর্ত্তব্যকে ভুলতে বসেছেন। তাঁর কর্ত্তব্যবোধ অপত্যস্নেহের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। গান্ধারীর আবেদন ধৃতরাষ্ট্রের শুভবুদ্ধির কাছে। স্বামীকে তিনি প্রশ্ন করলেন,

"শুধাই তোমারে
যদি কোনো প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হ'তে টানি করে অপমান,
বিনা দোষে, কী তাহার করিবে বিধান।"

রাজা উত্তরে বলেছেন, "নির্ব্বাসন।"

তখন গান্ধারীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে :

"মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্ম্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্য্যোধনে।

'সামান্য ক্ষতি' কবিতাতে কাশীর মহিষী করুণা শীত-নিবারণের জন্যে প্রজার কুটিরে আগুন দিয়েছে। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গৃহহীন প্রজারা রাজার দরবারে এসে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করলো। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে রাজা কিঙ্করীকে আদেশ করলেন রাণীর দেহে চীরবাস তুলে দিতে। তারপর,

"পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-কটি কুটির হোলো ছারখার

যত দিনে পারো সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।"

এখানেও রবীন্দ্রনাথ ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে রাজাকে কর্ত্তব্যবিমুখ হতে দেননি। রাজার কর্ত্তব্যবোধ অম্লান দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কঠোর হস্তে নিজের মহিষীকে শাস্তি দিয়ে তিনি রাজধর্ম্ম পালন করেছেন।

'রাজা ও রাণী' নাটকে রাজা বিক্রমদেব রাজধর্ম্মপালনে উদাসীন। রাজ্যের ক্ষুধার্ত্ত এবং লাঞ্ছিত প্রজাদের কল্যাণের প্রতি তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। রাণীকে নিয়ে অন্তঃপুরে তিনি আত্মসুখে নিমগ্ন। রাজার আচরণের প্রতি রাণী কটাক্ষপাত করলে বিক্রমদেব বললেন,

"জানোনা কি প্রিয়ে
সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর?"

রাণী সুমিত্রা যখন স্বামীকে বললেন, "পীড়িত প্রজাদের রক্ষা করো"—তখন রাজা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গান্ধারীর আবেদন যেমন ব্যর্থ হয়েছে, বিক্রমদেবের কাছে সুমিত্রার আবেদনও তেমনি ব্যর্থ হলো। কিন্তু সুমিত্রা তো শুধু রাজমহিষী নন, তিনি যে প্রজাদের জননী। রাজার ভুজবন্ধনের মধ্যে নারীজীবনের সুখ আছে; কিন্তু সেই সুখের যুপকাষ্ঠে প্রজাদের মঙ্গলকে তিনি কেমন ক'রে বলি দেবেন প্রজার জননী হ'য়ে? তাই কর্ত্তব্যের কঠিন আহ্বানে রাণী সংকল্প করলেন,

"পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে। পতিসত্য পালনের
লাগি আমি যাবো।"

কর্ত্তব্যপালনে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে রাণী সুমিত্রা শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে ত্যাগ করে গেছেন, আর এই ত্যাগ তাঁকে অমরমহিমায় মহিমান্বিত করেছে।

'রামকানায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা' গল্পে বৃদ্ধ রামকানাই সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠস্বরে জজকে বললেন, "আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছে তাহা মিথ্যা।" একদিকে সত্য, আর একদিকে পুত্রের সৌভাগ্য। সত্যের কাছে রামকানাই পুত্রের সৌভাগ্যকে বলি দিয়ে তার বন্ধুদের কাছে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হ'লেও রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন।

'সমস্যা পূরণ' গল্পটিতে ঝি কড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার সত্যের নির্দ্দেশে যবনীপুত্র অছিমদ্দিনকে নিজের ঔরসজাত পুত্র বলতে একটুও দ্বিধা করেন নি। লোকনিন্দার ভয়ে সত্যকে অস্বীকার করবার ভীরুতা রবীন্দ্রসাহিত্যে ধিক্কৃত হয়েছে বারম্বার।

এমনি সব দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে আমরা অনায়াসে দেখাতে পারি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি। তাঁর মানসপুত্র এবং মানসকন্যারা ঋজুশুভ্র জীবনের মহিমায় দেদীপ্যমান। সমারসেট মম্ আর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতেগিয়ে একজায়গায় বলেছেন, "If it is to be more than self-indulgence it must strengthen your character and make it more fitted for right action. অর্থাৎ সাহিত্যকে মহৎ সাহিত্য হ'তে গেলে তার মধ্যে থাকা চাই আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় করবার ক্ষমতা। মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে কর্ত্তব্যপালনে, সত্যকে অনুসরণ করবার প্রেরণা দেয় আমাদের অন্তরে। হুইট্‌ম্যানের জীবনচরিতকার ক্যান্‌বি (Canby) থোরো এবং হুইট্‌ম্যান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাঁর প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ এমন একজন লেখক "who wrote from inner necessity and to life and chasten, not to please or drug their neighbours." তিনি লিখেছিলেন অন্তরের ঐশীপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর চারপাশের মানুষগুলিকে চরিত্রসম্বন্ধে ধনী করবার জন্যে, ভোগলালসার পঙ্কিলতা থেকে তাদের চিত্তকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে। যারা লেখে পাঠক পাঠিকাদের চিত্তকে পিয়ানোর কোমলসুরে ঘুম পাড়াবার জন্যে, মানুষকে খুশী করা যাদের সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য—তাদের দলে রবীন্দ্রনাথকে ফেলতে যাওয়ার মতো নির্ব্বুদ্ধিতা আর নেই।

ভারতবর্ষ ঃ সূচনার স্মৃতি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগে চলতি পথে হঠাৎ "ভারতবর্ষ"এর বর্তমান সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। কথাপ্রসংগে তিনি বললেন—"ভারতবর্ষ"-এর পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তার জন্মকালীন স্মৃতির টুকরো উদ্ধার করে কিছু লিখতে। এদেশে এই সুদীর্ঘ জীবনে বহু সাহিত্য পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু দেখলাম। এর মধ্যে "প্রবাসী" পত্রিকা কিছুদিন আগে ষাঠ বছর পূর্ণ করেছে; এখন "ভারতবর্ষ" পঞ্চাশ পূর্ণ করল—এটা আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা। কারণ সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই এই দুটি পত্রিকার সংগেও আমার যোগাযোগ। তাই স্মৃতির পাতা উল্টে পঞ্চাশ বছর আগের সেই দিন-গুলো খুঁজে পাবার চেষ্টা করছি—"ভারতবর্ষ" প্রকাশ পর্বের সেই দিনগুলো।

সেই সময়ে কবি, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মশাই কলকাতার চালতাবাগান অঞ্চলে (এখন ডি. এল. রায় স্ট্রীট) একটা বাড়িতে বাস করছিলেন—তিনি তখন অন্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ও গবেষণার উৎসাহ তখনও অটুট আছে। প্রয়োজনীয় বইপত্র তখন তাঁকে পড়ে শোনাতে হত এবং এই জন্য আমাকে প্রায় প্রত্যহই চালতাবাগানে যেতে হত। বিজয়চন্দ্রের বাড়ির পাশেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি "সুরধাম"। সুরধামের বাগানে তখন রোজ বিকালে সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের এক জমাট আড্ডা বসত। সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,সাহিত্যরসিক প্রসাদদাস গোস্বামী প্রভৃতি এই আড্ডায় রোজই জমায়েৎ হতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আর বিজয়চন্দ্র তো ছিলেন-ই। বিজয়চন্দ্রের দৌলতে আমারো সেই কিশোর বয়সেই সেই আড্ডায় যাতায়াত করবার সুযোগ হয়ে গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ির বৈঠকখানায় তখন "ইভিনিঙ্ ক্লাব" বলে এক নাটুকে সমিতি ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা নাটক ইত্যাদি অভিনয় করে তখন তাঁদের বেশ সুনাম। সেই "ইভিনিঙ্ ক্লাব"-এর অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক-সংস্থা "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স"-এর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

যথারীতি একদিন বিকালবেলা সুরধামে গিয়ে দেখি—দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বারান্দায় পায়চারী করছেন। ইতিপূর্বে এ রকম উত্তেজিত ও চিন্তিত হতে তাকে বিশেষ দেখেছি বলে মনে পড়েনা। কারণও জানতে বিশেষ বিলম্ব হলনা। জানলাম—হরিদাসবাবু তাঁদের "গুরুদাস লাইব্রেরী" থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করবার সংকল্প করেছেন, সেই পত্রিকার সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতেই দ্বিজেন্দ্রলালের এই উত্তেজনা। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যবন্ধু এত বেশি ছিলেন যে, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার জন্যে তাঁর কোন অভাব হবার নয়—তবুও সম্পাদকীয় গুরুদায়িত্ব স্মরণ করেই তাঁর চিন্তা ও উত্তেজনা ঘটেছিল। তারপর থেকে সেই বৈকালিক আড্ডায় রোজ সেই পত্রিকা প্রসংগে আলোচনা চলতে লাগল।

সেই সময়ে আমরা কয়েকজন সদ্যযুবক সাহিত্য-পথ-যাত্রী—আমি, শ্রীপ্রেমাংকুর আতর্থী, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, চিত্রশিল্পী শ্রীচারুচন্দ্র রায়—"জাহ্নবী" পত্রিকার সংশ্রব ছেড়ে ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রতিষ্ঠিত "যমুনা" পত্রিকার সংগে যুক্ত হয়েছি। একদিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এসে খবর দিলেন—তাঁর ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেলুড়ে তাঁর ভাই স্বামী বেদানন্দের কাছে এসে রয়েছেন। শরৎচন্দ্রের তখনও কোন নিজস্ব সাহিত্যখ্যাতি ছিলনা। কেবল তখন বেনামীতে "কুন্তলীন পুরস্কার"-এ "মন্দির" নামে গল্পটি ও "ভারতী"তে "বড়দিদি" নামে ছোট উপন্যাসটি বেরিয়েছে। উপেন্দ্রনাথের কাছেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, মন্দির আর বড়দিদি

বেনামীতে শরৎচন্দ্রের লেখা এবং তাঁর কাছে আরও কিছু লেখা আছে কিন্তু প্রকাশ করতে তাঁর বড় সংকোচ। এখন শরৎচন্দ্র বেলুড়ে এসেছেন শুনে ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়লাম, কারণ আমরা ঐ দুখানা লেখা পড়েই বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক দ্যুতিময় জ্যোতিষ্কের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁকে তাঁর যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আমাদের প্রাণে জেগেছিল দারুণ আগ্রহ।

আমরা এই সুযোগ অবহেলা করলাম না। বেলুড়ে অভিযান করা হল। অতিকষ্টে তাঁর সংকোচ ভাঙিয়ে, প্রায় জোর করেই তাঁর কয়েকটা লেখা আমরা নিয়ে এলাম। তারপর "পথনির্দেশ" "রামের সুমতি" আর "বিন্দুর ছেলে" "যমুনা"তে পর পর প্রকাশিত হল। এই তিনটি গল্প আমাদের এত উৎসাহিত করল যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম : এরকম একজন বিরাট প্রতিভাধর সাহিত্যিককে লোকচক্ষুর আড়ালে অজ্ঞাতবাস করতে দেওয়া হবেনা। আমরা তাই "যমুনা" বগলদাবা করে চেনাশোনা মহলে জোর প্রচার অভিযান শুরু করে দিলাম। সকলকে ধরে ধরে যমুনায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গল্প পড়ে শোনাতে লাগলাম। এ কাজে আমার সংগে সবচেয়ে বেশী উৎসাহের পরিচয় দিয়েছিল প্রেমাংকুর। আমাদের এই অভিযান খুব শীঘ্রই সাফল্যধন্য হয়ে উঠল; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শরৎচন্দ্রের লেখার উচ্চপ্রশংসা করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রের লেখায় খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললনে, 'এ দেখছি পাকা হাতের লেখা, এঁর লেখা আমার ভারতবর্ষের জন্য চাই।'

ইভিনিঙ্ ক্লাবের অন্যতম মাতব্বর প্রমথনাথ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু ছিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে ভারতবর্ষের জন্য লেখা আদায় করে আনতে পারবেন। শরৎচন্দ্র তখন রেংগুনে ফিরে চলে গেছেন। প্রমথনাথ তাই লেখা আনবার জন্য রেংগুনে চলে গেছেন এবং কৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল দেখে যেতে পারেননি। ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হবার আগেই হঠাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়ে তিনি ইহলোকত্যাগ করলেন।

ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যায়—বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে যাঁদের বিজ্ঞাপন অভিনবত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, কর্তৃপক্ষ তাদের পুরস্কৃত করবেন বলে ঘোষিত হয়েছিল। আজকাল পণ্যদ্রব্যাদির প্রচারের জন্যে অনেক প্রচারকসংস্থা হয়েছে, প্রচারশিল্পীরাও নিত্যনূতন প্রচার-কৌশল অবলম্বন করছেন। কিন্তু তখন পণ্যপ্রচারকলা এত উন্নত হয় নি। তাই প্রচারশিল্পকে উৎসাহিত করবার এই পরিকল্পনাটি তখন পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। সেই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন অধুনালুপ্ত প্রসিদ্ধ ক্রীড়াসরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্রব্যবসায়ী "কার অ্যাণ্ড মহলানবীশ" কোম্পানী। তাঁদের বিজ্ঞাপনে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতীক "হিজ মাস্টারস্ ভয়েস"এর উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের একখানা ছবির ব্লক ছেপে তার তলায় লালকালিতে লেখাছিল : "সেই কণ্ঠস্বর।" দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত খুব জনপ্রিয় ছিল, তাঁর তিরোভাবের শোকচ্ছায়ায় এই বিজ্ঞাপন খুবই সময়োপযোগী ও লোকচিত্ত-আকর্ষণীয় হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞাপন প্রচারণার আদি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে সেই বিজ্ঞাপনটিকে।

দ্বিজেন্দ্রলালের অবর্তমানে অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের উপরে ভারতবর্ষের সম্পাদনভার অর্পিত হল। অমূল্যচরণও আমাদের অত্যন্ত ভালবাসতেন; তাঁর এডওআর্ড ইনস্টিটিউট গৃহের আসরেও আমাদের দলবল প্রায়ই উপস্থিত থাকত। চারুচন্দ্র মিত্র, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যসেবীদেরও ছিল সেখানে নিয়মিত আনাগোনা।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে অমূল্যচরণ সুইডেনের নোবেল পুরস্কারদাতা সমিতির কার্যালয় থেকে চিঠি লিখে প্রথম বৎসর থেকে তাঁদের ছাপা কার্যবিবরণী আনিয়েছিলেন। সেই কার্যবিবরণীতে তখন পর্যন্ত নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণীজনের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল। অমূল্যচরণ আমাকে তার থেকে চুম্বক নিয়ে বাঙলায় প্রবন্ধমালা লিখবার জন্যে বললেন। তারপর কয়েকটি সংখ্যা ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবে সচিত্র সেই প্রবন্ধমালা আমি ও আমার বন্ধু শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার—দুজনে

মিলে প্রকাশ করি। ভারতবর্ষে সেই আমার প্রথম রচনা। তারপর আমরা দুজনে পাশ্চাত্যের আরও অন্যান্য সুধীজনের ছবি ও কর্মপরিচয় সংগ্রহ করে "পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলী" শিরোনামায় ধারাবাহিক সচিত্র প্রবন্ধমালা লিখেছিলাম ভারতবর্ষে। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্পর্কেও আমি তথ্য ও গান্ধীজী ও তাঁর কয়েক জন অনুচরের ছবি বহুকষ্টে জোগাড় করেছিলাম। সেইসব তথ্য ও ছবি সংবলিত প্রবন্ধও আমি ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের কোনো একটি সংখ্যাতে লিখেছিলাম। যতদূর জানি এই উপমহাদেশে গান্ধীজী সম্পর্কে সেইটিই প্রথম রচনা এবং এদেশে গান্ধীজীর মতবাদ ও কর্মধারার প্রচারের প্রথম বাহক এই ভারতবর্ষ পত্রিকাই।

একটী ঘরোয়া বৈঠকে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

অনেকদিন আগের কথা। ১৩২৮ সাল। কলকাতায় এসেছি পারিবারিক কোনো কাজ উপলক্ষে। তখন দেশে পর্দা খুব। ট্রামে-বাসে ওঠা তো দূরের কথা, মেয়েরা কাছা-কাছি পাশের বাড়ীতে যেতেও দীর্ঘ অবগুণ্ঠন দিয়ে পথে নামতেন। সঙ্গে থাকৃত একটি 'বডি গার্ড' ছেলে। তার বয়স ২০ বছরেরই হোক, কিম্বা ৮ বছরেরই হোক। ছেলে বা পুরুষ তো বটে!

'নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' পুরাদমে দিকে দিকে বাহু বিস্তার করে আছে। পাড়ার ছোট মেয়েরা বন্ধ গাড়ীতে করে মহাকালী পাঠশালা, বেথুন কলেজ স্কুল বা ডাফ স্কুলে পড়তে যায়। তেরো বছর পার হবার আগেই বিয়ে দিতে হবে। তার আগেই ঐ বিদ্যার্জনটুকু করিয়ে নেওয়া হোক, এই ছিল প্রথা তখনকার।

আর আমরা তখনকার একটু বড় বড় মেয়েরা ও বৌরা বাড়ীতে বসে থাকি সারাদিন। সংসারের কাজ করি। সেলাই বোনা করা হয়। বই পড়া হয় স্ব স্ব বিদ্যানুযায়ী।

তারি মাঝে মাঝে প্রায় সমবয়সী সম্পর্কীয় কাকারা ভাইয়েরা কোনো ভগ্নিপতি ও মামারা আসেন বিকালে ও সন্ধ্যায়। একটা জমাট আড্ডা জমে ওঠে—গল্প, কথা, যথেচ্ছ আলোচনা ও গানে।

দু'একজন কাকা সুগায়ক ছিলেন। তিনি বা তাঁরা এলে মজলিসটা জমত ভালো। পিয়ানো বেহালা হার-মোনিয়ম বাজাতে পারতেন চমৎকার।

এক কথায় বাইরে বেরুনো হ'ত না বটে, অন্তঃপুরটা একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনেক লোকজন নিয়ে খুব এক ঘেয়ে নীরস ছিল না।

গানও অনেক রকম হ'ত—রামপ্রসাদ, পদাবলী, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ (তখন আধুনিক সঙ্গীত জন্মায় নি) সব রকম।

"এ সংসার ধোঁকার টাটি"ও হ'ত। আবার

"এক জ্বালা গুরুজন, আর জ্বালা কানু···
দুজনে মিলিয়া মোর জর জর তনু···"

"এ ভরা বাদর" "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু" তাও হচ্ছে তার সঙ্গে। কাকা আবার হয়ত সহসা এক সময়ে গেয়ে উঠলেন—

"হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে"

এবং তখনকার খুব প্রচলিত "আমি তোমায় যত শুনিয়ে-ছিলাম গান।"

আবার "ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, না, না, না।"

সুর যেন তাঁর কণ্ঠে "সাতটী পোষা পাখী"র মতই খেলা করত (বরজলালের)। বেহালা হারমোনিয়ম গানে কথায় আলোচনায় ঐ ছোট্ট আত্মীয় সমাগম বা মজলিস যেন ঝলমল করত।

একদিন—যেদিন আর গায়ক-কাকা আসেন নি।

আমরাই কয়েকটী ভাই-বোন কাকা ভাইঝি বসে আছি কাকাদের পড়বার ঘরে।

সহসা কে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা, "এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান" তা অভিমান কথাটার ইংরেজী প্রতিশব্দ কি হবে বলতে পার কেউ?

সেকালের মেয়ে আমরা। স্কুল কলেজে পড়িনি। সব নীরব শ্রোত্রীর দল চুপ করেই রইলাম।

আর ছেলেরাও তখনকার আই-এ পড়া, বি-এ পড়ার দল। কেউ সুনীতিবাবুও নয়, রাজশেখর বসুও নয়। (ভাষা বাংলাটাই কতটা জানত এখন ভাবি)।

যাইহোক আলোচনা জমে উঠল।

আরেকজন বলে, "আর বিরহ অভিসার এগুলো? এগুলোরই বা কি কথা পাওয়া যাবে বলতে পার?"

'পণ্ডিতের' দল কেউ অভিধান আনে। কেউ কোনো সাহিত্য শিক্ষকের লেকচার স্মরণ করে। নাঃ—হালে আর পানি মেলে না। বিদ্যার দৌড় থমকে দাঁড়ায়।

একজন অনেক ভেবে-চিন্তে বললে ইংরেজী 'পিক্' কথাটা বোধ হয় খাটে···মেয়েরা নীরব। আর একজন বললে 'না ওটাতে ঠিক অভিমানের মত ভাবটা আসে না'। ওটা যেন আদুরে আহ্লাদে!

আমরা মেয়েরা অভিমানটা বুঝেছি। কিন্তু ইংরেজীটা আসছে না। কিন্তু মনে মনে বাংলাটা বেশ বানিয়ে নিচ্ছি। বলতে সাহস নেই কিছু। শুধু অভিমানের মধুর নরম কোমল উষ্ণতাময় একটী ভাব মনে পড়ছে। আমাদের কিছু প্রাচীনকালের বাংলায় দেখি "অভিমানী" মানে অহংকৃত কিম্বা উদ্ধত। এখনো ধর্ম সাহিত্যে 'অভিমান' শব্দ প্রায় ঐ অর্থেই ব্যবহার হয়। (অবশ্য কিন্তু তখন এত সব কথা ভাবি নি)।

সে থাক। রবীন্দ্রনাথের "এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান।" সে অভিমান আরেক জিনিষ।

যাই হোক সব পণ্ডিত'ই পরাস্ত হলেন। যে কথাটা তুলেছিল সে বললে "এ১বার রবীন্দ্রনাথের কাছেও নাকি কারা কথাটা তুলেছিল···সে কার কাছে শুনেছে।

সকলে জিজ্ঞাসা করি, "তা কি মীমাংসার কথা পাওয়া গিয়েছিল জানিস তুই?"

নাঃ। সে সব সে জানে না। অত শোনেনি। সে-কালের ছেলে গুরুজনদের মাঝে কথা বলতে চাইত না। আবার একজন বলে, তাহলে এখন 'বিরহের' কি প্রতিশব্দ হবে বল্ দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে আকুল হয়ে মনে পড়ে যায়। "কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ

সঘনে খরশর হন্তিয়া"

যেন এক সঙ্গেই পদাবলী সাহিত্যের বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসদের সঙ্গে এসে পড়েন রবীন্দ্রনাথও।

"বিরহ বিধুর হয়ে ক্ষ্যাপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে"···

আর বিরহী হোক বা না হোক—আর মনের মধ্যে সকলেই গুঞ্জন শোনে

"বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঙাইবি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।"
···"ওরে হরি বিনে দিন রাতিয়া"!
'হরি বিনে দিন রাতিয়া'।

তা শ্রীরাধা বা অন্য কেউ 'বিরহ' রজনী গোঙাতে পারুন বা না পারুন, 'বিরহ' শব্দটীরও তাঁরা বা আমরা কোনো ঠিক ঠিক কথাই খুঁজে পেলাম না। ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করা বিরহ বাল্মীকি কালিদাস থেকে বৈষ্ণব কবি থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি কত ভাবে কত রকমে কতজন বলেছেন 'বিরহের ভার' বহন করেছেন সে কথাটীর ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই? ইংরেজী কাব্যেও নেই? কার পড়া আছে কে জানে?

চুপ করে মনে মনে ভাবি, মিলন বিরহ তাদেরও তো ছিল, আছে। বাল্মীকির প্রথম শ্লোক তো জীব নিয়েই পৃথিবী ভুবন ভরে আজো জগতে রয়েছে আদি বিরহ শ্লোক হয়ে। এমন যে 'বিরহ' তার একটী প্রতিশব্দ আছে নিশ্চয়ই—আমরাই জানি না।

কিন্তু আমাদের সেদিনের "বিদ্বান সঙ্গমে" তা আর পাওয়া গেল না।

এখনো বাকি আছে অভিসার। এবারে সকলেই প্রায়

সমস্বরে একমত হয়ে গেলাম। অপণ্ডিত মেয়েরাও এ বিতর্কে যোগ দিলাম।

'ওদেশে ওদের আবার অভিসার যাত্রা কি করে থাকবে? ওই শীতের দেশ, সেখানে মেঘমেদুর আকাশ অন্ধকার বন পথই বা কোথা—তুষারে বরফে জমাট বাঁধা নিউমোনিয়ার ঠাণ্ডা লাগা সে দেশের রাত্রি।···আর সে গুরুজনই কোথা? ভয়ই বা কাকে—কোন গুরুজনকে? যে নীল নিচোলে তুকুলে সেজে (ঘাগরায়) ঘন ঘোর নিবিড় তিমিরময় অরণ্যে পায়ের নুপুর হাঁটুতে বেঁধে ঝর ঝর ঝরা দৃষ্টিতে যমুনার তীরে কলঙ্কিনী রাধা চলেছেন অভিসারে—যেখানে কদম্বমূলে কৃষ্ণের বাঁশী বেজেছে।

সে অভিসার লীলা এমনধারা আর কোন্ দেশে আছে প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়ে! যে অভিসারের কথা ব্রজাঙ্গনা কাব্যে অহিন্দু মাইকেল বলেছেন। (অ-দেব-বাদী) রবীন্দ্রনাথও বার বার কত গানে বলেছেন—"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে"

"মনে পড়ে রাধিকার বৃন্দাবন অভিসার" 'কনক কলসী জল ভরে'! না 'অভিসারে'ও আমাদের ক্ষুদ্র বিদ্যা হার মানল।

মন অবশ্য হার মানল না। মিলন আছে 'বিরহ' নেই? প্রেম আছে 'মান অভিমান' নেই? আর গোপন প্রেম আছে অথচ অভিসার নেই? সবাই ভাবি, আছে—আছে নিশ্চয়ই—কথা আমাদেরই হয়ত জানা নেই।

আর 'মান'? হাঁ। মনে মনে ভাবি 'অভিমান' আর 'মানে' যেন একটু প্রভেদ আছে।

মনে হয় একালের হিসাবে 'মান'টা যেন একটু স্থূল। একটু মোটা ভাবের। তাতে সূক্ষ্মতার 'লীলা' নেই—মাধুর্য নেই। অভিমান যেন সবশুদ্ধ একটা অনির্বচনীয় ভাব। দেহময় অথচ দেহাতীত গভীর কোমল মধুর মনে তার নীড়।

* * *

সহসা একদিন বাড়ীতে এক গানের আসর বসল। বাড়ীর গায়ক আর তাঁদের বন্ধু গায়কদল অনেকগুলি জড় হলেন।

নানা ধরণের সঙ্গীত হল। আর বেহালা বাজালেন কাকাদের তুএকজন বন্ধু।

আমরা মেয়েরা অন্তরীক্ষে উপরের বারান্দায়-জানলার ধারে যেখানে হোক—অদৃশ্য বা অসূর্যম্পশ্য হয়ে—গান শুনছি। নীচের উঠানে গান, গল্প আর চা জলযোগ জমে উঠেছে।

নানা গানের মাঝে 'আগুনের পরশ মণি' 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি' 'বারি ঝরে ঝর ঝর' গম্ভীর গভীর সুরের আবহাওয়ায় সমস্ত বাড়ী প্রাঙ্গণ যেন থমথম করতে লাগল।

মজলিস শেষ হয়ে এলো।

সহসা সু—বাবু গাইলেন—

"ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে না, না, না।"
আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, না, না, না।
···মুখ পানে চেয়ে বলে না, না, না।

গান আর শেষ হয়েও হয় না।

প্রাঙ্গণভরা তরুণ, যুবকদল গান বাজনা ছেড়ে উঠতে চাইলেই সমস্বরে তাঁরাও বলেন "ঐ 'না, না, না'। সু—বাবু আর একবারটী গান। একবারটী—"

একবারের জায়গায় বার বার ঘুরে ফিরে গেয়েও গায়ক আর ছাড়া পান না!

তবু শেষ হল গান। শেষ হ'ল মজলিস। রাত্রিও গভীর হল।

কিন্তু বাড়ীতে আর সুরের রেশ থামল না। যে গাইতে জানে, পারে সে তো গায়ই, যে জানে না, পারে না সেও গায়।

'ও যে মানে না মানা।'
আঁখি ফিরাইলে বলে না, না না

ছোটরাও গায়। বড়রাও গায়। মেয়েরা গায়, ছেলেরা পুরুষরাও গায়। বেতালা বেসুরে গাইছে! আর ঐ গানটাই গায় বেশী।······

এবারে সহসা আবার একদিন আমাদের সন্ধ্যার আসরে একজন বললেন—আচ্ছা বল তো কে বলেছিল ঐ না, না, না। মেয়ে না পুরুষ?

সকলেই চুপ করে ভাবে।

ছেলের দল বললে, মেয়ে বলেছে—না, না, না।

মেয়েরা প্রতিবাদ করলেন 'মেয়েরা দুয়ারে দাঁড়ায়ে না, না, না বলবে না···। ও পুরুষ বলতে পারে দোর আটকে।

গানের কথাগুলো মেয়েদের পক্ষেও বলা যায়, পুরুষের দিকেও বলা যায়।

ছেলেরা বলেন—

'যত বলি নাই রাতি মলিন হতেছে বাতি'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে না, না, না।

···এতো পুরুষের কথা হতে পারে না।

মেয়েরা বলেন,

"আমি যত বলি তবে
এবার যে যেতে হবে"···

······এতো পুরুষের মুখের কথা!

হাসি পরিহাস কৌতুকের মাঝে এগানের পাত্রী পাত্রও অমীমাংসিত রইলেন। যেন প্রেমের ক্ষেত্রে "ন সো রমণী নসো রমণ"? (রামানন্দ রায় মহাপ্রভু সংবাদ)

যাঁরা যাঁরা সেদিনে নানা মজলিসে ও গানের আসরে ছিলেন গায়ক শ্রোতা শ্রোত্রী, রসিক সকলেই প্রায় স্বর্গত হয়েছেন।

যে গায়ক বন্ধুটি গানি গেয়েছিলেন তিনিও বেঁচে নেই।

তাঁর চেহারাটা একটু অদ্ভুত দর্শন ছিল। খুব কালো, মোটা সোটা—বেঢপ ধরণ চেহারা, মুখে চোখেও মোটেই সুশ্রী ছিলেন না। দেখলে এবং কথাবার্তাতে সকলেই তাঁকে নিয়ে কৌতুক করতেন। তিনিও কৌতুক যোগ দিতেন!

কিন্তু সেদিন প্রথম গান গাইলেন যখন সমস্ত বাড়ী অন্তরীক্ষের অন্তঃপুর বাইরের প্রাঙ্গণ যেন সেই মুহূর্তের কালের মাঝে থমকে দাঁড়াল। তাঁর চেহারা তাঁর আকার-প্রকার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। কত গান তো কতজন গেয়েছিলেন।

কিন্তু শুধু একটি গানের সুরে আর কথাতে বাড়ী ভরে গেল এবং সকলের অন্তর ভরে রইল। আজো যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁকে ভোলেন নি।

এর পর আর কিছু নেই। নানা পক্ষীর একবৃক্ষে রাত্রিতে থাকার মত আমরা কলকাতার কাজ অর্থাৎ বিয়ে উৎসব মিটিয়ে প্রবাসে ফিরে গেলাম।

শিশুর জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

যে গতানুগতিক ধারায় মানুষের শিক্ষা-চিন্তা ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছিল তাতে বহুদিন অবধি শিক্ষক এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুরই ছিল নির্বিবাদ প্রাধান্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নেহাৎ গৌণ ও অপ্রধান। শিশু বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা এবং ভাল-লাগা-না-লাগার কথা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাত না। বড়রা চাইতেন নিজের আদর্শ ও অভিরুচি মত শিশুকে গড়ে তুলতে। শিক্ষকের নির্দেশ ছিল অমোঘ। চিকিৎসক যেমন রোগীর রোগ নির্ণয় ক'রে ওষুধের ব্যবস্থা করেন, এবং এ-বিষয়ে রোগীর মতামতের উপর সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করেন, বা আদৌ রোগীর কথাকে আমল দেন না, সেইরূপ শিশু-চিকিৎসক অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক মহাশয়ও এ-পর্যন্ত শিশু-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। শিশু ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলকল্পে তাঁরা যা ভাবছেন বা করছেন—তাতে শিশুর কোন বক্তব্য থাকতে পারে—এ ছিল সম্পূর্ণ কল্পনা বহির্ভূত। শিক্ষা-চিন্তা-ধারার এই গতানুগতিকতার বন্ধন কাটিয়ে যাঁরা প্রথম পৃথিবীর শিক্ষা-চিন্তার নতুন ভাব ও আদর্শের প্রবর্তন করেছিলেন

তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের মন্ত্রগুরু জ্যঁ জ্যাক্‌স্‌ রুশো। রুশোর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ "এমিল" (Emile) —শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাব-ভাবনা এবং আদর্শের দিক দিয়ে যুগান্তর এনেছিল। এই গ্রন্থখানাকে শিশু তথা শিক্ষার্থীর অধিকারের মহাসনদ (Magna Carta of the learner's freedom) আখ্যা দেওয়া চলে। মধ্যযুগীয় বিদ্যালয়-কারাগৃহের নিষ্করুণ আবহাওয়া, নিরানন্দ পরিবেশ, আর কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা হতে রুশোই প্রথম শিশু ও শিক্ষার্থীর জন্মগত স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করলেন। আর সে দাবী হচ্ছে সহজ, স্বাভাবিক ও সুশিক্ষার দাবী। রুশোর উত্তরসূরী জগদ্বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসী, হার্বার্ট, ফ্রোয়েব্‌ল, মন্তেসরী এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিশুদরদী মনীষীবৃন্দ শিশু-শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তিত্ব, শিশুর প্রকৃতি ও শিশুর স্বাধীন সত্তার সহজ স্ফুরণের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করেছেন। শিশুমনকে আতুরে সংহার না করে কি ভাবে তার সহজ ও সার্থক স্ফূর্তি সম্ভব করে তোলা যায় তার জন্য এঁরা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এঁরা সবাই শিশু ও শিক্ষার্থীর মর্যাদাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিশুকে এঁরা অবোধ, অক্ষম খেলার পুতুল বলে মনে করেননি। শিশুর মধ্যেই যে শিশুর পিতা ঘুমিয়ে থাকে, অপরিণত শিশু-বীজের মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রতিশ্রুতি —এই সহজ সত্যটি ধরা পড়েছিল এই সকল মনীষিগণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ও সুগভীর উপলব্ধিতে।

সাধারণ পাঠাগারের সঙ্গে শিশু-পাঠগৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পিছনেও রয়েছে এই নতুন শিক্ষা-চিন্তার অনু-প্রেরণা। যারা বড়, যারা শিক্ষিত, তাঁরাই লাইব্রেরির ব্যবহার করেন নিজেদের নানা প্রয়োজনে। যারা শিশু, যারা অপরিণতবয়স্ক তাদের প্রয়োজনে লাইব্রেরি—এ কথাটা কিছুদিন পূর্বেও অনেকের ধারণার বাইরে ছিল। ছাত্রাণাং অধ্যয়নংতপঃ—এই নীতির যাঁরা পরিপোষণ করতেন তাঁদের মনে নির্দিষ্ট পাঠ্যবইয়ের বাইরে শিক্ষার্থীর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এমন কোন ধারণাই ছিল না।

তাই'ত শুনি :

অপাঠ্য সব পাঠ্য কিতাব সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গীতে তোলা।

লাইব্রেরির বই ছিল না শিশুর পক্ষে সহজলভ্য। পাঠ্য বই বহির্ভূত অন্য বই পড়া ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। বহুদিন অবধি এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ছিলেন অভি-ভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ। আর এই ভুলের মাশুল দিয়ে আস-ছিল দেশের শিশু ও কিশোরগণ। শিক্ষার্থীর মনের সহজাত জ্ঞানস্পৃহা ও কৌতূহলকে জাগ্রত করতে হলে সরস্বতীর মণিকোঠার চাবিকাঠি যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া আবশ্যক—এ কথাটা আজ আর কে অস্বীকার করবে? লাইব্রেরির চারদেয়ালের সীমানার মাঝে মানুষের যুগযুগান্ত আহৃত জ্ঞানভাণ্ডারকে সযত্নে সঞ্চিত রাখা হয়েছে। শিশুর আছে সেই মণিকোঠায় প্রবেশের অবাধ অধিকার।

সাধারণ পাঠাগারের শিশু-বিভাগের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সেই অধিকারকেই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন একটা তিনমহলা বাড়ি। মহল তিনটির দু'টির সঙ্গেই আমাদের বেশী পরিচয়। যে দুটি মহলে আমাদের সচরাচর আনাগোনা—তা হচ্ছে তত্ত্বের মহল আর তথ্যের মহল। শিক্ষাশাস্ত্রকারগণ জীবনদর্শনের নানা তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন নানা ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের মাধ্যমে। শিক্ষা-চর্চার উঁচু পর্যায়ের উপজীব্য হচ্ছে এই তত্ত্বগুলি। আর সাধারণ ভাবে আমরা শিক্ষা-মন্দিরে যে জিনিসটা পেয়ে থাকি তা হচ্ছে নানা বিষয়ের নানা তথ্য বা খবর। এই তথ্য-বিচিত্রাকেই আমরা শিক্ষার উৎকর্ষ বলে মেনে নি। কিন্তু এতে একটা মস্ত বড় ভুলের ফাঁকি আমাদের থেকে যায়। শিক্ষা-সৌধের আর একটা বড় মহলের কথা আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত থেকে যায়। সে মহলটা হচ্ছে রসের মহল বা আনন্দের মহল। তত্ত্বই বলুন আর তথ্যই বলুন, রসোত্তীর্ণ না হ'লে কোনটার আস্বাদনই তৃপ্তিকর হয় না। রস বা আনন্দের মহলকে পাশ কাটিয়ে শিক্ষার শেষ লক্ষ্যে পৌছুবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। বিচিত্র আনন্দ ও রসের আধার হচ্ছে গ্রন্থরাজি। গ্রন্থরাজ্যের আনন্দ মহলে তাই শিক্ষার্থীর চাই অবাধ প্রবেশাধিকার। শিশুগ্রন্থাগারের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে, এর সাহায্যেই শিশুর মানস, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আশানুরূপ বিকাশ সম্ভব।

গ্রন্থাগারের মুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশে শিশু ও শিক্ষার্থী মাত্রেই একটা সুন্দর ও সুস্থ অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। শেলফের তাকে তাকে সাজান বই, আর টেবিলের উপর ছড়ান সুদৃশ্য পত্র-পত্রিকার বাহার শিশুচিত্তকে স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ করে। নেহাৎ শিক্ষাবিমুখ, স্কুলবিবাগী ছাত্রও এই আকর্ষণের প্রভাব এড়াতে পারে না—মধুলুব্ধ পতঙ্গের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ডের দিকে ধাবিত হয়। শিক্ষার্থীকে শিক্ষামুখী করে তোলার এত বড় উপায় আর দ্বিতীয়টি নেই।

শিশু-গ্রন্থাগারের কথায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের কথাও এসে পড়ে। সাধারণ অর্থে শিশু-সাহিত্য বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে উপকথা, রূপকথা আর অ্যাড্‌ভেঞ্চার। শিশুচিত্ত কল্পনাশ্রয়ী। তাই বিভিন্ন ভাষায় শিশু-সাহিত্যের লেখক-লেখিকারা কল্পনাকেই তাদের রচনার প্রধান অবলম্বন করে নিয়েছেন। কতকগুলি নামকরা বই, যেমন ইংরাজীতে এলিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড, পিটার প্যান্ এণ্ড ওয়েণ্ডি, বাংলায় ঠাকুমার ঝুলি। এই বইগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়—কিন্তু নিছক কল্পনাশ্রয়ী এবং অবাস্তব ভিত্তিক। এক সময়ে এই শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যের কদর ছিল খুব বেশী। শিশুরা এই সকল বই নিয়ে খাওয়া-নাওয়া ভুলে যেত—যেন তাই ছিল সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি। নিছক কল্পনাশ্রয়ী শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে নানা উদ্ভট চিন্তা, নানা অসম্ভব পরিস্থিতি এবং অলৌকিক ঘটনা-পরম্পরা পাঠক-চিত্তকে বিহ্বল করে তোলে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠে একটু ক্ষণিকের আমোদ পাওয়া ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে কিনা বুঝা যায় না। কিন্তু বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' বা হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডারসেনের বিখ্যাত কাহিনীগুলি কল্পনাপ্রসূত হলেও রসোত্তীর্ণ এবং দর্শন-ভিত্তিক। এদের প্রতিটি গল্পের পিছনে আছে জীবন-দর্শনের গভীর অনুভূতি এবং সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। গল্পগুলি কেবল আনন্দই দেয় না—একটা মহানাদর্শের প্রেরণাও জাগায়। সেই জন্যই গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ।

বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে শিশুসাহিত্য স্বষ্টির একটা বড় রকমের প্রয়াস দেখা যায়। শিক্ষা প্রসারের জন্য রুশদেশে গত ৪০।৪৫ বৎসরে যে বিপুল উদ্যম দেখা যায় তার তুলনা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার। বিশ্বসংস্কৃতি সংসদের নির্ভরযোগ্য খতিয়ানে দেখা যায় যে বিপ্লবের পূর্বে যে দেশের শতকরা কুড়িজন মাত্র লোক লেখাপড়া জানত, সেই দেশে আজ নিরক্ষরতা আর জাতীয় সমস্যা নয়। সময়ের এই স্বল্প ব্যবধানে শিক্ষার এই অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং সুব্যাপক করার জন্য সাহিত্যস্বষ্টির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। শিশু এবং কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য স্বষ্টিকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়। বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ এবং সঙ্কলন করা হচ্ছে প্রচুর। ইংরাজী, ফরাসী, স্কেনদিনাভীয় এবং প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য হতে উপাদান সংগৃহীত হচ্ছে। রুশ বালক-বালিকাদের জন্য যে সব ইংরাজী বইয়ের অনুবাদ খুব প্রচলিত, তার মধ্যে যে বই-খানার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে ড্যানিয়েল ডিফো'র সর্বজনবিদিত "রবিন্‌সন ক্রুশো"। 'রবিন্‌সন ক্রুশো' বইখানা লিখিত হয়েছিল খ্রীষ্টিয় সতর শতকের প্রথমার্দ্ধে। সে সময়টা ছিল ইংরাজ জাতির সম্প্রসারণের যুগ, তথা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের যুগ। জনমানবহীন, অজানা দ্বীপের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে একজন মানুষ বুদ্ধি ও সাহসের বলে কি ভাবে বেঁচে থাকল, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে আনল—তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই বইখানায়। "রবিন্‌সন ক্রুশো" ইংরাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল পৃথিবীর অজানা অঞ্চলগুলিকে খুঁজে বার করতে। এই বইখানার সরস ও সরল রচনাভঙ্গী পুরুষানুক্রমে লক্ষ লক্ষ ইংরাজ ছেলেমেয়ের আনন্দ এবং অনুপ্রেরণার খোরাক জুগিয়েছে। কাহিনীটি কাল্পনিক, কিন্তু খুবই বাস্তবঘেঁষা। লুই ক্যারলের "এলিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড" এবং জে, এম্, ব্যারির "পিটার প্যান এণ্ড ওয়েণ্ডি" প্রভৃতি নিছক কল্পনাশ্রয়ী ছেলে-ভুলানো বইয়ের সম পর্যায়ভুক্ত নয় 'রবিন্‌সন ক্রুশো'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রবিন্‌সন ক্রুশো পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন :

I still believe it is one of the best books for boys that has ever been written. In "Robinson Crusoe", the delight of the union with nature finds its expression in a story of adven-

ture in which the solitary man is face to face with solitary nature, coaxing her, cooperating with her, explaining her secrets using all his faculties to win her help.

শিশুগ্রন্থাগার সংগঠনে গ্রন্থ-নির্বাচন ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নানা ভাষা ও সাহিত্যের সম্ভার থেকে সত্যি-কারের শিশু-সাহিত্যের সমিধ্ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। যে সাহিত্যের দু'টি লক্ষণ সুপ্রকট, অর্থাৎ যে সাহিত্য সুখপাঠ্য এবং আনন্দপ্রদ আবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ও সমাজের পক্ষে শুভঙ্কর তাই সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য। মামুলী কল্পনাবিলাস আর আজগুবি অ্যাডভেঞ্চারের আজ ছড়াছড়ি! কিন্তু শিশুচিত্তকে সরস ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে চাই অন্য কিছু। মানুষ আজ সামুদ্রিক অভিযানের যুগ বহুদূর পিছনে ফেলে মহাকাশ জয়ের অভিযানে উদ্যোগী।

এই নতুন যুগের স্বপ্ন, এই নতুন অভিযানের কাহিনী ব্যক্ত হবে সাহিত্যে। সাহিত্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে শুভ চিন্তায়, শুভ প্রচেষ্টায়।

সাহিত্যের এই মাপকাঠি ও মূল্যায়ন অনস্বীকার্য।

নারীর রূপ

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

তখন উঠেনি তপন গগনে,
নিদাঘ দিনের প্রাতে,
তখন অরুণ রক্তিম রাগ
পূরব আকাশে ভাতে,
জাহ্নবী জলে করিয়া সিনানি,
মঙ্গল বাস করি পরিধান
লাঞ্ছিত করি সিন্দুর ফোঁটা
সুন্দরতম ভালে,
দেবালয় পানে মরাল গমনে
সুন্দরী এক চলে।

সহসা হেরিল সম্মুখে তার
সুন্দর একঠাম,
সুকঠিন পেশী উন্নত উরঃ
যুবা অতি অভিরাম
মনে হয় যেন পৌরুষ যত
দেহ পরে তার হয় বিকশিত,
হৃদয়ের ভাষা নয়নে ফুটেছে
হ'ল দিঠি বিনিময়
শিহরণ জাগে সম্মুখে আগে
চরণ না যেতে চায়।

মাতৃত্বের যত আভরণে
সজ্জিত তনুখানি
সিঞ্চিত করি কর কিঙ্কিনী
বসনে ঢাকিল টানি

রক্ত ঝলকে গণ্ড শোভিল
রক্তিম রাগ নয়নে ভাসিল
শাশ্বত এক মিলনের তৃষা
জাগিল দোঁহার প্রাণে
ঝটিতি সমাজ শাসন টুটিয়া
বন্ধন লয়ে আনে।

উদ্বেল করি যুবকের হিয়া
বহে ঘন ঘন শ্বাস
স্ফীত হ'ল নাসা অপলক আঁখি
রুদ্ধ হইল আশ
দেখে সে নারীরে অতিমনোরম
সুন্দর হতে সুন্দরতম
অনাদি কালের সাধ বিধাতার
মূর্ত্ত দেখিল তায়
আঁখি নাহি পড়ে যত যায় দূরে
তত দেখিবারে চায়।

সলাজ নয়ন করিল রমণী
বদ্ধ ধরণী পরে,
মনের নিভৃত বাতায়ন পথে
চাহে ফিরে বারে বারে,
সম্মুখে হেরে দেবালয় দ্বারে
বৃদ্ধের সাথে কিশোর কুমারে
তুলি দুই বাহু আধ আধ ভাষে
কোলে যেতে চাহে তার
নারীর সেরূপে দেখিল বৃদ্ধ
রূপ নিজ তনয়ার।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উঃ—'ওঃ সুশীলের পিতা তা'হলে এতোদিন পরে ছেলেকে ফিরাবার জন্যে পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু একজন ছেলে কোনও এক মেয়েকে নিয়ে গেলে ভারতীয় দণ্ডবিধি মতে ভালোই মামলা হয়। কোনও মেয়ে কোনও ছেলেকে নিয়ে গেলে তো আইন-মত কোনও মামলা হবে না। এই সব পারিবারিক বিষয়ে পুলিশে না জানিয়ে আমাদের তাঁর জানালেই তো হতো। কতো চোর গুণ্ডা বদমাস ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ একরত্তি একটা ছেলে ঠাণ্ডা হবে না। এদিকে কাশী থেকে কোনও পত্রাদি না নিয়েই এক অপরিচিত ভদ্রলোক সেদিন অফিসে এসে জানালেন যে সুশীলকে তার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছেন। আমরা অবশ্য তাকে এই বিষয়ে আদপেই আমল দিই নি। প্রমীলা দেবীর এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হওয়ার অবশ্য অন্য কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ঐ কাশীর পাটনার ভদ্রলোককে বুঝিয়ে তাকে পুষ্যিপুত্র গ্রহণ হতে বিরত করা। এর কারণ সুশীলের পক্ষে তার বাবার এই ফার্মের ওপর একটা মায়া অবশ্যই থাকবে। এখন বাইরের এক বেনোজল আমাদের ফার্মে ঢুকলে এতদিনের এই পুরানো ফার্মটি যে তছ্‌নছ হয়ে যাবে। এই সরল সত্য বুঝবার পক্ষে আমাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে। আচ্ছা! ওঁদের কাশীর বাটীর ঠিকানাটা আমরা আপনাকে অবশ্যই দিতে পারবো। এই নিন—

এই বয়স্ক ডিরেক্টরদ্বয় তাদের খাতা পত্র ঘেঁটে এই আহত যুবক সুশীলের পিতার কাশীধামের ঠিকানাটা অতি সহজেই আমাদের দিতে পেরেছিলেন। এদিকে আমার নিরীহ সহকারীকে ঐ সাংঘাতিক সন্দেহমান মোচওয়ালা ভদ্রলোককে ফলো করতে পাঠানোর পর হতে আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই নবীন অফিসার ঐ সব গুণ্ডাদের একা অনুসরণ করতে গিয়ে আবার বিপদে না পড়ে। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার মন ক্রমশঃই অধীর হয়ে উঠছিল। আমি এইজন্য এখানে আর অধিক বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলাম না। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকদের আপাততঃ অবহিত করে দিতেও আমার মন চায় নি। আমি তাই এঁদের আসল ঘটনা সম্বন্ধে কোনও কিছু না জানিয়েই দ্রুতগতিতে থানায় ফিরে এলাম।

আমি প্রায় দুই ঘণ্টা হলো থানায় ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার নবীন সহকারী কনকবাবু তখনও পর্য্যন্ত থানায় ফিরে এলেন না। আমার অবোধ সহকারীকে একাকী এদের অনুসরণ করতে পাঠানোর জন্য আমার মন অনুশোচনায় বিদগ্ধ হয়ে উঠছিল। এরপর আরোও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি ভাবছিলাম যে এইবার নিজেই শহরের পথে পথে তাকে খুঁজতে বার হই। ঠিক এই সময়েই আমাকে আশ্বস্ত করে সহকারী কনকবাবু ভীতত্রস্ত ও শুকনো মুখে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে থানায় ফিরে এলেন। এঁর মুখে আমি যা শুনলাম তাতে আমিও কম চিন্তিত হয়ে উঠিনি। আমি তখুনি তাকে এই একক অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কীয় একটি প্রতিবেদন [রিপোর্ট] লিখে ফেলতে বললাম। এই রিপোর্টটি এই দিনকার এই মামলা সম্পর্কীয় স্মারকলিপিতে আমি সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। আমার এই সুযোগ্য সহকারীর এই প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

"আমি এই কাশীপুরের ম্যানেজার ও সঙ্গীদের অনুসরণ করে প্রথমে পায়ে হেঁটে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত যাই। এখানে ওরা ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রামে চড়লে আমি ঐ ট্রামেরই সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে বসি। এরপর তাদের সঙ্গে আমরা হাওড়ায় এসে রিসড়াগামী একটা প্রাইভেট বাসে উঠে পড়ি। রিসড়ায় বাস থামলে এদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেখানে নেমে পড়েছিলাম। এরা সকলে রিসড়া মিলের গেটের সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকলে ঐ মিলের ভিতর থেকে জন ছয়-সাত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বেরিয়ে এসে ঐ দোকানে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। আমি রাস্তার এপার থেকে তাদের শুধু হাবভাব লক্ষ্য করতে থাকি। এতো দূর হতে অবশ্য তাদের একটি কথাও আমার পক্ষে শুনা সম্ভব ছিল না। এরপর ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোক একাকী বেরিয়ে এসে কলিকাতা-গামী বাসে উঠলে আমিও তার সঙ্গে সেই বাসে উঠে বসেছিলাম। এইভাবে কখনও বাসে কখনও বা ট্রামে করে আমরা উভয়েই বেনিয়াপুকুরের জোড়া-গির্জ্জার সামনে নেমে পড়লাম। এরপর হইতে খুব সাবধানে দূরে দূরে তাকে অনুসরণ করার পর আমি দেখলাম যে সে আমাদের সেই নাম-করা গুণ্ডা-অধ্যুষিত তালপুকুরের বিস্তীর্ণ বস্তীর সামনে এসে দাঁড়ালো। এই সময় এই কদর্য্য বস্তীর সামনে রাস্তার ওপর ঐ B L T 44 (c) ট্যাক্সি গাড়ীখানাও দাঁড়িয়ে ছিল। এই ট্যাক্সির পিছনে ফুট-পাতের ওপর একটা খাটালের সামনে খাটিয়া পেতে জন দশ-বারো গুণ্ডা গোছের লোক বসে জটলা করছিল। এই মোচওয়ালা ভদ্রলোককে যেখানে দেখে তারা সসম্মানে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে নমস্কার করে ঘিরে দাঁড়ালো। এরপর উনি এদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন—'হারু। তুই একবার পিরুমিয়াকে নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস। এখন হঠাৎ আমাকে দরকার হলে আর নিউ তাজমহলে কখনও যাবি না। তোদের এখন আমি এমন একটা কাজ দেবো যে সেটা করতে পারলে তোরা অনেক টাকা ইনাম পেতে পারবি।" এরপর তাদের আর তাঁর এই কথার কোনও উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে তাদের নিয়ে এ বাড়ীটার ভিতরের দিকে ঢুকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আমি এই গহন বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ওদের পিছু নিতে আর সাহস করি নি। এর প্রায় আধ ঘণ্টা পর ঐ মোচওয়ালা লোকটাই শুধু বেরিয়ে এসে তাঁর সেই ট্যাক্সীটাতে উঠে বসে নিজেই ট্যাক্সীটা চালিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেলেন। এর পর আমিও আর ওখানে অপেক্ষা না করে ট্রামে করে থানায় ফিরে এসেছি।"

আমার সহকারীর এই বিবৃতিমূলক প্রতিবেদনটী যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন তার মধ্যে এই মামলা সম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না। তবে এই বিবৃতি থেকে আমরা শুধু এইটুকু প্রমাণ করতে পারবো যে—হয়তো বা হাওড়ার ওই দাঙ্গাহাঙ্গামাতে এঁরও কিছুটা সংস্রব আছে। কিন্তু হাওড়ার ঐ শ্রমিক-নেতার মামলার সঙ্গে আমাদের কলকাতার এই অদ্ভুত মামলার কি যোগাযোগ থাকতে পারে? বেনিয়াপুকুর থানার এলাকাধীন তালপুকুরের মালিক যে কাশীপুর ষ্টেটের বড় তরফের অংশীদাররা তাতো আমাদের জানাই আছে। তবু আমার একবার মনে হলো যে অন্ধকারেই একবার হাঁতড়ে দেখা যাক না। কিসে কার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে তা কে বলতে পারে? এই সময় হঠাৎ আমাদের এই অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা নবীন সরকারের বিষয় মনে পড়ে গেল। ডাইরীর পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমি দেখলাম যে বারে বারে সুযোগ্য অফিসাররা ও পুরাতন জমাদাররা প্রতিবেদন পেশ করে জানাচ্ছে যে, ৫নং শানকিভাঙ্গা রোডে ঐ নামে কোনও ব্যক্তি কখনও বাস করে নি। তাহলে সুবিধামত অন্তর্ধান হবার পরিকল্পনা নিয়েই কি সে এই মামলার প্রাথমিক সংবাদ লেখাবার সময় ইচ্ছা করেই একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে। ওদিকে প্রমীলা দেবীও তো তাঁর এই গ্রাম-সুবাধে দাদার কলকাতার ঠিকানাটা দিতে পারলেন না। হঠাৎ এই সময় আমার মনে পড়ে গেল ডোভার রোড আর ডোভার লেনের নাম। এমনি ভাবে শানকিভাঙ্গা রোডের ন্যায় হয়তো শানকিভাঙ্গা লেনেরও অস্তিত্ব আছে। প্রাথমিক সংবাদ বইতে তো ঠিকানার স্থানে লেখা আছে শুধু ৫নং শানকিভাঙ্গা। এই চিন্তা আমার মনে উদয় হওয়া মাত্র আমি স্থানীয় এক পোষ্ট অফিসে ফোন করে জানলাম যে হাঁ৷ এই দুইটী রাজ পথেরই ওখানে অস্তিত্ব আছে। আর এই শানকিভাঙ্গা রোড থেকেই

এই শানকিভাঙ্গা লেন বহির্গত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই নিদারুণ বোকামী ও তৎসহ গাফিলতির জন্য এঁকে খুঁজে বার করতে দেরী হওয়ার ফলে যে কি একটা সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তথনও পর্য্যন্ত আমরা তা জানতেও পারি নি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে প্রয়োজনীয় তদন্তে আর একটু মাত্রও দেরী করা উচিত হবে না। আমরা মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই শানকিভাঙ্গা লেনে আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতার বাটীতে গিয়ে আমাদের অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাকে পাকড়াও করার পর ওখানকার প্রয়োজনীয় তদন্তকার্য্য সেরে আমরা বড়বাজার মেডিকেল হাসপাতালে গিয়ে অতো নং বেডে রিসড়া মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের আহত নেতা তথনও পর্য্যন্ত যদি চিকিৎসাধীন থাকে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এর পর সময় থাকলে আমরা এই দিনই হাওড়া জিলার রিসড়ার পুলিশ থানাতে গিয়ে সেখানকার সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার মামলার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসা যাবে।

'তাহলে, কনক ? আর দেরী না করে বেরিয়েই পড়া যাক, পথে কোনও একটা হোটেলে ঢুকে খাওয়া দাওয়া কাযটা সেরে নেওয়া যাবে। আমি এইবার সহকারী কনক বাবুকে উদ্দেশ করে বললাম 'আজ থেকেই আমরা সন্দেহমান আসামীদের গ্রেপ্তার করতে সুরু করে দেবো। সেই দিন থেকে এই দিন পর্য্যন্ত আমাদের অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা আমাদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ করলেন না! এই কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি এতবড় একটা মামলার প্রধান সাক্ষী হলেও উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে আমাদের এড়াবার জন্যে ইচ্ছা করেই পলাতক হয়েছেন। সব বিষয় আদ্যোপান্ত চিন্তা করলে এর উপর আমাদের সন্দেহ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার মতে এই ব্যক্তিকেই আমাদের প্রথম গ্রেপ্তার করা উচিৎ হবে।

অতো নং শানকিভাঙ্গা লেনটীও আমাদের খুঁজে বার করতে কম বেগ পেতে হয় নি। এর কারণ এই বাড়ীটীর সামনের অপরিসর লেনটীকে গহ্বরে পুরে ইতিমধ্যেই ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের একটা চওড়া রাস্তা সেখান দিয়ে বার হয়ে গিয়েছে। গলি খুঁজির পথের উপরকার এই পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ীটা ভাগ্যগুণে একেবারে অক্ষত অবস্থায় একশ ফুট চওড়া সি-আই-টি রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধা বিধবার উপর এই বাড়ীটীর এক্ষণে মালিকানা বর্ত্তিয়েছে। এই দ্বিতল বাড়ীর উপরের ঘরগুলিতে এই বৃদ্ধামহিলা তার পরিবারবর্গদের নিয়ে বসবাস করেন। এই বাড়ীটীর একতলের ঘরগুলি ভাড়া দিয়ে ইনি সংসারের যাবতীয় খরচখরচা চালিয়ে থাকেন। আমরা আমাদের অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতার এখানে সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তাঁর কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিই। এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার এই মামলা সম্পর্কীয় বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

ঐ ভাড়াটের নামটা কিন্তু শ্রীনীহাররঞ্জন কি না আমার ভালো করে মনে পড়ছে না। তবে পদবীটা বোধ হয় তার সরকারই হবে। আমি এই ভাড়াটীয়া ছেলেকে চিনি বৈ কি! ভদ্রলোক মাস দুই হলো আমাদের বাড়ীর নীচের সামনের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে এতদিনে প্রায় ওর বয়সীই হতো। আমার সেই প্রথম গর্ভে-ধরা ছেলের সঙ্গে আমার এই ভাড়াটীয়া ছেলের হুবহু মুখের আদল আসে। আমাকে সে মা বলে ডাকলে আমি মোহিত হয়ে যেতাম। একদিন দেখি—জামা কাপড় পরে সোলার হ্যাট মাথায় শানকিভাঙ্গা লেনের যোলো নম্বরের বাড়ী খুঁজছে। আরে সেতো প্রায় চার বছর আগেই ইম্প্রুভমেন্টের বর্গীদস্যুরা একেবারে ভেঙ্গে চুরে মাঠ করে দিয়েছে। আহাঃ। ঐ বাড়ীটারই মালিক অঘোর বাঁড়ুয্যের বড়ছেলে মানিকলাল ছিল আমার সেই প্রথম গর্ভের ছেলের ছোটবেলাকার বন্ধু। তারা যে এখানকার সাত পুরুষের এই ভিটে ছেড়ে কোথায় চলে গেল! হা! তার পর আমি চেয়ে দেখি যে ঐ ছেলের ঐ অদ্ভুত বেশ দেখে রাস্তার কুকুরগুলোর সঙ্গে পাড়ার ছোঁড়া-গুলোও ওকে তাড়া করেছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে আশ্রয় দিয়ে সব কথা শুনে বললাম—'তা তুমি বাপু কোট প্যান্ট না পরে শুধু ধুতি জামা পরা অবস্থায় মাথায় আবার সোলার হ্যাট লাগিয়েছো কেন ? আমার সেই ছেলে তখন

কেঁদে ফেলে আমাকে মা বলে প্রণাম করে বললো, 'মা, আমাদের পশ্চিমের শহরে সূর্য্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে আমরা এগুলো পরে থাকি। এই হচ্ছে মা আজ আমার বিশ বৎসরের বেশী সময়ের অভ্যাস ; বাংলা দেশের আদবকায়দা বাঙ্গালী হয়েও এর ফলে ভুলে গিয়েছি। আমি তার কাছে শুনলাম যে তার একমাত্র ছেলেকে খোঁজ করবার জন্যে সে এখানে এসেছে। ঐ ভেঙ্গে ফেলা বাড়ীটাতে তার এক আত্মীয় পূর্ব্বে একতলাতে ভাড়াটে ছিল। এমনি আলাপ সালাপ হবার পর সে আমার এই বাড়ীরই ঐ ঘরটাতে থেকে গেলো। একমাসের পাঁচগণ্ডা টাকা আমি তার কাছে নিয়েছি। তবে রসীদ টসীদ সেও চায়নি, আর আমিও তাকে তা দিই নি। এর পরের মাসের ভাড়াটা আমি আর ইচ্ছে করেই চাইনি। এর পর এই দিন চারপাঁচ হলো সে সেই-যে 'আমি মা একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে গেলো—আর তার এই বুড়ো মাকে মনে করে ফিরে আসবার সময় হলো না, তার ঘরে একটা তালা পর্য্যন্ত সে দিয়ে যেতে পারে নি। এ কদিন সে কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পাশের রেওতদের মুখে শুনেছি যে এদানী সারা রাত সে না ঘুমিয়ে ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠেছে। ওরা তো বলে, এদানী তার মাথাটা বোধ হয় একটু খারাপ হচ্ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে তো সে কতো মনের প্রাণের কথা বলেছে। এ কদিন সে আবার বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকতো। এই কি জানি তার কোনও শত্রু তাকে রাস্তায় একা পেয়ে শেষ করে দিলে কি'না! তোমরা বাবা ওর জন্যে যদি একটু খোঁজ খবর করে দেখো; এ জন্যে যদি একগণ্ডা টাকা খরচ করতে হয় তো তা'ও আমি করবো।"

এই পলাতক ভদ্রলোক যে ভাড়া দিতে পারে নি বলে পালিয়েছে তা আমাদের মনে হলো না। এদিকে আমরা এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কাছে শুনলাম যে সে তার যাবতীয় দ্রব্যাদি সহ একটা পোর্টমেন্টু তার ঘরের মধ্যে খোলা অবস্থাতেই ফেলে গিয়েছে। এর পর এখানকার সব ভাড়াটীয়াদের কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করে আমি এই বৃদ্ধা মহিলাকে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটী প্রশ্ন করলাম। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ আচ্ছা! আপনি যে বললেন আপনার ঐ নতুন ভাড়াটিয়া ছেলে এদানী মন-মরা হয়ে থাকতো তা আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি নীচে এসে আপনার এ ছেলের ঘরে বসে তার সঙ্গে গল্প গুজব করেছেন?

উঃ—হাঁ। তা, আমি কতো দিন সন্ধ্যে দেওয়ার পর নাতিদের খাইয়ে রাত্রির দিকে ওর ঐ ঘরে গিয়েছি বৈকি! এখানে আসার পর ও সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই বাড়ী থাকতো না। কিন্তু পরে কয়দিন ও আর বাড়ী থেকে বার হতেই চাইতো না। একদিন রাত্রে সে হঠাৎ আমার পায়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলে উঠেছিল—'মা! আমি লোভে পড়ে একটা ভীষণ পাপ করে ফেলেছি। আমার ভয় হয় এই পাপে জীবিত কালে আর আমার একমাত্র পুত্রের মুখদর্শন করা হয়তো সম্ভব হবে না।' আমি বাপু তখন তার চৌকীটার উপর বিছানার কোনটা তুলে বসে পড়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলাম—'বাছা'। আমি আশীর্ব্বাদ করছি একবার তোর সঙ্গে তার দেখা হবে বৈ কি? তবে বাপু তার পাপটাপের কাযের বিষয় তাকে আমি কোনও কথাই সেদিন জিজ্ঞাসা করি নি। সে একবার আরও জোরে কেঁদে উঠে আমার হাতটা তার মাথার ওপর রেখে বলেছিল—'মা! একটা পুরানো ডাকিনীর আমি খপ্পরে পড়ে গিয়েছি। এই কথা শুনে আমি ওপর থেকে একটা পূজার তুলসী পাতা এনে তামার মাদুলিতে পুরে তার ডান হাতে বেঁধে দিয়ে উত্তর করেছিলাম—'আরে মায়ের স্নেহের কাছে কোনও ডাকিনী যোগিনী আবার পাত্তা পাবে নাকি। ওরা ওরকম কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভালো ভালো কথা বলে; কিন্তু তা' বলে ওদের স্বরূপ জেনেও ওদের ঐ সব কথা বিশ্বাস করতে হবে না'কি। আহা! এই বাছা আমার সেই মাদুলী পরে বেরিয়ে গিয়েও আর ফিরে এলো না। সেই দিনকার সেই ঝড়ের রাতে বাছার আমার মুখে কথা গুলো আজও আমার মনে পড়লে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে, বাবা—'কোনও দরকার ছিল না, কোনও দরকার ছিল না এ আমি কি করে বসেছি। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন তাকে চুপ করে ভগবানের নাম নিতে বললে তাতে সে চুপ করেছিল। আমার মনে হয় কোনও ডাকিনীই তাকে ভর করে এখান থেকে বার

করে নিয়ে গিয়েছে। তা না হলে সে যে তার বাপ মায়ের এক সোনার টুকরো ছেলে ছিল, বাবা।

এই ভদ্রমহিলার কাছ হতে আমাদের যা জানবার ছিল তা জানা হয়ে গিয়েছিল। এর পর তাঁকে আর কোনও বিষয় জিজ্ঞেস না করে আমরা তাঁকে ও দুজন স্থানীয় সাক্ষী সঙ্গে করে ঐ পলাতক ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে তাঁদের সামনে তার সেই ঘরটী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাস করতে সুরু করে দিলাম। প্রথমেই আমার নজর পড়েছিল ঘরের কোণে ন্যস্ত একটা মোটা খেঁটে লাঠির দিকে। আমি এখানকার এই বাড়ীউলী মায়ের কাছে শুনলাম যে এই লাঠিটা তাঁর ঐ নূতন ভাড়াটীয়া ছেলে ৮।১০দিন আগে কিনে এনেছে।

'আমার মনে হয়—ভাই কনক! এই পলাতক ভদ্রলোক সত্যই এদানী প্রাণ ভয়ে ভীত ছিল। সর্ব্বদাই সে আশঙ্কা করেছে যে কেউ না কেউ তাকে ফলো করে এখানে এসে তার শারীরিক কোনও হানি ঘটাবে', ঘরের কোণ থেকে ঐ নতুন-কেনা মোটা লাঠিটা তুলে সেটা নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে করতে আমি বললাম, 'এই দেখ কেনার পর এই লাঠিটার মুড়োতে কেমন এক গাদা মাথা চওড়া লোহার পেরেক পুতে দেওয়া হয়েছে। এটা সখের কোনও কাজ হলে এটার এখানে লোহার স্থলে পিতলের অনুরূপ পেরেক লাগানো হতো। সদাসর্ব্বদা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই ভদ্রলোক এই ভাবে তাড়া তাড়ি করে এই লাঠিটাকে মজবুত করে তুলেছে। কলকাতার বাজারে এই রকম লোহার পেরেক লাগানো লাঠি কোনও দিনই বিক্রয় হয় নি।

আমার এই কথা শুনে সহকারী কনকবাবু বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালী মা ও তাঁর কয়েকজন ভাড়াটীয়াকে জিজ্ঞাসা করলো যে তারা কোনও এক গোঁফওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোককে এদানী এই বাড়ীর আশে পাশে ঘুরা ফিরা করতে দেখেছেন কি না! কিন্তু তাঁরা কেউই এইরকম একটা সন্দেহজনক লোককে এই বাড়ীর আশে পাশে দেখেছে কিনা তা বলতে পারলে না। আমরা যখন এই ভাবে কথাবার্ত্তায় লিপ্ত ছিলাম তখন আমাদের অপর সহকারী সুবোধবাবু এই পলাতক ভদ্রলোকের বাক্সটী সাক্ষীদের সামনে তল্লাস করতে ব্যস্ত ছিল।

'এইতো স্যার পেয়ে গেছি আসল চীজ'—আমার সহকারী সুবোধ বাবু উল্লসিত হয়ে একটা পুরানো ছোট উঁয়ে-কাটা ফটো বার করে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'ঐ দেখুন দার্জিলিঙের মলের একটা বেঞ্চের ওপর কারা বসে রয়েছে। এই ফটোর পিছনে প্রমীলা দেবী নামে জনৈকার দস্তখতও তো দেখা যাচ্ছে। এই ফটোর ছেলে-মেয়েটী তখন নিতান্ত তরুণ তরুণী থাকলেও তাদের মুখের আদল থেকে ওরা যে কারা তা ভালো করেই বুঝা যায়।

আমি তাড়াতাড়ি এই ফটোটী হাতে তুলে সহকারীর দিকে চেয়ে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লাম; কিন্তু তবুও এদের এই ছোট বেলার তোলা ফটো দেখে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ফটো থেকে সঠিকভাবে মানুষ চেনা যদি যেতো তা'হলে আজ পর্য্যন্ত পেন্টিঙের কোনও মূল্য থাকতো না। ফটো এক নির্জীব মানুষের মুখের আদল ধরে দিলেও তাতে তাদের প্রাণ বা চরিত্র ফুটাতে পারেনা। তা'ও আবার এদের এখনকার চেহারা তো পূর্ব্বের চেহারা থেকে অনেক দূর সরে এসেছে। এখন কেবল মাত্র ওর গায়ে প্রমীলা দেবী নামটা ছোট বেলাকার হাতের লেখায় খোদাই থাকলেই প্রমাণ হয় না যে অপর চেহারাটা এখানকার এই পলাতক ভাড়াটীয়াটীরই যে হবে। এ সব বিষয় জোর করে কেই বা কাকে বলতে পারে? তবে এদের এই কুমার কুমারী অবস্থায় যুগ্ম ফটো এই ভদ্রলোকের বাক্সের মধ্যে পাওয়া যাওয়াও যে তাৎপর্য্যপূর্ণ, তাতেও কারুর অবশ্য কোনও সন্দেহ থাকবার নয়। এর পর যে ফটোটী এই পলাতক ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত বাক্স থেকে বেরুলো সেটী হচ্ছে একটী পরিপূর্ণ পূর্ণ যৌবনা শাঁখা সিন্দুর শোভিতা বিবাহিতা নারীর। এই ফটোটি দেখা মাত্র আমার মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বার হয়ে এলো 'ইনি তাহলে কে আবার? বেচারামের মা' ননতো। এই কয়টী দ্রব্য ব্যতীত আর কোনও দ্রব্য পাওয়া গেল না—যাতে করে আমাদের এই অদ্ভুত মামলার কোনও একটা সুরাহা হতে পারে। ফটোর পিছনে লেখা প্রমীলা দেবী যে অন্য কোনও প্রমীলা দেবী নন, তাই বা হলপ করে কে বলতে পারে। আমি মনে মনে ভাবলাম যে একাধিক সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে এই ফটোর মানুষ কটীকে দেখিয়ে

তাদের সনাক্ত করতে না পারলে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

এই স্থানের এই প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি সাবধানে একটী কাগজের প্যাকেটে প্যাক্ করে নিয়ে আমরা এখানকার সাক্ষীদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে সোজা অমুক হাসপাতালের সারজিক্যাল ওয়ার্ডে এসে অতো নম্বরের বেডের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এইখানে তখন পর্য্যন্ত রিসড়া মিলের অমুক শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। কয়েকজন দরিদ্র জরাজীর্ণ হাঁটুর উপর কাপড় পরা শ্রমিক ডালিম ও বেদানার ঠোঁঙা হাতে কাতর নয়নে তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে এই আহত শ্রমিক নেতা চোখ বুজিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এই ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের মুখে শুনলাম যে তাঁরা এঁর জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় কয়দিনের মধ্যেই তিনি আশ্চর্য্যজনকভাবে সেরে উঠছেন। ওঁর আঘাত হেড-ইনজুরী হলেও উনি এখন ভালোভাবেই কথাবার্ত্তা বলতে পারবেন। আমাদের কয়জনের পদশব্দ একত্রে শুনে এই শ্রমিক নেতাটী ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমাদের দিকে চাইলেন! এর পর পিছনের দিকে ফিরে তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন যে তাঁর চিন্তাগ্রস্তা সহধর্ম্মিণী ইতিমধ্যে তাঁকে দেখবার জন্যে এসে গিয়েছেন কিনা। ইতিমধ্যে ভিজিটিঙ টাইম এসে যাওয়াতে আমরা তাঁর সঙ্গে একথা সেকথার পর তাঁর একটী বিবৃতি গ্রহণ করতে স্বরু করে দিলাম। মস্তকে আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় বহু মনগড়া কথা নিজেদেরই অজ্ঞাতে বলে বসে। এমন কি এই সময়ে তারা নিজেদের ও আপনজনদের বিরুদ্ধেও বহু সত্য মিথ্যা বলে ফেলে। এই জন্য বৈজ্ঞানিকরা মস্তকে আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরা রীতিমত সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত কোনও মামলা সম্পর্কে তাদের বিবৃতি গ্রহণ করতে মানা করে গিয়েছেন। কিন্তু এর পর আরও দেরী করে অন্য কোন নূতন উপসর্গ জোটাতে রাজী ছিলাম না। এ'ছাড়া হঠাৎ একদিন এঁর পক্ষে মৃত্যু পথে যাত্রা করাও অসম্ভব ছিল না। এই মুমূর্ষু রোগীর মামলা সম্পর্কীয় দীর্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার নাম জ্ঞানদাচরণ ভাদুড়ী; আমার পিতার নাম ৺নীরদ ভাদুড়ী। সাং অমুক পোঃ, গ্রাম ও জিলা। হাল সাং ১নং রতনমণি রোড, হাওড়া। আমি রিসড়া মিলের শ্রমিক সংঘের প্রধান সেক্রেটারী। শ্রীযুক্তবাবু হরিসাধন ভারতী আমাদের সভাপতি। আমরা কোনও রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত নেই। এর কারণ এতে পার্টির স্বার্থের জন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থের হানি ঘটে। কিছুদিন যাবৎ আমার সঙ্গে শ্রমিক স্বার্থের ব্যাপারে এই কলকাতা অফিসের দুজন প্রধান ডিরেক্টারদের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। তাঁরা আমাদের দাবীদাওয়া দাবিয়ে দেবার জন্যে ক্রমাগত নিজেদের হাতের লোককে মিলে কায দিয়ে তাদের দ্বারা আরও একটী শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলে তাদের স্বীকৃতি দেন। এ ছাড়া এরা আমাদের দাবিয়ে দেবার জন্যে কলকাতা থেকে বহু গুণ্ডা আমদানী করে এখানে ওখানে মোতায়েন করেছিলেন। এই সব গুণ্ডারা প্রায় সকলেই কাশীপুর ষ্টেটের বেনিয়াপুকুর অঞ্চলের অমুক বস্তীতে বসবাস করে। এদিকে আত্মরক্ষার জন্য আমরাও এই সব গুণ্ডাদের কোনও কোনও নেতাকে টাকা খাইয়ে হাত করে ফেলতে চেষ্টা করতে থাকি। এই ভাবে পরস্পরের গুণ্ডা ভাঙানো ভাঙানির কায কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষকেই করে যেতে হয়েছে। এই সময় হঠাৎ একদিন আমার এক প্রবাসী পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বহু বৎসর পর কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। আমার এই বাল্যবন্ধুর নাম হচ্ছে শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার। অনেক দিন পর তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি তাকে আদর করে রিসড়ায় আমার বাড়ীতে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় পথে আমাকে ভুল করে তাকেই কয়েকজন গুণ্ডা এসে প্রকাশ্য দিবালোকে ধরে ফেললে। আমার বন্ধু তখন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা পত্র বার করে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠলো 'ভাদুড়ী! এটা তুই রেখে দে। সময় হলে সব কথা বলবো। তার মুখে এই কথাটী শুনা মাত্র ঐ গুণ্ডারা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এদের একজন জোর করে ছোঁ মেরে ঐ পত্রখানা কেড়ে নিলে ও ঐ পত্রের একটা টুকরা আমার হাতের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় পিছন

দিক থেকে কে একজন আমার মাথার উপর একটা যেন লোহার ডাণ্ডা মারলো। আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম যে কয়েকজন লোক আমার ঐ বন্ধুকে পাকড়াও করে একটা ট্যাক্সিতে তুলে সো সো করে কলকাতার দিকে চলে গেল। এর একটু পরেই আমি মাথার রক্তক্ষরণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার জ্ঞান হবার পর আমি দেখলাম যে আমি এই হাসপাতালের এই বেডটাতে শুয়ে রয়েছি। আমার চারদিকে ঘিরে হাওড়া ও কলকাতা পুলিশের অফিসাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনাকে আমি যে বিবৃতি দিলাম এর অনুরূপ বিবৃতি হাওড়া পুলিশকেও আমি দিয়েছি। আমার সেই অপহৃত বন্ধু এখন কোথায় তা আমি জানি না। তবে আমার হাতের মুঠিতে পাওয়া পত্রের ছেঁড়া টুকরাটা শুনেছি যে হাওড়া পুলিশের লোকেরা আমার হাত থেকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। আমাকে এই হাসপাতালে পাঠাবার সময় তারা ঐ পত্রের টুকরোটা আমার হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিল।"

আমি ঐ আহত শ্রমিক নেতার এই দীর্ঘ বিবৃতি ওখানকার ডাক্তারের সামনে লিপিবদ্ধ করে ভাবলাম যে তা হলে কি সত্যই দুজন নবীন সরকারের অস্তিত্ব আছে? আমাদের শ্রীমতী প্রমীলা দেবী একবার আমাদের জেরার উত্তরে বলেছিলেন যে তাঁর গ্রাম-সম্পর্কীয় যে ভ্রাতাটীকে তিনি প্রাথমিক সংবাদ দিতে পাঠিয়েছিলেন তার নাম ছিল নবীন সরকার, আবার তাঁর যে পূর্ব্ব প্রেমাস্পদটী সেইদিন সকালে তাঁর বাড়ী গিয়ে হামলা করেছিলেন তাঁরও নাম হচ্ছে ঐ একই নবীনচন্দ্র সরকার। আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে যে তিনি সেদিন আমাদের জেরার প্রত্যুত্তরে আশ্চর্য্য হয়ে চোখ কপালে উঠিয়ে বলেছিলেন'—তাই তো। একই নাম একই গ্রাম তো ওদের বটে! এদিকে তো এই আহত শ্রমিক নেতা বলে গেছেন যে পিছন দিক হতে কে একজন তার মাথায় লোহার দাণ্ডা মেরেছিল। ওদিকে তো আমাদের সেই প্রাথমিক সংবাদদাতা অন্য লোকটীর বাটীতে একটা লৌহ চাকতিওয়ালা পেরেক মোড়া একটি মোটা লাঠিও তো আমরা পেয়েছি। কে বলতে পারে যে আঘাত করার পরে এ লাঠির মণ্ডপে লাগা মনুষ্য রক্ত সাবধানে ধুয়ে উঠিয়ে ফেলা হয় নি। তাহলে এক নবীন অপর নবীনকে কোনও ব্যক্তিগত কারণে ঠেঙিয়ে গেল নাকি। কিংবা এমনও হতে পারে যে প্রমীলা দেবী তাঁর গ্রাম-সম্পর্কীয় ভাই নীহাররঞ্জনকে দিয়ে তাঁর পূর্ব্ব প্রেমাস্পদ নীহাররঞ্জনের সেই দিনকার সেই বেয়াদবীর এই ভাবে শোধ নিলেন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এইখানে ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবুর ভূমিকা কি হতে পারে? তা হলে কি প্রথন মোহড়ায় এঁকে দিয়ে ওঁকে শায়েস্তা করতে গিয়ে তিনি আমাকে শায়েস্তা করেছিলেন, এর পর পরের মোহড়ায় ইনি তাঁর ঐ গ্রামসম্পর্কিত ভাইকে এই কাষে লাগিয়ে দিয়ে থাকবেন। আপাততঃ আমি নিজের মনের এই চিন্তা সাবধানে গোপন করে এই আহত শ্রমিক নেতাকে আরও কয়েকটী বাছা বাছা প্রশ্ন করলাম। এই প্রশ্নোত্তর-গুলির সারাংশ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা! আমরা শুনেছি যে আপনাদের মিলের এই মালিকদের মধ্যে দু'টি দল আছে। এখন বলুন দিকি আপনি এদের কোন দলটিকে বেশী পছন্দ করেন। আপনারা নিজেরা এঁদের এই সব দলাদলীর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন কখন?

উঃ—আমার মূল বিবৃতিতেই আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছি। এঁদের কাউর ওপর আমাদের নিজস্ব কোনও পছন্দাপছন্দ নেই। যদি বুঝি যে এদের মধ্যে কলহ বাঁধলে শ্রমিকদের কোনও সুবিধা করা যাবে, তাহলে এদের কলহের মধ্যে ইন্ধন যোগাতে স্বভাবতঃই আমরা কোনও ইতস্ততঃ করবো না। তবে এদের অন্যতম মহিলা পার্টনার শ্রীমতী প্রমিলা দেবী আমাদের দিকেই টেনে কথা ক'য়ে থাকেন। এঁদের একজন যুবক পার্টনারও এই বিষয়ে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা তো ঠিক করে রেখেছি যে আমরা প্রমীলা দেবীদেরই দিকে থাকবো। কিন্তু এদিকে মুস্কিল হচ্ছে এই যে আমাদের নিজেদেরই বহু লড়ায়ে শ্রমিককে অপর পক্ষ টাকা খাইয়ে ওঁদের দালাল করে নিয়েছেন। এই জন্যই তো আমি আমার ওপর হামলার ব্যাপারে ওঁদেরও কখনও কখনও সন্দেহ করেছি।

প্রঃ—আচ্ছা! এইবার আপনার ঐ অপহৃত বন্ধুটির সম্বন্ধে আমাদের আপনি কিছু বলুন। ওঁর সঙ্গে অনেকদিন

পরে দেখা হলেও কিছুক্ষণ তো ওঁর সঙ্গে আপনি ট্রামে বাসে ছিলেন। কলকাতা থেকে এই রিষড়া পর্য্যন্ত পৌছুতে তো অন্ততঃ আপনাদের ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছে। এখন বলুন তো ঐ সময়টুকুর মধ্যে আপনি আপনার ঐ বন্ধুর স্ত্রীপুত্র সংসার ও পূর্ব্ব এবং বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু কি জেনেছিলেন ?

উঃ—আজ্ঞে। তা একটু আধটু তার কাছে শুনেছি বৈ কি ? তবে খুব বেশী কথা বলার তাঁর সুযোগ হয়নি। বরং বারে বারে সে আমাকে বলেছিল যে আমার বাড়ীতে পৌছে সে নিজের সম্বন্ধে বহু আজব কথা শুনাবে। সে এও বলেছিল যে এই সব বিষয় কোনও এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে না শুনানো পর্য্যন্ত সে একটুও শান্তি পাচ্ছে না। তবে সে যে একটু বিপদের মধ্যে আছে তা সে আমাকে বলেছিল। এমন কি কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে সে আমার বাড়ীতেও এসে থাকতে চেয়েছিল।

প্রঃ—আচ্ছা! সে কি একথা বলেছিল যে কোনও এক পূর্ব্বপরিচিতা মহিলা তার সঙ্গে বেইমানি করেছে। তাকে বহু বিষয়ে বহু আশা দিয়ে সেই আশার মূল্য সে আদপেই দিতে চাইলে না। উপরন্তু সে তাকে নানা ভাবে অপমান করে আরও বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

উঃ—আরে। এ আপনি কি সব আজে বাজে কথা বলছেন ? এতো কথা আগে ভাগে সে আমাকে বললে আমি কি ওকে নিয়ে এতো অসাবধানে পথ চলতাম। সারা হাওড়া ও রিসড়ায় আমারও কি কম লোকজনের বল আছে নাকি! ওদের মত আমরাও গুণ্ডাগিরিতে কম যেতাম না। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আপনারা কি আমার ঐ বন্ধুকে ওদের খপ্পর হতে এখনও উদ্ধার করতে পারলেন না। আমি আজ ভালো থাকলে আপনাদের কাছে এতো সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করার প্রয়োজন হতো না। আমি নিজেই ঐ সব গুণ্ডাদের আড্ডা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ওকে আমি উদ্ধার করে আনতে পারতাম। পুলিশের সাহায্য না পেলে বেঁচে থাকবার জন্যে গুণ্ডাগিরিকে গুণ্ডাগিরি দ্বারা বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় কি আছে ?

এইভাবে বহুক্ষণ কথা বলাতে এই আহত শ্রমিক নেতা এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এইবার বন্ধুকে তখনও না পাওয়ার সংবাদে উত্তেজিত হয়ে উঠে তিনি একেবারে অবশ হয়ে পড়লেন। রোগীর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত ডাক্তারবাবু আমাদের তার সঙ্গে আর না কথা বলতে অনুরোধ করছিলেন। অগত্যা এই দিনের মত এই সাংঘাতিকরূপে আহত শ্রমিক নেতাটীকে রেহাই দিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সি করে তখুনি রিসড়া থানাতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এইদিনের মধ্যে এদিককার এই তিনটি স্থানে তদন্ত শেষ করে তবে বিশ্রামের জন্য থানায় ফিরবো।

এই যান্ত্রিক যুগে বড়ো বড়ো শহরেরও এপ্রান্ত এবং ও'প্রান্ত এখন এপাড়ায় ওপাড়ায় পর্য্যবেশিত হয়ে পড়েছে। হু হু করে ট্যাক্সি ছুটে গিয়ে মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড়ের ভীড় ঠেলে একেবারে রিষড়া থানার গেটের সামনে এনে হাজির করলো। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় এঁদের এখানকার এই জখমী মামলার তদন্তকারী অফিসার রমেশবাবু তাঁদের সেই থানাতে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি আদর করে আমাদের সেই থানায় তাঁর নিজস্ব অফিস ঘরে এনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই দুইটী মামলা সম্বন্ধেই বহুক্ষণ আমরা আলাপ আলোচনা করেছিলাম। এখানকার এই জখমী মামলা সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমিই মশাই এখানকার এই সাংঘাতিক মামলাটীর তদন্ত করেছিলাম। এ ছাড়া এই সম্পর্কীয় অপহরণের মামলাটীও এই একই সঙ্গে আমি তদন্ত করেছি। আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে দ্রুত বার হয়ে পড়ি। প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাবে রাস্তায় একটী চলন্ত লরী পাকড়ে সেইটেতেই আমি উঠে পড়ি। কিন্তু আমাদের ঘটনাস্থলে পৌছুবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্তরা একজনকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করে ও অপরজনকে অপহরণ করে সরে পড়তে পেরেছিল। ঐ রক্তাক্তকলেবর শ্রমিক নেতাটীকে অজ্ঞান অবস্থায় আমিই প্রথমে স্থানীয় হাঁসপাতালে ও পরে কলকাতার বড় হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিই। আমি এই বেহুঁস শ্রমিক নেতার ডান হাতের মুঠি থেকে একটী বাংলা হাতের লেখার পত্রের একটা টুকরোও উদ্ধার

করেছি। এ ছাড়া একটা তুলসী পাতা পোরা একটা তামার মাদুলীও আমি ঘটনাস্থলে পড়ে আছে দেখে সেটা কুড়িয়ে নিয়েছি। এই দুটো প্রামাণ্য দ্রব্য ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের এই থানার মালখানাতে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমি ঐ দ্রব্য দুটী এখুনি বার করে এনে তা আপনাদের দেখাবো।"

উপরোক্ত প্রদর্শনী দ্রব্য দুটী এই থানার মালখানা থেকে বার করে এনে এই স্থানীয় অফিসারটী সেইগুলো আমাদের সামনে মেলে ধরলে আমরা অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। আমাদের যেন আর কোনও বাক্-স্ফূরণ পর্য্যন্ত হচ্ছিল না। তাহলে কি আমাদের ঐ অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাই এখানে আসায় গুণ্ডা দল কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে? বলাবাহুল্য যে এই তুলসীপাতা-ভরা মাদুলীটী এইখানে আমাদের উভয় সঙ্কটজনক সমস্যার সমাধান করে এই উভয় ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে একটী ব্যক্তিতে পরিণত করে দিয়েছে। তা'-হলে কি প্রমীলা দেবীর পূর্ব্ব প্রেমাস্পদ সেই দিনকার সেই হামলাকারী নীহাররঞ্জন আগে ভাগে তাঁর বিপদ বুঝে তার সম্ভাব্য আঘাতকারী তাঁর গ্রাম সম্পর্কীত ভ্রাতা অপর নীহাররঞ্জনকে পূর্ব্বাহ্নেই নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থা করে দিলেন না'কি। তবে প্রমীলা দেবীর তথাকথিত পূর্ব্ব-প্রেমাস্পদ নীহাররঞ্জন এবং তাঁর গ্রামসম্পর্কিত ভ্রাতা নীহাররঞ্জন—এই দুই বিভিন্ন-মন্য ব্যক্তিদেরও এক ব্যক্তি হওয়াও যে অসম্ভব এতক্ষণে তা'ও আমাদের আর পূর্ব্বের মত মনে হয় না; এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থা দৃষ্টে এই সময় আমরা নিজেরাও যেন নিজেদের আর বিশ্বাস করতে পারছিনা। যাই হোক আপাততঃ আমরা আমাদের এই সব পরস্পরবিরোধী চিন্তাসমূহ সাময়িকভাবে মূলতবী রেখে সে আহত শ্রমিক নেতার হাতের মুঠির মধ্যে পাওয়া সেই পত্রের বিচ্ছিন্ন টুকরাটী বিশেষ যত্নের সঙ্গে পড়তে স্বরু করে দিলাম।

এই পত্রের টুকরাটী নেড়ে চেড়ে বারে বারে পড়ে আমি মাত্র কয়েকটী বাংলা শব্দ উদ্ধার করতে পারলাম। এই শব্দগুলি হচ্ছে—মত বদলেছি। তাই হতে। কাল সকালে। তাহলে এসো। আমাকে পাবে। এ ছাড়া কোনও অক্ষরের নিম্নংশ কোনটীরও বা একটা রেখা মাত্র এই পত্রে ছিন্ন অংশে পড়া যায়। কিন্তু তা থেকে কোনও পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব ছিল। অনুমানে আমি বুঝতে পারলাম যে মত বদলে এই পত্র দ্বারা কাউকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না—এই যে এই পত্রখানা এদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এতো মারামারি ও খুনাখুনি কেন এরা করে গেল। এ ছাড়া ঐ অপহৃত মানুষ নীহাররঞ্জন (?) এই পত্রটী রক্ষা করবার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়েছিল কেন—তা'ও আমি এই সময় বুঝতে পারি নি। তবে এই পত্রটীর মধ্যে তার নিজের বা অপর কারুর মৃত্যুবান নিহিত ছিল তা আমি সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলাম। এত কারণ—তা' না হলে এই পত্রের প্রাপক বা মালিক [অধিকারী] এই পত্র-খানি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীতে বাক্সে না রেখে সেটা তার জামার পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো না।

এই সময় আমাদের মনে পড়ে গেল যে শানকিভাঙ্গা লেনের অতো নম্বরের বাড়ীর মালিকানী বৃদ্ধামহিলা আমাদের বলেছিলেন যে তার সেই ভাড়াটীয়া ছেলেটীর অন্তর্ধানের পূর্ব্বে পর পর দুই দিন তার অবর্ত্তমানে তার ঘরের জানালার গরাদ উপড়ে চোরেরা ঢুকে তার বাক্সো ভেঙ্গে জিনিষপত্র তছনছ করে গেলেও কোন বারই কোনও দ্রব্য চুরি করে নিয়ে যেতে পারে নি। এতক্ষণে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলাম যে কোনও সুদক্ষ চোরের দলকে তাহলে কোনও ব্যক্তি এই পত্রটী এই ঘরটী থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে যাবার জন্য সর্ব্বপ্রথম নিয়োগ করে থাকবে। কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে তারা নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে এই প্রয়োজনীয় পত্রটী এই লোকটী তার জামার পকেটে নিয়েই তাহলে ঘুরাফিরা করে থাকে। এত দিন হয়তো তারা এই একই উদ্দেশ্যে একে অনুসরণ করে কোনও এক নিরালা স্থানে তাকে পাওয়া মাত্র ঐ পত্রটীর উদ্ধায়ের জন্য এই সাংঘাতিক অপরাধটী করে বসেছে। এই সময় আরও একটা বিষয় আমাদের মনে পড়লো এই যে, কাশীপুরের জমীদারদের সেই পাকা বস্তীটা-তে তাদের সেই ম্যানেজারের রক্ষণাবেক্ষণে বহু নাম-করা বিড়াল চোরের দলও তো বাস করে বটে! কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সে এই একই সঙ্গে এরা এই লোকটীকেও অপহরণ করে নিয়ে গেল কেন? [ক্রমশঃ

সুরছান্দসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নরেন্দ্র দেব

সাবালক হয়ে ওঠবার আগে থেকেই ডি-এল-রায় নামটার সঙ্গে পরিচিত। শুনতুম হাসির গানে তিনি নাকি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তখনকার দিনে ডি-এল-রায়ের হাসির গান শোনবার জন্য উচ্চশিক্ষিত সমাজের লোক ভিড় করেই জমায়েৎ হতেন। আমরা সে গানের আসরে ঢুকতে পেতুম না। আশ পাশ থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে শোনবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু শুনবো কি ? "পারো তো কেউ জন্ম নাকো বিষ্যুৎবারের বার বেলা"—এই একলাইন গান ধরতে না ধরতেই উঠতো ঘর জুড়ে হাসির হররা।

তখন আমরা জানতুম না এবং বুঝতুমও না যে এগুলো নিছক হাসির গান নয়। সুরে ও ছড়ায় চাবুক হাঁকরে চলেছেন তিনি দেশের পাষণ্ড লোকগুলোকে সচেতন করে তোলবার জন্য। হাসির ভিতরের সেই ঝকঝকে শাণিত শ্লেষের শরনিক্ষেপ ধরবার মতো বিদ্যাবুদ্ধিও তখন আমাদের অনেকেরই ছিলনা।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এক সময়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক হাসির ছড়া অনেক লিখেছিলেন। দাশুরথী রায়ের পাঁচালির গানে আর গ্রাম্য-কবিদের লড়াইয়ের ছড়ায় কিছু কিছু মোটা হাসি ছিল। কিন্তু ভদ্র হাসির গান ছিল কিনা জানা নেই। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' এই ছদ্মনামে ঈশ্বর গুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণে কিছু কিছু হাসির ছড়া, গান ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন—যা একসময়ে রঙ্গপ্রিয় বঙ্গবাসীকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল কারুর অনুকরণ বা অনুসরণ করেননি। তিনি ছিলেন নিজেই একজন অনন্যসাধারণ—প্রতিভাধর কবি, সুরশিল্পী ও নাট্যকার। উচ্চাঙ্গের হাসির গানের এক নবস্রষ্টা তিনি।

নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত বিলেতফেরত মানুষ হয়েও বিলিতি আদবকায়দায় দেশীসমাজে কারুর বিচরণ করাটা তিনি পছন্দ করতেন না। যাঁরা কিছুদিন বিলেত ঘুরে এসেই একেবারে আপাদমস্তক সাহেব বনে যেতেন, তাঁদের বিদ্রূপ করে তিনি গান বেঁধেছিলেন—

> "আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই
> আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
> তাই, কি করি, নাচার, স্বদেশী আচার
> করিয়াছি সব জবাই !"

গানের পসরা নিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম বাংলার কাব্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আর্যগাথা' অনেকগুলি স্বরচিত গানের সমষ্টি। রচনার মধ্যে আশ্চর্য কাব্যপ্রতিভার পরিচয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই 'আর্যগাথা' পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুর-তালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্য সমালোচকের অধিকার বহির্ভূত। আর, কতকগুলি গান আছে যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে।"

সুতরাং, একথা বলাই বাহুল্য যে 'আর্যগাথা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত রচনাগুলির কতকাংশ উপভোগ করতে হলে পাঠকদের ছন্দবোধের সঙ্গে সুর তালের জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যে জয়মাল্য তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিল, তা আজও অম্লান রয়েচে। তার প্রধান কারণ, এই গানগুলিতে যে রঙ্গব্যঙ্গ এবং শ্লেষ ও বিদ্রূপ উৎসারিত হয়েছে সেদিনের সমাজের অনেকেরই কাছে সেগুলি শুধু নূতন নয়, অসাধারণ শক্তি ও সাহসের পরিচয় বহন করে এনেছিল।

এই ধরণের হাসির গানের সাধারণতঃ একটা সময়োপযোগী আবেদন থাকে বলেই এগুলির চলতি দাম অনেক বেশি পাওয়া গেলেও শাশ্বতকালের মূল্য থেকে

এরা বঞ্চিত হয়। কারণ, সমাজের রূপ ও মানুষের রুচি দ্রুত বদলে চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল ভণ্ডামী কখনো সহ্য করতে পারতেন না। তাই, হাসির গানের চাবুক নিয়ে তিনি আসরে নেমেছিলেন সমাজের অমানুষ লোকগুলোকে শাসন করে তাদের চৈতন্য সম্পাদন করতে। যেমন ধরুন, 'নন্দলাল' 'হিন্দু' 'চণ্ডীচরণ' ইত্যাদি গানগুলি। এরা কিন্তু কোনও বিশেষ কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। সর্ব কালকেই এরা স্পর্শ করতে পেরেছে, যেহেতু, পৃথিবীর সর্বত্রই আজও আমরা এই 'নন্দলাল' জাতীয় জীবদের এবং 'বিলেত ফেরতা ক' ভাইদের' বিচরণ করতে দেখতে পাই। সুতরাং, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দ্বিজেন্দ্র-লালের এ ধরণের হাসির গানগুলি আজও বেঁচে আছে। এ গানগুলির সুর বা তাল জানা না থাকলেও পড়তে ভালই লাগে। নব নব ছন্দে রচিত প্রত্যেকটি গান অনুপম ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভরা—আর নির্মল হাস্যরসে টইটম্বুর।

শুধু হাসির জন্যই হাসির গানও তিনি অনেক লিখেছেন —যার মধ্যে স্রেফ্ হাস্যরসের উচ্ছলতাই আছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কষাঘাত নেই। যেমন ধরুন 'তানসেন-বিক্রমাদিত্য সংবাদ' 'সন্দেশ' 'স্ত্রীর উমেদার' 'বিরহ' ইত্যাদি। এগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু, পুঁথি বেড়ে যাবার আশংকা আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি গানও আছে যা আমাদের পরাধীনতার বেদনাকে, আমাদের অসহায় অক্ষমতার কান্নাকে পরিহাসের আবরণে ঢেকে তিনি প্রকাশ করে গেছেন। যেমনঃ 'ইরাণ দেশের কাজী' 'জিজিয়াকর' 'খুসরোজ' বা 'আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারিই রাগে' ইত্যাদি' শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত "দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়ন" দ্রষ্টব্য। এর মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা অনেক আছে।

'বলি ত হাসবনা' গান খানির মধ্যে পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রলাল কেন হাসির গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ গানখানি যেন তারই একটি চমৎকার কৈফিয়ৎ। বহুদিন আগের রচনা আর্যগাথার পরই বোধহয় তাঁর হাসির গান লেখা শুরু হয়। 'বলিত হাসবনা' গানখানির মধ্যেই তাঁর হাসির গানের উৎস-সন্ধান মিলবে।

"বলিত হাসব না, হাসি রাখতে চাই তো চেপে,
কিন্তু, ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে!
সাহেব তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর—
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম ধরে, গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায়
তখন, আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হ'য়ে ওঠে দায়!
যবে নিয়ে উড়োতর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে,
একটু 'গ্যানো' পড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
করতে একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোনো ভায়া,
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফভরে ছেড়ে প্রাণের মায়া!
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙে গড়ে;
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে হাসি চেপে রাখতে পারে কোন-!"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ যোগ্য ও দুঃসাহসিক কীর্তি হ'ল বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরিজি শব্দ মিলিয়ে গান রচনা করা। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী কোনো কবি একাজ করতে সাহস করেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে পরবর্তী অনেকেই তাঁর অনুকরণ করেছিলেন জানি। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের মতো অমন অবলীলাক্রমে বাংলার সঙ্গে ইংরাজীর বেমালুম মিলন ঘটাতে আর কেউ পারেননি। যেমনঃ—

"যদি জানতে চাও আমরা কে—
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেনে না কো যে
Surely he is an awful goose!"

অবশ্য একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, বিলেত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজী গান বেশ ভাল ভাবেই আয়ত্ত করে এসেছিলেন এবং প্রথমযুগে বন্ধুবান্ধবের আসরে তিনি ইংরিজী গানই গাইতেন। কিন্তু তাঁর শ্রোতার দল সে ইংরিজী গানের সম্পূর্ণ রসোপভোগে বাধা পেতেন। তখন তিনি বাংলা গান রচনা করতে শুরু করেন। অবশ্য সে গানের প্রকাশ ভঙ্গীতে ইংরিজীর ঢং এবং ইংরিজী সুর প্রায় বজায় ছিল। কাজেই, তার চেহারা হয়েছিল অনেকটা ধুতি চাদর পরা গোরা সাহেবের মতো।

হাসির গানের পর আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে পেয়েছিলাম তাঁর হাসির কবিতার বই 'আষাঢ়ে'। এ কবিতাগুলির অধিকাংশই হচ্ছে হাস্যরসাভিষিক্ত কাহিনী বা গাথা। 'আষাঢ়ে' কাব্যের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখেছিলেন "এ কবিতা গুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়াই বিধেয় মনে করি। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা' প্রসঙ্গে 'মেঘনাদবধে'র দুন্দুভি-নিনাদি-ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?"

এই 'আষাঢ়ে' গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "ভাষা সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে তিনি কোনও কৈফিয়ৎ দেন নাই।...পদ্যকে সমিল গদ্য বলিয়া চালাইবার কোনো হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়েনা বরং কমিয়া যায়। কারণ, কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষণ করিয়া পড়িতেই স্বতঃই চেষ্টা জন্মে। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে, তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।"

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকেই বোধহয় এক মত যে "ছন্দের শৈথিল্য হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ, হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান—অবাধ গতিবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে দুই-তিনবার দুই-তিনরকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।"

রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ের' কবিতাগুলির ছন্দসম্পর্কে আরও একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই। এই জন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যক মতো কোথাও টানিয়া, কোথাও বা ঠাসিয়া কমবেশি করিয়া চলিতে হয়।...'আষাঢ়ে'র অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃ-ঙ্খলতাবশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।"

কবিগুরুর এ আক্ষেপ সর্বজনীন। 'আষাঢ়ে' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চৌষট্টি বছর আগে। কাব্য পাঠকেরা তখনও পর্যন্ত পয়ার ত্রিপদীর স্বচ্ছন্দ গতি-বেগ উত্তীর্ণ হ'য়ে মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের আবর্তে এসে প্রবেশ করেনি। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তাঁরা সেদিন হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনুপম নবীন সৃষ্টিকেও তাঁরা সেদিন 'পায়রা কবির বক-বকামি' বলেছিলেন। কাজেই, দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার সেই অভিনব দানকেও সেকালে সকলে যোগ্য সমাদরে শিরো-ধার্য করে নিতে পারেননি। শিক্ষিত ভদ্রজনের উপভোগ্য হাসির গানের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টারূপে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক খ্যাতি সুদৃঢ় হলেও, 'নাট্যকার' হিসাবে তাঁর গৌরব সে কবিখ্যাতিকে অনেক খানি আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

'আষাঢ়ে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলে-ছেন "ছন্দ ও মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়াই 'মিল' বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারেনা তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িত্ব ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন।......এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌মক্ করিতেছে।...... সকলেরই মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।"

হাসির কবিতা সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত হচ্ছে "শুদ্ধমাত্র অমিশ্র হাস্য ফেনরাশির মতো লঘু ও অগভীর। তাহা বিষয়পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী উজ্জ্বল বর্ণপাত মাত্র। কেবল সেই হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করেনা। রূপালি পাতের মধ্যে শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু তাহার লঘুত্ব ও অগভীরতা-বশতঃ তাহার মূল্যও অল্প এবং তাহার স্থায়িত্বও সামান্য। সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে স্বৌপ্যপিণ্ডের কাঠিন্য এবং ভার থাকিলে তবেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে। হাস্যরসের সঙ্গে

চিন্তা ও ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। আলোচ্য গ্রন্থে 'বাঙালী মহিমা' 'কর্ণবিমর্দন কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্যরস প্রকাশ পাইতেছে তাহা লঘু হাস্য মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরব-বিশিষ্ট।···যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। এরূপ প্রকৃতির রহস্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং 'আষাঢ়ে'র কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা ভঙ্গী বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।······তিনি যে কেবল বাঙালীকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে দ্বিজেন্দ্রলালের পর বর্তী কাব্য 'মন্দ্র' অনেকখানি সার্থক করে তুললেও সেকালে 'মন্দ্র' যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এমন কথা বলা চলেনা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'মন্দ্র' কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করে গেছেন। বলেছেন "মন্দ্র কাব্য খানি বাংলার কাব্য সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করেছে।"

'মন্দ্র' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একথাগুলি বিবুধসমাজে অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু, সাধারণের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—কী সে বৈচিত্র্য ? এরও উত্তর কবিগুরু দিয়ে গেছেন। "ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দ রচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের মনকে শেষপর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিচার-বিশ্লেষণাত্মক গুণগ্রাহী মন্তব্য শিরোধার্য করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মন্দ্র'কাব্য আজ এই ষাট বৎসরের মধ্যেও লোকরঞ্জনে অসমর্থ কেন ? বিদগ্ধ জনেরা যাই বলুন না কেন, কবিগুরুর আলোচ্য সমালোচনার মধ্যেই এর উত্তরটিও রয়েছে। তিনি লিখেছেন "কাব্যে যে নবরস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নবরসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে একমহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।"

আমাদের মনে হয়, এই ঠিকানা খুঁজে না-পাওয়ার ফলেই সাধারণ পাঠকসমাজ দ্বিজেন্দ্র-কাব্যগুহার রসকূপেপৌছতে পারেননি। কিন্তু বিশিষ্ট কাব্যরসিক সমঝদার ব্যক্তিরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই নবরূপায়িত কাব্যসৃষ্টিকে কোনো দিনই অবহেলা করতে পারেননি। তাঁরা হয়ত আজও রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে একমত হয়েই বলবেন "—'মন্দ্র' কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই। ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকার গুলি হইতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।"

পরক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন : "কিন্তু নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির সঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ, ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য,বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময়—সমস্তই পুরুষের, তাহার চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নজর নাই।"

কাব্যানুরাগী পাঠকেরা হয়ত রবীন্দ্রনাথের এই সপ্রশংস সমালোচনা শুনে বলবেন,—যে রচনার মধ্যে কোমল মধুর হাবভাব, অপাঙ্গে ইঙ্গিত, সাজে সজ্জায় কোনও বিলাস-কুতুহলের কমনীয়তা নেই, তা কেমন করে কাব্যের রংমহলে প্রবেশ করে প্রেয়সীর সমাদর লাভ করবে ? বরং, কবিগুরুর সমালোচনার পরবর্তী অংশে উল্লিখিত 'শ্রাবণের পূর্ণিমা রাত্রি'র উপমাটিই এক্ষেত্রে অধিকতর, প্রযোজ্য মনে হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আলোক এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তব্ধতা, মাধুর্য্য ও বিরাটভাব আকাশ জুড়িয়া অনায়াসে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে মাঝে এক এক পশলা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝর ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গি ; তাহা কখনও চাঁদকে অর্ধেক ঢাকিতেছে, কখনও পুরা ঢাকিতেছে

কখনো বা হঠাৎ একেবারে মুক্ত করিয়া দিতেছে, কখনও বা ঘোরঘটায় বিদ্যুৎ স্ফুরিত ও গর্জনে স্তনিত হইয়া উঠিতেছে।"

কবিগুরুর এই সমালোচনার নির্গলিত অর্থ কিন্তু দাঁড়ায় এই যে—পুর্ণিমার রজতশুভ্র স্নিগ্ধ আলো 'মন্দ্র' কাব্যের সর্বত্র বিরাজিত নয়। মেঘের বেয়াদপি আছে, ঘনঘটার অত্যাচার আছে, আবার কখনও বা মুক্তিস্নানের নির্মল আনন্দও পাওয়া যায়। 'মন্দ্রে'র কাব্যভূমি যদিও মালভূমি, কিন্তু তা অসমতল একমনে একনিঃশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার বাধা আছে পদে পদে। এককথায়, মন্দ্রের কাব্য-স্রোতের উপলব্যথিতগতি। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন ঃ "ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'আশীর্বাদ' ও 'উদ্বোধন' কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গিয়াছেন, কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোনও ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।"

রবীন্দ্রনাথ বার বার একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন "দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সেই কাজ। ভাষা বিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন। পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল-বাবু বাংলা কাব্য-ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতি শক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুত বেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি-গুরুর সঙ্গে এইখানে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমাত্মক গানগুলি একদিন সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। "বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!" "ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা!" "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" "ভারত আমার! ভারত আমার! যেথায় মানব মেলিল নেত্র।" এবং "জননী বঙ্গ ভাষা এ জীবনে, চাহিনা অর্থ চাহিনা মান।" এই সব গান একদিন বাংলা দেশে সকলেরই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। যদিও সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে, মানুষের রুচি ও রসবোধের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি আজও কোনও গম্ভীর অনুষ্ঠানে এ-গানের কোনও একটি গীত হ'লে শ্রোতারা প্রচুর আনন্দ পান। তাঁদের দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!

বলা বাহুল্য যে এ ধরণের এবং এ সুরের 'সমবেত' সঙ্গীতগুলি বাংলার সঙ্গীত রাজ্যে সম্পূর্ণ নূতন। বহু কণ্ঠের সম্মিলিত ভাবে গীত ইংরাজী গানের সঙ্গে যে 'কোরাস' গাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে-যাকে ঠিক 'ধুয়া বলা চলে না, দ্বিজেন্দ্রলালই বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রথম সেই 'কোরাস' প্রবর্তিত করেন। নানা বাংলা গানের সুর ও ছন্দের মধ্যে তিনি ইংরিজী গানের সুর ও ছন্দের ঢং চালু করেছিলেন। অবশ্য এখানে বলা উচিত যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আগেই ইংরিজী 'অপেরা'র অনুসরণে ইংরিজী সুরে ও ঢংএ একাধিক বাংলা গান রচনা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ গানেরই কবি ছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই প্রথম তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। বিলেত-ফেরতা ডি-এল-রায়, যিনি এক সময়ে ইংরিজীগানেরই অনুরাগী ছিলেন, তাঁর মুখে ভক্ত বৈষ্ণবের মতো আমরা এ গানও শুনেছি "গিরি গোবর্ধন গোকুল চারী, যমুনাতীরে নিকুঞ্জ বিহারী" "ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়, পথে পথে ঐ নদীয়ায়।" আবার পরম শাক্তের মতো শ্যামা-সঙ্গীত শুনিয়েও তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন ঃ—'এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!" অথবা "চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিসনি মা!" জননী জাহ্নবীর বন্দনা সঙ্গীতে তাঁর কণ্ঠে যে অপূর্ব স্তবগান উৎসারিত হয়েছে, হিন্দু সন্তানের প্রাণে সে গান অমৃত বর্ষণ করে। সেই, "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।"

চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে নিখিল বিশ্বে যে মায়ের রূপ সদা প্রতিভাত, ভক্তকবি সেই মাকে ডেকে বলছেন ঃ 'প্রতিমা

দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব-নিখিল তোমারি প্রতিমা; মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো, মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা!' এর পর দ্বিজেন্দ্রলালের যে গান শুনে সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে সে হ'ল "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কী সঙ্গীত ভেসে আসে!" অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতির এই উদাত্ত আহ্বান কবিকে বিচলিত করে তুলেছে! তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন এগিয়ে চলার পথে। ঘর তাঁকে হাতছানি দিয়ে পিছু ডাকছে। উদাসী কবি তখন বলছেন:

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে
চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন
প্রদীপ জ্বালো?"

দেশ চলে গেছে বিদেশীদের অধিকারে। পরাধীনতার দুঃসহ বেদনায় ক্লিষ্ট দেশবাসীকে অভয় আশ্বাস দিয়ে এই চারণ-কবি দৃঢ়কণ্ঠে গেয়েছেন:

"কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'॥"

দ্বিজেন্দ্রলালের আর একখানি মর্মস্পর্শী গান:—

"হেসে নাও দুদিন বই ত' নয়
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়!"

এই গানখানির মধ্যে জীবনের যে অনিশ্চিত প্রশ্ন জেগে উঠেছে তার মধ্যে চিরকালের মানুষের অন্তিম ভাবনাই ধরা দিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত কয়েকটি প্রেমের গানও বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কবিপত্নী সুরবালা দেবী দুটি শিশু পুত্র-কন্যাকে তাঁর হাতে দিয়ে যৌবন-মধ্যাহ্নে চিরবিদায় নিয়ে অনন্তলোকে যাত্রা করেছিলেন। একনিষ্ঠ প্রেমিক কবি আর দারপরিগ্রহ করেন নি। মাতৃহারা শিশু পুত্র কন্যা দুটিকে বুকে তুলে নিয়ে প্রিয়া-বিরহ কাতর জীবন তাঁর জননী বঙ্গবাণীর সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেমের গানগুলির মধ্যে যেন কী এক করুণ কোমলতা স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও বলা চলে যে এ গানগুলির মধ্যে প্রেমের সাধারণ বাঁধাবুলিই বেশি, তবু, কবির প্রকাশ-নৈপুণ্যে এগুলি মামুলি প্রেমের বয়েৎ হয়ে ওঠেনি। যেমন: "এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি!" অথবা: "যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুখ আমি দিতেতো পারি না" কিম্বা: "সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী" ইত্যাদি।

গানের তালিকা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গে আধিক্য দেখা দেওয়া অসঙ্গত নয়। কারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় দিতে হলে তাঁর গান বাদ দিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, গানই ছিল তাঁর প্রাণ!

উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালের বৈরাগী মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একাধিক অধ্যাত্মতত্ত্বসম্পৃক্ত গানগুলির মধ্যে, যেমন:—

"একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথ যদি,
জীবন জলবিম্ব সম, মরণ-হ্রদ হৃদি;
দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দু'দিন আগে দু'দিন পিছে;
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।"

অথবা:

"শুধু দুদিনেরই খেলা
ঘুম না ভাঙিতে, আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।"

অথবা:

"সুখের কথা বোল না আর, বুঝেচি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।"

অথবা:

"জীবনটাতো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখবি চল।"

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পালা শেষ করবার আগে বলতে চাই যে বর্তমানে এদেশের সর্বজাতীয় জীবন-সঙ্গীত যা হওয়া উচিত, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি তা অনুমান করে আগেই লিখে রেখে গেছেন। স্বাধীন ভারতবাসীরা আজ পনেরো বছর পরেও কাতরকণ্ঠে বলছে:—

"এ প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত,
পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্ত?"

গানের আলোচনা এইখানেই বন্ধ ক'রে আবার কাব্য-বিচারে অবতীর্ণ হওয়া যাক। 'মন্দ্র' কাব্যের পর উল্লেখ

করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' কাব্যের। 'আলেখ্য' কাব্যখানিতেও ছন্দের অভিনবত্ব পরিবেশিত হয়েছে। গানের মধ্যে তিনি ইতিপূর্বে এ ধরণের ছন্দ একাধিকবার ব্যবহার করলেও, কবিতায় এ ছন্দের সমাবেশ করেন 'আলেখ্য' কাব্যেই প্রথম। দ্বিজেন্দ্রলাল এ ছন্দকে বলে গেছেন 'মাত্রিক' (Syllabic)—এ ছন্দ অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বর্তমানে এ ছন্দকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ। তালমান মাত্রা নির্ভর এই জটিল ছন্দকে দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু খুবই সহজ ও স্বাভাবিক মনে করতেন। এই কাব্যখানির ভূমিকায় তিনি কবিতাগুলির মাত্রার তাল ভাগ করে দেখিয়ে বলেছেন "একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে পরে এ ছন্দ পড়া অত্যন্ত সোজা হবে।"

'আলেখ্য' কাব্যের ভাষাও খুবই সহজ। চলতি কথাবার্তার ভাষা। যে ভাষায় আমরা পরস্পরের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করি, সে আলাপের অবকাশে আমরা প্রায়শঃ শব্দের হসন্তযুক্ত উচ্চারণই করে থাকি। এই 'আলেখ্য' কাব্যের সর্বত্রই ক্রিয়াপদগুলিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত আলাপের সহজ রূপটাই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অপ্রচলিত শব্দ যে একেবারে বর্জন করেননি এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কবি একথা 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় স্বীকারও করেছেন। অধিকাংশক্ষেত্রেই চল্‌তি ভাষার মধ্যে মনোভাব প্রকাশের যে একটা জোর আছে দ্বিজেন্দ্রলাল 'আলেখ্য' কাব্যে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। "সাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাবা বলায়!" অথবা "আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারিই রাগে, তোর তো আস্পর্ধা ভারি বলিস্ কিনা ব্যথা লাগে?" এ বলার মধ্যে ভাষার যে বলিষ্ঠতা আছে সাধুভাষায় কথাগুলি বললে প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে সে জোর কিন্তু পাওয়া যাবে না। আশা করি এ বিষয়ে কবির সঙ্গে কেউই দ্বিমত হবেন না। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে—সহজ চলতি ভাষায় লেখা হলেও ছন্দের ঘোর প্যাঁচে পড়ে অনেকগুলি কবিতাই সুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারেনি। কবিতা পড়বার সময় অত তাল মান মাত্রার সূক্ষ্ম হিসাব রেখে সাধারণ পাঠকেরা কবিতা পড়তে রাজী নয়। কবিতা দেখলেই তারা সুর করে বেশ গড়গড়িয়ে পড়ে যেতে চায়। মাত্রার অঙ্ক কষে, যতিঃপাত হিসেব করে, 'যোগ-বিয়োগ' সমাধান করতে করতে কবিতা পড়তে তারা শুধু নারাজ নয়, ব্যাজার বোধও করে। কাজেই দ্বিজেন্দ্রলালের নবছন্দের কবিতাগুলি বিদগ্ধ সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলি পেলেও—'হয় নাই তাহা সর্বত্রগামী' অর্থাৎ, জনসমাজের সাধারণ পাঠকদের কাছে তা মুখরোচক হয়ে উঠতে পারেনি।

'আলেখ্য' কাব্যখানির সব চেয়ে বড় বিশেষত্বই এই যে, এর অনেক কবিতার মধ্যেই কবির ব্যক্তিগত জীবনের অতি সুমধুর ঘরোয়া ছবিগুলি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের স্নেহাসক্ত জনক-জননী নিজেদের সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও যে কত কাব্যমধুর চিত্র ফুটে ওঠে তার পরিচয় পেয়ে প্রীত ও পুলকিত হয়ে উঠবেন। 'ঘুমন্ত শিশু' পড়তে পড়তে করে প্রাণ না বাৎসল্য রসে অভিসিঞ্চিত হয়ে যাবে? 'পুত্রকন্যার বিবাদ' পড়তে পড়তে, কবিরই কথায় বলি 'বাষ্পে হঠাৎ ছেয়ে আসে আঁখি!' এবং, কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—

"মনে হল শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থ ত্যাগও আছে এ সংসারে ;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি
তত খারাপ না হ'তেও পারে।"

'আলেখ্য' কাব্যে কবি বিধবার যে আলেখ্যখানি এঁকেছেন সে ছবি দেখে কার না চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠবে? আমাদের অনেকের পরিবারেই কেউ না কেউ একজন দুখিনী বিধবা থাকেনই। তাঁর অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে আমরা অনেকেই কমবেশি পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ এই করুন কবিতাটি আমাদের চিরাভ্যস্ত সহজ সরল ভাষায় ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে! পড়তে গিয়ে কোথাও বাধা পাইনা। তাছাড়া, শক্তিমান কবির আশ্চর্য মিলের ঐশ্বর্য এই সাবলীল কবিতাটিকে আরও সুখপাঠ্য করে তুলেছে—

"মনে পড়ে সকালবেলা বাড়ীর ছায়ায় ঘুঁটি খেলা
ফল্‌সা পাড়তে গাছের উপর ওঠা।
মনে পড়ে চাঁপায় ঘিরে ভোম্‌রা গুলো ঘোরে ফিরে
মনে পড়ে অশোক কুসুম ফোটা॥"

উদাহরণ উদ্ধৃত করতে হলে এমন অনেক কবিতাই উংকলন করতে হয়। পুঁথি ইতিমধ্যেই অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং এইবার কবির অপর কাব্য 'ত্রিবেণী'তে অবগাহন করা যাক।

'ত্রিবেণী' কবির আর এক অভিনব সৃষ্টি। এর মধ্যে নানা কবিতার সঙ্গে কিছু 'সনেট'ও আছে। কিন্তু এগুলি সেই পেত্রিয়ার্কের চিরাচরিত চতুর্দশপদী 'সনেট' নয়। কবি এগুলিকে 'দশপদী-সনেট' বলে অভিহিত করেছেন। এর কৈফিয়ৎ কবির নিজের মুখেই ব্যক্ত : "ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমার মনে হয় যে চতুর্দ্দশ-পদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী!"

দশপদী 'সনেট' লেখার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেছেন "আমি ইংরাজী বা ইটালিয়ান সনেটের পক্ষপাতী নই।" মুখবন্ধে নিবেদন করেছেন "ত্রিবেণী কাব্যে তিন রকমের কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথমতঃ 'মিতাক্ষর' অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয় 'মাত্রিক' ছন্দ, অর্থাৎ, যে কবিতার ছন্দ মাত্রা (syllable) দ্বারা পরিমিত হয়। তৃতীয় 'দশপদী'—অর্থাৎ একপ্রকার 'মাত্রিক' কবিতাই যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে।"

বোধ করি তিন রকমের বিভিন্ন ছন্দের কবিতার এ গ্রন্থে একত্র সমাবেশ হয়েছে বলেই এ কাব্যের নাম রেখেছিলেন কবি 'ত্রিবেণী'। এর মধ্যে এমন কতকগুলি সহজ সুন্দর সাবলীল ভাষায় রচিত জনমানস ভাবানুকুল হৃদয়বেদ্য কবিতা আছে—যা সকল পাঠককেই মুগ্ধ করতে পারে। যার মধ্যে কবির কোনো শ্রমসাধ্য ঘর্মাক্ত প্রয়াসের চিহ্ন নেই। এগুলি যেন তাঁর মনের স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস আপন আনন্দে উৎসারিত হয়ে এসেছে! 'আহ্বান' কবিতাটি পড়তে পড়তে কার না মনে হবে—এ যে একান্ত-ভাবে তাঁরই মনের কথা!

"যখন আমার সঙ্গে হবে খেলা, তুমি আমার এসো,
যখন ধীরে পড়ে আসবে বেলা, তুমি একবার এসো।
যখন যাবে সব কলরব থামি, যখন বড় একা;
কাউকে খুঁজে পাবেনা কো আমি—তুমি দিও দেখা।"

দুর্দিনে দুঃসময়ে নির্বান্ধব অবস্থায় তাঁকেই যে আমাদের সব চেয়ে মনে পড়ে যে মনের মানুষকে আমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসি। অথচ, জীবনের সুসময়ে মন আমাদের তাঁকেই ভুলে থাকে।

'সুন্দরী কে?' এই প্রশ্নসূচক কবিতাটির উত্তর দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :—

"সেই সে যাহার বক্ষে প্রীতি, চক্ষে যাহার সুখের স্মৃতি,
বাক্যে যাহার কলগীতি ঝরে পুণ্য শ্লোক,
মুখে পবিত্রতা রাশি, ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক?"

আলোচনা শেষ করবার মুখে আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্বন্ধে লোকের ভিন্নমত যাই থাকনা কেন, তাঁর নাট্য-কাব্য 'পাষাণী' 'সীতা' 'ভীষ্ম' ও 'সোরাব-রুস্তমের' উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষ করে 'পাষাণী' ও 'সীতা' বাংলার কাব্য সাহিত্যে দু'টি অনবদ্য দান বলে বিদ্বৎ সমাজে নিঃসন্দেহ চিরদিন সমাদৃত হবে।

উপসংহারে কবির একটি 'দশপদী সনেট 'অবসান' উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের অবসান করতে চাই—

"করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকু আমার যাহা জমা।
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকু খরচ দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ কোরো ভাই ক্ষমা
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি সুখ, কোরো আশীর্ব্বাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসিনি ক করতে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই;
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তি বশে, ক্ষম অপরাধ,
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি, কোনো দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশি হয়েই থাকে, তোমরা দোষী নহ,
জমা যদি বেশি থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ।"

অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা ও মিশ্র অর্থনীতি

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম. এ

যাঁরা ইতিহাস আলোচনা করবেন তাঁরা দেখতে পাবেন, রাশিয়াতে যখন বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল তখন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান হয়নি। গোটা রুশবিপ্লবের মূল ভিত্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। আজকের তুনিয়ায় ধনতন্ত্র এবং সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে আরব্ধ বিরোধ এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে যেখানে একটা মতবাদ আরেকটা মতবাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর। বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরে রুশ সরকারের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে তু একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার। মূলধনের অভাবের ফলে অর্থ নৈতিক পরি-কল্পনা কতটা ব্যাহত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি কতটা তুর্ব্বল হয়ে পড়ে সেটা সোভিয়েট রাশিয়া তাঁর অস্তিত্বের প্রথম দিকে ভালভাবেই বুঝেছেন, প্রকাশিত খবর থেকে। জানা যায়, সঞ্চয়ের দিকে যা'তে প্রত্যেকটি মানুষের ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে পারে সেজন্য রাশিয়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ আর কিছুই নয়। মূলধন সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি যা সঞ্চয় করেন সেটা তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যেতে পারেন। এই ব্যাপারে আইনগত কোন বাধা আছে বলে জানা নেই। আর মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কীয় সবকিছু যৌথ-সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব—এই তুটো জিনিসের মধ্যে এমন সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যেটা সত্যি লক্ষ্য করার মত। সোভিয়েট রাশিয়ার অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম দিকে যদি রাশিয়ার হাতে সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্ন না থাকত, তাহলে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যাপারে রাশিয়া গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন থাকতেন। প্রশ্ন হতে পারে, কি করে রাশিয়া এত সোনা এবং মূল্যবান রত্ন পেয়েছেন। এগুলোর শতকরা প্রায় নব্বইভাগ হয় লুণ্ঠন, না হয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অবশ্য লুণ্ঠিতই হোক কিম্বা বাজেয়াপ্তই হোক, বিনিময়ের ব্যাপারে রাশিয়ার বেশ সুবিধা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে বিশ্বের বাজারে রাশিয়া রুবলকে বিনিময়যোগ্য করে তোলার জন্য তৎপর হয়েছেন। জানা গেছে, এই বিনিময়ের ব্যাপারে রাশিয়া স্বর্ণকে ভিত্তি করতে চাইছেন। যেভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দিনের পর দিন জটিল হয়ে উঠছে তাতে রাশিয়ার এই চেষ্টা কতটা সফল হবে বলা শক্ত। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইতিমধ্যে সাফল্য রেখা কিছুটা অর্জিত হয়েছে।

কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস্ ইত্যাদির নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এঁদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে নূতন করে কিছু বলার নেই। বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি বুদ্ধিজীবী এঁদের চিন্তাধারার সাথে মোটামুটিভাবে পরিচিত। বিগত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে এঁরাই সকলের আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এমনি একদিন আসবে যেদিন ধনতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটবে। এঁরা বলেছেন, ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হবার পর যে সমাজের পত্তন হবে সেটাতে শ্রেণী বৈষম্যের কোন স্থান নেই। অর্থাৎ সে সমাজ হবে সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীহীন। অবশ্য পৃথিবীর বুক থেকে ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব হঠাৎ মুছে যাবে, এই প্রকার ধারণা পোষণ করা ভুল। বরঞ্চ স্বকীয় প্রভাব এবং কার্য্যপরিধি বিস্তৃত করার জন্য ধনতন্ত্র সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাই ক্রমে ধনতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল করার জন্য বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা চোখে পড়ে। আমরা যা বলতে চাইছি সেটা তু-তিনটি উদাহরণ দিলেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ শিল্প আইনের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকের মজুরী এবং সুখসুবিধা সম্পর্কীয় আইনের কথা উল্লেখ করছি। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ধরণের কর ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের মূল অভিযোগ হ'ল এই যে, ধনতন্ত্র কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের নির্য্যাতনের পথই

সুগম করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তশালীদের হাতে দরিদ্র মানুষ নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কোন রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনৈতিক অধিকার নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কেবলমাত্র মুনাফা অর্জ্জন করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে। কর্ম্মসংস্থানের কোন সুব্যবস্থা আশা করা চলেনা। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিতরেই অনেক প্রকার মতবাদ চোখে পড়ে। তাই বলে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে মতবাদগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে একথা মনে করা ভুল। অবশ্য কিভাবে সমাজ গঠিত হবে সে সম্পর্কে মতবাদগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা মতবাদের উল্লেখ করছি, যেমন ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম, সিণ্ডিক্যালিজম্, গিল্ড সোস্যালিজম ইত্যাদি।

যে সময় ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপোলিয়নের অন্তর্দ্ধান হল সে সময় থেকে জনসাধারণ তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগলো। এই সচেতনতা বিশেষ করে সে সব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে দেখা গেছে, যেগুলো নেপোলিয়নের আক্রমণাত্মক নীতির দরুণ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, এঁদের এই ঐক্যের মূলভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ। নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক আরব্ধ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু জনসাধারণের আত্মচেতনাবৃদ্ধি পেয়েছিল নেপোলিয়নের অন্তর্দ্ধানের পরে। ঐ সময় থেকে আরো একটা জিনিষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অর্থাৎ ধনতন্ত্র নিজের প্রভাব এবং ক্ষমতা বর্দ্ধিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে এই চেষ্টা ব্যাহত করার জন্য কম আয়োজন হয়নি। অর্থাৎ আমরা বল্‌তে চাইছি, একদিকে ধনতন্ত্র এবং অন্যদিকে জনগণের আত্মসচেতনা এই দুটোর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যন্ত জোর লড়াই চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব নিঃসন্দেহে নূতন অধ্যায় সূচনা করেছে। বর্তমান যুগে ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্র বল্লে যা বুঝায় সেটা শিল্পবিপ্লবের যুগ থেকে সুরু হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি ক্যাপিটালিজমের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হতে থাকে। ঐ সময়টুকু তিনটি কারণ বশতঃ পশ্চিমের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রথম কারণ হল এই যে, গণতন্ত্রের পথে ইংলণ্ড তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গণতান্ত্রিক বিবর্তন অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। তৃতীয়তঃ তখন গোটা ইউরোপের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের প্রধান অভিযোগ হল এই যে, সমাজতন্ত্র একনায়কত্ব স্থাপনের সহায়তা করে এবং এই একনায়কত্ব দেশের অমঙ্গল ডেকে আনে। তাছাড়া স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণভাবে সুবিধাবাদী। শুধু তাই নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কিছু থাকেনা। এঁদের গোটা জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জনসাধারণ একনায়কত্বের প্রভাব অনুভব করেন।

যতই ধনতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের আক্রমণ এসে পড়ছে, ততই ধনতন্ত্রের কার্যাধারা যেন বদলে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রের কার্য্যধারা পরিবর্ত্তিত হবার পিছনে একটা প্রধান উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এজন্যই ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে যে সব ধনতন্ত্র-বিরোধী শক্তি রয়েছে সে সব শক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা চলেছে। ফলে সমাজতন্ত্রের অনেক কিছুই ধনতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

একথা না বল্লেও চলে যে, গোটা পৃথিবীর কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত। অর্থাৎ সেখানে এমন অর্থনীতিবিদ্ আছেন যাঁরা মিশ্র অর্থনীতি চালু করার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ ধরণের অভিমত কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্ত হয়েছে একথা বলা ঠিক নয়। অন্যান্য যে সব দেশে ধনতান্ত্রিক কাঠামো বিদ্যমান সে সব দেশেও মিশ্র অর্থনীতি চালু করার জন্য দাবী উঠেছে। এটা গেল ধনতান্ত্রিক দেশের কথা। কম্যুনিষ্ট চীনের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে, সেখানে গোড়া থেকেই মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণের প্রতি প্রবল ঝোঁক বিদ্যমান। এর কারন আর কিছুই নয়। কম্যুনিষ্ট চীনের নীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত তাঁরা মনে করেছেন, প্রথমেই যদি গোটা দেশকে কম্যুনিষ্ট অর্থ-

নীতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে সুফলের পরিবর্তে কুফলই পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়। বিভিন্ন ধরণের গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হবার আশঙ্কাও রয়েছে। কম্যুনিষ্ট চীনের অনুসৃত নীতি থেকে মনে হয়, যে সব দেশ অনগ্রসর—সে সব দেশে যদি খুব তাড়াতাড়ি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য অয়োজন চলে তাহলেই সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত—এইপ্রকার মনোভাব অবলম্বন করার পিছনে যুক্তি নেই। অবশ্য নির্দ্দিষ্টভাবে মিশ্র অর্থনীতির কোন সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। বিভিন্ন দেশে এটা বিভিন্ন ধরণের রূপ নিয়ে থাকে, কারণ যে দেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে মিশ্রনীতি অনুসরণ করেন সে দেশকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী এটা নির্দ্ধারণ করতে দেখা যায়। ফলে মিশ্র অর্থনীতি নির্দ্দিষ্ট অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে কখনও স্বীকৃতি পায়নি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, যেরকম কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট উপাদানকে আশ্রয় করে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠে, মিশ্র অর্থনীতির ঠিক সেরকম কোন নির্দ্দিষ্ট উপাদান নেই। কিভাবে মিশ্র নীতি নির্দ্ধারণ করা হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অবস্থা এবং সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে খুব তাড়াতাড়ি কোন দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু করা যায় না—কিম্বা চালু করা বাঞ্ছনীয় নয়। ক্রমে ক্রমে দেশের জনসাধারণকে মিশ্রনীতির সাথে অভ্যস্ত করে নেওয়া দরকার। হঠাৎ এঁদের উপর এই নীতি চাপিয়ে দিলে অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আমরা অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি এজন্য যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মিশ্রনীতির প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, মিশ্র অর্থনীতি বললে আসলে কি বুঝায়। এটা ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এই দুটো মতবাদ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু অংশ নিয়ে মিশ্রনীতি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

অর্থনীতিবিদদের অভিমত হল, ক্যাপিটালিজমের সাথে সোস্যালিজমের সংগ্রাম যতই প্রত্যক্ষ এবং তীব্র হয়ে উঠবে ততই মিশ্রনীতির প্রসার ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিবে। অবশ্য কেবলমাত্র এই ধরণের সংগ্রাম চলতে থাকলে মিশ্রনীতি প্রসারিত হবে এইপ্রকার ধারণা ঠিক নয়; কারণ সংগ্রাম কেবলমাত্র এই দুটো মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ মানুষ যতই সচেতন হয়ে উঠবে এবং মানুষ নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য যতই চেষ্টা করতে থাকবে ততই আরো নূতন সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠবে। সে সংঘর্ষও অবশ্য কেবলমাত্র ধনতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষের আত্মচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা। সমাজতন্ত্রও এই সংগ্রামে জড়িত হয়ে যেতে পারে। তবে ধনতন্ত্র কিম্বা সমাজতন্ত্র যে মতবাদের সাথেই সাধারণ মানুষের আত্মসচেতনার সংঘর্ষ সুরু হোক না কেন, এই সংঘর্ষের ফলে মিশ্র অর্থনীতি প্রসারিত হবার সম্ভাবনা আছে।

যেরকম প্রচণ্ডভাবে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে ধনতন্ত্রের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ধনতন্ত্রবিরোধী লড়াই ধনতন্ত্রের পক্ষে অস্তিত্বের লড়াই হিসাবে দেখা দিয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য ধনতন্ত্র আজ এমনি একটা নীতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, যেটা সমাজতন্ত্রের আক্রমণের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে দিতে পারবে। মিশ্রনীতি হল সে নীতি—যেটাকে আশ্রয় করে ধনতন্ত্র নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সমাজতন্ত্র কর্ত্তৃক আরব্ধ সংগ্রামে মিশ্র অর্থনীতি হল ধনতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ। তাই বলে মিশ্র অর্থনীতি কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক দেশে অনুসৃত হচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর প্রয়োগ চোখে পড়ে। কম্যুনিষ্ট চীনের অর্থনীতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একথা আগেই বলেছি। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, একক শক্তি বল্লে যা বুঝায়, মিশ্রনীতি তা কখনও হতে পারেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে হতে পারবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ একক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার মিশ্র অর্থনীতিতে এখন পর্য্যন্ত সে সব গুণ চোখে পড়েনি।

রমণীর মন

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

এ-নাটকে আমার পার্ট অনেকটা উপনায়কের মত।

অথচ-অথচ আমার কাছে চিঠি এল। হাঁা, ইরার চিঠি। যা আমি কখনো ভাবিনি।

ইরার লেখা এনভেলাপটি নিয়ে দ্বিধা করেছি এক-মুহূর্ত। তারপর সব সংশয় কাটিয়ে চিঠিটা পড়েও নিয়েছি এক সময়ে! ও লিখেছে।

অজয়,

খুব অবাক লাগছে আমার চিঠি পেয়ে—না? ভাবছ, তোমাকে চিঠি লেখার কথা ত আমার ছিল। ছিল না? তবে কেন তোমার ঠিকানা নিয়ে ছিলাম? অশোককে চিঠি দেব বলে? তোমরা বড় দেরীতে বোঝ। তোমার খবর কি? ভালো আছ? চিত্তরঞ্জন আমার ভালো লাগছে না—কোন-দিন লাগবেও না। কলকাতা ছেড়ে যেদিন চলে আসি—হাওড়া ষ্টেশনে অশোক এসেছিল। তুমি না এসে ভালই করেছিলে। অশোক এসে আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল—বর্ধমান পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে এসেছি। মা যখন জিগোস করলে কি হোল—উত্তর দিয়েছিলাম চোখে কয়লা পড়েছে। ভালো লাগছে না এখানে আমার। গত কয়েক মাসের সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে কান্না আসে। আর তোমার দেওয়া সেই ক্যালেণ্ডারটী প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভালবাসা জানালাম। নিও কিন্তু।

তোমার ইরা ॥

চিঠির এককোণে ঠিকানা লেখা। আমার চিঠির সংগে অশোককে লেখা এক টুকরো চিঠি। কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছে ইরা।

ইরা জানতে চেয়েছে আমি অবাক্ হয়েছি কিনা। লাগবে না—এ-নাটকে আমার পার্ট যে অনেকটা উপনায়কের মত। নায়ক? হাঁা, অশোকই এ নাটকের নায়ক। সেই প্রথমদিন থেকে।

নাটকের আরম্ভ আজ থেকে মাসচারেক আগের কলেজ স্কোয়ারে। শীতের বিবর্ণ বিকেল যখন সন্ধ্যার বুকে আশ্রয় নিত, সেই সময়ে একটা বেঞ্চে আমি অশোক আর রবি গিয়ে বসেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কলগুঞ্জনে স্থানটা মুখর হয়ে উঠেছে। অশোক আমাদের হিরো। ও পার্ট আমাকে মানায় না—তাই আমি কোনদিন ও নিয়ে স্বপ্নও দেখি নি। আমার কৃশ চেহারায় সাইড্ অ্যাক্টরই ভালো। আমরা দুজনে কলেজে অভিনয় করেছি। পুরস্কার জুটেছে দুজনের ভাগ্যে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিনও আমরা অভিনয় নিয়েই আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ অশোককে অস্বাভাবিক-রকম উত্তেজিত মনে হোল। সামনে চেয়ে দেখি তিনটী মেয়ে আমাদের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাসন্তী রঙের শাড়ীপরা মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, "ওর সংগে আমি কথা বলব—Challenge" রবি বললে, "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"ঠিক আছে," বলে অশোক এক সময় উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমার এবং রবির বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অশোক নমস্কার করে ওদের সংগে কথা বলেছে। আমরা দুজনে কখন যে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি বুঝতেই পারিনি। অশোককে কেমন যেন লজ্জায় লাল লাগছিল।

এক সময় মেয়েটী বলে উঠেছে, "আপনাদের রকম দেখে চায়পাশে ভিড় হয়ে যাচ্ছে।" সত্যি কয়েকটী কৌতু-হলী ভদ্রলোকের আনাগোনা দেখা গেল। অশোক মরিয়া হয়ে কফি হাউসে যাবার প্রস্তাব করলে। ওরা কি বলেছিল এতদিন বাদে ঠিক মনে নেই—তবু মনে আছে ওরা দ্বিধা

করেছিল। কিন্তু অশোকের কথার তোড়ে ওদের কোন অজুহাতই টেঁকে নি। অগত্যা ওদের যেতে হয়েছিল।

সেই ত প্রথম আলাপ। রেষ্টুরেণ্টের উজ্জ্বল আলোর তলায় মেয়েটীকে ভালো করে দেখলাম। অস্বীকার করব না যে আমারও খারাপ লাগে নি মেয়েটীকে সেই প্রথম দিনে। নাম বলেছিল—ইরা—ইরা সেন। ওর সংগীর মধ্যে ছিল ওর বোন আর একটী বন্ধু—শোভা।

মনে আছে, ওরা বিদায় নেবার পর সেদিন রবি আর আমি অশোকের সাহসের প্রশংসা করেছিলাম। আর রবি সরস করে বলেছিল, "কি অশোক, পলকে হৃদয় নিলে।" অশোক কেমন নায়কের মত সেই প্রশংসার রোদ পোহাচ্ছিল!

তারপর প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় আমি অশোককে সাহচর্য দিয়েছি। বলা বাহুল্য, ইরাও বাদ যায় নি। আমি ওদের সংগে থেকেছি, আর মাঝে মাঝে সিগারেট খাওয়ার ছল্ করে পালিয়েছি—ওদের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছি। ওরা মন দেওয়া নেওয়া করুক এই আশায়।

পরিচয়ের চার পাঁচদিনের পর অবাক্ হয়েছি যখন ইরা সরাসরি আমাকে অজয় বলে ডেকেছে। তুমি সম্বোধন করেছে। আশ্চর্য কম হয় নি অশোকও। তাই আমাকে একদিন বলেছিল—"কিরে তোকে যে তুমি বলছে—কি ব্যাপার?"

আমি সহজ স্বরে বলেছি, "বোধ হয় এখনও আপনি বলার উপযুক্ত হইনি।"

সত্যি কথা বলতে কি—ইরা যখন আমাকে তুমি বলত আমার বেশ ভালো লাগত। তুমি কথাটা যে এত মিষ্টি তা আগে জানা হয় নি। আমার সংগে কথা বলতে ওকে কখনও নিরুৎসাহ দেখি নি। অশোককে নাম ধরে ডেকেছে ও আরও অনেক পরে। অশোক চাইত ওকে ইরা তুমি বলে ডাকুক। অশোক ত সেই রেষ্টুরেণ্টেই ইরাকে তুমি বলেছে।

আমি অনেক সময় ভেবেছি অশোক কেমন সপ্রতিভ—ওর মধ্যে কেমন একটা সাবলীল ভংগী আছে—যা আমার নেই। ওটা বোধহয় নায়ক হতে প্রয়োজন লাগে।

মাঝে কয়েকদিন বিশেষ কাজে ওদের সংগে আমার দেখা হয় নি। যেদিন দেখা হোল দেখি ইরা বেশ গম্ভীর—অশোকের সংগে কথা বলাতেই মত্ত। আমাকে যেন ও চেনেই না।

তারপর হঠাৎ ওর পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে বলেছে, "মশাই, এতদিন কোথায় ছিলেন?" আপনি সম্বোধনটা বোধহয় অভিমানের। আমি অজুহাত দেখিয়েছি, তারপর দেখেছি, মেঘ কেটে গিয়েছে—হাওয়া অনুকূলে।

আর একদিনের কথা বলি। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছি, "প্রথমদিন যাকে দেখেছিলুম—শোভা ত আর আসে না।" মুহূর্তের মধ্যে দেখি ওর চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, "কেন তাকে আবার কি দরকার?" অথচ সেদিন। হাঁ সেই দিনই আমার বোঝা উচিত ছিল আমার কাছেও আসতে পারে ইরার চিঠি। ভাবিনি, ভাবতে পারিনি—কেননা আমার পার্ট যে উপনায়কের।

ওদের সংগে অনেক জায়গাতেই ঘুরেছি। ম্যুজিয়াম, কার্জন পার্ক থেকে সিনেমা হল কোনটাই বাদ যায় নি। সিনেমায় ওদের পাশাপাশি বসার সুযোগ করে দিয়ে আমি অশোকের পাশে বসেছি। অশোক ত তাই চাইত।

কিন্তু বিচ্ছেদের দিন যে এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসবে কে জানত?

একদিন সন্ধ্যায় নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখি অশোক আর ইরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। আমি হাসতে হাসতে বলেছি—"ওগো মৌন, না যদি কও—নাই কহিলে কথা।" অশোক বললে, "ঠাট্টা নয়, ইরার বাবা চিত্তরঞ্জনে বদলী হয়ে গেছেন। সামনের সপ্তাহে ওরা চলে যাচ্ছে।" ইরা মুখ ঘুরিয়ে নিল—বোধ হয় কান্না চাপতে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "আর দেখা হবে না?" ওরা কেউ উত্তর দিলে না।

অন্য দিনের চেয়ে সেদিন আমি একটু বেশীক্ষণ আড়ালে থাকতে চেষ্টা করেছি। এক সময় ফিরে এসে দেখেছি—ইরার হাতখানা অশোকের হাতের পরে রাখা। অশোক আমাকে লক্ষ্যই করেনি। ইরা আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়েছে।

সেদিন ইরা যখন বললে, "আজ উঠি।" অশোক বলেছিল, "কতদিন তোমায় দেখব না ইরা—আর একটু বস।" আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় ওরা বেশী কথা বলতে পারে নি। এক সময়ে ইরা বলেছে, "মায়া বাড়িয়ে লাভ

কী অশোক, যখন অনন্তকাল ধরে বসে থাকতে পারব না!"

তারপর ঠিক হোল ইরা অশোককে নিয়মিত চিঠি দেবে। হ্যাঁ, আমার ঠিকানায়। কেননা, অশোকের ভয় তার নিজের জ্যাঠামণিকে। একটা ছোট্ট কাগজে ঠিকানা লিখে ইরার হাতে দিলাম। ইরার হাতের স্পর্শ সেদিন পেয়েছিলাম। জানিনা সেটা ইরার স্বেচ্ছাকৃত কিনা।

কয়েকদিনের মধ্যে চিঠি এল নীলরঙের খামে। আমার নামে, চিঠি পেয়ে আমি কী করব ভেবে পেলাম না। ইরা আমাকে কেন চিঠি লিখল? আমার দিক থেকে আমি কোনদিন উৎসাহ প্রকাশ করিনি। আমি স্থির জানতাম ও অশোকের একান্ত আপনার। কত অসংকোচে আমি মিশেছি। অশোকের বাগদত্তা হিসেবে ঠাট্টা করেছি।

অশোক ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। ইরা কাঁটাচামচের ব্যবহার জানত না। মনে আছে অশোক বলেছিল, "আমি যদি অফিসার হই তাহলে ত তোমাকে ওসব ব্যবহার করতে হবে।" ইরা কি মিষ্টি হেসেছিল সে আমি ভুলি নি।

আমার কেমন ভয় করতে লাগল। সারারাত চিঠি নিয়ে ভাবলাম।

পরদিন অশোকের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম।

অশোক তখন পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল। আমাকে দেখে বললে, "কিরে ও চিঠি দিয়েছে?" আমি পকেট থেকে ওর চিঠিটা দিলাম। ও পড়ে বললে, "এত ছোট চিঠি! কি ব্যাপার বল্ ত? ঠিকানাও দেয় নি।"

আমি যেন নাটক করছিলাম। পকেট থেকে বার করে আমার চিঠিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। অশোক যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে চিঠিটা পড়তে লাগল। ক্রমশঃ ওর চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল। অশোক আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হোল ওর দৃষ্টির সামনে আমি বোধহয় ভস্ম হয়ে যাব। অশোকের রাইভাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মত।

কি হোত বলা যায় না—এমন সময় রবি এসে উপস্থিত। রবি বোধহয় ঝড়ের পূর্বাভাষ পেয়েছিল। কোনকথা বলল না ও। অশোক ওর দিকে চিঠি দুটো বাড়িয়ে দিল। রবি চিঠি দুটো পড়লে। একটু থেমে বললে, "এ আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম। অশোক তোরই ভুল। হাওড়া ষ্টেশনে সেদিনই তোর বোঝা উচিত ছিল ও যাকে আশা করেছিল সে তুই নয়—অন্য কেউ।"

অশোক সহ্য করতে পারল না। গর্জে উঠল, "রবি।" রবি বললে, "ঠিকই বলছি অশোক।"

তারপর সব চুপচাপ। ঘরটা নিঝুম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন কেউ কাউকে চিনি না। কোন ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে আছি। আলমারীতে রাখা টাইম পীসটার আওয়াজ কেবল শোনা যাচ্ছে। এমন ভাবে কতটা সময় পার হয়ে গেল কে জানে।

হঠাৎ বলে বসলাম, "অশোক, সব অপরাধ আমার। আমারই অন্যায় হয়েছিল তোদের সংগে ঘুরে বেড়ান। নইলে অমন কিছু ঘটার অবকাশই হোত না।"

কিন্তু এতেও বিশেষ কিছু ফল ফললো না। আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

তারপর এক সময়ে দেখি অশোক আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছে। বলেছে, "অজয়—তুই দূরে সরে যা—আমার আর ইরার মাঝখান থেকে। তুই—তুই ওর চিঠির উত্তর দিবি না কথা দে। ইরাকে নইলে আমি বাঁচব না অজয়!"

আমি কী দেখলাম! দেখলাম আমাদের নায়কের চোখে জল! সে আমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছে!

আর আমি? আমি বাঙলা উপন্যাসের নায়কের মত বলে বসলাম, "তাই হবে অশোক, তাই হবে। রবির সামনে আমি কথা দিলাম। এর কোনদিন নড়চড় হবে না।"

এরপর অশোকের বাড়ীতে আর থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হোল না। আমি পথে পা দিলাম।

পথে চল্‌তে চল্‌তে ভাবলাম ইরার চিঠি, ইরার ভালবাসা যদি আমি স্বীকার করে নিতাম তবে কী ক্ষতি হোত আমার। আমার দিক থেকে ও কোন সাড়া পায় নি। তাই সব লজ্জা ভুলে চিঠিতে ও ধরা দিয়েছে আমার কাছে।

এখন ভাবি আমি কি কোনদিন কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওকে কামনা করিনি? মেয়ে হিসেবে ইরার তুলনা দেখি না। কোথায় যেন ওর সংগে আমার মিল ছিল। সেটা কি মনের? আমি কী ভুল করলাম? কে জানে।

আমি আমার কথা রেখেছি। ইরার সেই চিঠির উত্তর আমার লেখা হয় নি। চিঠিখানা আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

অশোকের নামে নীলখামে এখন ঘন ঘন চিঠি আসছে। ওরা দুজনে সুখী হোক।

অন্ধের জগৎ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ইংলণ্ড একটী ছোট দেশ কিন্তু ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের অন্ধের সংখ্যা ৯৭,০০০। এই হিসাব ১৯৬০ সনের।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় সেখানে "আইনতঃ অন্ধের" সংখ্যা ২,৩০,০০০। আইনতঃ এই অর্থে—যেহেতু সেই সকল ব্যক্তিকেই অন্ধ বলিয়া ধরা হয় যাহারা দৃষ্টিহীনতার জন্য কাজ করিয়া খাইতে পারেনা। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে অন্ধের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় ২,৭৯,০০০ জন অর্থাৎ প্রতি বৎসর বৃদ্ধির সংখ্যা ৬,৭০০ জন। এখন অনুমান করা হয় যে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৬০ সনে ৩,৫৬,০০০ হইবে অর্থাৎ দেখা যাইবে যে প্রতি হাজারে দুইজন "আইনতঃ" অন্ধ। অথচ ১৯৪০ সনে এই অন্ধের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ১৭'৫জন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য প্রচার প্রতিষ্ঠানের মতে অন্ধত্বের এই বৃদ্ধি, বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়িবার জন্যই হইয়াছে। আবার যে সকল রোগে লোক অন্ধ হয় সেই সকল রোগী লোকেরা বহুদিন বাঁচিয়া থাকার দরুণও অন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আমেরিকার মত উন্নত দেশের চিত্র এইরূপ। সাধারণ ও শৈল-চিকিৎসার প্রসার। উন্নত স্বাস্থ্যবিধি একদিনে অন্ধত্বকে কিছুটা রুখিয়াছে কিন্তু অন্যদিকে আবার সে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। উন্নত দেশগুলির ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকিলেও অন্ধত্বকে ঠেকাইবার মত শক্তি উহারা আজ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করে নাই। কিন্তু অনগ্রসর দেশসমূহেই পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চারিভাগ অন্ধ লোকের বাস, সুতরাং এই সকল দেশের অন্ধত্ব কি বিরাট তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

বিজ্ঞানে এবং সমাজ সেবায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর দেশ হইতেছে উত্তর আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া—এখানে অন্ধের সংখ্যা হাজারে প্রায় দুইজন। ইউরোপে এবং এশিয়ার অনেক দেশে অন্ধের সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এবং আফ্রিকার অনেক দেশে অন্ধের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা ছয় হইতে দশগুণ বেশী। এই নির্ম্মম সত্যের জন্যই আফ্রিকা "অন্ধকার মহাদেশ" আখ্যা পাইয়াছে।

আফ্রিকার প্রত্যেক গ্রামের বা উপজাতির বা এক একটী এলাকার অন্ধের সংখ্যা লইয়া গড়পড়তা কসিলে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। প্রকৃত তথ্য অজ্ঞাত রহিয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে অন্ধের সংখ্যা প্রতি ৫০০ জনে একজন, কিন্তু উত্তর ঘানার কোন কোন গ্রামে প্রতি দশ জনে একজন অন্ধ। কেনিয়া এবং দক্ষিণ সুদানেও অনুসন্ধান করিয়া অন্ধের সংখ্যা প্রায় এইরূপ জানা গিয়াছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার সাকউপজাতির লোকেরা প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন কোন না কোন চক্ষুরোগে আক্রান্ত। মাসাই যোদ্ধাগণের মধ্যে প্রতি আটজনের একজন ক্ষীণ-দৃষ্টি সম্পন্ন। ঘানার কোন কোন গ্রামের এরূপ অবস্থা যে দৃষ্টিহীন স্ত্রীলোকেরা দড়ি ধরিয়া জল আনিবার জন্য কূপের দিকে অগ্রসর হয়। চাষের মাঠে অন্ধেরা একটী বাঁশের সাহায্যে সারি বাঁধিয়া বীজ রোপন করে।

উত্তর রোডেশীয়ায় মিউরু হ্রদের (Lake Mwernu) দিকে যাইবার রাস্তায় একটী মিশন হলের নিকট সাইন বোর্ডে মোটর চালকগণকে সতর্কীকরণের জন্য "আস্তে

চালান—অন্ধলোক" এরূপ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ সতর্কীকরণের কারণ অবশ্য আছে—জরিপে দেখা গিয়াছে হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী ৮৫টী গ্রামের পরিণত বয়স্কের প্রতি ৪০ জনে একজন এবং শিশুদের প্রতি ৫০ জনে একজন একেবারে অন্ধ।

উত্তর নাইজিরিয়ার কোনো সহরে একটী "অন্ধপাড়া" আছে, এখানে ৭০০ অন্ধব্যক্তি পরিবার লইয়া বসবাস করে। ইহারা সকলেই একটী পুরাতন আঞ্জুমান বা সমিতির সভ্য—সমিতির কার্য্য হইতেছে ভিক্ষা সংগ্রহ করা। ভিক্ষা দান ইসলামে একটী অবশ্যকর্ত্তব্য। এই সমিতিতে একজন "রাজা" আছে। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠগণের সাহায্যে সমিতির সকল কার্য্য পরিচালনা করেন। বলা বাহুল্য ইহারা সকলেই অন্ধ। সমস্ত দিন সমিতির সভ্যেরা পুরাতন সহরের অলিগলি চলিয়া মসজিদে, বাজারে এবং ধনী ব্যবসায়ীগণের বাড়ীতে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। সন্ধ্যায় সকলে বাড়ী ফিরিয়া যায় এবং সরকারী কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে নিয়মানুযায়ী ভাগবাটার পর নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে।

চীন দেশেও অন্ধদের একটী গিল্ড বা সমিতি আছে। পিকিং সহরের এই সমিতিটী প্রাচীনতম। প্রকাশ হান বংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই সমিতির সভ্যগণ দাবী করে যে তাহাদের প্রতিষ্ঠান ২০০০ বৎসরের প্রাচীন।

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিরাট অন্ধজগতে শিশু-অন্ধের সংখ্যা কত?

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক অনুসন্ধান চালান হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে প্রত্যেক ১০০জন অন্ধ ব্যক্তির মধ্যে ১৬ জন বিশ বৎসর বয়সে পৌছিবার পূর্ব্বেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। কেনিয়ায় অন্ধের সংখ্যা ৬৫,০০০ হইতে ৭০,০০০ মধ্যে, ইহাদের ২২,০০০ জনই শিশু অথবা কাজে লাগিতে পারে এরূপ বয়সের তরুন।

উত্তর রোডেশীয়া জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ১,০০,০০০ শিশুর মধ্যে ৩,২৩৫ জন অন্ধ। প্রত্যেক ১০০ জন অন্ধের মধ্যে ৮৩ জনই দশ বৎসর বয়সে পৌছিবার পূর্ব্বেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল। আবার বিশ বৎসর বয়সে পৌছিবার পূর্ব্বেই ১০০ জনের মধ্যে ৯০জনই অন্ধ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে অন্ধ নাগরিকের সংখ্যা কমপক্ষে ২০,০০,০০০। ইহাদের শতকরা প্রায় ৩০জন ২১ বৎসর বয়সে পৌছিবার পূর্ব্বেই অন্ধ হইয়াছিল। এই ৬,০০,০০০ লোক আবার জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অন্ধ হইয়াছিল।

ভারত সরকার অন্ধদের জন্য কোনরূপ সম্ভাব্য কল্যাণ পরিকল্পনার জন্য একটী হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে একব্যক্তি ২১ বৎসর বয়সে পৌছি-বার পূর্ব্বে অন্ধ হইলে এবং মোট ৪০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে ৬,০০,০০০ তরুন অন্ধের পক্ষে মোট ২,৪০,০০,০০০ বৎসর অন্ধকারে জীবন ধারন করিতে হইবে। সকল বয়সের অন্ধদের হিসাবে আনিলে মোট কুড়ি লক্ষ অন্ধের ৪,১০,০০,-০০০ বৎসর অন্ধকার ভোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ২১ বৎসরে পৌছিবার পূর্ব্বে যাহারা অন্ধ হইয়াছে তাহারা এই অন্ধকারের শতকরা ৫৮ ভাগের বেশী বোঝা বহন করিবে।

কিন্তু মানুষের দুঃখ কয়েকটী অঙ্কের সংখ্যা দ্বারাই বুঝান যায় না। উপলব্ধিও হয় না। সমস্যা কিরূপ বিরাট, তাহা বুঝিতে হইলে একটী কল্পনার আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে জাপানের টোকিও নগরী বৃহত্তম সহর—মনে করুন এখানকার প্রত্যেক পুরুষ মানুষ, প্রত্যেক নারী, প্রত্যেক বালক বালিকা অন্ধ। ইহাই যথেষ্ট নয়। ইটালীর রোম সহরে আসুন—মনে করুন এখানে কোন দৈব দুর্ঘ-টনার জন্য সকলে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই দুই সহরের সম্মিলিত জন সংখ্যা যত, বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্ধের সংখ্যা তত।

অথবা অন্য দিক দিয়া দেখিলে একমাত্র ভারতবর্ষের অন্ধের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের লস্ এঞ্জেলস্ সহরের জনসংখ্যা হইতে বেশী। এক কলিকাতায় যত অন্ধ লোক আছে সমস্ত কানাডা দেশে ততজন অন্ধ নাই।

পৃথিবীর ৩০০ কোটী লোকের মধ্যে প্রায় এক কোটী লোক অন্ধ,—ইহার মধ্যে আবার ৬,৫০,০০০টি শিশু। অনেকে বলেন, অন্ধের এই সংখ্যা খুবই কম করিয়া ধরা হইয়াছে—পৃথিবীর অন্ধের সংখ্যা অন্ততঃ দেড় কোটী। এই বিরাট "অন্ধকার সাম্রাজ্যের প্রায় সকল দেশেই আছে। এই অন্ধের মধ্যে আবার ৭০ লাখ পল্লী অঞ্চলে বাস করে। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতই উন্নত ধরণের হউক, অন্ধত্বের আক্রমণ হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

অথচ এই বিরাট অন্ধত্বের দুই তৃতীয়াংশ নিবারণ করা যাইতে পারে—আর তাহা করিতে পারিলে মানুষের কি বিরাট দুঃখের লাঘব এবং আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি রক্ষা পায়।

বিশ্বভারতী

ঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর নাম বিশ্ববিশ্রুত। বিশ্বভারতীর আদর্শটি যে হঠাৎ তাঁর মনে জেগে ওঠেনি, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। যে ভাব ও সংকল্পের বীজটি তাঁর "মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল" তাই "ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে" উঠেছিল। বাল্যকালে কবি ছিলেন নিতান্তই "একান্তবাসী"—বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কলকাতা শহরের ইটকাঠপাথরের সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাঁর বাল্যজীবন। সেই সময়েই বাইরের প্রকৃতি তাঁকে ডাক দিয়েছিল। ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে সেই বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। মধ্যাহ্নের নির্জনতায় বালক রবীন্দ্রনাথ যখন লুকিয়ে একলা ছাদের কোনটিতে আশ্রয় নিতেন, তখন মাথার উপরকার উন্মুক্ত নীল আকাশ, চিলের ডাক, পাড়ার গলির জনতার 'বিচিত্র কলধ্বনি'র মধ্যে দিয়ে শহরের জীবনযাত্রার যে খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি তাঁর চোখে পড়তো, তাতেই তাঁর বালক-মন আনন্দে নেচে উঠতো। তাঁর বাল্যে একসময়ে কলকাতার ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেওয়াতে, তাঁকে কিছুদিন পেনেটিতে গঙ্গার ধারে গিয়ে বাস করতে হয়েছিল। সেই সময়েই তিনি প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির নিবিড় গভীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। পরবর্তী জীবনে জমিদারী কার্যপরিচালনা উপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল পদ্মাতীরেও বাস করতে হয়েছিল। তখনই বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। কবি তাঁর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পদ্মাতীরে নিরালায় সাহিত্যরচনায় নিরত ছিলেন। এই সময়েই তাঁর অন্তরে শিক্ষাসংস্কারের ও পল্লীউন্নয়নের নব-প্রেরণা জাগে। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর খুব কমই আস্থা ছিল। তিনি তাঁর বাল্যের স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যে গুরুতর ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে তা দূর করতে না পারলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্তই বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। তাঁর মনে হয়েছিল "প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়।" শিক্ষায়তনগুলির "এই অস্বাভাবিক, নিষ্ঠুর পরিবেষ্টনের কঠিন নিষ্পেষণের ফলে শিশুদের পেলব মনগুলি ঠিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে বাধা পায়। এতে করে তারা "প্রকৃতির সাহচর্য" ও শিক্ষকদের "প্রাণগত স্পর্শ"—উভয় থেকেই বঞ্চিত হয়। "প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন" এইরূপ শিক্ষা কখনই তাদের জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনা।" তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে বিদ্যার একটি "প্রাণনিকেতন" গড়ে তুলতে, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতিই হবে ছেলেদের "অন্যতমশিক্ষক" ও "জীবনের সহচর"। "শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানব শিশু নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে" এবং তার শিক্ষাও হয়ে পড়ে বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। একথার সত্যতা কবি নিজ বাল্য অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কঠোর শাসনে সুকুমারমতি শিশুগণ কতোখানি দুঃখ পায় তাও তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর কল্পনায় ছিল প্রাচীন ভারতের তপোবনের সুন্দর একখানি ছবি। তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে যে খুব বড়ো একটি সত্য নিহিত ছিল, তাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন। তাঁর মতে "যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।" সেকালে তপোবনের বনস্থলীতে ছেলেরা পেতো প্রকৃতির নিবিড় গভীর সাহচর্য। বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিশাল উদার পরিবেশের মাঝখানে গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে তারা যখন তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ আহরণ করতো, তখনই তাদের শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগাযোগ স্থাপিত হতো এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধটিও হয়ে উঠতো "সত্য" ও "পূর্ণ"। "যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব

একটা বড়ো শিক্ষা আছে।" তাই তখনকার দিনে শিক্ষা মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "একান্ত ব্যাপার" হতে পারতো না। এমনি করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলনটিও "মধুর" ও "স্বাস্থ্যকর" হয়ে উঠতো। কবির মনে হল "বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।" এই ভাবটিই সেদিন তাঁকে শান্তিনিকেতনে তপোবনের আদর্শে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করতে প্রণোদিত করেছিল। তিনি বাল্যে এখানে তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে কিছু কাল কাটিয়েছিলেন। সেই সময়েই তিনি দেখেছিলেন—কেমন করে "বিশ্বছবির" মাঝখানে নিখিল বিশ্বকে যিনি পূর্ণ করে বিরাজ করছেন তাঁকে দেখা মহর্ষির জীবনে "প্রত্যক্ষ সত্য" হয়ে উঠেছিল। তাই কবির মনে হয়েছিল "মহর্ষির সাধনস্থল" এই শান্তিনিকেতনে ছেলেদের এনে বসিয়ে দিলে এবং তাদের সঙ্গে থেকে তাঁর নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে "প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে" তাদের সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। তিনি তাঁর এই সংকল্পটিকে কার্যে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অর্থ-সম্বল, দুইই ছিল স্বল্প ও সীমাবদ্ধ। সেদিন তাঁর ডাকে দেশের খুব অল্প লোকেই সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি একটুও দমলেন না। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল—"বীজের যদি প্রাণ থাকে, তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে, তাহলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।" তার মতে "শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেই রকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ যখন মাত্র পাঁচ ছ'টি ছেলে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে তাঁর প্রধান সহায়রূপে পেয়েছিলেন। শিক্ষকতার ভারটি তাঁর অনুরোধে বেশীর ভাগ তাঁর উপরেই ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গদানের কাজটি কবি নিজেই নিয়েছিলেন। তাঁর 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে' তখন "ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়।" সেখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সেটি হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতিরই উদার আহ্বান—"ইস্কুল মাষ্টারের আহ্বান নয়"। কবির মনে হয়েছিল শান্তিনিকেতনই "প্রকৃতির অবাধ সঙ্গলাভের উন্মুক্ত ক্ষেত্র।" তিনি চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন অনুভব করতে পারে এখানে "বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে।" প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে গাছপালা পশুপাখীই বিশেষ করে তাদের শিক্ষার ভার নেবে—এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। আর সেই সঙ্গে তারা মানুষের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করবে। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে "বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা" করা হয়, তাতে যে শিশুচিত্তের "বিষম ক্ষতি" হয় একথাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ বাল্য অভিজ্ঞতা থেকে খুব ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে "বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র" তৈরি করতে চাইলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যটি তিনি তাঁর অনুপম ভাষায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন—"বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধা শক্তি যোগাং রূপরস গন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলেছেন—তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুল মাষ্টার বেতের ডগায় নিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য ভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রম বিদ্যালয়ের শুরু হল, এই টুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম" কবিগুরুর মতে "প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা" পরম সৌভাগ্য। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার—এই দুইএর মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং এই দুইকে একত্র মিলিয়ে শিক্ষায়তন গড়লেই "শিক্ষার পূর্ণতা" সাধিত হয় এবং মানবজীবনেরও "সমগ্রতা" লাভ হয়। ছেলেরা সাধারণতঃ শহরের ইটকাঠপাথরের কারাগারেই বর্ধিত হয়ে থাকে। তাদের সেই জড়তার কারাবাস থেকে মুক্তি দিয়ে "প্রান্তর-যুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতোটা পারেন তাদের মানুষ করে তোলাই ছিল কবির অভিপ্রায়। বিশ্বপ্রকৃতিই তাদের "বাহ্য মুক্তির প্রশস্ত লীলাক্ষেত্র।" তাই রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের "প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে" মুক্তি দিয়ে তাদের এই বাহ্যমুক্তির সহজ অনাবিল আনন্দেরই আস্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীতে

খুব কম বিদ্যালয়েই ছাত্রেরা এতোখানি অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেরেছে। শান্তিনিকেতনে ছেলেরা মনের আনন্দে গাছে চড়তো, গান গাইতো,ছবি আঁকতো—"পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত" হয়ে মেলামেশা করতো। এখানে তাদের এসব কাজে বাধা দেবার কেউই ছিলেন না। নিছক পুঁথিগত বিদ্যার উপরে কবির খুব কমই আস্থা ছিল। তিনি বলেছেন—"শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ বিতরণ নয়, মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" তাঁর মতে কেবল "পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়," কিন্তু "যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয়" কতকটা "ভারবাহী জন্তুর" মতোই। কবি ছেলেদের বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মুক্তি দিয়ে তাদের শুধু আনন্দই দিতে চান নি। ছোটো বেলা থেকেই তারা যেন জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য বুঝতে শেখে এবং প্রকৃতির উদার বিশালতার মধ্যে তারা যেন ভূমার স্পর্শ অনুভব করতে পারে, এও তাঁর অভিপ্রেত ছিল। আমাদের সাধনার মন্ত্রই হচ্ছে 'ভূমৈব সুখম্‌ নাল্পে সুখমস্তি'। তাই শান্তিনিকেতনে সকালে ও সন্ধ্যায় খানিকক্ষণের জন্যে ছেলেদের একত্র সমবেত হতে হতো। প্রতিদিন সেইসময় যখন তারা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসতো, তখন কোনও বেদমন্ত্র বা প্রাচীন তপোবনের কোনও মহতী বাণী উচ্চারিত হতো। এইরূপ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ছেলেরা যেন একটি বড়ো জিনিসের ইশারা পায়—তাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রেরা জীবনের আরম্ভ কালকে বিচিত্ররসে পূর্ণ করে নেবে। "প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য-যোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে"—এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। বাঙালী ছেলেরা "এখানে মানুষ হবে—রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে"—রবীন্দ্রনাথ এই কামনাই করেছিলেন। তিনি নানা উপায়ে তাদের শিক্ষাকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত, ও সরস করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছেন, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাদের কতো গল্প বানিয়ে বলেছেন, তাদের জন্যে নানা রকম খেলা উদ্‌ভাবন করেছেন এবং গান ও নাটকাদি রচনা করে তাদের নিয়ে একত্র অভিনয় করেছেন। শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের মনের দাসত্ব ঘোচানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের উপরে কোনও রকম 'জবরদস্তি' চলতো না। কবি তাদের উপরে আত্মকর্তৃত্বের ভারটি ও আশ্রম পরিচালনার দায়িত্বও অনেকাংশে ছেড়ে দিলেন। এদিক দিয়েও তিনি তাদের অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন বুঝতে পারে আশ্রমটি তাদের নিজেরই জিনিস।

সকল দেশেই শিক্ষার দুটি লক্ষ্য আছে—নিম্নতর ও উচ্চতর। "ব্যবহারিক সুযোগ লাভ" ও জীবনসংগ্রামের উপযোগিতা অর্জনই হচ্ছে শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য। আর উচ্চতর লক্ষ্যটি হচ্ছে—"মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে শিক্ষার এই উচ্চতর লক্ষ্যটিকে আমরা প্রায় ভুলেই গেছি, যার ফলে আমাদের জীবনের ও শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে—জীবিকা-অর্জন। বণিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন আমাদের দেশের বিদেশী শাসকগণ এককালে প্রধানতঃ নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যেই—কতোগুলি কেরাণী তৈরি করবার উদ্দেশ্যে—এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন আজও তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও প্রয়োজন মিটানোই। এই "ভয়ংকর জবরদস্তি"র জন্যেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষাপ্রণালীতে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের খুব কমই অবকাশ আছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র ও শিক্ষকদের একটু স্বাতন্ত্র্য দেওয়াই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা যেন বহির্জগতের সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্য ও "রিপুর আক্রমণ" থেকে নিজেদের মনকে মুক্ত রেখে "শ্রেয়ের" কথা চিন্তা করবার যথেষ্ট অবসর পান এবং শ্রেয়ের সাধনায়ই রত থাকেন। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ যেন আদর্শভ্রষ্ট না হয়ে সকল চিত্তবিক্ষেপ থেকে নিজেদের সর্বতোভাবে দূরে রেখে শান্তির মধ্যে তাঁদের

জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—এই ছিল কবির কাম্য।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি মস্তো বড়ো দোষ এই যে, আমরা প্রথম থেকেই ধরে নিই যে আমরা একান্ত নিঃস্ব ও রিক্ত—"আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই।" আমাদের মনের এই দাসত্ব ঘোচাতে না পারলে আমাদের শিক্ষার দৈন্যও কোনোদিনই ঘুচবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত লক্ষ্য হবে শিক্ষাকে এই হীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া। তাঁর মতে আমাদের শিক্ষাকে "মূল আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করে" তার উপরেই "অন্য সকল শিক্ষার পত্তন" করলে আমাদের শিক্ষা যথার্থ সত্য এবং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। "জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।" এই ছিল কবির অভিপ্রায়। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা জ্ঞানতাপসদের চারদিকে এসে সমবেত হলেই এই উদ্দেশ্য সফল হবে। এই ভাবটি থেকেই বিশ্বভারতীর আদর্শের উদ্ভব। এমনি করেই সেদিন বিশ্বভারতীর প্রথম বীজটি উপ্ত হয়েছিল।

সবদেশের শিক্ষার সঙ্গে দেশের "সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রা"র ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তা নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত। এটিও আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি মস্তো বড়ো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটিটিকে দূর করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্য-বিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বললাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রশিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।" এই ভাব ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে সুরুল গ্রামে তাঁর গ্রামোদ্যোগকেন্দ্র "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার সাংস্কৃতিক দিকটিকেও রবীন্দ্রনাথ ভোলেননি। তাই শান্তিনিকেতনে তাঁর বিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে একটি "সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র"ও গড়ে তোলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল। জ্ঞানচর্চাকে তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি। তিনি মনে করতেন—"সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্য গীত বাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লী-হিতসাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন, সমস্ত এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত"। বাস্তবিকই শিশুচিত্তের পূর্ণ বিকাশের জন্যে যে এ সমস্তেরই প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। আশ্রমের সাধনায় "যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হওয়া উচিত"—এই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি বলেছেন "যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে।" আর একটি প্রয়োজনও তিনি ক্রমে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেটি হচ্ছে "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগ।"

ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথের মনে হলো তাঁর ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু "দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ করে রাখা সমীচীন হবে না। তাহলে "তাকে বৃহৎ আকাশে মুক্তি লাভের" সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে। "যে অনুষ্ঠান সত্য, তার উপর দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়।" গাছের বীজ ক্রমে তার প্রাণের স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে ওঠে। তখন আর তাকে ছোট্ট একটি বীজের সীমার মধ্যেই ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সেই রকম রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার সেই ছোট্ট বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিও প্রাণের এই স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমে বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো। আজ যখন পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে চলেছে তখন ভারতবর্ষই বা সেই যুগধর্ম ও যুগসাধনাকে অস্বীকার করবে কি করে? রবীন্দ্রনাথ

বুঝেছিলেন আজকের দিনে "বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে।" তাই তাঁর মনে হলো বিশ্বভারতী একান্তই ভারতের নিজস্ব জিনিস হলেও তাকে বিশ্বমানবের মিলন ও তপস্যার ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। এই বিশ্ববোধের দ্বারা উদ্‌বোধিত হয়েই তিনি ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য কোনখানে তাও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি জানতেন ভারতবর্ষ বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলেই সে আজও "বিদ্যার নির্জন কারাবাসে" আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আজকের দিনে তাকে সেই কারাবাস থেকে মুক্তি দেওয়াই দরকার হয়ে পড়েছে—তাকে আর "শিক্ষার ছিঁটে ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালায় পোড়ো" করে রাখা চলবে না। ভারতবর্ষের "বিরাট সত্তা" চিরকাল ধরে "বিচিত্রকে আপনার মধ্যে সংহত ও সম্মিলিত করবারই চেষ্টা করে এসেছে। তার সেই নিত্যকালের তপস্যাকে সত্য করে তুলবার জন্যে চাই একটি উপযুক্ত সাধন ক্ষেত্র। বিশ্বভারতীই হবে সেই সাধন ক্ষেত্র, যেখানে সর্ববিদ্যার মিলন সাধিত হবে। "বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয়" তবে তো আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। "মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে" যুক্ত হলেই "আমাদের বিদ্যার যথার্থ সার্থকতা হবে।" তাই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছেলেদের শুধু বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েই পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি মানুষকে সর্বমানবের বিরাটলোকেই মুক্তি দিতে চাইলেন। তাঁর বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর এই ঐকান্তিক কামনাটিই বিশেষভাবে জড়িত। "বিশ্বকে সহযোগীরূপে" পাবার জন্যেই তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বভারতী "সর্বমানবের যোগ-সাধনের সেতু রচনা" করবার ভারটিই নেবে—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে এমন একটি ক্ষেত্র রচিত হবে যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ 'স্বাভাবিক' 'কল্যাণজনক' ও 'আত্মীয় জনোচিত' হবে। তিনি বিশ্বভারতীতে জ্ঞান সাধনার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। "বড়ো জায়গায় যে মাটি, তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি"। এই ছিল তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তিনি বলেছেন—"আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সব-চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্ব-কালের। তারমধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই।" তাই তাঁর মতে—"যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে-সব কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যার কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ধৃত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা একজাতির দান নয়।" সেজন্য কবিগুরুর সংকল্প ছিল যে শিশুদের "চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা" করবেন, "দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্ম যোগে শিক্ষাসত্র" স্থাপন করবেন। তিনি চেয়েছিলেন—ছেলেরা যেন বুঝতে শেখে তারা এই বিশাল বিশ্বে এতো বড়ো মানবসমাজে জন্মগ্রহণ করে এক মস্তো বড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে। শিক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষকে চিনে নিতে হবে তার আপন অধিকারটিকে। সে যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তার চিত্তের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে শিখছে, তেমনি বিরাট বিশ্বের মানবের সঙ্গেও তাকে সম্মিলিত হতে হবে।* বিশ্ববিদ্যালয়েই পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন অনুযায়ীই পাঠ্যবিধি প্রণয়ন চেষ্টা করা হয়। তাতে করে শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই খর্ব করা হয়। তাই কবি চেয়েছিলেন "মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে" এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন যেখানে সর্ববিদ্যার সমবায় হবে।

আমাদের দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই অনুকৃতি। তাই যেগুলি দেশের মাটির উপরে দাঁড়িয়ে নেই—পরগাছার মতোই "পরদেশীয় বনস্পতির শাখায়" ঝুলছে। এই চিন্তাটিই কবির চিত্তকে বিশেষ ক্ষুব্ধ

ও ব্যথিত করে তুলেছিল। তাঁর মতে "সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।" শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরানুকরণশীলতাকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন—"চিন্তাজীবিকায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।" ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা ও স্থপতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টিতে তার নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের অবদান আছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ভারতের এই পরিচয় না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের শিক্ষাও 'দুর্বল' ও 'অসম্পূর্ণ'ই থেকে যাবে। ভারতবর্ষের মন আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই ভারতীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতিতে যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির নানা শাখার সমাবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটেছে সেগুলির মধ্যে যোগসূত্রটিকে সে আজ হারিয়ে ফেলেছে। সেই জন্যেই সেই মন এখন আর কিছু আপনার করে দান বা গ্রহণ করতে অক্ষম। হাতের দশটি আঙুল একত্র যুক্ত করে অঞ্জলিবদ্ধ হাতেই দান বা গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং আমাদের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি "সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত" করতে হবে। এই উপায়েই ভারতবর্ষ "আপনার নানা বিভাগে"র মধ্যে দিয়ে আপনার "সমগ্রতা উপলব্ধি" করতে পারবে। এমনি করে আপনাকে "বিস্তীর্ণ" এবং "সংশ্লিষ্ট" করে না জানলে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করবে, তা ভিক্ষার মতোই গ্রহণ করবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যটিকেই ভুলতে বসেছে। বিদ্যা উৎপাদন ও বিদ্যা উদ্‌ভাবনই হওয়া উচিত এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য—শুধু বিদ্যাদান নয়। তাই কবি বলেছেন যে বিদ্যার ক্ষেত্রে সকলদেশের মনীষীদেরই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যাঁরা নিজ শক্তি ও সাধনার দ্বারা "অনুসন্ধান আবিষ্কার, ও সৃষ্টির" কাজে অভিনিবিষ্ট ও ব্যাপৃত আছেন তাঁরা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হবেন সেখানেই জ্ঞানের উৎস স্বতঃই উৎসারিত হবে এবং "সেই উৎস ধারার নির্ঝরিণী তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা" হবে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী তার অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা বিশ্বের লোককে সাদর আহ্বান জানাতে কুণ্ঠিত হবো না। এই মিলন ক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকেও ভুললে চলবে না। সেই ঐশ্বর্যের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখেই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের সম্বল—শুধু ভিক্ষার ঝুলিই নয়। "তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্যে সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।" কবিগুরুর স্বপ্ন ছিল—"কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না।" যে ভারত "সকল লোকের" এবং "সকল কালের" সেই ভারতেই বিশ্বের লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভারটি বিশ্বভারতী নেবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা।" বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্যই হচ্ছে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। বিশ্বভারতীতে তারই সাধনা হবে—কবির এই ছিল কাম্য। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীই ভারতের বাণীকে বিশ্বের কাছে পৌছে দেবে। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"—এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই সে আপন সগৌরব পরিচয় বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে। "যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য" তারই আসন তিনি সেদিন বিশ্বভারতীতে পাতবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। "সত্যের ও প্রীতির আদান-প্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক"—কবির এই কামনা-টিই ছিল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার মূলে। "এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে" বিশ্বভারতীতে তারই সাধনা হোক—এই ভাবনা ও আদর্শটিই বিশ্বভারতীর মধ্যে জয়যুক্ত 'সত্য ও 'ধ্রুব' হয়ে উঠুক—রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে সেই কামনাই করেছিলেন

তিনি বলেছেন—"পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক, যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকল প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদ মুক্ত-রূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া।"

বিশ্বভারতীর মধ্যে দিয়ে যে উদার মহান আদর্শটিকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার যে আদর্শ রূপটিকে তিনি সেদিন দেখতে চেয়েছিলেন, তা যে চিরকাল অবিকল সেই রকমই থাকবে, এ আশা তিনি কখন করেন নি। তিনি জানতেন, জগতের কোনও বড়ো সৃষ্টিই ব্যক্তি-বিশেষের একলার সৃষ্টি বা কৃতিত্ব হতে পারে না। তিনি তাই বলেছেন—"সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তাহলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকু মাত্রই আমার ভরসা ছিল।" জগতের কোনও জীবন্ত চলমান আদর্শই বা স্থিতিশীল নয়, একথাও কবি জানতেন। তিনি যে আদর্শে বিশ্বভারতীকে সেদিন গড়তে চেয়েছিলেন তা যে চিরদিনই অচল অনড় থাকতে পারে না—একথাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি বলেছেন যে তিনি শুধু ভাবীকালের পথিকদের জন্যে দীপটুকু জেলে দিয়েই যাবেন। কালের ধর্ম ও দাবীকে যে অস্বীকার করা যায় না সে কথাও তিনি ভুলে যান নি। সেই দাবীকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি বলে গেছেন—"আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে সে ধর্ম নয়। ভাবীকালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্যস্থানকে আমরা আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই, তাহলে সে আমাদের সংকল্পের সমাধিস্থান হবে।" কিন্তু তবু এ আশাও তিনি পোষণ করতেন যে এর "মূলগত গভীর তত্ত্বটি চিরকাল অবিকৃতই থাকবে। সেটি হচ্ছে যে তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি কোনও দিনই "বিদ্যা-শিক্ষার একটা খাঁচায়" পরিণত হবে না। এখানে সকলে মিলে একটি 'প্রাণ লোক' সৃষ্টি করতেই চিরদিন রত থাকবে।

তাঁরই স্মরণে

প্রদ্যোত হাজরা

জনতার ম্লান চোখে জেলে দিলে প্রজ্ঞার আলোক
দীপ্তিহীন প্রাণ পেলো অফুরন্ত রোদের আলোক ;
সূর্য্য-পাখী ডানা মেলে রাত্রির গুহায়—
অনিন্দ্য জীবন জাগে দীপ্ত সুষমায়।

প্রাণে প্রাণে জাগে আজ বাঁচিবার দুর্ম্মর শপথ
দুর্যোগ প্রহরে তুমি দেখিয়েছ আলোকের পথ।

এখানে প্রোজ্জ্বল তাই সূর্য্যের মিছিল
মসৃণ আকাশ দেখি পরিপাটী নীল।

মৃত্যু তব নেই জানি অবিরাম মনের আকাশে
রাতের প্রাচীর চিরে সূর্য্য হ'য়ে স্মৃতি তব ভাসে ;
জলন্ত মহিমা তব দিনের স্বাক্ষর
স্থবির জীবন হ'ল চঞ্চল মুখর।

মহতী সৃষ্টির তরে এইখানে জনতারা জাগে—
লঙ্ঘিয়া মৃত্যুর ছায়া জানি তুমি আছ পুরোভাগে।

উপহার

রচনা—ও' হেনরী

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

মোট একডলার সাতাশি সেণ্ট। ওর মধ্যে আছে ষাট সেণ্টের পেনি।

একটা দু'টো করে পেনিগুলো বাঁচিয়েছে—বাঁচিয়েছে বেনে, ফোড়ে, ও মাংসওয়ালাদের ভয় দেখিয়ে। এই গায়ে-পড়া ভাব দেখে তারা চটে উঠেছে, নীরবে নিন্দে করেছে ওর এই কাঙালপনার জন্যে।

এক ডলার সাতাশি সেণ্ট—তিন তিনবার গুণে দেখে ডেলা।

আগামীকাল বড়োদিন। পুরণো ছেঁড়া কোচের ওপর লুটোপুটি খেয়ে বিলাপ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না ডেলার। ওর মনে হয় শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার জন্যেই যেন জীবনটা।

আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো ফ্লাট বাড়ী—সপ্তাহের ভাড়া আট ডলার। এক সময় সংসারের অবস্থা ভালো ছিলো। দিন দিন তা-ও খারাপ হতে চলেছে।

নীচের বারান্দায় একটা চিঠির বাক্স দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাক্সটার অবস্থা এমনই যে, একটা চিঠিও বোধহয় ওর মধ্যে পড়ে না। একটা ইলেক্‌ট্রিক বেলও রয়েছে—কোনদিন বোধহয় কেউ তাতে হাত দেয়নি। বেলটার গায়ে ঝুলছে একটা কার্ড—তাতে লেখা "মিঃ জেমস্ ডিলিংহাম ইয়ং।"

সংসারের অবস্থা যখন ভালো ছিলো, যখন সপ্তাহের আয় ছিলো ত্রিশ ডলার তখন কার্ডে লেখা ঐ 'ডিলিংহাম' বাতাসে দুলতো।

সপ্তাহের আয় ধাপে ধাপে কমে বিশ ডলারে ঠেকলো, আর ঐ নামের অক্ষরগুলোও থেকে থেকে অস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো—'ডি' অক্ষরটা তো এখন পড়াই যায় না।

দিনের কাজ সেরে মিঃ জেমস্ ওপরের ফ্লাটে এসে দাঁড়ায়। মিসেস্ জেমস্ (আমাদের ডেলা) হেসে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানায়।

কান্না শেষ হলে ডেলা মুখে পাউডার মাখে, পরে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। পেছনের জমিটার বেড়ার ওপর দিয়ে একটা ছাই রংয়ের বেড়াল চলে যাচ্ছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ডেলা বেড়ালটাকে লক্ষ্য করে। আসছে কাল বড়োদিনে, ডেলার কাছে আছে মোট এক ডলার সাতাশি সেণ্ট।

সপ্তাহের বিশ ডলারে বেশী দিন চলে না। হিসেবের খাতায় জমার চেয়ে খরচের খাতায় বেশী জমে। দিনের পর দিন একটা দু'টো করে পেনি বাঁচিয়ে ডেলা ঐ টাকা জমিয়েছে। ইচ্ছে আছে ঐ টাকা দিয়ে জিমকে একটা উপহার কিনে দেবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে বসে ডেলা ভাবে—ভাবে কি ধরণের উপহার দেওয়া যায় জিমকে। এমন একটা জিনিষ দিতে হবে যা বাজারে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় অথচ জিমীর আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে।

ঘরের জানলা দু'টোর মাঝখানের দেয়ালে টাঙ্গানো একটা আয়না। আট ডলার ভাড়া ফ্লাটে ঐরকম আয়না আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন। তাড়াতাড়ি যাবার সময় চট করে নিজের চেহারাটা আয়নার মধ্যে দেখে নেয়। ঐ কায়দাটুকু ডেলাও বেশ ভালো করে রপ্ত করেছে।

ডেলা জানলার কাছ থেকে সরে এসে আয়নাটার সামনে দাঁড়ায়। চোখ দুটো জলজ্বল করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা ফ্যাকাসে হ'য়ে ওঠে। খোঁপাটা খুলে দিতেই চুলের গোছাটা লম্বা সাপের মতো ঢেউ খেলে পায়ের দিকে ঝুলে পড়ে।

বাপ্-ঠাকুরদার দেওয়া একটা সোনার ঘড়ি ছিলো জিনের আর ডেলার ছিলো সুন্দর চুলের গোছা।

সোনার ঘড়িটা দেখে ডেলার মনে হতো যে তার স্বামী যেন কোন রাজপুত্র তার কাছে ধরা দিয়েছে। আর ডেলার চুলের গোছা দেখে জিমীর মনে হতো ডেলা যেন কোন স্বপনপুরীর রাজকন্যা।

চকচকে ঢেউ খেলানো চুলের গোছা ডেলার পিঠের ওপর দিয়ে হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলে আছে—যেন সোনালী রংয়ের একটা ঝর্ণা গড়িয়ে পড়ছে ওর পিঠ বেয়ে।

ডেলা চুলের গোছাটা হাতে করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দু'ফোটা চোখের জল ছেঁড়া কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ে। প্রসাধন শেষ করে ডেলা কাঁপতে কাঁপতে ছুটে বেরিয়ে আসে রাস্তায়, তখনও জল লেগে চোখে।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানেই ডেলা থেমে পড়ে। সামনে সাইন বোর্ডের লেখাগুলো পড়তে আরম্ভ করে। পড়া শেষ হ'লে দৌড়ে দোকানের ভেতর ঢুকে হাঁপাতে থাকে। মোটা ধবধবে ফর্সা একজন মেয়ে-ছেলেকে দোকানের মধ্যে বসে থাকতে দেখে—চুপচাপ বসে আপন মনে কী যেন ভাবছে।

ডেলা জিজ্ঞেস করে "আমার চুলগুলো কিনবেন?"

"হ্যাঁ কিনবো। দেখি আপনার চুলের গোছাটা।"

খোঁপাটা খুলে দিতেই সোনালী রংয়ের চুলের গোছা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।

মেয়েছেলেটি চুলের গোছাটা হাতে করে তুলে ধরে, বোধহয় ওজনটা দেখে। পরে বলে "কুড়ি ডলার দিতে পারি।"

"তাই দিন একটু তাড়াতাড়ি করুন।"

টাকাটা পেয়ে মনের আনন্দে ডেলা দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ায়। জিমের জন্যে একটা পছন্দসই উপহার খুঁজে বার করতেই প্রায় ঘণ্টা দুই কেটে যায়। চুল কাটার কথা আর মনে থাকে না।

শেষ পর্যন্ত একটা পছন্দসই জিনিষ তার চোখে পড়ে—জিমির খুব কাজে লাগবে।

এক এক করে ডেলা সব কটা চেন টেনে বার করে। প্লাটিনামের তৈরী পকেট ঘড়ির একটা চেন ওর পছন্দ হয় —নতুন ডিজাইনের। নতুন ডিজাইনের জন্যেই চেনটার এতো দাম।

চেনটার দাম একুশ ডলার। বাকি সাতাশি সেণ্ট পকেটে পুরে ডেলা তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালায়।

জিমের ঘড়িটা খুব দামী। চেনের বদলে একটা পুরনো চামড়া বাঁধা আছে ঘড়িটাতে। তাই সকলকার সামনে ঘড়িটা বার করতে জিমের লজ্জা হয়। ডেলার চেনটা পেলে জিম সুবিধামতো যখন তখন, যার তার সামনে ঘড়িটা বার করতে পারবে।

বাড়ী ফিরে আসার পর ডেলার মনে ধুকধুকুনি ধীরে ধীরে কমে আসে। প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে ওর যা ক্ষতি হলো, সেই হারানো চুলের কথাই ডেলা ভাবে।

ডেলা ঘরের আলো জ্বালে। জালটা খুলে মাথাটা ভালো করে আঁচড়ায়।

ডেলার প্রাত্যহিক কাজ সারতে মিনিট চল্লিশ সময় লাগে। কাজ শেষ করে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে ডেলা নিজের চেহারাটা দেখে। ঘাড় পর্যন্ত চুল ছাটা ডেলাকে ছোট্ট ছেলের মতো দেখায়।

ডেলা মনে মনে ভাবে—আমার কাণ্ড দেখে জিম না আমাকে খুন করে বসে। কী করতে পারতাম? মাত্র এক ডলার সাতাশি সেণ্ট দিয়ে কী করতে পারতাম আমি?

সাতটার মধ্যেই কফি তৈরী করা শেষ হয়। কিন্তু জিম ফিরে না-আসা পর্যন্ত খাবার তৈরী করতে পারে না।

আজ জিমের ফিরতে দেরী হচ্ছে। এতো দেরী করে তো জিম কখনো ফেরে না। চেনটা হাতে করে দরজার কাছে টেবিলটার কোণে চুপ করে বসে থাকে।

ডেলার মুখের চেহারা মরা-মানুষের মতো ফ্যাকাসে হ'য়ে ওঠে। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করে।

জিম ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। জিমকে দেখে একটু যেন গম্ভীর ও বিমর্ষ বলে মনে হয়।

জিমের বয়স বাইশ। এই বয়সেই সংসারের সব দায়িত্ব

জিমের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। টাকায় টান পড়ায় হাত-মোজা ও কোট কিনতে পারেনি। ওদু'টো জিমের খুবই দরকার।

ঘরের ভিতর এসে জিম ডেলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—যেমন করে শিকারের ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে শিকারী কুকুরগুলো। চোখের ঐ নীরব ভাষা ডেলা বুঝতে পারে না—তাতে না আছে রাগ, না আছে ভয়, না আছে ঘৃণা, না আছে বিদ্বেষ। কোন কিছুরই চিহ্ন দেখতে পায় না ঐ দৃষ্টির মধ্যে। ডেলা জিমের দিকে তাকাতে ভয় পায়।

টেবিল ছেড়ে ডেলা জিমের দিকে ছুটে আসে।

ভয় পেয়ে ডেলা কেঁদে ফেলে। বলে—ওভাবে তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ কেন? বড়োদিনে তোমাকে উপহার না দিয়ে আমি কি করে থাকি বলো? তাই চুলগুলো আমি বেচে দিয়েছি। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। দেখতে দেখতে আমার চুল আবার বড়ো হ'য়ে উঠবে। জিম, তোমার জন্যে কী সুন্দর একটা উপহার কিনেছি!

"তুমি চুল কেটে ফেলেছো?"

"হ্যাঁ, চুলগুলো বেচে দিয়েছি। চুল নেই বলে কী আর আমায় পছন্দ হচ্ছে না?"

"কী বলছো! সত্যি তুমি চুল কেটে ফেলেছো?"

"মিথ্যে আমার ওপর রাগ করেছো তুমি। সত্যি কথা চুলগুলো আমি নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু ওরা তো জানে না যে আমি তোমায় কত ভালবাসি!"

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে ডেলা জিজ্ঞেস করে "খাবার দেব কী?"

জিম যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ডেলাকে সামনে পেয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

কোটের পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক বার করে জিম টেবিলের ওপর ছুড়ে দেয়। জিম বলে ডেলা, আমায় তুমি ভুল বুঝো না। তুমি চুল কেটেছো কি চুল বেচেছো তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। কিংবা তোমার মাথায় চুল নেই বলে যে তোমাকে কম ভালোবাসবো তা-ও নয়। কাগজের মোড়াটা খুললেই সব বুঝতে পারবে।

মোড়াটা খুলেই ডেলা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু ক্ষণিক সে আনন্দ। কাগজের মোড়াটা হাতে করে ডেলা দাঁড়িয়ে আছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। ডেলা কাঁদছে……

টেবিলের ওপর পড়ে আছে চিরুণীগুলো—মাথার দুপাশে ও খোঁপায় লাগাবার পাথর বসানো হাড়ের তৈরী সুন্দর একসেট চিরুণী।

এতো দামী চিরুণী যে একদিন ভাগ্যে জুটতে পারে এতটা আশা ডেলা কোনদিনই করেনি। আজ হাতের কাছে রয়েছে চিরুণীগুলো, কিন্তু যেখানে ওগুলো সাজিয়ে পরবে সেই সোনালী চুলের গোছা আজ আর নেই।

চিরুণীগুলো বুকে চেপে ধরে ম্লান হেসে ডেলা বলে "আমার মাথার চুল খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।"

ছোট বেড়াল বাচ্চার মতো তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে ডেলা। "ঐ যাঃ। দেখেছো একেবারেই ভুলে গেছি; এই দেখ"—চেটোর ওপর চেনটা রেখে ডেলা জিমির সামনে ধরে। আলো পড়ে চেনটা চক্‌চক্ করে ওঠে।

"খুব সুন্দর দেখতে, না? সারা শহর ঘুরে এটা আমি খুঁজে বার করেছি। এখন যতবার ইচ্ছে তুমি সময় দেখতে পারবে। কই দাও? তোমার ঘড়িটা বার কর। চেনটা কেমন মানায় দেখবো।"

ডেলার কথায় কান না দিয়ে জিম সোফার ওপর বসে পড়ে। হাত দু'টো মাথার পেছনে রেখে ডেলার দিকে চেয়ে মুচকে হাসে। জিম বলে "সুন্দর দেখতে চেনটা। কিন্তু ওটা এখন সরিয়ে রাখ। ঘড়িটা বিক্রী করে ঐ টাকায় তোমার মাথার চিরুণী কিনেছি।"

প্রাচীন পারসিক যাজকেরা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। অদ্ভুত বুদ্ধি তাঁদের। তাঁরা পুত্রকন্যাদের যে সকল উপহার দিতেন, পুত্র কন্যারা সে সকল উপহার কাজে লাগাতে পারতো না। তাছাড়া উপহার দেবার সময় তাঁরা নানা পন্থা আবিষ্কার করতেন। বিচক্ষণ হওয়ায় উপহারগুলো বাস্তবিকই খুব সুন্দর হতো। ঐ রকম দুজন যুবক-যুবতীর কথা বললাম। বোকার মতো তারা নিজেদের অমূল্য সম্পদ হেলায় নষ্ট করলো।

পরিশেষে আমি বলতে চাই—বলতে চাই আধুনিক যুগের বুদ্ধিমান লোকদের কথা। আজকের দিনে যত রকমই উপহার দেওয়া হোক না কেন, এ দুটো উপহার সবার থেকে সেরা। যাঁরা উপহার দেন আর যাঁরা উপহার গ্রহণ করেন ঐ যুবক-যুবতী দুজন তাঁদের থেকেও বুদ্ধিমান।

বাঁসকী বাঁসরী — ভীমপলাশী—একতালা

মূল হিন্দি (ত্রিমাত্রিক ছন্দে)—ইন্দিরা দেবী

অনুবাদ, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইক বাঁসকি থী বাঁসরি মধুবনমে বজ রহী—
ইংনী জরাসি বাতপে দুনিয়া বদল গঈ !
(জীবন বদল গয়া সখি, দুনিয়া বদল গঈ !)

খোজা ন পর্বতোমে বনমে উস্কো থা কভী,
খোজা ন তীরথোঁমে মন্দিরোঁমে জা কভী,
সাধন ন তপ কিয়া সখী, ন পায়া জ্ঞানসে,
দেখা ন বেদমে, ন পঢ়া থা পুরাণমে,
রাধাকি প্রেমবারতা কিসীনে আ কহী,
ইংনী জরাসি বাতপে দুনিয়া বদল গঈ !

কহতে হৈঁ—লাখ গুণ হৈঁ উস্কে, লাখ রূপ হৈঁ,
রো দেবদেব হৈ, মহান্ হৈ, অনূপ হৈ,
তিরলোককা রো নাথ হৈ, রো জগতপাল হৈ,
দেখা ন সমঝা মৈনে কুছ, জানা—গোপাল হৈ,
মনমোহনী ছবী সখী মৈ দেখতী রহী,
ইংনী জরাসি বাতপে দুনিয়া বদল গঈ !

ইংনী জরা জরাসি বাতপে ন জানুঁ কুঁ্য
কহতা হৈ মন—"লুটা দে সব, জীবন লুটা দে তূ !"
মুকতীকি [illegible] হৈ নহী", ন লোভ জ্ঞানকা,
ন [illegible]কা, ন কুলকি আনকা,
মীরা [illegible] নাম সুন হি বাবরী হুঈ,
ইংনী জরাসি বাতপে দুনিয়া বদল গঈ !

অনুবাদ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

নীল যমুনায় উঠল বেজে বাঁশের বাঁশি তার—
ছোট্ট সে-ডাক শুনে ভেসে গেল এ-সংসার !
(জীবন ভুবন অমনি আমার হ'ল একাকার !)
খুঁজি নি সই, তাকে আমি পর্বতে কি বনে,
মন্দিরে কি তীর্থেও তার ধাই নি অন্বেষণে,
তপ সাধনে চাই নি তাকে জ্ঞানের অভিমানে,
পাই নি দরশন তার বেদ তন্ত্র কি পুরাণে,
রাধার প্রেমের কথা শুনেছিলাম মুখে কার—
সেই ছোট্ট ডাকেই ভেসে গেল এ-সংসার !
শুনেছিলাম—গুণ কত তার—নিত্য নব রূপ !
সে দেবদেব, আদিকারণ, মহান্, অপরূপ !
তিন ভুবনের শুনেছিলাম নাথ সে, লোকপাল,
পাই নি ভেবে পার, জেনেছি শুধু—সে গোপাল।
দেখেছিলাম শুধু মোহন মুখটি সখী, তার—
সেই ছোট্ট দেখায় ভেসে গেল এ-সংসার !
তার একটি ছোট্ট ডাকে কেন যে মন গায় :
"যা আছে তোর সব বিকিয়ে দে তার রাঙা পায় !"
মুক্তিকামী নই লো আমি, চাই না অগাধ জ্ঞান,
তাকে চেয়ে ছেড়েছি লোকলাজ ভয় কুল মান।
মীরা পাগল হ'ল শুধু নাম শুনে সই, তার
সেই ছোট্ট গানেই ভেসে গেল এ-সংসার !

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত গানের অনুবাদ—২৮. ৩. ৭২

—শ্রীদিলীপকুমার রায়

একতালা বা দাদরা

০ ১ + ৩

{ I র্সা -া র্সা | পা পা দা I ^পমা -া পা | মজ্ঞা জ্ঞা মা I
নী ল য মু না য় উ ঠ ল থে বে -

সনা সা -া | মজ্ঞা মজ্ঞা মা পা -া -া | -া -া -া I
বাঁ শে র বাঁ - শি তা - - - - র

ণা -া ণা | ণা ণা পা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা পা I
ছো ট্ ট সে ডা ক শু নে - ভে সে -

জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞর্রা সর্রা I র্সা -া -া | -া -া -া I}
গে ল - এ সং - সা - - - - র

পজ্ঞা জ্ঞা -া | সর্রা র্রা -া I ^র্সা -া ণা | ধা পা ধা I
জী ব ন ভু ব ন অ ম্ নি আ মা র

^মা মা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা I পা সা -া | -া -া -া II
হো লো - এ - কা কা - - - - র

সা সা মা | মা মা -া I মা মা -া | মা মা -া I
খুঁ জি - নি স ই তা কে - আ মি -

মা -া পা | মজ্ঞা মা -া I পা পা -া | -া -া -া I
প র্ ব তে কি - ব নে - - - -

ণা -া ণা | ণা ণা পা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা পা I
ম ন্ দি রে কি - তী র্ থে তা হা র

^জ্ঞা -া জ্ঞা | র্রা র্সা র্রা I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
যা ই নি অ - ম্বে ষ ণে - - - -

জ্ঞা -া জ্ঞা | সর্রা র্রা -া I ^র্সা -া র্সা | ধণা ণা -া I
ত প সা ধ নে - চা ই নি তা কে -

পধা ধা -া | মপা র্সা ণা I ধা পা -া | -া -া -া I
জ্ঞা নে র অ - ভি মা নে - - - -

র্সা -া র্সা | ধণা ণা -া I পধা -া ধা | ^পা পা -া I
পা ই নি দ র - শ ন তা র বে দ

জ্ঞমা -া মা | জ্ঞা -া মা I পা সা -া | -া -া -া I
ত ন্ ত্র কি - পু রা গে - - - -

সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া I
রা ধা র প্রে মে র ক থা - শু নে -
দে খে - ছি লা ম শু ধু - মো হ ন
মী রা - পা গ ল হো লো - শু ধু -

মা র্মা -া | র্জ্ঞর্রা র্সা র্রা I র্সা -া -া | -া -া -া I
ছি লা ম মু - খে কা - - - - র

র্সা র্পা র্মা | র্জ্ঞা র্রা -া I র্সা ণা -া | ধা পা ধা I
সে ই ছো টু ট - ডা কে - ভে সে -

পমা মা পা | মজ্ঞা মা -া I পা সা -া | -া -া -া I
গে ল - এ স ং সা - - - - র্

দ্বিতীয় স্তবক "শুনেছিলাম…এ-সংসার" ও তৃতীয় স্তবক "তার একটি…এ-সংসার" এই সুরেই গাওয়া যায় ত্রিমাত্রিক দাদরায় বা একতালায়। আমি নিজে তালফের ক'রে গাই এ-দুটি স্তবক: "শুনেছিলাম… সে-গোপাল" এই চারটি চরণ তেওরায় গেয়ে "দেখেছিলাম…" এ ফিরে আমি "রাধার প্রেমের…" চরণের সুরে ও তালে অর্থাৎ সপ্তমাত্রিক থেকে ত্রিমাত্রিক তালে এবং "তার একটি…কুলমান" এই চারটি চরণ চতুর্মাত্রিক কাহারবা বা কাওয়ালিতে গেয়ে "মীরা পাগল…" চরণে ঐ ভাবে ফিরে আমি "রাধার প্রেমের…" চরণের সুরে ও তালে। স্বরলিপির বহর বাড়ানোর স্থানাভাব ব'লে শুধু আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হব কী ভাবে তেওরা ও কাওয়ালিতে গাওয়া যায় স্তবক দুটি।

তেওরা

+ ২ ৩ + ২ ৩
সা মা -া | মা া | মা -া I মা -া মা | মা -া | মা -া I
শু নে - ছি - লা ম শু ণ ক ত - তা র

মা -া মা | মজ্ঞা -া | মা -া I পা া -া | -া -া | -া -া I
নি - ত্য ন - ব - রূ - - - - - প

কাওয়ালি

স মা মা -া মা | মাঃ মঃ মা মা I মা পা মজ্ঞা মা | পা -া -া -া |
তা র এ ক টি ছো ট্ট ডা কে কে ন যে মন চা - - য়

ইন্দিরা দেবীর মূল হিন্দি মীরা ভজনটিও ঠিক এই ভাবে গাওয়া যাবে। আমি শুধু প্রথম স্তবকের স্বরলিপি দিয়েই ইতি করব—সঙ্গীতানুরাগীরা খুব সহজেই হিন্দি ভজনটি বাংলা অনুবাদটির সুরে তালে তুলতে পারবেন।

II পা -া I র্সা -া র্সা | পা পা দা I পমা পমা পা | মজ্ঞা জ্ঞা মা I
ই ক বা - স কি ণী - বা - স রি ম ধু

পণ্ -া সা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা I পা -া -া | -া পা -া I
ব ন মে ব ঞ্জ র ী - - - ই ত

ণা -া ণা | ণা পা পা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা পা I
নী - জ রা - সি বা - ত পে ছু নি

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্সা র্রা I র্সা -া -া | -া পা -া I
য়া - ব দ ল্ গ ন্ধ - - - জী -

পর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | সর্রা -া র্রা I ণর্সা -া ণা | ধা পা ধা I
ব ন্ ব দ ল গ য়া - স খি ছু নি

পমা পমা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা I পা সা -া | -া -া -া I
য়া - ব দ ল্ গ ন্ধ -

সা -া I মা -া মা | মা -া মা I মা -া মা | মা -া মা I
খো - জা - ন প ঘ্ ব তোঁ - মে ব ন মে

মা -া পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা I পা -া -া | -া পা -া I
উ স্ ত্তো থা - ক ভী - - - খো -

ণা -া ণা | ণা -া পা I র্সা -া র্সা | র্সা -া পা I
জা - ন তী - র খোঁ - মে ম ন্ দি

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্সা র্রা I র্সা -া -া | -া পা -া I
রেঁ - মে জা - ক ভী - - - সা -

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | সর্রা -া র্রা I ণর্সা -া র্সা | পণা -া ণা I
ধ ন্ ন ত প্ কি য়া - স খী - ন

পধা -া ধা | মপা র্সা ণা | ধা পা -া | -া পা -া I
পা - য়া জা - ন সে - - - দে -

র্সা -া র্সা | ধণা -া ণা | পধা -া ধা | মপা পা ধা |
খা - ন বে - দ মে - ন প ড়া -

পমা -া পা | ম্জ্ঞা ম্জ্ঞা মা | মা সা -া | া সা -া |
ধা - পু রা - ন মে - - - া -

র্সা -া সা | র্সা -া রা | র্রা -া র্রা | র্রা -া মা |
ধা - কি প্রে - ম বা - র তা - কি

র্মা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্সা র্রা I র্সা -া -া | -া র্সা া I
নী - নে আ - ক হী - - - ই ত

র্পা -া র্মা | র্জ্ঞা -া র্রা I র্সা -া ণা | ধা পা ধা I
নী - জ রা - সি রা - ত পে হু নি

পমা পমা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা I পা সা -া | -া II
রা - ব দ ল্ গ ঈ - - - -

এখানেও ইচ্ছা হ'লে "কহতে···গোপাল হৈ" এই চারটি চরণ "খোজা ন পর্বতোঁমে···পুর পদে"-র সুরে গাওয়া যায় তালফের ক'রে তেওরায় কিম্বা কাওয়ালিতে। তেওরায় যথা :

সা -া I মা -া মা | মা -া | -া মা I মা -া -া | মা -া | -া মা I
ক হ তে - হৈঁ লা - - থ গু ণ হৈঁ উ - স্ কে

মা -া পা I মজ্ঞা মজ্ঞা | মজ্ঞা মা I পা -া -া I -া া | পা -া I
লা - খ রূ - - প হৈঁ - - - - - রো -

ণা -া ণা I ণা -া | -া পা I র্সা -া -া | র্সা -া | -া পা I
শে - ষ দে - - ব হৈ - ম হা - - ন

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্রা I র্সা -া -া | -া -া | পা -া I
হৈ - অ নূ - - প হৈ - - - - তি র

"ইতনী··আনকা" এই চারটি চরণও ইচ্ছা করলে কাওয়ালি বা তেওরায় গাওয়া যায়, কাওয়ালি যথা :

সা -া I মা -া -া মা | মা -া -া মা I মা -া -া মা | মা -া -া মা I
ই ত নী - - জ রা - - জ রা - - সি বা - - ত

যাঁরা তালফেরে গাইতে বেগ পান তাঁরা বরাবর ত্রিমাত্রিক দাদরা বা একতালায় গাইতে পারেন সমস্ত গানটি।
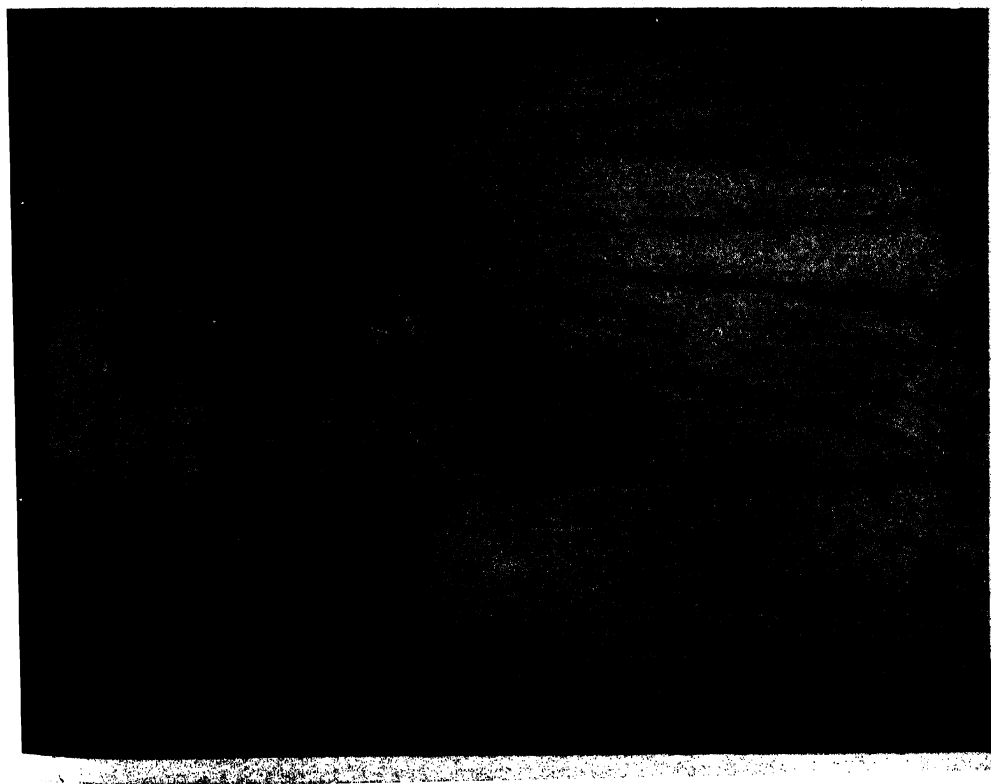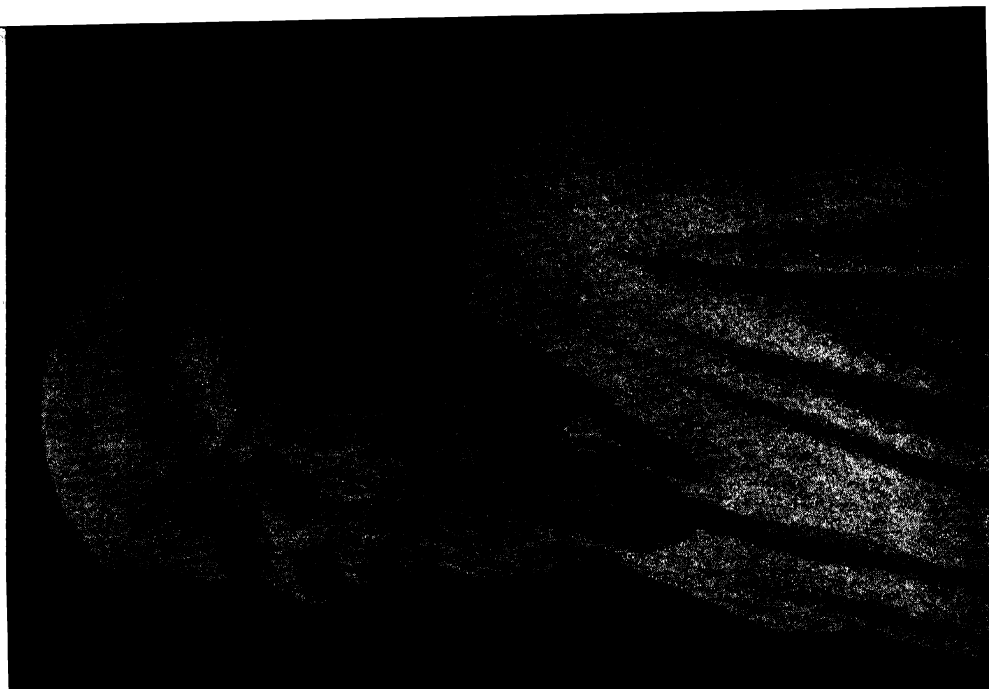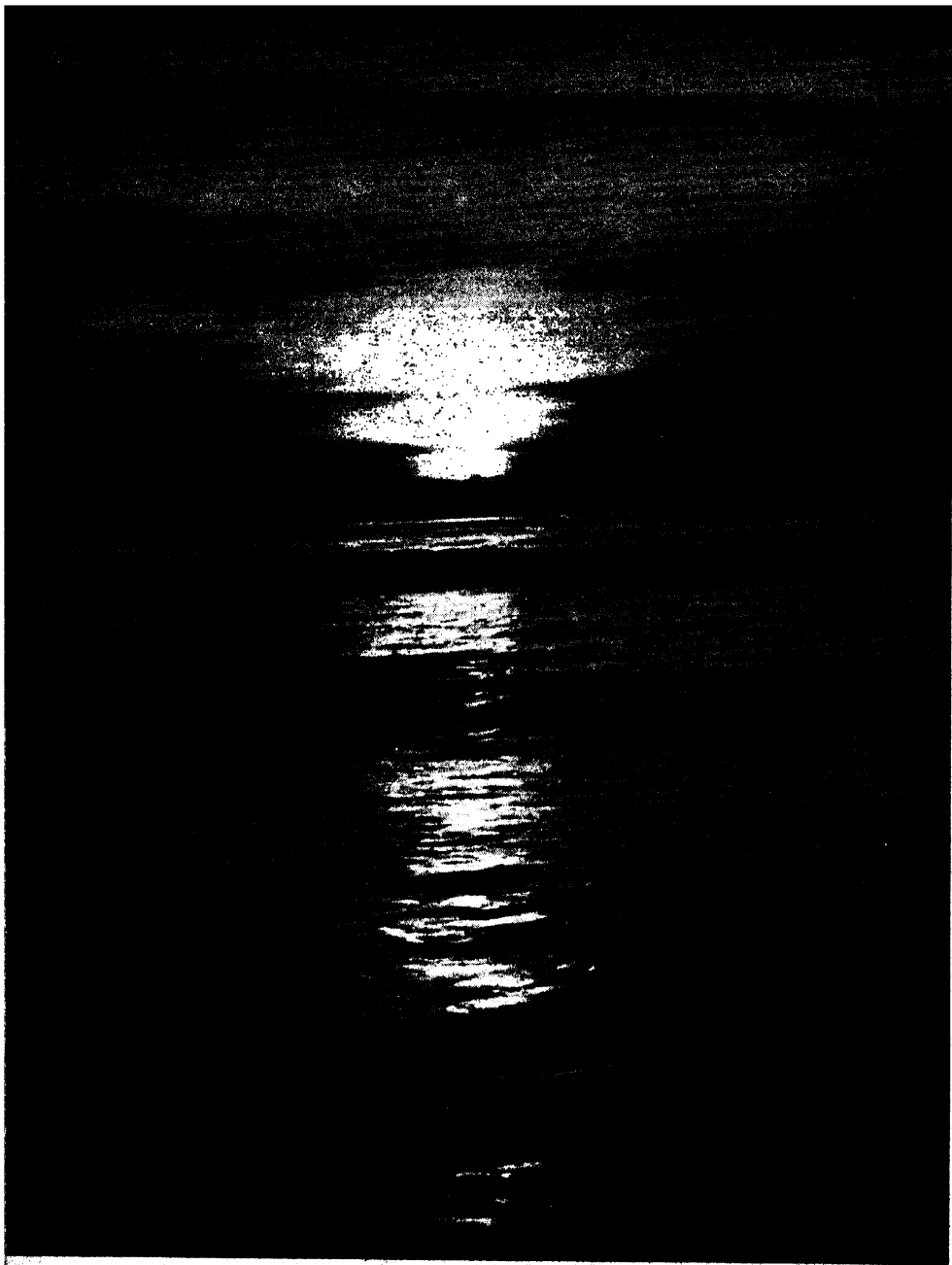
উদয়ের পথে

ফটো: রামকিঙ্কর সিংহ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

দ্বিজেন্দ্র প্রশস্তি

মন্মথ রায়

আজ হইতে নিরানব্বই বৎসরপূর্বে বাংলার পুণ্যভূমিতে এক দেবশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেদিন সে কাঁদিয়াছিল দেখিয়া আর সকলে হাসিয়াছিল। আজ হইতে উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সেই জাতক যখন মরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে যায়, সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক তাহার জন্য কাঁদিতেছে দেখিয়া সে হাসিয়া থাকিবে। কে এই ক্ষণজন্মা জাতক আজ যাহার শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তীর উদ্বোধন হইতেছে? তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি, নাট্যকার, নব ভারতবর্ষের উদ্গাতা। তাঁহাকে নমস্কার॥

কে সেই কবি, কে সেই নাট্যকার—যিনি সামাজিক সঙ্কীর্ণতার নিকট শির অবনত করেন নাই, বরং সাহিত্যিক কশাঘাতে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন? তিনি দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়। সেই উদারচেতা, সেই নির্ভীক মনীষীকে নমস্কার॥

কে সেই কবি, কে সেই নাট্যকার, যিনি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও আত্মাকে শৃঙ্খলিত হইতে দেন নাই, বরং কবিতায় গানে এবং নাটকে বন্দনা করিয়াছেন আকাশের উদারতাকে, জলধির বিপুলতাকে, মানুষের মনুষ্যত্বকে? তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। তাঁহাকে নমস্কার॥

মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদে দেশবাসী যখন মর্মাহত, বিক্ষুব্ধ, কে সেই কবি, কে সেই নাট্যকার যিনি ইতিহাসের পাতা হইতে গৌরবোজ্জ্বল বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী উদ্ধার করিয়া সঙ্গীত ও নাটকের মধ্যে করিলেন গ্রথিত, মুক্তিকাম-সন্তানদের মনে সঞ্চার করিলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেম —তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জাতির মুক্তিযজ্ঞের সেই মহাঋত্বিককে নমস্কার, বার বার নমস্কার॥

শুধু দেশপ্রেম নহে, জাতিধর্মনির্বিশেষে এক উদার সার্বজনীন প্রেমে কাহার হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল? আধ্যাত্মিকতারও উর্দ্ধে কে স্থান দিয়াছিলেন মহা-মানবতাকে? কাহার হৃদয় মানুষের প্রতি অসীম বেদনা ও করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গের দিকে না তাকাইয়া মাটির মানুষের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্খা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন কে? কে সেই মানবপ্রেমিক কবি ও নাট্যকার? তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেই মহামানবকে নমস্কার—সেই মহান স্রষ্টাকে নমস্কার॥

জাতিকে কে দিয়াছিল 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি'র বন্দনা গীতি? 'মেবার পাহাড়ে'র অতীত গরিমার আনন্দ বেদনা গাথা? জননী ভারতবর্ষকে সুনীল জলধি হইতে উঠিতে দেখার স্বপ্ন সঙ্গীত? এই 'হতাশাময় বর্তমানে' 'আবার মানুষ হইবার' মহা আশ্বাসবাণী? তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁহাকে নমস্কার —সেই পরম কবিকে নমস্কার॥

কার এই নমস্কার? উত্তরসূরী এক নাট্যকারের— যে শৈশব হইতেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল পূর্বসূরী এই মহানাট্যকারের নাট্যকীর্তিতে। কার এই নমস্কার? এ নমস্কার বাংলার প্রতিটি নাট্যকারের, প্রতিটি নাট্য-শিল্পীর। কার এই নমস্কার? এ নমস্কার প্রতিটি বাঙালীর—যাহার মনে, যাহার প্রাণে আমরণ ঝংকৃত হয়:

"দেবী আমার সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

গত ৪ঠা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৯, কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উৎসবে প্রধান অতিথি প্রদত্ত শ্রদ্ধার্ঘ।

অতীতের স্মৃতি

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

৫

সেকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা শহরে বিবিধ কাজ-কারবারের দৌলতে তখনকার দেশী ও বিলাতী সমাজের অনেক ভাগ্যবান করিৎকর্ম্মা-পুরুষই বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে, আয়াস ও অনায়াস-লব্ধ সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে, অচিরেই অগাধ ধন-সম্পত্তি আর প্রচুর প্রতাপ-প্রতিপত্তির মালিক হয়ে উঠতেন। তখনকার আমলের দেশী-বিলাতী সমাজের এই সব 'রাতারাতি-সৌভাগ্যবান, নব্য-অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট-ব্যক্তিরা যেভাবে সৌখিন-বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে নিত্য-নতুন বিচিত্র-ধরণের খানা-পিনা আর নাচ-গানের জমজমাট-আসরের ব্যবস্থা করে অফুরন্ত আমোদ-প্রমোদে মেতে পরমানন্দে দিন কাটাতেন—তার বহু কৌতূহলোদ্দীপক নজীর মেলে, সেকালের বিভিন্ন স্মৃতি-কাহিনী আর সংবাদ-পত্রের পাতায়-পাতায়! খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে প্রকাশিত এইসব প্রাচীন স্মৃতি-কাহিনী আর সংবাদ-পত্রের খবরাখবর থেকে যে সব বিচিত্র-তথ্যের পরিচয় মেলে, তাই থেকে সুস্পষ্ট অনুমান করা যায়—সেকালে দেশী-বিদেশী লোকজনের এই নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিক-মেলামেশা আর অভিনব সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ফলেই, আজ থেকে প্রায় ২৭০ বছর আগে ইংরেজের হাতে-গড়া আজব-শহর কলিকাতা, সৃষ্টির সেই আদি-যুগ থেকেই ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে—বিশ্বের অন্যতম-অপরূপ বিশিষ্ট একটি 'Cosmo-politan Metropolis' অর্থাৎ সার্ব্বজনীন মহানগরী'! তবে শহর-পত্তনের আদি-পর্ব্বে কোম্পানীর আমলে, এদেশী-জনগণের সঙ্গে বিলাতী-সমাজের লোকজনের ভাবসাব, মেলামেশা আর সৌহার্দ্দ্য-সহযোগিতার সম্পর্ক যতখানি ঘনিষ্ঠ, মধুর ও স্বাভাবিক ছিল, ১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক 'সিপাহী-বিদ্রোহের' পর ভারতে ইংরেজ-সরকারের সার্ব্বভৌম-শাসন-ব্যবস্থা কায়েমী হবার স্মরণীয়-মুহূর্ত্ত থেকে ঠিক তেমনি আর বজায় রইলো না…নানা কারণে কালে-কালে ক্রমেই তার অবস্থাবনতি ঘটতে সুরু করলো সাবেকী-দিনের দু'কূল-প্লাবী সম্প্রীতির জোয়ার-স্রোতে ধীরে ধীরে দেখা দিলো সংশয়-অবিশ্বাসের ভাঁটার টান! অবশেষে ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব আর এদেশের জনগণের মধ্যে দেশাত্ম-বোধক-চেতনা ও জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের সাড়া জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদী ও অসহযোগী বিপ্লবীদের প্রবল আঘাতে ভাঙন দেখা দিলো অতীতের সেই ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে…সুদীর্ঘ-সংগ্রামের সে ইতিহাস আজ আর কারো অজানা নেই! কাজেই, রাজনীতির আলোচনা ছেড়ে আপাততঃ বরং বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি-পত্র থেকে সেকালের বিচিত্র সব কীর্ত্তি-কলাপের কয়েকটি অভিনব-বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক…এ সব বিবরণ থেকে একালের কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা তখনকার আমলের দেশী ও বিলাতী সমাজ-জীবনের নানা বিস্ময়কর-তথ্যের সবিশেষ পরিচয় পাবেন।

* * * *

সৌখিন সঙ্গীত-সম্মিলনী

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কথা' [Memoirs] ১৭৭৮)

Soon after my return to town (কলিকাতা) was elected a member of the Catch Club, one of the pleasantest societies I ever belonged to, but unpopular with the ladies, no female being admitted. It was originally established by some musical men, seceders from a meeting called the Harmonic, at which the younger people of both sexes being more pleased with their own rattling chatter and noise, paid no attention to the sweet strains of Corelli and other famous composers, and thereby gave great offence to the real lovers of music. A party thereupon resolved to establish a sort of club, where none of the profane should admittance and women to be excluded altogether···I was also a member of the Old Harmonic, which, upon the establishment of the new one, sunk into a mere dance. The young women facetiously termed the new meeting, "The He Harmonic".···Upon its coming to my turn to preside, I gave the master of the house private directions as soon as the clock struck two (রাত্রি) to introduce some kettles of burnt champagne, a measure that was highly applauded by all···We sat until an hour after sunrise. From that night it became an established rule to have burnt champagne the moment it was two 'o'clock.

* * *

খানা-পিনা আর নাচ-গান-বাজনার আসর

(মিসেস্ ফে লিখিত স্মৃতি-কাহিনী, ১৭৮১)

I felt far more gratified some time ago, when Mrs Jackson procured me a ticket for the Harmonic which was supported by a select number of gentlemen who each in alphabetical rotation gave a concert, ball and supper, during the cold season ; I believe once a fortnight···We had a great deal of delightful music and Lady Chambers, who is a capital performer on the harpsichord, played among other pieces a Sonata of Nicolai's in a most brilliant style. A gentleman who was present and who seemed to be quite charmed with her execution, asked me the next evening, if I did not think the *jig* Lady C— played the night before, was the prettiest thing I ever heard ? He meant the rondo which is remerkably lively ; but I dare say "Over the water to Charley" would have pleased him equally well.

Mrs Hastings was of the Parts ; she came in late···

* * *

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কথা, [Memoirs] ১৭৮৪)

A fete-champetre announced as to be given by Mr Edward Fenwick (যাঁর নামে কলিকাতার খিদিরপুর-গার্ডেনরীচ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ ফেন্উইক্-বাজারের নামকরণ হয়েছে), a gentleman high in the Civil Service, entirely engaged the public attention Conversation during the greater part of the month of May. It was intended to be celebrated at his country house, situated upon the banks of the river, in Garden Reach, about five miles from Calcutta···The gardens were to be brilliantly illuminated with many thousand coloured lamps ; an eminent operator in fireworks had been brought down from Lucknow to display his talents ; the company to appear in dresses, those that chose it to wear masks. Ranges of tents were fixed in different parts of the gardens, wherein tables were laid covered with all the dainties the best French cooks could produce, for the accommodation of three hundred persons, besides

which every room in the house was stored with refreshments of every sort and kind; different bands of martial music were stationed in several parts of the gardens, and also in the house, with appropriate and distinct performers for the dancers. The last two miles of the road were lighted up with a double row of lamps on each side, making every object clear as day. In short, nothing could exceed the splendour of the preparations for this rural entertainment.

উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কথা' [Memoirs] ১৭৯৭)

The party (১৭৯৭ সালে কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট-কর্ম্মচারী কর্ণেল শ্রেব্রুকের গৃহে অনুষ্ঠিত বিরাট এক ভোজ-সভায়) consisted of eight as strong-headed fellows as could be found in Hindostan. During dinner we drank as usual, that is, the whole company each with other at least twice over. The cloth being removed, the first half-dozen toasts proved irresistible, and I gulped them down without hesitation; at the seventh, feeling disposed to avail myself of the promised privilage (কারণ, হিকি সাহেব তৎকালে বিশেষ অসুস্থ ছিলেন) I only half filled my glass, whereupon our host s:i', "I should not have suspected you, Hickey, of shirking such a toast as the Navy", and my next neighbour, "it must have been a mistake", having the bottle in his hand at the time, he filled my glass up to the brim. The next round I made a similar attempt, with no better success, and then gave up the thought of saving myself. After drinking two-and-twenty bumpers in glasses of considerable magnitude, the *Considerater* President said, every one might then fill according to his own discretion, and so *discreet* were all of the company that we continued to follow the Colonel's example of drinking nothing short of bumpers until two o'clock in the morning, at which hour each person staggered to his carriage or his palankeen, and was conveyed to town. The next day was incapable of leaving my bed, from an excruciating, headache, which I did not get rid of for eight-and-forty hours; indeed a more severe debauch I never was engaged in any part of the world.

*　　*　　*

দেশী-নাচের আসরে সেকালের সাহেব-বিবি আর গোলাম
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি)

(সমাচারদর্পণ, ২৭শে মার্চ্চ, ১৮২৪)

খানা।—১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়বাজারের বাটীতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তম২ দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ১লা মে, ১৮২৪)

সভা।—২১ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের বাটীতে সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রীমতী লেডি আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী লেডি পুলর ও শ্রীযুত চিপজুষ্টস সাহেব প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চ পদাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং মহামহিমানিতা-বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও অনেক সাহেব লোক ও বিবি লোক ঐ বাদ্যোদ্যমে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু লালচাঁদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর পানি প্রভৃতিও ঐ সভারোহণে নিমন্ত্রিত হইয়া নির্ণীত সময়ে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাঁহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহর্ষে অভ্যর্থনা করিলেন। বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া নৃত্যাদি দর্শন শ্রবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিগের বিদায়কালীন শ্রীযুত লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেকে আতর ও গোলাপ পানের খিলি প্রদানপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।

*　　*　　*

দেশী ও বিলাতী সমাজ

(রাজনারায়ণ বসু রচিত 'সেকাল আর একাল' প্রবন্ধ ১৮৭৩)

…ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে (১৬৯০) হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত (১৮১৭) যে সময় তাহা "সে কাল" এবং তাহার পরের কাল "এ কাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।

..　　..　　…　　…

…সে কালের বিষয় বলিতে হইলে সে কালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্য, সেকালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সে কালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সে কালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সে কালের সাহেবদের বর্ণনা করা কর্ত্তব্য।…সে কালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেলতেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানীর পূজা হইয়া তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। এ কালেও গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া

আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সে কালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যাভিচারস্থল স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম, এরূপ সাহেবই অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।...

* * *

...অতঃপর সে কালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। একজন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশবৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন।

* * * *

দেশী-বিলাতী সমাজের এই সব খানা-পিনা আর নাচ-গানের অভিনব-মজলিসের মতোই সেকালের বিলাসী-সৌখিন অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকজনদের আরো একটি বিশেষ-উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয়-আনন্দোৎসব ছিল—কলিকাতার ইংরেজ-বড়লাটের প্রাসাদে সাড়ম্বরে আয়োজিত রাজকীয় দরবার-অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া। সেকালের ছোট-বড়, দেশী আর বিদেশী, সকল স্তরের সৌখিন-বিলাসী অভিজনদের কাছে, লাট-প্রাসাদের দরবারে নিমন্ত্রিত হওয়া ছিল পরম সৌভাগ্য ও অসাধারণ গৌরবের ব্যাপার...কাজেই বিচিত্র-সম্মানকর এই সামাজিক-আমন্ত্রণের জন্য তাঁরা তখন রীতিমত উন্মুখ-লালায়িত ও সদা-তৎপর থাকতেন। তখনকার আমলে ইংরেজের লাট-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এ সব রাজকীয়-দরবারে যেমন ছিল বিরাট জাঁকজমক আর আড়ম্বরের ঘটা, তেমনি বিপুল হতো দেশী-বিলাতী সমাজের উৎসাহী-অভিজাতদের সমাগম। এ সব দরবারের বৈঠকে হামেশা যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে, দেশী ও বিলাতী উভয় সমাজের লোকজনের মধ্যে ক্রমেই অভিনব সম্প্রীতি-সৌহার্দ্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া নিজেদের কাজ-কারবার আর প্রশাসনিক-স্বার্থরক্ষার সুবিধার্থে পূর্ব্বতন মোগল বাদশা আর নবাবদের চিরাচরিত-প্রথানুকরণে কোম্পানীর ইংরেজ-কর্ত্তারাও এদেশী লোকজনদের তুষ্ট ও করায়ত্ত রাখবার উদ্দেশ্যে সেকালের এই সব রাজকীয় দরবারের বৈঠকে নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত-অভিজাতদের দু'হাতে খেলাৎ আর দামী-দামী উপঢৌকন দান করে সবিশেষ সম্মান জানাতেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রাচীন নথী-পত্রের পাতায় তারও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

লাট প্রসাদের দরবার

(সমাচার দর্পণ, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮২৫)

দরবার॥—গত ২৪ ডিসেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গালা সন ১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার বেলা দশ ঘণ্টার সময় গবর্ণরমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ বড়সাহেবের বাটীতে দরবার হইয়াছিল তাহাতে এপ্রদেশস্থ অর্থাৎ সুবেবাঙ্গালা বেহার উড়িস্যার প্রায় যাবদীয় সম্ভ্রান্তলোক বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত মহারাজরাজচক্রবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় বাহাদুরের অধীন যাঁহারা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ২ স্বয়ং কাহার বা প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর্ জেনেরাল বাহাদুরের নিকট হাজির হইয়াছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারদিগকে খেলাৎ হইয়াছে তাঁহারদিগের নাম এবং কি খেলাৎ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কলিকাতাস্থ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরকে সাত পারচার খেলাৎ মুক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগা সেপরসমসের দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্ভ্রম করিয়াছেন যেহেতুক তিনি লোকোপকারার্থে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে মহারাজ সংপ্রতি এইরূপে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদ্যাপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার টাকা নেটিব হাঁসপাতালের ব্যয়ের কারণ দান করিয়াছেন।···

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌত্র রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুত কুঙর রাজনারায়ণ রায় ৬ পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ৬ ছয় পারচার খেলাৎ এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২৭শে মে, ১৮২৬)

দরবার। গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইং ১৯ মে বাং ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে সাত ঘণ্টার সময় কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঘরে দরবারে যে ২ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং শ্রীশ্রীযুতকর্ত্তৃক কে কি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে···।

রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ
এক জিগার ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় রাজা বাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন্।

সাত পার্চার খেলাৎ।
এক জিগা ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ৯ই জানুয়ারী, ১৮৩)

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দ উৎসব।—গত ১ জানুয়ারি শুক্রবার রজনীযোগে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এবং শ্রীমতী লেডি উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডাধিপের বর্ষবৃদ্ধি-নিমিত্তিক এতন্নগরস্থ ও ইতস্ততঃস্থানস্থ যাবদীয় রাজকর্ম্ম-সংক্রান্ত সাহেবলোককে নাচ ও খানানিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন।···গবর্ণমেণ্ট হৌসে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্ব্বদা হইয়া থাকে কিন্তু এই কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়-দিগকে দর্শনার্থ কোন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আমলে আহ্বান হয় নাই শ্রীশ্রীযুত এতদ্দেশীয়দিগকে লইয়া এতাদৃশ আমোদপ্রমোদ করতে ভাবতেই মহাসুখী হইয়াছেন।

ঐ সভায় এতদ্দেশীয় যিনি ২ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখিতেছি।

শ্রীযুত নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব তলবার জঙ্গ বাহাদুর ও আগা কারবেলাই মহম্মুদ সেরাজি ও আকবর আলি খাঁ ও রায় গিরিধারীলাল উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালাচাঁদ বসু ও বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও বাবু রূপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাঁহার দুই পুত্র বাবু সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ও বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র সরকার ও বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাডলিমোহন ঠাকুর ও বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব ও বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামকমল সেন।···

* * * *

বর্ষপঞ্চাশৎ পূর্ব্বে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

বয়স যখন তেইশ ছিল পঞ্চাশ বর্ষ আগে,
তখন যাদের সঙ্গ পেলাম, আজ তারা কেউ নেই!
আনন্দেতে আকুল হোতাম গভীর অনুরাগে,
সেই দিনের সেই তরুণ যুবা বয়োবৃদ্ধ এই!
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে একদিন সন্ধ্যেবেলা
জ্যোৎস্নারাতে হারিয়ে গেলো "আমার দেশের" কবি!
জবরদস্ত পুরুষ একি কোর্‌লো ছেলেখেলা!
"মাতৃহারা" মন্ত্, মায়া রইলো পড়ে' সবি!

২

শক্তিশালী পাঁচকড়ি নেই, নেই সে সমাজপতি!
আগাছায় আজ বোঝাই তরী, টল্‌টলায়মান!
কোথায় গেলো বড়াল কবি, হারিয়ে পুণ্যবতী
আর্ত্তনাদে কাঁদিয়েছিল, আজো কাঁদায় প্রাণ!
ছন্দসরস্বতীর দুলাল সুহৃৎ গেছে চলি'!
শুন্‌ছি এখন বেধড়ক্কা ঢক্কানিনাদ শুধ্!
নেই করুণানিধান কবি!—দুঃখ কা'কে বলি,
কতই অভাব সইতে হোলো,—কোর্‌তো জীবন ধূ ধূ!

৩

"স্বভাব-কবি" তলিয়ে গেলো বুড়ীগঙ্গার জলে!
দুখের দীর্ঘ জীবন-জ্বালা চেঁচিয়ে গেছে ক'য়ে!
ঠাঁই নিলো সে ক'দিন এসে আমার বুকের তলে!
অভিশপ্ত ধনীর দেওয়া দুঃখ গেছে স'য়ে!
গল্পলেখক সরল হৃদয় নেই সুধীন্দ্রনাথ!
সেই তো "রবি কাকার" সাথে ঘটায় পরিচয়!
রবির গভীর স্নেহের আলোয় কাট্‌লো আঁধার রাত!
মহাকালের দরবারেতে ঘুচ্‌লো ঢোকার ভয়।

৪

দুঃখ সুখের সুদূর অতীত বড়ই মধুময়!
এক নাগাড়ে সুখের স্বপ্ন দেখছি রাত্রি জেগে!
আজ্‌কে প্রতিপদক্ষেপেই জাগছে মৃত্যু ভয়!
হোক্ তিয়াত্তর বর্ষ বয়স, রইবো আশায় লেগে।
বাস্তবে যা হয়নি পাওয়া, কল্পনাতে পাই;
মনের কল্প ভুবনে মোর সব যে রমণীয়!
ভবিষ্যতের রঙীন শোভায় মুগ্ধ থাকি তাই,
হাতের নাগাল পাইনে যাদের, তারাই আমার প্রিয়!

৫

ভোগের মাঝেই দুর্ভোগ অনেক, বাসনা ঢের ভালো;
জীবন সদাই মধুর থাকে পাওয়ার অপেক্ষাতে!
প্রাপ্য যেদিন মিল্‌বে সেদিন ফুরিয়ে যাবে আলো!
তাইতো কভু যাইনে দমে' লোকের উপেক্ষাতে!
দীর্ঘ পথের পথিক মানুষ; অতিথ্ চিরদিন,
পতিত এবং পুণ্যবানের পেলাম সবার দেখা;
ছাড়্‌লো কত, মর্‌লো কত, কেউ তারা নয় হীন!
দোক্‌লা চলার সাধ করিনে, এলাম যখন একা!

৬

অনেক-কিছুই বদ্‌লে গেছে। এই তো বর্ত্তমান!
অখণ্ড সেই ভারতবর্ষ ত্রিখণ্ড হয় আজ!
জাত বাঙালী থান কদলী এখন মর্ত্তমান!
নিজের দেশেই র'ন্ প্রবাসী, কোথায় ঘৃণা লাজ!
চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র—কোথায় মানুষ তাজা?
অধঃপতন হোক্ না যতই, সমুত্থান কেবৃ হবে;
মনের কাণে শুনছি জাতির আস্‌ছে ত্যাগী রাজা,
নতুন কোরে' দেশটা ভেঙে গড়বে সগৌরবে!

উইল
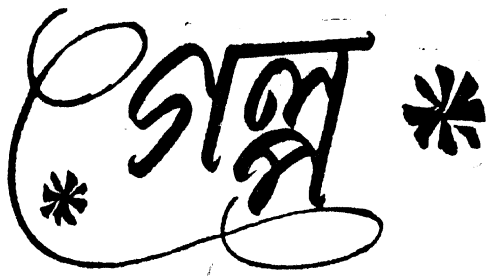
শ্রীবার্ণিক

এক সময়ে খুবই ভাল অবস্থা ছিল ব্রজেনবাবুর। কিন্তু এখন নাকি তার কিছুই নেই।

কী একটা ব্যবসায়েই প্রায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শোনা যায়, মাত্র তিরিশ টাকা মূলধন নিয়ে তিনি যে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই ব্যবসা নাকি তিরিশ লাখ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মাত্র দুই ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যাবার পর ব্রজেনবাবু যেন আরও মুষড়ে পড়লেন। উৎসাহ উদ্দীপনা সব তাঁর হারিয়ে গেল। আবার নতুন করে ব্যবসা করার চেয়ে বড় ছেলে নরেনের ওপরেই যেন নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।

দুই ছেলের মধ্যে নরেনই উপযুক্ত, শিক্ষিত এবং উপার্জনক্ষম। ব্যারিষ্টার হিসেবে সে সুনাম এবং পশারও করেছে যথেষ্ট। তার আয়েই ব্রজেনবাবুর সংসার চলত।

ছোট ছেলে হরেন ম্যাট্রিকটা কোন মতে পাশ করে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়েছে। ব্রজেনবাবুর শত শাসন এবং অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সে আর পড়াশুনার ব্যাপারে অগ্রসর হয় নি।

যত দিন ব্রজেনবাবুর আয়ে সংসার চলেছে ততদিন হরেনের জীবনেও ছিল নিরঙ্কুশ সুখ। কিন্তু যেদিন থেকে নরেন সংসার খরচ দিতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে হরেনের জীবনেও দেখা দিয়েছে অচিন্তিতপূর্ব দুঃখের আভাস।

সুযোগ পেলেই নরেন বলত হরেনকে—বসে বসে খাস, লজ্জা করে না? ওসব চলবেনা, আমি বসিয়ে খাওয়াতে পারব না।

প্রতিবাদ করার ইচ্ছা জাগলেও নিতান্ত সঙ্গত কারণেই কিছু বলত না হরেন। নীরবে সব কিছু সহ্য করে যাওয়াই বিধেয় বলে মনে করত।

কিন্তু তাতে বিপরীত ফলই ফল্‌ল। নরেনের কথার আক্রমণ তাতে বেড়েই চলল। শ্লেষ করে আবার এক দিন হরেনকে বলল নরেন—এ তোমার বাবার পয়সা নয় যে ঘরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো। আমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা! হয় কাজ-কর্ম করো—নয় পথ দ্যাখো।

কথাগুলো খচ্ করে হরেনের মনে গিয়ে বিঁধলো। ব্যথা যত না পেল, জ্বালা হল তার চেয়ে অনেক বেশী। আর মনের সেই জ্বালা কমাতেই কয়েক দিনের মধ্যে একটা চাকরিতেও ঢুকে পড়ল হরেন।

কিন্তু তাতেও নরেনের কথার আক্রমণ কমল না। অসহ্য অভিব্যক্তির সঙ্গে একদিন বলল সে হরেনকে—তোর আর কি, বিয়ে থা করিস নি—বাউণ্ডুলে তো হবিই। না আছে চিন্তা, না কিছু। ভাবলে ওই কটা টাকা দিলে চলবে না। আমার ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের ভবিষ্যতের কথা আমার ভাবতে হয়। কেবল তোদের পেছনে খরচ করলেই আমার চলবে?

এতদিন কেবল শুনেই এসেছে হরেন। কিন্তু সেদিন আর চুপ করে থাকতে পারল না। তাই নরেনের মুখের ওপরেই বলে বসল—কী এমন খরচটা হয় শুনি! ঢের তো আয় করো।

—ঢের তো মানে? সাতশো টাকার আড়াইশো টাকা তো তোমরাই খেয়ে বসে থাক! এর ওপরে আমার গাড়ীর খরচ, ছেলে-মেয়েদের খরচ তো আছেই। সে সব খরচ কোত্থেকে আসবে তা বলতে পারো?

—করলেই না হয় বাবার জন্যে—ভায়ের জন্যে খরচা। সেটা কি খুব বেশী? ওঁর জন্যই তো তোমার যা কিছু। কে তোমায় বিলেত পাঠিয়েছে, কে তোমায় মানুষ হবার জন্যে সর্বরকমে সাহায্য করেছে?

—হরেন! বড় বেশী বেড়েছিস। নরেনের মেজাজ তখন ধৈর্যের বাইরে।

প্রকৃতপক্ষে মাসে পাঁচ হাজার টাকারও বেশী আয় করত নরেন। কিন্তু সে কথা সে একেবারেই গোপন করে গেল।

নরেনের কথায় কিন্তু হরেন একটুও চুপ করল না। বরঞ্চ আরও গলা চড়িয়ে বলল সে—এখন আর ছেলেমানুষ নেই যে গলাবাজি করে সব কিছু থামিয়ে দেবে। সত্যি কথা বলব তাতে ভয়টা কিসের? বাবা তোমায় বিলেত না পাঠালে তুমি ব্যারিষ্টার হতে পারতে? পারতে জীবনে দাঁড়াতে?

—বাবা করেছেন মানে? আমার চেষ্টা, আমার মাথা না থাকলে কি ওঁর চেষ্টায়, ওঁর মাথায় আমার ব্যারিষ্টারী পাস হয়েছে? কি বলতে চাস?

—বাঃ! চমৎকার! ছি ছি ছি!

—ছি ছি কিসের। নিশ্চয়ই আমার মাথায়, আমার চেষ্টায় আমার যা কিছু। এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। মনে করনা তাতে তোমার অথবা বাবার কোনও ভাগ আছে। আমার যা কিছু তা আমারই কৃতিত্বে।

—কে চায় তোমার আয়ের ভাগ! তবে এও মনে রেখ, তোমার কুটবুদ্ধি দিয়ে তুমি যে আমার অধিকারকে অনুগ্রহে পরিণত করবে তা-ও হতে দেবনা।

—সব তাতেই জ্যাঠামি। এতোই যদি দরদ তো বাবাকে খাওয়ালেই পারিস। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়েই বুঝি কর্তব্য শেষ!

—তা কি করব। যা পাই তাতে ওর চেয়ে বেশী দেওয়া যায় না।

—আমার বুঝি সবই বেশী।

—নয়তো কি। তোমাকে তো বাবা দুধলো গরুই দিয়েছেন, তোমার অভাব কিসের!

—মানে? দুধলো গরু মানেটা কি?

—ব্যারিষ্টারী ডিগ্রিটা দুধলো গরু ছাড়া আর কি। ওই ডিগ্রিটার জোরেই তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার কর।

—রাখ্ রাখ্, ওসব কথার ফাঁকি আমি বুঝি। দাদার পয়সা পেলে অনেক ভাইই এরকম গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারে। যত্তোসব!

—থাক্ দাদা, আমার ঘাট হয়েছে। বাবা বেঁচে থাকতে এসব কথা না হয় আর না-ই তুল্লে।

নরেন কিন্তু ততক্ষণে রাগে গরগর করতে করতে সেখান থেকে চলে গিয়েছে।

বালিগঞ্জ অঞ্চলেই ব্রজেনবাবুর বাড়ী।

বাড়ীটা বিরাট না হলেও একেবারে ছোট নয়। আজ প্রয়োজনীয় মেরামতীর অভাবে সে-বাড়ী হতশ্রী হলেও, সেই বাড়ীই ব্রজেনবাবুর প্রাণ। শত হলেও নিজের বাড়ী তো!

সেই বাড়ীর প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে নরেনকে বলতেন ব্রজেনবাবু—তুই তো ইচ্ছে করলেই বাড়ীটা সারাতে পারিস। দেনা সারিয়ে!

নরেন কিন্তু বুদ্ধিমানের মত প্রশ্নের জবাব দিত। বলত —একথা বলে আমায় আর লজ্জা দেবেন না বাবা। যা আয় করি তাতে মাস-খরচ চালানই দায়, তার উপর আবার বাড়ী সারান।

—ও! দীর্ঘশ্বাস পড়ত ব্রজেনবাবুর। তাঁর ঠিক বিশ্বাস হ'ত না ছেলের কথা।

একদিন এ্যাটর্নি রায়ের চেম্বারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন ব্রজেনবাবু—তুমি তো সবই জান আমার। নিজের দোষেই আজ আমার এই অবস্থা। কপর্দকহীন পরমুখাপেক্ষী!

—কেন, কি হ'ল?

—এখনও কিছু হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতে হবে।

—ঠিক বুঝচি না, স্পষ্ট করে বলোতো দেখি।

—বড় ছেলেটার কথাই ভাবছি। ওর চালচলন দেখেই একটু ভাবনা হয়েছে। বাড়ীটাও সারাতে চায় না, আমাকেও খেতে দিতে যেন আপত্তি—

—যদি না-ই দেয়, তাতে কি তোমার খাওয়া ঠেকবে? সেই যে নগদ ষাট হাজার টাকা পেলে সেগুলো কি করেছ? খরচ করে ফেলেছ নাকি?

—না, সে টাকা আছে। কথা তা নয়। আমি বেঁচে থাকতেই এই—মরলে কি হবে। আমি না হয় মরে বাঁচবো,

কিন্তু হরুটার—ওই মুখ্যুটাকে তো ও সবই ফাঁকি দেবে। ওটা কি নিজেরটা সব বুঝে নিতে পারবে?

—আই সি! এই কথা! তা এর জন্যে এত ভাবনা? উইল করে যাও, যাকে যা দেবার তাই দিয়ে যাও—তা হলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। বাই দি বাই—সেই টাকাগুলো কোথায়? ব্যাংকে রেখেছ?

—না, সিন্দুকে।

এবারে ব্রজেনবাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কি সব যেন বললেন মিঃ রায়।

দেখা গেল ব্রজেনবাবু হঠাৎ হাত নেড়ে বলে উঠেছেন —কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। শত হলেও, শত হলেও—

—তুমি চুপ করো তো। আমি যা বলি তাই শোন। ব্রজেনবাবুকে থামিয়ে দিলেন মিঃ রায়।

অগত্যা মিঃ রায়ের কথাতে রাজী হয়েই যেন চলে এলেন ব্রজেনবাবু।

ক' চাল চিন্তা করে ঘুঁটি চালে নরেন—সেটা এতদিন ঠিক বুঝতে পারেন নি ব্রজেনবাবু। সংশয়ের ধোঁয়ায় মনটা আচ্ছন্ন হলেও, পিতৃ-স্নেহের প্রভাবে প্রায়ই সে সংশয় সরে যেত মন থেকে। কিন্তু পর পর নরেনের কথাবার্তায় ও চাল-চলনে ক্রমেই তাঁর সন্দেহ বাড়তে থাকলো। ব্রজেনবাবু স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, তিনি ও হরেন নরেনের গলগ্রহ বিশেষ।

নরেনের মনোভাব অনুভব করতে পেরে হরেনও একদিন ব্রজেনবাবুকে বলে বসল—বাবা, দাদার মতলব-টতলব কিন্তু আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না। আপনি চোখ বোজার পর আমার যে কি দশা হবে তা ভগবানই জানেন। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই তাড়িয়ে দেবে।

—দেবেই তো। একশবার দেবে। নয় তো কি, রাজার আদরে পুষবে? লজ্জা করে না, বড় ভায়ের নামে নালিশ করতে আসিস! যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। রেগে বলে উঠলেন ব্রজেনবাবু।

ধমক খেয়ে চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো হরেনের। আর কোন কথা বলল না সে।

কোর্টে বেরোবার আগে রোজই নরেন ব্রজেনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যেত। সেদিনও তেমনি দেখা করতে গেল সে।

ছেলেকে দেখে বললেন ব্রজেনবাবু—তোকে ক'টা কথা বলার ছিল, এখন কি শোনার সময় হবে তোর?

—বলুন না কি কথা।

—বাড়ীটা সারানোর কথাই বলছি। কখন মরে যাব তার ঠিক নেই। তাই ভাবছি এ সাধটা অপূর্ণ থাকলে আত্মাটা শান্তি পাবে না। অথচ তোর কথা শুনে যা বুঝচি তাতে তোরও এমন ক্ষমতা নেই যে বাড়ীটা এখন সারাতে পারিস।

—সত্যি বাবা, পারলে কি আর বারবার আপনার বলতে হ'ত!

—এখন তো তাই-ই মনে হচ্চে। সত্যিই তো, কোত্থেকে পারবি। যে বাজার! আমারও এমন কপাল যে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে পারলুম না।

—কেন এমন হ'ল বাবা? বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল নরেন।

—আর কেন, লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। ভগবানের ধন চুরি করলে এমন দশাই হয়।

—ভগবানের ধন চুরি? অবাক হয়ে চেয়ে রইল নরেন।

—নয় তো কি! সবই তো তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভুলে গেলাম ন্যায়-অন্যায়। ভাবতাম, আমি যা আয় করি তার সবই আমার। তাই নিজের ভোগ-বিলাসে খরচ করতে লাগলাম হাজার হাজার টাকা। কিন্তু যাঁর দয়ায় আমার এত সুখ-সম্পদ, তাঁর সেবায় দিতাম না এক কপর্দকও। সে জন্যে শাস্তিও পেলাম হাতে হাতে—অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতেই হবে।

—অন্যায় কেন?

—কেন নয়? আমার তো শুধু সেইটুকু—যেটুকু ভালভাবে খেয়ে-পরে থাকার জন্যে লাগে। উদ্বৃত্তটা তো সবই তাঁর, তাতে আমার কি অধিকার। আত্ম-সুখকে বড় করে কর্তব্যে করলাম অবহেলা; করলাম তাঁর ধন চুরি। নইলে এ দশা হয়। বলে হাঁফাতে লাগলেন ব্রজেনবাবু।

বিচক্ষণ অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ নরেন। বাদী প্রতিবাদী সকলের কথাই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়ে ধৈর্য ভরে শুনবার

অভ্যেস আছে তার। সেখানে নরেনের প্রতিটি ভ্রুকুটিই বক্তার প্রতিটি কথার সূক্ষ্ম বিচার করে; বিশ্লেষণের ছাঁকুনিতে ছেঁকে বার করে সে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য। ব্রজেনবাবুর কথাগুলোও সে তেমনি সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল নরেন—এখন ওসব থাক বাবা। আপনার শরীর ভাল নেই। পরে সময় মত না হয় এ নিয়ে যা বলার বলব।

—না না, পরে টরে নয়। হরেনটা বাড়ী নেই—এই-ই সুযোগ।

সুযোগ? সুযোগ কেন? বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকলো নরেন। বলল—বলুন তাহলে, কি কথা?

—বলছি, সব বলছি। কিন্তু তোর কোর্টের দেরী হ'য়ে যাবে না তো?

—না, হবে না। আপনি বলুন।

—বলবই তো, তোকে না বললে আর কাকে বলব। অবাক হয়ে যাবি সে সব শুনে।

নরেনের বিস্ময় তখন বেড়েই চলেছে।

ব্রজেনবাবু বলতে থাকলেন—ব্যাংকের দেনা, পাওনাদারদের টাকা শোধ করতে গিয়ে আমার সব টাকাই শেষ হয়ে গেল। আবার সেই পথেই এসে দাঁড়ালাম। তুই তখন বিলেতে। রাত্রে ঘুম নেই, কোথা থেকে তোর পড়ার খরচ চালাবো। অথচ তোর পরীক্ষারও আর মাত্র চার মাস বাকি। টাকা যে আমার তোকে পাঠাতে হবে। মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ষাট হাজার টাকা পেয়ে গেলাম। আর সেই টাকা থেকেই তোর যাবতীয় খরচা চালিয়ে বাকি টাকাটা সিন্দুকে তুলে আগলে রেখেছি যক্ষের ধনের মত।

কথার মাঝখানে বাধা দিল নরেন। বিস্ময়ে সে তখন বলে উঠেছে—বলেন কি, ষাট হাজার টাকা!

—হ্যাঁরে, পঞ্চান্ন হাজারের মতই এখন রয়েছে সিন্দুকে। বয়েস গিয়েছিল বলে সেই টাকা দিয়ে নতুন করে আর কোন ব্যবসা করতে সাহস পাইনি। ইচ্ছে ছিল টাকাটা তোকে আর হরুকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যাব। কিন্তু এখন ভাবছি, ওই টাকা থেকেই বাড়ীটা সারাবো। আর বাকি টাকাটার এমন একটা বন্দোবস্ত করে যাব যাতে হরু কেবল সেই টাকার সুদটাই তুলতে পারে। আসল টাকা ওর হাতে পড়লে ওটা দু-দিনেই তা ফতুর করে দেবে। তুই কি বলিস?

—সে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—

—নারে, এর মধ্যে আর কোনো বলাবলি নেই। ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর খাওয়া-পরার অভাব হবে না। কিন্তু ওই অপদার্থটার জন্যে কিছু না করে গেলে ওটা না খেয়ে মরবে।

টাকার অঙ্কটা শোনার পর থেকে বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করতে আরম্ভ করেছিল নরেনের। বুকে হাতে যেন জোর পাচ্ছিল না সে। তাই কোন রকমে বলল—আমার কথা হ'ল—

নরেনকে কথা শেষ করতে দিলেন না ব্রজেনবাবু। বললেন—আমি জানি তুই কি বলতে চাস। কিন্তু ওছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। নইলে মুখ্যুটার দুর্দশার অন্ত থাকবে না। এ জন্যে তুই দুঃখ পাস নি।

—না বাবা, ও দেওয়া-নেওয়ার কথা আমি কিছুই ভাবছি না। আমি ভাবছি আমার কর্তব্যের কথা। বড় ছেলে হিসেবে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করলেন, আর আমি কিছু করব না তা হয়। ও টাকা সম্পত্তি আপনি যাকে খুশী দিন, সে আমি জানতে চাইনে। তা ছাড়া এও বা আপনি ভাবেন কি করে যে, আমি বেঁচে থাকতে হরেন না খেয়ে মরবে। আমি যদি রাজভোগ খাই তো ও-ও রাজভোগ খাবে। সে যাক্, যদি অনুমতি দেন তো বাড়ীটা সারাবার বন্দোবস্ত আমি আমার টাকা দিয়েই করি। আপনার গচ্ছিত টাকা গচ্ছিতই থাক।

—এ তুই কি বলছিস, এরকম কথা তো আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। জল জল করে উঠলো ব্রজেনবাবুর চোখ দুটো। বললেন—সারাবি যে, তুই টাকা পাবি কোথায়?

—সে আমি বন্দোবস্ত করব। না হয় ঋণই হবে একটু। তা বলে আপনার মনের সাধ অপূর্ণ থাকবে, তা হয় না। এতটা আগ্রহ আপনার—তা যদি আগে বুঝতাম, তবে কবে সারানোর বন্দোবস্ত করে ফেলতাম না!

হঠাৎ যেন আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল ব্রজেনবাবুর মনের ওপর দিয়ে। খুশীর আবেগে আত্মহারা হয়ে বললেন—এই তো ছেলের মত কথা। এমন কথা শুনতেই তো মনটা চায়। বড় আনন্দ দিলি বাবা, বড় আনন্দ দিলি। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত, আর আমার কোন ভাবনা নেই। বলতে বলতে বালিশের তলা থেকে সিন্দুকের চাবিটা বার করে বললেন—এই নে চাবিটা, এখন থেকে চাবিটা তোর কাছেই থাকবে। আমার অবর্তমানে তোরই তো সব দায়িত্ব।

আনন্দে বুকের ভিতরটা দুলে উঠলেও মুখে বলল নরেন—ও চাবি-টাবি আমার দরকার নেই। ওসব আপনার কাছে থাকুক।

—দরকার নেই কিরে, খুব দরকার আছে। কখন হঠাৎ মরে যাব, তখন সিন্দুকের চাবি পেয়ে হরুটা সব উড়িয়ে দিক আর কি। আমার অনেক রক্ত জল-করা টাকা রে, অনেক রক্ত জল-করা টাকা।

ব্রজেনবাবুর কথার দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না নরেনের। ছিল সিন্দুকের ওই চাবিটারই দিকে। তাই চাবিটা হাতে নিয়ে বলল সে—এটা আপনার কাছে থাকলেই ভাল হত না কি? নেহাৎ আপনি বলছেন তাই না নিয়ে পারছি না। নাহলে—

—যার কাছে থাকলে সব চেয়ে ভাল হবে তাকেই দেওয়া হয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন ব্রজেনবাবু।

—আমি তাহলে এখন যাই বাবা? কোর্টের অনেক দেরী হ'য়ে যাবে তা না হলে।

—আচ্ছা আয়।

ততক্ষণে নরেনও পা বাড়িয়েছে।

কোর্ট থেকে ফিরে এসে সেদিন রাত্রেই নরেন তার স্ত্রী মিনতিকে বলল চুপি চুপি—জানো বাবার সিন্দুকে কত টাকা আছে?

—কত?

—অনেক, অনেক—সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। তাইতো ভাবি, লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন, সবই কি গ্যাছে। এ্যাটর্নি মিঃ রায় তো তাহলে ঠিকই বলেছিলেন।

—কি বলেছিলেন গো?

—বলেছিলেন বাবার সিন্দুকে নাকি ষাট হাজার টাকা আছে।

—হ্যাঁ, বলো কি!

—হ্যাঁগো, দাঁড়াও না—দাঁওটা এবারে মারতেই হবে। কেবল কয়েকটা বছর সময় চাই। আগে বাবা মরুন, তারপরে দেখো—। জানো মিনু, বাবাকে দিলাম অ্যায়সা চাল যে একেবারে সিন্দুকের চাবি আমার হাতে এসে গেল। বলে চাবিটা উঁচিয়ে ধরল নরেন।

—ও মা! কি সাংঘাতিক লোক গো তুমি। সাধে কি আর নামজাদা ব্যারিষ্টার! চোখ দুটো গোল করে বলল মিনতি।

—হে হে হে! আগে বাড়ীটা সারাতে দাও, তারপরে গ্যাখোনা কি করি।

কয়েক দিনের ভিতরেই বাড়ী সারানো হয়ে গেল নরেনের। টাকা যা খরচ হ'ল তার সবই তার চল্লিশ হাজার ব্যাংক-ব্যালেন্স থেকেই।

এদিকে সব দেখে-শুনে হরেনও খুব অবাক হ'য়ে ব্রজেনবাবুকে বলে বসল—কী ব্যাপার বাবা, দাদা যে হঠাৎ বাড়ীটা সারিয়ে ফেলল।

—কেন, সেটা কি অসম্ভব কিছু? নিজেদের বাড়ী না সারানোই তো অস্বাভাবিক। সে সারাক না সারাক, তা দিয়ে তোর কি দরকার! যা, নিজের কাজ করগে যা।

ব্যাপার বেগতিক দেখে সেখান থেকে সরে পড়ল হরেন।

বাড়ী সারানো হ'য়ে যাবার পরই ব্রজেনবাবুকে বলল নরেন—বাড়ী তো সারালাম, আর যদি কোনও সাধ থাকে তো বলুন—

ব্রজেনবাবু বলতে থাকলেন—নারে, যা করেছিস তাই-ই বেশী। দিন আমায় ফুরিয়ে এসেছে রে, ফুরিয়ে এসেছে। বার বারই মনে হয়, কী কোরলাম সারাটা জীবন। এত সুখ, এত ঐশ্বর্য পেয়েও হারালাম। ফাঁকি বুদ্ধি থাকলে তার এই পরিণামই হয়, ভগবান তাকে এমনি ভাবেই বঞ্চিত করেন।

নরেনের মাথায় তখন অন্য বুদ্ধি খেলছে।

* * *

একদিন যেমন আকস্মিকভাবে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন ব্রজেনবাবু, তেমনি একদিন আকস্মিকভাবে চলেও গেলেন।

ব্রজেনবাবু মারা যাবার পর হরেনের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলল। স্নেহের আকর্ষণ নেই, ঘরের বন্ধন নেই—তাই ঘর ছেড়ে বাইরের দিকেই তখন বেশী মন হরেনের। এমন কি সংসারে টাকা দেওয়াও সে বন্ধ করে দিল।

নরেনের কাছে সেই টাকা না দেওয়াটাই শাপে বর হ'ল। টাকা বন্ধ করে দেবার পরিপ্রেক্ষিতেই হরেনকে একদিন বলল নরেন—বলি ভেবেছটা কি? এখন বাবা নেই যে তাঁর ভয়ে কিছু বলব না। হয় খরচ দাও, নয় সরে পড়।

আগুনে ঘি ঢালা হ'ল। রেগেমেগে নরেনের মুখের ওপরেই বলে বসল হরেন—কেন, এটা আমার বাড়ী নয়? সরে পড়ব কিসের জন্যে! তোমারও যেমন, আমারও তেমন। খেতে দিতে না চাও, আমি আলাদা খাব।

—বেশ তাই-ই খেও। বলে হন হন করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল নরেন

রাত তখন একটার কম নয়। হরেন তখন গভীর ঘুমে। নরেন সেই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এসে ঘুমন্ত স্ত্রীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল—ওঠ, ওঠ মিনতি।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বলল মিনতি—কি হয়েছে?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপা গলায় বলল নরেন—চুপ। কথা ব'ল না। এসো আমার সঙ্গে। বলে এগোতে থাকলো সে।

নরেনের পিছনে পিছনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল মিনতি—কি ব্যাপার গো? ঠাকুরপোর কিছু হয় নি তো?

—না না, চলো না আমার সঙ্গে—দেখতেই পাবে। বলতে বলতে ব্রজেনবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল নরেন।

এবারে ট্যাঁক থেকে নরেনকে সিন্দুকের চাবিটা বার করতে দেখে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'য়ে গেল মিনতির কাছে। আস্তে বলল সে—কী সাংঘাতিক! ঠাকুরপো জেগে নেই তো?

—থামো তো! বলে টর্চটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, নরেন—লাইটা ভাল করে সিন্দুকের দিকে ধরতো।

বুকটা তখনও কাঁপছিল নরেনের। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা উত্তেজনায়। আস্তে আস্তে চাবিটা ঘুরিয়ে সিন্দুকের হ্যাণ্ডেলটায় চাপ দিল সে। খট্ করে একটা শব্দ হয়েই সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল। সেই সামান্য শব্দেই চমকে উঠলো নরেন। এবারে মুখ তুলে মিনতির দিকে তাকালো সে।

মিনতির মুখেও তখন চাপা উত্তেজনা। কাঁপা গলায় বলল সে—এতও জান বাপু। একেই বলে ব্যারিষ্টারী বুদ্ধি।

—তা তো বটেই। বলতে বলতে টান দিয়ে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেলল নরেন।

কিন্তু 'হা হতোস্মি।' কোথায় টাকা! সারা সিন্দুকে একটা চিঠি আর গোটা কয়েক সোনার দুল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেল না নরেন। পাগলের মত হ'য়ে গেল সে। তন্ন তন্ন করে ঘাঁটলো সিন্দুকটা। কিন্তু টাকার ছায়াও দেখতে পেল না।

চিঠি পড়ার মত মানসিক অবস্থা তখন ছিল না নরেনের। তাই চিঠিটা মিনতির হাতে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সে। মুখ দিয়ে তার অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে পড়ল—বাবা আমার সঙ্গে শেষে এই করল!

নরেন তখন অজ্ঞান হবার উপক্রম।

ওদিকে মিনতি তখন চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

চিঠিতে লেখা ছিল:

স্নেহের নরেন,

তোমার মতিগতি দেখিয়া সংশয় হওয়ার জন্যেই পিতা হইয়াও তোমার সহিত একরূপ শঠতাই করিতে হইয়াছে। সিন্দুকে টাকা নাই। টাকা অথবা গহনার সব কিছুই ব্যাংকে গচ্ছিত রহিয়াছে। তোমাকে এক পঞ্চমাংশ ও বাকিটা হরুকে উইল করিয়া দিয়া গেলাম। এ ব্যাপারে সকল কিছুই আমার এ্যাটর্নি মিঃ রায়ের নিকটে জানিতে পারিবে। শীঘ্রই সংবাদ লইও। যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি—তজ্জন্য ক্ষোভ রাখিও

না। যাহা পাইয়াছ তাহাতেই সুখী থাকিতে চেষ্টা করিও। জানিয়া রাখিও, 'চালাকি অথবা অধর্মের দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না'। তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত, প্রার্থনা করি জীবনে আরও উন্নতি লাভ করো। ঈশ্বরের নিকট তোমাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আশীর্বাদক—বাবা

বলা বাহুল্য, কয়েকদিন বাদে মিঃ রায়ই হরেনকে ব্রজেনবাবুর উইলের কথা জানিয়ে গেলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও স্বদেশী-সঙ্গীত

নির্মল দত্ত
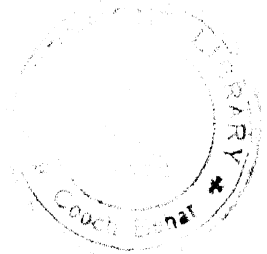
দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী-সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনের মূল্য সম্পদ। তাঁর যে কবিচিত্ত স্বদেশ মহিমার গীত-ঝঙ্কারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল, তা বাংলা কাব্যজগতে এক অমর সৃষ্টি। সেই মাতৃ-মন্ত্রের উদ্গাতা দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে সুরের রেশ, ভারতবাসীর কানে কানে শুনিয়েছিলেন যে মন্ত্র —তা সমগ্র দেশবাসীকে নতুন জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। শাশ্বত ও চিরন্তনী সেই সুর আজও আমাদের কানে বাজে :

জননি-তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

বাংলা দেশকে তিনি একেবারে আপন ক'রে দেখলেন। সে যেন সর্বেসর্বা। সে বঙ্গমাতা যেন সবার শ্রেষ্ঠা।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।

শুধু বাংলা দেশ নয়। সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখ্‌লেন তিনি ধর্ম ও কর্ম জ্ঞানের বিরাট এক ক্ষেত্ররূপে। তাই তিনি গাইলেন—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী,
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমির চেয়ে যেন আর কোন দেশ বড় নয়। নিজের জন্মভূমিকে এত বড় ক'রে দেখ্‌তে পেরেছিলেন ব'লেই তিনি মাতৃ-বন্দনায় আত্মহারা হ'য়ে যেতে পেরেছিলেন! তিনি বিলেতে গেলেও আসল সত্যের সন্ধান পেলেন যেন নিজের জন্মভূমিতে। সকল গুণের আধার তাঁর জন্মভূমি। তাঁর মন তাই ঘুরে বেড়িয়েছে সেই দেশের আকাশে-বাতাসে, মাঠে-মাঠে, অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মাঝে! দেখেছে নতুন স্বপ্ন। স্বপ্ন দিয়ে তৈরী যেন সে দেশ! তিনি গেয়েছেন—

এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবেনাকো তুমি ;
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

দেশকে ভালবাসতে পেরেছিলেন ব'লেই তিনি কোনদিন দেশের প্রতি অন্যায় বা সেই দেশের মানুষের কাপুরুষতা ও আবিলতাকে সহ্য করতে পারেন নি। সেই কাপুরুষতা ও ক্লীবত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মন সর্বদাই বিদ্রোহ করে উঠেছে।

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে,
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে।

সদুপদেশ

উপানন্দ

বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে শুধু যে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় তা নয়, সাংসারিক জীবনে বহু বিষয়ে সাবধান হয়েও চলতে পারা যায়। অলস ও অপব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হতে পারে না, সৌভাগ্যও তার অনায়াসসাধ্য নয়। যারা একটি মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করেনি, এরূপ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারের ফলেই সমগ্র জগত চলে থাকে। যে সব দেশে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য, সেই দেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। এদেশে এখনও কেউ সময়ের মূল্য বুঝতেই শিক্ষা করে নি। কার্য্যের যথাযোগ্য সুবন্দোবস্ত যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণই সময় নষ্ট হবে। পরিশ্রমই মানুষ প্রস্তুত করে, অদৃষ্ট নয়। অদৃষ্টের সাধক আশায় নিশ্চেষ্ট আর অকর্ম্মণ্য হয়ে হতাশার করালগ্রাসে প্রায় আত্মসমর্পণ করে চিরতরে নষ্ট হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষাতেই বড় বড় সর্ব্বনাশ ঘটে। একের উপার্জ্জনে দশ জনে বসে খাওয়া উচিত নয়, এতে দেশের দীনতা বৃদ্ধিপায়। বর্ষ পরে বর্ষ প্রতিদিন জীবনের এক একটি দিন চুরি করে ক্রমে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হরণ করে সরে পড়ে। বর্ষ জীবনের প্রত্যেকটি দিন অপহরণ করছে, ক্রমে জীবনও অপহৃত হবে। প্রত্যেক মানব জীবন এক একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস বই আর কিছুই নয়, সেই জীবন ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শুদ্ধ আহার বিহারের চিন্তাই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত নয়। জ্ঞান সাংসারিক হওয়া উচিত' কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান হওয়া উচিত নয়। সিসিরো বলেছিলেন, সংসারেই হোক আর রাজ্যেই হোক, মিতব্যয়িতাই ধনাগমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যারা দুর্ব্বল, তারাই জীবনের মমতা বেশী করে থাকে। এ রোগ সংক্রামক, দুদিন অতিবড় সাহসীর নিকট থাকলেও তাকে সংক্রমিত করে তোলে। মনুষ্যচরিত্র চক্ষু এবং কর্ণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কেবল দেখ, শোনো—আর বহুদর্শিতার দ্বারা চরিত্রের পরিপুষ্টতা লাভ করো। সংগ্রামই জীবন। কাপুরুষেরাই দৈবের দোহাই দিয়ে থাকে, জীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেলে ঠক্‌বার আশঙ্কা থাকে না। মানুষ নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। জীবনকে সার্থক করতে হলে সকলের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করা দরকার। সঙ্কোচে জীবন খণ্ডিত হয়। বর্ত্তমান সভ্যতা আলকাতরার মত কালো। ইংরাজীতে এই সভ্যতাকে 'কোল টার সিভিলিজেসন' বলে। যে মানুষের মনের কোন ক্রিয়া নেই, সে মানুষ কখনও অর্থ অর্জ্জন করতে পারে না, তার ব্যবহারও জানে না। দেশভ্রমণের দ্বারা নিজে চিত্তের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করা যায় না। মানুষের ভেতর পশুত্ব আছে। পশুত্বকে হনন বা নিয়ন্ত্রিত করার সাধনার নামই জীবন। এই জীবন দীর্ঘ করতে হলে সংযম ও শৃঙ্খলা আবশ্যক। জিহ্বার সংযম প্রয়োজন। আত্ম-গৌরব প্রচার করার জন্য মানুষ অসত্য ভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা ঠিক নয়। আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন মানুষ অপরের হেয়। কাজের অপর নাম

সদুপদেশ

উপানন্দ

বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে শুধু যে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় তা নয়, সাংসারিক জীবনে বহু বিষয়ে সাবধান হয়েও চলতে পারা যায়। অলস ও অপব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হতে পারে না, সৌভাগ্যও তার অনায়াসসাধ্য নয়। যারা একটি মহূর্তও বৃথা নষ্ট করেনি, এরূপ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারের ফলেই সমগ্র জগত চলে থাকে। যে সব দেশে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য, সেই দেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। এদেশে এখনও কেউ সময়ের মূল্য বুঝতেই শিক্ষা করে নি। কার্য্যের যথাযোগ্য সুবন্দোবস্ত যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণই সময় নষ্ট হবে। পরিশ্রমই মানুষ প্রস্তুত করে, অদৃষ্ট নয়। অদৃষ্টের সাধক আশায় নিশ্চেষ্ট আর অকর্ম্মণ্য হয়ে হতাশার করালগ্রাসে প্রায় আত্মসমর্পণ করে চিরতরে নষ্ট হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষাতেই বড় বড় সর্বনাশ ঘটে। একের উপার্জ্জনে দশ জনে বসে খাওয়া উচিত নয়, এতে দেশের দীনতা বৃদ্ধি পায়। বর্ষ পরে বর্ষ প্রতিদিন জীবনের এক একটি দিন চুরি করে ক্রমে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হরণ করে সরে পড়ে। বর্ষ জীবনের প্রত্যেকটি দিন অপহরণ করছে, ক্রমে জীবনও অপহৃত হবে। প্রত্যেক মানব জীবন এক একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস বই আর কিছুই নয়, সেই জীবন ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শুদ্ধ আহার বিহারের চিন্তাই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত নয়। জ্ঞান সাংসারিক হওয়া উচিত' কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান হওয়া উচিত নয়। সিসিরো বলেছিলেন, সংসারেই হোক আর রাজ্যেই হোক, মিতব্যয়িতাই ধনাগমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যারা দুর্ব্বল, তারাই জীবনের মমতা বেশী করে থাকে। এ রোগ সংক্রামক, দুর্দিন অতিবড় সাহসীর নিকট থাকলেও তাকে সংক্রমিত করে তোলে। মনুষ্যচরিত্র চক্ষু এবং কর্ণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কেবল দেখ, শোনো—আর বহুদর্শিতার দ্বারা চরিত্রের পরিপুষ্টতা লাভ করো। সংগ্রামই জীবন। কাপুরুষেরাই দৈবের দোহাই দিয়ে থাকে, জীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেলে ঠক্‌বার আশঙ্কা থাকে না। মানুষ নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। জীবনকে সার্থক করতে হলে সকলের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করা দরকার। সঙ্কোচে জীবন খণ্ডিত হয়। বর্ত্তমান সভ্যতা আলকাতরার মত কালো। ইংরাজীতে এই সভ্যতাকে 'কোল টার সিভিলিজেসন' বলে। যে মানুষের মনের কোন ক্রিয়া নেই, সে মানুষ কখনও অর্থ অর্জ্জন করতে পারে না, তার ব্যবহারও জানে না। দেশভ্রমণের দ্বারা নিজে চিত্তের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করা যায় না। মানুষের ভেতর পশুত্ব আছে। পশুত্বকে হনন বা নিয়ন্ত্রিত করার সাধনার নামই জীবন। এই জীবন দীর্ঘ করতে হলে সংযম ও শৃঙ্খলা আবশ্যক। জিহ্বার সংযম প্রয়োজন। আত্ম-গৌরব প্রচার করার জন্য মানুষ অসত্য ভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা ঠিক নয়। আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন মানুষ অপরের হেয়। কাজের অপর নাম

পূজা। শ্রম সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধক। সব বিষয়কে জটিল করে তোলাই বুদ্ধিমান লোকদের প্রধান কাজ। সত্যদ্রষ্টার কাছে মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয়। স্বার্থপর লোকেরা সচল জগতে নিশ্চল ও মৃত। স্মৃতি বাস্তব নয়—বাস্তবের ছায়া মাত্র। অজ্ঞানতার কোন বিকার নেই, জ্ঞানে বিকার আছে। মানুষ যার সঙ্গে দিনরাত মেশে, তার দোষগুণ পেয়ে থাকে। স্নেহ মানুষকে সর্বপ্রকার জাগতিক ব্যাপারে অন্ধ করে রাখে। দুঃখে কষ্টে পড়লে মানুষের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হয়। জ্ঞান ফিরে আসে। ধনীর দরিদ্রের জন্য সমবেদনা তার খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। শিল্পে ঋণ পরিশোধ করে, কিন্তু হতাশা ঋণ বৃদ্ধি করে। বড় কাজ করতে হলে, ছোট কাজে প্রথমে হাত দিতে হয়। মানুষ কখন অসৎ পথ দৈবাৎ অবলম্বন করে না, তা তার সম্পূর্ণ অনুমোদিত আর বহুদিনের চেষ্টার ফল। এজন্য তাকে ক্ষমা করা যায় না, তার অসৎকাজে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। সুদীর্ঘ দিনকে ছোট করে তোমরা নিজের কাছে যত ঋণী, অপরের কাছে তত নও। নিজের সুখের জন্য অপরকে প্রতারণা করা উচিত নয়। প্রকৃত বন্ধু দিতে চায়, কখন নিতে চায় না। নির্ব্বাক থাকলে কাকেও ক্ষুণ্ণ করবার সম্ভাবনা কম। খোস্ মেজাজ সুখের প্রধান উপকরণ। জীবন সুদীর্ঘ করতে হলে আহার কমানো দরকার। মন্দ ভাগ্য উচ্চাশাকে দ্রুত পরিচালিত করে, সুতরাং দুঃসময়ে কাতর হওয়া উচিত নয়, দুর্দ্দশায় না পড়লে মানুষ উদ্যোগী হয় না—হতাশ না হয়ে উদ্যোগী হলে দুর্দ্দিন দূর হয়ে যায়, কুঅভ্যাস বিষ বীজাণু—উপেক্ষা করলেই সর্ব্বনাশ। সংসারেই হোক, আর সংসারের বাইরেই হোক, নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করার দিকে নজর রাখতে না পারলে আগুন লাগবেই। পরকে আপনার করে লওয়া দরকার। পিতামাতার আদেশ উপদেশ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাদের সংসারে অশান্তির কারণ হচ্ছে পরস্পর অনৈক্য আর অসহযোগভাব—এইটি কর্ত্তব্যের অবহেলা হোতে জন্মায়। দুঃখের সময় লোকে দুঃখের অবস্থা স্মরণ করে, কিন্তু সুখের সময় কেউ নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয় না। যদি সুখের সময় মানুষ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে শেখে, তাহলে এ সংসারে আর দুঃখ বলে কিছু থাকতো না। জ্ঞানীর মুখ হৃদয়ে, নির্ব্বোধের হৃদয় তার মুখে। সন্তোষের নিভৃত কক্ষে সুখের আবাস। গল্প গুজব করে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়, যাতে জীবনের বাঁচা ও বৃদ্ধির পথ সুপ্রশস্ত হয়, এজন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। আত্মম্ভরিতা আত্মহননের নামান্তর মাত্র। পরমুখাপেক্ষিতা মৃত্যু তুল্য। কর্ম্মে আসক্তি, স্বার্থত্যাগ, একান্ত অধ্যবসায় ও স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জীবনে উন্নতির সাফল্যের সহায়। সন্দেহ মানুষকে পাগল করে। ভোগ ও ত্যাগের সংযোগ ও সামঞ্জস্যের দ্বারাই যথার্থ লক্ষ্মীশ্রী ফুটে ওঠে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে মানবসংসার সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির নামই মুক্তি। ত্যাগ ভিন্ন সাধনা হয় না। পরের কাছে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে বাস করা অনুচিত। জগতে মানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। যার অতীত আছে, ভবিষ্যৎ তারই জন্য পথ রচনা করে। মহতের আসনভূমি তীর্থস্থান। আশার শক্তির পরিমাণ কেউ করতে পারেনা। সংসারের পথে চল্‌তে চল্‌তে মাঝে মাঝে অবসাদ ও নৈরাশ্য আসে। এজন্য আশার প্রয়োজনে উৎসাহ দরকার। যারা কোন কাজ করে না, তারাই মৃত্যুভয়ে ভীত। যার পদে পদে ভয়, সেই পাপ অর্জ্জন করে। স্বার্থকে কেউ কোন কালে পূর্ণ করাতে পারে না। মহাপুরুষগণের জীবন বিচিত্র। এঁদের জীবন পাঠ করলে অন্তরের নীচতা দূর হয় ও মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে—আর অবনতির নৈরাশ্যময় অন্ধকার দূর হয়। এজন্যে মহাপুরুষগণের জীবন পাঠ অবশ্য কর্তব্য। জীবনে সুখ পেতে হলে দুঃখের মধ্য দিয়ে সাধনা করতে হয়। দুঃখ এড়িয়ে সুখের সাধনা সম্ভবপর নয়। পদ্মফুল তুলে নিতে গেলে কাঁটার আঘাত সহ্য করতেই হবে। তোমরা এই সব বাণী অনুসরণ করে সংসার পথে অগ্রসর হতে পারলে মানুষের মত মানুষ হয়ে পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম্ম

কাউন্ট লিও টলষ্টয়

রচিত

গমের দানা

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোড়ল-চাষার বুড়ো-বাপের কথা শুনে রাজা তখনি গ্রামে লোক পাঠালেন—মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দাকে দরবারে এনে হাজির করবার জন্য। রাজার হুকুমে লোকজনেরা ছুটে গিয়ে মোড়ল-চাষার প্রবীণ-ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে এলো রাজ-দরবারে। রাজা দেখলেন—মোড়ল-চাষার বুড়ো-বাপের চেয়ে প্রবীণ-ঠাকুর্দ্দার শরীর আরো অনেক বেশী স্বস্থ-সবল…বার্দ্ধক্যের এতটুকু রেখা নেই তার দেহের কোথাও…চোখের দৃষ্টিও উজ্জ্বল, কথায় জড়তা নেই, কানেও শুনতে পান বেশ স্পষ্ট…চলাফেরা তার জোয়ান-মানুষের মতোই সহজ-স্বাভাবিক…কোনো লাঠির সাহায্য না নিয়েই দিব্যি স্বচ্ছন্দ-গতিতে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে এসে মোড়ল-চাষার প্রবীণ-ঠাকুর্দ্দা দাঁড়ালো রাজার সিংহাসনের সামনে।

আগেরবারের মতো এবারেও, রাজা মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দার হাতে সেই অদ্ভুত গমের দানাটি দিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো ঠাকুর্দ্দামশাই, এটি কি জিনিষ?…এঁরা তো কেউ ঠিক ঠাওর করতে পারছেন না…আপনি তো এতখানি বয়সে অনেক কিছুই দেখেছেন আর শুনেছেন…বলতে পারেন এই আজব-বস্তুটি কি এবং কোথায় মেলে?

রাজার কথা শুনে মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দা তার হাতের আঙুলে সেই আজব-দানাটিকে বারকয়েক বেশ পরখ করে দেখেই সবিস্ময়ে বলে উঠলো,—আরে, এ যে দেখছি, সেই আদ্যিকালের গমের দানা!

তারপর সেই গমের দানাটিকে একবার দাঁতে কামড়ে চেখে দেখেই সোৎসাহে মন্তব্য করলে,—হুঁ, যা বলেছি…কোনো ভুল নেই!…এ সেই আমাদের আমলের গমের দানা…ঠিক চিনেছি! অবিকল সেই স্বাদ…সেই চেহারা!…ভোলবার নয়!

রাজা বললেন—বটে!…তা আপনি কখনো আপনার ক্ষেতে এমন গমের ফসল চাষ-আবাদ কিম্বা কোনো হাট-বাজারে কেনা-বেচা করেছিলেন ঠাকুর্দ্দামশাই?

মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দা জবাব দিলে—মহারাজ, আমাদের আমলে সারাটা বছরই ক্ষেতে এমন গমের ফসল ফলতো! আজন্মকাল আমরা তখন এমনি গম খেয়েই দিন কাটিয়েছি…জ্ঞান হওয়া ইস্তক ক্ষেতে এমনি গমেরই চাষবাস করেছি, ফসল তুলেছি আর ঝেড়ে-ঝুড়ে গোলা-মরাই ভরে রেখেছি!…এখনকার মতো হাটে-বাজারে ফসল কেনা-বেচার রেওয়াজ ছিল না সেকালে…ফসল কেনা-বেচা সবাই তখন মহা-পাপকাজ বলে মনে করতো…আর টাকাকড়ির কথা…লোকে জানতোই না, বুঝতোই না কিছু তখনকার আমলে! প্রত্যেকেরই ঘরে-ঘরেই সেকালে সব সময়ে মজুত থাকতো গোলা-ভরা এমনি বড় বড় গম…অভাব কি, তা ছিল অজানা তখনকার সংসারে!

ঠাকুর্দ্দার কথা শুনে রাজার কৌতূহল হলো…তিনি প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা ঠাকুর্দ্দামশাই, কোথায়, কোন জমিতে এমন আজব-গমের ফসল বুনেছিলেন আপনি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দা জবাব দিলে—মহারাজ, ভগবানের দুনিয়া যতখানি বড়, ততখানিই বিরাট ছিল আমার গমের ক্ষেত! যেখানেই আমি লাঙল চালাতুম, সেটিই হতো আমার ফসলী-জমি! আমাদের আমলে সব জমিই ছিল সকলের আয়ত্তে…জমি নিয়ে লোকজনের কারো সঙ্গেই কারো ছিল না তখন এতটুকু বিবাদ-বিসম্বাদ, রেষারেষি বা হিংসা-দ্বেষ! সবাই দিব্যি মিলেমিশে শান্তিতে-আনন্দে, কাজকর্ম্ম আর বসবাস করতো তখনকার দিনে…নিজের হাতে চাষ-করা জমি ছাড়া অন্য কোনো জমিকে কেউই সেকালে 'আমার-জমি' বলে দাবী জানাতো না কখনো!…এমনি সুন্দর ছিল সেকালের বিধি-ব্যবস্থা!

মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দার মুখে আদ্যিকালের বিচিত্র এই

বিধি-ব্যবস্থার কাহিনী শুনে রাজা মোহিত হলেন। কিছু চুপচাপ কি যেন চিন্তা করে তিনি বললেন—আরো দুটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, ঠাকুর্দ্দা-মশাই ?

হাতের মুঠোয় রাখা আদ্যিকালের সেই গমের দানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঠাকুর্দ্দা জবাব দিলে,—বলুন মহারাজ !

রাজা বললেন—আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আপনাদের আমলে যে ক্ষেতে আপনারা এমন অতিকায়-গমের ফসল চাষ করতেন, সে-ক্ষেতে, আমাদের আমলে, আমরা কেন তেমনটি ফলাতে পারি না ?

ঠাকুর্দ্দা মন দিয়ে রাজার কথা শুনতে লাগলো। রাজা বললেন,—আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—আপনার এতখানি বয়স হওয়া সত্বেও, আপনি দেখছি কোনো লাঠির সাহায্য না নিয়েই দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে বেড়ান, অথচ আপনার চেয়ে কম-বয়েসী হয়েও, আপনার ছেলে একটি লাঠির উপর, আর আপনার নাতি দুটি লাঠির উপর ভর করে কষ্টেসৃষ্টে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন কেন ? তাছাড়া ওদের দুজনের চেয়ে আরো বেশী প্রবীণ-বৃদ্ধ হয়েও, আপনার চোখের দৃষ্টি এখনও এমন প্রখর, মুখের দাঁত সব এখনও এমন মজবুত-অটুট, গলার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট-জোরালো, কথায় এতটুকু জড়তা নেই…এমনটি হলো কেমন করে ? কৈ, একালের কোনো প্রবীণ-বৃদ্ধের তো এমন সুস্থ-সহজভাব দেখতে পাওয়া যায় না !…বলতে পারেন, ঠাকুর্দ্দামশাই…এর কারণ কি ?

রাজার কথা শুনে মোড়ল-চাষার ঠাকুর্দ্দা তার হাতের মুঠোয় রাখা ডিমের মতো বড় গমের দানাটির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে জবাব দিলে,—একালের ক্ষেতে-জমিতে এমন গমের ফসল জন্মায় না বলেই তো এখনকার বৃদ্ধেরা দিন-দিন এতখানি দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ, পঙ্গু হয়ে পড়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে ! আমাদের আমলে আমরা সবাই নিজের হাতে কাজকর্ম্ম করতুম। প্রাণ দিয়ে খাটতুম…মনের আনন্দে ক্ষেতে-আবাদে এমন বড়-বড় গমের ফসল ফলাতুম ! কিন্তু একালে কেউই আর তেমনি ভাবে নিজের হাতে কাজ করে না…অন্যের হাতে নিজের কাজের ভার তুলে দিয়ে, তারা অলস হয়ে বসে শুধু তাদের পাড়া-পড়শীদের ঐশ্বর্য্য দেখে হিংসা করে, লোভ করে, আর সর্ব্বনাশের চক্রান্ত করে ! সেকালের লোকজন কিন্তু এমনটি ছিল না, মহারাজ ! তারা পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুর মতো দেখতো…কেউ কাউকে হিংসা-দ্বেষ করতো না…সবাই মিলেমিশে পরম-শান্তিতে পাশাপাশি বাস করতো…কাজকর্ম্ম করতো…মনের আনন্দে দিন কাটতো ! একালের লোকজনের মতো অপরের উন্নতি, অপরের সৌভাগ্য দেখে কারো মনে এতটুকু লোভ, ক্ষোভ, ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা জাগতো না !…সেকালের লোকজন বিশ্বাস করতো—তারা সবাই একই ভগবানের সন্তান…পরস্পর ভাই-ভাই…দেহে-মনে সকলেই ছিল তখন বেদাগ-খাঁটি ধরণের মানুষ ! তাই, সেকালে গমের ফসলও ফলতো যেমন বড়-ছাঁদের…মানুষের দেহ-মনও হতো তেমনি সুস্থ-সবল, উদার-উন্নত আর সজীব-আনন্দময় ! এই হলো, আসল কথা, মহারাজ…এছাড়া আর কোনো কারণ নেই !
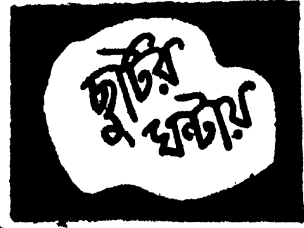
চিত্রগুপ্ত

এবারে যে অভিনব-মজার খেলাটির কথা তোমাদের জানাচ্ছি, সেটি থেকে তোমরা বিজ্ঞানের একটি বিচিত্র-তথ্যের সন্ধান পাবে। এ খেলাটির কলা-কৌশল খুবই সোজা…একটু চেষ্টা করলেই রহস্যময়-বিজ্ঞানের মজাদার এই লীলা-কৌতুক দেখিয়ে তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের রীতিমত অবাক করে দিতে পারবে। এ খেলাটির আসল রহস্য হলো—বাতাসে কতখানি 'অক্সিজেন' (Oxygen) বা 'অম্লযান'-বাষ্প

মিশে রয়েছে, বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা-কৌশলের সাহায্যে তারই সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা···অর্থাৎ মোটা-কথায় যাকে বলে 'হিসাব কষে দেখা' ! এখন শোনো—কি উপায়ে অদৃশ্য-বাতাসের মধ্যে মিশে-থাকা 'অক্সিজেন'-বাষ্পের সঠিক পরিমাণ হিসাব কষে নির্দ্ধারণ করা যায়, তারই বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুনের কথা বলি ।

অদৃশ্য-বাতাসে মিশে-থাকা অক্সিজেন-বাষ্পের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ঃ

এ খেলার কায়দা-কানুনের বিশদ পরিচয় দেবার আগে, এটি দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—গোড়াতেই তার একটা ফর্দ দিয়ে রাখি । তবে ফর্দটি খুব লম্বা আর বেয়াড়া-ধরণের নয়···এ খেলার সাজ-সরঞ্জাম নিতান্তই অল্প এবং সচরাচর সবাইকার বাড়ীতেই মিলবে···অতি সহজে ও বিনা-ব্যয়ে ! বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি দেখানোর জন্য দরকার—একঘটি জল, একটি চ্যাটালো জল-রাখবার গামলা (Saucer Bowl), একটি বড় মোমবাতি, একবাক্স দেশলাই, চওড়া-মুখওয়ালা একটি খালি-বোতল—সচরাচর দুধ, বা মধু কিম্বা চাটনি-আচার প্রভৃতির রাখবার জন্য যে-ধরণের বোতল ব্যবহার করা হয়, তেমনি-ছাঁদের জিনিষ ।
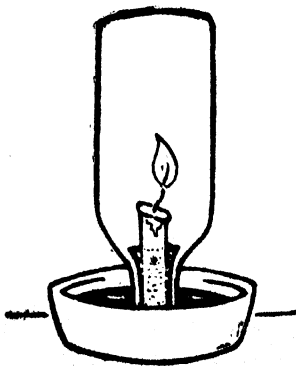
এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, সমতল মেঝে কিম্বা টেবিলের উপরে জলের গামলাটিকে রেখে, সেই গামলার ঠিক মাঝখানে মোমবাতিটিকে বেশ পাকাপোক্তভাবে এঁটে বসিয়ে দাও—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল সেই ধরণে । এবারে ঘটি থেকে আন্দাজমতো খানিকটা জল ঢেলে বাতি-বসানো ঐ গামলাটির সিকি-অংশ (Bowl এ) ভরে নাও । তারপর সাবধানে দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতির পল্‌তেটিতে আগুন ধরাও । তবে হুঁশিয়ার···দেশলাই ঘষে বাতি জ্বালাবার সময় অসাবধানতার ফলে, নিজেদের জামা-কাপড়ে বা দেহের কোথাও যেন আগুনের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগে—সেদিকে খেয়াল রেখো !

দেশলাই-কাঠির আগুনে মোমবাতির পল্‌তেটি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই, ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে বোতলটিকে উপুড় করে বসিয়ে দাও ঐ জ্বলন্ত-মোমবাতির উপরে । তবে, জ্বলন্ত-মোমবাতির উপরে এভাবে বোতলটিকে উপুড় করে বসানোর সময়, নজর রেখো—অযথা-তাড়াহুড়োর ফলে,বাতির প্রজ্বলিত-শিখা যেন দম্‌কা-বাতাসের ধাক্কায় আচম্‌কা নিভে না যায় একেবারে ! এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সারতে পারলেই দেখবে···জল-ভরা গামলায়-আঁটা বোতল-ঢাকা মোমবাতির প্রজ্জ্বলিত সুদীর্ঘ-শিখাটি ক্রমশঃ আকারে ছোট হয়ে এসে অবশেষে একেবারেই নিভে যাবে ! তাছাড়া আরো দেখবে যে জ্বলন্ত-মোমবাতির সুদীর্ঘ-শিখা ক্রমশঃ ক্ষয়ে আকারে যতই ছোট হয়ে আসছে, গামলার নীচেকার জল ততই ফেঁপে-ফুলে উঠে আপ্‌না থেকেই ধীরে ধীরে ঐ বাতির উপর উপুড়-করে রাখা চওড়া-মুখওয়ালা খালি-বোতলের ভিতরে প্রবেশ করে বোতলটির ½ অংশ ভরে তুলেছে ।

কেন এমন হয়, জানো ?···অর্থাৎ, মোমবাতিটি ক্রমশঃ যতই নিভে যায় ততই এ গামলার জল ফেঁপে উঠে আপ্‌না থেকেই ফাঁকা-বোতলের মুখে সেঁধুতে থাকে···এমন আজব কাণ্ড ঘটে কি কারণে ? এর কারণ···ভেল্কীর মন্ত্র বা ম্যাজিকের হাত-সাফাইয়ের কারসাজি নয়···বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্য-লীলা ! সে লীলা-রহস্যটি আসলে কি···সেই কথাই তোমাদের খুলে বলি !

এমন আজব কাণ্ড ঘটবার কারণ···বোতলের ভিতরের বাতাসে 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান-বাষ্পের' অভাব জন্মায় বলেই । গামলায় জলে-বসানো মোমবাতির উপরে উপুড়-করে-রাখা খালি-বোতলটির ভিতরকার বাতাসে যে পরিমাণ 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান'-বাষ্প মিশে থাকে,

প্রজ্জ্বলিত-শিখার সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞানের রীতি-অনুসারে আগুনের তাপে রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার (Chemical transformation) ফলে তার বিচিত্র রূপান্তর ঘটে। এই কারণেই বোতলের ভিতরকার বাতাসে যেটুকু 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান' বাষ্প থাকে, সেটুকু আগাগোড়া রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায় ঐ দাহ্য-পদার্থের (Burnable Material) সঙ্গে। তাই ঐ বোতলের ভিতরকার বাতাসে-সংরক্ষিত 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান' বাষ্পটুকু জলন্ত-মোমবাতির আগুনের উত্তাপের সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞান-সম্মত রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে যতই রূপান্তরিত ও দাহ্য-পদার্থের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে, ততই প্রজ্জলিত-শিখার আকার এবং আয়ু ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে···এমনিভাবেই শেষ পর্য্যন্ত বোতলের মধ্যে বাতাসের চাপ কমে যায় আর অক্সিজেনের অভাবে জলন্ত-বাতিও যায় নিভে। তখন ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করার আকর্ষণে গামলার জল নীচে থেকে ফেঁপে-ফুলে বোতলের মুখের মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ উপরে উঠে ফাঁকা বোতলের ভিতরকার 'অক্সিজেনের' এই অভাব-অনটন ভরিয়ে তোলে বলেই, এমন আজব কাণ্ড ঘটে। কাজেই এই বৈজ্ঞানিক-প্রথায় হিসাব কষে দেখলে সঠিকভাবেই বোঝা যায় যে বাতাসে 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান' বাষ্পের পরিমাণ কতখানি! অর্থাৎ, এই হিসাবে বোতলের ⅕ অংশ জলে ভরে গেলে, বোঝা যাবে যে, বাতাসে 'অক্সিজেন বা 'অম্লযান' বাষ্পের পরিমাণ রয়েছে—শতকরা ২০% অর্থাৎ একশোভাগের বিশ ভাগ মাত্র!

এই হলো এবারের অভিনব-মজার বিজ্ঞানের খেলাটির আসল রহস্য! এখন এটির কায়দা-কানুন ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের দেখাও··· বিজ্ঞানের এই আজব-মজার খেলাটি যে তাঁদের প্রচুর আনন্দ ও বিস্ময়ের খোরাক জোগাবে—সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ রইলুম।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। দেশলাই-কাঠির আজব ধাঁধা ঃ
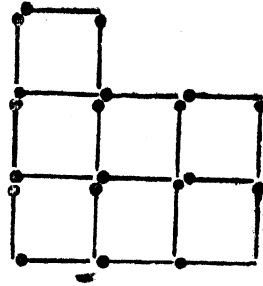
উপরের ছবিতে কুড়িটি দেশলাই-কাঠি সাজিয়ে যেমন ভঙ্গীতে সমান-মাপের সাতটি চতুষ্কোণ-খোপকাটা নক্সা রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তোমরাও ঐ ধরণের একটি নক্সা বানাও। এবারে ঐ নক্সার যে কোন জায়গা থেকে তিনটি দেশলাই-কাঠি সরিয়ে নাও এবং বুদ্ধি খাটিয়ে এমন-ভাবে কায়দা করে সম্পূর্ণ নতুন-ভঙ্গীতে এই তিনটি দেশলাই কাঠিকে পুনরায় অন্য সতেরোটি দেশলাই-কাঠির সঙ্গে সাজিয়ে বসাও যে শেষ পর্য্যন্ত উপরের ঐ সমান-মাপের সাতটি চতুষ্কোণ-খোপওয়ালা নক্সাটি রূপান্তরিত হয়ে সমান মাপের পাঁচটি চতুষ্কোণ-খোপকাটা অভিনব-ছাঁদের বিভিন্ন আরেকটি নক্সায় পর্য্যবসিত হয়। তবে মনে রেখো, সম্পূর্ণ নতুন-ছাঁদের ঐ পাঁচটি চতুষ্কোণ-খোপকাটা নক্সাটি রচনার সময় কুড়িটি দেশলাই-কাঠির প্রত্যেকটি যেন সর্ব্বদা একে অপরটিকে ছুঁয়ে থাকে এবং পাঁচ-খোপওয়ালা ঐ বিচিত্র চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি খোপই যেন আগাগোড়া সমান-মাপের হয়! এখন চেষ্টা করে ছাখো তো এই আজব-ধাঁধার মীমাংসা হবে কি উপায়ে!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা আর হেঁয়ালি ঃ

১। গরমের দিনে গ্রামে গ্রামে প্রতি ঘরে রয়,
কিন্তু সেটা অতি সস্তা, দু-অক্ষরে হয়।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে দেহের অংশ বোঝায়,
আর গোড়ার অক্ষর বাদ দিলে—মা বলে তা ছাঁয়!

রচনা ঃ—মুরারী চৌধুরী (ফটিগোদা)

৩। তিন অক্ষরের একটি পদ…পদটি একটি কালের নাম বোঝায়। প্রথম দুটি অক্ষরে—এক জাতীয় অশ্বের নাম বোঝায়! বলো তো সেটি কি?

রচনা ঃ—প্রবীরগোপাল মুখোপাধ্যায় (শিবপুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

রুমালের ফাঁশ বাঁধবার কায়দা-কৌশল পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে। অর্থাৎ, রুমালের দু'দিকের দুটি প্রান্ত ধরবার আগে তোমাদের হাত দু'খানি ঐ ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে রাখো। তারপর ঐ ভঙ্গীতে রুমালের দুই প্রান্তের দুটি কোণ ধরে হাত দু'খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে আনলেই অনায়াসে গিঁট বাঁধা যাবে।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

২। জীবন
৩। নদীয়া

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা), প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (বোগাই), সৌরাংশু-কান্ত ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বাণী, সীমা, বন্দনা ও চন্দনা (গয়া), সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর), দেবাশীস মৈত্র, বুলা ও নন্দিতা (কলিকাতা), অলকা ও অরবিন্দ (পশ্চিমবার, বালেশ্বর), আলো, তুফান ও চায়না (রাউরকেল্লা), বুদো, প্রদ্যোৎ, করালী, গোকুল, মীনাক্ষী ও বৌমণি চক্রবর্ত্তী (জয়নগর), আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা), কানু, মন্টু, করালী, চিন্টু, গোরা (জয়নগর), গৌতম, অশোক, কল্পনা ও নীতা ঘোষ (কলিকাতা), মানসমোহন বসু, তাপস, ছবি, রুবি, নমিতা, সবিতা, কবিতা (কোন্নগর), অলোককুমার ভট্টাচার্য্য (লাভপুর), সদানন্দ ও ধীরেন (পাকুড়তলা), অরূপ চৌধুরী (ফটিগোদা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

প্রবীরকুমার কুণ্ডু (দেওঘর), কৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ), পুলু, ডিগবী, ফণীন্দ্র ও বুজকু (কলিকাতা), পুইতণ্ডী (এথোড়া), সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঘডাঙা)।

কড্ মাছ

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সমুদ্র শুধু সমুদ্র নয়। এর ভিতর অনেক রত্ন আছে। তাই সমুদ্রের আর এক নাম হ'ল রত্নাকর। এর ভিতর একটী প্রাণীর কথা বলছি। তোমরা মন দিয়ে শোন।

আমি যে প্রাণীর কথা বলব, সেটি হ'ল সামুদ্রিক মাছ। কড্‌লিভার অয়েলের নাম তোমরা শুনে থাকবে, যে অয়েল আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার জন্য ব্যবহার হয়। তা কি দিয়ে তৈরী হয় জান? কড্ মাছ থেকে। এ মাছ খুব উপকারী। এর কাঁটা থেকে আরম্ভ করে, মাছের কোন কিছুই ফেলা যায় না। এমন উপকারী মাছ সমুদ্রে আর একটি তোমরা দেখতে পাবে না। এ মাছের দেখা সব সমুদ্রেই কিন্তু পাবে না। আইসল্যাণ্ডের সমুদ্রে এদের দেখতে পাবে।

এ মাছের মত পেটুক মাছ আর নেই। শুনলে তোমরা অবাক হবে, এ মাছ যা পায় তাই গিলে খায়। ওদের কাছে খাদ্য অখাদ্য বলে কিছু নেই। সবই ওরা খাদ্য মনে করে খায়। এমন কি শিশি বোতল, মোমবাতি, কাগজ যা পাবে তাই খাবার মনে করে খেয়ে নেবে। এদের হজম শক্তি খুব প্রবল। সব সময় খাই খাই। এরা খাবার জিনিস পেলে ছাড়ে না। এ মাছ যতই খাক না কেন, কখন ওদের পেটের অসুখ করে না। বোধ হয় সেই জন্যই ওরা খাবারের জন্য সমুদ্রে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

কড্‌মাছ খেতে খুব মিষ্টি। এমন স্বাদ অন্য মাছের নেই। এদের কাঁটাও খুব নরম, স্বাদও চমৎকার। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। কড্ মাছ এক সঙ্গে ত্রিশ-লক্ষ ডিম পাড়ে। এত ডিম অন্য কোন মাছে পাড়ে না। সে জন্য এদের সংখ্যাও অন্য মাছের তুলনায় অনেক বেশী। কড্‌মাছ এই জন্য কখনও নির্বংশ হবে না। অন্য মা[ছ] সমুদ্রের নীচে সেওলার ভিতর ডিম পাড়ে। কিন্তু ক[ড্] মাছ জলের উপরই ডিম পাড়ে।

কড্‌মাছ শুধু মানুষেরই প্রিয় খাদ্য তা নয়। নরওয়ে[র] লোকেরা গরুকেও কড্‌মাছ খাওয়ায়। কড্‌মাছ খা[ওয়ায়] বলে ওদেশের গরুদের প্রচুর দুধ হয়। আর সে দুধে[র] স্বাদও হয় খুব।

নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ডের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। এরা হ'ল শীত প্রধান দেশ। সে জন্য ওখানে গাছ-পা[লা] জন্মায় না। দেশটা হ'ল বরফের দেশ। সে দেশের গ[রু] ভেড়া ঘাস পায় না। তারা কি খেয়ে বাঁচে জান? এ[ই] কড্‌মাছের কাঁটা খেয়েই ওরা জীবন ধারণ করে। [ও] দেশে গাছও নেই, কাঠও নেই, তবে ওখানকার মানুষ[রা] আগুন ধরায় কেমন করে শুনলে অবাক হবে। এই ক[ড্] মাছের কাঁটা শুকিয়ে ওরা কয়লার কাজ চালিয়ে নেয়। এখন বুঝতে পারছ, কড্‌মাছ মানুষের কত উপকার ক[রে] থাকে। এ ছাড়া ওখানকার ব্যবসায়ীরা কড্ মাছে[র] তেল নানান দেশে বিক্রি করে প্রচুর টাকা আয় ক[রে] থাকে।

আমরা যেমন পশু-পাখী পুষে থাকি। ওদেশের সৌখি[ন] লোকেরা কড্‌মাছ পোষে। যারা কড্ মাছকে খে[তে] দেয়—কড্ মাছ তাকে চেনে। কড্ মাছ শিকার ক[রা] খুব কঠিন। ওখানকার সমুদ্রে এত কুয়াশা হয় যে, যা[রা] জাহাজ নিয়ে মাছ শিকার করতে যায়, তাদের জাহা[জে] আলো থাকা সত্ত্বেও অন্য জাহাজ দেখতে পায় না। এ[র] ফলে অনেক জাহাজ ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে যায়। জাহা[জ] ভাঙ্গা মানেই হ'ল মৃত্যু। তবু ওরা কড্‌মাছ শিকা[র] করে, তার কারণ কড্ মাছই ওদেশের লোকের জীবন। কড্‌মাছ না হ'লে ওদেশের মানুষ বাঁচতে পা[রে] না।
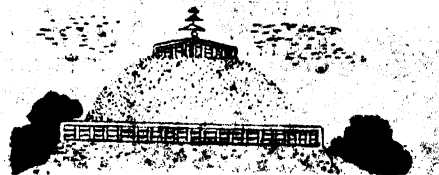
মোটর-গাড়ীর কথা

দেবশর্ম্মা রচিত
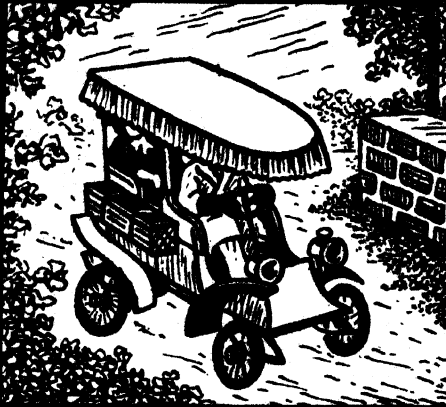
মোটর-গাড়ী আবিষ্কারের প্রথম যুগে উত্তর-আমেরিকা, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে কুশলী যান্ত্রিক আর বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিলো নিত্য নূতন আর উন্নত-ধরণের পেট্রোল ও বাষ্প-চালিত দ্রুতগামী-যান তৈরীর জন্য। তারই ফলে, ১৯০৭ সালে হেনরী ফোর্ড সাহেবের তৈরী এই বিচিত্র-ছাঁদের মোটর-গাড়ী দেখা দিলো আমেরিকা রাজ্যের রাজপথে। সেকালের সৌখিন সমাজে এ গাড়ীর কদর ছিল রীতিমত

ক্রমে বিভিন্ন দেশে পথ-ঘাটের উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে যান-বাহন চলাচলের সুব্যবস্থা হলো সবিশেষ। ফোর্ডের আবিষ্কৃত মোটর-গাড়ীটি পথে চালু হবার কিছুদিন পরেই, ১৯০৮ সালে আমেরিকার রাজপথে দেখা দিলো— বিচিত্র-ধরণের এই 'ক্যাডিল্যাক্' (CADILLAC) মোটর-গাড়ী। এ গাড়ী চলতো পেট্রোল-এঞ্জিনের সাহায্যে... চাকায় থাকতো হাওয়া-ভরা টায়ার ও টিউব— রবারের তৈরী...একালের মতো
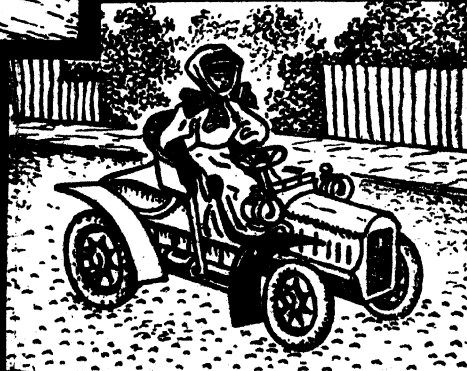
এমনিভাবেই কুশলী যান্ত্রিক আর বৈজ্ঞানিকদের নব-নব আবিষ্কার ও ব্যাপক-গবেষণা-তথ্যানুসন্ধান চালানোর ফলেই আজ দুনিয়ার সর্বত্র পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একালের উন্নত-পদ্ধতিতে তৈরী কত সব বিচিত্র-অভিনব ধরণের দ্রুতগামী এবং আরামপ্রদ সৌখিন-ছাঁদের মোটর-গাড়ী। আধুনিক সভ্য-সমাজে মোটর-গাড়ী এখন আর শুধু বিলাসের সামগ্রী নয়— মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মোটর-গাড়ীর প্রয়োজন আজ একান্তই অপরিহার্য !

হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। আনন্দ পরিবেশন। কথায় রস না থাকলে, সে কথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বীররস, করুণরস প্রভৃতির মত হাস্যরসও একটা প্রধান রস। হাস্যরসকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অনাবিল হাস্যরস ও নির্ম্মল শুচিশুভ্র রঙ্গরস একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গানে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাঙ্গালীর কাছে এ এক অপূর্ব্ব সম্পদ। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে এই অনাবিল সাহিত্যসৃষ্টি উজ্জ্বলপ্রতিভা, অসামান্যশব্দসম্পদ যেমন তাঁর ব্যঙ্গ-রচনায়, হাসির গানে আত্মপ্রকাশ করেছিল—সে রকম আর কোন বিষয়ে হয় নি।

বিপিনচন্দ্র পাল একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি সভায় বলেছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের আর কোন স্মৃতি থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে হাস্যরসের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যের যে একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সে কথা কেহ ভুলিতে পারিবে না—সে স্মৃতি স্থায়ী হইবে।"

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের কবি। হাসি না থাকলে, মানুষের জীবন একঘেয়ে নীরস ও নিরানন্দ হত। হাসতে জানলে গম্ভীর মুখে উপদেশে যে কাজ হয় না, অনেক সময় হাসিতে তার দশগুণ কাজ হয়।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা আমরা যখন শুনতে যেতাম, তখন দেখতাম যে তিনিও মার্জ্জিত সুরুচিসম্পন্ন ও বিদ্বজ্জনভোগ্য হাস্যরসের পরিবেশক ছিলেন। তিনি শুধু লেখায় নয়, বন্ধু মজলিসের আলোচনায় ও অধ্যাপনায় নির্ম্মল স্বচ্ছ হাস্যরসের ফোয়ারা ছোটাতেন। শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ নিয়ে অন্য কেউ এমন হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারতেন বলে আমার জানা ছিল না। তিনি গম্ভীর মুখে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর কথার ফোয়ারায় হাস্যকৌতুক ও রঙ্গরসিকতায় সমস্ত ছাত্র একেবারে আত্মহারা হয়ে হাসিতে ক্লাস মুখর করে তুলত। তিনি কিন্তু গম্ভীরমুখে পড়িয়ে যেতেন ইংরাজি কাব্য সাহিত্য, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য থেকে তুলনামূলক রচনা মুখে মুখে অনর্গল বলে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে যেতেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হাস্যরসের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় এই একটিই দেখেছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে, রঙ্গরসের কশাঘাতে কারও কারও মন থেকে কুঅভ্যাসের ভূত নেমে গিয়েছে। একবার দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বশুর ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে শ্রীরামপুরের নন্দলাল গোস্বামীর নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে নন্দলাল গোস্বামী দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে হাসির গান শুনতে চাইলেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর "নন্দলাল" গানটি সেই সভায় শুনিয়ে দিলেন।

> "নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ,
> স্বদেশের তরে যা করেই হোক রাখিবেই সে জীবন।
> সকলে বলিল, আহা হা কর কি কর কি নন্দলাল!
> নন্দ কহিল বসিয়া বসিয়া রব কি চিরটা কাল?
> আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ
> তখন সকলে বলিল বাহবা, বাহবা, বাহবা বেশ।"
>
> ইত্যাদি

গোস্বামী মশাই বলতেন, গানটি শুনে তাঁর স্বভাবের অনেক দুর্ব্বলতা শুধরে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা দ্বিজেন্দ্রলাল এই গানটি বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'পত্রে এই "নন্দলাল" কবিতাটির উচ্চপ্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনাবিল হাস্যরসের কবিতা "পারত জন্মনা কেউ বিষ্যুৎ বারের বার বেলা," "হতে পারতাম

আমি কিন্তু মস্ত একটা বীর," "আমরা পাঁচটি এয়ার—দাদা আমরা পাঁচটি এয়ার," "We are reformed Hindu ," 'আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক ভাই" প্রভৃতি গানগুলির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ একেবারে উদ্দেশ্যহীন ছিল না। সেই ব্যঙ্গের পেছনে লুকিয়ে ছিল তীব্র ভৎর্সনা, মর্ম্মন্তুদ বেদনা আর লুকাইত অশ্রু।

"আমরা ইরাণ দেশের কাজি," "পাচশ বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদয়," "সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়," "আজি এই শুভদিনে" প্রভৃতি গান গুলিতে গভীর শ্লেষ আছে।

জজ সারদা চরণ মিত্রের বাড়ীতে একদিন পূর্ণিমা মিলন হয়। সেই সভায় দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে "আজি এই শুভ দিনে," "আমরা ইরাণ দেশের কাজি," "পাচশ বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদয়" প্রভৃতি গান শুনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "এ কি হাসির গান? এ যে cruelest tragedy।"

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ঠিক শ্লেষ বিদ্রূপ নহে, উহা কৌতুক মাত্র। সে কৌতুকের অন্তরালে স্তরে স্তরে করুণা, অনুকম্পা, সমবেদনা যেন সাজান রহিয়াছে। শ্লেষ বিদ্রূপ যাহারা করিয়া থাকেন তাহারা অভিজ্ঞতা এবং পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীন জ্ঞানে শ্লেষ বিদ্রূপের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।...কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন, স্বয়ং তাহাদের দলে মিশিয়া যাইতেন।" "আমরা সেজেছি বিলাতি বাঁদর"—এই এক 'আমরা' শব্দ প্রয়োগ করেই ইউরোপের অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গালী সাহেব-দের ওপর কি গাঢ় অনুকম্পা প্রকাশ করা হয়েছে।... Reformed Hindus, ইরাণ দেশের কাজি, ইংরেজ নবিশের ধর্ম্মমত পরিবর্তন প্রিয়তার গানে, নন্দলালের দেশ হিতৈষণায়, প্রত্যেক হাসির গানে, প্রত্যেক ব্যঙ্গে, প্রত্যেক কৌতুকে তিনি নিজেকে বাদ দেন নি। নিজেকে জড়িয়ে কৌতুক করেছেন।

'কেরাণী' কবিতায় তিনি লিখছেন—

"খেটে খেটে খেটে—
অস্থি হোল মাটি; এবং পৃষ্ঠ হোল মেটে;
শয্যা হ'ল তক্তপোষ; আর না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড় মেয়ে;
বেছে বুড় বরে
ভাল কুলীন ঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট করে,
স্ত্রী হলো গতাসু, কি করি? শোকতপ্ত অমনি—
আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।"

কেরাণীর দুঃখের সংসারে দুঃখ ও বেদনা, অভাব ও অনটনের মধ্যে তার স্ত্রী বিয়োগের পর একটি 'ন' বছরের 'রমণী'কে বিয়ে করার বিড়ম্বনাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত করে তাঁর অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেছেন। "শ্রীহরি গোস্বামী" কবিতার প্রথম পঙক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন—

"একদা শ্রীহরি, প্যাণ্টটা কোটটা পরি'
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাটলেট, রোষ্ট, ক্যারি;
চতুর্দ্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন—হিন্দুধর্ম্মখানি;
ছিলেন সঙ্গে অন্য আরো মান্য গণ্য,
বিশেষ লক্ষ্য (টিকীর দৈর্ঘ্যে) মহেশ চুড়ামণি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল পণ্ডিত শ্রীহরি গোস্বামীকে প্যাণ্ট কোট পরিয়ে টেবিলে টিকীধারী পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়েছেন। তারপর তাঁকে কাটলেট, রোষ্ট ও ক্যারি খাইয়ে বিশুদ্ধ রঙ্গ পরিহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন।

"ভট্টপল্লী সভা" নামে একটি দীর্ঘ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল কথার মায়াজাল সৃষ্টি করে কোন পার্থক্যবিহীন নিরর্থক তর্কে এমনি অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে তাতে দেবগণও বিচলিত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে এর মীমাংসার জন্য ছুটে গিয়েছেন।

"একদিন ভট্টপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,
'তৈলাধারই পাত্র, কিম্বা পাত্রাধারই তৈল',
সে গভীর প্রশ্ন, এবং সে বিষম তর্ক
মীমাংসা করিতে মিলে যত পক্ক পক্ক
পণ্ডিতেরা শেষে, টোলে সবাই এসে
করেন মহা সভা একটা অস্মিন বঙ্গদেশে।"

সেই কবিতার চতুর্দ্দশ পঙক্তিতে তিনি লিখলেন—

"(—যদিও তাঁদের কেশ মাথায় করিবারে ছিন্ন
ছিলনাক বড় বেশী এক এক টিকি ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ, হয়ে গেল ভঙ্গ
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাকচিক্য ;)
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।"

এই রকম অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতার মধ্য দিয়ে নির্ম্মল, নিছক শুচিশুভ্র আনন্দ পরিবেশনই দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর হাসির গান অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ। সাহিত্যে কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া তিনি অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। অর্দ্ধশতাব্দী আগে আমাদের সমাজচিত্রগুলিকে ব্যঙ্গ-কবিতার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হল। স্থির হয়েছিল বৈশাখ থেকেই এর বর্ষ আরম্ভ হবে। কিন্তু তাঁর সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার অনুমতি আসতে দু'মাস দেরী হল। সুতরাং 'আষাঢ়' থেকেই বর্ষ সুরু হবে স্থির হল।

প্রমথ ভট্টাচার্য্যের মাধ্যমে তাঁর বন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য "চরিত্রহীন" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রেঙ্গুন থেকে এসে পৌঁছল। দ্বিজেন্দ্রলাল 'চরিত্রহীন' পড়ে মন্তব্য করলেন —মেসের ঝি যে উপন্যাসের নায়িকা সে উপন্যাসে শালীনতা বজায় থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল 'চরিত্রহীন' 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করতে সম্মত হলেন না। সুতরাং 'চরিত্রহীন' আবার রেঙ্গুনে ফিরে গেল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও তাঁর 'সাহিত্য' পত্রে 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে সম্মত হন নি। তিনি 'চরিত্রহীন' উপন্যাসকে অতি উপাদেয় 'আটার লুচি' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্রকে তিনি কিছু 'ময়দার লুচি' তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ব্যবধান এতই কঠোর ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালও সে সময়ে কোন রকম কুরুচির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় কোথাও নিছক, নির্ম্মল অনাবিল হাস্যরস ছাড়া আর কিছু স্থান পায় নি। সেগুলি ছিল শরৎ জ্যোৎস্নার মত শুচিশুভ্র ও নির্ম্মল।

'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গবিদ্রুপের এক নির্ম্মল প্রস্রবণ। এটি বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য ও অতুলনীয় সম্পদ। শ্রীহরিনাথ দত্ত দুর্গাপূজার ছুটিতে একদিন ট্রেণে চড়ে পাটনা থেকে তাঁর শ্বশুর বাড়ী হুগলী ঘাটে আসছিলেন। তিনি পাটনায় নামমাত্র চাকরি করতেন।

"পাটনায় চাকরি করেন ; কি সে চাকরির কি অর্থ
বলা কিছু শক্ত ; কারণ এটি ব্যক্ত
যে হরিনাথ মাঝে মাঝে শ্বশুরকে তাঁর, ত্যক্ত
করতেন টাকার জন্যে ; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে করে অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃমাতৃ উভয়কুলই করেছিলেন উদ্ধার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সমাজব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাত করলেন। তারপর হরিনাথ যখন ট্রেণে আসছিলেন তখন এক ভদ্রব্যক্তি তার পাশে বসেছিলেন। তিনি হরিনাথের ভাব গতিক দেখে

"জানলেন সেই বুড়, ব্যাপারটি যা গুঢ়
তাহার নাম ও বাড়ী, নক্ষত্র ও নাড়ী
জানলেন সবই—হরির পত্নীর বয়সটি পর্য্যন্ত।"

হরিনাথের মুখে কাল মিসমিসে এক মুখ দাড়ী দেখে তিনি হরিনাথকে তার দাড়ি কামিয়ে ফেলতে উপদেশ দিলেন। হরিনাথও অনেক বিচার বিবেচনার পর দাড়ি কামাতে সম্মত হলেন। তখন

সবিশেষ অন্বেষণে বর্দ্ধমান ইষ্টেসনে
পেলেন একটি নাপিত
এখন দাড়ি অতি প্রবীণ, নাপিত অতি নবীন
বাকি সময় অষ্ট মিনিট ; এত তাড়াতাড়ি
হবে—ভাবে পরামাণিক—কামান এ দাড়ি ?
যা হক সে বিষয়ে চিন্তা করলেই নিজের ক্ষতি ;
(নাপিতেরও পয়সার সে দিন টানাটানি অতি)
বল্ল একটা টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি। হরি স্বীকার, করি তায় টাকটি
পরামাণিক ভাইয়, ক্ষুরটি করে বাহির।
[illegible]
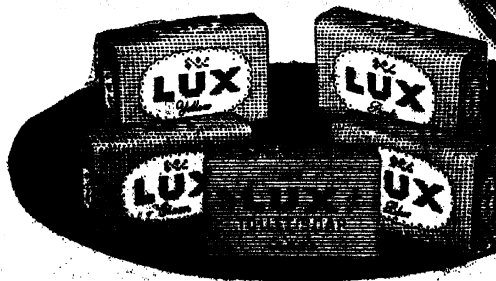
দাড়ির এক দিকটা কামান হয়েছে এমন সময় গাড়ীর ঘণ্টা বাজল। তখন হরি—

"চাদর মাদর ফেলে লোকজন ঠেলে
উঠলেন গিয়ে, বহুৎ কষ্টে পুনরায় রেলে।"
... ...
গেল সে রেল গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়ি ;
রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।"

তখন সেই ভদ্রলোকের কুপরামর্শে দাড়ি কামাতে গিয়ে হরিনাথ তার এই অবস্থার জন্য ভদ্রলোককে দায়ী করলেন। যাই হোক ট্রেন হুগলীতে থামলে হরিনাথ তীব্র বেগে ট্রেণ থেকে নেমে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী ভাড়া করে শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাত্রি তখন দুপুর। হরিনাথ শ্বশুরবাড়ী এসে পৌছলেন। তার ডাকাডাকিতেও বিকৃত মুখ দেখে—

"জেগে উঠল সবাই ভেবে ডাকাত পড়ল নাকি ?
চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি করে খাড়া
হতভাগ্য হরিনাথকে কল্ল বেগে তাড়া।"

কর্ত্তাবাবু ওপর থেকে হুকুম দিলেন, "মারো বেদম বজ্জাত চোর কো।" "আমি, আমি, আমি চিৎকার করিলেন হরিনাথ"। হরিনাথ ত লাঠি খেয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়লেন। সবাই তাকে বেঁধে কাঁধে করে বাবুর কাছে নিয়ে এল। তারপর "দিল মনঃপূত জোরে দু দশ জুতো।" "হরি বল্ল, আমি জামাই।"

"জামাই! তবে কোথা গেল একটা দিকের দাড়ি ?"

হরিনাথ বললে, "ফেলেছি তা কামাইয়ে।" যখন সকলে নিঃসন্দেহ হল, "হাঁ, জামাই ত বটে, তখন সকলে দারুণ অপ্রস্তুত হলেন।

শেষে স্ত্রী সৌদামিনী হরির এই বীভৎস চেহারা দেখে মূর্চ্ছিত হল। তার চোখেমুখে জল দিতে তবে তার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল। যাক প্রভাতে হরিনাথ—

"ছাড়ি সাধের শ্বশুরবাড়ী
জেগে সারারাত্রি, প্রাতে কামাইয়া দাড়ি
চড়ে পুন নৌকা, ছ্যাকড়া এবং রেলের গাড়ী—
উক্ত দিনই হরিনাথ ফের পাটনায় দিলেন পাড়ী।"

যখন বাংলা সাহিত্য ও সমাজে হাস্যরসের দুর্ভিক্ষ ছিল তখন দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার সর্ব্বত্র এই নির্ম্মল হাস্যরসের কবিতায় বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমাজকে হাস্যমুখর করে রেখে গিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর "কর্ণ বিমর্দ্দন কাহিনী" শীর্ষক সরস কবিতায় আবিষ্কার করলেন যে ভগবানের কান দুটি সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তা আকর্ষণ করবার জন্য।

"কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য
যদি না তা আকর্ষণ জন্য ?
যদি বল সেটা শালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদর-চিহ্ন ;
তবু যদি সাহেব অল্পে স্বল্পে
টানে, হয়ত বা মধুর বিকল্পে" ;

সাহেবকে কবি অনুরোধ করছেন—

"ঘুসি আসটা রাগে
মেরো নাকো কেবল নাকে!
ও ঘুসি পড়িলে কর্ণে স্তব্ধ
ত্রিভুবন ; শুনি শুধু ঝা ঝা শব্দ
ও ঘুসি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে।"

যদি ও ঘুসিটা চোখে পড়ে তবে তিনি একেবারে কানা হয়ে যাবেন। আর—

ভূমি বিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পঙক্তি।
পড়লে নাকে রক্তারক্তি।

কবি বলছেন, স্নানে স্নিগ্ধ হয়ে, উদরটা ডাল ভাত দিয়ে ঠেসে পূর্ণ করে, গণ্ডে পান ভরে, চাপকান পরে, নিত্য আপিস আসি পুরুষানুক্রম ভৃত্য,

"নাকে কর্ণে চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া কোনরূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি
রহিনা ঘুসি ফুঁসি কাছাকাছি।"

দ্বিজেন্দ্রলালের "ডিপুটী কাহিনী", "রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা," "নসীরাম পালের বক্তৃতা" "কলিযজ্ঞ", "নিত্যানন্দের উপাখ্যান", "গুরুদেব" প্রভৃতি অসংখ্য হাসির গান সে সময় বাঙ্গালী জাতিকে হাস্য পরিহাসে আনন্দমুখর করে

রেখেছিল। হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গাইতেও তিনি সেই রকম অতুলনীয় ছিল।

ময়মনসিং থেকে মালদহ, দার্জ্জিলিং থেকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত বাংলার প্রত্যেক জেলায় দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরি উপলক্ষে বদলী হয়েছেন। বাংলার সর্ব্বত্র তিনি নিজে তাঁর হাসির গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। না গেয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। আমরা বাল্যকালে দেখেছি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কি কদর! যদি কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান গাইবার লোক পেয়েছেন, তখনই তাঁকে হাসির গান গাইতে অনুরোধ করেছেন। তা সভা-সমিতিতেই হোক আর কারও বাড়ীর বৈঠকখানায়ই হোক। আর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনবার জন্য লোকের এতই আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল যে সেখানেই শত শত লোক এসে সমবেত হয়ে সেই কৌতুকজনক গান শুনে প্রাণভরে আনন্দ উপভোগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানের মধ্যে বিলাতের হিউমার বা ব্যঙ্গ এদেশে আমদানী করে তার সঙ্গে শ্লেষের মাদকতা মিশিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিলিতী ঢংয়ের সুরে সেই হাসির গান প্রচার করেছিলেন। সে গান বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সম্পদ হয়ে আছে। বাংলার সকল শ্রেণীর ভণ্ডকে ধরে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। কেউ কিন্তু তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। বাংলার সর্ব্বত্র দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন তাঁর অপূর্ব্ব হাস্যরসের স্নিগ্ধ স্বত-উচ্ছ্বসিত অনাবিল নির্ঝ'র ধারায় বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন।

বাঙ্গালী এক আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই বাঙ্গালী আজ সেই প্রতিভাধর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ভুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলেছে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতাব্দীর সূচনায় তাঁর হাসির গানের কথা বাঙ্গালী জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

কটকে চব্বিশ মাস

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গত বোশেখ মাসের 'সংহতি' পত্রিকায় দেওঘর সম্বন্ধে লেখা সমাপ্তির সূত্রে লিখেছিলুম—

'দেওঘরের কথা ফুরুলো।

নটে গাছটি মুড়ুলো।——তবে বর্ষার জল পেয়ে আবার যদি নটে গাছ গজায়, তখন আবার দেখা যাবে।' এখন দেখছি, আষাঢ়ের জল পেয়ে, নটে গাছে দু'চারটে কচি পাতা দেখা দিয়েচে। তাই আবার কলম তুলে নিয়ে,—দেওঘরের নয়—কটকের এই কাহিনী।

উড়িষ্যার পথে এই আমার প্রথম পদার্পণ। এর আগে ওদিকে আমি কখনো যাইনি। সম্ভবতঃ বাংলা ১৩১৮ সালে আমি কটকে যাই। সুতরাং তখন আমার বয়স তিরিশ। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন উড়িষ্যা আজকের মত এতটা শিক্ষিত ও উন্নত হয়নি। সারা উড়িষ্যার একটি মাত্র জন-নায়কের নাম তখন সকলের কাছে সম্ভ্রমের সঙ্গে পরিচিত ছিল—এম. এস. দাস। উৎকলের প্রতিনিধি হিসাবে সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই সে সময় ভাইস্‌রয়ের কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। আমি কটকে চব্বিশ মাসের মধ্যে যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে তাঁদের স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসা পেয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে স্বর্গতঃ এম. এস. দাস (মধুসূদন দাস) অন্যতম। কটকে থাকা কালে আমি অনেকবার তাঁর গৃহে গিয়েছি। সে সময় কনিকার রাজার তিনি ছিলেন অভিভাবক ও উপদেষ্টা। বিখ্যাত 'উৎকল ট্যানারী' তাঁরি উৎসাহ ও উদ্যমে সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে চর্মজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রথম বৃহদায়তন কারখানা বোধ হয় এই 'উৎকল ট্যানারী'। উৎকল ট্যানারীর জুতা রূপে ও গুণে বিলাতীর সমকক্ষ হোয়ে উঠেছিল; অথচ বিলাতী জুতার তুলনায় তার দাম ছিল খুব কম। উড়িষ্যায় গো-সাপের সংখ্যা ছিল প্রচুর। গো-সাপকে ওখানে গন্ধী সাপ বলা হয়। গন্ধীর চামড়ায় খুব সুন্দর জুতা তৈরী হোত। এর [illegible]

মামার বাড়ী রামেশ্বরপুর থাকবার ফলে ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল। কালীঘাটে চলে এসে ওষুধ-বিষুধ খাওয়ায় জ্বরটা বন্ধ হোয়ে যায়, কিন্তু শরীর সারে না। কোনো ভাল জায়গায় চেঞ্জে যেতে পারলে অল্প দিনে শরীরটা সেরে যেতে পারে। কিন্তু যাই কোথা? আগে যেমন হুট্ বলতে দেওঘর চলে যেতুম, এখন আর তা হবার উপায় নেই। মামা-মামী এখন আর দেওঘরে নেই। এখন যেখানেই যাই, পয়সা খরচ চাই। সেদিকে হাত খালি। সুতরাং এ অবস্থায় কোথায় যাওয়া যায়? ভাবতে লাগলুম নানা দিক দিয়ে। কিন্তু কোন ভাবনাই যখন কুল পায় না, তখন হাতের কাছে খবরের কাগজের একটুকরো বিজ্ঞাপন ভেসে এল—'রতন-এষ্টেটের কটকস্থিত সদর কাছারীর জন্য একজন বাঙ্গালী কেশিয়ার চাই। কোয়ার্টার দেওয়া হইবে। স্থান স্বাস্থ্যকর।' সেইটুকুকে অবলম্বন কোরে উৎসাহে উৎফুল্ল হলুম। সেই দিনই একখানা দরখাস্ত লিখে ডাকে ছেড়ে দিলুম। দরখাস্তটা ছাড়বার আগে পর্যন্ত মনের মধ্যে যেরকম আশা-উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, ছাড়বার পরেই দিনের-পর-দিন তা কমে আসতে লাগলো। ঘরের সন্ধ্যা-প্রদীপ উস্কে দেবার জন্যে একটা কাঠি থাকে, মনের এ-দীপ উস্কে দেবার কাঠি কোথায় পাই? ভাবছি; খুবই ভাবছি। দশ-বারো দিন কেটে গেল। প্রদীপ প্রায় নিভে এসেচে। পনর দিন, ষোল দিন। হঠাৎ দক্ষিণের বাতাসে নিবন্ত প্রদীপ জ্বলে উঠলো—'আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। যথাসম্ভব সত্বর আপনি চলিয়া আসুন।' সুতরাং আর দেরী না কোরে, তল্পী-তল্পা বেঁধে পরের দিনই কটক যাত্রা করলুম। ভেবেছিলুম মাস-দুই-ওখানে থেকে, শরীরটা একটু সারলেই চলে আসবো! কিন্তু তা হয়নি, দু'মাসের জায়গায় পুরো দুটি বছর ওখানে আমি কাটিয়ে আসি। আজ কটকের সেই চব্বিশ মাসের কথা, পঞ্চাশ বছরের ক্ষীণ স্মৃতি ঘাঁটা-ঘাঁটি কোরে লিখতে বসেচি।

জুতা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত দ্বারা একদিকে যেমন গো-সাপের সংখ্যা হ্রাস পায়, অপর দিকে গো-সাপ নিধন কাজে এক শ্রেণীর দরিদ্র লোকের অর্থাগমের উপায় হয়। গো-সাপের চামড়ায় তৈরী এক জোড়া জুতা (Shoe) আমি কিনেছিলাম। দাম বোধ হয় ২৲ টাকা কি ২॥০ টাকা। সে জুতা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি মোলায়েম। তার ফিনিশ (finish) ছিল ঠিক বিলিতীরই মত। টিঁকে-ছিলও অনেকদিন।

আমার এক বন্ধু—মহানন্দবাবু—আলিপুর বেলভেডিয়ার রোডে থাকতেন। ওঁরা ছিলেন খৃশ্চান। ওঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ী কটকের বক্সীবাজারের ঐ দিকে। আসবার পূর্বদিন মহানন্দবাবুর কাছ থেকে ওঁদের নামে একখানা চিঠি নিয়ে রেখেছিলুম। মহানন্দবাবু ঐ চিঠিতে ওঁদের লিখে দিয়েছিলেন, আমাকে সব বিষয়ে যেন ওঁরা সাহায্য করেন। এর আগে কখনো যাইনি, নতুন জায়গা, ওখানকার পথ-ঘাট চিনি না। কোথায় রতন এষ্টেট, কোথায় তুলসীপুর—কিছুই জানি না। সাহায্যের দরকার বই কি। সুতরাং মহানন্দবাবুর চিঠি আমার খুব কাজে লেগেছিলো।

মধ্যরাত্রে আমার কামরায় একজন উড়িয়া ভদ্রলোক উঠলেন, পুরী যাবেন। পুরী জেলায় তাঁর বাড়ী। তিনি একজন ডেপুটী-ম্যাজিষ্টেট। তাঁর সঙ্গে নানাবিষয়ে গল্প-গাছা চলতে লাগলো। বয়সে তিনি আমার চেয়ে ৮।১০ বছরের বড় বলে মনে হোল। তাঁর মুখে শুনে আশ্চর্য হলুম যে, উড়িয়া জাতির মধ্যে সে সময় একমাত্র তিনিই ডেপুটী-ম্যাজিষ্টেট। তারপর কটকে দুবছর থেকে জানতে পারি, সে সময় উড়িষ্যার বড়-বড় রাজ-কর্মের অধিকাংশই নিযুক্ত ছিল—বাঙ্গালী—আজকের এই অধঃপতিত অবজ্ঞাত অন্যান্য প্রদেশের অপ্রিয়—বাঙ্গালী। শুধুই রাজকার্যে নয়, উড়িষ্যার অনেক বড় বড় জমিদারীর মালিক ছিল—বাঙ্গালী। আমি যে-রতন এষ্টেটের কাজে নিযুক্ত হোয়ে এসেছি, তার মালিক বাঙ্গালী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-গোষ্ঠীর এখানে বিস্তৃত জমিদারী। এখানকার আরো অনেক ছোট-বড় মাঝারি জমিদারীর মালিক তখন—বাঙ্গালী। তা' ছাড়া, উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, জজ, সাব-জজ, মুন্সেফ, ডাক্তার, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার একধার থেকে সবই বাঙ্গালী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত, উড়িষ্যায়ও নানাদিকে তখন বাঙ্গালীর মান-মর্যাদা, আদর, প্রতিপত্তি উচ্চপর্যায়ে উঠেছিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ অন্তরে তখন সকলে বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদর্শের দিকে তাকিয়ে, তার অনুসরণ ও অনুকরণ কোরে নিজেদের ধন্য মনে করতো। অবশ্য তখন বেহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গলা প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ ১৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকেই বোধ হয় পৃথক হোয়ে যায়। যাই হোক, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালীর সেদিনের সে চাকা ঘুরে গিয়েচে, পাশার ঘুঁটী আজ উলটো পড়তে সুরু করেচে। ৫০ বছরের ব্যবধানে আজ বাঙ্গলার, এই অবস্থা, সুতরাং আর ৫০ বছর পরে তার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কর্ণেল ইউ· এন· মুখার্জির 'A dying race' য়ের মত তার হিসাব, জ্ঞানী অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরাই করবেন। আমি আমার পুরানো স্মৃতির সূত্র ধরে এবিষয়ে দু'একটা কথা বললুম মাত্র।

রেলের কামরা থেকে কটক ষ্টেশনে যখন নামলুম, তখন ভোর বেলা। চারিদিকে একটু একটু অন্ধকার আছে। ষ্টেশনের বাইরে এসে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করলুম। গাড়োয়ানকে মহানন্দবাবুর সেই আত্মীয়ের নাম ঠিকানা বলাতে, সে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর বাড়ীর সামনে এনে নামিয়ে দিলে। দেখলুম, ষ্টেশন থেকে খুবই কাছে; ঘোড়ার গাড়ীর কোন দরকারই ছিল না, একটা কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা চাপিয়ে দিলে খুব সহজেই হেঁটে আসা যেত। রোজ এইরকম সময়ে সাত মাইল হেঁটে প্রাতর্ভ্রমণ করা যার চিরকালের অভ্যাস, এটুকু তার পক্ষে 'সিন্ধুর কাছে বিন্দু তুল্য।' ওঁরা তখন ঘুমুচ্ছিলেন; ডাকা-ডাকিতে উঠে পড়ে দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমি যে আজ এই গাড়ীতে আসবো এটা যদি এঁদের চিঠি দিয়ে আগে জানাতে পারতুম, তা হোলে—ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নেমেই এঁদের দেখা পেতুম।

হাত মুখ ধুয়ে, একটু বেলা হোতেই, কিছু জলযোগ করবার পর, ওঁদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে, আমার কর্মস্থল তুলসীপুর ও সেখানে রতন এস্টেটের অফিস দেখে এলুম। রতন এস্টেটের মালিক শ্রীজে· এন· বসু মহাশয় যে প্রকাণ্ড

বাংলোয় থাকতেন তারি বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের একধারে এস্টেটের অফিস। এটা সদর কাছারী। বিশ-পঁচিশজন কর্মচারী এখানে কাজ করেন। তা' ছাড়া জমাদার ও পাইক, বরকন্দাজের সংখ্যাও দশ বারো জন। এঁরা সকলেই উড়িয়া। উড়িয়া ভাষাতেই সেরেস্তার কাজকর্ম চলে। শুধু ক্যাশ ডিপাটমেণ্টটাই বাঙ্গলা খাতা-পত্রে ও হিসাবে চলে। এ ডিপার্টমেণ্টে শুধু আমি ও আমার একজন সহকারী মনীন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বাংলো কম্পাউণ্ডের অপর প্রান্তে সারি সারি তিনখানা পাকা ঘর; ইঁটের দেওয়াল, খড়ের ছাউনী। চাটাইয়ের মত এ-দেশের একরকম জিনিষের মজবুত সিলিং দেওয়া। এরই একখানা ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হোল। একখানা তক্তাপোষ, একখানা ছোট টেবিল, খান দুই চেয়ারও পাওয়া গেল। আমার সামান্য জিনিষ-পত্তর নিয়ে, বিকেলের দিকে আমার এই ঘরে এসে পড়লুম ও অফিসের একজন বরকন্দাজের সাহায্যে আমার বিদেশের এই ছোট্ট সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে ফেললুম। এই বরকন্দাজটির নাম—সুখিয়া। ঠিক হোল, সুখিয়া আমার জন্যে দু'বেলা এখানে রান্না করবে, আমিও খাব, সে-ও খাবে। বাজারটাও তার দ্বারা হবে। এক পাশে ছোট একটা রান্নাঘরও ছিল, সুতরাং কোন বিষয়ে কোনও অসুবিধা হোল না। সকালে উঠে খানিক বেড়িয়ে এসে, আমি পয়সা দি, সুখিয়া বাজার কোরে আনে; সুখিয়া রাঁধে আমি খাই। এইভাবে বেশ নিয়মের মধ্যে এবং সহজভাবে দিনগুলো কাটতে লাগল। সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়; অন্ধকার নামে, আবার ভোরের আলোয় চারিদিক ঝল্-মল্ করে। নতুন দেশের পাখীরা নতুন সুরে গাছে গাছে ডেকে ওঠে; তারি সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমার জীবন-পুঁথির পাতাগুলোও সেকালের কটকের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় বেশ আনন্দ ও আরামে একটা একটা কোরে উল্টে যেতে লাগলো। মাস খানেকের মধ্যেই আমার চেহারার বেশ পরিবর্তন ঘটলো।

আসবার সময় ভেবেছিলাম, মাস-দুই পরে, বায়ু পরিবর্তনের ফলে চেহারাটা একটু সারলেই দেশে ফিরে আসবো, কিন্তু তা হোল না। মন রাজী হোল না। বিদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী জল-হাওয়ার সঙ্গে নেমক-হারামী করতে পারলুম না। মাস-দেড়েক পরে, অফিসের খুব কাছে তিনটাকা মাসিক ভাড়ায় ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া কোরে দেশ থেকে আমার স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকরুণকে আনালাম। এতে সুখিয়ার রান্নাঘরের কাজ বেহাত হোয়ে গেল, তবে নিত্য বাজার করাটা তার হাতেই রইলো।

* * *

কটকের যেদিকটায় ঘন-বসতিপূর্ণ এবং লোকবহুল, সেটাকেই সহরাঞ্চল বলা হোত। তুলসীপুর তার বিপরীত দিকে—এটা একটু নির্জন, হট্টগোলশূন্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অঞ্চল। কটকের এই দু'দিকে দুটো নদী—কাঠজুড়ী আর মহানদী। কাঠজুড়ীর ঐ দিকটাতেই সহরাঞ্চল,—দোকান-পসার, লোকজন, হাট-বাজার। তুলসীপুর অঞ্চলটা মহানদীর কাছে। এখানকার রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ছাড়া-ছাড়া এক-একটা বাংলো, কোথাও কোন হৈ-চৈ, হট্টগোল নেই। এ ছাড়া ষ্টেশনের ঐ দিকে বক্সী-বাজার। বক্সী-বাজারেও কিছু দোকান-পত্তর, লোকজন, কেনা-বেচা আছে।

তুলসীপুর অঞ্চলে থাকেন রেলের গার্ড-সাহেবরা, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়। সুপ্রসিদ্ধ শতবর্ষজীবী সাহিত্যিক স্বর্গতঃ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশায়ও ঐ সময় কটকে থাকতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় শতবর্ষ হোয়ে ছিল। ঐ সময় তিনি বাঁকুড়ায় তাঁহার দেশের বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই দেশের বাড়ীতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য তাঁকে সম্বর্ধিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় তিনি লিখতে পড়তে না পারলেও, কাঁপা হাতে যে তাঁর নামটা ঐ অত বয়সেও সই করতে পারতেন, এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। ঐ সময়কার তাঁর নাম সইএর একটা প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হোল।

স্মরণ হইতেছে না। আপনার নামটিও সহজে ভুলিবার নয়।

ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

* * *

ঐ সময়ে কটকে যে-সমস্ত নাম-করা লোক থাকতেন, তাঁদের মধ্যে জনকয়েকের নাম এখানে উল্লেখ করলাম: নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা—জানকীনাথ বসু, রতন এষ্টেটের মালীক জে. এন. বসু (যোগেন্দ্রনাথ বসু), ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, জে. সি. দত্ত, রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার জয়ন্ত রাও ও শ্রীমতী সুখলতা রাও, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিপিনবিহারী গুপ্ত, ব্যারিষ্টার সুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি। জানকীনাথ বসু মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশের সর্বজনবিদিত নাম-করা শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। কটকে তাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বাল্যজীবনে নেতাজী কটকে থেকেই লেখাপড়া করতেন। আমার মনিব অর্থাৎ রতন এষ্টেটের মালীক জে. এন. বোস মশায় ছিলেন চন্দননগরের বিখ্যাত ধনীবংশের সুযোগ্য বংশধর। চন্দননগর রেল ষ্টেশনের ওপরেই যে সুন্দর ঝিল-পোল কৃত্রিমপাহাড়-ঝরণা-লতাগুল্ম-বৃক্ষ-বাগান সমন্বিত অট্টালিকা একদা প্রত্যেক রেল-যাত্রীর চোখে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হোয়ে দেখা দিত, সেই বাড়ী এঁদেরই।

বয়সাধিক্যের ফলে স্মৃতির কিছু দুর্বলতা ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ণিত ঘটনাবলী ও তার পরিচয়-বিবৃতির মধ্যে কোনও ভুলভ্রান্তি নেই বলেই মনে করি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতির ও-পারে ফিরে চাইলে সব যেন একটু ঘোলাটে বলেই মনে হয়, সব বিষয়েই মনে যেন একটু সন্দেহ আসে—এটা ঘটেছিল কি? তিনিই ত ঠিক? মহানদীতে ত প্রায়ই স্নান করতুম, বাসা থেকে খুবই কাছে ছিল নিশ্চয়, কিন্তু কত কাছে? তার নাইবার ঘাটটা কোন্‌দিকে ছিলো? ফুটবল গ্রাউণ্ডটা কোথায় কোন্ দিকে? মেডিকেল স্কুল? ক্ষীরোদবাবুর বাংলো? এম. এস. দাসের বাড়ীটা? সবই যেন কেমন ঝাপসা-ঝাপ্‌সা। ৫০ বছর পরে আজ এইসব লেখবার ফাঁকে-ফাঁকে, খোলা জানলা দিয়ে সামনেকার বিস্তীর্ণ দীঘিটার দিকে অন্যমনে চেয়ে থাকি—দীঘির ও-পারে ঐ দূরের গাছ-পালা। ছোট ছোট ঐ দিশী খোলায়-ছাওয়া কুটীরগুলো। তার পেছনে একটু দূরে ধানকলের ঐ চিম্‌নী, আরও দূরে—অনেক দূরে—সীমান্তের আকাশ যেখানে মাটির সঙ্গে ভাব করতে একেবারে তার বুকের ওপর নেমে পড়েচে—শূন্য মনে ঐ সবের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবি।

ভাবি অনেক কিছু। কখনো ভাবি, এই যে পুরোণো স্মৃতি মন্থন কোরে এই সব-লিখচি, কে এ-সব পড়বে? পড়ে আনন্দ পাবে, তৃপ্তি পাবে? হয় ত কেউ পাবে না। পড়বেই না। তবে···তবে—শুধু বর্তমান নিয়েই ত কথা নয়; কাল অনন্ত; কালে কালান্তরে অগণ্য মানুষের যাতায়াত। হয়ত ভবিষ্যৎকালের কোন পাঠক এ লেখা আগ্রহভরে পড়বে; পড়ে আনন্দ পাবে। হয় ত তখন আমার কথা তার মনের একরত্তি স্থান অধিকার কোরে ফুটে উঠবে। তখন আমি থাকবো না, তাই ভবিষ্যৎকালের সেই পাঠককে এখন আমি আমার অন্তরের প্রীতিভরা ধন্যবাদ দিয়ে রাখলাম।

কটকে এসে আমার নতুন কাজে বাহাল হবার পর, তখন বেশ একটু পুরোণো হোয়ে গিয়েছি। এই সময়ে একদিনের একটা মজার কথা বলি। তখন হাত-ঘড়ীর (wrist watch) চলন অল্প অল্প সুরু হোয়েছে। আমাদের সেরেস্তার একজন কর্মচারী 'হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র ক্যাটালগ দেখে, একটা হাত ঘড়ীর জন্যে চিঠি দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ ঘড়ীটা ভিঃ পিঃ হোয়ে আসে। ঘড়ীর দাম এবং মাশুলাদি নিয়ে, ভিঃ পিঃটা বোধ হয় ১৮ টাকার ছিল। কর্মচারিটি ঝোঁকের মাথায় ঘড়ী পাঠাতে চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু আঠারো টাকা চার্জ হোয়ে ঘড়ীটা যখন এল, তখন তিনি 'ভিঃ পিঃ' নিতে রাজী না হোয়ে, ফেরৎ দিতে চাইলেন। সেরেস্তার একজন প্রবীণ কর্মচারী বললেন—"অর্ডার দিয়ে, 'ভিঃ পিঃ' ফেরত দিলে কোম্পানীর কাছে রতন এষ্টেটের দুর্নাম হবে। আমাদের বাবু কোম্পানীর একজন পরিচিত খদ্দের।' সুতরাং ওটা ফেরৎ দিতে পারলে না। তবে, কয়েকজনের পরামর্শে এই সাব্যস্ত হোল যে, সেরেস্তার ১৬ জনের প্রত্যেকের কাছ হোতে একটা কোরে টাকা নিয়ে, ঐ ১৬ জনের মধ্যে ঘড়ীটা লটারী কোরে দেওয়া হোক। এ জন্যে ওঁরা আমার কাছেও এলেন। আমি চিরকাল লটারীতে নাম দেবার বিপক্ষে, সুতরাং নাম দিতে রাজী হলুম না। কিন্তু ওঁদের ভীষণ পীড়াপীড়ি, নাম দিতেই হবে। শেষে একটু

বিরক্ত মনেই একটা টাকা ওঁদের দিলাম এবং দিলাম যখন, তখন লটারী-স্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাগজ কেটে ছোট ছোট ৩২টা টুকরো করা হোল। তার ১৬ খানায় ১৬ জনের নাম আর বাকী ১৬ খানার ১৫ খানাতে ০ লিখে ১খানাতে লেখা হোল 'ঘড়ী'। তারপর দুটো মাটির হাঁড়ী এনে, একটার মধ্যে ১৬ খানা নামের কাগজ ভাঁজ কোরে রাখা হোল, আর অন্য হাঁড়ীটায় বাকী ১৬ খানা কাগজ ঐরূপ ভাঁজ কোরে রাখা হোল। 'বালা' নামে আফিসের এক মালী ছিল, সে অফিসের পাশেই একখানা ঘরে থাকতো। তার চার বছরের এক ছেলে ছিল। তাকে এনে, তার চোখ বেঁধে, দুটো হাঁড়ীর মাঝখানে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলা হোল যে, প্রত্যেক হাঁড়ী থেকে প্রত্যেক হাতে এক একখানা কাগজ সে তুলে দেবে। তাই সে করলে। কিন্তু সবাই চমকে উঠলো যে প্রথম বার তুলতেই আমারই নামে ঘড়ী উঠলো। তখন প্রথমটায় কারুর মুখে কোন কথা বার হ'ল না, সকলে ওঁরা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আমি বললাম—"আমার নামে উঠলো, ঘড়ীটা দাও।" তখন ওঁদের মধ্যে একজন যেন ঢোঁক্ গিলে বললেন—"লটারীটা ঠিকমত হয়নি, একটু দোষ হোয়েচে।" আমি বললুম—"কি দোষ?" উনি বললেন—"ভেতরের কাগজগুলো ভালো কোরে নেড়ে-চেড়ে ঘুলিয়ে দেওয়া হয়নি।" আমি বল্লুম—"নেড়ে-চেড়ে ত দেওয়া হোয়েচে। তা' ছাড়া, ও চার বছরের ছেলে, তার ওপর ওর চোখ বাঁধা।' মনে মনে একটু বিরক্ত হলুম। ওঁদের মনের দুর্বলতাটাও বুঝলুম। আমি আর ওখানে দাঁড়ালাম না, আফিসে আমার জায়গায় এসে বসলুম। মণীন্দ্র ওখানে থাকলো। ওঁরা ছেলেটিকে আবার বসিয়ে দিলেন। আবার কাগজগুলো ভালো করে নেড়ে-চেড়ে ওলোট্-পালোট করে দেওয়া হোল। ছেলেটা আবার এক একখানা কোরে ওঠাতে সুরু করলে। একবার···দু'বার···তিনবার···চারবার; চার জনের নামেই '০' শূন্য উঠলো। তারপর—পাঁচবার কাগজখানা ভাঁজ খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখ ম্লান হোয়ে গেল। এবারও আমারই নামের সঙ্গে ঘড়ী! আর উপায় নেই। ম্লান মুখভাবের সঙ্গে ওঁরা লোক দেখানো একটা আনন্দভাব দেখিয়ে, আমার কাছে এসে বললেন—"আপনার ভাগ্য ভালো, আপনার নামে উঠেচে।" ঘড়ীটা আমার হাতে দিলেন। আমি দেখলুম, কমদামের ঘড়ী, একেবারে বাজে জিনিস। আমি সঙ্গে-সঙ্গেই ওটা ওঁদের একজনকে ১০ দশ টাকাতে বিক্রী করে দিলুম, আর তা থেকে একটা টাকা 'বালা'র ঐ পুঁচ্‌কে ছেলেটাকে মোয়া খেতে দিলুম।

* * *

আমার স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন, যথা সময়ে একটি পুত্রসন্তান হোল। আমার বাসার পাশে একটি ছোট উড়িয়া-খৃষ্টান পরিবার ছিল। দুই বোন—মনোরমা ও সুশীলা এবং মনোরমার স্বামী। বড় বোন মনোরমা ছিলেন লেডিডাক্তার এ সময় গোড়া থেকে এঁদের খুব সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল।

খোকাটি হবার পর মাস-দুই বেশ কেটে গেল। খাই দাই-থাকি বেড়াই আর ঘরের কারখানা আর বাইরের অফিস চালাই। নব-জাতকটি দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়চে। তার ট্যাঁ-ট্যাঁ কান্নায় বাড়ী সরগরম। তার সঙ্গে যখন আর একজনের স্বর মেলে, তখন বাড়ী ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। 'সেই আর একজন'টি হচ্চে—একটি ক্ষুদ্রাকার পাখী। উড়িষ্যায় এই পাখী প্রচুর। এর নাম 'হরোয়াল্'—অর্থাৎ হরবোলা। সারা দিন অনবরত শীষ দিয়েও বাড়ীকে কুঞ্জ-কানন কোরে তোলে। খোকা যখন স্বর তোলে, তখন ও চারিদিকে চেয়ে খুঁজতে থাকে, তাঁর জুড়িদারটি কোথায়। তারপর দুজনে পাল্লা দিয়ে স্বর-সাধনা চালায়।

এই ভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর, হঠাৎ এক বিপদ এসে উপস্থিত। বিপদের বদলে আপদ বলাই ভালো। ফৌজদারী কোর্টের পিয়াদা আমাকে একখানা শমন জারি কোরে গেল। আমার নামে শমন? এই বিদেশে। শমনটা উড়িয়ায় লেখা, সুতরাং তা থেকে কিছুই বুঝতে পারলুম না। তা আবার দাওয়ানী নয়, একেবারে ফৌজ-দারী! কই, ক'কেও ত খুন-জখম করিনি, মারা-মারি করিনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাই নি। নানারকম দুশ্চিন্তা এসে মনকে ছেয়ে ফেললে। সন্ত্রস্ত মনে শমন খানা নিয়ে তখনি গেলুম—আমার এক উড়িয়া প্রতিবেশীর কাছে। তিনি সবটা পোড়ে বললেন—আপনার খোকাটির স্বার্থ-

রেজেষ্ট্রী করান নি ?" বললাম—"প্রথমটায় ভুলে গেছলুম, কিন্তু মনে পড়তে সেদিন ত করিয়ে এসেচি।"

"সময়ে না-করার জন্য পুলিশ আপনার নামে কেস্ করেচে।"

আমি ওঁর মুখের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রইলুম। উনি বললেন—"ভয়ের কিছু নেই, বড় জোর দু'চার টাকা ফাইন হবে। সত্যপথে চলবার এসব হোল মাশুল। আপনি না লিখিয়ে এলে পুলিশ জানতে পারতো না ; তা ছাড়া মিথ্যে করে জন্মের তারিখটা কয়েকটা দিন আগিয়ে দিয়ে লেখা-লেও, আইনের আওতায় আপনাকে পড়তে হোত না। উড়িষ্যার কত লোক বার্থ-রেজেষ্ট্রীর ধারও ধারে না, পুলিশ তাদের কিছু করতেও পারে না।

সন্ধ্যার পর শমন খানা পকেটে কোরে, শ্রী জেঃ সি· দত্ত —ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় গেলুম ও শমনখানা তাঁকে দেখালুম—তিনি বললেন—"খোদ হর্স ফীল্ডের ঘরেই আপনার কেস্।"

"আচ্ছা কোর্টে আমাকে যেতেই ত হবে ?"

"হ্যাঁ, এটা ক্রিমিন্যাল কেস্ কি না ; যাবেন্—তাতে আর কি। এখানকার কোর্ট-কাছারীটা বেড়িয়ে দেখে আসা হবে।"

"তারপর ?"

"তারপর হাতী আর ঘোড়া হবে। যা'হোক ঐ দিন খেয়ে-দেয়ে বেলা ১১টার সময় আমার ঘরে যাবেন। কিছু এজন্যে ভাববার দরকার নেই। খোকাটিকে কোলে নিয়ে এখন চুমু খান গিয়ে। সামান্য কিছু ফাইন দিতেই হবে। খোকা বড় ছেলে। তার জল-খাবারের পয়সা থেকে সেটা কেটে নেবেন।"—বোলে দত্ত-সায়েব হাসতে লাগলেন।

যাই হোক, দিনের দিন গেলুম—ওঁরই-এজলাসে প্রথমে, উনি তখন একটা কেস্ করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই উনি ওঁর পেস্কারকে কি বোলে, বাইরে চলে গেলেন। পেস্কার আমাকে একখানা চেয়ার দিয়ে বললেন—"আপনি বসুন, উনি আসচেন।" আমি বাইরের দালানটাতে গিয়ে বসলাম।

প্রায় মিনিট্-কুড়ি-পচিশ পরে উনি ফিরে এসে বললেন, —আপনার কেস মিঃ হর্স ফীল্ডের ঘর থেকে ট্রান্সফার হোয়ে এখন মিষ্টার চন্দ্রের ঘরে। আপনি ওঁর ঘরে যান"—তিনি আমাকে অপরদিকের বারান্দার প্রান্তভাগ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"বরাবর চলে যান্, দরজার মাথায় ওঁর নাম লেখা আছে দেখবেন।" নির্দেশমত আমি সেই ঘরে ঢুকতেই, মিষ্টার চন্দ্র আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার নাম অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ?" আমি বললুম—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।" অন্য একটা কেসের জন্যে এজলাসে কিছু ভীড় ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কেস্‌য়ে পুলিস থেকে কে এসেছেন ?" ইউনিফর্ম-পরা সম্ভবতঃ এক জন সাব-ইন্সপেক্টার সামনে এগিয়ে এসে বল্লেন—"আমি এসেচি, হুজুর।"

"আচ্ছা, ওঁর ছেলের বার্থ-রেজেষ্ট্রী যে করানো হয় নি, এটা কি-সূত্রে আপনারা ধরতে পারলেন ?"

"উনি থানায় এসে লিখিয়ে গেছলেন, তাইতেই আমরা জানতে পারি।"

"ওঃ! তা হোলে, লিখিয়ে উনি গিয়েছিলেন, তবে একটু দেরীতে, তাই না? তারপর তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কটকে আপনি কতদিন আছেন ?"

"অল্প কয়েক মাস।"

"এখানে আপনার আর কে-কে আছেন ?"

"আমার স্ত্রী আর শাশুড়ী ঠাকরুণ।"

"কোন আত্মীয়-কুটুম্ব আপনার এখানে আছে কি ?"

"আজ্ঞে, না।"

"এই ছেলেটিই কি আপনার প্রথম সন্তান ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কেস্ হোয়ে গেল। একখানা কাগজে কি লিখলেন। জানতে পারলুম, আমার ফাইন হোল—৩২ পয়সা অর্থাৎ আট আনা। কিন্তু……ফাইন ত। মনে মনে ভাবলুম, আইনের ত মর্য্যাদা রাখতে হবে। সেই সঙ্গে পুলিশের কার্যদক্ষতার কথাটাই বার বার মনকে নাড়া দিতে লাগলো।

সন্ধ্যার পর দত্ত-সায়েবের বাংলোয় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

• • • • •

আমাদের এইদিকেই ফুটবল গ্রাউণ্ড। এই সময়টায়

সকলের মধ্যে ফুটবলের আকর্ষণটা একটু বেশী হোয়েছিল। এর কারণ, কোলকাতার মোহনবাগান দল এই বছর সর্ব-প্রথম শীল্ড-বিজয়ী হোল, সারা ভারতে ফুটবল খেলার রেকর্ড স্থাপন করেছিল, যার ফলে ভারতের সর্বত্র ফুটবল খেলার প্রতি সকলের একটা প্রবল প্রীতি ও ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। বিকালের দিকে আমি প্রায়ই ফুটবল খেলা দেখতে যেতুম। সেখানে ব্যারিষ্টার সুকুমার রায় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুনলিনী রায় চৌধুরীর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হোত। ফুটবল খেলা দেখতে এঁদের দুজনের খুব ঝোঁক ছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সে সময়ে কটকের মধ্যে একজন নাম-করা লোক পূর্বে তিনি র‍্যাভেন্‌সা কলেজের প্রিনসিপ্যাল ছিলেন। অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি—"উৎকল টাইমস নামে একখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা কোরে, তার সম্পাদকীয় কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি আমার শুধুই প্রতিবাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অভিভাবক স্বরূপ। সে সময় তাঁর বৃদ্ধ বয়স। ব্যারিষ্টার শ্রীরায় চৌধুরী তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। তবে তিনি পিতার সঙ্গে থাকতেন না, স্বতন্ত্র বাসায় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন এবং মধ্যে মধ্যেই স-স্ত্রীক পিতার বাংলোয় এসে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরে যেতেন।

ফুটবল গ্রাউণ্ডে একদিন শ্রীযুক্তা রায় চৌধুরীর হাতে বেশ ঝক্-ঝকে একখানা বই দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, ওখানা কি বই? তিনি বই খানি আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, ইংরাজী কবিতার বই বিলাতে ছাপা—অক্সফোর্ড কি কেমব্রিজ। শ্রীসরোজিনী নাইডুর লেখা। বইখানার নাম আমার স্মরণ নেই, Feathers of a bird, কিংবা 'Songs of a bird,' কিংবা ঐ রকম কিছু। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বললেন—"পড়বেন? আমার স্ত্রীর উনি বড় বোন।" বইখানা তিনি দিতে এলে, নিয়েছিলুম কি না, আমার স্মরণ নেই—ভদ্রতা দেখিয়ে, তাঁর কথায় বইখানা হয়ত পড়বার জন্যে নিয়ে থাকবো, কিন্তু অভদ্রতা দেখিয়ে, তা' যে পড়বার চেষ্টা করিনি, সে বিষয়ে হলপ কোরে বলতে পারি। ইংরেজী কবিতা পোড়ে বুঝবো এবং তার রসবোধ করবো, এ দুর্নাম আমার অতিবড় শত্রুরাও কেউ আমাকে দিতে পারবে না।

সুকুমার রায় চৌধুরী খুব অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীসুনলিনী রায় চৌধুরীও অত্যন্ত নম্রস্বভাব, ভদ্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত তিনিও একজন বিদুষী মহিলা।

পঞ্চাশ বছর আগের কথা, পঞ্চাশ বছর পরে লিখচি। স্মৃতির কোঠায় সব যেন ম্লান হোয়ে আসচে। যা কিছু দেখেছি, যা কিছু ঘটেচে, সবই যেন কেমন আবছা ঘোলাটে বলে মনে হয়। মহাকাল দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্চে; দিন মাস বছর তার অনুসরণ কোরে ছুটচে। কত মরু সাগরে এসে মিশেচে, কত সাগর-কূল ভেঙ্গেচে, কত নদীপথ ভুলে গুমরে মরেচে, কত পর্বতচূড়া ধ্বসে পড়েছে। কালে কালে ধরিত্রীর কত ভাঙ্গা-গড়া চলেচে। যা ছিল এখন তার অনেক কিছুই নেই; যা হোয়েচে, তার অনেক কিছুই ছিল না। কিছুদিন হল সংবাদ পেয়েছিলাম, ব্যারিষ্টার শ্রীরায় চৌধুরী মারা গিয়েচেন। শ্রীসুনলিনী জীবিতা আছেন; বর্তমানে তিনি আমেরিকায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
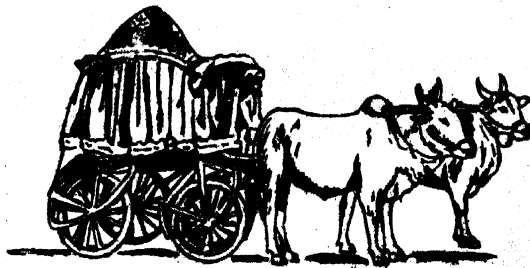
"ই. সি. এম্-"এ ব্রিটেন ও ভারতের সমস্যা

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার বা কমন মার্কেট (E C M) শব্দটি আজ সারা পৃথিবীতে আন্দোলন তুলিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল বা আফ্রিকার অশ্বেত-দেশগুলির মত পশ্চাৎপদ উন্নয়নশীল দেশের উপর শব্দটির বিশেষ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হইতেছে, যদিও এই বারোয়ারী বাজারের ইয়োরোপীয় সদস্যবৃন্দের কাছে ইহা সংহতি, শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক।

গ্রেট ব্রিটেন এখনও ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের বাহিরে আছে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় ব্রিটেনের এই বাজারে যোগদান অনিবার্য। বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে ব্রিটেনের লাভ এবং লোকসান উভয়ই আছে, কিন্তু লোকসান প্রধানতঃ মর্যাদার এবং লাভ বস্তুগত হওয়ায় ব্রিটেন যোগদানের পথেই অধিকতর ঝুঁকিয়াছে। এখন চলিতেছে সুবিধা-জনক সর্ত আদায়ের দরকষাকষি, অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের পূর্ণ সদস্যপদে বৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের ইতিহাস ব্যাখ্যা এখন অপ্রয়োজনীয়, ইহা লইয়া বর্তমানে ব্যাপক আলোচনা চলিতেছে, সকলেই অল্প-বিস্তর ইহার সহিত পরিচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রধানত ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী ইটালী, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের সহযোগিতায় রোম নগরে মিলিত হইয়া এই বাজার গঠনের এক চুক্তি করে। বাজারটি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইবে ধরিয়া লইয়া চুক্তিটি ব্যাপক এবং বিশদ-ভাবে রচিত হয়। ইহাতে ব্রিটেনের যোগদানের আশা করা হয় এবং ব্রিটেনের নেতৃত্বে ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল, ক্যানাডা, নাইজিরিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশকে লইয়া যে কমনওয়েলথ গঠিত হইয়াছে অথবা ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশের আফ্রিকার যে সব উপনিবেশ আছে, তাহাদের ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবারও বিধিব্যবস্থা রাখা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে রোম চুক্তি দ্বারা গঠিত ইয়োরোপীয় আর্থিক সমাজ (European Economic Community) বা ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার (European Common Market) একটি অর্থনৈতিক সংস্থা। রোম-চুক্তির দ্বিতীয় ধারায় বলা হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে একই হারে শুল্ক নীতি প্রবর্তন এবং সমগ্রভাবে ইহাদের আর্থিক সমুন্নয়ন। কিন্তু এই সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে, সদস্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিও ইহার লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সংস্থার আবরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন এই বারোয়ারী বাজারের লক্ষ্য সন্দেহ নাই।

ইয়োরোপের মধ্যে ব্রিটেনের মর্যাদা চিরকালই ফ্রান্সের চক্ষুশূল। ফ্রান্স ইংলণ্ডের মতো জার্মানীর সঙ্গেও এতকাল প্রায়ই বিবাদ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখন স্বার্থের খাতিরে ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানী ও ইটালীর সহিত দল পাকাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। এই বাজার গঠনের ফলে ইংলণ্ড খেলো হইবে, কমিউনিষ্ট ইউরোপকে সমৃদ্ধি ও সংহতির জোরে অগ্রাহ্য করা যাইবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুধু সংরক্ষিত হইবে না, বৃদ্ধি পাইবে; এগুলিই সম্ভবত ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের বর্তমান অধিনায়ক ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর প্রাণের কথা।

ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার গঠনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পূর্বাহ্নেই অনুধাবন করিয়াছিল। কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তি-সংহতি বৃদ্ধিতে তাহারও স্বার্থ, কাজেই বারোয়ারী বাজার গঠনের ব্যাপারে তাহার উৎসাহ

থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বাজার গঠনের ফলে ইয়োরোপে তাহাকে মর্যাদাভ্রষ্ট করিয়া ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্মানী বাড়িয়া উঠিবে, ইহা তাহার মনঃপূত হইতে পারে না। এই জন্যই ব্রিটেন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডকে লইয়া ইয়োরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিল। ব্রিটেনের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অধিনায়কত্বে চালিত এই সংস্থা (EFTA) ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়কত্বে চালিত সংস্থাটির (ECM) কাছে অগ্রগতির দৌড়ে স্পষ্টত পরাজিত হইয়াছে। ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের আপেক্ষিক উন্নতিতে অস্থির হইয়া নরওয়ে, আয়র্ল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, গ্রীস প্রভৃতি দেশ ইহার সদস্য হইবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছে। ব্রিটেনও ইহার বাহিরে থাকিয়া পিছু হটিয়া যাইবার পরিবর্তে ভিতরে ঢুকিয়া সমৃদ্ধির অংশলাভ এবং সম্ভব হইলে আপন আধিপত্য রক্ষার প্রয়াসই সমীচীন বলিয়া বোধ করিতেছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী ব্রিটেন প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করে যে, তাহারও ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগদানের ইচ্ছা আছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপুষ্ট ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভেদাত্মক শুল্কনীতি প্রবর্তক এই ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার সোভিয়েট রাশিয়া পছন্দ করে না, কিন্তু এই বাজারের সম্ভাবনা এত বেশী যে সোভিয়েট গোষ্ঠীর পছন্দ-অপছন্দ বাজারের সদস্যবৃন্দ গ্রাহ্য করিতেছে না। এই সমৃদ্ধির ও সংহতির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপন বৃহত্তর স্বার্থে এই বাজারের উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা করে নাই। বাস্তবিক ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্যকরী এই ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার ইতিমধ্যে সদস্যদের শিল্প-পণ্যের অভাবিত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব করিয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই সদস্যগুলির শিল্প-পণ্য উৎপাদনের সূচকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০, পক্ষান্তরে ব্রিটেনের শিল্পপণ্য উৎপাদনের সূচকসংখ্যা বাড়িয়া মাত্র ১২০ দাঁড়াইয়াছে। বারোয়ারী বাজারের দৌলতে ফরাসী বৃহৎ শিল্প-গোষ্ঠীগুলির সমৃদ্ধি এমন হইয়াছে যে, তাহাদের শেয়ারসমূহের শতকরা ৬৮ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ব্রিটেনে কৃষিপণ্যের উপর শতকরা ৩ ভাগ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়, ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে জনসাধারণ এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহার বিপরীতে তাহারা বৎসরে ১৫ কোটি পাউণ্ড করভার হইতে রেহাই পাইবে। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির আশা অত্যধিক বলিয়া ব্রিটেনের অনেকেই বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের পক্ষপাতী। অবশ্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা নাই বলিয়া এবং ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর নেতৃত্বে গঠিত বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে ব্রিটেনের মর্যাদাহানি হইবে বলিয়া অনেকে আবার ইহাতে সম্মতিদানে উৎসাহী নহেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, (ইহার মধ্যে বিশিষ্ট শ্রমিকদলীয় সদস্যও আছেন) ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে ব্রিটেনের লাভ তো কিছুই হইবে না, ইহার ফলে শুধু শুধু ব্রিটেনের সমুন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অধঃপতন ঘটিবে।*

ব্রিটেন এখনও ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগ দেয় নাই বটে, তবে দুদিন আগে বা দুদিন পরে যোগদান তাহার একরূপ নিশ্চিত। এ অবস্থায় ভারতের মত উন্নয়নকার্যে অগ্রসর অথচ পশ্চাৎপদ কমনওয়েলথভুক্ত দেশের অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। রোম চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে ভারতের সহিত ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (মোটামুটি ব্রিটেনের যোগদানের তিন বৎসর পরে) বাণিজ্যচুক্তি করা হইবে, সম্প্রতি ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে ব্রিটেনের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সহিত সাধারণভাবে অস্থায়ী ধরণের এক চুক্তি

---

* প্রখ্যাত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ ডলগাস জে ২৫।৫।৬২ তারিখের 'New Statesman' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—"We are asked to damage the Commonwealth and sacrifice some of the realities of the Parliamentary Government for the sake of economic gains which, in the opinion of those best qualified to judge, do not exist.

করা হইবে। এই চুক্তি দুইটির সময় ভারতের নিজস্বার্থে খুবই দৃঢ়তা দেখান দরকার। ব্রিটেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সুবিধার জন্য কিছুটা চেষ্টা করিতেছে সত্য, তবে সে চেষ্টার ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানী পণ্য কাপড় যাহাতে ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া তথা হইতে ইয়োরোপীয় বাজারে পুনঃরপ্তানী হইয়া না যায়, তজ্জন্য ফ্রান্স ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের নিকট ভারত হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ (fixed quota) কাপড় আমদানীর দাবী জানাইয়াছে। ফ্রান্স তাহার বস্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধন করিতেছে বলিয়াই এই দাবী, ইহা হইতেই বুঝা যায় নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের সদস্যবৃন্দ ভারতকে আশানুরূপ সুবিধাদানে কুণ্ঠিত হইবে। ইয়োরোপীয় আর্থিক সমাজে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী বি লাল এই জন্যই আলোচ্য বারোয়ারী বাজারে ভারতের জন্য রক্ষাকবচ দাবী করিয়াছেন। ইয়োরোপের বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের ফলে ভারতের ১৯ শতাংশ চা রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এছাড়া পাটজাত চট ও থলিয়া, থয়ের, কার্পেট, শোধিত পশুচর্ম, হস্তনির্মিত কার্পেট, সূতিবস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দারুণ ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা এখনও তেমন দেখা যাইতেছে না। ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কয়েকটি ভারতীয় পণ্য বিনাশুল্কে (Duty Free) ইউরোপীয় বারোয়ারী বাজারে প্রবেশাধিকার পাইবে সত্য, কিন্তু অসুবিধাগ্রস্ত রপ্তানী পণ্যের হিসাবে এই সুবিধাগ্রস্ত পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ নগণ্য বলিয়া ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি ইয়োরোপ সফর হইতে ফিরিয়া গত ৬ই আগষ্ট লোকসভায় প্রদত্ত বিবৃতিতে গভীর হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন—"What has caused me the greatest concern is that while, on the one hand, the list of items to be given duty-free entry in the commndity on the U. K's accession is still very small, it is proposed that the present common external tariff of the community should begin to become applicable in stages right from the date of the U. K's accession.

This would mean that for a wide range of our major exports, new restirctions will appear where none existed so far. Their effect on our trade and on our development plans cannot but be extremely serious."

ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার যতটা শ্বেত স্বার্থ রক্ষায় উৎসাহী হইবে ততটা কৃষ্ণ-স্বার্থ রক্ষায় উৎসাহ দেখাইবে না; এইরূপ বাস্তব আশঙ্কার জন্যই এশিয়া ও আফ্রিকার পশ্চাৎপদ উন্নয়নকামী দেশগুলিকে লইয়া পৃথক একটি বারোয়ারী বাজার গঠনের কথা অনেকে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। গত ৮ই জুলাই হইতে মিশরের কায়রোতে ৯দিন ব্যাপী যে সম্মেলন হইয়া গেল এবং যাহাতে ভারতের পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানুভাই দেশাই স্বয়ং যোগ দিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ বাজার গঠনের আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার দেশগুলিকে না ধরিয়া শুধু এশিয়ার দেশগুলিকে লইয়া একটি বারোয়ারী বাজার গঠনের জন্যও অনেকে আগ্রহ দেখাইতেছেন। গত ১৬ই জুলাই কলিকাতার মার্চেন্টস্ চেম্বার অফ্ কমার্সের ৬১তম বার্ষিক সভায় সভাপতি শ্রীবি. পি. ডালমিয়া এইরূপ বাজার গঠনের উপর জোর দেন। 'দি ইকনমিক উইকলি'র গত জুলাই মাসের বিশেষ সংখ্যায় "কমন মার্কেট ফর অল" শীর্ষক প্রবন্ধে এশীয় বারোয়ারী বাজার ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগ না দিয়া কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলিকে লইয়া নিজেদের স্বার্থে একটি পৃথক বারোয়ারী বাজার গঠন করুক, কমনওয়েলথ্ ভুক্ত দেশ নাইজিরিয়া সেরূপ একটি প্রস্তাব আনিয়াছিল।

ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বাজারে যোগ দিলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই। এক্ষেত্রে ভারতের বহির্বাণিজ্য যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য ভারতীয় পণ্যের যথাসম্ভব নিম্ন মূল্য এবং গুণগত উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতের অলঙ্কারাদি, বস্ত্র, সৌখিন-পণ্য ও শিল্প-সামগ্রী প্রভৃতি যাহাতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় বিদেশের বাজারে পৌছিতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য ভারতে বিদেশীদের ভ্রমন ব্যবস্থা অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। মার্চেন্টস্ চেম্বার অফ কমার্সের উপরোক্ত বার্ষিক সভার সভাপতি শ্রীবি. পি. ডালমিয়ার নিম্নোক্ত মন্তব্য এক্ষেত্রে সর্বদাই স্মরণযোগ্য :—"Unless India is able lo reduce the cost of her products by improved methods of production, it would be impossible to safeguard India's traditioal exports in case Britain joins the ECM."
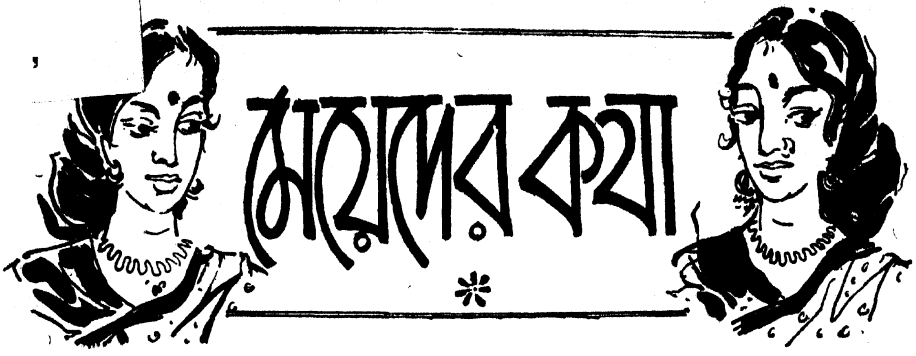
স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

বিবাহিত জীবন বিভিন্ন নারীর কাছে বিভিন্ন রকমের। কিন্তু বেশীর ভাগ নারীর জীবনই কেটে যায় প্রায় একই রকম ভাবে। স্বামী তার কাজে চলে যায়। ছেলে-মেয়েরা চলে যায় স্কুলে। বাড়ীতে সে থাকে একা। জীবন তার কাছে বড় ফাঁকা ঠেকে।

পাঞ্চালীর মেয়ে মৌলি ও ছেলে পিনাকী যখন বড় হয়ে উঠল, তখন তারও এ দুর্দশা হল। শুধু গার্হস্থ্য কাজ, শুধু স্বামী-পুত্র-কন্যার পরিচর্যা নিয়ে থাকতে ভাল লাগল না পাঞ্চালীর। এই কী নারীর জীবন? পাঞ্চালী জীবনে বৈচিত্র্য চায়। সে বৈচিত্র্য ঘর-কন্নার জীবনে কোথায়? তাই তিনি নারী সংগঠনের কাজে মন দেন। নানা রকম সমিতির পরিচালনায় তিনি হাত দেন। তার-পর ঘর-কন্নার সময়ই যে পান্ না। সঞ্জয় দিবারাত্র পরের ছেলে মানুষ করায় ব্যস্ত। নিজের ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়ায় নজর দেবার সময় নেই। তিনি বলেন, "মায়েদের কাছে শিক্ষাই সন্তানের বড় শিক্ষা।" পাঞ্চালী রেগে যান। "তাহ'লে আর স্কুল মাষ্টার বিয়ে করে কি লাভ হ'ল?" দুজনের মধ্যে প্রায়ই এ নিয়ে কলহ বাঁধে। পাঞ্চালীর সঙ্গে সঞ্জয় পেরে উঠে না, মৌলি আর পিনাকীকে নিয়ে বসতে হয় সঞ্জয়কে। সঞ্জয় কত সুন্দর গল্প বলেন ছেলে ও মেয়েকে নীতিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। মৌলিকে বিশেষ করে শোনান সাবিত্রীর গল্প, গার্গী মৈত্রেয়ীর জ্ঞানের কাহিনী। পাঞ্চালী ওসব শুনতে পেলে বড় রেগে যান। বলেন, "রেখে দাও তোমার সেকেলে সতী-সাবিত্রীর ভূতোড়ে গল্প। ইংরেজীটা একবার শেখাও। বিলেতের শিক্ষায় তোমার কিছু উপকার হয়নি।" মা ও বাপের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ মৌলির মনে অতি শৈশব কালেই একটা পরস্পর-বিরোধীভাবের বীজ বপন করল। একদিকে সমাজ সেবার নামে পাঞ্চালীর বহু পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেসা, অপর দিকে সঞ্জয়ের সতীত্ব-মাহাত্ম্য কীর্তন, নীতি উপদেশ ও সরল জীবন—দুয়েরই গভীর প্রভাব পড়ল মৌলির শিশু মনে। তা বিকাশ পেল তার কিশোর মানসে। আর প্রকটিত হ'ল ফুল্ল-যৌবনে।

ডাঃ ধ্রুব সেনের সঙ্গে যখন প্রথম প্রণয় জন্মে, তা'তার পিতার আদর্শগত প্রেরণার ফলেই একনিষ্ঠ প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু আবার যখন সে স্বামীর সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ী এসে ল' কলেজে ভর্তি হ'ল, সুশীলা আয়ারের পথে পা বাড়াল তখন তা'র মায়ের উচ্ছৃঙ্খলতাই তার মধ্যে রূপ পেল। কিন্তু এই দুই জীবনবাদের দ্বন্দ্ব তাকে, তার আত্মাকে, সতত পীড়িত ও দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলল। তার অন্তরে যেন দুই নারীর আত্মা বাস করছে। একটি সতীর—অপরটি ভ্রষ্টার। ভ্রষ্টার আত্মা যখন তাকে

পদস্খলিত করে, তখন সতীর আত্মা তার জেগে উঠে অনুশোচনা নিয়ে। অনুতাপের জ্বালায় মৌলিকে পুড়িয়ে মারে। সঞ্জয় মৌলির এ দুরবস্থা বুঝতে পারে। কিন্তু পাঞ্চালীর পক্ষে তা' বুঝতে পারা, সহ্য করতে পারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি মৌলিকে গালি দিতেন, আর নিজের পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। মৌলি তার বাপের কাছে বসে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত। সঞ্জয় মৌলির মনের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করতেন, ডাঃ সেনের সঙ্গে যাতে পুনর্মিলন সম্ভব হতে পারে সে রকম ভাবে উপদেশ দিতেন, গল্প করতেন।

একদিন সন্ধ্যায় সঞ্জয় বসে বসে কি লিখছিলেন। চসারের কেণ্টারবারী টেলস্ (Chaucers' Canturbury Tales)খানা তাঁর টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে। বিরস বদনে মৌলি তার বাপের জন্যে প্লেটের উপর কাপ বসিয়ে চা এনে রাখল। তারপর বসে পড়ল পাশের একটা চেয়ারে। সঞ্জয় পেয়ালা তুলে চুমুক দিতে দিতে মৌলির মুখখানা দেখে বড় বিষণ্ণ হলেন। ভাবলেন, মেয়ের জীবনে সুখলাভ, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কিছুরই অভাব হত না, যদি একটা জিনিস থাকত। সে হচ্ছে সহনশীলতা। বাপের সহনশীলতা সে পায় নি। সেই জন্যেই স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও একদিন তার সুখের সংসার ভেঙ্গে গেল। এত লেখাপড়া শেখা সত্ত্বেও সে সংসারের সুখ পেল না। মেয়ের মুখ মলিন দেখে সঞ্জয় নিরানন্দের আবহাওয়াটা দূর করবার উদ্দেশ্যে একটা গল্প বলতে সুরু করলেন চা খেতে খেতে।

'দেখেছ মৌলি, চসারের কবিতায় কী চমৎকার একটা গল্প। রাজা আর্থারের রাজসভায় এক লুব্ধ নাইট্‌কে (Knight) ধরে নিয়ে এল। অবলা নারীকে একা পথে পেয়ে তার সর্বনাশ করেছে সে। প্রজারা তার ন্যায়-বিচার চায়। রাজা তার শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজসভাস্থিত রাণী ও অন্যান্য মহিলারা—তার প্রাণ-ভিক্ষা চাইলেন। রাজা শেষে তাকে রাণীর হাতে ছেড়ে দিলেন। রাণী নাইট্‌কে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে এক বৎসর একদিন সময় দিচ্ছি। তুমি যদি এই সময়ের মধ্যে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পার, তবে তুমি মুক্তি পাবে। নইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। সে প্রশ্নটি হচ্ছে —"নারীর অন্তরের তীব্রতম বাসনা কি?" নাইট্ পথে পথে ঘুরতে লাগল। প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে সে গিয়েছে, কত নারীর কাছে সে প্রার্থনা করেছে—কেউ বলেছে নারী চায়, সুখ, সম্পদ, জমকালো পোষাক, চাটুকারিতা, অন্যের লুব্ধ দৃষ্টি, স্বাধীনতা, সুরক্ষা, কত কিছু। কিন্তু নাইট্ অন্তরে বুঝেছে একটিও প্রকৃত উত্তর নয়। অথচ সময় শেষ হ'তে দেরী নেই। পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে সে দূরে দেখতে পেল কয়টি পরী। এগিয়ে গেল সে। দেখল এক বুড়ী বসে আছে।

বুড়ী বলল, সে উত্তর রাত্রের মধ্যে বলবে, যদি সে প্রতিজ্ঞা করে সে যা বলবে তাই করবে। নাইট্ প্রতিজ্ঞা করল। উত্তর পেয়ে গেল সে। রাণীর সামনে হাজির হয়ে বলল, "নারী চায় স্বামীর উপর সার্বভৌম অধিকার, কর্তৃত্ব।" রাণীর সভার সকল নারী এক সংগে চীৎকার করে বললেন, "তোমার প্রাণ বেঁচেছে।" রাণী খুশী হয়ে তার মুক্তি দিলেন।

কিন্তু আর এক বিপদ হল নাইটের। সেই বুড়ী তাকে এবার ধরে বসল, "তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর—আমায় বিয়ে কর।" নাইট্ বলল, "তুমি অন্য কিছু চাও। আমি তাই করব।" বুড়ী রাজী হ'ল না। নাইট্ শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করল। বাসর শয্যায় নাইট্ বিরস বদনে বসে আছে। বুড়ী তাকে বলল, "এই কি নাইটের রীতি।' এই কি প্রতিজ্ঞা রক্ষার ধারা? বল তোমার কি দুঃখ?"

নাইট রেগে বলল, "তার দুঃখের আর অবসান নেই! বুড়ী তাকে ছলে বঞ্চিত করেছে।" বুড়ী তখন নাইটকে বলল, "বল তুমি আমায় কি ভাবে পেতে চাও! আমার কদর্যরূপ সত্ত্বেও আমার ভালোবাসা, আমার পতিভক্তি পেতে চাও? না চাও, কেবল আমার যৌবনোৎফুল্ল সম্মোহিনীরূপ, যে রূপে মাতাল হয়ে তোমার বন্ধুরা তোমার বাড়ীতে এসে ভিড় জমাবে?" নাইট সমস্যায় পড়ল। সে কোনটাই চায় না। সে কদর্য বুড়ীকেও চায় না—যে তার জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তুলবে, আবার সম্মোহিনীকেও চায় না—যে তাকে ঈর্ষায় উন্মাদ করবে। সে শেষ পর্যন্ত বুড়ী স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। বলল, "তোমার যা খুশি তাই কর।" বুড়ী নাইটের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পেল—নারী যা চায়। তারপর সে মোহিনী মূর্তি

ধারণ করল কিন্তু রইল পতির চির-অনুরক্তা। নাইটের জীবন সুখের হ'ল।

"নারী কি চায়, পুরুষ কি চায়, দাম্পত্য জীবন কিসে সুখের হয়—সবই এ কাহিনীতে পরিস্ফুট হয়েছে।" বলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন সঞ্জয়।

মৌলি বাপের বলা কাহিনীর সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করল। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলল, "বাবা, ভাল একটা দিন দেখো, আমি ছেলে দুটোকে ওদের বাপের কাছে নিয়ে যাবো, কিছুতেই ওদের অসুখ সারছে না।'

[ক্রমশঃ

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের 'সৌখিন-অথচ-নিত্য-প্রয়োজনীয়' কয়েকটি অভিনব কারু-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করেছি। এবারে বলছি, রঙ-বেরঙের টুকরো কাপড় দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার পুতুল তৈরী করার কথা। বাড়ীতে তৈরী বিভিন্ন-ছাঁদের এই সব সুন্দর-মনোহারী 'কাপড়ের-পুতুল, (Cloth-Dolls) হাতে পেলে শিশুদের মুখেই যে শুধু আনন্দের হাসি ফুটে উঠবে তাই নয়, গৃহস্থ-সংসারে নিত্য-নতুন খেলনাপত্র কেনার খরচেরও সুরাহা-সাশ্রয় হবে অনেকখানি।

আপাততঃ, নিতান্ত সহজসাধ্য, সাধাসিধা অথচ দেখতে সুন্দর, বিশেষ এক-ধরণের 'কাপড়ের-পুতুল' রচনার বিচিত্র পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ জানাচ্ছি। রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে রচিত এ পুতুলটির চেহারা কেমন হবে, নীচের ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট-পরিচয় পাবেন।

উপরের নক্সার ছাঁদে 'কাপড়ের পুতুল' তৈরী করতে হলে যে সব উপকরণ দরকার, প্রথমেই সেগুলির কথা বলি। এ কাজের জন্য চাই—প্রয়োজনমতো মাপের কয়েক টুকরো সূতী সিল্ক বা পশমের রঙীণ কাপড়…তবে, কাপড়ের টুকরোগুলি যেন বেশ খাপি এবং পুরু ধরণের হয়—নাহলে পুতুলটি তেমন মজবুত-টেকসই হবে না, খেলার সামগ্রী হিসাবে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে পড়ে দু'দিনেই ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই 'খেলার পুতুলের' জন্য কাপড়ের টুকরো বাছাই করবার সময় এদিকে দৃষ্টি রাখবেন সবিশেষ। কাপড়ের টুকরো ছাড়া আরো যে সব সরঞ্জাম দরকার, সেগুলির মধ্যে একান্ত-উল্লেখযোগ্য হলো—একখানি ভালো কাঁচি, প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রঙের সেলাইয়ের-সুতো, ছুঁচ, সরু-মোটা তুলি সমেত ছবি-আঁকার রঙের বাক্স (Colour-Box and Paint-Brushes) আর একপাত্র পরিষ্কার জল, পুতুলের চেহারার 'খশড়া-চিত্র' (Pattern-outline) আঁকবার জন্য বড় সাইজের একখানা কাগজ, পেন্সিল ও রবার (Eraser), এক প্যাকেট পরিচ্ছন্ন তুলো (Absorbant Cotton) কিম্বা খানিকটা পরিষ্কার বালি (Sand) বা মিহি-ধরণের কাঠের-গুঁড়ো (Fine Saw-Just), ¾" ইঞ্চি বা ১" ইঞ্চি চওড়া রঙীণ রেশমী-ফিতা একগজ, আর কাপড়ের পুতুলের মাথায় কেশ-রচনার জন্য দু'এক আউন্স কালো, শাদা অথবা বাদামী রঙের পশম।

এ সব জিনিষগুলি জোগাড় হবার পর, প্রথমেই বড় কাগজখানির বুকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে এবং প্রয়োজন-মতো আকারে নীচের ১নং ছবিতে দেখানো নক্সার নমুনা-অনুসারে পরিকল্পিত 'কাপড়ের-পুতুলের' দেহের 'খশড়া-চিত্রটি' এঁকে ফেলুন।

এবারে পছন্দমতো রঙীণ কাপড়ের টুকরোটির উপরে 'পুতুলের' দেহের 'খশড়া-চিত্র'-আঁকা ঐ কাগজখানিকে বসিয়ে কাঁচির সাহায্যে যথাযথ-আকারে কাপড়টিকে আগাগোড়া নিখুঁতভাবে কেটে নিন। এমনিভাবে হুবহু একই-ছাঁদে এবং সমান মাপে রঙীণ-কাপড়ের দু'টি টুকরো ছাটাই করে নেবেন···এ দুটি কাপড়ের টুকরোর একটি দিয়ে 'পুতুলের' দেহের সামনের অর্থাৎ মুখের দিকের অংশ আর অন্যটি দিয়ে 'পুতুলের' দেহের পিছনের বা পিঠের দিকের অংশ রচনা করতে হবে। 'পুতুলের' দেহের এ দুটি অংশ রচনার জন্য, কাপড়ের টুকরোগুলিকে কিভাবে ছাটাই করতে হবে—নীচের ২নং ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট আভাস পাবেন।
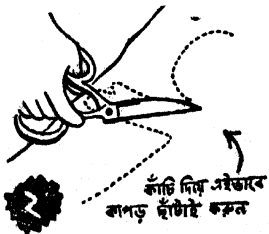
'পুতুলের' দেহের সুমুখ ও পিছন—দু'দিকের কাপড়ের টুকরো দু'টি সুষ্ঠুভাবে ছাটাই করে নেবার পর, নীচের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে এই দেহাংশ-দুটিকে আগাগোড়া সমানভাবে মিলিয়ে নিয়ে ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে কাপড়ের কিনারায় বরাবর 'টেঁকা-সেলাই' (Basting) দিয়ে একত্রে জুড়ে দিন। এভাবে জোড়া দেবার সময়, 'পুতুলের'

পা, কোমর, বুক আর হাত সবই সেলাই করতে হবে··· বাকী থাকবে শুধু মাথার অংশ। কারণ, সেলাই না করার ফলে, মাথার অংশের ঐ 'ফোকরটির' (opening) মধ্যে দিয়ে খালি-ঠোঙার (Hollow-Bag) মতো ছাঁদের 'পুতুলের' দেহ-কাণ্ডের ভিতরে বালি, কাঠের-গুঁড়ো অথবা তুলো ঠেশে আগাগোড়া ভরাট করে দেবার সুবিধা হবে।
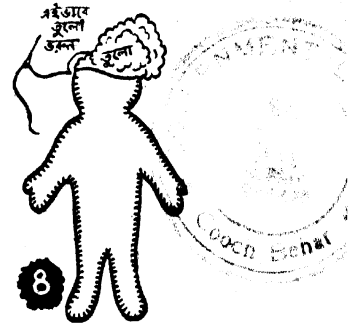
উপরোক্ত-পদ্ধতিতে 'পুতুলের' দেহ-কাণ্ড ভরাট করবার সময়, মাথার ঐ ফোকরটির মধ্যে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে বেশ ঠেশে-ঠেশে যথোপযুক্ত-পরিমাণে বালি, কাঠের-গুঁড়ো কিম্বা তুলো ভর্ত্তি করে দেবেন···যে সব জায়গায় আঙুলের নাগাল পাবেন না, সে অংশগুলি ভরাট করবার জন্য পেন্সিলের পিছন-দিকের 'ভোঁতা-মুখ' (Blunt-end of Pencil) ব্যবহার করবেন···তাহলেই আর কাজের কোনো অসুবিধা ঘটবে না—'পুতুলের' দেহটি আগাগোড়া দিব্যি পরিপাটিভাবে ঠেশে-ভরাট হয়ে

যাবে, কোথাও কোনো খুঁত বা এতটুকু আল্‌গা-ঢলঢলে্‌-ভাব থাকবে না—সবটুকুই বেশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

এমনিভাবে বালি, কাঠের-গুঁড়ো অথবা তুলো ঠেশে পুতুলের' দেহ-কাণ্ডটি আগাগোড়া পরিপুষ্ট-ভরাট হয়ে উঠলে, ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে 'টেঁকা-সেলাই' (Basting) দিয়ে মাথার সুমুখের ও পিছনের অংশের কাপড়ের কিনারা ছুটিকে একত্রে মিলিয়ে জুড়ে দিন। তারপর কালো, শাদা অথবা বাদামী রঙের পশমের ফালি দিয়ে 'কাপড়ের-পুতুলের' মাথায় বিনুনী-সমেত কেশগুচ্ছ বানিয়ে পাকাপোক্তভাবে সেলাই করে ফেলুন। এবারে নীচের ৫নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে রঙ-তুলির সাহায্যে 'কাপড়ের-পুতুলের' মুখে পরিপাটি-ছাঁদে চোখ, নাক, ঠোঁট প্রভৃতি এঁকে নিলেই হাতের কাজ মোটামুটি শেষ হবে।

পুতুলের মুখ, চোখ, নাক এঁকে নিয়ে পশমের সুতো দিয়ে মাথার চুল রচনা ও সেলাই করতে হবে এই ধরণে

এ কাজের পর, বাকী রইলো বিচিত্র এই 'কাপড়ের-পুতুলটিকে' জামা-জুতো পরিয়ে, চুলের বিনুনীতে সিল্কের ফিতা বেঁধে দিয়ে সুসজ্জিত করার পালা। সে পর্ব্ব অবশ্য এমন কিছু দুঃসাধ্য নয়, কাজেই তার আলোচনা করে আর বৃথা আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। ছোটবেলা নিজেদের হাতে খেলার পুতুলের জন্য কত সব সুন্দর-সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ বানিয়েছেন···সুতরাং এই 'কাপড়ের-পুতুলের' সাজসজ্জা রচনা, মেয়েদের পক্ষে এমন একটা কিছু কঠিন কাজ নয়···একাজ অনায়াসেই করে নিতে পারবেন।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি অভিনব-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

ব্লাউশের প্যাটার্ন

সুরুচি মুখোপাধ্যায়

গতবারে বর্ষার মরশুমে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপ-যোগী অভিনব-সৌখিন ছাঁদের কয়েকটি আরামপ্রদ পোষাক-পরিচ্ছদের নমুনা দিয়েছি। এবারে ভাদ্র মাসের ভ্যাপ্‌সা-গুমোট গরমে মহিলাদের পরিধানোপযোগী বিচিত্র-ধরণের ছুটি হাল্কা-ঢিলাঢালা এবং বুক-পিঠ-গলা-ঢাকা সৌখিন ব্লাউশের প্যাটার্ণ প্রকাশিত হলো।

উপরের ১নং ছবিতে ঢিলাঢালা-ছাঁদের যে সৌখিন ব্লাউশের প্যাটার্ণটি দেখানো হয়েছে, সেটি ভ্যাপ্‌সা-গরম আর বিশ্রী-গুমোটের দিনে ব্যবহারের উপযোগী। এই ধরণের ব্লাউশ সৌখিন এবং আটপৌরে—উভয়বিধ-ধরণেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলবে। তবে ক্ষীণকায়া মহিলাদের চেয়ে স্বাস্থ্যবতীদের অঙ্গেই এ প্যাটার্ণের ব্লাউশ আরো বেশী শোভন-সুন্দর ও মানানসই হবে—বিশেষ করে যাঁদের দেহের গঠন সুশ্রী আর সুসমন্বিত। এ ধরণের ব্লাউশের জন্য বিশেষ উপযোগী হবে—বিচিত্র-নক্সাদার অথবা এক-রঙা কোনো সৌখিন মিহি-মোলায়েম ধরণের রেশমী বা সুতীর কাপড়। এই প্যাটার্ণের 'পোষাকী-ব্লাউশ' বানাতে হলে, নক্সাদার রেশমী-কাপড় ছাড়াও এক-রঙা 'নাইলন' (Nylon) ও 'ভেলভেট'-

জাতীয় (Velvet) কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে··· আর 'আটপৌরে-পোষাক' হিসাবে সাধারণতঃ নক্সাদার রঙীণ-ছিটের অথবা এক-রঙ 'পপলিন' (Poplin), 'লন' (Lawn), খদ্দর ও হস্ত-চালিত তাঁতে-বোনা (Handloom-fabrics) সূতীর কাপড়েই এই প্যাটার্ণের ব্লাউশ অনেক বেশী সুন্দর আর মানানসই হবে। সম্প্রতি আমাদের দেশে জালিদার 'লেস্'-জাতীয় (Lace) মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের উপযোগী যে অভিনব কাপড় বাজারে বেরিয়েছে, সে-ধরণের কাপড়েও এ ব্লাউশটি বানানো যেতে পারে। কাজেই ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে এ ব্লাউশের জন্য কাপড় বাছাই করে নেওয়াই হলো সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা !

এ প্যাটার্ণের ব্লাউশের ছাঁট-কাট-সেলাইয়ের কাজ খুব একটা দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়···সীবন-শিল্পে যাঁদের অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা অনায়াসেই ঘরে বসে নিজেদের হাতে এ ধরণের পোষাক বানাতে পারবেন।

উপরের ২নং ছবিতে বুক-পিঠ-গলা ঢাকা বিচিত্র-ছাঁদের যে ব্লাউশের প্যাটার্ণটির নমুনা দেওয়া হয়েছে, সেটি বর্ষাকালের স্যাঁতসেতে-বাদ্‌লা আবহাওয়া আর শীতের ঠাণ্ডা-প্রকোপ থেকে মহিলাদের অঙ্গরক্ষার উপযোগী অভিনব-আরামপ্রদ বিশেষ এক-ধরণের পোষাক। সাধারণতঃ যে সব মহিলাদের দেহের গঠন রোগা-ধাঁচের, স্থূলাঙ্গীদের চেয়ে, এ প্যাটার্ণের ব্লাউশে তাঁদেরই অনেক বেশী সুশ্রী ও মানানসই দেখাবে। কারণ, এই প্যাটার্ণের ব্লাউজে, নিপুণ-কৌশলে বুক-পিঠ-গলা ঢাকা থাকার ফলে, তাঁদের দৈহিক-ত্রুটি-বিচ্যুতি বাইরে থেকে আদৌ নজরে পড়বে না এবং সুষ্ঠু-ছাঁদের ছাঁট-কাট-সেলাইয়ের গুণে পোষাকের ভূষণ-পারিপাট্য বৃদ্ধি পেয়ে, তাঁদের দেখাবে আরো অনেক্ বেশী সুন্দর-সুবেশা।

এ পোষাকটিও রচনা করতে হবে—উপরোক্ত অন্য ব্লাউশের মতো রঙীন অথবা নক্সাদার-ছিটের সূতী, রেশমী আর পশমী কাপড়ে। তবে অন্য ব্লাউশটি হবে যেমন ঢিলেঢালা-ছাঁদের, এ ব্লাউশটী কিন্তু সে ধরণের নয়···এটি তৈরী করতে হবে পুরু-কাপড়ে এবং অপেক্ষাকৃত আঁটসাঁট-ছাঁদে—অর্থাৎ, ইংরাজীতে যাকে বলে—ঈষৎ 'টাইট্-ফিট্' (Tight fitting)। মোটকথা এ প্যাটার্ণের ব্লাউশ যেমন দেহের সঙ্গে বেমালুম সেঁটেও থাকবে না, তেমনি অন্য প্যাটার্ণের ব্লাউশের মতো আবার নিতান্ত ঢিলেঢালা-ছাঁদের হলেও চলবে না—এ পোষাক তৈরীর সময় সেদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। খুব বেশী ঢিলেঢালা হলে, এ প্যাটার্ণের ব্লাউশ যে তেমন শোভন-সুন্দর ও আরামপ্রদ হবে না—সে কথা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কাজ করাই বিধেয়। যাঁরা নিজের হাতে জামা-কাপড় ছাঁট-কাট-সেলাইয়ের কাজকর্ম্ম করেন, তাঁদের পক্ষে এ প্যাটার্ণের ব্লাউশ-বানানো খুব একটা দুরূহ ব্যাপার নয়···একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা ঘরে বসে অনায়াসেই এ ধরণের পোষাক তৈরী করতে পারবেন।

বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব ছাঁদের সুন্দর-সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদের নমুনা দেবার বাসনা রইলো।
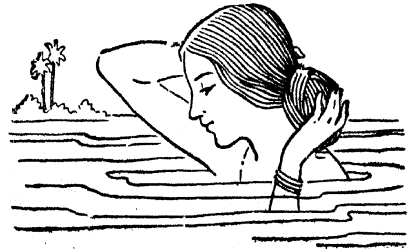
সুধীরা হালদার

এবারে উত্তর-ভারতের জনপ্রিয় কয়েকটি মুখরোচক খাবার রাঁধার কথা বলছি।

প্রথমেই যে বিচিত্র-উপাদেয় খাবারটির রন্ধন-প্রণালীর কথা জানাচ্ছি, সেটি ভারতের উত্তরাঞ্চলের মুসলমান-সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। মুসলমানী-খাবার হলেও, এটি কিন্তু পায়েস-জাতীয় বিশেষ এক-ধরণের সুমিষ্ট-সুস্বাদু নিরামিষ-রান্না এবং বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের রসনা-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে এ খাবার রান্না করা খুব একটা দুঃসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। মুসলমানী-ভাষায় উত্তর-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ এই খাবারটির নাম—'ফিন্নী'!

ফিন্নী ঃ

প্রায় ছয়-সাতজনের আহারোপযোগী অভিনব এই 'ফিন্নী' খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন—গোড়াতেই তার তালিকা পেশ করছি। এ রান্নার জন্য চাই—চায়ের চামচের ২ চামচ ভালো-মিহি পায়েসের চাল, চায়ের চামচের ৮ চামচ পরিষ্কার চিনি, কয়েকটি বাদাম আর পেস্তার কুচো, কিছু কিসমিস আর ১ সের টাটকা দুধ। অবশ্য, অতিথিদের সংখ্যা যদি ছয়-সাতজনের কম বা বেশী হয়, তাহলে প্রয়োজনানুসারে উপরোক্ত উপকরণের মাত্রাও যে সেই হিসাবে কমাতে বা বাড়াতে হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য!

যাই হোক, এ সব উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে প্রথমেই চাল-গুলিকে পরিপাটিভাবে বেছে, ভালো করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বড় একটি গামলা বা ডেকচিতে বেশ খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এভাবে ভিজিয়ে রাখার ফলে, চালগুলি আগাগোড়া নরম হয়ে গেলে, সেগুলিকে পাত্র থেকে তুলে ভালোভাবে জল ঝরিয়ে নিয়ে বেশ মিহি করে বেটে 'লেই' বা 'মণ্ড' (Pulp) বানিয়ে ফেলুন।

এবারে উনানের নরম আঁচে ডেকচি বা কড়া চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে দুধটুকু ঢেলে কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে জাল দিয়ে নিন। দুধটি ফুটন্ত হলে, ডেকচিতে দুধের সঙ্গে চিনি এবং চালের 'মণ্ড' বা 'লেই' মিশিয়ে একটি হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে রন্ধন-পাত্রের ভিতরকার ঐ 'মিশ্রণটিকে' (Melt) অনেকটা ঠিক পায়েস-রান্নার পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ বেশ করে নেড়ে-চেড়ে নিন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটন্ত-দুধের সঙ্গে চিনি আর চালের 'মণ্ড' বা 'লেই' ভালোভাবে মিলে-মিশে একাকার না হয়ে যায়, ততক্ষণ অবধি রান্নাটিকে এমনিভাবেই হাতা বা খুন্তী দিয়ে সমানে নাড়াচাড়া করতে হবে। তবে এ কাজের সময় সর্ব্বদা খেয়াল রাখবেন—অসাবধানতার ফলে, ফুটন্ত দুধ, চিনি আর চালের 'মণ্ডের' এই 'মিশ্রণ' খুব বেশী ঘন হয়ে যেন রন্ধন-পাত্রের তলায় কোথাও না কামড়ে বসে যায়। উনানের নরম-আঁচে কিছুক্ষণ এমনিভাবে রান্নার ফলে, ফুটন্ত দুধ, চিনি আর চালের 'মণ্ডের' মিশ্রণটুকু আগাগোড়া বেশ ঘন-থকথকে ক্ষীর বা পায়েসের মতো রূপ-ধারণ করলেই, রন্ধন-পাত্রটিকে আগুনের উপর নামিয়ে রাখবেন। তাহলেই উত্তর-ভারতের সুমিষ্ট-পরমান্ন 'ফিন্নী' রান্নার কাজ শেষ হবে।

উনানের আঁচ থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রাখার পর, পায়েসের মতো ঘন-থকথকে 'মিশ্রণটির' উপরে সামান্য একটু সুগন্ধী গোলাপ-জল আর পেস্তা-বাদামের কুচো ছড়িয়ে দিন। তারপর অতিথি-অভ্যাগতদের পাতে পরিবেষণের আগে রন্ধন-পাত্রের চারিদিকে বরফের টুকরো সাজিয়ে রান্নাটিকে কিছুক্ষণ ভালোভাবে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে নিন! তাহলেই ঐ ঘন-থকথকে নরম পায়েসের মতো সুস্বাদু 'ফিন্নী' খাবারটি ঈষৎ-জমাট

ধরণের হয়ে উঠবে। এবারে উপাদেয় এই খাবারটি পাতে পরিবেশনের পালা!

এই হলো, উত্তর-ভারতের অভিনব-পরমান্ন 'ফিরনী' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

অতঃপর, উত্তর-ভারতের আরো যে একটি বিচিত্র-উপাদেয় আমিষ-জাতীয় মোগলাই-খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি, সেটির নাম—'টিক্কি'। এটিও রসনা-তৃপ্তিকর বিশেষ জনপ্রিয় একটি সৌখীন খাবার··· বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিথি-অভ্যাগত আর প্রিয়জনদের সমাদরকল্পে অভিনব এই উত্তর-ভারতীয় আমিষ-খাবারটি পরিবেশন করে প্রত্যেক সুগৃহিনীই তাঁর সুরুচি আর রন্ধন-পটুতার সবিশেষ পরিচয় দিতে পারবেন।

টিক্কি ঃ

মোগলাই-ধরণের এই 'টিক্কি' খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—১ সের ভালো মেটুলী, ২টি পাতি-লেবু, অল্প কিছু পেঁয়াজ ও কাঁচা-লঙ্কার কুচো, আন্দাজ মতো পরিমাণে খানিকটা ঘি, গোলমরিচ, নুন আর কয়েকটি ঝকঝকে-পরিষ্কার লোহার শিক—সচরাচর শিক-কাবাব রান্নার কাজে যেমন জিনিষ ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত হিসাব-অনুসারে উপকরণগুলির যে পরিমাণ দেওয়া হলো, সেটি প্রায় সাত-আটজনের মতো খাবার রান্নার উপযোগী। সুতরাং, অতিথির সংখ্যা কম-বেশী হলে, প্রয়োজনানুসারে উপরোক্ত-পরিমাণেরও যে যথোচিত পরিবর্তন-সাধন করতে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য!

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজ সুরু করবার আগেই, মেটুলীর টুকরোগুলিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে সাফ করে নিয়ে, সেগুলিকে প্রায় এক ইঞ্চি আকারে খণ্ড-খণ্ড করে কেটে নিন। তারপর মেটুলীর খণ্ডিত-টুকরোগুলির সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, গোলমরিচ আর লেবুর রস মিশিয়ে রাখুন। এবারে ঐ লোহার-শিকগুলিতে ভালো করে ঘিয়ের প্রলেপ মাখিয়ে আগাগোড়া তৈলাক্ত করে নিয়ে, মেটুলীর খণ্ডিত-টুকরোগুলিকে সুষ্ঠুভাবে গেঁথে দিন। তারপর গনগনে-উনানের আঁচে একের পর এক মেটুলীর টুকরো-গাঁথা লোহার ঐ শিক-গুলিকে অনবরত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালোভাবে সেঁকে-ঝল্‌সে নিন! এমনিভাবে আগুনের গরম-আঁচে ঝল্‌সে নেবার ফলে, লোহার শিকে-গাঁথা মেটুলীর টুকরোগুলি যখন আগাগোড়া 'সুদগ্ধ' (Roasted) হয়ে যাবে, তখন সেগুলিকে লোহার-শিক থেকে খুলে নিয়ে পরিষ্কার একটি রেকাবীতে সাজিয়ে রেখে, সেগুলির উপর সামান্য একটু পেঁয়াজ আর কাঁচা-লঙ্কার কুচো ছড়িয়ে দেবেন। তাহলেই উত্তর-ভারতের বিচিত্র মোগলাই-খাবার 'টিক্কি' রান্নার পালা শেষ হবে। এবারে ভোজের আসরে প্রিয়জনদের পাতে পরিপাটিভাবে সৌখিন-উপাদেয় এই মেটুলীর 'টিক্কি' খাবার পরিবেশন করুন···এ খাবারের অপরূপ-স্বাদ পেয়ে তাঁরা প্রাণ ভরে সুগৃহিণীর সুরুচি আর রন্ধন-পটুতার তারিফ করবেন।

বারান্তরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি বিচিত্র খাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো!

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মশত বার্ষিকী—

গত ২০শে জুলাই শুক্রবার বাংলাদেশে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিন কবির জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) জন্মশতবার্ষিক পরিষদের উদ্যোগে কবির জন্মভিটায় উৎসব আরম্ভ হয়। কবিবর তথায় ১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় স্কুল ও কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। ঐ দিন সকালে কবিকন্যা শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ভিটায় স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। পরিষদের সভাপতি মহারাজকুমার শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় স্বাগত সম্ভাষণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর টাউন হলে এক সভায় অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন এবং পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায় স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য আবেদন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক সভায় দ্বিজেন্দ্র জীবন ও সাহিত্য আলোচিত হয়। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। গত ৫ই আগষ্ট আলমবাজারে কবি শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে রবিবাসরের একসভায় দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচিত হয়। সর্বাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিলে বহু বক্তা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করেন। এই শতবার্ষিক বৎসরে সর্বত্র নূতন করিয়া দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচিত হওয়া উচিত।

অধ্যক্ষ বি-আর-দে—

কলিকাতা গুরুদাস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবি-আর-দে কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস সুপণ্ডিত শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

অধ্যক্ষ অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—

২৪পরগণা গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিতেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীএ-পি-দাশগুপ্ত অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘকাল ঐ পদ খালি ছিল—৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে অমিতেশবাবু নির্বাচিত হইয়াছেন।

নোয়াখালিতে ২৫ নিহত, ৫০ আহত—

গত ১লা জুলাই পূর্বপাকিস্তানের নোয়াখালি জেলায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, গত ৯ই আগষ্ট দিল্লীর রাজ্যসভায় শ্রীনেহরু প্রকাশ করেন যে তথায় ২৫জন হিন্দু নিহত ও ৫০জন হিন্দু আহত হইয়াছে। চৌমহনীতে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্বপাকিস্তানে গত কয়েকমাসে রাজসাহী, যশোহর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি ঘটনায় বহু সংখ্যালঘু—হিন্দু নিহত হওয়ায় সেখান হইতে দলে দলে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। পূর্বপাকিস্তান সরকার উহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করে না বা বিনা পাসপোর্টে হিন্দুদিগকে চলিয়া আসিতে দিতেছে। ভারত সরকার পত্র লিখিয়া বা লোক পাঠাইয়া কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। এখন উপায় কি?

কোচবিহারে বন্যার ক্ষতি—

গত জুলাই মাসের প্রথম হইতে কোচবিহার সহরের নিকট তোরসা ও ধল্কা নদীর বন্যার ফলে বহু গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে ও বহু বর্গমাইল শস্যক্ষেত্র ডুবিয়া গিয়াছে। ফলে বহু লোক গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হয় ও রেলের লাইন বিপন্ন হওয়ায় কয়েকদিন রেল চলাচল বন্ধ ছিল। নানাস্থানে পথ ও পুল নির্মাণ এবং নদী-বন্ধনের ফলে পাহাড় অঞ্চলে এরূপ দৈবদুর্বিপাক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একদিক দিয়া আমরা যেমন প্রকৃতিকে নিজের

কাজে লাগাইতেছি, অন্যদিক দিয়া প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে। ইহার প্রতীকারের উপায় নাই।

যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র—

প্রবীণ কংগ্রেস সেবক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মী পাবনা শীতলাইএর জমীদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসগৃহে থ্রম্বসিস রোগে ৩১শে জুলাই পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি উত্তরবঙ্গ ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সহিতও যুক্ত ছিলেন। তিনি শিক্ষা, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি প্রচারে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি ২ বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ৬ পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম শত বার্ষিক—

আগামী বৎসরে ভারতের নবযুগ ও নবজীবনের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালিত হইবে ও সেজন্য এখন হইতে সর্বত্র উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ে স্বামীজির কথা সর্বত্র প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের মাতৃভূমির প্রাণশক্তি কি তাহা বলিতে যাইয়া স্বামীজি বলিয়া গিয়াছেন—"আমাদের এই পুণ্যভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারতবাসীর জীবন সঙ্গীতে ধর্মই মূল স্বর। অপর জাতিরা রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যের প্রভাবে সমৃদ্ধি লাভের মহিমা প্রচার করিয়া বৈশ্যবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করুক, অথবা রাষ্ট্রের বাহ্য স্বাধীনতার গৌরব কীর্তন করুক, ভারতের জনগণ কিন্তু এই সব বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহে না।" এই কথাগুলি আজ ভারতের তথা বাংলার গৃহে গৃহে ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন—এই কথা দ্বারাই ভারত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। সে জন্য আমরা কথা কয়টি ভারতবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র (পুলিস) মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৬২ বৎসর বয়সে গত ২৩শে জুলাই রাত্রি ১১ টার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসগৃহ ১৬, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীটে সহসা সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর মাত্র ২৩ দিন পরে তাঁহার অন্যতম প্রধান সহকর্মী কালীপদবাবুর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রী
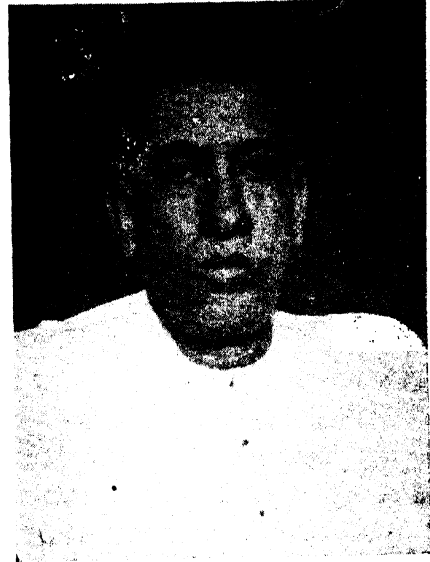
কালীপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রধান সহকর্মী ছিলেন না, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পরিচালনায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষেরও অন্যতম প্রধান সহকর্মী ছিলেন। তিনি পত্নী, ২ পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশে যে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, কালীপদবাবু তখন হইতে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। সোমবার সকালে সংবাদপত্র পাঠের সময় হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং গভীর রাত্রিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯০০ সালে তাঁহার জন্ম—তাহার পিতা ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আইনজীবী ছিলেন—হুগলী চন্দননগরে তাঁহাদের পূর্বনিবাস ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি খ্যাতনামা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসেন ও বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি-এ পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও তদবধি কংগ্রেসের কার্য্যে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে

নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন ও ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবন হইতেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে বহুবার তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। প্রায় ২০ বৎসর কাল তিনি কংগ্রেস আন্দোলন ও মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রধান কর্মীরূপে পশ্চিমবঙ্গের সকল কার্য্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। শ্রম, কারাগার, রাজস্ব, স্বরাষ্ট্র ও সর্বশেষে পরিবহন বিভাগের তিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছিল এবং অসাধারণ শ্রমশীলতা তাঁহাকে সকল কার্য্যের সহিত যুক্ত রাখিয়াছিল।

তিনটি রাজ্যে নূতন রাজ্যপাল—

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীএন-ভি-গ্যাডগিল অবসর গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীকে-সি-রেড্ডী পাঞ্জাবের নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। অন্ধ্রের রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচারের স্থানে আসামের রাজ্যপাল জেনারেল এস-এম-শ্রীনাগেশ অন্ধ্রের রাজ্যপাল হইলেন এবং যোজনা কমিশনের সদস্য শ্রীবিষ্ণু সহায় আসামের নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইলেন। এই সকল রাজ্যপাল নিয়োগে কোন বাঙ্গালীর স্থান হয় না—ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রই দুঃখিত বোধ করেন। বাংলাদেশে ত প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির অভাব নাই।

মাখনলাল রায়চৌধুরী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী গত ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় করোনারী থ্রম্বসিস রোগে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৬২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি পত্নী ও ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যাকে তিনি সকালে দমদম বিমান ঘাঁটিতে যাইয়া বিলাত পাঠাইয়া আসেন—বাড়ীতে ফিরিয়া সওয়া ১২টায় অসুস্থ হন ও সন্ধ্যা সওয়া ৬টায় তিনি মারা গিয়াছেন। ১৯০০ সালে নোয়াখালিতে তাঁহার জন্ম—পিতা ছিলেন মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী। ১৯২৫ সালে তিনি এম-এ পাশ করেন ও ১৯৫৩ সালে ডি-লিট হন। ১৯৪২ সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি ভারতবর্ষের লেখক ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত জাহানারার আত্মকাহিনী গ্রন্থ জনপ্রিয় হইয়াছিল। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি—

কলিকাতার কোন প্রকাশ্য স্থানে রাজ্য সরকার রাজা রামমোহন রায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার। উভয়েই বাংলার প্রধানতম ব্যক্তি—তাঁহাদের মূর্তি সত্বর প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য।

কবি নজরুলের পত্নী বিয়োগ—

কবি কাজি নজরুল ইসলামের পত্নী প্রমীলা ইসলাম গত ৩০শে জুন শনিবার ৫২ বৎসর বয়সে কলিকাতা বেলগাছিয়ায় স্বামীগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রমীলা ঢাকা মানিকগঞ্জ তেওতা গ্রামের বসন্তকুমার সেনের কন্যা, ১৯২৪ সালে তাঁহার বিবাহ হয়, দুই পুত্র সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ। প্রমীলা দেবীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহ বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে স্বামীর বংশের জমীতে কবর দেওয়া হইয়াছে। কাজি সাহেব ঐ সময় চুরুলিয়ায় যাইয়া কয়েকদিন তথায় বাস করিয়া আসিয়াছেন।

বলাই দেবশর্মা—

স্বদেশী যুগের লেখক ও কর্মী খ্যাতিমান সাংবাদিক বলাই দেবশর্মা মহাশয় গত ৩রা আগষ্ট শুক্রবার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ৭০ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানস্থ গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাঘনাপাড়ার অধিবাসী, যৌবনে স্বাদেশিকতা প্রচারে ব্রতী হন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া সারা জীবন স্বদেশী প্রচারে অতিবাহিত করেন। তিনি

সানলাইটে কেচে

কত ফরসা, ঝলমলে !

পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...

সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান

S. 32A-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে পুত্রদের সহযোগিতায় বর্দ্ধমান হইতে সাপ্তাহিক আর্য্য ও মাসিক শ্রী পত্র প্রকাশ করিতেন। বহু বৎসর দৈনিক বসুমতীর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষেও আমরা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তিনি জ্ঞানী, গুণী ও সুপণ্ডিত বলিয়া এবং হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আমরা তাঁহার স্নেহকৃপা লাভে ধন্য হইয়াছি এবং তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

মহিলাদিগকে নূতন শিক্ষা দান –

মহিলাদিগকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতা আলিপুর হেষ্টিংস হাউসে কয় বৎসর পূর্বে বিহারীলাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে কলিকাতা ১১ লোয়ার রাউডন ষ্ট্রীটে কলিকাতা মহিলা সমিতি মহিলাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য দ্বিতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীজে-কে-বিড়লার পত্নী স্বর্গতা জোহরী দেবী বিড়লার নামে ঐ নূতন কলেজের নামকরণ করা হইয়াছে। তথায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে আর্ট ও সায়েন্সে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স এবং বি-এ ও বি-এসসি থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত বাড়ে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

শ্রীঅরবিন্দ

রণজিৎ সরকার

হিরণ্ময় আলোর নির্ঝর
স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ে
মর্তের অন্তরে ;
পাতালের গাঢ় অন্ধকার
লুপ্ত হয় সে-স্রোতের বিপুল বিস্ময়ে।
এ গঙ্গা তোমার দান !

মানুষের চেতনার দুর্গম শিলায়
ও নদীর গতিপথ করেছ নির্মাণ
তাই মর্মে শুনি ওর চিরন্তন অমৃতের গান।

দিগ্বিদিকে দ্বন্দ্ব ছিল, ছিল অন্ধকার,
অসুরের কীর্তিসৌধে পূর্ণ ছিল জগৎ সংসার,
ছন্দহারা ছন্নছাড়া পৃথিবীর বুকে
তুমি দিলে শাশ্বত আলোক,
অব্যক্ত পুলকস্পর্শে রোমাঞ্চিল দ্যুলোক ভূলোক।

তোমার সোনালি স্বপ্ন স্পন্দমান জগতের
শিরায় শিরায় ;
তোমার নদীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ যাত্রী-আত্মা জীবনের
জাহাজ ভিড়ায়।
দেখা যায় ওই নবজন্মের তোরণ !
জেনেছি, শ্রীঅরবিন্দনাম
পৃথিবীর পরম শরণ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

উৎপল সতীশঙ্করের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছল দিনের রোদ আর নেই, রাত্রির আলোও জলে ওঠেনি। গাছপালার আড়ালে সারা বাড়িটি যেন স্তব্ধ আর ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। যেন বাড়িতে লোকজন এখন আর বাস করে না। পরিত্যক্ত গৃহটি যেন নিজের মনে বিষণ্ণ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানটি দরজা ভেজিয়ে রেখে ভিতরে কোথাও গেছে। সে হয়তো জানে এ বাড়িতে কেউ আর অনধিকার প্রবেশ করবে না। কারো কোন উৎসাহ কি ঔৎসুক্য আর অবশিষ্ট নেই।

উৎপল একটুকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখল। সন্ধ্যার আগে আগে তার মনও মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। সেই বিষণ্ণতার কারণ সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজতে ইচ্ছাও করে না। উৎপলের মনে হল তার বিষণ্ণতার সঙ্গে এই পরিত্যক্ত-প্রায় বাড়িটির কোথায় যেন প্রকৃতিগত একটু মিল রয়েছে।

উৎপল বারান্দা পার হয়ে বসবার বড় ঘরটিতে গিয়ে ঢুকল। চাকর ছিল না কাছাকাছি। সুইচ টিপে নিজেই আলো জ্বালল, পাখা চালাল। তারপর চেয়ারে চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে রইল। কী ব্যাপার। কারোরই সাড়া-শব্দ নেই। মিসেস রায় কি নেই নাকি বাড়িতে? পদ্মা আর বিশুই বা গেল কোথায়?

কিন্তু একটু বাদেই পর্দাটা আন্দোলিত হয়ে উঠল। মিসেস রায় অন্দর থেকে বাইরের ঘরে এলেন। উৎপলকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আপনি এসেছেন। নিজেই বুঝি আলো-টালো জ্বেলে নিলেন। আমাকে ডাকলেই পারতেন।'

'আপনাকে! আলো জ্বালবার জন্যে!'

অনুরাধা হাসলেন, 'কেন সুইচ টিপে আলোটি জেলে দিতে পারব না—আমি কি এমনই অকর্মণ্য? পারি আর না পারি আমাকেই দিতে হত। বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।'

উৎপল বলল, 'কেন, আপনার লোক-লস্কর যারা ছিল তারা সব গেল কোথায়?'

অনুরাধা বললেন, 'লোক-লস্কর? লোক-লস্কর কোন দিনই তেমন বিশেষ ছিল না। যাঁরা ছিল ওঁর চলে যাওয়ার পর তারাও বিদায় নিয়েছে। আছে শুধু শম্ভু-চাকর, আর ওই বুড়ো দারোয়ানটি।'

'তাদেরও তো কাউকে দেখছি নে।'

অনুরাধা বললেন, 'বিশুকে নিয়ে পদ্মা গেছে সিনেমা দেখতে। কী একটা ছেলেদের বই এসেছে। পদ্মাকে বললাম যা দেখিয়ে নিয়ে আয়। সিনেমা সিনেমা করে ছেলে একেবারে মাথা খেয়ে ফেলছিল। আর শম্ভু—সবে ধন নীলমনি ওকে পাঠিয়েছি ডাক্তারখানায়।'

উৎপল বলল, 'সেকি! ডাক্তারখানায় কেন আবার! কার অসুখ?'

অনুরাধা একটু হাসলেন, 'আপাতত আমিই রোগিণী। মাথাটা ধরেছে, 'ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণও টের পাচ্ছি। তাই ভাবলাম একটা টেবলেট-টেবলেট খেয়ে দেখি।'

উৎপল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সে কি। আপনি তাহলে অসুস্থ শরীর নিয়ে নেমে এসেছেন! না না, আপনি আর বসে থাকবেন না। যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

অনুরাধা বললেন, 'তাতে সামান্য রোগ একেবারে মহা আস্কারা পেয়ে যাবে। শুয়ে থাকার চেয়ে বসেই আমি ভালো থাকব। আপনি এলেন। খানিকক্ষণ গল্পে গল্পেও

বেশ সময় কাটবে। ভালো কথা, আপনার বইয়ের কত দূর হল ? কেমন এগোচ্ছে ?'

আসল প্রসঙ্গ উঠতেই উৎপল চুপ করে গেল। একটু-কাল নির্বাক হয়ে থেকে বলল, 'দেখুন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। সেই কথা বলব বলেই আজ এসেছি।'

অনুরাধা বললেন, 'বলুন না। আপনার দীর্ঘ প্রস্তাব না শুনে ভয় হচ্ছে।'

উৎপল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখুন আমি একটা বিষয় ঠিক করে ফেলেছি। যতদিন আমি বইটা শেষ করে না দিতে পারব আপনার কাছ থেকে আমি আর কিছুই নেব না।'

অনুরাধা একটু হেসে বললেন, 'শেষ করাটাই বড় কথা। অন্য সব কথা পরেও হতে পারবে।'

উৎপল একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'না, পরে না, ওসব কথা এখনই হয়ে যাক। আর দু-এক মাসের মধ্যে যদি আমি অনেকখানি কাজ শেষ করে আনতে না পারি তাহলে এই জীবনচরিত লেখার কাজ আমি ছেড়ে দেব। আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে—।'

অনুরাধা একটু কৌতুকের ভঙ্গিতে হেসে উঠে পাদ-পূরণ করে দিলেন, 'চিরজীবনের মত চলে যাব এবং কোন-দিন আর মুখ দেখাব না। এই তো ?'

অনুরাধার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। তিনি যে শুধু একদা প্রভাবশালী এবং অসাধারণ না হন সাধারণের চেয়ে আলাদা ক্ষমতাবান পুরুষের সহধর্মিণী ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও চারিত্রিক দৃঢ়তায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। তাঁর মত মহিলার এই চপলতায় একটু লাস্যঘেষা ভঙ্গিতে উৎপল বিস্মিত হল, শুধু বিস্মিত নয়, মুগ্ধও হল। লাস্য এখনও মানায় অনুরাধাকে। বয়সের দিক থেকে যৌবন অতিক্রান্ত হলেও চেহারা দেখে তা বুঝবার জো নেই। অথচ বেশভূষার খুব যে পারিপাট্য আছে তাও নয়। সেই কখনো কালোপাড়, কখনো খয়েরী কি নীল পাড়ের শাদা খোলের শাড়ী—গলায় সরু একগাছি হার আর হাতে দু গাছি চুড়ি—আর কোন আভরণ নেই। চোখে ঠোঁটে, কোন প্রসাধনের ছাপ নেই, অন্তত এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু রূপ যাঁর আছে লাবণ্য যাঁর আছে শিক্ষা আর রুচি যাঁর আছে তাঁর বোধ হয় বাইরের ভূষণের কোন দরকার হয় না। তাঁর স্বভাবই অলঙ্কার।

উৎপল ভেবেছিল তার কথা শুনে অনুরাধা রাগ করবেন, অন্ততঃ গম্ভীর হয়ে থাকবেন—কিন্তু তিনি যে ব্যাপারটাকে এমন করে হেসে উড়িয়ে দেবেন তা ধারণা করতে পারেনি।

উৎপলকে অমন বিস্মিত অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনুরাধা একটু যেন অপ্রতিভ হলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'অমন বড় বড় সঙ্কল্প ছেড়ে দিন উৎপল-বাবু। দু-এক মাসের মধ্যে শেষ করে দেবেন কী করে আপনি যে আমার বই—এখন পর্যন্ত আরম্ভই করেন নি একটি লাইনও লেখেননি'—তাকি আর আমি জানিনে ভেবেছেন ?'

এবার উৎপল স্তব্ধ হয়ে রইল। মিসেস রায় তাহলে তার মিথ্যাচরণ ধরে ফেলেছেন। অথচ তাঁকে উৎপল মাঝে মাঝে আশ্বাস দিয়েছে কিছু কিছু করে লিখে যাচ্ছে সে, তার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এ কথার এক বর্ণও তিনি বিশ্বাস করেননি। উৎপল একবার ভাবল প্রতিবাদ করে। কিন্তু পর মুহূর্তে তার মনে হল—যত প্রতিবাদই করুক এই বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে নিজেকে সে কিছুতেই আর বিশ্বাসভাজন করে তুলতে পারবে না। ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন অপমানের একটা খোঁচা অনুভব করল উৎপল। ভাবল আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। এই উপযুক্ত মুহূর্ত। জীবনী লেখার দায়িত্ব থেকে এখনই মুক্তি নিতে পারে উৎপল। শ পাঁচেক টাকা অবশ্য এ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে মিসেস রায়ের কাছ থেকে। সে টাকা ক্রমে ক্রমে শোধ করে দিলেই হবে। আর উনি যদি অবিলম্বে একসঙ্গেই টাকাটা ফেরৎ চান, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকাটা তুলে দিতে পারবে না উৎপল ? পাবলিসারদের কাছ থেকে কিছু অগ্রিমও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কী ভাষায় মিসেস রায়কে বলবে কথাটা ? এতদিনের আলাপ পরিচয়। সরাসরি বলাটা ভালো দেখাবেনা। একটু ঘুরিয়ে বলতে পারলেই শোভন হবে।

অনুরাধা উৎপলের দিকে চেয়ে ফের একটু হাসলেন, 'কি রকম হাতে হাতে ধরে ফেলেছি দেখুন। আর মুখে কথাটি নেই। আপনারা ভাবেন মনস্তত্ত্ব শুধু লেখকদেরই

মনোপলি। পাঠিকাদের তাতে একেবারেই কোন দখল নেই।'

উৎপল কি বলতে যাচ্ছিল—শম্ভু ঘরে ঢুকল।

অনুরাধা বললেন, 'কি, পেয়েছিস—টেবলেট? বাব্বা, ওষুধ আনতে তুই কি বোম্বে মেলে উঠে পড়েছিলি? চল টেবলেটটা খেয়ে নি। অবশ্য টনিকের কাজ আমার হয়ে গেছে।'

উৎপলের দিকে আর একবার হেসে তাকিয়ে অনুরাধা তাকে নির্বাক করে রেখে চলে গেলেন।

উৎপল তবু ভাবতে লাগল, কী ভাবে কথাটা বলা যায়। প্রথমে একটু আভাস দিয়ে তারপর ঘুরিয়ে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে—।

একটু বাদেই চলে এলেন অনুরাধা। ফের নিজের চেয়ারটিতে বসলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—আচ্ছা উৎপলবাবু আজ আমাকে একটি সত্যি কথা বলবেন?'

উৎপল বলল, 'মানে এতদিন যা বলেছি তার সবই মিথ্যে—।'

অনুরাধা হেসে বললেন, 'তা যদি বলেই থাকেন তাতে দোষের কী হয়েছে। মিথ্যেকে সত্যি করে তোলাই তো আপনাদের আর্ট। হ্যাঁ যা বলছিলাম। লিখতে আপনার অসুবিধেটা কী হচ্ছে বলুন তো।'

উৎপল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অসুবিধের কথা যদি নিজে বুঝতে পারব—কি বুঝিয়ে বলতে পারব—তাহলে তো—'

শম্ভু চা আর খাবার নিয়ে এল।

প্লেটটি রাখল উৎপলের সামনে।

অনুরাধা কেটলি থেকে চা ঢালতে লাগলেন।

উৎপল বলল, 'এসব আবার কি।'

'কিছুই না—একটু পুডিং। বিশু কদিন ধরে বায়না ধরেছিল। একবার যদি কোন কথা মুখ থেকে বেরোল, আর কি রক্ষে আছে। হুকুম তামিল না করা পর্যন্ত আর রেহাই নেই। একফোঁটা ছেলে। কিন্তু তার প্রতাপে সবাই অস্থির।'

এবার বাৎসল্যোসিক্ত একটি নারীর স্নিগ্ধরূপ দেখতে পেল উৎপল। ভাবল পুরুষই হোক মেয়েই হোক—মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের রূপ বদলায়। সেই রূপান্তর সব সময় চোখে পড়ে না তাই। যখন পড়ে মানুষ, নিজেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

উৎপল ভেবেছিল শুধু চা-টাই খাবে। মিষ্টিটা আর নেবে না। কিন্তু অনুরাধা তা কিছুতেই হতে দিলেন না। নিজে কিন্তু শুধু এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খেলেন না। বললেন, 'এ সময় আমার কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু আপনি তো আর আমার মত নন। আপনি কিছু না খেলে ধমক খাবেন।'

তারপর চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে অনুরাধা বললেন, 'আপনি নিজে তো নিজের অসুবিধের কথা কিছু বলতে পারলেন না। আমি বলি।'

উৎপল বলল, 'বেশ তো বলুন না।'

অনুরাধা বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন মহিলাটির কি স্পর্ধা। আমার মন কি ওঁর নখদর্পণ?'

উৎপল বলল, 'তা কেন ভাবব। কারো কারো আন্দাজ করবার ক্ষমতা বেশি থাকে। আপনার সব ক্ষমতাই বেশি।'

অনুরাধা বললেন, 'ওরে বাপরে। এবার কি মহা-শক্তির স্তবস্তুতি শুরু হল?' শক্তি আপনারও আছে। শুধু তা খাটাবার ইচ্ছা নেই। সিন্দুকে সঞ্চয় করে রেখেছেন?'

ফের একটু চুপ করে রইলেন অনুরাধা। তারপর বললেন, "দেখুন, যে সব সর্তে প্রথম প্রথম আপনাকে বেঁধেছিলাম তা একে একে প্রায় সবই তুলে নিয়েছি। কী লিখলেন, কতখানি লিখলেন—ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই তাগিদ আজকাল আর দিইনে। আমি জানি শুধু বাইরের তাগিদে লেখা হয় না, যদি ভিতরের তাগিদ তার সঙ্গে না মেলে। তারপর আমার স্বামীর সম্বন্ধে শুধু ভালো-ভালো কথাই আপনাকে লিখতে হবে বলে যে আবদার করেছিলাম তাও আমি তুলে নিয়েছি। পরে বুঝেছি এও এক ধরণের ফরমায়েস। ফরমায়েস দিয়ে মাপমত জামা-জুতো করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ওই রাস্তায় বই লেখানো চলে না। সে বই হয় নিষ্প্রাণ; দুষ্পাঠ্য। সে বই লিখতেও কষ্ট, পড়তেও কষ্ট। তা লিখে বা লিখতে বলে লাভ কি।'

উৎপল বলল, 'আপনিই এ নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছেন।'

অনুরাধা বললেন, 'আপনি আমাকে ভাবিয়েছেন। দরকার নেই ও ভাবে লিখে। দোষে গুণে মিশিয়ে যে মানুষ আপনি তাঁর কথাই লিখুন। কিন্তু তাঁর পিঠে শুধু দোষের বোঝাটিই তুলে দেবেন না—এই আমার অনুরোধ।

উৎপল চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারল না।

অনুরাধা বললেন, 'হ্যাঁ আমার সবচেয়ে শক্ত যে সর্ত ছিল তাও কবে আলগা হয়ে গেছে। তবু যে আপনার কোথায় কিসে অসুবিধে হচ্ছে—।'

উৎপল বলল, 'বলুন। আজ তো আপনারই দৈবজ্ঞের ভূমিকা।'

অনুরাধা বললেন, 'দৈবজ্ঞ! না দৈবজ্ঞ আমি নই। তাহলে তো বলতাম আপনার হাত দেখান। লগ্ন রাশি নক্ষত্রের কথা বলুন। আসলে আপনি আমার স্বামীর সম্বন্ধে এত বিপরীত বিপরীত সব কথা নাবালকের মুখ থেকে শুনছেন যে—আপনি মাথা স্থির রাখতে পারছেন না। সেই সঙ্গে মনও অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনি যদি ওভাবে তথ্যের পর তথ্য কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ান, শুধু প্রবাদের পর প্রবাদ জড়ো করতে থাকেন আপনি কি ভেবেছেন তার ভিতর থেকে একটি মানুষকে আপনি চিনে বার করতে পারবেন, কি সবাইকে চিনিয়ে দিতে পারবেন? আমি তো কোনদিন বই লিখিনি, চরিত্র সৃষ্টি করিনি, তাই বলতে পারব না ওভাবে কিছু সৃষ্টি করা যায় কিনা।'

উৎপল খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, 'কিন্তু সৃষ্টিরও তো উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো সংগ্রহ করে নিতে হবে। বিশেষত আমি যদি ভাবি একজন মানুষের সত্যিকারের জীবনের কথাই লিখব—তাহলে তাঁর জীবনের ছোটবড় ভালোমন্দ ঘটনা আমাকে জানতে হবে বইকি।'

অনুরাধা বললেন, 'তা না হয় জানলেন। যদিও হাজার চেষ্টা করলেও সব ঘটনা আপনি জানতে পারবেন না, জানলেও লিখতে পারবেন না। লিখতে ইচ্ছেই হবে না আপনার। অনেক ঘটনাই আপনার তুচ্ছ অসংলগ্ন বলে মনে হবে।'

উৎপল বলল, যা অসংলগ্ন, তাকে অবশ্য সংলগ্ন করে তোলা চাই।'

অনুরাধা বললেন—'তবেই দেখুন কল্পনার সাহায্য আপনাকে নিতেই হবে। আপনি কোন একটি ঘটনাকে কিভাবে দেখবেন, কি ভাবে বদলাবেন, তার ওপর সব নির্ভর করে। কোন একজন মানুষ কিছু একটা করে বসল। কিছু একটা ঘটল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সংঘটনের পিছনে মানুষটির কি উদ্দেশ্য ছিল—তার চিন্তা ভাবনা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যদি আপনি না দেন, তাহলে একটি সত্যি ঘটনার কথা লিখলেও তা সত্যি হবে না। সাধারণ মানুষ ঘটনাকে সেইভাবেই দেখে। যা দেখে না, তার গল্প শোনে। নিজেদের রুচি বুদ্ধি অনুযায়ী সে সব কথা বিশ্বাস করে—তার বিশ্বাস-করা কাহিনী আর একজনের কাছে বলে। যাতে বিশ্বাস হয় তার জন্যে যতদূর পারে ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য করে তোলে। কারণ বেশিরভাগ মানুষই অলৌকিক—অন্তত পক্ষে অসঙ্গত অসামাজিক অশোভন সব ঘটনার কথা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে।'

অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন।

উৎপল বিস্মিত হয়ে শুনছিল। মিসেস রায় প্রথম জীবনে তেমন পড়াশুনো না করলেও পরে যে তা পুষিয়ে নিয়েছিলেন সে কথা উৎপল শুনেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যে চিন্তাশক্তি আর তা প্রকাশ করবার শক্তিও অর্জন করেছেন, তা দেখে বিস্মিত হল। ইলেকসনের সময় দলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা নাকি দিয়ে থাকেন অনুরাধা। কিন্তু এখন যা বলছেন তা অরাজনৈতিক। অথচ শ্রোতাকে নিজের দলে টানবার মত একটা রাজকীয় দৃঢ়তা তাঁর বক্তব্যে বেশ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে।

একটু বাদে অনুরাধা নিজেও এবার হাসলেন, 'আপনি ভাবছেন আপনাকে বাগে পেয়ে খুব একচোট বক্তৃতা দিয়ে নিলাম। এ যদি রেডিওর বক্তৃতা হত, সঙ্গে সঙ্গে আপনি কান মুচড়ে বক্তার গলা বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু এখানে তো সে উপায় নেই। আপনাকে জোর করে শোনাবার আগে জবরদস্তি করে খাইয়ে দিয়েছি। আপনি ভাবছেন আগে জানলে কে আর ওঁর পুডিং খেত।'

হাসি মুখে চুপ করে রইলেন অনুরাধা। তারপর

বললেন, 'হ্যাঁ, আমার স্বামীর সম্বন্ধে অমন অনেক অলৌকিক অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা আপনি হয়তো এই পাড়াতেও শুনতে পাবেন। শুনুন। আপনার বিশ্বাস করবার ক্ষমতা কতখানি তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তার আগে ওঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা আপনাকে শোনাই।'

উৎপল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'লেখা! লেখা কোথায় পেলেন?'

অনুরাধা তাঁর হাসির মধ্যে রহস্যের ব্যঞ্জনা ভরে দিলেন, 'পেয়েছি, আপনি ছাড়া আর লেখক নেই সংসারে?'

উৎপল ভাবল, 'সে লিখতে দেরি করায় অনুরাধা কি আর কারো সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন? তাহলে আর মিছামিছি এত আদর যত্ন আলাপ আপ্যায়ন কেন? সে কথা বলে দিলেই তো উৎপল উঠে চলে যেতে পারে।

অনুরাধা চাকরকে ডেকে বললেন, 'আমার টেবিলের ওপর থেকে সেই বাঁধানো খাতাটা—। না ও পাবে না। আমি নিজেই নিয়ে আসি।'

অনুরাধা উঠে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। মিলিয়ে গেল। খানিক বাদে আবার সেই শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

অনুরাধা কালো রঙের সুন্দর একটা খাতা হাতে নিজের চেয়ারটিতে এসে বসলেন।

উৎপল লক্ষ্য করে দেখল—খাতা নয় একটি ডায়েরি।

অনুরাধা তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ভাববেন না, আপনার কোন রাইভাল বন্ধুর কাছ থেকে খাতাটা চেয়ে নিয়ে এসেছি। এ একটি সাধারণ মেয়ের লেখা। টুকরো টুকরো এলোমেলো কথা যা মনে এসেছে তাই সে লিখে রেখেছে। সন তারিখ মিলিয়ে লেখেনি। এর সব আপনাকে শোনাবার মত নয়। বেছে বেছে শোনাব। কিন্তু তাতেও আপনি হাসবেন। পড়ব খানিকটা?'

উৎপল উল্লসিত হয়ে বলল, 'বাঃ পড়বেন বই কি।'

এবার সে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে।

ডায়েরির লেখিকাটি যে কে—তাঁকে আর তার চিনতে বাকি নেই।

[ক্রমশঃ

বাৎসায়নের কালে নাগরিক জীবন*

ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

ঐতিহাসিকদের মত এই যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর রচনা হইল বাৎসায়ন প্রণীত কামসূত্র। কামকলার নানা অলিঘলি নির্দেশক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজজীবনের অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহাতে নাগরিকের স্ফূর্তিচঞ্চল জীবন সম্বন্ধে বিবরণ আছে, যেমন, তাঁদের বাসভবন, বাগানবাগিচা, আমোদ-প্রমোদ, সুরুচি-সংস্কৃতি। 'নাগরবৃত্তম্' নামক অধ্যায়টিতে শহুরে মানুষের গুণাগুণ—তাঁদের চাতুর্য, তাঁদের শাঠ্য—সম্বন্ধে কথা আছে। বাৎসায়নের সময়ে যারা সাধারণ লোকের চেয়ে কিছুটা বিশেষত্ব লাভ করিত—অর্থাৎ মেধায়, বিদ্যায়, শিল্পকলায় দক্ষতা অর্জন করিত তারা নগরেই আকৃষ্ট হইত এবং কোন রাজারাজড়ার পৃষ্ট-পোষকত্বে চাকরী পাইত, অথবা কোন ধনী নাগরিকের আওতায় আসিয়া বিদূষক বা বৈহাসিকের পদে বাহাল হইত, অথবা কোন শিল্পপতি বা বণিকের সংঘে নাম লিখাইত, অথবা পৌরসভার সভ্য হইত।

শহুরে জীবনের আনন্দস্রোতের প্রতি এই যে প্রবল আকর্ষণ তাহা হইতে মনে হয় যে—ভারতের প্রাচীন যুগে

* সাংস্কৃতিক চক্রের সৌজন্যে। সঃ

শহরের সংখ্যা অল্প ছিল না। ঋগ্বেদে গ্রাম, গ্রামীন, মহাগ্রাম ও পুরের কথা আছে; পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, যথা মানবগৃহ্যসূত্রে, গ্রাম, নগর ও নিগমের উল্লেখ আছে; পাণিনির সূত্রে নগর ও নাগরিকের দৃষ্টান্ত আছে; মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বড় বড় শহর ও তাদের পৌরসংস্থা ও পৌরশাসন-পদ্ধতির বিবৃতি পাওয়া যায়; বৌদ্ধ জাতক ও অন্যান্য পালিপুস্তকে অসংখ্য নগর ও তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত ইতিহাস আছে, যথা, মিলিন্দ-পন্‌হো-তে 'শাকল' পুরী সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে; অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তরে সে যুগের অনেক সমৃদ্ধ নগরের পরিচয় মিলে।

বাৎসায়নের কাল গুপ্ত-পূর্ব হওয়ায় সে সময়ে ছোট-বড় শহরের সংখ্যা বড় কম ছিল না; কারণ, ভারতে তখন একচ্ছত্র সম্রাট না থাকায় উহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং রাজধানীর সংখ্যাও অনুরূপ থাকা স্বাভাবিক। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পীঠস্থানগুলি ব্যবসা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। 'ফুনান্-তু-সু-চুয়াং' খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের একখানা চীনা বই; তাহাতে আছে, খৃঃ পূঃ ৫৩ অব্দে কৌণ্ডিণ্য ইন্দোচীনে এক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন, যেটি বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসারের এক বিশাল কেন্দ্র ছিল। ভারতীয়েরা চীনের সংগে সামুদ্রিক পথে ব্যবসা চালাইত;—'জিনান্'এর (বর্তমান ভিয়েটনাম) মধ্য দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ইন্দোচীনে গমনাগমন করিত। অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ভারতের সহিত এশিয়া মাইনর ও অন্যান্য প্রতীচ্য ভূখণ্ডের বহুদিন যাবৎ যোগাযোগ বর্তমান ছিল এবং কুশান রাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অনেকটা প্রসারিত থাকায় পূর্ব-পশ্চিমে বাণিজ্য পথ খোলা ছিল, তজ্জন্য সভ্য জগতের সংগে ভারতের বাণিজ্যসূত্র এক সুদৃঢ় বাঁধনে বাঁধা ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জনৈক কুশানরাজের উপাধি ছিল—"মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র কৈসব কণিষ্ক"। ইহা হইতে ধারণা হয় যে, সে সময়ে ভারতীয়-চৈনিক-রোমীয় এই ত্রয়ী সভ্যতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি ও দ্বিতীয় শতকে টোলেমি বলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে রোমক-সাম্রাজ্যের সংগে ভারতের বাণিজ্যসংযোগ পুরাদমে চলিয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরবর্তী বাৎসায়নের সময়ে ঐ ব্যবসাবাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কথাতেই আছে। প্রাচীন ভারতের সর্বাতিশয়ী ঋদ্ধি নিশ্চয়ই অত্রস্থ নাগরিকের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই নাগরিকের জীবনে পত্রে পত্রে, যথা, গৃহের মার্জিত পরিকল্পনায়, ইহার মনোরম আসবাব-পত্রে নাগরিকের বেশভূষার পারিপাট্যে ও অলংকার-মণ্ডনে, খেলাধূলায়, দান-দক্ষিণায়, অর্থব্যয়ের অবাধ প্রাচুর্যই দেখা যায়।

নাগরিকের বাসভবনের নির্মাণ কৌশল হইতে গৃহস্বামীর স্থাপত্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যপ্রীতি উপলব্ধি হয়; আসবাব-পত্র ও প্রকোষ্ঠের কারুকার্য হইতে তাঁর শিল্পবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাগরিকের গৃহটি কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী হইতেই হইবে। ইহার দুইটি মহল—অন্তঃপুর ও বহির্বাটিকা। বহির্বাটিতে নাগরিকের যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদিত হয় ও তিনি অতিথি-অভ্যাগতের সংগে আলাপ-আপ্যায়নে রত থাকেন। গৃহসংলগ্ন বৃক্ষবাটিকাটিতে পুষ্পবৃক্ষ, ফলের গাছ, ভেষজ উদ্ভিদ বর্তমান এবং রন্ধনের জন্য শাকসব্জী উৎপন্ন হয়। বাগিচার মধ্যস্থলে নলকূপ অথবা পুষ্করিণী। বাগিচাটি অন্তঃপুরসংলগ্ন, যাহাতে বাটীর গৃহিণী বৃক্ষাদি দেখাশুনা করিতে পারেন। বাগিচায় যূঁথি, জাতী, নবমল্লিকা, জবা, কুরন্তপুষ্প শোভা পাইতেছে ও তাদের সুগন্ধ চারিদিকে আমোদ বিকীরণ করিতেছে। বাগিচার মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ এবং স্থানে-স্থানে বিশ্রামের জন্য চত্বর নির্মিত আছে।

কোন কোন ধনাঢ্য নাগরিকের বিশাল হর্ম্য ও প্রাসাদ থাকিত, যার উন্মুক্ত ছাদে বিহার করিতে করিতে কর্তা ও গৃহিণী নীলাকাশে ভ্রাম্যমান্ গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। প্রকোষ্ঠগুলির মেঝে মোজাইক বা মার্বেল পাথরের ও প্রবালখচিত। বৃক্ষবাটিকার অভ্যন্তরে ইহাদের আরামের জন্য "সমুদ্রগৃহ" থাকিত, অর্থাৎ জলাশয়বেষ্টিত শীতল গ্রীষ্মালয়। ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তা"য় এইরূপ সমুদ্র-গৃহের উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশে এইরূপ প্রমোদালয়ের কথা আছে—"দীর্ঘিকাঃ গূঢ়মোহনগৃহাঃ" [১৯।৯]। আসবাবের মধ্যে নাগরিকের শয়নঘরে দুটি

সুকোমল কৌচ ও তৎপার্শ্বে শুভ্রশয্যা পরিপাটি করিয়া আস্তীর্ণ। শয্যার শীর্ষে 'কূর্চস্থান' বা কুলুংগী থাকিত, বোধ হয় ইষ্টদেবতার মূর্তি রাখিবার জন্য। কৌচের সন্নিকটে কার্পেটের উপর মস্তক রাখিবার জন্য গির্দা বা তাকিয়া এবং দাবাপাশা খেলার সরঞ্জাম থাকিত। শয়নপ্রকোষ্ঠের বহির্দেশে, অলিন্দে থাকিত পক্ষিশালা, এবং গৃহের নির্জন স্থানে লেদ, বাটালি, করাত জাতীয় যন্ত্র থাকিত অবসরমত নাড়িয়াচাড়িয়া আমোদ উপভোগ করিবার জন্য,—"একান্তে চতুর্কতক্ষণস্থান মন্যাসাং চ ক্রীড়ানাম্"।

নাগরিক ছিলেন সে যুগের বেশ ছিমছাম্ কেতাদুরস্ত ব্যক্তি; তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্বন্ধে বাৎসায়ন এক সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ; প্রাতঃকৃত্য সমাধান; মুখপ্রক্ষালন ও দন্তমঞ্জন। অতঃপর প্রসাধন ব্যাপারে আত্মনিয়োগ। সেটি কীরূপ বলিতেছি।—প্রসাধনের প্রথম বস্তুটি হইল 'অনুলেপন"; উহা এক প্রকার মিহি করিয়া বাটা অতিনির্মল [অচ্ছ] চন্দনের সুগন্ধি মলম—'অচ্ছীকৃতং চন্দনমন্যদ্বানুলেপনং'। এই অনুলেপন খানিকটা দেহে মাখা তাঁর প্রথম কায। তারপর, ধূপের মিষ্টগন্ধীধূমে পরিধেয়বস্ত্র সুগন্ধিযুক্ত করা তাঁর দ্বিতীয় কায। অতঃপর, কণ্ঠে মাল্যধারণ ও নয়নে অঞ্জন-প্রলেপ এবং অধরোষ্ঠ অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া ও মসলাযুক্ত তাম্বুল চর্বণ করিয়া মুকুরে স্বীয় অনুপম দেহযষ্টির কলাসৌষ্টব অবলোকান্তে গৃহকর্মে যোগদান। কেশের বিন্যাসে তাঁর মনোযোগ তীক্ষ্ণ। হস্তে মূল্যবান্ অংগুরী ধারণ। ললিতবিস্তরে আছে,—'অনেকশতসহস্রমূল্যমঙ্গুলীয়কম'। পরিধেয়বাস দুই প্রস্থ,—বস্ত্র ও উত্তরীয়। উত্তরীয় কুসুমগন্ধসিক্ত।

প্রাতঃকালীন কর্মশেষে নাগরিক প্রত্যহ স্নানাভিষেক করিতেন। একদিন অন্তর অংগ-সংবাহন ও কেশ 'উৎসাদন' (মার্জন) করিতেন; দুইদিন অন্তর সাবানযোগে ["ফেনক"] শরীর প্রক্ষালন করিতেন; তিনদিন অন্তর মুখবিবরের নিম্নভাগ [অধর চিবুক] পরিষ্কার করা দীর্ঘায়ুজনক ["আয়ুধ্যম্"] বলিয়া বিবেচিত হইত; পাঁচদিন (কদাপি দশদিন)অন্তর ক্ষৌরকার্য সম্পাদন এই ছিল নিয়ম।—

"নিত্যং স্নানং, দ্বিতীয়কমুৎসাদনং, তৃতীয়কঃ ফেনকঃ, চতুর্থকমায়ুষ্যম্, পঞ্চমকং দশমকং বা প্রত্যায়ুষ্যমিত্যহীনম"॥

কামসূত্র ১৭॥

দাড়িকামান সম্বন্ধে বর্তমান অফিসের বাবুদের মত রুচিবাগিশ না হইলেও, আঙুলের নখ ও দাঁত সম্বন্ধে নাগরিক একটু বেশীমাত্রায় যত্নশীল ছিলেন। নখের বিশিষ্ট বাঁকা ছাঁট ও তাদের কোমলতা মসৃণতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দাঁতের পরিচ্ছন্নতার দিকেও অনুরূপ দৃষ্টি দিতেন নাগরিক। কেশ, নখ ও দাঁতের প্রতি তাঁর শিল্পিমানসুলভ দৃষ্টি প্রেমচর্চার পক্ষে অনুকূল বলিয়া গণ্য হইত। এতদ্ভিন্ন স্বেদ অপনয়নের জন্য তিনি সর্বদা রুমাল ব্যবহার করিতেন।

নাগরিক দিনে দুইবার আহার করিতেন, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যার পর। বাৎসায়ন তিনপ্রকার আহারের কথা বলিয়াছেন,—ভক্ষ্য (শক্ত আহায) ভোজ্য (নরম আহার্য) ও পেয় (পানীয়)। তাঁর খাদ্যসামগ্রীর অন্তর্গত ছিল এইগুলি—অন্ন, গম, যব, দাইল, প্রচুর সব্জী ও দুধ; এবং এগুলোর রন্ধনে ঘি, মাংস, মিষ্টান্ন, লবণ ও তৈল ব্যবহৃত হইত। মিষ্টান্নের মধ্যে গুড়, শর্করা ও খণ্ড-খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। খাদ্য হিসাবে মৎসের কথা বাৎসায়ন বলেন নাই, তবে মাংসের কথা আছে। মাংস সুপ্ করিয়া অথবা ঝল্সাইয়া খাওয়ার রীতি ছিল। নাগরিকের পানীয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। জল ও দুধ ব্যতীত টাটকা তালরস, মাংসের নির্যাস, কাঞ্জি, আম ও পাতিলেবুর রসে শর্করা মিশ্রিত করিয়া সরবত। তীব্র পানীয়ের মধ্যে কয়েকজাতীয় মাদক মদ্য ব্যবহৃত হইত, যথা, সুরা, মধু, মৈরেয়, আসব। কাষ্ঠ বা ধাতুনির্মিত "চষক" নামক পাত্র হইতে ঢালিয়া মদ্য পান করা হইত এবং মদ্যের স্বাদুতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং মুখরোচক তিক্ত জিনিস খাওয়া হইত (আমরা বর্তমানে যাকে "চাট" বলি তাহাই মদের অনুপান ছিল)।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নাগরিক কিছুক্ষণ নিদ্রা উপভোগ করিতেন, অথবা পীঠমর্দ ও বিদূষক প্রভৃতির সহিত হাসিখুশীতে কাটাইতেন, অথবা, টিয়া-চন্দনা প্রভৃতি বিহংগের কাকলী শুনিতেন, অথবা, মোরগ, তিতির, মেড়ার লড়াই দেখিতেন, অথবা, নানা প্রকার চারুশিল্পের নিদর্শন উপভোগ করিতেন। আমোদ উপভোগের জন্য হরেকরকম কাকাতুয়া পুষিয়া তাদের মিষ্ট আলাপ শুনিতেন, অথবা,

ময়ূরের উজ্জ্বল পক্ষবিস্তার শোভা নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা, বাঁদরদের অংগভংগী ও অদ্ভুত ক্রীড়া নৈপুণ্যে কৌতুক অনুভব করিতেন।

অপরাহ্নে মনোরম সাজে সাজিয়া নাগরিক "গোষ্ঠী"তে উপস্থিত হইতেন; সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সহিত নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন করা অথবা হাস্যপরিহাসে কাটাইতেন। রাত্রে স্বগৃহে গীতবাদ্যে ও মাঝে মাঝে নৃত্যাদি গান্ধর্ব অনুষ্ঠানে তিনি চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তিলাভ করিতেন।

নাগরিক ও তস্য পত্নীর জীবনের বৈপরীত্য সুমেরু-কুমেরুবৎ। বাৎসায়ন নাগরিকের যে জীবনচিত্র আঁকিয়াছেন, আমরা দেখিলাম, তাহা বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখকে কেন্দ্র করিয়াই অংকিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁর পত্নীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে কর্তব্য কর্মের বিরাট বোঝা। ধর্মশাস্ত্র-গুলিতে স্ত্রীর যে আদর্শ উপস্থাপিত হইয়াছে নাগরিক-স্ত্রী সেই আদর্শকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছেন। তাঁহার কর্তব্যের ফিরিস্তি কয়েকটি দিতেছি:

ভক্ত যেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ইষ্টদেবতার পূজা করেন, ঠিক সেইরূপ ভক্তির সহিত নাগরিকপত্নী স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নাগরিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সর্বদা নির্বাহ করেন, তাঁর খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ও তাঁর প্রসাধনব্যাপারে ও আমোদপ্রমোদে সাহায্য করেন; তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বুঝিয়া চলেন; তাঁর মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনদের ভালবাসেন ও ভৃত্যবর্গের প্রতি উদারতা দেখান। তাঁর শয়নশেষে নিদ্রা যান এবং তাঁর শয্যাত্যাগের পূর্বে গাত্রোত্থান করেন। কোন কারণে ক্ষুব্ধা হইলেও নাগরিকের বিরাগসূচক বাক্য উচ্চারণ করেন না। নাগরিকের অনুমতি লইয়া তাঁর স্বকীয়া বান্ধবীর সহিত কোন উৎসবে যোগদান করেন। তার অজ্ঞাতে নাগরিকপত্নী কোন-কিছু দান করেন না। তাঁর বিশ্বস্ততার সন্দেহ জন্মিতে পারে নাগরিকপত্নী এরূপ কায কদাপি করেন না; সন্দেহজনক চরিত্রের স্ত্রীলোকের সংগ পরিহার করিয়া চলেন, যথা, সন্ন্যাসিনী, নটী, জ্যোতিষিনী, 'মূলকারিকা' (যে স্ত্রীলোক যাদু জানে)। কামকলাশিক্ষার্থে ইচ্ছা করিলে স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'য় উদয়ন তাঁর মহিষীকে 'হা প্রিয়শিষ্যে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কালিদাসের 'রঘুবংশে' মৃত ইন্দুমতীর জন্য অজের বিলাপে আছে,—অয়ি, ললিতকলায় আমার প্রিয়শিষ্যা ["প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"]।

একটা শম ও সংযমের আবেষ্টনীর মধ্যে নাগরিকপত্নী নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কথাবার্তায় তিনি স্বল্পবাক্; কখনও উচ্চে কথা বলেন না বা হাস্য করেন না; শ্বশুর বা শ্বশ্রূ দ্বারা ভর্ৎসিতা হইলে প্রত্যুত্তর দেন না, সৌভাগ্যগর্বে কখনও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন না। সাজসজ্জায় তিনি মধ্যপন্থিনী; কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিবার কালে সাধাসিধা অলংকার ও সজ্জার পক্ষপাতিনী; সুগন্ধির ব্যবহার পরিমিত ও সাজসজ্জায় শ্বেতপুষ্প ছাড়া অন্য পুষ্পকে আদর করিতেন না। স্বামীসন্দর্শনের প্রাক্কালে প্রসাধন ব্যাপারে যত্ন লইতেন; নিজেকে শুদ্ধা ও সুহাসিনী রাখিবার প্রয়াসে অলংকারের মণ্ডনে কিছু অতিরিক্ততা লক্ষিত হইত; নানাবর্ণের ও নানাগন্ধের পুষ্প ধারণ করিতেন, এবং মনোরম সুগন্ধি ব্যবহারে নিজেকে আকর্ষণীয়া করিয়া তুলিতেন। পুষ্প নানাপ্রকারে ধারণ করিতে পারিতেন,—কণ্ঠসংলগ্ন মাল্যাকারে [স্রজ্], অথবা, শিরমালারূপে, অথবা কেশে গুঁজিয়া দিয়া, অথবা, কর্ণভূষণের সংগে জড়াইয়া 'কর্ণপূর' রূপে।

দৈনন্দিন গৃহদেবতার সেবায় সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায় নাগরিকপত্নী আত্মনিয়োগ করিতেন এবং ব্রতনিয়মাদি পালনে যথাবিধি কর্ম সম্পাদন করিতেন। গৃহস্বামীর অনুমতিক্রমে পরিবারের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। সারা বছরের একটি আয়ব্যয়ক (budget) তিনিই প্রস্তুত করিতেন। মনু বলিয়াছেন,—

'অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়েচৈব নিয়োজয়েৎ' (সংহিতা ৯।১১) স্বামীর একটি কর্তব্য হইবে স্ত্রীকে অর্থদিয়া তাঁকে হিসাবমত খরচপত্তর করিতে দেওয়া; স্বামী আর্থিক সংস্থানের বেশী খরচের জন্য ঝুঁকিলে স্ত্রী গোপনে প্রতিবাদ জানাইতে পারিবেন। গৃহিণী সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত রাখিবেন ও খরচ হইয়া গেলে পুনরায় আবশ্যকীয় দ্রব্য ভাণ্ডারজাত করিবেন। ভৃত্যবর্গের বেতন হিসাব করিয়া তিনিই দিবেন। কৃষি-কায ও গো-পালন তাঁর তত্ত্বাবধানেই হইত; গৃহপালিত পশুপক্ষী তিনিই দেখা-শুনা করিতেন এবং রন্ধনশালার যাবতীয় কায ব্যতীত অবসরমত সুতাকাটা ও বয়নকাযও তিনি করিতেন। **এইরূপ আদর্শ গৃহিণী আজ সংসারে দুর্লভ হইয়াছে।**

হিসাব-নিকাশ

তরুণ-প্রেমিক : সত্যি বলছি, তোমায় কী ভালবাসি, আমার এই বুক চিরে যদি ছাখো তো বুঝবে আমার মন···

আধুনিকা-তরুণী : উচাটন···এই কথা বলতে চাও ? তা তোমার এই উচাটন-মনের জন্য আমি কি করতে পারি ?

তরুণ-প্রেমিক : আমায় স্বামীত্বে বরণ করে, ধন্য করো ! আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দেবো—তুমি যা চাও···

আধুনিকা-তরুণী : আমি যা চাই ! আমি চাই চৌরঙ্গীতে সাজানো-গোছানো বাড়ী···আনকোরা ক্যাডিল্যাক গাড়ী···হাল-ফ্যাশনের জুয়েলারী, নিত্য-নূতন শাড়ী-ব্লাউশ··· ব্যাঙ্কে মোটা টাকার অঙ্ক···আর সিনেমায় অভিনয় করবার অবাধ-স্বাধীনতা···পারবে এ সব দিতে ?···

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত আষাঢ় মাস হইতে শুরু হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'র স্বর্ণ জয়ন্তী বৎসর। আলোচ্য বর্ষের প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। **তন্মধ্যে পরবর্তী আশ্বিন সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পূজা বা শারদীয়া সংখ্যারূপে বর্দ্ধিত কলেবরে শীর্ষস্থানীয় লেখক লেখিকাগণের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রস-রচনা ও নয়নাভিরাম চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে।**

প্রতি কপির বিক্রয় মূল্য হইবে ২৲। 'ভারতবর্ষ'র রেজিষ্টার্ড গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে উক্ত সংখ্যার বিজ্ঞাপনের জন্য এখন হইতে সত্বর হইবার অনুরোধ জানাই। এজেণ্টগণ যাহাতে তাঁহাদের প্রয়োজনমত সংখ্যা সরবরাহ পাইতে পারেন, তজ্জন্য পূর্বাহ্নেই তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের আবশ্যক সংখ্যার অর্ডার দিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত—
কর্মাধ্যক্ষ
ভারতবর্ষ

শ্রী'শ'—

॥ 'যাত্রা' হল সুরু ॥

সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে নাট্যকাব্যের প্রকার-ভেদ কল্পনা করা হয়েছে তার রীতি ও বিষয়ের গুরুত্বের ওপর নির্ভর কোরে। আবার এই নীতি অবলম্বনে সেখানে দৃশ্য-কাব্যকে দশটি রূপক ও অষ্টাদশ উপ-রূপকে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা নাট্য-সাহিত্যকে সাধারণতঃ নাটক ও প্রহসন—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রে যাত্রাভিনয়কে নৃত্যগীত-বহুল নাটকেরই দৃশ্যপটবিহীন অভিনয় অর্থাৎ দৃশ্যপট-সন্নিবিষ্ট মঞ্চাভিনয়েরই এক অসংস্কৃত সংস্করণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু অভিনয়-রীতি হিসাবে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যকে প্রধাণতঃ যাত্রা ও নাটক—এই দুটি শ্রেণীতেই ভাগ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকেই এই 'যাত্রা' প্রচলিত আছে। 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে দেবতার পূজার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, মেলা অথবা নাট্য-গীত। তবে শুধু যে পূজা উপলক্ষ্যেই যাত্রা-গান হতো তা নয়, যে কোনো সাধারণ উৎসবেও যাত্রা-গানের অনুষ্ঠান হতো। কিন্তু সেকালে যাত্রাগানের কোনো বাঁধা পালা কিছু ছিলনা। পাত্র-পাত্রীগণ উপস্থিত হয়ে নিজেদের উপস্থিত-বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টকরা সংলাপ ব্যবহার করতো এবং গান ও শ্লোকাদি পাঠ করতো। ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যাত্রার মধ্যে পাঁচালীর প্রভাব এসে পড়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাঁচালী ও কীর্ত্তনের প্রভাবমণ্ডিত কৃষ্ণ-যাত্রা (কালিয় দমন ও রাস) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে। এই সময় পরমানন্দ অধিকারী এবং শ্রীদাম ও সুবল দুই ভাই কৃষ্ণ-যাত্রায় অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের পরেই বাঁধা যাত্রা-পালার সৃষ্টি ও প্রচলন হয়। এই বাঁধা যাত্রা-পালায় যে সকল ব্যক্তি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও গোবিন্দ গোস্বামী। পরবর্ত্তীকালে যাত্রা-গান বা যাত্রা-পালা দিনে দিনে জনসমাদর লাভ করলেও ভদ্রসমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার লাভের ফলে, আমাদের দেশে প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী ও কীর্ত্তন প্রভাবান্বিত যাত্রা-গানের জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মনোমোহন বসু, তিনকড়ি বিশ্বাস, মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুগায়ক ও বাঁধনদারের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, ইংরেজী ধরণের নাটকের সঙ্গে কথকতার মত বক্তৃতা এবং পাঁচালী ও প্রাচীন যাত্রা পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান সংযোগ কোরে এক নূতন পদ্ধতির যাত্রা-গান সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে থিয়েটারী নাটকের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবহেতু এই নূতন পদ্ধতির যাত্রা-গানও স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ যাত্রা-গানের এই হৃত বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে কলিকাতার রবীন্দ্র-কাননে (বিডন স্কোয়ার) বিভিন্ন যাত্রাভিনয়ের এক উৎসবায়োজন করেছেন। ইহা খুবই আশা ও আনন্দের কথা। আগামী ৩১শে আগষ্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই উৎসব চলবে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন কর্ত্তৃক মোট ৩১টি উৎকৃষ্ট যাত্রাপালার অভিনয় হবে। আমরা এই উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

খবরাখবর ঃ

শক্তিপদ রাজগুরুর "শেষ নাগ" উপন্যাস অবলম্বনে "শেষাগ্নি" নাটকের সৃষ্টি। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নিয়মিতভাবে এই নাটকটি অভিনীত হচ্ছে। নাট্যরূপ ও পরিচালনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

অভিনয়াংশে আছেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষকুমার, শান্তি দাশগুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ-

আর, ডি' বনশল্ প্রযোজিত ও বিমু বর্ধণ পরিচালিত "এক টুক্‌রো আগুন" চিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্ত।
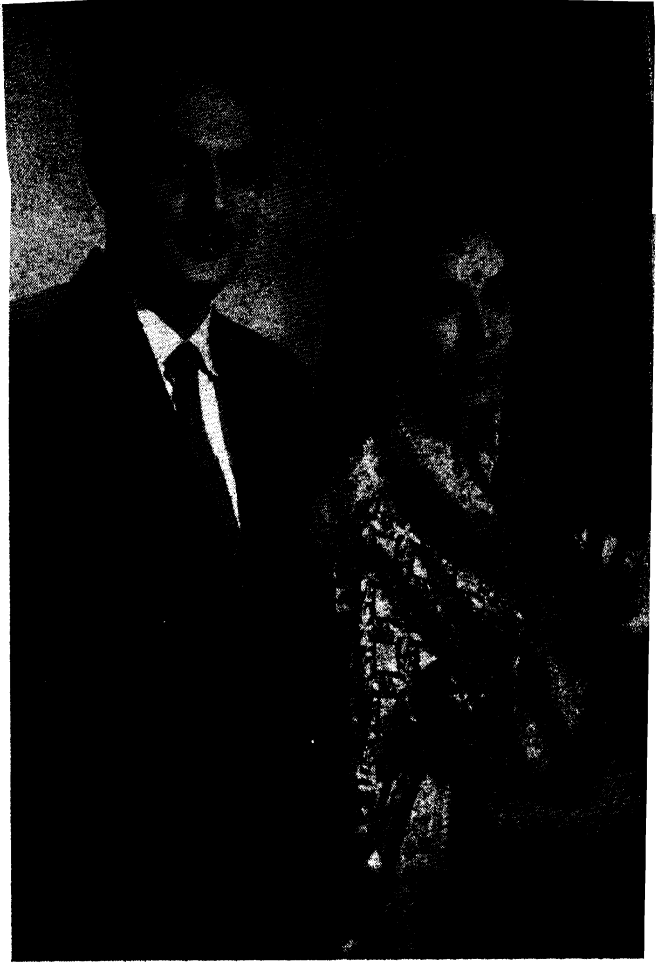
কুমার, শ্যাম লাহা, বাসবী নন্দী, লিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, গীতা দে প্রভৃতি।

* * *

"উত্তমকুমার ফিল্মস (প্রাইভেট) লিমিটেড্"-এর 'ভ্রান্তি-বিলাস' নামক চলচ্চিত্রের কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ভ হবে। উত্তমকুমার এই চিত্রটির প্রধান দ্বৈত-চরিত্রে অভিনয় করবেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য তিনটী বিশেষ চরিত্রে রূপ দেবেন। পরিচালনা করবেন মানু সেন।

* * *

প্রযোজক আর, ডি, বনশল্ সস্ত্রীক বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে সম্প্রতি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। আড়াই মাস বিদেশ ভ্রমণ কালে শ্রীবনশল্ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ঐসব দেশের চলচ্চিত্র-ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর নিয়েছেন। হলিউডেও তিনি কয়েকদিন অতিবাহিত করেন এবং জাপানের কয়েকটি ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন।

* * *

আর, ডি, বনশল্ প্রযোজিত ও বিমু বর্ধন পরিচালিত চিত্র "এক টুকরো আগুন" সমাপ্তির মুখে। শ্রীবনশল-এর "সাত পাকে বাঁধা" চিত্রটি অজয় করের পরিচালনায় দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই চিত্রে সর্ব্বপ্রথম সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্মিলিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। শ্রীবনশল্-এর পরবর্তী চিত্র "ছায়াসূর্য্য"-র

চিত্র গ্রহণ পার্থ প্রতিম চৌধুরীর পরিচালনায় আগামী মাসে সুরু হবে।

* * *

অতি আশার কথা যে "ফটো প্লে সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ"-এর হয়ে শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ পুনরায় একটী শিশু-চিত্র নির্ম্মাণ করবার সংকল্প করেছেন। ইতিপূর্বে 'পরিবর্ত্তন' নামক চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও অন্যতম প্রযোজকরূপে মনোরঞ্জনবাবু একদা বিশেষ খ্যাতি ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। এবারে ছোটদের রূপ-কথা ও বাস্তবের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণের দ্বারা তাঁর এই চিত্রের জন্য তিনি এক নূতন ধরণের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। সন্তোষ সেনগুপ্ত চিত্রখানির সংগীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

* * *

তারকার মৃত্যু ঃ

আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা!—প্রশ্ন জেগেছে আজ বিশ্বের চলচ্চিত্র অনুরাগী জনতার মনে। মৃত্যু হয়েছে মেরিলিন্ মনরোর আকস্মিকভাবে। 'মেরিলিন্ মন্‌রো'—এই নাম সারা পৃথিবীর চিত্রামোদীদের মনে আনন্দের ঢেউ তুলত। কিন্তু সেই নামের পাশে যখন দেখা গেল 'মৃত্যু' কথাটি তখন স্তম্ভিত হয়ে গেল বিশ্বের চিত্র-জগৎ! মেরিলিন্ মন্‌রোর মৃত্যু? এ যে অবিশ্বাস্য! কিন্তু তাই সত্য। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে সৌন্দর্য্যের রাণী, চিত্রাকাশের দেবী আকস্মিক ভাবে, অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে মৃত্যু বরণ করলেন।

গত ৫ই আগষ্ট রাত্রি শেষে মেরিলিনের ঘরে কোনও সাড়া না পেয়ে তাঁর পরিচারিকা মেরিলিনের চিকিৎসককে খবর দেন। তারপর ধাক্কাধাক্কি করেও কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে সকলে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখেন অন্তিম শয়নে শুয়ে আছেন মেরিলিন্ মন্‌রো! দেহ তাঁর প্রাণহীন। চির-নিদ্রায় নিদ্রিতা সুন্দরীর দেহ শীতল, কঠিন; কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁর তখনও অটুট। মৃত্যু তাঁর প্রাণ হরণ করলেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য তাঁর হরণ করতে পারে নি—সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মেরিলিন্ রূপ মাধুর্য্যে মহিয়সী হয়ে বিরাজ করছে শয্যার উপর। বিছানার পাশে Barbiturates নামক ঘুমের ওষুধের শিশি পাওয়া যায়। ডাক্তারেরা মনে করেন মেরিলিন্ অতিরিক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করেই মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু এ কি ইচ্ছাকৃত, না দুর্ঘটনা? সে প্রশ্নের জবাব আজ কে দেবে?

মেরেলিন্ মন্‌রোর পিছনে ফেলে আসা ব্যক্তিগত জীবন, মাতার উন্মাদ রোগ, তাঁর নিজের চির-অসুখী মন প্রভৃতির থেকে অনেকেই মনে করছেন যে তিনি আত্মহত্যা করেই জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন, তাঁর অসুখী-অসুস্থ মনের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছেন।

১৯২৬ সালের ১লা জুন্ নর্ম্মা জিন্ বেকার নামে একটি মেয়ে লস্ এঞ্জেলিসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই উত্তরকালে মেরিলিন্ মন্‌রো নামে ভুবন-বিখ্যাত হন। কিন্তু জন্মাবধি তিনি দুঃখই পেয়ে এসেছেন। তাঁর জন্ম হয় অবৈধ সন্তান রূপে। তাঁর জন্মদাতা ছিলেন ডেন্‌মার্কের লোক। নাম তাঁর এড্‌ওয়ার্ড মার্টেন্‌সেন্ (Edward Martensen)। মেরিলিনের জন্মের আগেই কিন্তু তিনি নিরুদ্দেশ হন। মেরিলিনের জন্মের কয়েকমাস পরে ঐ স্থানে এক এড্‌ওয়ার্ড মার্টেন্‌সেন্ মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন। সম্ভবতঃ ইনিই মেরিলিনের সেই পিতা। মেরিলিনের মাতার নাম গ্ল্যাডিস্ বেকার (Gladys Baker)। তিনি মেরিলিনের জন্মের কিছু পরেই উন্মাদ রোগগ্রস্থা হন এবং তারপর থেকে উন্মাদ আশ্রমেই তিনি জীবন কাটাচ্ছেন।

মেরিলিনের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে অতিশয় দুঃখের মধ্যে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাকে চাকরাণীর কাজও করতে হয়েছে। নানা সংসারে তিনি স্থান পেয়েছেন এবং বিভিন্ন চরিত্রের লোকের মধ্যে এবং বিভিন্ন পরিবেশে তাঁকে কাল কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর দেহ সৌষ্ঠব ছিল অতুলনীয়, আর সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের যন্ত্রণাও ছিল অনেক। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় মাত্র ১৬ বছর বয়সে লস্-এঞ্জেলিসের এক পুলিসম্যান্ জেমস্ ডাফার্টি (James Dougherty)-র সঙ্গে। এর পর তিনি আরও দু'বার বিবাহ করেন, কিন্তু কোনও বিবাহই স্থায়ী হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী হচ্ছেন বেস্‌বল খেলোয়াড় জো ডিমাগিও (Joe Dimaggio) এবং তৃতীয় স্বামী

হচ্ছেন নাট্যকার আর্থার মিলার (Arthur Miller)। তাঁর প্রথম বিবাহ স্থায়ী হয়েছিল দুবছর, দ্বিতীয়টি মাত্র ৯ মাস এবং তৃতীয়টি পাঁচ বছর।

তাঁর প্রথম স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি প্রথমে Radio Plane Parts Company-তে parachute inspector-এর কাজ নেন। সেখানে সামারিক বাহিনীর এক ফোটোগ্রাফার মেরিলিনের দেহ-সৌষ্ঠব দেখে তাঁকে বলেন যে, 'মডেল্' রূপে কাজ করলে মেরিলিন্ ঘণ্টায় পাঁচ ডলার করে পারিশ্রমিক পেতে পারে। সুতরাং মেরিলিন্ ফ্যাক্টরী ছেড়ে মডেলের কাজ নিলেন। মেরেলিনের চুলের রং ছিল আসলে কাল। অনেকে তখন তাঁকে চুলের রং পাল্টে ফেলতে বলেন যাতে তাঁকে আরও সুন্দর দেখায়। কিন্তু মেরিলিন রাজী হন না। শেষে একজন নামকরা ফোটোগ্রাফার যখন স্যাম্পু সাবানের বিজ্ঞাপনের মডেলের জন্যে ঘণ্টায় দশ ডলার হিসাবে ছয় ঘণ্টার কাজ দিলেন, তখন মেরিলিন তাঁর চুলের রং পালটাতে রাজী হলেন। তারপর থেকেই 'ব্রুনেট্' নর্ম্মা জিন্ হলেন 'ব্লণ্ড'। ১৯৪৬ সালে মেরিলিন্ বা নর্ম্মা জিন্-এর ফোটো প্রায় সব সাময়িক পত্রের প্রথম পাতায় শোভা পেতে লাগল। এই সময় অনেক চিত্র-নির্ম্মাতার চোখে এই ছবিগুলি পড়ে এবং শেষে মেরিলিন এক এজেণ্টের মাধ্যমে 2cth. Century Fox ফিল্ম কোম্পানিতে একটি ছয় মাসের কনট্রাক্ট পান। ঐ কনট্রাক্টের তারিখ হচ্ছে ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ সাল এবং সেখানে তাঁর নাম দেওয়া আছে মেরিলিন্ মনরো। নর্ম্মা জিন্ বেকারকে এই মেরিলিন মনরো নাম দিয়েছিলেন Ben Lyon নামক এক চিত্রাভিনেতা তাঁর প্রিয় গায়ক ও হাস্যরসিক অভিনেতা Marilyn Miller-এর নাম অনুসারে। এর পর থেকে নর্ম্মা জিন্ এই মেরিলিন্ মনরো নামেই ধাপে ধাপে যশের ও গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠে দাঁড়ালেন।

মেরিলিনের নামকরা ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখ করা চলে—

'Gentlemen Prefer Blonds,' 'How toMarry a Millionaire', 'Niagara', 'River of No Return' 'The Prince and the Showgirl', Some Like it Hot', 'Seven Year Itch' প্রভৃতি। তাঁর আর একটি ছবি "Billionare" কিছুদিন আগেই কলিকাতায় প্রদর্শিত হয়েছে। "Something Got to Give" নামে শেষ যে ছবিটিতে তিনি কাজ করছিলেন তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। তাঁর মানসিক অস্থিরতার জন্য মেরিলিন্ এই ছবিতে কাজ করতে পারছিলেন না। এ জন্য ঐ চিত্রের নির্ম্মাতাদের সঙ্গে তাঁর বিবাদও চলছিল। তবে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় করবেন বলে মনস্থিরও করেছিলেন, কিন্তু তা আর হল না।

বড় হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল ছোটবেলা থেকেই। আর তিনি তা হয়েছিলেনও আশাতীত রূপেই। কিন্তু জীবনে কি তিনি শান্তি পেয়েছিলেন? মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে কি রেহাই পেয়েছিলেন? না, তা তিনি পান নি। আর পাননি বলেই যশের সেই উচ্চ শিখরে অবস্থান করেই তিনি স্বহস্তে তাঁর এই গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটালেন। তাঁর জীবন যেন চিত্র-জগতের এক মহান ট্রাজেডি হয়ে রইল। লাস্যময়ী,হাস্যময়ী,আনন্দময়ী রূপে মেরিলিন্কে যাঁরা শুধু পর্দায় দেখেছেন তাঁরা ভাবতেই পারতেন না এই মেয়েটির মনের ভেতর কি গভীর দুঃখ, কি প্রচণ্ড ব্যথা, কি মর্ম্মান্তিক জ্বালা লুকিয়ে রয়েছে। আজ তাঁর সে জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। তিনি সব যন্ত্রণার বাইরে চলে গেছেন জীবনের অভিনয় শেষে।

মেরিলিন মনরোর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু দর্শক মানসে তিনি বহুকাল বেঁচে থাকবেন চিত্রজগতের রূপময়ী দেবী রূপে। মেরিলিনের বহুদিনের বন্ধু, ব্রড্ওয়ের নাট্য-শিক্ষক Lee Strasberg মেরিলিনের সম্বন্ধে বলেছেন—

"In her own lifetime she created a myth of what a poor girl from a deprived background could attain. For the entire world she became a symbol of the eternal feminine".

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড—পাকিস্তান টেস্ট ক্রিকেট ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ৪২৮ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টম গ্রেভনী ১১৪, পিটার পারফিট ১০১, টেড ডেক্সটার ৮৫ এবং ডেভিড শেফার্ড ৮৩। ফজল মামুদ ১৩০ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান ঃ ২১৯ রান (মুস্তাক মহম্মদ ৫৫, সৈয়দ আমেদ ৪৩ এবং নাশিমুল গনি ৪১। ট্রুম্যান ৭১ রানে ৪, স্ট্যাথাম ৫৫ রানে ২ এবং নাইট ৩৮ রানে ৪ উইকেট) **ও ২১৬ রান** (৬ উইকেটে। মুস্তাক মহম্মদ ১০০ নট আউট এবং সৈয়দ ৬৪। স্ট্যাথাম ৪৭ রানে ২ উইকেট)

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রীজে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের চতুর্থ টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে খেলার মোট সময়ের মধ্যে সাড়ে দশ ঘণ্টা খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। পাকিস্তানের অধিনায়ক জাবেদ বার্কি টসে জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ইনিংস খেলার দান ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রথম দিনে বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। খেলার দ্বিতীয় দিদে ইংল্যাণ্ডের ৩টে উইকেট পড়ে ৩১০ রান দাঁড়ায়। তৃতীয় দিন ইংল্যাণ্ড ৫টা উইকেট জমা থাকতে ৪২৮ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে গ্রেভনী এবং পারফিট ব্যক্তিগত শত রান পূর্ণ করেন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে পারফিট এই নিয়ে তিনটে সেঞ্চুরী করলেন। অন্য দিকে গ্রেভনীর দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে গ্রেভনীর সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ৬টা। গ্রেভনী এ পর্য্যন্ত ৫২টা টেস্ট ম্যাচ খেলে ২,৯৯১ রান করেছেন। আর মাত্র ৯ রান করলেই তিনি সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে তিন হাজার রানপূর্ণ করবেন। টেস্ট খেলায় তিন হাজার রান করার গৌরব লাভ করেছেন মাত্র ২২জন খেলোয়াড়। এই দলের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় পলি উমরীগড়।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬টা উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করে।

খেলার চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২১৯ রানে শেষ হলে তারা ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের থেকে ২০৯ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে ‘ফলো-অন’ করে। এই দিনে পাকিস্তানের ১টা উইকেটে পড়ে ১১ রান হয়।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে না পারায় ইংল্যাণ্ড চতুর্থ টেস্ট খেলায় জয়ী হতে পারলো না, খেলা অসমাপ্ত থেকে গেল। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল পাকিস্তানের ৬টা উইকেট পড়ে ২১৬ রান উঠেছে। পাকিস্তানের এই বিপর্য্যয়ের মুখে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে খেলেছিলেন পাকিস্তান দলের সর্ব্বকনিষ্ঠ তরুণ খেলোয়াড়

মুস্তাক মহম্মদ। তিনি সেঞ্চুরী (১০০) ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। তাঁর পরই সৈয়দ আমেদের ৬৪ রান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের যখন ৩য় উইকেট পড়ে তখন দলের মাত্র ৭৮ রান উঠেছিল। মুস্তাক মহম্মদ এবং সৈয়দ আমেদ ৪র্থ উইকেটে জুটি বেঁধে দু'ঘণ্টার খেলায় দলের ১০৭ রান তুলে দেন। মুস্তাক আমেদের শতরান পূর্ণ করতে ৩১৫ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারীর সংখ্যা ছিল চার।

ইংল্যাণ্ড সফরে পাকিস্তান ক্রিকেট দল এ পর্য্যন্ত (২রা মে থেকে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত) ২৬টি ম্যাচ খেলেছে। খেলার ফলাফল: পাকিস্তানের জয় ৪, হার ৬ এবং খেলা ড্র ১৬। সফরের আর মাত্র ৬টা খেলা বাকি।

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস ঃ

আমেরিকান জোন: ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকান জোন সেমি-ফাইনালে মেক্সিকোর কাছে পরাজিত হ'য়ে আমেরিকা এ বছরের মত প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। ১৯৩৬ সালের পর নিজের জোনেই (আমেরিকান জোন) আমেরিকার পরাজয় এই প্রথম। ১৯৩৬ সালের আমেরিকান জোন ফাইনালে আমেরিকা পরাজিত হয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার কাছে।

মেক্সিকো আমেরিকান জোনের ফাইনালে খেলবে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে।

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। কিন্তু ১২ বছর প্রতিযোগিতা হয়নি। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ ১০ বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯০০ এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলেশিয়াকে ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সেইহেতু এই দুই বছরে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলেশিয়াকে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ হিসাবে ধরা হয়। ১৯০০ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ পেয়েছে আমেরিকা ১৯ বার (১৯০১ সালেওয়াকওভার), অষ্ট্রেলিয়া ১৮ বার (নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার এবং ১৯১০ সালে ওয়াকওভার), বৃটেন ৯বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুনরায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৪৬ থেকে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকা একটানা ১৪ বছর (১৯৪৬-১৯৫৯) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলে ৬ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে এবং অষ্ট্রেলিয়া পেয়েছে ৮ বার। গত দু'বছর (১৯৬০ ও ১৯৬১) আমেরিকা ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠতে পারে নি; ইণ্টার-জোন ফাইনালে দু'বারই ইতালীর কাছে পরাজিত হয়।

ইউরোপীয়ান জোন: ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয়ান জোনের ফাইনালে সুইডেন ৪-১ খেলায় ইতালীকে পরাজিত করেছে। ইতালী গত দু' বছর (১৯৬০-৬১) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে সুইডেন এবং ইতালীর ৬ষ্ঠ বার সাক্ষাৎ এবং ইতালীর বিপক্ষে সুইডেনের এই প্রথম জয়।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা ঃ

১৯৬২ সালের রাশিয়া বনাম আমেরিকার চতুর্থ বাৎসরিক এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে আমেরিকা ১২৮-১০৭ পয়েণ্টে এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া ৬৪-৪১ পয়েণ্টে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

বিগত তিনটি বাৎসরিক প্রতিযোগিতাতেও আমেরিকা এবং রাশিয়া যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। ১৯৬১ সালের এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় ৬টি অনুষ্ঠানে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছিল; ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় মাত্র দুটি অনুষ্ঠানে—পুরুষদের হাইজাম্প এবং হ্যামার থ্রোতে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

হাইজাম্পে ভ্যালেরি ব্রুমেল (রাশিয়া) ৭ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বের বিশ্ব রেকর্ড (৭ ফিট ৪½ ইঞ্চি) ভেঙ্গেছেন। হ্যামার থ্রোতে হল কনোলি (আমেরিকা) বিশ্ব রেকর্ড (২৩১ ফিট ১০ ইঞ্চি) করেছেন নিজস্ব বিশ্ব রেকর্ড (২৩০ ফিট ৯ ইঞ্চি) অতিক্রম ক'রে। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় দুটি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান

লাভ করেছেন মাত্র দু'জন—মহিলা বিভাগে তামারা প্রেস (রাশিয়া) এবং পুরুষ বিভাগে পিওৎর বলৎনিকোভ (রাশিয়া)। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা পুরুষ বিভাগের ১৪টি এবং মহিলা বিভাগের ৩টি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। অপর দিকে রাশিয়া প্রথম স্থান লাভ করেছে পুরুষ বিভাগের ৮টি এবং মহিলা বিভাগের ৭টি বিষয়ে।

চতুর্থ এশিয়ান গেমস ঃ

আগামী ২৪শে আগষ্ট থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়ামে চতুর্থ এশিয়ান গেমস শুরু হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর এই বৃহত্তম স্টেডিয়ামটি মাত্র দু' বছর সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হয়েছে এবং সোভিয়েট রাশিয়া ৯,৫০০,০০০ ডলার মূল্যের মালমশলা এবং যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে সরবরাহ ক'রে সাহায্য করেছে।

ভারতবর্ষ আগামী চতুর্থ এশিয়ান গেমসের ফুটবল, হকি, ভলিবল, এ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, ভারোত্তোলন, রাইফেল স্যুটিং এবং বক্সিং অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় এখনও চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হয়নি। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের লীগের খেলা শেষ হয়েছে এবং এই দুই দলই ২৮টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট ক'রে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থানে আছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান নির্দ্ধারণের জন্যে এখন এই দুই দলকে পুনরায় খেলতে হবে। এই দুই দলের নিষ্পত্তিমূলক খেলার তারিখ সঠিকভাবে ঘোষণা করা এখনও সম্ভব হয়নি।

হাওড়া ইউনিয়নকে এক সময়ে নীচের দিকের দলগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে নামা নিয়ে অনেকদিন দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছিল। এখন সেই হাওড়া ইউনিয়নই তৃতীয় স্থানে উঠে গেছে।

দ্বিতীয় বিভাগে কোন দল নামবে সেই নিয়ে বালী-প্রতিভা, খিদিরপুর এবং পুলিশের মধ্যে মরণপণ আত্মরক্ষার চেষ্টা চলছে।

সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে গত দু'ই সংখ্যায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন-বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। আরও অনেক অভিনন্দন-বাণী আমাদের কাছে এসেছে; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না——আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

—সম্পাদক।

সাহিত্য সংবাদ

একদা অতীতে বিদেশী বাদ্য-যন্ত্র হারমোনিয়ম্ ভারতীয় সঙ্গীত জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল এবং এরই ক্ষুদ্র ও ভারতীয় সংস্করণ বক্স-হারমোনিয়ম্ বাদ্যযন্ত্রটি তারপর থেকে কায়েমী ভাবেই আসন পেতে বসেছে এদেশীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। উচ্চাঙ্গ বা ক্লাসিক্যাল্ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যে এ বাদ্য যন্ত্রটি ব্যবহার হয় না তা নয়। মাত্র কয়েকটি অতি-উচ্চাঙ্গের ওস্তাদ গায়ক, যাঁরা তানপুরা সহযোগেই গেয়ে থাকেন, ছাড়া প্রায় সর্ব্বস্তরের গায়কেরাই এই বক্স-হারমোনিয়ম্ যন্ত্রের সুর-সহযোগে গান গেয়ে থাকেন—তা সে ক্লাসিক্যাল্ই হোক বা আধুনিকই হোক বা রবীন্দ্র-সঙ্গীতই হোক বা অন্য যে কোনও স্তরের গানই হোক, হারমোনিয়ম্ ছাড়া প্রায় কোনও গায়কই এককভাবে গান গান না। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে হারমোনিয়ম্ বাদ্য-যন্ত্রটি বিদেশী হলেও ভারতীয় সঙ্গীত জগতে ভারতীয় রূপ নিয়ে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে যে একে বাদ দেওয়ার কথা তো দূরের কথা, বিদেশী বলে যেন মনেই হয় না। এর বিদেশী সত্বা লোপ পেয়ে এ যেন ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে এক মন, এক প্রাণ হয়ে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ পেয়ে গেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, যে বিদেশ থেকে এই হারমোনিয়ম্ এসেছিল সেখানে কিন্তু আর এর চলন নেই একেবারেই—এর স্থান নিয়েছে বোধ হয় "পিয়ানো একোর্ডিয়ান্"।

অধুনা দেখা যাচ্ছে আর একটি বিদেশী বাদ্য-যন্ত্র আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতের, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসন পেতে বসছে। এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে খুবই দ্রুতগতিতে। এই যন্ত্রটিকে আজকাল সবাই চেনেন—এর নাম "গীটার"। গীটারের প্রচলন এ দেশে খুব বেশীদিন হয় নি, কিন্তু এর সুনিষ্ট ধ্বনি, এর সুমধুর সুর-ঝঙ্কার, এর সুললিত সুর-মূর্চ্ছনা—বাদক, গায়ক, শ্রোতা সকলেরই মন হরণ করেছে অতি অল্প সময়েই। এবং মনে হয় হয়ত অচিরেই এই বাদ্য-যন্ত্রটি ভারতীয় বাদকদের হাতে হাতে ফিরবে অবিচ্ছেদ্য সুর-সহযোগীরূপে।

গীটার যন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সুদূর অতীতের মিশর ও ব্যাবিলনে যে "লায়ার" (Lyre) নামক বাদ্য-যন্ত্র বাজান হত তাই বহু যুগের ক্রম বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এসে আধুনিক গীটারে রূপ নিয়েছে। ঐ 'লায়ার' থেকে পরে লাউ আকৃতি "লিউট্" (Lute)-এর জন্ম হয়েছে। মুরগণ যখন স্পেন্ দেশ আক্রমণ করে তখন তারা তিন তারের "রেবাক্" (Rebac) নামক ম্যাণ্ডোলিনের মতন দেখতে বাদ্যযন্ত্র, যা ধনুকের ন্যায় বক্রাকৃতি ছড়ির (bow) সাহায্যে বাজান হত, তাদের সঙ্গে নিয়ে গেছল। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চার্চ অফ্ স্পেনের বিদ্রোহের সময় (Revolution of Church of Spain) এই 'রেবাক' বাদ্য বাজান নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্পেনের লোকেরা এই 'রেবাক্' বাজনা এত পছন্দ করত যে তারা একে ত্যাগ করতে পারল না। তাই আইনকে এড়াবার জন্যে তারা যন্ত্রটি বো (bow) ছাড়াই বাজাতে লাগল। আর বাজানর এই পরিবর্ত্তনই পরে বাজনাটিকে গীটারে রূপান্তরিত করল। তখন সৃষ্টি হল দু'রকম গীটারের। 'গীটার ল্যাটিনা' (Guiter Latina), যার তলদেশ সমতল (flat back), তা ব্যবহৃত হত 'কর্ড' (chord) বাজানর জন্যে। আর 'গীটার মরিস্কা' (Guiter Morisca), যার তলদেশ লাউ আকৃতি (curved back), তা ব্যবহৃত হত 'মেলডি' (melody) বা গানের প্রধান সুরটি বাজানর জন্য। এই দুই প্রকারের গীটারই পাঁচ তারের হত। এরপর এল ছয় তারের 'স্প্যানিস্ গীটার' (Spanish Guiter)।

স্প্যানিস্ গীটার বাজান হয় বুকের ওপর ফিতা দিয়ে ঝুলিয়ে এবং তারগুলি পর্দ্দার (fingerboard) ওপর বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ধরে। এর পর সৃষ্টি হল

'হাওয়াইয়ান্ ষ্টীল্ গীটার'-এর। এই হাওয়াইয়ান্ গীটার বাজান হয় কোলের ওপর রেখে বাঁ হাতে এক খণ্ড ছোট ষ্টীল নির্মিত বার (steel bar)-কে পর্দার ওপর ঘসে ঘসে এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলিতে একরকমের আংটি (finger picks) পরে তাই দিয়ে তারগুলি বাজিয়ে। এই হাওয়াইয়ান্ গীটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে হাওয়াই দ্বীপবাসী এক ব্যক্তির হাত থেকে তার ষ্টীল্ নির্মিত ছুরিকা হঠাৎ হাত ফসকে তার কোলে রাখা গীটারের তারগুলির ওপর পড়ে গড়িয়ে যায় এবং এক সুমধুর সুর-লহরীর সৃষ্টি করে। এই থেকেই হাওয়াইয়ান্ ষ্টীল্ গীটারের নাকি সৃষ্টি। এবং এই হাওয়াইয়ান্ ষ্টিল্ গীটার পরে স্প্যানীস্ গীটারকে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে যে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে তা বোঝা যায় ষ্টিল্ গীটারের বিশ্বব্যাপী সমাদর দেখে। আমাদের দেশেও দেখে যায় স্প্যানিস্ গীটার খুব অল্প লোকেই বাজিয়ে থাকেন। বিশেষ করে মেয়েদের কাছে তো এ গীটার একেবারে অপাংক্তেয়। কিন্তু অপর দিকে ষ্টীল গীটারের আদর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এর প্রধান কারণরূপে বলা যায় যে এই ধরণের গীটারে গমক, গীটকারী ও বিভিন্ন সুরের (different chords and harmonies) সমন্বয় করে অপূর্ব্ব সুর-ঝঙ্কারের সৃষ্টি করা চলে। বাঙ্গলা আধুনিক গান এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর এই ষ্টীল্ গীটারে অতি সুন্দর ভাবে বাজান যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারা যায় না যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গীটারের মাত্র একটি দুটি তারেই সুরগুলি বাজান হয় অন্য তারগুলি খালি রেখে, এতে করে ষ্টীল্ গীটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'হারমনি' ও সুর-ঝঙ্কারের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা শোনায়। ঠিক ভাবে হাওয়াইয়ান্ ষ্টীল্ গীটার বাজাতে গেলে 'হারমনাইজড্' (harmnised) বা সুরের সমন্বয় সাধন করে ও 'কর্ড' (chord) সহযোগ বাজান উচিত, তাতে গীটারের সুর-সৌন্দর্য্য আরও ফুটে উঠবে। তবে ঠিক ভাবে ষ্টীল্ গীটার বাজাতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষকের বা গীটার শিক্ষার উপযোগী পুস্তকের সাহায্য নিতে যে হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। উপযুক্ত গীটার শিক্ষকের অভাব বাঙ্গলা দেশে না থাকলেও গীটার শিক্ষার উপযোগী পুস্তকের অভাব আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্বনামখ্যাত গীটার বাদক ও শিক্ষক শ্রীমুকুল দাস এইরূপ একটি পুস্তক প্রকাশ করে গীটার শিক্ষায় উৎসুক ছাত্রদের একটি বিরাট অভাব পূর্ণ করে গীটার অনুরাগীদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। মুকুল দাস বিজ্ঞানের ছাত্র ও বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার হলেও প্রায় শিশু বয়স থেকেই নানা রূপ বাদ্যযন্ত্রের অনুশীলন করে আসছেন। ষ্টীল্ গীটার ও পিয়ানো একোর্ডিয়ন্ তাঁর প্রিয় যন্ত্র এবং গীটারের তিনি নামকরা শিল্পী ও শিক্ষক। তাঁর এই "Steel Guitar Method" বইটিতে তিনি বিভিন্ন সুরের সমন্বয় সাধন (harmonisation), 'কর্ড' দেবার নানারূপ প্রণালী, ৫৫ রকমের সুর বাঁধা এবং রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গানগুলিকে 'কর্ড' সহযোগে 'হারমনাইজড্' করে, যাতে গীটারের ছয়টি তারেই সুর-সমন্বয় করা যায় সেইভাবে করে, এই বইটিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন। শ্রীদাসের এই পুস্তক সম্বন্ধে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও হাওয়াই দেশের প্রসিদ্ধ গীটার বাদক Tauivi Moe উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তো বটেই ভারতীয়দের মধ্যেও তিনিই প্রথম এরূপ পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে 'কর্ড' সংযুক্ত ষ্টীল্ গীটার শিক্ষার পুস্তক প্রকাশ করলেন। আমরা তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। পুস্তকটির প্রচ্ছদ-পট, বাঁধাই ও ছাপা একথায় চমৎকার বলা চলে।

[Steel Guitar Method—by Mukul Das. Published by Orient Longmans. Price-Rs. 6.00]

—শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৃত্তি নির্ণায়ক বিচার পদ্ধতি

উপাধ্যায়

উচ্চ শিক্ষালাভ (Higher University Education), উচ্চ চিন্তা ধারার অনুকম্পন, যৌগিক শক্তি অর্জ্জনের দ্বারা অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন ও অদৃশ্য লোকের পরিচয়লাভ প্রভৃতি সম্বন্ধে লগ্ন থেকে নবম স্থানে বিচার্য্য। এইসব শক্তি অর্জ্জনের—তারই পক্ষে সম্ভব যে ব্যক্তির রাশিচক্রে এই স্থানে বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, রবি অথবা হার্সেল অবস্থিত। এদের যতই শক্তি, এখানে দৃষ্টি অবস্থান ও বর্গবলের মাধ্যমে দৃঢ় হবে, ততই সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠ্‌বে। দশমস্থানে বহু গ্রহের সমাবেশে সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের পরিচায়ক। এখানে শুভ গ্রহের সমাবেশে রাজযোগ হয়। শনি এখানে বলবান হয়ে অবস্থান করলে জাতক পর্ব্বতে অরণ্যে বা গুহায় নির্জ্জনে একাকী ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থাকে নগ্ন ও নেপথ্য অবস্থায়, বহিরঙ্গ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজার্চ্চনাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করে মনন ও নিদিধ্যাসনে ব্যাপৃত হয়। ওয়েমিস বলেন, মিথুন আর ধনুর ২৩° ডিগ্রি হচ্ছে ধর্ম্মপ্রত্যয়ের অংশ, মেষ ও তুলার ২৩° ডিগ্রি আশার, সিংহ ও কুম্ভের ২৬° ডিগ্রি সহানুভূতি, কর্কট ও মকরের ১৬° ডিগ্রি কর্ত্তব্যবোধের অংশ এবং বিশ্বাস, আশা ও দানের এমীরূপ এভাবে গড়ে ওঠে।

বুদ্ধিরপ্রাখর্য্য মূলক রাশি হচ্ছে মিথুন, তুলা আর কুম্ভ। এখানে যাদের লগ্ন, তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ, চিন্তাশক্তির স্ফুরণ আর পরিকল্পনায় সাফল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং গভীর গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় সিদ্ধিলাভ তাদেরই পক্ষে সম্ভব হয়—যাদের লগ্ন কর্কট আর মকর। ধনু আর মিথুনের ১১°-১২° অংশে জাত ব্যক্তির দোষ গুণ বিচার করবার শক্তি আছে। মেষ ও তুলার ১৩°-১৫° অংশে জাত ব্যক্তির মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ও ছন্দ বোধ, কুম্ভ ও সিংহের ৭° ডিগ্রি জাত ব্যক্তির নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌বার শক্তি দেখা যায়। এরা আইনজ্ঞ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর্‌তে পারে। সাধারণতঃ বৃহস্পতি যার বলবান, অথবা যার দশমস্থানে বৃহস্পতি অবস্থিত তার ভেতর রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান, নিরপেক্ষ বিচারশক্তি এবং বিচারককে অভিভূত করে মক্কেলকে মোকর্দ্দমায় জিতিয়ে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা। এ শ্রেণীর লোক ব্যবহারজীবী হোলে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রভূত অর্থোপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে। এ সব প্রতিভার চরমোৎকর্ষ সাধন হয় বুধের সহাবস্থান বা শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষার আনুকূল্যে।

ত্রিকোণে বুধ অবস্থান করলে বক্তৃতা দেবার শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আর এর ওপর মঙ্গলের শুভ দৃষ্টি পড়লে বুদ্ধিদীপ্ত রসসঞ্চারের তৎপরতা সংমিশ্রিত হয়, ফলে সুন্দরভাবে রসিয়ে মক্কেলের পক্ষে দাঁড়িয়ে ওকালতি করার ক্ষমতার মাধ্যমে আইনের দুর্ভেদ্য জটাজাল ভেদ করে মোকদ্দমায় জিতে যাওয়া সহজসাধ্য হয়। এরূপ যোগ যাদের আছে, আইনের ক্ষেত্রে তারা হয় কে নয়, নয়কে হয় কর্‌তে পারে।

শুক্রের ওপর চন্দ্রের শুভদৃষ্টি পড়লে সহানুভূতি, নম্র ব্যবহার সামাজিক বোধ, মার্জ্জিত ব্যবহার, মনোরম আচার ও আচরণ সুন্দর-ভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কর্‌বার শক্তি অর্জ্জিত হয়। ব্যবহার-জীবীর পক্ষে এযোগটী উন্নতির সহায়ক। আইন ব্যবসায়ীর পক্ষে দশমে একাই মঙ্গল বিশেষ সাহায্য করে। তর্কবিতর্ক বা জেরা কর্‌বার শক্তি, বিচার বিশ্লেষণ বিচক্ষণতা এবং অত্যন্ত গূঢ় জটিল আইনের সূক্ষ্ম ধারাগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বোধ প্রভৃতি দশমে মঙ্গলের অবস্থিতি দ্বারা সম্ভব। কিন্তু অন্যগ্রহের শুভদৃষ্টি বর্জ্জিত হোলে আইন-ব্যবসায়ী জাতকের হঠ কারিতা, কলহ দ্বন্দ্বের আতিশয্য ও রুক্ষ ব্যবহার হেতু অসাফল্য বৃদ্ধি করে। গ্রহদের শুভদৃষ্টি থাক্‌লে শক্তি, প্রতিপত্তি প্রভুত্ব ও আইনের লড়াইতে পৌনঃপুনিক জয় হেতু ক্রমে আধিপত্য বিস্তৃতির সুযোগ আসে এবং পরে বিচারক হওয়ার পক্ষে অনুকূল হয়। মঙ্গল মানুষকে কর্ম্মদক্ষতা, তর্ক বিতর্কের প্রতি অনুরাগ, জেরা কর্‌বার কৌশল আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আইনের প্রতিটি ধারার সঙ্গে নিগূঢ় পরিচিতি ও সেই সব ধারার অন্তর্ভুক্ত মামলা মোকর্দ্দমায় কৃতিত্ব অর্জ্জন প্রভৃতি সম্পর্কে সাহায্য করে। মঙ্গল, বুধ, ও বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের পারস্পরিক অশুভ দৃষ্টি সত্ত্বেও কয়েকজন ফৌজদারী সংক্রান্ত মামলা মোকর্দ্দমায় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন। আইনের সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান নেই, প্রতিভার অভাব এবং চিন্তাশক্তির দুর্ব্বলতা থাক্‌লেও তাঁরা কেবল ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞতা ফন্দিবাজী, নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক দুঃখপ্রদ ও ভদ্রতাসঙ্গতিশূন্য প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী আসামী বা বাদীকে বিপর্যস্ত করে মামলায় জিতে যান। এঁরা আইন সম্বন্ধে অন্তঃসারশূন্য হয়ে ও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করছেন, যান বাহন, গৃহ, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যস্ফীত, এরূপ লক্ষ্য করা গেছে।

ইঞ্জিনিয়ার হোতে গেলেও স্মৃতিশক্তি, চিন্তার ক্ষমতা, পরিকল্পনা করবার দক্ষতা ও অঙ্কশাস্ত্রে বুৎপত্তি আবশ্যক। মঙ্গল বলী ও রবির ওপর শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষার প্রয়োজন। কেননা ইঞ্জিনিয়ারের বলিষ্ঠ দেহ ও উন্নত চেহারা, তা ছাড়া বাহিরের কাজ করবার শক্তি, ছুটোছুটি করবার সহনশক্তি অত্যাবশক। মঙ্গল অগ্নি, ধাতুপদার্থ, যন্ত্রপাতি এবং বহিঃক্ষেত্রে কর্ম্মনির্দ্দেশক। মঙ্গল যার দুর্ব্বল, তার পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে না যাওয়াই ভালো। মঙ্গল ও বুধ উদ্ভাবনশক্তি ও বুদ্ধি কারক। জাতকুণ্ডলীতে এদের বলিষ্ঠ প্রভাব ব্যতিরেকে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না। এদের দৃষ্টি শুভ হয়ে শনি, হার্সেল অথবা বৃহস্পতির ওপর থাকা চাই। মঙ্গলের ক্ষেত্রে মেষে জাত ব্যক্তির মঙ্গল হার্সেলের সঙ্গে কুম্ভে অবস্থিত, দশমে শনি মকরে, নবমে বৃহস্পতি ধনুতে—ইনি একজন বিখ্যাত বিমান-পরিচালনা কুশলী।

তুলার ২৬° ডিগ্রি হচ্ছে আবিষ্কারের অংশ। যে সব বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার নব নব পরিকল্পনা ও মৌলিক চিন্তাধারার আনুকূল্যে সাধারণের উপযোগী বস্তু আবিষ্কার করেছেন তাঁদের জন্মকুণ্ডলীতে এই অংশ প্রাধান্য লাভ করেছে, এ অংশে গ্রহদের সমাবেশ বা অনুকূল দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত জ্যোতিষী ওয়েমিস এই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে মেষ ও তুলার ১৮° ডিগ্রি, আর মঙ্গল ও নেপচুনের অবস্থা বা গতিবিধি এ সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। মিথুন ও ধনুর ৯° ডিগ্রী আর বুধ বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনা সম্পর্কে নির্দ্দেশক। ইলেকট্রিসিয়ান হোতে গেলে এদিকের অবস্থা অবলোকন প্রয়োজনীয়। মঙ্গল অথবা বুধের ওপর হার্সেলের শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষার প্রভাব থাকলে জাতকের গবেষণামূলক ব্যাপারে কর্ম্মতৎপরতা লাভ হয়, বিশেষতঃ হার্সেল যদি ১৪° ডিগ্রী থেকে ১৮° ডিগ্রীর মধ্যে বৃশ্চিক রাশিতে থাকে তা হোলে ফলটা খুব জোরালো হোতে পারে। চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধের মধ্যে শুভদৃষ্টি বিনিময় বা অবস্থানের আনুকূল্যে খাল খনন, সেতু নির্ম্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা প্রকার উদ্ভাবন কৌশল, এবং নৌ-বাহ-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ হয় যদি উপরোক্ত গ্রহেরা জল রাশিতে থাকে।

চিকিৎসকের পক্ষে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, মানব প্রকৃতির তীক্ষ্ণ বোধ যাতে রোগীর আরোগ্যলাভের পক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় হয়, পথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান, রোগীর প্রতি যথাযথ সহানুভূতি, রোগ নির্ণয় করবার তীক্ষ্ণ অন্তর্নিহিত শক্তি এবং শস্ত্রোপচারে বিশেষ তৎপরতা প্রয়োজন। লক্ষণ দৃষ্ট রোগ নির্ণয়ের পক্ষে দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির সহায়ক হয়ে উত্তম চিকিৎসক করার পক্ষে তুলা, মিথুন, বৃশ্চিক ও কুম্ভ অনুকূল। বৃশ্চিক রাশিতে রবি ও বুধ জ্ঞানের এই শাখাতে গবেষণার পক্ষে অসীম অনুরাগ এনে দেয়। এদের ওপর হার্সেলের শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষা হোলে ফলটা অতীব উত্তম হয়। রবি, মঙ্গল, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতির মধ্যে উত্তম দৃষ্টি বিনিময় আছে কিনা তা বিচার্য্য। মঙ্গলের ওপর রবির শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষা কিংবা শনির ওপর রবির অনুকূল দৃষ্টি সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ বুঝায়। শস্ত্রোপচার কার্য্যে রবি সাহস ও কর্ম্মশক্তির দৃঢ়তা আনে। সুতরাং রবির আনুকূল্য আবশ্যক। শনির ওপর বুধের শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষা থাকলে সতর্কতা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও যথার্থতা (precision) আনে। হার্সেলের প্রতি বুধের অনুরূপ দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুদক্ষতা প্রদান করে। ওয়েমিস খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে আরোগ্যশক্তি ও গূঢ় অতীন্দ্রিয় বোধ বৃষ ও বৃশ্চিকের ৬° ডিগ্রীতে সীমিত। পরার্থপরতা বোধ ও সহানুভূতি আসে সিংহ ও কুম্ভের ২৩° ডিগ্রীভুক্ত হোলে। কৌশল হস্তচালনার পারদর্শিতা লাভ হয় মেষ ও তুলার ২° ডিগ্রীতে থাকলে, তন্ন তন্ন করে দেখা, আর শস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভও হয় অনুরূপ হোলে। চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ মেষ ও তুলার ১২° ডিগ্রীতে।

যার কোষ্ঠীতে উপরোক্ত গ্রহরা তুলার ১২° ডিগ্রী থেকে ১৮° ডিগ্রীর মধ্যে, তার উত্তম শস্ত্রোপচার দক্ষতার জন্যে প্রসিদ্ধি আবশ্যম্ভাবী। জনৈক লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের দশমাধিপতি মঙ্গল তুলার ১৮° ডিগ্রীতে থেকে হার্সেলের দ্বারা অনুগৃহীত দেখা যাচ্ছে। শস্ত্রোপচারে তাঁর অসাধারণ শক্তি দেশ দেশান্তরে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতি অনুকূল না হোলে উত্তম সাংবাদিক বা সম্পাদক হওয়া যায় না। এদের ত্রিকোণে অবস্থিতি আবশ্যক। মীন ও কন্যার ২১° ডিগ্রী বিবদ্ধতা ব্যঞ্জক, এদের ১৭° ডিগ্রী বর্ণনাশক্তি প্রদায়ক, মিথুন ও ধনুর ১৩° ডিগ্রীতে বিদ্রূপাত্মক রচনা শক্তি প্রকাশ করে। সুতরাং জন্মকুণ্ডলীতে এরূপ যোগাযোগ না হোলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নগণ্য হয়ে থাকতে হবে। তৃতীয়াধিপতি ও নবমাধিপতি তৃতীয়ে এবং নবমে অথবা শুভ ক্ষেত্রে না থাকলে গ্রন্থকার হওয়া যায় না। চন্দ্র এবং বুধ বলী হোলে আর মিথুন কন্যা তুলা ও কুম্ভ এর মধ্যে যে কোনটীতে লগ্ন হোলে জাতক হিসাব পরীক্ষক (Accountant) হয়।

ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী বা নাট্যকার হোতে হোলে বুধ, শুক্র ও চন্দ্রের অশুভ দৃষ্টি বা প্রেক্ষা আবশ্যক এবং তাদের ত্রিকোণে বলী হওয়া প্রয়োজন কেননা অতিমানস দর্শন বা রোমান্স মানুষের মনে গ্রহদের শুভ দৃষ্টি প্রভাবে গড়ে ওঠেনা। বুধ ও বৃহস্পতি উত্তমভাবে বলীয়ান হয়ে না থাকলে অধ্যাপকীয় বৃত্তিতে বা শিক্ষকের বৃত্তিতে সাফল্য অর্জ্জন হয় না।

পৃথ্বী রাশিই ব্যবসায়ের অনুকূল। জনৈক ব্যারিষ্টারের দশমাধিপতি রবি তুলার ১৩° ডিগ্রীতে, বুধ সংযোগী এবং চন্দ্র সেক্স্ টাইল ছিল। তিনি ব্যবসা আরম্ভ করে অতুলৈশ্বর্য্য লাভ করে ছিলেন। শনির দ্বারা চন্দ্র পীড়িত থাকলে কখন ব্যবসা করতে যাওয়া উচিত নয়। যদি বৃহস্পতি, মঙ্গল ও নেপচুনের শুভ দৃষ্টি শনি বা চন্দ্রের ওপর পতিত হয়, তা হোলে অবশ্য ব্যবসায় অবতীর্ণ হওয়া যায়। দশমে বৃহস্পতি, অথবা রবি, এরা সংযোগী হোলে, তৃতীয়ে বা নবমে শুক্র থাকলে ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা যেতে পারে। রবির ওপর শনির অশুভ দৃষ্টি হোলে ব্যবসায়ে ক্ষতি। রবির প্রতি চন্দ্রের সেক্স্ টাইল বা ট্রাইন প্রেক্ষা অথবা এদের একটির দৃষ্টি বৃহস্পতি বা শুক্রের ওপর থাকলে ব্যবসায়ে প্রচুর এবং ক্রমাগত লাভ হোতে থাকবে।

অনেকে মনে করে লগ্ন থেকেই বুঝি ভাব গুলির বিচার হয় কিন্তু তাদের জানা উচিত এ ধারণা ভুল। প্রত্যেক গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত সেই গ্রহকে আলম্বন করেও দ্বাদশ ভাব বিচার করতে হয় অর্থাৎ গ্রহটি যেখানে আছে সেই রাশিটীকে মনে করতে হয় লগ্ন, তা থেকে বামাবর্ত্তে দ্বাদশ ভাব ঠিক করে বিচার করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ রবিকে নেওয়া যেতে পারে। রবি যে রাশিতে আছে, সেই রাশি থেকে নবম রাশিতে পিতার সম্বন্ধে বিচার করতে হয়। রবি স্থিতি রাশি থেকে জাতকের যশ, খ্যাতি, উচ্চপদপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিচার্য্য। কর্ম্মজীবনের বিচারেও লগ্ন থেকে দশম ভাবের মত, রবি, চন্দ্র, ও শনির স্থিত রাশি থেকে দশম রাশিতে ও কর্ম্মবিচার করতে হয়। গ্রহ তখনই অনুগৃহীত হয় যখন সে শুভ গ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয় বা দ্বিতীয় সম্বন্ধ করে, শুভ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়, শুভ গ্রহের সঙ্গে কনজাংশন বা অপোজিশন প্রেক্ষা করে, কোন গ্রহের সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ বা তৃতীয় সম্বন্ধ করে আর কোন গ্রহের মিত্র প্রেক্ষা পায়। পাপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত বা

দ্বিতীয়সম্বন্ধ করলে,' পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে, পাপগ্রহের সঙ্গে বনুগাংশন বা অপোজিশন প্রেক্ষা করলে, কোন গ্রহের সঙ্গে স্কোয়ার সেমিস্কোয়ার অথবা সেসকুই কোয়াড্রেট প্রেক্ষা করলে গ্রহ পীড়িত হয়।

'কর্ম্মস্থানং গ্রহৈহীনং যদি বা দৃষ্টি বর্জ্জিতং। তদা দারিদ্র্য-দোষেণ মেদিন্যাং ভ্রাম্যতি নরঃ'। কর্ম্মস্থানে গ্রহ না থাকলে আর গ্রহ দৃষ্টি বিবর্জ্জিত হোলে মানুষকে দারিদ্র্য দোষ বশতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করতে হয়। কর্ম্মস্থানস্থ গ্রহ মাত্রেই শুভ ফল দেয়। দশম থেকে দশম স্থান স্থিত পাপগ্রহ স্বীয় দশান্তর্দ্দশা কালে কর্ম্মবৈকল্য প্রদান করে। মীনরাশি স্থিত শনি দশম ভাব গত হোলে সন্ন্যাস যোগ হয়।

বুধ কেন্দ্রে শুক্র দ্বিতীয়ে, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হয়। সাহিত্য শক্তি এবং প্রজ্ঞা বুধ ও শুক্রের অবস্থান ও বৃহস্পতি প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। বৃহস্পতি শক্তি সম্পন্ন, শুভদৃষ্ট ও বর্গোত্তম হোলে জাতক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও বাগ্মী হয়। মঙ্গল বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হয়ে বুধের সঙ্গে দ্বিতীয়ে অবস্থান করলে এবং চন্দ্র অথবা চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ একত্রে কেন্দ্রে সহাবস্থান করলে জাতক উত্তম গণিতজ্ঞ হয়। বুধ বুদ্ধি ও মানসিকতার কারক। কাজেই কর্ম্মের যোগ্যতা এবং কর্ম্মে সাফল্যের ব্যাপারে বুধের অনেকখানি প্রভাব আছে। বুধ যার দুর্ব্বল, এযুগে তার পক্ষে বিদ্যার্জ্জন থেকে সুরু করে কর্ম্মপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাপারে দেখা যায় নৈরাশ্য। জাতকাভরণে বলা হ'য়েছে লগ্ন বা রাশির দশমে শনি থাকলে নীচবৃত্তি হয়ে থাকে। চন্দ্র ও বৃহস্পতি প্রভুত্বকর্তৃত্ব সূচনা করে। লগ্ন ও পঞ্চম ভাবের শুভ সম্বন্ধ আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে যখন জাতকের মনোমত কর্ম্ম হবে কিনা এরূপ প্রশ্ন উঠবে। পরস্পরের মধ্যে শুভ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে জাতককে অবাঞ্ছনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হোতে হয়, কখন কখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করতে হয়। দশম স্থানস্থ গ্রহ বা দশমাধিপতি চন্দ্র বা বুধের দ্বারা সুপ্রেক্ষিত হোলে জাতকের মনোমত কর্ম্ম হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে দায়িত্বের বিচার শনির অবস্থা ও বলাবল নির্ণয় করা আবশ্যক। শনির সঙ্গে কর্ম্মভাবের সম্বন্ধ থাকলে, রবি, চন্দ্র ও লগ্ন থেকে দশম ভাব ও আত্মকারক নবাংশ থেকে দশম ভাবের সঙ্গে শনির সম্বন্ধ হোলে কর্ম্মের ব্যাপারে জাতককে দায়িত্ব নিতে হয়। এই সম্বন্ধ শুভ হোলে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম কষ্টকর হবে না, কিন্তু অশুভ হোলে দায়িত্বের জন্যে কষ্টভোগ করতে হবে। কর্ম্মে পরিশ্রম করতে হবে কিনা বিচার করতে হোলে ষষ্ঠ ভাবের বিচারও আবশ্যক। ষষ্ঠপতি যার দশমে কিম্বা দশমপতি ষষ্ঠে, তাকে প্রায়ই বেশী পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হয়। ষষ্ঠ দশমপতি অবস্থান করলে কর্ম্ম ক্ষেত্রে জাতকের পরিশ্রম নির্দ্দেশ করে।

দশমস্থ বলবান পাপগ্রহ কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষকে অসৎ প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হয় সে সাহসী হয় আর কাজ করার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। দশম স্থানে কোন গ্রহ না থাকলে দশমাধিপতির অধিকৃত নবাংশের অধিপতিকে বের করা দরকার। রবি হোলে জাতক ঔষধ ব্যবসায়ী, রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা ও স্বর্ণকার হবে। চন্দ্র থাকলে নানা কলা কুশলতা, নানা রকমের সাহসিক কাজ বা কৃষি কর্ম্ম সংক্রান্তে জাতকের কর্ম্ম হয়ে থাকে মঙ্গল থাকলে যোদ্ধা, মেকানিক, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রেতা হোতে পারে, সাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হবে, দূর ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারাও জাতকের কর্ম্ম হয়ে থাকে। বুধ থাকলে লেখক, গ্রন্থকার ভাস্কর, গণিতজ্ঞ হোতে পারে, নেতৃত্ব শিল্প অর্থকরী বিদ্যা সাহস বহুমুখীনতা প্রভৃতির সংক্রান্তে কর্ম্মলাভ। বৃহস্পতি দশমে থাকলে ধর্ম্মযাজক, গুরু পুরোহিত, আইনজ্ঞ, এটর্ণী ব্যারিষ্টার প্রভৃতি হোতে পারে। অর্থ প্রয়োগ, বিচিত্র বিদ্যা কিম্বা রাজকার্য্য প্রভৃতির সংক্রান্তে জাতকের কর্ম্ম হয়ে থাকে। শুক্র থাকলে পশু ব্যবসায়ী, পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত কারক, নৃত্যগীত ও অভিনয় কুশলী, শিল্পী প্রভৃতি হোতে পারে, তা ছাড়া নানা শাস্ত্র আলোচনা, নানা কলাবিদ্যা ও বিলাস বৃত্তির সংক্রান্তে জাতকের কর্ম্ম হয় আর অন্যান্য সৎকর্ম্মের জন্যে জাতকের খ্যাতি ও নেতৃত্বলাভ হয়ে থাকে। শনি থাকলে হীন ও সামান্য কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ menial ও subordinate officer ও হোতে পারে। দশমপতি বা দশমস্থ গ্রহ বলবান বা শুভগ্রহ হোলে উত্তম কর্ম্ম আর দুর্ব্বল বা পাপগ্রহ হোলে নীচকর্ম্ম হয়ে থাকে। গ্রহের বলাবল ও অবস্থান ও দৃষ্টি ভেদে উপরোক্ত কারকতা অবলম্বন করে বিচার করা আবশ্যক। রবি শুভ না হোলে উচ্চপদস্থ বা উত্তম বৃত্তি লাভ হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রের রাশি অগ্নিসংজ্ঞক হোলে জাতকের যন্ত্র বিদ্যা বা আগুনের কোন রকম সংস্রবে এসে কাজ করতে হয়, আর যে সব কাজে দেখাতে হয় বুদ্ধি, কৌশল, উদ্যম ও তৎপরতা। বায়ুসংজ্ঞক রাশি জাতকের কর্ম্মক্ষেত্র হোলে জাতকের মস্তিষ্ক চালনায় ব্যাপৃত হোতে হয়। অর্থকরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কাজ হয়। এই রাশি আইনজ্ঞ লেখক, গণিতজ্ঞ, শিল্পী, কেরানী, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি কাজের দিকে জাতককে নিযুক্ত করে। জলরাশি সংজ্ঞক কর্ম্মক্ষেত্র হোলে কাব্য, নৃত্য, সঙ্গীত অভিনয়ের দিকে টান হয়, জাহাজের কাজ হয়, যে সব প্রতিষ্ঠানের জাহাজ আছে সেখানেও কাজ হয়। জলীয় পদার্থের যে কোন ব্যবসা, লণ্ড্রির ব্যবসা প্রভৃতিও হয়। পৃথ্বীরাশি সংজ্ঞক হোলে পূর্ত্তকার্য্য, খনন কার্য্য, গৃহ নির্ম্মাণ, এরোড্রোম প্রভৃতি স্থানে কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, রাজনৈতিক বা সাধারণ সংশ্লিষ্টকাজ, সংগঠনমূলক কাজ প্রভৃতি হয়। কর্ম্মজীবনে বৃত্তি নির্ব্বাচন সমস্যামূলক। এজন্য জ্যোতিষের সাহায্যে বৃত্তি নির্ব্বাচন করে সেইমত জীবনযাত্রা সুরু করলে পরে বাধাবিঘ্ন বিপত্তি ভোগ করতে হয় না।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

ভরণী নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্বিনী ও কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ ভালো যাবে। শত্রুজয়, সুখ, উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ স্বজন মিলন, বন্ধুদের সাহায্য প্রাপ্তি, শুভঘটনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সম্মান হানি কলহ বিবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, অপবাদ, নানা কার্য্যে বাধা, দুঃখ কষ্ট, ক্লান্তিকর-ভ্রমণ, ইত্যাদি। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে গুহ্যপ্রদেশ উদরে অথবা মূত্রাশয়ে কষ্ট। চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি নেওয়া আবশ্যক। সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক কলহ বিবাদ এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা। ব্যয়াধিক্য ও আর্থিক ক্ষতি হলেও অর্থাগম হবে। প্রথমার্দ্ধে আর্থিকোন্নতির যোগ আছে। অপরিমিত ব্যয়ের জন্য শেষের দিকে অর্থের টান অনুভূত হবে। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ ও মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হোতে পারে। শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হবে না। বাড়ীওয়ালার পক্ষে অশুভ নয়। প্রথমার্দ্ধে চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম, উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির চাকুরি এমাসে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে কার্য্যসিদ্ধি-

পাত করবে, কার্য্যে সাফল্য লাভের আশা কম, আর নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি। রেশ খেলায় অর্থাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উত্তম। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু কিছু দুঃখ ভোগ, আশঙ্কা ও উদ্বিগ্নতার কারণ ঘটবে কিন্তু সাংঘাতিক কিছু ঘটনা দেখা যায় না। যে সব নারী রঙ্গমঞ্চ ও পর্দ্দায় অভিনয় করে তাদের পক্ষে উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়, কোর্ট সিপ প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। পারিবারিক সামাজিক ও বৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে আনন্দ লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি উত্তম।

বৃষরাশি

রোহিণী জাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়। কৃত্তিকা ও মৃগশিরা জাতগণের পক্ষে বিশেষ লাভ হবে না, অল্প-বিস্তর কষ্ট-ভোগ আছে। এ মাসে নীরোগ, মোটামুটি সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা বিলাসিতা জনপ্রিয়তা গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আমোদপ্রমোদজনক ভ্রমণ, প্রীতিমুগ্ধ বন্ধুদের আবির্ভাব এবং তাদের সহযোগিতা লাভ। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধই ভালো যাবে। প্রতিদ্বন্দ্বীও শত্রুদের কাছ থেকে কিছু কিছু কষ্ট ভোগ, সামান্য ভাবে শারীরিক কষ্ট ভোগ, দুঃখ ও স্বজন বিচ্ছেদ। স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। নিজের ও সন্তানাদির শরীর খারাপ হতে পারে মাসের প্রথমার্দ্ধে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে পারিবারিক অশান্তি ঘটতে পারে। গৃহে নবজাতকের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা বাইরের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে ভ্রমণের সম্ভাবনা। নানা দিক দিয়ে অর্থ আসবে। আয়বৃদ্ধি অনিবার্য্য, খাদ্য দ্রব্যপ্রস্তুতকারক যাদের অধীনে বহুকর্ম্মী নিযুক্ত, বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করবে। স্পেকুলেশনে বিশেষতঃ ষ্টক এক্‌সচেঞ্জের ব্যাপারে মাসের শেষার্দ্ধে অর্থাগম হবে। বাড়ীওয়ালা ভূমাধিকারীর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। চাকুরিজীবিরাও বিশেষ উত্তম ফললাভ করবে। প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষায় বা পদ প্রার্থী হয়ে নিয়োগকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে সাফল্য। বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতি, উপরওয়ালার নিকট প্রশংসা অর্জ্জন, নূতন পদমর্য্যাদা লাভ প্রভৃতি লক্ষ্যকরা যায়। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বেকার ব্যক্তি কর্মলাভ করবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম মাস। অবৈধপ্রণয়ে আশাতীত সাফল্য ও নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে পারিবারিক, সামাজিক, প্রণয় ও চাকুরির ক্ষেত্রে নারীর মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। পুরুষের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও অন্তরের বিনিময় হেতু প্রচুর আনন্দ লাভ। আহার বিহারে আমোদ প্রমোদে ভ্রমণে দিনগুলি উপভোগ্য হয়েও উঠবে। তাছাড়া মঞ্চ ও পর্দ্দায়, যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে অভিনয়ে যে সব নারী যোগদান করে থাকে তাদের সাফল্য ও প্রশংসা অর্জ্জন হতে পারে। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী পরিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি অশুভ নয়।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম, মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম এবং আর্দ্রার পক্ষে শেষার্দ্ধটি অধম। বিলাসব্যসন লাভ, আমোদপ্রমোদ, সাফল্য, বন্ধুর সাহায্য প্রাপ্তি, সুসংবাদ লাভ এবং আনন্দ জনক ভ্রমণ প্রভৃতি যোগ আছে। তাছাড়া গ্রহবিরুদ্ধতার জন্যে কিছু অশুভফলও ঘটবে—যেমন কলহ বিবাদ, দুঃখ, কর্ম্মে বাধা, নানাপ্রকার আশঙ্কা, শত্রুবৃদ্ধি, ক্ষতি উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি ক্লান্তিকর ভ্রমণ, সামান্য দুর্ঘটনা ইত্যাদি যোগ আছে। শরীর একটু ভেঙ্গে পড়লেও বিশেষ পীড়া হবেনা। পারিবারিক অশান্তি অর্ন্তবস্তুর হলেও মারাত্মক কিছু ঘটবেনা। আর্থিক অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনেকখানি ভালো অবস্থা আশা করা যায়। অর্থোপার্জ্জনে বেশ উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করতে হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। সম্পত্তিসংক্রান্ত গোলযোগ। যে কোন কার্য্যে বাধা ও অসাফল্যের আশঙ্কা। রেসে পরাজয়। টাকা কড়ি লেন দেন ব্যাপারের পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। ভাড়া আদায়ের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না। চাকুরির ক্ষেত্রের নানা অশান্তি ভোগ। উপরওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও হবে না। মার্চ্চেন্ট অফিসের কর্ম্মচারীর পক্ষে অশুভ সময়। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করবেনা। হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন আয়। সুতরাং কোনপ্রকার প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তৃতি ঘটবে বন্ধুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পর পুরুষের সহিত আচার আচরণে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। অবৈধ প্রণয়ে কোর্ট সিপে বা প্রণয়ের প্রস্তাবনায় ব্যর্থতা ও বিপত্তির আশঙ্কা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভ। ভ্রমণে আনন্দ লাভ। পরিক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে উত্তম। অশ্লেষা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। পুষ্যার পক্ষে অধম। উত্তম স্বাস্থ্য সাফল্য উত্তম বন্ধুত্ব, উত্তম পদমর্য্যাদা লাভ, সুখ সৌভাগ্য, নূতনবিষয় অধ্যয়ন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রুজয় প্রভৃতিযোগ আছে। শেষার্দ্ধে কিছুটা খারাপ হবে। বন্ধু ও স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য, কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বাধা বিঘ্ন, অর্থের টান, মনস্তাপ ইত্যাদি ঘটতে পারে। উল্লেখযোগ্য পীড়া না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটবে। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যতিক্রম ঘটবে না। অনুগত ব্যক্তিরা আদর আপ্যায়ন করবে। অর্থের প্রাচুর্য্য হবে, স্বোপার্জ্জিত বিত্ত লাভ, অর্থোপার্জ্জনে বন্ধুরা সংসদ পরিষদ অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করবে। মঞ্চ ও পর্দ্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষভাবে অর্থোপার্জ্জন করবে। চোরা কারবারে ঝোঁক হবে কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হবে না। স্পেকুলেশনে লাভ ও লোকসান দুই-ই ঘটবে। অস্থাবর সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময় ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা আবশ্যক। এমাসে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হবে, মামলামোকদ্দমা সুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জমি, খনি ও বিষয় সম্পত্তির দালালরা লাভবান হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম। পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি ও পদোন্নতি যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম লাভ এবং অস্থায়ী কর্ম্মীর স্থায়ীপদে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম সময়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছুটা অসুবিধা দেখা যায়। রেসে অর্থ লাভ।

কর্ম্মী মহিলাদের পক্ষে উত্তম সময়। বিশেষতঃ যে সব নারী সঙ্গীত কলাবিদ্যা বা অভিনয়ে পটু, সমাজকল্যাণকর কর্ম্মে নিযুক্ত তারা সাফল্য লাভ করবে। বস্ত্রালঙ্কার, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। ভ্রমণের পক্ষে উত্তম সুযোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। মঘা ও উত্তরফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত শুভ। উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী জয়, উত্তম বন্ধু লাভ, বিলাসিতার ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্মান, বিদ্যার্জ্জনে উন্নতি, লাভজনক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ ও সিদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি যোগ আছে। কিছু ক্ষতি, আর্থিক কষ্ট, কলহ, স্বজনের শত্রুতা, প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ের জন্য বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে একাধিকবার ভ্রমণ এবং তাতে সাফল্য লাভ, বিশেষ কোন গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নেই, বরং পূর্ব্ব থেকে যে সব অসুখে ভুগছে সেগুলি দূর হয়ে যাবে। বহুদিনের রোগ নিরাময় করবার পক্ষে এই মাসের চিকিৎসায় আশু ফলপ্রদ। পারিবারিক অবস্থা ভালো, উত্তম পোষাক, অলঙ্কার, সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য বিলাসব্যসনের বস্তু

লাভ। গৃহে নবজাত সন্তানের আবির্ভাব। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অবস্থা অনুকূল কিন্তু পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা তা সম্ভব হবে। গভর্ণমেণ্ট কাজে, অস্থায়ী পদে (যেমন রিসিভার, কমিশনার অথবা এজেণ্ট হিসেবে), ব্যবসার সম্পর্কে ভ্রমণের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা সাহায্য করবে। রেসে জয় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূস্বামী ও কৃষিজীবির পক্ষে সময়টা সন্তোষ জনক। চাকুরিজীবিদেরও সময় ভালো যাবে, মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পদোন্নতি ও মর্য্যাদা লাভ। উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হওয়ার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং প্রসারতা লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী বিশেষ উপভোগ্য। সর্ব্বকার্যে সিদ্ধি। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সমাদর লাভ। শিল্প সঙ্গীত চারুকলায় পারদর্শী নারীরা খ্যাতি অর্জ্জন করবে। মঞ্চ ও পর্দায়, সঙ্গীত অনুষ্ঠানে, আকাশবাণীর বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে প্রশংসা লাভ হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কন্যা রাশি

হস্তাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়, উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে মধ্যম, চিত্রার পক্ষে অধম সময়। মাসের শেষার্দ্ধে বিশেষ শুভ সময়। মাসটী মিশ্রফলপ্রদ। সাধারণ সাফল্য, শত্রুজয়, বিলাসিতা, সৌভাগ্য বৃদ্ধি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, এবং সর্ব্বপ্রকারে আমোদ প্রমোদ। গ্রহ বৈগুণ্যহেতু ব্যয় বৃদ্ধি, ক্ষতি, মামলা মোকর্দ্দমা, অহেতুক অপবাদ প্রভৃতি যোগ আছে। সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভালো যাবে। যার রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগ, উদর, হৃদরোগ, হাঁপানি, চক্ষুপীড়া প্রভৃতিতে বহুদিন ভুগছে তাদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ যোগ আছে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। মাসটি আর্থিক উন্নতির পক্ষে পরিপন্থী নয় তবে প্রথমে প্রাপ্তিযোগে কিছু বাধা বিলম্ব ঘটতে পারে। লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, কাষ্ঠ, কৃষি কর্ম্মে ব্যাপৃত ব্যক্তিরা, কমিশন এজেণ্টগণ প্রভৃতি লাভবান হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে সমভাবে সময় অতিবাহিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা লাভবান হবে। স্ত্রীলোকেরা রোমান্স ও এড্‌ভেঞ্চারের দিকে এগিয়ে যাবে। বাইরের আমোদপ্রমোদে, ভ্রমণে, পার্টিতে ও পিকনিকে বেশী আনন্দ পাবে। পরপুরুষের সংস্পর্শে তরুণীদের আসা এমাসে অনুচিত। বরং গার্হস্থ্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

তুলা রাশি

বিশাখা জাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম আর স্বাতীজাত গণের পক্ষে অধম। নানাপ্রকার ভয়, দুঃখ, মর্য্যাদা হানি, কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বাধা, ব্যর্থভ্রমণ, স্বজনবিরোধ, অর্থক্ষতি, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি। বন্ধুদের সাহায্য লাভ, চাকুরী প্রার্থী হয়ে দেখাসাক্ষাৎ করলে সাফল্য, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ। জ্বর, উদর ও বাত-পীড়া, রক্তের চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি হোতে পারে। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে, স্বজনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে কলহ-বিবাদ। মাসের শেষার্দ্ধে আর্থিকোন্নতি ও সৌভাগ্য লাভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকর্দ্দমা। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। কৃষিজীবীর পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে নানাপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ভালো ফল লাভ হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটি ভালো নয়। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থার কোন ভালোমন্দ পরিবর্ত্তন হবে না। রেসে পরাজয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধে বিশেষ ভালো যাবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা। পরকীয়প্রেমে আসক্তি, অবৈধ প্রণয়ে সন্তোষ লাভ। জনপ্রিয়তা অর্জন। অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্পর্কে কথাবার্তা চলবে আসবাবপত্র সাজসজ্জা ক্রয়ে বাহুল্য যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর ফল মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা জাত ব্যক্তিদের পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, অনুরাধাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অধম। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ ভালো। সাধারণতঃ লাভ, কর্ম্মে সফলতা সুখ, প্রতাপ প্রতিপত্তি প্রভৃতি শুভ ফল। কলহ, মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়, অর্থক্ষতি, স্বজন বিয়োগ ইত্যাদি ও আশঙ্কা আছে। শারীরিক দুর্ব্বলতা, বিশেষ পীড়ার আশঙ্কা নাই, চক্ষুপীড়া ও পিত্ত প্রকোপ সম্ভব। পারিবারিক অবস্থা এক ভাবেই যাবে। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য নিকটতম আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তিতে মানসিক আঘাত প্রাপ্তি। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে না। লাভ ও ক্ষতি দুইই ঘটবে। গ্রন্থ প্রকাশক ভ্রাম্যমান প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠানের অংশীদার প্রভৃতির পক্ষে শুভ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মিশ্রফল। মাসটী বিষয় সম্পত্তিতে অর্থ নিয়োগ বা বিষয় সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। চাকুরির ক্ষেত্র একভাবেই যাবে। যাদের দশা দুর্দ্দশায় বিশেষ গ্রহ বৈগুণ্য বোধ আছে তাদের পক্ষে পদমর্য্যাদা হানি, পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির সময়টা ভালো বলা যায় না। মহিলাদের পক্ষে মাসটী অনুকূল। এদের কর্ম্মোন্নতির যোগ আছে। অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রসঙ্গ উপস্থিত হবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে। শিল্পকলা নৃত্য সঙ্গীতে যাদের পারদর্শিতা আছে তারাও খ্যাতি অর্জ্জন করবে। অবৈধ প্রণয়েও সাফল্য। ভ্রমণের যোগ আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুভফল প্রাপ্তি। মূলা অথবা উত্তরাষাঢ়ায় জাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। মাসটি সবার পক্ষেই ভালো যাবে। সাফল্য লাভ, শত্রুজয়, সুখ ও সৌভাগ্য লাভ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি প্রচেষ্টায় সাফল্য, উত্তম স্বাস্থ্য, সম্মান, জন প্রিয়তা, নূতন বিষয় অধ্যয়ন জনিত জ্ঞানার্জ্জন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বজন বন্ধু বর্গের সামান্য কলহাদি যোগ। স্বাস্থ্য উত্তম থাকবে। পুরাতন ব্যাধিমুক্ত হবারও যোগ আছে। এই মাসে কোন প্রকার জটিল ব্যাধির চিকিৎসা আরম্ভ করলে আরোগ্য লাভ সুনিশ্চিত। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা ও সুন্দর পরিবেশ। গৃহে বিলাসিতার দ্রব্যাদির আমদানি হবে। নবজাত সন্তানের আবির্ভাব। মাসাধিক ক্ষেত্রে নূতন বন্ধুলাভ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা উৎসবের সম্ভাবনা। বিশেষ আর্থিক উন্নতির যোগ, মোটরকার ক্রয় সম্ভাবনা, সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনায় সাফল্য ও উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ। উৎসাহ অধ্যবসায় ও চিত্তের প্রসন্নতা বৃদ্ধি। রেসে জয়লাভ। স্পেকুলেশনেও কিছু সাফল্য। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে অতীব উত্তম সময়। গৃহাদি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ। চাকুরিজীবিরা আশাতীত শুভফল পাবে। পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি, পদোন্নতি, কর্ম্মদক্ষতা এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বিস্তৃতি ঘটবে। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে অতীব উত্তম সময়। অর্থের প্রাচুর্য্য ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম মাস। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ এবং বস্ত্রালঙ্কার

ও নানা উপঢৌকন প্রাপ্তি। অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধি। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমাদর লাভ। বন্ধু ও আত্মীয় কুটুম্বের সান্নিধ্য লাভ। অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রসঙ্গ। ভ্রমণ, পিকনিক ও পার্টিতে সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মকর রাশি

শ্রবণা জাত গণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম সময়। উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভালো। উত্তরোত্তর সাফল্য আশা আকাঙ্খার পূরণ, লাভ, উত্তম সঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভ, শত্রুজয়, সৌভাগ্য সুখ ধনাগম, বিলাসিতা বৃদ্ধি, জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি শুভ ফল। দূরভ্রমণ, স্বজনদের জন্য কষ্ট ভোগ, ক্ষতি, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ বাধা, বহুকার্য্যে ব্যর্থতা, মনস্তাপ ও অপমান ইত্যাদি গ্রহ বৈগুণ্য জনিত অশুভ ফল। কিন্তু ভালো বা মন্দ ফলাফলগুলি পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। সাংঘাতিক রকমের পীড়াদির ভয় নেই, সাধারণ শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকবে। দুর্ঘটনার বিশেষ আশঙ্কা আছে, যেখানে লোকের ভিড় সেখানে না যাওয়াই ভালো। পারিবারিক অবস্থা এক ভাবেই যাবে, কোন প্রকার অশান্তির কারণ ঘটবেনা। শুভ ঘটনায় যোগ আছে। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। অর্থ এলেও দাঁড়াবে না। অপ্রত্যাশিতভাবে অপরিমিত ব্যয় ঘটবে। শত্রুদের উপদ্রব প্রথমার্দ্ধেই বেশী, তাও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে। চুরি ডাকাতি পর্য্যন্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে সন্তোষজনক অবস্থা। চাকুরি জীবিদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। পদোন্নতিলাভ অনুগ্রহ প্রাপ্তি, সম্মান লাভ। মিউনিসিপ্যালটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের পক্ষে উত্তম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা আশাপ্রদ ফললাভ করবে। রেসে জয়লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ ও শান্তিপূর্ণ। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সঙ্গীতনৃত্য কলাভিনয় কুশলী নারীর বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন ও অর্থলাভ। সামাজিক কর্ম্মেলিপ্তা নারীর উত্তম সুযোগ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুফল লাভ। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সুযোগ ও সুখসুবিধা। কোর্টসিপেও সফলতা। যে সব নারী বেকার তাদের চাকুরি লাভ ও অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হবে। অর্থের দ্বারা পরিবার বর্গের ভরণ পোষণে সাহায্য করতে পারবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের উত্তম সময়।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ জাত ব্যক্তিদের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম এবং শতভিষার পক্ষে অধম সময়। মাসটী সকলের পক্ষেই মিশ্রফল দাতা। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, বন্ধু ও স্বজন বিরোধ, স্ত্রী ও সন্তানাদির পীড়া, মর্য্যাদাহানি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অর্থক্ষতি, কর্ম্মে বিলম্ব ও বাধা, মিথ্যা অপবাদ ও অহেতুক সন্দিগ্ধতা প্রভৃতি গ্রহ বৈগুণ্য জনিত কুফল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ, উত্তম স্বাস্থ্য, প্রীতিভাজন বন্ধু সমাগম এবং সর্ব্বপ্রকারে সৌভাগ্যবৃদ্ধি। শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হেতু কষ্টভোগ। রক্তের চাপবৃদ্ধি। সাধারণভাবে শারীরিক দুর্ব্বলতা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তি। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য মধ্যে মধ্যে বিবাদ হোলেও সাংঘাতিক কিছু ঘটবেনা। শেষার্দ্ধ সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপ্রদ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষ জনক নয়। অর্থাগমের পথ কিছুটা রুদ্ধ হবে। অপরিমিত ব্যয় অর্থনৈতিক সঙ্কট এনে দেবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। বিষয় সম্পত্তির গোলযোগ। কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী শুভ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালা পক্ষে উত্তম বলা যায় না। সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়াদি লাভ জনক হবেনা চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটী শুভপ্রদ নয়। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মোটামুটি মন্দ যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। কোন প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। অবৈধপ্রণয়, পরপুরুষের সান্নিধ্য, পিকনিক; পার্টি প্রভৃতিতে যোগদানে অশুভ ফলের আশঙ্কা আছে। গার্হস্থালী ব্যাপারে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করাই ভালো। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ বলা যায় না।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রজাত গণের পক্ষে উত্তম। রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত গণের পক্ষে মধ্যম এবং উত্তর ভাদ্রপদ জাত গণের পক্ষে অধম। লাভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জনপ্রিয়তা সম্মান, বিলাসব্যসন প্রভৃতি যোগ আছে। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শারীরিক কষ্ট, কলহ, উদ্বিগ্নতা অসম্মান দুর্ঘটনা মামলা মোকর্দ্দমা, নারীর নিকট নিগ্রহভোগ তজ্জনিত দুঃখকষ্ট, অশান্তি ও অপবাদ। গুহ্য, উদর, মূত্রাশয় প্রভৃতি স্থানে পীড়াদির আশঙ্কা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। মন ভেঙে পড়বে, সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নতা। ঘরে বাইরে কলহ বিবাদ ও মত দ্বৈধতা হেতু অশান্তির সৃষ্টি। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা, নব জাতকের আবির্ভাব প্রভৃতি যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা খুব সন্তোষ জনক। কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি এমনকি আর্থিক ক্ষতি ঘটবে। কোন ব্যয়সাপেক্ষ কর্ম্মে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে এ বিষয়ে ভেবে তবে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। টাকা লেন দেন ব্যাপারের হিসাব নিকাশ উত্তমরূপে দেখে নেওয়া দরকার। উত্তরাধিকার সূত্রে বা অপরের দানের আনুকূল্যে কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে জটিল অবস্থা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। চাকুরির স্থান ভালোই বলা যায়। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপর ওয়ালার সঙ্গে আচরণের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বেকার ব্যক্তিদের চাকুরি হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শ্রীবৃদ্ধি লাভ। রেসে জয়লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাঝামাঝি সময়। কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে মধ্য পথ অবলম্বন করলে সব বিষয়েই সিদ্ধিলাভ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ সম্ভাবনা। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ। অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্জ্জনীয়, শরীর ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা, সংযমের আবশ্যক। যৌনোদ্দীপনা বৃদ্ধি পেলেও সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এমাসে যৌন উত্তেজনা বেশী হবার সম্ভাবনা আছে। পরপুরুষের সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, ক্রোধবৃদ্ধি পাবে, এটা দমন না করলে মস্তিষ্কের পীড়ার আশঙ্কা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

সর্ব্বত্র সাফল্য, উত্তম বৃদ্ধি, প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ ও ঝঞ্ঝাট, রেসে জয়লাভ, ধনাগম বিলাসিতার দ্রব্যাদি ক্রয়, স্ত্রীজনিত অশান্তি, বান্ধবীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়, মুরুব্বির সাহায্যে আর্থিক উন্নতি, স্ত্রীলোকের জন্য ব্যয়, কর্ম্মচারীর জন্য ঝঞ্ঝাট, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ শিরঃ, পীড়া বা চক্ষু রোগের প্রবণতা, চিঠিপত্রের ব্যাপার বা লেখা পড়ায়

ব্যাপার নিয়ে অশান্তি. স্ত্রীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যোগ। ভ্রমণ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, কর্ম্মের ব্যাপারে অকস্মাৎ ক্ষতি, কর্ম্মের সংস্রবে শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন

সুযোগ হানি, ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য অশান্তি, স্বজন বিরোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ, লেখা পড়ার ব্যাপারে বাধা বিঘ্ন, গৃহে উৎসবাদি, পারিবারিক শান্তি. প্রতিবেশীদের সঙ্গে হৃদ্যতা। স্ত্রীলোকের গর্ভে বা মূত্রাশয়ে পীড়া সন্তান হানি, যৌন প্রেমের ব্যাপারে মনোকষ্ট বা বিবাদ বিসংবাদ, সন্তানের পীড়া মামলা মোকর্দ্দমা, প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে অপবাদ। আয়বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুনলগ্ন

সুযোগ প্রাপ্তি, ব্যয় বাহুল্য, পত্নীর পীড়া, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ, কর্ম্মোন্নতি. ভ্রমণ, সন্তানের ব্যাপারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত রোমান্টিক ঘটনা, শারীরিক অস্বাস্থ্য. উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যের তরফ থেকে দুঃখ, অংশীর বিপদের জন্যে নিজের ক্ষতি স্বীকার, মামলা মোকদ্দমা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

কর্কটলগ্ন

আর্থিক ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট ও বিশৃঙ্খলা, কর্ম্মে দ্রুত অগ্রগমন, ভ্রমণে আনন্দ ও আর্থিক লাভ, আত্মীয়ের দ্বারা লাভবান, নতুন ধরণের কাজে অর্থাগম, সংসদ পরিষদের সংস্রবে অর্থপ্রাপ্তি, শিরঃপীড়া, বিদ্যার্জ্জন শত্রুবৃদ্ধি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহলগ্ন

আকস্মিকভাবে আঘাত প্রাপ্তি। ভাগ্য ও পুরুষকার উভয়ই অনুকূল। ঋণগ্রস্ত হওয়ার যোগ। পড়া শুনায় অমনোযোগিতা। পিতার স্বাস্থ্য ভালো। দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতি, আত্মকেন্দ্রিকতার বৃদ্ধি, অবৈধ প্রণয়ে ঝোঁক। আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা, অধম ফল।

কন্যালগ্ন

ব্যবসায়ে উন্নতি, ইষ্টসিদ্ধি, জয়ের প্রবণতা, বেহিসাবী খরচ যন্ত্র শিল্প থেকে বিশেষ অর্থাগম, হাতের কাজ, এজেন্সি, কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি কাজে লাভ, ঘাড়ে কতকগুলি দায়িত্ব বহন। দাম্পত্য প্রণয় যোগ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, কপট মিত্রের সমাগম, আয় বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

তুলা লগ্ন

শারীরিক অসুস্থতার অনুভব, সহোদর হানি বা বিচ্ছেদ। গুরুজন বিয়োগ, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে খ্যাতি, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তি। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অধিক উন্নতি, বিবাহাদির প্রসঙ্গ, ধনাগম যোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন—

বাত বেদনা, নানারকম ব্যয় বাহুল্য, পত্নী সুখ, দাম্পত্য প্রণয় অটুট, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার, দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে বেশ উপার্জ্জন, পাকযন্ত্রের পীড়া, ভাগ্যোন্নতির যোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে অপবাদ বৃদ্ধি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

ধনুলগ্ন—

অধ্যবসায় বৃদ্ধি ও অনায়াস ইষ্টসিদ্ধি, দেহভাবে ক্ষতির আশঙ্কা, আকস্মিক আঘাত, ধনাগমযোগ, সহোদরের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে মতানৈক্য, অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ আলোচনা, বন্ধুর জন্য বিশৃঙ্খলতা, জামাতা ও পুত্রবধূর জন্য অপ্রত্যাশিত গণ্ডগোল, উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি. স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকরলগ্ন—

মানসিক দ্বন্দ্বভাবের মধ্যেও সুযোগের সন্ধানে অগ্রসর, শারীরিক অশান্তি, সম্বন্ধ লাভ, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তীর্থ পর্য্যটনে ব্যয়বাহুল্য, সহোদরের সহিত অসদ্ভাব, ভাগ্যোন্নতির পট প্রশস্ত, বিবাদপূর্ণ মনোভাব, আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কুম্ভলগ্ন—

ঘন পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিব্রত অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, বিদ্যালাভে উন্নতি, বন্ধু বান্ধবের চেষ্টায় চাকুরি ও পদোন্নতি, পত্নীর শারীরিক অশান্তি যোগ, ভাগ্য বা ধর্ম্মভাবের যোগ প্রবল নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ নয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মীনলগ্ন—

দেহভাব শুভ, বাতবেদনা, দাঁতের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, সহোদর ভাব শুভ, ব্যয়াধিক্য, সন্তানের দেহপীড়ার যোগ প্রতীয়মান হয়, ভাগ্যোন্নতি যোগ, অর্থাগম, ধনবৃদ্ধি, সুন্দর সামাজিক পরিবেশে আনন্দ লাভ, বিদ্যাস্থানে শুভ, সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

=শৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চ প্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲ কাশীনাথ ২৲

বিন্দুর ছেলে ১-৫০

রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ২-৫০, প্রফুল্ল ২-৫০, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ২৲, নল-দময়ন্তী ১-৫০, বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ২-৭৫

অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

মহানিশা ২-৫০

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুল্লরা ২৲,
সুদামা ১-২৫, অপ্সরা ০-৩৭

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

মিটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গী ২-৫০, পথের শেষে ২-৫০,
দেবলাদেবী ২-৫০,
ললিতাদিত্য ২৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

মানময়ী গার্লস্ স্কুল ১-৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

আলিবাবা ১৲, নর-নারায়ণ ২-৭৫
প্রতাপ-আদিত্য ২-৭৫
আলমগীর ২-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

রাণাপ্রতাপ ২-৫০, দুর্গাদাস ২-৫০,
সাজাহান ২-৫০, মেবারপতন ২-৫০,
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲,
সোরাব-রুস্তম ১-২৫, পুনর্জ্জন্ম ০-৬২,
চন্দ্রগুপ্ত ২-৫০, বিরহ ০-৫০,
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, নূরজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২৲
ভূপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫

কানাই বসু প্রণীত

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, ঝান্সীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲,
চাঁদসদাগর ২৲, খনা ২৲,
জীবনটাই নাটক ২·৫০,
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া
(একত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্ম্মঘট, পথে বিপথে, চাষার
প্রেম, আজব দেশ একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ৫৲ নবএকাঙ্ক ৩৲
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ
পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—
দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫০
ছোটদের একাঙ্কিকা ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ২৲, পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন্দ-[illegible] ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভুল ১৲

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৬৯

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

DF/K 4

পূজার আনন্দ উৎসবে
উজ্জ্বলতর আলোর
জন্য
Calcutta
CALCUTTA ELECTRIC LAMP WORKS LIMITED. CALCUTTA-1

দি ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিঃ

মিলস্ঃ
আহমেদপুর, বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ

রেজিঃ অফিস,
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১৩

উল্লেখযোগ্য তথ্য

১। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ

	প্রতিশ্রুত মূলধন	আদায়ীকৃত মূলধন
(১) ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রথমবর্ষ অন্তে	৫'৮৯ লক্ষ টাকা	২.৮৮ লক্ষ টাকা
(২) ১৯৬২ সালের ৩১মে পর্যন্ত	৩৩'৯১ " "	৩১'৪৫ " "

২। কোম্পানীর স্থাবর সম্পত্তি সমূহের মূল্য

(১) ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত	৪'৫৮ লক্ষ টাকা
(২) ১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	৩১'৪৫ " "

৩। উৎপন্ন চিনির পরিমাণ

১৯৬০-৬১	সালে	৭৮৮২৩ মণ
১৯৬১-৬২	"	১,০৩,৬১৮ "
১৯৬২-৬৩	" আনুমানিক পরিমাণ	১,৫০,০০০ "

ইক্ষু আমদানীর সময়ে প্রথম দুইটি ঋতুতে মিল কর্তৃক ইক্ষু ক্রয়ের জন্য ইক্ষুচাষীগণ উপকৃত হইয়াছে	৩০'০০ লক্ষ টাকা
আজ পর্যন্ত উৎপন্ন চিনির মূল্য	৭৫'০০ লক্ষ টাকা
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বিভাগের ও রেল মাশুলের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব তহবিলে মিল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	৪'৪৭ লক্ষ টাকা

কলিকাতা।
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

এম, এম, মিত্র
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার
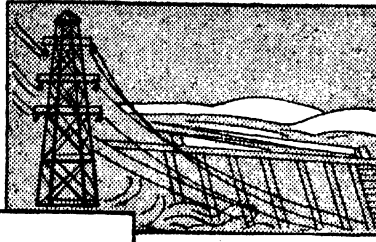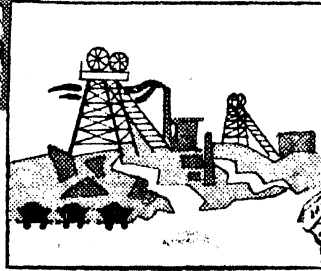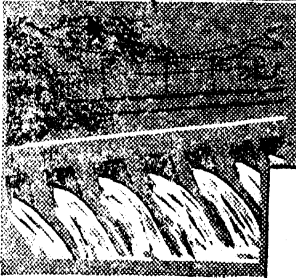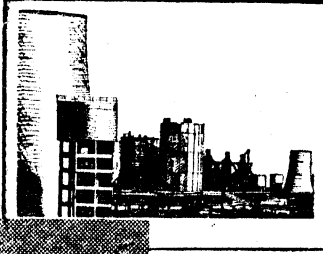
পুণ্য উৎসব দিন নন্দনের
এনেছে সংবাদ
আজকে এই বহু প্রতীক্ষিত দিন আগের চেয়ে
অনেক বেশী আনন্দের বার্তা বহন করে
এনেছে, কারণ এর আগে
কখনো এই মহান উৎসব
দেশের এমন বৈপ্লবিক উন্নয়নের
পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত হয় নি।
দেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৃহত্তম
সংস্থা রেলপথ সর্বশক্তি নিয়োগ করে জাতির
অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় ও স্বনির্ভরশীল
করে তোলার প্রয়াসে নিরত রয়েছে।
তা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ও
তাদের ভাবসম্পদের আদান প্রদানের মাধ্যমে
জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতিকে ত্বরান্বিত করাতেও
রেলপথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
IPB/SE/9-62

মহিষাসুরমর্দিনী

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি-শাড়ী আর নানারকম বস্ত্রসম্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি নানারকম নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের ক্রমবর্দ্ধন চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
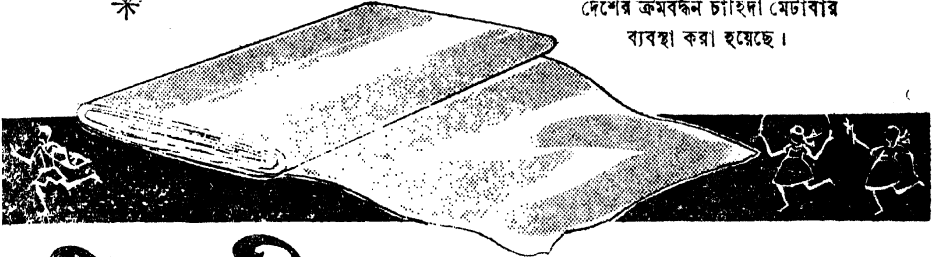
কটন মিলস্ লিমিটেড্

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

বঙ্গলক্ষ্মীর গায়ে মাখা সাবান

নীম

পাইলট

গ্লিসারিণ

সুচন্দন

ব্যবহারে আনন্দ ও লাভ দুইই পাবেন

বাঙলার বঙ্গলক্ষ্মীর সাবান—

অতুলনীয়।

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ

৭ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

আশীর্বাণী

চিরদিনের আনন্দ হও—
সুখী হোক তোমায় দেখে,
শত শরত আসুক ও যাক,
পদে কমল দল রেখে।
ভক্ত জনের আশীষ লভ—
গুণী জনের হও প্রিয়,
সমৃদ্ধ হও দেহে মনে—
জগজ্জনের আত্মীয়।

কোগ্রাম
১৪।৫।৬৯

MANMATHA RAY

229C, Vivekananda Road
Calcutta-6

"ভারতবর্ষ" অপরিচিত আমাকে বাংলার সাহিত্য জগতে পরিচিত করিয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৩৩২-এর শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে আমার একাঙ্ক নাটক "রাজপুরী" প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমার কত একাঙ্কিকাই না ঠাঁই পাইয়াছে এই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজ আমি শুধু আনন্দিত নই, গৌরবান্বিত। ভারতবর্ষের জয় হোক। এ জয়ে সাহিত্যের জয়।

আশীর্ব্বাণী

চিরদিনের আনন্দ হও—
সুখী হোক তোমায় দেখে,
শত শরত আসুক ও যাক,
পদে কমল দল রেখে।
ভক্ত জনের আশীষ লভ—
গুণী জনের হও প্রিয়,
সমৃদ্ধ হও দেহে মনে—
জগজ্জনের আত্মীয়।

কোগ্রাম
১৪।৫।৬৯

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

MANMATHA RAY

229C, Vivekananda Road
Calcutta-6

"ভারতবর্ষ" অপরিচিত আমাকে বাংলার সাহিত্য জগতে পরিচিত করিয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৩৩২-এর শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে আমার একাঙ্ক নাটক "রাজপুরী" প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমার কত একাঙ্কিকাই না ঠাঁই পাইয়াছে এই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজ আমি শুধু আনন্দিত নই, গৌরবান্বিত। ভারতবর্ষের জয় হোক। এ জয়ে সাহিত্যের জয়।

পঞ্চাশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের সেবা করে আসছি। ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। আমার যেটুকু প্রতিষ্ঠা হয়েছে সাহিত্যিক বলে, তার জন্য আমি ভারতবর্ষের কাছে প্রধানতঃ ঋণী। এই ভারতবর্ষ আজ অর্ধশতাব্দী কাল দেশের সেবা করে আসছে—আজ এই ভারতবর্ষের অর্ধশতকীয় উৎসবে আমি আমার শুভবাসনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

সন্ধ্যারকুলায়
কলিকাতা—৩৩

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

MAYOR OF CALCUTTA

জুলাই ১১, ১৯৬২

পঞ্চাশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'ভারতবর্ষ'কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করছি যে, এই পত্রিকার ভিত্তি-সংস্থাপনে মহামতি দ্বিজেন্দ্রলালের পুণ্যস্পর্শের সংযোগ ঘটেছিল। ব্রহ্মদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি যে অফুরাণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাঙালী সাহিত্য-রসিকদের চিত্তভূমিকে সিঞ্চিত করেছিল, তার প্রধান বাহন ছিল 'ভারতবর্ষ'। বঙ্গভারতীর রসভাণ্ডারটিকে 'ভারতবর্ষ' অদ্যাপি অশেষ করে রেখেছে, এই কথাটি পরম গৌরবের। 'ভারতবর্ষের' দীর্ঘ জীবনের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর চিত্ত চিরকল্যাণমণ্ডিত হোক, এই কামনা করি।
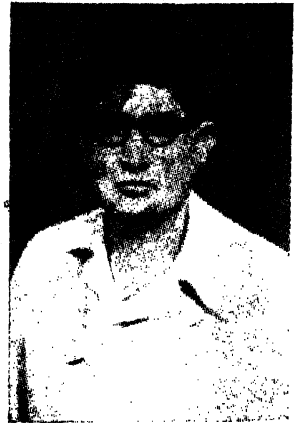
মেয়র
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান
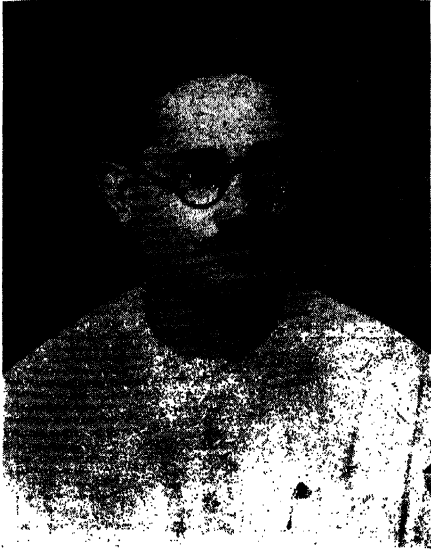
Dr. SHASHI BHUSAN DAS GUPTA, M. A. Ph. D.
Ramtanu Lahiri Professor & Head of the
Department of Modern Indian Languages,
University of Calcutta.
Phone No. 46-7307
101/3: B, Charu Avenue,
Calcutta—33.
Date......16-8-62

'ভারতবর্ষ' পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে এ তথ্যটি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই একটি মূল্যবান্ তথ্য। এই দীর্ঘ দিনের সাধনায় 'ভারতবর্ষ' বাঙ্গলা সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির মানকে উন্নত করিয়াছে, বিচিত্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই অর্ধশতাব্দী কাল যে-সকল লেখক এই মাসিক পত্রিকাটির সহিত যুক্ত ছিলেন এবং আছেন তাঁহাদের ইতিহাস আমাদের সাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাস। আজ জানাই এই পত্রিকার পরিচালকবর্গ এবং লেখকবর্গকে আমার শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন। 'ভারতবর্ষে'র সাধনা অতন্দ্র হোক, কল্যাণকর হোক এবং দীর্ঘস্থায়ী হোক।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

DR. TRIGUNA SEN
Rector

JADAVPUR UNIVERSITY
CALCUTTA-32
১৭ই আগষ্ট, ১৯৬২

বাংলা মাসিক পত্রিকা "ভারতবর্ষ" পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে শুনিয়া খুবই খুশী হইয়াছি। যে স্বদেশানুরাগ ও সাহিত্য সেবার আদর্শ নিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দীর্ঘ অৰ্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তাহা অক্ষুন্ন রাখিয়া "ভারতবর্ষ" উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে চলিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়। শুভ সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষে "ভারতবর্ষ"কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার অমূল্য অবদান যেন চিরদিন অম্লান থাকে ইহাই কামনা করি।

CHIEF JUSTICE
HIGH COURT
CALCUTTA.

প্রিয় শৈলেনবাবু,

আপনার চিঠিতে "ভারতবর্ষের" সুবর্ণ জয়ন্তীর সংবাদ পেলুম। আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক নয় বটে, কিন্তু যখন মাঝে মাঝে এই পত্রিকাতে মনোনিবেশ করবার সুযোগ পাই তখন নিজেকে এক অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে হারিয়ে ফেলি আর অনুভব করি যে কত উন্নতশ্রেণীর এই পত্রিকা। যাঁদের সুদক্ষ পরিচালনায় এই পত্রিকা অৰ্দ্ধশতাব্দীর উপর এর আভিজাত্য ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে সাহিত্যানুরাগী জনগণের অত্যন্ত সমাদরের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকে এই পত্রিকার পাঠক পাঠিকাদের আন্তরিক ধন্যবাদের ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র। শত শত বৎসর ধরে যেন এই পত্রিকা এর গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে দেশবাসীয় সাহিত্য সাধনায় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে, এই কামনাই আমি তার সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরে সর্বান্তঃকরণে করছি। আর আপনি এই পত্রিকার সম্পাদক-রূপে যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করেছেন তার জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৭ই আগষ্ট, ১৯৬২

হিমাংশু কুমার বসু
প্রধান বিচারপতি-
কলিকাতা হাইকোর্ট
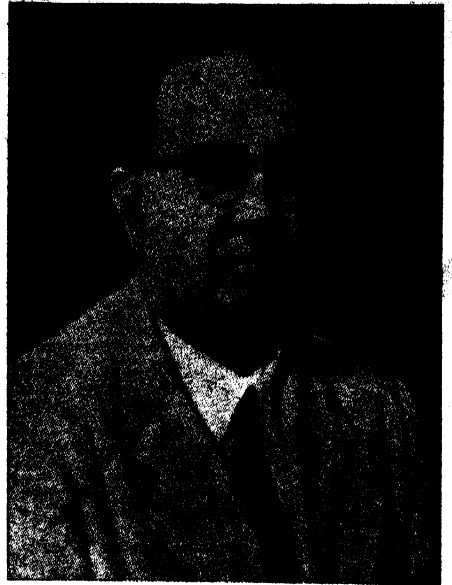
আশ্বিন—১৩৬৯

প্রথম খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
সুরাসুরশিরোরত্ন-নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৪
দেবি প্রচণ্ডদোর্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিষূদিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৫

পুরাণে শ্রীদুর্গার স্বয়ংবর

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

নানা শাস্ত্রে শ্রীদুর্গার অনন্ত মহিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। জলে স্থলে, স্থাবরে জঙ্গমে—বিশ্বের সর্বত্র আছেন বিশ্বব্যাপিনী সর্বস্বরূপিণী দুর্গা।—

ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা
নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরসুরাদি।
যদ্ যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা
দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ॥

—সমস্ত প্রাণিবর্গ, সমগ্র বিশ্ব, স্ত্রী, পুরুষ, দেব, অসুর—য কিছু দেখা যায় সবই দুর্গা। তাঁকে ছেড়ে অপর কিছুই নেই। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনি নিত্যা। জগতের কল্যাণকল্পে দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যে তিনি সীমার মধ্যে ধরা দিয়ে থাকেন। তাঁর আবির্ভাবকেই আমরা বলি উৎপত্তি।

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপাভিধীয়তে॥

ব্রহ্মপুরাণে হৈমবতী দুর্গার এমনই এক আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে। হৈমবতীর স্বয়ংবরকাহিনী বড় বিচিত্র। সে কাহিনী রচনার লালিত্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, বর্ণনার চাতুর্যে উত্তম কাব্যের পর্যায়ে পড়ে। পুরাণোক্ত উমাশঙ্করের বিবাহাখ্যানে আর কুমারসম্ভব বর্ণিত হরপার্বতীর মিলনকথায় বচনভঙ্গীর অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিন্যাসবৈচিত্র্যেও উভয় গ্রন্থই অপূর্ব।

দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। পর্বত-পুত্রীর নাম হল অপর্ণা। এ জন্মেও শিবই হলেন তাঁর কাম্য পতি। তিনি পতিলাভকামনায় অনাহারে দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। জননী মেনকাদেবী কন্যার ক্লেশে কাতর হয়ে তাঁকে তপশ্চরণ থেকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন—'উ-মা'—এমন করো না। তদবধি কন্যা উমা নামে খ্যাত হলেন।

উমা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন, পরমবাঞ্ছিত মহাদেবের দর্শন পেয়ে তাঁকে বললেন—মহাভাগ, তুমি আমার অভীষ্ট দেবতা, এখানেই তোমাকে বরণ করছি।

ইহৈব ত্বাং মহাভাগ বরয়ামি মনোগতম্।

উমার নিভৃতে পতিবরণের কথা অবগত হয়েও নিয়মানুবর্তী গিরিরাজ নিয়ম রক্ষার জন্যে দিকে দিকে কন্যার স্বয়ংবরবার্তা ঘোষণা করলেন।

জানন্নপি মহাশৈলঃ সময়ারক্ষণেপ্সয়া।
স্বয়ংবরং ততো দেব্যাঃ সর্বলোকেষ্বঘোষয়ৎ॥

গিরিজার পাণিপ্রার্থী দেবগণ সিদ্ধ-গন্ধর্বসহ গিরিপুরে উপস্থিত হলেন। শত শত বিমানে বিস্তীর্ণ পর্বতপৃষ্ঠ সঙ্কুল হয়ে উঠলো। যথাকালে শৈলসুতার স্বয়ংবর আরম্ভ হল।

দেবগণ বিশিষ্ঠ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে স্বয়ংবরসভা অলঙ্কৃত করলেন। মহাবল দেবরাজ দর্শনীয় মূর্তিতে অধিরাজ হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। মহাদেবও সে সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রদীপ্ত তেজে সকলে নিমীলিত নেত্রে অভিভূত হয়ে রইলেন। সহসা মণিময়সানারূঢ়া চঞ্চলচামরবীজিতা পার্বতী সুগন্ধকুসুমে গ্রথিত মাল্য হস্তে সভায় প্রবেশ করে ত্রিদিববাসীদের সমক্ষে শঙ্কর-পদে মাল্যার্পণ করলেন। সহস্রকণ্ঠে সাধু সাধু ধ্বনি উত্থিত হল।

এরপর ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ—তুম্বুরু, নারদ, হাহা হুহু—সকলে রমণীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমবেত হলেন। বেদজ্ঞ ঋষিরা পবিত্র বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। মাতৃকাগণ, দেবকন্যাগণ ললিত মঙ্গল-গীতের তান তুললেন। হৈমবতীর বিবাহে যুগপৎ ছয় ঋতুর আবির্ভাব হল।

ঋতবঃ ষট্ সমং তত্র নানাগন্ধসুখাবহাঃ।
উদ্বাহঃ শঙ্করস্যেতি মূর্তিমন্ত উপস্থিতাঃ॥

তখন চিরতুষার পর্বতপ্রদেশে একই সময়ে বিচিত্র উপভোগের বিলাসভূমিতে পরিণত হল। নবসঞ্জাত শিলীন্ধ্রকন্দলী আর উদ্গতপল্লব তরুলতাদের সহচর করে সেখানে উপস্থিত হল ধারাপ্লাবিত বর্ষাকাল। বর্ষণোন্মুখ ভেকের

নিনাদে আর গর্জনমুগ্ধ ময়ূরের কেকারবে চতুর্দিক ধ্বনিত হতে লাগল। পুষ্পসম্ভারের মধুর গন্ধে বনস্থল আমোদিত হল। পথিকাঙ্গনাদের উৎসুক চিত্ত প্রিয়সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠল।—

প্রত্যগ্রসঞ্জাতশিলীন্ধ্র কন্দলীলতাক্রমাত্যুদ্গতপল্লবা শুভা।
শুভাম্বুধারা প্রণয়প্রবোধিতৈর্মহালসৈর্ভেকগণৈশ্চ নাদিতা॥
প্রিয়েষু মানোদ্ধতমানসানাং মনস্বিনীনামপি কামিনীনাম্।
ময়ূরকেকাভিরুতৈঃ ক্ষণেন মনোহরৈর্মানবিভঙ্গহেতুভিঃ॥

অসিতজলদধীরধ্বানবিত্রস্তহংসা
বিমলসলিলধারোৎপাতনম্রোৎপলাগ্রা।
সুরভিকুসুমরেণুরুপ্তসর্বাঙ্গশোভা
গিরিদুহিতৃবিবাহে প্রাবৃড়াবির্বভূব॥

জলসিক্ত প্রাবৃটের পার্শ্বে ভেসে উঠল মেঘনির্মুক্ত শারদ-সৌন্দর্য। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল হংসের কাকলি আর সারসের কূজন। বিস্তীর্ণ শস্যপঙ্‌ক্তির হরিতপ্রভায় আর বিকীর্ণ পুষ্পরাগের বিচিত্র বর্ণে দিগন্তর শোভিত হল।—

হংসনূপুরনির্হ্রাদা সর্বশস্যদিগন্তরা।
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণী কূজৎসারসমেখলা॥
নির্মুক্তাসিতমেঘকঞ্চুকপটা পূর্ণেন্দুবিম্বাননা
নীলাম্ভোজবিলোচনা রবিকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মস্তনী।
নানাপুষ্পরজঃসুগন্ধিপবনা প্রহ্লাদিনী চেতসাং
তত্রাসীৎ কলহংসনূপুররবা দেব্যা বিবাহে শরৎ॥

কোনস্থানে হেমন্ত আর শিশির ঋতু শীতলার্দ্র হিমকণা বর্ষণে প্রবৃত্ত হল। ঘন তুষারসম্পাতে গিরিতল বিশাল ক্ষীরসমুদ্রের আকৃতি ধারণ করল। তুহিনশুভ্র শৃঙ্গ সকল পৃথিবীপতির শ্বেতচ্ছত্রের মত শোভা পেতে লাগল।

অত্যর্থশীতলাম্ভোভিঃ প্লাবয়ন্তৌ দিশো দশ।
ঋতু হেমন্তশিশিরাবাজগ্মতুরতিদ্যুতী॥
তেন প্রালেয়বর্ষেণ ঘনেনৈব হিমালয়ঃ।
অগাধেন তদা রেজে ক্ষীরোদ ইব সাগরঃ॥
প্রালেয়পটলচ্ছন্নৈঃ শৃঙ্গৈস্তু শুশুভে নগঃ।
ছত্রৈরিব মহাভাগৈঃ পাণ্ডরৈঃ পৃথিবীপতিঃ॥

পর্বতের স্থলে স্থলে শিখরে কন্দরে তরুলতায় বসন্তশ্রী ফুটে উঠল। নাতিশীতোষ্ণ সরসীসলিল পুষ্পকিঞ্জল্কে পিঙ্গল হয়ে গেল, চক্রবাক-দম্পতি আনন্দে কলরব তুলল। তাল তমাল কদম্ব কপিত্থের শাখাপ্রশাখা পুষ্পপল্লবে নুয়ে পড়ল। মত্ত কোকিলের কলধ্বনির সঙ্গে নীলকণ্ঠের কণ্ঠনাদ মিশ্রিত হয়ে দিগন্ত মধুময় করে দিল। কমলবনের বর্ণশোভায় উদজল রঞ্জিত হল। সে জলে কোথাও পড়ল উৎপল-দলের নীল ছবি, কোথাও প্রতিফলিত হল মৃণাল-দন্তের শুভ্র আভা; আবার অন্যত্র মিলিত হল কোকনদের রক্তিমার সঙ্গে চঞ্চল ভৃঙ্গের শ্যামলোজ্জ্বল কান্তি।

নাত্যুষ্ণশীতানি সরঃপয়াংসি কিঞ্জল্কচূর্ণৈঃ কপিলীকৃতানি।
চক্রাহ্বযুগ্মৈরুপনাদিতানি প্রজজ্ঞিরে পদ্মবনানি সর্বতঃ॥
তস্মিন্নৃতৌ শুভ্রকদম্বনীপাস্তালাস্তমালাঃ সরলাঃ কপিত্থাঃ।
বৃক্ষাস্তথান্যে ফলপুষ্পবন্তো দৃশ্যা বভূবুঃ সুমনোহরাঙ্গাঃ॥

শ্রুত্বা শব্দং মৃদুমদকলং সর্বতঃ কোকিলানাং
চঞ্চৎপক্ষাঃ সুমধুরতরং নীলকণ্ঠা বিনেদুঃ।
তেষাং শব্দৈরুপচিতবলঃ পুষ্পচাপেষুহস্তঃ
সজ্জীভূতস্ত্রিদশবনিতা বেদ্ধুমঙ্গেষ্বনঙ্গঃ॥
নীলানি নীলাম্বুরুহৈঃ পয়াংসি গৌরানি
গৌরৈশ্চ মৃণালদণ্ডৈঃ।
রক্তৈশ্চ রক্তানি ভৃশং কৃতানি মত্তদ্বিরেফা-
বলিজুষ্টপত্রৈঃ॥

কোন স্থলে মুহূর্ত মধ্যে হিমাচলের স্বভাবশৈত্য অন্তর্হিত হল। গিরিশৃঙ্গ নিদাঘসুলভ কুসুমশোভায় মণ্ডিত হল। পাটলপুষ্পের গন্ধবাহী পর্বতবায়ু সুগন্ধ ছড়াতে লাগল। বাপীসলিল প্রফুল্লপদ্মের লোহিতরাগে রক্তিম হয়ে গেল। কুরুবকতরু কুসুমে কুসুমে পাণ্ডুর হল। নানা জাতির বৃক্ষ থেকে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হতে লাগল। পর্যন্ত বকুলপুষ্পে শৈলপৃষ্ঠ আস্তৃত হল।

দেবীবিবাহ সময়ে গ্রীষ্ম আগাদ্ধিমাচলম্।
শোভয়ামাস শৃঙ্গানি প্রালেয়াদ্রেঃ সমন্ততঃ॥
ইতস্ততো গিরৌ তত্র বায়বঃ সুমনোহরাঃ।
ববু পাটলবিস্তীর্ণকদম্বার্জুনগন্ধিনঃ॥
বাপ্যঃ প্রফুল্লপদ্মৌঘকেশরারুণমূর্তয়ঃ।
তথা কুরবকশ্চাপি কুসুমাপাণ্ডুরোচিষঃ॥
বকুলাশ্চ নিতম্বেষু বিশালেষু মহীভৃতঃ।
উৎসসর্জ মনোজ্ঞানি কুসুমানি সমন্ততঃ॥

নানা ঋতুর নানা শোভায় জলস্থল শোভিত হল। পুষ্পাচ্ছাদিত পাদপের অপূর্ব দৃশ্যে আর বিচিত্রবর্ণ বিহগের মধুর নিনাদে বনপ্রদেশের রমণীয়তা বর্ধিত হল। ছয় ঋতুর সমবায়ে বিপুল আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্বতীর পরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যের মুনিসভায় জগন্মাতার বিবাহ-বার্তা শুনিয়েছিলেন। আজ তাঁর আগমন উৎসবের মঙ্গল-রবে বাংলার পথঘাট মুখরিত। পবিত্র পুরাণকথা স্মরণের এ-ই শুভক্ষণ।

বহুদিন পর সনৎ চিঠি লিখেছে ধানবাদ আসছে, এই দিকেও ঘুরে যাবে দুএক-দিনের জন্য। খুশী হয়েছে প্রশান্ত।

সেইই উদ্যোগ আয়োজন করছে। সহর থেকে মাছ এনেছে—আজ ডে-সিপ্টের ডিউটি বদলে নাইটে ডিউটি নিয়ে নিজেই গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যাবার আয়োজন করছে। মানসীই বলে—

—খুব যে হৈ চৈ! ব্যাপার কি?ঃ

প্রশান্ত পাইপে তামাক পুরতে পুরতে জবাব দেয়—হাজার হোক শ্বশুর বাড়ীর লোক!

—ইস! মানসী হেসেছিল।

খুশীও যে হয়নি সে, তা নয়। তবে সেই উপচে-পড়া খুশীটুকুকেও ঢেকে রাখতে চায় মানসী।

প্রশান্ত গাড়ী নিয়ে বের হয়ে গেল। চুপ করে বাংলোর বারান্দায় বসে আছে মানসী।

কেমন যেন অতীতের আবছা স্মৃতিগুলো আজ ভিড় করে আছে। পাশাপাশি বাড়ী, কলকাতার ও অঞ্চলে তখনও প্রতিবেশীসুলভ ভাবটা হারায়নি, তাই দীর্ঘ দিনই সহজ ভাবেই মিশেছিল মানসী আর সনৎ।

হঠাৎ একটি ম্লান আলোভরা বৈকালে লেকের নির্জন গাছের ছায়ায় মানসী আর সনৎ দুজনে দুজনকে নোতুন করে চিনেছিল।

কারা কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

অপ্রতিভ বোধ করে মানসী—চল। লোকগুলো যেন কি?

ভ্রমণরত ছেলেদের উড়ো ছেঁড়া মন্তব্যও কানে আসত তাদের।

মানসী হাসি চেপে বলে—কি বাঁদর দেখছে ওরা?

সনৎ জবাব দিত—ওদের দোষ কি বলো? কলেজ পালিয়ে এসেছি দুজনে—

—এ্যাই!

চাপা স্বরে মানসী ধমক দিত। দোষী যেন সে একাই। তবু ভাল লাগতো মানসীর ওই উধাও হয়ে বেড়ানো, পালিয়ে বেড়ানো, কোনদিন বা ডায়মণ্ডহারবার অবধি যেতো।

…সনৎ সবে কলেজ পেরিয়ে চাকরী পেয়েছে।

মানসীই খুশী হয় সব থেকে বেশী। কি একটা গোপন নিভৃত মনে সে স্বপ্ন দেখেছিল। কি সে বলতেও চেয়েছিল।

সনৎ দুচোখ ওর দিকে তুলে চেয়ে থাকতো—ওর হাতখানা তার হাতে।

—বলো!

মানসী তবু বলতে পারেনি। অভিমানাহত সনতের কি কিছুই বলবার নেই? সে কেন আগ বাড়িয়ে বলতে যাবে—জানাতে যাবে তার এতদিনের আশার কথা! তাই অভিমান ভরেই জবাব দিতো।

—বলবো।

…কিন্তু সে কথা না বলাই রয়ে গেছে। আজও!…

সে আজ আট বছর আগেকার কথা। মনে হয় মানসীর—এ যেন সেদিনের ঘটনা।

সনৎ টুরে বেরিয়েছে, সেই মাস খানেকের মধ্যেই সব স্বপ্ন আশা, সবকিছু তার ওলট পালট হয়ে গেল।

প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল—ও বাড়ীর প্রথম কলেজে-পড়া মেয়ে মানসী, কিন্তু বাড়ীর সাবেকী জগদ্দল পাথরের নীতিটাকে ভাঙ্গতে পারেনি।

সনৎ যেদিন বাড়ী ফিরলো…হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়ায় বাইরে। মানসীদের বাড়ীতে নহবতের সুর উঠেছে। বিয়ের পরদিনই চলে যাচ্ছে মানসী প্রশান্তের বাংলোয়।

শেষবারের মত তার হারানো মানসীকে চিনতে কষ্টই হয় সনতের, অবাক হয়ে উঠে দেখছে। দুচোখে অসহায় নীরব চাহনি। মানসীর চোখেও জল টলমল করে।

—চলে যাচ্ছি।

ওর স্বরে কান্না মেশানো।

সনৎ কথা বলেনি।

…মানসী আজও ভোলেনি সেই দিনগুলো। সেই মানুষটিকে—নিজের সেই কুমারী অতীতকে।

দীর্ঘ আটবছর কেটেছে এই বাংলোয়। প্রশান্তের অর্থ প্রতিপত্তি—গাড়ী সবই আছে। মানসীর কোলে এসেছে একটি সুন্দর মেয়ে—সুখের সংসারই বলা চলে।

কিন্তু তবু মানসী আগে সেই দিনগুলোর স্মৃতি ভোলোনি, এ যেন তার গোপন সম্পদ।

সনতের খবর আজ ও পায় ছোট বোনের চিঠিতে।

সনৎ এখন ভালো চাকরী করছে। বিয়ে থাও করেনি। সম্বন্ধ আসে সবই নাকচ করে দেয় সে। বাড়ীতেও কোন উত্তর এর দেয়নি।

কেন সনৎ বিয়ে করেনি তা জানে মানসী।

সনৎকে সে শেষদিন বলে এসেছিল—তুমি ভীতু! কাপুরুষ!

সনৎ সেদিন জবাব দেয় নি।

মানসীর মনে আজও সেই সনৎ বেঁচে আছে, মানসীও জানে সেই কুমারী কন্যাটি আজও বেঁচে আছে সনতের

মনের রূপ রস বর্ণে মিশে। সনৎ তার কথা ভোলেনি—ভোলেনি সেই নিভৃত স্বপ্নের মাধুর্য্য।

তাই নিয়েই রয়েছে সে।

অন্ততঃ একজন মানসীকে ভোলেনি। তাই সনৎ বিয়ে করেনি, করতেও পারেনি। মনে মনে খুশী হয়েছে মানসী।

…গাড়ীর শব্দ পেয়েই এগিয়ে যায়। কেয়ারি করা ফ্লাওয়ার বেডে সিজন ফ্লাওয়ার ডালিয়া ফুটে রয়েছে। গাড়ী থেকে নামছে প্রশান্ত—পিছনে সনৎ।

সনৎ তেমনিই রয়ে গেছে। বিশেষ বদলায় নি।

ছেলেদের বদলাতে সময় লাগে। তেমনি হাসিটুকুও লেগে রয়েছে, চুলগুলো বাতাসে উস্কোখুস্কো।

—কেমন আছো?

সনৎ থমকে দাঁড়িয়েছে মানসীকে সামনে দেখে।

মানসী আজ বদলে গেছে। ফর্সা রং ছিপছিপে তন্বী মেয়েটির দেহে আজ এসেছে মেদাধিক্য। দুচোখের সেই সহজ আভা-মাখানো দৃষ্টিটুকু কেমন ক্লান্তি আর ঈষৎ নিষ্প্রভতায় ভরা। সেদিন যে মানসী দুহাত দিয়ে কাঙ্গালের মত সব পেতে চেয়েছিল একজনের নিঃশেষ প্রীতি আর ভালবাসা, আজ আর তার যেন সেই মোহ কেটে গেছে, গাড়ী বাড়ী স্বামী অর্থ সব পেয়েছে সে। সেই মনের প্রাচুর্য্য-মেশানো ভালবাসার বিশেষ কোন মর্যাদা আর তার কাছে নেই।

সনতের মুখের সেই ভাবটা যেন লক্ষ্য করেছে মানসী। চমকে ওঠে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সহজ হাসিমাখা স্বরে অভ্যর্থনা জানায়।

—যাক, মনে করে তবু এসেছো।

ফুলের মত ছোট্ট মেয়েটি মায়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে ভীরু চাহনিতে।

সনৎ ওকে আদর করে।

মানসী বলে ওঠে—আমার মেয়ে! নীলা!

…ওরা বাগান থেকে বাংলোয় উঠে গেল।

দুপুরের রোদ সামনের গাছগাছালির মাথায় ছায়ার ভাষা এনেছে। বাতাসে কেমন একটা শিহরণের স্বর। পাখী ডাকছে।

খাবার টেবিলে নানা আয়োজন দেখে চমকে ওঠে সনৎ।

একেবারে সাহেবী কেতায় লাঞ্চ যাকে বলে। ওদের ওখানে এইটাই রেওয়াজ।

—এতো কি করেছেন?

প্রশান্ত হাসে—ওটা ওর ডিপার্টমেন্ট, আমি এ সবের কিছুই জানি না।

মানসী হাসিভরা কণ্ঠে জবাব দেয়—কিই এমন আয়োজন করেছি। পোড়া দেশে কিইবা মেলে।

মানসীদের কলকাতার বাড়ীর পরিবেশ এর সঙ্গে মেলে না। সাবেকী বাড়ী। এখনও রান্নাঘরের বাইরের বারান্দায় আসন পেতে খাবার ব্যবস্থা। বুড়ী পিসীমা, মায়ের নিরামিষ হেঁসেলও আলাদা। কাচা-আকাচা ছোঁয়াছুঁয়ির বেড়া থেকে মানসী আজ মুক্ত।

সেও আজ ওদের সঙ্গে বসেছে ডাইনিং টেবিলে। বেয়ারা পরিবেশন করছে।

—খাও সুনুদা।

সনৎ অনেকদিন পর ওই ডাক শুনে কেমন যেন চমকে ওঠে। মানসী ওর দিকে চেয়ে থাকে, যেন ইচ্ছে করেই সে ওই নামে ডেকেছে তাকে।

…দুজনের মনে দুটো নীরব চিন্তাধারা বয়ে চলেছে।

…মানসী খোঁজে সনতের মধ্যে ওর নিজের অতীতের সেই স্বপ্নের কোন স্মৃতিই আজ বেঁচে আছে কিনা। সনৎ দেখছে মানসীর পরিবর্তনটা।

…স্তব্ধ নির্জন কারখানা-সহরে সন্ধ্যা নামে।

গাছঢাকা সুন্দর ঝকঝকে পথে—আলো আঁধারির মায়া জমেছে। দূর পাহাড় থেকে ভেসে আসে বাতাসের সুর।

বাংলোর বাগানে রাতের আবছা আলো রক্তরং-এর ডালিয়া—বোগেনভিলা ক্রোটন লালক্যানাগুলো ফুটে রয়েছে।…গোলাব গাছে শীতের শেষেও ফুলগুলো ঝরেনি, নীরব বেদনায় তারা আঁধারে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে আকাশের তারার পানে, শিউরে ওঠে রাতের বাতাসে।

ডিউটিতে বের হয়ে গেছে প্রশান্ত। নীলা সারাদিন দুষ্টুমি করে সন্ধ্যা থেকেই একরাশ ফুলের মত বিছানায় এলিয়ে পড়ে।

মাধবীলতার ঘনঝোঁপের ফাঁক দিয়ে আলোটা হিজি-

...জি রেখায় এসে পড়েছে মানসীর মুখে। চুপ করে বসে ...ছে সনৎ। কি দেখছে! সন্ধান করছে সে।

আজ মনে হয় তার কল্পনা আশা সব মিথ্যা ভুল। যে ...তীত সে অতীতই। তাকে সন্ধান করে বর্তমানের ...ড়ে চাপানো গোঁজামিল দেওয়ারই সামিল।

অতীতের সেই মানসী তার কান্নাভেজা ডাগর ছুটো ...চাখ, নিবিড় সেই সান্নিধ্য আপন করার স্পর্শ তা আজ ...ব হারিয়ে গেছে।

কেউ কারও জন্য বসে নেই, থাকেনা। এগিয়ে যাবার ...থে মানুষ এক জায়গায় স্থির হয়ে একটি মন নিয়ে বসে ...কতে পারেনা।

মানসীও তাই বদলে যাবে—এইটাই সত্য। গিয়েছেও। ...দ এতদিন একটা ভুল ধারণা নিয়েই ভালবাসার প্রতি ...ন্ধ শ্রদ্ধা আর মোহ নিয়ে বসেছিল। নিজেকে বঞ্চিত ...রে রেখেছিল।

—কি ভাবছো?

মানসী লেসবোনা থামিয়ে ওর দিকে চাইল। বাড়ীর ...সারের ঝামেলা মিটিয়ে এতক্ষণে বসবার সুযোগ ...পয়েছে।

—কিছুই না। জবাব দেয় সনৎ।

মানসী ওর দিকে চেয়ে আছে।

সনতের মনে হয় কেমন নিশ্চিন্ত মাধুর্যময় জীবনের ...চ মিনার থেকে মানসী ওর মত কাঙ্গাল নিঃস্ব ব্যর্থ ...কটি মানুষের দিকে পরম করুণাভরে চেয়ে আছে।

একফালি চাঁদের আলো সামনের মাঠে কেমন আবছা ...য়াসায় ঢাকা থেকে যবনিকার আভাস এনেছে। ছুএকটা ...জানাকি তারই গায়ে আলোর ক্ষণিক আভাস আনে, ...াবার মিলিয়ে যায়। আবার জ্বলে ওঠে। মানসী ...লে ওঠে—

—বিয়ে করবে না শুনলাম।

জবাব দিলনা সনৎ, চুপকরে ওর দিকে একবার মুখ ...লে চাইল মাত্র। রাতের হিমবাতাস মাধবীলতা আর ...ফুলের গন্ধে কেমন ভারি হয়ে উঠেছে। ছুএকটা তারা ...খনও জেগে আছে আকাশে, ভীরু চাহনি মেলে ওর যেন ...দিনরাত কোন পরমলগ্নের প্রতীক্ষা করে। অন্তহীন ...প্রতীক্ষা। সূর্য্যের আলোক শাসনে দিনের বেলায় হারিয়ে যায়—আবার রাতের আকাশে দেখা দেয় ব্যাকুল ব্যর্থ বেদনা-ভরা চাহনিতে।

মানসীর মনে সেই হারাণো দিনগুলো—সেই কুমারী মন আজও বেঁচে আছে অমনি ব্যাকুল বেদনা আর ব্যর্থ প্রতীক্ষা নিয়ে।

গাঢ়স্বরে বলে ওঠে মাধবী—

—না করাই ভালো। সেদিনগুলো পেরিয়ে এসেছো। অনেক কটা বছর। সনৎ একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। মানসী যেন স্বপ্নভরা স্বরে বলে চলে—

—দিনগুলো একদিন বদলাতেও পারে। সেদিন তুমি আমি অনেক বুড়ো হয়ে যাবো। আচ্ছা বেনারসের বাড়ীটা তোমাদের আছে?

সনৎ ছোট্ট করে জবাব দেয়—হঁ্যা।

মানসী বলে চলে—আমরাও ছোট্ট একটা বাড়ী কিনবো তার কাছাকাছি। তোমার কাছাকাছি। তোমার ও সুবিধা হবে—দেখাশোনার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

সনৎ ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

মনের অতলে একটু সুন্দর স্বপ্ন যেন আবার জেগে ওঠে—বেঁচে থাকার স্বপ্ন। দূর কোন সূর্য্যালোকের প্রতীক্ষা রাত্রির অমানিশার মধ্যেও। এই মানসীর মাঝে ও অতীতের সেই স্মৃতি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

ফোনটা বেজে ওঠে নিস্তব্ধ পরিবেশে।

ওর কর্কশ শব্দে ক্ষণিকের জন্যও সব মাধুর্য কেটে যায়, মানসী উঠে গিয়ে ধরলো—হঁ্যা!

মানসীর মুখে ফুটে ওঠে সহজ সুন্দর একটি শান্ত ভাব; সনতের সঙ্গে যে নারী কথা বলছিল এ সে নয়।

সনৎ ওর দিকে চেয়ে আছে।

মানসীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রশান্তের মুখখানা। ফ্যাক্টরী থেকে ফোন করছে। মাঝে মাঝে কাযের অবসরে ও ফোন করে। কানে আসে মেসিনের শব্দ, কলরব।

প্রশান্ত সেই কঠিন বাস্তবের মাঝেও বেঁচে থাকে।

—ঘুমোও নি?

মানসী ফিসফিসিয়ে বলে তরল কণ্ঠে।

—ঘুম আসছে না লক্ষ্মীটি!

কি যেন বলে প্রশান্ত, মানসী হাসছে। ধমকে ওঠে।

—যাঃ দুষ্টু কোথাকার।

…সনতের কানে আসে ওদের কথাবাতার টুকরো, হাসির সুর। ওখানে যেন তার থাকার কোন অধিকার নেই। এই মানসীর চিরন্তনরূপ আর প্রতিষ্ঠা, সেই জগতে সনতের কোন স্থান নেই। বাগানে নেমে আসে সনৎ, পায়চারী করছে।

দূরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ছুটে চলেছে হেডলাইট জেলে ট্রাকগুলো, অন্ধকারের বুক থেকে বের হয়ে আবার আঁধারেই হারিয়ে গেল তারা—আলোক স্বপ্নের মত একটি উজ্জ্বল রেখায়।

মানসীও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। চুপ করে সে কি ভাবছে। যে আনন্দ আর আবেগ নিয়ে মানসী আজ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সনৎকে, তার উত্তাপ কেমন নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

তবু সহজ হবার চেষ্টা করে মানসী।

…হঠাৎ নীলা ঘুমের ঘোরে কেঁদে ওঠে।…

বাধা পেয়ে থেমে গেল মানসী। তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলে গেল।

একাই দাঁড়িয়ে থাকে সনৎ। আঁধারে যেন হারিয়ে গেছে সে। সব তার হারিয়ে গেছে। ভেসে গেল সব কিছু—দূর-দিগন্তে রাতের ওই দিকহারা পাতাঝরা হিম বাতাসে।

…পরদিনই চলে গিয়েছে সনৎ। কলকাতায় ফিরে গেছে।

ওর এই অতর্কিত ফিরে যাওয়ার কোন কারণই ঠিক বুঝতে পারেনি প্রশান্ত। অনুরোধ করেছিল থাকতে। কিন্তু সনতের কায আছে। জরুরী কায।

মানসী ওর দিকে চেয়ে থাকে গভীর দৃষ্টি মেলে, বেদনাভরা দৃষ্টি। কোন কথা সে বলেনি, বলতে পারেনি।

কিন্তু সনৎ চলে আসার পর বারবার মনে হয়েছে—সনৎ তাকে ভুল বুঝেই গেছে। মানসী কি করে বোঝাবে তাকে—আজ আর কোন পথ নেই। তবু সে সনতের কাছে কৃতজ্ঞ।

নিজের অতীতের সেই স্বপ্ন চকিতের মধ্যে ফুটে উঠেছে মনে। কিন্তু কতটুকু বা তার স্থায়িত্ব? সনতের কাছে যা সত্য—তার কাছে আজ তা দিনের আলোয় ঢাকা তারার মতই অদৃশ্য একটা বাস্তব।

প্রশান্ত কোন কথা বলেনি। দেখেছে কদিন মানসী কেমন মনমরা হয়ে থাকে। কারণ অকারণে সুর ভেসে উঠতো ওর কণ্ঠে, হাসি আর সুর। সেটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

—শরীর খারাপ মানসী?

আদর করে কাছে টেনে নেয়

প্রশান্তের নিভৃত স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নীরব বেদনায়।

—কই না তো ?

নীলা খেলার সময় ডেকে ফিরে গেছে—মায়ের সাড়া না পেয়ে।

মানসী আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। অসময়ের বৃষ্টি। অকারণে বৃষ্টি। তবু মেঘে ঢেকে যায় আকাশ; কালো কালো পুঞ্জ মেঘ। হাওয়ায় শীতের শেষ কাঁপুনি জাগে। গাছগাছালির মাথা থেকে—আকাশ থেকে শুধু জল ঝরে। চারিদিকে সব আলো নেভা অন্ধকার।

কেমন অসহ্য হয়ে ওঠে এই পরিবেশ। মানসী দিন-কতক ছুটি চায়।

—ক'দিন কলকাতা থেকে ঘুরে আসি।

একটিবার সেও যেন হারাণো দিনের সন্ধান করতে চায়। প্রশান্ত বলে—বেশ তো, অনেকদিন যাওনি। ঘুরে এসো—

আদর করে ওকে কাছে টেনে নেয় প্রশান্ত, মানসী যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। আদরেও কোন সাড়া নেই।

প্রশান্ত দুহাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, —বেশীদিন নয় কিন্তু। ঘর সংসার সব পড়ে রইল।

মানসী যাবার আয়োজন করছে।

সনৎ তাকে ভুল বুঝে গেছে। তাকে আঘাত দিতে সে চায়নি। তবু নিজের মনের গোপন কামনাবাসনার কথাই বলে ফেলেছিল দুর্বলতম মুহূর্তে। ব্যঙ্গ করতে চায়নি সনৎকে। তার অতীত জীবনের মধুস্মৃতির সাক্ষী সনৎ। তার মধ্যে বেঁচে আছে মানসী চির-তরুণ—রঙ্গীণ একটি স্বপ্ন হয়ে। সেইটুকুও হারাতে চায় না সে। সনতের মাঝে ক্ষণিকের জন্যও নিজের অতীতকে ভালোবেসেছিল সেদিনও। যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হঠাৎ সেদিন চিঠিখানা এসে সব কেমন ওলটপালট করে দিল মানসীর মনে। রঙ্গীণ খামের চিঠি—মানসী পড়েই একটু থমকে দাঁড়াল।

জিনিয়া—বোগেনভিলা ফুলগুলো বাতাসে মাথা নাড়ছে। মাধবীলতা থেকে বাতাসে ঝরে পড়ল কয়েকটা শুকনো ফুল—প্রায়ই ঝরে তারা। আজ ওই বৃন্তচ্যুত শুকনো বিবর্ণ ফুল ঝরার সঙ্গে নিজের অতীতের একটা সৌরভমদির মহামুহূর্তও ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেল।

চিঠিখানা নিস্ফলরাগে ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করে বাগানের ওই ঝরা ফুলের মাঝে ছিটিয়ে ফেলে দিল মানসী।

কি ভাবছে রোদপোড়া তামাটে আকাশের দিকে চেয়ে। অসীম শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে ওর বুক।

প্রশান্তের ডাকে ফিরে চাইল মানসী। গাড়ী নিয়ে তৈরী ষ্টেশনে যাবার জন্য। তাগাদা দেয় প্রশান্ত।

—দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি !

…মানসী ওকে দেখে যেন চমকে উঠেছে। ওর হাত-খানা তুলে নেয় প্রশান্ত নিজের হাতে। কাঁপছে মানসীর সারা শরীর নিবিড় উত্তেজনায় !

—মানসী !

মানসী ওর বুকে আজ নিঃশেষে নিজেকে তুলে দেয়—একটি বলিষ্ঠ অবলম্বন নিবিড় করে চায় সে।

বলে ওঠে—যাবো না। কোথাও যাবো না আমি।

মানসীর কণ্ঠস্বর কেমন অশ্রুভেজা।

তামাটে রোদ পোড়া বন্ধ্যা মাটির উপর দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ বাতাসে উড়ে চলেছে ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো। উধাও বাতাসে দূরের পানে হারিয়ে গেল তারা।

মানসীর স্বপ্নরাঙ্গা অতীতের জীবনও ওই সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

সনতের বিয়ের চিঠি।

সনৎ বিয়ে করছে সেই সংবাদটাই সদর্পে যেন ঘোষণা করেছে সে মানসীর কাছে। জানিয়ে দিয়েছে তার অতীত জীবনের নিঃশেষ মৃত্যু !

মানসী আজ সব ভুলতে চায়। প্রশান্তের নিবিড় বন্ধনে আজ সব হারিয়ে যেতে চায় সে—নিজেকেও।

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

তুই নাম কর্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এ কলিযুগে অন্য প্রকার গতি নাই। হরির নাম, হরির নাম, হরির নামই পরম গতি।

তিনবার এ কথা বল্‌লে কেন ?

আমি ত্রিসত্য ক'রে বলছি—আমার নামই একমাত্র গতি। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের হাত হতে আমার নাম ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করতে পারে না। যখন তুই তমোগুণে থাক্‌বি—আলস্য, তন্দ্রা, ভ্রম তোকে অভিভূত করে রাখবে, তখন তুই আমার নাম করলে তমোগুণকে জয় ক'রে ধ্যান লাভে সমর্থ হবি। যখন তুই রজোগুণে থাক্‌বি—বিক্ষেপ, লোক-চেষ্টা, ভোগ, আরোগ্য, যশঃ প্রভৃতি তোকে গ্রাস করবে, তখন তুই আমার নাম করিস্ রজোগুণ কেটে যাবে—তুই মানসপূজার অধিকার পাবি। যখন তুই স্বধর্ম্মাচরণ, জপ, পূজা, পাঠ রূপ সত্ত্ব গুণে থাক্‌বি, সে সময়েও আমার নাম করবি, তা হলে গুণাতীত হয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে কৃতার্থ হবি।

নামাশ্রয়ী তিনগুণকে জয় করতে সমর্থ হয় ; সেইজন্য তিনবার বলেছি। এই যে তুই একভাবে থাকতে পারিস্ না, শত চঞ্চলতা তোকে আকুল করে, এ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-দোষ। আমার নাম কর্, সে কর্ম্ম-দোষ থাক্‌বে না। ইহ-জন্মের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা কারণে তুই আচার পালন করতে পারিস্ না, স্থির হতে পারিস্ না, ইহজন্মকৃত তোর যে কুকর্ম্ম আছে সে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যাবে। তুই কেবল আমার নাম কর্।—ইহজন্ম জয় করতে পারবি। সর্ব্বদা আমার নাম নিয়ে থাকলে আগামী জন্ম আর হবে না। আমার নাম করলে তিন জন্ম জয় করতে পারবি বলে তিনবার বলেছি। বাল্যে ও যৌবনে যে সব সুকর্ম্ম-কুকর্ম্ম করেছিস্, এখন যে সব কর্ম্ম করছিস্, ভবিষ্যতে যে সকল কর্ম্ম করবি, সে সমস্ত তোকে বাঁধতে পারবে না—যদি তুই কেবল আমার নাম করিস। ত্রিকাল জয় করতে পারবি ব'লেই তিনবার বলেছি।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূতাত্মক স্থূল শরীর, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় সমন্বিত অপঞ্চীকৃত ভূতজাত সূক্ষ্ম শরীর এবং অজ্ঞান রূপ কারণ শরীর—তোর স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছে, তুই কেবল নাম কর্—

এই তিনটে উপাধি তোকে আবৃত করতে পারবে না, তুই নিরুপাধি হয়ে যাবি। তাই তিনবার বলেছি।

কেবল আমার নাম করলে—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে জয় করে তুরীয়ে চিরস্থিতি লাভ করবি। সেইজন্য তিনবার বলেছি।

সর্ব্বদা আমার নাম করলে ভু-ভুর্বঃ-স্বঃ এই ত্রিলোক জয়ী হবি, ত্রিলোকের কোন কামনাই তোকে বাধা দিতে পারবে না। সেই জন্য তিনবার বলেছি।

'মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি' একথা শুনে হতাশ হস্ না। তোর কোটিজন্মের সঞ্চিত এবং বর্ত্তমান জন্মের ক্রিয়মান ও আগামী জন্মের সমস্ত কর্ম্মক্ষয় করে দিব। নাম, আমার নাম, কেবল আমার নাম। সেইজন্যই তিনবার বলেছি।

তুই কেবল নাম করলে—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তীকে অতিক্রম ক'রে পরায় চিরস্থিতি লাভ করতে পারবি বলেই—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ তিনবার বলেছি।

দেখ বিশ্বের আদি স্পন্দন 'প্রণব'। এই প্রণবই আমার প্রিয় নাম, সুষুম্নাপথে প্রণব ধ্বনি ভিন্ন অন্য ধ্বনি উত্থিত হয় না। অ উ ম এই অক্ষরত্রয় গঠিত প্রণবে

সৃষ্টি স্থিতি লয়—এই তিন ভাবই আছে—এই সৃষ্টি স্থিতি লয়—আমার তটস্থ লক্ষণ, আমার স্বরূপ লক্ষণ—"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তুই সৃষ্টি স্থিতি লয়কে জয় করতে পারবি বলে তোকে হরি নামই গতি—একথা তিনবার বলেছি। অবিশ্রাম হরি, হরি করলেই আমার স্বরূপ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ঐ নামের ভিতরই বিকাশ হবে। তখন তুই আপনা আপনি আদি মন্ত্র লাভ করে তাহার জপে আমার পরম স্বরূপে ডুবে যাবি।

আচ্ছা তোমার এই ছোট শ্লোকটির ভিতরে এত অর্থ আছে ?

হাঁরে আরও আছে। অধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ জানিস্ তো ?

খুব জানি। জন্মাবধি এই ত্রিতাপের জ্বালায় পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছি, এই ত্রিতাপ শান্ত করবার শক্তি আর কারও নাই দেখে তোমার আশ্রয় নিয়েছি।

আমি সকলের ত্রিতাপ-শান্তি করবার জন্য ত্রিতাপ শান্তির মহামন্ত্র এই হরিনাম তিনবার বলেছি।

কলির জীব রোগপীড়িত হওয়ায়, তাদের দ্বারা অন্য কষ্টকর সাধনা সম্ভব হবে না। রোগের কারণ অনুসন্ধান করলে বায়ু-পিত্ত-কফ এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্যই কারণ বলে জানতে পারা যায়। ত্রিকালে ত্রিধাতু সাম্য থাকবে বলেই তিনবার—হরির নাম করতে বলেছি।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ে প্রাণবায়ু অহোরাত্র সঞ্চরণ করছে। স্বরোদয়শাস্ত্রে ইড়ার উদয়ে শুভ কর্ম্ম, পিঙ্গলার উদয়ে ক্রুর কর্ম্ম এবং সুষুম্নার উদয়ে মোক্ষ-প্রাপক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য—এই রূপ কথিত হয়েছে। যে নাড়ীতেই প্রাণ সঞ্চরণ করুক না কেন—সর্ব্বদা হরি হরি করবার বাধা নাই, এই জন্য তিনবার—হরের্নামৈব কেবলম্—বলেছি।

শারীর, মানস, বাঙ্ময় তপস্যার দ্বারা যারা মালিন্য নষ্ট করতে পারে তাদের ত কোন ভাবনা নাই, তোর মত যারা শারীর, মানস, বাঙ্ময় তপস্যা করতে পারে না, তাদের জন্য আমার বল্‌তে হয়েছে—হরের্ণাম-হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।'

দেখ্, নাম একবার বল্লে কোন কাজ হবে না, সর্ব্বদা নাম করতে হবে। তার মধ্যে প্রাতে, মধ্যাহ্ণে, সায়াহ্নে, নিয়মপূর্ব্বক বিশেষ ভাবে করতে হবে বলেই তিনবার বলেছি। আমার নাম আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্তের অবলম্বন বলেই তিনবার বলেছি। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমার স্বরূপ জান্‌তে কেহ সমর্থ হবে না। সতত হরি হরি উচ্চারণে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান থাকবে না। জীব তখন অনায়াসে স্বরূপ জান্‌তে পারবে বলে—হরের্ণাম-হরের্ণাম-হরের্ণামৈব কেবলম্ তিনবার বলেছি।

অদ্বৈত বাদীর উপাসনা ত্রিবিধ—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। ইয়মুদ্গীথ ব্রহ্ম উপাসীত, ইহা—অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা। 'আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত' ইহা প্রতীক উপাসনা, 'সাঽহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি অহংগ্রহ উপাসনা। এই ত্রিবিধ উপাসক যে-গতি লাভ করবে, কলিযুগে হরিনাম করলে এই ত্রিবিধ উপাসনার লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে বলে—তিনবার বলেছি।

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগ স্বাধ্যায় মানয়েৎ।
স্বাধ্যায়যোগ সম্পত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥

সর্ব্বদা হরি হরি করা মহা স্বাধ্যায়। 'যোগ' প্রাণায়াম-মূলক ; ব্রহ্মচর্য্যহীন কলির জীব—পূরক, কুম্ভক, রেচক রূপ প্রাণায়াম করতে পারবে না। কেবল হরিনাম করলে রেচক, পুরক, কুম্ভক রূপ প্রাণায়াম করা যাবে বলেই তিন-বার বলেছি। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই তিন প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের একমাত্র অবলম্বন এই হরি নাম, সেই জন্য তিনবার বলেছি। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার। কলির প্রতাপে এই ত্রিবিধ কর্ম্ম যথাযথ—অনুষ্ঠিত হবে না। কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য—এই তিন প্রকার কর্ম্মের ত্রুটি—হরি নাম করলেই নষ্ট হবে বলে তিনবার বলেছি।

আমার পরমানন্দময় ভাব—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা ভক্ত অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করতে পারে। দারুণ কলিযুগে রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত, অল্পায়ু,মন্দবুদ্ধি জনগণের শ্রবণাদিজনিত জ্ঞান অনায়াসে লাভের জন্য এই মহামন্ত্র তিনবার বলেছি।

অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব ! তোমার এই আশ্বাসপ্রদ কথা শুনে আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি। আমার প্রাণ আনন্দে

পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেবল তোমার নাম করতে ইচ্ছা করছে।

শুধু ইচ্ছা করলে কি হবে, নাম কর্। বল-বল আরও বল—শোন—ধ্যান, ধারণা, সমাধি তিনটির একটি সন্নিবেশের নাম সংযম। এই সংযম সাধনায় জীবের দুঃখ নিবৃত্তি হয়। কেবল হরি হরি করলে জীব, ধ্যান, ধারণা, সমাধির ফল-লাভে সমর্থ হবে বলে তিনবার হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্ বলেছি।

আত্মার অবস্থা তিন; অস্তি-ভাতি-প্রিয়। কেবল হরি হরি করলেই এই তিন প্রকার অবস্থা প্রত্যক্ষ হবে বলেই তিনবার বলেছি।

ব্রহ্ম-স্বগত-স্বজাতীয়, বিজাতীয় এই তিন প্রকার ভেদ শূন্য। অবিরাম হরি হরি করলে এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কলির জীব সমর্থ হবে বলে তিনবার বলেছি।

কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিনটি মোক্ষপ্রাপক পথ। কলিযুগে এতে বিচরণ করা খুব কঠিন হয়ে উঠবে, পদে পদে ভুল হয়ে যাবে সেইজন্য কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত সকলের ত্রুটী সংশোধনের অদ্বিতীয় মহামন্ত্র হরিনাম—এইজন্য তিনবার বলেছি।

সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের এই তিন ভাব। সৎভাবে-সন্ধিনী ক্রিয়াশক্তি, চিৎভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে হয়—তাহা সম্বিৎ জ্ঞান শক্তি; আর আনন্দ ভাবের প্রকাশ-কারিণী শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি।

ব্রহ্মের এই তিন ভাব হরিনাম করলেই জান্তে পারবে বলে তিনবার বলেছি। কেবল নাম কর্। কোন দিকে চাস্ না, কিছুর জন্য ভাবিস্ না, আমি সব করে দিব।

আমি ধন্য হলাম। আমি কৃতার্থ হলাম। আমার হৃদয় বীণার তারে তোমার নাম অনুক্ষণ ধ্বনিত হোক। এই কর প্রভো! এই কর প্রাণেশ্বর? আমি আর কিছু চাই না, তোমার নাম যেন দিবারাত্র করতে পারি, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে যেন তোমার নামই আমার একমাত্র অবলম্বন হয়।

তাই হবে—তুই নাম কর্।
সীতারাম সীতারাম সীতারাম।
সীতারাম সীতারাম সীতারাম॥

খেলা-শেষের গান

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অনেক ত খেলা হ'ল—ক্ষান্ত হোক এবার কূজন,
বেলা যায় জীবনের রক্ত-রাঙা গোধূলি-লগনে;
অনেক দুরাশা নিয়ে স্বপ্ন-সাধে করেছি পূজন,
স্মরণেরে সাথী করি কল্পনার নিভৃত বিজনে।

গানে গানে ভরিয়াছি আকাশের ঘনকৃষ্ণ নীলে,
প্রাণে প্রাণে নিয়ে শুধু ভালবাসা কল্যাণ কামনা,
বিন্দু বিন্দু সমাহারে পুঞ্জীভূত আশা তিলে তিলে,
দিয়েছি বিলায়ে আমি লভিবারে প্রীতি এক কণা।
অনেক ত' বেলা হ'ল—এখনো কী
কিছু আছে বাকি,
অমৃতকুম্ভ হ'তে সুধাধারা করিতে বর্ষণ?
নিঃশেষিত পুঁজি মোর অবশেষ কিছু নাহি রাখি'
এখন শুধু কী হবে দিন গুণে চলা আমরণ!

আমি জানি মোর পানে তুমি হাস' করুণার হাসি—
তোমার উদ্বেল বুকে আজো জাগে দুরন্ত যৌবন,
থরো থরো কাঁপে দেহ—আঁখি কোণে কামনার রাশি—
আমার বিবাগী মনে আজি তার চির বিসর্জ্জন।

তবে কী হয়েছে শেষ?—আর কিছু প্রয়োজন নাই—
জন্ম হতে জন্মান্তরে এ দিনের পথচলা শেষ?
জীবনের পারে যদি বেলাভূমি খুঁজে নাহি পাই,
আসুক অকূল হ'তে অসীমের অজানা উদ্দেশ।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি তর্পণ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
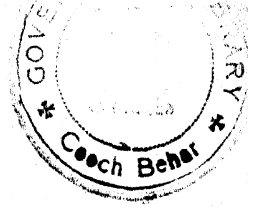
কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শততম জন্মদিবস এখন উপস্থিত। দেশের মানুষ তাঁর কথা স্মরণ ক'রে সর্বত্র শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এই দীর্ঘ নিরনব্বই বছরের মধ্যে তাঁর জীবন কাল অধিকার করেছিল মাত্র পঞ্চাশ বছর। বাঙালীর দুর্ভাগ্য তিনি দীর্ঘায়ু হননি। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই তিনি চাকুরী জীবন হতে অবসর গ্রহণ ক'রে সাহিত্যজীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা স্থাপন ক'রে স্বহস্তে তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবেন, এই হয়েছিল ব্যবস্থা। ১৩২০ সালের পয়লা আষাঢ় 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হবার কথা। তার নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক গানটিও রচনা ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। তাঁর মানস-কন্যার তিনি নামকরণ ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

এই ঘটনাটি সত্যই বাঙালীর দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি যদি আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাহিত্য জীবনের আর একটি নূতন অধ্যায় রচিত হয়ে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করত। সে সৌভাগ্য হতে বাঙালী বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সম্ভবত তাঁর আশীর্ব্বাদলাভে তাঁর মানস কন্যা 'ভারতবর্ষ' বঞ্চিত হয়নি। তা না হলে 'ভারতবর্ষ' সাহিত্য জগতে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কেন? একটি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা হিসাবে তা সগৌরবে আজ পঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরটি তার স্বর্ণ জয়ন্তী বৎসর হিসাবে প্রতিপালিত হবার ব্যবস্থা হয়েছে। যাঁর আশীর্ব্বাদে এতখানি হয় তাঁর স্বহস্তের সেবা পাবার সৌভাগ্য ঘটলে আরও কতখানি না হত!

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে ১৯০৩ সালে। এই ঘটনার পূর্ব্বে ও পরে তিনি যা রচনা করেছিলেন তার বিশেষ রকম প্রভেদ দেখা যায়। স্ত্রীবিয়োগের পূর্ব্বে তিনি গীতি-কবি। তিনি আর্য্যগাথার মন্ত্রের লেখক-রূপে সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাব্যশক্তি রবীন্দ্র-নাথেরও সপ্রশংস মন্তব্য অর্জ্জন করেছিল। আরও বড় কথা তিনি বাংলা সাহিত্যে হাসির গান রচনা ক'রে বাঙালীকে এক নূতন রসরচনার আস্বাদ দিয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে পরশুরামি রচিত শ্লেষাত্মক গল্পের মতই তা বিস্ময়কর রসরচনা। তিনি হাসির গানের রাজা বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর দেখি—তিনি আর হাসির গান রচনা করেন না, তিনি গীতিকাব্যে বিশেষ নজর দেন না। তিনি এখন বিখ্যাত নাট্যকার। নূতন ধরণে, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বিভিন্ন নাটক তাঁর লেখনী হতে নিঃসৃত হয়ে আসে। তাও বাঙালীর মনকে মুগ্ধ করে, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে তা দর্শকের আনন্দবর্দ্ধন করে। নাটকের গানগুলি বাঙালীর নূতন জাগ্রত দেশপ্রেমকে পুষ্টি দান করে। যিনি ছিলেন কবি, তিনি হলেন নাট্যকার। এই মন্তব্যের সামান্য ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু তা মোটামুটি সত্য।

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূল কারণ সম্ভবত তাঁর স্ত্রীবিয়োগের দুঃখ। তিনি যে তাঁর সহধর্ম্মিণীকে নিবিড়-ভাবে ভালবাসতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। স্ত্রী-বিয়োগের অব্যবহিত পরেই তিনি একটি কবিতা রচনা করেছিলেন যার সহিত বাঙালী সাহিত্যরসিক পরিচিত। তার প্রথম কয়েকটী পদ হল এইরূপ :

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য ক'রে অর্দ্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চলে যারে সুখের রাজ্য, দুখের রাজ্য নেমে আয়
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়।

যাঁকে ঘিরে তাঁর হাসির গানগুলি রচিত হয়েছিল তাঁর আকস্মিক তিরোধান তাঁর মনে কি বিপর্য্যয়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল, তা এই উক্তিগুলি হতে হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যই তিনি তারপর হতে হাসির গানকে বর্জ্জন করেছিলেন।

আজ প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী নীরব হয়ে গেছে। তারপর কত কাল কেটে গেছে। দেশের মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আজ বোধ হয় অনায়াসে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর মোটামুটি সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা যায়। তিনি হাসির গানের রচয়িতা হিসাবে এবং উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবার অধিকারী। রবীন্দ্রযুগের মধ্যে জন্মলাভ করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে যে কয়জন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম।

তাঁর হাসির গানের মধ্যে তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। একশ্রেণীর হাসির গান আছে যা শ্লেষাত্মক। আর এক শ্রেণীর হাসির গান অনুকরণাত্মক ব্যঙ্গরচনা। আরও এক শ্রেণীর হাসির গান পাই, অবিমিশ্র কৌতুকই হল যার প্রেরণা।

শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যা ঘৃণ্য, যা দোষণীয়, যা কৃত্রিম—তার জন্য তাঁর সাহিত্যিক সম্মার্জ্জনী নিয়তই উদ্যত থাকত। যেখানে কৃত্রিম ও নিন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করতেন সেখানেই মার্জ্জনাহীন হস্তে সেই সম্মার্জ্জনী তিনি প্রয়োগ করতেন। এ কবিতা শুধু হাসায় না, উপহাস ক'রে সমাজের হীনবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মম আঘাত হানে। এ শুধু অকারণে পরনিন্দার ব্যসন নয়। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল চরিত্র সংশোধন। কবি তাঁর একটি বচনে সে কথা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

ব্যঙ্গ কবি আমি? ব্যঙ্গ কবি শুধু?
নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না, আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি আমি নকলে।

তাঁর শ্লেষের মাধ্যমে এই ভর্ৎসনা-রীতি অনন্যসাধারণ। পরশুরামের গল্পগুলির মতই তা নূতন সৃষ্টি। উভয়ের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও একই ধরণের। পার্থক্য কেবল রচনার রীতিতে। একটি কবিতায় লেখা, অপরটি গদ্যে। হাসির কবিতার লক্ষ্য বস্তু অনেকেই ছিলেন। মেকি স্বদেশপ্রেমিক, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহিরের আচার-ব্যবহার ও পোষাকের অন্ধঅনুকরণকারী বিলাত-ফেরত বাঙালী সাহেব, মেকি ধার্ম্মিক—কেহই তাঁর আক্রমণ হতে অব্যাহতি পায়নি।

এই সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বিষয়টি একাধিক দিক হতে চিত্তাকর্ষক। এক দিকে এটি তাঁর শ্লেষাত্মক হাসির গানের একটি ভাল উদাহরণ। অপর দিকে যা আক্রমণের বিষয়, সে দোষ আমাদের সমাজ জীবনে এখনও বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তা ঐতিহাসিক বিষয় নয়, তার এখনও প্রয়োগ ক্ষেত্র মিলবে। এখানে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু আমরা সাধারণত যে ভাষা ব্যবহার করি তাই। আমরা বাংলা সাহিত্যের গর্ব্ব করি বটে, কিন্তু এখনো বিশুদ্ধ বাংলা বলতে শিখিনি। ইংরেজি ভাষার প্রভাবে আমরা এক প্রকার খিচুড়ি ভাষা প্রয়োগ করি, যা না ইংরেজি, না বাংলা। তা ইংরেজি ও বাংলা ভাষার অদ্ভুত মিশ্রণ। ফলে আমাদের কোনো ভাষাটির ওপর ভাল রকম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং কোনো ভাষাতেই অপর ভাষার শব্দ প্রয়োগ না ক'রে ভাব প্রকাশ করতে পারিনা। এই বিষয়টি লক্ষ্য ক'রে তিনি একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। তার ভাষাও বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে খিচুড়ি ভাষা। ভাব বহনের উপযুক্ত ভাষা বটে। তার একটি পংক্তি নীচে উদ্ধৃত করা হল:

আমাদের ভাষা একটু quaint as you are
এ নয় English কি Bengali।
করি English ও Bengalir খিচুড়ি বানিয়ে
Conversationএ use;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি, if you think
ত'লে you are an awful goose.

তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর হাসির রচনা অনুকরণাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা। দুর্ভাগ্যক্রমে এর প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উভয়েই সমকালীন কবি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মাত্র দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। এটি উভয় কবির জীবনের এক অপ্রীতিকর অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রথম অংশে একাধিক শক্তিমান সাহিত্যিক তাঁর প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও 'সাহিত্যে'র সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন অন্যতম। এদের প্রতিকূল সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের মনে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছিল।

তবে আমরা যদি মনে রাখি—সাহিত্য জীবনে প্রতিভাবান কবির ভাগ্যে এমন ঘটে থাকে, তা হলে গ্লানি অনেক কমে যায়। সত্যই শক্তিমান লেখকের ভাগ্যে এমন ঘটে থাকে। অন্য সাহিত্যেও এর উদাহরণ আছে। এই সম্পর্কে আমরা ইংরেজ কবি Wordsworth এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিও প্রতিভাবান কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁরও সমকালীন সমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি কবিতার ওপর তার প্রভাব অবিস্মরণীয়। পোপ ও ড্রাইডেনের যুগের কৃত্রিম বাকপটুতাই তাঁর পূর্ব্বে পাঠকের মন অধিকার ক'রে বসেছিল। সুতরাং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কৃত্রিমতামুক্ত সরল রচনারীতি সমালোচক সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁকে নিয়েই সে সময় ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হয়েছিল। ভাল জিনিষও অপরিচিত হলে প্রথমে সহজে অনুমোদন লাভ করে না। তাকে গুণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সত্যটি ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "যে কোনো লেখকের,- যে পরিমাণে তিনি গুণী হন, সেই পরিমাণে, কর্ত্তব্য এসে পড়ে সেই রুচিবোধ গড়ে তোলবার —যা দিয়ে তাঁর রচনা উপভোগ করা যায়। পূর্ব্বেও এমন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও এমন ঘটবে।" ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এই তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি খুবই সত্য এবং ভবিষ্যদ্বাণী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিকই ফলেছিল। কারণ তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় শ্রেণীর ব্যঙ্গ কবিতার অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এখানে অবিমিশ্র কৌতুক বোধই প্রেরণা। এর মধ্যে শ্লেষের আঘাত নেই, অপরের মনোবেদনা সৃষ্টি করবার মত কোনো দাহিকা শক্তি নেই, এ শুধু অবিমিশ্র আনন্দ পরিবেশন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা, 'পার ত জন্মোনাক বিস্মৃত বারের বার বেলায়,' এই শ্রেণীর কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় ভাগের বৈশিষ্ট্য হল—সেটি তাঁর নাট্য রচনার যুগ। এই সময় তিনি বহু নাটক রচনা করে গিয়েছেন। সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটকও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় ঐতিহাসিক নাটকগুলি বেশী। এদের মূল প্রেরণা দেশাত্মবোধ। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলি ছিল তাদের বিষয়বস্তু। রাজপুতকাহিনীগুলিই তার মনকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। তার কারণ শৌর্য্য, বীর্য্য, দায়িত্ব-বোধ এবং অপূর্ব্ব সাহসিকতার দৃষ্টান্তে তা সমুজ্জ্বল। এই সম্পর্কে তাঁর 'রাণা প্রতাপ', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পথপ্রদর্শক। তিনি এক সময় ক্ষোভ ক'রে বলেছিলেন যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও অসীম সাহসিকতার দৃষ্টান্ত খুঁজতে আমরা বিদেশের ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়ে থাকি। গ্রীকদের থারমোপাইলির কাহিনী আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমাদেরই দেশের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই তত্ত্বটি প্রতিপাদন করতেই তিনি রাজসিংহ উপন্যাসটি রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যে নাট্যগুলি লিখে গেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের রত্ন হয়ে থাকবে। বাঙালীর নবজাগ্রত দেশাত্মবোধকে প্রেরণা দিয়ে শক্তিশালী করেছিল নিশ্চিত। বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তা পরোক্ষভাবে কাজে লেগেছিল।

এই হলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি যে বিশেষ ক্ষমতাবান লেখক ছিলেন, তার স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে নিশ্চিত তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন। তার হাসির গান ও তাঁর ঐতিহাসিক নাটক-গুলি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদ হয়ে বিরাজ করবে। তাঁর জন্ম শতবার্ষিক উৎসব যেন তাঁর সাহিত্যের স্থায়ী প্রচারের ব্যবস্থা ক'রে সার্থক হয়ে ওঠে।

পুনর্জন্ম

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

সেদিন শিবশঙ্কর ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হলাম। চৌকাঠ পেরবার আগেই তাঁর পুরাতন ভৃত্য জানাল—আজ দেখা হবে না।

কেন?

বাবুর মন আজ ভয়ানক খারাপ, কারও সঙ্গেই দেখা করবেন না।

সম্পাদক, প্রকাশকরা কি খুব বেশি জ্বালাতন করছেন?

জানি না।

তবে কি কোন নতুন লেখা মাথায় আসছে না?

তাও জানি নে।

তবে?

আপনি অন্যদিন আসবেন—বলে ভৃত্য অন্তর্হিত হল।

শিবশঙ্কর ত্রিবেদীর নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল। বত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি এই সম্মানের আসন পেয়েছেন। আজ হিন্দীর গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতে তাঁর নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ তাঁর সাম্প্রতিক রচনাগুলি। উপন্যাস ছেড়ে তিনি এখন গোয়েন্দা কাহিনী লিখছেন। তাঁর অনেকগুলি সিনেমা হয়েছে, বাকি বইগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। ত্রিবেদীজী তাঁর বইএর জন্যে এখন তারকা পছন্দ করে দিচ্ছেন।

ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ছিপছিপে ছোটখাট চেহারার মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তাঁর নাম আমি জানি না। কিন্তু তাঁকে প্রিয়দর্শীর সঙ্গে অনেকবার দেখেছি। তাঁরই সহকারী।

প্রিয়দর্শীর পরিচয় আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। ত্রিবেদীজী তাঁর সকল বইএ এই ভদ্রলোককেই অমর করে গেলেন। আসল নাম আমি জানি না, জানবার চেষ্টাও করি নি। ভদ্রলোক সরকারী চাকরি করেন। গোয়েন্দা বিভাগেরই চাকরি। ব্যক্তিগত জীবনের ত্রিবেদীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করেন, নানা অভিজ্ঞতার গল্প বলেন। বস্তুত এঁরই সাহায্য পেয়ে ত্রিবেদীজী নূতন নূতন রহস্য কাহিনী তাঁর পাঠকদের পরিবেশন করছেন।

এই সহকারী ভদ্রলোককে ত্রিবেদীকে মাষ্টার বলে ডাকেন, আমিও তাঁকে মাষ্টার নামেই চিনি। খুব সন্তর্পণে তিনি গেট খুলে ভিতরে ঢুকলেন। কাছে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম, বললাম: কেমন আছেন মাষ্টার?

মাষ্টার খুবই অন্যমনস্ক ছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন: ভাল। ত্রিবেদীজী বাড়ি আছেন?

আছেন। কিন্তু দেখা হবে না।

কেন?

তাঁর মন আজ ভয়ানক খারাপ, কারও সঙ্গেই দেখা করবেন না।

আমার সঙ্গে করবেন।

কেন?

সে আপনি বুঝবেন না। ওরে, ও—

ভৃত্য নিকটেই ছিল। বেরিয়ে এসে বলল: বসুন, বাবুকে খবর দিচ্ছি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল: আপনি এখনও অপেক্ষা করছেন!

উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করে নি। তবু বললাম: ছুটি

দিনে একটু বসব বলেই তো এসেছিলাম, আমার আর তাড়া কিসের!

আমার কথা মাষ্টারের কানে বোধহয় গেল না। তিনি একখানা বেতের চেয়ারে বসে পকেট হাতড়ে নোটবুক বার করলেন। মুখ অত্যন্ত থমথমে, দৃষ্টি অন্যমনস্ক, কিছু বিষণ্ণ, বোধহয় উদ্বিগ্ন। গভীর মনোযোগে নোটবুকের আঁক জোক পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আমিও একখানা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলাম: আজ প্রিয়দর্শী কোথায়?

মুখ না তুলেই মাষ্টার বললেন: কে?

আপনার বস্ প্রিয়দর্শী।

কিন্তু ভদ্রলোক এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না। তার আগেই ত্রিবেদীজী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন: বাইরে কেন, ভিতরে এস।

তাঁকেই অনুসরণ করে আমরা বসবার ঘরে এসে বসলুম।

ত্রিবেদীজী আমাকে বললেন: আপনি!

সসঙ্কোচে আমি বললাম: আজ ছুটির দিন, ভাবলাম—

কথাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন: বেশ করেছেন, ভাল করেছেন। তারপর মাষ্টার, কী খবর এনেছ বল।

মাষ্টার বলল: লাস মর্গে পাঠানো হল।

কার লাস?

আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠব কিনা ভাবছিলাম। উত্তরটা শুনে আর বসে থাকতে পারলাম না। মাষ্টার বললেন: আপনি খবর পান নি?

এই ঘরে এই রকমের পরিবেশের ভিতর আমি অনেক খুনোখুনির গল্প শুনেছি। অনেক লাস আমরা মর্গে পাঠিয়েছি ময়না তদন্তের জন্য। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যেন গোড়া থেকেই অন্য রকম মনে হচ্ছে। তাই চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: না তো!

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাষ্টার বললেন: বস্ বেঁচে নেই।

বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই দেখে ত্রিবেদীজী বললেন: খেয়ে দেয়ে প্রিয়দর্শী নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিল, সকালে তাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

প্রিয়দর্শীর বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। সুস্থ সবল-স্বাস্থ্য দৃঢ় কর্মঠ। তার এমন আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল।

ত্রিবেদীজী বুঝতে পারলেন যে এ কথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই বললেন: সকালবেলায় আমিও এ সংবাদ বিশ্বাস করি নি, এখনও আমার সন্দেহ দূর হয় নি। যে মানুষ অত্যন্ত সাবধানী তাঁর মৃত্যু এমন সহসা হয় না। মাষ্টার তাঁকে সমর্থন করে বললেন: দোতালার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুতেন, জানালা থেকে অনেকটা দূরে তাঁর খাট। মজবুত গরাদ। বাইরে থেকে তাঁকে আক্রমণ করা একেবারেই অসম্ভব।

ততক্ষণে আমি বসে পড়েছিলাম। বললাম: অমন ভদ্রলোককে কেউ আক্রমণ করতে আসবে কেন!

আমার কথা শুনে ত্রিবেদীজী হাসলেন। বললেন: আপনি একান্ত ছেলেমানুষ আছেন।

লজ্জিত হয়ে বললাম: কেন বলুন তো?

মাষ্টার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, বললেন: আমাদের জীবন সারাক্ষণ বিপন্ন। একটা খুনের আসামী যখন খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন খুনেরাও আমাদের চোখে চোখে রাখছে। সুযোগ পেলে আমাদেরই খুন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে।

সত্যি কথা।

ত্রিবেদীজী বললেন: এবারে, কী খবর এনেছ তাই বল।

খবর যথাসাধ্য সংগ্রহ করেছি। ডাক্তার ভাটনগর বলছেন যে শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, বিষের ক্রিয়ারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বাধা দিয়ে ত্রিবেদীজী বললেন: এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেও মনে করা উচিত নয়। তার কারণ প্রধানত এই যে—প্রিয়দর্শীর কোন রোগ ছিল না, রাতে কোনও কষ্ট বোধ হয়ে থাকলে ডাক্তারকে খবর দেওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না।

তা বটে, রাতে টেলিফোনটা তাঁর বিছানার পাশেই থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এ ছাড়াও কি কোন কারণ আছে?

আছে বৈকি। এরা যে কেসটা হাতে নিয়েছিল, তা অতি জটিল ঘটনা। খুনের রহস্যটা ধরা পড়লে সমস্ত দেশের মুখে চুণকালি পড়ত।

বলেন কি!

এখন আর বলতে আপত্তি নেই। লোকটাকে তো মেরেই ফেলল, এবারে সব কিছু ধামা চাপা পড়বে। তাই না মাষ্টার?

ভয়ে ভয়ে মাষ্টার বললেন: আপনার সন্দেহের কথা শুনেই আমার সাহস ফুরিয়ে গেছে। বসের প্রতি আমার শেষ কর্তব্যটুকু চুকে যাক, আমি ছুটি নিয়ে দেশে যাব।

আরও কর্তব্য আছে?

অবিবাহিত মানুষ, তাঁর আত্মীয় স্বজনেরও খবর জানি নে। মর্গ থেকে লাস ফিরে পেলে মুখাগ্নিটা আমিই করব। তারপর গয়ায় একটা পিণ্ড দিয়ে ছুটি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাদের নতুন কেসটা কী?

খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন। থানার একজন অফিসার রাতে ডিউটিতে বেরিয়ে খুন হয়ে গেলেন। এমন পরিশ্রমী সাহসী সৎ অফিসার নাকি অনেক দিন দেখা যায় নি। দূরে একটা জায়গায় রেলের গাড়ি থেকে নানারকমের মাল পাচার হত। সেইটে ধরতে গিয়েই জীবনটা গেল।

এই কেস জটিল বলছেন কেন?

জটিল এইজন্যেই বলছি যে কুকুর লাগিয়ে খুনের জায়গাটা নাকি খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছিল। সে এমন অভিজাত স্থান যে পুলিস সেখানে কিছুতেই মাথা গলাল না। নিন্দুকেরা বলল যে, এর সঙ্গে পুলিশও জড়িয়ে আছে।

মাষ্টার বললেন: আমরা অত্যন্ত গোপনে এই কেসের অনুসন্ধান করছিলাম।

ত্রিবেদীজী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন: নানা, প্রিয়দর্শীর প্রতি আমরা অন্যায় করছি। তার মৃত্যুই আমরা স্বাভাবিক বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তুমি কী খবর এনেছ বল।

মাষ্টার বললেন: প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই স্বাভাবিক। সময় মতো খেয়েছিলেন, বেয়ারা খানসামাকে ছুটি দিয়ে নিজের শোবার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিলেন, যেমন প্রতিদিন করেন। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়েছিলেন।

এ খবর কে দিল?

তাঁর বেয়ারা। সে নিচের তলার বারান্দায় শোয়। কোলাপ্‌সিবল গেটের ভিতরে। তার মাথার উপরে মনিবের ঘরে আলো জ্বললে সে শুয়ে শুয়েই দেখতে পায়, খোলা জানলা দিয়ে সেই আলো এসে নিচের বাগান ও ফুলগাছের উপরে পড়ে।

তারপর?

রাতে সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল, কোন সাড়াশব্দ পায় নি। ভিতরে বাইরে কোন শব্দ হলে তার ঘুম নিশ্চয়ই ভাঙত।

উদ্বিগ্নভাবে এবারে আমি বললাম: তারপর?

তারপর সকাল হল। খানসামা বেডটী নিয়ে উপর থেকে ফিরে এল, সাহেব দরজা খোলেন নি। এ রকম আগেও দুএকবার হয়েছে। বেশিক্ষণ রাত জাগলে সকালে উঠতে তাঁর দেরী হয়। তখন বেডটীর বদলে একেবারে ছোট-হাজরি খান। কাজেই খানসামা ছোট-হাজরি তৈরি করে নিচে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগল। বেলা বাড়তেই বেয়ারার সন্দেহ হল। ঠিক এমনটি কখনও হয় না, এত বেলা পর্যন্ত তিনি কখনও ঘুমোন না। এমনকি কোন দিন শেষ রাতে বাড়ি ফিরলেও সময় মতোই উঠে পড়েন, দরকার হলে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে দুপুরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেন।

আমি সোজা হয়ে বসেছিলাম। মাষ্টার বললেন: শেষ পর্যন্ত সাহস করে বেয়ারা দরজায় ঘা মারল, কান পেতে অপেক্ষা করল, খানিকক্ষণ, তারপর আবার আঘাত, আবার অপেক্ষা। একে একে খানসামা এল, মালি এল। তারা তিনজনে মিলে পরামর্শ করল। টেলিফোন সাহেবের ঘরে, ব্যবহার করার উপায় নেই। পাশের বাড়ী গিয়ে আমার নাম তারা বলতে পারল না। কাজেই থানায় খবর দিল। দারোগা এসে দরজা ভাঙল।

তোমাকে কে খবর দিল?

দারোগা নিজে।

আপনাকে?

আমি প্রশ্ন করলুম ত্রিবেদীজীকে।

আমার উত্তর মাষ্টার দিলেন তৎপরভাবে: ওঁকে আমি খবর দিয়েছি। বসের টেলিফোনেই দিয়েছি।

ত্রিবেদীজী বললেন: কিছু বাদ দিও না, পর পর সব কথা বলে যাও।

মাষ্টার বললেন: আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এসেছিলুম। খবর পাবার পর বসের বাড়ি পৌছতে আমার দশ মিনিটও সময় লাগে নি। দারোগা তখন একখানা চেয়ারে বসে চুরট টানছিলেন। আমাকে বললেন, ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে বস বেঁচে নেই। প্রশান্ত সৌম মুখে শুয়ে আছেন, শান্ত স্থির দৃষ্টি। কোন আঘাতের দাগ নেই, কোন কষ্টের চিহ্ন নেই।

বাধা দিয়ে ত্রিবেদীজী বললেন: হ্যামলেটের পিতার মৃত্যু হয়েছিল কী করে জান।

না।

সে কথা কেউ জানত না। বৃদ্ধের অশরীরী আত্মা এসে হ্যামলেটকে বলেছিল যে তার কাকা তাঁকে খুন করেছে। তিনি যখন ঘুমচ্ছিলেন, তখন এক রকমের বিষ তাঁর কানে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।

আমারও এ গল্প মনে পড়ে গেল। হ্যামলেট বই আমি পড়ি নি, সিনেমায় ছবি দেখেছিলাম।

ত্রিবেদীজী বললেন: আরও মারাত্মক কথা আমার জানা আছে। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ি ঈষ্ট বেঙ্গলে। তিনি এক দিন আমায় গল্প বলছিলেন যে তাঁর দেশে এক অদ্ভুত উপায়ে মানুষ খুন হয়। একটা জাত আছে, তারা বিষ-দাঁতওয়ালা সাপ সামলাতে পারে। মোটা টাকা পেলে তারা ঘুমন্ত মানুষের গায়ে সাপের ছোবল মারার ব্যবস্থা করে থাকে।

বলেন কি!

আমরা শিউরে উঠলাম।

ত্রিবেদীজী বললেন: তবেই দেখ, এই রকমের একটা মৃত্যুকে আমরা কী করে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করি!

আমি বললাম: বটেই তো।

ত্রিবেদীজী বললেন: ঘরের ভিতর আর কী লক্ষ্য করেছ বল।

দক্ষিণের দুখানা জানালাই খোলা ছিল, রাস্তার দিকের জানালা। জানালা থেকে খাট অনেকটা দূরে।

মাপ এনেছ?

মাপবার সাহস পাই নি।

কেন?

এই মৃত্যুরও অনুসন্ধান করব জানলে আজকেই আমাকে নিখোঁজ করে দেবে।

দারোগা চলে যাবার পর তো মাপটা নিতে পারতে।

সেই জন্যেই এতক্ষণ বসেছিলাম। কিন্তু যাবার সময় একটা পুলিশকে ঘরের চৌকাঠে বসিয়ে গেল।

কেন?

সে তারাই জানে।

তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

বলে ত্রিবেদীজী উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন: যাবেন নাকি?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: প্রিয়দর্শীর বাড়ি?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ত্রিবেদীজী ভিতরে চলে গেলেন। গাড়ি বের করার হুকুম দিয়ে বেরবার জন্যে তৈরি হলেন। ফিরে এসে বললেন: আসুন।

আমি আপত্তি করার অবকাশ পেলামনা। সুড় সুড় করে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

শিবশঙ্কর ত্রিপাঠীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প দিনের নয়। যে যুগে তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে লিখেও দেশের জনসাধারণের নিকট অভিনন্দন দূরের কথা কোন প্রশংসাই লাভ করেন নি, সেই যুগে আমি তাঁর বৈঠকখানায় প্রথম এসেছিলাম। তাকে বৈঠকখানার বদলে অন্ধকূপ বললে বেশি মানাত। দিল্লীতে যে অমন অন্ধকার গলি আছে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল।

তখন আমি হিন্দী জানতাম না। যে বন্ধুর সঙ্গে আমি তার কাছে এসেছিলাম, সে তার ভক্ত ছিল। তার কাছেই আমি ত্রিবেদীজীর সাহিত্যকর্মের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলাম। সে বলত যে দেশের লোকের রুচি বদলালেই এই মানুষটি তাঁর যোগ্য সমাদর পাবেন।

কিন্তু দেশের লোকের রুচি বদলাল না দেখে ত্রিবেদীজী

নিজেই তাঁর রুচি বদলালেন। চিরাচরিত পথ ছেড়ে তিনি গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে শুরু করলেন। বললেন, সাহিত্যের এই বিভাগটি এ দেশে অস্পৃশ্য হয়ে আছে, যোগ্য লোকের হাতে পড়লে এও মহৎ সাহিত্য হতে পারে।

অল্প দিনেই তিনি তা প্রমাণ করলেন। দেশের লোক যেন চাতক পাখির মতো তৃষ্ণার্ত ছিল। দেখতে দেখতে তাঁর বইগুলি সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। সিনেমা হল। তাঁর যে উপাখ্যানগুলি এতদিন বই-এর দোকানে পোকায় কাটছিল, তারও পুণর্মুদ্রণ হল। দেশের লোক বুঝে দেখল যে শিবশঙ্কর ত্রিবেদী একজন শক্তিশালী লেখক। সাহিত্য আকাদমীও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হল।

কিন্তু একজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারাল। আমার যে বন্ধু আমাকে তাঁর কাছে প্রথম এনেছিল, সে আর এল না। বলল আমি আর যাব না। ঐ অন্ধকূপ গলিতে তিনি যদি অনাহারে মরে থাকতেন, আমি একা তাঁকে কাঁধে করে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যেতাম, তারপর নিজের ঘরে পূজা করতাম প্রতি দিন।

আমি বলেছিলাম, তুমি অকারণে রাগ করছ। আজও তো তিনি সাহিত্যসেবী। সে বলেছিল, এ সাহিত্য সেবা নয়। নূতন দেশনেতাদের মতো আপন স্বার্থে জনসাধারণের সেবা। আমি আত্মহত্যা করে বেশি আনন্দ পেতাম।

কিন্তু আমি তাঁকে ত্যাগ করিনি। গলির বাড়ি থেকে তিনি এই প্রাসাদে উঠে এলেন। আমিও এলাম। দুর্দিনের বন্ধু বলে আমাকে তিনি ছেঁটে ফেলতে পারেন নি। আমি এখনও নিয়মিত যাতায়াত করছি।

আমরা তিন জনেই গাড়ির পিছনে বসেছিলুম। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। ত্রিবেদীজী বললেন : এই মৃত্যুর রহস্য আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।

মাষ্টার কোন উত্তর দিলেন না। আমি তাঁর দিকে চেয়ে বললাম : মনে হচ্ছে আপনাদের নতুন কেসটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে।

ত্রিবেদীজী বললেন : আপনিও তাই সন্দেহ করছেন তো!

খুবই সন্দেহের কথা।

ত্রিবেদীজী বললেন : আমার মনে হয়না যে পুলিশ সে খুনের রহস্যটা অজ্ঞাত আছে। বরং জেনে শুনে তা চা[illegible] দেবার চেষ্টা করচে বললে হয়তো মিথ্যা বলা হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি তাই মনে করেন?

আমি শুনেছি, সেই অফিসারটি সেদিন রাতে থান[illegible] নিজের গতিবিধি লিখে রেখে দুজন কনস্টেবল নি[illegible] বেরিয়েছিলেন। প্রথমে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলেন, অনে[illegible] দূরে গিয়ে সেটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন, কনস্টে[illegible] দুজনকেও ছেড়ে দেন। তারপর তিনি যেখানে যান [illegible] সন্দেহ করা গেছে, কিন্তু কী করে খুন হন তা জা[illegible] যায় নি। কিন্তু একটা বিষয়ে কেউ গুরুত্ব না দিলেও প্রি[illegible] দর্শীর দৃষ্টি তা এড়ায় নি। সেই অফিসারটির লাস পাও[illegible] গিয়েছিল তৃতীয় দিন সকাল বেলায়, কিন্তু এ সম্বন্ধে পুলি[illegible] এর আগে কোন অনুসন্ধান করে নি। এই খবরটি প্রি[illegible] দর্শী সেই মৃত অফিসারের স্ত্রীর কাছে পেয়েছিল। সকা[illegible] স্বামীকে ফিরতে না দেখে সে মহিলা থানায় এসেছিলে[illegible] একবার নয়, কয়েকবার। কোনবারই তারা তেমন আগ্[illegible] প্রকাশ করে নি। এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন অনুসন্ধানে[illegible] কিছু নেই।

আমি দেখলাম, মাষ্টার বড় অস্বস্তি বোধ করছেন, কি[illegible] কোন কথা কইলেন না।

ত্রিবেদীজী বললেন : প্রিয়দর্শী এইখান থেকেই অনুসন্ধা[illegible] শুরু করেছিল। আমার মনে হয় তার আরও বেশী সত[illegible] হওয়া উচিত ছিল।

কেন?

বোধহয় জানেন যে আজকাল দেশের সর্বত্র যে স[illegible] চুরি হচ্ছে তা চোরেরা করেনা।

তবে?

যারা চুরি করে তারা সব ভাড়াটে লোক। অনে[illegible] পয়সাওয়ালা ব্যবসাদার লোক সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠি[illegible] আছেন। তাদেরই এক আধজন ভাড়াটে লোক পোষে[illegible] রাতের কারবারের জন্য। চারি দিকের আট ঘাট বাঁধ[illegible] শেয়ারের কারবার। যারা চুরি করে তারা মজুরি পায় মা[illegible] পিছু। যেমন জিনিষ তেমনি মজুরি। পথে হাতও বা[illegible] লায় অর্থাৎ কেউ চুরি করে মাল বার করে, কেউ ব[illegible]

নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তোলে, ছোট গুদাম থেকে বড় গুদামে পৌছায় অন্য লোক। যার যেমন কাজ, তার তেমন মজুরি। এও একটা ব্যবসা। এদের চোর বললে ভুল বলা হবে।

এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে ত্রিবেদীজী বোধহয় ঠিকই বলেছেন। আমরা যাদের পকেটমার বলি, তারাও পকেটমার নয়। তারাও ভাড়াটে লোক। তাদেরও দলপতি আছে শুনেছি। তারই কাছে সব জমা হয়, যার যা প্রাপ্য সেই তা ভাগ করে দেয়।

ত্রিবেদীজী বললেন: এই ব্যবস্থার কেন প্রয়োজন হয় তাও বলি। সে আত্মরক্ষার জন্য। ধরা পড়লে কে বাঁচাবে, বা ধরা পড়বে না এই আশ্বাস কে দেবে। থাক এসব কথা, এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা সেই অফিসারের মৃত্যুটা একটা পরিকল্পিত হত্যা বলে ধরে নিতে পারি। তার পিছনে যে ক্ষমতাশালী লোকের হাত আছে, তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। না থাকলে পুলিশ এই খুনটা এত অবহেলা করত না। অন্তত নিজেদের একজন খুন হয়েছে বলে চেষ্টার কোন ত্রুটি করত না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এ কেস প্রিয়দর্শীর হাতে কী করে এল?

ত্রিবেদীজী মাস্টারের মুখের দিকে তাকালেন—

মাস্টার বললেন: মনে হয় সেই অফিসারের বিধবা স্ত্রী এসে তার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

ত্রিবেদীজী বললেন: এইবারে বুঝতে পারছেন, কী দুঃসাহসের কাজে প্রিয়দর্শী হাত দিয়েছিলেন!

মাষ্টারের মুখে কোন কথা যোগাল না।

আমি বললাম: তাইতো দেখছি।

আমরা যখন প্রিয়দর্শীর বাড়ি পৌছলাম, তখন মাষ্টারকে বড় কাতর দেখাচ্ছিল। আমরা দুজনে নামবার পরেও তিনি গাড়িতে বসে রইলেন। ত্রিবেদীজী বললেন: ব্যাপার কী?

মাষ্টার কোন রকমে বললেন: বড় অসুস্থ বোধ করছি।

অসুস্থ! তবে থাক, তোমাকে নামতে হবে না।

আমি বরং বাড়ি চলে যাই।

সেই ভাল। ড্রাইভার, সাহেবকে পৌছে দিয়ে এস।

আমরা প্রিয়দর্শীর বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম।

প্রিয়দর্শীর বেয়ারা ত্রিবেদীজীকে চিনত। নমস্কার করতে গিয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলল। ত্রিবেদীজী তাকে অনেক কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয়দর্শীর গত কয়েক দিনের খবর নিলেন। তারপর মাষ্টারের সম্বন্ধে প্রশ্ন শুরু করলেন। কাল কখন এসেছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন, আজ কখন এসেছেন, ইত্যাদি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি—

তাঁর চোখের দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তিনি বাধা দিয়ে বললেন: বিচিত্র কিছুই নয়।

এই মন্তব্য শুনে আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। মাষ্টার মানুষটিকে তো আমরা কম দিন থেকে জানি না, প্রিয়দর্শীর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘোরেন। কে একজন তামাসা করে একদিন বলেছিল, প্রভুভক্ত কুকুর। মাষ্টার রাগ করেন নি। হেসে বলেছিলেন, এ আমার প্রশংসা হল। কুকুরই সবচেয়ে প্রভুভক্ত হয়। প্রিয়দর্শীর ব্যবহারেও মনে হয়েছে যে, এই মানুষটিকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। শুনেছি নিজের পরিবার ছিল না বলে তিনি মাষ্টারের পরিবারকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন। ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচও বোধহয় দিতেন। সেই মাষ্টারের সম্বন্ধে এই রকমের একটা সন্দেহের কথা ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

ত্রিবেদীজী বেয়ারাকে বললেন: চল একবার ওপরে যাই।

আসুন।

বলে লোকটা আমাদের উপরে নিয়ে গেল।

দরজার চৌকাঠের কাছে একজন কনেস্টবলকে দেখলুম। এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাল যে ত্রিবেদীজী আমাকে তা লক্ষ্য করতে বললেন। সে কোন বাধা দিল না, কিন্তু আমাদের উপর শ্যেন দৃষ্টিতে নজর রাখল।

ত্রিবেদীজী ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। খাটের নিচেটা দেখলেন, দেখলেন আলমারির পিছনটা। এমন কি জানলার শিকগুলোও প্রত্যেকটি পরীক্ষা করে দেখলেন। আমি কোন প্রশ্ন না করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম।

ত্রিবেদীজী এর পরে, বাথরুমে গেলেন। শোবার ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত বাথরুম। এ ঘরে দরজা নেই, আছে

একটি জানালা। ত্রিবেদীজী এই জানালার শিকগুলো পরীক্ষা করতে গিয়েই থমকে গেলেন, ফিরে তাকালেন আমার দিকে।

আমি এগিয়ে গেলাম।

দুহাতে দুজোড়া লোহার শিক চেপে বললেন: দেখুন।

আমি দেখলাম যে মাঝখানের ফাঁক বেড়ে যাচ্ছে। তারপর নিজে হাত লাগিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জোর করলেই ফাঁক করা যায়।

ত্রিবেদীজী আরও দু তিনটে শিক পরীক্ষা করে বললেন: এগুলো শক্ত আছে।

তারপর সেই জানালার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে তিনি চারিধারটা দেখলেন। আমাকেও দেখতে বললেন।

আমি যা দেখলাম, তাতে আমার ভয় হল। জানালার নিচে একটুখানি কার্নিস। তাতে পা রেখে দাঁড়ানো যায়। আর দেওয়ালের গা বেয়ে জলের মোটা পাইপ নিচে নেমে গেছে। এই পাইপ বেয়ে কোন মানুষ অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারবে।

বেয়ারা বাথরুমের দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েছিল। ত্রিবেদীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই দরজাটা বন্ধ ছিল, না খোলা?

বেয়ারা বিপদে পড়ল বলে মনে হল। খানিকক্ষণ ভেবে বলল: মনে পড়ছে না।

ত্রিবেদীজী আমার দিকে তাকালেন গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ত্রিবেদীজী বেয়ারাকে জিজ্ঞসা করলেন: মাষ্টারের বাড়িতে কি প্রিয়দর্শীর যাতায়াত বেশি ছিল?

জানি না।

মাষ্টারের বাড়ি থেকে কেউ আসত না?

আসত অনেকে, কিন্তু কাদের বাড়ি থেকে তা বলতে পারব না।

এবারেও তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

নিচের তলায় নেমে আমি আর একবার আশ্চর্য হলাম। অনেকদিন পরে আজ নরেশের সঙ্গে দেখা হল। কয়েক বছর আগে সে-ই আমাকে ত্রিবেদীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি এখানে?

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: খবর সংগ্রহে এসেছি।

খবর সংগ্রহে!

নিজের কৌতুহলে নয়, নিজের প্রয়োজনেও নয়। খবরের কাগজের জন্যে।

বন্ধু আমার সরকারী দপ্তরে কাজ করত বলে সহসা এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। সে বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, বলল: সরকারের চাকরি আর নেই, এখন খবরের কাগজে কাজ করি।

ত্রিবেদীজী তাকে চিনতে পেরেছিলেন, বললেন: কেমন আছেন?

ভাল।

অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় না।

হ্যাঁ।

আসবেন এক দিন।

এ কথার উত্তরে সে হ্যাঁ বলল না, যা বলল তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

নির্দয় ভাবে সে বলল: তার প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে।

কেন কেন?

কারণটা কটু, তা নাই বা শুনলেন।

বলুন না আপনি।

আমি তার বিরাগের কথা জানি। ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। সে বলল: আপনি মানুষকে যখন ভাল-বাসতেন, তখন আমি নিয়মিত যেতাম। এখন আপনি রুগ্ন অসুস্থ। আপনার সঙ্গলাভে মানুষের জীবন আর ভরবে না।

ত্রিবেদীজী বোধহয় নিজের কানকেই প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। যখন বুঝলেন যে তিনি ভুল শোনেন নি, তখন আর কথা কইলেন না। আমাকে বললেন: আসুন!

বন্ধু আমার হাত টেনে ধরল, বলল: তুমি কোথায় যাচ্ছ!

আমি দেখলাম, শিবশঙ্কর ত্রিবেদী আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। নিজের গাড়িতে উঠে এই স্থান তখনই ত্যাগ করে গেলেন।

আমার বড় অনুতাপ হল, বললাম : ছি ছি, এ তুমি কী বললে !

নরেশ বলল : আমি ঠিকই বলেছি। তার সমস্ত সুখ-সম্পত্তির মূলে ছিলো এই প্রিয়দর্শী। এই ভদ্রলোকই তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়ে ঐ লোকটিকে দাঁড় করিয়েছে। আজ তার মৃত্যুর পরে কী দেখছ ?

কী ?

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বেয়ারাকে যে প্রশ্নগুলো করল, তুমি এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

না না, ভুলি নি। কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে যে তার বড় প্রীতির সম্বন্ধ ছিল।

সেইটেই তো স্বাভাবিক। অকারণে যারা জীবনকে বিকৃত দেখে, তারা আবার সাহিত্যিক !

নরেশের চোখে আমি গভীর ঘৃণা দেখলাম। একটু সামলে নিয়ে বলল : এসো, রিপোর্টটা লিখে নিই।

বলে বেয়ারাকে কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করল। তারপর ঘরটা দেখতে গেল। আমি নিচেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

ফিরতে তার দেরি হল না। এক টুকরো কাগজ হাতে করে ফিরল।

জিজ্ঞাসা করলাম : ওটা কী ?

একটা প্রেসক্রিপসন।

প্রিয়দর্শীর কোন অসুখ করেছিল ?

করেছিল কিনা সেইটেই জানা দরকার।

বলে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। আমাকেও তার পাশে বসাল। আমরা সোজা ডাক্তার শর্মার চেম্বারে এসে উপস্থিত হলাম।

চেম্বারে কোন রোগী ছিল না, কিন্তু ডাক্তার বসে-ছিলেন। নমস্কার করে নরেশ জিজ্ঞাসা করল : কাল রাতে কি প্রিয়দর্শী আপনাকে টেলিফোন করেছিল ?

কই না তো।

মাঝ রাতে গভীর রাতে—

সে কি প্রিয়দর্শী ? কেমন আছে সে ?

আমরা দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। নরেশ বলল : ঘটনাটি আগে খুলে বলুন। কিছু লোকোবার দরকার নেই, আমরা তার বন্ধু।

ডাক্তার শর্মা বললেন : তখন কত রাত হবে বলতে পারব না, টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। আমার স্ত্রী বিরক্ত হন বলে টেলিফোন আমার শোবার ঘরে রাখি না, তাই বেশিক্ষণ না বাজলে ঘুম ভাঙে না। কোনরকমে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ফোন ধরলাম। একজন বললেন, বুকে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে ডাক্তারবাবু, এখনই একবার চলে আসুন। আচ্ছা—বলে টেলিফোন রেখে দিয়ে মনে হল যে—তাঁর নামটা জেনে নেওয়া হল না। বিছানায় ফিরে এসে বড় অশান্তি বোধ হল। বুকের যন্ত্রণা অনেক সময় মারাত্মক হয়, আর এ রকম ঘটনা চারিদিকে হামেশা ঘটছে। ঘুমতে পারলাম না। খানিকক্ষণ পরে উঠে একজনকে টেলিফোন করলাম, গলার স্বর তারই মতো মনে হয়েছিল। সে আমার উপর ক্ষেপে উঠল, আপনি কি পাগল হয়েছেন ডাক্তারবাবু, না স্বপ্ন দেখছেন! প্রিয়দর্শীর নাম আমারও মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে—

কী মনে হচ্ছে ?

সেই বোধহয় আমাকে ডেকেছিল।

নরেশ আমার দিকে তাকাল, আমি তার দিকে।

ডাক্তার ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করলেন : এখন কেমন আছে প্রিয়দর্শী ?

নরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : মারা গেছে।

অ্যাঁ !

ডাক্তার শর্মা অনেকক্ষণ কোন কথা কইতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে বললেন : আমার অবহেলার জন্যেই বেচারার জীবনটা গেল।

এ তো নিয়তির কথা, আপনার অবহেলা নয়।

বলে নরেশ উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠলাম। কিন্তু ডাক্তার আর মুখ তুললো না।

গাড়িতে বসে নরেশ বলল : চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

বললাম : তার আগে মাষ্টারকে খবরটা দেব।

চল।

বলে আমরা মাষ্টারের বাড়ির দিকে চললাম।

এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ডাক্তারের কথা তোমার কেন মনে এল ?

খুব স্বাভাবিক কারণে। প্রিয়দর্শীর ঘরে ঢুকে দেখলাম, তার বালিশের তলায় একটা রিভলবার, আর খাটের

পাশে টেলিফোন। কোন শত্রু এলে রিভলবারটা লাগবে। আর অসুখ করলে টেলিফোন। তার বেয়ারাকে আমি ডাক্তারের নাম জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলতে পারল না। একখানা পুরনো প্রেসক্রিপসন চেয়ে নিয়ে নামটা জেনে নিলাম।

বাথরুমের জানালাটা দেখেছ ?

ওর বেয়ারা আমাকে দেখাল। এ ব্যবস্থা হয়তো নিজের আত্মরক্ষার জন্যেই রেখেছিল। প্রিয়দর্শী বোকা নয়, অসতর্কও নয়। বাইরের শত্রু তাকে কাবু করতে পারবে, এ সন্দেহ আমার কোনদিন হবে না।

মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। জড়োসড়োভাবে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলো। কালো রঙের থপথপে চেহারার মহিলা। দৃষ্টি শুধু অসহায় নয়, উদ্বিগ্ন। তিনি কিছু বলার আগেই নরেশ বলল : আপনার কোন ভয় নেই, আমরা তাঁর বন্ধু।

মহিলা তাঁর কপালের ঘোমটা আর একটু টেনে দিলেন। সভ্যজগতের এই নিয়ম। পরিচিতের সঙ্গেই ঢাকাঢাকি বেশি।

নরেশ বলল : নানারকম আশঙ্কায় তিনি হয়তো লুকিয়ে আছেন। তাঁকে জানাবেন যে প্রিয়দর্শীর মৃত্যু হয়েছে করোনারি থ্রম্বসিসে।

ভয়ে ভয়ে মহিলা বললেন : তবে যে শুনলাম—

ভুল শুনেছেন। আমি খবরের কাগজের লোক। প্রিয়দর্শীর মৃত্যুর খবর আমরা স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই ছাপছি।

খালি গায়ে চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে বারান্দায় বেরিয়েছিল। তাদের মধ্যে বড়টাকে নরেশ বলল : বাবাকে খুঁজে আন।

ভেবেছিলাম, এই গল্পের শেষ ঐইখানেই হয়ে গেল। কিন্তু তা হল না।

দিন কয়েক পরে এক সন্ধ্যাবেলায় নরেশ এসে উপস্থিত হল। বলল : চল একবার ত্রিবেদীজীর বাড়ি।

বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এই সেদিন যাঁকে গায়ে পড়ে সে অপমান করল, আজ সেধে তাঁর বাড়ি যেতে চাইছে !

আমার বিস্ময় দেখে সে বলল : আশ্চর্য হচ্ছ তো ! তা একটু হবে বৈকি।

বলে একখানা মাসিক পত্রের একটা পাতা খুলে আমার হাতে দিল। [ভারত সরকারের কল্যাণে এখন অল্প অল্প হিন্দি পড়তে শিখেছি।] পড়ে বুঝলুম, এই মাসিকপত্রে শিবশঙ্কর ত্রিবেদীর যে গোয়েন্দা কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, তা আর বেরবে না। তিনি আর গোয়েন্দা কাহিনী লিখবেন না।

নরেশ বলল : কেন লিখবেন না সে কথা তিনি জানান নি। সবাই ভাবছে যে প্রিয়দর্শীর মৃত্যুতে তিনি ফুরিয়ে গেলেন। এ কথা সত্য হলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম না।

ত্রিবেদীজীর বাড়ি পৌছে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাষ্টার কাঁদছেন, কাঁদছেন ত্রিবেদীজীও। মাষ্টার বললেন : না না, এ আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

ত্রিবেদীজীও গভীর ভাবে উত্তর দিলেন : তুমি না নিলে প্রিয়দর্শীর আত্মাকে আমার সম্মান জানানো হবে না।

আমাদের দেখতে পেয়ে মাষ্টার বললেন : দেখুনতো কী বিপদ, উনি ওঁর সমস্ত ডিটেকটিভ বইয়ের স্বত্ব আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন।

নরেশ এগিয়ে গেল ত্রিবেদীজীর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে, আর আমি মুখ ফেরালাম আমার চোখের জল লুকোবার জন্যে।

প্রিয়দর্শীর কি সত্যিই মৃত্যু হয়েছে !

"ভারতবর্ষ"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

সন তেরশত উনিশ সালের কথা। কি যেন একটা কাজ উপলক্ষে দুবরাজপুরে গিয়াছি। আমাদের গ্রাম হইতে দুবরাজপুর প্রায় পাঁচ ক্রোশ রাস্তা, হাঁটিয়াই যাতায়াত করিতাম। কোন কোন দিন সকালে গিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়াও আসিতাম। দরকার মত গরুর গাড়ী লইয়া যাইতাম। রাস্তা বড় কদর্য্য, তখনো ছিল, এখনো আছে।

দুবরাজপুরে আমাদের পুলিশ থানা ছিল, সাবরেজেষ্ট্রী অফিস, আর মুন্সেফী আদালত ছিল। দুবরাজপুরে কাপড়ের দোকান, নুন তেল মরিচ মসলার দোকান; তরি-তরকারীর বাজার ছিল। সপ্তাহে সোম ও শুক্রবার দুই-দিন হাট বসিত, পূজাপার্ব্বণে ক্রিয়াকর্ম্মে দুবরাজপুর গেলেই ঘি, ময়দা, তেল, মসলা, কাপড় চোপড় ও তরি-তরকারী কিনিতে মিলিত। বলিতে ভুলিয়াছি—দুবরাজ-পুরে উৎকৃষ্ট পিতল কাঁসার বাসন-কোসন পাওয়া যাইত। দুবরাজপুরই আমাদের মত গরীবদের খাগড়াই বাসনের অভাব মিটাইত। কতক বাসন দুবরাজপুরেই তৈরী হইত, কতক বা দোকানদারেরা জয়দেব কেন্দুলীর পাশের গ্রাম—টিকরবেতা হইতে কিনিয়া আনিত। দুবরাজপুর ও টিকরবেতার কাঁসার বাসন আজিও আপনার নামডাক বজায় রাখিয়াছে। মানকরের কদমার মত দুবরাজপুরেও একটা জিনিস ছিল, কাটা বাত্‌সা। পরিধি প্রায় ছয় হাত, ব্যাস তিন হাত—এমন একখানা চিনির বাত্‌সাও দুবরাজপুরের ময়রারা তৈরি করিতে পারিত। বাত্‌সাটা এমন ফাঁপা হইত যে, একবিন্দু জল তাহাতে ফেলিয়া দিলেই সর্ব্বনাশ। বাত্‌সা গলিয়া ফুটা হইয়া যাইত। দুবরাজপুরের জিলিপিও খুব চমৎ-কার ছিল। একখানা জিলিপির ওজন পাঁচসের, এমন কি দশ সের পর্য্যন্ত হইত। হেতমপুরের রাজবাড়ীতে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন গেলে হেতমপুরের রাজারা তাঁহাকে সন্দেশ রসগোল্লার বদলে জিলিপি খাইতে দিতেন। উৎকৃষ্ট ঘি-এর জিলিপি, ওজন আধপোয়া, একপোয়া, খাইতে অতি সুস্বাদু। প্যারীমোহন খাইয়া তারিফ্ করিতেন। সে দিনের লোকে বিবাহে দুবরাজপুরের বড় কাটা বাত্‌সা ও বড় জিলিপি "সজ্" (তত্ত্ব) পাঠাইতেন। আজ কাল এ সব উঠিয়া গিয়াছে।

দুবরাজপুরের আর একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল, বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবরাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তন। দুবরাজপুরের গৌরদাস মোহান্ত, ফুলচাঁদ কবিরাজ আর রামকল্প মোদী ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র গুঁই প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক ইহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই উপলক্ষে বনওয়ারী দাস, অবধুত বন্দোপাধ্যায়, বিষ্ণু দাস, অখিল দাস, সুরেন আচার্য্য প্রভৃতি অনেক নামকরা কীর্ত্তনীয়া দুবরাজপুরে লীলাকীর্ত্তন গান করিতে আসিতেন। আমরা কয়েকদিন ধরিয়াই শুনিয়া আসিতাম। নবরাত্রটী আরম্ভ হইত চব্বিশপ্রহর রূপে, তাহার পর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাহাকে নবরাত্রিতে রূপান্তরিত করিতেন। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন গৌরদাস মোহান্ত। নিকটবর্ত্তী বরাগ্রামে ইহার পূর্ব্ব নিবাস, পূর্ব্বাশ্রমে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। সামাজিক অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইনি আসিয়া দুবরাজপুরে আশ্রম স্থাপন করেন। দুবরাজপুরবাসীগণ অতি স্বাভাবিকভাবেই ইহার হস্তেই সর্ব্বকর্ম্মের নেতৃত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন। দুবরাজপুরবাসীগণ তাঁহাকে আপন হইতেও একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতেন।

আমার তখন কবি বলিয়া নাম কানাকানি সুরু হইয়াছে। স্থানীয় কাগজে কয়েকটি কবিতাও ছাপা হইয়া গিয়াছে। দুবরাজপুরের পরিচিত কয়েকজন যুবক আমাকে একটা অনুষ্ঠানপত্র আনিয়া দেখাইলেন। "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্র বাহির হইবে, তাহারই কিছু কিছু কথা সেই প্রচারপত্রে ছাপানো ছিল। সম্পাদক এবং

কয়েকজন লেখকের ছবিও তাহাতে দেখিলাম। গোঁফ দাড়িযুক্ত মুখে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটী ছবির, আর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলালের ছবির কথাটা বেশ মনে আছে। দেখিলাম লেখা আছে বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা। সে সময় ছয় টাকা দামের মাসিকপত্র বাঙ্গালায় একখানাও ছিল না। দাম দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। তখন ছয়টী টাকা জোগাড় করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সিউড়ীতে কে একজন মন্তব্য করিয়াছিলেন—"সংবাদপত্রেও মূলধন নিয়োগ আরম্ভ হইল"। আমি সে সময় সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" মাসিকপত্রের গ্রাহক ছিলাম। "সাহিত্যে" একটা নূতন ধাঁচের গল্প পড়িয়া চমক লাগিয়াছিল—"কাশীনাথ",—লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কেন জানি না মনে হইল এই সেই শরৎচন্দ্র। এবার "ভারতবর্ষে" ইহার লেখা পড়িতে পাইব।

সন তেরশত কুড়ি সালের আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষ প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বেই সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলালের লোকান্তর ঘটিয়াছে। দুবরাজপুরে গিয়া ভারতবর্ষ পড়িয়া আসিলাম। ভারতবর্ষের গ্রাহক সিউড়ীতেও ছিল। সন তেরশত একুশ সালের শ্রাবণ মাসে আমি হেতমপুর রাজবাড়ীতে আসিলাম। কিছু দিন পরে মহারাজকুমার মহিমা-নিরঞ্জন বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে আমি সমিতির সহকারী সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করিলাম। মহিমা-নিরঞ্জন ভারতবর্ষের গ্রাহক হইয়াছিলেন।

আমি যাওয়ার আগে মহারাজকুমার দুই খানা বই ছাপাইয়া ছিলেন, একখানা বীরভূম রাজবংশ, রাজনগরের (সাবেক লক্ষুর) মুসলমান রাজবংশের বিবরণ। অন্যখানি "রমাবতী" নাটক। বই দুইখানি বিক্রয়ের জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে দিয়াছিলেন। দোকান তখন ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। একদিন মহারাজকুমার আমাকে লইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আসিলেন। তখনো মোটরের চাল হয় নাই। মহিমা-নিরঞ্জনের ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের বাড়ী ভাড়াবিলি থাকিত। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ৮৭।১ সংখ্যক রিপন ষ্ট্রীটের বাড়িতে থাকিতেন। বাড়ীটী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা সত্যনিরঞ্জনের। এই বাড়ীতে একটা সুন্দর ল্যাণ্ডো গাড়ী ছিল, প্রকাণ্ড দুইটী সাদা ঘোড়া গাড়ীটা টানিয়া দৌড়াইত। মহিমানিরঞ্জন সেই গাড়ীতেই কলিকাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে দোকানের একটু দূরে গাড়ীটা দাঁড়াইল। মহিমানিরঞ্জন গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। আমি দোকানে ঢুকিলাম—সেই আমার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। গম্ভীর অথচ সুরসিক মানুষ ; বলিলেন—"বই তো বিক্রী হয় না। আপনাদের রাজারাজড়ার কাণ্ড। কেন গরীবের ঘর জুড়ে রাখা। একদিন আসবেন, বইগুলি নিয়ে যাবেন" কথামত অপর একটা দিন আসিয়া বইগুলি লইয়া গিয়াছিলাম।

মহারাজকুমার কলিকাতায় আসিলে রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আমার কথামত দুই একদিন কোন কোন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিতেন। জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আমি একদিন দুই শত এব কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দোকানের উপর তলায় জলধর দাদার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখি—দাদার কাছে শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া আছেন। মুখে সেই দাড়ী। জলধরদাদা পরিচয় করাইয়া দিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখি—শরচ্চন্দ্র কি একটা মুখে পুরিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া ফেলিলেন। গোলাকার দলাটা একটু মোটা। পরে শুনিয়াছি সেটা আফিংএর দলা। জল খাইয়াই তিনি একটী সিগারেট ধরাইলেন। পরে শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত হইয়াছিলাম। কিছু দিন পরে শরচ্চন্দ্র গোঁফদাঁড়িটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বাজে শিবপুরের বাড়ীতে গিয়াছি, পাণিত্রাসে গিয়াছি, পণ্ডিতিয়া রোড়ের বাড়ীতেও বহুবার আসা যাওয়া করিয়াছি।

"ভারতবর্ষে" আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ।" তাহার পর মহিমা নিরঞ্জনের নামে এবং আমার নিজ নামে অনেক লেখা "ভারতবর্ষে" বাহির হইয়াছে। "ভারতবর্ষের" নিকট আমার ঋণের পরিমাণ অনেক।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সুধাংশুশেখরের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াইল। সুধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে রূপান্তর লইল। তাহার সঙ্গে কত কথারই না আলোচনা হইত। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই দরদী বন্ধুর অকাল লোকান্তরে সাহিত্যিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইলেও তাঁহাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতাম। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার দ্বারা আমি বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছি। ষ্টার থিয়েটার আর্ট থিয়েটার লিমিটেডে পরিণত হইলে তিনি তাহার অন্যতম ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় আসিলে নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের বাড়ীতেই উঠিতাম। প্রায়ই থিয়েটারে হাজিরা দিতাম। সেই সূত্রে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানান গল্পগাছার সুযোগ ঘটিত। ষ্টার থিয়েটারের উপরের ঘরে বড় বড় সাহিত্যরথীরা আসিতেন। শরৎ চাটুজ্জে, রাখালদাস বাঁড়ুজ্জে, শ্রীযুক্ত সুনীতি চাটুজ্জে—এমনই অনেককে সেখানে দেখিয়াছি।

শরৎচন্দ্রের কথাপ্রসঙ্গে হরিদাস একদিন বলিলেন—"প্রমথ ভটচাজ আমাদের বন্ধু ছিল। শরৎ চাটুজ্জের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। প্রমথ একদিন শরৎচন্দ্রের লেখা চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি এনে দেখালে। আমি সেটা পড়ে ফেরৎ দিলাম। বললাম—এটা ভারতবর্ষে বের করবো না। তবে এঁর অন্য গল্পটল্প নিয়ে এস ছাপাবো। প্রমথের হাত দিয়েই "বিরাজ বৌ" প্রভৃতি পাই। কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে একখানা পত্র লিখলেন। পত্রখানার মর্ম্মার্থ—আমি রেঙ্গুন থেকে চলে যেতে চাই। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, শ' চারেক টাকা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা আমি সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই টাকাটা পেয়েই শরৎচন্দ্র কলকাতায় চলে আসেন। "ভারতবর্ষ" তাঁর লেখা পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছে, অবশ্য "ভারতবর্ষে"র পৃষ্ঠাতে শরৎচন্দ্রের নামটাও ছড়িয়েচে।"

নিজের পিতাঠাকুরের কথায় আর একদিন বললেন—"রাসবিহারী ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (স্যর আশুতোষের পিতা) প্রভৃতি একটা মেসে থেকে কলেজে পড়াশোনা করতেন। বাবা এঁদের বাজার সরকার ছিলেন। একদিন গঙ্গাপ্রসাদ বাবাকে বল্লেন—আমরা খেয়েদেয়ে কলেজে চলে যাই, তুমি তো চুপচাপ বসেই থাক। যদি খান্ কতক বই এনে দিই বিক্রীর চেষ্টা দেখতে পার। যা লাভ হবে সেটা আলাদা রেখে মহাজনের টাকাটা রোজই মিটিয়ে দিও। গঙ্গাপ্রসাদ প্রথম প্রথম ডাক্তারী বই এনে দিতেন। বাবা বইগুলি বিক্রী করে লাভের পয়সাটা কাগজে মুড়ে রেখে সন্ধ্যের সময় মহাজনের টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আসতেন। বাবা প্রথম ডাক্তারী বই বিক্রী করতেন বলে যখন বইয়ের দোকান খোলেন—দোকানের নাম দেন "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী"।

গঙ্গাপ্রসাদই বাবার বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তো কলকাতায় বাড়ী ঘর নাই। তাই মা প্রথম গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। বৌ-ভাতও গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ীতেই হয়েছিল। আমরা যখন কিছু বড় হয়েছি, আমরা পড়া শোনা ছেড়েছি, বাবা একদিন আমাদের দুই ভাইকে স্যর আশুতোষকে প্রণাম জানাতে নিয়ে গেলেন। আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আদর করলেন, মিষ্টি আনিয়ে দিলেন। আমরা মিষ্টিমুখ করে চলে এলাম। ফেরবার পথে বাবা বললেন—"আর কখনো এমুখো-হয়োনা, টেকস্‌টবইএর জন্যে বা অপর কিছুর জন্যে কোন দিন কোন সাহায্য চাইতে এসনা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমাদের অবস্থা কিছু ভাল হয়েছে। তোমাদের মনে হতে পারে হয়তো আমার পূর্ব্বাবস্থার কথা মনে করে উনি তোমাদের উপর একটু অবহেলার ভাব দেখিয়েছেন। হয়তো সেটা সত্যি নয়, তোমাদেরই মনের ভ্রম, তবু কাজ কি, এসোনা। সৎপথে থেকো, কোন রকমে চলে যাবে"। কত লোক আমাকে কত অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত বাবার আদেশ লঙ্ঘন করে, স্যর আশুতোষকে বিরক্ত করিনি। এত দিন যখন কেটে গেল, ভবিষ্যতেও আর যাবনা"।

বাবার কাছে আর একটা শিক্ষা পেয়েচি। আমাদের দোকানের দুবার হিসেব হয়। একবার পুজার আগে, আর একবার বছর শেষ হবার মুখে। দেখতাম বাবা এক এক জনের হিসেব করিয়ে পাওনা টাকাটা এবং হিসাবের কাগজটা আলাদা আলাদা রেখে দিতেন। লেখক এলে

তার টাকা আর হিসেব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে বসতে বলতেন। আমিও সেই ধারাটা বজায় রাখার চেষ্টা কোরেচি।

একবৎসর ভুনি বাবু (অমৃতলাল বসু) টাকা নিতে এলেন, আমি হিসেব এবং টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বসতে বললাম। তিনি বললেন—তোমার কাছে আমার সব দেনা শোধ হয়ে গিয়ে এই পাওনা হয়েচে তো। আমি বললাম আজ্ঞে হাঁ। তিনি বললেন এটা—তো ভাল কথা নয় বাপু। তোমার বাবার আমল থেকে দেনা করে আসচি, আজ সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল! এ তো অমঙ্গুলে কথা। তুমি গুটী পঞ্চাশ টাকা দাও, আর টাকাটা আমার দেনার ঘরে লিখে রাখ। আমি হাসতে হাসতে টাকাটা ভুনি বাবুর হাতে দিলাম।" এমন কত গল্প আছে।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভাল অভিনেতা ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচালনায় তাঁরা একবার চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় করেছিলেন। হরিদাসের কি ভূমিকা ছিল মনে নাই। চন্দ্রগুপ্তেই হোক কি অন্য কোন অভিনয়েই হোক তাঁহার একজোড়া গোঁফের দরকার হয়। তাড়াতাড়িতে তিনি একজন সহ-অভিনেতার গোঁফ ধরিয়া টান দিয়াছেন,সে বলিয়া উঠিল—'আঃ এ যে আমার গোঁফ'। হরিদাস বলিলেন —'তুমি আর একটা নাও না, আমার এখনই চাই আমাকে দাও'। সে বলিল "বাঃ এটা আমার নিজের'। 'তোমার কি কেনা,' বলিয়া হরিদাস আর একটা টান দিতেই সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হরিদাসের হাতটা জোরে ছাড়াইয়া দিল। তখন হরিদাস বুঝিলেন—এটা উহারই নিজস্ব আদি ও অকৃত্রিম। হরিদাস বলিলেন—তার গোঁফ জোড়াটা কিন্তু ভারি সুন্দর ছিল।

শরৎচন্দ্রের "পল্লীসমাজে"র হরিদাস নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, কেন জানিনা সেটা অভিনীত হয় নাই। "মানময়ী গার্লস স্কুল" শনিবারের চিঠিতে ছাপানো হয়। তিনি শনিবারের চিঠিতে পড়িয়া বইখানার আর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ছবিরও তিনি একজন ভাল সমঝদার ছিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থাপনায় "ভারতবর্ষে" কিছুদিন ধরিয়া মাসে মাসে অনেক নামকরা লোকের ছবি বাহির হইয়াছিল। যে মাসে যিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলে সেই মাসে তাঁহার ছবি ছাপানো হইত। বেশ রসিকতা সঙ্গেই তিনি কথার পিঠে কথার উত্তর দিতেন। অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিতেও তাঁহার রসিকতার আমেজ থাকিত "ভারতবর্ষে"র নিয়মিত প্রকাশ এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাঁহার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল। যত বড় লেখকই হউন লেখায় ন্যায্য প্রতিবাদ প্রকাশে হরিদাসের কোনদিন কুণ্ঠা দেখিনাই।

একদিন রাত্রে তাঁহার বালীগঞ্জের বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ। বলিয়া দিলেন "আটটার আগে আসবেন না। আবার নয়টার পরে এ বাড়ীর হেঁসেল বন্ধ হয়ে যায়" আটটা কয়েক মিনিটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি একটু বাড়তি রকমের আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন এবং নানা রকমের গল্প সুরু করিলেন। নয়টা বাজিতে যাঃ দেখিয়া আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। তিনিও যেন উঠি উঠি ভাব দেখাইয়া বলিলেন—তা কি মনে করে? আমি বললাম—আমি এখানে খাব। বললেন—সে কি হঠাৎ! ও হো—আপনাকে খাবার নেমন্তন্ন করেচি না। তা সে তো কাল। আপনি পল্লীগ্রামের লোক হলেও বহুদিন তো কলকাতায় আসচেন। তারিখটা ভুল করলেন। আমি বলিলাম—আমি যেখানে খাই (সে সময় নিকটেই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতে থাকিতাম) সেখানে জবাব দিয়ে এসেচি। এখন আজ তো খেতে দিন্। আগামী কালকের ব্যাপার কাল দেখব। তখন বেশ পরিপাটীরূপে খাওয়াইয়া জেদ করিয়া বলিলেন—দেখুন ভুল যখন হলোই। তখন কাল যেন অতি অবশ্য আসবেন। আপনি যাই বলুন নেমন্তন্নটা আপনার কালই ছিল। যাক আজ যখন লোকসানটা হলো, কাল যেন আসতে ভুলবেন না। বলা বাহুল্য তারপরদিনও গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।

স্বনামধন্য পুণ্যচরিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়ের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এই রজতজয়ন্তী বৎসরে "ভারতবর্ষের" সাফল্যপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়
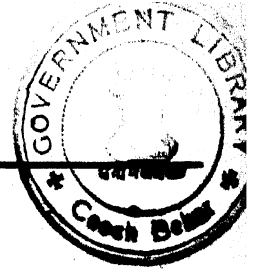
আবাল্য শুনে এসেছি মানবচরিত্র সর্বত্রই এক। রটনাটা যে মূলতঃ অসত্য এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু তবু ওদেশের বহু নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমার বার-বারই মনে হয়েছে যে ওদের মনপ্রাণ আমাদের থেকে বেশ একটু আলাদা। সাধারণভাবে যে কোনো সূত্র দিতে গেলেই মুস্কিলে পড়তে হয় মানি, তবু বলব—না, দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি না কেন : ওদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রতিভার স্ফুরণ সহজ, আমাদের মধ্যে দার্শনিকতার প্রভাব বেশি। ওদের মধ্যে রাজসিকতা প্রবল, আমাদের মধ্যে তামসিকতাই বেশি চোখে পড়ে, অথচ সেই সঙ্গে এ-ও না ব'লে পারি না যে আমাদের মধ্যে মহাজনরা যত সহজে সাত্ত্বিক হ'তে পারেন—ওদের মহাজনরা কিছুতেই তত সহজে নিরীহ নিবৃত্তিমার্গী হ'তে পারেন না। অন্যভাবে বলা যায়—ওরা প্রবৃত্তিতে ঐহিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বেশ একটু অনৈহিক—otherworldly। ওদের দেশে পরিবর্তন দ্রুত হ'লে মানুষ শঙ্কিত হয় না, আমরা হই। অন্য ভাষায়, আমরা ওদের চেয়ে সমাজে ও ধর্মে ঢের বেশি রক্ষণশীল—conservative—অন্ততঃ এ-পর্যন্ত হ'য়ে এসেছি। আর এই জন্যেই হয়ত ইংরাজকে চড়াও হ'তে হয়েছিল এদেশে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেও ওদের মতিগতির পরিচয় পেতে বিদেশ গেলে আমাদের জাত যেত—একঘরে হ'তে হ'ত। কিন্তু ওরা যখন এদেশে এসে জাঁকিয়ে বসল তখন প্রাণপণে চোখ বুঁজে থাকতে চাইলেও চোখে পড়ল বৈ কি ওদের কীর্তিকলাপ—রেল রে, হোটেল রে, ক্লাব রে, শৈলাবাস রে, গ্রামোফোন রে, মোটর রে, রেডিও রে—কী নয় রে? দেখতে দেখতে আর চমকে উঠতে উঠতে আমাদের একটু একটু ক'রে চৈতন্য হ'ল : তাই তো, এ-ম্লেচ্ছদের চলার ছন্দ যে দেখি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জলদ—ওদের তুলনায় আমরা চলি যেন প্রায় ঢিমা তেতালায় বা আড়াঠেকায়! এ-ও স'য়ে ছিলাম—ওদের উঠতে বসতে আমাদের নেটিভ বলা, বাবু বলা—কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটল একটি অঘটন : ওদের প্রাণশক্তির ছোঁয়াচে আমাদের ঘুম ভাঙল, ওদের গতির ছোঁয়াচে আমাদের গজেন্দ্রগমন লজ্জা পেল। ফলে আমাদের প্রাণে না হোক মানে বাঁচতে দীক্ষা নিতে হ'ল ওদের ত্বরিৎগতির; মন্থরকর্মাকে মন্ত্র দিল বিশ্বকর্মার দল—নেটিভকে গাইতে হ'ল :

"আমরা বিলেতফেরতা কভাই, আমরা সাহেব
সেজেছি সবাই।
আমরা কী করি, নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি
সব জবাই!"

জবাই না ক'রে উপায়ও ছিল না—আফিসে চাকরি করতে হ'লে ফার্সি ছেড়ে ইংরাজি শিখলে সুবিধে, ধুতি-চাদর ছেড়ে হ্যাটকোট। এ সব হয়ত বাহ্য, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি অঘটন ঘটল—আমরা ইংরাজি ভাষাটায় হঠাৎ চমৎকার পোক্ত হ'য়ে উঠলাম—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষিতবৃন্দ সত্যিই রসিয়ে উঠলেন এ-আশ্চর্য উদ্দীপনাময়ী, প্রাণদা, বলদা, বরদা ভাষায়। আমরা শুধু শেলি, কীট্স্, বাইরন, শেক্সপীয়র আওড়ানোই নয়—এমন বক্তৃতা দিতে সুরু করলাম সাহেবি ভাষায় যে ওদের সত্যিই তাক লেগে গেল। এরই ফলে আমরা এসে পড়লাম সেকাল থেকে একালে—হলাম আধুনিক।

সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মিকে অভিনন্দন করে সবপ্রথম উচ্চতম শিখরগুলি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের দেশের শিখরচারী পুরুষদের মধ্যেও অগ্রণী। তাই তাঁর মন যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অরুণাভায় সব আগে রঙিয়ে উঠবে এতো জানাই। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা সজাগ হ'য়ে উঠলাম যে, তিনিই করলেন এক

অভিনব আধুনিক যুগের স্থচনা, ওদেশের নানা ভাবধারার শ্রেষ্ঠ রংরূপ নিয়ে অকুতোভয়ে আমাদের মনকেও সে-আভায় রঞ্জিত ক'রে তুললেন। বললেন: ওদের কাছে আমরা শিখব সংঘ গড়তে, কর্মতৎপরতা—efficiency আর ওরা আমাদের কাছে শিখবে ধ্যান, তপস্যা, যোগ, বেদান্ত। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—আমরা দেব আমাদের যা দেওয়ার আছে, তোমরা প্রতিদানে দাও তোমাদের যা দেওয়ার আছে। "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" এর প্রথম অধ্যায়ে স্বামীজি একথা চমৎকার ক'রে বলেছেন—দ্রষ্টব্য।

এ-সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি আজো মনে জেগে আছে, থাকবেও চিরদিন। স্মৃতিটি রবীন্দ্রনাথের একটি দীপ্ত উক্তির—আমার স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব ৪৭০—৪৭১ পৃষ্ঠায় ফলিয়েই লিখেছি। তাই শুধু শেষটুকু উদ্ধৃত করি—যেটুকুতে স্বামীজির কথা বলেছিলেন তিনি লণ্ডনে ১৯২০ সালে। বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে লণ্ডনে সভা ডাকা সম্পর্কে: "দিলীপ, আমরা এ-স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা-হীনতা ভীরুতা প্রচার ক'রে এদের আদর কাড়তে ছুটব? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল —যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদেশে এসে এদের ডাক দিয়ে-ছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ব'লে—কাঁদুনি গাননি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত, দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেন: 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড়ো ক'রে দেখো না।' আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু ক'রেই বলেছিলেন ভারতের ধর্ম-তত্ত্বের মহিমার কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে পাই গো' ব'লে, তাহ'লে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।"

তাঁর পরে স্বামী রামতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কবি নিজেও ঠিক এই কাজই করেছিলেন—এই পারস্পরিক দান-প্রতিদানের সম্বন্ধের বনেদ গেঁথে নিজের নিজের ঢঙে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজিই ছিলেন পুরোধা—ভারতের প্রথম ধর্মীয় সংস্কৃতিদূত, ওদেশে বেদান্তের প্রথম উদ্গাতা। তাঁকে এজন্যে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল, বহু দুঃখ ও নিন্দা সইতে হয়েছিল—সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল—যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু এ হ'ল তাঁর আধুনিক প্রচার-মিশনের মাত্র একটি দিক। ওদেশে এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের হরির লুট বিলিয়ে তিনি দেশে ফিরে এর পাল্টা—Converse—ঘোষণায় লেগে গেলেন—এদেশে খানিকটা য়ুরোপীয় ঢঙেই সেবাধর্মকে লোকপ্রিয় ক'রে এবং কুসংস্কারবর্জিত মঠের পত্তন ক'রে। য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে তাঁর আগেও কয়েকজন বরেণ্য মনীষী বরণ করেছেন, যথা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের পত্তন ক'রে, ও মধু-সূদন-বঙ্কিম য়ুরোপীয় সাহিত্যের-রস বাংলায় আমদানী ক'রে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম তথা কর্মলোকে পাশ্চাত্য প্রাণশক্তিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন প্রথম স্বামীজি—তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে, প্রাণোন্মাদী বক্তৃতায়—সর্বোপরি, তাঁর রোমান্টিক নবজাগৃতিমন্ত্রের তথা বহ্নিময় ব্যক্তিরূপের ফুলঝুরিতে। মানুষের ঘুমন্ত শক্তি সবচেয়ে সহজে জেগে ওঠে দিগ্বিজয়ীর টঙ্কারে। স্বামীজি এ-টঙ্কারের সঙ্গে জুড়ে দিলেন পরমহংস-দেবের কাছ-থেকে-পাওয়া জ্ঞানভক্তির ওঙ্কার ও ঝংকার। ফলে দেশের ঝিমিয়ে-পড়া মনে উঠল শিহরণ জেগে।

"রোমান্টিক" বিশেষণটি অনুধাবনীয়। কারণ স্বামীজির চুম্বকশক্তির মধ্যে এই রোমান্টিক উদ্দীপনার মালমসলা ছিল অপর্যাপ্ত। এ-যুগে আমরা হয়ে পড়েছিলাম খানিকটা দিনগতপাপক্ষয় করে চলারই পক্ষপাতী। তাই সুভাষ প্রায়ই বলত: "আমাদের বরণ করতেই হবে স্বামীজির aggressive Hinduism এর বাণী—নির্বিবাদী ভালো-মানুষের দিন গত—স্বামীজির কথায় কান দিতে হবে—চড়াও হ'তে হবে, আর তারই জন্যে চাই সবপ্রথম স্বাধীন হওয়া।" কিন্তু আমাদের মনে এ স্বাধীনতার অভীপ্সা সবপ্রথম ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছিল যখন স্বামীজির আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের তূরীধ্বনিতে আমরা চমকে উঠলাম এ-অঘটনের রোমাঞ্চে। স্বামীজি

যখন আমেরিকার দুরবস্থায় পড়েন তখন তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করে নি। কিন্তু তার পরেই যখন শিকাগোর বিশ্বমানবিক ধর্মসভায় স্বামীজির বিদ্যুৎপ্রবেশে হাজার হাজার মার্কিন নরনারী বিচলিত হ'য়ে উঠল, তখন আমরা বললাম: "তাই তো হে। চিরদিন ওরাই আমাদের চমকে দিয়েছে। এখানে দেখি শোধ তুলল আমাদেরই মতন ভেতো বাঙালী—যাকে আমরা 'কর্মনাশা' নাম দিয়ে শাপমণ্যিই দিয়ে এসেছি—অনেকগুলি ভালোমানুষের পো-র মস্তক-ভক্ষণ করার অপরাধে। অতএব ও গোঁসাই, এসো চাদর গায়ে দিয়ে ছোটা যাক্, দেখে আসি কী ব্যাপার—শুনে আসি কী বলে নরেন্দর। মনে হচ্ছে বুঝি বা এ-ঘুমের দেশে হঠাৎ একটা কিছু ঘটবার মতন ঘটল। নৈলে কি তোমার আমার মতন ছাপোষা মনিষ্যির বুকেও কেমন যেন ঘরছাড়া ডাক বেজে ওঠে?—চলো চলো!" আমার বাল্যকালে স্বামীজির তিরোধানের পরেও এই রোমান্সের কিছু রেশ শুনেছি প্রাণভরে—এ একটুও অত্যুক্তি নয়।

এই রোমান্সের শিহরণ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস এসে লেগেছিল স্বামীজির দিগ্বিজয়ী হ'য়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। কান পেতে শুনলে আজও চমকে উঠতে হয় —কলম্বোয় ১৬ই জানুয়ারিতে (১৮৯৭) তাঁর প্রথম বক্তৃতার শঙ্খধ্বনিতে। বললেন স্বামীজি সঘনে:

"আগে আগে আমি ভাবতাম যে, ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।······এই পুণ্যভূমি থেকেই ধর্মনায়কেরা বরাবরই পৃথিবীতে অধ্যাত্ম সত্যের বান বইয়ে দিয়েছেন। এখান থেকেই দর্শনের বিপুল জোয়ার প্রবহমান হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্লাবিত করেছে, আর এখান থেকেই ফের সে-স্রোত বইবে যার স্পর্শে জগতের বস্তুতান্ত্রিকতা শুদ্ধিলাভ করবে। আপনাদের বলছি আমি—এ হবেই হবে।"

"গেরুয়া-পরা সন্নিসি বলে কি হে?" শুধালেন সকব্বি প্রবীণরা চোখ কপালে তুলে! "আমরা জগতের চেহারা বদলে দেব—আমাদের অধ্যাত্ম শক্তির পরশপাথরের ছোঁওয়ায়? অ্যাঁ? আমরা—যারা—ডি. এল্. রায়ের ভাষায়—

"পাঁচশো বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদায়,
এইটে কি আর সইবে নাকো—দুঘা বেশি জুতোর ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা—দে না বাবা,
দুঘা বেশি, দুঘা কমে—এমনিই কি আসে যায়?"

অ গোঁসাই ছাপোষা মনিষ্যি আমরা—সাতেও নেই পাঁচেও নেই—অথচ নরেন্দর বলে কি: 'The mild Hindu has always been the blessed child of God···Abhih Abhih! We have to become fearless, and our task will be done—নিরীহ হিন্দু ভগবানের মানসপুত্র আমরা—অভীঃ হলেই হাতে হাতে সিদ্ধিলাভ!' এ কী ব্যাপার, গোঁসাই? শুনে তাক লেগে গেল যে! বলে কি নরেন্দর?—'To the other nations of the world religion is but one among the many occupations of life—অপর দেশে ধর্ম আর পাঁচটা বৃত্তির মধ্যে একটা—রাজনীতি রে, সামাজিকতা রে, অর্থসুখ রে, ক্ষমতাবিলাস রে, রকমারি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রে-কত কীরে-কেবল ঐ পাঁচমিশেলের সঙ্গে থাক্ না একটু ধর্মেরও অনুপান। ও দেশের লোককে গিয়ে শুধাও, দেখবে তারা এ-ও-তা অনেক কিছুরই খবর রাখে। কিন্তু যদি ধর্মের কথা পাড়ো, তাহ'লে তারা বলবে যে তারা নিয়মিত গির্জায় যায় ও অমুক খৃষ্টীয় অভিধায় অভিহিত। তারা ভাবে এইটুকু জানাই যথেষ্ট'* – শুনছ নরেন্দর বলছে?

স্বামীজি অতঃপর বক্তৃতার পর বক্তৃতায় আরো কত কীই না বললেন—দেখালেন কত দৃষ্টান্ত দিয়ে যে, ওরা এইভাবে চললেও আমাদের চলার ছন্দ ঠিক উল্টো—অর্থাৎ আমরা এই আর-পাঁচটার খবর রাখি না, বলি এসব অবান্তর, রাখার মতন খবর কেবল একটি—ধর্ম। মনে পড়ে পরমহংসদেবের বিচিত্র কথিকা:

চলে পণ্ডিত নৌকায়, মাঝি অদূরে আসীন
হালটি ধ'রে।
পণ্ডিত পুছে: "জানিস কি তুই দর্শন বেদ
পুরাণ ওরে!"
"না ঠাকুর।"—"সে কি? ন্যায়, বেদান্ত?"—"জানি না
ঠাকুর।"—"তন্ত্রসার?"

*স্বামীজির "First lecture In the west" দ্রষ্টব্য

মাঝি হাসে : "আমি মুখ্যু ঠাকুর, কোনো বিদ্যাই
নেই আমার।"
পণ্ডিতও হাসে গোঁফে চাড়া দিয়ে : "তা বটে, এসব
কজন জানে ?"
সহসা উঠল ঝড়। মাঝি বলে : "সামাল ঠাকুর !
স্রোতের টানে
নাও বুঝি ডোবে—তবে নিশ্চয় সাঁতার জানেন
আপনি, স্বামী ?"
পণ্ডিত বলে : "বলিস কি ? ওরে, সাঁতার দিতে তো
জানি না আমি।"
মাঝি বলে : "আমি জানি না পুরাণ, বেদ, বেদান্ত,
তন্ত্রসার,
হাবি জাবি আরো কত কী জানি না, কেবল ঠাকুর,
জানি সাঁতার।"

আমার মাতামহ ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন পরমহংস দেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে। (কথামৃতে তাঁর নাম আছে।) তিনি আমাকে বলেছিলেন—এ কথিকাটি তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শোনেন। (আরো বলেছিলেন যে, ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন একটি গান : "রামকো জো ন জানা সো ক্যা জানা হয় রে ?") কলম্বোয় ও অন্যত্র স্বামীজির নানা বক্তৃতার সুর ছিল এই কথাই : যে, হিন্দু এ-ও-তা হাবিজাবির খবর না রাখলেও একটি জিনিসের খবর রাখে—ধর্ম, যার নাম সে দেয় পরমার্থ। অর্থাৎ, পরম বস্তু হ'লেন তিনি, তাই তাঁকে জানার নামই সার্থক জ্ঞান—আর সব জ্ঞান—কি না ঐহিক জ্ঞান—না হ'লেও চলে, যদি এই জ্ঞানের জ্ঞান একবার অন্তরে আলো জ্বালায়।

এই প্রত্যয় আবহমানকাল ভারতের কাছে পরম ঈপ্সিত ব'লেই গণ্য হয়েছে—"নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ"—তাঁকে জানলে সবই জানা হয়। তাই তাঁকে জানায় যে বিদ্যা, তারই নাম দেওয়া হয়েছে "পরা বিদ্যা"—বাকি সব অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ গৌণ, মুখ্য নয়। স্বামীজি তাঁর নানা ভাষণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল এই বাণীরই ভাষ্য করেছেন—ধর্মবুদ্ধির নামই বুদ্ধি, ফন্দির নাম দুর্বুদ্ধি। তাঁর একটি প্রিয় বচন ছিল : "চালাকি ক'রে কোনো মহৎ কাজ হয় না।" প্রায়ই বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি করলে সব ডুববেই ডুববে—যেজন্যে ধর্ম-যে-ধর্ম সেও ডুবেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন (১৮৯৪ সালে) : "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা ? জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান ! ভাল মোর বাপ !! হে ভগবান ! এমন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।"

এ-যুগের একটি মহৎ প্রবণতা—সব কিছু প'ড়ে পাওয়া বুলির যাচাই করা। স্বামীজির মধ্যে এ প্রবণতা দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরের তেজোদীপ্তিতে। বলীয়ান্ মানুষের একটি ধর্ম—সব কিছুকেই প্রবল ভাবে অনুভব করা। স্বামীজি ছিলেন বীরসিংহ, কাজেই তাঁর প্রাণ ধিক ধিক ক'রে উঠত—চালাকি, ছুঁৎমার্গ ও ভাবের ঘরে চুরি দেখে। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন বৈ কি যে, আমরা ধর্মকেই একান্ত হ'য়ে বরণ করি, কিন্তু চারদিকে কপটতা ও মিথ্যাচার দেখে আহত হ'য়ে আমাদের অধঃপতনের জন্যে আমাদের তীব্রভাষায় তিরস্কার করতেন। আর তাঁর প্রাণোচ্ছল মন সবচেয়ে গভীর বেদনায় ছেয়ে যেত যখন তিনি দেখতেন তামসিকতাকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি। তাঁর "ভাববার কথা"য়—তিনি লিখছেন : "দেখিতেছ না সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমসা সমুদ্রে ডুবিয়া গেল ? যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সেদেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?"

এখানে কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে স্বামীজি তো তাহ'লে অপরের 'পরে যে অভিযোগ আনছেন নিজেই সে অপরাধে অপরাধী, যেহেতু তিনি ভারতের অতীত

মহিমা—"পিতৃপুরুষের নামকীর্তন"—যত্র তত্র প্রচার করে এসেছেন, তাহ'লে ভুল বলবেন। খৃষ্টদেবের একটি কথিকা আছে—এক গৃহস্থের তিনটি চাকর ছিল। তিনি বিদেশ যাবার সময় তাদের হাতে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে যান। ফিরে এলে দুজন চাকর বলে তারা গচ্ছিত মুদ্রা খাটিয়ে বাড়িয়েছে। প্রভু খুসি হ'য়ে তাদের পুরস্কার দেন। তৃতীয় চাকরটি তাঁর দেওয়া মুদ্রাটি ফেরৎ দিয়ে বলে সে টাকাটি সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছে—পাছে খোওয়া যায় এই ভয়ে। প্রভু তাকে তামসিক ব'লে তিরস্কার ক'রে শাস্তি দেন, বলেন যে, যে-জন্মালস অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তার কাছ থেকে সে অল্পও কেড়ে নেওয়া হবে। (For every one that hath shall be given : but from him that hath not, shali be taken away even that which he hath.) স্বামীজি চাইতেন বৈ কি যে, আমরা অতীত মহিমার জয়ধ্বনি করি—কেবল সেই সঙ্গে বার বার বলেছেন এই মহিমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে হবে, হাতে-পাওয়া পুঁজি খাটিয়ে যে বাড়াতে না চায় সে হয়ই হয় দেউলে। এইখানে তিনি ছিলেন বিশেষ করেই আধুনিক—প্রগতিশীলদের দলে যাদের জীবনের মন্ত্র—স্বামীজির ভাষায়ই বলি: "বল্ অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি ক'রে দেশটা গেল।···প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে হতভাগাগুলো! নেই নেই বলতে বলতে কি কুকুর বেড়াল হ'য়ে যাবি না কি? কিসের নেই! কার নেই। শিবোহং শিবোহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বাড়ি মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে আমার জন্ম গেল! ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনাহীনা ভাব—ও হ'ল ব্যারাম—ও কি দীনতা?···ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল প'ড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।·· উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্···নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। Avalancheএর মতন দুনিয়ার উপর পড়।"*

এই ধরণের উদ্দীপক ভাষণ পত্র কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন তিনি উঠতে বসতে—একদিকে দেবভাষার বীর্যবাণী, অন্যদিকে ভর্ৎসনা—দেখ্ কী ছিলি, কী হয়েছিস! এ-দুই মনোভাব তাঁর তেজস্বী চরিত্রের দুটি দিক—অতীত থেকে প্রেরণা আহরণ করতে হবে, অতীত মহিমাকে মনে প্রাণে বরণ করতে হবে—কেবল সে-আরো এগিয়ে যেতে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় we do not belong to the past dawns but to the noon of the Future : অতীতের উষাবিলাসী হ'লে চলবে না—হ'তে হবে আমাদের ভবিষ্যতের মধ্যাহ্নচারণ। এর কেন্দ্রীয় বাণীটি হল তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের শিরোনামা—বীরবাণী। তাতে "সবার প্রতি" কবিতায় স্বামীজি লিখছেন:

> ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হ'য়ে কি বা ফল?
> দাও আর ফিরে নাই চাও—থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
> তাই শুধু নিজের মুক্তি সাধনায় মুক্তি নেই, মুক্তি সর্ব সেবায় জীবপ্রেমে:
>
> বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
> জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সত্ত্বগুণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে, বাইরে থেকে অনেক সময়েই তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে ভুল হয়। তাই বলতেন বারবারই: তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় আরূঢ় হবার পরে তবে সাত্ত্বিকতার নাগাল পাওয়া যায়:

"সত্ত্বগুণ এখনো বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতের আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়?" (ভাববার কথা—বর্তমান সমস্যা)

দ্রষ্টব্য—বরাবরই দুটি আদর্শ পাশাপাশি চলেছে সমতালে—ঐহিকতা ও পারমার্থিকতা, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ, গুরুবাদ ও সোহংবাদ। আর সবার মূল প্রেরণা তার বীরাত্মার প্রবল গ্রহণবর্জন: "আমি কাপুরুষকে ঘৃণা করি, কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চাই নি। কোন প্রকার রাজনীতিতে আমি বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।"

(পত্রাবলী—৪৭১ পৃষ্ঠা)

---

* পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৪২ পৃঃ—আত্মাকে বলহীনেরা পায় না, মানুষকে জগজ্জাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যেমন সিংহ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসে···নিজেকে নিজেই উদ্ধার করতে হবে···ইত্যাদি।

আবার সেই সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন এক নিশ্বাসে : "দাদা, মুক্তি নাই বা হ'ল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। একথা কি মিথ্যে ?—

"মনসি বচসি কায়ে পুণ্য পীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণ পরমাণুং পর্বতীকৃত্য কোচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥

(ঐ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

(এমন সাধু আছেন যাঁরা নিয়ত এ-ভুবনে
সাধি' নিখিল জনের হিত বাক্যে কায়ে মনে
পরের অণুগুণই তুলি' শৈলকায় করি'
বিকাশ লাভ করেন প্রীতি পীযূষ নির্ঝরি'।)

"নাইবা হোলো তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম রাম!···ও কোন দেশী বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন্ দেশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও-রকম দীনাহীনা ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানি নি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জানো না তো এতকাল কল্লে কি? ও সব নাস্তিকের কথা, লক্ষীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব, যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষীছাড়া হুলো বেড়ালের ম'ত কোনে ব'সে মেউ মেউ করবে।"

কী উদ্দীপক কথা! যেন বল্গা মানতে নারাজ তেজী ঘোড়া! মনে পড়ে সুইজর্লণ্ডে রোলাঁর কথা : "গায়ে কাঁটা দেয় আমাদেরই তাঁর বীরবাণী শুনে—সোজা গিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই।"

এই ভাবের কত কথাই না তিনি বলেছিলেন আমাকে সোল্লাসে। একটি পত্রে সহস্তে লিখেছিলেন : (২২-৮-১৯২৮)

Lisez la prémiere conférence de Vivekananda sur Maya et l'Illusion (1896). Combien je me sens proche de sa coception tragique du monde et de son action héroiqte!···La premiére qualité de mondepoor nous (et ce n'est pas seulement Beethoven qui l'a dit—mais c'est aussi votre Vivekananda) c'est l'Energie. Sans elle vien de grand. Avec elle, rien de faible. Ni vice ni vertu.

[অর্থাৎ বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ পড়ো ১৮৯৬ সালে মায়ার উপরে। জগত সম্বন্ধে তাঁর দুঃখবাদ ও অকুতোভয় কর্মবাদ আমার এত মন টানে!···আমরা মনে করি এ জগতে সব আগে চাই শক্তিবাদ (আর এ শুধু বীটাভ্‌নেরই কথা নয়—তোমাদের বিবেকানন্দের বাণীও এইই) শক্তি ছাড়া মহৎ কিছুর প্রতিষ্টা হতে পারে না, আর শক্তি থাকলে ক্ষীণ কিছু টিঁকতে পারে না—না পাপ, পুণ্য।]

য়ুরোপের একটি শ্রেষ্ঠ অনুভব এই শক্তিবাদ—এনার্জি। ওদেশে যাবার পরে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে ওদের এই গতিতন্ত্র—চলো চলো চলো—থেমো না। এর ফলে ওরা অনেক সময়েই খানায় পড়ে—চলার মোহ পেয়ে বসলে মানুষ সেই মোহবশে অনেক সময়েই অন্ধ হয়ে পড়ে ব'লে। কিন্তু তবু সব জড়িয়ে উদ্ভিদের মতন অনড় হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে চলা ভালো—এইই হ'ল আধুনিক যুগের একটি প্রধান বাণী—অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ নয়, প্রবৃত্তিমন্ত্র। স্বামীজির মধ্যে দেখতে পাই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য : অশ্রান্ত কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগ। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন ভারত পুণ্যভূমি—আর কর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-পুণ্য-ভূমিকে নির্মল করতে। তাই তিনি আধুনিকযুগের সাম্য-বাদ মেনে নিয়েছিলেন ছুঁৎমার্গের প্রতি আমাদের ঘৃণা জাগাতে এবং লোকাচারের অসারতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি পরম উপভোগ্য নক্সায় তিনি লিখেছেন (ভাববার কথা) :

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সেমন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেখানে নেই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি সুযিমামা, ইঁদুর চড়া গণেশ—নেই কি?···আমারও কৌতূহল হ'ল, ছুটলুম। গিয়ে দেখি—এ কি কাণ্ড—মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্চে না, দোরের পাশে এক পঞ্চাশমুণ্ডু মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক-জনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে। ঐ যে বেদ-বেদান্ত

দর্শন পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ, ও সব মধ্যে মধ্যে শুনলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পালতে হবে এর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম, তবে এ দেবদেবের নাম কি ? উত্তর এলো, এঁর নাম 'লোকাচার'।'

ধর্মকে মেনে লোকাচারকে তুচ্ছ করার এই যে বোধ, এ আমাদের আগের যুগে ছিল না বললেই হয়। তাই অমন যে তেজস্বী পুরুষ বিদ্যাসাগর, তিনিও বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের সময় চলতি লোকাচারকে খণ্ডন করতে বেরিয়েছিলেন পরাশর সংহিতার আশ্রয় নিয়ে, দেখিয়ে যে আগে বিধবাদের বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ ছিল না। স্বামীজি কিন্তু এ-যুগের যুগধর্মকে এককথায় মেনে নিয়ে লোকাচারকে অবাস্তব বলেছিলেন—সোজাসুজিই। শাস্ত্র তিনি আওড়াতেন চিরন্তন পরবিদ্যাকে প্রামাণ্য করতে, আর হেয় লোকাচারকে বরখাস্ত করতে চাইতেন আধুনিকতার সহজ যুক্তিবাদের পায়। তাঁর পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই—তিনি অধ্যাত্ম সত্যকে মনে করতেন অমূল্য ফল ফুল, আর গতানুগতিক লোকাচার কুসংস্কার কাপুরুষতাকে মনে করতেন আগাছা, কাঁটাবন। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি পত্রে লিখেছিলেন (পত্রাবলী ৪৮ পৃঃ) ঃ

"আমার মটো—মূলমন্ত্র— এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল ও গোঁড়ার কথা মনে করি। কারণ সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাস স্বরূপ।"

এখানে লক্ষণীয়—তিনি চিরন্তন সত্যকে মেনেও সাময়িক লোকমতকে উপেক্ষা করছেন সমান তেজে। এই ভেদজ্ঞানকে বলা যায় চিরন্তন ও অবাস্তবের তফাৎ—the difference between the essential and non-essential : ভারত পুণ্যভূমি—এ চিরন্তন সত্য, ভারতীয় লোকাচার অন্য সব লোকাচারের মতনই কথনো শুভ কথনো অশুভ—কাজেই চিরন্তন নয়। বেদান্তের সূত্র চিরন্তন, কেন না তার ভিত্তি অপরোক্ষ-অনুভব—কিন্তু লোকাচারকে প্রতিপদেই আধুনিক যুগধর্মের নিকষে যাচিয়ে দেখতে হবে—কথনো কিছু জুড়তে, কথনো কিছু বাদ দিতে। অন্যথা গোঁড়ামির অভিযোগে অভিযুক্ত হ'তে হবে—উদারতার হবে ভরাডুবি। পত্রাবলীতে মাষ্টার মহাশয়কেও (শ্রীম) তিনি লিখেছিলেন এই কথাই (১৪ পৃঃ) ঃ "পূজ্যপাদেষু, আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" এ প্রসঙ্গে গুরুভক্তি সম্বন্ধেও তাঁর আধুনিক বলিষ্ঠ মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া অবান্তর হবে না। আমেরিকায় তিনি বলেছিলেন ঃ "Love him (the Guru) heart and soul, but think for yourself. No blind belief can save you , work out your own salvation—গুরুকে মনে প্রাণে ভালোবাসবে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে শিখতে হবে তোমাকে। অন্ধ বিশ্বাসে মুক্তি নৈব নৈব চ।" (Inspired Talks 164 p.)

আমাদের আগের যুগে খুব বেশি জোর দেওয়া হ'ত সব তাতেই শাস্ত্র মেনে চলার 'পরে। মুনি ঋষি মন্ত্র গুরু—বাপ্‌রে ! তাঁদের কথা বেদবাক্য। কিন্তু এযুগের একটি প্রধান প্রবণতা হ'ল—যা সবাই মেনে নিয়েছে, একবাক্যে, না ভেবেচিন্তে, তাকেও ভেবেচিন্তে দেখতে হবে—কতখানি রাখতে হবে আর কতখানি ফেলতে। এ-মনোবৃত্তির একটি বড় চমৎকার পরিচয় মেলে মহামনীষী বার্টরাণ্ড রাসেলের একটি উক্তিতে। তাঁর দাদা তাঁকে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াতে এসে বলেন—প্রথমে কয়েকটি সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ব'লে মেনে নিতে হবে। রাসেল বলেন ঃ তা কেন ? প্রমাণ বিনা কিছুই মানতে পারব না। তাতে তাঁর দাদা বলেন—তাহ'লে তোমাকে জ্যামিতি শেখাতে পারব না। এ সূত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কে বড় সত্য-দিশারি সে দারুণ তর্ক তুলতে চাই না, কেন না তর্কের পথে এ-প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একথা বলা যায় খানিকটা অকুতোভয়েই যে আধুনিক মনের একটি শুভ প্রবণতা হ'ল ব্যবচ্ছেদ করা, খুঁটিয়ে দেখা, প'ড়ে-পাওয়া ঐতিহ্যকে (tradition) অপৌরুষেয় ব'লে মেনে-নেওয়াও নয়, হাতের-পাঁচ রূপে ভোগ করাও নয়—খাটিয়ে বাড়ানো। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে একবার আমাকে লিখেছিলেন ঃ "The tradition of the past is a great thing in its own place, but that is no reason why we should go on repeating the past. A great past should be followed by a greater

future."* এককথায়, গতিবাদ আর শক্তিবাদ এই দুই বাদ আমাদের মনকে যেমন অভিভূত করে, আমাদের পূর্বসূরীদের মনকে তেমন অভিভূত করত না। স্বামীজির মহান্ ব্যক্তিরূপের পটভূমিকায় এই গতিবাদ ও শক্তিবাদ আশ্চর্য দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠেছিল আধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে—যে সমাহারকে পুণ্যভূমি ভারতের অবদান বললে অত্যুক্তি হবে না।"

আধুনিক যুগের আর একটি অনস্বীকার্য প্রবণতা—জটিলতার বৃদ্ধি; শুধু মহত্ত্বের বিকাশ নয়—সুষমার (হার্মনি) মঞ্জরণ। এ-মঞ্জরণের শোভা সবচেয়ে বেশি বিচিত্র হয়ে ওঠে মহাজনদের জীবন পর্যালোচনা করলে। স্বামীজি ছিলেন এ যুগে মহাজনদের মধ্যেও মহাজন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—a king among men! তাই তাঁর চরিত্রের মহনীয় বিকাশ একটু পর্যালোচনা করলে আমরা লাভবান হব দেখতে পেয়ে একটি চিত্তচমৎকার দৃশ্য—কতরকম বিরুদ্ধ ভাবধারার সমুচ্চয়ে তাঁর ব্যক্তিরূপ এমন অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।

পয়লা নম্বর: স্বামীজির মধ্যে দেখতে পাই আশৈশব ধ্যানের প্রবণতা। কৈশোরেও ধ্যান করতে বসতে না বসতে তিনি মগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন তিনি ধ্যানে বসেছেন—সার সার মশা ব'সে পিঠ কালো হয়ে গেছে, তবু তাঁর ধ্যান ভাঙে নি। অথচ অন্যদিকে তিনি ছিলেন এমন প্রাণচঞ্চল যে, একদিন তাঁর মাতৃদেবী উত্যক্ত হ'য়ে বলেছিলেন: "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, ৪ পৃঃ)

দোসরা নম্বর: বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল বললেই হয়, অথচ সহজে ভক্তি বিশ্বাস করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। পরমহংসদেব-যে-পরমহংসদেব—তাঁকেও তিনি নানাভাবেই পরখ ক'রে তবে গ্রহণ করেছিলেন—এমন কি তাঁর সমাধি সম্বন্ধেও রীতিম'ত সন্দিহান হয়েছিলেন। অগাধ ভক্তি করতেন গুরুদেবকে অথচ তাঁর কোনো কথাই সহজে মেনে নিতেন না। তিনি জগন্মাতা কালীকে দর্শন করেন শুনে প্রথমে বলেছিলেন—"ও মনের ভুল"। কথামৃতের তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে পাই (পরমহংসদেবের দেহান্তের পরে বরাহনগর মঠে):

"বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র বলিলেন: আমি তো কিছুই মানতাম না।

মাষ্টার: কি, রূপ টুপ?

নরেন্দ্র: তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতাম না। একদিন তিনি বলেছিলেন: 'তবে আসিস কেন?' আমি বললাম: 'আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।'

মাষ্টার: তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র: খুব খুসি হ'লেন।"

তেসরা নম্বর: কর্মোদ্যম ছিল তাঁর অসামান্য, অথচ তিনি নিবেদিতাকে একদিন বলেছিলেন যে, জগতে তাঁর কাম্য শুধু একটি গাছতলা—যার নিচে তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে থাকতে পারেন। পরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত—যেমন খুব কম মহাপ্রাণ মানুষেরও প্রাণ কাঁদে, অথচ তাঁর প্রকৃতি ছিল স্বভাববৈরাগী—ঘুরতেন পদব্রজে পাহাড় পর্বতে কত তীর্থে বনে জঙ্গলে। স্বভাব-নিঃসঙ্গ অথচ শুধু যে বহুকে সঙ্গ দিতেন তাই নয়, বহুর সাহচর্যে তাঁর প্রতিভা হ'য়ে উঠত খরদীপ্তি—তর্কে, বিচারে, হাসিতে, গল্পে।

কিভাবে তিনি বহুলোককে সঙ্গ ও আশ্রয় দিতেন, তার আমি বিশদ বর্ণনা করেছি আমার "এদেশে ওদেশে" ভ্রমণকাহিনীতে—"মাদাম কালভে" নিবন্ধে। সমস্ত প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তাছাড়া মাদাম কালভের কথা তাঁর নানা জীবনীতেই আছে। তাই আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হিসেবে এ-প্রবন্ধটি থেকে অল্প একটু উদ্ধৃত করি দেখাতে—মানুষ এ-জন্মবৈরাগী স্বভাবনিঃসঙ্গের পুণ্যসঙ্গে কত কী পেত।

আমি ১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা সুন্দরী নীস নগরীতে এক কাউণ্টেসের ওখানে ফরাসী ভাষায় একটি বক্তৃতা দিই ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে। সেখানে আমার বক্তৃতা ও গানের পরে মাদাম কালভে আমার সঙ্গে আলাপ করতে

---

* অতীতের ঐতিহ্য খুবই বড় জিনিষ, কিন্তু তাই ব'লে আমরা কেবল তার পুনরাবৃত্তি ক'রেই চলতে পারি না তো। মহৎ অতীতের পরে আবাহন করতে হবে মহত্তর ভবিষ্যৎকে।

এগিয়ে আসেন। তাঁর নাম আমি জানতাম—বিখ্যাতা গায়িকা—Prima Donna—পরমা সুন্দরী—কী ভাবে মনঃকষ্টে প'ড়ে স্বামীজির কাছে এসে আলো পান ও পরে তাঁর সঙ্গে ভারতে আসেন—পড়েছিলাম আগেই। এইবার উদ্ধৃতি দেবার সময় এলো। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইভাবে সুরু করেন :

"মাদাম কালভে : স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অলোক-সামান্য মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী—বলব কোন্ ভাষায়? তাঁর সঙ্গে সেই জাহাজে তিনমাস থাকা—অবিস্মরণীয়।

"আমি : তাঁর সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হয় কী সূত্রে?

"মাদাম কালভে : সে-সময়ে আমার বড় দুর্দিন। গভীর মনঃকষ্টে আছি। আমার স্বামী ও মেয়ে মারা যান, আরো নানা উপসর্গ ছিল। সেই সংকট সময়ে হঠাৎ আমার এক বন্ধু বললেন : 'চলো তোমাকে নিয়ে যাই এক হিন্দু মহাত্মার কাছে—তিনি হয়ত তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন।' আমি বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু আমি ভাবলাম—দেখাই যাক না।

"সে সময়ে তিনি মাটিতে ব'সে ধ্যান করছিলেন। আমি পাশে বসলাম একটি চেয়ারে। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। আমি ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কে এ rustic (চাষা) রে, আমার মতন জগদ্বিখ্যাতা গায়িকাকে কি না ঠায় অপেক্ষা করায় এতক্ষণ! উঠে যাব যাব ভাবছি, এমন সময়ে তিনি বললেন : 'ব্যস্ত হোয়ো না, আমি ধ্যান ক'রে দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক কোন্‌খানে ব্যথা ও কী প্রয়োজন। মুখে তো তুমি সব বলবে না।' চমকে গেলাম বৈকি—আরো যখন—খানিক বাদে—স্বামীজি আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন সব কথা বললেন যা আমি ছাড়া কেউ জানত না!

"আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ! এ কী ব্যাপার! তারপর তাঁর সঙ্গে কত জায়গায়ই না ঘুরেছি! আমার সব ব্যথা যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে! তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত—আর মুগ্ধ হ'তাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে—যদিও তখন আমার বয়স কম।

"কাউন্টেস (আর্দ্রস্বরে) : হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃ সম্বোধন করাটা কী সুন্দর!

"মাদাম কালভে : অথচ এমন মানুষেরও আমি নিন্দা শুনেছি মসিয়ে রায়—শুনে সত্যিই আমার লজ্জা হ'ত—মন ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠত : কী ক'রে পারে তারা এমন পুণ্যসুন্দর মানুষের নামে কুৎসা রটাতে! য়ুরোপে আমেরিকায় কত আর্তকেই যে তিনি এইভাবে শান্তি দিয়েছেন, কত অন্ধকেই দৃষ্টি দিয়েছেন! তাঁর কাছে শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।"

চৌঠা নম্বর : তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা মঠে তিনি আদৌ চান নি গুরুপূজা, অথচ গুরুভক্তিতে কে পারত তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একবার একটি চিঠিতে তীব্র ভৎর্সনা ক'রে লিখেছিলেন (পত্রাবলী ৪৮০ পৃষ্ঠা) :

"সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!!···তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধুলো পেয়েছিস।···সকল জায়গাতেই ভাবের ঘরে চুরি—কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি রক্ষে করতেন দেখতে পাচ্ছি যে! ওরে পাগল, পরীর মত সব মেয়ে, লাখ লাখ টাকা—এসব তুচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন।"

কলকাতায় তাঁর একটি বিখ্যাত ইংরাজি ভাষণে বলে-ছিলেন—এখানে তার অনুবাদ দিলাম :

"তোমাদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাম শুনে আমার হৃদয়ের একটি গভীর তন্ত্রী বেজে উঠেছে। আমি যদি চিন্তায় কথায় কি কাজে কোনো সিদ্ধিলাভ ক'রে থাকি, যদি আমার মুখ দিয়ে কখনো একটি সার্থক বাণীও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে, তবে সে-বাক্য আমার নয়—তাঁর। আর যদি কখনো কাউকে কোনো কটু কথা ব'লে থাকি, কি কোনো দ্বেষের বাণী রটিয়ে থাকি—তবে সে কুকীর্তি আমার—তাঁর নয়। দুর্বল ক্ষীণ যা কিছু—সব আমার। আর যা কিছু শুচি শুভ্র তার মূলে—তাঁর প্রেরণা, তাঁর বচন, তাঁর ব্যক্তিরূপ।"*

---

* "Brothers, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life—Sri Ramakrishna Param-

অন্যদিকে এই মানুষটিই আমাদের পদে পদে শাসিয়েছেন, নিষ্করুণ কশাঘাত করেছেন যেখানেই দেখেছেন ভণ্ডামি, জালজালিয়াতি, ভাবের ঘরে চুরি, শুচিবাই, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার উঁকিঝুঁকি। স্বামীশিষ্য সংবাদ-এ শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন—এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে একবার ধরেন গরুর জন্যে পিঁজরা-পোলে টাকা দিতে। তাতে স্বামীজি বলেন—মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষে নয় লক্ষ মারা গেছে, এ সব দুর্গতদের জন্যে কী করা যায়? তাতে ভদ্রলোকটি বলেন—মানুষ তার কর্মফলে দুঃখ পায়, শাস্ত্রে বলেছে গোজাতি আমাদের মাতা। স্বামীজির মুখ লাল হয়ে ওঠে, তিনি বলেন: বটেই তো, নৈলে আর এমন সুপুত্র হয়!

পাশ্চাত্য দেশ থেকে একটি মস্ত গুণ আমরা পেয়েছি—আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয় স্বামীজির মধ্যে রূপ নিয়েছিল আত্মবোধের। এ আত্মবোধের দীপ্তি বিশেষ ক'রে ফুটে উঠত যখন ভারতের কোনো পাশ্চাত্য নিন্দুক আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করতে চাইত। নিবেদিতা লিখেছেন (My Master as I saw him ২১০ পৃষ্ঠায়): "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কী বোঝায় সে-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। কতবারই না তিনি আমাকে বলেছেন: 'তোমরা ভারতকে বুঝতে পারো নি আজো। আমরা খতিয়ে নরপূজারী। আমাদের নারায়ণ নর।' প্রতিমা-পূজার সম্বন্ধেও সমানই স্পষ্টভাষায় বলতেন তাঁর প্রত্যয়ের কথা: 'প্রতিমাকে ভগবান্ বলতে পারো—একশোবার, কেবল ভগবান্ প্রতিমা এই ভুলটি কোরো না।' "শ্রীঅরবিন্দ আমাদের একবার বলেছিলেন যে তাঁর মনে আশ্চর্য আলো নামত—যার ফলে তিনি এমন সব সত্য দেখতে পেতেন যা সে-আলো বিনা দেখা যায় না। ইংরাজিতে এই জাতীয় বাণীকে বলে aphorism—জ্ঞানোক্তি; Inspired Talks নামে অপূর্ব বইটির ছত্রে ছত্রে পাই এই জ্ঞানোক্তি প্রায় মন্ত্রের ম'ত-ঝংকারে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করি—কী চমৎকার:

যার কিছুই নেই ভগবান তারই। (৪৮ পৃঃ)

সিংহ হ'তে না দিলে মানুষ শৃগাল হবে (৬৬ পৃঃ)

ভগবানের সন্ধানে মরাও ভালো, কিন্তু কুকুর হ'য়ে মাংসের জন্যে কাড়াকাড়ি কোরো না। (১০১ পৃঃ)

এমন অবস্থা লাভ করতে হবে যেখানে তোমার প্রতিটি নিশ্বাস হবে প্রার্থনা। (১০৪ পৃঃ)

অনুমান— আমার তোমার—আনে সংঘর্ষ। বলো তুমি কী দেখেছ, দেখবে তোমার কথা সবাই বরণ করবে। (১৩২ পৃঃ)

যখন মানুষ বোঝে যে সুখের অন্বেষণ বিড়ম্বনা, তখনই ধর্মের আরম্ভ হয়। (১৯২ পৃঃ)

মানুষ এগোয় প্রেমের প্রেরণায়, সমালোচনার অঙ্কুশে নয়।

এ-উক্তিগুলি মূল ইংরাজিতে পাঠ্য—বাংলা তর্জমায় এ-জাতীয় ধ্যানলব্ধ বাণীর দীপ্তি ম্লান হ'য়ে আসে। আমি তবু বাংলা তর্জমা দিলাম শুধু আভাষ দিতে—কি ধরণের মণিমুক্তা তাঁর কথালাপে নিরন্তরই বিচ্ছুরিত হ'ত ফুলঝুরির স্বর্ণরাগের ম'ত। এ তিনি পারতেন বুদ্ধিবলে নয়—প্রতিভ জ্ঞানের প্রেরণায়। এ সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত আলোচনা অবান্তর হবে না।

অনেকদিন আগে একদা আমার মনে প্রশ্ন ওঠে—অত্যধিক আত্মপ্রত্যয় সাধকের পক্ষে ভালো কি না—এর ফলে মনের মধ্যে অহমিকা প্রশ্রয় পায় কি না—যার গোড়াকার কথা এই যে, আমি আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বড়—ইংরাজিতে যাকে বলে—sense of superiority। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি চিন্তা-উদ্দীপক পত্র লেখেন। সেটি তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে ব'লে আমি অনুবাদে তার সারমর্মটুকু পেশ করি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন:

"যখন আমাদের দৃষ্টির সামনে কোনো নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় তখন অনেক সময়ে মনে আত্মপ্রত্যয়ের তেজ

hamsa. If there has been anything achieved by me—by thoughts or words or deeds—'if from my lips has ever fallen one word that has helped any one in the world, I lay no claim to it—it was his. But if there have been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me—it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, and all that has been life giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words and he himself." (Address at Calcutta—Swami Vivekananda's Works, Vol III, p. 312)

জেগে ওঠে যাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'তে পারে আত্মাভিমান। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এক মাদ্রাজী পণ্ডিতের তর্ক হয় জানো নিশ্চয়ই? পণ্ডিত বলেছিলেন: কিন্তু শঙ্করাচার্য তো কই এমন কথা বলেন নি?' স্বামীজি পিঠ পিঠ উত্তর দিয়েছিলেন: 'না। কিন্তু আমি, বিবেকানন্দ, বলছি।' তাঁর এ-উক্তির মূলে অহমিকা ছিল না—ছিল রণবীরের ব্যুত্থান—যে দাঁড়ায় নিজের আদর্শের জন্যে লড়তে, কেন না নিজেকে সে মনে করে কোনো মহৎ সত্যের প্রতিভূ—যার অমর্যাদা হবে যদি সে হার মানে। ("This is not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, could not allow himself to be put down or belittled.")

বিবেকানন্দের তেজস্বিতার মূলে ছিল যে এই ভাগবত প্রতিভূর প্রাণের প্রত্যয় ও অন্তরের আলো—এই সত্যটি শ্রীঅরবিন্দের এই কয় ছত্রে আমার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল বলেই তাঁর পত্রের উল্লেখ করলাম। স্বামীজির অজস্র নিবন্ধ, ভাষণ, কথালাপের মাধ্যমে নিত্যই ফুটে উঠত এই আদিষ্ট প্রতিনিধির অঙ্গীকার: "Thou lead and I follow." তিনি ছিলেন ধ্যানে শিবপূজারী, কর্মে কালীর সন্তান। তাঁর "attitude of the fighter."-এর আত্মপ্রত্যয়ী সুর ফুটে উঠেছে তাঁর একটি আশ্চর্য কবিতার বাণীতে:

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি
তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এ-ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি
চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না
ডরাব তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক
তাহাতে শ্যামা।

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এরই নাম "divine warrior"—কিন্তু শুধু দিব্য প্রেম নয়, সেই সঙ্গে দিব্য শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বার বারই বলতেন—জগতে প্রেম ও জ্ঞানের মূল ভিত্তি হ'ল শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের দেখা পেয়েছিলেন আলিপুরের কারাগৃহে। একটি চিঠিতে তিনি সহস্তে লিখেছিলেন: (SRI AUROBINDO AND HIS ASHRAM ৪৪ পৃষ্ঠা): "জেলে ধ্যানের সঙ্গে আমি ক্রমাগতই শুনতাম বিবেকানন্দের স্বর দুসপ্তাহ ধ'রে।" এ-অঙ্গীকার তিনি পরেও করেছিলেন ওঁর কথালাপে (MOTHER INDIA, June, 1962, pp 11, 12): বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে অতিমানসতত্ত্বের সন্ধান দেন—এই এই ঐ ঐ—নির্দেশ দিয়ে নানাভাবে। আলিপুর জেলে পনের দিন ধ'রে তিনি আমাকে শেখান ও বোঝান।" এ-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেন (MOTHER INDIA, June 1962, P. 12): "আলিপুরের জেলে তিনি আমার কাছে আসবেন এ আমি মোটেই ভাবিনি, কিন্তু তবু তিনি এসে আমাকে শিখিয়েছিলেন, আর তিনি দিয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ—I never expected him and yet he came to teach me. And he was exact and precise even in the minutest details."

শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। উভয়কেই তিনি গভীর ভক্তি করতেন। একবার বলেছিলেন একটি অতি চমৎকার কথা: "The capitulation of Vivekananda to Sri Ramkrishna is a capitulation of the West to the East." তিনি দেখেছিলেন তাঁর যোগ দৃষ্টিতে—যেকথা স্বামী বিবেকানন্দও বারবারই বলেছিলেন—যে, ভারতই হবে জগতের অধ্যাত্ম দিশারি।

শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন আরও একটি কারণে— কর্ম, লেখা ও তেজস্বিতার দিক দিয়ে এই দুই মহাপুরুষই ছিলেন সমধর্মী—এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ অবস্থা—বড় ছোটর প্রশ্ন ওঠে না—কেন না উভয়েই ছিলেন ভারত-আত্মার দীপ্ত বাণীবাহ, আত্মবোধের আলোকস্তম্ভ। ওদেশে বলে—শুধু খৃষ্টই পারে খৃষ্টকে বুঝতে।

শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজির মহিমার মর্মজ্ঞ হ'তে পেরেছিলেন —তিনি নিজেও সেই একই প্রজ্ঞা-পারমিতার আলোর প্রসাদ পেয়েছিলেন ব'লে। তাই তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে

১৯১৬ সালে লিখেছিলেন তাঁর মন্ত্রঝংকারিত ভাষায় যার জুড়ি মেলে না :

"Vivekananda was a soul of puisssance if ever there was one, a very lion among men··· We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitve, upheaving that has entered the soul of India and we say, 'Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother ahd in the souls of Her children." ("বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তিমত্তার মূর্তবিগ্রহ নরকেশরী। তাঁর প্রভাব আজো প্রচণ্ড ভাবে সক্রিয় রয়েছে অনুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কী ভাবে ও কোথায়। মনে হয় শুধু—যেন কোন সিংহবিক্রম অন্তর্মুখী উর্দ্ধায়িত মহাশক্তি ভারতের আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আর আমরা বলি : 'দেখ দেখ বিবেকানন্দ তাঁর চিরজননীর ও তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজো চিরজীবী।'")

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আত্মার একজন দীপ্ত বাণীবাহ, একথা আমরা সবাই জানি ও মানি। কিন্তু তাঁর দিব্যকর্মপ্রতিভা যে আজও আমাদের মধ্যে সক্রিয় একথা আমরা সময়ে সময়ে ভুলে ব'সে থাকি ব'লেই শ্রীঅরবিন্দের বিবেকানন্দ-তর্পণ চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁদের কাছে—যাঁরা এই দুই বীরকেশরীকে দিতে চান তাঁদের প্রাণের প্রণামী।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এ-তর্পণ শুধু কথা কথা কথা নয়। স্বামীজির প্রেরণা আজো হাজার হাজার আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীর মধ্যে কাজ করছে—যাঁদের মধ্যে একজনের মাথা আকাশে ঠেকেছিল; তিনি আমাদের দেশের নেতাজি—সুভাষচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে স্বামীজির মধ্যে তাঁর তপঃশক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার মনে হয় স্বামিজির সিংহবিক্রম মহাশক্তি ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর উত্তরসাধক সুভাষের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে দিয়েছিল তাকে দিব্য-উন্মাদনা। এ আমার বন্ধুপ্রীতির কাব্যোচ্ছ্বাস নয়। কারণ যাঁরা একটু গভীরদর্শী তাঁদের চোখে পড়বেই পড়বে যে স্বামীজির দুঃসাহসের মন্ত্রে সুভাষ কৈশোরে দীক্ষা নিয়েছিল বলেই সে "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন" মন্ত্র জপতে জপতে বিশ্বপরিক্রমা করতে পেরেছিল; তাঁর দিব্যপ্রে: তার মনে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল বলেই ভারতের দুঃখ ও দুর্গতদের জন্যে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই কল্পনা করতে পারি—যখন সে বর্মায় সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলে অসম সাহসে "দিল্লি চলো" রণদুন্দুভি বাজিয়ে তুলেছিল তখন তার দুর্দম অন্তঃশক্তির উদ্বোধন করেছিল স্বামীজির দিব্য দেশভক্তির—divine patriotism-এর—প্রাণোন্মাদী তূর্যধ্বনি—কোনো সাবধানী রাজনৈতিক বুলি নয়। স্বামীজির MY PLAN OF CAMPAIGN ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে এ কথার ভাষ্য করা হবে। স্বামীজি বলেছিলেন :

"They talk of patriotism. I believe in patriotism and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achive ments. First, feel from the heart. What is in the intellect or reason ?···Through the heart comes inspiration. Love opens the most impossible gates ; love is the gate to all the secrets of the universe. Therefore, feel, my would-be reformers, my would-be patriots ! Do you feel ? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and sages are starving today ? ··Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud ? Does it make you restless ? Does it make you sleepless ? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heart-beats ?···

"Yet that is not all. Have you got the will to Surmount mountain-high obstructions? If the whole world stands against you, sword in hand, would you still dare to do what you think is right ?···শেষতঃ "Have you got steadfastness ? It you have these things, each one of you will work miracles ··If you live in a cave, your thoughts will permeate even through the rock walls, will go vibrating all over the world for hundreds of years, may be, until they will fasten on to some brain and work out there. Such is the power of thought, of sincerity and of purity of purpose."

("শুনি দেশভক্তি সম্বন্ধে কত বুলি ! আমি বিশ্বাস করি দেশভক্তিকে---তবে আমার দেশভক্তির আদর্শ অন্য। এজন্যে চাই তিনটি জিনিস : প্রথম অন্তরের দরদ। বুদ্ধি-যুক্তির সাধ্য কতটুকু ? প্রেরণার উৎসমূল—হৃদয়। শুধু প্রেমই খুলে দিতে পারে চিররুদ্ধ দুয়ার, বিশ্বরহস্যের চাবি তারি হাতে। যদি সত্যি সংস্কারক কি দেশভক্ত হ'তে চাও, তবে সব আগে হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করতে শেখো। বুক ফেটে যায় কি তোমার ভাবতে যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি দেব-সন্তান ঋষি-সন্তান আজ নিরন্ন—অজ্ঞানের কালো মেঘে দেশ অন্ধকার ? বলতে পারো কি—তোমার রাত্রে ঘুম হয় না—প্রাণ কেঁদে ওঠে একথা ভাবতে ? অঙ্গীকার করতে পারো কি—যে পরের ব্যথা তোমার ধমনীর রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ ক'রে হৃৎস্পন্দনে কেঁপে কেঁপে উঠবে ?

"কিন্তু শুধু এইই নয়। পর্বতপ্রমাণ বাধা এলেও তাকে অতিক্রম করবে এমন পণ নিয়েছ কি তুমি ! সমস্ত জগৎ যদি তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহ'লেও তুমি কৃপাণ হাতে একলা চলতে পারো কি কর্তব্য পালন করতে —মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতনের পণ নিয়ে ? শেষতঃ, তোমার নিষ্ঠা আছে কি ? এই তিনটি গুণ যদি থাকে, তবেই তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে। এমন কি, যদি গুহাবাসীও হও তাহলেও তোমার চিন্তা ও অভীপ্সা পাষাণ ভেঙ্গে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে, স্পন্দমান হ'য়ে শত বৎসর ধ'রে যতদিন না তারা এমন কোনো আধার পায় যার মধ্যে দিয়ে তারা মূর্ত হ'য়ে উঠবে পরম সিদ্ধিতে। চিন্তা, অভীপ্সা, আন্তরিকতা ও পুণ্যসংকল্পের মধ্যে এমনি দিব্যশক্তি নিহিত।"

স্বামীজির দেশভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষকেও অনুপ্রাণিত করেছিল—এ আমার কথার কথা নয়, বিনিদ্র রাত্রে কতদিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার—শুধু এদেশে নয়—বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি, তেমনি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজির দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই। একথার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে—আমি কেবল সুভাষের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই সমাপ্তি আনব দেখাতে—স্বামীজির প্রাণের সুর তার প্রাণের তারেও কী ভাবে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছিল। সুভাষ বলেছিল :

"আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি—বাংলার আনন্দ উৎসবের মধ্যে নয়, বিত্তবানের শান্তির মধ্যে নয়। আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি, দুঃখ দৈন্য নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে ; অশান্তি অবিচার, অনাচারের মধ্যে—সবার উপরে মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।···

"মনে রাখিবেন যে, আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে।···জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান দিয়াছে—শুধু সেই অমৃতের সন্ধান পায়। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, শুধু ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃতসিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদের আজ আহ্বান করিতেছি—আসুন, আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে আমরা সকলে দীক্ষিত হই ! আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশ-মাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

'ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

এই কথাই যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন তাঁর অনুপম ভাষণে স্বামীজির সিংহবিক্রম প্রেরণাকে বরণ করে : "Behold Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of Her Children."

আজ এ-মহাভাগ কর্মবীর জ্ঞানশিখরচারী প্রেমব্রতীর জন্মশতস্মৃতিবার্ষিকীতে এই কথা স্মরণ করে যেন গাইতে পারি আমরা ভক্তিকম্প্র আনন্দের উচ্ছল অঙ্গীকারে :

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত
অলোকলোকের অশোক দুলাল, পুণ্য শুভ্র ধর্মনিত্য !
দলি' বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিষ্কাম অমলকান্তি !
কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে—
ভরসা শান্তি !

অল্পের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ !
তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের দুঃখ দৈন্য
ঘুচাতে হে দেবসেনানী, তোমারা তুলিলে গড়ি'
বেদান্তী সৈন্য !
হীন লোকাচারে মিথ্যাবিহারে ছিল যারা চির পথভ্রান্ত—
তোমার অভ্যুদয়ে হ'ল নব-অরুণোজ্জ্বল পথের পান্থ।
অল্পের পথ···অন্ধ !
হে অপরাজেয় বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জানিলে তাঁহার বরে—তুমি চিরজীবন্মুক্ত, শিবের অংশ।
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন—
যারা ছিল নগণ্য
তোমার বীর্য জ্ঞানের পরশমণির ছোঁওয়ায় হ'ল হিরণ্য।
অল্পের পথ···অন্ধ !

প্রাচী প্রতীচির মাঝে সেতু বাঁধি' সিন্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত,
ঐন্দ্রজালিক ! জাগালে—যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিযুপ্ত।
গীতা ও পুরাণ, ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, উপনিষদ, তন্ত্র
কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কৃত হ'য়ে জগন্মাতার অভয় মন্ত্র।
অল্পের পথ···অন্ধ !
ব্রহ্মচারী যে স্বাধিকারে তার, শুধু অমৃতেরি জপিল তৃষ্ণা,
প্রেমের মুকুট দেখি' শিরে যার লাজে মুখ ঝাঁপে
কামনা কৃষ্ণা—
সে-তুমি বিলালে দুহাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকারত্ন—
স্বার্থ ভুলিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রহিয়া মগ্ন।
অল্পের পথ···অন্ধ !

দ্বিজেন্দ্রলালের "ভারত আমার ভারত আমার" স্তবের সুরে গেয়।

নিঃসঙ্গ প্রহরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মরু সাগরের মত অনাদরে পড়ে আছি হেথা এক কোণে,
অনেক অনেক নীচে। তুমি দূরে, মোর কথা
পড়ে কি গো মনে !
বিমর্ষ বিহগ এলো সন্ধ্যার তিমির স্রোতে ডানা ছুঁয়ে
অরণ্য-কুলায়,
জীবনের মালভূমি ভরে গেছে অজস্র ধূলায়।

খুঁজেছি তোমারে আমি পাবার প্রত্যাশা নিয়ে
এশিয়ার নানা জনপদে,
ককেশাস পার হয়ে পশ্চিম গোলার্দ্ধ মাঝে মরু মেরু পথে
বারে বারে পরিক্রমা ; তবু আমি, পাইনি তোমারে—
উল্লাস অবজ্ঞাভরা জন সিন্ধুপারে।

তুমি যেন হোয়াংহোর মত
একদিন দিয়েছিলে দেখা তুষারের পথ বেয়ে।
তব প্রেমোচ্ছ্বাসে কত
ডুবে গেছে প্রণয়ের উপত্যকা তারুণ্যের আর্ত্ত কলরবে !
মোহমুগ্ধরূপ তব ভুলি নাই। তরঙ্গের মত
এসে যৌবন-বৈভবে
আকর্ষণ করে গেছ সহস্রপরাণ ;
তারা রিক্ত, তোমারে কি করেনি সন্ধান ?

অন্তরের বাতায়ন মুক্ত করি আনন্দের রোলে
এক হয়েছিল মোরা প্রেমের কল্লোলে।
সে তো বেশী দিন নয় ?
প্রথম প্রণয়।
বিজনে নিভৃতে বসে ফুলের ছায়ায়
গাঢ় ঘন আলিঙ্গনে,
আঁখি অধরের খেলা খেলেছিনু পুলক-স্পন্দনে,
বেণু বন নুয়ে নুয়ে পড়েছে বাতাসে
সুমধুর অবকাশে।

নিখিলের ব্যূহভেদ করে
আবার তোমারে পাবো, এই আশা করি না অন্তরে।
ভ্রান্তি মোর, শ্রান্তি মোর, সব বুঝি স্মরণের দীর্ঘ ছায়াতলে
নিয়েছে আশ্রয়। প্রাণযাত্রা স্থবির
বিমূঢ় মোর অশ্রুজলে ;
জ্যোছনার রেণু মেখে তুমি না বলেছ মোরে সান্ত্বনার
আলিম্পনা দিয়ে—
দেখা হবে পুনরায় মিলনের গান গাহিবে আমারে নিয়ে
সেকি আজ আকাশকুসুম !
সঙ্গীহারা প্রত্যেক নিমেষ মোর নিস্পন্দ নিঝুম।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই দিন সকাল সকাল থানায় নেমে বকেয়া কায-কর্ম্মগুলো সেরে ফেলতে মনস্থ করলাম। এই মামলার তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরও বহু মামলার তদন্ত করতে হয়ে থাকে। একটীমাত্র মামলা নিয়ে পড়ে থাকলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। তাই এরই মধ্যে আরও অনেক ছোট বড় মামলা আমাদের তদন্তাধীনে নিতে হয়েছে। কয়েক দিনের জন্য বেনারসে যাবার আগে এই মামলা-গুলিরও কিছু কিছু সুরাহা করে রাখবার দরকার ছিল। তাই সকালের দিকে আমি ও আমার সহকারী সুবোধ রায় আমাদের অন্য কাযগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর কারণ আমাদের বিভাগীয় বড়-সাহেব আজকেই রাত্রে আমাকে সহকারী সুবোধ রায়কে সঙ্গে করে বেনারস শহরে রওনা হবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই অদ্ভুত মামলা সম্বন্ধে সেখানে আমাদের স্থানীয় রক্ষীকুলের সহযোগিতায় দুইটী স্থানে ভালো করে তদন্ত করতে হবে। এই আহত যুবকের পিতা মাতার বাড়ীতে ছাড়া ওখানকার ঐ দ্বিতল বাড়ীর কাশীবাসী মালিকের ডেরাতেও সেখানে গিয়ে আমাদের তদন্ত করতে হবে।

সেদিনকার সেই গুণ্ডাদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় আমার দেহে খুব বেশী আঘাত লাগেনি বলেই মনে হয়েছিল। তাই এর বিশেষ কোনও চিকিৎসা করারও আমি প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু এই কয়দিন আমার পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন মধ্যে মধ্যে টন টন করে উঠে। একটু বেশী লেখালেখি বা অন্য কোনও পরিশ্রম করলেই তা বুঝা যায়। কিন্তু তবু এই অল্প-স্বল্প ব্যথা যেন মনের মধ্যে একটা পুলক শিহরণ আনে। ভদ্রজনেদের দ্বারা প্রহৃত হলে দেহের সঙ্গে মনের ব্যথাও জেগে উঠে। তাই এই ধরণের লোকের প্রহারজনিত ব্যথা আমরা একটুতেই বেশী মনে অনুভব করি। কিন্তু গুণ্ডা-ডাকাতদের প্রহারের ব্যথা পুলিশ অফিসারদের পক্ষে বেশ একটু সুখের আমেজ সৃষ্টি করে থাকে। তবু আমি বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা একটু টেনে নিজেই নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে আবার নথী-পত্রের মধ্যে ডুব দিলাম। এদিকে আজকেই সন্ধ্যার মধ্যে বেনারস মেলে রওনা হতে পারবো কিনা সে সন্দেহও আমার মনে থেকে থেকে জেগে যে না উঠছিল তা'ও নয়। কিন্তু সে যে রকম করেই হোক, আজকে সন্ধ্যের মেলেই সেখানে যে আমাদের রওনা হতেই হবে।

'আমার মনে হয়, স্যার,' নথীপত্রে লেখালেখি করতে করতে সহকারী সুবোধবাবু বললেন, 'এই শহরে এই কয়-দিন তদন্তে যা পেলাম তা'তে শুধু প্রমাণ হয় এই যে ঐ আহত যুবকটীর প্রতি ঐ ভদ্রমহিলা অনুরক্তা। আর স্যার, এই তথ্যটুকু তো তদন্তের প্রথম দিনেই আমরা জানতে পেরেছি। অথচ সেই দিন থেকে এই একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সাক্ষীর মুখে সেই একই কথায় ও সুরে কচকচি চলছে। এদিকে তদন্তের পথে যতোই এগুনো যায় ততোই একাধিক ব্যক্তির প্রতিই আমাদের সন্দেহ জাগে। এর ফলে আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই আমরা থেকে যাই। কতোবার মাত্র কয়েক পা এগিয়ে আবার আমাদের পূর্ব্বস্থানে ফিরে আসতে হয়েছে। আমার মনে হয় যে সেইদিন সকালে জনৈক বহিরাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে ঐ ভদ্রমহিলার কলহের প্রকৃত কারণটি জানতে পারা মাত্র আমাদের এই অদ্ভুত মামলাটীর কিনারা হয়ে যাবে।

'উহুঁ! ঐটুকু জানতে পারলে এই অপরাধের অপরাধী হয়তো ধরা পড়বে,'—আমি এইবার আমার

নথীপত্র হতে মুখ তুলে সহকারীর প্রশ্নের উত্তর করলাম, 'কিন্তু তাতে এই সাজ্ঘাতিক মামলার অপরাধের উদ্দেশ্য বা মোটীভ কি ছিল তা আদপেই জানা যাবে না। এই অপরাধের এই মূল হেতু না জানলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলা প্রমাণ করা দুষ্কর হয়ে উঠবে। আমাদের এখন এই তদন্তের প্রতিটী কায করে যেতে হবে তাদের কথা ভেবে—যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের মাত্র একটী ভুলের জন্যে আমাদের এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে পড়বে। আমার মতে এই মামলার যেখানে উৎপত্তি সেখানে এসেই এর নিষ্পত্তি হবে। আমি মনে করি এই যে, এই ভদ্রমহিলার 'বয়েস-ভীতা' রূপ কমপ্লেষটীর মূল কারণ নির্দ্ধারণ করতে পারা না পারার মধ্যেই আমাদের এই তদন্তে সাফল্য বা অসাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করছে। আচ্ছা! এই সব গুহ্য কথা আজ সন্ধ্যেয় দুজনায় মিলে বেনারস মেলে বসে বসে আলোচনা করা যাবে, আসুন এখন এসে হাতের বকেয়া কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে দুজনে মিলে বাজার ঘুরে কিছু কেনা কাটা করে নেই। এই একটা নূতন তোয়ালে, এক ডজন সেফটী রেজার ব্লেড, সাবান ও টুথ ব্রাশ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে নিতে হবে তো। একটা ফোল্ডিং বেডিং ও একটা চামড়ার পোটম্যাণ্ট্, সঙ্গে নেওয়া দরকার। কে বলতে পারে যে ওখানে আমাদের ক'দিন থাকতে হবে। হ্যা, ট্রেণে উঠবার আগে বাড়ী থেকে পেট ভরে খেলেও খাবার নিতে হবে যে! রেল গাড়ী চললে—ধকলে ধকলে আবার তাড়াতাড়ি খিদেও পেয়ে যায়।

আমরা তাড়াতাড়ি পর পর নথীপত্রের যথাযথভাবে বিলিব্যবস্থা করে উঠে পড়ে বাজার হাট করে জিনিষপত্র গুছুতে সুরু করে দিলাম। এদিকে দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো। আমাদের হাতে যেন আরও একটু সময় থাকলে ভালো হয়। এর পর বেশ একটু তৃপ্তি করে শুধু ঝোল ভাত খেয়ে রাত্রি আটটার আগেই মাল পত্র সহ বেনারস মেলে চেপে বসলাম। ট্রেণের কামরায় গদী-আঁটা সিটে চেপে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো—'আঃ কি আরাম! আমাদের কাজকর্ম্ম নেই, কোনও দায়িত্ব নেই, কারণে অকারণে ডাকাডাকি নেই, কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ দেবার ঝুঁকি নেই। বহির্জগতের সম্পর্কশূন্য এমন নির্ভেজাল আরাম ও বিশ্রাম আমরা ইতিপূর্ব্বে কোনও দিনই অনুভব করি নি। ট্রেণ ছেড়ে দেবার সঙ্গে আমরা জানলার ফাঁকে বাহিরের ছুটন্ত গাছপালা বাড়ী ঘর ও টেলিগ্রাফের পোষ্ট ও তারের দিকে চেয়ে আমরা বেঞ্চদুটীর উপর আরামে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

এই উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীর ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এইদিন আমাদের মনের মধ্যে নিশ্চিন্ততার জন্যে এমন একটা বিরাট ফাঁক বা ভেকুয়াম সৃষ্টি হয়েছিল যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট না করে মনের এই সদ্য নূতন অচিন্তনীয় আমেজটুকু চোখ বুজিয়ে শুয়ে উপভোগ করতেই শুধু ইচ্ছে করছিল। এ'ছাড়া আমাদের কর্ম্মক্লান্তি অবসর পেয়ে আমাদের অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছে। অবিরাম ছুটাছুটিতে অভ্যস্ত আমাদের মাংসপেশীগুলো এতদিন পর বিশ্রাম পেয়ে আমাদের অজ্ঞাতেই যেন টেনে টেনে শক্ত হয়ে আবার নরম হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় মহা আরামে ঘুমিয়ে পড়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইতিমধ্যে কখন যে বাঙালাদেশ পার হয়ে পাহাড়ে বিহারের প্রান্তদেশে গিয়ে পড়েছি আমরা তা জানাতেও পারেনি। আমাদের চক্ষু বুজিয়ে থেকেই যেন আমরা অনুভব করলাম যে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থেমে আবার সেটা চলতে সুরু করে দিলে। আধ-ঘুম অবস্থাতেই আমরা প্ল্যাটফর্ম্মের মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে মধ্যে হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। ক্রমে গাড়ীর হুমহুম শব্দের সঙ্গে এই কলরবও থেমে গেল। এরপর একসময় একটা বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে আমি উঠে বসে দেখলাম যে সহকারী অফিসার সুবোধবাবু তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছেন। হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম যে একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ভদ্রলোক গাড়ীর হ্যাঙ্গিংবেঞ্চের উপর বিছানাপত্র বিছিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। তাঁরই মতন আমার স্থূল বপুর দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপকো

কেয়া কারবার হ্যায়? আপকো গদী কলকাত্তামে হুঁ? অকারণে আমরা কমই মিথ্যে কথা ব'লে থাকি। তাই আত্মগোপনের জন্য তাঁকে নিরাশ করে আমি জানালাম —আমি ব্যবসাদার নই। আমি বিদেশভ্রমণবিলাসী বাঙলার একজন অলস নিষ্কর্মা আয়েসী জমিদার ব্যক্তি। আমাকে বেকারবারী মানুষ বুঝে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক অবজ্ঞায় তাঁর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। অবশ্য এ জন্য আমি এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দোষ দিই নি। আমি যে সময়কার কথা বলছি, সেই সময়ে উচ্চশ্রেণীর কামরায় দূরপাল্লার ট্রেণ জার্নি করা এক সরকারী অফিসার, ব্যবসাদার ও জমীদার ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব হতো না। হঠাৎ এই সময় আমি আচমকা একটা দারুণ ক্ষুধা উপলব্ধি করলাম; আমার পেট যেন মুচড়ে উঠে সেখানে একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। তাড়াতাড়ি সহকারীকে জাগিয়ে দিয়ে একটা কৌটায় বাড়ী থেকে আনা কয়েকটা লুচী ও পোস্ত-চচ্চড়ী বার করে সেগুলো উভয়ে গলাধঃকরণ করে উভয়ে আবার যে যার সিটে আরামে শুয়ে পড়লাম।

এরপর আবার উঠেছি, হাঁক ডাক করে জিনিস কিনেছি, কখনও বা দূরের নীলাভ পাহাড়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি. এরপর আবার কতবার উঠেছি, বসেছি, নেমেছি আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ভোর রাত্রে একসময় ট্রেণের গতি মন্থর হচ্ছে বুঝে তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি—সহকারী কখন জেগে উঠে বাতায়ন পথে মুগ্ধ হয়ে এক অপরূপ দৃশ্য দেখছে। এমন অপরূপ দৃশ্য আমি জীবনে কোনওদিন দেখিনি, আজ জীবনে এমনভাবে এইরূপ দেখতে পাবো বলেও মনে করি না। এই বিরাট দৃশ্যের প্রথম দেখার আনন্দ পরবর্ত্তীকালে আর পাওয়া সম্ভব নয়, কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসী শহরের ধারে গঙ্গার উপর দিয়ে ঝিকিঝিকি শব্দে ট্রেণ চলছিল। পুণ্যবতী গঙ্গানদীর বাঁকের পাড়ে পাড়ে দেখা যায় অজস্র সোপান শ্রেণী ও ছোট বড় হিন্দুদের মন্দির। এই মহান দৃশ্য নয়ন গোচর মাত্র আমার মনে হলো যে, এই প্রথম বুঝি হিন্দুধর্মে আমার দীক্ষা লাভ হলো। এই ছবিতে এই দৃশ্য দেখে বস্তুবাদী য়ুরোপীয়রাও কেন যে এদেশে ছুটে আসে তাও আমি বুঝলাম। ইতিপূর্ব্বে বহু ছবিতে আমরা এই চোখঝলসানো দৃশ্য দেখেছি। এইসব ছবির সঙ্গে এইস্থানের এমন হুবহু মিল কল্পনাও করা যায় না। এর আগে বহু শস্যশ্যামলা নিভৃত পল্লীগ্রামে ছবির দৃশ্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সরজমীন সেই স্থানে এসে দেখছি যে, ছবির সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। বরং ভ্রমাত্মক ছবিতে দেখা স্থানীয় শ্যামল আশাওড়া বন, ঝোপঝাড় ও পানা-পচা ডোবা ও কর্দ্দমাক্ত পথ সেইখানে সন্ধ্যার আগমন আশঙ্কায় আমাদের শঙ্কিত করে তুলেছে। কিন্তু এখানকার এই দৃশ্য যেন ছবিতে দেখা দৃশ্যের চেয়ে আরও মহান ও সুন্দর। আমরা বুঝে নিলাম যে বেনারস ষ্টেশন প্রায় এসে পড়লো। এইবার আমাদের মোটঘাট বেঁধে নামবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

এই বারাণসী ষ্টেশনের উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রাম-ঘরটির সুবিধাজনক স্থান ভারতের অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই এই ভোরের বাতাসে সেখানে আমরা বিছানা বিছিয়ে একটা প্রাতঃকালীন ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম। ততক্ষণে আমরা আমাদের মূল মামলার বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলাম। একটু বেলায় আমরা ভাবলাম, কোনও স্থানীয় থানায় না গিয়ে কোনও এক ধার্ম্মিক হয়ে কোনও ধর্ম্মশালায় উঠা যাক। একটা টাঙায় মালপত্র চাপিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে পথ চলছিলাম। এমন সময় আমরা অবাক হয়ে দেখলাম পিছনে আর একটা টাঙ্গা করে কলিকাতার নিউতাজমহল হোটেলে দেখা সেই মোচওয়ালা কাশীপুর ষ্টেটের ম্যানেজার লোকটী এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শহরের মধ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। কোনও এক অপ্রত্যাশিত স্থানে স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিরাও পরস্পর পরস্পরকে বহুক্ষেত্রে চিনেও চিনতে পারে না। এই সময় তাদের মনে হয় যে হয়তো এদের মুখের ভাব পূর্ব্ব-দেখা লোকের একটা আদল দেখা গিয়েছে মাত্র। কিন্তু কে বলতে পারে যে এই ধুরন্ধর ব্যক্তি আমাদের পিছু পিছু অনুসরণ করে এই শহরে আসে নি! আমরা তাড়াতাড়ি তাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে পথের ধারের একটা বেনারসী সাড়ীর দোকানে এসে এই ভারত-বিখ্যাত সাড়ীর দর করতে সুরু করলাম। কিন্তু দরের বহর শুনে বুঝলাম যে এই মানের শাড়ীর দর কলিকাতা ও বোম্বাই আদি শহরে আরও বেশী সস্তা। খুব সম্ভবতঃ আজকাল বেনারসী

শাড়ী বোম্বাই প্রভৃতি শহর হতেই তাদের আবিষ্কারের স্থান বেনারসে চালান এসে থাকে, কিন্তু শাড়ীর উপর আমাদের তত নজর ছিল না, যত নজর আমাদের ছিল ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোকের দ্রুতগামী টাঙ্গাটার দিকে। এই ভদ্রলোকের এই টাঙ্গাটি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের টাঙ্গাটীও মালপত্রসহ অনেকটা দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কখনও বা মধ্যে মধ্যে দৌড় দিয়ে সম্মুখগামী আমাদের টাঙ্গাটা ধরে ফেলে এইবার আমরা তাতে চেপে বসে বললাম—'চলো ভাই কোহী শহরকো ধরমশালামে। নেহী নেহী, তুম ভাই আভি কোতোয়ালীমে পহেলা চলো।

আমার কিন্তু মনে হয় যে এ লোকটা আমাদের অনুসরণ করে কোলকাতা থেকে এখানে আসে নি, আমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে আমার সহকারী সুবোধবাবুকে বললাম, 'এমন কি আমরা যে বেনারসে এসেছি তা ও জানেও না। এর কারণ এই লোকটী পথের দুধারের দোকান বা বাড়ীর দিকে তত নজর ছিল না,যত নজর ছিল দূরের উঁচু মিনার ও মন্দিরের চূড়ার দিকে। এই গেঁয়ো লোকটা নিশ্চয়ই এই শহরের কোনও এক ধর্ম্মশালায় প্রথমেই গিয়ে উঠবে। এই জন্য এখানকার থানা হয়ে আমাদের এ নগরীর তীর্থস্থানের বাইরে কোনও অভিজাত এক আধুনিক হোটেলে উঠাই উচিৎ হবে। এই সামান্য একটু হিসেবের ভুলের জন্য আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যেতে পারতো। তবে তোমার এই সন্দেহও যে আমি একেবারে বাতিল করে দিচ্ছি তাও নয়। এমনও অবশ্য হতে পারে যে আমরা যেমন মানুষকে ভেল্কি দেখিয়ে থাকি, তেমনি এই ব্যক্তিও আমাদের উপর অনুরূপ এক হাত ভেল্কি দেখিয়ে দিলে। আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে এর এখানে আসার উদ্দেশ্য একান্ত ভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত এক সাধু উদ্দেশ্য।

"আপনি যা বললেন তা আমিও স্বীকার করি, স্যার,' আমার সুযোগ্য সহকারী অফিসার চিন্তিতভাবে উত্তর করলেন, 'কিন্তু এই লোকটার এই সময় এখানে আসার উদ্দেশ্যটাও তো আমাদের জানা দরকার,আমার মতে একে এখুনি ফলো করে ওর এখানকার আস্তানাটা এখুনি জেনে নিতে পারলে ভালো হতো। এতো বড় শহরে আরও সহজে ওকে আমরা খুঁজে নিতে পারবো। ইতিমধ্যে এই শহরেরই বুকে বসে ইনি অন্য কোনও এক অঘটন না ঘটিয়ে বসেন। এখানে আমাদেরও একটু সাবধানে পথে ঘাটে বেরুনো উচিৎ হবে। আমার কিন্তু ওঁকে এখানে দেখে পর্য্যন্ত কিরকম যেন ভয় ভয় করছে।

না না না, এতো উতলা হলে কি চলে? এখুনি ওকে ফলো করে এগুলে আমরা ওর নজরে পড়ে যাবোই। এতো অপরিচিত মুখের মধ্যে মাত্র সামান্যমাত্র একটা পরিচিত মুখ সহজেই ওর নজরে পড়ে যাবে। এই শহরে ও আজ থাকলে আজই আমরা ওকে খুঁজে বার করবো। তুমি কি ওর কপালে একটা বড়ো চন্দনের ফোঁটা লক্ষ্য করো নি। এই শহরে এসেই কোথায় গড় হয়ে এইটে উনি কপালে লাগিয়ে নিয়েছেন। এই ধরণের বজ্জাত লোকেরা তীর্থস্থানে এলে একটু বেশী ভগবতপ্রেমিক হয়ে পড়ে। তাদের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সৎ ব্যক্তিত্বটী এই সময় একটু মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করতে থাকে। একটু ওয়াচ করলেই একে তুমি গঙ্গার ঘাটে বা কোনও বিখ্যাত দেবমন্দিরে রোজই দেখতে পাবে। আমার বিশ্বাস যে, যে কোনও উদ্দেশ্যই হোক—পরের পয়সায় ও আনুকুল্যে যখন এই তীর্থে আসবার সুযোগ পেয়েছে তখন জানবে কায সারা হবার পরও ছুতায় নাতায় এই লোকটা এই শহরে বেশ কয়দিন থেকে যাবে। এই শহরে যে এই লোকটা নূতন—তা ওর হাবভাব দেখে নিমেষেই তা আমি বুঝে নিতে পেরেছি। এখানকার দেবমন্দিরের আরতির সময় বা প্রাতঃকালীন গঙ্গাস্নানের সময় ভীড়ের এপার থেকে ওকে চিনে আমরা ছদ্মবেশে ওর পিছু নিয়ে সহজেই ওর এখানকার আস্তানাটা আমরা দেখে আসতে পারবো। এখন তো চলো স্থানীয় থানাতে যাই। ওখানে গিয়ে একটা পরামর্শ করে একটা ভবিষ্যৎ পন্থা ঠিক করে ফেলা যাবে, আসুন।

এই থানার কাছাকাছি এসে মুস্কিল বাঁধালো এই টাঙ্গাওয়ালার। লাইসেন্স না থাকায় সে সরাসরি থানার কাছে আসতে কিছুতেই রাজী নয়। অগত্যা আমরাই যে তার 'লাইসেন্স' তা তাকে বুঝিয়ে তবে তাকে থানায় আনতে পারলাম। এই থানায় এসে পরিচয় দিলে এরা আমাদের কলিকাতার পুলিশ জেনে খুবই খুশী হয়ে উঠলো।

কলিকাতা মহানগরীর পুলিশের তখন সারা ভারতে নাম-ডাক। এমন কি আমাদের দেখবার জন্যেও ভীড় জমে যায়। এর পর এই থানারই একটী নিরালা ঘরে বিশ্রাম করে শহরের পুলিশি বড়কর্ত্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সারবার জন্যে যখন আমরা আমাদের শীতকালীন জমকালো দামী নীল বনাতের ফুল প্যাণ্ট ও কাঁধে রূপালী কর্ড লাগানো নক্সা-করা কোট পুরাহাতার ইউনিফর্ম পরে বার হয়ে এলাম তখন এখানকার রক্ষীপুঙ্গবদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে কর্ত্তৃপক্ষের ভুলের জন্য সামান্য সরকারী অর্থ বাঁচাতে গিয়ে আজ আমরা এই মহাসম্মান স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেলেছি। এই জমকালো ইউনিফর্ম পরবার আশাতেই একদিন সমাজের বড় ঘরের শিক্ষিত যুবকরা দলে দলে কলিকাতা পুলিশে যোগদান করেছে। অবশ্য কোনও গেঁয়ো লোক কখনও কখনও আমাদের বড়লাটের ড্রাইভার ব'লে যে ভ্রম করেনি তা'ও নয়।

শহরের পুলিশ সাহেবের বাংলোয় গিয়ে প্রথামত তাঁকে আমাদের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে ফিরে এসে স্নানাহার শেষ করে বিকালের দিকে আমরা আবার সাদা বাঙালী পোষাক পরে এখানকার প্রয়োজনীয় তদন্তে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলাম। কয়েকটী কারণে আমরা স্থানীয় পুলিশের কাউকে সঙ্গে নিয়ে এই মামলার তদন্তে যাওয়া উচিৎ মনে করি নি।

এই দিন আমরা প্রথমেই এসে উপস্থিত এলাম বারাণসী ধামের বাঙালীটোলার অতো নম্বরের গলির শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের বিরাট বসতবাটীতে। দুইটী গেটসহ পাঁচিল ঘেরা একটা দ্বিতল পাথরের বাড়ী। এই সাবেকী বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি বগী গাড়ী, একটী ল্যাণ্ডো ও দুইখানা পালকী রাখা আছে দেখলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই এই বাড়ীর মালিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আমরা এই বাড়ীর মালিক শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদের এইখানে আগমনের হেতু সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকীবহাল করে দেওয়া মাত্র তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমটায় আমাদের নিকট হতে কিছু কিছু কলকাতার সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। সমভাবে ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁর সর্ব্ব শরীরটাই যেন একবার কেঁপে উঠলো। পরে অবশ্য তিনি আমাদের তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে এই মামলা সম্পর্কে একটী বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়। পিতার নাম ৺হরিশঙ্কর রায়। আদি নিবাস রামপুর গ্রাম, পোঃ রামপুর জিলা অমুক, বাংলা দেশ। এই বাড়ীটী ও এখানকার বহু সম্পত্তির মালিক ছিলেন আমার স্বর্গত দুই পুরুষের কাশী-বাসী ৺কাশীরাম মল্লিক। বর্ত্তমানে আমি তাঁর একমাত্র জামাতা বিধায় এই বিরাট সম্পত্তির ষোলো আনার মালিক হয়েছি। এইখানে আমি আমার স্ত্রী মনোরমা ও আমার একমাত্র বিবাহযোগ্যা শিক্ষিতা কন্যা রাধারাণীর সহ বাস করি। এ ছাড়া এখানে আমাদের বহু দাসদাসী ও আশ্রিত-আশ্রিতাই বসবাস করে। এক্ষণে এই পূণ্য-ধামে আমরা স্থায়ী নাগরিক রূপেই বাস করি। আমার বিবাহযোগ্যা কন্যাটীর বর্ত্তমান বয়েস আঠারো হবে। তাকে আমি বাড়ীতেই পড়াই ও গানের মাষ্টার রেখে বিদূষী করে তুলেছি। এই সময়ে আমাদের এখানকার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির একমাত্র ভবিষ্যৎ অধিকারিণী আমার এই বয়স্থা কন্যার বিবাহের জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে একজন সদ্যবিলাতপ্রত্যাগত চক্ষুবিশারদ ডাক্তার পাত্রও জুটে গেল। এই যুবকটী নিজে এসে আমার কন্যাকে তার ঈপ্সিতা স্ত্রীরূপে মনোনীত করে যায়। আমাদের এই বাবাজীবন হপ্তা দুই এই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে বাস করেও গিয়েছেন। বর্ত্তমানে এই পাত্রটী কলিকাতার একজন নাম-করা ডাক্তার। যে কোনও কারণেই হোক তিনি খাস বাঙ্গলার কোনও বাঙ্গালী কন্যাকে বিবাহ করতে চাইছিলেন না। তিনি বাংলার বাইরে কোনও এক প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ করবেন বলে জেদ ধরেছিলেন। এসব বিষয় অবশ্য বিবাহের প্রস্তাবকারী আত্মীয়-বন্ধুটীরই কাছ হতে শুনা। এ ছাড়া এই ছেলেটি ছিল বাঙলা দেশের কাশীপুর রাজষ্টেটের জমীদারদের ছোট তরফের একমাত্র সন্তান। এই জন্য আমার এই কন্যার তুলনায় এই পাত্রের বয়স একটু বেশী হয়ে গেলেও এতে আমি অমত করি নি। কিন্তু মধ্যিখান হতে আমার ওখানকার এক বিশেষ

বন্ধু অমুকবাবু এই ব্যাপারে গোল বাঁধিয়ে বসলেন। আমার এই বন্ধু অমুকবাবুরও এইখানে প্রচুর বিষয় সম্পত্তি আছে, তা ছাড়া কলিকাতার একটী নামকরা ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম অংশীদার। এঁর ও একমাত্র পুত্রটী এইবার কাশী হতে সিনিয়ার কেমব্রীজ পাশ করে কলকাতায় পড়াশুনা করছিল। এর ফাঁকে ফাঁকে তাদের নিজেদের আফিসের কাজ কারবারও শিখে নিচ্ছিল সম্প্রতি এই ছেলেটীকে তাঁর পিতা পুনরায় কাশী সহরে আনিয়ে এখানকার য়ুনুভারসিটী কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন—তবে বছরের প্রতি ভেকেসনে কলিকাতায় গিয়ে তাদের আফিসের কাযকর্ম্ম বুঝে নেওয়ারও তার কথা ছিল। এই ছেলেটি আমার কন্যার অপেক্ষা মাত্র কয় বৎসরের বড়ো ছিল এইযা। তা না হলে অন্য দিক হতে বিচার করলে জানা শুনা ঘরের মধ্যেই বিবাহাদি হওয়া তো ভালোই। এক্ষণে আমার এই প্রতিবাসী বৃদ্ধ বন্ধুবরও প্রায় দৃষ্টি শক্তিহীন ও অন্যান্য বিষয়ে ইনভ্যালিড্ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর এই ছেলেটী তাঁর শেষ বয়সের সন্তান হওয়ায় তাঁর অবর্ত্তমানে তার জন্য ও তার সম্পত্তির জন্য একজন শক্ত অভিভাবকের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। এইবার তিনি আমাকে তাঁর এই ছেলেটীকে আমার জামাই-রূপে গ্রহণ করবার জন্যে ধরে করে পড়লেন। এদিকে আমি আমার আত্মীয়ের মাধ্যমে কলকাতার ডাক্তার ছেলেটীকে কথা দিয়ে বসেছি। এই ডাক্তার ছেলেটীর আমার মেয়েকে এমন মনে ধরছিল যে সে অন্য কোথায় আর বিবাহ করতেই চায় না। পরিশেষে আমি আমার এখানকার এই বন্ধুর ইচ্ছার অনুকুলেই মত ঠিক করে ফেলি। কিন্তু তখনও কি আমি জানি যে, কলকাতার এক সর্ব্বনাশী ডাকিনীর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই আমার এই বন্ধু তার ছেলেকে আমার অমন রূপবতী ও গুণবতী কন্যার স্কন্ধে চাপাতে চেয়েছিলেন এ কথা ভাবলেও এখনও আমার সর্ব্বশরীর রাগে রী রী করে উঠে। এ সব কথা জানলে কি একদিন এমন জামাই-আদরে তাকে ঘরে এনে খাইয়ে দাইয়ে আমি যত্ন আত্তি করতাম। আজ কাশীর সারা বাঙ্গালী সমাজে আমাদের কাউর আর মুখ দেখাবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। এদের আশীর্ব্বাদের মাত্র ক'দিন আগেই কি'না তার জ্ঞানপাপী বাপকে একটা পত্রাঘাত করে তিনি কাশীধাম ছেড়ে গোপনে কলকাতায় পালালেন। ওর বাপ অবশ্য এরপর কাগজে কলমে ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছে। এমন কি একজন পুষ্যিপুত্রও ও নেবে বলে সম্প্রতি শুনেছি। কিন্তু এতে তো আমি এই নিদারুণ লোকলজ্জার হাত হতে রক্ষা পেলুম না। ভাগ্যিস আমি কলকাতার সে ডাক্তার ছেলে সুরজিত রায়কে পুরাপুরিভাবে হাত ছাড়া করি নি। কিন্তু তাকে এখন আবার খোসামদ করে পত্র পাঠাতেও যে আমার মাথা কাটা যায়। বাপ্! আর আমি এঁচোড়ে পাকা ছোঁড়াটাকে আমাদের এই বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিই। ভগবান বিশ্বনাথ আমাকে তবু এই বিষয়ে কিছুটা রক্ষে করেছেন। আচ্ছা। আমিও এই হতভাগা ছেলেকে যে সহজে রেহাই দেবো তা আপনারা ভাববেন না। কলকাতা শহরে এখনও পর্যন্ত আমারও যথেষ্ট লোকবল আছে।

ভদ্রলোকের এই উপরোক্ত বিবৃতিটী লিপিবদ্ধ করতে করতে আমার ঠোঁটের কোনে একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এই অর্ব্বাচীন এঁচোড়ে পাকা ছেলেটীকে তিনি তাঁদের এইখানকার এই বাড়ীতে আর ঢুকতে দিতে নারাজ। কিন্তু তখনও জানতে পারেন নি যে সেই একই এচোঁড়-পক্ক ছেলে ইতিমধ্যেই তারা কলকাতার ভাড়া-দেওয়া বাড়ীটাতে এক দারুণ বিপাকে পড়ে ঢুকে পড়েছে। অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাসের বিষয় আপাতত তাঁকে না জানানো সমীচীন মনে করলাম। এদিকে এই ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটী আদ্যোপান্ত অনুধাবন করে আমি স্বভাবতঃই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। নিউ তাজমহল হোটেলের কাশীপুর ষ্টেটের সেই বড় তরফের ম্যানেজার সেই গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক তো সেইদিন এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায়কেই একজন ভয়ানক প্রায় নরখাদক ব্যক্তি রূপেই আমাদের কাছে তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এদিকে আবার তিনি নিজেই তো আমাদের পিছু পিছু কাশীধামে এসে বয়ের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী সেজে এখানে ঘোরাঘুরি করতে সুরু করলেন। এখন এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায়ের পরামর্শে তো ঐ হতভাগা আহত যুবকটীর চক্ষু দুটো নষ্ট করে দেওয়া হয় নি তো! এই আহত যুবকটীকে

ঘায়েল করে দিতে পারলে তার এই ঈপ্সিতা কন্যাটি তো তারই করতলগত হবার কথা। হয় তো এই ডাক্তারবাবু জানতেন না যে এমনিতেই তাঁর প্রেমের ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকটি দূরে সরে যাবে। হয়তো তাই অকারণে ভুল বুঝে তিনিই লোক মারফৎ তাঁর এই পথের কাঁটাটিকে সরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা'হলে এই আহত যুবকটির শুধু চোখ দুটো মাত্র নষ্ট করে দেওয়া হলো কেন? এমনি চিন্তায় আমার গাল হতে কানের পাশ পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠলো। আমি নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করলাম। এর কারণ জেগে জেগে চোখ বুজলে চিন্তা করার সুবিধে হয়। এর পর আমি ভদ্রলোকের নিকট হতে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নেবার জন্যে তাকে কয়েকটী প্রশ্নও করেছিলাম। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় আভাস নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনার বন্ধুর ও তার পুত্রের উপকার করতে গিয়ে আপনি যে বেইজ্জতের একশেষ হয়েছেন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি একটি বিষয় আপনার কাছ হতে জেনে নিতে চাই। আপনার প্রথম পাত্র সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে আপনার ঐ বন্ধুর পুত্ররূপ দ্বিতীয় পাত্রটীর কোনও দিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল কি?

উঃ—আজ্ঞে না, তাদের পরস্পরের সঙ্গে কখনও দেখা-শুনা হয় নি। তবে আমরা যে সুরজিৎ রায়কে প্রত্যাখ্যান করে আমার এই বন্ধুপুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ প্রায় পাকাপাকি করে এনেছি, তা সুরজিৎ রায় জানতে পেরে-ছিল! আজ্ঞে হাঁ। এইজন্য তাঁর আমার বন্ধুপুত্রের উপর হিংসা ও ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক বৈকি? আমারই কি ঐ দুগ্ধপোষ্যটীর উপর কম রাগ হচ্ছে না কি! ইচ্ছে করে, যে চোখ দিয়ে আমার মেয়েকে দেখে গিয়েছে ওর সেই চোখ দুটোই আমি গেলে দিই। আজ্ঞে হাঁ! এও সত্যি যে তিনি আমার বন্ধুপুত্রের নামধাম ও বর্ত্তমান বাস-স্থান সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বকথিত আত্মীয়ের মারফৎ জানতে পেরেছিলেন। এত সব জেনেও ডাঃ সুরজিৎ রায় আমার ঐ আত্মীয়কে তাঁর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্পর্কে পুন-র্বিবেচনা করবার জন্তে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমার কন্যাকে দেখে ও তার গান শুনে পর্য্যন্ত ডাঃ সুরজিৎ বাবা-জীবন মোহিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া সুরজিৎ রায় আমার এখানকার এই বন্ধুর কলকাতার প্রতিষ্ঠানের আফিসে কিছু গোপন তদন্ত করে আমার আত্মীয়কে যা লিখেছে তা পড়ে তো তাজ্জব বনে যেতে হয়। প্রথমে আমার এই বন্ধুর অতটুকু ছেলে সম্বন্ধে আমার বন্ধুর মত আমিও একটুও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু পরে আমার বন্ধুর ঐ গুণধর পুত্র তার পরবর্ত্তী আচার আচরণ দিয়ে তা সত্য-রূপেই প্রমাণ করে দিয়ে গেলো।

প্রঃ—তা ভালো। এখন আপনার আত্মীয়ের নিকট হতে এদের ব্যাপারে আপনি যে পত্রখানি পেয়েছিলেন সেটী কি আপনার কাছে আজও আছে? আর একটী কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনাদের ও সুরজিৎ রায়ের উভয়ের পদবীই তো রায়। এই রায় নিশ্চয়ই আপনাদের উপাধি মাত্র। আপনার গোত্র নিশ্চয়ই আলাদাই হবে। এ'ছাড়া আপনার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পাত্র সুরজিৎ লাহিড়ীর সম্বন্ধেও আপনি বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে থাকবেন।

উঃ—আরে! ডাক্তার সুরজিৎ লাহিড়ীর নাম কি কলকাতাতে আপনি শুনেন নি। ওঁর ঐ মহানগরীর বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সংযোগের বিষয় না হয় এখন বাদই দিলাম। এ ছাড়া উনি এমন একটি বিষয়ে বিশারদ বা স্পেশালিষ্ট যে বিদ্যায় ওঁর মত পাকাপোক্ত সমগ্র ভারতে আর একজনও নেই। উনি যে শুধু একজন চোখের ডাক্তার তা নয়। উনি চক্ষু সম্পর্কীয় প্লাসটিক সার্জ্জারীতে সুদক্ষ। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র উনিই ক্ষতবিক্ষত চোখে ফর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়ে স্বাভাবিক চক্ষু তৈরী করতে সক্ষম। অবশ্য এই চোখ দিয়ে বস্তু দেখা না গেলেও একটা ঝাপসা বা রঙিণ আলো দেখা যায়। য়ুরোপে যুদ্ধের সময় এই সম্বন্ধেই ইনি বিশেষ করে গবেষণা করে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এসেছেন, সারা ভারতে এই বিদ্যায় তিনি সবে ধন নিলমণি হওয়ায় তাঁকে এই ব্যাপারে সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে আনাগোনা করতে হয়। আমার দৃষ্টিহীন বাম-চোখে যে প্লাস্টীকের চোখ রয়েছে সেটা ওরই তৈরী করা। আমার এই চক্ষুর বাহ্যিক উন্নতির জন্য আমার ঐ পূর্ব্বকথিত আত্মীয় ওঁকে সর্ব্বপ্রথমে এখানে আনেন। এর পর সেই সূত্রেই ওঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে

উঠেছিল। এখন আমার কলকাতাবাসী ঐ আত্মীয় প্রেরিত শেষ পত্রটী পড়ে দেখুন। হ্যাঁ! আরও একটা কি আপনারা জিজ্ঞাসা করছিলেন না? আজ্ঞে হাঁ। আমরা বিভিন্ন গোত্রের হলেও উপাধি আমাদের একই। এতে বিবাহাদি কার্য্যে কোনও বাধা উৎপত্তি হবার কোনও প্রশ্নই উঠে না।

ভদ্রলোকের শেষ উত্তরটি আমার বিশেষ ভালো লাগছিল। এই রায়, চক্রবর্ত্তী, মল্লিক, সিংহ ও চৌধুরী প্রভৃতি কয়টি উপাধি আমার ভালোই লাগে। এই উপাধি হতে জাতি, ধর্ম্ম, গোত্র সম্প্রদায় প্রদেশ গোষ্ঠী কোনও কিছুরই বুঝবার উপায় নেই। এই উপাধি হতে শুধু আমরা বুঝি যে এরা সবাই ভারতীয় ও মানুষ। সমাজে যদি কোনও পদবীর প্রয়োজন থাকে তো এই সব বিভেদ-হীন পদবীরই বা সারনেমের প্রচলন হওয়া উচিৎ। নচেৎ প্রাচীন ভারতীয়দের ন্যায় শুধু পদবী বা সারনেমহীন কেবল মাত্র এক নামই ব্যবহার করা ভালো।

'আজ্ঞে হাঁ। আর একটা কথা আপনাকে মশাই আমি জিজ্ঞাসা করবো, প্রশ্নের একটা'ভুলে যাওয়া খেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে যাওয়ায় আমি দ্বিজেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা! আপনার কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে মহীন্দ্র ষ্ট্রীটেও তো একটা দ্বিতল বাড়ী আছে। এখন সেখানে কারা থাকে বলতে পারেন? কলকাতার বাড়ীতে আপনাদের যাওয়া হয়নি কতো দিন?

'হাঁ হাঁ, কলকাতাতেও তো আমার একটা বাড়ী আছে। আপনি তা জানলেন কি করে মশাই? ভদ্রলোক এইবার একটু আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর করলেন, 'ওখানকার ঐ বাড়ীটা হচ্ছে আমার নিজেরই বাড়ী। ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সময় এই বাড়ীটা আমিই প্রথমে তৈরী করি। তখনও ওখানে এখানে ঝোঁপ ঝাড় জঙ্গল ও মাটীর বাড়ী ছিল। এখন তো সেখানে একটা বিরাট শহর গড়ে উঠেছে। এর পর আমার এক বাল্যবন্ধুকে আমাদের বাড়ীর সামনের জমিটা কিনিয়ে দিলে তিনিও একটা ত্রিতল বাড়ী সেখানে করেন। ইতিমধ্যে এখানকার এক শ্রেষ্ঠধনী ব্যক্তি আমার পুজ্যপাদ শ্বশুরমশাই গত হলে তাঁর বিরাট বিষয় সম্পত্তি দেখা-শুনা করবার জন্যে সপরিবারে এখানে চলে আসতে হয়। এখন জানেন তো অগাধ বিষয় সম্পত্তিতে জ্বালাও আছে অশেষ'। এখানে গত কয়েক বৎসর ধরে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে কলকাতায় আর যাবার সময়ও পাই না। ওখানকার আমার ঐ বাল্যবন্ধুটীই ঐ বাড়ীটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আর ওটা ভাড়া দেন ও আদায় করেন। তবে ভাড়া উনি প্রতিমাসে নিয়মিতই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওবাড়ীতে কে ভাড়াটে আছে বা না আছে তার খবর আমি কোনও দিনই রাখবার প্রয়োজন মনে করি না। আর কটা টাকাই বা ঐ বাড়ীটা থেকে আয় হয়? তবে ঐ-টেই আমার একমাত্র নিজ সম্পত্তি ও একটা বসত বাড়ী, তাই ওটার আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও ওটা বিক্রয় করে দেবার কল্পনাও যে আমি করতে পারি না। আমি তো দিনরাত এখানকার সম্পত্তির রক্ষা ওতত্ত্বাবধান করতে ব্যস্ত। এদিকে আমার শ্বশুর মশায়ের আমল থেকেই তাঁর এখানকার কয়েকটী বস্তী বাড়ীতে যতো কাশীর নাম-করা গুণ্ডা ভাড়া নিয়ে সেখানে বসে আছে। প্রতি বৎসরই আপনাদের কলকাতা থেকে যতো জেল-খারিজ গুণ্ডাও এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই ব্যাপারে এখানে পুলিশের ঝঞ্ঝাট তো লেগেই আছে। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে ঐ গুণ্ডাদের ব্যাপারেই কলকাতা থেকে মহাশয়ের এখানে আগমন হয়েছে। তবে গুণ্ডাই হোক আর যাই হোক মশাই, ওরা তাদের ঐ বস্তীর মালিকদের প্রায় দেবতার মতই মান্যি করে চলে। আজ পর্য্যন্ত এই সব মানুষরা একমাসের জন্য বাড়ীর বকেয়া ভাড়া ফেলে রাখে নি। আমি অগাধ সম্পত্তি পেয়েছি মশাই, কিন্তু ভোগ করতে পারছি কই? এই পরিশেষে আমাদের অবর্ত্ত-মানে আমার মেয়েজামাই তা ভোগ করবে কিংবা এ-গুলো বেচে কিনে তারা হয়তো কলকাতাতে—বা অন্য কোনও বড় শহরে চলে যাবে। আচ্ছা! দাঁড়ান। আমি আমার সেই আত্মীয়ের কাছ হতে পাওয়া পত্রখানি আপ-নাকে এনে দিচ্ছি।

এই কাশীর গুণ্ডাদের সম্পর্কে ভদ্রলোকের মুখে শুনে আমার একটী বিশেষ কথা মনে পড়ে গেল। আমি শুনে-ছিলাম যে কাশীতে ষণ্ড ও গুণ্ডা ও বাঙ্গালী যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই দুই দিন যত্র তত্র ঘুরেও এই তিনটি জিনিসই চোখে পড়ে নি। একদিন প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে একটী পাজামা ও গোল টুপি পরা ও কপালে তিলক কাটা এক

ভদ্রলোককে পক্ষে দেখে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞেসও করেছিলাম —'হ্যাঁ মশাই, শুনেছি' এখানে অনেক বাঙ্গালী আছে। তারা এখানে কোনদিকে থাকে বলতে পারেন। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বলেছিলেন, 'আজ্ঞে, আমি নিজেই তো একজন বাঙ্গালী'। অনুমানে বুঝেছি যে, এইখানকার গুণ্ডা ও ষণ্ডরাও তা'হলে এইভাবে আত্মগোপন করে আছে। তবে একদিন একটী পাকা আমের মত রাঙা টকটকে গাত্রত্বক চোপড়ানো এক বৃদ্ধা বাঙ্গালীকে ফুটপাতের উপর থেবড়ে বসে তরকারী কিনতে দেখেছিলাম, এমন ভাবে তিনি সেখানে বসেছিলেন যেন কাশীর মাটী ওমনিভাবেই আঁকড়ে ধরে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই খানেই থেকে যাবেন। এমনি এলোমেলো চিন্তার মধ্যে কাশীর নামকরা গুণ্ডাদের কথাই আমার বারে বারে মনে পড়ছিল। এই কলকাতা বেনারস গুণ্ডা-এক্সিসের সহায়তায় এই ক্ষমতাশীল দাম্ভিক ক্ষিপ্ত ভদ্রলোক যে ঐ দুগ্ধপোষ্য আহত যুবকের ওপর কোনও প্রতিশোধ নিতে পারেন তা আমার কল্পনারও বাইরে। তবে হ্যাঁ। এতো বড়ো একটা সম্পত্তির লোভে কলিকাতার চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের পক্ষে তার পথের একমাত্র কাঁটাটা সরাবার জন্যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব ছিল না। যতো বড়োই তিনি হোমরাচোমরা জমীদার প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী বা ডাক্তার হোন না কেন? এতদিন য়ুরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষণকালে যথেষ্ট অর্থ তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে। এছাড়া আমরা শুনে এসেছি যে কলিকাতার সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ইলেকসনসমূহেও তিনি কনটেষ্ট করে থাকেন। এই সব ব্যাপারে মাতামাতি করে তাঁকে যথেষ্ট অর্থের অপচয় করতে হয়েছে। এমনি বেদরদী নেতা হতে হলে এখানে ওখানে পয়সা ঢেলে দিতে হয় যথেষ্ট। এখন এই মহাধনী দ্বিজেনবাবুর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী এই সম্ভাব্য জামাতাটীর পক্ষে এই বিরাট সম্পত্তির লোভে এমনভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠাও স্বাভাবিক ছিল। সুশিক্ষিতা ধনী ভার্য্যার পৈতৃক সম্পত্তি অপচয় করার মধ্যে অসুবিধা আছে। কিন্তু এই সাবেকী পরিবারের অর্দ্ধ-অন্তঃপুরচারী গৃহকার্য্যে নিপুণা অথচ সুন্দরী ও চলনসই শিক্ষিতা ও পতিভক্ত বালিকার পক্ষে তার এই সব কাজে প্রতিবন্ধক হওয়ার সম্ভাবনা এমনিতেই কম। আমার মনে হলো যে এই সব বিষয় ভেবেই এই য়ুরোপ-প্রত্যাগত ডাঃ সুরজিৎ রায় এইরূপ একটী কন্যার পাণিপীড়ন করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য এইরূপ এক স্থিরসিদ্ধান্তে আসার আগে এই ডাঃ সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে কোলকাতাতে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার মনের ভাব বুঝে নেওয়ারও প্রয়োজন আছে।

এর একটু পরেই আমার চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিয়ে ভদ্রলোক আমার হাতে তাঁর প্রতিশ্রুত পত্রটী তুলে দিলেন। আমি ধীরভাবে বহুক্ষণ বহুবার এই পত্রটি উল্টেপাল্টে দেখে নিলাম। এই পত্রটীর বিষয়বস্তু লেখক নিজে ডাঃ সুরজিতের সাহায্যে ওদের আফিসের লোকেদের কাছ হতে অতি সংগোপনে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এই প্রয়োজনীয় পত্রটীর বিষয়বস্তুর সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"দাদা ভাই! আর একটু হলে খুকীর আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যেতো। বাবা বিশ্বনাথের দাস বিধায় তাঁরই কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেলুম। আমি ও ডাঃ সুরজিৎ এখানকার বিভিন্ন সূত্রে ওদের সংগ্রহ করিছি। আপনার বন্ধুর পুত্র কলকাতায় এক বর্ষীয়সী ডাকিনীর খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আপনার বন্ধুই তাঁর ফার্মের অপর পুরুষ-পার্টনারদের সাবধান-বাণী অবিশ্বাস করে প্রকারান্তরে তিনিই তাঁর পুত্রকে তার হাতে প্রথম দিকটায় তুলে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য বিভিন্ন সূত্রে তিনি প্রকৃত সমাচার অবগত হয়ে তাঁর ঐ গুণধর পুত্রকে সামলাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখন খুব দেরী হওয়ায় বিষয়টী আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় তিনি তাঁর ঐ পুত্রকে কোলকাতা থেকে কাশীতে আনিয়ে নিয়ে তাকে আপনার সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। মন্দ কথা—এত কথা তিনি ঘুণাক্ষরে আপনাকে না জানিয়ে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও তিনি আপনার সঙ্গে বেইমানি করছিলেন। এখন বারাণসী থেকে পালিয়ে এসে ঐ ছোকরা কলকাতার একটা হোটেলে এসে উঠেছেন। তবে সে এখন তার বাপের আফিসে

নিয়মমত যে যাতায়াত করছে এ কথাও ঠিক। ঐ সাজ্যাতিকা প্রমীলা দেবীর সহিত একই সঙ্গে দশটায় আফিসে আসে ও সেখান হতে ঠিক পাঁচটার পর বেরিয়ে পড়ে। এঁদের কখনও ট্যাক্সিতে কখন প্রাইভেটকারে ঘুরাঘুরি করতেও দেখা গিয়েছে। এই প্রমীলা দেবী শহরের কোন স্থানে বসবাস করেন তা আমরা এখনও জানতে পারি নি। ইনি কখনও ট্যাক্সিতে কখনও ট্রামে ঘুরেন, আঁকাবাঁকা পথে সরে পড়েন ও কখনও এক পথ দিয়ে যান বা আসেন না। এইজন্যই ওয়াচ রাখার জন্যে তার বাসাবাড়ীটা আমরা এখনও খুঁজে বার করতে পারিনি। ওঁর বসতবাড়ীর ঠিকানা ওঁর আফিসেরও কোনও লোক বলতে পারলো না। এত সত্বেও যদি আপনার কন্যাকে আপনার ঐ বন্ধুপুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিতে মনস্থ করেন তো সে আপনার ইচ্ছা।" ক্রমশঃ

মহাকবি কালিদাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বহুশত বর্ষ আগে ওগো মহাকবি
আঁকিয়াছ স্বপ্নপটে হৃদয়ের ছবি।
সে দিনের বসুন্ধরা লভিয়াছে কত রূপান্তর
সেদিনের পুরপল্লী, জনপদ, কান্তার, প্রান্তর,
পথঘাট, বাসগৃহ বিবর্তিত নব জন্মলাভে
প্রকৃতি কেবল আছে সেই একই ভাবে,
অটবী তটিনী শৈল বিরাজিছে তেমনি ভূতলে,
রবিচন্দ্র তারাবলী একই ভাবে গগনে উজলে।
বিহঙ্গ কাকলী, ফুল্ল কুসুম সৌরভ
সমীরণে মর্মরিত তরুর পল্লব
শরতের কাশবন। বরষার নীলাঞ্জন মেঘ
তেমনি জাগায় আজো হৃদয়ে আবেগ।
গর্ভাধানে বলাকারা ধায়
দিগ্‌বধূদের কণ্ঠে আজো শুভ্র মালিকা দুলায়।
কণ্ঠাশ্লিষ্টা প্রিয়া যার নিরখিয়া নব জলধর
তারো চিত্তে জাগে ভাবান্তর।
রম্য বস্তু হেরি আর কর্ণে শুনি মধুর নিস্বন
সৌহৃদ জননান্তর আজো স্মরে বিরহী যৌবন।

সংসারের রীতিনীতি, আচার, বিচার, আচরণ,
সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, অশনবসন
সবই আজ বিবর্তিত। নারীনরে হৃদয়ের মিল
সেই মুগ্ধ প্রেমলীলা ক্ষুণ্ণ শুধু নয় এক তিল।
বিরহ মিলন-তৃষ্ণা রূপমোহ, মান অভিসার
একই ধারা ধরি করে আজো চিত্তে রসের সঞ্চার।
একই কুসুমের পাত্রে আজো মধুকর
বধূরে পিয়ায়ে মধু নিজে পান করে তারপর।
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করি কণ্ডূয়ন
প্রিয়া-অঙ্গ-রসাবেশ স্পর্শে তার ঢুলায় নয়ন।
করেণুর বদন বিবরে
তুলিয়া মৃণাল কন্দ দেয় করী তেমনি আদরে।
প্রকৃতি পিরীতি এই যুগ্মবৃন্ত করিয়া আশ্রয়।
বিকশিত করেছিলে তোমার সে সুরভি হৃদয়।
সুষমারে করেছিলে অনন্তের দূতী,
বারতা সঁপিলে তারে, প্রেমের আকুতি
নিত্যচিরন্তন যাহা শুধু তারি গীত
গেয়ে গেলে, তাই তুমি সর্বযুগজিৎ।
রসাবিষ্ট হই তব গীতে
তাই আজো, বহুকাল ব্যবধান
বিংশ শতাব্দীতে।
ধরণীর ভাঙাগড়া উঠাপড়া বিজ্ঞানীশাসন
টলাইতে পারে নাই রসলোকে তোমার আসন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বাঙালী সমাজ মন

অলোক রায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনা সম্বন্ধে আমাদের সহজ সংস্কার এই যে, বৈজ্ঞানিক মননসম্পন্ন পদার্থবিদ্ নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জিজ্ঞাসায়, সরল স্বচ্ছ ভাষায় প্রবন্ধ লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বর্তমান কালে রামেন্দ্রসুন্দর বহু-আলোচিত লেখক নন—তা সত্ত্বেও বিরলদৃষ্ট যে সব আলোচনা এ যাবৎ করা হয়েছে, তাতে সর্বদাই রামেন্দ্রসুন্দরের নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তাঁর প্রবন্ধের সাহিত্যিক গুণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যুগ ও দেশের পটভূমিকায় রামেন্দ্র-মানসের সামগ্রিক পরিচয় লাভের চেষ্টা করা হয়নি।

রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই তিনি 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি পরে সংকলিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪) কর্মকথা (১৯১৩), চরিত কথা (১৯১৩) ও শব্দকথা (১৯১৭)। তাঁর মৃত্যুর পর 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞকথা', 'জগৎ কথা', ও 'নানা কথা' ছাপা হয়। তিনি শেষ জীবনে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'রও বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্র-সুন্দরের মৃত্যু হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের কোন আত্মজীবনী নেই। তাঁর মনোজগতের বিভিন্ন পট পরিবর্তনের ইতিহাসও আমাদের অজানা। তবে তাঁর সমসাময়িক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকে এবং তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয় যে প্রথম জীবনে তিনি চিত্তসংকটের রুধিরাক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু এই নাস্তিবোধ থেকেই তাঁর মানস পরিণতি ঘটেছে অস্তিবোধের প্রশান্তিকে। অবিশ্বাসী এবং সংশয়ী মন বিশ্বাস এবং হিন্দুত্বের শান্ত উপলব্ধিতে আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র সব প্রবন্ধ বিজ্ঞান-বিষয়ক—এক 'জিজ্ঞাসা'র অর্ধেক প্রবন্ধও তাই। এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তাঁকে জিজ্ঞাসু করেছিল, সংশয়ী করেছিল এবং ক্রমেই নৈরাশ্যবাদী করে তুলছিল। কিন্তু সত্যানুসন্ধানই 'জিজ্ঞাসার' শেষের দিকের প্রবন্ধগুলিতে বস্তুসত্তার অতীত অমূর্ত জগতের চিন্তা এনে দিয়েছে এবং ক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর ভাববাদী দার্শনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞান চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও 'কর্মকথা'য় স্পষ্টই রামেন্দ্র-সুন্দর 'বিধি এবং নীতি'র মূলসূত্র নিয়ে বেশি চিন্তিত—এবং বলাই বাহুল্য তখন থেকে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হোলো 'কি হয়েছে' নয় 'কি হওয়া' উচিত। এর মধ্যে সমাজ এবং ব্যক্তির সমস্যা প্রাধান্য পেলেও মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের অনুশীলন তত্ত্বের মতই এ একটা 'মূর্তিমান বিত্তরি' হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিত কথা' গ্রন্থটির কিছু বিস্তৃত আলোচনা করবো। এই গ্রন্থটিকে বিশেষ করে বেছে নেওয়ার কারণ, 'চরিত কথা' রামেন্দ্রসুন্দরের পরিণত মননের সৃষ্টি—তাঁর রচনাবলীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং 'চরিত কথা'র প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রচিত হওয়ার ফলে এর মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরকে কিছুটা পরিমাণে আবিষ্কার করা সম্ভব। অন্যথায় তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলির মধ্যে প্রাবন্ধিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ স্বল্পই লক্ষিত হয়।

'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, প্রাণময় জগৎ, প্রজ্ঞার জয় প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির সঙ্গে 'জিজ্ঞাসা'র অনেক প্রবন্ধের সাদৃশ্য আছে। তবে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রের তাড়নায় লিখিত এবং প্রকাশিত হওয়ার ফলে তার মধ্যে মানসিক ধারাবাহিকতা আবিষ্কার সহজ নয়। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞকথা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে অসমাপ্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যে পরিণত রামেন্দ্রসুন্দরকে স্পষ্ট চিনতে পারা যায়। প্রধানতঃ যজ্ঞের দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কারেই তিনি অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দরের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র বঙ্গানুবাদও স্মর্তব্য। তখন থেকেই বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে গভীরতর যে সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তার আলোচনা সুরু করেন।

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের শেষ পর্বের রচনাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'রামেন্দ্রবাবু কেমন করিয়া বৈদিক যুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিক তত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে বলিতে পারিতেছেন? আমি যখন কলেজে কাজ করি, তখন তাঁহাকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এখন তিনি হার্বার্ট স্পেন্সার হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা রামেন্দ্রসুন্দরকে পত্রে লিখেছিলেন: "গোল্ডস্মিথ লিখেছে 'England with all thy faults I love thee still', আমি তেমনি বলতে পারি যে, 'Trivedi with all thy doubtings and flottings I love thee still'। তার সঙ্গে একটি কথা আমি বলতে চাই যে—doubt গুলো উপড়ে ফেলে cultivate faith and hope—আমাদের পুরাণ শাস্ত্রকথা will help you to do this with greatest facilities!" পরে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র অনুবাদ প্রকাশিত হলে দ্বিজেন্দ্রনাথই রামেন্দ্রসুন্দরকে 'ধন্য ধন্য' জানিয়েছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনীকার এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমসাময়িক সকলেই নানা প্রকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে শেষ জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ক্রমেই ভক্তিপরায়ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে বাইরের প্রমাণ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিগত মনোজগতের সাক্ষ্য পাওয়া বর্তমানে অসম্ভব। কাজেই আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে 'প্রকৃতি'র 'কোয়েস্ট ফর আননোন', 'যজ্ঞকথায়' 'কনকোয়েস্ট অফ আলটিমেট রিয়ালিটি'তে শেষ হয়েছে।

এখন এই পরিণতি ধারা বা পরিবর্তনের ইতিহাস ব্যক্তি-উপলব্ধি নির্ভর অথবা সামাজিক-প্রতিফলন সঞ্জাত, তা লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: 'রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়া অবতার।' শব্দ চয়নে এই মন্তব্যটি কৌতুকের উদ্রেক করলেও এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন 'খাটি বাঙালী', যে বাঙালীত্বের গর্ব করেছেন উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকের সকল বাঙালী মণীষী। সংস্কারে ও আচরণে, মননে ও জীবনচর্চায় এই রকম বাঙালীতাকে রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র জীবন অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ইংরেজীতে একেই হয়তো একধরণের 'পিউরিট্যানিজম' বলতে পারি, যদিও নিন্দার্থে নয়। পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায়: 'তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার আত্মসংযম ও তাঁহার নম্রতা তাঁহার রচনারীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি যেমন তাঁহার ব্রতসাধনপক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, তাঁহার প্রকৃতির পক্ষেও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি যে ভাবে অল্পবয়স হইতে অনুরাগবশবর্তী হইয়া জীবনের একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও বেষ্টনীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া যেরূপ অবিচলিতভাবে এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলেই তাঁহার জীবন ও কীর্তিকলাপের অর্থ পাওয়া যায়।

॥ ২ ॥

রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় তো মোটের ওপর পেলুম, এবার উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মানসের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছর ইংরেজ আমাদের দেশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়, শান্তি স্থাপনে, শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছে এবং বাঙালী ক্রমশঃ বিদেশী শাসনের আবশ্যম্ভাবিতায় অভ্যস্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আঘাতে বাঙালী চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি হয়—এই আলোড়নকেই আজকাল ভুল করে রেনেসাঁস নাম দেওয়া হয়েছে। নামকরণে ভুল হলেও মূল সত্যস্বীকার করতেই হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী মনে এক অদ্ভুত কর্মোৎসাহ দেখা দিয়েছিল, যার ফলে সমাজসংস্কার সুরু হোলো, রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগলো এবং সর্বোপরি সাহিত্যে সম্পূর্ণ

[নূ]তন যুগের সৃষ্টি হোলো। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করবো একটা বাঁধ-ভাঙা, বাঁধন-না-মানা প্রচণ্ডতা এবং কয়েক শতাব্দীর নির্জীবতা, মৃতপ্রায় স্থাণুত্বের পর এই জাগরণের প্রয়োজন ছিল। বলাবাহুল্য ভাঙনের প্রবল স্রোতেই সমাজ ও সাহিত্যের সর্বত্র পরিবর্তন [দে]খেছি—এবং রামমোহন রায়, ইয়ং বেঙ্গল, এমনকি বিদ্যাসাগরে পর্যন্ত, সর্বত্র প্রাচীনকে যাচাই করে নেওয়া, নতুনকে সাদরে বরণ করা, সংস্কারকামী চিন্তা এবং কিছুটা বিদ্রোহাত্মার জীবন চেতনা লক্ষ্য করেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই আলোড়নকে যদি আমরা নদীর জোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিই, তাহলে বলবো দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভাটা সুরু হয়ে গেছে। জোয়ারের স্রোতে যেমন প্রচণ্ড গতি এসেছিল, সেই সঙ্গে অনেক আবিলতাও এসেছিল। এই প্রচণ্ডগতির মুখে ধীরস্থির-ভাবে চিন্তা করার অবকাশ খুব কমই ছিল—তখন তাই তর্কবিতর্ক সংগ্রাম-প্রিয়তায় সমাজমন চঞ্চল। ভাঁটার সময়ে শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন বাঙালী আবার ফিরে পেল—এবং ক্রমে চিন্তার প্রাধান্য, দর্শনের উপস্থাপনা, চিত্তের স্থৈর্য বাড়তে লাগলো। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই এই যুদ্ধের সুরু।

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত স্থিতধী ব্যক্তি ছিলেন না এমন নয়, আবার দ্বিতীয়ার্ধেও চঞ্চল, আন্দোলনপ্রিয় ব্রাহ্ম-নেতাদের লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের মানস-প্রবণতাই যুগের হাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বঙ্কিম যুগ যদিও সুরু হয়েছে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, তবুও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভাঁটার পরিপূর্ণ রূপ চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোধর্মে নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং জটিলতা থাকায় বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশ্লেষণ অসম্ভব। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছর বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের একটা পুনরভ্যুত্থান দেখা দেয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে একে 'পুনরভ্যুত্থান' বলা উচিত নয়, কারণ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিল। কিন্তু আবার বলি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যারা প্রধান পুরুষ, হিন্দু বা বাঙালীত্বই তাঁদের প্রধান পরিচয় নয়। তারাও দেশকে ভালোবাসতেন, সকলেই নাস্তিক ছিলেন তাও নয়। কিন্তু তাঁদের যুক্তি-প্রধান মনে উগ্র স্বাধর্ম্য বোধ বা স্বাজাত্য-বোধ বাসা বাঁধতে পারে নি। তাঁদের প্রধান পরিচয় ছিল সংস্কারক রূপে। রামমোহন, ইয়ং-বেঙ্গল নেতৃবৃন্দ, বিদ্যাসাগর এমন কি মাইকেল মধুসূদনেও এই প্রধান পরিচয়। কোনো ঐতিহাসিকই আশা করি রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির তুলনা কিংবা ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুর তুলনা করার মূঢ় প্রয়াস করবেন না। হিন্দুপুনরভ্যুত্থানের যুগে বাংলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মনীষী এবং চিন্তানায়কের দল হিন্দুধর্মের দিকে অস্বাভাবিক রকম ঝুঁকে পড়েন—এবং আর্যত্বের অহমিকায় সত্য মিথ্যার জ্ঞান হারান। অথবা বঙ্কিম-চন্দ্রের উদাহরণ নিয়েই বলা ভালো যে, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী 'সাম্য' গ্রন্থের লেখক যখন শেষ পর্যন্ত 'অনুশীলন তত্ত্ব প্রচার করছেন, তখন মূল পরিবর্তন এই যে, বাঙালী ক্রমশঃ আদর্শসর্বস্ব অবাস্তব ভাববাদী ধর্ম, দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এই যুগে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই অসাধারণ মনীষার বলে নিজেকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্মের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও নিষ্কলঙ্ক বলতে পারি না। অন্যথায় তাঁর সমসাময়িক বাঙালী কেউই প্রায় এই হিন্দু-মিশনের জয়গানে অনিচ্ছুক ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকজন নেতার নাম করতে পারি: শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), অক্ষয় চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪ ১৯০৫), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) বীরেশ্বর পাঁড়ে, পূর্ণচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

॥ ৩ ॥

আমরা দেখেছি, রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ প্রবন্ধ-রচনার কাল উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ পনেরো বছর এবং সম্পূর্ণ যুক্তি অনুমোদিত পথেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে রামেন্দ্রসুন্দরের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন

নির্মোহ সংশয়ী চিন্তানায়কও ধীরে ধীরে যুগানুবর্তী হয়েছেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেওয়ার পূর্বে আরও কিছু তথ্যসংগ্রহ করা যায়, যার সাহায্যে পরিণত বয়সে রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর স্বদেশানুরাগ, স্বধর্ম প্রীতি এবং স্বাজাত্য-বোধ প্রমাণিত হয়। (দ্রঃ আশুতোষ বাজপেয়ী লিখিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবনী গ্রন্থ)। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লেখা' 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের পরিণত মননধারা লক্ষ্য করি: 'মালক্ষ্মী, কৃপা করো। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না ও পরের ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো।...ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।' এই ব্রত কথার আন্তরিক ভাবালুতা বাদ দিলেও, স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যিকের লেখনি থেকেও এর সৃষ্টি সম্ভব নয়। অবশ্য অতীত ভারতবর্ষের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মণত্বের সহজাত অহংকারবোধ পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি,—রবীন্দ্রনাথও তাই লিখেছিলেন: 'তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সঙ্গে তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশ প্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র মিলিত হইয়াছিল।'

আমরা এইবার 'চরিত কথা' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে যুগানুগত রামেন্দ্রসুন্দরের মানসিকতা বিশ্লেষণ করবো। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মনীষীর চরিতকথা এখানে বর্ণিত হয়েছে; এগুলির রচনাকাল ১৮৯৬—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান প্রবন্ধগুলি রচনার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক-সুলভ তথ্যপ্রিয়তা এবং নিরাবেগ প্রকাশভঙ্গী লক্ষিত হয় না। বরং উনবিংশ শতাব্দীতে জীবনীকারদের সম্মুখে প্রশস্তি (ট্রিবিউট) রচনার যে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত ছিল, রামেন্দ্রসুন্দরও সেই পথ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তাই লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি, শ্রদ্ধা ও অনুভূতি প্রধান হয়েছে এবং প্রায়শই এই আবেগমুখ্যতা প্রবন্ধগুলিকে সহজে সাহিত্যগুণান্বিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধগুলি রচনার মূল উদ্দেশ্য, বাঙালীর সম্মুখে বাঙালীর গৌরবমহিমা দীপ্ত ভাষায় বর্ণন এবং স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ। 'চরিত কথা'য় অবাঙালী চরিত্র দুটি আছে, ম্যাক্সমূলর ও হেল্মহোলংজ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়ার একমাত্র কারণ ম্যাক্সমূলারের ভারতভক্তি—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। তবে হার্মান হেল্মহোলংজ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি স্থানচ্যুত হয়ে এখানে এসে পড়েছে,—আসলে 'প্রকৃতি' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংকলনেই এটির প্রথম আবির্ভাব। রচনাকালের বিচারেও এই প্রবন্ধটিকে আমরা 'চরিত কথা'র বাইরে ফেলেছি।

অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে রসায়ন বিদ্যা এবং পরে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক চিন্তাশীল রামেন্দ্রসুন্দর 'চরিতকথা' গ্রন্থে কেবল অন্ধ জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়েছেন। আসলে 'প্রকৃতি' এবং 'জিজ্ঞাসা'র লেখক বিশ্লেষণমুখী ঐহিকতাবাদী ডারউইন—স্পেন্সারের ভক্ত রামেন্দ্রসুন্দরকে 'চরিতকথা' গ্রন্থে কখনো কখনো আবিষ্কার করা যায় না এমন নয়। কিন্তু এইখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের মনের প্রকৃত স্ববিরোধ, যা উনবিংশশতাব্দীর অধিকাংশ চিন্তানায়কই এড়াতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, উমেশ বটব্যাল, রজনী গুপ্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত। এই প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজ, সাহিত্য, জীবন, ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা জানতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত রেনেসাঁস সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়: 'একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজকীয় শাসনে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।...কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিতেও আমরা যে উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।' (বিদ্যাসাগর)। কারণ রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস, বাঙালী চরিত্রের কোন আত্যন্তিক পরিবর্তন হয়নি—বাঙালী আরও বেশি পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। অথসিদ্ধান্ত: বাঙালীকে 'খাঁটি বাঙালী হতে হবে, যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর। 'চরি

ফটো :
সন্তোষকুমার ঘোষ

চঞ্চল
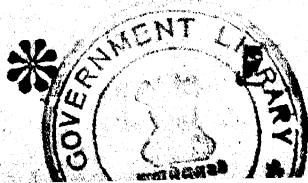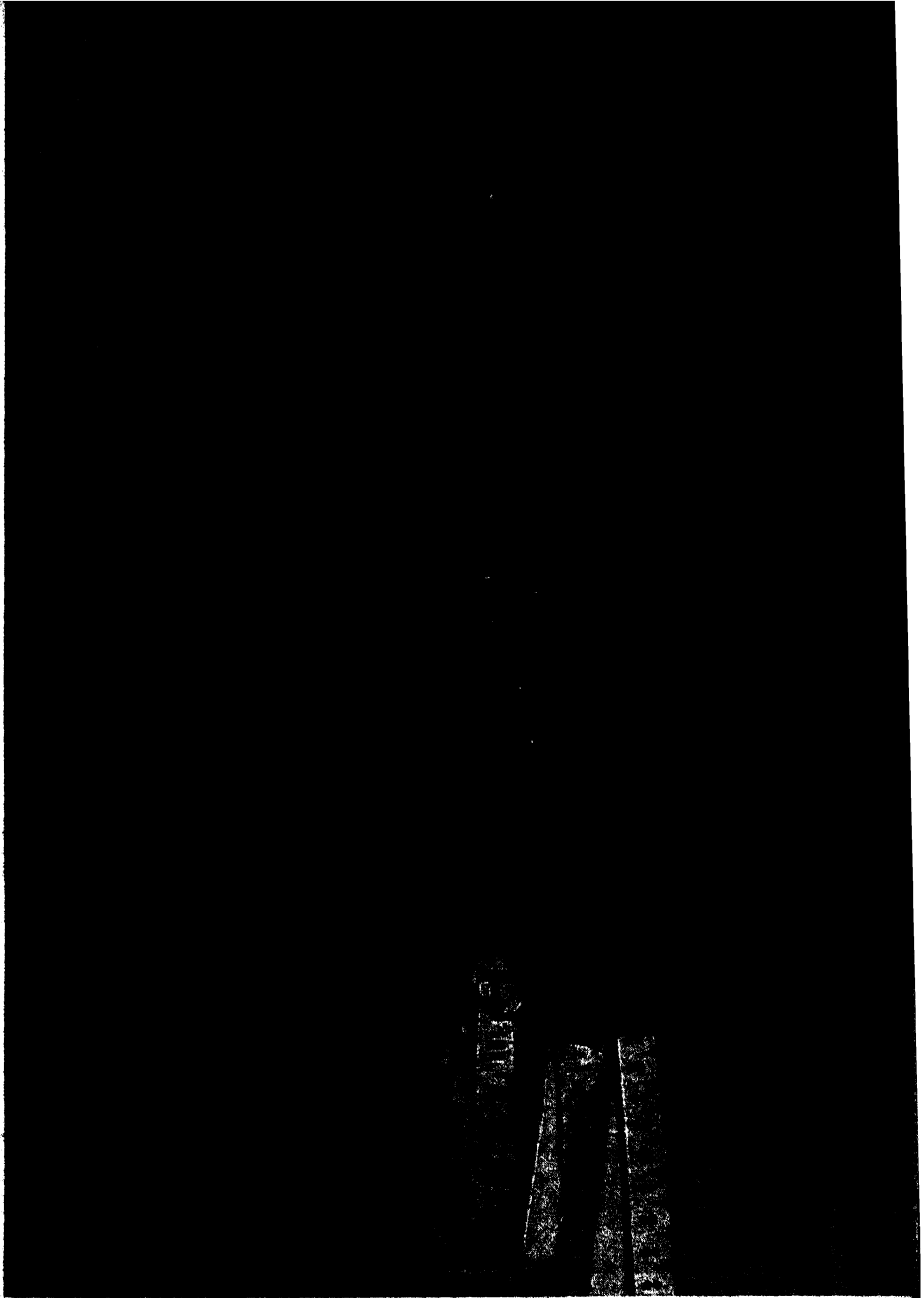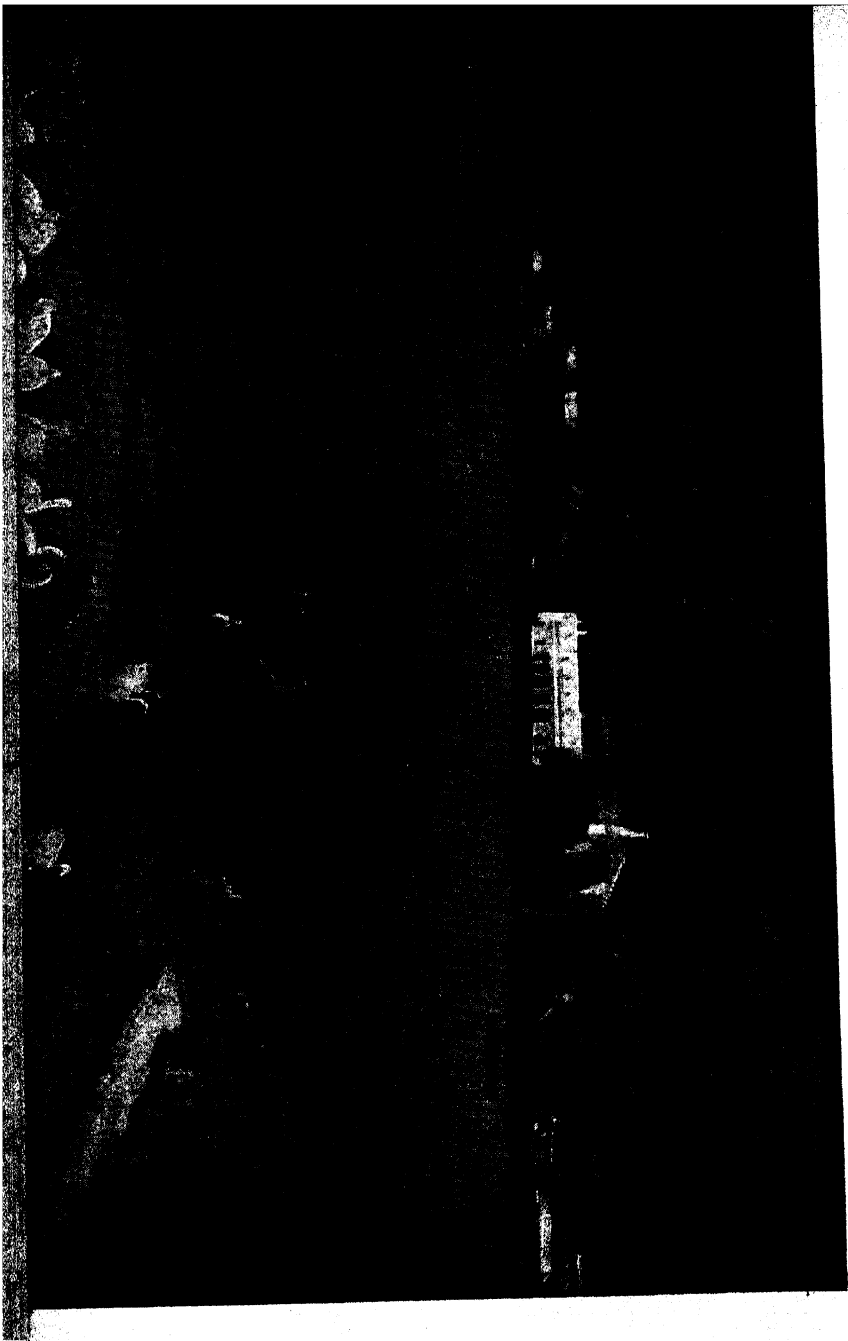
ফটো : পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং

কথা'র প্রথম প্রবন্ধ থেকেই এই 'বাঙালীত্ব' চেতনা দেখা দিল।

অন্য প্রবন্ধে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) আরও স্পষ্ট করে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজমনকে রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন: 'আমার বিবেচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিক পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জা বোধ করি না; আমরা স্বদেশীয়কে বিদেশীয় ভাষার বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না।' (তুলনীয় 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা')। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য— 'এই অস্বাভাবিক প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া' দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় 'উৎকট ত্যাগ স্বীকারে' প্রস্তুত হতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রামেন্দ্রসুন্দরের এই আত্মচিন্তা প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর সমাজ মনেরই আত্মপরিচয়।

বিজ্ঞানের অনেক অংশেই এখনো অপূর্ণতা আছে এবং অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণই আমাদের নবতর সত্যের সন্ধান দেবে, একথা রামেন্দ্রসুন্দর জানতেন না এমন নয়। কিন্তু আধুনিক সোসিওলজি যেহেতু বাঙালী সমাজের ত্রুটি নির্ণয়েই অধিক তৎপর, তাই সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা যত কম হয় ততই মঙ্গল। রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তি: 'সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে' (বিদ্যাসাগর) এবং ইউটিলিটারিয়ান জীবন দর্শনকেও তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি। তবে অধিকাংশ মানুষ যদি ভগবান্ রামচন্দ্র, ভগবান সিদ্ধার্থ বা শ্রীকৃষ্ণের ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত কল্যাণ প্রভৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে তখন 'রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জা-ঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্র-শালিকায় একত্র রক্ষিত হওয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে।' (বিদ্যাসাগর); বলা বাহুল্য এই প্রচণ্ড আদর্শবাদিতা, অতীত ভারতবর্ষের প্রতি মোহমুগ্ধ দৃষ্টি এবং ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ফেরাবার সর্বজনীন প্রয়াস, বাঙলাদেশে বিশেষ একটি সময়ের মানস-প্রবণতা। হিন্দু দেশাচারগুলি সংস্কারের বিরুদ্ধে রামেন্দ্রসুন্দর যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা আমাদের কমলকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণদেব বাহাদুরের 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র যুক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ ছিল—কিন্তু হিন্দু দেশাচারের সংস্কার সাধন সম্বন্ধে তাঁর মত: 'প্রাকৃতিক নির্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সময়-সাপেক্ষ এবং সেইদিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজ-শরীরের চিকিৎসক বিস্ফোটক ভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।' (বিদ্যাসাগর)—আবার সেই স্ববিরোধ। বঙ্কিমচন্দ্রও এই স্ববিরোধ অতিক্রম করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসবিশ্লেষণকালে রামেন্দ্রসুন্দরের হার্বার্ট স্পেন্সারীয় জীবনের পারিভাষিক সংজ্ঞা অবলম্বনে 'ধর্মবুদ্ধি' এবং 'লোকস্থিতি'তে পৌছুনো নিঃসন্দেহে আমাদের কৌতুক সৃষ্টি করে। বঙ্কিমের উপন্যাসে 'নৈতিক জীবন' আবিষ্কারের প্রয়াস অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিক ব্যাখ্যা নয়—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে অধিকাংশ সমালোচকই এই পথে এগিয়েছিলেন। এবং স্পষ্টতই রামেন্দ্র-সুন্দরের কাছে 'বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।' তারপর রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিম-চন্দ্রের মানস বিবর্তনধারা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে বলেন: 'বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু 'প্রচারে'র পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম হইতে স্বধর্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন।'

বর্তমান প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ায় স্বতন্ত্রভাবে

'চরিত কথা'র প্রত্যেকটি প্রবন্ধ থেকে চরিত্রাদি উদ্ধার সম্ভব নয়। তবে উমেশ বটব্যালের বৈদিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গবেষণা, রজনীকান্ত গুপ্তের আর্যকীর্তির ইতিহাস আবিষ্কারের প্রয়াস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পর্বের রচনায় 'স্বদেশী সৌন্দর্যে অনুরাগ কাহিনী যে রামেন্দ্রসুন্দরের সশ্রদ্ধ প্রশস্তি লাভ করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আসলে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালী যে 'আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল' হয়েছিল। 'চরিত কথা'র (?) প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা তারই পরিচয় পেয়েছি।

একে রক্ষণশীলতা বা প্রতিক্রিয়াপন্থী মনোভাব বলবো না। আসলে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের উদ্ভবের মধ্যেই যে স্ববিরোধ লুকিয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছরের 'নব্য হিন্দু আন্দোলনে' সেই আদি ও অকৃত্রিম পিছু টানই প্রকাশ পেয়েছে। এই আন্দোলনকে নিন্দা করার প্রশ্ন উঠে না, যেমন তথাকথিত 'রেনেসাঁস' নিয়ে উর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করাও অসমীচীন। ইতিহাসের তথ্যকে অবলম্বন করে বাঙালী সমাজমনকে বুঝতে হবে এবং তাহলেই বাঙালী প্রাবন্ধিকের সাহিত্য প্রয়াসেও প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হবো।

কৃপাদৃষ্টি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যাহার উপর পড়ে প্রভু তব—
কৃপা ছলছল আঁখি,
বল তারে আর সাধ্য কাহার
তুচ্ছ করিয়া রাখি।
মনে হয় যেন রবি, তারা, শশী,
তাহারে আগুলি রহিয়াছে বসি,
করে হিমালয় গঙ্গাসাগর
তারে যেন ডাকাডাকি

২

ঊষর মাঠের ধূসর কুসুম—
মূল্য কতই বলো?
জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি যে তাহার,
পরিমণ্ডল হ'ল।
যেখানে তোমার পড়েছে দৃষ্টি,
করেছে সেখানে অমৃত বৃষ্টি,
ছিল না কিছুই—সব পেতে তার
কিছু রহিল না বাকি।

৩

যে ছোট হইয়া, জীবন কাটালো—
বৃহৎ তপস্যায়,
মহা-সিদ্ধির খপর তাহার
তুমি বিনা কেবা পায়?
শুক্তির বুকে—না করিয়া গোল—
হ'ল যে মুক্তা নিখুঁত নিটোল
কনক কিরীটে কে তারে বসালো
আমরা তা জানি নাকি?

৪

কে হিজল গাছে নৌকা বাঁধিল—
যে হ'ল তোমার প্রিয়?
বিশ্বনাথের সহ বিশ্বের
সে যে হল আত্মীয়!
তাহার কখনো হয় না পতন,
সব ঠাঁই তার তব শ্রীচরণ,
হল যে অশোক, হল অক্ষয়—
তোমার সোহাগ মাখি।

৫

মত্ত হস্তী দলে না তাহাকে,
দংশে না বিষধর
সাগরে ডোবে না মৃত্যু ছোঁবে না—
তুমি যার নির্ভর।
চিরদিবসের তুমি দয়াময়,
কৃপা তো তোমার এক যুগে নয়,
অনাগত কত ধ্রুব প্রহ্লাদে—
আড়ালে রেখেছ ঢাকি।
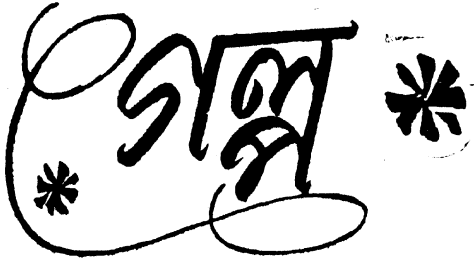
ভূমিকম্প

সঙ্কর্ষণ রায়

আজ আপিস থেকে ফিরতে একটুও দেরি করবে না কিন্তু—কাল আট মিনিট দেরি হয়েছিল।—বরেনের কোটটি ব্রাশ করতে করতে মিত্রা বললে।

আজ যে ভূমিকম্পের ওপর সিম্পোসিয়াম।—কাতর-স্বরে বরেন বললে।

মিত্রা মুখভার ক'রে বললে, আপিস, সিম্পোসিয়াম—এই সবই যদি তোমার সমস্ত দিন জুড়ে থাকে, আমি কী করি বলতে পার? আমার সময় কী ক'রে কাটে তুমি বোধ হয় ভাবও না।

—ভাবি না—এত বড় অপবাদ! ঐ রেডিওগ্রাম, একরাশ গল্প-উপন্যাসের বই—এ সব বুঝি আমার না ভাবার নিদর্শন!

—ও সব আমার ভাল লাগে না।

—কেন বল তো?

—কেন তা' বোঝ না বুঝি!

—বুঝি বই কি, খুব বুঝি। কিন্তু এদিকে যে আমার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে!

—কিচ্ছু বোঝ না। আসল কথা কী জান—বিয়েটা মেয়েদেরই হয়, তাদের জীবনটাকে পাল্টে দেয়, কিন্তু ছেলেদের তা' স্পর্শও করে না। এই যেমন তুমি—বিয়ের আগে যেমন ছিলে, বিয়ের পরও তেম্নি আছ। তেমনি আপিসে যাচ্ছ, আড্ডা মারছ।

—আড্ডা কোথায় মারছি, আপিস থেকে তো রোজই আজকাল সোজা বাড়িতে আসছি। বন্ধুবান্ধবরা সবাই বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে যে, আমার মত স্ত্রৈণ ভূ-ভারতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা মিত্রু, তুমি না বলতে যে স্ত্রৈণ পুরুষদের তুমি দু-চক্ষেও দেখতে পার না।

মুচকি হেসে মিত্রা বললে, তা' তো পারিই নে। কিন্তু আমার স্বামীটি স্ত্রৈণ হ'লে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই।

ঐ যাঃ, নটা বেজে গেল।—বরেন প্রায় আঁৎকে ওঠে।

—তা' বাজুক গে। আফিস থেকে ফিরতে যখন দেরি হ'বে তখন একটু দেরি করেই না হয় আপিসে গেলে।

ব'লে সে দু'হাত বাড়িয়ে বরেনের গলা জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে—তার বুকে মাথা রেখে গাঢ় স্বরে বলে, তোমার এ পোড়ার চাকরি ছেড়ে দাও না গো।

বরেন তার চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে বললে, চাকরি ছেড়ে দেব!

—হ্যাঁ দেবে। তোমার চাকরি তো আমি চাই নে, শুধু তোমাকে চাই—পুরোপুরি, একটানা।

কিন্তু মিত্রু, আমার এই চাকরির তকমাটা না থাকলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েই দিতেন না তোমার বাবা।

—বাবা কী করতেন না করতেন তাতে আমাকে টেনে এনো না। বাবা হয়তো চাকরিযুক্ত তোমাকেই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি চাই তোমাকে তোমার চাকরির খোলস থেকে মুক্তি দিতে। দিনরাত তোমাকে আমার কাছে পেতে চাই—খুব কাছে।

—তা' না হয় চাও। কিন্তু কাছাকাছি থাকার জন্যও তো রসদ দরকার—তা' আসবে কোথা থেকে?

—সে-ও আমি ভেবে রেখেছি। দু'জনে মিলে এমন জায়গায় চাকরি নেব, যেখানে আমাদের পাশাপাশি ব'সে কাজ করতে দেবে।

—সে' রকম চাকরি কী পাওয়া যাবে?

—চেষ্টা করলেই পাওয়া যাবে।

—মিতু, এদিকে ঘড়ির কাঁটা যে সোওয়া নটাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলল।

বরেনের কথায় কর্ণপাত মাত্র না ক'রে মিত্রা বললে, আচ্ছা, তুমি আমার কাছে না থাকলে আমার চারপাশে অন্ধকার দেখি কেন বলতে পার ?

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বরেন বললে, সময় নেই মিতু!—ব'লে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অফিসে এসে বরেন শুনল যে সিম্পোসিয়াম শুরু হ'তে ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। নিজের ঘরে এসে বসল সে। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত ব'সেই কাজে মন দিতে পারল না। মন তার বিক্ষিপ্ত—দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যেও সংহত হ'তে পারছে না।

তার ব্যক্তিসত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন তার আত্ম-শাসনের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গনের পালা শুরু হয়েছে যেন তার।

ভালবাসা প্রাণশক্তিকে নতুন ক'রে উজ্জীবিত ক'রে তোলে—এই সর্বসমর্থিত ধারণার সার্থক প্রতিফলন নিজের বিবাহিত জীবনের মধ্যে দেখতে পাবে ভেবেছিল বরেন। রঙিণ স্বপ্নের চশমা প'রে মিত্রাকে সে নিজের জীবনে বরণ ক'রে নিয়েছিল। তার চোখের সামনে অনেক মধুর সম্ভাবনা নানা রঙের বর্ণালীতে প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু বিয়ের পরই সে বুঝেছে, হৃদয়-বিনিময় ব্যাপারটা একটা রাসায়নিক ক্রিয়া; প্রবলতর পক্ষ নেয় দ্রাবকের ভূমিকা—ফলে দুর্বলতর পক্ষের অবক্ষয় ও অবলুপ্তি। দাম্পত্যলীলার ক্ষেত্রে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে নিজের পরিপূর্ণতা আবিষ্কার করতে গিয়ে মিত্রার দুর্নিবার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে বরেনকে। তার স্বকীয়তাকে রবাবের মত ঘষে মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছে মিত্রা।

নিজের দুর্বলতা ও অসহায়তাকে মনে মনে যাচাই করতে গিয়ে বরেন মুষড়ে পড়ে। তার আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তিসত্তা যেন একটা ভোঁতা ছুরি—অব্যবহার্য আবর্জনার মধ্যেই তার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ব্যক্তিত্ব যখন সর্বতোভাবে ক্ষয় হচ্ছে, আত্ম-ধিক্কারের ধার যাচ্ছে বেড়ে। কাপুরুষোচিত আত্মগ্লানির মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে সে।

বরেনের বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সামনের সেক্রেটারিয়েট টেবিলে জমে থাকা ফাইলের স্তূপের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে—কাগজপত্রগুলির মধ্যে নিজের ব্যর্থতাকে প্রত্যক্ষ করে যেন সে।

কী ভাবছ বরেন?—সুজিত মিত্রের কণ্ঠস্বর। বরেনের বিমর্ষতার আচ্ছাদনকে কাঁপিয়ে তোলে সুজিতের উপস্থিতি। মুখ তুলে বরেন দেখল, চটুল একটা হাসি তার গাম্ভীর্যকে যেন ব্যঙ্গ করছে।

সুজিত বরেনের সহকর্মী—তাদের লক্ষ্মৌয়ের শাখা অফিসে কাজ করে। কলকাতায় এসেছে সে ভূমিকম্পের ওপর সিম্পোসিয়ামে যোগ দিতে। লক্ষ্মৌতে মিত্রার বাপের বাড়ির কাছাকাছি সুজিতের বাসা। মিত্রাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা আছে। কর্মক্ষেত্রে তার সঙ্গে বরেনের পরিচয় সৌহার্দ্যে ঘনীভূত হয়েছে বিয়ের পর।

বরেনের সামনে একটি চেয়ার টেনে বসে প'ড়ে সুজিত বললে, তোমার টেবিলে কাগজ-পত্রের প্রাচুর্য দেখে বোধ হচ্ছে—টিটাগড়ের কাগজ-কলের গুদামটা যেন এখানেই স্থানান্তরিত হয়েছে। তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে যে সুখ্যাতি শুনেছিলুম, তার প্রতিবাদ তোমার টেবিলেই সাজানো থাকবে তা' আমি ভাবি নি কখনো। ব্যাপার কী বল তো? বিয়ে তো তোমার হয়েছে প্রায় এক বছর—এখনো তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পার নি!

মুখ নীচু ক'রে বরেন বললে, সারা জীবনেও পারব কিনা সন্দেহ। আমার পক্ষে বিবাহটা অতি-বিবাহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

—সে আবার কী!

—অবস্থা বিশেষে এক বৌ হাজারখানা হ'য়ে দাঁড়ায়—তাকেই বলে অতি-বিবাহ।

উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে সুজিত বললে, ভাগ্যবান পুরুষ হে তুমি। এমন অতি-স্ত্রী কজনের বরাতেই বা জোটে।

কাতর স্বরে বরেন বললে, ঠাট্টা কোরো না ভাই—আমার অবস্থাটা যে কী মর্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে, তা' বোধ হয় বুঝতে পারছ না তুমি।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে সুজিত বললে, পারছি বই কি। দেখ বরেন, বেঁচে থাকবার জন্য অনেক খুচরো কাজ আমাদের করতে হয়, তাদের মধ্যে প্রেম বা ভালবাসা জাতীয় হৃদয়বৃত্তিগুলিকে উহ্য রাখাই মঙ্গল। তা' ছাড়া আমাদের মত মধ্যবিত্ত চাকরীজীবীদের প্রেম করার সত্যিকারের অবসর কতটুকুই বা বল। দিনে কাজ, রাতে বিশ্রাম—এর মাঝে ভালবাসার জন্য মিনিট কয়েকের বেশি বরাদ্দ করা চলে না।

ম্লান হেসে বরেন বললে, তোমার উপদেশ শুনতে ভালই। কিন্তু নদীতে যখন বান ডাকে, তাকে সামলাতে পারে কী কেউ ?

—সামলাবার দরকার হয় না। কারণ নদীর বানের পরমায়ু খুবই ক্ষণস্থায়ী। তোমার নিজের অবস্থাটা যদি এই রকম সাময়িক উত্তেজনার কোঠায় ফেলা যায়, চিন্তিত হবার কিছুই থাকে না।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বরেন বললে, না ভাই, বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে আমার অবস্থাটা তোমার হৃদয়গম্য করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুজিত বললে, একটা কাজ কর—শ্রীমতীকে কিছুদিনের জন্য লক্ষ্ণৌতে পাঠিয়ে দাও। একটু ছাড়াছাড়ি হ'লে তোমরা দু'জনেই নিজের নিজের ব্যক্তিগত বৃত্তে ফিরে আসতে পারবে। বিয়ের পর এই এক বছরের একটানা মিলনপর্বটাকে সহজপাচ্য করতে কিছুটা বিচ্ছেদ দরকার।

—কিন্তু মিত্রা কী তা' যাবে!—বরেনের কথভঙ্গীটা খুবই সকরুণ হ'য়ে ওঠে।

সেদিন বাড়িতে ফিরে বরেন শুনল যে মিত্রার বাবার কাছ থেকে জরুরি তারবার্তা এসেছে—মিত্রার ছোট বোনের হঠাৎ বিয়ে স্থির হ'য়ে যাওয়ায় বিয়ের উদ্যোগপর্বে অংশ নেবার জন্য মিত্রার আহ্বান।

বরেনের বুকের মধ্যে চাঞ্চল্যের স্রোত বইতে শুরু করে। তার মনের অধীরতা মুখে যাতে ফুটে না ওঠে, তার জন্য সে মনে মনে আত্মশাসনের লাগাম কষতে থাকে।

তার মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে মিত্রা গম্ভীর গলায় বললে, এখন আমি কী করব বল ?

মিত্রার মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে নুয়ে প'ড়ে আমতা-আমতা ক'রে বরেন বললে, তুমি তো জানোই মিতু, আমার এখন ছুটি পাবার উপায় নেই। যেতে যদি হয়, তোমাকে একাই যেতে হ'বে।

নিমেষে ফ্যাকাশে হ'য়ে ওঠে মিত্রার মুখখানা। একটি কথাও না ব'লে সে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

দু'জনের মাঝখানে অস্বস্তিজনক নীরবতার পালা চলে। সারাটা রাত বিষাদে ভারাক্রান্ত হ'য়ে রইল।

পরদিন সকালে গুমোট আবহাওয়াটাকে হাস্যালাপে হাল্কা ক'রে দেবার চেষ্টা করে বরেন—কিন্তু মিত্রার থমথমে মুখের নিষেধকে ডিঙ্গিয়ে পারল না মুখ খুলতে।

অফিসে যাওয়ার আগে যথাসম্ভব সাহস জড়ো ক'রে বরেন বললে, আমার মনে হচ্ছে এতটা পথ একা যেতে তুমি যথেষ্ট পরিমাণে সাহস পাচ্ছ না। আমি বলি কী, তুমি সুজিতের সঙ্গে যাও—দু' এক দিনের মধ্যেই তার লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার কথা।

নিমেষের জন্য ঝলসে ওঠে মিত্রার চোখ দুটি অর্থহীন উগ্রতায়। পরমুহূর্তে আবার সে নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের নির্বাক গাম্ভীর্যের আড়ালে।

তুন এক্সপ্রেসে মিত্রা লক্ষ্ণৌ রওনা হ'ল সুজিতের সঙ্গে ট্রেণ ছাড়বার সময় মিত্রা একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল বরেনের দিকে। তার সেই দৃষ্টি বরেনের বুকের মধ্যে বিঁধে রইল।

বাসায় ফিরে বরেন তার নিঃসঙ্গ রাত্রিতে খুঁজে পেল না প্রত্যাশিত মুক্তির স্বাদ। মিত্রার অদৃশ্য উপস্থিতি ঘিরে রইল তাকে। তার বিনিদ্র রাতের শিয়রে জেগে রইল একটা অশ্রু-সজল আকুতি। আঁধারের পটে ফুটে উঠল জমাট কান্নার অদৃশ্য ছবি।

বরেন বুঝল যে একা থাকতে হ'লে তাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হ'বে। পরদিন অফিসে গিয়েই বাসযোগ্য হোটেলের সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল সে।

এমন সময় ডিরেক্টরের দপ্তর থেকে শিলং যাওয়ার আদেশপত্র পেল সে। সেখানকার শাখা অফিসে জরুরি একটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে তাকে। এক সপ্তাহ লাগবে কাজটা সারতে।

নিজের ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল বরেন। বাসা-বদলের বিড়ম্বনা এড়োতে পেরেছে—তার উপর শিলং তার পরিচিত পরিবেশের বাইরে এমন একটি দূরের জায়গা, যেখানে গিয়ে তার একক অস্তিত্ববোধ নির্বিঘ্ন হ'বে ব'লে আশা করল সে।

কিন্তু শিলং-এ গিয়ে নিজেকে এক মুহূর্তও খাপ খাওয়াতে পারল না বরেন। তার এই ব্যর্থতা নিবিড় করুণ হ'য়ে ওঠে অতল নৈঃসঙ্গবোধের মধ্যে।

মেঘের স্তরে স্তরে মিত্রার সজল চাহনি শিলং-এর আকাশটাকে ছেয়ে ফেলে। মিত্রা তাকে ছেড়ে যেতে চায়নি—এই কথাটা পাহাড়ের শিখরে শিখরে সন্ধ্যাবেলার মেঘের আবরণ ভেদ ক'রে ফুটে ওঠে সূর্যের অন্তরালে।

বরেনের আর এক মুহূর্তও শিলং-এ থাকতে ইচ্ছে করল না।

শিলং-এ কাজের পালা দিন-কয়েকের মধ্যে শেষ ক'রে দিয়েই কয়েকদিনের ছুটি নিল সে লক্ষ্ণৌ যাবে ব'লে।

এই দিনকয়েকের বিচ্ছেদ দিয়ে যেন পূর্ণতর মিলনের আয়োজন হ'ল।

ছুটি মঞ্জুর হ'বার খবর আসতেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয় বরেন—হোটেলে ফিরে গিয়ে। সন্ধ্যার পর গৌহাটির শেষ বাস ছাড়বে—সেই বাসেই যাবে স্থির করে সে।

হোটেলের পোর্টারকে ট্যাক্সি ডাকতে বলবে ভাবছে বরেন, এমন সময় সমস্ত হোটেল-বাড়িটা দুলে উঠল। বরেন বুঝল, ভূমিকম্প।

সেদিন উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের পনেরোই আগস্ট। শহরের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ী হোটেলে বড়োরকম একটা ভোজ দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছিলেন। ডাইনিং হলে অনেকের ভিড়। রকমারি স্যুট্ ও সিল্কের শাড়ির নানা রঙের বর্ণালী—গান-বাজনা—সোনালি সুরার স্রোত—সিগারেটের ধোঁয়া—হাসি গল্প। স্বাধীনতা উৎসবের এই উৎকট প্রমত্ততা সারারাত ধ'রে চলত হয়তো। কিন্তু হঠাৎ যতিভঙ্গ হ'ল। পিয়ানোর টুংটাং ও বেহালার সুরের উচ্ছ্বাসকে ভেদ ক'রে উঠল এলো-মেলো কোলাহল ও নারীকণ্ঠের চিৎকার। তারপর ত্রস্ত পদক্ষেপে ছোটাছুটি। হোটেলের ম্যানেজার এসে সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে সামান্য একটু ভূমিকম্প হ'য়েই থেমে গেছে। তাঁর কথা কেউ অবশ্য বিশ্বাস করে না।

বরেন শুনল যে শিলং থেকে গৌহাটির বাস-সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে রাস্তায় ধস্ নামবার আশঙ্কায়। তার মিত্রার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটার সামনে হঠাৎ একটা কাল পাথরের দেয়াল আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়াল যেন!

কী রকম যেন মুষড়ে পড়ে বরেন। হোটেলের ম্যানেজার তাকে আশ্বাস দেবার জন্য বলেন যে ভূমিকম্পে রাস্তা নষ্ট হলেও আকাশটা অটুট আছে—প্লেনে করে অনায়াসে বরেন লক্ষ্ণৌ যেতে পারবে। কিন্তু এই রাত্রে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—রাতটা কোনমতে এই হোটেলেই কাটাতে হ'বে তাকে।

ডাইনিং হলে উৎসবের উচ্ছ্বাস তখন স্তিমিত—অতিথিরা বিদায় নিয়েছে—হোটেলের বোর্ডাররা নীচের তলায় বারান্দায় ও হলঘরে এসে ভিড় করেছে—ওপরের তলায় যেতে কেউ রাজি নয়। সারারাত জেগে থাকে তারা মাটির নীচে কোথায় যেন ভয়াবহ দুর্যোগের অমোঘ অস্ত্র শাণিত হচ্ছে, তার পূর্বাভাস তাদের আতঙ্কগ্রস্ত বুকের মধ্যে এসে স্পন্দিত হতে থাকে।

অবশেষে এই কালরাত্রির অবসান হ'ল। রাত্রে আর ভূমিকম্প হয় নি—কিন্তু হোটেলের বোর্ডারদের জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখের পানে চেয়ে বরেনের মনে হচ্ছিল যেন অনেক ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছে তাদের অস্তিত্বের ঋজুতা।

সেদিন ভোরের আকাশ মেঘের ঢাকনা সরিয়ে দুর্যোগ-ত্রস্ত লোকগুলোকে একটা রোদে-ঝলমল দিন উপহার দিল। শহরের থমথমে আবহাওয়াটা সকালের রোদের ছোঁয়ায় হাল্কা হ'য়ে এল—আধমরা লোকগুলোও যেন বেঁচে উঠল।

শিলং শহরটা মোটামুটি অটুট আছে জেনে প্রসন্নচিত্তে সবাই তাদের চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাবে, এমন সময় স্থানীয় খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বিগত রাত্রির দুঃস্বপ্নের কালিমাটি পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে বড়ো বড়ো কাল অক্ষরে। ভয়াবহ ভূমিকম্পে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বিধ্বস্ত হ'য়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে

প্রচণ্ডতর ভূমিকম্পের নজির নাকি নেই। সেই ভূমিকম্পের সামান্য একটা স্পন্দন শিলং-এ এসে পৌঁচেছিল। আসল কম্পনের পর আনুষঙ্গিকে ছোটখাট কম্পনের পালা চলেছে এখন। তাদের দু'চারটে ঝাপটা এসে শিলং-এর চিবুক ধরে কিছুটা নাড়া হয়তো দিতেও পারে।

ভোরের প্রথম চা বিস্বাদ ঠেকল শিলং শুদ্ধ সকলের মুখেই।

বরেন চা না খেয়েই ছুটল এয়ার-পোর্টের দিকে—কোনমতে পশ্চিম-অভিমুখী যে কোনও সার্ভিসে যদি একটি সীট্ জোগাড় করতে পারে।

বুকিং অফিসের সুইং ডোরের কাছে এসে বরেন যাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেল, তিনি তাদের শিলং-এর অফিসের ইন্-চার্জ নটরাজন।

প্রথম ধাক্কায় আচমকা চমকে উঠলেও পর মুহূর্তে উল্লসিত হলেন নটরাজন। বরেনের পিঠে একটা খুশির চাপড় মেরে তিনি বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলুম—এখন তোমাকেই আমার দরকার। ভূমিকম্পের ওপর সিম্পোসিয়ামে তুমি নাকি দুর্ধর্ষরকম একটা প্রবন্ধ পড়েছিলে—ডেপুটি ডিরেক্টর বলছিলেন যে আমাদের জিওলজিক্যাল সার্ভেতে তোমার মত ভূমিকম্প কেউ বোঝে না। কাজেই বরেন, মাই বয়, তোমাকে এক্ষুনি ডিব্রুগড় যেতে হবে এই ভূমিকম্পের তদন্তের জন্য। ডিব্রুগড় থেকে ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব দিকে যাবে নাগাল্যাণ্ড্ পেরিয়ে। ভূমিকম্পের এপিসেণ্টারে না পৌঁছতে পার—

বরেন বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু আমি তো ছুটি নিয়েছি। আজই লক্ষ্ণৌ যাব আমার স্ত্রীর কাছে।

—ছুটি ক্যানসেল করাচ্ছি—ডিরেক্টরকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব এক্ষুণি। কাজটা সেরে ফেলে যত দিন খুশি ছুটি নিও।

বরেনের মুখখানা প্রায় পাথর হয়ে ওঠে—সে বললে, মিস্টার নটরাজন, আমি যেতে পারব না—আপনিই যান।

বরেনের হাতদুটি চেপে ধ'রে নটরাজন বললেন, দোহাই তোমাকে বরেন, তুমিই যাও। আমি যদি যাই, আমার বউ আমাকে ডিভোর্স করবে। গতকাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ডে সেলিব্রেট করবার জন্য বাড়িতে একটা কক্‌টেল পার্টির আয়োজন করেছিলাম—শহরের সব হোমরা-চোমরাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তাতে। কিন্তু ভূমিকম্পের দরুণ সব ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল। স্যার অরুণাচলম আইয়ারের চশমা গেল ভেঙ্গে—মিসেস্ শর্মা চেয়ার থেকে টেবিলের নীচে হুমড়ি খেয়ে পড়ার দরুণ শ্যাম্পেনভর্তি জগ্ গিয়ে পড়ল জাষ্টিস মারুতির মাথায়,তিনি টেবিলের নীচে শেল্টার নিতে গিয়েছিলেন। আর আমার মিসেস্ অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন কার্পেটের ওপর। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি আমাকে আজই আবার আর একটি কক্‌টেল পার্টির আয়োজন করে গত রাত্রির ত্রুটি সংশোধন ক'রে নেবার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ভূমিকম্প-টম্প কিছু বোঝেন না—তাঁর ধারণা সব দোষ আমার। বলা বাহুল্য, তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম। কিন্তু অফিসে এসেই পেলাম ডিরেক্টারের টেলিগ্রাম—সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে হ'ল এই বুকিং অফিসে প্যাসেজ বুক করতে। হোম ফ্রন্টের ডিক্টেটরের আদেশ ও চাকরিক্ষেত্রে ডিরেক্টারের নির্দেশের মধ্যে বিরোধ বাধলেও চাকরি বজায় রাখার জন্য ডিরেক্টারের অনুজ্ঞামত যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে হ'ল—যদিও জানি শ্রীমতী আমাকে ক্ষমা করবেন না। ইতিমধ্যে ঈশ্বর প্রেরিতের মত তুমি এলে—ভগবানের নিশ্চয়ই অভিপ্রায় যে তুমি আমাকে ত্রাণ কর আমার এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে।

তিক্ত স্বরে বরেন বললে, ভগবানের কী অভিপ্রায় আমি তা জানি নে—আমার নিজস্ব অভিপ্রায়টাই শুধু আমার কাছে স্পষ্ট—সে' অভিপ্রায় অবশ্য আপনাকে সাহায্য করা নয়।

নটরাজনের মুখখানা এবারে কঠোর হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন, আমাকে সাহায্য করতে যদি না চাও, বাধ্য হয়ে আমাকে ডিরেক্টারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। ছুটিতে থাকলেও তুমি যে চাকরির শেকল ছাড়া নও, এটা নিশ্চয়ই জানা আছে।

বরেন চুপ ক'রে থাকে।

ধূর্ত দৃষ্টিতে বরেনের মুখের গাম্ভীর্যকে যাচাই ক'রে নিয়ে গলার স্বরে কমনীয়তা বিস্তার করে নটরাজন বললেন, মৌনম্ সম্মতিলক্ষণম্—কী বলো? তা' হলে চল আমার সঙ্গে অফিসে—তোমাকে সব বুঝিয়ে দিই।

প্যাসেজ্ বুক করা আছে—ঘণ্টা তিনেক বাদে প্লেন ছাড়বে।

ডিব্রুগড়ের ধ্বংস স্তূপে বরেন যখন পৌছল, তখন বেলা দুপুর। নির্জন পথঘাট। এখানে ওখানে স্যালভেজ্ পার্টির লোকজন ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াচ্ছে। জায়গায় জায়গায় পুলিশ ও আর্মির পাহারা। গোটা শহরটা যেন মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে আছে—কোথাও তার প্রাণসত্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শহরের সড়কগুলি সব ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কোন রাস্তারই খেই পাওয়া যায় না। পথ-ঘাটের পিচের মসৃণতা বিশ্লিষ্ট হ'য়েছে অসংখ্য ফাটলের আঁকিবুকিতে।

ভাঙ্গা ঘরবাড়িগুলো হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছে। ভগ্ন-স্তূপের সঙ্গে একাকার হ'য়ে আছে অক্ষত বাড়িগুলো। এক নজরে মনে হয় যেন নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গন পুরো শহরটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

আগাগোড়া সমস্ত শহর টহল দিল বরেন। ভাঙ্গা ইঁটকাঠের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সূত্র খুঁজল বুঝি—প্রকৃতির নৃশংসতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

এই আকস্মিক বিপর্যয়ে প্রকৃতির কী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল কে জানে। সভ্যতার অগ্রগতি সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় আনতে চেয়েছে বলেই কী প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে! বাইরের শ্যামল শোভন মোহন রূপে মানুষ ভুলে ছিল, সে কী জানত যে আড়ালে ভয়াবহ বিনাশশক্তি চরম সর্বনাশের আয়োজন করছে!

শহরের সীমানার বাইরে এসে দাঁড়ায় বরেন। অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদ। নানা আকারের আঁকাবাঁকা সব গহ্বরের ক্ষত চিহ্ন মাঠ ও নদীজোড়া সুদৃশ্য সামঞ্জস্যকে বিকৃত ক'রে দিয়েছে। সমান্তরাল ফাটলগুলো কোণাকুণিভাবে নদীকে ছুঁয়েছে। নদীটা কী রকম যেন শীর্ণ হ'য়ে পড়েছে—বর্ষার জলের প্রাচুর্যের চিহ্নমাত্রও নেই। এরও হয়তো কারণ আছে। হয়তো বন্যার পূর্বাভাস—কিংবা হয়তো কোনও অজ্ঞাত শোষণে শুকিয়ে গেছে নদীটা।

উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয়ের দুর্গমতার মধ্যে কোথাও হয়তো স্তরীভূত শিলাপুঞ্জের আপাতস্থায়ী বিন্যাস ও ঋজুতার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছে, তাই এই ভূমিকম্প। উত্তর-পূর্বে সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে এই বিপর্যয়ের কেন্দ্রটি প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকলেও বহু দূর পর্যন্ত কঠিন মাটির সুপ্তি ভেঙ্গেছে প্রলয়ঙ্কর জাগরণে।

নদীর ধারে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে বরেন। মেটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের দপ্তরে ব'সে সিস্মোগ্রাফে চিহ্নিত মাটির কাঁপনের রেখাগুলো বিশ্লেষণ ক'রে ভূমি-কম্পের ভূ-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা যায় নানারকম সূত্রের জাল বুনে—কিন্তু প্রত্যক্ষ বিভীষিকার সাম্নে দাঁড়িয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যায় অসাড় হ'য়ে। আর কেউ হ'লে কী করত তা' বরেন জানে না, কিন্তু বরেনের মস্তিষ্কের কল-কব্জাগুলো নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়েছে আপাততঃ।

নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে সে—নিজেকে নিজের মধ্যে শক্ত ক'রে দাঁড় করাবার উপযুক্ত অবলম্বন যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ তার মনে হ'ল মিত্রা যেন তার সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে। সে যেন মাটির ফাটল ও গহ্বর, শুকিয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র, বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ—সব অসামঞ্জস্যকে ঢেকে ফেলে স্নিগ্ধ আশ্বাসের আলো বিকীর্ণ করছে। পর মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল তার স্বপ্নঘোর।

মিত্রাকে একান্তভাবে কাছে পাবার দুর্নিবার আকাঙ্খা বরেনের ভীরু মনে সহস্র বাহু বিস্তার করল।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাত্রির আশ্রয়ের সন্ধানে স্যাল্‌ভেজ্ পার্টির ক্যাম্পে এসে হাজির হ'ল বরেন। সরকারী বিশ্রাম ভবনের পাশে পাঁচিলে ঘেরা ফুটবলের মাঠে অনেকগুলো তাঁবু পড়েছে। গেটে একজন দারোয়ান পাহারা দিচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে ক্যাম্পের অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাইল সে। লোকটি বললে, যে সাহেব রেস্ট হাউসে স্যালভেজের কাজে ব্যস্ত—সেখানে নাকি দুটো মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

ক্যাম্পের পাশেই রেস্ট হাউস্। অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়ে উঠলেও ইতস্ততঃ সঞ্চারমান কয়েকটি মশালের আলোয় ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাওয়া বাড়িটির অস্পষ্ট আদল চোখে পড়ছে।

প্রায় ষার জন লোক একটা বিশাল ইট-কাঠের স্তূপের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে খানিকটা অংশ পরিষ্কার করার চেষ্টা

করছিল। অনতিদূরে একজন মোটামত ভদ্রলোক একটি হাভানা সিগার ধরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বরেন অনুমান করল যে ইনিই অধিনায়ক। তাঁর মুখের ভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি অধৈর্য হ'য়ে উঠেছেন। বরেন তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনল যে তিনি বলছেন, ভাল জালা হয়েছে তো—দুটো লাশ বের ক'রে আনতে তোমরা বুড়ো হ'য়ে গেলে দেখছি!

ইট-কাঠের স্তূপের দিক থেকে শ্রান্ত জবাব এল, কী করব স্যার, বিশ্রী রকম চাপা প'ড়ে গেছে যে। বলা তো যায় না, হয়তো এখনো বেঁচে আছে।

—বেঁচে থাকলেই বা। টেনে বের ক'রে আন।

—পাওয়া গেছে স্যার। ইস্ একেবারে থেঁৎলে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে হাসব্যাণ্ড্ এ্যাণ্ড্ ওয়াইফ।

—কই দেখি।

অধিনায়ক এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ ক'রে বরেনও এসে দাঁড়াল সদ্য-উদ্ধার-করা মৃত দেহ দুটির সাম্নে।

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি দেহ একটি মাংসপিণ্ডে একাকার হ'য়ে গেছে। মুখোমুখি মুখ দুটি অবশ্য অক্ষত রয়েছে। ধুলোয় খানিকটা মলিন হ'য়ে উঠলেও চিনতে অসুবিধে হয় না বরেনের। মিত্রা ও সুজিত। মৃত্যু-নিথর শেষ আলিঙ্গন।

বরেনের চোখের সাম্নে আকাশ—মাটি সমস্ত অন্ধকার প্রলয় আন্দোলনে আবর্তিত হ'তে থাকে।

আবার কী ভূমিকম্প শুরু হ'ল!

শুকতারা সম চিত্ত আকাশে

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়.

কালের প্রবাহ সেই বহে যায় যুগ-যুগান্ত অন্তহীন,
ধরণীর শ্যাম-উপকূলে শুধু অবিরাম আসা-যাওয়া ;
পান্থশালার মুক্তদুয়ার রুদ্ধ নহে ত কোনটি দিন,
কভু আশাবরী, কভু বা পূরবী—অনাহত চির-গাওয়া।

অচেনার সাথে অজানা পথিক পরিচিত হয় প্রীতির ডোরে,
মনে হয় যেন কত জনমের কত যে গো প্রিয়তম ;
যাত্রী তাহারা কালের কক্ষে, জীবনের শুরু কোন সে ভোরে,
পার হ'য়ে এল কত ছায়াপথ দীপ্তি-উছল তারকা সম।

এমনি করিয়া আমরা এসেছি ধরণীর বুকে শুন গো মিতা,
অপরিচয়ের সংকোচ ত্যজি' কাছে টেনেছিলে—ভরিল বুক;
অবাক মেনেছি প্রীতির ধারায়,ভেবেছি এ কোন অপরিচিতা,
আপন-জীবন-আলোক দানিয়া জ্বালালে প্রাণের প্রদীপটুক।

আপন প্রাণের দূতী হ'য়ে এলে, জাগালে
প্রাণের অভীপ্সা,
বৃহতের সাথে হ'ল পরিচয় ক্ষুদ্রতা কোথা
হ'ল যে লীন ;
অসীমের বুকে লভিল বিরাম জগৎ-জীবন সে লিপ্সা,
জানিনু নিজেরে জানিনু পৃথিবী—বসুধার বুকে
নহি ত দীন।

কালের প্রবাহে কোথা চ'লে গেলে বন্ধু আমার হে স্মরণীয়,
দিন চ'লে যায়, থাকি যে আশায় বাঞ্ছিত তব
আসার লাগি' ;
তোমার স্মৃতির কুসুম-চয়নে কাটাইব দিন হে বরণীয়,
শুকতারা সম চিত্ত আকাশে তোমার প্রীতিটি
রহিবে জাগি'।

আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল

আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা আছে তাহাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম+ষ্ণিক্=আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয়। আর্যশাস্ত্রানুসারে আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এক এবং অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিবিধ প্রকাশ। এক এবং অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দুই ভাব—নিত্যভাব ও লীলাভাব। তিনি নিত্যভাবে নির্গুণ এবং লীলাভাবে সগুণ। তিনি একই সময়ে নিত্যভাবে নির্গুণ এবং লীলাভাবে সগুণ। এই অতিবিরুদ্ধ দুই ভাবের এককালীন একত্র হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের মনবুদ্ধির অগম্য। আমাদের তর্কশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। সাধন পন্থী না হইলে ইহা উপলব্ধিতে আনা অসম্ভব। সুতরাং এ বিষয়ে আপ্তবাক্য একমাত্র প্রমাণ। অন্য প্রমাণের অবতারণা অনর্থক। উপনিষদে আছে—"এতদ্বৈ সত্যকাম পরংচাপরং চ ব্রহ্ম"···"দ্বেবাব ব্রহ্মণো-রূপে মূর্তাং চৈবামূর্তাং চ মর্তাং চৈবামৃতঞ্চ। ব্রহ্মের পর ও অপর, মূর্ত ও অমূর্ত, মর্তা ও অমৃত দুই রূপ। উহা আমাদের স্বীকার্য। অন্যথায় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব এবং তাহার একমেবমাদ্বিতীয়ভাব এবং সর্বশক্তিমানতা সম্ভব নহে। এই পৃথিবীতে যত ধর্মমত বর্তমানে প্রচারিত আছে তাহাতে সকল ধর্মে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা স্বীকৃত আছে। সুতরাং সকল ধর্মমতে পরমব্রহ্মের একই সময়ে নিত্য ও লীলাভাবে বা সগুণ ও নির্গুণভাবে অবস্থিতির শক্তি আছে! যে ধর্মমতে পরমব্রহ্ম একই সময়ে সগুণ ও নির্গুণ বা সাকার ও নিরাকার—এই শক্তিমত্তার স্বীকৃতি নাই সেই মতে পরমব্রহ্মের সর্বশক্তিমানতার স্বীকৃতি নাই। ভারতীয় দর্শনে নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম সর্বত্র নিত্যভাবে পূর্ণরূপে আছেন, আর তিনি সর্বত্র লীলাভাবে সগুণ ও সাকাররূপে পূর্ণভাবে আছেন। এজন্য উপনিষদের শান্তি বাক্য—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

(ঈশোপনিষদ)

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, এক এবং অদ্বিতীয় পরিপূর্ণতম ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। পরমব্রহ্মের এই প্রকাশ সর্বব্যাপী হইলেও তাঁহার নিত্য পূর্ণ স্বভাবের কোন হানির সম্ভাবনা নাই। এই বিরাট অসীম উপলব্ধি ভারতীয় ধর্মের নিজস্ব। তিনি

—অণোরনীয়ান মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহতো গুহায়াম্।
তমশ্চতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানামাত্মনঃ॥ (কঠোপনিষদ)

ভারতীয় সাধনা আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনা। অনন্ত সুখলাভের সাধনা নহে। ভারতীয় ঋষিগণের উপলব্ধিতে সুখও বন্ধন, দুঃখও বন্ধন। এই সুখ ও দুঃখের বন্ধন হইতে পরমামুক্তি লাভ ভারতীয় সাধনার চরমলক্ষ্য। আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন সেই পরমামুক্তি সম্ভব নহে। এজন্য আত্মা কি ইহা ভারতীয় মানসে প্রধানতম জিজ্ঞাস্য। আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো—ইহাই আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের মর্মবাণী। আমি জীব, আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব—এই ধারণা মূর্খ পণ্ডিত দীনদরিদ্র নরনারীর সকলেরই আছে। আমি কে? আত্মা কে? ইহার সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলেও আমি যে দেহের অতিরিক্ত এই ধারণাও সকলের আছে। এজন্য মূর্খপণ্ডিত দীনদরিদ্র নরনারী সকলে বলিতে অভ্যস্ত—আমার দেহ, আমার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার অহংকার। তথাপি এই আমি কে?—ইহা জানিবার জন্য প্রচেষ্টা এই মরজগতে কয়জন করিয়া থাকেন? যে আমি তাহার আমাকে লইয়া প্রতি পলে পলে সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া মরিতেছে, সেই আমি তাহার আমাকে জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছে না—ইহাই এই মরজগতের একটী পরমাশ্চর্য। তথাপি আমি এই পৃথিবীর সকল জীব হইতে স্বতন্ত্র এই বোধ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল জীবের থাকে। মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন—মানব শিশুর মতো আত্মকেন্দ্রিক প্রাণী এই জগতে দ্বিতীয়টী নাই। আত্ম-

কেন্দ্রিক শিশু তাহার 'আমার' পরমতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে—তাহার অনন্ত চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে। এই নগ্ন কামনা বাসনা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে। তারপর বয়ঃ ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অসংখ্য কামনা বাসনার সংঘাতে তাহা সংযত হয়। সুতরাং এই মরজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানবের স্বাতন্ত্র্যবোধ মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জ্ঞানের সঙ্গে একাত্মভাবে থাকে। অর্থশাস্ত্র মতে প্রতি জীবে ইহাই জীবাত্মা।

জীবাত্মার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কেন?

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাঁহার নিত্যভাবে নির্গুণ ও নিরাকার এবং এই একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাঁহার লীলা-ভাবে বহুরূপে প্রকাশিত সাকার। এই পরমব্রহ্ম তাঁহার শুদ্ধমায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সকল জীবে কূটস্থ চৈতন্য ঈশ্বররূপে বিরাজ করেন। আবার তিনি তাঁহার অবিশুদ্ধ মায়া বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপে স্বাতন্ত্র্য-বোধের উদ্দীপনা করেন। এক ভাবে লীলা সম্ভব নহে। বহুভাব আবশ্যক। এই জন্য, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাঁহার লীলা মানসে বহু হইয়াছেন। পরমব্রহ্ম কেন লীলা-মানসে বহুভাবে প্রকাশিত আছেন—ইহার উত্তর মানবের পক্ষে প্রদান করা অসম্ভব। ইহার উত্তর একমাত্র পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং দিতে পারেন। বিশুদ্ধ মায়াতে সগুণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ যে চৈতন্য তাহা সর্বজ্ঞ পরাৎপর কূটস্থ চৈতন্য ঈশ্বর নামে খ্যাত। অবিশুদ্ধ মায়া বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তাহা আভাস চৈতন্য বা জীবরূপে জগতে কর্ম-পরতন্ত্রগুলো জন্ম স্থিতি মৃত্যু প্রবাহে ঘুরিতেছে। অবিশুদ্ধ-মায়া বা অবিদ্যার নির্মলতার তারতম্যে এই মরজগতে বহু প্রকৃতির মানব ও পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির জন্ম সম্ভব হইতেছে।
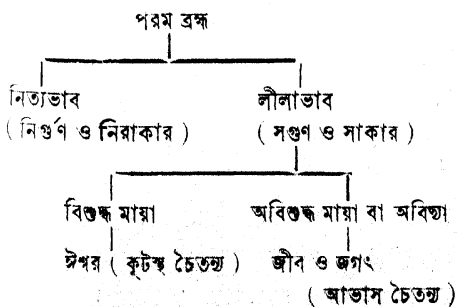
ঈশ্বর সমস্ত জীবচৈতন্যকে আপনার সহিত অভেদ জানিতেছেন। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে জীবগণ পরস্পরকে পৃথক ভাবে জানিতে বাধ্য হইতেছেন। এই মায়া ও অবিদ্যা জীবকে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে পৃথকভাবে ভাবিত হইতে বাধ্য করিতেছে। এই অবিদ্যা ও মায়াকে যিনি সাধনা দ্বারা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভে সক্ষম হন। এজন্য ভারতীয় উপনিষদে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য। তৎ (ব্রহ্মচৈতন্য) ত্বম্ (অবিদ্যা-অভিমানী জীবচৈতন্য) অসি (হও)। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম চৈতন্য হইলেও জীবাত্মাতে অবিদ্যার (বিষয় বাসনা কামনাদির) অধিকার থাকায় সাধনা ভিন্ন স্বরূপবোধ সম্ভব হইতে পারে না। জীবশরীর তাহার ব্রহ্মবোধের বাধক। আকাশাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের পঞ্চ সত্ত্বগুণাংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। জীবের ভোগের জন্য তমোগুণপ্রধান পঞ্চভূতাত্মক এই জড়জগৎ। আকাশ ভোগ জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ। বায়ুভোগ জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্। সেই রূপ তেজঃ জল ও ক্ষিতি ভোগ জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে চক্ষু, রসনা ও নাসিকা। সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিগত সত্তা মানব অন্তঃকরণ। মানব অন্তঃকরণের প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রকাশ সংশয়াত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণাংশ হইতে মানব-জীবের পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপত্তি। শব্দগুণ প্রধান আকাশের রজোগুণ হইতে মানবের কর্মেন্দ্রিয় বাক (কার্য কথন)। বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত (কার্যগ্রহণ) তেজঃ হইতে পাদ্ (কার্য চলন) জল হইতে বায়ু (কার্য-পরিত্যাগ) ক্ষিতি হইতে উপস্থ (কার্য-আনন্দ উপভোগ। আকাশাদি পঞ্চ-ভূতের সমষ্টিগত রজোগুণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ইহা পঞ্চধা বিভক্ত। (১) প্রাণ (হৃদয়স্থবায়ু যাহা নাসিকায় চলাচল করে) (২) অপান (পায়ুতে অবস্থিত বায়ু) (৩) সমান (উদরস্থ বায়ু) (৪) উদান (কণ্ঠস্থিত বায়ু) (৫) ব্যান (সর্বশরীরস্থ বায়ু)।

পঞ্চভূত সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা। পরম ব্রহ্মের একপাদ সর্বভূতে ব্যাপ্ত। আর তাহার তিনপাদ মুখ্যতঃ সমস্তই নিত্যশুদ্ধ মুক্ত স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ। শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো

জগৎ।" অহম্ (আমি) একাংশেন (এক অংশ দ্বারা) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থান করিতেছি)। দেবীসূক্তে অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপিণী মা মহামায়া এরূপই বলিয়াছেন—"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা। পর দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমাসম্বভুব।" আমি এই বিশ্ব ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া বায়ুর মতো উহাদের অন্তর বাহিরে বিচরণ করিতেছি। যদিও স্বরূপতঃ আমি আকাশের অতীত, পৃথিবীর অতীত, তথাপি আমার মহিমায় সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমব্রহ্মের একাংশ মাত্র। মানবমনঃ এই সামান্য পঞ্চভূতাত্মক বিষয় ভোগ জন্য আপনার আমিকে না জানিয়া—আপনার স্বরূপ ভুলিয়া এই অমূল্য মানবজীবনকে হেলায় নষ্ট করিতেছে বা নষ্ট করিতে বাধ্য হইতেছে। এই অবিদ্যাপ্রসূত বিষয় ভোগ হইতে অবিদ্যাপ্রসূত আপনার শরীর ও মনের কামনা বাসনাকে বিযুক্ত করিতে—বিষয়কে জানিয়া তাহা হইতে বিযুক্ত হইবার উপায় জানিবার চেষ্টা আবশ্যক।

সগুণ ব্রহ্মের কার্য—মায়া ও অবিদ্যা। মায়া আশ্রয়ে ঈশ্বর সমগ্র জীবে ও জগতে অনুপ্রবিষ্ট এবং অবিদ্যাপ্রভাবে জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র। সগুণ ব্রহ্মের মায়াভাব যেরূপ সমগ্র জীবজগতে সর্বব্যাপিনী, সেরূপ অবিদ্যাভাব সর্বব্যাপিনী। শুদ্ধ মায়াভাব অন্তরে গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্নভাবে আছে এবং অবিদ্যাভাবে জীবজগতে বাহিরে সর্বত্র আচ্ছন্নভাবে বর্তমান। ব্রহ্ম চৈতন্যের মায়াভাব যেন সৃষ্ট জীবে পৃথিবীর অন্তঃস্থিত অখণ্ড জলরাশি এবং ইহার অবিদ্যাভাব বিভিন্ন বাহিরে প্রকাশিত জলরাশি ও তাহাদের তরঙ্গ এবং বুদ্বুদ এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত এক সূর্যের বহুবিধরূপে প্রকাশ।

অবিদ্যার স্বাভাবিক গুণ বিকারত্ব শূন্যত্ব
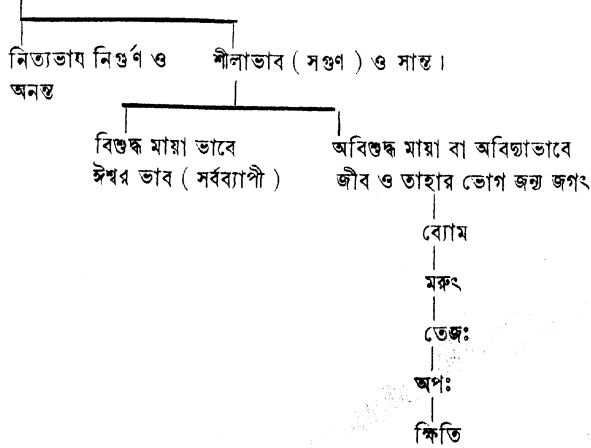
অনিত্যত্ব ও ভ্রান্তিভাব

পঞ্চভূত	স্বাভাবিকগুণ	আগতগুণ
ব্যোম (আকাশ)	শব্দ	অবিদ্যার সমস্ত গুণ
মরুৎ (বায়ু)	স্পর্শ	অবিদ্যার সমস্তগুণ ও শব্দ
তেজঃ (অগ্নি)	রূপ	ঐ ও শব্দ ও স্পর্শ
অপঃ (জল)	রস	ঐ ও শব্দ, স্পর্শ ও রূপ
ক্ষিতি (মাটী)	গন্ধ	ঐ ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস।

সগুণব্রহ্ম লীলামানসে বহুত্ব ইচ্ছার সৃজন করেন। জীব তাহা সংযোগ ও বিয়োগে ভোগ করে। জীবশরীরে যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহা জীবাত্মা। জীবাত্মা স্বরূপভাবে ব্রহ্ম চৈতন্য হইলেও অবিদ্যা অভিমানে ভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত। জীবাত্মার প্রকাশ চতুর্বিধ ভাবে—মনঃ (সংকল্প বিকল্পাত্মক) বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক) চিত্ত (অনুসন্ধিৎসু) অহংকার (অভিমান ও কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বোধ)। জীবদেহে ইন্দ্রিয়বর্গ পঞ্চভূতাত্মক। সগুণ ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট জড় জগৎ তমো-

গুণ প্রধান। মানব দেহ পঞ্চভূতাত্মক। মানবদেহে জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণ ও কর্মেন্দ্রিয় রজোগুণ প্রধান। মানবদেহে প্রাণই প্রধান। প্রাণভিন্ন মানবদেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ ভিন্ন মনের কার্য থাকে না—মনঃ বুদ্ধি চিত্ত, অহংকার দেহ হইতে বিলুপ্ত হয়। মন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের কোনও কার্য নাই। কিন্তু মন ইন্দ্রিয় ব্যতীত তাহার কার্য করিতে সক্ষম। এই জগৎ জীবগণের অন্তর ও বাহিরে সর্বত্র। এজন্য ইন্দ্রিয়বর্গ মনের সাহায্যে অন্তরের ও বাহিরের উভয়বিধ বিষয় গ্রহণ করে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া কর্ণ ভিতরের শব্দ শ্রবণে সক্ষম। সেইরূপ চক্ষুঃ ,রসনা, নাসিকা ত্বক্—অন্তরের ও বর্হির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ উপভোগ করে। জীবের পরিদৃশ্যমান যে দেহ তাহা স্থূলশরীর (অন্নময় কোষ), উহার অন্তরে লিঙ্গশরীর (প্রাণময় কোষ) তদন্তরে সূক্ষ্মশরীর (মনোময় কোষ) ও কারণ শরীর (বিজ্ঞানময় কোষ) শেষ (অসম্পূর্ণকোষ)

সাংখ্য ও বেদান্ত মতে জীবাত্মা

সাংখ্য মতে আত্মা বহু ও ভিন্ন। বেদান্ত মতে আকাশের ন্যায় ব্যাপক আত্মা (পরমব্রহ্ম) এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু মনের নানাত্বে বহুরূপে প্রকাশিত। তিনি অসংখ্য অন্তঃকরণে অসংখ্য প্রতিবিম্ব অর্পণ করেন, এই অসংখ্য প্রতিবিম্বিত অন্তঃকরণ জীব। বেদান্তমতে জীবজগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। এজন্য জীবাত্মার কোন গুরুত্ব বেদান্তে নাই। সাংখ্য শাস্ত্রে আত্মা প্রতিটী শরীরে বিভিন্ন, এজন্য আত্মার বহুত্ব। এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগৎকে সাংখ্যশাস্ত্র গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। এজন্য সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ে উভয়ের অনুপূরক বা পরিপূরক। বেদমূল শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্‌বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃনোতি, শ্রুত্বাপেনংবেদ ন চৈব কশ্চিৎ।" কেহ কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ বলিয়া দেখেন—কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ বলিয়া বর্ণনা করেন। কেহ আবার ইহাকে আশ্চর্যবৎ বলিয়া শ্রবণ করেন। কেহ বা শ্রবণ করিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না।

সকল উপনিষদের সারভূতা শ্রীশ্রীগীতায় আত্মার স্বরূপ

শ্রীশ্রীগীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে। আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়। ইহা কাহাকে হনন করে না বা কাহারো কর্তৃক হত হয় না। ইহার জন্ম-মরণ নাই। ইহা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ ও অব্যয়। ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইহা সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী। শ্রীশ্রীগীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। জীবশরীরে জীবভাত প্রাপ্ত সনাতন আত্মা ব্রহ্মের অংশ। মানব দেহে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়বর্গ সহ মনে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সমূহ উপভোগকরে—এই উপভোগ প্রকৃত ভাবে অবিদ্যা প্রভাবে ভ্রান্তিভাবে আচ্ছন্ন। মৃত্যু সময়ে এই জীবাত্মা এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। ঐ অধ্যায়ে দশম শ্লোকে আছে—উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। বিমূঢ়ব্যক্তি উৎক্রমণকারী অথবা দেহে অবস্থিত বা বিষয়ভোগী সত্ত্বাদিগুণান্বিত আত্মাকে দেখেন না, জ্ঞানচক্ষুগণ দেখেন। সর্বব্যাপী স্থির অচল আত্মার এই বিষয় ভোগ বা উৎক্রমণ অবিদ্যার প্রভাব। গতিশীল পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা যেরূপ সূর্যের গতি দেখি ইহাও তদ্রূপ। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে জীবাত্মাকে ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্যতে জগৎ। পঞ্চমহাভূত এবং মন বুদ্ধি অহংকার ব্রহ্মের এই অষ্ট প্রকৃতি অপরা। জীবভূতা অন্য প্রকৃতি, আমার পরা (শ্রেষ্ঠ) যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত আছে। মানব দেহে 'আমি' জীবাত্মা। ইহা অংশ ভাবে কল্পিত হইলেও স্বভাবতঃ পূর্ণ কারণ অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পারমার্থিক বিভিন্নতা কোথায়ও নাই। নিত্য পূর্ণ নির্গুণ স্বভাব ব্রহ্ম লীলামানসে সগুণ হইয়া আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন ভাবে জীবশরীরে কর্মপরতন্ত্র প্রবাহে লীলা করিতেছেন। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুনঃ তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া॥ হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে, তাহাদিগকে স্বীয়মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ়বৎ ঘূর্ণিত

করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) মায়াধীনা, এজন্য সকল জীবে ও জাগতিক সকল পদার্থে তাহার একত্ব-বোধ বর্তমান। কিন্তু, জীবগণ মায়াধীন, এজন্য স্বতন্ত্র ও অহং-মদমত্ত। তথাপি জীবাত্মা মনের প্রতি দুই দিকে চালিত হইতেছে—একটী পার্থিব বিষয়ে, অপরটী পারমার্থিক বিষয়ে। জীবাত্মার পরম-আত্মবোধ স্বাভাবিক ভাবে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে রহিয়াছে।

জীবাত্মার নিজস্বরূপ বোধের উপায়।

জীবগণের অহংবুদ্ধি এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ আত্মদর্শনের পক্ষে প্রযুক্ত বাধা। জীবশরীরে অহংবোধ একেবারে নাশের সম্ভাবনা নাই। এজন্য পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন-কাঁচা আমি (কর্তা আমি) কে নাশ করে পাকা আমি (ঈশ্বরদাস সর্বজীবে প্রেমময় আমি) কে শুধু রাখতে। কর্তা আমি নাশের চারিটী উপায় (১) স্বাধ্যায় (২) সৎসঙ্গ (৩) আত্মসমীক্ষা (৪) সর্বজীবে প্রেমভাবের উদ্দীপনা। আমরা জীবগণ সদগ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গ ও আত্মসমীক্ষার সময় পাইনা কিন্তু কুরুচির উদ্দীপক গ্রন্থাদি, অসৎ সঙ্গে অসৎ আলোচনা ও পরনিন্দা পরচর্চ্চার সময় পাই। জীবশরীরে মনের এই নিম্নাভিমুখী গতিকে ফিরাইতে প্রয়োজন (১) আহার শুদ্ধি (২) ব্যবহার শুদ্ধি (৩) কায়মন-বাক্য শুদ্ধি (৪) দেশকাল পাত্র জ্ঞান (৫) ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন অন্য সকল সংকল্প ত্যাগ বা সর্বসংকল্প ঈশ্বর উদ্দেশ্যে গ্রহণ—"যৎকরোমি জগন্নাতঃ তদেব তব পূজনং" ভাবে ভাবিত হওয়া (৬) ইন্দ্রিয় সংযম (৭) ব্রত চর্চা (৮) সর্বজীবে ঈশ্বরাধিষ্ঠান বোধ (৯) গুরুসেবা।

লৌকিক সমস্ত বিষয় শিক্ষার জন্য গুরুর শরণাপন্ন হওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। সুতরাং আত্মদর্শন বিষয়ে গুরুকরণের আবশ্যকতা নাই চিন্তা করা বাতুলতার নামান্তর। লৌকিক শিক্ষার জন্য আমরা উপযুক্ত শিক্ষকের অনুসন্ধান করি। সুতরাং পারমার্থিক শিক্ষার জন্য আত্মবোধযুক্ত সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক। সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ হইলে জীবের নিত্য কর্তব্য (১) শ্রবণ (২) মনন (৩) নিদিধ্যাসন। আর্যশাস্ত্রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন লক্ষণ লিখিত আছে।

(১) শ্রবণ লক্ষণ—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আদি মধ্য ও অন্তে ব্রহ্ম আছেন এবং ব্রহ্মে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মং—তিনিই সব এবং সবই তিনি—এই জ্ঞান লাভ জন্য শ্রবণ। সুতরাং একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র শ্রবণই শ্রবণ পদবাচ্য। (২) মনন লক্ষণ—শ্রবণ দ্বারা সম্ভাবিত যে সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য তাহা সর্বদা যুক্তি তর্কসহ যে মানসিক অনুসন্ধান তাহাই মনন। সুতরাং পরম ব্রহ্ম শাস্ত্রজ্ঞান বিশ্বাস দ্বারা দৃঢ়ীকরণ মনন। (৩) বিপরীত ভাবনা চিত্তের একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত বিপরীত ভাবনা প্রতিনিবৃত্তির জন্য অনন্যমনে অবিশ্রাম যে প্রগাঢ়ধ্যান তাহাই নিদিধ্যাসন। আর্যশাস্ত্রে আছে সর্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে। অন্যান্য নানামুখী চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমব্রহ্মে যোগ নিমিত্ত নিরন্তর ধ্যান নিদিধ্যাসন। মনঃ এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ—মানবের মন বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয় চিন্তা বন্ধন এবং পরমার্থ বিষয়ক চিন্তা মুক্তির হেতু।

উত্তর গীতার উপদেশ—জীবাত্মা ও প্রণবকে অগ্নি উৎপাদক কাষ্ঠ খণ্ড মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে ব্রহ্মরূপ অগ্নি উৎপাদন করিবে। উত্তর গীতার আর একটী উপদেশ—আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরং সমন্বয়াৎ। যোগেন গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে। আত্মমন্ত্র (গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র) শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া সকল কামনা ত্যাগ করিয়া যোগযুক্তমনে ভাবনা ব্রহ্মলাভের উপায়।

দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহংভাবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে দৃশ্যত জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই। শুধু দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবোধের তারতম্যে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ। শ্রীশ্রীগীতায় চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যিনি সত্তাদি গুণসকলের প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ ভাব স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হইলে দ্বেষ করেন না এবং উহার অবসানে উহাকে আকাঙ্খা করেন না, উদাসীনবৎ থাকেন, তিনি গুণাতীত, যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিবেশ দ্বারা সর্বদা ভগবানের চিন্তা করেন তিনি গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম ভাবের যোগ্য হন।

উপনিষদের বাক্য—আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতং। আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন দ্বারা জানিলে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না।

আর একটী মহাবাক্য আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মাকে দর্শন, মনন ও নিরন্তর ধ্যান করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে মহাভারতের একটী উপদেশ—যেমন গাভীর দেহে ঘৃত সূক্ষ্মভাবে থাকিলেও তাহা যেমন গাভীর দেহস্থিত ক্ষতের আরোগ্য করিতে পারে না, কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা দুগ্ধদোহন ও মন্থন দ্বারা ঘৃত উৎপাদন করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতের বিলোপ হয়। তদ্রূপ জীবশরীরে ঘৃতবৎ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান জীবের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহার দর্শন লাভ হইলে জীব ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হয়। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি।

কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ধূম-জঙ্গাল-ধূসরিতা তুমি
ক্লেদ-কলুষিতা হে কলিকাতা!
পুণ্য-পাপের চিরলীলাভূমি,
কোটি শহীদের রুধির স্নাতা!
তোমার উদার প্রাঙ্গণতলে
নিখিল আসিয়া জোটে কুতূহলে;—
তুমি নিঃস্বের শেষ সম্বল,—
স্নেহময়ী তুমি বিশ্বমাতা।
হে কলিকাতা॥
গুর্জর হ'তে আসে গুজরাটী,
সুরাট হইতে মারাঠী আসে,
মরু-প্রান্তর হতে মারোয়াড়ী
এসেছে ছুটিয়া তোমার পাশে।
তোমার মধুর মুরতি নেহারি,
বিহার হইতে এসেছে বেহারী;
উড়িয়া-সিন্ধী সবার লাগিয়া
ভবনে তোমার আসন পাতা।
হে কলিকাতা॥
কাশ্মীর তোমা দিয়েছে আপেল,
আঙ্গুর দিয়েছে হস্ত ভরি,'
পাহাড়ী রাস্তা পারায়ে কাবুলি
এনেছে পেস্তা বস্তা ভরি'।
নেপালী—লেপ্‌চা আর ভোজপুরী
তোমারে পাহারা দেয় রোজ ঘুরি';
পরি' নানা বেশ ছত্রিশ দেশ
মাথায় তোমার ধরিছে ছাতা।
হে কলিকাতা॥

ইংরেজ এসে শিখালো তোমায়
নকল পোষাক, নকল বুলি;
হে মহাপ্রেমিকা বাহিরের প্রেমে
গৃহেরে তোমার গিয়েছ ভুলি'।
ধুতি-লুঙ্গি-সুট-কোর্তা-কামিজে
ঘাঘরা-শাড়ীতে উঠেছ ঘামি' যে!—
কতো বিচিত্র রূপের পশরা
কুহকিনী, তোমা দিয়েছে ধাতা।
হে কলিকাতা॥
তবু ফুটপাথে সাধু-গাঁটকাটা,
ঠাকুর-কুকুর গিয়েছে মিশে!
আসল-নকল, মিছরি ও মুড়ি
কেবা কি রকম বুঝিব কিসে!
জ্ঞানী-গুণী-খুনী-চোর-পাটোয়ার
সতী-স্বৈরিণী সব একাকার!
তব রাজপথে শৌণ্ডিকসাথে
দণ্ডী চলেছে—যেন সে ভ্রাতা।
হে কলিকাতা॥
বিজুরি-উজল প্রাসাদ তোমার
চির মুখরিত হাস্যে গানে;—
কতো হাহাকার পর্ণকুটীরে
কভু উদাসিনী, শুনেছ কানে?
রোগ শোক ঋণ, ব্যথা-বেদনায়
যারা দিন যাপে পাগলের প্রায়,—
যারা শুধু দেয়—পায়নাকো কিছু
তাদের তরে কি ঘামাও মাথা?
হে কলিকাতা॥

গোটা পাড়ায় উত্তেজনার ব্যারোমিটার সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সার্ব্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচন। সবাই বলে, এই অবৈতনিক পদটি নাকি মধুতে মাখা! আখেরে অনেক কাজ গুছিয়ে নেয়া চলে।

বহু বাক্য বিনিময়, টিকা-টিপ্পনী, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী-জাল সৃষ্টি এবং তত্ত্ব ও তথ্যের তুব্ড়ী-বাজির পর আমাদের ঘনশ্যাম সেই দুর্লভ পদটি ভোটের জোরে লাভ করে বস্‌ল।

গত বছর ঘনশ্যামই নাকি সব চাইতে বেশী চাঁদা তুল্‌তে পেরেছিল, সেইটেই প্রধান যোগ্যতা হিসেবে কাজে লেগেছে।

যাই হোক—বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে নির্ব্বাচনের পালা ত' চুকলো। এইবার প্রতিমা তৈরীর কাঠ-খড়ের আয়োজন করতে হয়। ঘনশ্যাম মনে-মনে আঁচ করে রেখেছে—এবারকার পূজো এমন জাক-জমকের সঙ্গে সমাধা করবে যে, সবাই একবাক্যে তাকে ধন্যি ধন্যি করে!

তা এই শহরে করিৎকর্ম্মা লোকের অভাব নেই। রাতটাও ভালো করে পোয়াতে দেয়নি।

কার যেন ঘন ঘন হাঁক-ডাকে ঘনশ্যামের সকাল বেলাকার মধুর আমেজের ঘুমটা আচম্‌কা ভেঙে গেল!

ডেকরেটর

এমন বেরসিক মানুষও সংসারে থাকে! ভোরবেলা ঘনশ্যাম স্বপ্ন দেখ্‌ছিল—সবাই দলবেঁধে এসে তার খোসামোদ করছে। খোসামোদ জিনিসটাই এমন আরামের যে সব কিছু জেনে-শুনেও প্রাণে পুলক জাগে!

দেখা করতে এসেছে প্যাণ্ডেল তৈরীর ডেকরেটর। মাপ-জোক-হিসেব-পত্তর সব একেবারে তৈরী করেই এনেছে। কিছু বল্‌বার যো-টি রাখে নি।

কাগজ-পত্র উল্টে-পাল্টে দেখে সার্বজনীন পূজার সাধারণ সম্পাদক বল্লেন, হুঁ!

ডেকরেটর সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনি কাট্‌লে, শুধু হুঁ দিলে ত হবে না স্যার। আমি ফর্ম্ম-টর্ম্ম সব নিয়েই এসেছি। একটা সই করে দিতে হবে যে স্যার! নইলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সবাই পিঁপ্‌ড়ের মতো ছেঁকে ধরবে।

ঘনশ্যাম জবাব দিলে, সবই ত বুঝ্‌লাম ভাই। কিন্তু আমার কি শেয়ার থাক্‌বে—সেটা আগে পরিষ্কার করো—

জিব কেটে, মাথা চুল্‌কে ডেকরেটার ঘাড় কাৎ করে বল্লে, সে কথা আপনাকে মুখ ফুটে বল্‌তে হবে কেন স্যার? আমি আগে থাক্‌তেই সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছি। বিল পেমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দশ পারসেণ্ট। ও ত' আমাদের বাঁধা বরাদ্দ। নিন্—এইবার ফর্ম্মটা সই করে দিন। হিমালয়ান ডেকরেটার বোধ করি ওৎ পেতে বসে আছে! তার আগে আমি পালাতে চাই।

মাইকওয়ালা এসে বল্লে, স্যার, কিচ্ছুটি আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। শেষ রাত্তিরের চণ্ডীপাঠ থেকে সুরু করে পূজো ব্রড্‌কাষ্ট, ছেলেমেয়ে হারানোর ঘোষণা, এবেলা-ওবেলা ডজন তিনেক করে হিন্দি গান, রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, আরতি নৃত্যের ধ্রুপদী বোল, সন্ধিপূজোর নির্ঘণ্ট, বলিদানের পাটার ভ্যাঁ-ভ্যাঁ ডাক—চাই কি মেয়েদের সিঁদুর খেলার মিউজিক পর্য্যন্ত আমার মাইকে শুনিয়ে দেবো।

ঘনশ্যাম বল্লে, কিন্তু এবার যে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। রয়েছে ছেলে-মেয়েদের দুদিনের নাটক।

মাইকওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, সব আমার তালিকাভূক্ত করে নিচ্ছি। আপনাকে কুটো গাছটি অবধি ভাংতে হবে না।

—তারপর আমার অংশটা? অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে ঘনশ্যাম।

মাইকম্যান

মাইকওয়ালা বিনয়ে একেবারে বিগলিত হয়। বলে, সে জন্যে আপনাকে কিচ্ছু ভাব্‌তে হবে না স্যার। একেবারে চুলচেরা ভাগ আমাদের। আপনাকে বঞ্চিত করে আমরা এক নয়া-পয়সাও ঘরে নিতে চাই নে!

শুনে পুলকিত হয়ে ওঠে ঘনশ্যাম। তা হলে এবারকার পূজোর বাজারটা ভালো ভাবেই করা যাবে। ঘর থেকে এক আধলাও বের করতে হবে না।

পাড়ার একটি ছেলে সুন্দর প্রতিমা তৈরী করে। ঘনশ্যাম তাকে গিয়ে বল্লে, এবার আর কুমোরটুলিতে যাবো নারে। পাড়ার শিল্পীকেই আমি 'পেট্রোনাইজ' করবো। তারপর গলাটা একটু খাটো করে বল্লে, দেখিস্ ভাই, দামটা একটু কমসম করে ধরিস। সব দিক আমাকেই ত' সাম্‌লাতে হবে···হে-হে-হে।

এবার পূজো-প্যাণ্ডেলে বাড়তি প্রোগ্রামও রেখেছে ঘনশ্যাম। একটা প্রদর্শনী খোলা হবে। পাড়ার ছেলে-

মেয়েদের সব বলে রেখেছে। কেউ হাতে-আঁকা ছবি দেবে, কেউ সূচিশিল্প সাজিয়ে দেবে, কেউ নানা রঙের ডাল দিয়ে কারুশিল্প তৈরী করবে। আবার কেউ দেবে বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ, মেয়েদের হাতে-আঁকা আলপনা থাক্‌বে। থাক্‌বে মাটির মূর্ত্তি, পিস্‌বোর্ডের বাড়ী, টিন কেটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এ ছাড়া ডালের বড়ি, আমসত্ব কিছু বাদ যাবে না। এই প্রদর্শনীতে সকাল-সন্ধ্যায় চরকায় সুতো কাটার প্রতিযোগিতাও চল্‌বে।

ওদিকে পাড়ার মেয়েরা নতুন ডিজাইনে পূজোর পোষাক তৈরী করেছে। তাদের একান্ত অনুরোধ—পূজো প্যাণ্ডেলে আরতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, আর দু হাতে ধুনুচি নিয়ে রাত দিন সেই

আরতি নৃত্য

আরতি নৃত্যের অনুশীলন চলেছে। একজন নামকরা নৃত্য-শিল্পী মুখে নাচের বোল শোনাবে। মাইক সেই ঘুঙুরের শব্দ আর নাচের বোল ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। সুতরাং এ বিভাগটিকেও বাদ দেয়া চল্‌বে না।

একটু বাদেই একদল ছেলে এসে হাজির। তাদের তীব্র অভিযোগ—মেয়েরা আরতি নৃত্য দেখাবে, আর আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, তোমরা ব্যাটা-ছেলেরা ধেই ধেই করে নাচ্‌বে নাকি? প্রজাপতির নৃত্য চোখ মেলে দেখবার বস্তু। কিন্তু তাই বলে কাকেরা যদি সমবেত নৃত্য সুরু করে, তা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় তোমরাই আঁচ করে বলো—

এই টিপ্পনী শুনে ছেলের দল মোটেই লজ্জিত হল না। বরং ফোঁস করে উঠে উত্তর দিলে, আচ্ছা, ঘনশ্যামদা, এটা আপনি কি কথা বল্‌ছেন? নাচ ত ছেলেদেরই বিষয়। সকল নৃত্যের গুরু হচ্ছেন নটরাজ। তা ছাড়া আমাদের আধুনিক জগতে—আগে উদয়শঙ্কর, তারপর ত' অমলা-শঙ্কর। কাজেই আপনি হিসেবে ভুল করলে চল্‌বে কেন? সুতরাং ছেলেদের আরতি নৃত্যের 'আইটেম'টাও বাদ দেয়া চল্‌বে না।

ঘনশ্যাম আর কি করে? এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ। আর একথা ভুল্‌লেও চল্‌বে না যে, ওদের সবাইকার ভোটের জোরেই নির্ব্বাচনী সমুদ্র পার হয়ে সে সার্ব্বজনীন পূজোর সাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছে। পুরুত ঠাকুর এসে আগ বাড়িয়ে বসে আছেন।

অন্যান্য দাবীর মধ্যে তাঁর দাবীটাও শোনা প্রয়োজন।

বিরাট এক ফর্দ্দ বের করে পুরুত ঠাকুর ঘনশ্যামের হাতে গুঁজে দিলেন, মুখে তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না।

সে তালিকা দেখে ঘনশ্যামের চক্ষু স্থির!

ঘনশ্যাম বুঝলে, ঝগড়া-বিবাদ আর মন-কষাকষি করে কোনো লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা করে সব ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে হবে।

তাই সে পুরুত ঠাকুরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—দেখুন ঠাকুর মশাই, আপনি অভিজ্ঞ আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তাই সবই বুঝতে পারছেন। যুগ-ধর্ম্মকে আমাদের মেনে চল্‌তেই হবে। আজকের যুগের ছেলেরা উৎসবের আড়ম্বরটাই বেশী করে বোঝে। মানে হচ্ছে—থিয়েটার, সাংস্কৃতিক-সম্মেলন, প্রদর্শনী, আরতি নৃত্যের প্রতিযোগিতা—এই সব আর কি! কাজেই আপনাকে মূল পূজোটা নম-নম করে সারতে হবে। আমাদের মা আমাদের চাইতেও বুদ্ধিমতী। তাই তিনি সন্তানের সব অপরাধই ক্ষমা করে নেবেন।

সার্ব্বজনীন পূজা কমিটির সম্পাদকের বিবৃতি শুনে

পুরুত ঠাকুর মশাই হাসবেন—কি কাঁদবেন—ঠিক ঠাহর করে উঠ্‌তে পারলেন না। সম্পাদক আবার সোৎসাহে

পুরুত ঠাকুর

বল্লেন, এই দেখুন না কেন, পূজো হোক-আর-না-হোক—বিসর্জ্জনের জন্যে বিরাট লরী, মাইক, আলোর খেলা, ঢাকের বাদ্যি, ফ্লাড্-লাইট, দো-নলা-পরা নাচিয়ে দল—সব কিছুর ব্যবস্থা আমায় আগে থাক্‌তে করে রাখতে হবে। নইলে—বুঝ্‌তেই ত' পারছেন—পাড়ার নৌ-জোয়ানের দল আমার মাথা ফাটিয়ে দেবে।

আর আপনি কিচ্ছু ভাব্‌বেন না। আমাদের ভাব্‌লা শেষ রাত্তিরে উঠে ঐক্যতান বাদনের সঙ্গে এমন চণ্ডী-পাঠ করবে যে, পূজোর সব কিছু ত্রুটি মা দুর্গা ক্ষমা করে নেবেন।

পুরুত ঠাকুর ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বল্লেন—আচ্ছা বাবা তাই হবে। তবে আমার প্রণামী আর পাওনা ধুতি সাড়ী-গুলো যেন বাদ না পড়ে!

ওদিকে গোটা পাড়ার মধ্যে বিপুল বিক্রমে চাঁদা আদায় সুরু হয়ে গেছে।

যারা সময়মত চাঁদা দিতে ইতস্তত করছে, কিম্বা চাঁদার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে তাদের বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে ঢিল পড়ছে—জানালার কাচ ভাঙ্‌ছে—আর আড়ালে-আব্‌ডালে অনেক বিশেষণ-কণ্টকিত সম্ভাষণ শুন্‌তে হচ্ছে।

শুধু এতেই চাঁদা-আদায়কারীরা সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারছে না। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, বাজারে যাবার পথে—ছেলের দল টহল দিয়ে ফিরছে। সঙ্গে রয়েছে তাদের রসিদ বই। যাদের কাছ থেকে চাঁদা এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি, তাদের বাজারের সওদা ভর্ত্তি থলি সহসা উধাও হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চাঁদা পাওয়া না যাচ্ছে—ততক্ষণ সেই হারানো থলির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এইভাবে নেহাৎ কম টাকা আদায় হচ্ছে না! পাড়ার প্রত্যেক দোকান থেকে চাঁদা আদায় চল্‌ছে। যে সব দোকানের মালিক চাঁদা না দিয়ে আদায়কারীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে—তারা পরের দিন সকালবেলা এসে দেখছে—জানালার কাচ ভাঙা—কিম্বা দোকানের সাইনবোর্ড উধাও, অথবা ভেতরের অনেক জিনিস আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

পাড়ায় বাস করতে গেলে প্রাণটাকে আগে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তাই শেষ পর্য্যন্ত সবাই চাঁদা দিয়ে পৈতৃক প্রাণটাকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করছে!

পাড়ার মেয়ে আর বৌদের মধ্যে আর এক প্রতি-যোগিতা সুরু হয়ে গেছে। কে কি রকম সাড়ী পরে পূজো প্যাণ্ডেলে গিয়ে হাজির হবে—তারই একটা নেক্-ট্‌-নেক্ রেস চল্‌ছে।

সেদিন দুপুর রাত্তিরে একটা ফ্ল্যাটে নাকীসুরে কান্না শুনে পাড়ার সবাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেই ফ্ল্যাটটিতে একটি নববিবাহিত দম্পতি থাকে। সেখানকার দাম্পত্য-কলহের কারণও সাড়ী। তরুণী-স্ত্রী বলেছে—মানে-না-মানা সাড়ী না পেলে সে পূজো প্যাণ্ডেলে আদৌ যাবে না! স্বামীটি আবার ঔদরিক। সে স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, দুর্ম্মূল্যের বাজারে সাড়ীর পেছনে অকারণ অর্থব্যয় না করে এসো, রোজ নতুন নতুন খাবার

খাওয়া যাক্। তাতে পেটও ভরবে, পয়সাও উশুল হবে। কিন্তু তরুণী স্ত্রী এই প্রস্তাবে আদৌ সম্মতি জানায় নি!

ফলে দুপুর রাত্তিরে একেবারে দাম্পত্য প্রেম থেকে দরাজ গলায় দাঙ্গাবাজি! আর একটু হলেই পুলিশ অথবা দমকলকে ডাকতে হয়েছিল আর কি!

কর্পোরেশনকে স্তোকবাক্যে শান্ত করে, পুলিশের পিঠ চাপড়ে, পাড়ার লোকের পকেট খালি করে শেষ পর্য্যন্ত বিরাট পূজা-প্যাণ্ডেল গড়ে উঠল। পাড়ার উঠ্‌তি গুণ্ডার দল সেখানে দিন-রাত ঘুরঘুর্ করতে লাগলো—কি ভাবে পূজোর মরশুমে পয়সা-কড়ি আর গয়নাগাটি স্রেফ্ হাত-সাফাই করা যায়—তারই সলা-পরামর্শ চল্‌ছে তাদের সব সময়।

অবশেষে পূজোর শুভ মুহূর্ত্ত এসে সমুপস্থিত হল।

সকাল থেকে সে কী দারুণ বৃষ্টি!

ভোর রাত্তিরে ভাব্‌লার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না! কাজেকাজেই চণ্ডীপাঠ একেবারে মাঠে মারা গেল।

কাক-ভেজা হয়ে ঠাকুরমশাই এসে হাজির। কিন্তু তখন কর্ম্মীর দল সারারাত প্যাণ্ডেল সাজিয়ে ভোরবেলা আরামের ঘুম লাগিয়েছে। হাজার ডাকাডাকি করেও তাদের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

যে সব মহিলা পূজোর ফুল আর নৈবেদ্য সাজানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা বলে পাঠালেন,—চাকর পালিয়েছে বলে কারো চা-সেবন হয়নি, তাই তারা দেবার্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না।

ডেকরেটর কি কৌশলে প্যাণ্ডেল তৈরী করেছিল—কারো জানা ছিল না! কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল—গোটা প্যাণ্ডেলে ঝুপ্ ঝুপ করে জল পড়ছে!

দারুণ ঝড় বৃষ্টিতে প্রদর্শনীর জিনিসপত্রগুলি তচ্‌নচ্ হয়ে যে কোথায় উড়ে গেল—তার কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

রাত চারটের সময় মাইকে সানাই বাজিয়ে পাড়ার সবাইকার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়া হবে কথা ছিল। কিন্তু এই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাইকওয়ালার আর দেখা পাওয়া গেল না!

যাদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়েছিল—তারা এইবার মওকা পেয়ে সার্ব্বজনীন পূজোর সম্পাদকের বাড়ী ঘেরাও করলে। তাদের সবাইকার দাবী—আমাদের চাঁদা ফেরৎ দাও—। নইলে তোমার বাড়ী আমরা পুড়িয়ে দেবো—

ঘনশ্যাম

ঘনশ্যাম চোখে সরষের ফুল দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

কেউ তাকে এক পয়সা ছাড়বে না। প্যাণ্ডেলওয়ালা থেকে সুরু করে পুরুত পর্য্যন্ত সবাই হাঁ করে যেন তাকে গিলে খেতে আস্‌ছে!

সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে, ওরে, তোরা একটা কাজ কর। লরী ত' ভাড়া করাই আছে। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় তোরা আমায় চ্যাংদোলা করে ওই একই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়ে দে। আমি তা হলে ঋণের হাত থেকে উদ্ধার পাই—!

❋ অতীতের স্মৃতি ❋

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

৭

সেকালের অভিজাত-সৌখিন দেশী-বিলাতী সমাজের বিত্তশালী-বিলাসীদের নিত্য-নৈমিত্তিক খানা-পিনা, নাচ-গানের জমজমাট-আসর আর ইংরেজ লাট-প্রাসাদের আড়ম্বর-পূর্ণ দরবার-অনুষ্ঠানের মতোই, বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা শহরে হামেশা লেগে থাকতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের নানা রকম পাল-পার্ব্বণ-পূজোর ধূমধাম এবং বিচিত্র আনন্দোৎসবের ঘটা! দোল-দুর্গোৎসব, রাসলীলা, গাজনের মিছিল, রথের মেলা, চড়ক, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী-পূজো, ঈদ, মহরম, বড়দিনের উৎসব ছাড়াও, সেকালের হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক-জনই প্রবল উদ্দীপনা আর অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে বছরের অধিকাংশ সময়ে ছোট-বড় আরো বিবিধ প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান আর লৌকিক-উৎসবের হিড়িকে মেতে থাকতেন। আজ এ পার্ব্বণ, কাল সে উৎসব, পরশু অন্য কোনো মোচ্ছব···এমনি একটা-না-একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান বা লৌকিক-উৎসবের হুজুক নিত্যই লেগে থাকতো তখন ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা আর শহরতলীর আশ-পাশের অঞ্চলে। সেকালের ছোট-বড় এই সব অভিনব আনন্দোৎসবে যোগ দিতে দূর-দুরান্ত থেকে ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকজন সমাগমও বড় মন্দ হতো না। কারণ, সেকালের লোকজনের মনে ধর্ম্মানুরাগ আর সামাজিকতা-প্রীতি ছিল অপরিসীম। তাছাড়া, ইংরেজ-কোম্পানীর হাতে-গড়া এই নতুন শহরে নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য আর কাজকর্ম্মের সুযোগ-সুবিধার ফলে, তখনকার আমলের লোকজনের হাতে অনায়াসেই পয়সাও মিলতো যেমন প্রচুর, তেমনি অবাধ-স্ফূর্ত্তিতে অবসর-বিনোদনের বিবিধ উপায়ের চিন্তায় সদা-সর্ব্বদা ভরে থাকতো তাদের মন। তাই সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের লোকজন এত সহজে, এমন অকাতরে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারতো তখনকার আমলের সৌখিন বিলাস-লীলা আর এই সব বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান ও লৌকিক-উৎসবের আনন্দ-মেলার আসরে। বিগত-দিনের এই সব অভিনব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বহু পরিচয় মেলে প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পাতায়···একালের কৌতুহলী-পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য তার কিছু বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। প্রাচীন সংবাদ-পত্রের এই সব বিবরণ থেকে সেকালের বিচিত্র জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট চিত্র চোখে পড়বে!

* * *

রথের মেলা

(সমাচারদর্পণ, ১১ই জুলাই, ১৮১৮)

রথ।—২২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু

এ বৎসরে রথ চলন স্থানে নূতন রাস্থা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন২ বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যা হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পশারী কলিকাতা হইতে এবং অন্য২ স্থান হইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবার বিকালে জগন্নাথদেবকে রথ হইতে নামাইল ও রাধাবল্লব ঠাকুরের বাটী শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [রথ] খোলাতে লোকযাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।

* * *

শহর কলিকাতার উপকণ্ঠে মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ রথের মেলার মতো তেমন বিরাট ধূমধাম-আড়ম্বর না হলেও সেকালে সুদূর-পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন পুণ্য-তিথিতে পরমোৎসাহে আরো নানা দেব-বিগ্রহের রথযাত্রার উৎসব প্রতিপালিত হতো। পল্লী-অঞ্চলের এ সব উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সে-যুগে দূর-দূরান্ত প্রদেশ থেকে লোক-সমাগমও হতো সবিশেষ···প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তারও প্রচুর নজীর মেলে।

* * *

রথযাত্রা

(সমাচার দর্পণ, ২৫শে নভেম্বর, ১৮২০)

···জিলা জঙ্গলমহলের শহর বাঁকুড়াহইতে পূর্ব্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পসারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে।···

* * *

শুধু রথের সময়েই নয়, রাসযাত্রা আর বারুণী-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যেও সেকালে রীতিমত ধূমধাম-আড়ম্বর হতো—শহর কলিকাতা আর আশপাশের পল্লী-অঞ্চলে। সে সব উৎসবেরও বহু পরিচয় মেলে তখনকার আমলের সংবাদ-পত্রের পাতায়। হিন্দুদের এই উৎসবানুষ্ঠানে সোৎসাহে যোগ দিতেন সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের সর্ব্বশ্রেণীরই লোকজন।

* * *

রাসের উৎসব

(সমাচার দর্পণ, ১৩ই নভেম্বর, ১৮৩০)

রাসযাত্রা।—এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয় ভবনে প্রতিবৎসর অবিচ্ছেদে ঐ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং···তত্রস্থ তাবদ্বিষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতুক পূর্ব্বদিক্‌স্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে—অতএব সেইস্থানে অনেক২ বিবি ও সাহেবলোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্থান হইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে ঐ বাবু তাঁহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্ভিন্ন নীচের তলা হইতে বহুবাদ্যকরকৃত অতিসুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাঁহার বাটী কলিকাতা ও বারাকপুর হইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত

সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষাও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজকৃষ্ণ রায়-চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।···

*　　*　　*

বারুণী

(সমাচার দর্পণ, ৭ই এপ্রিল, ১৮২১)

মহামহাবারুণী।—গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দয় ঐ বৈদ্যবাটীতে যে২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দধিপ্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল। তাহার মধ্যেও অনেক মরিল ক্বচিৎ কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্যা প্রদেশীয় অন্য২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ,···১৮২২ ?)

মহামহাবারুণী।—মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর যেপ্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিগের লোক দশ দিবসের পথহইতে আসিয়াছিল। ও চাকদহ ও ত্রিবেণী ও বৈদ্যবাটীতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈদ্যবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

*　　*　　*

একালে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে, মকর-সংক্রান্ত দিবস উপলক্ষ্যে সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা-সাগরের মেলায় দেশ-দেশান্তর থেকে আগত ধর্ম্মপ্রাণ-যাত্রীদের যেমন বিপুল ভিড় জমে, সেকালেও ঠিক এমনি উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যেতো জন-সাধারণের মধ্যে। বেশীর ভাগ যাত্রীই তখন সাগর-তীর্থে যেতেন পুণ্য-স্নানের অভিলাষে, বহু লোক যেতেন সাধু-সন্ন্যাসী সন্দর্শনে আর দেব-পূজার মানসে। তাছাড়া তাঁদেরই মতো সেখানে আরো যেতেন, সেকালের বহু ধর্ম্মান্ধ-পুরনারী···সাগর-সঙ্গমের তীর্থ-সলিলে তাঁদের নবজাত-শিশুসন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়ে—পারলৌকিক পুণ্য-সঞ্চয়ের আশায়! তবে সুখের বিষয়—সেকালের এই নির্ম্মম-প্রথা আজ চিরতরে লোপ পেয়েছে ইংরেজ কোম্পানীর তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদের কড়া-আইনের বিধানে—ইতিহাসের সে কাহিনী, আশা করি, আজ আর কাকেও নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই!

*　　*　　*

গঙ্গাসাগরের মেলা

(সমাচার দর্পণ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা ও মাড় সাগর উপদ্বীপের

এক টেঁকে একত্র হইতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত্ত বৈরাগি ও সন্ন্যাসিরদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপূজা করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ মন্দিরগ্রথিত হইলে জয়পুররাজ্যস্থ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্য্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন। এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তুকি ও নির্মহী ও নির্ব্বানী ও মহানির্ব্বানী এবং নিরালম্বীতে এক২ শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারম্ভ হইয়া ১৬ জানুআরি পর্য্যন্ত ছিল। ঐ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়া ও ক্ষুদ্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৬০ হাজারের ন্যূন নহে এমত অনুমান হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতিদূর দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাই হইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যূন নহে এবং এই তীর্থযাত্রাতে ব্রহ্মদেশ হইতেও অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্র২ দোকানদারেরা যে ভূরি২ বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো অধিক হইবে।

ঐ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রিলোকেরা স্নানপূজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত অতিকষ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুষ্পাপ্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া এইক্ষণে আমরা স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু ঐ মাসের ১৬ তারিখে ঐ দেবালয়ে প্রাণিমাত্র রহিল না তাঁহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল।—হরকরা।

* * *

গঙ্গাসাগরের মেলার মতোই, সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতো সেকালের ছোট-বড় আরো নানান্ লৌকিক পূজাপার্ব্বণের উৎসব···প্রাচীন সংবাদ-পত্রে সে সবেরও অনেক হদিশ পাওয়া যায়! আপাততঃ, সেকালের বিচিত্র-অভিনব বিশেষ জনপ্রিয় একটি লৌকিক-উৎসবানুষ্ঠানের সংবাদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল মেটানোর উদ্দেশ্যে!

* * * *

ব্রহ্মাণী-পূজা

(সমাচার দর্পণ, ১৪ই আগষ্ট, ১৮১৯)

ব্রহ্মাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জাননগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয়। ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয়, বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রে২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামী রবিবারে হইবেক।

* * * *

কিন্তু এ সবই হলো সেকালের দেশী-সমাজের লোকজনদের উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা। তখনকার আমলে ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজন কিভাবে ধর্ম্মাচারণ ও খৃষ্টীয় উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করতেন—পুরানো স্মৃতি-কাহিনী আর সেকালের সংবাদ-পত্র থেকে কয়েকটি বিশেষ খবর উদ্ধৃত করে এবারে বরং তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক! বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে কোম্পানীর আমলে, বিলাতের যে সব অধি-

বাসীরা এদেশে এসে বসবাস করতেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন রীতিমত বেপরোয়া, অনাচারী আর উচ্ছৃঙ্খল ধরণের মানুষ···সৌখিন বিলাস-আড়ম্বর, যথেচ্ছাচার, বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ-আহরণ, খানা-পিনা, নাচ-গান, নবাবী-আনা আর অবাধ হৈ-হুল্লোড়-স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটানো—এই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য! তাছাড়া সেযুগে দুরন্ত সাগর-পাড়ি দিয়ে সুদূর ইউরোপ থেকে ভারতে যাতায়াতের রীতিমত অসুবিধা ছিল বলেই, ওদেশের মেয়েরা সচরাচর তখন এদেশে বড় বেশী আসতে পারতেন না। তাই ভারতের আদিম বিলাতী-সমাজে ইউরোপীয় নারী সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প···তার ফলে, এদেশের ইউরোপীয়েরা তখন অধিকাংশই সাময়িকভাবে স্ত্রী বা সঙ্গিনী হিসাবে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বেছে নিতেন ভদ্র-ইতর, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এদেশী মেয়েদের এবং প্রবাসী-জীবনের বেশীর ভাগ দিনগুলিই কাটিয়ে দিতেন এঁদেরই সংস্পর্শে থেকে! আধ্যাত্মিক-উন্নতির চেয়ে জৈবিক-বৃত্তির পরিতৃপ্তি-সাধনই ছিল সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-পুরুষদের পরম কাম্য বিষয়···ধর্ম্মাচরণ বা কৌলীন্য-রক্ষার চিন্তা নিয়ে তাঁরা তখন আদৌ মাথা ঘামাতেন না···বরং বেপরোয়া-যথেচ্ছাচারী-উচ্ছৃঙ্খল হওয়াটাই ছিল সে-যুগের সব চেয়ে বড় পৌরুষের লক্ষণ আর গৌরবের কীর্ত্তি! কাজেই ভারতের বন্দরে বিলাতের কোনো জাহাজ এসে ভিড়লেই, সেকালের বিলাতী-সমাজের ছোট-বড় সব সাহেবই একান্ত দুর্লভ স্ত্রী-রত্ন সংগ্রহের আশায় সোৎসাহে ছুটে যেতেন অল্প যে কয়েকটি মেম-সাহেব এদেশের মাটিতে সবে পদার্পণ করেছেন তাঁদেরই আশেপাশে! জাহাজ-ঘাট ছাড়াও, বল-নাচের আসরে, খানা-পিনার মজলিশে, লাট-প্রাসাদের দরবারে, এমন কি গীর্জ্জার উপাসনা-সম্মেলনেও নিজেদের খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাচরণ ভুলে তারা বিবি-বিজয়াভিযানে সদা-তৎপর হয়ে সদলে এসে ভিড় জমাতেন। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো যে, কোম্পানীর উপরওয়ালা-কর্ত্তারা আর ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা সেকালের সংবাদ-পত্রে কড়া-রকমের নিষেধজারি করতে বাধ্য হলেন—বিলাতী-সমাজের মর্ম্মান্তিক উচ্ছৃঙ্খলতার উচ্ছেদ-সাধনের উদ্দেশ্যে! কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে ব্যাণ্ডেলের সুপ্রাচীন পোর্ত্তুগীজ গীর্জ্জাই কাল-ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনকার আমলের বিলাতী-সমাজের বিবি-সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র! তবে সংবাদ-পত্রে পরোয়ানাজারি ও কড়া-তদারকের ফলে, ধর্ম্মস্থানে এ অনাচার অচিরেই রহিত হয়েছিল কিছুদিন পরেই! এই সম্পর্কে, সেকালের সংবাদ-পত্রে যে, 'নিষেধাজ্ঞা' প্রচারিত হয়েছিল, তার নমুনা নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * * *

বিবি-বাছাই

(ক্যাল্‌কাটা গেজেট, ১৫ই নভেম্বর, ১৮০৪)

Caution

Bandel, 10th November, 1804

Every person present at Bandel Church while divine service is performing from the 15th to the 24th current, are requested to behave with every due respect as in their own Churches; on the contrary, they shall be compelled to quit the temple immediately, without attending the quality of person.

* * *

তবে এ অনাচার রহিত হলেও, সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের মনে ধর্ম্মের প্রতি তেমন বিশেষ আন্তরিক-অনুরাগ জাগানো গেল না—দেশের নানা জায়গায় ছোট-বড় নানান্ ধরণের গীর্জ্জা-উপাসনালয় বানিয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচারানুষ্ঠানের রীতিমত সুব্যবস্থা করে দেওয়া সত্বেও অবশ্য সেকালের বিলাতী-সমাজের লোকজন সবাই যে পুরোমাত্রায় নাস্তিক ছিলেন, তা নয়,···তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সাহেব-বিবিই তখন ইউরোপীয়-প্রথানুসারে নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবারে এবং খৃষ্টীয় পাল-পার্ব্বণ আর ভজন-উৎসবের দিন সপরিবারে হাজির হতেন এ সব গীর্জ্জা-উপাসনালয়ে···এমন কি

এদেশে নিত্য-নতুন আরো নানা ভজনালয় গড়ে-তোলার উদ্দেশ্যে প্রচুর টাকা চাঁদাও দিতেন তাঁরা দু'হাতে… তাছাড়া বিভিন্ন পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে উপবাস-মানত-পূজার্চ্চনা…এ সবও লেগে থাকতো নিত্য সেকালের বিলাতী-সমাজের ছোট বড় প্রত্যেক সংসারেই। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, সেকালের বিশিষ্ট ইউরোপীয়-অভিজনদের বিবিধ স্মৃতি-কাহিনী থেকে তখনকার দিনের ভজনালয়ে এদেশী বিলাতী-সমাজের লোকজনের ধর্ম্মাচরণের যে পরিচয় মেলে, সেটা নিতান্তই নৈরাশ্যময় বলেই অনুমিত হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত এমনি একটি স্মৃতি-কাহিনী থেকে সামান্য যে অংশটুকু নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো, তাই থেকে সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের ধর্ম্মাচরণের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে।

* * * *

গীর্জ্জা-ঘরের উপাসনা-সভা

(নাইটন্ (Knighton) সাহেবের স্মৃতি-কাহিনী, ১৮৫৫)

…It was a truly lamentable, and, at the same time, a strange sight, The vast majority of those for whom the sermon was intended, and who could have understood all of it that was at all intelligible, were fast asleep; whilst those who knew nothing of the language, and who could not therefore profit by it in the least, were actively and wakefully employed in adding to the comfort of the sleepers (by pulling the punkahs)…Altogether a more truly melancholy spectacle than this outrageous barlesque of devotion, it would not have been easy to parallel elsewhere. To judge by the fashionable Calcutta church, religion was a mere Ceremonial mockery—an ingenious contrivance for passing away one day in the week in strange contrast with the others…Drowsy discourses, ill-prepared, or not prepared at all, and drowsy congregations who listened to little of them, the rule—neither an energetic preacher, nor a wakeful audience, was to be found in the fashionable Church in the City of Palaces at that time.

* * *

সেকালের দেশী-সমাজের লোকজনের মধ্যে কিন্তু দেখা যেতো—ধর্ম্মোন্মাদনার অফুরন্ত উৎসাহ! সাড়ম্বরে পূজা-পার্ব্বণের ধুমধাম দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, সাধু-সন্ন্যাসী ভজন, দান-ধ্যান, নামকীর্ত্তন, ব্রত-পালন, দীন-দুঃখী-আতুর আর ব্রাহ্মণ সেবা প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানের ঘটা নিত্যই হতো তখন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলেরই ঘরে-ঘরে। সেকালের বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিরা প্রায়ই নানা রকম ধর্ম্মানুষ্ঠানকার্য্যে অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তখনকার আমলের প্রাচীন সংবাদ-পত্রে এ সব কীর্ত্তি-কলাপেরও বহু নজীর খুঁজে পাওয়া যায়।

* * * *

কালীঘাটের মন্দির
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

পূজা

(সমাচার দর্পণ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২২)

পূজা।—গত ৫ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহনবাবু মোং কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর অতি চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা দুই থান ও জড়াও বাজু দুইখান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বর্ণ মুণ্ড ও এক রুপ্য খড়্গ ও নানাবিধ জরি ও পট্টবস্ত্রাদি ও নৈবেদ্যাদি পুজোপকরণেতে নাটমন্দির পূর্ণ তদুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবৎ কাঙ্গালিদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহা এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তাদি সমভিব্যাহারে যেরূপ শোভা হইয়াছে সে অত্যাশ্চর্য্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন।

* * *

তবে সেকালে এদেশের ধর্ম্মপ্রাণ বিত্তশালী-ব্যক্তিরা পরম-আগ্রহে একদিকে যেমন প্রচুর অর্থব্যয়ে ছোট-বড় নানা রকম দেব-দেউল বানিয়ে দেব-বিগ্রহকে বহুমূল্য রত্নাভরণ ও সাজসজ্জায় সুসমৃদ্ধ করে তুলতেন, তেমনি অন্যদিকে তখনকার সমাজ-বিরোধী হীন-মতি চোরের দল সুকৌশলে নিশুতি-রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে এসে দেবালয়ে হানা দিয়ে দেবতার সম্পত্তি অপহরণ করে নিয়ে যেতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতো না! পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাতায় সেকালের এই সব চৌর্য্য-কাহিনীর বহু রোমাঞ্চকর নিদর্শন মেলে···তারই কয়েকটি বিচিত্র বিবরণ নীচে সঙ্কলন করে দেওয়া হলো।

* * *

চুরির হিড়িক

(সমাচার দর্পণ, ১১ই ডিসেম্বর, ১৮১৯)

চুরি।—মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধ প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব-কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ-রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট অনেক লোক মানিত-পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তথনি কএদ করিল। ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে একব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে, ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে, কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২০)

চুরি।—মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য২ ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক হইতেছে।

* * *

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

(যাত্রী মানুষ)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদের ঋষির উপলব্ধিতে এসেছিল চারিটি মহৎ অনুভূতি। অনিত্যের মধ্যেই আছেন একমাত্র নিত্য, সব-চেতনার মাঝেই সেই এক চেতনা, সেই হলো আমি, এবং আমিই ব্রহ্ম। বিরাটের বীজের মধ্যে যে একাত্মতা, এই চেতনাই স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে, দ্রষ্টা ও দৃষ্টিকে, অভিনেতা ও অভিনয়কে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে এক করে দিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—

He is the Maker and the world he made
He is the Vision, He is the seer
He is himself the actor and the act
He is himself the knower and the known
He is himself the dreamer and the dream.

পৃথিবীর দেহের অভ্যন্তরেই এই স্বপ্ন সমাধিস্থ—জড়ের মধ্যেই নিমজ্জিত এই শক্তি—ক্রুশবদ্ধ খ্রীষ্ট এরই প্রতীক্। প্রতি মুহূর্তে তিনি মথিত হচ্ছেন, আত্মাহুতি দিচ্ছেন। সেই মন্থনে অমৃত উঠছে মূর্ত হয়েছে। বারে বারে প্রমিথিউসরা এসেছে—আগুন জ্বেলেছে, স্বপ্ন দেখেছে, পৃথিবী হবে স্বর্গ—বীজ বপন হবে, ভৃগু মারবে লাথি, কবি গাইবে গান—খোল রে শৃঙ্খল খোল—

আমি বিদ্রোহী, আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার

এ সবই আত্ম উন্মোচনের খেলা। এও খোঁজা, কিন্তু ফিরে আসতে হয় এক স্থানে, অন্তরের অনুভবের কাছে। আমি যাকে আমিত্বে ফেললুম, ভক্ত তাকে আত্মসমর্পণে তুমি করে নিলেন—হৃদি প্রতীক্ষা—হৃদয়ের প্রত্যক্ষ বোধে।

কেউ দেখলেন—

কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারি প্রলোভন তরে সাজায়েছি যৌবন পশরা
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে কামাতুরা রামার সমান
হে বৈদেহী করো মোরে সেখানে আহ্বান

(সুধীন দত্ত)

কেউ গাইলেন—

প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতহি গাওত গীত
ঝলকত ও মুখচন্দ

(গোবিন্দদাস)

যখন আমি চাইছি, আমি কাঁদছি, আমি কামনা করছি তখন মহাপ্রকৃতিই আমার অচেতন দেহকোষের (Inconscient cells) মাধ্যমে তাঁর খেলা খেলিয়ে নিচ্ছেন। একদিকে আছে (A spirit vast as the containing sky) সর্বব্যাপী আকাশের মত সব ছেয়ে এক মহাস্ত চৈত্য পুরুষ—আর একদিকে আছে আনন্দ পরমানন্দ—উপনিষদের সেই কথা, ঋষি কবির সেই গান—আকাশে আনন্দ যদি না থাকতো। এর ফলে কি হলো—

A god came down and greater by the fall.

দেবতা নেমে এলেন এবং তাঁর পতনে বা অবতরণে মহত্তর হয়ে উঠলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনী গুপ্তের উদ্ধৃত ইয়েটসের বিখ্যাত কবিতা "Four Ages of Man"এর উল্লেখ করা যায়। মানুষের প্রথম লড়াই তার দেহের সঙ্গে—জাতি হিসাবেই হোক আর ব্যক্তি হিসাবেই হোক্। শিশু চেষ্টা করছে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে। বানর চেষ্টা করছে ন্যুব্জ দেহকে সোজা করতে। স্থূলে এই প্রতিষ্ঠা লাভ

হলো প্রথম বিজয়। দ্বিতীয় লড়াই লাগলো যৌবনে—তখন কাম এসেছে, কামনা এসেছে, ক্ষমতার লোভ, জিঘাংসা, জীগিষা, রিরংসা—মানুষ চাইছে ভোগ করতে, প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি রেণুতে, শরীরের ধর্ম তাই, মনের প্রবৃত্তি তাই, শৈশবের সারল্য সে হারিয়েছে। তৃতীয় স্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তার মনের অস্ত্র দিয়ে—সে উঠলো জিজ্ঞাসু হয়ে, তার্কিক হয়ে, সংশয় নিয়ে, সন্দেহ নিয়ে—সে হলো এগনষ্টিক, সে হলো স্কেপটিক্, তার ভোগের উপকরণের মধ্যেও এসে গেছে গতানুগতিকতা, প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে সেই উপাদানগুলির তীব্রতা কমে এসেছে, প্রথম প্রণয় পরশমুগ্ধতা নেই, আছে শুধু লুব্ধতা। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে আত্মচেতনায়—কোথায় আলো, কোথায় আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো। মহানিশাময়ী তামসী ঢেকে নেয় চেতনাকে, কিন্তু Coming of dawn is inevitable জীবনকে ভোগ করা যায় না। শুধু একই দুইই হন না, দুইও এক হন্—

> There are two who are one
> and play in many worlds.

লীলা লীলাময়ে ভেদ নেই—তিনিই তিনি—কালো আর আলো একই—এই বিশ্ব হচ্ছে এক অনন্ত ছদ্মবেশীর রূপ

A part is seen, we take it for the whole.

একটুখানি দেখেই মনে হলো বুঝি সব দেখেছি, সব জেনেছি, সব পেয়েছি। কিন্তু এই ছদ্মবেশীর যে অনন্তরূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত যোগ বিয়োগ, এই বিশ্বরূপের খেলাঘরে যে লীলা চলছে তা দেখে দেখে 'নয়ন না তিরপিত ভেল।' একদিকে আকাশের তড়িৎ রেখায় দেখি জলদগ্নি নিদারুণ, আবার তিনিই তিমির হৃদবিদারণ। চকিতে দেখা যায় সেই স্ফুরিত আননের ললিত লাস্যে আলোর বিলাস—কিন্তু যতটুকু দেখলাম তার চেয়ে বেশী যে দেখতে পেলাম না। তাঁর দুইরূপ—তিনি এক আধারে প্রকৃতি, অন্য আধারে পুরুষ—তাই তো তিনি অর্ধনারীশ্বর। কিন্তু প্রকৃতি যেমন সক্রিয় ও সচল, তেমনি পুরুষকেও Dynamic হতে হবে—একটি আধার নিষ্ক্রিয়, আর একটি আধার সক্রিয়—এ হলে দিব্যের প্রতিটি বিভা, প্রত্যেকটি স্বরূপ প্রকাশিত হলো না। পুর অগ্রগমনে— অগ্নির মত তিনি অগ্রণী, আবার পুরি শেতে—হৃদয়পুরে শুয়ে আছেন প্রাণারাম—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি

তিনি একদিকে অক্ষর অর্থাৎ ক্ষরিত হন না—Immutable—আবার তিনি স্বভাবে আছেন অর্থাৎ স্বস্থ পুরুষোত্তমস্থ ভবনে যাচ্ছেন বা হচ্ছেন—Becoming. আবার তিনি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—তিনি ভূত (ছিলেন) ও ভাবরূপে উদ্ভূত হচ্ছেন—এবং তিনি বিসর্গ বা বিসর্জন করছেন। জীবনে বিসর্জন (কর্মসঙ্গত হয়ে) এই তো দিব্যের দান—নিজেকে সব দিকে উৎসর্গ করে দেওয়াই হলো নিজেকে প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত করা। এই তত্ত্ব উপনিষদের ঋষির চক্ষেও প্রতিভাত হয়েছিল। অন্নই ব্রহ্ম এই আমার কামনার প্রথমভূমি—একে সম্প্রসারণ করে দিলাম অনন্তের কামনাতে—এই মাটিকে 'মা' করে নিলাম—দ্যুলোক পিতা বটে কিন্তু ভূলোক মাতা—এই দুই মিললেই, স্বর্গের দেবতা হন মধু, মর্ত্যের ধূলি হয় মধু, ওঁ মধু। এক অন্নরসময় আত্মার অন্তরে আছেন এক মনোময় আত্মা, তারও অন্তরে আছেন এক বিজ্ঞানময় আত্মা, তারও অন্তরে আছেন এক আনন্দময় আত্মা। মহাপরিনির্বাণের কয়েক মাস পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—For me, all is Brahman and I find Divine everywhere. It will be quite possible to insist only on the realisation of the Supreme Being or Iswara even in one aspect and proceed from there to integral results.

এই দুই নিয়েই হলো তথ্য ও তত্ত্ব, শিব ও শিবানী, প্রকৃতি আর পুরুষ, রাধা আর কৃষ্ণ—

The two who are one are the might and right in thin go

His breast he offers for her cosmic dance

বুক পেতে দিলেন মহাদেবতা—নাচো, শ্যামা মা, নাচো—

Happy, inert he lies beneath her feet

শুয়ে রইলেন তিনি নিস্পন্দ, নিশ্চেতন হয়ে—

A witness and student of her joy and dole

মহাপ্রকৃতির আনন্দের তিনি সাক্ষী, সেই অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারী হয়ে—ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, মহাপ্রকৃতির

কাছে ভিক্ষা নেওয়া সহজ নয়—মহাপ্রভু তাই অন্য ভিক্ষা চাননি—ধন নয়, মান নয়, চেয়েছিলেন দৃষ্টি ভিক্ষা—

নবৈ যাচে রাজ্যং ন কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽ রম্যাং সকল জন কাম্যাম বরবধূম
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

শুম্ভ নিশুম্ভ মহামায়াকে প্রার্থনা করেছিলেন রমণীরূপে। দেবী বলেছিলেন—আমায় জয় করে ভোগ কর। প্রকৃতিকে জয় করার অর্থই হচ্চে ভোগ করা। মহাপ্রকৃতির এই যে লীলা এর মধ্যে—

There is a plan in the Mother's deep
world-whim
A purpose in her vast random game

এই লীলাটা হলো শাশ্বত—লাটাইএর সুতো ছাড়া ও গুটিয়ে নেওয়া, সৃষ্টি আর স্রষ্টা যে এক্‌।

অশ্বপতির যোগজীবনে এই কথাগুলিই প্রমাণিত করলেন কবি শ্রীঅরবিন্দ। আমরা দেখেছি অশ্বপতি অর্থাৎ ঊর্ধ্বাশী মানবাত্মার প্রতীক এগিয়ে চলেছেন অনন্তের পথে, অমৃতের পথে—লোক থেকে লোকান্তরে। তিনি তাপস, তিনি সাধক, তিনি যোগবিভূতিসম্পন্ন। অনুভূতির জগতে প্রতিটি পদে পদে পর্দা উঠে যাচ্চে—প্রতিটি বাঁকে বাঁকে নব নব সৃষ্টির রূপায়ন।

সাধকের প্রথম হয় চেতনার মুক্তি অর্থাৎ অজ্ঞানকে ছাড়িয়ে অহংকে ছাপিয়ে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। তারপরে আসে চেতনার ব্যাপ্তি—যে আমি ছোট ছিল সে হলো বড়ো অর্থাৎ আমি আর তুমিতে ভেদ রইলনা। দেশকাল-বর্জিত একটি অখণ্ড সত্তার অনুভবে প্রথমদিকে একটা বৈরাগ্যের আবেগ থাকে—সবই বুঝি অলীক অনিত্য, কিন্তু শীঘ্রই আর একটি জ্যোতির্ময় চেতনার আবির্ভাব হয়—সেটি বিশ্বগত বিশ্বচেতনার সামগ্রিক উপলব্ধি—সর্বভূত সর্বগত শিবের চেতনা—ঈশাবাস্যের চেতনা সর্বমিদং-এর চেতনা—যেথা যেথা নেত্র পড়ে। কিন্তু তারও পরে আসে চেতনার সমত্ব—বিশ্বোত্তীর্ণ আর বিশ্বে কোন ভেদ নেই, যেমন উজিয়ে যাওয়া তেমনি ভাটিয়ে আসা।

যজুর্বেদে আছে—আমি উঠেছি ভূ থেকে ভুবে, তার পরে গেছি স্বর্গে, সেখান থেকে আমি যাব সবিতার জ্যোতির্ময় লোকে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—এই তো উর্ধগতি—জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন—মন থেকে মনের অতীত রাজ্যে। কবির দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই সত্যের একটা অপূর্ব দিক প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বললেন—জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্চে, তাকে বুঝতে পারছি সেই প্রাণস্য প্রাণং, প্রাণের অন্তরতম প্রাণ। এই গূঢ়মনুপ্রবিষ্ট নিগূঢ়কে নাম দেওয়া যায় না, শুধু বলা যায় এই তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয় নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব।

অশ্বপতি যখন এই স্তরে উঠেছেন তখন তিনি স্তব্ধ পাঠকের মত জীবন-পুস্তকটিকে পাঠ করে চলেছেন একাগ্র-চিত্তে, নতুন করে টীকা করছেন, ভাষ্য করছেন, তার ধারণাগুলি উজ্জ্বলন্ত উজ্জীবন্ত হয়ে উঠছে। তাঁর দৃষ্টি খুলেছে, সৃষ্টি হয়েছে জায়মান, প্রজ্ঞায়, প্রেমে, কর্মে, জ্ঞানে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কিন্তু এখনও তার সম্পূর্ণতা আসেনি।

কবি বলছেন এক একটি করে 'locked archines' খোলা হচ্চে—আর ঘুমন্ত রাজপুরীর এক একটি রাজকন্যার সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠছেন—

A Sleeping deity opened deathless eyes

ঘুমন্ত দেবতারা মৃত্যুহীন চোখ খুলচেন।—কঠোপনিষদের ভাষায় এই তো তিনি—যিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মাঝে। অশ্বপতির মন নেচে উঠলো—

A will, a hope immense now seiged his heart
He raised his eyes to unseen Spiritual heights
Aspiring to bring down a greater world

অশ্বপতির সাধনা এখন এক নতুন রূপ নিলে—শুধু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলে চলবেনা—দুর্গম গিরিশিখর হতে নামিয়ে আনতে হবে গঙ্গোত্রীর ধারাকে। মানুষের সাধনা শুধু উর্ধ্বে উঠে নয়, নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই অমৃতধারার কলস্বনাকে। তার সাধনার শেষ হবে না।
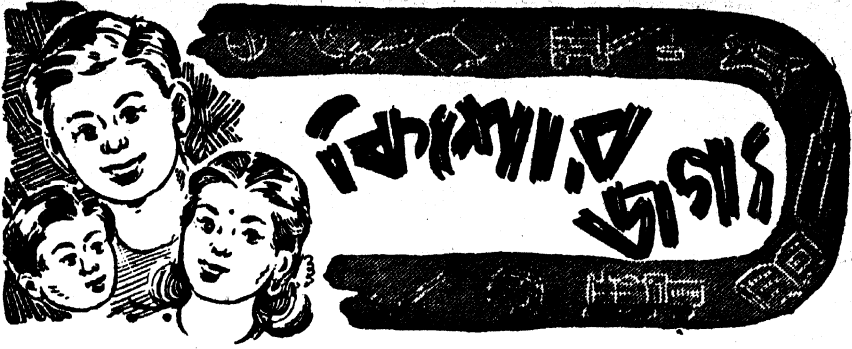
শারদোৎসবে

উপানন্দ

প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতার পটভূমিকায় শারদপ্রভাত। ...রজনী স্বচ্ছসুন্দর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। বর্ষার জলভরা মেঘ নেই আজ আকাশে। এসেছে শরৎ। শতদলশ্রী। কাশ-কুসুমের হিল্লোল। শেফালি সৌরভ। নুয়ে পড়ে কাশ-কুসুমেরা বাতাসের ছোঁয়া লেগে। সোনাঝরা রোদ। জল-হারা সাদা মেঘ করে আনা গোনা সুনীল আকাশে। মাঠে মাঠে হরিৎ ধানের শোভা। কানে আসে দোয়েল শ্যামার ডাক, বিলে কল্‌মিলতার বনে ডাহুকের নৃত্য। সাপ্‌লা ফুল দোল খেয়ে ওঠে জলে। বাঙ্‌লার বর্ষা পূর্বের মত আর নেই। নেই আর সেই নীপবনে আনন্দের উচ্ছ্বাস, পূর্বের মত নেই পারাবারহীন নদীর রূপ। অরণ্যহীন ভূমি। কাজেই অতীত দিনে বর্ষা বিদায়ের পর শরতের যে অপূর্ব শোভা দেখে অন্তর আনন্দে উন্মত্ত হোতো, আজ তা আশা করা যায় না। তবুও সর্ব্বত্র আশা ও আনন্দের সঞ্চরণ।

আনন্দময়ীর আগমনের বার্তা এনেছে শরৎ। বৈরাগীর একতারায় শোনা যায় আগমনী সুর—রামপ্রসাদ আর চণ্ডী-দাসের দেশে বারোমাসই গানের আসন পাতা। সারাপ্রকৃতি উৎকণ্ঠিত জননীর বন্দনার জন্য। বাঙালীর আর সেদিন নেই। আজ সে হারিয়েছে জীবন সম্পদ। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জ্জরিত বাঙ্‌লার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ঘর ছেড়ে এসে ঠাঁই করে নিয়েছে পথে। পথও তাদের দেয়নাকো স্থান সমবেদনায়। অন্ন-বস্ত্রের হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুধ আর মাছ যা বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয়, সে প্রয়োজন থেকেই গেল, আজ আর গৃহস্থের পাতে দুধ বা মাছ কিছুই পড়ে না। সায়েস্তা খাঁর যুগ নেই যে টাকায় আটমণ চাল পাওয়া যাবে, নেই আর সেই বস্ত্রশিল্প যার মাধ্যমে বাঙালীর ঘরে ঘরে বস্ত্রের অভাব থাকবে না, নেই আর সেই কৃষিপ্রধান মেজাজ—যাতে ঘরে ঘরে থাকবে গোলাভরা ধান। আলু মাছ সবই এখন ঠাণ্ডাঘরে আশ্রয় নিয়েছে, সুযোগসুবিধামত তাদের আবির্ভাব হয় হাটে বাজারে, চড়াদরে বিকোয় পালপার্ব্বণ-উৎসব অনুষ্ঠানে। সরকারের পণ্য নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে যে সদুদ্দেশ্য—তা ব্যর্থ হয় ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অতিলোভঘটিত অপকৌশলের দরুণ। কাজেই পূজার সময় পণ্য হয়ে উঠবে মহার্ঘ্য—সাধারণ গৃহস্থের নেই ক্রয় শক্তি, কেউ ঋণ করে বাজার করবে, ঋণ কর্‌বার শক্তি যার হারিয়েছে সে থাক্‌বে অর্দ্ধভুক্ত অভুক্ত হয়ে। সমাজের এক শ্রেণীর ব্যক্তির হয়েছে অর্থস্ফীতি, তারাই অর্জ্জন করছে ক্রয়শক্তি, তাদেরই তো পূজা। দরিদ্রের সন্তান মৌন ম্লান হয়ে যাবে প্রতিমা দর্শনে। ভিড়ের চাপে কত প্রাণেরই না হানি হবে। যান বাহনের বৃদ্ধিবিস্তারে কত ঘটনা ও দুর্ঘটনার সঙ্গে হবে আমাদের পরিচয়। দেবীর নৈবেদ্য আর ভোগ উপকরণ সাজানো হবে চোখের জলে। এত দুঃখ বেদনার ভেতরে তবু বাঙালী দেবে উৎসবে সাড়া, প্রাণভরে মায়ের

পূজার আয়োজনে রত হবে। কিন্তু মা পাষাণী, তাই বর্ষে বর্ষে বাঙালীর অন্তরের পূজা গ্রহণ করেও তার দুঃখ দূর করলেন না। দুঃখময় সংসারে সুখের হিল্লোল দেখা গেল না। ধর্ম্মকেন্দ্রী বাঙ্‌লা বিকেন্দ্রিত। তার অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে।

কবি দুঃখে বলেছেন—

'আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাহি কিছু নাই।'

মায়ের পূজার উদ্দেশ্য পশুত্ব বা দানবতার ধ্বংস করে মানুষের অন্তরে দেবত্ব স্থাপন। সে উদ্দেশ্য এখন ব্যর্থ হতে বসেছে। বরং মানুষ উত্তরোত্তর পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে, এর পরিণাম একদিন ভয়াবহ হয়ে উঠবে। যে জাতির প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে জাতীয়তা বোধ আছে, সামাজিকতা বোধ আছে, শিবজ্ঞানে সর্ব্বজীবে সেবার বাসনার প্রাবল্য আছে—আর আছে স্বার্থপরতার অভাব, সেই জাতি বড় হোতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী খুব বড় হয়ে উঠেছিল পরার্থপরবোধের জন্য, জাতীয়তাবোধ এসেছিল অস্থিতে মজ্জায়। তার রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে আত্মশক্তি অর্জ্জন করেছিল। তাই তার পক্ষে দেশজননীর মুক্তি আনয়ন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সে হারিয়ে ফেলেছে তার জাতীয় আদর্শ, তাই সকল প্রকার দুর্গ্রহের কাছে আজ লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞেয়, তাই সে আজ হৃতসর্ব্বস্বা। সমগ্র জাতিকে নিজের বৃহত্তম পরিবার এইরূপ বোধ যতদিন না আসবে; ততদিন দিকে দিকে শোনা যাবে ক্রন্দন ধ্বনি। একেবারে ক্ষয়িত হয়ে যাবে সমগ্র জাতির জীবনীশক্তি। অতীত বাংলার ষড়ৈশ্বর্যময়ী মূর্ত্তি আবার রূপায়িত হয়ে উঠবে, এ গভীর প্রত্যয় থেকে আমরা বঞ্চিত হোতে পারি—যদি দেশের ভেতর আজকের দিনের মত সমাজঘাতী নরপশুর উত্তরোত্তর আবির্ভাব হয়। আমাদের সম্মুখে আজ জীবন মরণের সমস্যা উগ্ররূপে দেখা দিয়েছে, বিষণ্ণতায় জীবনপ্রবাহ আবর্ত্তিত। প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত। বক্তৃতা-সর্ব্বস্ব দেশ। কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের অভাব। আশাবরীর পর্দায় বাজে পূরবীর সুর।

উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য নানা ভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা। এই পূজা বাঙালী হিন্দুসমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের ভিতর আত্মিক সংযোগ স্থাপন করে। এক মূর্ত্তিতে দেবী জগন্মাতা, মহাশক্তির আধার—আবার অন্য মূর্ত্তিতে দেশমাতৃকা। বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকেই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গারূপে দেখেছেন—বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। মাতৃপূজার মধ্যেই বাঙালীর ভাবজীবনের সকল বিশিষ্টতা প্রোজ্জ্বল। দিক্ দিগন্তে নব সমারোহের বাণী॥ পুরাণে-কথিত রক্তবীজবিনাশিনী চণ্ডিকাকে বাঙালী দুর্গা রূপে ধ্যানে গ্রহণ করেছে। নিয়েছে তাঁকে পরিবারের আপনজন করে। তিনি হিমালয়ের কন্যা, শিবের গৃহিণী। বৎসরে মাত্র তিন দিনের জন্যে তিনি পিতৃগৃহে আসেন, তারপর আবার চলে যান স্বামীর ঘরে কৈলাসে। এই তিন দিনের ভেতর রয়েছে আগমনীর সুর, বিজয়ার আনন্দ ও বেদনা।

অশ্বমেধযজ্ঞাদি বৈদিক যাগযজ্ঞের একটি অঙ্গ ছিল লৌকিক উৎসব। একে বর্জ্জন করে কোন যজ্ঞ সমারোহ প্রাচীনকালে হয়নি। সেই ধারা বহু যুগের যাত্রাপথের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের কাছে। আজকের দিনে যাগযজ্ঞের পরিবর্ত্তে পূজা অর্চ্চনা প্রাধান্য লাভ করেছে। পাল পার্ব্বণ ও পূজাকে কেন্দ্রীভূত করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনেক সময়ে উৎসবের বাতায়নপথ রুদ্ধ করে দেয়। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। সমাজের প্রতি মমত্ব ও একত্ব বোধ ভিন্ন উৎসব সার্থক হোতে পারে না। জনসাধারণের অর্থভাণ্ডার অনেক সময় কতকগুলি সুযোগবাদীর অপকৌশলে অযথা অপব্যয় হয়, ফলে অর্থ সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয়। এদিকেও আমাদের দৃষ্টি আবৃত রাখা চলে না। ব্যবস্থাপকের অন্তরে অপহরণের প্রবৃত্তি যে দেশে দেখা যায়, সে দেশে কোন অনুষ্ঠান সফল হয় না।

এসময়ে তোমাদের পূজার অবকাশ। তোমরা অন্ততঃ পূজার কয়দিন মনপ্রাণ দিয়ে দেবীর আরাধনায় মনঃসংযোগ করবে, যাতে মাতৃপ্রসাদে অমিত বীর্য্যের অধিকারী হয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির হৃতশক্তির পুনরুদ্ধার করতে পারো। তোমরাই জাতির আশাভরসা। যেখানে

অসত্যের লীলা চলেছে, সমাজঘাতী নীতি অনুসৃত হচ্ছে, আর স্বার্থসর্ব্বস্ব মানুষ অর্থ শোষণে ব্যাপৃত হয়ে কর্তৃত্বের নামে শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে, সেখানে তোমাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মহান্ আদর্শের বলিষ্ঠ আঘাত প্রয়োজন, প্রয়োজন তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া, তবেই শক্তিপূজায় দেবীর বরাভয় লাভ করে এই জাতি বিশ্ব সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পেতে পারবে। আশা করি তোমরা এদিকে বিশেষ লক্ষ্য নেবে, আর স্বজাতির উন্নয়নে সচেষ্ট হবে।

মশা

শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

অনেক—অনেক দিন আগে, এক সুখী দম্পতী বাস করতো। তাদের দুজনের মধ্যে গভীর ভালবাসা। এমন সুখ যে ভাগ্য দেবীর পর্যন্ত ঈর্ষা জাগলো, মৃত্যু এসে যুবতী স্ত্রীটিকে ছিনিয়ে নিল।

শোকে অধীর স্বামী মৃতা স্ত্রীর কবরের কথা পর্যন্ত ভাবতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুর কাজ সব ক্ষেত্রেই সমান—তার মৃত দেহ আস্তে আস্তে মাটিতে মিশিয়ে যেতে থাকলো, গ্রামের লোকদের অসহ্য এ দৃশ্য—তাই শেষে, স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চাইতে সে দূরে চলে যাওয়া শ্রেয়স্কর মনে করলো। ছন্নছাড়া, ভবঘুরে হয়ে লোকবসতি থেকে দূরে নদীতে সে বাস করতে থাকলো, শুধু খাবার জোগাড়ের জন্য তার নৌকাঘর ছেড়ে সে একবার গ্রামে আসতো।

শেষে—তার কঠোর সাধনায় জীন-দৈত্যের হৃদয় পর্যন্ত গলে গেল। গভীর শোক আর হতাশায় তাড়িত হয়ে নদীতে উদ্দেশ্যহীনভাবে সে একদিন ভেসে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় এক দৈত্য তার কাছে হাজির। সে বললে, সাহায্য করার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু, জেনো, এক জনের ভাগ্য বদলে দেওয়া সব সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। নিজের ভাগ্যকে স্বীকার করে নিতে জানা চাই। যা হোক, সত্যি চাও যদি, বৌকে তোমার বাঁচিয়ে তুলতে পারি…তবে ভরসা করি পরে এর জন্য আক্ষেপ করবে না।

লোকটি বললে, সেই তো তার প্রাণের আশা। আক্ষেপ সে করবে না।

তবে তাই হোক—বলে—দৈত্য লোকটির হাতের আঙুল দীর্ণ করে দিল, আর এক ফোঁটা রক্ত শবদেহের উপর ঝরে পড়লো। দেখতে দেখতে সে বেঁচে উঠলো—আগের মতই সুন্দর, তেমনি সজীব।

তারা নদীতেই বাস করবে ঠিক করলো দু'জন। কিন্তু একদিন খাবার আহরণ করে গ্রাম থেকে ফিরলো যখন লোকটি দেখে সুন্দরী স্ত্রী তার সেখানে নেই। নৌকাঘর খালি। স্ত্রী নাই! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো সে—কোন সাড়া নেই। তবু খুঁজতে তাকে বেশী দূর যেতে হল না। কাছেই অন্য এক নৌকায় অপর একজনের সঙ্গে বসবাসের জন্য বাড়ী ছেড়েছে সে। স্বামী তার বহু অনুরোধ করলো, কিন্তু কোনই ফল হল না। ফিরে আসতে সে নারাজ। তার ইচ্ছা মতই কাজ করতে সে কৃত সঙ্কল্প।

সে বলতে চাইলো, কতদূর অকৃতজ্ঞ সে। তার দ্বিতীয় জীবন কি তারই দেওয়া নয়!

যুবতী পাশের নৌকার ছই থেকে উত্তর দিল। বহুক্ষণ চললো তাদের বাক বিতণ্ডা। অবশেষে স্ত্রী জানালো তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকবে না আর। সে তার রক্ত বিন্দু ফেরত নিতে পারে।

মাথার থেকে একটা লম্বা কাটা টেনে নিয়ে পলকে সে তার আঙুল বিদ্ধ করে দিল। রক্তের মুক্তা-বিন্দু ছিটকে নদীর জলে ভেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো তার স্বামীর ফিরিয়ে আনা জীবন। তার শরীর আবার ধূলায় মিশে নদীর জলে ভাসতে লাগলো। ক্রমশ সেই ধূলা ছোট ছোট কীটে পরিণত হল, তাই থেকে জন্মাল—মশা।

দৈত্যের কথা মনে পড়লো লোকটির। অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর জন্য কাঁদলো না সে। আবার সে বিয়ে করলো। তারই সন্তান-সন্ততি আমরা।

আর—অকৃতজ্ঞ স্ত্রীলোকটি তার ক্ষোভ ও দুঃখ ভুলতে পারে না। সে একটি মশায় পরিণত হয়েছে। তার সেই দুঃখ জানাবার জন্য তার পিন পিন শব্দে মানুষকে

সে উত্যক্ত করে মারে—আর, সেই এক ফোঁটা রক্ত ফিরে পাবার জন্য সে হুল ফোটায়—যা দিতে পারে তাকে সেই জীবন। *

* দক্ষিণ ভিয়েৎ-নাম-এর কাহিনী।

পূজোর মেলা

প্রভাকর মাঝি

পূজোর মেলা, পূজোর মেলা।
বেশ জমেছে ম্যাজিক খেলা।
কাগজকে ছাথ ফু-মন্তরে।
কেউটে সাপের বাচ্চা করে।
ঐ ওদিকে নাগর দোলায়।
ফুর্ত্তি করে চড়বি কে আয়।
তালের ভেপু আনবি কে ঘর,
বাজবে খাসা ভ্যাপর, ভ্যাপর।
বাস ছুটেছে পাপর-ভাজার,
দূর, যাবো না ওদিকে আর।
সত্যি এটা মাটির পেঁপে ?
আসছে কেষ্টনগর থেকে ?
সেলুলেডের হাঁস-হীরেমন,
এক ঠেঙে বক দেখতে কেমন।
চোখ পিট পিট পুতুল কতো !
বেলুন রিবণ ইচ্ছেমতো
কোনটা ছেড়ে কোনটা খুঁজি ?
সাতাশ নয়া পয়সা পুঁজি
দেখতে চতুর্দিক মেলাটার
ঢাক বেজেছে সন্ধি পুজার।

চিত্রগুপ্ত
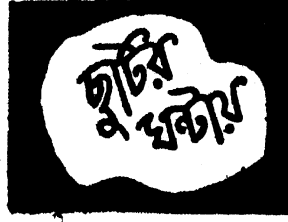
লোহার জিনিষপত্রে 'মরচে' (Rust) পড়ে, এ তোমরা সবাই দেখেছো এবং জানো। কিন্তু কেন এবং কি জন্য লোহাতে এমন 'মরচে' ধরে, সে তথ্য হয়তো তোমাদের অনেকেরই সঠিকভাবে জানা নেই। তাই আজ বিজ্ঞানের এমন একটি বিচিত্র-মজার খেলার কথা বলছি, যা থেকে তোমরা—লোহায় 'মরচে' ধরে কেন, সেই অভিনব-রহস্যের আসল-তথ্যটুকুর মোটামুটি পরিচয় পাবে। শুধু তথ্য-পরিচয়ই নয়, বিজ্ঞানের এই আজব-খেলাটির কলা-কৌশল আয়ত্ত করে, তোমরা নিজেরাই অঙ্কের মতো হিসাব কষে আন্দাজ করতে ও জানতে পারবে যে এক টুকরো লোহাতে কত পরিমাণ 'মরচে' জমে রয়েছে। কাজেই, এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, অনায়াসেই এই অভিনব-মজার বিজ্ঞানের খেলাটির নাম দেওয়া যেতে পারে—'লোহাতে মরচে-ধরার হিসাব-নিকাশ'! এখন শোনো—এ খেলাটির বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের কাহিনী।

লোহাতে মরচে ধরার হিসাব নিকাশঃ

এ খেলাটির জন্য চাই বিশেষ কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম··· গোড়াতেই তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র খেলাটি দেখানোর জন্য দরকার—রবারের ছিপি-সমেত ওষুধের একটি খালি বোতল—সচরাচর বাজারে বিশেষ-বিশেষ ধরণের ওষুধ রাখবার জন্য যেমন বোতল ব্যবহার করা হয়, তেমনি-ধরণের জিনিষ, কাঁচের তৈরী একটি ফাঁপা-নল (Hollow glass-tube), অল্প একটু 'সিরকা' বা 'ভিনিগার' (Vinegar), কাঁচের

গেলাসে-ভরা এক গেলাস জল, কিছু লোহাচুর (Iron-fillings) অথবা 'লোহার-সুতো' (Steel-wool) এবং ওষুধের শিশির ছিপির মাঝখানে ফুটো করবার জন্য বেশ মজবুত একটি ছুঁচ—সাধারণতঃ চটের থলি সেলাইয়ের কাজে যে-ধরণের মোটা এবং লম্বা ছুঁচ ব্যবহার করা হয়, তেমনি জিনিষ। ছুঁচের অভাবে পেন্সিল-কাটবার ছুরি দিয়েও এ কাজ সারা চলবে।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় করার পর, খেলাটি দেখানোর আগে, আরো কয়েকটি জরুরী কাজ সেরে ফেলতে হবে। অর্থাৎ প্রথমেই অন্য একটি পাত্রে 'সির্কা' বা 'ভিনিগারের' আরকে ঐ লোহাচুর কিম্বা 'লোহার-সুতোকে' বেশ কিছুক্ষণ ভালো করে ভিজিয়ে স্যাঁত্‌সেতে (Moisten) করে নাও। এগুলি আগাগোড়া বেশ ভিজে-স্যাঁত্‌সেতে হলে, আরকের পাত্র থেকে লোহাচুর অথবা 'লোহার-সুতো' তুলে নিয়ে রবারের-ছিপিওয়ালা ঐ ওষুধের খালি বোতলের মধ্যে ঢেলে, শিশির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (One-third portion of the medicine-bottle) ভরে রাখো। এবারে একটি মজবুত মোটা-ছুঁচ অথবা ধারালো-ছুরির সাহায্যে ওষুধের বোতলের ঐ রবারের ছিপির ঠিক মাঝখানে উপর থেকে নীচে পর্যান্ত এফোঁড় ওফোঁড় করে লম্বালম্বি-ছাঁদের এমন একটি 'গর্ত' (Bore) বানাও যে, তার ভিতর দিয়ে কাঁচের ফাঁপা-নলটিকে যেন
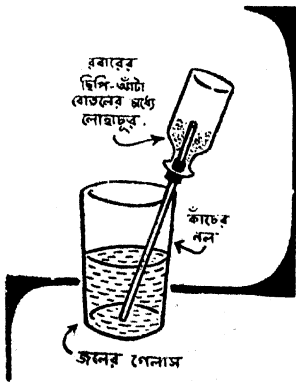
সহজেই উপরের ছবির ছাঁদে ছিপির মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। এমনিভাবে রবারের ছিপির গর্তের ভিতরে কাঁচের ঐ ফাঁপা-নলটিকে পরিয়ে নিয়ে, আরকে-ভেজানো লোহাচুর অথবা 'লোহার-সুতো' ভর্তি ওষুধের বোতলের মুখে ছিপিটাকে বেশ পাকাপোক্তভাবে এঁটে বসিয়ে দাও। তাহলেই ওষুধের বোতলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং ঐ রবারের ছিপির গর্তে কাঁচের নল-আঁটা বোতলটিকে জল-ভরা গেলাসের উপর উবুড় বা কাৎ করে ধরলেও, বোতলের ভিতরের লোহাচুর কিম্বা 'লোহার-সুতো' বাইরে গড়িয়ে পড়বে না এতটুকু।

এ সব আয়োজনের পর, সুরু করো খেলা-দেখানোর পালা! বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের সামনে এ খেলাটি দেখানোর সময়, প্রথমেই একটি সমতল-টেবিলের উপরে অর্দ্ধেক জল-ভরা কাঁচের গেলাসটিকে সাজিয়ে রাখো। তারপর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে ছিপির গর্তে নল-আঁটা লোহাচুর বা 'লোহার-সুতো' ভর্তি বোতলটিকে জলের গেলাসের মাথায় উবুড় করে ধরে, কাঁচের নলের 'খোলা-মুখটি'কে (Open-end of the glass-tube) ঐ গেলাসের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। এভাবে কিছুক্ষণ রাখবার পরেই দেখবে—ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরের লোহাচুর বা 'লোহার-সুতোর' গায়ে ক্রমশঃ 'মর্‌চে' ধরতে সুরু করেছে! এই 'মর্‌চে' ধরার কাজটি কিন্তু হবে খুবই ধীরে ধীরে···কাজেই, তাড়াহুড়ো করলে চলবে না—রীতিমত ধৈর্য্য ধরে বেশ খানিকক্ষণ নজর রাখতে হবে, বিজ্ঞানের এই রহস্যময় আজব-লীলার পরিচয় পাবার জন্য! এ প্রক্রিয়ার ফলে, শুধু যে লোহাচুর বা 'লোহার-সুতোর' গায়ে 'মর্‌চে' পড়বে তাই নয়, বরং দেখবে, বিজ্ঞানের বিচিত্র রীতি-অনুসারে, কাঁচের ঐ ফাঁপা-নলের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গেলাসের জল প্রবেশ করে ক্রমশঃ উপরের ঐ ছিপি-আঁটা বোতলের দিকে এগিয়ে যাবে এবং শেষ পর্য্যন্ত বোতলের ভিতরটি ও কাঁচের নলের এক-পঞ্চমাংশ জলে ভরাট হয়ে উঠবে।

এমন আজব-কাণ্ড ঘটবার কারণ, বোতলের ভিতরের লোহাতে 'মর্‌চে' ধরতে (Rusting) সুরু করলেই; ছিপি-আঁটা বোতলে ক্রমশঃ 'অম্লযান' বা 'অক্সিজেন' (Oxygen) বাষ্পের অভাব হয়। তার ফলে, গেলাসের মধ্যে ডুবিয়ে-রাখা কাঁচের ঐ ফাঁপা-নলের মধ্যে দিয়ে বাইরে, নীচেকার-জলে যে বাড়তি 'অম্লযান' বা 'অক্সিজেন'

বাষ্প মজুত রয়েছে, সেটুকু ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরের 'বায়ু-শূন্যতা' ভরে-তোলার আকর্ষণে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উঠে আসে উপরে। কাঁচের নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাস থেকে ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরে বাষ্পের এই 'উর্দ্ধগতি', চোখে দেখতে পাওয়া যায় না···কারণ, বাষ্প অ-দৃশ্য Invisible পদার্থ···তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়···পরোক্ষভাবে বোঝা সম্ভব, কিন্তু আদৌ নয়নগোচর হয় না! তবে, কাঁচের ফাঁপা-নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার জল-ভরা গেলাস থেকে উপরের ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরে অ-দৃশ্য 'অক্সিজেন' বাষ্পের এই 'উর্দ্ধগতির' সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে—বিজ্ঞানের বিচিত্র একটি রীতি লক্ষ্য করলে। ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরকার 'লোহার' গায়ে 'মর্‌চে'-ধরবার ক্রিয়া সুরু হবার ফলে, 'অক্সিজেন' বাষ্পের অভাব-মেটানোর জন্য যে প্রবল আকর্ষণ' সৃষ্টি হয়, সেই আকর্ষণে কাঁচের ফাঁপা-নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাসের জল ফেঁপে-ফুলে ক্রমশঃ উঠে আসে উপরের ঐ বোতলের দিকে···তখন নীচেকার গেলাস থেকে কাঁচের নলের মধ্যে দিয়ে উপরের লোহা-ভরা বোতলের পানে জলের এই 'উর্দ্ধগতি' দেখেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়—বিজ্ঞানের অভিনব লীলা-রহস্য! তাছাড়া, গেলাসের জলের এই 'উর্দ্ধগতি' দেখে অনায়াসে হিসাবনিকাশ করে সন্ধান পাওয়া যায়, বোতলের ভিতরের 'লোহাতে' কি পরিমাণে, কতখানি 'মর্‌চে' পড়েছে! এ হিসাব কষে দেখতে হলে, ভালো করে নজর রাখা প্রয়োজন—লোহা-ভর্ত্তি ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরের 'অক্সিজেনের' অভাব-পূরণের আকর্ষণে, কাঁচের নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাসের জলটুকু ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসে কতক্ষণে ঐ ওষুধের বোতলটি এবং কাঁচের নলের এক পঞ্চমাংশ (one fifth portion of the glass-tube) ভরে তোলে। নিজেরা হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি পরখ করলেই, দেখতে পাবে যে বোতলের ভিতরকার লোহার গায়ে 'মরচে' পড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই বাতাসের যত অভাব ঘটবে, ততই সেই বায়ু-শূন্যতা পূরণের আকর্ষণে কাঁচের নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাসের জল ধীরে ধীরে ফেঁপে-ফুলে উপরে উঠে এসে পুরো বোতলটি এবং ফাঁপা-নলের এক-পঞ্চমাংশ স্থান ভরাট করে তুলবে। এই দেখেই হিসাব কষে সন্ধান মিলবে যে—বাতাসে 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান' বাষ্প রয়েছে প্রায় ⅕ ভাগ। তাছাড়া আরো বুঝতে পারবে যে বিজ্ঞানের বিচিত্র রীতি-অনুসারে 'অক্সিজেন' বা 'অম্লযান' বাষ্পের সংস্পর্শে এসে অভিনব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার (Chemical Combination) ফলেই, লোহার গায়ে 'মর্‌চে' পড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায়—'মর্‌চে'-পড়া ব্যাপারটি হলো—'বিনা-আগুনে নিতান্তই ধীর-গতিতে লৌহ-পদার্থের বিশেষ এক-ধরণের দহন-ক্রিয়া' (A sort of slow-burning of iron without a flame)! অর্থাৎ, আগুনে কাঠ, খড়, কাগজ বা কাপড় পোড়ালে, সে সব যেমন জলে ছাই হয়ে যায়, 'অক্সিজেনের সংস্পর্শে অভিনব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার, ফলে, লোহারও তেমনি 'মর্‌চে-ধরে' রূপান্তর ঘটে এবং সহজেই ছাইয়ের মতো গুঁড়িয়ে ধূলি-কণা হয়ে ঝরে পড়ে!

এবারের মজার খেলাটি থেকে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র রহস্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাবে তোমরা। পরের মাসে এ-ধরণের আরেকটি মজার খেলার কথা জানানোর ইচ্ছা রইলো।

দুই পথিক ও ভালুক

সতীন্দ্রনাথ লাহা

(কথামালা)

দুই বন্ধু ভেবেচিন্তে ঠিক করে একযোগে—
রোজ সকালে করবে এমন ভ্রমণ, ঠিক তাড়াবে রোগে।
এ ওর কাঁধে হাতটি রেখে
বেড়িয়ে বেড়ান সকাল থেকে।
গল্প করেন সাত সতেরো ঃ শরীর কতো ভোগে··
ফেরার পথে হঠাৎ দেখেন ভালুক দৈব যোগে॥
পথের পাশে বন যে শুরু গ্রাম এখানে শেষ।
ভালুক দেখে দুই বন্ধুর ভয়েই খাড়া কেশ।
এক বন্ধু জোরসে ছোটে,
তড়াক করে গাছেই ওঠে।
আর এক জন। শোয় মাটিতে বুঝেই পরিবেশ।
জানতো সে জন ছোঁয় না ভালুক জীবন যাহার শেষ॥

শুঁকলো ভালুক তাহার দেহ ভাবলো এ প্রাণহীন।
চললো তখন অন্য পথে, বৃথায় গেল দিন॥
মিট্‌লে বিপদ গাছের থেকে
আর এক বন্ধু শুধাল ডেকে—
ভালুক যেন বলছিল কি—তোমার কানে কানে?
কি ছিল ওর বলার মতো, বুঝ্‌ছু না তো মানে!

ভুঁই-এ শোয়া বন্ধু বলে, রাগ ক'রো না ভাই!
বললে ভালুক দামী কথা, তুলনা যা'র নাই।
বিপদ দেখে যে যায় দূরে
(তাকে) বিদায় দেবে মধুর সুরে;
যোজন দূরে থাকবে নিজে, ত্যাগ ক'রো তার ঠাঁই।
এমন বন্ধু থাকার চেয়ে নাই থাকলো ভাই॥

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্রে

১। দেশের বাড়ীতে ফেরার আজব হেঁয়ালি ঃ
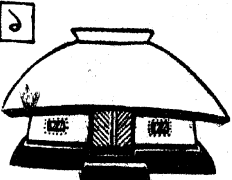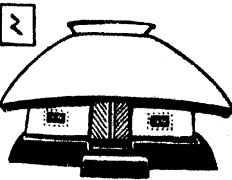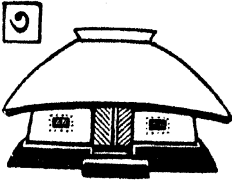
উপরের ছবিতে বাঁ-দিকের সারিতে দেখছো—পর-পর সাজানো রয়েছে, তিনখানি গ্রামের গোলপাতায়-ছাওয়া ঘর···আর ডান-দিকের সারিতে সহরের পথের মোড়ে পোটলা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিনটি কিশোর ছেলে। এ তিনটি ছেলে সহরের ইস্কুলে পড়াশোনা করে···থাকে সেখানকার ইস্কুল-বোর্ডিংএ। পূজোর ছুটিতে এরা তিনজন সহর ছেড়ে ফিরে চলেছে দেশে—যে যার নিজের ঘরে। প্রথম ছেলেটি ফিরবে এক নম্বর ঘরে, দ্বিতীয় ছেলেটি-দুই নম্বর ঘরে, আর তৃতীয় ছেলেটি তিন নম্বর ঘরে···অর্থাৎ, যে যার আপন-আপন দেশের বাড়ীতে—প্রিয়জনদের কাছে। এরা তিনজনেই চায়, খুব তাড়াতাড়ি যে যার নিজের ঘরে ফিরতে···অকারণ বেশী পথ ঘুরে ছুটির সময়টুকু নষ্ট করতে রাজী নয় কেউ! কাজেই কোথাও এতটুকু না থেমে, অল্পপথ মাড়িয়ে এই তিনটি ছেলে চটপট ফিরে যেতে চায় তাদের প্রত্যেকের দেশের বাড়ীতে। তবে ঘরে ফিরবে এরা প্রত্যেকেই একা-একা—আগাগোড়া যে যার স্বতন্ত্র-পথে··· তিনজনের কারো সঙ্গে কারো যেন সাক্ষাৎ না হয় পথের কোনোখানে কোথাও! অর্থাৎ, সহর থেকে দেশের বাড়ী পর্য্যন্ত সারাটা পথই, এরা প্রত্যেকেই চলবে যে যার নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট রাস্তা ধরে এবং এমনিভাবে পথ-চলবার সময় এদের তিনজনের কেউ যেন কারো দেখা না পায়—এই হলো আজব হেঁয়ালির সর্ত্ত! এই সর্ত্ত মেনে, বুদ্ধি খাটিয়ে তোমরা এবারে পেন্সিলের রেখা টেনে এঁকে দেখাও তো—এই তিনটি ছেলে কি উপায়ে সহর থেকে বেরিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাক্ষাৎ এড়িয়ে, কত অল্প পথ মাড়িয়ে, যে যার নিজের দেশের বাড়ীতে ফিরে আসবে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

মোটা দু'অক্ষরে আমার নাম। থাকি জলে। মাঝে মাঝে ডাঙায়ও আসতে হয়। শিরচ্ছেদ হলে, ধড়টার আর গরীবের ঘরে থাকা পোষায় না···একদম বড়লোকের বাড়ী! মধ্যবিত্ত লোকের বাড়ীতেও কখনও কখনও থাকতে হয়। আর যদি ধড়টা উড়ে যায়, তাহলে মুণ্ডটাই যে তোমাদের বুকে তুলে নেবে, তাই নয়···সে না থাকলে, তোমরা বাঁচতেই পারতে না—এ পৃথিবীর মুখও দেখতে পেতে না।

রচনা :—ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী)

৩। জগদীশ দেখলে এই সুযোগ! এই সুযোগে পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরে নিতে হবে। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে—পুকুরের মালিক মাণিক ভট্টচাজ কি একটাকাজে কোলকাতায় গেছে। কাল ফিরবে। মহাস্ফূর্ত্তিতে জগদীশ দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেই পুকুরে ছিপ-সুতো নিয়ে বসলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পুকুর পাড়ের তিন বাড়ী থেকে তিনটি ছোকরা এসে হাম্‌লা সুরু করলে। মাণিকবাবু তাদের পুকুর আগলাতে বলে গেছে!···নিরাশ হয়ে জগদীশ ছিপ গুটোতে আরম্ভ করলে। ছোকরাদের একজন বললে,—ধরতে দিতে পারি, যদি তুমি যা ধরবে তার অর্দ্ধেক মাছ গুণে আমাকে দাও এবং একটি মাছ ফাউ দাও! যুক্তিটা দ্বিতীয় জনের মন্দ লাগলো না। সে বললে,—আর ওকে দিয়ে যা থাকবে, তার অর্দ্ধেক আর একটি মাছ ফাউ, আমাকেও দেবে! তৃতীয় জন বললে,—তা বেশ, ওদের দুজনকে দিয়ে যা থাকবে, তার অর্দ্ধেক আর একটি মাছ ফাউ আমাকে দেবে!···উপায় না দেখে জগদীশ তাতেই রাজী হলো! বাড়ী ফিরলো জগদীশ মাত্র একটি মাছ নিয়ে!···বলো তো, কতগুলি মাছ ধরেছিল সে?

রচনা:—শ্রীকৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ
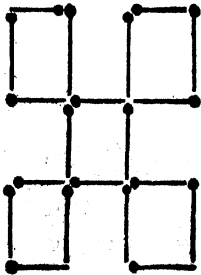
১। উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি-ধরণে দেশলাই-কাঠিগুলিকে সাজালেই অনায়াসে এই পাঁচটি সমান-মাপের চতুষ্কোণ-খোপ রচনা করতে পারবে।

২। শরৎ

৩। পাখা

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

চপল ও বন্দনা (বারাকপুর), কল্পনা, অশোক, সীতা ও গৌতম ঘোষ (?), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য (কলিকাতা), কুলু মিত্র (কলিকাতা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু (হাওড়া) মিতা, বিষ্ণু, কামতৌল (দ্বারভাঙ্গা) শংকর চক্রবর্তী (নবদ্বীপ) নির্মল, শ্যামল, পরেশ ও অরুণা (নবদ্বীপ) প্রশান্ত, অরুণ, স্বপন (ফুটীগোদা) মুরারী চৌধুরী ও স্বপন ঘোষ (ফুটীগোদা),

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বাচ্চু (কেশিয়াড়ী), অমিতা লাহিড়ী (কলিকাতা) প্রবীরকুমার কুণ্ডু (দেওঘর) চম্পা ও শ্যামসুন্দর ধ (কলিকাতা), ঝণ্টু চক্রবর্তী (জলপাইগুড়ি) সুব্রত ব্যানার্জী (বাঘডাঙ্গা) কুমারী রেখা ঘোষ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘো (জাসপুরনগর) মণ্টু, বুচি, পণ্টু, লালা ও শৈল (মীরাট) জয়ন্তী, তীর্থংকর ও দীপংকর ব্যানার্জী (মেদিনীপুর) অনুরাগ ও পরাগ (মেদিনীপুর) শিবপ্রসাদ মালটিপারপাস বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, সদানন্দ কুণ্ডু (বিশ্বভারতী) মুরারী চৌধুরী ও প্রবীর মুখোপাধ্যায় (কাতরাজগড়) কমলে মুখোপাধ্যায় (মেদিনীপুর) আলো, তুফান ও চায়ন (রাউরকেল্লা) ইরা, মীরা, বাবলু, বেনু, চণ্ডী, স্বাতী, গৌত স্বপু, পতু (কিষণগঞ্জ) কাশীনাথ রায় ও শুভ্রা রা (কুচবিহার) সন্ধ্যা চৌধুরী (ফুটীগোদা) ননীগোপাল প্রতীশ, অশোক, অধিপ (কৃষ্ণনগর) সিদ্ধার্থ ও সোমনা বসু (বর্ধমান) চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর) সুশী অধিকারী চন্দন, ধর্মদাস, রণজিৎ মণ্ডল (পঃ দিনাজপুর সত্রাজিৎ দাশ (নিউ আলিপুর) রবীন্দ্র দিনদা, হেমন্ত জানা চিত্রলেখা চৌধুরী (শিউলিপুর) মদন ও নারায়ণ মি (মেদিনীপুর) দিগ্বী, ফণী, বুচকু (কলিকাতা) [illegible], টিঙ্ ধমু, চন্দন ও অলোক ভট্টাচার্য (লাভপুর)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বিশ্বনাথ, দেবকী, মুন্না (কলিকাতা), বুবু ও মি গুপ্তা (কলিকাতা)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

পৃথিবীর আদিম-যুগে মানুষ যখন ক্রমশঃ উন্নত-সুসভ্য হয়ে উঠতে লাগলো এবং নানা রকমের পাথর, তামা, ব্রোঞ্জ আর কাঠের তৈরী হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখলো, তখন তারা তাদের গিরি-গুহা-কন্দরের আশ্রয় আর বন-জঙ্গলের বাসা ছেড়ে দেশ-দেশান্তরে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বসবাস সুরু করে। এভাবে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করতো তারা নানা উপায়ে—কেউ চলতো স্থলপথে, আবার কেউ বা পাড়ি জমাতো জলপথে—নদী, খাল-বিল... এমন কি, দুরন্ত সাগর পার হয়ে। জলপথে পাড়ি দেবার সময় আদিম-মানুষেরা তখন ব্যবহার করতেন বড়-বড় গাছের গুঁড়ি ও লতা বা বাকলের দড়ি দিয়ে তৈরী এ-ধরনের বিচিত্র কাঠের বা বাঁশের ভেলা। এমনি সব ছোট-বড় ভেলায় চড়েই সেকালের আদিম-লোকজন অনায়াসেই জলপথে পাড়ি দিয়ে দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। কাজেই এ-ধরণের কাঠের বা বাঁশের তৈরী ভেলাই হলো—পৃথিবীর প্রথম জলযান। তবে শুধু সেকালেই নয়, একালেও এ-ধরনের জলযানের ব্যবহারিক-উপযোগীতা দেখা দুনিয়ার নানা স্থানে আধুনিক মানুষের সমাজে।

কালে-কালে আদিম-যুগের মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমশঃ তৈরী করতে শিখলো গাছের মোটা গুঁড়ি কুরে বানানো বিচিত্র-ছাঁদের এই সব ডোঙা আর সালতি জাতীয় জলযান। এই ধরণের অভিনব জলযানে চড়ে দুর্গম সাগরের বুকে পাড়ি দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করতো হামেশা ঝড়-জলের দুর্য্যোগ-বাধা তুচ্ছ করে। একালেও দুনিয়ার অনেক দেশে এ-ধরণের ডোঙা আর সালতি নৌকার রীতিমত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

এমনিভাবেই মানুষ ক্রমশঃ কাঠের তক্তা গাছের গুঁড়ি, বাঁশের গোড়ার উপর গাছের বাকল, চামড়া আর মোটা কাপড়ের আবরণ মুড়ে আরো নানা ছাঁদের এবং উন্নত-ধরণের বিচিত্র সব জলযান বানাতে সুরু করলো। এ সব জলযান চালনার জন্য ব্যবহার করা হতো বাঁশের বা কাঠের লগি কিম্বা দাঁড় আর হাল। এ-ধরণের ডিঙি-নৌকা বা 'ক্যানো' (Canoe) আজো ব্যবহার করে আমেরিকার আদিম-অধিবাসী 'রেড-ইণ্ডিয়ান' (Red Indian) সম্প্রদায়ের লোকজনেরা।

আর এই ধরণের ঝুড়ির মতো ছাঁদের আজব জলযান আজো দেখা যায় একালের মধ্য-প্রাচ্য দেশে। তবে এই আজব-জলযানে চড়ে নদী পারাপার সম্ভব হলেও, সাগরে পাড়ি জমানো অসম্ভব!

এছাড়া কালক্রমে, আজ প্রায় চার হাজার বছর আগে, প্রাচীন মিশর দেশে সভ্যতা-বিকাশের ফলে, সেখানকার প্রগতিশীল-অধিবাসীরা বানাতে লাগলো নল-খাগড়ার (Reed) গুচ্ছ দিয়ে অভিনব-ছাঁদের বিচিত্র এই জলযান। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই ধরণের নল-খাগড়ার তৈরী জলযান ব্যবহৃত হয়ে আসছে মিশর দেশে। এ সব জলযান তৈরী ওদেশের বিশেষ এক-জাতের নল-খাগড়া থেকে ...এগুলি যেমন মজবুত, তেমনি টেঁকসই!...

সমস্যা সমাধানে সমবায় ও পঞ্চায়েত

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী

সমবায় ও পঞ্চায়েতের গুরুত্ব নিয়ে আজ আর কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। গ্রাম-পঞ্চায়েত ও গ্রাম-সমবায়—এই দুটি হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। একটি জনগণকে শাসন ক্ষমতার অংশীদার করে দেবে, আর অন্যটি জনগণের সমবেত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাতির আর্থিক শক্তি ও সম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে। পঞ্চায়েত আনবে গণতন্ত্র, সমবায় আনবে প্রকৃত স্বাধীনতা—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কল্যাণকর সমাজ গড়ে তুলতে চাই ভারতবর্ষে। গ্রাম-প্রধান আমাদের দেশ। তাই গ্রামাঞ্চলে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও আঞ্চলিক-পঞ্চায়েত কায়েম করতে না পারলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কথার কথাই থেকে যাবে। আগেই বলেছি যে গ্রাম-পঞ্চায়েতই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি; এদের বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের কোন ভবিষ্যত নেই। গ্রাম-পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, গাছের গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল ঢালারই সামিল। একথা আজ সর্ববাদিসম্মত যে পঞ্চায়েত হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, বিশেষতঃ আজকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতরাজ ও সমবায় সমিতি সংগঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি।

ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ। অনুন্নত দেশ বলতে আমরা বুঝি: (১) স্বল্প উৎপাদন, (২) প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, (৩) প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাবার মত সুদক্ষ কারিগরের অভাব, (৪) স্বল্প মূলধন, (৫) বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী বন্ধ, (৬) উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তার রূপায়নের অভাব, (৭) দ্রুতহারে জন্মহার বৃদ্ধি। এগুলোর বিচারে আমাদের দেশকে অনুন্নতই বলতে হবে। আশার কথা যে, বিগত এক দশক ধরে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক সংগ্রাম সুরু হয়েছে; কল্যাণ রাষ্ট্রের যা অবশ্যকরণীয় তা করার একটা শুভ-প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তব-বিমুখ না হয়ে এ-কথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে পনের বছরের স্বাধীনতা ও এগার বছরের পরিকল্পনা কি দিয়েছে আমাদের। গত এগার বছরে ভারতবর্ষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে—আজও করে চলেছে। তার বিনিময়ে দেশের সামগ্রিক উন্নতি যে কিছুটা হয় নি তা বলি না, তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আজো উন্নত হয়নি। মানুষের অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বেড়ে চলেছে—জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে আকাশগামী হয়ে; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ ধ্বংসের পথে; অক্টোপাসের আলিঙ্গন ক্রমশই তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে আনছে। কেন এই অবস্থা? এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত না হলেও এটিকে গুদামজাত করে রাখাও যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দেশের পরিচালকবৃন্দ প্রায়ই এই মামুলী কথাটি বলে থাকেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর নানা সমস্যা এসেছে তার সামনে। সমস্যা যে ছিলো না বা নেই—এমন কথা বলছি না। জাতির জীবনে মাঝে মাঝে সমস্যা আসবেই—এ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। তাই সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস না পেয়ে বরং তার সম্মুখীন হওয়ার জন্যই সব সময় তৈরী থাকতে হবে জাতিকে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ হিসাবে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি থেকে বিভিন্ন খাতে এপর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ' বা সাহায্য হিসাবে পেয়েছে। এ ছাড়া খাদ্য শস্যও পেয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার। শুধু কি তাই? অনুন্নত

দেশগুলো যেমন সাহায্য পায় বিভিন্ন দিক থেকে—ভারতবর্ষও তা পেয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ তহবিল ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে। শুধু ১৯৬১ সালেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছ থেকে ভারতবর্ষ পেয়েছে আটানব্বই কোটি ডলার দীর্ঘ-মেয়াদী স্বল্পহার সুদ হিসেবে। তাহলে? এত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও এ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলো না কেন? দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের সামনে যে সমস্যা ছিল—তাহলো উদ্বাস্তু সমস্যা। এ ছাড়া আর কোন উল্লেখ-যোগ্য সমস্যা আমাদের সামনে আসেনি। কিন্তু সে সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেননি আমাদের সরকার। শুধু দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে সর-কারের সব পরিকল্পনাই তো ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয়েছে। নতুন ভারত গড়ে তুলতে হবে—দেশের আর্থিক উন্নতি করতে হবে—এই আদর্শই তো আছে পরিকল্পনার মূলে। আর এই মহান উদ্দেশ্যেই তো প্রথম পরিকল্পনা সুরু হয় ১৯৫০-৫১ সালে। প্রথমবার খরচ হলো ৩৩৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয়বার ৬৭৪০ কোটি টাকা এবং তৃতীয়বারে খরচ হবে ১১,৬০০ কোটি। গত দশ বছরে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা খরচ করে আমরা কতখানি আয় বাড়াতে পেরেছি। এক কথায় আর্থিক স্বাধীনতার স্বাদ আজও আমরা পাইনি। আর্থিক উন্নতির সাফল্য বিচার করতে হলে দুটি লক্ষণ দেখতে হবে: (১) দেশের লোকের খাওয়া-পরার ব্যবস্থার উন্নতি: আর (২) বেকারের সংখ্যা কমে যাওয়া। এই দুই দিক থেকে বিচার করলে খুব দুঃখের সঙ্গেই এই কথা বলতে হয় যে—দুটোর কোনটাই আমরা দেখি নি। এক কথায় সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। কিন্তু কেন? জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ না করলে কোনও পরিকল্পনাই সাফল্য লাভ করতে পারে না। দেশের জন-মনের সাথে পরিকল্পনাগুলোর যোগসূত্রের হয়েছে অভাব। যে সরকারী-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপা-য়িত করা হচ্ছে তার সাথে জনগণের কোন সংযোগ নেই। পরিকল্পনা রচয়িতাদের দূরদৃষ্টির অভাব, বাস্তব-বিমুখতা ও অজ্ঞানতা—এই সর্বনাশের মূলকারণ।

দেশের এই অর্থনৈতিক পটভূমিকায় আজ তাই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো পঞ্চায়েত ও সমবায় সংস্থার সুষ্ঠু সংগঠন। লক্ষ লক্ষ গ্রাম নিয়েই তো আমাদের দেশ। আর এ দেশের শতকরা আশী ভাগ মানুষই কৃষির উপর নির্ভর-শীল। যে দেশের প্রতি দশজনের মধ্যে আট জন মানুষই কৃষির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে সেখানে কৃষির উন্নয়ন-সমস্যাই হলো আসল সমস্যা। কৃষির উন্নয়নতথা ফসল বাড়ানো এবং উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা—এই দুটোই হলো আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা। এই সব সমস্যার সমাধানে 'সমবায়' একটি অমোঘ উপায় রূপে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনী-য়তা সম্পর্কে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশের অভাব-অনটন, খাদ্য সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা ইত্যাদি দূর করার জন্য আমরা যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার সার্থক রূপায়ন করতে হলে চাই সমবায়-প্রচেষ্টা বা যৌথ-প্রচেষ্টা (Co-operative Approach)। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয় যে বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলন আজো দেশে গড়ে ওঠে নি।

ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামের অবস্থা আজো শোচনীয়। সেখানে, রাস্তাঘাট নেই, রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, নিত্যদিন অভাব-অনটন লেগেই আছে। অন্ধকার, অশিক্ষা ও অভাবে নিমগ্ন আমাদের গ্রামগুলো। গ্রামীণ সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যেই তো ভারতবর্ষের নতুন শাসনতন্ত্রে (Article 40 of the Constitution) গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কারণ জাতীয় উন্নয়ন পরি-কল্পনার রূপায়নে গ্রাম-পঞ্চায়েতই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। ১৯১৯ সালের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের বলে পশ্চিমবাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড চালু ছিলো; কিন্তু ১৯৫৬ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় এবং পরের বছর (১৯৫৭ সনের ৩নং আইন) থেকে ইহা কার্যকরী হয়েছে। দুই বা তিনটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম-সভা (গ্রাম-পঞ্চায়েত) এবং পাঁচ ছয়টি গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে একটি কোরে অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। প্রতি জিলায় জিলা-বোর্ডের বদলে জিলা পরিষদ এবং প্রতি ব্লকে একটি কোরে ব্লক-পঞ্চায়েত গঠনের পরি-কল্পনাও আছে। গ্রাম-পঞ্চায়েত শুধু গ্রাম পর্যায়ের স্বায়ত্ত শাসন ইউনিটই নয়, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোকেও রূপ দেওয়া হবে এই গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই। একদিকে গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রামের সমবায় সমিতির কাছ থেকে গ্রামের চাষীর

প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কৃষিঋণ, কৃষি-সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেবে, আবার অন্যদিকে গ্রামের স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামের লোকের অশিক্ষা দূর করে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সর্বমুখী ব্যবস্থা করবে। সমবায়, পঞ্চায়েত ও স্কুল—এই তিনটি গ্রাম্যপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আসবে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর ত্রিবেণী ধারায় পুতস্নান না করলে কোন পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারবে না। পরিকল্পনাগুলোর সার্থক রূপায়ণে গ্রাম-পঞ্চায়েত যেমন একদিকে ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিটির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখবে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামের লোকের সঙ্গেও তার থাকবে আত্মার যোগাযোগ। গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর কাজ যখন চলতে থাকবে তখন গ্রাম-পঞ্চায়েত রাখবে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি যাতে শ্রম ও মূলধনের কোন অপচয় না ঘটে। আত্মোন্নতি ও পারস্পরিক সাহায্য নীতির (self help and mutual self) উপর ভিত্তি করে যাতে গ্রামাঞ্চলে সত্যিকারের কর্মী বা বেসরকারী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে—সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রাম-পঞ্চায়েতকে। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন সংগঠন থেকে (যেমন, কৃষক সঙ্ঘ, যুবক সঙ্ঘ, মহিলা মণ্ডল ইত্যাদি) প্রতিনিধি নিয়ে পঞ্চায়েতের ওয়ার্কিং সাবকমিটি গঠন করতে হবে। সাধারণতঃ গ্রাম পিছু একটি পঞ্চায়েত থাকবে। স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও কোথাও ছোট গ্রামগুলো একত্র করে একটি পঞ্চায়েত এলাকা ধরা হবে। প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় যাতে স্ত্রীলোকের জন্যে দুটি ও তপশীলভুক্ত জাতির জন্যে একটি সিট রিজার্ভ থাকে—সে সম্পর্কে রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা চাই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই একথা বলা যায় যে গ্রামীণ সমাজের সর্বমুখী কল্যাণ সাধনের জন্যে সমবায় ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সমন্বয়সাধনের একান্ত প্রয়োজন। সমবায় ও পঞ্চায়েতকে আলাদা কোরে দেখলে হবে না; মনে রাখতে হবে যে একটি অপরটির অনুপূরক (Complementary); তাই সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্যে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি মোটামুটি সীমারেখা বেঁধে দেওয়াও উচিত। সামাজিক উন্নয়ন ও শাসন সম্পর্কীয় কাজের দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েতের হাতে, আর গ্রামের অর্থনৈতিক কাজগুলোর দায়িত্ব থাকবে গ্রাম্য সমবায় সমিতির হাতে। প্রথমদিকে গ্রাম্য সমবায় সমিতি ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের মনে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে National Development Councilএ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে গ্রামের অর্থনৈতিক কাজগুলো সম্পাদিত হবে সমবায় সমিতির মাধ্যমে—কিন্তু তবুও বিভ্রান্তি আজো দূর হয়নি। তাই এই বিভ্রান্তির মূল কারণ সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্ল্যানিং কমিশন গ্রাম সমবায় অপেক্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলো। তাই গ্রামের অর্থনৈতিক কাজগুলোর দায়িত্বও বহুলাংশে দেওয়া হয়েছিলো পঞ্চায়েতের হাতে। কাজগুলোর কতকগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—(১) গ্রামের উৎপাদন কর্মসূচী তৈরী, (২) উক্ত কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাজেট তৈরী, (৩) সরকারী সাহায্য গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে কাজ করা, (৪) গ্রামের পতিত জমিগুলো চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা, (৫) গ্রামের মানুষকে গ্রাম-উন্নয়ন-মূলক কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, (৬) গ্রামাঞ্চলের ভূমিসংস্কার কার্যে সাহায্য করা। (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—১৩৪ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—১৫২ ও ১৫৩ পৃষ্ঠা)।

এই সমস্ত কাজগুলোর দায়িত্বই যদি পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে পঞ্চায়েত তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে না। তাই সমবায় ও পঞ্চায়েতের মধ্যে কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে এমন কতকগুলো কাজ আছে যেগুলো এই দুই প্রতিষ্ঠানের কোনটির পক্ষেই একক প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয়; তাই সেক্ষেত্রে এই দুই সংস্থার সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন—যেমন পতিত জমিগুলোর তত্ত্বাবধান, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। এই কাজগুলোর গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে উভয় সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি জয়েণ্ট কমিটি গঠন করা হবে। 'প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন অর্গানাই

জেসন্ এর পঞ্চম ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"Additional responsibility, especially for development works, should not be imposed on the Panchayets at least for sometime to come. The functions of the Panchayets and Co-operative Societies should be clearly distinguished from one another......Ways may, however, be thought out of bringing the Panchayets into closer association with development work in the villages. Arrangement for supply of seed, development of cottage industries etc., are job for the Co-operative Societies and not the Panchayets."

সমবায় ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দপ্তর (Ministry of Community Development and Co-operation) যে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছিলেন তাঁরাও এই কথা বলেন যে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের কাজের দায়িত্বের একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়া উচিত। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"The Panchayet is primarily an administrative body which comprises all the people in the village and has revenue resources and taxation powers, while the village co-operative is essentially a business organisation whose resources are largely based on contractual obligations." যাই হোক, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্টের অনুলিপি উত্থাপন না কোরেও খুব সহজেই একথা বলা যেতে পারে যে গ্রামাঞ্চলে কতকগুলো কাজ আছে—যেগুলো কেবল পঞ্চায়েতই করবে, আবার কতকগুলো কাজ আছে যেগুলো সম্পাদিত হবে শুধু গ্রাম-সমবায় সমিতির মাধ্যমে। এছাড়া কতকগুলো এমন কাজ আছে যেগুলো সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় সংগঠনের যে কোন একটি দ্বারা সম্পাদিত হবে। আমরা আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে National Development Council সমবায় ও পঞ্চায়েত এর কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আরো সুস্পষ্টভাবে একটা সীমারেখা বেঁধে দেবেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে এই দুটি সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে কোন চুলচেরা বণ্টন করা সম্ভব নয়, কারণ গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজগুলো একই কাজের দুইটি দিক মাত্র। দুইটি সংস্থার কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সম্পূর্ণ নয়। তাই সমবায় ও পঞ্চায়েত'—এই দুই সংস্থার মধ্যে যথাসম্ভব যোগসূত্র স্থাপন ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন। সর্বাধিক উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্যে তাই গ্রাম-সমবায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে, উভয় সংস্থার পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমেই গ্রামীন সমাজের সত্যিকার কল্যান আসবে। আর গ্রামীন সমাজের সর্বমুখী উন্নয়নের মাধ্যমেই সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, গড়ে উঠবে কল্যাণকর রাষ্ট্র।

শরতের কাহিনী

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

দৃষ্টির দিগন্তে ওই শ্যামলের ভাষার স্নিগ্ধতা
শরতের কাহিনীকে তুলে' ধ'রে সহজ ইচ্ছায়—
সবুজ চেতনা আঁকে প্রশান্তির নম্র তুলিকায় :
দিক্প্রান্তের স্বাক্ষরেতে সৃষ্টির এ-নব অভিজ্ঞতা।
মাঠের নিজস্ব বায়ু ধানের খুশীর মসৃণতা
তরঙ্গিত ক'রে দিয়ে, আলোকিত রৌদ্রের মায়ায়
অনেক মনকে আনে প্রত্যাশার অভিজ্ঞ ছায়ায় :
আগামী কালের স্বপ্ন পায় এক আশ্চর্য স্বচ্ছতা!
মেঘের সে-ষড়যন্ত্র চ'লে গেছে, শেফালী-হাওয়ায়
সাদা পাল নৌকো হ'য়ে আকাশের বিস্তৃতির সুরে
সে এখন ভ্রাম্যমান। রহস্যের জ্যোৎস্নার ছোঁওয়ায়
দিগ্বিজয়ী আত্মা তার স্বপ্নরূপে দেখা দেয় দূরে।
স্বভাবের ব্যঞ্জনায় স্মরণীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে,
শরতের কাহিনীকে এরাই তো ধ'রে রাখে কাছে!

নকল নক্ষত্র

মায়া বসু
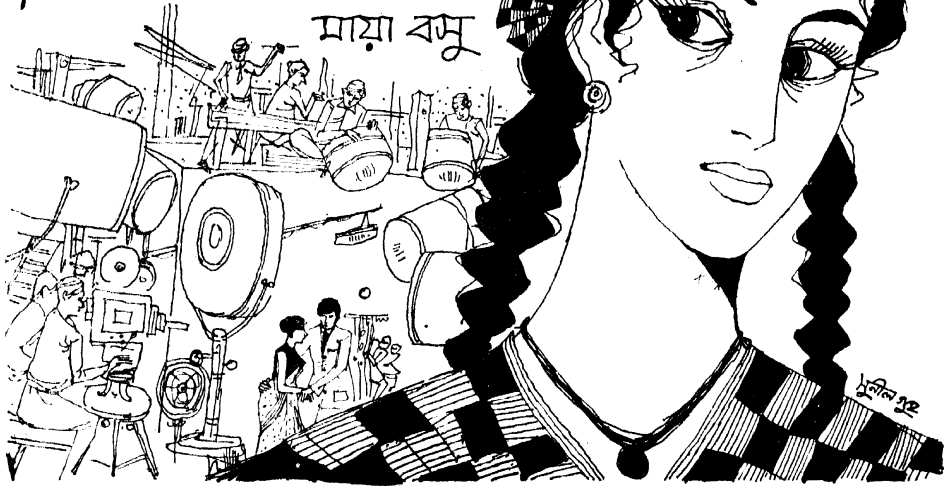
প্লেন থেকে নামতে না নামতেই প্রত্যাশিত বিপুল সম্বর্দ্ধনার মুখোমুখি হতে হল বাসনা ব্যানার্জীকে।

হঠাৎ একদিন একটা সামান্য এক্সট্রার রোল থেকে রাতারাতি যিনি বাংলাদেশের চিত্রজগতের নায়িকা হয়েছিলেন, উজ্জল জ্যোতিষ্কের চোখ ধাঁধানো দ্যুতিতে এককালে যিনি আবালবৃদ্ধ দর্শক-মনোহারিণী ছিলেন, পরিচালক-প্রযোজক যাঁর করুণা কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্যে সদাসর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকতেন, একযুগেরও বেশী আগেকার সেই স্বনামধন্য অভিনেত্রী বহুকাল বাদে বোম্বাই থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছেন নিজের জন্মভূমিতে।

বছর বারো আগে বোম্বাই স্টুডিওর সাদর নিমন্ত্রণে চলে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। তারপর এক স্টুডিও থেকে অন্য স্টুডিও। এক ভূমিকা থেকে অন্য ভূমিকা। মান-সম্মান যশ অর্থ প্রতিপত্তি। কাগজে কাগজে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মনোমগ্ধকর নয়ন লোভনীয় ছবি। দেয়ালে দেয়ালে আকর্ষণীয় পোষ্টার। সিনেমা পত্রিকাগুলোর দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি। হাঁচি কাশি থেকে ছবি। সত্যি মিথ্যের মিশেল খবর।

এক ডাকে বাসনা ব্যানার্জীর নাম সবাই জানে।

সেই বাসনা সিনেমা জগৎ থেকে অবসর নিয়ে ফিরে আসচেন। আগেকার মত চাহিদা তাঁর আর নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর আকর্ষণ শিথিল হয়ে গেছে। নায়িকার ভূমিকায় বাসনা এখন একেবারেই অচল। শুধু বিশ্বজগৎ নয়, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও পরিবর্তনশীল। পুরোনো মুখে তাঁদের রুচি নেই। নিত্য নতুন মুখেই তাঁরা বেশী আনন্দ পান।

বয়স হয়েছে বাসনা ব্যানার্জীর। মেক-আপের চাকচিক্যও তাকে আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। শুধুই বয়স নয়। দেহের অভ্যন্তরে এতদিনকার উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতাচারের ভাঙ্গন সুরু হয়েছে। শরীর অত্যন্ত খারাপ। বিশ্রাম চান বাসনা। চিত্রাভিনেত্রীর মান সম্মান নাম — আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। যৌবন শেষ। এবার প্রেক্ষা-

মঞ্চের লাইমলাইট থেকে ওঁকে অন্ধকার যবনিকার আড়ালে মুখ লুকোতে হবে চিরদিনের মত।

দেহ পট সনে নট সকলি হারায়! দেহসর্বস্ব নটীর শেষ পরিণতি!

প্রেস ফোটোগ্রাফার। সিনেমা পত্রিকাগুলির নিজস্ব সংবাদদাতাদের ভিড়। ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্। বন্ধু-বান্ধবের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। আরো বহুদর্শকের সশ্রদ্ধ কৌতূহলী দৃষ্টি।

সব মিলিয়ে প্রায় রাজকীয় অভ্যর্থনা।

তবু ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বাসনা তাকাল এদিক ওদিক, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে কাকে যেন খুঁজল জনতার মধ্যে।

কিন্তু না। সে আসেনি।

আর এতবড় আশ্চর্যের ব্যাপার আগে কখনো ঘটেনি বাসনার জীবনে। নিজের হাতে চিঠি লিখে ওকে এয়ার-পোর্টে উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল বাসনা। একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রামও করেছিল। পৌছনোর সময় জানিয়ে।

তবে কি সুজিত অসুস্থ?

কিন্তু তাই বা হবে কি করে? বাসনা ভুলে যায়নি মাত্র কটা বছর আগেই কত বড় অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতা থেকে বোম্বাই ছুটে গেছে ও বাসনার ডাকে। যখন মালাবার হিল রোডে বাসনার বাড়ী গিয়ে পৌছল, তখন ওর গায়ে একশো তিন জ্বর।

নিজের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে বিজয়িনী বাসনা মনে মনে খুশীতে ফেটে পড়ে মুখে রাগ দেখিয়ে বলেছিল, 'ছি ছি, এত অসুখ নিয়েও তুমি এসেছ? তুমি ঠিক আগেকার মতই ছেলেমানুষ আছ সুজিত। লতাই বা আসতে দিল কি বলে? চিঠিতেও তো কিছু লেখনি?'

সুজিত শীর্ণ অসুস্থ মুখে ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল, 'তুমি ডাক দিলে আমি কি না এসে থাকতে পারি বাসনা? তোমার লতা এবার অবশ্য সাহস করে মুখ ফুটে আসতে বারণ করেছিল। বলেছিল তোমার বাসনাদিদিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও—তোমার শরীর ভাল নয় এই বলে। কিন্তু আমার স্বভাব জানতো? বরং মরতে মরতে ছুটে চলে আসতে পারি, তবু চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না।'

জানে বই কি বাসনা, সব জানে। আর এই জানার শক্ত নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের উপরই অটল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। ওর উচ্ছৃঙ্খল সাত ঘাটে ঘুরে মরা নৌকো শেষ পর্যন্ত ঐ একটি কূলেই বাঁধা থাকবে শক্ত বাঁধনে। দুলবে না, টলবে না। ডুববেও না। সব গেলেও সব থাকবে। সুজিত থাকবেই চিরদিন বাসনার আঁচলে-বাঁধা বন্ধ দরজার চাবির মত। বাসনার বশীকরণের মন্ত্রে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত পুরুষের সম্পূর্ণ সত্তা এবং আত্মাও বাসনার দখলে থাকবে চিরদিন।

চিঠি লেখার স্বভাব নয় সুজিতের। কোনকালেই বাসনার কাছে অতি সংক্ষিপ্ত দুই এক কথা ছাড়া ও বেশী কিছু লিখতে পারে না। তবু লতার কথাটা সুজিতের মুখ থেকে শুনে খুব ভাল লাগল না বাসনার। ওদের দুজনের মধ্যে লতার স্থান কতটুকু? আজ লতা যেখানে বসে আছে, বাসনাই দয়া করে সেখানে ওকে বসতে দিয়েছে, বসিয়েছে। লতা যেন ভুলে না যায়, বাসনার প্রত্যেকটি ইচ্ছার পায়ে সুজিত তার গোটা জীবনটাকেই সঁপে দিয়েছে। দাসখৎ লিখে দিয়েছে।

পুরোনো বন্ধু প্রযোজক ও পরিচালক মিঃ ভাটমল বিরাট অ্যামবাসেডর নিয়ে এসেছিলেন। সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বাসনা তাঁর গাড়িতে উঠে বসল। কুইনস্ হোটেলে ওর জন্যে স্যুট রিজার্ভ করাই আছে।

সমস্ত দিন কেটে গেল। সুজিত এলো না। খবরও দিল না।

সন্ধ্যার দিকে একে একে অনেক অতিথিই এলেন বাসনার স্যুটে। বিখ্যাত প্রযোজক সোরাবজী। বয়স্ক অভিনেতা অরুণকুমার, অজিতকুমার, ইন্দ্রধনুর ডিরেক্টর মদন লোহিয়া, পূর্বপরিচিতা কয়েকজন অভিনেত্রী। দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার লোক।

চায়ের আসর একসময় শেষ হল। হৈ চৈ গল্প গুজবের পর অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। বাসনা বিস্মিত ক্রুদ্ধ সংশয়াকুল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। অনির্দিষ্ট আশঙ্কায়। এ লাইনে চৌদ্দ বছরের উপর আছে বাসনা। এমন কখনো হয়নি। দশ বারো বছর ও কলকাতা ছাড়া। কিন্তু তবু যখনি কাজে কর্মে কলকাতায় দুচার দিনের জন্যে এসেছে, সুজিতকে বাড়ি ছাড়া করে নিজের কাছে হোটেলে রেখেছে। বোম্বেতে যখনি ডেকেছে, সব কাজ কর্ম এমন

কি চাকরির মায়া ত্যাগ করেও স্থজিত ছুটে গেছে বাসনার ডাকে। যদিও তাকে বিশেষ কারণে দু এক দিনের বেশী কাছে রাখতে সাহস করেনি ও।

সেই শান্ত বাধ্য খাঁচায়-পোরা পোষা পাখিটির মত স্থজিত প্রকাণ্ড একটা কিছু গোলমাল বাধিয়ে না বসলে নিশ্চয় আসত এখানে।

কিন্তু গোলমালটা বাধাল কে?

লতিকা? লতা?

ভাবতেই মাথায় আগুন জলে উঠল। সেই কেঁচোর মত মেরুদণ্ডহীন একটা অল্পবয়সী মেয়ের এতবড় স্পর্ধা হবে? এও কি সম্ভব? লতিকার নিজস্ব কোন ব্যক্তি-সত্তা নেই। অস্তিত্বও নয়। সে একটা নাচের পুতুল মাত্র। অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে তাকেও দূর থেকে বাসনাই নাচায়। স্থজিতের মত সেও বাসনার ইচ্ছা দিয়ে গড়া পুতুল মাত্র। লতার মৃত্যুবাণ, জীবন-মরণ—সব কিছু বাসনার হাতের মুঠোয়। যে কোন মুহূর্তে ওর তাসের ঘর এক ফুঁয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে বাসনা। আর সে ক্ষমতা তার আছে বলেই ওকে স্থজিতের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল নির্ভয়ে। নিশ্চিন্ত মনে।

অনেক রাত অবধি ঘুম এলোনা বাসনার। স্থজিতের টেলিফোন নেই। খবর নেবার উপায়ও নেই কাল অফিস টাইমের আগে। সে কলকাতায় এসেছে অথচ স্থজিত কাছে নেই, এমন অভিজ্ঞতা, এতবড় শূন্যতা ওর জীবনে এই প্রথম।

আলো নিবিয়ে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিগত ষোলো বছরের বিবাহিত জীবনটাকে চোখের সামনে এই প্রথম ভালো করে তুলে ধরল বাসনা।

ফার্স্ট ইয়ারে ভালোবাসার স্থরু। উপসংহারে দেখা গেল এম এ পাস করার কিছুদিন পর স্থজিত হাঁটা-হাঁটি করে একটা চাকরি যোগাড় করবার পরই দুজনে রেজেষ্ট্রী অফিসের খাতায় নাম সই করে এসেছে। এ ছাড়া বিয়ের অন্য উপায় ছিল না। স্থজিত কুলীন ব্রাহ্মণ। মস্তবড় সংসারের সবচেয়ে বড় ছেলে। আশাভরসাও বটে।

আর বাসনা। জন্ম-পরিত্যক্তা। ক্রিশ্চিয়ান মিশন সোসাইটিতে প্রতিপালিতা। অজ্ঞাতকুলশীলা।

বিয়ে করে দুজনে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিল। সম্বল স্থজিতের নতুন চাকরি। আর বাসনার টিউশন। দুজনে দুজনকে নিবিড় করে পাওয়ার আনন্দে ভুলে গেল আর্থিক অসাচ্ছল্য। কঠিন পরিশ্রম কৃচ্ছ্র সাধন।

তারপরই হঠাৎ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পাওয়ার মত কপাল ফিরল। যে বড়লোকের মেয়েটিকে বাসনা পড়াত, তারি এক কাকার কল্যাণে। তিনি সিনেমা ডিরেক্টর।

বাসনা খুব একটা সুন্দরী নয়। তবে স্মার্ট। মুখশ্রী আর ফিগারও চমৎকার। ভয়েস টেষ্টে, ক্যামেরায় চমৎকার উৎরে গেল। অভিনয়ে আরো বেশী। দু একটা সাইড পার্টে নামতে না নামতেই রাতারাতি একেবারে নায়িকা বনে গেল। ডাক আসতে লাগল চারিদিক থেকে। মোটা টাকার কনট্র্যাক্টে।

স্থজিতের ভাল লাগেনি। আপত্তি করেছিল খুবই। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারের মতই এই ব্যাপারেও হার মানতে হল বাসনার ইচ্ছার কাছে। সংসারে টাকা কে না চায়? কে সুখী হতে না চায়? হাতের মুঠোয় এত বড় সুযোগ স্বেচ্ছায় এলে তাকে যে ছাড়ে সে তো নির্বোধ। কাঁচ-পোকা যেমন তেলা-পোকাকে টেনে নিয়ে যায়, স্থজিতের সব আপত্তি বাসনার যুক্তিতর্কে তেমনি ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তারপরই কলকাতা থেকে একেবারে বোম্বে। নতুন পাতা ঘর সংসার উঠে গেল। স্থজিত বাধ্য হয়ে ফিরে গেল বাড়িতেই। মায়ের কাছে।

প্রথমে বাসনা স্থজিতকে বোম্বেতেই থাকবার জন্যে বলেছিল। একটা চাকার জোগাড় করাও হয়ত অসুবিধা হতনা ওর পক্ষে। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী কেরিয়ারিস্ট বাসনা ব্যানার্জী এর মধ্যেই এ জগতের হালচাল ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। নাচতে নেমে যেমন ঘোমটা টানা চলেনা, অভিনেত্রীর পেশা নিয়ে তেমনই বিয়ে করা স্বামীকে নিয়ে একবাড়িতে বাস করাও অসম্ভব। যে লাইনের যেমন রীতি। নানা রকম লোকজনের আসা যাওয়া। মেশামেশি। আরো অনেক কিছুই করতে হয়। সেটা স্বামীর চোখের আড়ালে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি স্বামীকে ভবিষ্যতের জন্যে হাতের মুঠোয় রাখতে হয়।

সুজিতের বাড়ির সবাই খুশী। খৃশ্চান বউ মুক্তি দিয়ে চলে গেছে বোম্বাই। সুতরাং সুজিত আর একটা বিয়ে করুক।

কিন্তু এখানেও বাসনার প্রবল আপত্তি সার্থক হয়েছে। সুজিত বিয়ে করতে রাজী হয়নি। বাসনা মত দেয়নি।

কিন্তু একজন কলকাতা, অপর বোম্বাই। এভাবে বেশী দিন চলল না। বাসনা বুঝতে পারল সুজিতেরও একটা আলাদা সত্তা আছে। বিবাহিত জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে। বাসনাকে সে ভালবাসে। দুর্বিষহ বিরহ যন্ত্রণায় জ্বলতে সে মোটেই রাজী নয়। এ ভাবে কোন মতে দু এক বছর কাটানো যায়, কিন্তু চিরকাল যায় না। হঠাৎ যখন ইচ্ছে সুজিত ছুটে চলে আসতে লাগল বোম্বাই। বার বার ওকে ফিরে যাবার জন্যে জেদ ধরতে লাগল।

এর মধ্যে মা মারা গেছেন। সুজিত এবার বাসনাকে ভাল ভাবেই জানিয়ে দিল সংসারে আপত্তি করার মত আর কেউ নেই, সুতরাং বাসনা আর সুজিতের এবার সংসারী হবার পক্ষে কোন বাধাই নেই। আর যথেষ্ট রোজগার সে এখন করে, বাসনার সিনেমার প্লে করবার কোন প্রয়োজনই আর নেই।

কিন্তু ততদিনে বাসনার চরম অধঃপতন সুরু হয়ে গেছে। শুধু মদের নেশা নয়। অর্থ লালসাও নয়। উদ্দাম জীবনের মাদকতা সহস্র তন্তুর জালে বেঁধেছে ওকে নাগপাশের মত। ফিরে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। শান্ত নিস্তরঙ্গ গৃহস্থ বধূর জীবন ওর জন্যে নয়। বোধ হয় ওর রক্তেরই দোষ এটা। পার্টি, হোটেল, পিকনিক, জয়-রাইড, বার ড্রিঙ্কিং—এ না হলে আর চলে না। ভক্ত, স্তাবক, ফ্যান, নায়ক, প্রযোজক, ওদের না হলে বাসনার জীবন যৌবন শূন্যময়। একা সুজিত তার সহস্র অভাব পূর্ণ করতে পারবে না। ওকে হাতে রাখা শুধু অসময়ের সঞ্চয়ের জন্যে। বুড়োবয়সের আশ্রয়। যখন সবাই বাসনাকে ত্যাগ করবে, তখনকার জন্যেই থাক ও। এখন ওকে বাসনার কোন প্রয়োজনই নেই। বরং বাসনার এই উদ্দামজীবনে সুজিত মাঝে মাঝে হঠাৎ এখানে এসে অসুবিধা আর বাধার সৃষ্টি করে। বড় মুসকিলে পড়তে হয় তখন বাসনাকে।

বাসনার চেয়ে সুজিত বয়সেও ছোট। পাঁচ ছয় বছরের মত। সস্নেহ প্রশ্রয়—মনের কোণে আছেও খানিকটা। তাই ওর দিকটা না ভেবেও পারল না।

যে সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয় প্রত্যেক মানুষের জীবনে, স্বাভাবিক নিয়মে, তাকে কোন মতেই এড়িয়ে যাওয়া চলেনা। বাসনা নিজেকে দিয়েই তো সেটা বুঝতে পারছে।

ইদানীং ঘন ঘন আসতে সুরু করেছে সুজিত। বাসনাও বিপদে পড়ছে বার বার। ওর স্বাধীনতায়, কাজকর্মে বেশ অসুবিধাই সৃষ্টি হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, সতীলক্ষ্মীর মুখোসটা না খুলে পড়ে যায়। ওর আসল স্বরূপটা না জেনে ফেলে সুজিত। ওর ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা একমাত্র সুজিত—ওর স্বামী।

হঠাৎ মনে পড়ল লতিকার কথা। বাসনার আশ্রিতা প্রতিপালিতা। অল্পবয়সী সুশ্রী সুন্দর অতি ভীরু অতি লাজুক মেয়েটা লজ্জায় সঙ্কোচে সর্বদা যেন মাটিতে মিশিয়ে আছে। বাসনার একটা কথায় ও যেন জীবন দিতে পারে। হুগলির কোন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি ছিল। বাবা আছেন। সৎমা, তার চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে। সৎমায়ের দুর্ব্যবহারে পাড়াতুতো দাদার সঙ্গে বোম্বে পালিয়ে এসেছিল সিনেমায় নামবে বলে। শুটিং করতে তাদের গ্রামে কোন এক সিনেমা কোম্পানীর লোকেরা এসেছিল। তাদেরই একজন লোকের পাল্লায় পড়ে অল্পবয়সের অনভিজ্ঞতায়, অল্প বুদ্ধিতে পালিয়ে এসে দালালের ফাঁদে ধরা পড়ে। পাড়াতুতো দাদাটি উধাও হল। পরম দুর্গতি আর লাঞ্ছনা জুটল ওর কপালে। শেষ পর্যন্ত খবর পেয়ে বাসনাই ওকে আশ্রয় দেয়।

ওর বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিল বাসনা। মেয়েকে যেন নিয়ে যান উনি। অন্য কথা লেখেনি কিছুই। কিন্তু বাবার বদলে ওর সৎমা জবাব দিয়েছিল। অমন মেয়ের মুখ কেউ দেখতে চাননা তাঁরা। এখানে যদি এ চিঠি পাবার পরও ওই কুলখাকী ঘর-পালানো মেয়ে ফিরে আসে, এ বাড়িতে ওর জায়গা হবে না।

লতিকা বাসনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়েছিল। ওকে যেন তাড়িয়ে না দেয়। এখানে ও ঝিয়ের মতই সব কাজ করবে। এককোণে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকবে।

ছিলও তাই। পোষা কুকুরের মত। নিঃশব্দ নির্বাক। বাসনার ডান হাতের মতই। বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ।

সেবার সুজিত কঠিন অসুখ নিয়ে ভুগেছিল খুব এখানে এসে। বাসনা নিজে পারেনি। লতিকাই ওকে দিনরাত সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। লতিকা এ বাড়ি আসবার পর থেকে সুজিতের সব ভারই বাসনা ওর উপর ছেড়ে দিয়েছিল। নিজের সুবিধা আর স্বার্থের জন্যেই।

সুজিত যখন ভয়ঙ্কর রকম জেদ ধরে বসল—বাসনাকে না নিয়ে ও ফিরবে না। এমনভাবে একা একা ও থাকতে পারবে না, ভয় পেল বাসনা। পুরুষ মানুষ রক্ত-মাংস-লোভী শ্বাপদেরই সগোত্র। এভাবে দূর থেকে ভুলিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। আর কাছে রাখা আরো অসম্ভব তার পেশার পক্ষে।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর লতিকাকে কাছে ডাকল। দরজা বন্ধ করে বলল, 'বোসো। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

ভীরু লতিকা আরো ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বাসনার দিকে।

'তুমি জান, তুমি যে অবস্থায়, যে বিপদে পড়েছিলে, আমি না বাঁচালে আজ তোমার কী গতি হত?'

ছলছল কৃতজ্ঞ চোখে স্বীকার করল লতিকা সে কথা।

'তুমি জান, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তুমি আর কুমারী মেয়ে নও। যাদের হাতে পড়েছিলে, তারা তোমাকে—'

লতিকা শিউরে উঠল। ওর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সমস্ত শরীরে সেই বরফ-ঠাণ্ডা সরীসৃপের ঘৃণ্য স্পর্শের স্মৃতি জেগে উঠল। বিগত দিনের ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন!

'শোন। কোন ভয় নেই। এসব কথা কেউ কোনদিনও জানতে পারবে না। তোমার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা, দালালের হাতে পড়া—এসব একমাত্র আমিই জানি। আরো জানি তুমি সুজিতকে ভালবাস। ওকি? চমকে উঠলে কেন? শুধু বয়সে নয়, সংসারের অভিজ্ঞতায় তোমার চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞান আছে আমার। ভুলে যেওনা আমি সিনেমা-অভিনেত্রী। অভিনয় করা আমার পেশা হলেও সুজিতের প্রতি তোমার এই সেবাযত্ন সতর্ক সদাজাগ্রত পাহারা। এটা যে শুধু আমার কথায় কর্তব্য হিসেবেই কর, তা নয়। কিন্তু তাতে আমি বাধা দিইনি, কেননা এতে আমার উপকারই করেছ তুমি। ওর বয়স কম। অবুঝ। ওকে সামলাতে আমি পারব না। তাই তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব স্থির করেছি। এ ছাড়া ওকে হাতে রাখার আর কোন উপায়ই আমার নেই। আর ওকে আমি কোন মতেই হাতছাড়া করতে পারব না। তোমার কাছে কিছুই লুকোনো নেই। জীবনটাকে আমি উপভোগ করছি পূর্ণভাবে। আর ও বেচারী বহু দূরে আমার প্রত্যাশায় দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, এ অসম্ভব।'

লতিকা এত অবাক হয়ে গেল যে চমকাতেও ভুলে গেল। কোন স্ত্রীলোক যে তার নিজের স্বামী সম্বন্ধে এমন নির্বিকারভাবে কথা বলতে পারে, একথা অকল্পনীয় ছিল ওর কাছে। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে ও বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল বাসনার মুখের দিকে। অভিনয় নিপুণা নটীর দিকে।

'আমি তোমাকে ঘর দেব, স্বামী দেব, সংসার দেব। যা তুমি জীবনেও পেতে না।" বাসনা বলে চলল। 'কিন্তু একটি সর্ত থাকবে আজীবন। তোমাদের সংসারে কোনদিনও আমি যাব না। কোন অসুবিধা ঘটাবনা। কিন্তু যখনি আমার প্রয়োজন হবে, যখনি ওকে আমি ডাকব, তুমি কোনমতেই বাধা দিতে পারবে না। মনে রেখো, তোমার মৃত্যুবান, আমারি হাতে।"

এই নরক থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে লতিকাও বুঝি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কোন প্রতিবাদ করল না। করে কোন লাভ নেই, এটা ও জানত। বাসনা যে ওকে আরো কোন পাপের কোন কঠিন অবস্থার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়নি, এতেই ও শান্তি পেল। বাসনার অসাধ্য কিছুই নাই।

তবু কোন মতে বলল, 'উনি কি রাজী হবেন?'

বাসনা হাসল। বিজয়িনীর হাসি। ছলনাময়ী কুটিলার চতুর হাসি। 'আমার কথায় সুজিত মরতে পারে। তবে তোমাকেও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।'

সেবার বোম্বে থেকে সুজিত একা ফেরেনি। লতিকা চক্রবর্তী লতিকা ব্যানার্জী হয়ে, নববধূর বেশে ওর পাশে ছিল। ব্রাহ্মণ পুরুত ডেকে, হিন্দুমতেই বাসনা বিয়ে দিয়েছিল ওদের।

সে কি আজকের কথা?

নিজেকে মুক্ত রাখতেই ও সুজিতকে কলকাতায় বেঁধে রেখেছিল লতাকে দিয়ে। আর বহুবার বহু পরীক্ষা করেছে—বিশ্বাসঘাতকতা করেনি লতা।

ইচ্ছা না থাকলেও অনেক দুঃখেই ফিরে আসতে হয়েছে—বাসনাকে। সিনেমা জগতে নিত্য নতুন মুখের কদর। অসংখ্য উঠতি তারকার সুন্দর মুখের আলোয় বাসনা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মাসিপিসির পার্ট ছাড়া বড় একটা কেউ আর ওকে ডাকে না।

তাছাড়া বয়স হয়েছে। সুজিতের সঙ্গে এক সঙ্গে এম. এ. পাস করলেও ওর চেয়ে সে অনেক বড়। অনাথ আশ্রম থেকে অনেক বয়সেই ও ম্যাট্রিক পাস করেছিল। শরীরের মাংস-পেশী শিথিল। অমিতাচারের, উচ্ছৃঙ্খলতার অনেক ছাপই পড়েছে দেহে মনে মুখে চোখে। অনেক দামী বিদেশী ক্রীম-লোশনের প্রলেপেও আর তাকে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না।

এবার শেষ জীবনটায় শান্তি পেতে চায় বাসনা। সংসারী হতে চায়। সুজিতকে নিয়ে এত দিন পর ঘর বাঁধতে চায়।

সমস্ত রাত নানা ভাবনা চিন্তায় বাসনার ঘুম এলোনা, বার বার মনে পড়তে লাগল সুজিতের কথা। বোম্বাইয়ের জীবনে যাকে এক দিনও মনে হয়নি, কলকাতায় ফিরে এসে আর একদিনও তার অদর্শন সহ্য করতে পারছে না ও। রাগ হচ্ছে লতিকার উপর। হয়ত সেই আসতে দেয়নি। হয়ত সেই মেয়েই কলঙ্কের কথা ভুলে গিয়ে আটকে রেখেছে সুজিতকে।

পর দিন সকালেও সুজিত এলোনা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাবক হারা বাঘিনীর মত হিংস্র উত্তেজিত হয়ে উঠল বাসনা। টেলিফোন করল ওর অফিসে।

আর ও আশ্চর্য হল, সুজিত টেলিফোন ধর্‌ল্যতে। ও সুস্থই আছে। দিব্যি খেয়ে দেয়ে নিয়ম-মাফিক অফিসে এসেছে।

কচি খুকীর মত অনেক মান অভিমান চালাল বাসনা। অনেকক্ষণ ধরে। নতুন বিয়ের কনের মত।

'কী ব্যাপার গো? কাল এলেনা কেন রাত্রে? জানো সমস্তরাত তোমার জন্যে ছটফট করেছি? একটুও ঘুমোইনি'?

'আর বল কেন?' সুজিতের গলায় কৌতুক। আমিতো তোমার কাছে যাবার জন্যে রেডি। কিন্তু—সুজিত চুপ করল।

'কিন্তু কি? জান কতদিন, কত বছর তোমায় দেখিনি? লতিকা আসতে দেয়নি বুঝতে পেরেছি আমি।'

'না না লতিকা নয়। বরং ওই রাগ করতে লাগল আমি গেলাম না বলে। এমন একটা শক্ত পাল্লায় পড়েছি আজকাল, এড়ানোও যায়না, পালানোও যায় না। ছাড়তেই চায়না একদণ্ড—'

'নিশ্চয় কোন মেয়ের পাল্লায়। আর তুমি স্বীকার না করলেও মনে হচ্ছে সে মেয়ে লতিকা।' বাসনার কণ্ঠস্বর থেকে কিছুক্ষণ পূর্বের মিষ্টতা মধুরতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হুকুমের মতই বলে উঠল 'শোন, অফিসের ছুটির পর সোজা এখানে চলে আসবে। খাবে থাকবে। ভুল না হয়। আমি ডাকছি, একথা ভুলো না।'

মহারাণীর মতই আদেশ শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন রেখে দিল বাসনা। পাছে সুজিত অন্য কোন অজুহাত সুরু করে, সেই ভয়ে।

কিন্তু অফিসের পর নয়। প্রায় আটটার পর সুজিত ওর ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল।

অস্থির অধীর হয়ে বাসনা ওর প্রতীক্ষা করছিল। সুজিতের পরিবর্তনটা এত বেশী যে ও শঙ্কিত হয়েছিল।

ওকে দেখে আদরিণী অভিমানিনী ষোড়শী তরুণীর মত লিপষ্টিক মাখা ঠোঁট ফুলিয়ে ছল ছল চোখে বলল, 'এত দেরী হল কেন? আজকাল তুমি আমাকে আগের মত একটুও ভালবাসনা সুজিত। আমি বুঝতে পারছি। এত দিন পর এলাম অথচ—'

সুজিত সে কথার জবাব না দিয়ে একটু হাসল মাত্র। সে হাসি দেখে বাসনার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। এমন হাসি সুজিত হাসতে পারে একথা ভাবতেও পারেনি বাসনা কোনদিন।

অনেক বদলে গেছে ও—আমিই যেন ওকে চিনতে পারছি না।—বাসনা মনে মনে ভাবল। আমার চালে ভুল হয়েছে। লতিকার হাতে তুলে দেওয়া অন্যায় হয়েছে। অথচ এ ছাড়া ওকে ঠেকাতাম কি করে? প্রেমচাঁদ সিংয়ের আগেকার মেয়ে মানুষটি হঠাৎ খুন হয়ে গিয়েছিল,

একথা আমি ভুলতে পারিনি। তাই ওকে ডাকতে অথবা কাছে রাখতেও সাহস করিনি। আমি নর্দমার আকণ্ঠ পাঁকের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। আর প্রেমচাঁদ সিংয়ের হিংসা যে কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর তাও আমার জানা ছিল। আমার ধারে কাছে ও অন্য পুরুষকে সহ্য করতে পারতনা।

কিন্তু আমি যাই করি না কেন, সুজিত চিরদিনের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে এই সর্তই ছিল লতিকার সঙ্গে। ওই বোকা হাঁদা মেয়েটার সাধ্য নেই ওকে বেঁধে রাখে, আটকে রাখে আমার কাছ থেকে।

আজকাল তুমি আমাকে আগের মত একটুও ভালবাসনা সুজিত

খোলা দরজাটা বন্ধ করে সুজিতের বুকে মাথা রেখে দুচোখে গভীর কটাক্ষ ভরে বাসনা মুচকে হাসল। 'রাত্রে থাকতে হবে, মনে থাকে যেন।'

সুজিত ঘাড় নাড়ল, 'রাত্রে থাকা সম্ভব নয় বাসনা। ঘণ্টাখানেক বাদেই বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।'

'ইস! যেতে দিলে তো? যাও দেখি—কেমন করে যাবে?' দুহাতের আলিঙ্গনে সুজিতকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল বাসনা নিবিড় ভাবে।

বাসনার আলিঙ্গন থেকে অতি সহজেই নিজেকে মুক্ত করে সরে বসল সুজিত। 'এখানে রাত্রে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

সুজিতের গলার স্বরে, ভাবভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, বাসনার মনে হল যেন সুজিত তাই দিয়েই সজোরে ওর গালে প্রচণ্ড এক ঘা চড় কষিয়ে দিল। সুজিতের মুখের উপর ফুটে ওঠা সেই বিচিত্র হাসিটা ওর সমস্ত শরীরের শিরায় শোণিতে ভয়ের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। সুজিত যেন সেই সুজিত নেই!

তবু সব কিছু অপমান সহ্য করে নিপুণ অভিনেত্রীর মতই মুখের হাসি চোখের কটাক্ষ অম্লান রাখল বাসনা। 'সিমলায় যাবার কথা মনে আছে তো? তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। এ হোটেলে আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করতে না চাও, সিমলায় যেতেই হবে।'

এবার সুজিতও একটু সহজ হল। 'ছুটি পেলে তো?'

'ছুটি পাবে না কেন? ক'বছর তো একেবারে ছুটি নাওনি। যদি ছুটি না দেয়, কাজ ছেড়ে দেবে। সুজিত, আমার সমস্ত জীবনের সব উপার্জন সব তোমার জন্যেই রেখেছি।'

এবার সুজিত মনখোলা প্রাণখোলা হাসি হেসে ফেলল। 'বাসনা, আমার একটা মনিব? অফিসের মনিব তবু অনেক ভাল। আর একটি যা মনিব জুটেছে, তার কাঠগড়ায় আমি দিনরাত চব্বিশঘণ্টা আসামী হয়ে আছি। একরকম চোরের মতই, বলতে পারো।'

নিষ্ঠুর একটা শপথ উচ্চারণ করে—বাসনা মনে মনে বলল বুঝেছি। আমার নিজের জিনিষ ভুল করে চোরের হাতে তুলে আমি নিজেই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তো জানে না, সে জিনিষ উদ্ধার করার ক্ষমতাও আমার আছে? তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার ক্ষমতাও।

কিন্তু সুজিতের কথার উত্তরে সেকথা চাপা দিল বাসনা। 'নিউ আলিপুরের বাড়িটা শেষ হয়ে গেছে খবর পেলাম। সিমলার বাড়িটাও নতুন কিনেছি। ব্যাঙ্কের নগদ টাকাগুলো খানিকটা কমল। এবার সব দায়

তোমার। সব তোমার নামে লেখাপড়া করে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই সুজিত।'

সুজিত গম্ভীর হল। 'পুরুষ মানুষকে এত বিশ্বাস করতে নেই বাসনা, ঠকতে হয়।'

আবার দুহাতে সুজিতের হাতখানা বুকের উপর তুলে নিল বাসনা। আবার কাছে এসে বসল। দুচোখের তারায় সর্বস্ব সমর্পণের আকুলতা নিয়ে তাকাল সুজিতের দিকে। 'তুমি আমার ইহকাল পরকাল, সর্বস্ব। আমি তোমার। তুমি আমার। তুমি কি আমাকে ঠকাতে পার সুজিত? আমি যে তোমার সেই বাসনা। মনে পড়ে কলেজে পড়ার দিনগুলির কথা?'.........

......তবু বেঁধে রাখা গেল না! এত অভিনয় করেও!

তবু চলে গেল সুজিত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অভিনেত্রীর ছলাকলা মানঅভিমান হাসিকান্না কোনটাই আজ আর কাজে লাগল না।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের বিগত জীবনটার কার্যকলাপ নতুন করে বিচার করতে বসল বাসনা। সেই ফেলে আসা দিনগুলির কুশ্রী অসংযম বলগাহীন প্রবৃত্তির রাশ সংযত করে ফিরে আসা উচিত ছিল লতিকাকে ওর হাতে তুলে না দিয়ে।

সেদিনের সব সর্ত, সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছে বিশ্বাস-ঘাতিনী।

পথের মেয়ে ভুলে গেছে সব কিছু। চরম কলঙ্কের কাহিনী। স্বামীর ভালবাসায় মাথায় উঠেছে। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করে।

কিন্তু আর নয়। যথেষ্ট সহ্য করেছে বাসনা। এবার ওকে মাথা থেকে পথের ধুলোয় নামানোর সময় হয়েছে।

পরদিনই লতিকাকে মস্তবড় একখানা চিঠি লিখল। আগেকার সমস্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। ওর বিগত পুরোনো জীবনের সেই দালালের হাতে পড়ার চরম দুর্গতির কাহিনী কি লতিকা মাত্র কটাবছরে একেবারে ভুলে গেছে? যার সাক্ষী সাবুদ সব কিছু বাসনার হাতে মজুদ রয়েছে? ওকি চায় সে সব কথা সুজিতের কানে উঠুক?

সুজিতকে নিয়ে যেতে চায় বাসনা সিমলায়। লতিকা যেন বাধা না দেয়। গরম জামাকাপড় ইত্যাদি গুছিয়ে রাখে। কোন তারিখে কোন গাড়িতে যাবে, সব কিছুই সুজিতকে জানিয়ে দেবে বাসনা। বেশী দিন সেখানে তারা থাকবেনা—চিরদিনের মত সুজিতকে নিয়ে যাচ্ছে না বাসনা।

একবার কোনমতে নিয়ে যেতে পারলে, আর সুজিতের রক্ষা নেই। সহস্র লতিকাও বাসনার কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে না ওকে। স্বামী-স্ত্রীর আইনগত সম্বন্ধটাও যখন রয়ে গেছে। সব গিয়েও বাসনার এখনো যে রূপ-যৌবন আছে, তাতেই বাঁধা থাকবে সুজিত। জোলো, পানসে আটপৌরে লতিকার কি আছে? কি করে পুরুষকে ভুলিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে হয়, ষোলো বছর ধরে সে বিদ্যা শিখে শিখে চরম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে অভি-নেত্রী বাসনা।

এবার নিজের স্বামীর উপরই সে বিদ্যা প্রয়োগ করবে বাসনা ব্যানার্জী। দেখি কে হারে—কে জেতে।

মালপত্র পাঠানো হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ঘরবার করছিল বাসনা। বার বার ঘড়ি দেখছিল। সুজিত না আসা পর্যন্ত স্বস্তি-শান্তি কোনটাই ওর নেই।

কলিং বেলের শব্দে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ছুটে গিয়ে নিজেই দরজা খুলে দিল বাসনা। সুজিত এসেছে। 'এসেছ—এসেছ তাহলে তুমি?'

'এসেছি। তুমি ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি?' এই দেখ কাকে এনেছি। তুমি সেদিন বলেছিলে না, কোন শক্ত মেয়ের পাল্লায় আমি পড়েছি? এই দেখ সেই শক্ত পাল্লা। আমার মনিব। আমি যার কাছে চোর হয়ে থাকি। সত্যি বাসনা, তুমি ভাবতেও পারবেনা, এতটুকু মানুষের এত বড় ক্ষমতা আছে।'

একটা রঙিণ ডল পুতুলের চেয়েও সুন্দর, এক মুঠো স্বর্ণ চাঁপার চেয়েও অতুলনীয় প্রায় বছর দেড়েকের মত একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুজিত। সে মেয়ের বিস্ময় বিস্ফারিত দুই চোখে গভীর কাজলটানা। গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী রেশমের মত চুলে লাল ফিতে বাঁধা।

'ও—ওকে?' ভয়ে সংশয়ে বাসনা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'ও মৌটুসী। বছর খানেক আগে লতিকার এই মেয়েটাই হয়েছিল। তোমাকে ইচ্ছে করেই জানাইনি। হঠাৎ এখানে এসে ওকে দেখবে তাই।'

সস্নেহে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে গিয়ে বসল সুজিত। চোখে মুখে সন্তান স্নেহের অমৃতধারা। হেসে আবার বলল; 'তোমাকে হঠাৎ দেখিয়ে আশ্চর্য করে দেব বলে এতদিন চুপ করে ছিলাম। আর তা ছাড়া জানতোই, চিঠি লেখায় আমার কি কুড়েমি।'

দপ দপ করছে কপালের পাশের শিরা দুটো। মুখ গলা সব কিছুতেই একটা বিশ্রী তিক্ত আস্বাদ। বাসনার পরম শত্রু তবে এতদিন গোকুলে বাড়ছিল! লতিকা নয়—অন্য কেউই নয়—বাসনার প্রতিদ্বন্দ্বিনী তবে ঐ বছর দেড়েকেরও কম একরত্তি মেয়েটা! ঐ মৌটুসী! লতিকার গর্ভজাত সন্তান! সুজিতের আর লতিকার—

কোন মতে অশক্ত দেহটাকে নিয়ে সুজিতের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বাসনা। দুহাতে একটা চেয়ার আঁকড়ে ধরল। 'কিন্তু ওকে এখন নিয়ে এলে কেন? যাবার সময়?'

'তোমাকে দেখাতে। সত্যি করে বলতো দেখানোর মতই সুন্দর হয়নি কি? কিন্তু বাসনা এত বয়সেও তোমার ছেলেমানুষী গেল না? লতিকাকে তুমি কি বলে ঐ চিঠি লিখলে? ছিঃ।

সুজিতের এই ধিক্কার-ভরা ভর্ৎসনায় মুখোস খুলে গেল বাসনার। সাপের মত ফণা তুলে হিস্ হিস্ করে বিষ ঢালল, 'ও বুঝি বলেছে সব মিথ্যে কথা? জান প্রত্যেকটি কথা সত্যি? জান তার সব প্রমাণ সাক্ষী আমার কাছেই আছে এখনো? জান তুমি একটা নষ্ট-চরিত্রের মেয়েকে নিয়ে ঘর করছ?

'চুপ কর চুপ কর!' কঠিন কণ্ঠে ধমকে উঠল সুজিত। মৌটুসীর মায়ের নামে কোন নিন্দে করার অধিকার তোমার নেই। সে চিঠি আমি ওর হাতে দিইনি। ও দুঃখ পাবে তাই সে চিঠি পড়েই চেক শুদ্ধই ছিড়ে কুচি কুচি করে ফেলেছি।'

এত দরদ! এত ভালবাসা! লতিকা দুঃখ পাবে বলে এত সাবধানতা! মৌটুসীর মায়ের নিন্দে করার অধিকারও ওর নেই।

আত্মসংবরণে অসমর্থ বাসনা কর্কশ গলায় বলে উঠল, যে চিঠি আমি ওকে লিখেছি, সে চিঠি তুমি খুললে কোন অধিকারে?'

'পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়ে সে অধিকার বছর তিনেক আগে তুমিই আমায় দিয়েছ। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে কিছুই গোপনীয়তা থাকেনা। ভুলে যেওনা সে আমার স্ত্রী। আর একটা কথা তোমার জানা দরকার। ফুলশয্যার রাত্রে ওকে ছোঁবার আগে ও সমস্ত কথাই আমাকে খুলে বলেছিল। ওর সেই কলঙ্ক কাহিনী। একটা কথাও আমার কাছে লুকোয়নি লতিকা।'

দেহে মন স্নায়ু সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারটার উপর বসে পড়ল বাসনা অবসন্ন, মূর্চ্ছাহতের মত।

সুজিত বলে চলল; 'মউ আমার কী অবস্থা করেছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না বাসনা। আমার কোলে ও ঘুমোয়। আমাকে খাওয়াতে হয় ওকে। ওর সঙ্গে খেলতে হয়, গল্প বলতে হয়। ও আমাকে একেবারে ভরে রেখেছে। লতিকা আমায় পূর্ণ করেছে।'

'তাহলে তুমি যাবেনা? আমাকে একাই যেতে হবে? সিমলার অতবড় বাড়িতে আমি একা কী করে থাকব একবারও ভাবলেনা?'

বাসনার কণ্ঠস্বরে সর্বস্ব হারানোর ব্যাকুলতা। তবু তার মুখের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুজিত জবাব দিল, 'তোমাকে একা যেতে হবে না। থাকতেও হবেনা। প্রেমচাঁদ সিং আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি কলকাতায় এসে পৌচেছেন। তিনি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, এবং থাকবেন সিমলায়।'

যেটুকু মাটি পায়ের তলায় অবশিষ্ট ছিল, প্রচণ্ড ভাঙ্গনে সেটুকুও বন্যার অতল গর্ভে তলিয়ে গেল। বিক্ষুব্ধ আবর্তিত নদীর বুকে ভেঙ্গে পড়া ধ্বসের মত। দুরন্ত স্রোতে ভেসে যাওয়ার মত।

কিছু না ভেবেই, তলিয়ে যাবার মুহূর্তে কুটো ধরার মত বাসনা হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে দিল মৌটুসীর দিকে।

এতক্ষণ বাবার কোলে বসে মৌটুসী বিস্মিতভাবে অপরিচিত পরিবেশের দিকে তাকাচ্ছিল ভ্রুকুঞ্চিত করে। বাসনাকে হাত বাড়াতে দেখে মুখ ফিরিয়ে সজোরে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। বাসনার কাছে ও যাবেনা।

সুজিত হেসে ফেলল। 'ওর মা, পিসি ওরা সব

একেবারে সাদা সিধে। তোমার সাজ পোষাক দেখে ভয় পেয়েছে। নইলে মৌটুসী বড় লক্ষ্মী মেয়ে। সবার কাছেই যায়।'

সপাং করে একটা চাবুক বাসনার উৎকট অশালীন বেশ-ভূষায় রং-করা মুখের উপর পড়ল।

মায়ের কথা শুনেই মৌটুসী বায়না নিল। "মা দাবো। বাবা ওতো।'

'আঁর একটু বোসো না মা।'

'না বাবী তল। মৌ মা দাবে।' বাবার বুকে মাথা ঘষতে লাগল মৌ।

'আচ্ছা আচ্ছা চল।' তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুজিত। বাসনাকে উদ্দেশ করে বলল, 'নিজের চোখেই দেখলে তো আমার অবস্থা? ওকে ফেলে এক পাও কোথাও যাবার জো আমার নেই। আগেকার মত কি আর স্বাধীন আছি আমি?'

মেয়েকে সন্তর্পণে বুকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল সুজিত। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি ভেবে ফিরে তাকাল প্রাণহীন মূর্তির মত বসে-থাকা বাসনার দিকে। 'তা হলে আসি বাসনা। তোমারও রওনা হবার সময় হয়ে গেছে। তুমিও আর দেরী কোরোনা।'

বাসনা উঠলনা। নড়ল না। কোন কথার জবাব দিল না। চোখের জলে ওর সযত্ন রচিত মেক-আপ ধুয়ে মুছে বিশ্রী কদাকার হয়ে উঠেছে, টেরও পেল না।

শুধু ওর উৎকর্ণ দুই কানের ভিতর একটা অতি মিষ্টি অতি মধুর আধো আধো কচি গলার স্বর নীচে থেকে ভেসে এলো।

'বাবা বাবী তল। মা দাবো বাবা।'

'হ্যাঁ মাণিক। তোমাকে তোমার মায়ের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি সোনা।'

আর কোন কথা নয়।

সিঁড়িতে পায়ের জুতোর শব্দটুকুও আর শোনা গেল না।

দোসরা অক্টোবর

শান্তশীল দাস

একলা পথিক চলছে আজো, চলবে সে;
চলবে, তবু চলবে।
এপারে তার পায়ের ছাপ আর পড়বে নাকো,
নাই পড়ুক—তবুও সে ওপার থেকে বলবে:

হিংসা নয়, হত্যা নয়,
অস্ত্র দিয়ে হয় না জয়,
দাও ছুঁড়ে ওই সাগর জলে অস্ত্রগুলো, তারপরে
সবার সাথে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে হেসে প্রাণভরে
গান গেয়ে যাও 'এক' মানুষের, বিশ্বমাঝে আসন যার:
খণ্ড নয়, ক্ষুদ্র নয়, সবাই মানুষ মৃত্তিকার।

একলা মানুষ চলছে আজো, চক্ষে জলে কী প্রত্যয়;
পথ সুদূর, অনেক পথ হোকনা তবু নাইকো ভয়।

অস্ত্রাগারে অস্ত্র-গড়া চলছে কত; আস্ফালন
বিশ্বজয়ের! শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ
অস্ত্র নিয়ে—এই প্রহসন, এই মূঢ়তার শেষ কোথায়!
হায় অভিমান, হায় রে হায়।

বেঁচে-থাকার সহজ কথা সহজ করে বললে সে:
বলছে আজও ওপার থেকে, শুনছে কে?
কান আছে যার শুনতে পায়—
সব সমাধান এক নিমেষে, সত্য প্রেম আর অহিংসায়।

ভারতবর্ষের জন্মকথা

নরেন্দ্র দেব

১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে সুকিয়া ষ্ট্রীট (বর্তমানে কৈলাস বসু ষ্ট্রীট) ও বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটের মোড় বরাবর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর বোস কোম্পানীর ডাক্তারখানার বিপরীত দিকে 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দুজন উৎসাহী সদস্য হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। প্রমথনাথ ছিলেন 'কলিকাতা পোর্ট কমিশানার্স' অফিসের প্রধান কর্মচারী। এঁরা আবার পরস্পরের সহপাঠী-বন্ধু ছিলেন। 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠার পূর্বে এঁরা ছিলেন নট ও নাট্যকার ৺ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ 'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়নে'র দুই স্তম্ভ স্বরূপ। 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন' প্রথম শুরু হয়েছিল সুকিয়া ষ্ট্রীটে একটি ছোট ঘরে। পরে সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এরা উঠে আসেন চোরবাগানে মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে। ১৯০৭ সালে 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নে'র কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এঁরা 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের' সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের একান্ত অনুগত আরও কয়েকজন বন্ধু 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নে'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে ছিন্ন ক'রে এঁদের অনুগামী হন। তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করে 'ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাব' নামে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। আমিও এই সময় এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিই। ইভনিং ক্লাবের সভাপতি পদ গ্রহণ করেছিলেন হাস্যরসার্ণব কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সহ-সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক হয়েছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। আর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সব কিছুরই পশ্চাতে প্রধান প্রাণশক্তি স্বরূপ।

'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন' তাঁদের অবসর বিনোদনের তালিকায় নাট্যাভিনয়কেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু ইভিনিং ক্লাবে নাট্যাভিনয় ছাড়া ঘরে বসে খেলারও অনেক ব্যবস্থা হয়েছিল, যেমন, পিংপং বা টেবিল-টেনিস, বিলিয়ার্ড, সঙ্গীত, নৃত্য ও নানা বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া ইভনিং ক্লাবের গ্রন্থাগার ছিল একটি বিশেষ সম্পদ। নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এখানে পাওয়া যেতো হরিদাসবাবুর অকুণ্ঠ ও উদার বদান্যতায়। অল্পদিনের মধ্যেই ইভিনিং ক্লাব খুব জমে উঠেছিল এবং এর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁদের অভিনয়ের উৎকর্ষও ইভনিং ক্লাবকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও মাঝে মাঝে ক্লাবের বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হতেন। একবার দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাট্যকাব্যের অভিনয়ে ইভিনিং ক্লাবের সদস্যগণের সঙ্গে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালও বাল্মীকির ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকদের বিস্মিত ও মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও একবার ইভনিং ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে অভিনয় করতে সম্মত হয়ে বেশ কিছুদিন নিয়মিত এসে মির্জাফরের ভূমিকার মহড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে সে নাটকখানি আর শেষপর্যন্ত মঞ্চস্থ করা হয়ে ওঠেনি।

এর কিছুদিন পরেই দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরোধে 'ইভিনিং ক্লাব' তাঁর নন্দকুমার চৌধুরী লেনের (বর্তমানে ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট) 'সুরধাম' নিবাসের একতলায় উঠে এল। ক্লাবকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীর জন্য প্রতিমাসে বেশ মোটা টাকা ভাড়া দিতে হ'ত। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল বিনা ভাড়ায় আমাদের আশ্রয় দেবেন বলায় আমরা সানন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে তাঁর 'সুরধাম' ভবনে এসে বসলুম।

এর ফলে আমাদের মস্তবড় একটা লাভ হ'ল এই যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা আমাদের ক্লাবের সভাপতি

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভে ধন্য হতুম। তিনি আমাদের সঙ্গে গান-বাজনায় যোগ দিতেন। তাশ, দাবা ও বিলিয়ার্ড খেলতেন। নূতন নূতন গান ও নাটক লিখলে আমাদের শোনাতেন এবং শেখাতেন। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' 'ধনধান্য পুষ্পভরা' 'আজি গো তোমার চরণে জননী' প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের একাধিক জনপ্রিয় গান এই ইভনিং ক্লাবের সদস্যেরাই দেশে প্রথম প্রচার করেছিলেন নানা সভাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে ও বিভিন্ন সাহিত্যানুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে। আমাদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর শিশু পুত্রকন্যা দিলীপকুমার ও মায়া দেবীও গাইতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ণিমা সম্মেলনে'ও ইভিনিং ক্লাবের সদস্যরা সংগীত পরিবেশনের ভার নিতেন। 'পূর্ণিমা সম্মেলন' প্রতিমাসের পূর্ণিমার রাত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের গৃহে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হত।

এই সময়ে বাংলাদেশে যে-কয়টি মাসিকপত্র প্রকাশিত হ'ত তার মধ্যে ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকা খানিই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। যদিও ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য', ৺সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' প্রভৃতি আরও একাধিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'প্রবাসী' ছিল সমধিক সমাদৃত। এর পরেই ছিল 'ভারতী'র স্থান। একদিন ইভনিং ক্লাবের আসরে মাসিকপত্র নিয়ে আলোচনার অবকাশে প্রস্তাব ওঠে যে 'প্রবাসী'র চেয়ে আরও উৎকৃষ্টতর ও বহু বিষয়-সম্বলিত একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র প্রকাশ করা কি সম্ভব নয়? যতদূর মনে পড়ে বন্ধুবর স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যই এই প্রস্তাব করেন। স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসাহিত হয়ে উঠে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু, এতবড় একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করতে হ'লে তার জন্য যে বিপুল প্রস্তুতির প্রয়োজন কে তার ভার নেবে? স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য স্বেচ্ছায় সে ভার গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন। ধীরে ধীরে এই পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠলো। পত্রিকার নাম কি রাখা হবে এবং এ পত্রিকার সম্পাদকই বা কাকে করা হবে? ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকা সে সময় সবিশেষ জনপ্রিয়। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারে 'প্রবাসী' পত্রিকার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যেক খ্যাতনামা লেখক ও লেখিকাগণের সুখপাঠ্য রচনায় 'প্রবাসী' তখন সবচেয়ে সম্পদ-শালী মাসিকপত্র। প্রবাসীর সঙ্গে কি প্রতিযোগিতায় নূতন কোনও পত্রিকা দাঁড়াতে পারবে?

প্রমথনাথ ছিলেন দুর্জয় আশাবাদী। তিনি বললেন, হরিদাস যদি অর্থব্যয়ে কৃপণতা না করে তাহলে আমি প্রথম বৎসরেই কাগজখানিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবো। আরও একটি ভার হরিদাসকে নিতে হবে। বাংলা দেশের প্রায় সব কজন নাম-করা লেখককেই হরিদাসের কাছে তাঁদের পুস্তক প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আসতেই হয়, হরিদাস এই নূতন কাগজের জন্য তাঁদের সকলের কাছ থেকে নিয়মিত লেখাসংগ্রহ ক'রে দিক। তার অনুরোধ কেউ এড়াতে পারবেন না। আমি এই কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক সংগ্রহ করার দুরূহ ভার নিজের হাতে নিতে প্রস্তুত। ইভনিং ক্লাবের সদস্যগণের মধ্যে অন্তরঙ্গ আরও কয়েকজন উৎ-সাহিত হয়ে উঠে স্বেচ্ছায় এই প্রস্তাবিত নবপত্রিকা-খানিকে সকল দিক দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন।

তখন দলবেঁধে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আমাদের পরিকল্পনা পেশ করা হল এবং তাঁকে এই পত্রিকার নামকরণ করে দিতে এবং সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হল। পত্রিকায় প্রতিমাসে কি কি পাঠ্য বিষয় থাকবে, কিভাবে চিত্র-শোভিত করে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম তারিখে প্রকাশ করা হবে, কোন প্রেসে এবং কী কাগজে এই পত্রিকা ছাপা হবে, তার বিশদ বিবরণ তাঁর সামনে উপস্থিত করা হ'ল। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনে এবং পত্রিকার একটি খসড়া দেখে আমাদের খুবই উৎসাহ দিলেন। পত্রিকার নামকরণ করলেন "ভারতবর্ষ"। কাগজ-খানির সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতেও সম্মত হলেন। সর্ত হল একটি লাইনও তাঁর বিনানুমতিতে কাগজে ছাপা হবেনা। হরিদাসবাবু ও প্রমথবাবু সানন্দে সে প্রতিশ্রুতি

দিলেন। তখন, দ্বিজেন্দ্রলাল মহা উৎসাহে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজনে লেগে গেলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘকাল ছুটিতে ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের শাসন বিভাগের কর্ম থেকে অবসর নেবার আবেদন করেছেন। কাজেই, হাতে অবকাশ ছিল যথেষ্ট। অবশ্য নাটক রচনা তাঁর চলছিল সমানেই। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর নাটকগুলির প্রকাশক। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা তাঁরাই প্রকাশ করবেন শুনে নিশ্চিন্ত মনে দ্বিজেন্দ্রলাল এ প্রচেষ্টায় যোগ দিলেন। কারণ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকপ্রকাশ ব্যাপারে কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সততার উপর তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

মহাসমারোহে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের অয়োজন শুরু হয়ে গেল। তখন ইংরিজী ১৯১২ সালের শেষাশেষি। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে বাঁকুড়ায় ডেপুটি কালেক্টারের পদ থেকে বদলী হয়ে মুঙ্গের যাবার আগে কলকাতায় এসেছিলেন। এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আর কাজে যোগ দিতে পারেন নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাখানি বাংলা ১৩২০ সালের বৈশাখ থেকেই প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল সকলেরই, কিন্তু সেই বিরাট আয়োজনের পক্ষে সময় অল্প থাকায় 'ভারতবর্ষ' আষাঢ় ১৩২০ সাল থেকে প্রকাশ করা স্থির হয় এবং সেই অনুসারে প্রমথবাবু একখানি সচিত্রসুন্দর 'বিজ্ঞপ্তিপত্র' বা ঘোষণা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা পুস্তিকায় সম্ভার থাকবে, কি কি বিষয়ের অবতরণা করা হবে, কত ফর্মা, কত পৃষ্ঠা, কত ছবি প্রকাশিত হবে। বিশিষ্ট লেখকগণের প্রতিকৃতি শোভিত হয়ে এই পুস্তিকাখানি সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। এটাও এ দেশে মাসিকপত্র প্রকাশের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার! ফলে সারা বাংলা দেশে একটা সাড়া পড়ে গেলো। সকলেই উদ্‌গ্রীব আগ্রহে এই পত্রিকাখানি প্রকাশের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল পত্রিকার নাম 'ভারতবর্ষ' রেখে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্য তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত 'ভারতবন্দনা' সংগীতটি রচনা করে রেখে ছিলেন—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগত্তারিণী! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল "জয়মা জগন্মোহিনি জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় জন্য তিনি সম্পাদকীয় বক্তব্যের 'সূচনাটি' নিবেদন করবার জন্য লিখে রেখেছিলেন।

ইং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ বাংলা ১৩২০ সালের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবে স্থির হয়ে গেল। একেবারে তিন মাসের মতো বিবিধ রচনা সংগৃহীত হয়েছে। কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর 'প্যারাগন' প্রেসে ছাপাবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সালে ইং ১৩ই মে ১৯২০খৃষ্টাব্দে বিকেল পাঁচটা নাগাদ খবর পাওয়া গেল দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। তাঁর জীবন সংকটাপন্ন। এই দুঃসংবাদ শোনবা মাত্র তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং ইভনিং ক্লাবের হরিদাস বাবু, প্রমথবাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন সদস্য 'সুরধামে' ছুটে এলুম। কিন্তু চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাত্রি সওয়া ৯টা নাগাদ সকলকে কাঁদিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল মহাপ্রস্থান করলেন। বাংলার এক প্রতিভা-প্রোজ্জল সূর্য অস্তমিত হল।

এই নিদারুণ আঘাতে অবসন্ন হ'য়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু যে সংকল্প কার্যে পরিণত করবার সকল আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছে, বহু অর্থও ব্যয় হয়েছে এর পিছনে—তা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে কেউই মত দিলেন না। কাজেই, শোকাবেগ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ণ উদ্যমে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের প্রস্তুতি চললো। সমস্যা দেখা দিল দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্য সম্পাদকের আসনে কাকে এনে বসানো যায়! অবশ্য, স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ দ্বিজেন্দ্রলালের সহকারী রূপে গোড়া থেকেই

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে ছিলেন, তা'হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের আসনে তাঁকে বসাতে উদ্যোক্তারা সাহস করলেন না। অবশেষে তাঁরা অনেক চিন্তা করে তদানীন্তন সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ লেখক ও সাংবাদিক ৺জলধর সেনকে আমন্ত্রণ জানালেন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদনা ভার নেবার জন্য। জলধরবাবু স্বর্গতঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর পুত্রগণের অনুরোধে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন, অতঃপর এই নবজাত পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই উভয়ের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়াই স্থির হল।

কিন্তু বৃহৎকর্মে বিঘ্ন উপস্থিত হয় নানা দিক দিয়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু যাঁরা প্রায়ই তাঁর বৈঠকে হাজির থাকতেন, যেমন, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বরদাচরণ মিত্র, দেবকুমার রায়চৌধুরী, অক্ষয়কুমার বড়াল, রসময় লাহা প্রভৃতি আরও অনেকেরই, সকলের নাম আমার স্মরণ নেই—'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা-পুস্তিকায় যাঁদের মধ্যে অনেকেরই চিত্রসহ নাম ঘোষণা করা হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁরা নিয়মিত লিখবেন বলে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের স্বর্গারোহণের পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ঘোষণা করলেন—'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই এবং তিনি উক্ত পত্রিকার লেখক শ্রেণী-ভুক্ত নন। তিনি তাঁর নিজের কাগজ 'সাহিত্য' পত্রিকারই একনিষ্ঠ সেবক। শুধু এই কথা ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তাঁর পরিচিত একাধিক বিশিষ্ট লেখককে 'ভারতবর্ষে' যাতে তাঁরা রচনা না দেন সে অনুরোধও করেছিলেন। তাঁদের মুখ থেকে এ খবরও আমাদের কানে এসে পৌঁছলো। হরিদাসবাবু এতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হলেন না। কারণ, 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের মাত্র কিছুদিন পূর্বেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় নিজ-সম্পাদিত 'ছিন্ন-হস্ত' নামে একখানি উপন্যাসের সর্বস্বত্ব বিক্রয় করে দিয়ে গিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু সমাজপতি মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সতর্ক করে না দিয়ে, ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সেই 'ছিন্নহস্ত' উপন্যাসখানি ছাপতে শুরু করে দিলেন। তখন যাঁদের যাঁদের তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা দিতে নিষেধ করেছিলেন তাঁরা সমাজপতি মহাশয়কে পাকড়াও করে জানতে চাইলেন এর অর্থ কি? আপনি আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা দিতে নিষেধ করে শেষে নিজেই 'ভারতবর্ষে'র জন্য কলম ধরেছেন? সমাজপতি মহাশয় তখন দারুণ অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য বললেন—ও লেখা আমার নয়। আমার নাম জাল করে ঐ উপন্যাসখানি প্রকাশ করা হচ্ছে। একথা শুনে অনেকেই ছুটে এলেন হরিদাসবাবুর কাছে এবং সমাজ-পতি মহাশয়ের অভিযোগের কথা জানালেন। হরিদাসবাবু কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে তাঁদের 'কপিরাইট' কেনার ফাইলটি বার করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সই করা সর্বস্বত্ব বিক্রয়ের 'কবলাখানি' দেখিয়ে দিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি মহাশয়ের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষরের সঙ্গে তাঁদের সকলেরই পরিচয় ছিল। তাঁরা তো সেই 'বিক্রয় কবলা' দেখে বিস্ময়ে হতবাক! এই নির্বুদ্ধিতার ফলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য' পত্রিকার যে কোনও ক্ষতি এসে পৌঁছয়নি এমন কথা বলতে পারলে সুখী হতুম।

যাইহোক্, 'ভারতবর্ষ' যথাসময়ে প্রকাশিত হ'ল। 'প্রবাসী' পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল তখন তিন টাকা। ভারতবর্ষের বার্ষিক মূল্য করা হয়েছিল তার দ্বিগুণ! অর্থাৎ ছ'টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যাও দেওয়া হয়েছিল দেড়া। চিত্র সংখ্যা অসংখ্য। একাধিক ত্রিবর্ণ চিত্র ও একবর্ণ চিত্র। গল্পগুলিও সচিত্র ক'রে ছেপে 'ভারতবর্ষ'ই প্রথম বিদেশী মাসিকপত্রের মর্যাদা এনে দিয়েছিল দেশীয় পত্রিকার ইতিহাসে।

দেখতে দেখতে 'ভারতবর্ষ' সারা বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙালীদের প্রিয় মাসিকপত্র হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষের গ্রাহকসংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়ে চললো। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের প্রাণপাত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সবদিক দিয়ে সার্থক হ'য়ে উঠলো। ইনিই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'ভারতবর্ষে' লেখবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে পত্র লেখেন। শরৎচন্দ্র তখন ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনে বাস করছিলেন। বন্ধুবর প্রমথনাথের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন। ইতিমধ্যে ৺ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা-

দেশের পাঠকেরা সে রচনা পড়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' গল্পটি পড়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনিও প্রমথবাবুকে অনুরোধ করেন—ভারতবর্ষের জন্য শরৎচন্দ্রের লেখা 'গল্প' সংগ্রহ করতে। কিন্তু প্রমথবাবু যখন তাঁকে 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপি এনে দিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তা' পড়ে মুগ্ধ হলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে এ উপন্যাস তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্রে তিনি ছাপতে পারবেন না। মেসের ঝিয়ের সঙ্গে প্রেম তিনি বাংলা সাহিত্যে আমদানি করার বিরোধী।

কারণ, এই ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্বেই কাব্যে ও সাহিত্যে দুর্নীতি নিয়ে তিনি খুব লেখালেখি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' যে কত বেশি দুর্নীতিদুষ্ট ও রিরংসা-উদ্যোতক তারই প্রমাণে তিনি প্রবলভাবে লেখনী পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন। এর ফলে রবীন্দ্রভক্তের দলকে তিনি রুষ্ট করে তুলেছিলেন। তাঁরাও দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' প্রভৃতি নাট্য-কাব্যে ও হাসির গান ও কবিতায় কোথায় কোথায় অশ্লীলতার চূড়ান্ত আছে তা' খুঁজে খুঁজে উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছিলেন 'ভারতী' ও 'মানসী' পত্রিকা দু'খানিতে। কাজেই দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রের লেখা 'চরিত্রহীন' 'ভারতবর্ষে' ছাপতে পারলেন না। কিন্তু প্রমথবাবু ছিলেন অত্যন্ত জেদী ও নাছোড়বান্দা মানুষ। তিনি ভীষণভাবে অনুরোধ উপরোধ করে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের লেখা ভারতবর্ষের জন্য আদায় করে ছাড়লেন। 'ভারতবর্ষে'র প্রথমবর্ষের পৌষ সংখ্যাতেই শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাস প্রকাশিত হ'ল। এর ফলে 'ভারতবর্ষে'র যশ ও খ্যাতি আরও ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো।

ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যায় যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য, যেমন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অনুরূপা দেবী, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কবিশেখর কালিদাস রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে থাকবার সৌভাগ্য এই অধমেরও হয়েছিল। তখন আমার বয়স মাত্র পঁচিশ।

বর্ষণসিক্ত আষাঢ়ে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হল। যে বিরাট পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা নিয়ে 'ভারতবর্ষ' দেখা দিয়েছিল বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে তার বিলম্ব হলনা। জলধরদাদা ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় যুগ্মসম্পাদক হ'লেও এর অন্তরালে ছিলেন যে কর্মীগণ তাঁদের মধ্যে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য প্রধান। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অকুণ্ঠ সেবা ও ঐকান্তিক সহযোগিতা ভিন্ন 'ভারতবর্ষে'র প্রকাশ সম্ভব হত না। আজ এই পঞ্চাশ বছরের সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহে তাঁদের কথাই সকলের চেয়ে বেশি করে স্মরণে জেগে উঠছে। আজ আর তাঁরা কেউ ইহলোকে নেই। তাঁরা বেঁচে থাকলে এই আনন্দ আজ আমাদের সার্থক ও সম্পূর্ণ হত।

দ্বিতীয় প্রকৃতি

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তুফান—তোলপাড় অথৈ গাঙে যেন না' পেল অধিকারী বটুকদাস।

সহর্ষে বলে উঠলো : শুনেছ তো মাষ্টার মোর সুবল-সখার কথাটি ? বাস্, হয়ে গেল সমস্যাটির সমাধান। চুকে গেল ল্যাঠা।

তবু দ্বিধাভরে মধুময় আর একবার জিজ্ঞাসা করলো : ঠিক পারবে তো সুবল ভয়াসুরের পার্ট ?

ঝাঁ করে ঝুঁকে পড়ে ধাঁ করে এক খাবলা মধুময়ের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে সুবল জবাব দিল : তুমার আশীবাদ পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি, আর ইটা পারবো নাই মাষ্টার ? খুব পারবো, দেখো নিও কেনে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল বটুকদাস।

মধুময়েরও দুর্ভাবনা মিটলো।

ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে দুভাবনা হবার কথাই বটে।

মরশুমের ক্ষেপ—এবার হয়েছিল সহর কোলকাতার বিখ্যাত পেশাদার যাত্রার দল "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি"। গাঁ থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে গড়গড়িয়ে চলছিল তার মসৃণ-চক্র জয় রথ।

হঠাৎ...

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেই চালু রথ রাঢ়দেশের পিয়ালফুলী গাঁয়ে এসে। অচল হবার জোগাড়। পাঁচ-রাতের বায়না। প্রথম-রাতে গান হোল প্রচুর যশের সঙ্গে। হৈ হৈ পড়ে গেল খ্যাতিতে। আর সেই রাতের সাফল্যের "সাইত" (আনন্দোৎসব) করতে অভিনয়ান্তে আকণ্ঠ "কাঁচি" (চোলাই মদ) গিলে বেসামাল বেহেড় হয়ে দলের অন্যতম "নম্বরী অ্যাক্টর" (বক্স আর্টিষ্ট) ভূষণ মালাকর অসমতল রুক্ষ মাঠে হোঁচট খেয়ে ঠ্যাং ফুলিয়ে কলাগাছ করে পড়ে রইল ডালাই-এর বিছানায়।

আকাশ ভেঙে পড়লো অধিকারী বটুক দাস আর পরিচালক মধুময়ের মাথায়। উপায় ?

ডার্ক রোল্-এ ভূষণ মালাকারের তুলনা নেই। সেই ভূষণই যদি গোদা পা নিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে কোঁকায়, তাহলে পরদিনই "ধর্মের জয়" পালায় ভয়াসুরের অমন বিরাট পার্টটা চালবে কে ? মাত্র একটা লোকের বিহনে চল্লিশ জনের গোটা দলটা বসে থাকবে ? কেঁচে যাবে অমন লোভনীয় বায়না ? মধুময়কে পাকড়াও করে ডুকরে উঠলো অধিকারী বটুকদাস : মাষ্টার, বাঁচাও হে মোরে একটি উপায় করে !

মধুময় পেশাদার যাত্রাদলে নবাগত। এখনও বছর চারেক কাটেনি। রপ্ত হয়ে ওঠেনি এখনও এদের বিচিত্র যত রেওয়াজ-রহস্য। শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। পেটের দায়ে একান্ত নাচার হয়েই দলে এসেছিল। কিন্তু অদৃষ্ট তার সুপ্রসন্ন। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, আর আভিজাত্যের মূলধনে হয়ে উঠেছে দলের ছোটবড় সব্বার সমীহের পাত্র। খেতাব জুটেছে—"মাষ্টার"।

পেশাদার যাত্রাদলে ও-খেতাবটা একমাত্র গুণীভাবী—সম্মানীয়দেরই প্রাপ্য।

একটা পালাও লিখে দিয়েছিল মধুময় দলের জন্যে। সে-পালা ডেকেওছে ভাল। ফলে, ক'বছরের মধ্যে মধুময় হয়ে উঠেছে ওদের দলের পরিচালক। বিপদে-আপদে সবার বিপত্তারণ।

ভাবনায় পড়েছিল মধুময়ও। কোনও উপায় ওরও মাথায় আসছিল না।

খেই ধরিয়ে দিয়ে বটুকদাসই বললো : দেখ না কেনে একটিবার সুবলরে কয়্যে। উটার তো ই পালায় "বস্তি" বটে, কুনও পার্ট নাই।

: সুবল? ওতো কখনও ডার্ক্-রোল করেনি। পারবে কি?

: আহা, কুনও প্রেকারে কাজটি ঠেকা দিয়ে চালাতে পারবে নাই একটি রাত? তুমি কইলে না করবে নাই হে। আর দিব—দিব উটারে ঠেকা-পার্টের তরে ডবল ঠিকা (রোজগণ্ডা)।

নাছোড়বান্দা বটুকদাস।

সুবলকে তাই বলতেই হোল কথাটা।

সুবল যে সঙ্গে সঙ্গে অতবড় দায়িত্বটা নিতে রাজি হবে, তা কিন্তু আশাই করতে পারেনি মধুময়।

সুবল সখার পুরো নাম—সুবল সামন্ত।

রাঢ় অঞ্চলের কোন এক গাঁয়ে বাড়ি। গানের দলে আছে ছোটবেলা থেকে। আগে ছিল "একানে ছেলে।" বৃষকেতু সাজতো। সাজতো গয়াসুর, একলব্য, বালক শ্রীকৃষ্ণ।

এখনও কৃষ্ণ সাজে। বড় কৃষ্ণ। সাজে রাম, নারায়ণ। সুইট রেলে। শুধু ঠাকুর দেবতার পার্ট।

যেমন চমৎকার মানায়, তেমনি মিষ্টি অভিনয়। কৃষ্ণ সেজে দেখা দিলে তো আসরে হৈ হৈ পড়ে যায়। মনে হয় যেন ছবির মূর্তি জীবন্ত হয়ে নেমে এসেছে মাটির দুনিয়ায়। মুগ্ধ শ্রোতার দল—বিশেষতঃ গাঁয়ের মেয়েরা—দলে দলে সাজঘরে ছুটে আসে। ধন্য হয় তারা কাছ থেকে একটিবার কৃষ্ণদর্শন করে। কৃতার্থ হয়ে গলায় আঁচল দিয়ে সামনাসামনি ভক্তিভরে ভূমিষ্ট প্রণাম করে।

প্রথম প্রথম প্রবল আপত্তি জানাতো সুবল। কিছুতে রাজি হোত না ওদের দর্শন দিতে, প্রণাম নিতে।

ক্রমে ক্রমে হার মেনে ছেড়ে দিয়েছে। বুঝেছে, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই। এইসব গ্রামীণদের কাছে যাত্রাওলাদের প্রত্যেকের অভিনীত চরিত্রটিই তার একমাত্র পরিচয়, তার সত্যস্বরূপ। অভিনয় আসরের বাইরে যেটা তাদের প্রকৃতই আসল রূপ আর পরিচয়, সেটার খোঁজ এরা রাখেনা, মাথাও ঘামায়না তা নিয়ে। তাই যাত্রাপালার কৃষ্ণ এদের কাছে আরাধ্য ইষ্ট, আর মহিষাসুর হোল ভীতিপ্রদ দুর্জন।

গোড়ার দিকে এহেন ভক্তি আর প্রণামের হিড়িকে পড়ে শিটিয়ে উঠতো সুবল।

মধুময়ের শরণাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করতো : মাষ্টার, ইটায় আমার পাপ হবে নাই?

কেন? কীসের পাপ?

: আমি মানুষ, চাষীর ব্যাটা, দেবতার ভাগ নিয়ে মোর পাপ হবে নাই?

: অভয় দিত মধুময়।

বুঝিয়ে বলতো : প্রণাম ওরা তোমাকে করে না সুবল। তোমার ভিতর দিয়ে প্রণাম পাঠায় ওরা ওদের কল্পনার ঠাকুরকে অন্তরের আরাধ্যকে। তুমি বাহক। তুমি আধার। তুমি মাধ্যম। ব্যস, এইটুকু মাত্র। আর ভয় পাবারই বা এতে কী আছে। হলেই বা চাষীর ছেলে। ঠাকুর তো তোমার মধ্যেও আছেন। ওদের প্রণাম তুমিই না হয় তাঁকে পৌছে দিও।

তবু আশ্বস্ত হতে পারেনি সুবল।

খুঁতখুঁত করে বলেছিল : তুমি কইছ, আমি হইছি বটে মন্দির একটি, ভিতরে রইছে উদের ঠাকুর?

: ঠিক তাই।

তালে তো মাষ্টার আমারে ইথন হত্যে হবে, না কী কও? দেবথানটি তো পবিত্র রাখত্যে হবে।

: বেশ তো বাধা দিচ্ছে কে? শুদ্ধাচারে থাকবে, একটু আধটু জপ-পূজা করবে, এতো ভাল কথা।

বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিল সুবল মধুময়ের কথাগুলো।

সেই থেকে আরম্ভ হয়েছিল তার সংযম, শুদ্ধাচার আর নিত্য পূজা। তিথি-পার্বণে নিয়মিত উপোস সুরু করেছিল। দলের অনেকে তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। গ্রাহ্যই করেনি সুবল। আচার-নিষ্ঠা তার ব্যাহত তো হয়ইনি কোনদিন, উপরন্তু আরও বেড়েছে। প্রথমে যা ছিল নিছক অনুষ্ঠান, এখন তা হয়ে উঠেছে নিত্যকর্তব্য—ধর্ম।

যাত্রাদলে প্রায়শঃ প্রচলিত কোনও কদভ্যাস প্রলুব্ধ করতে পারেনি সুবলকে। কোনও সহকর্মী তাকে দলে ভেড়াতে পারেনি।

মদ কোনদিন স্পর্শ করেনি সুবল। জুয়া খেলেনি একটি দিন। কথায় কথায় পঙ্কালোচনা আর অশ্রাব্য খিস্তির ঝড়বন্যা বয়, সেখানে ওসব তো দূরের কথা, সুবলের মুখে কেউ কোনদিন একটা কটুকথাও শোনেনি। সদাই হাসিমুখ। সদা প্রসন্ন। নালিশ নেই, অভিযোগ নেই, বিরূপতা নেই তুনিয়ার কারও বিরুদ্ধে।

পথে-ঘাটে দলের অনেকেই দল বেঁধে হানা দেয় পণ্যাপল্লীতে। তাতে ওদের লজ্জা নেই, অপমান নেই। যেন খাওয়া-পরার মতনই ওটাও একটা অবশ্যপালনীয় নিত্যকর্ম। কতবার কত জনে হাত ধরে টেনেছে সুবলকে। কিছুতে দলে ভেড়াতে পারেনি কেউ। আগে সুবল মিনতি জানিয়েছে। তারপর হয়তো কেঁদেই ফেলেছে।

অথচ পথে-গাঁয়ে ওকে ঘিরেই সব চেয়ে বেশি জমে নারীর ভিড়।

কৃষ্ণ মোহে কত বিহ্বলা। কুলবধূ। রাজবধূ। সবাই। প্রণাম নেয় সুবল। স্মিতকণ্ঠে প্রসন্নহাস্যে শুভকামনা জানায় সবার। ভেদাভেদ নেই ওর কাছে। সবাই সমান। সবাই এক।

একবার···

কাণ্ডটা ঘটেছিল রতন-গড়ের রাজবাড়িতে।

রাজপ্রিয়া প্রিয়াবাঈ পাগল হয়ে উঠলো।

সব ছাড়তে রাজি সে সুবলের জন্যে। সব করতে প্রস্তুত। শুধু যদি সুবল···

মিনতি জানালো রূপসাগরিকা পিয়ারাঈ। পায়ে ধরে কাঁদলো। লোভ দেখালো। ভয় দেখালো।

দলের আর সবাই ঈর্ষায় আর আপশোষে হায় হায় করতে লাগলো।

সুবল কিন্তু নির্বিকার। একটুও টললো না।

বললো: সিটা হবে নাই পিয়াবাঈ।

: কেন? জানো—কত পুরুষ এই পিয়াবাঈয়ের একটু দয়ার জন্যে পায়ে ধরে কেঁদেছে, আত্মহত্যা করেছে?

: তারা মানুষ না পিয়াবাঈ, অমানুষ। পুরুষ না, কাপুরুষ।

লজ্জায়—অপমানে ফুঁসিয়ে উঠলো পিয়াবাঈ: এতো দেমাক তোমার? তুমি আমাকে কী ভাবো বলতো?

স্মিতকণ্ঠে জবাব দিল সুবল: মেয়েরা আমার মা-বুন পিয়াবাঈ।

এরপর আর মুখে জবাব দেয়নি পিয়াবাঈ। ঠাস্-ঠাস্ করে আচমকা সুবলের তু'গালে তুটো চড় বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল।

সুবল রাগ করেনি।

স্মিতহেসে শুধু বলেছিল: বেজায় রেগে গেইছে। ঠাকুর উটারে শাস্তি দিবে।

আজও দলের অনেকে সেকথা বলে ওকে ঠাট্টা করে, ক্ষ্যাপাতে চায়।

রাগ করে না সুবল। আজও হাসে। ঠিক সেদিনের মতই স্মিত হাসে।

সেই সুবল যে কি করে অমন একটা ডার্ক-রোল চালবে, তা নিয়ে বিলক্ষণ তুর্ভাবনা ছিল মধুময়ের।

বটুকদাসের মতন একজনের "ঠেকা পার্ট" ধাঁ করে ধরে-বেঁধে আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

সুবল কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি। বরং নতুন একটা কিছু করবার সুযোগ পেয়ে সে মহানন্দে মেতে উঠেছিল। সারাদিন বইখানাকে কাছ ছাড়া করেনি। থেকে থেকে পাকড়াও করে এখান-ওখানটা দেখিয়ে নিচ্ছিল।

মুখে শুধু একবুলি: আজ রেতে একটি খেল যা দেখায়ো দিব মাষ্টার, দেখ্যে নিও কেনে—হ্যাঁ!

তা দেখে নিয়েছিল বটে মধুময়।

দ্বিতীয় অঙ্ক পেশ হোল। অবাক হোল মধুময় সুবলের কৃতিত্ব দেখে। সাবলীল অভিনয় করছে।

খেল দেখালো সুবল তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে।

······দেবভক্ত দৈত্যরাজ তার আবাল্য-বন্ধু মহামন্ত্রী ভয়াসুরের ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য তীর্থযাত্রা করলো। ক্ষমতার মোহে আর ভোগের লালসায়

ধীরে ধীরে কর্তব্য ভুলে ভয়াসুর হয়ে উঠলো জনত্রাস অত্যাচারী আর নারীলোলুপ। তার লেলিহান লালসায় নিত্য বলি পড়তে লাগলো রাজ্যের যত কুলাঙ্গনা। অবশেষে এক রাতে তার প্রমোদোদ্যানে তারই অনুচরেরা ধরে নিয়ে এলো রূপবতী অনূঢ়া রাজকন্যা সুছন্দাকে।···

জমে উঠেছে পালা। হাজার হাজার দর্শক রুদ্ধনিশ্বাসে অভিনয় দেখছে।

সীন্'এ ঢুকলো অট্টহাস্যরত মদমত্ত ভয়াসুর ক্রন্দমানা সুছন্দাকে আসুরিক লালসায় টানতে টানতে। হাত বাড়ালো পৈশাচিক উল্লাসে তাকে বিবস্ত্র করতে।

আছড়ে তার পায়ের কাছে কেঁদে পড়লো সুছন্দারূপী পবনা পাড়ুই। দলের হিরোইন (!) সে।

বাঁহাত নেড়ে (নারীচরিত্রাভিনেতার ডানহাত নাড়া বারণ) কাঁপাকাঁপা মিহিসুরে কঁকিয়ে উঠলো : রক্ষা করো, রক্ষা করো মহামন্ত্রী! এতবড় সর্বনাশ তুমি আমার কোরোনা।

অট্টহাস্য করে উঠে ভয়াসুর বললো : কেন সুন্দরী? সর্বনাশ কিসের? নারী তো বীরভোগ্যা।

সুছন্দা আকুতি জানালো : তুমি আমার পিতৃবন্ধু। তুমি পিতৃতুল্য, আমি তোমার কন্যাসমা। তুমি বাবা, আমি যে মেয়ে তোমার।

ব্যস, কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেল। পার্ট ভুলে গেল সুবল। যেন পাগল হয়ে গেল।

পাগলের মতন চিৎকার করে উঠলো : কী বললে? তুমি মেয়ে, আমি বাবা? ঠিক-ঠিকই তো! না না আমি পারবো না। পারবো না—পারবো না—

বলতে বলতে ভয়াসুরের দ্রুত প্রস্থান।

ভ্যাবাচ্যাকা মেরে ক্ষণিক বজ্রাহতের মতন দাঁড়িয়ে রইল পবনা পাড়ুই। অবাক হোল। পেশাদার যাত্রাদলে "ফাউল্" করা অথবা "ধরতাই" বা "কিছু" না বলা অলিখিত অমার্জনীয় অপরাধ! সেই ফাউল্ করবে সুবল? কেনে হে? নম্বরী অ্যাক্টর বলে?

স্থানকাল-পাত্রীপাত্র ভুলে ফুঁসিয়ে উঠলো পবনা পাড়ুই তার দেশোয়ালী ভাষায় : না মাইরি সুবলসখা, নম্বরটি (সংলাপ) কয়ে যাও মাইরি। নাতো মাইরি আম্মো একদিন ইমন লেগ্ দিব যে—

আর বলা হোল না। শ্রোতা-দর্শকদের হট্টগোল কানে পৌছতেই আসর ছেড়ে চকিতা সুছন্দারও সভয়ে দ্রুততম প্রস্থান।

হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আসর পণ্ড হবার উপক্রম। অনেক কষ্টে, অনেক কন্সার্ট ফুঁকে, শেষ অব্দি মধুময় নিজে ভয়াসুরের পার্ট-এ নেমে তবে মান/ আর বায়না রক্ষা করেছিল।

সুবলকে সে-রাতে আর আসরে বার করা যায়নি।

সাজঘরে সেই যে মাথা নিচু করে বসেছিল, সারারাতে সে-মাথা আর উঁচু করে তাকায়নি। সবার যত গঞ্জনা মাথা পেতে নিয়ে মুখ বুজে সহ্য করেছিল। রা' কাড়েনি। জবাব দেয়নি কারও কোনও জিজ্ঞাসার।

বলেছিল শুধু মধুময়কে। সঙ্গে ছিল বটুকদাস।

পালা তখন শেষ হয়ে গেছে। যে যার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। খায়নি শুধু সুবল।

খোঁজ করতে করতে সাজঘরে এসে তার দেখা পেয়েছিল মধুময় আর বটুকদাস।

বসে আছে একই জায়গায়! একইভাবে মাথা নিচু করে। যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। ডে-লাইটটা নিভে গেছে। টিমটিম করে জ্বলছে শুধু ইঞ্চি দেড়েক একটা মোমবাতি। থমথম করছে ঘরটা।

পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকালো সুবল।

ক্ষীণালোকেও লক্ষ্য করলো মধুময়, সুবলের দুচোখে বইছে অঝোর ধারা।

সবিস্ময়ে জানতে চাইল মধুময় : কী হয়েছে সুবল?

ডুকরে উঠলো এতক্ষণে সুবল : পবনা আমারে "বাবা" বল্যে যেমনি ডাক দিল, আমি ভুল্যে গেলাম মাষ্টার যে সিটা অভিনয়। ভুল্যে গেলাম নম্বর। মনে হোল, ইটাই সত্য। কী যেন হয়্যে গেল আমার মধ্যে। পারলাম নাই তারে বিবস্ত্র করতে। সে তো আর তখন পবনা না হে, হয়ে উঠেছে বটে সত্যকারের সুছন্দা। হাত উঠলো নাই। বুকটি কেঁপে উঠলো। পালায়্যে এলাম।

: কিন্তু কেন অমন হোল তোমার?

ফুঁসিয়ে উঠলো সুবল : তুমি জান নাই? যিটী ছিল বটে ডাকাত রত্নাকর, তুমরাই সিটারে রাম নামের মন্ত্র পড়ায়্যে বাল্মীকি কর‍্যেছ কেনে কও দিকি আগে? আমি চাষার ব্যাটা, ই অধিকারী মোরে নিতিরাতে ঠাকুর সাজাইছে, পতিতপাবন দুষ্টদমন বানাইছে। আর তুমি মাষ্টার—তুমিই তো শিখালে আমারে সাধু-সজ্জন হতে, সকল জনার প্রণামের যুগ্যি হতে, পৃথিবীর সব মেয়্যেকে মা-বুন ভাবতে। ইতকাল ধর‍্যে সিগুনা পালন কর‍্যে কর‍্যে আর ভেবে ভেবে আজ হঠাৎ ভুলতে পারবো কেনে? অভ্যাসটি যে স্বভাব হয়্যে গেছে হে। তাই—তাই তো সুছন্দার "বাবা"—ডাক আমারে অভিনয় ভুলায়্যে দিছে গো—সব ভুলায়্যে দিছে—সব সব—

পরাজয়ের গ্লানি আর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো সুবল সামন্ত।

সে কোন বনের হরিণ

ফটো : ষষ্ঠীরাম দাশ মোদক

আলোর আহ্বান ফটো : সত্যপ্রকাশ বালা

বাঙালীর শক্তিপূজা

কুমারেশ ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ

আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষ আরম্ভের সংগে সংগেই আকাশ যেন হাসতে থাকে আনন্দে ; জলে-স্থলে-বাতাসে জাগে আনন্দের এক পুলক শিহরণ। সুনীল আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে শরতের স্নিগ্ধোজ্জল আলো। সে আলোক-বীণায় ধ্বনিত হয় মায়ের আগমনী সুর! সে অপূর্ব সুরের পরশ লাগে পূর্ণযৌবনা নদীর উচ্ছলতায়···পাখীর সুমধুর কূজনে, বাঙলার শ্যামল প্রান্তরে ধানের ক্ষেতে। সে সুরের মূর্চ্ছনা জাগে বনমর্মরে, মানব-মনের নানাবিধ আশা-আকাংখায়।

'বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি তোমার শঙ্খধ্বনি,
আকাশ-বীণার তারে তারে
বাজে তোমার আগমনী।'

শ্যামায়মান প্রকৃতির বুকেও পুষ্প-পল্লবে স্বাভাবিক ভাবেই রচিত হয় মহাপূজার অর্ঘ্য—আনন্দস্রোতে প্লাবিত হয় সমগ্র দেশ।

মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা আসছেন মাত্র তিনটি অহোরাত্রির জন্যে দশদিক আলোকে উদ্ভাসিত করে। দক্ষিণে তাঁর ধনৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, বামে বিদ্যাদায়িনী সর্বশুক্লা দেবী সরস্বতী ও দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। মায়ের বাম পদতলে বিমর্দিত মহিষাসুর। মায়ের এই অপরূপ মূর্তির সংগে বাঙালী চিরপরিচিত। নিত্যকালের পথে এইরূপে মা কতবার এসেছেন আবার চলে গেছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে, যখন বলদর্পী মহিষাসুরের পদানত স্বর্গরাজ্য, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত। অসুরের জয়োল্লাসে ত্রিভুবন বিকম্পিত। তখন ভীত-সন্ত্রস্ত দেবগণ হলেন বিষ্ণুর শরণাপন্ন। তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মুখ হতে নির্গত হল মহৎ তেজ এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে একত্রে সৃষ্টি হল এক সুমহৎ তেজরাশি। তারপর সেই অনুপম তেজরাশি থেকে সৃষ্টি হল অপরূপকান্তি-সমন্বিতা এক অসামান্যা যুবতী নারীর। তখন সমস্ত দেবতাগণ স্ব স্ব অস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করলেন এই দেবীকে! দশহস্তে দশপ্রহরণ ধারণ করে অপূর্ব লাবণ্যময়ী সিংহবাহিনী দেবী অসুর বিনাশের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তখন দেবগণ দেবীকে লক্ষ্য করে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, মুনিগণ ভক্তি বিনম্রভাবে করতে লাগলেন দেবীর স্তব।

'জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়ঃ॥'

তারপর ঘোর যুদ্ধ শুরু হল দেবী ও দানবে। অবশেষে মহাশক্তি দেবীর হস্তে নিহত হল মহিষাসুর। দেবগণ তখন জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দেবীর স্তব করলেন।

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেব মহর্ষি-পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।"

পুরাণে বর্ণিত এ কাহিনীর অনুরূপ সংঘাত নিয়তই চলেছে আমাদের এই পার্থিব জগতে। ন্যায় ও অন্যায়ে, ধর্মে ও অধর্মে, অহিংসা ও হিংসায়, শুভবুদ্ধি ও অশুভবুদ্ধিতে, দৈবী শক্তি ও আসুরিক শক্তিতে সংগ্রাম চলেছে সর্বকালে—সর্বযুগে। যখনই অসুর শক্তির হয়েছে জয় তখনই অন্যায় ও অত্যাচারে ভরে উঠেছে পৃথ্বী, অধর্মে ভরে উঠেছে জগৎ। আবার যখন দৈবী শক্তির হয়েছে জয়, তখন পৃথিবীবাসী ফেলেছে শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস। ন্যায় ও অন্যায়ের, শুভবুদ্ধি ও অশুভ বুদ্ধির, কল্যাণ ও অকল্যাণের

এই সংঘাত কোনদিনই শেষ হবে না। 'সত্যমেব জয়তে'। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় সুনিশ্চিত। অসত্যের, অন্যায়ের ও অধর্মের সাময়িক জয় হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী নয়—ক্ষণ-স্থায়ী। অসুর শক্তিকে পরাভব করে দৈবীশক্তির জয় হবে। অকল্যাণ ও অসত্যের পরে প্রতিষ্ঠা হবে কল্যাণের ও সত্যের। হিংসার দ্বারা অহিংসাকে জয় করা যায় না।

কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে কত যুগ থেকে মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী দুর্গার সংগে বাঙালী-জীবনের নিবিড় যোগ-সূত্র হয়েছে স্থাপিত। দুর্গাপূজা যেন বাঙালীর নিজস্ব পূজা, দেবী দুর্গা যেন বিশেষভাবে বাঙালীরই মা। তাই শারদোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব।

সারা বৎসর ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর শরৎকালে মাত্র তিনটি অহোরাত্রির জন্যে বাঙালী আবাহন করে আনে দেবীকে অর্চনার উদ্দেশ্যে। পূজার এই কটি দিন বাঙালী রোগ-শোক দুঃখ-দৈন্য সব কিছু ভুলে একান্তভাবে মেতে ওঠে মহামায়ার পূজায়। তারপর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মাকে দেয় বিসর্জন। এই আবাহন ও বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জীবনে শত শত বৎসর ধরে আবর্তিত হচ্ছে আশা ও আনন্দ।

শরৎকালে প্রকৃতির পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ভেতর দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হন প্রতিমার মধ্যে। আদ্যাশক্তি দুর্গা বিশ্বব্যাপিনীরূপে বিরাজ করলেও ভক্ত সাধকের অন্তরের আকুল আহ্বানে, প্রাণের একান্ত টানে তাঁর বিশাল সত্বাকে সংহত করে ধরা দেন একটি বিশেষভাব ও রূপের মধ্যে। প্রতিমা হচ্ছে সেই ভাব ও রূপের প্রতীক। ভক্ত পূজারী এই মৃন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চিন্ময়ীরূপ দর্শন করে থাকেন।

'পুতুল পূজা করে না হিন্দু
খড় মাটী দিয়ে ঘেরা।
মৃন্ময়ী মাঝে চিন্ময়ী দেখে,
হয়ে যায় আত্মহারা॥'

পূজার পূর্বে হয় বোধন। দেবীর সুপ্ত শক্তিকে অর্চনার দ্বারা প্রতিমার মধ্যে জাগ্রত করার অর্থই হচ্ছে বোধন বা জাগরণ। তাই ষষ্ঠীর দিনে হয় বোধন উৎসব। বোধনের পরেই হয় অধিবাস বা আমন্ত্রণ। বোধনের দ্বারা মা হলেন জাগরিতা—প্রতিমার মধ্যে আবির্ভূতা। তারপর অধি-বাসের দ্বারা তাঁকে যথাবিধি সংবর্ধনা জানাতে হয়—অর্চনা করতে হয় তিনদিনব্যাপী মহাপূজা গ্রহণের জন্যে।

তারপর মহাসপ্তমীর শুভ প্রভাতে হয় দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। পূজক তখন পূজায় বসে প্রথমেই জড় প্রতিমাকে করবেন প্রাণময়ী।

প্রাণ প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মায়ের প্রাণের সংগে পূজারী তাঁর প্রাণ মিলিয়ে দেবেন—একাত্ম হয়ে মিশে যাবেন। তবেই পূজকের পূজা হবে সার্থক। মহা-সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী এই তিনদিন ভক্তির সংগে দেবীর পূজা সমাপ্ত করে দশমীর দিনে চোখের জলে বাঙালী বিসর্জন দেয় দেবী প্রতিমাকে। বিসর্জনের অর্থ হচ্ছে—যে ভাবাতীত ক্ষেত্র থেকে দেবী দুর্গা ভাবময়ী ও রূপময়ী হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন প্রতিমার মধ্যে, সেই স্থানে 'গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবী চণ্ডিকে'—এই বলে দেবীকে বিদায় দেওয়া। বিসর্জনের পর ভক্তের অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে বিজয়ানন্দে। তার মন থেকে হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি হয় বিলুপ্ত। শারদোৎসবের চরম ও পরম সার্থকতা এখানেই। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের সংগে এই মিলনের আনন্দই হচ্ছে মাতৃপূজার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

আজ শত দুঃখ-দারিদ্র্য-রোগ-শোকের মধ্যেও বাঙালী মনে-প্রাণে মায়ের পূজায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, অন্তরের সবটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে করে মহাশক্তির আরাধনা।

মায়ের কাছে আকুলভাবে আমাদের প্রার্থনা—মা জগদম্বে, বাঙালীর আজ বড় দুর্দিন। তার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের কাল মেঘ। বাঙালীর ঘরে ঘরে রোগ, শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের বীভৎস দৃশ্য। চারদিকে তার অশিব ও অন্ধকার। সন্তানের এই দুর্দিনে তুমি এস মা, তোমার আদ্যাশক্তি মহামায়ার নিত্যলীলাময়ী জগত-প্রকৃতির পরিপূর্ণতম মূর্তি নিয়ে। তুমি বর এবং অভয়-দানে তোমার বিভ্রান্ত সন্তানকে সাহস দাও, শক্তি দাও, সৎপথে চালিত কর, তাদের মানুষ কর মা!

অপূর্ব তোমার রূপ। সৃজনকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালনে তুমি স্থিতিরূপা, প্রলয়ে তুমি সংহাররূপা। এই তিনরূপের সমন্বয়ে তুমি অপরূপা।

হে শান্তিদায়িনি, আমাদের সর্ববিধ অশান্তি দূর করে শান্তি দাও মা!

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে!
সর্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥

রোজপরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে!
SUNLIGHT SOAP
Rs 10,000 Reward
HINDUSTAN LEVER LIMITED
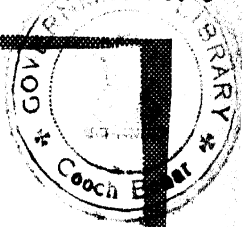
ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

এই দুইখানি গাথাকাব্যসংগ্রহ ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা সচেতন ব্যক্তিশিল্প-প্রয়াসের ফল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন এই কাহিনীর প্রাচীন নৈর্ব্যক্তিক রচনার মধ্যে আধুনিক ব্যক্তিহস্তের সযত্ন মার্জনার চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়। ইহা হয়ত সত্য হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনীগুলিতে যে কবিমন ও রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার ভাবরসনিমগ্ন ও প্রাচীন পল্লীসমাজের ভাষা-ছন্দবিন্যস্ত। যদি আধুনিক যুগের কোন কবি এগুলির রচয়িতা হন, তবে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান কালোচিত সমস্ত মানস জটিলতা ও স্ববিরোধ পরিহার করিয়া তৎকালিক জীবনরসতন্ময় হইয়া গিয়াছেন ও রূপকথাসুলভ ভাষাভঙ্গী ও চিত্রকল্পের অব্যভিচারী অবলম্বনে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য। সমস্ত গাথাগুলি রূপকথারই নিকট-আত্মীয় ও বিভিন্ন সমাজ-পরিস্থিতিতে উহারই সম্প্রসারিত সংস্করণ। রূপকথার উদ্ভব যে পরিবেশে, ইহাদেরও উদ্ভব সেই একই পরিবেশে ও কিছুটা পরবর্তীকালে।

আমাদের বাংলা রূপকথাগুলি যে ঠিক জাতির শৈশবকালজাত তাহা উহাদের জীবনদৃষ্টি ও পরিণত শিল্পরূপ হইতে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সমাজের অলৌকিকসংস্কারপুষ্ট ও বিশিষ্ট-জীবনদর্শন-লালিত বয়স্ক ব্যক্তির মনে যে শিশুকল্পনা সুপ্ত থাকে, রূপকথা তাহারই বর্ণোজ্জ্বল, সমৃদ্ধ প্রকাশ। বাংলা রূপকথা আদিম সমাজের মনের কথা নহে; যে সমাজে জীবনাভিজ্ঞতা আদিম বিস্ময়বোধকে উন্মূলিত না করিয়া বরং উহাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছে, নানা কুটিল পথের কাঁটা অতিক্রম করিয়া দৈবপ্রসাদের আনুকূল্যে এক শুভ পরিণতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সমাজেরই পরীক্ষিত জীবনবোধ ইহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দৈবনির্ভর সমাজে জীবন-বিপর্যয়ের বহু অভিজ্ঞতার পরেও জীবন সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা অবিচলিত থাকে। বিপদ নিজ কৃতকর্মের ফল নহে, রুষ্ট দৈবের অভিশাপ; সুতরাং মৃত্যু ও আত্মদায়িত্বের অভাবে মনে খুব গভীর বিষাদরেখা অঙ্কিত করে না। আমাদের সমস্ত বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আনন্দময় পরিণতির জন্য উন্মুখ বলিয়া দুঃখের অন্তে মিলন এত স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই রূপকথাধর্মী, পল্লীজীবনের দুঃখমথিত-রস-নির্যাসগঠিত গাথাগুলি বাঙালীর গভীরতম জীবন-প্রত্যাশারই সংকেতবহ। এই গীতিকাগুলিকে জাতির স্বপ্নাতুর শৈশব-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে উহাদের কাব্যমূল্য ও জীবনসত্যের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। জাতির বাস্তব জীবনের সঙ্গে, রূপকথার এই আকস্মিকতার গ্রন্থিবদ্ধ, অভাবনীয়ের চকিত-আলোকদীপ্ত জীবনলীলার সম্বন্ধ গভীর ও অবিচ্ছেদ্য।

এই গাথাগুলিতে যে জীবনচিত্র ও সমাজরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের বস্তু-অবলম্বন হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন-আবেগের দুর্দমশক্তি-চালিত।

এখানে সমাজের যে ক্রূর, হিংস্র অত্যাচারী রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন সাহিত্যে অঙ্কিত ও আমাদের সার্বিক অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু এখানে সমাজ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নহে, মানুষের গড়পড়তা নিম্নগামী

চিত্তবৃত্তির সমষ্টিগত রূপ। দুষ্ট কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ সমাজের দুঃশীল ও দুর্বল চরিত্রের উদাহরণ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্তের যে সংঘর্ষ তাহাতে প্রথার যান্ত্রিক মূঢ়তাই প্রধান উপাদান, কোন ধর্মান্ধতার বিস্ফোরক শক্তি ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। একদিকে আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি ও নিষ্করুণ দৈব, অন্যদিকে অদম্য জীবনোল্লাস ও দুর্দম প্রেম-চেতনা পরস্পরের সহিত এক নির্মম সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে।

সমাজচিত্র সাধারণ ও পরিচিত, কিন্তু প্রেমের বিচিত্র আবেগ নানা পরিস্থিতিতে নূতন নূতন রূপপরিগ্রহ করিয়াছে ও বিভিন্ন পরিণতিতে উহার প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে। আমরা এতদিন কাব্যসাহিত্যে প্রেমের যে পার্বত্য নির্ঝরিণী-বেগের কথা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা এই গীতিকাগুলির নায়ক-নায়িকার বাক্যে ও আচরণে প্রমূর্ত হইয়াছে। এ প্রেম সমাজবিধির ধার ধারে না, শাস্ত্রের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে, প্রতিকূল দৈবের ভ্রূকুটিতেও ভীত হয় না, একমাত্র প্রণয়াকূতির অমোঘ আকর্ষণে অজানা ঘটনাস্রোতে নিজ জীবনতরীকে ভাসাইয়া দেয় ও মনোবল না হারাইয়া চরম মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করে। বাংলার ক্ষীণ, সমাজশাসিত, আদর্শনিয়ন্ত্রিত, অদৃষ্টনির্ভর জীবনধারায় যে এত স্রোতোবেগ কোন উৎস হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। মনে হয় কেন্দ্রশাসন হইতে বহুদূরে স্থিত, পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, শাস্ত্রবিধি ও পৌরাণিক চেতনার দ্বারা অস্পৃষ্টপ্রায় এই প্রত্যন্ত-প্রদেশ আর্যধর্মের ভৌগোলিক সীমার বহির্ভূত ছিল। ইহার অধিবাসীরা হিন্দুমুসলমান-আদিম-জাতি-নির্বিশেষে শাস্ত্রাতিরিক্ত এক সার্বভৌম হৃদয়-নীতির অনুবর্তী ছিল। ইহাদের নারীর সতীত্ব পৌরাণিক দৃষ্টান্তনির্ভর না হইয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রেমের স্বতস্ফূর্ত প্রেরণাশ্রয়ী হইয়াছে। এই সতীত্ব-মাহাত্ম্য-ঘোষণায় আমরা যত না সীতা-সাবিত্রীর নাম শুনি, তাহার চেয়ে বেশী শুনি নারীর অবিচল প্রণয়ানুগত্যের কথা। অবশ্য কোন কোন কাহিনীতে পুরাণচেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; মনে হয় যে পুরাণের দূরাগত ভাবনির্যাস তথ্যভারমুক্ত হইয়া এই দুর্গম প্রদেশের আকাশ-বাতাসে ক্ষীণ সুরভির ন্যায় পরিব্যাপ্ত ছিল। মুসলমান ও হিন্দুর প্রেম কাহিনী-গুলিও মূলতঃ অভিন্ন; বিবাহিত প্রেম ও বিবাহবন্ধনমুক্ত প্রেম একই সুরে কথা বলে ও একই আদর্শের ছাপ অঙ্গে বহন করে। করুণ বিরহার্তি ও স্পর্ধিত দুঃসাহস উভয় জাতীয় কাহিনীতেই এক অভিন্ন ভাবপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভালবাসার যে কোন জাতি নাই—এই সার্বভৌম সত্যগাথাসমূহের সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রভাবক্ষীণতায় ও একই অন্তরছন্দের অনুবর্তনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সামান্য ঝিনুকের মধ্যে অসামান্য মুক্তার ন্যায় এই তুচ্ছ সমাজজীবনই যে গাথাগুলির রূপকথাজাতীয় অন্তর-ঐশ্বর্য ও রূপদীপ্তির মূল উৎস তাহাও ইহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২

কাহিনীগুলির রূপবর্ণনায়, ঘটনার ইঙ্গিতময় বিবৃতিতে ও প্রেমের গভীর ও বিচিত্র মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে পল্লীপ্রকৃতির সর্বতোমুখী দ্যোতনাশক্তি আশ্চর্য সু-সঙ্গতির সহিত মানবমনের ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়সম্বন্ধ হইয়াছে। পল্লীজীবন হইতে আহৃত রূপশ্রী প্রেমের সমস্ত আকৃতিতে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবহৃদয় যেন এক আশ্চর্য সুর-সঙ্গতিতে একাত্ম হইয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এ শুধু প্রকৃতির রাজ্য হইতে উপমা-চয়ন নহে, উভয়ের প্রাণরহস্যের ও জীবনলীলার পারস্পরিক অনুপ্রবেশ। উপমান-উপমেয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন এই অন্তরঙ্গ সাদৃশ্যরসে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিলীন হইয়াছে। ঘটনা বা ভাবে যাহা কিছু কর্কশ, অসুন্দর, গ্লানিকর ও ভয়াবহ তাহার উপরেও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের এই উদার আস্তরণ বিস্তৃত হইয়া উহাদিগকে একটি সাঙ্কেতিক স্বপ্ন-ময়তায় আবিষ্ট করিয়াছে। মলুয়ার মৃত্যু একটি করুণ যবনিকার অন্তরালে আবৃত হইয়াছে, এক নিরুদ্দেশযাত্রার অনির্দেশ্যতায় উহার বস্তুগত নির্মমতা হারাইয়াছে, মেঘের গর্জনে মানবহৃদয়ের হাহাকার চাপা পড়িয়াছে।

পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কায করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ॥

(মহুয়া)

এখানেও শেষরাত্রির অস্ফুট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের আবছায়া সঙ্কেত-কন্যার নিষ্ঠুর সংকল্পের মধ্যে মানস অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করিয়াছে ও রক্তাপ্লুত হত্যার ভীষণতাকে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাববিপর্যয়ের রহস্যদ্যোতনায় আবৃত করিয়াছে। বিষবাণ-প্রয়োগে নায়কের সাংঘাতিক আঘাত ও অতর্কিত রূপক-প্রয়োগে—ঘরের বাতি নিবানো ও নগর-কানা কালা মেঘের উদয়ের দ্বারা—বস্তুকাঠিন্য হইতে ভাবসুষমার রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে।

তারা হইল ঝিকিমিকি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেই না নদীর জলে ॥

—একই উপায়ে মৃত্যুকে রমণীয় করিয়াছে।

রূপবর্ণনায় এই প্রকৃতিপ্রাণতা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট। নারীরূপের রং ও রেখার সহিত প্রকৃতিরূপের রং ও রেখা গভীরভাবে মিশিয়া উভয়ে মিলিয়া এক যৌগিক সত্তা রচনা করিয়াছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির প্রাণলীলা মানবীর রূপে আরোপিত হইয়া উহাকে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় রহস্যময় করিয়াছে। প্রকৃতির সহযোগিতা মানবের অন্তররহস্যের নিগূঢ়তাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছে।

ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা ॥ (কঙ্ক ও লীলা)

অথবা

বৈকালীন রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায় ॥

এখানে আসন্ন মৃত্যুর উপর রামধনুর ক্ষণস্থায়ী বর্ণচ্ছটা আরোপিত হইয়া উহার বিলয়ের মধ্যে এক করুণ মাধুরী সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি যে সমস্ত স্থলে প্রথাসিদ্ধ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানেও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সর্বব্যাপিত্ব পুরাতন উপমাসমূহকেও এক নূতন ভাবদ্যোতনায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাচনভঙ্গীর অভিনবত্ব ও আবেগের গাঢ়তা পরিচিত উপমানগুলিকেও প্রথাজীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়া উহাদিগকে জীবনরসের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৩

প্রেমের আরম্ভ রূপবর্ণনায়; কিন্তু উহার পরিণতির পথে আমরা প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের মর্মস্পর্শী প্রকাশকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করি। রূপমুগ্ধতা, বিস্ময়, অন্তরের প্রবল আলোড়ন, মিলনের একান্ত আকূতি, বিরহের তীব্র অস্বস্তি ও বিদায়ের অসহনীয় জ্বালা—এই ভাবপরম্পরা যখন প্রণয়ীদের উক্তিতে বা লেখকের নিবিড় উপলব্ধিতে যথা-অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই প্রেমকবিতার কাব্যসার্থকতা। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাদ্বয়ে এই সার্থক আবেগ-প্রকাশের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলে। এখানেও প্রাকৃতিক দৃশ্য পটভূমিকা-রচনায় ও সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় নর-নারীর হৃদয়া-বেগকে একদিকে ব্যাপ্তি ও বিস্তার, অপরদিকে আবেদন-গভীরতা দিয়াছে। প্রেমিক হৃদয়ের আর্তি প্রকৃতির নিপুণ সহযোগিতায় আপনার আকুলতাকে সুকুমারসৌন্দর্য-মণ্ডিত করিয়া নিখিলচিত্তজয়ের সুদূর অভিযানে প্রেরণ করিয়াছে।

আমি ত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর-পূড়া।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া ॥

(মইশাল বন্ধু)

প্রেমের ক্ষোভ ও অতৃপ্তি বর্ষাস্ফীত নদীর একটি খেয়ালী আচরণের উপমায় অপূর্বভাবে ফাটিয়া পড়িয়াছে। আত্মপ্রসারণের মধ্যে আত্মক্ষয়ের সম্ভাবনা সাধারণ নদীর মত প্রণয়-স্রোতস্বিনীর একটি অনিবার্য বিপদ। প্রণয়মুগ্ধা নারীর ব্যাকুল আলিঙ্গন-প্রয়াস সময় সময় শূন্যতাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

সময় সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অধীর, সম্ভব-অসম্ভবের সীমালঙ্ঘী প্রণয়াকূতি প্রায় একইরূপ ভাষায় অথচ পল্লী-নারীর সংকীর্ণ জীবনাভিজ্ঞতার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই গাথা-কাব্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

আজি হৈতে তোমায় বন্ধু ছাইড়্যা নাই সে দিব।
নয়ানের কাজল কৈরা নয়ানেতে থুইব ॥

বসন কইর্যা অঙ্গে পরব মালা কইর্যা গলে।
সিন্দূরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে॥
... ...
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব॥
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
এমন হইলে ঘুচবো তোমার দুই আঁখির আঁধার॥

(আন্ধা বন্ধু)

এই উদ্ধৃতিটিতে অনন্তরূপের ধ্যানবিভোর, অধ্যাত্মসাধনার উচ্চভাবলোকবিহারী বৈষ্ণব কবি—আর অন্ধ বন্ধুর প্রেমাকাঙ্খিনী এক সামান্য কৃষক-রমণী—একই উপমার প্রয়োগে নিজ অন্তরের আকূতিকে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রেম উহাদের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া উহাদের ভাবরাজ্যের একই স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হয়ত এইখানে পল্লীগীতির মধ্যে কিছুটা সাহিত্যশিল্পের পরিমার্জনা সন্দেহ করা যায়। বিপরীত দিকে, অন্ধ নারী নিজ ভুবনজোড়া আঁধারের মধ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রেমিককে আহ্বান জানাইতেছে ঃ—

না জ্বালিলাম ঘরের বাতি রে বন্ধু অন্ধ আমার আঁখি।
হাত বুলাইয়া বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি॥

(শ্যামরায়ের পালা)

কখনও কখনও প্রেমবিষয়ে সংলাপকুশলতা প্রেমের অশিক্ষিতপটুত্ব ও নাটকীয় চমকসৃষ্টির উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা যায়। প্রণয়ানুভূতি যে সকল মানুষকেই একটা স্বভাব-আভিজাত্যের পদবীতে উন্নীত করে ইহা তাহারও প্রমাণ।

"মহুয়া" গল্পে ব্রাহ্মণকুমার নদেরচাঁদ বেদের মেয়ে মহুয়ার প্রণয়ভিখারী। মহুয়া কপট ক্রোধে এই প্রণয়-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

লজ্জা নাই—নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের সপ্রতিভ উত্তর আমাদিগকে বিস্মিত করে।

কোথা পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥

অপাত্র-ন্যস্ত অশুভান্ত প্রেমের বিড়ম্বনা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্যবর্তিকার আশ্চর্য ব্যঞ্জনাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেক উদয়॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা বটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে॥

(ধোপার পাট)

আবার এই বিসদৃশ অভিজ্ঞতার উপর কবির মন্তব্য অপূর্বভাবে প্রেমের স্বরূপরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

এক প্রেমেতে মারে কন্যা আর প্রেমে জিয়ায়।
যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেম কেবা চায়॥
চক্ষের কাজল কন্যা ঠাঁইগুণেতে কালি।
শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি॥

এই উক্তিটিকেও ঠিক অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনা বলিয়া মনে হয় না।

প্রেমসম্পর্কবিরহিত বিশুদ্ধ প্রকৃতিবর্ণনাতেও এই গীতিকাকাব্যের অনুভূতিস্বাতন্ত্র্য ও রূপকথাধর্মী প্রকাশ-উচ্ছলতা লক্ষিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে কবিরা যে মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহাই অবিকৃতভাবে তাঁহাদের ভাবোচ্ছ্বাসময়, কারুকার্যহীন বাচন-ভঙ্গীর মধ্যে বিধৃত হইয়াছে।

আগ-রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া।

(মহুয়া)

কান্ধে কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া।
আসমানে খাড়াইয়া জমীনে ঢালে ধারা॥

(আয়না বিবি)

গৃহস্থবধূর কল্পনায় বর্ষার এই নূতন মূর্তি আমাদিগকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুরূপ বর্ষাকল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়।

সূর্যোদয়ের চিত্র :

দুধের বরণ ঘোড়াগোটা আগুনবরণ পাখা।
(আরে) বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে
যায় দেখা ॥
আবের বাড়ী আবের ঘর করে ঝিলিমিলি ॥
(কমলারাণীর গান)

বৈদিক সপ্তাশ্ব-বাহিত, অরুণ-সারথি সূর্যরথেরই একটি গ্রাম্য সংস্করণ। এখানে সূর্য রথারূঢ় দেবতা নন, শ্বেত-অশ্ব, তাহার অগ্নিবর্ণ পাখা। সূর্যমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, কিন্তু এই মণ্ডলবিচ্ছুরিত রশ্মিজাল আগুনের মত রাঙা। গ্রাম্য কবি নিজ প্রত্যক্ষতার মানদণ্ডে বৈদিক ঋষির কল্পনাকে এইরূপে সংশোধন করিয়া লইয়াছে।

৪

রূপকথাসুলভ শব্দ ও বাক্যাংশ সম্ভার প্রকৃতি বর্ণনার মৌলিকতা ও কবিদের রূপমুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। মনে হয় প্রকৃতিরূপের প্রথম বিস্ময়বোধ, রূপকথারাজ্যের অপার্থিব সৌন্দর্যের মত, ছেলেভুলান ছড়ার মত, অভিধানে অপ্রাপ্য ও কাব্যরীতিতে অপ্রচলিত নূতন চিত্রকল্প শব্দ আবিষ্কারের দাবি জানায়। এই জাতীয় কাব্যে আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ডাগল আঁখি, তেল-ফুরাণ্যা বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্কামাথা পরভাত প্রভৃতি দ্বৈতশব্দ ও বাক্যাংশগুলি যেমন সজীব কল্পনার নিদর্শন, তেমনি রূপচাঞ্চল্যের ঝিলিকমারা। পল্লী-কবির সৌন্দর্যোত্তেজিত মনোভাব এইরূপ অসাধারণ শব্দ-প্রণালী বাহিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ—তাহা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দর্য-মণ্ডিত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের অসাধারণ, অসুন্দর অংশের প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি কম তীক্ষ্ণ নহে। কেনারাম ডাকাতের চেহারা যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট চোখ ও থপথপে চলনভঙ্গী, সাঁওতাল-হাঙ্গামার উদ্বাস্তু নর-নারীর পলায়ন-ত্রস্ততা প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিকতার কথাও এ কাব্যে যথা-যথ স্থান পাইয়াছে। দুই একটি গ্রামজীবনসম্ভব উপমার সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য-সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবনক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল।

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে।
হরা (সরা) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে ॥
(সুরন্নেহা ও কবরের কথা)

অথবা

সতি-পুত্তেরার (সতীন-পুতের) লাগ্যা রহিল বসিয়া ॥
বগা যেমন চউথ বুজ্জ্যা পগারের ধারে।
সাধু হইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে ॥
(দেওয়ান মদিনা)

কোন মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির মনে এই জাতীয় উপমা উদিত হইত না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধুয়া ও বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী এই কাব্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু ভাবব্যঞ্জনার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে।

গাছের শোভা পাতা রে ভাই,
পাতার শোভা ফুল।
মাথার শোভা সিঁথার সিন্দুর
কানের শোভা দুল ॥
(সুরন্নেহা ও কবরের কথা)

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি ॥
(ভেলুয়া)

প্রভৃতি বাক্যযোজনারীতি লোকসাহিত্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকা বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি অসাধারণ সংযোজনা। বাংলা সাহিত্যে লোকগাথার অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক সাধনাতত্ত্বনির্ভর। জনসাধারণের চিরাচরিত ধর্মসাধনা, নাথ-সাহিত্য ও বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভাব ও ভাষা অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সীমিত গোষ্ঠীর গুহ্য ভজনতত্ত্ব অর্ধদুর্বোধ্য, রহস্যময় ভাষাকে অনেকটা অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যসংগ্রহে কোন নিগূঢ় সাধন-প্রণালী নহে, সর্বমানবিক হৃদয়াকুতিই অসাধারণ রূপচেতনা ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সহযোগিতায় এক সজীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই স্বর্গের চাবি যে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান কবিগোষ্ঠীর হাতে নাই, আছে জনসাধারণের অতিসন্নিহিত পল্লী-কবির হাতে—ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। যখন উপলব্ধি করা যায় যে এই চাবি হয়ত চিরকালের মত হারাইয়াছে তখন কবিত্বের একটা সর্বসাধারণের আয়ত্ত উৎস রুদ্ধ হওয়ার আক্ষেপ আমাদের সমস্ত আধুনিক প্রগতির মধ্যেও মনকে ক্ষুণ্ণ করে।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। সংসারের কর্ত্রী, ডাকসাঁইটে প্রকৃতির বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা, নাম শীতলা দেবী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহিম অফিসে চাকরী করে, এতদিন বিপত্নীক ছিল। সম্প্রতি ছোট ভাই দেবেশের অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয্যে বিবাহ করিয়াছে। নববধূর নাম ক্ষমা। দেবেশ সাংবাদিক।

[শনিবার। অফিস হইতে ফিরিয়া মহিম জলখাবার খাইতেছে, পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ক্ষমা। হঠাৎ নেপথ্যে একপ্রস্থ বাসন ক্রমান্বয়ে ছুঁড়িয়া ফেলার বিকট শব্দ।]

মহিম॥ ব্যাপার কী গো?

ক্ষমা॥ ব্যাপার আবার কী! মা-র কাণ্ড! আর আমি সইতে পারছি না, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

মহিম॥ বিয়ে হবার পর প্রথম স্বামীর ঘর ক'রতে এসেছ। একমাসও যায়নি, এরই মধ্যে বাপের বাড়ি যাবে কী গো, লোকে বলবে কি?

[দেবেশের প্রবেশ]

দেবেশ॥ বউদি! দেখছি রাইট টাইমে এসে পৌঁচেছি। চা আনো। [পুনরায় বাসন ফেলার শব্দ।] বাসন-বাদ্য শুনছি, ব্যাপার কী?

মহিম॥ তুমি যাও, চা আনো—আমি বলছি। [ক্ষমা চা আনিতে চলিয়া গেল] দেখ্ দেবেশ! আমার একটি বউ আমার ঐ 'শীতলা'-মার মেজাজের আগুনে দগ্ধে দগ্ধে মরেছে। আর বিয়েতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না আমার; সংসার অচল হয় দেখে বিয়ে দিতে চাইলাম তোর; তুই রাজী তো হলিই না, উপরন্তু আবার আমায় সংসারী ক'রলি। তখন কথা দিয়েছিলি, মা'র হাত থেকে তোর বৌদিকে তুই রক্ষা করবি। কথা দিয়েছিলি কিনা বল?

দেবেশ॥ হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

মহিম॥ সেটা তো তোর মুখের কথাই রয়ে গেল।

দেবেশ॥ কেন, কেন দাদা?

মহিম॥ মা'র ঐ বাসন ছোঁড়া শুনে এখন কী ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না তোর, ইডিয়েট?

দেবেশ॥ আঃ দাদা, ওটাকে 'জাজ্' মিউজিক ব'লে ধরে নাও না? ঝামেলা কমাও। আমি কী করি জানো দাদা?

মহিম ॥ কী ?

দেবেশ ॥ জীবনে কথাই সব। অধিকাংশই কর্কশ, কিছুটা মধুর। কিন্তু সব কথার মধ্যেই একটা সঙ্গীত শোনবার সাধনা ক'রে যাচ্ছি আমি এবং সিদ্ধি ও প্রায় করতলগত।

মহিম ॥ দেখ্ দেবেশ, ফাজলামো রাখ্। মা'র এই মেজাজ গোটা পাড়াটাকে এতকাল উত্যক্ত ক'রে তুলেছে, পরের উপর দিয়ে যায় ব'লে সেটা আমি গায়ে মাখিনি এতদিন। তোর আগের বৌদি তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে ভুগে ভুগে মারা গেল—সেটাও যদিও বা সয়েছিলাম, আর আমি সইবো না। সংসার না চিতার উপর ব'সে আছি দেবেশ।

দেবেশ ॥ না, না তুমি এমন ঘাবড়াচ্ছো কেন, দাদা ? তুমি কী ভাবছো, আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি ? মা'র ঐ মেজাজের দাওয়াই আমি পেয়েছি—পেয়েছি মানে তৈরী ক'রে নিয়েছি। মাকে তা খাইয়েওছি এবং তার সুফল ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে বাধ্য। একটা জিনিস লক্ষ্য করলেই তুমি সেটা বুঝবে।

মহিম ॥ কী আবার লক্ষ্য করবো ?

[চা লইয়া ক্ষমার প্রবেশ।]

দেবেশ ॥ এই যে বৌদি, চা এনেছো ? চমৎকার। মা বাড়ী নেই না কী ?

ক্ষমা ॥ কেন বলো তো ?

দেবেশ ॥ কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না।

মহিম ॥ কেন, ঝন্‌-ঝন্‌-ঝনাৎ শুনলি না ? এই কান নিয়ে তুই রিপোর্টারের চাকরী করিস ?

দেবেশ ॥ রিপোর্টারের চাকরি আমি ঠিকই করি দাদা। করি কিনা দেখবে এখন। ঐ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দটা তো মা'র নয়, শব্দটা বাসনের।

মহিম ॥ কিন্তু বাসনগুলো ছুঁড়ছেন তো মা !

দেবেশ ॥ হ্যাঁ ! ধ'রে নিলুম তিনিই বাড়ীতে রয়েছেন, আর তিনিই ছুঁড়ছেন। কিন্তু তার মুখের কথা শুনছি না কেন ? এটাকে আশ্চর্য বলবে না তুমি, দাদা ?

মহিম ॥ ব্যাপার কী ক্ষমা ?

ক্ষমা ॥ আজ বাসন মাজতে ঠিকে ঝি আসেনি, সে বাসন আমি না মেজে তোমার চা ক'রতে গিয়েছি—এই হ'য়েছে রাগ। তোমাদের চা দিয়েই কিন্তু আমি যেতাম বাসন মাজতে। কিন্তু সেটুকু তর ওঁর সইলো না। কল-তলায় বসে নিজে এক একখানা বাসন মাজছেন, আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাওয়ায় ফেলে দিচ্ছেন।

দেবেশ ॥ হ্যাঁ তা দিচ্ছেন—কিন্তু দিচ্ছেন নীরবে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাসনগুলো চেঁচাচ্ছে; কিন্তু তিনি চেঁচাচ্ছেন না। গেল দশ বছরের মধ্যে এমনটি কখনও দেখেছো, দাদা ?

মহিম ॥ বটেই তো ! ব্যাপার কী দেবেশ ?

দেবেশ ॥ আমার দাওয়াইয়ের কাজ শুরু হ'য়েছে—অস্বীকার ক'রতে পারবেনা বৌদি—!

ক্ষমা ॥ মুখে কথা না কইলে কী হয়, হাতে কথা কইচেন।

মহিম ॥ আঃ ! দাওয়াইটা যে কী, তাইতো আমি বুঝছি না।

ক্ষমা ॥ সে যার দাওয়াই তিনিই বলুন, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

[চায়ের বাসন লইয়া প্রস্থান।]

মহিম ॥ ব্যাপার কীরে ? একটু অবাকই তো হচ্ছি দেবেশ। চেঁচামেচি কমা মানে তো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শান্তি রে ! এই বা কী ক'রে হ'লো ?

দেবেশ ॥ মা'র মনে চিরদিন দুঃখ কাশী-বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কন্যাকুমারী তীর্থ করা হ'লো না। পাড়ার সব গিন্নীদেরই এসব হ'য়ে গেছে—তাই তাঁদের আর সব বিষয়ে মা ঠকতে পারলেও এই একটি জায়গায় যান ঠ'কে। স্বামী-পুত্র নির্ধন—কিন্তু বাপের বাড়ীতে ঠাকুর্দারা সোনার থালায় খেতেন, তাঁর এ সব গল্পের সঙ্গে কে এঁটে উঠতে পারে বলো ? বিপদে পড়েছেন শুধু ঐ তীর্থ-যাত্রা নিয়ে। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তো আর মিথ্যে চাল দেওয়া চলে না।

মহিম ॥ আজ বছর দশেক হোলো তীর্থের বাবদ শ' পাঁচেক টাকার জন্য আমাকে কম পেড়াপিড়ি করেন নি মা, শেষে গালিগালাজ ক'রেছেন, শাপ-মন্যি দিয়েছেন। ভাগ্যিস মা, তাই সে সব ফলেনি, এই যা রক্ষা।

দেবেশ ॥ সেই টাকা পাবার পথ বাৎলে দিয়েছি আমি।

মহিম ॥ সে কীরে! কোত্থেকে দেব সেই টাকা! নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এই তো আমাদের অবস্থা। পারলে কী আর আমি দিতাম না?

দেবেশ ॥ না, না—তোমাকে এক পয়সাও দিতে হবেনা; দাদা!

মহিম ॥ তবে কে দিচ্ছে, তুমি? রিপোর্ট তো করো দেখি কোটি কোটি টাকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কিন্তু কোটি নয়া পয়সারও কী মুখ দেখেছো এতদিন রিপোর্টারি ক'রে?

দেবেশ ॥ দাদা! টাকাটা আমিও দিচ্ছি না। কে যে দিচ্ছে তাও জানি না। কিন্তু ওতেই—দাওয়াইয়ের কাজ হ'চ্ছে। এই দেখো।

[ঘরের একটি ফাইল টানিয়া আনিয়া তাহা হইতে একটি সংবাদপত্র টানিয়া বাহির করিয়া উহার একটি বিজ্ঞাপন চেঁচাইয়া পড়িতে লাগিল।]

"শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা"

পুরস্কার পাঁচশত টাকা।

'নিখিল বঙ্গ শাশুড়ী কল্যাণ সমিতি' স্থির করিয়াছেন যে, বধূমাতাদের ব্যালট ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শাশুড়ীকে পাচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতি বধূমাতা প্রতি শাশুড়ীর সদ্গুণের বিবরণ দিয়া পূর্ণ সংখ্যা একশত মার্কের মধ্যে নম্বর দিবেন। যে শাশুড়ী এইরূপে সর্বোচ্চ মার্ক পাইবেন, তিনিই প্রথম স্থানাধিকারিণীরূপে উক্ত পাচ-শত টাকা পুরস্কার লাভ করিবেন। আগামী বৎসরের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার শেষ তারিখ শাশুড়ী ও বধূর যুগ্ম ফটো সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন। বক্স নং 'কালান্তর' ৪২০।

মহিম ॥ এই বিজ্ঞাপন তবে তুই দিয়েছিস।

দেবেশ ॥ অস্বীকার ক'রছি না দাদা। কাগজে চাকরী করি বলে কনসেসনে চার্জ করেছে মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু এই পাঁচ টাকায় লাখ টাকার ফল মিলিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ফটো তুলতে আমার এই বক্স নং ৪২০ থেকে এখুনি আসবে আমার বন্ধু সুনীল—তুমি তাকে শুধু একটু স'য়ে থেকো এই অনুরোধ।

[গিন্নীমা শীতলা দেবীর প্রবেশ।]

শীতলা ॥ হ্যাঁরে দেবু! আপিস পালিয়ে এসেছিস বুঝি? কাজে এত ফাঁকিও দিতে পারিস তুই। দেখা-দেখি সবাই দিচ্ছে। লাট-গিন্নী ঝি। আসেন নি আজ কাজে। নবাব-নন্দিনী বউ—

নবাব-নন্দিনী বউ

দেবেশ ॥ মা, পাচ শ!

শীতলা ॥ পাচশ! ও হ্যাঁ! মনেও থাকে না ছাই।

[ক্ষমার প্রবেশ।]

শীতলা ॥ বলি হ্যাঁগা ভালমানুষের ঝি! বাবুদের

তো চায়ের পাট হয়ে গেল ; এবার নিজে কিছু গেলো! নইলে আবার কোন্‌দিন কাকে বলে বসবে, বউ খেলো কী মরলো, শাশুড়ী তাকিয়েও দেখে না।

ক্ষমা॥ বিকেলে আমার খিদে পায় না, মা।

শীতলা॥ পায়না বল্লে, শুনছে কে? এস, কিছু গিলতে তোমাকে হবেই হবে।

দেবেশ॥ হ্যাঁ মা, কিছু গেলাও, গেলাও। নইলে শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতায় নম্বর দেবেনা তোমাকে।

শীতলা॥ হ্যাঁরে দেবু, ঐ অলপ্পেয়ে কোম্পানি শেষ পর্যন্ত টাকাটা দেবে তো? দেখছিস তো, কাল থেকে কী তপিস্তেই না করছি। এ যে কী কষ্ট বাবা, বুঝছিস তো?

মহিম॥ কী হ'য়েছে, কী হয়েছে মা?

শীতলা॥ না বাবা! অতশত আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। এক কথায় বলতে গেলে, 'বউ তুষ্টি যজ্ঞ' করছি। দেখি, তাতে যদি এখন পাঁচশ টাকা পাই। তাতে যদি তীর্থ করার সাধটা এখন পূরণ হয়! স্বামী পুত্রের কাছে কোন আশাই তো পুরল না—এখন শেষ চেষ্টা দেখি, এই 'বউ তুষ্টি যাগে' কী হয়।

মহিম॥ কী তুষ্টি যাগ?

দেবেশ॥ বৌ তুষ্টি যাগ।

[ক্যামেরা ঘাড়ে দেবেশের বন্ধু স্থনীলের প্রবেশ]

স্থনীল॥ নমস্কার। আমি বক্স নং ৪২০ থেকে এসেছি। শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতায় শীতলা দেবী যোগদান ক'রেছেন। ঠিকানা রয়েছে এই বাড়ীর। কে তিনি? আমি তাঁর ফটো নিতে এসেছি। সেই সঙ্গে তাঁর বৌমার।

শীতলা॥ নেবে বাবা, ফটো নেবে আমার? তিনকুল গিয়ে এককুলে এসে ঠেকেছি, এখন আর কী ফটো নেবে বাবা? তাও তো তুমি নিতে চাইছো বাবা, আর এই যে, এঁরা কেবল নিজেদের ফটোই তুলছে। বিয়ে করলেন তাঁর ফটো, ফুলশয্যায় এলেন তার ফটো, পাড়ার মেয়েরা আড়ি পাতছে তার ফটো। আর বউর কথা বলবো কী গা, যেন লাটগিন্নী! ঘোমটা মাথায় ফেলে ফটো, ঘোমটা ফটো—কি যে সব আদিখ্যেতা!

দেবেশ॥ আঃ! মা, পাঁচশ!

শীতলা॥ ও হ্যাঁ! তাও তো বটে। তা' ফটো নেওয়া ভালো। আমার বউমা-র অমন চাঁদমুখ বলেই না—আমি তো বলি তোলো ফটো, ফটোই তোলো—শুধু দেখো আগের বউয়ের মত পটল তুলো না যেন!

স্থনীল॥ আপনার নাম শীতলা দেবী! সার্থক আপনার নাম মা। কথাগুলো শুনলেই কেমন শীতল হ'য়ে যায় প্রাণ!

শীতলা॥ এই কথাটা, এই কথাটা বাপ-মায়ের মুখে শুনতাম। কিন্তু কী কপাল ক'রে যে এসেছিলাম এই বাড়িতে! এই কথাটি কারো মুখে শুনলাম না! কেবলই শুনে এলাম সারা জীবন আমারই জন্যে নাকি কাক-চিল বসে না এই বাড়িতে! তা বসবেই বা কেন? বাড়িতে কাক চিল বসা কি ভালো? মানুষের বাড়িতে কাক-চিল বসবে কেন? বলো বাবা, তুমিই বলো—

স্থনীল॥ আমি বলবো না মা, যা বলবার বলবেন আপনার বউমা—গোপনে, ভোটপত্রে। এইবার বউকে নিয়ে আপনি বস্থন মা। মানে, আমরা এমন একটা ফটো চাই—বউ-র প্রতি আপনার মনোভাব কীরূপ সেটা যেন প্রকাশ পায়! এখন কীভাবে আপনার বউকে নিয়ে ফটো তুলবেন, সেটা ঠিক করুন।

শীতলা॥ ওমা, সে আবার আমি কী ঠিক করবো বাবা! হ্যাঁরে মহিম, ওরে দেবু, তোরা যে সব বোবা হ'য়ে বসে রইলি, কী করবো বল না?

মহিম॥ বউয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা তো? তা ধর, বউ-র তুমি চুল বেঁধে দিচ্ছ। এম্নি একটা কিছু কর।

স্থনীল॥ হ্যাঁ বেশীর ভাগ শাশুড়ীরাই ঐ ফটোই তুলিয়েছে।

দেবেশ॥ না, না তাহ'লে মা ওটা বাদ দাও। তুমি বরং বউকে পান সেজে দিচ্ছ—

শীতলা॥ [জলে উঠে] কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? বউকে পান সেজে দেবো আমি?

দেবেশ ॥ মা পাঁচ শ ! কাশী, বৃন্দাবন।

মা পাঁচশ ! কাশী, বৃন্দাবন

শীতলা ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। তা' বউমা'র যদি তাই ইচ্ছে হয়, তাহ'লে নিয়ে এস বাছা, পানের বাটাটা।

ক্ষমা ॥ আমি তো-মা পান খাই না,।

সুনীল ॥ না, না, তবে আর ও ফটোটা হবে না। আমরা কোনো মিথ্যে ফটো নেই না। আসল কথাটা হ'চ্ছে—বউ-র জন্যে শাশুড়ীর আন্তরিক দরদটা যাতে ফুটে ওঠে এম্নি একটা কিছু—এম্নি একটা কিছু আমাকে দিন।

শীতলা ॥ তাহ'লে বাবা, আমি যা বলি তাই করো। বউ মা আমার পা টিপে দিক। আমি মুখে বলি বউমা থাক, পা টিপতে হবে না তোমার। তোমার হাতে ব্যথা হবে।

মহিম ॥ চমৎকার হবে মা। এক ঢিলে তুমি দুই পাখী মারবে। পা টিপিয়ে নেওয়াও হবে, দরদটাও প্রকাশ পাবে।

সুনীল ॥ কী বিপদ! ওঁর মুখের কথাগুলো তো আর ফটোতে উঠবে না ?

শীতলা ॥ উঠবে না মানে ? আমি যদি চেঁচিয়ে বলি—রাস্তার লোক শুনতে পাবে, আর তুমি শুনতে পাবে না ?

সুনীল ॥ [হতাশভাবে ছেলেদের প্রতি] নিন্, বোঝালেও যখন উনি বুঝবেন না, কী ক'রবেন করুন।

শীতলা ॥ না বুঝবার কী আছে এতে ? এই তো বায়োস্কোপ ! বায়োস্কোপে ফটোও দেখছি, কথাও শুনছি। না, না, যত বড় পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ভেবেছ, তত পাড়াগাঁয়ে নই আমি। আমারও বাপের বাড়ি নদে জেলার শান্তিপুর।

সুনীল ॥ তাই বলুন মা। না, তবে আর অশান্তি করবো না। আমার এই ক্যামেরাটা কথা তুলতে পারে না।

শীতলা ॥ তাই বলো। আমার কাছে কারো চালাকি চলবে না, কারো না। বেশ তো, কথা কইব না, কিন্তু তবু দেখিয়ে দেবো বৌ-সেবা কাকে বলে। বউমা! শুয়ে পড় এখানে। শুয়ে পড় বলছি। আমি তোমাকে হাওয়া করবো। মাথার যন্ত্রণায় কোঁ-কোঁ করো, আমি তোমার মাথা টিপে দেব।

[বউকে জোর করিয়াই শোয়াইলেন।]

শীতলা ॥ একটা পাখা, একটা পাখা।

মহিম ॥ যেখানে ইলেকট্রিক ফ্যান রয়েছে, সেখানে আবার পাখা কী মা! পাবই বা কোথায় ?

শীতলা ॥ তর্ক করিস না মহিম। আমার পেটেই তুই হয়েছিস, তোর পেটে আমি হইনি। বিজলীর হাওয়া অনেক রোগীর সয় না, ঘরে পাখা নেই, তাতে কী হয়েছে, আঁচল দিয়ে হাওয়া করছি আমি। একটু কোঁ-কোঁ কর বউমা! কী! এত ক'রে বলছি, তাও তোমার কানে যাচ্ছে না, শতেক-খোয়ারীর ঝি ?

দেবেশ ॥ পাঁচশ ! হরিদ্বার ! কন্যাকুমারী !

শীতলা ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। এ যে কী জ্বালা ?

এ যেন সাপ হ'য়ে ছুঁচো গিলেছি—না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে।

সুনীল॥ আমি তো আর অপেক্ষা ক'রতে পারছি না মা। আমাকে এখন কত জায়গায় যেতে হবে, কত ফটো তুলতে হবে! আজ ঘরে ঘরেই এই প্রতিযোগিতা চ'লছে কিনা? আমি আর বড় জোর তিন মিনিট আছি। এতে ফটো উঠলো তো উঠলো নইলে আমি চল্লাম। আমারও তো চাকরী, ভাতে মারবেন না মা।

দেবেশ॥ আরে মশাই! গেরস্তর বাড়ীতে এসেছেন, আমার অন্নপূর্ণা মা আপনাকে একটু চা-মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়বেন ভেবেছেন? গেরস্তর অকল্যাণ ক'রে যাবেন না, মশাই।

সুনীল॥ বেশ তো! দয়া ক'রে একটু চট্‌পট্‌ সেরে নিন।

শীতলা॥ নিচ্ছি বাবা, নিচ্ছি। [বউএর মাথার ঘোমটা সরিয়া গিয়াছে দেখিয়া] বলি হ্যাঁগা ভাল মানুষের ঝি, এমন বিবি সাজতে শিখলে কবে থেকে? পরপুরুষের সাম্নে ঘোমটা যাবে খসে? কালে কালে এ পোড়া সংসারে হ'ল কী?

দেবেশ॥ আঃ মা! তুমিই না বলেছিলে মাথার যন্ত্রণায় কোঁ-কোঁ করতে? যার মাথার অত যন্ত্রণা, তার ঘোমটা ঠিক থাকে কখনও?

[বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে ক্ষমা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে।]

শীতলা॥ রাজার পাপেই রাজ্য যায় বাবা। তোদের পাপেই এই সব যত অনাসৃষ্টি। এককালে বউ আমরাও ছিলাম। হ'য়েছিল টাইফয়েড্। এসেছিল কোবরেজ— সাতপাক আঁচলে এমন ঘোমটা টেনে দিয়েছিলাম মুখে— আমার জিভ্ দেখতে পেল না কোবরেজ। শেষে কর্তার জিভ দেখে ওষুধ দিয়ে গেল। অমন নিষ্ঠা ছিল বলেই না যমের রুচি হ'ল না। সেরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। তা' বেশ তো! কত অনুরাগ দেখতে চাও, দেখাচ্ছি। এই তো বউমা শুয়েছেন—সারা গায়ে ব্যথা। একটু ছটফটানি শুরু কর বউমা—এমন সেবা আমি তোমার করছি, যা দেখে—দুনিয়ার বৌ-ঝি-রা 'থ' হয়ে যায়। দেখি, এই পাঁচশ টাকা পুরস্কার আমার কে আটকায়?

[শীতলা দেবী ক্ষমার সেবা করিতে লাগিলেন। সুনীল ফটো তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।]

সুনীল॥ আমি এক-দুই-তিন বলবো মাসীমা। যতটা অনুরাগ আপনি পারেন, তা দেখাতে হবে আপনাকে, এই এক-দুই-তিন বলবার সময়টুকুর মধ্যে। এক—।

শীতলা॥ একে মাথা—

[বৌর মাথা টিপিতে লাগিলেন]

সুনীল॥ দুই—।

শীতলা॥ দুইয়ে হাত! [হাত টিপিতে লাগিলেন]

সুনীল॥ তি-ন!

শীতলা॥ তিনে-পা! [বউ-র পা টিপিতে লাগিলেন]

সুনীল॥ থ্যাঙ্কস্। একেবারে চরম!

দেবেশ॥ যাকে বলে একেবারে মোক্ষম। একী চল্লেন যে। চা মিষ্টি খেয়ে গেলেন না।

সুনীল॥ আজ আর হজম হবে না। খাবো আর একদিন। আজ চলি। [প্রস্থান]

[বউ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে।]

মহিম॥ মাকে প্রণাম কর ক্ষমা।

[ক্ষমা শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে আসিল।]

শীতলা॥ থাক্ থাক্ হ'য়েছে। গরু মেরে জুতো দান. থাক।

[রাগে পা সরাইয়া, সরিয়া গেলেন।]

কিন্তু এও আমি তোদের বলে রাখছি দেবু, এত ক'রেও ঐ পাঁচশ টাকা যদি আমি না পাই—তবে আমি আত্মঘাতী হবো, আত্মঘাতী।

[বউ তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিল, তিনি তাহাকে এড়াইয়া গিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।]

শীতলা॥ কোন মুখপুড়ী শাশুড়ী এমন ফটো তুলতে পারে আমি দেখে নেবো।

দেবেশ॥ কিন্তু মা তুমি চর্কির মত ঘুরছো কেন? বউদি প্রণাম ক'রতে গিয়ে পাক খেয়ে মরছে।

শীতলা॥ এ পা আমি সহজে ছুঁতে দেবো ভেবেছ? ও আগে স্বামীর পা ছুঁয়ে দিব্যি করুক, আমাকে পুরো নম্বর দিয়ে জিতিয়ে দেবে ভোটে—তবে না আমার পা ছুঁতে দেব ওকে!

দেবেশ ॥ বেশ তো বৌদি যাও না, দাদার পা ছুঁয়ে সেই দিব্যিটা সেরে এসে মায়ের পা ধর।

ক্ষমা ॥ অমন মিথ্যে দিব্যি আমি ক'রতে পারবো না। শুনুন মা, এ সবই হ'ল ঠাকুর পোর চালাকি! আপনি যাতে আমাকে ভালবাসেন—তাই মতলব ক'রে ভুয়ো পুরস্কারের মতলব ভেঁজেছে। পাঁচশ টাকা পুরস্কার ও সবই মিথ্যা, সবই মিথ্যা মা।

[শীতলা একটি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং অগ্নিময় দৃষ্টিতে দেবেশের দিকে তাকাইতে গিয়া দেখেন, দেবেশ নাই। সে পলাইয়াছে। শীতলা রাগে ক্ষোভে দুঃখে যেন পাষাণ-প্রতিমা বনিয়া গেলেন।]

ক্ষমা ॥ আমাকে আপনি ক্ষমা করুন মা। মিছিমিছি আপনি আমার পায়ে হাত দিয়ে আমাকে অনন্ত পাপে ডুবিয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করে সেই অনন্ত নরক থেকে উদ্ধার করুন মা।

[ক্ষমা প্রণাম করিয়া উঠিল।]

[মহিম ড্রয়ার খুলিয়া এক'শ টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বলিল।]

মহিম ॥ আমাদের দুই ভাইকেও ক্ষমা কর মা। পূজার বোনাস আজই পেয়েছি এই পাঁচশ। টাকাটার দরকার আমাদের খুবই ছিল। কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে এ বোনাস না-ও তো পেতে পারতাম! এ টাকাটা তুমিই নাও মা। তোমার তীর্থ হোক, মুখে তোমার হাসি ফুটুক। তোমার নাম শীতলা। আমাদের আশীর্বাদ ক'রে আমাদের শীতল করো মা।

শীতলা ॥ [প্রসন্ন দৃষ্টিতে] দে!

[এক হাতে মহিমকে ও অন্য হাতে ক্ষমাকে টানিয়া আনিয়া]

না! এ বউমা আমার লক্ষ্মী!

যবনিকা

পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা—

গত ৭ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাংবাদিক বৈঠকে নিম্নলিখিত ৫টি বড় বড় সমস্যার কথা বলিয়াছিলেন—(১) জনসংখ্যার চাপ (২) জমীর অভাব (৩) বেকার সমস্যা (৪) আংশিক ভাবে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুসমস্যা (৫) কলিকাতা সহরের সমস্যা (৬) কলিকাতা বন্দরের শোচনীয় অবস্থা। ইহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সকল সমস্যার কথা আছে। সেন মহাশয় এই গুলির প্রতীকারে সচেষ্ট হইয়াছেন—দেশবাসী সকল লোক তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিলে সত্বর এ গুলির সমাধান সম্ভব হইবে।

চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ—

১৩ই সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে খবর আসিয়াছে যে চীন সৈন্যরা ভারত-চীন সীমান্ত রেখা ম্যাকমোহন লাইন পার হইয়া নেফা প্রদেশে (উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি) প্রবেশ করিয়াছে। যে স্থানে ভূটান, নেফা ও তিব্বত তিনটি রাজ্যের সীমা একত্র হইয়াছে সেখানে একটি ভারতীয় রক্ষা-কেন্দ্রের নিকট চীনা সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে—থাংলা পাশের নিকট ঐ কেন্দ্র অবস্থিত। চীনা সৈন্যরা এই প্রথম ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করিল। কোথাও যুদ্ধ হয় নাই, ভারত-রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষ চীনের নিকট এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাইয়াছে মাত্র।

ভারতে ষোড়শ রাজ্য—

এতদিন ১৫টি রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের অধীন ছিল—গত ২৮শে আগষ্ট নাগাভূমি নাম দিয়া আসামে একটি ষোড়শ রাজ্য গঠন করা হইয়াছে। নাগাভূমির অবস্থা শান্ত ও স্বাভাবিক হইলে তথায় স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রদান করা হইবে। তুয়েং সাং অঞ্চল ও আসামের নাগা পাহাড় জেলা লইয়া নাগাভূমি নূতন রাজ্য গঠিত হইল। ইহার মধ্যে আসামের জাপভো (৯৮৯৫ ফিট) গিরিশৃঙ্গ পড়িয়াছে। নূতন রাজ্যের আয়তন ৪২৯৮ বর্গমাইল—মোট জন সংখ্যা ৪ লক্ষ, কোহিমায় ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট নাগাভূমি শাসন পরিষদ গত ১৬ই মার্চ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় উন্নয়ন—

কলিকাতার উন্নয়নের জন্য সি-এম-পি ও (কলিকাতা মেট্রপলিটান প্ল্যানিং অর্গানিজেসন) একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে কলিকাতার উপকণ্ঠে কয়েকটি উপনগরী নির্মাণ, মার্টিনের ছোট রেলের বদলে বড় লাইন, ক্যানিংয়ে মাছের চাষের ও দক্ষিণাঞ্চলে তরিতরকারীর উৎপাদনের বৃদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা সহ বহু সুপারিশ আছে। কলিকাতার ৪ পাশে প্রায় ৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা প্রত্যক্ষভাবে কলিকাতার উপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ ২৪পরগণা হইতে কলিকাতায় শতকরা ৮০ ভাগ তরিতরকারী আসে—মাছ ও ডিমের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র ক্যানিং। বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বারাসত, বসিরহাট, বাগনান, কুলপি, ক্যানিং পর্য্যন্ত ৪ হাজার বর্গমাইল হইল ঘনিষ্ট অঞ্চল। ইহার বাহিরের বড় এলাকা কলিকাতার উপর নির্ভরশীল, মোট এলাকার পরিমাণ সাড়ে ৭ হাজার বর্গমাইল। হলদিয়া বন্দর হইলে তমলুক, সুতাহাটা, মহিষাদল ও শ্যামপুর—হইবে বাহির অঞ্চল। তাহাও পরে ঘনিষ্ট অঞ্চলে পরিণত হইবে। ঐ সম্পর্কে কলিকাতা ও সহরতলীর ৩৫টি রেল ষ্টেশন হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। বারুইপুর হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ফল কলিকাতায় আসে। বৃহত্তর এলাকায় জল সরবরাহের জন্য ১১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে—আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে ঐ টাকা ব্যয় করার চেষ্টা করা হইবে। ২৪টি মিউনিসিপলিটী ও ১৪টি ছোট খাট সহরে জল সরবরাহের জন্য ইতিমধ্যে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও ২৮টি পৌর এলাকা ও হাওড়ায় জলসরবরাহ

করা হইবে। বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে। মোটের উপর সত্বর কাজগুলিতে হাত দিলে লোক উপকৃত হইবে।

২৪পরগণা জেলা—

২৪পরগণা জেলাকে ২ ভাগে ভাগ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগণা করা হইবে। উত্তরে থাকিবে বারাকপুর, বারাসত, বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমা—দক্ষিণে থাকিবে সদর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা। এ জন্য ৭টি নূতন থানা গঠন করা হইয়াছে—(১) মীনা খাঁ (২) গোসাবা (৩) মন্দির বাজার (৪) নামখানা (৫) কুলতলি (৬) বাসন্তী (৭) হিঙ্গলগঞ্জ। বড় বড় থানা এলাকাগুলি ভাগ করিয়া ছোট করা হইয়াছে। মহকুমাগুলিরও এলাকা ঐ সঙ্গে বদল করা হইয়াছে—বসিরহাট মহকুমায় থাকিবে—বসিরহাট, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, মীনা খাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ ও গোসাবা থানা। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় থাকিবে—ডায়মণ্ডহারবার, মগরাহাট, ফলতা, কুলপী, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ, সাগর, মন্দির বাজার, পাথর প্রতিমা ও নামখানা থানা। সদর মহকুমায় থাকিবে—কুলতলী, বাসন্তী, ক্যানিং, জয়নগর, মেটিয়াব্রুজ, ভাঙ্গড়, বারুইপুর, সোনারপুর, বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলা, বেহালা ও টালীগঞ্জ থানা—তাহা ছাড়া থাকিবে কলিকাতা সহরের ১৪টি থানা ও কলিকাতা ফোর্টের ২টি থানার যে সকল অংশ কলিকাতা সহর এলাকার বাহিরে থাকিবে।

১৫৮ বৎসরের মানুষ—

গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতা আলিপুরে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী কে-কে দাসের আদালতে সেখ নাজিব নামক এক বৃদ্ধ সাক্ষী দিতে আসিয়াছিলেন। তাহার বয়স ১৫৮ বৎসর—আদি নিবাস উত্তর প্রদেশের গাজিপুর—বর্তমান ঠিকানা বেলপুকুর, ফতেপুর, মেটিয়াব্রুজ—জন্ম ১৮০৪ সাল, ১৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় প্রথম আসেন। দেখিবার মত মানুষ বটে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা—

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার জন্য প্রথম পর্য্যায়ে মোট ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল, গত মে মাস পর্য্যন্ত তাহার ১২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে—১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের জন্য উড়িষ্যা সরকার ৯১৭৭৫ একর ও মধ্যপ্রদেশ সরকার ৬৩৮৪৮ একর জমী দিয়াছেন—তন্মধ্যে উড়িষ্যার ৩৭৭০৫ ও মধ্যপ্রদেশের ২৬২৯৫ একর জমী চাষবাসের যোগ্য করা হইয়াছে। বহু বাঙ্গালী উদ্বাস্তু তথায় গমন করিয়াছেন—এখন আরও অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী তথায় যাওয়া দরকার।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নূতন মুখ্যমন্ত্রী হইয়া জনগণের সহিত সংযোগের বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি সোমবার

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

বিকালে তিনি তাঁহার গৃহে ৫।৭ ঘণ্টা কাল ধরিয়া প্রায় ৩ হাজার লোকের সহিত দেখা করেন—সে সময় অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীও তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করেন। তিনি গত ৭ই সেপ্টেম্বর সারা দিন দিল্লীতে ছিলেন—বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া তথায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের অভাব অভিযোগের কথা বলিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় এক ভোজসভায় তিনি সাত শত গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীকেশবচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে

ছিলেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা ময়দানে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে—তথায় ২৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেন মহাশয় সারাজীবন জনসেবা করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহার মুখ্য-মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তিতে জনগণের মধ্যে এই উল্লাস দেখা যায়। পরে তিনি মফঃস্বলে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকিয়া মন্ত্রীদের সহিত নিজে মফঃস্বলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইবেন ও তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনিবেন। আমরা তাঁহার এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ জানাই এবং কামনা করি, তাঁহার প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধতর হউক।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ—

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস নেতা শ্রী অতুল্য ঘোষ এম-পি'র গত ২৮ শে আগষ্ট ৫৯তম জন্ম-

শ্রীঅতুল্য ঘোষ
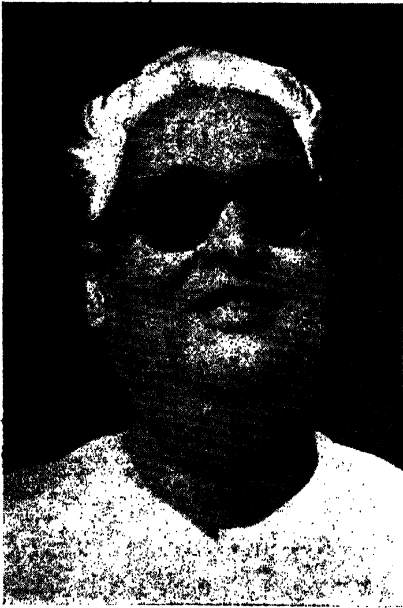
দিন উপলক্ষে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতুল্য বাবু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর যে ভাবে সকল দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। সততা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে দেশের উচ্চতম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয়। অতুল্যবাবু জন্ম-দিনে সকলকে জানান—প্রফুল্লদার কোন ব্যাঙ্কে টাকা নাই —প্রফুল্লদার সব টাকা অতুল্যবাবুর কাছে থাকে—তাহা হইতে অতুল্যবাবুর ও প্রফুল্লবাবুর সকল ব্যয় নির্বাহ হয়। —এই কথা গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। আমরা শুভদিনে অতুল্যবাবুর সুদীর্ঘ, কর্মময় ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন কামনা করি।

ফারাক্কা বাঁধের কার্য্যারম্ভ—

সম্প্রতি সরকার পক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী শীতের আগেই ফারাক্কা বাঁধ তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ করা হইবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। অর্থনীতিক উপদেষ্টা ও চিফ একাউন্টস্ অফিসারের অফিস শীঘ্রই কলিকাতায় আনা হইবে। গত ২৫শে আগষ্ট দিল্লীতে ফারাক্কা বাঁধ কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় যন্ত্র-পাতির জন্য ৩৩ হাজার টাকা ও জলবিজ্ঞান মতে পর্য্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার জন্য ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আশা ও আনন্দের সংবাদ।

কলিকাতা দুর্গাপুর নূতন পথ—

পশ্চিম বঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের এক সভায় গত ২৮ আগষ্ট স্থির হইয়াছে যে ১৯৬৪ সালের মধ্যে কলিকাতা দুর্গাপুর নূতন রাজপথ নির্মাণ শেষ করা হইবে। ৯২মাইল দীর্ঘ এই নূতন পথ বালীর নিকট হইতে বাহির হইয়া দুর্গাপুর যাইবে। ১৭ মাইল পথের জমী দখল করিয়া মাটি ফেলা হইয়াছে—পূজার পর আরও ৩৮ মাইল পথের জমীর দখল পাওয়া যাইবে। ১০০ ফিট চওড়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রাস্তা করিতে ১৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

কংসাবতী বাঁধ-পরিকল্পনা—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় কংসাবতী বাঁধ পরিকল্পনার জন্য ২৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কংসাবতী ও তাহার সাথে কুমারী নদীর জন্য ২টি মাটীর বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। ২টি বাঁধ পরস্পর যুক্ত থাকিবে এবং একই পথে উভয় বাঁধের জল ছাড়া হইবে। ঐ জল পাইলে ৯ লক্ষ একর নূতন জমীতে ধান ও দেড় লক্ষ

একর জমীতে রবিশস্থের চাষ হইবে। জমীগুলি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় অবস্থিত।

রাজবংশী দেবী—

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদের পত্নী রাজবংশী দেবী ৯ই সেপ্টেম্বর পাটনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর। মৃত্যুকালে স্বামী রাজেন্দ্রবাবু, দুই পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয় এবং নাতি অরুণ তাঁহার কাছে ছিলেন। কিছুকাল হইতে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমান সদস্য খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বঙ্গের অর্থ ও পরিবহন বিভাগের ভার লইয়া নূতন মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভার সদস্য হইল এখন ১৫ জন—তাহা ছাড়া ১১ রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১০ জন উপমন্ত্রী আছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এই একজন মাত্র নূতন মন্ত্রী হইলেন। শঙ্করদাসবাবু নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার যোগদানে মন্ত্রিসভার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে।

খেলার মাঠে ষ্টেডিয়াম—

কলিকাতা গড়ের মাঠে এলেনবরা কোর্সে ২২.৭৭ একর জমীর উপর এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ষ্টেডিয়াম নির্মিত হইবে—তাহাতে এক লক্ষ লোক খেলা দেখিতে পারিবে। তাহাতে ফুটবল ও হকি খেলা হইবে—ক্রিকেট খেলা চলিবে না। মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীবিজয় সিং নাহার ও শ্রীজগন্নাথ কোলেকে লইয়া মন্ত্রিসভার যে ষ্টেডিয়াম সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছিল গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা মাঠে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। উহার জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ৭০ হাজার লোক বসিয়া খেলা দেখিবে—মোটর গাড়ী রাখিবার স্থান থাকিবে ও কিছু লোকের বসিবার স্থানের মাথায় ঢাকা থাকিবে। ৩ মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইবে এবং মাল পাওয়া গেলে ২ বৎসরে কাজ সম্পূর্ণ হইবে। কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের চেষ্টায় এ ব্যবস্থা এত শীঘ্র আরম্ভ হইতেছে।

নব নিযুক্ত পালি অধ্যক্ষ
শ্রীঅনুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়—

বর্তমানে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণারত যে কয়েকজন কৃতী ও প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ডঃ শ্রীঅনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। নিজদেশ নদীয়ার সুধাকরপুর উচ্চবিদ্যালয়ে তাঁহার ছাত্র জীবন আরম্ভ হয়। কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ (সংস্কৃত অনার্স সহ) উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষায় পালিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া স্বুবর্ণ পদক লাভ করেন। ইহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়া

পালি অধ্যক্ষ অনুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেগণা আরম্ভ করেন। চীনা ও তিব্বতী সাহিত্যেও গবেষণার জন্য তিনি চীনা সংস্কৃতি বিষয়ক বৃত্তি লাভ করেন। 'সর্বাস্তিবাদ সাহিত্য' নামক সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে ঘোষবৃত্তি লইয়া শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালে পালির অধ্যক্ষ বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে সেই পদে তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। বান্ধবতা ও ছাত্রবাৎসল্যের জন্য ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়াছেন। বহুদিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ ডঃ বন্দ্যোবাধ্যায়কে পাইয়া পুনরুজ্জীবিত হইল। আমরা ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অধ্যাপকদের বর্দ্ধিত বেতন—

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস

হইতে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বর্দ্ধিত বেতনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন—গত ২৯শে আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৬৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ বেতন দিবেন।

আবার হিমালয় অভিযান—

নন্দাঘুটি ও মানা অভিযাত্রী দলের সদস্যগণ আগামী বৎসর সিকিম—হিমালয়ের কোন চূড়ায় অভিযান করিবেন স্থির করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারকে সভাপতি ও শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া পর্বত অভিযাত্রী সংঘ গঠন করা হইয়াছে। অভিযানে খরচ পড়িবে আন্দাজ ৪৫ হাজার টাকা।

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা সহরতলী বরাহনগর মিউনিসিপলিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সমাজসেবক জননেতা ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা নভেম্বর বিকালে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত ২৪শে আগষ্ট নিজগৃহে দুবৃর্ত্তের বোমায় আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিলেন। তিনি গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী-রূপে শ্রীজ্যোতিবসুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। তিনি ৯৫ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

অন্ধ ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কলিকাতা মোহন বাগান টোলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীপুরাণদাস অষ্টতীর্থের ছাত্রী কুমারী ইন্দিরা বাগচী অন্ধ। এবার তিনি ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে গুণানুসারে একাদশ স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণা হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। অন্ধ ছাত্রীর এই সাফল্য অসাধারণ।

পূর্ববঙ্গে ভীষণ বন্যা—

গত আগষ্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী, পাবনা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, বগুড়া ও শ্রীহট্ট জেলায় ভীষণ বন্যা হইয়া ১ শত লোক মারা গিয়াছে, ৮ হাজার বর্গমাইল জমি জলমগ্ন হইয়াছে; ২০ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে ও ক্ষতির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা, বুড়ি গঙ্গার জলে ঢাকা সহরও ভাসিয়া গিয়াছে। পূর্ব বাংলার নানা বিপদ—দৈব দুর্বিপাকের ও অভাব নাই। ইহার ফলে পূর্ব বাংলার সকল হিন্দু ও অনেক মুসলমান ভারত রাজ্যে—বিহার, পশ্চিম বাংলা ও আসামে চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের সমস্যাও ভীষণ, উপায় কি?

ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ গত ৫ই সেপ্টেম্বর ৭৫ বৎসরে পদার্পণ করায় তাঁহার জন্ম দিনে উৎসব করা হইয়াছে। তিনি ভারতের অন্যতম কৃতী সন্তান। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলিকাতায় হাঙ্গামা—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় একটি লোকের বিনা টিকিটে ট্রেণে চড়া লইয়া যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহা সত্যই বিস্ময় ও দুঃখের বিষয়। ঐ দিন শিয়ালদহ অঞ্চলে ১৩ খানি ট্রামগাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ও বহু লোক আহত হইয়াছে। বেলা ১টা হইতে প্রায় সারাদিন ট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ থাকায় জনসাধারণের বহু ক্ষতি ও দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আরও দুঃখের কথা, একদল ছাত্র প্রথমে এই হাঙ্গামার কারণ ছিল—পরে অবশ্য কলিকাতার বেকার গুণ্ডা প্রকৃতির লোকই সব অনাচার করিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে আর কখনও এরূপ ঘটনা না হয়, সে জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত।

আচার্য্য বিনোবা ভাবে—

১১ই সেপ্টেম্বর আচার্য্য বিনোবা ভাবের ৬৮ তম জন্ম দিন। ঐ দিন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একটি গ্রামে ছিলেন। ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল হইতে গত ১১ বৎসরে তিনি ভারতে প্রায় ৪০ হাজার মাইল পথ পদযাত্রা করিয়াছেন। প্রায় ১ কোটি লোকের সামনে তিনি উপস্থিত হইয়া ভূদান তথা আত্মদানের কথা বলিয়াছেন। তিনি এবার পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, ২৪পরগণা প্রভৃতি জেলায় পদযাত্রা করিবেন।

রুই কাতলা ধরো—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাকরণে পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় পুলিশ কর্তাদের সহিত মিলিত হইয়া দুর্নীতি দমন সম্বন্ধে আলোচনা

কালে বলিয়াছেন—"চুনা পুটিদের পিছনে অথবা সময় ব্যয় না করিয়া রুই কাৎলা ধরিবার দিকে বেশী নজর দিন।" মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য। সাধারণ মানুষের ধারণা—সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন লাভ করিয়া দেশের এক শ্রেণীর ধনী লোক দরিদ্রদিগের উপর শোষণ চালাইয়া থাকেন। প্রফুল্লবাবু যদি সাহসের সহিত তাহাদের কার্য্যে বাধা দেন, তবেই দেশের অসন্তোষ অনেক কমিয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য লালফিতার উপর নির্ভর করা চলিবে না—সে জন্য বিশেষ সাহসী কর্মীর ও প্রয়োজন।

হাওড়ায় ভ্রাম্যমান পাঠাগার—

হাওড়া সালকিয়ার বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার ঐ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। সম্প্রতি ঐ পাঠাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগের উদ্বোধন হইয়াছে। হাওড়া মিউনিসিপলিটীর চেয়ারম্যান শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উৎসবে বিবৃত করেন। সভায় কমিশনার শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, পাঠাগারের সভাপতি শ্রীতারকপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

হাওড়ার ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্বোধন উৎসবের চিত্র

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

ভারতবর্ষের নূতন সংবিধান রচনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী আইনজীবী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি কলিকাতা ভবানীপুরের অধিবাসী এবং প্রথম জীবনে পশ্চিম বঙ্গের আইন বিভাগের সচিবের কাজ করার পর দিল্লীতে সংবিধান রচনায় নিযুক্ত হন। তিনি এম-এ, বি-এল এবং গত সুদীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যসভার সচিবের কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য দিল্লীর বাঙ্গালীসমাজে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম শতবার্ষিক—

২৪পরগণা বারাকপুর মণিরামপুর ভোলানন্দ আশ্রমের মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তনের উদ্যোগে গত ২৬শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় বিরাট মণ্ডপে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মঙ্গলাচরণ করেন, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সভাপতিত্ব করেন ও খ্যাতনামা বক্তা সুপণ্ডিত শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। সভার বৈশিষ্ট্য ছিল—কৃষ্ণনগরের মহারাজকুমার শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় সভায় বক্তৃতা করিবার পর দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তাঁহার পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়া দেবীর একত্র গীত গান—টেপ রেকর্ড হইতে শুনাইয়াছেন এবং কৃষ্ণনগর-উৎসবের সম্পাদক শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায় বর্ষব্যাপী উৎসব আয়োজনের

বিবরণ জানাইয়াছেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায়, শ্রীনির্মল দত্ত ও অধ্যাপক স্মরণকুমার আচার্য্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কয়টি অংশ অভিনীত হইয়াছিল।

শিশু স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সমিতি—

গত ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে কলিকাতা বাদুড়-বাগান ১১৷৩এ রামকৃষ্ণ দাস লেনে শিশুস্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ সমিতির এক শাখা কেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে। মন্ত্রী শ্রীজীবনরতন ধর উৎসবে সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন প্রধান অতিথি ও মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করেন। সমিতির সম্পাদক ডাক্তার বিমলেন্দু নারায়ণ রায়ের চেষ্টায় সমিতি কয়েকটি স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সভায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, কবি শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক—

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতামহ এলাহাবাদে গিয়াছিলেন—বিধুভূষণ সেখানে সারাজীবন বাস করিতেছেন, সুদীর্ঘ জীবনের শেষে তিনি পিতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের কথা আছে। আমরা তাঁহার কর্ম-সাফল্য কামনা করি।

স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৯
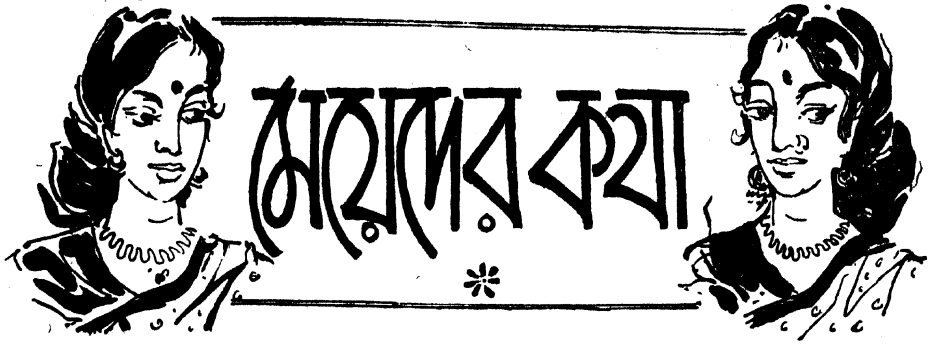
কামনা নারীকে বর্হিমুখী করে। সে অপরকে চায়। অপরের প্রতি আকর্ষণকেই প্রেম বলে। কিন্তু সে প্রেম যখন দুটি হৃদয়কে একত্রিত করে, তখন দম্পতির মধ্য থেকে সে অপরত্ব-ভাব কেটে যায়—দুজনে এক হয়ে যায়। একত্বভাব যখন সম্পূর্ণভাবে অপরত্ব-ভাবকে দূর করে দেয়, সে বড় কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করে। দুজনেব মধ্যে তখন দেয়া-নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। তারা যেন তখন একে অপরকে আত্মদান করে না, দুজনে মিলে আত্মরতিতে মত্ত হয়।

পাঞ্চালী ও সঞ্জয়ের দাম্পত্য জীবনে এ-ভাব অতি সত্বর এসে পড়েছিল।—ছেলে মেয়ে দুটি বড় হয়ে উঠার আগেই। সঞ্জয়ের সাহচর্যে পাঞ্চালী আর তেমন আনন্দ পেতেন না। প্রথম প্রথম তিনি সঞ্জয়কেই ভিন্ন পুরুষ কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে বিহার করতেন। সঞ্জয়ের কাছে সে কথা স্পষ্ট হতে বেশী সময় লাগল না। তিনি একদিন বলেই ফেললেন :—

"পরোৎসর্গমনুপ্রাপ্য বাঞ্ছতি পুরুষান্তরম্।
নার্থঃ সধাঃ স্বভাবেন বদন্ত্যমলাশয়াঃ॥"

"কি বল্লে? কি বল্লে?" বলে তাঁকে আক্রমণ করলেন পাঞ্চালী, সঞ্জয়কে এ শ্লোকের অর্থ বোঝাতে হল। কিন্তু সে-অর্থ শুনে পাঞ্চালীর কী রাগ! বড় ভুল করলেন সঞ্জয়। কল্পনায় পাঞ্চালী যে অপরত্বের আস্বাদ ভোগ করতেন তা চলে গেল। তখন থেকে তাঁকে সত্যিকারের অপরকে খুঁজতে হল। তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে দেখা দিল কতগুলি স্ত্রীরোগ। সহরের নানা বয়সের ডাক্তারদের ডাক পড়লো পাঞ্চালীর ঘরে। একের পর এক ডাক্তার পাঞ্চালীর দেহ পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন। পাঞ্চালীর তাতেই সুখ, তাতেই আনন্দ। তাই এই যে এক রোগে তাঁকে ধরল, কোন ডাক্তারই আর আরোগ্য করতে পারল না।

ডাঃ ধ্রুব সেন যখন জামাই হয়ে বাড়ীতে এল তখনই তিনি তার দ্বারা রোগের পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডাঃ সেন তাতে কেমন ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছিল; বলেছিল, "চলুন, ডাঃ বিশীর কাছে একদিন নিয়ে যাব। তিনি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।" পাঞ্চালীর সে-কথা পছন্দ হয় নি। সেই থেকেই একটা প্রচণ্ড ক্রোধ জেগেছিল তাঁর মনে জামাতার বিরুদ্ধে। মেয়ের মনকেও বিষাক্ত করতে সেই ক্রোধই গোপনে ক্রিয়া করেছে পরে।

সেদিন বৈকালিক ভ্রমণ সেরে যখন তিনি শুনলেন, মৌলি তার বাপের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্বশুর-বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে দিন ঠিক করেছে, ক্রোধে ফেটে পড়লেন

তিনি। নিলর্জ্জের মত চেঁচিয়ে বললেন, "ছেলেদের নিয়ে যাবে বাপের কাছে রোগ দেখাতে? কত বড় ডাক্তার গো। আমার একটা সামান্য রোগ দেখতে পারে নি! ওর মত ডাক্তার কত শত রয়েছে এ সহরে। বল, কত জনকে ডাকবো বল। আমি ডাকলে সবগুলি ডাক্তার এখানে এসে দিবা-রাত্র বসে থাকবে।"

পাঞ্চালীর গলায় যে আওয়াজ বেরুল, তাতে মৌলির পতি-গৃহে ফিরে যাওয়ার বাসনা একমুহূর্ত্তে ভস্ম হয়ে গেল। সঞ্জয় 'থ' হয়ে বসে রইলেন। পাঞ্চালীর বিরুদ্ধে একটি কথা বলার তাঁর সাহস হল না। বসে বসে তিনি ভাবলেন। মনে পড়ল তাঁর একটি অ্যামেরিকান্ বই-এ পড়া বিবাহিতা নারীর করুণ কাহিনী—শাশুড়ী অর্থাৎ ছেলের মা ও মেয়ের মার উৎপাতে যে নারীর জীবন বড় দুঃসহ হয়েছিল ঃ—

মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ এক ছেলে ও এক মেয়ের মা। আট বছর আগে মিঃ ব্যাক্‌মেনের সংগে তার বিয়ে হয়, উভয়েরই মা-বাপের অনিচ্ছায়। তাই বরের মা ও কনের মা দুজনের কেউই তাদের সংসার গড়ে তুলতে সাহায্য করল না। মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ তার বাপের বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। সেখানেই তাদের এক ছেলে আর এক মেয়ের জন্ম হল। ইতিমধ্যে যুদ্ধের একটা চাকুরী পেয়ে ব্যাক্‌মেন্ বাইরে চলে গেল। কিন্তু সেখানে মিলিটারী চাকুরী করা তার পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হল না। গ্যাষ্টিক্ আল্‌সার হওয়াতে তাকে চাকুরী ছেড়ে আসতে হল। ব্যাক্‌মেন্ অবশ্যই প্রথমে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা যেখানে রয়েছে সেখানে এসে উঠল। কিন্তু শাশুড়ীর যা দুর্দান্ত প্রতাপ, তাতে তার সে বাড়ীতে থাকা কঠিন হল। কেন সে বসে খাবে? কেন সে চাকুরী জোগাড় করছে না? দিবা রাত্র সে কথা শুনতে শুনতে শাশুড়ীর বাড়ী ঘর ছেড়ে পালাল সে। কিন্তু নিজের মায়ের কাছে সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে হাজির হতে পারল না। ব্যাক্‌মেনের মা এত খরচ কি করে চালাবে? চালাতে পারলেও মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ সেখানে যেতে রাজী নয়। যা মুখ করেন শাশুড়ী!

জামাই এর উপর খড়্গহস্তা হলেও মিসেস্ ব্যাক্‌মেনের মা মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ ও তার ছেলে মেয়ের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা দয়া করে করেছিলেন, যদিও মিসেস্ ব্যাক্‌মেনকে দিবারাত্রই তার স্বামী সম্বন্ধে কটূক্তি শুনতে হত। মিসেস্ ব্যাক্‌মেনের সঙ্গে তার স্বামীর দেখা করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। ব্যাক্‌মেন্ তার শাশুড়ীর বাড়ীর কাছে গেলেই তাঁর বক্তৃতা সুরু হয়ে যেত। তাই দুজনে মিলিত হত হোটেলে, রেঁস্তোরায়, টেক্সিতে, পার্কের নির্জনতায়। কিন্তু তার জন্যে তো পয়সা দরকার। ছেলেমেয়ে দুটিকে ভাল স্কুলে পড়াতেও পয়সার দরকার, তাই মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ এক হোটেলে-পরিচারিকার চাকুরী নিয়ে নিল। তাতে তার বেশ পয়সা আসতে লাগল। স্বামীকে নিয়ে মনের খুশিতে ঘুরে বেড়াতে পারল, প্রাণ ভরে রেঁস্তোরায় পান করতে পারলো। কিন্তু এতে আর এক মুস্কিল হল। পুলিশ তাদের দুজনের গতি-বিধিতে সন্দেহ বোধ করল। তারা লক্ষ্য করল—এক হোটেলের পরিচারিকা মত্ত অবস্থায় একটি পুরুষের সঙ্গে টেক্সিতে ঘুরে বেড়ায়, নির্জন পার্কে অর্দ্ধ-রাত্রি কাটায়। ভালো কথা নয়। একদিন ব্যাক্‌মেন্ তার ভাড়া-করা গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে। মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ তার হোটেল থেকে ছুটি পেয়ে ছুটে ছুটে আসছে। গাড়ীতে সে উঠবে, এমন সময় তাকে পুলিশ ধরে ফেলল। রাত্রি তখন বারোটা। ব্যাক্‌মেন্ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার ভাড়াটে গাড়ীর ড্রাইভার বিপদ ভেবে তাকে নিয়েই জোরে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল। মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্‌কে পুলিশ জেলহাজতে নিয়ে রাখল। বারবনিতা সন্দেহে কোর্টে তার বিচার হল। তার স্বামী ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রভৃতি দাখিল করে উকীল লাগিয়ে মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্‌কে মুক্ত করে আনল। কিন্তু বিচারকের নির্দেশ অনুসারে মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্‌কে প্রতি সপ্তাহে সমাজ-সেবা অফিসে হাজিরা দিতে হবে। কী লজ্জার কথা! বারবনিতাদেরও এ শাস্তি হয়ে থাকে। তাঁর ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে, তাদের উপর না কটাক্ষপাত করে সাধারণ লোকেরা। আসল কথা তো কেউ জানতে পারবে না। বুঝতে পারবে না!

সমাজসেবা অফিসের নির্দেশে মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্‌কে ছাড়তে হলো হোটেল-পারিচারিকার কাজ। কিন্তু তার যে চাকুরী চাই। নইলে কোথায় পাবে সে স্বামীর হাত খরচ, নিজের হাতখরচ, ছেলেমেয়েদের ভাল পোষাক? সে একটা মিষ্টি তৈরীর কারখানায় চাকুরী নিল। অনেক খাটুনী সেখানে। তাহোক এবার সে ব্যাক্‌মেনের জন্যে

একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করল। ব্যাক্‌মেন্ সেখানে থাকবে একা। মিসেস ব্যাক্‌মেন্ যাবে সেখানে তার অবসর মত, এই হলো ব্যবস্থা।

খৃষ্টমাসের ছুটি। মিসেস্ ব্যাক্‌মেন্ কিছু বেশী ডলার পেয়েছে ছুটির আগে। মদ কিনলো, খাবার কিনলো, নূতন নাচের রেকর্ড কিনলো, তারপর স্বামীর ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌছল। মিসেস্ ব্যাক্‌মেনের নেশা গাঢ় হল। ব্যাক্‌মেনেরও ও তেমনি। তারা রেকর্ড বাজাল, নাচল। নেশার চোটে মিসেস ব্যাক্‌মেন্ পুরো মাতাল হয়ে পড়ল। একটা হট্টগোল বুঝতে পেরে পুলিশ এল ও মিঃ ব্যাক্‌মেন্‌কে উচ্ছৃঙ্খল গৃহ পরিচালনার জন্যে ধরে নিয়ে গেল।"···

সঞ্জয় ভাবতে লাগল ভারত আর কোন দিক দিয়ে না হোক, শাশুড়ীর উৎপাতে অ্যামেরিকার মত সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিমর্ষমুখে তাঁর ভাবনার গাম্ভীর্য দেখে মৌলি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো, বললো, "তুমি ভেবো না, আমি এখন যাবো না ঠিক করেছি।" পাঞ্চালীর বাজখাই গলায় তখনও মৌলির শাশুড়ীর আদ্য-শ্রাদ্ধ হচ্ছে।··· ক্রমশঃ

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

এবারে কাপড়ের টুকরো দিয়ে, স্নানের সময় গায়ে সাবান-মাখবার উপযোগী বিচিত্র-ছাঁদের এবং সৌখিন-অথচ-নিত্যপ্রয়োজনীয় এক-ধরণের 'দস্তানা' বা Mitte.' রচনার কথা বলছি। অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন যে—স্নানের সময় গায়ে সাবান মাখবার জন্য আবার কাপড়ের তৈরী এ-ধরণের 'দস্তানার' প্রয়োজন কি?···গায়ে জল ঢেলে সাবেকী-প্রথায় শুধু সাবান ঘষলেই তো হয়···আরামের জন্য, বড় জোর চিরাচরিত-কায়দায় ধুঁধুলের-ছোব্‌ড়া, 'স্পঞ্জ' (Sponge) কিম্বা অধুনা-প্রচলিত প্লাষ্টিক-রবারের তৈরী সাবান-ঘষ্‌বার হাতিয়ার ব্যবহার করলেই তো কাজ চলে···সুতরাং মেহনৎ করে নতুন-ধরণের এই কাপড়ের দস্তানা বানানোর সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি দেখানো যায় যে প্রথমতঃ—স্নানের সময় এ-ধরণের কাপড়ের দস্তানা ব্যবহার করলে সাবান ক্ষয় হবে অপেক্ষাকৃত কম এবং সাবানের ফেনা বেশী হবার ফলে, গাত্র-মার্জ্জনারও সুবিধা হবে অনেকখানি। তাছাড়া বাজার থেকে সাবেকী-ধরণের ধুঁধুলের-ছোব্‌ড়া, 'স্পঞ্জ' বা প্লাষ্টিক-রবারের তৈরী সাবান-মাখার হাতিয়ার কিনতে অল্প-বিস্তর যে পয়সা খরচ করবেন, বাড়ীতে নিজের হাতে কাপড়ের টুকরো দিয়ে এ-ধরণের সাবান-মাখার দস্তানা বানিয়ে নিলে, তার সাশ্রয় হবে অনেকখানি। টুকরো-কাপড় দিয়ে এ-ধরণের দস্তানা তৈরী করা খুব একটা দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার নয়···সামান্য চেষ্টা করলেই যে কোনো সুগৃহিণীই বাড়ীতে বসে নিজের হাতে এ সব সৌখিন-অথচ-নিত্য-

প্রয়োজনীয় কারুশিল্প-সামগ্রী বানাতে পারবেন···এমন কি, বিশেষ কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রিয়জনদের এই ধরণের অভিনব-সুন্দর হাতের কাজ উপহার দিয়ে

অনায়াসেই তাঁদের রীতিমত খুশী করে তুলবেন। যাই হোক, এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে, মোটামুটি ভাবে কি উপায়ে কাপড়ের টুকরো দিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের এই 'সাবান-মাখা দস্তানা' বানানো যায়—আপাততঃ, সেই কথাই বলি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে, টুকরো-কাপড়ের তৈরী অভিনব ছাঁদের এই 'সাবান-মাখা দস্তানাটি' দেখতে কেমন হবে—নীচের ছবিতে তার সুস্পষ্ট 'নমুনা' প্রকাশিত করা হলো।
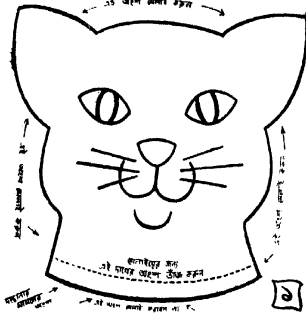
উপরের ছবিতে দেখানো 'বেড়ালের মুখের' নমুনা-চিত্রের ছাঁদে কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'সাবান-মাখা দস্তানা' রচনা করতে হলে বিশেষ কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন। তবে, এ সব উপকরণ নিতান্তই ঘরোয়া-সামগ্রী···যে কোন সংসারে অনায়াসেই এগুলি জোগাড় করা যাবে। এ কাজের জন্য চাই—নক্সা-আঁকার উপযোগী বড় একখানা কাগজ, পেন্সিল ও রবার (Eraser), অন্ততপক্ষে ১৬″ ইঞ্চি × ২৬″ ইঞ্চি অথবা প্রয়োজনমতো ছোট-বড় মাপের একখানি পুরোনো তোয়ালে (Towel or Washcloth), গোটাকয়েক সরু ও মোটা ছুঁচ, আর পছন্দমতো দু'তিন রঙের 'এমব্রয়ডারী' কাজ করবার সেলাইয়ের সুতোর 'হালি' (two or three colours of Embroidery-thread)।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমে বড় কাগজ-খানির একপিঠে পরিপাটি-নিখুঁত ছাঁদে উপরের ঐ ১নং ছবির নমুনা-অনুসারে প্রয়োজনমতো ছোট কিম্বা বড় আকারে 'বেড়ালের মুখের' নক্সাটিকে এঁকে নিন। তারপর তোয়ালেটিকে সুষ্ঠুভাবে দুই-ভাঁজ করে নিয়ে পাশের ২নং ছবির ধরণে কাগজে-আঁকা 'বেড়ালের মুখের' ঐ নক্সাটিকে তার উপর রেখে চারিদিকে 'আলপিন' (Pin) অথবা 'সেফ্‌টিপিন' (Safety-Pin) এঁটে পাকাপোক্ত-ভাবে গেঁথে দিন। এবারে নীচের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে

নক্সা-আঁকা কাগজ ও তোয়ালেটিকে সুষ্ঠুভাবে সেলাইয়ের কাজ করবার কাঠের ফ্রেমের মধ্যে এঁটে বসিয়ে, 'বেড়ালের মুখের' খশড়া-চিত্রটির চারিদিকে ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে আল্‌গাভাবে 'চেন্-ষ্টিচ্' (Chain-Stitch) সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে 'এম্‌ব্রয়ডারী' করুন। এ কাজের পর, 'সাটিন্-ষ্টিচের' (Satin-Stitch) সেলাই দিয়ে বেড়ালের চোখ, নাক, মুখ ও গোঁফের রেখা রচনা করে ফেলুন।

এ কাজটুকু পরিপাটিভাবে শেষ করে নিলেই তোয়ালে-কাপড়ের (Toweling-Cloth) দস্তানার সামনের দিক অর্থাৎ বেড়ালের মুখের ছাঁদ তৈরী হয়ে যাবে। এবারে কাঠের ফ্রেম থেকে কাগজ-আঁটা তোয়ালে-খানিকে খুলে নিয়ে নীচের ৪নং ছবির ভঙ্গীতে,
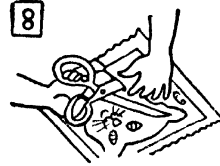
কাপড়ের চারিদিকে সাবধানে কাঁচি চালিয়ে 'বেড়ালের মুখের' সামনের-অংশের কাপড়টিকে ছাঁটাই করে নেবার পর, অবিকল একই মাপে এবং একই ছাঁদে 'বেড়ালের মুখের' পিছনের-অংশের কাপড়টুকু কাঁচি দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে ফেলুন। তাহলেই 'বিড়ালের মুখের' উভয় অংশ অর্থাৎ মাথার সামনের ও পিছনের দিক দুটিই
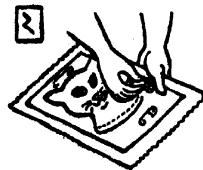
সমান-মাপে ছাঁটাই হয়ে যাবে। এ কাজ সারা হলে, উপরের ১নং চিত্রে দেখানো 'বেড়ালের মুখের উভয় অংশের' 'ফুটকি-চিহ্নিত স্থান (Dotted line portion at bottom of the design) পরিপাটিভাবে মুড়ে ভাজ করে নিয়ে, 'হেমিং' (Hem) সেলাই দিন। ঠিক এমনিভাবেই 'বেড়ালের মুখের' পিছনদিকের কাপড়টিতেও, 'ফুটকি-চিহ্নিত-অংশে' 'হেমিং'-সেলাইয়ের কাজ করুন। তারপর 'বেড়ালের মুখের' নক্সা এম্ব্রয়ডারী-করা সামনের ও পিছনের-অংশের কাপড়ের টুকরো ছটিকে উল্টে নিয়ে,

উপরের ৫নং ছবির ধরণে, সে ছটি কাপড় সমানভাবে মিলিয়ে রেখে, ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে আগাগোড়া 'টাঁকা-সেলাই' (Basting) দিয়ে উভয়-অংশের কাপড়ের টুকরোর মাথার ও ছ'পাশের কিনারাগুলি পাকাপোক্তভাবে একত্রে জুড়ে দিন। তাহলেই টুকরো-কাপড় দিয়ে সাবান-মাখার অভিনব 'দস্তানা' তৈরীর কাজ শেষ হবে। এবারে সন্ত-সেলাই-করা 'কাপড়-উল্টানো' দস্তানাটিকে যথারীতি সোজা করে নিলেই দেখবেন—চমৎকার একটি কারুশিল্প-সামগ্রী তৈরী হয়ে গেছে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি বিচিত্র সামগ্রী রচনার বিষয়ে আলোচনা করার বাসনা রইলো।

সূচী-শিল্পের নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

আজকাল কার্পেটের বিচিত্র সূচী-শিল্পের কাজ বড় বেশী চোখে পড়ে না। অথচ, মাত্র কয়েক বছর আগেও কার্পেটের সূচী-শিল্পের নানা সৌখিন-কারুসামগ্রী রচনা করার রীতিমত রেওয়াজ ছিল আমাদের দেশের ধনী-দরিদ্র সকল সংসারেই। দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে কার্পেটের ছবি, আসন, ব্যাগ, কুশন প্রভৃতি নানা রকমের অপরূপ কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার দিকে ছোট-বড় সকল বয়সের মেয়েদেরই ছিল প্রবল অনুরাগ...ইদানীং পশমের পোষাকআশাক (Woolen Garments) বোনার দিকে আধুনিকাদের যেমন একান্ত আগ্রহ দেখা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে, বিভিন্ন ধরণের কার্পেটের জিনিষপত্র বানানোর ব্যাপারেও তেমনি বিপুল উৎসাহ নজরে পড়তো! সে উৎসাহের স্রোতে কি কারণে সম্প্রতি এমন ভাঁটা পড়তে সুরু করেছে, তার সঠিক মর্ম্ম হয় তো খুঁজে পাওয়া কঠিন—কিন্তু তাই বলে, কার্পেটের সূচীশিল্প-কলার অনুশীলন নিতান্তই অবহেলিত হয়ে থাকবে—সেটাও তো আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়! তাই আজ কার্পেটের সূচী-শিল্পের কয়েকটি সহজসাধ্য 'প্যাটার্ণ' (Pattern) বা 'নক্সার' নমুনা পরিবেশন করা হলো...যে কোন শিক্ষার্থী, একটু বেশী চেষ্টা করলেই, রঙ-বেরঙের পশমী-সুতো দিয়ে বুনে অনায়াসেই এ সব 'প্যাটার্ণ' বা নক্সা কার্পেটের উপর সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। শুধু কার্পেটের উপরেই নয়, এসব প্যাটার্ণ বা নক্সার প্রত্যেকটিকেই 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' (Cross-stitch) সূচী-শিল্পের সাহায্যে অন্যান্য কাপড়ের বুকে অপরূপ-ছাঁদে রচনা করা চলবে।
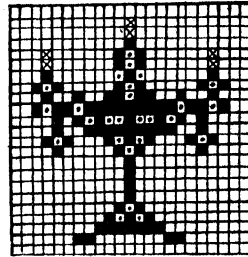
উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে—কার্পেট এবং 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সূচীশিল্প-কাজের উপযোগী সহজসাধ্য কয়েকটি 'প্যাটার্ণ' বা নক্সা। ১ নং নক্সাটি হলো—বিচিত্র একটি প্রদীপ-দানীর প্রতিলিপি এ নক্সা রচনার জন্য চাই—প্রয়োজনমতো সাইজের কার্পেট-বোনার কাপড়, কার্পেট-বোনবার ছুঁচ আর লাল, হলদে, কমলা, নীল অথবা সবুজ রঙের পশমী-সুতো। সচরাচর, বাজারে সরু বা ছোট। আর মোটা

বা বড় ঘরওয়ালা—এই দুই ধরণের কার্পেট-বোনার কাপড় কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুসারে সরু বা মোটা—কোন ধরণের কার্পেট-বোনার কাপড়ে এ সব নক্সার প্রতিলিপি রচনা করবেন, কাজে হাত দেবার আগেই তার মীমাংসা সূচী-শিল্পী নিজেই স্থির করে নিলে ভালো হয়। তাছাড়া এ সব নক্সার প্রতিলিপি রচনা, ছোট বা বড়—কোন সাইজের হবে—সেটিও কাজে হাত দেবার আগে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বিচার করে নেওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে যে নক্সাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে বড়-সাইজের কার্পেটের কাপড়ে বড় ছাঁদে রূপদান করতে হলে, প্রত্যেকটি ঘরকে প্রয়োজনমতো বর্দ্ধিত-আকারে অর্থাৎ 'ঘরের সংখ্যা বাড়িয়ে' ছুঁচ-সুতো দিয়ে বুনতে হবে। ধরুন, উপরের ঐ প্রদীপদানীর নক্সাটি যদি চারগুণ বড় সাইজের ছাঁদে সূচী-শিল্পের কাজ করে কাপড়ের বুকে চিত্রিত করতে হয়, তাহলে নক্সাতে-দেখানো প্রত্যেকটি 'ঘর' বুনতে হবে ১ × ৪ = ৪ঘর—এই হিসাবে…অর্থাৎ কার্পেটের কাপড়ের চারটি করে 'ঘর' নিয়ে একেকটি 'ঘর' রচনা করে! কোনো 'নক্সা' বা প্যাটার্ণ বড়-সাইজে রচনা করতে হলে—সচরাচর এই নিয়মে সে কাজ সারতে হয়।

কার্পেটের কাপড়ে উপরের ঐ প্রদীপদানীর নক্সাটি রচনার সময়, কালো-রঙের ঘরগুলিকে হলদে-রঙের পশমী সুতো দিয়ে ভরাট করে তুলবেন। কালো-রঙের বিন্দু-চিহ্নিত ঘরগুলি ভরে নেবেন—লাল-রঙের পশমী-সুতোয় এবং পশ্চাদপটের (Background) শাদা-রঙের ঘরগুলি আগাগোড়া বুনে ফেলতে হবে—নীল বা সবুজ রঙের পশমের সুতো দিয়ে। প্রদীপের প্রজ্জলিত-শিখা রচনা করতে হবে "×" চিহ্নিত ঘরগুলিকে কমলা রঙের পশমের সুতো দিয়ে ভরিয়ে তুলে। অবশ্য এই তিন রঙের পশমী সুতো ছাড়া সূচী-শিল্পীর নিজস্ব রুচি-অনুসারে অন্যান্য রঙের পশমের সুতোও ব্যবহার করা চলবে…তবে, আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত লাল, হলদে, কমলা এবং নীল বা সবুজ রঙের পশমী-সুতোতেই প্রদীপদানীর নক্সাটি অনেক বেশী সুন্দর ও মানানসই দেখাবে।

এবারে কার্পেটের কাপড়ে পশমের সুতো দিয়ে বুনে কিম্বা অন্যান্য কাপড়ের উপরে 'ক্রশ্-ষ্টীচ্ সেলাইয়ের কাজ করে সূচী-শিল্পের আরো যে সব অভিনব-সুন্দর নক্সা রচনা করা যায় আপাততঃ তারই একটি নমুনা দিচ্ছি।
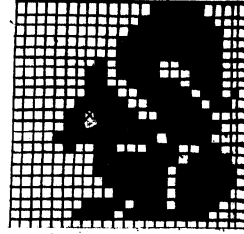
উপরের ২নং ছবিতে কাঠবেড়ালীর যে বিচিত্র নক্সাটি দেখানো হয়েছে—রঙীণ পশমী-সুতোর সাহায্যে কার্পেটের কাপড়ে এ নক্সা ফুটিয়ে তুলতে হলে—কালো-রঙের ঘরগুলি সব ভরাট করে ফেলুন—ফিকে-ধূসর বর্ণের পশমের সুতোয়। তারপর কাঠবেড়ালীর দেহের ভিতরকার কালো-রঙের বিন্দু-চিহ্নিত ঘরগুলিকে ভরে তুলুন—গাঢ়-বাদামী কিম্বা কালো রঙের পশমী-সুতো দিয়ে। তারপর গাঢ়-লাল, বাদামী অথবা কালো রঙের পশমী-সুতো দিয়ে বুনে নিন—কাঠবেড়ালীর চোখ…অর্থাৎ ছবিতে দেখানো "×" চিহ্নিত ঘরটিকে! তাহলেই, কাঠবেড়ালীর চেহারাটি সম্পূর্ণ হবে। এবারে ছবির 'পশ্চাদপট' বা 'Background রচনার পালা। একাজের জন্য বেছে নিন ফিকে-হলদে রঙের পশমী-সুতো এবং সেই সুতো দিয়ে আগাগোড়া পরিপাটি-ভাবে বুনে ফেলুন উপরের ২নং নক্সার প্রত্যেকটি শাদা-চিহ্নিত ঘর। তাহলেই কার্পেটের কাপড়ের উপর সুদৃশ্য-ছাঁদে কাঠবেড়ালীর নক্সা-চিত্রণের কাজ শেষ হবে।

এবারে সূচী-শিল্পের যে দুটি সহজসাধ্য ও অনাড়ম্বর ছাঁদের নক্সার নমুনা দেওয়া হলো, সেগুলির জৌলস-শ্রী আরো অনেক বেশী বাড়বে—যদি কার্পেটের বুকে রচিত প্রতিলিপির চারদিকে মানানসই-রঙের পশমী-সুতো দিয়ে আগাগোড়া পরিপাটি-ধরণের ঈষৎ-চওড়া 'বর্ডার' (Border বা 'পাড়' রচনা করে দেন। তবে এই ধরণের 'পাড়' শুধু কার্পেটের চিত্র-রচনা সময়, 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের কাজের সময়, নক্সার চারিদিকে এ ধরণের 'বর্ডার' বা 'পাড়' না দিলেও চলবে…'বর্ডার' বা 'পাড়ের' অভাবে সূচীশিল্প-

সামগ্রীর সৌন্দর্য্যহানির বিশেষ কোনো কারণ ঘটবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

পরের সংখ্যায় এ ধরণের কার্পেট ও 'ক্রশ ষ্টিচ' সূচী-শিল্পের আরো কয়েকটি সহজ-সুন্দর নক্সার নমুনা দেবার বাসনা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

এবারে পশ্চিম-ভারতের মহারাষ্ট্র-দেশীয় ছুটি উপাদেয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি। প্রথমটি হলো—মহারাষ্ট্র-দেশের পরমান্ন-জাতীয় বিশিষ্ট এক-ধরণের খাবার, এবং দ্বিতীয়টি হলো—বিচিত্র-সুস্বাদু রুটি-লুচি-পরোটা দিয়ে খাবার বিশেষ এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী।

বাদামের পায়েস ঃ

মহারাষ্ট্র-দেশীয় সুমিষ্ট এই পরমান্ন-জাতীয় খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—বেশ মিহি করে বাটা এক-পোয়া ভালো বাদাম, সের তিনেক দুধ, আধসের চিনি আর অল্প একটু জাফরানের গুঁড়ো।

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, উনানের আঁচে রান্নার কড়া বা ডেকচি চাপিয়ে, সেই পাত্রে দুধটুকু বেশ ভালো করে জ্বাল দিয়ে নেবেন। দুধটুকু অর্দ্ধেক-জ্বাল দেওয়া হলে, সেই দুধে বাদাম-বাটা, চিনি আর জাফ্রানের গুঁড়ো মিশিয়ে আরো খানিকক্ষণ ভালো করে ফুটিয়ে নিন। কিছুক্ষণ এইভাবে উনানের আঁচে জ্বাল দিয়ে ফোটানোর ফলে, তরল-দুধটুকু ক্ষীরের মতো বেশ ঘন-থক্থকে হয়ে উঠলেই, রন্ধন-পাত্রটিকে আগুনের উপর থেকে নামিয়ে রেখে খাবারটি ভালো করে জুড়োতে দিন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ হবে। এবারে নিমন্ত্রিত-অতিথি আর প্রিয়জনদের পাতে মহারাষ্ট্র-দেশের এই বিচিত্র-উপাদেয় 'বাদামের পায়েস' খাবারটি সযত্নে পরি-বেশন করুন...নূতন-ধরণের এই সুমিষ্ট-খাবারটি খেয়ে তাঁরা আপনার রুচি ও রান্নার তারিফ করবেন।

আলু-গোবি তরকারী ঃ

এবারে বলি—মহারাষ্ট্রীয়-প্রথায় রান্না করা অভিনব-সুস্বাদু নিরামিষ-তরকারীটির কথা। এ খাবার রান্নার জন্য দরকার—আধ সের আলু, আধ সের ফুলকপি, আধ পোয়া রান্নার তেল, আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা গুড়, হলুদ-গুঁড়ো, লঙ্কা-গুঁড়ো, নুন, আর ফোড়নের জন্য অল্প একটু সরষে, হিং ও গরম-মশলা।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, আলু আর ফুলকপিগুলিকে সমান-মাপে টুকরো করে কুটে, জলে ধুয়ে সাফ্ করে নিন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে তরকারীর ঐ টুকরোগুলি ও' রান্নার তেল, মিশিয়ে তার সঙ্গে সরষে আর হিং ফোড়ন দিয়ে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। খানিকক্ষণ এমনিভাবে নেড়েচেড়ে নেবার পর, রান্নার পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে গুড়, লঙ্কা-গুঁড়ো, হলুদ-গুঁড়ো আর নুন মিশিয়ে, রান্নাটিকে ভালোভাবে সাঁত্লে নিন। সুষ্ঠুভাবে সাঁত্লানোর ফলে, তরকারীর টুকরো আর রান্নার মশলাগুলি বেশ ভালো রকম মিশে গেলে, রন্ধন-পাত্রে অল্প একটু জল ঢেলে দেবেন এবং পাত্রের মুখে একটি ঢাকা চাপা দিয়ে রান্নাটিকে আরো খানিকক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে সুসিদ্ধ করে নেবেন। তরকারীর টুকরোগুলি সুসিদ্ধ এবং ঈষৎ-থক্থকে কাই-কাই ধরণের হলেই, রন্ধন-পাত্রে চায়ের চামচের দু-চামচ গরম-মশলার গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে রান্নার পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে রাখবেন। তাহলেই মহারাষ্ট্র-দেশের অভিনব নিরামিষ-খাবার—'আলু-গোবি তরকারী' রান্নার কাজ চুকবে।

পরের মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় আমিষ ও নিরামিষ খাবারের পাক-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

আধুনিকার গৃহিণীপণা

বান্ধবী ঃ— একি!...সাত্-সকালেই কুকুরের সেবা-পরিচর্য্যা নিয়ে বসেছো?...ঘরকন্না, স্বামী-পুত্রের দেখাশোনা ..ঠাকুর-পূজো...সংসারের সব কাজ ছেড়ে?... ব্যাপার কি?

আধুনিকা-সুগৃহিণী ঃ—উপায় নেই!...বাড়ী ভর্ত্তি চাকর-দাসী, গণ্ডা গণ্ডা বেয়ারা-খানসামা...তারাই দেখাশোনা করে কর্ত্তাকে আর ছেলেমেয়েগুলোকে...তাছাড়া পুরুত বাঁধা আছে—বারো মাস ঠাকুরের সেবা করবার জন্যে... কাজেই সেদিকে নিশ্চিন্ত আছি! কিন্তু এই কুকুরের ভার কারো হাতে বিশ্বাস করে দিতে পারি না... তাই নিজেই এর সব কর্ম্ম করি!

শিল্পী ঃ—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

একখানা টেবিলের দরকার। বৈঠকখানা বাজারে আমাদের গাঁয়ের চন্দদের ফার্নিচারের দোকান আছে। সেখানেই গেলাম। খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিলে দোকান ভর্ত্তি। ভিতরে বসবার জায়গা নেই। বাইরে খান দুই চেয়ার পাতা। একখানা চেয়ারে হাফ্‌সার্ট গায়ে সতের আঠের বছরের একটি ছেলে পা ঝুলিয়ে মুরুব্বিচালে বসে রয়েছে। একটু দূরে ওরই বয়সী আর একটি ছেলে একখানা খাটের পায়া পালিশ করছে।

আমি বললাম, 'সুরেনকাকা আছেন?'

ছেলেটি বলল, 'আপনি জ্যোঠামশাই-এর কথা বলছেন? না, তিনি খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। বসুন, কি চাই আপনার?'

বললাম, 'একখানা টেবিলের জন্যে এসেছিলাম। তোমাকে তো চিনলাম না।'

ছেলেটি সগর্বে বলল, 'আমার নাম হীরেন্দ্রনাথ চন্দ। স্থরেনবাবু আমার জ্যেঠামশাই হন।'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললাম—'আপন জ্যেঠামশাই ? তোমার বাবার নাম কি ?'

হীরেন জবাব দেওয়ার আগে পালিশওয়ালা ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপন নয়, তিন চার পুরুষের জ্ঞাতি।'

হীরেন বিরক্ত হয়ে পালিশওয়ালা ছেলেটির দিকে তাকাল,—'এই ফটিক তুই যা করছিস কর, আমাদের কথার মধ্যে তোকে মাথা গলাতে হবে না। তিন চার পুরুষ না —আরো কিছু। মাত্র দুপুরুষ হয়েছে। আমার ঠাকুরদা আর জ্যেঠামশাই-এর বাবা আপন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই ছিলেন, তা জানিস ?'

ফটিক আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসল, তারপর হীরেনের দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলেই দেখ ক'পুরুষ হল ?'

হীরেন বলল, 'ক'পুরুষ হোল ? যে কয় পুরুষ হোক, একই তো বংশ, একই তো গোত্র। এসব হিসাবের মধ্যে তোকে আসতে হবে না, তুই যা করছিস কর। আর খবরদার ফের যদি তুই 'তুমি' 'তুমি' করবি, জ্যাঠামশাইকে বলে দেব।'

ফটিক ফের মুখ তুলে তাকাল,—'কি বলতে হবে তা হলে ? আপনি ?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া কি। আপনিই বলবি।'

'আচ্ছা বলব।'

ফটিক ফের একটু হেসে নিজের কাজে মন দিল। ওর হাসিটুকু হীরেনের চোখ এড়াল না।

কিন্তু আপাতত ফটিকের স্পর্দ্ধাটুকু হীরেনকে হজম করেই নিতে হোল। ওকে অবজ্ঞা করে আমার সঙ্গেই ভদ্রলোকের মত আলাপ স্থরু করল হীরেন,—'আপনাকে যেন আরো কোথাও দেখেছি।'

বললাম, 'গ্রামেই হয়ত দেখেছ। আমাদের বাড়িও সদরদি।'

হীরেন বলল, 'ও আপনি মিত্রদের বাড়ির—'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

হীরেনের চোখ উল্লাসে উজ্জ্বল দেখাল, 'ও তাই বলুন। তাই এত চেনা চেনা লাগছিল। এবার ঠিক চিনেছি।'

হীরেন ফের পালিশওয়ালা ছেলেটির দিকে তাকাল, 'আমাদেরই গাঁয়ের লোক। বলতে গেলে একই পাড়ার। অনেকদিন দেশে যান না বলে প্রথমটা চিনতে পারেন নি।'

আমি খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে এলাম।

বললাম, 'স্থরেনকাকা এলে বলো, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

হীরু বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। যিনি যখন আসেন আমি জ্যাঠামশাইকে সব খবর দিই। নাম-টাম জিজ্ঞেস করে রাখি।'

তারপর গলা নিচু করে বলল, 'ওদের দিয়ে তো আর সব কাজ চলে না।'

মাসখানেক বাদে স্থরেনকাকা একদিন নিজেই এলেন, আমাদের বাসায়।—'এই যে বাবাজী, কেমন আছ-টাছ বল। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে।' একটা পুরোন আলমারি দেখতে এসেছিলাম তোমাদের ওই রাণী ব্রাঞ্চ রোডে। সেকেলে জিনিস বার্মা টিক। আজকাল আর পাওয়া যায় না। কথাবার্তা মোটামুটি ঠিক হোল। নেব জিনিসটা।'

কথায় কথায় হীরুর কথা উঠল, বললাম, 'সেদিন আলাপ হোল ওর সঙ্গে। ছেলেটি তো বেশ চালাক-চতুর আছে।'

স্থরেনকাকা বললেন, 'আর বোলো না; বড্ড ওপর-চালাক। কেবল ফরফর ফরফর করে। কোন কাজ শিখবার দিকে মন নেই। পয়লা নম্বরের বাবু। আর রাতদিন কেবল জ্যেঠামশাই জ্যেঠামশাই, আমি সেদিন জোর ধমক লাগিয়ে দিয়েছি। বাইরের সব বড় বড় কাষ্টমার আসে, তারা ভাবে কি বলতো। সম্পর্ক তো ভারি। আমি বলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কিছু বলে ডাকতে হবে না। অত ডাকাডাকির কী আছে। ভারি ফাঁকিবাজ। অত ফাঁকি দিলে আমি পারি কী করে। দুবেলা খেতে তো দিতে হয়। আজকালকার বাজারে হিসেব করতো একজনের খোরাকী কি রকম পড়ে ?

বললাম, 'তাতো ঠিকই।'

স্থরেনকাকা বললেন, 'দিয়েছি পালিশের কাজে

...গিয়ে। বলেছি বাবা, ফোর্থ ক্লাস অবধিই পড় আর ...র্ড ক্লাস অবধিই পড় এ বাজারে ও বিদ্যেয় কেউ পোছবে না। বরং দোকানের কাজ কর্ম যদি শেখ তাতে গুণ দেবে।'

মাস পাঁচ-ছয় বাদেই হবে বোধ হয়, শিয়ালদায় এক ...কে তুলে দিতে গিয়েছিলাম, ফিরে আসবার পথে ভাবলাম সুরেনকাকার সঙ্গে দেখা করে যাই। মুরুব্বি ...ষ। গেলে দুটো সুখ দুঃখের কথা তিনিও বলেন, আমিও বলি।

গিয়ে দেখি সুরেনকাকা উত্তেজিতভাবে তাঁর পালিশ-ওয়ালাকে কী যেন সব বলছেন। আমি দোকানে ঢুকতে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'এসো বাবাজী এসো। সব ভালো তো? বোসো, কথা বলছি।'

তারপর পালিশওয়ালার দিকে চেয়ে বোধহয় তাঁর আগের কোন কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'বিবেচনা ...ন করবার আমিই করব নন্দ। তোমার সুপারিশের কোন দরকার নেই।'

পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে নন্দের বয়স। কালো রোগাটে চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

অনেকদিন ধরে কাজ করছে এখানে। আমাকে একদিন বলেছিল বারো তের বছর বয়স থেকে সে এই বৈঠকখানায় পালিশের কাজ শুরু করেছে। তার এখন একটা ওজন হয়েছে বইকি। নন্দ সুরেনকাকার দিকে চেয়ে বলল, 'আজ্ঞে হীরুই আমাকে কদিন ধরে বলছিল। ওর একটা কিছু ঠিকঠাক করে দিতে। অনেকদিন তো হল।'

সুরেনকাকা বললেন, 'হীরু আমাকে বলতে পারে না?'

নন্দ বলল, 'আপনাকে বলতে বোধ হয় লজ্জা করে।'

সুরেনকাকা গম্ভীরভাবে বললেন, 'হুঁ, আমার কাছে লজ্জা আর তোমাদের কাছে বুঝি লজ্জা নেই। আজকাল তোমরাই বুঝি—' কথাটা শেষ করলেন না সুরেনকাকা। পান সিগারেট হাতে ফটিক এসে ঢুকল। আর তার পিছনে পিছনে এলো হীরু। হাতে একটা ওষুধের শিশি।

সুরেনকাকা বললেন, 'এই হীরু ওষুধ আবার কিসের?'

হীরু ওষুধের শিশিটা এক কোণে রেখে দিয়ে বলল, নন্দকাকার মেয়ের। পুষ্পর।'

সুরেনকাকা বললেন, 'হুঁ, পুষ্পই বুঝি তোমার বড় মেয়ে নন্দ?'

নন্দ বলল, 'আজ্ঞে না মেজো। বছর পনের ষোল বয়স হল মেয়ের, কিন্তু মোটে বাড় নেই গড়নের। বাড়বে কি অসুখই সারে না। এই তো ফের জ্বরে পড়েছে। আজ জরটা বেশী। বড্ড ছটফট করছে। মা তো নেই ঘরে। কে দেখে কে শোনে?'

সুরেনকাকা বললেন, 'তা তো বটেই অসুবিধা হবারই কথা। কিন্তু নন্দ, দত্তদের বিয়ের তারিখ তো এই সপ্তাহেই। কাল এসে ওঁরা তাগিদ দিয়ে গেলেন। বিয়ের খাটটা এবার ধরো। গভর্নমেণ্ট অর্ডারগুলিই বা কবে ধরবে?'

নন্দ বলল, 'আজ্ঞে হয়ে যাবে।'

সুরেনকাকা মৃদু হেসে বললেন, 'হয়ে যাবে বললেই তো হয় না। সময়মত জিনিসগুলি তো ডেলিভারি দিতে হবে। বিয়ের তারিখটাও পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। হাত চালাও, হাত চালাও, হাত চালিয়ে কাজ কর।'

নন্দ আর কোন কথা না বলে খাটের পায়া আর বাতাগুলি নামিয়ে আনতে লাগল।

হীরেন এগিয়ে গেল নন্দকে সাহায্য করতে।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওষুধের শিশির ওপর।

'পুষ্পের ওষুধটা যে পড়ে রইল নন্দকাকা।'

নন্দ বলল, 'পরে নিয়ে যাব।'

হীরু বলল, 'নিয়ে যাও ওটা যে এখনই খাওয়াতে হবে।

নন্দ খাটের পায়ায় শিরিষ ঘষতে ঘষতে বলল, 'খাওয়াব পরে।'

হীরেন ধমকের স্বরে বলল, 'তা কি হয়? যাও ওষুধটা দিয়ে এসো।'

নন্দও একটু হেসে বলল, 'কাজ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাই তোমাদের—'

হীরেন শিরিষ কাগজ আর পালিশের বাটির কাছে এগিয়ে বসল,—'কাজ তোমার আর এগুতে হবে না। তুমি যাও, আর যদি খুব বেশী জর দেখ, আজ আর আমার দরকার নেই। কাজ যা আছে আমরা দু'জনেই পারব।

কি বলিস ফটিক, পারব না? আর দাঁড়িয়ে থাকিস নে আয় তাহলে শুরু করে দিই।'

নন্দ শিশিটা হাতে নিয়ে বলল, 'তাহ'লে ওষুধটা আমি পুষ্পকে দিয়েই আসি।'

হীরু খাটের পায়ায় পালিশ লাগাতে বসে গেল।

আমি যে এসেছি তা যেন আজ আর ও লক্ষ্যই করল না।

সুরেনকাকা একটুকাল গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ফের আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। যেন পালিশওয়ালাদের ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁরও কোন মাথা ব্যথা নেই।

খবর

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

খবর—খবর—'হকার' হাঁকে
মহেঞ্জোদারো-পথের বাঁকে ;
খবর কিনিতে সকলে চায় ;
জনতার ভিড় বাড়িয়া যায়।
সে-সব খবর—জনতা সব
কবরে ঘুমায়—সব নীরব।
ধুলা-মাটি আর শ্মশান-ছাই
যাদুঘরে ঘরে দেখিতে পাই ;
দেখিয়া অবাক্ জনতা যায় ;
মহেঞ্জোদারো প্রাণ কি পায় !

(২)

খবর—খবর—হাঁকে 'হকার'—
বুদ্ধ তো নাই জগতে আর ;
খবর শুনিয়া কুশীনারায়
জনতা-জোয়ার প্লাবিয়া যায়।
সে মহাখবর—জনতা—ভিড়
শ্মশান-চিতায় চির-বধির।
অমিতাভ নাই; মূরতি তা'র
যাদুঘরে—ঘরে গড়ে পাহাড় ;
অবাক্ জনতা দেখিয়া যায় ;
কুশীনারা তবু প্রাণ কি পায় !

(৩)

খবর—খবর—জোর খবর—
'হকারের' সেই হাঁকের স্বর
ঘরে ঘরে আজও শিহর তোলে।
জনতা-জোয়ার সে কল্লোলে
হাসিয়া—কাঁদিয়া—ভাসিয়া যায় ;
যাদুঘর ফিরে খড়ে-কুটায়
ভরিয়া উঠিবে,—জমিবে ভিড়।
তবু আজিকার এ-পৃথিবীর
প্রাণ কি ফিরিবে এ যাদুঘরে !
কাল তো কেবলই 'হকারী' করে।

শিবঠাকুরের বহির্ভারতে যাত্রা

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং দ্বীপময় ভারত একদা ভারতীয় বণিক, ধর্ম্মপ্রচারক, এবং অভিযাত্রীগণের চরণধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বহির্ভারতে তাহারাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদূত। তাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও এই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, কোথাও বা ইহার চিহ্ন ক্ষীণ; কিন্তু দ্বীপময় ভারতের বা দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার এমন কোন বিস্তৃত অঞ্চল নাই যেখানে প্রাচীন ভারতীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এই চিহ্ন সুস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে এই অঞ্চলের কথা ভাষায়, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, সমাজে এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পে। এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, কিন্তু তাহার ফল মুখ্যতঃ ডাচ্ এবং ফরাসীভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের একটি অধ্যায় সম্বন্ধে আজিও অনবহিত রহিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় এবং দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিযান সম্পূর্ণই অভিনব, কারণ এই সাংস্কৃতিক বিজয় যুদ্ধের পিচ্ছিল রাজপথ বহিয়া অগ্রসর হয় নাই। মহাদেশের মত এইরূপ এক বিরাট অঞ্চলে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করিয়াছিল তাহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এই সভ্যতার রূপায়ণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে হইয়াছিল। বর্ম্মা, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, চম্পা, কম্বোজ, দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি দেশে বা অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা স্থানীয় কৃষ্টির সহিত সংমিশ্রিত হয়ে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজজীবনের মধ্য দিয়া এই রূপান্তর অনুধাবন করা বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের বিষয়। এই পট-ভূমিকায় আমরা দ্বীপময় ভারতে শিবঠাকুরের অভিযান কাহিনী বর্ণনা করিব। শিবঠাকুর এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য অগস্ত্যের দক্ষিণ ভারতের যাত্রার কথা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু তাঁহাদের বহির্ভারতে যাত্রার কাহিনী ততটা সুপরিচিত নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল শিব-ঠাকুরের দ্বীপময় ভারতে যাত্রার কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যবদ্বীপে শিবঠাকুরের প্রথম আবির্ভাব কবে হইল জানিনা। রাজা পূর্ণবর্ম্মণ যখন আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম যবদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্যে যে শিবঠাকুরের পূজা আদৌ প্রচলিত ছিল না ইহা কল্পনা করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি উহা প্রমাণ করাও দুঃসাধ্য। যবদ্বীপে শিবপূজার প্রথম নিদর্শন পাই মধ্য যবদ্বীপের দিয়েঙ্গ—অঞ্চলে। যবদ্বীপের প্রাচীন অনুশাসনলিপিতে এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে ডিহ্যঙ্গ্। এই অঞ্চলে যে-সমস্ত শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাহার নির্ম্মাণকাল অষ্টম হতে একাদশ শতাব্দী। এই সমস্ত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির উভয়ই বিদ্যমান। দিয়েঙ্গ অধিত্যকা ৬৫০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার উপরে মহাভারতের নায়ক-নায়িকাগণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সহজ আভিজাত্য, অলংকরণ এবং ভাস্কর্য্যের দিক দিয়া এইগুলি গুপ্তযুগের কথা অনেকসময় স্মরণ করাইয়া দেয়। ডিহ্যঙ্গ্—অধিত্যকার মূর্ত্তিগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের; ইহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে আবার শৈবমূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। মালয় উপদ্বীপ এবং বোর্ণিওর সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই শৈবদেবদেবীগণের। ডিহ্যঙ্গে্র আর একটি বিশেষত্বের দিকে এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এই অঞ্চলের কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরা প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের পরিচয় পাইতেছি; ইহা হইল গুরু, পিতামহ এবং হরিচন্দনের সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান। এই

গুরু সম্ভবতঃ যবদ্বীপের বিখ্যাত ভটার গুরুর প্রাচীন রূপ যাঁহার কীর্ত্তি সাহিত্যে এবং ধর্ম্মের জগতে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক এবং ধর্ম্মীয় চিহ্নের মধ্য দিয়াই যেন আমরা মধ্যযবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রথম কাকলী শুনিতে পাইতেছি।

আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যজাভার এই অঞ্চলে মেররবু পাহাড়ের উপর তুক মাস নামক স্থলে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল। উহার ভাষা ছিল সংস্কৃত, লিপি পল্লব গ্রন্থ। এই সংস্কৃত লিপিটিতে তুক মাসের বা স্বর্ণ-নির্ঝরিণীর নির্ম্মল বারিকে পূত গঙ্গাজলের সহিত তুলনা করা হয়েছে। এই শিলালিপিটির উপরে দেবতাদের কতকগুলি প্রতীক বা স্মারকচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূল, কমণ্ডলু প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ত্রিশূল এবং কমণ্ডলু নিঃসংশয়ে শিবপূজার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। ইহার পর প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যেই শিবঠাকুর রাজদরবারে স্থান পাইয়াছেন, কারণ ৭৩২ খৃষ্টাব্দের চঙ্গলশিলালিপিতে আমরা শার্দ্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় পড়িতেছি :

"শাকেন্দ্রে তিগতে (বিগতে ?) শ্রুতিন্দ্রিয়রসৈরঙ্গীকৃতে বৎসরে
বারেন্দৌ ধবল ত্রয়োদশিতিথৌ ভদ্রোত্তরে কার্ত্তিকে
লগ্নে কুম্ভময়ে স্থিরাংশবিদিতে প্রাতিষ্ঠিপৎ পর্ব্বতে
লিঙ্গম্ লক্ষণ লক্ষিতন্নরপতিশ্ শ্রীসঞ্জয়শ্ শান্তয়ে॥"

উপরোক্ত শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে ৬৫৪ শকাব্দে সোমবার দিবসে শুক্লা ত্রয়োদশীতিথিতে, কুম্ভলগ্নে মহারাজ সঞ্জয় একটি সুকর্ষণ যুক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠার তারিখ ছিল ৭৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর, বেলা সায়াহ্নে এক ঘটিকা। পরবর্ত্তী যুগের একটি অনুশাসনলিপি অনুযায়ী মহারাজ সঞ্জয় ছিলেন মতরাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বা প্রথম বংশকর্ত্তা। বিখ্যাত ডাচ্ পণ্ডিত ডঃ বস্ বলিয়াছেন যে শিবলিঙ্গ, শাসনরত রাজবংশ এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই থিয়োরী অনুযায়ী রাজা পৃথিবীতে শিবের স্থলে আবির্ভূত হন এবং তাঁহার রাজকীয় শৌর্য্য লিঙ্গে রূপ পরিগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হিসাবে এই আদিম শিবলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া বংশের রক্ষাকর্ত্তা রাজাকে উহা প্রদান করেন। এইরূপ ধারণা জাভা, চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান ছিল। রাজা সঞ্জয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে এই হিন্দু রাজবংশ পরবর্ত্তী যুগেও এই শিবপূজার ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মধ্য যবদ্বীপে শিবপূজার প্রাধান্য এই সময় হইতেই পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইহার কিছুদিন পরেই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত দিনজ-লিপিতেও আমরা অগস্ত্য মুনির পূজার বিবরণ পাঠ করিতেছি। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে রাজা গজয়নে ঋষি অগস্ত্যের একটি "সুরদারুময়ী প্রতিমার" স্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত কলসজ (অগস্ত্য) প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটি একটি সুরম্যগৃহে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল "শকাব্দে নয়নবসুরসে (অর্থাৎ ৬৮২ শকাব্দে) মার্গশীর্ষে চ মাসে আর্দ্রাঋক্ষে শুক্রবারে প্রতিপদ-দিবসে" তখন লগ্ন ছিল কুম্ভ। সেই পবিত্র দিনে পবিত্র স্থলে উপস্থিত ছিলেন "বেদবিদ ঋত্বিক" যাতবরগ, হোত্র শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং শিল্পীগণ। সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রাজা এই উপলক্ষে চরু, হবি এবং অগস্ত্যের স্নান এবং উপাসনার জন্য "ক্ষেত্র, সুপুষ্টা গাভী, মহিষ সমূহ, দাসদাসী প্রভৃতি" দান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি কালমকর মুখ বিশিষ্ট বৃহৎ ভবন (অর্থাৎ দরজার উপর কালমকর মুখ সম্বলিত) দান করিলেন দ্বিজ অতিথি গণের বিশ্রামার্থ ; উহা "যবযবিক-শয্যা-আচ্ছাদন—" দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল।

এই যুগেই মধ্য যবদ্বীপে শৈলেন্দ্র রাজগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। শৈলেন্দ্র রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ এবং মধ্যযবদ্বীপে তাঁহাদের প্রাধান্যের কাল ৭৫০-৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। এই যুগে মধ্য যবদ্বীপের ধর্ম্মজগতের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা হইল শিব এবং বুদ্ধের সমন্বয় সাধন। বাংলাদেশের পাল রাজত্বকালে আমরা হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের পালা দেখিয়াছি। যবদ্বীপেও এই সময় হ'তে তাহার পরিচয় পাই। এই সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বাংলা দেশ হইতেই উৎসারিত হয়েছিল বলিয়া আমি মনে করি। কারণ জাভা-সুমাত্রার সহিত পাল-বাংলার সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল। ভারতে-

তিহাসের পাঠকগণ জানেন যে সুবর্ণ দ্বীপাধিপতি বালপুত্র দেব দেবপাল দেবের রাজত্বকালে নালন্দায় একটি বিহার দান করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের কেলুরক-লিপিতে আমরা পড়িতেছি যে শৈলেন্দ্র রাজার গুরু মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এইরাজগুরুকে বলা হইয়াছে "গৌড়দ্বীপ গুরু"। একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কুমারঘোষ মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং শৈলেন্দ্র রাজগুরু এবং কুমারঘোষ একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাহিনী এ স্থলে বিবৃত করার কারণ নিম্নলিখিত শ্লোক পড়িলেই পরিস্ফুট হইবে ঃ

"আম্ স বজ্রধৃক শ্রীমান্ ব্রহ্মাবিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ
সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী মঞ্জুনক ইতি গীয়তে।"

এই স্থলে দেখা যাইবে বৌদ্ধ দেবতার সহিত হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির সমীকরণের চেষ্টা চলিতেছে। এই ব্যাপারটি যবদ্বীপের বিভিন্ন সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এবং যবদ্বীপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সিম্পঙ্ শিলালিপিতে (১০৩৪ খৃষ্টাব্দ) আমরা পড়িতেছি ঃ "শৈব সোগত ঋষি"; ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপিতে পড়িতেছি "সোগত মহেশ্বর মহাব্রাহ্মণ" ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সিঙ্গসারি লিপিতে পড়িতেছি ঃ "মহাব্রাহ্মণা শৈব সোগত"। সঙ্ হ্যঙ্ কমহাথানিকন নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের একখানি পুঁথিতে (লম্বক-সংগ্রহ ৫০৬৮ নং) ২২ পৃষ্টায় পড়ি "বুদ্ধ তুঙ্গল লবন শিব" অর্থাৎ বুদ্ধ এবং শিব অভিন্ন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রপঞ্চ কর্তৃক লিখিত ঐতিহাসিক কাব্যেও আমরা পড়িতেছি, "ভগবান বুদ্ধ শিব হইতে পৃথক নহেন···তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও এক।" শিবকে কেবল বুদ্ধের সহিত নহে, সূর্য্যের সহিতও এক করিবার প্রচেষ্টা হয়েছে। বলিদ্বীপে যে সূর্য্যসেবন-মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার অর্থই হইল শিবকে সূর্য্যরূপে উপাসনা করা। এই প্রচেষ্টা শুধু যবদ্বীপের বিশেষত্ব নহে, কারণ ভারতবর্ষেও ইহার সূচনা পূর্ব্বেই হয়েছিল। অগ্নিপুরাণের একস্থলে আমরা পড়িতেছি "হৃৎ-পদ্মে শিব-সূর্য্য ইতি"; অনুরূপ উদাহরণ সৌর এবং গরুড়পুরাণেও বিদ্যমান। ডঃ গোরিস বলিয়াছেন যে বলিদ্বীপের একটি কূটমন্ত্রে আমরা পাই "ওম্ হ্রাম্ হ্রিম্ সঃ পরম—শিবাদিত্যায় নমঃ"। সুতরাং নাগর কৃতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যে শিবকে যে দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বলিদ্বীপের ঐতিহ্যে যমরাজকে শিবরূপে উপাসনা করা হয়।

ডিহঙ্গ অধিত্যকা এবং প্রাম্বানান উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত কেযুর বিখ্যাত প্রান্তর; সেখানে শৈব এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ভীড় করিয়া অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কিন্তু শিবঠাকুরের বিশেষ অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হইল প্রাম্বানান-উপত্যকা। প্রাম্বানান উপত্যকার লোরো জংগ্রাঙ্গ-এর হিন্দু মন্দিরগুলি বরবুদুরের মত বিশালকায় না হইলেও এইগুলির স্থান বরবুদুরের নিম্নেই। এই মন্দিরগুচ্ছে আটটি মন্দির আছে। কেন্দ্রীয় শিবমন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাতে একটি শিবমূর্ত্তি বিদ্যমান; উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। শিবমন্দিরের পাষাণ-গাত্রে রামায়ণ কাহিনী প্রথম হইতে লঙ্কাভিযান পর্য্যন্ত উৎকীর্ণ হয়েছে এবং এই কাহিনীর শেষাংশ পার্শ্বস্থ ব্রহ্মা মন্দিরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। শিবঠাকুরের সঙ্গে তাহার পরিবারের অন্যান্য দেবতারাও দ্বীপময় ভারতের অধিবাসি-গণের প্রণাম কুড়াইয়াছেন। দুর্গা কোথাও উমারূপে, কোথাও মহিষমর্দ্দিনী রূপে পূজা পাইয়াছেন। গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিও যবদ্বীপবাসিগণের বন্দনা লাভ করিয়া-ছেন; এমন কি শিবের দ্বাররক্ষক নন্দী পর্য্যন্ত তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। যবদ্বীপে শিবঠাকুরের কতকগুলি অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে; উহা যবদ্বীপের ভাস্কর্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার মধ্যে আমষ্টার্ডামের কলোনীয়াল মিউজিয়ামে রক্ষিত শিবমূর্ত্তিটি শিল্পীর অপূর্ব্ব প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই শিবমূর্ত্তিটি রাজা অশ্বপতির প্রতিচ্ছায়া বহন করিতেছে। সিম্পিঙ্গের হরিহর মূর্ত্তিটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মূর্ত্তিশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, অনুশাসনলিপিতে শৈব দেব-দেবীগণের অতুলনীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে যে শৈব মতের পরিচয় পাই তাহা তান্ত্রিক শৈব ধর্ম্মের। যবদ্বীপের ভুবনকোষ, ভুবন সংক্ষেপ এবং তত্ত্ব সঙ্গ হ্যঙ্গ মহাজ্ঞান নামক গ্রন্থগুলি এই পর্য্যায়ের। ভুবনকোষ নামক

গ্রন্থে সিদ্ধান্তমার্গের শৈবমতের অভিব্যক্তি দেখিতেছি। এই গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং তাহার পরে পরেই আছে যবদ্বীপীয় ভাষায় ব্যাখ্যা বা অনুবাদ। গ্রন্থে পৌরাণিক প্রভাবের পরিচয় রহিয়াছে এবং ডঃ গোরিস্ ভুবনকোষ এবং অগ্নিপুরাণ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা পড়িতেছি :

"অবিঘ্নম্ অস্তু :

সসংগ্রহ্ কারি সির মোবুস, লিঙ্গ্ নির :

(১) প্রণম্য, শিরসে (শিরসা ?), দেব, বাক্যম্ মুনিরমন্মথ

দেবদেব, মহাদেব, পরমেশ্বর, শঙ্ কর

শ্রীমুনি ভার্গব, সির মহ্যান তুমকুয়নকেন্ ইকঙ্গ্ পদ নির্বাণ রি ভটার, মঙ্কন পুয়াভিপ্রায়নির, মনম্বহ্ ত সির রি ভটার "সিরসা", মককারণ হুলুনির সির, রি তেলসনির মনম্বই, মোজর ত সিরঃ : হে "দেবদেব", কিত দেব নিঙ্গ্ দেবতা কবেহ্, হে "মহাদেব" কিত ভটার মহাদেব ঈরন্ত, হে "(মহেশ্বর)", কিত ভটার মহেশ্বর ঙ্গরন্ত, হে "সঙ্গকর", কিত ত ভটার শঙ্ কর ঙ্গরন্ত"।

উপরোক্ত বিকৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং সংশ্লিষ্ট যবদ্বীপীয় টীকার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"অবিঘ্ন বা শান্তি হউক।

সমস্ত জ্ঞাত হইয়া তিনি (ভার্গব) নিম্নলিখিতরূপে বলিলেন :

(১) দেবতাকে শির দ্বারা প্রণাম করিয়া মুনি বলিলেনঃ "দেবদেব, মহাদেব, পরমেশ্বর, শঙ্কর"

ইহার পর যবদ্বীপীয় টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

ভার্গব মুনি ভট্টারককে নির্ব্বাণের অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভট্টারকের সম্মুখে শির নত করিয়া প্রণাম করিলেন, "শিরসা"—তিনি ইহা তাঁহার মস্তকের মধ্যভাগ দ্বারা করিলেন। তাঁহার প্রণাম শেষ হইলে তিনি বলিলেন "হে দেবদেব" অর্থাৎ তুমি সকল দেবতার দেবতা ; "হে মহাদেব" অর্থাৎ তুমি ভট্টারক মহাদেব নামে পরিচিত ; "হে মহেশ্বর" (সংস্কৃত অংশে পরমেশ্বর আছে) অর্থাৎ তুমি ভট্টারক মহেশ্বর নামে পরিচিত, "হে শঙ্কর" অর্থাৎ তুমি ভট্টারক শঙ্কর নামে পরিচিত ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে শূন্যশিব, ষোড়শবিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শূন্যের যেমন কোন পরিবর্ত্তন নাই, সেইরূপ শূন্যশিবেরও কোন পরিবর্ত্তন নাই। তিনি নির্ব্বিকার। লেখক অতঃপর ভারতীয় দর্শনের সূত্রানুযায়ী বলিয়াছেন যে ঈশান বা শিবের সহিত একাত্ম হইলেই মোক্ষ বা নির্ব্বান লাভের পথ সুগম হয়। এই পথের দিগ্-দর্শন হইল (ক) তত্ত্বরূপ (খ) তত্ত্ব দর্শন (গ) তত্ত্ব শুদ্ধি (ঘ) আত্মরূপ (ঙ) আত্মদর্শন (চ) আত্মশুদ্ধি (ছ) শিবরূপ (জ) শিবদর্শন (ঝ) শিবযোগ এবং (ঞ) শিবভোগ। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম হইল জ্ঞানসিদ্ধান্তশাস্ত্রম্। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যিনি এই "সিদ্ধান্তজ্ঞানম্ উত্তমম্" সুষ্ঠুরূপে অধিগত করিবেন তিনি অবশ্যই শিবলোকে প্রস্থান করিবেন অথবা শিবাত্মক হইবেন। শিবদর্শনের আরো অনেক তত্ত্ব এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা আলোচিত হইল না। উপরে যাহা বলা হয়েছে তাহাতে অন্ততঃ এই-টুকু স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে যে গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ শিব ভাবনার জারকরসে রঞ্জিত।

শৈবমতের আর একখানি গ্রন্থের নাম হইল ভুবনসংক্ষেপ। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি "ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু নমো শিবায়।" এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে সংস্কৃত শ্লোক আকীর্ণ রহিয়াছে এবং তাহার পরে পরেই যবদ্বীপীয় অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে উমা এবং কুমার ঈশ্বর বা শিবের নিকট হতে উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন। এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল যেস্থলে বিখ্যাত পরমতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে :

(১) ন ভূমি, ন জলম্ ব্যাপিঃ, না তেজো, না চ্ছা, মরুতঃ না সূর্য্যো, ন চন্দ্রশ্চেব, না কল্পত রজম্ থতম্ সিদ্ধ্যা-নিঙ্গ্ সঙ্গ্ হ্যঙ্গ সূক্ষ্ম ইকা

(২) উদ্ধ জ্ঞানে ন, মোক্ষক্কা, সুদ্ধ লিলাম্প্রয়োত্মকা শুদ্ধ সূক্ষ্মান্তরে যোগী অকশশ্বত নির্ম্মলম্ সিদ্ধ্যান্ সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ সূক্ষ্মতর ইকা

(৩) ন স্বর্গ, ন র্যার্তিমোক্ষ, ন শিবস্পদ, সূণ্যতম্ ন রিয়ৎ, ন দি চিন্ত্যন্তে, দিক্ শত সুপ্রম্ অপ্ন্যুৎ সিদ্ধ্যান্ সঙ্গ্ হ্যঙ্গ্ পরমসূক্ষ্মা ইকা

(৪) ন বুদ্ধিঃ, ন মণস্কারাঃ, ন বিষ্ণু, ন ব্রহ্ম ঈশ্বরম্ ন নিষ্টে, ন মধ্যোত্তমঃ, ন মিব দেবতা পুণঃ সিদ্ধ্যান্ সঙ্ হ্যঙ্ অত্যন্ত সুক্ষ্মা ইকা

(৫) ন তিজ্ঞানন্, ভুবেৎ শূন্যঃ নিরব্যক্তস্ত নিষ্কালম্ নিরুপণ সর্ব ভবেষু, মোক্ষম্ এতৎ প্রকীর্ত্তিতঃ সিদ্ধ্যান্ সঙ্ হ্যঙ্ অতীসূক্ষ্ম ইকা

(৬) ন বোদ্ধি, ন মনো নিত্যম্, নিশ্চিত্ত, শচ নিরাত্মক নিয়োলী নিরাভিপ্রয়ম্, মুনী স্বস্থত সিষ্যতে সিদ্ধ্যান্ সঙ্ হ্যঙ্ কমোক্ষন ইকা।

সংস্কৃত শব্দগুলি অনেকটা বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত অংশের অর্থ অস্পষ্ট নহে। বোধ হয় গ্রন্থের মধ্যে এই অংশটুকুই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি যে এই সংস্কৃতাংশের মূলটি হয়তো ভারতবর্ষের শৈবসাহিত্যে একদিন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার এই স্থলে শূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন: গ্রন্থকারের মতানুযায়ী এই বিরাট শূন্যতাই মোক্ষ। যখন সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী,, জল ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না, যখন মানবদেহের বিভিন্ন চেতনার অবলুপ্তি ঘটে, যখন সমস্তই শূন্য এবং স্থান ও কালের অতীত, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই মোক্ষ। একজন হীনযানী বৌদ্ধও কম জোরের সহিত হলেও প্রায় একই সুরে বলিবেন যে বর্ত্তমান জীবনের পরে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না এবং "দেহের অবলুপ্তির পর জীবনের পরপারে দেবগণ এবং মানবগণ কেহই তাহাকে দেখিতে পাইবেন না।" দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা শূন্যপুরাণে নিরঞ্জনের প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যবদ্বীপীয় গ্রন্থকার মোক্ষ বা মুক্তিকে এক বিরাট নঞ্-বাঞ্জক শূন্যতায় পর্য্যবসিত করিয়াছেন। ভারতীয় ধ্যান-ধারণা যেন দ্বীপান্তরে নূতন বেশে দেখা দিল। শূন্যব্রহ্ম ইন্দো-যবদ্বীপ ধর্ম্মতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য স্থান পরিগ্রহণ করিলেও আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই ধারণাকে আরো বহুদূর অগ্রসর করাইয়া উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে শূন্যতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—এমন কি ইহা স্থান কাল এবং দেবগণেরও উর্দ্ধে।

এই পর্য্যায়ের আর একখানি গ্রন্থের নাম হইল তত্ত্ব সঙ্ হ্যঙ্ মহাজ্ঞান। এই গ্রন্থখানিতে তান্ত্রিক (শৈব) প্রভাব সুপরিপুষ্ট। ইহাতেও লিঙ্গ উপাসনার বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। গ্রন্থের স্থলে স্থলে সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ইহাও অনেকটা ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থের রীতিতে রচিত হয়েছে; কারণ ইহা ভটার গুরু (অর্থাৎ শিব) এবং কুমারের কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। কুমার দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া ভটার গুরুকে লিঙ্গ-উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পুস্তকের এক স্থলে একটি বিকৃত সংস্কৃতে আমরা পড়িতেছি:

অপ্সু দেবো দ্বিজাতীনাম্, ঋষিনাম্ দিবি দেবতঃ
শিলাকাস্তঞ্চ লোকানাম্, মুণীনাম্ অত্মো দেবতঃ॥

এই স্থলে গ্রন্থকার শিলাকান্ত বা পবিত্র শিবলিঙ্গকে জনসাধারণের দেবতারূপে পরিকল্পিত করিয়াছেন। যবদ্বীপে আবিষ্কৃত বহু শিবলিঙ্গ আবিষ্কারকের দ্বারা এই কল্পনার যথার্থতা স্বীকৃত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি খণ্ডিতরূপে পাওয়া গেলেও ইহার সর্ব্বত্রই শৈব-গন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে।

যবদ্বীপে আরো কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে যাহা শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য রচিত হয়েছে অথবা যাহাতে শৈবমতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শৈব কাহিনী অবলম্বন করিয়াও কোন কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিবকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় পৌরাণিক রীতিতেও গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। যবদ্বীপে শিবকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে স্মরদহন, লুব্ধক প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রধান। স্মরদহন কাব্যটি রাজা প্রথম বা দ্বিতীয় কামেশ্বরের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল (দ্বাদশ শতাব্দী)। যবদ্বীপীয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে দেবগণ নীলরুদ্রক নামের দৈত্যের পরাক্রমে ভীত হইয়া অবশেষে চক্রান্ত করিলেন যে শিবকে পার্ব্বতীর প্রতি আসক্ত করিয়া উভয়ের মিলন হইতে যে সন্তান উদ্ভূত হইবে তাহাকে দিয়া দৈত্যকুল নিধন করিবেন। কামদেবকে এই কার্য্যের জন্য পাঠাইলে কামদেব শিবক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলেন। এই মিলনের ফলে গণপতির জন্ম হইল। এই কাহিনীটি কুমারসম্ভব, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে আমরা দেখিতেছি যে এই মিলনের ফলে যাঁহার জন্ম হইল তিনি গণপতি নহেন, তিনি হইলেন কুমার। যাহা হউক দেবগণ গণপতির নেতৃত্বে অবশেষে দৈত্যগণকে

পরাজিত করিলেন। এই কাব্যটি ৪০ সর্গে সমাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের আর একটি বিখ্যাত শৈব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে লুব্ধক-নামক যবদ্বীপীয় কাব্য গ্রন্থটি। ইহাতে কথিত হইয়াছে যে এক অমাবস্যা রাত্রে লুব্ধক-নামক একজন ব্যাধ (সংস্কৃত লুব্ধক শব্দের অর্থ ব্যাধ: যবদ্বীপে ইহা ব্যাধের নাম হিসাবে পরিগৃহীত হইয়াছে) একটি বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া যাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিল। বৃক্ষতলে ছিল শিবলিঙ্গ। ব্যাধের দেহভারে এবং ভয়কম্পনে বিল্ববৃক্ষ হইতে কয়েকটি পত্র শিবলিঙ্গের উপর নিপতিত হইল। কাল-ক্রমে ব্যাধের মৃত্যু হইলে যম এবং শিবের অনুচরগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, কিন্তু শিবের অনুচরগণ ব্যাধের আত্মাকে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন। এই কাহিনী শিবপুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। পোষাকী বা দরকারী সাহিত্য বাদ দিলেও লৌকিক সাহিত্যেও শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী স্থায়ী আসন পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই লৌকিক সাহিত্যে আমরা একটি অদ্ভুত বিষয় দেখিতে পাই। ইহাতে শিব-ঠাকুরের বিভিন্ন নামগুলি এক একটি স্বতন্ত্র দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। যবদ্বীপে ঈশ্বর এবং পরমেশ্বর বলিতে শিবকে বুঝাইত। তন্ত্র পঙ্গেলরণ নামক গ্রন্থ-খানিতে ঈশ্বর, মহাদেব, পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় রূপায়িত হইয়াছেন। অনুরূপভাবে বলিদ্বীপের নব সঙ্গ বা নয়জন দেবতার নাম হইল ঈশ্বর, মহেসোর, ব্রহ্মা, রুদ্র, মহাদেব, শঙ্কর, বিস্নু, সম্বু, শিবদেবি। নামের বানান, বিভ্রাট সত্ত্বেও এই দেবগণকে চিনিতে কাহারো কষ্ট হয় না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সমুদ্রমন্থনের সময় পরমেশ্বর কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। এই অংশে আরো বলা হইয়াছে ভারত-বর্ষ হইতে যবদ্বীপে কিরূপে মহামেরুর শৃঙ্গ মন্দর পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে জগৎপ্রমাণ এবং উমার কাহিনী দিয়া। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই স্থলে তাহাদের পুত্রকন্যার নাম বহুতর হইয়াছে কামদেব এবং স্মরী। ইহার কিছু পরেই আবার গুরু এবং পরমেশ্বরীর প্রণয়লীলার কথা এবং গণ-কুমারের জন্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহার পরই একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে যাহা যবদ্বীপীয় লৌকিক সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। যথা উমার ব্যভিচারিণী হওয়ার কাহিনীটি। কথিত হইয়াছে যে গুরু অর্থাৎ শিবঠাকুর একদা পুত্রগণকে উমার সমক্ষে গুহ্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উমাকে কৃষ্ণবর্ণা বক্না-গাভীর দুগ্ধ আহরণ করিতে পাঠাইলেন। উমা নিখিল বিশ্ব ঘুরিয়া অবশেষে এক গোপালককে তিনটি পুত্র উপহার দিয়া এই দুগ্ধ সংগ্রহ করিলেন। এই তিনটি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠের নাম হইল ভিকু বৌদ্ধ বা সোগত। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে পরমেশ্বর যবদ্বীপে অনেকগুলি মণ্ডল স্থাপন করিলেন এবং প্রথম মণ্ডলের স্থাপয়িতা হইলেন গুরু। এই গুরুর নিকট দীক্ষা লইবার জন্য আসিলেন ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে উমা কুমারের প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে গুরুর অভিশাপে তিনি রাক্ষসী দুর্গাতে পরিণত হন। এই কাহিনীর প্রতিধ্বনি সুদমল নামক যবদ্বীপীয় গ্রন্থেও পরিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক প্রিয়তমা দুর্গাকে রাক্ষসীতে পরিণত করিয়া গুরুর নিজের জীবনেও ধিক্কার আসিল। সুতরাং তিনিও নিজেকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া হইলেন ত্রিনেত্র এবং চতুর্বাহু সংযুক্ত ভয়াবহ রাক্ষস। এখন হইতে তাঁহার নাম হইল কালরুদ্র। তারপরে দীর্ঘকাল পরে কালরুদ্র এবং উমা কঠোর তপস্যান্তে পুনরায় পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন। সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে কিরূপে গুরু শৈব-সম্প্রদায়ের ভুজঙ্গ শ্রেণীর ভিক্ষুতে পরিণত হইলেন। এই সমস্ত লৌকিক কাহিনীর ছায়া পড়িয়াছে মানিক মায়া নামক গ্রন্থে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে গুরুর পুত্র হইলেন মহাদেব এবং মহাদেবের স্ত্রী হইলেন মহাদেবী। মহাদেব পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের শাসক হইলেন আর শিব হইলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সমুদ্র-মন্থনের কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যথা গুরু কর্ত্তৃক কালকূট পান এবং তৎপরে নীলকণ্ঠ হওয়া ; এতদ্ব্যতীত রাক্ষস রেম্বু (রাহু) কর্ত্তৃক অমৃত পানের চেষ্টা প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর বলা হইয়াছে যে গুরু তাঁহার পত্নী দুর্গার চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে দুর্গা ভীষণদর্শনা-

রাক্ষসীতে পরিণত হন। এইরূপ ছোট ছোট শৈব আখ্যায়িকা বা তাহার অংশ যবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রন্থে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে যবদ্বীপীয় রামায়ণের সীতাহরণের কাহিনীটিও মনে পড়িতেছে ; সেখানেও রাবণের আবির্ভাব শৈব মুনির বেশে। অর্জ্জুন বিবাহ নামক কাব্যেও নীলকণ্ঠ কিরাতের বেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন অর্জ্জুনের শক্তি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষে কিরাত অর্জ্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে পদ্মাসন-মনিতে আসীন হইলেন। অর্জ্জুন স্তব করিয়া তখন পাশুপত অস্ত্রলাভ করিলেন। ডঃ বার্গ এই শিবস্তোত্রগুলির প্রশংসাযোগ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

এই শিবঠাকুরের আর একটী লীলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্ত্তমান আলোচনার পরিসমাপ্তি করিব। উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা নিশ্চয়ই প্রতিভাত হইয়াছে যে ভারতের দেব-দেবীগণ দ্বীপময় ভারতে গিয়া কোন কোন স্থলে নিজের রূপ অনেকাংশে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কোথাও কোথাও তিনি অংশতঃ নূতন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও আবার তিনি নিজের আদিম অকৃত্রিমরূপেই বিরাজমান ছিলেন। এইরূপ দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন শিবঠাকুর। তিনি ভটার গুরুরূপে দ্বীপময় ভারতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লোকের প্রশস্তি এবং পূজা পাইয়াছেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্‌ তিগ দেবতা ত্রিপুরুষ হইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর ; ইহাদিগকে কখনো কখনো তিগ ভটার-ও বলা হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপ এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে শিবঠাকুর হইলেন এই ত্রিপুরুষ-মহলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তাঁহাকে সদসিব, মহসিব, প্রমসিব (পরম-শিব) রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। বলিদ্বীপের কিম্বদন্তী অনুযায়ী পরমব্রহ্ম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বসিয়া আছেন পদ্মাসনে ; তাঁহার চতুর্দ্দিকে আছেন বটর বিষ্ণু, ঈশ্বর এবং বটর ব্রহ্ম। কোন কোন শৈব গ্রন্থে দেবতাদিগের অধিষ্ঠান দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেখান হইয়াছে। বলিদ্বীপের প্রার্থনার সময়, শৈব-পুরোহিতগণ বটর প্রম-শিবকে আবাহন করিয়া থাকেন ; তখন প্রম বা পরম শিবের নাম হইল মহাদেব, মহস্বর, রুদ্র, সঙ্কর, সম্ভু, ইশ্বর। নামগুলির বানানে বিকৃতি ঘটিলেও কোন দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বলিদ্বীপের নিকটস্থ যবদ্বীপের পরবর্ত্তী সাহিত্য এবং ধর্ম্মভাবনা তাঁহার প্রশাস্তিতে মুখর। এই ভটার (=ভট্টারক) গুরু দেবপ্রধান রূপে, গুরু এবং তপস্বী রূপে, উমা ও দুর্গার স্বামীরূপে, গণেশ এবং কার্ত্তিকেয়ের পিতারূপে শিবেরই নামান্তর। ভারতীয় উপসাধকগণের নিকট শিবই পরম গুরু বা শিক্ষক ; তিনি গুরু হিসাবে বিভিন্ন পুরাণ এবং উপদেশাবলীর প্রবক্তা। শিবঠাকুর এবং দুর্গা ও উমা বিভিন্ন পুরাণকাহিনী এবং ধর্ম্মোপাখ্যানের নায়কনায়িকা হওয়ায় তাঁহারা জনসমাজে এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে একটা ধারণা ছিল যে গুরুর নাম উল্লেখ করিতে নাই ; সেইজন্যই হয়তো শিবঠাকুর ভটার গুরু নামেই যবদ্বীপীয় সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগের জাভা, বলি এবং সুন্দনীজ সাহিত্যের ভটার বা ভটার গুরু শিব ব্যতীত আর কেহই নহেন। বলিদ্বীপের ভটার গুরু দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতে বাস করেন। মালয় উপদ্বীপের সাহিত্যে আমরা যেমন বেটর বেরহ্ম (=ব্রহ্মা) বেটর বিস্নু (=বিষ্ণু) ইত্যাদিকে পাই, তেমনি পাই এই বেটর গুরুকে। মালয় উপদ্বীপের মন্ত্রেতন্ত্রে বটার গুরুর উচ্চস্থান আছে। সুমাত্রার বটকগণের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ দেবতার মধ্যে একজন ছিলেন বটর গুরু। বোর্ণিওর ডয়কগণের দেবতাদের মধ্যেও আছেন বহতর বা মহতর গুরু। সিলিবিসদ্বীপের মাকাসার এবং বুগিনীজগণের মধ্যেও বটর গুরু সুপরিচিত দেবতা। সুন্দনীজগণও তাঁহাকে সঙ্গ রতু দেবতা বা দেবতাদের রাজা বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন।

সুতরাং যবদ্বীপের শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্য্যে শিব-ঠাকুরকে পাইতেছি কখনো রুদ্ররূপে, কখনো মঙ্গলময় রূপে। ভারতীয় ধর্ম্মসাহিত্যের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি শিবচরিত্র ; ইহা দ্বীপময় ভারতে, বিশেষতঃ যবদ্বীপে, কিরূপে ক্রমে ক্রমে বিশেষ বিশেষ স্থলে নূতন রূপ পরিগ্রহণ করিল তাহা বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয়। দ্বীপময় ভারতে ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত দেবদেবীই গিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একমাত্র যবদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই প্রায় ১৫০০ দেবদেবী, মুনিঋষি, কিম্বদন্তীর রাজারাণী, পাহাড়পর্ব্বত নদনদীর উল্লেখ আছে। তন্ত্র পঙ্গেলরণ, মাণিক মায়া, যবদ্বীপের কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হইবে যে ভারত-বর্ষের দেবদেবী, বিদ্যাধরী, অপ্সরা, গন্ধর্ব্বসহ পৌরাণিক সমস্ত জিনিষই বুঝি দ্বীপময় ভারতে সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিল। শিলালেখ-তাম্রশাসন, ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের নিদর্শন স্মরণ করাইয়া দিবে যে এই অনুমান অনেকাংশে যথার্থ।

আগামী ছুটিতে
শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস
দার্জিলিঙে
বেড়িয়ে আসুন

তীর্থমৃত্যু যোগ

উপাধ্যায়

ধর্ম্ম বা ভাগ্যাধিপতি ধর্ম্ম বা ভাগ্যভাবকে পূর্ণ দৃষ্টি করলে, লগ্নাধিপতি অনুরূপভাবে লগ্নকে অবলোকন করলে, আর নিধনাধিপতি নিধন স্থানকে দৃষ্টি করলে স্বতীর্থে মৃত্যু হয়। লগ্ন বা রাশিতে না থেকে যদি তিনটী গ্রহ একত্র যে কোন রাশিতে অবস্থান করে তা হোলে বিবিধ ভোগের পর গঙ্গা জলে দেহত্যাগ হয়। রবি বৃষরাশিতে, বৃহস্পতি নবম স্থানে এবং লগ্নে শক্র, চন্দ্র নিধন স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি করলে জাহ্নবী তীরে দেহত্যাগ হয়। চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্রে থাকলে এবং শুভগ্রহ নিধন স্থানে অবস্থান বা পূর্ণ দৃষ্টি করলে, লগ্নাধিপতি বা নিধনাধিপতি ভাগ্যস্থানে থাকলে তীর্থমৃত্যু হয়।

কেন্দ্রে বৃহস্পতি ও শুক্র নিধন স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি, চররাশিস্থ নিধন স্থানে বৃহস্পতি থাকলে গঙ্গা তীরে দেহত্যাগ। বৃহস্পতি ও চন্দ্র একত্র থাকলে, লগ্নাধিপতি ভাগ্যস্থানে থাকলে এবং সপ্তমাধিপতি বা ব্যয়াধিপতি একাদশে থাকলে জাহ্নবী জলে প্রাণত্যাগ। লগ্নে শক্র, সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি, ভাগ্যস্থানে চন্দ্র, এবং নিধনস্থান লগ্নাধিপতি কর্তৃক পূর্ণ দৃষ্টি হোলে গঙ্গা তীরে মৃত্যু ঘটে।

রবি ও বুধ একত্র থেকে বা ক্ষেত্র বিনিময় করে মিথুনে সিংহে বা কন্যায় বুধাদিত্য যোগ করলে, চিরকাল সুখভোগ করে গঙ্গা তীরে মৃত্যু হয়। ভাগ্যস্থানে রবি ও নিধন স্থানে চন্দ্র অবস্থান করলে বহু পুণ্যার্জ্জন করে শেষে জাহ্নবী জলে দেহত্যাগ হয়। দশমস্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র, নিধন স্থানকে নিধনাধিপতির পূর্ণদৃষ্টি এবং লগ্নে মঙ্গল অথবা লগ্নাধিপতি মঙ্গল হোলে কাশীতে মৃত্যু। সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি, চন্দ্র দশমে এবং লগ্নাধিপতির পূর্ণ দৃষ্টি নিধনস্থানে থাকলে বারাণসী ক্ষেত্রে দেহত্যাগ। পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে ভাগ্যকারক বৃহস্পতি ভাগ্যস্থানে থেকে মারক সম্বন্ধ করে শুক্রের ক্ষেত্রে থাকলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

চন্দ্র উচ্চস্থ হোলে, দশম স্থান বৃহস্পতি দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হোলে, নিধন স্থানে শুক্র এবং ধন স্থানে বৃহস্পতি অবস্থিত হোলে তীর্থ ক্ষেত্রে মৃত্যু। যার জন্মকুণ্ডলীতে ষষ্ঠ অষ্টম পঞ্চম বা নবমে বৃহস্পতি উচ্চস্থ অথবা মীনলগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিত—তার বর্ত্তমান জন্মই শেষজন্ম এবং মৃত্যুর পর তার মোক্ষ। সিংহলগ্ন, ষষ্ঠে শনি, মিথুন রাশিতে বৃহস্পতি এবং নিধন স্থান লগ্নাধিপতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হোলে বারাণসী ক্ষেত্রে মৃত্যু। নানা রাশিতে ভাগ্যস্থানে গ্রহ থাকলে আর ভাগ্যাধিপতির দ্বারা ভাগ্যস্থান পূর্ণ দৃষ্ট হোলে সুখে জাহ্নবীতটে মৃত্যু।

নিধনস্থানে মঙ্গল থাকলে এবং সেই স্থান বুধের ক্ষেত্র হোলে, তা ছাড়া চন্দ্র কেন্দ্রে থাকলে কাশীবাস ঘটে। লগ্নে চন্দ্র ও চর রাশিতে রবি থাকলে গঙ্গাতীরে মৃত্যু। চন্দ্র বৃহস্পতিকে পূর্ণ দৃষ্টি করলে এবং বৃহস্পতির দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। লগ্নের দক্ষিণে চন্দ্র এবং বামে রবি থাকলে বহু পুণ্যার্জ্জন করে জাহ্নবী তটে মৃত্যু।

বহুবিধ যোগ

লগ্নাধিপতি বা ব্যয়াধিপতি নীচস্থ হোয়ে নীচস্থ গ্রহ দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হোলে, লগ্নাধিপতি লগ্নে থাকলে পথে আটকে

গিয়ে মৃত্যু। লগ্নাধিপতি ও ভাগ্যাধিপতি পাপগ্রহের সহিত অবস্থিত বা পূর্ণদৃষ্ট হোলেও নিধনাধিপতি নিধন স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিলে নৌকা. ষ্টীমার প্রভৃতি জলযানের মধ্যে মৃত্যু। লগ্নাধিপতি বা ভাগ্যাধিপতি নীচস্থ হয়ে শত্রু গ্রহের সহিত একত্র থেকে নিধনস্থানকে পূর্ণদৃষ্টি দিলে কারাগারে মৃত্যু ঘটে। লগ্নাধিপতি ও বন্ধুভাবাধিপতি একত্র থাক্‌লে এবং এদের শত্রুগ্রহ এদের ওপর পূর্ণদৃষ্টি করলে আর নিধনাধিপতি নিধনস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করলে গৃহমধ্যে মৃত্যু। লগ্নাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি নিধনস্থানে একত্র থাক্‌লে বা একই দ্রেক্কাণে উভয়ের অবস্থিতি ঘট্‌লে স্বামী স্ত্রীর একত্র মৃত্যু। জায়াধিপতি ও অষ্টমাধিপতি একত্র একরাশিতে থাক্‌লে আর মৃত্যুভাবাধিপতি লগ্নের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি কর্‌লে স্বামীস্ত্রীর একত্র মৃত্যু। শুক্র বা শনির ক্ষেত্রে সপ্তম বা নিধনস্থানে রবি থাক্‌লে এবং শুক্র মঙ্গল বা শনির দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হোলে বৃক্ষ থেকে পতন হেতু মৃত্যু। নিধনস্থানে শুক্র শত্রুগ্রহে চন্দ্র সংযুক্ত হোলে সর্পদংশনে মৃত্যু। অষ্টমস্থানে রাহু ও চন্দ্র একত্র থাকলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু। কোন রাশিতে রবি ও শনি একত্র থাক্‌লে এবং লগ্নে মঙ্গল থাক্‌লে দণ্ডাঘাতে মৃত্যু। রাত্রিকালে জন্ম হোলে ষষ্ঠে বুধ ও দশমে শুক্র থাক্‌লে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌লে বাম কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে থাকে।

চতুর্থস্থ ষষ্টপতি বুধ-কর্তৃক দৃষ্ট হোলে বধির হয়। তৃতীয়, পঞ্চম, নবম ও একাদশে শুভদৃষ্ট পাপগ্রহ থাক্‌লে নিশ্চয় কর্ণদোষ হয়; নবমস্থান দক্ষিণকর্ণ এবং পঞ্চমস্থান বামকর্ণ, ষষ্ঠে বুধ, গুরু শুক্র ও চন্দ্র বা ঐ সব গ্রহ অস্তগত হোলে কিম্বা সপ্তমে ও অষ্টমে শনি এবং মঙ্গল থাকলে বা নীচরাশিগত হোলে কুব্জ হয়। সপ্তমে বা চতুর্থে শনি মঙ্গল চন্দ্রের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে বড় দরের চোর হয়। তিনটি পাপ গ্রহ একত্র থাকলে শূল রোগ হয়। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধ ও শনির ক্ষেত্রে মঙ্গল থাকলে পঁচিশ বৎসর বয়সে বনে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হবে। শনির গৃহে রাহু এবং সিংহ রাশিতে চন্দ্র থাক্‌লে শিরচ্ছেদ যোগ। রবির সঙ্গে শনি রাহু একত্র হোলে বংশনাশ যোগ। মঙ্গলের ক্ষেত্রে লগ্ন হয়ে রবি ও শনি একত্র থাক্‌লে অথবা লগ্ন পাপ সংযুক্ত হোলে কর্ণচ্ছেদ হয়। মঙ্গল এবং রবি লগ্নে পূর্ণদৃষ্টি দিলে পাতকী যোগ হয়। লগ্নে রবি এবং চতুর্থে রাহু অবস্থান কর্‌লে পিতৃব্যের ঔরসে জন্ম হয়। ষষ্ঠে শুক্র ও লগ্নে মঙ্গল থাক্‌লে নাসাচ্ছেদ যোগ।

বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা

ভারতবর্ষের বাহিরে কোন বৈদেশিক স্থানে অথবা সুদূরে শিক্ষার জন্যে যাবার দরকার হোলে জাতকের নবম স্থান এবং এর অধিপতির অবস্থান প্রথমে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। নবম স্থানটীতে গ্রহগণের উত্তম আপেক্ষিক অবস্থান ঘট্‌লে বা ঐস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাক্‌লে উত্তম ফল লাভ হয়। নবমস্থানে পাপগ্রহ থাক্‌লে এবং উক্ত স্থানটি পাপপীড়িত হোলে বিদেশে জাতকের দুর্ঘটনা ঘটবে।

জাতকের লগ্ন থেকে চতুর্থ স্থান, চতুর্থাধিপতি এবং লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল ও পাপপীড়িত হোলে জাতক কখনই জন্ম ভিটায় বাস করতে পারবে না। লগ্নে কোন পাপগ্রহ থাক্‌লে জন্মস্থানে জাতকের সৌভাগ্যোদয় হবে না। চতুর্থ স্থানটি উত্তম ও সবল থাক্‌লে জাতকের জন্মস্থান ত্যাগ কর্‌বার আবশ্যক হবে না, সেখানেই ভাগ্যোন্নতি কর্‌বে। নবমস্থান থেকে বিদেশে গমন বুঝায়, সমুদ্র যাত্রাই করুক আর আকাশযানেই যাত্রা করুক, চতুর্থস্থান থেকে এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত বলশালী হোলে তবে যাওয়া উচিত, অন্যথা নানারূপ বাধাবিপত্তি দুর্ঘটনা, অসাফল্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হোতে পারে।

লগ্ন পূর্ব্বদিক লগ্নের সপ্তম স্থান, পশ্চিম দিক, লগ্নের চতুর্থ স্থান উত্তর এবং লগ্নের দশমস্থান দক্ষিণ দিক, দ্বাদশ এবং একাদশ দক্ষিণ পূর্ব্ব পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উত্তর পশ্চিম এই ভাবে ধরতে হয়।

বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়

শুক্র এবং চন্দ্র অপেক্ষা রবি ও শনি সবল হোলে মাতার চেয়ে পিতা দীর্ঘজীবী হবেন। শনি এবং চন্দ্রের অবস্থান থেকে পিতামাতার পার্থিব সম্পদ ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। চতুর্থস্থান মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হোলে পারিবারিক জীবন কলহ বিবাদ ও নানা অশান্তিতে বিধ্বস্ত হয় এবং শেষ জীবনে বহু কষ্ট ভোগ করে দেহত্যাগ করতে হয়।

মাতার অবস্থা ও তাঁর আয়ু সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করতে হোলে চন্দ্র, শুক্র ও দশমাধিপতির বলাবল ও দৃষ্টি বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম এবং একাদশ স্থানে বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থানে যে সব গ্রহ থাকে তাহাদের দশা মারাত্মক। এই সব গ্রহের দশায় জীবন সংশয় পীড়া ও মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

দ্বিতীয়স্থানে মঙ্গল অশুভ, কিন্তু মিথুন ও কন্যা দ্বিতীয় স্থানে হোলে এবং সেখানে মঙ্গল থাক্‌লে অশুভদাতা হয় না। দ্বাদশস্থানে মঙ্গল অশুভ, কিন্তু বৃষ ও তুলা দ্বাদশস্থানে হোলে অশুভপ্রদ হয় না। মঙ্গল চতুর্থস্থানে থাক্‌লে অশুভ কিন্তু মেষ ও বৃশ্চিকে হয় না।

সপ্তমস্থানে মঙ্গল অশুভ, কিন্তু কর্কট ও মকর সপ্তমস্থান হোলে এবং এই সব স্থানে মঙ্গল থাক্‌লে অশুভদাতা হয় না। ধনু এবং মীন ভিন্ন অন্যরাশি অষ্টমস্থানে হোলে আর সেখানে মঙ্গল থাক্‌লে অশুভ ফল দেয়। সিংহ ও কুম্ভে মঙ্গল থাক্‌লে গ্রহটী সেই ক্ষেত্রস্থ ভাবকে নষ্ট করে না। বৃহস্পতি ও মঙ্গল একত্র থাক্‌লে মঙ্গলের দোষ দূর হয়। চন্দ্র এবং মঙ্গল একত্র থাক্‌লে মঙ্গলের অশুভ ভাব থাকে না।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

তিনটী নক্ষত্রই এমাসে একভাবে ভালো মন্দ ফল পাবে। স্বাস্থ্য সন্তোষজনক। পারিবারিক অশান্তি। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। গৃহে অশান্তি। পরিবারবর্গের মধ্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো যাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা, শেষার্দ্ধে উত্তম, পদোন্নতি প্রভৃতি সূচিত হয়। বেকারব্যক্তির কর্ম্মপ্রাপ্তি। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, অন্যান্য ভাব শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়।

বৃষরাশি

রোহিণীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির নিকৃষ্ট ফল, কৃত্তিকা ও মৃগশিরার পক্ষে মন্দ নয়। মামলা মোকদ্দমা। ব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের অবনতি, পিত্তপ্রকোপ, রক্তদুষ্টি, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। আর্থিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। জমিনদারের বিপত্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটা আশাপ্রদ নয়। দুঃসংবাদ প্রাপ্তি। ভ্রমণ। চাকুরির ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়, উপরওয়ালার বিরাগভাজন। বদলির সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়, পরপুরুষ এড়িয়ে চলাই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা ও পুনর্বসুজাত ব্যক্তির শুভ। আর্দ্রার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যহানি। শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, পিত্তপ্রকোপ শ্লেষ্মা প্রবণতা, অত্যধিক উষ্ণতা হেতু কষ্ট। দুর্ঘটনার ভয়। নবজাতকের সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা। চাকুরি ক্ষেত্র মন্দ নয়। পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। চাকুরি জীবী নারীর উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কর্কট রাশি

পুনর্বসু জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুষ্যা ও অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক দুর্ব্বলতা। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। আর্থিক অবস্থা মধ্যম। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। গৃহভূমি ক্রয়বিক্রয়ে লাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থা মন্দ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। ভ্রমণ। সমাজ বিহারিণীদের মর্য্যাদাবৃদ্ধি ও নানা প্রকার লাভ। চিত্রতারকা, শিক্ষিকা, সঙ্গীতকলা পারদর্শিণী প্রভৃতির পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

সিংহ রাশি

মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী জাতগণের এক প্রকার ফল। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য। গৃহে আমোদ প্রমোদ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যতা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। দীর্ঘ ভ্রমণ। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটী অনেকটা অনুকূল। চাকুরিপ্রার্থীর পক্ষে মাসটী ভালো। বৃত্তিজীবী

ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী আশানুরূপ অনুকূল নয়। প্রণয়ের ব্যাপারে কেবল মাত্র অসাধারণ সাফল্য, অবৈধ প্রণয়িনী বহু সুযোগ সুবিধা পাবে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী ও চিত্রা জাতগণের পক্ষে উত্তম, হস্তার পক্ষে নিকৃষ্ট। জ্বর অজীর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট। রক্তের চাপবৃদ্ধি, চক্ষু পীড়া প্রভৃতি। পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। আর্থিক অবস্থা উত্তম। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মিশ্রফল দাতা, বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থা উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, অলঙ্কার উপঢৌকন প্রভৃতি লাভ, জনপ্রিয়তা, চিত্র বা মঞ্চে অভিনেত্রী, আর্টিষ্ট প্রভৃতির পক্ষে মাসটী উত্তম। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

তুলা রাশি

চিত্রা ও বিশাখাজাতগণের পক্ষে শুভ, স্বাতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। বিশেষ কোন অসুখ হবে না। অস্ত্রে আঘাতের সম্ভাবনা। আচার ব্যবহারে কথাবার্তায় সংযত হওয়া আবশ্যক। আর্থিক লাভ ও ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী এক ভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। সন্তান সম্ভাবনা, অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য, সঙ্গীত কলা ও অভিনয়ে মঞ্চ ও পর্দ্দায় অভিনেত্রীর পক্ষে উত্তম। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। রক্ত দুষ্টির জন্য কষ্ট ভোগ ও জ্বর, রক্তহীনতা, পারিবারিক শান্তি। সুখ ও ঐক্য। নবজাতকের আবির্ভাব, কোন আত্মীয়ার মৃত্যু। আয়বৃদ্ধি হোলেও ব্যয়াধিক্য যোগ। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম সময়, চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। পদোন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সময়ও উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শুভ। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। সঙ্গীতে মঞ্চ ও পর্দ্দায় যে সব নারীকে দেখা যায় তাদের আশাতীত সাফল্য ও খ্যাতি। অধ্যয়নরতাও জ্ঞানার্জ্জন করবে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া জাতগণের একই প্রকার ফল। হজমের গোলমাল, এ ছাড়া অন্য কোন অসুখ হবে না। পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মতান্তর ও কলহ। স্বজন ও বন্ধু বিয়োগ। আর্থিক অবস্থার অস্বচ্ছন্দতা বা হ্রাস। ব্যয়বৃদ্ধি। টাকাকড়ি সম্পর্কে কলহবিবাদ বা মনোমালিন্য। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে সময়টী মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর কর্ম্মপ্রসারতা ও উত্তমভাবে লাভজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত শুভ সময়। সুখকর ভ্রমণ। পরপুরুষের সান্নিধ্য বর্জ্জনীয়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম, শ্রবণার পক্ষে অধম। শরীর ভালো যাবে না। পারিবারিক শান্তি। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। অর্থাগম। সামান্যক্ষতি। ব্যয়াধিক্য। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মোটের উপর সন্তোষজনক। গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা। চাকুরীর ক্ষেত্র শুভ। পদমর্য্যাদালাভ। প্রতিযোগিতায় সাফল্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। অবিবাহিতার বিবাহ প্রসঙ্গ। অবৈধপ্রণয়ে সাফল্য, পুরুষের চিত্তজয় ও তজ্জনিত আত্মপ্রসাদ এবং লাভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম। শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট। উদর ও গুহ্যদেশে পীড়া এবং প্রদাহ। স্ত্রী পুত্রাদির স্বাস্থ্যহানি বা সাময়িক পীড়া। বন্ধু বিচ্ছেদ। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। নগদ টাকা আসবে যেমন ব্যয়ও হবে সঙ্গে সঙ্গে, সঞ্চয়ের আশা কম। গৃহে বা ভ্রমণকালে চৌর্যভয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটের উপর মন্দ নয়। চাকুরীর ক্ষেত্র ভাল বলা যায় না, উপরওয়ালার বিরাগভাজন। অবৈধপ্রণয়,

পরপুরুষের সান্নিধ্য প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয় বাত-প্রকোপ প্রভৃতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের অবনতি। পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব, ব্যয়াধিক্য। সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা। প্রতারণা। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভক্ষতি দুইই ঘটবে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ ও অনুকূল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টি ভালো বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। উপহার প্রাপ্তি। স্বজন বন্ধুবর্গের শুভেচ্ছা। শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা। পরপুরুষের সান্নিধ্য বর্জ্জনীয়। গৃহস্থালী ব্যাপার নিয়ে থাকা কর্ত্তব্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

সাংসারিক অশান্তি, মাতৃপীড়া, আর্থিকোন্নতি, অগ্রজের উন্নতি। বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি। কর্ম্মস্থানে শত্রুবৃদ্ধি। পত্নীপীড়া। বিদ্যাভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন

উত্তম বন্ধুলাভ। সন্তানের দেহপীড়া। পত্নীর স্বাস্থ্য-হানি। দাম্পত্য প্রণয়। ধনাগম। পারিবারিক অশান্তি। গুরুজন হানি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

মিথুনলগ্ন

স্বাস্থ্য হানি। অপরিমিত ব্যয়। দুশ্চিন্তা। আকস্মিক আঘাত। কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ যোগ। কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি

কর্কটলগ্ন

আর্থিকোন্নতি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নূতন কর্ম্মে অর্থ-বিনিয়োগ ও তজ্জনিত ক্ষতি, চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, সাধারণ উন্নতি, বিদেশে ভ্রমণ। চরিত্র রক্ষা শিথিল হোতে পারে। ব্যবসায়ে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থাকা আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহলগ্ন

কর্ম্মস্থল শুভ। বিদ্যোন্নতি, সন্তানের পীড়া, পদে আঘাত, পিত্তাধিক্য, পত্নীভাব শুভ, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ, শত্রুবৃদ্ধি, সন্তানাদির বিবাহ প্রসঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যালগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা। আর্থিক ভাব শুভ। সন্তানের স্বাস্থ্য হানি। জামাতা ও পুত্রবধুর রোগ ভোগ, অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের আলোচনা। কর্ম্মস্থল স্বাভাবিক অবস্থায় চল্‌বে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা লগ্ন—

আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি। ধনভাব অশুভ। রক্তঘটিত পীড়া। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রু। মাতৃপীড়া। পুত্রের উন্নতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো বলা যায়না, মানসিক উদ্বেগ ও আশাভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। অর্থাগম। স্ত্রীর সহিত কলহ। মোকর্দ্দমা সৃষ্টি, ভ্রাতার বিশেষ পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ!

ধনুলগ্ন—

সন্তানের লেখা পড়ায় উন্নতি। অর্থাগম যোগ। মিত্র লাভ। বিবাহের আলোচনা, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উন্নতি। আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টি ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মকরলগ্ন—

সহোদর ভাব শুভ। রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, স্নায়ু দুর্ব্বলতা।

বিদ্যোন্নতি যোগ। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি। কর্মভাব শুভ। পদোন্নতি, অপরিমিত ব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। ধনাগম যোগ। আর্থিকোন্নতি। সন্তান ভাবের ফল শুভ। বন্ধু বিচ্ছেদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। জটিল পরিস্থিতি। ভ্রমণ যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

মীনলগ্ন—

পড়াশুনা বা পরীক্ষা বিষয়ে সন্তোষজনক ফলের অভাব। শারীরিক অসুস্থতা। ধনাগম যোগ। সদ্বন্ধু-লাভ। মাতা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির জীবন সংশয়, পুত্রবধূ, জামাতা থেকে অশান্তি বৃদ্ধি। সন্তানের উদ্বেগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট।

॥ চাঁদমারী ॥
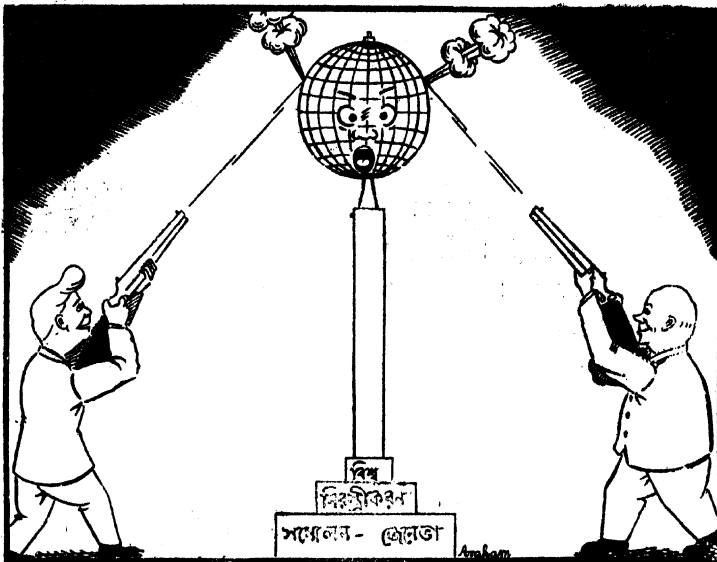
শিল্পী: ইব্রাহিম্ রহ্‌মান্

ও কিছু না, একটা ছবি।

কবে তুলিয়েছিল রেণুকা—মনে নেই। অনেক—অনেকদিন আগে, কার যেন আসবার কথা ছিল—তার কথা ভেবেই মা-বাবা জোর করেছিলেন নতুন একটা ছবি তোলাবার জন্যে। কিন্তু কাজে লাগেনি এই ছবি। যার জন্যে তোলা সে আসে নি।

না আসুক। রেণুকা জানত, তখন—মনে হয় যেন সেদিন, আসবেই একজন। সে এল না, আয়নায় নিজের ভরা শরীর—ঝকঝকে নিখুঁত শরীর দেখতে-দেখতে মনে হত রেণুকার, এই দেহ, এই রূপ—আসবে একজন।

আর, তাকেও দেখবে রেণুকা। রূপ যেমন দেখাবে, দেখবেও তেমন। গুণের কথা যেমন শোনাবে, শুনবেও তেমন। একজন, যে-সে নয়, বিশেষ একজন, আসবে তার নিখুঁত শরীরের জন্যে। রেণুকা দেখবে, বুঝবে, আর

পরে, অনেক পরে, ভালবাসবে। যাকে মন চায় না, মা-বাবার কথায় তাকে কি মন দেয়া যায়!

মন দিতে পারে নি রেণুকা। কাউকেই নয়। সেদিন অবধি না। পরশু অবধি না। কাল অবধি না। রেণুকা ভালবেসেছিল নিজেকে—একটা নিখুঁত অহঙ্কারকে। সে-অহঙ্কার ভাঙবার মানুষ আসে নি। সে অহঙ্কার ভাঙবার মানুষ তখন হয় তো ছিল না।

কিন্তু, রেণুকা বুঝতে পারে নি, কখন এক-এক মুহূর্ত, এক-এক দিন, এক-এক বছর—কালের, নির্বিকার মহাকালের এক-এক টুকরো আঘাত করে-করে গেছে তার অহঙ্কারকে—ভেঙেছে—খুঁত ধরিয়েছে নিখুঁত শরীরে। আর হঠাৎ চলতে-ফিরতে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে লম্বা নিশ্বাসের ক্লান্তিতে রেণুকা অনুভব করে, আর গোটা জীবনটাই যেন এখন একটা ছবি হয়ে গেছে। দূর থেকে এখনও দেখবে কেউ-কেউ, দেখেও। কিন্তু যৌবন দিয়ে, দেহ মনের আশ্চর্য উত্তাপ দিয়ে রেণুকাকে কাছে টানবে না কেউ, টানে না।

এখন রেণুকা একটা ছবি—ছবিই। ফ্রেমে বাঁধানো। ধুলো পড়া। বোবা। দেয়ালে টাঙানো ওর বড় ছবিটার দিকেও তাকায়। রেণুকা নিজে যেমন থাকে সংসারে—পৃথিবীতে, ওর প্রথম বয়সের অহঙ্কার, ম্লান নেভা-নেভা ভিজে-ভিজে, তেমনি টাঙানো থাকে ওরই ঘরের দেয়ালে।

একটা নয়, এ বাড়িতে, যে-বাড়িটা এখন রেণুকার একার—অনেক ছবি আছে। মা-বাবার, মাসি-পিসির, দাদামশাই-দিদিমার—অনেকের। তারা কেউ নেই। শুধু রেণুকাই বেঁচে থেকে ছবি হয়ে গেছে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এক-একবার মনে হয় রেণুকার, একদিন নিজের ছবিটা ও খুলে ফেলবে—ভেঙে ফেলবে—ফেলে দেবে। যে-অহঙ্কার ভেঙে গেছে তার মূক একটা চিহ্ন ওকেই যেন যন্ত্রণা দেয়। কাঁটা ফোটায়। ছবির কী দাম?

এই ভাবনার অল্প পরেই হঠাৎ একদিন রেণুকা বুঝতে পারে দাম আছে—আছে। তার চেয়ে, প্রথম বয়সের, রেণুকার যৌবনের টলোমলো শরীরের অনেক বেশি দাম। তখন ভিজে-ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে বারবার ছবিটা ঘষে রেণুকা। দেখে অনেকক্ষণ। দেখতে-দেখতে হাসে। একা-একা। আপন মনে। আর তারপর আলমারী খুলে অ্যালবাম টেনে খুঁজে-খুঁজে বের করে অনেক-অনেক ছবি। নানা বয়সের। নানা ভঙ্গির। এখন অনেক দাম ছবির—রেণুকার ভরা-যৌবনের এক-একটা চিহ্নর।

প্রথম দিন রেণুকার হাতে ওর নিচের ফ্ল্যাটের ভাড়া তুলে দিতে এসে ইতস্তত করে বারীন। দেয়ালে টাঙানো সেই ছবিটা দেখে অনেকক্ষণ। তারপর রসিদ নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে-আগে রেণুকার ছবি দেখতে-দেখতেই জিজ্ঞেস করে, "কার ছবি?"

হঠাৎ যেন একটা আঘাতের ঝাপটায় থমকে দাঁড়ায় রেণুকা। উত্তর দিতে পারে না ওর এই অল্পবয়সী নতুন ঝকঝকে ভাড়াটের প্রশ্নের। কী বলবে সে? এ ঘরে আয়না না থাকলেও তার এখনকার চেহারার কথা খুব ভাল করে জানে রেণুকা। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল। চোখের নিচে চামড়া কুঁচকে গেছে। ভারী শরীর। ওজনও বেড়েছে অনেক। রেণুকার মনে হয়, সত্যি বললে হয়তো বারীন বিশ্বাস করতে চাইবে না তার কথা।

যেন ভেবে-ভেবে ভয়ে-ভয়ে রেণুকা অদ্ভুত হেসে বলে, "চিনতে পারেন কার ছবি? বলুন না?"

"খুব চেনা-চেনা, ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধহয় কোন ফিল্মস্টারের, না?"

বারীনের কথা শুনে, প্রথম বয়সের মতোই প্রাণ খুলে হাসে রেণুকা, "চিনতে পারলেন না তো? না না, কোন ফিল্মষ্টারের নয়, ওটা আমারই ছবি—"

কয়েক মুহূর্তের কৌশলে বিস্ময় গোপন করে বারীন। হাসি-হাসি মুখে তাকায় রেণুকার দিকে, "আরে, তাই তো। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল," ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বারীন। তারপর আস্তে খুব আস্তে, রেণুকা যেন শুনতে না পায় বোধহয় তেমন স্বরে আপন মনে বলে ওঠে, "কি সুন্দর!"

আস্তে বলে উঠলেও বারীন, সমস্ত দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, চোখ কান মুখ, যেন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে রেণুকা অনুভব করে বারীনের কথা। আর তখন সে নিজেও দেখে ওর ছবি। দেখতে-দেখতে আবার যেন ফুটে ওঠে। বারীনের মাত্র দুটি কথার ঝড় ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ছোট, খুব ছোট, হালকা একটা পাখির মতো ওর প্রথম বয়সের কড়া অহঙ্কারের অনুভূতিতে। আর তখন একটা

ফুটফুটে সুন্দর মেয়েকে, একটা থরোথরো যৌবনকে, অনেক আগেকার একটা নিখুঁত শরীরকে অ্যালবাম হাতড়ে-হাতড়ে, ফটোগ্রাফারের দোকানে ঘুরে-ঘুরে—রেণুকা আজ টেনে আনতে চায়, দাঁড় করিয়ে দিতে চায় বারীনের সামনে—ওকে চমকে দিতে চায়। আর আশ্চর্য, এখন, এত পরে, হঠাৎ রেণুকার মনে হয়, বারীনকে যখনই দেখে তখনই, ও শুধু দেয়ালে টাঙানো একটা ছবিই নয়। ছবির রেখায়-রেখায় ভর করে, বারীনকে দেখতে-দেখতে, ওর কথা ভাবতে-ভাবতে আর শুনতে-শুনতে রেণুকা হঠাৎ পেয়ে যায় হাতের মুঠোয় ওর প্রথম বয়সকে, যৌবনকে, অহঙ্কারকে। যেন সে এখনও বারীনকে তার রূপ দিয়ে, দেহ দিয়ে,মন দিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিতে পারে।

বারীন এ বাড়িতে, রেণুকার ভাড়াটে হয়ে আসার পর প্রথম-প্রথম, ওর চেহারা দেখে, ওর সঙ্গে কথা বলে—আর ওর বড় বিলিতি আপিসে পাকা চাকরির কথা শুনে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছিল রেণুকা। যদিও তার ফ্ল্যাটের ভাড়া বেশি, এত বেশি যে বারীনের মতো বড় চাকুরে না হলে, রেণুকার বাড়ির নিচের তলা কেউ ভাড়াই নিতে পারেনা। কিন্তু এক পরিচ্ছন্ন তরুণকে, যার সংসারে আর কোন মানুষ নেই, এমন এক তীক্ষ্ণ যুবককে ফ্ল্যাট ভাড়া দেবার সুযোগ পেয়ে প্রথম থেকেই একটু বেশি খুশি হয়েছিল রেণুকা। খুশি হয়েছিল যখন সে শুধু একটা ছবি হয়েই ছিল। আর আজ?

প্রসাধনে অনেক সময় যায় রেণুকার। বারীন ফিরবে যখন বিকেল ফুরিয়ে যাবে, ভিজে পাতলা সবুজ আলোর রেখা অন্ধকারের আগে-আগে অনেকক্ষন স্থির হয়ে থাকবে কাঠ-গোলাপের পাতায়-পাতায়—রেণুকা সুইচ টিপে আলো জ্বালাবে। ঘড়ি দেখে রেণুকা। ছ'টা বাজে। কয়েক মিনিটের জন্যে রাস্তার ওপারে ছোট ফোটোর দোকান থেকে ঘুরে এলে হয়। এতক্ষণে বোধহয় শেষ হয়েছে এনলার্জমেন্টের কাজ।

স্লিপারের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকায় রেণুকা। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নামে। হালকা, আজ খুব হালকা মনে হয় ওর নিজের শরীর। রাস্তা পার হয়ে রেণুকা দাঁড়ায় ফটোগ্রাফারের সামনে। আজ এই সময় রেণুকার আসবার কথা ছিল এখানে।

কিন্তু ফটোগ্রাফার রেণুকার ছবি ফেরৎ দেয়, "হল না।"

"কী হল না? বলে গিয়েছিলাম তো আর্জেন্ট?"

"না না, তা নয়," বিনয়ের হাসি হেসে বলে ফটোগ্রাফার—"এটা এনলার্জ করলে ভাল হবে না, নেগেটিভটা পেলে না হয়—"

বাধা দিয়ে রেণুকা বলে ওঠে, "নেগেটিভ থাকলে কি আর ওটা দিতাম? ভাল হোক না হোক, আপনি, যেমন বলেছিলাম তেমন করে রাখলেই তো পারতেন—"

অপ্রস্তুত ফটোগ্রাফার বলে, "শুধু শুধু আপনার টাকা নষ্ট হবে তাই—যাহোক, দয়া করে আর ত্থদিন সময় দিন, পরশুদিন আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

"ঠিক যেন সেদিন পাই,"—অপ্রসন্ন মুখে বেরিয়ে আসে রেণুকা। কিন্তু ছবিটা যেন পরীক্ষা করতে-করতে ফটোগ্রাফার জিজ্ঞেস করে, "আপনার মেয়ের ছবি বুঝি?"

"না," যেন লোকটার অকারণ কৌতূহলে বিরক্ত হয় রেণুকা। রাস্তায় নেমে তাড়াতাড়ি পা ফেলে বাড়ি ফেরে। লোকটা বোকা নাকি! সিঁদুরের রেখা নেই রেণুকার সিঁথিতে। হাতে লোহা শাঁখা কিছু নেই—তবু বলে, "আপনার মেয়ের ছবি বুঝি?" ও দোকানে আর কখনও যেতে ইচ্ছে করে না রেণুকার।

কিন্তু এখনও আরও অনেক ছবি, যেগুলো পড়েছিল অনেক জঞ্জালের তলায়, কোন-কোনটার নাকের কাছে সাদা দাগ, কোন-কোনটা অযত্নে অস্পষ্ট—সেই সব ছবি আবার নতুন করে ফোটাতে হবে—মেলে ধরতে হবে বারীনের সামনে। ছবির দোকানে-দোকানে ঘোরাই এখন রেণুকার কাজ। দেয়ালে এখন সে আরও কয়েকটা ছবি ঝুলিয়েছে। কয়েকটা দামী ফটোফ্রেমও কিনে এনেছে এর মধ্যে। বারীন দেখেছে সব।

একটা একটা করে রেণুকার ছবি মন দিয়ে দেখে বারীন। অপূর্ব! আজ তার পাশে বসে আছে যে মানুষ, বয়স তাকে ক্ষমা না করলেও, এখনও—ছবি দেখতে-দেখতে বারীনের মনে হয়, হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্যেই মনে হয়, রেণুকা সুন্দর—আশ্চর্য সুন্দর। সে ছবিটা বারীন হাতে নিয়ে দেখে অনেকক্ষন ধরে, নটীর পূজার একটি দৃশ্য—শ্রীমতীর দেহ ভেঙে পড়ছে জীবন উৎসর্গ করবার

"বারীন, তুমি আমাকে তখন দেখলে না!"

যেগুলো ছড়ানো রয়েছে সামনের টেবিলে, যেগুলো আছে তার হাতে, বারীনের চোখের সামনে—সবগুলোই, কুড়িবাইশ বছর আগে নয়, রেণুকাযেন তুলিয়েছে কয়েকদিন আগে, তার পাশে যে তীক্ষ্ণ পরিচ্ছন্ন মানুষ বসে আছে তারই জন্যে—যেন বারীনের জন্যেই এতদিন তার রূপ অহঙ্কার দেহ মন নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল রেণুকা—যার সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী নেই, বিদেশের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী যার আছে, যার মাইনের অঙ্ক রীতিমতো মোটা—এমন যুবকের জন্যে প্রতীক্ষা করে-করে ছবি হয়ে গেল রেণুকা। আর আজ এতদিন পর তার পাশে, খুব কাছে এল সেই মানুষ—রেণুকার মনের মানুষ।

আর বারীন ছবি দেখতে-দেখতে রেণুকাকে দেখে। বর্তমানকে দেখে চোখ দিয়ে, অতীতকে দেখে মন দিয়ে। দেখতে-দেখতে হঠাৎ, বারীন নিজেই বুঝতে পারেনা কখন, যে মেয়ে একদিন, কোন এক শীতের দুপুরে চিড়িয়াখানায় একটা গাছে সাদা ফ্রেমের সান্‌-গ্লাসের পরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আকাশের দিকে চোখ তুলে; আন্তরিক ভঙ্গিতে—দেখতে-দেখতে আরও কাছে, খুব কাছে সরে আসে বারীন—রেণুকার গা ঘেঁষে বসে।

আর এতদিন পর, জোরালো আলো-জ্বালা বারীনের ড্রয়িংরুমে একই সোফায় পাশাপাশি বসে নিজের ছবি দেখতে-দেখতে সব ভুলে যায় রেণুকা। ও ভুলে যায় বয়সের ভার, কালের চক্রান্ত যেন ব্যর্থ করে দেয়। কী এক আশ্চর্য মধুর অনুভূতিতে তার নিজেকে মনে হয় ছোট—বারীনের চেয়ে দু-চার বছরের ছোট। আর এইসব ছবি, মূর্তিমতী টলোমলো যৌবন, সেই মেয়ে রেণুকা, কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার সেই যৌবন, তেমন রূপ নিয়ে বারীনের মনে চলে আসে—তার পাশে এসে বসে।

"একদিন, চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম," ঝুঁকে পড়ে নিজের ছবি দেখতে-দেখতে রেণুকা বলে, "আমার এক কাকা, এই ছবিটা তোলে সেদিন—"

"এটা আমার কাছে থাক?"

"নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করলে সবগুলোই তুমি রাখতে পার

বারীন," খুশিতে উপচে পড়ে রেণুকা বলে, "কই, 'নটীর পূজা'র কথা তো কিছু বললে না? ওটা ভাল লাগেনি তোমার?"

"এ চেহারা কার না ভাল লাগে? এমন রূপ আর কার আছে! আপনি নাচতেও পারতেন?"

"পারতাম না?" একটা নিশ্বাস ফেলে রেণুকা বলে, "বারীন, তুমি আমাকে তখন দেখলে না!"

"দেখলাম," রেণুকার এক-একটা ছবি তাসের মতো হাতে খেলাতে-খেলাতে বারীন বলে, "দেখলাম—সব দেখলাম—কত দেখলাম—" শ্রীমতীর সাজে রেণুকার সেই ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখে বারীন, "না, আর কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না—"

তখন বারীনের গালে হাত বুলোয় রেণুকা। ওর কোলের ওপর ভেঙে পড়ে। উপুড় হয়েই বলে, "বারীন, পাইনি—এতদিন কিছু পাইনি আমি। কাউকে চাইনি। বোধহয় তোমার জন্যেই সরিয়ে দিয়েছি—ফিরিয়ে দিয়েছি অনেক মানুষ—"

রেণুকার মুখ দেখতে পায় না বারীন। পিঠ দেখে। ঘাড় দেখে। খোঁপা দেখে। রেণুকার শাড়ীতে এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ। কী ফর্সা রঙ ওর! রেণুকা কথা বলে যাচ্ছে। বারীনের পায়ে চাপ লাগছে। তার শরীর ঝিমঝিম করছে। বারীন রেণুকাকে দেখছে না, ওর ছবি দেখছে—যে-ছবিগুলো ওর সামনে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে রেণুকা—

শ্রীমতীর চোখ দুটো, টানা-টানা চোখ দুটো অপরূপ! বৌদ্ধ যুগের বেশ তার দেহের অনেক রেখা স্পষ্ট করে তুলেছে। তাকেই পায় আজ বারীন। বারীন পেয়ে যায় চিড়িয়াখানার সেই মূর্তিমতী যৌবনকে। আর সেই একই মেয়ে স্টীমার ছাড়বার আগে আগে হাত তুলে কোন একদিন রুমাল নাড়ছিল। ছোট, খুব ছোট হাতা ব্লাউজ। মুখে হাসি। অনেক মেয়ের ভিড়ে একজনকেই চিনে নেয় বারীন।

"রেণু—রেণুকা!"

"বারীন, আমি মরে যাব, ঠিক মরে যাব, ডাক—ডাক—"

এখনও মাথা তোলে না রেণুকা। তুলতে পারে না। একটা ঘোরে, একটা হঠাৎ আসা আবেগের ঝাপটায়-ঝাপটায় তার মনে হয়, আজ, এত পরে, যদিও প্রতীক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে, তবুও যেন এখন—এই মুহূর্ত থেকে আবার তার প্রতীক্ষা শুরু হয়।

আর কথা বলে না বারীন। রেণুকার নাম ধরেও আর ডাকে না। তবে তার পিঠে—সাদা পাতলা ব্লাউজ ঢাকা পিঠে মুখ ঠেকিয়ে অতীতের সেই মেয়েটিকেই যেন পেয়ে যায় বারীন। ছবিগুলো তখন টেবিলের ওপর বোবা হয়ে পড়ে থাকে ঠাণ্ডা সিঁড়ির মতো। আর অতীত বর্তমান হয়ে যায় বারীনকে মাতাল করে দিয়ে।

কিন্তু তারপর, বারীনের ড্রয়িংরুমে সেই সন্ধ্যার পর—যেদিন থেকে আবার রেণুকার প্রতীক্ষা শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকে আজও রেণুকা বলে থাকে ওর পিঠের ওপর একটা চাপ অনুভব করবার জন্যে, একটা ডাক শোনবার জন্যে। রেণুকা প্রতীক্ষা করে সারাদিন একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যে—যখন বারীনের ঘরে জোরালো আলো থাকবে না, একটি মানুষও থাকবে না—সে ওকে কাছে ডাকবে।

এই ডাক শোনবার জন্যেই বাকি সব হিসেব যেন গোলমাল হয়ে যায় রেণুকার। সে ঠিক সময় ইলেকট্রিক বিল পাঠাতে ভুলে যায়, মিস্তিরী ডেকে জলের কল সারাবার কথা খেয়াল থাকে না। আর যারা আজ নেই, রেণুকার মা-বাবা, তার মনে হয়, বয়সটা হঠাৎ অনেক কমে যায় বলেই মনে হয়, আছে, আছে—সকলেই আছে। বাড়ি নিয়ে বিব্রত রেণুকা ভাবে তখন, এ বাড়ি না থাকলেই যেন ভাল হত। এত খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না তার। একটা নিশ্চিন্ত অলস ভাবনায়—বারীনের কথা ভেবে সে কাটাতে পারত অনেক সময়।

কিন্তু সে-সন্ধ্যা আর ফিরে আসে না। বারীন আসে দেরি করে, এত দেরি করে যে তখন তাকে ডাকাডাকি করা যায় না…আর সকালে, অফিসে বার হবার আগে-আগে তার এত তাড়া যে কথাই বলা যায় না। হঠাৎ শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রেণুকা ভাবে, কী কথাই বা সে বলবে বারীনকে!

একটা ছবি তার কাছে চেয়েছিল বারীন—চিড়িয়াখানায় তোলা রেণুকার সেই ছবি। তখন দেয়নি রেণুকা। ভেবেছিল, আরও বড় করিয়ে, সুন্দর একটা ফ্রেমে ভরে একদিন রেখে আসবে বারীনের শোবার ঘরের টেবিলে। কিন্তু ফটোগ্রাফাররা এত ভোগাচ্ছে তাকে! একটা সামান্য কাজে এত সময় নিলে কি চলে!

যেদিন সেই ছবি বড় হয়ে এল রেণুকার—রেণুকা নিজেই নিয়ে এল সাহেব-পাড়ার এক বড় দোকান থেকে, সেদিন অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তায় কাদা। ফেরবার সময় ট্যাক্সির জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। আর যখন ফিরল তখন বারীন বেরিয়ে গেছে। ফিরতে অনেক দেরী হল রেণুকার।

ওপরে উঠল না রেণুকা। বারীনের ঘরে এল। চেনা লোক। কেউ বাধা দিল না। একটা ফটো-ফ্রেম আছে রেণুকার হাতে। এইমাত্র কিনেছে। এখন আস্তে আস্তে রেণুকা যাবে বারীনের শোবার ঘরে। কয়েক মিনিট বসবে তার খাটে। বিশ্রাম করবে। তারপর ফ্রেমে ভরে নিজের ছবি রাখবে তার টেবিলে। নিজেই দেখবে কয়েক মিনিট ধরে। আর, তারপর বারীনের প্রথম দিনের বলা কথা ভাবতে-ভাবতে হাসি ফুটে উঠবে আর ঠোঁটের ফাঁকে, "কী সুন্দর!"

এখনই হাসে রেণুকা। একবার বারীনকে দেখতে চায়—দেখাতে চায়। কখন ফিরবে বারীন! সে বেরিয়ে গেছে অনেক আগে। যাবার আগে পাখা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। গরম লাগছে রেণুকার। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি হলেও ঘরে ঢুকে ভীষণ গরম লাগছে। ও পাখা বন্ধ করে না। রেগুলেটারে হাত দিয়ে জোরে, সব চেয়ে বেশি জোরে পাখা ঘুরিয়ে দেয়।

বারীনের ঝকঝকে খাটে বসে তৃপ্তির একটা নিশ্বাস ফেলে রেণুকা। ওর আরামে গড়াতে ইচ্ছে করে। বারীন ফিরবে কখন? আজ রাতে, অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরে কী দেখবে বারীন? রেণুকাকে দেখবে—অনেকক্ষণ দেখবে। ফটো-ফ্রেমটাকে বুকের কাছে নিয়ে আসবে। বুকে চেপে ধরবে, "না, আর কাউকে দেখতে ইচ্ছে করেনা—"

তখন—রাত অনেক হলেও, ঘুম না আসার যন্ত্রণায়, হালকা পা ফেলে, দোতলায় রেণুকার ঘরে চলে আসতে পারে বারীন। আসবেই, হঠাৎ রেণুকার মনে হয়, আজ তার কাছে আসবেই বারীন—ঠিক আসবে। রাতে ঘুম আসেনা রেণুকার। সে জেগে থাকে অনেকক্ষণ।

আজও জেগে থাকবে রেণুকা। অন্ধকার ঘরে একা-একা জেগে থাকবে। পায়ের শব্দ হবে। দরজায় শব্দ হবে। বারীন আসবে। আজ আলো থাকবে না ঘরে। রেণুকা আলো জ্বালবে না। অন্ধকারে বারীন আসবে। কথা বলবে। অন্ধকারে নির্লজ্জ হয়ে উঠবে বারীণ—রেণুকাও।

বারীনের শোবার ঘরে যে বড় টেবিলটা আছে, সেখানে ছবিটা সাজিয়ে রাখবে রেণুকা, সে হঠাৎ সেদিকে চোখ ফেরায়। কিন্তু ও কী? বারীন অবাক করেছে রেণুকাকে। টেবিলের ওপর একটা ফটোফ্রেম। তার কোন ছবিটা ওখানে রেখেছে বারীন? কোন ছবিটা লুকিয়ে নিয়ে নিয়েছে এক সময়?

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে রেণুকা এসে দাঁড়ায় টেবিলের সামনে। কঠিন একটা ধাক্কা খায় যেন। নড়তে পারে না। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। এটা কার ছবি রেখেছে বারীন—কার? একটি মেয়ে, কপালে টিপ, হাতে ঘড়ি—ঘড়িটা দেখাবার জন্যে গালে হাত দিয়ে ছবি তুলেছে—বোকা! এমন মেয়ের ছবি, ওর চেহারা দেখে মনে হয় রেণুকার, এত সাধারণ যে বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখা যায় না—বারীন দেখে কেমন করে!

বোকা! বারীনটাও ভীষণ বোকা। রেণুকার ইচ্ছে করে ফ্রেম থেকে টেনে বের করে ওই বোকা সাধারণ মেয়েটার ছবি দুমড়ে মুচড়ে দূরে ফেলে দিতে। ঘরে রাখবার মত চেহারা নাকি ওর! চোখ নেই বারীনের?

নিজের ছবি—সেই চিড়িয়াখানার ছবি খাম থেকে বের করে দেখে রেণুকা—ওই বোকা সাধারণ মেয়ের ছবির পাশাপাশি ধরেই দেখে। আর বারীনের রুচির কথা ভেবে নিজের ছবির সঙ্গে ওই বোকা মেয়ের তুলনা করে হাসে মনে মনে। আজ বাড়ি ফিরে আসুক বারীন—যত রাতেই আসুক—রেণুকা দুটো ছবি পাশাপাশি রেখে ওর চোখ খুলে দেবে—ওকে বিদ্রুপ করবে।

ফিরে দাঁড়ায় রেণুকা। আবার একটা ধাক্কা খায়।

আর হাসির শেষ রেখাটা মিলিয়ে যায় ওর ঠোঁট থেকে। বারীনের আয়নায় ও দেখে নিজের মুখ। দেখে, অনেকক্ষণ ধরে দেখে ওর পুরো শরীরটা। দেখতে দেখতে কাঠ হয়ে যায়। জড় বোকা হাবা হয়ে যায়। হাসতে পারে না। কাঁদতে পারে না। শুধু নিজের ছবিটা এখন দেখতে ওর ভীষণ লজ্জা করে। আর তখন ঘরের দেয়ালে দেয়ালে একটা বিদ্রুপ কাঁপে।

নিজের ছবিটাই ছুটো নিষ্ঠুর হাতে টুকরো টুকরো করে বারীনের ঘর থেকে চোরের মতো বেরিয়ে যায় রেণুকা।

স্কেচ ৪

শিল্পী : শম্ভু রায়

পর্দা ও পীঠ

শ্রী'শ'—

।। চলচ্চিত্র গবেষণা ।।

সম্প্রতি ইউনেস্কো এবং ইণ্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ১৯৫৯-৬০ সালে নির্মিত মোট ৩০টি ভারতীয় চলচ্চিত্র অবলম্বনে ভারতীয় চিত্র ও চিত্র-তারকা সম্পর্কে এক বিশদ গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়। গবেষকগণ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে প্রেমই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রণয়-ভূমিকার শিল্পীগণ সুচেহারা সম্পন্ন এবং অভিনীত চরিত্রের আচরণ ভদ্রোচিত। ঐ ৩০টি চিত্রের মোট ১১১টি প্রধান চরিত্রের মধ্যে ৪৮টি স্ত্রী চরিত্র এবং ৬৩টি পুরুষ চরিত্র। আর এই সকল চরিত্রের শিল্পীদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। চিত্রগুলিতে কেবলমাত্র পারিবারিক পটভূমিতেই কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, সমাজের কোনো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী-জীবন রূপায়িত হয়নি। প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলির অধিকাংশই অবিবাহিত এবং তারা নায়িকাকে স্ত্রীরূপে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল। পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতেই ভারতীয় চিত্রের প্রণয় গড়ে ওঠে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে উপরোক্ত ৩০টি চিত্রের মধ্যে ২৮টি চিত্রের কাহিনীর সমাপ্তি হয়েছে নায়ক ও নায়িকার মিলনে, আর সে মিলন ঘটেছে ভাগ্যেরই বিধানে। তবে ব্যতিক্রমের মধ্যে একাধিক সচ্চরিত্রনায়ক কাহিনীর পরিণতিতে সুখলাভ করেনি। কিন্তু অপরিহার্য পরিণতিরূপে মৃত্যুর মধ্যেই তাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া চিত্রের নায়কের বিশেষ কোনরূপ রাজনীতিক বিশ্বাস কিছু দেখা যায় না এবং বিজ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলনে আগ্রহান্বিত কোনো চরিত্রকে উপরোক্ত চিত্রসমূহে নায়করূপে দেখা যায় নি। ভারতীয় চিত্রে খল বা দুষ্ট চরিত্রের শাস্তি দেখা যায় এবং ঐ ৩০টি চিত্রের মধ্যে ৫টি খল চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে।

*　　*　　*

। বাংলা চিত্রের সংকট ।

বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে এরূপ চেষ্টা আর কখনো হয়নি। তাই সরকারের এই শুভ-প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সভায় স্থির হয় যে, বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট সমূহের কারণ নির্ণয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ করবেন। আমরা আশা করি বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, গুণী, সাংবাদিক ও সাধারণ দর্শকের প্রতিনিধিবৃন্দও এই কমিটিতে স্থান লাভ করবেন। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কমিটিতে স্থান লাভ করলে নিরপেক্ষ তদন্ত ও তথ্যানুসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন নাও হতে পারে। সুতরাং সরকার যদি ঐ কমিটির জন্য ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিষয়ে সচেতন হন, তবেই তাঁদের বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করতে পারবেন।

*　　*　　*

খবরাখবর ঃ

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্কর ও অমলা শঙ্কর গত ৩রা সেপ্টেম্বর আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে ২৩জন সহকারী শিল্পীও গমন করেছেন। তাঁদের নিয়ে শঙ্কর দম্পতি প্রায় ৮ সপ্তাহ ব্যাপি আমেরিকা ও কানাডায় ভারতীয় নৃত্যকলা পরিবেশন করবেন। অন্যান্য নৃত্যাংশের সঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি" অবলম্বনে প্রস্তুত নৃত্যনাট্যটিও বিদেশে পরিবেশন করবেন। ভারতসরকারের ব্যবস্থানুযায়ী স্বদেশে ফিরিবার পথে শঙ্করদম্পতি সোভিয়েট রাশিয়া ও

ইউরোপের বিভিন্ন সহরেও ভারতীয় নৃত্যকলা পরিবেশন করবেন।

* * *

একটি আশার কথা যে শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ পুনরায় একটি শিশুচিত্র নির্মাণ করবার সংকল্প করেছেন। ইতি-পূর্বে 'পরিবর্ত্তন' নামক চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও অন্যতম প্রযোজকরূপে মনোরঞ্জনবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এবারে ছোটদের রূপকথার কাহিনীর সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণের দ্বারা তাঁর এই নূতন চিত্রের জন্য তিনি এক অভিনব ধরণের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। সন্তোষ সেনগুপ্ত সঙ্গীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আর 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ'-এর প্রযোজনায় চিত্রটি নির্মিত হবে।

* * *

আর, ডি, বি, এ্যাণ্ড কোং-র "সাতপাকে বাঁধা" চিত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একত্রে এই প্রথম নায়িকা ও নায়করূপে এই চিত্রটিতে অভিনয় করবেন। অন্যান্য ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, মলিনা দেবী, তরুণকুমার প্রভৃতি শিল্পীগণ অবতীর্ণ হবেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চিত্রটির সুরকার এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চিত্র-নাট্যকার।

* * *

প্রযোজক ও অভিনেতা সুনীল দত্ত একটি নতুন ধরণের কাহিনী অবলম্বনে চিত্র নির্মানের আয়োজন করেছেন। ভারত-চীন সীমান্তে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মনিয়োগকারী বারোজন নির্ভীক ও দুঃসাহসী ভারতীয় যুবকের কর্মকুশলতা এই কাহিনীর বিষয়। কেবলমাত্র ভারত সরকারের অনুমতির জন্যই এই চিত্রের দৃশ্য গ্রহনের কাজ অপেক্ষা করছে।

* * *

সুবিখ্যাত ভারতীয় চিত্র-নির্মাতা ভি, শান্তারামের 'রাজকমল কলা মন্দির'-এর প্রযোজনায় বোম্বাই সহরে 'পলাতক' নামে একটি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলার সুবিখ্যাত চিত্র-পরিচালকগোষ্ঠী 'যাত্রিক' উপরোক্ত প্রতিষ্টানের কাছ থেকে এই চিত্রটির পরিচালনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই পরিচালকগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য শ্রীতরুণ মজুমদার উপরোক্ত চিত্রগ্রহণ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করবার জন্য বোম্বাই যাত্র করেছেন। বাংলা দেশের বাইরে যাত্রিকের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক—এই কামনা করি।

* * *

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত "সাতপাকে বাঁধা" চিত্রে

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে বি, কে, প্রোডাক্সন্স-এর 'বীণাবাঈ' চিত্রখানি নির্মাণ করা হচ্ছে। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। কণ্ঠদান করছেন সঙ্গীত পরিচালক নিজে ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এন, সি, ষ্টুডিওতে 'শিল্প ভারতী প্রোডাকসন্স'-এর 'বর্ণচোরা' চিত্রের কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বনফুল-রচিত 'কঙ্কি' নাটক অবলম্বনে 'বর্ণচোরা'র কাহিনী গঠিত। এই চিত্রে একটি জলসার দৃশ্যে নায়িকা সন্ধ্যা রায়ের নাচ বিশেষ আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়। অনিল চট্টোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। অন্যান্য ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, গীতা দে, জহর রায়, অনুপকুমার, রাজলক্ষ্মী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি শিল্পীগণকে দেখা যাবে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' চিত্রের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। কিছুদিন হলো চিতোরে বর্হিদৃশ্যের চিত্র-গ্রহণ কার্য শেষ করে তিনি কোল্‌কাতায় ফিরে এসেছেন। 'অভিযাত্রিক' প্রযোজিত এই চিত্রখানি খুব শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। ওয়াহীদা রেহমান্‌, রুমা গুহঠাকুরতা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি শিল্পীগণ এই চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

* * *

এন, টি, ষ্টুডিওতে নির্মীয়মান কল্পনা মুভীজ-এর 'শেষ অঙ্ক' চিত্রটির কাজ হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় প্রায় শেষ অঙ্কেই এসে পড়েছে। খুব শীঘ্রই ইহার কাজ শেষ হবে। উত্তমকুমার নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য কয়েকটি প্রধান চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, জীবেন বসু প্রভৃতি শিল্পীগণ অভিনয় করছেন। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা করছেন।

* * *

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের "কাঁচ ও কেয়া" কাহিনী অবলম্বনে এস-সি প্রোডাকসন্স্‌-এর দ্বিতীয় চিত্র-নিবেদন 'শুভদৃষ্টি' সম্ভবতঃ এই মাসের শেষের দিকে মুক্তি লাভ করবে। ইহার বিভিন্ন চরিত্রে সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পীগণকে দেখা যাবে।

* * *

রাজীব শিক্‌চার্স-এর 'হাই হিল' চিত্রটি খুব শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। দিলীপ মিত্র চিত্রটি পরিচালনা করছেন। হাস্যরসই চিত্রটির কাহিনীর মূল বিষয়। ইহাতে সুর-সৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাস।

* * *

ভাইয়ের মৃত্যুর পর হলিউডের বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী সাবু অভিনয় পরিত্যাগ করেছিলেন। সম্প্রতি প্রায় তিন বছর পরে, তিনি পুনরায় অভিনয় করবেন বলে রবার্ট মিচামের 'দি এনচ্যান্‌ট্রেস' নামক চিত্রের চুক্তিপত্রে সই করেছেন।

* * *

"লোলিটা আমার জীবনের আলো আর আগুন। আমার পাপ, আমার আত্মা, লো-লি-টা"—এই কথাগুলিই 'লোলিটা' গ্রন্থের গোড়ার কথা। নভোকভ্‌-বিরচিত এই উপন্যাস নিয়ে সারা বিশ্বে একসময় ঝড় বয়ে গিয়েছিল। একটি কিশোরীর বিপর্যয় ঘটানো আকর্ষণ ইহার বিষয়বস্তু। চিত্র-পরিচালক ষ্টানলে কুব্রিক-এর পরিচালনায় ও স্যু লায়ন-এর অনবদ্য অভিনয় দ্বারা 'লোলিটা' চিত্র রূপ লাভ করেছে। কিন্তু উপন্যাসের তুলনায় 'লোলিটা' চিত্র সেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ভারতে চিত্রটির আগমন সম্ভব হবে কিনা জানা যায় নি।

* * *

—শেষ চিহ্ন—

কাহিনী : শিবনাথ একজন দরিদ্র পুরোহিতের পুত্র। মিনতি তার বাল্যসখী। এদের উভয়েরই সংসারের অবস্থা ছিল প্রায় একই রকম। শিবনাথ মিনতিকে ভালবেসেছিল। পিতার মৃত্যুর পর এক ধনী ব্যক্তির আশ্রয় লাভ কোরে

সে কৃতবিদ্য হলো। সেই সঙ্গে তাঁর কন্যা লতারও অকৃত্রিম ভালবাসা সে লাভ করলো। তথাপি সে মিনতিকে ভুলতে পারেনি। কালক্রমে শিবনাথ বিদেশ ঘুরে বড় ডাক্তার হয়ে এলো। ইতিমধ্যে অন্যত্র মিনতির বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর একটি সন্তান লাভ কোরে মিনতি বিধবা হলো। তার রুগ্ন সন্তানকে শিবনাথ চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে তুললো। অবশেষে লতার সঙ্গে শিবনাথের বিয়ে হলো। আর সেই বিয়ের রাত্রেই মিনতি মারা গেল। পরিশেষে মিনতির শেষ চিহ্ন স্বরূপ মিনতির সন্তানটিকে লতা কোলে তুলে নিলো।

'শেষ চিহ্ন' চিত্র সংসারের প্রথম নিবেদন। একটি মামুলী প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে ইহার চিত্র-নাট্য নির্মিত হয়েছে—একথা অতি সহজেই বলা চলে। শরৎচন্দ্র অনুপ্রাণিত কাহিনীও বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কাহিনীটি যথোচিত ভাবে পরিণতি লাভ করেনি। কারণ ত্রি-ধারা সমন্বিত প্রেম-কাহিনীতে যে নাটকীয় আবর্ত, জটিলতা এবং সংঘাত স্বাভাবিক ও আবশ্যম্ভাবী বোলে পরিগণিত হয়,—এই চিত্র-কাহিনীতে তার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হল। আবার কাহিনীতে নায়কের চরিত্রটিকে এমনভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যে, দুটি নারীর

"নৃত্যম"-এর একটি অনুষ্ঠানে 'নমস্কারম্' নৃত্যনাট্যে সবিতা ঘোষ, মঞ্জুলা হাজরা, জয়শ্রী মিত্র ও সুব্রতা হাজরাকে দেখা যাচ্ছে।

সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাচ্ছেন মঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী, অর্চ্চনা খাঁ, প্রতিমা দাশ, সন্ধ্যা আঢ্য, দীপ্তি কর, প্রতিভা মুন্সী, গোপা চৌধুরী ও মৈত্রেয়ী চক্রবর্ত্তী।

ফটো: রনেন ঘোষ

কোনোটির প্রতিই তার একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায় না। নাটকের উপাদান ভাল থাকা সত্বেও সংঘাতের দুর্ব্বল বিস্তারহেতু নাট্যাংশ অতিশয় ক্ষুন্ন।

নবাগত পরিচালক বিভূতী চক্রবর্তী পরিচালনার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ না কোরলেও তাঁর এই প্রথম স্বাধীন প্রয়াসকে আমরা সম্ভাবনা পূর্ণ বোলেই মনে করি। তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে রথীন ঘোষ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন কোরতে পারেননি। শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ উল্লেখ যোগ্য।

অভিনয়াংশে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প-দক্ষতা প্রশংসনীয় এবং দুই নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় ও লিলি চক্রবর্তী সু-অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কমল মিত্র, রসরাজ চক্রবর্তী, তুলসী চক্রবর্তী, অনুপ কুমার রেণুকা রায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্তী। কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : লীলা দেবি। সঙ্গীত : রথীন ঘোষ। শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরানী ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

—অভিসারিকা—

কাহিনীর সারাংশ : একটি মেয়ে বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে চলে যায় দয়িতের সন্ধানে। কিন্তু যে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সে ঘর ছাড়লো সে তার দয়িত-প্রেরিত ব্যক্তি নয়। আবার যার জন্যে সে কুল-মান-ঘর ছাড়লো, তার যখন সন্ধান পেল তখন জানালো সে শঠ ও প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনা চক্রে কাহিনীর শেষে উপরোক্ত অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেই তার মিলন হলো।

কাহিনীর দিক থেকে 'অভিসারিকা' বহু ব্যবহৃত উপাদানে গঠিত ও নিতান্তই কল্পনা-প্রসূত বলা চলে বাস্তব চিন্তার ও স্বাভাবিক ঘটনা বিন্যাসে চেষ্টা অপেক্ষা নায়কের ভাগ্যে "অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা" প্রাপ্তির বহু প্রচলিত প্রবাদ বচনটিকে এই কাহিনীতে যেন একান্তভাবেই সফল ও সার্থক কোরে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। প্রণয়ের গভীরতাকে অতল-স্পর্শী করবার চেষ্টায় এই কাহিনীর 'অভিসারিকা' যেন 'রাধা'র অভিসারকেও হার মানিয়েছেন। কিন্তু তার ফলে কাহিনী তার সাবলীল গতি ও স্বাভাবিক পরিণতি রক্ষা কোরতে একেবারেই অসমর্থ হয়ে পড়েছে। তবে পরিচালক মহাশয় চিত্রটিতে যথাসম্ভব অবান্তর ঘটনা পরিহার, সুকৌশলে নায়িকার প্রথম প্রণয়ীকে চিত্রে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত রাখা ও চিত্রনাট্যের স্থানে স্থানে কৌতুকজনক ঘটনা-সন্নিবেশ দ্বারা পরিচালন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনয়াংশে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী উভয়েই নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, অসীতবরণ, ভারতী, তপতী ঘোষ, নিভাননী; রাজলক্ষ্মী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অমর মল্লিক ও মণি শ্রীমাণি ভাল অভিনয় করেছেন।

চিত্রটির আলোকচিত্র গ্রহণ ও সম্পাদনা প্রশংসনীয়। আবহ সঙ্গীত, শিল্প নির্দেশ ও শব্দগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় না থাকলেও ভাল বলা চলে। কণ্ঠ-সঙ্গীতও ভাল।

পরিচালনা : কমল মজুমদার। কাহিনী : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায় আলোকচিত্র : দীনেন গুপ্ত। শিল্প-নির্দেশ : সুনীতি মিত্র। শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও শচীন চক্রবর্তী সম্পাদনা : কমল গঙ্গোপাধ্যায়।

CATERINA VALENTE—জার্মান চলচ্চিত্রের উজ্জ্বলতম তারকা। একত্রিশ বৎসর বয়সের এই সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়ে জার্মানীর চলচ্চিত্র, রেডিও, রেকর্ড, টেলিভিসন্, নাইট্ ক্লাব প্রভৃতির মধ্যে আজ হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। কিন্তু Caterina-র এই বিরাট জনপ্রিয়তা হঠাৎ পাওয়া নয়। এর পিছনে রয়েছে তার একাগ্র সাধনা।

১৯৩১ সালে প্যারিসে Caterina জন্মগ্রহণ করে। মাতা Maria Valente ইতালীয় এবং বিখ্যাত নারী ক্লাউন্। আর পিতা স্পেন্ দেশীয় এবং প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক। মাত্র চার বছর বয়সে Caterina ব্যালে ও ট্যাপ্ নৃত্য শিক্ষা করে এবং পাঁচ বছরে গীটার বাজাতে আরম্ভ করে ও ষ্টেজেও নামে। ১৯৪৩ সালে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগ। যুদ্ধের জন্য জার্মান রঙ্গমঞ্চ বন্ধ হয়ে যায়। কোনও রকমে তাঁদের দিন চলে। পরে যখন রাশিয়ান বাহিনী Breslau দখল করে তখন এই পরিবারটি ফ্রান্সে যেতে চায় কিন্তু তাঁদের পাঠান হয় Ukraine-এর একটি শিবিরে। তারপর ১৯৪৬ সালে Valente পরিবার প্যারিসের মাটিতে পদার্পণ করলেন। ইতিমধ্যে Caterina পনের বছরের সুন্দরী কিশোরীতে পরিণত হয়েছে। এখানে এসে সমস্ত পরিবারটিই আবার রঙ্গমঞ্চে নামতে আরম্ভ করলেন। পরে ১৯৫০ সালে তাঁরা জার্মানীতে ফিরে যান। হাম্‌বুর্গের এক রঙ্গমঞ্চে Erik Van Aro নামক এক বাজিকর-শিল্পীর সঙ্গে Caterina-র আলাপ হয় এবং ১৯৫২ সালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এরপর Caterina নিজ চেষ্টায় সঙ্গীত শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯৫৪ সালের মধ্যেই তিনি ইউরোপের নামকরা গায়িকা বলে পরিগণিত হন। তাঁর গান রেকর্ড ও রেডিওতে জার্মানীর সর্ব্বত্রই গীত হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে Caternina সর্ব্বপ্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। "Models for Rio" এবং "Ball at the Savoy" তাঁকে জার্মান চলচ্চিত্র জগতে চিনিয়ে দেয়। তার পর তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করে তাঁর সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা ও চেষ্টার দ্বারা আজ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন—তাঁর বহুমুখী প্রতিভা আজ তাঁকে যশের উচ্চ শিখরে তুলে ধরেছে।

তাঁর অনুকরণযোগ্য একাগ্রতা ও সাধনা বহু শিল্পীকে প্রেরণা যোগাবে, এই আশাই আমরা করি।

বিদেশের অধিকাংশ চিত্রে মারামারি ও ক্রাইম্ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ছবির বিষয়-বস্তু গড়ে ওঠে। বাংলা ছবি কিন্তু বড় একটা এ ধরণের ঘটনাকে আশ্রয় করে নির্ম্মিত হয় না। কিন্তু ক্রাইম্ চিত্রের একটি বিশেষ আকর্ষণ যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার শ্রীউমেশ মল্লিক বিলাতে বসে ক্রাইম্ ড্রামাই লিখেছেন চিত্রের উপযোগী করে এবং শ্রীমল্লিকই প্রথম ভারতীয় যাঁর লেখা ইংরাজী গল্প বিদেশে চিত্রায়িত হয়েছে।

এখানে শ্রীমল্লিক লিখিত ও প্রযোজিত এবং জে, আর্থার র‍্যাঙ্ক কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত বিলাতি চিত্র "The Man Who Could Not Walk" চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।
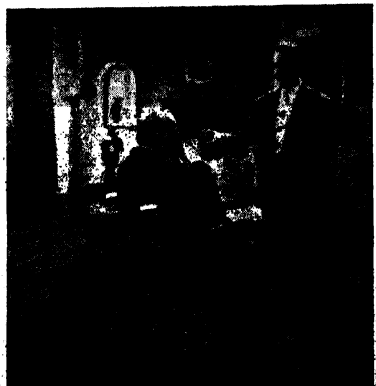
"The Man Who Could Not Walk"-এর তারকা প্যাট্ ক্লেভিন্ লণ্ডনের ক্রোড়পতি বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পত্নী। চ্যার্লি চ্যাপ্লিনের "A King in New York"-এর অন্যতম প্রধান অংশেও ইনি অভিনয় করেছেন। জাতিতে ইনি রাশিয়ান্।

Hayley Mills—ব্রিটিশ চিত্রের কিশোরী তারকা। "Whistle Down The Wind" চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। Walt Disney-র 'Pallyana' ও 'The Parent Trap' চিত্রে সু-অভিনয় করেও দর্শক-মন আকৃষ্ট করেছে। বয়স মাত্র পনের। ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এম. এ. ডি.ফিল্

নাটকের ইতিহাস ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, কারণ সর্ব্বদেশেই অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নাটক রচিত হইয়াছে। অ্যারিস্টটল Poetics-এ লিখিয়াছেন,'…in a play the personages act the story,' কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্, নাটকের প্রথম অঙ্কে পরিব্রাজিকার মুখ দিয়া বলা হইয়াছে, 'দেব! প্রযোসপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্।' অর্থাৎ, নাট্যশাস্ত্র বস্তুটাই হইল অভিনয়মূলক। সাহিত্যদর্পণেও লিখিত রহিয়াছে, 'দৃশ্য-শ্রব্যভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা স্থিতম্। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্।' অর্থাৎ, কাব্যের দুই রূপ দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্য হইল সেই কাব্য, যাহা মঞ্চে অভিনীত হয়।

প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন সংগীতশালা অথবা প্রেক্ষাগৃহ ছিল তাহা বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংগীতশালা অথবা প্রেক্ষাগৃহে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রাণী হংসপদিকা সংগীতশালায় বসিয়া স্বরালাপ করিতেছেন ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদূষকের মুখে এই সংগীতশালার উল্লেখ হইয়াছে। 'ভো বঅস্স সংগীত-সালন্তরে অবহাণং দেহি।' অর্থাৎ, ওহে, বয়স্য, সংগীত-শালার দিকে একবার কান দিয়া শোন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ রহিয়াছে। বিদূষক বলিয়াছে, 'তেন হি দুবেবি বগ্‌গা পেক্খা ঘরে সংগীত রঅণং করিঅ অত্তভবদো দূদং পেসম,' অর্থাৎ, তাহা হইলে তোমরা দুই দলই এখন প্রেক্ষাগৃহে গিয়া সংগীত রচনা করিয়া রাজার নিকট দূত পাঠাইও। রামগড় পাহাড়ের গুহায় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি প্রেক্ষাগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে যে প্রস্তরনির্মিত আসনগুলি লক্ষ্য করা যায়, ব্লক অনুমান করিয়াছেন, সেগুলিতে বসিয়া দর্শকগণ কোনো মঞ্চাভিনয় দর্শন করিতেন। পূর্বকালে পর্বতগুহায় সংগীত, নাটক প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে সে নাট্যমণ্ডপকে পর্বতগুহাকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা স্মরণীয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।' (২।৮৪) খুব সম্ভবত শব্দের স্থিরতা বিধান করিবার জন্যই নাট্যমণ্ডপকে শৈলগুহাকার করিবার কথা বলা হইয়াছে।১ ভরতের উপরিউক্ত নাট্যমণ্ডপের বর্ণনার মধ্যে আর একটি কথা আছে, তাহা হইল 'দ্বিভূমি।' 'দ্বিভূমি' কথাটি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত এই 'দ্বিভূমি' ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, আসনগুলি নিম্নতল হইতে রঙ্গপীঠ পর্যন্ত উচ্চ হইত। অধ্যাপক কিথ্ এই 'দ্বিভূমি'-কে দ্বিতল (two stories) বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ 'দ্বিভূমি' বলিতে দর্শকদের জন্য নিম্নতল এবং অভিনয়ের জন্য উচ্চায়িত রঙ্গমঞ্চের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।২

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তিনপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের পরে লিখিত নাট্যকলা ও মঞ্চকলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে বিভিন্নপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনা রহিয়াছে। সারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ নৃত্যপদ্ধতির জন্য তিনপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের কথা বলা হইয়াছে। গোলাকার, বর্গাকার এবং ত্রিকোণা-কার এই তিন প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনা ঐ গ্রন্থে রহিয়াছে। নারদের সংগীত মকরন্দে ৪৮ × ৪৮ গজের বর্গাকার প্রেক্ষাগৃহ শুধু বর্ণিত হইয়াছে। নারদ এই প্রেক্ষাগৃহের চারটি দ্বারের নির্দেশ করিয়াছেন, মধ্যস্থলে বার গজ পরিমিত বর্গভূমিতে রাজার বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' দুই প্রকার প্রেক্ষাগৃহ বর্ণিত হইয়াছে। আয়তক্ষেত্রাকার

১। অভিনবগুপ্তের টীকা লক্ষণীয়—'শৈলগুহাকারত্বং স্থির শব্দাদিত্বং চ ভবতি।'

২। The Theatre of the Hindus গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ডঃ রাঘবনের Theatre Architecture in Ancient India নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ও বর্গক্ষেত্রাকার প্রেক্ষাগৃহের কথাই এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলিতে যে সব প্রেক্ষাগৃহের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে সেগুলি স্পষ্টতই নাট্যশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেক্ষাগৃহের লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ভরত বলিয়াছেন যে বিশ্বকর্মা কর্তৃক তিন প্রকার প্রেক্ষাগৃহ পরিকল্পিত হইয়াছিল এবং আকৃতি অনুযায়ী ইহাদের আবার তিনটি প্রমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল।১ বিকৃষ্ট অথবা জ্যেষ্ঠ ১০৮ হস্ত, চতুরস্র অথবা মধ্যম ৬৪ হস্ত এবং ত্র্যস্র অথবা কনীয় ৩২ হস্ত পরিমিত। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, জ্যেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ দেবতাদের জন্য, মধ্যম রাজাদের জন্য এবং কনীয় সাধারণ লোকদের জন্য নির্ধারিত। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ডিম প্রভৃতি যেসব নাটকে দেবাসুরের সংগ্রাম দেখানো হয় এবং যে সব অভিনয়ে ভাণ্ডবাদ্য এবং পরিক্রমণ প্রভৃতি থাকে সেগুলির জন্য এই জ্যেষ্ঠ প্রেক্ষালয় উপযোগী। রাজার ব্যক্তি-জীবনের ঘটনাদি মধ্যম প্রেক্ষালয়েই ভালো ভাবে দেখানো যাইতে পারে। কনীয় প্রেক্ষালয়ে ভাণ প্রহসন প্রভৃতি নাটক যে সব স্থানে সাধারণ নরনারীর চরিত্র অবতারণা করা হয়, সেগুলিই অভিনীত হয়। ভরত বলিয়াছেন যে, মধ্যম প্রেক্ষাগৃহই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় ও সংগীত সর্বাপেক্ষা সুশ্রাব্য হয়।২

বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র এই তিনপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহাদের আয়তন যথাক্রমে আয়তক্ষেত্রাকার (Rectangular), বর্গক্ষেত্রাকার (Square) এবং ত্রিকোণাকার (Triangular)। আয়তক্ষেত্রাকার প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনা দিতে যাইয়া ভরত বলিয়াছেন যে, ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৪ হস্ত এবং প্রস্থে ৩২ হস্ত হইবে। এই প্রেক্ষাগৃহকে আবার সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভাগ তাহা হইলে ৩২×৩২ হস্ত পরিমিত দুইটি বর্গক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সম্মুখস্থ বর্গক্ষেত্রটি দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট। অপর বর্গক্ষেত্রটি পুনরায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। ১৬×৩২ হস্ত পরিমিত সম্মুখ ভাগটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ৮×৩২ হস্ত পরিমিত সম্মুখবর্তী অংশটি রঙ্গপীঠ এবং ৮×৩২ হস্ত পরিমিত পশ্চাদ্বর্তী অংশটি রঙ্গশীর্ষ নামে অভিহিত করিতে হইবে। বর্গক্ষেত্রটির ১৬×৩২ হস্ত পরিমিত অপর অর্ধটি নেপথ্যগৃহের জন্য নির্ধারিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে রঙ্গপীঠ অথবা যথার্থ রঙ্গমঞ্চের জন্য ৮×৩২ হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্যবর্তী ৮×১৬ হস্ত পরিমিত স্থানটুকুই রঙ্গপীঠ নামে অভিহিত, উভয়পার্শ্বের ৮×৮ এবং ৮×৮ হস্ত পরিমিত স্থান বারান্দা রূপে ব্যবহৃত হইত। রঙ্গশীর্ষের জন্য নির্ধারিত ৮×৩২ হস্তবিশিষ্ট অংশের মধ্যবর্তী ৮×৮ হস্ত পরিমিত স্থানই রঙ্গশীর্ষরূপে অভিহিত হইত।

চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহ উভয় পার্শ্বে ৩২ হস্ত পরিমিত হইবে।১ এই প্রেক্ষাগৃহে রঙ্গপীঠ ক্ষুদ্রতর এবং নেপথ্যগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বারও একটি। বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গপীঠ যেমন আয়তক্ষেত্রাকার, চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গপীঠও তেমনি বর্গক্ষেত্রাকার। ত্র্যস্র প্রেক্ষাগৃহ ত্রিকোণাকার এবং ইহার রঙ্গপীঠও ত্রিকোণাকার।২ ইহার পশ্চাৎ-কোণে নেপথ্যগৃহে যাইবার দ্বার অবস্থিত।

ভরতের উক্তি অনুসরণ করিয়া প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন প্রকার আয়তন সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল। এখন প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। রঙ্গমঞ্চের কথাই প্রথম উল্লেখ করিতে হয়। ভরত বলিয়াছেন রঙ্গপীঠ দর্পণের মত

১। বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ।
তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্॥
॥ ২য়। ৮ম শ্লোক॥

২। প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে।
যাবতপাঠ্যং চ গেয়ং চ তত্র শ্রাব্যতরং ভবেৎ॥
২য়। ২৪

১। সমন্ততশ্চ কর্তব্যা হস্তা দ্বাত্রিংশদেব তু।
২য়। ৭১

২। ত্র্যস্রং ত্রিকোণং কর্তব্যং নাট্যবেশ্ম প্রযোক্তৃভিঃ।
মধ্যে ত্রিকোণমেবাস্য রঙ্গপীঠং তু কারয়েৎ॥
২য়। ১০৬

সমতল হইবে। ইহা কূর্মপৃষ্ঠের (মধ্যস্থলে উচ্চ এবং চার পাশে ঢালু) মত হইবে না এবং মৎস্যপৃষ্ঠের (মধ্যস্থলে উচ্চ এবং দুই পাশে ঢালু) মতও হইবে না। ভরত বলিয়াছেন যে, যে সব নৃত্যে ইতস্তত গতি আছে তাহাদের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার রঙ্গপীঠই উপযোগী। চতুরস্র এবং ত্র্যস্র রঙ্গপীঠে নৃত্যের চতুরস্র গতিই শুধু সম্ভব। রঙ্গপীঠ নানা চিত্রে শোভিত থাকে। রঙ্গপীঠের পশ্চাৎপ্রান্তদেশে রঙ্গমঞ্চের শীর্ষ অথবা রঙ্গশীর্ষ অবস্থিত। আয়তক্ষেত্রাকার রঙ্গমঞ্চে রঙ্গশীর্ষ একটু উচ্চতর, কিন্তু চতুরস্র রঙ্গমঞ্চে রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠ একই স্তরে অবস্থিত। রঙ্গশীর্ষ নানা মূর্তি দ্বারা শোভিত থাকে এবং এখানে পূজার্চনা করাই বিধেয়। নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গপূজার কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।১

রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে রঞ্জিত যবনিকা থাকিত। ইহাকে পটী, অপটী, তিরস্করণী, প্রতিসীরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইত। দ্রুত প্রবেশ করিবার সময় যবনিকা সজোরে একপাশে সরান হইত, তাহাকে বলা হইত অপটীক্ষেপ। যবনিকার রঙ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে নাটকের প্রধান রস অনুযায়ী যবনিকার রঙ হওয়া উচিত, কেহ কেহ বা শুধু লাল রঙ অনুমোদন করিয়াছেন। সাধারণত অভিনেতার প্রবেশের সময় দুইজন সুন্দরী বালিকা কর্তৃক ধৃত যবনিকা একপাশে অপসারিত হইত। রঙ্গমঞ্চ হইতে নেপথ্য-গৃহে যাইবার দরজা দুইটি থাকিত২ এবং সম্ভবত এই দুই দরজার মধ্যবর্তী স্থানে ঐক্যতান বাদ্যের স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে নেপথ্যগৃহ অবস্থিত ছিল।৩ অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন যে নেপথ্যগৃহের দৈর্ঘ্য ষোড়শ হস্ত এবং বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ হস্ত।৪ নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের আপেক্ষিক উচ্চতা সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ করা হইয়াছে। নেপথ্য—এই নামের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, নেপথ্যগৃহ রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা নিম্নতর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু অধ্যাপক কিথ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, নেপথ্যগৃহ রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরেই নির্মিত হইত। 'রঙ্গাবতরণ' কথাটি হইতেই বুঝা যায় যে, নেপথ্যগৃহ রঙ্গমঞ্চ হইতে উচ্চতর ছিল বলিয়াই সেখান হইতে অভিনেতারা মঞ্চে অবতরণ করিতেন। অবশ্য যে সব মঞ্চ দ্রুত এবং অল্প সময়ের জন্য নির্মিত হইত তাহাদের সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা হইত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নেপথ্যগৃহে নটনটীদের প্রসাধনক্রিয়া যে শুধু সম্পন্ন হইত তাহা নহে, ইহা দ্বারা অভিনয়ের অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পরিপূরক গোলমাল ও গর্জন এখান হইতে সৃষ্টি করা হইত। যে সব দেবতা ও অন্য চরিত্র রঙ্গমঞ্চে দেখানো সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় ছিল না তাহাদের কণ্ঠস্বর এই নেপথ্যগৃহ হইতেই শুনান হইত।

ভরত বলিয়াছেন যে নাট্যমণ্ডপের ভূমি হইবে সমান, স্থির ও কঠিন। প্রথমে ঐ ভূমি লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া অস্থি, নরকপাল, তৃণগুল্ম ইত্যাদি হইতে শোধন করিতে হইবে। সূত্র দ্বারা মাপ করিবার সময় বিবিধ পূজানুষ্ঠান পালন করিতে হইবে। তারপর শুভ নক্ষত্রযোগে শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষের মধ্যে স্থাপনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। এই স্থাপনকর্মের পর ভিত্তিকর্মের কথা বলা হইয়াছে। ভিত্তিকর্মের পর শুভতিথি ও নক্ষত্রযোগে স্তম্ভস্থাপন করিতে হইবে। সর্বশুক্লস্তম্ভ ব্রাহ্মণদের বসিবার স্থানে স্থাপিত, রক্তবর্ণস্তম্ভ ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট, পশ্চিমোত্তর দিকে পীতবর্ণস্তম্ভ ছিল বৈশ্যদের জন্য এবং পূর্বোত্তর দিকে নীলকৃষ্ণস্তম্ভ শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণদের স্তম্ভের মূলে স্বর্ণবর্ণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের তলদেশে তাম্রবর্ণ, বৈশ্যস্তম্ভের মূলে রজতবর্ণ এবং শূদ্রস্তম্ভের মূলে কাঞ্চনবর্ণ অনুলেপন করিতে হইবে। স্তম্ভস্থাপনের সময়েও ভরত বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদান এবং নৃপ পুরোহিত প্রভৃতিকে মধুপায়সের দ্বারা ভোজন করাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

গীতবাদ্যের শব্দ যাহাতে গম্ভীর হয়, সেজন্য ভরত

১। অপূজয়িত্বা রঙ্গং তু নৈব প্রেক্ষাং প্রবর্তয়েৎ। ১ম। ১২৭

২। কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য তু। ২য়।৭২

৩। পশ্চিমে চ বিভাগেহথ নেপথ্যগৃহমাদিশেৎ। ২য়। ৩৮

৪। ষোড়শহস্তং নেপথ্যগৃহং ভবতি বিস্তারাস্তু দ্বাত্রিংশতক রমেব।

নাট্যমণ্ডপকে বায়ুহীন করিবার কথা বলিয়াছেন।১ নাট্যমণ্ডপের দেওয়াল বর্ণলেপিত করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার লতাপাতা এবং নারীপুরুষের আকৃতি চিত্রিত করিবার কথা ভরত বলিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে দর্শকদের আসন সোপানাকৃতি হইবে ('সোপনাকৃতি পীঠকম্')। আসন ইষ্টক অথবা কাষ্ঠ নির্মিত হইবে।২ আসনগুলি ভূমি হইতে এক হস্ত উর্ধ্বে সমুত্থিত হইবে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে নাটক, মঞ্চ, অভিনয় ও প্রয়োগরীতি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়গণের সুগভীর জ্ঞান ও ভূয়োদর্শিতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের তুলনা করিলে এই রঙ্গমঞ্চের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। অভিনয়ের জন্য উচ্চ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যকতা এবং অভিনয়দর্শনের সুবিধার জন্য সোপানাকৃতি আসন এবং রঙ্গপীঠের উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আসনশ্রেণী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভরত যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বকালের পরিণত মঞ্চ-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কালে মঞ্চের আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে, কিন্তু ভরত নিখুঁত পরিমাপ নির্দেশ করিয়া বিভিন্নপ্রকার বিষয়, রস ও আঙ্গিকের নাটকের জন্য যে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের মঞ্চের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যেও মঞ্চাভিনয়ের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। ভরত একাধিকবার অভিনয়ের দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতার উৎকর্ষ বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নাট্যমণ্ডপকে নেপথ্যগৃহ, রঙ্গপীঠ, রঙ্গমঞ্চ, এবং প্রেক্ষকস্থানের স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বিভাগ এবং গাণিতিক পরিমাপ ইত্যাদির উল্লেখের মধ্যে নাট্যাচার্যদের পূর্তবিদ্যা এবং ধ্বনি ও আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অগাধজ্ঞানের নিদর্শনও রহিয়াছে। পরিশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন নাট্যাচার্যগণ মঞ্চ ও নাট্যের সঙ্গে দেবপূজা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অবিচ্ছেদ্য মনে করিতেন। প্রেক্ষাগৃহ-নির্মাণ এবং রঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রসঙ্গে রঙ্গদেবতার পূজা ও নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও নির্দেশ হইতে ইহাই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নাটক ও অভিনয় কলা শুধু কেবল অনন্দদানের জন্য নহে, মহত্তর ধর্মসাধনার অঙ্গরূপেই গৃহীত হইয়াছিল।

১। তস্মান্নিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি।

২। ইষ্টকাদারুভিঃ কার্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্।
২য়। ৯৫
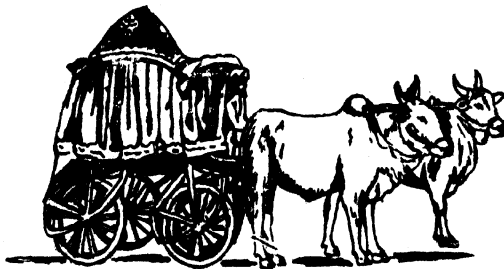
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

চতুর্থ এশিয়ান গেমস ঃ

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় নবনির্মিত 'সেনাজান' স্টেডিয়ামে চতুর্থ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। এই স্টেডিয়ামটি আজ পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামটি সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া—এই দুই দেশের সৌহার্দ্যের প্রতীক বলা যায়। বিনা স্বার্থে রাশিয়া এই স্টেডিয়াম নির্মাণের গুরু ব্যয়ভার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাশিয়ান মালমসলায় এবং রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে স্টেডিয়ামটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সোয়েকর্ণ ২৪শে আগষ্ট এই স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হয় ২৫শে আগষ্ট থেকে এবং শেষ হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর। রাজনীতির হস্তক্ষেপে ক্রীড়ানুষ্ঠান কিরূপ বীভৎস রূপ ধারণ করে তারই এক নজির হয়ে রইলো সদ্যসমাপ্ত চতুর্থ এশিয়ান গেমস। চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ান (কুয়োমিণ্টাং চীন) রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক কারণে ভিসা দেওয়া হয়নি। এই দুই রাষ্ট্র এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সভ্য। ফেডারেশনের আইন অনুযায়ী সকল সভ্য-দেশই এশিয়ান গেমসে যোগদানের অধিকারী। ভিসার অভাবে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানের ক্রীড়া-প্রতিনিধিরা জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগদান করতে পারেননি। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান সহ-সভাপতি ভারতবর্ষের শ্রী জি. ডি. সোন্ধি ইন্দোনেশিয়ান সরকার এবং চতুর্থ এশিয়ান গেমসের উদ্যোক্তা ইন্দোনেশিয়ান ক্রীড়াসংস্থার এই আইন-বিরুদ্ধ কাজের সমালোচনা এবং দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিরাগভাজন হন। তাঁর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ফ্রণ্টের জাকার্তা শাখা বিভিন্ন ধরণের প্রচার পত্র বিলি ক'রে সারা সহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাস বিক্ষোভকারীদের আক্রমণে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে হোটেলে শ্রীসোন্ধি অবস্থান করছিলেন সেই হোটেল পর্য্যন্ত বিক্ষোভকারীরা ধাওয়া করে। তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁকে ভীতি-প্রদর্শনও করা হয়। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে শ্রীসোন্ধি জাকার্তা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সব ঘটনার জন্য পরে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে দুঃখ প্রকাশ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইন্দোনেশীয় পার্লামেণ্টের সদস্যরাও দুঃখপ্রকাশ করেন। চতুর্থ এশিয়ান গেমসে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ান রাষ্ট্রের যোগদান ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ান ক্রীড়াসংস্থার কার্য্যকলাপের ফলে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের আদর্শ এবং আইন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। শ্রী জি ডি সোন্ধি জাকার্তায় আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের পর্য্যবেক্ষক হিসাবেও

উপস্থিত ছিলেন। ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে বে-আইনী-ভাবে চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চরম পরিণতি কি—সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল, 'চতুর্থ এশিয়ান গেমস' কথা থেকে 'চতুর্থ' কথাটি বাদ দেওয়া। এই প্রস্তাব জাপান সমর্থন করে। চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগদানকারী সকল দেশের প্রতিনিধি এমনকি ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিও এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির অদৃশ্য হস্ত শ্রীসোন্ধির এই প্রস্তাবকে উপলক্ষ ক'রে জাকার্তায় ভারত-বিরোধী বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে। শ্রীসোন্ধির পর্য্যালোচনার মধ্যে যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল তা পরবর্ত্তীকালে বেলগ্রেডের আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের কাউন্সিল এবং কংগ্রেস সভায় চতুর্থ এশিয়ান গেমসে ইন্দোনেশিয়ার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা ও নির্দ্দেশ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। চতুর্থ এশিয়ান গেমসের এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানের ফলাফল আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন চতুর্থ এশিয়ান গেমসের অংশ হিসাবে গ্রহণ করেনি, শুধু আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করেছে।

ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে চতুর্থ এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভায় ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার কঠোর নিন্দা করা হয় এবং কোনরূপ চরম শাস্তি না দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়। তাছাড়া সরকারী-ভাবে শ্রীসোন্ধির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দ্দেশও দেওয়া হয়।

চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাপান পূর্ব্বের তিনটি এশিয়ান অনুষ্ঠানের মত সর্ব্বাধিক পদক লাভ ক'রে প্রথমস্থান লাভ করে।

চতুর্থ এশিয়ান গেমসে জাপানের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২টি (স্বর্ণ ৭৩, রৌপ্য ৫৬ এবং ব্রোঞ্জ ২৩)। চতুর্থ এশিয়ান গেমসের উদ্যোক্তা ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় স্থান পায়—পদক সংখ্যা ৫০ (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ১২, ব্রোঞ্জ ২৭)। তৃতীয় স্থান অধিকার করে ভারতবর্ষ—পদক সংখ্যা ৩৩টি (স্বর্ণ ১০, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ১০)। এই তিনটি দেশই তৃতীয় এশিয়ান গেমসের থেকে অধিক পদক লাভ করে। তৃতীয় এশিয়ান গেমসে ভারতবর্ষ মোট ১৩টি পদক লাভ ক'রে ৭ম স্থান পেয়েছিল। টোকিওর তৃতীয় এশিয়ান গেমসে প্রথম স্থান অধিকারী জাপানের মোট পদক সংখ্যা ছিল ১৪১টি এবং জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসে তারা মোট ১৫২টি পদক পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত চারটি এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানেই জাপান পদকলাভের তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশের থেকে অনেক বেশীসংখ্যক পদক লাভ ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ চতুর্থ এশিয়ান গেমসের এই সাতটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল—এ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, হকি, ভলিবল, কুস্তি, বক্সিং এবং রাইফেল স্যুটিং।

হকি খেলার ফাইনালে ভারতবর্ষ পুনরায় পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়েছে। তৃতীয় এশিয়ান গেমসে পাকি-স্তান গোল এভারেজে প্রথম স্থান পেয়েছিল; কিন্তু এবার পাকিস্তান ২-০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। খেলা আরম্ভের ছয় মিনিট পর ভারতবর্ষের সেণ্টার-হাফ চিরঞ্জিৎ সিং নাকে গুরুতর আঘাত পেয়ে বরাবরের জন্য মাঠ ত্যাগ করেন। সুতরাং ভারতবর্ষকে বাকি সমস্ত সময় ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হয় এবং এই সময়ের মধ্যে ভারত-বর্ষ গোল খায়। চিরঞ্জিৎ সিংয়ের শূন্য স্থান রাইট-আউট দর্শন সিংকে দিয়ে পূরণ করায় ভারতবর্ষের আক্রমণ ভাগে একজন খেলোয়াড় কমে যায়। পাকিস্তান দলের খেলায় সৌষ্ঠবের যথেষ্ট অভাব ছিল। তাদের খেলায় গায়ের জোরই প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং তার ফলে ভারতীয় দলের অনেকেই শারীরিক আঘাত পেয়েছিলেন। এইরূপ বে-আইনী খেলার দরুণ পাকিস্তানের অধিনায়ককে এক বার কিছু সময়ের জন্য শাস্তি হিসাবে মাঠ ত্যাগ করতে হয়েছিল। দৈহিক শক্তিতে ভারতীয় হকি দল পাকিস্তান দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। ভারতীয় হকি খেলার ধরণই আলাদা—সেখানে খেলার কারুকার্য্যই মুখ্য—দৈহিক শক্তি গৌণ।

ভারতবর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২-১ গোলে গত দু'বারের রাণার্স-আপ দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণপদক পায়। গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ান তাই-ওয়ানকে এবার প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষ দিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমসের ফুটবলের

ফাইনালে ১-০ গোলে ইরাণকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানও নিতে পারেনি। সুতরাং চতুর্থ এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট ৩৩টি পদকের মধ্যে ভারতবর্ষ এক কুস্তিতেই ১২টি পদক পায়—স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৬ এবং ব্রোঞ্জ ৩।

॥ ফাইনাল ফলাফল ॥

(এ্যাথলেটিক্সের ফাইনালে যাঁরা প্রথম স্থান পেয়েছেন)

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার : মহম্মদ সারেঙ্গাৎ (ইন্দোনেশিয়া)
সময় : ১০'৫ সেঃ (নতুন রেকর্ড)।

২০০ মিটার : এম জগথেসন (মালয়)
সময় : ২১'৩ সেঃ (নতুন রেকর্ড)।

৪০০ মিটার : মিলখা সিং (ভারতবর্ষ)
সময় : ৪৬'৯ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৮০০ মিটার : মামোরু মোরিমতো (জাপান)
সময় : ১ মিঃ ৫২'৬ সেঃ।

১,৫০০ মিটার : মহীন্দর সিং (ভারতবর্ষ)
সময় : ৩ মিঃ ৪৮'৬ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৩,০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ : মুবারক সাহ (পাকিস্তান)
সময় : ৮ মিঃ ৫৭'৮ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৫,০০০ মিটার : মুবারক সাহ (পাকিস্তান)
সময় : ১৪ মিঃ ২৭'২ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

১০,০০০ মিটার : তারলোক সিং (ভারতবর্ষ)
সময় : ৩০ মিঃ ২১'৪ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

১১০ মিটার হার্ডলস : মহম্মদ সারেঙাৎ (ইন্দোনেশিয়া)
সময় : ১৪'৩ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৪০০ মিটার হার্ডলস : কে ওগোসি (জাপান)
সময় : ৫২'২ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৪০০ মিটার রীলে : ফিলিপাইন
সময় : ৪১'১ সেঃ (হিট)

১,৬০০ মিটার রীলে : ভারতবর্ষ।
সময় : ৩ মিঃ ১০'২ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

হাই জাম্প : কুনিয়োসী ওগিওকা (জাপান)
উচ্চতা : ২'০৮ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ব্রড জাম্প : তাকুয়কি ওকাজাকি (জাপান)
দূরত্ব : ৭'৪১ মিটার

হপ-স্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প : কোজি-সা-কুরাই (জাপান)
দূরত্ব : ১৫,৫৭ মিটার

পোলভল্ট : হিসাও মোরিতা (জাপান)
উচ্চতা : ৪ ৪০ মিটার (নতুন রেকর্ড)

জাভেলিন থ্রো : তাকাসি মিকি (জাপান)
দূরত্ব : ৭৪'৫৬ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ডিসকাস থ্রো : সোজো ইয়ানাগাওয়া (জাপান)
দূরত্ব : ৪৭'৭১ মিটার (নতুন রেকর্ড)

সটপুট : তেরু ইতোকাওয়া (জাপান)
দূরত্ব : ১৫'৫৭ মিটার (নতুন রেকর্ড)

হ্যামার থ্রো : নোবোরু ওকামোতো (জাপান)
দূরত্ব : ৬৩ ৮৮ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ডেকাথলন : গুরবচন সিং (ভারতবর্ষ)
পয়েন্ট : ৬'৭৩৫

ম্যারাথন : মাসায়ুকি নাগাতা (জাপান)
সময় : ২ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৫৪'২ সেঃ

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার : মোন সুলেমান (ফিলিপাইন)
সময় : ১১ ৮ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

২০০ মিটার : মোন সুলেমান (ফিলিপাইন)
সময় : ২৪'৪ (নতুন রেকর্ড)

৮০০ মিটার : আই সি তানাকা (জাপান)
সময় : ২ মিঃ ১৮'২ সেঃ

৮০ মিটার হার্ডলস : ইকুকো জোডা (জাপান)
সময় : ১১'৪ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৪০০ মিটার রীলে : ফিলিপাইন।
সময় : ৪৮'৬ সেঃ (পূর্ব রেকর্ডের সমান)

হাই জাম্প : কিজু সুটসুমি (জাপান)
দূরত্ব : ১'৬০ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ব্রড জাম্প : সাচিকো কিসিমাতো (জাপান)

দূরত্ব : ৫.৭৫ মিটার।

জাভেলিন থ্রো : হিরোকো সাতো (জাপান

দূরত্ব : ৪৮.১৫ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ডিসকাস থ্রো : কিকো মুরাসি (জাপান)

দূরত্ব : ৪৫.৯০ মিটার

সটপুট : সিকো ওবোনাই (জাপান)

দূরত্ব : ১৫.৪ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ভারতবর্ষের সাফল্য

স্বর্ণপদক

এ্যাথলেটিকস (স্বর্ণ পদক ৫) :

৪০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং (পাঞ্জাব)।

সময় : ৪৬.৯ সেঃ।

১,৫০০ মিটার দৌড় : মহীন্দর সিং (সার্ভিসেস)।

সময় : ৩ মিঃ ৪৮.৬ সেঃ।

১০,০০০ মিটার দৌড় : তারলোক সিং (সার্ভিসেস)

সময় : ৩০ মিঃ ২১.৪ সেঃ।

১,৬০০ মিটার রিলে : ভারতবর্ষ।

সময় : ৩ মিঃ ১০.২ সেঃ।

ডেকাথেলন গুরবচন সিং (দিল্লী)। পয়েন্ট ৬৭৩৫।

কুস্তি (স্বর্ণ-পদক ৩)

ফ্রি স্টাইল : লাইট হেভীওয়েট—মারুতি মানে (মহারাষ্ট্র)।

গ্রিসো-রোম্যান : ফ্লাইওয়েট—মালওয়া (পাঞ্জাব); হেভীওয়েট—গণপৎ আন্দালকার (মহারাষ্ট্র)।

মুষ্টিযুদ্ধ (স্বর্ণ-পদক ১)

লাইটওয়েট—পদম বাহাদুর মল (সার্ভিসেস)।

ফুটবল : ফাইনালে ভারতবর্ষ ২—১ গোলে গত দু'বারের রাণার্স-আপ দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণ-পদক লাভ করে।

রৌপ্যপদক

এ্যাথলেটিকস (রৌপ্য পদক ৫) :

৪০০ মিটার দৌড় : মাখন সিং (সার্ভিসেস)।

৮০০ মিটার দৌড় : দলজিৎ সিং (সার্ভিসেস)

১,৫০০ মিটার দৌড় : অমৃত পাল (সার্ভিসেস)

ডিসকাস থ্রো : পরদুমন সিং (সার্ভিসেস)

সটপুট : দিনসা ইরাণী (মহারাষ্ট্র)

কুস্তি (রৌপ্যপদক ৬) :

ফ্রি স্টাইল : লাইটওয়েট—উদয় চাঁদ সার্ভিসেস); মিডলওয়েট—সজ্জন সিং (সার্ভিসেস); হেভীওয়েট—গণপৎ আন্দালকার।

গ্রিসো-রোম্যান : মিডলওয়েট সজ্জন সিং; লাইট ওয়েট—উদয় চাঁদ; লাইটহেভী—মারুতি মানে।

ভলিবল (পুরুষ বিভাগ : ৬ জন খেলোয়াড়) : ভারতবর্ষ ২য় স্থান পায়।

হকি : ফাইনালে ভারতবর্ষ ০—২ গোলে পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়ে রৌপ্য-পদক লাভ করে।

ব্রোঞ্জপদক

এ্যাথলেটিকস :

৮০০ মিটার দৌড় : অমৃত পাল (সার্ভিসেস)।

৫০০০ মিটার দৌড় : তারলোক সিং (সার্ভিসেস)।

সটপুট : যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস)

জাভেলিন (মহিলা বিভাগ) : এলিজাবেথ ডেভনপোর্ট (রাজস্থান)

কুস্তি :

ফ্রি-স্টাইল: ফ্লাইওয়েট—মালওয়া; ওয়েল্টারওয়েট—লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে (ইউ পি)

গ্রীসো-রোমান পদ্ধতি : নারায়ণ ঘুমে (মহারাষ্ট্র)

মুষ্টিযুদ্ধ :

লাইট মিডলওয়েট—বাড়ি ডি'সুজা (রেলওয়ে); মিডলওয়েট—সুরেন্দ্রনাথ সরকার (সার্ভিসেস)

সুটিং : হরিচরণ সাহা

মেডেলের প্রতিযোগিতায় স্থান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৩	৫৬	২৩
ইন্দোনেশিয়া	১১	১২	২৭
ভারতবর্ষ	১০	১৩	১০
পাকিস্তান	৮	১১	৯

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ফিলিপাইন	৭	৭	২৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৪	৭	১০
মালয়	২	৪	৯
তাইল্যাণ্ড	২	৫	৫
ব্রহ্মদেশ	২	১	৫
সিঙ্গাপুর	১	০	২
সিংহল	০	২	৩
হংকং	০	২	০
কম্বোডিয়া	০	০	১
দক্ষিণ ভিয়েৎনাম	০	০	১
আফগানিস্থান	০	০	১
উত্তর বোর্ণিয়ো	০	০	০
সারাওয়াকা	০	০	০

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬২ সালের কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। মোহনবাগান এবং গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোট ৩৮টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট পেয়ে লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারণের জন্য তখন এই দুই দলকে আবার খেলতে হয়। এই খেলায় মোহনবাগান ২-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় দশবার লীগ চাম্পিয়ান হ'ল—১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪-৫৬, ১৯৫৯-৬০। প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় একমাত্র মোহনবাগানই ১০বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মোহনবাগানের পরই মহমেডান স্পোর্টিং দলের ৯বার, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ৮বার এবং ইস্টবেঙ্গল দলের ৭বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

ডেভিস কাপ ঃ

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার আমেরিকান জোন-ফাইনালে মেক্সিকো ৪-১ খেলায় যুগোস্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে উঠেছে। মেক্সিকোর পরবর্ত্তী খেলা পড়েছে সুইডেনের সঙ্গে। এই খেলার বিজয়ী দেশ ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবে ভারতবর্ষের সঙ্গে। ইণ্টার-জোন ফাইনালে বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

রড লেভারের সাফল্য ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় রড লেভার ১৯৬২ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের ফাইনালে জয়লাভ ক'রে একই বছরে পৃথিবীর চারটি বিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতায় (অষ্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভের দুর্লভ সম্মান অর্জ্জন করেছেন। ইতিপূর্ব্বে একমাত্র ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) এই সম্মান লাভ করেছিলেন ১৯৩৮ সালে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "নর-নারায়ণ" (১৩শ সং)—২.৭৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩৬শ সং)—২.৫০, "মেবার-পতন" (২৩শ সং)—২.৫০

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণার্জ্জুন" (২৬শ সং)—২.৫০

শ্রীমধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত কিশোর-পাঠ্য "শরতের শিউলি"—৩, "সোনার ভারত"—৩

সব্যসাচী প্রণীত "টারজান এণ্ড হিজ মন"—১.৫০

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "অনেক আলোর অন্ধকারে"—৪.৫০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অবাক পৃথিবী"—৩

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাতে ও প্রভাতে"—৩

রবিদাস সাহারায় প্রণীত উপন্যাস "নব বসন্ত"—৩

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দাদুমণির ঝুলি"—৩

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৬৯

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

দার্জ্জিলিং

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কার্ত্তিক—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

দয়ারূপা

ডক্টর রমা চৌধুরী

শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের সুবিখ্যাত দেবী-স্তবের একস্থানে দেবীকে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :—

> "যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" (৫।৬৭)

> "যে দেবী সর্বভূতে দয়ারূপে বিরাজিতা।
> তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই
> প্রণাম, অনিন্দিতা!"

সর্ববাদিসম্মতিক্রমে, দয়া একটী মহৎ গুণ। মানবমনের রসস্বরূপ যে প্রেম বা ভালবাসা, তার তিনটী প্রধান রূপ—উচ্চস্তরীয়দের জন্য ভালবাসার নাম "শ্রদ্ধা"; সমস্তরীয়দের জন্য ভালবাসার নাম "প্রীতি"; নিম্নস্তরীয়দের ভালবাসার নাম "স্নেহ।" এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রেই কেবল "দয়া"র স্থান আছে। "দয়া" কি? "দয়া"র আন্তর দিক করুণা বা ক্ষমা; বাহ্যিক দিক্ "দান"। দোষক্রুটী না থাকলে, করুণা থাকলে, "ক্ষমা"র উদয় হয়। এই ভাবে "দয়া" সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ সেবা। স্বার্থের লেশমাত্র থাকলেও, "দয়া" আর "দয়া" থাকেনা, সুনিশ্চিত।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উদয় হয় প্রারম্ভেই : ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে "দয়া"র কোনো প্রকৃত স্থান আছে, কি না?

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূলভিত্তি হল কর্মবাদ। এই মতানুসারে, কর্ম দ্বিবিধঃ সকাম ও নিষ্কাম। উভয়েই, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Voluntary Activity, অথবা স্বাধীন, বিচারবুদ্ধিপ্রসূত কর্ম। কিন্তু এ দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সকাম কর্ম স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম, নিষ্কাম কর্ম নিঃস্বার্থ কর্ম। সকাম কর্মের ক্ষেত্রে, প্রথমে কর্মকর্তা কোনো বিষয়ে একটী অভাব অনুভব করেন। সেই অভাব দূর করবার জন্য তিনি কোনো একটি বস্তুর কথা চিন্তা করেন। তখন তাঁর মনে সেই বস্তুটী লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা বা কামনা হয়। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই সেই বস্তুটী লাভের উপায় স্থির করেন। পরিশেষে, সেই উপায় অবলম্বন পূর্বক তিনি সেই বস্তুটী লাভে সমর্থ হন। যেমন, কোনো ব্যক্তির খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। তিনি এখন স্বভাবতঃই সেই ক্ষুধার জ্বালা প্রশমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হন এবং তার উপায় চিন্তা করেন। এরূপে তিনি স্থির করেন যে, খাদ্যই তাঁর অভাব ও তজ্জনিত ক্লেশ দূর করতে পারবে। তারপর তিনি সেই খাদ্যবিশেষ লাভের জন্য উপায় চিন্তা করেন; সর্বশেষে, সেই উপায়াবলম্বনে বস্তুটী লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সকাম কর্মের এই সাধারণ প্রণালীতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক স্থলেই কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় এবং স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে কর্ম করছেন—লক্ষ্য স্থির করছেন এবং তার উপায়ও। তাই যদি হয়, তাহলে একমাত্র তিনিই তাঁর স্বীয় সকাম কর্মের জন্য দায়ী, অন্য কেহই নয়। তাহলে, ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারে, একমাত্র তাঁকেই তাঁর নিজের সকাম কর্মের ফলভোগও করতে হবে। কর্ম তিনি স্বেচ্ছায়, বুদ্ধি বিচার-সহকারে করলেন, অথচ সেই কর্মের উপযুক্ত ফলভোগ তাঁর হলনা—এ হলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হয়না। সেজন্য, ভারতীয় মতে, প্রত্যেক সকাম কর্মেরই ফলভোগ কর্মকর্তার পক্ষে অবশ্য-ম্ভাবী, আজ না হয় কাল, এ জন্মে, না হয় পরজন্মে। এই কারণে, "কর্মবাদে"র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল "জন্মজন্মান্তরবাদ"। এরূপে, যে সব সকাম কর্মের ফলভোগ এই জন্মে সম্ভবপর হয়না, তাদের ন্যায্য ফলভোগের জন্য কর্মকর্তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই নূতন জন্মে তিনি কেবলই যে প্রাক্তন, অনুপভুক্ত কর্মের ফলভোগ মাত্রই করেন, তাই নয়; স্বভাবতঃই বহু নূতন সকাম কর্মও সম্পাদিত করেন। সেই সব সকাম-কর্মের ফলও সেই নূতন জন্মে সম্ভবপর হয়না বলে তাঁকে সেই সব ফলভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই ভাবে চলে, সংসার চক্র—জন্মঃ কর্মঃ জন্মঃ কর্ম ইত্যাদি ক্রমে। তাহলে মুক্তির উপায় কি? মুক্তির উপায় নিষ্কাম কর্ম ও সাধনাবলী। একটী নূতন জন্মে যদি কর্মকর্তা শুভবুদ্ধিবলে, কেবল নিষ্কাম কর্মই করেন, তাহলে তিনি তখন কেবল তাঁর প্রাক্তন সকাম কর্মেরই ফলভোগ করেন, কারণ নিষ্কাম কর্মের ফলভোগ নেই, এবং সেজন্য, সেই সকল নিষ্কাম কর্মের ফলে তাঁর আর জন্মান্তর হয়না। এই ভাবে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে, তিনি জ্ঞান-ভক্তিপ্রমুখ সাধনাবলী অবলম্বনে মুক্তিলাভে পরমধন্য হন। এই হল অতি সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের মূলগত নিগূঢ় কর্মবাদ ও জন্মজন্মান্তর-বাদ। এই মতবাদ যে সম্পূর্ণরূপেই ন্যায়ানুমোদিত, অথবা যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়ধর্মানুগ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনরূপ অবকাশই নেই।

এই তত্ত্বানুসারে, জীব নিজেদের সৃষ্টি ও মুক্তির জন্য নিজেই কেবল—নিজেই একাকী সম্পূর্ণরূপে দায়ী, অন্য কেহই নয়, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবানও নয়। এরূপে পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, জীবের কর্মানুসারে এবং জীবের সাধনানুসারেই তাকে মোক্ষলাভে অধিকারী করেন। না হলে তাঁকে "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য" অথবা পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা এই দুটী দোষযুক্ত বলে গ্রহণ করতে হয়। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, জগতে জীবে জীবে বহু প্রকারের অবস্থাভেদ আছে—কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ, কেহ স্বাস্থ্যবান, কেহ রুগ্ন, ইত্যাদি। এই সব অবস্থাভেদ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করেনা—তিনি অনুগ্রহ করে 'রামকে করেছেন ধনী, জ্ঞানী, স্বাস্থ্যবান প্রভৃতি, অথচ শ্যামকে করেছেন তার বিপরীতঃ দরিদ্র, মূর্খ, রুগ্ন—এ বল্লে তাঁকে পক্ষপাত-দোষদুষ্ট বলে গ্রহণ করতে হয়। পুনরায় এই জগৎ-সংসার অসংখ্য দুঃখক্লেশপরিপূর্ণ। সেজন্য পরমেশ্বর যদি স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হন ত, তাঁকে নিষ্ঠুরতা-দোষদুষ্ট বলে গ্রহণ করতে হয়। বলাই বাহুল্য, পরমেশ্বরকে এইভাবে দোষদুষ্ট বলে আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। সেজন্য,

বেদান্ত দর্শনে তাঁকে বলা হয়েছে ঃ "পর্জন্যবৎ" অথবা মেঘের মত। মেঘ পক্ষপাতহীনভাবে, সদয়ভাবে একটী ক্ষেত্রের উপর বারিবর্ষণ করে, তাতে সেই স্থানে প্রোথিত প্রত্যেক বীজই সমানভাবে জলসিক্ত হয়। তা' সত্ত্বেও, পরে দেখা যায় যে, সেই সব বীজ থেকে উদ্ভূত বৃক্ষে বৃক্ষে বহু প্রভেদ আছে—কোনো বৃক্ষ সুমিষ্ট ফল দেয়, কোনো বৃক্ষ বিষাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু এই সব প্রভেদের জন্য মেঘ দায়ী নয়, একেবারেই দায়ী কেবল সেই সেই বীজেরাই স্বয়ং। একই ভাবে, সংসারে জীবে জীবে অসংখ্য প্রভেদ, এবং সাংসারিক জীবগণের অসংখ্য দুঃখের জন্য সেই সেই জীবই একমাত্র, সম্পূর্ণভাবে দায়ী, অন্য কেহ নয়, শ্রীভগবানও নন। এই মূলীভূত তত্ত্বটী অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে গীতার সেই মহামন্ত্রে ঃ—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব
রিপুরাত্মনঃ॥" (গীতা ৬—৫)

"নিজেই নিজের উদ্ধার কর,
করোনা আত্মায় অবসন্ন।
আত্মা আত্মার বন্ধু সনাতন
আত্মা আত্মার শত্রু ভীষণ॥"

এই ভাবে, ভারতীয় মতে, বন্ধ মোক্ষ, সৃষ্টি মুক্তি সবই জীবের নিজের কর্মাফলানুসারেই হয়। এই জগতেও, সব কিছুই জীবের কর্মানুসারী—সে যা কিছু পায়, বা পায়না—যা কিছু হয়, বা হয়না—যা কিছু করে, বা করেনা—সবই তার নিজেরই কর্মানুসারী। কর্মবাদানুসারে ন্যায়ের আমোঘ বিধানানুসারে, এর আর বাত্যয় ব্যতিক্রম হয়না কোনোক্রমেই।

সেক্ষেত্রে, ভারতীয়-দর্শনে দয়া, দান বা অনুগ্রহের স্থান কোথায়? যদি আমরা কর্মবাদে বিশ্বাসী হই; যদি আমরা মনে করি যে আমরা এই জন্মে যা কিছু হয়েছি যা কিছু পাচ্ছি তা' সবই আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মের ফলস্বরূপই মাত্র—তাহলে অন্যদের নিকট থেকে কোনো অনুগ্রহ বা দান আমরা নিতে পারি কি করে; কারণ, কর্মবাদানুসারে পূর্বেকর্ম না করলে, পরে ফললাভ—পূর্বে অর্জন না করলে, পরে প্রাপ্তি—অসম্ভব। এরূপে কর্মবাদানুসারে, দয়া, কৃপা, করুণা, অনুগ্রহ করে দান করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়ানুমোদিত নয়। এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবান, অথবা পরমাজননীও আমাদের দয়া, কৃপা, করুণা, বা অনুগ্রহ করতে পারেন না কোনোদিন।

অথচ আমাদের ধর্মগ্রন্থাদিতে বারংবার পরমেশ্বরকে পরমকরুণাময়, বন্ধমোক্ষকারক, স্বর্গমুক্তিপ্রদাতা প্রভৃতি বলে স্তুতি-নিবেদন করা হয়েছে। যথা—উপনিষদ্ বলছেন ঃ—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"
(কঠোপনিষদ্ ২—২৩)

"এই আত্মা হয়না লভ্য তর্কালোচনা দ্বারা
অথবা মেধা, কিম্বা শাস্ত্রবাণী সারাৎসারা।
তিনি বরণ করেন যারে সেই লভে তাঁরে
তাঁরি কাছে করেন প্রকাশ তনু অনিবারে॥"

পুনরায় ঃ—

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির-
কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসার মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১৬—১৬)

"তিনি বিশ্বজ্ঞ বিশ্বকারক
তিনি স্বয়ম্ভু কালধারক
তিনি সগুণ গুণশাসক
তিনি প্রধান-জীব চালক
তিনি সর্বজ্ঞ ভবপালক
তিনিই বন্ধ-মোক্ষ প্রাপক।"

একই ভাবে, গীতা বলছেন ঃ—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম"॥
(গীতা ১৮—৬১)

"সবভাবে তাঁরি শরণ লও সদা ভারত।
প্রসাদ তাঁরি আনবে পরা শান্তি অবিরত

শাশ্বত স্থান আনবে, জেনো একত্রে নিয়ত
সর্বভাবে তাঁরি শরণ লও সদা ভারত!"

পুনরায় :—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।"

(গীতা ১৮—৬৬)

"সর্বধর্ম ত্যাগ করে তুমি
লওহে আমার শরণ।
দেব আনি তোমা মুক্তি আমি
করি পাপ সংহরণ।
শোক ব্যাকুল হয়োনা সদা।
ক্ষণে ক্ষণে অকারণ
সর্বধর্ম ত্যাগকরে' তুমি
লও, হে মোর শরণ॥"

একই ভাবে, শ্রীশ্রীচণ্ডীও বলছেন :—

"সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী।
ত্বাং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১—৭)

"সর্বভূতস্বরূপা জননী
স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী।
তব আরাধনা কালে হবে
কি বা স্তুতি সুমোহিনী॥"

পুনরায়—

"সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৮—৮)

বুদ্ধিরূপে বিরাজিতা
সর্বজন চিত্তে যিনি
নমি তাঁরে নারায়ণী
স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদায়িনী॥"

এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন এই যে, কর্মবাদের পার্শ্বে এই ঈশ্বর-কৃপাবাদের স্থান কোথায়? জীবের সব কিছুই স্বপ্রচেষ্টা লভ্য, স্বকর্মজাত হলে—কারো কোনোরূপ দয়া, করুণা, কৃপা, প্রসাদ, অনুগ্রহাদির কোনো প্রয়োজন ত তার একেবারেই নাই।

সত্য একদিক থেকে এসবের তার কোনোরূপ প্রয়োজন নেই একেবারেই। এ সব ব্যতীতও সে অনায়াসে শক্তিলাভ করতে পারে স্বসাধন দ্বারাই। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর কৃপাবাদের অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে ধর্ম-তত্ত্বে। কারণ, এই ঈশ্বরকৃপাবাদই জীবেশ্বরের সম্বন্ধের প্রকৃত রূপটী উদ্ভাসিত করে সগৌরবে। কি সেই রূপ? সেই রূপ হল নিকটতম, নিগূঢ়তম, মধুরতম, সুন্দরতম প্রীতির রূপ। শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা, মালিক-মজদুরের সম্পর্ক একেবারেই নয়। এই সব সম্বন্ধে দাবী-দাওয়া, অধিকারাদির প্রশ্নই হয়ে ওঠে প্রধান, প্রাণের মিলনের কথা যায় বাদ। যেমন, মজদুর মালিকের আদেশে কাজ করছেন, এবং তাঁর প্রাপ্য মাহিনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা 'কড়ায়গণ্ডায়' মালিকের নিকট থেকে আদায় করে নিচ্ছেন। এর মধ্যে আর অন্য কোনো কথা নেই—স্নেহ নেই, সখ্য নেই, প্রেম নেই, প্রীতি নেই,—পরস্পর হৃদয়-বিনিময় নেই, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের স্পর্শ নেই, মনের সঙ্গে মনের মিলন নেই, আছে কেবলই একপক্ষে কঠোর শাসন ও বাধ্য হয়ে কিছু অনিচ্ছাকৃত অধিকার দান উপায়ান্তর না দেখে; এবং অপর পক্ষে অবিরত অধিকার দাবী, 'হুম্‌কি', 'চোখরাঙানো', ধর্মঘটের ভয় দেখানো প্রভৃতি ছলাকৌশল। এই ভাবে মজদুর বা শ্রমিক অবিরত ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, 'আঁখি লাল করে' 'বিবাদ বিসংবাদ' করে তার ন্যায্য প্রাপ্য পান।

কিন্তু, আমাদের ধর্মতত্ত্বানুসারে ঈশ্বর-জীবের সম্বন্ধ এরূপ শুষ্ক, কঠোর—বিবাদ-বিসংবাদমূলক সম্বন্ধ একেবারেই নয় এবং এতে বচসা করে, ভয় দেখিয়ে, 'হুম্‌কি দিয়ে', 'চোখ রাঙিয়ে', 'জোর করে', নিজের ন্যায্য অধিকার, ন্যায়ানুগ প্রাপ্য 'আদায় করে' নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। উপরন্তু ঈশ্বর জীবের, পরমজননী-সন্তানের সম্বন্ধ, মধুরতম প্রাণের সম্বন্ধ, সুন্দরতম প্রীতির সম্পর্ক, নিকটতম পর-মাত্মীয়ের সম্বন্ধ। সুতরাং এতে একপক্ষে যেমন সরোষ, সদম্ভ, সগর্জন, দাবী-দাওয়া, জোর করে আদায় নেই; আছে তার স্থলে কেবলই নীরব, বিনীত, সশ্রদ্ধ, প্রার্থনা; অপর পক্ষে, ঠিক তেমনি নেই অনিচ্ছাকৃত, ভয়জনিত, ক্রোধ-সমন্বিত 'মঞ্জুর'; আছে তারস্থলে অকাতরে, আনন্দভরে,

স্বেচ্ছায় দান। জীবেশ্বরের এই সুমধুর সম্বন্ধ স্পষ্ট করবার জন্যই ভারতীয় দর্শনে একপক্ষে "প্রার্থনা" এবং অন্যপক্ষে "অনুগ্রহে"র কথা এরূপ বারংবার বলা হয়েছে।

"প্রার্থনা"র অর্থ এস্থলে এই নয় যে, আমরা নূতন কোন বস্তু ভিক্ষা করব—যা আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম দিয়ে অর্জন করিনি। "প্রার্থনা"র অর্থ এস্থলে কেবল এই যে, যা আমাদের নিজেদের কর্মানুসারেই প্রাপ্য, তা' আমরা পরমেশ্বরের নিকট দাবী রূপে উদ্ধতভাবে উপস্থাপিত না করে, তাঁরই স্বহস্তের দানরূপে সবিনয়ে যাচ্ঞা করব। একই ভাবে "দয়া বা অনুগ্রহের" অর্থ এস্থলে এই নয় যে, ঈশ্বর কৃপাপূর্বক, প্রসাদরূপে আমাদের এমন একটী বস্তু বা ফল দিচ্ছেন, যা আমাদের কর্মানুসারে আমাদের প্রাপ্য নয়। "দয়া বা অনুগ্রহের" অর্থ এস্থলে কেবল এই যে, আমাদের কর্মানুসারে প্রাপ্য বস্তু বা ফলই তিনি কোনোরূপ দাবী-দাওয়া, আদায় প্রভৃতির অপেক্ষা না রেখে, স্বেচ্ছায়, সানন্দে সাগ্রহে আমাদের দান করেন। "প্রার্থনা" ও "দান" এই শব্দ দুটীকে এক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, সাধারণ অর্থে নয়।

লৌকিক দৃষ্টান্তও দেখুন। পিতার নিকট পুত্র আইন বলেই সামাজিক অনুশাসনানুসারেই অনেক কিছুই দাবী-দাওয়া, আদায় প্রভৃতি করতে পারেন—ভরণপোষণ, শিক্ষা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি। কিন্তু কোনো পুত্র কি তা করেন? না, কদাপি নয়। বরং পুত্র তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য, অধিকারাদির কথা একেবারেই উত্থাপিত না করে, পিতার নিকট সেই সব প্রার্থনা করেন, সেই সবের জন্য 'আবেদন-আবদার'ই কেবল করেন, অন্য কিছুই নয়। পিতাও স্বেচ্ছায়, সানন্দে তাকে সেই সব যেন "দান" করেন। এই ত হল পিতা-পুত্র, সখা-সখী, পতি-পত্নীর মধ্যে সুমধুর প্রীতির, প্রাণের সম্বন্ধ। এতে 'অধিকার' থাকলেও, 'দাবী' নেই, আছে কেবলই সকাতরে 'প্রার্থনা'। দিতে বাধ্য হলেও, 'মঞ্জুর' নেই, আছে কেবলই সানন্দ 'দান'। কি অপূর্ব এই সম্বন্ধ। এরূপ সম্বন্ধ না থাকলে ধর্মই ত বৃথা। এই কারণে, সম্বন্ধটীকে যে কোনো উপায়ে রক্ষা করবার জন্যই ভারতীয় ঋষিরা কর্মবাদের পাশাপাশি ঈশ্বরকৃপাবাদের অবতারণা করতে সাহসী হয়েছেন সগৌরবে। ঈশ্বর ত কিছু বাধ্য হয়ে করতে পারেন না। কিন্তু অন্য দিকে তিনি স্বীয় স্বরূপের বিরুদ্ধেও নিজে যেতে পারেন না; স্বকৃত নিয়মও নিজে ভঙ্গ করতে পারেন না। স্বরূপতঃ, তিনি পক্ষপাতহীন, ন্যায়-নিষ্ঠ; অথচ পরমকরুণাময়। পুনরায়, কর্মবাদ তাঁর নিজেরই নিয়ম, তাও ত রক্ষা হওয়া প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রেই। এই দুটী দিকই অতি সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়েছে ভারতের এই মৌলিক "দয়া-তত্ত্বে" ও "দান-তত্ত্বে"।

"দয়ারূপা" পরমাজননী এই মহাতত্ত্বেরই প্রতীকস্বরূপা। তিনি তাঁর সমস্ত আলোক, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত অমৃত অকাতরে বিতরণ করে চলেছেন বিশ্ব ভুবন মাঝে, কোনো দাবী-দাওয়ার অপেক্ষা না রেখে, স্বেচ্ছায়, সানন্দে, স্বরূপ-বশে। আমরা সেই প্রকারের উপযুক্ত কর্ম করতে পারলেই দর্শন করতে পারব সেই আলোক, উপভোগ করতে পারব সেই আনন্দ, আস্বাদ করতে পারব সেই অমৃত। এর চেয়ে বড় আর কি আছে?

বাসাংশে উপন্যাস

শক্তিপদ রাজগুরু
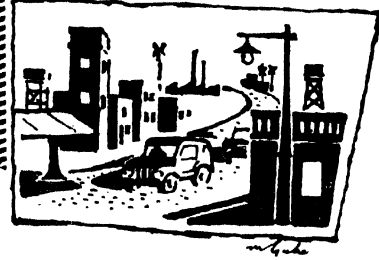
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নিতে বাউরী জেগে আছে।

ওর মনে একটা স্বপ্ন জ্বালা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ছোট মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে—সারাদিন পেটে দিতে পেরেছে একটু ফ্যান মাত্র।

কাষ কেউ তাকে দেয়নি।

এখন আর কাষ দেবে কে? চাষ আবাদ চুকে গেছে। ধান উঠে গেছে। দুচার কানি আখ, আলু যাদের আছে তারাও নিজেরাই চাষীবাসী। বামুন চাসী নয়—নিজেরাই গায়ে গতরে খাটতে পারে।

...বাধ্য হয়েই ওরা বেকার।

ধরণী মুখুয্যে সেই ঘটনার পর থেকে কেমন যেন সারা গ্রামে বামুন পাড়ায় রটিয়ে বেড়িয়েছে নিতের বদমেজাজের কথা। তাকে কাষ দিলেই নিদেন ফৌজদারী বাধাবে সে মুনিবের সঙ্গে।

ডাকতে এসেছিল ছান্নু দাস।

দোকানে কাষ করবি নিতে?

ছান্নু দাস আর পান্নু দাস-এর দোকানে কাষ করতে কেউ চায় না। খাটুনির শেষ নেই। রাতবিরেতে গাড়ী আর মালপত্র নিয়ে আস যাও বাঁকুড়া আর দুর্গাপুর। বন-পাহাড় আর দামোদরের দিগন্তপ্রসারী বালিয়াড়ি পার হওয়া গাড়ী নিয়ে মানেই—নিজেই গরুর মত যোয়ালে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা একই কথা।

...সেতো নিত্যকার ঘটনা—তাছাড়া ধানের মরসুম এখন দোকানে। দেশের লোক এখন শুধু ধানই বিচবে, ধান থেকেই ওদের সব। কাপড়-চোপড়—সম্বৎসরের বলদ গরুর খোল—সংসারের যাবতীয় সব।

ধান তাই দেখতে দেখতে গ্রাম থেকে উপে যায়—আশপাশের সব গ্রাম থেকেই।

কোমরে করে বস্তা বস্তা ধান তোল গাড়ীতে, আবার মহাজনের গদিতে নামিয়ে কাঁটায় তুলে ওজন দাও।

গতর ছিঁচে যায়।

তারপর আছে রাতবিরেতে দামোদরের আঘাটায় চালের বস্তা পাচার করা।

থানা পুলিশের নজর এড়িয়ে এসব কাষ করতে হবে। ধরা পড়লেই জেল, না হয় পুলিশের গুতো।

...বেজা বাউরীকে দেখেছে—দেখেছে মদনা কালীকে।

সবাই কেমন আখের ছিবড়ের মত পড়ে আছে, নিতে বাউরী তাকে জবাবই দেয়—উহুঁ লারবো উ কাষ করতে।

ছান্নুদাস আশা করেই এসেছিল, নিতের মত যোয়ান পেলে কাযে লাগে, তাছাড়া বলিয়ে কইয়ে আছে। মহাজনের ঘরে ও কাষ সেরে আসতে পারবে।

—বেশী রোজ হুব। রাতবিরেতে গাড়ী লিয়ে গেলেও রাত বেরুণ।

—আতবেরুণে দরকার নাই গো। বলছি তো লারবো।

নিতে জবাব দেয় সোজা।

দুকানি জমি কোনরকমে আলু করছে, তাই এখন সম্বল। পরে কি করবে জানেনা সে।

দুপুরের নির্জনতা জাগে কাঁইবোড়ের ধারে। ওদিকে কাঁকুরে ডাঙ্গা—বনসীমা শেষ হয়ে এসে সুরু হয়েছে মাঠের পরিক্রমা।

…নেমে এসেছে চড়াই—নীচের দিকে।

…ফালিফালি বেতের বেড়া দিয়ে নেমে এসেছে জমিগুলো উৎরাইএর কোলে কাইবোড়ের ধারে।

ছায়াঘন ঠাঁইটায় নির্মলতা নেমেছে।

বাঁধদেওয়া ছোট খাতে জমেছে মাঠের ঘোলা জল। শস্যরিক্ত প্রান্তর, এই খানেই এখনও সবুজের একটু আভা টিকে আছে। দুচারটে আখক্ষেত, মাঝে মাঝে আলু গাছের সবুজ সীমানা—কোথায় ফুটেছে কুসুমফুলের ঘন লাল ফুলগুলো।

…নিতে জল সিয়াত করছিল আলুর ক্ষেতে; আখ ক্ষেতে শনশন বইছে হাওয়া, ফুলকোগুলো সাদা বেগুনী মেশা রংএ কেমন ময়ুরকণ্ঠী আভায় আকাশ ভরে তুলেছে।

হঠাৎ কার আর্তচীৎকারে চমকে ওঠে নিতে।

জলের ওধারে কেয়া ঝোপের আড়ালে একটা বড় বউড়ি গাছের ডালে কে যেন ঝুলছে।

নড়ছে দেহটা—হাত পাগুলো তার অসহায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেমন যেন একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে ওঠে।

…চমকে উঠে—কোদাল ফেলেই ছুটল নিতে বাউরী।

তার হাঁক ডাকে আখক্ষেতের ওদিক থেকে ছুটে আসে হারু ঘোষও।

গাছের কাছে গিয়েই অবাক হয়!

বেজা!

…বেজা বাউরী ডালে ঝুলছে, গলায় দড়ি দিয়েছে বোধহয়।

অসহ্য যন্ত্রণায় দুচোখ ঠেলে বের হয়ে আসে। হাত-পাগুলো তখনও দাপাচ্ছে, আর মুখ দিয়ে ঠেলে বের হয়ে আসছে জিবটা।

…হারু ঘোষ চীৎকার করছে দড়িটা কাট নিতে।

…নিতে গাছে উঠে যায় তরতরিয়ে—

হারু ঘোষ ওর জ্ঞানহীন দেহটা ধরে ফেলে—শুইয়ে দিল,…নিতে ততক্ষণে ভাঙ্গা মাটির একটা খোলায় কাই-জোড় থেকে জল এনে মুখে চোখে ঝাপটা দিচ্ছে।

—শালো মরতে আইছিস ইয়ানে! হ্যাঁ শালো?

…কেমন যেন চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে বেজা। বিড় বিড় করে কি বলছে।

…নিতে বাউরী গজগজ করে।

…মরলেই ভালো ছিল উটোর গো।

‥ উঠে বসেছে বেজা, কেমন যেন হাঁপাচ্ছে!…

হারু ঘোষ জবাব দেয় —কালে তো সব্বাইকে মরতে হয় নিতে। বেঁচে থেকে আর লাভটা কি বল? কিন্তুক মরে কে?

…বেজার দুচোখে তখনও কেমন শূন্য অর্থহীন চাহনি!

বাঁচার কি সার্থকতা তা সে টের পায়নি—ওরা কেউই টের পায়নি। তবু বাঁচার তাগিদেই যেন বাঁচতে চায়।

শুধু এই মাত্র।

শূন্য অসীম দিগন্তে কোথায় আকাশ মিশেছে—একটা পাখী সেই দিক থেকে উড়ে আসছে—এদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

—ঘরকে যেতে পারবি বেজা?

বেজা নিতের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। জবাব দেয় না।

—চল!

গাঁয়ের দিকে ফিরছে তারা।

নিতে দেখেছে—জানে, বেজার দুঃখটা কোনখানে। আরও বেজেছে দুঃখটা—গতরও ভেঙ্গে, পড়েছে। বৌটার কথা জানে সবাই।

…বড়বাবুর খামার বাড়ীর সেই পাঁচীলভাঙ্গা ঠাঁইটা দিয়ে ঢুকেছিল একদিন নিতে—বাঁচবার শেষ পথ হিসেবে চেয়েছিল চাট্টি ধান।

দরকার হয় চুরিই করবে।

কিন্তু চমকে উঠেছিল সেদিন—হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছে প্রকৃত চোর কে? তার জানবার আগেই বড়বাবুরা

করে তাদের সংসারের শান্তি শুধু বেঁচে থাকার নির্ভরটুকুও যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

বড়বাবুর ওই জীবনের ধানে সেদিন হাত দিতেও ঘৃণা বোধ হয়েছিল তার। ফিরে এসেছিল।

বেজাও আজ তাই বোধহয় মরতে গিয়েছিল কি নিদারুণ ঘৃণা আর হতাশায়!

শান্ত ঝিমিয়ে পড়া গাঁয়ে ঝড় ওঠে—ঝড়ের সুচনা আগে হতেই দেখা দিয়েছিল, হঠাৎ আজ প্রকাশ পেয়েছে।

সেই সঙ্গে নেমেছে বজ্রাঘাত; আকাশ কোল থেকে মাটি অবধি নেমে এসেছে মৃত্যুমুখী আগুনের ঝলক, ঝলসে দিয়েছে সবুজ বনভূমি—বাড়ী ঘর সব কিছু। জ্বলে উঠেছে ঘরবাড়ী সর্বনাশা সেই আগুনের শিখায়।

…স্তব্ধ হয়ে যায়, কামারপাড়ায় সতর্কিত সেই বজ্রাঘাতে!

তারকবাবু শেষ অবধি রাজী করিয়েছিল, গোকুলেরও রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। চুরির কেসে পড়েছে—হাতে নাতে ধরে ফেলেছে তাকে। মালপত্র কিছু সঙ্গে ছিল না, না থাক রাতদুপুরে গৃহস্থের বাড়ীতে গোকুলের মত একটা দাগী লোকের প্রবেশ করাটাই চুরির চেষ্টার পথে যথেষ্ট প্রমাণ।

সাজাও হয়ে যাবে। নিদেন কয়েকমাস জেল।

এ গোকুলও জানে। তবু তার বিনিময়ে যদি বাড়ী-ঘরটা মেরামত হয়ে যায়, দুচার মাসের খোরাকী ধান পাওয়া যায়—তাইই লাভ। সাতপাঁচ ভেবে তাই মত দিয়েছিল গোকুল।

চুরির কেস উঠেছে কোর্টে। হাজির হয়েছে এমোকালী—ভুবন, বুড়ো অতুল কামারও রাজসাক্ষী হিসাবে।

তারকবাবু সেদিন অন্য মামলার কাযে সদরে গেছে; মালি-মামলা তার লেগেই আছে।

বাঁধান বটগাছঘেরা মিষ্টির দোকানে বসে চা খাচ্ছে, ওদিকে গোকুলও বসে আছে চেয়ারে। তাকেও চা মিষ্টি খাওয়াচ্ছে তারকবাবু; বেশ হেসেই কথা বলছে গোকুল।

হঠাৎ কালীচরণের নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে।

—মামা! খুবযে পিরীত'গো উদের।

কেমন যেন একটা সন্দেহ করছে কালী। ভুবন, অতুলও দাঁড়াল।

গোকুলের কোন ভ্রুক্ষেপ নাই—অমন মামলা তার কাছে চিন্তার বস্তুই নয়।

হঠাৎ তারকবাবুর নজর পড়তেই, তারকবাবুই ডাকে তাদের—আরে কম্মোকার যে! এসো—চা খাও।

অতুল সেই খানেই নমস্কার করে—আজ্ঞে, উতো খাই না। আপনি সেবা করুন।

তারকবাবু দেখল—কালী, ভুবন মাথা নোয়ালনা তাকে দেখে। ওরা এগিয়ে গেল।

কোর্টে তখন উকিল মোক্তাররা ঘোরাঘুরি করছে। হাঁক ডাকও সুরু হয়েছে।

…সেই প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে সেদিন গোকুল কথাটা প্রকাশ করে—জজের সামনে।

—চুরি করতে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে না! যথাধম্মো বলছি।

গোকুল হাতযোড় করে গদগদকণ্ঠে জবাব দেয় যেন বিনয় এবং সত্যের মূর্তিমান অবতার।

—তবে?

মাথা চুলকাতে থাকে গোকুল। এদিক ওদিক চাইছে। তারকবাবু ও দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন। তার দিকে চোখ পড়তে গোকুল যেন কেমন কাচু মাচু করে।

—জবাব দাও।

এ জবাব দিতে গোকুলের মনুষ্যত্বে—অবশিষ্ট সম্মানের মূলে যেন বাধে। তবু তারকবাবু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। অনেক দিয়েছে তারই মূল্য যেন কড়াক্রান্তিতে আদায় করে নিতে এসেছে আজ তারকরত্ন ওর কাছ হতে এই প্রকাশ্য কোর্ট-এর মধ্যে।

জবাব দেয় গোকুল।

—আজ্ঞে কামারদের বাড়ীর বৌএর সঙ্গে আমার ঘটনা ছিল—এতের বেলায় যেতাম, সিদিন ধরা পড়ে গেলাম—

চমকে উঠেছেন যেন জজসাহেব—কি বললে?

—আজ্ঞে ভুবন কামারের বৌএর সঙ্গে আমার ঘটনা ছিল কিনা—তাই চুরির কেসে ফেলিয়ে—

…চমকে ওঠে ভুবন।…পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

এতদিন যাকে নিঃশেষে ভালবেসে এসেছে, ঘরবেঁধেছে

সেই কদম-বৌ কিনা শেষকালে ওই ঘৃণ্য শয়তান চোরটার সঙ্গে···

—ভুবনদা !

এমোকালী ইস্পাতে গড়া একটি মানুষ ! মুহূর্তের মধ্যে তার তির্য্যক দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে গেছে ওদের চক্রান্ত। তারকবাবুকে এখানে দেখে এমনি একটা কিছুরই কল্পনা করেছিল সে।

তাই একথাটা তার কাছে নোতুন ঠেকেনি।

ভুবন ওর ডাকে প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করে।

অতুল কামারের বুড়ো শরীরে যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্ত স্রোত ; সাধারণ সোজা মানুষটি আজ সব ভয় ঠেলে সরিয়ে এই এজলাসেই প্রতিবাদ করে ওঠে।

—মিছে কথা হুজুর। ঘরের বৌএর নামে এই মিছে অপবাদ দিছে উ এই দরবারে। তুমারও তো মা ছিল ঠাকুর—মায়ের নামে দিব্যি করে বলদিকিন—যা বলছ তা অজবল সত্যি ! বলো—

জজসাহেব বৃদ্ধের উত্তেজিত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন। কথাটা তিনিও সন্দেহ করেছেন। অপরপক্ষের উকিল বাধা দিয়ে ওঠে,—ইওর অনার।

আসামীকে জেরা করতে পারে উকিলই, ফরিয়াদী নয়।

···ওরা থামিয়ে দিল অতুলকে।

কালীচরণ মামাকে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বুড়োর জীর্ণ চোখে জল এসে গেছে।···স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন।

দিনের সব আলো, ওই বটগাছের ছায়াঘেরা জায়গাটা, কোর্টের বাইরে মটর ষ্ট্যাণ্ডের কর্ম্মমুখর পরিবেশ, সব কেমন হারিয়ে গেছে তার চোখের সামনে হতে। আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারিদিক।

···ওরা এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে।

—শুনছেন ! ও মশাই।

—উকিলের মুহুরী তক্কে তক্কে ছিল। এগিয়ে এসে পথ আটকাল।

—আজ্ঞে আমার ফিটা।

কালীই জবাব দেয়,—আপনার ফি ! আমরাতো সাক্ষী।

ফস্ করে জবাব দেয় লোকটা—তালে কোর্ট শেষ না হওয়াতক চলে যাচ্ছেন কেন। ফিরে চলুন। পাঁচটায় কাছারী ভাঙ্গবে তবে ছুটি পাবেন।

অতুল কামারের একদণ্ড যেন এখানে মন টিকছেনা। ফতুয়ার পকেট হাতড়ে একটা আধুলি বের করে দিতেই লোকটা বিনাবাক্যব্যয়ে চুপকরে সরে গেল। ওরা বের হয়ে আসে।

···মনে মনে ফুঁসছে ভুবন। স্তব্ধ হয়ে গেছে অতুল কামার।

বুড়ো বয়সে—মানুষের একি রূপ সে দেখছে—তারক-বাবু ব্যস্ত হয়ে কোন মুহুরির সঙ্গে চলেছেন। ওদের দিকে চাইবার সাহসটুকুও নেই।

···মনে মনে হাসছে ধূর্ত্ত লোকটা। ভুবন, অতুল কামারের অন্তরের এমন একটি জায়গায় আঘাত দিয়েছে তারকরত্ন—যে আঘাত সহ্য করে সমাজে মাথা তোলা অত্যন্ত সুকঠিন।

···এমোকালী ওরদিকে চেয়ে রয়েছে। বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, চোখ দুটোও তেমনি বড় বড়। ওর নীরব হিংস্র চাহনির সামনে থেকে সরে গেল তারকরত্ন।

—মামা ! একটু জলখাবা না ?

বুড়ো অতুল কামার কালীর ডাকে মুখ তুলে চাইল। কি ভেবে জবাব দেয়—লরীতে উঠে ঘর চল, ইথানে থাকতে মন চায় না।

—একবার মহাজনের গদিতে যাবো নি, এলাম যখন সদরে। মালপত্তর কিছু বায়না দিয়ে যাবো।

—তুরা যা। আমাকে লরীতে উঠিয়ে দে। ঘর যাবো।

ভুবন আর বুড়োকে তুলে দিয়ে কালী সহরের দিকে চলে গেল—কাজ সেরে পরের বাসে ফিরবে।

···স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে ভুবন আর অতুল।

দুজনেই নির্বাক। কি এক প্রাপ্ত আঘাতে মুষড়ে পড়েছে তারা। কথা বলেনা, যাত্রী বোঝাই বাসটা এগিয়ে চলেছে সদর থেকে দামোদর ঘাটের দিকে।

সবুজ শালবন ঢাকা চড়াই উৎরাই পার হয়ে চলেছে বাসটা।

...বড় রাস্তার ধারে নেমে মাইল খানেক পথ আসতে হবে—ছোটবনের পরেই তাদের গ্রাম।...বাসষ্টপে নামছে ভুবন আর অতুল কামার; বনের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ, আর পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে খোয়াঢাকা একটা সরুরাস্তা তাদের গ্রামের দিকে।

বেলা পড়ে আসছে, শালবনে এসেছে নোতুন পাতার সমারোহ—কোথায় ফুটেছে পলাশ ফুলের ঘন লাল আস্তরণ।

...হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অতুল কামার।

ভুবন নেমেই এগিয়ে গেছে, বুড়ো ধীরে ধীরে চলছিল।

পিছনে আসছে গোকুল আর তারকরত্নবাবু।

ওকে দেখেই থমকে দাঁড়াল তারকবাবু।

বুড়ো চেয়ে আছে তার দিকে, দুচোখে কেমন নীরব ঘৃণাভরা চাহনি।

...আর সকালের মত দেঁতো-হাসি হেসে আপ্যায়ন করে না বড়বাবু, কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

...অতুল কামার ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

...না। কিছুই বলল না সে। সরে দাঁড়াল পথের ধারে। ওরা দুজনে মুখ বন্ধ করে বের হয়ে গেল।

...হাওয়া হাঁকছে বনে বনে।

শীত গিয়ে আসছে বসন্ত আর গ্রীষ্মের আগমনী। বাতাসে-রোদে সেই উত্তপ্ততার আমেজ।

বুড়ো যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

...বন পার হয়ে ডাঙ্গার ধারে মহুয়া গাছের ছায়ায় বসলো।

...রোদের আঁচ যেন ডাঙ্গায় লি লি করছে হাজারো বিসর্পিল রেখায়; উৎরায়ের শেষে মাঠের বুক ছাড়িয়ে আবার শালবনের সীমানা উঠে গেছে দূরদিগন্তের দিকে। কেমন অসাড় শূন্যতা এর চারিদিকে।

...মাঝে মাঝে সেঁয়াকুলের ঝুপি দু একটা, ছোট ছোট বনফুলের লাল গোলাবী আভায় পাতা অবধি ঢাকা পড়ে গেছে। দূর বনের সবুজে জেগে উঠেছে মাঝে লাল পলাশ ফুলের স্তবক। পুঞ্জ পুঞ্জ লাল গেরুয়া ডাঙ্গার সঙ্গে মিশে কেমন একটা বেদনা-রঙ্গীণ আমেজ আনে।

—মামা! এখনও বসে রইছ!

...ডাক শুনে ওর দিকে চাইল অতুল, কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে।

পরের বাসে ফিরেছে কালী।

—তুই!

অতুল কোনরকমে জীর্ণ দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ডাঙ্গার মুখেই তারকবাবুর বড় বাড়ীটা চোখে পড়ে—রাজ্যিজোড়া প্রাচীর। ডাঙ্গার নীরস বন্ধুর মাটিতে বাগান গড়ে তুলেছে।

...চল।

এগিয়ে আসছে ওরা। জীর্ণ অতুল গদার গায়ের মুমূর্ষু অতীত আর নীরব শপথের মত ঋজু কঠিন আগামী ভবিষ্যৎ এই কালীচরণ।

বেলা পড়ে আসছে।

লালচে হয়ে উঠেছে পশ্চিম আকাশে দিনের শেষ সূর্য।

কি এক অসহ্য নীরব বেদনায় সে ফেটে পড়ছে সারা ধরণীর আকাশ বাতাসে।

বাতাসের আগেই কথা ছোটে।

সারা গ্রামে আজ কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। হাট-তলার বাইরে, মদনার চায়ের দোকানে—এ বাড়ীর বৈঠক-খানা—কার দাওয়ায় সংবাদটা বেশ রসাল আলোচনায় ফেটে পড়ে।

অবনী মুখুয্যেই এ আড্ডার মধ্যমণি।

বেশ জোর গলাতেই আজ ঘোষণা করে।

—সিঙ্কিং সিঙ্কিং ওয়াটার ড্রিঙ্কিং।

শিবস্ ফাদার নেভার থিঙ্কিং” হু হুঁ বাবা। তাই বলি মেয়েটা এত ফুসফাস করে কেন?

সতীশ চাটুয্যে অনেকদিন পর যেন বলবার একটা কিছু পেয়েছে। তারকরত্নবাবুর বৈঠকখানার আসরে আজ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে।

—আগেই আমি ধরেছিলাম বড়বাবু; মেয়েটা লষ্টা—চাউনি কেমন যেন।

ফোড়নকাটে অবনী—তোমার দিকে ও নজর দিয়েছিল নাকি গো?

সতীশ ভটচায সবে গরম চা-টা হাপুস করে গলায় ঢেলেছিল, অবনীর রসিকতায় একটু অপ্রতিভ বোধ করে,

তাড়াতাড়ি করে কোনরকমে গিলে একটা জবাব দিতে যাবে—গলায় আটকে গিয়ে ছটফট করতে থাকে। কাসতে থাকে বেদম।

—আহা নাম করছে গে।

সতীশ আরও একটু গোপন খবর দেয়।

—দেখ, ওই অশোকবাবু যেন কেমন ঢালছে।

তারকরত্ন আর অবনীর মধ্যে কেমন একটা মুখ চাওয়াচায়ি হয়ে যায়। গোকুল চুপ করে বসে আছে।

কেমন যেন এসব তার ভাল লাগে না।

বাইরে এসে দাঁড়াল।

নিঝুম রাত্রি, ঘরের ভিতর থেকে ওদের কুশ্রীরসিকতার শব্দ ভেসে আসে। কার নিরপরাধ দুটো চোখের চাহনি মনে পড়ে। ক্ষুধার্ত একটি লোককে সেদিন পথ থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে খাইয়েছে। তৃষ্ণায় একদিনও জুগিয়েছে অযাচিতভাবে পানীয়।

...আজ তেমনি একটি মেয়ের নামে প্রকাশ্য কোর্টে ঘোষণা করে এসেছে জঘন্যতম কলঙ্ক আর অপমানের কাহিনী, যার বিন্দুমাত্রও সত্য নয়।

এত চুরিডাকাতি খুনখারাপি করেছে গোকুল—অনেকের সর্বনাশ করেছে—কোন অনুশোচনা বিশেষ হয় নি। কিন্তু আজ মনে হয় মহাপাপ করেছে সে।...

কাঁদছে কদম বৌ।

নিরন্ধ্র অন্ধকারস্তব্ধ গ্রামের বাতাসে ওর কান্নার সুর মিশেছে...সবই শুনেছে সে।

ভুবন কিছু বলতে পারেনি, সদর থেকে ফিরে গুম হয়ে বসেছে দাওয়ায়। রোদে তেতে পুড়ে এসেছে, অশোকও এসেছে মামলার খবর নিতে। ওর দিকে চেয়ে থাকে ভুবন, আর্ত অসহায় চাহনিতে।

—কি হল ভুবন!

চমকে ওঠে অশোক।...কদম-বৌ হাত-পা ধোবার জল এনেছে ব্যস্ত হয়ে; গেলাসে তৈরী করেছে গুড়ের সরবৎ।

হঠাৎ ভুবন উঠে পড়ল, মনে ওর একটা চাপা ঘৃণা আর অসহায় সন্দেহের প্রকাশ; অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

—হাতপা ধুয়ে সুস্থির হও!

কদম স্বামীকে অনুনয় করছে। হঠাৎ ফেটে পড়ে ভুবন।

—গোকলোর সঙ্গে তুর কি ঘটনা আছে বল?

অবাক হয়ে যায় কদম—মুখ চোখের সব রক্ত নিমেষের মধ্যে মুছে যায়। আর্তনাদ করে ওঠে—ইকি বলছ!

ভুবন গজরাচ্ছে—নালে উ শালা কোটের মাঝে দাঁড়িয়ে ই কথা বলে কেনে? ঠিক করে বল—ইয়ার মাথা পেড়ে দিয়ে ফাঁসী যাবো। বল—

অশোক অবাক হয়ে ভুবনের দিকে চেয়ে থাকে। বিশ্বাস করতে পারে না এতবড় অপবাদ দিতে সাহস করবে সে। প্রশ্ন করে অশোক—তারকবাবুদের কেউ ওর সঙ্গে ছিল?

—হ্যাঁ। বড়বাবু নিজেই ছিল দেখলাম কোর্টে।

ভুবনের সারা মনে আগুন জলছে, শালের গনগনে আগুনের মত মাঝে মাঝে দমকে দমকে বুক ঠেলে উঠতে চায় নিষ্ফল আক্রোশে, বের হয়ে এসে বাইরে বসল।

অসহায় কান্নায় ফেটে পড়ে কদমবৌ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক, অসহায় কোন নারী নির্মম অপমান আর নিবিড় বেদনায় মাথা ঠুকছে।

—আমাকে মেরে ফেলাও ছুটবাবু। এ জীবন আর আথ্‌তে পারি না। এও শুনতে হ'ল আমাকে। তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলালা নাই কেনে!

...কি এর জবাব দেবে অশোক!

...রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, আজও সেই রাবণের দল সশরীরে বেঁচে আছে, তারা আজও নারীর সবচেয়ে যা মূল্যবান পবিত্র একটি স্বত্বা—তাকেই কলঙ্কিত করে তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

—চুপ কর কদম। কাঁদিস না। ওসব বাজে কথা।

...একজন হঠাৎ এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল, কথাটা শুনেই সে ছুটে এসেছে। জানে সে এর সবটাই মিথ্যা কাহিনী। তাই প্রতিবাদ জানাবার জন্য এসেছিল। ঢুকেই অবাক হয়ে যায়—অসহায় বেদনায় মুচড়ে ওঠে ওর সারাটা অন্তর।

সতীত্ব—তার পবিত্রতা এ সম্পদ—তার আর অবশেষ নেই; কিন্তু অনুক্ষণ সে নিদারুণ মর্মবেদনায় অন্তরে অন্তরে বুঝেছে কি তার মূল্য!

আজ একজন নিরপরাধ বৌ—একে সেই চরমতম অপবাদ লাঞ্ছনা করে যারা দূরে সরে মজা দেখছে—তাদেরও হাড়ে হাড়ে চেনে মিষ্টি।

...এই বেদনার অপরিসীম জ্বালায় কাঁদছে কদমবৌ--

মিষ্টির দুচোখে জলে ভরে আসে, সামনে গেল না। চুপে চুপে সরে এল বাইরে। অশোকও।

সন্ধ্যা নেমেছে। আজ আর উঠোনের তুলসীতলায় কল্যাণীর বেশে প্রদীপ জ্বালে না কদমবৌ। শঙ্খধ্বনির সুরে সুরে ওঠে না উলুধ্বনির সমারোহ।

বাঁশ বনে জোনাকী জ্বালা সন্ধ্যা নামে--বেদনার আঁধার ছেয়ে যায় চারিদিক। সারা বাড়ীটা থমথম করছে—তার মাঝে কাঁদছে কদমবৌ।

...এমোকালী চুপ করে বসেছিল—আজ সে প্রত্যক্ষ করেছে জীবনের পরম বেদনার মধ্যে একটি কঠিন সত্যকে। শপথের মত কঠিন হয়ে উঠেছে তার অন্তর।

—চুপ করো ভাজবৌ! কেঁদোনা—সব মিছে কথা!

কদম ওর দিকে চেয়ে থাকে অশ্রুভেজা কণ্ঠে। বলিষ্ঠ দুর্মদ কালীচরণ বলে চলেছে কঠিন কণ্ঠে—এর শোধ লোবই ভাজবৌ। জম্মে ইস্তক মাকে দেখিনি--মনে পড়ে না। তুমাকেই দেখেছি—মায়ের মতনই তুমি। তুমি দেখো—কালী এর শোধ লেবেই। গোকলো—তারকবাবু সম্মাইকে একে একে ইয়ার জবাব দেবো।

...দুটো চোখ ওর জ্বলছে ধক ধকে কি এক জ্বালায়।

কালী কি করে জানবে—কদমবৌএর অন্তরের ক্ষতির পরিমাণ!...যা তার হারিয়েছে তা কেউ ওরা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

আবছা অন্ধকারের শেষে আলো জ্বলছে। ঝকঝকে চৌদ্দ বাতির বড় আলোটা সদ্য-চুণকাম-করা ঘরে আর জোরালো হয়ে উঠেছে। তারই মাঝে হাসির শব্দ শোনা যায়।

তারকবাবু হাসছে, হাসছে অবনীমুখুয্যে।

...সে এগিয়ে চলেছে ছায়ামূর্তিটা আঁধার থেকে ওই আলোর দিকে। বড় উঠানটা ছেয়ে গেছে ধানের স্তূপে ছোট পুকুরের চারিপাশে তারকবাবুর ধানের আকাশ-প্রমাণ পালুই গ্রামের বাইরে যেন লক্ষ্মীর রাজ্য গড়ে তুলেছে। এখনও ধান পিটোন হয়নি, এতধান পিটুতে মাড়াতে সেই মাঘ ফাগুন পার হয়ে যাবে, তারপর উঠবে গোলায়।

—বাতাসে গোলাপ ফুলের মিষ্টি গন্ধ মিশেছে বন থেকে ভেসে-আসা সদ্য-ফোটা মহুয়া ফুলের সৌরভে! মৌ মৌ করছে বাতাস।

মিষ্টির কেমন যেন ভাল লাগেনা।

তারকবাবু একটু রাত্রি গভীরে আজ ফূর্তির আসর জমিয়েছে। সদর থেকে আনন্দের ধমকে কিনে এনেছে বিলাতী মদ।

অবনীমুখুয্যে, সতীশ ভটচায তাকে কেন্দ্র করে আজ কারণে বসেছে। একদিকে বসে আছে গোকুল। এই আসরে সে যেন নেহাৎ অবাঞ্ছিত; অন্ধকারে একা বের হয়ে নিজের বাড়ীতে যেতেও ভয় লাগে।

আজ জানে সে দলের লোকজন কেউ তাকে বাঁচাতে আসবেনা...পায়ে পায়ে ঘুরছে কামারপাড়ার মদ্দ যোয়ানরা; আঁধারে শিকারী কুকুরের মত ঝোপেঝাড়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একবার সুযোগ পেলেই ধারাল নখদাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেবে। তাড়াখাওয়া কুকুরের মত গৃহস্থের ঘরের কোনে যেন আজ আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে গোকুল।

হঠাৎ জমজমাট আসরে মিষ্টিকে ঢুকতে দেখে অবনীবাবু যেন আনন্দে ফেটে পড়ে।—আরে তুই যে, অনেকদিন পর, পথ ভুলে নাকি রে?

সতীশ ভট্টচায খুশিতে ডগমগ করছে। শীর্ণ মুখে কেমন একটা লোলুপ হাসি ফুটে ওঠে। মিষ্টি ওসবের দিকে নজর দেয় না--কাকে যেন খুঁজছে। হঠাৎ গোকুলকে দেখে এগিয়ে যায়। দুচোখ তার জ্বলে ওঠে।

—এই যে মামাগো—ইথানে এঁঠো পাত চাটছিস। বলি ইয়ার বিচার করেন বড়বাবু দরবার করতে এয়েছি।

গোকুল মুখরা মেয়েটাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে—কি বলছিস?

—ঠিকই বলছি রে ত্যাঁদলা। এদ্দিন আমার সঙ্গে ঘটনার জন্যে ঘুর ঘুর করছিলি, তা আজ আবার কোটে

শুনিয়েছিস অন্য কার সঙ্গে ঘটনা। তুর মাটো মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে।

অবনীমুখুয্যে তারকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হালকা রসিকতা করতে গিয়ে থেমে গেল। গুম হয়ে গেছে তারকবাবু। তার মুখেও কে যেন একরাশ কালি লেপে দিয়েছে।

মুখরা মেয়েটার কথায় গোকুল তখনও কোন ঠাসা হয়ে হয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

—কেনে ?

হাসছে মিষ্টি। খিলখিলিয়ে ওর সারা দেহ কি এক নিটোল স্বপ্ন আবেশে জিবের ডগায় ঝরে পড়ে গরল জ্বালা।

—কেনে আবার! কুনদিন শুনতাম—সিখানেও কুন ঘটনা আছে তুর।

তারকবাবু গর্জে ওঠে এইবার।—চুপকর মিষ্টি!

মেয়েটাকে থামান যায় না, ঝরণার গতিবেগের মতই বারবার হাসিতে মেতে ওঠে সে।

—ওই দেখ, ভালকথা বুলতে এলাম আগকরো বলবো নাই। তা বড়বাবু ওই গোকুলো কে বাড়ী মাড়াতে দিও না—কুনদিন দেখবা তুমার বাড়ীতেই কুন ঘটনা—

বোমো ফাটার মত ফেটে পড়ে তারকবাবু—মিষ্টি! জিব টেনে ছিঁড়ে দোব তোর—

—তা টানবা বইকি। গতর টেনে ছিঁড়েছ খেঁকি কুকুরের মত। জিবটাও বাকী আছে, তাও টানবা বৈকি বড় বাবু—তুমার এলাকায় বাসকরি কিনা। তাই গায়ের সম্মাই এর বাসই তুলবা। তাই লয়।

মুখরা স্বৈরিণী মেয়েটি জানে ওদের চরম দুর্বলতম স্থান অন্তরের কোনখানে, সেইখানেই আজ চরম আঘাত হানতে এসেছে।

যাবার সময় বলে ওঠে—পারো তাই করো—উটোই বা বাকী থাকে কেনে।

চুপ করে গেছে তারকবাবু, অবনী তবু বলে ওঠে গোকুলকে দেখিয়ে—কই রে নিয়ে যেতে এসেছিলি মনের মানুষকে—নিয়ে যা।

ঘুরে দাঁড়াল মিষ্টি। দুচোখে ওর ঘৃণা-ভরা চাহনি।

—মানুষ! কুকুর উটো। ঘেয়ো কুকুর! থুঃ।

··চমকে ওঠে গোকুল—আবছা আধারে ওরা শেষের চরম অপমানটুকু প্রত্যক্ষ করেনি।···হাসছে অবনী। গোকুলের মুখেই ছিটকে এসে পড়েছে. স্বৈরিণী সমাজপরিত্যক্তা ওই নারীর নিষ্ঠীবন!

···সেও তাকে আজ ঘৃণা করে।

···মুখ ফিরিয়ে থুথুটা মুচছে গোকুল রকে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আবিষ্কার করে চোখ দিয়ে যেন জলও বের হচ্ছে তার।

কাঁদছে একটি ব্যর্থ মানুষ—ওরা সব কেড়ে নিয়েছে, কিনে নিয়েছে। মানুষ পরিচয়ের শেষ কণিকাটুকু।

মিষ্টি লোহারণী তাই ঘোষণা করে গেল।

রাত্রি বেড়ে ওঠে!

নিশুতি স্তব্ধ রাত্রি।

খামারের বড় বড় খড় পালুইগুলো আবছা অন্ধকারে বিরাট ঢিবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াসামুক্ত আকাশকোলে জেগে উঠছে দু একটা তারা।

বন থেকে শিয়ালের ডাক শোনা যায়; ওরা বের হয়েছে মানুষের আবাসের দিকে। লকলক করছে জিব—দুটো চোখ শ্বাপদ ক্ষুধায় জ্বলছে এদিক ওদিক।

হঠাৎ গোকুলের যেন চমক ভাঙ্গে।···কার পায়ের শব্দ শোনা যায়।···আবছা অন্ধকারে খামারের এককোণে পড়েছিল গোকুল। ঘুম আসেনা।

হঠাৎ দেখে ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

ঠিক ঠাওর করতে পারে না। খড় গালুইএর আশেপাশে কি করছে লোকটা। অন্ধকারে দপ করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠে।

···একমুহূর্ত।

লোকটাকে চিনতে পারে গোকুল। বলিষ্ঠ দুর্মদ একটা জোয়ান। কঠিন হয়ে উঠেছে ওর মুখ চোখ।

আগুনটা ধরিয়ে দিল খড় পালুইএর নীচে। ধিকিধিকি জ্বলছে নীলাভ শিখাটা—কেমন বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

লোকটা সরে গেল চকিতের মধ্যে।

···গোকুল নড়ে না, ঠায় বসে থাকে। বাধা দিতেও গেল না। আজ এই প্রতিশোধ সে নিজেই নিতে চেয়েছিল।

কিন্তু পারেনি। কিনে নিয়েছে তাকে তারকবাবু সামান্য টাকার বিনিময়ে।

এমোকালী!

কালীচরণ তাই করে গেল। মনে হয় ঠিকই করেছে।

ঝড় উঠেছে।

হু হু ঝড়। রাতের বাতাস আগুনের স্পর্শে ফেঁপে উঠেছে। বারুদের মত জ্বলছে ধানের স্তূপ!

—আগুন!

কারা চীৎকার করে ওঠে।...রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে জ্বলছে পর্বতপ্রমাণ খড়ের স্তূপ। লেলিহান শিখায় বৈশ্বানর তখন একটা পালুই থেকে লাফ দিয়ে অন্য পালুই ধরেছে।

ধূ ধূ জ্বলছে আগুন।

গ্রামের লোকজন ছুটে আছে। কিন্তু নিষ্ফল সেই চেষ্টা।

...বেড়া আগুনে ঘিরে ফেলেছে পুকুরের চারিদিকের চারটে পালুই।

জল তেতে লাল হয়ে উঠেছে।

দাপাচ্ছে সখ করে পোষা আট দশ সের রুই কাতলা মাছগুলো, লাল আভাময় জলের উপর দেখা যায় তাদের ভাসমান মৃতদেহগুলো।

...মাঝেমাঝে আগুনের নীলশিখার সীমানা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে আঁটি-বাঁধা দুচারটা জ্বলন্ত খড়—ফুলঝুরির মত আগুনকণাগুলো ছিটিয়ে পড়েছে নীল আকাশে।

...খিলখিল করে হাসছে দাশু পাগলা।

—বাহবা কি বাহবা। ইযি জগন্নাথপুরের মালকারের হাউই বাজির চেয়ে সরেশ গো। লে-লে বাবু দো আনা।

—এ্যাই : শালাকে ডুব আগুনে ছুঁড়ে।

ছান্নু দাস গর্জন করে ওঠে।

তখনও দাশু পাগলার হাসি থামেনা।

একটু নিরাপদদূরত্বে সরে গিয়ে ছড়া কাটছে।

—আজ আমাদের মেড়া পোড়া।

কালকে হবেক দোল।
ফটাস করে ফুটে গেল।
বড়বাবুর—

অশ্লীল ইঙ্গিত করে হাসতে থাকে দাশু। [ক্রমশঃ]

নিরাশার বালুতীরে

অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত

বার বার কেন ভাঙ্গে আশা ঢেউ
নিরাশার বালুতীরে—
ফেন-উচ্ছল বাসনা প্রবল
মরে আপনারে ঘিরে ;
সোনালী রঙের বুদ্বুদ যেন
অচিন দেশের মায়া,
স্রোতের দোলায় নিয়তই দোলে
কায়া ভেঙ্গে হয় ছায়া ;
মায়ার আকাশে মায়া রামধনু
শুধুই কি মায়া হবে
মায়া সূর্য্যের ঝিকিমিকি খেয়ে
মেঘ কেন হাসে তবে ?
বুঝি অদৃশ্য সাগরের টান
টানে বেগে নদী নীর
নদী ভাঙ্গে, নদী গড়ে পুনরায়
বেগ কভু নয় স্থির ;
আলো আর ছায়া, ঢেউ আর জল
আশা নিরাশার খেলা
নিত্যকালের জীবন-কবিতা
বিশ্ব-ধারার দোলা।

স্ত্রীশূদ্রের বেদাধিকার

ডক্টর মতিলাল দাশ

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদিমতম স্রোতো-ধারা বেদ। প্রাচীনতম এই বেদ-সাহিত্য অক্ষয়-জ্ঞান-ভাণ্ডার বলে আমাদের দেশে সর্বযুগে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে। ইহা ধর্মের সর্বোত্তম এবং গভীরতম উৎস, সূক্ষ্মতম পরাভৌতিক দর্শনের আদিস্রোত আধ্যাত্মিক সত্যের খনি।

আমাদের দেশের বহু সাধু-প্রকৃতির ব্যক্তিও মনে করেন যে বেদ-সাহিত্যে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নেই। মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন বেদের আজ্ঞাই ধর্ম, আর যা বেদবিরুদ্ধ তাই অধর্ম। অতএব বেদ যদি এই ধরণের আজ্ঞা দিতেন, তাহলেও বোঝা যেত।

কিন্তু বেদ ত প্রতিষেধ করেন নি, বরং অনুজ্ঞা দিয়েছেন। বেদ পড়তে ও জানতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বেদের এই আমন্ত্রণ বাণী আমরা যজুর্বেদে পাই।

সেখানে ষড়বিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম প্রজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায় চারণায় চ॥

এই কল্যাণী ব্রহ্মবিদ্যা দিতে হবে সমস্ত মানুষকে। দিতে হবে ব্রাহ্মণকে, দিতে হবে ক্ষত্রিয়কে, শূদ্রকে, বৈশ্যকে, যে আত্মীয় দিতে হবে তাকে—বাক্‌সম্বন্ধরহিত শত্রু যেজন তাকেও দিতে হবে।

বেদের এই মহান্ উদারতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তাই পরবর্ত্তী কালের অন্ধ ও যুক্তিহীন কুসংস্কারে বিহ্বল হয়ে আমরা আত্মহত্যার সুকঠোর ব্যাখ্যাই গ্রহণ করে বিদ্যা ও বুদ্ধির অবমাননা করছি। যুক্তিহীন বিচার ধর্মের পথ নয়। যে বাণী লৌকিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্কর পথ দেখাবে, যে বাণী থেকে স্ত্রী ও শূদ্রকে বঞ্চিত করা কি মহৎ পাপ নয়? এই দুর্বিনীত অহঙ্কার করবার কি অধিকার আছে আমাদের? যদি শাস্ত্রে নিষেধও থাকত, তাহলে আমাদের বলতে হত সে নিষেধ অন্যায়, তাকে মান্য করা চলবে না—আর্য ধর্মের মূল গ্রন্থ সর্বসাধারণের সম্পৎ, সর্বসাধারণের তাতে অবাধ অধিকার।

কারণ শাস্ত্র বলছেন :—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মানিঃ প্রণায়তে॥

শাস্ত্রকে মূর্খের মনোভাব নিয়ে শ্রদ্ধা করা অশ্রদ্ধা—কোনটি করণীয়, কোনটি করণীয় নয়, কর্তব্য নির্ণয়ের সেই সংশয়ে শাস্ত্রই কেবল আশ্রয় নয়, তখন যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে। যে বিচার যুক্তিহীন, সে বিচারে ধর্মের বিনাশ ঘটে।

যে যুক্তি সরল ও সহজ, তার অনুসরণ করলে আমাদের বলতে হবে বেদবিদ্যা সর্ব মানুষের। ভারতের সংস্কৃতির উদ্গম হয়েছে বেদ থেকে, বেদ অখিল ধর্মের মূল। সে বেদ অর্গলহীন। ঘৃণার বেড়া দিয়ে অপরকে প্রবঞ্চিত করবার যে বক্তব্য, সে ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ও দূষিত। বেদ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পন্থা দেখায়—কি ভাবে মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক অভ্যুদয় ঘটতে পারে, বেদই তার পথপ্রদর্শক। সেই পথের আলোক থেকে আমরা স্ত্রী ও শূদ্রকে যদি বঞ্চিত করি, সে হবে মহাপাপ, মহা অন্যায়। ধর্মধ্বজী ছাড়া অপরে এ ধরণের কথা বলতে পারেন না। ধর্মজ্ঞ মাত্রেই বলবেন—বেদ সকলের জন্য। বেদই প্রতি মানুষকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যায়, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যায়, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যায়।

পরমাত্মার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান—বেদ মানবতার ধর্মগ্রন্থ, বেদের সংস্কৃতি মানবের সংস্কৃতি। তাই ত দেখি বিবস্বান্ আদিত্য দশম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথম দিকেই বলছেন :—

যুজে তাং ব্রহ্ম পূর্ব্যান নামার্ভিবি শ্লোক
এতু পথ্যে সূতয়ঃ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি
দিব্যানি তস্থুঃ ॥

পণ্ডিতপ্রবর Griffiths ইহার অনুবাদ করেছেন :—

"I yoke with marjer your ancient
inspiration ;
may the land rise as on the mince's
hatter way.
All sons of immortality shall hear it,
all the hossersow & celestial natures.

আমি অনাদিকালপ্রবৃত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তোমাদিগকে কেমন করছি। আমার স্তোত্র মুখাবহ আহুতির ন্যায় দেবলোকে গমন করুক, হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা যারা দিব্যধামে বাস করছ, তোমরা এই অমৃতবাণী শোনো।

অমৃতের পুত্র—মানুষকে এর চেয়ে সুন্দরতম সম্বোধনে আহ্বান সম্ভবপর নয়; মরণধর্মা মানুষকে এই মর্ত্যলোকেই অমৃতত্ব লাভ করতে হবে—এই ছিল বৈদিক আদর্শ। মানুষের এই মর দেহই তার দিব্যধাম—ওগো দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ—তোমরা সকলে ব্রহ্মবিদ্যার অভয় বাণী শোনো—শোনো।

এই সমুদারতা ভুলে যেদিন অজ্ঞানের অন্ধকারে স্ত্রী ও শূদ্রকে ডোবাতে বসলাম, সেইদিন আমরা ভারতের অধঃপতন সুরু করলাম। সেইদিনই জাতির মঙ্গল ঢেকে অমঙ্গলের ঘোর ব্যবধান গড়ে উঠল। এই মৃত্যুঞ্জয় পরম ঘোষণায় আজ একান্ত প্রয়োজন। কবিগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে বলতে হবে :—

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা গতি পথে বাধা
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

কিন্তু এই যুক্তিদীপ্ত সাম্যের বাণীকে উপেক্ষা করে কেহ কেহ বলেন—"সকলেই ঈশ্বর লাভ করবে ইহা হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সকলের পথ এক নয়। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বেদ পাঠ করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার চেষ্টা করবে। অন্য সকলে ভগবানের নাম নিয়ে ভক্তিপথে অগ্রসর হবে।"

এই বাগ্‌জাল কেবল অহঙ্কারপ্রসূত নয়, শাস্ত্রের মর্মার্থ না জানার জন্যও। ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি, শাস্ত্রবিশ্বাসী এই সব মানুষের ভ্রান্তি দূর হোক—তারা সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুন, যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল, সেই সরলতা তাদের আসুক।

কিন্তু এই সব মানুষের অন্তরে প্রাণহীন ধর্ম—'ভার সম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।' সে আড়ষ্টতা সহজে দূর হবে না—ইহারা শাস্ত্রের অন্ধ অনুসরণকারী—তাই শাস্ত্রের সত্যার্থ ইহাদের জন্য প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন।

গীতা বলেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

যিনি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের উপায় শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করে যথেচ্ছাচারীরা বলেন, তিনি ইহজগতে সিদ্ধিলাভ করেন না। তিনি পৃথিবীতে সুখ এবং পরলোকে পরমাগতি প্রাপ্ত হন না। অতএব কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, নিজের বা অন্যের কল্পনাদি নহে। শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ জেনেই ইহলোকে কাজ করতে হবে অর্থাৎ নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং বিহিতের অনুষ্ঠান করতে হবে।

মনুষ্য জন্মের সার্থকতার পথ শাস্ত্রানুসরণ। আমি যাঁদের নিন্দা করছি। তাঁরা শাস্ত্রের অনুসরণ করেন, কিন্তু ভ্রান্তভাবে করেন। শাস্ত্রের কতিপয় বচন মানেন, কিন্তু অন্য বচন মানেন না। শাস্ত্রবোধের প্রধানতম উপায় যুক্তিকে গ্রহণ করেন না।

একটিমাত্র উদাহরণ তুলি—মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনার হেতু প্রদর্শনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকগুলি

আছে। ব্যাসদেব কলিকালের মানুষদিগকে ধৈর্যশূন্য, মন্দমতি, অল্পায়ু দেখে একবেদকে চারভাগ করেন।

চাতুর্হোত্রং কর্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞ সন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধম্॥ ১।৪।১৯
ঋগ্ যজু সামথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বারে উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥২০
তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনি কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাবো যজুষামৃত ॥২১
অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাস পুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥২২
ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যসন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোহ ভবন্ ॥২৩
ত এ বেদা দুর্মেধৈর্ধার্যন্তে পুরুষৈর্বঞ্চ।
এবং চকার ভগবন ব্যাস কৃপণবৎসলাঃ ॥২৪
স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এব ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিশ কৃতম ॥২৫

বেদে যজ্ঞের চারিভাগের কর্ম শুদ্ধভাবে করবার জন্য বেদব্যাস একই বেদকে চার ভাগ করলেন, এবং ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব এই চার নামে চার বেদ সংকলন করলেন। ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। পৈলকে ঋগ্বেদ পড়ালেন, জৈমিনিকে সামবেদ শিখালেন, বৈশম্পায়ন একাই যজুর্বেদে নিষগত হলেন, সুমন্ত দারুন অথর্বাঙ্গিরসে পারদর্শী হলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাসপুরাণে পাণ্ডিত্য লাভ করলেন। এইসব ঋষিরা বেদকে অনেক ভাবে গ্রহণ করলেন। এইভাবে শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা বেদের অনেক শাখা হল। অল্পমতি পুরুষগণ যেহেতু বেদের ধারণা করতে পারে না সেই হেতু ভগবান বেদব্যাস এইরূপ করলেন। স্ত্রী, শূদ্র এবং নামমাত্র দ্বিজগণের শ্রুতিগোচর হয় না, এইসব মূঢ়েরা কর্মের দ্বারা শ্রেয়ো লাভে অসমর্থ, তাই তাদের মঙ্গলের জন্য মুনি কৃপা করে ইতিহাস পুরাণ রচনা করলেন।

'স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।' এই শ্লোকার্দ্ধের মধ্যে নিষেধ অর্থ নয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত রচনাকালের সাময়িক অবস্থার নির্দেশ—তখনকার কালে স্ত্রী শূদ্র এবং নীচ দ্বিজগণ বেদ পড়ত না, তাদের মঙ্গলের জন্যই ইতিহাস পুরাণ রচনা। এই ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। ইহার অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী, শূদ্র, নীচ দ্বিজ বেদ পড়তে পারবে না।

আমার এই ব্যাখ্যাই যে গ্রহণীয় তার সমর্থন পাওয়া যাবে মহাভারত থেকে—মহাভারতে আছে যে ব্যাসের শিষ্যেরা প্রার্থনা করলেন যেন তাঁরা চারজন এবং গুরুদেব শুকদেব এই পাচজন ছাড়া আর কেহ বেদে খ্যাতিলাভ না করেন। এই বর দিলেন বটে, কিন্তু শিষ্যদের বললেন ঃ—

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানে কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তথা কার্য্যং মহৎস্মৃতম্॥ শান্তিপর্ব ৩২৭।৪৯

ব্রাহ্মণকে অগ্রে রেখে চারিবর্ণকেই বেদ শোনাবে—এইভাবে বেদ ধ্যানকে মহৎ কার্য বলে স্মৃতিতে বলা হয়েছে।

অতএব বেদ শুনবার বাধা চার বর্ণের ছিল না—এ-কথা একান্তভাবে সত্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে, ব্রহ্মবর্ত্ত দেশে পাবনী সরস্বতী নদীতীরে ঋষিগণ সত্র আরম্ভ করেছিলেন। কবষ নামে একজন লোক সেখানে ছিল—কবষ দাসীপুত্র এবং অব্রাহ্মন। ঋষিরা শূদ্র বলে তাকে ঘৃণা করে মরুভূমিতে তাড়িয়ে দিলেন। পিপাসার্ত কবষের মুখ থেকে ঋকমন্ত্র উদ্গীত হল। মন্ত্র শুনে বেগবতী সরস্বতী স্বয়ং স্রোত ফিরিয়ে কবষের কাছে এলেন। কবষের পিপাসা শান্ত হল। সরস্বতীর আশীর্বাদে কবষ ঋষি হলেন। তাঁর রচিত অপোনপ্ত্রীয় মন্ত্র সোমযজ্ঞে স্থান পেয়ে প্রাধান্য লাভ করল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যিনি রচনা করেন, তিনিও শূদ্র। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা যখন শূদ্র ছিলেন, তখন শূদ্রের বেদাধিকার নেই একথা যারা বলেন—তারা যে একান্ত ভ্রান্ত—সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

শূদ্রেরা যেমন বেদমন্ত্র রচনা করেছেন, বহু মহিলা ঋষিও তেমনই বৈদিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বেদে বহু স্ত্রী কবির নাম আছে—কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ করছি। রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, অদিতি, অপালা, ঘোষা, সূর্য্যা, যমী, সরমা, রক্ষোহা, বিবৃহা, জুহু ও বাক প্রভৃতি মহিলা ঋষিদের রচিত অনান্য মন্ত্র বেদপাঠককে অতীত কালের ব্রহ্মবাদিনীদের সাথে পরিচিত

করিয়ে দেয়। উপনিষদের যুগেও আমরা এই ঐতিহ্যের পোষকতা দেখতে পাই গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর জীবনে। পঞ্চম মকনের ২৮ সূক্তে আমরা দেখি, অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা ঋত্বিকের কার্যও করছেন।

এখন একটি তর্ক উঠানো যায় যে শূদ্রের উপনয়ন অধিকার ছিলনা, কাজেই শূদ্র বেদ পাঠে অধিকারী নয়। একথা ফেলবার মত নয়—প্রাচীন বামপন্থী সমাজের একটু পরিচয় যদি আমরা নেই, তাহলে এই ব্যাপারটি অনুধাবন করা সহজ হবে। প্রত্যেক আর্যকে দ্বিজত্বলাভ করতে হত। মাতৃগর্ভ থেকে আমাদের যে জন্ম, সে জন্ম আমাদের পশু জীবনে—সেই পশুজীবন থেকে অমৃতের অধিকারে উঠতে হলে শাস্ত্রপাঠ করতে হত—বেদ পাঠ করতে হত—সেই বেদ পাঠের অধিকারই দ্বিজত্ব। তাদের আলোকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে অজ্ঞানের তিমির অন্ধকার দূর করতে হত। আচার্যের সমীপে যাওয়ার নাম উপনয়ন। প্রত্যেক আর্য বালক আচার্যের কাছে যেয়ে কিছুদিন গুরুগৃহে বাস করত। গুরু তাকে বেদবিদ্যা দান করতেন। তারপর কয়েক বৎসর পরে শিষ্য আচার্যের কাছে সমাবর্তন নিয়ে গৃহে ফিরতে পারতেন। বেদের একনাম ছিল ব্রহ্ম। বেদপাঠী ছাত্রকে তাই ব্রহ্মচারী বলা হত এবং এই উপনীত বালকের কর্তব্যের নাম ছিল ব্রহ্মচর্য্য। সমাবর্তন শেষে গৃহে ফিরলে তখন বিবাহ করে গৃহস্থ হত। গৃহপতি বেদবিহিত ধর্মকর্ম সম্পাদন করে সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখতেন।

অতএব নৈসর্গিক মানব জন্ম নিয়েই বেদপন্থী সমাজ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাঁরা বেদ বিদ্যায় মানুষকে সংস্কৃত করে বিশুদ্ধ এবং পূতচরিত্র করে নূতন দিব্য জন্ম এবং দেব জন্ম দিতেন। এই দ্বিজন্ম যার হয়েছে—সেই দ্বিজ।

সামাজিক বন্ধন কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান। একদিন মানুষ উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ভুলে অনুষ্ঠানকে যন্ত্রে পরিণত করে—জটিল করে। উপনয়ন কালে একটা সংস্কারে পরিণত হয় এবং উপনয়নহীন ব্যক্তি আর বেদবিদ্যার অধিকার পাবেনা। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত অচলায়তন সৃষ্টি হয়নি—প্রবেশোন্মুখ বিদ্যাসমুৎসুক ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত বেদপন্থী সমাজ গ্রহণ করেছেন—তার বহু ইতিহাস আছে। পণ্ডিতপ্রবর রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের সুচিন্তিত অভিমত তুলছি। তিনি লিখেছিলেন—"ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

এই উপনয়নের অধিকার কালে মেয়েদেরও থাকেনা। কিন্তু প্রাচীনকালে মেয়েরাও উপনয়ন গ্রহণ করে আচার্য-কুলে বেদ পাঠ করতে যেতেন।

যম সংহিতায় বচন আছে :—

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥

পুরাকালে কুমারীরা উপনীত হতেন—বেদের অধ্যাপনা করতেন এবং গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন।

শূদ্ররা শূদ্র হিসাবে উপনীত হতেন না, কাজেই শূদ্রত্ব স্বীকার করে বেদবিদ্যার অধিকার পাওয়া দুরূহ ছিল। কিন্তু আমরা একথা যেন ভুলে না যাই যে বেদকে বা বিদ্যাকে যারা ত্যাগ করেছিলেন, তারাই শূদ্র। বশিষ্ঠ সংহিতায় এই ভাবটি বিশেষ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :—

বেদ সন্ন্যানতঃ শূদ্রঃ তস্মাৎ বেদং ন সন্নস্তেৎ।

তারাই শূদ্র যারা বেদকে উপেক্ষা করেছেন, ত্যাগ করে-ছেন, অতএব বেদকে পরিত্যাগ করতে স্মৃতিকার বারংবার বারণ করেছেন।

বশিষ্ঠের এই কথার সাথে মহাভারতের এই সমুদার বাণী তুলনা করতে বলব।

সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মজাশ্চ সর্বে, নিত্যং ধ্যাহংস্তে চ ব্রহ্ম।

সমস্ত বর্ণই ব্রাহ্মণ, সবই ব্রহ্মজাত—সবই বেদ উচ্চারণ করেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রে যেথানে প্রতিষেধ তাকে যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারব—ব্রহ্মবিদ্যার অমৃত উৎস বেদের দ্বার শূদ্রের জন্য বন্ধ ছিল না। কেবল যেথানে সামাজিক দুর্দৈবের কারণ প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শূদ্র নিজেই জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ ছিল সেথানেই বেদবিদ্যা অর্জনে তার বাধা ছিল।

কিন্তু যখনই বেদজ্ঞান জানতে তার জিজ্ঞাসা জেগেছে—

তখনই তাকে সত্য ও কল্যাণের অমৃত মন্ত্র অবারিত আহ্বানে প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রে উৎকট ধর্মধারীদের প্রক্ষিপ্ত বচন কিছু কিছু আছে। এইসব আকষিত বচনে বলা হয়েছে শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে তাহলে তার কর্ণের ছিদ্র সীসা দিয়ে বা জতু দিয়ে পূর্ণ করে দিতে হবে। শূদ্র যদি বেদবাণী উচ্চারণ করে তাহলে তার জিহ্বা ছেদন করতে হবে।

কিন্তু এই প্রক্ষিপ্ত বচনকে উপেক্ষা করে আমাদের স্মরণ করতে হবে কবষ ঋষির কথা। স্মরণ করতে হবে ঐলুষের কথা—স্মরণ করতে হবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতায় কথা—আর সর্বোপরি স্মরণ করতে হবে বেদানুশাসন। "পৃথিবীর সকল মানুষকে আর্য্য করে তোলো।"

কেহ কেহ বেদান্তদর্শনের কথা তোলেন আর বলেন—ব্রহ্মসূত্র স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে শূদ্রের বেদাধিকার নেই। একথা ঠিক যে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৪—৩৮ সংখ্যক সূত্রে শূদ্রের বেদাধিকার নিরাকরণ করা হয়েছে।

কিন্তু বেদান্তদর্শন যদি ভগবান বেদব্যাসেরই রচিত হয়, তাহলে বলতে হয় তাঁর মহাভারতের অনুজ্ঞার সাথে ব্রহ্মসূত্রের একান্ত বিরোধ ঘটছে। এই বিরোধের সর্বোত্তম মীমাংসা যে এই সূক্তগুলি প্রক্ষিপ্ত।

এ আমাদের গায়ের জোরের কথা নয়। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায় সমন্বয়-অধ্যায়। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বলে যে প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসুর মনে জাগানো হয়েছে, তাতে সন্দিগ্ধ শ্রুতিসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় দর্শনই লেখকের উদ্দেশ্য—কাজেই তৃতীয় পাদে শূদ্রের বেদাধিকার বিচার একান্তভাবে অপ্রাসঙ্গিক। পরম সৎ পদার্থের নির্ণয় যেখানে লক্ষ্য, সেখানে এই অবান্তর প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই মূলের সূক্ত নয়। পরবর্তী সূক্তে পুনরায় লেখক বক্তব্য, বিষয় ও কথায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বেদবিদ্যা বৈশ্বানর বিদ্যা—বৈশ্বানর অগ্নি। অগ্নি পুরোহিত—সমস্ত কল্যাণকর্ম তাঁর অধিকারে—তিনিই যজ্ঞের দেবতা তিনিই হোতা নামক ঋত্বিক, তিনিই দেবগণকে আহ্বান করে যজ্ঞস্থলে ডেকে আনেন। তিনিই হব্যবহ—দেবগণের জন্য হব্য বহন করে নিয়ে যান। অগ্নিমুখে দেবতারা খাদ্যগ্রহণ করেন, তাই অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। জ্যোতিঃস্বরূপ সেই অগ্নিকে নমস্কার। কিন্তু বৈশ্বানর ত শুধু অগ্নি নয়, তিনি বিশ্বজনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—তিনি বিশ্বমানবের দেবতা—সেই বৈশ্বানরকে বেদবিদ্ নিত্য পূজা করেন এবং সেই নিত্যপূজায় বিশ্বমানবের ঐক্য ও সঙ্গতি কামনা করেন।

ঋগ্বেদ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এই বিশ্বমৈত্রীর উদাত্ত বাণী ঝঙ্কৃত হয়েছে—

ঋষি বলছেন ঃ—

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বানর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যাস স নো বসূন্যা ভর ॥১॥১
সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথাপূর্বে সং জানানা উপাসতে ॥২
সমানো মন্ত্রঃ সমিধে সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥৩
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৪

মানুষের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন—প্রতিনিয়ত হানাহানি ও সংগ্রাম তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অন্যকে বঞ্চনা করে নিজের স্বার্থসাধন, পরের জীবন হনন করে নিজের প্রাণরক্ষা—এই ত তার কাম্য। কিন্তু এই পাশব জীবনে কোনও গৌরব নেই। বৈদিক ঋষি জীবনের সম্পূর্ণ উল্টা তাৎপর্য দিয়াছেন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকর্মকে বৃহৎ ভূমায় পরিব্যাপ্ত করতে বলেছেন, বিশ্বের জীবনের সাথে সামঞ্জস্য করে বিশ্বরূপ বৈশ্বানরের সেবা করতে বলছেন।

যে অনবদ্য মন্ত্রটি চয়ন করেছি সেই মন্ত্রের ঋষি সংবসন। তিনি বলেছেন ঃ "হে দেব বৈশ্বানর! তুমি সর্বকামদাতা, তুমিই পরমেশ্বর। তুমিই সমস্ত ভোগ্যবস্তু দেবগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতেছ উত্তরবেদিতে আরোহণ করে তুমি ঋত্বিকগণের হস্তে সন্দীপিত হয়েছ, হে জ্যোতির্ময়, তুমি আমাদিগের জন্য প্রাপ্তব্য সমস্ত ধনসম্পদ সমাবেশ কর। হে বিশ্বজন! তোমরা সকলে একই পথে চল, একই কথা বল, পরস্পরের বিরোধ পরিত্যাগ কর। তোমাদের মন এক হোক—দেবতারা যেমন পূর্বে সম্মিলিত হয়ে যজ্ঞভাগ করেছিলেন, তোমরাও তেমনই বৈপরীত্য ত্যাগ কর।

তোমাদের মন্ত্র একবিধ হোক, তোমাদের সমিতি এক হোক, তোমাদের অন্তঃকরণ একবিধ হোক, তোমাদের বিচারক জ্ঞান ঐক্যলাভ করুক। তোমাদের আহুতি একই মন্ত্রে হোক, তোমাদের হবিঃ একই হোক। তোমাদের সংকল্প ও অধ্যবসায় একবিধ হোক, তোমাদের হৃদয় পারস্পরিক প্রীতিতে সমৃদ্ধ হোক, তোমাদের মন এক হোক, তাহলে তোমাদের সম্মেলন শোভন হবে।

ভাবলে কি আনন্দই হয়, যে কত পুরাতন দিনে আমাদের পিতামহরা বিশ্বমানবের এই সৌহৃদ্য, এই সহমর্মিতা কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের বিশ্ববোধ এক অনুপম বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ছিল। সমগ্র মানবের মানবিকতায় দীপ্ত মা সপরিমণ্ডলে তাঁরা নিজেদের গড়তে চেয়েছিলেন। ঐশ্বর্যশীল মানবসত্তাকে তাঁরা চরম মূল্য দিয়েছিলেন। মানবচরিত্রকে তাঁরা আর্য করতে চেয়েছিলেন—সেই বিশাল পরিধি থেকে কেউ বঞ্চিত ছিল না—তাই ত তাঁরা সোৎসাহে বলতে পেরেছিলেন ঃ—

সমানমিন্দ্রম্ অবসে হবামহে বসবানং বসূজুবম্। ৮।৯৯।৮

সেই পরমকে আহ্বান করি, যিনি সমান, যাঁর করুণায় সকলের তুল্য অধিকার, তিনি সকলকে দেন ধন---তিনিই বাসব। ভগবান্ ত দ্বিজাতির নয়, সর্বজাতির, সর্বমানবের। তিনি ত সকলের প্রাণের ধন।

ইন্দ্র সাধারণঃ ত্বম্।

হে ইন্দ্র, তুমি সকলের, সর্বসাধারণের।

দেবতার যে পূজা সে সকল মানুষের আরাধনায় অন্তহীন দিগন্তে প্রসারিত হয়ে চলে। বিশ্বের বিরাট মানব পরিবারের সকলই সেই মহান দেবতার অর্ঘ্য সাজায়, তাইত প্রার্থনায় পাই ঃ—

য ঋষ্বঃ শ্রাবয়ৎ সখা বিশ্বেৎস বেদ জনিমা পুরুষ্টুতঃ।

৮।৪৬।১২

তং বিশ্বে মানুষা যুগেন্দ্রং হবন্তে তবিষং যতস্রুবঃ॥

যিনি দর্শনীয়, ঋত্বিকগণ যাঁর সখা, তিনি যে সবই জানেন, সবাই তাঁকে স্তব করে, সমস্ত মানুষ অর্চনা দিয়ে তাঁর পরম সহায়তা যাজ্ঞা করে। বলবান্ ইন্দ্রের উপাসনা—বিশ্বে মানুষা—কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নয়, সর্বদেশের সর্ব জাতির মানুষ।

বেদের সাধনা অমৃতের সাধনা। সেই সাধনার পথিককে যে ভাবনা প্রত্যহ ভাবতে হয় সে সর্বগত আত্মার ভাবনা—তাইত তাঁর আত্মীয়তা কেবল মানুষে নয়—সর্বভূতের মাঝে অজস্রতায় অভিব্যক্ত—তাই ত সর্বভূতে আপনাকে দর্শন করে তিনি সমস্ত জুগুপ্সা থেকে পরিত্রাণ পান। ঘৃণায় অচলায়তন গড়ে যারা বেদবিদ্যার মধুধারাকে সংকীর্ণ করতে চান; সেই সব ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষদের কাছে বারংবার বেদের উদার সমদৃষ্টির ও মৈত্রীর কথা বলা প্রয়োজন—যে সাম্যবোধ অধ্যাত্ম সাধনায় এবং ব্রহ্মবোধে ভাস্বর—সেই সাধনায় তাঁরা বলতে পেরেছিলেন ঃ—

দৃতে দৃংহ মা, মিত্রস্য মা চক্ষুষ।

সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য

চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥ যজু ৩৬।১৮

জরাজর্জরিত শরীরে হে মহাবীর তুমি দাও দৃঢ়তা—আমি যেন সমস্ত কর্ম অচ্ছিদ্র হয়ে করতে পারি। কি ভাবে আসবে এই দৃঢ়তা? এই পৌরুষ? এই সাফল্য? আসবে মৈত্রী ভাবনার পোষণে। আমি যেন মিত্রের চোখ দিয়ে সমস্ত ভূতবর্গকে দেখতে পারি। সকল ভূতও যেন আমাকে পরম সখ্যে অবলোকন করে—পরস্পরের এই অদ্রোহে, এই মৈত্রীতে যেন পরস্পরকে দেখতে শিখি।

এই বিপুল হৃদয়বত্তা যাঁদের, এই সর্বাতিশায়ী প্রেম যাঁদের, তাঁরা শূদ্রকে ঘৃণা করে দূর করতেন—একথা যেসব মন্দমতি বলতে চান বলুন, কিন্তু যাঁদের প্রাণ বেদবাণীর আলোকে আলোকিত, তাঁরা হৃদয়ের সমস্ত আচরণ দূরীভূত করে আপন উদাররূপ প্রকাশ করেন—এখানে একটি মাত্র মন্ত্র—সে মন্ত্র হল—

যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্।

মানুষকে আমরা খণ্ডিত করে দেখব না, ভেদ ও বিভেদের বৈষম্য দিয়ে ছোট করবনা, আমাদের অন্তরে তাবৎ পৃথিবী খুঁজে পাবে একটি নীড়।

অতএব আসুন বন্ধুগণ, সর্বমানবের জয়ধ্বজা উড্ডীন করে আমরা বেদের অমৃত আহ্বান শুনি—বিশ্বমানবের মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করি—অন্তরে বাহিরে শুচিসুন্দর হয়ে মানবিক মাহাত্ম্যের বিকাশে যত্নবান হই। মনে আমাদের ব্রহ্মভাবের প্রসার করতে হবে—আমিত্বের প্রসার করতে হবে—যে বৃহৎ ভূমার অনুভূতি সত্যতর

ব্রহ্মানন্দে হৃদয়কে উন্নীত করে, সেই ভূমাকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু বলতে হবে—বলার স্নানেই সব বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা—ভগবান্ পথিক বন্ধু—পান্থজনের তিনি সখা, পথে চলাই তাঁকে পাওয়া। ঘরের আড়ষ্টতা মানুষের নয়—তার জন্য রয়েছে বিপুলা পৃথিবী—সেই বিশাল পৃথিবীতে "উরুং লোকং" নিয়েই হবে আমাদের লেনাদেনা। এই বিস্তারের উপাসকেরা গোঁড়ামির তত্ত্ব জানতেন না—আজ যারা ক্ষীণদৃষ্টি অল্পগতা হয়ে আমাদের হৃদ্যতার প্রসারতাকে ক্ষুন্ন করেছেন—তারা কুলাঙ্গার—তারা ভারতবাসীর চিন্ময় জীবনবাদকে বীভৎস এবং ঘৃণ্য করে তুলেছেন।

বিপুলা পৃথ্বী ত কেবল ভারতীয়ের নয়—সর্ব জাগতিক সর্ব মানুষের। নানাকর্মা, নানাধর্মা সেই মানুষের স্পর্শকে এড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে যারা নীচতার প্রাচীর তুলতে চান, বারংবার সেই প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—তবু তাদের জ্ঞান হয় না। বেদ মানুষকে ডাক দিয়েছে দেবজন্মের পানে। দেবতাদের কল্যাণ ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের দেবসখা হতে হবে। সেই দিব্য জীবনের অধিকার সকলের।

মানুষ যেখানে অন্য মানুষের সাহচর্যে সব মানুষের ঐশ্বর্য্যের অধিকার লাভ করে, তখনই সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে পূর্ণতার আস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করে। বিশাল মানব-পরিবারে মানুষেব জন্ম, সেখানেই তার নির্ভর আশ্রয়। সেখানেই মানুষের হাসি-কান্নায় সে অংশীদার, মানুষের সৃষ্টির, মানুষের ইতিহাসের, মানুষের বিবর্ধনের অংশী হয়েই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। সেই ক্ষেমঙ্কর মিলনের বাণীই বেদের অনুশাসন। আমাদের চিত্তে সেই উদার মানবতার উদ্বোধন ঘটাতে হবে। নিঃকবি কাশ্যপের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের বলতে হবে—দৃপ্তকণ্ঠে, সমন্বয় ও মিলনের আকৃতিতে উদ্বেল হয়ে—

ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ
কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্
অপঘ্নন্তো অরাব্ ণঃ॥

যাঁরা কর্মচঞ্চল তাঁরা ইন্দ্রের মহিমাবর্ধন করুন—সেবা সমৃদ্ধ কর্মে—সমস্ত বিশ্বকে আর্য করে তুলুন—আর অযাজ্ঞিক অধার্মিকদিগকে বিনাশ করুন।

আমাদের পিতামহদের অনুজ্ঞা—সমস্ত জগতকে ভারতের অমৃত ব্রহ্মবিদ্যার আলোক দিয়ে আলোকিত করতে হবে। আমাদের জগজ্জয়ে অভিযান করতে হবে-কিন্তু অস্ত্রের ঝঞ্চনায় নয়, মৃত্যুর বান হস্তে নয়—আমরা নিয়ে যাব দিকে দিকে দেশে দেশে প্রেমের অভয় মন্ত্র, জগৎকে দেব অভয় আনন্দ—দেব সমপ্রাণতর অমৃত।

অজ্ঞান তিমির অন্ধকারে আমরা আনব আলোক—অসত্যের মাঝে আনব সত্যের বজ্রদ্যুতি—মৃত্যুর মাঝে আনব অমর সঞ্জীবন। সেই খানেই ভারতবর্ষের সত্য, শাশ্বত চিন্ময় পরিচয়।

পরস্পর কোলাহল ও হানা হানিতে ব্যস্ত বিশ্বজগতে আমরা নিয়ে যাব ঐক্যের উদার অনুভব, তাহলে সমস্ত গ্লানির অন্তরালে বেড়েই উঠবে অমৃতের আনন্দ। আমরা ত লড়াই করে অপরকে অধীন করব না। ভালবাসায় আপনাকে সকলের দিকে উৎসর্গ করে ত্যাগের মধ্যেই অমৃতের সার্থকতা অর্জন করব। তাইত প্রার্থনা করব—

বিশ্বাপি দেব সবিতঃ দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব—

হে জ্যোতির্ময় কনকোজ্জ্বল দেব সবিতা—তুমি তোমার আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও, আমাদের যত কিছু অমঙ্গল, পাপ ও দুরিত, সবই তোমার কিরণে দূরদূরান্তরে বিলীন হয়ে যাক, যা মঙ্গল, যা সুন্দর, যা শুভ্র ও বিমল, তাই আমরা গ্রহণ করব।

ঘৃণায় যাদের হৃদয় মরুভূমি হয়ে গেছে—তারা বৈদিক মৈত্রীয় মহামন্ত্রটি জপ করুন—তাহলে তাদের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যেরি রস বৃষ্টি হবে—যেখানে অরণ্য সেখানে পুষ্পিত কানন জেগে উঠবে। আসুন গৃৎসমদেব সাথে স্তব করি :—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, কবিং কবীনামু বা
মস্ত্রবস্তমং
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃন্বন্নুতিভিঃ
সীদ সাদনং॥ ২।২৩।১

তোমাকে প্রণাম করি, তুমি যে জনগণের পতি, তুমি কবিদের মাঝে মহৎকবি, সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের জ্যেষ্ঠ এবং সম্রাট, তোমার করুণায় আমাদের কথা শোনো—আমাদের হৃদয় শতদলে তোমার আসন প্রতিষ্ঠা করি।

তুষের আগুন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার আধুনিক কালের একটি দোতলা বাড়ির একতলায় দেড়খানি ঘর। আর তাইতেই কী আর এমন ঘরদোর! কেমন ছিমছাম সংসার। স্বামী, স্ত্রী আর একটি কোলের বাচ্চা। আর সংসারের একজন বাড়তি লোক, ঝিকে ঝি, রাঁধুনীও বলা যায়।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রোজগার করে। দশটা-পাচটা অপিস দু'জনের। এক সঙ্গেই খেয়ে-দেয়ে একই ট্রামে কিংবা বাসে যায়। আসেও প্রায়ই এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে শুধু ব্যতিক্রম। ছেলেটি হয়তো দেরি করে ফিরলো। কিন্তু একটিমাত্র সন্তানের জননী, মেয়েটি তাই দেরি করতে পারে না। হাজার হোক্—মায়ের মন।

সামনের বাড়ির একতলার ছোট দেড়খানি ঘরের একটি ফ্লাটে ভাড়া এসেছে এই কিছুদিন আগে। কিন্তু এসেই পাড়াশুদ্ধ মাতিয়ে রেখেছে। ভারি ছিমছাম সংসার। অভাব নেই, স্বভাবে মাধুর্য,—স্বামী আর স্ত্রী। বেশিদিন বিয়ে হয়নি। একটি ছেলে হয়েছে বটে, কিন্তু গানের সুরে প্রাণের মিলন।

বয়স্থা একজন স্ত্রীলোক, রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বাজার-হাট করা আর বাচ্চাটাকে সামলানো—এদিক থেকে সংসারের কোন ঝক্কিই পোওয়াতে হয় না, তরুণবয়স্ক স্বামী এবং স্ত্রী—সামনের বাড়ির সুখী দম্পতিকে।

তাই প্রতিটি সন্ধ্যায় তকতকে ঘরে ঝকঝকে বিছানা, একটি নরম সোফায় দুজনা পাশাপাশি বসে কলগুঞ্জরণ, ঘরে নীল আলো জ্বেলে কাব্য পাঠ কিংবা রেডিওর সুরে সুর মিলিয়ে গানের গুণগুণানি—এতে বিস্মিত হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

কিন্তু ঈর্ষ্যা করার কারণ আছে যথেষ্টই। আর সে ঈর্ষ্যা শুধু আমাদের সংসারে কেন, পাড়ার আশপাশের সকল সংসারেই তুষের আগুন জ্বালায়।

অপিস থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কালিঝুলিমাখা মূর্তি আর ময়লা শাড়িখানি দেখে যখন সামনের বাড়ির বৌটিকে উপমা স্বরূপ দাঁড় করাই, গৃহিণী তখন হুমকি দিয়ে বলেন, 'আধ ডজন ছেলেমেয়ের মায়ের অমন কচি-খুকির মতন বেহায়াপনা সাজে না। আর অতই যখন কপোত-কপোতীর সাধ, তখন গোনাগুষ্টি নিয়ে সংসার করতে নেই। রোজগেরে মেয়েদেখে জাত খুইয়ে ওই রকম প্রেমের বিয়ে করলেই তো পারতে!' বুঝলাম, সামনের ফ্লাটের ছোট সংসারটির ইতিহাস এবাড়ির গৃহিণীর জানা হয়ে গেছে। তবু বললাম, পুষ্যি বেশি হলেও রোজগার তো কম নয়। অভাব সেখানে নয়, অভাব স্বভাব।' গৃহিণী এ-কথায় যে-মন্তব্য করলেন, তা আর না বলাই ভালো।

সকাল বেলাতে হৈচৈ এ ঘুম ভেঙে গেলো। সামনের একতলার ফ্ল্যাটের ঝিটি তার স্বরে চীৎকার করছে। শিশুটিও কাঁদছে। গৃহিণী এসে বললেন, 'শুনছো! ও বাড়ির বৌটি সুইসাইড করতে গিয়েছিলো। ডাক্তার এসে পড়ায় এ-যাত্রা বেঁচে গেলো!'

বিস্মিত হলাম—'ব্যাপার কী?'

'অবিশ্বাস। স্বামিটি নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতো। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে?'

'সে কী?'

'হ্যাঁ।'

'এর আগেও অনেক যাচ্ছে-তাই ব্যাপার ঘটে গেছে। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি, আত্ম-হত্যার মহড়া।'

'কোথেকে জানলে এ-সব ব্যাপার?'

'একী আর জানতে হয়? হাওয়ায় ভেসে আসে।'

স্ত্রীর কাছে শুনলাম, সামনের বাড়ির ঝিটি সবই ফাঁস করে দিয়েছে রাগের মাথায়।

বাজারের পথে শুনলাম, পাড়ার এই নিয়ে খুবই জটলা। অনেক গুপ্ত রহস্য এরই মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে। পাড়ার ডাক্তারই বলছিলেন—'দিস্ ইজ্ দি থার্ড টাইম। এবার মশাই স্পষ্টই বলে এসেছি, ডাকতে এলে আর যাবো না। শেষ কালে কী পুলিস কেসে পড়বো?'

ডাক্তার ঘটনা সব জানেন। এর আগেও ওদের চিনতেন। বললেন, 'নিকে-করা বউ হলে কী হয়? মেয়েটি কিন্তু ভারি সিনসিয়ার।'

'নিকে-করা বউ মানে?'

'মানে, মেয়েটির প্রথম বিবাহ অত্যন্ত বেদনার। সে বিয়েও হয়েছিলো লভ-ম্যারেজ। অসচ্চরিত্র একটি পাষণ্ডের হাত থেকে ওই ছেলেটিই মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পূর্বের স্বামীকে ডাইভোর্স করে একে বিয়ে করে মেয়েটি ভেবেছিলো এই বার সে স্থায়ী সুখের সন্ধান পাবে। কিন্তু তা হলো না।'

'হলো না কেন?'

'সে লোকটি এখনো আসে। অনুনয়-বিনয় করে মাঝে-মাঝে টাকা-কড়ি নিয়ে যায়। এ-পক্ষের স্বামী তা সহ্য করতে পারে না।'

'তা তো না পারবারই কথা। মেয়েটি সে-লোকটিকে প্রশ্রয় দেয় কেন?'

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'সে আর এক ইতিহাস মশাই!'

আমরা সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'বলুন না, শুনি!'

ডাক্তার বললেন, 'পূর্বের স্বামীর প্রতি মেয়েটির আর কোনো আকর্ষণ নেই বটে, কিন্তু সে-লোকটা আবার আর একটি মেয়েকে ফাঁসিয়েছে। তারো গোটাদুয়েক ছেলে-মেয়ে। এ-মেয়েটি সেই মেয়েটিকে অনুকম্পা করে কিছু কিছু সাহায্য করে। আর তাই নিয়েই বিরোধ। ছেলেটি তা বোঝে না, ওর ধারণা মেয়েটির এখনো দুর্বলতা আছে তার আগের স্বামীর প্রতি। ছেলেটিও তাই কিছুদিন হলো একটি মেয়ের প্রতি ঢলেছে। বড় কম-প্লিকেটেড কেস মশাই। যাই হোক্, মেয়েটি যে-পরিমাণে বিষ খেয়েছিলো, তা বার করে দিয়েছি। এখন আর মৃত্যুর ভয় নেই। কিন্তু আমি আর এদের কেস দেখতে আসবো না। কী জানি, কোনদিন কী ফ্যাঁসাদে পড়ি!'

ডাক্তার চলে গেলেন। আমিও বাজারের দিকে অগ্রসর হলাম।

বাড়ি ফিরবার পথে দেখি সামনের বাড়ির একতলার দেড়খানি ঘরের কোলাহল থেমে গেছে। একটি শান্ত এবং সমাহিত ভাব। ঝিটির কোলে শিশুটি পরমানন্দে হাসছে। বৌটি একটি খাটে শুয়ে—স্বামীটি তার শিয়রে বসে। মাথায় হয়তো ওডিকলোনের জলপটি দিচ্ছে। টেবিল-ফ্যানটি দ্রুতগতিতে ঘুরছে। আর সেই হাওয়ায় টেবিলে রাখা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা মৃদু মৃদু কাঁপছে। বাড়ি ঢুকে বাজারের থলিটি রাখতে গৃহিণী বললেন, 'মরণ আর কী? কতো ছেনালি-পনাই না দেখলাম! একটু আগে এই মরতে যাওয়া, আবার এক্ষুণি রজনী-গন্ধায় ঘর সাজানো!'

স্ত্রীর কথার আর কোনো প্রত্যুত্তর দিলাম না। কিন্তু নিজের সংসারের নিরঙ্কুশ জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দ গতিতেও সুখী হতে পারিনা কেন?

মহাভারতের যুগে ভারতের লোক-সংখ্যা

একটা আঁচ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

মহাভারতের যুগে ভারতেব লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা ত দূরের কথা, একটা মোটামুটী আন্দাজ করাও শক্ত। প্রথমেই কথা উঠে তখনকার দিনে ভারতবর্ষ কতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল? ভারত যে কাবুল বা আফগানিস্থানের হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দক্ষিণ অবধি বিস্তৃত ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০০০ খৃঃ অঃ অবধি কাবুলের হিন্দু নরপতি ছিল। পশ্চিম তিব্বতেরও কিছু অংশ ভারতভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব চীনের দিকে কতদূর অবধি ভারতের বিস্তৃতি ছিল তাহা বলা যায় না, তবে কামরূপ, মণিপুর ছাড়াইয়া যে বিস্তৃত ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ভারতের সব অঞ্চলের লোক কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল? কিছু কিছু জাতি বা জায়গা এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। যাদবগণের বেশীর ভাগই নিরপেক্ষ ছিলেন, যদিও শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ মহাভারতের যুগ আজ হইতে কত বৎসর আগে? হিন্দুমতে দ্বাপরের শেষে কলিযুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এমতে ৩১০২ খৃঃ পূঃ যুদ্ধের সময় হয়। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় ও বহু দেশীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আন্দাজ ১৫০০ খৃঃ পূঃ এ হইয়াছিল। আমরা উপস্থিত-মত এই শেষোক্ত মতই মানিয়া লইলাম।

অনেকে বলেন যে মহাভারত কবি-কল্পনা। আবার অনেকে বলেন যে মহাভারতের ঘটনাবলির মূলে কিছু সত্য আছে; কিন্তু তাহার উপর যুগে যুগে বিভিন্ন কবি রং চড়াইয়া এমন করিয়াছেন যে—মূল যে কি ছিল তাহা ধরিবার উপায় নাই। হোমারের ইলিয়াড সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিযোগ শুনা যাইত। পরে শ্লীমান যখন ট্রয় খুঁড়িয়া প্রায়াসের যুগের সহর আবিষ্কার করিলেন, তখন ইলিয়াডের গল্প যে ঐতিহাসিক সত্য তাহা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এখন ইলিয়াড কাব্য হইলেও উহার মূলে যে সত্য আছে একথা আর কেহ অস্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অভিযোগ করিতেন যে জনশ্রুতি ছাড়া কৌরব রাজধানী হস্তিনাপুর যে কোথায় তাহার কোনও প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি গঙ্গার পলিমাটী চাপা মহাভারতের যুগের হস্তিনাপুরের দেওয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে যে দেওয়ালের ইটসমূহ কিছু ঘুরিয়া গিয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা মহাভারতের ঘটনা সত্য ধরিয়া লইলাম।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসিয়াছিল। সে মতে এই সেনা সমষ্টি হইতেই ভারতের লোক-সংখ্যার একটা মোটামুটী আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। উত্তর-ভারতে, বিন্ধ্যগিরির উত্তরকে আমরা উত্তর ভারতবর্ষ বলিতেছি—আর্য্য-অধ্যুষিত জায়গা হইতে যে পরিমান লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, দাক্ষিণাত্য হইতে কি সেই পরিমাণ লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল বা করিতে পারিয়াছিল? কন্যাকুমারিকা হইতে কুরুক্ষেত্রের দুরত্ব ১৪০০ মাইল, মধ্যে বহুজঙ্গলাকীর্ণ বিন্ধ্যগিরি। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে কুরুক্ষেত্রের দূরত্ব ১০০০ মাইলের কম। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত দুর্য্যোধনের শ্বশুর।

খুব সম্ভবত উত্তর ভারতের যে পরিমাণ সবলকায় লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল দক্ষিণ

ভারতের সে পরিমাণ লোক যুদ্ধে যোগদান করে নাই। দূরত্ব, পথের দুর্গমতা, আর্য্যসভ্যতার প্রসারের অভাব ও রাজাদের তাদৃশ আগ্রহের অভাব ইহার হেতু হইতে পারে।

আমরা ধরিয়া লইলাম যে উত্তর-ভারতের যে পরিমাণ লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ লোক দাক্ষিণাত্য হইতে যোগদান করিয়াছিল। আমাদের এই অনুমান যে সঙ্গত বা সত্যের কাছাকাছি তাহা পরে দেখাইব।

এক অক্ষৌহিনী সেনা বলিতে ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক; ৬৫,৬১০ জন অশ্বারোহী; ২১,৮৭০টী হাতী ও ২১,৮৭০টী রথ বুঝায়। রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক লইয়া হয় চতুরঙ্গ বল। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার মিলিটারী হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন যে পৌরব বা পুরু খৃঃ পূঃ ৩২৭ সালে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করেন, তখন প্রত্যেক রথে ৬ জন করিয়া যোদ্ধা ছিল এবং প্রত্যেক হাতীতে ৪জন করিয়া যোদ্ধা ছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার আরলি হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের ৭০০,০০০ সৈন্য ছিল; রথে অন্তত পক্ষে ৩ জন করিয়া যোদ্ধা ও হাতীতে ৪জন করিয়া যোদ্ধা ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৫০০ খৃঃ পূঃ এ হইলে ইহা ১২০০ বৎসর পরের কথা।

হিন্দুদের রণকৌশল সহজে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; পুরাতনের প্রতি একটা মোহ আছে। সেজন্য আমরা ধরিয়া লইলাম যে প্রত্যেক রথে ও প্রত্যেক গজে ৪ জন করিয়া যোদ্ধা ছিল। এমতে এক অক্ষৌহিনী সেনাতে নিম্নের হিসাব মত লোক ছিল। যথাঃ—

১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক বা ধাম্নুকী	১,০৯,৩৫০ জন
৬৫,৬১০ জন অশ্বারোহী	৬৫,৬১০ জন
২১,৮৭০ গজে ৪ জন করিয়া	৮৭,৪৮০ জন
২১,৮৭০ রথে ৪ জন করিয়া	৮৭,৪৮০ জন
	মোট :—৩,৪৯,৯২০ জন করিয়া যোদ্ধা

এমতে ১৮ অক্ষৌহিনীতে ৬২,৯৮,৫৬০ জন যোদ্ধা। এক কথায় ৬৩ লক্ষ লোক। মোট হাতীর সংখ্যা ৩,৯৩,৬৬০টী। তখনকার দিনে কি এত হাতী ছিল? না ইহা কবি-কল্পনা। হিউয়েন সাঙ্গ খৃষ্টিয় ৭ম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলেন যে হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্বে ৫,০০০ হাতী ছিল, পরে ইহার সংখ্যা বাড়াইয়া তিনি ৬০,০০০ যুদ্ধের হাতী করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য উত্তর ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; ইহা 'হাতীর আড্ডা' আসাম, উড়িষ্যা বা মহীশূর অবধি বিস্তৃত ছিল না। পরিমাণে তাঁহার সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ। সমগ্র ভারতের তখনকার দিনে ২ লক্ষ হাতী থাকা খুবই সম্ভব। মহাভারতের যুগে, অর্থাৎ ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে আরও বেশী হাতী থাকা খুবই সম্ভব। এজন্য আমরা এই পরিমাণ হাতীর সংখ্যা কবির কল্পনা নহে, বাস্তবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁহার ধনুর্বেদে লিখিয়াছেন "এক এক গজে ১জন অঙ্কুশধারী, ২জন ধনুর্ধারী ও ২ জন খড়্গধারী আরোহণ করিবে।" "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রথ ইত্যাদি।" এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

যুদ্ধ করিবার মত সামর্থ্য আছে এইরূপ বয়স সাধারণতঃ ২০ হইতে ৩৫ ধরা হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ বয়সের লোকের অনুপাতে গত ৫টী সেন্সাসে এইরূপ দেখান হইয়াছে:—

প্রতি ১০,০০০ পুরুষে—

বয়স	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
২০-২৫	৮৯১	৭৭৫	৮২২	৭৮৭	৮০২
২৫-৩০	৮৭৭	৮৬৫	৮৯৬	৮৭৯	৮৭৬
৩০-৩৫	৭৭০	৮২৫	৮২৯	৮৪৮	৮৪২
২০-৩৫	২,৫৩৮	২,৪৬৫	২,৫৪৭	২,৫১৪	২,৫২০

সর্ব্ব গড়:—২,৫১৭

পুরুষ ও নারীর সংখ্যা স ান সমান ধরিলে এই অনুপাত ইহার অর্দ্ধেক ১২৫৮এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ শতকরা ১২'৬ জন যুদ্ধ করিবার সামর্থ্যের বয়সের লোক। মোটামুটি যুদ্ধ করিবার বয়সের লোক: সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাত ১ : ৮ হয়।

মহাভারতের যুদ্ধে অভিমন্যুর বয়স ১৬, ভীষ্ম, দ্রোণের বয়স ৮০ র উপর। যুধিষ্ঠিরাদির বয়স ৩৫ এর ঢের উর্দ্ধে। কিন্তু রাজা বা ক্ষত্রিয় বীরের প্রতি যাহা প্রযোয্য জন-সাধারণের পক্ষে তাহা প্রযোয্য নহে। অভিমন্যু, ভীষ্ম,

দ্রোণাদির বয়স আমরা সাধারণের ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিয়া লইলাম। ইঁহারা সকলেই মহারথী। মহারথীদের হিসাব ধরিয়া রথীদের বা সাধারণ অশ্বারোহী বা ধানুকীদের বিচার করা সঙ্গত নয়।

আলেকজাণ্ডার মল্লি বা মল্লইদের এক সহর অবরোধ করেন। এই সহরের লোকেরা যখন যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত বলিয়া জানিতে পারিল, তথন নিজেদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ আগুনে ঝাঁপ দিল। এইরূপে ২০,০০০ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিল। দুর্গের মধ্যে যাহারা ছিল তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল ; অবশেষে তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। এইরূপ লোকের সংখ্যা ৩,০০০। মোট লোক-সংখ্যা ২৩,০০০ হাজারের মধ্যে ৩,০০০ হাজার যোদ্ধা। এ হিসাবে যোদ্ধার সংখ্যা : জনসংখ্যা=১ : ৭৬৭ কিংবা মোটামুটি ১ : ৮। ভিনসেণ্ট স্মিথের আরলি হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া ৯৩ পৃঃ দেখুন।

এই হিসাবে মহাভারতের যুগে ভারতের জন-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩ লক্ষ × ৮=৫০৪ লক্ষ।

পক্ষান্তরে যদি আমরা ধরি যে প্রত্যেক বাড়ী হইতে ১জন করিয়া লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন—যেমন পূর্ব্বেকার রাজারা বেগার বা পেয়াদা ধরিবার জন্য করিতেন এবং এইরূপ যে করা হইত অতীত যুগে তাহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোক-সংখ্যা ৬৩ লক্ষ × ১১·১১=৭০০ লক্ষ হয়। পূর্ব্বে যে প্রতি বাড়ীতে ১১·১১ জন করিয়া লোক ছিল তাহার পক্ষে যুক্তি আমরা পরিশিষ্টে দেখাইতেছি।

এই দুই হিসাব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে ; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বা independent। তাহা হইলে এই পার্থক্যের (এক হিসাবে ৫০৪ লক্ষ—আর এক হিসাবে ৭০০ লক্ষ—পার্থক্য ১৯৬ লক্ষ) কারণ কি ?

বর্ত্তমানে (১৯৩১) বিন্ধ্যগিরির উত্তরের ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণের লোক-সংখ্যার ২গুণ। মোরল্যাণ্ড সাহেব আকবরের মৃত্যুকালে ভারতের জন-সংখ্যা ১০০০ লক্ষ ধরিয়াছেন। আর উত্তর ভারতের লোকসংখ্যা ৭০০ লক্ষ, দক্ষিণের লোকসংখ্যা ৩০০ লক্ষ ধরিয়াছেন। তিনি উত্তর ভারত বলিতে কি বুঝিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মোটামুটি উত্তর ভারতের জনসংখ্যা দক্ষিণের জনসংখ্যার ২·৩ জন। সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া মোটামুটী হিসাবে মহাভারতের যুগে উত্তর ভারতের জন-সংখ্যা দক্ষিণের জনসংখ্যার ২গুণ ধরিতে পারি।

আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছি বা ধরিয়া লইয়াছি যে উত্তর ভারতের যে অনুপাত লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল দক্ষিণের লোক তাহার অর্দ্ধেক অনুপাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এখন দেখা যাউক এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিলে ভারতের জন-সংখ্যা কত দাঁড়ায়।

সমগ্র ভারতে লোক-সংখ্যার ২/৩ অংশ উত্তর ভারতে ; ১/৩ অংশ দক্ষিণ ভারতে। এমতে ২/৩ × $\frac{১}{৮}$ × ১ + $\frac{১}{৩}$ × $\frac{১}{৮}$ × $\frac{১}{২}$ = $\frac{৫}{৪৮}$ লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তাহা হইলে প্রথম হিসাবে লোক-সংখ্যা ৬৩ × $\frac{৪৮}{৫}$ = ৬০৫ লক্ষ হয়।

দ্বিতীয় হিসাবে সব বাড়ী হইতে যোদ্ধা আসিলে জনসংখ্যা হয় ৭০০ লক্ষ। কিন্তু সমগ্র জন-সংখ্যার বা বাড়ীর মধ্যে উত্তর ভারতের ২/৩ বাড়ী হইতে যোদ্ধা আসিয়াছে ষোল আনা ; আর দক্ষিণ ভারতের ১/৩ বাড়ী হইতে যোদ্ধা আসিয়াছে আট আনা হিসাবে। এমতে সমস্ত বাড়ীর ২/৩ × ১ + $\frac{১}{৩}$ × $\frac{১}{২}$ = $\frac{৫}{৬}$ বাড়ী হইতে যোদ্ধা আসিয়াছিল। এমতে জন-সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত ৭০০ লক্ষ হইতে কমিয়া ৭০০ × $\frac{৫}{৬}$ = ৫৮৩ লক্ষ হয়।

এইবার দুই হিসাবের পার্থক্য খুবই কম, এক হিসাবে ৬০৫ লক্ষ, অন্য হিসাবে ৫৮৩ লক্ষ—পার্থক্য ২২ লক্ষ ; শতকরা ৪এর কাছাকাছি। আমাদের অনুমান যে সত্যের খুব কাছাকাছি ইহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। কিছুটা ভুলভ্রান্তি অবশ্যই থাকিবে।

এই দুইটী আলাহিদা পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত জন-সংখ্যার গড় হইতেছে ৫৯৪ লক্ষ বা ৬ কোটী।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কত পরিমাণ লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করে নাই। জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে যোগদান করেন নাই—যদিও দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অনুপাত শতকরা ৭·৫ জন। যাদবগণ সকলে যুদ্ধে যোগদান করেন নাই ; অসভ্য বন্য লোকেরা

অনেকে যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। আমাদের আন্দাজ —ইহা কেবলমাত্র আন্দাজ, ভুলভ্রান্তি থাকা খুবই সম্ভব। ভারতের জন-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ যুদ্ধে যোগদান করে নাই। তাহা হইলে ভারতের লোক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায় :—

৫৯৪ লক্ষ

৬৯ লক্ষ=৫৯৪ লক্ষর ১/৯ ভাগ

মোট ৬৬৩ লক্ষ

৫৯৪ লক্ষের উপর যে জন-সংখ্যা কিছুটা বাড়িবে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ ; কিন্তু কতটা বাড়িবে, ৬৯ লক্ষ বাড়িবে বা তাহার বেশী বা তাহার কম বাড়িবে, সে সম্বন্ধে আমাদের নিজেদেরই সন্দেহ আছে। সেজন্য আমাদের আন্দাজ এইরূপ যে মহাভারতের যুগে ভারতের জন-সংখ্যা ৬ কোটির বেশী ও ৭ কোটীর কম ছিল। মাঝামাঝি ধরিলে ৬॥ কোটী হয়। ইহার বেশী কিছু জোর করিয়া বলা চলে না।

আকবরের মৃত্যুকালে মোরল্যাণ্ডের হিসাব অনুযায়ী ভারতের জন সংখ্যা ১০ কোটী ; আর আমাদের হিসাবে ১১ কোটী। (ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুলোচনে বুলেটীন নং ১ দেখুন)

নাথ তাঁহার ষ্টাডি ইন দি ইকনমিক কণ্ডিসানল্ অফ এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অশোকের সময় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১০ কোটীর উপর ও ১৪ কোটীর কম। তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক্ হইলে মহাভারতের যুগ (১৫০০ খৃঃ পূঃ) হইতে ১৩০০ বৎসরে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ১০ কোটী বা ১৪ কোটী হইয়াছিল। জনসংখ্যা প্রতি ১০০ বৎসরে এক হিসাবে বাড়িয়াছিল শতকরা ৩ করিয়া ; অপর হিসাবে বাড়িয়াছে শতকরা ৫.৬ হিসাবে।

এইরূপ কম বৃদ্ধির হার দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে, মহাভারতের যুগে জন-সংখ্যা অত বেশী ছিল না। কিন্তু যেখানে যেখানে প্রাচীন যুগে জন-সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে, দেখা যায় বৃদ্ধির হার খুব কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কখনও কমে কখনও বাড়ে। উইলকক্স ও কারসাণ্ডাসে'র হিসাবে পৃথিবীর জন-সংখ্যা গত ৩০০ বৎসরে এইরূপ হারে বাড়িয়াছে। সম্প্রতি বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়িতেছে।

হাজার করা বার্ষিক বৃদ্ধি

	উইলকক্সের মতে	কারসাণ্ডার্সে'র মতে
১৬৫০-১৭৫০	৪	৩
১৭৫০-১৮০০	৬	৪
১৮০০-১৮৫০	৩	৫
১৮৫০-১৯০০	৭	৬
১৯০০-১৯৫০	৯	৮

ইং ১৯০১ সালে ভারতের লোক-সংখ্যা ছিল ২৯.৪ কোটী ; আকবরের মৃত্যুকালে ছিল ১০.০ কোটী। এই হারে যদি তৎপূর্ব্ব ১৫০০ বৎসর লোক বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে ১০০ খৃঃ অঃ ভারতের লোক-সংখ্যা হয় ১৩॥ লক্ষ। অথচ তাহারও ৪০০ বৎসর আগে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য সংখ্যাই ছিল ৭ লক্ষ। একই হারে লোক-বৃদ্ধি হয় নাই। জন-সংখ্যা কখনও দ্রুত বাড়িয়াছে, কখনও কমিয়াছে।

পরিশিষ্ট

বাড়ী প্রতি কয়জন লোক।

(ক) পূর্ব্বে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল। এজন্য পুরাকালের লোকেরা সুণ্ডবার্গের ষ্টেসনারী বা স্থিতিশীল টাইপের লোক ছিল ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপ ষ্টেসনারী বা স্থিতিশীল টাইপের জনগণের মধ্যে বয়স বিভাগ এইরূপ হয়। যথা :—

প্রতি ১,০০০ হাজারে

বয়স	০—১৫	১৫—৫০	৫০ ও তাহার বেশী
	৩৩০	৫০০	১৭০

৫০এর উপর সকল পুরুষকে যদি বাড়ীর কর্ত্তা, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী প্রথার প্রচলন থাকায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ধরি, তাহা হইলে প্রকৃত তথ্যের খুব কাছাকাছি থাকিব। এ মতে প্রতি বাড়ীতে—

$$\frac{১০০০ \text{ পুরুষ} + ১০০ \text{ নারী}}{১৭০} = ১১.৭৭ \text{ জন করিয়া হয়।}$$

(খ) কৌটিল্যের সময় ৫টী চাষী পরিবার ৬৪ একর জমী চাষ করিত। এ মতে প্রত্যেক পরিবারের ভাগে পড়ে ১২.৮ একর। দেখা গিয়াছে যে একজন সবল পুরুষ

৫ একরের বেশী জমী চাষ করিতে পারে না। এই হিসাবে ১২·৮ একর জমী চাষ করিতে ২·৫৬ জন লোক দরকার। যদি আমরা ধরি যে ১৫ থেকে ৫০ বছর অবধি সকল পুরুষই চাষ করিতে পারে তাহা হইলে প্রতি পরিবারে ২·৫৬×৪=১০·২৪ জন হয়। কিন্তু সকলেই ১৫ পার হইলেই সবল হয় না; আর ৫০ পার হইলে বুড়া বা চাষের অনুপযুক্ত হয় না। দেখা যায় ৫০—৫৫ বৎসরের পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৩·১৮; আর ১৫ থেকে ২০ বৎসরের পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৯·০৪। ইহাদের অর্দ্ধেককে যদি সবল ধরি তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। তাহা হইলে চাষ করিতে পারে 'সবল' লোকের অনুপাত দাঁড়ায় ৫০—৪·৫+৩= ৪৮·৫ শতকরা। ৪এর জায়গায় ৪·১২ দিয়া গুণ করিলে বাড়ী প্রতি ২·৫৬×৪·১২=১০·৫৫ জন।

(গ) পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের শেষে এথেন্স সহরে বাড়ীর সংখ্যা ১০,০০০ ছিল। গ্রীস দেশের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ তৎকালে এথেন্স নগরীর লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বাড়ী প্রতি ১২ জন করিয়া ধরিয়া মোট লোকসংখ্যা ১,২০,০০০ সাব্যস্ত করেন। কেহ কেহ আবার বাড়ী প্রতি ১৮ জন করিয়া ধরিয়া লোকের সংখ্যা ১,৮০,০০০ সাব্যস্ত করেন। আমরা বাড়ী প্রতি ১২ জনের হিসাবই মানিয়া লইলাম।

এ মতে ৩টী হিসাবে পাই বাড়ী প্রতি জন :—

(ক) ১০·৭৭
(খ) ১০·৫৫
(গ) ১২

গড় : ১১·১১ জন করিয়া

দুই আমি

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আমার মাঝারে হেরি দুইজন আমি;
কামনা-বিহীন একজন—আর আরজন শুধু কামী
আমাদের সংসারে
দেখিবারে পাও ধূলিকাদা মাখা যারে,
কভু হাসে উল্লাসে,
কভু বা দুঃখে ধূলায় লুটায়ে চোখের জলে
সে ভাসে।
তার মাঝে আসে শৈশবসুধা, আসে যৌবন জ্বালা,
প্রিয়ার অধরে আঁকে চুম্বন, কণ্ঠে জড়ায় মালা,
কল কারখানা, খেত বা খামারে, আফিসে
সে কাজ করে
রামধনু-আঁকা মেঘ থাকে তার ঘরে।

আর এক আমি থাকে শুধু নিরালায়,
আপনার মনে বাঁশরী বাজায়ে সুদূরের গান গায়।
তাহার গগনে নাই রামধনু, আছে শুধু ছায়া পথ
সেথা সে উর্দ্ধে চালায় স্বপ্নরথ।
রঙে রাঙা নয় প্রেম ফুল তার, শুধু সৌরভ-সার,
মিলনের চেয়ে গুরু-বিচ্ছেদে বহে গৌরব ভার।
পূজা করে সুন্দরে;
আড়ালে বসিয়া মানব-মহিমা মধুর করিয়া ধরে;
রাত্রি যখন নিকষ-কঠিন-কালো
পথের দিশারী হয়ে সে দেখায়, ভ্রান্ত আমিরে আলো।
অঙ্গে অঙ্গে সবার সঙ্গে সবার অতীত থাকে
স্তিমিত আলোতে স্বপ্ন-তুলিতে অরূপের ছবি আঁকে।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম—তাঁদের বাড়ীর ওপর তলা হতে একটা সুললিত স্বরে প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে আসছে। আমরা অনুমানে বুঝলাম যে দ্বিজেনবাবুরই একমাত্র কন্যা উপর হতে নির্বিকারচিত্তে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন। তাঁর সম্পর্কে এদানী বাইরে কি হলো বা না হলো তাতে তার কোনও আসে যায় না। এর কারণ এরা এক প্রজাপতি-বিবাহ বা নেগোসিয়েটেড্ ম্যারেজছাড়া অন্য কোনও বিবাহ বুঝতে চেষ্টা করাও পাপ মনে করে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাদের আজও বিশ্বাস যে এক মাত্র স্বামীকে—স্বামী হওয়ার পর ভালোবাসা যায়। অন্য কাউকে ভালবাসা তারা আজও পর্যান্ত কল্পনা করতে পারে নি। এই জন্য অতি সহজেই তারা নিজেকে ও সেই সঙ্গে স্বামীকে সুখী করতে সক্ষম হয়ে থাকে। স্বামীকে ভালবাসা এদের কাছে শুধু কর্ত্তব্য নয়, সেটা এদের কাছে একটা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অতি প্রয়োজনীয় জীবন-ধর্ম্মও বটে। এমন কি ঐ বিপথগামী যুবকটীরই সঙ্গে যদি তার ইতিমধ্যে বিবাহ হয়ে যেত তাহলেও সে অনায়াসে তার সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো। পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচীনতম বেদ মন্ত্র—'তাং গোত্রং মাং গোত্রং' এই সাবেকী পরিবারের মেয়েদের পুরুষানুক্রমে উদ্বেলিত করে তাদের বীজকোষ বা গ্যামেট্ পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত করে রেখেছে। এরা যেন একটা নরম কাদামাটীর ঢেলা; তাই অধিকবয়স্ক হলেও এদের ইচ্ছামত রূপ দেওয়াও সম্ভব। স্বামীর রূপ গুণ সম্বন্ধে এদের চিত্তকে প্রস্তুত বা প্রিডিসপোসড্ করে রাখার এরা কোনও প্রয়োজনই মনে করে না। এর কারণ এরা মানুষ চায় না। এরা চায় শুধু একজন সচ্চরিত্র দয়ালু স্বামী। এই দিক হতে বিচার করলে বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সুরজিত রায় এইরূপ এক কন্যাকে ভার্য্যারূপে মনোনীত করে কোনও ভুল করেছেন বলে মনে হয় না। কিংবা সাত সাগরের জল খেয়ে অতীষ্ঠ হয়ে এতদিন পর তাঁর বৈজ্ঞানিক মন কোনও এক শান্ত শীতল গণ্ডীবদ্ধ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে অবগাহন করতে চেয়েছে। এতো তত্ত্বকথা পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করার এটা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান ছিল না। তাই এই কাশী শহরের অন্যতম মহাধনী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাটী হতে বার হয়ে তাঁর মেয়ের সুললিত কণ্ঠের ভজন সঙ্গীত শুনতে শুনতে বড় রাস্তার এপারে এসে যা আমরা দেখলাম, তাতে আমরা বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেলাম। এইমাত্র কলকাতার সেই মোচওয়ালা ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাদের দিকে চাইতে চাইতে তাড়াতাড়ী একটা টাঙ্গায় উঠে দ্রুত গতিতে রাস্তার বাঁকের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এদিকে আমাদের নজরের মধ্যে কোনও শকট না থাকায় তাকে ফলো করে পাকড়াও করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার চালচলন ও হাবভাবে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে বেশ বোঝা গেল যে এতক্ষণ তিনি এই দ্বিজেন-বাবুরই বাড়ীর গেটের আশে পাশে ঘুরাঘুরি করছিলেন। এই রহস্যময় ভদ্রলোক এইখানে নিশ্চয়ই দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। তাই যদি হয় তাহলে ওঁর এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা মনে মনে ঠিক করলাম এর পর স্থানীয় থানা থেকে একজন সিপাহী সঙ্গে না নিয়ে আর এই শহরে কোথাও বার হব না।

এর পর আমরা সোজা স্থানীয় থানায় ফিরে এসে সেখান হতে দুইজন সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে তখনি আবার আমাদের সেই সাংঘাতিকরূপে আহত যুবকটীর পিত্রালয়ে

এসে হানা দিলাম। এই বিষয়ে এতো তাড়াতাড়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার মধ্যে অন্য আর একটীও কারণ ছিল। সে বিষয়ে পরবর্ত্তী একসময় আমি বলবো, আস্থন। এই মরণাপন্নভাবে আহত যুবকটীর পিতা অমুকবাবুও যে এই শহরের ধনী বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ করবার কিছু নেই। একটা উঁচু পোতাসমন্বিত প্রকাণ্ড একটী পাথরের দ্বিতল বাটী। আমরা বেশ কয়েকটী পাথরের সোপান অতিক্রম করে একটা আধতলার মত উঁচু স্থানে এসেও দেখলাম যে সেখানেও পাথর কুঁদে একটা ইঁদারা বা পাতকুয়া রয়েছে। এই পাথর বাঁধানো ইঁদারার পাশ ঘেঁসে একটা সরু পাথরের গলি ধরে আমরা এই ভদ্রলোকের বৈঠকখানা ঘরে এসে তাঁদের এক স্থানীয় ভৃত্যের মারফৎ সেই ভদ্রলোকের নিকট আমাদের আগমন সংবাদ জানালাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঐ আহত যুবকের পিতার পরিবর্ত্তে সেখানে এসে উপস্থিত হল তাঁর কাশী শহরের সম্পত্তির ও তৎসহ এঁদের অন্দর মহলের ম্যানেজার শ্রীভবতোষ রায়। অগত্যা আমাদের তাঁকেই প্রথমে আমাদের এখানে আগমনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললাম। এঁদের কথাবার্ত্তা শুনে প্রথমেই আমরা বুঝেছিলাম যে এঁরা তখনও তাদের একমাত্র বংশের দুলালের কলকাতাতে সাজ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়ে পড়েথাকার সংবাদ অবগত হতে পারেন নি। এই জন্যে আমরাও তাঁকে এই সম্পর্কে কোনও কিছু না জানিয়ে কেবল মাত্র তাঁদের সেই ছেলেটীর গতিবিধি ও বর্ত্তমান অবস্থান সম্পর্কে শুধু কৌশলে প্রশ্ন করেছিলাম। অবশ্য আমাদের ইচ্ছে ছিল যে পরে প্রকৃত তথ্য ঐ আহত যুবকের পিতাকেই মাত্র আমরা জানিয়ে যাবো। ঐ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রীভবতোষ রায়ের এই সম্পর্কে বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আজ্ঞে, অধীনের নাম শ্রীভবতোষ চৌধুরী। পিতার নাম ৺সর্ব্বানন্দ চৌধুরী। পূর্ব্বে আমাদের পৈতৃক বাস বাংলার অমুক জিলার অমুক গ্রামে ছিল। বর্ত্তমানে প্রায় তিন পুরুষ হলো আমরা কাশীবাসী। আমি এই বাড়ীর মালিকের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বিধায় আমিই তাঁর এখানকার সম্পত্তির দেখাশুনা করি। আমাদের একটি মাত্র বিশ বৎসর বয়সের পুত্র সন্তান আছে। আমার এই পুত্রটী আমাদের এখানকার এই বাবুর পুত্রের সঙ্গেই এই বৎসর সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করেছে। এখানকার শহরতলীতে আমার পিতামহের আমল থেকে দুটো ছোটো বস্তী বাড়ী আছে। সেই বস্তীর আয় ও এখানকার মাইনে থেকে আমাদের সংসার চলে। আমি খুব কষ্ট করেও আমাদের বাবুর দয়াতে আমার এই পুত্রটিকে আমাদের বাবুর ছেলের মত করেই মানুষ করে তুলেছি। তবে বাবুর ছেলের মত আমার ছেলেটীর দুর্ব্বুদ্ধি একটুও নেই। এই জন্য এদানী আমাদের সহৃদয় বাবু তাকে নিজের পুত্রের চেয়েও অনেক বেশী ভালো বাসেন। আমাদের বাবুর এই দুঃসময়ে সে তাঁর কাছে কাছে সব সময় থাকে বলেই না তিনি ভেঙ্গে পড়লেও এখনও শয্যা নেন নি। আপন পুত্র হলেও এ ছেলেটা তার বাবাকে কি নিদারুণ আঘাতই না দিলে। ঐ গুণধর ছেলের জন্যে তিনি এই শহরের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের কারও কাছে মুখ পর্য্যন্ত দেখাতে পারছেন না। একেবারে কিনা আশীর্ব্বাদের আগের দিনই ছেলেটা বাপমার মুখ পুড়িয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেল। এদিকে আমাদের এই বাবুও হচ্ছে এক বড়ো শক্ত বাবু। তিনি তাঁর শোকে ভেঙ্গে পড়া গীন্নির মুখের দিকেও চেয়ে দেখলেন না। সব কথা জানা মাত্র তিনি তাঁর সেই ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করে আমার পুত্রকে পুষ্যিপুত্র নেবেন ঠিক করে ফেললেন। এমন কি আমাকে দুদিন আগে তাঁদের কলকাতার ফার্ম্মের চার্জ আমার পুত্রকে দেবার জন্যেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার সেই সর্ব্বনেশে মহিলা পার্টনারটী ওঁর ঐ ছেলের শুভাকাঙ্খী সেজে আমাকে একেবারেই পাত্তা দেন নি। অবশ্য ওদের পুরুষ পার্টনারদ্বয় অন্য কারণে আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব্বতন বন্ধুস্থানীয় পার্টনারকে বুঝিয়ে এই পুষ্যিপুত্র না নেবার জন্যে অনুরোধ করবেন বললেন। কিন্তু আমাদের এই কর্ত্তার এই নূতন পরিকল্পনা আর বদলাবার নয়। তিনি তাঁর ঐ অসচ্চরিত্র পুত্রের আর কোনও দিনই মুখদর্শন করবেন না। এই সম্পর্কে আইনসম্মত ভাবে লেখাপড়ার যা কিছু কায, তা তিনি ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন। হাজার হোক আমার পিতামহ এবং আমার ঐ কর্ত্তার পিতামহ সম্পর্কে সহোদর ভ্রাতা হতেন। অর্থাৎ

কিনা একই বংশের পূত রক্ততো আমার ও ওঁর ঐ পুত্র-মধ্যে সমভাবে বয়ে চলেছে। কিন্তু তবুও তুজনার যে এতো তফাৎ হলো কেন তা ভগবানই জানেন। এই নিদারুণ বিপাকে পড়ে আমাদের কর্ত্তা তাঁর বন্ধু ঐ দ্বিজেনবাবুকে প্রস্তাব করেছিলেন যে তাঁর এই পুষ্যিপুত্রকে যদি তাঁর সম্পত্তির ও কলিকাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হয় তা'হলে কি তিনি তাঁর ঐ অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে তার এই পুষ্যিপুত্রের বিবাহ দিতে রাজী আছেন? কিন্তু মশাই ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলীও হচ্ছে এক মহা শয়তান লোক। কলকাতার যতসব জেল-খারিজ গুণ্ডা তাঁর জমীদারীর বস্তীগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোলকাতা পুলিশ থেকে ওদের সম্পর্কে খতপত্র এলে ইনি তাদের চরিত্র সম্পর্কে সাফাই গেয়ে স্থানীয় পুলিশে সাক্ষী দিয়ে থাকেন। এদিকে এই সব গুণ্ডা বদমায়েসরা তাঁর আস্কারা পেয়ে হামেসা কোলকাতায় গিয়ে খুন ডাকাতি করে পুনরায় কাশী শহরে ফিরে এসে থাকে। এদিকে এখানকার থানা পুলিশ তাঁর মত মহাধনী লোকের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকায় এই সব বদমায়েসদের গায়ে অঙ্গুলী স্পর্শ করবার পর্য্যন্ত কারও সাহস নেই।"

আমি এই মহালোভী ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটী সাবধানে লিপিবদ্ধ করে নিয়ে তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশসমূহ পাঠকদের অবগতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—এখন আপনার এই উত্তর হতে যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই যে, ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলি মশাই আপনার পুত্রের সঙ্গে তার গুণবতী রূপবতী কন্যার বিবাহে সম্মত নন। অবশ্য আপনার পুত্রের চেহারা ও গুণপণা না দেখে বা শুনে এই সম্বন্ধে কোনও অভিমত আমি এখন প্রকাশ করবো না। এখন আপনি যে বললেন যে তাঁর ভাড়াটে বাড়ীগুলোতে বহু জেল-খারিজ গুণ্ডা বাস করে তা এখান থেকে আপনি কি করে জানতে পারলেন মশাই। আপনার কি ঐ সব গুণ্ডাবদমায়েসদের জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনও পরিচয় আছে না কি?

উঃ—আপনি আমার পুত্রকে দেখলে বুঝতে পারতেন যে—সে দেখতে, শুনতে ও গুণগরিমায় আমাদের বাবুর আপন পুত্রের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এত তো মশাই আমার নিজের কথা নয়। আমার খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য বাবুই এ'কথা আজকাল সকলকে বলেন। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি পূর্ব্বে কিছুকাল ঐ দ্বিজেনবাবুর বস্তীগুলির ছোট-লোক রেওতদের কাছ হতে ভাড়া আদায় করতাম। ভদ্রলোক কিনা শেষেই আমাকে দোষী করে বললেন যে, আমিই না কি ঐ সব মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের বন্ধু হয়ে উঠেছি। এই সব কথা শুনে আমাদের এই মহৎ বাবু সেখান থেকে আমাকে সরিয়ে এনে আমাকে তাঁর নিজেদের সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে ভর্ত্তি করে নিয়েছেন, আজ্ঞে, হাজার হোক আমি এই বাবুরই তিনরাত্রির ওষুধের জ্ঞাতিকুটুম্ব তো বটে। আমি একটু নেশাভাঙ মাঝে মাঝে করলেও আমার ছেলেটা হচ্ছে সত্যই ঋষিপুত্র তুল্য ছেলে।

প্রঃ—হাঁ! আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন মাত্র আমি আপনাকে করবো। আপনার ঐ কড়া মেজাজের বাবু না হয় তাঁর একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করে বসলেন। কিন্তু তেনার বৃদ্ধা স্ত্রী অর্থাৎ ঐ ত্যাজ্যপুত্রের গর্ভধারিণী মাতাও কি আপনার ঐ কর্ত্তার এই সাংঘাতিক প্রস্তাবে সায় দিতে পেরেছেন। তিনি তাঁর স্বামীর এই সব ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠলেন না।

উঃ—আজ্ঞে! এই সব আকচাআকচি নিয়েই তো সেই দিন থেকে উভয়েই মনে প্রাণে ভেঙ্গে পড়ে শয্যা নিয়েছেন। আরে, সব মাতাই কি আর মহাভারতের গান্ধারীর মত পুত্রস্নেহান্ধ হয়েও দুষ্ট পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন। তা' এ বিষয়ে বাবুর আমার বিশেষ খুউব কোনও দোষ দিতে পারি না। শেষ কালে তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি নিজেই না জেনে ঐ ডাইনীর হাতে নিজের ছেলেকে তুলে দিয়েছেন। হাঁ! পরে অবশ্য তিনি তার ঐ ছেলেটীকে জোর করে কলকাতা থেকে কাশীতে আনিয়ে দ্বিজেনবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্প্রতিকালে ঐ ডাইনীর ছোঁয়াচ থেকে দূরে এসে তার মনটী এদানী বেশ একটু সুস্থও হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এদিকে সেই ডাইনী স্ত্রীলোকটী পত্রের পর পত্র কলকাতা থেকে এই ছেলেটীকে

পাঠাতে সুরু করে দিলে। এই এক একটি পত্র পাওয়ার সঙ্গে সে আবার পূর্ব্বের ন্যায় মনমরা হয়ে পড়তো। একদিন একটা দীর্ঘ পত্র কলকাতা থেকে পেয়ে সে কাউকে না বলে আশীর্ব্বাদের আগের দিন কলকাতায় উধাও হয়ে গেলো। যাই হোক, আমরা এই কুলঙ্গারকে এখন আমাদের কাছে মৃত ব'লেই ধরে নিয়েছি। আমিই অবশ্য সরল বিশ্বাসে ওই সব পত্রগুলো বাবুর ঐ ছেলেটীর হাতে তুলে দিয়েছি। এই বিষয় অবশ্য কলকাতার কোনও চিঠি তাকে দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তা এ একটা যে আমার দারুণ ভুলই হয়ে গিয়েছিল, তা আমাকে অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

প্রথমে অবশ্য আমার একবার মনে হয়েছিল যে সামাজিকভাবে অপমানিত হয়ে ঐ গাঙ্গুলী মশাই বোধ হয় এই পলাতক ছেলেটীর উপর কলকাতায় লোক পাঠিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চিন্তার পর আমার মনে আশা পরক্ষণেই বুঝেছিলাম যে আমার এই চিন্তা একান্তরূপেই ভুল। মানুষ মাত্রকেই সন্দেহ করে করে এই সব বিষয়ে বোধ হয় আমার বেশ একটু বদ্ অভ্যাসই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এক্ষণে এই ভবতোষ চৌধুরী নামক মহা-শয়তান লোকটীর সংস্পর্শে এসে আমার অন্তরাত্মা এই সাঙ্ঘাতিক অপরাধ সম্পর্কে এঁকেও যে একবার সন্দেহ না হলো তা নয়। কিন্তু শহর থেকে এই সব নেশাখোর মহালোভী অপদার্থের পক্ষে কলকাতায় কোনও হামলা করা বা তা করানোর ক্ষমতা কোথায়? এদিকে কাব্যের উপেক্ষিতার ন্যায় মহাধনী দ্বিজেন বাবুর কলকাতার সেই বিবাহের সম্বন্ধকারী আত্মীয়টীকেও এই ব্যাপারে সন্দেহ করার বিচার একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। অপর দিকে কলকাতার সেই রাজনৈতিক নেতা ও ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক ডাক্তার অমুকই যে তার বহু সম্পত্তির লাভের ব্যাপারে তার একমাত্র প্রতিবন্ধক ঐ আহত ছেলেটীর আহত হবার কোনও এক কারণ ঘটান নি তো! তাই যদি সত্য হয় তা হলে একমাত্র ঐ প্রেমিকা মহিলাটীকে সাংঘাতিক মহিলা আখ্যা দিয়ে তাকে আমাদের মন এই বিষয়ে পূর্ব্বাহ্নেই একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করতে চায় কেন? এই সাংঘাতিক অপকর্ম্মটী হয়তো মাত্র একজন পাপী লোকের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয় বহু লোককে সন্দেহ করে আমি যে শতেক পাপী হতে চলেছি। আমাদেরই এই সন্দেহের বাতিকের শেষ কোথায়? এইরূপ আদ্যোপান্ত বহু বিষয়ে চিন্তা করে আমরা এই সাক্ষী চৌধুরী মশাইকে তার ঐ নিষ্ঠুর-হৃদয় মনিবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য জিদ ধরলাম।

আমাদের এই অনুরোধে এই অপদার্থ লোকটা প্রথম থেকে একটু আমতা আমতা করছিল। কিন্তু তাঁকে এই দোলা-মন থেকে রেহাই দিয়ে ঐ আহত যুবকের পিতা স্বয়ং আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। এই পক্ককেশ ঋজুদেহী বৃদ্ধের অগ্নিবর্ষী চক্ষুর ধার ব'য়ে সামান্য অশ্রুজলও গড়িয়ে পড়েছিল। এই অপদার্থ লোকটীর সহিত আমরাও তাঁকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখালাম।

'ওঃ বুঝেছি। আপনারা তাহলে কলকাতা পুলিশ থেকে এখানে তদন্ত করতে এসেছেন?' এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক একরকম দুর্ব্বলতাজানত কাঁপতে কাঁপতে ও টলতে টলতে অন্যদিকে চেয়ে চোখে জল মুছে আমাকে বললেন, 'আপনারা এখানে কি বিষয়ে তদন্তে এসেছেন তা আমি ইচ্ছে করেই জানতে চাই না। আমি শুধু যা বলছি তাই আপনারা শুনে যান। কিন্তু দয়া করে কোনও বিষয়ে আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। এমন কি ওদিককার কোনও দুঃসংবাদ ও যদি আপনাদের আমাকে দেবার থাকে তা'ও দয়া করে আর দেবেন না। আমার স্ত্রী এই মাত্র জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। এ জ্ঞান খুব সম্ভবতঃ আর ফিরবে কিনা জানি না। আমি ডাক্তারকে আসার জন্যে টেলিফোন করে দিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। এছাড়া আমার ভাবী পোষ্যপুত্রটীকেও আমি এখুনি একজন বড় ডাক্তারকেও ডেকে আনবার জন্যে পাঠালাম। কলকাতায় অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাড়ীতে আমার ঐ ত্যাজ্য-পুত্রের মাতুল থাকে। সিংহী বাগানের সিংহী লেনের সিংহী বাড়ীর লোকেরা হচ্ছে আমার শ্বশুর কুল। যদি কোনও কিছু খবর দেবার বা সাহায্য নেবার প্রয়োজন থাকে তো দয়া করে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন। তারা অবশ্য আমার মতো এতটা হৃদয়হীন হতে পারবে না। অন্ততঃ আমার কাছে আমার ঐ কুপুত্র মৃত বলেই জানবেন। এ ছাড়া আর অন্য কোনও বিষয় জানতে

হলে আমার ঐ আর এক অপদার্থ একই সঙ্গে আত্মীয় ও ম্যানেজর চৌধুরীবাবুর নিকট হতে জেনে নিতে পারেন।

কোনও ক্রমে মাত্র এই কয়টী বাক্য উচ্চারণ করে পক্ক-কেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেমন ঝটীতে আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনি তেজের সহিত তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে পাশের ঘরে ঢুকে সশব্দে সেদিককার দরজাটা আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দিলেন।

আমাদের ঐ পক্ককেশ হতভাগ্য বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পিছন পিছন দৌড়ে তাঁকে শুনাতে ইচ্ছে করছিল, আরে মশাই! আপনার ঐ ভাবী পোষ্যপুত্রটীকে আপাততঃ আপনার ঐ রুগ্ন জ্ঞানহারা স্ত্রীর সুমুখ থেকে সরিয়ে দিন। তা না হলে বারে বারে জ্ঞান ফিরলেও পুনরায় তাঁর অজ্ঞান হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা এখানে এসেছি মাত্র আদার-ব্যাপারীর বিষয় নিয়ে। এক্ষণে এখানে আমরা জাহাজের কারবারের কথা তুললে এঁরা অন্ততঃ আমাদের কাছ হতে তা শুনবেন কেন? এইরূপ এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে এঁদের ঐ একমাত্র বংশধরের শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে এঁদের শুনাতে আর আমাদের সাহস বা ইচ্ছে হলো না। আমরা মনে মনে ঠিক করলাম যে ঐ আহত যুবকের কলকাতার মামার বাড়ীর ঠিকানাটা যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন এই সব বিষয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গেই যা হোক কিছু একটা পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে অখন।

এর পর আমরা এই বাড়ী হতে বার হয়ে বাহিরে অপেক্ষমান স্থানীয় পুলিশ কনেষ্টবল দুইটীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি; এমন সময় হঠাৎ আমাদের নজর পড়লো রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাতের দিকে। এই ফুটপাতের উপর একটা সরু পাথুরে গলির মুখে জন চার ঘাড়-ছাঁটা গুণ্ডা গোছের লোককে আমাদের সেই পূর্ব্বের দেখা গোঁফ-ওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাদের ঐ আহত যুবকটীর পিতা-মাতার সেই বাটীটীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে কি একটা যেন বোঝবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে কয়খানা যাত্রীবাহী শকট সামনে এসে পড়ায় তাদের কিছুক্ষণের জন্য আর দেখা গেল না। এর পর গাড়ীগুলো চলে গেলে সেইদিকে আমাদের সঙ্গের স্থানীয় সিপাহীদের দৃষ্টি আকর্ষন করার পূর্ব্বেই আমাদের সেই মোচওয়ালা ভদ্রলোক সরে পড়তে পেরেছিল। এই স্থানীয় সিপাহী দুইজন রাস্তার ওপারে দণ্ডায়মান গুণ্ডা লোক কটাকে দেখে আঁতকে উঠে বলে উঠলো, হারে, বাপস্! ইনে গুণ্ডা লোক কিন বেনারসমে লোটকে আয়া? আভি উধার মাৎ যানে চাহী বাবু সাব। থানামে যাকে বড়-বাবুকো ইনলোককো বাড়ে পহেলা খবর দেনে চাহী। এর একটু পরে দেখা গেল যে সেই গুণ্ডালোকগুলোও সেই সরু পাথুরে গলির মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছে।

এইরূপ এক বিপদের মধ্যে আমরা আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলাম না। আমরা তাড়াতাড়ি কেতোয়ালীতে ফিরে সেখানকার অফিসার-ইনচার্জ্জকে সকল বিষয় খুলে বলে তাকে ঐ আহত যুবকের পিতামাতার বাড়ীতে পাহারা বসানো সম্ভব না হলে সে নিরালা বাড়ীটার উপর মধ্যে মধ্যে একটু নজর রাখবার জন্যে তাঁকে আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম। যে কোনও কারণেই হোক আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে ঐ আহত যুবকের পিতামাতা এই সব গুণ্ডাদের দ্বারা একদিন নিহত হলেও হতে পারে। এই সব গুণ্ডাদের দিক হতে তাঁদের বিপদ তো ছিলোই, উপরন্তু তাঁর পোষ্যপুত্রের পিতা হতেও তাঁদের বিপদের আশঙ্কা আমরা করেছিলাম। এর কারণ পোষ্যপুত্র নেওয়া ঠিক হয়ে গেলেও মালিক বেঁচে থাকলে তাঁর এই ইচ্ছা একদিন পরিবর্ত্তিত হলেও হতে পারে। এই অবস্থায় তাঁর ঐ নেশাখোর আত্মীয়টার পক্ষে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে পৃথিবী হতে সরিয়ে ফেলাও অসম্ভব ছিল না। এইরূপ এক আতঙ্কগ্রস্ত অথচ লোভী ক্রুর দৃষ্টি এইদিন আমরা তার চোখের মধ্যে ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছি। তবে এইরূপ একটা কিছু যে ঘটবেই, তা হলপ করে বলবার মত কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের কাছে মজুত নেই। তবে প্রতিটী বিষয়ে সন্দেহ হওয়া মাত্র সেই সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমরা আমাদের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য ব'লে মনে করে থাকি। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলে থাকেন যে অর্থই হচ্ছে যতো অনর্থের মূল।

আমার ইচ্ছে ছিল যে আজই কলকাতাগামী একটা ট্রেণে উঠে পড়ি। কিন্তু আমার সুযোগ্য সহকারী অফিসারটী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তাঁর মত এত দূরে এসেও একবার সারনাথ তাঁকে দেখে যেতে হবেই।

এ ছাড়া তাঁর মতে আরও এক রাত্রি ও একটা দিন থেকে এখানকার পরবর্ত্তী পরিস্থিতিটাও আমাদের পক্ষে দেখে যাওয়া উচিৎ। আমার এই চতুর ও সুযোগ্য সহকারী তাঁর প্রথম প্রস্তাবটীর সহিত তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটীও জুড়ে দেওয়ায় আমাকে তাঁর এই সব প্রস্তাবে রাজী হতে হয়েছিল।

এই থানাবাড়ীর একটা আলাদা কক্ষে রাত্রিবাস করে আমরা পরদিন একখানি টাঙ্গা ক'রে ভারতের মহা বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্র সারনাথ যাত্রা করলাম। এই প্রাচীন সারনাথের ধ্বংস ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা মুগ্ধ নেত্রে সারনাথের সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চারিদিকের মনোমুগ্ধকর এবড়ো-খেবড়ো স্থানীয় সুন্দরতম পরিবেশের প্রাচীনত্ব ও পবিত্রতা দূর করে এখানে ওখানে সবুজ ঘাস-ভরা কৃত্রিম আধুনিক বাগিচাসৃষ্টির তখন সবেমাত্র চেষ্টা চলেছে। আমি ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবছিলাম যে এমন স্বাভাবিক প্রাচীন প্রাকৃতিক পরিবেশটী হেলায় বিনষ্ট করে এমন করে কর্ত্তৃপক্ষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছে কেন? এমনভাবে জোর করে এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো আধুনিক কৃত্রিম পরিবেশ দ্বারা বেষ্টন করে এরা কি ঐ পবিত্র নিদর্শনগুলি আবর্জ্জনা স্তূপে পরিণত করতে চান না'কি? আমি মনে মনে কল্পনা করছিলাম যে তাজমহলের রম্য পরিবেশ হতে সেই শ্বেতসৌধটীকে যদি কলিকাতার মিউজিয়ম ও আর্ম্মি-নেভি ষ্টোরের মধ্যে চৌরঙ্গির রাস্তার উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটিকে কিরূপ দেখাবে? এমন সময় হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়লো একটী পীতবসনধারী চৈনিক সাধুর সৌম্যমূর্ত্তির দিকে। সামনের পুরাতন ইঁটের প্রাচীন মহা-স্তূপটী ঘিরে প্রার্থনা করতে করতে এই চীনা ভদ্রলোক সেটীকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। এই সময় চীন ও জাপানের মধ্যে সভ্যতা-বিধ্বংসী যুদ্ধ চলছিল। তা সত্বেও এই চীনা ভদ্রলোক তাঁর স্বদেশ থেকে সোজা তাঁদের এই মহাতীর্থে আগমন করবার সময় করে নিতে পেরেছেন। আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাষা না বুঝলেও ইসারায় আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু করে দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ঘুঁসী পাকিয়ে উপুড় হওয়ার ভঙ্গিমায় আমাকে ইসারায় বুঝালেন—জাপান জাপান এঁ্যা। এরপর কিছুটা চীৎ হয়ে গলা টিপে আমাদের বুঝালেন—চীনা চীনা এঁ্যা—ও জাপান। আমরা ঘাড় নেড়ে তাকে আমরা বুঝালাম, 'ওঃ বুঝেছি! জাপান অন্যায়ভাবে চীনের টুঁটী চেপে ধরেছে। এই চীনা ভদ্রলোক এইবার উপর দিকে চেয়ে হাতজোড় করে আমাদের বললেন—'বুদ্ধ বুদ্ধ চীন জাপান এ্যা! আমরা অনুমানে বুঝলাম যে ইনি চীনের শেষ বেশ বিজয় ও জাপানের আশু নিধনের জন্য তাঁর আরাধ্য দেবতা বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছেন। অথচ শুনতে পাই এই দুইটী মহান দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এই মহান পুরুষ বুদ্ধদেবেরই হচ্ছেন একান্ত অনুগত শিষ্য। আমার মনে হলো যে ভগবান বুদ্ধের আবার এখানে জন্মগ্রহণ করলে এখুনি বোধ হয় তাঁর এই পূর্বস্থানেই এসে এই নূতন পরিস্থিতিতে নূতন করে সত্যের সন্ধানের জন্য তপস্যায় বসতেন।

এই মামলার তদন্তের প্রথম দিন হতে কমই সৎমানুষের সংস্পর্শে বোধ হয় আমরা আসতে পেরেছি। একমাত্র আমাদের বেচারাম বা বিচেকেরই বোধ হয় এতগুলো মানুষের মধ্যে নিষ্পাপ মন ছিল। প্রতিদিনই আমরা নাগ ও নাগিনীদেরই বিষাক্ত নিশ্বাস সারা দেহ দিয়ে অনু-ভব করে এসেছি। এদিকে প্রাচীন ভারতের সূর্য্যাস্তের ন্যায় নবীন ভারতেরও সূর্য্যাস্ত এখন সমাগতপ্রায়। একটু পরেই ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এই দিগন্তমুক্ত প্রান্তরের উপর তার স্নেহচ্ছায়া নামিয়ে দেবে। আর বেশীক্ষণ আমাদের সদানন্দিগ্ধ মন এইখানে বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না। এদিক ওদিক তাকাতেও আমাদের যেন কিরকম একটা ভয় ভয় করতে লাগলো। এইরূপ এক মানসিক অবস্থায় আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের ভাড়া করে আনা টাঙ্গাখানিতে উঠে বসে টাঙ্গাচালককে বললাম —'সিধা ষ্টেশন চলো ভাই। আমরা থানা থেকে বার হবার সময় উপস্থিত সকলের কাছে বিদায় নিয়ে লাগেজপত্র সহ টাঙ্গায় উঠেছিলাম। এই জন্য সোজা কলিকাতাগামী ট্রেণ ধরবার জন্যে রেল ষ্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধে ছিল না।

আবছায়া অন্ধকার ভেদ করে দ্রুতগতিতে আমাদের টাঙ্গাখানি শহরের দিকে ছুটে চলেছে। এমন সময় সভয়ে আমরা চেয়ে দেখলাম—একটা ছোট ষ্টেশন ওয়াগান ভক্ ভক্ আওয়াজ করতে করতে সারনাথের দিকে এগিয়ে গেল।

এই যন্ত্র শকটটীতে কয়েকজন গাট্টাগোট্টা লোকের সঙ্গে আমাদের সেই মোচওয়ালা ভদ্রলোক সামনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বসেছিল। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক আমাদের টাঙ্গাখানি দেখতে পান নি। কিন্তু তা সত্বেও শুধু এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম না যে, এই ভদ্রলোকের এইরূপ ছুটাছুটীর প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে? এইদিকে আমরা রেল ষ্টেশনে এসে জানলাম যে, কলিকাতার মেল ট্রেণ আসতে দু'ঘণ্টা দেরী আছে। আমরা এতক্ষণ রেল পুলিশ থানাতে অপেক্ষা করে ট্রেণ আসা মাত্রই একটা গাড়ীর কামরাতে উঠে বসেছিলাম। তবে রেল পুলিশের মারফৎ কলিকাতায় আমাদের প্রত্যাগমন সম্পর্কে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা—আমাদের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ একটী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

এই সময় রাত্রি হওয়াতে আমরা খুব সাবধানে রেলের কামরার দুধারের ছিটকীনী বন্ধ করে নিদ্রা যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও একত্রে দুজনায় ঘুমিয়ে পড়তে পারি নি। আমরা পালা করে করে একটু করে ঘুমিয়ে বা ঝিমিয়ে নিচ্ছিলাম—অবশ্য ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোকের পক্ষে আমাদের সঙ্গে এই ট্রেণেতে উঠবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবু লোকে কথায় বলে যে সাবধানের মধ্যে কখনও কোনও মার নেই। ভোরের দিকে আমাদের ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে জানালা খুলে দেখি যে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে বাম দিকে চাইতে চাইতে সেই মোচওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক 'পানিপাড়ে পানি পাড়ে' বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি জানালার সাটারটীর আর্দ্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে তার তলা থেকে লক্ষ্য করলাম যে সেই ব্যক্তি এইবার পানি পাড়ে পানি পাঁড়ে—বলে ডান দিকে চাইতে চাইতে পিছনের দিকে ফিরে গেল। অগত্যা এইবার আমাদের ট্রাঙ্ক থেকে পিস্তল দুটী বার করে নিয়ে তাতে গুলি ভরে সেই দুটী আমাদের নিজের নিজের পকেটে রেখে দিলাম। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের কুপে গাড়ীতে এই সময় তৃতীয় কোনও যাত্রী ছিল না। তা হলে আমাদের তাকেও আমাদের এই ব্যবহার সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অস্থির হতে হতো। এমন কি আমাদের ডাকাত ভ্রমে অন্য যাত্রীদের পক্ষে শিকল টেনে ট্রেণ থামানও অসম্ভব ছিল না। এই ভাবে দারুণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে কালযাপন করে পরের দিন সকাল আটটার সময় আমরা হাওড়া ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়টুকুর মধ্যে একটি বারের জন্যেও আমরা সেই অদ্ভুত চরিত্রের মোচওয়ালা প্রৌঢ় লোকটীর আর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি নি। এই বার আমরা আশান্বিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, দুই খানি মোটর ট্রাক সহ আমাদের অপর সহকারী ভক্তিবাবু ও কনকবাবু ওখানকার উভয় প্লাটফর্মের মধ্যবর্ত্তী রাজপথের উপর অপেক্ষা করছেন। আমরা এতক্ষণে সত্য সত্যই নিশ্চিন্ত মনে উভয়ে একে একে তাদের আলিঙ্গন করে আমাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাদের ও আমরা নিশ্চিন্ত করলাম। তা'হলে আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে এঁরা ঠিক সময় মতই টেলিগ্রামে আমাদের কলকাতায় আগমনের বার্ত্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। এর পরই আমরা সকলে মিলে সারা ট্রেণের কামরায় কামরায় ও প্লাটফর্মে ও ষ্টেশনের অপরাপর স্থানে ঐ সন্দেহমান মোচওয়ালা অদ্ভুত প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে ছুটাছুটী করে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখানে ওখানে বহু চেষ্টা করেও তার কোনও সন্ধানই আমরা করতে পারি নি। এই ভদ্রলোক যেন রহস্যজনক ভাবে নিমিষের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অগত্যা আমরা পুলিশ ট্রাকে উঠে কলকাতার আমাদের নিজেদের থানায় প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

আরে, স্যার! আপনারা এতো শীঘ্র কলকাতায় ফিরে এলেন, আমাদের থানায় ঢুকতে দেখে জনৈক অফিসার বলে উঠলেন, 'আমরা মনে করলাম যে এই সুযোগে ওখানে একটু জিরিয়ে টিরিয়ে তবে কলকাতায় ফিরবেন। এক বাইরে বা হাঁসপাতালে না গেলে তো আর আমাদের বিশ্রাম লাভই হয় না। আমরা ছুটীছুটী এমনিতে চাইতে গেলেও তো নানা কাযের অজুহাতে আমাদের তা দেওয়াই হয় না। এক এনকোয়ারীটোয়ারী একটা হাতে না এলে তো আমাদের অন্য কোনও সূত্রে বিদেশ ভ্রমণের তো কোনও সুযোগই নেই, এতে সরকারী খরচে তদন্ত সঙ্গে সঙ্গে দেশ দেখাও হয়ে যায়। এবার এরকম কোনও বাইরের এনকোয়ারীর সুযোগ এলে আপনারা আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন স্যার।

এই অফিসরটীকে আমি তার এই আপ্যায়িতের যথোচিত উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এখানকার অন্য আর একজন অফিসার আমাদের পথ অবরোধ করে আমাদের এই মামলা সম্বন্ধেই অপর আর একটী খবর দিলেন। অপর এইরূপ একটি সংবাদ শুনবার জন্য আমাদের মন উন্মুখ হয়ে ছিল।

হাঁ! ভালো কথা, স্যার! এই কয়দিন আপনাদের সেই বেচারাম ওরফে বিচকেবাবু বার দুই তিন আপনার খোঁজ করে গিয়েছে, আমাদের থানার এই অফিসারটী ব্যস্ত হয়ে আমাদের উদ্দেশ করে বললো, আপনাদের এই বেচারাম না'কি আপনাদের মামলা সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছে, এই কয়দিন এই সংবাদটী আপনাদের দেবার জন্য প্রায়ই এই থানার আশে পাশে ঘুরাঘুরি করছে। এই সব জরুরী বিষয় আপনাকে ছাড়া এখানকার আর কাউকে সে জানাতেই চাইলো না।

প্রীতি বা ভালবাসাবশতঃ যারা পুলিশের ইনফরমার হয় তাদের স্বভাবচরিত্র এমনিই হয়ে থাকে। তারা মাত্র একজন অফিসারের বশ্যতা স্বীকার করে তবেই বংশানুবদ্ধ হয়ে মাত্র তাকেই তারা খুশী করে চলে। অন্য অফিসারদের পক্ষে ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করলে এরা স্বভাবতঃই পুলিশের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, কিন্তু এইদিন আমরা নিদ্রাহীনতা ও অতি-পরিশ্রমে এমনই ক্লান্ত তো বটে; এমন কি স্নানাহারের অভাবে আমাদের চোখ মুখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। আমাদের পা দুটোও যেন আর আমাদের ভার রাখতে যেয়ে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে পড়তে চায়। আমাদের অবর্ত্তমানে আমাদের সম্পর্কে এখানে কোনও অঘটন হয়নি, এইটুকু মাত্র জেনে খুশী হয়ে আমরা ঘাড় নাড়তে নাড়তে উপরে চলে গেলাম।

[ক্রমশঃ

বাসগৃহ-সমস্যা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বর্ত্তমানে ভারতের বড় বড় সহরে বিশেষতঃ কলিকাতা ও বোম্বাই বা দিল্লীতে বাসগৃহ-সমস্যা যে কত তীব্র সে কথা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। চাহিদার তুলনায় বাড়ীর সংখ্যা এত সামান্য যে বাড়ী পাইতে হইলে আজ মোটা টাকা সেলামী দিতে হয়, নয়ত দালালকে খুসী করিতে হয়। নতুবা বাড়ী-পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এদিকে প্রধানতঃ ভাড়াটিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্যই সরকার প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই বাড়ীভাড়া আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সমস্যা সমাধান হওয়া দূরের কথা উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আবার একথাও সত্য যে, বড় বড় সহর ও তার আশে-পাশে বহু নূতন নূতন বাড়ী তৈরী হইতেছে। কিন্তু তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। বর্ত্তমানে অবস্থা এমন যে বহুসংখ্যক বাড়ী তৈরী ব্যতিরেকে এ সমস্যা সমাধানের আর দ্বিতীয় পথ নাই। অথচ সকলেই জানেন বাড়ী তৈরী করিতে কত টাকার প্রয়োজন। তাই, সমস্যা সমাধানের জন্য যেরূপ পাইকারীহারে গৃহনির্মাণ করা প্রয়োজন সে টাকা সরকার বা পুঁজিপতি ছাড়া কাহারো পক্ষে জোগান সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে বাড়ীভাড়া সেরূপ চড়া, তাহাতে এই খাতে টাকা লগ্নী করিলে মোটাহারে মুনাফা করাও সহজ। অতএব পুঁজিপতিগণ সহজেই এদিকে আকৃষ্ট হইবেন ইহা আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি বনিকশ্রেণী এদিকে অগ্রসর হইতেছেন না কেন, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে আমরা সেই কারণসমূহও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

সেজন্য বর্ত্তমানে গৃহনির্মাণ আশানুরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না, তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ আমাদের কর ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে আয়কর ব্যতীত করদাতাকে আরও পাঁচটি প্রত্যক্ষ করের চাপ সহিতে হয়, যথা, ধনকর

Wealth Tax), মূলধন লভ্যাংশ কর (Capital Gains Tax), ব্যয়কর (Expenditure Tax), দানকর Gifts Tax) ও সম্পত্তি কর (Estate Duty)। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ধনিকশ্রেণীকে একমাত্র আয়কর ও ধনকর বাবদ যে অর্থ সরকারকে বছরে গণিয়া দিতে হয় তাহার পরিমাণ প্রায় তাহাদের মোট আয়ের সমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা; ইহা হইতে তাহার বার্ষিক আয় হয় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই আয়ের উপর তাহাকে আয়কর বাবদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা ও সম্পত্তির উপর ধনকর বাবদ ৪১ হাজার টাকা সরকারকে গণিয়া দিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, উপরোক্ত দুই খাতে করের পরিমাণ মোট আয়ের প্রায় শতকরা ৯৭।৯৮ ভাগের সমান। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এমতাবস্থায় তাহার পক্ষে বাড়ীঘর রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নহে। কিভাবে যে তাহার সংসার খরচ চলিবে সে কথা না বলাই ভাল। এই যখন অবস্থা, তখন ধনিকশ্রেণী বৃহদাকারে বাড়ীঘর নির্মাণ সুরু করিবে ইহা আশা করা বৃথা। তাছাড়া উচ্চ করভারের ফলে যে সব বাড়ীঘর এখন আছে, উপযুক্ত তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তাহাও ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। অতএব নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ ও পুরাতন বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের উপর ধনকরের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া কী ভাবে রোধ করা যায় তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী এই করের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ রদবদল করা প্রয়োজন।

এবার দেখা যাক, বাসগৃহের আয়ের উপর—আয়করের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হয়। আয়কর আইনের ৯ ধারানুযায়ী বাসগৃহের আয় ধার্য্য হইয়া থাকে। এই ধারানুযায়ী বাড়ীর ন্যায্য বার্ষিক মূল্য (Bonafide annual value) যাহা হইবে, তাহাই বর্ত্তমানে করযোগ্য আয় বলিয়া ধরা হয়। এই ধারায় আরও আছে, বাসগৃহ হইতে নিম্নলিখিত আয়সমূহ আয়কর হইতে রেহাই পাইবে।

(ক) ন্যায্য বার্ষিক মূল্যের এক ষষ্ঠাংশ বাড়ী মেরামতের দরুণ;

(খ) বাড়ীভাড়া আদায় প্রভৃতি খরচের দরুণ বার্ষিক মূল্যের শতকরা ৬ ভাগের অনধিক;

(গ) মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বাবদ ভাড়াটিয়ার দেয় অংশ।

(ক) বাড়ী মেরামতের দরুণ বার্ষিকমূল্যের যে এক ষষ্ঠাংশ করমুক্ত করা হইয়াছে, তাহা যুদ্ধপূর্ব্বকালের স্থিরীকৃত হার। তাহার পর অদ্যাবধি মেরামতীখরচ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—অতএব, বহুপূর্ব্বে স্থিরীকৃত এই এক ষষ্ঠাংশহার অতি সামান্য। তাছাড়া, যুদ্ধপূর্ব্বকালের তুলনায় মেরামতীর অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যথা,—সিমেণ্ট, চুন, সুরকী, কাঠ, লোহালক্কড় প্রভৃতি মাল মশলার দাম ও শ্রমিক মজুরী এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আয়কর মুক্ত এই অল্প পরিমাণে কোন বাড়ীওয়ালাই গৃহনির্ম্মাণে অগ্রণী হইবে না। অতএব গৃহ-নির্ম্মাণে বাড়ীওয়ালাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হইলে করমুক্ত আয়ের পরিমাণ বর্ত্তমান বর্দ্ধিত মূল্যমানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থির করা প্রয়োজন। এই হার বাড়াইবার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি এই যে, যদিও গৃহনির্ম্মাণের মালমসলার দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছে, বাড়ীভাড়া কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বকালের তুলনায় তদনুপাতে বাড়ে নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অধিকাংশ রাজ্যসরকারই আইন করিয়া (Rent Control Act) বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, আয়কর আইনের ৯ ধারার এমনভাবে সংশোধন প্রয়োজন যাহাতে মেরামতীর জন্য করমুক্ত আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়। তবেই বাড়ীওয়ালারা বাড়ীমেরামত ও বাড়ীর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উৎসাহ বোধ করিবেন।

(খ) তারপর বাড়ীভাড়া আদায়ের খরচও পূর্ব্বের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়াছে। ভাড়া-আদায়কারী সরকার বা মুহুরীর বেতন ও সাধারণ মূল্যমানের সহিত তাল রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমতাবস্থায় গৃহের বার্ষিকমূল্যের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র এই খাতে আয়কর হইতে মকুব করিলে বাড়ীওয়ালার করভার কিছুমাত্র লাঘব হয় না বলা চলে। অতএব এক্ষেত্রেও সমুচিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবে যেহেতু এই হার আয়কর আইনের নিয়মাবলী (Rules) অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পরিবর্ত্তনের জন্য আয়কর আইনের সংশোধন প্রয়োজন হইবে না। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুসারেই ইহা সম্ভবপর।

(গ) এইবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের কথা আলোচনা

করা যাক। বর্ত্তমান আইনে খুব পুরাতন বাড়ী ব্যতিরেকে অন্যান্য বাড়ীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভাড়াটিয়ার দেয় মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের অংশ আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হয়। বাড়ীওয়ালার দেয় অংশের উপর আয়কর মকুব করা হয় না। বর্ত্তমান কলিকাতায় বাড়ীর বার্ষিক-মূল্যের শতকরা ২৩½ ভাগ মিউনিসিপ্যাল কর বাবদ কর্পোরেশনকে দিতে হয় এবং ইহার মধ্যে বাড়ীওয়ালা অর্দ্ধেক ও ভাড়াটিয়া বাকী অর্দ্ধেক দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী, বাড়ীওয়ালার দেয় এই অর্দ্ধেক অর্থাৎ কতকরা ১১¾ ভাগ বাস্তবিকই খুব বেশী এবং মনে হয়, বাড়ীওয়ালার এই অংশও আয়করমুক্ত করিয়া দিলে বাড়ীওয়ালা গৃহনির্ম্মাণে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করিবে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। গত ১৫ বৎসর যাবৎ বাড়ীভাড়া আইনের দৌলতে বাড়ীভাড়া মোটামুটি একই রকম রহিয়াছে অর্থাৎ খুব বেশী বাড়ে নাই। অথচ আয়করের হার যথেষ্টই বাড়িয়াছে। ফলে, বাড়ীভাড়া হইতে আয়কর দেওয়ার পর বাড়ীওয়ালার উদ্বৃত্ত খুব বেশী কিছু থাকে না। যাহারা এ ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন তাহারাই একথা স্বীকার করিবেন। এ কারণেই বাড়ীওয়ালার দেয় মিউনিসিপ্যাল করের অংশ আয়কর মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

আরেকটি ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। শিল্পক্ষেত্রে আইনানুযায়ী ক্ষয়ক্ষতি বাবদ (Depreciation) কর রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাসগৃহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আয়কর আইনের ৯ ধারানুযায়ী বাসগৃহের ক্ষয়ক্ষতির দরুণ কোন কর রেহাই দেওয়া হয় না। কিন্তু বাসগৃহও ত' চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতে পাইতে বাসগৃহে নিয়োজিত মূলধনও নিঃশেষ হইয়া আসে। এই ক্ষয় পূরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাসগৃহ হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে নির্দ্দিষ্ট একটা অংশ প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে লইয়া একটি তহবিল গঠন করিতে দিলে কয়েক বৎসর পর যখন বাড়ী পুনর্নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইবে তখন এই তহবিলের টাকা দিয়াই সে প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হইবে। সকলেই দেখিয়াছেন, দেশের অধিকাংশ বাসগৃহের অবস্থা আজ কত জীর্ণ এবং অবিলম্বে উহাদের সংস্কার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত তহবিলের অভাবেই আজ বাড়ীওয়ালারা বাড়ীঘর মেরামতের কাজে হাত দিতেছে না। বাসযোগ্য বাড়ীঘরের পরমায়ু গড়ে সাধারণতঃ ৩০ বৎসরের মত ধরা হয় এবং এই ভিত্তিতে হিসাব করিয়া বাড়ীভাড়া আয় হইতে একটা ন্যায্য অংশ বার্ষিক আয়করের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইলে কালক্রমে একটি ভাল তহবিল গড়িয়া উঠিতে পারে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহনির্ম্মাণ একটি প্রধান কর্ম্মসূচী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অতএব এই তহবিল গঠনের প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। আরেকটি বিষয়ও বিবেচনা সাপেক্ষ। যেখানে ইজারা-করা জমির উপর বাড়ীঘর তৈরী হয় সেখানে ঝামেলা আরও বেশী। কারণ ইজারার মেয়াদ শেষ হইলে ইজারাদারের আর জমি বা সম্পত্তির উপর কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না। ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিবার সময় এ বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

আজকাল ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা বা বাণিজ্যক্ষেত্রেই তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকেন—কারণ উভয়ক্ষেত্রেই মুনাফার যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু তদনুরূপ মুনাফা গৃহনির্ম্মাণ শিল্প হইতে পাওয়া যায় না বলিয়াই এদিকে বিরাটাকারে কোন লগ্নী দেখা যায় না। তাই গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারেও আয়কর আইন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন লগ্নীকারীরা গৃহনির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট মূলধন বিনিয়োগ করিতে উৎসাহ বোধ করেন। উপরে যে ক্ষয়ক্ষতি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে—তাহা গ্রহণ করিলে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি প্রস্তাব—বাসগৃহের আয় অন্যান্য ব্যবসাজাত আয়ের মত আয়কর আইনের ১০ ধারা অনুসারে ধার্য্য করা, অর্থাৎ করদাতা তাহার গৃহজাত আয় হয় ৯ ধারা নতুবা ১০ ধারা অনুযায়ী করধার্য্য করাইবার স্বাধীনতা পাইবেন।

বেশীদিন আগের কথা নয়, আয়কর আইনে ব্যবস্থা ছিল, বাড়ী তৈরী হইবার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহা হইতে যে আয় হইবে তাহা আয়কর হইতে রেহাই পাইবে। গত ১৯৫৬ সন হইতে সরকার বাড়ীওয়ালাগণকে এই সুবিধা আর দিতেছেন না। দেশে যখন বাসগৃহ সমস্যা অতি তীব্র সে সময় এই সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া লইবার কোন যৌক্তিকতা নাই। অন্ততঃ বেশী না হইলেও আরও ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়ীওয়ালাগণকে এই সুবিধা দেওয়া

উচিত। তাহা হইলে বাসগৃহ নির্ম্মাণে বাড়ীওয়ালারা অধিকতর অর্থ লগ্নী করিতে উদ্যোগী হইবেন এবং এই প্রচেষ্টার দরুণ বাসগৃহ সমস্যারও কিঞ্চিৎ সমাধান হইবে।

বাসগৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে জমি-উন্নয়ন কোম্পানীগুলির ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতএব এই কোম্পানীগুলিকে নানারকম সুযোগ সুবিধা দিলে প্রকারান্তরে তাহা বাসগৃহ নির্ম্মাণেই উৎসাহ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীগুলি বাড়ী তৈরী ব্যাপারে কোন উৎসাহই পায় না। বর্ত্তমানে ইহারা সহর বা পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা ইজারা লইয়া সেখানকার বনজঙ্গল আবাদ করতঃ বাসোপযোগী করিয়া তোলে, ছোট ছোট টুকরা করিয়া জমি বণ্টন করে, পানীয়জল, আবর্জ্জনা নিষ্কাশন ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা নিজেরাই বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুবিধাজনক কিস্তিতে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারাও নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া থাকে; যেমন কিস্তিবন্দী হিসাবে যখন বাড়ী বা জমিবিক্রয় হয়, তখন ভবিষ্যৎ কিস্তির পরিমাণ মোট আয়ের সহিত ধরিয়া তবেই এই কোম্পানীগুলির বার্ষিক আয়কর ধার্য্য হয়। ফলে, অনাদায়ী টাকার উপরও ইহাদের কর দিতে হয় এবং কখনও বাড়ী বা জমির ক্রেতা কিস্তির টাকা খেলাপ করিলে সে টাকা আর আদায়ই হয় না। অথচ এই কোম্পানীগুলিকে সে টাকার উপরও কর দিতে হয়। ইহা বাস্তবিকই বাঞ্ছনীয় নহে। কখনও কখনও এই কোম্পানীগুলি জমি সংগ্রহের ব্যাপারেও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে। সুতরাং জমি সংগ্রহ আইন (Land Acquisition Act) এমনভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যেন এই কোম্পানীগুলির অসুবিধা বহুলাংশে লাঘব হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সহর বা পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল উন্নয়ন করিবার পর সন্নিহিত এলাকার মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌর কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত অঞ্চল তাহাদের এলাকাযুক্ত করিয়া লন এবং পানীয়জল ও নিষ্কাশন প্রভৃতি ব্যবস্থার দরুণ অত্যন্ত চড়াহারে করধার্য্য করিয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও পৌর কর্ত্তৃপক্ষ কখনও কখনও নলকূপ খনন বা ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিয়োগের জন্য এই কোম্পানীগুলির উপর অত্যন্ত চাপ দেন। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের এই ক্ষমতাপ্রয়োগ হইতে বিরত হওয়া উচিত।

দেশের ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলিরও উচিত এই কোম্পানীগুলিকে অধিকতর উৎসাহদান করা। অত্যন্ত কমসুদে বাড়ী বা জমি বন্ধক রাখিয়া কোম্পানীগুলিকে দীর্ঘকালীন ঋণ মঞ্জুর করিলে প্রকৃতই গৃহনির্ম্মাণ প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হইতে পারে। বিদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে এই কোম্পানীগুলি গৃহ বা জমির মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। তাছাড়া, কেহ যদি এই কোম্পানী হইতে বাড়ী বা জমি ক্রয় করিতে চাহেন তবে তিনিও ব্যাঙ্ক হইতে সহজেই ঋণ পাইয়া থাকেন। তবে এক্ষেত্রে কোম্পানীগুলিকে বাড়ীর ক্রেতা-মালিকের জন্য জামীন দাঁড়াইতে হয়। দেশের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন যেন ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন রাজ্যসরকার বাড়ীভাড়া আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই আইনই নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আইনে ন্যায্য ভাড়ার পরিমাণ ও মাত্রা এমনভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে যে নূতন গৃহনির্ম্মাণে নিয়োজিত মূলধন হইতে আনুপাতিক হারে অর্থ পাওয়া সম্ভব নহে। কোন কোন রাজ্য সরকার ১৯৪১ সাল বা তার কাছাকাছি সময় যে ভাড়ার হার চালু ছিল সেই হারকেই ভিত্তি করিয়া ন্যায্য ভাড়া স্থির করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ১৯৪১ সাল হইতে অদ্যাবধি ২০ বছর পর্য্যন্ত মূল্য মান প্রায় ৪।৫ গুণ বাড়িয়াছে, অতএব ১৯৪১ সালের ভাড়ার হার যদি বর্ত্তমান ভাড়ার হারের ভিত্তি হয়, তবে তাহা যেমন হাস্যকর তেমনি অবাস্তব—এ বিষয়টি সরকারের পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাড়ীভাড়া আইনের আলোচনায় আরও দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ যদি কোন ভাড়াটিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকমাসের ভাড়া বাকী ফেলিয়া রাখে তবে বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের আইনে এ হেন ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাড়ীওয়ালার পক্ষে অতি কষ্টকর। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ উপভাড়াটিয়া সম্বন্ধে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আসল ভাড়াটিয়ার থাকিবার মেয়াদ কয়েক বছরের জন্য হইলেও উপভাড়াটিয়াগণ নির্দ্দিষ্ট

মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও বাড়ী ছাড়েন না। কোন কোন রাজ্যের অধীন এইরূপ উপভাড়াটের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা আছে অথচ বাড়ীওয়ালাদের কোনও সুবিধা দেওয়া হয় নাই। ইহাও নূতন গৃহনির্ম্মাণের পথে এক প্রধান অন্তরায়। বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করার ফলে এই সব আইন নূতন নূতন গৃহনির্মাণে উৎসাহ না দিয়া বরং নিরুৎসাহই সৃষ্টি করিতেছে।

সম্প্রতি ভারতের বীমা কর্পোরেশনও গৃহনির্ম্মাণে উৎসাহ দিতে অগ্রণী হইয়াছেন। তাহাদের পরিকল্পনানুযায়ী তাহারা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া গৃহনির্ম্মাণ ঋণ মঞ্জুর করিতেছেন। ইহা সময়োচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরিকল্পনা কেবলমাত্র কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ দিল্লী ও হায়দরাবাদের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। এ পরিকল্পনার সুবিধা অন্যান্য এলাকায়ও প্রসারিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া, কার্য্যতঃ যে সব কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ১০০০৲ টাকার উর্দ্ধে, কর্পোরেশন তাহাদিগকে এই ঋণের সুবিধা দিতেছেন না। কিন্তু এই শ্রেণীগত বাধা দূর হইলে দেশে অধিক-সংখ্যক গৃহনির্ম্মাণ সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমানে বহু কর্ম্মচারী মাসিক এক হাজার টাকার উর্দ্ধে উপার্জ্জন করিয়াও গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন বিরাট পরিমাণ টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একসঙ্গে যোগাড় করিতে পারেন না। অথচ তাহারা প্রতিমাসে মোটা টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া থাকেন। তাহারা এ ঋণের সুবিধা পাইলে নিজেদের বাস গৃহ তৈরী করতে সক্ষম হইবেন এবং যে টাকা এখন বাড়ীভাড়া বাবদ ব্যয় করিতেছেন তাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ—এ প্রস্তাবটি যত্ন সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখেন—ইহা বাস্তবিকই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে এ ঋণের একটা সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে, যেমন বিশ হাজার বা ত্রিশ হাজার টাকা। আসল কথা, মাসিক একহাজার টাকার উর্দ্ধে আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও এ ঋণের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। উপরের প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী হইলে একদিকে যেমন বিরাটকারে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যকলাপ সুরু হইতে পারে, তেমনি কয়েক বছরের মধ্যেই আশা করা যায় বাসগৃহ-সমস্যারও অধিক পরিমাণে সমাধান হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কবি তোমার হাসির গানে—
শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ি'
ব্যথার নদী বয় উজানে।
দেয়না কেবল হাসির ছিটা,
সে দিয়ে যায় বিঁধন মিঠা,
হাতে রঙের পিচকারী তার
আগুন লাগায় সে আসমানে।

২

ত্র্যম্বকের ও অট্টহাস্যে—
শিব যে স্বয়ং বসত করে।
খণ্ডায়ে দেয় সব অভিশাপ।
জাতির সর্ব্বরিষ্ট হরে।
অতি সহজ সরল কথা,
মাপ্‌বে কে তার গভীরতা?
কানে যা কয় সামান্য তা—
প্রাণ বোঝে তার হাজার মানে
মর্ম্মভেদী তোমার গানে।

৩

চামুণ্ডীর ও হাস্য চেয়ে—
অনেক গুণে কান্না ভালো।
চক্ষে জোরে আঙুল দিয়ে
বলে 'বারেক চক্ষু মেলো।'
ফুলের মালা সর্প হয়ে,
করতে আসে দংশন হে,
সব্যসাচীর নিশিত শর
প্রলয় ঘটায় রাজোদ্যানে।

৪

সে হাসির হায় দারুণ আঁচে—
জতুগৃহে আগুন লাগে।
পাপীর পাকা ভাণ্ডারেতে
ফাটাল ধরে—শঙ্কা জাগে।
যা ফাঁকি আর যাহা মেকী।
আপ্‌নি ঝরে তারেই দেখি,
রাবণ রাজার কিরীট নড়ে,
সিংহাসনে চিকুর হানে।
কবি তোমার হাসির গানে।
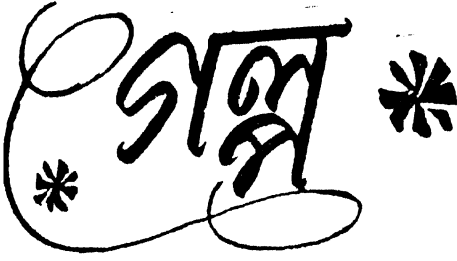
পুতুলের জন্যে

সন্তোষকুমার অধিকারী

ঝগড়াটা আরম্ভ হ'য়েছিল হঠাৎ—আর অকারণে। এক-মাত্র মেয়ে মিন্নুর জন্মদিনে অপর্ণা নেমন্তন্ন করেছিল শহরের অনেককেই। সন্ধ্যের সময়ে সকলে চা খেতে আসবে। অথচ সমরেশ সেই যে দশটার সময়ে খেয়ে উঠে বেরিয়েছে, এখনও খোঁজ নেই তার। ছুটির দিন দেখেই অপর্ণা এই আয়োজনটা করেছিল। জন্মদিনটা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই অজুহাতে অনেককেই যে বাড়ীতে আন্‌তে পারবে, আর তার স্বামী ও সংসার দেখাতে পারবে—এই ছিল তার মনের ইচ্ছে। কিন্তু একি করছে সমরেশ ?

সন্ধ্যে হ'য়ে যাওয়ায় অপর্ণার অবস্থাটা অবর্ণনীয় হ'য়ে দাঁড়ালো। অভ্যাগতরা ততক্ষণে অনেকেই এসে গেছেন। সমরেশ গিয়েছে কলকাতায় সন্দেশ আর ডালমুট আন্‌তে। দুটো তিনটের মধ্যেই তার ফিরবার কথা। লোকের কাছে শেষ পর্য্যন্ত অপদস্থ হ'বে নাকি অপর্ণা ?

প্রথমে রাগ, তারপরে ভয় তার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগ্‌লো। কিছু বিপদ ঘট্‌লো না ত? সমরেশ ত দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। তাই সন্ধ্যে পার হ'য়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন সমরেশের রিক্সা এসে দাঁড়ালো তখন চাপা ক্রোধে ফেটে পড়লো সে।

—আশ্চর্য লোক ! আমাকে অপদস্থ করবার ইচ্ছেই যদি ছিল, তা আগে বল্‌লেই পারতে। কাউকে ডাকতাম্ না বাড়ীতে।

রিক্সা থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে সমরেশ বল্‌লো—ধরোত অপর্ণা।

সন্দেশের বাক্সটা রিক্সাতেই ছিল। সে অপর্ণার হাতে তুলে দিল কাগজে জড়ানো একটা পুতুল। বিরক্তিতে হাসি চাপতে চাপতে অপর্ণা পেছনে মেয়ের হাতে পুতুলটা দিয়ে বল্‌লো—নে, তোর বাবা সারাদিন ধরে কলকাতা ঘুরে নিয়ে এসেছে তোর জন্যে।

—আহা হা হা ! মিন্নু মা, ওটা ফেলে দিওনা। দাও আমার হাতে।

সন্দেশ আর ডালমুটের প্যাকেট মাটিতে নামিয়ে রেখে সমরেশ হাতে তুলে নিল পুতুলটা। বল্‌লো—অনেক দাম দিয়ে কিনেছি এটা। বোঝোনা ত ? আসলে এটা বুদ্ধ-মূর্তি। মালয় থেকে আনা। এ' মূর্তির কল্পনা এ' দেশের নয়।

কাপড়জামা বদ্‌লে সমরেশ যখন ঘরে এলো তখন সকলে চা খাচ্ছে। অপর্ণা তাদের ডিসে সন্দেশ ডালমুট সাজিয়ে দিয়ে চা পরিবেশন করছে—তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

তরুণ মুন্সেফ মুখার্জি সন্দেশের কোণা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বললেন—আপনার এত দেরী যে ?

সমরেশ বললো—একটা অপূর্ব মূর্তি পেয়েছি। বুদ্ধ-মূর্তি। নিউ মার্কেটে কিউরিও শপে এটা কিন্‌তে গিয়েই ত' দেরী।

আমাদের দেখাবেন না ?—বললেন মিসেস মুখার্জি।

সমরেশ কিছু বলবার আগেই অপর্ণা ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর দিল—বুদ্ধমূর্তি না আরও কিছু ? কেমন কুশ্রী একটা চেহারা। ঠিক ভূতের মত। বুদ্ধের দাড়ি ছিল বলে কেউ শুনেছে ?

সমরেশ এক মুহূর্তে তার দিকে চেয়ে বললো—এই জন্যেই বলি একটু লেখাপড়া শেখা দরকার। মূর্খের মত যা' তা বোলোনা ত।

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধকরি অপর্ণা এত

চমকাতো না। এক ঘর লোকের সামনে কিনা সমরেশ এমনিভাবে অপমান করলো তাকে। অপর্ণা বেশীদূর লেখাপড়া করেনি। কিন্তু সে কথার উল্লেখ করলো সে এমনি কদর্য ভাবে।

সকলেই কেমন হতচকিত। সমরেশ নিজেও অপ্রস্তুত। ঘরের আবহাওয়াটাই কেমন বিশ্রী হ'য়ে গেল এক মুহূর্তে।

সে রাত্রে কিছুই খেল না অপর্ণা। মিনুকে নিয়ে আলাদা ঘরে খিল দিল। রাগে অভিমানে সে তখন অন্য-মানুষ।

পরের দিন সকালেও কোন কথা হ'লো না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কোথা থেকে একটা যেন উড়ো মেঘ এসে জমেছে। নীরবে গম্ভীর মুখে সমরেশ আপিস চলে গেল। আর স্বামীর পাতে মিনুকে খাইয়ে নিজেও কোনমতে সামান্য কিছু খেয়ে নিলো সে। তারপর মিনুকে ঘুম পাড়িয়ে জান্‌লার ধারে এসে বসলো সে।

জান্‌লা দিয়ে অনেকটা দেখা যায়। রাস্তার ওপারে ভাঙ্গা বাড়ীটাতেও থাকে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রীটার কি দেমাক! কিন্তু স্বামী যেন তাকে হাতের তেলোয় ক'রে রেখেছে। অপর্ণা নিজের কথা ভাব্‌লো—তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিছানার দিকে এগোল। হঠাৎ দেয়ালের দিকে নজর পড়লো তার।

আশ্চর্য! দেয়ালে এ'র মধ্যে একটা ব্র্যাকেট টাঙানো হ'য়েছে। তার ওপরে শোভা পাচ্ছে সেই অপরূপ কালো কাঠের তৈরী মূর্তিটা। ইস! ওই নাকি বুদ্ধমূর্তি? বুদ্ধের সৌম্য সুন্দর চেহারার সঙ্গে ও চেহারার মিল কোথায়?

মূর্তিটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল অপর্ণা। হঠাৎ এক সময়ে মনে হ'লো তার—সেই কালো কাঠের মুখাবয়বে দুটি ছোট চোখের সাদামণি তার দিকে চেয়ে সজীব হ'য়ে উঠ্‌ছে। ও' যেন নীরবে তিরস্কার করছে অপর্ণাকে। কেমন যেন অভিভূত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল অপর্ণা। তার সম্বিত্‌ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে মিনু কেঁদে উঠলো—মা গো।

চমক ভাঙ্গতেই ছুটে এসে মিনুকে জড়িয়ে ধরলো সে বুকে। কেমন একটা অজানিত ভয়ে তার গা ছমছম করছে। ওই মূর্তিটা টেনে ফেলে দিতে পারলে সে স্বস্তি পায়। কিন্তু স্বামীকেও চেনে অপর্ণা। কাল এই নিয়েই ঝগড়া। এ'রপর এ' নিয়ে আর এগোবার সাহস তার আর নেই এখন।

অপর্ণা ভাব্‌ছিল—কাল সারারাত সে না খেয়ে কাটালো, আর সমরেশ একবার ডাকলোনা পর্যন্ত। চাপা একটা অভিমান তার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে লাগল।

অপর্ণা মনে মনে ঠিক করলো, সমরেশ যখন তাকেই অপদস্থ করেছে তখন সেও নিজেকে সরিয়ে নেবে। নির্লিপ্ত হ'য়ে যাবে সংসার থেকে। কিন্তু বিকেলে সমরেশ যখন আপিস থেকে ফিরে এল তখন তার মুখ দেখে চমকে উঠ্‌লো অপর্ণা।—একি—অসুখ করেছে নাকি?

—না, গম্ভীর মুখে বললো সমরেশ। তারপর সোজা ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। জামা খুলবার সময় পর্যন্ত হ'লোনা তার।

—তাহলে? অপর্ণা হতভম্ব হ'য়ে বসলো কাছে।

সমরেশ মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল। যা হয়েছে অপর্ণাকে বলা দরকার। তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবনের কোন কিছুই অপর্ণাকে না বলা হয়নি তার।

অপর্ণা ততক্ষণে কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখছে—না, জ্বর হয়নিত? তবে?

সমরেশ বললো—আজ খবর এসেছে, আমাদের আপিস নাকি উঠে যাচ্ছে কলকাতা থেকে। এবার যেতে হ'বে—হয় মাইথনে, আর নইলে বিহারের কোন শহরে। আর নইলে চাকরী ছাড়তে হবে।

দুশ্চিন্তার ছায়া নামলো অপর্ণার মুখে। তবু সে উঠে বললো—আগে তোমার চা করি।

উঠে দাঁড়িয়েই অপর্ণা সামনের দিকে চাইলো, আর সেই কাঠের পুতুলটা তার চোখে পড়লো। মনে হ'লো কালো মুখটাতে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ একটা হাসি। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন মনে হল ওই পুতুলটা বুঝি প্রাণবান।

চা খেয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যাচ্ছিল সমরেশ। কিন্তু কি ভেবে ফিরে এলো আবার। সেই কাঠের মূর্তিটাকে হাতে নিয়ে রুমাল দিয়ে ঝাড়লো। তারপর ব্র্যাকেটে বসিয়ে মিনুকে একটু আদর করে বেরিয়ে গেল।

অপর্ণার মনের দুঃখটা আবার নতুন করে জেগে

উঠলো। পুরুষ জাতটা এমনি স্বার্থপর। অপর্ণার মন ব'লে যে একটা জিনিস আছে, তা সে আমল দিতেই চায়না। অথচ এই সমরেশই কিছুদিন আগেও অপর্ণা মুখভার করে থাক্‌লে অস্থির হ'য়ে উঠতো।

সন্ধ্যের সময় একা একা ভালো লাগছিলনা। তাই অপর্ণা মিন্নুকে নিয়ে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গেল। পাশের বাড়ীর সুধা উকীলের গিন্নী। তার রোজ নতুন গয়না আসছে আর শাড়ি। সুধা দেখাচ্ছিল অপর্ণাকে। হঠাৎ মনে হলো—সমরেশ বাড়ী ফিরেছে আর চিৎকার করে ডাকছে মিন্নুর নাম ধরে।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলো। ঘর খুলতেই সমরেশ আগে এসে শয্যা, তাক্‌, আলমারীর মাথা খুঁজতে লাগলো। তারপর অপর্ণার সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠলো —আমার টাকার ব্যাগ কোথায়?

—আমি কেমন করে জান্‌বো?

—আমার পকেটে ছিল। ঘরে জামা খুলে রেখে বাথরুমে গিয়েছিলাম।

—তুমি কি বলতে চাও আমি চুরি করেছি? অশিক্ষিত হ'তে পারি, কিন্তু বাপ মা চুরি করতে শেখায়নি। রাগে গরগর করতে করতে অপর্ণা তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আর সমরেশও উত্তর দিতে ছাড়লোনা। বললো—বড় মেজাজ দেখ্‌ছি। কে তোমার মেজাজের ধার ধারে?

অভুক্ত সমরেশ গভীর রাত্রিতে ঘরে পায়চারী করতে করতে ভাবছিল—একি হ'লো? ত্রিশটা টাকাসমেত ব্যাগটা গেল। রাস্তাতেই কেউ তুলে নিয়েছে।

জান্‌লায় মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অপর্ণা ভাবলো—আর না। এবার সমরেশ তোমায় সহ্য করতে পারছেনা।

দিন তিনেক পর পর কেটে গেল। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনা, কারও মুখের দিকেও চায়না। অপর্ণা প্রায় না খেয়েই কাটাচ্ছে। মাঝখান থেকে বাচ্চা মেয়ে মিন্নুরও নাকালের একশেষ। সমরেশ আপিস যাচ্ছে আগের মতই। অনেকরাত্রে ফিরে ঢাকা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। বাড়ীতে মাত্র দুটি লোকের মাঝখানে যেন এক দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান।

এই কদিনই মিন্নুটারও শরীর খারাপ যাচ্ছে। অপর্ণা দুপুরে মিন্নুকে ঘুম পাড়িয়ে, পাশে বসে বসে একটা চিঠি লিখছিল দাদাকে। ভবানীপুরে তার দাদা থাকে অপর্ণার ইচ্ছে এখন কিছুদিন ভবানীপুরে গিয়ে থাকে।

চিঠিটা একটা বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে অপর্ণা তার পুরোনো দিনগুলোকে ভাববার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ ভর্ত্তি হ'য়ে জল নামলো। চোখ ধোয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো অপর্ণা, আর তিন চারদিন পর আজ আবার সেই কাঠের মূর্তিটার দিকে চোখ পড়লো তার। অপর্ণার মনে হ'লো চাপা হাসিতে তীক্ষ্ণ সে মুখ। হাসি ফুটে বেরোচ্ছে মূর্তির চোখ দুটো থেকে। চোখ ফিরিয়ে নিল অপর্ণা। হঠাৎ তার মনে কেমন একটা আশঙ্কার ছায়া নাম্‌লো। কে জানে ওই মূর্তিটার মধ্যে কোন অশুভ ছায়া লুকিয়ে আছে কিনা।

ওই পুতুলটাকে টেনে ফেলে দিই—আগুনে কিম্বা আস্তাকুড়ে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে এগিয়ে গেল অপর্ণা। কিন্তু সভয়ে স্তব্ধ হ'লো। মূর্তিটার দুই চোখ আবার জ্বলে উঠেছে। যেন ক্রোধে আরও কঠোর সেই দৃষ্টি। অপর্ণা চোখ নামিয়ে পালিয়ে এল। হঠাৎ মনে হ'ল বাইরের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। জোরে জোরেই ধাক্কা দিচ্ছে। অপর্ণা বেরিয়ে এল। কিন্তু দরজা খুলে অবাক হ'লো কেউ নেই ত। দরজা বন্ধ করে উঠোনে এসে দাঁড়ালো সে। টিউবওয়েলের জল গড়িয়ে উঠোনটা পেছল হ'য়ে আছে। দূরের নারকোল গাছটার মাথায় একটা কাক বসে আছে। সেদিকে তাকাতে তাকাতে পেছল উঠোনে পা দিলো। পা দিয়েই মনে হ'লো যা পেছল, কেউ অসাবধানে চললেই পড়ে যেতে পারে। ভাবতে গিয়ে কেমন গা শিরশির করে উঠলো তার। আর হঠাৎ মনে হ'লো সেও ত' পড়ে যেতে পারে। নীচের দিকে তাকিয়েই পা ফেললো অপর্ণা; আর মনে হলো পায়ের তলায় সবুজ বুঝি শাওলা। চোখ বন্ধ করলো সে আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল।

* * *

পূরো দশঘণ্টা অজ্ঞান থেকে হাসপাতালে জ্ঞান ফিরলো অপর্ণার। কিন্তু এত দুর্বল যে নড়াচড়া তার

বারণ। সমরেশকে ডেকে বললো ডাক্তার—she was carrying কাজেই এ' অবস্থায় কোন রকম পরিশ্রম উদ্বেগ বা চিন্তা করতে দেওয়া চলবে না। সব রকম ভেবে সমরেশ ভবানীপুরেই তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অপর্ণা ভবানীপুর গেল।

দিন পনেরো পর অপর্ণা ফিরে এলো। অবশ্য সে নিজের থেকে আসার নাম করেনি। সমরেশই আন্‌তে গিয়েছিল তাকে।

ফিরবার পথে একটিও কথা হ'লো না। অপর্ণার বুকের জমা অভিমানটা এখনও নামেনি। নেহাৎ সমরেশ নিতে এসেছিল তাই। বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরে ওকে নামিয়ে দিয়ে সমরেশ বেরিয়ে গেল। আর অপর্ণা লাগলো বাড়ী পরিষ্কার করতে। এর মধ্যে একটা বাচ্চা চাকর আমদানী করেছে সমরেশ। বোকা বোকা ছেলেটা—নাম রামযশ। অপর্ণার কাজ কিছুটা কমবে। মনে মনে তবু একটু খুসী হ'লো অপর্ণা।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে এলো সমরেশ। তার জামা খোলা শরীর দেখে চমকে উঠলো অপর্ণা। কি হ'য়েছিল? এমন রুগ্ন লাগছে?

—জ্বর। বললো সমরেশ। তুমি যাওয়ার পর জ্বর হ'য়ে একসপ্তাহ শুয়েছিলাম।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লো অপর্ণা। খবর দিলে কি দোষ হ'তো?

সমরেশ হঠাৎ অপর্ণার হাত দুটো চেপে ধ'রে বললো—রাগ ভাঙ্গেনি এখনও?

একটু আদরেই এলিয়ে গেল অপর্ণা। বললো—আমি জানি, কোন কারণে তোমার মন অন্যরকম হয়েছিল। নইলে তুমিত আগে কখনও বক্‌তে না আমাকে।

সমরেশ দুহাতে কাছে টান্‌তে গেল তাকে। অপর্ণা বললো—দাঁড়াও আলোটা নিভিয়ে আসি।

আলোটা নিভোতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হ'লো তার—ব্র্যাকেটটা যে খালি। সেই পুতুলটা?

সমরেশ বললো—একদিন ঝড় উঠেছিল, পড়ে নাকটা ভেঙ্গে গেল। তাই সারাতে দিয়েছি।

অপর্ণা সমরেশকে জড়িয়ে ধ'রে বললো—একটা কথা রাখবে আমার? পুতুলটা আর ফিরিয়ে এনো না।

সমরেশের বুকে মুখ গুঁজে বললো অপর্ণা—আমার মনে হয় কি জানো? ওই পুতুলটা বড় অশুভ। তোমাকে বলতে পারিনি—শুধু ওই পুতুলটার জন্যে আমাদের এত ঝগড়া, বিপদ, সব কিছু।

প্রতিবাদ না ক'রে সহাস্যে বললো সমরেশ—তাহ'লে শুধু একটা পুতুলের জন্যেই; কি বলো।

অপর্ণা বললে—হ্যাঁ।

বাণী

শ্রীবংশী মণ্ডল

নিশীথ স্বপনে বেজেছে প্রাণের তন্ত্রী
শয়ন সায়রে ঘনায়ে গভীর তন্দ্রা
দ্যুলোকের তুমি কোন সে গানের যন্ত্রী
জ্যোৎস্না স্বরের আলোক মগন চন্দ্রা।

তুমি তো সবার সকল প্রাণের বন্ধ
বদ্ধ রেখেছ মানসীর বাতায়ন
আমারে দিলে কি তোমার ভাবের ছন্দ
বাঁধন থসায়ে সব মোর তনু-ঘন।

যে বাণী পাইনি যে কথা বল্লিনি মুখে
প্রিয়া সে যে মোর মানবী চিরন্তনী
কি গান শিখায়ে কি সুর বাজালে বুকে
গলেতে দুলায়ে কোন বেদনার মণি।

হৃদয় দুয়ার এখনো রেখেছি খোলা
নিখিলে উঠেছে গভীর স্বরের ধ্বনি
গানের সুবাসে তুমি গো আপন ভোলা
যে বাণী পাঠালে সে যে মোর আবাহনী।

ভারতের মিলনসূত্র সংস্কৃত

শ্রী নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তী

পণ্ডিতজনেরা প্রায় বলে থাকেন যে আজ পর্যন্ত সংস্কৃতই ভারতের মিলনসূত্র। এ কথাটী যে কত বড় সত্য, তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি—যখন আমাদের পণ্ডিত-প্রবর সংস্কৃতসেবায় দত্তপ্রাণ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরীর সুবিখ্যাত সংস্কৃত-পালি নাট্যসঙ্ঘের সঙ্গে সুদূরতম দ্বারকা পর্যন্ত পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটেছিল এই পূজার বন্ধে।

ভারতবাসী মাত্রেরই স্বপ্নস্বরূপ দ্বারকা, শ্রীকৃষ্ণের মহা-লীলাক্ষেত্র দ্বারকা। কতদিন থেকে মনে আশা পোষণ করে আসছিলাম যে একবার পদার্পণ করে শ্রীকৃষ্ণের পদ-রেণুপূত সেই ধূলি মস্তকে ধারণ করে জীবন ধন্য করবো। সেজন্য প্রাচ্যবাণী দিল্লী, জামনগর, দ্বারকায় ডক্টর যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরীর কয়েকটী সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন জেনে আমিও এঁদের সঙ্গে জুটে গেলাম পরম আনন্দে।

অতি সুদীর্ঘ পথ। কলিকাতা থেকে দ্বারকা প্রায় দু'ই হাজার মাইল। ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমতম প্রান্তে আমাদের যাত্রা প্রকাণ্ড একটা দল সহ। তাতে গায়ক, রূপসজ্জাকর প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্ব স্ব দ্রব্যাদি সহ।

চার চার দিনের রাস্তা ; তার উপর বার বার গাড়ী বদল করতে হয়। দিল্লীর পর থেকে ছোট গাড়ী ; অসুবিধাও যথেষ্ট নানা দিক থেকে। রিজার্ভেসন পাওয়া, বিশেষতঃ পূজার ভিড়ে—প্রায় দুর্ঘট ; তার উপরে খাবারও ভাল নয়। কিন্তু সমস্ত অসুবিধা তুচ্ছ করে আমাদের মনের আনন্দ হয়ে উঠ্‌লো উৎসারিত সহস্র ধারে। কি আনন্দেই না আমাদের যাত্রাপথ কেটেছে। কেন্দ্রস্থলে ছিলেন সদা-নন্দ মূর্তি চৌধুরীদম্পতী। তাঁদেরই সস্নেহ পরিচর্যায়, গানে, রিহার্সিয়ালে, সহজ সরস আলোচনায়, হাসিতামাশায় আমাদের যাত্রাপথ হয়ে উঠ্‌লো পরম রমণীয়। সেই মধু-স্মৃতি কখনও ভুলবার নয়।

দ্বারকা

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২, রাত্রে কলিকাতা ত্যাগ করে আমরা ৪ঠা অক্টোবর বিকালে সাড়ে তিনটায় পুণ্যভূমি দ্বারকাধামে উপস্থিত হলাম। পথে দিল্লীধামে শ্রীযুক্ত জয়-দয়াল ডালমিয়া, মেহেসানা বানংসানে, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ শেখ এবং রাজকোটে ডাঃ গোস্বামী ও তাঁহার পত্নী আমাদের অকাতর সাহায্য দান করেন। আমাদের আম-ন্ত্রণ জানিয়েছিলেন দ্বারকার নবরাত্র মহোৎসব সমিতি। এবার তাঁদের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বেদান্তাচার্য শ্রীশান্তিপ্রসাদজীর বিশেষ বন্ধু শ্রীহরিদাস যমুনাদাস ও ঘেরিয়া কানারি, এম্-এল,এ মশায়ের অতু-লনীয় উৎসাহ ও সহায়তা আমাদিগের সমস্ত শ্রমক্লান্তি নিমেষে দূরীভূত করে দিল। শান্তিপ্রসাদজীর শিষ্য ভক্তিরাম ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীশান্তিপ্রসাদজীর রমণীয় ধাম "আনন্দভবন" আনন্দে ভরপুর করে রেখেছিলেন। ডক্টর জয়ন্তীলাল ও আমাদের সহায়তা করতে লাগলেন। পরের দিন ছয় তারিখে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়। কিন্তু পূর্ব-দিনের অর্থাৎ চার তারিখের এক বিশেষ অধিবেশনে ডাঃ জয়ন্তীলাল, স্থানীয় সংস্কৃত রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ও কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ডাঃ চৌধুরী-দম্পতীকে গুজরাত-বঙ্গদেশের মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক ও বঙ্গীয় সভ্যতার অগ্রদূতরূপে স্বাগত অভিনন্দন জানান। তাঁরা আরো বললেন যে বাংলা দেশ থেকে কোনও সাংস্কৃতিক বা নাট্যদল—সংস্কৃত নাট্যদল তো নয়ই—দ্বারকায় ইতঃপূর্বে যাননি। সেই দিক থেকেও চৌধুরী-দম্পতী সত্যই অগ্রদূত। এ সঙ্গে এ-সি-সি কম্পানীর আলোকসম্পাতাদি বিষয়ে সহায়তা বিশেষ উ[illegible]যোগ্য ও ধন্যবাদার্হ।

এখানে পাঁচই অক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীরাধার পুণ্যজীবন অবলম্বনে রচিত "আনন্দরাধম্" গ্রন্থ বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। পাঁচ সহস্রাধিক দর্শক রাত্রি আট ঘটিকা থেকে সাড়ে বার ঘটিকা পর্যন্ত নীরবে নিঃশব্দে বসে থেকে

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস উপভোগ করেন। এতবড় অথচ এরূপ গাম্ভীর্যপূর্ণ সভা আমি খুব কমই দেখেছি। সকলেই বার বার অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন—আর একদিন থেকে যাবার জন্য; কিন্তু আমাদের হাতে একেবারে সময় ছিলনা বলে আমরা তাঁদের সেই অনুরোধ কিছুতেই রক্ষা করতে পারলাম না। সেজন্য মনে বড়ই দুঃখ জমে আছে। সত্যই এরূপ উৎসাহ, আদর-যত্ন অতি বিরল। সভায় বহু নারীও উপস্থিত ছিলেন—ছাত্র অধ্যাপক প্রভৃতিদের সঙ্গে। তাঁরা যে ডক্টর চৌধুরীর সহজ সরল নাটক অতি সহজেই উপভোগ করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ—সাড়ে বারটার পরেও নাটক আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে যেতে তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন।

ফাঁকে ফাঁকে দ্বারকাধীশের মন্দির, মহামায়া ও রুক্মিণী-মন্দির, ভেটদ্বারকা, মহাপ্রভুর বৈঠক আমরা দেখে নিলাম, জীবন ধন্য হলো॥

জামনগর

দ্বারকা থেকে জামনগর রেল যোগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ। আমরা সাতটায় যাত্রা করে প্রায় বারটায় জামনগরে এসে পৌছলাম। ষ্টেশনে শ্রীহরজীবনজী, আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীরামরতন পাঠক, জামনগর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরামদাস বিষ্ণু কৌণ্ডিন্য, এবং অন্যান্য বহুবিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ডক্টর চৌধুরী-দম্পতী ও আমাদিগকে প্রভূত সমাদরে বরণ করে নিলেন। এখানে বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ এস্. এন. সেন, কবিরাজ শ্রী নিমাই রায় ও অন্যান্য অনেকে। জামনগর একটী বিখ্যাত এয়ার ও ন্যাভাল ফোর্সের ট্রেনিং সেণ্টার ও সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে ভারত সরকারের আয়ুর্বেদীয় কলেজ ভারতবিখ্যাত। তা' ছাড়া নানা দিক থেকে জামনগর সুপ্রসিদ্ধ।

এখানে সংস্কৃত ও ধর্মশিক্ষার মধ্যমণি হলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীশান্তিপ্রসাদজী। তাঁর বৃহৎ অট্টালিকায় আমাদের থাক্‌বার সুবন্দোবস্ত হয়। এখানকারও আদর যত্নের তুলনা নেই। অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় অতি-সুন্দর টাউন-হলে পর পর তিন দিন গোপালভবনের তত্ত্বাবধানে। গোপালভবন সৌরাষ্ট্রের একটী সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক ও জনসেবামূলক সংস্থা। জামনগরে অভিনয় হয় ৬ই, ৭ই ও ৮ই অক্টোবর তারিখে যথাক্রমে,—ডক্টর চৌধুরী রচিত "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্", "শক্তি-সারদম্" ও "মহাপ্রভু হরিদাসম্"। এই সময়ে ঘটলো একটী গৌরবব্যঞ্জক ঘটনা। দ্বারকা থেকে "ট্রাঙ্ক কল" করে সেখানকার সভাপতি মহাশয় জানালেন যে তাঁহারা ডক্টর চৌধুরীদ্বয়কে সম্মানিত করার জন্য মানপত্রদ্বয় এবং স্বয়ং দ্বারকাধীশের অঙ্গের পট্টবস্ত্রদ্বয়সহ আসছেন জামনগরে। তাঁরা উপস্থিত হলে তাঁদের মুখে সকলেই দ্বারকায় অভিনীত "আনন্দরাধম্" এর প্রশংসা শুনে জামগনরবাসিগণ সকলেই ঐ নাটক এখানেও অভিনয় করতে বলেন। সেজন্য—শেষ দিনে "মহাপ্রভু-হরিদাসম্"এর পূর্বে দেড় ঘণ্টা "আনন্দ-রাধম্"এর কিছু অংশ অভিনীত হয়। এই অভিনয় সকলেরই উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রখ্যাত সন্ন্যাসী শ্রীত্রিবেণীপুরী মহারাজ, শ্রীজামসাহেব দিগ্‌বিজয়সিংহজী মহারাজ এবং বোম্বাইয়ের প্রেস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীভানুশঙ্কর যাজ্ঞিক যথাক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং তৃতীয় দিন শ্রীহীরালাল ত্রিলোচনদাস সোডা প্রধান অতিথি ছিলেন। তাঁহারা ও শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই রাত্রি সাড়ে বারটা পর্যন্ত নাট্যাভিনয় দর্শন করে পরম পুলকিত হন। দ্বিতীয় দিনে জামসাহেব দ্বারকা থেকে আনীত দ্বারকাধীশের পট্টবস্ত্র এবং চৌধুরীদম্পতীর জন্য প্রেরিত মানপত্র চৌধুরীদম্পতীকে উপহার দেন। তৃতীয় দিনে স্থানীয় রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রামদাস বিষ্ণু কৌণ্ডিন্য জী মঠাধ্যক্ষ শ্রীশান্তিপ্রসাদ জীর আদেশে বিরচিত মানপত্র ডক্টর চৌধুরীকে উপহার দেন। এভাবে সমগ্র সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে একটী মহানন্দের সাড়া পড়ে যায়।

ডক্টর চৌধুরীর সংশোধিত ও প্রকাশিত জাম-বিজয় কাব্য এবং জামনগরের রাজন্যমণ্ডলীর কৃতিত্বব্যঞ্জক অন্যান্য বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধদর্শন করে জামসাহেব ও মহারাণীসাহেবা বিশেষ প্রীত হন। ডক্টর চৌধুরী বিরচিত শক্রশল্য দিগ্বিজয় নাটক অভিনয়ের জন্য পুনরায় জামনগর যাওয়ার জন্য মহারাজ সর্বজনসমক্ষে আহ্বান জানান। মহারাজ ও রাণীসাহেবা স্বয়ং সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা-কাল উপস্থিত থেকে সকলকে ভূরিভোজনে ও তাঁদের

পূর্বপুরুষগণের সংগৃহীত বহু কৌতুহলোদ্দীপক বহুমূল্য আসবাব পত্র ও অন্যান্য দ্রব্য প্রদর্শনে আপ্যায়িত করেন। তাঁদের আদর যত্ন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরকাল সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

জামনগরের বাঙ্গালী সম্প্রদায় পরম আদর সহকারে স্বহস্তে রন্ধন করে একদিন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করেন। তা' ছাড়া—জামনগর সাংস্কৃতিক নাট্যোন্নয়ন সংস্থা ডক্টর চৌধুরীদম্পতী এবং প্রাচ্যবাণীর সদস্য ও সদস্যাগণকে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীশান্তিপ্রসাদজী তিনমাস যাবৎ মোটর দুর্ঘটনায় শয্যাগত হলেও যে রকম আদরযত্ন ও সুবন্দোবস্ত করেছেন, তার তুলনা সত্যই নেই। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সকলেই একমনপ্রাণে আমাদের যত্ন পরিচর্যা করেন। ডক্টর এস এম সেন ও তাঁর সহধর্মিনী ডাঃ শ্রীমতী উর্মিলা সেন, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করে আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন এবং শ্রীযুক্ত নিমাই রায় সদাসর্বদা ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে থেকে—এমনকি অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করে আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

দিল্লী

আমাদের যাত্রার শেষের অংশ হলো দিল্লীধাম। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রীযুক্ত স্বাহানন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ মিশনের সুবিস্তৃত সুন্দর হলে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর যথাক্রমে "শক্তি-সারদম" ও "মহাপ্রভু হরিদাসম্" অভিনয় হয়। এ দুটী অভিনয়ই সকলের অতি উচ্চ-প্রশংসা লাভ করেছে। প্রথম দিনের অভিনয়ের পরে ডক্টর রঘুবীর সকলকে বিশেষ প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন এবং উভয় দিনে স্বামী স্বাহানন্দ প্রশংসা করে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। মিশনের সন্ন্যাসিগণের আদরযত্নের তুলনা নেই। তাঁদের সেই ঋণ শোধ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এই সকল স্থানেই বহু জায়গায় ডক্টর চৌধুরীদম্পতীকে বহু ভাষণ দিতে হয়। সকলের শেষ দিনে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল সংস্কৃতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে অপূর্ব ভাষণ দেন, তা' সুদীর্ঘকাল শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণকুহর আপায়িত করবে।

দিল্লীতে ডক্টর চৌধুরী বিরচিত "মেলন-তীর্থ-ভারতম' দিল্লী রেডিও থেকে রেকর্ড করে নেওয়া হয় এবং আগামী ৩রা ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে ছয়টায় তা দিল্লী কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইবে। বিগত বারও দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে ন্যাশন্যাল প্রোগামে ডক্টর চৌধুরী বিরচিত "ভক্তি-বিষ্ণু-প্রিয়ম্" এবং "বিমলযতীন্দ্রম্" প্রচারিত হয়।

দিল্লীর প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর শ্রীজয়দয়াল ডালমিয়ার নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এবারের অভিনয় তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং ষ্টেশনে এসে, গাড়ী ও খাবার পাঠিয়ে এবং অন্যান্য নানা ভাবে আমাদের জন্য যে কি করেছেন, তা মুখে বলা যায় না।

উপসংহার

মাত্র পনের দিনের সফর—কিন্তু চতুর্দিক থেকে কি গৌরবমণ্ডিত, কি স্নেহ সুষমায় ভরপূর। কি প্রশংসায় সমুজ্জ্বল। প্রত্যেক স্থানেই সকলেই বারংবার যে কথা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—সেটী হলো এই যে, ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বর্ধিত এবং মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে একমাত্র সংস্কৃতই প্রধান পন্থা স্বরূপ। এই সকল স্থানে আমরা নিশ্চয় ইংরাজী বা বাংলায় অভিনয় করতেই পারতাম না। কিন্তু হাজার হাজার লোক চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে ধরে সংস্কৃত অভিনয়ের রস উপভোগ করেছেন; অত্যন্ত তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়েছেন—এই তো আমাদের স্বচক্ষে দেখা জিনিষ। কত-ভাবেই না ডক্টর চৌধুরীদম্পতি এবং প্রাচ্যবাণীর সভ্য-সভ্যাদের অভিনন্দিত করেছেন, সাংস্কৃতিক অগ্রদূত ও ভক্তিধর্মের মূর্ত প্রতীক বলে। বাঙ্গালীরা সকলে বারং-বার বলেছেন—আপনারা বাঙ্গালীদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। যে সব স্থানে আমরা গিয়েছি সে সব স্থানে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত অভিনয়ের দল নিয়ে কখনও যাননি। অথচ কত হাত বাড়িয়েই না, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলেই আমাদের গ্রহণ করেছেন। সবই ত সম্ভব হলো, সংস্কৃত-জননীর কৃপায়। পরমা জননীর কৃপায় জয় হোক, জয় হোক প্রাচ্যবাণীর—আর জয় হোক, ভক্তিধর্মের মূর্ত প্রতীক সংস্কৃত জননীর আজন্মসেবক সকলের পরম আদরের চৌধুরীদম্পতীর।

রূপসী বাংলা

সুনীলময় ঘোষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্য পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) লিখে-ছিলেন,…"কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। * * * যে দেশের প্রকৃতির নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নির্ঝরে, সৌরভে, ঝঙ্কারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, আর ধূমাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুকু লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে।"

কিন্তু জীবনানন্দ এর ব্যতিক্রম। বাঙ্‌লা দেশের অন্তর-বাহিরে কবি মন সেই শ্যামলতার মায়ার নির্ঝরের গানে সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়ে একক অনুভূতিতে একাকার হ'য়ে রূপ-দর্শন, শ্রবণ করেছেন 'রূপসী বাংলা'য়। সর্বত্র একটা রূপমুগ্ধতা। প্রাণে প্রাণে রূপতরঙ্গের ঢেউ যেন কবি মনের স্বাভাবিক বোধের অতি পরমক্ষণটিকে অভিষিক্ত করে সর্বজনীন ব্যাকুলতায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সে প্রকাশে একদিকে জীবনের বিচিত্র রূপসজ্জার অনন্ত বর্ণচ্ছ্টা, আর একদিকে আনন্দঘন রসোজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আন্তরিকতার ঘরোয়া কথা। প্রতিদিনকার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ-কর জীবনের আশে-পাশে ভীড় করে আছে এমন অনেকের রূপানুভব আনন্দ, অসাধারণ মমত্বে একটা সর্বকালীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেখানে ক্ষয়ক্ষতি আছে, ধ্বংস আছে, কিন্তু আবহমান বাংলার রূপ, সব কিছু পেরিয়ে অনন্ত-কালের প্রবাহে শাশ্বত।

সাধারণ "কল্‌মীদামের" থেকে যার জন্ম, 'পুকুরের নীড়ে' সেও একদিন "দূরে নিরুদ্দেশে চলে যায় কুয়াশায়" কিন্তু কবির কাছে,

"……তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার
এ বাংলার তীরে।"

বাঙ্‌লার সহজ প্রকাশ সৌন্দর্যের মধ্যে কবি জীবনানন্দ বাঙ্‌লার ঐতিহ্যকে তার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে অনুভব করেছেন।

রূপ-মুগ্ধতার মধ্যে একটা অখণ্ড অনুভব জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্টতা। বিচ্ছিন্ন ও বিচিত্র রূপ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষাই জাগায়—তৃপ্তি আনে না; শুধু লোলুপতার হিংস্র দংশন চিত্তের ধ্যানকে বিধ্বস্ত করে, অভিযোগ আনে, আনে কেবল অতৃপ্তির বেদনাবিক্ষুব্ধ জ্বালাময়ী ছবি। সেখানে রূপের জাগে দস্যুতা আর প্রতিযোগিতা।

কিন্তু জীবনানন্দ বিশ্বরূপ-ব্যাকুল নন। বাংলার অতি নিকট-পল্লীর অতি-তুচ্ছ প্রকাশের মধ্যে জীবনের যে রূপ ধ্যান করেছেন তাতেই কবি মনের স্নিগ্ধতা পৃথিবীর রূপ আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে।

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ;……"

জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশথের, ফণীমনসার ঝোপ, শটিবন তার সাথে মধুকর ডিঙ্গা, চাঁদ, চম্পা, বেহুলা-গাঙুড়-জলে ভেলা আর কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় মরে-যাওয়া নদীর চড়ায় ইন্দ্রের সভা—সেখানেই—

"………একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার—
কেঁদেছিল পায়।"

যা আছে তাতে মন আকৃষ্ট হয়, নির্মোহ আকুলতায় নিজের আনন্দটিকে তার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু তাও একদিন শেষ হয়, তখন রূপাভিসারী কবি ক্লান্ত, বিচিত্র দেখার মধ্যে একটা নীরবতা চান—

"আমি যে দেখিতে চাই,—আমি যে বসিতে চাই
বাংলার ঘাসে,
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে,

যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা
আজো আসে"

বেদনার সাথে সাথে অনন্ত আরামের ইঙ্গিত। একটা রোমান্টিক অথচ অত্যন্ত কাতর মন জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভরপুর।

অসীম আকাশের রূপ-মোহ কবি-কল্পনায় শুধু মোহ জাগায়। নিজেকে ঐখানে সকল নীরবতার মধ্যে মিশিয়ে দেবার একটা সুপ্ত ঐকান্তিক বাসনা আছে। কিন্তু তা আর হ'ল না। সে জন্য কবি-মন বিদ্রোহী নয়; একটা শান্ত রস-স্নাত চেতনায় বাংলার কচি ঘাসের মধ্যে তার রূপানুভবজনিত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছেন।

"আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই
ঘাসে ব'সে থাকি ;"......

—"আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন
এসেছে আকাশে ;
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে
চুল তার ভাসে,"

ঐতিহ্য ও রূপগর্বিত কবি-মন স্বর্গলোকের নিত্য আনন্দের অনন্ত রস বাংলার অতিপরিচিত তুচ্ছ হিজলে, কাঁঠালে, জামে তার 'অজস্র চুলের চুমা' 'ঝরে অবিরত' অনুভব ক'রছেন।

পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য এমন অতিসাধারণ প্রকাশের মধ্যে সর্বকালীন গৌরব লাভ করেনি। নরম ধানের গন্ধ, হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা-সরপুঁটি, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত সবটাতেই 'বাংলার প্রাণ'—মর্তে সেই 'সাতটি তারার আনন্দ-রূপ' কবি অনুভব করেন।

বাংলার রূপকথার জীবন-চরিত্রের মাঝে মাঝে বাংলার যে সত্য ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এমন কি সাংস্কৃতিক সত্তায় চিরকালের বাণী বহন করে এসেছে, বিচিত্র গাঁথায় কবি তারই মধ্যে তারই চিন্তায় সারাটা বাদলের দুপুর কাটিয়ে দিতে চান। সেই কালীদহ, চাঁদ-সদাগর, মধুকর ডিঙা; ধলেশ্বরীর চড়ায় গাংশালিখের ঝাক; ফণী-মনসা আর সনকার রূপ কল্পনায় কবি-মন ধ্যানস্থ। বর্তমানের সাথে সেদিনের একটা মিল খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষা ঐতিহ্যপীড়িত মনে তীব্র।

জীবনানন্দ দাশের মন বাংলার যা কিছু প্রকাশ সব-টুকুতেই মুগ্ধ।

"জীবন অথবা মৃত্যু চোখে র'বে—আর এই বাংলার
ঘাস রবে বুকে ;"

কারণ..."এই ঘাস ; এরি নিচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস।" তাই মরণের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করতে গিয়েও কবি কল্পনা করেন...

"সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ;—সেদিন দু'দণ্ড এই
বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি
ভাবিব হায় !"

কারণ 'বেহুলা লহনার মধুর জগতে', 'তাদের পায়ের ধুলো-মাথা পথে' কবি তাঁর মন বিকায়ে দিয়েছেন—সেখানেই তাঁর সফলতার শক্তি, সেই 'বঁইচির বনে' 'জোনাকির রূপ দেখে' কবি হ'য়েছেন কাতর। এই কাতরতায় কবি তাঁর অতীত ও ভাবিজীবনের যোগসূত্র রচনায় ব্যস্ত।

"ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড়
গেল ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হ'ল খড়
আর ঘর"

সৃষ্টির অনন্ত নিয়মে বাংলার নব-রূপায়ণ কবি-মনে তার সার্থক রূপ রূপায়িত হয়ে উঠেছে—রূপের ধ্যানে ; বেদনায় ও মিলনে। তাই আজ আর কবির ভয় নেই।

"ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে—
কথা ভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে—
অনেক নবীন
নতুন উৎসব র'বে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে
তোমাদের ব্যস্ত মনে ;"

তারই মধ্যে কবি ও রূপ হারিয়ে আবার রূপ পরিগ্রহ ক'রে—

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের
দেশে।"

রূপ কল্পনার সাথে সাথে আস্‌ছে বাংলার ঐতিহ্যগর্বিতা পাটরাণীদের কথা। তাদের গর্বে কবি গর্বিত, তাদের সৌন্দর্য চর্চ্চায় কবি-মন স্নাত। আজ তা ইতিহাস, তাই তাদের চিহ্ন মেশা, মিলিয়ে যাওয়া ঘ্রাণে কবি-মন উৎসুক। সকল আকুতির মধ্যে কবির অনুভব···

···"কত পাটরাণীদের গাঢ় এলো চুল
এই গৌড় বাংলার—প'ড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে"···

হাজার মহালের 'মৃত সব রূপসীদের বুকে আজ ভেরেণ্ডার ফুলে ভীমরুল গান গায়'। বাংলার গ্রামে গ্রামে অশ্বত্থের সন্ধ্যায়, শত শতাব্দীর বটের হাজার সবুজ পাতায় উমার প্রেমের গল্প, চন্দ্রশেখরের জট, বল্লাল সেন, রায়গুণাকর, দেশবন্ধু, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, 'মৃত শত কিশোরীর কঙ্কনের স্বর' যেন আজও কবি শুনতে পাচ্ছেন; বাংলার জীবনে সংকট যেন শেষ হ'য়ে গেছে। কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেই বাংলার রূপ পরিবর্তন—যা ছিল আজ তা নেই—দেখেছেন। আজ সর্বত্র কৃত্রিমতায় ভরে গেছে—সহজ সৌন্দর্যের সরল মনটি আজ অত্যন্ত বস্তুপীড়িত। তাই পরিবেশের পটবিবর্তনে কবি মন ও একটু সংশয়াবিষ্ট। কিন্তু আশা ছাড়েন নি; জীবনে ও মনে সর্বত্র না-পাওয়া, না-দেখার বেদনা অনুভব ক'রেছেন তবুও আশায় বসে আছেন; ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার অন্বেষণ চলেছে। একদিন যা ছিল একান্ত নিকটে, অনন্ত সম্ভাবনার জীবন-রসে ভরপুর; আজ সবটাই যেন স্মৃতি, সবটাই যেন রহস্য। সে দেখা আজ আর তেমন নেই, দাঁড়কাক আজও ক্লান্ত হয়ে এ উঠানে এসে বসে, কিন্তু কোথায় সেই—

"······আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেত দিন রাত—সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব। আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার"

দু'প্রহর রৌদ্রে কত গল্প কাহিনীর স্বপ্ন সেদিন কত ঘর বেঁধেছে—আজ তার গন্ধ আছে সত্য কিছু—"কেঁদে কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে"।

"আসিবে না ক'রে গেছে আড়ি"

বিরহের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। মর্মে মর্মে সে বেদনা, যেন জীবন লাভ করছে, নোতুন ভাবে পাবার, অনুভব করবার, ভাব করবার সচেষ্ট আকুলতা কবি-মনে রূপসীর রূপ তন্ময়তায় জীবন্ত।

তাই তো কবি-বাংলার ঘাসে ঘাসে যে রূপসীর শরীর মসৃণ হয়ে উঠেছে তার কাছে প্রতীক্ষায় বসে আছেন। কোন প্রলোভন, কোন ক্ষুব্ধতা কবি-চিত্তকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি।

"এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।
বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তরের গল্প ডেকে আনে।"

আঞ্চলিক রূপপ্রকাশ ও তাতে সর্ব-মন-প্রাণ সমর্পণে একাকার হয়ে ভালবাসার একটা গৌরব আছে, একটা মর্যাদাবোধ আছে। কবির ভাল লাগা মনের উপর পৃথিবীর আর কোন দেশের রূপ-চিন্তা মোহ জাগায় না, বরং তুলনা করে নিজেকে রূপসী বাংলার শুকিয়ে যাওয়া, ঝরে-পড়া কাঁঠাল জামের বুকের গন্ধ, বাসমতী ধান-ক্ষেতের মায়া 'মালাবারে উটির পর্বতে'র চেয়ে বেশী মধুর, বেশী স্নিগ্ধ।

"যার রূপ জন্মে জন্মে কাঁদায়েছে, আমি তারে খুঁজিব সেথায়"

এ কান্না 'রূপ লাগি আঁখি ঝরে'।

অতি সাধারণ প্রাত্যহিক বাংলার রূপ ষড়ঋতুর বিচিত্র আভরণে কবি দেখেছেন।

কবির দেখা বাংলা অনির্বচনীয় আন্তরিকতায় সজল-রসঘন। আজ তেমন বাঙলা কেউ যদি দেখতে চায় তবে কবির কথা:—

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান
সোনালি চিলের মতো উড়ে উড়ে আকাশের রৌদ্র আর মেঘে,
······································

······বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে;
পদ্মা মেঘনা ইছামতী নয় শুধু—তুমি কবি করিয়াছ স্নান
সাত সমুদ্রের জলে,···

মহাকাল কিছুই চিরকাল রাখে না; সময় এলে সব সমর্পণ ক'রে দিয়ে যেতে হয়। এ নিয়ম; এর ব্যতিক্রম ভাবনাই বেদনা; শোক। আজ যা একান্ত সর্ব, তাই একদিন 'নাশে'র মূর্তি ধরে সব শেষ করে দিয়ে যায় কীর্তিকে নাশ ক'রে। কিন্তু সেখানেই সব শেষ নয়। বার বার 'নাশে'র পরশে শুণ্ড তার খাঁটি হয়; নিজের প্রকাশে বেগ জাগে। এ জগতে কত এসেছে, কত চলে গেল—কিন্তু ধারাটি যেন গভীর হতে গভীর হ'য়ে রাঙা হয়ে উঠে। প্রবাহের তার বিরাম নেই, নেই তার শেষ গান।

······রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা;
তবু ও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়—
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার আরো ঢের জল, জল আরো";

চিত্ররূপময় কাব্যচিন্তায় জীবনানন্দ নিভৃত মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার আনন্দ-বেদনার ছবি এমনভাবে ফুটিয়েছেন যা বাঙলা কাব্য সাহিত্যে বিরল।

সর্বত্র একটা সজাগ মমত্ব ও সুগভীর আন্তরিকতা ছড়িয়ে আছে বর্ণনার প্রতি ছত্রে।

'রূপসী বাংলা'র কবি বাংলার প্রকৃতি প্রাণ-চেতনার রসে রসস্নাত। এ শুধু বাংলার পক্ষেই সম্ভব। এর তুলনা নেই; শুধু মাত্র স্বপ্ন আর ঘুম ভেঙে বিস্ময় মুগ্ধতায় থাকা।

"এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা;
চাল্‌তার পাতা থেকে টুপ্ টুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির;
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর;
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা আকাঙ্ক্ষার;"

পল্লী-প্রকৃতির রূপ যারা না দেখেছে, তাদের পক্ষে জীবনানন্দ অচল। রূপের স্নিগ্ধতা পারিপার্শ্বিক প্রকাশের মধ্যে অবগাহিত। কোন ছন্দ চাতুর্য বা শব্দ ঐশ্বর্যের প্রচার-রূপ তাতে নেই। সহজ দেখার সহজ প্রীতির মাধুর্য জীবনানন্দ দাশের কবিতার বৈশিষ্ট্য।

পল্লী-রূপ কবি-মনের রোমান্টিক চেতনার স্মৃতির দ্বার খুলে দেয়। ব্যক্তি মনের একান্ত সহজ গোপন ভাষাও যেন তার মধ্যে খুঁজে পায়। তখন প্রকৃতিরূপ শুধু মাত্র দেখা নয়, শুন্‌তেও পাওয়া যায়। তাই তো হারিয়ে যাওয়া সেই বাঁশীর সুরে আজও কবি পরিচয় খুঁজে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে একমনে শুধু চেয়ে থাকেন। মৃত্যুর নিদারুণ আঘাত ও যেন—

"যেমন ঘুমায় মৃত্যু, তাহার বুকের শান্তি যেমন ঘুমায়।"

আঞ্চলিক চেতনা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এক-মন লাভ করেছে। জাতীয় গৌরব ও দেশ গৌরব জীবনের আনন্দ-বেদনার সাথে অনুভূত। বাংলার আকাশ, কচি ঘাস, রাতের আকাশ সবকিছু পৃথিবীর তুলনায় একটু মরমী একটু মায়ায় স্নিগ্ধ। এই স্নিগ্ধতার মধ্যেই কবি সকল শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। মুগ্ধতার মধ্যে অনন্ত পিপাসার জ্বালা জল হয়ে যায়। তখন শুধু মনে হয়

.............................."কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে— সব চেয়ে ঢের দূর নক্ষত্রের তলে
সব পথে এই সব শান্তি আছে: ঘাস-চোখ-
শাদা হাত-স্তন—"

এ একটা বিশেষ দেখা, বিশেষ মনের অনির্বচনীয়ত্বের আনন্দ। বস্তু-জীবনের জীর্ণতার গ্লানি কবি-মনের সহজ বোধকে আঘাত করতে পারে নি। চিত্রকরের চিত্র দর্শনে বাক্‌শূন্য মুগ্ধতায় জীবনানন্দ তন্ময়।

যুক্তি তর্কের, দেনাপাওনার ক্ষয়ক্ষতিতে কোন হিসেব মেলাতে কবি আসেন নি। ঐতিহাসিক মনের গভীর প্রত্যয়ে আপন পরিচয় লাভ করে নিজেকে বার বার আপন চরিতার্থতায় সমর্পণ করতে ব্যস্ত।

প্রকৃতির প্রকাশ কবিকে মুগ্ধ করে; তার সবুজ ঘাস, রোদ মউমাছি সবটাই যেন "নরম পায়ের তলে যেন কত কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস কথা কয়।"

তা কবি শুন্‌তে পান—

"ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর।"

তাই তো:—

এ জল ভালো লাগে ; বৃষ্টির রূপালি জল কত দিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ—বুলায়ে দিয়েছে চুল—চোখের
উপরে
তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে কত খেলিয়াছে,—
আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চলে গেছে কুমারীর মতো
ভালবেসে

বাস্তব জীবনের সকল বেদনা, অপূর্ণতার কান্না, রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু সব কিছুই ঢেকে দেয়, মুছে দেয়,—বাসমতী, কাসবন, রাঙা রোদ, শালিধান আর ঘাস।

"মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে
এসে—হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি ঃ"
....
...."আকাঙ্খার রক্ত, অপরাধ
মুছায়ে দিতেছে যেন বার বার—"
....
.. .."পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের,
অশ্রু গেছি রেখে ;
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে
দেয় সব।"

পৃথিবীর ভিড়ে কবি-মনের সব হারিয়ে যায়। গড়া মিনার দুদিনেই যায় ভেঙ্গে, স্বপনের ডানা যায় ছিঁড়ে ; ক্ষুধা এসে ব্যথা জাগায়, কিন্তু তবুও প্রাণের মমতা জড়ানো ফড়িঙের ডানায় বুদ্ধ, নিউসিডিয়া, মণিকা, রোম এশিরিয়া উজ্জয়িনী, গৌড় বাংলা, দিল্লী ও বেবিলনের স্বপ্নের গন্ধ আর গোলাপের রক্তিমতা। এখানেই কবি মানবতার দোসর।

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি—
আমি হৃষ্টকবি
আমি এক ; ধুয়েছি আমার দেহ অন্ধকারে একা একা
সমুদ্রের জলে ;

তাই কবির উপলব্ধি ঃ—

আম নিম জামরুলে প্রসন্ন প্রাণের স্রোত—অশ্রু নাই—
প্রশ্ন নাই কিছু
ঝিলমিল ডানা নিয়ে উড়ে যায় আকাশের থেকে দূর
আকাশের পিছু ;
চেয়ে দেখি ঘুম নাই—অশ্রু নাই—প্রশ্ন নাই, বট ফল
গন্ধ-মাখা ঘাসে

অনন্ত কালের প্রকৃতির এই রূপচিন্তায় কবি জীবনানন্দ মহাকালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির মধ্যে জীবনের আনন্দ ধারায় বিশ্বাসী ; সে বিশ্বাস মানুষের অমিত তেজে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে।

"সন্ধ্যা হয়—চারিদিক শান্ত নীরবতা ;
... ...
... ...
'পৃথিবীর পূর্ব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে
আকাশে।"
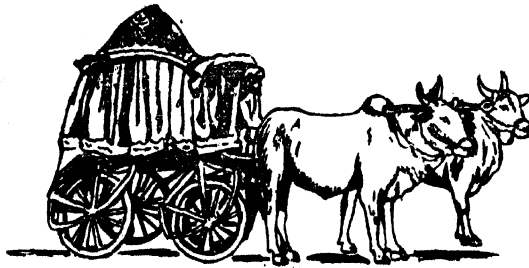
দরিয়াবাদ

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

দরিয়াবাদ স্টেশন থেকে দেরাদুন এক্সপ্রেস নড়তে চায়না। বিরক্ত লাগে হিতেনবাবুর। Times of Indiaটা ফেলে রেখে দরজায় এসে দেখেন—প্ল্যাটফর্মে লোকে লোকারণ্য। গাড়ি থেকে নেমে চলে আসেন ইঞ্জিনের কাছে। সেখানে খুব ভিড়। চাকায় কি গোলমাল হয়েছে—ইঞ্জিন চলবে না। ড্রাইভার ফায়ারম্যান অনবরত কলকব্জা নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু কোন ফল হচ্ছেনা। স্টেশন-মাস্টার বললেন—লক্ষ্ণৌতে খবর পাঠিয়ে অন্য ইঞ্জিন আনাতে হবে। ঘণ্টা তিনেকের আগে গাড়ি ছাড়বার কোন সম্ভাবনা দেখছিনে।

একটা চুরুট ধরিয়ে হিতেনবাবু প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করেন এদিক থেকে ওদিক। ব্রেক-ভ্যানের সামনে একটি মহিলা যেন তাঁকে বারবার লক্ষ্য করছেন। চেয়ে দেখেন সুপরিচিত মুখ। এগিয়ে গিয়ে সোজা প্রশ্ন করেন—মন্দিরা না?

বিস্ময়ের সুরে মহিলা বলেন—ঠিক চিনেছেন তো!

—চিনতে না পারার কি আছে?

—অনেকদিন পরে দেখা। প্রায় পনের বছর হবে।

—পরিচয় তেমন হলে পনের কেন তিরিশ বছরেও মুছে যায় না।

কথাটা বলেন হিতেনবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে। মন্দিরা দেবীর মুখে ছায়া পড়ে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন—হিতেনবাবু, তুমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারনি?

—চিনতে পারিনি তা নয়, তবে একটু সন্দেহ হচ্ছিল। আপনি বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া আপনার মাথার সেই সুন্দর চুল তো আর নেই।

—সবাই তো আর সহজে জীবনের সংগে রফা ক'রে নিতে পারে না।

মন্দিরা দেবীর চোখ আর্দ্র হয়ে ওঠে। রুমালে চোখ মুছে আপন মনে বলেন—উঃ, রদ্দুরের কী তেজ!

—আচ্ছা তুমিও নিশ্চয় আমার মতো এই গাড়ির যাত্রী?

—হ্যাঁ।

—তবে তো ঘণ্টা তিনেক এখানে কাটাতে হবে। যদি আপত্তি না থাকে ঐ খালি বেঞ্চিটাতে বসতে পারি। দেরি হলে আর কেউ দখল ক'রে নেবে।

—বেশ তো চলুন।

চাঁপা গাছের নিচে বেঞ্চির ওপর বসেন হিতেনবাবু ও মন্দিরা দেবী। দুজনে দুই প্রান্তে—মাঝখানে পনের বছরের ব্যবধান। প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকেন মন্দিরা দেবী। কি এত দেখছেন তিনি! প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন কিছু অপরূপ নয়। বিস্তীর্ণ বিবর্ণ আকাশ, না বহরমপুরের স্মৃতি চিত্র!

চুরুটে মৃদু টান দিয়ে সুরু করেন হিতেনবাবু—তারপর তুমি আসছ কোত্থেকে?

—দেরাদুন থেকে। ওখানে ভাশুর ডাক্তার। আমার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। এক বছরের জন্য ওয়েস্ট জার্মানী গিয়েছেন সরকারী কাজে। শরীরটা হঠাৎ খারাপ না হয়ে পড়লে আমিও যেতাম।

—তাহলে তোমার সংগে দেখাও হতনা। কিছু মনে না করতো জিজ্ঞেস করি—তোমার সংসারে নতুনের আবির্ভাব হয়নি?

মাথা নিচু ক'রে আরক্ত মুখে উত্তর দেন মন্দিরা দেবী—না।

—সময় কাটে কেমন ক'রে ?

—কাটে আর কই ! দেরাদুন মুসৌরিতে মাসখানেক ভালোই লাগল। কলকাতায় আবার সেই একরঙা জীবন। হরিদ্বার যাবার ইচ্ছা ছিল, শেষ পর্য্যন্ত সংগীর অভাবে যাওয়া হল না।

—গেলে হয়তো আরও ভালো জায়গায়—হরকী-পৈড়ি ঘাটে, শিবানন্দ আশ্রমে, না হয় গীতা ভবনে—দেখা হয়ে যেত।

—ও, আপনি হরিদ্বার থেকে ফিরছেন। আপনার অন্য খবর জানতে পারি ?

—আমার আবার খবর ! মাষ্টার চিরদিনই মাষ্টার। বহরমপুরে ছিলাম—এখন কলকাতায় রয়েছি। সেই পড়ানো আর খাতা-দেখা, খাতা-দেখা আর পড়ানো। "রাঁধার পর খাওয়া আর খাবার পর রাঁধা, বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা"।

স্মিতমুখে বলেন মন্দিরা দেবী—আপনার কবিতা আওড়ানো স্বভাবটা বদলায়নি দেখছি।

—মানুষের স্বভাব কি বদলায়, অবস্থার গতিকে একটু চাপা পড়ে। উপযুক্ত আবহাওয়ায় আবার যে কে সেই।

—আহা। কি এমন অনুকূল আবহাওয়া ! রোদের তাতে শীতকালেও ঘেমে উঠছি। খিদেয় পেট জলছে। হতচ্ছাড়া জায়গায় এক কাপ চা পর্যন্ত পাবার উপায় নেই।

—মানুষই সব। মানুষকে বাদ দিয়ে পরিবেশের কোন মূল্য নেই। মনের মানুষ কাছে এলে—"মরুভূমে নদী ধায়, পাষাণে উৎস ছোটে।"

—বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। এরকম করলে আমাকে উঠে যেতে হবে। ভুলে যাচ্ছেন আমি এখন মিস মন্দিরা গুপ্ত নই, মিসেস মন্দিরা রায়।

—ভুলিনি কিছুই আমি। আমাদের দূরত্বটাকে রীতিমতো রক্ষা করছি। দেখছ না বেঞ্চির এক প্রান্তে আমি, অপর প্রান্তে তুমি। "তোমার আমার মাঝ-খানেতে একটি বহে নদী, দুই তীরেরে একই গান যে শোনায় নিরবধি।" গানটা হচ্ছে একাকিত্বের। "তুমিও একাকী আমিও একাকী।" তুমি কয়েক মাসের জন্যে, আর আমি বহু বছর ধ'রে। তাই একটু চেষ্টা ক'রে দেখছি যদি সরস কথাবার্তার ভিতর দিয়ে অন্তত সাময়িক-ভাবেও অপসারিত করতে পারি জীবনের শূন্যতা, অন্ধকার, বেদনা। এতে তোমার রাগের বা ধৈর্যচ্যুতির কোন কারণ আছে ব'লে তো মনে হয় না। যদি বর্তমান ভুলে গিয়ে অপরাধ ক'রে থাকি আমি, তাহলে অপরাধ তুমিও করেছ। তুমি অতীতকে ভুলেছ। মনে আছে বহরমপুর ছেড়ে আসার আগের দিন তুমি আমাকে একটি জিনিস দিয়েছিলে ?

মলিন মুখে মাথা নাড়েন মন্দিরা দেবী।

—মনে পড়ছে না ? একটা কাগজের মোড়ক ? ভিতরে জিনিস ছিল। তার উপর ছড়িয়েছিলে অনেকটা পাউডার আর দুচার ফোঁটা ল্যাভেণ্ডার।

শিউরে ওঠেন মন্দিরা দেবী। আঁচলে মুখে ঢাকেন কিছুক্ষণ। তারপর ব্যথা ভরা কণ্ঠে বলেন—ওকথা তুলে আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কি লাভ ? ওসব ভুলে যাওয়াই তো ভালো। কাগজের মোড়কটা কি আজও আছে আপনার কাছে ? মিনতি করছি কলকাতা ফিরেই ওটা পুড়িয়ে ফেলবেন।

—এ তোমার অন্যায় অনুরোধ মন্দিরা। জিনিসটার পিছনে একটা প্রতিশ্রুতি ছিল। ও একটা প্রতীক—সত্যের প্রতীক—

—না না ওর মধ্যে কিছু সত্যি নেই, সব মিথ্যে, সব ভুল। ও শুধু উচ্ছ্বাসের অবদান।

—যে সম্পর্কের প্রতীক ঐ জিনিসটা সেটা যদি মিথ্যে হয় মন্দিরা, তাহলে তুমি আর আমি স্টেশনের বেঞ্চিতে মুখোমুখি ব'সে এতক্ষণ যে সুখ দুঃখের কথা বলছি রেল দুর্ঘটনার দৌলতে এও মিথ্যে। যদি পুরনো সম্পর্কটাকে স্বীকার না কর, তবে কিসের ওপর ভিত্তি ক'রে আমরা দুজনে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছি ? 'Love at fight sight' এর বয়স তো আমরা পার হয়ে এসেছি।

—আপনার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারব না। সোজা কথা হচ্ছে—দুঃখকে এড়িয়ে চলাই উচিত, দুঃখের চিহ্নকে নষ্ট ক'রে ফেলাই যুক্তিসংগত।

—জিনিসটা তো আমাকে দুঃখ দেয় না, আনন্দের মুহূর্তগুলোই বরং স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক সময় জ্যোৎ-স্নার আলোয় নিরালায় খুলেছি কাগজের মোড়কটা, উপ-ভোগ করেছি পাউডার ও ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ—'সুদূরের

সুগন্ধধারা'। মনে হয়েছে 'বিরহ মধুর হল আজি মধু রাতে'। * * * একটা যুগ কাটল! ফিকে হয়ে গেল পাউডারের রঙ, মিলিয়ে গেল ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ। জিনিসগুলো গুঁড়িয়ে গেল, রেখাগুলো পরিণত হল বিন্দুতে। সাদার ওপর কালো বিন্দু—অদ্ভুত জীবন্ত। নষ্ট করতে মায়া হয়। নশ্বর দেহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলি—কিন্তু প্রেম যে অবিনশ্বর—'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন'।

মন্দিরা দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। হিতেনবাবু অনর্গল কথা বলে যান ভাবমগ্ন কবির মতো। ক্রমে স্বর উত্তেজিত হয়ে ওঠে—আমায় ক্ষমা কর মন্দিরা। তোমার earnest request আমি রাখতে পারবনা। কাগজের মোড়কটা কোনমতেই নষ্ট করতে পারব না—অসম্ভব, অসম্ভব।

গালে হাত দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবেন হিতেনবাবু—আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসে। মন্দিরা দেবী বাণীহারা—চোখের জল মোছেন বারে বারে। আবেগের সংগে বিরতি ভংগ করেন হিতেনবাবু—এক কাজ করবে মন্দিরা? একদিন যাবে আমার সঙ্গে বহরমপুরে? একবার বসবে সেই হেলে-পড়া পুরনো খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর মরা-গংগার ধারে? মনে পড়বে সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ হাসি, আর অস্ফুট ভাষায় তোমার অসংলগ্ন কথা। দেখ যদি পার। তাহলে তোমার পাশে দাঁড়িয়েই আমি জলে ভাসিয়ে দেব যত্নে-রাখা কাগজের মোড়কটা। আমাদের সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল যে পরিবেশে—সেখানেই হবে তার সমাপ্তি।

মন্দিরা দেবীর দৃষ্টিতে বিমূঢ় ভাব। প্রগল্ভ হিতেনবাবু তাঁর কাছে সরে এসে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন? রাজী?

রীতিমত রেগে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে বলেন মন্দিরা দেবী—ছি ছি, লজ্জা করেনা এই বয়সে ছেলেমানুষি করতে! যারা ঘর সংসার না ক'রে কল্পনা বিলাসেই জীবন কাটায় তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু পাগলামির একটা সীমা আছে। কেন ঘুরে ফিরে অপ্রীতিকর প্রসংগ টেনে এনে আমাকে অকারণ আঘাত দিচ্ছেন? বহুদিন পরে দেখা হল। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের আনন্দটাকে কেন বিষিয়ে তুলছেন? কী নিষ্ঠুর আপনি! কবিতা শুধু মুখে, ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন। এখানে আর বসতে দিলেন না। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই।

কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে অত্যন্ত অশোভনভাবে মন্দিরা দেবী ফিরে যান নিজের কামরায়। আহত হিতেনবাবু দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন। ভাবেন ভালোবাসার জগতে তিনি exploited হয়েছেন—যে অনুপাতে দিয়েছেন সে অনুপাতে পাননি। এ রাজ্যে কেউ হারে, কেউ জেতে। সম্পর্ক তখনই সার্থক হয় যখন দুপক্ষই মনে করে তারা জিতেছে। চোখ ভিজে যায় হিতেন বাবুর।

প্ল্যাটফর্মে সোরগোল। সশব্দে ইঞ্জিন আসছে। এইবার ট্রেণ ছাড়বে জনতা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। হিতেনবাবু চুরুট ধরিয়ে নিয়ে উঠে পড়েন বেঞ্চি ছেড়ে। এগুতে থাকেন শান্তভাবে ইঞ্জিনের দিকে। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি গাড়ির বিভিন্ন কামরার ভিতর। কানে আসে নানা কথা—"বাবা বাঁচা গেল!"—"উঃ কি বিপদেই না পড়া গিয়েছিল!"—"দরিয়াবাদ একেবারে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দিয়েছিল!"—"খিদেতে'শরীর ঝিমিয়ে আসছে, একটা বড় স্টেশন আসলে আগে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"—আরও কত কি।

মিনিট কুড়ি পরে ট্রেণ ছাড়ে। অন্যমনস্ক হবার জন্য হিতেনবাবু সহযাত্রীদের সংগে গল্প জুড়ে দেন। সকালের কাগজের সংবাদ নিয়ে আলোচনা চলে। বেলা পড়ে আসে। ঝির ঝিরে হাওয়া দেয় শীতের। ফয়জাবাদে কিছু খেয়ে নেন। বেনারসের বাঙালী পরিবারটি নেমে যাওয়াতে বেশ নিসংগ বোধ করেন। অতীতের অনেক স্মৃতি ভিড় করে মনের গহনে। * * * * * সতের বছর আগে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন বহরমপুরে। বাড়িভাড়া করে ছিলেন গোরাবাজারে। পাড়াতে কাছেই থাকত মন্দিরা। থার্ড-ইয়ারের 'ছাত্রীটির সংগে প্রথম পরিচয় কলেজে। মন্দিরার বাবা কর্মসূত্রে ঘুরে বেড়াতেন বাঙলার বাইরে নানা শহরে, যদিও কলকাতায় ছিল তাঁর হেড অফিস। মা মরা-মেয়েটিকে রেখেছিলেন ঠাকুমার কাছে বহরমপুরের বাড়িতে। গংগার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে তাঁর মার সংগে আলাপ হয় মন্দিরার ঠাকুমার। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মধুর সম্পর্ক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়েছেন

মন্দিরাকে তন্ময় হয়ে। মন্দিরাও বিমুগ্ধ হয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্যে। মনোরম সন্ধ্যায় পাশাপাশি বসে নক্ষত্র-শোভিত আকাশের প্রতিবিম্ব দেখেছেন গংগার বুকে। কত বর্ষা-মুখর রাত! কত অশোক-রাঙা ফাগুন দিন! সে সব কিছুই মনে নেই মন্দিরার! বি-এ পাশ করার পর বাবার জরুরী চিঠি পেয়ে হঠাৎ কলকাতা চলে গেল মন্দিরা। যাবার আগের দিন বিদায় নিতে এসে অনেকক্ষণ কাটিয়েছিল তাঁর পড়ার ঘরে। কত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল! কত চোখের জল ফেলেছিল! শেষে অভিজ্ঞান স্বরূপ দিয়েছিল একটি কাগজের মোড়ক। তিনি হাত ধ'রে বলেছিলেন—"মন খারাপ করোনা। কলকাতা তো আর দিল্লী সিমলা নয়। মাঝে মাঝে দেখা হবেই।" আশ্বাসবাণী শুনে মন্দিরার অধরে ফুটে উঠেছিল হাসি—প্রত্যয়ের প্রসন্নতার। তার সংগে আর দেখা হয়নি। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মাস তিনেকের ভিতর। কিন্তু তিনি তো আজও সংসারী হয়নি। কথাটা জেনেও মন্দিরা এমন অনুদার অকরুণ আচরণ করলে! পূর্ব-প্রীতির এককণাও কি অবশিষ্ট নেই কোথাও! প্রাণের প্লাবন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে! কোথায় যেন পড়েছিলেন :—"A woman is never too old to be touched by the faithfulness of an old lover," রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইনও মনে পড়ে :—

"ফুলের অক্ষরে প্রেম
লিখে রাখে নাম আপনার—
ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার।"*****

রাত প্রায় দশটা। ট্রেণ মোগলসরাই ছেড়ে এসেছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুয়ে পড়েন হিতেনবাবু।

রাগ বিরক্তি বিতৃষ্ণা ভরা মন নিয়ে মন্দিরা দেবী কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েন। দুপুর গড়িয়ে যায়। তিনি ওঠেনও না খানও না। সহযাত্রিণী মিসেস সিং এলাহাবাদের লেডি ডাক্তার। বিকেলের দিকে মন্দিরা দেবীকে ডাকেন। চোখ মুখের অস্বাভাবিক ভাব দেখে জিজ্ঞেস করেন—ভাই, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? কি কষ্ট হচ্ছে বল; আমার কাছে ওষুধ আছে; খেলেই আরাম বোধ করবে।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে মন্দিরা দেবী বল্লেন-আমার অসুখ করেনি। মনটা অত্যন্ত অস্থির হয়েছে উত্তেজনার কারণ একটি দুঃসংবাদ। দরিয়াবাদ স্টেশনে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম আমার একটি নিকট আত্মীয় মারা গিয়েছেন।

কোমলকণ্ঠে সমবেদনা জানান মিসেস্ সিং—কি করবে ভাই, সংসারে শোক তাপ সহ্য না ক'রে উপায় নেই সন্ধ্যা হয়ে এল। কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়। অসুস্থ বোধ করলে আমাকে বলতে সংকোচ ক'রোনা একটুও।

মিসেস সিং-এর অনুরোধ রাখেন মন্দিরা দেবী। নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরভাবে আহার শেষ ক'রে বার্থের ওপর গা ঢেলে দেন। এক্সপ্রেস ছোটে দুর্বার গতিতে। বাইরে সুন্দর জ্যোৎস্না। মিসেস সিং ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু মন্দিরা দেবীর ঘুমের আরাধনা ব্যর্থ হয়। বিগত জীবনের এক একটা দিন, এক একটা রাত্রি, এক একটা ছোটখাটো ঘটনা, এক একটা পরম পরিপূর্ণ মুহূর্ত ভেসে ওঠে চোখের ওপর। * * * বহরমপুর কলেজের ছাত্রী মন্দিরার জীবন রমণীয় হয়ে উঠেছিল কান্তিমান নবীন অধ্যাপক হিতেন করের আবির্ভাবে। প্রতিবেশী অধ্যাপকের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। কত জিনিস শিখেছিল তাঁর কাছে! কত বই পেয়েছিল পড়তে। কাব্যজগতের আনন্দ আস্বাদনের কত মূল্যবান অধিকার লাভ করেছিল! প্রাত্যহিক জীবন হয়েছিল সুষমামণ্ডিত স্বপ্নরঞ্জিত। কলতলায় প'ড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছিল তার। তখন রোজ অধ্যাপক এসে ব'সে থাকতেন বিছানার পাশে চেয়ারে। কত গল্প প'ড়ে শোনাতেন। কবিতা পাঠ করতেন দেশী ও বিদেশী বড় বড় সাহিত্যিকদের। হঠাৎ তাকে কলকাতায় চলে আসতে হল। খুব আঘাত পেলেন হিতেনবাবু। বিদায় বেলায় চোখ জলে ভ'রে এল। তবু হাসিমুখে আশ্বাস দিলেন, সাগ্রহে গ্রহণ করলেন স্মারকটি। তার তরুণ হৃদয়ের নিভৃতে যে সিংহাসন পেতেছিলেন হিতেনবাবু, তা চিরদিন অটল থাকবারই কথা। কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! তাকে জীবনসংগিনী হ'তে হল অপরের। অথচ হিতেনবাবু মোটেই ভুলতে পারেননি সে ইতিহাস। একক রয়েছেন এখনও—অক্ষুণ্ণ রেখেছেন প্রেমের মর্যাদা। এমন মানুষের সংগে সে

কী নিদারুণ নির্মম ব্যবহারই না করলে অভাবনীয় মিলনের লগ্নে! * * * *

অঝোরে কাঁদেন মন্দিরা দেবী। বার বার এপাশ ওপাশ ক'রে শেষে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন।

দেরাদুন এক্সপ্রেস হাওড়ায় পৌছতে বেশী দেরি হয় না। ইঞ্জিন বিকল হওয়ার জন্য যে সময়টা নষ্ট হয়েছিল তার অনেকখানি make up ক'রে নির্ধারিত সময়ের কিছু পরেই এসে পড়ে। বেলা আন্দাজ আটটা। প্ল্যাটফর্মে নামার পর হিতেনবাবুর ব্যাকুল দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। কিন্তু তিনি স্থিরভাবে কুলির মাথায় সুটকেশ ও হোল্ডঅল চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত হন। এমন সময় অতি নিকটে শুনতে পান অতি-পরিচিত কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর—একটু দাঁড়াবেন কি? কথা আছে।

মন্দিরা দেবী সামনে এসে থামেন। এক টুকরো কাগজ বের ক'রে হিতেনবাবুর হাতে দিয়ে বলেন—কিছু মনে করবেন না। আমার addressটা দিলাম। একদিন এলে ভারি খুশী হব। রাগ পুষে রাখতে নেই। বহরমপুরের কথা ভোলবার নয়, ও কথা ভোলা যায় না। আজ চলি।

মমতা-মাখা মুখে তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান মন্দিরা দেবী। হিতেনবাবুর মুখে একটি কথাও ফোটেনা। চুপ ক'রে কত কি ভাবেন পারিপার্শ্বিক ভুলে।

কুলি বেচারা প্রথমটা একটু অবাক্ হয়ে যায় ভদ্রলোকের রকম সকম দেখে। তারপর অসহিষ্ণু স্বরে বলে—বাবু, পাঞ্জাব মেলের সময় হয়ে গেল। আমাকে মাল নামাতে হবে। চলুন, আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।

হিতেনবাবুর চমক ভাঙে। লজ্জিতভাবে বলেন—তাইতো বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।

আকাঙ্ক্ষার নদী

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার এ আকাঙ্ক্ষার নীল নদী কী যে অন্ধকার!
উদ্দাম জলের শব্দ, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের পাহাড়
ফুঁসে ওঠে ফুলে ওঠে—ভেঙে পড়ছে কী যে আবেগে।
থমথমে চারিদিক। শুধু কটি নির্জন তারার
অস্পষ্ট আলোক কাঁপছে, ভয় স্মৃতি জলের ভূগোল।
আমি তবু জেগে থাকি, সেই এক অন্তিম বিবেকে
কখনো জীবনকে ছুঁয়ে—জীবনেরই আর এক বিস্ময়
আমাকে কখনো যেন স্তব্ধ করে।
তবু সেই আশ্চর্য হিন্দোল;
আমি একই অন্ধকারে আকাঙ্ক্ষার স্তব্ধ অনুচর;
খুলেছি পালের নৌকা—সহচর কেবল সময়।

হে আকাশ কথা কও! বৃষ্টি তুমি ঝরাও তোমার
সমস্ত নিহিত জল; এ সমুদ্রে সমস্ত বন্দর
কী এক কুয়াশা-ক্লান্ত—আমি তার
জানি না ঠিকানা

জানি এ সমুদ্র সত্তা সমুদ্রেই পেয়েছে বিস্তার
ভেড়াবার কাল নেই চারিদিকে অপ্রমত্ত ঝড়।
জল-ঢেউ-দিন-বৃষ্টি রাত্রি আলো সমস্ত অজানা,
তবু এই হৃদয়ের গোল ঘরে সমস্ত ছবির
প্রতিলিপি আঁকা থাকে; যে নামেই জীবনকে ডাকি
আমাকে সে অন্ধকারে বার বার দিয়ে গেছে ফাঁকি।
আকাঙ্ক্ষা নদীর জল তবু কত নীল ও গভীর॥

প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের নতুন নয়। অতি পুরাকালে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ যখন পর্যন্ত সভ্যতার আলো দেখতে পায়নি, সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তখন ভারত গগনে দেদীপ্যমান। সেই সুপ্রাচীন যুগেও ভারতে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা যে খুব উন্নত ধরণের ছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমন কি খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরও আগে রামায়ণ, মহাভারতের যুগে এর প্রচলন যে খুবই জনপ্রিয় ছিল, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন পুরাণে দেখতে পাই যে, সে সময় দূতের দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদান হত। কঠোপনিষদের 'ঋতধ্বজ' রাজার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দানব-রাজ 'পাতালকেতু' ঋতধ্বজ-এর পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষিত পারাবৎ মারফৎ।

রামায়ণে আমরা পাই যে, যখন সীতাকে লঙ্কার রাজা রাবণ হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান, তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে দূত হিসেবে লঙ্কায় সীতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সীতার বিবাহ উপলক্ষ করে জনক রাজার ধনুক-ভাঙা-পণ-এর সংবাদ অশ্বারোহী বার্তাবহ মারফৎ দেশ-দেশান্তরে, এমন কি সুদূর লঙ্কাতেও পাঠানো হয়েছিল।

মহাভারতেও পাওয়া গেছে যে, বিদেহ প্রদেশের রাজা 'নল' যখন দময়ন্তীর কাছে প্রেম-পত্র পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি রাজহংস মারফৎ সে পত্র পাঠিয়েছিলেন। দ্রৌপদী, ভানুমতী, লক্ষ্মণা ও দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দেবার জন্যে বিভিন্ন দেশের রাজাদের ও রাজকুমারদের যে-সব আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়েছিল, তা' অশ্বারোহী ও রথারোহী পত্র-বাহক মারফৎ পাঠানো হয়েছিল। অর্জুনের সাথে সুভদ্রার বিয়ে দেবার জন্যে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সাথে পরামর্শ করে গোপনে অর্জুনের কাছে লিপি পাঠিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে কৌরব ও পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েই সারা ভারতের ছোট বড় রাজারা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে, মহাভারতীয় যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত ধরণের ছিল।

ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীত আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। পাশ্চাত্যের অধিকাংশই যখন অজ্ঞতার ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, অধিকাংশ অধিবাসী যখন বৃক্ষ-কোটর ও ভূ-গর্ভবাসী এবং নগ্ন—সেই স্মরণাতীত যুগে খৃষ্টজন্মেরও বহু শতাব্দী আগের কথা, যখন ভারতের সমুদ্র-পোত ভারত মহাসাগর-এর উত্তাল তরঙ্গ-মালা উপেক্ষা করে যাভা, সুমাত্রা, মলাক্কা এমন কি ইউরোপের রোম ও গ্রীসেও যাতায়াত করত। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বাংলার বীর সন্তান বিজয়সিংহ মাত্র ৭ শত অনুচর নিয়ে সিংহল (লঙ্কা) বিজয় করেছিলেন। বিজয় সিংহ-এর কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, বিজয় সিংহ ছিলেন নিঃসন্তান, সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর সিংহলের রাজা হবার জন্যে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রকে সিংহলে পাঠাবার জন্যে পিতা সিংহবাহুর কাছে বাংলাদেশে সুদূর সিংহল দ্বীপ থেকে জলপথে দূত মারফৎ লিপি পাঠিয়েছিলেন। বুদ্ধ জন্মের আগেও প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব অনুন্নত ছিল না। সে সময় জলপথেও এদেশ থেকে অন্য দেশে ডাক চলাচল হ'ত।

সভ্য-জগতের মধ্যে ভারতবর্ষই অন্যতম এবং এখানেই সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রথম চালু হয়েছিল দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, সে-সময় ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পত্র-বাহকেরা ঘোড়ায় চড়ে এক স্থান থেকে অপর স্থানে

যাতায়াত করত। যতদূর জানা গেছে, ভারতে প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন হয় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, প্রচলন করেন কৌটিল্য চাণক্য। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। তবে সে-সময় সাধারণ লোকেরা তেমন সুযোগ সুবিধা পেতো না।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত)-এর রাজত্বকালে মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর কাব্য 'মেঘদূত' রচনা করেন। মেঘদূতের বর্ণনা থেকেও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে-যুগে দূত বা পত্র-বাহক মারফৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণেও পাওয়া যায় যে, গুপ্তযুগে স্বদেশের ও বিদেশের ভ্রমণকারীদের বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধর্মশালা বা পান্থশালার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এই সব ধর্মশালার সাহায্যেই দেশের সর্বত্র চিঠিপত্র ও সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদ তাঁর কন্যা সংযুক্তার বিবাহ-উপলক্ষে স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছিলেন। তথনো ভারতে মুসলিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে মহম্মদ্ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে 'ইবন্-বতুতা' যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি ভারতীয় পত্র-বাহকগণকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে ডাক নিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছেন।

অতি দূর-দূরান্তরে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যেই প্রাচীন ভারতে রাজহংস, পারাবত প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। আর নিকটবর্তী স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান হত অশ্বারোহী অথবা রথারোহী পত্র-বাহক মারফৎ। হিন্দুরাজত্বকালে ও মোগল-পাঠানের রাজত্বকালেও সৈনিকদের চিঠিপত্র এক স্থান থেকে অন্যস্থানে 'হোমা' নামক পায়রা দ্বারা পাঠানো হ'ত। ১৯৫৪ সালে যখন দিল্লীতে ডাকটিকিটের শত-বার্ষিকী উৎসব হয়, সে-সময় এমনি পায়রা দ্বারা চিঠি পাঠিয়ে দর্শকদের দেখানো হয়েছিল। সে-উৎসবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল, আর সে ব্যবস্থা আজকালকার মত না হলেও খুব খারাপ ছিল না—তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য দেশের চেয়ে খুব উন্নত ধরণেরই ছিল।

পায়রা ছাড়াও প্রাচীন-ভারতে রথারোহী পত্র-বাহকের কাহিনী পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরাম-চন্দ্র বনবাসে গেলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন। তখন রাণী কৈকেয়ী ভরতকে আনবার জন্যে রথারোহী পত্র-বাহক পাঠিয়েছিলেন গিরিরাজনগরে কেকয় রাজার কাছে।

'ঘোড়ার-ডাক' সব-দেশেই প্রচলিত ছিল। গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেই ডাক-টিকিট প্রচলনের আগে ঘোড়ার ডাক বা ডাক-হরকরার দ্বারা চিঠিপত্র পাঠানো হত। পরবর্তীকালে এর বহুল প্রচার ও সংশোধন করেন পাঠান সরদার শের-শা ১৫৪৩ সালে। শের-শাহই ভারতের প্রথম সম্রাট, যিনি ঘোড়ার-ডাক বসিয়ে নিয়মিতভাবে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দু'হাজার মাইল দীর্ঘ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক-রোড্' নির্মাণ করে বাংলার সোনারং থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত যাতায়াতের যে সুন্দর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন; তার তুলনা হয় না। তিনিই সর্বপ্রথম ডাক-ঘরে'র কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। ভারত-বিখ্যাত এই সুপ্রশস্ত রাস্তাটির সংলগ্ন ডাক-ঘরের ব্যবস্থা করে ডাক আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করে দেন। কেন না একজন অশ্বারোহীর পক্ষে বাংলাদেশ থেকে সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিনা বিশ্রামে একাদিক্রমে গমনাগমন করা সম্পূর্ণ অসাধ্য। কাজেই ডাকঘরের প্রচলন হওয়ায় ডাক-বাহকদের এই কষ্ট অনেকাংশ কমে গেল। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে আগের চেয়ে ডাকও অনেক তাড়াতাড়ি ও কম খরচে যেতে লাগলো। যদিও এখনকার তুলনায় সে-খরচ অনেক বেশী হ'তো।

যে-সব 'রানার' বা 'ডাক-হরকরা' ডাক বা পত্রাদি নিয়ে যেতো, দেশীয় ভাষায় তাদের 'ডাক-চৌকিয়া' বলা হত। আর যেখানে ডাক বদল হত, সেই স্থানকে বলা হত 'ডাকচৌকী'।

'ডাকঘর' বা ডাকবিভাগের কাজ নিতান্ত আধুনিক

নয়। বহুদিন থেকেই রাজন্যবর্গ আপনাদের রাজকীয় কাজের সুবিধার জন্যে 'ডাকপিয়াদা' বা 'ডাকপেয়াদা' নিযুক্ত করতেন। তাঁরা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি নিয়ে দ্রুতবেগে একস্থান থেকে অন্যস্থানে, সেখান থেকে আবার আর একজন সেই পত্রাদি নিয়ে দ্রুতবেগে অন্যস্থানে, এমনি করে বহুদূর দেশান্তরে অল্প সময়মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করতেন।

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে শের-শাহই সর্বপ্রথম অশ্বপৃষ্ঠে অধুনিক ধরণের ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড্ দিয়েই তাঁর ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে মোগলসম্রাট আকবর গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বে প্রতি দশ মাইল অন্তর একটা করে স্থায়ী ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এই ডাকঘরগুলি থেকে দ্রুতগামী ও তেজী তুর্কী ঘোড়ার সাহায্যে দূর-দূরান্তরে ডাক নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথেই সে-প্রথা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রাবাদ যাবার পথে মাঝে মাঝে আজো সে-সব পরিত্যক্ত ডাকঘর দেখা যায়।

আকবর বাদশাহের চেষ্টায় মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্যে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। কাফি খাঁ নামক মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে, "বাদশাহ আকবর যে নতুন নিয়ম প্রচলন করেন, তার মধ্যে 'ডাক-মেবড়া' একটি উল্লেখযোগ্য। তাদের সকল স্থানেই আড্ডা ছিল।" আবুল-ফজলের 'আইন্-ই-আক্বরী'তে লিখিত আছে: "মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, তারা দ্রুতগামী বলে বিখ্যাত। তারা বহুদূর থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি এনে দিত। তারা আবার উত্তম-গুপ্তচর বলেও গণ্য হত।"

হিন্দীতে 'ডাক-পেয়াদা' বা 'পিয়ন'-দের 'ডাকবালা' বলা হত। ডাক থেকে বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের সমধিক উপকার সাধিত হলেও আগে বণিকেরা-এর প্রয়োজনীয়তা তেমন উপলব্ধি করতো না। সে-কালে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুরুষেরাই সুবিধা পেতেন।

দক্ষিণ-ভারতে আধুনিক ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৬৭২ সালে মহীশূরের চিক্‌দেব-রাজ-এর রাজত্বকালে। তিনিই প্রথম দক্ষিণ-ভারতে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা করেন। সেখানকার ডাকঘরের পোষ্ট-মাষ্টারদের শুধু চিঠিপাঠানোই কাজ ছিল না। চিঠি পাঠানো ভিন্ন স্থানীয় গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহ করে রাজার দরবারে পৌছে দেওয়াও তাদের আর একটি বিশেষ কাজ ছিল। ডাকঘরের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের কাজ ছিল গুপ্তচরের কাজ করা। হায়দার আলী ও টিপু স্থলতানের সময় এই ব্যবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করে। এই সব ডাকঘরকেই তখন 'ডাক-বাংলো' বলা হত। সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ-ভারতে যে ডাক-হরকরারা ডাক নিয়ে যাতায়াত করতো, স্থানীয়-ভাষায় সেকালে তাদের 'কাসিদ' বলা হত। তাদের পিঠেও থাকতো চিঠির থলি বা ব্যাগ্—আর অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে থাক্‌তো একটি বল্লম। এই বল্লমের শেষে আবার বাঁধা থাক্‌তো কতকগুলি 'ঝুনঝুনি' বা 'ঝুমঝুমি'। ডাক-হরকরা যাবার সময় তার বল্লমের এই ঝুনঝুনিতে বেশ মধুর একটি সুর-তরঙ্গের সৃষ্টি করতো। আজো অনেক অজ্ পাড়াগাঁয়ে ডাক-হরকরা বা রানারদের এই ঝুনঝুনির শব্দ শোনা যায়।

প্রত্যেক ডাক-বাংলোতে থাকতো তিনজন করে ভৃত্য—এরাই আবার পোষ্ট-অফিসের বা ডাকঘরের অধীনে কাজ করতো। পোষ্টমাষ্টারদের কাজ ছিল ভ্রমণকারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখাশুনা করা এবং ভ্রমণকারীরা যখন এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতেন, তখন তাঁদের পাল্‌কী ও বাহকের ব্যবস্থা করা। এই থেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে 'ডাকবাংলো' কথাটির সূত্রপাত হয়েছে। সেই থেকে 'ডাকবাংলো' বা 'বাংলো' কথাটি আজো চলে আসছে। সে-সময় পথের ধারে কোন 'হোটেল' বা 'সরাইখানা' ছিল না। অথচ আজ থেকে দেড়-হাজার বছর আগে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'ধর্মশালা' বা 'পান্থশালা' ছিল, সে-তথ্য আমরা চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণেই পেয়েছি। তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ১৫ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যে মাঝে মাঝে 'ডাক-বাংলো' বা 'রেষ্ট্-হাউস্' ছিল। এই জাতীয় 'ডাকবাংলো' বা 'বিশ্রাম-ঘর'গুলির অধিকাংশই ছিল একতলা খড়ের-ঘর। কোন কোন বাংলোতে অবশ্য একাধিক শয়নঘর, স্নানঘর, রান্নাঘর প্রভৃতিও ছিল। ভ্রমণকারী ও সরকারী কর্মচারীদের দেখাশুনা করবার ভার ছিল একজন 'পরিচারক'-এর ওপর। এরাও এক জাতীয় চর। সেকালে

এদের বলা হত 'খিদ্‌মদ্‌গার্‌' বা 'খিদ্‌মত্‌গার্‌'। বড় বড় বাংলোতে 'খিদ্‌মদ্‌গার' ছাড়াও একজন লোক থাক্‌তো, জল ও জ্বালানী কাঠ যোগাড় করবার জন্যে। এরা ছিল ভৃত্য শ্রেণীর। এই সব বাংলোতে অস্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে ভ্রমণকারীদের মাথা-পিছু থাকার ও খাওয়ার খরচ আলাদাভাবে দিতে হ'ত। আবার কোন ভ্রমণকারী কোন জায়গায় যাওয়া মনস্থ করলে, সেখানে যাবার দু'তিন দিন আগে স্থানীয় 'ডাকমুন্‌শী' বা পোষ্টমাষ্টারকে জানাতে হ'ত তাঁর যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। যদিও ভ্রমণকারীদের নিজেদের পাল্‌কী অনেকের থাকতো, তবে পোষ্টমাষ্টারকে 'পাল্‌কী-বাহক' বা 'বেহারা' যোগাড় করে দিতে হত। পাল্‌কী-বাহক বা বেহারাই আবার পত্র-বাহকের কাজ করতো। এই 'বেহারা' শব্দ থেকেই পরবর্তীকালে পত্র-বাহক বা পিয়নদের 'বেয়ারা' বলা হত। 'পাল্‌কী-বাহক,' 'মশালচী' ও 'ভাঙ্গী,' এদের জন্যে মাইল পিছু তখন বারো আনা করে খরচ লাগতো এবং টাকাটা পোষ্ট-অফিসে অগ্রিম জমা দিতে হ'ত। 'মশালচীর' কাজ ছিল আলো বা লণ্ঠন হাতে রাত্রি-বেলা পাল্‌কী বাহকদের পথ দেখানো, আর জিনিষপত্র-বাহকদের বলা হ'ত 'ভাঙ্গী'। আবার পথে যদি ভ্রমণকারী কোন কারণে দেরী করে ফেলতেন, তবে তার জন্যে তাঁকে ক্ষতিপূরণও দিতে হ'ত। প্রতি দশ মাইল অন্তর বাহকদের বদল করে নতুন বাহক নিযুক্ত করতে হত। বন্দোবস্ত যা করবার সে-সব পোষ্ট-মাষ্টারই করতেন। প্রতি তিন ঘণ্টা বা প্রতি দশ মাইল অন্তর এই বদল-ব্যবস্থা করতে হ'ত। ডাক-চলাচলে এই বদল-ব্যবস্থাও আজকের নতুন নয়। প্রাচীন ভারতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই বদল ব্যবস্থার প্রবর্তনও করেন 'অর্থশাস্ত্র' প্রণেতা কৌটিল্য চাণক্য।

ঘোড়ার-ডাকের বেলাতেও ঠিক একইভাবে ঘোড়া-বদল করতে হ'ত এবং প্রতি দশ মাইলে এক জোড়া করে ঘোড়া রাখা হত বদল করবার জন্যে।

আগে মানুষের চিঠি-পত্র ভিন্ন পূজার ফুল-ফল বইবার জন্যেও রাজপুতনায় উদয়পুর ও পুষ্করের মধ্যে ডাকের ব্যবস্থা হয়েছিল। একালের ডাকে এখন আর ফুল-ফল বইবার প্রয়োজন হয় না বটে, তবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ওষুধ, পথ্য, সখের-খাবার, প্রসাধন-সামগ্রী প্রভৃতি সব কিছুই যায় ডাকে।

সে-কালে এদেশের অধিকাংশ রাস্তাই তেমন ভাল ছিল না। কাজেই এই সব রাস্তায় সচরাচর গরুর-গাড়ী ও মহিষের গাড়ীই বেশী যাতায়াত করত। তখন গরুর-গাড়ী ও মহিষের গাড়ীর সাহায্যেও ডাক-চলাচল হ'ত। আবার ভাল ভাল সুপ্রশস্ত রাস্তায় ডাক চলাচল হত 'টাঙ্গা,' 'এক্কা,' 'ঘোড়ার-গাড়ী' প্রভৃতির সাহায্যে। মরুভূমি অঞ্চলে যেমন সিন্ধু দেশ ও পশ্চিম-রাজস্থান—সেখানে উটের ডাকেরও প্রচলন ছিল। পার্বত্য-অঞ্চলে নেপাল, ভূটান, সিকিম, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে আগে ডাক-চলাচল হত স্থানীয় 'টাঙ্গন্‌' ঘোড়ার সাহায্যে। দুর্গম অঞ্চলে আরব ও ব্রহ্মদেশীয় বলবান্‌ ছোট ঘোড়া টাট্টু' বা 'টাট্টু'ও পত্র-বাহকদের কম সাহায্য করতো না। জলপথে ছোট বড় নানা জাতের নৌকা বা জাহাজ তো ছিলই।

ইংরেজ রাজত্বের স্থায়ী ডাকঘর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভের আমলে।
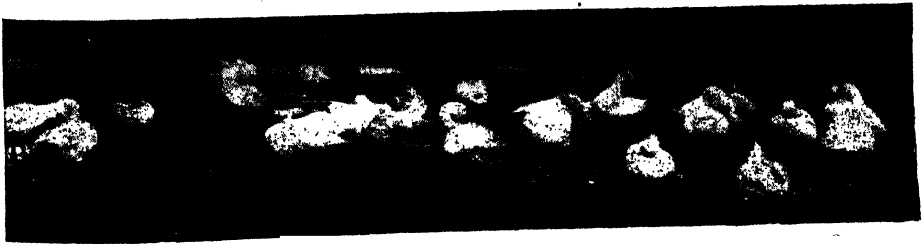
ডাক্তার মেঘনাদ সাহার জীবন-পঞ্জী

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ—মেঘনাদের জন্ম, ৬ই অক্টোবর, ঢাকা জেলার শেওড়াতলী গ্রামে। পিতা জগন্নাথ, মাতা ভুবনেশ্বরী। মেঘনাদ পঞ্চম সন্তান। স্বগ্রামেই পিতার ছোট্ট দোকান।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করে ৭ মাইল দূরস্থ শিমুলিয়ায় মিডল স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। সেখানে ডাক্তার অনন্তকুমার দাশের বাড়ীতে থাকতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ—ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়ে সেখান হতে ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। স্কুলের বেতনও ফ্রি হল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হরতালে যোগ দেওয়ায় মেঘনাদ স্কুল হতে বিতাড়িত হলেন, ছাত্রবৃত্তিও কাটা গেল। ঢাকায় কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। স্কুলে ফ্রি হলেন, একটা ছোট বৃত্তিও পেলেন। সমগ্র বঙ্গদেশের বাইবেল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে নগদ একশত টাকা ও শোভন সংস্করণ বাইবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ—এণ্টান্সে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।

ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হলেন। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে বিজ্ঞান পড়া। তখনই চতুর্থ বিষয় নিলেন, জার্মান ভাষা। রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ নগেন্দ্রনাথ সেন, অঙ্কের অধ্যাপক কে পি বসু।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ—আই-এস্-সি পরীক্ষায় তৃতীয় হলেন; কিন্তু রসায়ন ও গণিতে প্রথম। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হলেন। সহপাঠী হলেন, সত্যেনবসু, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি। ২।২ ক্লাস উপরে পড়তেন, প্রশান্ত মহলানবীশ ও নীলরতন ধর। নেতাজী সুভাষ তাঁর ৩ বছরের ছোট। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্নেহস্পর্শ লাভ করলেন ও তাঁর প্রভাব পেলেন। দামোদর বন্যায় স্বেচ্ছাসেবক হলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দ—গণিতে দ্বিতীয় হয়ে বি-এস-সি অনার্স পাশ করলেন। প্রথম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ—এম-এস্-সি পাশ করলেন। এবারও সত্যেন্দ্র প্রথম হলেন, মেঘনাদ হলেন দ্বিতীয়। স্বদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে জানাশুনা থাকার দরুণ মেঘনাদ ফাইনান্স পরীক্ষায় বসতে অনুমতি পেলেন না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে অঙ্কের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। ক্রমে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের দিকে ঝুকলেন এবং খুব খেটে তৎকালীন আধুনিকতম পদার্থ বিজ্ঞানের কঠিন আবিষ্কারগুলির ব্যাখ্যায় দক্ষ হলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ—Lecturer of Mathematical Physics হলেন। journal of the Asiatic Societyতে তার পর পর দুইটি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। On the New Theorem of Elasticity পৃষ্ঠা ৪২১ এবং On the Pressure of Light পৃষ্ঠা ৪২৫। এই শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি স্ব-উদ্ভাবিত একটি সহজ অথচ সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করে তার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে আলোর চাপ আছে। এই গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-এস্ সি উপাধী দিলেন। বিবাহ করলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ—আইনষ্টাইনের থিয়োরির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে কলকাতার Statesmanকে তাঁর আবিষ্কারের সংবাদ প্রচারে সাহায্য করলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পেলেন। ঘোষ পরিভ্রমণ বৃত্তি পেয়ে বিলাত গেলেন। সঙ্গে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ—আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির ইংরাজী অনুবাদ মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ

করলেন। ভূমিকা লিখলেন প্রশান্তমহলানবিশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে বই প্রকাশ করলেন। নাম—Einstein A and Minkowski H—The Principles of Relativity 1920, তাতে ছিল।

1. Historical Introduction by P. C Mahalarobis.

2. On the Electrodynamics of Moving Bodies in the Einstein's first paper on the restricted theory of Relativity originally published in the Annalon der Physik in 1905. Translated from the original German by Dr. Meghnad Saha.

3. Albrecht Einstein A short Biographical note by Dr. Meghnad Saha.

4. Principles of Relativity (H. Minkowski's original paper in the restricted Principle of Relativity first published in 1909. Translated from the original German by Dr. Meghnad Saha.

5 Appendix to the above by H Minkowski —(Translated by Dr. Meghnad Saha)

6 The Generalised Principal of Relativity [A Einstein's second paper of the Generalised Principle first published in 1916] Translated from the original German by Mr. Satyendra Nath Bose.

সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে সূর্যস্থ নানা ধাতবের রশ্মির রং বদল হয়। নানা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা এই তথ্য নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ লণ্ডনের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে ছাপা হল। তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হল; তখন বয়স ২৭ বৎসর মাত্র। খয়রা অধ্যাপক হতে আমন্ত্রিত হলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ—মেঘনাদের একটি গবেষণা প্রবন্ধ আমেরিকার ইয়ার্কেস মানমন্দিরের আপিসের দেরাজে আছাপা অবস্থায় ছিল। এই প্রবন্ধের কাছে ঋণ স্বীকার করে অক্সফোর্ডের বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মিলনে সাহেব নানা তথ্য আবিষ্কার করে তার ফল প্রকাশ করলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ উত্তরবঙ্গের বন্যায় আচার্য রায়ের রিলিফের কাজে সহকারী হলেন, মডার্ণ রিভিউতে প্রবন্ধ লিখলেন। যন্ত্রপাতির অভাবে উচ্চতর গবেষণার অসুবিধা হওয়ায় খয়রা-অধ্যাপক হয়ে আর কলকাতায় থাকতে পারলেন না। গবেষণার সুযোগের আশা নিয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন এবং সে বছরই বিজ্ঞান কংগ্রেসের অনুমোদনে (ডাঃ সাহা সেবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের, বোম্বাই অধিবেশনে মূল সভাপতি হয়েছিলেন) তা পরবৎসর (১৯৩৫) National Institute of Science of Indiaতে পরিণত হয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ—বিজ্ঞান কংগ্রেসে (বারাণসী অধিবেশন) পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শাখার সভাপতি হলেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ—বিলাতের রয়াল সোসাইটির ফেলো হলেন। উত্তর প্রদেশের গভর্ণর সার উইলিয়ম মরিস বার্ষিক ৫০০০৲ বরাদ্দ করিলেন গবেষণার খরচ জন্য। Atomic Physics ইত্যাদি বিষয় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি বক্তৃতা দিলেন। বিষয়: (১) The atom—the electron—the proton (২) Radiation (৩) Theories of spectra of Elements (৪) Principals of Atom structure (৫) Continuation of Atom (৬) Recent ideas on the structure of matter.

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ—Six lectures on Atomic Physics etc. in Patna University নামে উল্লিখিত বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ—A treatise on Modern Physics : atoms, molecules and Nuclei—Allahabad হতে প্রকাশিত হল। তাঁর লিখিত A treatise on Heat-including kinetic theory of gases, thermodynamics and recent advances in statistical thermo dynamics ও অতঃপর ছাত্র ও অধ্যাপক সমাজে খুব প্রচলিত হল। ক্রমে তার ৪র্থ সংস্করণ হয়েছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ—Indian Science News Association গঠন করে 'Science & Culture' নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ—মেঘনাদ কর্ণেগী ট্রাষ্টের অর্থে, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ—National Institute of Science of Indiaর সভাপতি হলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ—বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক হয়ে ডাঃ সাহা কলিকাতায় ফিরে এলেন। National Planning Committee (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হতে) স্থাপিত হলে জহরলাল নেহেরু সভাপতি হলেন, মেঘনাদ হলেন Power ও Fuel বিভাগের সভাপতি। আর হলেন সেচ বিভাগের সদস্য।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ—Council of Scientific and Industrial Research স্থাপিত হলে ডাঃ ভাটনগর ডিরেকটর হলেন; মেঘনাদ হলেন একজন সদস্য। ভারতে সর্বপ্রথম রেফ্রিজেটর তৈরি হল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ—রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হল। তার সঙ্গে মেঘনাদের যোগাযোগ হল।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ—দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটির সদস্য হলেন এবং বন্যা নিরোধের উপায় নির্দ্ধারণ করে তা প্রচার করলেন। সেই সূত্রে অবলম্বন করে স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সনে দামোদর ভ্যালী করপোরেশন স্থাপিত হল।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ—আমেরিকা গমন।

Indian Association for the Cultivation of Science এর সেক্রেটারী; ১৯৪৬ সনে সভাপতি হলেন। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উন্নতি বিধানে নিযুক্ত হলেন। সফল হলেন।

ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্‌কোপ পরীক্ষাগারের জন্য তৈরি করে আনালেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ—My Experience in Soviet Russia শীর্ষক পুস্তক প্রকাশিত হল। 'Contains my impressions of the Soviet Union—where I went for the first time during the summer of 1945, as an Indian delegate to the 220th Anniversary of the Russian Academy.'

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য প্রতিষ্ঠান গ্রহণ।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দ—Indian Association for the Cultivation of Science যাদবপুরে নূতন বিস্তীর্ণ গৃহে উঠিয়ে আনলেন। ভারতসভার সদস্য হলেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ—Council of Scientific & Industrial Research এর তরফ হতে পঞ্জিকাসংশোধন কমিটি (Calender reform Committee) গঠিত হল। ডাঃ সাহা কমিটির সভাপতি হলেন। ১৯৫৫ সনে কমিটির রির্পোট প্রকাশিত হয়েছে। সরকার ক্রমে তা ব্যবহার করছেন।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ—Science Association এর ডিরেক্টর হলেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রক্তের চাপে দিল্লীতে মৃত্যু। ৬৩ বৎসর বয়সে।

গৌরীনাথ মন্দির
(ভাগলপুর)

ফটো : চঞ্চল মিত্র
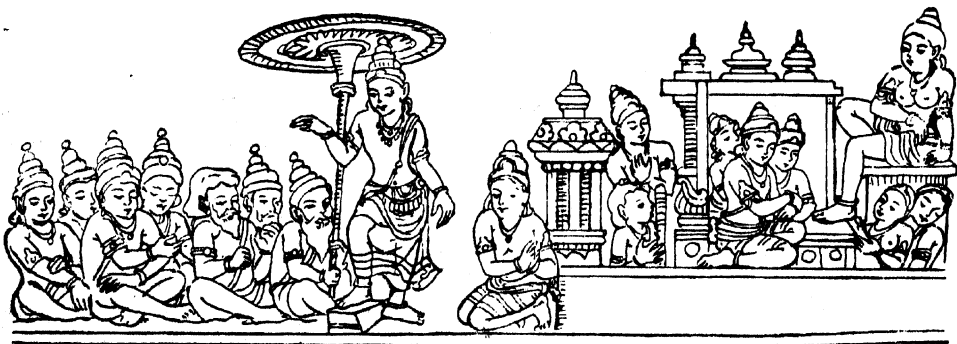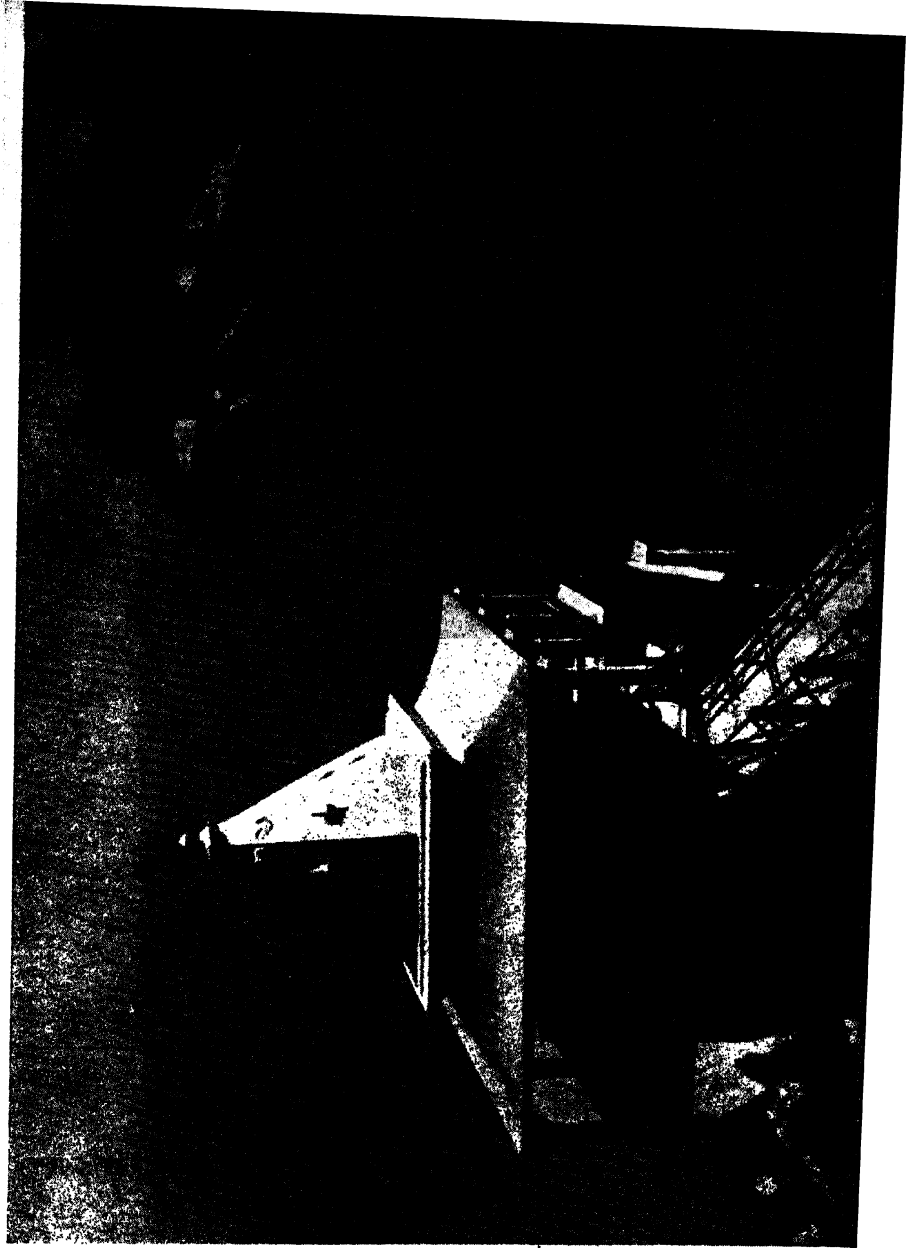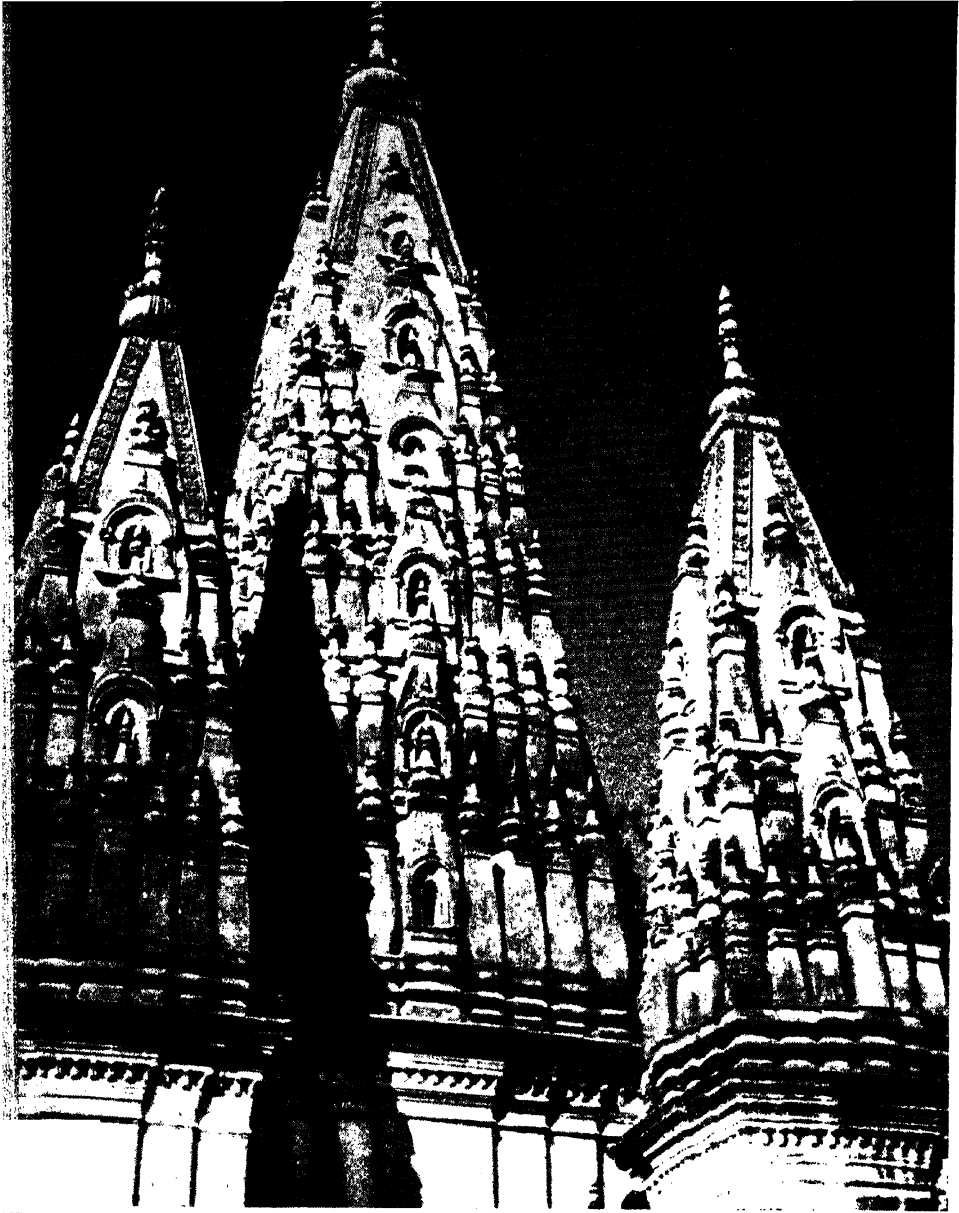
মন্দির (হাজারীবাগ)

ফটো : ষষ্ঠীরাম দাস মোদক

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
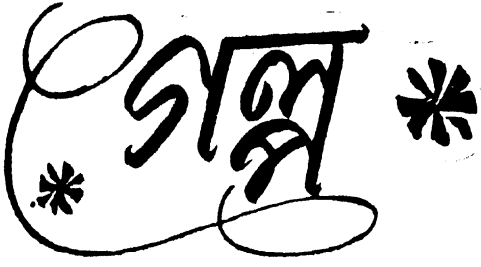
তাপ

সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

এটা বছরের শেষ ঋতুর একটা সকাল।

দিনের গরমটা রাত্রিতেও আঠার মত লেগেছিল, তাই অধর নেয়ের চোখে আর ঘুম আসেনি। সারাটা রাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছে, ভোরের দিকে নদীর ঘাটের দিকে এসেছে, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে যেন হাফ ছাড়ছে, কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে কোকিলটা ডেকে সারা হচ্ছে। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল তার বোট তিনটে পাল তুলে চলেছে। নদীর ঘাটে দেখল তার আরও একটা বোট নোঙ্গর করে রয়েছে, ছোট ছোট ঢেউয়ে বোটটা দুলছে, বোটটা দেখে কি যেন ভাবল, তারপর নদীর ঘাটকে পিছনে রেখে চলল নদীর পাড় ধরে। কিছুদূর গিয়ে ভেড়ি থেকে নেমে মাঠের পড়ো পথ ধরল, আশে-পাশে কোন ঘরবাড়ী নেই, সামনে কতগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে, তাও একটা থেকে অপরটা বহু ছাড়াছাড়ি।

এতক্ষণে অধর একটা ভাঙ্গা ঘরের কাছে এসে পড়ল, এটা হল অধরের বোটের দাঁড়ির ঘর। নাম তার নয়ন, ডাক নামের কাছে আসল নামটা চাপা পড়েছে, ডাকে সবাই 'লয়ন' বলে, এতেই খুব খুশী, যেন মহেশ্বর, নয়ন কদিন হল বোটে কাজ করতে যায়নি, তাই অধর তাকে খোঁজ করতে এসেছে, বাড়ীর সামনে এসে ডাকল—হেই লয়ন,—

নয়ন বলল—ও টুসকি, ঐ দেখ, নেয়ে এসে হাজির।

টুসকি একটা পিড়ে এগিয়ে দিয়ে—নেয়ে বাবা এয়েচ, বস, আমাদের ভাগ্য ভাল। বাবা এদ্দিন পর এসতে হয়, আমি কি আর নেয়ে বাবার মেয়ে, যাক্, বাবা হেই সক্কালে কুমারপুর ঠেঙ্গে (থেকে) এখানে ?

নেয়ে পিঁড়েটায় বসল। কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুখ মুছে—যেন আবার! হুই নয়ন শালাটার তরে। কদ্দিন ভোর দেখাই নেই, হ্যাঁরা টুসকি, হুইটার হয়েছিল কী ?

তাচ্ছিল্য করে—কি আর হবে! যা হয় তাই, হাতে খোরাকির পয়সা থাকলে ধরাকে ত সরা জ্ঞান করে। মদ তাড়ী গিল্লে যে ব্যারাম হয় তাই হয়েছে। ঐ বুক জ্বালা করছে, পড়ে গিয়ে হাতটায় ব্যথা লেগেছে। আর বল কেন! বল্লেই মারপিট করবে।

নয়ন দাবড়ি দিয়ে—চুপ কর। আহ্লাদী গলে গেলি যে, দে কোথায় কি পান্তা আছে।

মুকটা বাঁকিয়ে—আহা! মিন্সের ঢঙ্গ দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়, ঐ ত মাটির বাসন চাপা আছে।

পান্তার থালাটা কাছে নিয়ে বলল—ও টুসকি, নিম্মি (শুধু) পান্তা কি করে খাই বল ত ? এট্টা ঝাল পুইড়ে দেনা।

টুসকি তামাকটা সেজে—নেয়ে বাবা, এই হুঁকো ধর। ওর ঝালটা পুইড়ে দি। লঙ্কাটা পুড়তে পুড়তে হেসে—হ্যাঁ গো নেয়ে বাবা, এবার ঠাহর কর ত কার বেশী আহ্লাদ, লঙ্কাটা দিয়ে—নাও এবার খাও, পয়সাটা যেন তাড়ি মদ গিলে এসনি, নিয়ে এস, মনে থাকবে ত? নাকি আত্তিরে (রাত্রে) কি সেদ্ধ করব ভাবতে হবে।

অধর হুঁকো টানতে টানতে—ও টুসকি, চাল যদি না থাকে, ত আমার ঠেঙ্গে আনিস, পরে শুইধে দিসখুন।

টুসকি বলল—এই ত লেয়ে বাবা ছেলের গাছে তুলে দিলে, আর কি ঘরমুখ হবে ?

নয়নের খাওয়া শেষ হয়। হুঁকো টেনে বলে—নেয়ে বাবা, চল কাজে যাই। হয়ত সওয়ারীরা দেইড়ে আছে।

নয়ন দেখছে টুসকি ঘরের ভিতর চৌকাঠের পাশে বসে চাল বাচছে, আর সেই দিকেই চেয়ে আছে নেয়ে। চোখে

টনক হেনেছে, চোখ ফেরাতে পারছে না, এবারে গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল—ও নেয়ে বাবা, চল।

অধর একটু যেন চমকে উঠল, বল্ল—আরে লয়ন, ভাবছিলুম একটা কথা। তুই যে মনে আছে কি তোর। যে লোকটা বোট লেবার কথা বলেছিল, আচ্ছা যাক্। থর্ থর্ (তাড়াতাড়ি) চল, ও টুসকি, কি করছিস ?

কুলো থেকে মুখটা তুলে বল্ল—এই বাবা খুঁদ কটা খুঁটতেছি,—এখন তা হলে যাই বুঝলি ?

মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, আবার এস, আর সঙ্গে যেটা যাচ্ছে, ওর পেঠিয়ে দিও।

রাস্তায় চলতে চলতে অধর টুসকির কথা ভাবছে, এই টুসকি সেই গেমোখালির টুসকি। টুসকি নামে রোগা লিকলিকে মেয়েকেই দেখে এসেছে। চিকণ মাজায় শাড়ীটা দুবেড় না তিনবেড় দেওয়া থাকত, বুকের কাপড়টা অনেক সময় আলগা থাকত। সেদিকে মেয়েটার লক্ষ্য ছিল না। নাকের সর্দিটা প্রায় করত। ফোস ফোস করে সেগুলো টেনে নিত। অধর একবার দেখে আর ফিরে তাকাত না। কালো চামড়ার শরীরটা মানুষের না কিসের সন্দেহ করত।

কিন্তু এই বসন্তে তার পরিচয় ভিন্ন, পুষ্ট দেহ, তাজা আনাজের মত শরীরটা চকচক করছে। কালো দেহে কিসের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নিটোল মুখ, বুকটা ভরাটে, এখন কোমরে একবেড়ও কাপড় বাকি থাকে না। তার শরীর থেকে কিসের একট্য গন্ধ ভুরভুর করে বেরোচ্ছে। এ গন্ধ সে নেবে, এ স্রোতে সে নৌকা ভাসাবে। তবেই ত সে নেয়ে।

মাঝি খাটায় এসে দেখে সওয়ারীরা দাঁড়িয়ে আছে। নয়নের জন্যে মাঝি দেরি করছিল, নয়ন আসায় মাঝি বোট ছেড়ে দিল। বেলা হয়ে গেছে, অধরও কি যেন ভেবে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

বৈকালে অধর নদীর ঘাটের দিকে আসছে। ভাবছে একবার টুসকির সঙ্গে দেখা করে আসবে। তাই চলল, বাড়ীর কাছে এসে টুসকি কাঁথা সেলাই করছে। অধরকে আসতে দেখে—কি গো নেয়ে বাবা, এবেলা কিসের তরে (জন্যে) ? সে একটু থেমে—এখানে একটু কাজে এয়েছিলুম, তাই ভাবলুম তোর সনগে একটু দেখা করে যাই।

পিঁড়েটা দিয়ে বল্ল—বস নেয়ে বাবা।

—হ্যাঁগা টুসকি, চাল আনতে গেলিনে কেন ?

—এ বেলার মত কুলিয়ে যাবে তাই যাই নে।

কাল সকালে দেখবেক্ষণ আমি গিয়ে হাজির।

—আচ্ছা তাই যাস, হ্যাঁরে টুসকি, তোদের সবদিন দুবেলা খাওয়া হয় ? না কোন দিন হয় আর কোন দিন হয় না। আর হবে কোত্থেকে, শালা কি সব পয়সা ঘরে আনে।

টুসকির গলার স্বরটা স্বাভাবিক—নাগো বাবা, ওর তরে কি যায়। একমুঠো ভাত দুজনে ভাগ করে খাই। তাই আনন্দ, তা হ্যাঁগো নেয়ে বাবা তুমি ত এসব জান, তবু জিগ্যেস করতেছো ?

—এই এমনি, তা কি জানিস, তোদের কষ্ট আমার বড্ড লাগে, পরাণটা যেন কেমন করে, যেমন তোর খুব পেটে নায় ? ওই'ত তোর গায়ে দাগ, শালা খেতে দিতে পারেনে আবার মারে!

ওর চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন—হ্যাঁগো নেয়ে বাবা, তুমি এমন তারা সব কথা বল'ছ কেন ? মা মরে গিয়েছে বলে তোমার এত দুঃক্ষু, কিন্তু তখন ত তোমার দুঃক্ষু ছিল না। মা নিজের দুঃক্ষু নিয়ে মরেছে, যে কষ্টে মরেছে আমিজানি। মনের কথা কাউকে অভাগী বলতো নি। ভগবানকে জানাত, এই যে তোমার এত টাকা পয়সা; এগুলো করেছে কে ? বেবাক'ত (সব) সেই মার কষ্টের পয়সা, সে মা লক্ষ্মী ছিল।

টুসকির কথাগুলো শুনে অধরের গাটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। তাই হঠাৎ বল্ল—হ্যাঁরে টুসকি, ঘরটা এরকম ভেঙ্গে গেছে, সারাবিনী ?

এতক্ষণ সেলাই বন্ধ ছিল, আবার সেলাই করতে করতে—হ্যাঁ ভয়ে ভয়ে সারাব, আবার জল ঝড় আরম্ভ হয়েছে।

সূর্যটা এখন আকাশ বেয়ে পশ্চিম আকাশে পাড়ি জমিয়েছে, সিসে রংগের আকাশের বুক দিয়ে পাখিগুলো উড়ে যায়। টুসকিও হাত থেকে ছুঁচ নামায়।

—নেয়ে বাবা, সনঝে (সন্ধ্যে) লেগেছে। এখন ঘরে যাও। এতখানি পথ যেতে আত হয়ে যাবে।

গলার স্বরটা কেমন শোনায়—হ্যাঁরে কি বলেছিস। তবে তুই কাল যাবি ত ?

একটু হেসে—হ্যাঁ বাবা। হ্যাঁ।

নেয়ে কি যেন ভেবে চলেছে। চোখে মুখে কি এক শিকারের পরিকল্পনার ছাপ, সে এখন শিকারের আশায় চার ফেলতে চায়, রাস্তায় নয়নের সঙ্গে দেখা। টলতে টলতে আসছে, মুখ দিয়ে তাড়ির গন্ধ বেরিয়েছে। সে বল্‌লে কথাগুলো জড়ান—সে নেয়ে বাবা নাকি ? কোথায় টাঙ্গে এমন সময় ?

—ও পাড়ায় কাজ ছিল, কাজ সেরে তোর বাড়ী ভেঙ্গে এসতেছি।

—বাবার পায়ের ধুলো পড়েছে। এ'ত ভাগ্য, নেয়ের পায়েয় ধুলো নিয়ে বল্‌লে—এ ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপী পদরেণু। যাক বাবা এখন চলি।

সকালে নেয়ে বসে তামাক খাচ্ছে, ভাবছে কই টুসকি ত এলনা। কি হল তার ? শালা মারধোর করল নাকি ? না সে'ত চাল নিয়ে যাবে বল্‌ল, এমন সময় দেখল টুসকি আসছে, নেয়ে মনটায় শান্তি পেল, কাছে এলে বল্‌ল, গলার স্বরটা মিষ্টি।

—কিরে টুসকি, এত দেরি করলি ? লয়নকে বুঝি বোটে দিয়ে এসতেছিস ?

—হ্যাঁ। বাবা, এখনকার মত এক দোল (আড়াই সের) চাল ধার দাও।

—আঃ তুই এত থর্ কেন ? বোট ছেড়ে যাবে নাকি তোর ? কদ্দিন পর এলি। বস, দুটো কথা বল, না, দাও আর দাও, হ্যাঁরে টুসকি, শালা মেরেছে নাকি কাল ?

মাথা নিচু করে বল্‌ল—আর বাবা ওর কথা বলনি, কিছু বল্লেই ত পিটতে আসে। হ্যাঁগা বাবা, ঘরটা যেন ফাঁকা পেনা (মত) লাগছে, মা থাকতে এর ছিরি অন্য রকম ছেল।

গলার স্বরটা শুষ্ক—হ্যাঁরা টুসকি, তাই ভাবি, এবার কপালে কি যে আছে, ঘর, বাড়ী, জায়গা জমি, পেট, একা কদ্দিকে যাই, টাকা পয়সা, ঘর-দোর মুখ'ব না বাইরে বেরব ? আমার দুঃখ্যু তুই তবু বুঝিস। বলে একটা নিশ্বাস ফেলে অধর, আবার শুরু করে—যাক টুসকি তোর কাপড় আর নেই না। তা না হলে ছেঁড়া কাপড় পরে তুই আছিস। শালাটা যে পয়সা কি করে, তোর কানের মাগড়ী দুটো বোধ হয় শালা বেচে দিয়েছে। আমি তোর একটা শাড়ী কিনে দোব, তুই এখনও দেইড়ে আছিস ? বস।

ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—থাক আর বসতে হবেনি। ওসব কথা কয়ে আর কি হবে ? ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে। আবার পয়সা খচ্চা করে কাপড় দিতে হবেনি। যা আছে চলে যাবে। চ লটা দাও। বেলা হয়ে গেল। গিয়ে আন্না করতে হবে।

—হুই কলসীতে আছে, তুই নে।

—কিসে করে নেবে ?

—তু আঁচলা ভরে, যত পারিস।

একটু হেসে—বাবা যে কি বল, দাম দোব কোত্থেকে ?

—তোর কাছে আবার চালের দাম কিসের ? নে যা পারিস।

টুসকি আঁচলে করে এক দোনের মত চাল এনে বল্‌ল —নেয়ে বাবা, যাচ্ছি, ও বেলা যদি যাও তবে ওকে সনগো নিয়ে যেও। ওজ (রোজ)টা আমার হাতে দিও।

টুসকি চলে যায়। ভরাটে নিতম্বটা কাঁপতে থাকে। ওদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অধর। আর একবার যেন ডাকতে চেষ্টা করে। কি ভেবে নিয়েই থেমে যায়। কি এক পরম পরিতৃপ্তিতে ঠোঁটটায় জিভ বুলিরে নেয়।

বৈকালে অধর বসে আছে, সামনে মদের বোতল আর গ্লাসটা, অধর মদ এক গ্লাস গলায় ঢেলে দিল। সেই সঙ্গে একটা কথা ভাবছে। কালকের নয়নদের এখানে নিমন্ত্রণ কর়বে। ভেবে হাসছে; এমন সময় নয়ন এসে হাজির। অধর বল্‌লে—কিরে শালা এয়েচিস ?

—হ্যাঁ নেয়ে বাবা। তা পেরসাদ আর এট্টু হবেনি ? হেঃ—হেঃ।

—নে ঢাল, মদ জীবনে ছাড়িসনে। তা হলে মরবি।

কয়েক গ্লাস গলায় ঢেলে—সে কথা বলে, ওসব বাবা কাপুরুষের কথা, বাবা মহাদেব আগ করবে নায়।

অধর কাগজ মোড়া একটা শাড়ী কাপড় বগলে নিয়ে —হেই লয়ন, চল তোর বাড়ী !

—হুইটা কার কাপড় বাবা ?

-টুসকির।

তার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌ল—একেই বলে বাবা। এই সুধা কিনব না মাগীর কাপড় কিনব। এইরম মাঝে মাঝে কিরপা করবে বাবা।

টুসকি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এরা দুজনে হাজির, একটু হেসে—কি বাবা, দুজনেই রংগে আছ। আবার কাপড় আনতে গেলে কেন?

নয়ন বল্‌ল—টুসকি, তোর তরে নেয়ে বাবা কাপড় এনেছে।

নেয়ে কাপড়টা দিয়ে বল্‌ল—এই নে টুসকি, কাপড় পরবি, আর এই ওর পয়সাটা নে, আর হেই লয়ন, কালকের তোয়া অমোর বাড়ীতে খাবি নেমন্তন ওইল। যাবি'ত?

—হ্যাঁ যাবো, বাবার বাড়ী যাবনি'ত কার বাড়ী যাব? নিচ্চয় যাব।

—আর টুসকি, তোর কিন্তু আন্না করতে হবে, সক্কালে যাবি, অনেকদিন ভাল আন্না খাইনি, আমি যাই বুঝলি।

অধর রাত্রিতে শুয়ে ভাবছে, চার যেগালে সে ফেলেছে, তাহলে কি শিকার গাঁথবে। কালকের জোয়ারে দু কিস্তি ধান যাবে, তাতে নয়নকে পাটাবে। এই সুযোগে সে একটা নতুন রক্তের স্বাদ নেবে।

সকালে টুসকি আর নয়ন এসেছে। টুসকিকে রান্না চাপাতে বলে, তা না হলে নয়ন খেয়ে যেতে পারবে না। সে এই জোয়ারে তালের কিস্তিতে যাবে। টুসকি রান্না করে, অধরও নিজের কাজ সারে, ধারের ঘরটায় দুজনে মদের বোতল নিয়ে বসে। অধর মাত্রা রেখে যায়। নয়নকে গ্লাস গ্লাস ঢেলে দিচ্ছে। নয়নের কুং কুং শব্দে ঢেকুর উবিছ, ধান বোঝাই হয়েছে কি-না দুজনে নদীর ঘাটে দেখতে আসে, ফিরে আসতে রান্না শেষ হয়। জোয়ার লেগেছে। তাই নয়নকে এখুনি খাইয়ে বোটে তুলে দিতে আসে।

গাল ভরা হাসি নিয়ে অধর বাড়ী ফেরে, বলে—টুসকি, আমার ভাত দে, খুব খিদে পেয়েছে।

টুসকির গলার স্বরটা ক্ষীণ—কবে আসবে?

কথাটা বলে একবার ওর মুখের দিকে তাকাল—দিন দুই পর। কেন মনটা খারাপ হয়ে গেল? ভয় কি? আমি আছি নায়।

টুসকি মাথা নিচু করে কথাগুলো শুনছে, ভাত খেতে খেতে বলছে—আঃ এমন আন্না কদ্দিন খাইনি। তোর যেমনি উপ (রূপ) তেমনি গুণ, যে এরস রাঁধে সে খায় কি-না খুঁদ সেদ্ধ। তুইও ভাত নিয়ে বস।

কিছুই ভাল লাগে না টুসকির। তবুও শুনে শুনে যেন কমুটো ভাত খেল, আর না খেয়ে উপায় আছে! নেয়ের তদ্বিরের যে রকম ঘটা। টুসকি খেয়ে পান সেজে দিচ্ছে। নেয়ে বল্‌ল—কদ্দিন পর তোর হাতে পান খাচ্ছি, সেই কাপড়টা পরে এসলিনি কেন?

—এটা পরে ঘর্ ঘর্ চলে এলুম।

কথায় যেন রস ঢালা—তোর পরলে কেমন সেন্দর দেখাবে। সেই গয়নাগুলো পরবি আয়।

গলার স্বরটা ধরা ধরা—সেকি! না।

—দেখ টুসকি, আর না টা নয়। তোর কষ্ট আমার বড্ড লাগে। তাহলে কি আমার কষ্ট তোর একটুও লাগে না। তুই'ত বুঝিস আমি কদ্দিন একা। এই টাকা জায়গা জমি কে দেখবে। তুই আমার কাছে আয়। গলার স্বরটা যেন ক্রমশঃ কেমন শোনাচ্ছে, এগুলো বেবাক তোর, আমার বলতে কিছু থানবেনি, এই পিথিমীতে তুই শুধু আমার থাকবি। আয় এইগে আয়। পিছোস কেন? তুই যা চাইবি দোব। একবার এইগে আয়।

টুসকি নেয়ে বাবার মুখে নতুন কথা শুনছে। সে এখন নীরব। কি জানি ভাবছে। কদ্দিন ভোরই নেয়েকে যেন অন্য রকম দেখছে। নেয়ে তার দিকে কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কিসের আশায় চোখ দুটো তার জল জল করছে। নেশার দাপটে নেয়ের দেহখানা টলছে। তাকে একটা পশু অশান্ত করে তুলেছে। তার শিরা উপশিরা দিয়ে কিসের যেন তরঙ্গ বয়ে চলেছে। এই জন্যেই সে এতদিন তার বাড়ীতে যাতায়াত করেছে। চাল ধার দিয়েছে। তাকে নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। সে কাপড় যেন নেয়ের আশার, লালসায় ও মোহের সুত দিয়ে বোনা। নেয়ে আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক-জনের স্ত্রীকে সুখী করার জন্যে নেয়ের চেষ্টার অন্ত নেই। যে পুরুষের পায়ে একদিন সে অগ্নি সাক্ষী করে নিজের মন, প্রাণ ও দেহকে অর্পণ করেছে; আজ তাকে সে দূরে ফেলতে পারবে না। নেয়ের কথাতে সে কখনও সম্মত

হবে না। যাচায় দেখেছে সেও যে সাবিত্রী সীতার দেশের মেয়ে। টুসকির কপালটা ঘামে ভরে উঠেছে, গলার স্বরটা কাঁপছে—না, না, পিছিয়ে যাচ্ছে টুসকি। নেয়ের এরকম মূর্ত্তি সে কোন দিন দেখেনি। তাই বুকের মধ্যে অসম্ভব দাপানি শুরু হয়েছে।

নেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে, নেশার দাপটে চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে গেছে, সামনের চুলগুলো কপালের ওপর ঝুলছে। খোঁচা দাড়ি, বাঁ দিকের কালো জরুলটা যেন কাঁপছে, ভুড়ি ওলা থলথলে মাংসল পিণ্ডটা নারীর রক্তের স্বাদ নিতে এগিয়ে আসছে।—টুসকি, আয়।

হাঁ্যা ঐ তো হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে অধর। এইবার টুসকিকে বুকের মধ্যে ধরে চুপসে ফেলবে হাঁ্যা হয়েছে। কিন্তু হায়! একি হল, টুসকি পালাল। মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে অধর নেয়ে।

টুসকি খিড়কীর দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় চলে এসেছে। এখন সে হাঁফাচ্ছে। নদীর দিকে তাকাল, নদী যেন কাকে শাসাচ্ছে। কালো মেঘগুলো আকাশের সামিয়ানায় ভরে উঠেছে। তার হৃদয়টাও বুঝি চিন্তার কালো মেঘে ঠেঁসবো না।

কি যেন চিন্তা করে মদের বোতল নিয়ে বসল নেয়ে।

বোতলটা শেষ করে উঠতে সন্ধ্যে হয়ে এল। এই অবস্থায় পা বাড়াল টুসকির বাড়ীর দিকে। দেহখানা টলছে। সে তার কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবেই।

আকাশটা কালো হয়ে গেছে। ঝড়ও শুরু হয়েছে। গেমো ও কেওড়া গাছগুলো থেকে বাতাসটা শোঁ শোঁ করছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন তার গায়ে তীরের মত বিঁধছে। কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের আলোটা বক্ররেখার মত খেলছে। খ্যাপা বাতাস নেয়েকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। বৃষ্টিতে নেয়ে ভিজে জাউ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় শীত লাগছে, কাঁপুনিও লেগেছে। সমস্ত মাংসল পিণ্ডটা যেন কাঁপছে। বিদ্যুতের আলোয় একটু চোখে পড়ল, দেখল মাতানী নদীটা তার সামনে ভেড়ির অনেকটা ধ্বসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

নেয়ে থামল না, ওখান থেকে মাঠের মাঝ দিয়ে চলেছে, যতদূর তাকান যায় শুধু অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না। এখন সে কী করবে? কেঁপে পড়ে যাচ্ছে। তবু চলেছে। নেয়ে কোথায় চলেছে? কিছুই বোঝে না। দাঁতে দাঁতে লাগছে। টলতে টলতে একটা বাড়ীর দরজায় গিয়ে দুম করে পড়ে গেল নেয়ে।

বাড়ীর দরজা খুলে লম্ফ হাতে একটা মেয়ে বেরোল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, নেয়েকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এল, ঘরে কোন শুকনো পরার কাপড় নেই, কলসীর ভিতর দিয়ে একটা মাত্র নতুন শাড়ী বার করল। এনে নেয়েকে পরতে দিল। বিছানা করে শুইয়ে দিল। হাতে তেল নিয়ে আগুন মালসায় হাত সেঁকে অতিথির বুকে পায়ে ও হাতে মালিশ করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর অতিথি একটু সুস্থ হল। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে নেয়ে চোখ বুজল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন মোচড় দিল। মুখটায় কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল। তখন অধর নেয়ে একটা কথা ভাবছে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত টুসকি নামে এক যুবতীর দেহের তাপ ও তার রক্তের সঙ্গে নিজেকে মেশাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এখন সে সেই যুবতীর কাছ থেকে একটা তাপ পাচ্ছে। সেটা হল মাতৃত্বের, বন্ধুত্বেরও—জীবন রক্ষার জন্যে।
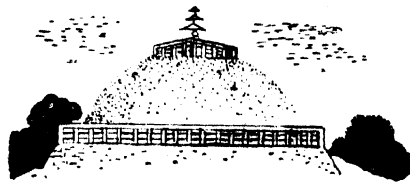
খনিজ তেল শিল্প

(PETROLEUM INDUSTRY)

শ্রীশান্তিদা শঙ্কর দাশগুপ্ত

এ প্রবন্ধে খনিজ তেলকে আমরা শুধু তেল বলব—ইংরাজীতে যেমন পেট্রোলিয়ামকে (Petroleum) অনেক সময় শুধু "অয়েল" বলা হয়। পেট্রোলিয়াম কথাটির আক্ষরিক বাংলা পাথুরে-তেল, কারণ Petro মানে পাথর, আর oleum তেল।

সভ্যতার ইতিহাসে এক একটি জিনিষ এমন এসে দেখা দেয় যে কিছুকাল পরেই সে জিনিষটি যে কোন দিন ছিল না, বা তার অভাবে যে জীবন যাত্রা সম্ভব তা আমরা ভাবতেই পারি না। টেলিভিসন তো সেদিনের কথা। আমেরিকার ঘরে ঘরে এখন টেলিভিসন। টেলিভিসন নাই, অথচ তারা আছে, আমেরিকানদের কাছে এ-কথা কল্পনার বাইরে। তেলের ব্যাপারে এ কথা আরও অনেক সত্য। অথচ তেল মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে ধরা দিয়েছে মাত্র ১০০ বছরের কিছু আগে। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, সেক্সপিয়র, ডাভিঞ্চি তেল-হীন জগতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নি। কিন্তু আজ তেলের মূল্য কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা বোঝা যাবে তেল-হীন পৃথিবীর কথা কল্পনা করলে। মনে করুন কোন যাদুকরের মায়ায় কোন এক রাত্রির প্রায় অবসানে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে সব তেল অদৃশ্য হয়েছে। তখন কী ভয়াবহ অবস্থার ভিতর আমরা পড়ব ভেবে দেখুন। সুইস টিপলেন, আলো নেই, তেলের অভাবে দূরের বিদ্যুৎ-যন্ত্র অচল হয়ে পড়েছে। মোমবাতি খুঁজছেন, সেখানে খনিজ মোম নেই, শুধু সলতে পড়ে আছে। টেলিফোনে নালিশ জানাবেন, কিন্তু টেলিফোন বন্ধ। রাস্তাগুলির চেহারা বদলে গেছে। তেল-নির্ভর রাস্তার কালো আবরণ আর নেই। পাথরের কুঁচি আর সুঁড়কি বের হয়ে পড়েছে। বাইরে যাবেন তার উপায় নেই। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, ট্রেণ সব বন্ধ। মুখ ধোবেন জল নেই, তেলের অভাবে সব পাম্প বন্ধ। সমস্ত কল কারখানা অচল। তেলের অভাবে একটি চাকাও ঘুরছে না। এক কথায় তেল নেই, বর্ত্তমান সভ্যতা আছে তা ভাবা অসম্ভব। সুতরাং তেল চলুক যতদিন চলে। যেদিন ফুরিয়ে যাবে—সমস্ত খনিজ দ্রব্যের মত একদিন ফুরোতেই হবে—তখন নতুন করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে দেখবেন তেলের সার্থক উত্তরাধিকারী প্রকৃতির জগতে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

পৃথিবীর প্রথম তেল-কূপ

আগের কথা

তেলের ব্যাপক ব্যবহার অল্পদিনের হলেও এর সঙ্গে

মানুষের পরিচয় কিন্তু যিশু-খ্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে থেকে। অনেক প্রাচীন লেখায় তেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের পরিশ্রমের ফলে পুরাকালে তেলের ব্যবহারের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এ্যাসফল্ট (Asphalt) তেলের রকম ফের। ইজিপ্টের বহু পুরাতন কবরে এর ব্যবহার দেখা যায়। রাশিয়ার বাকু প্রদেশে তেলের ফোয়ারার মুখে বহু শতাব্দী ধরে আগুন জ্বলতে থাকে। লোকে মনে করত সে-আগুন দেবতার আশীর্বাদের পথ বেয়ে এসেছে। দেবতার মন্দির গড়ে উঠল সেখানে।

সে যুগে তেলের কোন অনুসন্ধান ছিল না। এখানে সেখানে একটু আধটু যে অপরিশুদ্ধ তেল (Crude oil) নীচের চাপে মাটী খুঁড়ে বের হত মানুষ তাই কাজে লাগাত। কখনও ওষুধ হিসেবে, কখনও ঘরের অগভীর দীপাধারে। তখনকার দিনে যুদ্ধেও তেলের ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। শূকরের গায়ে তেলে ভেজা কাপড় জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। অগ্নি-ভীত শূকরের দল ছুটে গেছে শত্রুব্যূহের ভিতর। শত্রু আর শূকর দুই-ই মরেছে অগণিত সংখ্যায়।

তেলের উৎপত্তি

প্রকৃতির ভাণ্ডারে তেল কি করে তৈরি হল সে বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিক মুনি নানা মত দাখিল করেছেন। যে-মত শেষ পর্য্যন্ত এখন আমরা বিশ্বাস করি তার সার কথা এই যে তেল সামুদ্রিক জীব ও গুল্মের প্রচণ্ড চাপ ও তাপের প্রভাবের ক্রম-পরিবর্ত্তনের শেষ অবস্থা। প্রকৃতির এই বিরাট রাসায়নিক লীলাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে স্বল্প পরিসরে নিজের যন্ত্রের ভিতরেও দেখতে পেরেছেন। ছোট ছোট সামুদ্রিক জীব ও গুল্মকে চাপ ও তাপের প্রভাবে রেখে যে-তেল পরীক্ষাগারে পাওয়া গেল তার ধরণধারণ স্বাভাবিক অপরিশুদ্ধ তেলেরই মত।

তেলের গতিবিধি

সৃষ্টির আদি যুগে পৃথিবীর উপরিভাগের প্রচণ্ড উত্থান পতনের লীলা-তাণ্ডবে যে-তেল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে তা-কিছু সৃষ্টি-স্থানেই চুপচাপ বসে থাকে না। তেল আপন-ধর্মে উঁচু থেকে নীচে চলতে চায়। অনুকূল অবস্থা ও পথ পেলেই মাটির নীচে একস্থান থেকে আর একস্থানে যাত্রা সুরু হয়। যখন উপযুক্ত বসবাসের আধার মেলে পাথরের ঘরে তখন তেল স্থিতি লাভ করে। এই তেলের স্থিতি কোথায় কোথায় কি ভাবে থাকতে পারে তেল-শিকারী তা জেনে নিয়েছেন। তার তূণে আজ অনেক রকম বৈজ্ঞানিক অস্ত্র ও যন্ত্র। তিনি মাটির উপরে বসে পাতালপুরীর বৈজ্ঞানিক খবরাখবর নিয়ে বুঝতে পারেন কোথায় কোথায় এই তরল কালো সোনা। অথবা তার জ্ঞাতিভাই প্রাকৃতিক গ্যাস লুকিয়ে আছে। এই সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেই সুরু হয় তেল-কূপ বসাবার কাজ। সম্ভাবনা থাকলেই যে ব্যবসা-জনক তেল পাওয়া যাবে এমন কথা নেই। এই তো সেদিন তেলের সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভারত সরকার আর ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী (এর নাম বদলে এখন 'Esso' হয়েছে) একত্রিত হয়ে বহু কোটি টাকা খরচ করলেন পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায়। নিরাশ হতে হল। তেল ও গ্যাসের ছিটে ফোঁটা পাওয়া গেল বটে কিন্তু তা দিয়ে খরচ পুষিয়ে ব্যবসা করা চলে না। এমন অঢেল নিস্ফল টাকা খরচের নজির তেলের ইতিহাসে বহুবার লেখা হয়েছে। আবার কোথাও স্বল্প পরিশ্রম ও টাকা ব্যয়ে বিরাট তেলের আধারের সন্ধান পাওয়া গেছে—যেমন মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির বেলায়। এই অনিশ্চয়তাই তেলের ব্যবসায়ে রোমাঞ্চের ছোঁওয়া আনে।

তেলের রাসায়নিক স্বরূপ

"শত ধৌতেন মলিনং" যে অঙ্গার বা কার্বন সেই রয়েছে সকল জীব ও তেল সৃষ্টির মূলে। প্রতি কার্বন পরমানুর চারখানি রাসায়নিক হাত, বা ভ্যালেন্সি (valency)। কার্বণের আর এক গুন এর পরমানুগুলি নিজেরা অসংখ্য সংখ্যায় হাত ধরাধরি করে রাসায়নিক ভাবে মিলিত হয়ে যে হাত গুলি খালি থাকে তা দিয়ে এক রাসায়নিক হাত বিশিষ্ট হাইড্রোজেনের পরমানুগুলির সঙ্গে রাসায়নিক মিতালি পাতায়। ফলে সৃষ্টি হয় হাজার হাজার রকমের ও বিভিন্ন আণবিক ওজনের কার্বন-হাইড্রোজেন অনুবৃন্দ। এদেরই আমরা বলি হাইড্রো-কার্বন গোষ্ঠী। মাটির নীচে যে অপরিশুদ্ধ তেল পাওয়া

যায় তা অসংখ্য রকমের হাইড্রো-কার্বণের সমাবেশ। তার কতকগুলি পেট্রোল হিসেবে চলে, কতকগুলি কেরোসিন হিসেবে, কতকগুলি ডিজেল-তেল হিসেবে, কতকগুলি মোম আবার কতকগুলি এ্যাসফল্ট হিসেবে। অপরিশুদ্ধ তেলকে এই রকম বিভিন্ন জাতিতে আলাদা করার নাম পরিশোধন বা রিফাইনিং। হাজার হাজার তেলের রিফাইনারীতে এই কাজই করা হয়। তেলের প্রথম ইতিহাসে রিফাইনারী গুলিকে তেলের কাছাকাছি জায়গায় তৈরী করা হত। তার পরে পরিশুদ্ধ তেলের বিভিন্ন ভাগকে চালান করা হত পৃথিবীর নানা বাজারে। এতে ভোগী-দেশের (consuming countries) খরচ পড়ে বেশী। তাই ত্রিশ দশকের পর থেকে ভোগী দেশগুলি যাদের নিজেদের তেল নেই বা অল্প আছে—বাইরে থেকে অপরিশুদ্ধ তেল নিজের দেশে এনে রিফাইন করে। ইংলণ্ড, জাপান, ভারতবর্ষ, ইত্যাদি এই পর্য্যায়ে পড়ে।

তেলের বর্ত্তমান যুগ

এ যুগের সুরু হয়েছে ১৮৫৯ সনে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের পেনসিলভিনিয়া (pennsylvania) অঞ্চলে। দুইজন আইন ব্যবসায়ী এই যুগের সূচনা করেন—তাঁদের নাম George H. Bissel ও Jonathan G. Eleveth। তাঁদের জমির উপরে তেল জমে আছে দেখতে পান। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁরা সেই তেলের নমুনা ইয়েল কলেজের রাসায়নিক Sillimen-এর কাছে পাঠান পরীক্ষার জন্য। রাসায়নিক রিপোর্টে লিখলেন:

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে তেলের নমুনা পাঠিয়েছেন তা কাঁচা মাল হিসাবে অমূল্য। এর সম্ভাবনা সুদূর প্রসারী।"

আইনজ্ঞ ভদ্রলোক দুটি উৎসাহিত হয়ে তেল বের করবার জন্য নলকূপ বসাবার কথা ভাবতে লাগলেন। এ এক নবযুগ সূচনার ভাবনা। আগে কেউ এ-ভাবে তেল উত্তোলনের কথা ভাবেন নি। এই কাজের জন্য তাঁরা খুঁজে বের করলেন Edwin Drake-কে। ড্রেক ছিলেন রেলগাড়ীর কনডাকটার। তেলের কিছুই জানতেন না। তবুও কাজের ভার নিলেন উৎসাহী ভদ্রলোক।

১৮৫৮ সনের গ্রীষ্মকালে তাঁর কূপের কাজ সুরু হল। চারদিকে হাসি ঠাট্টা সুরু হল, যেমন পৃথিবীর অনেক বড় কাজের সুরুতে হয়ে এসেছে। কেউ কেউ কূপের নামকরণ করলেন—"Drake's folly", অর্থাৎ ড্রেকের বোকামী"। ড্রেক নির্বিকার। তিনি সাফল্যের সঙ্গে ১৮৫৯ সনের আগষ্ট মাসে ৬৯½ ফিট গভীর ঐতিহাসিক কূপের কাজ শেষ করে—বর্ত্তমান পেট্রোলিয়াম সভ্যতার উদ্বোধন করে নিজেন নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে অমরত্ব লাভ করলেন। এই কূপ থেকে রোজ ৮০০ গ্যালন অপরিশুদ্ধ তেল পাওয়া যেতে লাগল। ড্রেকের নামে হাসি ঠাট্টা তখন কোথায় উড়ে গেল। তার জায়গায় এল বিস্ময় ও শ্রদ্ধা। কয়েক বছরের ভিতরেই দেখতে দেখতে আমেরিকা তেলের দেশ হয়ে উঠল। এই শতাব্দীর সুরুতে টেকসাস প্রদেশে এত তেলের সন্ধান পাওয়া গেল যে তখন থেকে সুরু করে আজও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তেলের জগতে রাজার আসনে বসে আছে। তেলের কূপের দৈর্ঘ প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। ড্রেক সুরু করেছিলেন ৬৯½ ফিট দিয়ে—আর আজ কূপের গভীরতা ৩০,০০০ ফিট্‌ও ছাড়িয়ে গেছে।

তেল ঘণীভূত শক্তি

তেলের এত আদরের প্রধান কারণ তার সহজে শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা। যার হাতে যত তেল, তার হাতে তত শক্তি। তাই তেলের জন্য আজ এত কাড়াকাড়ি, এত সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি বা মন কষাকষি। প্রথম যুগে তেলের একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যার পরে কেরোসিন রূপে আলোর যোগান দেওয়া। কেরোসিন ঘরের আলোয় যুগান্তর ঘটাল। বনজ তেলের বা চর্বির বাতির অগভীর আধারগুলি রাতারাতি কোথায় চলে গেল তার জায়গায় দেখা দিল নানা রকমের ও ধরণের কেরোসিনের বাতি। তখন তেলের শোধনাগার থেকে যে পেট্রোল পাওয়া যেত তার কোন ব্যবহার ছিল না। তাকে মনে করা হত আপদ বিশেষ। তার পরে শতাব্দী ঘুরবার মুখে দেখা দিল মটর ইনজিন। সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলের আদর ও চাহিদা বেড়ে গেল। তার পরে এল ডিজেল ইনজিন্। ডিজেল ছিলেন জার্মান। ইলেকট্রিক-স্ফুলিঙ্গহীন তেলের ইনজিন আবিষ্কার করে ইনি অমর হয়ে আছেন। ডিজেল-তেল, ডিজেল-ইনজিন, ডিজেল-রেল তো আমরা রোজ শুনি। এই ডিজেল কথাটি পৃথিবীতে রোজ এতবার বলা ও লেখা হয়

—যে পৃথিবীর কোন যুগের কোন মনীষীর নাম এর কাছাকাছিও আসতে পারে না। এ-এক পরম বিস্ময়ের কথা। ডিজেল তেলের এত বিক্রী যে তা পেট্রোল বিক্রীর পরিমাণ অনেক দিন আগে ছাড়িয়ে গেছে। ডিজেলের পরে এল এরোপ্লেন। তার জন্য তৈরী হল বিশেষ ধরণের পেট্রোল। এরও পরে এল জেট-এরোপ্লেন। এর জ্বালানী আবার উন্নত ধরণের কেরোসিন। হাওয়াই পেট্রোলের বিক্রি এখন দিন দিন কমে আসছে, আর হাওয়াই কেরোসিনের বিক্রী বাড়ছে। এই সব শক্তির ভূমিকা ছাড়াও তেল ক্রমাগত কয়লাকে কোনঠাসা করে চলেছে। কয়লার অসুবিধা অনেক। ভাল কয়লা পৃথিবীর সর্বত্র কমে আসছে। কয়লা পরিবহন-কর্ত্তাদের এক বিশেষ সমস্যা। কয়লা অপরিষ্কার—তার ধোঁয়ায় দিগ্‌দিগন্ত কালো হয়ে ওঠে। রেলের ইনজিনে প্রায় শতাব্দী কাল কয়লার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এখন সেখানে এসেছে ডিজেল ইনজিন। কয়লার ইনজিন তাকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ক্রমাগত। বিদ্যুতেও রেল চলে—তবে সে বিদ্যুতের জন্ম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর কয়লা থেকে—অথবা জলশক্তি থেকে।

এতকাল ষ্টীল তৈরীর কার্বণের যোগান দিত কয়লা থেকে তৈরী কোক। সেখানেও ভারী তেলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের দেশেও তেলের কার্বণ দিয়ে ষ্টীল তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক কথায় তেলের জয়যাত্রার রথের গতিবেগ প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।

পৃথিবীতে তেলের প্রাকৃতিক বণ্টন

তেল বণ্টনের বেলায় প্রকৃতি সব দেশকে সমান চোখে দেখেন নি। কোন কোন দেশে এত তেল, (যেমন আমেরিকা, রাশিয়া বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি) যেন মাটির নীচে তেলের সমুদ্র গড়ে রেখেছেন প্রকৃতি দেবী। আবার কোন কোন দেশে, যেমন ইংলণ্ড, জাপানে তেল এত কম যে তাদের তেলের জন্য চিরকাল অন্য দেশের মুখ চেয়ে থাকতে হবে। প্রথম সবাই ভেবেছিল পৃথিবীর সব তেলই বুঝি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল তা বোঝা গেল—যখন অনেক তেল পাওয়া গেল দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারাবিয়ান সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে—বিশেষ করে ভেনিজুয়েলায় (Venezuela)। তারপরে দেখা দিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বিরাট বিরাট তেলের ভাণ্ডারের আবিষ্কার। সে-সব দেশে একত্রে ভবিষ্যতের জন্য যে তেল জমা আছে তা আমেরিকার জমার পরিমাণের চেয়ে বেশী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। রাশিয়ার উরাল (Ural) অঞ্চলে নতুন নতুন বড় বড় তেলের খনি পাওয়া গেছে। এসব ক্ষেত্রে নাকি এত তেল জমা আছে যে ক্যাসপিয়ান সমুদ্রে অত জল নেই। একেবারে হাল আমলে তেলের বড় আবিষ্কার সাহারার মরুভূমিতে। যা ছিল নিষ্ফল বালির সমুদ্র, তা এখন হয়ে উঠেছে পরম সফল বাণিজ্য স্থল। তেল ব্যবসায়ীর দুঃসাহসিকতা অতুলনীয়—তা না হ'লে মরুভূমির নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার করে তেলের সন্ধান কোন দিনই পাওয়া যেত না। সমুদ্রের ভিতরেও অনেক জায়গায় তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-তেলও গভীর নলপথে মাটির উপরে উঠে আসছে।

১৯৬০ সনে পৃথিবীর প্রধান প্রধান অঞ্চলে কত তেল তোলা হয়েছে তার মোটামুটি হিসেব দেওয়া হল।

	অঞ্চলের নাম	কোটি মেট্রিক টন	শতকরা অনুপাত
১।	উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডা	৩৭·০	৩৫·২
২।	দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন অংশ।	১৬·৫	১৫·৭
৩।	অন্যান্য আমেরিকান দেশ	৩·২	৩·০
৪।	মধ্যপ্রাচ্য	২৬ ৭	২৫·৪
৫।	সাহারা ও অন্যান্য আফ্রিকান অঞ্চল	১·০	১·০
৬।	পশ্চিম য়ুরোপ	১·৫	১·৪
৭।	দূরপ্রাচ্য—ভারত ও পাকিস্থানসহ	২·৬	২ ৫
৮।	রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ	১৬·৬	১৫·৮
	সারা পৃথিবী একত্রে	১০৫·১	১০০

শুধু ভারতে ১৯৬০ সনে তেল তোলা হয়েছে মাত্র ০·০৪ কোটি টন, আর পাকিস্থানে ০·০৩ কোটি টন। পৃথিবীর হিসাবের পরিপেক্ষিত একেবারেই নগণ্য।

১৯৫৯ সনের তুলনায় ১৯৬০ সনে তেলের উৎপাদন সারা পৃথিবীতে বেড়েছে শতকরা ৭·৫ ভাগ। এই বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ সব চেয়ে বেশী দেখা যায় সাহারার নতুন তেলের খনিতে—৫ গুণেরও বেশী বেড়েছে তার উৎপাদন। তারপরেই উৎপাদন বৃদ্ধির স্থান মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা ১৫·৬ ভাগ। পৃথিবীতে যে হারে তেলের খরচ বাড়ছে—উৎপাদনের হার তার চেয়েও বেশীর দিকে—এই সব কারণে উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিতে তেলের দাম ক্রমাগত নিম্নমুখী।

বিভিন্ন শক্তি উৎপাদকের ক্রমপরিবর্তনশীল ভূমিকা

তেলের শৈশবে শক্তির জন্য কয়লা ছিল আমাদের মুখ্য আশ্রয় স্থল। জল-শক্তি, বনের কাঠ এ সবও ছিল। কিন্তু তুলনায় কয়লার কাছে তাদের বাতি ধরবার মর্য্যাদা ছিল না। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে কয়লাকে শক্তির জগতে তার এই রাজকীয় আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে তেল নিজে সেখানে বসেছে। ১৯৬০ সনে বিভিন্ন শক্তি-ধরেরা পৃথিবীতে শতকরা কি অনুপাত আসন নিয়েছে এবং ১৯৭০ সনে অনুপাত সংখ্যাগুলির কি পরিবর্তন হবে মনে করা হয় তার হিসাব দাখিল করা হল এখানে।

	১৯৬০ সন যা হয়েছে	১৯৭০ সন যা হবে	শতাংশ পরিবর্তন
তেল	৪৩	৪৬	+৩
প্রাকৃতিক গ্যাস তেলের জ্ঞাতি	১৫	২০	+৫
কয়লা	৩৪	২৬	−৮
জল-শক্তি	৪	৪	০
অন্যান্য উপাদান থেকে শক্তি	৪	৪	০
	১০০	১০০	

প্রাকৃতিক গ্যাস মোম ও এ্যাসফল্টের মত পেট্রোলিয়াম। প্রসঙ্গত, আমাদের আসামের নাহারকাটিয়ায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্যুঁই (Sui) অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। গ্যাস আর তেল মিলে পৃথিবীর মোট শক্তির প্রয়োজনের প্রায় ৬০ ভাগের যোগান দিচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও দেবে। পারমাণবিক-শক্তির তেল ও কয়লার পাশে আসন নেবার এখনও অনেক দেরী।

মাটির নীচে কত তেল ?

এ এক এমন প্রশ্ন, যার উত্তর কোন দিনই সঠিকভাবে পাওয়া যাবে না। ১৯৩৮ সনের হিসেবে যে সংখ্যা মাটির নীচে কত তেল আছে জানিয়েছে, আজকে হিসেব মত সেই সংখ্যা দশগুণেরও বেশী বেড়েছে। অদ্ভুত মনে হলেও এ কথায় অসঙ্গতি কিছু নেই। ক্রমাগত নতুন নতুন তেল-ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আগে কূপের দৈর্ঘ্য ছিল কম, এখন অনেক বেড়েছে। ১৯৪৭ সনে পৃথিবীর দীর্ঘতম কূপের দৈর্ঘ্য ছিল ১৭,৮২৩ ফিট। আর আজ তা হয়েছে ২৫০০০ ফিটেরও বেশী। সুতরাং ১৭০০০ ফিটের নীচে তেলের যে সব স্তর আছে, ১৯৪৭এ তেল ব্যবসায়ীর হাত সেখানে পৌছায় নি। আজ মানুষের লোভী হাত অনেক অনেক নীচে পৌছে যাচ্ছে। ১৯৬০ সনের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর মাটির নীচে উত্তোলন-যোগ্য তেল ছিল ৪১,০০০ কোটি মেট্রিক টন। যে হারে পৃথিবীতে তেলের খরচ বেড়ে চলেছে, তাতে এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই সব তেল শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তেল-জগতে এর জন্য কোন দুশ্চিন্তা নেই। পুরাতন অভিজ্ঞতা থেকে তেল ব্যবসায়ীরা ধরে নিয়েছেন আরও অনেক বড় বড় তেলের ক্ষেত্র আবিষ্কার হবে সমুদ্রের নীচে, নানা মরুভূমিতে, আফ্রিকার গভীর বনে। আজ যে দেশ তেলহীন, তার বরাতে একদিন অনেক তেল জুটবে না—তা কে বলতে পারে। সুতরাং তেল ব্যবসায়ী ভাবেন—তেলের জীবনকাল আরও দুই শত বছর।

মাথা পিছু তেল খরচ

চিরকাল এবং এখনও তেলের রাজ্য আমেরিকার সংযুক্ত দেশ, U. S. A.। তাদের তেল-উত্তোলন সব দেশের চেয়ে বেশী। খরচ আরও বেশী। তাই সে দেশে এখন রপ্তানীর চেয়ে বাইরে থেকে তেল আমদানী করতে হয় বেশী। ১৯৫৯ সনে কয়েকটি দেশের ও ভারতবর্ষের মাথা পিছু তেল খরচের হিসেব দেওয়া হল।

দেশের নাম	১২৮ আউন্সের গ্যালন মাথা পিছু
আমেরিকার সংযুক্ত দেশ	৭৮৪
সুইডেন	৪২৫

দেশের নাম	১২৮ আউন্সের গ্যালন মাথা পিছু
ইংলণ্ড	১৯৫
ফ্রান্স	১৩৯
জার্মানী	১৩২
ইটালী	৯৩
তুর্কী	১৬
ভারত	৪

মাথা পিছু তেল খরচ দেশের সমৃদ্ধির মান হিসেবে ধরা যায়। এই মান অনুসারেও আমাদের জীবন-যাত্রার স্থান উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখনও কোন অতলে তা বোঝা যায়।

তেলের পরিবহন

আগে বলা হয়েছে এখন তেলের ক্ষেত্রের কাছে রিফাইনারি তৈরী না হয়ে ভোগী দেশগুলিতে হয়। এর জন্য বৃহৎ ও সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রথম অবস্থায় তেল চলাচল হত ছোট ছোট আধারে—টিন বা পিপায়। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও আমাদের সব কেরোসিন আসত বিদেশ থেকে টিনে করে দেবদারু কাঠের বাক্সে বন্দী হয়ে। সেই থেকে "কেরোসিনকাঠ" কথাটি চালু হয়েছে এবং আজও চালু আছে।

তেলের খরচ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দীর্ঘ নল-পথ (pipe line) ও সমুদ্রগামী ট্যাঙ্কার। পৃথিবীর প্রথম তেলের নল-পথ তৈরী হয় ১৮৭৫ সনে আমেরিকার পিটস-বার্গ (Pittsburg) অঞ্চলে। তার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৬০ মাইল, আর ব্যাস মাত্র ৪ ইঞ্চি। আজ ২০ ইঞ্চি ব্যাসের একটানা হাজার মাইলেরও বেশী নল-পথ অনেক দেশেই তৈরী হয়েছে। আমাদের নাহার্‌কাটিয়া-বারুণী নল-পথের দৈর্ঘ্য ৭২০ মাইল। তেলকে সমুদ্র-পথে দেশান্তরী করবার সময় প্রয়োজন হয় ট্যাঙ্কারের। প্রথম যুগের ট্যাঙ্কার-গুলি ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে আকারের বড় জোর তিন চার হাজার টন তেল বহন করতে পারত। তারপর থেকে ট্যাঙ্কারের আয়তন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ট্যাঙ্কার যত বড় হবে, টন পিছু সমুদ্র পথে তেল পরিবহনের খরচ তত কম। ১৬০০০ টনের ট্যাঙ্কারে তেল পরিবহনের যে খরচ, তার অর্দ্ধেক খরচে ৪৬,০০০ টনের ট্যাঙ্কারে তেল পরিবহন করা যায়। ১৯৪৬ সনে পৃথিবীর ট্যাঙ্কারগুলির গড়ে পরিবহন ক্ষমতা ছিল ১২,৫০০ টন। ১৯৬০ সনে এই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ২১,১০০ টনে। সম্প্রতি জাপান ১,৩০,০০০ টনের অতি-কায় ট্যাঙ্কার বানাবে স্থির করেছে। এ-সব ট্যাঙ্কারের জন্য চাই গভীর জলের সামুদ্রিক বন্দর ও জেটি। কলকাতার নদী-পারের বন্দরে এক সঙ্গে সাত আট হাজার টনের বেশী তেল আনা যায় না। এত কম নদীর গভীরতা।

অন্যান্য পরিবহন শিল্পের মত, তেল-পরিবহন ব্যবসার মালিকানার সঙ্গে, তেল-ব্যবসায়ীদের মালিকানার মিল খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্যাঙ্কার ও নলের-পথের মালিকেরা তেলের ব্যবসার অন্যান্য দিকের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেন না। সম্প্রতি ভারত সরকার পরিচালিত সিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া—দুখানি ছোট ট্যাঙ্কার কিনে তেল-কোম্পানীদের ভাড়া দিয়েছেন। এই দু'খানির নাম "দেশ-দীপ" ও "দেশ-সেবক"।

বর্ত্তমানে তেল পরিবহনের জন্য যত ট্যাঙ্কারের প্রয়োজন —তার চেয়ে অনেক বেশী ট্যাঙ্কার তৈরী হয়ে গেছে। ফলে ট্যাঙ্কার ভাড়ার বাজার বিশেষ মন্দা, নানা জায়গায় নতুন নতুন তেল আবিষ্কারের ফলে, ট্যাঙ্কার-টন-মাইলের প্রয়োজনের অঙ্ক অনেক কমে গেছে। সাহারার তেলের বন্দর য়ুরোপের দেশগুলির মধ্য-প্রাচ্যের তুলনায় অনেক কাছে। ফলে মধ্য-প্রাচ্যের তেলের বাজারের খানিকটা আফ্রিকার দেশগুলি পেল। ভাড়ার যে সুবিধা হল, মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিকে তেলের দাম কমিয়ে তা পুষিয়ে দিতে হবে—তা না হলে আফ্রিকার কাছে মধ্য-প্রাচ্যের ক্রমাগত য়ুরোপের তেলের বাজারে হার হবে। ১৯৫৬।৫৭ সনে যখন সুয়েজ খাল বন্ধ করা হল, তখন ট্যাঙ্কারের মালিক-সম্প্রদায় উৎফুল্ল হলেন। ভাবলেন, এবার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যাবার ফলে তাদের রোজগার বাড়বে। তারা অনেক বড় বড় নূতন ট্যাঙ্কার বানাবার অর্ডার দিলেন। দুদিনেই আশার ঘর ভেঙ্গে গেল—সুয়েজ খাল দিয়ে আবার তেলের জাহাজ চলাচল সুরু হল এবং পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে নতুন নতুন তেলের বন্দর দেখা দিল। ফলে, ট্যাঙ্কারের মোট সংখ্যা ও পরিবহন ক্ষমতা বর্ত্তমান প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেল।

তেলের দাম কি করে ঠিক হয় ?

তেলের দাম নির্ণয় এক জটিল বিষয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় তেলের স্থান সর্বপ্রথম। সুতরাং বিভিন্ন বন্দরে যে দাম দিতে ক্রেতার দল প্রস্তুত থাকেন সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তেলের প্রথম জীবনে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বনজ তেল ও দীপাধারের চর্বি। তাই তেলের দাম এমন রাখা হল যে বনজ তেল ও চর্বিকে আলো দেবার কাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হঠিয়ে দেওয়া যায়। হঠিয়ে দেওয়াও হল। তাদের জায়গায় এল কেরোসিন। এর পরে এল কয়লা থেকে পাওয়া গ্যাস ও বিদ্যুত। অগ্রসর দেশে এবং আমাদের সহরাঞ্চলে কেরোসিনকে এদের জন্য জায়গা ছাড়তে হল কিছু। তারপর তেলের অভিযান দেখা দিল শক্তি যোগাবার পথে। কয়লার সঙ্গে তেলের লড়াই দেখা দিল। এর ফল আমরা আগেই দেখেছি। তেলের দাম যথাসম্ভব কম রেখে ও তেলের আপেক্ষিক গুণাবলীর সুযোগ নিয়ে এই লড়াইতে জিততে হয়েছে তেল-ব্যবসায়ীকে। যখন একের পরে এক মটর, ডিজেল ও এরোপ্লেন দেখা দিল তখন আর তেলকে পায় কে ? কারণ এ সব ক্ষেত্রে কয়লা অচল। তবুও তেলের দাম এমন সীমানায় রাখতে হয় যে বিক্রী যেন ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। তেলের দাম কম রাখা হয়েছিল বলে—মটর ও ডিজেল ইনজিনের ব্যবহার অল্প-সময়ের ভিতর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াতে পেরেছিল। তেলের বাজারে প্রতিযোগিতা প্রচুর। প্রতি বছর তেলের খরচ চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা তিন চার বেড়ে চলেছে। কিন্তু তেল উৎপাদন হার বাড়ছে তারও বেশী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্যাঙ্কারের ভাড়ার হ্রাস। এই দুইয়ে মিলে তেলের দাম এখন ক্রেতার বাজার ঠিক করছে, বিক্রেতার নয়। বড় বড় তেল কেন্দ্রে, (যেমন ভেনিজুয়েলা, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি) তে এখন বিজ্ঞাপ্ত দামের (Posted price) উপরে গোপনে কমিশন বা ডিসকাউণ্ট দেওয়া হয়। এর উপরে আছে রাশিয়া। সেখানে সব সরকারী ব্যবস্থা, রাশিয়ানরা বিদেশী তেলের বাজার হাত করবার সংকল্প করেছেন। এরই মধ্যে দাম কমিয়ে অনেক জায়গায় বড় বড় কোম্পানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-বাজারের অনেকখানি অধিকার করে ফেলেছেন। রাশিয়ানদের তেলের দামের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যেখানে যেমন অবস্থা, তেমন তারা দামের ব্যবস্থা করেন। আবার তারা ক্রেতা-দেশের টাকাই মূল্যহিসাবে গ্রহণ করেন। আমাদের সরকারী তেল-কোম্পানী টাকার মূল্যে (বিদেশী মুদ্রা নয়) অনেক রাশিয়ান পরিশুদ্ধ তেল আমদানী করেছেন। কলকাতায়ও রাশিয়ার কেরোসিন ও ডিজেল এসে গেছে। রাশিয়ানরা ক্রেতার দেশের ভোগ্য-দ্রব্যের বিনিময়েও তেল বিক্রী করে থাকেন। সুতরাং তেল কোনও কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা নয়, এ এক বিষম প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা এখন।

তেলের নতুন দিগন্ত—পেট্রো কেমিক্যালস্

তেল এতকাল ছিল রান্নাঘরে, বিদ্যুৎহীন গৃহে, যান-বাহনে, কলকারখানায়। এবার তেল প্রবেশ করেছে খুব ব্যাপকভাবে জৈব-রসায়ন শিল্পে। এতদিন সমস্ত জৈব-রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর মূল জিনিষ ছিল কয়লা বা বনজ দ্রব্যাবলী। এখন প্রাকৃতিক গ্যাস বা রিফাইনিংএর সময় যে হাল্কা পেট্রোলধর্মী তেল ও গ্যাস পাওয়া যায়—তারা সেই জায়গা দখল করে চলেছে ক্রমাগত। এদের কাঁচা মাল হিসাবে নিয়ে তেল থেকে এখন তৈরী না হয় এমন জিনিষ নেই—বিভিন্ন রকমের এ্যালকোহল, এসিটোন, কিটোন, গ্লিসিরিণ, রাবার, প্লাসটিক, জমির সার, সাবানের বিকল্প রাসায়নিক, সুগন্ধ-স্পিরিট, আরও অনেক অনেক কিছু! এইসব পেট্রোকেমিক্যালস তৈরীর জন্য তেল-কোম্পানীরা নতুন নতুন আলাদা কোম্পানী খুলেছেন। কোটি কোটি টাকা এই সব কোম্পানীর মূলধন। এদের সঙ্গে তেলের ব্যবসার যে-সব দিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত—তার কোন সম্পর্ক নেই। এরা শুধু তেল-আশ্রিত রাসায়নিক দ্রব্যাবলী তৈরী ও বিক্রী করেন। ভারত সরকারের অধীনে আমাদের দেশেও বিদেশীদের সহযোগিতায় একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। তেলের গ্যাস থেকে সার বানাবার কারখানা তৈরী হচ্ছে বম্বের উপকণ্ঠে ট্রম্বে সহরে।

তেল ও সরকার সম্প্রদায়

ড্রেক যখন তেলের প্রথম কূপ খনন করেছিলেন তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তেল একদিন

দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কথা ছেড়েই দিলাম। কারণ তাদের সব কিছুই সরকার-নিয়ন্ত্রিত। মধ্য-প্রাচ্যে যখন বিরাট তেল-সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন বড় বড় শক্তিগুলি যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও বিচলিত হলেন। আমেরিকা, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড তখন প্রধান তেল-ব্যবসায়ীদের দেশ। এই সব ব্যবসায়ীরা সরাসরি সরকারের আওতায় না থাকলেও, প্রত্যেকে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সময় তাদের দেশের নানা রকম সরকারী কূটনৈতিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। এরাই বিরাট অর্থবল সঙ্গে নিয়ে তেলের ব্যবসা জমালেন মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে। এত তেল সহজে পাওয়া যেতে লাগল যে তাদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল কয়েক বছরের ভিতরেই।

মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির যে সব সরকার, তারাও তেল বিক্রীর লাভের কিছু কিছু অংশ পেতে লাগলেন রয়ালটি (Royalty) হিসেবে। লাভ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রয়ালটির হারও কিছু কিছু বাড়তে লাগল। এই সব দেশগুলি অল্প দিনেই দেখতে পেলেন যে রয়ালটি এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। তখন তারা বিদেশী কোম্পানীদের হুমকি দিলেন যে লাভের সমান অংশ দিতে হবে। ইরাণের মন্ত্রী মুসাদিক তো বিদেশী কোম্পানীদের কাজই বন্ধ করে দিলেন। ফলে ইরাণের তেলের জগতের যে অবস্থা হল, সেখানকার সরকার তা আয়ত্তের ভিতর আনতে পারলেন না। মুসাদিকের পতন ঘটবার পরে আবার বিদেশী কোম্পানীরা একত্রে সংঘবদ্ধ, (consorted) হয়ে ইরাণের তেলের ব্যবসাকে পুনরায় বর্দ্ধিতভাবে চালু করলেন। এ-সব মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। মোটের পরে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি এবার চালাক হয়ে উঠেছে—তারা সবাই এখন মোট মুনাফার অর্দ্ধেক অংশীদার। তবে সমস্ত কাজ, গবেষণা, ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীদের হাতে। এই সব কোম্পানীতে চাকরীর ব্যাপারে স্থানীয় লোকের সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে প্রতিদিন, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে।

মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির ভিতর সবচেয়ে তেল-ভাগ্য ছোট্ট একটি পারস্য উপসাগরে অবস্থিত দেশের। কোয়েট (Kwait) তার নাম। এদেশের মালিক একজন সেইক, (Sheikh)। তেলের দৌলতে সেইক সাহেব নিজে ও তার ছোট্ট দেশ অর্থে ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। গত দশকের প্রথমভাগে যখন মুসাদিক বিদেশীদের কাজ বন্ধ করে দেন ইরাণে, তখন তাদের নতুন করে দৃষ্টি পড়ল কোয়েটের দিকে। কোয়েটের তেলের উৎপাদন ছিল তখন সামান্য। কিন্তু আজ কোয়েট মধ্য-প্রাচ্যের দেশ-গুলির শীর্ষে। মধ্য-প্রাচ্যের দশটি দেশে ১৯৬০ সনে তেল তোলা হয়েছিল ২৬৭ কোটি টন। এর ৮'৪ কোটি টন এসেছিল শুধু কোয়েট থেকে—অর্থাৎ শতকরা ৩১ ভাগেরও বেশী।

আজকাল অনেক দেশের সরকারই তেলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছেন। না পড়ে উপায় নেই—এমনি গুরুত্ব এখন তেলের। যুদ্ধের সময়ে তেলের পরে সরকারের পূর্ণ অধিকার না থাকলে তেলের অনটন ও অব্যবস্থার জন্য হার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া যত রকম দ্রব্য আছে তার ভিতর তেলই এখন সব চেয়ে বেশী শুল্ক আনে সরকারের ঘরে। আমাদের দেশেও তেলের উপরে নানা রকমের ট্যাক্স বসিয়ে সরকারের যত আয়—এমন আর অন্য কোন জিনিষ থেকে নয়। আমাদের পড়শী-দেশ সিংহল তো তেলের ব্যবসা প্রায় পুরোপুরি সরকারের আওতায় এনেছেন। ভারত সরকারও তিনটি তেল কোম্পানী গঠন করেছেন। তার ভিতর একটির দায়িত্ব, (ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী) বিদেশী কোম্পানীদের পাশা-পাশি তেল বিক্রী করা। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমরা বারান্তরে করব। কিউবায় তেল জাতীয়করণ করা হয়েছে। ইটালীতেও তেলের ব্যবসা পুরোপুরি সরকারের হাতে। ইটালি রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় খরিদদার। ইটালির সরকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম Ente Nazionale Idrocarburi—সংক্ষেপে E. N. I. এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক—Signor Enrico Mattei—তেলের জগতে একজন বিশেষ নামকরা লোক। রাশিয়ার বাইরে সরকারী তেল-প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর E. N. I.র নাম সবচেয়ে বেশী। নিজের দেশের তেলের সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে তেলের ব্যবসা চালাতে রাজী। Signor Mattei কিছুদিন আগে নয়া-দিল্লীতে এসেছিলেন—আমাদের সরকারি তেল-দপ্তরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। এই আলোচনার

সঠিক ফলাফল এখনও সাধারণের জানা নেই। মোটের উপরে সরকারী ও আধা-সরকারী তেলের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছোট বড় মিলে এদের সংখ্যা এখন চল্লিশেরও বেশী। এই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। যেখানেই সরকার ব্যবসায় নেমেছেন, সেখানেই তেলের দিকে নজর পড়েছে সবার আগে।

শেষ কথা

তেলের ব্যবসায়ে যত টাকা খাটে পৃথিবীতে এত আর কিছুতে নয়। কোটির নীচে এ-জগতে আর কথা নেই। এ ব্যবসায়ে যেমন লাভ, তেমন ঝুঁকি। তেলের খরচ বাড়বার তালে তালে নতুন নতুন তেলের খনির সন্ধান চাই। আরও ট্যাঙ্কার, পাইপ লাইন, রিফাইনারি বন্দর, জেটি, গবেষণাগার, বজবজের মত বড় বড় তেল মজুত রাখার জায়গা আরও কত কি। হাজার হাজার কোটি টাকা ঢালতে হয় তেলের ব্যবসায়ীদের তাদের তেলের যোগান বাড়াতে। যে জমিতে আজ প্রচুর তেল, কয়েক বছরের ভিতর সে তেল ফুরিয়ে যায়, তার বদলে আবার নতুন তেলের খোঁজ পাওয়া চাই। তা না হলে ক্রমবর্দ্ধমান সরবরাহকে চালু রাখা অসম্ভব। এত টাকার দরকার মেটাতে হয় লাভের একটা বড় অঙ্ককে ব্যবসার কাজের জন্য ফিরিয়ে এনে ইংরেজীতে বলা হয়—Ploughing back the profit for expansion।

এর পরে আছে গবেষণার জন্য বিরাট খরচ। যে পেট্রোলে একদিন ১৯০৪ সনের গাড়ীতে শক্তি দিয়েছে—তার পক্ষে আধুনিক দ্রুতগামী মটরের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখা অসম্ভব ছিল। তাই তেল-ব্যবসারীকে সব-রকমের ইনজিনিয়ারিং উন্নতির সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজন মত উন্নত ধরণের তেল সরবরাহ করতে হয়। আজকের বিরাট পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের পিছনে যে গবেষণার কাজ আছে—তা বহু সময় ও ব্যয়-নির্ভর ছিল। এ গবেষণার বিরাম নাই। সবচেয়ে কৃতী বৈজ্ঞানিকদের অনেক টাকা মাইনে দিয়ে তেল-কোম্পানীরা নিজেদের কাজে নিয়োজিত করেন। ইনজিনিয়ারিং ও ধাতু-সংক্রান্ত গবেষণারও অনেক প্রয়োজন হয় তেল শিল্পে। এই গবেষণা না থাকলে আজকের দিনের অতি দ্রুতগতির জেট-প্লেনের তেলের যোগান সম্ভব হত না।

এ-সবের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছাড়া মুনাফার একটি বড় অংশ দিতে হয় নতুন তেলের ভাগ্য অন্বেষণের জন্য। এই কাজের জন্য তেল কূটনীতিবিদ (oil diplomat) দেশান্তরে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা চালিয়ে থাকেন। আলোচনা সফল হলে তখন সুরু হয় তেলের খোঁজ ও অর্থ-বৃষ্টি। হয় বড় লোকসান, নয়ত বড় লাভ। লাভ লোকসানের মোট খতিয়ান খুললে দেখা যাবে যে মোটের পরে আন্তর্জাতিক বড় ব্যবসায়ীর দল শেষ পর্য্যন্ত বড় লাভ করেই এসেছেন। এই দক্ষ ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তেলের ঝুঁকি এমনভাবে নিয়ে থাকেন—যে ব্যবসার মূল-শিকড়ে মারাত্মক রকমের আঘাত না লাগে কিছু।

আমাদের দেশের তেলের ইতিহাস ও সমস্যা নিয়ে—"ভারতবর্ষ ও তেল" এই শিরোনামার অধীনে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

"তীর্থঙ্কর" প্রশস্তি*

জ্যোতির্ময়ী দেবী

কহিল স্বজন তব—তব জন্মক্ষণে
হেরিল সুন্দর শিশু বসি যোগাসনে,
মাতৃগর্ভে ধ্যানমগ্ন মুদিত নয়ান,
দুটী কর বক্ষপুটে করে যেন ধ্যান।
মা বাপেরে বলে 'ছেলে হইবে সন্ন্যাসী।'
কৌতুকে শিশুরে কোলে লন তাঁরা হাসি।
মধুচক্র রচিলেন, ধর্ম-অর্থ-কাম
গৃহ সুখ বিদ্যা যশে ধন্য হবে নাম।

হে বৈরাগী, বিধাতাও সেইক্ষণে 'হাসি'
লেখেন ললাটে, "বৎস হয়োরে সন্ন্যাসী।
নানা তীর্থ নীরে যথা বিন্দু সরোবর—
তেমতি রচিবে তুমি নব তীর্থংকর—!
ভক্তি প্রেম শ্রদ্ধাভরা মধুচক্র তব
সাহিত্যে আনিবে এক স্বাদ অভিনব।"

---

*শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্কর' তৃতীয় সংস্করণ পড়ে।

তামাকের অপকারিতা

শ্রীরাধাবল্লভ দে

আমাদের ভিতর অনেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে তামাকের নেশা করে থাকেন। সভ্য লোকেরা সিগারেট, চুরুট, পাইপ, হুঁকা-গড়গড়া ব্যবহার করেন, আর গরীবরা ধূমপান করেন শুধু বিড়ি আর হুঁকার মাধ্যমে। আবার পুরুষের মধ্যে যারা ধূমপান করেন না, তাদের মধ্যে অনেকে নস্য নেন, আবার মেয়ে পুরুষের মধ্যে অনেকেই পানের সঙ্গে খান দোক্তা আর জরদা। বৃদ্ধেরা অবলীলা ক্রমে ছোটদের সামনে ধূমপান করেন, কিন্তু এ কুকর্মটি করতে তাদের বারে বারে নিষেধ করেন। বলা বাহুল্য এই নিষেধের জন্যই তামাকের নেশা এতখানি সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তাই তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে একটু সমালোচনা সমীচীন বিবেচনা করি।

তামাকের ভিতর তিনটি অনিষ্টকারী পদার্থ আছে। একটির নাম নিকোটিন, আর দুইটির নাম পাইরিডিন্ এবং কার্বনমনোক্সাইড্। পাইরিডিন এক অতি বিষাক্ত সামগ্রী। আজকাল এটি ব্যবহার করা হয় মশা-মাছি প্রভৃতি পোকা-মাকড় মারবার জন্য আর কখনো কখনো বীজাণু নাশের তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে এই পাইরিডিন থাকে বলেই তার দ্বারা কণ্ঠদেশের ঝিল্লিতে একটা প্রদাহ উপস্থিত হয়, আর সেইজন্যই ধূমপানকারীর গলা খুসখুস করে। এতে কারো কারো এমন অবস্থা হয় যে, তারা সদাসর্ব্বদাই এক ধরণের শুষ্ক কাসি (snrokeri con(h) কাসতে থাকে।

দ্বিতীয় বিষাক্ত জিনিসটির নাম কার্বন-মনোক্সাইড। ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে বলেই এর বিষক্রিয়া শুরু হয়। আর ধূমপানকারী যে কোন রকমেই ধূমপান করুন, টান দেবার সময় কিছু ধোঁয়া গলাধঃকরণ হয়। ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করলেই এর বিষক্রিয়া শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক মতে সিগারেটের ধোঁয়াতে ইহার অংশ শতকরা আধ থেকে একভাগ, পাইপের ধোঁয়াতে এক-ভাগের কিছু বেশী, আর সিগারেট বা চুরোটের ধোঁয়াতে ৬ থেকে ৮ ভাগ পর্য্যন্ত। সিগারেটের ধোঁয়াতে এই অনিষ্ট সববেয়ে বেশি হয়, কারণ, যদিও তাতে এই গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে, তবু সিগারেট টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রায় অনেকটা ধোঁয়াই আমরা গলাধঃকরণ করে নিই।

তামাকের মধ্যে নিকোটিনের তৃতীয় স্থান। সাধারণতঃ তামাকের মধ্যে নিকোটিন অল্প পরিমাণেই থাকে, এবং তার অল্পই আমাদের পেটের ভিতর ঢোকে, কিন্তু তবু সামান্য পরিমাণে তো যায়ই,—তার কোন আশু বিষক্রিয়া দেখা না গেলেও একটা বিলম্বিত ক্রিয়া চলতে থাকে। মোট কথা ধূমপানকারীর ধোঁয়ার গলাধঃকরণ এই ফুসফুস আক্রমণের উপরই অপকারিতার কম বেশী নির্ভর করে

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন তামাকের সমস্তই কোন দোষের, আর গুণের কিছু নেই? এর উত্তর এতে যে সুখ পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি মৌতাত। এ মৌতাত আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করে, বিষণ্ণ অন্তঃকরণে কিছু প্রসন্নতা এনে দেয়। কিন্তু অপকারিতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখি এ ধূমপান শুধু হার্ট খারাপ করে তা নয়, ব্লাড্ প্রেসার সায়াটিকা, হজমের দোষ, নিদ্রাহীনতা, বাতের ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং অপকারিতার অনুপাতে উপকারিতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।
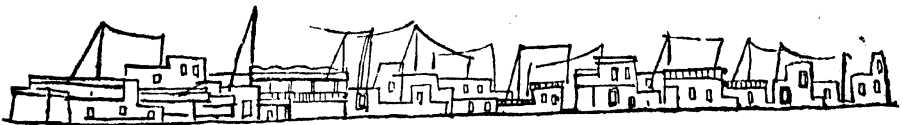
সাহিত্যে ক্লাসিকাল রসের ধারা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

আধুনিক মন সাহিত্যে আধুনিক রস সন্ধান করে। এই সন্ধানের সূত্রেই প্রত্যেক যুগ নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করে। কিন্তু classics বা প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশে এমন কিছু সর্বজনীনতা আছে যাহাতে প্রত্যেক যুগ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সার্থকতাও লাভ করে। দুই ভাবে ইহা ঘটে। পুরাতনের নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া মানুষের মন তৃপ্তি পাইতে পারে। হোমারের অডিসি কাব্যের নায়ক সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। টেনিসন তাঁহার ইউলিসিস কবিতাটিতে ইউলিসিসের অভিজ্ঞতাকে নূতন ভাষ্যে সঞ্জীবিত করিয়া আধুনিক মনের পক্ষে হৃদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। হোমারের 'তন্ময় জগৎ' টেনিসনের হাতে 'মন্ময় জগৎ' হইয়া উঠিয়াছে। হোমারের অডিসিতে মহত্ত্ব, টেনিসনের ইউলিসিসে নৈকট্য; হোমারের পাত্রে সর্বজনীন সুধা, টেনিসনের পাত্রে আধুনিক মনের সুধা।

নূতন যুগের পরিবর্তন সাধন করিয়া আর এক রকমে প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক তৃষ্ণার পানীয় জোগাইতে পারে। টেনিসন কাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়া নূতন ভাষ্যের দ্বারা আধুনিক মনের আসন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লেখক প্রাচীন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন, কাহিনী অংশের অদল বদল করেন, নূতন তথ্য সংযোজিত করেন এবং নূতন ভাষ্য ও নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে নূতন যুগের নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া দূরবর্তী মহত্ত্বকে আধুনিক মনের নিকটে আনিয়া দেন।

এমন উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে অবিরল।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী সর্বাংশে আর্য রামায়ণকে অনুসরণ করে নাই। তাঁহার রাম, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ নামে মাত্র বাল্মীকির রাম রাবণ, ইন্দ্রজিৎ। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের I don't believe in the sacredness of the Ganges' মেঘনাদবধ কাব্যের আগ্নেয়গিরির মুখে উত্থিত হইতে থাকে, অগ্নিতে গলন্ত ধাতুপিণ্ডে, বাষ্পে ও বজ্রনির্ঘোষে। মেঘনাদবধ কাব্যের লঙ্কাকাণ্ডের স্থান কোন দূরবর্তী লঙ্কা দ্বীপ নয়, সেকালের গোলদীঘি ও হিন্দু কলেজ।

রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার মূল মহাভারতে। মূলে 'প্রথম রমণী দরশমুগ্ধ' ঋষ্যশৃঙ্গই প্রধান পাত্র। তাঁহার বিস্ময়, তাঁহার উল্লাস, তাঁহার অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাই কবিতাটির প্রাণ, যে নারী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল সে সামান্য বারযোষিৎ মাত্র। মহাভারতের বারযোষিৎ আধুনিক কবি কর্তৃক দেবীপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের দ্বারা কবিতাটিকে কবি আধুনিক মনের পক্ষে সুপেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মূলও মহাভারতে। রবীন্দ্রনাথ মূলের কাহিনী ও ভাষ্য, দুয়েরই পরিবর্তন করিয়াছেন। মূলের খনি হইতে তিনি ধাতু সংগ্রহ করিয়া নূতন যুগের ছাঁচে পাত্র গড়িয়া লইয়াছেন আর তাহাতে আধুনিক মনের আধেয় রক্ষা করিয়াছেন।

মহাভারতোক্ত "শকুন্তলা" পুরাণের "শকুন্তলা" নয়, আবার কালিদাসের "শকুন্তলা" এ দুই হইতেই ভিন্ন।

যাবতীয় cl ssics সাহিত্য আরব্য রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো আপনি দেহ হইতে যুগে যুগে নবতর সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনকে তৃষ্ণার বারি জোগাইয়া আসিতেছে। classics সাহিত্যে এমন কিছু সর্বজনীনতা, স্থিতিস্থাপকতা আছে যাহা নূতন ভাষ্য, নূতন সংযোজনা ও নূতন পরিবর্তন বহনক্ষম এখানেই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অর্বাচীন সাহিত্য হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য "Man does not live by classics alone"—সর্বাংশে সত্য নয়।

ভাষার নিজস্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়। পেশীবহুল কান্তিসমুজ্জ্বল অশ্বের মূল্যবান সাজসজ্জাও যে অশ্বের অঙ্গীভূত। ফকরে ঘোড়ার পিঠে একখানা ছেঁড়া চট পাতিয়া আমরা যে গণসাহিত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছি, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, গণসাহিত্যের কাছাকাছি পৌঁছিবার অনেক আগেই উক্ত ফকরে ঘোড়া ও তাহার আরোহী সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিবে। যদি কেহ শুধান যে এমন কেন হইল, তবে বাধ্য হইয়া, Dr. Johnsonএর ভাষায় উত্তর দিতে হয়—"Ignorance, madam, pure ignornce" বস্তুত গণসাহিত্যের উপাদান বস্তিতে বা গোলদীঘিতে নাই, সঞ্চিত আছে ওই রামায়ণ, মহাভারতে।

বিজয়ার সম্ভাষণ

উপানন্দ

একদা রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছিল আর্য্য-অনার্যের মহামিলন। তারই স্মৃতি বহন করে যুগ হতে যুগান্তর ধরে চলেছে বিজয়ার আলিঙ্গন। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। সেই পূজা রামচন্দ্র করেছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বর্ষে বর্ষে মাতৃ-আবাহন করে আস্‌ছি। আজ সে উৎসবের অবসান। তোমরা আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। আশীর্ব্বাদ করি, স্বাধীন চিন্তার উত্তেজনায় যথেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প যেন না তোমাদের মনে জেগে ওঠে, সমাজের ভেতর যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারের অবাধ প্রবাহ, সেখানে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তার গতিরোধ করো। পরগাছাকে গাছের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে মনে করে অকাল-বিভ্রান্তি ঘটিও না।

শিউলি-ঝরা আঙিনায় শিশির ঝরার দিন এলো। প্রভাতের অলঙ্করণেও এসেছে পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতার পটভূমিকায় হেমন্তের আবির্ভাব। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে হরিৎধানের সমারোহ। শরতের শতদলশ্রী অন্তর্হিত। নদনদীর স্রোতোধারার গতিবেগ হ্রাস হোতে সুরু হয়েছে। দুইপারের জল আস্‌ছে নেমে, জেগে উঠ্‌ছে বালির চড়া। চরের ওপর বিচিত্রবর্ণের পাখীরা ভিড় করছে—নদী আজ স্বচ্ছতোয়া। শীতের আমেজ লেগে তরুপল্লবের সঙ্কোচন, মেঠো পথে চলেছে রাখাল বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র পল্লীঅঞ্চল। প্রতিটি উৎসবে পল্লীতে ফিরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন জীবনকে সংহত করা আবশ্যক। তোমাদের আশা ও আশীর্ব্বাদ পল্লীতেই প্রতীক্ষা করছে। এদিকে তোমাদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখা চলেনা। প্রকৃতি ও মানুষের প্রয়াগ-সঙ্গম পল্লীতেই সম্ভব হয়েছে, তাই পল্লী আমাদের নিকট তীর্থস্থান।

আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের সাহিত্যকে, আমাদের মনকে এখনও বিদেশী, বিজাতি আর বিধর্ম্মীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারিনি, তাই আমাদের সাম্প্রতিক অবস্থা সমস্যা-সঙ্কুল, তাই এত দুর্গতি ভোগ। আমাদের ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা চালাকির দ্বারা বাঁচেনি, বেঁচেছে গায়ের জোরে, বেঁচেছে মহান্ আদর্শের জোরে। তার মূলে যে অমৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্য্য-সভ্যতার মহীয়সী বাণীর অনুরণন উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু আজ আমরা উপেক্ষা করতে বসেছি, এজন্য এসেছে অসন্তোষ আর অতৃপ্তি—বাসনার সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতা। অনির্ব্বচনীয়কে উদ্‌ঘাটন করার শক্তি হারিয়ে গেছে।

তোমাদের কর্ত্তব্য দেশের ভাবস্তন্যরস পান করা, মৃত্তিকামাতার চরণ বন্দনা করা,তবেই জাতীয় শক্তির পরিপুষ্টি সাধন হবে। তোমরা সত্যকে চাও, মোহকে চেয়োনা। মনটাকে যতদূর সম্ভব সংস্কারবর্জ্জিত করে সত্য-

লাভের চেষ্টা করবে। নিজেদের অক্ষমতা আর ব্যর্থতার প্রহসনকে অন্তরালে রেখে যারা বক্তৃতাসর্ব্বস্ব হয়ে আত্ম-প্রাধান্য বিস্তার করে ও মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করে তাদের ব্যাধিগ্রস্ত মনের সংস্পর্শে তোমাদের পক্ষে না আসা ভালো। সময়ই শ্রেষ্ঠ বিচারক। নিরপেক্ষ বিচার করে সে প্রত্যেককে তার যথাযোগ্য মূল্য চুকিয়ে দেয়। আজ এসেছে পরিপক্ক চিন্তার অভাব, এসেছে ভাব ও ভাষার দৈন্য—নূতন আলোকে পুরাতনকে অবলোকন করাও ভুলেছে। মানুষের অবজ্ঞা থেকেই নূতন সৌন্দর্য্য জন্মলাভ করে। যা সৎ তা যুগান্তরেও বেঁচে থাকবে। আদর্শের মৃত্যু নাই। তাই আজও আমরা হাজার বৎসর পরে বিজয়ার উৎসব করি, পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'আমি চাই একদল আগুনের মতন তেজস্বী ও জোয়ান বাঙালী ছেলে—চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবকদের ওপরই আমার আশা ভরসা।' তোমরা ক্লৈব্য, নৈরাশ্য, জড়তা ও সুপ্তির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বামীজীর কেদারবাহিনী ভাবধারায় অবগাহন স্নান করে অর্দ্ধমৃত স্বজাতির পুনরুজ্জীবনের ব্রত গ্রহণ করো।

দার্শনিক মনীষী এমার্সন বলেছেন—'একাগ্রতা মানব জীবনের একমাত্র কল্যাণ অথবা লাভ এবং শক্তির অপচয়ই একমাত্র অকল্যাণ। রাজনীতি, যুদ্ধ-কৌশল, বাণিজ্য এবং মানব জাতির অন্য সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে একাগ্রতাই একমাত্র শক্তির উৎস স্বরূপ।'

শক্তিলাভ করতে হোলে একাগ্রতা আবশ্যক। একাগ্রতাই ধ্যান। ধ্যানেই সিদ্ধিলাভ। অধ্যয়নই তোমাদের তপস্যা। একাগ্রতা ভিন্ন তপস্যা ব্যর্থ হয়ে যায়। তোমরা একাগ্রতার অভ্যাস করো, এই অভ্যাসের ফলে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে।

স্বামীজি বলেছেন—'তোমরা দেশে দেশে যাও। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জ্জন করো। দেশে দেশে নিজের বিদ্যা ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা দেখাও। নিজের দেশকে জগতের কাছে গৌরবান্বিত করো—'

বাঙলার সন্তানদের উদ্দেশে স্বামীজি যে কথা বলে গেছেন, সে কথা তোমরা কার্য্যে পরিণত করো, তবেই সার্থক হবে তোমাদের শক্তিপূজা, তোমরা এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করো—যাতে আজকের আদর্শহীন, পরানুকরণপ্রিয়, সত্যভ্রষ্ট, হীনতায় অবসন্ন দেশ আবার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন—'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ।' পশুত্বের প্রাবল্য সর্বত্র। এই পশুত্বকে বিতাড়িত করে তোমরা দেশের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করো। জনৈক পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন—'When man is no longer anxious to do better than well, he is done for.' অর্থাৎ যে লোক নিজের বর্ত্তমান অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত করবার জন্য প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হয় না, তার দফা রফা অর্থাৎ সে লোক জীবনেও উন্নতি করতে পারবে না।

এই কথাটি স্মরণ করে তোমরা কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও। আমাদের বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ করো।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম্ম ঃ

ওর্‌তেন্‌জিয়ো ল্যান্দো

রচিত

শঠে-শাঠ্যং

সৌম্য গুপ্ত

[বিশ্বের সাহিত্য-জগতে ইতালীয়-সাহিত্যিকদের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুদীর্ঘ চারশো বছর ধরে ইতালী-দেশের বিশিষ্ট কবি, কাহিনীকার, সঙ্গীত-নাট্য-রচয়িতা ও প্রবন্ধকার তাঁদের বিচিত্র রচনা-সম্ভারে সেকালের ও একালের অগণিত সাহিত্যরসিকদের প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি দান করে আসছেন। আজ তাই বিগত ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয়-সাহিত্যিক ওর্‌তেন্‌জিয়ো ল্যান্দো (Ortensio Lando) রচিত অভিনব একটি কাহিনী তোমাদের শোনাচ্ছি। এ কাহিনীটি থেকে শুধু যে অপরূপ মজার খোরাক মিলবে তাই নয়, সারগভ নীতিকথারও সন্ধান পাবে প্রচুর। তবে, ওর্‌তেন্‌জিয়ো ল্যান্দোর এই কাহিনীটি পুরোপুরি মৌলিক-রচনা নয়… এটির মূল-ভাবধারা সংগৃহীত হয়েছিল সেকালের একটি

প্রাচীন ফরাসী কবিতা থেকে। কারণ, তৎকালীন প্রথানুসারে, ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয়-সাহিত্যিকরা প্রায়ই তাঁদের পূর্ব্বসূরীদের রচিত কাব্য-কাহিনী থেকে নিজেদের সাহিত্য-রচনার ভাবধারা গ্রহণ করতেন এবং নিজস্ব কলা-কৌশলে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক-ছাদে রূপদান করতেন। ওরতেন্‌জিয়ো ল্যান্দোর লেখা এ কাহিনীটিও সেই পর্য্যায়ে পড়ে—আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকদের মতে !]

•

অনেকদিন আগেকার কথা। ইতালীর টাস্কানি (Tuscany) শহরে বাস করতো এক বিচক্ষণ ব্যবসাদার ···তার নাম—রিকার্ডো কপ্পনি (Ricardo Copponi)। অল্প-বয়স থেকেই নানা রকম ব্যবসা করে সে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল। সে টাকায় বহু বিষয়-সম্পত্তি কিনে প্রৌঢ়-জীবনে রিকার্ডো ক্রমে দেশের একজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-অভিজন হয়ে উঠলো। সারা জীবন একটানা পরিশ্রমের ফলে, বৃদ্ধ বয়সে রিকার্ডোর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল, তাই সে তার ছেলে ভিন্‌সেন্তিকে (Vincenti) কাজ-কারবার, বিষয়-সম্পত্তির সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে অবশেষে একদিন ক্লান্তিতে-অবসাদে রোগ-শয্যায় আশ্রয় নিলো !

ভিন্‌সেন্তি কিন্তু ছিল ভারী বেয়াড়া ছেলে···যেমন লোভী, তেমনি স্বার্থপর। বুড়ো রুগ্ন-বাপকে সে এতটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা বা সেবা-যত্ন করতো না···সারাক্ষণই কেবল মেতে থাকতো নিজের কাজকর্ম্ম আর বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের ফন্দী-ফিকির মেটানোর তালে! ছেলের এই ঔদাসীন্য আর অবহেলার ফলে, বৃদ্ধ-পঙ্গু রিকার্ডোর অবস্থা দিন-দিন ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠলো। বাপের এমন মরণাপন্ন অসুখ দেখেও ভিন্‌সেন্তির কিন্তু এতটুকু চৈতন্য হলো না ···সে তখনও তার ব্যবসা আর প্রতিপত্তি বাড়ানোর চিন্তায় মশগুল! নেহাৎ আশপাশের পাড়া-পড়শীরা নিন্দা-অপবাদ রটাবে, এই আশঙ্কায় ভিন্‌সেন্তি শেষ পর্য্যন্ত তার অসুস্থ বুড়ো-বাপকে সেবা আর চিকিৎসার জন্য শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত-আরামে নিজের ঐশ্বর্য্য-বিলাস আর কাজকর্ম্ম প্রসারের ব্যাপারে মন দিলো। যে বুড়ো-বাপের দৌলতে ছেলের এতখানি বিভব প্রতিপত্তি, তার কোনো খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত রাখতো না ভিন্‌সেন্তি ! সে ভাবতো—এমন রোগে ভুগেও বুড়োটার তো দেখছি, মরবার নামটি নেই···কাঁহাতক আর বাপের চিকিৎসা আর ওষুধপত্রের পেছনে মিছামিছি পয়সা নষ্ট করি ! তার চেয়ে বুড়োটাকে বরং দাতব্য-চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। লোকে যদি কিছু বলে তো তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যাবে যে—বাড়িতে অষ্টপ্রহর সাড়ম্বরে ডাক্তার-নার্সের ভীড় জমিয়ে চিকিৎসার নানান্ অসুবিধা···তাই রোগীর দেখাশোনার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেওয়াই ভালো—কারণ বাড়ীর চেয়ে হাস্‌-পাতালেই বরং রুগ্ন-বাপের ঢের বেশী ভালো সেবা-শুশ্রূষা আর চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে !

কিন্তু জলন্ত আগুনকে যেমন একমুঠো শুকনো খড়কুটো চাপা দিয়ে নেভানো সম্ভব নয়, তেমনি কোনো অন্যায় কাজকেও মিথ্যা-ওজর দিয়ে চিরকাল ঢেকে রাখা যায় না! রুগ্ন-মরণাপন্ন রিকার্ডোকে হাসপাতালে পাঠানোর কিছুদিন পরেই পাড়া-প্রতিবেশীরা বুড়ো-বাপের প্রতি ভিন্‌সেন্তির এই নির্ম্মম অন্যায়-আচরণের কথা জেনে নিন্দা করতে লাগলো···এমন কি আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরাও সকলেই তাকে ধিক্কার দিতে সুরু করলো। ভিন্‌সেন্তির কিন্তু এতেও এতটুকু লজ্জা বা চৈতন্যোদয় হলো না। সে বরং তার পাড়া-পড়শী, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে ডেকে ডেকে বোঝাতে লাগলো,—কেন এমন মিথ্যা দুর্নাম রটাচ্ছো তোমরা···পয়সা কি কম আমার, যে খরচ বাঁচাবো বলে বুড়ো বাপকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি !

ভিন্‌সেন্তির জবাব শুনে লোকজনেরা বিরক্ত হয়ে বললে—বটে! এই বয়সে কোথায় নিশ্চিন্ত আরামে-শান্তিতে বুড়ো রিকার্ডো তার নিজের বাড়ীতে নরম-পালঙ্কে শুয়ে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে হাসি-গল্প করে আনন্দে দিন কাটাবে, তা নয়, রোগে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালের নিরালাকুঠুরীতে ঐ শক্ত-বিছানায় একা পড়ে বেচারী ছটফট করছে! এ কেমন ব্যবস্থা হলো ?···অমন বাপের ছেলে হয়ে শেষে এই কি তোমার কর্ত্তব্য ?···

লোকজনের মন্তব্য শুনে ভিন্‌সেন্তি তো রেগে আগুন ! সে খিঁচিয়ে উঠে জবাব দিলে,—খুব তো আক্কেল দিচ্ছে

দেখছি, সবাই !·· বলি, এত সব কাজ-কারবার যে চলছে সেটা দেখছে কে···আমি, না, আপনারা ?···কাজ-কারবারের দিকে নজর না দিলে পয়সাই জুটবে কোত্থেকে আর বাবার চিকিৎসার মুঠো-মুঠো খরচই বা জোগাবো কেমন করে ! কাজেই সব দিক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিতান্ত বাধ্য হয়েই রুগ্ন বুড়ো-বাপকে হাসপাতালে রেখেছি ! তাছাড়া কাজ-কারবারের ঝঞ্ঝাটে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকলেও, রোজ আমি ছেলেদের পাঠাই হাসপাতালে—বাবার জন্য ওষুধ-পথ্য, জামা-কাপড় আর টুকিটাকি জিনিষপত্র দিয়ে···বাড়ী ছেড়ে থাকার দরুণ যাতে তাঁর কোনোরকম অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য না ঘটে সেখানে ! উপরন্তু, রোগে ভুগে বুড়ো বয়সে বাবার মেজাজটি যে কেমন কড়া হয়ে উঠেছে—সে খবর তো রাখেন না আপনারা···পান থেকে চূণটি এতটুকু খশেছে কি, ব্যস্···একেবারে খাপ্পা ! ···তাছাড়া জানেনই তো, আজকালকার বাজারে, বাড়ীতে চিকিৎসা-সেবা-যত্নের ব্যাপারে অষ্টপ্রহর ডাক্তার-বদ্যি আর নার্স-দাই মোতায়েন রাখা কতখানি দুঃসাধ্য-ঝঞ্ঝাটের কথা ! কাজেই রুগ্নাবস্থায়' এত সব অসুবিধা আর দুর্ভোগ থেকে রেহাই দেবার উদ্দেশ্যেই বাবাকে চিকিৎসার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী থেকে হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না !

এমনিভাবে ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে মিষ্টি-কথায় পাড়া-পড়শী আর আত্মীয়-বন্ধুদের ভুলিয়ে ভিন্‌সেন্তি তো কোনো-মতে সে-যাত্রা তার মুখরক্ষা করলে। পাছে আবার তার নামে অপবাদ রটে, এই আশঙ্কায় ভিন্‌সেন্তি অবিলম্বে তার বছর-আষ্টেক বয়সের ছেলের হাতে দামী দুটো ভালো কামিজ পাঠিয়ে দিলে হাসপাতালে—তার রোগে-পঙ্গু বুড়ো-বাপের কাছে।

হাসপাতালে এসে রোগশয্যাশায়ী বৃদ্ধ রিকার্ডোর সামনে কাগজের ঠোঙা থেকে কামিজ দুটো খুলে বার করে দেখিয়ে ভিন্‌সেন্তির ছেলে বললে,—এই ত্যাখো, দাদু··· বাবা তোমার জন্য নতুন জামা পাঠিয়ে দিয়েছে।

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ রিকার্ডো বললে,—বলিস্ কি ভাই··· তোর বাবা পাঠিয়েছে !···বাঃ, বেশ, বেশ !

এই বলে ছোট্ট নাতিটির হাত থেকে ভিন্‌সেন্তির পাঠানো দামী কামিজ দুটি নিয়ে শয্যার পাশে রেখে স্নেহ-ভরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে রোগাতুর রিকার্ডো বললে,—আচ্ছা দাদাভাই, তুই কি জানিস—তোর বাবার ঐ যে অত সব ধন-দৌলত, অগাধ সম্পত্তি··· ও সব আমারই দেওয়া ?

ভিন্‌সেন্তির ছেলে তো অবাক ! কৌতূহলী-কণ্ঠে সে বললে—বলো কি দাদু ! এ কথা তো জানতুম না আমি !

ম্লান হাসি হেসে বৃদ্ধ রিকার্ডো জবাব দিলে,—তুই কি কি করে জানবি, দাদাভাই···একরত্তি ছেলেমানুষ !··· কিন্তু দাদাভাই, আমার সারা জীবনের রোজগারের ফলে, অত সব ধন-দৌলত-সম্পত্তি···তার বদলে, মাত্র এই দুটো কামিজ পাঠিয়ে দিয়েছে আমায় তোর বাপ !···এ কাজটা কি তোর বাপের উচিত হলো, ভাই ?

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রোগ-শীর্ণ ঠাকুর্দ্দার দিকে তাকিয়ে ভিন্‌সেন্তির ছেলে শুধোলো,—তার মানে ?···

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ রিকার্ডো বললে,—আমার যা কিছু সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, এই বুড়ো বয়সে···এই রোগে-পঙ্গু অবস্থায়···আমাকে, বাড়ী থেকে, তোদের সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাতব্য-হাসপাতালের এই নির্ব্বান্ধব-কুঠুরীতে একা মরতে পাঠিয়ে তোর বাপ যে কাজটা করেছে···সেটা কি···

বলতে বলতে রিকার্ডোর গলা ভার হয়ে এলো··· কথাটা সে আর শেষ করতে পারলো না ! বৃদ্ধের কথা শুনে ভিন্‌সেন্তির ছেলের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো··· ঠাকুর্দ্দার জরাজীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ছোট্ট নাতি বললে,—এ সব কথা বলছো কেন, দাদু ?···বাড়ী তো তোমার···তবে কেন তুমি এখানে রয়েছো···নিজের বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছো না ?···

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ রিকার্ডো জবাব দিলে,—তা যে সম্ভব নয়, ভাই !···তোর বাবা আমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে···সে এসে নিজে যদি আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে না যায়, তাহলে কেমন করে যাই বলতো দাদাভাই !···বরং একা-একাই এই হাসপাতালের কুঠুরীতেই পড়ে আমি শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বো···তবু তোর বাবা নিজে এসে আমাকে না নিয়ে গেলে আর তোদের বাড়ীতে ফিরবো না !

বুড়ো ঠাকুর্দ্দার দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রু-সজল চোখে ভিন্সেন্তির ছেলে বললে,—অমন কথা বলো না…তুমি বাড়ী ফিরে চলো, দাদু!…আমি এখুনি গিয়ে বলছি বাবাকে!…

ছোট্ট নাতির কথা শুনে বৃদ্ধ রিকার্ডোর রোগ-শীর্ণ ম্লান-মুখ আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো…ভিন্সেন্তির ছেলেকে আদর করে নিজের কাছে টেনে এনে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে সে বললে,—পারবি…পারবি তোর বাবাকে বলতে, দাদাভাই!

ভিন্সেন্তির ছেলে সোৎসাহে মাথা নেড়ে জবাব দিলে,—হ্যাঁ, দাদু! নিশ্চয়!…

সস্নেহে ছোট্ট নাতিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ রিকার্ডো বললে,—বেশ, তাহলে আয়…তোকে শিখিয়ে দি, দাদাভাই…কথাটা কেমন করে বলবি গিয়ে তোর বাবাকে!…এই বলে বৃদ্ধ রিকার্ডো তার নাতির কানের কাছে জরাজীর্ণ-পাণ্ডুর মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিশ-ফিশ করে কি যেন কথা শিখিয়ে দিলে চুপিচুপি…সে কথা শুনেই ভিন্সেন্তির ছেলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঠাকুর্দ্দাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে হাসতে হাসতে হাসপাতালের কুঠুরী ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ীর দিকে!

*   *   *

পরের দিন সকালবেলা ছেলেকে ডেকে ভিন্সেন্তি জিজ্ঞাসা করলে,—কি রে, কামিজ দুটো দিয়ে এসেছিস তোর ঠাকুর্দ্দা বুড়োকে?

ছেলে সোৎসাহে জবাব দিলে,—হ্যাঁ…তবে ঠাকুর্দ্দাকে আমি একটা কামিজ মাত্র দিয়েছি, বাবা!…

রেগে ঝঙ্কার তুলে ভিন্সেন্তি বললে,—সে কি! মাত্র একটা কামিজ?…তোকে না বলে দিলুম দুটো কামিজই দিতে!

অবিচলিত-কণ্ঠে ছেলে জবাব দিলে,—হ্যাঁ! কিন্তু একটা কামিজ যে তোমার জন্য রেখে দিয়েছি, বাবা!

সবিস্ময়ে ভিন্সেন্তি বললে,—আমার জন্যে?…আমার কি জামার অভাব আছে?…

ছেলে দৃঢ়স্বরে জবাব দিলে,—না, তা নয়!…তবে, আমি ভাবলুম—ও দুটো কামিজের একটা ঠাকুর্দ্দাকে দিই, আর আরেকটা তোমার জন্য রেখে দিই! তুমি যখন বুড়ো হবে, তখন তোমায় ও তো ঠাকুর্দ্দার মতো হাসপাতালে পাঠাতে হবে…সেই সময় তোমাকে ঐ কামিজটা পাঠিয়ে দেবো—হাসপাতালে কাল তুমি যেমন পাঠিয়েছিলে!

ছেলের কথা শুনে ভিন্সেন্তি রাগে গর্জ্জে উঠলো,—বটে! বুড়ো বয়সে আমাকেও হাসপাতালে পাঠিয়ে দিবি তুই…পাষণ্ড কোথাকার!

শান্ত-কণ্ঠে ছেলে বললে,—নিশ্চয়!

রেগে আগুন হয়ে ভিন্সেন্তি শুধোলো,—তার মানে?…

অবিচলিত-কণ্ঠে ছেলে বললে,—কেন?…কথাই তো আছে—কেউ পরের মন্দ করলে, তার নিজের মন্দ আগে হয়!…তুমি তোমার রুগ্ন বুড়ো বাপকে হাসপাতালে পাঠিয়েছো…দাদু তো তোমার কোনো মন্দ করেনি জীবনে! তেমনি, আমিও যখন তোমার মতো বড়ো হবো—আর তুমি দাদুর মতোই বুড়ো হয়ে যাবে, তখন তোমাকে পাঠিয়ে দেবো ঐ হাসপাতালে!…আর সে সময়, তুমি যেমন কাল দাদুকে কামিজ পাঠিয়েছিলে, তেমনিভাবে ঐ আরেকটা কামিজও আমি তখন তোমাকে পাঠাবো তোমায় হাসপাতালে! সত্যি বলছি বাবা…আমি নিশ্চয় তোমাকে ঐ কামিজটা পাঠিয়ে দেবো তোমার হাসপাতালে…দেখো তুমি তখন!…জানোই তো…পরের মন্দ করতে গেলে, নিজের মন্দ আগে হয়!

ছেলের কথা শুনে ভিন্সেন্তি চমকে উঠলো…এতদিনে তার হুঁশ হলো—রুগ্ন বুড়ো বাপকে চিকিৎসার জন্য বাড়ী থেকে সরিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে সে কী দারুণ অন্যায় করেছে!

লজ্জায়-অনুতাপে জর্জ্জরিত হয়ে ভিন্সেন্তি তখনি ছুটে গেল হাসপাতালে—তার বুড়ো বাপ রোগ-জীর্ণ রিকার্ডোর কাছে! সেখানে গিয়ে তার অন্যায়-আচরণের জন্য বৃদ্ধ রিকার্ডোর কাছে অনুতপ্ত হয়ে মাফ চেয়ে, রুগ্ন-পঙ্গু বাপকে হাসপাতাল থেকে পরম-সমাদরে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলো নিজেদের বাড়িতে!

তারপর…

সেদিন থেকেই ভিন্‌সেন্তির মতিগতির আমূল-রূপান্তর ঘটলো···বৃদ্ধ রিকার্ডের সেবা-যত্নের যা কিছু ব্যবস্থা সবই সে করতে লাগলো পরম নিষ্ঠাভরে···রোগে পঙ্গু অসহায়-বাপের ওষুধ-পথ্য-চিকিৎসার যাতে কোনো অসুবিধা, কোনো কষ্ট না হয়—সেদিকেও ভিন্‌সেন্তির ছিল সদা-সজাগ দৃষ্টি!

* * *

এ ঘটনার পর থেকেই শুধু টাস্কানি শহরই নয়, সারা ইতালির সর্ব্বত্র চিরকালের মতো প্রবাদ রটে গেল যে—পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।

——
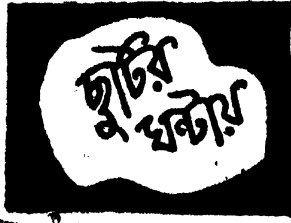
চিত্রগুপ্ত

জলন্ত-আগুনের স্পর্শে কাপড় যে সহজেই পুড়ে যায়—এ ব্যাপার তোমরা সকলেই জানো এবং দেখেছো। কিন্তু বিজ্ঞানের এমন বিচিত্র কলা-কৌশল আছে, যে সে পদ্ধতিতে জলন্ত-আগুনের শিখার স্পর্শ লাগলেও, রহস্যময় বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে কাপড়টুকু পুড়বে না এতটুকু···বরং আগাগোড়া অক্ষত-অটুট থাকবে। এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের সেই অভিনব-মজার খেলাটির কথা বলছি—এ খেলার কায়দা-কানুন ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যাবে। মজার এই খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব কলা-কৌশল রপ্ত করা দরকার, সেগুলি এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা বিপুল-ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়···নিতান্তই ঘরোয়া, সামান্য কয়েকটি উপকরণ সংগ্রহ করতে পারলেই, অনায়াসেই বিজ্ঞানের এই বিচিত্র রহস্যময় খেলাটি দেখানো চলবে।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য সাজ-সরঞ্জাম দরকার—একখানি সূতীর রুমাল বা চৌকোণা-কাপড়ের টুকরো, একটি আধুলী বা টাকা এবং একটি জলন্ত-সিগারেট। এ সব জিনিষ সকলের বাড়ীতেই বড়দের কাছ থেকে অনায়াসেই জোগাড় করা চলবে···তবে পাঁচজনের সামনে এ খেলা দেখানোর সময়, ফর্দ্দমাফিক উপকরণগুলি দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নিলে, মজা আরো অনেক বেশী জমবে!

এবারে বলি—এ খেলার কলা-কৌশলের কথা। উপরোক্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, খেলা-দেখানোর সময়—গোড়াতেই নীচের ছবির ভঙ্গীতে রুমালের বা চৌকোণা-কাপড়ের খুঁটে ঐ আধুলী বা টাকাটিকে বেশ শক্ত এবং 'টান' করে মুড়ে নিয়ে ডান-হাতের আঙুলের সাহায্যে এঁটে ধরো। তবে নজর রেখো—এমনিভাবে এঁটে ধরবার সময়, রুমাল বা কাপড়ের টুকরোটি যেন আধুলী বা টাকার গায়ে সমানভাবে সেঁটে থাকে আগাগোড়া···অর্থাৎ, কাপড়টি আল্‌গা থাকার দরুণ কোথাও এতটুকু কুঁচকে অথবা ভাঁজ খেয়ে অসমান না থাকে···এ ত্রুটি ঘটলেই, মজা মাটি—জলন্ত-আগুনের শিখার স্পর্শে কাপড়ের টুকরো
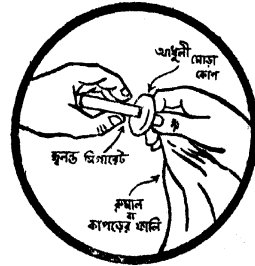
নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! কাজেই খেলাটি দেখানোর সময়, এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

এমনিভাবে ডান-হাতের আঙুলের টিপে রুমাল বা চৌকোণা-কাপড়ের খুঁটে-মোড়া আধুলী অথবা টাকাটিকে ধরে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে সন্তর্পণে সেটিকে এগিয়ে আনো তোমার বাঁ হাতের আঙুলের চাপে রাখা ঐ জলন্ত-সিগারেটের আগুনের শিখার উপর। তবে দেখো—সিগারেটের

জলন্ত-আগুনের শিখার স্পর্শ লাগে যেন শুধু ঐ রুমাল অথবা কাপড়ের খুঁটে সেঁটে-মোড়া আধুলী বা টাকাটির উপরেই···অন্য কোনো অংশে তার ছোঁয়াচ না লাগে এতটুকু। তাহলেই পরিচয় পাবে—বিজ্ঞানের রহস্যময় এক বিচিত্র-তথ্যের ··দেখবে, সিগারেটের জলন্ত-আগুনের ছোঁয়া লেগেও আধুলী বা টাকা মোড়া ঐ সুতীর রুমাল অথবা কাপড়ের টুকরো পুড়বে না এতটুকু—আগাগোড়া দিব্যি অক্ষত-অটুট থাকবে···এমন কি, কাপড়ের কোথাও পোড়া-কালো দাগটুকু পর্য্যন্ত নজরে পড়বে না। কিন্তু ধাতু-নির্ম্মিত (metal-coin) এই আধুলী অথবা টাকা মোড়া খুঁটের অংশটি ছাড়া, রুমাল কিম্বা কাপড়ের টুকরোর অন্য যে কোনো জায়গায় সিগারেটের জলন্ত-আগুনের সামান্য স্পর্শ লাগলেই, দেখবে—সে জায়গাটি তৎক্ষণাৎ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এমন আজব কাণ্ড ঘটবার কারণ হলো—বিজ্ঞানের রহস্যময়-নিয়মানুসারে জলন্ত-আগুনের উত্তাপটুকু (heat) সবই বেমালুম শুষে 'আকর্ষণ' (conduct) করে নেয়··· সুতীর-কাপড়ের গায়ে সেঁটে-মোড়া ধাতু-নির্ম্মিত ঐ সমতল-আকারের (flat) আধুলী বা টাকা মুদ্রাটি। তারই ফলে, আগুনের যা কিছু উত্তাপ আর দাহিকা-শক্তি (heat and fire) সবটুকুই টেনে নেয় ধাতু-নির্ম্মিত ঐ সমতল-গড়নের আধুলী বা টাকা মুদ্রা···কাপড়ের সুতোর গায়ে তার এতটুকু ছোঁয়াচ লাগে না এবং সেই-জন্যই আগুনের আঁচে ধরবার ফলে, নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় না।

এই হলো—বিজ্ঞানের বিচিত্র-মজার খেলাটির আসল রহস্য। এখন তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দেখো—এ খেলাটির কলা-কৌশল। তবে হুঁশিয়ার··· আগুন নিয়ে খেলা···অসাবধানতার ফলে, এ খেলা দেখাতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কারো যেন হাত-পা বা জামা-কাপড় না পোড়ে—আর ডাক্তার-ওষুধপত্রের ব্যবস্থা না করতে হয়!

পরের মাসে, এ ধরণের আরো একটি বিচিত্র-মজার খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

—

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের আজব-হেঁয়ালি ঃ

উপরের ছবিতে এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে আটটি '৮' সংখ্যা। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এই আটটি '৮' সংখ্যাকে পাশাপাশি এক-লাইনে রেখে, এ সব সংখ্যার মাঝেমাঝে শুধু যোগ-চিহ্ন (+), বা বিয়োগ-চিহ্ন (–), অথবা গুণ-চিহ্ন (×), কিম্বা ভাগ-চিহ্ন (÷), বসিয়ে, এমনভাবে কায়দা করে সাজাও যে এগুলি একত্রে মিলিয়ে যেন অঙ্কের মোট সংখ্যাফল হয় ১০০০। সহজেই যদি এ হেঁয়ালির সমাধান করতে পারো তো বুঝবো—অঙ্ক-শাস্ত্রে রীতিমত দড় হয়ে উঠেছো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

তিন অক্ষর দিয়ে নাম, অতি সুখাদ্য হয়।
মাথা যদি কাটা হয়—চালের মাথায় রয়॥
মধ্য যদি কাটো···তবে একটি ভাষা হবে।
শেষ 'দু' অক্ষর কেটে দিলে শরীরেতে রবে॥
ভাইবোনেদের দিলুম আমি শারদ-উপহার।
তোমরা এবার দাও তো দেখি উত্তর উহার॥

রচনা ঃ যোগেশ ঘোষ (ফুটিগোদা)

৩। মহাভারত-খ্যাত বীর···দুটি বিভিন্ন শব্দে গঠিত। প্রথমটি ঠাকুর-দেবতাদের প্রতিভূ হয়ে পুজা পায়,

দ্বিতীয়টিকে সুযোগ পেলে এ-যুগে প্রায় সবাই পকেটস্থ করতে তৎপর। বলো তো কে এই বীর ?

রচনা :—আলো, তুফান ও চায়না (রাউরকেল্লা)

৪। তিন অক্ষরে নাম···সেটি ছাড়া আমাদের বাঁচা সম্ভব নয়। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে একটি খেলার বস্তু হয়, আর মাঝের অক্ষর বাদ দিলে বোঝায় বিশেষ এক-ধরণের লোক-বাহী যান।

রচনা :—অলোককুমার ভট্টাচার্য্য (লাভপুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। উপরের ছবিতে যেমন দেখান রয়েছে, তেমনি উপায়ে পথ চলে তিনটি কিশোর ছেলে সহর থেকে তাদের নিজের নিজের দেশের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে। এ ছাড়া আরো অন্য পথে চলেও তারা অনায়াসেই গ্রামের বাড়ী ফিরতে পারে।

২। মাঝি

৩। ২২টি মাছ ধরেছিল।

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ
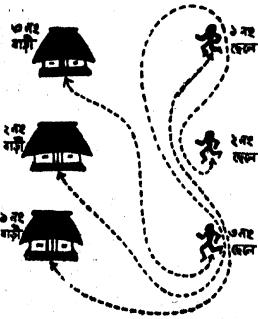
কৃষ্ণা, চীনু, সুভাষ, আলোক ও চন্দন (লাভপুর), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কুলু মিত্র (কলিকাতা), কৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ),।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা) সত্রাজিৎ দাশ (কলিকাতা), প্রবীর কুমার (দেওঘর) জয়ন্তী, দীপঙ্কর, তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর), শমিতা (কামতৌল, দ্বারভাঙ্গা), রবীন্দ্রনাথ দিন্দা, হেমন্ত কুমার জানা ও চিত্রলেখা চৌধুরী (শিউলীপুর, মেদিনীপুর), রেখা ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (যশপুরনগর, রায়গড়)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), মদন মোহন দাস (রামজীবনপুর), সুকেনচন্দ্র নন্দী ও সুত্যবান কুণ্ডু (রামপুর, সাঁওতাল পরগণা)।

খুকুর কুকুর

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

খুকুর কুকুর কেউ দেখেছো তাকে ?
ডাগর কালো চোখ দুটিতে
আগুন জ্বলে থাকে !
পায়ের থাবা নখগুলো তার
নরম তুলোর দেখতে বাহার।
হাস্‌ছো দেখে নখগুলোকে
ধারালো নয় মোটে
আর দেখে কী রাংতা চোখে
রং চড়ানো ঠোঁটে।
খুকুর কুকুর নামটি গদাই
লেজ তুলে সে থাকে সদাই
তেজী কুকুর জিদেল ভারী
লেজ নাড়ালেই তাড়াতাড়ি
ঘেউ ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পাবে
খুকুর কুকুর কে দেখ্‌তে যাবে ?
খুকুর কুকুর কেউ দেখেছো তাকে ?
হলেও তুলোর সত্যি সে যে
ঘর সাজিয়ে রাখে।
তাইতো খুকু আদর করে
গদাই, গদাই ডাকে।
দিন-রাত্রি সাজায় তাকে
নোলক পরায় নাকে,
আর সে খাবে ভাত কী লুচি ?
শুধায় নিতুই মাকে।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

মানব-সভ্যতার প্রথম যুগে আমেরিকার আদিমতম যে অধিবাসীরা পল্লব-তৃণের কুটিরে বাস করতো, গাছের বাকল আর পশু-চর্ম্মের বসন-পরিচ্ছদ পরে, চকমকি-পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতো, জলপথে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করতো এই ধরণের 'ভেলা'। এ ভেলায় চড়ে তারা অনায়াসেই নদীর বুকে, এমন কি দুরন্ত সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ পার হয়ে দূর-দুরান্ত দেশেও পাড়ি জমাতো। সুদৃঢ় লতা-পাতার দড়ি দিয়ে গাছের কয়েকটি গুঁড়ি বেঁধে তারা ভেলা বানাতো।

এমনি ধরণেরই বিচিত্র জলযান বানাতো ইউরোপের আদিম অধিবাসীরাও। তাম্র-যুগে (BRONZE AGE) মধ্য-ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড অঞ্চলে হ্রদের কিনারে গ্রাম-রচনা করে পাতার কুটিরে আদিম-যুগের যে সব অনুন্নত অধিবাসীরা বাস করতো, জলপথে যাতায়াত আর শীকারের সুবিধার্থে তারা বানাতো বড়-বড় গাছের গুঁড়ি কুঁদে এই ধরণের কাঠের ডোঙা।

আর প্রস্তর-যুগে ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীরাও জলপথে পাড়ি এবং মাছ-ধরার সুবিধার জন্য ব্যবহার করতো গাছের গুঁড়ি কুঁদে বানানো বিচিত্র-ছাঁদের এমনি সব কাঠের ডোঙা। নৌকা তৈরী আর নৌ-চালনা বিদ্যায় ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীরা ক্রমশঃ সবিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল দিনে-দিনে। আদিম-যুগে ওদেশে কাঠের তৈরী ডোঙা আর নৌকা ব্যবহার করাই ছিল নিয়ম।

কাঠের ডোঙার চেয়েও আরো উন্নত-গড়নের জলযান বানাতো আমেরিকার আদিম-অধিবাসী 'রেড-ইণ্ডিয়ান' (RED INDIAN) বা 'লাল-মানুষেরা'। এ সব নৌকা বা 'CANOE' তৈরী করতো তারা কাঠের কাঠামোর উপর 'বার্চ-গাছের' (BIRCH-TREE BARK) বাকল মুড়ে। এ সব নৌকা বেশ হালকা আর মজবুত ছাঁদের হতো ... এমন নৌকা আজও তৈরী করে রেড-ইণ্ডিয়ানরা।

ভারতবর্ষেও আদি-কাল থেকেই প্রচলন ছিল বিচিত্র ছাঁদের নানা রকম জলযান ... কলাগাছের গুঁড়ি শক্ত লতার বাঁধনে বেঁধে বানানো অভিনব-ধরণের ভেলা। এমনি ধরণের ভেলায় চড়েই পুরাকালে সতী বেহুলা জলের বুকে ভেসে বেড়িয়েছিলেন তাঁর মৃত-পতি লখীন্দরকে নিয়ে। সেকালের মতো একালেও এমনি কলাগাছের ভেলায় চড়ে জলপথে যাতায়াত করার রেওয়াজ আজো আছে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে।

❋ অতীতের স্মৃতি ❋

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

৮

সেকালের দেশী-সমাজের অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রাণ লোক-জনের মধ্যে একদিকে যেমন বিভিন্ন লৌকিক ও পৌরাণিক দেব-বিগ্রহ পূজা-আরাধনার উদ্দেশ্যে মহাসমারোহে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে সহর আর গ্রামাঞ্চলের নানা জায়গায় নিত্য-নূতন ছোট-বড় বিবিধ-ধরণের দেবালয়-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার বিপুল-উদ্দীপনা দেখা যেতো, অন্যদিকে তখনকার আমলের কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক-উপাসকদের মনেও তেমনি প্রবল-উন্মাদনা জেগে উঠেছিল—গভীর নিশীথে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁদের বীভৎস-রহস্যময় বিচিত্র ধর্ম্মাচার-সাধনার নানান্ অনুষ্ঠান-লীলা সুসম্পন্ন করবার বিষয়ে। প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পাতায় সেকালের তান্ত্রিক-সাধকদের এই সব অভিনব-রহস্যময় গুপ্ত-পূজা আর নৃশংস-ধর্ম্মানুষ্ঠানের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর নিদর্শন পাওয়া যায়···একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাদের কৌতুহল মেটানোর উদ্দেশ্যে তারই কয়েকটি বিচিত্র বিবরণ নীচে সঙ্কলন করে দেওয়া হলো।

● ● ●

(সমাচার দর্পণ, ২৭শে নভেম্বর, ১৮১৯)

গুপ্ত পূজা। মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্ব্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে; সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রাম হইতে বিস্তর দূর নহে। চারি দিকে মাঠ, মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে—তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ—ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্যরূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সুতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান; তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদপযুক্ত উপকরণাদি। এই ২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই। পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই ২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদীর উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এক বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশরূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই।

কিন্তু এই বিষয় মোং পূর্ব্বস্থলীর দারোগা এইমাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মুদীর দোকান হইতে লণ্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২রা ফেব্রুয়ারী; ১৮২২)

গুপ্তপূজা॥—সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে, সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই—কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারিথান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ ২ অনুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামিগ্রী ও পাচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩)

অনির্ণীত বলি॥—মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুয়ারি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে—পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

* * *

শুধু যে নৈবেদ্য, পট্টবস্ত্র, তৈজসপত্র, রত্নালঙ্কার, দক্ষিণা আর জীবজন্তুর বলিদান দিয়েই সেকালের তান্ত্রিক-উপাসকেরা গভীর নিশীথে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁদের এই সব রহস্যময়-রোমাঞ্চকর গুপ্ত-পূজার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতেন তাই নয়, আরাধ্য দেব-বিগ্রহের তুষ্টিসাধন করে নিজেদের মনোস্কামনা-সিদ্ধি, শক্তি-সঞ্চয় আর শত্রু-নিপাতের কামনায় তাঁরা অকাতরে অঙ্গচ্ছেদ, রক্তদান, এমন কি, বিনা দ্বিধায় নির্ম্মমভাবে নরবলি দিতেও বিন্দুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ হতেন না! এমনই উৎকট-প্রবল ছিল তখনকার আমলের তান্ত্রিক-সাধকদের ধর্ম্মোন্মাদনা আর দেবানুকূল্য-লাভের আগ্রহ। সেকালের এই সব নৃশংস কীর্ত্তি-কলাপ বেশীর ভাগ সময়েই অনুষ্ঠিত হতো একান্ত গোপনে…কৌতূহলী-জনতার চোখের আড়ালে…কাজেই পীঠস্থানের আশপাশের লোকজন, এমন কি, সে এলাকার পুলিশের দারোগা-পেয়াদারা পর্য্যন্ত প্রাণপাত চেষ্টা করেও তান্ত্রিক-সাধকদের আসল পরিচয় বা তাদের রহস্যময় গতিবিধি আর সাধন-ভজন প্রক্রিয়ার এতটুকু হদিশ-তল্লাস খুঁজে পেতো না কোনোমতেই! পুরোনো সংবাদ-পত্রে এমনি সব লোমহর্ষণ-কাহিনীরও প্রচুর নজীর মেলে।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২১শে এপ্রিল, ১৮২৭)

কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।—শুনা গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺ কালী ঠাকুরাণীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছুরিকাদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপর্য্যন্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্তকলেবর হইয়া একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসি কর্ম্ম দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক দেশ ছেদনপূর্ব্বক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সং চং

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২২শে জুন, ১৮২২)

নরবলি॥—শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদানরূপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে কএদ রাখিয়াছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২১শে জানুয়ারী, ১৮৩৭)

এক দিবস দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথানিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্ব্বক মহামায়ার অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত—চারি পার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে, ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিকে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর ২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তদুপরি এক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার, তাহাও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক। পরে পুরোহিত ঐ অদ্ভুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদ হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক সেই সকল শোণিত ধৌতকরত বস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটী ও নৈবেদ্যপ্রভৃতি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্তু তাহার দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদ হইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল, ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণরূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে ঐ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহাকর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট হইলে বর্দ্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেননা সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।—জ্ঞানান্বেষণ।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়ৎকালাতীত হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্র হইতে প্রায় সামুদায়িক প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুত প্রাণনাথ বাবুর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন—তাহাতে কএকটা দাঁড়কাক ও একটা ঘোটক বধ হইয়াছিল। তথাপিও ঐ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ না হইয়া বরঞ্চ তাহার বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে আবার সম্বাদ প্রভাকর পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী৺রক্ষিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মূর্ত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এপর্য্যন্ত হয় নাই। সে যাহা হউক অদ্যাবধি বর্দ্ধমাননিবাসি মহাশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণীবধ বা জীবৎ হইতে পারে। হায় ২ কি খেদের বিষয় আমাদিগের বাঙ্গলার মনুষ্যগণেরা কত দিনে মনুষ্য হইবেন কিছু বলা যায় না। কস্যচিৎ ভবানীপুরনিবাসিনঃ। শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবস্য।

* * *

সেকালের দেশী-সমাজের তান্ত্রিক-উপাসকদের ধর্ম্মোন্মাদনার এমনি রোমাঞ্চকর কীর্ত্তি-কলাপের মতোই বিশেষ এক-ধরণের নির্ম্মম-রীতির ব্যাপক-প্রচলন ছিল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ

সেকালের দৈবজ্ঞ

(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

থেকে ও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি-যুগ পর্য্যন্ত ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের মধ্যে। তৎকালীন ইউরোপীয় সামাজিক-রীতি অনুসারে, সেকালে বিলাতের যে সব গোরা-সাহেবেরা কাজকর্ম্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে ভারতে এসে বসবাস করতেন, কোনো কারণে তাঁদের কারো সঙ্গে নিতান্ত তুচ্ছ-ব্যাপারে রঙ্গ-রসিকতার ঝোঁকে কারো কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ—অথবা মনো-মালিন্য ঘটলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিবাদী পক্ষের ব্যক্তিরা উভয়েই সে সব বিষয়ের মীমাংসা করতেন শাণিত-তলোয়ার কিম্বা গুলী-ভরা পিস্তল হাতে 'দ্বৈরথ-সমর' বা 'ডুয়েল' (duel) লড়াই করে। এ সব লড়াইয়ে বাদী এবং বিবাদী পক্ষ···উভয়ের বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতো—একপক্ষের অস্ত্রাঘাতে অপর-পক্ষের পরাজয়ে। এ পরাজয়ের ফলে, এঁদের অনেকেই শুধু যে গুরুতরভাবে আহত হতেন তাই নয়, তলোয়ারের আঘাতে অথবা পিস্তলের গুলীর চোট খেয়ে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত দিয়েছেন এবং বিজয়ী-পক্ষকে খুনের দায়ে শেষে হাজির হতে হয়েছে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়—এমন নজীরেরও প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন পুঁথি-কেতাবে আর সেকালের সংবাদ-পত্রের পাতায়। একালের পাঠকপাঠিকার অবগতির জন্য তারই কয়েকটি রোমাঞ্চকর বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো···এ সব বিবরণ থেকে তখনকার আমলের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের অভিনব 'দ্বৈরথ-সমর' (dueling) রীতির সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে।

* * *

দ্বৈরথ সমর

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কাহিনী Memoirs' ১৭৭৮)

···In this party (তদানীন্তন কলিকাতা-সহরের অভিজাত ইংরেজ-অধিবাসী বারওয়েল ও পট্‌স্ সাহেবের ভবনে অনুষ্ঠিত সৌখিন-মজলিসে) I first saw the barbarous custom of pelleting each other, with little balls made of bread like pills, across the table, which was even practised by the fair sex. Some people could discharge them with such force as to cause considerable pain when struck in the face. Mr. Daniel Barwell was such a proficient that he could at the distance of three or four yards snuff a candle, and that several times successively.

This strange trick, fitter for savages than polished society, produced many quarrels, and at last entirely ceased from the following occurance : A Captain Morrison had repeatedly expressed his abhorrence of pelting, and said that if any person struck him with one he should consider it intended as an insult and resent it accordingly. In a few minutes after he had said so, he received a smart blow in the face from one which, although discharged from a hand below the table, he could trace by the motion of the arm from whence it came, and saw that the pelleter was a very recent acquaintance. He therefore, without the least hesitation, took up a dish that stood before him and contained a leg of mutton, which he discharge

with all his strength at the offender, and with such well-directed aim that it took place upon the head, knocking him off his chair and giving him a severe cut on the temple. This produced a duel, in which the unfortunate pelleter was shot through the body, lay upon his bed many months, and never perfectly recovere l. This put a complete stop to the absurd practice.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৩১শে মে, ১৭৮৭)
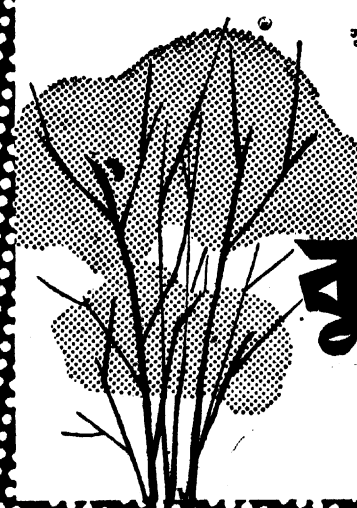
Yesterday morning a duel was fought between Mr. G—an attorney at law, and Mr. A—one of the proprietors of the Library, in which the former was killed on the spot. We understand quarrel originated about a gambling debt.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৫ই জুলাই, ১৭৮৭)

On Monday last came on the trial of Mr. A—for killing Mr. G—in a duel. The trial lasted till near five o' clock in the afternoon, when the Jury retired for a short time, and brought in their verdict not guilty.

Mr. G—was a very restectable man, very able in his profession, and is much regretted by all who had the pleasure of his acquaintance.

* * *
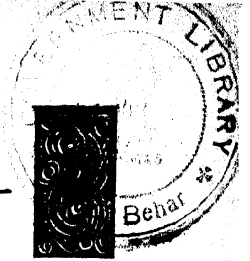
প্রথম পর্ব

বীজ ও অঙ্কুর

এক

পুণার উত্তরে বারো মাইল দূরে পুণ্যতোয়া ইন্দ্রায়নী নদীতীরে দেহু গ্রাম। বিখ্যাত মারাঠী মহাপুরুষ তুকারাম এই গ্রামটিকে তীর্থ করে রেখে গেছেন তাঁর পুণ্য পদরজঃ স্পর্শে। তাঁর একটি স্মৃতিমন্দির আজো সেখানে আছে। বহু ভক্ত সাধক সাধু সন্ন্যাসী সেখানে আজো যান তাঁর ছবিকে প্রণাম করতে তীর্থপর্যটনে। একজন পুরোহিত সেখানে মোতায়েন আছেন—তিনি যাত্রীদের তুকারামের স্বহস্তলিখিত "অভঙ্গ" ভজনাবলীর পাণ্ডুলিপি দেখান—যে গীতাবলি মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে আজও ভক্ত ও ভক্তিমতীরা গেয়ে থাকেন।

দেহু গ্রামে একটি সেনানিবাস—ক্যান্টনমেণ্ট—আছে। কাজেই গ্রামটিকে উভধর্মী বলা চলে—সেকেলে তথা একেলে। গ্রামের স্নিগ্ধতা তথা শহুরের সুবিধা—জলের কল, বিজলি বাতি ইত্যাদি—দুইই মেলে।

এই গ্রামের বনেদি বাসিন্দা—বিখ্যাত ওস্তাদ মহাদেব পলুস্কর।

মহাদেবের পিতা ছিলেন খানদানী মারাঠী ওস্তাদ। মারাঠীরা তাঁর ওস্তাদী তানের নাম করতে অজ্ঞান! তিনি একমাত্র কুলতিলক মহাদেবকে যথাবিধি শিখিয়েছিলেন ঘরানা ওস্তাদি গান—হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়াল—অবশ্য মারাঠী চালে। দেহুর মনোরম পরিবেশে মহাদেবের মন ব'সে গিয়েছিল। ওস্তাদ নামডাক হবার পরে একটি ছোট মোটর কিনে পুনা যাওয়া আসা করতেন—সপ্তাহে চারদিন সেখানে সাত আটটি ধনী শিষ্যকে গানে তালিম দিতে। তাছাড়া গ্রামোফোনে গান গেয়েও দক্ষিণা পেতেন রাজকীয়। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পৈতৃক আবাসটি একতলা থেকে দোতলা হ'য়ে দাঁড়াল। স্ত্রীকে নিয়ে মহাদেব থাকতেন উপরতলায় পিতৃমাতৃহীনা আদরিনী ভাগনী গৌরীকে নিয়ে। নিচের তলার প্রশস্ত বৈঠকখানায় সাগরেদদের সকালে গান শেখাতেন। সন্ধ্যায় ওস্তাদি গানের জলসা হ'ত সপ্তাহে দু তিন দিন। সেখানেও প্রণামী পেতেন কম নয়।

স্ত্রী নিঃসন্তান এ-দুঃখ মহাদেবের খানিকটা মিটেছিল ভাগনী গৌরীকে নিয়ে। অঙ্গে রূপ ধরে না—গুণও হাতে গোনা যায় না—বলতেন মামা ভাগনীগর্বে। লেখাপড়া, গানবাজনা, সর্বোপরি—বিদ্যা। "মা আমার বীণাপাণিও বটে, ভারতীও বটে"—বলতেন মহাদেব যখন তখন পাড়া-পড়শীদের। "গান গাইতেও যেমন, শাস্ত্র আওড়াতেও কি ঠিক তেম্‌নি!" ভাগ্যদেবতা সম্ভবতঃ সেই সময়ে অন্তরীক্ষে হেসেছিলেন গৌরীর শাস্ত্রানুরাগের কথায়। কিন্তু সে পরের কথা।

গৌরীকে মহাদেব পোষ্য-কন্যা নেবেন সব ঠিক—এমনি সময়ে প্রহ্লাদ এল মার কোল জুড়ে মহাদেবের বিবাহের বারো বৎসর পরে। এর আগে মহাদেবের স্ত্রী গিয়েছিলেন বদরীনাথে, সেখানে এক সন্ন্যাসী তাঁকে একটু ভস্ম দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন: "তোমার মহাভক্ত ছেলে হবে মা, এই ভস্মটুকু তুলসীপাতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে তিন রাত্রি খেও।"

মহাদেব একথা শুনে অবিশ্বাসী হাসি হেসে বলেছিলেন: "যত সব হাম্বাগ্ !"

সে যাই হোক ছেলে এলো বটে রূপে ঘর আলো ক'রে, কিন্তু তার পরেই হরিষে বিষাদ: আঁতুড়ঘরেই প্রসূতি পাড়ি দিলেন পরপারে। গৌরীর বয়স তখন নয় বৎসর।

দেখতে দেখতে বারো তেরো বৎসরেই গৌরী ঘরের গিন্নি হ'য়ে দাঁড়াল, বলল বিবাহ করবে না। ছোট ভাই প্রহ্লাদকে মানুষ করবে। অল্পবয়সে সংসারের ভার নেওয়ার ফলে তার বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল অসামান্য। প্রহ্লাদ হ'য়ে দাঁড়াল দিদির নেওটো—দিদি বলতে অজ্ঞান। গৌরী ছিল তার একাধারে দিদি ও মা।

মহাদেব কিন্তু চান নি গৌরী চিরকুমারী থাকে। এমন রূপে তিলোত্তমা গুণে সরস্বতী—মা হবার জন্যেই যে বিধাতা ওকে গড়েছেন! তাছাড়া বিবাহ না ক'রে মেয়েছেলে করবে কী? মহাদেব ছিলেন সেকেলে প্রকৃতির মানুষ। তাই ভাগনীকে স্কুলে পাঠান নি, ঘরেই ছুটি মাষ্টার রেখে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিখিয়েছিলেন। সবাই অবাক হ'ত তার মুখে অনর্গল দেবভাষা তথা ম্লেচ্ছভাষা শুনে। মহাদেব পাত্র খুঁজতে লাগলেন।

গৌরীর বয়স যখন কুড়ি তখন জুটে গেল পাত্র: মনুভাই কাপাডিয়া।

বরের মা বাঙালী, বাপ গুজরাতী। বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়র হ'য়ে এসে সে দেহুতে সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টে কাজ পেয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিস্তর অর্থোপার্জন ক'রে মহাদেবের বাড়ির পাশেই মস্ত তিনতলা বাড়ি তুলল জাঁকিয়ে।

মনুভাইয়ের দুটি প্রবৃত্তি ছিল প্রায় সমান প্রবল: উচ্চাশা ও লালসা। সুন্দরী মেয়ে তাকে অশান্ত ক'রে তুলত দেখতে দেখতে। বিলেতে এজন্যে তাকে বিপদে পড়তে হ'য়েছিল দুএকবার। এমনকি জেলও হ'ত—কেবল তার প্রখর বুদ্ধির জন্যে রগ ঘেঁষে বেঁচে গিয়েছিল দুবারে হাজার দশেক টাকা দণ্ড দিয়ে।

ফলে দেশে ফিরে সে স্থির করল অনর্থক আর এমন ফ্যাসাদে পড়বে না—এ-জাতীয় সংকটে বিবাহরূপ রক্ষাকবচ বেঁধে সুশীল নাগরিক হওয়াই বিধি। ঠিক এই মাহেন্দ্রলগ্নে সুন্দরী গৌরীকে দেখেই সে উজিয়ে উঠল। মহাদেব তার বৈলাতিকী কীর্তির খবর রাখতেন না ব'লেও বটে, আর গৌরীর জন্যে পাত্র খুঁজছিলেন ব'লেও বটে, এমন প্রতিভাবান তথা সুদর্শন যুবককে ভাগনীজামাই পাবার জন্যে উদ্বাহু হয়ে উঠলেন। এ যে হাতে চাঁদ পাওয়া! চাঁদ বলে চাঁদ—ভাগনী বিবাহের পরেও পাশেই থাকবে বরাবর! এমন সুবর্ণ সুযোগ কি ছাড়া চলে?

অথ, বিবাহ হ'য়ে গেল ঘটা ক'রেই। প্রহ্লাদের একটির জায়গায় লাভ হ'ল দুটি আনন্দনীড়: পিতৃগৃহ ও দিদিগৃহ। বয়স তার তখন মাত্র বারো বৎসর, গৌরীর একুশ। গৌরীও স্বামীর গৃহে ভর্ত্রী হ'য়ে র'য়ে গেল মাতুলগৃহের কর্ত্রী।

দুই

প্রহ্লাদ গীতি-প্রতিভায় পিতাকেও ছাড়িয়ে গেল। গৌরীর বিবাহ মণ্ডপে তার অপরূপ ধ্রুপদ খেয়াল শুনে সবাই মুগ্ধ হ'ল। পুত্রগর্বে মহাদেবের বুক দশহাত হ'য়ে উঠল। তিনি আরো উৎসাহে পুত্রকে তালিম দিতে ব্রতী হলেন।

"বাপকা বেটা" হ'য়ে ওস্তাদি গানকে অর্থকরী বিদ্যারূপে বরণ করার পথ ছিল ওর নিষ্কণ্টক। কেবল বেঁকে নিল ওদের গৃহবিগ্রহ বিঠোভার কোনো গূঢ় চালেই হবে। নৈলে গৌরীর বিবাহের ঠিক পরেই প্রহ্লাদ তুকারামের প্রভাবে প'ড়ে যাবে কেন?

মহাদেব ওকে ওস্তাদি গানের সঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত তুকার অভঙ্গ শিখিয়েছিলেন। মারাঠীরা ওস্তাদ হ'লেও অভঙ্গ গেয়ে থাকে। এ-ভজনগুলির নিহিতার্থ যে প্রহ্লাদ পুরোপুরি বুঝত এমন কথা বললেও নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে। কিন্তু একথা বলে:চলে সত্যের অপলাপ না ক'রেও যে, বিঠোভার নামে কেমন যেন ওর মনে সাড়া উঠত জেগে। কোনো কোনো চরণ গাইতে গাইতে সময়ে সময়ে আনন্দে ওর রোমাঞ্চ হ'তে, চোখে নামত ধারা।

মহাদেব স্বধর্মে ভক্ত না হ'লেও ভক্তি ও বৈরাগ্যের মর্ম কিছু বুঝতেন। শুধু প্রহ্লাদের মার স্বপ্নে তুকারামকে দেখার এবং তার পরে সন্ন্যাসীর ভস্ম সেবন করবার পরেই গর্ভ হওয়াই তো নয়, প্রহ্লাদের কুষ্ঠীতেও ছিল যে সে বৈরাগী হবে। তাই অভঙ্গ গানে পুত্রকে অপ্রত্যাশিত

ভাবে সাড়া দিতে দেখে তিনি ভরিয়ে উঠে পাত্রী খোঁজা সুরু করলেন। চাই এমন লোকললামভূতা অনিন্দনীয়া যে—বৈরাগ্যোন্মুখ কুমতিকে সুমতি দেবে—আকাশ থেকে উড়ুক্কু পাখীকে পুরতে পারবে নিরাপদ সংসারপিঞ্জরে।

তিন

রূপসী কমলা দেবী ছিলেন কলকাতায় এক দরিদ্র বাঙালী ঘরের মেয়ে। বিমাতার নির্যাতনে বাধ্য হ'য়ে মেডিকাল কলেজের হাসপাতালে ধাত্রী হ'য়ে সেখানেই থাকতেন নার্সদের ওয়ার্ডে। সেখানে এক মারাঠী উকিলকে পরিচর্যা করতে করতে তার প্রেমে প'ড়ে তাকে বিবাহ ক'রে পুণায় এসে কায়েমী হল। একটী মাত্র মেয়ে—নিখুঁৎ সুন্দরী। নাম দিয়েছিলেন সাবিত্রী, কিন্তু সবাই বলত ওর নাম হওয়া উচিত ছিল উর্বশী প্লাস গার্গী। কারণ শুধু রূপে মনোমোহিনীই তো নয়, বিদ্যায়ও বাণী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পনের বৎসর বয়সে প্রথম হ'য়ে—হ'য়ে উঠল খ্যাতিমতী। কমলার স্বামী গোপালকৃষ্ণ মাডগাঁওকর ছিলেন মহাদেবের সাকরেদ। শিষ্যের মেয়ের বিদুষী ব'লে নামডাক হ'তে মহাদেব উৎফুল্ল হ'য়ে দেহু থেকে পুণা এসে সাবিত্রীকে বরণ ক'রে নিয়ে গেলেন পুত্রের গৃহলক্ষ্মী রূপে। সাবিত্রীর বয়স তখন ষোলো, প্রহ্লাদের কুড়ি।

স্ত্রী রূপবতী, গুণবতী, বিদুষী—সর্বোপরি স্নেহময়ী। প্রহ্লাদ আকৃষ্ট হ'ল বৈ কি। যৌবনের জলতরঙ্গে নবদম্পতী চলল উধাও হ'য়ে আসক্তির পাল তুলে। পুত্রের ভক্তি তথা বৈরাগ্য এল ঢিমিয়ে। পিতা ফেললেন স্বস্তির নিশ্বাস।

বুদ্ধিমতী সাবিত্রী শুধু যে স্বামীর কোষ্ঠীর খবরে উদ্বিগ্ন হয়েছিল তাই নয়, আরো ত্রস্ত হ'য়ে উঠল দুদিন স্বামীর ঘর করতে না করতে। মেয়েরা যখন বিয়ের পরে স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসে তখনও তেমন অন্ধ হয় না—যেমন স্বামী হয় নবপরিণীতার সম্বন্ধে। স্বামীকে দেহ নিবেদন ক'রে বধূ ক্ষতিপূরণ পায় বরের মনকে স্ববশে এনে। এর পরে তাকে চিনতে বধূর বেশি দেরী হয় না। সাবিত্রী দুদিনেই আঁচ পেল স্বামী কী ধাতুতে গড়া। কারণ বিবাহের পরে প্রহ্লাদের ভক্তি ও বৈরাগ্যে ভাঁটা পড়লেও সময়ে সময়ে সে-হারানো উচ্ছ্বাসের ঢেউ পাড় ভাঙত তার বিবাহিত মনের সুখতটে—বিশেষ ক'রে নানা সংস্কৃত স্তোত্র পড়তে পড়তে। সাবিত্রীর বুক কেঁপে উঠত যখন স্বামীর মুখে শুনত শংকরাচার্যের:

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে
শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াঽপারে পাহি মুরারে ॥*

প্রহ্লাদকে বলত এ-সব না পড়তে। প্রহ্লাদ সব বুঝেও দুঃখ পেত স্ত্রী তার ব্যথার ব্যথী নয় ভেবে। ওদিকে সাবিত্রী দুঃখ পেত স্বামী তার দরদী হতে পারে না কেন বুঝতে না পেরে। কিন্তু এ-দুঃখের কথা বলবে কাকে—যখন যে ভর্তা সেই হতে চাইছে হর্তা—আর গৃহিণী কর্তাকে সুখী করতে চেয়েও পুরোপুরি সংসারী দাঁড় করাতে পারছে না? সচরাচর এ-খেদ সাবিত্রী দাবিয়ে রাখত, কিন্তু সময়ে সময়ে বেশি ভয় পেলে পুণায় যেত মার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

স্বামী মারাঠী হ'লেও কমলা দেবী মেয়ের সঙ্গে শুধু যে বাংলাতে কথাবার্তা কইতেন তাই নয়, আশৈশব তাকে বাংলা সাহিত্যের পাঠ দিয়ে সে-রসে রসিয়ে তুলেছিলেন। কমলা সব শুনে ভেবেচিন্তে সাবিত্রীকে উপদেশ দিলেন প্রহ্লাদকে বাংলা সাহিত্যের দিকে টানতে—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের অবনীবিলাসী কবিতার ইঞ্জেকশনের সহায়তায়। মার উপদেশ সাবিত্রীর মনে দাগ কাটল। সে স্বামীকে ধরল। ভাষা শেখার স্বাভাবিক মেধার প্রসাদে প্রহ্লাদ দেখতে দেখতে সাবিত্রীর সঙ্গে শুধু যে বাংলায় কথাবার্তা বলা সুরু ক'রে দিল তাই নয়, দুতিন বৎসরের মধ্যেই চমৎকার বাংলা শিখে নিল। ওদিকে গৌরীও মন্নুভাইয়ের এবং সাবিত্রীর সঙ্গে বাংলায় কথা ব'লে ব'লে চমৎকার বাংলা শিখে নিয়েছিল। সেও প্রহ্লাদকে বলল: "আমরা যতটা পারি বাংলায়ই কথা কইব, এমন ভাষা শিখতেই হবে।" ফলে সাবিত্রী, গৌরী ও প্রহ্লাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা আরো বেড়ে গেল। সাবিত্রী উৎফুল্ল হয়ে দিদি আর স্বামীকে শোনাত নানা ঐহিক রসের কবিতা ও গল্প, বিশেষ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের নানা

---

* আবার জন্ম আবার মরণ, আবার জননীগর্ভবরণ!
এই দুস্তর ভবপারাবার কাণ্ডারী কৃপাময়! করো পার!

প্রেমের গান : এ-জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি, প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়, তোমারেই ভালোবেসেছি আমি তোমারেই ভালবাসিব…ইত্যাদি। ওদিকে কমলাদেবী জামাইকে নানাছলে শোনাতেন রবীন্দ্রনাথের নানা বৈরাগ্য-বিমুখ কবিতা : মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়, আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে…ইত্যাদি।

দিনের পর দিন বিশেষ ক'রে সাবিত্রী ও কমলা দেবীর মধুর কণ্ঠে এই সব গান ও কবিতা শুনতে শুনতে প্রহ্লাদের মন একটু একটু ক'রে রসিয়ে উঠল ঐহিক আনন্দে। ওর সব চেয়ে ভালো লাগত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমগীতি, শরৎচন্দ্রের নারীস্তব ও রবীন্দ্রনাথের পৃথ্বীবাদ। স্বভাবে বরাবরই ছিল সে একান্তী, রোখালো—যখনই যা ধরবে শেষ পর্যন্ত না নিয়ে ছাড়বে না। তাই সাবিত্রীর মুখে নানা বিখ্যাত বাংলা গান শুনতে শুনতে ক্রমশঃ মনের আনন্দে সেসব গান নিজের ইচ্ছামত গাওয়া সুরু করল নানা সুর দিয়ে : রবীন্দ্রনাথের—তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে; দ্বিজেন্দ্রলালের—সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, রজনীকান্তের—তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা …ইত্যাদি।

প্রবচন আছে—মন ধোপাঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে নীল। অথ, প্রহ্লাদের মনও নিরন্তর বৈরাগ্য-বিমুখ কবিতা, গান ও গল্পের ছোঁয়াচে একটু একটু ক'রে ঐহিক রঙে রঙিয়ে উঠল। মনে হ'তে লাগল ক্রমশই যে বৈরাগ্যের পথ শূন্যবাদের পথ, সংসারে ভগবান্ আছেন—এই কথায় শ্রদ্ধেয় তথা বরণীয়, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি :

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী,
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল !
বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানি'
আদিহীন অন্তহীন কাল !

এই তো সত্যের সত্য, বাণীর বাণী। ভগবান্ এতবড় সংসারের আনন্দমেলায় দেয়ালি জ্বালিয়েছেন কি বনে জঙ্গলে গাঢাকা হ'য়ে জীবনের যাত্রীদের ব্যঙ্গ করতে—এ-সব মায়া বলে প্রাণোৎসবীদের দমিয়ে দিতে? ও সোচ্ছ্বাসেই গাওয়া সুরু করল :

রবীন্দ্রনাথের—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর !
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।…

কি দ্বিজেন্দ্রলালের—

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজো মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও ভেসে যাক শুধু
সাগরে জীবন তরণী !
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্যে
স্বর্গে উঠুক ধরণী।…

মহাদেবও তো এই-ই চাইছিলেন। পুত্রবধূর কাছে চুপি চুপি সব শুনে একান্তে তাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন : "এই-ই তো চাই মা! এই-ই হ'ল চিরকালের সত্য—মানুষ মানুষের মধ্যে থেকেই ভাষা শিখেছে, গান গেয়েছে, ভালোবেসে সার্থক হয়ে এসেছে—বনে জঙ্গলে শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পারে কেবল পশুপক্ষীকীটপতঙ্গের। তোমাকে আমি বরণ করেছিলাম কি সাধে? এক আঁচড়েই যে চিনে নিয়েছিলাম মা! তুমি এসেছ গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে, ওকে লক্ষ্মীছাড়া হ'তে দিও না।"

সাবিত্রী আনন্দে অধীর হ'য়ে শ্বশুরের পায়ে মাথা রেখে বলে : "না বাবা! কেবল আপনি আশীর্বাদ করুন—আমার নিজের আর কতটুকু শক্তি?

আনন্দে মহাদেবের চোখে জল এল, বললেন সাবিত্রীর মাথায় হাত রেখে : "আমি তো নিরন্তরই আশীর্বাদ করছি মা, তবে তোমার সহযোগ চাই, নৈলে হবে না। কেবল একটি কথা মা। মন্ত্রগুপ্তি চাই। সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে। ওকে আমি জানি তো : যেমন উদার তেম্নি সরল, যেমন ঝোঁকালো তেমনি নমনীয়। সব চেয়ে বিপদ এইখানেই—রোখালো মানুষ কানপাৎলা হ'লে যা হয়—ফুশ্‌লে ফাশ্‌লে তাকে যে-কেউ যে-কোনো দিকে ফেরাতে পারে। তাই তো তোমাকে পই পই ক'রে মানা করি সাধু সন্ন্যাসীদের আমল দিতে। খুব সাবধান!—এদের কোনো অছিলায় এ-তল্লাটে আসতে দিও না। আমার কুকুর নেই এই যা দুঃখ, নৈলে লেলিয়ে দিতাম মা, সত্যি বলছি। ওদের ছোঁয়াচ বড় সর্বনেশে। ওরা জাদু জানে। আমার এক বন্ধুর ছেলে এম্নি এক ভবঘুরে সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে বছর খানেক আগে। চিঠি লিখে

রেখে গেছে—তিব্বতে গিয়ে তার ভগবান্‌কে না পেলেই নয়। তাকে আবার প্রহ্লাদ বিষম ভালোবাসত। থেকে থেকে বলে—তাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। ও যদি একবার বিবাগী হয়—আর ফিরবে না মা, লিখে রাখতে পারো তুমি।"

সাবিত্রীর বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝেই থেকে থেকে রাতে প্রহ্লাদের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে: "আমাকে কথা দাও তুমি তিব্বতে যাবে না।"

প্রহ্লাদ হো হো ক'রে হাসে: "তিব্বতে? সে কি!"

সাবিত্রী নাছোড়বন্দ সুরে বলে: "কোথাও যাবে না আমাকে ফেলে—কথা দাও।"

প্রহ্লাদ গভীর স্নেহে তাকে চুম্বন ক'রে বলে: "তোমার সঙ্গে ঐ গানটা সেদিন গাইছিলাম মনে নেই—তোমার প্রিয় কবির? ঐ যে" ব'লেই গুণ গুণ ক'রে:

"আঁধারে আলোকে কাননে কুঞ্জে নিখিল ভুবন মাঝে
তাহার হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহার মুরলী বাজে।
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীর খানি:
আমার কুটীর রাণী সে যে গো, আমার হৃদয়রাণী।"

ব'লে থেমে হেসে: "কেবল এখানে একটু বদ্‌লে গাইতে হবে প্রহ্লাদী সংস্করণে:

আমার কুটীর রাণী দেহতে—আমার গীতির রাণী।"

সাবিত্রী (গৌরবে সোহাগে গ'লে গিয়ে স্বামীর বুকে মাথা রেখে): ঠিক্। কেবল মনে রেখো। দেহ ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে যেও না—যাবে না, কথা দাও।

প্রহ্লাদ (চিবুক ধ'রে সাদরে): ফের মনে করিয়ে দিলে তাঁর গান—আহা, কী প্রেমের গানই তিনি বেঁধে গেছেন!

(ফের সুর ক'রে)

লোকালয় বন বিহনে লো তোর, গৃহে
আমি রে উদাসী,
তোরে কাছে ল'য়ে সংসার ত্যজিয়ে বনে
আমি গৃহবাসী।

তাছাড়া তোমাকে ফেলে যাব কোন্ চুলোয় বলো দেখি?

সাবিত্রী (গাঢ়কণ্ঠে): আমাকে কাছে ডেকে দূরে ঠেলবে না, ঠেলবে না, ঠেলবে না—তিন সত্যি করো।

প্রহ্লাদ (হাসিমুখে): দূরে ঠেলব এমন সাধ্য থাকলে তবে তো—কবি বলেন নি কি আমারই মুখের কথা টেনে —(সুর ক'রে):

তুমি বাঁধিয়ে কী দিয়ে রেখেছ হৃদি এ
পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে!
এ কী বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর,
চিরবাঞ্ছিত কারা এ!

সাবিত্রী (স্বামীর বুকে মুখ ডুবিয়ে): যাও যাও—জানা আছে! মনে নেই দুদিন আগেও কী সব মোহ-মুদ্‌গরী শেল হেনেছিলে আমার বুকে—

(ঠোঁট বেঁকিয়ে সুর ক'রে)

নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্॥

মা গো মা! বিয়ের পরে এম্‌নি শাসিয়েই বৌয়ের প্রেমের মৌচাক ভাঙতে হয় বটে!

প্রহ্লাদ (হার মেনে হেসে): এবার এক হাত নিয়েছ, মান্‌ছি। তবে বৌয়ের মৌচাক কী ভাবে শোধ তুলল সেটাও একবার ভেবে দেখো মায়াময়ী! এ-হেন জন্মবৈরাগীও শুধু যে গৃহী হ'ল তাই নয়, হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ী প'রে কয়েদী হ'য়ে স্রেফ্ বিধিলিপি উল্টে দিল, গাইল—

(সুর ক'রে)

সে কে? মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার
শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে!
সে কে? হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদিপ্রহেলিকা মাঝে!"

* * *

এমনি ক'রে ওদের দিনগুলি কেটে যায় যেন স্বপ্নের ঢেউয়ে রঙের পাল তুলে—"নিদাঘে নিশীথে ভোরে আধজাগা ঘুমঘোরে।" প্রহ্লাদের কৈশোরে-জাগা বৈরাগ্য যৌবনের জোয়ারে ভেসে গেল, প্রেম এসে বৈরাগ্যের চোখে নবাঞ্জন পরালো—ধূসর সব কিছুই হ'য়ে উঠল রঙিণ।

কেবল থেকে থেকে স্বপ্নে দেখে একটি উজ্জলকান্তি বৃদ্ধকে। কখনো তিনি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, কখনো বা কীর্তন গেয়ে চলেন ভাবাবেশে। শ্বেত শ্মশ্রু, শুভ্র কেশ, গৌরকান্তি। সংসারী বলা যায় না, অথচ সন্ন্যাসের কোনো ভেকই নেই—না অঙ্গে গেরুয়া, না কণ্ঠে

রুদ্রাক্ষ। সাদা ধুতি, সাদা চাদর, সাদা উপবীত। আর মাত্র একদিন তো নয় যে বলবে স্বপ্নের জল্পনা! তিন বৎসরে দেখল তাঁকে অন্ততঃ সাত আট বার। তাঁর গানও শুনল, কিন্তু কী গান—কিছুতেই মনে করতে পারে না।

সাবিত্রী প্রহ্লাদের কাছে ওর শ্বশুরের পরামর্শের কথা লুকোলেও সাবিত্রীর কাছে প্রহ্লাদ কিছুই লুকোতো না, তাই বলত প্রতিবারই স্বপ্নের কথা, আর সাবিত্রীর বুক উঠত কেঁপে। সে যে শুনেছিল সন্ন্যাসীর ভস্মের ও ভবিষ্যদ্বাণীর কথা যে, ছেলে মহাভক্ত হবে; শুনেছিল ৺শাশুড়ীর স্বপ্নে তুকারামকে দেখার কাহিনী—প্রহ্লাদ গৌরব ক'রেই করত সে-গল্প—তার পরেই প্রহ্লাদের আবির্ভাব। মনে পড়ত প্রহ্লাদের কোষ্ঠীর কথা: সে ভোগী নয়—যোগী। ভয় পেয়ে স্বামীকে আরো জড়িয়ে ধরে বলত: "আমাকে ঐ গানটা শেখাও না, লক্ষ্মীটি!—তোমার নিজের সুরে—ঐ

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার
অতীত গণি
আমি আঁধারে পথের ধুলার মাঝারে কুড়ায়ে
পেয়েছি মণি।"

প্রহ্লাদ (ওর গালে ঠোনা দিয়ে): স্বপ্নের কথা শুনেই এত ভয়? ছি ছি। তাছাড়া তোমার রক্ষাকবচ কি খুলে ফেলেছি, না হারিয়ে গেছে?

চার

বিপত্নীক মহাদেবের শূন্য গৃহে যেন নতুন ক'রে আনন্দ-মেলা বসল। গৃহলক্ষ্মীর দেহান্তের পরে তিনি আর আশা করেন নি সেখানে নতুন সংসার কোনোদিন পাতা হবে—ভাঙা হাটে আবার সুখের দেয়ালি হাসবে।

আর সুখ ব'লে সুখ! প্রহ্লাদ দিনে দিনে হ'য়ে উঠল শুধু কি দিব্যকান্তি! তার উপরে কী অপরূপ কণ্ঠ। যখন নানা আসরে মহাদেব পুত্রের সঙ্গে গিয়ে জাঁকিয়ে ব'সে রাগালাপ সুরু করতেন, তখন প্রায়ই মাঝপথে গলার তান থামিয়ে পুত্রকে ইসারা করতে না করতে সে অসমাপ্ত তানকে শেষ করে শোম্-এ পৌঁছে দিত, আর সমজদারেরা করত জয়ধ্বনি। মহাদেবের বুক উঠত দশ হাত হ'য়ে প্রতিভাধর পুত্রের দিগ্বিজয়ী কণ্ঠকলাপে।

কিন্তু বিধাতার এ কী লীলা! সব দিয়েও বঞ্চিত করলেন!—প্রহ্লাদ রইল নিঃসন্তান। মহাদেব সময়ে সময়ে পুত্রকে হেসে বলতেন: "ওরে বাবা! ভীষ্ম মহাভারতে বলেছেন বটে—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিনী গৃহম্ উচ্যতে'—আমি হলে পাদপূরণ করতাম—গৃহিণ্যা অধিকঃ পুত্রঃ নরকাং খলু মুঞ্চতে।" (স্ত্রীর চেয়েও পুত্র বড়-সে নরক থেকে ত্রাণ করে ব'লে)

কিন্তু মুখে হাস্কামি করলে কী হয়, মনের অতলে দুশ্চিন্তার তাঁর অবধি ছিল না। সন্তানই তো সংসারের সার, খামখেয়ালের খুঁটি। অপুত্রক হ'লে ফের সেই বৈরাগ্য ওর দেখা দেবেই দেবে। আড়ালে সাবিত্রীকে বলতেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে: "মা! এ হাসির কথা নয়, কান্নার কথা। রোজ প্রার্থনা করবে গৃহদেবতার কাছে, তোমার কোল জুড়ে আসুক একটি আনন্দ গোপাল। তার নামও আমি ঠিক ক'রে রেখেছি—দেবকুমার। কিন্তু সংসারের সব আয়োজনই বিফল, যদি নয়ন থেকেও নয়নানন্দের দেখা না মেলে।"

সাবিত্রীর মন দুঃখে শঙ্কায় কালো হ'য়ে আসে—সন্ধ্যায় রোজ গৃহদেবতা বিঠোবা ও রুক্মিণীর যুগলমূর্তির সামনে প্রার্থনা করে আকুল হ'য়ে: "ঠাকুর! সব দিলে, কেবল যেন শেষ রক্ষা হয়—তীরে এসে ভরাডুবি না হয়।"

কিন্তু বিধাতা মুখ তুলেও হাসলেন না, চোখ মেলেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন যেন। সংসার স্বচ্ছল হ'ল; প্রতিভাধর পুত্রের নামডাক হ'ল; পুণাতেও পিতাপুত্রের প্রতিপত্তি দেখতে দেখতে বানের জলের মতন ফুটে উঠল—প্রহ্লাদ বাংলা গান গেয়ে বাঙালী সমাজেও সমাদৃত হ'ল—সাবিত্রী যা অনেক দিন থেকেই চাইছিল। গ্রামোফোনেও তার ওস্তাদি গানের জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠল—সবই হ'ল, কেবল ঐ একটি অভাবে সব বৈভবই হ'য়ে দাঁড়ালো যেন ছায়াবাজি! আর এ তো যেমন-তেমন অভাব নয়—সংসারে থেকেও সংসারী হ'তে না পারা—যেন সাঁতার দিতে না পারা সত্বেও জলচারী হওয়া—উদ্বেগ কেটেও কাটে না, শান্তি এসেও আসে না। বিবাহের পর পাচ পাঁচটি বৎসর কেটে গেল—কত ডাক্তার বৈদ্য ধাত্রী

দেখানো হ'ল কিন্তু নিয়তি : কেন বাধ্যতে—প্রহ্লাদ রইল অপুত্রক। ডাক্তারেরা একবাক্যে বললেন—মেয়ে বন্ধ্যা। সাবিত্রীর মুখের আলো নিভে আসে ধীরে ধীরে—আরো স্বামীর মুখে তার স্বপ্নে-দেখা মহাপুরুষের কথা শুনে। গৃহদেবতার পায়ে শুধু মাথা কোটে রোজ সাঁঝসকালে: "সব দিয়ে নিঃস্ব কোরো না ঠাকুর! দাও একটি ছেলে।"

পাঁচ

ওদিকে গৌরীও ছিল নিঃসন্তান। কিন্তু সে ডাক্তার বৈদ্য দেখাল না। পাঁচবৎসর স্বামিসহবাসের পর একদিন হঠাৎ কাশী চ'লে গেল। সেখান থেকে সাবিত্রীকে লিখল এক মস্ত সাধুপুরুষের আশ্রমে পরমানন্দে আছে। মাস তিনেক পরে যখন দেহুতে ফিরল তখন তার মুখে এক অপূর্ব আভা! সাবিত্রীর সন্দেহ হ'ল, গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: "ব্যাপার কী দিদি? কী হয়েছে?" গৌরী হেসে বলল: "এখনো বলবার সময় হয়নি। আরো দুদিন যেতে দে।"

সাবিত্রী প্রহ্লাদকে বলল একথা। সে কৌতূহলী হ'য়ে মনুভাইকে গিয়ে শুধালো। মনুভাই ঠোঁটে আঙুল রেখে মৃদুস্বরে বলল: "বলা বারণ।"

(মনুভাইয়ের মাতৃভাষা ছিল বাংলা, পিতৃভাষা গুজরাতী। তাই সে গৌরী, প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীর সঙ্গে বাংলায়ই কথা কইত।)

প্রহ্লাদ: "কে বারণ করেছেন শুনি? না, তাও বলা মানা?"

মনুভাই (একটু চুপ করে থেকে): বলতে পারি যদি তুই কথা দিস কাউকে বলবি না। কারণ বললে গৌরী আর রক্ষে রাখবে না। She will raise hell!

প্রহ্লাদ: আঃ। কী নাটুকেপনা শুরু করেছ দাদা! বলোই না খুলে। না না, আমি বলব না কাউকে—বলব না, বলব না, বলব না—তিন সত্যি করছি—হ'ল?

মনুভাই (এদিক ওদিক চেয়ে): গৌরী স্নানে গেছে নদীতে। তাকে বলিস নি কিন্তু—হয়েছে কি, ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম কাশীতে—জানিস তো? সেখানে ছিলাম এক গ্র্যাণ্ড সাধুপুরুষের আশ্রমে। তাঁর খুব নামডাক। অঢেল শিষ্য! শুনি নাকি হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট মহাপুরুষ—সমাধিতে নাকি দেবদেবীর সঙ্গে সমানে গালগল্প করেন। গৌরী জানিসই তো চিরদিনই ধর্মধর্ম করে পাগল একেবারে crazy fanatic। ও দীক্ষা না নিয়ে ছাড়ল না।

প্রহ্লাদ (চমকে): দীক্ষা? তোমার আবার কবে থেকে গুরুবাদে বিশ্বাস এল শুনি? ভূতের মুখে আবার রামনাম?

মনুভাই (দোরের দিকে তাকিয়ে): বিশ্বাস করবার পাত্র নয় এ-ভূত। তবে গিন্নির মন রাখতে এ-সংসারে ভান-ভঙ্গি করতে না হয় কাকে বল্? তোকেও কি শাশুড়ী আর বৌয়ের হুকুমে বাংলা ভাষায় টিয়াপাখী হ'তে হয় নি রাধাকৃষ্ণ বুলি কপ্‌চাতে? (গম্ভীর হ'য়ে) না ঠাট্টা নয়—সত্যিই ওর বিশ্বাস দেখে আমার মন একটু ভিজেছে বৈ কি। তাই গিন্নি দীক্ষা নিতে না নিতে কর্তাকেও বইতে হল তল্পি—toeing the line। নিতে হল মন্ত্র 'সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ'—জানিস তো—হা হা হা!

প্রহ্লাদ (বিরক্ত হ'য়ে): সাধুদের সম্বন্ধে এ-ধরণের হাসিমস্করা ভালো নয় দাদা!

মনুভাই (সুর বদলে): না না, ওভাবে বলিনি আমি কথাটা। কারণ সত্যিই বিষ্ণু ঠাকুর একজন জাঁদরেল সাধু রে—নৈলে কি তাঁর এত বোল্‌বোলা হয়—বাইরে সাধু, ভিতরে আছেন রাজার হালে—making the best of both world যাকে বলে।

প্রহ্লাদ: ফে—র! শোনো, বাজে কথা রাখো। আমার জিজ্ঞাস্য—দিদি দীক্ষা নেওয়ার কথা এত গোপন করতে চায় কী দুঃখে? এ তো আনন্দের কথা দাদা!

মনুভাই (জানালায় মুখ বাড়িয়ে): গৌরী এখনো জপ করছে নদীতে—ঐ দেখ্। তাই শোন্ বলি—কিন্তু ওকে বলিস নে খবর্দার! বলবার জন্যে আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলী করছে—

প্রহ্লাদ (হেসে): তুমি দাদা, যেমন ভণ্ড তেম্‌নি পেট-আলগা—না জানে কে? তাই অ্যাপলজি ছেড়ে বলো—না না, আমি গৌরীর কাছে ফাঁস করব না, করব না, করব না—তিন সত্যি করছি আবার। কত হলপ করব?

মনুভাই (সুর নামিয়ে): ব্যাপার কী জানিস? বিষ্ণু ঠাকুর—মানে, ওর গুরুদেব—না ঐ সঙ্গে আমারো গুরু বৈ কি—কাশীতে রাজত্ব করছেন আজ দশ বৎসর। গুজব

এই যে তাঁর আশীর্ব্বাদে খোঁড়া এভারেষ্ট পার হয়, বন্ধ্যারও সন্তান হয়। গৌরী চাপা মেয়ে—তবু জানিস তো মনের খেদ মেয়েরা চেপে রাখতে পারে না—তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বকে সময়ে সময়ে ছেলে ছেলে ক'রে। She's the limit!

প্রহ্লাদ: শুনেছি সে কথা সাবিত্রীর কাছে। কিন্তু এসব ফালতো কথা রেখে—

মনুভাই: ফালতো কথা মানে? প্রোলোগ না হ'লে গল্পের পাট বসে? ও ছেলে ছেলে করে বলেই তো দীক্ষা নিয়েছে। মানে দীক্ষা হ'ল means to an end, আর কি।

প্রহ্লাদ (বিরক্ত): মিথ্যুক। দিদি অনেক দিন থেকেই গুরু খুঁজছে।

মনুভাই (আতপ্ত): মিথ্যুক! বললেই হ'ল? আমি জানি না না কি? ও যদি শুধু সদ্‌গুরুই চাইত, তাহ'লে কি ছুটত কাশী? পুণায় পন্ধবপুরে নাসিকে কি সব গুরু ম'রে গেছে নাকি? না। ও যেমন তেমন গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে চায় নি—চেয়েছিল বিষ্ণু ঠাকুরকেই গুরু করতে—তাঁর আশীর্বাদে সন্তানও মিলবে এই ভরসায়। To kill two birds with one stone—এও বুঝলি না?

প্রহ্লাদ: তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না দাদা! যাহোক বলো শুনি: তারপরে?

মনুভাই: তার পরে আর কি? বিষ্ণু ঠাকুর আর যাই হোন, ভণ্ড টণ্ড নন। মাদুলি ভস্ম তুকতাক এসবের পাট নেই তাঁর আশ্রমে। করতেন শুধু—আশীর্বাদ, আর দিতেন একটু গঙ্গাজল। ব্যস্‌। তা গঙ্গাজল তো আমরা সবাই খাই, না হয় সাধুর দেওয়া গঙ্গাজলই একটু মুখে দেওয়া গেল—থুড়ি, আমার নয়—গৌরীর—কারণ গর্ভ হবার কথা তার, আমার নয়।

প্রহ্লাদ (হেসে): কী যে বাজে ফাজলামি! কিন্তু সে যাক। কিন্তু এই যদি ব্যাপার, তা'হলে এর জন্যে এত চুপ্‌ চুপ্‌ কেন শুনি? সত্যিই তো আর গঙ্গাজলে ছেলে হয় না।

মনুভাই (স্বর নিচু ক'রে): হয় রে হয়। বিশ্বাস করতে কি আমিই চেয়েছিলাম। তবে দুই আর দুয়ে চার হয় দেখে কী করে বলি পাঁচ? Seeing is believing—বলে না?

প্রহ্লাদ: ফের ঠাট্টা?

মনুভাই: না ভাই—সত্যি। তবে দেখিস কাউকে বলে ফেলিস নে don't blab for mercy's sake!—কাল ধাত্রী আসবে শেষ কথা বলতে—তবে সন্তান ওর গর্ভে এসেছে একথার মার নেই।

ছয়

প্রহ্লাদ কিন্তু কথায় কথায় সেদিন রাতেই সাবিত্রীকে ব'লে ফেলে। আর যাবে কোথায়? সাবিত্রী রুদ্ধশ্বাসে পরদিন সকালেই মহাদেবকে গিয়ে খবর দেয়। মহাদেব চ'টে উঠে বললেন: "যত সব বাজে গুজব—কুসংস্কার! গঙ্গাজলে ছেলে! দূর্‌ দূর্‌। বিশ্বাস করো না মা এসব আষাঢ়ে গল্প। সাধুরা এই সব ফিকিরের জোরেই পরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি আরামে থাকে। এ-সব গুরুদের ফন্দিবাজি, আজকের দিনে না জানে কে বলো? ওদের ছায়া মাড়ালেও সর্বনাশ হবে, মনে রেখো।"

সাবিত্রী এ-যাত্রা প্রথম প'ড়ে যায় দোটানায়। ওর মন চায় বিশ্বাস করতে যে, সাধুদের আশীর্বাদে সন্তান আসে, আসে বন্ধ্যা মার গর্ভেও—যেমন শাশুড়ীর গর্ভে এসেছিল—কিন্তু ওদিকে সাধুদের ছোঁয়াচে যদি 'সর্বনাশ' হয়—কে বলতে পারে? ভয়টাও তো অমূলক নয়!

পুরো দুদিন দোমনা হয়ে থেকে শেষে আর পারে না, গৌরীর কাছে এসে সোজা দরবার করে। গৌরী ভ্রূকুটি ক'রে বলে মনুভাইকে দেখে নেবে—যে কথা দিয়ে কথা রাখে না—আবার কথায় কথায় মেয়েদের ঠেশ দিয়ে বলা যে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না ইত্যাদি। সাবিত্রী ভয় পেয়ে বলে: "তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি—দাদাকে কিছু বোলো না। উনিও কথা দিয়েছিলেন তাঁর কাছে যে কাউকে বলবেন না। এখন সব ফাঁশ হ'লে আমাকেই শুনতে হবে পাঁচ কথা। লক্ষ্মী দিদি, আমার ঘাট হয়েছে—আমি কাউক্কে বলি নি—"

গৌরী (হেসে): কেন মিথ্যে বলছিস বউ? মামাবাবুকে বলিস নি তুই?

সাবিত্রী (অপ্রস্তুত): তিনি কাউক্কে বলবেন না।

গৌরী: কী ক'রে জানলি? জানিস না সাধু সন্নিসি তাঁর চক্ষুশূল? তিনি নিশ্চয় তোকে বলেছেন এসব গুরুঠাকুরদের কারসাজি—বলেন নি?

সাবিত্রী (উদ্বিগ্নকণ্ঠে): বলেছেন দিদি। কিন্তু কী হবে এখন? অপরাধ যখন করে ফেলেছি। (বলেই চোখে আঁচল)

গৌরী (প্রশমিত): আচ্ছা আচ্ছা—হয়েছে। কাঁদিস নে। শোন্ এ-শুভদিনে কি চোখের জল ফেলতে আছে?

সাবিত্রী (সকৌতূহলে জলভরা চোখে হেসে): শুভদিন? তবে খবরটা সত্যি দিদি?

গৌরী: হ্যাঁরে হ্যাঁ—সত্যি। কাল পুণা থেকে এক ধাত্রী এসেছিল, সে ব'লে গেছে—প্রায় তিন মাসের হয়েছে।

সাবিত্রী: কী আনন্দ দিদি? (একটু থেমে) আচ্ছা দিদি, তিনি কি তুকতাক জানেন? পুরিয়া টুরিয়া বা ভস্ম টস্ম—

গৌরী (কপালে দুহাত জোড় ক'রে উদ্দেশ্যে নমস্কার ক'রে): অমন কথা বলতে আছে? তিনি মহাপুরুষ—সাক্ষাৎ দেবতা। যাঁর শুধু আশীর্বাদেই সব হয়, তিনি তুকতাক করতে যাবেন কেন বল্? তিনি এমন কি ভুলেও বলেন না যে—তিনি কোনো কিছুরই কর্তা। তাঁর একটি প্রিয় গান—

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ, তুমি রথী—যেমন চালাও তেমনি চলি।

তুই তো জানিস এ-গানটা।

সাবিত্রী: জানি ভাই, কিন্তু—মানে—গাই না আর আজকাল।

গৌরী (হেসে): কেন? পাছে প্রহ্লাদ ঘর ও ঘরণী ছেড়ে বোম বোম করতে করতে গুরুকে সারথি ক'রে নিজে উল্টো রথ হ'য়ে দাঁড়ায়?

সাবিত্রী (মুখ নিচু ক'রে): বাবা যে বলেন সাবধান হ'তে দিদি! কী করব বলো?

গৌরী (একটু চুপ করে থেকে): তোরা কি প্রহ্লাদকে এভাবে আগলে রাখতে পারবি বৌ? বেশী চাপ দিলে উল্টো উৎপত্তিই হয়। ভয় করলেই ভয় বেশি চেপে ধরে—জানিস না কি?

সাবিত্রী উদ্বিগ্ন: কী করব বলো না দিদি? আমি কি কিছু বুঝি?

গৌরী: মামাবাবুকে একটু বোঝাতে চেষ্টা কর্ যে, সাধুর আশীর্বাদে কখনো অমঙ্গল হয় না। এই তো আমি গুরুদেবের আশ্রমে তিনমাস থেকে এলাম, স্বামীও সঙ্গে ছিলেন প্রায় দেড়মাস। আমরা কি সেখান থেকে ফিরে এসেছি, না নৈমিষারণ্যের গুহায় গিয়ে নাক টিপে ব'সে আছি ঘর বাড়ি ছেড়ে?

সাত

ওরা চমকে ওঠে। মহাদেব চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলেন: "ফিশফিশ ক'রে দুই চক্রীতে কী চক্রান্ত করা হচ্ছিল শুনি?"

গৌরী উঠে হাসিমুখে বলল: "আসুন মামাবাবু। বসুন। কতদিন পায়ের ধুলো পড়েনি আপনার জানেন? এগার দিন। গত পূর্ণিমার পরে আর আসেন নি। আজ একাদশী।"

মহাদেব (সভ্রূভঙ্গে): তুই বুঝি একাদশী সুরু করেছিস কাশী থেকে ফেরবার পরে?

গৌরী: ঠিক একাদশী নয়—ফল ও মিষ্টি খাই দুবেলা। ফল বলতে মনে পড়ল: কাশী থেকে গুরুদেব খুব ভালো আম পাঠিয়েছেন—বসুন কেটে আনি।

মহাদেব: না না। এখন আম খেলে আর দুপুরে কিছুই খেতে পারব না। তোদের মতন যখন তখন খেলে কি আমাদের সয় রে? না, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম—কেবল ভাবছি সোজা জিজ্ঞাসা করব, না ঘুরিয়ে?

গৌরী: আমি কি খুব বাঁকা মেয়ে মামাবাবু? তবে আমি জানি আপনি কেন আজ হঠাৎ এ-সময়ে এসেছেন। বৌয়ের কথা বিশ্বাস হয় নি, না?

মহাদেব: বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। তবে জানতে চাই কথাটা সত্যি কি না?

গৌরী (মুখ নিচু ক'রে): সত্যি।

মহাদেব (একদৃষ্টে তাকিয়ে): আমাকে বলিস নি কেন এতদিন।

গৌরী (চোখ তুলে): এ-জেরার সুর কেন মামাবাবু—যখন এসব কিছুই আপনি বিশ্বাস করেন না?

মহাদেব (বিরস কণ্ঠে): না, করি না। কারণ গুজবে বিশ্বাস করা আমার স্বভাব নয়।

গৌরী (একটু চুপ ক'রে থেকে): যদি বলি—গুজবের মধ্যেও অনেক সময় সত্যের দেখা পাওয়া যায় ?

মহাদেব: না, যায় না। কারণ এসব ভণ্ড তপস্বীরা ভেল্কি দেখিয়ে বা তুকতাকের জোরে গোবেচারিদের যে ভাবে ধাপ্পা দেয়, তার মধ্যে সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে না।

গৌরী: না জেনে মানী লোকের অপমান করতে নেই মামাবাবু।

মহাদেব: অপমান মানে? এ যুগে—

গৌরী: শুনুন মামাবাবু, ভেল্কিওয়ালারা গোবেচারিদের ধাপ্পা দেয় এইই একমাত্র সত্য নয়। বুদ্ধিমান্ শেয়ানরাও যোগী তপস্বীদের মধ্যে এমন অনেক কিছু দেখেছেন যা তাঁরা মানতে বাধ্য হয়েছেন—এযুগেও।

মহাদেব: ডিশমিশ। আমি চাই প্রমাণ—data, তথ্য।

গৌরী: শুধু তথ্য প্রমাণ নিয়ে কী হবে মামাবাবু, যখন মহাপুরুষদের কাছে চাইলে পাওয়া যায় আরো ভারিক্কি বস্তু।

মহাদেব (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে): আরো ভারিক্কি বস্তু? কী শুনি?

গৌরী: তত্ত্ব।

মহাদেব: তত্ত্ব? তোর কি গুরুকরণ ক'রে রাতারাতি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

গৌরী: মাথা খারাপ আমার হয় নি মামাবাবু। হয়েছে আপনার মাথা গরম। নৈলে এমন ইঙ্গিত করতেন না যে, আপনি যা দেখেন নি, তা আর কেউই দেখে থাকতে পারে না—কিম্বা দেখে থাকলেও তার নাম ভেল্কি, তুকতাক।

মহাদেব (আতপ্ত): ভেল্কি নয় তো কী শুনি? গঙ্গাজলে বন্ধ্যার সন্তান হয় এও মানতে হবে? আকাশে গাছ হয় কখনো?

গৌরী: যদি বলি হয়?

মহাদেব: কী? আকাশে গাছ?

গৌরী: না। বন্ধ্যার সন্তান—সাধুর আশীর্বাদে।

মহাদেব (রুষ্ট): ননসেন্স! যত সব হাম্বাগ্!

গৌরী (শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে): মামাবাবু রাগ করতে চান করুন—কিন্তু প্রহ্লাদের মন সাধু সন্ন্যাসীর দিকে সহজেই ঝোঁকে ব'লে তাঁদের অকারণ গালিগালাজ করবেন না লক্ষ্মীটি! সাধুনিন্দা করার প্রত্যবায় আছে—বিশেষ করে গুরুদেবের মতন মহাপুরুষের নিন্দা—যিনি শুধু নির্ভেজাল সাধুই নন—তার উপর সত্যি মহাত্মা—উদার, জ্ঞানী, দীনবন্ধু।

মহাদেব: ফুঃ! জ্ঞানী হ'লে কি তিনি বলতেন যে, তাঁর দেওয়া গঙ্গাজলে বন্ধ্যা মেয়ের গর্ভে সন্তান আসে?

গৌরী: তিনি একটিবারও এমন কথা বলেন না। তবে যাদের গর্ভে সন্তান এসেছে তাঁর আশীর্বাদী গঙ্গাজলে, তারা যদি এজাহার দেয়?

মহাদেব: বাজে বকিস নি। তুই দেখেছিস এমন কোনো মেয়েকে?

গৌরী (একটু চুপ ক'রে থেকে): যদি ধরুন আমার নিজের কথা বলি?

মহাদেব: তুই কি সত্যিই ক্ষেপে গেলি গৌরী? এই সেদিনও বম্বের একজন মস্ত ডাক্তার ব'লে গেলেন আমাকে যে তুই আর বৌমা বন্ধ্যা।

গৌরী: তবে শুনুন মামাবাবু। কাল এক ধাত্রী এসেছিল। বৌকে সেই কথাই বলছিলাম—তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। কেবল অনুরোধ আপনি নিজে বিশ্বাস করতে না চান—থাকুন নিজের অবিশ্বাস নিয়ে। কেবল আমার সামনে আমার গুরুনিন্দা করবেন না—দুটি পায়ে পড়ি।

ব'লে প্রণাম ক'রেই চোখে আঁচল দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মহাদেব খানিকক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে ব'সে রইলেন, তারপর সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "ব্যাপার কী বৌমা?"

সাবিত্রী (মুখ নিচু ক'রে): দিদি পেয়েছে যা চাইছিল।

মহাদেব (বিস্মিত): সত্যি? ঠিক জানো?

সাবিত্রী (মৃদু স্বরে): ধাত্রীকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

* * *

সেদিন রাতে মহাদেবের চোখে ঘুম আসতেই চায় না। কত কী যে হিজিবিজি চিন্তা!...এ কখনো হয়? গৌরী বন্ধ্যা—একাধিক ডাক্তার ও ধাত্রীর মুখে শুনেছেন

তিনি স্বকর্ণে। দূর! অনেক বৎসর বাদে কখনো কখনো তো এম্‌নিতেও মেয়েদের সন্তান হয় হঠাৎ। তাঁর নিজের স্ত্রীরই তো হয়েছিল। সেই সন্ন্যাসীর ভস্ম আর গঙ্গাজলের কথা মনে প'ড়ে যেতেই সে-চিন্তাকে সরিয়ে দিলেন। মানুষ যা দেখতে বা শুনতে চায় না তাকে দাবিয়ে রেখে বা সোজা ডিশমিশ ক'রে ভাবে পার পাবে। কিন্তু হায় রে পার পায় না, সার হয় শুধু অশান্তি—মনের ভারের দরুণ। মহাদেবের মন ভার হ'ল। তখন রুখে উঠে অন্য যুক্তি পাড়লেন। যদি গৌরী সত্যিই গর্ভবতী হ'য়ে থাকে, তবে বলতেই হবে ডাক্তার ভুল ক'রে গৌরীকে বন্ধ্যা বলেছিল—এমন তো কতই ভুল হয় ডাক্তারের। To err is human, নয় কি? তবু মনের কোণে সংশয় যায় না। পুণার তুহুজন মস্ত ধাত্রীও বলেছিলেন—গৌরী বন্ধ্যা। শুধু ডাক্তারই তো নয়। তবে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে প'ড়ে দেখলেন স্বপ্ন। গৌরীর ঘরে আজই দেখেছিলেন ফটো—বিষ্ণু ঠাকুরের। স্বপ্নে দেখলেন অবিকল সেই মূর্তি—গৌরকান্তি, সাদা চুল, সাদা দাড়ি।

চেঁচিয়ে উঠলেন ভয়ে।

প্রহ্লাদ ও সাবিত্রী পাশের ঘর থেকে ছুটে এল: "কী বাবা!"

মহাদেব বিব্রত স্বরে বললেন: "কিছু না, এম্‌নি একটা বাজে স্বপ্ন···যা ঘুমো গে।"

আট

মহাদেব পরদিন উঠেই মনুভাইকে তলব করলেন। মনুভাই এসে প্রণাম করতেই বললেন: "বোসো বাবা। বিশেষ কথা আছে।"

মনুভাই: জানি, গৌরী বলেছে কালই।

মহাদেব: বলেছে তো। কিন্তু সত্যি, না কল্পনা?

মনুভাই (চটুল হেসে): কল্পনা নয় স্যর! এ-যাত্রা আমাদেরই হার। The faithful have won.

মহাদেব (একটু চুপ ক'রে থেকে): মানে—তোমার বিশ্বাস হয়েছে?

মনুভাই: বংশরক্ষা হ'তে চলল—তবু বিশ্বাস হবে না স্যর? ঐ—গৌরীও এসেছে—কিছু বলতে চায় আপনাকে।

গৌরী ও সাবিত্রী ঘরে ঢুকতেই মহাদেব বললেন: "এসো মা। কেবল···মানে···ভুল হয় নি তো ধাত্রীর?"

সাবিত্রীই ও'র হ'য়ে জবাব দিল: "না বাবা! আজ সকালে উনি টেলিফোন করছিলেন নিজে। ধাত্রী বলেছে—ভুল হ'তেই পারে না।"

মহাদেব (স্তম্ভিত): কিন্তু···কী বলো মনুভাই?

মনুভাই (চটুল হেসে): আপনার ভাষায় বলতে হ'লে—ব্যাখ্যা প'ড়েই আছে—মানে, কাকতালীয়—coincidence; তবে কাক আসুক বা না আসুক, তালটা যে পড়েছে এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই স্যর্।

গৌরী: একটা কথা বলব মামাবাবু?

মহাদেব: কী?

গৌরী: রাগ করবেন না—কথা দিন আগে।

মহাদেব: কী এমন কথা শুনি?

গৌরী: অনর্থক কেন এত কষ্ট সইছেন, মামাবাবু? বৌকে একবার কাশী পাঠিয়ে দিয়েই দেখুন না। আমার মনে হয় তাতে সব দিক দিয়েই ভালো হবে।

মহাদেব: কী যে বাজে বকিস? তিনি কি প্রজাপতি না কি—যে গঙ্গাজলের জাতুতে যত ইচ্ছে প্রজা সৃষ্টি করতে পারেন? সাক্ষাৎ দক্ষ, না স্বয়ম্ভুব মনু?

মনুভাই: স্যর্! আমি স্বভাবে পাষণ্ড, জানেনই তো। কিন্তু এযাত্রা irreverent হওয়া সত্ত্বেও একটু নাজেহাল হ'য়ে পড়েছি ব'লেই বলছি—এত ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি···মানে গুরুদেব—নাগা সন্নিসি নন। আমাদেরই মতন সংসারী—স্বচক্ষে দেখে এসেছি। শুধু স্ত্রী নয়, একটি ছেলেও আছে তাঁর—বারো তেরো বছরের। আমাকে বলেছেন যে তিনি গৃহস্থাশ্রমে বিশ্বাস করেন। (গৌরীকে) কার গল্প করছিলেন মহাভারত থেকে?

গৌরী: শ্বেতকেতু আর সুবচনার। শান্তিপর্বে পাবেন মামাবাবু। বলছিলেন—শ্লোকতুটি আমি মুখস্থ করেছি আপনাকে বলব ব'লে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন:

ভর্তা চ তাম্ অনুপ্রেক্ষ্য নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতঃ।
পরমাত্মনি গোবিন্দে বাসুদেবে মহাত্মনি॥
সমাধায় চ কর্মাণি তন্ময়ত্বেন ভাবিতঃ।
কালেন মহতা রাজন্ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥

সাবিত্রী (সকৌতুহলে): মানে কি দিদি?

গৌরী : মানে খুব সোজা বৌ। গুরুদেব বলেন— আমাদের শাস্ত্রে নানা মুনিই বিধান দিয়েছেন যে, স্বামী স্ত্রী যদি ভগবানের কথা ভেবে তন্ময় হ'য়ে নিত্যকর্ম তাঁকেই নিবেদন ক'রে সংসার চালায়, তাহ'লে শেষরক্ষা হবেই— মানে, পরমা গতি অবধারিত—যেমন হয়েছিল এই ধর্মপ্রাণ দম্পতীর। তাই বলি মামাবাবু অকারণ কেন ভয় পাচ্ছেন ? প্রহ্লাদও চায় সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ। রাশ ক'ষে ক'ষে কতদিন অনিবার্যকে ঠেকিয়ে রাখবেন ? তার চেয়ে ছেড়ে দিয়েই দেখুন না একবার।

মহাদেব : তুই কি বলতে চাস—বৌমা কাশী গিয়ে তোর গুরুদেবের কাছে দরবার করলেই পাবে যা চাইছে ?

গৌরী : আমি তো পাগল হইনি মামাবাবু যে, এমন কথা বলব এত জোর ক'রে। তবে এতে যখন লোকসান হবার কোনো আশঙ্কা নেই—তা ছাড়া তিনি যখন খাঁটি সাধু—বহুলোকের মঙ্গল করেছেন সবাই জানে—তখন তাঁর আশীর্বাদে শুধু প্রহ্লাদেরই সর্বনাশ হবে—এ কখনো হ'তে পারে ?

মহাদেব (একটু চুপ ক'রে থেকে) : আচ্ছা, তোরা যা, আমি একটু ভেবে দেখি।

* * *

কয়েকমাস বাদে যথাকালে গৌরীর জন্মাল একটি মেয়ে। কী সুন্দর শিশু···কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—আর রং যেন ফেটে পড়ছে···দুধে আলতায় মেশানো।

প্রহ্লাদই ওর নাম দিল···রমা। বলল : এমন লক্ষ্মী প্রতিমার কি আর কোনো নাম মানায় ?

[ক্রমশঃ

দুটি দিন

হাসিরাশি দেবী

আবার দিনের সূর্য্য অন্ধকার রাতের পাহাড়
পার হ'য়ে দেখা দিল। চারিদিককার
নীল আর হলুদ-সবুজে,—
আর একদিনের চেনা ফেরে খুঁজে খুঁজে
আজকের মন।
হয়তো এ বৃথা !—অকারণ,—
তবুও তা ভাল লাগে,—করি অনুভব,—
আর এক দিনের হাসি, অশ্রু আর
আনন্দ-উৎসব।

সেদিনের আলোছায়া, সেদিনের সবুজ সে ঘাস,
সকাল দুপুর ছোঁয়া দিনান্তের
নিঃশঙ্ক আশ্বাস
কী এক মায়ায়—
ভুলে-থাকা মনটাকে ছুঁয়ে চলে যায়।
হঠাৎ চমক লাগে। এক ঝাঁক পাখী যেন উড়ে—
চ'লে যায় দূর থেকে দূরে।
ওদের ডানায়,—
যেন কি সুরের রেশ ! তার ছেঁড়া স্মৃতির বীণায়
হঠাৎ আঘাত করে। হঠাৎ মনের কোন নদী—
বালির বাঁধন ভাঙ্গে। বদ্ধস্রোত ফিরে পায় গতি।

তবু এদিনের সূর্য্য ভেদ করে রাত্রির জঠর
আবার উদয় হ'ল। আবার রথের পরে তার
জয়ের নিশান দেখি। মনে হয় সাত রং দিয়ে—
আবার সে দিয়ে যাবে এ মাটি ভরিয়ে।

শিল্প-বিরোধ ও শিল্পে শান্তি

শ্রীসমর দত্ত

শিল্পে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ট্রেড্ ডিস্‌পিউট এ্যাক্ট (Trade Dispute Act) নামে আইন প্রণোদিত হয়। তারপর অনেকগুলি ছোট ছোট প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনের সৃষ্টি হয়। অবশেষে শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট এ্যাক্ট (Industrial Dispute Act) নামে রচিত একটি যুগান্তরকারী আইন বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। শিল্পবিরোধ মীমাংসা এবং ভবিষ্যৎ বিরোধের পথ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে এই আইনটির পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। যেমন (ক) ওয়ার্কস কমিটি (খ) বোর্ড অব কনসিলিয়েশন (গ) কোর্ট অব ইনকোয়ারী এবং (ঘ) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইবুনাল।

উপরোক্ত আইন অনুসারে শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রথম পর্য্যায়ে ওয়ার্কস কমিটির কাজের ব্যবস্থা আছে। এই কমিটির কাজ—বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার উপায় উদ্ভাবন করা এবং বিবাদের জন্য শিল্পে যাতে কাজের অবনতি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। এ বিষয়ে ওয়ার্কস কমিটির চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কনসিলিয়েশন অফিসারদের ওপর বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা এবং এরপরও যদি বিরোধের অবসান না হয় তাহলে রেল, খনি, তৈল, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি শিল্পের বিরোধ—বোর্ড অব কনসিলিয়েশনের নিকট প্রেরিতব্য হয়। এতেও যদি বিরোধের নিষ্পত্তি না হয় তা-হলে কোর্ট অব ইন্‌কোয়ারী এবং তারপর শিল্পবিরোধ ট্রাইবুনালের নিকট বিবাদ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি বিচারের জন্যে পাঠাতে পারা যায়। কনসিলিয়েশন বোর্ডে না পাঠিয়েও সরকার বিবাদটিকে সরাসরি শিল্প ট্রাইবুনালের নিকট বিচারের জন্য পাঠাতে পারেন। জনকল্যাণমূলক কর্ম্মে শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য এই প্রক্রিয়াগুলি বাধ্যতা-মূলক এবং অন্যান্য কর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে এগুলি স্বেচ্ছামূলক।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে আলোচ্য মূল আইনটির সঙ্গে বহু সংশোধনী ধারা যুক্ত হয়েছে। ১৯৫০ সালের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট (এ্যাপেলেট ট্রাইবুনাল) এ্যাক্ট অনুসারে আপীল ট্রাইবুনাল গঠিত হতে পারতো। শ্রমিক-আদালত (Labour Court), শিল্প আদালত (Industrial Court), এবং শিল্প-ট্রাইবুনাল (Industrial Tribunal) রোয়েদাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষ বিবাদমূলক বিষয়গুলির পুনর্বিবেচনার জন্য আপীল করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সংশোধনী ধারার বলে আইনটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউটস্ (এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাণ্ড মিসলেনিয়াস প্রভিসনস্) এ্যাক্ট (Industrial Disputes Amendment and Miscelleneous Provisions Act) নামে রূপান্তরিত হয়। এই এ্যাক্ট আপীল ট্রাইবুনাল বাতিল করে দেয় এবং শ্রমিক আদালত (Labour Court), শিল্প-আদালত (Industrial Tribunal) ও জাতীয় ট্রাইবুনাল (National Tribunal) গঠনের নির্দ্দেশ দেয়।

১৯৫৬ সালের উল্লিখিত নতুন আইন অনুসারে বিরোধের গোড়ার দিকের ছোট ছোট অভাব অভিযোগ দূরীকরণের ভার শ্রমিক-আদালতের ওপর দেওয়া হয়েছে। এই এ্যাক্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তপশীলে বর্ণিত বিরোধ-গুলি অর্থাৎ বেতন, বোনাস, কাজের সময়, ছাঁটাই ইত্যাদি সম্বন্ধীয় দ্বি-পাক্ষিক দ্বন্দ্ব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইবুনাল কর্তৃক মীমাংসিত হ'বার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির কর্ম্ম এবং দায়িত্ব জাতীয় ট্রাইবুনালের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

এ কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৯৪৭

খৃষ্টাব্দের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট এ্যাক্ট নামে সুপরিচিত আইনটি শিল্প-বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। যদিও আইনটির অন্তর্গত কতকগুলি গলদ শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ সুসম্পন্ন করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি এই আইনটির আনুকূল্যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তীকাল থেকে প্রথম কয়েক বৎসর শিল্প-বিরোধ ক্রমশঃ কমে এসেছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বোক্ত সংশোধিত আইনটি মূল আইনের গলদগুলি দূর করার পরিবর্ত্তে আরো অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্য ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত বিরোধের সংখ্যা কিভাবে বেড়েছে নিম্নোদ্ধৃত পরিসংখ্যান থেকে সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে।

বৎসর	বিরোধের সংখ্যা
১৯৫৬	১২০৩
১৯৫৭	১৬৩০
১৯৫৮	১৮৩৪
১৯৫৯	১৫৩১
১৯৬০	১৫৫৬

উপরোক্ত তালিকা পাঠে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত বিরোধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। কিন্তু ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে অপেক্ষাকৃত কমে গেছে। অবশ্য ১৯৫৬ সালের পরিসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে বিরোধের সংখ্যা কমেনি। কিন্তু ১৯৫৭ সাল অর্থাৎ যে সালে সংশোধিত নতুন আইন জন্ম নিল—ঠিক তার পরবর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে বিরোধের সংখ্যা কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার কারণ যথাস্থানে আলোচিত হবে। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার শিল্প-বিরোধ আইনের যে সংশোধন করেন সেটাকে সংশোধন না ব'লে একটা নতুন আইন বলাই যুক্তিসঙ্গত। কি নীতির দিক থেকে, কি বিধি-বিধানের দিক থেকে, এটা প্রায় একটা নতুন আইনের মত। একথা অনস্বীকার্য্য যে শ্রমিকের সুবিধার জন্য আগেকার শিল্প-বিরোধ আইনের মধ্যকার অনেকগুলি অসুবিধা বর্ত্তমান আইনে দূর করা হয়েছে। যেমন—ট্রাইবুনাল ব্যবস্থাকে নিখুঁত ও সক্রিয় করার জন্য তিন ধরণের ট্রাইবুনাল; বিনা নোটিশে কোন শ্রমিকের কার্য্য ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করার বিধান; ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনের অধিকার স্বীকার; আইনভঙ্গকারী মালিকের শাস্তি-বিধানের জন্য আর্থিক জরিমানা ছাড়াও কারাদণ্ড বিধানের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি। শ্রমিক স্বার্থের দিক থেকে এগুলি সবই ভাল। কিন্তু এই কতকগুলি ভাল ব্যবস্থার অন্তরালে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এমন কতকগুলি মারাত্মক বিধি-বিধান রাখা হয়েছে, যার ফলে সামগ্রিক বিচারে এটি মালিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে ব'লে মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আইনের পরিবর্ত্তিত ৩৩ ধারা সবচেয়ে মারাত্মক। কোন শিল্প-বিরোধ ট্রাইবুনালের বিচারাধীন থাকা কালীন অবস্থায় বিরোধ-সংশ্লিষ্ট কোন শ্রমিককে মালিক বরখাস্ত করতে পারবেন না। যদি তা করতে হয়, তাহলে আগে ট্রাইবুনালের অনুমতি নিতে হ'বে। শিল্প-বিরোধ আইনের ৩৩ ধারায় এই বিধান থাকায় বিরোধরত শ্রমিকেরা মালিকের প্রতিশোধ স্পৃহার হাত থেকে এতদিন রক্ষা পেয়ে এসেছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মালিক এই বিধান অমান্য ক'রে শ্রমিকের ওপর প্রতিশোধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন এবং যদিও ট্রাইবুনালের কাছ থেকেও সব সময় শ্রমিকেরা সুবিচার পায়নি. তবুও এই আইনের নৈতিক সমর্থন শ্রমিকদের পক্ষে থাকায় মালিকদের আক্রমণ অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের দাবি ছিল এই আইনটিকে আরও ক্রটিহীন করা – যাতে মালিক পক্ষ কোন রকমেই শ্রমিকের ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারে।

কিন্তু নতুন আইনে ঠিক উল্টো ব্যবস্থা করা হোলো। বর্ত্তমান ৩৩ ধারা অনুযায়ী ট্রাইবুনাল চলাকালীন ও বিরোধসংশ্লিষ্ট শ্রমিকের কার্য্যব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করার বা তাকে বরখাস্ত করার অধিকার মালিককে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি সর্ত্ত অবশ্য আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সর্ত্তগুলি দ্বারা শ্রমিকের পূর্ব্ব অধিকার রক্ষিত হয় নি। যেমন—বরখাস্তের পরই বরখাস্তের কাজটি অনুমোদনের জন্য ট্রাইবুনালের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। আগে অনুমোদন নিয়ে তবে বরখাস্ত নয়। আগে বরখাস্ত করে তারপর বরখাস্ত অনুমোদনের জন্য

বিচার বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। বরখাস্ত ছাড়া অন্য ব্যবস্থায় অর্থাৎ শ্রমিকের কাজের পরিবর্ত্তন করতে চাইলে (অর্থাৎ ডিপার্টমেণ্ট বদল, মজুরি সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন বা অন্য কিছু) তাও মালিক ট্রাইবুনালের বিনা অনুমতিতে করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সর্ত্ত হয়েছে ষ্টাণ্ডিং অর্ডার অনুসারে এ পরিবর্ত্তন করতে হবে। এই সর্ত্তটিও অর্থহীন। কারণ ট্রাইবুনাল বসুক বা না বসুক, ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার অনুযায়ী কাজ সর্ব্বদাই মালিককে করতে হয়। তাই এই সর্ত্তদ্বারা নতুন কিছু সুবিধা শ্রমিকেরা পায়নি। বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রশ্নেই উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করার অধিকার মালিককে দেওয়া হয়েছে, বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে আগেকার মতই ট্রাইবুনালের অনুমতি-সাপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে।

এই সর্ত্তটি আপাতদৃষ্টিতে ভাল, কিন্তু এটিও মস্ত বড় একটি ফাঁকি।

৩৩ ধারার রক্ষাকবচটি আগেছিল বিরোধ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের জন্য। এখন সেটা করা হয়েছে বিরোধ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জন্য। এই পরিবর্ত্তনের সুযোগ নিয়ে বিরোধ-সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে বিপর্য্যস্ত করার চেষ্টা মালিক সহজেই করতে পারবেন। আগের আইনে সে সুযোগ মালিকের ছিল না। এই রকম একটি সুযোগের জন্যই মালিকেরা বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। নতুন আইনের মাধ্যমে সরকার তাঁদের সেই সুযোগ দিয়ে দিলেন।

এর পরের কথা হচ্ছে রক্ষাপ্রাপ্ত (protected) শ্রমিকদের জন্য নতুন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন না করে পুরাণো ব্যবস্থাই চালু রাখা। এটি অবশ্য মন্দের ভাল। ইউনিয়নের কিছু কর্ম্মীও যদি এই আক্রমণাত্মক ধারা থেকে রক্ষা পায়, তা মন্দ কি ? কিন্তু ভালর সঙ্গে সঙ্গে একটা মন্দও এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। এটি হচ্ছে—এই ব্যবস্থাকে উপলক্ষ করে শ্রমিকদের মধ্যে একটি বিভেদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল কথনই এড়িয়ে যাবে না। রক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক হিসেবে কাদের গণ্য করা হবে, এই প্রশ্ন নিয়েও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল শ্রমিক-ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাতে ইতস্ততঃ করবে না।

বরখাস্তের ব্যাপারে এই রকম একটা সর্ত্ত আছে যে, বরখাস্ত শ্রমিককে এক মাসের মাহিনা দিতে হবে। কিন্তু বরখাস্ত করা যাবেনা, আর একমাসের মাহিনা দিয়ে বরখাস্ত করা চলবে—এ দুটো এক জিনিষ নয়। একমাসের মাহিনার বিনিময়ে কোন শ্রমিকই চাকুরী খুইয়ে আনন্দ অনুভব করেনা। নতুন আইনে আপীল ট্রাইবুনালের অস্তিত্ব বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে! এই ব্যবস্থা শ্রমিক-স্বার্থের পরিপন্থী। যদিও আপীল ট্রাইবুনালের শুনানী এবং রায়দান দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর অর্থব্যয়সাপেক্ষ, তথাপি বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ন্যায়বিচার লাভের জন্য আপীল ট্রাইবুনাল বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এতে এক ট্রাইবুনালের ভুল ও অবিচারের বিপক্ষে আর এক ট্রাইবুনালের কাছ থেকে সুবিচার পাবার সম্ভাবনা থাকে।

শুধু এই নয়। এই সংশোধিত আইনবলে সরকার ট্রাইবুনাল প্রদত্ত রায়টির রদবদল করতে পারেন। এমনকি রায়টিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিলও করে দিতে পারেন।

সংশোধিত নতুন আইনের এই তো গেল সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। এখন আসল কথা আলোচনা করা যাক্।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট এ্যাক্টের সবচেয়ে যেটি বড় গলদ, সেই গলদটাই সংশোধিত আইন দ্বারা দূরীভূত হয়নি। বাধ্যতামূলক মালিকের সাহায্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধজনিত সমস্যার সমাধান করাই হোলো ১৯৪৭ সালের আইনের উদ্দেশ্য। এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার জন্য বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও এই আইনটি সম্প্রতিকালে অখ্যাত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আপোষ-আলাপ-আলোচনা ও স্বেচ্ছামূলক-সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংশোধিত আইনে বাধ্যতামূলক সালিশের দ্বারাই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধুনিক কালে বাধ্যতামূলক সালিশের দ্বারা শিল্পবিরোধ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ ধরণের বিরোধের জন্য বাধ্যতামূলক সালিশের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বাধ্যতামূলক সালিশই শিল্পবিরোধ মীমাংসার প্রকৃষ্ট পন্থা। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে জিনিষটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—তা হোলো বিরোধ-বিহীন শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা। (অবশ্য বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে)। দ্বিপাক্ষিক

আলাপ-আলোচনায় অথবা স্বেচ্ছামূলক সালিশী ব্যবস্থায় এই সহযোগিতা আনা সম্ভব। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষ পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা উপলব্ধি করে শিল্প সম্বন্ধীয় কোন সমস্যার সমাধানের জন্য একটি যৌথ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। এতে যৌথ-কল্যাণের রুদ্ধপথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক সালিশের ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি তো হবেই না, বরং দুই পক্ষের মধ্যে বৈরীভাবাপন্ন উত্তেজনার আগুনের তেজ ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে।

স্বেচ্ছামূলক সালিশী সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতি অস্পষ্ট না হলেও বলিষ্ঠ নয়। সরকার অবশ্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে শিল্পবিরোধের সংখ্যা কমিয়ে এনে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বেতন বৃদ্ধি প্রশ্নেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধের সূত্রপাত হয়ে থাকে। সেই জন্য সরকার বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। ওয়েজেস্ কমিটি (Wages Committee) এবং ষ্টাডি গ্রুফ অন ওয়েজেস্ (Study Group on Wages) এর কাছ থেকে মূল বেতন নির্ণায়ক কতকগুলি সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক প্রকার শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারণের জন্য ত্রি-পাক্ষিক বেতন বোর্ড (Tripartite Wages Board) প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে যে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে যুক্ত ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠিত হবে এবং এর ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যস্থ ব্যবধান ক্রমশঃ দূর হয়ে গিয়ে সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯৫৮ সালের মে মাসে নৈনিতালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে (16th Session of Tripartite Indian Labour Corfereuce) শ্রমিক এবং মালিকদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ কর্ত্তৃক একটি আচরণ বিধি (Code of Discipline) গৃহীত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষের দায়িত্ব ও অধিকার এই কোডে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বর্ত্তমান তিক্ত সম্বন্ধ দূর করে শান্তি এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্টার জন্য শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি মেনে নিয়েছেন :—

(ক) শিল্পসম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে একতরফা কর্ম্ম পন্থা গ্রহণ করা চলবে না ; নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে শিল্প বিরোধের মীমাংসা করতে হবে।

(খ) শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া বর্ত্তমান সেই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে যত শীঘ্র সম্ভব বিরোধের মীমাংসা করতে হবে।

(গ বিনা নোটিশে ষ্ট্রাইক অথবা লক-আউট করা চলবেনা।

(ঘ) শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে শিল্পসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে কিংবা অভাব-অভিযোগজনিত বিরোধ অথবা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হলে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা কিংবা স্বেচ্ছামূলক সালিশের সাহায্যে মতভেদ দূর অথবা বিরোধের মীমাংসা করতে হ'বে।

কোন পক্ষই বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন, পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না অথবা কর্ম্ম সম্পাদনের গতি হ্রাস করবেন না।

(চ) উভয় পক্ষ মামলা-মকর্দ্দমা, ষ্ট্রাইক এবং লক-আউট এড়িয়ে চলবেন।

(ছ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্য উভয় পক্ষ সচেষ্ট থাকবেন।

(জ) উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এমন কর্মপন্থা গৃহীত হবে, যার ফলে অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং দ্রুত মীমাংসিত হওয়া সম্ভব হয়।

(ঝ) উভয় পক্ষই বিভিন্ন পর্য্যায়ে অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের কর্ম্মব্যবস্থা মেনে চলবেন এবং এমন কোন স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করবেন না যাতে গৃহীত কর্ম্মব্যবস্থা অমান্য করা হয়।

(ঞ) উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের লোকদের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলবেন।

যে কথা আগেই বলেছি যে ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত বিরোধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের তুলনায় কমে গেছে। এই কমে যাবার কারণ আচরণ-বিধির প্রতি উভয় পক্ষের আনুগত্য প্রদর্শন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ শ্রমিক সম্মেলনে (19th

Session of the Tripartite Indian Labour Conference) ভারতের শ্রমমন্ত্রী এই কথা ঘোষণা করেন যে আচরণ-বিধি বিভিন্ন শিল্পে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে কর্ম্মদিবসের অপচয়ও অনেকাংশে কমে গেছে। কর্ম্ম দিবসের অপচয় কেমনভাবে কমেছে, নিম্নলিখিতপরিসংখ্যান থেকে তা অনেকটা বোঝা যাবে :—

	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১
প্রথমার্দ্ধে—	৪৭	৩১	২৯	১৬
দ্বিতীয়ার্দ্ধে—	৩১	২৫	১৯	—

(উপরোক্ত সংখ্যাগুলি লক্ষের অঙ্কে)

যদি আচরণ-বিধি দু'তরফ থেকে আন্তরিক ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহলে পারস্পরিক ভয়, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস দূর হয়ে গিয়ে আলাপ-আলোচনার পথ সুগম হয়ে যাবে ব'লে মনে হয়।

এমনিভাবে দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন এবং শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে ভারত-সরকার সচেষ্ট, কিন্তু আমাদের দেশের জনসমাজের ভেতর এখনও জাতীয়তাবোধ, সামাজিকতাবোধ ও পরার্থপরতাবোধ সম্যকরূপে আসেনি। এজন্য সমাজের উপর তলার মানুষের সঙ্গে সমাজের নীচের তলার মানুষের একাত্মানুভূতি, আত্মিক সংযোগ ও সৌহার্দ্দ্য নেই। তাই কথায় কথায় এদেশে ধর্ম্মঘট হয়, কল-কারখানা লক-আউট ক'রে দেওয়া হয়, কর্ম্মবিশৃঙ্খলতার দ্বারা বিপন্নতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে সব দেশে সামাজিক সচেতনতা আছে, সেই সব দেশের মানুষেরা মূলেই সর্ব্বপ্রকার বিরোধ মিটিয়ে নেয়, আর জাতীয় উন্নয়নের পথ রচনায় অংশ গ্রহণ করে। ফলে সেই সব দেশের শিল্পে শান্তি সচরাচর ক্ষুণ্ণ হয় না। শিল্পে শান্তি স্থাপনের জন্য সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা প্রশংসনীয় হোলেও তাঁরা আইনের দ্বারা এর বাঁধন শক্ত করেন নি। এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখা উচিত নয়। পূর্বোল্লিখিত স্বেচ্ছা-মূলক সালিশী প্রবর্ত্তন যতদিন না এ দেশে আইনানুগনীতিতে প্রচলিত হয়, ততদিন ভারতবর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে বিরোধ উচ্ছেদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পুর্নরূপে সম্ভব হ'বে ব'লে মনে হয় না।

পঞ্চানন্দ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবন-সমাজ-বদ্ধ সামাজিক মানস বিহার
মুক্তির বিহঙ্গ নয় উদাস বৈরাগ্যময় মনে,
বিশ্বের অমৃত তীর্থে যে আনন্দ শাশ্বত চিন্তার
তাই যেন খণ্ড দেশে কালাতীত মহিমা গ্রহণে।

বিদেশীর পুঁজিবাদী শাসনের দাপটেই দিন
উনিশ শতকে ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতে স্থির,
শুধু দিন যাপনের প্রাত্যহিক জীবন আসীন
আলোকিত আনন্দের বার্ত্তা বক্ষে বঙ্কিম বাণীর।

জীবনের সমাজের গলিত পথের ধারে যেন
কটাক্ষ রেখেছে ধরে পঞ্চানন্দ পঞ্চেন্দ্রিয় লোকে
আসন্ন প্রলয় বুঝে তাই কথা নানান বলেন
বঙ্গবাসী তৃপ্ত হলো সে বাণীর গভীর আলোকে।

হৃদয়ের সাধু ধর্ম নিত্য সত্য জীবন যাত্রার
বিচিত্র বোধের ব্যঙ্গে সচেতন জাতীয় আত্মার।

---

* ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত।

স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

(১০)

একদিন রাজা পারিষদসহ কদম্বতলায় স্নিগ্ধছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। তিনি বহুক্ষণ তাঁর প্রেয়সীর চিত্রের দিকে তাকিয়েছিলেন, তারপর হঠাৎ স্তব্ধতাভঙ্গ করে বললেন, "রসকোষ, এ এক নারী মূর্তি। কিন্তু নারী বিষয়ে তো আমি কিছু জানি না। বলো তো নারীর প্রকৃতি কেমন?" রসকোষ স্নিগ্ধ হেসে বলল, মহারাজ, আপনি এই প্রশ্ন মহারাণীর জন্যে রেখে দিন। কারণ, বড় কঠিন প্রশ্ন। নারী সত্যি বড় সাংঘাতিক জীব, অদ্ভুত উপাদানে তৈরী। আমি প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করছি, শ্রবণ করুন—

"আদিকালে ভগবান্ স্রষ্টা যখন নারী সৃষ্টি করতে গেলেন তখন দেখলেন—পুরুষ সৃষ্টি করতেই তিনি সব উপাদান নিঃশেষ করে ফেলেছেন। বড় চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি নিলেন পূর্ণ-চন্দ্রের চন্দ্রিমা, লতার বঙ্কিমতা, আকর্ষীর আকর্ষকতা, তৃণের কম্প্রতা, কঞ্চির কৃশতা, কুসুমের প্রফুল্লতা, পত্রের লঘুতা, করী-করের ক্রম-কৃশতা, হরিণীর স্নিগ্ধ প্রেক্ষণতা, ভ্রমর-কুলের নিবিড়তা, রবিকরের আনন্দ, মেঘের অশ্রু, পবনের চপলতা, শশকের ভীরুতা, ময়ূরের অহংকার, তোতা-পাখীর বুকের কোমলতা, উদ্ধক্তের কঠিনতা, মধুর মিষ্টতা, বাঘিনীর ক্রূরতা, অগ্নির উষ্ণ-প্রখরতা, কোকিলের কণ্ঠ-মাধুর্য, সারসের শঠতা, চক্রবাকীর বিশ্বস্ততা—এই সকল মিশিয়ে তিনি নারী সৃষ্টি করলেন। তারপর পুরুষের হাতে অর্পণ করলেন সেই নারীকে। কিন্তু কয়দিন পরে পুরুষ ফিরে এল। বলল, 'প্রভো, তুমি যে নারী আমাকে দিয়েছ, সে যে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সে অনবরত কলকল করে, আমার সহ্যের অধিক পীড়ন করে, আমাকে এক মুহূর্তও একা থাকতে দেয় না। অনবরত সে চায় আমার সেবা, আমার সব সময় নষ্ট করে দেয়। উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করে, গড়াগড়ি যায়—আলস্যে সময় কাটায়। তাই আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমি আর তাকে নিয়ে বাস করতে পারছি না।'

স্রষ্টা বললেন, 'তথাস্তু'। তিনি ফিরিয়ে নিলেন নারীকে। এক সপ্তাহ পরে পুরুষ আবার ফিরে এল, বলল, 'প্রভো, আমি অনুভব করছি জীবন আমার বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে—যখন আমি নারীকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন আমার মনে পড়ছে, সে কেমন নাচত, কেমন গান করত, অপাঙ্গদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত, আমার সঙ্গে খেলা করত, আমায় জড়িয়ে ধরে থাকতো। তার হাসিতে ছিল সঙ্গীতের মূর্ছনা, কত মধুর ছিল তার স্পর্শ। তাকে আবার আমায় ফিরিয়ে দাও প্রভো।'

ভগবান্ আবার ফিরিয়ে দিলেন নারীকে। কিন্তু

আবার তিন দিন পরে পুরুষ ছুটে গেল ভগবানের কাছে। বলল, 'প্রভো, এ যে কী আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু সকলের শেষে আমি সিদ্ধান্তে পৌছেছি—নারী যত না আনন্দ দেয় তার চেয়ে যন্ত্রণা দেয় অনেক বেশী, তাই প্রভো, দয়া করে তাকে তুমি ফিরিয়ে নাও।' ভগবান স্রষ্টা ক্রুদ্ধ হলেন, আদেশ করলেন, 'এক্ষুনি চলে যাও। আমি আর এ ছেলেমানুষি সহ্য করতে পারছি না। তুমি যে ভাবে পারো—তাকে নিয়ে থাক।' পুরুষ অনুনয় করল, 'প্রভো, আমি যে আর তাকে নিয়ে থাকতে পারছি না।' স্রষ্টা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তুমি তাকে ছেড়েও তো থাকতে পারনি!' তারপর তিনি মুখ ফেরালেন অন্য দিকে, নিজের কাজে মন দিলেন। পুরুষ ভাবতে ভাবতে ফিরে এল, 'কী করি? আমি তাকে নিয়েও থাকতে পারছি না, তাকে ছাড়াও থাকতে পারছি না।' এই বলে চুপ করল রসকোষ।

এ অভিজ্ঞতা প্রায় সব পুরুষের জীবনেই কোন না কোন সময়ে এসে যায়। ডাঃ ধ্রুব সেনের অবস্থাও তাই হল। মৌলি যখন ঝগড়া করে ছেলে দুটিকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল, ধ্রুব ভেবেছিল, বেশ হয়েছে। এখন নিরিবিলি পড়াশোনা, আর রুগী নিয়েই আনন্দে দিন কেটে যাবে, যাচ্ছিলও তাই। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই একটা বেদনা-বোধ তার মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। মনে পড়তে লাগল, মৌলির প্রথম যৌবনের কথা। প্রত্যেক কথা ছিল তখন তার কাকলি, দৃষ্টি ছিল কটাক্ষ, ক্রোধ ছিল অভিমান। তার চোখে জল দেখলে ধ্রুবর বুক ভেঙ্গে যেত। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি। মৌলি হোষ্টেলে থেকে পড়ত। তার ছুটিতে বাড়ী ফিরে আসার দিনগুলির জন্যে কেমন অধীর হয়ে থাকত ধ্রুব। শ্বশুর বাড়ীর কথা মনে পড়লেই আবার তার খারাপ লাগত। সেই মধুর দিনগুলিকে ম্লান করে দিত তার শাশুড়ীর আচরণ। তিনি মৌলিকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার প্রশ্রয় দিতেন। মৌলির প্রতি ধ্রুবর গভীর ভালোবাসাকে যেন ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন। সেই ঈর্ষা ধীরে ধীরে জঘন্য আকার ধারণ করল। ধ্রুবর প্রতি মৌলির ভালবাসাকে যেন কীটের মত খেতে লাগল। রাগ বেড়ে যায় শাশুড়ীর উপর, আবার অনুরাগ বেড়ে যায় মৌলির জন্যে। কিন্তু রাগ বা অনুরাগ কোনটাই প্রকাশ করার ক্ষমতা ধ্রুব সেনের নেই। বাহির থেকে তাকে যতই ধীর স্থির দেখা যেত না কেন—অন্তরে ছিল তার প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভই সকলের অলক্ষ্যে ধ্রুব সেনের সর্বাঙ্গ কী করে বিকল করে দিল কেউ বুঝতেও পারল না।

অনেক রকম চিকিৎসা হ'ল ধ্রুব সেনের। নিজে সে ভাল চিকিৎসা করত। কিন্তু নিজের অবস্থা নিজে সে কিছুই বুঝতে পারল না। অ্যালোপ্যাথিক্ বড় বড় সব ডাক্তারই তার চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হল না। তার মা কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক, হেকিমী, তান্ত্রিক কোন চিকিৎসাই বাকী রাখলেন না। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে গেল। ছয় মাসে ধ্রুবর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল উদাসভাবে তাকিয়ে থাকত, আর তার চোখ বেয়ে জল পড়ত। কথায়ও ক্রমে ক্রমে জড়তা এসে গেল। শেষে আবার অ্যালোপ্যাথিক্ ডাক্তারের ডাক পড়ল। ডাঃ জীবন সরকার ধ্রুবকে আগে থেকে জানতেন। ধ্রুবর অধ্যাপক ছিলেন তিনি। দেখে শুনে তিনি মৌলি আর ছেলে দুটিকে এনে ধ্রুবর কাছে রাখতে বলে গেলেন। শুনেই ধ্রুব দুর্বল জড়িত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল। তবু ধ্রুবের মা বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র দ্বারা ছেলের অসুখ, রোগের কঠিন অবস্থা ও ডাক্তারের নির্দেশের কথা জানিয়ে দিলেন।

বেহানের চিঠি পড়ে শোনাল সঞ্জয় পাঞ্চালী ও মৌলিকে। জ্বলে উঠল পাঞ্চালী দেশলাইএর কাঠির এক খোঁচায় যেন। 'কোন দরকার নেই, যেতে হবে না! ওদের প্যাকামির কথা শোনার দরকার নেই।' সঞ্জয়ের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি। 'গেলে বাঁচা যায়। ডাইভোর্সের খরচটা করতে হবে না।' কত কথা রাগের মাথায় বলে যাচ্ছিলেন তিনি। মৌলি কেমন একটা মৃদু প্রতিবাদ করল, 'দোষ কি একবার দেখে এলে, ক্ষতি কি?' সঞ্জয় তক্ষণি সমর্থন করলেন, 'ক্ষতি হবে কেন? দেখতে যাওয়াই তো উচিত।'

'ও বাপে মেয়েতে ইতিমধ্যেই সব স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যেদিন যাবে সেদিনই ফিরে আসতে হবে। সেখানে রাত কাটাতে পারবে না।'

মৌলি বলল, 'তাই হবে'।

সঞ্জয় পাঞ্চালীকে বলল, 'তোমাকেও তো কিন্তু যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, আমি তো যাবোই, নইলে তোমাদের সকলকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে আনবে কে?'

দুটি ছেলেকে নিয়ে মৌলি মা ও বাপসহ সেইদিনই বিকালে শ্বশুরবাড়ী ফিরে এল। ধ্রুবর অবস্থা দেখে তার মনটা কেমন গলে গেল। ধ্রুব নড়তে পারছে না, ছেলেদের দিকে, মৌলির দিকে, সকলের দিকে তাকিয়ে কেবল চোখের জল ফেলছে। কথা বলছে অস্পষ্ট। মৌলি তার শিয়রের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, পাঞ্চালী শুধু বার বার ছেলে দুটিকে টেনে নিয়ে নিজের কাছে কাছে রাখতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। পাঞ্চালী উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের হাব-ভাব তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। একটা ভারী গলায় আদেশ করলেন তিনি—'দেরী হয়ে যাচ্ছে। চল এক্ষুণি।' তাকালেন সঞ্জয় ও মৌলির চোখের দিকে। মৌলি মিনতির স্বরে বলল, 'আমার না গেলে হয় না?' একটা অস্বাভাবিক চীৎকারে ফেটে পড়লেন পাঞ্চালী—'আমায় সবাই মিলে ফাঁকি দিচ্ছে? যেতে হবে না কারও। আমি একাই যাব।' বলে প্রচণ্ড পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ক্রোধে তাঁর মাথায় তখন রক্ত উঠে গিয়েছে। হঠাৎ ধপাস করে পড়ে গেলেন। দেয়ালে মাথা ঠুকল। দেহ লুটিয়ে পড়ল মেজেতে। মৌলি, সঞ্জয়, আর মৌলির শাশুড়ী চীৎকার করে তাঁকে গিয়ে ধরল।

একটা আকস্মিক উত্তেজনায় ধ্রুব বিছানা থেকে কেমন করে দরজা পর্যন্ত উঠে গেল সকলের অলক্ষ্যে, তার পর শাশুড়ীর নাড়ী পরীক্ষা করে কাঁপানো গলায় বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে।'

ছমাস ধরে সে অবশাঙ্গ, শয্যাশায়ী, একটি আকস্মিক ঘটনার আঘাতে তার কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল। সেদিনই ধ্রুব গাড়ীতে করে শ্মশান ঘাটে পর্যন্ত গিয়েছিল, শাশুড়ীর শেষ কৃত্য দেখবার জন্যে। শুনে স্তম্ভিত হলেন চিকিৎসকেরা যাঁরা ছয়মাসেও কোন ঔষধের দ্বারা কোন ফল দেখাতে পারেন নি। (আগামী বারে সমাপ্য)

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

এবারে বলছি—ছোট-বড় নানান্ ছাঁদের রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে অভিনব-পদ্ধতিতে 'এ্যাপ্লিক' (Applique) সূচী-শিল্পের কাজ করে বিচিত্র-ধরণের সৌখিন-সুন্দর কারু-চিত্র রচনার কথা। বহুকাল থেকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো সেলাই করে এই ধরণের অপরূপ শিল্পশ্রী-মণ্ডিত বিবিধ ছাঁদের মনোরম চিত্র-রচনার রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে এবং আজকাল অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়—বাড়ীর দরজা-জানলার পর্দায়, বিছানার চাদর, সুজনী ও বালিসের ওয়াড়ের কোণে, মহিলা আর ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের কিনারায় 'এ্যাপ্লিকের' সুদৃশ্য-নক্সাদার সূচী-শিল্পের কাজ করে অভিনব-উপায়ে নিজেদের গৃহ-সজ্জা ও বেশ-ভূষার শ্রী-শোভা বাড়িয়ে তোলার দিকে। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, শাদা, কালো প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের কাপড়ের উপরে বিপরীত-ধরণের অন্য কোনো রঙীণ-কাপড়ের টুকরো কেটে বানানো বিভিন্ন-ছাঁদের ফুল-লতা-পাতা, জীব-জন্তু বা মানুষের নানা রকম 'আলঙ্কারিক-নক্সা' (Decorative Motifs) সেলাই করে বিচিত্র সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনা করা খুব একটা দুরূহ-কঠিন বা বিপুল-ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। সামান্য চেষ্টা করলেই, নিতান্ত-ঘরোয়া কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে যে কোনো শিক্ষার্থী অনায়াসে ঘরে বসে নিজের হাতে 'এ্যাপ্লিকের' বহু সুন্দর-সুন্দর শিল্প-কারুকার্য্য রচনা করতে পারবেন।

'এ্যাপ্লিক' সূচী-শিল্পের জন্য প্রয়োজন—সূতী অথবা পশমের তৈরী কয়েকটি রঙীণ-কাপড়ের টুকরো, একটি ভালো কাঁচি, নক্সা-আঁকার উপযোগী খানকয়েক শাদা কাগজ আর পেন্সিল, রবার, কাপড়ের বুকে অঙ্কিত-নক্সার প্রতিলিপি-রচনার জন্য কয়েকখানি 'কার্ব্বন-পেপার' (carbon-paper) এবং নক্সাদার-কাপড়ের টুকরো সেলাইয়ের জন্য কয়েকটি সরু, মোটা ও মাঝারি সাইজের ভালো ছুঁচ—আর বিভিন্ন রঙের কয়েক 'ছালি' (strands) মজবুত-পাকা (cotton) তুলো বা পশমের (woolen) সুতো (threads)।

'এ্যাপ্লিকের' কাজের জন্য, সাধারণতঃ বেশ মোটা-পুরু এবং থাপি-ধরণের (thick and stiff materials) 'খদ্দর', 'দোসূতী', 'লিনেন' (linen), 'কেসমেণ্ট', (casement) জাতীয় সূতীর কাপড় কিম্বা 'ফেল্ট', (felt), 'ফ্ল্যানেল' (flannel) প্রভৃতি পশমী-কাপড় ব্যবহার করাই রেওয়াজ। কারণ, মিহি-মোলায়েম কাপড়ের চেয়ে এ সব কাজ মোটা-পুরু-থাপি ধরণের কাপড়েই অনেক বেশী সুন্দর আর মানানসই দেখায়। তবে 'এ্যাপ্লিকের' কাজের জন্য সূতী অথবা পশমী যে কাপড়ই বেছে নিন, সেটি বেশ 'উজ্জ্বল-রঙীণ' (Bright-Colour) কিম্বা 'সাধাসিধা-রঙের (Neutral Tint) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'এ্যাপ্লিক' সূচীশিল্পের চিরাচরিত প্রথা হলো— 'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' (Background-cloth) কাপড়ের রঙ যদি 'উজ্জ্বল' (Bright-colour) হয়, তাহলে তার উপরে রঙীণ-কাপড়ের যে টুকরোটি বসিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের 'নক্সা-চিত্র' (Design বা Motif) রচনা করবেন, সেটি হবে মানানসই-ধরণের কোনো 'সাধাসিধা' (Neutral Tint) অথবা 'বিপরীত' (coutrasting colour)। বর্ণের কাজের সময় কাপড়ের এই রঙ-বাছাই করার ব্যাপারে সজাগ-দৃষ্টি না রাখলে, 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পসামগ্রীর শ্রীশোভার অভাব ঘটবে সবিশেষ—কাজেই এ বিষয়ে নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের কাজ সচরাচর বিভিন্ন-ধরণের 'উজ্জ্বল', 'সাধাসিধা' ও 'বিপরীত'-বর্ণের 'এক-রঙা' কাপড়ের সাহায্যে রচিত হলেও, বিশেষ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সূচীশিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুসারে মানানসই-ছাঁদের নানারকম 'ছিটের কাপড়, (striped or printed cloth) দিয়েও এ ধরণের বিবিধ নক্সা-প্রতিলিপি সৃষ্টি করা যায়। তবে, এ সব শিল্প-সৃষ্টির কাজের সময়, 'জমী' বা পশ্চাদপটের' কাপড়ের সঙ্গে 'নক্সার' কাপড়ের 'ছিট' যেন এতটুকু বেমানান আর অসুন্দর না ঠেকে, সেদিকে সর্ব্বদা নজর রাখা দরকার।

উপরের ১নং চিত্রে রঙীণ কাপড়ের টুকরো কেটে 'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' কাপড়ের (Background cloth) উপর সেলাই করবার উপযোগী 'লোক-কলাশিল্পের' আদর্শ অনুসারে বেড়ালের (Folk-Art Motif) যে অভিনব 'নক্সার' নমুনা দেওয়া হলো—'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের কাজ করে শিক্ষার্থীরা সহজেই সেটিকে সুন্দর-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। 'পশ্চাদপট' বা 'জমীর' (background) কাপড়ের রঙ যদি 'গাঢ়' (deep) বা উজ্জ্বল, (Bright-colour) হয়, এ নক্সাটি তাহলে রচনা করতে হবে 'হালকা' (Light) অথবা 'সাধাসিধা' (Neu tral tint) কিম্বা 'বিপরীত' (contrasting colour) বর্ণের কাপড়ের টুকরো দিয়ে। তবে, 'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' কাপড় যদি 'হালকা' বা সাধাসিধা' রঙের হয়, তাহলে বেড়ালের ঐ নক্সাটিকে রচনা করতে হবে পছন্দমতো এবং মানানসই-ধরণের কোনো 'গাঢ়', 'উজ্জ্বল' অথবা 'বিপরীত' বর্ণের টুকরোকাপড় ছেঁটে-কেটে! এই হলো—'এ্যাপ্লিকের'কাজ করে উপরের 'লোক-কলার' নক্সা রচনার মোটামুটি নিয়ম। নক্সাটি রচনার সময়, গোড়াতেই পেন্সিল দিয়ে নিখুঁত-ছাঁদে 'ডিজাইনটিকে' প্রয়োজনমতো আকারে কাগজের উপর এঁকে নেবেন। তারপর নক্সা-আঁকা কাগজের নীচে' কার্ব্বণ-পেপার বসিয়ে রঙীণ-কাপড়ের টুকরোর উপর সমানভাবে বিছিয়ে রেখে অঙ্কিত-চিত্রের রেখা বরাবর পেন্সিলের মৃদু চাপ দিয়ে, নক্সার কাপড়ের বুকে 'ডিজাইনের' প্রতিলিপি

ছকে ফেলুন। তাহলেই রঙীণ-কাপড়ের উপর আগাগোড়া নক্সার 'ছাদ' (form) আঁকা হয়ে যাবে। এবারে রঙীণ-কাপড়ের উপর আঁকা ঐ নক্সার রেখা বরাবর পরিপাটিভাবে কাঁচি চালিয়ে নিখুঁত-ছাঁদে 'ডিজাইনটিকে' ছাঁটাই করে নিন। তারপর রঙীণ-কাপড় থেকে ছাঁটাই-করা নক্সার প্রতিলিপি-টিকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে 'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' কাপড়ের উপর যথোচিতস্থানে সমানভাবে বসিয়ে রেখে নিপুণ-ভঙ্গীতে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাই করে পাকাপাকি-ধরণে জুড়ে দিন। 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের কাজে সচরাচর 'চেন্-ষ্টিচ্' (Chain-stitch), 'সাটিন-ষ্টিচ্' (Satin-stitch), 'লেজি-ডেইজি-ষ্টিচ্' (Lazy-Daisy-stich) এবং 'ষ্টেম্-ষ্টিচ্' (Stem-stitch) সেলাই-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং এ সব পদ্ধতি-অনুসারে সেলাই করলেই নক্সাদার কারু-সামগ্রীটি অনেক বেশী সুন্দর ও মানানসই দেখায়। তাছাড়া শাদামাটা সেলাইয়ের বদলে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে তেমনি-ধরণের সরল-সোজা আর বড়-বড় ছাঁদে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাইয়ের কাজ করলে, 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের 'নক্সা-চিত্রটি অধিকতর সুন্দর ও মনোরম দেখাবে—এ তথ্যটুকু প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই জেনে রাখা দরকার। শুধু সূতীর কাপড়েই নয়, পশমী-কাপড়ের উপর 'এ্যাপ্লিকের' নক্সা রচনার সময়ও এমনি ধরণের পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। উপরের ঐ বেড়ালের ছবিতে যে সব 'আলঙ্কারিক' নক্সার নমুনা দেখানো হয়েছে, পরিপাটি-ছাঁদে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাই করে সেগুলিকেও যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলে, 'এ্যাপ্লিকের' কাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে সবিশেষ। প্রসঙ্গক্রমে, নীচের ২নং চিত্রে 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের উপযোগী অভিনব-ছাঁদের পাখীর যে নক্সাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকেও উপরোক্ত পদ্ধতি-অনুসারে রঙীণ-কাপড়ের উপর অনায়াসেই রচনা করা যাবে। কাজেই

এ বিষয়ে বিশদ-আলোচনা করে প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। পাশের নক্সা দুটিকে 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের কাজ করে গৃহের দরজা-জানলার পর্দা, বাক্স-তোরঙ্গ আর টেবিল-ঢাকা, বালিশের ওয়াড়, বিছানার সুজনী, নানা রকম টুকিটাকি জিনিষপত্র-রাখার থলি এবং পোষাক-পরিচ্ছদের কাপড়ের উপরে সহজেই ফুটিয়ে তোলা চলবে।

বারান্তরে এই ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব-সুন্দর 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের নক্সা-রচনার হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

সূচী-শিল্পের নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

২

গত মাসের মতো এবারেও 'কার্পেট' ও 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের উপযোগী আরো কয়েকটি সহজ-সুন্দর বিচিত্র নক্সা বা 'প্যাটার্নে'র' (pattern) নমুনা দেওয়া হলো··· যে কোনো শিক্ষার্থী একটু চেষ্টা করলেই রঙীণ পশমী-সুতো দিয়ে বুনে অনায়াসেই এ সব সহজসাধ্য 'প্যাটার্ণ' বা নক্সা কার্পেট কিম্বা সেলাইয়ের কাপড়ের উপর অপরূপ-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।
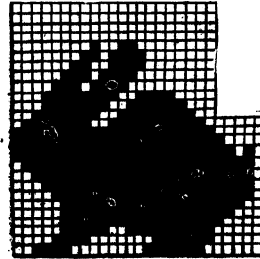
উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে—একটি খরগোশের 'প্যাটার্ণ' বা নক্সা। 'কার্পেট' ও 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের কাজ করে সাদাসিধা-ছাঁদের এ নক্সাটির প্রতিলিপি বানাতে

হলে চাই—প্রয়োজনমতো সাইজের 'কার্পেট' কিম্বা 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের উপযোগী কাপড়, কার্পেট-বোনবার ছুঁচ আর শাদা হাল্কা ধরণের সবুজ অথবা নীল আর লাল বা গোলাপী রঙের পশমী-সুতো। সূচী-শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী, সচরাচর বাজারে যেমন সরু বা ছোট আর মোটা বা বড়-ঘরওয়ালা কার্পেট-বোনার কাপড় মেলে, তেমনি-ধরণের জিনিষ বেছে নেওয়াই রীতি। তবে বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে যে নক্সা বা 'প্যাটার্ণের' নমুনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বড় সাইজের কার্পেটের-কাপড়ে বড়-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, ইতিপূর্ব্বে গত মাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে যেমন হদিশ দিয়েছি, সেই পদ্ধতিতেই কাজ করা ভালো। অর্থাৎ, নক্সাটিকে সাইজে যত বেশী বড়-ছাঁদে রচনা করবেন, আলোচ্য-প্যাটার্ণের প্রত্যেকটি 'ঘর' সেই হিসাব অনুসারে তত গুণ বাড়িয়ে কার্পেট-বোনার কাজ করতে হবে। ধরুন, উপরের নক্সাটিকে যদি দশগুণ বড়-আকারে রচনা করতে হয়, তাহলে ঐ নক্সাতে দেখানো প্রত্যেকটি ঘর' বুনতে হবে, ১×১০=১০ ঘর হিসাবে অর্থাৎ, কার্পেটের কাপড়ের দশটি করে 'ঘর' নিয়ে উপরের নক্সার প্রত্যেকটি 'ঘর' রঙীণ পশমী-সুতো দিয়ে বুনে যেতে হবে—এই হলো এ কাজের মোটামুটি নিয়ম।

কার্পেটের কাপড়ে উপরের ঐ খরগোশের নক্সাটি রচনা করতে হলে, ১নং ছবিতে দেখানো কালো-রঙের প্রত্যেকটি 'ঘর' অর্থাৎ খরগোশের দেহাংশটি আগাগোড়া শাদা-রঙের পশমের সুতো দিয়ে ভরে তুলবেন। খরগোশের চোখ অর্থাৎ উপরের নক্সাতে দেখানো কালো-রঙের বিন্দু-চিহ্নিত 'ঘরটিকে' ভরাট করতে হবে—লাল বা গোলাপী রঙের পশমী-সুতোয়। প্রতিলিপির পশ্চাদপট (Background) অর্থাৎ উপরের নক্সাতে দেখানো শাদা-রঙের ফাঁকা 'ঘরগুলির' প্রত্যেকটি ভরে তুলতে হবে—হাল্কা-ধরণের নীল (Sky-Blue] কিম্বা সবুজ (Light Green] রঙের পশমের সুতো দিয়ে। এই তিন রঙের পশমী-সুতো ছাড়া সূচী-শিল্পীর নিজস্ব রুচি ও পছন্দ অনুসারে অন্যান্য রঙের পশমের সুতোও ব্যবহার করা যেতে পারে তবে, আমাদের ধারণা, খরগোশের এই নক্সা-রচনার ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটি রঙের পশমী-সুতোতেই অনেক বেশী সুন্দর ও মানানসই দেখাবে। গত সংখ্যার কাঠবেড়ালীর যে বিচিত্র নক্সাটি প্রকাশিত হয়েছিল, অবিকল সেই পদ্ধতিতেই এবারের এই খরগোশের 'প্যাটার্ণটিকে' রঙীণ পশমী-সুতোর সাহায্যে 'কার্পেট' ও 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের উপযোগী কাপড়ের উপর অনায়াসেই রূপদান করা যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে, নীচের ছবিতে 'কার্পেট' এবং 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের উপযোগী আরো একটি অভিনব নক্সার নমুনা প্রকাশ করা হলো। এটি আধুনিক-যুগের অভিনব একটি 'হেলিকোপ্টার' (Helicopter) উড়ো-জাহাজের প্রতিলিপি···রঙ-বেরঙের পশমী-সুতো দিয়ে সহজেই এ নক্সাটিকে 'কার্পেটের' বা 'ক্রশ-ষ্টিচের' কাপড়ের উপর বুনে তোলা চলবে। 'হেলিকোপ্টারের' এই বিচিত্র-নক্সাটি বোনবার জন্য চাই—হাল্কা-নীল (Sky-Blue), ধূসর (Grey) অথবা ফিকে-হল্দে (Light Yellow) বা গাঢ়-লাল (Scarlet Red) আর শাদা রঙের পশমী-সুতো।
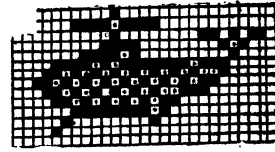
উপরের ছবিতে দেখানো 'হেলিকোপ্টারের' নক্সার শাদা-রঙের 'ঘরগুলি' আগাগোড়া ভরে তুলবেন—হাল্কা নীল রঙের পশমের সুতোয়। ২নং নক্সাতে দেখানো কালো-রঙের প্রত্যেকটি ঘর ভরাট করতে হবে—ধূসর অথবা ফিকে-হল্দে বা গাঢ়-লাল রঙের পশমী-সুতোয়···এবং কালো-রঙের 'বিন্দু-চিহ্নিত, 'ঘরগুলির' প্রত্যেকটিকে ভরাট করবেন শাদা অথবা ফিকে-হল্দে রঙের পশমের সুতো দিয়ে। তাহলেই সুষ্ঠুভাবে 'কার্পেট' ও 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচী-শিল্পের কাপড়ের উপর সুদৃশ্য 'হেলিকোপ্টার' উড়ো-জাহাজের নক্সা-চিত্রণের কাজ শেষ হবে।

বারান্তরে এ ধরণের 'কার্পেট' ও 'ক্রশ-ষ্টীচ্' সূচী-শিল্পের আরো নানান বিচিত্র-অভিনব সুন্দর-সুন্দর নক্সা বা 'প্যাটার্ণের' নমুনা দেবার বাসনা রইলো।

—

স্থধীরা হালদার

এবারে উত্তর-ভারতের পাঞ্জাব-অঞ্চলের ছুটি উপাদেয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি। প্রথমটি হলো—ওদেশী অধিবাসীদের পরম-মুখরোচক বিশেষ এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী, এবং দ্বিতীয়টি হলো--বিচিত্র-সুস্বাদু অভিনব এক-ধরণের ডাল রান্নার প্রণালী।

পাঞ্জাবী আলুর দম ঃ

পাঞ্জাব-দেশীয় এই উপাদেয় নিরামিষ-তরকারী রান্নার জন্য উপকরণ চাই—একসের ভালো নৈনিতাল আলু, আধ পোয়া ভালো টোম্যাটো, ছুটি রস্থন, ছু'তিন টুকরো আদা, অল্প কিছু ধনেপাতা, একছটাক পেঁয়াজ-বাটা, আন্দাজমতো স্থন, আন্দাজমতো পরিমাণে হলুদ-গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, মরিচ-গুঁড়ো, গরম-মশলার গুঁড়ো আর আধ পোয়া ঘী।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই আলুগুলিকে জলে ধুয়ে সাফ করে, বঁটি বা ছুরির সাহায্যে সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে নেবেন। তারপর একটা বড় ছুঁচ বা কাঁটা (fork] দিয়ে বিঁধিয়ে ঐ খোসা-ছাড়ানো আলুগুলিকে আগাগোড়া ফুটো-ফুটো করে নিন—অর্থাৎ পটলের দোর্মা রান্নার সময় সচরাচর যেমনভাবে কাজ করেন, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতেই এ কাজটি সেরে ফেলতে হবে।

এ কাজটুকু সারা হলে, উনানের আঁচে রান্নার কড়া বা ডেকচি চাপিয়ে সেই পাত্রে ঘী ঢেলে আলুগুলিকে বেশ বাদামী করে ভেজে ফেলুন। এমনিভাবে ভেজে নেবার পর, আলুগুলিকে সাবধানে রন্ধন-পাত্র থেকে নামিয়ে রাখুন এবং উনানের-আঁচে-বসানো কড়া বা ডেক্‌চির ঐ গরম ঘীয়ে আদা-বাটা, পেঁয়াজ-বাটা, রস্থন-বাটা আর টোম্যাটোগুলি মিশিয়ে ভালো করে সাঁতলে নিন। এ সব উপকরণ যথাযথভাবে সাঁতলানো হলে, সদ্য-ভাজা আলুগুলিকে পুনরায় রন্ধন-পাত্রে ছেড়ে আন্দাজমতো পরিমাণে ধনে-গুঁড়ো, মরিচ-গুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো আর স্থন মিশিয়ে, একটি বড়-হাতলওয়ালা চামচ বা খুন্তীর সাহায্যে রান্নাটিকে অল্পক্ষণ নেড়ে-চেড়ে নিয়ে ডেক্‌চিতে সামান্য একটু জল ঢেলে কড়া বা ডেক্‌চির মুখে ঢাকা চাপা দিয়ে রন্ধন-পাত্রটিকে কিছুক্ষণ উনানের মৃদু-আঁচে দমে বসিয়ে রাখুন। রন্ধন-পাত্রটিকে খানিকক্ষণ এমনিভাবে উনানের অল্প-আঁচে 'দমে' বসিয়ে রাখার ফলে, রান্নার-মশলার সঙ্গে মিলে-মিশে আলুগুলি আগাগোড়া বেশ সুসিদ্ধ ও 'কাই-কাই' (paste) ধরণের হলে, কড়া বা ডেক্‌চির মুখের ঢাকাটি খুলে তরকারীতে আন্দাজমতো পরিমাণে গরম-মশলার গুঁড়ো আর ধনেপাতার কুচি মিশিয়ে, রান্নার পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে রাখবেন। নামাবার পরেও কড়া বা ডেক্‌চির মুখে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবেন—অর্থাৎ, পাতে পরিবেষণের সময় পর্য্যন্ত রান্নাটি যেন বরাবরই 'দমে' রাখা থাকে—সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে, রান্নাটি আরো বেশী সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়ে উঠবে। উত্তর-ভারতীয় প্রথায় বিচিত্র-উপাদেয় 'পাঞ্জাবী আলুর দম রান্নায় এই হলো মোটামুটি নিয়ম।

পাঞ্জাবী 'শুখা-দাল' ঃ

এবারে বলি—পাঞ্জাবী-প্রথায় শুখা দাল বা 'শুকনো-ডাল' রান্নার অভিনব পদ্ধতির কথা। এ রান্নার জন্য দরকার—একপোয়া কলাইয়ের ডাল, এক ছটাক ঘী, আন্দাজমতো পরিমাণে গরম-মশলার গুঁড়ো, স্থন, এক ছটাক পেঁয়াজ-কুচি, চায়ের চামচের আধ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, চায়ের চামচের এক চামচ জিরে ভাজার গুঁড়ো এবং অল্প কিছু ধনেপাতা।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, রান্নার পালা। রান্নার কাজ সুরু করবার আগে পরিষ্কার জলে ডাল বেশ ভালো করে ধুয়ে নেবেন—এতটুকু ধুলো-বালির ময়লা যেন

না থাকে কোথাও। তারপর উনানের আঁচে ডেক্‌চি চাপিয়ে রন্ধন-পাত্রে অল্প খানিকটা জল ও নুন দিয়ে ডালটুকু আগাগোড়া বেশ সুসিদ্ধ করে নিন। এ কাজের সময় রন্ধন-পাত্রে এমন পরিমাণে জল দেবেন, যাতে ডাল সুসিদ্ধ হবার পর, এতটুকু জল বাড়তি না থাকে—সবটুকুই যেন বেশ থক্‌থকে এবং কাই-কাই (paste) ধরণের হয়।

ডালটুকু এমনিভাবে আগাগোড়া সুসিদ্ধ হয়ে যাবার পর, ডেক্‌চি থেকে অন্য পাত্রে ঢেলে রাখবেন। এবারে ডেক্‌চিতে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘী আর পেঁয়াজ-কুচি চাপিয়ে রন্ধন-পাত্রটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বসিয়ে খুন্তী বা বড়-হাতলওয়ালা চামচ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, বেশ ভালোভাবে পেঁয়াজ-কুচি ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘীয়ে ভাজার ফলে, পেঁয়াজ-কুচি বেশ বাদামী-রঙের হলে, রন্ধন-পাত্রে সুসিদ্ধ ডাল মিশিয়ে, খুন্তী বা বড়-হাতলওয়ালা চামচের সাহায্যে সেগুলিকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। খানিকক্ষণ এমনিভাবে নাড়াচাড়া করলেই যখন দেখবেন —ডেক্‌চিতে-চাপানো ডাল আর পেঁয়াজ-কুচি গরম-ঘীয়ে বেশ ঝরঝরে-ধরণের ভাজা হয়েছে, তখন রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে কিছু ধনেপাতার কুচি আর জিরে-ভাজা, লঙ্কা, গরম-মশলার গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে রান্নাটিকে আরো অল্পক্ষণ খুন্তী বা বড়-হাতলওয়ালা চামচ দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিন। তাহলেই রান্নার কাজ মোটামুটি শেষ হবে। তবে এভাবে রান্নার কাজ করবার সময়, বিশেষ নজর রাখবেন—ডালে যেন ঝোলের মতো জল না থাকে এতটুকু …আগাগোড়া যেন বেশ শুকনো-ঝরঝরে ধরণের হয়। এমনিভাবে রান্না করে ডালের জলটুকু মরে গিয়ে বেশ ঝর্‌ঝরে-শুকনো ধরণের হলেই, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রাখবেন।

এবারে গৃহে-আমন্ত্রিত আত্মীয়-বন্ধুদের পাতে সযত্নে পরিবেশন করুন অভিনব-প্রথায় রাঁধা এই বিচিত্র-মুখ-রোচক 'পাঞ্জাবী 'শুখা-দাল'। পরম-উপাদেয় এই সুস্বাদু শুকনো-ডাল' খেয়ে তাঁরা সবাই একবাক্যে আপনার হাতের রান্নার তারিফ করবেন।

পরের মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

বিজয়াভিবাদন—

বাংলার সর্বপ্রধান উৎসব শ্রীশ্রী৺শারদীয়া দুর্গাপূজার পর বাঙ্গালী সকল বিভেদ বিরোধ ভুলিয়া শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সকলের সহিত মিলিত হয় ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করে। ইহা একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আমরা তাই মহাপূজার পর আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে—গ্রাহক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলকে আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও নমস্কারাদি জ্ঞাপন করি। এই শুভদিনে প্রার্থনা করি, মঙ্গলময়ীর কৃপায় সকলের জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সুখশান্তিতে সমৃদ্ধ হউক। পূজ্যগণের আশীর্বাদ যেন ভারতবর্ষের পরিচালকগণকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে—ইহাও আমাদের কামনা।

যুদ্ধারম্ভ—

বহু দিন ধরিয়া চীন পররাজ্য গ্রাসের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতের উত্তর সীমান্তে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘকাল পূর্বে সীমান্ত-রেখা স্থির হইয়াছিল—তাহা ম্যাকমোহন লাইন বলিয়া খ্যাত। তিব্বত হইতে দালাই লামা ভারতে পলাইয়া আসার পর চীনারা সমগ্র তিব্বত দখল করে ও তথায় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ তিব্বতকে সমৃদ্ধ করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লয়। ভারতের উত্তরে নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি রাজ্য তিব্বতের সহিত ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। চীনারা ক্রমে ক্রমে ঐ তিন রাজ্য গ্রাসেরও চেষ্টা করিতেছিল। উত্তরপূর্বসীমান্তে নেফা নূতন রাজ্য—সেখানে ক্রমে চীনা প্রভাব বিস্তারিত হইতেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরের সংলগ্ন লাডাক ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও চীনারা তথায়প্রবেশ করিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিধানে অধিক সচেষ্ট ছিলেন—পররাজ্য গ্রাসের বাসনা তাঁহার কোন দিন ছিলনা। তিনি চীনাদের বাধা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, তবে চীনারা যে কোন দিন ভারত আক্রমণ করিতে সাহস করিবে, ইহা তিনি মনে করেন নাই। ম্যাকমোহন লাইনের নিকট কয়েক শত বর্গ মাইল পাহাড় ও জঙ্গলপূর্ণস্থান চীনারা তাহাদের জমি বলিয়া জোর করিয়া দাবী ও অধিকার করিলে সে সকল স্থান কাড়িয়া লইবার আয়োজন চলিতেছে। ইতিমধ্যে চীনারা বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া ভারতের মধ্যে কয়েকটি স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে এবং নেপাল, ভূটান ও সিকিমকে ধীরে ধীরে করায়ত্ত করার ব্যবস্থা করিতেছে। আসাম পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ—তথায় নেফা ও নাগাল্যাণ্ড ভারতের অধীন রাজ্য হইলেও সেখানকার অধিবাসীদের অশিক্ষার ফলে তাহারা যে কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠে। চীনারা সেই দুই রাজ্যেও তাহাদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছে। চীনারা পররাজ্য গ্রাসে লোলুপ হওয়ায় ভারতের পক্ষে চীনাদের সহিত যুদ্ধ করা ছাড়া এখন আর গত্যন্তর নাই। কাজেই শ্রীনেহরু ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থায় অবহিত হইয়াছেন। ঐ অঞ্চলে বহু সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরিত হইয়াছে ও বহু স্থানে ভারতীয় সৈন্যরা বাধা দান করিয়া চীনাদের হটাইয়া দিয়াছে। এ সময়ে শ্রীনেহরুকে তাঁহার কার্যে সহযোগিতা ও সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। এই স্নায়ুযুদ্ধ যদি অধিকদিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বন্ধ হইয়া যাইবে ও সকল উন্নয়ন কার্য ব্যাহত হইবে। সে জন্যই শ্রীনেহরু আত্মরক্ষা বিষয়েও প্রথমে তত মনোযোগী হন নাই। এখন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে সৈন্যদিগকে বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে—সৈন্য বিভাগে লক্ষ লক্ষ নূতন লোক গ্রহণ করা হইবে এবং

অল্প শিক্ষিত সৈন্যদিগকে পূর্ণশিক্ষা দান করা হইবে। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবাসী তাঁহাদের দেশের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কর্তব্য পালনে অনবহিত থাকিবেন না।

সমরোপকরণ ও লোক সংগ্রহ—

চীন ভারত যুদ্ধ অনিবার্য হওয়ায় ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর সকল সরকারী কারখানায় ২ বা ৩ গুণ করিয়া সমরোপকরণ উৎপাদন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। সে জন্য বিভিন্ন কারখানায় বহু নূতন লোক নিযুক্ত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া সৈন্যবিভাগে শিক্ষাদানের জন্য এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করিতে যাইবার জন্য লোক সংগ্রহ করা হইতেছে। ভারত বিরাট দেশ—তাহার লোকসংখ্যাও কম নহে—কাজেই ভারত সরকার সচেষ্ট হইলে অনায়াসে চীনা হানাদারদিগকে হটাইয়া দিতে পারিবে।

কলিকাতায় মাছ সমস্যা—

কিছু দিন হইতে কলিকাতায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাছ আসিতেছে না। সে জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রথমে উড়িষ্যা, অন্ধ্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব-পাকিস্তান প্রভৃতির মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ সকল রাষ্ট্র হইতে অধিক পরিমাণে মাছ আমদানীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কলিকাতায় মাছের আড়তদারগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কলিকাতায় মাছের বাজার আটক করেন ও সুলভে মাছ বিক্রয়ে বাধা দেন। সম্প্রতি আড়তদারদিগের সহিত সরকারী কর্তৃপক্ষের রফার ব্যবস্থা হইয়াছে ও সরকার কলিকাতায় মাছের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন মাছের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম—কাজেই অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা না হইলে কলিকাতায় সুলভে মাছ পাওয়া যাইবে না। আমরা এ বিষয়ে ধনী ও শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

কলিকাতা কর্পোরেশনে নূতন ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্ডিনান্স জারি করিয়া ২ জন সরকারী কর্মচারীকে কর্পোরেশনের স্পেশাল ডেপুটী কমিশনার নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা সহরের উন্নতি সাধনে অবহিত হইয়াছেন। তাঁহারা (১) হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীএম, জি. কুট্টি এবং (২) রাজ্য সরকারের ডেপুটী পরিবহন কমিশনার শ্রী আর. মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে শ্রী এস, বি. রায় কমিশনাররূপে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীকুট্টি ময়লা সাফাই, জল সরবরাহ ও ড্রেণ ব্যবস্থা এবং শ্রীমুখোপাধ্যায় মোটর বিভাগ, মিউনিসিপাল রেল ও ইটালীর কারখানার দেখা শুনা করিবেন। মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত পরামর্শ করিয়াই কমিশনার শ্রীরায় ডেপুটী কমিশনারদ্বয়কে কার্যভার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের সুখ সুবিধা কি সত্যই বাড়িবে?

বারাকপুরে গান্ধী সংগ্রহশালা—

গান্ধী স্মারক নিধির পশ্চিমবঙ্গশাখার উদ্যোগে সম্প্রতি ২৪ পরগণা বারাকপুরে ১৪নং রিভার সাইডে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গঙ্গাতীরে একটী নবনির্মিত প্রাসাদ ক্রয় করা হইয়াছে—তাহা ১০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত—তথায় একটি গান্ধী সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে লইয়া সংগ্রহশালার পরিচালক কমিটী গঠিত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় যাহাদের নিকট সংগ্রহশালায় রাখার উপযুক্ত গান্ধী স্মারক দ্রব্যাদি আছে, তাহা সকলকে ঐ স্থানে পাঠাইতে আবেদন করা হইয়াছে। গত ২রা অক্টোবর সন্ধ্যায় উক্ত গৃহে গান্ধী জন্মদিবসে এক উৎসব পালন করা হয় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহাতে সভাপতি হইয়া তাঁহার সহিত গান্ধীজির ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা বিবৃত করেন।

জোয়ানদের সাহায্যে দান -

চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধে যে সকল ভারতীয় সৈন্য কাজ করিতেছে, তাহাদের উপহার প্রেরণের জন্য উত্তর কলিকাতায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—শ্রীঅতুল্য ঘোষ কমিটীর সভাপতি ও অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ আহ্বানকারী। কমিটীতে আছেন, শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ [অমৃতবাজার পত্রিকা], শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় [প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক], শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক], শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় [ন্যাশানাল রবার], জি. এ, দোসানী [ফিল্ম কর্পোরেশন] শ্রীরাধাকিষণ কানোরিয়া [৯ ব্রাবোর্ণ রোড] শ্রীকৃষ্ণদাস রায়

[ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীম সার্ভিস] ও শ্রী এম. এল. সাহ [মোহিনী মিল]। সারা পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ প্রচেষ্টা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসীকে উদ্যোগী হইতে আহ্বান করি।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

১৯০৯ সালে উক্ত ভাণ্ডার স্থাপিত হইলেও সম্প্রতি ১৯৬২ সালে ভাণ্ডারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উৎসবে মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতি ও মন্ত্রী শ্রীফজলর রহমন প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ভাণ্ডারের প্রাণস্বরূপ শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভাণ্ডারে এখন (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও (খ) ডাক্তার বি. সি. রায় শিশুসদন পরিচালিত হইতেছে এবং ভাণ্ডারের চেষ্টায় বারাকপুরে ১০ বিঘা জমির উপর যক্ষ্মা-চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতালের কাজ চলিতেছে। এই তিনটি বিরাট জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে—তাহার অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গ বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করিলেও ভাণ্ডারের কর্মীরা বহু লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। শম্ভুনাথবাবু এই বিরাট কার্য সম্পাদন করিয়া দেশবাসী সকলের ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার দান তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের রজত জয়ন্তী—

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ১৪ই অক্টোবর রবিবার গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সভায় সে উৎসব পালন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি. পট্টনায়ক অতিথিরূপে উৎসবে থাকিয়া ভাষণ দান করেন। একটি দৈনিক সংবাদপত্র দেশের কত উপকার করিয়া থাকে, তাহা অবর্ণনীয়। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রও স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবন ও মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়াছে। পত্রিকার বর্তমান পরিচালক শ্রীঅশোককুমার সরকার সকলকে স্বাগত জানাইয়া পত্রিকার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন।

লাভপুরে নূতন কলেজ—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন-বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-উপাচার্য ডাক্তার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানে তাঁহার বাসগ্রাম বীরভূম জেলার লাভপুরে একটি নূতন ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও উহা শম্ভুনাথ কলেজ নামে অভিহিত হইবে। লাভপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আরও অনেকে এই কলেজের জন্য অর্থ ও জমিদান করিয়াছেন এবং নেতা শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ পরিচালন কমিটীর সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীমান সত্যনারায়ণ বীরভূম জেলার খ্যাতিমান দেশসেবক এবং স্বর্গত নাট্যকার শ্রদ্ধেয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। শম্ভুবাবু অপুত্রক—কাজেই তাঁহার অর্থ দ্বারা তাঁহার দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তিনি মহৎ কার্যই সম্পাদন করিলেন। বর্তমান সময়ে গ্রামে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক।

রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ—

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গত ১৬ই জুন আশি বৎসর বয়সে মহাসমাধিলাভ করিলে গত ৪ঠা আগষ্ট স্বামী মাধবানন্দ মঠের নবম অধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) নির্বাচিত হইয়াছেন। মাধবানন্দ ১৮৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯১০ সালে মঠে যোগদান করেন। দুই বৎসর মায়াবতীতে থাকার পর দুই বৎসর তিনি উদ্বোধনের সম্পাদকরূপে কাজ করেন ও পরে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ হন। ১৯২৭ সাল হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে বেদান্ত সমিতিতে কাজ করেন এবং ১৯৩৮ হইতে ১৯৬১ পর্যন্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সুবিখ্যাত এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার গঠনমূলক কার্যব্যবস্থা মঠ ও মিশনের বর্তমান প্রসার ও প্রচারের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সালে তিনি পদব্রজে জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীশ্রীসারদা মাতার নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। পর বৎসর তিনি কাশী যাইয়া স্বামী শিবানন্দের সহিত মিলিত হন।

১৯২৭ হইতে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি রাঁচী মোরাবাদী পাহাড়ে নির্জনে তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট স্বামী শঙ্করানন্দের তিরোধানের পর গত ৬ই মার্চ ১৯৬২তে তিনি মঠের সভাপতি হইয়াছিলেন। মাত্র অল্পকাল অধ্যক্ষের কাজ করিয়া তাঁহাকে সাধনোচিত ধামে চলিয়া যাইতে হইল।

তারাপদ চৌধুরী—

সমবায় আন্দোলনের নেতা ও প্রাক্তন এম-এল-এ কাটোয়া নিবাসী তারাপদ চৌধুরী গত ৯ই অক্টোবর ৬৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় সংঘের ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি ছিলেন। আজীবন তিনি সমবায় আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত—

শ্রীগোপাল স্বামী পার্থসারথী সম্প্রতি পাকিস্তানের হাইকমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিন পূর্বে পিকিংয়ে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদেও ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। লণ্ডনে ভারতের ডেপুটী হাইকমিশনার শ্রীটি-এন-কাউল রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইলেন—শ্রীএস-পি-দত্ত রুশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। শ্রীআর্থার লালের স্থলে শ্রীকাউলকে অষ্ট্রিয়ায়ও রাষ্ট্রদূতের কাজ করিতে হইবে। শ্রীকেবল সিংহ শ্রীকাউলের স্থানে লণ্ডনে ভারতের ডেপুটী হাইকমিশনার হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে এই সকল পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কলিকাতায় সাব-ওয়ে—

কলিকাতায় ডালহৌসি-শিয়ালদহ এবং চৌরঙ্গী-ধর্মতলা অঞ্চলে পথের উপর দিয়া রাস্তা পার হইয়া যাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য অনেক সময় পথিককে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। সেজন্য ঐ অঞ্চলে মাটীর নীচ দিয়া তিনটি পথ নির্মিত হইবে—২টি ডালহৌসীতে ও একটি চৌরঙ্গীতে। সেজন্য ১৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। নূতন পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ জন্য শীঘ্রই কলিকাতার উন্নতি বিধায়ক সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই পথত্রৈ নির্মাণের ভার গ্রহণ করিবে।

স্কুলের ছাত্রদের খাদ্যদান—

গত ১৮ই অক্টোবর দিল্লীতে রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী সম্মিলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকে-এল-শ্রীমালি বলিয়াছেন—স্কুলের ছাত্রগণকে মধ্যাহ্নে আহার দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেজন্য রাজ্য কর্তৃপক্ষগণ যে অর্থব্যয় করিবেন তাহার এক তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় সরকার দান করিতে প্রস্তুত আছেন। এ ব্যবস্থা বহু পূর্বে সর্বত্র চালু হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয়েকটি স্থানে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মধ্যাহ্নে খাবার দেওয়া হয়, স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষকগণ সচেষ্ট হইলে এ বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের ও সরকারের সাহায্য অতি সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। ডক্টর শ্রীমালীর এই ঘোষণা যেন সর্বত্র কর্মীদের উৎসাহ দান করে।

পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গের পাকিস্তান-সীমান্ত এত অধিক দীর্ঘ যে ঐ সীমান্তকে ভাল করিয়া রক্ষা করার জন্য আজ বহু সৈন্য ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পাকিস্থানী হানাদারেরা প্রত্যহ কোন না কোন স্থান দিয়া ভারতরাজ্যে (পশ্চিম বাংলায়) প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদের উপরও অত্যাচার করিয়া এবং মালপত্র ও গরুবাছুর কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া যায়। বহুসংখ্যক সীমান্তঘাঁটি স্থাপন করিয়া ভারত কর্তৃপক্ষ এই হানা বন্ধ করিতে পারেন না। জলপথ ও স্থলপথে এই সীমান্ত কয়েকশত মাইল—তাহা রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলগঠন করা প্রয়োজন। আজ চীন-ভারত যুদ্ধ প্রায় সমাগত—এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সীমান্ত রক্ষার জন্য উদ্যোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য। একদিকে চীনের আক্রমণ—অপর দিকে পাকিস্তানীদের হানা—এ উভয় সঙ্কট হইতে পশ্চিমবঙ্গকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

স্বামী অখিলানন্দ—

আমেরিকার বোষ্টন ও প্রভিডেন্স সহরের বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ মহারাজ ৬৮ বৎসর বয়সে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।

তিনি প্রথম জীবনে নীরদচন্দ্র সান্যাল নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বি-এ পাশ করার পর ১৯১৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হন। কিছুকাল ভুবনেশ্বর ও মাদ্রাজে কাজ করিয়া তিনি ১৯২৬ সালে আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকায় বাস করিলেও বেলুড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি বলিতেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্য দিয়া কাজ করাইয়া লইতেন।

কেরলে নূতন মুখ্যমন্ত্রী—

কেরল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পি-এস-পি নেতা শ্রীথানু পিলাই পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কেরলের কংগ্রেস নেতা শ্রীআর-শঙ্কর কেরলের নূতন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কেরলে কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিয়া কংগ্রেস ও পি-এস-পি দল একযোগে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল। শ্রীথানু পিলাই চলিয়া গেলেও প্রজাসমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিবেন এবং দুই দলের চেষ্টায় কংগ্রেস নেতা শ্রীশঙ্করকে নূতন মুখ্যমন্ত্রী করা হইয়াছে। রাজ্যপাল শ্রীভি-ভি-গিরি কেরলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী আছেন। কেরল পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য—তথায় উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য।

বিপৎকালীন ব্যবস্থা—

চীন কর্তৃক ভারত রাজ্য আক্রমণের ফলে যে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য গত ২৬শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন দিল্লীতে এক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন—তাহার নাম "ভারত রক্ষা অর্ডিনান্স ১৯৬২"—তাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভারত রক্ষা আইনের মত। অর্ডিনান্স অনুসারে কাজ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু (২) অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই (৩) পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীনন্দ (৪) সমন্বয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী (৫) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী (৬) শ্রীমেনন। এই ছোট মন্ত্রীসভা প্রায়ই মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

গত ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতা গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের এক সভায় নিম্নলিখিতরূপ দাবী জানানো হইয়াছে—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, পি-এস-পি নেতা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, জনসংঘ নেতা শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও কলিকাতার মেয়র শ্রীরাজেন্দ্র মজুমদার সভায় বক্তৃতা করেন। সভার দাবী ছিল—(২) কৃষ্ণ মেননের অপসারণ (২) পঞ্চম বাহিনী দমন ও (৩) হানাদার বিতাড়ন। চীন-দরদী কমুনিষ্টদের ও মুনফা-শিকারকারীদের কঠোর হস্তে দমন করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। ২৫শে নভেম্বর পশ্চিম বঙ্গে যে তিনটি সাধারণ (বিধানসভা) কেন্দ্রে উপনির্বাচনের কথা ছিল, তাহা জরুরী অবস্থার জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সামরিকশিক্ষাগ্রহণ করিয়া দেশরক্ষা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

জাতীয় সংহতি সপ্তাহ—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ আগামী ৪ঠা নভেম্বর হইতে ১১ই নভেম্বর ৮ দিন পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদিগকে জাতীয় সংহতি সপ্তাহ পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ সপ্তাহে দেশের সর্বত্র জনসভা করিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। কার্য্যসূচি এইরূপ হইবে (১) ন্যাশানাল সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয়ের অভিযান (২) কারখানা ও মাঠে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনমত সৃষ্টি (৩) ভারত সীমান্ত রক্ষারত জোয়ানদের জন্য উপহার সংগ্রহ (৪) সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার ব্যবস্থা। আমাদের বিশ্বাস সর্বত্র এ বিষয়ে আলোচনা হইলে বিভ্রান্ত দেশবাসী কর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবে।

হরেন্দ্র ঘোষের মর্মরমূর্তি—

স্বর্গত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন। গত ২১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় হাওড়া ময়দানের পূর্বপ্রান্তে তাঁহার এক মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। খ্যাতনামা বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীমতী লীলা রায়, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, হাওড়া মিউনিসিপলিটীর চেয়ারম্যান শ্রীনির্মল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বর্গত হরেন্দ্রনাথের জীবনী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন দেশের নাগরিকগণ তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করায় তাঁহারা দেশবাসীর অভিনন্দনের পাত্র হইয়াছেন।

সমস্যা

গৃহিণী ঃ—সত্যি, ভারী মুস্কিলে পড়েছি! ভাইফোঁটায় ভাইদের কাকে কি দেবো—কিছুই ঠিক করতে পারছি না! এই সেদিন পূজোর সময় সবাইকে জামা-কাপড় দিলুম···কাজেই ভাইফোঁটায় আবার সেই জামা-কাপড় উপহার···তাই ভাবছি, এবারে বরং বেশ দামী কোনো নতুন সৌখিন জিনিষ কিনে ওদের···

কর্ত্তা ঃ— বটে! শুধু জিনিষের কথাই ভাবছো···কিন্তু সে জিনিষের দাম জোগাবো কোত্থেকে—সে কথাটাও একবার ভেবো ঐ সঙ্গে!···

শিল্পী ঃ—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
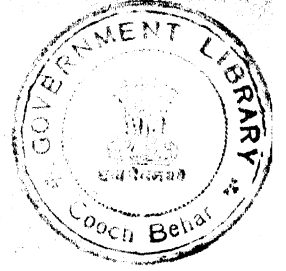
মধ্যাহ্নে

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

বেলা দ্বিপ্রহর।
স্নানাহার শেষ করে শয্যার উপর
শুয়ে আছি চুপচাপ দোতলার ঘরে,
জানালাটা খুলে দিয়ে মাথার শিয়রে।
সুমুখের বস্তিটা ভেঙে দিয়ে খোলা জমিটাতে
তোলে কারা পাকা-বাড়ি ; তারি উঁচু ছাতে
সারি-দেওয়া কালো কালো ছাতার আড়ালে
একসাথে ধীরে ধীরে মৃদু ঢিমে তালে
ওঠা-নাবা করিতেছে চুড়ি-পরা সারি সারি হাত।
ছাতপিটুনীর দল পিটিতেছে ছাত
গান গেয়ে একটানা সুরে।
রেশ তার ভেসে যায় দূর হতে আরো বহু দূরে।
ঘুম-পাড়াবার কালে কোলের শিশুরে
জননীর হাতখানি নেবে আসে ধীরে
ঐভাবে কচি কচি শিশুদের গালে
ছড়ার সুরের তালে তালে।
ছাতপিটুনীর গান একটানা কানে ভেসে আসে
শরতের ঝিরঝিরে উদাসী বাতাসে।
চোখ দুটো বুজে আসে সে গানের সুরে বারে বারে ;
ঘুমপাড়ানিয়া গান কে শোনায় ক্লান্ত এই
বুড়ো শিশুটারে।

শরতের ঘন নীল আকাশের গায়
ভেসে ভেসে যায়
ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, পথভোলা উদাসীর দল,
ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সব সঞ্চিত সম্বল।
ঘোষেদের বাড়িটার দোতলার ভাঙা কার্নিসে
গত ষাট বছরের শ্রাবণের ধারা নেবে এসে
ফেলে গেছে এলো-মেলো সবুজের ছোপ।
সেখানে দিয়েছে দেখা একরাশ আগাছার ঝোপ।
গলা-ফোলা পায়রাটা সেইখানে গুম্ হয়ে বসে
চাপা-সুরে গুমরোয় কিসের আবেশে।
চাপা তার ক্লান্ত সুর দূর হতে ভেসে আসে কানে ;
কি যে সে জানাতে চায় সেই শুধু জানে।
খেঁকি-কুকুরের চাপা কাতরানি-ডাক
কানে ভেসে আসে বারে বারে ;
কে বুঝি মেরেছে তারে লাঠি ;
খোঁড়া করে দিয়ে গেছে তারে।
ঠুং ঠুং মৃদু মৃদু শব্দ আসে কানে ;
রিক্সা-গাড়ি চড়ে বুঝি গেল কারা ওপাড়ার পানে।
ছেঁড়া ছেঁড়া এইসব সুর দূর হতে কানে ভেসে আসে ;
চোখ দুটো ঢুলে ঢুলে পড়ে
কি জানি কি নেশার আবেশে।

প্রেম সংক্রান্ত বিচার

উপাধ্যায়

নারী পুরুষের পরস্পরের লগ্নের ব্যবধান যদি ৬০° ডিগ্রি (সেক্সটাইল) অথবা ১২০° ডিগ্রি (ট্রাইন) হয়, তা হোলে তাদের ভেতর ভালোবাসা দৃঢ় হবে। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মধ্যে একজনের রাশিচক্রে যেখানে মঙ্গল আছে সেখানে অপরের শুক্র থাকলে প্রথম দর্শনেই পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ হয় এবং তাদের ভেতর যৌন আকর্ষণ হয়ে থাকে। চর ও স্থির, অগ্নি ও বায়ু, পৃথ্বী এবং জল রাশি জাতকজাতিকার মধ্যে পারস্পরিক সুসংবদ্ধ প্রেম ও মিলন ঘটে। পঞ্চমস্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করলে অস্বাভাবিক প্রণয়াসক্তি বৃদ্ধি করে। একজনের রবি বা চন্দ্রের স্ফুট অপরের বৃহস্পতি বা শুক্রের স্ফুটের খুব কাছাকাছি থাক্‌লে অথবা ১২০° ডিগ্রীর ব্যবধান হোলে অথবা একজনের চন্দ্রের স্থানে অপরের রবি অবস্থান করলে প্রণয় দৃঢ় হয় এবং তাদের মধ্যে বিবাহ ঘটলে, বিবাহিত জীবন সুখেই অতিবাহিত হয়। একজনের লগ্নাধিপতি অপরের লগ্নে অবস্থান করলে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্দ্য জমে ওঠে।

প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর পারস্পরিক রাশিচক্রে যদি দেখা যায়···রবি চন্দ্র অথবা শুভগ্রহগুলি ৯০° ডিগ্রি (স্কোয়ার বা ১৮০° ডিগ্রি (অপোজিশন) ব্যবধানে আছে, তা হোলে তাদের প্রণয় শিথিল হবে, দুঃখ কষ্ট, ক্ষয় ক্ষতি ও মানসিক বেদনা বৃদ্ধি পাবে।

প্রণয়কারক গ্রহের প্রতি শনি, মঙ্গল, হার্সেল এবং নেপচুনের বৈর দৃষ্টি থাক্‌লে অথবা পঞ্চম বা সপ্তম গৃহে অবস্থান করলে প্রণয় ভঙ্গ, নৈরাশ্য, বিবাহবিচ্ছেদ অথবা বিবাহিত জীবনে নানা অশান্তি দেখা দেয়। মঙ্গল এবং শুক্র পীড়িত হোলে অত্যন্ত-প্রণয় ও কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করে—ফলে অবাধ মেলামেশা ও সংসর্গের মাধ্যমে নিন্দিত জীবন যাপন করে। বহু প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংস্পর্শে এসে তারা লাম্পট্যদোষে দুষ্ট হয়। হার্সেল বা নেপচুন শুক্রকে পীড়িত করলে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কলহ ও মারপিঠের সৃষ্টি করে, আর অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্যের ভেতর শেষ পর্য্যন্ত প্রণয় ভঙ্গ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপার ঘটিয়ে তোলে।

স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে শনি দ্বারা রবি আক্রান্ত হোলে দুঃখপ্রদ বিবাহ ঘটে, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মোটেই বনিবনাও হয় না কিন্তু এদের ওপর বৃহস্পতি বা শুক্রের শুভ দৃষ্টি থাক্‌লে ঐ দোষের খণ্ডন হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী ওয়াইল্ডি বলেন, পুরুষের কোষ্ঠীতে চন্দ্র আর নারীর কোষ্ঠীতে রবি অথবা শুক্র, হার্সেল, শনি, ও মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হোলে প্রেমের ব্যাপার জোরালো হয়ে ওঠে অবৈধ ভাবে, আর অপবাদ কুড়োতে হয়, শুনতে হয় কানাঘুষো কথা।

সপ্তমে শনি বিবাহের বিলম্ব ও নৈরাশ্যের কারক, তবে বিবাহকারক গ্রহ বলবান হোলে আর লগ্ন থেকে সে গ্রহ দুঃ-স্থান গত না হোলে ত্রিশ বছরের মধ্যে বিবাহ সুনিশ্চিত। স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে শনির দ্বারা রবি পীড়িত হোলে, তার স্বামী মাতাল হোতে পারে অথবা অন্য রকম নেশা ভাঙ্ করতে পারে স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করে নানাভাবে নিগ্রহ করতে পারে, পঞ্চম বা সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাক্‌লে অথবা সপ্তমাধিপতি পঞ্চম স্থানে পাপসংযুক্ত হোলে প্রণয় বা বিবাহের

বহু যোগাযোগ নষ্ট হয়, বিচ্ছেদ, শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মুখ দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। জনৈক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পঞ্চম স্থানে শুক্র, মঙ্গল, হার্সেল সপ্তমাধিপতির সহিত অবস্থিত। এঁর স্ত্রী অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, অবৈধ-প্রণয়ে আসক্তা এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে তফাতে গিয়ে আছেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি কোন সম্বন্ধ রাখেন নি। এঁদের বিবাহিত জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। জনৈক মহিলার চন্দ্র থেকে সপ্তম স্থানে রবি আর অষ্টমে মঙ্গল, চন্দ্র রাহু ও শনিযুক্ত—ফলে অল্প-বয়সে তাঁর স্বামী বিয়োগ ঘটেছে। সপ্তমস্থান দ্বাত্মক অথবা দ্বিত্বভাববিশিষ্ট রাশিতে হোলে আর পাপ সংযুক্ত শুক্র এখানে থাক্‌লে একাধিক বিবাহ ঘটে। স্ত্রী-লোকের কোষ্ঠীতে সপ্তমে শনি ও চন্দ্র একত্র থাক্‌লে তার একাধিক বিবাহ। রবি ও রাহু যে পুরুষের কোষ্ঠীতে সপ্তমে অবস্থিত, তার একাধিক রমণীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে অর্থহানি হয়। স্ত্রীলোকের অষ্টমে শনি তার বিবাহিত জীবনকে একেবারে নষ্ট করে, কোন আকর্ষণ বা রোমান্টিক পরিস্থিতি থাকে না। সপ্তমে রাহু বা কেতু বিবাহিত জীবনের ট্রাজেডি আনে, আর বিবাহিত জীবন অসুখী হয়। দ্বিতীয়স্থানে পাপ গ্রহ দৃষ্টিবর্জ্জিত আর সপ্তমাধিপতির ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে অবস্থান না হোলে বিবাহিত জীবন সুখের হয়। কোন পুরুষের লগ্নে বা সপ্তমে চন্দ্র, আর নবাংশ লগ্ন সিংহরাশিতে হোলে তার স্ত্রীর চরিত্র-দোষ ঘটে। সপ্তমে শুক্র ও বুধ একত্র থাক্‌লে একটির পর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ করে পুরুষ পশুর অধম হয়ে যায়। তিনটি কেন্দ্রে পাপগ্রহ থাক্‌লে স্ত্রীকে নিয়ে কোনদিন সুখী হওয়া যায় না। সপ্তমে রবি থাক্‌লে বন্ধ্যারমণীগণের সঙ্গে রমণ সূচিত হয়।

শুক্রপাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হোলে মানুষের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা থাক্‌তে পারে। শুক্র শনির দ্বারা পীড়িত হোলে বিবাহে বিলম্ব হবার বা প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ বিবাহের সম্ভাবনা। সপ্তমাধিপতি অষ্টমে থাক্‌লে জাতক বেশ্যাসক্ত হয়। তার স্ত্রী রুগ্না বা তার স্ত্রীতে অনাসক্তি হয় অথবা সে স্ত্রীলোকের অবাধ্য হয়। সপ্তমপতি দশমে থাক্‌লে জাতকের স্ত্রী পতিব্রতা হয় না। সপ্তমস্থান মঙ্গল বা শনির বর্গ হোলেও তা'তে মঙ্গল বা শনির দৃষ্টি থাক্‌লে স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক্—পরপুরুষ বা স্ত্রীতে আসক্ত হয়। চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি একনক্ষত্রে বা নবাংশে থাক্‌লে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যভিচারী হয়। উক্ত যোগে সপ্তমপতি বুধের নবাংশগত বা বুধ দৃষ্ট হোলে ভার্য্যা বেশ্যাতুল্যা হয়। সপ্তমাধিপতি দ্বাদশে থাক্‌লে জাতকের স্ত্রী চঞ্চলা হয় অথবা ঘরের বাহির হয়ে যায়।

শুক্র এবং মঙ্গল যে কোন রাশিতে তাদের নবাংশের বিনিময় হোলে, নারী অসতী হয়। সপ্তমে রবি, চন্দ্র এবং শুক্র একত্র থাক্‌লে স্বামীর সম্মতি নিয়ে সে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়। সপ্তম নবাংশে মঙ্গল থাক্‌লে এবং শনির দৃষ্টি তার ওপর থাক্‌লে নারীর জননেন্দ্রিয় ব্যাধিপীড়িত। রবি অথবা মঙ্গল লগ্নে থাকলে নারী দারিদ্র্য-কষ্টভোগ করে। চন্দ্র থেকে বলবান বৃহস্পতি তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে সপ্তমে অষ্টমে নবমে অথবা দশমে অবস্থান করে তা হোলে স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভপ্রদ।

শুক্র ও বুধ জায়া স্থানে অবস্থান করলে স্ত্রী লাভ হয় না, কিন্তু তারা শুভ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে অধিক বয়সে অল্পবয়স্কা রমণীর সঙ্গে পরিণয়। ক্ষীণ চন্দ্র পাপগ্রহ যুক্ত হয়ে সপ্তম স্থানে থাক্‌লে জাতমানব পরস্ত্রীরত হয়, আর সপ্তমাধিপতি পাপযুক্ত হয়ে লগ্নে অবস্থান কর্‌লেও জাতক পরস্ত্রীরত ও কুপথগামী হয়।

স্ত্রীলোকের রাশিচক্রে সপ্তম স্থানে শুক্র থাক্‌লে স্বামী সুন্দর ও সুখী, বুধ থাকলে শিক্ষিত ও কর্ম্মদক্ষ, চন্দ্র থাক্‌লে কোমল আর চরিত্রহীন, বৃহস্পতি থাক্‌লে উন্নত-হৃদয়, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও চরিত্রবান, রবি থাক্‌লে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও লম্পট হয়।

স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে সপ্তমে শনি বা বুধ থাক্‌লে স্বামীর পুরুষত্ব হানি নির্দ্দেশ করে। শুভগ্রহের দৃষ্টিগত নীচস্থ গ্রহ সপ্তম স্থানে থাক্‌লে জাতিকা স্বামীর অবহেলার পাত্রী হবে। স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে সপ্তমস্থান চররাশি হোলে, স্বামী হবে ভ্রমণকারী—স্থিররাশি হোলে স্বামী গৃহে থাক্‌বে, দ্বাত্মক হোলে কখন ঘরে কখন বাইরে কাটাবে।

কোষ্ঠী-বিচার সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হোলে অশুভ। সেই গ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ গৃহের অধিপতি হোলে অশুভ। আবার ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ গৃহের অধিপতি হোলে অশুভ। অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে তা হোলে কি সে গ্রহ সব বিষয়ে অশুভ-দাতা? এর উত্তরে বলা যায় যে ঐ শুভগ্রহের শুভত্ব নষ্ট হোতে পারে না, মারক সংক্রান্ত ব্যাপারে অশুভ দাতা হয়, এজন্যেই অশুভ বলা হয়েছে। অন্য সব বিষয়ে সে শুভফলপ্রদ হবে। তার দৃষ্টিও অশুভ হবে না। গ্রহ দুইটি ভাবের অধিপতি হোলে, (একটি শুভ ভাবের, অপরটী অশুভ ভাবের) এবং ত্রিকোণাধিপতি হোলেই যে তার সবদোষ খণ্ডন হয়ে যাবে, এটি ভুল ধারণা। যে ক্ষেত্রে গ্রহ দুটি গৃহের অধিপতি—সে ক্ষেত্রে যদি একটি গৃহ তার মূলত্রিকোণ হয়, তা হোলে মূলত্রিকোণের ফলই সে দেবে, অপরটির দেবেনা। গ্রহ দুইটি গৃহের অধিপতি হয়ে যে কোন একটিতে অবস্থান করলে দুই ভাবেরই ফল দশান্তর্দ্দশায় দেবে। দশার প্রথমার্দ্ধে তার অবস্থিত ভাবের ফল শেষার্দ্ধে অপরটী ভাবের ফল দেবে, এরূপ অভিমত অনেকে প্রকাশ করেছেন। আবার এ কথাও অনেকে বলেন যে গ্রহ বিষম রাশিতে থাকলে ঐ রাশিগত ভাবের ফল দেবে প্রথমার্দ্ধে—আর সমরাশি গত ভাবের ফল দেবে শেষার্দ্ধে। দুঃস্থানের অধিপতি যদি তার অপরক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়, তা হোলে দুঃস্থানের অশুভ ফল না দিয়ে যে ঘরে সে বসে আছে—তারই ফলদাতা হবে। উদাহরণস্বরূপ এখানে শনিকে ধরা যাক। শনির দুইটি ক্ষেত্র মকর ও কুম্ভ। সে পঞ্চমস্থান মকরে অবস্থিত (কন্যালগ্ন জাত ব্যক্তির পক্ষে) অতএব সে জাতককে পুত্রদান করবে এবং ষষ্ঠাধিপতি হেতু দুঃস্থানের অশুভ ফল গুলি দেবে না। রবি পাপগ্রহ হোলেও শনি এবং মঙ্গলের মত মারাত্মক পাপগ্রহ নয়। সুতরাং সে নবম কিম্বা পঞ্চমে থাকলে ভালোই করে। লগ্নাধিপতি শুভই হোক আর অশুভই হোক—যোগকারক হ'য়ে জাতক জাতিকার কল্যাণই করে এবং বিশেষ অনুকূল আবহাওয়া এনে দেয়। ধনুলগ্নের পক্ষে বৃহস্পতি লগ্নাধিপতি ও চতুর্থাধিপতি। চতুর্থাধিপতি হেতু সে মারক, আর দশান্তর্দ্দশার মাধ্যমে সময় সুযোগ পেলে সে জাতকের মৃত্যুর কারণও হোতে পারে। দুঃস্থানাধিপতি দুঃস্থানগত হোলে ফল ভালো দেয়, বিষে বিষক্ষয়। এজন্য অষ্টমাধিপতি দ্বাদশে থাকলে ব্যয় স্থানের ফল খারাপ করেনা। কোন গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হয়ে স্বক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থ হোলে অশুভ দাতা হয় না, কিন্তু অপর কেন্দ্রে থাকলে এরূপ ফল দেবে না।

দক্ষিণ ভারতের একখানি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে (মণিকাণ্ড কেরালাম ও জুলিপ্পানি—৩০০ পৃঃ) লিখিত আছে যে চন্দ্র ও বৃহস্পতি নবমস্থানে একত্র থাকলে জাতক বা জাতিকার ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার মৃত্যু হয়, আর সপ্তমস্থানে এরূপ থাকলে জাতক বা জাতিকার বিবাহই হবে না—আর বংশ লোপ পাবে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রজাতগণের সময় ভরণী জাতগণের অপেক্ষা অনেকটা ভালো। অজীর্ণ, উদরাময় ও রক্তঘটিত পীড়া। পুরাতন জ্বর রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে সুখের হোলেও স্বজন বিরোধ ও কলহ ঘরে বাইরে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। বন্ধুদের প্রতারণা। জনপ্রিয়তা। ভূম্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরীজীবীর পক্ষে উত্তম। উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ ও অফিসে পসার-প্রতিপত্তি। প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শুভ সময়, কর্ম্মীদের সঙ্গে প্রীতিভাব। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর সময় উত্তম। মহিলারাও শুভ ফল পাবে। উপহার, উপঢৌকন ও অলঙ্কার প্রাপ্তি। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ হয়।

বৃষরাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও রোহিণীর

পেক্ষ মধ্যম। প্রথমার্দ্ধে শরীর খারাপ যাবে, শেষার্দ্ধে কিছু ভালো। স্ত্রী-পুত্রাদির পীড়া। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ বিবাদাদি। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়, শেষার্দ্ধে লাভ-জনক পরিস্থিতি। প্রচেষ্টায় লাভ ও সাফল্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক, শেষার্দ্ধে বিশেষ ভালো। এমাসে বাসের জন্য গৃহারম্ভের যোগাযোগ। প্রথমার্দ্ধে চাকুরিজীবীর পক্ষে আদৌ ভালো নয়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুভ। ব্যবসায়ে ও বৃত্তির ক্ষেত্রে উত্তম। নারীর পক্ষে মিশ্রফলদাতা। সমাজ বা জনসংস্থার মধ্যে যারা কর্ম্মী, তাদের পদে পদে বাধা ও কর্ম্ম বিশৃঙ্খলতা। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। প্রণয় ও পারিবারিক ক্ষেত্র ভালো বলা যায়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুন রাশি

মৃগশিরার পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসু অথবা আর্দ্রাজাতকের পক্ষে মৃগশিরা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ফল। আয়বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় সাফল্য, কর্ম্মদক্ষতার জন্য খ্যাতি। বাত ও পিত্ত প্রকোপ। প্রথমার্দ্ধে রক্তঃস্রাব শেষার্দ্ধে দুর্ঘটনা ভয়। স্বজনবিরোধ ও পারিবারিক অশান্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-জীবীর পক্ষে মাসটা দুর্ব্বল। চাকুরির স্থান ভালো বলা যায় না। উপরওয়ালার প্রীতির অভাব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে ভালো হোলেও কোনপ্রকার নব প্রচেষ্টার দিকে না যাওয়াই ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। পরপুরুষের সংস্রবে আসা বা অবৈধ প্রণয় বর্জ্জনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত করা আবশ্যক। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়।

কর্কট রাশি

পুষ্যার পক্ষে উত্তম, পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম, আর অশ্লেষার পক্ষে নিকৃষ্ট। লাভ, আমোদপ্রমোদ, ভ্রমণ, শত্রুজয় প্রভৃতি যোগ আছে। উদ্বিগ্নতা ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন। পারিবারিক শান্তি। আকস্মিক লাভ ও ক্ষতি দুই-ই সম্ভব। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধটি ভালো বলা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি আদৌ ভালো বলা যায় না, নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি আদৌ অশুভ নয়। সর্ব্বক্ষেত্রেই যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ। কোন কোন নারীর সন্তান সম্ভাবনা। সমাজসেবী স্ত্রীলোকের বিশেষ প্রাধান্য। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। প্রণয়ের ক্ষেত্রে এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

সিংহ রাশি

মঘা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বফল্গুনী জাতগণের পক্ষে অধম। উত্তম স্বাস্থ্য। সৌভাগ্য সুখ। চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি। পরিবার বহির্ভূত স্বজনবর্গের সহিত বিরোধ। মাসের প্রথমার্দ্ধ আর্থিক ব্যাপারে ভালো নয়। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ভূম্যাধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালায় পক্ষে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। পদোন্নতি, সম্মান ও মর্য্যাদালাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে আয় বৃদ্ধি স্ত্রীলোকদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য। অবৈধ প্রণয়েও সিদ্ধিলাভ। উপহার ও অলঙ্কার লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী ও চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে অধম। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উপঢৌকনপ্রাপ্তি। শত্রুজয়, স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। উদরের গোলমাল হোতে পারে। পারিবারিক শান্তি। আর্থিক অবস্থা অনুকূল নয়। গৃহারম্ভ বাধাপ্রাপ্ত হবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। চাকুরি-জীবীদের সময় একভাবেই যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের সময়ের কোন পরিবর্ত্তন হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। পরপুরুষের সংস্রবে বা মেলামেশার ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। কোর্টসিপ, রোমান্স বা অবৈধ প্রণয়ের পক্ষে মাসটি প্রতিকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

চিত্রাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম। স্বাতী ও বিশাখা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। এ মাসে স্বাস্থ্যের অবনতি। রক্তের চাপবৃদ্ধি, হৃদ্রোগ, শ্বাসপ্রশ্বাস ও বক্ষের পীড়াদি সম্ভব। উদরের গোলমাল। পারিবারিক অশান্তি। দাম্পত্য কলহ। আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। টাকা

লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক নয়। চাকুরিজীবীর ভাগ্যেও কোনপ্রকার সুযোগ সুবিধা নেই, বরং উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে কষ্টভোগ ও আশাভঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। শিল্পকলার পসারপ্রতিপত্তি। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। প্রণয়ে সুখলাভ ও উপঢৌকন প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধাজাতগণের পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম। জ্যেষ্ঠাজাতগণের অশেষ দুর্ভোগ। শারীরিক দুর্ব্বলতা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তপাত। ভ্রমণকালে দুর্ঘটনা। পারিবারিক শান্তি। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য। সম্যক বিদ্যার্জ্জন। সৌভাগ্যবৃদ্ধি। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক হোলেও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সমস্যা ও দুশ্চিন্তা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম, শেষের দিক নৈরাশ্যজনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সময় ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শুভ। শিল্পকলার উন্নতি লাভ। অবৈধ-প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় লাভজনক পরিস্থিতি এবং সৌহার্দ্দ্য ও সম্প্রীতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

ধনু রাশি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে শুভ। পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে কষ্ট ভোগ। শারীরিক অবস্থার অবনতি, জ্বর, রক্তপাতাদির সম্ভাবনা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা, শত্রুজয়, অর্থাগম, পারিবারিক শান্তি, স্বজনবন্ধু বিয়োগ। আর্থিক উন্নতির কোন লক্ষণ নেই, বরং দ্রুত পরিকল্পনার রূপ দিতে গিয়ে নানা বাধাবিপত্তি ও ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি প্রতিকূল,। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা। চাকুরিজীবীর সর্ববিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। দায়িত্বপূর্ণ কাজে কৃতিত্ব প্রকাশের যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। স্ত্রীলোকের পক্ষে এমাসটা আমোদপ্রমোদে যাবে। কোর্টসিপ, পার্টি, অবৈধ প্রণয় ও পরপুরুষের সঙ্গে মেলা মেশায় বিশেষ সাফল্য। পারিবারিক সুখশান্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্যোন্নতি, পারিবারিক অবস্থা একভাবেই যাবে। আর্থিক অবস্থা শুভ, আয়বৃদ্ধি। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বজন-বন্ধুবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্য। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দতা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়, ক্লান্তিকর ভ্রমণ। চাকুরির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয় নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষের কারণ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর কর্ম্মক্ষেত্রের বৃদ্ধিবিস্তার ও আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকেরা বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য্যে সাফল্যলাভ করবে। সামাজিকতার ক্ষেত্র উত্তম হবে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন। পারিবারিক শান্তি। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান. বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। শারীরিক অবস্থার অবনতি। সন্তানাদির পীড়া, শত্রু ভয়, কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। মামলা মোকর্দ্দমা, ভ্রমণের সময় সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। আর্থিক অবস্থা ভালোমন্দ মিশ্রিত। অর্থ এলেও ব্যয়াধিক্য। সঞ্চয়ের অভাব। অপরিমিত ব্যয়। আর্থিক অনাটনের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে অনুকূল নয়। সামান্য কারণে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। সমাজঘেঁষা নারীমহলের বিশেষ শুভ। শিল্পী ও অভিনেত্রীবৃন্দের খ্যাতি। অবৈধ প্রণয় ও রোমান্সে অসাধারণ সাফল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি ভালো যাবে না।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে মধ্যম। রেবতীজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি। উদরের গণ্ডগোল, মূত্রাশয়ের

পীড়া বা উপসর্গ। রক্তের চাপবৃদ্ধি। পারিবারিক কলহ স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মনোমালিন্য। ক্লান্তিকর ভ্রমণ। শত্রুপীড়া, আর্থিক স্বচ্ছন্দতার হ্রাস। কর্মপ্রচেষ্টায় ক্ষতি। গৃহে চৌর্য্যভয়। টাকা লেনদেনের ব্যাপারে গণ্ডগোল। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্র অনুকূল নয়। উপরওয়ালার অসন্তোষবৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায়না, স্ত্রীলোকের পক্ষে সময় এক ভাবেই যাবে। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। পরপুরুষের সংস্রব বর্জ্জনীয়। কোন কোন নারীর সন্তান সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি। জ্ঞানার্জ্জন। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীব্যাধি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

পাকযন্ত্রের পীড়া, দাঁতের পীড়া, দৈহিক প্রদাহ। ধনভাব মধ্যবিধ। কর্ম্মোন্নতিযোগ। মাতার শারীরিক অসুস্থতা। আত্মীর মনোমালিন্য। পত্নীভাব অশুভ। স্ত্রীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও পাকযন্ত্রের পীড়া। ব্যয় বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষ লগ্ন

শারীরিক অসুবিধাভোগ। যথেষ্ট পরিমাণে ধনাগমযোগ। সহোদরের সহিত সদ্ভাবের অভাব। বন্ধুভাবের ফল শুভ। দাম্পত্য প্রণয় সুখ। তীর্থ ভ্রমণযোগ। পিতার সহিত মতানৈক্য। শুভ কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুন লগ্ন

স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। ধনাগম হোলেও অপরিমিত ব্যয় হেতু সঞ্চয়ের পক্ষে প্রতিকূল। সম্বন্ধু লাভ। ভাগ্যোন্নতিযোগ। কর্ম্মোন্নতি। গৃহাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয়। সন্তানের বিদ্যার্জ্জন। মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট লগ্ন

শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। আর্থিকোন্নতিযোগ। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য। সন্তানভাব শুভ। দাম্পত্য প্রণয়। নূতন কর্ম্মে অর্থ বিনিয়োগে ক্ষতি। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম। মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগদান। ভ্রাতৃপ্রণয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ লগ্ন

পিত্তাধিক্য পীড়ায় কষ্টভোগ। আকস্মিক ভাবে অর্থপ্রাপ্তি। ধনভাব উত্তম। প্রতিযোগিতায় সাফল্য। খ্যাতি প্রতিপত্তি। সন্তানাদির উত্তম বিদ্যার্জ্জন। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধিযোগ। ভূম্যাদি ক্রয় বা গৃহাদি নির্ম্মাণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যালগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবনতি। আর্থিকোন্নতির পক্ষে উত্তম। ভ্রাতৃভাবের ফল শুভ নয়। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি। মাতার দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়া। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্ম্মভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

তুলা লগ্ন—

দাঁতের পীড়া, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক উদ্বেগ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। অর্থব্যয়াধিক্য। সাময়িক ঋণযোগ। আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি। কর্ম্মস্থান মন্দ নয়। মাতার স্বাস্থ্যহানি। বিদেশ গমন। তীর্থ পর্য্যটন। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃশ্চিক লগ্ন

দৈহিক ও মানসিক সুখের অন্তরায়। অর্থাগমযোগ। ঋণ। সম্বন্ধু লাভ। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা। ভ্রমণ। দাম্পত্যপ্রণয়। বিদ্যার্জ্জনে বিঘ্ন। কর্ম্মস্থল উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি ভালো নয়।

ধনুলগ্ন—

শারীরিক দুর্ব্বলতা, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, অর্থাগমন-যোগ। ব্যয়াধিক্য-নিবন্ধন বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতি। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। মিত্র-লাভ যোগ। সাময়িকভাবে আয়বৃদ্ধি। ভাগ্যভাবের উন্নতি। কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে নিজের বিবেচনা দোষে ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

মকরলগ্ন—

দেহভাবের ক্ষতি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া। অপরিমিত ধনক্ষয়হেতু চাঞ্চল্য। সহোদরভাব শুভ। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি। পত্নীভাব অশুভ। বিদ্যোন্নতি-যোগ। চাকুরী ক্ষেত্রে পদোন্নতি। তীর্থভ্রমণ। স্ত্রী-লোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, ধনাগমযোগ। সহোদরভাব শুভ। বন্ধুর সাহায্যে আর্থিকোন্নতি বা পদোন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। নূতন কর্ম্মযোগ-দানে সিদ্ধিলাভ। পিতার শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক। বিদেশ ভ্রমণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীনলগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবনতি। বেদনাসংযুক্ত পীড়া ভোগ। ধনাগম, সঞ্চয় আশানুরূপ নয়। ব্যয়বৃদ্ধি। সদ্বন্ধু লাভ। মাতা বা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রাণসংশয় পীড়া। স্ত্রীর সহিত সাময়িক মতানৈক্যহেতু অশান্তি। মধ্যে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

সুরকার ভক্ত রামপ্রসাদ

অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী

বহু সাধকের লীলাকেন্দ্র এ বাংলার পূণ্যভূমি। কত না কবি, কত না সুরস্রষ্টা তাঁদের কালজয়ী প্রতিভা দ্বারা বাংলার তথা ভারতের মানস ক্ষেত্রকে অমৃত রসধারা-সিঞ্চনে উর্বরা করেছেন—ফলবতী করেছেন নীরস প্রাণহীন মাতৃভূমিকে। কত না সুরকবি, কত না ভক্তসাধক তাঁদের শ্রীমন্ত কথা ও অমিয় মধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে সুসঞ্জীবিত করে তুলেছেন আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে। এমনি এক সুরসাধক—শিল্পীপ্রবর হলেন—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

আনুমানিক ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৯ বাং সন) বাংলার সাধন-সঙ্গীত জগতের অত্যুজ্জ্বল রত্ন রামপ্রসাদ সেন ২৪ পরগণা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে (বর্তমান হালি সহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরাজ সেন। রামপ্রসাদের জন্মোত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রিক গোলযোগ ও বিপর্যয়ে আবর্তিত ছিল; তা সত্ত্বেও একনিষ্ঠ সাধক রাম-প্রসাদ শৈশবে সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্তির পর সর্বাণী নামে এক সুশীলা কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দরিদ্র ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন বলে রামপ্রসাদকে জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল। পড়াশুনায়ও বহু ব্যাঘাত ঘটেছিল। অতি শৈশবকাল থেকেই রামপ্রসাদের কাব্য ও সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্ফূরণ হতে থাকে। উদরান্ন-সংস্থানের জন্য ও সাংসারিক প্রয়োজনে পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদকে কলকাতায় এসে এক ধনাঢ্য জমিদারের অধীনে সামান্য করণিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। বাল্যকালে রামপ্রসাদ গ্রামীণ সমাজে বুদ্ধিমত্তা সংস্বভাবের জন্য সুচিহ্নিত ছিলেন—তাঁর স্মৃতিশক্তিও খুব প্রখর ছিল। কৈশোর ও যৌবনেই রামপ্রসাদের মধ্যে ভক্তিভাবের উদয় হয়। তিনি রাগসঙ্গীতের অর্থাৎ কালোয়াতী গানের চর্চা করেছিলেন ভাল ভাবেই; কিন্তু ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতেই তিনি অনুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকতেন। শ্যামা মায়ের আকুল আহ্বান তাঁকে নিয়ত উন্মনা উদ্ভ্রান্ত করে তুলত।

কালী সাধনায় রামপ্রসাদ দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। সারা দিনরাত তিনি কালীমাতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ভক্তিভাবাপ্লুত প্রাণমাতান মধুকণ্ঠ নিঃসৃত গানে তিনি চতুপার্শ্বস্থ নরনারীকে বিমোহিত করে রাখতেন।

জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করার সময় রামপ্রসাদ একবার দপ্তরের খাতায় "আমায় দে' মা তবিলদারি—আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী" গানখানি লিখে রেখেছিলেন। সহকর্মীরা এ গানখানি জমিদারবাবুকে দেখান। গুণগ্রাহী জমিদারবাবু রামপ্রসাদের কাব্য-ক্ষমতা ও ধর্মভাব লক্ষ্য করে পরম প্রীত হন। তিনি তাঁকে তুচ্ছ চাকুরী থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন।

গ্রাসাচ্ছাদনের সুরাহা হওয়ায় রামপ্রসাদ তাঁর নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণে সাধন সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি যেন তখন দুর্বার বেগে স্ফূরিত হতে লাগল। করুণরসঘন সুরে যেন তাঁর ভক্তিভাবাবেগ মুক্তি খুঁজে পেল। ভক্তিময় বাণী যেন সুরের সুরধুনীতে সুমধুর কলতান সৃষ্টি করল। তাঁর রচিত গানে তিনি নিজেই সুরারোপ করে তা' গাইতে লাগলেন—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
—প্রসাদী-একতালা

... ...

আর কাজ কি আমার গয়া, কাশী।
মায়ের চরণ তলে পড়ে আছে গয়া, গঙ্গা,
বারাণসী॥
হৃদ কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ তাতে
রাশি রাশি॥—জংলা-একতালা

* * *

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা
মাত্র হলো।
যেমন চিত্রে পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
—ললিত-বিভাষ একতালা

* * *

মনে করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥—প্রসাদী-একতালা

* * *

ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে॥—প্রসাদী-একতালা

* * *

আমার সাধ না মিটিল,
আশা না পুরিল;
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা;
সকলি ফুরায়ে যায় মা॥—ভীমপলশ্রী-দাদরা

রামপ্রসাদ একধারে সাধক-কবি-সুরকার ও গায়ক ছিলেন। এতগুলো সদগুণের অধিকারী হওয়া পরম ভাগ্যের বিষয়। মানুষ হিসাবেও রামপ্রসাদ অতি অমায়িক ও সৎ ছিলেন। তিনি খুব সাদাসিধে সরল জীবন যাপন করতেন। মাতৃসাধনায় তিনি এমন আত্মহারা হয়ে যেতেন যে তার বাহ্যজ্ঞান বা বৈষয়িক জ্ঞান লোপ পেত। তাঁর যশ বাংলার গ্রামে-সহরে বন্দরে এমন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যে—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ রামপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সুললিত গানের জন্য তাঁকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ও তাঁর অনুপম কাব্য শক্তির স্বীকৃতিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। রামপ্রসাদও মহারাজকে তাঁর ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ স্বরচিত কাব্য-গ্রন্থ "বিদ্যাসুন্দর" উৎসর্গ ও অর্পণ করেন।

কথিত আছে যে, নবাব সিরাজউদৌল্লা হালিসহরে এসে রামপ্রসাদের ভক্তিভাবময় সঙ্গীত শুনে পরম প্রীতি লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদ নবাব সাহেবকে ওস্তাদী গান এবং তাঁর স্বকৃত সাধনমার্গের গান শুনিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন।

রামপ্রসাদের অমিত গীত-শক্তি ও তাঁর স্বভাব সুলভ কবিত্বশক্তি সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আজও প্রচলিত আছে। তাঁর সাধনজীবন সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী আজও বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত হয়ে থাকে। রামপ্রসাদের নব সঙ্গীত সৃষ্টি তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি এক নবতর সঙ্গীত শৈলীর প্রবর্তক। তাঁর এ অভিনব সঙ্গীত সৃষ্টি 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' নামে সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত ও বহুল গীত। বিরাট প্রতিভার অধিকারী না হলে সঙ্গীতের ন্যায় প্রাচীন শিল্প-কলায় নতুন অধ্যায় যোজনা করা যে, অতি দুরূহ ব্যাপার তা' সহজেই অনুমেয়। স্বভাবকবি রামপ্রসাদের ধ্যানোপলব্ধি অতি গভীর ছিল। তিনি মাতৃনাম কীর্তনে সর্বক্ষণ তন্ময় হয়ে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় অবিরাম শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর কবিতা ও গান ভক্তিরসানুভূতিরই সহজ সরল অভিব্যক্তি।

প্রসাদী শিল্পকর্ম তথাকথিত বুদ্ধিবিলাসে ভারাক্রান্ত নয়। হৃদয় মাধুর্য ও ভাবের ঋজুতাই প্রসাদী সঙ্গীতের মর্মবাণী। আত্মনিবেদন ও মাতৃবন্দনাই তাঁর কাব্য সঙ্গীতের মৌল সুর। আরাধনা বিলাস ও মাতৃপূজা তাঁর গানকে এক নবরূপে মহিমান্বিত করে তুলেছে। তিনি তাঁর গানের ভিতর দিয়ে যেন সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে তাঁর সাধনার ধনকে সর্বস্ব নিবেদন করেছেন। ভক্তমনের কামনা-আকুতির রুদ্ধ দ্বার যেন তাঁর গানের স্পর্শে উন্মোচিত হয়েছে।

শ্যামা সঙ্গীত ছাড়াও তিনি মানব মনের বিভিন্ন ভাবকে তাঁর গানে রূপায়ন করেছেন। সমসাময়িক সমাজজীবনের এবং মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনীও প্রসাদী সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। তার শেষ জীবনে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ) সংঘটিত হয় এবং বাংলার মসনদে ইংরাজগণ স্থায়ীভাবে অধিকার স্থাপন করেন। এ সময় দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়—কিছুকাল পর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বাং সন) সোনার বাংলায় এক ঘোর আকাল নিয়ে উপস্থিত হয়।

দেশের সেই দুর্দিনে দেশবন্ধু রামপ্রসাদ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন নি। সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের সময় রামপ্রসাদ দেশবাসীর দুঃখে এত কাতর হয়েছিলেন যে, তিনি মানুষের অন্নকষ্ট ও বিপৎকালকে শুধু তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেই ক্ষান্ত হন নি—সে সময় তিনি অগ্রণী হয়ে আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সুরকার রামপ্রসাদের দান বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বিভিন্ন রাগরাগিণী সম্বলিত বহু গান রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর নিজস্ব নতুন ঢঙএর গান—যা' রামপ্রসাদী সুর নামে খ্যাত—তাই তাঁকে চিরপ্রিয় করে রেখেছে। তাঁর অধ্যাত্ম সঙ্গীত তথা মাতৃসঙ্গীত কী ভাব সম্পদে—কী সুর-বৈচিত্রে—কী রচনার সারল্যে বাস্তবিকই অতুলনীয়। তাঁর,—

"এমন দিন কি হবে তারা।
(যবে) তারা তারা তারা বলে, তারা
বয়ে পড়বে ধারা॥

—সিন্ধু-ঠুংরী

* * * *

এ সংসার ধোঁকার টাটি
ও ভাই আনন্দ বাজার লুটি ।

—প্রসাদী সুর-একতাল।

* * * *

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

—ঝিঁঝিট-কাওয়ালী

* * * *

মন রে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইলো পতিত, আবাদ
করলে ফলতো সোনা॥

—জংলা-একতালা

* * * *

মন কেন মা'র চরণ ছাড়া।
ও মন, ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে
ভক্তি-দড়া॥

—প্রসাদী সুর-একতাল।

এ গানগুলি কথা ও সুরের দিক থেকে অতি প্রাঞ্জল। এমন কোনও বাঙ্গালী নেই যে, এ সব ভক্তিময় সুললিত সঙ্গীত শুনে যার হৃদয়ে ভাবান্তর উদিত না হয়।

রামপ্রসাদী গানে বহু তালের ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য খোলের তাল 'লোফা'ই প্রসাদী সঙ্গীতে অধিক। যৎ—আড়খেমটা—একতালা—পোস্ত—ঝাঁপতাল—মধ্যমান-ঠুংরী—আড়াঠেকা—আদ্ধা—খয়রা—তেওট-রূপক—কাওয়ালী—ঢিমে-ত্রিতাল প্রভৃতি তালও প্রসাদী সঙ্গীতে সুসংবদ্ধ দেখা যায়। 'কালী-কীর্তন' ও 'কৃষ্ণ-কীর্তন' নামক আরও দুখানি সুর সম্বলিত কাব্য-গ্রন্থ রামপ্রসাদ রচনা করে গিয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরণের সুরারোপিত ভক্তিমূলক গীত-গ্রন্থ আর নেই।

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর বাংলার অতি-প্রিয় গীতকার রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি মায়ের নাম গান গাইতে গাইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন কালী-মূর্তি বিসর্জন কালে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। যাই হোক, ৭২ বৎসর বয়সে বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান ভক্ত-হৃদবিকাশ-রামপ্রসাদ দেশবাসীর জন্য মধুর গীত-কাব্যামৃত রেখে বাংলা মায়ের শান্ত কোলে চির-আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রী'শ'—

॥ দেশের দাবী ॥

চলচ্চিত্রে বৈচিত্রের অভাব বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি বললে অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই। তার কারন বোধ হয় আমাদের জীবনেই বৈচিত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই বাস্তবধর্ম্মী চিত্র নির্ম্মাণ করতে গেলেই তা প্রায় একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। সেই নায়ক-নায়িকার দেখা হওয়া, সেই প্রেম, বিচ্ছেদ ও মিলন, আর খান কয়েক গান। এই হচ্ছে এ দেশের চিত্রের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এ নিয়ে আর কতদিন চলবে? এবার সময় এসেছে অন্য দিকে চোখ ফেরাবার। চলচ্চিত্রের রয়েছে এক মহান দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি। দেশেরও রয়েছে দাবী চলচ্চিত্রের ওপর। সমাজ জীবন গঠনে ও সাধারণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তারে রয়েছে চলচ্চিত্রের অসামান্য ক্ষমতা। আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সেই প্রভাবকে, সেই জনমানস গঠনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সময়োপযোগী চিত্র নির্ম্মাণের বিশেষ আবশ্যকও রয়েছে। আজ সেই আবশ্যক, সেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নিদারুন ভাবে। চলচিত্র শিল্পকে দেশের এই প্রয়োজনে, এই দাবীতে, এই ডাকে সাড়া দিতেই হবে।

ভারত সীমান্তে আজ বিদেশী শত্রু হানা দিয়েছে। দেশের নিরপত্তা আজ বিপন্ন। দেশের অভ্যন্তরে গুপ্তশত্রু পঞ্চম-বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠছে। জনগন কিন্তু দেশরক্ষার সঙ্কল্পে অটুট। ভারতের বীর বাহিনী অমিতবিক্রমে শত্রুকে বাধা দিচ্ছে, হটিয়ে দিচ্ছে। ভারতের বীর জওয়ানদের বীরত্বে আজ সমগ্র দেশ মুগ্ধ, শত্রুরা স্তম্ভিত। দেশের নওজোয়ান-রাও আজ তাদের পাশে দাঁড়াতে চায় অস্ত্র হাতে—প্রাণ দিতে চায় রণক্ষেত্রে শত্রু নিধন করে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে আজ আবাল-বৃদ্ধবনিতা ও দল, উপদল নির্ব্বিশেষে সকল ভারতীয় এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে উঠেছে। আজ এই সন্ধিক্ষণে, জাতির এই মহাপরীক্ষার দিনে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে। চলচ্চিত্র শিল্পকেও এগিয়ে আসতে হবে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে জাতির সেবায়, দেশের রক্ষাকল্পে। শুধু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেশরক্ষা তহবিলে দান করলেই দায়িত্ব শেষ হবে না।—আরও বড়, আরও ব্যাপক ভাবে কাজ করতে হবে। দেশের দাবী তাদের কাছে আরও অনেক বেশী।

এ যুদ্ধ অল্প সময়ে শেষ হবে না—হয়ত বহুদিন ধরেই চলবে। আমাদের প্রধান মন্ত্রীরও তাই ধারণা। তাই জাতিকে প্রস্তুত হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য, তৈরী হতে হবে ত্যাগের জন্য, সচেষ্ট হতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য। চলচ্চিত্র পারবে জাতি গঠনের এই কাজে অংশ গ্রহণ করতে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের লোকের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এই সংগ্রামের, এই ত্যাগের, এই একতার মনভাবকে। কাজে লাগাতে হবে চলচ্চিত্রের প্রভাবকে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য, জাতিকে আরও সংঘবদ্ধ করবার জন্য, বহিঃশত্রু ও গৃহ-শত্রুকে পরাস্ত করবার জন্য, জাতির চেতনাকে জাগিয়ে তুলবার জন্য, সাধারণ জড় মানুষকে সংগ্রামী মানুষে পরিণত করবার জন্য। এ কাজে চিত্র-নির্ম্মাতাদের হয়ত করতে হবে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ দেশের ও দশের প্রয়োজনে। লাভের দিকে লক্ষ্য না রেখে জাতির জন্যে, দেশের জন্যে এ স্বার্থত্যাগ তাঁরা অবশ্যই করবেন আশা করি।

এমন সব চিত্র এখন নির্ম্মিত হওয়া উচিত যাতে জাতির সংঘশক্তি আরও সুদৃঢ় রূপ লাভ করবে, বীররসে সঞ্জীবিত করবে জাতিকে, একতার বলে বলিয়ান করে তুলবে সমগ্র দেশকে। এই রকম চিত্রই, বেশী না হলেও, কিছু কিছু নির্ম্মিত হওয়ার এখন একান্ত প্রয়োজন। উপাদানের অভাব হবে না। নেফা ও লাদকের রক্তরঞ্জিত রণাঙ্গনে ছড়িয়ে

আছে ভারতীয় জওয়ানদের অজস্র বীরত্ব-কথা। জওয়ান্-রক্ত-সিঞ্চিত রণভূমিতে ভারতের বীর বাহিনী যে ইতিহাস রচনা করছে সে ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে, বরণীয় করে তুলতে হবে কাব্যে, গাথায়, চিত্রে। রূপায়িত করতে হবে সেই বীরত্ব-গাথাকে চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায়, যা দেখে দেশের জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, যুবশক্তি জেগে উঠবে, রুখে দাঁড়াবে হানাদার ও হামলাদারদের বিরুদ্ধে।

এরূপ চিত্রে হয়ত থাকবে না নায়ক-নায়িকার ন্যাকামি-ভরা প্রেমালাপ, চটুল নৃত্যগীতের চটক বা ব্যঙ্গভরা হাস্যপরিহাস। কিন্তু তবুও এরকম চিত্র লোকে অবশ্যই দেখবে, সাদরে গ্রহণ করবে দেশের দর্শকসমাজ এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আজ ভারতের বিপুল জনশক্তি ও উদগ্র যুবশক্তি স্তিমিত হয়ে রয়েছে প্রেরণার অভাবে। নেতৃত্বের অভাবে আবার কখনও কখনও চলে যাচ্ছে বিপথে। বিভ্রান্তিকর মতবাদের প্রভাবে ভ্রান্ত রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ডেকে আনছে দেশের সর্ব্বনাশকে। এই গণ-শক্তিকে, এই যুবশক্তিকে দিতে হবে প্রেরণা, দেখাতে হবে পথ, চালাতে হবে লক্ষ্যের দিকে সুপরিকল্পিত ভাবে। চলচ্চিত্রের দ্বারা এ কাজ করা খুবই সম্ভব, কারণ তার বিশেষ প্রভাব রয়েছে জনমনের ওপর এবং বিশেষ করে যুবকদের ওপর। সত্যকার ঘটনা অবলম্বনে রচিত বীরত্ব-পূর্ণ সমর-চিত্রের প্রভাব তাদের ওপর পড়ে তাদের মনের সুপ্ত সৈনিককে জাগিয়ে তুলবে। তখন আর তারা প্রতিমা নিরঞ্জনের বাদ্যের সঙ্গে নক্কার জনক নৃত্য না করে রণ-দামামার তালেতালে রণসঙ্গীত গাইতেগাইতে এগিয়ে যেতে চাইবে শত্রুর সম্মুখে সাহস বিস্তৃত বক্ষে। দেখাতে চাইবে জগতকে এই ভারতীয়রা, এই বাঙ্গালীরা ক্লীব নয়, জড় নয়, কাপুরুষ নয়। সুযোগ সুবিধা পেলে তারাও নিপুণ যোদ্ধাতে পরিণত হতে পারে। সময় এলে দেশের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, শান্তির জন্যে অকাতরে তারাও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে সমর-প্রাঙ্গনে।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে ব্যয়বহুল যুদ্ধ-চিত্র নির্ম্মাণের খরচ ও হাঙ্গামা অনেক তা স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে এলে তো চলবে না। দেশের দাবী [illegible] এসেছে। চলচ্চিত্রকেও সে দাবী মেটাতে হবে, দায়িত্ব পালন করতে হবে—দেশের প্রয়োজনে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। দেশের অনেক শিল্পপতিগণ ও ধনীগন আজ মুক্ত হস্তে দেশ রক্ষা ভাণ্ডারে দান করছেন। এরূপ চিত্র নির্ম্মাণে তাঁরাও সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবেন না বলেই আশা করি। চলচ্চিত্র শিল্পীগণও তাঁদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক কমিয়ে এই সকল চিত্র নির্ম্মাণে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই। ভারত সরকার ও সমর বিভাগও এই ধরণের যুদ্ধ-চিত্র নির্ম্মাণে সর্ব্বরকম সাহায্য দেবেন বলেই মনে হয়। সরকারেরও উচিত নেফা ও লাদকের রণক্ষেত্রের কয়েকটি প্রামাণ্য (ডকুমেণ্টারী) চিত্র গ্রহণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

আশা করি চলচ্চিত্র নির্ম্মাতারা, চলচ্চিত্র শিল্পীগণ, শিল্পপতিকুল প্রভৃতি সকলেই ভারতের বীর বাহিনীর যোদ্ধাদের অতুল বীরত্বে সাহসে উজ্জ্বল এরূপ চিত্র নির্ম্মাণে অচিরেই উদ্যোগী হবেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সম্মুখসমরে নিহত বীর জওয়ানদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই সকল চিত্র উৎসর্গ করে জাতিকে উপহার দিয়ে দেশের দাবী মেটাবেন।

* * *

খবরাখবর ঃ

বাঙলাদেশের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের মহিলা শিল্পীগণ "মহিলা শিল্পীমহল" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলাদেশের আজীবন অভিনয়-অনুশীলন-কারী আথিক দুর্দশাগ্রস্ত এইরূপ শিল্পীবৃন্দকে আর্থিক সাহায্য করবার জন্য এক মহৎ ও গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান দুস্থাশিল্পীদের জন্য একটি 'হোম' নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তদুদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণ বিখ্যাত 'মিশরকুমারী' নাটকটি আগামী ৫ই ও ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ করবেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পী-গণের মধ্যে সরযুদেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, কানন দেবী, সুনন্দা দেবী, মলিনা দেবী, যমুনা দেবী, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, অনুভা গুপ্তা, বনানী চৌধুরী, শিপ্রা মিত্র, রেণুকা রায়, গীতা

দে, কেতকী দত্ত, সুলতা চৌধুরী, বাসবী নন্দী, শ্যামলী চক্রবর্তী, নমিতা সিংহ, দীপিকা দাস, শুক্লা দাস, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তারা ভাদুড়ী, সাধনা রায়চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীগণ এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে মহিলা শিল্পীগণই স্ত্রী ও পুরুষ—উভয়বিধ চরিত্রেই অভিনয় করবেন।

নাটকটি পরিচালনা করবেন সরযূ দেবী ও মলিনা দেবী এবং সহযোগিতা করবেন বনানী চৌধুরী।

* * *

কারের বিবরণ এবং দৃশ্যও চিত্রটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত টেলিভিশন ক্যামেরা-ম্যান উইলিয়াম হার্টিগ্যান্ পাঁচ সপ্তাহব্যাপী কলিকাতায় ইহার চিত্রগ্রহণ করেছেন। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করে বিদেশী কলা-কুশলীগণ নিউ ইয়র্কে ফিরে গেছেন।

* * *

ভূপেন্দ্র সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতার পরিচালনায় রেনেসাঁস ফিল্মস-এর 'ঢেউয়ের পর ঢেউ' চিত্রটি সান-

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও বিমু বর্ধন পরিচালিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত "এক টুকরো আগুন" চিত্রে ভদ্রা বর্মন ও বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী কলিকাতার ছাত্রজীবনকে অবলম্বন কোরে তথ্যমূলক একটি প্রামাণিক চিত্র নির্মাণ করেছেন। হেলেন জীন রজার্স নামে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপিকা এই চিত্রটি প্রযোজনা কোরছেন। এই নভেম্বর মাসেই আমেরিকার এ-বি-সি টেলিভিশন-এর মাধ্যমে চিত্রটি প্রচার করা হবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র, তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কলিকাতার নাগরিক-জীবনের একটি বিচিত্র তথ্যপূর্ণ রূপ ইহাতে তুলে ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-

ফ্রান্সিসকোর আগামী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের নিমিত্ত আমন্ত্রিত হয়েছে। দীঘার সমুদ্র-সৈকতের মনোরম দৃশ্যাবলী ও এক ভিন্নধর্মী কাহিনী অবলম্বনে চিত্রটি নির্মিত। ইহার ইংরেজী নাম দেওয়া হয়েছে "ওয়েভস্ আফ্‌টার ওয়েভস্"। উপরোক্ত আসন্ন চিত্র প্রদর্শনীতে আমরা চিত্রটির সাফল্য কামনা করি।

* * *

'উইল ইউ ম্যারি মি' নামটা ইংরেজী বটে, কিন্তু চিত্রটি বাঙলা। জগনাথ চক্রবর্তী ও কৌতুকাভিনয়-শিল্পী অজিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় এবং বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে অপজিত পিকচার্সের প্রথম নিবেদন "উইল ইউ ম্যারি মি" কমেডি চিত্রটি নির্মাণ হচ্ছে। 'নব-

গোষ্ঠী' চিত্রটী পরিচালনা করবেন। বিশ্বজিৎ, শর্মিলাঠাকুর, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রটির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন।

* * *

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে গীতা পিকচার্স-এর প্রযোজনায় 'চোরা-বালি' চিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠান গত মহালয়ার দিন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন সুনীলরঞ্জন দাশ।

* * *

নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

* * *

রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত শিক্ষা-সফরের জন্য ভারত সরকার একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করেন। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট নাট্য প্রযোজক শ্রী টি কে. শুনমুখম্ এই প্রতিনিধি-দলের অন্যতম সদস্য। তিনি সম্প্রতি বাংলা দেশ সফর কোরে মাদ্রাজে গিয়ে সেখানকার সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে বাংলার মঞ্চ ও মঞ্চাভিনয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "বর্ণচোরা" চিত্রের একটী দৃশ্যে **জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়** প্রভৃতি।

জে. বি. প্রোডাকসন্স-এর প্রযোজনায় 'এ প্রভু মহাপ্রভু' নামক এই নির্মীয়মান চিত্রটি একটি বাঙলা কৌতুকচিত্র। নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ইহার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন হরিধনমুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। চিত্রটির পরিচালনা ও সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রতন চট্টোপাধ্যায় ও কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 'শ্রেয়সীর' মঞ্চাভিনয় ইতিপূর্বেই জনসমাদর লাভ করেছে। শ্যাম চক্রবর্তী বর্তমানে ইহার চিত্ররূপ দান করছেন। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'শ্রেয়সী'র মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে নায়ক ও

সবিশেষ প্রশংসা করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি 'ষ্টার' 'বিশ্বরূপা' ও 'রঙমহল' নাট্যশালার ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা, ঐ সকল রঙ্গমঞ্চের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিশেষ 'সাউণ্ড এফেক্ট' ব্যতীত 'মাইক্রোফোন' ব্যবহার না করার কথা, বাঙলা নাটকের কাহিনীর উৎকর্ষতা এবং তার চরিত্র-কল্পনা ও অভিনয়-বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

* * *

চিত্র সমালোচনা

॥ অভিযান ॥

কাহিনীর সারাংশ: নরসিং একজন ট্যাক্সিচালক। জাতিতে রাজপুত। কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে বাংলা দেশেই

বাস করছে। লেখা-পড়া জানেনা। নিজের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। অথচ ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজকে সে ভদ্রলোকের কাজ বলে মানে না। সে 'ভদ্দরলোক' হতে চায়, তাই গোপনে ইংরেজী শিখবার চেষ্টা করে। বর্তমানে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার বৌ তাকে ছেড়ে পালিয়েছে। তাই স্ত্রীলোকের ওপর তার বড় বিদ্বেষ-ভাব। তার ট্যাক্সিতে কোনো স্ত্রীলোকের স্থান নেই। বেপরোয়া মানুষ। কারো তোয়াক্কা করেনা। একদিন বেপরোয়া ভাবে এস-ডি-ও সাহেবের গাড়ীকে ওভারটেক করায় তার ট্যাক্সির লাইসেন্স গেল। ফিরে চললো নিজের দেশে। পথে শ্যামনগরের ব্যবসায়ী সুখনরামের সঙ্গে পরিচয়। সুখনরাম সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে গরুর গাড়ীতে শ্যামনগরে ফিরছিল। পথে দুর্ঘটনা ঘটে।—গরুর গাড়ী অচল। নরসিং তাকে পৌছে দেয় শ্যামনগরে। এই প্রথম তার গাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক উঠলো—সুখনরামের সঙ্গের মেয়েটি।

তারপর চোরা ব্যবসায়ী সুখনরাম নিজের প্রয়োজনে নরসিংকে থাকবার জায়গা ও গাড়ী চালাবার টাকা দেয়। সেখানে খ্রীষ্টান যোশেফ ও তার বোন মিশনারী স্কুলের টীচার নীলিমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নীলিমাকে সে ভালবাসতে চায়। পরে জানে নীলিমা ভালবাসে আর একজনকে। ঘটনাক্রমে সুখনরামের সঙ্গের ঐ মেয়েটি—গুলাবীকে নিয়েই সে ঘর বাঁধবার জন্য পাগল হয়। প্রথমে গুলাবীকে সে খারাপ মেয়ে ভাবত। পরে যখন তার মনের এই ভুল ধারনা কেটে গেল তখন কিন্তু সুখনরাম গুলাবীকে নিয়ে পালিয়েছে চোরাকারবারের জন্য পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায়। কিন্তু নরসিং বোধহয় এবারে রাজপুত বীরের মতই ঝাঁপিয়ে পড়লো তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় কৃত চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত সমন্বিত হয়ে অভিযাত্রিক-এর প্রথম নিবেদন 'অভিযান' চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে চলতি বাংলা চিত্রগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে অভিযান-এর কাহিনীতে নূতনত্ব আছে—একথা অবশ্যই বলা চলে। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র গতানুগতিকের ব্যতিক্রম, সর্বত্র সাড়া পড়বার মত অভিনবত্ব তাতে পরিলক্ষিত হয় না তথাপি এই ব্যতিক্রম সৃষ্টির জন্যই আমরা পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের প্রশংসা করি।

চিত্রনাট্যে ত্রুটি আছে। সেই ত্রুটির জন্যই স্থানে স্থানে অভিনীত চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় ও প্রয়োজন বুঝতে অসুবিধা হয়। যেমন, বীরেশ্বর সেন কর্তৃক অভিনীত চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে এস-ডি-ও না পুলিশ সাহেবের তা বুঝা যায় না। তাঁর অভিনয় দর্শনে স্বাভাবিক-ভাবেই এ-প্রশ্ন মনে আসে। এ-ছাড়া টাইটেল সুরু হবার আগে যে চরিত্রের দ্বারা নায়ককে পরিচিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে নাটকের সর্বাঙ্গীন বিচারে সেই চরিত্রটির মূল্য কি বা কতটুকু? সে চরিত্রটি এলোই বা কেন? আর গেলই বা কোথায়? তার এই একবার আসা এবং তারপর একেবারে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে নাটকীয় সামঞ্জস্যও যেন একেবারেই হারিয়ে গেছে। আবার নাটকীয় তাৎপর্যের দিক থেকে একটি ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানী প্রদর্শনের কোনো হেতুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে যদি কেউ মনে করেন নায়িকা ওয়াহিদা রেহমানের দ্বিবিধ অভিনয় প্রদর্শনের জন্যই ইহার প্রয়োজন আছে, তাহলে যুক্তিটা একেবারেই হাস্যকর হয়ে পড়ে।

অভিনয়ের বিষয়ে নায়কের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ভাল করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখে একটি প্রশ্ন জাগে;—তিনি কি একজন সাধারণ পাঞ্জাবী ড্রাইভারের অভিনয় করেছেন? না—একজন রাজপুত বংশীয় ব্যক্তির অভিনয় করেছেন? যদি দ্বিতীয় চরিত্রটির, অর্থাৎ রাজপুত বংশীয় ব্যক্তির অভিনয় করে থাকেন, তা হলে তাঁর অভিনয় ও সংলাপ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এবং সত্যজিৎ রায়ের আরও সাবধান ও যত্নবান হওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। নায়িকার ভূমিকায় ওয়াহীদা রেহমান বিশিষ্ট না হলেও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। তবে এই চরিত্রের জন্য বোম্বাই থেকে শিল্পী আনয়নের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ বাংলা দেশে উক্ত চরিত্রের জন্য উপযুক্ত মহিলা শিল্পীর অভাব নেই। বরং অপেক্ষাকৃত ভাল অভিনেত্রীও মিলতে পারতো। তাই এ-ক্ষেত্রে সত্যজিৎবাবুর বোম্বাই-প্রীতিটুকু অযথা বলেই মনে হয়। অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে রবি ঘোষ, রুমা গুহঠাকুরতা, জ্ঞানেশ

মুখোপাধ্যায়, রেবা দেবী, চারুপ্রকাশ ঘোষ (সুখনরাম), শেখর চট্টোপাধ্যায় (বাস ড্রাইভার) ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলিমার বিকলাঙ্গ প্রণয়ী) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলা-কুশলতার বিষয়গুলির মধ্যে সৌমেন্দু রায়ের চিত্রগ্রহণ ও দুলাল দত্তের সম্পাদনার কাজ খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু শব্দ ধারণের কাজ (দুর্গাদাস মিত্র, নৃপেন পাল ও সুজিৎ সরকার) সর্বদা উপযুক্ত মান বজায় রাখতে পারেননি। অনেকক্ষেত্রে তা অস্পষ্টও হয়েছে। সঙ্গীত ও আবহ-সঙ্গীত মানোপযুক্ত। রূপসজ্জার কাজ (অনন্ত দাস) ভাল হয়েছে।

॥ কুমারী মন ॥

কাহিনীর সারাংশ: নায়ক ও নায়িকা উভয়েই সহরের মানুষ। নায়ক আদর্শবাদী। সুন্দরবনের একটি অংশে বন কেটে চাষ করে সে ফসল ফলাবে। নায়িকা তার স্ত্রী নায়কের সঙ্গে ঐ সুন্দরবনে এলো বাস করতে। কিন্তু আদর্শ-পাগল স্বামীর সঙ্গ সে যথোচিতভাবে লাভ করবার সুযোগ পায় না। তার মন গুমরে গুমরে ওঠে। ফলে স্ত্রীর অভিমান ও অভিযোগকে ভুল বুঝে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তার মাঝে হঠাৎ এসে পড়ে নায়িকার কুমারী-অবস্থার প্রণয়ী। ঘটনাচক্রে স্বামীর ঘর ছেড়ে নায়িকা তার পূর্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে যাত্রা করে অনিশ্চিতের উদ্দেশে। কিন্তু পরিশেষে নাটকীয়ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটে।

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে এবং 'ফিল্ম-এজ'-এর প্রযোজনায় ও 'চিত্ররথ'-এর পরিচালনায় 'কুমারীমন' চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। চিত্রের কাহিনী একেবারেই মামুলী। তবে সুন্দরবনের পারিপার্শ্বিকের মাধ্যমে যে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে নায়ক-নায়িকার জীবনকেই মুখ্যভাবে গ্রহণ না কোরে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন ও তার পরিবেশকে বিশিষ্ট কোরে তোলার যে চেষ্টা করা হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের কথা বাদ দিলে, কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকার উপরোক্ত কাহিনীগত মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ও তার প্রকাশ এবং তজ্জনিত নাটকীয় পরিণতি —এক কথায় তাদের দাম্পত্য জীবনের পরিণতি প্রদর্শনের জন্য সুন্দরবন অথবা ঐরূপ একটি পরিবেশের অবশ্য প্রয়োজন ছিল—একথা স্বীকার করা চলে না। ঠিক এই একই কারণে মরিয়ম, ও ইফানের প্রণয় কাহিনীরও কোনরূপ অপরিহার্য নাটকীয় মূল্য স্বীকার করা চলে না কারণ এই ধরণের কাহিনী সাধারণতঃ মূল কাহিনীর অনুকূল অপেক্ষা প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। তাতে নাটকের মূল কাহিনীর গতিও মন্থর হয়ে পড়ে—যা যে কোনো নাটকের পক্ষেই একান্ত অবাঞ্ছনীয়। তবে এ-ক্ষেত্রে ঘটনাটি অবশ্য প্রয়োজনীয় না হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় সমর্থ হয়েছে। কাহিনীর অন্যান্য ত্রুটি ও নাটকীয় সামঞ্জস্যের অভাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও, চিত্রের শেষ দৃশ্যটির অতি নাটকীয় পরিণতির কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। চিত্রনাট্যকার এ-বিষয়ে সাবধান হলে চিত্রটী কাহিনীগত মর্যাদাও বোধহয় লাভ করতে পারতো।

অভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নায়িকার ভূমিকায় কণিকা মজুমদার—উভয়েই স্বীয় স্বীয় অভিনয় দক্ষতার প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (খলব্যক্তি), দিলীপ মুখোপাধ্যায় (নায়িকার পূর্ব-প্রণয়ী), চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক (পাগল), সন্ধ্যা রায় ও আশাদেবীর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রটিতে ক্যামেরার কাজ (দীলিপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়) ও শব্দ গ্রহণের কাজ (সুজিত সরকার) খুবই সুন্দর। বহির্দৃশ্যের মধ্যে ঝড়-জলের মধ্যে নদীর উপরের ভাসমান নৌকোর দৃশ্য গ্রহণের কাজ অনবদ্য হয়েছে। এ-ছাড়া শিল্প নির্দেশনা (রবি চট্টোপাধ্যায়) ও সম্পাদনার (গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়) কাজও প্রশংসনীয়।

পরিশেষে, চিত্রটির কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও, "চিত্ররথ"—এই ছদ্মনামের আড়ালে থেকে যে নবীন পরিচালকগোষ্ঠী তাঁদের প্রথম প্রয়াসে এই প্রায় সার্থক 'কুমারী মন'-এর সৃষ্টি করলেন তাঁদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।
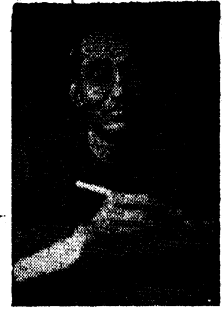
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় স্কুল গেমস ঃ

সম্প্রতি ইম্ফলে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ হল। পশ্চিম বাংলা তিনটি অনুষ্ঠানে—ফুটবল, সন্তরণ (বালক ও বালিকা বিভাগ) এবং টেবল টেনিসে (বালিকা বিভাগ) জয়লাভ করেছে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১৬টি রাজ্যের প্রতিনিধি যোগদান করে। ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম বাংলা ২—০ গোলে মণিপুরকে পরাজিত করে। বালক বিভাগের সন্তরণে পশ্চিম বাংলা ৪০ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষ স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান পায় মহারাষ্ট্র (১০ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান মণিপুর এবং গুজরাট (২ পয়েন্ট)। বালিকা বিভাগের সন্তরণে প্রথম স্থান পায় পশ্চিম বাংলা (২৫ পয়েন্ট) ; গুজরাট ২য় স্থান পায় (১৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান পায় ত্রিপুরা (৬ পয়েন্ট)। কাবাডি প্রতিযোগিতায় মধ্যপ্রদেশ, খো-খো প্রতিযোগিতায় মধ্যপ্রদেশ জয়লাভ করে।

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের ফ্লাইওয়েট বিভাগে জাপানের মাসাহিকা হারাদা একাদশ রাউণ্ডের ২ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ডে থাইল্যাণ্ডের বিশ্ব মুষ্টি যোদ্ধা যোন কিংপেচকে পরাজিত করেন। কিংপেচ ১৯৬০ সালে এই বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছিলেন।

বিশ্ব অপেশাদার গলফ্ ঃ

জাপানের কাওয়ানা ফুজি গলফ্ মাঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব অপেশাদার গলফ্ প্রতিযোগিতায় আমেরিকা জয়লাভ ক'রে 'আইসেনহাওয়ার' ট্রফি জয় করেছে। এই প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম বার এবং আমেরিকা দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় কানাডা দ্বিতীয় স্থান, বৃটেন এবং আয়ারল্যাণ্ড তৃতীয় স্থান এবং নিউজিল্যাণ্ড চতুর্থ স্থান পায়।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা ঃ

বুলগেরিয়াতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় রাশিয়া প্রথম স্থান, যুগোশ্লাভিয়া দ্বিতীয় স্থান, আর্জেন্টিনা তৃতীয় স্থান এবং যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থান লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া ৬ বার বিশ্ব প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলো।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ ঃ

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই প্রথম স্থান (৫৮ পয়েন্ট), কলিকাতা দ্বিতীয় স্থান (৩৫ পয়েন্ট) এবং দিল্লী তৃতীয় স্থান (১৫ পয়েন্ট) লাভ করেছে। ওয়াটার পোলোর ফাইনালে বোম্বাই ৮—৫ গোলে কলকাতাকে পরাজিত করে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ঃ

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে যাদবপুর বনাম মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলা ৪—৪ গোলে ড্র যায়। প্রথমদিনের অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির দরুণ ফাইনাল খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ফলে উভয় দলকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

এই প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে যাদবপুর দল ৩—২ গোলে গৌহাটিকে পরাজিত ক'রে সুলতান আমেদ কাপ জয় করে।

পরলোকে হেনড্রেন ঃ

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় প্যাটসি হেনড্রেন গত ৪ঠা অক্টোবর ৭২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দক্ষ ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলোয়াড় ছাড়াও হাস্যরসিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

টেস্ট খেলায় সাফল্য ঃ

খেলা ৫১, ইনিংস ৮৩, নটআউট ৯, মোট রান ৩৫২৫, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান নট-আউট ২০৫ এবং গড় ৪৭·৬৩।

জুনিয়ার ন্যাশনাল ফুটবল ঃ

জুনিয়ার ন্যাশনাল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ৫—০ গোলে উড়িষ্যাকে পরাজিত ক'রে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ট্রফি পেয়েছে। বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে ১৪—০ গোলে কেরালাকে এবং সেমিফাইনালে ৫—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে। ফাইনালে বাংলার সেণ্টার ফরওয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি হ্যাটট্রিক সমেত চারটে গোল দেন। বাংলা তিনটে খেলায় মোট ২৪টা গোল দেয়; বাংলা দলের বিপক্ষে কোন গোল হয়নি। এই চব্বিশটা গোলের মধ্যে অশোক চ্যাটার্জি ১১টা গোল দেন।

মহিলাদের জাতীয় হকি ঃ

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহীশূর দল ৪—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন ঃ

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে এলাহাবাদ ৩—১ খেলায় বোম্বাই দলকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে। বোম্বাই দল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে মাত্র ১৯৪৯-৫০ সাল বাদে প্রতি বছর জয়লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩—২ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৬ বার জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

আই. এফ. এ. শীল্ড ঃ

১৯৬২ সালের আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনালে মোহন-বাগান ক্লাব ৩—১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে একই বছরে ফুটবল লীগ এবং আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে মোহনবাগান চারবার (১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬১) একই বছরে ফুটবল লীগ কাপ এবং আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করলো। এ বছর নিয়ে মোহনবাগান ১৬ বার আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনালে উঠে ৮ বার শীল্ড পেল। ১৯৫২ ও ১৯৫৯ সালে মোহনবাগান আই. এফ. এ. শীল্ডের ফাইনালে উঠেছিল; কিন্তু ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি—খেলা পরিত্যক্ত হয়। এবছর নিয়ে মোহনবাগান উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৫৮—৬২) শীল্ড ফাইনালে উঠে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬০—৬২) শীল্ড পেল।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে সনি লিস্টন প্রথম রাউণ্ডের ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটারসনকে নক-আউট ক'রে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন। ১৫ রাউণ্ড পর্যন্ত লড়াইয়ের কথা ছিল। বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম রাউণ্ডেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৮ বার। এই আটবারের মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো লুই পাঁচবার প্রথম রাউণ্ডের লড়াইয়ে জয়লাভ ক'রে রেকর্ড করেছেন। কম সময়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়াতে লিস্টন—প্যাটারসনের লড়াইটি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি লড়াইয়ের উল্লেখ করা যায়—১ মিনিট ২৮ সেকেণ্ডে টমি বার্ণস ১৯০৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ জেম রোচিকে পরাজিত করেন এবং ১৯৩৮ সালের ২২শে জুন জো লুই ২ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে ম্যাক্স স্মেলিংকে পরাজিত করেন।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

পঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৬৯

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

পারের যাত্রী—

শিল্পী—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ও

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

ভারতবর্ষ
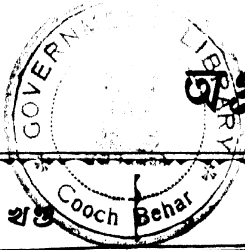
প্রথম খণ্ড | পঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গীতায় অধিষ্ঠানতত্ত্ব

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিষ্ঠানতত্ত্ব বুঝিলে পর গীতায় কথিত অনেকতত্ত্বই সহজ হইয়া যায়। তাই এই প্রসঙ্গ নিজ অন্তরে যেমন বুঝিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

গীতায় বলা হইয়াছে, কোন কাজের জন্য কর্ম্ম (Object), করণ (Instrument), ও কর্তা (Subject) থাকা চাই (১৮।১৮)। ইহাদের সংসর্গ "চেষ্টা"র সহিত, ব্যাকরণ হিসাবে, ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কর্তা ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে থাকিতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম ও করণ প্রকাশ্যতঃ না থাকিলে কোন ব্যাপারই সংঘটিত হইতে পারে না। এই দুইটিকে সব ব্যাপারের মাতাপিতা বলা চলে। যেমন উদাহরণ দিয়া বলা যায়, "ফুলটি রূপ দ্বারা (দেখি বা দেখা হয়)"। এখানে ফুলটি "কর্ম্ম" ও রূপ দ্বারা "করণ"। এস্থলে দার্শনিক ভাষায় ফুলটি "বিষয়" এবং রূপ দ্বারা "ইন্দ্রিয় গোচর" (গীতা ১৩।৫) বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব এইরূপ কাজ, গীতার ভাষায়, নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত হয় :—বিষয় (কর্ম্ম) + ইন্দ্রিয় গোচর (করণ)।

এই বার অধিষ্ঠান প্রসঙ্গ আসিতেছে। গীতায় বলা হইয়াছে, "অধিষ্ঠান তথা কর্ত্তা" (১৮।১৪)। এখানে অধিষ্ঠান (বাসস্থান) ও কর্তা পৃথক বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই কারণেই কর্ত্তা অদৃশ্য থাকিয়া, অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত

হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন। "কেন" শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে আত্মাই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির চালক ও পোষক এবং গীতাও সেই মত সমর্থন করেন, যদিও গীতা অনুসারে আত্মা প্রকৃতির মারফৎ প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক কাজ করিতেও পারেন (১৩৷২০, ২৷৪০)। তাহা ছাড়া গীতা ইহাও স্মরণ করান যে মানুষের সাধারণ অবস্থায় কাম, চতুর ভাড়াটিয়ার মত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে সহজে দখল ছাড়ে না (২৷৪০)। অতএব কেমন করিয়া আত্মা যথাক্রমে এই সকল অধিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া জীবের কর্ম্ম ক্ষেত্রে নিজ আগমনের সূচনা বারবার দে'ন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুখ্যভাবে বিবেচ্য।

আমরা দেখিয়াছি, সামান্য কাজের মধ্যেও বিষয় (কর্ম্ম) + ইন্দ্রিয় গোচর (করণ) উপস্থিত না থাকিলে কাজ হয় না। এবারে বলিব, যেখানে এই দুইজন উপস্থিত, সেখানে কর্ত্তা নিজ অধিষ্ঠিত তৃতীয় সত্তা পাঠান, কাজের সম্যক তাগিদ ও ভোগের সুব্যবস্থার জন্য। এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সব চেয়ে নিকটস্থ অধিষ্ঠান যন্ত্র হইতে পারে। সেই জন্য এ সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইল :—বিষয় (কর্ম্ম) + ইন্দ্রিয় গোচর (করণ) + ইন্দ্রিয় (অধিষ্ঠান)।

কিন্তু তিনজন একত্র হইলেই সংসারে বাদবিবাদের সৃষ্টি হয়। কে যে চাষের মালিক তাহা যদি বা স্থির হয়, কে যে গ্রামের মালিক পরস্পরের মধ্যে নির্ণয় হওয়া কঠিন হয়। এখানে ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান হইলেও কার্য্যতঃ কর্ত্তা বলিয়া তিনি ভোগের সবটুকু নিজের মত পাইতে চান ও সেই জন্য বেশী করিয়া কাজ উসুল করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি করণ-রূপী ইন্দ্রিয় গোচরকে বেশী করিয়া চাপ দেন। ফলে, যাহাকে তিনি অপমান করেন, অপমানে তাহার সহিত সমান আসন তাঁহাকে লইতে হয় ও পেষণ-কারী সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে যে পীড়িত সে নির্জীব হইয়া যাঁহা হইতে তাহার জন্ম ও কর্ম্ম তাঁহাতেই নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া বসে। এক্ষণে তাহাই হইল। ইন্দ্রিয় গোচর ইন্দ্রিয়ে অন্তর্হিত হইল। আবার কর্ম্মক্ষেত্রে নিম্নরূপে দুইজন মাত্র রহিল :—বিষয় (কর্ম্ম) + ইন্দ্রিয় (করণ)।

ইতর জন্তুদের মধ্যে এইরূপই দেখা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষ করিয়া বার্গসন (Bergson) তাঁর প্রণীত Creative Evolution পুস্তকে দেখাইয়াছেন, জন্তুদের জীবন এমনই চলে বটে। কিন্তু সেখানেও গণ্ডীভূত মন (Instinct) শীঘ্রই দেখা দে'য়। ইহার পুষ্টি হইতে থাকে। ইহা ক্রমশঃ আর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ফলতঃ গণ্ডীভূত মন (Instinct) যেমন পরিসরে ও পরাক্রমে বাড়িতে থাকে, ততই জীব ইতর জন্তুদের স্তর হইতে মানবীয় সত্তার দিকে উন্নতি লাভ করিতে থাকে। মানুষের সত্তায় মন আর গণ্ডীভূত থাকে না। ইহা তালাবদ্ধ এবং সেইজন্য অসীম গতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ মনকে বিদেশীয় মণীষীগণ Intuition আখ্যা দেন। কারণ ইহা মানব অন্তরে কথা বলে, সতর্ক করিয়া দেয় ও ভেসে যেতে চায় অন্তরের দিকে। এই যে শ্রুতি ও চিন্তনের অভ্যাস মানুষের অন্তরে উদ্‌যাপিত হয়, ইহা হইতে তাহার স্মৃতি ও সংস্কার আরম্ভ হয় ও সেইমত কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সে পরিপক্ব হইয়া উঠে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন, এইভাবে উর্দ্ধতর মানুষের মধ্যে Intellect অর্থাৎ অন্তরের শ্রুতি অনুযায়ী কর্ম্মকৌশলের পদ্ধতি জন্মায় এবং এইভাবে উর্দ্ধতম মনুষ্য শ্রীবুদ্ধের ন্যায় মহামানব হইতে পারেন। বার্গসনের ও তাঁহার মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার সঙ্গে বুদ্ধধর্ম্মের অনাত্মবাদের গভীর সংযোগ সুস্পষ্ট। যাঁহারা কর্ত্তাবিহীন জগতে বাস করিয়া নিজেদের দাপটে উন্নতি বিধান করিতে পারার কথা ভাবিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কর্ত্তার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকিবেন। (৭৷২১)

আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে হিন্দু ধর্ম্ম ও তদীয় দর্শন ইহার অনুমোদন করেন না। বিষয় হইতে সকল উন্নতির আরম্ভ না ধরিয়া বিষয়েরও পশ্চাতে জীবের যে স্বভাবরূপ আধ্যাত্মিক সূত্রপাত রহিয়াছে তাহা হইতেই যে সকল কর্ম্মের সূচনা তাহা জ্ঞাপন করেন (৫৷১৪, ৮৷৩)। গীতা তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া এইরূপ অভিমতই সমর্থন করেন। গীতা বলেন, বিষয় মানুষের অন্তরে আছে বলিয়া তাহার নিকট বাহিরেও প্রকট হয়। যে ফুলটির উদাহরণ লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধেও গীতায় বলিবার কথা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সুন্দরভাবে বলা যায় :—

"পুষ্প নলে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে
পরাণে বসন্ত এল, কা'র মন্তরে ?"

যাহার মন্ত্রে সকলই হইতেছে, তিনিই আত্মা। মনের মধ্যে তাঁর হুঁস আছে বলিয়াই মানুষকে মানুষ বলা হয়। গীতা সেই মানুষের ধর্ম্মপুস্তক। আমরা গীতায় ফিরিয়া আসি।

আমরা গীতা হইতে জানিয়াছি, আত্মা চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি যখনই দেখেন, বিষয় (কর্ম্ম) + ইন্দ্রিয় (করণ) দুইজন মিলিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, তখনই মনকে অধিষ্ঠানরূপে চালিত করিয়া অধিষ্ঠিত করেন ও যথাবিহিত শক্তি ও সামর্থ্য দেন। সেই সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হয় :—

বিষয় (কর্ম্ম) + ইন্দ্রিয় (করণ) + মন (অধিষ্ঠান)।

এইরূপ দলবদ্ধ হইয়াই, সাধারণতঃ মানুষের জীবনে কর্ম্ম-নাট্য চলে।

যতদিন প্রত্যেক সত্তা নিজ কক্ষে থাকিয়া নিজ ভূমিকা পূরণ করেন ততদিন কোন বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। ইন্দ্রিয় যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়সম্ভোগ করে ও মন নিজ শুচিতা রক্ষা করিয়া, দক্ষভাবে উদাসীন থাকিয়া সকল ব্যথার অতীত থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগ সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু চিরদিন একই ভাবে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে মানুষের ধর্ম্ম জীবনে এইখানেই "ইতি" হইয়া যায়। তাই কর্ত্তার মঙ্গল বিধান অনুসারে মনের ভাবান্তর ঘটিতে থাকে। তখন মন শুধু কাজের তাগাদা দেয় না, ভোগের যতটা পারে উসুল করিতে তৎপর হয়। বিষয়ের পক্ষে এ বড় বিষম জ্বালা উপস্থিত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত বিষয়ের একটি বা ততোধিক ইন্দ্রিয় পতিরূপে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে অধিকন্তু মন, উপর থেকে উপপতি রূপে দেখা দিল। ক্রমে বিষয়ের সহিত মনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ও ততই মনের মধ্যে বিষয় সঙ্গ অভিলাষ বৃদ্ধি পায়। এইরূপে মানুষের মনে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিপত্তি দেখা দিয়া তাহার জীবনকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দে'য়। (২।৩২-৩৩)। বেশ সুস্পষ্টভাবে তখন বুঝা যায়, মন যখনই অধিষ্ঠানের স্থান ছাড়িয়া করণের কক্ষে নামিয়া আসিতে ব্যস্ত হয়, তখনই বিপর্য্যর আরম্ভ। বিষয়-পীড়িত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ভঙ্গ দিবার সুযোগ অন্বেষণ করে। সে আর কর্ম্মের আকর থাকিতে চায় না। মন তখন ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মের স্থান লইতে বাধ্য করে। কোন উপায় নাই দেখিয়া বিষয় তখন আত্মার নিকট সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্য আবেদন করে। আত্মা তাহাকে ছুটি দে'ন। বিষয়, এখন আর বহির্ম্মুখীন অবস্থায় কর্ম্মক্ষেত্রে সহ-যোগী থাকে না, জীবের অন্তর্ম্মুখীন হইয়া, ভৌতিকস্তর অতিক্রম করিয়া দৈবক্ষেত্রে উপনীত হয়। আত্মার বিধানের জন্য সে অপেক্ষা করে এবং সুস্থ হইয়া, যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল তাহাদের সহিত পুরাতন সৌহার্দ্য স্মরণ করিয়া, নিজ শুভকামনা জানায়। কর্ম্মক্ষেত্রে এ সময়ে রহিল :—ইন্দ্রিয় (কর্ম্ম) + মন (করণ)।

মনের এখন সমস্যা উপস্থিত, সে কি করিয়া ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পূর্ণমাত্রায় কাজ লইবে। বিষয়ের অনুপ-স্থিতিতে, ইন্দ্রিয় পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি নূতনভাবে নাড়াচাড়া করিয়া মনের কাছে উপহার দেয়। মন স্বীয় কল্পনা দ্বারা ইহার সঙ্গে বিষয়কে জুড়িয়া লয়। কিন্তু এ সমস্তই "মিথ্যাচার" (৩।৬) বলিয়া যতই স্পষ্ট হইতে থাকে, মন ততই ঠিকমত নির্দ্দেশ পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। এইরূপ বিপত্তিকালে আত্মা বুদ্ধিকে অধিষ্ঠানরূপে পাঠান বুদ্ধি আসিলেই আবার তিনজন নিম্নলিখিত ভাবে কর্ম্মমঞ্চে উপনীত হয় :—

ইন্দ্রিয় (কর্ম্ম) + মন (করণ) + বুদ্ধি (অধিষ্ঠান)।

এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠা পাইতে অনেক সময়ে বিলম্ব হয়। কারণ ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া থাকিতে চায় না। বুদ্ধির অধিষ্ঠানের জন্য সে বুঝিতে থাকে, তাহার স্থান বিষয়ের পাশে। গীতা অনুসারে, বিষয় মানুষের অন্তরে ছিল বলিয়া ভৌতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল ও আবার যখন কাজ ফুরাইল সে নিজ চিরন্তন স্থানে, দৈব স্থানে, ফিরিয়া যায়। (গীতা বলেন, বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি, ২।২৯। বিষয় বিদায় লইয়া ফিরিয়া যায় তার চিরন্তন আবাসভূমিতে ইত্যাদি)।

ইন্দ্রিয় এক্ষণে তাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সে প্রকৃতির অংশ। যদি মানুষের মধ্যে এখনও রাক্ষস বা অসুরের অভিরুচি বাকি থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের এখন যাওয়া হয় না। সেই কারণে হয়ত বিষয়কে আবার ভৌতিক স্তরে ফিরিতে হয়, ও মানুষের জীবনে কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি সুরু হয়।

কিন্তু উন্নতিশীল মানুষের ভিতর দৈবপ্রকৃতি যে নিজ প্রতিষ্ঠায় জয়যুক্ত হয়, সে আশ্বাস অর্জ্জুনকে গীতায় বার

বার দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য আমরাও বিশ্বাস করি, ইন্দ্রিয়ও এই অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া দৈবধামে বিষয়ের পার্শ্বে চলিয়া যাইবে। আজ না হয় কাল, এবং সে চলিয়া গেলে কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে :—মন (কর্ম্ম) + বুদ্ধি (করণ)।

ইহাই মানব অন্তরে এই ভৌতিক জগতে প্রাকৃতিক জ্ঞান সঞ্চায়ের যথার্থ অবসর। আর বিষয়ের জ্বালা নাই ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না নাই। এ যেন "সিদ্ধ" অবস্থা (১৬৷২৩)। মানুষের চরিত্র গঠন হইবার পর সে যখন যথার্থ শিক্ষার্থী হয়, ইহা সেই অনুকূল সময়। বুদ্ধির দ্বারা মনে উপনীত হইয়া সাধক চিরন্তন বিদ্যা, শিল্প ও সংস্কৃতি আহরণ করিতে চান। কিন্তু আত্মার প্রত্যক্ষ পরিচালনা না থাকায়, ইঞ্জিনবিহীন মালগাড়ী যেমন সঞ্চিত বেগে বেশীদূর গতিশীল হইতে পারে না, সাধকের অন্তরও সেইরূপ দশাপ্রাপ্ত হয়। এইবার আত্মা স্বয়ং অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হ'ন। তখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত :—

মন (কর্ম্ম) + বুদ্ধি (করণ) + আত্মা (কর্ত্তা)।

কর্ত্তা স্বয়ং উপস্থিত বলিয়া অধিষ্ঠান ক্ষেত্র শেষ হইয়াছে। কিন্তু অধিষ্ঠানতত্ত্বের বিরাম নাই। তাহারই "কাঠাম" ধরিয়া কাজ চলিতেছে। সেইজন্য তাহার অনুধাবন করিতে হয়। মন তাহার যাহা অবিনশ্বর সম্পদ বা অভিজ্ঞতা তাহা জানায়। সাধক অন্তর ধর্ম্ম ও ধ্যানের ধাত্রী হইয়া যায়। অনাগত কালের যে সমস্ত আধ্যাত্মিক চেতনা উপলব্ধি হইবার বাকি আছে তাহাও চিত্রবিচিত্র রূপে অন্তরে রেখাপাত করিয়া যায়। প্রভাতের আলো যেমন সারাদিনের সকল পাওয়ার পূর্ব্বাভাস দেয়। সাধক কৃতার্থ হ'ন। জগৎ মণ্ডলে যেন সাধকের অন্তরের আশা প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। তিনি কর্ম্মমার্গের শেষ সীমানায় যেন পৌছাইয়াছেন এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

বুদ্ধিকে তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে দেখা যায়। বুদ্ধি অসংখ্য বুদ্বুদযুক্ত বলিয়া তাহার ফেনার রাশি অন্তর সাগরকে আলোড়িত করিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বুদ্ধির সেই অসংখ্যমুখী প্রতিভা আর দেখা যায় না। সে জীবনের যথার্থ কারবার বুঝে বলিয়া একমুখীন হয়। (২৷৪১) যোগীগণ জানান, বুদ্ধি একমুখীন হইলেই মানুষের "চিত্ত" জাগে এবং মানুষ তখন "যতচিৎ আত্মা" হইতে চায়। অর্থাৎ চিত্তের যত্ন দ্বারা আরও বেশী করিয়া আত্মাভিমুখী হয়। কিন্তু যাঁহারা এখনও এইরূপ যোগী নহেন, তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা কর্ম্মসাধন হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিদ্বারা, কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক, জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত হইয়া, কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া অনাময় পদের দিকে অগ্রসর হ'ন (২৷৫১)। ইহাও সেই একই কথা। কর্ম্মফল ত্যাগ হইলেই আর ত কোন আরম্ভ নাই ও সেই জন্য পুনর্জন্ম হয় না। অথচ জগৎমণ্ডলের কত উপকার সাধিত হয়। কিন্তু থাক্ সে কথা। আমরা বুদ্ধির খেলা কতক ধরিলাম।

আত্মা "নির্লিপ্ত" অথচ "কারণ" (১৩৷১১-১২)। তিনি উপস্থিত থাকায়, মন আপন অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারে। সে দেখে, সে ছিল অধিষ্ঠান, পরে হোল করণ, এবং এক্ষণে কর্ম্মকক্ষে বাঁধা পড়িয়াছে। অবস্থাভেদে তার গুণভেদও হইয়াছে। যখন অধিষ্ঠান ছিল, আত্মার বাসস্থান ছিল বলিয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিল। যখন করণ হইল; প্রকৃতি ও পুরুষের সংস্পর্শ পাইয়া, সে রাজসিক হইল। এক্ষণে কর্ম্ম হইয়া, অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, তমোপ্রধান হইতে চলিয়াছে। তবে আর কেন?

বুদ্ধির একনিষ্ঠ সেবক সে হইয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তার প্রভুত্ব আর নাই। পূর্ব্বে বিষয় ও ইন্দ্রিয় তাহার ভৃত্য ছিল। কিন্তু এখন তাহারা কোথায়?

তাহারা ভৌতিক অবস্থা ছাড়িয়া দেব-সত্তায় পৌছিয়াছে। দেব সত্তার আভাষ এক্ষণে বুদ্ধির সাহায্যে মন কতক উপলব্ধি করিতে পারে। সেখানে কর্ম্মের বালাই নাই। আছে যজ্ঞের জন্য প্রস্তুতি। তাহা দৈবস্থানে বলিয়া সেখানে বৈদিক দেবতাবৃন্দের বসতি। দ্বিজ হইলে সেসকল দেবতাগণ দ্বিজ শরীরে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আবার শ্রুতি অনুযায়ী মানুষের ইন্দ্রিয় দেবরূপে সেখানেই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিষয় ত পূর্ব্বেই গিয়াছে। অতএব বিষয় ও ইন্দ্রিয় দেবতাবৃন্দের মত "সহযজ্ঞা" হইয়া পড়ে। এবং যজ্ঞের পাবণে যতই শুদ্ধ হয়, ততই তাহারা "পদার্থ" ও "দেব" নামের পূর্ণ সার্থকতা অর্জ্জন করে। পদার্থ বলিতে বুঝায়, যাহা পরম পদের অর্থ বা সংবাদ বহন করিতে

সমর্থ হয় (ঈশ, সপ্তম মন্ত্র ; তৃতীয় পংক্তি) এবং দেব শব্দ জানায়, যাহারা দেবার জন্য ব্যস্ত, কর্ম্মসেবীদের মত খাবার জন্য নয় (ইন্দ্রিয়কে দেবশব্দে ঈশ, চতুর্থ মন্ত্র, দ্বিতীয় পংক্তিতে অভিহিত করা হইয়াছে)। অধিদৈবস্তর হইতে অধিযজ্ঞ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, বিষয় (পদার্থ) ও ইন্দ্রিয় (দেব) এক্ষণে কর্ম্মসেবীদেরও ভৌতিক স্তরে "যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম্ম" এই উপদেশের প্রেরণা দিতে সমর্থ হয়। তাহারা নিজেরাই সেইভাবে ভৌতিক সত্তার কর্ম্মসেবী-দের সঙ্গে সঙ্গত রাখিয়া জগৎমণ্ডলে যে শুদ্ধতার পরিবেষ্টন আনয়ন করে তাহা প্রদর্শন করা গীতার বৈশিষ্ট্য।

সেই জন্য গীতা বলেন, দৈবই পৃথিবীতে কর্ম্মসিদ্ধির বিশেষ কারণ (১৮।১৪) এবং ইহা জানিয়া মানুষও সব সময়ে দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করে (৪।১২)। মোট কথা, কর্ম্মভূমি হইতে মন ও বুদ্ধি যে কাজে লিপ্ত থাকুক না কেন, দৈব বা উর্দ্ধতর স্তর হইতে বিষয় ও ইন্দ্রিয় তাহাদের সাহায্য করে ও এই রূপে সকলে পরস্পরের সহিত একসুরে মিলিত হইয়া পরমশ্রেয় লাভের প্রয়াসী হয় (৩।১১]।

মন যতই এই সকল কথা বুঝে ততই সে দৈবসত্তা প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাও আত্মার অভিপ্রেত। মনত সবই পাইয়াছে, এক্ষণে সব পাওয়ার আগ্রহ থেকে তাহাকে মুক্তি পাইতে হইবে। সে মুক্তি পাইলে তবে ত সাধকের পক্ষে মুক্তির পথ পাওয়া হয়। ইহাকে "মননাস" বলা চলে না। গীতা বলেন আধ্যাত্মিক জীবন পাইতে হইলে কাহারও বিনাস নাই। আত্মা সকলের শুভানু-ধ্যায়ী। অবস্থা বুঝিয়া তিনি মনকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর দে'ন। মন এখন "অমন [বৃহদারণ্যক শ্রুতি] হইতে চলিল। গীতার ভাষায় সে এক্ষণে দৈব ও অধি-যজ্ঞ ক্ষেত্র পার হইয়া আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পৌছাইয়া "আত্মসংস্থ" হইয়া পড়িল। এখন তার আর চিন্তা রহিল না [৬।২৫]।

মন যখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় হইল সেই অবসরে তাহার ভবিষ্যৎ একটু খানিক দেখা গেল। আমরা আবার অধিষ্ঠান তত্ত্বে ফিরিয়া আসি। মন চলিয়া গেলে এইরূপ ভাবে কার্য্য চলে :—

বুদ্ধি [কর্ম্ম] + আত্মা [করণ] + আত্মা [কর্ত্তা]। অর্থাৎ কর্ম্ম কক্ষে, মনের স্থানে, থামিয়া পড়ে। এবং আত্মা অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্ত হইতে পারেন বলিয়া স্বয়ং করণ ও কর্ত্তা হ'ন। বুদ্ধি যতই আত্মার ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে, ততই তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। এখন আর কর্ম্ম নাই। যখন আর ইন্দ্রিয় বা কর্ম্মে প্রবৃত্তি বা আসক্তি থাকে না, এবং কর্ম্ম সঙ্কল্প পর্য্যন্ত প্রশমিত হইয়া যায়, তখন সাধক যোগারূঢ় [৬।৪]। এখন বুদ্ধির বিকৃত অংশ, যাহাকে "ধৃতি" বলা হয়, চলিয়া যায় মনের পিছনে দৈবস্থানে বা উর্দ্ধতর লোকে, পূর্ব্বগামীদের একত্র সম্মিলিত রাখবার জন্য [৬।২৫ ও ১৮।৩৩]।

বুদ্ধি আর "চেষ্টা" করে না বলিয়া ধী হইয়া যায়। সাধক "ধীর" হন। ধী এ সময়ে আত্মার পরাগত লাভ করে। তাহার অন্য কোন স্তরে (যথা অধিদৈবিক প্রভৃতি) যাইবার প্রয়োজন হয় না। যিনি (পুরুষোত্তম) জীবকে (পরে দেখিব) বুদ্ধি যোগ দিবার মালিক, তাঁহার আদেশের প্রত্যাশায় সে নিশিদিন জগৎমণ্ডলে প্রতীক্ষা করে। বুদ্ধি এইভাবে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় হইলে পর অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় :—

আত্মা (কর্ম্ম) + আত্মা (করণ) + আত্মা (কর্ত্তা)।

ইহার ইঙ্গিত পাই, গীতা যখন বলেন, আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মা পরিতুষ্ট হ'ন [৬।২০]। শিশু যেমন মায়ের দেওয়া মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া মা'র কর্তৃত্বাধীনে বড় হয়, ইহাও সেইরূপ অবস্থা। তবে শিশু স্বীয় কর্ম্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। সাধক কিন্তু উল্টা পথে চলেন। তাঁর নিজস্ব অবলম্বন অহঙ্কার ও অব্যক্ত অংশ [১৩।৫] যাহা তাঁহাতে এখন বাকি আছে, সেগুলি পর্য্যন্ত তিনি চা'ন প্রত্যার্পণ করিতে মাতৃগর্ভে [এখানে আত্মার গর্ভে, যাহাকে "প্রভব ও প্রলয় স্থান" বলা হয়]। ইহাই পূর্ণ শরণাগতির অবস্থা। মাতৃগর্ভে আশ্রয় পাইলে আর ত সাধকের কোন কাজ থাকে না। কর্ম্ম (Object) ও করণ (Instrument) পর্য্যন্ত থাকে না বলিয়া অধি-ষ্ঠানতত্ত্বও সুপ্ত হয়। শুধু আত্মা আছেন, এই উপলব্ধি যোগীজীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হয়। এইসঙ্গে সাধু-জীবনে আর একটি অনুভূতি তাঁহাকে পাইয়া বসে। তিনি বুঝেন, আত্মা ত শুধু তাঁর মা নহেন, সর্ব্বভূতের মা

অথবা পরমাত্মা, যিনি সর্ব্বভূতে আছেন ও সর্ব্বভূত ও যাঁহাতে আছে [৬।২৬]। তবে ত সাধক এ সময়ে পরমাত্মায় লীন হলেন। এইবার পরমাত্মার ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের পরিচয় লাভ হইলে তিনি পরম স্থিতি লাভ করিয়া পূর্ণসত্তায় জীবনের পরিক্রমা শেষ করেন [৬।২৭]।

এই কথাটি কিন্তু পরিষ্কার হওয়া দরকার। আত্মা, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তমের সংস্রব জটিল হইলেও গীতা অনুসারে সাধক, জীবনে সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ পায়। আত্মা কর্ত্তা হিসাবে করেন ও বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত। (১৩।৩২]। পরমাত্মা করেন না এবং শরীরে থাকিয়াও নির্লিপ্ত [১৩।৩১] পুরুষোত্তম ইঁহাদের উর্দ্ধে অবস্থিত, পরমাত্মাকে তাঁহার উদাহরণ চিহ্ন বলা যায়। [১৫।১৭] সাধনা দ্বারা পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত যে পৌছান যায় তাহা ত গীতা আমাদিগকে জানাইলেন। কিন্তু সকলের এ সৌভাগ্য সর্ব্বকালে না হইতে পারে। সেই কারণে পুরুষোত্তমের এমনই মহিমা যে তিনি সকলের প্রতি সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব অবস্থায় তাঁর অহেতুকী কৃপা বর্ষণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া অবতীর্ণ হইতেছেন ধরাধামে, যাহাকে তিনি ধরিয়া আছেন বলিয়া ইহা সুরক্ষিত [১৫।১৩]।

পুরুষোত্তম যতই অবতীর্ণ হন, তাঁর আগমনে অধিষ্ঠানতত্ত্ব আবার জাগিয়া উঠে। গীতা বলেন, অধিষ্ঠান তত্ত্বের সাহায্যে পুরুষোত্তমের অবতরণ হইয়া থাকে। অপ্রাকৃতিক মণ্ডলে পুরুষোত্তম কি করিয়া পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আত্মায় স্থিত হ'ন ও সর্ব্বভূতেশ্বর পরমেশ্বরে ব্যক্ত হইয়া পড়েন তাহা শ্রুতিতেও আছে এবং গীতায়ও তাহা পাই। (৪।৬, ১৫।১৮)। এক্ষণে অপ্রাকৃতিক হইতে প্রাকৃতিক স্তরে অবতরণের জন্য পুরুষোত্তম অধিষ্ঠান তত্ত্বের সাহায্য ল'ন। তিনি প্রকৃতিতে কর্ত্তারূপে অধিষ্ঠিত হ'ন ও স্বীয় মায়া (করণ) দ্বারা ভূতজগতে ও এমন কি ভূতশরীরে (কর্ম্ম) প্রকট হ'ন (৪।৬)।

শুধু তাহাই নহে। বুদ্ধি যোগ তিনি দে'ন। মন তিনি ক্রমশঃ মন প্রভৃতি বিষয় গোচর পর্য্যন্ত অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল বিষয়ের উৎসেবন করেন (১৫।৯)। তবে ত অধিষ্ঠানতত্ত্ব তাহার পূর্ণ মর্য্যাদা পাইল। আত্মার অধিষ্ঠানে, সাধক জীবনে, সে কেবল ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারিয়াছিল (৩।৪০)।

এই খানেই অধিষ্ঠানতত্ত্বের আলোচনা শেষ হইলে ভাল হইত। কিন্তু মানব জীবনে কর্ম্মের সাথে অধিষ্ঠান-তত্ত্বের অভিন্ন যোগ। এক্ষণে পুরুষোত্তমের অবতরণে জ্ঞানের যেমন গভীরতা বাড়ে সেইমত কর্ম্মেরও মর্য্যাদা বাড়িয়া থাকে। সাধন জীবনে মানুষের অবলম্বনীয় যে জ্ঞান (সৎ) ও জ্ঞেয় (চিৎ) চিরস্মরণীয় (১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সম্পদ, তাহা অসংলগ্ন রহিয়া যায়, যতক্ষণ না পুরুষোত্তম, যিনি অলক্ষ্যভাবে "জ্ঞানগম্য" ছিলেন. "পরিজ্ঞাতা"রূপে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের নিজ সত্তায় সমন্বয় সাধন করিয়া স্বীয় আনন্দঘন রসধারায় সাধকের জীবন ও পরি-বেষ্টনকে প্লাবিত করে দে'ন। তখন আবার জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা "কর্ম্ম চেতনা" (১৮।১৮) অর্থাৎ নব নব কর্ম্মের প্রেরণা ও চেতনা দে'ন। এ সকল কর্ম্ম দিব্য-কর্ম্ম। সাধন জীবনে প্রার্থনার ফলে কর্ম্মের আদেশ পাওয়া যায়। পুরুষোত্তমের কৃপায় মানব জীবনে যে সকল দিব্যকর্ম্মের প্রারম্ভ হয়, তাহা প্রথমে আসে ও পরে সেই মত মানব হৃদয়ে প্রার্থনা জাগে। এইরূপ সৌভাগ্য-সম্পন্ন কর্ম্মনায়ককে শ্রুতিতে "আপ্তকাম" ও "আত্মকাম" বলা হয়। আসলে পুরুষোত্তম ধরা না দিলে কর্ম্মজীবন পূর্ণ হয় না (১৫।২০)।

তবে ত মানব জীবনে কর্ম্মের শেষ নাই এবং সেই সঙ্গে অধিষ্ঠানতত্ত্বেরও নানাভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা এই তত্ত্বের যতটুকু স্পর্শ পেলাম, তাহাতেই ধন্য হলাম। এইবার গীতার ভগবান্ আচার্য্যরূপে আমাদের সকলের সহায় হউন্!
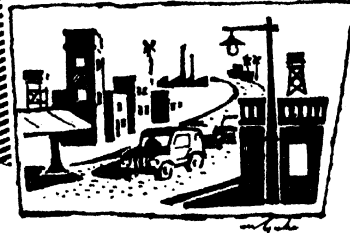
পূর্বপ্রকাশিতের পর।

শন শন শব্দ ওঠে। ধূ ধূ জলছে আগুন।

...দু পাঁচ খানা গ্রামের লোক ব্যর্থ চেষ্টা করছে আগুন নেভাবার।

...বড়বাবু গর্জে উঠেছে। গোকুল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আঁধার আলোর কেমন লালাভায় রহস্যময় হয়ে উঠেছে ঠাঁইটা।

—বল কে করেছে একায। তুই তো ছিলি খামার বাড়ীতে? গোকুল জবাব দেয় না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

...হঠাৎ তারকবাবুর একচড়ে ছিটকে পড়তে পড়তে থেমে যায় গোকুল।...ভিড় করে রয়েছে লোকজন। গোকুল উঠে দাঁড়াল।

...ভিড়ের মধ্যে দেখে এমোকালীও এসেছে। একবার চোখাচোখি হয়ে যায়। কঠিনকণ্ঠে গোকুল জবাব দেয় আমি দিয়েছি আগুন।

—তুই!

—হ্যাঁ। সারা গাঁয়ের লোকের ঘরে আগুন জ্বালাতে বলেছিলেন বড়বাবু; ওদের ঘর জলছে—সেই সঙ্গে আপনার খড় গালুইও জ্বলুক। কেমন লাগে দেখুন।

...বড়বাবুর মুখে কে যেন একরাশ কালি মেড়ে দেয়। এমোকালী চেয়ে থাকে গোকুলের দিকে।

তারকরত্নের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়েছে গোকুল, আবার মারতে যাবে—ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে কালী-চরণ; বাধা দেয়।

—মারবেন না ওকে।

বড়বাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—তুই!

রুখে দাঁড়িয়েছে ওরা—সামনে ধূ ধূ সর্বনাশা আগুন, যেন ওতেই ফেলে দেবার জন্যও ওরা তৈরী। চুপ করে তারকবাবু।

অশোক ও এসে পড়েছে মাঝখানে। উঠে বসল গোকুল।

নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ছেঁড়া জামাটা দিয়ে মুছতে থাকে—মাঝে মাঝে বড়বাবুর দিকে চাইছে—অসহায় রাগে আর চাপা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে সে। জীবন কি বলতে যাবে, বাধা দেয় তারকরত্ন।

আগুন তখনও জলছে।

...নীল আকাশকোলে উঠেছে ধ্বংসের ধূ ধূ লেলিহান শিখা। সব পুড়ছে। ধান খড়—অতীতের সব সঞ্চয় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখছে তারকরত্ন আর জীবনরত্ন অবস্থায় দর্শকের মত।

সাদা নিশান উড়ছে মাঠের মধ্যে। ধূ ধূ শস্যরিক্ত মাঠ, চড়াই-এর মত নেমে গেছে সিঁড়ি সিঁড়ি ক্ষেত, আবার

উঠেগেছে ওদিকে আমুড়ের দিকে। মাঝখানে তিরতিরে কাঁইজোড়। ডাকনাম শুভঙ্করের জোড়।

গ্রাম্য অঙ্কশাস্ত্রবিদের নাম শুধু মানসাঙ্ক বই-এর ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বোধহয় তার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল অতীতের মানুষ। আজও ক্ষীরধারার মত এই ক্ষুদ্র জলধারা তাঁর কথাই স্মরণ করায়—কোন স্মরণাতীত কালের কথা।

কতদিন মাস বৎসর কেটেছে—ওই ক্ষীণজলধারা শ্রী নেও এসেছে রূপান্তর। সাতজোড়ার বনগড়ানী জল-ধারা—পাহাড়ী টিলার কোন অন্ধ অতল থেকে বের হয়ে এসেছে ওই বালুরেখা, গ্রীষ্মের নিদাঘতাপসন্তপ্ত দিনে ওর বুকে জলরেখার স্পর্শটুকু কোনরকমে ধরে রেখেছিল; দুপাশের রুক্ষ উষর কাঁকুরে প্রান্তরে বিলীন পত্রহীন গাছগুলো দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। বর্ষার সমারোহ নামে প্রান্তর বনসীমায়—দূর ছায়াচ্ছন্ন শুশুনিয়া পাহাড়ের সীমারেখা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বৃষ্টি নামে।

যৌবনবতী হয়ে ওঠে শুভঙ্করের জোড়। গেরুয়া জলস্রোত ছুটে চলে দূর ছায়াচ্ছন্ন গ্রামসীমা পার হয়ে বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে।

কঠিন রুক্ষ দেশ।

বৃষ্টিও এখানে হয় অপেক্ষাকৃত কম, তারপর ওই পাহাড়ী বুনোমাটি আর উঁচুনীচু জমি। এই টই টম্বুর তোড়ে বন্যাতেই সব জমাজল জমি থেকে কোন ফাটল দিয়ে নেমে যায়। অজন্মা তাই এদের প্রতি বৎসরের সঙ্গী, দুর্ভিক্ষ হাহাকার বাঁকুড়া জেলার অপরিহার্য সমস্যা।

…ওই এলাকাটুকু তবু চেয়ে থাকে শুভঙ্করের জোড়ের দিকে। ওই জলধারাটুকুই তাদের চাষ আবাদের মূল সম্বল।

তাই নিয়ে কাটাকাটি দাঙ্গাও বাধতো।

সেবার নিজে এসেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা স্বয়ং। তাঁরই এলাকা, মূল জমিদার তিনিই, আর সব পত্তনীদার।

তিনিই এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন জোড়ের মধ্যখানে বাঁধ উঠবে, জলধারা দুভাগ হয়ে যাক।

ছ আনা আর দশ আনা হিসাবে জলধারা বইবে। নামকরণ হল ছ আনি আর দশ আনির দাঁড়া।

…সেই জমিদারী বিচারের নির্দেশ আজও মেনে চলেছে তারা, ক্রমশঃ সেই বিভাগের চিহ্নটাকে শক্ত ইটের স্তূপ করে কায়েম করা হয়েছে। পাশে মাথা গজিয়েছিল রাস্তার ধারে একটা বটগাছ, ক্রমশঃ সেটা অনেক বড় হয়ে ছায়াছন্ন করে তুলেছে ঠাঁইটা।

মাঠের মধ্যে এই এতটুকু ছায়ার নিশানা। পাথপাখালী ডাকে—রোদের তাপে মানুষ দুদণ্ড জিরোয়; চাষীরাও হালফাল ছেড়ে এসে গড়িয়ে নেয়—তামুক খায়।

এতদিন শান্তি বিশ্রাম আর পূর্ণতার স্বপ্নই মনে জাগিয়ে ছিল। ওই জলধারা, ওই ছায়াময় বটগাছটা। আজ ওখানে পতাকা উড়ছে, বাঁশের মাথায় একটা সাদা পতাকা হাওয়ার পতপত করছে।

একটা নোতুন ফোল্ডিং চেয়ার পাতা হয়েছে—তাতে পিন দিয়ে আটকানো একটা ম্যাপ—পাশেই পড়বার খাতা বগলে দাঁড়িয়ে আছে আমিনবাবু; সঙ্গে চেনম্যান দুজন, মাঝে লোহার শিকল ফেলে—কখনও বা বাঁশ-এর দাঁড় দিয়ে মাপজোপ করছে।

…মাঠের আলে হেথা হোথা বসে আছে উৎসুক ব্যগ্র দুচোখ মেলে লোকজন চাষীরা, দুএকজন বয়স্থা মহিলাও দূরে ঘোমটা দিয়ে বসে সাগ্রহে চেয়ে রয়েছে এই দিকে।

কেউ যেন জোর করে তাদের বন্দী করে রেখে—নিজেরা লুট করছে ওদের এতকালের সম্পত্তি।

নোতুন জরিপ হচ্ছে। নয়া কানুন নয়া বন্দোবস্ত হবে।

সারাদেশে চালু হচ্ছে নোতুন কায়েমী ব্যবস্থা। জমির মালিক আর সরকার দুজনেই বহাল থাকবে, মধ্যে জমিদার—মধ্যস্বত্বাধিকারী—দরপত্তনিদার—কেউ মুনাফা-লোভী থাকবে না।

ফৌত হয়ে যাবে সব। ঝরাপাতার মত উড়ে যাবে তারা।

…তারকরত্ন কথাটা শুনেছিল আগেই। সোনামুখীর দত্তরা—হোদল নারায়ণপুরের রায়চৌধুরীবাবু, মালিয়াড়ার সিংহরায় আরও অনেকের কাছেই শুনেছিল।

আগুন লাগার পরই সদরে গিয়েছিল তারকরত্ন মামলাদায়ের করতে—সেইখানেই শোনে কথাটা। ওরাও বাকীকর নীলাম নালিশ করতে এসে ইতিউতি করছে। থামোকাই আর কেন।

দত্তবাবু পরামর্শ দেন—তার চেয়ে পিছনের তারিখ দিয়ে জমি বন্দোবস্ত করে দেন গে—যা সেলামী আসে তাই লাভ। শেষ পাওয়া।

…ওরা মামলা দায়ের করেনি।

ফিরে এসেছিল তারকরত্নও চিন্তিত মনে। দিন বদলাচ্ছে। বনে বনে ঝরাপাতার দিন এসেছে। শালগাছ-গুলোর ডাল থেকে বাতাসে ঝেঁটিয়ে নিয়ে জীর্ণপাতা-গুলোকে, চলেছে—ঝরে গেছে মহুয়া গাছের সবুজ পাতার আবরণ, রিক্ত নিঃস্ব বনভূমি শুধু পলাশের পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার আভায় রক্তাক্ত বেদনাময়।

…অমনি যেন ঝরে যাবার দিনই আসছে।

আজ মনে হয় ফুরিয়ে যাবার বেলার সঙ্কেত ওই বন-ভূমি—শেষ সূর্যের রঙ্গিমাভায়।

…অবনী মুখুয্যে তৈরী ছিল, ঢাকের আগেই কাঠির বাদ্যির মত দু পায়ে লাফাতে লাফাতে আসে কাগজ বগলে।

—এই যে তারকদা শুনেছো—all gone. সত্যি?

কথাটা সেও বিশ্বাস করতে পারে না।

ধরণী মুখুয্যেও এসে জুটেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে—কেশ-বিরল মাথায় এদিক ওদিকে দু'একগাছি চুল তখনও লেগে আছে—তাতেই হাত বোলাতে থাকে।

…আবছা আলোয় দেখা যায় তারকবাবুর মুখে চিন্তার রেখা। গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়—হ্যাঁ। সবই সত্যি।

—ধানসাজা, দেবোত্তর—মধ্যস্বত্ব! সব নিয়ে নেবে? ধরণী মুখুয্যের গলা কাঁপছে।…এতকাল নানা ফিকিরে রোজকার করেছে সব কিছু। ঠকিয়ে আর মামলার হুমকি দেখিয়ে সব বেহাত করে নিয়েছে লোকের কাছ থেকে দেনার দায়ে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ফড়িংএর মত লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে পঞ্চাশ থেকে একশো—দুশো তক্‌।

…অবনী মুখুয্যে তখনও কোট ছাড়েনি। গজরাচ্ছে।

—বাবা কর্ণওয়ালিশ-এর আমলের পত্তনি, খোদ বিষ্ণু-পুর মল্লরাজার তাম্রপট্টোলী এক কথায়…ভক্কা হয়ে যাবে?

—যাচ্ছে! শুনছি কম্‌পেনসেসন দেবে।

—ড্যাম ইওর কম্‌পেনসেসন। জুতো মেরে গরু দান।

ধরণী ভীতকণ্ঠে বলে—তাও শুনছি জরিপ করার পর দখল সাব্যস্ত করে নোতুন রোকড় পড়চা হলে—

কথার জবাব দিল না তারকরত্ন।

রাত বাড়ে।

হু হু হাওয়া বয়, বন থেকে ভেসে আসে মহুয়া ফুলের সৌরভ! আজ কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ মনে হয় সব কিছু। ওরা চলে গেছে।

একাই বসে আছে তারকবাবু; ওদের নামে মামলা করতে পারেনি। নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হয়। যে মাটির উপর এতকাল দাঁড়িয়েছিল পায়ের নীচে থেকে সেই মাটি সরে যাচ্ছে।

…পুরোনো বাড়ীটা আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত থমথমে মনে হয়। কোথায় একটা শিয়াল ডেকে থেমে গেল—আঁধারে চীৎকার করে ওঠে অনেকগুলো শিয়াল, বাড়ীর আশপাশেই।

কি যেন একটা অমঙ্গলের চিহ্ন।

… উঠে যাচ্ছে ভিতর বাড়ীর দিকে।

…সারি সারি গোলা—মাত্র কয়েকটা তার ভর্তি, বাকী সবই ফাঁকা। ভর্তি হয়ে উঠতো এবারের ফসলে। কিন্তু সব ছাই হয়ে গেছে—সামান্য ধান যা বাঁচাতে পেরেছে তাও আগুনের তাপে কালো হয়ে গেছে—কতক আবার খই ফুটে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

হঠাৎ গোলার পাশে কার হাসির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। তারার আলোয় দেখা যায়, একটা মেয়ে—আবছা চিনতে পারে—বেজাবাউরীর বউ—ভাবি।

…চমকে ওঠে!…কানে এসেছে অনেক কথাই জীবনের সম্বন্ধে।…আজ ওকে দেখে দাঁড়াল।

—তুই।

মেয়েটার হাসি মুছে যায়।

তারকবাবু ওর দিকে চেয়ে রয়েছে, অল্প বয়েস, যৌবনের উন্মাদ স্রোতধারা ওই অসংযত বেশবাসের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। মেয়েটা সরে গেল।

…চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আঁধারে তারকরত্ন। বাড়ীটা ধুকছে—যেন দীর্ঘশ্বাস উঠেছে ওর বুকের গভীর অতলে। কাঁপছে ইট কাঠ—প্রচণ্ড ধাক্কায় এইবার মুইয়ে পড়বে চুর চুর হয়ে।

কাঁদছে কে!

এ বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক দীর্ঘশ্বাস—অনেক কান্না জমে আছে।

…অশোক জানতো এমনই একটা কিছু হবে।

…এতদিন চাকাটা একজায়গায় থেমে গিয়েছিল, আজ গতিবেগে সচল হয়ে উঠেছে। এতকালের পুরোনো প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত এসে বেজেছে, প্রচণ্ড সেই আঘাত।

…একে মেনে নেওয়া ছাড়া—মানিয়ে নিয়ে চলাছাড়া গত্যন্তর নেই।

নীলুবাবু সেদিন কথাটা বলেন।

—এবারে অনেকেই তো বেকার হল দেখছি।

—কেন?

অশোকের কথায় নীলুবাবু বলে ওঠেন

—জমিদারী অর্থাৎ তেজারতি, ধানমহাজনী, ওই তম্বি-হাম্বি বন্ধ হয়ে যাবে। বছরকী ধান সাজাও—তখন আর চলবে কি করে?

প্রীতি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছে।

কিছুদিন ধরে সেও দেখছে গ্রামে সাজসাজ রব। সদরে দৌড়চ্ছে সবাই রোকড় পড়চার নকল আনতে। নীলু-বাবুও ইতিমধ্যে বালিকাগজে দাগ এঁকে ঘর কেটে ফরম এ. বি. ইত্যাদি নানা ছক পুরোণ করতে ব্যস্ত।

এক সিকির তিনআনার ষোলভাগের ভাগ। যেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মত বলেন নীলকণ্ঠ-বাবু।

—মিললনা অশোক, এই কড়া ক্রান্তি তিল দণ্ডী হিসাব করা আমার কম্মো নয়। দেখ দিকি প্রীতি—

প্রীতি জবাব দেয়—ওই গণ্ডা কড়া ক্রান্তি করে যা পাবে—তাতে মজুরী পোষাবে না, তারচেয়ে ইস্তফা দিও—শান্তি পাবে।

হাসতে থাকে অশোক।

তবু নীলকণ্ঠবাবু যেন পৈতৃক ওই কাক দণ্ডীর হিসাব মেলাবার জন্যই রোকড-পরচা বগলে উঠে পড়েন। ওদিকে আমিন আসছে—জমি জরিপ হবে, এতদিন মাঠদিকেও যাননি, এইবার যেন জমিগুলো একবার চেনাজানাও দর-কার, নাহলে জবাব দেবেন কি?

মুনিষটাকে বলেন—বৈকালে একবার মাঠদিকে যাবো আসিস।

গরুর ছানি কাটছিল ফকীর, জবাব দেয়—আজ্ঞে এখুনিই চলেন কেনে?

উঁহু, এখন ধরণীর কাছে যেতে হবে, হিসাবটা বুঝে আসি। তারপর ওবেলায়—

নীলকণ্ঠবাবু হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন।

পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া ওই তিনকড়া দুক্রান্তি অংশ জমিদারীর—একেবারে বিনাপ্রতিবাদে ছেড়ে দেবার নয়।

হাসতে থাকে প্রীতি বাবার এই দুর্বলতায়। হঠাৎ অশোকের দিকে চেয়ে থাকে—কেমন যেন স্থির হয়ে আছে ও।

—আপনার মনে কিছু রেখাপাত করেনি এটা?

অশোক কি ভাবছে। জবাব দেয়—করেনি তা নয়! তবে স্রোতের বেগকে আটকাবার চেষ্টা করা বৃথা—এইটাই মেনে নিয়েছি।

সকালের রোদ বেড়ে চলেছে।

…সোনারোদ গেরুয়া হয়ে ওঠে। বাতাসে মাদার ফুলের তীব্র সুবাস। বাঁশবনে কোথায় একটা পাখী ডাকছে। শান্ত স্থির পল্লীপরিবেশের অতল অন্তরে কোন দুর্বার আত্মা দীর্ঘ শতাব্দীর বন্দী দশা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বাতাসে বাতাসে তারই স্পন্দনধ্বনি।

প্রীতি বলে ওঠে—এইবার কি করবেন? একটা চাকরীতো গেল।

অশোক জবাব দেয় না।

প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে দেখেছে প্রীতি যেন তাকে সুযোগ পেলেই এই প্রশ্ন করেছে। অশোক যেন বেকার—তার দিন কাটানোর জীবনধারণের একটা পথ চাই; তাকেও পাঁচজনের মাঝে একজন হয়ে বাঁচতে হবে এই কথাটাই তাগিদ দিয়ে এসেছে।

কেন তা জানে না। ভেবেছে সেও।

প্রীতিও ভেবেছে। ওর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই কেমন যেন খানিকটা ঠাঁই ওর মনেও নিয়েছে অশোক।

—জবাব দিচ্ছেন না যে?

—জবাব দেবার কিছুই নেই। আপাততঃ সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে শুনেছি।

—তাতেই দিন চলবে?

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে প্রীতি, ওর মনের এই নীরব নিষ্ক্রিয়তাকে পছন্দ করেনা সে।

অশোক জবাব দেয়—তা হয়তো চলবে কিছুদিন। তারমধ্যেই একটা পথ ভেবে নেব। চাকরী করে—ব্যবসা করে যারা পয়সা রোজগার করছে—দিন চালাচ্ছে, তাদের মতো হয়তো সবাই নয়; সংসারে অকাজ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত লোকও কিছু চাই।

—অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দলে?

জবাব দিলনা অশোক, কেমন যেন বেদনাহত চাহনিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

প্রীতি এতটা কঠিন হতে পারে কি করে জানেনা। সহরজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে যতই সুরু করেছে ততই যেন পল্লীর এই অলস জীবনযাত্রাকে সে ঘৃণা করতে সুরু করেছে।

প্রশান্তের কথা মনে পড়ে।

তাদের চেয়ে তিনবৎসরের সিনিয়র। প্রীতির মনে সেই যেন খানিকটা আবর্তের সৃষ্টি করেছে। সহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী নিবারণবাবুর ছেলে—কিন্তু তার মনে স্বপ্ন রয়েছে—সে এখানে সুতোর কল চালাবে। তাঁতি—আর সমস্ত জেলার তাঁত ব্যবসায়ীদের প্রচুর সুতোর চাহিদা—সুতো—চাই কি ক্রমশঃ কাপড়ের কলও করবে।

ওর মনের গভীর কর্মপ্রেরণার উত্তাপ দেখেছে প্রীতি—তাই বোধহয় অশোকের এই নিবিড় স্থৈর্য্যকে আজ কেমন নীরব নিষ্ক্রিয়তা বলেই মনে হয়।

...অশোক উঠে পড়ে।

—যাচ্ছেন? ছোট্ট প্রশ্নকরে প্রীতি ওই দূর কোন সবুজ চিন্তার অবসরে।

হ্যাঁ। বেলা হয়ে গেছে।

চলেগেল অশোক।

...নির্জন পথটা দিয়ে চলেছে, একদিকে তারকবাবুর উঁচু পুকুর—নীচে গ্রামের সেই রাস্তাটা; চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে জলের ঝরণা ধারা—বাঁশ বনের ছায়া কাঁপছে পথে।

বাতাসে কানে আসে বাসনপেটার হাতুড়ির শব্দ। ...হঠাৎ তালগাছের ছায়ায় কাকে দিঘী থেকে স্নান সেরে উঠে আসতে দেখে দাঁড়াল।

...কদমবৌ উঠে আসছে। ভিজে কাপড়—কলসীর জল চলকে উঠছে ওর নধর দেহের গতিবেগে।

—ছোটবাবু!

অশোক ওর দিকে চাইল।

—আর যাওনা কেনে বাড়ীর দিকে?

কথা বলেনা অশোক। বলে ওঠে কদম—কেনে যাওনা তা জানি?

—কেন?

একটু ভারি হয়ে আসে কদমের গলা—তুমিও সত্যি ভেবেছ কথাটা।

ওর দিকে চাইল অশোক। গোকুলের সেই কথাটা আজও ভোলেনি কদম, ওর মনে একটা নীরব নিভৃত স্থানে সেই বেদনাটা মিশিয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনের কোণে ঝড় তোলে।

—না, না। সময় পাইনি।

সহজ হবার চেষ্টা করে কদম—তবু ভালো।

চলে গেল সে! ছায়ায় আলোয় ঢাকা পথটা দিয়ে হারিয়ে গেল ওপাশে, চলছে অশোক।

...তারকবাবুর বৈঠকখানার সামনে কয়েকজনকে দেখে চলে যাবার চেষ্টা করে অশোক।

...এমোকালীও ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে, বলাকওয়া নেই একটা প্রণাম ঠুকে বসে।

—কি রে?

ভবিৃযুক্ত হয়ে ওকে প্রণাম করতে দেখে একটু অবাক হয়েছে অশোক। কালীই জবাব দেয়—এজ্ঞে জমি সিলমক বিঘে ধান সোলের সোতে।

—জমি নিলি?

হাসছে কালীচরণ, খুশির হাসি। এসে দাঁড়িয়েছে অতুল কামার—দয়াময় আরও ক'জন। কালীচরণ বলে ওঠে—কামারপাড়ার ক'জন মিলে সিলম বিঘে দশেক জমি। তারকবাবু সব জমি ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা।

অশোক মনে মনে হাসে। খুশীই হয়েছে সে—বেশ, বেশ।

—আজ্ঞে ইবার আর বলতে পারবেক নাই—শালোর তিলক কাটতে মিস্তিকে নাই, কথাটা পেরায় বলতো ওই অবনীবাবু কিনা। অতুল কথাটা বলে—সাঝ বেলায় একবার আস্থন অনে ছুধবাবু।

—আচ্ছা!

ওরা চলে গেল।

চুপকরে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।

দুপুরের রোদ ঠেলে উঠেছে আকাশের মধ্যসীমায়। শীতের আমেজ চলেগিয়ে আসছে গ্রীষ্মের দাবদাহের আভাষ লীন কপিশ প্রান্তরে রোদ উঠেছে—ঝাঁ ঝাঁ রোদ; বন-খেজুর ঝোপের পাশে দমকা হাওয়ায় উঠছে ছোট ছোট ঘূর্ণি।

চাকাটা ঘুরছে।

নীরব নিস্পন্দ জীবনযাত্রায় এসেছে গতিবেগের ছন্দ।

কালীচরণ, ভুবন কর্মকার আর কারা আজ সমাজের বুকে নোতুন পরিচয়ে স্বীকৃত হলো।

ভূমিহীন পরগাছা আর নয়—তাদেরও অস্তিত্ব আছে, মাটিতে আছে তাদের দাবী—এই কঠিন অধিকার তারা আজ ছিনিয়ে নিয়েছে ওই তারকবাবুর হাত থেকে।

…বড় বাড়ীখানার কলরব-সমারোহ কেমন স্তব্ধ হয়ে এসেছে।

…শুকিয়ে গেছে বাগানের মাঝের গোলাপগাছ-গুলো—আগুনের তাপে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা আধপোড়া নারকেল গাছ।

…পথের ধুলোতে এখনও ছড়ানো কালো ছাই আর ছাই।

…অশোক এগিয়ে চলে। প্রীতির কথাটা তখনও মনে পড়ে। কেমন যেন বদলে গেছে প্রীতি।

…ওর চোখের সামনে কোন স্বপ্নই নেই—আছে শুধু বেঁচে থাকার বিলাস ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার কথাটাই সবচেয়ে বড়। আগামী যুগের কেমন একটা ব্যর্থ রূপ—অশোক যেন চিন্তায় পড়েছে।

কাটা ছাগলের মাংস ভাগ ভাগ করে বিক্রী হচ্ছে। এতদিন ছাগলটা ঘুরে বেড়াত—চরত, জীবনটাকে উপভোগ করেছিল। এক নিমিষেই সব চেতনা হারিয়ে সে পণ্যে পরিণত হয়েছে। ফুসফুস—দাবনা—বুকো—সব বিভিন্ন দামের পশরায় পরিণত হয়েছে বাজারে।

তারকবাবুর জমিদারীর অবস্থাও তেমনি। ভাগা দরুণে বিক্রী হচ্ছে, পচে যাবার আগেই হাটে বেচে দিয়ে যা পাওয়া যায় গোছের অবস্থা।

পিছনের তারিখ দিয়ে বন্দোবস্ত হচ্ছে জমিদারী। যে যা চায় নিয়ে যাক।

কামারপাড়ার লোকেরাও এসেছিল। দিতে চায় নি প্রথম। অবনীবাবু আড়ালে বলে—Drive them. হঠাও বাঁশরোপন সিংহ—আস্র্লা হবে পাখী—

কিন্তু অন্য খদ্দের আর আসতে পারে না, এমোকালীর দলবলই নাকি পথ আগলায় তাদের। কথাটা শোনে ওরা—কিন্তু করবার কিছুই নেই।

…শেষ অবধি মত না দিয়ে পারেনি।

সবচেয়ে অবাক হয় তারকবাবু মিষ্টিকে দেখে। ভিড়ের মধ্যে সেও এসেছে। ধরণীমুখুয্যে খাতা থেকে মুখ তুলে বলে ওঠে।

—তুই! তুই ইথানে কেন রে?

হাসে মিষ্টি—ভয় নাই, বাকী টাকার তাগাদ দুব নাই গো।

—বাকী টাকা! কুন শালা বলবেক—ধরণীমুখযো কারোও আধলা ধারে! মরা হাতি আভি সওয়া লাখ।

মিষ্টি হাসছে, হাওয়ায় উড়ছে শাড়ীর আঁচল। বেহায়া মেয়েটা বলে ওঠে—আদার ব্যাপারী লাখ বিলাখের খপর জানিনা—তা সেদিন কাত্তিক পূজোর এতে বলেছিলা—

ধরণীমুখুয্যে টাকে হাত বুলোচ্ছে। থেমে গেল মিষ্টি। খুঁট থেকে দলাপাকানো নোটগুলো বের করে নামিয়ে দেয়।

—যাক্ উকথা। আমাকে টুকবেন জমি দাও কেন্নে।

অবনীমুখুয্যে উঠে গেল। ধরণী চুপ করে কি ভাবছে। জোঁকের মুখে নুন পড়েছে।

…কারা তাগাদা দেয়—চটক করো ঠাকুর। তিনকোশ পথ যেতে হবেক নি গো। দাও য়োকড় হাতচিঠায় সই করে।

মিষ্টিও দাওয়ায় চেপে বসেছে।

রাতের অন্ধকারে যারা আসতো চোরের মত ওদের

অত্যাচারে নীরব সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছে, সেই মিষ্টিও আজ ঘরের স্বপ্ন দেখে—একটু ঘর; জমিজারাত—তাই নিয়ে আবার ভাঙ্গাজীবন নোতুন করে যাপন করবে।

দিনবদল—পালা বদলের দিনে তাই তারা নোতুন আশায় বুক বেঁধে এসেছে—সেই দাবী ছিনিয়ে নিতে।

ধরণীমুখুয্যে টাকের উপর ভিজে গামছাটা চাপিয়ে পরচা দেখতে থাকে।

খাতিয়ান নম্বর, দাগনম্বর, তৌজি নম্বর—সব লিখে মৌজাজারী বন্দোবস্ত করছে।

ঘর ছাইছিল মুনিষগুলো—জলটোপ দাঁড়িয়ে তদারক করছে। সামনের দিকে একটা সুশ্রী মন্দিরের মত আদল এনেছে। রাশিরাশি খড় গড়ের জলে চুবিয়ে এনে মুনিষগুলো সাঁ সাঁ শব্দে চালের উপর বসা বারুই-এর হাতে তুলে দিচ্ছে।

বারুইগুলো আসমানে নিপুণ অভ্যস্ত হাতে খড়ের আটিগুলো ধরে ধরে চালে লাগাচ্ছে। গ্রীষ্ম আসছে —কালবৈশাখীর ঝড়ের আগেই মজবুত করে ঘর বানিয়ে নিতে চায়, ঝড়ে আর বৃষ্টিতে যাতে না কষ্ট পায়।

সামনের ঠাঁইটুকুতে কয়েকটা বেগুনগাছ—সযত্ন পরিচর্যায় তারা নধর সবুজ হয়ে উঠেছে, ঝুলছে কতকগুলো বেগুন; গাঢ় ভেলভেট রং-এর ফলগুলো পাতার আড়ালে কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে নিটোল পূর্ণতায়।

...মিষ্টিকে দেখে ফিরে চাইল জলটোপ।

...হাতের বন্দোবস্তের কাগজখানা বের করে দেয়।

—নে!

—ইকিরে? অবাক হয় জলটোপ।

—জমি লিলম। গয়না পরে আর কি হবেক বল? সব বিচে দিয়ে জমি লিলম। ধান হবেক—আখ আলু ধান—কেমন ঘর মানাবে বল দিকি?

মা লক্ষীর আটন।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লোকটা ওর দিকে। সেই বর্দ্ধমানের দেখা রঙ্গিণী রহস্যময়ী নারী কেমন বদলে গেছে। ওর সারা দেহে একটা অপূশ্রী—দুচোখে সেই লাস্যময়ী উচ্ছল ভাব মুছে গিয়ে একটি সবুজ শ্রী ফুটে উঠেছে। ঘরের স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে তার।

নিরাভরণা একটি নারী, শাড়ী গহনা সব ছেড়ে আজ মাটির স্বপ্ন আর সার্থকতার আনন্দে বিভোর। বলে ওঠে মিষ্টি।

—তুই খুশী হোস নি লাগছে?

—না। না। বেশ তো ভাল—করেছিস।

সায় দেয় জলটোপ।

মিষ্টির আজ গুণগুণিয়ে সুর আসে মনে। চালের উপর বসে চাল ছাইছিল পশুপতি লোহার। বুড়োর সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধ। একটু হালকা কণ্ঠেই বলে ওঠে মিষ্টি—

ও দাদামশাই—সর্বাঙ্গেই রোদ পোয়াচ্ছ নাকি গো?

পশুপতির জলদোষের ব্যারাম আছে, একটু সামলে বসলো পশুপতি। হাসছে বুড়ো।

...জলটোপ গুণগুণানি সুরটা শুনছে। মিষ্টির মনে আজ সুখের পরশ—ঘর বাঁধার সার্থক স্বপ্ন।

...ও সুখী হোক। অনেক ঘাটে ভেসে বেড়িয়েছে আবর্জনার সঙ্গে; তবু থিতু হোক—কোন উর্বর পলিচরে ও সবুজ তরুশাখায় বিকশিত হোক।

লোকটা কি ভাবছে।

ঘরের নেশা—ও যেন বদনেশা! সাংঘাতিক নেশা। মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়।

একটু চিন্তায় পড়েছে আজ জলটোপ। জমি-জারাত মানেই ঝামেলা নানান বখেরা। হেপা সামলাতে প্রাণান্ত —একটা করে ঝামেলায় যেন জড়িয়ে পড়ছে বিবাগী মেয়েটা।

জলটোপের কাছে এসবই বিস্বাদ লাগে।

এত আবর্তন-বিবর্তনের মাঝে একটি লোক নিরাসক্ত নির্বাক দৃষ্টিতে গোপগায়ের অতীতকে দেখেছে—বর্তমানকেও, দেখছে—কল্পনা করে ভবিষ্যৎ-এর। তার সেই মতামত প্রকাশের ভাষা নেই।

একপক্ষে বোধ হয় ভালই হয়েছে নারাণঠাকুরের। ভাষাহীন লোকটি গ্রামের এত বড় ঘটনা, স্রোত, অন্তঃস্রোত কিছুরই খবর রাখে না। তার কল্পনা সীমিত হয়েছে ওই মাঠের কাযের মধ্যে, আর গরু বাছুরের তদারকিতে। সেই তার জগৎ।

ছাহুদাস পান্নুদাস-এর দোকান অবধি বড়জোর তার দৌড়।

ভাইপো সনাতন বড় হয়ে উঠছে। ছোট্ট ছেলেটাকে বড়-ভাজবৌ গঙ্গাঠাকরুণ ধার কর্জ করে পড়াচ্ছে, গাঁয়ের স্কুল ছেড়ে পাশের গ্রামের বড় ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছেঃ হিসাব কিতাবও শিখেছে।

...নারাণ অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে তার সনাতন ইস্কুলে যাচ্ছে; বই পত্র নিয়ে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে।

বড় ভাই-এর কথা মনে পড়ে। অকারণেই যেন মনটা কেমন হু হু করে। কত নিশ্চিন্ত ভাললাগা দিনগুলো; ওদিকে মরাইএর ধানও ফুরিয়ে আসে। বই জামা-জুতো কত খরচ।

ছেঁড়া কাপড়খানা ভাল করে গুটিয়ে-সুটিয়ে পরে নারাণ-ঠাকুর গোয়ালের আড়াচ থেকে খড় নামিয়ে কাটতেথাকে। মুনিষটাকেও জবাব দিয়েছে এখন।

হাল-ফালের কায নাই; নিজেই সব দেখতে পারবে। তবু বাঁচবে একজনের মজুরি—দৈনিক চার সের ধান আর মুড়ি—সেই সঙ্গে তেল তামাক।

...গঙ্গা ঠাকরুণ অবশ্য অন্য স্বপ্ন দেখে।

জমি-জারাত যা আছে তাতে যজমানি করে আর পেট চলে না। তাই ছেলেকে পড়াচ্ছে সে।

হেলু মাষ্টার—তারকবাবুর হাতে-পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে কোন রকমে বিনি মাইনেতে পড়াবার ব্যবস্থা করেছে স্কুলে—তার স্বপ্ন অন্য জগতের। বাবুদের ছেলের মত তার ছেলে সনাতনও পাশ দেবে।

মাঠের কাযের সময় ও ছেলেকে যেন ওদিকে পাঠাতে মন চায় না। কাদা জল বৃষ্টিতে মাঠে পাঠাতে রাজী নয়।

সেদিন ধান কাটার সময়েই কাণ্ডটা ঘটে যায়, বাকুড়ীর ধান কাটা হচ্ছে—এক টানে সব জমিটার ধান কাটতে না পারলে পিছু পড়ে যাবে! তাই নারাণ ঠাকুর বহু কষ্টে কিছু ধান কবুল করে বাড়তি মুনিষ এনে কাটাচ্ছে।

সনাতন মাঠে গিয়ে কি যেন কৌতুহলবশেই একটা কাস্তে নিয়ে মুঠি মুঠি ধান কাটতে থাকে।

...নারাণ ঠাকুর ওর দিকে চেয়ে থাকে।

...হাসছে অর্থহীন বোবা ভাষায়; মাথা নাড়ে। ইসারা করে দেখায় এই ভাবে আরও তাড়াতাড়ি কাটতে হবে।

কি যেন গর্ব আর আনন্দে ওই ভাষাহীন মানুষটার বুক ভরে ওঠে। দাদার চিহ্নটুকু মুছে যায়নি, আবার তারই দোসর হয়ে পাশে দাঁড়াবে। মশ্ মশ্ শব্দে ধান কেটে চলে নারাণ।

.. হঠাৎ সনাতনের অনভ্যস্ত হাতে কাস্তে বেঁধে যায়; ধারাল কাস্তের ফলায় কেটে যায় হাতটাও। রক্ত পড়ছে। প্যান্ট জামায় লাগে রক্তের দাগ। কোন রকমে সরে চলে আসে।

তারপরই শোনা যায় গঙ্গাঠাকরুণের চীৎকার। ন্যাকড়া পোড়া—এটা সেটা দিয়ে কোন রকমে একটু ব্যবস্থা করেই, তার স্বরে সপ্তম সুরে হাঁক পাড়তে থাকে—

—ওগো তুমি কোথা গেলেগো? তোমার ছেলেকে ওই বোবা কেটে ফেলাতো গো?

...দু-পাচজন লোকজনও জুটে যায়। গঙ্গাঠাকরুণ সবিস্তারে বোবা যে কত শয়তান তাই জাহির করতে থাকে। এবং এও ঘোষণা করে—আজই এর ব্যবস্থা করে তবে ছাড়বে।

...বোবা জানল না, তবে বাড়ী ফিরতেই ভাজবৌ-এর হাঁক ডাকে চুপচাপ বাইরের দাওয়ায় এসে বসল।

সন্ধ্যা নামছে।

শীতের সন্ধ্যা। সারাদিন স্নান খাওয়া নেই। ধানই কেটেছে। অসহ্য বেদনায় টনটন করছে মাজা কোমর... গা হাত পায়ে শীতের চড়চড়ে বাতাসে ফাট ধরেছে। সারা শরীরে ক্ষুধার নীরব জ্বালা।

...অব্যক্ত বেদনায় নির্বাক নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। জগতে মাকে মনে পড়ে না—মনে পড়ে দাদাকে। সেও আজ কোথায় কে জানে!

...এমনি দিনও কেটেছে অনেক।

তবু যেন সয়ে গেছে তার। সনাতন বড় হবে—পাশ দেবে। বাবুদের ছেলেদের মত চাকরী করবে। আর জমি-জারাত কিনবে সে; তালতলার বাকুড়ীখানার মত আরও অনেক জমি।

[ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্র-স্মরণে

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের পূত স্মৃতি-বিজড়িত জন্ম-ভিটার যথাযোগ্য সমাদর আমরা করি নাই। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরা কবিবরের জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন করেছি। ইহা দেশ ও জাতির পক্ষে শুভ সূচনা।

সেকালে কৃষ্ণনগরে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশের মধ্যমণি ছিলেন—দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। সঙ্গীতজ্ঞ পিতার সাহচর্য ও সঙ্গীত-সংস্কৃতিময় প্রাকৃতিক পরিবেশের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে বালক দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে অনেকেই কার্ত্তিক-ভবনে পদার্পণ করছেন—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

কবির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য হারান নি। তিনি গেয়েছেন মানুষের জয়গান—"আবার তোরা মানুষ হ ;" সত্যই তিনি নিজে একজন প্রকৃত মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর মুখে এই কথা শোভা পেয়েছিল। তাঁর এক বন্ধু (এ, কে, রায়) লিখ্‌ছেন,—"ঐ যে দেখ্‌ছেন একটি মানুষ, যদি ওকে মানুষই বল্‌তে হয় ত' জান্‌বেন, ও এই আজকালকার এ যুগের কেউ নয়—ও সেই ভীষ্ম-টিস্মর মত একটা অদ্বিতীয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।" তার কাব্যের মধ্যে যে পৌরুষ এবং তাঁর হাস্যের অভ্যন্তরে যে তেজ-প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রেও তা' পরিস্ফুট ছিল।

তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রথম বিকাশ হয়—ইংলণ্ডে 'Lyrics of Ind' রচনায়। কবিবর শ্রীমধুসূদন ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্র হ'তে মাতৃ-ভাষার কোলে ফিরে এসে মধুচক্র রচনা ক'রে গিয়েছেন—'গৌরজন যাহে করিছে পান সুধা নিরবধি'—তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলালের প্রেরণায় মাতৃভাষার কোলে ফিরে এসে তাঁর অমর দান রেখে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের মধ্য দিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজ করেছেন। "একি শুধু হাসি-খেলা" ব'লে হাসিকে তিনি খেলার সামগ্রী রূপে মনে করেন নি। শ্লেষকে রসের ভিয়ানে পাক করা অতি-বড় ওস্তাদের কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই রকম একজন ওস্তাদ। বীরবল বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয়। তাঁর গানে হাস্যরস, ভাবে কথায় সুরে তালে লয়ে পঞ্চীকৃত হ'য়ে মূর্তিমান হ'য়ে উঠেছে। কান্নার মত হাসিরও নানা প্রকার বিভিন্ন রূপ আছে, এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি নানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল ভাস্বর—তাঁর নাটকীয় প্রতিভায়। তাঁর নাটকগুলি বাংলার রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিল। বলা বাহুল্য, তিনি বাংলা নাটককে উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন। যে কয়জন নাট্যকার ইতিহাসের ঘুণধরা পাতাকে প্রাণবন্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালই শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী।

তিনি ও বীরবল—উভয়েই কৃষ্ণনাগরিক। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন ; বীরবল বলেছেন —"এখানকার ভাষা আদর্শনীয়।"

গানই তাঁর রচনাবলীর প্রাণ। তাঁর স্বদেশী গানে মাতৃভূমির শোভা-সৌন্দর্য, তার ধর্ম, আচার ও সংস্কৃতির মহিমান্বিত রূপ অসামান্য কাব্যিক সুষমায় প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর 'আমার দেশ'—গানটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তরুণদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল,—তা তখন-কার তরুণেরা—যাঁরা এখন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—সম্যক উপলব্ধি করেন। তখন বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ যে অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলেন, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল তাতে ইন্ধন যুগিয়ে-ছিলেন।

এই গানটির ইতিহাস স্বর্গত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের সহিত জড়িত। যখন দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় অস্থায়ী

ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন জগদীশচন্দ্র তাঁর অতিথি। দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার পাহাড়'-গানটি গেয়ে তাঁকে আনন্দদান করেন। গানটি শুনে জগদীশচন্দ্র বলেন,—"আপনার এ গানে কবিত্ব উপভোগ করতে পারি,' কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম, তা' হ'লে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা—বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।" এই কথা শুনেই দ্বিজেন্দ্রলালের মনে একটি মাতৃবন্দনা রচনা করবার বাসনা উদিত হয়। তার ফলেই এই অনবদ্য সৃষ্টি—'আমার দেশ'।

"নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
(আবার) কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো,
রাখিস্ নে আর মায়ায় ঘিরে, স্নেহের বাঁধন দেরে ছিঁড়ে
উধাও হয়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত পাব না গো"—

কবি সৌন্দর্যের উপাসক ও প্রকৃতির পূজারী; তিনি আত্মহারা প্রকৃতির সুষমার মাঝে, ভূমার সঙ্গে মিশে যেতে চান। যেখানে দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমিতে দুই তট আপনাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে, যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ওই অসীম কালো—সাহিত্য সেখানে সার্বজনীন হ'য়েছে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যও এখানে সার্বজনীনতা লাভ করে সার্থক হ'য়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে সাহিত্যিক বিরোধ ঘটেছিল, তা' ক্ষণস্থায়ী (ephemeral),—কবিগুরুর মনে কোনোরূপ স্থায়ী রেখাপাত করে নাই। তিনি বল্ছেন,—"দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু ব'লে নিয়েছেন, আমিও তাঁকে কিছু ব'লে নিয়েছি। তারপরে এই খানেই খেলাটা শেষ হ'য়ে গেলেই চুকে যায়—অন্ততঃ আমি তো এই খানেই চুকিয়ে দিলুম। আগুনের উপর কেবলই ইন্ধন চাপিয়ে আর কত দিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড ক'রে মরব।" কবিগুরু আবার বলছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে, আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।" পক্ষান্তরে, মৃত্যুর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল; "আমাদের শাসনকর্ত্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"—রবীন্দ্রনাথ Knight তো হয়েছিলেন, Nobel Prizeও পেয়েছিলেন।

মহাকবি Shakespeareর প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মরণীয়। Lake District পরিভ্রমণরত কবি Statford-on-Avonএ Shakespeareর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান করেন,—"ঘুমাও কবিবর! যেখানে ইংরাজী ভাষা বিদিত, সেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না। * * দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীর বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।"

কবি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তিনি লিখেছেন,—

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরিয়াছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

—কবির আশা পূর্ণ হয়েছে। পরাধীনতার তমসা দূর হয়েছে; স্বাধীনতা-সূর্যের অরুণ-রাগে আজ দেশ-মাতৃকা উদ্ভাসিত।

আজকার দিনে এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। তিনি বর্তমান ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পূর্বাভাষ দিয়ে গেছেন। তিনি বল্ছেন,—"সে ধর্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। আর তাদের নিজের কিছুই কর্তে হবে না; ঈশ্বরের কোনো অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গ'ড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্যদিয়ে নয়, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে—যে পথ শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথ দিয়ে।"

কবি, তুমি অমর; তোমার অযোগ্য দেশবাসী আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই।

নগর কীর্ত্তন

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে আবির্ভূত হইলেন, মহাভারতের যুগে, অথচ আমরা শুনিতে পাই যে আদিযুগে দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা কি রকম কথা? প্রকৃত ব্যক্তির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাঁহার নামের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল? বিশ্বকোষ বলেন, "পুরাণকার কৃষ্ণ নামের অন্যরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন—

'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ
তয়োরৈক্যাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণইত্যভিধীয়তে॥'

(শ্রীধরস্বামী)

কৃষিশব্দের অর্থ সংসার ও ণ শব্দের অর্থ নিবৃ‍্তি বা মোচন করা, পরে ৫মী তৎপুরুষ সমাস, যিনি সংসার হইতে মোচন করেন, সেই পরম ব্রহ্মকেই কৃষ্ণ বলে।" (বিশ্বকোষ, কৃষ্ণশব্দ, ৪১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অনেকে বলেন যে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ, আর যশোদানন্দন কৃষ্ণ বৈষ্ণবগণের বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। এমনও অদ্ভুত কথা শোনা যায় যে বসুদেব যখন নিজপুত্রকে লইয়া নন্দালয়ে উপনীত হন, সেই সময় নাকি যশোদা দেবীও সন্তান প্রসব করেন। ঐ দুই শিশু এক অঙ্গ হইয়া কৃষ্ণ নাম ধারণ করেন।

বৃন্দাবন-বিহারীকে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার যৌবনের পূর্ব্বে, আর মহাভারতীয় চক্রীকে আমরা দেখিতে পাই কৈশোরের পরে। অনুমান, যশোদানন্দন কৃষ্ণ কাল্পনিক, দেবকীনন্দন কৃষ্ণকেই যশোদা দেবী শিশুকাল হইতে কৈশোরকাল পর্যন্ত লালনপালন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগন তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে কৃষ্ণ নামে গ্রহণ করেন, আর মহাভারত তাঁহাকে গ্রহণ করেন চক্রধর-রূপে। দুই কৃষ্ণই এক, দুই নহে। কৈশোর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমময়রূপ, আর তাহার পরে তাঁহার ধ্বংসকারী রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম জীবনকে আদি বৈষ্ণবগণ উক্ত শ্রীধর-স্বামীর মতানুযায়ী পরমব্রহ্মরূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আধুনিক বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে লম্পট-চূড়ামণি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কয়েকজন ভাগবতসেবী পণ্ডিতের নিকট অনুসন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, ভাগবতে রাধা নামে কোন গোপিনীর সন্ধান মিলে না। তবে প্রধানা গোপিনীর কথা উল্লিখিত আছে। বিশ্বকোষেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন,—"শ্রীমদ্ভাগবতে রাধিকার কোনরূপ উল্লেখ নাই। কৃষ্ণভক্তা এক প্রধানা সখীর নির্দ্দেশ আছে মাত্র।" (বিশ্বকোষ রাধা শব্দ)

রাধা নামে যখন কোন গোপিনীর সন্ধান মিলে না, তখন রাধা নামের উৎপত্তি হওয়ার কারণ কি? আবার পুরাণে রাধার সন্ধান মিলে, সেও আবার আদি যুগের ঘটনা। যেমন—"গোলকে রাসমণ্ডলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গোলকধামে রাস-মণ্ডলে এই কন্যা আবির্ভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধাবিত হইয়াছিলেন, এইজন্য দেবগণ তাঁহার নাম রাধা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" (বিশ্বকোষ রাধা শব্দ)

অনুমান এস্থানে রাসমণ্ডল অর্থে দেবগণের (মহর্ষি-গণের) সভাস্থল, যেখানে বসিয়া তাঁহারা ভগবানের (সৃষ্টিকর্ত্তার) গুণকীর্ত্তনরূপ রসাস্বাদন করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ অর্থে পরমব্রহ্ম, মহাব্যোম; আর রাধা অর্থে প্রাকৃতিক শক্তি, যিনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য পরমব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া পুনরায় পরমব্রহ্মের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কেন না, 'রা' শব্দের অর্থ গ্রহণ, আর 'ধা' শব্দের অর্থ দান। অর্থাৎ যাঁহার নিকটে আত্মা গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাই রাধা নামের তাৎপর্য্য।

বর্ত্তমান যুগে কীর্ত্তন শব্দের বহুরকমই ব্যাখ্যা শোনা

যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ শব্দটি সাঁওতালী ভাষা হইতে আসিয়াছে। সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বা সাঁওতালী রীতিনীতির সঙ্গে বাঙ্গলার কিছুটা সামঞ্জস্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কেননা উহা বাঙ্গালার প্রতিবেশী রাজ্য। কিন্তু ঐ কীর্ত্তন শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ হইতেই আগত। উহা সাঁওতালী ভাষার অন্তর্গত নহে।

"কীর" শব্দের অর্থ শুকপক্ষী, আর "তন" শব্দের অর্থ ধ্বনি (শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। শুকপক্ষীকে ভগবানের প্রধান ভক্তরূপে বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান, শুকপক্ষীর কলরবকেই প্রথমে কীর্ত্তন নামে গ্রহণ করা হয়। তৎপরে উহা ভগবানের লীলা-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন গৌড়ের বাদশাহী আমলের মধ্যস্থলে, অর্থাৎ হুসেন শাহের সমসাময়িক কালে। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশ হইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মই হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৈষ্ণব আচার্য্যগণ নাকি হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মমুক্ত করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যেমন,—"যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের নামে নানা অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ প্রচার করিতেছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহারাই পাষণ্ডী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।" (খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত কীর্ত্তন, ২৬ পৃঃ)

ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেন সুপণ্ডিত হলায়ুধ ও পশুপতির সাহায্যে শাক্ততন্ত্রের প্রচার দ্বারা বৌদ্ধতন্ত্র-বাদকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাই নহে, লক্ষ্মণ সেন বৌদ্ধতন্ত্রবাদকে উত্তর বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর শাখা-রাজধানীরূপে ব্যবহারের জন্য সুহ্ম দ্বীপের (আদি নদীয়ার) উত্তর সীমান্ত-স্থিত কর্ণসুবর্ণ নগরের নাম রাখেন "লক্ষ্মণ নগর"। কারণ পাল রাজাগণ মৈথিলী ব্রাহ্মণদিগকে ঐ প্রদেশে বসবাস করাইয়া উহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মৈথিলী ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এখনও ঐ প্রদেশে বসবাস করিতেছেন।

লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই কর্ণসুবর্ণ নগরের নাম লুপ্ত হয়। পরে হিসামুদ্দিন গিয়াসুদ্দিন বাদশাহ ঐ কর্ণসুবর্ণ বা লক্ষ্মণনগর কাঁকজোলের পার্শ্বস্থ নগর বলিয়া উহাকে কাঁকজোল নামেই অভিহিত করেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী হইতে কাঁকজোল পর্য্যন্ত এবং কাঁকজোল হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত একটি সুবৃহৎ রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। পরবর্ত্তী কালে ঐ কর্ণসুবর্ণ নগর গৌড়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত সুহ্ম বা আদিনদীয়া হইতে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটিকে আশ্রয় করিয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের সময় লইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব পর্য্যন্ত শাক্ত তন্ত্রই হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। অনুমান, তন্ত্রোক্ত মতাবলম্বী শক্তি-উপাসকদিগকেই গোঁড়া বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ পাষণ্ডী নাম অভিহিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভু যে কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক, সে রাধাকৃষ্ণ অরূপ-রতন পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি। তাঁহার সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ ঐ অরূপরতনকে সাধারণের গ্রহণ যোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রূপদান করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ঐ রূপকে মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে গায়ক সম্প্রদায়ের হস্তে পড়িয়া ঐ রূপ বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। অনুমান, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্যের অতীত।

নাম কীর্ত্তনের মাধ্যমে মানসিক আবিলতা যতটা দূরীভূত হয়, পদাবলী কীর্ত্তনের মাধ্যমে ততটা হয় না এবং বোঝার বা বোঝাইবার দোষে মানসিক আবিলতা আরও ঘনীভূত হয় বলিয়াই আমার ধারণা।

শাক্তধর্ম্মের পথ সহজ, কিন্তু সামাজিক অনুশাসন কঠোর, আর বৈষ্ণব ধর্ম্মের পথ কঠোর কিন্তু সামাজিক অনুশাসন সহজ। বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মপথের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র সামাজিক অনুশাসনকে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করার জন্যই বোধ হয় দিন দিন নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নামিয়া আসিতেছেন। আর ঐ সঙ্গে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলনক্ষেত্ররূপ নগর কীর্ত্তনকেও যেন দিন দিন পরিত্যাগ করিতেছে। নগর কীর্ত্তনের মাধ্যমে আত্ম-তৃপ্তি যেমন সংঘটিত হয়, সামাজিক আবিলতাও তেমনি দূরীভূত হয়। অথচ বর্ত্তমান সময়ে ঐ নগর কীর্ত্তন বা নামকীর্ত্তন যেন অবহেলায় বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোহব্বত্

কমল মৈত্র

প্রেম বা প্রণয় ভীরু, প্রকাশে তার সংকোচ; 'লভ' যেন পারস্পরিক স্বীকৃতি; হিসেবের মাপামাপি! কিন্তু মোহব্বত্? একজনের উপর আর একজনের চিরন্তন দাবীরদম্ভ প্রকাশ!

সেই দম্ভই প্রকাশ করে যশোবন্ত সিং সেদিন সেক্সন সুপারিন্‌টেনডেন্টের টেবিলের উপর সজোরে ঘুসি মেরে বীর দর্পে ঘোষণা করল—

—মোহব্বত্! মেরা মোহব্বত্ আগিয়া।

দুপাশের টেবিলের থেকে সমস্বরে প্রশ্ন হল—কিসকা সাথ?

ইসারায় পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল—উনকা সাথ।

পাশের ঘরে যাকে উদ্দেশ্য করল তিনি নতুন রিক্রুট! মাত্র তিনদিন হল ভর্ত্তি হয়েছেন। বয়স আন্দাজ উনিশ কুড়ি, অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, দেহ লাবণ্যে অনির্ব্বচনীয়। সব মিলিয়ে নিপুণ শিল্পীর প্রতিভা স্বাক্ষর।

চিত্তচাঞ্চল্য জাগাবার মত রূপ বটে। ভর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে সারা অপিসে চাঞ্চল্যের চাপা স্রোত বয়েছিল বইকি। অতি-উৎসাহী যুবকেরা নাম ধাম ইত্যাদি বিবরণ সংগ্রহ করতে একটু দেরী করেনি।

অন্য সেক্সনে লোকেদের ঈর্ষা হওয়াও স্বাভাবিক। ফাইল চিঠিপত্র নিয়ে অকারণে এ সেক্সনে আসা যাওয়া করতে লাগলেন কয়েকজন লোক। দর্শনেও তৃপ্তি!

আমাদের সেক্সন ইন্‌চার্জ্জ বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমাদের বড় ঘরটার শেষে এক ফালি 'কভারড়্' বারান্দা। সেই খানে তার বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাঝের দরজা অবশ্য বন্ধ করেন নি।

যশোবন্ত সিং-এর সদম্ভ ঘোষণায় অনেকেই বিষণ্ণ বোধ করলেন। এই তিনদিনেই যশোবন্ত সিং ম্যানেজ করল কি করে?

যখন শুনল যে এই মোহব্বত্ এক পক্ষের। অপর পক্ষ এর বিন্দু বিসর্গ জানে না—তখন তারা নিশ্চিন্ত হল।

চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে যশোবন্ত সিং। প্রাণবন্ত দিলখোলা ছেলে। তাকে দেখলে কে বলবে দুবছর আগে নিজের দেশকে সে হারিয়েছে। হারিয়েছে বাবা ও এক-মাত্র বোনকে।

নতুন পরিবেশে, নতুন জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

যশোবন্ত সিংএর মোহব্বত্ তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ভেবে লোকেরা কেউ কোন গুরুত্ব দিলে না। কিন্তু যশোবন্ত সিং সত্যি 'সিরিয়াস'। জীবনের প্রথম প্রেম! ইন্‌-চার্জ্জ বানার্জ্জিকে একান্তে পেয়ে বলল সব কথা। জানাল তার মনের কামনা। এখন ও পক্ষকে কি জানান যায় সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ যশোবন্ত অভিজ্ঞ দাদার কাছে সাহায্য চায়।

বানার্জ্জি মোহব্বত্-এর মর্ম্ম বোঝেন না। কিন্তু এটুকু বোঝেন—যে মেয়েরা 'লভ' প্রেম বা মোহব্বত্ যা কিছু করুক, কিন্তু বিয়ে করার সময় 'সিকিউরিটি' চায়।

করাচীর বাস্তুহারা মেয়ে লাহোরের বাস্তুহারা একশো তিপান্ন টাকার কেরাণীর কাছে পাবে কি সেই সিকিউ-রিটি? কাজেই—যশোবন্ত সিং অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠে। বলে—তাহলে সে বাঁচবে না। রাস্তা একটা বাতলে দিতেই হবে।

অগত্যা বানার্জ্জি-দাদাকে বলতে হয়।

—ভাগ্যদোষে তুমি কেরাণী হতে পার, কিন্তু তুমি খানদানী বংশের ছেলে এটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাস্তহারা বলে তুমি সর্ব্বহারা নও। স্থাবর সম্পত্তি পাকিস্তানে পড়ে থাকলেও অস্থাবর যা কিছু নিয়ে আসতে পেরেছ তা কিছু উপেক্ষণীয় নয়।

—বহুত বহুত সুক্রিয়া দাদা। যশোবন্ত সিং যেন আশার আলো দেখতে পেল।

পরের দিন টিফিনের সময় যশোবন্ত সিং দৌড়ে এসে বানার্জ্জিকে জড়িয়ে ধরল, উচ্ছ্বাসে গলে পড়ছে।

—খা লিয়া দাদা! খা লিয়া!

অতি কষ্টে যশোবন্ত সিং-এর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করলেন—

—ব্যাপার কি?

যশোবন্ত সিং বলল হৃদয়াবেগ চেপে,—আজ একটু সকাল সকাল এসে মেয়েটির ড্রয়ারে কলাকন্দ (ক্ষীরের বরফি) ও করাচী হালুয়া রেখে দিয়েছিলাম। মেয়েটি অপিসে এসে কলম পেন্সিল বার করবার সময় খাবারের প্যাকেটটি দেখে। যশোবন্ত ভেবেছিল হয়ত মেয়েটি এই নিয়ে আপনাকে কিছু বলবে। কিন্তু না, কিছু বলল না। মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন নেই। টিফিনের সময় সকলে বেরিয়ে আসতে ড্রয়ার টেনে সেই খাবার খেয়েছে।

বানার্জ্জি হাসি চাপতে পারলেন না। হেসেই বললেন,—

—তাহলে আর ভাবনা কি? টোপ গিলেছে। চালিয়ে যাও ব্রাদার কিছুদিন ঐ ভাবে।

যশোবন্ত সিং নিত্য নতুন খাবার এনে ড্রয়ারে রাখে। আজ বরফী, কাল মটরি, ডালমুট, তারপরের দিন সন্তারা, কলা; এমনিভাবে সে রোজই খাবার রাখতে থাকে আর মেয়েটি বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে সেগুলি নির্ব্বিকারে খেয়ে নেয়।

দিন সাতেক পরে যশোবন্ত সিং জিজ্ঞাসা করে—আর কতদিন অপেক্ষা করব?

ব্যানার্জ্জি উপদেশ দেন,—

—আরো কিছুদিন চালাও না।

আরো কিছুদিন চালায় যশোবন্ত সিং। কিন্তু নিজের টিফিন খাওয়া বন্ধ করেছে। দু চার টাকা ধারও করতে হয়েছে ইতিমধ্যে।

—বলিয়ে দাদা আউর কিত্‌না দিন এনতাজার করনে হোগা? যশোবন্ত অধৈর্য্য হয়ে ওঠে।

—এই শনিবার ওকে নিয়ে যাও না কোথাও। ভাল হোটেলে দুজনে খেতে খেতে আলাপ পরিচয় কর এবার।

আরো কয়েক টাকা ধার করে যশোবন্ত সিং। অভিজাত হোটেলের চার্জ্জ অনেক। সব চেয়ে ভাল স্যুইট পরে, ম্যাচ করে পাগড়ীও বাঁধতে ভোলে না।

সূত্রপাত ভাল করেছিল যশোবন্ত সিং, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না।

সোজা মেয়েটির টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তার কোন প্রোগ্রাম আছে কি আজ?

টাইপ মেসিন থেকে চোখ তোলেনি মেয়েটি। ভ্রু দুটো শুধু একটু কুঁচকে জবাব দিয়েছিল।

—কিঁউ?

সর্দ্দার টাইটা ঠিক করতে করতে বলেছিল—এমনি তাহলে দুজনে বেরুতাম অপিসের পর।

মেয়েট কোন উত্তর দেয় নি। শুধু মুখ তুলে চেয়েছিল। দৃষ্টিতে ছিল শুধু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার আভাষ নয়। দৃষ্টিতে ছিল ইতর প্রস্তাব করার জন্য নীরব তিরস্কার।

যশোবন্ত সিং কিন্তু থামেনি সেইখানেই।

—সিনেমা যাব দুজনে। তারপর 'কোয়ালিটি'তে ডিনার—

—আমার কাছে এই প্রস্তাব করার অর্থ? নম্র মেয়েটি বেশ উত্তেজিত হয়েছে যেন—আর আপনার সঙ্গেই বা খেতে যাব কেন?

যশোবন্ত ধৈর্য রাখতে পারেনি আর—সেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—

—তা যাবে কেন? আজ সতের দিন আমার পয়সায় টিফিন খেতে পার। আর আমার সঙ্গে একত্রে খেলেই তোমার মান যাবে?

উত্তরে কিছু না বলে মেয়েটি যশোবন্ত সিংকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোমবার যশোবন্ত সিং অপিসে এল না। শনিবারের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মেয়েটি যথাসময়ে হাজির।

উপমন্ত্রী। তিনি কিছুদিন আগে রাজ্যসভায় বলেছেন, ভারত সরকার দশটি নূতন যান্ত্রিক খামার চালু করার কথা চিন্তা করছেন। প্রস্তাবিত খামারগুলোর এক একটাতে দশ হাজার একর থেকে ত্রিশ হাজার একর পর্যন্ত জমি থাকবে বলে শ্রীকৃষ্ণাপ্পা রাজ্যসভাকে জানিয়েছেন। প্রশ্ন হতে পারে, প্রস্তাবিত খামারগুলো কি ধরণের হবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সুরাটগড়ে যে যান্ত্রিক খামার গড়ে তোলা হয়েছে, সে খামারের নমুনা অনুযায়ী নূতন দশটি যান্ত্রিক খামার প্রবর্তন করা হবে। সুরাটগড় রাজস্থানের অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণাপ্পা মনে করেন, যান্ত্রিক খামার প্রবর্তিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য তিনি সরাসরি এই ধরণের মন্তব্য করেননি। তবে রাজ্যসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের মধ্যে এই মর্মে পরোক্ষ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, যান্ত্রিক খামার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করে থাকে। বিশেষজ্ঞমহলে শ্রীকৃষ্ণাপ্পার মন্তব্যের সমালোচনা করা হয়েছে। এঁদের অনেকেই শ্রীকৃষ্ণাপ্পার মন্তব্য মেনে নিতে অনিচ্ছুক। মনে হচ্ছে, এঁরা এমনি সব ছোট ছোট খামারের পক্ষপাতী, যেগুলোতে intensively চাষ আবাদ করা যেতে পারে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ জোর দিয়ে বলেছেন, যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, ভারতে যান্ত্রিক খামারের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সরকার যদি সত্যি শেষ পর্যন্ত বিরাট আকারের নূতন নূতন যান্ত্রিক খামার প্রবর্তন করেন, তাহলে সরকারের নীতিকে অবিবেচনাপ্রসূত ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না। অর্থনীতিবিদরা নাকি অবিবেচনাপ্রসূত কথাটি ব্যবহার করছেন এজন্য যে, যান্ত্রিক খামার প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হলে দেশের স্বল্প এবং সীমাবদ্ধ সম্পদের অপচয় ঘটবে। অর্থনীতিবিদদের কথা ছেড়ে দিলেও বিরাট আকারের যন্ত্রচালিত খামার গড়ে তুলে সরকার আসলে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান সেটা আমরাও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না। সরকারের তরফ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাক, এটা সকলেরই কাম্য। কিন্তু বিবেচনা করার বিষয় হচ্ছে, এইপ্রকার খামার সম্বন্ধে সরকারের নিজের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা। কেবলমাত্র সুরাটগড়ের খামারের নমুনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক খামার গড়ে তোলার নীতি সমর্থন করা চলে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুরাটগড়ের যান্ত্রিক খামারটি বিরাট আকারের। যদি এই খামারের ধাঁচে সরকার তাঁর প্রস্তাবিত দশটি খামার গড়ে তুলেন, তাহলে সে সব খামারের আয়তন ত বিরাট হতে বাধ্য। আমরা আগেই বলেছি, সুরাটগড়ের খামার গড়ে তোলার সময় রাশিয়া সাহায্য করেছেন। কিন্তু প্রস্তাবিত দশটি খামার প্রবর্তন করার সময় রাশিয়া কিম্বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা—কিম্বা পাওয়া গেলে কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে—সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যদি ভারতের কৃষিকে যন্ত্রচালিত করতে হয় তাহলে কমপক্ষে অর্দ্ধকোটি ট্র্যাক্‌টরের প্রয়োজন হবে। শুধু তাই নয়। যে সব ট্র্যাক্‌টর ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে, প্রত্যেক বছর সে সব ট্র্যাকটরের স্থলে আরো প্রায় সাত লক্ষ ট্র্যাক্‌টর কাজে লাগান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। সুতরাং এইপ্রকার একটা বিরাট দায়িত্ব ভারত যথাযথভাবে পালন করতে পারবে কিনা সেটা সবদিক থেকে বিবেচনা করে দেখা সরকারের বিরাট কর্তব্য।

আমরা লক্ষ্য করে আসছি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমবায় খামার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। কিভাবে এইপ্রকার খামারের পরিকল্পনা কার্যকরী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে জাতীয় সরকারও চিন্তা করছেন বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল শেষ-পর্যন্ত সরকার কি ধরণের সমবায় চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করবেন। যদি সরকার সমবায় খামার বল্লে বিরাট বিরাট যন্ত্রচালিত খামার বুঝে থাকেন—তাহলে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকেই ডেকে আনা হবে বলে মনে হচ্ছে। এর প্রধানতম কারণ হল এই যে, সাধারণ দরিদ্র চাষী নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। স্বাভাবিক উদ্যম বল্লে যা বুঝায়, সেটার কিছুই চাষীর ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শ্রীমন নারায়ণ-এর নামের সাথে আমাদের অনেকেরই

হয়ত পরিচয় আছে। তিনি হলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া তাঁর আরো একটা পরিচয় আছে। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। তিনি তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভিতর দিয়ে বার বার intensive farming এর উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা গৃহীত হয় যার ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির সুযোগ নিয়ে নিবিড় ভাবে চাষ আবাদ করতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। অর্থাৎ তিনি যান্ত্রিক খামারের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করতে রাজী নন। তাঁর ধারণা যেভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, তা'তে সাধারণ মানুষের দৈহিক শ্রমকে অগ্রাহ্য করে যন্ত্রের সাহায্যে বিরাট আকারের চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

যন্ত্রচালিত খামার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য চালিয়ে পাঞ্জাবের অর্থনীতি এবং সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কীয় সংস্থা মন্তব্য করেছেন, যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে দেখা গেছে প্রত্যেক একরে একশত তিয়াত্তর টাকা লগ্নী করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অথচ লাঙ্গল চালিত খামারে খরচ পড়ে একশত ছয় টাকা। অর্থাৎ সাতষট্টি টাকা কম। তাছাড়া আয়ের দিক থেকেও শেষোক্ত খামার অধিকতর লাভজনক। অবশ্য একটা কারণবশতঃ আয়ের তারতম্য ঘটে। যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই, সেখানে একর প্রতি গড়ে আয় হ'ল একশত সাতচল্লিশ দশমিক সত্তর টাকা। আবার যেখানে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে গড়ে আয় হচ্ছে দুশত সাতষট্টি দশমিক ষাট টাকা। এটা গেল লাঙ্গল-চালিত খামারের কথা। এখন যন্ত্রচালিত খামারের কথা বিবেচনা করা যাক। যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে একর প্রতি গড়ে আয় হল দুশত উনপঞ্চাশ দশমিক ছাপ্পান্ন টাকা। আর যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে আয় হচ্ছে আটানব্বই দশমিক চোদ্দ টাকা। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যে সব জমিতে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় সে সব জমিতে আয়ের পরিমাণ বেশী। আসল কথা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক খামার প্রবর্তন করার উপযুক্ত সময় আসেনি। জোর করে প্রবর্তন করতে গেলেও অন্যান্য গুরুতর সমস্যা দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া "in a democratic set-up, new ideas cannot be forced on the people as in Communist countries, The value of new practices has to be demonstrated and the villagers will accept only those new ideas which appeal to them and satisfy their needs.

বিদায় প্রহর

বন্দে আলী মিয়া

এবারে আমার শেষ হয়ে এলো
প্রবাসের দিনগুলি
যাবার বেলায় বারে বারে হায়
মন ওঠে তবু দুলি।
কেটেছে হেথায় কয়টি বছর
সুখে দুখে বেদনায়
স্মরণ ভরিয়া রহিলো সে সব
ভুলিব না কভু তায়।
ছিলো নাকো কেহ আপনার জন
দেয়নি আদর—করেনি যতন,
জনতার মাঝে ছিলাম হেথায়
একটি নীরব কোণে—
বিদায়ের দিনে চলে যাবো আমি
একেলা সংগোপনে।

অনাহূত হয়ে ছিলাম হেথায়
আপনার কাজ লয়ে
কেটেছে প্রহর বন্ধু জনের
শত অবিচার সয়ে—
দশটি বছর রহিলাম হেথা
ধূসর হইল কেশ
বালু লয়ে খেলা জীবন বেলায়
এতদিনে হলো শেষ।
ভুলে আর ভুলে কেটে গেল দিন
সবাকার কাছে হলো শুধু ঋণ
কোনো দিন আর ফিরিব না কিনা
বলিতে পারিনা আজ—
মোর প্রয়োজন নাহিকো হেথায়
ফুরায়ে গিয়েছে কাজ।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বদিন বেনারস হতে কলকাতায় ফিরে সেই যে উপরের কোয়াটারে উঠে শয্যা নিয়েছিলাম, তারপর আজ সকাল আটটা পর্য্যন্ত একনাগাড়ে বিশ্রাম নিয়েছি। আবার নীচের আফিসে নেমে সেই পূর্ব্বের ন্যায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনির চিন্তা পর্য্যন্ত করতে যেন কষ্ট হয়। বিদেশে গিয়ে তদন্তের মধ্যে খাটাখাটুনি থাকলেও সেখানে আমাদের স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে যে কতো বেশী তফাৎ, তা এখানকার এই অপরের তত্ত্বাবধানাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে এসে আমরা সম্যকরূপে বুঝতে পারছিলাম।

এখন এই কয়দিন কাশীধামে গিয়ে আমরা এই মামলার তদন্তে কতটা সুরাহা করে এলাম তার একটা জবাবদিহী আমাদের বিভাগীয় বড়সাহেবের কাছে করতে হবে। তাই এইবার তাড়াতাড়ি—এই সম্পর্কে একটী স্মারক লিপি লিখবার জন্য নীচের অফিস ঘরে নেমে এলাম। ঠিক এই সময়েতেই আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম যে আমার অতি-আদরের বেচারাম ওরফে বিচকে-বাবু আমাদের অফিস ঘরে ঢুকছে।

আরে ভাই বেচারাম, আমি বিচকেকে সমুখে দেখে বিপুল আগ্রহে বলে উঠলাম, শুনলাম তুমি নাকি এর মধ্যে বার দুই তিন আমাদের জন্য খোঁজ খবর করে গিয়েছ। তা' ওখানকার কোনও একটা ভালো খবর আছে না কি? ঐ দুইটী বাড়ীর আর কোনও রহস্য তুমি ভেদ করতে পেরেছো নাকি?

হ্যাঁ স্যার! ওখানকার অনেক নূতন খবর আমি সংগ্রহ করেছি। ওখানে এমন অনেক অদ্ভুত বিষয় আমি দেখেছি ও শুনেছি, যার মূল হেতু আমি বুঝেও উঠতে পারছি না; আমাদের অতি আদরের বেচারাম আমার সম্মুখে এসে আগ্রহ করে চারিদিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিম্নস্বরে বললো, ওখানকার ঐ দুটো বাড়ীই যেন রূপকথার যাদুমন্ত্র-করা বাড়ী, বাবু! কিন্তু তবু ওদের কোনও ক্ষতি করতে আর আমার মন চায় না। এই দুই বাড়ীর দুই গিন্নীই আমাকে তাদের ছেলের মত যত্ন করে। তাই—

আমাদের এই বিশ্বস্ত ইনফরমার বা সংবাদবাহী চরের মুখের এই রকম একটা মানবীয় করুণ সংবাদ শুনে আমি প্রমাদ গণলাম। এইরূপ একটা আশঙ্কা ইতিপূর্ব্বে আমার মনের মধ্যে না জেগেছিল তা'ও নয়। মা, মাসী ও বোনের স্নেহের কাঙাল এ পরাশ্রয়ী ও পরভোজী বেচারামের পক্ষে এদের মাতৃসুলভ আদর আপ্যায়িতের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে আমাদের ভুলে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এ ছাড়া এই কয়দিন আমার প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকার ফলে বেচারাম ওদের আয়ত্ত্বাধীন হয়ে উঠেছিল আর কি? আমি অতি সাবধানে তাকে নানা বাক্যে ভুলিয়ে প্রথমে তাকে প্রকৃতিস্থ করে নিলাম। এই ভাবে অনেক আয়াস স্বীকার করে আমি তার কাছ হতে ঐ বাড়ী দুটীতে তার এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় একটি মনোহর বিবৃতি আদায় করতে পেরেছিলাম। আমাদের বালক ইনফরমার বেচারামের দীর্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"এদের সম্বন্ধে আপনাদের অনুমানে একটু মাত্রও ভুল নেই, স্যার। সত্য সত্যই এই বাড়ীর ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী এবং ওধারের বাড়ীর তাঁর বান্ধবী জমিদার-গিন্নীর মধ্যে যে কতো ভাব তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। এরা দুজনাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রমীলা দেবীর

বাড়ীর দ্বিতলে এসে গল্পগুজব ক'রে থাকেন। প্রমীলা দেবীও মধ্যে মধ্যে উভয় বাড়ীর পাঁচিলের মধ্যকার দরজা দিয়ে জমিদার বাড়ীতে এসেছেন। এই সময় এঁদের সেই গোঁফওয়ালা ম্যানেজারও এঁদের সঙ্গে এসে কি সব সলা-পরামর্শ করতো। তবে যে দিন আপনারা কাশী রওনা হয়ে যান সেই দিন থেকে তিনিও আর এদিকে আসেন নি। হাঁ আসল কথাই আমি আপনাকে স্যার বলতে ভুলে যাচ্ছি। আপনাদের কাশী যাবার আগের দিন দুটো —বিশ্বাসের বাইরে চমকপ্রদ অদ্ভুত—না দুটো কেন সেখানে তিনটে অদ্ভুত ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি। এই দিন এদের জমীদারীর সেই মোচওয়ালা হন্তদন্ত হ'য়ে এঁদের দুই বান্ধবীর সম্মুখে এসে হাজির হলেন। তার ঝুলে-পড়া গোঁফ দুটো আরও ঝুলে পড়েছে। এমন কি তাঁর পাঞ্জাবীর স্থানে স্থানে কে যেন ছিঁড়ে দিয়েছে। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাঁর জামার পকেট থেকে একটা হাতের লেখা চিঠি বার করে জমিদার-গৃহিণীর হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলে উঠলেন, এই নাও বৌ-দিদিমণি! এইটের জন্যে আর একটু হলে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম! এঁর এনাকেও আমি ঠিক জায়গায় এনে রেখেছি। প্রয়োজন হয়তো এখানেই সব শেষ করে দেবো, আসুন। এঁর এই হেয়ালীপূর্ণ সমাচার শেষ হওয়া মাত্র এপাড়ার ভদ্রমহিলা ওপাড়ার জমিদার গিন্নীর হাত হতে সেই চিঠিখানা তুলে নিয়ে তার বুকের ব্লাউসের তলা থেকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ বার করে তার মধ্যে সেটা গুঁজে রাখলেন। এরপর খুব খুশী হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই থেকে দুখানা হাজার টাকার নোট বার করে সেই গুঁফো ম্যানেজারের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনাকে আর কি ব'লে ধন্যবাদ জানাবো বলুন। আপনি আমার মৃত্যুবাণটাই খুঁজে পেতে এনে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই চিঠিখানার জোরেই যতো না ওর ভিরকুটী হয়েছিল। বাবা! এই সব বিষয় চিন্তা করবো না, আমার ওঁকে চিকিৎসা করাবো। এখন বাকী আর দুটো কাজ যদি এমনিভাবে করতে পারেন তো পুরো আর তিন [illegible] মুদ্রা আপনার জন্যে তোলা আছে। এই সময় আমি [illegible] পেয়ালা সমেত ট্রে হস্তেই ঘর থেকে এনে দর[illegible] পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। এই জন্য এইটুকুই মাত্র আমি দেখতে ও শুনতে পেয়েছিলাম। এরপর আমি ঘরে ঢোকা মাত্র ও বাড়ী থেকে একজন নার্স দৌড়ে এসে বলে গেলেন—চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায় এসে গেছেন। মায়েরা, এই সংবাদ শুনা মাত্র আমাকেও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলে এই উভয় মহিলা তাড়াতাড়ি ও বাড়ীর সেই আহত রোগীর ঘরের পাশের ঘরে ভেজানো দুয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু যতক্ষণ ডক্টর সুরজিত রায় ও নার্সরা ঐ আহত ছেলেটির ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁরা মধ্যে মধ্যে দর[illegible]ার ফাঁকে চোখ রাখলেও নিজেদের দেহগুলো খুবই সাবধানে দরজার এপারে গোপন করে রাখছিলেন। অন্য কোনও ডাক্তার এই রোগীর ঘরে এলে কিন্তু তাঁরা দুজনাই তাঁদের আশে পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। কিন্তু যতক্ষণ এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায় ওখানে ছিলেন, তাঁরা মুখ থেকে জোরে শব্দ পর্যান্ত নির্গত করছিলেন না। আমি অবশ্য এই সময় ফাইফরমাজ খাটবার জন্যে এই রোগীর ঘরেই নার্সদের সঙ্গে হাজির ছিলাম। এদিকে যথারীতি এদিককার রাস্তার জানালাগুলো বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে আমাদের পাড়ার চেনাজানা কাউর পক্ষে আমাকেও দেখতে পাবার নয়। এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায় এই রোগীর চোখ দুটোর দুটো মোমের ছাঁচ নিয়ে চলে গেলেন। তবে আমার হাত দিয়েই এই ভদ্র-মহিলা প্রমীলা দেবী তাঁকে ছয়খানা দশ টাকার ও এক-টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন। ওখানকার নার্সদের কথাবার্তা হতে আমি বুঝলাম যে এই চোখের মোমের ছাঁচ হতে আমেরিকা থেকে এর জন্যে দুটো কাঁচের চোখ তৈরী হয়ে আসবে। এই চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার সুরজিত রায়কে বিদায় দিয়ে আমি ওনাদের বসবার ঘরে এসে দেখি, আমাদের সেই প্রমীলা দেবী হাপুস নয়নে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লেগেছেন। এদিকে তাই দেখে আমাদের এ বাড়ীর জমিদার-গিন্নী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে-ছিলেন, আরে এখন কেঁদে কি আর হবে ভাই। এছাড়া কি অন্য কোনও উপায় ছিল—যা ভুল হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন সারা জীবন ধরে ওকে সেবা করে কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর। এরপর হঠাৎ আমার দিকে তেনাদের নজর পড়া মাত্র আমার মনিবীনি আমাকে

ডেকে বললেন 'তুই তো এখনও কিছু খেলি না। যা ঠাকুরের কাছ হতে চা আর পাউরুটী নিয়ে খেয়ে আয়। এই দুইটী ঘটনা ছাড়া আমি তৃতীয় একটি অদ্ভুত ঘটনাও আমার নজরে এসেছিল। একদিন ঐ রোগীর ঘরে কয়েকটি ঔষধ এ বাড়ী থেকে পৌছিয়ে দিতে গিয়ে আমি দেখি যে—ও বাড়ীর ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী কয়েকটী পুরানো পত্র পড়ে পড়ে দেখে সেগুলো আবার তুলে রাখছিলেন। হঠাৎ দেখি এই সবের মধ্য হতে একখানি চিঠি বার করে তিনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। আমার সন্দেহ হওয়ায় পরে ঐ টুকরোগুলো কুড়িয়ে আমি পকেটে রেখে দিই! এই নিন আমার কুড়ানো সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো। ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের আনা সেই চিঠিখানা ওঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আমি চুরি করে আনতে পারি। কিন্তু না না না! আর কোনও ক্ষতি ওঁদের আমি করতে পারবো না। ওঁরা যে আমাকে এতদিন মায়ের মতই যত্ন আত্তি করেছেন। ওদের চাকুরী এবার ছেড়ে দিয়ে আমি পিসেমশাইএর বাড়ীতে ফিরে যাবো। ওখানবার মাইনে থেকে ওদের যা কিছু দেনাটেনা ও পিসতুত ভাইদের স্কুলের বাকী মাইনে আমি শোধ করে দিয়েছি। এখন আবার ওঁদের বাজার হাট আমি পূর্ব্বের মত করে দিতে চাই। যে কদিন বুড়ো পিসেমশাই ও বুড়ী পিসিমা বেঁচে আছেন, সে কদিন আর আমি তেনাদের ছেড়ে অন্য কোথায় যাবো না।"

'সে কি ভাই বেচারাম। তুমি এসব কি আবার বলছো' আমি একটু এইবার সন্ত্রস্থ হয়ে উঠে বেচারামকে বললাম, আজ যদি তোমার বাবার কাছ হতে তোমার ডাক আসে? তাহলেও কি তুমি এঁদের ছেড়ে তাঁর কাছে যাবে না। তোমার মা তোমাকে ছেড়ে বহুদিন হলো গত হয়েছেন। কিন্তু তোমার বাবা ভাই এখনও বোধ হয় বেঁচে আছেন। কিন্তু এখুনি তাঁকে খুঁজে বার করতে না পারলে তিনি প্রাণ হারাবেন। আমার বিশ্বাস ওখানকার ঐ দুজনা ডাকিনীরই হুকুমে তাকে কোথায় গুম করে রাখা হয়েছে। যে চিঠিখানা ঐ মোচওয়ালা ম্যানেজার ঐ ভদ্রমহিলাদের হাতে তুলে দিয়েছেন সে'টা ঐ লোকটা তোমার বাবার হাত হতেই ছিনিয়ে এনেছিল। আরও তুমি ভাই শুনে রাখো যে তোমার বাবা কলকাতায় তোমাকে খুঁজতে এসেই এই বিপদে পড়ে গিয়েছেন। এখন তোমার বাবাকে ওরা কোথায় রেখেছে, তাও আমি তোমায় বলে দেবো। আমাকে এখন সেই বিরাট বাড়ীতে ঘুরে এদের সেই গুপ্ত স্থান খুঁজে বার করতে হবে।

এ্যা! বাবু বাবু! একি আপনি বলছেন, আমার পা'দুটো ধরে মাটিতে বসে পড়ে বেচারাম বললো, 'তাহলে বাবু ওরা জননীর রূপধরা ডাইনি। বাবু বাবু। আমি আবার ওদের বন্ধু সেজে ওখান থেকে সেই চিঠিখানা আমি নিশ্চয় চুরি করে আপনাকে এনে দেবো। আমার বাবাকে যারা খুন করবে তাদের টুঁটি আমি কামড়ে ছিঁড়ে নেবো।

আমাদের বেচারামকে আবার নূতন করে তাতিয়ে দিয়ে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য এইরূপ একটা অনুমানসূচক বারতা তাকে জানানো ভিন্ন আমাদের অন্য আর কোনও উপায় ছিল না। তবে হাওড়া হতে গুম্ করা ভদ্রলোকটি একই সঙ্গে আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা এবং আমাদের এই হতভাগা বেচারামের পলাতক জন্মদাতা পিতা হওয়াও অসম্ভব ছিল না। অবশ্য নিশ্চিতরূপে এইরূপ এক ধারণায় উপনীত হওয়ার মত সাক্ষ্যপ্রমাণ তখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের এইরূপ এক ধারণা সত্যও হতে পারে—আবার তা মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, এই বারতা আমাদের বেচারামকে হিংস্র ও ক্রুর ও প্রতিশোধপরায়ণ করে তো তুলেছে। এইরূপ এক মানসিক পরীক্ষা এই সরলমতি বালকের উপর প্রয়োগ করতে লজ্জা অনুভব করলেও আমরা এই মামলার প্রয়োজনে এই বিষয়ে তখন নিরুপায়ও বটে।

এই তো তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্রের মত তুমি কথা বলছো, আমি বেচারামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, এখন তোমার আনা ছেঁড়া চিঠির টুকরো দুটো আমরা পড়ে দেখি। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার বাপকে ওরা যেখানে আটকে রেখেছে সেই জায়গাটার সন্ধান আমরা ঐ গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের আনা চিঠিখানার মধ্যে পাবোই। তোমাকে এখন প্রমীলা দেবীর ভ্যানেটী ব্যাগ শুদ্ধ ঐ পত্রখানা এখুনি আমাকে এনে দিতে হবে। এই বিষয়ে

খুব বেশী দেরী হয়ে গেলে তোমার বাবাকে আমরা জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে বোধ হয় পারবো না।

আমি বেচারামকে যথা-উপদেশসহ বিদায় দেবার পূর্ব্বে কোনও একটী বিশেষ কারণে কয়টী প্রয়োজনীয় প্রশ্নও করে নিয়েছিলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি এক্ষণে নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা, ভাই বেচারাম। আমি এখন একটা বড়ো প্রশ্ন তোমাকে করবো। প্রমীলা দেবীর ঐ ভ্যানিটী ব্যাগটা তুমি ঠিক কোথায় পেয়েছিলে? আরও একটা বিষয় তোমাকে মনে করে বলতে হবে ভাই। আগে আগে তো তোমরা অনেকেই এই প্রমীলা দেবীকে ঘটা করে সাজগোজ করতে দেখেছিলে। কিন্তু ঐ যুবকটী চক্ষু-হীন হওয়ার পর কি তুমি আগের মত ঐ মহিলাটীকে আর সদাসর্ব্বদা সেজেগুজে থাকতে দেখেছো। তোমার এই উক্তির ওপর আমাদের এই অদ্ভুত মামলার তদন্তের ভবিষ্যৎ ও পন্থা নির্ভর করছে।

উঃ—আজ্ঞে ঐ সময় চক্ষুবিদ ডাক্তার আসছেন শুনে তাড়াতাড়িতে ঐ ভ্যানেটী ব্যাগটা রোগীর ঘরের আলমারীর উপর ফেলে রেখেই তিনি পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। আজ্ঞে, হাঁ হাঁ, এ কথা তো ঠিকই। এই যুবকটী চক্ষুহীন হওয়ার পর থেকে আমি আর একদিনও প্রমীলা দেবীকে কখনও সাজগোজ করতে দেখিনি। এদানী ইনি সাদা-সিদে ভাবে ঘুরা ফিরা করে থাকেন। আমার মনে হয়, ঐ আহত যুবকটীর এই দশার পর থেকে উনি কেমন যেন মর্ম-মরা হয়ে গিয়েছেন—

আমাদের এই বেচারামের রহস্য সিরিজ ও ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে পড়ে তার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা জেঁকে বসেছিল। যে কোনও কারণেই হোক তার বিশ্বাস হয়েছিল, যে পুলিশের লোকেরা এমন সব বিষয় জানতে পারে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব। এর পর আমাদের এই বেচারাম আর একটু মাত্রও দেরী না করে আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় সেই চিঠি ও ভ্যানেটী ব্যাগ চুরী করে আনবার জন্যে তার মনিবীনীর বাড়ীর দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। এখন বেচারাম আর পূর্ব্বের বেচারাম নেই। তার মধ্যে আদিম হিংস্রপ্রবৃত্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমরা উপযুক্ত বাক্ প্রয়োগ বা সাজেসনের সাহায্যে তার মনের দুর্ব্বলতম স্থানে বারে বারে আঘাত হেনে তাকে পুরাপুরি একজন অপরাধীর পর্য্যায়ে অবনত করে দিয়েছি।

আমি বেচারাম ওরফে বিচকে বাবুর নিষ্ক্রামন পথের দিকে চাওয়া মাত্র আমার মনের মধ্যে একটা ভুলে যাওয়া পুরাণো গানের ক'টী কলি মনে পড়ে গেল। এই নাম-করা গানটী হঠাৎ যেন বিকৃত হয়ে মনের উপর উপচে পড়লো—ওরে! ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে তার বাবারে। তার বাবা খুঁজে ফেরে তার ছেলেরে। ছেলেদের ছড়াতে রূপান্তরিত হয়ে আমার এই অদ্ভুত কলি দুটী মনে উদয় হওয়া মাত্র আপন মনে হেসে ফেলে আমি মুখ ফেরাতেই দেখলাম যে টেবিলের উপর রাখা চিঠির ছেঁড়া টুকরো থেকে দুটো টুকরো উড়ে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। আমি হাঁ হাঁ করে উঠে তাড়াতাড়ি বাকী টুকরোগুলো পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া মাত্র আমাদের সহকারী সুরেনবাবু উড়ে যাওয়া টুকরো দুটো তুলে এনে দিলেন। এর পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে পাখা বন্ধ করে একটা বড়ো সাদা কাগজ টেবিলের ওপর মেলে দিলাম। তার পর এক শিশি গঁদের আটা নিয়ে তার সাহায্যে ঐ ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো তাদের যথাযথ স্থানে সেঁটে—ঐ চিঠির পাঠোদ্ধার করতে আমরা সচেষ্ট হলাম।

বলা বাহুল্য যে এই পত্রটির প্রত্যেকটী অংশ আমাদের বালক ইনফরমার বেচারাম আমাদের এনে দিতে পারেনি। এই সব টুকরোর বহু অংশের অভাবে বাকি অংশগুলির সাহায্যে এই পত্রের মোটামুটী সার মর্ম্ম আমাদের ধারণা করে নিতে হয়েছিল। এই পত্রের উপরের অংশটুকু হতে আমরা জানতে পারলাম যে উহা মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে কাশীপুর রাজবাটী হতে পাঠানো হয়েছে। এ পত্রে তল-দেশের একটী অংশে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল—'ইতি তোমার বান্ধ' বেশ বুঝা যায় যে উহার পরবর্ত্তী অংশে প্রমীলা দেবীর বান্ধবী জমিদার গৃহিণীর নামটী দস্তখত করা ছিল। এর কারণ এই পত্রের উপরের টুকরার বামদিকে লেখা ছিল 'ভাই প্রমীলা'। এর এই পত্রের মধ্যকার টুকরা-গুলির প্রাপ্ত অংশ কয়টী একত্র করে আমরা নিম্নোক্তরূপ একটা সমাচার অবগত হতে পারি।

"খুব বেশী দেরী করলে ওরও একদিন ঠাকুরপোর মনের মত মন হবে। আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান বয়স্ সাজ-

গোঁজ দিয়ে কতদিন আর ঢেকে রাখা যাবে। ওদের বুড়ো হতে ভাই এখন অনেক দেরী—তাতে ওরা হচ্ছে আবার যাকে বলে পুরুষ। আর কয়েক বছর পরে ওর কি আর তোকে ভালো লাগবে। এর আগেও না একবার কে তোর বয়সের জন্য তোকে অপছন্দ করে গেছে। আচ্ছা! আমি কলকাতায় গিয়ে এবার তোকে একটা ভালো পরামর্শ দেবো। তবে আমাদের সেই কাযটী ভালো করে করাতে হলে একটা সাহসী লোকেরও প্রয়োজন আছে। তবে এ কথা ঠিক যে তোর নিজের দ্বারা সে কায কখনও করা যাবে না।"

এই পত্রের এইটুকুই মাত্র পরিষ্কারভাবে আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারি। এর পরের কয়েকটী টুকরোর আধ আধ টুকরোগুলো ছোট শিশুর আধ আধ কথার মতই কোনও অর্থ বহন করে না। আমরা বহু চেষ্টা করেও পত্রের পরবর্ত্তী অংশগুলি হতে কোনও সঠিক অর্থ বার করতে পারি নি।

এই ভাবে এই ছিন্ন ভিন্ন পত্রটীর যথা সম্ভব পাঠোদ্ধারের পর আমার সব কয়জন সহকারী আমারই মত ঝুঁকে পড়ে এই পত্রটীর প্রাপ্ত অংশটুকু বারে বারে পড়ে নিচ্ছিল। এই পত্রের সারমর্ম্ম অনুধাবণ করা মাত্র আমাদের সর্ব্ব-শরীর ঘৃণায় ও ক্রোধে শিউরে শিউরে উঠছিল। একবার আমাদের মনে হয় এই অদ্ভুদ মামলার যবনিকা বেশ ভালো ভাবে উপরে উঠে গিয়েছে, আবার পরক্ষণেই আমাদের মনে হয় যে এটা এই পত্রের কয়েকটী নির্দ্দোষ ছত্র হওয়াও হয়তো অসম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে যা কিছু সামনে পাওয়া যায় তাকেই আমাদের মনগড়া থিওরীতে ফিট্ ইন্ করবার চেষ্টা করাও তো এই এক প্রকারের একটী অপরাধ। এই পত্রের সারমর্ম্ম সম্বন্ধে এই পত্রের প্রেরক ও প্রাপকের কৈফিয়ৎ নেওয়ার আগে আমাদের পক্ষে কোনও একটী স্থির সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় উচিৎ হচ্ছে না। কিন্তু ঐ অদ্ভুদ ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী তার অতোগুলো পত্রের মধ্য হতে বেচে বেচে মাত্র এই পত্রটীই এতো তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললে কেন?

আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম, স্যার! আমার সহকারী কনকবাবু এইবার অনুযোগ করে আমাকে বললে, ওদের সব কটী বাড়ীই লণ্ড ভণ্ড করে তন্ন তন্ন ভাবে খানা তল্লাসী করে ফেলুন। এই দেখুন এই অতি-প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যটী আর একটু হলেই আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন আর দেরী না করে ওদের বাড়ীগুলো ঘেরোয়া করে তল্লাসী করতে সুরু করে দিই, আসুন। বড়সাহেব এই দেরীর জন্যে এখনও কৈফিয়ৎ চাননি এই যথেষ্ট।

হুঁ! তুমি যা বলছো সে কথাও অবশ্য ঠিক। কিন্তু তাতে কি খুব বেশী লাভ হতো? আমি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সহকারীকে বললাম, আগেই ওদের বাড়ী তল্লাস করে লাভ হতো কি না হতো তা বলা বড়ো শক্ত। এই তো দেখলে যে ঐ মহিলাটির এমনেতেই প্রামান্য দ্রব্য বিনষ্ট করে ফেলার একটা পাকাপোক্ত অভ্যাস আছে। আমরা এর মধ্যে ওদের বাড়ী ঘেরাও করা মাত্র এই পত্রখানি আরো ভালো ভাবেই তিনি বিনষ্ট করতেন। আমরা এর একটু পরে ওদের বাড়ী ঢুকে দেখতাম যে মেঝের উপর একটা পোড়া দেশলাই এর কাঠি ও কয়েকটুকুর পোড়া কাগজের ছাই শুধু আমরা দেখতে পেতাম। তোমরা ভুলে যেও না যে ঐমহিলাটীমহিলা হলেও শহরের একটা নাম-করা প্রতিষ্ঠান ও চালিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া আমাদের এই অদ্ভুদ মামলার তদন্তের প্রথম দিনেই যদি আমরা ঐ বাড়ী দুটো তল্লাস করতাম তাহলে কি ঐ মোচওয়ালা ম্যানে-রবাবু এমনি করে ঐ শেষের পত্রটী প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবী জমিদার গৃহিণীর হাতে তুলে দিতেন। এই জন্যেই না আমার পুলিশি গুরু রায়বাহাদুর অমুক মুখার্জ্জি আমাদের বলতেন 'বদমায়েসদের কায়দায় ফেলতে হলে তাকে কিছুদিন ধরে ভালো করেই বাড়তে দিতে হবে। প্রথম দিকে তাদের অপরাধের পথের প্রতিবন্ধক হওয়া মানে তাদের সুরুতেই সাবধান করে বাঁচিয়ে দেওয়া। এতে অপরাধ নিরোধ হলেও অপরাধ নির্ণয় হবে না। আমারও ভাই হচ্ছে গুরুদেবর মত সেই একটি মত। এদের সাক্ষ্য প্রমাণের প্যাচে ফেলতে হলে এদের আরও একটু এগিয়ে যেতে দিতে হবে। প্রথম প্রথম ওরা সাক্ষী প্রমাণ এড়িয়ে সাবধানে অপরাধ করে। কিন্তু বিনা বাঁধায় সাফল্যের ও জন্য এদের বুক এমনি ব'লে যায় যে পরবর্ত্তী কালে তারা সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা না ভেবেই কাজ করে

যায়। এই জন্যই না আমি বেচারামকে বলেছিলাম। ভাই ওদের বাড়ীতে থাকবার সময় সব সময়ই চোখ ও কান খুলে রেখো। কোনও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা দেখা মাত্র সেই সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করতে যেন ভুলো না? কিন্তু আমাদের উপরকার তদারকী অফিসাররা কি তোমাদের মতই এতো গুহ্য কথা যে বুঝতেই চান না। পাছে বড়ো সাহেব আমাদের ডাইরী পড়ে ঐ মহিলা ধীয়র বাড়ীগুলো আগে ভাগে তল্লাস করতে হুকুম দিয়ে বলেন, এই জন্যে আমি আমরা ডাইরীতে ঐ মহিলাদেরও যে এই অদ্ভুত মামলার তদন্তে বারে বারে শন্দেহ করি যে কথা ঘুণাক্ষরেও আমাদের স্বারকলিপি বা ডাইরীর পাতার কোনও স্থানেই উল্লেখ করিনি।

তা কি জানি স্যার, কোনটে সত্যি, আর কোনটা মিথ্যে, আমার দীর্ঘ উপদেশ মুলত বক্তৃতাটি মধ্য পথে থামবে আমার অপর সহকারী সুবোধবাবু বললেন, এদিকে হয়তো বা এই অপকার্য্য ঐ পাড়ারই কোনও বখাটে ছোকরা ঘরে বসে বেমালুম আত্মগোপন করে আছে। কিংবা এমনও হোতে পারে যে এটী কোনও একটা বাহিরে পুরানো দিন তাই চোরেরই কায। আমাদের বেতনভুক্ত কয়েকজন পেশাদার ইন্‌ফরমারকে এই অপরাধ নির্ণয়ের কাযে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন দেখা যায় তারা আবার কোনও আড্ডাস্থান হতে কোন এক বারতা নিয়ে আসে। যদি তাতে দেওয়া সংবাদ অনুযায়ী কোনও বায়াল গ্রাহকের বাড়ী তল্লাস করে ঐ মহিলাটি সেই অপহৃত ভ্যানিটীব্যাগ ও কয়েক ফাইল ভিবোলের শিশি বেরিয়ে পড়ে তাহলে তো ঐ নির্দোষ মহিলাদের অহেতুক-ভাবে সন্দেহ করার জন্যে আমাদের আপশোষের তো আর সীমা থাকবে না।

আমার সহকারীর মতন আমরাও এই একই বিষয় সন্দেহ মধ্যে মধ্যে আমার মনে যে না আসত তা'ও নয়। এই সব বিষয় চিন্তা করতে করতে আমি মধ্যে মধ্যে চমকেও উঠতাম। কিন্তু আমার পুলিশি ইনিস্টিটিউট্ আমাকে অভয় দিয়ে তখুনি বলে উঠেছে 'না না। তা হতেই পারে না, আমি ঠিক পথেই তদন্ত করছি। তবুও আমি আমার এই সহকারীর ন্যায় এই একই খাতে চিন্তা করে কয়েকজন পেশাদারী পুরানো চোর ইনফরমারকে ডেকে ওখানকার পুরানো পাপী ছিল তাইদের মধ্যে যে এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করতে না বলেছিলাম তাও নয়। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত এই রূপ এক ঘটনা ওদের কাউর দ্বারা ওখানে সমাধা হয়েছে বলে কোনও সংবাদই তো এযাবৎ তাদের কেউই এখানে সংগ্রহ করে আনতে পারলে না।

'এখনও যে আরও একটা রহস্যের মীমাংসা করা আমাদের বাকী রয়ে গেল, স্যার! আমাদের বেচারামের দেওয়া একটা প্রায় অদ্ভুত সংবাদটী আপনি মন দিয়ে শুনেছেন কি? আমার এক সহযোগী আমাকে উদ্দেশ্য করে এইবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা ওদের ঐ গোঁফ-ওয়ালা ম্যানেজার এবং আরও অন্যান্য সূত্রে তো শুনেছিলাম যে কাশীপুর ষ্টেটের ছোট তরফ চক্ষুবিশারদ ডাঃ সুরজিত রায়ের সঙ্গে ওদের ঐ বড় তরফের বাবুদের সম্পর্ক হচ্ছে যাকে বলে একেবারে অহি-নকুলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সেই দুষমণটীকেই এঁদের দলের একজন এই বিনষ্ট চক্ষু ছেলেটীর চিকিৎসার জন্য ডেকে এনেছিল কেন? তাহলে কি বুঝতে হবে যে এসব এদের আপোষের ঝগড়া, না বড়তরফকে না জানিয়েই প্রমীলা দেবী এঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। কিন্তু এদিকে বেচারামের কথা সত্যি হলে তো কাশীপুরের বড় তরফের বড় গিন্নি নিজেই তাঁর বান্ধবী প্রমীলা বেবীর সঙ্গে এই চিকিৎসার সময় রোগীর পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। তাহলে এঁদের দুজনারই কাশীপুরের বড় তরফের কর্ত্তাদের অগোচরে তাদের এই জ্ঞাতি শত্রুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে না'কি!

আমিও যে এই সব বিষয় ভাবিনি তা'ও নয়, হে! আমি আমার সহকারীদের আশ্বস্ত করে উত্তর করলাম, এই জন্যেই আমার বোধ হচ্ছে ওঁরা দুজনে পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে ঐ সময় লুকিয়ে বসেছিল। খুউব সম্ভবতঃ ডাঃ সুরজিত রায়ের জানা নেই যে প্রমীলা দেবী স্বয়ং এই বাড়ীতে থাকেন। এই বিষয় ঘুণাক্ষরে টের পেলে নিশ্চয় এঁদের এই আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। এ'ছাড়া সুরজিত রায়কে এখানে ধোঁকা দিয়ে 'কল্' দেওয়া ভিন্ন এঁদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। এর কারণ এই যে কলকাতায় এখন ইনিই কৃত্রিম চোখ বসানোর বিষয়ে এক-

মাত্র বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট। আমাদের প্রমীলা দেবী বোধ হয় এইবার হৃত চক্ষু যুবকটীর চোখে কাঁচের চোখ বসিয়ে তাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলবেন আর কি!

আমরা এই সময় থানার আফিসে বসে এইরূপ বহু সম্ভব্য ও অসম্ভাব্য বিষয়ে আলোচনা করছিলাম; এমন সময় চোখ মুখ লাল করে হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের বেচারাম ওরফে বিচকে বাবু থানায় এসে উপস্থিত হলো, এর পর সে ঠক্ ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ধপাস করে সামনের একখানা চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমরা সকলে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে ভাবলাম আরে! এ আবার কি? বেচারাম তখনও দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুগরে ডুগরে কাঁদছিল।

'আমি-ই আমি-ই চো-ওর আমি চোওর আমি তাহলে চোর'—আমি তার হাত দুটো তার মুখ হতে সস্নেহে সরিয়ে দেওয়া মাত্র বেচারাম অঝোরে কেঁদে উঠে বলে উঠলো, 'স্যার! আমার বাবা, পিসিমা ও পিসেমশাই আর পাড়ার লোক তো একদিন জানতে পারবে আমি চোর। এর পর স্যার আমার মরে যাওয়াই ভালো। আজকে একটু আগে সুরজিত ডাক্তার এসে ওদের ঐ রোগীর চোখে কাঁচের চোখ বসিয়ে গেল। এই গোলমালে ও ছুটাছুটীর সুযোগে আমি ওদের ঐ বেঁটে আলমারীর মাথা হতে টপ করে প্রমীলা মায়ের ভ্যানিটী ব্যাগটা তুলে নিয়ে এখানে চলে এসেছি। কিন্তু স্যার এই তো চুরি। এর চেয়ে ডাকাতি করাও যে ভালো ছিল।

এঁ্যা বলো কি তুমি? কৈ কৈ, কৈ সে ভ্যানিটী ব্যাগ; আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠে বেচারামের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে উঠলাম, 'ওর ঐ ভ্যানিটী ব্যাগটা কোথায় তুমি এনেছো। কৈ ওটা তাহলে আমাদের দাও। এতে তুমি অন্য সব চোরেদের মত চোর হতে যেতে কেন? এটাকে আমরা চুরি না বলে গোয়েন্দাগিরি বলে থাকি। য়ুরোপ হলে প্রাইভেট গোয়েন্দা বুরোতে তোমার একটা বড়ো চাকুরী হয়ে যেতো। এখন কৈ দাও আমাদের সেই ভ্যানিটী ব্যাগটা।

আমাদের সমবেত চেষ্টায় বোঝাবার গুণে বেচারাম বোধ হয় তার মনের শান্তি পুনরায় ফিরে পেয়েছিল। সে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো আমাদের এই সব সান্ত্বনার বাণীর মধ্যে সত্যই কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে তার কাপড়ের তলা দিয়ে তার গেঞ্জীর মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে আমাদের বিমুগ্ধ করে তার চুরি করে আনা প্রমীলা দেবীর সেই ব্যাগটা বার করে সেটা আমার হাতে তুলে দিলে। আমি আর একটু দেরী না করে দুরু দুরু বক্ষে তাড়াতাড়ি সেই ব্যাগটী খুলে তার ভিতরকার দ্রব্যাদি পরীক্ষা করতে সুরু করে দিলাম। আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে গোঁফওয়ালা ম্যানেজার কর্ত্তৃক ডাকাতি করে আনা সেই দুর্লভ পত্রটী আমাদের বেচারাম কর্ত্তৃক চুরি করে আনা এই ভ্যানিটী ব্যাগের মধ্যে তখনও মজুত ছিল। মানুষের ভাগ্য বোধ হয় নদীর কুলের মত হয়ে থাকে! তাই এরা এক কূল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অপর কুল গড়ে দেয়, প্রমীলা দেবীর দুর্ভাগ্যক্রমে এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই মামলার একটী শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এতে সহজে আমরা পেয়ে গেলাম। আমি কম্পিত হস্তে এই পত্রখানি খুলে প্রথমেই দেখলাম যে এর কোনও একটি অংশ বিচ্ছিন্ন আছে কিনা। হাঁ! ঐ পত্রের একটী ছোট অংশ ছেঁড়াই দেখা গেল বটে। এরপর আমার আর বুঝতে বাকী থাকে নি যে পত্রের ঐ না' পাওয়া অংশটী হাওড়ার আহত শ্রমিক নেতার হাতের মুঠোর মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। এর পর আমরা সকলে মিলে এই পত্রটীর পাঠোদ্ধার করে খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠেছিলাম। এই অতি প্রয়োজনীয় পত্রটীর হুবহু একটী প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

এই পত্রে উপরে—'নীহার ভাই' বলে সম্বোধন করা হয়েছিল এবং এই পত্রের তলদেশে দস্তখত করা ছিল—'তোমারই' প্র—

"আমি ভেবে দেখলাম যে তোমাকে আর আমি কষ্ট দেবো না, এই অমূল্য অপরূপ সম্প্রীতির যথাযথ মূল্য আমি দিতে চাই। আর আমি অন্যায় মরীচিকার পিছন পিছন ছুটবো না। কিন্তু এখন আমাদের মিলনের এই একমাত্র প্রতিবন্ধকটীকে দূর করে দিতে চাই। এতদূর আমাকে নামিয়ে সেদিন তার শেষ কথা বলে দিলে। যদি এর একটা বিহিত তুমি করতে পারো তাহ'লে জানবে

আমি তোমারই, নচেৎ আমি পূর্বের মতই আজীবন আর কারুরই থাকবো না। তুমি কাল সকালে এসো এখানে একবার। আমি তোমার সঙ্গে একটা এই বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ করতে চাই। কিন্তু এই কাযে তোমাকে কঠিন নির্মম ও হিংস্র হতে হবে। যে চক্ষু দিয়ে আমাকে ও কুৎসিত দেখে ও বুঝে আমাকে অপমান করে প্রত্যাখ্যান করেও আবার এখানে আসা যাওয়া করতে চায় তার সেই চোখ দুটো ভগবান যেন কাউকে উপলক্ষ্য করে হরণ করে নেন। তুমি এখানে এসে পরামর্শ করার পর আমাকে পাওয়ার যৌতুক স্বরূপ তোমার কাছে আমি একটা অদ্ভুত ভিক্ষা চাইবো। এই যৌতুকটী দেবার জন্যে অবশ্য তোমার পয়সা খরচের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাকে তোমার সাহস দিয়ে ও প্রতিশোধ নিয়ে তুমি জয় করে নাও এই-টুকুই শুধু আমি চাই।"

এই পত্রটি যে নবীন নামক কোনও ব্যক্তিকে লেখা হয়েছে তা পত্রের উপরকার শিরোনামা হতেই বুঝা যায়। কিন্তু পত্রের প্রেরকের নাম শুধু 'প্র' হতে এই পত্র যে প্রমীলা দেবীই পাঠিয়েছে তা বলা যায় না। এ'ছাড়া দুজন নবীন সরকার থাকাও অসম্ভব মনে হয় না। সাধারণ ভাবে এই পত্রটীর সারমর্ম্ম হতে মাত্র অনুমান করা যেতে পারে যে এই নীহার নামক ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে ওখানে ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাকে দিয়েই ঐ আহত যুবকের চক্ষু দুইটী বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এখন যদি প্রমীলা দেবীর গ্রাম্য সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং পূর্ব্ব প্রেমাস্পদ এই দুই নবীন সরকারের অস্তিত্ব থাকে তাহলে এদের কোনও জন এই সাংঘাতিক কার্য্য সমাধা করলো। তবে এই পত্রটী প্রমীলা দেবী নিশ্চয়ই প্রাপককে ডাকে পাঠান নি। এটা ডাকে পাঠালে পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পসহ খামটী কারুর না কারুর কাছে পাওয়া যেতো। যতদূর বুঝা যায় যে কোনও লোক মারফৎই এই পত্রটী গ্রাহকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রমীলা দেবী নিজে যে এটা তার কাছে দিয়ে আসেন নি তো বটেই! এতে এই পত্র পাঠাবার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যেতো। তাই যদি হয়, ত'াহলে এই পত্রটী ঐ 'প্র' দেবী কার মারফৎ ডাকে পাঠাতে পেরেছিলেন। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে এখুনিই এই পত্রটী সম্পর্কে প্রমীলা দেবীর উপর হামলা বা হৈচৈ না করে প্রথমে এই পত্রবাহকটীকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। এই পত্রবাহকটী খুঁজে বার করতে পারলে সেই ব্যক্তি আমাদের এই অদ্ভুত মামলার একজন অন্যতম সাক্ষীও হতে পারবে। ইনি তখন হবেন এই পত্রপ্রেরক ও পত্রপ্রাপকের মধ্যে হবেন একজন আইনসম্মত সংযোগ সাক্ষী। এ'ছাড়া এই পত্রটীর লিপিকা প্রমীলা দেবীর হস্তাক্ষরেই যে লেখা হয়েছে তা সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ করে তবে এই সম্পর্কে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হতে পারে। হঠাৎ এই সময় বেচারামের গলার স্বর কানে আসায় আমার এই সব আজে বাজে চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল।

এখন স্যার ওরা এই চুরির জন্যে এই থানা পুলিশ করবে না তো। ওরা নিশ্চয়ই এখন আপনাদের সাহায্যে এই ভ্যানিটী ব্যাগ উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে, এইরূপ আইন ঘটিত প্রশ্ন আইন না জেনেও বেচারাম অতর্কিতে তুলে আমাকে উদ্দেশ করে বললো, 'এর পর তো আর আমার ওদের বাড়ী ফিরে যাওয়া চলে না। ওরা আমাকে সন্দেহ না করলেও আমি আর এ বেইমান মুখ ওদের কাছে দেখাতে পারবো না।

হুঁ! তোমাকে ওরা যে খুব বিশ্বাস করতো সে কথা ঠিক। তুমি ওখানে ফিরে গেলে হয়তো ওরা এই চুরির জন্য তোমাকে সন্দেহ না'ও করতে পারতো। তবে তুমি অবশ্য ওদের চাকরীতে আর ফিরে না গেলে ওরা তোমাকেই হয়তো এই চুরির জন্য সন্দেহ করবে। তবুও আর আমি ওদের ওখানে ফিরে যেতে বলবো না', আমি ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের এই উপকারী ছোট বন্ধু বেচারামকে বললাম, 'এই মাস হতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তোমাকে সরকার থেকে কয়েক মাস বিশ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। এ'ছাড়া আজই আমরা তোমাকে এখানকার একটা য়ুরোপীয় ফার্মে মেকানিকস্ শেখার জন্য ভর্ত্তি করে দিচ্ছি। তবে তুমি তোমার পিসেমশাই-এর বাড়ীতে থেকেও ঐ বাড়ীর পিছনকার ঘুরা পথে কিছুকাল যাতায়াত করো। তা না হলে আমার আশঙ্কা হয় যে এর পর তোমারও কোনও না কোনও একটা বিপদ হতে পারে। হাঁ! কিন্তু প্রত্যেক দিনই তুমি আমার সঙ্গে রাত্রের দিকে একবার করে দেখা করতে ভুলো না। সম্ভব হলে তোমাকে আমি

এই থানাতেই রেখে দিতাম। কিন্তু তাতে আবার অন্য অনেক কথা উঠতে পারে, এই যা—

আমি কোনও শত্রু ভয় কোনও দিনই করি না স্যার, আমার এই সাবধানী বাণী শুনে বেচারাম উত্তর করলো। আমি শুধু ভয় করি অপবাদের। ওরা এতো আমাকে যত্ন—আত্তি করা সত্ত্বেও আমি তার মর্য্যাদা দিতে পারলাম না। এ দুঃখ স্যার আমার মরার পরও বোধ হয় যাবে না। এই মহাপাপের জন্য প্রতিদিনই আমাকে আমার প্রাপ্য শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আমি বেচারামের এই প্রত্যুত্তর শুনে মনে মনে একটু হাসলাম মাত্র। বেচারা অবোধ বালক নিজেকে এখনও একজন দুঃসাহসী কর্ম্মঠ মানুষ ভাবে। কিন্তু সে জানে না যে কাশীপুরের জাত-জমিদারদের ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের কর্ম্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে ও একজন শিশু মাত্র। এখন ওকে এই সব সম্ভাব্য দস্যুপনার কবল হতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমাদের উপর বর্ত্তিয়েছে। আমি বেচারামকে নানা ভাবে বুঝিয়ে তার হাতে জোর করে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়ে থানার এক সশস্ত্র সার্জ্জেন্টের জিম্মায় বাঁকা পথে তার পিশেমশাই এর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে সহকারীদের সঙ্গে এইবার এই অদ্ভুত মামলার বাকী তদন্তগুলি সম্বন্ধে আলোচনায় রত হলাম। (ক্রমশঃ)

পরিবার পরিকল্পনা

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

১৯০১ সালে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ। ৮।৮।৬২ তারিখে লোকসভায় যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে, তাতে জানা যায় যে পূর্ব্বের ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলো ধরে গত আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের মোট জন সংখ্যা ২১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ সুশীলা নায়ার ২৯।৭।৬২ তারিখে কোলকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন ভারতে জন সংখ্যা-বৃদ্ধির হার খুবই উদ্বেগজনক। এই দেশে প্রতি বছর শতকরা ২·১৫ হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপেতে থাকলে ১৯৭৬ সালে ভারতের লোক-সংখ্যা ৬২ কোটির বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। এতে বুঝা যাচ্ছে যে ভারতের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে প্রতি বর্গমাইলে ৪০৬ জন লোক বাস করে। সুতরাং বর্ত্তমান হারে যদি জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, তবে ১৯৭৬ সালে গিয়ে প্রতি বর্গ মাইলে ৫৭২ জন লোককে বসবাস করতে হবে। ঘেঁষাঘেষি বসবাসের ফলে দেশবাসীদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি কুফল দেখা যাচ্ছে যে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ছে এবং চাহিদার অনুপাতে দেশে উৎপাদন না থাকায় দ্রব্যমূল্য ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। ইতি-মধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য শতকরা ৫০ জন দেশবাসীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে এবং অনেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রপরিবারে অর্দ্ধাহার ও মধ্যে মধ্যে অনাহারের খবরও বর্ত্তমানে শোনা যাচ্ছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় যদি এখন থেকে লোকসংখ্যাকে আয়ত্তের ভেতর আনবার ব্যবস্থা করানা যায়, তবে অভাব, অনটন, অর্দ্ধাহার ও অনাহারে মৃত্যুছাড়া ভারতবাসীর গত্যন্তর থাকবে না। আর এই জন সংখ্যাকে আয়ত্তের ভেতর আনতে হলে "পরিবার পরিকল্পনা নীতি" গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতে অর্থাৎ হিন্দুরাজাদের শাসনকালে সাধারন ভারতীয় নরনারীরা "পরিবার পরিকল্পনা" কি

জিনিস জানতো না, তবে তারা ধর্মভাবাপন্ন ছিল এবং বিবাহিত নরনারীরা ২।৩টি সন্তান জন্মের পর সংযত জীবন যাপন করতো। ফলে সে যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম ছিল। লোক সংখ্যা তখন কম এবং দেশের খাদ্যোৎপাদনের সীমারেখার ভেতর ছিল বলে সে যুগে সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য খুবই সস্তা ছিল। সে যুগে জিনিসপত্রের মূল্য কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান যুগে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের মূল্য কিরূপ বেড়েছে, তা নিম্নলিখিত তালিকা হতে বুঝা যায়।

হিন্দুরাজত্বে (কৌটিল্যের আমলে)				বর্ত্তমানে (মোটামুটি)
চাউল	প্রতিমণ	৫ তাম্রপণ	বা এক আনা	২৮৲
তৈল	„	৪১ „	বা প্রায় ৮ আনা	১০০৲
ঘৃত	„	৬০ „	বা ১২ আমা	৩২০৲
ডাল	„	৬ „	বা প্রায় ১ আনা	৩২৲
চিনি	„	৪৮ „	বা প্রায় ১০ আনা	৪৪৲
কাপড়	১ থানি	১ „	বা $\frac{১}{৫}$ আনা	৭৲

সেরূপ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যও সস্তা ছিল, যা বর্ত্তমান জনাকীর্ণ ভারতের নরনারীর পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তার ওপর বর্ত্তমান যুগের ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদের মত সে যুগের ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল মেশাতেও জানতো না। অর্থাৎ অতীতে ভারতবাসীরা নিশ্চিন্তে দু'বেলা পেটভরে ভেজালহীন খাদ্যদ্রব্য খেতে পারার কারন হল দেশের জনসংখ্যা অল্প ও খাদ্যোৎপাদনের সীমার ভেতর ছিল এবং ব্যবসায়ীরাও সৎ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনের সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ায় আমাদের এই দুর্দ্দশা ও খাদ্যাভাব। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে জনসংখ্যার আধিক্যই ভারতের অন্যতম সমস্যা কথাটি খুবই সত্য।

আমাদের দেশের মত পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে, যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যাকে আয়ত্তের ভেতর আনবার জন্য পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য দেশ এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে, সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পরিবার পরিকল্পনার কাজ নানাভাবে এগিয়ে চলেছে। সেদেশে বহুলোক নিয়মিত ভাবে ক্লিনিকে আসছেন এবং বহু আবেদন প্রত্যহ জমা হচ্ছে সাহায্যের জন্য। জনসাধারণও এই কাজে নানাভাবে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় কিছুকাল পূর্বে যে হিসাব বের হয়েছিল, তাতে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা প্রায় ১৭৯,৫০০,০০০ জন। গত দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ২৮ লক্ষ।

পৃথিবীর আর একটি উন্নত দেশ বৃটেনেও পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করার বিশেষ চেষ্টা চলছে। শোনা যায় ১৯৬০ সালে ৩৪০০০০ লোক পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যাতায়াত করেছেন। এই রকম কেন্দ্রের সংখ্যা সেখানে গত বছর ছিল ২৯২টি, বর্ত্তমানে আরও অনেক বেড়েছে। আফ্রিকার মত অনুন্নত দেশের নরনারীরাও বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন।

১৯৪৭-৫৬ সালের মধ্যে জন্মহার আশ্চর্য্যরকমে কমে গেছে জাপানে। বিলম্বে বিয়ে—ও বিজ্ঞান সম্মত উপায় অবলম্বন করে জাপান লোকসংখ্যাকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছে। জাপানের অধিকাংশ পরিবারই এখন দুইটি সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট। ১৯৬০ সালে জাপানের জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী আরও বিস্তৃত করেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সম্বন্ধে ৩৫৭২টি গ্রাম ও সহরে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন।

ভারতের পরিবার পরিকল্পনার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতের সর্বত্র এই নীতি অনুসারে কাজ চলছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারও এই রাজ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জনগণকে শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সহর ও পল্লীঅঞ্চলে পরিবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিষ্টা হয়েছে এবং তা আরও বাড়াবার চেষ্টা চলছে। পরিবার পরিকল্পনা খাতে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ, কয়টি কেন্দ্র ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে, তার একটা মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

পরিবার পরিকল্পনা খাতে তৃতীয় পাঁচশালা যোজনায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং সমগ্র দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়

পরিকল্পনার কার্যসূচী অনুসারে ভারত সরকার চার প্রকারের ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন। যথা, (১) শহরাঞ্চলীয় ক্লিনিক, (২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে ক্লিনিক, (৩) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ক্লিনিক ও (৪) ভ্রাম্যমান ক্লিনিক। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই যাবতীয় জেলা মহকুমা ও কলিকাতার হাসপাতালগুলোতে ৫৩টি সহরাঞ্চলীয় কেন্দ্র তৃতীয় পরিকল্পনা কালে স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৮০টি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে এইরূপ কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ২৫৫টি পর্যন্ত হওয়ার আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোর (৫৫টি পল্লী ১৯টি শহরাঞ্চলীয়) সহিত যুক্ত ৭৪টি ক্লিনিক স্থাপিত হয়। ১৮১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহিত একটি প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রাখবার জন্য স্থির করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে পশ্চিমবঙ্গে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩৭৩টি। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে আরও ১০০টি কেন্দ্র স্থাপিত হবে। ভারত সরকারের তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী অনুসারে এইরূপ ৪৭৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে একটি প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ১৫টি জেলার প্রত্যেকটিতে এবং কোলকাতার জন্য একটি মোট ষোলটি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক খোলা স্থির হয়েছে। এতে বুঝা যায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার কাজের ওপর কত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও পরিবার পরিকল্পনার কাজের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে এই দেশে পরিবার পরিকল্পনার কাজ দ্বিমুখী নীতিতে চলছে বলে কেও কেও অনুমান করেন। সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, যে হিন্দু সমাজে লক্ষ লক্ষ হিন্দুমেয়ে জঘন্য ও মানবধর্ম বিরোধী পণপ্রথার অভিশাপে অবিবাহিতা ও সন্তানহীনা থাকতে হয়; যে সমাজে বিধবা, চাকুরে ও ব্রহ্মচারিণীর সংখ্যা যথেষ্ট, যারা অবস্থার চাপে সন্তানহীনা থেকে হিন্দুসংখ্যা হ্রাসের পথ তৈরী কচ্ছে, সেই হিন্দু সমাজেই পরিবার পরিকল্পনার নীতি দ্রুত প্রসার লাভ করছে। অথচ যাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পরিণামে অবশিষ্ট ভারতকেও পাকিস্তানভুক্ত করবার সম্ভাবনা, তাদের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা নীতি প্রসারের চেষ্টা করতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। এই সম্পর্কে "আমরা বাঙ্গালী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

"কিছুদিন হইল নেহেরু সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই। বড় বড় শহরগুলিতে ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা সফলতার পথে অগ্রসরমান। জন্মের হার সহরাঞ্চলে প্রায় স্থিতাবস্থার পর্য্যায়ে আসিয়াছে বলিয়া সরকারী কর্ত্তারা নিজ কর্ম-গর্বে গর্বিত হইয়া উঠিতেছে।

পরিকল্পনা মত যদি ক্রমশঃ লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সফল হইয়া উঠে, তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতের বৃহৎ দুই সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সংখ্যা কি অনুপাতে হ্রাস বৃদ্ধি হইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে সরকারের এই কল্যাণকর (!) প্রচেষ্টার পরিণতিতে ভারতে আর এক পাকিস্তান পয়দার সহায়ক হইবে।"

* * *

এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্য ক্রমশই হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মহলে গ্রহণীয় হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বেশী ব্যাপ্ত হইবে এই পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে দেখা যায় যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানা হইবে, এই ছুৎমার্গ তুল্য ভয়ে পরিবার পরিকল্পনা ঐ সম্প্রদায়ের দোরে মাথা কুটিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা যেখানে বৎসর বৎসর কমিতেছে বা স্থিতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকবৃদ্ধি যথা পূর্বং থাকিয়া যাইতেছে। ইহার উপরে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের যে কোনরূপ ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী না হওয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ে বহু বিবাহ প্রথা চালু রহিয়াছে পূর্ববৎ। অপরপক্ষে "হিন্দু কোড বিল" চালু হওয়ায় সে সুযোগ হইতে হিন্দু সমাজ বঞ্চিত। এবং এক বিবাহেই তাঁহারা (হিন্দুরা) কি ধর্মের দিক দিয়া কি রুচির দিক দিয়া সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রঃ

এই যে হিন্দু সম্প্রদায় যখন পরিবার পরিকল্পনা ও একবিবাহ প্রথা গ্রহণ করিয়া লোক বৃদ্ধিকে সংযমের তথা আইনের বেড়া দিয়া সামিল করিতে ব্যস্ত,—সেই অবসরে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ধাক ধাক করিয়া বর্ধিত হইয়া চলিতেছে।

আমরা ভারতের হিন্দু জনসাধারণকে এই সর্বনাশ-কর দ্বিমুখী নীতি সম্পর্কে অবিলম্বে সচেতন হইতে অনুরোধ জানাই এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলি যে, তাঁহারা যদি অবিলম্বে এই নীতির প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর না হন, তবে অদূর না হইলেও সুদূর ভবিষ্যতে লোকসংখ্যার আনুপাতিক হিসাব সম্মুখে তুলিয়া মুসলমানগণ আর এক পাকিস্তানের দাবী তুলিবে এবং সে দাবী তখন মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।"

সুতরাং যে দ্বিমুখী নীতিতে পরিবার পরিকল্পনার কাজ ভারতে এগিয়ে চলেছে, তা দেশের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতের আরও কিছু অঞ্চলকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ও পাকিস্তান-ভুক্ত করবে। অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কাহিনী যাঁরা জানেন এবং সেই পাক-শাসিত অঞ্চলে হিন্দুদের দুর্দশার কাহিনী যাঁরা এখন শুনিতেছেন,তারা উক্ত অনুমানকে হেসে উড়িয়ে দিতে ও মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধিতে আতংক বোধ না করে পারবেন না। মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির কুফল সাধারণ ভারতবাসীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, কিন্তু যাঁদের আমরা ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য পাঠিয়েছি, তাঁরা ইহা উপলব্ধি করতে পারছেন না। এ শুধু ভারতবাসীদের দুর্ভাগ্যের কারণ নয়, ভারতেরও দুর্ভাগ্যের কারণ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে লোক বিনিময় হয়ে গেলে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হতো না, পাকিস্তানই স্বধর্মীদের জন্য তখন মাথা ঘামাতো। কিন্তু দেশভাগের সঙ্গে লোক বিনিময় না হওয়ায় অবিভক্ত ভারতের যে সমস্যার জন্য ভারত বিভাগ হয়েছিল, সে সমস্যা এখন ভারত ইউনিয়নেও বজায় আছে। শুধু তা নয়, আমেরিকান অস্ত্রে বলীয়ান পাকিস্থান নিত্য গুপ্তচর পাঠিয়ে—ভারতীয় একশ্রেণীর মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পাকিস্থানের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য অনুপ্রেরিত করছে। আর আমাদের নেতারা মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধিতে উদাসীন থাকায়, Hindu Code Bill এর স্থলে Indian Code Bill পাশ করে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ না করায়, মুসলমান সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। আসামে বাঙ্গালী হিন্দুদের বাদ দিলে আজ মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৫৬ জন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, বিশেষতঃ সীমান্ত অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের মতে গত ১০ বছরে ভারতের জনসংখ্যা ৮ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ৮ কোটির মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার, ভারতীয় নাগরিকের ছদ্ম-বেশে ভারতীয় অঞ্চলে যে সমস্ত পাকিস্থানী মুসলমান বসবাস করছে তাদের সংখ্যা কত জানতে পারলে ভাল হয়। যতদূর মনে হয়, মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা এবং লক্ষলক্ষ পাকিস্থানী মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশ ও বসবাসের ফলে জন সংখ্যা এত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

যা হোক্, আমরা ভারতের কল্যাণকামী এবং দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য পরিবার পরিকল্পনার প্রসার কামনা করি। ভারতবাসীদের বাঁচতে হলে এই পরিকল্পনা সকলে গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং পরিবার পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করলে নিজেদের তো মঙ্গল হবে সেই সঙ্গে দেশেরও অশেষ কল্যাণ হবে। আর পরিবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্য, তথা জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলো বাঞ্ছনীয় মনে করি।

(১) ভারতের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের পুরুষদের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা। ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে জন্মহার শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ হ্রাস প্রয়োজন। কিন্তু দেশ থেকে বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করতে না পারলে জন্ম-হার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস সম্ভব নয়।

(২) পাকিস্থানী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় অঞ্চলে পাকিস্থানী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য পাকিস্তান সংলগ্ন ভারতীয় অঞ্চল থেকে মুসলমানদের দেশের অভ্যন্তরে সরিয়ে দেওয়া। কারণ ভারত সীমান্তের একশ্রেণীর মুসল-মানদের সহায়তায় লক্ষ লক্ষ পাকিস্থানী মুসলমান ভারতে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছে ও ভারতের জন সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।

উক্ত প্রস্তাব দুটি কোন ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত নয় অথবা মুসলমানদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও নয়। এইরূপ প্রস্তাব অন্যান্য ভারতবাসীরা তো সমর্থন করবেই, যে সমস্ত মুসলমানরা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগকে ঘৃণা করে, ভারতরাষ্ট্রের অনুগত ও কল্যাণকামী তাঁরাও আশাকরি সমর্থন করবেন। কারণ এক ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ চালু থাকায় এবং লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী মুসলমানদের ভারতীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দ্রব্যমূল্যও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়ে ভারতবাসীদের জীবনে দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারতীয় মুসলমানরাও এই অভাব অনটন জনিত দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

(৩) তিনটি সন্তানের জননীর সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে বিনাব্যয়ে গর্ভরোধের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ অনেকেই অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদানের কুফল বোঝে, কিন্তু গর্ভরোধ অত্যাধিক ব্যয়সাপেক্ষ বলে ইচ্ছা থাকলেও করতে পারেনা এবং বাধ্য হয়ে বহুপুত্রের জননী সাজতে হয়।

(৪) সম্প্রতি "জেনিমিন" নামক একপ্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সেবনে একবৎসর গর্ভসঞ্চার হয় না। এইভাবেও জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য পরীক্ষামূলক চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) অতীতে নরনারীদের ধর্মভাব ছিল এবং এই ধর্মভাবই তাদের সংযত জীবন যাপনে অনুপ্রেরিত করত। বর্তমানে ভারতবাসীদের এক বৃহৎ অংশ ধর্মের প্রতি আস্থাহীন হওয়ায় তাদের মন কুকাজ ও পাশবিক কাজের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং ভারতীয়দের মধ্যে আবার ধর্মের ভাব ফিরিয়ে আনতে পারলে তাদের পাশবিক ভাব হ্রাস পাবে, যা জনসংখ্যা হ্রাসের সহায়ক মনে করি।

উক্ত ব্যবস্থাগুলো পরিবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার, জনসংখ্যা হ্রাসের এবং দেশের নিরাপত্তা ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক মনে করি।

একটি সুন্দর জীবন

শ্রীকালীপদ সেন

"তাঁহার নারী হৃদয়ে ঋষির প্রজ্ঞা ও কবির বাগ্মিতার সমন্বয় হইয়াছিল", এ কথা লেখা আছে ফ্লোরেন্সে ব্রাউনিং দম্পতির বাস ভবনের সম্মুখের স্মৃতি ফলকে। লেখাটি প্রখ্যাত ইংরেজ মহিলাকবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর উদ্দেশ্যে।

ইরেজী সাহিত্যে মহিলা লেখিবার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। জেন অষ্টিন, জর্জ এলিয়ট, ব্রন্টিগ্নিগণ এবং আরও অনেক মহিলা ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনীর তুলনায় ব্যারেট ব্রাউনিং-এর জীবনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নাটকীয়। নাটক যে শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তা না, বাস্তব জীবনেও যে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে তার প্রমাণ এলিজাবেথের জীবনে মিলবে।

একদিন কবি ব্রাউনিং-এর নজর পড়লো একটা কবিতায়। কবিতাটির নাম Lady Geraldine's Courtship, লেখিকা মিস এলিজাবেথ ব্যারেট।

"Or from Browning some Pomegranate,
Which if cut deep down the middle
Shows a heart within Blood tinctured
Of a veined humanity."

স্পষ্টতঃই লেখাটি ব্রাউনিং এর প্রশস্তি। কবি আকৃষ্ট হলেন। প্রথমে চিঠি, পরে পরিচয়, পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে ভালবাসা, প্রেম, কিন্তু প্রেমের পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ। পিতা মিঃ ব্যারেট ছিলেন বিয়ের ঘোরতর বিরোধী। তাই সামাজিক প্রথামত বাঁধা-ধরা পথে হোল না বিবাহ। Wimpole Streetএর সেই পোড়ো বাড়ীটার অন্ধকারময় ঘর থেকে অদৃশ্য হলেন এলিজাবেথ।

Marylebone চার্চ-এ সকলের অজ্ঞাতে দু'টি কবি হৃদয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোল। তখন ব্রাউনিং ৩২ আর এলিজাবেথ ৩৮, তারপর ফ্লোরেন্সের মনোরম পরিবেশে তাঁদের তরঙ্গহীন জীবন বইতে লাগলো অনাবিল ভাবে। এর ছেদ এল ১৮৬১র ৩০শে জুন এলিজাবেথের মৃত্যুতে।

বিকলাঙ্গ এলিজাবেথকে শুধু বই পড়েই জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছিল। শুধু সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যই নয়, গ্রীক সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রগাঢ়। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি গ্রীক ভাষায় মূল হোমারকে পড়েছিলেন। হোমার, প্লাটোর লেখা আর বাইবেল ছিল তাঁর প্রিয়।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর শ্রেষ্ঠ রচনা Sonnets from the Portuguese. ব্রাউনিং এর প্রতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই ৪৪টি সনেট বিশ্বকাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৮৪৭ সালে একদিন প্রাতরাশের পর ব্রাউনিং জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মনে হল কেউ যেন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাকাবার আগেই মিসেস ব্রাউনিং তাঁর কাঁধটি চেপে ধরে তাড়াতাড়িতে তাঁর পকেটে একগাদা কাগজ গুঁজে দিলেন। বললেন - ভাল লাগলে পড়বে, নইলে ছিঁড়ে ফেলবে। আর এই কাগজগুলোই হচ্ছে Sonnets from the Portuguese.

মিসেস বা ব্রাউনিং-এর অন্যান্য রচনার ভিতর উল্লেখযোগ্য তার The Cry of the Children এবং Aurora Leigh. The Cry of the Children-এ দরিদ্র ঘরের শিশুদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি মানবতার মানদণ্ডে চিরদিন প্রশংসা লাভ করবে। Aurora Leigh প্রকৃতপক্ষে তাঁর আত্মজীবনী।

ব্যারেট ব্রাউনিংএর লেখায় অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু বহু ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যে তিনি যে একটি দীপ্ত নীহারিকা, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তাই পরিপূর্ণ একশত বছরের ব্যবধানেও সাহিত্যের ছাত্রদের ভিতর এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর অনুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

দর্শনের সার্থকতা

জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম মহামতি ব্রাডলি দর্শনের সার্থকতা সম্বন্ধে যা ব'লেছেন তা সকলের প্রণিধান যোগ্য। যতদূর সম্ভব তাঁর ভাষায় তাঁর কথা ব'লতে চেষ্টা ক'রেছি।

দর্শন নিয়ে, বর্তমানযুগে আলোচনা করাতে অনেক বাধা। দর্শন নিয়ে বাস করা একরকম বাতুলতা। দর্শন ও দার্শনিকতা আর যাই কিছু হ'ক না কেন, দাসত্ব নয়, চিরাচরিতকে মেনে নেওয়া নয়, মুগ্ধমনের শুদ্ধ প্রলাপ নয়। দার্শনিকদের দেখতে যতই শান্ত ও সম্মানিত মনে হ'ক না কেন, তাদের অন্তরে আছে উষ্ণ বিদ্রোহ ও বিপুল দুরন্তপনা। তাদের বৃত্তি অসহযোগীর বৃত্তি; আপাত দৃষ্টিতে তাদের প্রশ্নপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির একটা অমার্জনীয় অপরাধ। বহুযুগের সংস্কার, প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনের বহুজনস্বীকৃত সত্য মিথ্যা হাড়মাংসের ও রক্তের মধ্যে বাসা-বাঁধা ধারণা এদের সবকিছুকে উপেক্ষা করে দার্শনিককে তার আলোচনার আরম্ভ করতে হয়। প্রথম থেকেই সে সংগ্রামী। দর্শনের সম্ভাবনা নিয়েই অনেক সন্দেহ। এর মূল্য নিয়েও বহু সংশয়। বিশ্বকে সমগ্রভাবে জানবার প্রয়াসকে যদি দর্শন বলা যায়, তাহ'লে অনেকেই প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রবেন যে (১) এই প্রকার জ্ঞান অসম্ভবও (২) এই প্রকার জ্ঞান অসম্ভব না হ'লেও এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে যা জানতে পারি তা অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন।

দার্শনিকের উত্তর এই যে যাঁরা বিশ্বের বা ব্রহ্মের

সামগ্রিক জ্ঞান অসম্ভব বলেন—তাঁরা না ভেবে চিন্তেই তাঁদের এলোমেলো স্বভাব অনুযায়ী, এই কথা বলেন। (বিশ্বকে এই পরিপ্রেক্ষিতে, ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করা খুব অসংগত হবে না।) কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিন্ত ধারণা না থাকলে, "ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব"—একথা বলাও অসম্ভব। অন্ততঃ তাঁদের কাছে "ব্রহ্মেরতত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব" —এই জ্ঞানটা সম্ভব হ'য়েছে। দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে দার্শনিক বিচারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা স্বীকার করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা দর্শনের জ্ঞানকে সম্ভব স্বীকার ক'রেও মূল্যহীন বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তাঁদের উত্তরে দার্শনিক এই কথাই বলবে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান আংশিক ও অসম্পূর্ণ হ'লেও, এই জ্ঞান মূল্যহীন নয়, কারণ মানুষের মনের একটা নিগূঢ় ও অপরিত্যাজ্য প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় এই তত্ত্বজ্ঞানে। অপূর্ণ ব'লেই যে অকিঞ্চিৎকর হ'তে হবে এমন কোনও কথা নেই।

এই দৃশ্যমান জগৎ মানুষকে নিয়ত বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে, এর বর্ণ,রূপ, রস ও সৌন্দর্যে। মানুষ বিশ্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে পারে না। যতদিন মানুষ বিশ্বের মর্ত্যাকাশব্যাপী রহস্যে রোমাঞ্চিত হবে, ধর্ম, কাব্য ও কলার প্রদোষলোকে বিচরণ ক'রে আনন্দ পাবে ততদিন দর্শনচিন্তারও তাৎপর্য ও মূল্য স্বীকৃত হবে। সাধারণ মানুষের মনও বিশ্বের স্বরূপকে জানতে চায়, এর সাথে মানুষের সম্বন্ধ জানতে চায়. জীবনের মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, ভাল মন্দের বিচার করে। এই সবই সাধারণে করে এলোমেলোভাবে, আরও অন্যান্য বৃত্তির সহযোগিতায়, কর্দমাক্তভাবে। দর্শন সাধারণের এই জানবার স্পৃহাকেই শোধনকরে, সমর্থন করে। তার কথা এই, জানতে যদি হয়ই, তবে একান্তভাবে, যথার্থভাবে বিচার ক'রে এই জিজ্ঞাসার তৃপ্তি আনতে হবে। বেয়াড়াভাবে নয়, খাপছাড়াভাবে নয় ও খামখেয়ালীভাবে নয়। নিষ্ঠা, নিপুণতা ও ঐকান্তিকতার সাথে বিচারের মূলসূত্র অনুযায়ী অন্যান্য মানসিক বৃত্তির থেকে পৃথকভাবে একমাত্র জ্ঞানের পথ অনুসরণ ক'রে এই জানবার আগ্রহকে পরিচালিত করবার সংকল্প সাধনা দার্শনিকের। কেউ যদি অপরিচ্ছন্ন বিচারে তৃপ্ত থাকতে পারে, অনেকে অবশ্যই তৃপ্ত থাকতে পারে, সে থাকুক। তেমনি কেউ যদি সম্যক বিচার না ক'রে, পর্য্যালোচনা না ক'রে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর না হ'তে চায় তাকেও নিন্দিত করবার কোনও সংগত কারণ নেই। দর্শন আলোচনায় যদি আপাতঃদৃষ্টিতে কোন লাভনাও হয়, তবুও এই আলোচনা থেকে ক্ষান্ত হবার কোনও কারণ নেই। একমাত্র দর্শনই মানুষকে সাম্প্রতিকের পোষণ, কুসংস্কারের পীড়ন, বিষয়ের আধিপত্য ও সমস্ত রকম মোহ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। একমাত্র বিচার-প্রিয় দর্শনই মানুষকে চিরমুক্ত সজীব ও সংস্কারহীন দৃষ্টি দিতে পারে। দিবসের আলোকে শর্বরীর ভূত যেমন পলায়ন করে, দর্শনের সংশয় কুটিল ও শাণিত বিদ্যুৎদৃষ্টির সম্মুখে তেমনি কুসংস্কার, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও লোকাচার অপসারণ করে।

যে মানুষ অপরের দাসত্ব না ক'রে, বিচারের পথে সত্যকে জানতে চায়, দর্শন তার পক্ষে উৎকৃষ্ট আশ্রয়।—তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। আমরা সকলেই প্রাত্যহিক ঘটনার বাইরের এক জগতের আহ্বান কম-বেশী শুনতে পাই। দৃশ্যমান জগতের বহির্ভূত এক বৃহত্তর জগতের ডাক আমাদের অনেককেই কখনও না কখনও বিচলিত করে। নানাজনে নানাভাবে নানাপথে তাদের জীবনে এমন সত্যের সামনে উপনীত হয়—যার উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃই তারা স্বীকার ক'রে নেয়, যা তাদের জীবনে স্বর্গের সংবাদ বহন ক'রে আনে, মহত্তর আস্বাদন দেয়। মানুষ চরিত্রের এই আধ্যাত্মিক অংশের তৃপ্তি অনেকের কাছে হয় জ্ঞানের মার্গে। তারা দার্শনিক। বৃহত্তর লোকের খবর একমাত্র জ্ঞানের ও বিচারের পথে যারা পায়, দর্শন তাদের রক্তের দোলায়। তাদের পক্ষে দর্শন জলবায়ুর মতো, খাদ্য-জলের মতো অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। তাদের কাছে দর্শনের সার্থকতা এর নিজস্ব গতির মধ্যে। যার মনে জ্ঞানের চাঞ্চল্য এসেছে তার পক্ষে এর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং আত্মসমর্পণই তার জীবনের সম্যক সার্থকতা। সাধারণতঃ আত্মত্যাগ ব'লতে আমরা যা করি, তা শুধু অকিঞ্চিৎকরের দান বা ত্যাগ। কঠিনতর ব্রত, কঠিনতম ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ হচ্ছে নিজেকে নির্ধারিত পথে পরিচালিত করার জন্য আর সব কিছু ত্যাগ। প্রথমে জানতে হবে, নির্ধারণ ক'রতে হবে, আমি কি চাই এবং আমি যা চাই, পাওয়ার

জন্য অন্য সবরকম বঞ্চনা ও ত্যাগ স্মিতমুখে স্বীকার করতে হবে। এতেই জীবনের চরম সার্থকতা। এই আমৃত্যু দুঃখের তপস্যার জন্যও অনেকের পক্ষে দর্শনের আজীবন চর্চা নিতান্ত প্রয়োজন। যে মানুষ দর্শনের আদেশ পেয়েও তার দাসত্ব করতে কুণ্ঠিত হয়, সুখ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে পথভ্রষ্ট হয়, সে হেয়, সে ঘৃণ্য।

দর্শনে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব না হ'লেও প্রতি যুগের চিন্তাধারার উপযোগী নূতনত্ব এতে দরকার। নূতন ভাষা ও নূতন ভংগির দরকার। যেমন যুগে যুগে নূতন কাব্যের দরকার, তেমনি নূতন দর্শনের দরকার। নূতনের মূল্য এইখানে যে যা নূতন ও নিকট—তা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে বেশী। প্রত্যেক যুগের মানুষের মনের প্রকৃষ্ট বৃত্তিগুলোর চালনা করবার জন্য দরকার নূতন নূতন দর্শন তা পুরাতনের চেয়ে ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক। যা সনাতন তাকেও নূতন নূতন ফুলে ফলে ও পল্লবে যুগে যুগে আমাদের কাছে আসতে হবে মানুষ যেহেতু বদলায়, সেই জন্য দর্শনেরও পরিবর্তন দরকার।

শেষ কথা এই যে এ যেন আমরা মনে না করি যে, একমাত্র জ্ঞানপথেই ব্রহ্মস্পৃহা তৃপ্ত হয়। ব্রহ্মে পৌছবার আরও অনেক পথ আছে। No calling or pursuit is a private root to Deity ;

বিচারের পথ, দর্শনের পথ যে অন্যান্য পথের চেয়ে উচ্চতর এমন কথাও বলা চলে না। দর্শন সম্বন্ধে গর্বই দার্শনিকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অপরাধ।

ধর্ম-অনুষ্ঠানে নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ফলতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল

আমরা মানবজাতি কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে, এই পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হই। প্রথমে, আমরা পর্বত গুহায়, অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক আশ্রয়ে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতাম। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক আঘাত খাইতে খাইতে, এবং রোগ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইতে, ক্রমে ক্রমে আমাদের মনে ঐ সকল আঘাতকারীর বা আঘাতকারীগণের পশ্চাতে একটী বা একাধিক শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করি এবং সেই সকল আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই শক্তি বা শক্তিসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করি। কতকগুলি শক্তির আবাস আকাশে বা পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোন স্থানে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করি, যথা বজ্রপাতের শক্তি। অন্য কতকগুলি শক্তির আবাস এই পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করি, যথা রোগ, মৃত্যু আনয়নকারীর শক্তিসমূহ। ইহা হইতে আমরা একদিকে প্রকৃতির উপাসক হই এবং অন্য দিকে গাছ, পাথর প্রভৃতির উপাসক হই। এই প্রকারে পৃথিবীর নানাদেশে নানা আদিম অধিবাসী, আমাদের পূর্বপুরুষগণ, বর্তমান বিভিন্ন ধর্মের প্রথম বীজ বপন করেন।

তারপর বহু সহস্র বা বহু লক্ষ বৎসর কাটিয়া যায় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রকারে উন্নতির পথে অগ্রসর হই। এই ভাবে, এই পৃথিবীতে নানা প্রকার উন্নতধরণের ধর্মের সৃষ্টি বা প্রচলন হয়, এবং বিগত দশ পনের হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বর্তমান প্রধান ধর্মগুলির সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে থাকে।

সাধু ও মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন যে, বর্তমান ধর্মগুলির প্রবর্তকগণ ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ, অথবা ঈশ্বরের অবতার। সুতরাং তাঁহাদের প্রবর্তিত প্রত্যেক ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটী ধর্মই আমাদিগকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, যদি আমরা আন্তরিকভাবে উহা অনুশীলন করি। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করিলেও ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, জৈন, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মসকল বহুবৎসর ধরিয়া লক্ষ

লক্ষ নরনারীকে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, এবং উহাদের প্রত্যেকটী ধর্মে বহু নরনারী শান্তি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেকটী ধর্ম যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তরিকভাবে অনুশীলন করিলে যে প্রত্যেকটী ধর্মই আমাদিগকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যদিও আমরা বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে এই সকল মহানধর্মের অধিকারী হইয়াছি, এবং অসংখ্য নরনারী প্রত্যেকটী ধর্ম আন্তরিক অনুশীলন করিয়া শান্তিলাভ বা ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন, তথাপি আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মপথে অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির অধীন হইয়া আমরা আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের ন্যায়, এবং কোন কোন বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্বরোচিত ব্যবহার করিতেছি ও বর্বর জীবন যাপন করিতেছি।

অন্যদিকে বিজ্ঞানে আমরা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের ধর্মপুস্তকে পুষ্পকরথ, আগ্নেয় বাণ, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা আছে। হয় তাহা কল্পনামাত্র, নতুবা আমরা বিজ্ঞানে বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পর, সে সমস্ত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত অনেক পরে উন্নত হইয়াছে। কিন্তু মাত্র ৩০০ বা ৪০০ বৎসর অনুশীলনের ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদিগকে উন্নতির উচ্চতর স্তরে উপনীত করিয়াছে। আমরা পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হইয়াছি। আমরা আকাশে পৃথিবীর চারিধারে উপগ্রহ ঘুরাইতেছি, তাহাতে করিয়া মানুষ ঘুরাইয়া নিরাপদে ফিরাইয়া আনিয়াছি, চন্দ্রের চারিধারে উপগ্রহ ঘুরাইয়াছি, এবং চন্দ্রের জমিতে পতাকা প্রোথিত করিয়াছি।

এখন আমাদের বিশেষ জরুরী বিবেচ্য বিষয় এই—কেন আমরা বহু শত বা সহস্র বৎসর পূর্বে বর্তমান প্রধান ধর্মগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় তত্ত্ব জানিতে পারিয়া, ও সেই ধর্ম বহুশত বা বহুসহস্র বৎসর অনুশীলন করিয়াও, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে ধর্মজীবনে এত অনগ্রসর হইয়া আছি, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তিন চারিশত বৎসর অনুশীলনের পরই আমরা বিজ্ঞানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের উপর আমাদের সকলের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে একটী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে, আমাদের নিজনিজ ধর্ম, জাতি বা দেশ সম্বন্ধে অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সত্য অপ্রিয় হইলেও, অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রকৃত অবস্থা এই—

১। আমরা সকলে অল্পবিস্তর ধর্ম অনুশীলন করি সত্য। কিন্তু আমরা আমাদের নিজনিজ ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যতত্ত্ব জানিনা, জানিবার চেষ্টাও করি না, এবং অজ্ঞ অথবা স্বার্থপর ধর্মবিশ্লেষণকারীর দ্বারা চালিত হইয়া ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি।

(ক) আমরা ধর্মপুস্তকের আক্ষরিক সত্যের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করি, তাহার অন্তর্নিহিত সত্য বুঝিবার চেষ্টা করিনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।" সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য দেবতা, দুর্গা কালী, শিব প্রভৃতির উপাসনা করা ভুল। বাইবেলে যীশুখৃষ্ট বলিলেন—"হে সন্তাপগ্রস্ত মানব, আমার কাছে আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" সুতরাং আমরা বলিলাম যে ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায় যীশুখৃষ্ট ভজনা। একটু সাধারণবুদ্ধি ব্যবহার করিলেই বুঝা যায় যে এই উভয় উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহারা উভয়েই, ঈশ্বরের প্রেরিত অতিমানব, অথবা ঈশ্বরের অবতার। ইহাদের বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে আন্তরিকভাবে ধর্ম অনুশীলন করিলে ঈশ্বর লাভ করিতে পারে। সকল পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। কিন্তু আমরা নির্বোধ, সেইজন্য আমরা এই সকল মহাবাক্যের সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া নিজেদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করি এবং পরস্পর বিবাদ করি।

(খ) প্রতি ধর্মে বহু প্রকার অনুষ্ঠানের নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল নিয়ম সকল ব্যক্তির জন্য নহে। যাহার যেরূপ পরিবেশ, মানসিক গঠন ও শক্তি, সে তাহা হইতে তদুপযুক্ত নিয়ম গ্রহণ ও পালন করিবে, এবং তাহাতেই তাহার মঙ্গল হইবে। কাহাকেও

অহিংসার পথে নিরামিষ ভোজন করিয়া ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যাধকে পশুহত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়জাতীয় ব্যক্তিকে কুরুক্ষেত্রের মত মহারণে সহস্র সহস্র মানুষকে ধর্মযুদ্ধে হত্যা করিয়া ঈশ্বর-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও, একটী অন্তর্নিহিত সত্য আছে। সকল ধর্মেই ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ বলা হয়। সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেককেই সত্য পথে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে, এবং পৃথিবীর সকল মানবের প্রতি সকল জীবের প্রতি, নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রদর্শন করিতে হইবে। আমরা নিরামিষাশীই হই, অথবা ব্যাধই হই, অথবা যোদ্ধাই হই, আমাদিগকে নিজ নিজ কর্তব্য পথে চলিয়া, সত্য ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা অনুশীলন করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিব। নতুবা ধর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হইবে।

(গ) ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির সেই বিশ্বাস জন্মাইয়াছে ও আত্মসমর্পণের ভাব আসিয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ করিবেন। তখন, তাঁহার আর কোন প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিবে না, তাঁহাকে তখন আর বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে না। এই শেষ সত্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, অনেক স্বার্থপর ধর্মবিশ্লেষণকারী ব্যক্তি আমাদিগকে প্রথম হইতেই বিচারবুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন এবং তাঁহাদের স্বার্থদুষ্ট বাক্যে অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিতে বলেন। আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই নির্বোধ, অথবা বিচারবুদ্ধি ব্যবহারে বিমুখ, এবং তদুপরি ঐ ধর্মবিশ্লেষণকারীগণের করতলগত। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের অবস্থা লাভ অতি দুষ্কর, এবং বহুদিন বহুপ্রকার বিশ্বাস লাভের জন্য পরিশ্রম ও বিচারের পর ঐ প্রকার অবস্থা আসে। ইহার ফলে, আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র বিশ্বাসকে বড় করিয়া দেখি; এবং ধর্ম অনুশীলনে বিচার বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি। পাছে আমাদের বিচারবুদ্ধির আলোক আমাদের ধর্ম অনুষ্ঠানে রেখাপাত করে, সেই ভয়ে আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধির নবদ্বার শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া রাখি, এবং সম্পূর্ণ-নির্বুদ্ধিতা ও অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে—আমাদের ধর্মে, ষড়দর্শন গ্রন্থে অতি উচ্চস্তরের বিচার বিশ্লেষণ আছে, এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "গীতা" বিচারের মুকুটমণি।

(ঘ) অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান মাত্র তিন চারিশত বৎসর ভালভাবে জ্ঞানচর্চা করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে আমাদিগকে এত উচ্চে উঠাইয়া আনিয়াছে, তাহার কারণ এই যে—সে আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছে। বিচারে যাহা টিকিবে তাহাই সত্য, বিচারে যাহা টিকিবে না, বা সন্দেহযুক্ত হইবে তাহা সত্য নহে। এই মূল মন্ত্রের সাহায্যে যে এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে, এবং এই মূলমন্ত্র বর্জন করার জন্যই আমরা অত্যুৎকৃষ্ট সত্যধর্মের অধিকারী হইয়াও ধর্মজীবনে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছি। এই শত শত বৎসর এই ভাবে নির্বোধের ন্যায় ধর্মানুষ্ঠান করিয়া আমরা নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছি। ঈশ্বরই জানেন—আমাদের ভাগ্যে এই দুরবস্থা আর কতদিন চলিতে থাকিবে, এবং কতদিনে আমরা গীতার উপদিষ্ট জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মের সমন্বয় করিতে পারিব।

আর একটী প্রশ্ন বহু বৎসর হইতে মানব হৃদয়ে জাগরিত হইয়া আছে, এবং আজিও তাহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় নাই। সেটী এই—ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ? এ বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা এই—

১। ধর্মের ও বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রণালী বিভিন্ন। ধর্মের তত্ত্বগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয়—ধর্ম-গ্রন্থের বাক্যের উপর ও মহাপুরুষের বাণীর উপর। ঐ সকল বাক্যের ও বাণীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় তত্ত্বকে সত্য মনে করা হয়, তদ্‌বিপরীত তত্ত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয় প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা। যে তত্ত্বগুলি বার বার প্রমাণ ও পরীক্ষার পরও অচল থাকে, সেইগুলিকেই বিজ্ঞান সত্য বলিয়া স্বীকার করে, অন্যগুলিকে স্বীকার করে না। সত্য নির্ণয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ে বহুদিন পৃথক পরিচালিত হইতেছিল। সাধারণতঃ ধর্ম, ঈশ্বর সম্বন্ধে ও ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে

আলোচনা করিত। বিজ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে অথবা ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিত না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধর্ম-বিজ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলিয়াই স্বীকার করিত না।

২। পরে বিজ্ঞান পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে অতি-বৃহৎ শক্তির সন্ধান পাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অপরিহার্য সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইল। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে একটী মূল শক্তির সন্ধান করিতে লাগিল, এবং কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে চালক একটী মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে উদ্যত হইলেন।

৩। অপর দিকে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে অধিকাংশ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির ভিতর একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগরিত হইল, এবং বর্তমান ধর্মরক্ষকগণের পক্ষে আর অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাইয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী-গণকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইতেছে না। তাঁহারা এখন তাঁহাদের ধর্ম-বিশ্লেষণ করিয়া ধর্মের ভিতর বিজ্ঞানের ভিত্তি সন্ধান করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ঋষি-উপলব্ধ ধর্মের সারতত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যতত্ত্ব। সুতরাং তাঁহারা এখন হিন্দুধর্মের কোন কোন তত্ত্ব যে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং কতক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ, হিন্দুধর্মের দশ অবতারের আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তৎসঙ্গে বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব তুলনা করা যাইতে পারে।

(ক) বিজ্ঞানের মতে, এই পৃথিবী প্রথম বাষ্পীয় অবস্থা হইতে জলে পরিণত হয়। সেই জলে প্রথম জীব, মৎস্যজাতীয় কোন প্রাণী—আমাদের দশ অবতারের প্রথম অবতার মৎস্য অবতার।

(খ) বিজ্ঞানের মতে, দ্বিতীয় জীব কূর্ম—সে জলের ধারে বাস করিত, এবং কখনও কখনও জলে বিচরণ করিত। হিন্দুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম।

(গ) বিজ্ঞানের মতে তৃতীয় জীব বরাহ—সে জল হইতে একটু দূরে কর্দমাক্ত স্থানে বাস করিত। হিন্দুর তৃতীয় অবতার বরাহ।

(ঘ) বিজ্ঞানের মতে চতুর্থ জীব, জল হইতে দূরে জঙ্গলবাসী। হিন্দুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ—অর্থাৎ অর্ধেক জঙ্গলবাসী জন্তু, অর্ধেক মনুষ্য।

(ঙ) বিজ্ঞানের মতে এবং হিন্দুধর্মের মতে, ক্রম-বিকাশের পথে মনুষ্য সর্বশেষে জন্মগ্রহণ করে। হিন্দু শাস্ত্র রূপকে পরিপূর্ণ। তাহাদের আক্ষরিক অর্থ করিলে অত্যন্ত ভুল হইবে।

হিন্দুধর্ম মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্য ও জীব ঈশ্বরের অংশ মাত্র। পৃথিবীতে এই অংশগুলি, এক হইলেও তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা (১) আত্মা, (২) পার্থিব শক্তি ও (৩) পার্থিব জড়পদার্থ। বিজ্ঞান, আত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করে না। সে শক্তি ও জড় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সে হিন্দুধর্মের ন্যায় শক্তি ও জড়ের একত্ব স্বীকার করে না। সম্প্রতি পরমাণু বিশ্লেষণের পর জড়পদার্থের ভিতর অসীম শক্তি আবিষ্কার করিয়া হিন্দুধর্মের শক্তি ও জড়ের মৌলিক একত্ব স্বীকার করিয়াছে।

৪। এইভাবে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাহায্যে জানা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম শুধু অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন অতিবাহিত হইবে, ততই হিন্দুধর্মের ও অন্যান্য ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে এবং অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে এমন একটী দিন আসিবে, যখন ধর্ম ও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া যাইবে, যখন ধর্মগুলি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এবং বিজ্ঞান, ধর্ম-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে। সেই দিন ধর্ম-অনুষ্ঠানে নির্বুদ্ধিতার ও নিষ্ফলতার অবসান হইবে। সেইদিন ধর্ম ও বিজ্ঞান পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে। সেইদিন আসিবেই আসিবে।

'তুগলকাবাদের ধ্বংস স্তূপ দর্শনে'

শ্রীচিন্ময়কুমার রায়

(১)

মরুপ্রান্তরে তুগলকাবাদ
স্থাপিত হইল যবে
বিজয়ী বীরের বিজয় নিনাদ
সেদিন শুনিল সবে।
সুপ্ত প্রকৃতি হ'ল জাগরিত
শুনি জন কলরব
আকাশে বাতাসে হইল ধ্বনিত
বিজয়ের উৎসব।

(২)

নব নগরীর কক্ষে কক্ষে
জাগিল নবীন আশা
শত রমণীর বক্ষে বক্ষে
নব প্রেম ভালবাসা।
কর্ম্মমুখর হ'ল রাজপথ
বহুজন সমাগম
বিজয়ী বীরের পূরে মনোরথ
জাগে নব উদ্যম।

(৩)

সেদিন নিভৃত কুঞ্জকাননে
চাঁদিনী আকাশতলে
আঁকি দিয়া চুমা প্রিয়ার আননে
পরাইয়া মালা গলে।
বীরসম্রাট কহিল যে কথা
প্রেয়সীর কানে কানে
মানুষ আজিও পায় সে বারতা
অনাদি কালের গানে।

(৪)

আনত নয়নে মৃদু মৃদু হেঁসে
প্রিয়কে আঁচলে ঢাকি
হেলাইয়া পড়ি প্রেমের আবেশে
বাহুপরে বাহু রাখি।
কহিলা প্রেয়সী সুখেতে মগন
"হে মোর তরুণ প্রিয়
আজিকার এই মোদের মিলন
অমর করিয়া দিও।"

(৫)

"তোমার বিজয়ে মোর গৌরব
রহে যেন চিরদিন
তোমার প্রেমের বিপুল বিভব
মোর মাঝে হোক লীন।
তোমার মাঝারে আমাকে হেরিব
এই মোর অভিলাষ
আমার মাঝারে তোমাকে পূজিব
মিটিবে মনের আশ।"

(৬)

"যেদিন আমরা রহিব না আর
মর্ত্য জগতের মাঝে
আমাদের এই প্রেম সম্ভার
লাগিবে কি কারো কাজে?
মোদের ঘেরিয়া কেহ কি রচিবে
প্রেম গাঁথা অভিনব
অনাগত কাল কভু কি স্মরিবে
বিজয় কাহিনী তব?"

(৭)

সম্রাট কহে প্রেয়সীকে তার
আধেক আদরে চুমি
"মানব হৃদয় কহে অনিবার
যে কথা কহিলে তুমি।
মানুষ রচেছে যুগ যুগ ধরে
সৌধ লক্ষ শত
নিজেকে অমর করিবার তরে
প্রয়াস করেছে কত

(৮)

"আপনার স্মৃতি যতনে রেখেছে
অনাদিকালের রথে
অতীত যাহাকে টানিয়া চলেছে
ভবিষ্যতের পথে।
অতীত কহিছে অনাগত কালে
আমি যে তোমাকে চিনি।
মোর ইতিহাস লেখা তব ভালে
কালের ধ্বংস জিনি।"
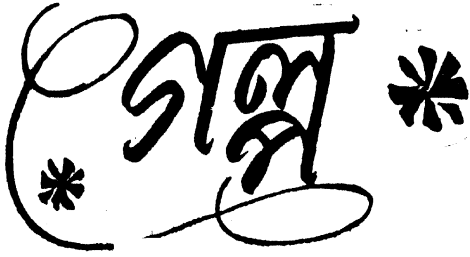
প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীঅনিল মজুমদার

সকালে শ্রীমতীর সঙ্গে রীতিমত একটা বচসা হয়ে গেল ছেলের বিয়ে নিয়ে। ছেলে শীঘ্রই বিলেত থেকে ফিরছে, শ্রীমতীর ইচ্ছে তার আগেই একটি ভাল দেখে মেয়ে ঠিক করে রাখা, ছেলে এলেই তিনি তখনই তার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবেন। খুব ভাল কথা, এতে আমিও খুব রাজি, কিন্তু গোল বাধলো মেয়ে দেখা নিয়ে। শ্রীমতীর মেয়ে আর পছন্দই হয় না—একটা না একটা খুঁত তিনি ঠিকই বার করবেন, হয় বেজায় মোটা—না হয় টিং টিংএ রোগা, রঙ হয় তো মুখ হয় না, মুখ পাওয়া যায় তো চোখে কম দেখে। শুধু কি তাই—এর ওপর আছে ভাল বংশ হওয়া চাই—আবার দেবে থোবেও ভাল। ফলে হয়েছে—দেখতে শুনতে ভাল পাওয়া যায় তো বংশ পাওয়া যায় না, আবার বংশ মেলে ত চেহারা মেলে না, যখন আবার দুই-ই জোটে তখন অবস্থায় আটকে যায়। ভাল অবস্থা না হলে ছেলের জামাই আদর হবে না, এইটেই শ্রীমতীর বদ্ধমূল ধারণা। যাহোক এই করে করে যে শ্রীমতী কত মেয়ে অপছন্দ করলেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, আর আমিও তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গেলাম। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ত একরকম হাল ছেড়েই দিয়েছে, সাফ্ বলে গিয়েছে তারা, এমন করলে আর তোমাদের ছেলের বিয়ে হবে না। ঘটকও সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কটক চলে গেছে, বাকি ছিল কাগজে বিজ্ঞাপন, তাও করেছি, কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। বস্তা বস্তা চিঠিই এসেছে, মেয়ে আসেনি একটিও। ব্যাপার দেখে শ্রীমতীকে তাই একদিন বললাম, যে রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে দেখছি তোমায় কিছু ছাড়তে হবে, তা না হলে আর ভাল মেয়ে জুটবে না। কিন্তু শ্রীমতীর আমার একেবারে ধনুক-ভাঙ্গা পণ, তার সবই চাই, অতএব বৃথা তর্ক, চুপ করেই থাকি।

সেদিন একটি মেয়ে দেখে এলাম, মেয়েটিকে আমার বেশ ভালই লাগলো। দেখতে শুনতে বেশ ভাল, খাসা গান গায়, কথাবার্ত্তা চমৎকার, বি. এ. পাশ, পাওনা গণ্ডাটাও মন্দ হবে না, ভাবলাম নিশ্চিন্দি হওয়া গেল, অনেক খুঁজে পেতে একটা ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে। কিন্তু শ্রীমতীর মতামত জানতে গিয়েই আবার রিক্সা চাপা পড়লাম। শ্রীমতীর মেয়ে একেবারেই পছন্দ হয়নি, কারণ শুনলাম মেয়ের নাক নাকি চাপা।

জিনিষটা দিন দিন যেন আমার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল, এতদিন তবু কোন রকমে চেপে চুপে ছিলাম, কিন্তু আজ সকালে একেবারে ফেটে পড়লাম। শ্রীমতীকে একেবারে স্রেফ বলে দিলাম, এবার যদি কোথাও মেয়ে দেখতে যেতে হয়, তবে তুমিই যেও, আমায় আর ডেকোনা যেন।

শ্রীমতীও অবাক, বললেন, সেকি কথা? তুমি যাবে না মানে?

—মানে খুব সহজ। অমন করে ভদ্রলোকের মেয়েদের আর আমি হেনস্থা করতে পারবো না। বেচারারা আসে, পায়ের ধুলো নেয়, থালা ভর্ত্তি খাবার হাতে তুলে দেয়, দিব্যি পেট পুরে খাই—আর তার পরেই এটা ওটা বলে তাদের নাকচ করি। এ শুধু অভদ্রতা নয়, একেবারে মহাপাপ। তোমার পাল্লায় পড়ে অনেক পাপ করেছি, আর নয়।

—ও সব কথার কোন মানে হয় না কি! সমাজের যা রীতি সেটাও মেনে চলতে হবে। বলি, তুমি কটা মেয়ে দেখে বিয়ে করেছিলে?

—আমাদের কথা বাদ দাও না, তখনকার দিন কালই

ছিল অমনি। কিন্তু আজকাল আর সেদিন নেই, যুগ পাল্টে গেছে। মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখছে, বোঝবার শুনবার বয়েস হয়েছে তাদের। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হয়েছে, এই করে কি শেষকালে একদিন কারও কাছে অপমানিত হব। তাছাড়া এই বা কি? তোমার ছেলেরও বয়স হয়েছে, তারও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে, আমাদের পছন্দ হলে যে তার হবে তার কি ঠিক আছে?

—ছেলের কি পছন্দ অপছন্দ সে নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাতে হবেনা, সে আমি বুঝবো। ছেলেকে আমি তেমনভাবে মানুষই করিনি, আমার যা মত ছেলেরও তাই মত, এইটে তুমি ভাল করে জেনে রাখো। আসলে দায়িত্ব নিতে চাওনা—সেইটে খুলে বলনা কেন?

—সে তুমি যা বোঝ তাই বোঝ, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই এইটেই বলে দিচ্ছি তোমাকে।

চেঁচামেচি কথা-কাটাকাটিটা বেশ ভাল রকমই হলো। শ্রীমতীও চুপ করে রইলেন না, অনেক পুরোনো রেকর্ড বাজালেন তিনি। তার ভাবার্থ হলো, আমি একটা অপদার্থ, সংসারে একেবারে অচল, চিরজীবন আমায় নিয়ে তিনি জলে পুড়ে মরছেন, তিনি না থাকলে আর ছেলে মানুষ হতোনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এসব কথা শুনে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই, এটা নতুন কিছু নয়, শেষ জীবনে সব স্বামীর কপালেই প্রায় এইসব অপবাদগুলো এসে জোটে। ছেলেকে তিনিই মানুষ করেছেন, অতএব ছেলেও যে তাঁর দিকে যাবে, এটাও না হয় মেনেই নিচ্ছি, তাছাড়া আমি যে সারাজীবন উপোষ করে ছেঁড়া পেণ্টুলুন পরে বিলেত থেকে গাধাকে ঘোড়া বানিয়ে আনছি—ধরে নিচ্ছি তারও কোন দাম নেই। দুঃখ করবার কিছু নেই, সংসারটাই এমনি আমরা নামেই সংসারের কর্ত্তা, আসলে চিনির বলদ।

যাকগে!

বিকেলে নিজের ঘরে বসে কাগজখানা পড়ছিলাম, এমন সময় চাকর এসে খবর দিল একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—কথাটা শুনে কেমন কেমন লাগলো আমার। কে জানে এমনও হতে পারে হয়ত—কোন নাকচ-করা মেয়েই হয়ত এসেছে, হয়ত আবার আমার কৈফিয়ৎ চেয়েই বসবে। আজকালকার দিনে অসম্ভব কিছু নয়। মনের মধ্যে একটু খটকাও লাগলো। একরকম দোনা-মোনা করেই নিচে নেমে এলাম।

বাইরের ঘরে ঢুকে দেখি—মেয়েটি একাই বসে আছে, আগে যে তাকে কখনও দেখেছি বলেও মনে হলোনা। কিন্তু মুগ্ধ হলাম তার রূপ দেখে। এমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে খুব কমই নজরে পড়ে। যেমনি টানাটানা দুটি কালো চোখ, তেমনি নাক, তেমনি দুধে-আলতা গোলা গায়ের রঙ। মুখখানাও বড় মিষ্টি। চুপকরে খানিকক্ষণ দেখলাম তাকে। কিন্তু অবাক হলাম তার বেশভূষা দেখে—অত্যন্ত সাধারণ, যাকে বলে অতি-সাধারণ। তবু যেন তাতেই আমার খুব ভাল লাগলো তাকে।

মেয়েটি আমায় দেখে কাছে এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আপনি হয়ত আমায় চিনতে পারবেন না, আমার নাম মালতী, আমার মায়ের নাম বীণা।

—বীণার মেয়ে তুমি? চেহারা দেখে এখন অনেকটা আন্দাজ করতে পারছি। তা দাঁড়িয়ে কেন মা, বসো।

হাত ধরে তাকে একখানা সোফায় বসাই, নিজেও একখানায় বসি।

—তোমরা কটি ভাইবোন, মালতী?

—আমিই একা।

—তুমিই একা? তা বেশ। বাবা মা ভাল আছেন?

—বাবা তো নেই।

—সে কি?

—হ্যাঁ, বছর কয়েক আগে রায়পুরে এক মোটর এ্যাকসিডেণ্টে মারা যান তিনি।

—বলকি? এ সব ত আমি কিছুই শুনিনি। বড়ই দুঃখের কথা মা, বীণা এখন কোথায়?

—মা কলকাতাতেই আছেন, তবে তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছেনা।

—কেন, কি হয়েছে?

—বছর খানেক হলো টি. বি.তে ভুগছেন, এখন হাসপাতালে রয়েছেন।

একের পর এক করে দুঃখের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে বসে থাকি আমি। আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতেও যেন ভরসা হয়না। তবু বলি, বীণা এখন আছে কেমন ?

—মোটেই ভাল নয়, ডাক্তার একরকম আশা ছেড়ে দিয়েছে।

আর বলতে পারেনা মালতী ; মুখের কথা তার মুখেই আটকে থাকে। গণ্ড বেয়ে দু ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়ে সেই সঙ্গে।

আমিও নির্ব্বাক।

বীণা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। দুজনে পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতুম। ছেলেবেলায় কতদিন তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়িয়েছি। তারপরে দুজনেই বড় হলাম। আমি যখন কলেজে পড়ি বীণার তখন বিয়ে হলো। বীণার বাপের অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা, কিন্তু সে নিজে ছিল পরমাসুন্দরী এবং তার রূপ দেখেই তার শ্বশুর তাকে হীরে মুড়িয়ে নিয়ে যান। বিয়ের পরের দিন সে আমার কাছে বিদায় নিতে আসে—সে বিদায়ক্ষণটুকু আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। মনে পড়ে একদিন তাকে কথা-চ্ছলেই বলেছিলাম, দেখ, বীণা তোর যদি কোনদিন মেয়ে হয় তবে আমায় জানাস, আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব তার।

একেবারে তুচ্ছ ছেলেমানুষী কথা।

তারপর তিরিশ বছর কেটে গেছে, ইতিমধ্যে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তার যে এতসব বিপর্য্যয় ঘটে গেছে, সে খবরও আমি কোনদিনও পাইনি, সেদিন মালতীর মুখেই যা কিছু শুনলাম।

মালতী আজ এখানে কেন এসেছে সেটা আমি অনেকটা অনুমান করতে পারি, কে তাকে পাঠিয়েছে তাও আমি জানি, বীণা নিশ্চয়ই। মায়ের মন, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে হয়ত দিবারাত্র তার মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, তার অবর্ত্তমানে কে তাকে দেখবে ? কে তার দায়িত্ব নেবে ? এই সব ভাবতে ভাবতেই সে হয়ত চলে গেছে তার অতীতের দিনে—তখনই মনে পড়েছে আমাকে, মনে পড়েছে আমার দেওয়া সেই ছেলেমানুষির কথা। আশার ক্ষীণ আলো দেখেছে সে, তাই সে পাঠিয়েছে মালতীকে আমার কাছে।

এটা আমার নিছক অনুমান, আবার কিছু নাও হতে পারে। সে যাইহোক বীণা আজ অসুস্থা, সত্যকারের বিপন্না, বন্ধুত্বের দাবীতে সে যদি কিছু আশা করে, সেটুকু আমার যথাসাধ্য করতেই হবে। মৌনতা ভঙ্গ করে বলি, তোমার মাকে একদিন দেখতে যাব, মালতী।

'নিশ্চয়ই যাবেন'—মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে মালতী। গেলে মা খুব খুসী হবেন, প্রায়ই আপনার কথা বলেন তিনি। কতদিন আপনাকে খবর দিতে বলেছেন—কিন্তু আপনার ঠিকানাটা ত জানতুম না, তাই আসতে পারিনি।

—আমার ঠিকানা কে তোমায় দিলে ?

—হাসপাতালের একজন ডাক্তার।

—তোমার মা কি এখন যাদবপুরে আছেন ?

—হাঁ।

—বুঝেছি এবার।

কিছুদিন আগে ওই ডাক্তারের মেয়ে দেখতে গিছলাম আমি। কিন্তু বেজায় মোটা বলে শ্রীমতী মেয়ে পছন্দ করেন নি।

চুপ করেই ছিলাম, মালতী দেখি যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

—আজ তাহলে উঠি।

—সেকি ! এর মধ্যেই যাবে। একটু চা টা খেয়ে যাও।

—আজ নয়, আর একদিন এসে খাব—আজ আমার বেজায় দেরী হয়ে গেছে, এখুনি আমাকে টিউসানিতে যেতে হবে।

—তুমি টিউসানি কর ?

—না করে উপায় কি বলুন ? একটা চাকরীও করি। তা নাহলে আর মায়ের চিকিৎসা হবে কি করে ?

মালতী চলে গেছে, কিন্তু এর মধ্যেই সে আমার মনে এমনি একটি রেখাপাত করে গেছে যা হয়তো কোনদিনও মুছতে পারবোনা আমি। মালতী শুধু আমার মেয়ের মত নয়, সত্যিই সে আমার নমস্যা।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আমার অনুমান একে-বারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বীণাকে দেখতে গেলে বীণার প্রথম কথাই হলো তাই।

'অজিত দা, তুমি যে আসবে সে আমি জানতুম। আশা করি তুমি তোমার কথাও রাখবে।'

কি বোঝাই তাকে ? সে ত জানে না সেদিনের আমি—আর আজকের আমির মধ্যে কত তফাৎ। সেদিন ছিলাম আমি একা, আজ আমার সঙ্গে রয়েছে আমার স্ত্রী, আমার পুত্র। তাদেরও একটা মতামত থাকতে পারে, থাকলে সে-গুলোকেও সহজে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারবেনা। যুগও পাল্টে গেছে এখন।

তবু বীণার সেই রোগশীর্ণা মুখখানার পানে তাকিয়ে আমার চোখে জল আসে, তার মুখের করুণ আবেদনটুকুও আমার হৃদয় স্পর্শ করে। তাই তাকে একটু আশ্বাস দিয়ে বলি, তুই কিছু ভাবিস না বীণা, আমার দিক থেকে যেটুকু করবার আমি ঠিকই করবো।

সামান্য একটা মুখের কথা, তাতেই যেন তার মুখের রঙ পাল্টে যায়।

আর বেশীক্ষণ বসতে পারিনা সেখানে। আশঙ্কা হয়, পাছে যদি আরও কিছু বলে ফেলি। নিঃশব্দে পালিয়ে আসি সেখান থেকে।

এর পরেও কয়েকদিন মালতী আমার কাছে এসেছে। শ্রীমতীও তাকে খুব আদর যত্ন করেছেন। স্বীকারও করেছেন এমন সুন্দরী মেয়ে তিনি আগে কখনও দেখেন নি। তবু আমি চুপ করেই ছিলাম, কথাটা কিছুতেই উত্থাপন করতে পারিনি তাঁর কাছে, কেমন যেন একটা বাধা এসেছিল আমার মনে।

একদিন সাহস করে কথাটা বলেই ফেললাম।

—মালতীকে তোমার পছন্দ হয় মালা ?

শ্রীমতী তখনই তার কোনও উত্তর দিলেন না, বেশ একটু চিন্তা করতে থাকেন তিনি। অনেকক্ষণ বাদে দুঃখ-সহকারেই বলেন তিনি, এটা যে আমার মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু দেখছি এ হবার নয়।

—কেন বলোত ?

—বিয়ে দিয়ে কি শেষে রোগ ডেকে আনবো। জানই ত ওর মায়ের টি. বি।

এইটেই আশঙ্কা করেছিলাম আমি। জানতুম মালতীকে শ্রীমতীর পছন্দ নিশ্চয়ই হবে, শুধু বাধবে ওই এক জায়গায়। এর জন্য তাকে আমি মোটেই দোষ দিইনা, বীণাকেও না, নিজের মেয়ের মুখ চেয়েই অনুরোধ করে সে, শ্রীমতীও অরাজি শুধু তাঁর পুত্রের কল্যাণে। শ্রীমতীর স্বার্থে আমিও জড়িত, অতএব এ নিয়ে আর তাকে কোন অনুরোধ করতে পারলাম না।

বিপদে পড়লাম শুধু বীণাকে নিয়ে। তাকে এখন কি বলি। সেত নিশ্চয়ই আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। মালতীকেও হয়ত এর কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। যদি দিয়ে থাকে, তবে কি সেই ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েটির প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে না ? এদিকে আমিও বাপ, জেনে শুনে ছেলেকে মৃত্যুর পথে এগিয়েই বা দিই কি করে ?

দিবারাত্র ওই সবই চিন্তা করি, কিন্তু কোন একটা মীমাংসা করতে পারিনা। শেষকালে একদিন মনে জোর ধরলুম, ঠিক করলুম যাহোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে আমাকে। এ নিয়ে আর কাউকে আমি আশার মধ্যে রাখবোনা। ঠিক করলুম আমিও মিথ্যার আশ্রয় নেব—অন্যায় কিছু নয়, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকেও একদিন এই পথ নিতে হয়েছিল। আমিও নিলাম। বীণাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ছেলে নিজেই দেখে শুনে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, অতএব এর মধ্যে আর আমার কোন কথা চলেনা। তুই দুঃখ করিসনা কিছু।

মালতীও এরপরে আর এসেনি।

সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় না কোনদিন। বীণার সেই রক্তশূন্য মুখখানা প্রায়ই মনে পড়ে, মনে পড়ে মালতীকে। নিজের মনের আগুনে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরি দিবারাত্র।

সেদিন সকালে বাইরের ঘরে একাই বসেছিলাম, চাকর এসে ঢুকলো, হাতে একখানা টেলিগ্রাম।

চমকে উঠি। বীণার কিছু হয়নি ত, মালতীর ? না, টেলিগ্রামখানা, খুলে দেখি খোকনের। শ্রীমতীও এসে ঘরে ঢুকলেন।

—কার টেলিগ্রাম ?

—খোকনের।

—খোকনের ? কি খবর ?

—ভালই, কাল সকালে সে প্লেনে আসছে। তোমাকে দমদমে যেতে বলেছে।

—সেকি ? হঠাৎ সে চলে আসছে ?

—হ্যাঁ, সঙ্গে তার স্ত্রীও আছে। এক ইংরেজ ললনাকে বিয়ে করেছে সে। ভারী সুন্দর দেখতে নাকি ?

শ্রীমতী মূর্চ্ছা গেলেন। আমারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো।

বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, [illegible]

বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে পূর্বে বাঙ্গালী জাতি ও তাদের মাতৃভাষার যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ নেই—স্বাধীন ভারতে এই জাতি ও তাদের মাতৃভাষা দিন দিন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। কেবল-মাত্র দেশ বিভাগের অভূতপূর্ব পরিস্থিতি এর জন্যে দায়ী নয়। বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার ওপর এমন কতকগুলো বিশেষ ধরণের চাপ আজ পড়েছে, যে সমস্তর অস্তিত্ব ইংরেজ আমলে ছিল না। আর এই চাপ প্রধানতঃ আসছে ভারতের বর্তমান শাসকদলের তরফ থেকে।

ইংরেজ আমলে বাঙ্গালী

স্বাধীন ভারতের বাঙ্গালী অপেক্ষা বৃটিশ ভারতের বাঙ্গালী খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও কর্মদক্ষতায় বেশী অগ্রগণ্য ছিল—একথা সর্বজনবিদিত। কি দুঃসাধ্য শাসন-সংস্কারে, কি দায়িত্বশীল সংগঠন কাজে, বাঙ্গালী মনীষা তখন অপরিহার্য ছিল। দেশকে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিত বাঙ্গালী। নতুন নতুন ভাবধারা ও নতুন নতুন কর্মের চেতনায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করত বাঙ্গালী। রাজনীতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে ভারতের যে কোন প্রদেশের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রণী ছিল বাংলা। এই সমস্ত লক্ষ্য করে মহামতি গোখলে বলেছিলেন—Bengal is the brain of India. What Bengal thinks today India thinks to-morrow মুক্তিযুদ্ধেও দেখা গিয়েছে প্রত্যেক স্তরেই বাংলা যা বলেছে, যা করতে চেয়েছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ প্রথমে বাধা দিয়ে শেষে সেটিই গ্রহণ করেছে। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালীর এই উন্নত প্রতিভাকে যথা-যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাই সরকারী বিভাগের সর্বোচ্চ পদগুলোর অধিকাংশই তখন বাঙ্গালীদের দেওয়া হত। ইংরেজ আমলে বড় বড় সরকারী পদগুলি পিছনের দরজা দিয়ে সুপারিশের জোরে পাওয়া যেতো না, যেমন এখন পাওয়া যায়। শিক্ষা, কর্মক্ষমতা ও সততার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে মোটা বেতনের চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যেতো না বৃটিশ ভারতে। এইজন্য অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন বাঙ্গালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা তাদের হিংসা করত।

রাজনীতিক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে বাংলার নেতারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতাদের চেয়ে বড় ছিল রাজ-নীতিতে এবং বাংলার নেতাদের পরামর্শ যেখানে গ্রহণ করা হয়নি, সেখানেই দেশ ও জাতির অকল্যাণ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন ইউরোপে মহা-সমরের কালাগ্নি প্রজ্জলিত, দুর্দ্ধর্ষ জার্মণ জাতির ভয়ে ইংরেজ জাতি ত্রস্ত, তখন সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীকে বললেন —ইংরেজকে যুদ্ধে সাহায্য করার পরিবর্তে যদি দেশব্যাপী আন্দোলন করে বিব্রত করা হয়, তবে, তারা (ইংরেজ জাতি) ভারত ছেড়ে পালাবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে। মহাত্মাজী যদি এই বঙ্গনেতার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, তবে অতি সহজে দেশ স্বাধীন হত। কিন্তু জাতির জনক, নেতাজীর এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন না, যার ফলে আপোষে স্বাধীনতা আনতে গিয়ে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হল, ভারতের বুকে পাকিস্তান নামে ঐসলামিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল এবং খণ্ডিত ভারতে হিন্দুদের অবস্থা হয়েছে কণ্টকশয্যার পর শূলশয্যায় শয়নের মত, শাসকদল', সাম্যবাদীদল ও মুসলমান, এই ত্রিশক্তি হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে ওঠে পড়ে লেগেছে। এইরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গনেতার পরামর্শ উপেক্ষা করে সর্ব-ভারতীয় নেতারা চলতে গিয়ে দেশ ও জাতির অকল্যাণ করেছেন।

স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী

স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজ নয়, কংগ্রেস। এখানে যোগ্যতার মাপকাঠি আলাদা। এখানে ইংরেজ আমলের মত শুধু গুণের দ্বারা কর্তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না, এখানে উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্যে, সাফল্য অর্জনের জন্যে সোজা পথে না চলে বাঁকা পথে চলতে হয়, স্পষ্ট কথা না বলে চাটুবাক্য বলতে হয় এবং সুপথে না চলে কুপথে চলতে হয়। যে সমস্ত বাঙ্গালী উক্ত উপায়ে চলতে পারে না, তোষণতা জানে না, তারা সকল প্রকার যোগ্যতা সত্ত্বেও চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পাত্তা পাচ্ছে না। আজ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর বাঙ্গালীদের আয়ের পথও প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাঙ্গালী দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছে, অথচ স্বাধীন ভারতে আজ বাঙ্গালীর যথা-যোগ্য স্থান নেই। সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবন যাপন কচ্ছে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সম্মানের সহিত বসবাস করতেও পাচ্ছে না। বিদেশী আমলে দেশী লাটের পদ বাঙ্গালীরা পূরণ করত, কিন্তু স্বদেশী আমলে বাঙ্গালীদের সহজে লাট করা হয় না। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, ডিরেক্টার, সেক্রেটারী প্রভৃতি মোটা বেতনের পদগুলোতে এখন উপযুক্ত বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। দিল্লীর সরকারী দপ্তরগুলোতে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা দশজনও নেই। অথচ উচ্চশিক্ষিত ভারত-বাসীর শতকরা কুড়িজনেরও বেশী বাঙ্গালী এবং দেশের জন্যে যারা জীবন দিয়েছে বা সর্বস্বান্ত হয়েছে, তাদের শত-করা ষাটজনেরও বেশী বাঙ্গালী। যে স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গালী আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজদেশে পরবাসী হয়েছে, সেই স্বাধীনতার জন্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাঙ্গালীরা শুধু আরম্ভ করেনি, সংগ্রামের প্রথম অনেক বছর বাঙ্গালীরা একপ্রকার একাই লড়েছে, বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকিররা পর্যন্ত এক-টানা চল্লিশ বছর ধরে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে; পরবর্তীকালে বাঙ্গালীরা অনেকের সহায়তা পেয়েছে, কিন্তু বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ-কল্পে আপোষ-বিরোধী সংগ্রাম তারা একাই পরিচালনা করেছে। সে সংগ্রামে যারা বিরোধিতা করেছিল, যারা সুবিধাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারা আজ ইংরেজের নিকট হতে খণ্ডিত ভারত উপঢৌকন পেয়ে বাঙ্গালীর মনিব হয়ে বসেছে। এর চেয়ে নিয়তির নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে? বাংলার জনমতের আজ কোন মূল্য নেই, বাঙ্গালীর আস্থাহীন ব্যক্তিদের মন্ত্রী করে বাঙ্গালীদের নিশ্চিহ্ন করবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হচ্ছে; বাংলার জনমতের বিরুদ্ধে বাংলার অবিচ্ছেদ্য হিন্দু-প্রধান বেরুবাড়ী অঞ্চল পাকিস্তানকে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা এবং এইভাবে কয়েক হাজার বাঙ্গালী হিন্দুদের পাকিস্তানের কবলে ঠেলে দেওয়ার আয়োজন, এইরূপ পরিকল্পনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী প্রতিভাকে উৎসাহ দেওয়ার লোক নেই, সরকারী স্তরে বাঙ্গালী প্রতিভার কদর নেই, স্বীকৃতিও নেই, এবং বাঙ্গালীদের (বঙ্গ-ভাষাভাষী হিন্দুদের) নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে ও ভারত ইউনিয়নভুক্ত বাংলার এই অবশিষ্ট অংশ মানচিত্রের পৃষ্ঠা থেকে লোপ করবার জন্যে ঘরে বাইরে চক্রান্ত চলেছে। অবস্থা দেখলে মনে হয়, স্বাধীন ভারতে বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাবে, যদি নতুন কোন উদার ও উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা না হয়।

বাংলা ভাষা

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা হল সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর ভাষা, কিন্তু ইহার যথাযোগ্য মর্যাদা আজ স্বাধীন ভারতে নেই। ভারতের জাতীয় মহাসভা "হিন্দী" ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার গৌরবদান করেছেন। এই হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দীও নয়, উর্দুও নয়, ইহা অতীত যুগের মোগল শিবিরে কথিত হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে উদ্ভূত চলিত ভাষা। ইহা কোন মর্যাদা পাওয়ার উপযোগী নয় এবং বাংলাভাষার সমকক্ষও নয়।

কিন্তু এই মধুর ও সুন্দর বাংলা ভাষা আজ উপেক্ষিত কেন? বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী কি অচল? বাংলা সাহিত্যের দাবী কি প্রণিধানযোগ্য নয়? উত্তরে বলা যায়—সমগ্র ভারতে সাহিত্য হিসাবে বাংলার দাবী অগ্রগণ্য ও অবিসংবাদী। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা শিখিতে প্রতিপদে কি ব্যাকরণের জটীল সূত্র জানা প্রয়োজন? উহা

আদৌ প্রয়োজন নহে, অপর পক্ষে হিন্দীভাষা ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয় প্রশ্ন, হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যা বাংলা-ভাষাভাষীর তুলনায় বেশী না কম ? হিন্দীর সমর্থকগণ বলেন, হিন্দী-ভাষীরই সংখ্যা অধিক। কিন্তু আদমসুমারির তালিকা গ্রহণ-যোগ্য নয়। ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, উক্ত তালিকায় পৌরবী হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দী আলাদা ভাবে না দেখিয়ে একত্রে দেখানো হয়েছে। হিন্দী বলিলে পশ্চিমী হিন্দী ভাষাভাষীদের সংখ্যা মাত্র বুঝায়। তাহার ওপর এলাহাবাদ,পাঞ্জাব ও বিহারকে পশ্চিমী হিন্দী ভাষা-ভাষীবলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিহারীর সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সাদৃশ্যই অধিক। তার ওপর উক্ত তিন প্রদেশের বহুলোক উর্দু ভাষাভাষী। অপর পক্ষে বাংলা-দেশ ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বহু পরিমাণে বাংলা-ভাষাভাষীর অস্তিত্ব আছে। অধিকন্তু উড়িয়া, মাগধী মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সহিত বাংলাভাষার সম্পর্ক নিকটতম। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় তেরো কোটি এবং হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র চার কোটি বা তার কিছু বেশী। এই সমস্ত বিবেচনা করলে ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলাভাষাই হল শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ইহাই একমাত্র যোগ্যতা রাখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীদের মত বাংলা ভাষাও আজ অবহেলিত, কোন মহল থেকে বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী উত্থাপন করা হচ্ছে না।

জীবনমরণ সমস্যা

বাঙ্গালীজাতির আজ জীবন মরণ সমস্যা। এই জাতিকে বাঁচতে হলে আজ কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে, দলাদলি ত্যাগ করতে হবে এবং অযৌক্তিক ভাব-প্রবণতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে। বাংলাদেশে শিক্ষার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক, কারণ শিক্ষার প্রসার লাভ হলে দেশবাসীদের বুদ্ধিবিবেচনা বৃদ্ধি পায়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লোপ পায় এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যে অকল্যাণকর, তা বুঝতে পারে। বাঙ্গালীদের ধর্ম বিষয়ে, সমাজ বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে ভেদ-প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে তারা (বাঙ্গালীরা) জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ ভুলে গিয়ে দল ও উপদলগত স্বার্থ নিয়ে কলহ করে, এই স্বভাব ত্যাগ করতে হবে। এই সঙ্গে বাঙ্গালীদের প্রকৃত প্রগতিবাদী হতে হবে, শ্রম ও কর্ম্ম, সেবা ও ত্যাগের দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হবে, স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে, স্বজাতীয়ের প্রতি হিংসা ত্যাগ করতে হবে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও স্বধর্মের প্রতি আস্থাবান হতে হবে, সাহিত্যের আদর্শ আরও উন্নত করতে হবে—নিয়মানুবর্তী, সংযমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্যে মাড়োয়ারীদের সমকক্ষ হতে হবে এবং নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। বাংলার হিন্দু মুসলমানদের বর্তমান অশেষ দুর্গতির কারণ হল বঙ্গ-বিভাগ। এই দুর্গতির অবসানের জন্যে যাতে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের ভেতর আবার ভ্রাতৃভাব জাগে, মুসলমানরা যাতে নিজেদের পাকিস্তানী মনে না করে পূর্বের মত বাঙ্গালী মনে করে, উভয় ধর্মাবলম্বী লোক যাতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অধীনে এক প্রদেশে পরিণত করতে আন্দোলন স্থরু করে ; সেভাবে নেতাদের চেষ্টা করতে হবে।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি তারদি বেগকে দরবেশের জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলি। এইভাবে সে আমার বহু বৎসর সেবা করেছে। আবার দরবেশ-জীবনে ফিরে যাওয়ার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো। সে আমার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলো। ছুটি মঞ্জুর করে কোষাগার থেকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে কামরানের কাছে দূত হিসাবে পাঠানো হলো।

গত বৎসর যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে তাদের মনোভাব কতকটা প্রকাশ করে আমি একটুকরো কবিতা লিখেছিলাম। সেইটিতে মোল্লা আলিখাঁর নামে তারদি বেগের মারফৎ তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

'হায়রে!
'হিন্দুস্থান ত্যাগ করি'
তোমরা তো গিয়েছ চলিয়া!
এ দেশের ব্যথার স্মৃতি
এখনও কি যাওনি ভুলিয়া?
সেথাকার মনোরম পরিবেশ
তোমাদের করেছিল আকুল,
ক্ষিপ্রপদে হিন্দুস্থান করি' ত্যাগ
তোমরা তাই গিয়েছ কাবুল।
যে সুখের সন্ধান তরে
সেখানে গিয়েছ।
ঘরোয়া আরাম, সুখ শান্তি
নিশ্চয় লভেছ।
এত দুঃখ, এত ব্যথা
হেথায় যদিও সহিয়াছি।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
মোরা এখনও বেঁচে আছি,—
অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যথা,
শারীরিক কষ্ট দুঃখ
এবে করেছ অতিক্রম।
জেনে রেখো একই ভাবে
আমরাও লভিয়াছি সুখ
এতটুকু নহে ব্যতিক্রম।'

আমার এগারো বছরের বয়স থেকে কখনও একই জায়গায় দুইবার রমজান উৎসব দেখি নাই। গত বৎসর আমি রমজান উৎসবের সময় আগ্রায় ছিলাম। এই প্রথা বজায় রাখার জন্য ১৩ই তারিখ রবিবার রাত্রে রমজান উৎসব পালন করার জন্য সিক্রিতে আসি। যুদ্ধ জয়ের স্মারক-সূচক উদ্যানের উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি পাথরের উঁচু মঞ্চ তৈয়ারী করা হয়। তার উপর কয়েকটি বড় তাঁবু খাটিয়ে সেখানে উৎসব উদ্‌যাপন করি। যে রাত্রে আমরা আগ্রা ত্যাগ করি, সেই রাত্রেই মির আলি চলে যায়। সে তাস খেলতে ভালবাসতো। সে কতকগুলি তাস চেয়ে পাঠায়। আমি তা পাঠিয়ে দিই।

৫ই জেল্‌কদ, শনিবার আমি অসুখে পড়ি। অসুখ সতেরো দিন ধরে চলেছিল।

এই সময়টা নানা লোকে সেখ বেজিদের সম্বন্ধে নানা কথা বলছিল। সুলতান কুলিতুর্ককে তার কাছে পাঠিয়ে বলা হয় যে কুড়ি দিনের মধ্যে সে যেন আমার সামনে হাজির হয়।

জেলহজ মাসের ২রা তারিখ শুক্রবার থেকে আমি কোরাণের একটি অধ্যায় একচল্লিশ বার পড়তে আরম্ভ করি।

'বলবো কি তার আঁখির কথা?
অথবা ভুরু তার?
আগুনের মত গায়ের রং
কিংবা কণ্ঠস্বর?
তার দেহ সৌষ্ঠবের কথা
না তার গণ্ডদেশ?

তার চুলের বাহার
না তার কটিদেশ ?'

২রা জেলহজ আমি আবার অসুখে পড়ি। অসুখে নয় দিন ভুগলাম।

২৯শে জেলহজ আমরা অশ্বারোহণে কুল ও সম্বলের দিকে প্রমোদ ভবনে বেরিয়ে পড়ি।

মহরম মাসের ১লা তারিখ শনিবার আমরা কুলে (আলিগড়) এসে পৌছাই। হুমায়ুন দরবেশ-ই-আলি এবং ইউসুফ-ই-আলিকে সম্বলে রেখে যায়। তারা একটা নদী পার হয়ে কুতুর সেরওয়ানি এবং চল্লিশজন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে এবং অনেক লোককে হত্যা করে। তারা কয়েকটি নরমুণ্ড ও একটি হাতী আমাদের কাছে কুল-এ পাঠিয়ে দেয়। তখন আমরা সেখানে ছিলাম। কুল-এ দুই দিন কাটানোর পর সেখ গুরাণের আমন্ত্রণে তার বাড়ীতে আসি। সেখানে সে তার আতিথ্যে আমাদের পরিতৃপ্ত করে এবং আমাদের সামনে উপহার দ্রব্য রাখে।

বুধবার দিন আমরা গঙ্গা নদী পার হয়ে সম্বল এলাকায় একটা গ্রামে রাতটা কাটাই। বৃহস্পতিবার আমরা সম্বলে অবতরণ করি। সেখানে দুইদিন থাকবার পর শনিবারে চলে আসি।

রবিবারে আমরা সিকেন্দারায় রাও শিরওয়ানির ভবনে পৌছাই। সে আমাদের আহারের আয়োজন করে ও নিজেই খাদ্য পরিবেশন করে। যখন আমরা ভোরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি তখন এমন ভাবটা দেখাই যেন আমি সকলকে পিছনে ফেলে একাই চলে যাব। আমি দ্রুত কদমে আগ্রার এক ক্রোশের মধ্যে একাই এসে পৌছাই। সেখানেই আমার সঙ্গীরা আমাকে ধরে ফেলে। মধ্যাহ্নে নমাজের সময় আমরা আগ্রা পৌছে যাই।

মহরম মাসের ১৬ই তারিখ আমার আবার জর এবং শারীরিক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। পঁচিশ ছাব্বিশ দিন এই জর ঘুরে ঘুরে আসে। আমি ওষুধ খেতে থাকি এবং কিছু কিছু আরাম পাই। এই সময়টা পিপাসায় ও অনিদ্রায় খুবই কষ্ট পাই।

আমরা অসুখের সময় দুই একটি চতুষ্পদী কবিতা রচনা করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই :—

'দিনের বেলায় ভুগি প্রবল জ্বরে
নিশীথে যায় আঁখির নিদ্ দূরে।
যন্ত্রণা আর সহিষ্ণুতা পাশাপাশি রহে।
একটা যদি কমতে থাকে আর একটি বাড়ে।

সফর মাসের ২৮শে তারিখ শনিবার আমার দুই পিসিমা ফকর-ই-জাহান বেগম ও খাদিজা-সুলতান-বেগম সিকান্দারায় আসেন। আমি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভার্থনা করে নিয়ে আসি।

রবিবার ওস্তাদ আলি কুলি একটি বড় কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করে। গোলাটি অনেকদূর পর্য্যন্ত যায় বটে, কিন্তু কামানটি চুরমার হয়ে যায়। তার এক টুকরার ধাক্কায় কয়েকজন আহত হয় এবং আটজন মারা যায়।

প্রথম রবিয়ল মাসের ৭ই তারিখ সোমবার সিক্রি পরিদর্শনের জন্য অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি। হ্রদের মাঝখানে একটি আট কোণা মঞ্চ তৈরী করার আদেশ দিয়েছিলাম। দেখলাম সেটা তৈরী হয়েছে। মঞ্চের ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে সেখানে একটা নেশার আসর বসানোর ব্যবস্থা করি।

সিক্রি থেকে ফেরবার পর প্রথম রবিয়াল মাসের ১৪ই তারিখ সোমবার রাত্রে চান্দেরির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য রওনা হই। তিন ক্রোশ যাওয়ার পর জলসিরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। সেখানে লোকদের যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করে রবিয়াল মাসের ১৭ই তারিখ (ডিসেম্বর ১২ই) বৃহস্পতিবার পুনরায় সৈন্য চালনা করে আনওয়ারে এসে নামি। আমি নদী পথে নৌকায় আনওয়ার ত্যাগ করি এবং চান্দওয়ার ছাড়িয়ে নৌকা থেকে নামি।

কদম কদম এগিয়ে গিয়ে আমরা ২৮শে তারিখ সোমবার কানওয়ারে প্রবেশ পথের কাছাকাছি অবতরণ করি।

রবিয়স.সানি মাসের ২রা তারিখ বৃহস্পতিবার আমি নদী পার হই। নদীর এপারেই হোক বা ওপারেই হোক সমস্ত সৈন্য পার হতে চার পাঁচ দিন দেরী হয়ে যায়। এই কয়েকদিন আমরা লুকিয়ে বেড়াই এবং আফিং খাই। কানওয়ারে যাওয়ার পথ চম্বল নদীর দুই এক ক্রোশ উজানে। শুক্রবার আমি একটি নৌকায় চড়ে এ রাস্তায় এসে পৌছাই এবং শিবিরে উপস্থিত হই।

যদিও সেখ বেজিদ শত্রুতাচরণ করছে কিনা ঠিক

বোঝা যাচ্ছে না, তবুও তার অসদাচরণে এবং কার্য্যে এটা অনুমান হচ্ছিল যে তার হয়তো শত্রুতা করার মতলব আছে। এই জন্য সৈন্যদলের মধ্য থেকে মহম্মদ আলি জংজংকে নির্ব্বাচিত করে তাকে কনোজ থেকে মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা এবং সেখানকার আমির ও সুলতানদের যেমন—কাসিম-ই-হোসেন সুলতান, বেয়াকুব সুলতান, মালিক কাসিম কুকি, বল্লমধারী আবদুল মহম্মদ ও মিনুচুর খাঁ আর তাদের ছোট বড় ভাইরা এবং দরিয়া খানিসকে আনার জন্য পাঠানো হলো যাতে তারা এক সঙ্গে বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। উপদেশ দেওয়া হলো যে তারা যেন প্রথমে সেখ বেজিদকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যদি সে দ্বিরুক্তি না করে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে যেন তাকে সঙ্গে নেওয়া হয়। তা যদি না করে তাহলে যেন তাকে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহম্মদ আলি কয়েকটি হাতি চাওয়ায় দশটি হাতি তার সঙ্গে দেওয়া হয়। তাকে যাত্রা করার অনুমতি দেওয়ার পর বাবাচুরাকেও তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

১৫২৮ সনের ঘটনাবলী

চান্দেরি যাত্রার বিবরণ

কানার থেকে দুই মাইল নৌকা যোগে যাই। ১লা জানুয়ারি রবিয়ল মাসের ৮ই তারিখ বুধবার কালপির এক ক্রোশের মধ্যে অবতরণ করি। শিবিরে বাবা কুলি আমাকে সম্বর্দ্ধনা করতে আসে। সে খলিল সুলতানের পুত্র। খলিল সুলতান সুলতান সৈয়দ খানের ছোট ভাই। গত বৎসর সে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে আসে, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে আন্দার আর মীমান থেকে ফিরে আসে। যখন সে খাস্‌করের কাছাকাছি আসে, সেই সময় সৈয়দ খান হায়দার মহম্মদকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

পরদিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি আমরা আলমখাঁর বাড়ী কুলপিতে আসি। আমাদের জন্য সে হিন্দুস্থানি খাদ্যের আয়োজন করে এবং নানা উপহার দ্রব্য দেয়।

১১ই জানুয়ারি আমরা কান্দিরে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

১২ই জানুয়ারি রবিবার চিনঃ তাইমুর সুলতানকে দিয়ে ছয় সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করে চান্দেরির বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রগামী দল হিসাবে পাঠিয়ে দিই। তার সঙ্গে যায় বেগ বাকি সিংবামি (এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক)। কুজবেগের ভাই তারদি বেগ, খাদ্য-পরীক্ষক আসিক বেগ, মোল্লা আহাক, মুসিম দুলদাই এবং হিন্দুস্থানি বেগদের মধ্যে সেখ গুরণ।

১৭ই জানুয়ারি শুক্রবার (দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৪শে তারিখ) আমরা কাটোয়ার নিকটে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। এখানকার অধিবাসীদের উৎসাহিত করে বদরউদ্দিনের পুত্রকে এই জায়গার শাসন ভার অর্পণ করি।

এই স্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে পাহাড়গুলির মধ্যে আড়াআড়িভাবে বাঁধ তৈরী করে একটি বড় গোলাকার হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে যার আয়তন প্রায় দশ বারো বর্গ মাইলের মত। এই হ্রদ কাচোয়াকে তিন দিকে ঘিরে আছে। উত্তর পশ্চিম দিকে খানিকটা জায়গা শুকনো রাখা হয় সেইখানেই কাচোয়ার প্রবেশের ফটক। হ্রদের ওপর অগণিত ছোট ছোট নৌকা—যাতে তিন চার জন লোক ধরে। যদি এখানকার লোককে কোনও কারণে পালাতে হয় তাহলে নৌকায় চড়েই যেতে হয়। কাচোয়ায় পৌছানোর আগেও দুইটি হ্রদ দেখা যায়—সেগুলো কাচোয়ার হ্রদের চেয়ে ছোট এবং এই হ্রদ দুটিও পাহাড়-গুলির মধ্যে তাড়াতাড়ি বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে।

কাচোয়ায় আমাদের একদিন অপেক্ষা করতে হয়। কারণ এইখানে কয়েকজন কর্ম্মক্ষম ওভারসিয়ার ও মাটি কাটার লোকদের রাস্তা সমতল করা ও জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কাচোয়া এবং চান্দেয়ারির মধ্যে স্থানগুলি জঙ্গলাকীর্ণ। ১৯শে জানুয়ারি আমরা কাচোয়া ত্যাগ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একরাত্রি বিশ্রাম করি। তারপর বুরহানপুর অতিক্রম করে চান্দেরি থেকে ছয় মাইল দূরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

চান্দেরি দুর্গ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তার নীচে সহর এবং বহির্দুর্গ। তারও নীচে সমতল রাস্তা—যার উপর দিয়ে গাড়ী চলাচল করে। যখন আমরা বুরহানপুর ত্যাগ করি সেই সময় (২০ই জানুয়ারি) গাড়ী চলাচলের সুবিধার জন্য চান্দেরির দুই মাইল নীচের রাস্তা দিয়ে যাই।

২১শে জানুয়ারি একটা রাত বিশ্রামের পর আমরা অগ্রসর হয়ে বাজাত খাঁয়ের পুকুরের পারের ওপর দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৮শে তারিখ মঙ্গলবার এসে পৌছাই।

২২শে জানুয়ারি—প্রত্যুষে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দেওয়াল-ঘেরা সহরের চারদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ, বামে, মধ্যস্থলে ঘাটি স্থাপন করি। ওস্তাদ আলি কুলি প্রস্তর গোলা নিক্ষেপের জন্য একটি জায়গা নির্ব্বাচিত করে। মজুর ও ওভারসিয়ারদের সেই নির্ব্বাচিত স্থান উচু করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—যার ওপর কামান স্থাপন করা হবে। সমস্ত সৈন্যদলকে দুর্গ অধিকার করার জন্য যন্ত্রপাতি, মই ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আদেশ করা হয়।

পূর্ব্বে চান্দেরি মাণ্ডু সুলতানদের অধীনে ছিল। যখন সুলতান নাসিরুদ্দিন মারা যান (তিনি ১৫০০-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালওয়ার শাসক ছিলেন) তাঁর এক পুত্র সুলতাদ মামুদ যিনি মাণ্ডুর শাসক তিনি এর এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর অধিকার স্থাপন করেন, এবং আর এক পুত্র চান্দেরি দখল ক'রে সেকেন্দার লোদির অধীনস্থভাবে সেখানে থাকেন। সেকেন্দার লোদিও মহম্মদ সাহের পক্ষাবলম্বন করে তাঁর সাহায্যের জন্য বিশাল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। মহম্মদ সা সুলতান সেকেন্দারের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। তিনি আমেদ সা নামে এক নাবালক পুত্র রেখে সুলতান ইব্রাহিমের রাজত্ব কালে মারা যান। সুলতান ইব্রাহিম আমেদ সাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর একজন নিজের লোককে চান্দেরির শাসক নিযুক্ত করেন। যে সময় রাণা সঙ্গ সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে এবং ইব্রাহিমের অধীনস্থ বেগরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে—সেই সময় চান্দেরি রাণার হাতে যায় এবং রাণা চান্দেরির শাসন ভার মেদিনী রায়ের ওপর অর্পণ করে। রাণার বিশ্বাসভাজন এই বিধর্ম্মী মেদিনী রাও চার পাঁচ হাজার বিধর্ম্মীর সঙ্গে এইখানে ছিল।

জানা গিয়েছিল যে মেদিনীরাও এবং আরাইস্ খাঁয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। সেইজন্য শেষোক্ত ব্যক্তিকে সেখ গুরণকে সঙ্গে দিয়ে মেদিনী রায়ের নিকট অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়। তার নিকট এই প্রস্তাব করা হয় যে, চান্দেরির পরিবর্ত্তে তাকে সামসাবাদের (সংযুক্ত প্রদেশে) শাসন ভার দেওয়া হবে। কিন্তু মেদিনী রায়ের দুই একজন বিশ্বস্ত অনুচর এই আপোষ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে—যার ফলে কোনও মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যায় না। হয়তো মেদিনী রায়ও এই আপোষ প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, অথবা তার দুর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অজেয় এই ভ্রান্ত গর্ব্বে সে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

প্রথম জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ (২৮শে জানুয়ারি) মঙ্গলবার আমরা বাজাত খাঁয়ের পুষ্করিণীর তীর থেকে চান্দেরি দুর্গ আক্রমণের জন্য সৈন্য চালনা করি। দুর্গের নিকট একটি পুষ্করিণীর পাশে এসে ভূমিতে অবতরণ করি।

এই দিনই সকালে মাটিতে পা দেওয়ার পরই খলিফার চিঠি নিয়ে আসে ; তার মর্ম্মটি হচ্ছে—পূর্ব্ব দিকে যে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তারা অবিবেচকের মত যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে এবং লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে কনৌজে গিয়েছে। বুঝলাম এই পরাজয়ের সংবাদে খলিফা অত্যন্ত বিচলিত ও শঙ্কিত হয়েছে। তার মনের ভাব বুঝে আমি বল্লাম—ভয়ের বা অস্থির হওয়ার মত কোনও কারণ ঘটেনি। আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই সম্পন্ন হয় না এবং যা তিনি আগের থেকে ঠিক করে রেখেছেন তা ঘটবেই। এখন চান্দেরির ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। যে সব কথা আমাদের বলা হলো—সে কথা আর যেন উচ্চারিত না হয়। আগে আমরা দুর্গ আক্রমণ করবো। এই কাজ শেষ হলে দেখা যাবে সামনেতে কি আছে।

চান্দেরি দুর্গ অবরোধের সূচনা

শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছে। তারা বহির্দুর্গে এক এক দলে দুই তিন জন লোককে রেখেছে সতর্কতার জন্য। সেই রাত্রে আমাদের পক্ষের লোক চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। শত্রুপক্ষের অল্প কয়েকজন লোক যারা বহির্দুর্গে ছিল তারা যুদ্ধ করেনি, তারা দুর্গের ভিতর পালিয়ে যায়।

প্রথম জুমাদা মাসের ৭ই তারিখ বুধবার ; ১৯শে জানুয়ারী আমার সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত হতে আদেশ দিয়ে তাদের নিজ নিজ ঘাঁটিতে উপস্থিত থেকে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে নামবার প্ররোচনা দিয়ে আক্রমণ সুরু করতে বলে

আমি যুদ্ধ-ডঙ্কা ও পতাকা নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি।

পুরাদমে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আমি যুদ্ধ-ডঙ্কা ও পতাকা ফেলে রেখে ওস্তাদ আলিকুলির প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ দেখার আমোদ উপভোগ করতে সেই দিকে চলে আসি। এই গোলা নিক্ষেপে কোনও ফল লাভ হলো না, কারণ কামান ঠিক জায়গায় বসানোর স্থান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দুর্গ দেওয়াল আগা গোড়া পাথরে তৈরী থাকায় খুবই মজবুত ছিল।

চান্দেরি দুর্গ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই পাহাড়ের একপাশে নীচ দিয়ে দুই দেওয়াল ঘেরা একটা রাস্তা (দুতাহি) গিয়েছে জলাশয় পর্য্যন্ত। আমাদের আক্রমণ চালানোর এই একটি প্রধান স্থান। এই জায়গাটি আমার দক্ষিণ ও বাম দিকের এবং কেন্দ্রের রাজকীয় সৈন্যদের প্রধান ঘাটি বলে স্থির করা হয়েছিল। যদিও প্রত্যেক দিক থেকেই আক্রমণ স্বরু হয়েছিল তবুও বেশী ধাক্কা এইখানেই সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের সাহসী সৈন্যরা কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি, যতই না বিধর্ম্মীরা এদের ওপর প্রস্তর এবং জলন্ত আগুন নিক্ষেপ করুক। অবশেষে সা মহম্মদ ইয়ুজ বেগ 'দুতাহি' প্রাচীর যেখানে বহির্দুর্গের দেওয়াল ছুঁয়েছে সেই প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়ালো। আমার সাহসী সৈন্যরাও দলে দলে নানা স্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং এই ভাবে 'দুতাহি' দখল হয়ে গেল। এই সব ঘটনা ঘটে গেলেও বিধর্ম্মীরা কোনও বাধা দিল না। যখন আমাদের দলের লোক দুর্গ প্রাচীরের ওপর ভিড় করলো, তারা দ্রুত পালিয়ে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে আমাদের অনেক সৈন্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য করলো। তারা দুর্গ প্রাচীরের ওপর দিয়েই তাদের তাড়িয়ে এনে কতক লোককে কেটে হত্যা করলো। তারা কেন প্রাচীর থেকে সহসা প্রথমে সরে গিয়েছিল, তার কারণ হয়তো এই যে—পরাজিত হতে হবে এই আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে যারা মনস্থির করে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করে তারাও হয়তো তাই করেছিল। তারা দুর্গের ভিতর গিয়ে সমস্ত মহিলা ও সুন্দরীদের হত্যা করে তারপরে নিজেদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে এই কথা ভেবে নিয়ে নগ্ন দেহে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসে। আমাদের লোকেরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেককে আক্রমণ করে তাদের প্রাচীরের ওপর থেকে বিতাড়িত করলে তাদের মধ্যে দুই তিন শ' লোক মেদিনী রায়ের আবাসে প্রবেশ করে এবং সেখানে তারা প্রায় সকলেই পরস্পরকে এই ভাবে হত্যা করে। একজন তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ায়, আর অন্যান্যরা তরবারির আঘাতের জন্য আগ্রহ করে গলা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে তাদের অনেকেই নরকের পানে গমন করে।

আল্লার দয়ায় এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমার দখলে চলে আসে। কোনও রণবাদ্য বাজলো না। কোনও পতাকা উড়লো না। কোনও গুরুতর হাতাহাতি সংগ্রামও হলো না। বিধর্ম্মীদের শির দিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরী করে চান্দেরির উত্তর পশ্চিম দিকের পাহাড়ে স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হলো। এই শত্রু দুর্গ জয় করার তারিখ পাওয়া গেল এই কথাগুলির মধ্যে 'ফথ-ই-ইদর-উল-হব' (৯৩৪)। আমি তখন এই কবিতাটি রচনা করি!

'শত্রুর আবাস ছিল—চান্দিরি,
বিধর্ম্মীতে পূর্ণ ছিল—এই পুরী।
যুদ্ধ জয়ে এই দুর্গ অধিকারে এলো,
'ফথ-ই-ইদর-উল হব' জয়ের তারিখ হলো।'

চান্দেরি জায়গাটি বেশ ভাল, কারণ এর ধারে কাছে কয়েকটি জলাশয় আছে। দুর্গটি একটি পাহাড়ের ওপর। দুর্গের ভিতরে কঠিন পাথর খোদাই করা একটি জলাধার। 'দুতাহির' (দুই দেওয়ালে ঘেরা পথ) প্রান্তভাগে যেখানে আক্রমণ চালিয়ে আমরা দুর্গ অধিকার করি, একটি বড় জলাশয় আছে। চান্দেরির ছোট বড় সমস্ত বাড়ী পাথরে তৈরী। ধনীদের বাড়ী সযত্নে খোদাই করা পাথর দিয়ে আর নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীর পাথর অমন সুন্দর করে কাটা নয়। বাড়ীগুলির ছাতও মাটির টালির পরিবর্ত্তে পাথরের চাপড়া দিয়ে ঢাকা। দুর্গের সামনে তিনটি বড় পুষ্করিণী। এগুলি পূর্ব্বতন শাসকরা আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে উঁচু জমির ওপর তৈরি করেছিল। এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে বেতওয়া নামে একটি ছোট্ট নদী আছে। হিন্দুস্থানে এই নদীর জল অত্যন্ত সুপেয় বলে খ্যাতি আছে।

এই নদীটি সত্যই বেশ সুন্দর। নদীর জলের তলে খণ্ড খণ্ড পাথর আছে—যা দিয়ে ঘর তৈরী করা যায়। চান্দেরি আগ্রার দক্ষিণ দিকে হাঁটা পথে নব্বই ক্রোশ দূরে। চান্দেরি উত্তর অক্ষাংশের পঁচিশ ডিগ্রিতে অবস্থিত।

প্রথম জুমাদা মাসের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার। ৩০শে জানুয়ারি আমরা দুর্গের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে মোল্লা খাঁয়ের পুষ্করিণীর ধারে এসে ঘোড়া থেকে নামি। আমার চান্দেরি অভিযানে আমার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, চান্দেরি জয়ের পর আমরা বিধর্ম্মী অধ্যুষিত ভূমি রায় সিং, ভিলসাই এবং সারংপুর অভিযানে যাব। এইগুলি বিধর্ম্মী সালা উদ্দির অধীনস্থ রাজ্য। এইগুলি জয়ের পর রাণা সঙ্গর বিরুদ্ধে চিতোরের দিকে অগ্রসর হওয়ারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খারাপ সংবাদ আসার বেগদের আহ্বান করে তাদের সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই প্রথমে ব্যবস্থা করা উচিত। সুলতান নাসিরুদ্দিনের পৌত্র আমেদ সাকে চান্দেরির ভার অর্পণ করা হলো—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিল্লীর কোষাগারে সরাসরি পাঠাতে হবে। মোল্লা আসকারকে সৈন্য বিভাগের অধিনায়ক করে তাকে দুই তিন হাজার তুর্কি ও হিন্দুস্থানি ফৌজ দিয়ে তার সেনাবল বৃদ্ধির জন্য বলা হলো।

এখানকার কাজ সমাপ্ত করে মোল্লা খাঁর পুষ্করিণীর ধার থেকে প্রথম জুমাদা মাসের ১১ই তারিখ রবিবার উত্তর দিকে ফিরবার ইচ্ছা নিয়ে রওনা হলাম ও বুরহানপুর নদীর তীরে এসে থামলাম।

এই রবিবারেই ইয়াকুব খাজা ও জাফর খাজাকে কাল্পি থেকে নৌকা কানারের রাস্তার কাছে আনার জন্য বন্দির থেকে পাঠানো হলো।

এই মাসের ২৪শে তারিখ শনিবার কানারের পথের ধারে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি। তারপর, সৈন্যদলকে নদী পার হতে আদেশ দেওয়া হয়।

এই সময় সংবাদ আসে যে সৈন্যদলকে আগে পাঠানো হয় তারা কনোজও ত্যাগ করেছে এবং রাপরিতে এসেছে। শত্রুপক্ষের একটি সুদৃঢ় দল সামসাবাদও অধিকার করেছে যদিও আবুল মহম্মদ নিশ্চয়ই এ স্থান সুরক্ষিত করেছিল। সৈন্যদলের নদী পার হতে প্রায় তিন চারদিন দেরী হয়ে গেল। নদী পার হওয়া শেষ হলেই আমরা কনোজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই এবং একদল সাহসী সৈন্যকে শত্রুপক্ষের সংবাদ আনার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিই। কনোজ থেকে কিছু দূরে যখন আমরা পৌছাই তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের সংবাদ সংগ্রহকারী দলের কালো ছায়া দেখেই মারুফের পুত্র পালিয়ে দূরে চলে যায়। বিবর্ণ, বেজিদ ও মারুফ আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গঙ্গা পার হয়ে কনোজের বিপরীত দিকে পূর্ব্ব তীরে আমাদের রাস্তা বন্ধ করবে বলে ঘাঁটি স্থাপন করে।

শেষ জুমাদা মাসের ৬ই তারিখ বৃহস্পতিবার আমরা কনোজ অতিক্রম করে গঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে এসে অবতরণ করি। আমাদের কয়েকজন সাহসী লোক নদীর উজান ও ভাটিতে যাতায়াত করে জোর করে ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা নিয়ে আসে। ভেলা প্রস্তুতকারক, মির মহম্মদকে একটি সাঁকো তৈরী করার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে এবং সাঁকোর জন্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। সে একটি স্থান নির্ব্বাচন করে ফিরে আসে। স্থানটি আমাদের শিবির থেকে মাইল খানেক দূরে। উৎসাহী ওভারসিয়ারদের সেতু তৈরীর কাজে নিযুক্ত করা হয়। ওস্তাদ আলি কুলি তার কামান যেখানে সেতু তৈরী হবে তারই কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করে গোলা নিক্ষেপের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠলো।

বাবা সুলতান ও দরবেশ সুলতান দশ পনেরো জন লোককে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্য নমাজের সময় নৌকায় পার হয়ে যায়। তাদের এভাবে যাওয়ার কোনও উদ্দেশ্যই ছিলনা। তারা সেখানে যুদ্ধ কিংবা আর কিছুই না করে পুনরায় ফিরে আসে। তাদের নদী পার হওয়ার জন্য আমি তিরস্কার করি। মালিক কাসিম মজিদ এবং অল্প সংখ্যক লোক দুই একবার নৌকায় ওপারে যায় এবং সেখানে শত্রুর দলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে প্রশংসাজনক কাজ করে। যেখানে সেতু তৈরী হচ্ছিল তারই নীচে নদীর মধ্যে চর ভূমিতে একটি ছোট কামান স্থাপন করে গোলা বর্ষণ সুরু করা হয়। সেতুর চেয়েও উঁচু আত্মরক্ষার জন্য একটি মাটির বাঁধ তৈরী করে তার আড়াল থেকে গোলন্দাজগণ নিশানা করে কামান চালাচ্ছিল। অবশেষে মালিক কাসিম

কয়েকজন অনুচর সহ শত্রুপক্ষের একটি দলকে পরাস্ত করে বিশ্বাসের আতিশয্যে তাদের হত্যা করতে করতে তাদের শিবির পর্যন্ত অনুসরণ করে। শত্রুরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে একটি হাতি নিয়ে শিবির থেকে বেরেয়ে এসে তাকে অক্রমণ করে। তার সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে নৌকায় চড়তে বাধ্য করে। কিন্তু নৌকায় চড়ে পালাবার আগেই হাতী এসে সেই নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালিক কাসিম মারা যায়। যে কয়দিন সেতু তৈরী হচ্ছিল, ওস্তাদ আলি কুলি খুব সুষ্ঠু ভাবে তার কামান চালায়। প্রথম দিনে আটবার, দ্বিতীয় দিনে ষোলোবার, তারপর তিন চার দিন সে এই ভাবেই গোলা চালিয়ে যায়। যে কামান সে চালাচ্ছিল—তার নাম দিগ্‌গজি অর্থাৎ বিজয়ী কামান। এটা সেই কামান যে কামান বিধর্মী সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্যই কামানের ঐ নামকরণ করা হয়েছিল। এর চেয়েও আর একটি বড় কামান স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু যেটা প্রথমেই আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যায়। গোলন্দাজগণ গোলা বর্ষণের কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে চালাতে থাকে। অন্যান্যদের সঙ্গে তারা সম্রাটের দুইজন ক্রীতদাস যারা কাজ করছিল এবং ঘোড়া সহ কয়েকজন পথিককেও বধ করে।

সেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দ্বিতীয় জুমাদা মাসের ১৯শে তারিখ বুধবার ১১ই মার্চ, সেতুর অপর প্রান্তে এসে শিবির স্থাপনের জন্য তৈরী হই। আফগানরা গঙ্গার ওপর আমাদের সেতু তৈরী করার চেষ্টাকে একটা কৌতুককর ব্যাপার বলে মনে করে এবং এটাকে আবজ্ঞার চোখে দেখে। ১১ই মার্চ বুধবার সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হলে আমার কিছু পদাতিক ও লাহোরি সৈন্য সেতুপার হয়ে এলে শত্রুদের সঙ্গে একটা ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ হয়। শুক্রবার আমার নিজস্ব শিবিরের সৈন্য, আমার বাছাই-করা সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য নদী পার হয়ে আসে। আফগানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অশ্বারোহণ করে সঙ্গে হাতী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আমার সৈন্যদের আক্রমণ করে। এক সময় তারা আমার বামভাগের সৈন্যদের মনে যুদ্ধ জয় করছে এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু কেন্দ্রের এবং দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা অবিচলিতভাবে তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান করে এবং অবশেষে তারা শত্রু সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করে। দুইজন প্রচণ্ড আবেগের বশে চালিত হয়ে দলছাড়া হয়ে এগিয়ে যায়। তাদের এক জনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে শত্রুপক্ষ সেই স্থানেই বধ করে। আর একজন এবং তার ঘোড়াটিও দেহের নানাস্থানে আঘাত পায়। এই ঘোড়াটি ছিল দুর্বল ও রুগ্ন। কোনও রকমে উদ্ধার পেয়ে নিজ ঘাটির মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েই মাটিতে পড়ে যায়।

সেইদিন সাত আটটি দেহচ্যুত শির আমার কাছে আনা হয়। শত্রুপক্ষের অনেকেই তীরে এবং বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। অপরাহ্নে নমাজের সময় পর্যন্ত সঙ্ঘর্ষ প্রবলভাবে চলতে থাকে। সারা রাত্রি ধরে সেতুর উপর দিয়ে যারা নদীর অপর পারে ছিল তাদের নিয়ে আসা হয়। যদি সেই শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার অবশিষ্ট সৈন্যকে এপারে আনা যেত তাহলে হয়তো শত্রুপক্ষের সকলকেই আমাদের হাতে পড়তে হতো। কিন্তু আমার মনে এই খেয়াল চেপেছিল যে—গত বৎসর নববর্ষের দিনে আমি সিক্রি থেকে সঙ্গর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলাম—সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার এবং আমার শত্রুকে শনিবার দিন পরাভূত করি। এই বৎসরও ঠিক নববর্ষের দিনই এই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করি—সে দিন ছিল বুধবার। যদি তাদের রবিবারে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি তাহলে এই দুই যুদ্ধের ব্যাপারে দিন হিসাবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকবে। সেই জন্যই আমি সৈন্য চালনা করতে বিলম্ব করেছিলাম।

১৪ই মার্চ শনিবার শত্রুপক্ষ কোনও সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই। তারা দূরে শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবস্থান করছিল। সেই দিনই গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার এবং পরদিন সকালেই সৈন্য দলকে সেতু পার হওয়ার আদেশ দিই। প্রভাতী ডঙ্কা বাজার সময় অগ্রগামী প্রহরীদের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে, শত্রুরা পালিয়েছে। আমি চিন্ তাইমুর সুলতানকে শত্রুপক্ষের সন্ধানের জন্য সৈন্য দলের পুরোভাগে যেতে আদেশ করি এবং মহম্মদ আলি জং জং, হুসেমুদ্দিন আলি খলিফা, মুজিব আলি খলিফা, কোকি বাবা কাস্কে, দোস্ত মহম্মদ বাবা

কাস্কে এবং কিজিলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাদের এই নির্দ্দেশ দিই—যেন তারা শক্রপক্ষের পিছনে ধাওয়া করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং আমার এই আদেশ যেন তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

সকাল বেলার নমাজের সময় আমিও পার হয়ে আসি। নদীর ভাটিতে যেখানে জল কম, এমন একটা জায়গার সন্ধান করে সেখান দিয়ে উটগুলোকে পার করে আনার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। রবিবার দিন বেঙ্গারমনের এক ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ের ধারে শিবির ফেলি। শক্র-পক্ষকে পর্যুদস্ত করতে যে দলকে পাঠাই, তারা মোটেই তাদের কাজে সফল হতে পারে না! তারাও এই জায়-গাতেই এসে থেমেছিল এবং সেই দিনই (রবিবার) দুপুরের নমাজের সময় সেখান থেকে আবার যাত্রা করি। পরদিন সকালে বেঙ্গারমনের সম্মুখে একটা পুকুরের পারে এসে শিবির স্থাপন করি। সেই দিনই আমার মাতুল ছোটখাঁয়ের পুত্র তুখ্‌তে বুঘা সুলতান আমার সঙ্গে দেখা করে। শেষ জুমাদা মাসের ২৯শে তারিখ শনিবার (২১শে মার্চ) আমি লক্ষ্ণৌ পৌছাই এবং স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করে গোমতি নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করি।—সেই দিনই গোমতি নদীতে স্নান করি। জানিনা, কি কারণে, আমার কানে জল ঢোকার জন্যই হোক, না হয় ঠাণ্ডা লাগার জন্যই হোক আমার ডান কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না—যদিও সেটা খুব কষ্ট দেয়নি।

আমরা তখনও অযোধ্যা থেকে কিছুদূরে ছিলাম (অযোধ্যা নগরী গোগরা নদীর দক্ষিণ তীরে। গোগরা ও সরযূ নদীর সঙ্গম স্থানের কিছু ভাটিতে অবস্থিত)। সেই সময় চিন্‌ তাইমুর সুলতানের নিকট থেকে একটা দূত এই বার্ত্তা নিয়ে আসে যে শক্ররা সরযূ নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেছে এবং সে তার সৈন্যদল পুষ্ট করার জন্য আরও কেন্দ্রের সৈন্যদের মধ্য থেকে কাজাকের অধিনায়কত্বে এক হাজার বাছাই করা সৈন্য পাঠাই। রজব মাসের ৭ই তারিখ শনিবার (২৮শে মার্চ) গোগরা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অযোধ্যার দুই তিন ক্রোশ ওপরের দিকে শিবির স্থাপন করি। সেই দিন পর্য্যন্ত অযোধ্যার অদূরে সরযূ নদীর অপর পারে সেখ বেজিদ ঘাঁটি করে ছিল। সে আপোষ প্রস্তাব করে সুলতানের কাছে একটা চিঠি লেখে। সুলতান তার কপটতা বুঝতে পেরে মধ্যাহ্নে নমাজের সময় একজন লোককে কাজাকের কাছে পাঠায় তাকে সাহায্য করার জন্য এবং নদীর অপর পারে যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে থাকে। কাজাক সাহায্যের জন্য তার সঙ্গে মিলিত হলে তারা কাল বিলম্ব না করে নদী পার হয়ে যায়। অপর পক্ষের পনেরোটি ঘোড়া ও তিন চারটি হাতি ছিল। কিন্তু তারা তাদের ঘাঁটি রক্ষা করতে না পেরে পালাতে সুরু করে। আমার লোকেরা তাদের কয়েকজনকে ধরে মাথা কেটে ফেলে এবং সেই মাথাগুলো আমার কাছে পাঠায়। সুলতান নদী পার হওয়ার পরই বেয়াকুফ সুল-তান, তারদি বেগ, কুচ বেগ, বাবা চিরে ও বাকি সাঘা-ওয়েল নদী পার হয়ে যায়। যারা প্রথমে নদী পার হয় তারা সান্ধ্য নমাজের সময় পর্য্যন্ত সেখ বেজিদের পেছন পেছন ধাওয়া করে। সে সেই সময়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে বন্দী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। চিন্‌ তাইমুর সুলতান সেইরাত্রে একটা জলাশয়ের ধারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং মধ্যরাত্রে আবার শক্রর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। চল্লিশ ক্রোশ ধাওয়া করার পর সে এক জায়গায় এসে বুঝতে পারে যে শক্রপক্ষের পরিবার ও অনুচরবর্গ সেখানেই ছিল, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই দ্রুত বেগে পালি-য়েছে। হালকা বাহিনী নানা দলে বিভক্ত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বাকি সাঘাওয়াল এক ডিভিসন সৈন্য নিয়ে অনুসরণ করতে করতে শক্রপক্ষের কাছাকাছি এসে তাদের পরিবারবর্গ ও অনুচরদের ধরে ফেলে এবং তাদের কয়েকজন আফগানকে বন্দী করে।

অযোধ্যার এবং নিকটবর্ত্তী দেশগুলি শাসনের বিধি-ব্যবস্থা করবার জন্য ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করি। অযোধ্যার সাতআট ক্রোশ ওপরের দিকে সরযূ নদীর তীরে একটি বিখ্যাত শিকারের স্থান আছে। আমি গোগরা ও সরযূ নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য মির মহম্মদ জালেকবানকে পাঠাই এবং সে নদী পার হওয়ার জায়গা স্থির করে আসে। ১২ই তারিখ বৃহস্পতিবার, ২রা এপ্রিল শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

[এই বৎসরের অর্থাৎ হিজ্‌রি ৯৩৫ সালের ইংরাজী ৩রা এপ্রিল থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আর কোনও ঘটনা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। এমন কি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে কোনও রূপ আলোকপাত করতে পারেন নি।]

[ক্রমশঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নয়

মহাদেব অবশেষে মত দিলেন—আরো কিছুদিন আগু-পাছু করার পরে: প্রহ্লাদ বৌমাকে নিয়ে কাশী যেতে পারে বিষ্ণুঠাকুরের কাছে পুত্রবর চাইতে।

কিন্তু সংকট একটা যায় তো আর একটা আসে: প্রহ্লাদ বেঁকে বসল। যোগী বা তপস্বীর কাছে যেতে হয় পারের পারাণি চাইতে, দীক্ষা নিতে, "সংসারের চাকার তেল জোগাড় করতে নয়। সাবিত্রী অনেক কাকুতি-মিনতি করল, চোখের জলও ফেলল, কিন্তু প্রহ্লাদের ঐ এক কথা: ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন:

"এতমারাধ্য গোবিন্দং গতা মুক্তিং মহর্ষয়ঃ"—

কৃষ্ণকে মহর্ষিরা সবাই বরণ করেছিলেন মুক্তি পেতে। সাধুর কাছে কি ভক্তিমুক্তি না চেয়ে ঐহিক কোনো বর চাইতে আছে? ব'লেই বেরিয়ে গেল তুকারামের কুটীরে।

সেখানে ব'সে একমনে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল তুকারামের ছবির সামনে: "ঠাকুর! তোমার মতন মনের জোর নেই, তাই সংসারে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশই। কিন্তু তাই ব'লে এত বড় অপমান কোরো না—পুত্রলোভে যোগীর কাছে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে…"ইত্যাদি!

হঠাৎ গৌরীর অভ্যুদয়: "চল্। বৌ কান্নাকাটি করছে।"

প্রহ্লাদ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল: "দিদি! তুমি গিয়েছিলে দীক্ষা নিতে, না ছেলে চাইতে?"

গৌরী: দুইই।

প্রহ্লাদ: আমি যদি যাই শুধু দীক্ষা নিতে—তবেই যাব—নৈলে নয়।

গৌরী: আচ্ছা সে হবে। চল্ ঘরে, রাত দশটা বাজে। বৌয়ের জ্বর হয়েছে—১০৪ ডিগ্রি।

প্রহ্লাদ (চম্‌কে): একশো চার! চলো যাচ্ছি।

* * *

ফিরে এসে দেখে সাবিত্রী জ্বরের তাড়সে ভুল বকছে: "দাও ঠাকুর, দাও…নৈলে সব ডুববে…উনি বিবাগী হ'য়ে যাবেন…বেঁধে মেরো না ঠাকুর!…একটিমাত্র ছেলে…

প্রহ্লাদের চোখে জল এল। সাবিত্রী সন্তান চায়, শুধুতো নিজের জন্যে নয়—স্বামীর জন্যেও বটে। তাছাড়া গৃহ যে মেয়েদের নীড়—আর গৃহের, সংসারের কেন্দ্র কে—সন্তান ছাড়া? সাবিত্রীর জ্বর কমলে কথা দিল—যাবে কাশীতে।

কিন্তু তার পরেই ফের মন অশান্ত হ'য়ে উঠল। অনেকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সেই সন্ন্যাসীকে…শুধু দেখা নয়, এবার শুনল তাঁর গান স্পষ্ট। স্বপ্নে-শোনা গান যে এমন প্রাণকাড়া সুরে বেজে উঠতে পারে কে জানত? আর এবার গানটিরও দুটি চরণ মনে গেঁথে গেল:

বড় শুভ খনে তোমা হেন নিধি বিধি মিলায়ল আনি।'
পরাণ হইতে শত শত গুণে অধিক করিয়া মানি।
অন্যের আছয়ে আন জনা কত, আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল বলিয়া নিয়েছি শরণ আমি।

চণ্ডীদাসের এ-গানটি ও সাবিত্রীর মুখে বহুবারই শুনেছিল। স্বপ্নে এ-গানটি শুনল একটু অন্য সুরে—কিন্তু কীর্তনের উদাত্ত ঝংকারে ওর রোমে রোমে শিহরণ জেগে উঠল, চোখে ঝরল জল। এরই তো নাম আরাধনা—সব ছেড়ে তাঁকে চাওয়া। এ ও তাও চাইব, ঠাকুরকে, চাইব—এমন চাওয়াকে মান দেন না তিনি। সন্তানও চাইব, গৃহও চাইব—সর্বোপরি গৃহিণীর মন রাখতে যোগীর কাছে ধর্না দেব পুত্রার্থী হ'য়ে—গৌরী পারতে পারে—প্রহ্লাদ ওতে নেই। না না না।

ঘুম ভেঙ্গে এই সব কথাই কেবল ওকে বেঁধে। স্ত্রী কান্নাকাটি করছে বলেই কি ছুটতে হবে কাশীতে? শ্রীদাম কি দ্বারকায় গিয়ে ঠাকুরের কাছে চেয়েছিল ধন? তবে? এরি নাম কি ভাবের ঘরে চুরি নয়? গুরুর কাছে দীক্ষাও নেব, হাতও পাতব পুত্রবরের জন্যে? ধিক্! না। ও যাবে না কাশী। যাবে না, যাবে না, যাবে না।

দশ

জ্বর থেকে উঠলে প্রহ্লাদ সবকথাই বলল সাবিত্রীকে, কিছুই গোপন করল না। শেষে বলল: যদি চাও তুমি—যাও দিদির সঙ্গে। কিন্তু আমাকে আমার নিজের চোখে এমন ক'রে ছোট ক'রে দিও না।"

সাবিত্রীর চোখে জল এল। সে বলল: "অমন কথা বলে না। তুমি প্রভু, আমি দাসী। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমার দুর্বলতার জন্যে তোমাকে ছোট করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। ছেলে নাই হ'ল। শুধু তুমি মন খারাপ কোরো না—এই মিনতি।"

শুনে মহাদেবও মোটের উপর খুসিই হ'লেন। কারণ ভয়টা ছিল তো তাঁরই বেশি। বললেন সাবিত্রীকে: "তোমাদের কাশী যাওয়া স্থগিত হ'ল—এ ভালোই হয়েছে। ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আমার ভয় কেটেও কাটে না—বিষ্ণু ঠাকুরের ছোঁওয়ায় গৌরীর সংসার-বন্ধন না কাটতে পারে, কিন্তু প্রহ্লাদ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। শুনেছি তিনি মানুষকে মুগ্ধ করেন—নেচে গেয়ে ভাব-সমাধিতে কত কী মন-মজানো কথা ব'লে। কাজ নেই। বেশি লোভ ভালো না। তা ছাড়া সংসারে দেনেওয়ালা শুধু একজনই মা। চাইতেই যদি হয়—তাঁর কাছে চাওয়াই ভালো, এর ওর তার কাছে—দরবার করবে কী দুঃখে? আমি হোম করব এখানেই। দেখ না—ফল ফলবেই ফলবে। পুণায় একজন খুব ভালো তান্ত্রিক আছেন—আমার এক বন্ধুর ওখানে হোম ক'রে তাকে মকদ্দমা জিতিয়ে দিয়েছেন" ইত্যাদি।

প্রহ্লাদ শুনে মনে মনে হাসল, বলল সাবিত্রীকে: "এর নাম কি ভগবানের কাছে দরবার, না এর ওর তার পায়ে ধর্না দেওয়া?"

সাবিত্রী বুঝেও বুঝল না। তান্ত্রিকের কথা শুনে হোমে প্রার্থনা করল ঋগ্বেদের মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে তার সুরে সুর মিলিয়ে:

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাম"*

সাবিত্রীকে এই শ্লোক আবৃত্তি ক'রে হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে দেখে প্রহ্লাদ বিষম ঘা খেল। হোমের ছলে এই প্রার্থনা? ছি ছি! তা ছাড়া একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না ওকে? ও জানত না যে, মহাদেব সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পর্যন্ত দেন নি, ওকে সোজা টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন স্থণ্ডিলের কাছে। প্রহ্লাদ ক্ষোভের বশে সাবিত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে বোঝাপড়া না ক'রেই কানে আঙুল দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রায়ণী নদী পেরিয়ে এক মাইল দূরে নদীতীরে একটি নির্জন ঢিবিতে ব'সে ডাকে তুকারামকে। ডাকতে ডাকতে দুঃখে খেদে চোখে জল ভ'রে আসে। আবেগ ফুলে ওঠে দেখতে দেখতে, কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অথচ কাঁদে ঠিক কী জন্যে ঠাহর পায় না। বৈরাগ্য যাকে বলে—তা তো নেই, অথচ গৃহস্থালির ছন্দের সঙ্গেও ক্রমাগতই প্রাণের ছন্দের গরমিল হচ্ছে—ফলে তাল কাটছে, বেসুর বেজে উঠছে পদে পদে। স্ত্রীকে ভালোবাসে বৈ কি। ছাড়তে হবে ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে···অথচ কী যেন ছিল মন ভ'রে—সেটা হারিয়ে গেছে, সেই শূন্যতাই বুকের মধ্যে নড়তে চড়তে টনটনিয়ে ওঠে।

কেবল মনের মধ্যে ভেসে ওঠে গৌরীর ঘরে বিষ্ণু-ঠাকুরের ছবির কথা। কেন যে কেবলই মনে হয় কোথায় দেখেছে এ-মুখ! কিন্তু তা তো হ'তে পারে না। বিষ্ণু-

* ভূর্ভুব স্ব কে নমস্কার। পুত্রবান্ করো আমাদের।

ঠাকুর থাকেন কাশীতে, প্রহ্লাদ কখনো কাশী যায় নি, কি আর কোথাও তাঁর দর্শন পায়নি। তবু মনে হয় বড় চেনা মুখ। মীরার একটি ভজন মনে প'ড়ে যায়—কেন কে জানে—"বড়ী পুরাণী প্রীত!" হঠাৎ মনে জেগে ওঠে প্রার্থনা: "ঠাকুর! তুমি দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও তোমাকে। এ-শূন্যতা আর যে সয় না। অথচ সংসার-বন্ধন কেটে বেরিয়ে যেতেই বা পারি কই?—গুটিপোকার মতন নিজের গড়া গুটিতে আট্‌কে পড়েছি।" মনে প'ড়ে যায় কবির একটি গানের চরণ: "জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে!"

হঠাৎ দেহের মধ্যে বিদ্যুৎশিহরণ খেলে যায়—দেখেছে সে তো এই মহাপুরুষকেই স্বপ্নে। মনে প'ড়ে যায়—ডান দিকের ভুরুর 'পরে একটি বড় তিল—ফটোতেও পরিস্কার ফুটেছে। এই ছোট্ট তিলটিই যেন ওকে খেই ধরিয়ে দেয়। কে বলে তুচ্ছরা নগণ্য? সময়ে সময়ে তিলকেও তাল করা চলে বৈকি। দেখছি, এই তিলই তো তাল হ'য়ে ওকে নির্দিশায় দিশা দিল, নয় কি? তবে কি এই মহাপুরুষই তাকে পথ দেখাতে চান—তাই বার বার স্বপ্নে আসছেন?—অথচ স্বপ্ন ভাঙলে মূর্তির স্মৃতি আবছা হ'য়ে আসে, মনে হয় তিনি যেন কী বলেছিলেন—অথচ স্মরণ করতে পারে না কিছুতেই। কেন এমন হয়?

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুম আসে। ঠিক ঘুম নয়—ঘোর মতন। অম্‌নি ফের সেই মূর্তি? এবার তো আর ভুল হবার নয়—সেই উজ্জলকান্তি, শাদা দাড়ি, শাদা চুল, ডান দিকের ভুরুর উপরে সেই মস্ত তিল। বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়—শোনে এবার স্পষ্ট বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত কীর্তন—গ্রামোফোনে এ-গানই বরাবরই যে শুনেছে! স্বপ্নদৃষ্ট বিষ্ণুঠাকুর গাইছেন ঠিক সেই সুরেই:

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিনু অব মঝু হব
কোন্ কাজে!
মাধব! হামে পরিণাম নিরাশা!"

হঠাৎ দেবকান্তি কীর্তনী যেন ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওর মুখে করুণাভরা দৃষ্টি রেখে গেয়ে চললেন:

"আধ জনব হাম নীদ গোঙায়লুঁ জরা শিশু কতদিন গেলা!
নিধুবনে রমনীরঙ্গ রসে মাতলুঁ তোহে ভজব কোন বেলা!"

ওর ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মেরুদণ্ডের মূল পর্যন্ত শির শির ক'রে অসহ পুলকের ঢেউ ব'য়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদ জেগে ওঠে। কিন্তু মূর্তি মিলিয়ে গেলেও গানের রেশ কানে বাজতে থাকে:

"ভবতারণ ভার তোহারা।"

কী কান্নাই কাঁদল ও! কাঁদতে কাঁদতে বালির একটা বালিসে কখন যে ফের ঘুমে এলিয়ে পড়ে।

এগারো

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখে হুলস্থুল! হোমের পর ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় প্রহ্লাদকে কোথাও না পেয়ে সবাই ধ'রে নিয়েছে ও বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে। টেলিফোনে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে—তারা বম্বেতে খোঁজ করছে নানা জায়গায়। ব্রাহ্মণদের খাইয়ে দাইয়ে বিদায় ক'রে মহাদেব নিজে পুণায় গিয়েছেন মোটরে—প্রহ্লাদের নানা বন্ধুর ওখানে খোঁজ করতে! কোথাও প্রহ্লাদের খবর না পেয়ে সন্ধ্যায় ফিরেই দেখেন হারানিধি! তাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললেন: "না বাবা, আর করব না হোম, কথা দিচ্ছি। ছেলে না হয় নাই হ'ল—কেবল তুই চলে যাস নে রাগ করে বিবাগী হয়ে।"

রাতে সাবিত্রী ওর পায়ে মাথা কোটে: "আমার অপরাধ হয়েছে, তোমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে হোমে মন্ত্রপাঠ করা আমার উচিত ছিল না। আর কখনো হবেনা ভুল—প্রতিজ্ঞা করছি—কেবল তুমি এমন ক'রে দুঃখ দিও না।" ব'লে ওকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী কান্না!

স্ত্রীর সোহাগে আলিঙ্গনে চুম্বনে ফের নেশা জেগে ওঠে প্রহ্লাদের মনে…বিষ্ণু ঠাকুরের পদাবলীর স্মৃতি আবছা হয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়ে তার বাহু বন্ধনে। ঘুমের মধ্যে শুধু একটা সুর থেকে থেকে বেজে ওঠে: "হার মানলি? ধিক্!"

পরদিন সকালে উঠেই গৌরীর ওখানে যায়। গৌরী বিষ্ণু ঠাকুরের ছবির সামনে ফুল সাজাচ্ছিল ধূপ জেলে। ওকে দেখে উঠে বলে: "কী কাণ্ড! কোথায় গিয়েছিলি

শীতের সুরু

ফটো :
রামকিঙ্কর সিংহ

পাহাড়ি

ফটো :
সন্তোষ দাস
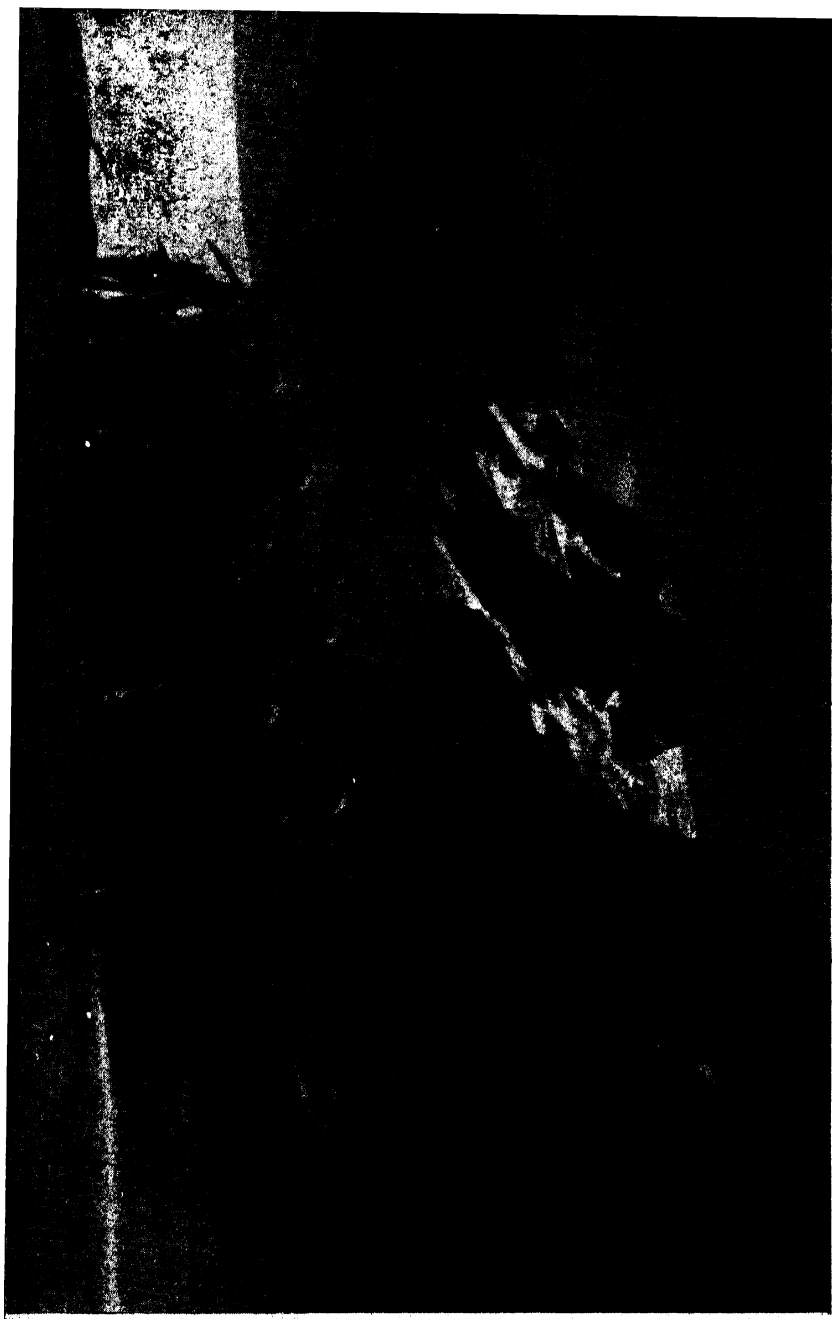
চলে? বাবা বাবা! কী যে ছেলে! আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম বুঝি বিবাগী হ'য়ে চলেই গেলি!"

প্রহ্লাদ বলে: "দাদা কোথায়?"

"গিয়েছেন বম্বে—কাজে।"

"তবে শোনো বলি দিদি—তোমাকে একা পেতেই চাইছিলাম।"

ব'লে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে—ওর নদীতীরে দর্শন ও শ্রবণের কথা।

গৌরী শুনে আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, জলভরা চোখে বলে: "বলেছিস বৌকে?"

প্রহ্লাদ দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলে: "না। ওকে ব'লে কী হবে? শুধু দুঃখ দেওয়া বৈ তো নয়। জানোই তো ও কিরকম ভয় পায় সাধু সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে।"

গৌরী একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "একটা কথা—বলতে পারি—যদি তুই কথা দিস কারুর কাছে ফাঁশ করবি না।"

প্রহ্লাদ হেসে ফেলে: "তোমাদের মেয়েদের এই কী যে স্বভাব দিদি!—সব তাতেই ফিশফিশ, চুপ চুপ্। এতে বুঝি রহস্য ঘনিয়ে উঠে কথায় দাম বাড়ে, নয়?

গৌরী (ওর গালে ঠোনা মেরে): তোর এ-ঠেশ দিয়ে কথা বলার স্বভাব আর গেল না। না শোন্—আমি গোপন করতে বলছি মন্ত্রগুপ্তিকে গুরুদেব বিশ্বাস করেন ব'লে। তিনি একদিন গল্প করছিলেন—অদিতিকে নারায়ণ বলেছিলেন—তিনি বামন হয়ে তার গর্ভে জন্মাবেন বলিকে বশে আনতে, কিন্তু একথা কাউকে বললে সিদ্ধিলাভ হবে না। বলেছিলেন ঠাকুর:

"সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্—"দেবতাদের অভিসন্ধি গোপন রাখলে কাজ হাসিল হয় সহজে। তাই বলছি শোন—(একটু চুপ করে থেকে) তুই স্বপ্নে দীক্ষা পেয়ে গেছিস্।

প্রহ্লাদ (চমকে): স্বপ্নে দীক্ষা? বলো কি দিদি?

গৌরী: হ্যাঁ রে হ্যাঁ। গুরুদেব এভাবে স্বপ্নে অনেককেই দীক্ষা দিয়ে থাকেন।

প্রহ্লাদ: যত বাজে কথা—

গৌরী: কে—র কিছুই না জেনে রায় দেওয়া? আমি কাশীতে একজনের কাছে শুনেছি—কত লোক তাঁর কাছে এই ভাবে প্রথমে স্বপ্নেই দীক্ষা পেয়েছে। গুরুদেব বলেন—স্বপ্নে দীক্ষা খুব সুলক্ষণ।

প্রহ্লাদ: কার কাছ শুনেছ আগে বলো—না বলতেই হবে।

গৌরী (একটু চুপ করে থেকে) গুরুমার কাছে।

প্রহ্লাদ: বিষ্ণু ঠাকুরের স্ত্রী?

গৌরী: হুঁ। কী চমৎকার যে ভাব তাঁর জানিস নে। তাই বলি একবার দেখেই আয় না।

প্রহ্লাদ (করুণভাবে মাথা নেড়ে): দেখে আসতে কি আমার অসাধ দিদি? কিন্তু যে-দারুণ বন্ধনে প'ড়ে গেছি—জানোই তো। একদিকে বৌ—অন্যদিকে বাবা।

গৌরী: মুখে বলতে না পারলেও বৌ ভিতরে ভিতরে তোরই দিকে—আর তুই তাকে নিয়ে যাবি কাশী—তাহ'লে—

প্রহ্লাদ (বেঁকে বসে): সে হবে না! পুত্রং দেহি ধনং দেহি মানং দেহি—এ-ভাব নিয়ে কিছুতেই সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যাব না। তার চেয়ে সংসারের বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে দুঃখ পাওয়াও ভালো। ঐহিক বর চাইব না আমি ম'রে গেলেও।

গৌরী: তোকে আমি কখন বললাম—গুরুদেবের কাছে ঐহিক বর চাইতে? লক্ষ্মী ভাই আমার, একটু মন দিয়ে শোন্ যা বলি। একটা ফন্দি করতে হবে। তুই কাশী যাবি কাউক্কে না ব'লে—শুধু বৌকে নিয়ে। রোস্ রোস্, আমার কথাটা শেষ করতেই দে, ফন্দিটা এই: তুই তো এখানে ওখানে কত সভায়ই যাস গাইতে? আচ্ছা ধর্ কলকাতায় কি পাটনায় গেলি কোনো সঙ্গীত সভায়—কনফারেন্সে। বলবি—বৌকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে চাস। কেমন তো? আচ্ছা। তারপর সেখান থেকে ফিরতি পথে কাশীতে ঢুঁ মেরে আসবি—আমি গুরুদেবকে লিখে দেব তুই যাচ্ছিস—তুই তারিখ জানালেই। সেখানে যাবি একথা বৌ জানবে, কিন্তু সে কাউক্কে বলবে না তো—তুই যদি মানা করিস? আচ্ছা। তাহ'লে এত আথাল পাথাল ভাবনা কেন শুনি? দিব্যি গেলি দুজনে মিলে। বৌ যা চায় চাক না—তোর তাতে কি? তুই তো আর ডিকটেটর নোস। ও চলুক ও র নিজের মতিতে—স্বধর্মে,

তুই চলবি তোর বিবেক মেনে। ব্যস, চুকে গেল। আসল কথাটা হচ্ছে তুই দীক্ষা নিয়ে আয়। স্বপ্নে দীক্ষা পেয়ে গেছিস যখন—তখন এতশত আগুপাছু নাই ভাবলি।

প্রহ্লাদ (খুশি হ'য়ে) : এ একটা চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছ বটে দিদি! (হেসে) সাধে বলে জটিলা কুটিলার চক্রান্তের কাছে পোলিটিশিয়ানরাও হার মানেন।

গৌরী : আ—হা!—ম'রে যাই! যেন নিজে সরলতার অবতার—ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! কিন্তু বাজে কথা থাক। আমাকে এখন যা ইচ্ছে বল্। একবার গুরুদেবকে দেখলেই বুঝতে পারবি তিনি কী বস্তু—আর তখন আমার উপাধি দিবি জটিলাকুটিলা নয়—অমলা ধবলা সরলা শ্যামলা। (তার হাত চেপে ধ'রে) সত্যি বলছি ভাই, তাঁকে দেখলে আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়, আর তাঁর পদাবলী শুনলে বুকের মধ্যে সব অশান্তির কালো গ্রন্থি গ'লে আলো হ'য়ে ওঠে। তুই কী মিথ্যে ওস্তাদি গানের বেসাতি ক'রে সময় নষ্ট করছিস? গাইতেই যদি হয় তবে এমন গান গা যার প্রসাদে ইহকালে মিলবে শান্তি পরকালে—পারানি। গুরুদেব বলেন—যা লোকদ্বয়াধনী 'তন্বভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী—সেই বুদ্ধিই বুদ্ধি, যার প্রসাদে ইহলোকে মেলে সুখ পরলোকে—শান্তি।

প্রহ্লাদ অশান্ত হ'য়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী সুরু করে। গৌরীও ওঠে। বলে : "শোন্, এত অস্থির হবার কিছু নেই।"

প্রহ্লাদ (থেমে) : কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন —তাহলে?

গৌরী : বলি নি মন্ত্রগুপ্তির কথা? তুই দীক্ষা নিয়ে ফিরে এসে তাঁকে বলবি কেন? বৌ-ও কক্ষনো বলবে না তুই বারণ করলে। আমিও পই পই করে মানা ক'রে দেব। বাইরে কাকে কী বলতে হবে—দিব্যি ক'রে রিহার্স্যাল দিয়ে তবে তাকে রওনা ক'রে দেব। তাছাড়া গুরুদেব তো সত্যিই সন্ন্যাসে দীক্ষা দেন না। তিনি গৃহস্থাশ্রমকেই সবচেয়ে বড় বলেন।

প্রহ্লাদ : তার মানে? চিরকুমার সাধকদের মন্ত্র দেন না?

গৌরী : দেবেন না কেন? তাঁর আশ্রমে দুতিনটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও সাধনা করে। একজন বানপ্রস্থীও আছেন, একজন অবধূত শিষ্যও মাঝে মাঝে এসে থাকেন, আবার ধূমকেতুর মতন বেরিয়ে যান। গুরুদেব বলেন : প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাব আলাদা, তাই তো এত নানা-রকমের দীক্ষার ব্যবস্থা আছে আমাদের শাস্ত্রে। গুরুও আধারভেদে অধিকারীভেদে নানা মুনিকে নানা মুখে রওনা করিয়ে দেন—কাউকে দেন কৃষ্ণ মন্ত্র, কাউকে বলেন শিবের উপাসনা করতে, কাউকে দেন শাক্ত দীক্ষা। কিন্তু সে পরের কথা। ওখানে একবার গেলে তাঁর শ্রীমুখের বাণীতে—তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—এক মুহূর্তে তোর সব সংশয়ের গ্রন্থি কেটে যাবে—এতশত দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রশ্ন তর্ক ফেনিয়ে উঠবে না—দেখে নিস্। শুধু যা—একটিবার ঘরে আয়। শুধু তীরে ব'সে ঢেউ গুণলে কী হবে? ঝাঁপ দিতে হবে—বলেন গুরুদেব। তোর দীক্ষা হয়ে গেছে ব'লেই বলছি একথা—নৈলে বলতাম না। যা একবার।

প্রহ্লাদ (হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে) : তুমি ঠিক বলেছ দিদি—যাব। তীরে ব'সে আর ঢেউ গুণব না। না, কোনো নাটুকে ভঙ্গি করতে একথা বলছি না। বীরও আমি নই স্বভাবে—তুমি তো জানো আমি কি রকম দুর্বল।

গৌরী : দুর্বল তুই নোস। কেবল—

প্রহ্লাদ : না দিদি। আমার মতন অব্যবস্থিতচিত্ত যারা—তারা সবল হ'তে পারে না—মনের অগোচর পাপ নেই দিদি, আমি নিজে তো জানি আমার কত গলদ। কিন্তু তবু আজ আমি মনে জোর পেয়েছি কেন শুনবে? শুধু একটি কারণে—কাল স্বপ্নে তিনি আমার মাথা ছোঁওয়ার পর থেকে আমার একটা সংশয় কেটে গেছে চিরদিনের জন্যে। আমি জানতে পেরেছি যে আমার গুরু তিনিই বটে, আর কেউ নয়! তোমাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব দিদি, যে তুমিই আমাকে প্রথম খেই ধরিয়ে দিয়েছিলে আলোর পথে?

গৌরী (চোখে জল) : ওরে প্রহ্লাদ, তোকে খেই ধরিয়ে দিয়েছেন তিনিই রে ভাই! আমি কে বল্? কতটুকু আমার জ্ঞান বা শক্তি? শুধু একটি কথা আমি জানি যা তোর জানতে এখনো বাকি আছে—যে, তুই কত বড় আধার।

প্রহ্লাদ প্রণাম করে গৌরীকে। গৌরী ওকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে, বলে : "তোকে ভাই পেয়ে ভাই তো

আমার এত আনন্দ, গৌরব রে! তুই আমাদের ঘরে এসেছিস তুকারামের প্রসাদে আমাদের সবাইকার মুখ উজ্জ্বল করতে।

বারো

প্রহ্লাদের কাছে গৌরীর উৎসাহ ও উপদেশ তৃষ্ণার জল হ'য়ে আসে। ও যেন হঠাৎ অকূলে কূল পেয়ে যায়। কাশী যাবে মনস্থির ক'রে ফিরে এসে ও পূজার ঘরে প্রার্থনায় বসে। বিষ্ণু ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করতে করতে প্রার্থনা জাগে: "তুমি আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে গেছ একথাও জানিয়ে দিয়েছ দিদির মাধ্যমে। তোমাকে কী ব'লে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব? কেবল, আমি অন্ধ, তুমি দেখিয়ে দাও। আমি অবোধ, তুমি বুঝিয়ে দাও। আমি আসক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, তুমি খুলে দাও। তোমার দেখা পাওয়া আমার চাই-ই চাই—নৈলে বল পাব কোত্থেকে? কিন্তু তুমিই সুযোগ ক'রে দাও কাশীতে তোমার চরণাশ্রয়ে কিছুদিন থাকবার। অনেক সময় নষ্ট করেছি, বিবেক আমাকে অশান্ত ক'রে তুলেছে—তীরে ব'সে ঢেউ গুণলে আর চলবে না। অথচ বাবার মনে কষ্ট দিতে বাধে, তাছাড়া সাবিত্রীও এখনো বিষম ভয় পায়। তুমিই ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমি কেবল গুরুকৃপায়ই শক্তি পেতে পারি—নিজের জোরে নয়। কেবলই তোমার গান কানে বাজছে: 'তুআ বিনা গতি নাহি আরা।' তুমি আমাকে আপন ক'রে নিয়ে চালাও—যেমন ঝড় চালায় ছিন্ন পাতাকে। যেদিকে তুমি নিয়ে যাবে সেদিকেই আমি মোড় নেব। অসহায় আমি হ'তে চাই—আজ শুধু তোমাকে সহায় পেতে।"

রাত্রেও কেবলই এই প্রার্থনা ওকে আকুল ক'রে তোলে। ঘুমের ঘোরে সাবিত্রী চমকে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরে। ও স্ত্রীকে বুকে চেপে ধরে। কিন্তু তারপরই ফের আত্মগ্লানির সুর বেজে ওঠে। এ-ক্লৈব্যের পথে—হৃদয় দৌর্বল্যের পথে—কখনো শক্তি মিলতে পারে অশক্তের? বল পেতে হ'লে প্রবল আগ্রহ চাই—ব্যাকুলতা, অভীপ্সা। সাবিত্রীর নিদ্রাশ্লথ বাহুবন্ধ থেকে নিজেকে সন্তর্পণে মুক্ত ক'রে জানলার কাছে আরাম কেদারা টেনে নিয়ে বসে। ইন্দ্রায়ণীর কলুধ্বনি ভেসে আসে। চাঁদের আলোয় ছোট ছোট ঢেউয়ে সোনার স্তম্ভ কাঁপতে থাকে। ওপারে শুকতারা জ্বলে···কী শান্ত, সুন্দর, উদাস! ওর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে: "ভবতারণ ভার তোহারা।"···

ঘুমিয়ে পড়ে এই চরণটি মনে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে। হঠাৎ আবার সেই অপরূপ মূর্তি! ফের তিনি ওর মাথায় হাত রাখলেন। বললেন: "চাইলে মানুষ পায়ই পায়। ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে!" অমনি ঘুম ভেঙে যায়। এ কী! অবসাদ কেটে গেছে! মনে বল এসেছে! যেতেই হবে কাশী। বিশ্বাস এসে গেছে—সুযোগও আসবেই আসবে, কেবল ডাকতে হবে ডাকার মতন, চাইতে হবে মনে প্রাণে।···

* * * *

কী, আশ্চর্য! কয়েকদিনের মধ্যেই ঘ'টে গেল যোগাযোগ! কলকাতার এক সঙ্গীতসভা থেকে হঠাৎ মহাদেবও প্রহ্লাদের নিমন্ত্রণ এল। প্রহ্লাদ প্রার্থনা করে আকুল হ'য়ে: পিতার যাওয়া যেন ভেস্তে যায়। আবার অঘটন! কে বলে চাইলে যোগাযোগ ঘটে না? তার এল—মহাদেবের এক প্রিয়বন্ধু কলম্বোয় নিউমোনিয়ায় মৃত্যুমুখে। অগত্যা মহাদেব বললেন প্রহ্লাদকে যে, সে আপাততঃ কলকাতায় একাই যাক, তাঁকে যেতেই হবে প্রিয়বন্ধুর কাছে কলম্বোয়। বললেন: "তুই তো একাই একশো, বাবা! যা—দিগ্বিজয় ক'রে আয়।" গৌরী শুনে উৎফুল্ল। বলল: "মামাবাবু, বৌয়ের ভারি ইচ্ছা—সেও একটু ঘুরে আসে।" মহাদেব খুশি হ'য়েই মত দিলেন: "তা বেশ তো। যাক না। আমিও তো থাকছি না এখন। বেশ হবে, ওরা ঘুরে আসুক—একটা চেঞ্জও তো হবে।" প্রহ্লাদকে বললেন: "যা, বৌমাকে নিয়ে একটু চক্র দিয়ে আয়। ওর তো বাইরে বড় একটা যাওয়া হয় না—একটু ঘুরে এলে ভালোই হবে। হাঁ, কনফারেন্সের পর দার্জিলিং ঘুরে আসিস। আমিই তোকে দার্জিলিং দেখাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন, এযাত্রা তোরাই যা যুগলে। আমি যদি পারি তো পরে উড়ে গিয়ে জুটব তোদের সঙ্গে দার্জিলিঙে।"

তেরো

মহাদেব আকাশ পথে উড়ে গেলেন কলম্বো। প্রহ্লাদ সাবিত্রীকে নিয়ে ট্রেনে গেল কলকাতায়। সেখানে কন-

ফারেন্সে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ আর সদারঙ্গী খেয়াল গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দু-তিন জায়গায় জলশা ক'রে পেয়ে যায় আশাতীত দক্ষিণা—আড়াই হাজার টাকা। সাবিত্রীকে বলল: "চলো কাশীতে দুদিন থেকে যাই।"

সাবিত্রী (আশ্চর্য হয়ে): সে কি? কাশী!

প্রহ্লাদ (একগাল হেসে ভজনের সুর ধরে): কাশী সমান নহী দ্বিতীয়া পুরী ব্রহ্ম আদি গুণ গাবত রে! মুক্তি প্রবাহ বহে যথা গঙ্গা সুর নর মুনি নিত ধাবত রে। সেখানে বিষ্ণু ঠাকুরের ওখানে থাকব, দিদি ঠিক করে দিয়েছে।

সাবিত্রী (ভয় পেয়ে): কিন্তু বাবা জানতে পারলে—

প্রহ্লাদ: বাবাকে বলছে কে? খু-ব সাবধান! ঘুণাক্ষরেও কাউকে বোলো না। দিদি তোমাকে বলে নি মন্ত্রগুপ্তির কথা?

সাবিত্রী: বলেছে, কিন্তু—ধরো, বাবা যদি কোনো সূত্রে জানতে পারেন?

প্রহ্লাদ: জানতে যদি পারেনও—মানে দুদিন পরে—ততদিনে তো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। বলব দার্জিলিঙে তাঁর সঙ্গেই যাব' পরের বার। তাহলেই খুশি হয়ে যাবেন। তাছাড়া তুমিও তো কাশী যেতে চেয়েছিলে সেদিন। যদি তুমি যা চাও পেয়ে যাও, ক্ষতি কি?

সাবিত্রী (মুখের মেঘ কেটে যায়): তুমি মত দেবে?

প্রহ্লাদ: দিদি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তোমার 'পরে জোর খাটানো অন্যায় হবে। তাছাড়া তুমি তো আর অন্যায় কিছু চাইছ না।

সাবিত্রী (গ'লে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে প্রণাম করে) ঠাকুরের কৃপা! জয় ঠাকুর!

প্রহ্লাদ: গুরুদেবের কৃপা, বলো।

সাবিত্রী: গুরুদেব?

প্রহ্লাদ তখন খুলে বলে সব কথা। স্বভাবে যে গোপনিক নয় সে কী করে মন্ত্রগুপ্তি সাধবে? সাবিত্রী ফের ভয় পায়। প্রহ্লাদ হেসে বলে: "এত ভয় কিসের? অঞ্চলের নিধি যখন তোমার নেওটা?"

সাবিত্রী (ত্রস্ত হ'য়ে): অমন কথা বোলো না। আমার মনের মধ্যে যে কতরকম দুর্ভাবনা—

প্রহ্লাদ (সাদরে): না, মা ভৈঃ। দেখবে এর ফল ভালোই হবে—মানে, আমাকে যদি বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না গো যাব না।

সাবিত্রী (ভরসা পেয়ে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে): তোমাকে বিশ্বাস করতে না পারলে কি বাঁচতে পারি আমি? তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

প্রহ্লাদ: বেশ। তাহ'লে কথা দাও বাবাকে কিছু বলবে না?

সাবিত্রী: দিচ্ছি গো দিচ্ছি। যাকে সব দিয়েছি তাকে কথা দিতে কি আমার অসাধ? মনে নেই সেই শুভদৃষ্টির দিন থেকে কী হাল করেছ তুমি আমার? (ব'লে হেসে সুর ক'রে)

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি,
মন প্রাণ দিয়া সব সমর্পিয়া হয়েছি তোমার দাসী,

আমার কেবল একটি ভয়: পাছে ফাঁসি কেটে ফাঁসি দিয়ে চলে যাও।

প্রহ্লাদ: না গো না। দিদি কি বলে নি তোমাকে যে গুরুদেব ঘর ছাড়তে বলেন না? বলে নি যে, তিনি নিজে গৃহী—তাঁর শুধু গৃহিণী না ছেলেও আছে একটি?

সাবিত্রী ভরসা পায়। শোবার সময়ে প্রার্থনা করে: "দেখো ঠাকুর! শেষরক্ষা যেন হয়।"

চোদ্দ

কাশী পৌঁছে বিষ্ণুঠাকুরের আশ্রমের কথা বলতেই টঙ্গাওয়ালা বলে: "গুরু মহারাজ? হাঁ হাঁ মালুম হ্যায়। শিবালামে বঢ়িয়া আশ্রম। চলিয়ে। নজদীগ হৈ।"

ওরা গুরু মহারাজের গঙ্গাতীরবর্তী কুটীরে পৌঁছল গুরুপূর্ণিমার আগের রাতে—শুক্লাচতুর্দশী। কৃষ্ণের মন্দির, সামনে মাঠ, উপরে শামিয়ানা প্রায় পাঁচশো ভক্ত মাটিতে সতরঞ্চের উপরে মন্ত্রমুগ্ধের ম'ত ব'সে গান শুনছে। পূর্ণিমার লগ্ন আসন্ন—তাই সুরু হয়েছে—গোবিন্দদাসের বিখ্যাত কীর্তন:

শারদচন্দ পবনমন্দ বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মধুকর ভোর নি···

প্রহ্লাদ ও সাবিত্রী টঙ্গাকে অপেক্ষা করতে ব'লে মাটিতে এসে বসতেই বিষ্ণুঠাকুরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি! প্রহ্লাদের গায়ে

কাঁটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুঠাকুর ভাবাবেশে আঁখরের ফুলঝুরি কেটে চলেন :

শুনে বাঁশরী
মধু বাঁশরী
দেখ এসেছে কত না গোপ গোপী আজ
সংসার-সুখ পাসরি'।
তারা এসেছে তোমায় বরিতে
রাঙা চরণে শরণ লভিতে,
চায় তনু মন প্রাণ সঁপিতে,
গায় : "বাঁশিসুরে কাছে টেনে নাথ, দূরে
ঠেলো না আড়ালে রহিতে"···

সাবিত্রী প্রহ্লাদের দিকে তাকায়। প্রহ্লাদের চোখে জল, মুখে হাসি, ইঙ্গিত করে ওদিক পানে। সাবিত্রী বিষ্ণু ঠাকুরের দিকে তাকাতেই গোবিন্দদাসের গান শেষ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ'রে দিলেন :

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে
তোহে বিসরি' মন তাহে সমপিনু অব মঝু হব
কোন্ কাজে ?
মাধব ! হাম পরিণাম নিরাশা···

প্রহ্লাদের বুকের রক্ত উচ্ছল হ'য়ে ওঠে···এ-গান যে মাত্র সেদিন শুনেছে ইন্দ্রায়ণী নদী তীরে অবিকল এই সুরে। সাবিত্রীর বুকে বেজে ওঠে আনন্দের ডমরু। সব বুঝেও সে ভুলে যায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এ-গানটি যে তার একটি অতি প্রিয় গান···কেবল আগে গাইত অর্থ পরিগ্রহ না ক'রে, আজ প্রথম বুঝতে পারে এর ভাব। তবু, কী আশ্চর্য !—তার ভয় কেটে যায়, জেগে ওঠে পুলক—কীর্তনীয়ার অপরূপ ভাববিহ্বল কণ্ঠস্বরে, তানে আঁখরে :

এ-তনু মন দিলাম তোমায়,
তোমারি ধন দিলাম তোমায়,
করো গ্রহণ হে শ্যামরায় !
বাঁশি মোহন কাটল বাঁধন প্রার্থি শরণ
ও-রাঙা পায়···

পনেরো

গান শেষ হবার পর প্রণামের ধুম প'ড়ে যায়। প্রহ্লাদ ও সাবিত্রী কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠে দাঁড়াতেই বিষ্ণু ঠাকুর পাশে একটি বালককে ইঙ্গিত করেন। সে ভিড় ঠেলে কাছে এসে প্রহ্লাদকে বলে : "চলুন, বাবা ডাকছেন আপনাদের।"

প্রহ্লাদ আশ্চর্য হবারও সময় পায় না, ছেলেটি ওর হাত ধ'রে "পথ দিন, পথ দিন" ব'লে হাঁক দিতে দিতে টেনে নিয়ে একটা মোটা পর্দার আড়ালে দাঁড় করিয়ে বিষ্ণু ঠাকুরকে খবর দিতেই তিনি পর্দা ঠেলে আসেন ঠাকুরের কাছে। ওরা তাঁকে গড় হ'য়ে প্রণাম করতেই তিনি হেসে বলেন : "এই যে, এসেছ তোমরা ? বেশ বেশ।" ব'লেই সেই ছেলেটিকে দেখিয়ে বলেন : "এ আমার ছেলে ধ্রুব। নে, প্রণাম করেছিস তোর প্রহ্লাদ দাদাকে ?"

ধ্রুব তার সুন্দর সরল চোখ দুটি আরো ডাগর ক'রে বলে : "ইনিই প্রহ্লাদদাদা ?" ব'লে প্রণাম ক'রে সাবিত্রীকে দেখিয়ে : "আর ইনি ?"

প্রহ্লাদ বলে : "আমার স্ত্রী—সাবিত্রী।"

ধ্রুব "ও—বুঝেছি" ব'লে নত হয়ে প্রণাম করতে যেতেই সাবিত্রী কুণ্ঠিত হ'য়ে পেছিয়ে গিয়ে ধ্রুবের হাত ধ'রে বলে : "থাক থাক ভাই, ও-ই হয়েছে।"

ধ্রুব : সে কি হয় ? আপনি আমার যে—দিদি, না বৌদি ? বাবা ?

বিষ্ণুঠাকুর : বৌদিতে কাজ কি ? দিদিই ভালো—বেশি মিষ্টি। কিন্তু এবার ওঁদের নিয়ে যা আমার ঠাকুর ঘরে।

ধ্রুব (অনিশ্চিত সুরে) : ঠাকুর ঘরে ? দুজনকেই ?

বিষ্ণু ঠাকুর (কৌতুকী সুরে) : না। দিদিকে, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে বিধবা দাদাকে নিয়ে ঘরে তোল্ টেনে।

ধ্রুব (এক গাল হেসে) : আপনি যে কী বাবা ! এমন ঠাট্টা করে কেউ বেচারী অতিথ্‌কে নিয়ে ?

বিষ্ণু ঠাকুর : তুই অমন বোকার মতন প্রশ্ন করলি, ঠাট্টা না ক'রে করি কী বল্ ?

ধ্রুব (পিঠ পিঠ) : বোকার মতন ? বা রে ! আপনি কি বলেছিলেন দিদির কথা ? তাছাড়া আপনার ঠাকুর ঘরে মেয়েদের ঢোকা বারণ না ?

বিষ্ণু ঠাকুর : সব মেয়েদের নয়। বন্দনা—

ধ্রুব : হ্যাঁ জানি। শিষ্যারা যেতে পারে। কিন্তু

বাইরের মেয়েরা যায় না কি ? আপনার খুশখেয়ালের অন্ত পাওয়া ভার। প্রহ্লাদ দাদার কথা আপনি বলেছিলেন—মানি। কিন্তু দিদির কথা—

বিষ্ণু ঠাকুর : বলি নি—কারণ ঠিক জানতাম না তোর দাদা "সস্ত্রীকং ধর্মম্ আচরেৎ" নীতি বিশ্বাস করেন কি না। (সাবিত্রীকে) অত লজ্জা পেতে হবে না মা। তুমি সুলক্ষণা মেয়ে—ভয় নেই। তবে এখানে ভিড়—কথা হবে না। আমার ঠাকুর ঘরে বাইরের লোক কেউ যায় না—তোমরা গিয়ে একটু বোসো, আমি এলাম ব'লে। হঁ্যা, তোমাদের মালপত্র ?

প্রহ্লাদ : বাইরে টঙ্গায়।

বিষ্ণুঠাকুর (একজন শিষ্যকে) : যা—ওঁদের মালপত্র সব ঐ কোণের ঘরে রেখে দে—টঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দে। (প্রহ্লাদকে) ঠিক আছে। অতিথিরা এলে এই রকমই ব্যবস্থা এখানকার। ধ্রুব! যা—দেরি করিস নি আর।

ধ্রুব "আসুন" ব'লে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ওদের দুজনকে এক লম্বা বারান্দা বেয়ে। প্রহ্লাদ সাবিত্রীকে জনান্তিকে বলে : "কী চমৎকার কথা! মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। না ?"

সাবিত্রী : সত্যি। আর কী মিষ্টি হাসি! শিশুর সরলতা মাখানো!—"ভয় নেই" বলতে না বলতে—মনে যেন ভরসা বিছিয়ে যায়। না ?

প্রহ্লাদ : ভয় তো আমার ছিল না গো। আমার শিবরাত্রির সল্‌তেও নেই।

সাবিত্রী : চুপ্ (ইঙ্গিত ক'রে) ও শুনতে পাবে।

প্রহ্লাদ : না—অনেক দূরে আছে।

ধ্রুব (ফিরে খিল খিল ক'রে হেসে) : বাবা বলেন আমার ইঁদুরের কান। সব শুনতে পেয়েছি।

প্রহ্লাদ ও সাবিত্রী এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

* * * *

[ক্রমশঃ

অবশেষে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এখন বুঝেছি আমাকে তোমার
নেই কোনো প্রয়োজন !
ভেবেছ বেচারি বড় নির্বোধ !—
সেটা কিগো নাহি জানি ?
মুখের আলাপ,—প্রাণের এ নহে,—
স্থির জানিয়াছে মন ;—
তুমি জানো তাহা,—আমিও জেনেছি ;
কি ফল বাড়ায়ে গ্লানি ?
ভালো নাহি লাগে—আদর কুড়ানো
নিলাজ কাঙাল-পারা ;
তুষ্টিবিহীন মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে,—
ভরে কিগো কভু প্রাণ ?
কে চাহে বিন্দু! কোথা কূলহারা
সাগরের বারিধারা ?
আর কাজ নেই,—এবার বিদায়—
এ লীলার অবসান !
ফুল যবে হায়, ছিল মধু-ভরা,
এসেছিলে মধু-চোর,—
কপট খুশীর উতল গুঞ্জতানে
মাতায়ে কুঞ্জতল ;

টাট্‌কা পরাগে খেলেছ হোলির
ফাগ—সারা নিশিভোর ;
এখনি ঝরিয়া যাবে যে কুসুম—
শোভা তার নিষ্ফল !
মত্তপ যথা ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে
স্ফটিক পাত্রখানি—
ফুটাইয়া তার বক্র ওষ্ঠ-কোণে
ব্যঙ্গের ক্ষীণ হাসি,—
একদা আমাকে ঐ মতো দিবে ছুঁড়ে,—
সুরু হতে সেটা জানি !
কেন তবে কেঁদে মরি বার বার ?—
জানিয়া পরেছি ফাঁসি !
আমি যে, তোমার বহু-পড়া পুঁথি,—
বড় একঘেঁয়ে তাহা !
তাই ফেলে দিলে রাবিশের স্তূপে ?—
রসকস কিছু নাই !
ভুল ক'রে চেয়েছিনু অনুরাগ
বাঘিনীর কাছে আহা !
নোংরা কাদায় খুঁজেছি স্বর্ণ,—
আক্ষেপ শুধু তাই !

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীস্মরজিৎ দত্ত

যখন সমগ্র জগৎ কামকাঞ্চনের মহাপঙ্কে নিমজ্জমান, যখন শিশ্নোদরপরায়ণতাকে মানুষ পরম ও চরম পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যখন ধর্ম্মেধর্ম্মে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে স্বার্থ-সঞ্জাত ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বহুযুগের মানবসভ্যতাকে ধূলিসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই মহাবিপ্লবের সময়, সেই ভীষণ যুগ বিপর্য্যয়ে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কেবল স্মরণীয় নহে—এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। ধংসোন্মুখ মানব সমাজকে শ্রেয়ের পথ, কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

তাঁহার অলৌকিক জীবন এবং মর্ম্মস্পর্শী বাণী এই জগতে এক বিরাট আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার অলোকসামান্য অধ্যাত্মসাধনা ও কল্যাণময়ী চিন্তা জগৎকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করিয়াছে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—

"In this age of scepticism Ramakrishna presents an example of bright, living faith, which gives solace to thousands of men and women, who would otherwise have remained without spiritual light."

ভারতের ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম জগতে বহুধাবিভক্ত অধ্যাত্ম-সাধনায় মূলপ্রবাহ। গঙ্গা যেমন তপোমূর্ত্তি হিমাদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বহু উপনদীকে স্বীয় পূতধারায় সঞ্জীবিত করিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইরূপ সনাতন ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম তপঃক্ষেত্রে ভারতভূমিতে উদ্ভূত হইয়া জগতের সকল ধর্ম্মের উপর আপন প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক অনন্তধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে বহু বিপ্লব, বহু উত্থান পতন সংঘটিত হইয়াছে। কালচক্রের মহাবর্ত্তনে সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রবাহ ঊষর মরু ক্ষেত্রে আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ।"

সেই লুপ্ত ধারার পুনরুদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। তিনি আসিয়াছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করিয়া একটি ধর্ম্মসেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য।

ঠাকুরের আবির্ভাব কালে ভারত সম্বন্ধে জগতের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার কিছুর পরিচয় আবশ্যক। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত Rudiard Kiplingএর নাম অনেকে শুনিয়াছেন। Kipling এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের পোষ্যপুত্র বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা মুখে বলিয়াছেন—

East is East: West is West,
And never the twain shall meet.

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক George Saeinsburs একবার বর্ত্তমান লেখককে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বন্ধু Kipling এর উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"But it is a pity that people try to make it otherwise."

কেন এমন হইল? ইহার পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে। যখন ভারত ও ইউরোপের পরিচয় ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছিল, যখন ভারত ও ইউরোপের সম্বন্ধ স্থায়ী হইয়া আসিতেছিল, তখন উভয় সভ্যতার মধ্যে একটা সঙ্ঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করিল। প্রাচ্যখণ্ডের সভ্যতার কেন্দ্র এই ভারতভূমিকে জগতের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বক্তৃতা, পুস্তক, চলচ্চিত্রাদির সাহায্যে "White men's burden"কে ফলাও করিয়া দেখান হইতে লাগিল।

White men's burden কি? নীলবর্ণ শৃগালের

উপাখ্যান অনেকে শুনিয়াছেন। একটি শৃগাল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এক রজকের গৃহে নীলরসপূর্ণ একটি পাত্রের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল তখন দেখিল তাহার সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বনের পশুগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তাহার গায়ের নীল রংটাকে কাজে লাগাইবার জন্য সে পশুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, পশুদিগের কোন রাজা নাই, তাই ব্রহ্মা আজ আমাকে তোমাদিগের রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন।" সেইরূপ আবহাওয়ার প্রভাবে গায়ের রং সাদা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সেই রংটাকে কাজে লাগাইবার জন্য শ্বেতকায় জাতিরা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—অসভ্য বর্ব্বর অশ্বেতকায় জাতিদিগকে সভ্য ও মানুষ করিয়া তুলিবার গুরু দায়িত্বের বোঝা ভগবান্ তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। ইহাই white men's burden.

রোম বাহুবলে গ্রীস জয় করিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার জন্য রোমকে গ্রীসেরই পদানত হইতে হইয়াছিল। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—The conquerors were conquered. ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে ভারতবিজয় করিল। কিন্তু ইতিহাসের যাহাতে পুনরাবৃত্তি নাঘটে, পাশ্চাত্য মণীষীর—"History repeats itself"—এই কথিত উক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্যই Cultural conquest অর্থাৎ কৃষ্টি বা সংস্কৃতিগত বিজয় অভিযান সুরু হইয়া গেল। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতিকে খাট করিয়া দেখানই ইহার উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিলেন। তাঁহারা জোরগলায় দেশ বিদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন যাহারা বল পূর্ব্বক বিধবাকে পোড়াইয়া মারে, মাতৃবক্ষ হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করে এবং অনুরূপ কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা কি মানুষ, না তাহারা সভ্য! আনন্দময়ী বরাভয়করা শ্যামাকে তাহারা সাঁওতালী মাগী রূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে লাগিল। ক্ষণে অক্ষণে অহর্নিশ কানের কাছে বলিত লাগিল—"তোমরা কিছু নও। তোমরা কিছু নও—আমরা তোমাদের মানুষ করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি—শ্বেত জাতি দায় বহন করিতে আসিয়াছে।" পাশ্চাতের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার উৎকট আলোকে এদেশের যুবকবৃন্দের চোখ ঝলসিয়া গেল। তাহাদের বিচার বুদ্ধি বোঝা যাইল। পরানুকরণপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। পরের মুখে ঝাল খাইয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল দেবোপম শ্বেতকায় জাতির নিকট তাহারা নিতান্তই অপদার্থ। এদিকে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, মেকলে মিলিয়া দ্বিতীয় সমরক্ষেত্র খুলিয়া দিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা ভারতবাসীকে ইংরাজভাবাপন্ন করিয়া তোলাই উদ্দেশ্য। Hindu College প্রতিষ্ঠিত হইল। দলে দলে তরুণেরা তাহাতে যোগদান করিল। শিক্ষাসচিব মেকলে লিখিলেন—"A Single shelf of a European Library is worth the whole literature of India and Arabia pad together."

মেকলে যখন বলিয়াছেন তখন উহা বেদবাক্য অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ডিরোজিত ছিলেন Hindu Collegeএর প্রধান শিক্ষক, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ণণ করে তিনিও সেইরূপ Hindu Collegeএর ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এটি একটি তর্কসভা। ইহার উদ্দেশ্য ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি—এক কথায় যাহা কিছু ভারতের গৌরব তাহাকে নিতান্ত হেয় আকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করা। সঙ্গে সঙ্গে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হইলে। তাহার নাম Athae nium. তাহারও ঐ একই মহৎ উদ্দেশ্য—ভারত কন্যকুক্ত করা। ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। হিন্দু কলেজের এক উজ্জ্বল রত্ন—নাম তাঁর মাধব চন্দ্র মল্লিক—এথিনিয়াম পত্রিকায় লিখিলেন—

If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."

জগতে যদি এমন কিছু থাকে যাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি তবে তাহা হইতেছে হিন্দুধর্ম্ম। Cultural conquest এর ঠেলাটা দেখুন! চারিদিকে ভাঙ্গ ভাঙ্গরব উঠিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। প্রবীণের দল প্রমাদ গণিলেন। মহাত্মা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্ক চূড়ামণি এই ভাঙ্গনের গতি রোধ করিতে হিম্ শিম্ খাইয়া

গেলেন। তখন সেই ভাঙ্গনের মুখে গৈরিক পতাকা হস্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ইহা হইতেই বুঝা যায়—কিরূপ কার্য্যের ভার লইয়া এবং কি পরিমাণ শক্তির পুঁজি লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ক্রমাভিব্যক্তিবাদের কথা স্মরণ করিতে হইবে। ক্রমাভিব্যক্তিবাদের ইংরাজি নাম Theory of Evolution, বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ পক্ষীপশু মনুষ্যসম্বলিত এই জীবজগৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। একটি স্থূল দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—একটি পাখী, তাহার দুইটি ডানা আছে এবং দুইটি পদ আছে। কালক্রমে ক্রমাভিব্যক্তির ফলে পাখা দুইটি পদে পরিণত হইল। তখন সে আর পাখী রহিল না। চতুষ্পদ জন্তুকে রূপান্তরিও হইল। তাহার পরও তাহার রূপান্তর ঘটীতে থাকিল। তাহার সম্মুখের পদদ্বয় ক্রমশঃ হাতের আকার গ্রহণ করিল। তখন যে বানর রূপ ধারণ করিল। বানর তাহার সম্মুখের পা দু খানির সাহায্য যেমন চলাফেরা করিতে পারে, সেইরূপ সে পা দুখানিকে হাতের ন্যায় ব্যবহারও করিতে পারে। ইহার পরবর্ত্তী উন্নততর স্তর নরমূর্ত্তি। বানরের না-হাত, না-পা রূপ অঙ্গদ্বয়- সম্পূর্ণ হস্তে পরিণত হইয়া তাহাকে দ্বিপদ ও দ্বিহস্ত বিশিষ্ট মানুষে পরিণত করিল। ইহারই নাম ক্রমাভিব্যক্তিবাদ। পুরাণে আছে—চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মানুষ জন্ম লাভ করে। এই উক্তির মধ্যে অনেক খানি সত্য নিহিত আছে। ক্ষুদ্র দান ক্ষুদ্র এমিবা (amoeba) হইতে আরম্ভ করিয়া অসীম সম্ভাব্যতাপূর্ণ মানুষের উদ্ভব ক্রমাভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ দেয়। আবার প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সহিত আণবিক যুগের মানুষের তুলনা করিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। আদিম যুগের মানুষ পশুরই প্রতিবেশী। সুতরাং পশুর জীবন-যাত্রা হইতে তাহার জীবন-যাত্রা বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। সেই পশুবৎ আচরণশীল মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশের ফলে বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া দুর্বার প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিজবশে আনয়নপূর্বক তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

মানবের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই—যুগে যুগে ক্রমোন্নতির স্তিমিত গতিকে বেগবতী করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারই নাম অবতার। প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন মত অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়। পূর্ব যুগে আগত অবতার পুরুষের কার্য্য হইতে পরবর্ত্তীযুগের অবতার পুরুষের কায্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না।" তাই আমরা অবতার ক্রমিক পুরুষদিগের মধ্যেও ক্রমাভিবাক্তিবাদের প্রসার দেখি। পুরাণবর্ণিত অবতারগণের কথা চিন্তা করিলে ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি হয়। সৃষ্টির আদিতে মৎস্যাবতার। সে সময় সমগ্র বিশ্ব জলময় ছিল। সেই প্রলয়পয়োধি-জলে বিচরণোপযোগী দেহধারণ করিয়া আসিলেন মহামীনরূপী ভগবান্। মাছের চারিখানা ডানা এবং পুচ্ছ আছে। উহাদের সাহায্যে মাছ স্বচ্ছন্দে জলে চরিয়া বেড়ায়। তাই ভগবানের মৎস্যাবতার। সৃষ্টির বীজ এবং বেদ নামধেয় জ্ঞানরাশি রক্ষা করাই তাঁহার কার্য্য। পরবর্ত্তী যুগে দেখি ভগবানের কূর্ম্মাবতার। কূর্ম্ম মৎস্য হইতে উন্নততর অবস্থাপন্ন। তাহার চারিখানি পদ আছে। সে জলেও থাকিতে পারে এবং স্থলেও থাকিতে পারে—সে উভচর। কূর্ম্মাবতারের কার্য্য ধরিত্রীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রক্ষা করা। তাহার পর ভগবানের বরাহাবতার। বরাহ চতুষ্পদ এবং দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্তু—কূর্ম্মাপেক্ষা উন্নততর ও অধিকতর শক্তিশালী ধরিত্রীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করা তাঁহার কার্য্য। ইহার পরে নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব। এই অবতারে দেখি পশু ক্রমশঃ নররূপ পরিগ্রহ করিতেছে—অর্দ্ধাঙ্গ সিংহ এবং অর্দ্ধাঙ্গ নর। অসুর বিনাশ তাঁহার কার্য্য। পরের স্তরে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যমূর্ত্তি। কিন্তু খর্ব্বাকৃতি বলিয়া তাঁহার নাম হইল বামনাবতার। তাহার পরবর্ত্তীযুগে সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট এবং পূর্ণাবয়বযুক্ত মানুষ—শ্রীরামচন্দ্র। ক্রমাভিব্যক্তির ধারা বেশ অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীরামের যুগের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের যুগের তুলনা করিলে বিরাট প্রভেদ চোখে পড়ে। বানর ও রাক্ষসদিগের মধ্যে শ্রীরামের কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল। রাক্ষস-বিনাশ তাঁহার মুখ্য কার্য্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। সুতরাং তাঁহার

কার্য্যও স্বতন্ত্র। তাঁহার কার্য্য ধ্বংস নহে, তাঁহার কার্য্য সংগঠন। প্রাকৃত-বিজ্ঞানবিশারদ শিক্ষিতাভিমানী মানুষ লইয়া তাঁহার কাজ। তাহাদের সংস্কারগ্রস্ত মনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁচে গড়িয়া তোলাই তাঁহার কাজ। ইহা যে কতবড় গুরুতর কার্য্য, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য—Cultural conquest পুরাদমে চালাইয়া জগতের চক্ষে ভারতকে খাট করিয়া দেখানর জন্য ভারতের যে চিত্র তুলিয়া ধরা হইল তাহা কতকটা এইরূপ—

"নরমাংসভোজী, নগ্নদেহ, বলপূর্ব্বক বিধবাদাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার সাপও অন্ধতায় পরিপূর্ণ পশুবৎ নরজাতির আবাসস্থল এই ভারতবর্ষ"।

ভারত সম্বন্ধে জগতের ধারণা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে সে ভারত হইতে জগতের কি উপকার সাধিত হইবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" জগৎ যখন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাই হারাইতে বসিয়াছে, তখন আর আশা কোথায়! Cultural conquest-কে প্রতিহত করিয়া ভারত সম্বন্ধে জগতের ধারণার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিবার পথে তুলিয়া দিবার জন্যই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ঘৃণাবিদ্বেষ স্বার্থানুসন্ধানের মধ্যে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা ধ্বংসের পথ, মৃত্যুর পথ। ত্যাগ ও প্রেমের মধ্যেই বাঁচিবার রহস্য নিহিত আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত এই ত্যাগ ও প্রেমের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। ভারতকেই জগতের কাছে এই ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্র পৌছাইয়া দিতে হইবে। অতএব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য ভারতকে যোগ্য করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা এবং ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রগ্রহণের জন্য জগৎকে প্রস্তুত করা।

এই মহৎ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। নরেন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরের নিকট সর্ব্বদা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—তখন ঠাকুর তাঁহাকে তীব্রভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—"আরে ছি! তোর মুখে একি কথা! আমি জানি তুই একটা বিশাল বট গাছ। তোর দ্বারা কত তাপিত প্রাণ শীতল হবে, সান্ত্বনা পাবে। এসব ছেড়ে আত্মমুক্তির কামনা!" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নির্ব্বিকল্প সমাধির আস্বাদ দিয়া বলিলেন—"চাবিকাঠি আমার কাছে রইল। এখন তোকে দিয়ে আমায় কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রেরণা রাখিয়া দেহরক্ষা করিলেন। ঠাকুরের চিতার আগুন নিভিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পদব্রজে হিমাদ্রি হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ঠাকুরের কার্য্যের বিরাট দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া গভীর নৈরাশ্যের বেদনায় অভিভূত হইয়া কন্যাকুমারীর শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর হইতে দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বুধির বক্ষে চিরশান্তি লাভ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রেরণার মুখে তাঁহার সকল নৈরাশ্য ভাসিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চার হইল। তিনি সাগরে পাড়ি দিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন।

আমেরিকার চিকাগো সহরে সেই সময় বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। জগতের ছোট বা প্রচলিত সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিকে সম্মেলনে আহ্বান করা হইয়াছে। কেবল হিন্দুধর্ম্মকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। তথাপি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্যই স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর গৈরিক বেশ দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া একজন মার্কিন মহিলা স্বামীজীকে ধর্ম্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা করিবার যোগাযোগ করিয়া দিলেন।

বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ মণীষী ও চিন্তানায়কগণ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গৈরিক আলখেল্লা ও উষ্ণীষপরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী স্বামীজী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বড় বড় মহারথীরা একে একে বক্তৃতা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইল। ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ্য-সভায়, বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষায় স্বামীজী বক্তৃতা করেন নাই। সেই জন্য একটু পরে বলিবেন বলিয়া পিছাইতে লাগিলেন। পরে যখন দেখিলেন আর পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ—বক্তৃতার অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া, তখন বাধ্য

হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভায় সমবেত নরনারীর উৎসুক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইল। তিনি আমেরিকাবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"Sisters and brothers of America—।" এই অভিনব সম্বোধন শুনিয়া সভায় দীর্ঘকাল করতালি চলিল। এই সার্থক সম্বোধনের মধ্য দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রকৃত রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর এক এবং জগতের পিতা। আর জগতের নরনারী তাঁহার সন্তান। অতএব সকলে পরস্পরের সহিত ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সমবেত করতালি রূপ অভিনন্দনে উৎসাহিত হইয়া স্বামীজী তেজস্বিনী ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উদারতা ও ব্যাপকতা প্রদর্শন করিলেন। সভা নিস্তব্ধ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন। কোন দিক দিয়া সময় কাটিতেছে তাহাতে কাহারও হুঁস রহিল না। Cultural conquestএ প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। ভারতকে সভ্য করিয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া ছিলেন তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া স্বামীজী যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন চিকাগো সহর ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। পূর্ব্বরাত্রে যিনি চিকাগোর রেল ষ্টেশনে পরিচয়াভাবে Packing caseএর তলায় শয়ন করিয়া কাটাইয়াছেন, আজ তিনি বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু ঠাকুরে নিবদ্ধচিত্ত স্বামীজী নির্ব্বিকার। তিনি ত ঠাকুরের হস্তের যন্ত্রমাত্র। তিনি যেমন বাজাইতেছেন সেইরূপই বাজিতেছেন। স্বামীজী আমেরিকার বিভিন্ন নগরে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আমেরিকাবাসীকে ভারতের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে সচেতন করিলেন। আমেরিকা ত্যাগ করিয়া তিনি ইউরোপে গমন করিলেন। সেখানে ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া ভারতের প্রতি ইউরোপবাসীকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণীর প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত রামকৃষ্ণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যের মনীষী, ঋগ্বেদের প্রচারক, সায়নাচার্য্যের অবতার, পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম্মদর্শন সাহিত্য সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক মোক্ষমূলার সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই সময়ে—India Houseএর Librarian Jawny মহোদয় বিখ্যাত Asiatic Review-তে শ্রীরামকৃষ্ণচরিতের অবতারণা করেন। তখন মোক্ষমূলার সাহেব কলিকাতা ও মাদ্রাজ হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা The Nineteenth Century-তে ১৮৯৬ সালের আগষ্ট সংখ্যায় "A Real Saint" প্রকৃত মহাত্মা নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার পণ্ডিতগণ পরম সমাদরে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। তখন তাঁহাদের মনে স্বতঃ এই প্রশ্নের উদয় হইল—যে দেশে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় লোকগুরুর অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা কি যেরূপ কদাকারপূর্ণ বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি সত্যই সেইরূপ। অথবা কুচক্রীরা ভারতের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে মহাভ্রমে চালিত করিতেছে!

অতঃপর মোক্ষমূলার সাহেব—"Ramakrishna, His Life And Sayings" নাম দিয়া একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। Cultural conquest-এ আর এক রাশ প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। মোক্ষমূলার ছাড়া আরও অনেক মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রোমা রোঁলার নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। Cultural conquest-এর সমাধি রচনার জন্যই যেন মোক্ষমূলার লিখিলেন—"India what it can teach us", Monier Williams লিখিলেন "Indian Wisdom" এবং Sir John Woodroffe লিখিলেন "Is India Civilised ?" Cultural conquest প্রতিহত হইল। ভারত সম্বন্ধে জগতের দৃষ্টি ও ধারণার পরিবর্ত্তন হইল। ঠাকুর নিজের আলোকচিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখিস, কালে ঘরে ঘরে এই মূর্ত্তির পূজা হ'বে।" ঠাকুরের এই ভবিষ্যৎবাণী যে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্থাপন যুগাবতারের আর এক উদ্দেশ্য। এই কামকাঞ্চনের রাজ্যে, এই শিশ্নোদরপরায়ণতার যুগে ঠাকুরের দাম্পত্য জীবনের অচিন্তনীয় আদর্শের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন যে আছে তাহা

ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে যে কোলাহল উঠিয়াছিল তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিবাহ করিয়া সন্ন্যাস-জীবনযাপন করা ঘোর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। তদুত্তরে মোক্ষমূলার বলিয়াছিলেন—"শরীর সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ! শরীর সম্বন্ধ না রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারেন এ বিষয়ে উক্ত ব্রতধারী ইউরোপ-নিবাসীরা সফল-কাম হন নাই বটে, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি।"

ঠাকুরের দাম্পত্য জীবনের আদর্শ যে কেবল যৌন সম্বন্ধ রাখিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তিনি স্বীয় পত্নীকে সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তিরূপে দেখিবেন এবং তদ্বুদ্ধিতে তাঁহার পূজা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কামগন্ধহীন পবিত্র ভাব জগতের সকল রমণীর উপর প্রসার লাভ করিয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুরের গণেশোপাখ্যান খুবই মর্ম্মস্পর্শী। বালক গণেশ একদিন কৈলাসে খেলা করিতে করিতে একটি বিড়ালীকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিল। পরে এ ব্যাপার সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া কে এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে তাহা মাতার নিকট জানিতে চাহিল—উদ্দেশ্য প্রহারকারীকে সমুচিত শিক্ষা দিবে। তখন জননী পার্ব্বতী বলিলেন—"তুমিই এ কার্য্য করিয়াছ।" গণেশ বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তখন গণেশজননী বলিলেন—"মনে করিয়া দেখ, আজ তুমি কাহাকেও প্রহার করিয়াছ কিনা। গণেশ বিড়ালীকে প্রহারের কথা স্বীকার করিল। তখন ভগবতী বলিলেন—বিড়ালীকে প্রহারে আমাকেই প্রহার করা হইয়াছে। জগতে যত পুরুষ তোমার পিতার এবং যত স্ত্রী আমারই এক একটী মূর্ত্তি।" এই কথা শুনিয়া গণেশের জ্ঞানোদয় হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল জীবনে বিবাহ করিবে না। কারণ বিবাহ করিতে হইলে মাতাকেই বিবাহ করিতে হয়। তাই গজানন চিরকুমার সকল দেবতার মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম পূজা পাইয়া থাকেন।

ঠাকুর বলিতেন "আমি ষোল টাং করি। তোরা যদি একটাং কর্‌বিল" ইহার অর্থ-তাঁহার সাধনার অনন্য-সাধারণ কঠোরত্ব দেখিয়া তদীয় ভক্তেরা যদি তাহার শতাংশের একাংশও আচরণ করে তাহাই তাহা-দিগের পক্ষে মহাফলপ্রসূ হইবে। বিবাহ আত্মার মিলন। স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে অধ্যাত্ম-সাধনার পথে সাহায্য করিবে। যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য্যপালন না করিলে অধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই দাম্পত্য জীবনে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালনরূপ কঠোর সাধনা প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর তদীয় গৃহস্থ ভক্তকে তদনুকরণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "দু'একটা ছেলেপুলে হোলে স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনের মত থাকবে।" ইহাই জন্মনিরোধ বা Birth-control রূপ ভয়াবহ সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান। ইহাই সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের পথ হইতে উন্নতির পথে আনয়নে সমর্থ। সংযমের বাঁধ যেখানে নাই, তাহা পশু জীবন হইতেও হেয়। পশুদিগের যৌন-মিলনের একটি প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। মানুষ স্বয়ং প্রভু হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছে বলিয়াই লোকবৃদ্ধি-বশতঃ সাম্রাজ্যবাদ মানবসমাজের মহাশত্রুরূপে দেখা দিয়াছে। দেশ যত লোকের আশ্রয় এবং অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে, তদতিরিক্ত লোকসংখ্যা হইলেই যুদ্ধ অনি-বার্য্য হইয়া পড়ে। ভারতের তথা পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত অধোগতি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াই ঠাকুর দাম্পত্যজীবনের এই মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা মানবপ্রেমী ঠাকুরের এক অপূর্ব্ব অবদান। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল যুগাবতার হইতে এ বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রাম বল, কৃষ্ণ বল, বুদ্ধ বল, খ্রীষ্ট বল, মহম্মদ বল, চৈতন্য বল—ইহাদের মধ্যে এক খ্রীষ্ট ব্যতীত আর সকলেই দার পরিগ্রহ করিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে দাম্পত্য জীবনের এরূপ সমুজ্জ্বল আদর্শ পাই নাই।

শাস্ত্রে ধর্ম্মকে বৃষরূপে কল্পনা করিয়া সত্য-শৌচ-তমঃ দায় রূপ চারিটিপদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম-সত্যই এই চারিটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ক্রমে বৃষরূপী ধর্ম্মের এক একখানি পদ নষ্ট হইয়া যায় এবং কলিযুগে উহা দয়া বা দান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

"দানমেকং কলৌযুগে"। দান দয়াপ্রসূত। জীবে দয়া! ঠাকুর বলিতেন—"তোর কি শক্তি যে তুই দয়া করবি! জগৎ কি এতটুকু না—যে তুমি তার উপকার করবে! দয়া নয় সেবা, শিববুদ্ধিতে জীবের সেবা—ইহাতেই মানবের অধিকার। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া জীবকে কৃতার্থ করা হয় না। জীবরূপী শিবের সেবায় মানব আপনিই কৃতার্থ হয়। দুঃস্থ রুগ্ন-বুভুক্ষু-পিপাসার্ত্ত-দরিদ্র-মূর্খ প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তিতে ভগবান আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের কোমল বৃত্তিনিচয়ের উন্মেষের সুযোগ প্রদান করেন—আমাদিগকে প্রকৃত মানুষ হইতে সাহায্য করেন। ঠাকুর দয়ার এই নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাই আজ ভিক্ষা দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইয়াছে। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আমিত্বের প্রসার হয়—ব্রহ্ম সাধনার সহায়তা হয়। আর্ত্তকে দরিদ্রকে প্রত্যাখ্যান করিলে দেবতা বিমুখ হন। বিশ্বমূর্ত্তিতে ভগবান্ নানারূপে উপস্থিত হন। আমদের সদা সচেতন থাকিতে হইবে—যেন ভগবানকে আমরা প্রত্যাখান না করি। Boy Scout Movement, Red-cross society, St. John's Ambulance প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের প্রেরণা সম্ভূত। এই সেবা-ধর্ম্মকে মূলমন্ত্র করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র জগতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রত।

এই সেবাধর্ম্মের আর একটি দিক আছে। ইহার অনুষ্ঠানের মূলগত অর্থ বেদান্তকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা। জীবই ব্রহ্ম, তত্ত্বমান বা সোঽহং প্রভৃতি তত্ত্বগুলিই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। উপনিষদ যুগেও অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তের এই তত্ত্ব কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়, পুস্তকে মাত্র উপনিষদ দেখা যাইত। উহা যে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়—এ পর্য্যন্ত খুব কম লোকই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই উহার ব্যবহারিক উপযোগিতা প্রদর্শন করেন। শাস্ত্রকি কেবল পুঁথিগত বিদ্যামাত্র। উহা যদি মানবের জীবনে প্রতিফলিত নাই হইল, তাহা হইলে উহার সার্থকতা কোথায়? তাই জীবে জীবে শিবদৃষ্টিতে এই সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রস্তাব। ইহা হইতে যে অভূতপূর্ব্ব ফললাভ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন মানুষই ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্র নহে। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান। বাহিরে ঘৃণা ও অবহেলার ফলে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবেই মানবের হৃদয়গুহাস্থিত ব্রহ্মসিংহ সুপ্ত থাকেন। তাঁহার জাগরণে মহা-শক্তির উন্মেষ হয়। এই সেবাধর্ম্মের দ্বারাই মানবমাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনে মানবের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসিংহ প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। আজ যে জগতের সর্ব্বত্র গণ-জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার মূলে এই সেবাধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি এই সেবাধর্ম্মের ফল। আজ আর কেহই খাট বা নীচ হইয়া থাকিতে চাহে না। সকল জাতিই সকল সম্প্রদায়ই আপনাকে উন্নত অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা এতকাল পরাধীন অবস্থায় নির্য্যাতীত হইয়া আসিতেছিল তাহারা Self determination বা আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ার এই সেবারূপ নূতন ব্যাখ্যা এত দূর-প্রসারী ফল প্রসব করিবে!

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের আর এক উদ্দেশ্য—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়। ঠাকুরের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাস বৈচিত্র্য। সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"লাউকুমড়ার যেমন আগে ফল পরে ফুল, এখানকার ও সেই কথা।" ঠাকুরের সাধনার এই বিপরীত বা প্রতিলোম গতি যে গভীর উদ্দেশ্যমূলক তাহা তাঁহার কার্য্যে প্রকটিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর প্রচলিত বিভিন্ন মতের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে সত্যের উপলব্ধি। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি চৌষট্টিখানি তন্ত্র বা শক্তি মত, বৈষ্ণব মতের মধুর ভাব, রামাইত মত, খ্রীষ্টীয় মত, মোহম্মদীয় মত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সাধনা করিয়া সবিশেষে অদ্বৈত সাধনায় রত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যেকটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। এই সকল সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর দেখিলেন—সকল ধর্ম্মই একই সত্যে পৌছাইয়া

দেয়। এক একটি ধর্ম্মমত ভগবদুপাসনার এক একটি পথ মাত্র। তাই ঠাকুর প্রচার করিলেন "যত মত তত পথ"। সুতরাং ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষের প্রয়োজন নাই। কাহারও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সকলেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিয়া সত্যের উপলব্ধি—ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে।

ধর্ম্ম সনাতন ও সার্ব্বভৌম। উহা কোন দেশ বা জাতি-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। একই ঈশ্বরকে আমরা বিভিন্ন নামরূপে উপাসনা করিয়া থাকি। ধর্ম্মের গোঁড়ামির জন্য যত রক্তপাত হইয়াছে, রাজ্যজয়ের জন্য বোধ করি তত রক্তপাত হয় নাই। Cross-crescent-এর যুদ্ধ দীর্ঘ ৬০০ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। খ্রীষ্টান ও ইহুদীর মধ্যে কলহও বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দু-বৌদ্ধের বিবাদ ও কম দিন যায় নাই। মুসলমান ও ইহুদী এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তো এক মহাসমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একই ধর্ম্মের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ ও কম প্রবল নহে। খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট, মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া-সুন্নী-কাদিরানী, বৌদ্ধদিগের মধ্যে মহাযান, হীনযান এবং হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব বিদ্বেষের বিষে জগতের আবহাওয়া রী-রী করিতেছে।

ধর্ম্মকে বাদ দিয়া অন্য কারণেও সমকর্ম্মীদিগের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভয়াবহ পরিণতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্র যুদ্ধের জন্য সাজসাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। সমরোপকরণ প্রস্তুত বিষয়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই নিদারুণ অবস্থা ধর্ম্মে আস্থাহীনতার বিষময় ফল। ধর্ম্মকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কুসংস্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া নইলে এইরূপ ধূমায়মান আগ্নেয়-গিরির উপর আসিয়া পড়িতে হয়। প্রলয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎ-পাতের ধ্বংসলীলা হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য বহু মনীষী বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কারণ সকল চেষ্টারই মূলে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ছিল। ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে চেষ্টার ইঙ্গিত ঠাকুরের "যত মত তত পথ" রূপবাণীতে সূচিত হইয়াছে। একমাত্র এই ভিত্তিতেই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া মানবের আসল স্ব-ভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন কার্য্যই সফল হইতে পারেনা। তাই দেখি, ঋষি টলষ্টয় On Socialism নামক তাঁহার জীবনের শেষ প্রবন্ধে খুব জোরের সহিতই প্রচার করিয়াছেন—ধর্ম্মের বিধান ভিন্ন মানুষ বাঁচিতে পারেনা এবং বিংশ শতাব্দীর যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমাদের মন হইতে এই কুসংস্কার দূর করিতে হইবে যে ধর্ম্মের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং সকল ধর্ম্ম আজ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তোমরা স্থির জানিও যে এখন অজানা থাকিলেও তোমরা এক আনন্দময় অবস্থায় নিশ্চয়ই পৌছাইবে।"

প্রাণকাব্য

মনের মাশুল দিয়েছি দীর্ঘদিন,
সকল যাতনা আজিকে হলো বিলীন।
ভালো লেগে গেলো অতীত রোমন্থনে,
কাব্য লিখিনু আগামী অন্বেষণে।

মনোকাব্য

এক রূপসী দূরে কোথাও থাকে,
একদা ভালোবেসেছিলাম যাকে।
তার হাতেই দিলাম উপহার,
কাব্যমালা প্রাণের হাহাকার।

—চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মরুর বুকে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

পাথুরে দেয়ালের আওয়াজী জানলার কাচে, কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো অধ্যাপিকা পুষ্প মিত্র।

আওয়াজটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো ক্রমে। একটা পাগল-করা আকর্ষণ ছাদের ওপর টেনে নিয়ে গেলো পুষ্প মিত্রকে।

পুষ্প মিত্রের দৃষ্টিপথে এক একটি দৃশ্য আটকে পড়তে লাগলো।

—দূরে পাহাড়ের ওপর জয়শালমেরের দুর্গ। দুর্গের ভেতরের চোদ্দশো বছরের চুড়ো। ছন্নছাড়ার মতো দাঁড়ানো, আশপাশের সবুজ চুলের ঝাঁকড়া মাথা শমী-গাছগুলো। মাঝ রাতের জ্যোৎস্না আলোয়, ওদের লম্বা লম্বা কালো ছায়ার বুকের ওপর, খয়েরি লোমের উটগুলো বালি-জমিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। সারাদিন উট চালানোয় ক্লান্ত লোহামারা, উটের কুঁজ পিঠে ঠেসান দিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

পুষ্প মিত্রের অনুসন্ধানী মন আওয়াজটার উৎস খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো এই সব দৃশ্যের মধ্যে।

বাতাস ওর কানে ঢেলে দিচ্ছে মিষ্টি সুরের জলতরংগ বাজনার টুং-টাং আওয়াজ। বাজনাটা বাজলো থেমে থেমে, প্রায় মিনিট পনেরো ধরে।

একটা বোবা-আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেললে পুষ্প মিত্রকে। মাথায় বাজনার রেশ দুলে দুলে উঠতে লাগলো। —বোধহয় জৈন মন্দিরের বাজনা—রাত দুপুরে আরতির। মন্দিরে যাবার প্রবল নেশা পেয়ে বসলো ওকে। দ্রুত পায়ে নেমে এলো ছাদ থেকে।

বাড়ীর মালিক সূর্যকরণের দরজায় টোকা মারতে লাগলো—এক-দুই-তিন।

ঘুম চোখে দরজা খুলে দিলে সূর্যকরণ। উৎকণ্ঠাভরা গলায় বললে—ভারি ডর লাগে মিস মিত্র?

—না, কোনো ভয় পাইনি আমি। নির্ভীককণ্ঠ পুষ্প মিত্রের।

—আমাকে নিয়ে যেতে হবে এখনি ওই জৈনমন্দিরে!

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে পুষ্প মিত্রের মুখের দিকে সূর্যকরণ। সে জানে, ইতিহাসের অধ্যাপিকা পুষ্প মিত্র এসেছেন এখানে ভারতের মন্দিরের বয়েস-তথ্য সংগ্রহ করতে। রাজস্থানে এসে ক'জায়গায় ঘুরেছেন। এই জয়শালমেরেও। জৈনমন্দিরটা একবার নয়, বার চারেক দেখেছেন। তবু এই রাত্তিরে—অদ্ভুত খেয়াল মেটানো অসম্ভব তার পক্ষে!

অনুরোধ করলে সূর্যকরণ—মিস মিত্র! ভোর হলেই, নিয়ে যাবো। আর একটু অপেক্ষা করুন—ইয়ুডিকোনো!

অস্থিরভাবে ব'লে উঠলো পুষ্প মিত্র—ভোর হলে বাজনা থেমে যাবে।

—বাজনা! জিজ্ঞাসুদৃষ্টি তুলে ধরলো পুষ্প মিত্রের চোখে সূর্যকরণ।

—আসার পর থেকে, আজ চার রাত ধরে জলতরংগ বাজনা শোনার কথা সব জানালে পুষ্প মিত্র। ওর ধারণার কথাও বললে—নিশ্চিত মন্দিরের বাজনা। হাওয়ার গতিবেগে তাই মনে হয়।

সূর্যকরণের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। বললে, ওটা জলতরংগের বাজনা নয়। মরুভূমির মরীচিকার মতো এও এক লোক ধোঁকা দেওয়া রহস্য! নিশুতি রাতে, বালিয়াড়ি-টিলার ওপর দিয়ে যখন পশ্চিমী বাতাস জোরে বইতে থাকে, তখন বালিয়াড়ি-টিলার বালি ঝরে

পড়ার আওয়াজই জলতরংগ বাজনার মতো শোনায়।

খুশীর আমেজ ফুটে উঠলো পুষ্প মিত্রের চোখে-মুখে। ডায়েরীতে নোট করলে।

অংকের, অধ্যাপক প্রণয়েশ ব্যানার্জীর জন্যে উথাল-পাতাল করতে লাগলো পুষ্প মিত্রের মন।

পুষ্প মিত্র চিঠি লিখতে বসলো।

...শীগগির চলে এসো! নতুন দুনিয়ায় ভেসে বেড়াবে প্রতি রাতে। অজানার গোপন রহস্য জানতে পারবে। জানো তো, ঠাট্টা করা আমার ধাতে সয় না...।

পুষ্প মিত্র খামের ওপর 'প্রণয়েশ ব্যানার্জী' নামটা লিখে, বার বার চোখ বুলোতে লাগলো। অতীতের ছবিগুলো ওর মনের চোখে ঘুরে ফিরে ভেসে উঠতে লাগলো।

—প্রোফেসর প্রণয়েশ ব্যানার্জী।

—প্রোফেসর পুষ্প মিত্র।

প্রথম পরিচয় পর্বটা শেষ করালেন অধ্যক্ষ।

এরপর।

কলেজের কমন রুমে ব'সে ব'সে, ভারতবর্ষের মন্দির সম্বন্ধে লেখবার জন্যে নানান বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকতো যখন পুষ্প মিত্র, ঠিক সেই সময় ব্যানার্জী এসে হাজির হ'তো। মন্দিরের ছবিগুলোর জ্যামিতিক নক্সা বুঝিয়ে দিতো।

সে নতুন ক'রে আবিষ্কার করতো অতীতকে, ব্যানার্জীকে।—প্রাচীন মন্দির নিখুঁত মাপজোপে গড়া এতো সুন্দর! এতো অংকশাস্ত্রে জ্ঞান ছিলো পূর্বসুরীদের!

ব্যানার্জীর সহায়তা না পেলে, তার লেখাটায় নতুন আলোকপাত করা অসম্ভব হ'তো। ওদিকটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'য়ে আসতো মন্দির-স্রষ্টাদের মেহনতী লোকদের কাছে।

এই সূত্রে ব্যানার্জীর সংগে তার প্রীতির ভিত মজবুত হয়ে গড়ে উঠতে লাগলো দিন দিন। তার জীবনের সব কিছু জানালো ব্যানার্জীকে।

—বাবার মৃত্যুর পর চাকরিতে নামতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। মাকে দেখা, ছোটো ভাইকে পড়ানো, নিজের পেট চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিলো।

ব্যানার্জীর দুচোখ ভরে সহানুভূতি উপচে পড়েছিলো এসব কথা শুনে। সেদিনের ব্যানার্জীর সান্ত্বনা দেওয়া স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আজো ভুলতে পারেনি সে। ভুলতে পারবেও না জীবনে। ব্যানার্জী বলেছিলো—এবার আর তোমায় ভাবতে হবে না। যদিও তোমার মতো আমারো অনেক প্রবলেম—মা, ভাই, বুড়ো বাপের দায়িত্ব ঘাড়ে, তবুও নিজের বাড়ী থাকায় ভাড়াটা অনেক সাশ্রয় করে। তোমার অর্ধেকটা ভার আমি নিতে পারবো।

কলেজের প্রোফেসররা, এমন কি প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত জানতেন—তাদের দুজনেব স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে বাঁধা হতে আর দেরী নেই বেশী।

হঠাৎ অন্য কলেজে চলে যেতে হ'লো ব্যানার্জীকে,—ওখানে মাইনে বেশী। আটকাতে পারলে না সে। তার অনুরোধের উত্তরে বলেছিলো ব্যানার্জী—না গেলে দুটো সংসার-তোমার আর বাবার—চালাবো কেমন ক'রে? তোমাকেও বেটার চান্স পেলে ছাড়তে হবে এখান। এতো অল্প আয়ে চলা সম্ভব নয়।

নতুন কলেজে যাবার কিছুদিন পর থেকে, ব্যানার্জীর সংগে দেখা-সাক্ষাতে ভাটা পড়তে লাগলো। ব্যানার্জী মাঝে-মধ্যে একবার ক'রে আসতো তাদের বাড়ীতে। তবে ছুটি-ছাটাতে বাইরে বেড়াতে যেতো দুজনে একসংগে।

কিন্তু সে একসংগে যাওয়াটাও বন্ধ হ'য়ে গেলো এবারে।

এখানে আসবার জন্যে, ব্যানার্জীর বাড়ীতে গেছলো সে দিন-সময় ঠিক করতে। ব্যানার্জীর ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তাকে দেখেই চমকে উঠেছিলো ব্যানার্জী। সেও আর দাঁড়াতে পারেনি একদণ্ড। হন হনিয়ে চলে এসেছিলো।

সারাটা রাস্তা ভেবেছে সে—যা 'শুনেছে সবই ঠিক। নতুন কলেজের ইকোনমিক্সের প্রোফেসর সিপ্রা মুখার্জীর সংগে ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশা চলছে ব্যানার্জীর। সেইটাই চাক্ষুষ প্রমাণ হয়ে গেলো মিস মুখার্জীকে ওখানে দেখে। সব চেয়ে সত্যি প্রমাণ করে দিলে ব্যানার্জী নিজেই—চমকে ওঠায়। এরপর আর ব্যানার্জীর সংগে ঘর বাঁধবার আশা করা বৃথা। একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে ফেলাই ভালো।

ব্যানার্জীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে সে—মুলতুবী

বিয়ের প্রস্তাবটার এখন কি করা উচিত? ব্যানার্জী তাকে নির্মম উত্তর দিয়েছিলো—মিস মুখার্জী ডক্টরেট হ'তে চলেছে। ওদের পয়সা, বাড়ী-গাড়ী, মান-সম্মান কোনো কিছুর অভাব নেই। মিস মুখার্জী কখনো ভার বোঝা হয়ে থাকবে না কারো। তাছাড়া ওরা ব্যানার্জীকে ফরেণেও পাঠাবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করতে পারা যায় না।

দু'বছরের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো।

নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে ছুটে এলো এখানে সে—মন্দিরের তথ্য অনুসন্ধান করতে।

কিন্তু ছুটে এসেও নিস্তার নেই। নতুনের হদিশে, ব্যানার্জীকে কাছে পাওয়ার জন্যে, আগের অভ্যেসটা পেয়ে বসছে কেন? মিছিমিছি ব্যানার্জীকে চিঠি লিখছে কেন সে? মনের এ দুর্বলতা থেকে কি মুক্তি নেই তার?

—উমাদের মন্দিরে যেতে হবে মিস মিত্র! সময় হয়ে গেছে—সূর্যকরণের কণ্ঠ শুনতে পেলে পুষ্পমিত্র। চিঠিটা তাড়াতাড়ি অ্যাটাচি কেসে রেখে দিয়ে, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

কর্ত্রী গাঁয়ে উমাদের মন্দির দেখতে চলেছে পুষ্পমিত্র। উটের পিঠে সওয়ার হয়েছে। সংগে সূর্যকরণ পথ-প্রদর্শক।

কর্ত্রী গাঁ।

কাকনী নদীর কাকচোখ জল ব'য়ে চলেছে তিরতিরিয়ে। রোদপড়া নদীর জল রূপো-চিকচিকে সরুপাতের মতো দেখাচ্ছে।

কাকনীর পুব পাড়ে উমাদের মন্দির। বেশীর ভাগ বাবলা, কুস, কাঁটা গাছের ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা জায়গাটা।

দূরে দূরে আটচালার কুঁড়ে এক একটা। নিরিবিলি পরিবেশে কুঁড়েগুলো যেন ঘুমন্ত। সেই ঘুমন্তপুরী থেকে স্বপ্ন সংগীত ভেসে আসছে। ঢোলক বাজছে। চাষী জেলেরা গাইছে দল বেঁধে বসে। গলায় গলা মিলিয়ে—

থারী বরোবরী মেহ করঁ। স কোই এক জাটনী মহাঁরে—

প্রভু তোমার আছে রাধারাণী আমার কিষাণী—।

মন্দিরে এসে পৌছুলো পুষ্প মিত্র। পুরোহিতের কাছে মন্দির সম্বন্ধে জানতে চাইলে।

বৃদ্ধপুরোহিত শান্তগলায়, থেমে থেমে বলতে লাগলেন।

—প্রায় চারশো বছর আগের উমাদে আজ মন্দির দেবী।

রাজকুমারী উমাদের বিয়ে হ'লো মারওয়াড়ের রাজা-রাও মালদেওয়ের সংগে। এই জয়শালমেরের রাজা-রাওল লুণকরণের মেয়ে উমাদে।

বাপ মেয়ের সংগে অনেক দাস-দাসী দিয়েছিলেন শ্বশুর-বাড়ী যাবার সময়। দাস-দাসীদের ভেতর ভীলদাসী সুন্দরী ভালমলীর ওপর নজর পড়লো মালদেওর। উমাদে জানতে পেরে ভং'সনা করেন মালদেওকে। রাজমহল ছেড়ে, গাঁয়ে বাড়ী করে বাস করতে থাকেন। স্বামীকে স্পষ্ট করে ব'লে দেন—ভালমলীকে না ছাড়লে তাঁকেই খসম ছাড়তে বাধ্য হ'তে হবে।

মালদেও-ও তাঁর নিজের জিদ থেকে এক পা নড়লেন না। ফলে হ'লো কি, চিরজীবনের মতো ছাড়াছাড়ি। সেই পুরোনো যুগে, স্বামী হ'লেও তাঁর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ছাড়েন নি এই তেজস্বিনী নারী। তাঁর সেই শক্তিকে, মনের জোরকে স্মরণ করবার জন্যেই রোজ পূজো-পাঠ-আরাধনা চলে আসছে এই মন্দিরে।

'মনের জোর, অন্যায়ের প্রতিবাদ' কথাগুলো পুষ্প মিত্রের মাথায়-বুকে জেঁকে বসলো। পরিতৃপ্তিতে ভরে গেলো মন-প্রাণ। যেন উমাদের শক্তি পেয়ে উমাদে হ'য়ে উঠলো পুষ্প মিত্র।

বাড়ী ফিরেই, অ্যাটাচিকেস খুলে বার করলে ব্যানার্জী-কে লেখা চিঠিখানা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে।

মাঝরাত। চারদিক নিস্তব্ধ-নিঝুম। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো পুষ্প মিত্রের। উঠে বসলো। তার স্মৃতির দরজায় একটা ফেরানো পুরোনো-মুখ উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো কেবল।

নিজের মনে মনে ব'লে চললো পুষ্প মিত্র—দর্শনের প্রোফেসর নীরেন দাশ! হাসি-চাউনি কতো নিরীহ-অমায়িক দাশের। খোলা মনের মানুষ। ব্যানার্জীর মতো মুখোশ-বাঁধা নয়। এখনো তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

জলতরংগ বাজনার আওয়াজে চমক ভাঙলো পুষ্প মিত্রের।—আওয়াজ, না মনের ভুল?

দৌড়ে ছাদে চলে গেলো পুষ্প মিত্র। না, সত্যি। বাড়ীর সামনে ছোট্ট বালির টিলাটা দুরন্ত পশ্চিমী হাওয়ার ধাক্কায় ভেঙে পড়ছে। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, ভাঙা টিলার বালি, বাতাসে ভর ক'রে খানিক দূরে গিয়ে জমা হ'চ্ছে সংগে সংগে। নতুন টিলা গড়ে উঠছে। পুষ্প মিত্র এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সেই দিকে।

সনেটের রূপরীতি ও মোহিতলাল

স্বপনকুমার বসু

বাংলা সনেটের প্রথম রূপদাতা মধুসূদন এবং সার্থক রূপদাতা রবীন্দ্রনাথ। যে বাংলা সনেট বিদ্রোহী মধুসূদন মনের বিদ্রোহে পেত্রার্কের প্রভাবে সৃষ্টি করলেন, তাকেই প্রতিভার যাদুদণ্ড বুলিয়ে জাতে তুললেন কবিগুরু। কবিগুরু শুধুমাত্র সনেট রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তার বিধি-নিয়মের নাগপাশগুলোও অবলীলাক্রমে ভেঙে দূর করে দিয়েছেন। অষ্টক ও ষষ্টক বিভাগ না মেনে তিনি অনেক সময় সাত চরণের দু'টি স্তবকও রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে অপর যে তিন জন কবি (প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার) সনেট রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁদেরই অন্যতম।

মোহিতলাল তাঁর সনেটে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ও পেত্রার্ক এই দু'জনকেই অনুসরণ করেছেন, এছাড়া তাঁর সনেটে খুব অল্প পরিমাণে ফরাসী আদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পেত্রার্কীয় সনেটের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অষ্টক (octave) ও ষটক (sestct) বিভাগ তাঁর মধ্যে স্পষ্ট আবার তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে চরণে চোদ্দর বদলে আঠার মাত্রার সন্নিবেশ করেছেন!

অনেকের মতে মোহিতলালের সনেটলক্ষ্মী সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রসাগর মন্থনেরই ফল। কিন্তু পেত্রার্কীয় প্রভাবেও যে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা' তাঁর যে কোন সনেট আলোচনা করলেই ধরা পড়বে। পেত্রার্কীয় রীতি অনুসারে অষ্টকের মিলের পদ্ধতি হচ্ছে, ক খ খ ক, ক খ খ ক এবং ষটকের মিলের পদ্ধতি হচ্ছে, চ ছ, চ ছ, চ ছ বা চ ছ জ, চ ছ জ ইত্যাদি। এখন এই রীতি তিনি কতটা অনুসরণ করেছেন দেখা যাক :

মঞ্জির খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা, ছন্দ বিলাসিনী! ক
কতকাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে— খ
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে, খ
চপল—চরণ—ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী? ক
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী, ক
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি হৃদি পদ্মাসনে— খ
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম হুতাশনে, খ
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম নিবাসিনী! ক

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রী মধুসূদন চ
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল আশ্রমে; ছ
'বলাকা'র মুক্তাক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন, চ
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর সঙ্গমে! ছ
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর নিক্কণ? চ
কোথায় জাহ্নবীধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে? ছ
—পয়ার।

এই সনেটটিতে মোহিতলাল পুরোপুরি পেত্রার্কের অনুসরণ করেছেন, কেবলমাত্র চরণে মাত্রা সন্নিবেশের ক্ষেত্রে তিনি কবিগুরুর আদর্শে চোদ্দমাত্রার বদলে আঠার মাত্রার চরণ রচনা করেছেন।

মোহিতলালের প্রতিটি সনেট এক একটি হীরকখণ্ডের মতো, ভাষা স্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও মার্জিত, দুর্বোধ্য শব্দের

ব্যবহার তিনি প্রায় করেন নি, তাঁর সনেটলক্ষ্মীর ভাব প্রতিমা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

মোহিতলাল বাংলা সনেটে বিশেষ কোন নতুন রূপ-রীতি সংযোজন করতে না পারলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'বনভোজন' নামক সনেটটির কথা উল্লেখকরা যেতে পারে। এর অষ্টকে তিনি যথারীতি মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এর ষটকে,

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বনভোজন!
নিদাঘার্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ আয়োজন!
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোকে কি বর্ণে বিলীন!
হরিত, ইষ্য-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল সুধা, আঁখি মুদি, বিরাম বিহীন!
—বনভোজন।

তিনি ষটকের মিলের প্রচলিত ধারাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন।

মোহিতলালের সনেট সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল এই যে, তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনেক কবিই প্রেমকেই সনেটের প্রধান অবলম্বন করেছেন—কিন্তু মোহিতলাল তার সনেটে প্রেমকে ততবেশী প্রাধান্য দেননি!

দেহবাদ নয়, জীবনপিপাসা, অস্পষ্টতা নয় প্রচণ্ড আবেগ, দেহাতীত নয় ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতিই তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য বাংলা-সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ!

আজ তিনি নেই, তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ভাষা অবলম্বনে আমরা বলতে পারি:

Mohit lal! than should be living at this hour:
Bengal hath need of thee:

চৈনিকের রক্তপান এই তব হোক্ ব্রত

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারত আত্মার বুকে অকৃতজ্ঞ লাল চীন হানিছে অশনি
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো অরাতিরে বীরগণ করি তূর্য্যধ্বনি।
এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র ধরণীর মধ্যমণি, জন্মভূমি মোর,
শান্তি তার ক্ষুণ্ণ করি, ঝঞ্ঝাসম আসে দস্যু, বাসনা-বিভোর—
পররাষ্ট্র জিনিবারে আকাশ-কুসুমরচি। তীব্র আক্রমণ
দুঃসাহস-গিরিবর্ত্মে রোধ করো, তুচ্ছ করি জীবন মরণ।
একদিন যাহাদের ভাই বলি করেছিলে আলিঙ্গন যবে,
পর্ব্বত সঙ্কটভেদি বেদনা-বারিধিলয়ে, আসে কলরবে।

জাগে মহাভারতের মহাশক্তি, রুদ্র ভৈরবের সাথে জাগে
ক্ষোভে মহাকাল, প্রতিশোধ নিতে, রণচণ্ডী আজ ডাকে
রক্তবীজে, মধুপানে মত্ত হয়ে, দেবভূমি করিতে হনন
তারে হিমগিরিশৃঙ্গ'পরে, হও আগুয়ান, করো আক্রমণ
তীব্রবেগে, চৈনিক দস্যুর মুণ্ড ছিন্ন করি মাতৃপদতলে
দাও অর্ঘ্য, শক্তিধর দুর্ব্বার দুর্জ্জয় বীর! বিশ্ব তব দলে
আসি, দেয় আলিঙ্গন সর্ব্বশক্তি দিয়া, চৈনিকের রক্তপান
এই তব হোক্ ব্রত, চূর্ণ হবে সাম্রাজ্যবাদীর অভিযান।

হিমাদ্রি শিখরে ডাকে রণক্ষেত্রে শিবশক্তি;
চলো, চলো, চলো,
আজি কোন কথা নয়, জাতীয় পতাকা তুলি,
জয় হিন্দ বলো।

মাউসেতুনের স্বপ্ন-আশা দীর্ঘদিন ভরা, হবে আজ লীন:
লক্ষ লক্ষ জোয়ানের অমিতবিক্রমে লুপ্ত হবে লাল চীন।
দৃপ্ত-শির কুণ্ঠাহীন দুর্দ্দম পবন বেগে তোলো জয়রোল,
ভাষাহীন বেদনায় ধ্বনিবে চৈনিক রাষ্ট্রে ক্রন্দন-কল্লোল।

অন্তর্ঘাতী নীতি লয়ে স্বদেশের বক্ষে যারা করে গুপ্ত কাজ,
বিভীষণ জয়চাঁদ মীরজাফরের সম, তাহাদের শীর্ষে বাজ
হানো আজ, ডেকে আনে লাল চীন দস্যুদলে প্রবঞ্চকগণ,
তাহাদের কুৎসা-ইতিহাস ঘৃণ্য পরিচয় শুনি, করগো বন্ধন—
পঞ্চমবাহিনীগণে দাও বলি যূপকাষ্ঠে শক্তির সম্মুখে,
তন্ত্র সাধনার তরে বীরাসনে বসি মহাশ্মশানের বুকে
হিংসার করালরাত্রে। স্বাধীনতা লভিয়াছি মহাসাধনায়,
তাহারে রক্ষিতে হবে ঝঙ্কার তুলিয়া রুদ্র উদগ্র বীণায়।

প্রতাপ শিবাজীসম রবে তব শৌর্য্য-বীর্য্য-কীর্ত্তি অবদান
রক্তের স্বাক্ষরে। ইতিহাসে চিরদিন তোমাদের জয়গান
উঠিবে ধ্বনিয়া, দুরন্ত ঝঞ্ঝার মত চলো গিরিদরী পথে,
অপ্রমেয় প্রাণের প্রবাহ যেথা বহে অতি দুর্গম পর্ব্বতে।
হবে জয়, হবে জয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়, অন্তরে অন্তরে—
মন্ত্রসিদ্ধ তপস্বীর দৈবশক্তি দিব্যদ্যুতি লয়ে লীলা করে।
স্বদেশের বহ্নিবীজে মন্ত্র চৈতন্যের দিনে সীমান্তের তীরে,
শূন্য করি তমিস্রার পাত্রখানি দাও আলোকের আহুতিরে।

বৈরাগ্য কেন ?

কেশব গুপ্ত

মুক্ত মন্ত্রে স্বীকার করলেন বিশ্বকবি—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নাই, কবি একথা বলেন নি। তেমন সাধনায় তিনি নিজে মুক্তি চাননি। তাঁর সাহিত্য অনুশীলন করলে স্পষ্ট বোঝা যায়—তিনি চেয়েছিলেন নিজের শুভ আত্মদর্শনে সংসার আশ্রমকে সাধন ক্ষেত্র করতে। সংসারীর পক্ষে বৈরাগ্য সুলভ সাধ্য সাধনা নয়। তিনি যে বৈরাগ্যের কথা বলেছেন, নীচের কবিতায় তার ব্যাখ্যা করেছেন—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

এই পথ তাঁর নয়। কারণ ইন্দ্রিয়কে জোর করে, অর্গল বন্ধ করলে স্মৃতি বা সংস্কার ছাড়বে কেন চেতনাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা তো কর্ম্মী জীব দেহে। তাঁর সৃষ্টি এরা—যিনি গড়েছেন জগৎ, বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। এরা সমাচার সংগ্রহ করে সকল ভুবনের। কিন্তু এদের রুদ্ধ করা কষ্টসাধ্য। এ সংস্কার ও সহজাত যে আনন্দ তাঁর চরম ও পরম উপাধি। দেশের সংস্কৃতি—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানীতি শক্তি উপাসীত। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। সে-হেতু জগৎ ব্রহ্মে জাত, লীন, জীবিত। শান্তভাবে প্রয়োজন তার উপাসনা। তাহলে আনন্দ কেন আসবে না, প্রতি অণুপরমাণুতে যখন তাঁর চরম ও পরম উপাধি আনন্দ। পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ, লীলায়—তাঁর প্রকাশ। আমরা কতটুকু ? অথচ আমরা ত সেই সীমাহীনের সসীম অংশ।

যদি চিত্তে শুভ শুদ্ধ প্রতীতি থাকে—তিনি আনন্দময় এবং সারা বিশ্বে তিনি ব্যাপ্ত, তাহলে প্রতি অণুপরমাণুতে বিরাজ করেন আনন্দময়। এ ধারণার আলোচনায় মন সন্ধান লাভ করে বিরাট বিশ্ব-একতার। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসেন যোগী—চিত্ত বিক্ষেপ বন্ধ করাবার সংকল্পে। একাগ্রতায় ভাব সংগ্রহ হয় নিশ্চয়। কিন্তু ভাবের অন্তরে নিমজ্জিত হয় যদি মন আর তার পটভূমিতে থাকে যদি শুদ্ধাভক্তি—মোহের কুহেলিকার হয়ে যায় অস্ত। শরণ ও ভক্তি জাগায় মনকে। মন পূর্ণ দর্শন পায় না অব্যয় অব্যক্ত অনন্তের। কিন্তু আনন্দের অনুভূতিতে হয় সে উজ্জ্বল।

এই চেতনা নিয়ে বিশ্বের সকল গতির সঙ্গে মিলে আভাস পাওয়া যায় আনন্দের। ইন্দ্রিয়ের সংগ্রামে তাঁকে পাওয়া যায়। সেই তো মুক্তির সাধনা যদি উপলব্ধি হয়—

যে কিছু আনন্দ আছে শব্দে গন্ধে গানে

তোমারি আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।

বাহ্যরূপে বিরাগ তখন আপনি আসবে। আসবে আনন্দ। তাই কবি গাইলেন—

এই বসুধার—

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার

তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত

নানা বর্ণগন্ধময়।

মৃত্তিকার বসুধার যে আমরা অধিবাসী। বর্ণ গন্ধ তো বসুমতি সদাই বিলোচ্ছেন। তার বাহিরের রূপ রস গন্ধ চেতনায় মুগ্ধ হলে হব মাটীর পুতুল। কিন্তু সে ভোগের মাঝে যদি পাই আস্বাদন বিশ্ব ছাওয়া আনন্দের কবির দৃষ্টি ভঙ্গীর গভীরতায়—সে দৃষ্টি অর্জ্জন কি মুক্তি লাভের সাধনা নয় ?

নষ্ট পাশের বন্ধনই তো আমাদের জীবন কে আড়ষ্ট করে রাখে। সেই বাঁধন মনে জাগায় সুখদুঃখ হাসি-কান্না, যশ, অপযশ, মান, অপমানের ঘূর্ণিপাক। তাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি। অথচ তাদেরই ভিতর থেকে লাভ করতে হবে মুক্তি। তাই মহাসাহসভরে কবি বল্লেন—

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির পথ।

যে পথের রথ সবার মাঝে আনন্দের উপলব্ধি।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছিলেন যুদ্ধে প্রাণবধ করেও মুক্তি পেতে। সমর ক্ষেত্রের তেরঙা কেতনের তিন বর্ণ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। উপনিষদের সার, গীতা বুঝিয়েছেন—কেমন করে সমর ক্ষেত্র হতে পারে ধর্ম্মক্ষেত্র এবং মুক্তি সাধনার আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ মাটীর বসুধামকেও আশ্রম করবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাশি রাশি গদ্য ও পদ্য রচনায়। সে দান অমোঘ।

অন্যত্র বুঝিয়েছেন পৃথিবী মাটিতে গড়া। কিন্তু বসুধা জননী। মাতৃভক্তি কি মাত্র কবিতার উচ্ছ্বাস? মোটেই নয়। কবির অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধি করেছিল একদিন যে শুভ সমাচার তিনি তা শুনিয়েছিলেন।

আজিকে খবর পেলাম খাঁটী
মা আমার এই শ্যামল মাটী
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন।

যখন অন্নদাত্রী তখন সত্যই তো পৃথিবী মা। তাঁকে মাটীরূপে দেখলে কৃতঘ্নতা-দুষ্ট হবে সন্তান। বাস্তবকে বাদ দিয়ে উপরে বা গভীরে দৃষ্টি দিলে সে দেখা হবে বাতুল বা উন্মাদের দেখা। কবির প্রাণ সাধকের প্রাণ। সে মজে থাকে না জীবন সাগরের উপরের উত্তাল তরঙ্গে। কবি ডুব দেয় রূপসাগরে। আশা তার ক্ষুদ্র নয়। সে আশা ক্ষুদ্রতার নাগপাশে সীমাবদ্ধ নয়। কবি রূপসাগরকে বাদ দিয়ে পালিয়ে গিরিগুহায় বৈরাগী হতে চাননি। রূপ সাগর তো নিত্য উপলব্ধির সামগ্রী। পথও ইন্দ্রিয় স্রষ্টার দান। কিন্তু রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের গতিতে বিরাজিত অন্তর দেবতা মহাপ্রাণ মহাজীবন। জীবন ধারণে যা প্রয়োজন, ইন্দ্রিয় সংগ্রহ করে তা। বাকী থাকে তার ভিতর যেটুকু অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করেন অন্তর দেবতা। সেই উদ্বৃত্ত নিয়ে থাকে কবি সাধক। কান শোনে শ্যামের বাঁশী, প্রাণ শোনে তার অন্তরের সুর ছন্দ যা কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, আকুল করে প্রাণকে।

তাই কবি মাটীর মাকে অশ্রদ্ধায় অপমান করলেন না। তিনি মায়ের বাহিরের রূপকে সম্যকভাবে দেখলেন। প্রতি গানে, প্রতি ছন্দে, গদ্যে, পদ্যে সে কথা বলেছেন। তাঁর বাণী প্রীতিমধুর। ঋতুর খেলা তিনি উপভোগ করেছেন। আলোক, আঁধার, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা সবই তো ঘিরে আছে মাটীর মাকে। তাই তিনি উপলব্ধি করলেন—

অভ্রভেদী মন্দিরে তার, বেদী আছে
প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।

কবি বৈরাগ্য পথকে মুক্তি পথ না মেনে তাই চাইলেন—

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিব অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়

সত্যই তো রূপের সাগরে বসবাস জীবের। কিন্তু তার অন্তরে ডুব দিলে মেলে অরূপ রতন। তখন বোঝা যায় প্রাণ দেবতার রূপ তো সীমাবদ্ধ নয়; সে যে অসীম—সীমাহীন। কাজেই অরূপের সীমা হীনতার উপলব্ধি মানতেই হবে। সীমায় ঘেরা জীবনের সুর ও ছন্দ তো বাজছে। অথচ তার রেশ নিয়ে যাচ্ছে অসীমের পথে। ক্ষুদ্র মনও উপলব্ধি করে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

কি মধুরসে উপলব্ধি। ক্ষুদ্রে তো সুখ নাই; সুখ ভূমায়, মহতে, বিস্তারে, সম্প্রসারে। তাই সে সুর যখন বাজে, প্রকাশ পায় 'বিশাল প্রাণ'—তখন প্রাণ আনন্দে গায়—

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

সৃষ্টি করেছেন যাদের অনন্ত অনাদি স্রষ্টা তারা সীমাবদ্ধ তার আদি আছে অন্ত আছে। কিন্তু তারা তো মুহূর্ত্তে সত্য, বিশ্বের বাহিরে তো কিছু নাই। তাই—

কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গান কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।

সেই রূপের মাঝে অরূপকে পেতে গেলে, রূপের অন্তরে সীমার বাহিরে শুভ যাত্রা করতে হয় শুরু। সে যাত্রায় প্রাণ আপনারে চিনে, সঙ্গীত মুখর হয়। গাহে—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি ধাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

দুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ—এসব তো জীবনের সাথী, সৃষ্টির উপাদান। উপাদানে গড়া পথের ওপর দিয়ে চলতে হবে অসীমের পথে, বিশ্বকবির এই উচ্ছ্বাস বিশ্ব স্বীকৃতি,

পটভূমিকায়। সেই অসীমের পথ যাত্রায় জেগে উঠবে জ্ঞান—

'মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইবে বিমুখ আপনার পানে চাই।"

ক্ষুদ্রতাই আনে বিপদ। সম্পদ লাভ হয় আত্মপ্রসারে। যখন এই বাস্তবের মৃত্যু ঘটে, সে নিজের কূপে ডুবে মরে।

চেতনাকে জাগাই প্রাণে। কর্মের মাঝে না থাকলে তো বোঝাই যায় না। বুঝি তুচ্ছ লোভে লোভ বাতুলতা। লোভের অন্ত নাই। সেই অল্প লাভও তো বহুক্ষণ থাকেনা। সত্যই—

নদীতট সম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আকড়ি রহিবারে চাই
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায়।

এ জ্ঞান উপজিতে পারে মাত্র সংসারে ঢেউয়ের মাঝে সাঁতার দিয়ে। চিত্তের উৎসমূলে থাকে প্রতীতি—সুখ অল্পে থাকেনা। থাকে ভূমায়। অভিজ্ঞতা আনবে শরণ। তখন চেতনা ফুটে উঠবে গাইবে—

যাহা ধায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে।
তবে নাহি ক্ষয় সবই জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।

এ নিশ্চয় বৈরাগ্য সাধন। কিন্তু এর সাধনা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়। ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি অল্পের তুচ্ছতায় অনুভূতি জাগিয়ে প্রাণে।

নানা ছন্দে নানা সুরে কবি বুঝিয়েছেন যে, সাধনার উপায় অশান্তির অন্তর হতে শান্তি পাবার মন্ত্র। এই ঠেকে-শেখার জ্ঞান প্রকৃত মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয় শরণে। বৈরাগ্য আসে অনুরাগের অন্তঃসারশূন্য অন্তর গ্লানি—

ভুলায় আমারে সবে। বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসারে মোরে কাঁদায় হাঁসায়।
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে
বাসনার টানে।

এ যেন প্রত্যেক সংসারীর মনের সাগর ছেঁচে রত্ন তোলা। এরপর যে বৈরাগ্য আসে, তার আয়োজনে *ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করবার প্রয়োজন নাই।* মোহের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে মনে। বহুদর্শিতার ফল পর্য্যবসিত হয় আন্তরিক প্রার্থনায়—

সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণা সম তব অঙ্গে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহ তন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও হে নাথ।

সীমার ভিতর দিয়ে অসীমের সাধনাই রবীন্দ্র সাহিত্য। বিশ্বকে বাদ দিয়ে তিনি বিশ্ববিধাতাকে জানবার চেষ্টা করেন নি। কবি বালুকণা, শিশিরবিন্দু সকলকে উপভোগ করেছেন। তাদের বিকাশে গভীরে ডুব দিয়ে বুঝেছেন—

ক্ষুদ্র বালুকণা ক্ষণিক শিশির
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আমার
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

তাদের সঙ্গে মেলা মেশার ফলেই তো কবি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। দুঃসাহসী কবি সম্মুখসমরে জয়ী হয়ে মুক্তি চেয়েছিলেন। দুঃখ, ভয়, বিপদ এরাই তো সাধন পথের বাধা। নির্ভয়ে কবি বল্লেন—

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপ তাপিত চিত্তে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নিশ্চয়। কিন্তু কিসের বৈরাগ্য। বীতরাগ হতে হবে কর্ম্মের প্রতি ক্রিয়ায় যা আর ডুবিয়ে মানুষকে কর্ম্মের ক্ষেত্রে ফল যদি মনের মতো না হয়; বাসনা যদি পরিপূর্ণ না হয়; যশ, মান, অর্থ বা প্রেম—যাদের পিছনে দৌড়ায় কর্ম্মী যদি আয়ত্ব না হয় তারা, হতাশ হয় মানুষ। জীবন শুকায়ে যায়, কিন্তু উপায় কি? আবার বৃথা কর্ম্ম। সংসার হতে পালিয়ে গিরিগুহায় লুকানো গৈরিক ধারণে বৈরাগ্য সাধনে সহজে কি মুক্তি আসে? মন যে অতীত দিয়ে গড়া। চেতনা উৎপীড়ক হয়—কারণ বাসনা ব্যক্তির অতীত ভোগ করে নিরাশা। চিত্তে জাগে দুঃখের স্মৃতি। গিরি

গুহার পাথরগুলো পারেনা তাদের অভিযান বন্ধ করতে। আশ্রমের পরিবেশের সাধ্য কি সন্ন্যাসী করবার, সন্ন্যাসীর চেতনাকে যদি তৃষ্ণার আগুন তীব্রদহনে তাকে পুড়িয়া মারে। এই অর্থেই বোধহয় কবি বৈরাগ্য সাধনকে বল্লেন —তাঁর মুক্তিমার্গ নয়। তবে কিসে আবার মনকে আনন্দের পথে আনা যায়। যখন সকল মাধুরী লুকায়, জীবন হয় শুষ্ক। সে উপায়কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—কর্ম্মসন্ন্যাস, কর্ম্মফলের বাসনাকে টেনে ধরা অশ্বের লাগাম টেনে যেমন তাকে ইষ্টপথে চালাতে হয়। কিন্তু মন তো শূন্য থাকতে পারেনা। বাসনা বন্যাকে রোধ করিলে নদীর গহ্বর শূন্য থাকেনা—জন্মায় সেথা আগাছা যার উপদ্রব আরও কঠিন।

তাই খাদকে ভর্ত্তি করতে হয়—ভগবচ্চিন্তার শরণে। একদিন কবি গাহিলেন—

কর্ম্ম যখন প্রবল আকার
গরজে উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ
শান্ত চরণে এসো।

মনকে দীনহীন করে পড়ে মনের খাদে আগাছা গজিয়ে ওঠে, তার প্রতিকারের নির্দ্দেশ দিলেন কবি—

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে হৃদয় নাথ
রাজসমারোহে এসো।

সমাদরে রাজ-অতিথির সেবা, আনন্দ পথে অগ্রগমনের সমৃদ্ধ আয়োজন। বাসনা বন্ধ করারও উপায় উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র
রুদ্র আলোকে এসো।

আবাহন শূন্যতার নয়, মূর্ত্তের আলোকময় উজ্জল প্রেরণার।

সদাই তিনি এই উজ্জল রুদ্র আলোকের আবাহনের কথা বলেছেন। বিপদে বা দুঃখে তিনি ক্ষণিক সান্ত্বনা আকাঙ্ক্ষা করেননি। তিনি তাদের জয় করতে চেয়েছেন। বৈরাগী হয়ে পালিয়ে গিয়ে তিনি আরাম চাননি। বলেছেন—

আরাম হতে ছিন্ন করে লও গো মোরে সেই গভীরে
অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান।

অমিতসাহসী ভক্ত বুঝলেন—বৈরাগ্যের শূন্য আধারে পরিত্রাণ অসম্ভব। জ্ঞানের আলোক দূর করে মূঢ়তা। বাসনা কামনাকে পুড়িয়ে মারতে হবে। তাই গাইলেন—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন ধন্য ক'র দহন দানে
আমার এ দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।

আঁধার ঘিরে রাখে পরম পথ। তাই জীব ঘোরে বিপথে—বিপদ যেথায় রাজত্ব করে। আলোক জ্ঞান। প্রার্থনা তাই প্রাণের অন্তর হতে তুলতে হবে—

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা
ধূলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।

ঈশ্বর সবার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। কবি সে কথা স্মরণ করলেন। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাই ভিক্ষা—

আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান
তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

কবির সাধনা যে ঘুম ভাঙাবার সুরবিন্যাস, তাঁর ভক্তি যে অসুরকে মেনে নিয়ে তাঁকে পরাজয়ের প্রচণ্ড অসম সাহসিক উদ্যোগ—একথা তাঁর সারা সাহিত্যে শুনিয়েছেন তিনি। তাঁর মানবপ্রীতি, তাঁর বনানীপ্রীতি, আলোকের আবাহন, চিত্ত মাঝে বিশ্বের প্রতিফলন, বিশ্বের মাঝে আমিত্বের প্রক্ষেপ, এরাই তাঁকে করেছে বিশ্বকবি। বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান ও অংশীদার সুখ ও দুঃখ। সেই সুখের অংশগুলিকে কাব্যের গুচ্ছের মত এক বাঁধনে বাঁধলে আনন্দের প্রবাহ বহে জীবনে। সেই উপলব্ধিতে সার্থক হয় গান—

আনন্দের সাগর হতে
আজ এসেছে বান
দাঁড় ধরে আজ বসরে সবাই
টানরে সবাই টান।

আর বহু কথা বলবার অবকাশ নাই এ প্রবন্ধে। মোট কথা সন্ন্যাসী মায়াময় এই অখিল হতে আপনাকে যেমন ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট করতে পারে—'বিদিত্বা' জ্ঞানের উদ্বোধনে উপলব্ধির ভক্তিতে, তেমনি জ্ঞানালোকের ঝরণা ধারার জ্যোতিতেও সম্ভব আত্মানুভূতি। আবশ্যক অন্তরে নিহিত ভক্তিতে জাগিয়ে তোলা জ্ঞান—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অনুরাগ তখন বাহিরের ক্ষণিক মায়াময় প্রকাশ দেখবে ভ্রান্তি—পরিণত হবে বিরাগ।

সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্বের অশাশ্বত রূপকে মেনে নিয়ে তার অন্তরের শাশ্বত, অসীম, অরূপ অনন্তকে উপলব্ধি করবার পথ দেখিয়েছে।

সীমাবদ্ধ মন অসীমকে দেখতে পায় না—উপলব্ধি করে অব্যয় আনন্দের সুর ও ছন্দ। তিনি বহুস্থলে উদ্ধৃত করেছেন ঋষিবাক্য

যতোবাচঃ নিবর্তন্তে্য অপ্রাপ্য মনসা সহ

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

বাণী তো পারে না বর্ণিতে তায়—কারণ আমাদের শব্দ অসীম যদিও শব্দ ব্রহ্ম। মন পারেনা সম্যক রূপে তাঁকে উপলব্ধি করতে—অথচ ভয় মনের সাথী—যার ফল দুঃখ। কিন্তু সে পথে অগ্রসর হলে, আনন্দের ঝরণাবারি তৃপ্ত করে তৃষিত মনকে। তখন দূরে পালায় ভয় ও দুঃখ।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি দেখেছেন শোভা। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, আলো ও জ্যোতিতে, ভগবানকে তিনি সবার মাঝে দেখেছেন। তাদের অন্তরের আনন্দস্ফুরণ দেখে, তিনি দেখেছেন তাদের আনন্দের হেতু। ভক্ত তিনি একা নন। তিনি বিশ্বের মাঝে সবাইকে হারিয়ে ফেলে একপ্রাণ হয়েছেন সবার সঙ্গে। তাই বিশ্ব-দেবতার সমবেত ভক্তির পূজায় মোহিত হয়ে গাহিলেন—

তাকে আরতি করে চন্দ্র তপন দেবমানব বন্দেচরণ
অসীম সেই বিশ্ব বরণ তাঁর জগত মন্দিরে।
অনাদিকাল অনন্ত গগন সেই অসীম মহিমা মগন
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দরে।

মাত্র এরা নয়। কবির মেলামেশা ছিল সবার সাথে। তাঁর সাধন-আশ্রমের দ্বার অবারিত। তাই তিনি দেখতেন সেই পূজার শুভ আয়োজনে—

বিহগ গীত গগন ছায় জলদ গায় জলধি গায়
মহা পবন হরষে ধায়, গাহে গিরি কন্দরে।
কত কতশত ভকত প্রাণ হেরিয়ে পুলকে গাহিছে গান
পুণ্য কিরণে ছুটিছে প্রাণ ছুটিছে মোহ বন্ধরে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করলে, তিনি এই সার্ব্বজনীন আরাধনায় করতে পারতেন না অংশগ্রহণ। সবার সঙ্গে তাঁহার সত্তা উপভোগ করেছেন অবিরত। এই মেলামেশায় তিনি নীর ছেড়ে ক্ষীর পাত্র করেছেন, সবার মধ্যে তাঁর আনন্দ উপলব্ধি করেছেন। জীবনের সারবোধ—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্যসুন্দর।

তখন উপলব্ধি আসে—

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের কী বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে।

আনন্দের ঝরণা ধারায় তিনি চেতনাকে পবিত্র করেছেন। তবে আর বৈরাগ্য কেন? তাই শোনালেন শেষ কথা—

বিশ্বরূপের খেলা ঘরে
কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যারে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করিল যদি
শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

অতীতের স্মৃতি

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

বিলাতী-সমাজের লোকজনের পিস্তল আর তলোয়ার নিয়ে 'দ্বৈরথ-সমর' বা 'ডুয়েল' (Duel) লড়াইয়ের মতোই সেকালে এদেশী অধিবাসীদের মধ্যে 'মল্ল-যুদ্ধ' অর্থাৎ 'কুস্তি-লড়াইয়েরও' উৎসাহ-অনুরাগ ছিল প্রবল। 'কুস্তি' বা 'মল্ল-যুদ্ধের' দিকে দেশের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর লোকজন সকলেরই বিশেষ আগ্রহ থাকার ফলে, তখনকার আমলের বহু বিত্তশালী-বিলাসী, সৌখিন-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই পরম উৎসাহে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে ছোট-বড়, পেশাদার ও অ-পেশাদার নানান জাতের মল্ল-যোদ্ধা আর কুস্তিগীরদের পৃষ্টপোষকতা ও প্রতিপালন করতেন। মল্লবীরদের প্রতি সেকালের অভিজাত-সম্প্রদায়ের এই সব পৃষ্টপোষকদের এতখানি সদয়-মনোভাব আর সক্রিয়-সহায়তা ছিল বলেই তখন দেশের সর্ব্বত্রই শারীরিক-ব্যায়ামচর্চ্চার অনুশীলন আর কুস্তির আখড়া গড়ে তোলার দিকে আপামর জনসাধারণের প্রবল অনুরাগ নজরে পড়তো—প্রাচীন সংবাদ-পত্রে সে সব কাহিনীরও অনেক নজীর মেলে। একালের কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, সে সব সংবাদের কিছু কিছু নমুনা নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * *

মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি-লড়াই

(সমাচার দর্পণ, ১৪ই মে, ১৮২৫)

মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তি লড়াই।—২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে মল্ল-যুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুইং জন একং বার মল্লযুদ্ধ করে—প্রথমে হাতা-হাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্‌টাপাল্‌টি লপ্‌টালপ্‌টি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর একজন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসিং বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধ্যে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিলাম।

শ্রীযুত বাবু নন্দদুলাল ঠাকুরের বৈষ্ণনাথনামক এক জন চাকর তাহার বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবেক সে ঐ যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রতিযোদ্ধা শ্রীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল—সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক। যখন দুই জনে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল তৎকালে প্রায় সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও ঐ সাহেবের চাকরের নিকট জয়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বাবুর ভৃত্য ঐ বৈষ্ণনাথ জয়ী হইল। দুই বার সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল, তদ্দর্শনে অনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করলেন। বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈষ্ণনাথকে কোল দিলেন এবং তাহার উৎসাহবৃদ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বস্ত্র অর্থাৎ একলাই শিরপা দিলেন।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সে স্থানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা পায়, যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে ব্যক্তি জয়ী সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে—শুনিতে পাই যে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা দুইজন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা সবিস্ক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোক অনেকে গিয়া থাকেন, আর অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।

* * * *

সেকালে জনপ্রিয় এই 'মল্ল-যুদ্ধ' বা 'কুস্তি-লড়াইয়ের' রেওয়াজ শুধু যে প্রাপ্তবয়স্ক-পালোয়ানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়, শহর আর পল্লী-অঞ্চলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ক্রমশঃ বড়দের আদর্শ-উৎসাহে অনুপ্রেরিত হয়ে উঠে শারীরিক-ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে সবিশেষ নজর দিয়েছিল—পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাতায় তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

ছোট ছেলেমেয়েদের কুস্তি-লড়াই

(সমাচার দর্পণ, ৭ই এপ্রিল, ১৮২৭)

কুস্তি লড়াই।—সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীলশ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই২ জন এক২ বার মল্ল-যুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়েরশাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।—তিং নাং।

* * * *

ব্যায়াম-চর্চ্চা আর মল্ল-ক্রীড়া ছাড়াও, সেকালের দেশী ও বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখিন লোকজনের রীতিমত অনুরাগ আর উৎসাহ ছিল ঘোড়দৌড়ের বাজী-খেলার দিকে। তখনকার আমলের ভারত-প্রবাসী সম্ভ্রান্ত-ইউ-রোপীয়দের আগ্রহে ও পৃষ্টপোষকতায় কলিকাতা শহরে ১৮০৮ সালে সর্ব্বপ্রথম ঘোড়দৌড়ের প্রবর্ত্তন হয়। কলি-কাতার গড়ের মাঠে একালে আমরা যে বিরাট 'রেস-কোর্স' (Race-Course) দেখছি, এটি সৃষ্টি হয়েছে ১৮১৯ সালে। অনেকের হয় তো জানা নেই—কলিকাতার এই 'ঘোড়-দৌড়ের মাঠ' আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'রেস-কোর্স' হিসাবে পরিগণিত। সেকালে অবশ্য কলিকাতার এই ঘোড়দৌড়ের মাঠের এমন সুচারু-শ্রী ছিল না। তখন এ মাঠে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা কি রকম ছিল এবং এ ব্যাপারে দেশী ও বিলাতী উভয়-সম্প্রদায়ের অভিজাত-বিলাসীদের উৎসাহ ছিল কতখানি—তারও বিচিত্র পরিচয় মেলে সে-কালের সংবাদ-পত্রের পাতায়।

* * *

ঘোড়দৌড়

(সমাচার দর্পণ, ৮ই পৌষ, ১৮২৭)

ঘোড়দৌড়।—কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর গিলবর্ট সাহেব ও শ্রীযুত বারবেল সাহেব স্ব২ অশ্বারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাঁহারদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময়ে এদেশীয় এক বালক একটা টাটু আরোহণ করিয়া তাহারদের সম্মুখে পড়িল, তাহাতে তাঁহারা অশ্বহইতে পতিত হইলেন, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় আঘাতী হন নাই কিন্তু ঐ বালকের চোআল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ৭ই জানুয়ারী, ১৮৩৭)

গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহু-সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাহাতে সুদর্শনার্থ যে সকলবস্তু বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য দুই রৌপ্যময় গাডু ছিল তাহার এক গাডু শ্রীলশ্রীযুক্তের ব্যয়ে পিটর কোম্পানিকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়—দ্বিতীয়টা শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে হামিল্টন কোং কর্ত্তৃক নিম্মিত হয়। শেষোক্ত গাডুর ওজন হাজার ভরির ন্যূন নহে উভয়েরই কারুকরী অতিবিস্ময়নীয় তাহাতে এতদ্দেশীয় কারিকরেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। ঐ উভয় মহা তৈজসই আগামি ঘোড়দৌড়ে পুরস্কারার্থ প্রদত্ত হইবে। এই বৈঠকের অপর এক প্রকোষ্টে অত্যদ্ভুত মাইক্রসকোপ অর্থাৎ যাহার দ্বারা অতিক্ষুদ্র পদার্থ অতিবৃহৎ দৃষ্ট হয় এমত একপ্রকার দূরবিন বিশেষ দর্শিত হইল।……

* * * *

সেকালের ঘোড়দৌড়ের মাঠে
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি)

সাহেবদের দেখাদেখি সেকালে এদেশের অভিজাত-সমাজে ঘোড়দৌড়ের ঝোঁক যেমন বেড়েছিল, তেমনি প্রবল হয়ে উঠেছিল শীকারের ঝোঁক। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে হিন্দু রাজা-রাজড়াদের এবং মোগল-বাদশা-দের শীকারের সখ ছিল খুবই, তবে ইংরেজদের আমলে বুনো জন্তু—আর পাখী শীকারের ঝোঁক সাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হলো ব্যাপকভাবে। তখন দেশে চারিদিকে জলা ও জঙ্গল ছিল প্রচুর—লোকের বসতি ছিল কম, পথ ছিল দুর্গম…যান-বাহনের তেমন সুবিধা ছিল না…বুনো-জানোয়ারের উৎপাত ছিল অপরিসীম। কাজেই সে-যুগে শীকারীদের শীকার মিলতো প্রচুর এবং অবাধে…এমন কি, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা শহরের প্রান্তে উনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও দেশী ও বিলাতী শীকারীরা দল বেঁধে বুনো বাঘ মৃগয়া করেছেন—প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পাতায় এবং সেকালের নানান্ কেতাবে ও পুঁথি-পত্রে তারও বহু নজীর খুঁজে পাওয়া যায়।

* * * *

শীকার

(ক্যালকাটা গেজেট, ২১শে আগষ্ট, ১৭৮৮)

European Hounds

To be sold by Public Auction…thirty couple of Europe Hounds and two Terriers.

A character is unnecessary to be given as they are well known for their goodness. They will be sold in Lots of four couple each. The same day will be sold, if not previously disposed of, a strong steady Hunter, who is rude in a scaffle, fit for any weight, good bottom, a charming leaper, and has been accustomed to the Hounds.

* * * *

(ফোর্বেস্ রচিত ["Oriental Memoirs"]
স্মৃতি-কাহিনী, ১৭৬৫-৮৩)

...The surrounding country abounds with bessts of prey, and game of every description. A gentleman lately engaged on a shooting party in the wilds of Plassey, gave us an account of their success in one month, from August the 15th to September the 14th (১৭৮৫), in which space they killed one royal tiger, six wild buffaloes, one hundred and eighty-six hog-deer, twenty-five wild hogs, eleven antelopes, three foxes, thirty-five hares, one hundred and fifty brace, of partridges and floricans, with quails, ducks, snipes, and smaller birds in abundance.

* * * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৯শে আগষ্ট, ১৭৯০)

We are creditably informed that a party of sportsmen, in the neighbourhood of Berhampore, speared, without the assistance of dogs, in thirteen days, forty hog-deer and eighty-six wild hogs.

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১)

কলিকাতায় মৃগয়া।—মৃগয়া কার্য্যনিযুক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুত মকান সাহেব ও অন্যান্য কএক জন সাহেবেরা কুক্কুর ও পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সম্প্রতি শ্যামপুকুরের দিকে ব্যাঘ্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থানে একটা চিতাবাঘ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুত মকান সাহেব কুক্কুর লইয়া অন্য দিকে গেলেন। পথিমধ্যে ঐ কুক্কুরেরা দুইটা শিয়াল দেখিতে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতুক তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে একটা অতিবৃহৎ চিতা বাঘ তাঁহার অতি নিকটে ঝাঁপটা মারিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি ভাবলোক ঐ চিতা বাঘের গায়ের দাগ দেখিয়া বনমধ্যে অনেক দূরপর্য্যন্ত গেল, কিন্তু পরে অতি গ্রীষ্মপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব কলিকাতায় যে ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে সে ঐ চিতা বাঘই ইহার সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ঐ ব্যাঘ্রের অন্বেষণার্থ যাইবেন। শহরের ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে, এইক্ষণে কএক দিবসাবধি পোলীসের কএক জন ঐ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।

* * * *

বন্দুক-হাতে সেকালের দেশী-শিকারী
(প্রাচীন চিত্রেরপ্রতিলিপি)

শীকারের সখের মতোই সেকালের ইউরোপীয়-সমাজের সৌখিন-বিলাসীরা এদেশী লোকজনের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন—আকাশের বুকে বেলুন ওড়ানোর অভিনব আগ্রহ। ইউরোপে তখন বেলুন-ওড়ানোর রীতিমত রেওয়াজ··· তারই রেশ ভেসে এলো ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা শহরে—ফরাসী-বেলুনবিশারদ রবার্টসন সাহেবের উৎসাহে। শোনা যায়—রবার্টসন সাহেব নাকি এদেশে পদার্পণ করার আগেই ইউরোপের বিভিন্ন বিখ্যাত

শহরে ঘোলবার বেলুনে চড়ে আকাশ-পথে পাড়ি দিয়ে রীতিমত বাহাদুরী দেখিয়ে প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেছিলেন। সেকালের এই সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয়-বেলুন-বাজ রবার্টসন সাহেবের উদ্যোগে ১৮৩৬ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা শহরের মুচিখোলা অঞ্চলে দেশী-বিলাতী সম্প্রদায়ের বিপুল কৌতুহলী-জনতার চোখের সামনে এদেশে সর্ব্বপ্রথম বেলুনওড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। রবার্টসন সাহেবের পর সেকালে ইউরোপীয়-সমাজের আরো অনেকেই এদেশে বেলুন-ওড়ানোর বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন। তাঁদের দেখা-দেখি তখনকার আমলের যে সব এদেশী-বেলুনবাজ পরম উৎসাহে ও সাহসভরে আকাশ-পথে পাড়ি দিয়ে অসাধারণ বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালের মতো তখনকার আমলেও, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা শহর ছিল শিক্ষা-সভ্যতা; আমোদ-প্রমোদ, সাজ-পোষাক, আদব-কায়দা, সব বিষয়েই অগ্রণী···কাজেই কলিকাতায় যা কিছু প্রচলিত হতো, সেটি অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়তো আশপাশের মফঃস্বলে—দেশী আর বিদেশী সমাজের লোক-জনের ভিতরে। সুতরাং সেকালের ইউরোপীয়দের এই বেলুন-ওড়ানোর অভিনব রোমাঞ্চকর নেশা অচিরেই সংক্রামিত হয়েছিল এদেশের প্রগতিশীল লোকজনের মনে। পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাতায় এ সব খবরেরও হদিশ পাওয়া যায়।

* * * *

৪

বেলুন-ওড়ানো

(সমাচার দর্পণ, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৩৬)

বেলুন।—গত বুধবার বেলুনারোহণরূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধ করি এ প্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই, গাড়ি পালকি নৌকাতে ও পদব্রজে গমনশীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বোধ হয় তাঁহারা বেলুন যন্ত্রে আকাশে গমন অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিখিয়া কার্য্য নাই, কেন না দীর্ঘকালের সম্বাদ সকল কাগজেই ব্যক্ত আছে কিন্তু উর্দ্ধে উঠিয়া কি কারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এ বিষয় সকলে জানিতে পারেন নাই, কেহ২ বলেন বেলুন-বিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুত রবার্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন না এবং যাঁহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল। এ কারণ আরোহি সাহেব সাক্ষাতে সমূদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন। অন্যেরা কহেন এ সকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই রবার্টসন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল কথা কিছু নয়—ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বারা বেলুনের মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া গেল। এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থকারণ না বুঝিয়া নানা কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে—এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি—কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত রবার্টসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া কি জানি তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলেন, পূর্ব্বকালের লোকেরা এই সকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজরা মন্ত্রাদি মানেন না। আপনারদের বুদ্ধির কৌশলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সৃষ্টি করেন কিন্তু অদ্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্রতন্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবুদ্ধি হইলেই এ সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের মাঠ হইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে উর্দ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়।

—জ্ঞানান্বেষণ।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ৫ই মে, ১৮৩৮)

বেলুন।—সকলেই অবগত আছেন যে রবার্টসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে বেলুন যন্ত্রের দ্বারা প্রথম উর্দ্ধগমন করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তাঁহার লোকান্তর-হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিন থান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় তাহা কেবল ৫০ টাকাতে বিক্রয় হইল।

* * * *

(সংবাদপ্রভাকর, ২৭শে নভেম্বর, ১৮৫৪)

সম্পাদক মহাশয়!···অস্মদাদির দেশ ভূম্যধিকারি শ্রীল শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এক অদ্ভুত বেলুনযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া গত ৮ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রত্যুষে নিজ রাজধানীর সম্মুখে উড্ডীয়মানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসংবাদ শ্রবণে নিজ কান্দী ও জমুয়া ও রষড়া ও বাগডাঙ্গা ও পাচথুপী প্রভৃতি ৪।৫ ক্রোশ অবধি অনেক গ্রামের লোকের সমাগম হয়, বিশেষতঃ শহর মুরশিদাবাদ আদালতের উকীল শ্রীযুত শ্যামধন ভট্ট ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকান্ত রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগেরও আগমন হইয়াছিল, ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র লোক দ্বারা উপরি উক্ত দিবস প্রাতে রাজধানীর চতুর্দ্দিগ বেষ্টিত হইলে শ্রীল শ্রীযুত রাজা বাহাদুর অনুমান দিবা ইংরাজী ৭॥০ ঘণ্টার সময়ে উপযুক্ত বেলুন যন্ত্রে গ্যাস পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গ্যাস পরিপূর্ণ হইয়া অনুমান দিবা ৮ ঘণ্টার সময় দ্রুতগামি তীরের ন্যায় উর্দ্ধমুখে গমন করিলে ৫।৭ মুহূর্ত্তকের মধ্যে দর্শনকারিদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া কান্দী হইতে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূর মোল্লাই নামক এক গ্রামের নিকটবর্ত্তি এক স্থানে বেলুন পতিত হয়। সম্পাদক মহাশয়, অস্মদাদির এতদ্দেশে এমত অদ্ভুত কাণ্ড কখনই হয় নাই ও আমরা কেহ কখন দৃষ্টিও করি নাই ···।···

১০ অগ্রহায়ণ ১২৬১, কস্যচিৎ সম্প্রতি কান্দীবাসিনঃ।

* * * *

উনবিংশ-শতাব্দীতে আমাদের দেশের লোকজনের কাছে বেলুনে ওড়াই ছিল আকাশ-পথে পাড়ি দেবার একমাত্র উপায়···বিংশ-শতাব্দীর 'এরোপ্লেন' বা আধুনিক উড়ো-জাহাজ তখন ছিল শুধু মানুষের মনের কল্পনা···নিছক স্বপ্ন! তখনকার আমলে বেলুন-ওড়ানোর বিদ্যায় এদেশের অল্প কয়েকজন রোমাঞ্চ-অনুরাগী প্রগতিশীল-পুরুষ রীতিমত সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বটে, তবে সে শুধু সৌখিন-বিলাস আর নতুন-ধরণের আমোদ-প্রমোদের নেশার ঝোঁকে মেতে···সে-যুগের ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের মতো উন্নত-ছাঁদের আকাশ-যান নির্ম্মাণের কোনো মৌলিক তথ্য-আবিষ্কার বা গভীর গবেষণার ব্যাপারে তাঁরা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেননি নানা কারণে, সেইটাই হলো বিশেষ পরিতাপের বিষয়!

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে

শ্রীসুধীরচন্দ্র বাগচী

শৈশবে সঙ্গীতে তব হিয়াতে জেগেছে ঝঙ্কার
স্বদেশীর উন্মাদনা, জনমনে আবেগ সঞ্চার।
কবিতার হাস্যরসে মর্ম্মে পশে তীব্র ব্যঙ্গ বাণী
স্বার্থেভরা সমাজের অবিচারে কশাঘাত হানি।

অমর নাটকে জাগে সেদিনের সুপ্তি ভেঙ্গে মন
আজো করে চিত্ত জয়—যুগে যুগে তা'র আবেদন।
আজিও আনন্দ পাই কবি তব স্বদেশী সঙ্গীতে
সেদিনের ছন্দ যেন চিত্তে মোর থাকে তরঙ্গিতে।
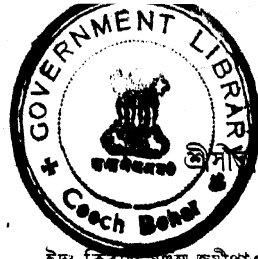
নসন্ধ্যা কার্য্যং কিমপিচারিতং দীনশরণ
যশোহর্থং বৃত্ত্যর্থং প্রতিদিন মহো কর্ম্মনিরতঃ।
ভবাম্বোধৌ ভীমেতরিবিরহিতে মগ্নমধুনা
জগন্নাথ স্বামিন্নগতিকমিমং পাহি কৃপয়া ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তভবতে ভোস্নানতুভ্যং নমঃ
ভোদেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণ বিধৌ নাহং ক্ষমঃক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপিনিষণ্ণ যাদব কুলোত্তংং সস্ত কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘংহরামিতদলং মন্যে কিমন্যেনমে ॥

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

মম নামানি লোকেহস্মি শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধ কোটিস্তু ক্ষমাম্যেব নসংশয়ঃ ॥ বিষ্ণুযামল

ঠাকুর বলেছেন আমার নাম যে শ্রদ্ধা করে কীর্ত্তন করে তার কোটি অপরাধ ক্ষমা করি এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

হেলা করে নাম করলে যখন তার নাম বুকে গেঁথে রেখে দাও ঠাকুর, তখন শ্রদ্ধা করে কীর্ত্তন করলে কোটি অপরাধ ক্ষমা করবে তাতে আর কার সন্দেহ হতে পারে।

নাহংদানৈ র্ণতপসা নেজ্যয়ানাপিতীর্থত ঃ।
সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথানাম্নাং প্রকীর্ত্তনাৎ ॥
গানেন নামগুণযোর্মন সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

অদ্ভুতরামায়ণ ॥

হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ আমার নামকীর্ত্তনে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই, দান তপস্যা যজ্ঞ তীর্থ সেবার দ্বারা আমার তাদৃশী তুষ্টি হয় না; মানব মদীয় নাম ও গুণগানের দ্বারা আমার সাযুজ্য লাভ করে।

ঠাকুরটী আমার শিব ব্রহ্মা অনন্ত নারদ প্রভৃতিকে দিয়া আপনার নামের মহিমা বলে তৃপ্তি লাভ করতে না পেরে নিজেই বলছেন।

ইদং কিরাত সংগ্রস্য জয়ীপাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতমন্ কৃষ্ণং সারথি মাপ্তবান্ ॥
কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দ নির্ভরঃ।
ব্রহ্মানন্দমবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ ॥ বিষ্ণুধর্ম্মে।

এই কৃষ্ণনাম জপ করে অর্জ্জুন জয়ী হয়ে মহাদেবের নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন, কৃষ্ণের প্রাণের সমান হয়ে কৃষ্ণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন, মানবের বিষয় লাভ অথবা স্বর্গাক্তি লাভের কথা আর কি অধিক বলবো কৃষ্ণনামকারী ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়ে শেষে কৃষ্ণ সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

শুদ্ধ ভক্তগণ সাযুজ্য চান না—সাযুজ্য কেন মুক্তি মাত্রই চায় না।

মুক্তি চান না তো ঠিক বলা যায় না, ঘুরিয়ে মুক্তি নেন মাত্র

সে আবার কি ?

ভক্ত চান সেবা, সেবা করতে গেলে সালোক্য সামীপ্য তো স্বতঃই হয়ে যায়, প্রভু রইলেন সাত তলার উপরে, আর সেবক রইল নীচে, তাতো হয় না; কাজে কাজেই সালোক্য সামীপ্য হয়েই গেল, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই তাঁর ন্যায় চতুর্ভুজ, সারূপ্য হয়ে গেল সার্ষ্টি তা মানে তত্তুল্যতা যে যার কাছে থাকে সে তার তুল্য হয়, যেমন আগুনের কাছে থাকলে আগুনই হয়ে যায়। কাজে কাজেই সেবা চাইলে সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য লাভ হয়েই গেলো।

সাযুজ্য মানে কি ?—
সর্ব্বদা সম্মিলিত
শ্রীভগবান রামানন্দাচার্য্য বলেছেন।

পরং পদং সৈব মুপেত্য নিত্য
মামানবোব্রহ্মপথেন তেন।

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ

উপানন্দ

তোমরা যারা ভারতবর্ষ পত্রিকার পাঠক পাঠিকা, অবশ্যই পড়েছ, এর গ্রহজগতে গত দুই বৎসরের মধ্যে একাধিকবার জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে তীব্র চৈনিক অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ ঘটবে, আজ সে ভবিষ্যদ্বাণী রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ফলে সমগ্র ভারত আর তার শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সাধনা-লব্ধ অমূল্য স্বাধীনতা বিপন্ন। আজ সর্ব্বত্র বিষণ্ণতা, গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা বিঘ্নিত। যে চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরূপে নেবার জন্যে ভারত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, আর ভারতের প্রচেষ্টায় বিশ্বের জনমত ধীরে ধীরে চীনের স্বপক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে, সেই কৃতঘ্ন বর্বর লাল চীন মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি নিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত ম্যাকমোহন সীমারেখা পেরিয়ে আমাদের মাতৃভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে আর, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র পাকিস্তান তার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হয়ে আমাদের সর্ব্বনাশের জন্যে পথ-রচনা ও কুৎসা রটনা করেছে। পাকিস্তান জানে না, এই বর্বর চৈনিক দস্যু একদিন তারও অস্তিত্ব লোপের জন্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না। চল্‌তি কথায় বলে—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। গোবরেরও একদিন আছে।' পাকিস্তানের একনায়কত্ব আর বেশীদিন নয়—মহাকালের আসন টলেছে।

তোমরা জানো ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তির বার্ত্তাবহ—অগ্রদূত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই আশাই পোষণ করেছিলেন যে ভারতই সর্বপ্রথম বিশ্বকে শান্তির বাণী শোনাবে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর কবির বাণীকে রূপ দেবার পক্ষে সকল বাধা অপসারিত হোলো। বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় এযাবৎ ভারতবর্ষ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, ভারতের শান্তির দূত হিসাবে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল। —ভারতের অবদান বিশ্বসমাজে অমূল্য। ইন্দোচীনে শান্তি, প্রতিষ্ঠায় ভারতের দান অসামান্য। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকা সাফল্য-মণ্ডিত। বান্দুং সম্মেলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের দান অবিস্মরণীয়। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারেও ভারত পরম সহিষ্ণু। চীনের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারত হতবাক্।

ধনতান্ত্রিক শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির বর্ত্তমান বিশ্বজগতের বুকে মল্লক্রীড়ায় উদ্যত। এর পরিণতি যে ভয়াবহ, তা উপলব্ধি করে, নিরপেক্ষ ভারত উভয় শিবিরকে শান্ত ও সংযত হয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করতে অনুরোধ করে আসছে, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে তার

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ

উপানন্দ

তোমরা যারা ভারতবর্ষ পত্রিকার পাঠক পাঠিকা, অবশ্যই পড়েছ, এর গ্রহজগতে গত দুই বৎসরের মধ্যে একাধিকবার জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে তীব্র চৈনিক অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ ঘটবে, আজ সে ভবিষ্যদ্বাণী রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ফলে সমগ্র ভারত আর তার শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সাধনা-লব্ধ অমূল্য স্বাধীনতা বিপন্ন। আজ সর্ব্বত্র বিষণ্ণতা, গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা বিঘ্নিত। যে চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরূপে নেবার জন্যে ভারত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, আর ভারতের প্রচেষ্টায় বিশ্বের জনমত ধীরে ধীরে চীনের স্বপক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে, সেই কৃতঘ্ন বর্বর লাল চীন মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি নিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত ম্যাকমোহন সীমারেখা পেরিয়ে আমাদের মাতৃভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে আর, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র পাকিস্তান তার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হয়ে আমাদের সর্ব্বনাশের জন্যে পথ-রচনা ও কুৎসা রটনা করেছে। পাকিস্তান জানে না, এই বর্বর চৈনিক দস্যু একদিন তারও অস্তিত্ব লোপের জন্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না। চল্‌তি কথায় বলে—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। গোবরেরও একদিন আছে।' পাকিস্তানের একনায়কত্ব আর বেশীদিন নয়—মহাকালের আসন টলেছে।

তোমরা জানো ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তির বার্ত্তাবহ—অগ্রদূত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই আশাই পোষণ করেছিলেন যে ভারতই সর্বপ্রথম বিশ্বকে শান্তির বাণী শোনাবে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর কবির বাণীকে রূপ দেবার পক্ষে সকল বাধা অপসারিত হোলো। বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় এযাবৎ ভারতবর্ষ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, ভারতের শান্তির দূত হিসাবে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল।—ভারতের অবদান বিশ্বসমাজে অমূল্য। ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের দান অসামান্য। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকা সাফল্য-মণ্ডিত। বান্দুং সম্মেলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের দান অবিস্মরণীয়। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারেও ভারত পরম সহিষ্ণু। চীনের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারত হতবাক্।

ধনতান্ত্রিক শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির বর্ত্তমান বিশ্বজগতের বুকে মল্লক্রীড়ায় উদ্যত। এর পরিণতি যে ভয়াবহ, তা উপলব্ধি করে, নিরপেক্ষ ভারত উভয় শিবিরকে শান্ত ও সংযত হয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করতে অনুরোধ করে আস্‌ছে ; বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে তার

আন্তরিকতা বিশ্ব-সমাজ-বন্দিত। মিশর ও হাঙ্গেরীর ব্যাপারেও ভারতবর্ষ তার মর্য্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেনি।

ভারত অধ্যাত্মপন্থী, অহিংসা ও শান্তির দেশ, প্রেম ও মৈত্রীর উদ্‌গাতা। এই ভারতই আক্রমণকারী লাল চীনের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে পঞ্চশীলের উপাসক হয়েছিল। ভারতের আনুকূল্যেই চীন একদা তিব্বতকে পেয়েছিল, আজ সেই তিব্বতকে মুক্ত করে তিব্বতীদের হাতে সমর্পণ করার কথা প্রসঙ্গে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন, ভারত তার ইতিহাসের কোন সময়েই অপরের এলাকা দখল করতে চায়নি অথবা চেষ্টা করেনি। চীন তার সম্প্রসারণশীল নীতি অনুসরণ করে তিব্বত দখল করে এবং সেখানকার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারত যদি তিব্বতকে মুক্ত করে তিব্বতীদের হাতে ওকে সমর্পণও করে, তা হোলেও তা নীতির দিক দিয়ে ভুল হবে না।

তিব্বত আমাদেরই ছিল। আমাদের উদারতা আর দান-শৌণ্ডতা বহুযুগেই আমাদের বিপন্নতা এনেছে। ফলে বলি রাজার মত আমাদের অবস্থা হয়েছে। আজ লাল-চীনকে তোমাদের পক্ষে চিনবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে, তাকে নির্ম্মূল করবার জন্যে শপথ গ্রহণ করো, অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করো, উন্নততম অস্ত্র পরিচালনায় উদ্যত হও—সে যুগ নেই, যে একলব্যের মত বুড়ো আঙুলটি কেটে ধানুকী দক্ষতার সর্ব্বনাশ সাধন হবে। ভুলোনা কখনও—৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালকে—ভুলোনা কখনও চৈনিক দস্যুতাকে। এই ভুলোনা বন্ধুবেশে চীনের গুপ্তঘাতকতার বিশিষ্ট বর্ব্বর ভূমিকা। দিনে জননী জন্মভূমির বুকে আঘাত হেনেছে চীন দস্যুরা। এরা বর্ব্বর হূনদের চেয়েও বর্ব্বর, এরা মৃত্যুর মত করাল।

মনে রেখো সামরিক দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্যে সবার আগের প্রয়োজন উন্নতমানের অস্ত্র। একদা চেঙ্গিস খাঁ নূতন প্রকারের লঘুতরবারি ও দৃঢ়তম বল্লমের মাধ্যমে তাঁর বাহিনীর দুর্দ্ধর্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, অভিযানে জয় লাভ করেছিলেন। মোগলবাহিনী নিয়ে বাবর দিল্লী অভিযানে কামান ব্যবহার করেছিলেন, তাই অদম্য শৌর্য্যবীর্য্য [illegible]ও তাঁর কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল, কামানের অগ্নিগোলকের আঘাতে বিপর্য্যস্ত হোতে হয়েছিল। ফরাসী সামন্ত বেয়ারের মনোভাব আজকের দিনে পৃথিবীর কোনও দেশের সামরিক সংগঠনে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবার নয়। যুদ্ধ করবো, অথচ উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করবো না—এটি উন্মাদনার অভিব্যক্তি হোতে পারে, মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। দেশরক্ষার জন্য অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র মাত্রেই অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকে—শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে প্রমত্ত থাকে না।

বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ভারতের বীর বাহিনীর হাতে সমর্পণ করতে হবে আধুনিকতম উন্নতমানের অস্ত্র, উন্নত প্রকারেয় অটোমেটিক অস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে রণাঙ্গণে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মাতৃভূমি থেকে শত্রু বিতাড়নের উদ্দেশ্যে, স্থলে জলে অন্তরীক্ষে চালিয়ে যেতে হবে যুদ্ধ আধুনিকতম রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে। তোমরা মাতৃভূমির আশাভরসা স্থল, আজ তোমরা হাতিয়ার গ্রহণ করো—অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মত বলো—

'আমরা ঘুচাবো মা তোর দুঃখ, মানুষ আমরা
নহি ত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ।

আজ আর আলোচনার দিন নয়, অপরিণামদর্শিতা, অকালবিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত আদর্শের সম্পর্কে আলোচনার সময়ও নয়—আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে, মাতৃভূমির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে, গণতান্ত্রিকতাকে অপরাজেয় রাখার জন্যে, এক মন্ত্রে এক পুণ্য নামে দেশের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, এসো আমরা বীর-দর্পে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, বর্ব্বর চৈনিক দস্যুর দন্তদর্প চূর্ণ করি, শপথ করো তিল বিন্দু রক্ত থাকতে ভারতকে বিদেশীর পদানত হতে দেবো না। দেশে পঞ্চম বাহিনীও উচ্ছেদ করো, সাময়িকভাবে পড়াশুনার কথা ভুলে গিয়ে দেশ রক্ষায় ব্রতী হও—মনে রেখো, আমাদের ঘরেও শত্রুর অভাব নেই—এখানে জয়চাঁদ, মীরজাফর এখনও আছে। এদেরও শাস্তি দিতে হবে সমুচিত ভাবে—এদিকে ঔদাসীন্য ভাব দেখালে জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য।—তোমরা অগণিত স্বদেশসেবী জন্মভূমির এক

একটি নক্ষত্র, আমাদের ভাগ্যাকাশে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠো—আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

তোমরা জেনে রেখো, চীনের ভূমিক্ষুধা চিরন্তন। আজ তার দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে, তবু সে দিকে তার দৃষ্টি নেই, পরস্বাপহরণে ব্যস্ত। মাউসেতুন নয়া চীনের ভাগ্যবিধাতা হয়েই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য পরদেশ গ্রাস করা। প্রায় সাড়ে পনর লক্ষ বর্গ মাইল আয়তন ছিল চীনের, তারপর মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং তিব্বত গ্রাস করে তেতাল্লিশ লক্ষ বর্গমাইল পর্য্যন্ত চীন নিজেকে বিস্তৃত করেছে—কিন্তু তবু ও তার উদর পূর্ণ হচ্ছে না। চীন চিরকালই ভূমি লোভাতুর, সাম্রাজ্যবাদী। কমিউনিষ্ট শাসনাধীনেও সেই মনোবৃত্তি অটুট। তাই আজ কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর সীমান্তের পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল স্থানের ওপর সে আজ আধিপত্য করতে চায়। রাষ্ট্রীয় ঘোষণার আগেই লদাক অঞ্চলে প্রায় পনের হাজার বর্গমাইল অধিকার করে চীন বহালতবিয়তে ছিল। চীনের রণ-তৎপরতার অন্যতম কারণও হচ্ছে বৃহৎ গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভারত তার পথের কাঁটা। একে বিধ্বস্ত করতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে—ভারতকে তার অধীনে এনে কমিউনিষ্ট স্বেচ্ছাতন্ত্রের মধ্যে ভারতবাসীকে আখমাড়াই কলে পিষে ফেলা তার ঐতিহ্য, সভ্যতা ও ধর্ম্মকে ধ্বংস করা,—আজ ভারতের বিপুল জনসংহতি শুধু তাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করবে না, আখমাড়াই কলে ফেলে তাদেরও পিষে মারবে, এজন্যে সকলেই দৃঢ় সঙ্কল্প, সকলেই শপথ গ্রহণ করেছে। তোমরাও অবশ্য নিশ্চেষ্ট থাক্‌বে না—তার অগ্রগমন প্রতিহত করে বীরত্বের পরিচয় দেবে। তোমরাও সমুচিত শিক্ষা চীনকে দেবে, এরূপ বিশ্বাস আমার আছে। জয়হিন্দ।

"জনগণ মঙ্গল দায়ক জয়হে জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয়হে, জয়হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম্ম ঃ

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অজ্ঞাত-নামা ইতালীয় সাহিত্যিক রচিত

রাজা ফিলিপ আর তাঁর বন্দী গ্রীক-ক্রীতদাস

সৌম্য গুপ্ত

[গত মাসে বিশ্ব-সাহিত্যে ইতালীয়-সাহিত্যিকদের অপরূপ অবদানের পরিচয় দিয়েছি। এবারেও ইতালী দেশের আরো একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন-কাহিনীর সার-মর্ম্ম সঙ্কলন করে দেওয়া হলো। আলোচ্য-কাহিনীটি আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগেকার রচনা হলেও, অভিনব রস-সৃষ্টির গুণে এটি আজো অমর হয়ে রয়েছে সারা দুনিয়ার সাহিত্যানুরাগীদের কাছে। তবে দুঃখের বিষয়, সুদীর্ঘকালের প্রবাহে ভেসে সেকালের এই অবিস্মরণীয়—কাহিনীর রচয়িতার নাম কোথায় যে হারিয়ে গেছে, একালের সুধী-সমালোচকের দল বহু অন্বেষণ করেও তার কোনো সন্ধান পান না।]

অনেক দিন আগেকার কথা···গ্রীস দেশে তখন রাজত্ব করতেন পরম-বিক্রমশালী এক রাজা—তাঁর নাম ছিল ফিলিপ। কি যেন একটা অপরাধে রাজা ফিলিপ তাঁর রাজ্যেরই এক মহাজ্ঞানী-গুণী প্রতিভাধর গ্রীক-পণ্ডিতকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। শোনা যায়, অসামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য-গুণে দেশের লোকজনের কাছে সেই প্রতিভাবান বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বিশেষ যশ-খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সারা রাজ্যের লোক বলাবলি করতো যে তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়···রীতিমত গগনস্পর্শী।

বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে, রাজা ফিলিপ একবার স্পেন দেশের অধিপতির কাছ থেকে উপহার পেলেন—বিরাট-গড়নের আর অপরূপ-সুন্দর চেহারার খুব দামী একটি ঘোড়া। এমন অসামান্য ঘোড়া উপহার পেয়ে রাজা ফিলিপ তখনি ডেকে পাঠালেন তাঁর অশ্বশালার অধিকর্ত্তাকে—নতুন

ঘোড়ার গুণাগুণ বিচারের উদ্দেশ্যে। ঘোড়া দেখে রাজ-অশ্বশালার অধিকর্তা তো মহা ফাঁপরে পড়লেন···এমন অদ্ভুত ঘোড়া তিনি জীবনে চোখেই দেখেননি কখনো, রাজ্যের কোনো পুঁথিপত্রেও এর এতটুকু হদিশ মেলে না —কানে শোনা তো দূরের কথা···কাজেই এ ঘোড়ার গুণাগুণ বিচার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। নিরুপায় হয়ে অশ্বশালার অধিকর্তা শেষে রাজা ফিলিপকে পরামর্শ দিলেন —রাজবন্দী সেই গ্রীক-পণ্ডিতকে ডেকে এনে এ ঘোড়ার গুণাগুণের বিষয়ে খোঁজখবর জানতে।

রাজা ফিলিপের আদেশে অবিলম্বে দরবারের প্রহরীরা নতুন ঘোড়াটিকে সযত্নে নিয়ে গেল প্রাসাদের বাইরে বিরাট খোলা মাঠে—আর বন্দীশালা থেকে সদর্পে টেনে এনে হাজির করলে সেখানে রাজা আর রাজ-অমাত্যদের সামনে রাজবন্দী সেই গুণী-জ্ঞানী গ্রীক-পণ্ডিতকে। বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতকে দেখেই রাজা ফিলিপ তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—লোকে বলে, আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি অগাধ···পাণ্ডিত্যেরও সুখ্যাতি শুনেছি প্রচুর···ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখে, বলুন তো পণ্ডিত মশাই, এ ঘোড়াটির দোষ-গুণ আছে কি এবং কতখানি!

রাজার কথা শুনে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত কিছুক্ষণ ঘোড়াটিকে বেশ ভালোভাবে নিরীক্ষন করে দেখে বললেন, —মহারাজ, ঘোড়াটি দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই বনেদী-জাতের···তবে আমার মনে হয়, ছোটবেলায় এটিকে ঘোড়ার দুধের বদলে গাধার দুধ খাইয়ে লালন করা হয়েছে!

বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনেই রাজা ফিলিপের আদেশে তখনি দূত ছুটলো স্পেন দেশের রাজ-দরবারে—নতুন ঘোড়াটি শৈশব-অবস্থায় গাধা কিম্বা ঘোড়া কোন প্রাণীর দুধ খেয়েছে তারই সঠিক খবর জানতে। সেখান থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে দূত ফিরে এসে রাজা ফিলিপকে সংবাদ জানালো—বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের কথাই ঠিক···শৈশবকালে নিতান্ত-অসময়ে মাকে হারানোর ফলে, স্পেন দেশের এই নতুন ঘোড়াটিকে গাধার দুধ খাইয়েই লালন করা হয়েছিল।

খবর শুনে রাজা ফিলিপ তো অবাক···বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে তাঁর মনে করুণা জাগলো! পুরস্কার হিসাবে রাজা ফিলিপ হুকুম দিলেন যে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের দৈনন্দিন-আহারের জন্য রাজ-ভাণ্ডার থেকে প্রত্যহ আধখানা করে রুটি বরাদ্দ করা হবে! বন্দীর প্রতি রাজার এই সদয় করুণা দেখে রাজ্যের প্রজা-অমাত্যেরা সবাই 'ধন্য-ধন্য' করে উঠলো।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে, প্রাসাদের কোষাগারে বসে রাজকীয় রত্ন-আভরণ, আর বহুমূল্য মণি-মাণিক্যাদি ঘাঁটতে ঘাঁটতে রাজা ফিলিপের হঠাৎ মনে পড়লো সেই রাজবন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের কথা। রাজার খেয়াল··· কাজেই তখনি প্রহরি-অনুচর পাঠিয়ে বন্দীশালা থেকে রাজ-কোষাগারে টেনে এনে হাজির করা হলো সেই বিচক্ষণ গ্রীক-পণ্ডিতকে।

বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত সামনে এসে হাজির হতেই, রাজা ফিলিপ তাঁকে রাজকোষের দামী দামী রত্ন-মণি-মাণিক্যাদি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন,—বলতে পারেন পণ্ডিতমশাই—আমার এই এত সব রত্ন-মণি-মাণিকের মধ্যে কোনটি সবার সেরা অমূল্য-সম্পদ বলে মনে হয় আপনার?—

সামনে স্তূপীকৃত রাজকোষের বহুমূল্য রত্ন-মণি-মাণিক্যের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই মৃদু হাসি হেসে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বললেন,—এর মধ্যে আপনার কোনটিকে সবার সেরা বলে মনে হয়, মহারাজ?

এ কথার জবাবে, সামনে জড়ো করে রাখা রত্নরাজির মধ্যে থেকে রঙীন-জলজলে একটি বিচিত্র-সুন্দর দামী মণি-পাথর হাতে তুলে নিয়ে রাজা ফিলিপ বললেন,—আমার মতে, এইখানাই হলো সবার সেরা সুন্দর আর দামী রত্ন!

রাজার মতামত শুনে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত কৌতূহলভরে সে রত্নটিকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন···তারপর সেটিকে নিজের কানের উপর নিবিড়ভাবে চেপে ধরে একাগ্রমনে কি যেন শুনলেন। রত্নটিকে খানিকক্ষণ এমনিভাবে পরীক্ষা করে দেখবার পর, রাজা ফিলিপের পানে তাকিয়ে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বেশ একটু চিন্তাকুল-ভঙ্গীতে বললেন,—মহারাজ, মনে হচ্ছে—এ রত্নখানার ভিতরে কোথায় যেন জ্যান্ত একটা পোকা সেঁধিয়ে রয়েছে।

বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের অদ্ভুত মন্তব্য শুনে রাজা ফিলিপের

মনে প্রবল কৌতূহল জাগলো···তিনি তখনি রাজকোষাগারাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন,—অবিলম্বে ঐ রত্নটিকে ভেঙ্গে টুকরো করে ছাখো···রত্নের ভিতরে কোথাও কোনো পোকার সন্ধান মেলে কিনা।

রাজার আদেশে রত্নটি ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করে ফেলতেই দেখা গেল যে তার ভিতরে সত্যিই রয়েছে—বিচিত্র-আকারের ছোট্ট একটি জীবন্ত-পোকা! এ দৃশ্য দেখে রাজা ফিলিপ আর তাঁর অমাত্য-অনুচরেরা সবাই রীতিমত স্তম্ভিত! বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের অসামান্য এই জ্ঞান-বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে রাজা ফিলিপের মনে শুধু যে করুণার ভাব আরো বৃদ্ধি পেলো তাই নয়, বন্দীর উপর শ্রদ্ধাও জাগলো অনেকখানি। পরম-পরিতুষ্ট হয়ে রাজা ফিলিপ হুকুম দিলেন,—রাজভাণ্ডার থেকে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের দৈনিক-আহারের জন্য এবারে আধখানা রুটির বদলে প্রত্যহ যেন পুরো একখানা রুটি বরাদ্দ করা হয়।

রাজার এই নতুন বিধানের কথা শুনে রাজ-অমাত্যের দল আর রাজ্যের প্রজারা সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো! (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—
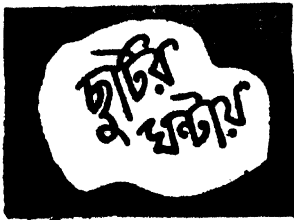
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় আরো একটি মজার খেলার কথা। এটি হলো চুম্বকের আজব-কারসাজি। অভিনব-মজার এই খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব কলা-কৌশল আয়ত্ত করা দরকার, সেগুলি এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়—একটু চেষ্টা করলেই, তোমরা অনায়াসেই চমকপ্রদ এই বিজ্ঞানের খেলাটি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া এ খেলা দেখানোর জন্য সাজ-সরঞ্জাম যা প্রয়োজন, সে সব জোগাড় করাও এমন কিছু শক্ত বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়—বেশীর ভাগই হলো নিতান্তই ঘরোয়া সামগ্রী, সচরাচর যা তোমাদের প্রত্যেকের সংসারেই মিলবে।

পুঁথি-পত্রে নজীর পাওয়া যায় যে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-রহস্যময় খেলাটি সর্বপ্রথম সাধারণের সামনে প্রদর্শিত হয়—বিংশ-শতাব্দীর গোড়ার যুগে, ইউরোপের আমষ্টারড্যাম্ (Amsterdam) শহরে অনুষ্ঠিত এক মেলার আসরে। এ খেলাটি দেখে তখনকার আমলের লোকজনেরা সবাই খুবই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন···রুদ্ধ-বিস্ময়ে তাঁরা দেখেছিলেন—ছোট্ট একটী বাঁধানো-জলাশয়ের (pond) ভিতরে কোনো-রকম সুতো, দড়ি, কাঠি কিম্বা 'স্প্রিং' (Spring), 'মোটর' (motor) প্রভৃতি যান্ত্রিক-সাহায্য (mechanical devices) না নিয়েই সম্পূর্ণ চালক-হীন অবস্থাতেই লোহার তৈরী সামান্য একটি খেলনার নৌকা আপন-গতিতেই দিব্যি-স্বচ্ছন্দো জলের বুকে অবিরাম চক্রাকারে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে। এ ঘটনা দেখে তাঁদের সেকালে রীতিমত তাক্ লেগে গিয়েছিল···অনেকেই তখন কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছিলেন—এমন আজব কাণ্ড সম্ভব হলো কেমন করে! আসল কারণটি কিন্তু খুবই সহজ-সরল···এ ঘটনার মূলে রয়েছে—বিজ্ঞানের অভিনব-রহস্যময় তথ্য···চুম্বকের বিচিত্র কারসাজি। অর্থাৎ চালক-হীন ও যন্ত্র-বিহীন সেই খেলনার নৌকাটি ছিল লোহার পাত (Iron-plate) দিয়ে তৈরী এবং বাঁধানো-চৌবাচ্চার জলের নীচে সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বিরাট-লম্বা 'চাক্তির' (a large horizontal Disc) উপর বসানো প্রবল 'আকর্ষণী-শক্তির' একখণ্ড চুম্বক (a powerful magnet)। জলের তলায় দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে সুনিপুণভাবে লুকিয়ে রাখা চুম্বক-বসানো বিরাট এই 'চাকতিকে' অভিনব-কায়দায় ক্রমান্বয়ে ঘোরানোর ফলেই, নীচেকার চুম্বকের 'আকর্ষণী-শক্তিতে' (Pulling-force) লোহার পাত দিয়ে বানানো খেলনার

নৌকাখানি চালক-হীন অবস্থাতেও অবিরাম-গতিতে বারবার চৌবাচ্চার চারিদিকে চক্রাকারে ভেসে বেড়িয়েছে। এই ছিল সেকালের বিচিত্র-মজার খেলাটির আসল রহস্য।

তবে নিঃখরচায় বাড়ীতে বসে এমনি ধরণে খেলা দেখানো, সাধারণ-লোকজনের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এত সব সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা শুধু যে বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার তাই নয়, নানা রকম ঝঞ্ঝাট পোহানোর দিক থেকেও রীতিমত অসুবিধাজনক। কাজেই এত খরচ-পত্র আর দুর্ভোগ-হাঙ্গামার উপদ্রব বাঁচিয়ে, অন্য কি উপায়ে তোমরা নিজেরাই সহজে এই ধরণের 'চুম্বকের খেলা' দেখানোর কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে পারো, আপাততঃ তারই মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে, এ খেলাটি দেখাতে হলে যে-সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, 'চুম্বকের আজব কারসাজির' খেলা দেখানোর জন্য চাই—প্রবল 'আকর্ষণী-শক্তির' একখণ্ড ভালো চুম্বক, জল-ভরা এনামেলের কিম্বা এলুমিনিয়ামের একটি বড় গামলা বা ডেকচি, নৌকা-বানানোর উপযোগী কয়েক টুকরো নরম-কাঠ, কিছু ১″ ইঞ্চি মাপের লোহার পেরেক, ছোট হাতুড়ী, গোটাকয়েক দেশলাইকাঠি, নৌকার পাল তৈরী করার জন্য খানিকটা পাতলা-কাগজ, সামান্য একটু গঁদের আঠা, একখানা ধারালো ছুরি, আর গজখানেক লম্বা সুতো।
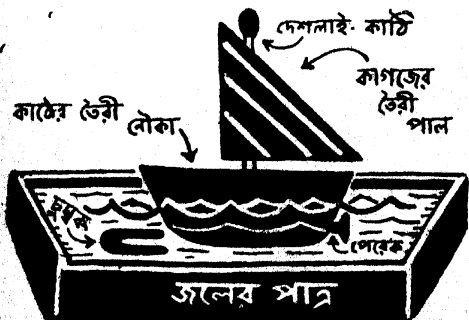
সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, সাবধানে ছুরি দিয়ে কাঠের টুকরো কেটে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ছাঁদের কয়েকটি ছোট-ছোট নৌকা বানাও। তবে খেয়াল রেখো—এ সব নৌকার কোনোটি যেন ১½″ ইঞ্চি মাপের চেয়ে বেশী লম্বা না হয়। নৌকাগুলি মাপমতো-ছাঁদে বানানো হলে, প্রত্যেকটি নৌকার তলায় পিছনদিকে একটি করে ১″ ইঞ্চি লোহার পেরেক গেঁথে দাও—উপরের ছবিতে যেমন দেখতে পাচ্ছো, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে। এবারে প্রত্যেকটি নৌকার ভিতরকার-পাটাতনের (Deck) ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় (Centre of the boat) ছুরি দিয়ে কেটে ছোট একটি 'গর্ত্ত' (Hole) রচনা করো। এই সব 'গর্ত্তে' বসানো হবে—নৌকার 'পাল' (Sail) খাটানোর 'দণ্ড' (Sail-mast)। নৌকার 'পাল' তৈরী করবার জন্য পরিপাটিভাবে 'ত্রি-কোণ' (Triangle) আকারে কয়েকটি কাগজের টুকরো কেটে নিয়ে সেগুলির প্রান্তে গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে উপরের ছবির ভঙ্গীতে প্রত্যেকটি দেশলাই-কাঠির গায়ে পাকাপাকি-ভাবে জুড়ে দাও। তাহলেই দিব্যি-সুন্দর 'ত্রিকোণাকার' (Triangular) নৌকার পাল তৈরী হয়ে যাবে। এবারে দেশলাই-কাঠির গায়ে-আঁটা এক-একটি কাগজের পাল, প্রত্যেকটি নৌকার ভিতরকার পাটাতনের ঐ সব 'গর্ত্তে' এঁটে বসিয়ে দিলেই নৌকা-রচনার কাজ শেষ হবে।

এ কাজের পর, গামলা বা ডেকচির জলের তলায় এক টুকরো কাঠের উপর চুম্বকটিকে বসিয়ে, ঐ কাঠের টুকরোর সঙ্গে চুম্বকের গায়েও লম্বা-সুতোর ফাঁশ এঁটে, সেটিকে চুবিয়ে রাখো...লম্বা-সুতোর অপর প্রান্তটি ধরে থাকো নিজের হাতে—যাতে লম্বা-সুতোর এই প্রান্তটিকে টান দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে জলে-ডোবানো চুম্বকটিকে অনায়াসেই গামলা বা ডেকচির চারিদিকে ঘুরিয়ে আনা যায়। এবারে সদ্য-বানানো কাঠের নৌকাগুলিকে ভাসিয়ে দাও গামলা বা ডেকচির জলে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের সুতোর প্রান্তভাগ টেনে জলে-ডোবা ঐ চুম্বকটিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকো জলপাত্রের তলায় চারিদিকে। তাহলেই দেখবে—কোনোরকম যান্ত্রিক-সাহায্য না নিয়েও সম্পূর্ণ চালক-হীন অবস্থায় জলের বুকে ভাসন্ত পাল-তোলা ঐ ছোট-ছোট কাঠের নৌকাগুলি নিজে-নিজেই গামলা বা ডেকচির চারিদিকে অবিরাম-গতিতে চক্রাকারে

রে বেড়াতে সুরু করেছে। এই হলো, 'চুম্বকের আজব কারসাজির' খেলা দেখানোর সহজ-সরল উপায়।

এ খেলার কলা-কৌশল তো শিখলে···এবারে নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দ্যাখো আর বিচিত্র-মজার এই বিজ্ঞানের রহস্যময় কারসাজি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দাও।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। ছবির হেঁয়ালী ঃ
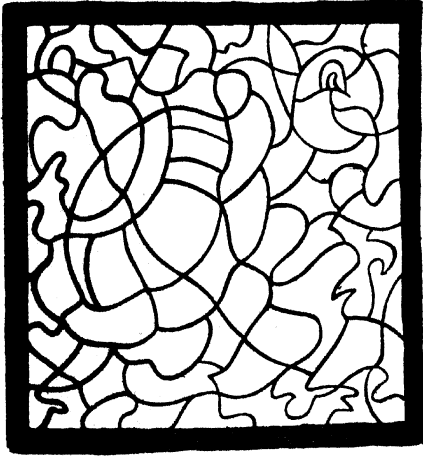
সেদিন আমাদের চিত্রকর-মশাইকে খবর পাঠালুম যে অতি-সাধারণ আর হামেশা নজরে পড়ে এমন একটি জলচর এবং স্থলচর অর্থাৎ উভচর-জীবের ছবি এঁকে দেবার জন্য। পরেরদিন দুপুরে আমাদের ফরমাসমতো চিত্রকর-মশাই যে ছবিখানি একে এনে সম্পাদকের দপ্তরে হাজির হলেন, সেখানি দেখে তো সবাইকার চক্ষু-স্থির! কাগজের উপর আগাগোড়া তুলির এলোমেলো খামখেয়ালী হিজিবিজি-রেখা টেনে আঁকা কিম্ভুত-ছাঁদের বিচিত্র এক ছবি—চিত্রকর-মশাই কি যে এঁকেছেন, ছবি দেখে তার হদিশ মেলে না এতটুকু! অনেক চেষ্টা করে আমরা কেউই সে ছবির মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না··· অথচ চিত্রকর-মশাই বারবার বলছেন যে তিনি নাকি আমাদের কথামত অতি-সাধারণ আর নিত্য চোখে পড়ে এমন একটি জলচর এবং স্থলচর অর্থাৎ উভচর জীবেরই ছবি এঁকে এনেছেন—তবে নিতান্ত স্পষ্ট ও সোজাসুজি ধরণে নয়, চিত্র-রচনার আধুনিকতম-কেতায় সামান্য একটু হেঁয়ালির ছাঁদে। তাই চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা সেই কিম্ভুত-ছাঁদের হেঁয়ালি-চিত্রটি প্রকাশ করলুম তোমাদের সামনে। হেঁয়ালির রেখায় আঁকা বিচিত্র-ছাঁদের এই ছবিখানি দেখে, চিত্রকরমশাই যে অতি-সাধারণ উভচর-জীবটির চেহারা এঁকেছেন। তার সঠিক সন্ধান যদি আবিষ্কার করতে পারো তো বুঝবো—বুদ্ধিতে তোমরা রীতিমত দড় হয়ে উঠেছো—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে!

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

সকলে আমার নাম দিয়েছে তিন অক্ষরে, থাকতে দিয়েছে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। মাথা কেটে দিলেও সকলে টানাটানি করে আমায় নিয়ে। তখন আমাকে ছাড়া যে দুনিয়া বাঁচে না। পেট কেটে দিলে যেটুকু থাকে, আজ আর তা বলা চলবে না। আর যদি ঠ্যাংটাকে কেটে ফেলো, তাহলে সারা জগৎ আমায় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। বলো তো, আমি কে?

রচনা ঃ ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী)

৩।

তিন অক্ষরে আমার নাম। আমাকে ছাড়া কোন লোকের চলে না, কিন্তু আমি নিশাচর জীবদের পরম শত্রু। আর আমার মাথাটা কেটে ফেললে, আমি হয়ে যাই—ব্যক্তিবিশেষ। বলো তো ভাই, আমার নাম কি?

রচনা ঃ মানসমোহন বসু (কোন্নগর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। ৮+৮+৮+৮৮+৮৮৮=১০০০

এই ধরণে সংখ্যাগুলিকে সাজালেই অঙ্কের হিসাব ঠিক-মতো মিলে যাবে। অঙ্কের হিসাব মেলানোর জন্য, এছাড়াও আরো অন্য-ধরণে সংখ্যাগুলিকে সাজানো যায়।

২। বাতাস

৩। ঘটোৎকচ

৪। পাটালি

গতমাসের চারটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), প্রমীতা ও যশোজিৎ মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা) দীপিকা দাশবড়ুয়া (জামশেদপুর), সমরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (দাসপুর, বর্দ্ধমান), বিপুল সরকার, চিত্ত ঘোষ, অমিতাভ ও রণজিৎকুমার মণ্ডল, সুশীল অধিকারী, মণ্টু চট্টোপাধ্যায়, শরৎ ও হরেন সরকার (পতিরাম, পশ্চিম দিনাজপুর),।

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

শুভা, সোমা, অরিন্দম, ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), কবি হালদার (কোরবা), সত্যেন মুখোপাধ্যায় (ভিলাই), ধর্ম্মদাস রায় (বিদ্যাধরপুর, বাঁকুড়া), অনুরাগময়, পরাগময়, বিরাগময়, সিপ্রাধারা, স্বরাগময়, ধীরাগময় ও মণিমালা হাজরা, (বড়বড়িয়া, মেদিনীপুর), শ্যামসুন্দর ও চম্পাবতী ধর (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সঞ্জয় বিশ্বাস ও মুরারী পালচৌধুরী (দুর্গ), বাসন্তী মিত্র (কলিকাতা), বাবলু সোম (শিবপুর), সুব্রত পাকড়াশী (কানপুর), সুব্রত, শ্যামল ও কমল (কলিকাতা), বাচ্চু (কেশীয়াড়ী, মেদিনীপুর),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় (কাঁচড়া-পাড়া), ইতি, ঐশ্বর্য্য, মোহন, ও বুন্টু (হুগলী)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

কালক্রমে শিক্ষা-সভ্যতায়, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, কলাকৃষ্টি-নৈপুণ্যে সমুন্নত হয়ে উঠে প্রাচীন যুগের গ্রীস-রাজ্যের অধিবাসীরা প্রবল ক্ষমতাশালী এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য-বিস্তারী শক্তিরূপে পরিগণিত হন। শুধু স্থলপথেই নয়, জলপথেও তাঁরা সদর্পে বিজয়-অভিযান চালাতেন—উন্নত-পদ্ধতিতে তৈরী কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো বিরাট-আকারের এই সব বিচিত্র অর্ণব-পোতে দুস্তর সাগরের বুকে পাড়ি জমিয়ে দেশে-দেশান্তরে হাজির হয়ে। সেকালের এ সব গ্রীক-জলযান চালিত হতো সুনিপুণ দাঁড়ি-মাঝিমাল্লা আর বাতাসের মুখে মস্ত পাল খাটানোর ব্যবস্থার ফলে। এ সব জলযান দেখতে যেমন সুন্দর, কাজেও তেমনি দৃঢ়-মজবুত হতো।

অতঃপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দশম শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত স্ক্যাণ্ডিনাভিয়া-অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌ-বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করে উত্তর-ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে এবং ইংলণ্ডের উপকূল-প্রদেশে বিপুল-বিক্রমে ঘন-ঘন হানাদারী-আক্রমণ চালিয়ে রীতিমত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন। এঁরা মূলতঃ ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ-নির্ম্মম ধরণের জলদস্যু-সম্প্রদায়—এঁদের বলা হতো 'ভাইকিং' (VIKING)। কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী এই-ধরণের সুদৃঢ়-বিরাট রূপ-সজ্জায়-সাজানো পাল-তোলা বিচিত্র-ছাঁদের জলযানে চড়ে অবলীলাক্রমে দুরন্ত সাগর পার হয়ে স্বদেশ ছেড়ে এরা বেরুতেন বিদেশী-রাজ্য লুন্ঠন-অভিযানে। ইতিহাসে এঁদের জলপথে অভিযানের বহু পরিচয় মেলে।

সাহসী আর সুদক্ষ-কুশলী নাবিক হিসাবে প্রাচীন যুগ থেকেই আরব দেশের অধিবাসীদের রীতিমত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। সেকালে এই কাঠের তৈরী বিচিত্র ছাঁদের পাল-তোলা দ্রুতগামী জলযানে চড়ে তাঁরা দক্ষিণ-ভারতীয় বন্দরে ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য আর রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। এ সব জলযান অবলীলাক্রমে সাগর-পাড়ি দেবার উপযোগী ছিল। এ ধরণের জলযান আজও ব্যবহার হয় আরব দেশে। এগুলি খুবই মজবুত-গঠনের জলযান

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের আমলে ভারতীয় নৌ-শিল্প এতই উন্নত হয়ে ওঠে যে আমাদের দেশের কুশলী নাবিকেরা বিভিন্ন ধরণের বড়-বড় বাণিজ্যতরী বিচিত্র সম্ভারে সুসজ্জিত করে দূর-দূরান্তের বিদেশী-রাজ্যে পাড়ি দিতেন সিন্ধু সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ যুদ্ধ করে। এ সব ভারতীয় জলযান আকারেও ছিল বিরাট এবং দেখতেও হতো অপরূপ কারুকার্য্যময়।

কটকে চব্বিশ মাস

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বেই, বলেছি, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শুধুই আমার হিতার্থী প্রতিবাসী ছিলেন না, তিনি ওখানে আমার অন্যতম অভিভাবক ছিলেন। আমি প্রায়ই সকালের দিকে তাঁর কাছে যেতাম। সে সময় প্রায় তিনি নানাবিধ সাময়িক পত্রিকা পাঠ করতেন, কিংবা 'Utkal Times' য়ের সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর সুবিস্তীর্ণ বাংলোর একধারেই ছাপাখানা ছিল। তাঁর হাতে Writers' cramp ব্যাধি থাকায়, তিনি সহজ ভাবে লিখতে পারতেন না এবং লেখার অক্ষরগুলো আঁকা-বাঁকা জড়ানো গোছের হোত, যা অন্যলোকের পক্ষে পাঠ করা কষ্টকর হোলেও, তাঁর ছাপাখানার অভ্যস্ত কম্পোজিটার তা বুঝতে পারতেন।

সর্ববিষয়ে তিনি মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন। যখনকার কথা লিখছি, তখন তাঁর বয়স, মনে হয় ৭০।৭২ বৎসর। এখন তিনি জীবিত থাকলে তাঁর বয়স একশো বিশ বৎসর হোত। কবে তিনি মারা গিয়েছেন, সে খবর জানি না। 'মানব প্রকৃতি' নামে তিনি একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর পড়াশুনা ও জ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতা তাঁর ঐ গ্রন্থখানি পাঠে জানা যায়। সে সময় ঐ বই বাজারে দুষ্প্রাপ্য ছিল। খুঁজে পেতে একখানা জীর্ণ মলিন বই তিনি আমায় দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, বইখানি আমার কোলকাতার বাড়ী থেকে কেউ নিয়ে গিয়ে আর আমাকে ফেরৎ দেননি। ভালো জিনিসকে ধরে রাখা বড় কঠিন।

ক্ষীরোদবাবুর বাংলোর বিস্তৃত হাওদার মধ্যে আরো দুটি বাংলো ছিল, একটি মাঝারি ও অপরটি ছোট আকারের। কোলকাতা হোতে মহাত্মা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় ঐ মাঝারি বাংলোটায় এসে মাস দুই থাকতে বাধ্য হন। সে সময়ে তিনি চোখের অসুখে ভুগছিলেন। ডাক্তারদের পরামর্শে কটকে চলে আসেন। তাঁর ওখানে আসবার কয়েকটা দিন পরেই কোন কারণে আমাকেও আমার ভাড়া করা সেই বাসাটি ছেড়ে দিয়ে, ঐ ছোট বাংলোটায় চলে আসতে হয়। শিবের পদতলে ভক্তের ঠাঁই মিল্‌লো। সর্বদাই তাঁর দর্শন, কথা-বার্তা, আলাপ—আলোচনা। শাস্ত্রীমশায়ের চোখ সদা-সর্বদাই বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকতো। সঙ্গে তাঁর সতী সাধ্বী সহধর্মিণী ছিলেন। তিনিই স্বামীর পরিচর্যা থেকে আরম্ভ কোরে রান্না-বান্না ঘরের কাজ প্রভৃতি সবই করতেন। কোন বিরক্তি নেই, বিলাস-বাহুল্য নেই, ক্লান্তি নেই। একটাকা আঠারো আনা দামের মোটা শাড়ী ছাড়া আর কিছু তাঁকে কখনো পরতে দেখিনি। লক্ষ্মী প্রতিমার হাতে কি কোন অলঙ্কার ছিল? মনে হয় যেন ছিল।—ম্যাড়্ মেড়ে সোনার, টোল্-খাওয়া, সাবেক প্যাটার্ণের দুগাছা দোচালাপাকের বালা। এই সূত্রে একদিন শাস্ত্রীমশায়কে বলেছিলুম—"মাসে তিন-চারটে টাকা দিলেই এখানে একজন লোক পাওয়া যাবে, যাকে দিয়ে রান্না-বান্না প্রভৃতি সব কাজই হোতে পারবে।" উনি বললেন—"বেশই ত চলে যাচ্ছে, অনাবশ্যক আমি যদি কিছু ব্যয় করি, তা হোলে মালীকের তবিল-তছরূপের দায়ে আমাকে পড়তে হবে, বাবা।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তিন-চার টাকায় যে এখানে কাজ করতে আসবে, সে অন্য জায়গাতেও কাজ পেয়ে যাবে, কিন্তু যার কাজ পাবার উপায় নেই, এই তিন-চার টাকাতে তেমন কত লোকের সাহায্য হোতে পারবে।"

সকালে ওঁর বাংলোর বারান্দায় বোসে কথা হোত। ওঁর স্ত্রী দরজার পাশে মেজের ওপর বসে থাকতেন। একদিন শাস্ত্রীমশাই আমাকে বললেন—"বলি—বলি কোরে বলতে পারি না, তুমি যদি আমার একটু উপকার কর।"

খুব আগ্রহ ভরে বললুম—"বলুন, কি করতে হবে।"

"চোখের জন্যে লেখাপড়া করা এখন আমার বন্ধ; ডাক্তারদের নিষেধ। তুমি যদি রোজ সকাল বেলায় কিছুক্ষণ পড়িয়ে শোনাও। তা না হোলে, আমার সময়

কাটানো দায় হোয়ে উঠছে, চিন্তা করবারও কিছু পাই না।—পারবে ?”

“এ কাজ ত আমার আশীর্বাদী। কি পড়তে হবে বলুন ?” উনি বললেন যে-সমস্ত বিলিতী—পত্রপত্রিকা আমার কাছে আসে, সেইগুলো থেকে কিছু কিছু পোড়ে যদি আমাকে শোনাও।”

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হলুম এবং পরের দিন থেকেই আমি ওঁকে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পড়ে, শোনাতে লাগলুম। পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয়। আমি পড়তুম মাত্র, তার অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাব কিছুই বুঝতুম না। এইভাবেই দিন চললো ; আমি একখানা চেয়ারে বোসে পড়ে যাই, উনি একখানা বেতের আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বোসে নিবিষ্টমনে শোনেন। সামনে কিছু দূরবর্তী মহানদীর পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, ধূসর উষর ভূমি ধূ ধূ করচে—তারপর একস্থানে ওপর থেকে আকাশ অর্ধচন্দ্রাকারে নেমে এসে তাকে আট্‌কে ফেলেচে।

এখানে বলা আবশ্যক, শাস্ত্রী মহাশয়কে সেই আমার দ্বিতীয়বার দর্শন। আমার বাল্য কিশোর কালের ঘটনাবলী সমন্বিত ‘জীবনের জলছবি’ তে ওর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনের কথা লিখিত হোয়েছে। এখানে সংক্ষেপে সে কথা লেখা যেতে পারে। তখন আমার কিশোর বয়স, সুতরাং ঐ সময়ের ১৪।১৫ বছর আগের কথা। ছোটদের মাসিক ‘মুকুলে’ সে সময় একটা গল্প প্রতিযোগিতায় আমার গল্প প্রথম হয়। জীবনে, সেই পাঠ্যাবস্থায় ঐটিই আমার প্রথম গল্প-লেখা। প্রথম হওয়ার পুরস্কারটি সেদিন ওঁর হাতে থেকেই আমি পেয়েছিলাম। সেদিন পুরস্কার দিতে গিয়ে, উনি আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—“খাসা গল্প লিখেচ, বড় হয়ে তুমি একজন বড়ো লেখক হবে।”

পনর বছর পূর্বের ওঁর সেই কথা উত্থাপন কোরে একদিন বললাম—“আপনার আশীর্বাদ যে—ফলল না। বড় লেখক দূরের কথা একটা পুঁচকে ছোট লেখকও ত হোতে পারলুম না।” উনি বললেন—“এখনো ত তুমি ছেলেমানুষ, বড়ো হওয়া ত পালিয়ে যায় নি।”

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কিশোর বয়সে আকস্মিক ভাবে ঐ গল্পটি লেখার পর, আমার চল্লিশ বছর বয়সে—আমি সর্বপ্রথম বাণীর মন্দিরে প্রবেশ কোরে আমার দীন অর্ঘ্য সাজাতে সুরু করেছিলাম।

সকাল-সন্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পবিত্র ও মহান সঙ্গে আমার দিন কেটে যেতে লাগলো। আমার কচি ছেলেটিকে উনি বড় ভালবাসতেন। মাস দুই পরে যখন তিনি কোলকাতায় ফিরে গেলেন, বলে গেলেন—“চিঠি দিয়ো, আর খোকার কথা লিখো।”

কটক থেকে গিয়ে তিনি ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডের এক বাড়ীতে থাকেন। আমি মাঝে মাঝেই সেখানে তাঁকে চিঠি দিতাম, আর তাঁর চিঠি পেতাম। একখানা চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, খোকার দুটো দাঁত বেরিয়েচে। উনি লিখলেন—”তাকে দেখবার আমার বড্ড ইচ্ছে করচে ; দু দাঁতের হাসি, আমি বড়ো ভালবাসি।”

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় যে-সব শক্তিধর ও মনীষী জন্মেছিলেন, দেশ ও সমাজের বিভিন্ন দিকে তাঁরা এক একজন ছিলেন—দিকপাল। বর্তমানকালে, কই সে-ধরণের লোক ত আর দেখা যাচ্ছে না।

* * *

রামমূর্তির সার্কাস

কটকে রামমূর্তির সার্কাসের দল এলো। আমাদেরই ঐ দিকে সার্কাসের প্রকাণ্ড তাঁবু পড়লো। নানারকম খেলা ছাড়া, চলন্ত মোটর গাড়ী পেছন থেকে রামমূর্তির টেনে রাখা, বুকের উপর ৪।৫ মণ ওজনের পাথর রেখে, প্রকাণ্ড হাতুড়ীর আঘাত মেরে তা ভেঙ্গে ফেলা ; আরো অনেক কিছু। রোজই খুব লোক হোতে লাগলো। আমিও প্রায় রোজই যাই,—অবারিত দ্বার ; টিকিট কিনে আমাকে ঢুকতে হয় না। এর কারণ হোল, আমাদের কালীঘাটেরই কয়েকজন খেলোয়াড় ঐ সময় রামমূর্তির দলে ছিল। তারা সব আমারই বয়সী—নেড়ু, কালাচাঁদ, গোরা, অতুল প্রভৃতি। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ অম্বুকুল মিত্তিরের আকড়ায়, কেউ-কেউ অমর-কেষ্টদা’র আকড়ায় খেলতো। কবে যে ওরা কালীঘাট থেকে চলে গিয়ে রামমূর্তির দলে যোগ দেয়, তা আমার জানা ছিল না।

যে ক’দিন ওখানে রামমূর্তির সার্কাস-দল ছিল সে

ক'দিন প্রায় রোজই আমি গিয়ে দেখে আসতাম। ওখানে আমার আদর-খাতির দেখে সকলে মনে ভাবতো, আমি যেন ওদের ভেতরেরই লোক।

একদিন খেলা দেখবার সময় এক কাণ্ড ঘটলো। তারের ওপর খেলা দেখানো হচ্ছিলো। উঁচুতে খাটানো তারের ওপর হেঁটে যাতায়াত করা, চেয়ারের পায়া তারের ওপর রেখে তার ওপর বসা, সেই অবস্থায় ৪।৫টা কাঠের বল নিয়ে দু'হাতে অদ্ভুতভাবে লোফা-লুফি করা প্রভৃতি অনেক-কিছু। খেলাটা দেখাচ্ছিল আমাদেরই পাড়ার কালাচাঁদ মুকুজ্যে। অত উঁচুতে, একগাছা সরু তারের ওপর বোসে, দাঁড়িয়ে, হেলে, দুলে, নেচে কত কি কাণ্ড করতে লাগলো। আমরা তন্ময় হোয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। এক অসতর্ক মুহূর্তে—কালাচাঁদ তারের ওপর থেকে পড়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সংজ্ঞা-হীন। হঠাৎ পড়ে গেলে কোন আঘাত না লাগে সে জন্যে অবশ্য ব্যবস্থাও ছিল। একখণ্ড মজবুত বস্ত্রের চার কোণার চারটে খুঁট ধোরে চারজন ওপরে কালাচাঁদের গতি অনুসারে, নীচে ঘোরা-ফেরা করছিল—যাতে পড়ে গেলে তারি ওপর পড়ে এবং কোন আঘাত না লাগে। তা সত্ত্বেও কালাচাঁদের আঘাত লাগলো এবং অজ্ঞান হোয়ে গেল। সমস্ত দর্শক এই ব্যাপার দেখে ভীত চকিত হোয়ে পড়লো। আমি কাঠের বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে ওঁদের তাঁবুর ভেতর চলে গেলুম।

গিয়ে দেখলুম, কালাচাঁদের সংজ্ঞাশূন্য দেহটা রামমূর্তি কোলে কোরে বসেচেন, আর জোরে-জোরে তার কানের মধ্যে একটানা ফুঁ দিয়ে যাচ্ছেন। আমি বল্লুম—"একজন ডাক্তারকে ডেকে আনলে হয় না?" উনি বললেন—"তাতে সময় নষ্ট হবে, অথচ ফল ভালো হবে না।" কোনো ভয়ের কারণ নেই। তিনি দুই কানের ছেঁদাতে অনবরত ঐ রকম ফুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন, আর কানের কাছে মুখ রেখে ডাকতে লাগলেন—"কালাচাঁদ!" মিনিট চার-পাঁচ পরে, এই ডাকের উত্তরে কালাচাঁদ ক্ষীণ স্বরে সাড়া দিলে—'অ্যাঁ!' রামমূর্তি বললেন—"কোন ভয় নেই আর।" তখন দুধের সঙ্গে একটু ব্রাণ্ডী মিশিয়ে তিনি চামচে দিয়ে একটু একটু কোরে ওকে খাওয়াতে লাগলেন। সেদিন খেলা আবার সুরু হোল বটে, কিন্তু রোজকার মত তেমন আর জমলো না। দর্শকদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা অস্থির মনোভাব—সেদিন সারা তাঁবুর ভেতর থম্‌-থম্‌ করতে লাগলো।

বুকের ওপর ৪।৫ মণ ওজনের পাথর রেখে, দুজন শক্তিশালী লোকের দমা-দম্‌ হাতুড়ীর আঘাতে তা ভেঙ্গে ফেলা, ঐ সময়ের পর থেকে অনেক স্থলেই দেখানো হয়, কিন্তু রামমূর্তির আগে কোথাও কেউ এ রকম কোরেছিলেন কি না, তা আমার জানা নেই। রাম-মূর্তির বুকখানা বিশাল। তিনি আসরে প্রবেশ কোরে, দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে, মধ্যস্থানে চিৎ হোয়ে শুয়ে পড়তেন। তখন তাঁর বুকের ওপর একটা তুলাভরা বালিস রাখা হোত। চারজন শক্তিশালী লোক সেই ভারি পাথরখানা ধরা-ধরি কোরে এনে তাঁর বুকের ওপর সন্তর্পণে চাপিয়ে দিতেন। তারপর অপেক্ষাকৃত এক খানা ছোট পাথর তার ওপর রাখা হোত। তখন তাঁর দুপাশে দু'জন প্রকাণ্ড হাতুড়ী দ্বারা পর্যায়ক্রমে দমা-দম্‌ আঘাত কোরে যেতেন সেই ছোট আকারের পাথরটার ওপর। বুকের ওপর প্রচণ্ড বিক্রমে সেই আঘাতের পর আঘাত দেখে আমরা সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠতুম। আমাদের বুক কেঁপে উঠতো। ঐরূপ ৮।১০ বার আঘাতের পর পাথরখানা যখন দুখানা হোয়ে ভেঙ্গে যেত, তখন রাম-মূর্ত্তি বুকের একটা ঝাঁকানী দিয়ে বুকের পাথরখানা পাশে ফেলে দিতেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আবার সকলকে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে চলে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভয়-বিহ্বল বুকের কাঁপন থেমে যেত।

একদিন খেলা শেষ হোলে, আমি ওঁদের তাঁবুর ভেতর গিয়ে, একথা-ওকথার পর ওঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনি রোজ কি খান?" উনি একটু হেসে বললেন—"আমি নিরামিষাশী; কি খাই এদের জিজ্ঞাসা করুন।" গোরা আমার পাশে বসেছিল, সে বললে—"দুবেলা দুটি ভাত খান, আর সামান্য কিছু তরি-তরকারী; তার সঙ্গে ইম্‌লীর ঝোল"—অর্থাৎ তেঁতুলের ঝোল। শুনে আশ্চর্য হলুম। পরে অতুল আমায় চুপি-চুপি বললে—"উনি রোজ যোগ করেন, প্রাণায়াম করেন। বুকে পাথর ভাঙ্গার সময় উনি শ্বাস-রুদ্ধ কোরে থাকেন। সে সময় হঠাৎ যদি শ্বাস ফেলেন, তখনি মৃত্যু।" এসব অসাধারণ ব্যাপার

যে যৌগিকক্রিয়ার ফলেই হয়, তা শুনেচি। হঠ্ যোগ। হঠ্ যোগের দ্বারা সাধারণের পক্ষে যা করা কঠিন সে রকম অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারা যায়। এমন কি দীর্ঘদিন ধরে কোন কোন যোগী শ্বাস-প্রশ্বাসহীন অবস্থায় মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হোয়ে যোগের অদ্ভুত ঐশ্বর্য সকলকে দেখিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে অন্যান্যের মধ্যে হরিদাসসাধুর কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যোগ-ক্রিয়ার দ্বারা অপরের সদ্যোমৃত দেহে যে তাঁরা প্রবেশ করতে পারতেন, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের কাহিনী থেকে তা আমরা জানতে পারি।

ভারতের মুনি-ঋষিরাই সর্বপ্রথমে উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল বর্তিকা জ্বালেন এবং সে আলোক পৃথিবীর দিকে দিকে বিকীর্ণ করেন। বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান এখনো সেরূপ গভীরে পৌঁছাতে পারেনি। মানুষ তার বহুমুখী মনকে কেন্দ্রীভূত কোরে, সেই অবস্থায় অনেক অসাধ্য সাধনও করতে পারে। বর্তমান ইয়োরোপ-আমেরিকায় এই ধরণের ইচ্ছাশক্তিকে (will power) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েচে।

* * * *

আমাদের সেরেস্তায় যে ক'জন বরকন্দাজ ছিল, তাদের ওপরে ছিল একজন হেড্ বরকন্দাজ ; তাকে সকলে 'জমাদার' বলতো। জমাদার লোকটি দেখতে শুনতে যেমন ভালো ছিল, তার স্বভাব-চরিত্র, আবার ব্যবহারও ভালো ছিল। অন্য বরকন্দাজদের মত সে চপল প্রকৃতির হাল্কা মানুষ ছিল না। বেশ গম্ভীর অথচ মিশুক প্রকৃতির লোক ছিল। তার বেশ সাহস ও ছিল। জান্‌তো-শুন্‌তোও অনেক। শিকার বিষয়েও তার কিছু জ্ঞান ছিল। একদিন সে আমাদের বললে যে, মহানদীতে অসংখ্য কুমীরের আড্ডা। এ কথা শুনে আমি চম্‌কে উঠে বললুম—"মহানদীতে কুমীর! কত লোক রোজ মহানদীতে স্নান করে, আমিও করি, কিন্তু মহানদীতে কুমীর আছে, একথা ত কারুর মুখে শোনা যায় না?" জমাদার বললে—"এ দিকে কুমীর আসে না, উজানে গেলে দেখা যায়—কত কুমীর! একদিন নৌকো কোরে আপনাকে উজানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।" সেই কথা মত একদিন আমাদের আট-দশজনকে নিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া কোরে জমাদার উজান বেয়ে নিয়ে গেল। সহরাঞ্চল ছাড়িয়ে প্রায় মাইল-দুই পথ আমরা নৌকোযোগে গেলাম। দু'তীরে কোথায় লোকালয় নেই। নির্জন, নিস্তব্ধ। কোন মানুষেরই সেখানে পা পড়ে না। শীতকাল। মন্দগতিতে মহানদী সমুদ্রাভিমুখে চলেছে—তার ভেতরকার সেই মন্দগতি বাইরে থেকে কিছু জানাও যায় না। মাঝে মাঝে নদীগর্ভে দু'একটা বালির চড়া মাথা জাগিয়ে দুপুরের সূর্যকরে চিক্ চিক্ করচে। একজায়গায় জমাদার বললে—"ঐ দেখুন, ঐ-সেই চড়াটার দিকে চেয়ে দেখুন, কতো কুমীর চড়ার ওপর শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে!"

তাই ত বটে! দেখা গেল, সামনের দিকে একটু দূরে একটা চড়ায় আট-দশটা কুমীর শুয়ে আছে। আমরা ক্রমশঃ একটু কাছে যেতেই, নৌকোর শব্দ পেয়ে, তারা ঝপ্-ঝপ্ কোরে নদীর মধ্যে পোড়ে অদৃশ্য হোয়ে গেল। আসবার সময় জমাদার একটা দো-নলা বন্দুক সঙ্গে এনেছিল। আমরা চড়াটাকে বাঁ দিকে রেখে ডান দিক ঘেঁসে আরো কিছু অগ্রসর হলুম। এক জায়গায় একটা পরিষ্কার পাড়ের ওপর আমরা নৌকা থেকে নামলুম। পেছনে দু'দশটা বড় বড় গাছ, আশে-পাশে দু'চারটে ঝোপ-ঝাড়। স্থানটা মনোরম। জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলুম—জলে ত দেখলুম কুমীর। ডাঙ্গায় কিছু আছে নাকি?

"না, বাঘের ভয় নেই।"

আমাদের ভেতর একজন বললে—"ভরসাও নেই। থাকা অসম্ভব নয়।"

স্থানটার পরিবেশ দেখে আমাদের একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো। শীতের বেলায় অপরাহ্নের ছায়াও পড়ে আসছিল। ফিরতেও হবে অনেকটা পথ। সুতরাং আমরা ওখানে আর না দাঁড়িয়ে নৌকায় উঠে এলাম এবং ফেরবার পথে ফিরলাম।

মাস-দুই পরে, আমাদের ঐ জমাদার সম্বন্ধে একটা দুঃখজনক ব্যাপার ঘটলো। আমাদের বাংলোর হুদ্দার মধ্যে অফিস ঘরগুলোর পেছনে একটা পুকুর ছিল। সেদিন চৈত্রের এক অপরাহ্ন। জমাদার নিত্যকার মত ঐ সময়ে ঐ পুকুরে মুখহাত ধুতে গিয়েছিল। কিন্তু পুকুর পাড়ে হঠাৎ শুয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হোয়ে পড়ে। ডাক্তার ডাকা হোল, কিন্তু জমাদারের জ্ঞান আর ফিরে এল না; তার দেহ অসাড় এবং ঠাণ্ডা হোয়ে

গেল। ডাক্তার বলে গেলেন—কলেরা—ড্রাই কলেরা। এর আগে ড্রাই কলেরা নামটা কখনো শুনি নি, সেই প্রথম শুনলাম।

* * *

বাঙ্গলা দেশের একজন মানুষের পক্ষে ৯০।৯৫ বছর বয়স খুবই দীর্ঘ বটে, কিন্তু ৮০।৮১ বছরটাও কি কম? এ বয়সে পেছনের দিকে ফিরে তাকালে, গোড়ার দিকের বড় একটা কিছু সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। সেই ছেলে-বেলা, সেই কিশোর বেলা—ওঃ! সে-সব কতদিন হোয়ে গেল। কত দিনের কথা! সে কি আজ—সবই অস্পষ্ট, সবই ঘোলাটে। কত ঘটনা কত কথা, কত-সব রকমারি অবস্থা, কত স্থান, কত মানুষ—কত কি! জীবন কত জায়গায় কত বাঁক ঘুরেচে, কত কাণ্ডকারখানা তার সামনে ঘটেচে, কত নিকট দূর হয়ে গেছে—কত দূর নিকটে এসেচে। স্মৃতির ছাপে কত কথা ক্রমেই যেন অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হোয়ে আসচে। মনে হয়, এ সব কি জীবনে কখনো ঘটেছিল? নিজের মনের ওপর সন্দেহ জাগে। বহুদিনের সেইসব স্মৃতি এখন যেন লুকোচুরি খেলে। এখন সেই বহুদিনের ওপার থেকে, তারা যখন আমার উদ্দেশ্যে টু দিয়ে ওঠে, তখন সেই দিকে চেয়ে কেমন-যেন সব গোলমাল হোয়ে যায়; যা দেখি, যাকে দেখি, মনে সন্দেহ হয়—ঠিক ত, ঠিক ত? এটা কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতা নয়, এটা স্মৃতির ওপর বহু ঘটনার অতিরিক্ত চাপের ফল কিনা বলতে পারি না।

রাশিয়া, বুলগেরিয়ার কথা আলাদা। কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের লোক সবাই ৮০।৮১ বছর পর্যন্ত না বাঁচলেও অনেকেই বাঁচে। কিন্তু এই বাঁচার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। একজনের এই সময়টা হয়ত কেটে এসেচে সীমাবদ্ধ, অল্প ওর স্থান, কাজ ও ঘটনাবলীর মধ্যে—আর একজনের কেটেচে, বহু স্থান কাজ ও ঘটনার মধ্যে। সুতরাং শেষোক্তের স্মৃতি ভাণ্ডারে চাপ পড়ে বেশী এবং তার ফলে ঐ ধরণের গোলযোগ ঘটে।

কবে, কি কারণে শ্রীযুত ক্ষীরোদ বাবু বাংলো ছেড়ে দিয়ে আবার আমার আগের বাসার পাশে প্রকাশ-মা'র বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে থাকলুম, আর আমার সেই 'হরোয়াল' পাখীটা কোন্ বাসায় থকেতে, খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে চলে যায়, তার কিছুই ঠিক-ঠিক মনে পড়ে না। শুধু পাখীটার সম্বন্ধে এইটুকুই মনে পড়ে যে, ওর পালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেছিলেন—"অন্য দিনের মত খাবার দিয়ে ওর দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, আর তখনি 'জঙ্গলী' উড়ে চলে যায়।" আমার স্ত্রী ওকে 'জঙ্গলী'—বলে ডাকতেন। যাই হোক, ভাবলুম—বনের পাখী বনে উড়ে গেল। বন্দী-জীবনের পর মুক্ত অবস্থা, এ যেন মৃতের পক্ষে নব-জীবন পাওয়া—যদি প্রকৃতির সেই বন প্রকৃত বনের মতই থাকে।

দু'একটা বিশেষ শ্রেণীর রোগ উড়িষ্যায় বড্ড বেশী। এখানকার জল দোষের জন্যে পদ-স্ফীতি, কোষ-বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ ও রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বক্সী-বাজারে এম. এল. সাহা এণ্ড সন্সের একখানা দোকান ছিল। আমি মাঝে মাঝে সময় পেলেই বিকেলের দিকে ওখানে গিয়ে বসতুম। রাস্তায় নানারকম লোক চলাচল দেখতুম। একদিন ভাবলুম, কতলোকের পদ-স্ফীতি রোগ (শ্লীপদ), বোসে বোসে গুণবো। গুণতে সুরু করলুম। পথিকদের পায়ের দিকে চাই আর গুণতে থাকি। আধ ঘনটার মধ্যে আমি এই রোগের অধিকারী পেলুম—বারো জন।

হঠাৎ আমার শ্বাশুড়ী-মাতার পায়ের পাতার ওপরে একটা ফোঁড়া হোল। বড়ো হোল, লাল হোল, পাকলো, যন্ত্রণা হোতে লাগলো, কিন্তু ফাটলো না। অগত্যা 'কটক মেডিক্যাল স্কুলে'র অধ্যাপক, কটকের নাম করা ডাক্তার দেবেনবাবুকে আনতে হোল। তিনি এসে ফোঁড়াটা কেটে দিলেন। ফী দিলুম; তিনি তা নিয়ে, থোকার কচি হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন। আমি বললুম—"এটা কিরকম হোল?" উনি বললেন—"ভাগনেকে শুধু হাতে দেখতে নেই"—বোলে অল্প-অল্প হাসতে লাগলেন।

এখানে বলা দরকার যে সেই ঘণ্টা-খানেক সময়ের মধ্যেই রোগিণী আর ডাক্তারের মধ্যে অনেক কথা-বার্তা পরিচয়াদি হোয়ে যাবার পর জানা গেল যে, ওঁদের পৈতৃক দেশ—বর্ধমান জেলার পাশা-পাশি দুটি গ্রামে। আমার শ্বশ্রূমাতা সেইদিন থেকেই দেবেন বাবুর মা হোয়ে

গেলেন, আমার স্ত্রী হোলেন ওর ভগ্নী। শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের পর, দেখলাম ডাক্তার দেবেন্দ্রবাবুর মধ্যেও দেবতা ও মানুষ এক হোয়ে গেছে। যখন যেটুকু জায়গায় এরা থাকেন, সেটুকু জায়গা তখন স্বর্গ হোয়ে যায়।

* * *

এমন সময় এমন একটা সামান্য এবং ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটলো, যাতে আমার মনের মধ্যে একটা চমক লাগলো। ঠিক এই ধরণের চমক, আমার আশী বছরের জীবনের মধ্যে পরে আরো কয়েকবার লেগেচে এবং সে সবের যা' মূল কারণ, তা আমার সারাজীবনকে ধন্য, সার্থক ও আনন্দময় কোরে রেখেচে। কিন্তু সে সব কথা আমি বলতে পারবো না, অর্থাৎ বলবো না। শুধু সেদিনের সেই ছোট্ট ঘটনার কথাটা বলি—

অপরাহ্ণ বেলা। বক্সীবাজারে এম এল সা'র দোকানের দিকে যাব বলে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু যেতে ভালো লাগলো না, খানিকটা গিয়েই ফিরে এলুম। ভালো না লাগার কারণ, মাথা ধরেছিলো। গত ৪।৫ দিন ধোরে রোজই এই সময়টায় মাথা ধরছিলো। বাসার কাছাকাছি এসে দেখলুম, রাস্তার ধারের একটা গাছের তলায় একজন প্রৌঢ় বয়সের লোক বসে আছেন। তাঁর পরণে সাদা রংয়ের সাধারণ একখণ্ড বস্ত্র, কোমর থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত জড়ানো, গলায় উত্তরীয়র মত ঐ রকম আর এক খণ্ড বস্ত্র দু'কাঁধের ওপর দিয়ে দু' পাশে ঝুলচে। আমি তাঁর সামনে দিয়ে আসতেই, তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি এখানে কোন বাড়ীতে থাক বাবা?" আমি তাঁর খুব কাছে সরে এসে বললুম—"এই গলির ভেতর, দু'খানা বাড়ীর পরে।"

"যেতে-যেতে ফিরে এলে কেন? শরীরটা ভালো লাগচে না বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, বড্ড মাথা ধরেচে।"

একটুখানি হেসে তিনি বললেন—"ও কিছু নয়, সেরে যাবে এখন।"

"আজ ক'দিন ধোরে ঠিক এই সময়টাতেই ধরচে; কিছুই ভালো লাগে না।"

গাছ-তলায় সুরু-সরু শুকনো কাঠি-কুটি দু' পাঁচটা আশে-পাশে পড়েছিল। তারি এক টুকরো তুলে নিয়ে উনি বললেন—"বোসো দেখি এখানে।"

বসলুম। তিনি সেই একরত্তি কাঠিটুকু আমার কপালে দু'চারবার বুলিয়ে দিলেন; বললেন—"সেরে যাবে এখন।"

সেরেই গেল। আশ্চর্যভাবে সেরে গেল। কাঠিটা বোলাবার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হোল, মাথা থেকে দু'মণ ওজনের একটা বোঝা যেন নামিয়ে নেওয়া হোচ্চে। তারপর ৩।৪ মিনিটের মধ্যে মাথা একেবারে হাল্কা। একটু আগে যে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক মাথা ধরেছিল এবং ৩।৪ দিন যাবৎই ধরে আসচে, সে কথা যেন আর মনেই হোল না।

ঐ সময়ের পর থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে আর একটি দিনও আমার মাথা ধরে নি। ২৪ বছর পরে যখন আবার একদিন মাথা ধরলো, তখন আমি সাহিত্য পথের একজন নগণ্য পথিক, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, এটা-ওটা লিখি; উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্রের সঙ্গে খুব ভাব-সাব; তিনি আমায় খুব ভালোবাসেন, আমিও তাঁকে খুব ভালোবাসি; দু'জনে থাকি খুব কাছাকাছি—অশ্বিনী দত্ত রোড, আর সত্যেন দত্ত রোড। বিকেলের দিকে রোজই দু'জনে বেড়াতে যাই। সেদিন গিয়ে আমি বললুম—"আজ আর বেড়াতে যাবো না। ভাল লাগচে না, বড্ড মাথা ধরেচে।"

উনি বললেন—"মাথা ধরেচে? ওটা আবার একটা একটা রোগ নাকি? ও কিছু নয়।"

২৫ বছর আগেকার কথা মনের মধ্যে ভেসে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলুম—"কোন কাঠি-টাঠি আছে নাকি?

"কি বলচো?"

কথাটা চেপে দিয়ে বললুম—"বল্‌চি, কোন উপায় আছে?"

"আছেই ত"—বলে তিনি পাশের তাকের 'জেনা-স্প্রিনে'র শিশি থেকে একটা ট্যাবলেট্ বার কোরে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"খেয়ে ফেলো। ঐ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নাও।"

জল গড়িয়ে নিলাম; ট্যাবলেট্‌টাও খেয়ে ফেললাম। মিনিট ১০।১২ পরে মাথা ধরা ছেড়ে গেল। কিন্তু তার পরদিন আবার ঐ সময় মাথা ধরলো! সেদিনও শরৎবাবু একটা ট্যাবলেট খেতে বললেন, খেলাম। কিন্তু মনে-মনে ভাবলাম। রোজ রোজ এই রকম 'অ্যাসপিরিন' খাওয়া

ত ভালো নয়। শরৎবাবুকে একথা বলতে তিনি বললেন "তাতে কি! রোগ হোলে ওষুধ খাবে না? আমার ত বারো মাসই মাথাধরা লেগে আছে।" সেটা আমি জানতুম, মাথা ধরলেই তিনি 'জেনাস্পিরিন' বা 'কেমিস্যাসপিরিনে'র ট্যাবলেট খেতেন। এইসব ট্যাবলেটের শিশি তাঁর এখানে-ওখানে সব জায়গাতেই থাকতো— শোবার ঘরের তাকে, বসবার ঘরের টিপয়ের ওপর, বাথরুমের কুলুঙ্গীতে, গাড়ীতে লাগানো জালের থলিটার মধ্যে, জামার পকেটে।···কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে; সুতরাং একথার এইখানেই শেষ করি। তবে এটুকু বলে রাখি যে, এর পর আর আমার কখনো মাথা ধরে নি। পঞ্চাশ বছর আগে, যিনি একটুকরো শুকনো কাঠি বুলিয়ে মাথাধরা সারিয়ে দিয়েছিলেন, চোখ বুজিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব করলে, মাথাধরা কোন ছার, কোনো-ধরাই আর ধরতে পারে না।

* * * *

হঠাৎ একদিন অসময়ে অর্থাৎ দুপুর বেলায় বাসায় আসতে হোয়েছিল। এসে দেখলুম, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবু আমার ঘরের মধ্যে বোসে—আমার শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে গল্পগাছা করচেন। ভয় হোল, হঠাৎ কারো অসুখ বিসুখ হোয়েচে না কি? কিন্তু তা নয়।

আমার বাসার বিপরীত দিকে, বাঁকের ওপর এক রাজার বাংলো। কোন্ রাজার, সেটা এতদিনে ঠিক আমার স্মরণে—আসচে না। বোধ হয় 'ঢেঁকানল'য়ের রাজার। সে সময় উড়িষ্যায় নরসিংগড়, কেওনঝোর, কণিকা, আউল, ময়ূরভঞ্জ, দশপলা, বারহান্পুর প্রভৃতি যে ৩৬টা ফিউডেটারী এষ্টেট বা করদরাজ্য (যাকে 'ছত্তিশ গড়' বলা হোত) ছিল, ঢেঁকানল তাদের অন্যতম। দেবেন্দ্রবাবুর মুখে শুনলাম রাজা কটকে এসেচেন এবং তাঁর কলেরা হোয়েচে। দেবেনবাবুর চিকিৎসাধীনেই তিনি আছেন। দেবেনবাবু বলতে লাগলেন—"এদের চিকিৎসা করা যে কি মুশ্‌কিল, তা আর কি বলবো। স্যালাইন ইনজেকশান্ কিছুতেই দেওয়া চলবে না—খাবার ওষুধে যতটা যা হয়, ফোঁড়া-ফুঁড়ি কিছুতেই চলবে'না।"

উপযুক্ত ফী-য়ের পরিবর্তে দেবেনবাবুকে প্রায় সর্বক্ষণ থেকে চিকিৎসা চালাতে হচ্ছে। সকালে এসে বহুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন, আবার দুপুরে এসেচেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রাজা আরোগ্যলাভ করলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, দেবেনবাবু একদিন এসে আমার শ্বশ্রূমাতাকে বললেন—"এখানে আপনাদের থাকা চলবে না। এ ধারটা বড্ড নিরিবিলি, নির্জন; আর দু'দশ ঘর বাঙ্গালী থাকলেও থাকা চলতো। আমার বাসায় আপনাদের গিয়ে থাকতে হবে। তা হোলে সর্বদাই আমি দেখা-শোনা করতে পারবো।" এ বিষয়ে এতবেশী তাঁর ঝোঁক হোল, যে আমাদের ঐ বাসা উঠিয়ে দিয়ে মেডিক্যাল স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে তাঁর বাসায় গিয়ে থাকতে হোল। কটকে চব্বিশ মাসের শেষ যে ক'মাস তাঁর বাসায় আমরা ছিলাম সে ক'মাস আমাদের স্বর্গবাস হোয়েছিল।

কটকের মধ্যে তিনিই ছিলেন—তখনকার দিনে নামকরা ডাক্তার। ডাক্তারীতে তাঁর জ্ঞান এবং নাম অসাধারণ; অথচ তিনি বলতেন 'আমি কিছুই জানি না।' রোজ বিকেলের দিকে তিনি বাইরের রোগী দেখতে বেরোতেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁর সঙ্গে যেতাম। আমার উদ্দেশ্য— তাঁর গাড়ীতে সহরের এখানে ওখানে বেড়ানো। যে দিনই আমি তাঁর সঙ্গে ঐরূপ গিয়েছি। দেখিচি, বালুবাজারের দোকান থেকে তিনি ভিন্ন-ভিন্ন ঠোঙ্গা ভরে সাগু, বার্লি, মিছরী, মেলিন্স ফুড, গ্ল্যাক্সো প্রভৃতি কিনে নিতেন এবং সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রোগীর বাড়ী দিয়ে আসতেন। দু'একদিন দেখিচি, খুব পুরোণো কিছু চালও যোগাড় কারে রোগীর বাড়ী দিয়ে এসেচেন। এমনকি এনামেলের বাটি, ডিশ, চামচ ইত্যাদিও কিনে রোগীর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর ঐ সব রোগীদের যে প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে আসতেন, তার ওষুধ দেওয়া হোত মেডিক্যাল স্কুল থেকে। বললে পরে, খুব সহজ ভাবেই বলতেন—"ওদের নেই, ওরা দেবে কোত্থেকে?"

আবার অন্যদিকের অন্য একটা ঘটনার কথা বলি। স্থানীয় কোন ধনবানের কাছে ওর দর্শনীর (ফী) বাবত ৮৪ টাকা পাওনা হোয়েছিল। উনি ওঁর সরকার মশাইকে ঐ টাকার জন্য পাঠিয়ে দেওয়াতে, তিনি ৮০ টাকা এনে ওর হাতে— দেন, বলেন—"খুচরো চারটাকা আর দিলেন না।" উনি সে টাকা তখনি সরকার মশাইকে ফেরৎ দিয়ে বলেন— আপনি আবার যান, পুরো ৮৪ টাকাই তাঁকে দিতে হবে, ওর থেকে এক পয়সাও আমি ছাড়তে পারবো না।" আমি

তখন সেখানে ছিলাম ; বললুম—"চারটে টাকার জন্যে আর না পাঠানোই ভালো।" উনি বললেন—"এসব লোকের টাকা আছে, এদের কাছ থেকে না নিলে, যারা গরীব তাদের দোবো কি কোরে ?" মোটের ওপর সেই ধনশালী-লোকের কাছ থেকে তিনি পুরো ৮৪ টাকাই নিয়েছিলেন, ৪ টাকা ছাড়েন নি।

তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। সকাল আট্‌টা আন্দাজ তখন বেলা। উনি আজ অসময়ে 'ডাকে' গেছেন। সকালের দিকে রোগী দেখতে পারত-পক্ষে যেতেন না। তখন ক্লাস আছে, হাসপাতাল আছে। সেদিন রোগীর পক্ষের খুব পীড়াপীড়িতে সকালেই যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর রোগী দেখে ফিরে এলেন ; সঙ্গে রোগীর বাড়ীর একজন লোক ওষুধ নিতে এসেচে। তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে উনি ভেতরে ওঁর শোবার ঘরে এলেন এবং মেজেতে একখানা বাঘ-ছালের আসন পেতে, সামনে তাঁর হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধ-ভরা বড় বাক্সটা খুলে বসলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে থেকে, সেই অবস্থায় বাক্সর মধ্যে থেকে একটা শিশি হাত দিয়ে তুললেন। তারপর চোখ চেয়ে, সুগার-অফ-মিল্কের মধ্যে সেই ওষুধের কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে নিয়ে, রোগীর সেই লোককে দিয়ে এলেন। বলে দিলেন, তিন ঘণ্টা পর-পর এক মোড়া। এখানে বলা দরকার যে, কখনো-সখনো হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধও তিনি ব্যবহার করতেন। তাঁর কোন গোঁড়ামী ছিল না। চিকিৎসার বিভিন্ন শ্রেণীর মতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। যা হোক ওষুধ চার পুরিয়া নিয়ে লোকটি বলে গেল। আমি তখন ওঁরই ঘরে বোসেছিলুম এবং ওঁর এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখছিলুম। লোকটিকে ওষুধ দিয়ে উনি ঘরের মধ্যে ফিরে এলে আমি অল্প-একটু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলুম—"এ কি রকমটা হোল, দাদা ?" উত্তরে উনি যা বললেন, তার মর্মার্থ এই :—রোগীটি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তার বাঁচবার আর কোন আশা নেই। এ সময় ওঁকে তারা নিয়ে গিয়ে, ওষুধ দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু এ অবস্থায় কোন ওষুধই নেই। অথচ ওদের ঐ পীড়াপীড়িতে ওষুধ একটা দিতেই হবে। তাই, ভগবানকে স্মরণ কোরে, হোমিয়োপ্যাথী ওষুধের যেটা হাতে উঠলো, সেটাই দিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন—"সন্ধ্যার দিকেই রোগীর মারা যাওয়া সম্ভব।"

সন্ধ্যার পর রোগীর বাড়ীর সেই লোকটি এসে হাজির। দেবেন্দ্রবাবু 'ডাক' থেকে তখনো ফেরেননি। ঘণ্টা-খানেক বসবার পর তিনি ফিরে এলেন। ওকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, লোকটি মারা গেছে। কিন্তু তা নয় ; রোগী নাকি সারাদিন চার মোড়া ওষুধ খেয়ে, আগের দিনের অপেক্ষা ভালো আছে। দেবেন্দ্রবাবু লোকটিকে ঐ ওষুধই আবার চার পুরিয়া দিলেন। পরের দিন সকালে লোকটি এসে আরো ভালো খবর দিলে—রোগী বেশ ভালো বোধ করচে। ঐ ওষুধই চলতে লাগলো। দেবেন্দ্র-বাবু গিয়ে একবার তাকে দেখে এলেন। দিন-চার-পাঁচের মধ্যেই রোগী আরোগ্যের পথে ফিরে এল এবং শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে উঠলো। কিন্তু বরাবর ঐ ওষুধটাই তাকে দেওয়া হোয়েছিল, যেটা ভগবানকে স্মরণ কোরে, চোখ বুজে তিনি তুলেছিলেন।

আমি কটকে তাঁর বাসাতে থাকতে থাকতেই তাঁর মন্ত্র-গুরু শ্রীমদ্‌ ভোলাগিরি ওঁর বাসাতে এলেন এবং চার পাঁচদিন ওখানে থাকলেন। 'সাধু-সঙ্গে স্বর্গবাস' এই প্রবাদ অনুযায়ী আমিও সেই ক'দিন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ গিরিজীর সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভে সৌভাগ্যবান হোয়েছিলাম। এর কিছুদিন পরেই আমি কটক ত্যাগ কোরে দেশে ফিরে এলাম। তার কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রবাবুও চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ কোরে কোলকাতা এসে রইলেন। সে সময়ে আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হোতে লাগলো।

তার পর বহুদিন কেটে গেল। পুরোণো পৃথিবীতে সর্বত্র একটা পরিবর্তনের ঝড় উঠলো। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব সুরু হোল। বাঙ্গলাতেও তার ঢেউ এসে লাগলো। জাপানী বোমার আতঙ্কে কোলকাতার লোক এখানে ওখানে পালিয়ে গেল। কোলকাতা সহর প্রায় লোকশূন্য। আমিও ঐ সময় সপরিবারে বসিরহাটের নিকট—ধান্যকুড়িয়া গ্রামে গিয়ে থাকতে বাধ্য হলাম। সেই সময় সেখানে একদিন কাগজে পড়লাম সন্ন্যাসী শ্রীমদ্‌ ভোলাগিরি দেহরক্ষা করেছেন এবং তাঁর প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংসার ত্যাগ কোরে সচ্চিদানন্দ গিরি নাম

গ্রহণ কোরে স্বর্গতঃ গুরুদেবের পরিত্যক্ত পবিত্র আসনে বসেছেন। সংবাদটা পড়েই মনটা ছাঁৎ কোরে উঠলো। দেবেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম—আজ তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়; তুমি আজ কত উধে। আর আমি কত নীচে। তোমার দেওয়া চন্দনলিপ্ত গীতাখানি আমি যে রোজই পাঠ করি, আর পাঠান্তে ভগবানকে প্রণাম করবার পর তোমার পায়েও যে আমার শ্রদ্ধার প্রণাম জানাই! তুমি আমাকে নীচে ফেলে রেখে চলে গেলে!

এরই কয়েকমাস পরে, আবার কাগজের সংবাদে জানতে পারলাম, শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ গিরি দেহরক্ষা কোরে তাঁর গুরুর পথানুসরণ করেছেন। আবার মনটা ছাঁৎ কোরে উঠলো। বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় বোসে থেকে আকাশ-পাতাল নানারকম চিন্তা করতে লাগলুম। এ চিন্তা দুঃখের না আনন্দের?
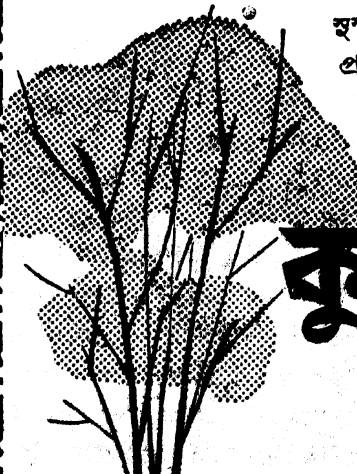
এই পুণ্য-পবিত্র কথার সঙ্গে সঙ্গেই সাঙ্গ করলাম—আমার কটকে চব্বিশ মাসের কাহিনী।

সবার উপরে সত্য

সনত কুমার মিত্র

নখে খুঁটে জীবনকে দেখতে চাইনি কোনদিন:
পা মেপে পা মেপে পথ চলা মানে জীবন দুর্বহ,
সভ্যতার প্রসাধনে পাঁচজনে চায় তাই সাজি
কিন্তু মন বুঝে গেছে এ জীবন কতটা শ্রীহীন;
এখানে আকাঙ্ক্ষা আর ইচ্ছা যদি ডানা মেলে আজই
শঙ্কা-সরম-মান, এরা বাধা দেবে অহরহ।

মনকে মৌন রেখে, ঠোঁটে-চোখে-মুখে মিষ্টি হাসি
পারিনা রাখতে ধরে, বিনয়ে বিনত তবু থাকি;
কি সুন্দর পরিহাস! মন যা চায়না তাকে আজ
মুখে মেখে পথ চলি, মনে হয় এই ভালবাসি।
সবার উপরে সত্য, (আমি নই), মান-ভয়-লাজ;
এই দিয়ে সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে অনায়াসে ঢাকি॥
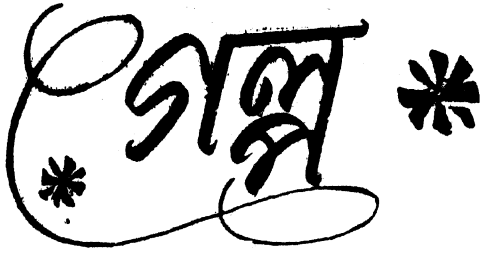
মুক্তি

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্, কালো মেঘ থম থম করছে, গ্রাস করেছে সকালের সূর্য্যকে। অভিসারিকা রাধার মত দুর্য্যোগের মধ্যে চুপি চুপি চলাফেরা করছিল একটা চিন্তা চিন্তাহরণ চাটুজ্যের মনের গহন বনে—সে যেন শুনতে পাচ্ছিল সেই চঞ্চলার চকিত চরণের নূপুরের কিঙ্কিনী, সেই বৃষ্টির ঝম-ঝমানি ছাপিয়ে···ঝিম, ঝিম, রুমঝুম্।

দক্ষিণের বারান্দায় তক্তায় বসেছিল চিন্তাহরণ চাটুজ্যে, সামনে পড়েছিল একটা তারের বড় খাঁচা; আর এক কোণে একটা ছোট খাঁচা। দুটোই নতুন। বড় তারের খাঁচাটার ভেতর একটা ছোট মাটির ভাঁড়ে ছিল খানিকটা জল; আর একটা সিগারেটের টীনের ঢাকনায় ছিল কাঁকরীদানা। খাঁচার দরজাটা ছিল খোলা। ছোট খাঁচাটা কাত হয়ে পড়েছিল একধারে; তার দরজা বন্ধ, ভেতরটা শূন্য।

খাঁচার খোলা দরজাটার দিকে চেয়ে ভাবছিল চিন্তা-হরণ চাটুজ্যে। ঐ ত বন্ধনের দ্বার মুক্ত, কিন্তু মুক্তি পেল কি সবাই। মুমুক্ষু ছিল হয়ত সবকটাই; কিন্তু একটা গেল কাকের ঠোক্করে, একটা ত ঐ মাঠটায় বৃষ্টিতে বসে বসে ধুঁকছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক লাফাচ্ছে বটে, কিন্তু মনে হয় বৃষ্টিতে ভিজে ওড়বার ক্ষমতা নেই—ওটাও হয়ত যাবে এখনি চিলের কি কাকের পেটে। বন্ধন থেকে মুক্তি দিলাম, কিন্তু হয়ত ঐ মুক্তিই হবে ওর মৃত্যুর কারণ। খাঁচার মধ্যে বন্ধ ছিল কিন্তু অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বিপদ ও বিপর্য্যয়ের ভয় থেকে মুক্ত ছিল ওরা। বন্ধন থেকে মুক্তি পেল যারা, বাইরের মুক্ত আকাশ বাতাসের জন্য আকুল হয়ে যারা ক্রমাগত খাঁচাটার মধ্যে লাফালাফি করত, তার-গুলো ঠোঁট দিয়ে কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করত, মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে সত্যই কি তারা সুখী হ'ল, নিরাপদ হ'ল? পেল কি তারা অভাব থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তি, দুর্য্যোগের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি?

স্ত্রী কমলা চা নিয়ে এল।

"চুপ করে বসে কেন এই সকাল বেলায়? কি ভাবছ?" জিজ্ঞাসা করল কমলা চিন্তাহরণকে, চায়ের পেয়ালাটা চৌকিতে নামিয়ে।

চিন্তাহরণ চায়ের পেয়ালা তুলে নেবার আগে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল শূন্য খাঁচাটা।

—"ওমা, বাকী পাখী দুটো কোথায় গেল? দরজাটা খোলা; ছেড়ে দিলে না কি?" সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করলে কমলা স্বামীকে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চিন্তাহরণ বললে, "হ্যাঁ, মুক্তি দিলাম।"

একটু চুপ করে থেকে কমলা বললে, "বেশ করেছ, বড় ঝঞ্ঝাট। খাবার, জল, রোগ বালাই। বেশ সুন্দর রঙ ছিল কিন্তু পাখীগুলোর, ভোরবেলা কেমন কিচ্ মিচ্ করত, বেশ মিষ্টি ডাক, না?"

ঠোঁট থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে চিন্তাহরণ বললে, "হ্যাঁ কিন্তু ওরা বন্ধন চাইল না, মুক্তি চাইলে ওরা, কিন্তু মুক্তি পেল কই?···"

জীবনের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের একটা ছোট্ট বাড়ী কোলকাতার বুকে। ব্যবসাদার চিন্তাহরণের সে আশা ভগবান পূর্ণ করেছেন। গৃহ, গৃহিণী, গৃহস্থালী নিয়ে চিন্তাহরণের চিত্ত আজ পূর্ণ। শুধু বিত্তশালী বলেই আজ তার খ্যাতি নয়, কমলা তার সুখের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে রত্নার মা হয়ে। চার পাঁচ বছরের ফুটফুটে কন্যা রত্না কথায়, কান্নায়, কাকলীতে বাড়ী মাতিয়ে রাখে। একদিন রবীন্দ্র সরোবরে বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে "কুমুদ সায়রে" (লিলি পুলে) দেখে এল রত্না ছোট্ট ছোট

পাখীর বর্ণ বৈচিত্র্য, শুনে এল তাদের কাকলী, তাদের জীবনের নৃত্য ছন্দের ছোঁয়াচ লাগল তার মনে। ঝোঁক ধরল রত্না তার অমনি পাখী চাই।

রথের মেলায় রত্নাকে নিয়ে চিন্তাহরণ আর কমলা কিনল তিন জোড়া অমনি রঙ-বেরঙের পাখী। পাখীর জোড়াগুলোর কি নাম, কি খায়, কি বা তাদের রোগ, পাখীওয়ালা বলল বটে অনেক কথা, কিন্তু খাবারটার নাম 'কাঁকরীদানা' এর বেশী কিছু মনে রাখা তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল। ছ'টাকা দিয়ে খাঁচাশুদ্ধ ছয়টি পাখী কিনে মনের আনন্দে তারা ফিরল বাড়ী। রত্নার উৎসাহই সব চাইতে বেশী।

নতুন বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় খাঁচাটা সাজানো হ'ল। সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, পেছনের মাঠের সবুজ ঘাসগুলোও চোখে পড়ে। বন্দীত্বের মধ্যেও উন্মুক্তির আস্বাদ যতটা দিতে পারে তারই ব্যবস্থা; গৃহসজ্জাও বটে। এতে রত্নার বড় অসুবিধা হ'ল। নীচে দাঁড়িয়ে দূর থেকে পাখীগুলো দেখতে হয়; তাদের আপন করে পায় না; ঘনিষ্ঠতার নিবিড়তা গড়ে ওঠে না; নিজ হাতে জল, খাবার দিতে পারে না, খাঁচাটা নিয়ে ঘুরে ফিরে আপনত্বের স্বাদ পায় না।

রত্নার আবদারে খাঁচাটা নামল নীচে। একদিন বিকেলে রত্নার আনন্দ উল্লাসে উচ্ছ্বসিত কলোচ্ছ্বাসে কমলা বারান্দায় এসে দেখল খাঁচার দরজাটা খোলা। দুটি পাখী বেরিয়ে এসেছে, একটি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে খাঁচার ওপরে, আর একটি দরজার সামনের কাঁকরীদানাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। রত্নার হাসিতে বন্ধুদের মুক্তির আনন্দের খুশী উপচে পড়ছে।—অবাক আনন্দে সে মুক্ত বিহঙ্গের গতি ছন্দ দেখছে—আর মাঝে মাঝে মাকে ডাকছে দেখবার জন্যে।

মা তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, "বোকা মেয়ে, পাখীগুলো যে পালিয়ে যাবে।"

রত্নার সান্নিধ্যে নিশ্চিন্ত মনে যে পাখী দুটো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল, কমলার কর্কশ স্পর্শের ছোঁয়াচ বাঁচাতে তারা ডানা মেলে দিল অসীম আকাশের বুকে। মুক্তির আস্বাদে মাতোয়ারা তারা মিলিয়ে গেল নীল শূন্যে।

কমলা বললে, "যা দেখলি ত পালিয়ে গেল।"

অবাকবিস্ময়ে রত্না জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গেল মা?"

কন্যার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে থমকে গিয়ে কমলা বল্লে, "ওদের বাড়ী, ঐ গাছপালায়।"

"আবার এখানে আসবে ত?" রত্না জিজ্ঞাসা করল।

"না, আর ফিরবে না খাঁচায়। তুমি ওদের ছেড়ে দিলে খুকু আর ওদের দেখতে পাবে না, ওরা চলে যাবে অনেক দূরে ঐ নীল আকাশের মধ্যে। আবার যদি দরজা খুলে দাও তবে এগুলোও পালিয়ে যাবে।..."

রত্না বুঝলো এবার পালিয়ে যাবার মানে। দরজা খুলে দিলেই ওরা হারিয়ে যাবে। সে গম্ভীর হয়ে বল্লে, "আর দরজা খুলব না, মা।"

মা কিন্তু সাবধান হয়ে খাঁচাটা আবার বারান্দায় ঝুলিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল—একটা পাখী মরে খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে, আর বাকী পাখী তিনটে চুপ করে দাঁড়ের ওপর বসে আছে।

কমলা ডাকলে চিন্তাহরণকে, "দেখ বাকী পাখীগুলো যেন শোক করছে। লাফালাফি বন্ধ করে চুপ করে বসে যেন কাঁদছে।"

চিন্তাহরণ খাঁচাটার দরজা খুলে মরা পাখীটা বের করে সামনের মাঠটায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে সেটা মুখে করে নিয়ে পালাল কোন নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আহারের আশায়। ঐ ভোজ্যের ভোজটার জন্য যেন সেদিন সেখানে সেই-ক্ষণেই তার নিমন্ত্রণ ছিল।

বিকালবেলা রত্নার চীৎকারে কমলা ছুটে এল বারন্দায়। রত্না চীৎকার করে কাঁদছে, কিছু বলতে পারছে না। মা আসতেই দেখাল খাঁচাটাকে—"দেখ, পাখীটা কি করছে।" কমলা হতভম্ব হয়ে গেল, কি করবে কিছু স্থির করতে না পেরে তাড়াতাড়ি সেলাই-এর কল থেকে একটা বড় কাঁচি নিয়ে এল। কিন্তু কাঁচিটা খাঁচার কাছে নিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া কমলা শেষে ডাকতে সুরু করল, "বাহাদুর, বাহাদুর!"

একটা পাখী মুক্তির চেষ্টায় খাঁচার তারের জালের মধ্যে মাথা গলিয়েছে, মাথাটা গলেছে, কিন্তু শরীর গলে

নি এবং মাথাটা টানাটানি করেও আর জালের ফাঁস থেকে মুক্ত করে ভেতরে আনতে পারছে না। খুঁটোয় বদ্ধ পাঁঠার মত জালের ফাঁসে গলাটা আটকে গেছে, খুব ঝটপটও করতে পারছে না, মাঝে মাঝে পাখাদুটো নাড়ছে আর খাঁচার বাইরে মাথাটা নড়ছে।

ছোট্ট একটা পাখী। মরলেই বা কি? তবুও জীবন্ত একটা জীবের এমনি মৃত্যু যন্ত্রণা কমলাকে ব্যাকুল করে তুল্ল। কাঁচিটা এনেছিল খাঁচাটার জালের সরু তারটা কেটে ফাঁস থেকে মুণ্ডটাকে মুক্তি দেবার জন্য; কিন্তু তারটা কাটতে কমলার সাহসে কুলোল না, কি জানি যদি গলাতেই চোট লাগে।

নেপালী বেয়ারা 'বাহাদুর' কর্ত্রীর চীৎকারে হাজির হতেই কমলা কাঁচিটা তার হাতে দিয়ে তারের জালে আবদ্ধ পাখীটা দেখিয়ে বল্লে, "ওর মুণ্ডটা আটকে গেছে, কাঁচিটা দিয়ে ওটা কেটে ফেল।" বাহাদুর খাঁচাটা নামিয়ে কাঁচিটা বাগিয়ে ধরে অবলীলাক্রমে খাঁচার বাইরে পাখীর গলাটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে পাখীটাকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিলে। কয়েক ফোঁটা রক্ত গা বেয়ে বারান্দায় পড়ল।

কমলা চীৎকার করে উঠল, "কোরলি কি, কোরলি কি বেকুব! মেরে ফেললি পাখীটা।"

অপ্রতিভ বাহাদুর বললে, "আপনিই ত বললেন মা!"

মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় কমলা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করতে পারেনি তার মনোভাব, আজ্ঞাবাহী বাহাদুর তাই হোল হত্যাকারী।

রাত্রে বাড়ী ফিরে শুনলেন সব চিন্তাহরণ। ভাবলেন মুক্তি দেবেন বাকী দুটোকে। ছোট্ট খাঁচাটায় ছ'টা পাখীর বড় কষ্ট হচ্ছিল। দাঁড়টায় রাত্রে যখন ঘুমত বড় ঘেষাঘেষি হত, চলতে ফিরতে গায়ে গা ঠেকত। সবল-গুলো দুর্বলদের যখন ঠোকরাত, ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে ধরে ভীষণ ক্রোধে ঘাড় ফোলাত, তখন পালাবার মত, অত্যা-চারীর হাত থেকে মুক্তি পাবার মত স্থানাভাব ছিল ছোট্ট খাঁচাটায়, তাই পাখী কেনার দুদিন পর পাঁচ টাকা ব্যয় করে চিন্তাহরণ একটা বেশ বড় খাঁচা কিনে এনেছিল। ছোট্ট খাঁচার পরিধিটা বড় খাঁচায় যখন বেড়ে গেল চিন্তা-হরণ খুশী হ'ল, পাখীগুলোর চালচলনের স্বাচ্ছন্দ্যে; সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়েছে জীবগুলো।

কিন্তু রক্তা বন্ধুত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিল দুটীকে, মৃত্যু দিলে আর দুটোকে। চিন্তাহরণ মুক্তি দেবে বাকী দুটোকে। মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে বন্দীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যে পাপ! এ পাপ থেকে মুক্তি নেবে আজ চিন্তাহরণ।

সকালবেলা উঠেই তাই খাঁচাটা চৌকিতে নামিয়ে দরজাটা খুলে দিল। পাখী দুটো ঘুরছে ফিরছে, দরজাটার কাছে আসছে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে না। কি ফ্যাসাদ, মুক্তি দিতে চাইলেও এরা যে মুক্তি নেয় না! খাঁচার বাইরে হাত উস্কিয়ে কয়েকবার তাড়া দিলে, পাখী দুটো ভয় পেয়ে একদিকে বসল কিন্তু খোলা দরজাটার মধ্যে মাথা বার করল না। দোষ আমার কই? আমি ত দিয়েছি বন্ধন মুক্ত করে, দ্বার দিয়েছি খুলে, ওরা যদি মুক্তি না নেয় সে কি আমার অপরাধ!—চিন্তা করছিল চিন্তাহরণ। তুমিই ত পুরেছ ওদের খাঁচায়—বল্লে তার মন।

কিছু কাঁকরীদানা নিয়ে ছড়িয়ে দিলে সে খাঁচার দরজার সামনে। চুপ করে বসে রইল চিন্তাহরণ কিছুক্ষণ।

বীতভয় পাখীগুলো নড়তে চড়তে লাগল। ধীরে ধীরে একটা পাখী বেরিয়ে এল—খোলা দরজা দিয়ে কাঁকরীদানার লোভে। কয়েকটা দানা ঠুকরে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার সেটা খাঁচার মধ্যে ঢুকল।

মুক্তি দেবার অধীর আগ্রহে চিন্তাহরণ ভাবলে খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে মুঠোর মধ্যে টিপে ধরে মুক্ত আকাশের বুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তি দেয় ওদের। খাঁচার মায়ায় ওরা মজেছে, এ মোহ থেকে জোর করে মুক্ত করতে হবে ওদের। তার প্রয়োজন হ'ল না, আবার বাইরে এল পাখীটা; কয়েকটা দানা খেয়ে লাফিয়ে উঠল খাঁচার মাথায়। মিনিট কয়েক খাঁচার ওপরেই এদিক ওদিক ঘুরল, জালের ফাঁক দিয়ে খাঁচার ভেতরটা দেখল, খাঁচাটার মধ্যেই যেন ঢুকতে চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বাইরের অনিশ্চয়তা ও বিপদের হাত থেকে বুঝি মুক্তি চায়, শান্তি চায় খাঁচার আড়ালের মধ্যে; কিন্তু তারও পথ আর খুঁজে পাচ্ছে না বেচারা। সঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার কাছে যাবার পথ হারিয়েছে পথহারা।

হঠাৎ লাফিয়ে নামল চৌকিটার বুকে, ঘাড় বাঁকিয়ে উঁচু করে বারান্দার ফাঁক দিয়ে কয়েকবার আকাশটাকে

দেখে নিল। তারপর লাফালাফির দুরন্তটা বাড়ল ; হঠাৎ লাফিয়ে চৌকি থেকে মেঝেয় নামল। বুঝি বিশ্বাস হোল আপন শক্তির ওপর। পারে সে ; এতটা লাফিয়ে নামতে পারে। তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে বসল বারান্দার রেলিংটায়। চুপ করে বসে রইল সেখানে, তাকাল-চিন্তাহরণের দিকে, খাঁচাটার দিকে। বন্দীত্বের অপরাধের জন্য অভিশাপ অথবা মুক্তির জন্য আশীর্বাদ জানাল কে জানে। তারপর লাফিয়ে পড়ল পাশের মাঠটায়। মাটীতে পড়ে যেন ঠোক্কর খেল। অতটা ওড়া অভ্যাস নেই, কিংবা হয়ত ক্ষমতাই নেই। ডানা দুটো হয়ত কাটা, কিংবা হয়ত পুরো গজায় নি।

এদিকে আর একটা পাখী,—শেষ পাখীটা—তখন খাঁচা থেকে বেরিয়ে রেলিং-এ বসেছে।

হঠাৎ এক ঝাঁক কাক কোথা থেকে চীৎকার করে এসে ঝাঁপিয়ে পোড়ল মাঠের বুকে—মুক্তির আস্বাদের আনন্দে চঞ্চল অথবা আঘাতের বেদনায় বিহ্বল সেই ছোট পাখীটার ওপর। সে তীব্র আক্রমণে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার ছিল না। বুভুক্ষু কাকগুলোর ভোক্ষ্য হয়ে গেল মুক্তিকামী ছোট্ট মুনিয়াটা। খাঁচাটার মধ্যে থাকলে হয়ত এই কঠিন মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেত বেচারা। ঐ নিষ্ঠুর আক্রমণের যন্ত্রণা ত খাঁচায় ছিল না ; যত্ন ছিল, সেবা ছিল, আন্তরিকতা ছিল আমাদের। কিন্তু কমলা ত চেয়েছিল পাখীটাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে অথচ বাহাদুরের নির্বুদ্ধিতা ঘটাল তার মৃত্যু। সহৃদয়তার জন্যেই ত বন্ধন থেকে মুক্তি দিলাম ওটাকে, কিন্তু পারলাম কৈ ? খাঁচাতেই রাখা উচিত ছিল এই সব দুর্বল, পঙ্গু জীবদের। কিন্তু ঐ খাঁচাতেই ত মরেছে ওরই এক সঙ্গী রোগে, আর একজন জহ্লাদের হাতে। ওখান থেকে পালিয়েছে দুটো, কে জানে কেমন আছে তারা, কোথায়ই বা আছে ? হয়ত তারা পেয়েছে সত্যই মুক্তি, মুক্ত আকাশের বুকে বুঝি তারা স্বচ্ছন্দ আনন্দে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে ; আর একটা—যাকে মুক্তি দিলাম—স্পষ্টই দেখছি ঘন বরষার দুর্ভোগ ধারার মধ্যে সে বিভীষিকা দেখছে, নিরাশ্রয়ে সে ভিজছে, থর থর করে কাঁপছে।...... ...

......বৃষ্টি পড়ছে ঝম্—ঝম্।

শিকার কাহিনী

(নন্তু ও সন্তুর সংলাপের মাধ্যমে)

নরেন্দ্র দেব

শুনেছো কি ? মেয়েরাও হয়ে গেছে শিকারী ?
মারে হাতী, গণ্ডার, হিপো বরা বিচারি !

......

বলো কী হে ? দুর্বল-ভীরু নারী-রমণী—
মারে যত জানোয়ার ? শুনে কাঁপে ধমনি !

......

বলো কি হে ! মেয়েরাও এ নেশাটা ধরেছে ?
তবেই তো এইবার সিংহেরা মরেছে !

......

আর তারা ভীরু নয়। দুর্জয় সাহসী !
নেয় না কো হাতিয়ার—বন্দুক বা অসি।

.. ...

সিংহই শুধু নয়, আরও কতো জানো কি ?
বাঘ ভাল্লুকও মারে অনায়াসে, মানো কি ?

শুধু হাতে মারে নাকি ? বলো কি হে ! সত্যি ?
তবে তো রে মেয়েগুলো হয়ে গেছে দত্যি !

সত্তরে! দৈত্যরা যায় তবু পালিয়ে—
এরা যাকে ধরে—দেয় হাড় মাস কালিয়ে!

......

না না, সেকি! কী যে বলো! স্রেফ্ গাঁজা ছাড়চো',
অতো বোকা নই, কেন বাজে গুল্ ঝাড়্‌চো।

......

আহা, তুমি শোনোনিকি? বলে—ওই বন্ধুরা—
মেয়েদেরই হাতে মরে দিক্‌গজ পশুরা।

......

বলো কি হে? শিকার কি অত সোজা ভেবেছো?
নেশা-টেশা করো বুঝি? এত নিচে নেবেছো?

......

হাঁদারাম! মেয়েদের কিবা জানো? থামোনা।
বড় পশু বাগাবার ওদেরই তো কামনা।

......

আছে কতো ছোটো জীব অগুন্তি নন্ত
তবু ওরা বেছে কেন মারে বড় জন্তু?

......

নারীদের নাড়ী টেপা করোনি তো চর্চা,
জানো কি সে পশু দেয় পশু মারা খরচা।

......

বলো কি হে? মৃগ দেয় মৃগয়ার ব্যয়টা?
এ দেশে কি ডুবে গেছে ধর্ম ও ন্যায়টা?

... ..

ভাবছিস মেয়েদের বাড়াবাড়ি! নয় কি?
মেয়ে দেখে আজ থেকে পাবি তুই ভয় কি?

......

আমি কেন পাবো ভয়? ঝোঁক নেই শিকারে,
ঘৃণা হয় মেয়েদের এই মনোবিকারে।

......

শিকারের যা খরচ শিকারটা বইবে,
এ খবর কি রে তোর সোঁদা মনে সইবে?

......

'বলি' দেয় 'বলি-ব্যয়'! শুনিনি এ নন্ত,
কোন্ পশু বল দেখি এত বেশি জন্তু?

......

শুনিস্‌নি আজো বুঝি সে জীবের নামটা?
শুনলেই বুঝে নিবি চড়া কতো দামটা।

......

রাখ তোর অত কথা, নাম শুধু বলে দে'
খরচের কথা তুলে ফেলে দিলি গোলে যে!

......

সংসারে রয়েছিস্, জানিস্‌নি পশু কে?
যানা, গিয়ে শুধো তোর সবজান্ বন্ধুকে।

......

না না, ছি ছি। বোস শুনে উজ্‌বুগ্ ভাববে!
সোজা করে বল তুই, কাজ নেই কাব্যে।

......

এত বেশি জানোয়ার কোন পশু জানোনা?
শিকারের ব্যয় বয় শিকাররা মানোনা?

......

মানি বটে; বেচে দাঁত, শিং, নখ, চামটা—
কিঞ্চিৎ উঠে আসে শিকারের দামটা।

......

ওরে গাধা! মহা পশু;—তুই পশু পালেতে,
পড়বিরে ধরা ঠিক মেয়েদের জালেতে।

......

থাম্ তুই। আমি চলি ওজাতকে এড়িয়ে,
সন্ধ্যের আগে ফিরি' মাঠে একা বেড়িয়ে।

......

শোন্ বলি, মাঠে-চরা আইবুড়ো যক্ষ!
মেয়েদের শিকারের তোরাই তো লক্ষ্য!

চীন-আক্রমণে দেশবাসীর কর্তব্য—

চীন কর্তৃক সহসা ভারত রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায় ভারতকে নানাদিক দিয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছে—এই বিপদে ভারতের অধিবাসীদিগকে ধীর ও স্থির হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। সে জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতি সর্বদা দেশবাসী সকলকে কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে আহ্বান করিতেছেন। ১৫ বৎসর পূর্বে দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের বহুবিধ গঠনমূলক কার্য্যের জন্য নেতারা বহুবিধ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু দেশরক্ষা ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হন নাই। সে জন্য চীন হঠাৎ ভারতরাজ্য আক্রমণ করিলে ভারতের পক্ষে উপযুক্ত বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয় নাই। ক্রমে ভারত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ও বিদেশ হইতে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া চীনকে বাধাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জন্য বহু স্থানে চীনারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পিছাইয়া গিয়াছে ও অনেক স্থানে চীন-সৈন্যদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। এ সংবাদ অবশ্যই ভারতবাসীর পক্ষে আনন্দ ও সন্তোষের সংবাদ। জহরলালের আহ্বানে দেশবাসী প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ ও স্বর্ণ দান করিতেছেন। সুখের কথা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত টাকা ও স্বর্ণ দিতেছেন। কিন্তু শুধু টাকা ও স্বর্ণ পাইলেই যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হইবে না। টাকা দিয়া এদেশে ও স্বর্ণ দিয়া বিদেশে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করা হইবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। স্বাধীন ভারতের মানুষের মধ্যে এখনও দেশপ্রেম উপযুক্তভাবে দানা বাঁধে নাই। তাই ভারত বিপন্ন হওয়া সত্বেও একদল মানুষ নিজেদের কর্তব্যের কথা আলোচনা না করিয়া দেশের পরিচালকগণের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিয়া থাকেন। সে জন্য যুদ্ধে প্রাণদানের জন্য স্বাধীন ভারতে মানুষের মধ্যে যতটা আগ্রহ হওয়া উচিত ছিল, তাহা দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময় মানুষকে খাদ্যবস্ত্রাদি সম্বন্ধে চিন্তা কমাইয়া কি ভাবে যুদ্ধরত জওয়ানদিগকে অধিক সাহায্য ও উৎসাহ দান করা যায়, তাহার চিন্তা করা প্রয়োজন। জহরলাল তাঁহার ৭৪তম জন্মদিন ১৫ই নভেম্বর দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন—সকলকে পুত্রদান করিয়া তাঁহার জন্মদিন পালন করিতে হইবে। যুদ্ধের জন্য সৈনিকের প্রয়োজন—সকলে নিজ নিজ পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের জন্য দান না করিলে কোথায় সৈনিক পাওয়া যাইবে এবং কি করিয়াই বা আমরা হানাদার বর্বর চীনদিগকে ভারত-ভূমি হইতে বিতাড়িত করিব? আজ দেশবাসীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য—দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা প্রচার করা—দেশের মধ্যে যে সকল দেশদ্রোহী কাজ করিতেছে, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহারা নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন আছেন, তাঁহারা যাহাতে কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হন—তাহার চেষ্টা করা। বর্তমান বিপদে সকলে মিলিত হইয়া ঠিক পথে কাজ না করিলে আমাদের ভবিষ্যত যে অন্ধকারময় হইবে, সে কথা সভ্য জগতের মানুষকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। গত ১৫ বৎসরে আমাদের জীবনে যাহা প্রয়োজন হয় নাই—আজ সে প্রয়োজনের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবাসী অবশ্যই দেশদ্রোহী বা জাতি-দ্রোহী হইয়া বসিয়া থাকিবে না—একদিকে বিদেশী শত্রু তাড়াইবার সময় আমরা দেশের বা ঘরের শত্রুদিগকেও ক্ষমা করিব না—তাঁহাদের উপযুক্ত শাস্তিবিধানে অবহিত হইব। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের যুগ্ম নেতৃত্ব আজ দেশ-বাসীকে নূতন পথের নির্দেশ দিতেছে—সেই নির্দেশ মান্য

করিয়া পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগকে আমরা আহ্বান জানাই—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ—

নিউইয়র্কবাসী সাহিত্যিক জন ষ্টাইনবেক ১৯৬২ সালের সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন—প্রাইজের মূল্য ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ১৮ জন সদস্য বিশিষ্ট সুইডিশ সাহিত্য একাডেমী ৬০ জন লেখকের তালিকা ৯ মাস ধরে বাছাই করে ষ্টাইনবেককে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ষ্টাইনবেক অতি সাধারণ লোক—কখনও রাখাল, কখনও ক্ষেতমজুর, কখনও ছুতোর, কখনও খবরের কাগজের সংবাদদাতা প্রভৃতির কাজ করেছেন—১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম বই 'কাপ অব্ গোল্ড' প্রকাশিত হয়ে তাঁর খ্যাতি আরম্ভ হয়। তাঁর বয়স এখন ৬০ বৎসর। ১৯৩৬এর পর তিনখানা উপন্যাস পর পর জনপ্রিয় হলে তাঁর প্রচুর অর্থলাভ হয়। এক বছর আগে তাঁর শেষ বই প্রকাশিত হয়েছে—তাঁর আগে ৫ জন মার্কিন সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

৮ দফা করণীয়—

গত ২৭শে অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী চীন আক্রমণের জন্য সঙ্কটকালে সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত ৮ দফা কর্মসূচি অনুসারে কাজ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন—(১) প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দানের জন্য সকলকে অনুরোধ, (২) প্রত্যেক সুস্থ যুবককে প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়া ন্যাশানাল ভলান্টিয়ার্স রাইফেল দলে যোগদানের অনুরোধ, (৩) বেআইনি মজুত ও কালোবাজারী বন্ধ ও মূল্যবৃদ্ধি-রোধের জন্য মহল্লা কমিটী গঠন, (৪) গুজব ও আতঙ্ক ছড়ান বন্ধ, (৫) কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য ভোজ-সভা, উদ্বোধন উৎসব বন্ধ করা, (৬) জনসাধারণকে প্রতিরক্ষা ও প্রাইজবণ্ড কিনিতে অনুরোধ, (৭) প্রত্যেককে শান্ত থাকিতে এবং কষ্ট ও অসুবিধা ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ, (৮) চীন-আক্রমণ প্রতিরোধ দলীয় বা সংকীর্ণ ব্যাপার নহে—প্রত্যেক ভারতীয় আজ বিপন্ন—এ কথাটি সর্বত্র প্রচার। প্রতি কংগ্রেস কর্মী যদি এই ৮ দফা কার্যসূচি প্রচার করে—তবে দেশবাসী যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

ভারতে নূতন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী -

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের কার্য সম্বন্ধে ভারতের সকল নেতা আপত্তি করায় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে নিজে প্রতিরক্ষা বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীমেননের উপর অস্ত্র নির্মাণ বিভাগের ভার দিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ও শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীজহরলাল নেহরু শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই. বি. চ্যবনকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীচ্যবনের বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর এবং তিনি জীবনে বহু সাহসিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। শ্রীচ্যবনের অধীনে প্রতিরক্ষা বিভাগ নবভাবে গঠিত হইয়া চীনা হানাদারদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলে দেশবাসীর উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

ভারতরত্ন ডি-কে-কার্বে—

গত ৯ই নভেম্বর সকালে পুণা সহরে খ্যাতনামা সমাজ-সংস্কারক ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভারতরত্ন ডাঃ দোন্দু কেশব কার্বে ১০৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এত অধিক দিন সুস্থ শরীরে কর্মঠ জীবনযাপন করা খুব কম দেখা যায়। মাত্র ২ দিন তিনি পেটের অসুখে ভুগিয়াছিলেন। ৮৬ বৎসর পূর্বে তিনি যে গৃহে প্রথম বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, সেই গৃহে বাস কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র, অথচ সাহসী মহর্ষি কার্বে যে যুগে সমাজসংস্কার কার্য—বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করেন, তখন মানুষ মোটেই তাহা সমর্থন করিত না। বরং সর্বদা তাঁহার কার্যে বাধা দিত। জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি সকল জাতির মধ্যে সমতা সাধনেরও ব্যবস্থা করেন, শেষ জীবনে তিনি বহু সম্মান লাভ করেন ও ১৯৫৮ সালে তাঁহাকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া হয়। তৎপূর্বে ১৯৫৫ সালে তিনি পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথা বহুল প্রচারিত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

জেনারেল কারিয়াপ্পা—

জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা এক সময়ে ভারতের সামরিক বিভাগের কর্তা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ৫ দিন ধরিয়া (১২ই নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর) কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে চীন-আক্রমণ প্রতিরোধে দেশবাসীর কর্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত জীবনযাপন করিতেছিলেন—পরিণত বয়স হইলেও তিনি যে প্রচার কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি ভারতের সকল বড় বড় সহরে যাইয়া বক্তৃতা করিয়া তরুণগণকে যুদ্ধে এবং যুদ্ধ-সম্পর্কিত কার্যে যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিবেন। আরও বহু নেতার আজ এই ভাবে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করার প্রয়োজন হইয়াছে।

আগামী দুর্গাপূজার দিন সমস্যা—

১৯৬২ সালে পুরাতন পঞ্জিকা ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতভেদের ফলে দুর্গাপূজার দিন লইয়া সমস্যা হইয়াছিল—১৯৬৩ সালে ঐ সমস্যা আরও অধিক হইবে—কারণ দুই পঞ্জিকা—একমাস ব্যবধানে দুটি পৃথক দিনে দুর্গাপূজা আরম্ভের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা পুরাতন পঞ্জিকার মত সমর্থন করিয়া আগামী বৎসর ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে (রবিবার) অক্টোবর দুর্গাপূজার ছুটি ঘোষণা করিয়াছেন। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত মত ২৫শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজার ঘোষণা করিলেও সে সময় সরকার ছুটি দিবেন না। সরকারী কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসীর মত লইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ১৯৬৩ সালে দেওয়ালীর ছুটী হইবে পশ্চিম-বঙ্গে ১৫ই নভেম্বর। কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর দেওয়ালীর ছুটী ঘোষণা করিয়াছেন। এ বিষয়েও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ব্যবস্থায় অবহিত হইবেন।

শ্রীমতী (ডাঃ) ফুলরেণু গুহের দান—

খ্যাতিমতী সমাজ-সেবিকা ডাঃ ফুলরেণু গুহ তাঁহার স্বর্গত স্বামী অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহের নিজস্ব পাঠাগার ও তাঁহার গবেষণার কাগজপত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিয়া ছাত্রদের ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই ভাবে স্বামীর সংগৃহীত পুস্তকাদির উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমতী গুহ সকলের ধন্যবাদভাজন হইলেন।

মেয়রের নূতন সম্মান—

কলিকাতার মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্প্রতি পরলোকগত মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য (এম-এল-সি) নির্বাচিত হইয়াছেন। মোট ৮৬ ভোটের মধ্যে তিনি ৫৪ এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সিলার কুমার দত্ত ২৭ ভোট পাইয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু সুপণ্ডিত ও সুধী ব্যক্তি—তাঁহার নির্বাচন সাফল্যে যোগ্যতারই জয় হইল।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন—সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ১লক্ষ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ লক্ষ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস্ কমিশন ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার ইহাই সর্বোত্তম উপায়।

ভারতে মার্কিন অস্ত্র আমদানী আরম্ভ—

চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হওয়ায় মার্কিন সরকার অস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়া ভারতকে সাহায্য করিতেছেন। কতকগুলি বিমান অস্ত্র লইয়া ভারতে পৌছাইয়া দিতেছে। গত ৩রা নভেম্বর প্রথম মার্কিন অস্ত্রসম্ভার কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। বৃটেন, পশ্চিম জার্মাণী, ক্যানাডা প্রভৃতি স্থান হইতেও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃটেন বহু সমর-উপকরণ ভারতকে উপহার দান করিয়াছে। এই সকল অস্ত্রের সাহায্যে চীনাদিগকে ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে এবং প্রয়োজন মত তিব্বত-অঞ্চল আক্রমণ করাও চলিবে।

সাময়িকপত্র সংঘ—

গত ২রা নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া সহরে 'বিচার' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার দাশগুপ্তের আহ্বানে তাঁহার গৃহে নিখিলবঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া এ বিষয়ে দেশবাসীর কর্তব্য

সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হাওড়ার ডাঃ শম্ভুচরণ পান ও দেবেন ঘোষ, যষ্টিমধু-সম্পাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য, পাঠশালার সম্পাদক সতীন্দ্রনাথ লাহা, জনবাণীর সুশীল ঘোষ, মার্কিন-বার্তার হিরন্ময় গুপ্ত, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ ঘোষ প্রভৃতি বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংঘ-সম্পাদক শ্রীসুরেন নিয়োগী সভার সাফল্য বিধানে অবহিত ছিলেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুরের শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর আহ্বানে গত ১০ই ও ১১ই নভেম্বর আশ্রমে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল—কলিকাতা হইতে ৫০ জনেরও অধিক সাহিত্যিক শনিবার সকাল ১০টায় তুফান মেলে হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৫টায় আশ্রমে উপস্থিত হন। আসানসোল, বার্ণপুর, ধানবাদ, কুমারডুবি, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থান হইতেও কয়েকজন সাহিত্যিক যোগদান করেন। শনিবার সন্ধ্যায় অধিবেশনে বর্ষীয়সী কথা-সাহিত্যিকা শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সভানেত্রী হন এবং প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরদিন রবিবার সকালে কবি সম্মিলনে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিকালে খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সম্মিলন-সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত তিনটি সভাতেই ভাষণ দেন এবং স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হাওড়ার ডাক্তার শম্ভুচরণ পাল, শ্রীরাধারমণ মিত্র, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রবিবার মধ্যাহ্নে স্বামীজি সকলকে মানভূমের টুসুগান শুনাইবার ব্যবস্থা করেন ও গান শুনিয়া গ্রাম্য গায়কদিগকে মিষ্টান্নের জন্য অর্থ ও পদক পুরস্কার দিয়া সম্মিলন কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত করেন। স্বামীজি, তাঁহার শিষ্যশিষ্যাগণ ও পুত্রকন্যারা অতিথিদের আদর আপ্যায়নে সর্বদা সতর্ক থাকায় প্রত্যেকেই আশ্রমটিকে নিজস্ব গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এইবার লইয়া তিনবার ঐ আশ্রমে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হইল এবং আশ্রম ত্যাগের পূর্বে সকলেই আবার তথায় যাওয়ার জন্য ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

নেফা রণাঙ্গনে রাষ্ট্রপতি—

গত ৮ই নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন নেফা রণাঙ্গনে যাইয়া সেনাদল পরিদর্শন করেন এবং যুদ্ধে রত জওয়ানদের উৎসাহ দান করেন। একখানি উড়োজাহাজে যাইয়া তিনি দিয়াং, বনডিলা ও মিঙ্গামারিতে নামিয়া কিছুক্ষণ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি সর্বত্র বলেন—চীনা আক্রমণে ভারত এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে, ভবিষ্যতে আর তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে না। সর্বত্র তাঁহার বিমান হইতে ভারতীয় সৈন্যদিগকে খাদ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—

চীন-আক্রমণের ফলে ভারতে হঠাৎ সর্বত্র চাউলের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। সর্বত্র রেশনের দোকান হইতে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে—তবে তথায় চাউলের সহিত সমপরিমাণ গম লইতে বাধ্য করা হইতেছে। ১৫ বৎসর স্বাধীনতা ভোগের পরও দেশ চাউল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নাই—ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। আমেরিকা গম ও চাউল না দিলে ভারতের অবস্থা কি হইবে—সকলের তাহা চিন্তা করিয়া খাদ্য উৎপাদনে অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসব—

গত ৩রা নভেম্বর হইতে এক সপ্তাহ জগতের সকল দেশের সমবায়ীকর্মীরা আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন করিয়া থাকেন। এবার ঐ উপলক্ষে নববারাকপুর গৃহ-নির্মাণ সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের উদ্যোগে নববারাকপুরে এক উৎসব হইয়াছিল। তথায় বারাসতের প্রাক্তন মহকুমা হাকিম শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল সভাপতি ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। হরিপদবাবু তাঁহার ভাষণে তাঁহার সমবায় সমিতি কি ভাবে ঐ স্থানটি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় ৩ হাজার পরিবারের বাসগৃহ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইতিহাস বর্ণনা করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি

হরিপদবাবুর অসাধারণ কর্মশক্তি ও সংগঠন শক্তির প্রশংসা করিয়া বর্তমান সময়ে সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। সমবায় উৎসব আরও ব্যাপকভাবে সর্বত্র পালিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

মফঃস্বলে মন্ত্রিসভার অধিবেশন—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর নানা উপায়ে জনসংযোগের চেষ্টা করিতেছেন। গত ২৮শে অক্টোবর রবিবার প্রথম পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা সহরের বাহিরে একটি অধিবেশন করিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলার টাকী সহরে ঐ অধিবেশন হইয়াছে ও তথায় এক বিপুল জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার সকল সহকর্মীকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। বহুসংখ্যক মন্ত্রী ও নেতা ঐ দিন টাকীতে সারাদিন থাকিয়া বিভিন্ন সভায় জনগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনিয়াছেন। সহরের বাহিরে এইভাবে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইলে মন্ত্রীদের সহিত জনগণের মিলিত হওয়ার সুযোগ বাড়িবে ও তাহার ফলে লোক উপকৃত হইবে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন—

খ্যাতনামা অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্প্রতি ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বালীগঞ্জের বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বরিশাল মাহিলাড়ার অধিবাসী ছিলেন এবং নিজ চেষ্টা দ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি দিল্লীতে সরকারী নথীশালার অধ্যক্ষের কাজও করিয়াছিলেন। ৪ বৎসর রোগভোগের পর পত্নী, ২ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া তিনি পরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘকাল 'ভারতবর্ষে'র লেখক ছিলেন এবং বহু বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি পি-এইচ্. ডি. হন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণের আদর করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগ-বেদনা অনুভব করি এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—

গত ১৪ই অক্টোবর সুকবি ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। তিনি খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম পি মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তারাশঙ্করবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান শান্তিশঙ্করের পরিবারবর্গকে এ শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি—

গত ১৫ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীএস. কে. পাতিল দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে আগামী ৬ মাসকাল প্রতি মাসে ৯০ হাজার টন করিয়া খাদ্যশস্য ভারতে আমদানী করা হইবে—কাজেই খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব চুক্তি মত আমেরিকা আরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য সরবরাহ করিবে।

ক্রেতা সমবায় গঠন—

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—সারা ভারতের ১১৩টি বড় সহর (যাহার প্রত্যেকটিতে এক লক্ষ লোক বাস করে) ও ১৩৭টি ছোট সহর (যাহার প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার লোক বাস করে)—এর জন্য হাজার হাজার ক্রেতা সমবায় গঠন করিয়া ন্যায্য মূল্যে সকলকে খাদ্য দেওয়া হইবে। বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিষয় হইবে এবং এই খাতে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। এ বিষয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্তন—

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও বলবন্তরাও চ্যবন কেন্দ্রে নূতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় বর্তমান রাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীকে. রঘুরামাইয়াকে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী শ্রীটি. টি. কৃষ্ণমাচারীকে অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা-সমন্বয়-মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সারদানন্দ সিংকে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টার জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সর্বত্র সাজ সাজ রব—এই সঙ্গে দেশবাসী জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

শ্রীজয়সুখলাল হাতি—

কেন্দ্রীয় শ্রম-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতিকে অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় দপ্তরের সরবরাহ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রীকরুণাকেতন সেন আই. সি. এস-কে পশ্চিমবঙ্গে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ডিরেকটার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি উভয় কাজই করিবেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীডি. এম. গুপ্ত সহকারী ডিরেকটার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। পুলিসের ডি. আই. জি শ্রীপ্রণবকুমার সেন কলিকাতার অসামরিক প্রতিরক্ষার কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। এ. আই. জি. শ্রীদেবব্রত ধর ডি. আই. জি. পদে উন্নীত হইয়া শ্রীসেনের কাজ ও সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেস বিভাগের কাজ করিবেন। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্রুততর ও ব্যাপক না হইলে দেশরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

উত্তরবঙ্গে সামরিক শিক্ষা—

উত্তরবঙ্গের তিনটি সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হইবে। আপাততঃ জনসাধারণকে আত্মরক্ষাত্মক ব্যবস্থা হিসাবে স্বেচ্ছায় এই শিক্ষা লইতে বলা হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে ইহা বাধ্যতামূলক করা হইতে পারে। এই ব্যবস্থা মন্দের ভাল —পূর্বে এই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় এই ব্যবস্থা চালু করা হইলে মানুষের মনে সামরিক প্রেরণা, শৃঙ্খলা ও শক্তি বাড়িবে।

নিমাইচরণ মল্লিক স্মৃতি—

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার দানবীর নিমাইচরণ মল্লিক আদি কলিকাতার বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন। গত ১৮ই কার্তিক শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৬৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের গৃহে তাঁহার স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। সেকালের কলিকাতার অধিবাসীদের কথা আজ লোক ভুলিয়া যাইতেছে।

হারানো সুর

শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়

আমারে যে তুমি ভাসিয়াছ ভাল
নহে সথা নহে ভুল,
তোমার অসীম করুণার দান
ফল্গু প্রবাহ সদা বহমান
অটুট তোমার প্রেমের বাঁধন
বেঁধেছে মনের কূল।

সেই ত আমার গরব গরিমা
ভুলি নাহি থাক মোরে,
লভিতে তোমার কোমল পরশ
উছলিত হিয়া, অমিত হরষ,
চুপিসাড়ে আসি নীরব নিশীথে
আঘাত হান সে দোরে।

তুলি দিয়ে আঁকা পটুয়ার ছবি
ধ্যানের দেবতা তুমি
তোমাবিনে হায় সকলি অসার
সে কথা স্মরণে জাগে বার বার
দিবস প্রান্তে চকিতে মিলন
শ্রান্ত অধর চুমি।

আমার যা' কিছু বিলায়ে সকলি
জেলেছি হৃদয়ে আলো,
জীবনে যদি না হয় পরিচয়
মরণের বুকে কর মোরে জয়
হারানো সুরের মদির কাকলী
কর্ণকুহরে ঢালো।

খল···

খলের প্রকৃতি হয় তস্করের প্রায়

অতর্কিতে হানা দেয় শান্তির কুলায়!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনুরাধা তাঁর খাতাটি খুললেন। নিজের মনেই কয়েকটি পাতা উল্টে উল্টে এক জায়গা থেকে পড়তে শুরু করবার আগে উৎপলের দিকে চেয়ে বললেন, 'হাসতে পারবেন না কিন্তু।'

উৎপল বলল, 'বাঃ, হাসব কেন। আপনি পড়ে যান।'

অনুরাধা পড়তে লাগলেন, 'আমার বাবার কাছ থেকে যে প্রেরণা আমি পেয়েছি তা আর কারো কাছেই পাইনি। তিনি ছিলেন সামান্য স্কুল-মাষ্টার। তখন কতইবা তাঁর আয়। খুব কষ্টেই আমাদের সংসার চলত। বাবা মা আর আমরা দুটি বোন। সংসারে অভাব অনটন বেশ ছিল। কিন্তু সেই অনটনকে বাবা কখনো বড় করে দেখেননি। সংসারে এটা বাড়ন্ত ওটা বাড়ন্ত বলে মা মাঝে মাঝে নালিশ করতেন। কোন কোন সময় বাবার যে ধৈর্যচ্যুতি না হত তা নয়। ঝগড়া-ঝাটিও হত। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। বাবার বন্ধুরা পাড়াপড়শীরা বাবাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন আমার মাও তেমনি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কীইবা হতে পারত। বাবাকে কখনো মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি, পরনিন্দা করতে শুনিনি, বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কির ধার দিয়েও তিনি যেতেন না। অথচ মানুষটি যে নীরস ছিলেন সে কথা কেউ বলতে পারত না। বাবার বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসতেন। আমাদের বাইরের ঘরের তক্তপোষে বসে বাবার সঙ্গে তাঁদের কত গল্প করতে শুনেচি। আমি আর আমার দিদিও তাঁর কাছে বসে গল্প শুনতাম।'

অনুরাধা থামলেন। একটু যেন অন্যমনস্ক দেখাল তাঁকে। উৎপল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার দিদির কথা তো এর আগে বলেননি। তিনি এখন কোথায় আছেন?'

অনুরাধা মুখ তুলে বললেন, 'এখন আর নেই। ছিল। আমার দিদির নাম ছিল রাধারাণী। আমার দিদিমা রেখেছিলেন ওর নাম। আমার নাম রাখেন বাবা দিদির নামের সঙ্গে মিলিয়ে। অল্প বয়সে বিয়ে হয় দিদির। সন্তান হওয়ার সময় মারা গেল। তার বয়স তখন ষোলও পূর্ণ হয়নি। আমরা একজন আর একজনকে খুবই ভালোবাসতাম। আমাদের আর তো কোন ভাইবোন ছিলনা। বাইরের কোন সঙ্গীসাথীও ছিল না। আমরা দুজনেই ছিলাম দুজনের সঙ্গী।''

অনুরাধা ফের একটুকাল চুপ করে রইলেন। কে জানে হয়তো দিদির কথা ছেলেবেলার দিনগুলির কথা তাঁর নতুন করে মনে পড়ল।

উৎপল লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি না জেনে আপনাকে—'

অনুরাধা বললেন, 'না না, আপনার সংকোচের কোন কারণ নেই। সে অনেক দিনের কথা। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর তো হবেই। তারপর কত শোকদুঃখের দিন এল, চলেও গেল। তবু মাঝে মাঝে দিদির কথা আমার মনে পড়ে।'

উৎপল বলল, 'আপনি বরং যা পড়ছিলেন তাই পড়ুন।'

অনুরাধা বললেন, 'শুনতে ভালো লাগছে আপনার?'

উৎপল বলল, 'নিশ্চয়ই! খুব ভালো লাগছে।'

অনুরাধা খুসিও হলেন, লজ্জিতও হলেন, 'কী যে বলেন। আমাদের লেখা কি আর লেখা হয়? এ হল আলাদা সাধনার ব্যাপার। আমি তো আর সে সব কিছু

করিনি। খেয়াল খুসিমত একটু একটু লিখে রেখেছি! মরে গেলেও আমি এসব আপনাকে শোনাতামনা। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম আপনি যখন কিছুতেই লিখছেন না, কী ভাবে আরম্ভ করবেন ঠিক করতে পারছেন না—।'

উৎপল হেসে বলল, 'তখন আপনিই আমার পথ-প্রদর্শিকা হয়ে—।'

অনুরাধা বললেন, 'অমন করে যদি ঠাট্টা করেন আমি আর একটি লাইনও পড়ব না। তাহলে খাতা বন্ধ করি।'

উৎপল বলল, 'না না, বন্ধ করবেন কেন। পড়ুন।'

অনুরাধা ফের পড়তে লাগলেন, 'আমরা বাবার কাছে গল্প শুনতাম। পুরাণের গল্প, ইতিহাসের গল্প। যাঁরা বীরপুরুষ আর বীরাঙ্গনা বাবা বেছে বেছে তাঁদের কাহিনীই আমাদের শোনাতেন। মানুষের শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের কীর্তনেই ছিল তাঁর আনন্দ। ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্রতা নিয়ে তাঁকে কোনদিন গল্প করতে শুনেছি বলে মনে পড়ে-না। রাজপুত বীরপুরুষদের, মারাঠা যোদ্ধাদের গল্প শুনতে শুনতে আমি আর দিদি দুজনেই বলাবলি করতাম আমরা প্রতাপ সিংহ কি শিবাজীর মত পুরুষরা ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। কিন্তু দিদির যখন শেষ পর্যন্ত ষাট টাকা মাইনের একজন অফিসের কেরাণীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সে যে খুব হতাশ হয়েছে তা মনে হলনা। বরং আমার সেই মসিজীবী জামাইবাবুর মধ্যে দিদি যেন পৃথিবীর সব বীরপুরুষকে এক সঙ্গে দেখতে পেল। শ্বশুর বাড়ি থেকে এসে দিদি তার বরের কত গল্পই না আমার কাছে করত। খুঁটিনাটি ঠাট্টা তামাসা আদর সোহাগের গল্প। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বীরের গল্প শুনতে পেতামনা, তখন কোন আফশোস হত না। বরের গল্পই কি কম মজার?

কিন্তু দিদি অসময়ে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেল। বাবা বললেন, 'অনুর আর বিয়ে দেবনা। আমি যতদিন আছি ও আমার কাছেই থাক।'

আমি বললাম, 'সেই ভালো বাবা। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি তোমার কাছেই থাকব। তোমার কাছে বসে পড়াশুনো করব।'

মা অবশ্য মাঝে মাঝে তাগিদ দিতে লাগলেন, 'মেয়ে যে ধিঙ্গি হয়ে উঠল। তুমি কি সত্যিই ওর বিয়ে দেবেনা ভেবেছ নাকি? পাড়ার লোকে কী বলবে শুনি।'

বাবা হেসে বলতেন, 'ভেবনা। ভালো সম্বন্ধ পেলেই ওর বিয়ে দেব। যার তার হাতে তো ওকে দিতে পারিনে। তোমার মেয়ের ধনুর্ভাঙ্গা পণ জানোতো? পুরুষের মত পুরুষ ছাড়া ও কাউকে বিয়ে করবে না।'

মা বলতেন, 'ওসব কথা তো তুমিই ওর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছ। না বাপু কাজ নেই অত বাছাবাছিতে। ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো হয়, স্বভাব-চরিত্র ভালো হয়, দুবেলা দু-মুঠি খেয়ে পরে থাকতে পারে আমি তাতেই খুসি। তারপর মেয়ের ভাগ্য। ভাগ্যের ওপর কেউ কি যেতে পারে?'

সম্বন্ধ খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল। কিন্তু মা আমার বিয়ে দেখে যেতে পারলেন না। কারো সঙ্গে পাকাপাকি কথা হবার আগে মাও চলে গেলেন। জর মাঝে মাঝে মার আগেও হয়েছে। কিন্তু অমন খারাপ ধরণের জর কখনো হয়নি। দিন রাত ছটফট করতেন। ডাক্তার বলেছিলেন সেপটিক ফিভার।

মা যে বাবার জীবনে কতখানি ছিলেন তা তিনি চলে যাবার পরে বুঝতে পারলাম। বাইরে থেকে বাবা দেখতে সেই রকমই আছেন। স্কুলে যান ছাত্রদের পড়ান, চাল চলন আচার আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ নির্দেশ দেন; বাসায় যদি কোন পুরোন বন্ধু বান্ধব দেখা করতে আসেন তাঁদের সঙ্গে গল্প করেন, তেমন জোর জবরদস্তি করলে যোগেশ কাকার সঙ্গে দু এক হাত দাবাও খেলেন কিন্তু আমি বুঝতে পারি বাবা যেমন ছিলেন তেমনটি আর নেই। ভিতরে ভিতরে অনেক বদলে গেছেন। কোন কোন সময় তিনি গীতা পড়েন, উপনিষদ পড়েন। আগেও পড়তেন। কিন্তু এখন পড়েন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে। সান্ত্বনা পান কিনা জানি না। একেক সময় দেখি চুপ করে বসে আছেন। জানলার বাইরে আমাদের এক-খানি জমি ছিল। তাতে মা ফুলগাছ লাগাতেন, তরি-তরকারির গাছও লাগাতেন। বাবাকে সেইদিকে চেয়ে থাকতে দেখতাম। আমি ওই সব সময় বাবার নিস্তব্ধতা ভাঙতাম না। কোন কথা বলে তাঁর মন অন্তর্দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করতাম না। বরং পায়ের শব্দটুকু নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটুকুও যেন গোপন করে চলে যেতাম। কোন কোন দিন রাত্রির অন্ধকারে বাবাকে আকাশের

দিকে তাকিয়ে থাকতেও দেখেছি। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি—মানুষ মরে গিয়ে ওইসব নক্ষত্রলোকে চলে যায়। বাবাও তাই বিশ্বাস করতেন কিনা, তারার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতেন কিনা—কে জানে। আমার মায়ের নাম ছিল নয়নতারা। নামের এই সাদৃশ্যের কথা কি বাবার মনে পড়ত ?

বাবার এই নীরব শোক আমার ভালো লাগল। মৃত্যুর পরে বাবা যে মাকে ভুলে যাননি, বরং গভীরভাবে মনে করে রেখেছেন—একথা টের পেয়ে বাবার ওপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বাবার সমবয়সীদের মধ্যে, কি বাবার চেয়েও বেশি বয়সীদের মধ্যে দেখেছি স্ত্রী মারা যাবার পরে অনেকেই বিয়ে করেছেন। ঘরে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কারো কারো বিয়ে করতে বাধেনি। বাবা তাঁদের দলে নন দেখে আনন্দ পেয়েছি, গর্ববোধ করেছি, মাঝে মাঝে বাবা মার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনাও করতেন। যখন আমরা হইনি তখনকার গল্প। দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে দুজনের ঘর সংসার চালাবার সেই কাহিনী, বাবা আমাকে বলতেন। মা বেঁচে থাকতে তার কিছু কিছু তো আমি নিজেও দেখেছি। তবু বাবা আমাকে সে সব দিনের কথা—কি আরো পুরোন আমার অদেখা দিনগুলির কথা শোনাতেন। কবে বাবার অসুখে মা রাত জেগে সেবা করেছিলেন, কবে টাকার অভাবে মাকে তার পছন্দমত একখানা শাড়ি কিনে দিতে না পেরে বাবা দুঃখ পেয়েছিলেন—আবার মার কাছে থেকে সেই দুঃখের সান্ত্বনাও কিভাবে জুটেছিল বাবার কাছে সেই গল্প শুনতাম। শিবপার্বতীর মত একটি আদর্শ দম্পতী আমি বাবা-মার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম।

কিন্তু মা তো আর নেই। তিনি থাকলে বাবার সেবা করতেন, শুশ্রূষা করতেন। আমি অবশ্য অতটা পারিনে। মার মত অমন সুন্দর করে রাঁধতেও পারিনে, যত্ন করে বিছানা পাততেও পারিনে, নিখুঁতভাবে মশারি খাটাতেও জানিনে—তবু আমি যতটুকু জানি তাতেই বাবার কাজ চলে যায়। আর আমি না থাকলে বাবার একদিনও চলেনা। বাবাকে একা ফেলে আমি কোথাও চলে গেছি এ কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। আমি মনে মনে ভাবতাম, বাবাকে ছেড়ে আমি কখনো কোথাও যাবও না। বাবা যতদিন বেঁচে থাকবেন আমি ওঁর কাছে থাকব, ওঁর সেবা শুশ্রূষা করব, ওঁর পায়ের তলায় বসে পড়াশুনো করব। তারপর তিনি যখন বুড়ো হবেন, কোন কাজকর্ম করতে পারবেন না আমিই তখন চাকরি করে বাবাকে খাওয়াব। আমার ভাই থাকলে যা করত তাই করব। একই সঙ্গে ওঁর ছেলে আর মেয়ের কাজ করব। আমাদের স্কুলের টিচারদের মধ্যে অমন দুএকটি চিরকুমারী স্নেহময়ী দিদিমণির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। মনে মনে আমি তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম। তাঁদের জীবনের ছাদে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিজের কল্পনায় গড়ে নিয়েছিলাম। আমার কাছে ওই ধরণের চেয়ে স্বাভাবিক কিছু যেন আর ছিল না।

আমার অমত সত্ত্বেও আমার সম্বন্ধ মাঝে মাঝে আসতে লাগল। বাবার চেয়ে বাবার বন্ধুদের গরজ যেন বেশি। মাসীমা মেসোমশাইদের গরজ আরো বেশি। কিন্তু তাঁরা সম্বন্ধ আনলে কি হবে—তার কোনটাই হল না। আমার তো অপছন্দ ছিলই, বাবারও পছন্দ হচ্ছিল না। ঘর বর কুল শীল রূপ যোগ্যতা সব দিক মেলে না—কোন না কোন খুঁৎ বেরিয়ে পড়ে। পাত্রপক্ষও খুঁৎ বের করতে ছাড়েন না। বাবার সব চেয়ে বড় দোষ দারিদ্র্য। বাবা তো টাকা পয়সা বেশি ব্যয় করতে পারবেন না। তবে অত বাছাবাছি কিসের। আত্মীয়স্বজন সবাই যখন বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, আমার বিয়ে হবে না বলেই ধরে নিয়েছেন—সেই সময় হঠাৎ অদ্ভুতভাবে আমার বিয়ে হয়ে গেল, আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এ বিয়েতে ঘটকালি করতে আসেননি। এমন কি বাবার পক্ষেও এ বিয়ে বোধ হয় অভাবিত ছিল। [ক্রমশঃ

স্ত্রীণাং চরিত্রম্
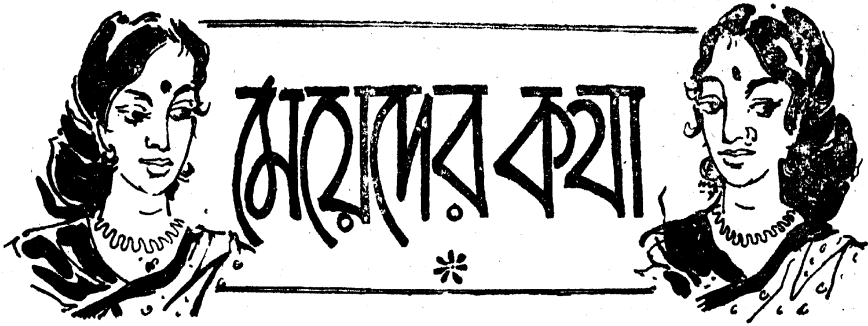
মিসেস্ গোয়েল্

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

১১

কবি বার্লস সিল্যাণ্ড বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ডায়না সৃষ্ট হয়েছিল সকল সৃষ্টির আগে। তারি মধ্যে সকল বস্তু নিহিত ছিল। তিনি নিজেকে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন—আঁধার আর আলোতে। তিনি নিজে রইলেন আঁধার, আর তাঁর ভাই আলো হলেন লুসিকার। ডায়না লুসিকারের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু লুসিকার তো রাজী নয়। লুসিকারের প্রিয় ছিল এক বিড়ালী ডায়না—বিড়ালীর রূপ ধরে তিনি লুসিকারের সঙ্গে মিলিত হলেন। একটি মেয়ের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল অ্যারেডিয়া।—

প্রাণতোষকে প্রলুব্ধ করার সকল চেষ্টা যখন আমার ব্যর্থ হল, তখন মনে পড়ল আমার উপরিলিখিত উপাখ্যানটির কথা। আমি প্রাণতোষকে প্রতারিত করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

আমার মাসতুতো বোনের কাহিনী বলা শেষ করেছি: এবার নিজের কাহিনী বলছি। একটা সাংঘাতিক প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু প্রাণতোষ কি দোষ করেছিল? হ্যাঁ, একটা দোষ ছিল প্রাণতোষের। সে ছিল আমার প্রেমের জন্যে আমার স্বামী মিঃ গোয়েলের প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমরা কলেজে তিন জন এক ক্লাসে পড়তুম। আমি প্রাণতোষ দাস, আর হরদয়াল গোয়েল। আমার বাবা শিবনাথ রায় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তারপর আমি ছিলুম তাঁর একমাত্র কন্যা প্রমীলা। শুধু রূপে আমি প্রমীলা ছিলুম না, গুণও আমার কিছু কিছু ছিল। কোন কোন পরীক্ষায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণতোষ ও হরদয়ালকে পরাভূত করে প্রথমও হয়েছি। আমাদের বাড়ীতে দুজনেরই অবারিত দ্বার ছিল। বাবা ও মা দুইজনকেই সমান আদর করতেন। আমার সঙ্গে কার বিয়ে হবে সে সম্বন্ধে কেউই ঠিক জানতো না। প্রাণতোষ ভাবত হরদয়ালকে, আর হরদয়াল ভাবত প্রাণতোষকে আমি বেশি ভালোবাসি। কিন্তু আমি নিজেও জানতাম না কার প্রতি আমার অনুরাগ বেশী ছিল। তবে বলতে পারি—দুই জনের প্রতিই আমার ঈর্ষা ছিল বেশী।

আমাদের বি-এ পরীক্ষার আগে হরদয়ালের বাবা গুরুদয়াল গোয়েল চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে নিজের বাড়ী অমৃতসর চলে গেলেন। হরদয়াল রইল হোষ্টেলে। সেই সময়ে হরদয়াল আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করত। প্রাণতোষ তত আসত না। কারণ সে তখন ভীষণ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে সুরু করেছিল। প্রেরণা ছিলুম আমি। আমার সঙ্গে তারি

বিয়ে হবে যে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হবে—একথা আমি একদিন বলেছিলুম।

হরদয়ালই জিতল। সে পরীক্ষায় শুধু ফার্স্ট হল না, প্রমীলাকেও লাভ করল। তৃতীয় স্থান অধিকারিণী প্রমীলাকে। হরদয়ালের বিয়েতে তার বাবা এসেছিলেন কোল্‌কাতায়। বিয়ের পর আমরা অমৃতসর চলে গেলুম। স্বামীর বাড়ীতে আমার যথেষ্ট আদর হল বটে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলুম, বড়ছোট সকলের মধ্যেই আমাকে নিয়ে চাপাচাপা হাসি—মুখটেপা হাসি। হরদয়ালকে একদিন ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করলুম। সে কোন সন্তোষজনক জবাব দেয় নি। কিন্তু তার পরদিনই আমাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে এল। কোলকাতায় এক পত্রিকা অফিসে চাকুরীর জোগাড় করেছিল হরদয়াল। ভাল লেখবার ক্ষমতা ছিল তার। বিয়ের পর আমার পড়া বন্ধ হয়ে গেল, হরদয়ালেরও। সে বলত চাকুরীর জন্য পড়ছিলুম। চাকুরী পেয়ে গেছি, পড়ে আর কী হবে? আসলে সে প্রাণতোষের সঙ্গে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভরসা পাচ্ছিল না।

প্রাণতোষ বৈরীহীন রণক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করতে লাগল।

আমার কী সর্বনাশ হয়েছে, কেন আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা মুখটিপে হাসছিল তা আমি বুঝতে পারলুম অনেকদিন পরে। হরদয়াল তার অফিস পাড়ায় একটা ফ্ল্যাটবাড়ী ভাড়া করল। আমি আর হরদয়াল মাত্র সেখানে। কিন্তু পুরুষের কাছে নারী যা পেয়ে থাকে আমি তা পাইনি। হরদয়াল সব সময়েই সেই মুহূর্তটিকে পরিহার করে গিয়েছে। কিন্তু নূতন বাসায় এসে হরদয়াল তার স্বামিত্বের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারল না। সে 'প্রিয়েপাস' ব্যবহার করল ও আমি ক্ষত বিক্ষত হলাম। অনভিজ্ঞা আমি। ভাবলুম এই বুঝি স্বাভাবিক। কিন্তু যন্ত্রণা মারাত্মক হওয়াতে ডাক্তার ডাকতে হল। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করলেন, তারপর মিঃ গোয়েলকে। কিন্তু যে রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করলেন তা সত্যি বড় মারাত্মক। হরদয়াল পুরুষ নয়! কী লজ্জা! একটি নারীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার!

কাজের অছিলায় হরদয়াল অমৃতসর চলে গেল। আমি কার কাছে আমার দুঃখের কথা বলব ভেবে পেলাম না। প্রাণতোষকে লিখে পাঠালুম আসতে। তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কোন কাজের চাপ নেই তবুও সে এল না। জাতীয়-গ্রন্থ-ভবনে সে গিয়ে পড়াশোনা করত। সেখানে কয়েক দিন যাতায়াত করার পর একদিন তার দেখা পেলুম। কিন্তু আমার দুঃখের কথা তাকে সব বলতে পারলুম না। কী একটা বিতৃষ্ণায় যেন তার মন বিমুখ হয়ে আছে। যতদূর বুঝলুম প্রাণতোষ জ্ঞানের রাজ্যে যেমন অজানাকে জানতে পাগল, তেমনি প্রেমের জগতেও চায় অজানাকে জানতে—রহস্যময়ীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। আমি যা বললুম সে যেন তা বিশ্বাসই করল না।

ডায়েনার ঐ কাহিনী মনে পড়ল। আমি তিন দিন পরে বোরখা পরে চিড়িয়াখানার ধারে রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্ধ্যার আঁধারে কত লোক এল গেল। কত লোক কত কী ভাবল। কিন্তু গ্রন্থাগার থেকে হেঁটে যাওয়ার পথে প্রাণতোষ যখন বোরখাওয়ালীর সামনে থমকে দাঁড়াল, আমি অনুনাসিক স্বরে উর্দু ভাষায় বললুম, 'দেখুন, আমি বিপদে পড়েছি আমায় সাহায্য করবেন!' হরদয়াল আমায় ভাল উর্দু শিখিয়ে ছিল, প্রাণতোষও উর্দু জানত।

'কি বিপদ বলুন।'

'আসুন যেতে যেতে বলব।'

অন্ধকারে দুজনেই গড়ের মাঠে প্রবেশ করলুম। অনেকগুলি গাছ যেখানে একত্র হয়ে অন্ধকারটাকে জমাট বাঁধিয়ে রেখেছে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। ঘাসের উপর বসলুম। পাশে বসতে অনুরোধ করলুম প্রাণতোষকে। প্রাণতোষ যেন অজ্ঞাতকে জানবার আগ্রহে উৎকণ্ঠ ও অধীর হয়ে উঠেছিল। কাছে ঘেঁসে বসল সে।

বললুম, 'আপনি পুরুষ?

কেন? সন্দেহ হচ্ছে?

হ্যাঁ। পরিচয় দিন।

অজানাকে যে পুরুষ জানতে চায়, দুর্ভেদ্যকে ভেদ করতে চায় সে পুরুষ পুরুষত্বের পরিচয় দিল। পরে আমার পরিচয়ও সে জানতে পারল। তারপর যখন সে আমার সর্বনাশের সকল কাহিনী শুনল, আমাকে বিয়ে

করবার প্রতিশ্রুতি দিল। এর তিন দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার বিয়েও হয়ে গেল। আর এ খবরটা হরদয়ালের কাছে পৌছতেও দেরী হল না। চিঠিটা লিখল আমারই এক সহপাঠিনী কমলা অধিকারী। সে হরদয়ালকে শ্রীমতী নামে সম্বোধন করেছিল। লিখেছিল, 'বোন তোমার জন্যে বর ঠিক করেছি। একবার কোলকাতায় এস।' কিন্তু এর ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল হরদয়ালের উপর। সে আত্মহত্যা করেছিল। পুরুষত্বই যখন গেল, তখন জীবন রেখে কী লাভ? প্রাণতোষ বড়ই দুঃখ পেয়েছিল। রেগে গিয়ে চিঠি লিখেছিল হরদয়ালের বাবা গুরুদয়ালকে, নিজের মেয়েকে এই রকম বিকৃতভাবে লালনপালন করে কী সাংঘাতিক মর্মান্তিক করলেন তার জীবনটাকে, বিনাশ করলেন একটা জলন্ত প্রতিভাকে। প্রাণতোষ বুঝতে পারেনি দোষ গুরুদয়ালের নয়। নারীর প্রকৃতি কত বিচিত্র হতে পারে তার অভিজ্ঞতা তো তার ছিল না। ফ্রয়েড যে বলেছেন—নারীর উদ্বর্তনের (sublimation) ক্ষমতা খুব কম সে কথা খুব সত্যি। নারী তার অপূর্ণতাকে উদ্বর্তিত করে বিশ্বের উদ্বর্ধন করতে পারে। প্রকৃতির তাই নিয়ম। কিন্তু শিক্ষার জন্যেই হোক, বা ব্যক্তিগত বিকৃতির জন্যেই হোক—শিক্ষিত নারীদের মধ্যে নারীর অপূর্ণতা একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে তাদের অন্তরের মধ্যে। সেই বিক্ষোভেই তারা সৃষ্টি করে অশান্তি—গৃহে ও সমাজে, পুরুষকে পরাজিত করার উদগ্র প্রয়াসে।

যাহোক আমিও একটা কঠিন চিঠি লিখলুম হরদয়ালের বড়দিদিকে যিনি খুব বেশী মুখ টিপে হেসেছিলেন আমার প্রথম পতিগৃহে যাবার পরে। নীচে নাম স্বাক্ষর করলুম শ্রীমতী প্রমীলা দাস। এই নাম লেখার মধ্যে নাকি একটা অহংকার তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রাণতোষ তাই একটু কটাক্ষ করেছিল।

কিন্তু আমি যে এখন আর মিসেস্ গোয়েল নই, শ্রীমতী দাস—শ্রীমান্ প্রাণতোষ দাসের স্ত্রী—যে প্রাণতোষ প্রকৃতই পুরুষ।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, পায়ের মোজা জীর্ণ-পুরাতন হয়ে গেলে সচরাচর সে মোজা নিতান্তই অনাবশ্যক-জঞ্জাল মনে করে আমরা ফেলে দিই। কিন্তু এভাবে পুরোনো মোজাগুলিকে একবারে বাতিল করে না দিয়ে, বরং সেগুলিকে অনায়াসেই অন্য-ধরণের আরো নানান্ দরকারী কাজে লাগানো যায়—এমন কি, মাথা খাটিয়ে সামান্য চেষ্টা করলেই, এ সব অব্যবহার্য্য পুরোনো মোজা থেকে ঘর-সাজানোর আর ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার ও উপহার দেবার উপযোগী কাপড়ের কারু-শিল্পের বহু বিচিত্র-অভিনব ছাঁদের সুন্দর সুন্দর পুতুল পর্য্যন্ত বানানো সম্ভব হয়। কি উপায়ে পুরোনো মোজা থেকে কাপড়ের কারু-শিল্পের এই সব অপরূপ পুতুল বানানো যায়, এবারে তারই মোটামুটি হদিশ জানাচ্ছি। পুরোনো মোজা থেকে তৈরী এ সব পুতুলের চেহারা দেখতে কেমন ছাঁদের হবে, পরপৃষ্ঠায় ১নং ছবিতে তারই একটি সুস্পষ্ট নমুনা দেওয়া হলো।

উপরের নমুনামতো কাপড়ের কারু-শিল্পের পুতুল বানাতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। এ ধরণের পুতুল রচনার জন্য চাই—পুরোনো একপাটি রঙীন মোজা, একটি ভালো কাঁচি, সেলাইয়ের কাজের জন্য—সরু, আর কার্পেট-বোনার উপযোগী মোটা ধরণের একজোড়া ছুঁচ, রঙ-বেরঙের এমব্রয়ডারী সুতো, পুতুলের মাথায়

কেশগুচ্ছ-বানানোর জন্য এক হালি' (strand) কালো, শাদা বা বাদামী রঙের পশমী-সুতো (woolen chord), এক বাণ্ডিল ধূলি-কাঁকর-বীচি-হীন পরিস্কার তুলো, লাইন টানবার ও মাপ নেবার জন্য ভালো একটি 'স্কেল-রুলার' (scale-ruler) আর কাপড়ের উপর নক্সা-আঁকার জন্য ভালো এক টুকরো রঙীণ-খড়ি।

এ সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে নেবার পর, পুতুল-তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে। সে কাজ সুরু করবার আগে, পুরোনো মোজাটিকে পরিপাটিভাবে সাবান-জলে কেচে রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে আগাগোড়া সমান-ছাঁদে (flat-shape) ইস্ত্রি করে নিন। মোজাটিকে নিখুঁত-ভাবে ইস্ত্রি করে নেবার পর, সেটিকে সমতল টেবিল অথবা মেঝের উপর সমানভাবে বিছিয়ে রেখে, নীচের ২নং ছবির

২

এমনি-ছাঁদে মোজা ছাঁটাই করতে হবে

পা পা দেহ গলা মাথা হাত হাত
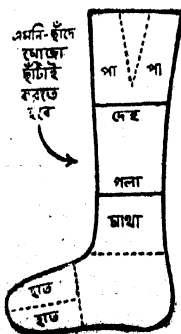
ছাঁদে তার বুকে, 'স্কেল-রুলার' আর রঙীণ-খড়ির সাহায্যে পুতুলের দেহাবয়বের বিভিন্ন-অংশের 'নক্সা' (Sectional drawing of the pattern) এঁকে ফেলুন। তাহলেই মোজার উপর পুতুলের দেহাবয়বের পুরো-নক্সাটি ছকে নেবার কাজ মিটবে। এবারে উপরের ২নং ছবির 'ফুটকি-চিহ্নিত' নক্সার প্রত্যেকটি রেখা বরাবর নিখুঁত-ভঙ্গীতে কাঁচি চালিয়ে পুতুলের দেহাবয়বের, পায়ের, হাতের ও মাথার অংশের প্রয়োজনীয়-কাপড়টুকু ছাঁটাই করে ফেলুন···মোজার গোড়ালির-কাপড় নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়—কাজেই সেটিকে বাদ দিয়ে রাখুন। এভাবে ছাঁটাই করলেই দেখবেন—মোজাটি চারিটি ছোট-ছোট অংশে বিভক্ত হয়েছে···এই চারটি ভাগের মধ্যে, প্রথম-টুকরোতে মিলবে—উপরের ১নং ছবিতে দেখানো 'ক' চিহ্নিত অর্থাৎ পুতুলের মাথার, গলার, দেহের আর পদ-যুগলের অংশ, আর দ্বিতীয়-টুকরোতে মিলবে—উপরোক্ত ১নং ছবির 'ঘ' চিহ্নিত অর্থাৎ পুতুলের দু'খানি হাতের অংশ। মোজার বাকী দুটি টুকরো অর্থাৎ উপরের ১নং ছবিতে দেখানো 'খ' আর 'গ' চিহ্নিত অংশ—পুতুল-বানানোর কাজের জন্য কোনো প্রয়োজনেই লাগবে না, সুতরাং এ দুটি কাপড়ের টুকরোকে বাড়তি-হিসাবে অনায়াসেই বাতিল করে দিতে পারেন—এতে শিল্প-কাজের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না।

কাপড়-ছাঁটাইয়ের পর, সেলাইয়ের কাজ। প্রথমেই পুতুলের আপাদমস্তক অর্থাৎ উপরের ১নং ছবিতে দেখানো 'ক'-চিহ্নিত অংশের অর্থাৎ মোজার ভিতরকার ঠোঙার মতো ফোকরে ভালোভাবে তুলো ঠেশে ভরাট করে দিন। তারপর পুতুলের মাথার ও পায়ের অংশের ছাঁটাই করা প্রান্ত-সীমার দু'দিকে ছুঁচ-সুতোর সেলাই দিয়ে পাকা-পোক্ত-ধরণে ফাঁক-বন্ধ করে বেমালুম জুড়ে দিন। এবারে উপরের ১নং ছবির 'ফুটকি-চিহ্নিত' রেখা-অনুসারে তুলো-ঠাশা মোজার পুতুলের পায়ের, কোমরের ও গলার অংশে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে পরিপাটিভাবে সেলাই করুন এবং বুকের উপর পূর্ব্বোক্ত ১নং নক্সায় যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে সারি-সারি ছোট আর বড় কয়েকটি মানানসই-ধরণের রঙীণ-বোতাম একের পর এক সুষ্ঠুভাবে টেঁকে দিন। এ কাজ শেষ

হলে, প্রয়োজনমতো রঙের সুতো দিয়ে পুতুলের মুখে চোখ, নাক আর ঠোঁট রচনা করুন। পুতুলের চোখের মণি বানাতে হবে, যথাস্থানে ছুঁচ-সুতো দিয়ে ছোট-সাইজের দুটি রঙীণ-বোতাম সেলাই করে।

এবারে পুতুলের মাথার উপরে সুদৃশ্য-কেশগুচ্ছ রচনার পালা। কেশগুচ্ছ-রচনার জন্য প্রয়োজনমতো রঙের পশমের সুতো বেছে নিতে হবে এবং কার্পেট-বোনার মোটা ছুঁচের সাহায্যে সেগুলিকে পাকাপোক্তভাবে একের পর এক সেলাই করে দিন পুতুলের শিয়রে। তাহলেই পুরোনো মোজা দিয়ে বিচিত্র-অপরূপ পুতুল-রচনার কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় এমনি-ধরণের কাপড়ের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি অভিনব-সামগ্রী রচনার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

পশমের পুলোভার

হিরণ্ময়ী দেবী

শীত এসে গেল…ঘরে-ঘরে মেয়েরা সকলেই এখন নানা ধরণের সৌখিন-সুন্দর পশমের পোষাক-পরিচ্ছদ বুনতে সুরু করেছেন। তাই শীতের সময় পুরুষদের নিত্য-ব্যবহার্যের উপযোগী সৌখিন-সুন্দর এবং সহজেই নিজের হাতে বুনে তৈরী করা যাবে, এমনি-ধরণের একটি পশমী-পুলোভারের 'প্যাটার্নের' বিষয়ে আলোচনা করছি।

এ 'প্যাটার্নের' পশমী-পুলোভারটি দেখতে কেমন হবে, উপরের ছবিটি থেকে তার মোটামুটি আভাস পাবেন। এই ধরণের প্রমাণ-সাইজ পুলোভার বুনতে হলে দরকার—৭ আউন্স ভালো '৪-প্লাই' পশমের সুতো (4-Ply Wool) একজোড়া ৯ নম্বর, আর একজোড়া ১১ নম্বর পশম-বোনার মজবুত কাঁটা (1 pair No. 9 and 1 pair No. 11 knitting-needles), একটি মাপ-নেবার ফিতা (measuring-tape) এবং একটি ভালো কাঁচি। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলে রাখি, এ পুলোভার বোনার সময় ব্যক্তিগত রুচি ও সুবিধা অনুসারে, আলোচ্য-প্যাটার্নটি সরু অথবা মোটা ধরণের পশম আর বোনবার কাঁটার সাহায্যে রচনা করা যাবে। এছাড়া আরো একটি দরকারী কথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেটি এই প্যাটার্ন-অনুসারে পশম আর কাঁটা

দিয়ে পুলোভার বোনবার পদ্ধতি-বর্ণনাকালে বিশেষ কাজে লাগবে। অর্থাৎ '*' এই সাঙ্কেতিক-চিহ্ন যেখানে বসানো থাকবে, বোনবার সময় এ-চিহ্ন যে-অংশ থেকে সুরু হয়ে যে-অংশে শেষ হবে, সেটুকু স্থান 'Repeat' বা 'পুনরাবৃত্তি করবেন। পুলোভার বোনার পদ্ধতি বোঝানোর সুবিধার জন্যই যে এ চিহ্নটি ব্যবহার করা হলো, সে কথা বলাই বাহুল্য!

যাই হোক, উপরোক্ত সামগ্রীগুলি সংগ্রহ হবার পর, পশম আর কাঁটার সাহায্যে যে পদ্ধতিতে পুলোভারটি আগাগোড়া বুনতে হবে, আপাততঃ তার পরিচয় দিই।

গোড়াতেই পুলোভারের সামনের অর্থাৎ পোষাকের বুকের দিকটি বুনে ফেলতে হবে। পুলোভারের সম্মুখভাগ, অর্থাৎ বুকের দিকে বোনবার সময়, প্রথমে ১১ নম্বর কাঁটার সাহায্যে ১১০ ঘর তুলে, ১ ঘর সোজা ১ ঘর উল্টো, এই নিয়মে 'Rib' বা দু'দিকের 'পঞ্জরের' কিনারা রচনা করবেন। দু'দিকের এই 'কিনারা' বা 'Rib' যেন পাঁচ আঙুল লম্বা হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এবারে ২ ঘর সোজা * ১টি ঘরকে দু'বার বুনে একটি

ঘর বাড়াতে হবে—১ সোজা ১ উল্টো হিসাবে তিনবার; সাঙ্কেতিক-চিহ্ন থেকে শেষের ১০ ঘর অবধি 'Repeat' বা 'পুনরাবৃত্তি' করবেন—শেষের ১০ ঘর, ১ সোজা ১ উল্টো হিসাবে তিনবার; পরবর্ত্তী ঘরটিকে বাড়িয়ে দু'টি ঘর রচনা করবেন—১ উল্টো ১ সোজা হিসাবে বুনে গিয়ে। তাহলেই দেখবেন—কাঁটায় ১২৬ ঘর রয়েছে।

এবারে প্যাটার্নটি বুনতে সুরু করুন। প্যাটার্ন বোনার সময়, ১০ নম্বর কাঁটা দিয়ে কাজ করতে হবে। সে কাজের পদ্ধতি হলো :—

প্রথম কাঁটায় : ১৫ সোজা ৮ সোজা—(২ উল্টো, ৪ উল্টো, হিসাবে) দু'বার, ১ উল্টো, শেষের ২৩ ঘর সোজা —এমনি নিয়মে বুনবেন।

দ্বিতীয় কাঁটায় : ১ সোজা * ৮ উল্টো—(২ সোজা, ৪ উল্টো) দু'বার, ২ সোজা *। প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন যে উপরোক্ত ৮ উল্টোর গোড়াতেই এবং ২ সোজার শেষে সাঙ্কেতিক-চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। অর্থাৎ, এ চিহ্নের অর্থ হলো—এবারে গোড়ার চিহ্ন থেকে শেষের চিহ্নটি (৮ উল্টো থেকে ২ সোজা) পর্য্যন্ত অংশ 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করতে হবে। এমনিভাবে কাজ করে এসে শেষের ২৩ ঘর উল্টো বুনতে হবে।

এ কাজের পর, আবার উপরোক্ত নিয়মে প্রথম আর দ্বিতীয় কাঁটায় যে পদ্ধতিতে ঘর তুলে এতক্ষণ বুনে এসেছেন, তারই 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করবেন।

* * এবারে পঞ্চম কাঁটায় বুনুন—১৫ সোজা, * সোজা ২ উল্টো…বুনে অন্য আরেকটি কাঁটায় পরবর্ত্তী ঘর দুটিকে রেখে, কাঁটাটিকে পিছনে সরিয়ে রেখে দিন। অতঃপর ২ সোজা বুনে তুলে, পিছনে ফেলে-রাখা অন্য কাঁটার ঐ ঘর দুটিকে হাতের কাঁটায় উঠিয়ে নিয়ে ২ সোজা বুনুন। বুনন-শিল্পের ভাষায় এমনিভাবে চারটি ঘরকে উল্টোপাল্টা করার পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে—'পিছনে মোড়-ফেলা'। এমনিভাবে অন্য একটি স্বতন্ত্র-কাঁটায় ২ উল্টো নিয়মে-তোলা ঘর দুটিকে আলাদা সরিয়ে রাখুন। তারপর ঐ স্বতন্ত্র-কাঁটাটিকে সামনের দিকে রেখে পরবর্ত্তী ঘর দুটিকে সোজা বুনুন। এবারে স্বতন্ত্র-কাঁটায় সরিয়ে-রাখা ঘর দুটিকে পুনরায় বাঁ-হাতের কাঁটায় তুলে নিয়ে ঐ দুটি ঘর সোজা বুনে যান। এমনিভাবে সামনের দিকে চারটি ঘর আলাদা সরিয়ে-রাখার পদ্ধতির নাম—'সামনে মোড়-ফেলা'। এবারে বুনুন—২ উল্টো, সাঙ্কেতিক-চিহ্নের সুরু থেকে শেষ অবধি অংশটুকু 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করে…তারপর শেষের ২৩ ঘর সোজা রচনা করুন।

এ কাজের পর, উপরোক্ত নিয়মানুসারে দ্বিতীয় কাঁটার লাইনটি একবার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কাঁটার লাইন দু'বার 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করে বুনে যান। এমনিভাবে কাজ করে গেলেই দেখবেন, মোট দশটি লাইন বোনা-হয়েছে।

একাদশ লাইনটি বুনতে হবে—১৫ সোজা * ৮ সোজা, ২ উল্টো সামনে-মোড়-ফেলে, ২উল্টো পিছনে-মোড়-ফেলে, ২ উল্টো * প্রথম থেকে শেষ সাঙ্কেতিক-চিহ্ন অবধি অংশ 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করে শেষের ২৩ ঘর পর্য্যন্ত, শেষ ২৩ ঘর সোজা *।

তারপর উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে আবার দ্বিতীয় কাঁটার লাইনটি একবার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কাঁটার লাইনটি দু'বার 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করবেন। এবারে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম কাঁটার * * সাঙ্কেতিক-চিহ্ন থেকে যে অংশের শেষ অবধি এমনি নিশানা রয়েছে, সেই অংশটুকু 'Repeat' বা 'পুনরানুবৃত্তি' করুন। এভাবে বোনার পর, আবার একবার উপরোক্ত-নিয়মে পঞ্চম কাঁটার লাইনটি বুনে যান। তারপর পুনরায় একবার পূর্ব্বোক্ত-পদ্ধতিতে দ্বিতীয় কাঁটার লাইনটি বুনে গিয়ে পুলোভারের বগল ও হাতার ছাঁদ রচনার কাজে হাত দেবেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের দুটি বিচিত্র-উপাদেয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা। দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা সাধারণতঃ নিরামিষভোজী, তাই অনেকের ধারণা—উত্তরাঞ্চলের খাবারদাবারের তুলনায় ওদেশী খাবার নাকি অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরহীন আর একঘেয়ে। এমন ধারণা থাকা কিন্তু ঠিক নয়। দক্ষিণ-ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা আমিষভোজী—বিশেষতঃ, যাঁরা সাগর-উপকূলে বসবাস করেন, তাঁদের খাদ্য-তালিকায় মাছ, মাংস এবং ডিমের এমন অনেক সুস্বাদু-মুখরোচক খাবার রান্নার রেওয়াজ আছে, যেগুলি আজ উত্তর-ভারতীয়দের কাছেও রীতিমত তারিফ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, এবারে দক্ষিণ-ভারতের পরম-উপাদেয় যে দুটি খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করছি, তার মধ্যে প্রথমটি হলো—ওদেশের বিশেষ এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী, এবং দ্বিতীয়টি হলো—মাছ দিয়ে রান্না-করা অভিনব এক-ধরণের আমিষ-খাদ্য।

মূলোর ফুগাৎ ঃ

দক্ষিণ-ভারতের বিচিত্র-মুখরোচক এই নিরামিষ-তরকারী রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—গোটা তিন চার ভালো শাদা-মূলো, তিন-চারটি কাঁচা লঙ্কা, ½ অর্থাৎ শিকি খানা নারিকেল, অল্প কিছু ধনেশাক, চায়ের চামচের আধ-চামচ পরিমাণ মাসকলাইয়ের ডাল, বড় চামচের এক চামচ পাতি-লেবুর রস, চায়ের চামচের আধ-চামচ পরিমাণ সরষে, প্রয়োজনমতো পরিমাণে অল্প একটু হুনের গুঁড়ো, আর বড় চামচের দু'চামচ পরিমাণ ঘি। এই ফর্দ্দ-অনুসারে অন্ততপক্ষে তিনচারজন লোকের আহারোপযোগী তরকারী রাঁন্না করা যাবে। এর চেয়ে বেশী লোকের আহারের জন্য ব্যবস্থা করতে হলে উপরোক্ত হিসাব-অনুসারে উপকরণগুলির পরিমাণ যে প্রয়োজনমতো বাড়িয়ে দেওয়া দরকার—সে কথা বলাই বাহুল্য।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, মূলো, নারিকেল, কাঁচা লঙ্কা আর ধনে শাক পরিস্কার জলে ভালো করে ধুয়ে নিন। রান্নার শব্জীগুলি ধোয়া হলে, ভাল একটি 'কুরুণীর' সাহায্যে মূলো আর নারিকেল আলাদা-আলাদাভাবে কুরে ফেলুন এবং কাঁচা লঙ্কাগুলিকে বেশ মিহি-ধরণে টুকরো-টুকরো করে কুটে নিন। এ কাজের পর, বঁটি কিম্বা ছুরির সাহায্যে ধনেশাকের গোছাকে মোটা-ছাঁদে কেটে রাখুন। তাহলেই রান্নার কুটনো-কোটার পর্ব্ব চুকবে।

এবারে তরকারী-রান্নার পালা সুরু করুন। গোড়াতেই উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে ঘি ঢেলে, গরম-ঘিয়ে কুচানো-ধনেশাক, লঙ্কা, মাসকলাইয়ের ডাল আর সরষে ছেড়ে, প্রায় মিনিটপাঁচেক কাল এগুলি ভালো করে ভেজে নিন। এবারে রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে নুন আর মিহি-ধরণে কোরা মূলো ছেড়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ উনানের মৃদু-আঁচে রেখে তরকারীটি রান্না করুন। এভাবে রাঁধবার সময়, মাঝেমাঝে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে রন্ধন-পাত্রের ভিতরকার তরকারীটিকে নেড়েচেড়ে দেবেন, নাহলে রান্নাটি পুড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাজ করার পর, তরকারীটি যখন বেশ রান্না হয়ে আসবে, তখন রন্ধন-পাত্রে নারিকেল-কোরা আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'মূলোর ফুগাৎ' নিরামিষ-তরকারী রান্নার কাজ শেষ হবে।

মাছের মোলী ঃ

এবারে বলি—মাছ দিয়ে রান্না করা ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের অভিনব-সুস্বাদু আমিষ-খাবারের কথা। অন্তত পক্ষে চার-পাঁচজনের আহারের উপযোগী এ খাবার রান্নার জন্য উপকরণ চাই—আধসের ভালো মাছ, আধখানা নারিকেল, গোটাদুয়েক বড় টোম্যাটো, তিন-চারটি কাঁচা লঙ্কা, এক আঁটি ধনেশাক, গোটাদুয়েক বড় পেঁয়াজ, তিন কোয়া

রসুন, অল্প কয়েকটি আদার টুকরো, চার-পাঁচটি কাজু-বাদাম, চায়ের চামচের এক চামচ হলুদ, চায়ের চামচের দেড় চামচ পরিমাণ ধনে, আধ চায়ের চামচ পরিমাণে মেথী, আন্দাজমতো খানিকটা নুন, আর বড় চামচের দু' চামচ ঘি।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, মাছটিকে আগাগোড়া কুটে নিয়ে, পরিস্কার জলে ধুয়ে সাফ্ করে রাখুন। এবারে-বঁটি বা ছুরির সাহায্যে পেঁয়াজগুলি মিহিভাবে কেটে ফেলুন এবং টোম্যাটোগুলিকে ছাড়িয়ে ভালোভাবে চটকে 'মণ্ডের' (Pulp) মতো করে নিন। তারপর কাজুবাদাম, মেথী, আদা, লঙ্কা রসুন, হলুদ, ধনে, নারিকেলের টুকরো আর ধনেশাক একত্রে বাটনা-বাটা শীলে বেটে 'লেইয়ের' (Paste) মতো করে নিয়ে, তার সঙ্গে চায়ের পেয়ালার দু'পেয়ালা পরিমাণ ঈষৎ-গরম জল মিশিয়ে থক্-থকে এই বিচিত্র 'মিশ্রণটিকে' (Mixture) প্রায় আধ ঘণ্টা কাল সযত্নে অন্য একটি পরিস্কার পাত্রের ভিতর রেখে দিন।

এমনিভাবে উদ্যোগ-পর্ব্বের কাজ সেরে খাবারটি রান্নার ব্যবস্থা করুন। রান্নার সময়, প্রথমেই উনানের আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে ঘি দিয়ে পেঁয়াজের কুচোগুলিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। গরম-ঘিয়ে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচোর রঙ বাদামী হয়ে উঠলেই, রন্ধন-পাত্রে মাছের টুকরো ছেড়ে দিয়ে অন্ততপক্ষে মিনিট পাঁচেককাল সেগুলিকে বেশ ভালো করে ভেজে নিন। এইভাবে পেঁয়াজ-কুচো ভাজার সময় রান্নাটিকে রসনা-তৃপ্তিকর করে তোলার উদ্দেশ্যে, পূর্ব্বোক্ত-উপকরণের সঙ্গে কয়েকটি তেজপাতা আর দু' একটি কাঁচা-লঙ্কা চেরাই করেও রন্ধন-পাত্রে মিশিয়ে দিতে পারেন। তবে এটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রন্ধন-কারিনীর এবং ভোক্তাদের ব্যক্তিগত-রুচির উপর। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নির্দ্দিষ্ট কোনো মতামত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক, মাছের টুকরোগুলি ভালোভাবে ভাজা হলে, রন্ধন-পাত্রে টোম্যাটোর 'মণ্ড' (Tomato Paste) আর রস (Tomato-juice) মিশিয়ে দিয়ে খাবারটিকে হাতা কিম্বা খুন্তীর সাহায্যে মাঝেমাঝে নাড়াচাড়া করে উনানের আঁচে রেখে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। তাহলেই এ রান্নার পর্ব্ব চুকবে। অতঃপর উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্র নামিয়ে রেখে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশণের ব্যবস্থা করুন। এই হলো দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় অভিনব-সুস্বাদু 'মাছের মোলী' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

পরের সংখ্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় এবং বিচিত্র-উপাদেয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর হদিশ দেবার বাসনা রইলো।
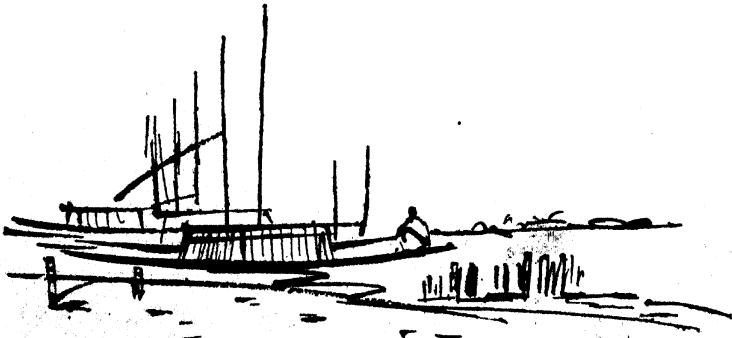
মেষলগ্ন

(রবি, চন্দ্র ও মঙ্গলের দ্বাদশভাবে অবস্থানভেদে ফল—ভৃগুসংহিতানুসারে)

উপাধ্যায়

মেষলগ্ন জাতকের তনুভাবে রবি থাকলে জাতক শিক্ষিত, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, ধূর্ত এবং পেশা অবলম্বন সম্পর্কে বিশেষ উদ্যম ও চেষ্টার অভাব। জাতকের জায়াভাব দুর্ব্বল হয়। দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। দ্বিতীয়ভাবে রবি থাক্‌লে বিদ্যার্জ্জন সহজসাধ্য হয় না, মানসিক চাঞ্চল্য ঘটে। গতানুগতিকতার মাধ্যমে অর্থোপার্জ্জন। সন্তান ভাব সুখের হয় না। ধন ভাব আশাপ্রদ নয়। গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে সন্তুষ্ট আর সেইভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তৃতীয় ভাবে বুদ্ধি বৃত্তির পক্ষে রবির অবস্থিতি শুভপ্রদ। বিদ্যা লাভ। সন্তান লাভ। বক্তৃতাকুশলী, উৎসাহী সাহসী এবং ভাগ্যের উন্নতি করে জাতক সুখী হয়। চতুর্থ ভাবে রবির অবস্থিতি থাকলে সহজেই বিদ্যা লাভ, সন্তান লাভ ও মায়ের গুণগুলি লাভ হয়। কথাবার্ত্তা মিষ্ট। ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। জ্ঞান ও বিদ্যার্জ্জনের মাধ্যমে উত্তম উপার্জ্জনের আনুকুল্যে ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। পিতৃবিষয়ে থাকে ঔদাসীন্য, রাষ্ট্রসমাজের প্রতি থাকে বিদ্বেষ। পঞ্চমভাবে রবি থাকলে উত্তম বিদ্যা লাভ। বক্তৃতা চিত্তাকর্ষক হয়। উত্তম বুদ্ধি বৃত্তি। সুসন্তান। আশানুরূপ আয় হয় না। নিজের সম্বন্ধে উচ্চধারণা আর অপরকে হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়। ষষ্ঠে রবির অবস্থান বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে আশাপ্রদ নয়, বুদ্ধিবৃত্তির দৌর্ব্বল্য, শত্রুজয়, বহু বাধাবিপত্তি জীবনে অতিক্রম করতে হয়। সপ্তম স্থানে রবি স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়ে জাতককে সুখী করে না, বিদ্যার্জ্জনে বাধা, পারিবারিক জীবন বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ, চাকুরী বা পেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে কষ্ট ভোগ। অষ্টম স্থানে রবি অবস্থান করলে সন্তান হানি বা সন্তানজনিত দুঃখ, অধ্যাত্মজ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা, কথাবার্ত্তায় গোপন ভাব। অর্থের দিকে হিংসালোলুপ দৃষ্টি, পারিবারিক শত্রুতা, বক্র বুদ্ধি, ক্রুরভাষী হয়। নবমস্থানে রবি থাকলে বিদ্যার্জ্জনে কৃতিত্ব প্রকাশ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সুনাম, ধর্ম্মজ্ঞান, সুপুত্র লাভ ও সুখী, দূরদর্শী, উৎসাহী, ভ্রাতা ভগ্নীর আদর আপ্যায়ন লাভ হয়। দশমে রবি থাক্‌লে বালে সুলভ চপলতা ও মনোবৃত্তি, কর্ম্মোন্নতিতে বাধা প্রাপ্তি, পিতৃ বিষয়ে অসুখী, সামাজিক ও গভর্ণমেণ্টের কাজে কষ্টভোগ, মাতৃভক্তি প্রকাশ পায়, গৃহ ভূসম্পত্তি প্রভৃতি লাভ করে সুখী হয়। একাদশে রবি অবস্থান করলে বিদ্যোপার্জ্জনে ঔদাসীন্য, সন্তানদের সাহায্য পেয়েও অসন্তুষ্ট, বুদ্ধি বলে অর্থোপার্জ্জন, কটুক্তির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি, সক্রিয় মন। মতলববাজ। স্বার্থান্ধ। দ্বাদশে রবি থাকলে বিদ্যাভাব ভালো হয় না। দুর্ব্বলচক্ষু, অপরিমিত ব্যয়ী। সন্তানভাব দুর্ব্বল। কথাবার্ত্তা সোজাভাবে বলে না, মানসিক দুঃখভোগী, শত্রুহন্তা, দুঃখ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম।

মেষলগ্ন জাতকের তনুভাবে চন্দ্র থাকলে জাতক সুখী হয়, পার্থিব সম্পদ লাভ করে, মাতৃসুখী হয়, ভূসম্পত্তি লাভ ঘটে। সুদর্শন হয়। দাম্পত্যসুখী ও যৌবনসম্ভোগে আনন্দ পায়। কর্ম্মক্ষেত্রে মর্য্যাদালাভ করে, স্নেহ

প্রবণতার দরুণ পারিবারিক জীবন সুখের হয়। বিলাসী মানুষ। দ্বিতীয়ভাবে চন্দ্র থাকলে ধনভাব উত্তম হয়। গৃহ-ভূসম্পত্তি বিশিষ্ট, পরিবার বৃদ্ধি, অর্থ স্বচ্ছন্দতায় সন্তোষ লাভ। তৃতীয়ভাবে চন্দ্র থাকলে ভ্রাতাভগ্নী সুখ, মাতৃপ্রভাব, নিজের চেষ্টায় ভাগ্যোন্নতি, খ্যাতিলাভ, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভূসম্পত্তি জনিত আত্মতৃপ্তি, উৎসাহ লাভ। চতুর্থে চন্দ্র মাতৃসুখ, সম্পত্তি দায়ক, মাতৃভক্তি কিন্তু পিতার প্রতি ঔদাসীন্য, ধীরে ধীরে সম্মানবৃদ্ধি, বিলাস প্রবণতা, রাষ্ট্র সমাজকর্ম্মে অনুরাগ। চন্দ্র পঞ্চমভাবে থাকলে বুদ্ধি বৃত্তির প্রাখর্য্য ও তজ্জনিত সুখ, সন্তানের সুখ স্বচ্ছন্দতা গৃহভূসম্পত্তিলাভ, বিদ্যার্জ্জনে পারদর্শিতা, মিষ্টভাষী, মাতৃভক্ত, মায়ের সদ্‌গুণগুলির অধিকারী, গভীর চিন্তা মগ্ন হয়। চন্দ্র ষষ্ঠভাবে থাকলে মায়ের সঙ্গে অসদ্ভাব, পারিবারিক অশান্তি, গৃহসম্পত্তিভাবের দুর্ব্বলতা, মানসিক কষ্টভোগ, অপরিমিতব্যয়ী, মাতামহের আনুকূল্য লাভ। সপ্তমভাবে চন্দ্র থাকলে পারিবারিক আনন্দ লাভ, সুন্দরী শান্ত নম্র স্ত্রী লাভ, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সুখস্বচ্ছন্দতা, মাতৃপ্রভাবে উন্নতি ও সম্মান লাভ, স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন, পার্থিব বিষয়ে দক্ষতা লাভ। অষ্টমভাবে চন্দ্র থাকলে মাতৃবিয়োগ, মাতৃসম্পর্কেও অশান্তিভোগ, গৃহসম্পত্তিহানি, মানসিক চাঞ্চল্য, দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতি, উদর ঘটিত ব্যাধি ও প্রদাহ, শরীরে আঘাত প্রাপ্তি, শ্লেষা ঘটিত ব্যাধি, আয়ুভাবের দুর্ব্বলতা, ধনবৃদ্ধির জন্য বহু দুঃখকষ্ট ভোগ। নবমে চন্দ্র থাকলে উত্তমভাগ্য, মাতৃপ্রভাবে ভাগ্যোন্নতি লাভ, গৃহ সম্পত্তি সুখ, উত্তম ভাগ্যজনিত মানসিক স্বচ্ছন্দতা, ধর্ম্ম-প্রবণতা, ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহাদর লাভ, দৈবের আনুকূল্যে সাংসারিক উন্নতি। দশমে চন্দ্র থাকলে মাতৃশক্তি লাভ। যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। সৎকার্য্যে অনুরাগ, ব্যবসায়ে সাফল্য। বিলাস ব্যসন সম্ভোগ। উচ্চ চিন্তাশীল। একাদশে চন্দ্র থাকলে জাতকের আয়বৃদ্ধি জনিত আত্ম প্রসাদ লাভ। বিদ্যার্জ্জন ভালোই হয়। নানা প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। দ্বাদশ ভাবে চন্দ্র থাকলে আমোদ প্রমোদ ও বিলাসব্যসনের জন্য ব্যয়েচ্ছু, অপরিমিত ব্যয়, মাতৃহানি, স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে অস্বোয়াস্তিবোধ, গৃহসুখসম্পত্তির দৈন্য, মনশ্চাঞ্চল্য ও অর্থের অনটন ভোগ।

মেষলগ্নে জাতকের তনুভাবে মঙ্গলের অবস্থিতি শারীরিক গঠনে যথেষ্ট সহায়ক ও শৌর্য্য বীর্য্যপ্রদ। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ। তমোগুণ সম্পন্ন। মাতৃভাবের দুর্ব্বলতা। জন্মভূমির প্রতি আসক্তির অভাব। দীর্ঘ জীবন লাভ। ভার্য্যা সুখের হানি। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। চঞ্চলতা। দ্বিতীয়ভাবে মঙ্গল থাকলে সর্ব্বদাই অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ততা, সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে ব্যয়ের প্রবণতা, ধন [illegible] প্রতিকূল গতি, অসদুপায়ে লাভ, সন্তানের পক্ষে [illegible] ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা ভাগ্যোন্নতি। তৃতী[illegible] মঙ্গল থাকলে অত্যন্ত উৎসাহী ভ্রাতৃহানি, দীর্ঘজীবন লাভ, সরকারী ও সামাজিক কাজে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও নিজের বিদ্যাবুদ্ধিবলে উন্নতি, শত্রুজয়ী, পরিশ্রমের সহিত কর্ম্ম কুশলী, পিতৃভাব প্রীতিপ্রদ। চতুর্থ ভাবে মঙ্গল থাকলে বটে, মাতৃভাবের দুর্ব্বলতা, চঞ্চলতা, আয়ুবৃদ্ধি, পিতৃভাব উত্তম, যশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়, স্ত্রীভাব নৈরাশ্যজনক, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দৈনন্দিন কষ্ট ভোগ। পঞ্চম ভাবে মঙ্গল থাকলে জ্ঞানবৃদ্ধি দীর্ঘজীবন, মানসিক প্রচণ্ডতা, কথাবার্ত্তার রূঢ়তা, বিশেষ লাভবান হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অপরিমিত ব্যয়ী। ষষ্ঠ ভাবে মঙ্গল থাকলে জাতক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়। আধ্যাত্মিকতা লাভ ঘটে, শত্রুজয় ও সম্মান। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ব্যাধি প্রবণতা। দুঃখ কষ্টে অচঞ্চলতা। উত্তমভাবে কার্য্য সম্পাদনে অক্ষমতা, ভাগ্যোন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট সাহসী ও স্বার্থপর। সপ্তমভাবে মঙ্গল থাকলে কর্ম্মক্ষেত্রে কষ্টভোগ ও পরিশ্রম সাধ্য কর্ম্ম। জায়াসুখের অভাব। বিরাট ব্যবসায়ে উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে পারদর্শিতা, সমাজে সম্মানলাভ, রাষ্ট্রেও মর্য্যাদা লাভ। খ্যাতি সম্বন্ধে সজাগ। দীর্ঘজীবন। যৌন সম্ভোগে দুর্ব্বলতা। অষ্টমভাবে মঙ্গল থাকলে হাল্কা চেহারা, শারীরিক সৌন্দর্য্যের অভাব। চঞ্চলতা। ভ্রাতৃভাব দুর্ব্বল। বিখ্যাত হয়। নবমভাবে মঙ্গল থাকলে জীবন পূর্ণ ভাগ্যসুখ লাভ করে। মাতৃস্থানের ফলশুভ হয় না। ভূমি ও সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে অভাব। ভ্রাতৃ ভাব অশুভ। দশমভাবে মঙ্গল থাকলে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হেতু অত্যন্ত প্রভাব। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে মর্য্যাদা ও আধিপত্য লাভ। আত্মসম্মান ও দর্পস্ফীতি, সমাজে ও সরকারী দপ্তরে সম্মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি। নিজের মতে কার্য্য করে, স্বাধীনতা প্রিয় ও আত্মম্ভরি। মাতার প্রতি উদাসীন, পিতামাতাকে গ্রাহ্য করে না, বিদ্যা বুদ্ধির বড়াই করে আর উদ্ধত প্রকৃতির হয়। একাদশ ভাবে মঙ্গল থাকলে জাতক শারীরিক শক্তি সম্পন্ন হয়। প্রচুর আয় করে, ধন সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টির অভাব, সন্তান সুখী হয় না। দুঃখ কষ্ট জেনেও তা উপেক্ষা করে। শত্রুজয়ী। দ্বাদশে মঙ্গল থাকলে জাতক অপরিমিত ব্যয়ী হয়, কঠোর পরিশ্রম করে, অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ সচেষ্ট হয় ও সম্মান লাভ করে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

ভরণী জাত গণ অপেক্ষা অশ্বিনী ও কৃত্তিকা জাতগণের

ফল উত্তম। শারীরিক কষ্ট ভোগ। উদর গুহ্য প্রদেশ ও মূত্রাশয়ের রোগাধিকার। জ্বর প্রকোপ, স্বজন বন্ধু বিরোধ। ঘরে বাইরে অশান্তি ও মনোমালিন্য অর্থকৃচ্ছ্রতা, আয়ের পথ উন্মুক্ত সত্বেও বায়াধিক্য সমস্যা সঙ্কুল করবে। বন্ধুর জন্য ক্ষতি। প্রতারণা। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি অনুকুল নয়। চাকুরিজীবির কোন আশঙ্কার কারণ নেই, তবে উপরওয়ালার ভৎর্সনা ও অসন্তোষ জনিত মনোবেদনা ভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর অবস্থার তারতম্য নেই। প্রথমার্দ্ধ স্ত্রীলোকের অনুকুল, দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রতিকুল। প্রথমার্দ্ধে অবৈধ প্রণয় পর পুরুষের সান্নিধ্য, রোমান্স, পার্টি, পিক্‌নিক, অবাধ বিহার প্রভৃতি লাভ প্রদ ও আনন্দদায়ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এগুলি পরিত্যজ্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র চলন সই। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

বৃষরাশি

রোহিনী জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। কৃত্তিকা ও মৃগ শিরা জাত ব্যক্তির পক্ষে অপেক্ষা কৃত ভালো। নিজের স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়াই শুধু নয়, তার চেয়েও স্ত্রী পুত্রাদির শারীরিক কষ্ট ও ব্যাধি বেশী হওয়ায় বিব্রত হোতে হবে। উদরের গোলমাল অজীর্ণতা, আমাশয় প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক কলহ। আর্থিক অবস্থার বিশেষ অবনতি হবে না। জামিন হওয়া বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে কোন উল্লেখ যোগ্য পরিস্থিতি নেই, জমির কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। চাকুরিজীবির মিশ্রফল। প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ অশুভ। ব্যবসায়ীও বৃত্তি জীবির পক্ষে মাসটি ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে চল্‌বে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ উত্তম, শেষার্দ্ধ নৈরাশ্যজনক। প্রথমার্দ্ধে অবৈধ প্রণয়, রোমান্স, পরপুরুষের সংস্পর্শে আসা, পার্টি, ভোজ, ভ্রমণ ও বিহার, কোর্টসিপ প্রভৃতি অনুকূল, লাভ দায়ক ও সাফল্যব্যঞ্জক। শেষার্দ্ধে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি ও সর্ব্বকার্য্যে বাধা বিপত্তিজনিত কষ্ট দায়ক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা জাত ব্যক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আর্দ্রার পক্ষে মধ্যম। পুনর্ব্বসু জাত ব্যক্তির পক্ষে কষ্ট ভোগ। উদর ও বায়ু ঘটিত পীড়া। মনশ্চাঞ্চল্য। উদ্বিগ্নতার বৈচিত্র্য। উৎকণ্ঠা ও ভয়। মনোকষ্ট ও দুঃখ ভোগ। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। কলহ বিবাদ সামান্যই ঘট্‌বে। আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট ভোগ, অনাদায়ী টাকার জন্য উদ্বেগ। ব্যয়াধিক্য জনিত সমস্যা। ভূম্যধিকারী কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ ও শুভ। চাকুরি জীবির পক্ষে মন্দ, উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধ কিছু ভালো বলা যায়। বৃত্তিজীবি, ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়াদি, মনস্তাপ, উদ্বেগ ও আশাভঙ্গ। শেষার্দ্ধ আনন্দপ্রদ, বিলাসব্যসন, অবাধ বিহার, অবৈধ প্রণয়, রোমান্স, কোর্টসিপ প্রভৃতি উত্তম ফল প্রদান করবে। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা লাভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

পুষ্যা জাত গণের পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। অশ্লেষাজাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। পিত্ত প্রকোপ ও শারীরিক উত্তাপবৃদ্ধি। পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা, কলহ ও অনৈক্য। আর্থিক দুর্ভোগ। পাওনাদারের চাপ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু বাধা-বিপত্তি। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে মাসটী নৈরাশ্য জনক। স্ত্রীলোকের পক্ষেই বিশেষ অনুকূল। গৃহে নব জাতকের আবির্ভাব। অলঙ্কার, বসন ভূষণ, উপঢৌকন প্রাপ্তি। অবৈধ প্রণয়, রোমান্স ও অবাধ বিহারে আশাতীত সাফল্য ও লাভ। শিক্ষিতা মহিলার নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন স্পৃহা ও জ্ঞানার্জ্জন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

সিংহ রাশি

উত্তর ফল্গুনী জাত অপেক্ষা মঘা জাত ব্যক্তির ফল ভালো। পূর্ব্বফল্গুনী জাত অপেক্ষা উত্তরফল্গুনী জাত ব্যক্তির ফল ভালো। স্বাস্থ্যের অবনতি, পিত্ত প্রকোপ চক্ষু পীড়া, রক্তস্রাব, পারিবারিক অশান্তি। ঘরে বাইরে স্বজন বন্ধু বিরোধ! আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। আয়বৃদ্ধি, মামলা মোকর্দ্দমা বর্জ্জনীয়, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ অনুকূল, শেষার্দ্ধ প্রতিকূল, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। স্ত্রীলোকের স্বার্থের অনুকূল মাসের প্রথমার্দ্ধ। পরীক্ষার্থী চাকুরি অন্বেষী প্রভৃতি নারীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ সাফল্য মণ্ডিত হবে। এই সময়ের মধ্যে পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র উত্তম হবে। অবৈধ প্রণয়, রোমান্স ও পরপুরুষের সান্নিধ্য দ্বিতীয়ার্দ্ধে বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ ব্যঞ্জক।

কন্যা রাশি

উত্তর ফল্গুনী ও চিত্রা জাতগণের পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, সন্তানের পীড়া পারিবারিক ঐক্য ও শান্তি। ঘরের বাইরে স্বজন বন্ধু বর্গের সহিত কলহ ও মনান্তর। এবং তজ্জনিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব। আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূল, লাভ, নব প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকার ও কৃষি জীবির পক্ষে মাসটী এক ভাবেই যাবে। চাকুরি জীবির

পক্ষে কিঞ্চিৎ প্রতিকূল। উপর ওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে একই প্রকার যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ ভালো বলা যায় না, নৈরাশ্য জনক ও অপ্রীতিকর পরিবেশ, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী বিশেষ ভালো যাবে। এসময়ে পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রসার প্রতিপত্তি ও প্রীতিলাভ। অবৈধ প্রণয়, রোমান্স, কোর্টসিপ প্রভৃতিতে সাফল্য। শিল্পকলা সঙ্গীত ছায়াছবি ও মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীর যশ প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম। স্বাতী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। প্রথমার্দ্ধে কিঞ্চিৎ শারীরিক অসুস্থতা। রক্তের চাপবৃদ্ধি, উদরশূন্যতা শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট প্রভৃতি সম্ভব। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনেকটা ভালো। কিছু পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। ঘরের বাইরে স্বজন বন্ধুর জন্য কষ্টভোগ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, শস্য ক্ষতি, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালোমন্দ মিশ্রিত। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে একই ভাব ও সন্তোষ জনক নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, উত্তম বন্ধুলাভ, অবৈধ প্রণয়, কোর্টসিপ, রোমান্স প্রভৃতির পক্ষে অনুকূল। পারবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র সর্ব্বোতোভাবে স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষর্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা জাতগণের পক্ষে উত্তম। জ্যেষ্ঠা জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। বিশাখা জাতগণের পক্ষে মধ্যম, স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ভ্রমণে দুর্ঘটনা, ধারালো জিনিষে আঘাত প্রাপ্তি। পুরাতন রোগীর জ্বর, উদরের গোলমাল, শ্বাস প্রশ্বাসের পীড়া এবং রক্তের চাপবৃদ্ধি। পারিবারিক কলহ, ঘরের বাইরে স্বজন বিরোধ, আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূল নয়। অর্থক্ষতি, ভ্রমণের সময় প্রতারণার মাধ্যমে অর্থনাশ। অপরিমিত ব্যয়, শস্যক্ষতি, জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গোল যোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। চাকুরির স্থান সুবিধা জনক নয়, সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ ভালো, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী সুবিধা জনক নয়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটবে না। সন্তানবতী হবার যোগ। অবৈধ প্রণয়, কোটসিপ, বিবাহ ও পরপুরুষের সান্নিধ্য প্রভৃতি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

ধনু রাশি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম ফল। পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্তদুষ্টির জন্য পীড়া, শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি। বাড়ী বদলের সম্ভাবনা। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি। পারিবারিক শক্তি ও ঐক্য। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থের অনাটন। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। শস্য ক্ষতি। মামলা মোকর্দ্দমা। চাকুরির ক্ষেত্রে শেষার্দ্ধ কিঞ্চিৎ অশুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ নয়, শেষার্দ্ধ শুভ। পারিবারিকক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা এ মাসে বাঞ্ছনীয়। স্বজনবর্গ ভিন্ন অন্য লোকের সঙ্গে চলাফেরা অনুচিত। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মকর রাশি

শ্রবণাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠার পক্ষে শুভ। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। হজমের গোলমাল। পারিবারিক কলহ। স্বজন বিরোধ। আর্থিক ক্ষেত্র অতীব উত্তম। সহজভাবে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। পদোন্নতি, উন্নতির পথে বাধা বিপত্তির অপসারণ প্রভৃতি সম্ভব। উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। বিলাস বাসন, অলঙ্কারাদিও সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ। সামাজিক ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। তীর্থ ভ্রমণ, নানা স্থান পরিক্রমা, প্রভৃতি সম্ভব। চাকুরিজীবি মেয়েরা পুরুষ সহকর্মীদের অপেক্ষা নানা সুযোগ সুবিধা পাবে। ছায়া ছবি ও মঞ্চের অভিনেত্রীদের খ্যাতি প্রতিপত্তি অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে উত্তম, শতভিষার পক্ষে মধ্যম এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে। পারিবারিক ক্ষেত্র একভাবেই যাবে। নিকট বন্ধু বা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি। আর্থিক ক্ষেত্রের মিশ্রফল। প্রথমার্দ্ধে অর্থকৃচ্ছ্রতা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থ লাভ। ক্ষতি, অর্থের জন্য বিরোধ, প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির অবস্থা অপরিবর্ত্তনশীল। চাকুরির ক্ষেত্রে শেষার্দ্ধটি শুভ, প্রথমার্দ্ধে প্রতিকূল পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে। প্রথমার্দ্ধে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ার্দ্ধে আনন্দপ্রদ ভ্রমণ। শিল্পী ও অভিনেত্রীর পক্ষে শেষার্দ্ধ বিশেষ শুভ। অবৈধ প্রণয়, রোমান্স, কোর্টসিপ প্রভৃতি অনুকূল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং রেবতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রথমার্দ্ধে রক্তের চাপ বৃদ্ধি। সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি ও চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা। ঘরে বাইরে স্বজন বিরোধ। আর্থিক অবস্থা অপরিবর্ত্তনশীল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থের জন্য গোলযোগের সৃষ্টি হোতে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, প্রথমার্দ্ধটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাড়ীওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আয়বৃদ্ধি ও সন্তোষজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। প্রথমার্দ্ধই বিশেষ শুভ। সন্তানবতী। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র সন্তোষজনক। শেষার্দ্ধে গৃহস্থালী বিষয়ে নিজেকে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয় ও পরপুরুষের সংস্পর্শ বর্জ্জনীয়। কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

অর্থপ্রাপ্তি। অগ্রজ দ্বারা ক্ষতির যোগ, সাংসারিক অশান্তি, মাতার রোগভোগ। বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং পুত্রের বিবাহোৎসব। কর্ম্মস্থলে বাধার মধ্য হোতে উন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। ব্যয়বাহুল্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃষ লগ্ন

ধনাগম যোগ, দেশভ্রমণ, কর্ম্মোন্নতি ও আর্থিকোন্নতি, বন্ধুভাব শুভ, তীর্থ দর্শন, শুভ কার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি, গুরুজন হানি, মানসিক উদ্বেগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন লগ্ন

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না, সাময়িক ঋণযোগ, সহোদর ভাব শুভ। নানাপ্রকার অশান্তি, ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মোন্নতিযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কট লগ্ন

স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ, সাধারণ উন্নতি, আকস্মিক বিপদ, মোকর্দ্দমার সৃষ্টি, চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতির আশা, দাম্পত্যপ্রণয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন

মিত্র লাভ। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। গুপ্ত শত্রুর বৃদ্ধিযোগ। অর্থ ব্যয়। গৃহ নির্ম্মাণ। শারীরিক আঘাত। দেশ ভ্রমণ। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কন্যালগ্ন—

আর্থিকোন্নতি। সহোদরের বিশেষ পীড়া। ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা। সন্তানের ক্ষতি। স্ত্রীলোকের প্রণয় ভঙ্গ যোগ। গর্ভবতী নারীর মৃত বৎসা দোষ। নারীর পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ ব্যঞ্জক।

তুলা লগ্ন—

পিতার অশান্তি, কর্ম্মস্থলে গোলযোগ, গবেষণায় উন্নতি, ধনভাবের ফল অশুভ, বিদেশ গমন, দাঁতের পীড়া, রক্তঘটিত পীড়া, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক লগ্ন

সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা ও বিদ্যালাভে বিঘ্ন, দাম্পত্যপ্রণয়, চিকিৎসকের সুনাম, অনুজের রোগভোগ, ধনভাব মধ্যম, ব্যয়বৃদ্ধি ও ঋণযোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

ধনুলগ্ন—

স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মোন্নতিতে বাধা, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট, শরীরে আঘাত প্রাপ্তি, স্ত্রীর স্বাস্থ্য মন্দ নয়, কন্যাসন্তানের বিবাহ, অর্থাগমযোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকরলগ্ন—

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বায়ুঘটিত পীড়া, শারীরিক অসুস্থতার জন্য ধনক্ষয়, মানসিক অশান্তি, সাময়িক ঋণযোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি, চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা। ধনাগমযোগ। সন্তানভাব শুভ। ভাগ্য বা ধর্ম্মোন্নতি যোগ। পিতার স্বাস্থ্য হানি। বিদেশ ভ্রমণ। কন্যা বা পুত্রসন্তানের বিবাহ। ব্যবসায়ে ক্ষতি। শত্রু দ্বারা অর্থ হানি। গৃহে অশান্তি। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

মীনলগ্ন—

পাকযন্ত্রের পীড়া। আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তি। অর্থাগমের পরিমাণ বৃদ্ধি। সম্বন্ধ লাভ। মামার জীবন সংশয় পীড়া। পুত্রকন্যার বিবাহ বা বিবাহ আলোচনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো। ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন সন্তানের উদ্বেগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সুবর্ণসুযোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা ঃ

সম্প্রতি পার্থে (পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া) ১৯৬২ সালের বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা শেষ হল। মূল প্রতিযোগিতার খেলায় চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হয়নি। ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স এবং অষ্ট্রেলিয়ার বব্ মার্শাল উভয়েই মোট ছ'টা খেলার মধ্যে পাঁচটা খেলায় জয়লাভ ক'রে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেন। ফলে এই দু'জনকে নিষ্পত্তিমূলক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। মূল প্রতিযোগিতায় উইলসন জোন্স ১৪২১—১৮০৮ পয়েণ্টে অষ্ট্রেলিয়ার টম ক্লিয়ারির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং বব্ মার্শাল পরাজিত হ'ন উইলসন জোন্সের কাছে ১৪৮৮—১৬৫৬ পয়েণ্টে।

নিষ্পত্তিমূলক খেলায় বব্ মার্শাল ৩৬২৩—২৮৯১ পয়েণ্ট উইলসন জোন্সকে পরাজিত ক'রে চতুর্থবার বিশ্ব খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন। মার্শাল ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫১ সালে বিশ্ব খেতাব পেয়েছিলেন। নিষ্পত্তিমূলক খেলার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত উইলসন জোন্স অগ্রগামী ছিলেন। তখন জোন্সের পয়েণ্ট ১৫৭৩ এবং মার্শালের পয়েণ্ট ১৪২৮। তাছাড়া জোন্সের সর্ব্বাধিক ব্রেক ৪৮৯, মার্শালের ২৩৪। খেলার তৃতীয় পর্য্যায় থেকে মার্শাল অগ্রগামী হ'ন।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাধিক ব্রেকের রেকর্ড (৩১৫) স্থাপন করার জন্য বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন অষ্ট্রেলিয়ার টম ক্লিয়ারি। তিনি এই রেকর্ড করেন উইলসন জোন্সের বিপক্ষে। নিষ্পত্তিমূলক খেলায় মার্শালের বিপক্ষে জোন্সের সর্ব্বাধিক ব্রেকের রেকর্ড (৪৮৯) বিবেচনা করা হয়নি, কারণ এই রেকর্ড মূলপ্রতিযোগিতায় হয়নি।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় যে সাতজন প্রতিযোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই চারজন ছিলেন ভূতপূর্ব্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ঃ অষ্ট্রেলিয়ার বব্ মার্শাল (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫১) এবং টম ক্লিয়ারি (১৯৫৪), ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স (১৯৫৮) এবং ইংল্যাণ্ডের হার্বাট বিথাম (১৯৬০)।

চূড়ান্ত ফলাফল

১ম বব্ মার্শাল (অষ্ট্রেলিয়া), ২য় উইলসন জোন্স (ভারতবর্ষ), ৩য় টম ক্লিয়ারি (অষ্ট্রেলিয়া), ৪র্থ হার্বাট বিথাম (ইংল্যাণ্ড), ৫ম সোমনাথ ব্যানার্জি (ভারতবর্ষ), ৬ষ্ঠ রসিদ করিম (পাকিস্তান) এবং ৭ম বিল হারকোর্ট (নিউজিল্যাণ্ড)।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

ত্রিবেন্দ্রামে অনুষ্ঠিত উনবিংশ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে, মহিলা এবং বালক বিভাগে পশ্চিম বাংলা প্রথম স্থান লাভ করেছে। দেশের আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক বছরের পুরুষ বিভাগের বিজয়ী সার্ভিসেস দল আলোচ্য বছরে যোগ দান করেনি। বাংলার প্রতিনিধি নিমাই দাস পুরুষ বিভাগে তিনটি স্থান লাভ করেন। বাংলা নিম্ন লিখিত অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে ঃ

পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ঃ নিমাই দাস। সময় ঃ ৫ মিঃ ১৮.৪ সেঃ

১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ঃ নিমাই দাস। সময় ঃ ২১ মিঃ ২৫.৩ সেঃ

২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : নিমাই দাস। সময় : ২ মিঃ ২৪.৫ সেঃ

৪ × ১০০ রিলে : বাংলা

মহিলা বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : গীতা দে। সময় : ৬ মিঃ ৩৯.৪ সেঃ

১০০ মিটার বুক সাঁতার : গীতা দে। সময় : ৪১.২ সেঃ

১০০ মিটার ব্যাকষ্ট্রোক : শিবানী দত্ত। সময় : ১ মিঃ ৩৬.৭ সেঃ

বালক বিভাগ

১০০ মিটার বুক সাঁতার : স্বনীল বিশ্বাস। সময় : ১ মিঃ ২৭.২ সেঃ

জুনিয়ার বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : অনিল মজুমদার। সময় : ৫ মিঃ ৪৭.৮ সেঃ

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : তড়িৎ সাহা। সময় : ১ মিঃ ২২ সেঃ

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : তড়িৎ সাহা। সময় : ১ মিঃ ৯ সেঃ

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম রেলওয়ে ৫৭, ২য় বোম্বাই ৪৩, ৩য় বাংলা ১৮, ৪র্থ মহারাষ্ট্র ১০, ৫ম কেরালা ৯, ৬ষ্ঠ ইউ পি ৬, ৭ম দিল্লী ১।

বালক বিভাগ : ১ম বাংলা ৩৮, ২য় বোম্বাই ১৭, ৩য় ইউ পি ৪, ৪র্থ কেরালা ৩ এবং ৫ম মহারাষ্ট্র ১।

মহিলা বিভাগ : ১ম বাংলা ৩২, ২য় বোম্বাই ১৯ এবং ৩য় মহারাষ্ট্র ৮।

রোভার্স কাপ

বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হতে চলেছে, কেবল ফাইনাল খেলা বাকি। কোয়ার্টার-ফাইনালে আটটি দলের মধ্যে কলকাতার এই তিনটি দল ছিল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং বি এন আর দল। ইস্টবেঙ্গল ৪—১ গোলে হায়দরাবাদের পুলিশ লাইন্সকে এবং বি এন আর ২—০ গোলে ক্যালটেক্স স্পোর্টস দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে যায়। কিন্তু মোহনবাগান ১—২ গোলে টাটা স্পোর্টস দলের কাছে পরাজিত হয়। একদিকের সেমি ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দল ১—০ গোলে বি এন আর দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে; অপরদিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল ৪—০ গোলে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস দলকে পরাজিত করে।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল	৪	:	হায়দরাবাদ পুলিশ লাইন্স ১
টাটা স্পোর্টস	২	:	মোহনবাগান ১
বি এন আর	২	:	ক্যালটেক্স স্পোর্টস ০
অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ	৫	:	মফৎলাল মিলস ০

সেমি ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল	১	:	বি এন আর ০
অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ	৪	:	টাটা স্পোর্টস ০

ভারত বনাম সিংহলের মুষ্টিযুদ্ধ :

ক'লকাতায় ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের চতুর্থ বার্ষিক মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ১০—৫ লড়াইয়ে সিংহলকে পরাজিত করেছে। এই দুই দেশের বার্ষিক মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়লাভ। ইতিপূর্বে সিংহল ১৯৫৯ সালে ৯—৬ লড়াইয়ে, ১৯৬০ সালে ৮—৭ লড়াইয়ে এবং ১৯৬১ সালে ৮—৬ লড়াইয়ে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে উপর্যুপরি তিন বার জয় লাভ করেছিল।

১৯৬২ সালের মুষ্টিযুদ্ধে ভারতবর্ষের অধিনায়ক সমর মিত্র সিনিয়র বিভাগে এবং সিংহলের নোয়েল বুলনার জুনিয়র বিভাগে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার পুরস্কার পান। দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে ভারতবর্ষ এন ডি গুনশেখর কাপ জয় করে।

ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানী :

পশ্চিম জার্মানী থেকে একটি এ্যাথলেটিক দল সম্প্রতি ভারতবর্ষ সফর করে গেল। এই দলটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মোট সাতটি টেস্ট অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের থেকে বেশী সংখ্যক প্রথম স্থান লাভ করে। পশ্চিম জার্মানীর শক্তিশালী দল ছিল না। ভারতবর্ষের ক্রীড়া-মান লক্ষ্য ক'রে পশ্চিম জার্মানীর বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ্যাথলেটদের দলভুক্ত করা হয়নি। এই দলে সতেরজন এ্যাথলিট ছিলেন। সাতটি টেস্ট অনুষ্ঠানের মোট ১২৩টি প্রথম স্থানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ৮৩টি এবং ভারতবর্ষ ৩৯টি প্রথম স্থান লাভ করে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত